ভারতবর্ষ

সম্পাদক—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

একপঞ্চাশত্তম বর্ষ, প্রথম খণ্ড ; আষাঢ়—অগ্রহায়ণ ১৩৭১

লেখ-সূচী—বর্ণানুক্রমিক

অগ্রাবনীর (উপন্যাস)—শ্রীদিলীপকুমার রায় ১৪৮, ২৮৪, ৬৩২, ৭৫২
অভিযাত্র (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ১৮
অতীতের স্মৃতি (আলোচনা)—
পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায় ৮৬, ১৯৯, ৩৪৯, ৫৩৩, ৭০৬, ৮১১
অভিমান (একাঙ্কিকা)—নারায়ণ চক্রবর্ত্তী ... ২১৪
অবশেষে (গল্প)—বুদ্ধদেব গুহ ... ২৩৮
অমনোনীত কবিতা (কবিতা)—কানাই বসু — ৩৬০
অপরাধ (গল্প)—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ... ৪৫৮
অন্তঃসলিলা (গল্প)—
শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৭৬
অভিমান (কবিতা)—সুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত ... ৬০৩
অলাবু (কবিতা)—নচিকেতা ভরদ্বাজ ... ৭০৮
অসুরের দেশে সুমেন বংশ (প্রবন্ধ)—
শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ... ৭৬৬
শ্রীঅরবিন্দের 'শিব' (প্রবন্ধ)—
সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮৪৪
আঁশা কুঁড়ি চোখ মেলো (কবিতা)—
রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১১৫
আশুতোষ (প্রবন্ধ)—
শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৫৮
আচার্য্য শঙ্কর (প্রবন্ধ)—
শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৪২
আগমনী গান (প্রবন্ধ)—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ৪৬৫
আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর (কবিতা)—
প্রসিত রায়চৌধুরী ... ৪৭৭
আধুনিক বাংলা কবি গান (প্রবন্ধ)—
পরমানন্দ হালদার ... ৭০৯
উদ্ভট কাহিনী (গল্প)—পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য ... ৮৯
ঋগ্বেদে দেবী উমা (প্রবন্ধ)—
শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী ... ৪১০
এমন কেন হয় (কবিতা)—লক্ষ্মীকান্ত রায় ... ২৬৪
এই ত জীবন (গল্প)—শ্রীমধুমা ঘোষ ... ২৬৫
ওরে বৃষ্টি (কবিতা)—শিশির মুখোপাধ্যায় ... ২৬৪
কিশোর জগৎ ... ৭৩৮১৯
(ক) নব ভারতের জীবন পুরোহিত
(খ) কাউন্ট অফ মণ্টিক্রিষ্টো
(গ) ছুটীর ঘণ্টায়
(ঘ) ধাঁধা ও হেঁয়ালী ... ২০২
কবি লেখে কেমন (প্রবন্ধ)—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ... ৯৬
কোষ্ঠীর বিচার—জ্যোতি বাচস্পতি ১৩১, ২৫৬, ৪০২
কলানবগ্রাম শিক্ষা নিকেতন (প্রবন্ধ)—পথিক ... ১৭৫
কিশোর জগৎ
(ক) পরলোকে পরিচালক
(খ) বিষলতা—ইত্যাদি
কবি ঈশ্বর গুপ্ত (প্রবন্ধ)—জগবন্ধু নাথ ... ২৯৪
কেপ গোটেল (কবিতা)—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ... ৩০৭
কিশোর জগৎ ... ৩৬১
(ক) আদর্শ—শ্রীজ্ঞান
বিলটু বাহক, বিচার ইত্যাদি
কীটসের কাব্য (প্রবন্ধ)...অরুণ দে ... ৪৮৩
কুঞ্জমামা (কাহিনী)—অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় ... ৫৫২
কিশোর জগৎ— ... ৫০২
(ক) পূজার প্রার্থনা—শ্রীজ্ঞান
(খ) বাজছে পূজার বাঁশী ইত্যাদি
(গ) দামাল সুরেশ (নাটিকা)—শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
কাব্য চর্চা (কবিতা)—অক্রূরচন্দ্র ধর ... ৬৭৮
কিশোর জগৎ ... ৬৮৯
(ক) গবেষণা ও শিক্ষা—শ্রীজ্ঞান
(ক) পূজার পরে—শ্রীজ্ঞান
(খ) ত্রিবিক্রম ভট্টাচার্য্য
কলম্বাসের পূর্বে আমেরিকা আবিষ্কার (প্রবন্ধ)—
শ্রীভগবতদাস বরাট ... ৭৮৫
কালো ঘোড়ার দাপট (চিত্র)—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা ... ৮৪৫
কোষ্ঠির বিচার—জ্যোতি বাচস্পতি ... ৮৫৫
খেলাধুলা—শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায় ১৪৩, ২৭৯, ৪০৫, ৭৪৫ ৮৬১
খেলার কথা—শ্রীক্ষেত্রনাথ রায়— ১৪৩, ২৭৯, ৪০৫, ৭৪৫

অস্ট্রেলিয়া : ৩৫২ রান (বব সিম্পসন ১৫৩ এবং পিটার বার্জ ৫৪ রান। সৈয়দ আমেদ ৪১ রানে ৩ উইকেট পান) ও ২২৭ রান (২ উইকেটে। সিম্পসন ১১৫ রান। রেডপাথ নটআউট ৪০ এবং বার্জ নটআউট ২৮ রান)।

সন্তোষ ট্রফি :

গৌহাটিতে নেহরু স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ২১তম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে রেলওয়ে দল ২—১ গোলে বাংলাকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় বার সন্তোষ ট্রফি জয়ের গৌরব লাভ করে। ১৯৬০ সালে রেলদল প্রথম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় প্রথম যোগদান ক'রে ১৯৬১ সালে প্রথম সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়। বাংলা দল এই নিয়ে ১৬বার ফাইনালে খেলে পাঁচবার রানার্স-আপ হ'ল। বাংলা ১১ বার (রেকর্ড) সন্তোষ ট্রফি জয়ী হয়েছে।

সুব্রত মুখার্জি কাপ :

১৯৬৪ সালের অল্ ইণ্ডিয়া স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে গোর্খা মিলিটারী স্কুল (দেরাদুন) ৪—২ গোলে বোম্বাইয়ের আঞ্জুমান-ই-ইসলাম স্কুলকে পরাজিত ক'রে সুব্রত মুখার্জি কাপ জয়ী হয়েছে।

মোহনবাগান ক্লাব :

সর্বজনপ্রিয় মোহনবাগান ক্লাবের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে যে আড়ম্বরপূর্ণ জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল তা আজ শেষ পর্য্যায়ে এসে পৌঁছেচে। গত ৫ই নভেম্বর মোহনবাগান ক্লাবের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে পূজা-হোম, মশাল নিয়ে রাজপথে দৌড়, কুচকাওয়াজ, তোপধ্বনি, শপথ গ্রহণ এবং পূতাগ্নি প্রজ্বলন অনুষ্ঠান মহাসমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

এই জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জার্মানী বনাম ভারতবর্ষের দ্বৈত এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠান, ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল বনাম মোহনবাগান দলের প্রদর্শনী হকি খেলা, হাঙ্গেরী বনাম মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং ভারতীয় দলের তিনটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রখ্যাত খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত কমনওয়েলথ দলের সঙ্গে মোহনবাগান জুবিলী-কমিটির সভাপতির একাদশ দলের তিনদিনের ক্রিকেট খেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর একাদশ দলের পাঁচদিনের এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার আয়োজন করা হয়েছে।

বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকগণের প্রতি

অগ্রহায়ণ মাসে যে সকল বাৎসরিক ও ষাণ্মাসিক গ্রাহকের চাঁদার টাকা শেষ হইয়াছে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ৭ই পৌষের পূর্বে মনিঅর্ডার যোগে বাৎসরিক ১৫৲ টাকা অথবা ষাণ্মাসিক ৭·৫০ টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা চাঁদা পাঠাইয়া দিবেন। টাকা পাঠাইবার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করিবেন। ডাকবিভাগের নিয়মানুযায়ী ভি, পি,তে কাগজ পাঠাইতে হইলে, পূর্বাহ্নে আদেশপত্র পাওয়া প্রয়োজন। ভি, পি, খরচ পৃথক লাগিবে। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন তাঁহারা মনিঅর্ডার কুপনে 'নূতন গ্রাহক' কথাটি উল্লেখ করিবেন।

কর্মাধ্যক্ষ—**ভারতবর্ষ**

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩/১/১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১০।১২।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

গৃহত্যাগ (নাটিকা)—কানাই বসু ... ৩৮
গ্রন্থজগৎ— ১২৫, ২৫২, ৩৯৬, ৫৯২, ৭৩৬
গৃহসজ্জা (গল্প)—অরবিন্দ ভট্টাচার্য্য ... ৩৮১
গান—কথা—শ্রীঅখিল নিয়োগী
সুর ও স্বরলিপি—ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত ... ৬৮২
গান ও স্বরলিপি—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৪৭৩
গান—অনুরূপা দেবী
স্বরলিপি—রবীন্দ্রমোহন বসু ... ৫৯১
গান—কথা—কামাখ্যা সরকার ... ৮২৭
ঘুড়ির কথা—পৃথ্বী দেবশর্মা বিরচিত ৮১, ৩৬৯, ৬৯৭,
ঘরে বাইরে (প্রবন্ধ)—অর্চনা মজুমদার ... ১৬৬
চন্দ্রশেখরের বঙ্কিমচন্দ্র (প্রবন্ধ)—পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ... ৬৩
ছায়াঘর (কবিতা)—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ... ৪৪৭
ছায়া নেই শুধু আলো—(কবিতা)—
গোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায় ... ৫৬৭
জহর তিলক (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ... ৫
জাতীয় সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল (প্রবন্ধ)
অম্বিকাচরণ চৌধুরী ... ১৫
জহরলাল নেহরু ... ১৩৪
জলে ডাঙ্গায় (চিত্র)—আব্রাহাম ৩৭০, ৫২২
জোড়া খুনের মামলা (কাহিনী)—ডঃ পঞ্চানন ঘোষাল ... ৫৮৪
জীবন নদীর কূলে কূলে (কবিতা)—
শ্রীশক্তিপদ মুখোপাধ্যায় ... ৭৬২
জীবনী সাহিত্যে বসওয়েল ও শ্রীম (প্রবন্ধ)—
শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ... ৭৮১
জিজ্ঞাসা (কবিতা)—হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৮০০
জাতিস্মর (কবিতা)—শ্রীআশুতোষ সান্যাল ... ৮৩২
টেষ্ট টিউব (একাঙ্ক নাটিকা)—নারায়ণ চক্রবর্তী ... ৭৮৭
ঠগ (গল্প) রথীন সরকার ... ৮০৯
ডেহরী অন সোন (কবিতা)—মণীন্দ্র দত্ত ... ৯৫
ডিথিরাম্বে (প্রবন্ধ)—শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত ... ১৭১
ডিসট্যান্ট সিগনাল (গল্প)—সমীর চট্টোপাধ্যায় ... ৩৭১
ঢেউ (গল্প)—অনিলকুমার ভট্টাচার্য্য ... ৪৪৮
তুমি নেই (কবিতা)—রতনচন্দ্র দাস ... ১৭০
তাঞ্জোর (ভ্রমণ)—দেবেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ... ১৯৬
ত্যাগ (প্রবন্ধ)—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ... ৪২৪
তোমাদের কাছে (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী ... ৪৯৮
তোমাকে (কবিতা)—হাসিরাশি দেবী ... ৬৮৮
দেহের ভার (কবিতা)—অমিতাভ বসু ... ৯৫
দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ২৭০
দুই তীর (কবিতা)—প্রতীশ দাশগুপ্ত ... ৩৪৪
দুঃস্বপ্ন ডিকটেটার (গল্প)—শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৪২০
দুর্গানামের কথা (প্রবন্ধ)—সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ... ৫২৭
দক্ষিণ পূর্ব্ব এসিয়া (প্রবন্ধ)—রমেশচন্দ্র মজুমদার ... ৫৬৮
দুয়োরাণী (গল্প)—কানাই বসু ... ৬৫৪
দোপাটি (কবিতা)—মিনতি পাল ... ৭৮৬
দেস্‌দিমোনা (কবিতা)—শ্রীসুধীর গুপ্ত ... ৮৪৯
ধাত্রীরূপা (কবিতা)—বীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার ... ৬৪০
নির্বিকল্প সমাধি (প্রবন্ধ)—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ১
নেহেরু স্মরণে (কবিতা)—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ... ২৭
নেহরু উইল (কবিতা)—পুষ্প দেবী ... ২৭
নিরুদ্দিষ্ট কবি কণ্ঠ (কবিতা)—হরি ভৌমিক ... ৬১
নতুন পৃথিবী (কবিতা)—রবি গঙ্গোপাধ্যায় ... ৬৬
নীলমণি বাই লেন (কবিতা)—বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ... ২৫৮
নিঃশেষিত প্রেম (কবিতা)—ভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত ... ৩০২
নেশা (গল্প)—মধুকর ... ৮৫০
পত্রাবলী ও ছিন্নপত্র (প্রবন্ধ)
প্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ২৮
পট ও পীট—'শ্রীশ' ১৩৭, ২৭৩, ৩৯৩, ৭৪০, ৮৫৯
প্রীতির ক্রমবিকাশ (প্রবন্ধ)
শ্রীসুধাংশুকান্তি ভক্তিবিলাস ... ১৪৫
পুতুলের ইতিকথা (চিত্র)—দেবশর্মা বিরচিত ... ২০৮
পুরীতে সংস্কৃত নাটক (প্রবন্ধ)—অনাথশরণ কাব্যতীর্থ ... ২১২
পশ্চিমবাংলার হস্তশিল্প (প্রবন্ধ)—কাশ্যপ শর্মা ২৩৫, ৬৪৯
পটুয়া (প্রবন্ধ)—শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ... ৪৪৫
প্রার্থনা (কবিতা)—শান্তি মুখোপাধ্যায় ... ৫৩১
প্রশ্রয় (গল্প)—মায়া বসু ... ৫৫৯
পত্রলেখা (গল্প)—শৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায় ... ৫৯৯
পল্লীকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ (প্রবন্ধ)
শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ৬২৫
পূর্ণকুম্ভ (গল্প)—বিমানকুমার রাজগুরু ... ৮২৯
প্রতিশ্রুতি পালন (গল্প)—চাঁদমোহন চক্রবর্তী ... ৭৩৯
ফিরায়ে দিয়েছি যারে (কবিতা)—মন্দাকিনী দেবী ... ৬৩১
ফুল (গল্প)—অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ... ৭৭৩
বেদনা অশ্রু (কবিতা)—হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২৮৩
বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রনাথ সেন ... ২৯৮
বাংলার চর্য্যাপদ (প্রবন্ধ)—দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৩৪৭
বর্ষা (কবিতা)—কুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৩৭৪
বন্দনা (কবিতা)—মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ... ৪৪১
বেদান্ত দর্শনে নেতাজী (প্রবন্ধ)—কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য ... ৫৯৬
বেদ ও প্রাচীন শাস্ত্রে স্বদেশ প্রেম (প্রবন্ধ)—
শ্রীমতী রেখা সিংহ ... ৭৪৭
বিবেকানন্দ (কবিতা)—তারকপ্রসাদ ঘোষ ... ৬৪৮
ভিক্টোরিয় যুগচেতনা (প্রবন্ধ)
বাংলার চর্য্যাপদ (প্রবন্ধ)—ডঃ দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭৬১
রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২০৯
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (প্রবন্ধ)—
শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ... ৮০৪
বাস্তযন্ত্রের কথা—চিত্র ... ৮২৬
বিশুদ্ধি (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৭৮৪
ভেজাল বিভ্রাট (চিত্র) ... ৩৮১
ভল্টুর সঙ্গে প্রথম মোলাকাত (শিকার)
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ৪৬৭
মার্কোপোলের দৃষ্টিতে ভারত (প্রবন্ধ)
স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ৬৭
মেয়েদের কথা— ... ১০০
(ক) আত্ম বিশ্লেষণ
(খ) আনন্দলতিকার জন্ম
(গ) প্রসূতি পরিচর্য্যা ও শিশু-মঙ্গল
(ঘ) ষ্টেনসিলের কারুকার্য্য
(ঙ) এমব্রয়ডারির নূতন নক্সা
(চ) রূপ চর্চা

(চ) রান্নাঘর
ম্যাদাম ফু-লুসি (অনুবাদ গল্প)—সুনীলকুমার দাস ... ১১৬
মধুসূদনের সৌন্দর্য্য চেতনা (প্রবন্ধ)
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য ... ১৬১
মেয়েদের কথা— ... ২২৫
(ক) শিক্ষার সমস্যা
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা
(গ) রূপ চর্চ্চা ইত্যাদি
মেয়েদের কথা— ... ৩৮৪
(ক) শিক্ষার সমস্যা
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা প্রভৃতি
মর্ত্ত (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৪২৫
মনের ঠিকানা (গল্প)—শক্তিপদ রাজগুরু ... ৪৩৪
মসজীদ (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ... ৫৪৩
মেয়েদের কথা— ... ৫৪৪
(ক) পিতাপতি বিরোধে তু
মিল (গল্প)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৫৭৩
মেয়েদের কথা— ... ৭১৫
(ক) আধুনিকতা
মেয়েদের কথা— ... ৮৩৩
(ক) পাত্রী ও পছন্দ—মীরা ঘোষ
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল
কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) রূপ চর্চ্চা—সুপর্ণা দেবী
(ঘ) কাদা-মাটির কারু-শিল্প—রুচিরা দেবী
(ঙ) পশমী-সুতোর বোনা শীতের কার্ডিগ্যান-জ্যাকেট
হিরণ্ময়ী দেবী
(চ) রান্নাঘর—সুধীরা হালদার ৮৬৪
মার্জার কথা (রম্যরচনা)—রমেশ মজুমদার ... ৮৬৪
যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (কবিতা)—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ২১৯
যোগজীবন (প্রবন্ধ)—বিমলানন্দ স্বামী ... ২৮১
যতীন্দ্রবিমল (জীবনী)—ধ্যানেশনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ... ৩১৮
রোমান্টিক যুগ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ (প্রবন্ধ)
অরুণ দে ... ৩৪
রামকৃষ্ণের দর্শন (প্রবন্ধ)—জিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ... ২৫৯
রেলের রাত্রি (বিবরণ)—শ, ক, চ ... ২৭১
রসকলি (গল্প)—ভক্তপ্রসাদ রায় ... ৩২২
রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)—অজিত ভট্টাচার্য্য ... ৩৪৫
রামের সুমতির অভিনয় (বিবরণ)—লীলা বিশ্বাস ... ৩৫৩
রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবী আরাধনা (প্রবন্ধ)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৪২৬
রবীন্দ্রনাথ ও গীতা (প্রবন্ধ)—সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৩১
রেশ (গল্প)—তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ... ৬৪৬
রোগ ও মনের কথা (প্রবন্ধ)—স্বামী মনোতোষ রায় ... ৪৭৯
রিলিফ (গল্প)—সুনীল রায় ... ৫৯৮
হুগলী নামের উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—
শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭০

লাঙ্গল স্রষ্টা কেদারনাথ (প্রবন্ধ)—
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ...
শ্রীরাধা—স্বরলিপি ও গান—শ্রীদিলীপকুমার রায় ...
শ্রেয়সী (কবিতা)—ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায় ...
শ্রীশ্রীচণ্ডী— ...
শেষ প্রশ্ন (প্রবন্ধ)—ডাঃ মতিলাল দাস ...
শেষ অংক (গল্প)—অজিত চট্টোপাধ্যায় ...
শাশ্বত (কবিতা)—শান্তশীল দাশ ...
সারারাত (কবিতা)—শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...
সীমা রেখা (কবিতা)—হরিসাধন দোলুই ...
সিড়ি (গল্প)—সঙ্কর্ষণ রায় ...
সাময়িকী— ১২০, ২৪২, ৩৭৪, ৫৭৮, ৭২৭, ১
সেক্সপীয়ার (কবিতা)—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ...
সেদিনের স্মৃতি (কবিতা)—অসিতবরণ চৌধুরী ...
সুতনুকা (গল্প)—মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ...
সাহসিকা আধুনিকা (চিত্র)—পৃথ্বীশ দেবশর্ম্মা ...
সাগর সঙ্গমে (ভ্রমণ)—প্রবোধ রাউত ...
সাহিত্য সংবাদ— ...
সেক্সপীয়ারের কবিতা (সংস্কৃত অনুবাদ)—
ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ... ৪
স্রেফ তেল দিয়ে (রসরচনা ও চিত্র)—শ্রীঅখিল নিয়োগী ... ৪
সদাশিব ও আজ উদ্বাস্তু (রসরচনা)—চৈতন্যচরণ বড়াল ... ৪
স্বপ্ন শেষ (কবিতা)—আশুতোষ সান্যাল ...
স্বামজীর যতবাদ (প্রবন্ধ)—সুনীলকুমার ঘোষ ... ৬
সেক্সপীয়ার (কবিতা)—অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত ... ৭
স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)—সমর দত্ত ... ৮
স্বরলিপি—কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়
ক্ষণপ্রভা (গল্প)—অরুণ দে ... ১
১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ (প্রবন্ধ)—
শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য ... ৪

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

আষাঢ়—বহুবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—২
শ্রাবণ—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—৮
ভাদ্র—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—৫
আশ্বিন—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—২০
কার্ত্তিক—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—১০
অগ্রহায়ণ—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—১০

আষাঢ়—১৩৭১

প্রথম খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | প্রথম সংখ্যা

নির্বিকল্প সমাধি

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন সমস্ত যোগই কঠিন, কারণ প্রত্যেক যোগেরই চরম লক্ষ্য নিরাকার পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করা (All zoga is difficult, because the aim of every zoga is to reach the Divine—Sri Aurobindo) এবং এই পরমেশ্বরকেই বিভিন্ন ভাষায় পরব্রহ্ম, পুরুষোত্তম, পরম শিব বা আদি কৃষ্ণ বলা হয়েছে, তত্ত্বত তা একই। শ্রীঅরবিন্দ আরো বলেছেন এ তত্ত্ব কেউ কাউকে দিতে পারে না, এর জন্য বিশেষ প্রস্তুতির প্রয়োজন, সুদীর্ঘকাল তপস্যার প্রয়োজন এবং উপযুক্ত আধারেরও প্রয়োজন; স্বামী বিবেকানন্দের মত অত বড় বিরাট আধারও প্রথমে এই অদ্বৈতানুভূতি সহ্য করতে পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যায় এ তত্ত্ব লাভ করতে বিরাট প্রস্তুতির ও উপযুক্ত আধারের প্রয়োজন। বুদ্ধদেবও বলেছেন তোমাদের চেষ্টা করতে হবে, তথাগত প্রচারক মাত্র ("Your feet must tread the path, the Tathagata can ony point the way', H. Dutta)। তিনি আরো বলেছেন জেনে রেখো, তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রকৃত কল্যাণ নিহিত নেই বরং অষ্টাঙ্গ আদর্শের সাধনাই এদের প্রকৃত কল্যাণ" (শঙ্কর বসু) অর্থাৎ খালি শব্দালাপে কিছুই হয় না, তার জন্য কঠোর তপস্যা করতে হয়, গুরু পথ দেখান মাত্র। সাধনার পথ সকলকেই বলেছেন সঙ্কটময় এবং বিনা কষ্টে তা কেউই

(চ) রান্নাঘর

মাদাম দু-লুসি (অনুবাদ গল্প)—সুনীলকুমার দাস ... ১১৬

মধুসূদনের সৌন্দর্য্য চেতনা (প্রবন্ধ)
শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য্য ... ১৬১

মেয়েদের কথা— ... ২২৫
(ক) শিক্ষার সমস্যা
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা
(গ) রূপ চর্চা ইত্যাদি

মেয়েদের কথা— ... ৩৮৪
(ক) শিক্ষার সমস্যা
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা প্রভৃতি

মর্ত্ত (কবিতা)—শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক ... ৪২৫

মনের ঠিকানা (গল্প)—শক্তিপদ রাজগুরু ... ৪৩৪

মন্দলীন (কবিতা)—সুধীর গুপ্ত ... ৫৪৩

মেয়েদের কথা— ... ৫৪৪
(ক) পিতাপতি বিরোধে ভু

মিল (গল্প)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র ... ৫৭৩

মেয়েদের কথা— ... ৭১৫
(ক) আধুনিকতা

মেয়েদের কথা— ... ৮৩৩
(ক) পাত্রী ও পছন্দ—মীরা ঘোষ
(খ) প্রসূতি পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল
কুমারেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
(গ) রূপ চর্চা—সুপর্ণা দেবী
(ঘ) কাদা-মাটির কারু-শিল্প—রুচিরা দেবী
(ঙ) পশমী-সুতোয় বোনা শীতের কার্ডিগ্যান-জ্যাকেট
হিরণ্ময়ী দেবী
(চ) রান্নাঘর—সুধীরা হালদার ... ৮৬৪

মার্জার কথা (রম্যরচনা)—রমেশ মজুমদার ... ৮৬৪

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী (কবিতা)—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য ... ২৯৬

যোগজীবন (প্রবন্ধ)—বিমলানন্দ স্বামী ... ২৮১

যতীন্দ্রবিমল (জীবনী)—ধ্যানেশনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ... ৩১৮

রোমাণ্টিক যুগ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থ (প্রবন্ধ)
অরুণ দে ... ৩৪

রামকৃষ্ণ দর্শন (প্রবন্ধ)—হিতেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার ... ২৫৯

রেলের রাত্রি (বিবরণ)—শ, ক, চ ... ২৭১

রসকলি (গল্প)—গুরুপ্রসাদ রায় ... ৩২২

রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র (প্রবন্ধ)—অজিত ভট্টাচার্য্য ... ৩৪৫

রামের সুমতির অভিনয় (বিবরণ)—লীলা বিশ্বাস ... ৩৫৩

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেবী আরাধনা (প্রবন্ধ)—কেশবচন্দ্র গুপ্ত ... ৪২৬

রবীন্দ্রনাথ ও গীতা (প্রবন্ধ)—সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৪৩১

রেণ (গল্প)—তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী ... ৬৪৬

রোগ ও মনের কথা (প্রবন্ধ)—শ্রীশ্রী মনোতোষ রায় ... ৪৭৯

রিলিফ (গল্প)—সুনীল রায় ... ৫৯৮

হুগলী নামের উৎপত্তি (প্রবন্ধ)—
শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ... ৭০

লাঙ্গুল প্রষ্টা কেদারনাথ (প্রবন্ধ)—
শ্রীসন্তোষকুমার অধিকারী ... ৬৮৬

শ্রীরাধা—স্বরলিপি ও গান—শ্রীদিলীপকুমার রায় ... ৩২

শ্রেয়সী (কবিতা)—ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায় ... ২১১

শ্রীশ্রীচণ্ডী— ... ৪০৯

শেষ প্রশ্ন (প্রবন্ধ)—ডাঃ মতিলাল দাস ... ৪০৪

শেষ অংক (গল্প)—অজিত চট্টোপাধ্যায় ... ৫২৩

শাশ্বত (কবিতা)—শান্তশীল দাশ ... ৮৩২

সারারাত (কবিতা)—শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ... ৩৭

সীমা রেখা (কবিতা)—হরিসাধন দোলুই ... ৬১

সিঁড়ি (গল্প)—সঙ্কর্ষণ রায় ... ৮২

সাময়িকী— ১২০, ২৪২, ৩৭৪, ৫৭৮, ৭২৭, ৮৪৬

সেক্সপীয়ার (কবিতা)—হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৩৬

সেদিনের স্মৃতি (কবিতা)—অসিতবরণ চৌধুরী ... ১৭৪

সুতনুকা (গল্প)—মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ... ১৮০

সাহসিকা আধুনিকা (চিত্র)—পৃথ্বীশ দেবশর্ম্মা ... ২৪৮

সাগর সঙ্গমে (ভ্রমণ)—প্রবোধ রাউত ... ৩০৩

সাহিত্য সংবাদ— ... ৪০৮

সেক্সপীয়ারের কবিতা (সংস্কৃত অনুবাদ)—
ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী ... ৪৮২

স্রেফ তেল দিয়ে (রসরচনা ও চিত্র)—শ্রীঅখিল নিয়োগী ... ৪৮৬

সদাশিব ও আজ উদ্বাস্তু (রসরচনা)—চৈতন্যচরণ বড়াল ... ৪৩৬

স্বপ্ন শেষ (কবিতা)—আশুতোষ সান্যাল ... ১০৯

স্বামীজীর মতবাদ (প্রবন্ধ)—সুশীলকুমার ঘোষ ... ৬৪১

সেক্সপীয়ার (কবিতা)—অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত ... ৭৮০

স্বামী বিবেকানন্দ (প্রবন্ধ)—সমর দত্ত ... ৮১৫

স্বরলিপি—কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়

ক্ষণপ্রভা (গল্প)—অরুণ দে ... ১৬৪

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ (প্রবন্ধ)—
শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য ... ৪০৩

মাসানুক্রমিক—চিত্রসূচী

আষাঢ়—বহুবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—২

শ্রাবণ—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—৮

ভাদ্র—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—৫

আশ্বিন—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—২০

কার্ত্তিক—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—১০

অগ্রহায়ণ—দ্বিবর্ণ চিত্র—১, বিশেষ চিত্র—২, একবর্ণ চিত্র—১০

লাভ করেননি। শাস্ত্র বলেছে ক্ষুরস্য ধারা এ পথ, খৃষ্ট বলেছেন সিদ্ধি লাভ ঘটে অতি অল্প ভাগ্যবানেরই ভাগ্যে। (Straight is the gate and narrow is the way, and few there be that find it Chrıst) শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন "আত্মজ্ঞান লাভ করতে মাত্র একজন্ম নয় সাধারণতঃ কয়েক জন্মও পর্য্যাপ্ত নয়" (The whole life and Several lives are often not enough to achiveit. Sri Aurobindo). পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এবং যারা মনে করেন এ পথ কুসুমাবৃত তারা ভ্রান্ত।

চিত্তের পাঁচটি অবস্থা—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। এর মধ্যে ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত মনের পক্ষে যোগ অসম্ভব। একাগ্র চিত্তে (one-pointedness) যোগ সম্ভব। শেষেরটি নিরুদ্ধ বা চিত্তবৃত্তি নিরোধই যোগ। যোগ করতে হলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে হবেই। তা যে কোন যোগই হোক না কেন (যোগাশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ—১।২ পতঞ্জলি)। অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করা যায় না, মাত্র সমাধির মধ্য দিয়েই তা সম্ভব বা জ্ঞানচক্ষু দিয়েই তা লভ্য। বাহ্য চক্ষু দিয়ে মাত্র বাহ্য বস্তুই দেখা যায় কিন্তু জ্ঞানচক্ষু দিয়ে মাত্র অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব নয় বাহ্য বস্তুও দেখা যায়, এরই নাম দিব্যদৃষ্টি যার অপর নাম চেতনা (Consciousness); এর অর্থ এ নয় যে বাহ্য চক্ষু দিয়ে দেবদেবী দর্শন করা যায় না, তা সম্ভব হয় যখন তাঁরা আমাদের সামনে নেমে আসেন মাত্র এবং যার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে মাত্র। মহাপুরুষরা ইচ্ছা করলে এই দিব্য দৃষ্টি খুলে দিতে পারেন।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন ভগবানকে উপলব্ধি করবার বহু পথ আছে (There are a thousand ways of approaching and realising the Divine and each way has its own experiences—Sri Aurobindo) এবং প্রত্যেক পথই সত্য। সমাধি বহু প্রকারের সম্ভব। সমাধির পাঁচটি স্তরের কথা বলা হয়েছে—বাক্, মন, বুদ্ধি বা জ্ঞানাত্মা, মহত্তত্ত্ব ও শান্ত আত্মা। বাক্, মন, জ্ঞান ও মহত্তত্ত্বকে পতঞ্জলি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতানুগত সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপে বর্ণনা করেছেন। মহর্ষি পতঞ্জলির মতে ছয় প্রকার সমাধি আছে—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার, সানন্দ ও সস্মিত, এই ছয় প্রকার যোগের মধ্যে প্রথম চারটি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা। সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কোন না কোন আলম্বন থাকে কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কোন আলম্বন থাকে না। অর্থাৎ "সবিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, বিষয়ী ও বিষয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের প্রভেদ থাকে কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে এরূপ কিছুই থাকে না, সব একাকার হয়ে যায়—কোন ভেদ বা দ্বৈতভাব থাকে না।" সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাকান্তে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি তখন ত্রিপুটি ভেদ হইয়া যখন নিরাকার ব্রহ্মসত্তায় চিত্ত নিদিধ্যাসিত বা লয় হয়, তখন চিত্তে চিৎ-সত্তাই স্ফুরণ থাকে, বিষয়ের অধ্যাস থাকে না। অহং বা ব্যষ্টিবোধ থাকতে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করা অসম্ভব। যেমন অহং বা ব্যষ্টি সত্তা থাকতে নির্ব্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা অসম্ভব (There is no "one" in Nirvana.…So long as' "you" are there you haven't got Nirvana. one has to get rid of all attachments and ersonanitips be fore Nirvana can come and that is extremely difficult for one attached to a mental personality" Sri Aurobindo) যেমন ব্যষ্টি বা দ্বৈতবোধ থাকতে নির্ব্বাণ লাভ করা অসম্ভব এবং তা পেতে হলে সমস্ত রকম আসক্তি ও ব্যক্তিত্ব হতে আগে মুক্ত হতে হয়, তেমনিই নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করতে হলে ঐ অবস্থার অবশ্য প্রয়োজন, তার আগে নয়। এখানে একটা কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার যে সমস্ত সমাধিই একটি মধ্যবর্ত্তী চেতনা বা যার পথ মধ্যে দিয়েই মাত্র ইষ্টে পৌছান যায়। অনেকে নির্ব্বিকল্পসমাধিকে নির্ব্বাণের সঙ্গে এক করে ফেলেন অর্থাৎ নির্ব্বাণ ও নির্ব্বিকল্পসমাধি একই বলেন কিন্তু সত্যই তা নয়। নির্ব্বিকল্পসমাধির মধ্য দিয়েই নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হয় এটা শুধু আমার একারই নয় যাঁদের নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞানের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা সকলেই এ স্বীকার করবেন। তবে একথা সত্য নির্ব্বিকল্পসমাধিতে ইচ্ছা মতন নেমে আসা যায় বা তা থেকে নির্ব্বাণে যাওয়া যায় বা তা থেকে আসা যায়। নির্ব্বিকল্পসমাধিতে

নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞানের অংশ আছে, সেইমাত্র শুদ্ধচেতনা (pure consciousness) আমি বহুবার এটি পরীক্ষা করে দেখেছি নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ করতে সুদীর্ঘ কাল কঠোর তপস্যার প্রয়োজন এবং তার জন্য উপযুক্ত চেতনার ও প্রস্তুতির প্রয়োজন ("As for Nirvikalpa Samadhi ; it is the result of a long Sadhana in a consciousness prepared for it : Sri Arobindo) যেমন আত্মজ্ঞান লাভ করতে বহুজন্ম তপস্যার প্রয়োজন তেমনিই নির্ব্বিকল্পসমাধিলাভ করতে সময় লাগে। এক কথায় সমাধিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। সবিকল্প সমাধির প্রকার ভেদ আছে, নির্ব্বিকল্পে তা নেই। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বলতে পারি খাঁটি নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে হলে একমাত্র নির্ব্বিকল্পসমাধির মধ্য দিয়েই তা সম্ভব অন্য আর কোন সমাধির কথা আমি জানি না হয়তো তা অসম্ভবও নয়। ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই আধ্যাত্মিকতার প্রকৃত আদর্শ (The loss of the ego in the Divine is the spiritual ideal —Sri Aurobindo এবং একমাত্র নির্ব্বিকল্প সমাধিতেই তা সম্ভব কারণ অন্য আর সব সমাধিতেই দ্বৈতবোধ কম বেশী কিছু থাকবেই যা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অসম্ভব। নির্ব্বিকল্প সমাধি কেউ জোর করে ভাঙতে পারেনা, মারলে বা গায়ে আগুন দিলেও সমাধি ভঙ্গ হয় না কারণ তখন আর সে ব্যক্তি শরীরের ভিতর থাকে না (Nirvikalpa samadhi . now which one can not be awakened even by burning or branding i, e, a trance in which one has gone completely out of the body. It is a trance in which there is no formation or movement of the consciousness. It is supposed to be a complete absorption in the suonptior Turiya · there is no thought or movement of consciousness or awakeness of either inward or outward things—all is drawn up into a Supracosmic Beyond"—Sri Aurobindo) অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কোন শক্তি বা আকৃতি কোন দ্বৈত বোধ বলে কিছুই নেই সমস্তই তুরীয়ের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়।

"প্রভাশূন্যং মনঃ শূন্যং বুদ্ধি শূন্যং নিরাময়ং
সর্ব্বশূন্যং নিরাভাসম্ সমাধিকস্য লক্ষণম্।"

সমাধি অবস্থায় নাম রূপ প্রকারাদি, মনের সঙ্কল্প বিকল্প-সুখশক্তি ও জ্ঞানাশক্তি, এ সব আর থাকে না। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলে জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের ঊর্দ্ধে, গুণাতীত শুদ্ধ চৈতন্যই থাকে। স্বরূপানুভূতি। এটি অবশ্য নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা, কারণ "সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে কেবল ধ্যেয় বস্তুর রূপটি থাকে-গুরু ইষ্ট, ব্রহ্ম-ফলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, ধ্যাতা ও ধ্যেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে।"

চিত্তং চিত্তং বিজানীয়াৎ তকার রহিতং যদা।
তকারঃ বিষয়াধ্যাসেঃ জবা রাগঃ যথা মণৌ॥

"অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্ত তকার রহিত হইয়া চিতে পরিণত হয়। মায়া অধ্যাস হইলে চিত্ত, আর মায়া মুক্ত হইলে চিৎ হয়।" অর্থাৎ সবিকল্প সমাধিতে মায়া থাকে, দ্বৈত থাকে, মনের অংশ থাকে, তাই তাকে চিত্ত বলা হয়েছে-কিন্তু নির্ব্বিকল্প সমাধি মায়া-মুক্ত তাই চিৎ (pure consciousness) বলা হয়েছে তাকে। সবিকল্প সমাধিতে যা অনুভব করা যায় তা বর্ণনা করা সম্ভব কারণ সেখানে দ্রষ্টা ও দৃশ্যের ভেদ থাকে কিন্তু নির্ব্বিকল্পে তা থাকে না। তাই শাস্ত্রে বলেছেন—

সমাধি নির্ধৌত মলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ
সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা, তদা স্বয়ং তদন্তকরণেন
গৃহ্যতে॥

নির্ব্বিকল্প সমাধিতে "কোনরূপ বিশেষ-বিজ্ঞান থাকে না বা কোন কিছু সম্প্রজ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহা স্বয়ং মাত্র…স্বরূপবোধ মাত্র—স্বরূপ লাভেই জ্ঞান ক্রিয়ার জন্য যে সবিশেষ জ্ঞান বা সম্প্রজ্ঞান তাহা থাকেনা "ন তত্র বাগ্ গচ্ছতি নো মনঃ" "বাক্য মনের অতীত সে স্বরূপ।" মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ মোক্ষয়োঃ অমৃতবিন্দু উপনিষদ।

মনই মনুষ্যের মোক্ষ ও বন্ধনের হেতু, সমস্ত সমাধিতে

মনের অংশ থাকে, কাজেই এই সমস্ত সমাধি মুক্তি বা মোক্ষ দিতে পারেনা কেবলমাত্র নির্বিকল্প সমাধি ছাড়া। নির্বিকল্প সমাধিতে মনের অংশ বলে কিছুই নেই, অবিদ্যা বলে কিছুই নেই, মায়া মুক্ত জীব তখন জীবন্মুক্ত হন। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে যে নির্বাণ বা মোক্ষলাভ যাঁরা করেছেন তাঁরা আর জন্ম নেন না, তাঁরা লয় হয়ে যান। আমি বহুবার নির্বিকল্পে গিয়েছি লয় হয়ে যাইনি। বুদ্ধদেবের কৃপাও আমি পেয়েছি তিনি লয় হয়ে যাননি এবং শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন নির্বাণে মৃত্যুর পর মুক্ত জীবাত্মার লয় হয়ে যাবার পরও পুনরায় জন্ম নেওয়া সম্ভব (Souls which have passed into Nirvana may (not "must") return to complete the larger upward curve "Sri Aurobindo) অতএব নির্বিকল্প সমাধি বা নির্বাণ বা মোক্ষের নামে ভয় পাবার কিছুই নেই। মুক্তির পর মায়াবাদীরাও লীলাবাদীদের মত উপযুক্ত স্থানে আনন্দে বাস করতে পারে বা ইচ্ছা মত জন্ম নিতে পারে।

এখন লীলাবাদী ও মায়াবাদীর মধ্যে পার্থক্যের কথা এসে যায়। লীলাবাদীরা সৃষ্টির অতীত তত্ত্ব না জানলে বা সৃষ্টির অতীত যেতে না পারলে তাকে জন্ম নিতে বাধ্য হতে হয় এটা শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করেছেন। বৌদ্ধ বা মায়া তত্ত্ব সমস্ত সৃষ্টির অতীত তত্ত্ব যদিও এর পরও আরো এক চরম বা পরম পরব্রহ্ম তত্ত্ব আছে। মায়াবাদী বা বৌদ্ধদের এক মস্ত বড় সুবিধা এই যে একবার সিদ্ধি লাভ করতে পারলেই সে মুক্ত, তাঁর জন্ম তাঁর ইচ্ছাধীন। লীলাবাদী সৃষ্টির মধ্যে থাকেন তার তত্ত্ব ও প্রকৃতির মধ্যে মুক্ত হলেও বাধ্য হয়ে তাকে জন্ম নিতে হয়। খাঁটি মুক্ত হতে হলে হয় নির্বাণ বা পুরুষোত্তম তত্ত্বকে জানতে হবেই নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় আর অন্য কোন পথই নেই।

সিদ্ধিলাভের দুটি পথ আছে, একটি সহজ ও সরল, যা এই জন্মেই শীঘ্র সম্ভব, অপরটি কঠিন ক্ষুরধার দুর্গম পথ যা শেষ করতে হয়তো মাত্র এক জন্ম নয় কয়েক জন্ম লাগে। যারা অষ্টাঙ্গ যোগের পথে যেতে চেষ্টা করেন তাদের মধ্যে অতি অল্পই সুকঠোর তপস্যা করে সিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হন। গুরুকৃপা মন্ত্র বা দীক্ষা নিয়ে সিদ্ধি লাভ করেছেন এমন একজন শিষ্যও আমার চোখে পড়েনি ; যাঁরা সিদ্ধি লাভ করেছেন জানি তাঁরা বিধি-নির্দ্দিষ্ট অর্থাৎ জন্মাবার আগেই তা নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল এঁদের পক্ষে গুরুকৃপা বা মন্ত্রের বা দীক্ষার কোন কথাই ওঠেনা। এক কথায় ধ্যান ধারণা বা গুরু কৃপায় সিদ্ধিলাভ করা সুদুর্লভ আমার জানিত কেউই নেই। সেই জন্যই বলেছে "গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলে না এক।"

অন্য পথটি সরল যা এ জীবনেই সম্ভব এবং বিনা বিঘ্নে এবং কষ্টে। আমার গুরু মন্ত্র বা কৃপা বলে কোন প্রকারের সাহায্য মানুষের কাছ থেকে পাইনি। আমার প্রায় দশ মাস লেগেছিল নির্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে এবং তা আমি সহজেই অযাচিত ভাবেই পেয়েছিলাম, নির্বিকল্প ও অন্য সমাধিটির জন্য আমাকে কোন যত্ন বা চেষ্টা করতে হয়নি, তা আপনিই এসে গিয়েছিল। কৃপা আমি অবশ্য পেয়েছিলাম সিদ্ধির আগে মহাকালীর এবং সিদ্ধির পরে বুদ্ধদেবের। শ্রীঅরবিন্দের এক পত্রে "ওঁ" মন্ত্রটির সম্বন্ধে জানতে পারি যে মন্ত্রটি ঠিক মত জপ করতে পারলে নির্বাণ বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়, এর জন্য কারো কৃপা বা মন্ত্রের দরকার হয়না। ধ্যান ধারণা আমি করিনি, মাত্র মন্ত্রটি ঠিক মত জপ করেছি এবং চেষ্টা করেছি চেতনাকে মাথার উপর দিয়ে অর্থাৎ সহস্রার ভেদ করে বাইরে নিয়ে যেতে এবং প্রায় দশ মাসে আমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করি যদিও আমার লক্ষ্য ছিল পরব্রহ্ম।

প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য মুচ্যতে।

অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ২।২।৪—মুণ্ডকোপনিষদ।

"ওঙ্কারই ধনু, জীবাত্মাই বাণ, ব্রহ্ম উক্ত বাণের লক্ষ্য বলিয়া কথিত হন। প্রমাদহীন হইয়া ভেদ করিতে হইবে। অতঃপর বাণের ন্যায় তন্ময় অর্থাৎ লক্ষ্যের সহিত অভিন্ন হইবে।" স্বামী গম্ভীরানন্দ। ওঁ মন্ত্রটি স্বয়ং সিদ্ধ অর্থাৎ নির্বাণ বা নির্গুণ ব্রহ্মই ইহার মূলে লক্ষ্যস্থল, যদিও এক মাত্র নয়, মন্ত্রটি ঠিক মত জপ করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধির মধ্যদিয়ে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভব এবং এর জন্য কোন দীক্ষা কৃপা বা গুরুর প্রয়োজন নেই। যাদের একাগ্রতা (one pointedness), আছে বা এরূপ করা অভ্যাস আছে এবং যাদের ইচ্ছা তীব্র তারাই শীঘ্র সিদ্ধি

লাভ করেন। মহর্ষি পতঞ্জলিতে বলেছেন তস্য বাচকঃ প্রণবঃ ১।২৭, তীব্র সং বেগানাম'সন্ন—১।২১ এবং তজ্জপ স্তদর্থভাবনম্-১।২৮। "সাধ্য বস্তু সাধনা বিনা কেহ নাহি পায়" বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব এবং যারা নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে লেগে থাকেন তাদেরই মাত্র সিদ্ধিলাভ হয় pm who cleve to the path-stead fastly can be sure of ther spiritual destiny—Sri Auro bindo); যে কোন প্রকারেই হোক একবার শরীর থেকে চেতনাকে বার করে নিতে পারলেই তা সম্ভব। কি করে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ করা যায় এর উত্তরে রমণ মহর্ষি বলেছিলেন দৃশ্যময় জগতের বিলোপ ঘটলে তবেই ব্রহ্ম উপলব্ধি হয়।" ইহাই যোগের সোপান চিত্ত বৃত্তি বিরোধ যে যোগ তাতে সন্দেহই নেই, তবে এই চিত্ত নিরোধ ভগবানের উপর নির্ভর করলে বিনা চেষ্টায় আপনিই আসে এর জন্য বৃথা চেষ্টা করতে হয় না।

গুরু সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন "আত্মাই আত্মার নাথ, আত্মার বন্ধু (আত্তাহি-অত্তনো নাথো, সোহিনাথো পরো শিয়া); শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন "আপনিই আপনার গুরু" (আত্মনো গুরুরাত্মৈব) যারা ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে চলে তারা ঠকে না এবং বলতে পারে—

"The way. It opened wide
plain for all to tread easy and near.

Sir Edwin Arnold.

N. B, কতকগুলি উদ্ধৃতি আমি নিয়েছি, দুঃখের বিষয় নামগুলি মনে নেই।

জহর-তিলক

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

আজন্ম অলক্ষ্যে চিতা জ্বলিতেই থাকে,
সংখ্যাতীত নর-নারী ভস্ম হ'য়ে যায়।
চিতা-ভস্ম মহাকাল উড়ায়ে বাত্যায়
নিশ্চিহ্ন করে যে সবই; তবু তা'রই ফাঁকে
এ বিশ্বের চিতা-ভীত মানব-সভাকে
জ্বলন্ত জহর-দীপ্তি দিব্য গরিমায়
আচম্বিতে জীবনের বিজয়-টিকায়
দীপ্ত করে, প্রাণ-বহ্নি-পদ্ম ফোটে পাঁকে।
ভস্ম করি' কাল-চিতা প্রাণের অনলে,
খণ্ড-কালে সীমায়িত জীবন ঢালিয়া,
সেই কাল-চিতা-ভস্ম সঁপি' ভূমণ্ডলে
জীবনেরে যায় সে যে অমৃতত্ব দিয়া।
বিশ্ব-পথ ভরি' মৈত্রী-প্রীতি-পরিমলে
জহর-তিলক চলো সকলে পরিয়া।

(২)

ভাণ্ডে ভাণ্ডে চিতা-ভস্ম আহরণ করি'
তুঙ্গ শৃঙ্গে—মাঠে—বাটে—সঙ্গমে ছড়াও;
জহর-তিলক লক্ষ গ্রামেরে পরাও,
অমর সে মৈত্রী-প্রীতি এ-ভারত ভরি'
কোটি নব-জাতকের মাঝে মূর্ত্তি ধরি'
নন্দিত করুক্ বিশ্ব। ছড়াও—ছড়াও
তা'র শুভ্র স্বপ্ন যত; প্রেম-দীক্ষা দাও;
হিংসা-মত্ত বিশ্বে তোলো একাত্মতা গড়ি'।
জীবন যা' দিতে পারে, তা'রও যে অধিক
সে দিয়েছে। ভস্ম করি' চিতা-ভীতি গত
ভারত-পথিক হোলো জগৎ-পথিক।
মানব-মূর্ত্তিতে ছিলো খণ্ডিত যে-ব্রত
মরণ-অমৃতে তা' যে প্রেম-পথে ঠিক
বিশ্বেরে প্রেরণা দিবে চলিতে সতত।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

গানের পরে বহিরঙ্গ ভক্তেরা সবাই প্রস্থান করলে পর আলোক হঠাৎ ব'লে বসল: "সত্যি গুরুদেব, আমার সময়ে সময়ে অবাক্ লাগে ভাবতে—আমরা নদীকে কত সহজে দেবীর পদে বসাতে উজিয়ে উঠি! আপনিই তো বলছিলেন দেহুর ইন্দ্রায়ণী নদীর উদ্ভব কাহিনী—ইন্দ্রের অর্ঘ্য গ'লে না কি পুণ্যসলিলা ইন্দ্রায়ণী স্রোত হ'ল—অমনি হাজার হাজার সাধক সেই জলে স্নান করে গদ্‌গদ!"

ধ্রুব টুকল: "বা:। ওরাও কি জর্ডন নদীকে পুণ্যসলিলা বলে না। পল রোবসনের ole man river—"

আলোক বলল: "ও কিছু না। আমরা যেমন ধূপকে বলি পবিত্র—জাপানীরা ফুলকে। আমাদের গঙ্গাদেবী হ'লেন গঙ্গামাতা মহাদেবী—শিবের ঘরণী—যাঁকে ভক্তি করলে 'সুখমুক্তি' হাতে হাতে। এই মাত্র সাধুজিই তো গাইলেন। আর এ-সার্টিফিকেট দিলেন কে? না, জ্ঞানের মূর্তবিগ্রহ ওজসের অবতার শঙ্করাচার্য যিনি প্রচার করেছিলেন:

'ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ পিতা নৈব মে
নৈব মাতা চ জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যাশ্চিদানন্দরূপ:
শিবোহং শিবোহম্।'

তেমনি অমন যে-স্বাবলম্বী পুরুষ, তীক্ষ্ণধী ক্রিটিক ও বিষম তার্কিক দ্বিজেন্দ্রলাল—যিনি যৌবনে হিন্দুধর্মের কোনো সনাতন আস্থা শ্রদ্ধা আচারকেই ছেড়ে কথা কন নি—তিনিও কিনা পঞ্চাশ না পেরুতেই গাইলেন,

কত নগ নগরী তীর্থ হইল তব চুম্বি' চরণযুগ মাঈ!
কত নরনারী ধন্য হইল মা, তব সলিলে অবগাহি'!
বহিছ জননি, এ-ভারতবর্ষে কত শত যুগ যুগ বাহি,'
করি সুশ্যামল কত মরু প্রান্তর শীতল পুণ্য তরঙ্গে!

না রে না—গঙ্গা যমুনা সরস্বতী কৃষ্ণা কাবেরী গোদাবরী··· এ সব নদীকে ভক্তি করতে না করতে আমাদের চক্ষে চলে ধারা, বক্ষে জাগে উচ্ছ্বাস! বিলেতে আমার এক খাস সাহেব বন্ধু বলতেন আমাকে বাঁকা হেসে:

"জলকে দেবী ব'লে স্তব ক'রে রাতারাতি স্বর্গের সিঁড়ি পার হবার সাধনা—এ তোমরাই পারো বন্ধু! আমরা, ছাপোষা মনিষ্যি, জলের মধ্যে দেবীয়ানার কল-কল্লোল শুনতে পাই না—শুনি শুধু হাইড্রোজেনের সঙ্গে অক্সিজেনের গলাগলির খোস খবর।"

নমিতা টুকল: "তুমি কী যে দুমদাম ক'রে যা তা বলো, বাবা! গুরুদেবের সামনে এমন ঢঙে বলতে আছে?"

আলোক (অপ্রস্তুত হ'য়ে): বলতে নেই না কি, গুরুদেব? যদি বলেন "না"—মেনে নেব। অতিবিশ্বাসী হ'তে যদি নাও হ'তে পারি, অপ্রতিভ হতে বাধবে না—কথা দিচ্ছি।

সাধুজি (হেসে): না বাবা, অপ্রতিভ হোয়ো রুগীদের কাছে যখন ধুমধাম ক'রে পেট চিরতে গিয়ে বুক চিরে ভুল ক'রে ফুসফুসের মধ্যে কাঁচি রেখে পাঁজরা ঠুকে সেলাই ক'রে দেবে। সাধু-সন্তদের কাছে বেপরোয়া

হ'য়েই ব'লে ফেলো - যা তোমাদের প্রাণ চায়। কারণ তোমরা তাঁদের জগতের খবর না রাখলেও তাঁরা তোমাদের বুদ্ধির খবর রাখেন, কাজেই ভুল বুঝবেন না—আরো এই জন্যে যে, তাঁরা জানেন একদিন আসবেই আসবে যেদিন ফাঁশ হ'য়ে যাবে—এই খাস সাহেবদের আত্মিক তত্ত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা কত গভীর। সেদিন তোমরাও অন্য সুর ভাঁজবে —বৈজ্ঞানিক সংশয়ের ফুটো নৌকা ছেড়ে চাইবে বিশ্বাসের মজবুৎ জাহাজে প্রেমের পারাণি।

আলোক (হেসে): সংশয়ের পরে আপনার কী যে জাতক্রোধ, গুরুদেব! কিন্তু সংশয়ও কি বিধাতার সৃষ্টি নয়—কুসংস্কারের হাজারো অনাসৃষ্টি কি সাফ করে না সে? শুধু খাস সাহেবরাই তো নয়, মস্ত যোগিকবি জর্জ রাসেলও কি বলেন নি সঘনে:

They are but the slaves of light
Who have never known the gloom?"

মালতী: এর মানে কী দাদা?

আলোক: "তারা শুধু আলোকের ক্রীতদাস হায়
জানে নি জীবনে যারা কভু তমসায়।"

(সাধুজিকে) বলবেন কি তিনি ভুল বলেছিলেন?

সাধুজি (মৃদু হেসে ধরা ছোঁওয়া না দিয়ে): ভুল যদি না ব'লে থাকেন তা হ'লে তোমাকে কিন্তু বাবা মহামুস্কিলে পড়তে হবে: একটি দাসও পাবে না কোনো দিন।

আলোক (আশ্চর্য হয়ে): কেন গুরুদেব?

সাধুজি: কারণ আমাদের এই পুণ্যভূমি ভারতেও এমন একটি মানুষও খুঁজে পাবে না যে, জীবনে অন্ধকারের খট্টায় না প'ড়ে আলোর শিখরে পৌঁচেছে।

আলোক (নাছোড়বন্দ): না গুরুদেব, বার বার অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না। আজ হয় এস্পার নয় ওস্পার। বলতেই হবে আপনাকে—সত্যিই কি কেউ সংশয়ের মধ্যে দিয়ে না গিয়েই সটাং পৌছতে পারে যথার্থ বিশ্বাসে?

সাধুজি (ঠোঁটে হাসি আরো যেন বাঁকা হ'য়েওঠে): বাবা! সংশয় তো আমাদের দেহ-মন প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ওতপ্রোত হয়েই আছে। এ-হেন ছিনে-জোঁকের ওকালতি নাই বা করলে? ঘর হাজার বন্ধ ক'রে রাখলেও মাটিতে ধুলো জমে। তাই ব'লে কি সুবুদ্ধি বলে—'যাকে ঠেকানো যায় না তাকে প্রশ্রয় দেওয়াই উচিত?' না বাবা, আমার গুরুদেব উঠতে বসতে আমাকে শাসাতেন একটি লাখ কথার এক কথা ব'লে: যে, আমরা জানার মতন অনেক কিছুই জানতে পারি না—জানতে চাই না ব'লে। আর এই না চাওয়ার মূলে ঘুপটিমেরে রয়েছে ঐ যত-নষ্টের গোড়া সংশয়। তোমরা কথায় কথায় বিলিতি বুলি কপচাও, Knowledge is power, কিন্তু রাজসিক যাজ্ঞিক হ'তে গিয়ে বেমালুম ভুলে ব'সে আছে যে, ভারতে আমরা যে-প্রজ্ঞাকে 'শক্তিদাত্রী' উপাধি দেই তার নাম পরাবিদ্যা ওরফে আত্মজ্ঞান। এ পরমাশক্তির বর পায় কেবল সেই ভাগ্যবান্ যে তার মনের জমিতে বিশ্বাসের আবাদ করে সোনা ফলিয়েছে—যার সংস্কৃত নাম শ্রদ্ধা, সাহেবি নাম faith তাই তো ঠাকুর গীতায় বলেছেন অত জোর ক'রে যে জ্ঞানের আলো আসে শ্রদ্ধার প্রণালী বেয়েই 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।'

ধ্রুব: কিন্তু ও শ্রদ্ধাবান্ হবে কী দুঃখে সাধুজি, যদি আপনি ওকে ধমকে না দিয়ে ধরেন কাকুতি মিনতির সুর? (আলোকের দিকে চেয়ে) গুরু করার পরে এ সব কী ফাজিল তর্ক শুনি? গীতায় বলেনি "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি?"

আলোক (ঈষৎ উত্তেজিত সুরে): এ তোর গাজোয়ারি কথা ধ্রুব! সংশয় যদি মানুষকে শুধু সর্বনাশের পথেই রওনা ক'রে দিত তাহলে আজ ওদেশে বিজ্ঞানীদের এ অদ্ভুত সমৃদ্ধি হত কি?

ধ্রুব (হো হো ক'রে হেসে উঠে): সমৃদ্ধি তো ঘণ্টা! সারা জগৎ আজ ভয়েই কম্পমান্—কখন অণীয়ান্ দেবতা মহীয়ান্ অপদেবতা হয়ে ফেটে পৃথিবীকে চৌচির করবেন—অথচ সঙ্গে সঙ্গে জাঁক কত: 'দেখ, আমরা আকাশে উল্কাবেগে পৃথিবীর চারদিকে বোঁ বোঁ ক'রে ঘুরে কী দুর্দান্ত দাপট দেখাচ্ছি গতির দামামা বাজিয়ে।' শুধু কি তাই? আস্ফালন কত: আজ চাঁদে ঢুঁ মারব, কাল মঙ্গল গ্রহে লাফ দিয়ে নিষ্কর জমিতে সোনা ফলাব, পরশু শনির বুকে গুঁতিয়ে বুঝিয়ে দেব আমরা কে?. মা প্রায়ই বলতেন নাস্তিককে শেষটায় পেয়ে বসেই বাস

শনির দশা – এ তাই। হাসব না কাঁদব ভেবে পাই নে— শান্তি গেল, ভক্তি গেল, মৈত্রী, করুণা, সহিষ্ণুতা, সংযম, তপস্যা, সব গেল চুলোর দোরে—রইল শুধু গতির গর্জানি আর হুজুগের হট্টরোল! উত্তর দিক দিয়ে হিমালয়ের চূড়ায় ওঠা হ'ল—এবার দক্ষিণ দিক দিয়ে হানা দেব – অমনি সবাই সঘনে হাততালি: "উঃ! কী বীরত্ব! এরই তো নাম অতিমানব!" শুনবি মজা? আমি বিলেত থেকে ফিরবার পথে আমেরিকায় যাই ওখানকার খৃস্টান সায়েন্স প্রকাশনার ম্যানেজারের নিমন্ত্রণে। সেখানে গিয়েছিলাম এক মস্ত "শো" দেখতে। (সাধুজিকে) উঃ সে কী রোমহর্ষক ব্যাপার গুরুদেব! প্রতিযোগিতা কিসের জানেন? আপনি এত বড় যোগী হ'য়েও শুনলে থ' হ'য়ে যাবেন। এই বিংশশতকের সুস্থমস্তিষ্ক বুদ্ধিবাদী যুগে একশো জন ধূম্রলোচন পাল্লা দিলেন—কে সবচেয়ে বেশিক্ষণ একটানা সিগার ফুঁকতে পারে। সে একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড! ঢেউয়ের পর ঢেউয়ে বুদ্ধিমন্ত ও বুদ্ধিমতী টিকিট কিনে পাল তুলে এলেন দেখতে!—শুধু তাই নয়, সে কী হাততালি যখন বীরশ্রেষ্ঠ একটানা সাতাত্তর ঘণ্টা সিগার ফুঁকে পেলেন তিন হাজার ডলার! (আলোককে) এ কি ভাবা যায়—বল্ তো? হুজুগের হল্লা রথে চড়ে কোন্ গোলকধামের গঙ্গোত্রী-মুখে চলেছে ওরা শুনি বিজ্ঞানের বাহ্বাস্ফোটে?

আলোক (হেসে উঠে): সিগার প্রতিযোগিতা আর আকাশে ঘোরার প্রতিযোগিতা এক হল? কী বলছিস রে মূঢ়? বিশ্বাস বিশ্বাস জপতে জপতে শেষে কি তোর বুদ্ধি লোপ হ'ল না কি? গুরুদেব! কী বলেন আপনি? আপনাকেই সালিসি মানছি। রায় দিতেই হবে।"

সাধুজি (স্নিগ্ধ হেসে): ধীরে ধীরে! মুনি-ঋষিরা বলেন: 'অশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ' অর্থাৎ অশান্ত যাওগো মন সে জ্ঞানের মাধ্যমে কখনো সত্যের দিশা পায় না, আর তর্কাতর্কি অশান্তিই আনে সাড়েপনেরআনা ক্ষেত্রে।' তাই উপনিষদে বলেছে 'নৈষা তর্কেন মতিরাপনীয়া'। আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা করো তবে আমি শুধু বলতে পারি আমার কাছে সেই পরমবেত্তই উপাস্য, মন বুদ্ধি তর্ক যুক্তি যাঁর নাগাল পায় না। (ধ্রুবর দিকে চেয়ে) তুমি ওদের হুজুগ আর গতির নেশার কথা তুললে বাপ! কথাটা খুব ভুল বলো নি। কারণ গতি আনে একটা তীব্র স্নায়বিক উত্তেজনা যার ফলে দিগ্‌ভ্রম হয় প্রায়ই। কিন্তু সেই সঙ্গে এও কি সত্যি নয় যে স্থিতিকে সত্যিই সম্পূর্ণ করে? কিংবা ধরো বলা যেতে পারে স্থিতির প্রশান্ত মহিমার বা সমাধির শাশ্বত রসের রসিক হ'তে শিখি আমরা তখনই যখন ঠেকে শিখি যে, হুজুগে হাওয়ার হাওদায় চেপে সুন্দরের শান্তিলোকে পৌছনো যায় না। নিলক্ষ্য গতির রথে চড়ে শেষে চোরা বালিতে পৌছিয়ে তবেই না আমরা খুঁজতে সুরু করি আপূর্যমাণ অচল-প্রতিষ্ঠ আনন্দলোকের চাবিকাঠি! হয়েছে কি জানো? ওদের বেসামাল প্রাণ-শক্তিই ওদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে মারছে শক্তির মদে মাতাল ক'রে। তাই ওরা থামতে পারছে না। অন্তরের মধ্যে অমৃত সমুদ্র, কিন্তু সে দিকে দৃষ্টি দেবারও সময় নেই, তাই চলে গৌরীশঙ্করে, মেরুজয়ে, সমুদ্রের অতলে, বাষ্প বায়ুলোকের ওপারে। একেই ওরা নাম দিয়েছে গতির প্রগতি বস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞানসিদ্ধি। এ-তাগিদেরও প্রয়োজন আছে, পূর্ণতম আত্মবোধের অগ্রদূত হয়েই হয়ত এসেছে এ যুগে এই গতির গর্জন, হুজুগের হামবড়াই। হয়ত অবিশ্রান্ত ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় আসবে যখন ওদেরও মনে হবে—শুধু হৈ চৈ-য়ের বহির্মুখী উত্তেজনালোকে পাওয়া যায় না সে-বর যে-বর বিনা ঘোরাঘুরি হয়ে দাঁড়ায় বিড়ম্বনা। হয়ত সে-শুভলগ্ন আসবে গতির সুরাপানের পরে অবসাদ এলে তবে। কখন কোন্ পথে কী ভাবে সে লগ্ন রাঙবে কেউ জানে না বাবা, এক ঠাকুর ছাড়া। তবে এটুকু তাঁরা সবাই জানেন যাঁরা তাঁর কৃপার স্পর্শে জীবন্মুক্ত হয়েছেন: যে, একদিন না একদিন সবাইকে চাইতে হবে উত্তেজনার মোহ ছেড়ে পরমা শান্তির সুধা, জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করার আনন্দ। আর সে-পরম প্রার্থনা ওদের হৃদয়ে পুরোপুরি জেগে উঠবামাত্র তার চিন্ময় আলোয় ওদের বস্তুতান্ত্রিক চোখের ঠুলি খ'সে পড়বে, অমনি ওরা দেখতে পাবে অন্তরাত্মার গহনলোকে যে-অফুরন্ত ঐশ্বর্য বৈচিত্র্য চমক আমাদের আবিষ্কারের অপেক্ষায় রয়েছে, তার কাছে বস্তুজগতের সেরা আবিষ্কারও নগণ্য। তখন দেখবে

একটা অভাবনীয় volte face এই সব নাস্তিক বিজ্ঞানী-রাই ডিগবাজি খেয়ে হয়ে উঠবে রাতারাতি আশ্চর্য আস্তিক। আমাদের খামখেয়ালী ঠাকুরটি কাকে যে কবে কোন্ পথে দিয়ে কোথায় টেনে তাঁর আপন ক'রে নেন, কেউ কি জানে বাবা?

মালতী খুব মন দিয়ে শুনছিল, হঠাৎ আলোকের পানে তাকিয়ে বলল: "গুরুদেব! কাল পরমহংসদেবের কথামৃত পড়তে পড়তে তাঁর একটি উপমা বড় চমৎকার লাগল। মনে আছে আপনার—তিনি বলতেন, একটা পাখী অকূলপাথারে জাহাজের মাস্তুলে ব'সে। একবার উড়ে উত্তরদিকে, উধাও হয় ফিরে আসে কূলের দেখা না পেয়ে। তারপর দক্ষিণে, পূর্বদিকে, পশ্চিমে। ঘুরে ঘুরে কোনো দিকেই কূল-কিনারার দিশা না পেয়ে সে শেষটায় কায়েম হ'য়ে মাস্তুলের উপরেই বসল—জাহাজ যেখানে নিয়ে যায়। অর্থাৎ হতাশাই শেষে এল শাপে-বর হ'য়ে, দিল নিশ্চিন্তির পরম দিশা। এরই নাম বুদ্ধির আত্মসমর্পণ—বহুদূরের পর কুটীচক, না গুরুদেব?"

সাধুজি (প্রসন্ন কণ্ঠে): হ্যাঁ মা, আমার গুরুদেব বলেন প্রায়ই যে, এ যুগের সাধকের কাছে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতই হ'ল গীতার গীতা। তাঁর সঙ্গে একত্রে এ বইটি যে আমি কতবারই পড়েছি! তবে কি জানো মা? শুধু পড়লেই হয় না। ঐ কথামৃতেই দেখতে পাবে ঠাকুর বলেছেন, 'সময় না হ'লে হয় না।' তাই তো অনেক ঘোরাঘুরির অন্তে তবে আসে শান্তির তৃষ্ণা, অনেক ঘা খেয়ে তবে আসে পরম নির্বেদ। তবে এ আমি দেখেছি মা যে, মেয়েরা স্বভাবে তর্কের ঘুরপাকের বিরোধী ব'লেই শান্তির ভক্তির প্রেমের পূজারিণী হতে পারে পুরুষদের চেয়ে সহজে। পুরুষেরা অবিশ্বাসকে বিদায় দিতে বেগ পায় আমির অভিমানে—অহংকারে। কিন্তু তোমরা, মেয়েরা, যদি একবার ভালোবাসো—আর ভালোবাসতে তোমরা পুরুষদের চেয়ে বেশি পটু, মানতেই হবে—তাহলে আত্মসমর্পণের ডাকে আমাদের চেয়ে ঢের বেশি সহজে বিশ্বাসে সাড়া দিতে পারো। তাই তো বৈষ্ণব কবিরা বলেছেন—গোপীরা যে বাঁশী শুনে এত সহজে ঘর ছেড়েছিল, সে-বাঁশি শুনতে হলে প্রতি হৃদয়কে হ'তে হবে হিয়া-রাধা, যার শুধু একটি কামনা—যা কিছু আছে সবই তাঁর চরণে প্রেমের অ: প্রণামী দেওয়া। (নমিতাকে) তুমিই কাল গাইছিলে ন কী গানটি যেন? গাও না মা, তর্ক ঢের হয়েছে—এ গান করুক্ শান্তি পাই।

নমিতা গাইল গুন গুন ক'রে আলোকের সঙ্গে—

কৃষ্ণের মঞ্জীরে মন্দ মৃদু সমীরে
ধায় কালিন্দীতীরে রাধা-হিয়া অভিসারে
মন্থর আশা কুঞ্জে নন্দন ফুল মুঞ্জে
মর্ম ভৃঙ্গ গুঞ্জে বসন্ত ঝঙ্কারে॥
দোল-দোল দোল গানে জয়-জয়-জয়-তানে
উধাও অলখপানে রাধাহিয়া সুখ-স্বপ্নে।
অচিনের অনুরাগে ঘুমন্ত প্রেম জাগে
মধুরের ঢেউ লাগে—মিলন-তৃষ্ণা লগ্নে॥
অম্বর গন্ধে পুলকে, দ্যুলোক নামিল ভূলোকে,
সন্ধ্যার ছায়া অলকে জ্যোৎস্না দুলায় মালা।
অদেখা বঁধুর বাঁশি বাজিল চিত উদাসি'
"আয় আয় ব্রজবাসী! আয় আয় ব্রজবালা!'
রাধা-হিয়া গায় উছলি': "লহ বল্লভ, সকলি,
শুনি' ঘরছাড়া মুরলী চিনেছি তোমারে স্বামী!
তোমারেই চির সুন্দর! চেয়েছি যুগ-যুগান্তর,
তনু মন প্রাণ অন্তর চরণে সঁপি প্রণামী।"

সাধুজি শুনতে শুনতে ভাবস্থ। বললেন ভাবমুখে: "এই—এই—এই-ই হ'ল সত্যের সত্য মা! আর সবই বড় জোর আংশিক সত্য। শুধু এই তনু মন প্রাণ—সর্বস্ব—তাঁর চরণে নিবেদন ক'রে তবে মানুষ পেতে পারে তাঁর পায়ে ঠাঁই—সেখানে পৌঁছলে সব তর্কাতর্কির শান্তি; সব ঘুরে মরার সমাপ্তি; সব গতির মোহের ক্লান্তির অবসান। তখনই ভক্ত বলে দ্রৌপদীর মতন কাতর সুরে: 'প্রভু, ভবভয় হতে তারণ করো—পাহি মাং কৃপয়া দেব অগতিনাং গতিভব,' অমনি ঠাকুর বরাভয় দিয়ে বলেন: 'মাভৈঃ, ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি—আমি যাকে রাখি, তাকে মারে কার সাধ্য'?"

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): অভয় পেতে না চায় কে গুরুদেব? কেবল—নাঃ, (ধ্রুবর দিকে তাকিয়ে) কাজ কি আমার অতিবিশ্বাসী বন্ধুটির কোমল মনে ফের আঘাত দিয়ে?

মালতী (হেসে) : না না, বন্ধুটি আপনার দেখতে যেমন সুকুমারী, আসলে তা নন। আপনি বলুন দাদা, যা প্রাণ চায়।

আলোক (সাধুজিকে) : বলতে চাইছি এমন কোনো পাষণ্ডীর মতন কথা নয়, গুরুদেব! তবে কি জানেন? দ্রৌপদী কৃষ্ণঠাকুরকে চোখে দেখে তবে পেয়েছিলেন ভরসা যে অগতির গতি ব'লে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেনই দেবেন। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা তো সে-তারক-ঠাকুরটির কৃপার কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয়ই পাই নি—মানে, কোনো শেষ রক্ষার অঘটনই চাক্ষুষ করিনি তো, তাই মনে হয়—যদি একবার দেখতে পেতাম স্বচক্ষে, তবে বর্তে যেতাম।

সাধুজি (হেসে) : কী দেখতে চাও শুনি? পরব্রহ্মকে?

আলোক (হেসে) : না, বাড় এখনও অতটা বাড়ে নি। আমি শুধু দু'একটা দৃষ্টান্ত দেখতে চাই যে, এ ঘোর কলিতেও ঠাকুর কথা দিয়ে কথা রাখেন—তাঁর ভক্ত ম'রেও মরে না। (করজোড়ে) একবার দেখান না গুরুদেব! লক্ষীটি! শুনেছি বিষ্ণুঠাকুর আপনাকে দেখিয়েছিলেন, আপনিও নাকি পারেন দেখাতে।

সাধুজি (দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে) : অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। আমি কে বলো দেখাবার? কতটুকুই বা বুঝি তাঁর লীলার ছন্দের? জানি তো হাড়ে হাড়ে নিজের বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি বাবা, যে অযোগ্য হয়েও আমি ঠাকুরের অপার করুণার কিছু ছিটে ফোঁটা পেয়েছি এই বিশ্বাসের পথেই। তাই তো তোমাদের বলতে পারি এত জোর দিয়ে যে, যারা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে তারা তাঁর করুণা পায়ই পায়। কাজেই বিশ্বাসকে নিয়ে যারা হাসাহাসি করে তাদেরকে বলতেই হবে 'দুর্ভাগা'—কেননা করুণা আসার প্রণালীটাকেই তারা বুঁজিয়ে দেয় সংশয়ের জাঙাল তুলে। তাদের জন্যে দুঃখ হয় বৈকি—তাদের এখনও অনেকদিন ভুগতে হবে ব'লে। তবে তারাও শেষে পাবেই পাবে বিশ্বাসের চাবি, ভক্তির দিশা, তৃষ্ণায় জল। ঠাকুর কাউকেই ফেলেন না বাবা—অসুরকেও একদিন না একদিন দেবতা হতেই হবে। গুরুদেব একটি প্রবচন আওড়াতেন প্রায়ই : "শ্রীক্ষেত্রে কেউই অভুক্ত থাকে না, তবে কেউ প্রসাদ পায় সকালে, কেউ বা সন্ধ্যায়—এই যা।"

আট

এই সময়ে দেহুতে হঠাৎ বসন্তের প্রকোপ দেখা দিল—এ-রকম মহামারী এ অঞ্চলে কখনো হয় নি। সাবিত্রী দারুণ ভয় পেয়ে স্বামীকে বলল : "চলো যাই কাশী।"

সাধুজি বললেন : আমি এইমাত্র দেশাইয়ের ওখানে গিয়ে নাম লিখিয়ে এসেছি—আলোককেও টেলিফোন করেছি—সেও এল ব'লে। আমি চাই দত্তাত্রেয়ও আসে আর্তদের সেবা করতে।"

সাবিত্রী (শুকমুখে) : দত্তাত্রেয়? কী বলছ? এই সময়ে?

সাধুজি (হেসে) : এই সময়েই তো আসা চাই। যখন আকাশে মেঘ নেই, বাগানে ফুলের ছড়াছড়ি—তখন কে না হরি হরি ব'লে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে পারে? দুর্দিনে যদি আর্তের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে না পারি, যদি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে যাই, তবে প্রাণ বাঁচতে পারে বৌ, কিন্তু মান বাঁচবে না ঠাকুরের কাছে। তুমি কি গুরুদেবের সে-ভজনটি শোনো নি?

ভোলে মন যে না বিসরানা লেনদেন হৈ-বড়া পুরাণা
পরখনওয়ালা বড়া সিয়ানা অন্ত চুকানা হি হোগা
জিসসে চুপ চুপ ফিরতা ভোলে সামনে জানা
জী হোগা

সাবিত্রী মুখ নীচু ক'রে বলল : "শুনেছি, গানটি আমার গাইতেও খুব ভালো লাগে—তবে বন্দনার অনুবাদ।"

সাধুজি : বন্দনা এ-গানটিরও অনুবাদ করেছিল না কি? কই আমাকে শোনায় নি তো।

সাবিত্রী : শুনিয়েছিল তুমি ভুলে গেছ। অনুবাদটি এই

ভুলিস নে তুই, ও ভোলা মন!
যুগ যুগের এ-প্রেম বাঁধন
বাজিয়ে সে নেয় চতুর সুজন—হিসেব নিকেশ
চায় ব্যাপারী

. পালাস কোথায় ? মুখোমুখি হ'তেই হবে সাথে তারি।

সাধুজি : চমৎকার। কেবল গানে যার বীজ বুনলে জীবনে যদি তার ফসল না ফলে তবে তো সে মিথ্যে গান। (একটু পরে সাবিত্রীর মাথায় হাত রেখে) তবে শোনো বৌ, আমি যা চাই—আমার চোখের দিকে তাকাও—যদি বলো—না, এ তুমি পারবে না, তাহ'লে আমি জোর করব না।

সাবিত্রীর মুখের মেঘ কেটে গেল, স্বামীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল: "তুমি যা বলবে। আমি আর ভয় পাব না।"

সাধুজি তার মাথায় হাত রেখে বললেন: "এইই তো চাই বৌ। গুরুদেবের কাছে যে ভাগ্যবতী দীক্ষা পেয়েছে সেও যদি ভয় পাবে তবে অভয় দেবে কে ?"

সাবিত্রী টেলিফোন করল। কিন্তু গুরুমা টেলিফোনে সব শুনে খুব জোর দিয়েই বললেন: "না, দত্তাত্রেয় এখন যাবে না।"

সাবিত্রী (স্বস্তির নিশ্বাস গোপন করে): উনি বলছিলেন—

টেলিফোনে গুরুমা: প্রসাদ বাবা যা বলেছে তার যোগ্য কথাই হয়েছে, কিন্তু এতদূর থেকে দত্তাত্রেয় যাবে বসন্ত রুগীর সেবা করতে এতে আমি মত দিতে পারি না। পরোপকার ভালো কথা—কিন্তু পরোপকরেরজন্যে ছুটোছুটি করার মধ্যে একটা দেখালেপনার ভাব আছে। যারা সাধনা নিতে চায় তাদের পক্ষে জাহিরিপনার হাঁকডাক, লটভঙ্গি—এ সবই বিষ। ও যদি দেহতে থাকত আর তুমি ওকে প্রাণ বাঁচাতে এখানে পাঠিয়ে দিতে তাতে আমি আপত্তি করতাম। কিন্তু ও এখন এখানে খুব মেতে আছে নানা কাজে। একটা ইস্কুলে র'তে পড়ায় গরীব ছেলেদের। তাদের গানও শেখায় সপ্তাহে তিনদিন। তাছাড়া দয়াময় ওকে দুটি অনাথ শিশুর তদারক করার ভার দিয়েছেন। শিশু দুটি খেলা করতে করতে কুয়োয় প'ড়ে যায়। দত্তাত্রেয় দড়ি বেয়ে নেমে ত'াদের তুলে আনে। এসব কেউ জানবে না মা হয়ত কোনোদিন। কিন্তু সেইজন্যেই এ জীবসেবায় চিত্তশুদ্ধি হয়। ওখানে দত্তাত্রেয়কে পাঠালে কাগজে লেখালেখি হবে—সাধুজির একমাত্র বংশধর ছুটে এসেছিল শরণাপন্নদের বাঁচাতে—হয়ত আরো বড় বড় কথা—লোকের তাক লেগে যাবে। তাতে ওর বিষম ক্ষতি হবে, মনে হবে—ও একজন কেওকেটা নয়—যাকে কাশী থেকেও ডেকে পাঠাতে হয় পরোপকার করতে। সাধনার উদ্দেশ্য পরোপকার করবার জন্যে দাপাদাপি ছোটাছুটি করা নয় মা, সাধনার শেষ লক্ষ্য—পদে পদে আমি আমার ভাব জয় ক'রে সকলের মধ্যেই ঠাকুরকে দেখে শিবজ্ঞানে জীব সেবা। এ-দুয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান জমীন। কিন্তু সে থাক—একটা কাজের কথা আছে। তোমার উপরে একটা ছায়া দেখেছেন দয়াময়। তাই এইমাত্র বলছিলেন তোমাকে তার করতে হবে যে, তোমার এক্ষণি টিকে নেওয়া দরকার।

সাবিত্রী (সভয়ে): টিকে ? কিন্তু উনি বলেন—ঠাকুরই আমাদের রক্ষা কবচ।

গুরুমা: মা, প্রহ্লাদ বাবার মুখে একথা সাজে কারণ—কিছু মনে কোরো না মা, গুরু মনরাখা কথা বলে না বলে সত্য কথা—তাই বলছি প্রহ্লাদ বাবা যে রক্ষাকবচ পেয়েছে সে-রক্ষাকবচ তুমি এখনো পাও নি। তাই তোমার নেওয়া চাই—আর আজই—এই মুহূর্তে।

সাবিত্রী: আচ্ছা মা, উনি আলোককে টেলিফোন করবেন—কিন্তু সে যদি আজ না আসতে পারে ?

গুরুমা: তা হ'লে—

টেলিফোন: Times up please!

নয়

টেলিফোন রেখে সাবিত্রী ছুটে এসে স্বামীকে প্রথম বলল দত্তাত্রেয়ের কথা। সাধুজি চুপ ক'রে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন।

সাবিত্রী: তোমার ভাবটা ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু ঠোঁটের কোণে চাপা হাসির ফিনকি চোখে পড়েছে আমার।

সাধুজি: ভাবছিলাম বৌ, পরমহংসদেবের একটি কথা: আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। অহঙ্কার আর মমকার—আমি আর আমার। এখনো আমরা মনে মনে বলি: আমার ছেলে বেঁচে ব'র্তে থাকুক। তাই

হাসছিলাম। বলছিলাম : "ঠাকুর কত বাঁধনেই না বাঁধতে পারো জীবকে আষ্টে পিষ্টে!" অথচ তোমাকে উপদেশ দিচ্ছিলাম না এইমাত্র যে অভয় হ'তে হবে ?

সাবিত্রী (খুসি হ'য়ে): তা হ'লে তোমারও ভয় ছিল বলো ?

সাধুজি : না থাকলে কি মনে হ'ত তোমার কথা শুনে —গুরুমা বাঁচিয়ে দিলেন বড় সময়েই—আমার আর দায়িত্ব রইল না ? এরই নাম নিজের দুর্বলতার সাফাই গাওয়া। কিন্তু সে যাক--গুরুমা আর কী বলবেন শুনি ?

সাবিত্রী : বললেন তোমার টিকে না নিলেও চলবে কিন্তু আমার আজই নেওয়া চাই।

সাধুজি : আলোক কাল আসবে—

সাবিত্রী : গুরুমা বললেন গুরুদেব আমার উপরে একটা ছায়া দেখেছেন।

সাধুজি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে আলোককে টেলিফোন করলেন। নমিতা টেলিফোন ধরল সব শুনে বলল : "বাবা এখন সাসুন হাসপাতালে, একটা অপারেশন করছেন—দুতিন ঘণ্টা লাগবে। কিন্তু গুরুমা যখন বলেছেন আমি এক্ষুণি যাচ্ছি মোটরে।

কিন্তু ভবিতব্য! নমিতা তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পা পিছলে প'ড়ে গেল স্নানের ঘরে। পা এম্‌নি মচকে গেল যে নড়তে পারে না। শুয়ে শুয়ে টেলিফোন করল—নিরুপায়, পরদিন ভোরবেলাই যাবে।

শুনে সাধুজি আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রণাম করলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাব সমাধি হ'ল···মুখে দিব্য হাসি, বললেন মৃদুস্বরে : "তোমার ইচ্ছা ঠাকুর!"

দশ

সাবিত্রী গেল প্রথমে একটি বস্তিতে। সেখানে তিন চারটি বসন্ত রুগীকে ঔষধাদি দিয়ে ফিরে আসতেই এক প্রতিবেশিনীর ওখানে কান্নাকাটি শুনে ছুটল। দরিদ্র বিধবা—কায়ক্লেশে দিন গুজরান করে তাঁত বুনে। একটি দশ বছরের ছেলে, কোলেরটি পাঁচবছরের মেয়ে। সাবিত্রী এদের রোজ পড়াত ও দুবেলা দু'সের দুধ পাঠাত।

গিয়ে দেখল আসল বসন্তে দুজনেই কালো হ'য়ে গেছে। সাবিত্রী ও সাধুজি দুজনে মিলে ওদের তুলে আনলেন—চাকর বাকর সব গাঁয়ের, ছেলেটিকে সাধুজি রাখলেন ভজন গৃহে। মেয়েটিকে সাবিত্রী রাখল নিজের ঘরে। তারপর সারারাত জেগে সেবা ওদের মা-র সঙ্গে। ওদিকে সাধুজি জেগে রইলেন ছেলেটির শিয়রে।

কিন্তু বাঁচানো গেল না। দুটি শিশুকে দাহ ক'রে সাধুজি বেলা দশটায় ফিরেই দেখলেন সাবিত্রী শুয়ে—জ্বর একশো দুই। সর্বাঙ্গে বেদনা।

খবর পেয়ে আলোক ছুটে এল একাই, কারণ নমিতা তখনো শয্যাশায়ী। সাধুজি শুধু বললেন : "Too late, বাবা!"

বিকেলে নমিতা এল পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে। পিতা-পুত্রী দুজনে মিলে সারারাত জেগে রইল সাবিত্রীর শিয়রে। খবর পেয়ে নীলমণিকে মালতীর হেফাজতে রেখে ভক্তিও ছুটে এল ধ্রুবর ছোট টু-সিটারে। কিন্তু তখন সাবিত্রীর সম্বিৎ নেই। জ্বর একশো পাঁচ।

শেষ রাতে জ্ঞান হ'ল। স্বামীকে পায়ের ধুলো দিতে ইঙ্গিত ক'রে শেষ নিশ্বাসে ইষ্টনাম শুনতে শুনতে সাবিত্রী অন্তর্জলী হ'ল পুণ্য সলিলা ইন্দ্রায়ণীর তীরে।

সাধুজি সকালবেলা তার দেহ চিতায় দিয়ে খানিকক্ষণ চিতার পাশে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন চোখ বুজে। চোখ দিয়ে একটি সরু রেখায় বয় অশ্রুধারা। শুধু অধরোষ্ঠ জপ করে : হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—চিতার অগ্নিশিখার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গতে।

* * *

সাধুজির কাজ শেষ হয় নি—আরো দুদিন তিনি আশেপাশের নানা দরিদ্র কৃষাণের ঘরে আট দশটি রুগীর দেখা শুনো করার পর এপিডেমিক কমল। দেহুর সিভিল সার্জন সাধুজিকে ধন্যবাদ দিয়ে ইস্তাহার জারি করলেন : "The situation is under control!" প্রতিবেশীরা এসে সাধুজিকে প্রণাম করল পরপর—"জয় সাধুজির জয়!"

* * *

ক্লান্ত জ্বরতপ্ত সাধুজিকে মোটরে ক'রে ধ্রুব ও মালতী দেহুর শূন্যগৃহ থেকে তুলে আনল তাদের ওখানে।

পরদিন সাধুজি ভোরে উঠেই কীর্তন ধ'রে দিলেন। গাইলেন সাবিত্রীর একটি প্রিয় কীর্তন :

নাথ! দিও হে শরণ শীতল চরণে—জীবনের
খেলা শেষে।
যেন তুফানেও জপি তারকা লগনে—তোমারেই
ভালোবেসে।
হে দীপঙ্কর দিও দীপদান
ক্লান্তি অন্তে শান্তি নিধান,
ধূসরের বুকে সুনীল বরণে—আলো ঝলমল রেশে।

এগারো

প্রহ্লাদের কাছে বিষ্ণু ঠাকুরের চিঠি এল :

"দুঃখ কোরো না বাবা। বলি নি কি তোমাদের বারবারই যে, যারা বড় আধার নিয়ে জন্মায় তাদের পরীক্ষাও হয় বড়? তাই তোমাকে বাইরের দিকে রিক্ত হ'তে হ'ল—শিবতুল্য পিতা, অনিন্দিতা সাধিকা দিদি, শেষে বিদ্যা স্ত্রী সবাই একে একে ছেড়ে গেল—কিন্তু অনাথ করতে নয়—তোমার আত্মসমর্পণের সাধনাকে আরো নিটোল, নিখুঁৎ করতে। দুঃখ যে পায় নি বাবা সে পরের দুঃখ বুঝবে কেমন ক'রে? নানা সাধু যোগে নানা উপলব্ধি চায়—যার যেমন সংস্কার বা প্রারব্ধ। তোমার সাধনার সিদ্ধি স্বতন্ত্র। আশ্চর্য ত্যাগ বা কৃচ্ছ্র-সাধন ক'রে মহাবৈরাগী হওয়াও নয়—সংসারে একটু আধটু জপ তপ ক'রে জীবনের তুফানে শান্তির আলোক-স্তম্ভ হ'য়ে একলাটি দাঁড়িয়ে থাকাও নয়। তোমার জীবন ধন্য হবে কেবল তখনই যখন তুমি ঠাকুরের আশ্রয় পেয়ে বহু নিরাশ্রয়ের আশ্রয় হবে, তার বাণীবাহ হ'য়ে বহু আর্তকে অভয় দেবে, অবিশ্বাসীর প্রাণে বিশ্বাস জাগিয়ে, দুর্ভাগাকে প্রেমের দীক্ষা দিয়ে, অজ্ঞান বস্তুতান্ত্রিকদের বহির্মুখী দৃষ্টিকে অন্তর্মুখী হ'য়ে অমৃত হবার দীক্ষা দিয়ে। সাবিত্রী মা সতী লক্ষ্মী সহধর্মিণী—তোমাকে ছেড়ে য ন নি। তাঁর এ-মহাপ্রয়াণের দিব্য আলোয় অনেক অবিশ্বাসীরই আঁধার কাটবে, অনেক সাধিকাই বল পাবে, দেখতে শিখবে যে, এ-কলিযুগেও সহধর্মিণী কী ভাবে স্বামীর ধর্মপথে সহায় হ'য়ে শেষে প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে আর্তের সেবায়। মেয়েরা আছে বলেই আজো এদেশে ধর্ম জীবন্ত আছে বাবা। প্রেমের-আত্মসমর্পণ কাকে বলে হাতে-কলমে ক'রে দেখাবার জন্যেই ওরা মেয়ে হয়ে জন্মেছে। ইতি।

নিত্যাশীর্বাদক শ্রীবিষ্ণু শর্মা"

বারো

সাবিত্রী শেষ নিশ্বাস ফেলার একটু আগে নমিতাকে বলেছিল : "আমাদের রমা বড় একলা, তাকে বলবে যেন বেশি দুঃখ না করে। আমি ওকে ভুলে থাকব ন।"

কিন্তু বৃথা! সাবিত্রীর আকস্মিক দেহরক্ষার খবর পেতে না পেতে রমার পায়ের নিচের মাটি উঠল টলমল করে। উপবাস ক'রে সারা রাত ও ঠাকু ঘরে চোখের জলে ইষ্ট ও গুরুর ছবির সামনে প্রার্থনা করল। সবচেয়ে ওর কাছে বড় হ'য়ে ওঠে ঐ একটি চিন্তা যে, শেষ মুহূর্তেও মা জননী ও:কে ভোলেন নি। বুকের মধ্যে অশ্রুসাগর দুলে ওঠে এ রেষারেষি দ্বেষাদ্বেষির জগতে এমন প্রেমও ঠাঁই পায় তবে? কোন্ সে-আলোর বীজে ফোটে এ-অচিন ফুল?

শেষরাতে ভূমিশয্যায় শুয়ে সাবিত্রীর ছবির সামনে হাতজোড় ক'রে বলে: "মা, করুণাময়ী আপনি, তাই ভরসা দিয়েছেন শেষমুহূর্তেও যে, ভুলে থাকবেন না। আশীর্বাদ করবেন—যেন একথা আমিও ভুলে না থাকি—আপনার আশীর্বাদ যেন সবসময়ে মনে রাখতে পারি: যে, মানুষের অবজ্ঞা গঞ্জনা অত্যাচার কাড়াকাড়ি এসবই মায়া। সংসারে সত্য কেবল সাধু, গুরু ও ইষ্ট। আর তাঁদের সব চেয়ে বড় দীক্ষা হ'ল—নিজেকে ভুলতে পারা—নৈলে জীবের মধ্যে শিবকে দেখা যায় না—আপনিই তো বলেছিলেন কতবার। আজ আমি বড়ই একলা মা। শুধু আপনার কৃপার রক্ষাকবচই আমার সম্বল। তাই আশীর্বাদ করুন যেন আপনার নিষ্ঠার—ভক্তির অন্তত: এক কণিকাও আমি পাই—যার প্রসাদে মায়াকে মায়া ব'লে চিনতে পারি—বিপদকে পরীক্ষা বলে—শাপকেও বর ব'লে। সবশেষে, আপনার দৃষ্টান্তে যেন আমি বল পাই—এই ভাবেই আর্তের সেবায় জীবন উৎসর্গ করতে। বাঁচতে আর সাধ নেই মা—কেবল গর্ভে যে এসেছে তার জন্যেই

বাঁচা। সেও যেন আপনার ও গুরুদেবের কৃপা পায়—আজ শুধু এই প্রার্থনা।"

প্রার্থনা করতে করতে আবেশ মতন এল—ঘুম ও জাগার মাঝামাঝি। দেখল সাবিত্রীর প্রদীপ্ত মুখ। রমা পায়ে লুটিয়ে পড়তেই জ্যোতির্ময়ী তাকে টেনে নিলেন, বললেন: দুঃখ কোরো না মা—আমি কাছে কাছেই থাকব। কেবল তোমার প্রসবের সময় হ'লে যাও পুনায়।"

ধ্যান ভেঙে গেল···পূর্বদিগন্তে ঊষার সোনার উলুধ্বনি বেজে উঠেছে। নমিতাকে লিখল ধ্যানস্বপ্নে পাওয়া বাণীর কথা। সব শেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখল:

"নমিতাদি!

পূর্বদিকে আঁধার ভেঙে আলোময়ী নামছেন আর, আজ আমার মনে হচ্ছে মা জননীর কথা। আমেদাবাদেও কত সময়েই না তাঁর অপার স্নেহের স্পর্শ পেয়েছি···এক এক সময়ে এত প্রত্যক্ষভাবে যে বললে তুমি হয়ত ভাববে মনগড়া। আমি আজও নিজেকে যোগিনী বলে চিনিনি দিদি!—আমাকে যখন গুরুদেব বড় আধার বলেন সত্যি আমি চমকে উঠি। কী আছে আমার বলো? না জ্ঞান, না ভক্তি, না নিষ্ঠা, না প্রতিভা। একটু রূপ—কিন্তু রূপ তো যৌবনের পদ্মপত্রে শিশিরের জল, নমিতা দি—ফুল না ঝরতে জল শুকোয়, বিশেষ মেয়েদের রূপ—কতটুকুই বা তার মূল্য? আমার স্বামী প্রথম প্রথম কী উচ্ছ্বাসই না করতেন আমার রূপশ্রী নিয়ে! কিন্তু এখন ফিরেও তাকান না। তাকাবেন কেন বলো? রূপের মোহ দুদিনে উবে যায়। থাকে শুধু টাকার তৃপ্তি। তাই তো আমার সৎমা আমার প্রাপ্য বিষয় আশয় সব তাঁর ও প্রবীরের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন শুনতে না শুনতে আমার স্বামীর প্রেমের নেশা গেছে। তবে এ নিয়েও আজ আর মন খারাপ করি না নমিতা দি। মা জননী প্রায়ই বলতেন না কি যে, বেদনা না পেলে চেতনা জাগে না?

"কয়েকদিন আগে ভক্তিমাসিমা এসেছিলেন খবর পেয়ে যে, আমেদাবাদে আমাকে আজ সবাই গঞ্জনা দিচ্ছে উঠতে বসতে। তিনি এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কী কান্নাই না কাঁদলেন! বললেন: 'আমার পাপিষ্ঠা বোনের জন্যেই তোর মতন লক্ষ্মীপ্রতিমার এ হাল হ'ল—আমি এ-লজ্জা রাখব কোথায় মা?' আমার শুনে সত্যি হাসি পেল, বললাম: 'প্রতিমার দাম শুধু ভক্তের কাছে মাসিমা—শক্তের কাছে নয়। আমার শ্বশুরবাড়িতে সবাই শক্ত হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে স্বর্ণময়ীর শক্তির ছোঁয়াতে। তাই ও নিয়ে দুঃখ না ক'রে শুধু এই প্রার্থনা কোরো মা জননীর কাছে—যেন আমাকে তিনি এবার টেনে নেন। আমি আজ বড় ক্লান্ত, নমিতাদি!'

"মা জননী আমাকে ভরসা দিয়ে গেলেন তাঁর শেষ নিশ্বাসের আশ্বাসে যে, আমাকে তিনি ভুলে থাকবেন না। কিন্তু আমার যে বড় একলা মনে হয় নমিতাদি। শুধু একলা নয়, আজ আমার মনে কেবল একটি প্রশ্ন উঠছে: কেন এমন হ'ল? ধনীর কন্যা ধনীর বধূ, দেখতেও কুৎসিত নই—তবু এমন অবস্থা আমার হ'ল কেন—উঠতে বসতে সবাই পায়ে মাড়িয়ে যায়? শুধু একটিমাত্র অবলম্বন ছিল আমার, তিনিও আজ চ'লে গেলেন! তবে আজ মনে হয় যে, বুঝি এ-ও আমার দরকার ছিল। সংসার সঙের সার—বলতেন মা জননী। এ কথা জেনেও আমি তো এই সংসারেরই আশ্রয় চেয়েছিলাম, নৈলে বিয়ে করতে গেলাম কেন? কই, তুমি তো করলে না? তোমার ভুল না করার দৃষ্টান্ত দেখেও শিখলাম না কেন? মাসিমা তো আমাকে ফেলতেন না, তাঁর কাছেই বা আশ্রয় নিলাম না কেন? এর কারণ শুধু একটি: আমি দীক্ষা নিয়েও সুখই চেয়েছিলাম, ঠাকুরকে চাইনি। তাই খেদ করার পথ নেই আমার—এমন কি অদৃষ্টের ঘাড়ে দোষ চাপাবারও মুখ নেই। ভালোই হ'ল দিদি। না ঠেকে জীবনে কজনই বা শেখে বলো? তা ছাড়া গুরুদেবের একটি শ্লোক আমার আজ কেবলই কানে বাজে: ভাগবতে বামন বলিরাজাকে সর্বস্বান্ত ক'রে বলেছিলেন: 'ব্রহ্মন্! যমহং গৃহ্ণামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্—' অর্থাৎ যাকে আমি কৃপা করি তাকে সব আগে করি নিঃস্ব। আমাদের তুকারামকেই দেখ না—সম্পদের মধ্যে জন্মেও অনশনে অর্ধাশনে যাঁকে কাটাতে হয়েছিল অকর্মণ্য ব'লে সকলেরই কাছে অবজ্ঞাত হ'য়ে। কেন? না, এই কথা মনে প্রাণে বলতে শিখতে যে তিনি ধনমান চান নি। তাঁর ছিল শুধু একটি প্রার্থনা 'তুকা মহণে প্রাণ করা দেবাসী অর্পণ'—প্রাণ মন সব বিঠলদেবের চরণে নিবেদন ক'রে দেওয়া। তাই দুঃখ পেলেও মনকে বুঝিয়েছি, ক্ষোভ নেই আর। শুধু তোমরা আশীর্বাদ কোরো দিদি, যে, নিঃস্ব হওয়াও যে তাঁর কৃপারই নিদর্শন অন্ততঃ এটুকু যেন উপলব্ধি করতে পারি। শুধু মুখে আওড়ালে শ্লোক থেকে যায় শুধু বুলি, মন-প্রাণ-অন্তর দিয়ে যখন তাকে বরণ করি তখনই সে হয় মন্ত্র। এই যে মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছি শুধু যেন তারই সিদ্ধি চাই—মুখের মিষ্টি নয়, সেই ভক্তির সিদ্ধি যে-ভক্তি ঠাকুরকে চায় আর পাঁচটার মধ্যে নয়—সব ছাড়িয়ে, সবার আগে।

[ক্রমশঃ

জাতীয় সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীঅম্বিকাচরণ চৌধুরী

ঊনবিংশ শতকের শেষার্দ্ধ বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের স্বর্ণ-যুগ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে, তাহার নব-জাগ্রত দেশাত্মবোধ বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহস্র নিষ্পেষণের বেদনায় যে অগ্নি-গর্ভ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, এই যুগেই তাহার উন্মেষ। সেই স্বাদেশিকতার উদ্বোধনে এবং তাহার বৈপ্লবিক রূপায়ণে বঙ্গসাহিত্যের দান অতুলনীয়। বিদেশী বণিকের "মানদণ্ড" তখন 'রাজদণ্ডে' রূপান্তরিত হইয়া ভারত-সাম্রাজ্য শৃঙ্খলিত করিয়াছে। স্বাধীনতা-যজ্ঞের প্রথম হোমকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়া ভারতীয় সৈনিক ও রাজন্যবর্গ দিকে দিকে যে প্রচণ্ড বহ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিল, তাহার সদ্য নির্ব্বাপিত ধূমে, গন্ধে গগন-পবন আচ্ছন্ন। সঙ্গে সঙ্গে পরপ্রান্ত হইতে জগৎ ও জীবন-বোধের নব নব দৃষ্টিভঙ্গী সমগ্র পাশ্চাত্যের সমাজ ও রাষ্ট্র-চেতনা বিক্ষুব্ধ করিয়া, প্রাচ্যের উপকূলেও তরঙ্গিত হইতে-ছিল। এই যুগ-সন্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার সাহিত্য-গগনে যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর অভ্যুদয় হয়,—ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র তাহাদের প্রাণসূর্য্য। মন্ত্রদ্রষ্টা এই নব ভগীরথ "বন্দেমাতরম্" শঙ্খ-নিনাদে স্বদেশ প্রেমের মন্দাকিনী-ধারা বঙ্গ-ভারতীর স্বল্পপরিসর অঙ্গনে প্রবাহিত করিলেন। নবীন বাংলা মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হইল।

দেশমাতৃকার সেই চিন্ময়ী ভাবরূপকে অনন্যসুলভ কলানৈপুণ্যে বাস্তবে মূর্ত্ত করিয়া বাংলার ঘরে ঘরে তাহার মঙ্গল-বেদী রচনা করিয়াছেন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তরসাধক, চারণ-কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁহার ধ্যান-দৃষ্ট মাতৃমূর্ত্তি ক্ষণিকের ভাব-বাষ্পে ভরা স্বপ্ন-প্রতিমা নয়,—"সদ্যস্নাত-সিক্তবসনা", "সিন্ধু শীকর-লিপ্ত-চিকুরা"—"বিমল-হাস্যে অমল-কমল-আননা" বিশ্বপালিনী জগজ্জননী জগন্মোহিনী" প্রত্যক্ষ দেবী, এই মৃন্ময়ী ভারতভূমি, যাহার—

"শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট, সাগর ঊর্দ্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার, পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।"

অনাদিকালের অনন্ত ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ তাহার প্রাণশক্তি দিকে দিকে সহস্র ধারায় অবিরাম উৎসারিত হইতেছে—

"এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়,
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে,
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার
দেশে ?"

সেই ধাত্রী দেবতার প্রসাধনে নিরত তন্ময় দ্বিজেন্দ্রলালের আকুল প্রার্থনা,—

"মাগো, তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি—
এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতেই মরি।"

এই প্রসঙ্গে অগ্নিযুগের নেতা, শ্রীঅরবিন্দের নিকট লিখিত একটি পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখযোগ্য : "অন্য-লোকে স্বদেশকে কতকগুলি মাঠ-নদী-পর্ব্বত-বনানীর সমষ্টি বলিয়া মনে করে। আমি তাহাকে "মা" বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি।" বিপ্লব তপস্বীর এই উক্তিতে দ্বিজেন্দ্র-কল্পিত জন্মভূমির "মাতৃরূপ" তৎকালে বিপ্লবী বাংলার চিন্তাধারাকে কতদূর প্রভাবিত করিয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট।

দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন সাহিত্য-সেবী। পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাব-সম্পদ ভারতের অতীত ঐতিহ্যে রসোপেত করিয়া তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগেই সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের শীতরশ্মি অস্তমিত, রবীন্দ্র-প্রতিভার অরুণালোকে দিঙ্মণ্ডল স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে। সেই সন্ধিক্ষণে এই দিক্‌পাল যুগলের অনিবার্য্য প্রভাব দ্বিজেন্দ্র রচনাবলীতে অল্পাধিক পরিলক্ষিত হইলেও, তাঁহার রচনাবলীতে মৌলিক উপাদানের প্রাচুর্য্যই সমধিক। পরিণত কালে বঙ্গসাহিত্যের যে বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্র-প্রতিভার চরম প্রকাশ, সেই জাতীয় সঙ্গীত ও নাটকে তাঁহার মৌলিক অবদান অপরিমেয়।

অনুভূতির বাস্তব ধর্ম্মিতা এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর সজীবত্বে

এই রচনাবলী "প্রগতি-তন্ত্রের" অগ্রদূত। এই অনুবৃত্তির সমর্থনে সমালোচকপ্রবর ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়,—"দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত, তিনি বাঙ্গালীর পথ-প্রদর্শক তিনি স্বদেশী-তন্ত্রের মহাকবি।"

বঙ্গভঙ্গের পূর্ব্ব হইতেই বাঙ্গালীর মজ্জাগত নির্জ্জীবতা এবং তামসিক অবসাদ দূর করিবার জন্য তিনি একদিকে যেমন তাহাকে শ্লেষে, ব্যঙ্গে জর্জ্জরিত করিতেছিলেন, তেমনি আবার তেজবীর্য্যের গৈরিক নিঃস্রাবে তাহার বিস্মৃতসত্তার উজ্জীবনেও তৎপর ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল বন্যা যখন বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইল, তাহার উদ্দাম তরঙ্গে তিনিও মাতিয়া উঠিলেন। চারণ-কবির বীণাতন্ত্রী দীপকে ঝঙ্কার তুলিল,—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি ত মেষ,
দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার,
আমার দেশ।"

শাসক শক্তির রুদ্ররূপে নির্য্যাতিত হতাশ জনসংঘ মেঘ-গম্ভীর দুন্দুভি-নিনাদে তাঁহার আশ্বাস বাণী শুনিল,—"কোন দুঃখ নাই, বীরের রক্তই জাতিকে উর্ব্বর করে। দুঃখ সে দেশের নয়,—যে দেশের বীর মরে, দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরেনা।"

"গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ।"

"সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠ বীর জায়া, বাঁধ কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর।'

রাজস্থান ভারতের অতীত ইতিহাসের স্বদেশ-প্রেম ও শৌর্য্য-বীর্য্যের কেন্দ্রভূমি ছিল। তাই মনস্বী দ্বিজেন্দ্রলাল এই দেশের আখ্যায়িকাকেই তাঁহার অধিকাংশ জাতীয়-নাটকের বিষয়বস্তু নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ভাষার ঝঙ্কারে, পৌরুষের অনুপ্রেরণায় "চারণ-কবির দক্ষতা ইহাদের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিস্ফুট। উৎকৃষ্ট ও অনবদ্য চরিত্র সৃষ্টিতে, ভাবের উদ্দাম প্রবাহে, অপূর্ব্ব দৃশ্য-পরিকল্পনায়, মধুর সঙ্গীত পরিবেশনে, রসমাধুর্য্যে, বলিবার শক্তিমান্ ভঙ্গীতে, অতুলনীয় শব্দ-বিন্যাসে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকাবলীকে উচ্চাঙ্গের গদ্যকাব্য বলা যাইতে পারে। দ্বিজেন্দ্রোত্তর যুগে অদ্যাবধি কোন নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকে অতিক্রম করিতে অথবা দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই। সর্ব্বোপরি এমন দোষে গুণে গড়া স্বাভাবিক চরিত্র তাঁহার অন্য কোন রচনায় বিরল। বাংলার গ্রামে গ্রামে পর্য্যন্ত এই নাটক সমূহ এখনও অদম্য উৎসাহে সগৌরবে অভিনীত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার নাটকাবলী অনূদিত হইয়া অভিনীত হইতেছে। সুদূর বিলাতেও তাঁহার কোন কোন নাটক মঞ্চস্থ হইয়া গৌরবার্জ্জন করিয়াছে। এখনও গৈরিক বসন পরিহিতা চারণী দলের উদাত্ত কণ্ঠে—

"মেবার পাহাড়, শিখরে যাহার রক্ত পতাকা উচ্চশির,
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছ-দর্প, দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর—"

শুনিতে শুনিতে প্রেক্ষাগৃহে উত্তেজনার বিদ্যুৎ-শিহরণ বহিয়া যায়, স্থান কালের যবনিকা ধীরে ধীরে অপসৃত হইয়া তন্ময় মানস-নেত্রে উদ্ভাসিত হয়—স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্ত-স্নাত মেবারের মহিমময় দৃশ্য—আরাবল্লীর গিরি-শীর্ষে গৌরবের সুবর্ণরেখা। দ্বিজেন্দ্রলালের উদয়ন যুগে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একবার লিখিয়াছিলেন, "দ্বিজেন্দ্রলাল জাতিকে শুধু হাসাইতে আসেন নাই, একদিন যে জাগাইবেন ও মাতাইবেন, তাহার-ও আশ্বাস দিয়াছেন।" তাঁহার এই ভবিষ্যৎ বাণী যে অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলালের জাতীয় সঙ্গীত ও নাটকের অদ্যাবধি অম্লান প্রভাব এবং অক্ষুণ্ণ জনপ্রিয়তাই ইহার জলন্ত প্রমাণ।

দ্বিজেন্দ্রলাল পাশ্চাত্যের আক্রমণশীল বা অহংসর্ব্বস্ব জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেন নাই। বিজাতি বিদ্বেষের সঙ্কীর্ণ নেতিবাদ এবং সাময়িক উত্তেজনাও তাঁহার আদর্শকে অভিভূত করে নাই। স্বদেশের স্বাধীনতা ও সর্ব্ববিধ কল্যাণে উদ্গত হইলেও তাহার চরম পরিণতি—স্বদেশ, স্বজন, স্বধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া, সর্ব্বমানবের, এবং সর্ব্বধর্ম্মের মৈত্রী-সঙ্গমে—

"অম্বর হইতে সম-শতধারে জ্যোতিঃপ্রপাত তিমিরে
নামি' ধরায় হিমাচল মূলে মিলিল সাগর সঙ্গে।"

"যেমন স্বার্থের চেয়ে জাতীয়ত্ব বড়, তেমনি জাতীয়ত্বের চেয়ে মনুষ্যত্ব বড়। জাতীয়ত্ব যদি মনুষ্যত্বের বিরোধী হয়, তবে মনুষ্যত্বের মহাসমুদ্রে জাতীয়ত্ব বিলীন হ'য়ে যাক, স্বদেশ, স্বজন ডুবে যাক্, এ জাতি মানুষ হোক্"—দ্বিজেন্দ্র

লালের মানসকন্যা মানসীর এই ভাষণে তাঁহার বিশ্বতোমুখী আদর্শের উদার প্রশান্তি অভিব্যক্ত। এই প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীর নিকট লিখিত চিঠি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—"অবারিত উদ্যম, অদম্য ইচ্ছাশক্তি, উন্মুক্ত উদার ও নির্মল মন, প্রাণময়ী চিন্তা ও জ্যোতির্ময়ী কল্পনা—এ সবের উপরে যদি কিছু থাকে ত আমার বিশ্বাস সে হচ্ছে একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য। এই এক ব্রহ্মচর্য্যের বলেই একদিন আমাদের স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমি অতি সহজে, এমন অনায়াসে, স্বাভাবিক শক্তিবলে এ বিশ্বসংসারে জগৎগুরুর আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। আর আজ যদিও সে পদানত, নির্জ্জীব, অসহায় ও নিঃস্ব, তবুও ঐ একমাত্র উপায় অবলম্বন করলে এখনও সে নিশ্চয় আবার সেই শূন্য সিংহাসনে ধীরে ধীরে গিয়ে উপবেশন কর্ত্তে পারবে। আমি সেই শুভদিনের জন্য প্রতীক্ষা করে বসে আছি। আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ দেখতে পাচ্ছি; যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের হেয়, নগণ্য ভেবে উপেক্ষা করুক, আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব। এ আঁধার চিরদিন কখনও আমাদের ছেয়ে থাকবে না, থাকতে পারেনা। এ স্বপ্ন নয়, কল্পনা নয়, অযথা প্রলাপ বা শূন্য অহঙ্কার নয়। "আসিবে, সে দিন আসিবে।" আমি চাই শুধু ঐ বীর্য্যবল ব্রহ্মচর্য্য; চাই শুধু আসল, খাঁটি, ধ্রুব ও নিটোল ধর্ম্মবল আর এক কথায় "মনুষ্যত্ব।" কবির এই স্বপ্ন-সাধনা কি সফল হইবে না?

দার্শনিক ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ভক্তিবাদী ছিলেন না। কেবল "পরপারে" নাটকে "ভবানীপ্রসাদ" ব্যতীত তাঁহার রচনায় ভক্তিমূলক চরিত্র আর বিশেষ নাই। তিনি ছিলেন…"কপিল-পন্থী"—সন্দেহবাদী। যুক্তি-প্রবণ বস্তু-তান্ত্রিক চিন্তাধারাই তাঁহার জগৎ ও জীবনবোধের ভিত্তি ছিল। এই উপাদানে গঠিত তাঁহার অনুপম সৃষ্টি "চাণক্যের ভাষায়, বিবেক একটা কুসংস্কার, ঈশ্বর নাই।"—তবুও সেই চাণক্যের অদ্ভুত মনীষা এবং দুর্জ্জয় পুরুষকারের সম্মিলিত লক্ষ্য, "ভারতে জীবিত জাতির সমবায়ে এক মহাসঙ্গীত রচনা," তাঁহার সুদূর নিবদ্ধ দৃষ্টিতে, "এই প্রধূমিতা, প্রজ্জ্বলিতা, প্রবাহিত-রক্ত-স্রোতস্বতী, ভৈরবী ভারত ভূমির পরিবর্ত্তে এক রত্নালঙ্কারা, পুষ্পোজ্জ্বলা, সঙ্গীত-মুখরা, হাস্যময়ী জননী, জলধি হতে জলধি পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ এক মহাসাম্রাজ্য।" আজ দীর্ঘকাল পরে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই সেই আদর্শ "মহাভারত" রচনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক কলহে জর্জ্জরিত, "খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত-ভারতে" প্রতিক্রিয়া-শীল জাতীয়তাবাদ দিকে দিকে মনুষ্যত্বের শোচনীয় লাঞ্ছনায় উন্মত্ত। অন্নহীন, গৃহহীন, শীর্ণ, শুষ্ক, লক্ষ মানবের ব্যর্থ হাহাকারে এই পুণ্যভূমির অতীত কলঙ্কিত, বর্ত্তমান অভিশপ্ত এবং ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হইতেছে। এই চরম দুর্গতির দিনে দ্বিজেন্দ্রলালের অনাবিল স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তার সার্ব্বভৌম আদর্শ দ্বিধাছিন্ন জাতিকে—আত্মচৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করুক,—"হিন্দু মুসলমান এক হোক্, এক সঙ্গে মন্দিরে মসজিদে আল্লার ও ব্রহ্মের নাম নিনাদিত হোক্, জাতিভেদ, ধর্ম্মভেদ, আচার ভেদ ভুলে তারা একবার সমস্বরে এই ভারতভূমিকে 'মা' বলে ডাকুক।" আমরণ জাতীয়তত্ত্ব সাধকের এই একান্ত কামনা কি পরিপূর্ণ হইবেনা?*

* পূর্ণিমা সম্মিলনী কর্ত্তৃক আহূত দ্বিজেন্দ্র জন্ম শত বার্ষিক অনুষ্ঠানে পঠিত।

অভিঘাত

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ঠিক একভাবে দরজায় হেলান দিয়ে তাপসী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। নীলার জীবনক্লান্ত, নিস্তেজ, ভেঙে-পড়া মূর্তির দিকে চেয়ে।

এত আনন্দ, এত উচ্ছ্বাস, এত উত্তেজনা এত স্বপ্ন তার পরমায়ু! মনে মনে তাপসী একবার হিসাব করার চেষ্টা করল।

কতদিন হবে? বছর দুয়েক তার বেশী নয়। মাত্র বছর দুয়েক আগে এ বাড়ীতে, এই মধ্যবিত্ত নির্জীব পরিবেশে সুকুমারের আসাটাই যেন একটা আনন্দের সংকেত ছিল।

আলাপ এ পারের নয়, ওপারের। একদল ভয় পাওয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য ছুটে আসা মানুষগুলোর দলে নীলারা যেমন ছিল, তেমনই ছিল সুকুমার। অবশ্য দেখা হ'ল শেয়ালদা ষ্টেশনে, যদিও দু পুরুষ একেবারে পাশাপাশি বাড়ীতে তারা কাটিয়েছিল।

তখনও নীলার বাবা এমন অথর্ব হয়ে পড়েননি। গায়ে শক্তি ছিল, পেটে বিদ্যাও ছিল। এক বেসরকারি স্কুলে চাকরি জুটে গেল। শিক্ষকতার সঙ্গে বাড়তি আয়ের পন্থা টুইশনি। মহিমবাবু পায়ের তলায় মাটি পেলেন। সরকার থেকে জমির ছিটে জুটেছিল, টিনের চালা। টিনের বদলে পাকা গাঁথনি হ'ল। কৃতবিদ্য ছাত্রদের দাক্ষিণ্যে একটু একটু করে স্বচ্ছল হ'ল অবস্থা।

নীলা স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে ঢুকল, তাপসী স্কুলের শেষ ধাপে।

সুকুমার আগে থেকেই আসা যাওয়া করছিল, এবার তার আসাটা বেশ ঘন ঘন হ'য়ে উঠতে লাগল আর কেমন একটু উদ্দেশ্যমূলক।

নীলা বাড়ী ফিরিল সিঁথের সিঁদুর মুছে। মেয়েকে দেখেই মা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল একটি কথাও না বলে।

বাপ দাওয়ায় মাদুর পেতে বসে তামাক খাচ্ছিলেন। মুখ চোখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। শুধু হুঁকোর শব্দ আরও দ্রুততর হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। ভাবটা যেন আত্মজার সামনে নিবিড় একটা ধূম্রজালের সৃষ্টি করে পরিস্থিতিটা সামলে নেবেন।

নীলা কিন্তু কোন দিকেই দেখল না। সোজা নিজের ঘরে এসে ঢুকল। অবশ্য এ ঘরটা আর তার নেই। এখন এখানে ছোট বোন তাপসী আস্তানা গেড়েছে। ছোট একটা আয়নার নীচে প্রসাধনের টুকিটাকি। এককোণে সারি সারি ট্রাঙ্ক। সেই পুরনো তক্তপোষ। নতুনের মধ্যে কেবল সস্তাদরের একটা আলনা।

তাপসী রান্নাঘরে ছিল। নীলাকে দেখে তার পিছন পিছন ঘরে এসে ঢুকল।

দিদি, এভাবে চলে এলি যে? দরজার কপাটে হেলান দিয়ে তাপসী প্রশ্ন করল। তখনও কিন্তু তার নীলার শূন্য সিঁথির দিকে নজর পড়ে নি।

কাঁধের ঝোলানো ব্যাগটা তক্তপোষের ওপর রাখতে রাখতে বিষণ্ণ, নিস্পৃহ গলায় নীলা বলল, বনল না।

কার সঙ্গে বনল না, কেন বনল না, কে বনাতে পারল না, এ সব কথা, এত সব কথা যেন অবান্তর। স্বামীর সঙ্গে সারা জীবনের সম্পর্কই নয়, যেন সামান্য একটা দোকানদারের সঙ্গে কোন জিনিষের দাম নিয়ে বনে নি, নীলা কথায় এমনই একটা আভাস দিল।

স্বল্প মূলধন সম্বল করে সুকুমার সামান্য একটা ব্যবসার পত্তন করেছিল, আজ তার অবস্থা ভালই। গাড়ী কিনতে পারে নি, কিন্তু একটা মোটর সাইকেল কিনেছে। তাতেই আসা যাওয়া করে। একটা মোটর সাইকেলের দামও নীলাদের সংসারে তখন অনেক।

তাপসী ছোট, কিন্তু তখনই সে বুঝতে পারত। দুঃখের আগুনে পুড়ে মানুষ একটু তাড়াতাড়িই সব কিছু শেখে।

সুকুমার এলেই ছলছুতো করে নীলার বাবা বেরিয়ে পড়তেন। নীলার মা তাপসীকে আটকে রাখত রান্নাঘরে। এক কথায় বাইরের ঘরে নীলা আর সুকুমারের অবাধ মিলনের পথের সব বাধা অপসারিত করা হত।

মাঝে মাঝে নীলা আর সুকুমার বেরিয়ে যেত। কোন দিন সিনেমা, কোনদিন দোকানে। সুকুমারের দেওয়া উপহারগুলো নীলা যখন তার মা বাপের সামনে মেলে ধরত তখন দুজনের দু জোড়া চোখ লোভের ছোঁয়ায় জ্বলে জ্বলে উঠত। একটা পরম প্রত্যাশার দিন গুণত দুজনে। নীলার মা মেয়েকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাও করত আগামী শুভক্ষণের কথা। সুকুমার এত দেরী করছে কেন? ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার মতন বিলম্ব।

নীলা উত্তর দিত না। সলজ্জভাবে সরে যেত মায়ের আওতা থেকে।

অবশেষে সুকুমার একদিন এগিয়ে এল। নীলার বাপের কাছে ভিক্ষা চাইল মেয়েকে।

এ যেন পাকা ফলের নীচে হাত পেতে বসে থাকা। ফলপ্রাপ্তিতে একটুও দেরী হল না। ততদিনে নীলার বাবা একটু গুছিয়ে নিয়েছেন। খুব ধুমধাম না হ'লেও, একেবারে শাঁখা সিঁদুরে মেয়ের বিয়ে দিলেন না।

এর পরের বছর খানেক নীলার পা যেন মাটিতে পড়ল না। মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী আসত, কখনও সুকুমারের মোটর সাইকেলের পিছনে চেপে, কখনও একলা ট্যাক্সিতে চেপে। সে যে অপরিসীম আনন্দে আর সুখে দিন কাটাচ্ছে তার চিহ্ন তার কথায়-বার্তায়, আবরণে-আভরণে।

সুকুমারের আরও উন্নতি হয়েছে। ব্যবসা ছাড়াও কজন বন্ধু মিলে সিনেমার কারবারে নেমেছে। গোটা দুয়েক বইও শুরু করেছে। নায়ক অলককুমার আর নায়িকা উর্মিলা দেবী যাদের একবার চোখের দেখা দেখবার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করে লোকেরা, তাদের নীল যে কতবার দেখেছে তার হিসাব নেই। শুধু দেখা নয় ষ্টুডিয়োতে পাশাপাশি বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প।

শেষের প্রলোভনটুকু অবশ্য তাপসীকে লক্ষ্য করে।

তাপসীর সামনে বি, এ, পরীক্ষা। তার অবস্থা যজ্ঞকুণ্ডের সামনে সমাহিতচিত্ত ঋষির মতন। দিদির এ উচ্ছ্বাস, এ কলরোল তার হৃদয়ে একটুও আলোড়ন জাগাল না।

সুকুমারও তাকে অনেক বলেছে। তখন বি, এ পরীক্ষা শেষ করে তাপসী বিশ্রাম করছে। সকাল বিকাল শুধু দুটো টিউশনি।

চল, অলককুমারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। বরাত জোর থাকলে একসঙ্গে দুজনের ফটোও উঠে যেতে পারে। সব সময়ে অলককুমারকে ফটোগ্রাফাররা ঘিরে থাকে তো।

তাপসীর তরফ থেকে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা গেল না। চায়ের কাপ আর খাবারের থালাটা সামনে রেখে বলল, মাকে ডেকে দিচ্ছি, আমি আবার একটু বেরোব।

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে সুকুমার বলল, পরীক্ষা তো শেষ। এখন তো লম্বা ছুটি, চল দিদির ওখানে কিছুদিন কাটিয়ে আসবে।

তাপসী ঘাড় নেড়েছে, ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়ার কি ছুটি আছে জামাইবাবু। আমার টিউশনি রয়েছে না।

কথা শেষ করে তাপসী আর দাঁড়ায় নি। তার মাকে ডেকে দিতে ভিতরে বলে গেছে।

তাপসী চিরদিনই এই রকম। নীলা সুন্দরী, অসামান্যা না হ'লেও চলন সই। গৌরবর্ণা, আয়তলোচনা, দীর্ঘাঙ্গী। তাপসীর রং কালো। চোখ আয়ত কিনা দেখবার উপায় নেই, কারণ ছেলেবেলা থেকেই তার চোখে বেশী পাওয়ারের চশমা। দৈর্ঘ্য সাধারণ বাঙালীর ঘরের মেয়ের মতন।

তাছাড়া, তার প্রকৃতিও আলাদা। ছেলেবেলা থেকে অধ্যয়নসর্বস্ব। বাইরের হুজুগের প্রতি তার আকর্ষণ কম। নিজেকে ঘিরে এমন একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলেছিল যে সহজে কেউ তার ধারে কাছে ঘেঁষতেই পারত না।

দেয়ালে হেলান দিয়ে তাপসী দাঁড়িয়ে রইল। নীলা

নীচু হ'য়ে স্যুটকেশটা খুলতে যেতেই তাপসীর নজরে পড়ল।

দিদি! তাপসীর কণ্ঠে আহত বিস্ময়ের স্বর।

কিরে? পাট করা একটা শাড়ী তুলতে তুলতে নীলা উত্তর দিল।

সিঁদুর মুছলি কেন?

নীলা একটু ভ্রূ কোঁচকাল তারপরই স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, কেন, মুছব নাই বা কেন? সিঁদুরের সম্পর্কই যখন রাখলাম না, তখন ওই লালগুঁড়োটা শিরোধার্য করতে যাব কোন দুঃখে।

আজকাল নীলা এই ধরণের কথা বলে। সিনেমার নায়িকাদের মতন সংলাপ। সোজা কথা পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কাব্য করে। এটা তাপসী লক্ষ্য করেছে।

জামাইবাবুর সঙ্গে কি ডাইভোর্স হয়ে গেল তোর?

না, দুবছর আলাদা না থাকলে তো ডাইভোর্স হয় না। সেইজন্যই তো চলে এলাম। কেন, তুই শুনিস নি কিছু!

এবার নীলা তাপসীকে উল্টে প্রশ্ন করল।

তাপসী দু এক মুহূর্ত ভাবল। কিছু যে একটা হয়েছে সে আভাস তাপসী পেয়েছিল। মা আর বাপের ফিসফাস কথাবার্তায়, নীলার ঘন ঘন এ বাড়ীতে আসায়, কোথায় অন্ধকার দানা বাঁধতে শুরু করেছে সেটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় নি। সেটা যে নীলা আর সুকুমারের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সেটুকুও আঁচ করতে পেরেছিল। তবে, এ বিষয়ে তার সঙ্গে কেউ আলোচনা করেনি, তাই সেও কোন আগ্রহ দেখায় নি।

তাছাড়া তার সময়ও কম। টিউশনি তো ছিলই, তার ওপর নিজের এম, এ পরীক্ষা সামনে। বাড়ীতে তাপসী যতটুকু থাকত, বই মুখে দিয়ে আর তার সেই বইয়ের পাতায় আর কারো, অন্য কিছুর ছায়া পড়ুক এটা সে চাইত না।

তবে ব্যাপারটা যে এমন আকার নিচ্ছে তা সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। সে ভেবেছিল, সব সংসারের মতন, এটা বুঝি সাময়িক অশান্তির ব্যাপার। মেঘ জমেছে, আবার মেঘ কেটে যাবে।

তাপসী আর কিছু বলল না। রান্না ঘরে ফিরে গেল। মায়ের শরীরটা একটু খারাপ হয়েছে, তাই তাপসী রান্নার ভার নিয়েছে। এরকম আজকাল মাঝে মাঝে হ'চ্ছে। তাপসীর পড়াশুনার একটু অসুবিধা হয়, কিন্তু এ ছাড়া আর উপায়ই বা কি। পয়সা দিয়ে রান্নার লোক রাখবে তাও যেমন সম্ভব নয়, আবার উটকো লোকের [illegible] রান্না মা মুখেও তুলবে না।

তাপসীর বিছানার পাশেই নীলার বিছানা হ'ল। এ ছাড়া আর পথও ছিল না। ঘর তো মোটে আড়াই-খানা। একটায় মা আর বাবা, আর একটাতে চিরকালই দুই বোন শুত। নীলার বিয়ে হয়ে যাবার পর, তাপসী হাত পা ছড়িয়ে একলা থাকবার অধিকার পেয়েছিল।

আর একটা ছোট্ট ঘর আছে। সেটা রাজ্যের বাজে জিনিসে ঠাস বোঝাই। ভাঙা প্যাকিং কেস, ঘুঁটের ঝুড়ি, হাতল ভাঙা চেয়ার।

তাপসী বিছানায় বসে পড়ছিল, নীলা শুতে এল। এতক্ষণ বোধহয় নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মা বাপের সঙ্গে আলোচনা করছিল। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে তাপসীর কানে মাঝে মাঝে টুকরো কথাবার্তা কানে আসছিল। সুকুমারের নাম, তার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা, নীলার প্রতি দুর্ব্যবহার।

নীলা পাশ ফিরে শুল। তাপসীর মনে হ'ল বাতির জন্য হয়তো তার ঘুমের অসুবিধা হচ্ছে। তাপসী একটা খাতা দিয়ে টেবিল ল্যাম্পটা আড়াল দিল। নীলার একটা অন্ধকার হয়ে গেল।"

হ্যারে তপু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? হঠাৎ এদিকে ফিরে নীলা প্রশ্ন করল।

মেটাফিজিক্সের বই থেকে মুখ তুলে তাপসী কিছুক্ষণ দিদির দিকে চেয়ে রইল, তারপর বলল, কি কথা?

তোর জীবনে কোন পুরুষ বন্ধু আসেনি তো?

তাপসী অবাক হ'ল। অবশ্য তাপসী শিশু নয়, এ ধরনের আলোচনা যে তার সঙ্গে চলতে পারে না, এমন নয়। তবু এভাবে আচমকা দিদি, বিশেষ করে মনের এ অবস্থায়, এ জাতীয় প্রশ্ন করবে, এটাই তাপসীর আশ্চর্য ঠেকল।

হঠাৎ এমন একটা প্রশ্ন?

না, এমনই জিজ্ঞাসা করছি।

ও বিলাসিতাটা আমার যে নেই, তাতো তুমি জান

করেই জানো দিদি। থেমে থেমে প্রত্যেকটী কথার ওপর জোর দিয়ে তাপসী উত্তর দিল।

জানে নীলা, খুব ভাল করেই জানে। নীলার জীবনে সুকুমার প্রথম পুরুষ নয়। পাড়ায়, কলেজে, গুণগ্রাহী, রূপমুগ্ধ একদল ছেলে নীলাকে ঘিরে গুঞ্জন করত, নীলা যে তাদের একেবারেই আমল দিত না, এমন নয়। পথে ঘাটে অন্তরঙ্গতার দৃশ্য তাপসীরও চোখে পড়েছে। সুকুমারকে নীলা বেছেছিল কারণ যারা আসত, তাদের মধ্যে সেই এর চেয়ে কাম্য ছিল। অর্থে আর সামর্থ্যে।

দু একজন যে কিশোরী তাপসীর দিকেও নজর দেয় নি, এমন নয়। নীলাকে সামনে রেখে তার সঙ্গে আলাপ করারও চেষ্টা করেছে। তাপসী সুন্দরী নয়, কিন্তু এমন একটা সময় আসে, যখন বয়স আর স্বাস্থ্যই সৌন্দর্য।

নীলা দু একবার চেষ্টাও করেছে। তাপসীকে দলে টানবার কিন্তু সুবিধা করতে পারে নি। ছেলে বয়স থেকেই তাপসীর একটা গাম্ভীর্যের আবরণ ছিল সর্বাঙ্গে। পথে ঘাটে কেউ তার সঙ্গে কথা বলতেও সাহস করে নি।

দূর থেকে দু একজন টিটকারি দিয়েছে। কেউ বলেছে সক্রেটিস, কেউ বলেছে ঋষ্যশৃঙ্গ। তাপসী প্রত্যুত্তর করে নি। কথাগুলো কানে গেছে, মুখের ভাবে তারও কোন চিহ্ন ফোটে নি। সব রকমের রসিকতা তাপসীর নিস্পৃহ-তার বর্মে ঠেকে ভোঁতা হয়ে গেছে।

ঠিক বলেছিস তপু, ওটা একটা বিলাসিতাই। পুরুষের সঙ্গে কদিন মিলে মিশে আমরা মন দেওয়া নেওয়ার পালা সাঙ্গ করি, কিন্তু ওই কটা দিনে কতটুকু আমরা চিনতে পারি পুরুষ মানুষকে। তারা যখন আমাদের কাছে আসে, তখন চড়া রং মেখে আসে। আমরা ভাবি এই বুঝি তাদের আসল রূপ। তাদের মধুর কথায় ভুলি, নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনি।

তাপসী চুপচাপ কথাগুলো শুনে গেল। ভেবেই পেল না, এসব কথাগুলো তাকে বলবার কি অর্থ থাকতে পারে! সুকুমারের চড়া রংয়ে যদি নীলা ভুলে থাকে, তবে সে দোষ নীলার। তার প্রায়শ্চিত্ত হয়তো সে করছে। কিন্তু তাপসীর জীবনে এমন কোন ঘটনা ঘটে নি, ঘটবার সম্ভাবনাও কম। কাজেই তার ওপর এই উপদেশ বর্ষণের কোন প্রয়োজন নেই।

বাপ মা খোঁজ-খবর করে, বংশ দেখে, কোষ্ঠি মিলিয়ে যে পাত্র ঠিক করে তাকে গ্রহণ করাই ঠিক।

নীলা পাদরী ধর্মযাজকের মতন বাণী বিতরণ করার ভঙ্গীতে বলল।

তাপসী এবার বইটা মুড়ে ফেলল। বুঝতে পারল আজ রাতের মতন পড়াশোনার ইতি। এভাবে পাশে শুয়ে একজন জীবনের দার্শনিক সত্য আওড়ে গেলে দর্শন শাস্ত্রে মন বসার সম্ভাবনা কম।

তাপসী বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। নীলার দিকে ফিরে বলল, এসে পর্যন্ত তো তোর গর্জন আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দই শুনছি, আসলে কি ব্যাপার হয়েছে বল তো?

আলোতে যেন একটু অস্বস্তি হচ্ছিল নীলার, অন্ধকারে সে বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল। আস্তে আস্তে বলল, ভদ্রলোকের ইচ্ছা আমায় সিনেমায় নামায়।

--এ অভিযোগটা নতুন। বাড়ীতে কথাবার্তার মধ্যেও এটা তাপসীর কানে আসে নি। জীবনে পাদপ্রদীপের আলোর সামনে নীলা কোনদিন দাঁড়িয়েছে, তাপসী মনে করতে পারল না। সিনেমায় নামার কোন ঝোঁক ছিল, এমনও মনে হয় নি। তবে, সুকুমারের হঠাৎ এমন একটা খেয়াল হবার কারণ?

হঠাৎ সিনেমায়? মনের দ্বন্দ্বটা তাপসী মুখের ভাষায় রূপ দিল। জানিস না, এটাই তো আজকালকার রেওয়াজ। বন্ধু বান্ধবরা সব নাচিয়েছে, আমার চেহারা নাকি পর্দার উপযোগী। খুব মানাবে। খ্যাতি আর অর্থ অল্প সময়ের মধ্যে আহরণ করতে হ'লে এটাই নাকি একমাত্র পন্থা। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম রসিকতা, তারপর দেখলাম সত্যি সত্যিই আমাকে ষ্টুডিয়োয় নিয়ে যেতে চায় স্ক্রীনটেষ্টের জন্য। একদিন পীড়াপীড়িতে স্ক্রীনটেষ্টও দিয়ে এলাম, আর আরও সর্বনাশের কথা তাতে উতরেও গেলাম। ব্যস, অজগর বন্ধন আরও শক্ত হ'ল। আমাকে নিয়ে প্রযোজকদের সঙ্গে দরদস্তরও চলতে লাগল। তখন আমি বেঁকে দাঁড়ালাম। সেই বিরোধের শুরু।

সেই বিরোধ থেকে একেবারে বিচ্ছেদ। কেন, সুকুমারকে কি বোঝানো সম্ভব হ'ল না যে রূপোলী পর্দায়

মোহ জীবনে কত বড় অভিশাপ আনতে পারে। অর্থের সঙ্গে দারুণ অনর্থ।

কি জানি এসব কথা ভাবতে তাপসীর ভাল লাগল না। সামনে পরীক্ষা, এখন এ সব চিন্তা মাথায় ঢুকলে বইয়ের একটি অক্ষরও মগজে যাবে না। তার চেয়ে, তাপসী পাশ ফিরে শুল। ঘুমের ভাণ ক'রে।

শুয়ে শুয়েই তাপসী শুনল, নীলার গলা, তপু ঘুমালি নাকি? উঃ মেয়ের আচ্ছা ঘুম বাবা।

পরের দিন সকালে নীলার সঙ্গে দেখা হলেও কথা বলবার অবকাশ তাপসীর হ'ল না। একটা টিউশনি আছে। চা মুখে দিয়েই তাপসী বাইরে ছুটল।

বিকেলের দিকে নীলার সঙ্গে আবার মুখোমুখি দেখা হ'ল।

নীলা বাইরের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, তাপসী আসতেই তার পিছন পিছন ঘরে ঢুকল।

তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল তপু?

বইগুলো টেবিলের ওপর রেখে তাপসী বলল, বল।

আমার একটা চাকরি করে দিবি। আই, এ পর্যন্ত তো পড়েছি। তোর তো চারদিকে অনেক জানাশোনা।

তাপসী দিদির দিকে ফিরে দাঁড়াল, হঠাৎ চাকরি করার তোমার কি দরকার হ'ল?

বারে, মা বাপের গলগ্রহ হয়ে থাকব নাকি? ওর কাছ থেকে একটি পয়সা সাহায্য আমি চাই না। তুই দেখ না খোঁজ করে।

বেশ দেখব। তাপসী আর দাঁড়াল না। বাথরুমে গিয়ে ঢুকল।

দিন দশেকের মধ্যে তাপসী সত্যিই একটা চাকরি জোগাড় করল। মাইনে খুব বেশী নয়, তেমনই কাজও আরামের। সকালে যে বাড়ীতে পড়ায়, সে মেয়েটির কাকার ছোটখাট একটা ওষুধের কারখানা ছিল, সেখানেই কেরাণীর চাকরি। এগারোটা থেকে চারটে।

নীলার কৃতজ্ঞতার যেন শেষ নেই। বারবার তাপসীকে ধন্যবাদ জানাল, কিন্তু তাপসীর মনে হল মা বাবার মুখ বেশ ভার। তারা খুব খুশী নয়।

মহিমবাবু মুখ ফুটে তাপসীকে আড়ালে একদিন বলেই ফেললেন, সাত তাড়াতাড়ি নীলার একটা চাকরি যোগাড় করে দেবার তোর কি দরকার ছিল?

বা, দিদি বারবার আমায় বলে যে।

তোমার দিদি তো কত কথাই বলছে। বেশ রাগত কণ্ঠস্বর মহিমবাবুর।

মাও অনুযোগ করল, সুকুমারের কাছে ফিরে যাবার যাও বা একটু আশা ছিল, সে পথ তুই বন্ধ করলি তপু।

তাপসী মায়ের কথার কোন উত্তর দিল না। নীলাকে একদিন সোজাসুজি বলল, তোমার চাকরি করে দেওয়াটা আমার ঠিক হয় নি দিদি।

কেন? নীলা বিস্মিত হ'ল। কিছু পরিমাণে বিরক্তও।

মা আর বাবার ইচ্ছা নয় তুমি চাকরি কর।

এবার নীলার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বলল, ওদের ইচ্ছা আমি ওই লোকটার কাছে ফিরে যাই। পতি পরম গুরু বলে গলায় আঁচল দিয়ে তার পায়ের ওপর আছড়ে পড়ি। কিন্তু আমার দ্বারা ওসব সতীলক্ষ্মীর অভিনয় হবে না তপু। সে যুগ আর নেই।

তপসী কোন কথা বলল না। নীলা যদি সত্যিই স্বামীর সংসারে ফিরে না যায় তাহলে এভাবে এ সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকাটা তার অনুচিত হবে। মহিমবাবুর রোজগার এমন নয় যে বাড়তি একটা মানুষকে তিনি পুষতে পারবেন, সে বাড়তি মানুষটা নিজের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও। তা ছাড়া বিয়ের আগে পর্যন্ত মেয়েদের বাপের সংসারে যে জোর খাটে, বিয়ের পর, শ্বশুরবাড়ীর পথ বন্ধ করে এখানে এলে, সে শক্তি তার থাকে না। তখন নির্বিষ ভুজঙ্গের মতন ফণা গুটিয়েই বাস করতে হবে।

তাপসী শুধু সেই দিকটাই ভেবেছিল। তাই নীলাকে স্বাবলম্বী হবার সুযোগ দিয়েছিল।

যা হোক চাকরি নীলা ছাড়ল না। তাকে সোজাসুজি চাকরি ছাড়ার অনুরোধও কেউ করল না। না বাবা, না মা।

মাস কয়েক পরে নীলা নিজে থেকেই কথাটা বলল।

তাপসীর পরীক্ষা শেষ। পরীক্ষার ফলও বেরিয়ে গেছে। এখন তাপসীর ঘোরাঘুরি খুব বেড়েছে। মনের মতন চাকরি এ দেশে জোটে না, বাঁচবার মতন কিছু একটা

পেলেই সে খুশী। তবে সরকারি কলেজে হলেই ভাল হয়। দু'একজন আশ্বাস দিয়েছে হয়েও যেতে পারে।

নীলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধছিল, তাপসী বাইরে থেকে ঘরে এসে ঢুকল।

খোঁপাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে নীলা বলল, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে তপু।

কি বল? আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তাপসী উত্তর দিল।

এ মাস থেকে আমার একটু মাহিনে বেড়েছে। অফিসের দু একজনকে বাড়ীতে খাওয়াতে চাই। মা বাবা কিছু মনে করবে না তো?

প্রশ্নটার তাৎপর্য তাপসী ঠিক বুঝতে পারল না। নীলার মুখের দিকে কিছুক্ষণ দেখে অর্থ খোঁজার চেষ্টা করল, তারপর বলল, তোমার পয়সায় তুমি খাওয়াবে এতে আর মা বাবার মনে করার কি আছে।

কি জানি, নীলা অদ্ভুত ভঙ্গী করে ঠোঁটটা ওল্টাল, আমার সব ব্যাপারেই তো দোষ হবে এখন।

তাপসী কথা বাড়াল না। চায়ের সন্ধানে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঠিক এর দিন তিনেক পরের ঘটনা।

একদিন কলেজ থেকে বেরোবার মুখেই তাপসীর সঙ্গে সুকুমারের দেখা হ'য়ে গেল। একেবারে সামনাসামনি। তাপসী এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল কিন্তু সুকুমারই এগিয়ে এল।

ভাল আছ? সুকুমারই প্রথম কথা বলল।

এভাবে একটা মানুষ সাধারণ কুশল জিজ্ঞাসা করলে, মুখ ফিরিয়ে থাকা যায় না। ঘাড় নেড়েও অন্তত উত্তর দিতে হয়। তাপসী তাই দিল।

তোমার দিদির শখ বোধ হয় মিটে গেছে?

এবার তাপসী কৌতূহলী হয়ে উঠল। জ্রকুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কিসের শখ?

সিনেমায় অভিনয় করার।

নির্লজ্জতার একটা সীমা থাকা দরকার। আরক্তমুখে তাপসী বলল, শখটা দিদির, না আপনার? জীবনে অভিনেত্রীই যদি কাম্য ছিল তা হ'লে ভদ্রঘরে ঘরণী খোঁজাটাই আপনার অন্যায় হয়েছে।

আঘাতটা একটু গুরুতরই হয়েছে। সুকুমারের মুখ থেকে পলকে যেন শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত শুষে নিল। নিষ্প্রভ দুটি চোখের তারা। পাংশু ওষ্ঠাধর।

একটু সামলে নিয়ে বলল, নীলা কি এই কথাই তোমাদের বুঝিয়েছে?

তাপসী আড়চোখে সুকুমারের দিকে চেয়েছিল। তার এই রূপান্তর তাপসীর চোখ এড়াল না। কিন্তু এ ব্যাপারে তার মাথা গলাবার কোন অর্থ হয় না। এটা সম্পূর্ণ নীলা আর সুকুমারের ব্যক্তিগত বিরোধসঞ্জাত। মিটিয়ে ফেলতে হ'লে তারাই মেটাবে।

কিন্তু এগোতে গিয়েই তাপসী দাঁড়িয়ে পড়ল। পথ আগলে সুকুমার দাঁড়িয়েছে।

ব্যাপারটা তোমার জানা দরকার।

আমার জেনে কি লাভ?

লাভ ক্ষতি জানি না। অযথা আমার সম্বন্ধে তোমরা কুৎসিত একটা ধারণা করবে, এটা আমি হতে দেব না। তোমার দিদির সিনেমায় নামার মোহ এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে আমি অনেক বুঝিয়েও তাকে নিরস্ত করতে পারি নি। এমন কি, এ ভয়ও দেখিয়েছিল, আমি যদি গররাজী হই তাহলে আমাকে অস্বীকার করে সে পর্দার জীবন গ্রহণ করবে। বাধ্য হয়ে আমি সায় দিয়েছিলাম। স্ক্রীণটেষ্টেও কোন রকমে উৎরে গেল, কিন্তু আসল কাজের বেলায় এমন নার্ভাস হয়ে পড়ল যে একটি কথাও মুখ দিয়ে বের হলনা। তারপর বহুকষ্টে যখন বাক্য ফুটল তখন মুখের অভিব্যক্তি ফোটানো সম্ভব হ'ল না। তিন-দিনের চেষ্টায় সবাই হতাশ হ'ল। তোমার দিদির অভিনেত্রীজীবন যে সম্ভব নয়, সে বিষয়ে ষ্টুডিয়োর সবাই এক মত। ব্যস, নীলার পুঞ্জীভূত আক্রোশ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের রূপ নিয়ে ফেটে পড়ল। তার ধারণা, তার এই পরাজয়ের মূলে আমার ছলনা। আমিই চক্রান্ত করে তাকে তারকার জীবন থেকে বঞ্চিত করলাম। কাজেই সব বিষটুকু আমার প্রতি লোমকূপে ঢেলে দিল। ইন্ধন দেবার লোকও জুটল। স্বাবলম্বী হবার বীজমন্ত্র জপল তোমার দিদির কানে। ফল কি হ'ল তাতো জানোই।

কথাগুলো তাপসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল বটে কিন্তু তার দুটি চোখে অবিশ্বাসের ঝিলিক দেখা গেল।

সেটুকু সুকুমারের চোখ এড়াল না।

হয়তো, কথাগুলো তুমি বিশ্বাস করছ না, কিন্তু আমার অন্তরঙ্গ যারা সিনেমার ব্যবসায় আমার সঙ্গে জড়িত, তাদের তুমি চেন। তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তুমি জিজ্ঞাসা ক'রো, আসল ব্যাপারের খোঁজ পাবে। নীলাকে হারানো আমার পক্ষে কতখানি তা বোঝাবার বৃথা চেষ্টা করব না।

শেষের দিকে সুকুমারের কণ্ঠ যেন একটু গাঢ় হয়ে উঠল। ছলছলিয়ে এল দুটি চোখ। তাপসী অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। একটা মানুষ যখন সত্যিকথা বলে তখন যেন জানা যায়, বোঝা যায়।

কিন্তু এক্ষেত্রে সুকুমারের কথায় সায় দেওয়া মানে নীলাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা। তাপসীর পক্ষে সেটা করা সম্ভব নয়। অন্যায় করলেও নীলাকে সমর্থন করা ছাড়া আর উপায় নেই।

তাপসী আস্তে আস্তে সরে গেল সুকুমারের সামনে থেকে। যেতে যেতেও কানে গেল সুকুমারের কথাগুলো।

তোমার দিদিকে বল তাপসী, আমি অপেক্ষায় থাকব। আমার দরজা চিরদিনই খোলা থাকবে তার জন্য।

তাপসী বাড়ীর উঠানে পা দিয়েই চমকে উঠল।

বারান্দায় ম্লান বাতি। মুখোমুখি দুটো চেয়ারে দুজন। একজন নীলা, আর একজনকে তাপসী ঠিক চিনে উঠতে পারল না।

তাপসীকে দেখে নীলা এগিয়ে এল, কিরে এত তাড়াতাড়ি ফিরলি যে? বলে গেলি আসতে দেরী হবে।

যাবার সময় তাপসী ঠিক কি বলেছিল তা তার স্মরণ নেই। তার মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সুকুমার অন্য এক চিন্তার কাঠি ছুঁইয়ে দিয়েছে তার মস্তিষ্কে। নীলার দিকে মুখ তুলে সে চাইতেও পারছে না। চাইলেই বুঝি এতদিনের সযত্নে গড়ে তোলা ধারণা চুরমার হয়ে যাবে।

সুকুমার নীলার সম্বন্ধে যা বলেছে, নীলা যে তাই এ বিষয়ে তাপসীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

কিরে কি ভাবছিস? নীলা গলা আর একটু চড়াল।

না, ভাবছি না কিছু, তাপসী আত্মস্থ হবার চেষ্টা করল। একটু দম নিয়ে বলল, এক জায়গায় যাবার কথা ছিল, কিন্তু মাথাটা বড্ড ধরেছে বলে আর গেলাম না।

আয় তোর সঙ্গে আলাপ করিয়েদি। নীলা তাপসীর দিকে আরো দু এক পা এগিয়ে এল।

তাপসী থমকে দাঁড়াল। নিজের চিন্তায় এত বিভোর ছিল যে তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা তার মনেই ছিল না।

আমার সহকর্মী অলকেশ সেন। ভদ্রলোক চমৎকার গান করেন। আমাদের বাড়ীতে তো আর হারমোনিয়ম নেই, থাকলে একটা গাইতে বলতাম।

তাপসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে আরম্ভ করল। হারমোনিয়ম একটা ছিল এ বাড়ীতে। যখন নীলা গলা সাধত। তাপসীর এসব বালাই ছিল না। বোধ হয় কোন এক পরীক্ষার ফি দেবার সময় হারমোনিয়মটা বিক্রি করতে হয়েছে।

কিন্তু সহকর্মী গাইতে জানে বলে তাকে বাড়ীতে ডেকে আনতে হবে! হারমোনিয়ম না পাকা সত্ত্বেও আধো-অন্ধকার বারান্দায় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আলাপ করতে হবে অন্তরঙ্গ সুরে!

নীলা সিঁথের সিঁদুর মুছতে পেরেছে বলে সত্যিই কি একজনের অস্তিত্বও নির্মম হাতে মুছে ফেলতে পেরেছে!

নীলার কথাবার্তায় অলকেশ কিন্তু রীতিমত বিব্রত হ'ল। দু হাত যোড় করে তাপসীর দিকে চেয়ে বলল, না, না, আপনার দিদির কথায় কান দেবেন না। গান গাইতে আমি মোটেই জানি না।

তারপর নীলার দিকে মুখ ফিরিয়ে গলার স্বর সামান্য খাদে নামিয়ে বলল, আঃ, কি হচ্ছে নীলা, এভাবে মানুষকে অপ্রস্তুত করে তোমার লাভ!

নীলার মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেল না, কিন্তু তাপসীর সারা মুখ আবির-লাল হয়ে উঠল। অলকেশের একটি কথাও তার কান এড়ায়নি। এর মধ্যে এত অন্তরঙ্গ হয়ে গেছে দুজনে? আপনি-র দুস্তর বাধা অতিক্রম করে দুজনে তুমি-র চড়ায় পরিচয়ের ডিঙ্গি বেঁধেছে?

শুধু তাই নয়, দুজনের চোখ মুখের ভাব ভঙ্গী, কপট ঔদাসীন্য বোঝার মতন বয়স আর বুদ্ধি দুইই তাপসীর হয়েছে।

আর কোন কথা বলল না তাপসী। ঘরের মধ্যে যেতে যেতে অস্ফুটকণ্ঠে কথাগুলো শুধু ছুঁড়ে দিল চলি, মাথাটা বড্ড ব্যথা করছে।

চোখের দোষ নয় তে? চোখটা কাউকে না হয় একবার দেখান। কথায় সঙ্গে সঙ্গে অলকেশ ব্যস্ত হয়ে পড়ল—অন্তত ব্যস্ত হবার একটা ভাণ।

দিনরাত লেখাপড়া, চোখের কামাই আছে। নীলার কণ্ঠ।

ঘরের মধ্যে ঢোকার পর আর কারও স্বর তাপসীর কানে এল না। এই আধ-অন্ধকার, এই নির্জনতা, এই সান্নিধ্য, এ সব হেলায় নষ্ট করতে দুজনের কেউই রাজী নয়।

কথা নয়, কিন্তু রাতের অন্ধকার ভেদ করে চুড়ির কিঙ্কিনী তাপসীর কানে এল।

দিন সাতেকের মধ্যেই।

ছাত্রীর বাড়ী থেকে বেরিয়ে তাপসী দোতলা বাসে পা দিয়েই যেন ভূত দেখল।

এ সময় ভীড়টা কম। বসার সীট অবশ্য নেই, কিন্তু বাদুড় ঝোলা অবস্থাও নয়। স্বচ্ছন্দে দাঁড়িয়ে যাওয়া যায়। অন্য মানুষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে।

একেবারে সামনের সীটে নীলা আর অলকেশ। নীলার খোঁপায় বড় সাইজের একটা রক্তগোলাপ। অদ্ভুত রং যেন কারও টাটকা হৃদপিণ্ড বলে মনে হচ্ছে। একটু পরেই তাপসী বসার জায়গা পেল। সে বসল, দৃষ্টি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও সামনে থেকে ফেরাল না।

বাস একটা ঝাঁকুনী দিয়ে থামতেই তাপসী অবাক হয়ে গেল। না, অলকেশ তো নয়. লোকটা এদিকে মুখ ফিরিয়েছে। বয়স খুবই অল্প। নীলার চেয়ে যেন ছোটই হবে। বাক ব্রাশ চুল, ব্রণ-বিমণ্ডিত মুখ।

নামবার সময় চোখাচোখি হ'ল। নীলা আর তাপসীর। নীলা একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, কিরে তুই এ বাসে?

তাপসী বলল, আমি তো এই সময়ে এই বাসেই ফিরি।

ওদের পিছন পিছন তাপসী নেমে পড়ল।

চলতে চলতে নীলা দাঁড়িয়ে পড়ল। তাপসীর কাছাকাছি এসে বলল, আমার ফিরতে একটু দেরী হবে তপু, তুই বাড়ীতে একটু বলে দিস। একটু দেরী হলেই তো মা আর বাবা একেবারে মূর্ছা যাবে। যত কড়াকড়ি কেবল আমার বেলায়।

কঠিন একটা উত্তর তাপসী অনেক কষ্টে সংবরণ করল। মনে পড়ে গেল, তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এমন একটা কাদা ছোঁড়াছুড়ির খেলা খুব রুচিকর হবে না।

কথাটা বোধ হয় নীলারও মনে পড়ল। পাশের ভদ্রলোকটির দিকে চেয়ে হেসে বলল, তোমার সঙ্গে আলাপ করে দিই। এ আমার বোন তাপসী, আর এ হচ্ছে প্রদীপ মজুমদার। রেবা কেমিক্যালের কেমিষ্ট। আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকে। অবশ্য নতুন এসেছে। এর শামুক আর ঝিনুকের অদ্ভুত সংগ্রহ আছে। তাই দেখতেই যাচ্ছি।

কথাটা শেষ করে নীলা আর দাঁড়াল না। প্রদীপকে প্রায় টেনেই বাঁ দিকের রাস্তা ধরে হন হন করে এগিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ তাপসী চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ী ফিরতে হবে, পথের মাঝখানে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা শোভন নয়, এ সব কথা একটি বারের জন্যও মনে এল না। কেবল ভাবল,. একি খেলা শুরু করেছে নীলা? এভাবে পুরুষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে নিজেকে তিলে তিলে নামিয়ে আনার কি অর্থ হতে পারে।

অর্থ হয়তো একটাই হতে পারে, কিন্তু তার স্বরূপ চিন্তা করেই তাপসীর মন ঘৃণায় শিউরে উঠল! এই নারীর জন্য সুকুমার ব্যাকুল দুটি বাহু মেলে অপেক্ষায় রয়েছে, এমন একটা কথা ভাবতেও যেন কষ্ট হল।

তাপসীর চাকরি একটা জুটে গেল। মেয়ে-কলেজে, অবশ্য বেসরকারি, তা হোক মাইনেটা নিন্দার নয়। মাস খানেক নতুন চাকরিতে তাপসী একেবারে ডুবে রইল। এই ব্যস্ততার মুখেই হঠাৎ একদিন সুকুমারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

ট্রেন থেকে নামতেই দেখল প্ল্যাটফর্মের ওপর সুকুমার। কাঁধে ব্যাগ। অসংস্কৃত, মলিন চেহারা।

এবার সুকুমার কথা বলবার আগেই তাপসী গিয়ে কথা বলল।

কেমন আছেন ?

প্রথমে একটু চকিত ভাব, তারপর সামলে নিয়ে সুকুমার বলল, ভালই আছি—মানে কিছুদিন ভুগে উঠলাম। বেশ কিছুদিন।

সে তো চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি।

তোমাদের খবর সব ভাল ? তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?

আমি চন্দননগর কলেজে চাকরি করি। একটু থেমে যেন দম নিয়ে তাপসী বলল, আমি আর দিদি দুজনেই চাকরি করছি।

সুকুমারের ক্লান্ত মুখে অবসাদের গাঢ় ছায়া নেমে এল। তাপসীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে বলল, চাকরি করছে, নীলা চাকরি করছে !

আপনি একদিন আসুন না আমাদের বাড়ী।

কিছু না ভেবেই বুঝি তাপসী কথাটা বলে ফেলল। সুকুমার চমকে উঠল। কাঁধ থেকে খসে পড়া ব্যাগটা আঁকড়ে ধরে বলল, আমি, আমি গিয়ে কি করব ?

আপনি না পুরুষ মানুষ ! জোর করে নিজের জিনিসের ওপর দাবী জানাতে পারেন না ?

সুকুমার ম্লান হাসল, সব জিনিসে জোর খাটে না তাপসী। সব জায়গায় শুধু বাহুবলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। অপেক্ষা করি, হয়তো একদিন ওর মোহ কেটে যাবে।

সুকুমার আর দাঁড়াল না। মাথা নীচু করে তাপসীর পাশ কাটিয়ে ট্রেণের দিকে এগিয়ে গেল।

*   *   *

কলেজ থেকেই দল বেঁধে মেয়েরা গিয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সঙ্গে জনাচারেক অধ্যাপিকা। তাপসীও তার মধ্যে একজন। মেয়েরা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিল, তাপসী একটা গাছের নীচে বসেছিল চুপচাপ। বাকি তিনজন অধ্যাপিকা প্রিন্সিপালের অবিবেচনা, বর্তমান জিনিসের মহার্ঘতা আর নিজেদের আখের আলোচনা করছিল।

হঠাৎ মেয়েদের খিলখিল হাসি আর অঙ্গভঙ্গী দেখে তাপসীর কৌতূহল হ'ল। মেয়েরা সরে যেতেই সে গাছ পালার ফাঁক দিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল। একটা ঝাঁকড়া বাতাবিলেবুর পাশে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ঝোপের ওপাশে মাঝবয়সী একটি ভদ্রলোক তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে রয়েছে নীলা। এগার মোটা গাছে নৌকা বেঁধেছে। পলকা হাওয়ায় স্থানচ্যুত না হয়।

দেখতে দেখতে তাপসীর দুটো চোখ জ্বালা করে উঠল। একটা দাহ, মর্মান্তিক একটা অস্বস্তি শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ল।

একজনকে নিয়ে উন্মাদনার তবু একটা ক্ষীণ অর্থ হয়, কিন্তু এভাবে একাধিক পুরুষের কাছে যারা ধরা দেয়, তাদের সম্বন্ধে অভিধানে যে সংজ্ঞা আছে তা মোটেই শ্রুতিমধুর নয়। কিসের মোহে বহুচারিণী হল নীলা, কোন অতৃপ্ত ক্ষুধা মেটাতে তার এই সর্বনাশা অভিযান।

সে রাত্রেই তাপসী কথাটা বলল।

নীলা যখন বাড়ী ফিরল, তখন রাত অনেক। দরজা খুলে দেবার জন্য তাপসী জেগে বসেছিল।

উচ্ছ্বসিত, উল্লসিত নীলা খুশীর বন্যার মতন ঘরে ঢুকল।

আমি খেয়ে এসেছি তপু, কিছু খাব না। রোজ রোজ বাপু তোদের একঘেয়ে তরকারি খেতে ভাল লাগে না, তাই মাঝে মাঝে বাইরে একটু মুখ বদলে আসি।

তাপসী এসব কথার কোন উত্তর দিল না। এসব কথা কানে গেছে, তার কঠিন নিস্পৃহ মুখের রেখার দিকে চেয়ে মনে হ'ল না।

নীলা জামা শাড়ী ছেড়ে বিছানায় শোবার আয়োজন করার সময় তাপসী কথাটা বলল ধীর চাপা কণ্ঠে।

সুকুমার বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সামান্য ভ্রুকুটি, ঠোঁটের কুঞ্চনে বিরক্তির ভাব, তারপর নীলা বলল, আমার খুব নিন্দা করলে তো ? একগাদা মিথ্যা কথা বললে ?

না, সুকুমারবাবু কিছু বলেন নি, আমিই বললাম।

একটু থেমে, দুটো চোখ [illegible] তাপসীকে জরিপ করতে করতে নীলা বলল, তুই কি বললি ? তার মতন লোকের সঙ্গে তোর বলার মতন কি থাকতে পারে ?

বললাম, এবার দিদিকে বাড়ী নিয়ে যান। এবার

দিদি অভিনয়ে ঠিক উতরে যাবে। বিশেষত রোমাণ্টিক নায়িকার রোলে। খুব মন প্রাণ দিয়ে এতদিন রিহার্সাল দিয়েছে, আর কোন ভয় নেই।

কথাগুলো বলেই তাপসী হাত বাড়িয়ে সুইচটা টিপে দিয়েছিল। ঘর জুড়ে অন্ধকারের বন্যা। আশা করেছিল সেই অন্ধকারে একটা শঙ্খিনী দারুণ আক্রোশে সব কিছুর ওপর ছোবল দেবে। সবটুকু বিষ ঢেলে দেবে নিঃশেষে।

কিন্তু আশ্চর্য, সে রকম কিছুই হল না।

অন্ধকারে চোখ দুটো অভ্যস্ত হযে যেতে তাপসী শুধু দেখতে পেল একটা ক্লান্ত, জীবন যন্ত্রণায় মুমূর্ষু মানুষের কাঠামো দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃশব্দ হ'যে বসে রয়েছে। রোমাণ্টিক নায়িকার মেক-আপের শেষ রংটুকুও মুছে গেছে।

আলো থাকলে তাপসী আরো দেখতে পেত সেই বিষণ্ণ, জীর্ণ মূর্তির গাল বেয়ে অশ্রুর বিন্দু ঝরে পড়ছে।

নেহরু স্মরণে

জ্যোতির্ময়ী দেবী

"অরণ্য তিমিরঘন মনোহর পথ।
তবু যেতে হবে মোর করেছি শপথ—
নিদ্রা নামিবার আগে। অনেক যোজন
বহুদূর পথ যাব করিয়াছি পণ।"*

খ্যাতি নিন্দা ভালমন্দ খেয়া পারাপার
শেষ হল। নেমে এলো গাঢ় অন্ধকার
সেই যবনিকা যার আশ্চর্য্য গুণ্ঠন
কেহ কভু পারে নাই করিতে মোচন।
তবু কেহ বলে মানি।
কেহ বাণীরব।
তিমির আবৃত দেশ অথবা উৎসব
আলোকের রাজ্য আছে সেই মহাদেশে
যে করে আড়াল সব আঁখির নিমেষে।
আজ নাই রাজসভা কথাতর্ক আশা।
আজ এলো পুরাতন বিমূঢ় জিজ্ঞাসা
ওই যবনিকা পাছে কি আছে
কে আছে!
দাঁড়ালাম সবে সেই অমোঘের কাছে!
যারা ধরিয়াছে ভুল মূক নতশির
আজ নিবেদিবে দুই বিন্দু অশ্রুনীর।

* প্রধানমন্ত্রীর টেবিলে যে রবার্ট ফ্রস্ট-এর লেখা কবিতাটি দেখা গিয়েছিল তার ভাবানুবাদ।

নেহরু উইল

পুষ্প দেবী

নেহরু উইলপাঠ হবে আজ লোকে বলাবলি করে
অগাধ অর্থ করিবেন দান তিনি জনহিত তরে
জোয়ানদেরই তো দেবেন যা কিছু কেহ করে অনুমান
লক্ষ মনের লক্ষ ধারণা কত দান? পরিমাণ।
শুনিয়া ইচ্ছা হতবাক সবে বিস্ময় মানে সবে
নিজের অস্থি ভস্মই সার কিছু না নিজের রবে
এই সার কথা মনে রাখে বল কয়টি বা জ্ঞানীমন
অর্থের তরে কত হানাহানি অকারণ আয়োজন
জানি এই কথা বলেছেন তিনি "আমার ভস্ম সার
ভারতের সব জনগণ তরে মোর শেষ উপহার
আমার আত্মবিলুপ্তি যেন বহে ভারতেরে ঘিরে"
না বলা কামনা আবার ফিরিতে মহামানবের তীরে
কাঁদিয়া সকলে কয়
তোমার অমর ভস্ম আশীষ সবে শিরোপরে লয়
দধীচি দানিল আপন অস্থি বাঁচাতে পরের প্রাণ
তুমি দিলে তব অমর শক্তি তোমার ভস্ম দান
লুটলে ভস্মে তিলক আঁকিয়া নূতন শকতি লভি
তব পদাঙ্ক ধরি জনমিবে কত শত শিশু রবি
আবার স্বরূপরাণীর কোলেতে জাগিবে নূতন চাঁদ
স্মিত হাসি হাসি পুন মতিলাল করিবে আশীর্ব্বাদ
কোন সে কমলা হইবে ধন্য দিয়ে গলে বরমালা
শিশু ইন্দুর বক্ষ ভরিয়া পুণ্য প্রদীপ জ্বালা
কোন জনগণ গাহিবে আবার নেহরু অমর রহে
সেই সুদিনের আশাপথ চাহি আশ্বাসবাণী কহে।

"পত্রাবলী" ও "ছিন্নপত্র"

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম-এ

১৫৫৫ খ্রীঃ অব্দের একটি চিঠি বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম প্রামাণিক স্বাক্ষর। পত্রের লেখক কুচবিহারের মহারাজ নরনারায়ণ। আহোমরাজ চুকামফা স্বর্গদেবকে পত্রটি দেওয়া হয়েছিল।

একখানা প্রাপ্ত চিঠিকে যদি বাংলা গদ্যের আদিসূত্রের প্রামাণিক নজীর বলে ধরা হয়, তবে বলতে হয় পাঁচশো বছর পরেও বাংলা-গদ্যের পত্র-সাহিত্য আকাঙ্ক্ষিত উন্নতি-লাভ করেনি।

বাংলা গদ্য-সাহিত্য সমৃদ্ধ হলেও পত্র সাহিত্যের অঙ্গটি একটি ব্যতিক্রম। ছিন্নপত্রের সঙ্গে বাংলায় লেখা অন্যান্য পত্র-সাহিত্যের তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। ক্লাসিক সাহিত্যে এবং উনিশ-শতকী পদ্য-সাহিত্যে পত্রের খোঁজ পাওয়া যায়। তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিন্নপত্র নিশ্চয়ই একজাতীয় নয়। তেমনি সমশ্রেণীর নয় বিবেকানন্দের 'পত্রাবলী'। 'ছিন্নপত্র' কবি-জীবনের চাবিকাঠি। 'পত্রাবলী' স্বামিজীর জীবনদর্শনের খণ্ডাংশ মাত্র। সম্পূর্ণতার দিক থেকে ছিন্নপত্র গভীর, 'পত্রাবলী' সেখানে পদ্মপত্রে জলবিন্দু মাত্র।

'ছিন্নপত্র' কেবলমাত্র বাংলা গদ্যে লেখা। মাঝে মধ্যে দু' একটা কবিতা, কিছু সংস্কৃত শ্লোক, কিংবা ইংরেজী উদ্ধৃত এতে স্থান পেয়েছে। 'পত্রাবলী' ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষার সংমিশ্রণে পূর্ণ।

'ছিন্নপত্র' খণ্ডহীন একক। 'পত্রাবলী'র পাঁচটি খণ্ড। রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংকলনে কি আছে? বাংলা দেশের মাটিতে বসে ভাবের কথা, প্রেরণার বাণী, মানুষের সুখ-দুঃখের ইতিবৃত্ত টুকরো টুকরো মেঘের মত কবিচিত্তে উদ্ভাসিত হয়েছে। সেই খণ্ডগুলো পরিণত জীবনে পরিণততর হয়েছিল। 'পত্রাবলী'র চিঠিগুলি শুধু বাংলায় বসে লেখা নয়। বাংলা দেশ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, আমেরিকা ও ইংলণ্ড থেকে সেগুলো লেখা। রবীন্দ্রনাথ চলিষ্ণু-জীবনের ছবি এঁকেছেন পদ্মার মহাপীঠে বসে। বিবেকানন্দের সাইক্লোনিক-চিত্ত দেশ হতে দেশান্তরে ছুটেছে অথচ দেশের কথা ভোলেন নি। দেশের বাইরে থেকেও দেশ ও জাতির কথা স্বামীজিকে কতটা আচ্ছন্ন রেখেছিল 'পত্রাবলী' তার প্রমাণ।

'পত্রাবলী'র সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য কতটা তা বিচার সাপেক্ষ। বিচার করলে দেখা যাবে বেশ কিছু সংখ্যক চিঠি সাহিত্য-গুণ-ঋদ্ধ। এসব চিঠিতে অন্তরাবেগ এবং জীবন প্রতীতির পরিচয় রয়েছে। 'ছিন্নপত্র' ও 'পত্রাবলী'র লেখক আসলে একই পথের পথিক। উপায়টি কিন্তু স্বতন্ত্র। 'ছিন্নপত্রে'র চিঠিগুলি একাধিক ব্যক্তিকে লেখা হলেও স্বামিজীর 'পত্রাবলী'র মত বহুজনকে ও ভিন্ন প্রদেশবাসীকে লেখা নয়। নয় বলেই 'ছিন্নপত্রে'র মূল্যায়ন করতে হবে ভিন্ন রীতিতে। ওর গুরুত্বও পৃথক। রবীন্দ্র সাহিত্যের যে লোহার সিন্দুক, তার কলকাটি ওই ছিন্নপত্র। 'পত্রাবলী' সেদিক থেকে বাংলা গদ্য সাহিত্য তথা স্বামিজীর রচিত সাহিত্যের পক্ষে অবশ্য গ্রন্থ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নরেন্দ্রনাথ উনিশ শতকের সার্থক প্রতিনিধি। বঙ্কিম ভাবনায় দুজনেই উদ্বুদ্ধ। কিন্তু চিন্তা, জীবনাচরণ এবং সৃষ্টির দিক থেকে দুই ভারত-পথিক চলেছেন দুই সরল রেখায়। একজন সাহিত্যের তপোবনে যাজ্ঞবল্ক, অন্যজন মানুষ গড়ার কাজে বিশ্বকর্ম্মা।

রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেম কাব্য ও গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমুৎসারিত। 'মা আমায় মানুষ কর' এই মন্ত্রের যিনি উদ্গাতা, তিনি কর্ম্মযোগী, তিনিই স্বামী বিবেকানন্দ।

'ছিন্নপত্র'-র শুরু বাংলা চিঠিতে। 'পত্রাবলী'র প্রথম চিঠিট ইংরেজী। অবশ্য বাংলায় অনূদিত হয়ে বিধৃত হয়েছে 'পত্রাবলী'তে। প্রথম খণ্ডের ছয় সংখ্যক পত্রটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। সম্ভবতঃ অনুবাদের সময় সাধু-

ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এ ভাষার সাহায্য নেওয়ার একটা কারণ অনুমান করা যেতে পারে। স্বামিজীর চলিত ভাষার যে প্রবহমানতা ও বজ্র-নির্ঘোষ হয়তো অনুবাদে তা রক্ষিত হতো না—তাই।

চিঠির কথা মনের কথা। সাহিত্যে তার স্থান হওয়ার পক্ষে যুক্তি যাই থাকুক, জীবনচরিতের পক্ষে তার অপরিহার্য্যতা অস্বীকার করা যায় না। চিঠি লেখবার সময় ভেবে ও মেপে তো লেখা হয় না। সে কারণে চিঠির শিল্পসম্ভাবনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জীবনে যাঁরা শিল্পী, লেখার সময়ও সেই শিল্পী-সত্তা পরিচয় রাখে। এ কারণেই বিবেকানন্দের চিঠিগুলি শিল্পগুণোপেত। ১৯ সংখ্যক পত্রটির কিছুটা অংশ দেখা যাক। : "তিনখানা মাটির ঢিবি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এ দেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটীর প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এ দেশেই হয়। খেঁদা-বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্ব্বসহিষ্ণু মাতৃত্ব ও নিগুর্ণ মহাদুষ্টপতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়।" এ পত্রে শিল্প-চেতনা, গৃহ-বন্ধন; পতি-পত্নী-প্রেম ও পাণ্ডিত্যের ইতিহাস ব্যক্ত হয়েছে। এই জাতি-প্রীতি 'ছিন্নপত্রে'ও আছে। সে প্রকাশ-রীতি স্বতন্ত্র। আলোচ্য চিঠিতে সাধু ভাষার সঙ্গে দ্রুতচালের মুখের কথার সুন্দর মেলামেশা দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমনটিই স্বামিজীর সহাধ্যায়ী উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের কলমে প্রকাশ হতো। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় ভাগের দুইসংখ্যক পত্রটি বাংলা গদ্যসাহিত্যে অভিনব। "ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না।···আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা, আর পরশ্রীকাতরতা। হম্‌বড়া, আর কেউ বড় হবে না।" এটি চলিত ভাষার। আধুনিক চলিত রীতির যে খাপছাড়া শ্রীহীন, ছন্দশূন্য ছাঁদ, এতে তা নেই। এতে পাণ্ডিত্যের গাম্ভীর্য্য অনুপস্থিত। সমব্যথী সমালোচক মুক্তকণ্ঠে জাতির দৈন্য প্রকাশ করেছেন। এ দৈন্য প্রকাশে ফুটে উঠেছে গভীর বেদনা। সেই বেদনা সত্ত্বেও জাতীয় দুর্ব্বলতাকে অকপটে স্বীকার করেছেন। আত্মগর্ব্ব বা জাতিপ্রীতির অন্ধতা নেই। অথচ, 'ছেঁড়া-মাদুর' 'মাটির সেজের' মধ্যে জাতির প্রাণ যে সজীব হয়ে আছে সহৃদয়তার সঙ্গে তা স্বীকার করেছেন। আত্মগৌরবে আনন্দ ও নৈকট্যবোধের গভীরতার ছাপ রয়েছে, কিন্তু আত্মদম্ভের স্পর্দ্ধাটি নেই বললেই হয়। সমালোচনায় যে পরিমিতি বোধ ও স্পষ্টতার প্রয়োজন এ চিঠি তারই নজীর। পাণ্ডিত্য ও পরিহাসের গলাগলি দেখুন। "কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এ দেশের সব। বিদ্যে-বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু (যিনি পুণ্যবানদের স্বয়ং লক্ষ্মী স্বরূপিণী)।···হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম, ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরীত্বং হ্রীঃ ইত্যাদি (তুমি লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই লজ্জাস্বরূপিণী)। চলিত বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার মিলনে চিঠিও যে সাহিত্য-ধর্মী হতে পারে এ-চিঠি সেই নমুনা। ইংরেজীর সঙ্গে চলিত বাংলার মিশ্রণে যে পত্র দেখা যাক সেই নমুনাটি। "দাদা, ওই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অবজ্ঞা দেখে আমার ঘুম হয় না, একটা বুদ্ধি ঠাওরালাম—Cape-comorin (কুমারীকা অন্তরীপে) মা-কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুকরার উপর বসে—এই যে আমরা এতজন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এ সব পাগলামি। খালিপেটে ধর্ম হয় না। গুরুদেব বলতেন না?" পত্রটিতে ইংরেজী বাংলার সহাবস্থান লক্ষণীয়। পত্র সাহিত্যের এই রীতিকে 'বিবেকানন্দী ছাঁদ বলে আখ্যা দিতে দোষ কি? এই জাতীয় লেখা উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের পরে সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যে অননুসৃত আছে। আর একটি উদ্ধৃতি। "তোমরা হয় ত মনে করিতে পার, কি utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা)!···কিন্তু গুরুদেব will show me the wayout (আমাকে পথ দেখাইবেন) ইতি। jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাকতে পারে না, ঐটে আমাদের জাতীয় দোষ, national sin (জাতীয় পাপ)!!! "জাতির দোষ কোন্‌খানটায় স্বামিজী দ্বিধাহীন ভাবে তা প্রকাশ করেছেন। চার সংখ্যক পত্রও এই শ্রেণীর।

"ঠাকুর-ঘর মন্দ নয়, তবে ঐটী all in all (সর্ব্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসানের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেলবার একটা tendency (ঝোঁক) আছে, আমার তাই ভয়।" এসব চিঠিতে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের ইংরেজী বাংলায় মেশান সংলাপের কথা মনে পড়ে নাকি ?

'পত্রাবলীর' সব চিঠিই এক ভাষায় রচিত নয়। কোথাও শুরুটা সাধুর, গাম্ভীর্য্যে কিন্তু ভেতরটা চলিতের লঘু-সরল চালে। দ্বিতীয় খণ্ডের পাঁচ সংখ্যক পত্রটি লক্ষ্য করুন। "তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ম—লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত।" এরপর আরম্ভ চলিতে শুরু-মায়া বিস্তে করতে গেলে ঐ রকম হয়।" আবার সাধু "আমার অপরাধ বড় নাই।" পুনরায় চলিত : "সে দশবৎসর আগে এখানে এসেছিল, বড় খাতির ও বড় সম্মান; এবার আমার পোহাবারো।" সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতেও রয়েছে : "যাক্ উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাম্।" ইংরেজীও রয়েছে। পর্দ্দা উঠছে—উঠছে ধীরে ধীরে, slow but sure jealousy selfishness (ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না—তবে leader প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা), দ্বিতীয় unselfishness (নিঃস্বার্থ), তবে 'leaderসব ঠিক হচ্ছে, সব ঠিক আসবে, তিনি জাল ফেলছেন,—বয়মনুসরামঃ। প্রীতিঃ পরমসাধনম্ (১) বুঝলেকিনা ? love conquers in the longrun (২), দিক হলে চলবে না—wait, wait (অপেক্ষা কর. অপেক্ষা কর) সবুরে মেওয়া ফলবেই।" এসব পত্র সাধু-চলিত-বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত—চতুর্ব্বেণীর সৃষ্টি করেছে।

সাহিত্যের শ্লীলতা নিয়ে যাঁরা ব্যস্ত, স্বামিজীর কতকগুলি পত্র তাঁদের ধারণায় অশ্লীল বলে হয়তো গণ্য হবে। স্বামিজীর মত প্রাচ্য-বিদগ্ধ কেমন অনায়াসে বললেন : "কীটগুলো—এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—মাগের আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবন যাপন করে, আর যদি কেউ ঐ গুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে।" জাতীয় চরিত্রের অলসকাতর ব্যর্থ জীবনের ছবি এঁকেছেন অনবদ্য অকপটতায়। এ চিঠি আত্মোদ্ঘাটনের সত্যস্বরূপ। কোন কোন পত্রে হিন্দী-মিশ্রিত বাগ্-বৈদগ্ধ্য রয়েছে। যেমন, "মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক। রঘুবীর টেক রাখবেন দাদা—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থেক। * * ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে—রাজপুতনায় যেখানে রঘুকুল রীতি সদা চলি আ-ই। প্রাণ যা-ই বরুবচন ন যা-ই।" এতে গিরিশচন্দ্রের পঞ্চরঙ্গ মার্কা রসিকতা নেই। শ্লীলতার পরিমিতি বোধ এবং জাতীয় চরিত্রের লঘুত্বকে উদ্ঘাটিত করা হয়েছে। "ঐ বিয়ের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে যায়। * * মিশনরি ফিসনরির কি কর্ম্ম এ ধাক্কা সামলায় ? * * * মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির ফার্সি পড়া ? ও সব চলবে না, ভায়া কিছু চিন্তা করো না। * * * চারিজনেই যুবতী—বে থা করেনি। বে-হওয়া এ দেশে বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়ীরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় করবার চেষ্টা করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম করতে-করতে একটা 'লাভ' হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়।" এসবকে অশ্লীল বলে যারা তুচ্ছ করবেন, তারা স্বামিজীর সব কিছুতেই বর্ণাশ্রম বিরোধিতার খোঁটা দেন। এ পত্রের ভাষা শিল্পীর নয় বলবো কেমন করে ? এমনকি এ ভাষাকে সন্ন্যাসীরও বলবো না। মানবিক সহৃদয়তায় কোমলতায় এ চিঠির ভাষা ও ভাব পরিপূর্ণ। ঐ ভাষা ও ভাবের বহ্নিচ্ছটাটা দেখুন। "কৃশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্তা ভজা। বল রোগ নেই—বস্, ভাল হয়ে গেল, আর বল "সোঽহং" বস্—ছুটি। * * এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা ! আমাকে বাচ্ছাটীর মত ঘাটে-মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। * * * তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁসবার যুগ্যি নয়—তোদের মেয়েদের কথাই বা কি ? হরে, হরে, আরে বাবা কি মহাপাপী ! ১০ বৎসরের মেয়ের বে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু ! কিমধিকমিতি।" এই পত্রে 'যাবনী-মিশাল' ভাষা যেমন 'সাদি'; বাচ্ছা (পূর্ব্ববঙ্গীয়) এবং গ্রাম্য ভাষা 'বে' প্রভৃতির অপূর্ব্ব মিলন আকাঙ্ক্ষিতই হয়েছে। একাধিক ভাষার সংমিশ্রণের ঔচিত্য কি অনৌচিত্য আলং-

কারিকেরা তা নিয়ে তর্ক করেন। কিন্তু স্বামিজীর হাতে একাধিক ভাষার মিলন যে ভাবৈশ্বর্য্য পূর্ণ হয়েছে তাতে দ্বিমত থাকবে না।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে স্বামিজীর প্রভেদ অনেক। কিন্তু দু'জনেই মানবপ্রেমিক। রবীন্দ্রনাথ শিল্পী ও কবি। স্বামিজী ধ্যানী ও তপস্বী। রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর কলা-নৈপুণ্যে দ্বিতীয় রহিত। স্বামিজী মনের কথা অকপটে প্রকাশ করায় সব্যসাচী। চিঠিগুলো পাঠ করলে মনে হয় যেন চোখের সামনে জীবন্ত চিত্র ও শিল্পীকে দেখছি।

তাই বলা যেতে পারে, 'পত্রাবলী' বাংলা গদ্যে স্বকীয় রীতিতে ভাস্বর। প্রমথ চৌধুরীর গদ্য-ভাষায় বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য যতটা, সহজ সাবলীল ও তরতরে প্রকাশ যেন ততোটাই স্তিমিত। স্বামিজীর চিঠিতে উপদেশ প্রাধান্য পায়নি।

'ছিন্নপত্রের' হাসি সাহিত্যের সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের হাসি। এতে শিল্পীর তুলির সূক্ষ্ম টান আছে। 'পত্রাবলী'র হাসি অন্য জাতের। পাশ্চাত্য ভোগানুসরণ ও মোহান্ধতায় যে জাতি তমসাবৃত, ধর্ম্মের তথাকথিত সংস্কার প্রচ্ছন্নতায় যে জাতি অনড়, স্বামিজী খোঁচা দিয়ে তাকে ঋজু করতে চেয়েছেন। একজনের দৃষ্টি সাহিত্যের সুরসভায়। অন্যের লক্ষ্য জাতীয় চরিত্রের অধঃপতিত দিকে প্রসন্ন উদারতায় পরিপূর্ণ।

আধুনিককালে রাজনৈতিক পত্রাবলীর সংখ্যা ও মূল্য উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যের রাজ্যে এসব চিঠি স্বীকৃত না হলেও অনাদৃত হবে না। 'ছিন্নপত্র' ও 'পত্রাবলী'তে মাঝে মাঝে রাজনীতির কথা যে নেই এমন নয়। কিন্তু ওটাই প্রাধান্য বিস্তার করেনি।

রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের প্রভেদ সত্বেও ঐক্য যে একেবারেই নেই এমন নয়। 'পত্রাবলী'র তৃতীয় খণ্ডের সঙ্গে ছিন্নপত্রের একটা জাতিগত সম্বন্ধ রয়েছে। 'ছিন্নপত্রে' বৌদ্ধবাদ ও জ্ঞানকাণ্ড নিয়ে ছোট ছোট আলোচনা আছে। তৃতীয় খণ্ড 'পত্রাবলী'তে এই বিষয়ের আলোচনা দেখা যায়।

বিবেকানন্দ পত্রের মধ্যে যা রেখে গেছেন, তা সাময়িক কালসীমায় সীমিত। সে বর্ণনা প্রকাশের ঔচিত্যে শিল্পের সুরসভায় কি অ-গৃহীত হয়ে থাকবে? জীবন্মুক্তির অভয়বাণী কি সাহিত্যে অস্বীকৃত থাকতে পারে?

নিরুদ্বিগ্ন কবিকণ্ঠ

হরি ভৌমিক

নিরুদ্বিগ্ন কবিকণ্ঠ ইদানীং একান্ত অভাব
উৎপাত ইচ্ছারা ঢেউ গোণে অবসন্ন মুখে।
লবণ সাগরে প্রবাল কীটের হয়না প্রাদুর্ভাব
বলিনা তাই সোনালী খোপা রাখব আমার বুকে।

মা বসুন্ধরা দ্বিধা হও—সীতার পাতাল প্রবেশ;
নতুন ক'রে আবার বাল্মীকির স্তব্ধ তপোবনে
আসবে না কভু দীপ্ত দিনের রাঘব পরমেশ।
বিশ্বাস কর আজকে আর কন্যা মিলেনা কর্ষণে।

নারিকেলবনে চন্দ্র সূর্য গ্রহণে গ্রহণে কালো
মৃত্তিকার বুকে মারুতাসনের হিংস্র অভিযান।
জোনাকির দেহগুলি যেন গোবি সাহারার আলো,
সমবেত মধুকরকণ্ঠে শোন সাইরেন গান।

ইতস্তত উদ্‌বন্ধনে মৃত্যুরা দেয় হাতছানি
কানাগলির শব্দহীন রাতে—গলিত গর্ভস্রাব
কবির মন করেছে কেবল বিষাক্ত ফুলদানী।
প'রনা প'রনা তুলে রাখ আজ স্বপ্নের কিংখাব।
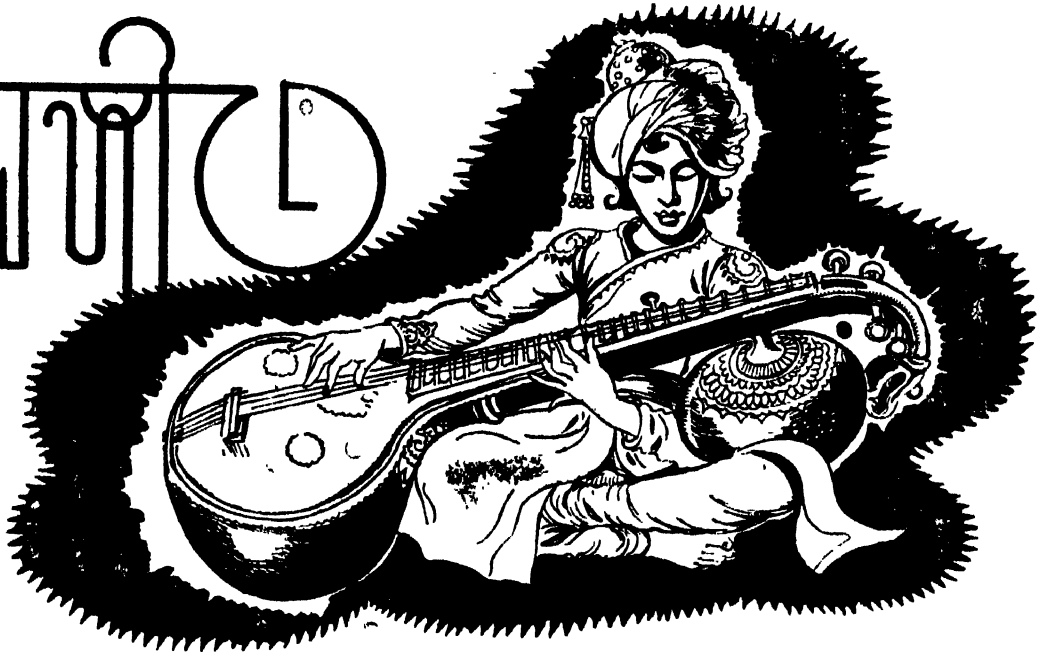
শ্রীরাধাস্তব

ভৈরবী ভৈরোঁ—ত্রি-তাল

শ্রীদিলীপকুমার রায়

০ ১ + ৩

র্সা র্সা I পা দা পা দা | পমা পা মগা মা I সা ঋা গা মা | পা -া

এ সো ল - ক্ষ্মী ম য়ী - প্রা ণ ম ন্ দি রে মা -

আ মি জা - নি না মন্ - ত্র কি বা - ণী গো মা -

মা গা I মা দা পা দা | পমা পা মগা মা I সা ণা ণা দা | পা -া

এ সো কৃ ষ্ ণ ম য়ী - কৃ পা ম ন্ জী রে মা -

অ নু ক ম্ পা তে মা র্ শু ধু মা - নি গো মা -

মা মা I সা ঋা মা গা | মা -া পা মগা I মা পা দা ঋা | র্সা -া

আ মি ম্লা - ন অ কি ন্ চ ন চা - হি তো মা র্

ত বু আ - লো হি য়া - কে ন হ য় মা তো রা -

র্সা র্সা I ঋা -া ঋা ঋা | র্সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা I র্সা র্মা জ্ঞা ঋা | র্সা -া

ব র নে - মা অ হৈ - তু কী ভ ক্ তি অ পা র্

ক্ষ ণ আ - লো য়া উ চ্ ছ্ব সে ল - ক্ষ্য হা রা -

র্সা র্সা I র্সা র্মা র্মা র্পর্মা | র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞা র্মা I র্মা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া
ডা কি অ - শ্রু জ লে - চ র ণে র তী রে মা -

এসো লক্ষ্মীময়ী, প্রাণমন্দিরে মা !
এসো কৃষ্ণময়ী, কৃপামঞ্জীরে মা !
আমি ম্লান, অকিঞ্চন—চাহি তোমার
চরণে মা অহৈতুকী ভক্তি অপার।
ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

আমি জানি না মন্ত্র কি বাণী গো মা !
অনুকম্পা তোমার শুধু মানি রমা !
তবু আজো হিয়া কেন হয় মা তারা,
ক্ষণ-আলেয়া-উচ্ছ্বাসে লক্ষ্যহারা ?
ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

যত বাসনা মোহ মা, দূর করো।
এসো প্রেমলা, ক্ষেম-প্রদীপ ধরো।
আমি প্রার্থনাফুল তুলি' নিত্য আনি
পায়ে অঞ্জলিতে তব রাধারাণী !
ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

দেখ যায় মা বেলা, ভাঙে রঙ্গমেলা !
হ'ল ক্লান্ত দিনের শেষে সাঙ্গ খেলা
এসো দাও মা শরণদিশা পায়ে টানি'
বেসে ভালো মিটাও তৃষা রাধারাণী !
ডাকি অশ্রুজলে চরণের তীরে মা ॥

সা সা I ন্‌া সা ঋা ঋা | সা ঋা গা গা I সা ঋা মা মা | মা -া
য ত বা - স না মো - হ মা দূ - র ক রো -
দে খ যা য় মা বে লা - ভা ঙে র ং গ মে লা -

মা মা I গা মা পা পা | মা পা দা দা I পা দা র্সা র্সা | র্সা -া
এ সো প্রে - ম লা ক্ষে - ম প্র দী - প ধ রো -
হো লো ক্লা ন্ ত দি নে র্ শে ষে সা ং গ খে লা -

র্সা র্সা I সা ঋা গা মা | পা দা ণা র্সা I মা ণা ণা দা | পা -া
আ মি প্রা র্ থ না ফু ল্ তু লি নি - ত্য আ নি -
এ সো দা ও মা শ র ণ্ দি শা পা - য়ে টা নি -

পা দপা I মগা মা পা দা ণা র্সা র্ঋা র্জ্ঞা I পা র্জ্ঞা র্জ্ঞা র্ঋা | র্সা -া
পা য়ে অন্ - জ লি তে - ত ব রা - ধা রা ণী -
বে সে ভা - লো কি টা ও তৃ ষা রা - ধা রা ণী -

বাংলা লঘুগুরু ছন্দে সংস্কৃত ছন্দের রীতি অনুসারে গুরুস্বর (আ ঈ ঊ এ ও) দু-মাত্রা ও অ ই উ একমাত্রা। ঐ ঔ বাংলা মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও দু-মাত্রা লঘুগুরুতেও। মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে গুরুস্বর বিকল্পে একমাত্রা হয় এই তফাৎ। এ-গানটি তোটক ছন্দে রচিত অর্থাৎ প্রতি পর্বের প্রথম দুইটি মুক্তদল (open syllable) লঘু—একমাত্রা, তৃতীয়টি রুদ্ধদল বা গুরুস্বর—দু-মাত্রা। বাকি সব দল মাত্রাবৃত্ত ছন্দের নিয়মে নিয়মিত, অর্থাৎ মুক্তদল একমাত্রা, রুদ্ধদল দু-মাত্রা। শ্রীপ্রবোধ সেনের পরিভাষাই আমি গ্রহণ করেছি দল মুক্তদল ও রুদ্ধদল এ তিনটি নামে। কেনো কোনো বৈষ্ণব শ্রীরাধাকে "মা" বলায় আপত্তি করেন। আমার মনে হয় এ-আপত্তি অসঙ্গত। ইতি। গীতিকার, সুরকার ও স্বরলিপিকার—শ্রীদিলীপকুমার রায়।

* তোটক : প্রণমামি শিবং শিব কল্পতরু
এসে লক্ষ্মী ময়ী প্রাণ মন্দিরে মা

রোমান্টিক যুগ ও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ

অরুণ দে

সাহিত্যের ধারায় যখন নতুন জোয়ার আসে—ভাব ও ভাবনায় যখন একটা নতুন স্পন্দন অনুভূত হয় তখন সেই নবীন গতিবেগকে আমরা একটা নতুন নামে অভিহিত করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইংরাজী সাহিত্যে ভাবে, ভাষায়, ছন্দে ও কল্পনাবিলাসে সৃষ্টির যে নবপ্লাবন এসেছিল তাকেই রোমান্টিক যুগ নামে আখ্যাত করা হয়। এই যুগ বস্তুতন্ময়তা থেকে আত্মতন্ময়তার, বাহ্যিকতা থেকে আন্তরিকতায় এবং গোষ্ঠি-চেতনা থেকে আত্ম-কেন্দ্রিকতার পথে অভিসারের যুগ। কবিমানসের অনির্দেশ্য ব্যাকুলতা, বিস্ময় ও রহস্যবোধ, প্রাণময় সত্তার উদাত্ত প্রকাশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য এই যুগের গীতিকবিতায় অজস্র ধারায় উৎসারিত হয়েছে। সৌন্দর্যপিপাসায় ব্যাকুল কবিগণ এ যুগে নতুন করে প্রকৃতির সঙ্গে অন্তরের মালাবদল করেছেন। তাঁরা জড়ে ও চেতনে একাত্মতা অনুভব করেছেন, রূপের মধ্যে দেখেছেন রূপাতীতকে এবং সামান্যের মধ্যে পেয়েছেন অসামান্যের দ্যোতনা। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন যে এই জগতের যা-কিছু আপাত বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা এক অখণ্ড তাৎপর্য-সূত্রে গ্রথিত এবং বিশ্ব-সুষমার অঙ্গীভূত। এই যুগে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্‌, বায়রণ প্রভৃতি যে সব কবিগণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা আজও কালস্রোতে হারিয়ে যান নি।

রোমান্টিক যুগের কাব্যে যে বিদ্রোহ ও মুক্তি পিপাসা ধ্বনিত হয়েছিল তার মধ্যে আমরা ফরাসী বিপ্লবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। ফরাসীবিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী এই যুগের কবিগণের প্রাণে নবপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল।

তাছাড়া রোমান্টিক যুগের কাব্যে জার্মান ভাববাদের প্রভাবের কথাও অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনই যে সমস্ত ভাব ও ভাবনার প্রধান উৎস এবং প্রকৃতি, মানব ও জীবসত্তা যে এক পরম সত্তারই বিভিন্ন বিকাশ—জার্মান ভাববাদীদের এই দার্শনিক চিন্তা রোমান্টিক যুগের কাব্যে ছায়াপাত করেছে।

বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক কাব্যে যে বিরাট সমৃদ্ধি তার পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব অন্যদিকে তেমনই লক্ষ্য করা যায় যে বৈষ্ণব কাব্য-ধারা থেকে রোমান্টিক কবিমানসের একটি ফল্গুধারা বিহারীলালের আবির্ভাবের বহু আগেই প্রবাহিত হচ্ছিল। ইংরাজী সাহিত্যেও সেই রকম রোমান্টিক যুগের অভ্যুদয়ের পেছনে বৈদেশিক প্রভাব থাকলেও রোমান্টিক কবিমানসের বীজ পূর্বতন সাহিত্যধারায় নিহিত ছিল। একটু অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলেই ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যযুগের সঙ্গে রোমান্টিক যুগের যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে অতি প্রাকৃতের প্রতি যে সহজ-সংস্কার ও আকর্ষণ ছিল তাই কোলরিজ ও কীটসের হাতে কল্পনার মায়াঞ্জন স্পর্শে নবরূপলাভ করেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখেছি অধ্যাত্ম চেতনার প্রাধান্য, পেয়েছি যুক্তির শৃঙ্খলে থেকে মুক্তিপ্রয়াসী উদাত্ত কল্পনার লীলাচাপল্য। তাই যদি বলি রোমান্টিক যুগের কবিকল্পনা, অধ্যাত্মবোধ ও অতি-প্রাকৃতের প্রতি আকর্ষণ মধ্যযুগের সাহিত্যেরই সুষ্ঠু পরিণতি তবে ভুল হবে কি?

রোমান্টিক যুগের কাব্যে যে বিস্ময়বোধ ও নিসর্গপ্রীতি রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভেই সেই অনুভূতির পদধ্বনি আমরা শুনতে পাই। গতানুগতিক রচনারীতির মধ্যে একটা নতুন ভাবের অনুরনণ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি টমসনের 'Seasons' কবিতায় ঝংকৃত হয়েছিল। এই কবিতায় বিভিন্ন ঋতুর আবর্তনে প্রকৃতির যে বিচিত্র লীলা

প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে রোমান্টিক যুগের কবিদের নিসর্গপ্রীতির পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যদি বলি, জন ডায়ার, টমসন, কাউপার প্রভৃতি কবির নিসর্গ চেতনাই রোমান্টিক যুগে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ প্রমুখ কবিদের মধ্যে ক্রম-পরিণতি লাভ করেছিল তবে বোধহয় অন্যায় হবে না।

দুই কবিবন্ধু, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে Lyrical Ballads নামে কবিতা সঙ্কলন প্রকাশিত হয়। এই বইটির প্রকাশকাল থেকে ১৮৩০ খৃ: পর্যন্ত রোমান্টিক যুগ বলে ধরা হয়। Lyrical Ballads এর কবিতাগুলির নতুনত্ব একটি নতুন যুগ নির্দেশ করে। এর কবিতাগুলি মূলতঃ কবিদের ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকেই জন্মলাভ করেছে। কবি আন্তরিক ও তীব্রভাবে যা-কিছু অনুভব করেছেন তাকেই ছন্দে গ্রথিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের কবিতা যেমন একটা নতুন যুগের সূচনা করেছিল ইংরাজী সাহিত্য Lyrical Ballads তেমনই রোমান্টিক যুগের প্রবর্তক। এই কারণে রোমান্টিক যুগের উদ্গাতা হিসাবে বিহারীলাল ও Lyrical Ballads এর অন্যতম কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের তুলনা করা চলে। স্বদেশের ও বিদেশের এই দুই কবির মধ্যে সেদিন যে যুগ-নির্দেশক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছিল তা' হল আত্মভাবের উদ্বোধন বা 'awakening of the self'; অবশ্য, রোমান্টিক যুগের প্রবর্তনায় ইংরাজী সাহিত্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের যে গুরুত্ব বাংলা সাহিত্যে বিহারীলালের গুরুত্ব ততটা নয়। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে এই দুই কবিই নবযুগের প্রবর্তনে গীতি কবিতার ভাষা ও স্বরূপ নির্ণয়ে নতুন আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রোমান্টিক কবিগোষ্ঠীর মধ্যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থই প্রাচীনতম এবং রোমান্টিক কবিমানসের প্রধান ধারক। প্রকৃতির ও মানবজীবনের বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে তিনি অনুভব করেছেন অপার্থিব সৌন্দর্য। তিনি বাস্তবজীবনের মধ্যে ভাবলোকের প্রদীপ জ্বালিয়া সৌন্দর্যের অনুসন্ধান করেছেন। তিনি যে কেবল ভাষাকে অলঙ্কার-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়েছেন তাই নয়, ক্লাসিক্যাল যুগের স্থির ও সংহত গঠন কৌশলের পরিবর্তে কাব্যলক্ষ্মীকে সাজিয়েছেন নতুন আভরণে। তাঁর কবিতায় আমরা পাই অনুভূতির তীব্রতা ও গভীরত্ব, রূপ-রস-স্পর্শময় প্রকৃতির আবেদনে জাগ্রত চিত্তবৃত্তি, সৌন্দর্যপিপাসা এবং মানবসত্ত', প্রকৃতি-সত্তা এবং পরমসত্তার ভাবগত ঐক্যবোধ।

বিষয়বস্তুর দিক থেকেও কবির পটপরিবর্তন কম লক্ষণীয় নয়। ক্লাসিক্যাল কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন প্রধানতঃ পৌরাণিক দেবদেবী, অভিজাত সম্প্রদায়, ঐতিহাসিক ব্যক্তি প্রভৃতি। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ কিন্তু বিপরীত দিকে এগিয়ে গেলেন। কোন বিখ্যাত বা অসাধারণ ব্যক্তি বা বস্তু তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পেল না। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যারা নগণ্য, যারা অবজ্ঞাত এবং ইতিহাস যাদের কোন দিনই মনে রাখবে না তিনি তাদেরই তাঁর কাব্যের অঙ্গিনায় প্রধান স্থান দিলেন। আপাত-দৃষ্টিতে যা নিতান্ত নগণ্য তারই মধ্যে তিনি খুঁজে পেলেন অসাধারণত্ব, রহস্যময়তা ও অনন্ত সৌন্দর্য। তাঁর কাব্য-বীণায় কল্পনাচাতুরীর বদলে সহজ সরল সুরের আলাপেরই প্রাধান্য দেখা যায়। তাঁর কবিকর্মের পরিচয় তাঁর ভাষাতেই বলি :—

"The moving accident is not my trade
To freeze the blood I have no ready arts
'Tis my delight, alone in summer shade
To pipe a single song for thinking hearts."

রোমান্টিক যুগের বৈশিষ্ট্য নিসর্গ কবিতায়। প্রকৃতির কবি হিসাবে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের স্থান বিশ্বসাহিত্যে আজও অদ্বিতীয়। তাঁর মনে হয়েছিল নাগরিক সভ্যতার জৌলুসে আমরা এতই মুগ্ধ যে প্রকৃতির দিকে তাকাতে ভুলে গেছি। তাই তিনি আক্ষেপ করেছেন—

"The world is too much with us ; late and soon
Getting & spending, we lay waste our powers;
Little we see in Nature that is ours ;

ইংলণ্ডের লেক অঞ্চলে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে কবির বাল্য ও কৈশোর কেটেছিল। প্রকৃতি ছিল তাঁর আজন্ম সহচরী। প্রকৃতির প্রতি কবির ভালবাসার বিভিন্ন পর্য্যায় "Tintern Abbey" কবিতায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। শৈশবে তিনি প্রকৃতির সহজাত আকর্ষণেই প্রকৃতির কোলে খেলা করেছেন। তারপর তারুণ্যে তিনি প্রকৃতির রূপ রস বর্ণে গন্ধে মোহিত হয়েছেন। সে সময়ে তিনি কেবল

প্রকৃতির ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন। বহি:প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করত কিন্তু হৃদয়ের নিবিড় অনুভূতির সাহায্যে প্রকৃতির মর্মদেশে প্রবেশ করার শক্তি তখনও তাঁর ছিল না। তাই তখন কবিকে—

"......the sounding cataract
Haunted me like a passion : the tall rock
Tbe mountain and the deep gloomy wood
Their colours and their forms, were to me
An appetite.

কিন্তু প্রকৃতির বাহ্যিক রূপরসে কবি চিরকাল পূর্ণ তৃপ্ত থাকতে পারলেন না। বয়স ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির পরে তিনি প্রকৃতির মধ্যে শুনতে পেলেন "The still sad music of humanity. প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয়ের অবশ্য এখানেই শেষ নয়। পরবর্তীকালে ভাবতন্ময় কবি প্রকৃতির প্রাণময় সত্তায় বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা অনুভব করলেন। প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের বাহ্যিক প্রকাশের আড়ালে যে প্রাণরসের প্রবাহ চিরবহমান তিনি তার সন্ধান পেলেন। তাঁর মনে হল—

And I have felt......
A motion and a spirit, that impels
All thinking things, all objects of all thought
And rolls through all things.

এখানেই প্রকৃতির কবি হিসাবে কীটসের সঙ্গে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের পার্থক্য। কীটস প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ থেকে আকণ্ঠ সৌন্দর্যসুধা পান করেছেন। প্রকৃতির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। কিন্তু ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের মত ধ্যান পরায়ণতা তাঁর ছিল না। তাই বাহ্যিক রূপের অতীত অরূপের সন্ধান তিনি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের মত পান নি। কীটসের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে ওয়ার্ডস ওয়ার্থের মত কোন অতীন্দ্রিয় রূপ পিপাসার ছোঁয়াচ লাগে নি। সুন্দর প্রিমরোজ ফুল কীটসের কাছে তার রঙ, আকৃতি ও রূপের জন্যই মনোহর। কিন্তু ওয়ার্ডস্ওয়ার্থকে তাঁর ভাষাতেই বলি—

"The meanest flower that blows can give
Thoughts that do often lie too deep for tears."

বস্তু জগতের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে আর এক নতুন ভাবজগতের সৃষ্টি করত। সৌন্দর্যকে ঘিরে তাঁর কল্পনাপ্রবণ ভাবতন্ময় কবি-চিত্ত আবর্তিত হত। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ওয়ার্ডস্-ওয়ার্থের সাদৃশ্য লক্ষণীয়। উভয়েই অনুভব করেছিলেন যে মানুষ ও প্রকৃতি একই মহান্ সত্যের দুই ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। উভয়েই প্রকৃতিকে প্রাণময়ী সত্তারূপে বন্দনা করেছেন।

প্রকৃতি কেবল ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের সৌন্দর্য-পিপাসা তৃপ্ত করেনি, তাঁকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাও দিয়েছে। তাই কবি বলেছেন—

'She can so inform
The mind that is within us, so impress
With quiteness and beauty and so feed
With lofty thoughts, that neither evil tongues
Rash Judgements, nor the sneers of selfishmen
......Shall ever prevail against us or disturb
Our cheerful faith, that all which we behold
Is full of blessings.

সাধারণ মানুষের চিত্র ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যে ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন সে যুগের অন্য কোন কবি তেমন পারেন নি। পল্লী-জীবনের চিত্রগুলি কবির নীতিবোধ, করুণা ও সহানুভূতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। 'The Ruined Cottage' ও Michael এ বিষয়ে স্মরণীয় কবিতা। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ মানুষকে প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। তাঁর প্রকৃতি লালিতা লুসি গ্রাম্য শিক্ষক, ফেরিওয়ালা প্রভৃতি মানব চরিত্রগুলি প্রকৃতির মানবীয় মূর্তি। কবি মানুষকে প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ বলে মনে করতেন। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে জ্ঞাতিত্ব তা' তিনি বিভিন্ন উপমার মধ্যে প্রকাশ করেছেন।

'Excursion' কবিতায় তিনি প্রকৃতির তুলিতে সরল আনন্দময় গ্রাম্য কৃষকের চিত্রটি এঁকেছেন—

"Grey locks profusely round his temple hung
In clustering curls, like ivy which the bite
Of winter cannot thin, the fresh air lodged
Within his cheek as light within a cloud."

আবার এলেনের শিশু সন্তানের মৃত্যুতে কবি তার করুণ অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

"...the green stalk of Ellen's life was snapped
And the flower dropped as every eye could see
It hung its head in mortal languishment."

মানুষ প্রকৃতিরই অংশ। তাই প্রকৃতির রূপ ও গুণের প্রতিলিপি মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়।

দীর্ঘায়ু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সমগ্র কাব্য জীবনের বিশ্লেষণ করলে আমরা একই কবির জীবনে দু'জন স্রষ্টাকে পাই। একজন প্রতিভাদীপ্ত, ভাব-তন্ময় এবং কল্পনার ঐশ্বর্যে উজ্জ্বল। এই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ১৭৯৮ খৃঃ থেকে ১৮০৮ খৃঃ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। কবির সুদীর্ঘ জীবনে মাত্র এই দশ বছরেই প্রকৃত প্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যেই কবি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি রচনা করেছিলেন।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর কবি যা রচনা করেছেন তা পড়ে মনে হয় বুঝি অন্য কোন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের লেখা। কবির প্রতিভা তখন স্তিমিত। উপদেশাত্মক বাণী, নীতিবোধ ও অধ্যাত্মচেতনার আধিক্যে কাব্যের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে! তিনি তখন একজন প্রতিভাশালী কবি থেকে পদ্য লেখকে রূপান্তরিত হয়েছেন। তবু একথা স্বীকার করতেই হবে যে মাত্র দশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি যে অসামান্য কাব্য রচনা করে গিয়েছেন তা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ।

সারারাত

শৈলেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

সারারাত
বৃষ্টির ফোঁটার মত
শিশির পড়েছে—
শীতের জড়া গ্রস্ত পাতার ওপর।
আমি জানালার অতি সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে
দেখেছি
শতাব্দীর অতীত
একটি তারা:
জেগেছিল তখনো
পাহাড়ের চূড়ায়—
নীরব দর্শকের মতো।
চারিদিকে নিশ্ছিদ্র গাঢ় অন্ধকার:
অকুতোভয়; কারা যেন
সাংকেতিক আনা গোনা করে
শত্রুর অন্বেষণে।
বড়ো মমতা করে
তারাটি;
অপলক চেয়েছিল—
ওই সীমান্ত পাহারারত
জোয়ানের দিকে।
কিন্তু
আমি জেগে
থাকতে পারিনি
সারা রাত।

গৃহ-ত্যাগ

(একাঙ্কিকা)

কানাই বসু

এই নাটিকায় আছেন :—

ভবদেব মিত্র, তাঁহার পত্নী ভদ্রা, ও তাঁহার ভাইঝি শিবানী।

সাতুবাবু, তাঁহার পুত্র দেবব্রত ও ডাঃ বসু।

[সকাল বেলা। অধ্যাপক ভবদেব মিত্র তার বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় বসে সংবাদ পত্র পড়ছে। তক্তাপোষের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে তার স্ত্রী ভদ্রা।]

ভব। তোমার কথা তো বলেছ ভদ্রা, এবার যাও না, সকালবেলা তোমার সংসারের কাজকর্ম নেই ?

ভদ্রা। আমার কাজের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার নিজের কাজের কথা ভাবো।

ভব। (সহাস্যে) তুমি তো জানো ভদ্রা, আমি হচ্ছি সেই "ভাবিতে পারি না পরের ভাবনা"রও ওপোরে নিজের ভাবনাও ভাবিতে বিশেষ পারি না। কিন্তু কাগজটা একটু পড়তে দাও।

ভদ্রা। কেন, আজ তো তোমার কলেজ বন্ধ বল্লে। সারা দুপুরতো কাগজ পড়বার জন্যে রয়েছে।

ভব। দুপুর আছে বটে, কিন্তু কাগজ পড়াটা, কী জানো, একটা প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে। সকালে অন্ততঃ একমেটে না হলে মনটা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করে। তাছাড়া তোমার কথা তো আমি শুনেছি, একটু সময় হলেই সব ঠিক করে ফেলবো। এখন তুমি একটু—

ভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি উঠে যাচ্ছি। তাহলে তাই বলো যে মেয়েটার বিয়ে আর এ জন্মে দেবে না। মেয়ে বুড়ি হয়ে গেল, আবার কবে তোমার সময় হবে জানি না।

ভব। (কাগজ থেকে মুখ তুলে) ইউ, ইউ! আবার ঐ সব বাজে কথা বলতে সুরু করলে ?

ভদ্রা। কী বাজে কথা বলেছি শুনি ? মাষ্টারী ফলাতে এসেছেন আমার কাছে !

ভব। না, সে বৃথা চেষ্টা আর করবো না, পুরাকালে যা করেছি করেছি। কিন্তু বাজে কথা বলাটা ছাড়ো দিকি ! বুড়ি মোটেই হয়নি শিবু। এই তো আঠারো উনিশ বছর মোটে—

ভদ্রা। সব খবরই তো রাখো কিনা। এই আশ্বিনে একুশ পূর্ণ হয়ে গেছে ! আঠারো-উনিশ !

ভব। বেশ একুশই হলো। একুশ বছরের মেয়েকে কেউ বুড়ি বলে না।

ভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাঙ্গালীর শাস্ত্রে মেয়েরা কুড়ি পেরোলেই বুড়ি।

ভব। ফের বাজে কথা! "কুড়ি পেরোলেই বুড়ি" ওটা কোনও শাস্ত্রই নয়। তাছাড়া এজন্মে বিয়ে দেবো না মানে কী ? মাত্র জুনমাসটা অপেক্ষা করতে বলেছি— কলেজের পরীক্ষাটা আসছে তাই। এতেই এজন্মে শিবুর বিয়ে দেবো না ?

ভদ্রা। আহা, জুনমাসটা গেলেই একেবারে পয়লা জুলাই যেন বিয়েটা দিয়ে ফেলছো। কত জুন যাবে, তার ঠিক কী ? এদিকে মেয়ে দিন দিন হাতী হয়ে উঠলো। আগেকার দিন হলে—

ভব। (চোখ পাকিয়ে) ইউ ! (ভদ্রা থেমে গেল। কয়েক মুহূর্ত নীরবে থেকে) তোমার এইসব অভ্যাস যদি তুমি ত্যাগ না কর ভদ্রা, তাহলে আমি তোমার কোনও কাজ বা কথায় থাকবো না। মানুষ যত বড়োই হোক, তাকে হাতী বলা চলে না কোন মতেই। বিশেষতঃ শিবু যখন মোটা নয়, তখন উপমার ছলেও ওটা খাটে না। এবার বল, কী বলছিলে ?

ভদ্রা নীরব

ভব। (ক্ষণকাল কাগজ দেখে, একটু অপেক্ষা করে) কই কী বলছিলে বল ? (কাগজ নামিয়ে চাইলো)

ভদ্রা মুখ ঘুরিয়ে বসলো

ভব। কী গো, রাগ করলে? কী আশ্চর্য! রাগ করবার কী আছে এতে? অত্যুক্তি করার অভ্যাসটা কেবল ছাড়তে বলেছি, আর তো কিছু নয়। অত্যুক্তি-গুলো মিথ্যে কথার জাতে পড়ে, এটা বোঝো না কেন? নাও, নাও, রাগ করে চুপ করে থেকো না, ওতে মিথ্যে সময় নষ্ট হয় মাত্র। চিরকাল কিছু আমার সঙ্গে কথা না কয়ে থাকতে পারবে না।

ভদ্রা। তা হলেই তুমি বাঁচো। আমি কথা না কইলেই বেশ সোয়াস্তিতে থাকো তুমি, তা জানি।

ভব। একেবারেই না। এটাও তোমার সত্যি কথা হলো না। তুমি কথা না কইলে আমার অত্যন্ত অস্বস্তি লাগে, তা তুমি বেশ জানো, রাগের বশে কেন আমাকে মিথ্যে দোষ দিচ্ছ?

ভদ্রা। দিচ্ছি, আমি যে মিথ্যেবাদী, আমি যে জোচ্চোর, আমি যে ঝগড়াটে—পাজী—

ভব। ইউ, ইউ, ইউ! (ভদ্রা থেমে গেল) নাঃ, ইউ আর ইন্‌করিজিব্‌ল্! তোমাকে পারা যাবে না। একেবারে মিথ্যে কথার ফোয়ারা খুলে দিলে। তুমি মোটেই মিথ্যেবাদী নও, মোটেই জোচ্চোর নও।

ভদ্রা। কেন নই? এই তো তুমি নিজের মুখে বল্লে—

ভব। আমি একবারও বলিনি যে তুমি মিথ্যেবাদী। আমি বলেছি তোমার কথাগুলো মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে, এটা বোঝো না কেন?

ভদ্রা। আহা গো! তোমাকে চোর বলিনি, খালি বলেছি তুমি বড়ো চুরি কর। মিথ্যে কথার ফোয়ারা খুলে দিলুম, আর মিথ্যেবাদী নই। তা অত পণ্ডিতি কথা আমি মুখ্যুমানুষ বুঝবো কী করে বলো?

ভব। খুব বোঝো। এতদিন পরে আর ওকথা চলে না ভদ্রা। আমি যা বলি তা তুমি বোঝো খুব, কেবল রাগের বশে আমার কথার অর্থটা বিকৃত করে তার কদর্থ কর আর অনর্থ কর। অতিশয়োক্তি না করেও বেশ কথা কওয়া যায়, মনের ভাব প্রকাশের কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না, এই আমি বলছি, বল্লেই পারো মেয়েটা বড়ো হয়েছে—অবশ্য বয়সোচিত বড়োই হয়েছে—কিন্তু বড়ো হয়েছে বল্লেই যখন তোমার বলা ঠিক হয়, আমিও ঠিক বুঝি, তখন—

ভদ্রা। আর হাতী বল্লে তুমি ঠিক বুঝতে পারো না, না? মনে কর শিবুর বুঝি চারটে থামের মতো পা হয়েছে, নাকটা লম্বা হয়ে শুঁড়ে দাঁড়িয়েছে, কান দুটো কুলোর মতো হয়েছে, এইসব বলছি, না?

ভব। চারটে পা, লম্বা শুঁড়, কুলোর মত কান যখন আমি বুঝি না, আর তুমিও যখন তা বোঝাতে চাও না, তখন মিছেমিছি ভাষার ওপোর কতকগুলো অতিশয়োক্তির বোঝা চাপিয়ে তাকে ভারী করবার দরকার কী? (ভদ্রা নীরব) যাক্, আর তর্কে কাজ নেই, তোমার কথার যদি কিছু বাকী থাকে, শেষ কর।

ভদ্রা। কিসের আবার কথা? তোমারই ভাইঝি, বড়ো হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে, দায় তোমার। তাতে এত কথাই বা কী, আর তর্কই বা কিসের? সত্যিই তো আমি বাইরের লোক, আমার কথা কইবার দরকার কী?

ভব। বল্লে রাগ করবে ভদ্রা, এ কথাটাও তোমার সত্যি হলো না। তুমি বাইরের লোক? শিবু আমার ভাইঝি বটে, কিন্তু তোমাকে সেদিন পর্য্যন্ত সে মা বলে ডেকেছে।

ভদ্রা। যখন ডেকেছে, ডেকেছে। সে কথায় কাজ কী? এখন তো আর বলে না।

ভব। ও তো বলতো। তুমিই বারণ করে করে কাকী বলা ধরিয়েছ।

ভদ্রা। বলাবো না? যা সম্বন্ধ, তাই বলা ভাল। কী দরকার আমার খুঁড়িয়ে বড়ো হবার? তাছাড়া লোকে কী মনে করে? সেদিন শিবুর এক বন্ধুর মা বেড়াতে এসেছেন, তোমার সাড়া পেয়ে আমায় বল্লেন, 'আপনার দেওর ডাকছেন আপনাকে। ঐযে নীচে থেকে শিবু বলেছে 'ও মা মেজকা ডাকছে।

ভব। হাঃ হাঃ হাঃ, অমনি সম্পর্ক বিচার করেছেন। সব সাতুমামার শিষ্য দেখছি।

ভদ্রা। সাতুমামা কেন, সম্পর্ক বিচার সকলেই করে থাকে। তোমার মতন তো নয়।

ভব। তা বটে। আমার মাথায় ওটা ঢোকে না। রিলেটিভদের (relatives) তত্ত্ব আমার কাছে থিওরি অফ রিলেটিভিটি (Theory of Relativity)র চেয়ে শক্ত। তা বলে মামাতো ভায়ের পিস্‌তুতো ভাই আমার কে হয়,

তা না জানলেও, তুমি যে শিবুর মা'র চেয়ে কম নও সেটা জানি।

ভদ্রা। থাক্। আমি যদি কেউ হতুম, তাহোলে আমার একটা কথাও থাক্‌তো। ও কথায় কাজ নেই আর।

ভব। অ চ্ছা, রাগারাগিতেও আর কাজ নেই শিবুর বিয়ের চেষ্টা আমি করবো, আজ থেকেই করবো। এবার যুদ্ধ থামাও, সন্ধি কর, লক্ষ্মীটি।

ভদ্রা। (গম্ভীর ভাবে) মিথ্যে কথা বোলো না বলছি যত বাজে কথা আর মিথ্যে কথা!

ভব। মিথ্যে কথা? না, না, সত্যি বলছি, আমি চেষ্টা করবো তুমি দেখ। এখন যাও, নিশ্চিন্ত চিত্তে কুমড়ো ঢ্যাড়স ইত্যাদি কুটে সংসার ধর্ম্ম পালন করগে। আমার ওপোর রাগ করে আঙুল কুটে ফেলো না, লক্ষ্মীটি।

ভদ্রা। আবার মিথ্যে কথা? ছি, ছি, একী বদ্ অভ্যেস তোমার?

ভব। (সবিস্ময়ে) কোথায় মিথ্যে কথা বল্‌লুম গো? কী পাগল?

ভদ্রা। ফের? নাঃ, তুমি একেবারে ইন্‌কারিজিব্‌ল।

ভব। কী হোলো তোমার বলো তো? আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না! দয়া করে একটু বুঝিয়ে বল কী মিথ্যে কথা কইলুম আমি।

ভদ্রা। তা বুঝতে পারবে কেন? নিজের দোষ কি দেখতে আছে? লক্ষ্মী লক্ষ্মী করছো কাকে শুনি? আমি কি পদ্মের ওপোর বসে আছি? পেঁচায় চড়ে বেড়াই আমি, না সমুদ্র থেকে উঠেছি? বল? মিথ্যে কথা নয়?

ভব। মাই গড্! (My god)! এখানে লক্ষ্মীর অর্থ—

ভদ্রা। আর যুদ্ধ সন্ধি, এসব কথা ওঠে কোত্থেকে? তোমাতে আমাতে যুদ্ধ হচ্ছে? ঢাল, তরোয়াল, বন্দুক, সড়কি, কী আছে আমাদের হাতে? বাজে কথা নয়?

ভব। (উচ্চহাস্য করে) আরে, যুদ্ধ মানে বাক যুদ্ধ।

ভদ্রা। আরে বাক্‌যুদ্ধ মানে বাজে কথা।

ভব। (হাস্‌তে হাস্‌তে) কী পাগল!

ভদ্রা। এখনও মিথ্যে কথা? আমি পাগল? ডাকো ডাক্তার। কোন্ ডাক্তার আমাকে পাগল বলে দেখি একবার। বাজে কথা আর মিথ্যে কথা বলবার আর জায়গা পাওনি?

ভব। (সহাস্যে) পেয়িং মি ব্যাক্ ইন্ মাই ওন্ কয়েন! (Paying me back in my own coin!) আমারই অস্ত্রে—

ভদ্রা। হ্যাঁ, নিজের দোষ হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় খুবই, মানুষকে হাতী বল্লে মিথ্যে কথা বলা হয়, সত্যিই তো, আর লক্ষ্মী বল্লে, সুস্থ মানুষকে পাগল বল্লে, একেবারে সত্যনারাণের পাঁচালী গাওয়া হয়।

[ভবদেব হাসছে। তার হাসির ছোঁয়াচ লেগে ভদ্রার মুখেও রাগের ভান সরে গিয়ে হাসি ফুটছে। এমন সময়ে দরজায় আবির্ভূত হলেন এক বৃদ্ধ-গোছের ভদ্রলোক, পরণে কোটপ্যান্ট, মাথা প্রায় পাকা, কাঁচাপাকা এড্‌ওয়ার্ড সেভেন্থ দাড়িগোঁফ। হাতে একটুক্‌রো কাগজ। তিনি এসে দরজার কাছে থমকে দাঁড়িয়েছেন, কারণ তাঁকে দেখেই ভদ্রা দ্রুতপদে ভিতরে চলে গেছে। কিন্তু ভদ্রা অন্তর্ধান হয়নি, পর্দার নীচে তার শাড়ীর পাড় ও পায়ের আভাস রয়েছে।]

ভদ্রা। এইটে প্রফেসার ভবদেব মিত্রের বাড়ী তো?

ভব। আজ্ঞে হাঁ। আপনি—

আগঃ। (এগিয়ে এসে) আমি ডাক্তার বোস। ভবদেববাবুর বাড়ীতে একটি মেয়েকে দেখতে এসেছি। আমাকে খবর দিয়েছিলেন দেখবার জন্যে।

ভব। আসুন, আসুন। নমস্কার। আমারই নাম ভবদেব মিত্র। মেয়েটি আমার ভাইঝি। বসুন আপনি। আমি মেয়েটিকে—

ডাঃ। নাঃ, এখানে বসে আর কী করবো। কোথায় আছে চলুন।

ভব। আজ্ঞে না, আপনি বসুন। আমি তাকে এখানে আনার ব্যবস্থা করছি।

ডাঃ। এখানে আনবেন? তা আসুন।

[ভবদেব ভিতরে যাবার জন্য উঠলো। কিন্তু দরজার পর্দার আড়ালে তার অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে। সেখানে সে স্ত্রীর সঙ্গে কথা কইছে।]

ডাঃ। (দরজার দিকে ও নিজের ঘড়ি দেখে) দেরী করবেন না। আমার কাজ রয়েছে।

ভব। (পর্দার পাশ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে) আজ্ঞে না, এই দশ মিনিটের মধ্যেই—

ডাঃ। দশ মিনিট ? এতক্ষণ দেরী হবার কারণ কী ?

ভব। মেয়েদের ব্যাপার জানেন তো। আমি যত শীগ্‌গির সম্ভব আনতে বলে দিচ্ছি।

ডাঃ। আচ্ছা, আমি তবে একটা কল্ সেরে আসছি। [প্রস্থান

(ভবদেব ও ভদ্রা ভিতরে এলো)

ভব। দেখ দিকি কাণ্ড !

ভদ্রা। কী আবার কাণ্ড দেখবো। ডাক্তার মানুষ, কল্ সেরে আসছেন।

ভব। সে কথা নয়। কোত্থেকে এক ঝঞ্ঝাট বাধালে তুমি। কে, কী বৃত্তান্ত কিছু জানালে না আমাকে, একেবারে ডেকে আনলে ভদ্রলোককে মেয়ে দেখাতে। আচ্ছা, এতক্ষণ এতকথা কইলে, কই একথা তো বলনি যে—

ভদ্রা। বল্‌তে দিলে কই তুমি। খালি ইউ, ইউ, আর ইউ।

ভব। তা আই আই করার চেয়ে ইউ, ইউ করা ভালো। সব তুঁহু, তুঁহু। যাক্, এখন বল, কী রকম ছেলে ? কতদূর লেখাপড়া করেছে ?

ভদ্রা। তা আমি কেমন করে জানবো ?

ভব। তার মানে ? ছেলের খবর কিছু না জেনে প্রথমেই মেয়ে দেখানো, ও আমি ভালবাসি না।

ভদ্রা। সে সব খবর তুমি নেবে।

ভব। হোপলেস্ ! আমি তো কিছুই জানি না, ভদ্রলোককে চিনিই না—

ভদ্রা। রাতদিন বইয়ে-মুখে বসে থাকবে, তা কিছু জানবে কেমন করে বল। লেখাপড়া যারা করে তারা বুঝি ছেলে মেয়ের বিয়ে দেয় না।

ভব। আহা-হা, দেবে না কেন, খুব দেয়। আমিও কি শিবুর বিয়ে দেবো না বল্‌ছি। কিন্তু কার সঙ্গে দেবো সেটাতো দেখতে হবে। বিয়ে দেবার পাত্রটিকে—

ভদ্রা। পাত্রকে তুমি খুঁজে পেতে আনবে, না পাত্র আপনা থেকে সেধে আসবে তোমার বাড়ী ?

ভব। তা আসতে পারে। কেন, কেবল মেয়েরই বিয়ে দেবার প্রয়োজন ? ছেলের কি বিয়ে করার প্রয়োজন নেই ? যাকগে, সে তর্কের সময় নেই। ভদ্রলোক এখনই এসে পড়বেন। এই বেলা এঁর সব পরিচয়-টরিচয় বলে দাও আমাকে, কোত্থেকে এঁর খবর পেলে ? মেয়ে দেখবার ব্যবস্থাই বা করলে কাকে দিয়ে, কে সন্ধান দিলে—

ভদ্রা। সন্ধান পাবো মনে করলেই সন্ধান পাওয়া যায়। তুমি তো মানো না, কিন্তু ওপোরে একজন আছেন তাঁকে—

ভব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড যাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলছে, সৃষ্টি স্থিতি লয়, চতুর্বেদ, পঞ্চবাণ যাঁর আদেশে ইত্যাদি। কিন্তু তিনি স্বয়ং কি তোমার কাছে আসবার সময় পেয়েছিলেন ? নাকি, কারও মারফৎ সন্ধানটা পাঠালেন ?

ভদ্রা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন ইনি। মেয়ে চাই, বাঙ্গালী, শিক্ষিতা, সৎস্বভাব, স্বাস্থ্যবতী মধ্য-বিত্ত শ্রেণীর—ঐ যেমন থাকে গো।

ভব। হুঁ, কোন্ কাগজে ? কত তারিখের কাগজে ?

ভদ্রা। তা কে জানে। অত সাত সতেরো, বারো পনেরো—

ভব। ইউ, ইউ। ওসব কী হুজ্‌পজ্ বকছো ? খামোকা অত ফিগার আওড়াচ্ছ কেন ? যা বলবে, ইন্ ওয়ার্ডস্ (in words) বল, নট্ ইন্ ফিগারস্ (not in figures).

ভদ্রা। ফিগার আবার কী ? কবেকার কাগজ, কোথাকার কাগজ অতশত জানি না। ঝিয়ের ছেলেটা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করছিল ক্ষিদে পেয়েছে, ক্ষিদে পেয়েছে বলে, কাজ করতে দেয় না ঝিকে, সবে অসুখ থেকে উঠেছে ছেলেটা, রাতদিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। কোলের ছেলে, দুটো নষ্ট হয়ে গিয়ে ঐটুকু আছে। সোয়ামীটা তো মানুষ নয়—

ভব। আহা, ঝিয়ের জীবনচরিতে আমার কী দরকার ? খবরের কাগজের কথা হচ্ছে

ভদ্রা। সেই কথাই তো আমিও তোমাকে বল্‌ছি। ছেলেটা কাঁদছিল, তাই তার জন্যে দু' পয়সার মুড়কি আনতে দিলুম। মুড়কি এনে ঝি ঠোঙাটা আমার হাতে দিলে—

ভব। তোমাকে দিলে? কেন? তোমারও ক্ষিদে পেয়েছিল নাকি? ছেলের জন্যে মুড়কি এনে তোমাকে—

ভদ্রা। মুড়কি দিলে বলেছি? ঠোঙাটা দিলে। আমি ঠোঙা পড়তে ভালবাসি ওরা জানে। অনেক জিনিষ থাকে। একবার একটা ঠোঙাতে দেখি—

ভব। ভদ্রা, মুড়কির ঠোঙার কথা হচ্ছে প্রিজ্।

ভদ্রা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি। সেই ঠোঙাতে বিজ্ঞাপন দেখেছিলুম। সবটা কি পড়া যায়। এমন আটা লাগিয়েছে।

ভব। ইন্‌ডিড্! (Indeed)।

ভদ্রা। হাঁ, তাই দেখে দুখনকে আজ ভোরে পাঠিয়েছিলুম তোমার নাম ঠিকানা দিয়ে।

ভব। ঠোঙার বিজ্ঞাপন? দি আইডিয়া! কতদিনের ঠোঙা আই মিন্ কতদিনের বিজ্ঞাপন, এখনও তাদের দরকার আছে কিনা সে সব জানা নেই—

ভদ্রা। নিশ্চয় দরকার আছে নইলে এরই মধ্যে, খবর দেবামাত্র দেখতে আসেন?

ভব। হুঁ। হয় ঘটকালী বিদ্যায় তুমি একটি জিনিয়াস্, অর ইউ আর এ ফুল্ (or you are a fool)।

ভদ্রা। তা ফুলই হব আমি। তোমার মতন ফল হতে চাই না। যাক্ এখন সব শুনলে তো। এবার তুমি কথা কও। বড়ো ডাক্তার বলে মনে হচ্ছে, দুখন বল্লে, বেশ বড়ো বাড়ী, নতুন মটর গাড়ী। বোধহয় ছেলের বে দেবে। আমি যাই, দেখি শিবুকে যদি—যে মেয়ে, এম্‌নিতেই সাজতে বল্লে মারতে ওঠে, তার ওপোর সকালে বলেছি তোকে দেখতে আসবে। সেই রাগে খায়নি পর্য্যন্ত, মুখ হাঁড়ী। (প্রস্থানোদ্যত)

ভব। (অপ্রসন্ন মুখে) তুমি চলে যাচ্ছো? ভদ্রলোক এখুনি এসে পড়বেন যে।

ভদ্রা। তা আমি কী করবো? আমাকে তো আর দেখবেন না। তুমি কথাবার্ত্তা কইবে।

ভব। আরে কী কথাবার্ত্তা কইতে হবে, তাই তো আমি জানি না। জ্বালাতন!

ভদ্রা। এরই মধ্যে জ্বালাতন? তবেই তুমি মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেছ!

ভব। বিয়ের ব্যবস্থা করা তো শক্ত নয়। দোকান বাজার পাঁচজনে করে দেবে, বামুনরা রাঁধবে, ডেকোরেটারদের বলে দেবো সাজিয়ে টাজিয়ে দেবে। বিয়ে হয়ে যাবে। এতে আর শক্তটা কী, কিন্তু এই সব সম্বন্ধ ঠিক করা, কথা কওয়া, ওঃ হরিবল্! (oh harrible!) যত সব ছেঁদো কথা আর দেঁতো হাসি—

ভদ্রা। তা কথা কইতে হবে বই কি। কথা না কইলে বিয়ে হয়?

ভব। না হয় নাই হবে। একি একটা কথা কইবার জিনিস? বিয়ে হ'লো ওয়ান্ অব্ দি মোষ্ট্ শেক্রেড ইভেন্টস্ অব ম্যান্‌স্ সোস্যাল লাইফ্ (one of the most sacred events of man's social life) মানুষের সামাজিক জীবনে যার চেয়ে বড়ো ব্যাপার আর নেই। সেকি অম্‌নি কইলেই হোলো।

ভদ্রা। চার কাল কথা কয়েই বিয়ে ঠিক হচ্ছে। বলে এক লক্ষ কথা না হ'লে বিয়ে হয় না। নাও বাপু, তুমি অমন করো না। ভদ্রলোক এলে ভালো করে হাসিমুখে কথাবার্ত্তা বোলো। আমি যাই, দেখি যদি মেয়েকে রাগ ভাঙ্গিয়ে একটু সাজাতে পারি।

[প্রস্থান]

ভব। (চিন্তিত ও বিরক্ত) হরিব্‌ল্, সিম্‌প্লি হরিব্‌ল্!

(সাতকড়ির প্রবেশ। ভবদেবের চেয়ে কিছু বড়ো। হাতে ছাতা, সঙ্গে একটি ৩।৪ বছরের বালক।)

সাতু। কীহে ফেলু, হরিবোল, হরিবোল বলছো যে বসে বসে! বেশ, বেশ!

ভব। এস সাতুমামা। হরিবোল নয়, বল্‌ছি হরিব্‌ল্। ওরে শিবু, তোর বন্ধু এসেছে।

(এদের কথাবার্ত্তার ভিতর অল্পক্ষণ পরে শিবানী এসে ছেলেটিকে ভিতরে নিয়ে গেল।)

যাক্, তুমি এসেছ ভালো হয়েছে। কথাবার্ত্তা কইবার ঠিক লোক পাওয়া গেল। বোসো, সাতুমামা।

সাতু। (ছাতা ঘরের কোণে রেখে, তক্তাপোষে বসতে বসতে) আর বসা। বস্‌বার কি জো আছে একদণ্ড। ঘানিগাছে জুড়ে দিয়েছে, ঘোরো, ঘোরো, যদ্দিন না মৃত্যু হয় কেবল ঘুরে মর'। এখন যেতে হবে বাজারে। বস্‌বার সময় কই?...কবে ছুটি পাবো বল্‌তে

পায়ো ফেলু? হ্যাঁ, আমি এসেছি, ভালো হয়েছে কেন বল্লে বলতো? কী ব্যাপার?

ভব। এক ঝঞ্চাটে পড়ে গিয়েছি। বলে একলক্ষ কথা নইলে বিয়ে হয় না। তার মধ্যে নব্বই হাজার নিশ্চয় বাজে কথা আর ছেঁদো কথা। কী বল?

সাতু। বিয়ের কথা উঠলো কেন? কার বিয়ের কথা হচ্ছে?

ভব। শিবুর। আছে কোনো ভালো ছেলে তোমার সন্ধানে? গিন্নী তো নিজেও অস্থির হয়ে উঠেছেন আর আমাকেও স্থির থাক্‌তে দিচ্ছেন না। আছে ছেলে, সাতুমামা?

সাতু। সেই কথাই ভাব্‌ছি। ছেলে, তা ছেলে একটি আছে বটে, আমাদের আপনা-আপনির মধ্যেই, ভালোই ছেলে।

ভব! আপ্‌না আপ্‌নির মধ্যে? কাদের বাড়ীর ছেলে বল তো?

সাতু। হরিচরণ বাবুকে জান্‌তে তো তুমি?

ভব। খুব জানতুম। হরিচরণকে জানি না? কী বল! আমাদের পণ্ডিত হরিচরণ তো?

সাতু। না, না, পণ্ডিত হরিচরণ নয়, সেতো থিয়েটারে মর্জিনা সাজতো, বার পাঁচ ছয় ম্যাট্রিক ফেল করতে বাপ রাগ করে বিয়ে দিয়ে দিলে! এদানিং উন্নতি করেছিল, মেবারের রাণা না মন্ত্রী কী হয়ে—

ভব। তবে কোন্ হরিচরণের কথা বল্‌ছ?

সাতু। এ হরিচরণ হচ্ছে—আমার বাবার এক জ্যাঠামশায়ের মানে আপন জ্যাঠা নয়, আমার ঠাকুর্দার এক বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন, জানো তো?

ভব। (ঘাড় নেড়ে) না।

সাতু। হ্যাঁ ছিলেন। তাঁরই ছেলে, মানে ঠাকুর্দার সেই ভাইয়ের ছেলে হরিচরণ। তা হোলে আমার হোলো কাকা, বুঝলে তো? বাবার জ্যাঠা মানে আমার ঠাকুর্দা,' সেই ঠাকুর্দার ছেলে, কাকা হোলো না আমার?

ভব। ও।

সাতু। তবে আমি বড়ো একটা কাকা-টাকা বলতুম না। রাগ করতো, বল্‌তো বাবাকে বলে দেবে। হ্যাঃ, তুমিও যেমন। বাবাকে বোলে দেবে কি, বাপের ধারে কাছেই ঘেঁসতো না। ভয়ানক রাশভারি ছিলেন কিনা, বাবার সেই জ্যাঠামশায়ের কথা বলছি, হরিচরণের বাপ। খুব রাশভারি লোক ছিলেন। সেকালের বি-এ পাশ ডেপুটি, পরে সদরালা হয়েছিলেন। সরকারী মহলে খুব খাতির। সায়েবরা ভারি ভালবাসতো। কিন্তু হলে হবে কী, ছেলেটার কিছু হোলো না। ঐ হরিচরণ। বি-এ পাশও করলে, ধরাধরিও কম করলে না, কিন্তু হাকিমি কি আর আজকাল অত সস্তা। চাকরি করে। চাকরি অবশ্য ভালো, পাকা চাকরি, মাইনে ভালো, এদিক ওদিকে দু'পয়সা আছে—

ভব। তা সেই হরিচরণ ছেলেটি কেমন? স্বভাব চরিত্র স্বাস্থ্য—

সাতু। আরে না, হরিচরণ ছেলে নয়। ছেলে হোলো শোনো না। হরিচরণের স্ত্রী—আমি আবার তাকে বলি হরিচরণ-কাকী (হাসি)। আর বল কেন। চটে যা যায়! তবে লোক ভালো, গেলেই খুব খাওয়ায়। হাতের রান্না—

ভব। তুমি ছেলের কথা বলছিলে, সাতুমামা।

সাতু। হ্যাঁ গো, সেই কথাই বলছি। হরিচরণ-কাকীর বড়মামা হচ্ছে সুরেন ঘোষ। পাথুরেঘাটার ঘোষেদেরই বংশ, মস্ত ঘর। সেই সুরেন ঘোষের একটি দৌত্তুর আছে, সে আবার আমার সেজো শালা নীরোদ খুড়শ্বশুরের—তোমার মনে আছে তো নীরোদকে, নীরোদ কেষ্টরাম দত্তর মেয়েকে বিয়ে করেছে না—এদিক দিয়ে হলো হরিচরণ কাকার মামাতো শালীর ছেলে, আবার ওদিক দিয়ে সেই নীরোদের—

ভব। ইউ, ইউ, এনাফ্‌ অফ্‌ ইট (Enough of it), সাতুমামা! রক্ষে কর। এদিক দিয়ে, ওদিক দিয়ে, অত সম্পর্ক বিচারে কি দরকার? ছেলের বাপের নাম বল, তাহোলেই তো হবে।

সাতু। (রাগ করে) বাপের নাম বল্লেই হবে? বাপের নাম বিপিন, কী বুঝলে:

ভব। বুঝলুম বিপিনবাবু নামে এক ভদ্রলোকের একটি বিবাহযোগ্য ছেলে আছে।

সাতু। বাস্। তবে আর কী! দাও, বিয়ে দাও। (সাতু মুখ ফিরিয়ে বসল)

ভব। না, না, কে বিপিন, কোথাকার বিপিন, কেমন ছেলে, সব বল।

সাতু। (আবার মুখ ফিরিয়ে বসল) তবে? সব বল্‌তে হবে তো ব্যস্ত হোলে কি চলে? ব্যস্ত হোলে চলে না। বিপিন দত্ত, উকিল, পটলডাঙ্গায় বাড়ী। তাঁরই ছেলে। ছেলের মামার বাড়ী তো তোমাকে বল্লুম ঐ সুরেন ঘোষের বাড়ী, আবার ছেলের পিসে, মানে বিপিনের ভগ্নীপতি ছিলেন আমাদের—আমাদের হোলো গিয়ে, এই দেখো, পেটে আসছে মুখে আসছে না, নামটা—(চিন্তা করছে)

[ভদ্রার প্রবেশ]

ভদ্রা। না বাপু, আমি তো হেরে গেলুম তোমার মেয়ের কাছে, তুমি একবার—ওমা, সাতুমামা বসে আছেন যে, (মাথার কাপড় টেনে দিল)।

ভব। তোমাকে বল্লুম না আজ থেকেই চেষ্টা করবো। এই দেখ, সাতুমামার কাছে একটি সম্বন্ধ পাচ্ছি। ছেলে ভালো, কলকাতায় বাড়ী, বাপ ডাক্তার—

সাতু। ডাক্তার নয়—উকিল।

(ভদ্রা ঘোমটার ভিতর থেকে ফিস্ ফিস্ করে কী বল্লে, ভালো শোনা গেল না)।

ভব। আঃ, তোমার এই লজ্জার অত্যাচারে গেলুম। সাতুমামাকে দেখে এখনও ঘোমটা, এবসার্ড (Absurd) আসলে ভাগ্নে বই তো নয়। বয়সে বড়ো বলে মামা বলি। কী গো, ঘোম্‌টা ফোম্‌টা ছেড়ে স্পষ্ট করে কথা কইবে তো কও, নইলে আমি আর পারবো না শিবুর বিয়ের ব্যবস্থা করতে।

ভদ্রা। (ঘোমটা কিছু কমিয়ে কণ্ঠ একটু উচ্চ করে) হোন্ তোমার ভাগ্নে, চিরকাল মামা বলে ডাকি, মামাশ্বশুর বলেই জেনে এসেছি। ওকথা থাক্, বলছিলুম কী সম্বন্ধর কথা বলছেন, ভালো করে জেনে নাও, কী রকম ঘর, কী বিত্তান্ত সব জেনে—

সাতু। সে দেখতে হবে না বৌমা। আপনা-আপনির মধ্যে। আমার সেই হরিচরণ-কাকীকে মনে আছে তো?

ভব। এই রে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাতুমামা, সে তো আমি সমস্ত শুনে নিয়েছি, পরে ওকে শুনিয়ে দেবো। (স্ত্রীকে) মস্ত ঘর, বুঝলে?

সাতু। হ্যাঁ, ভালো ঘর বৌমা, অবস্থাও ভালো। পটলডাঙ্গার বিপিন উকিল, সবাই চেনে।

ভদ্রা। ওমা, বিপিন উকিল, সে তো আমাদের চেনা গো তোমার মনে নেই? বেশ যা হোক। হাজারী-বাগের কালো মাসীর ননদের মেয়ের বিয়ে হয়েছে না, বর্দ্ধমানে? সে তো ঐ বিপিন উকিলেরই বড়বোনের—

ভব। (প্রায় চিৎকার করিয়া) ইউ, ইউ! স্টপ ইট, (stop it)। পাগল করে দেবে নাকি? এত সম্বন্ধের জট পাকালে মানুষ দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে যে।

সাতু। ওকী কথা ফেলু, সম্বন্ধ বিচার করতে হবে বইকি। আমাদের কায়স্থের ঘরে সম্বন্ধই হচ্ছে মানুষের আসল পরিচয়। তাছাড়া সম্পর্ক বিরুদ্ধ হচ্ছে কিনা, সেটাও দেখতে হয় অনেক সময়। বৌমা ঠিকই ধরেছেন। সেই বিপিন উকিল। বিপিনের সেই ভগ্নীপতির কথাই তো বলছিলুম। তিনি ছিলেন বর্দ্ধমান রাজ এস্টেটের এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার রায়সাহেব সরোজ গুহ। মনে পড়েছে ফেলু, সরোজ গুহ। তাঁর তিনটি ছেলে, না বৌমা? সতীশ ভোলানাথ আর—

ভদ্রা। (স্বামীকে) ঐ কালোমাসীর ননদের জামাই, বুঝলে গো?

ভব। (মাথা নেড়ে) হুঁ, হুঁ, কালোমাসী, বুঝেছি।

সাতু। হ্যাঁ, ভোলানাথের বিয়ে হাজারীবাগে হয়েছিল শুনেছিলুম। তা মেজো ছেলে ঐ ভোলানাথ, বড়ো ছেলে সতীশ, আর ছোট—ছোট—(চিন্তার সুরে) সতীশ, ভোলানাথ আর ছোট—ঐ যে আমাদের নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হোলো যার, বর্দ্ধমান থেকে বর এলো টানা মোটরে,—কী নামটা, আহা, বল না বৌমা?

ভব। সাতুমামা, তুমি বর্দ্ধমান থেকে পটলডাঙায় ফিরে এসো প্লিজ। তাহলে বিপিনবাবুর ছেলের সঙ্গে শিবুর বিয়ে হোতে পারে, কেমন?

সাতু। আহা, দাঁড়াও না, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? বৌমার মনে পড়ছে না? সতীশ, ভোলানাথ আর—

ভদ্রা। জীবন বলে একজন ছিল, শুনেছিলুম।

সাতু। আরে না, না, জীবন তো হোল সরোজবাবুর

ভাগ্নে। জীবনকে জানি না? বাঃ, জীবনের কাকা কাজ করতো ব্রাড্‌লি জোন্‌সের বাড়ী। আপিসের টাকাকড়ির কী গোলমাল করেছিল সে অনেক কাণ্ড। আমার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর বিয়ের সময়। ওঃ, সেকি আজকের কথা। বিয়ে করেছিল হরকালী মিস্তিরের মেয়েকে। ঐ বিয়ের পরই তো হরকালী চাকরী করে দিলে, তারপর সে বউ গত হলে, ঐ হরকালীরই এক মাসীর—

ভব। (চীৎকার করে) সাতুমামা, আই সে (I say), সাতুমামা, আমার মাথা ঘুরছে, আমার—

(ডাঃ বোসের প্রবেশ। ভদ্রার পলায়ন)

ভব। এই যে, আসুন।

ডাঃ। কার বমি হচ্ছে? সেই মেয়েটির?

ভব। আজ্ঞে না, ও অন্য কথা হচ্ছিল। আপনি বসুন।

ডাঃ। কই, মেয়েটি কই? আর দেরী করবেন না।

ভব। আজ্ঞে না, আনি নিয়ে আসছি। [প্রস্থানোদ্যত

সাতু। ফেলু, এঁকে তো চিন্‌তে পারলুম না।

ভব। ইনি ডক্‌টর—(ডাক্তারের দিকে চাইলো)

ডাঃ। বোস।

ভব। ডক্‌টর বোস। শিবুকে দেখতে এসেছেন। ইনি আমার আত্মীয় সাতকড়িবাবু, এই কাছেই থাকেন।

(প্রস্থান)

[ডাক্তার ও সাতকড়ি নমস্কার করলো। ডাক্তার খবরের কাগজ নিল]

সাতু। মশায়ের নিবাস?

ডাঃ। কোলকাতাতেই থাকি।

সাতু। তা নয়, মশায়ের আদি বাড়ি কোথায়?

ডাঃ। ও'দেশ। দেশ সিঙ্গুরে।

সাতু। সিঙ্গুর? আমাদের 'ছরিপাল সিঙ্গুর। তারকেশ্বর লাইনে। বেশ, বেশ। সিঙ্গুরে আমি গিয়েছি যে। বোসেদেরই বাড়ি, কৃপানাথ বোস, বেঙ্গির স্টোরকিপার ছিলেন, ছোটো ভাই নরনাথ বোস, চুঁচড়ো কোর্টের পেস্কার, অতি ধর্ম্ম ভীরু লোক, উপরির টাকাটি এনে প্রত্যহ ঠাকুরঘরের চৌকাঠ স্পর্শ করিয়ে তবে বাক্সে তুলতো। তার ছোট সুরনাথ, জাপান থেকে বেনারসী সিল্ক আনিয়ে ফেঁপে উঠলো। চেনেন নিশ্চয়। কৃপানাথ বাবু ছেলের বিয়ে দিয়েছিল শ্যামবাজারের মিত্তিরদের বাড়ী। সেই ফ্যামিলি তো।

ডাঃ। আজ্ঞে না, কৃপানাথ বোস বা তাঁর ফ্যামিলিকে আমি চিনি না।

সাঃ। দেশের দিকে যাওয়া আসা নেই আরকি। যাক্ মেয়ে যে দেখতে এসেছেন মশায়, ও মেয়ে দেখতে হবে না। বড়ো ভালো মেয়ে, যেমন নম্র, তেমনি ধীর। আজকালকার মেয়ের মত মোটেই নয়। কে বলবে কলেজে পড়া মেয়ে। রাস্তা দিয়ে যায়, মাটির দিকে চেয়ে। অতি লক্ষ্মী মেয়ে।

(নেপথ্যে দরজার পর্দার আড়ালে ভবদেব ও ভদ্রার কণ্ঠস্বর)

ভব। (নেপথ্যে) আচ্ছা, কাঁদছিস কেন? আহা তুমি আর বকাবকি করো না।

ভদ্র। (নেপথ্যে) দেখতে এসেছেন, সেই রাগে কান্না। আমি কি বকেছি নাকি? বল্লুম লাল জর্জেট খানা পর—

ভব। (নেপথ্যে) আহা, থামো না।

[ভবদেব ও শিবানীর প্রবেশ। শিবানী শ্যামবর্ণের সুশ্রী মেয়ে। স্বল্প আভরণে, অনাড়ম্বর সাজ। পর্দার আড়ালে ভদ্রা।]

ভব। এইটি আমার ভাইঝি শিবানী। (জনান্তিকে) শিবু নমস্কার কর। এবার বি-এস-সি দিয়েছে। (ঈষৎ হেসে) ও বৈজ্ঞানিক হবে, ওসব কাব্যি উপন্যাস ভালোবাসে না।

ডাঃ। চোখ ছলছল করছে যেন—

সাতু। ও কিছু নয়। মেয়ে বড় ভালো, বুঝলেন ডাক্তারবাবু যেমন সুবুদ্ধি, তেমনি শান্ত।

ডাঃ। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিবানীর মুখ দেখিতেছিল) সুবুদ্ধি শান্ত মেয়েদেরও শরীর খারাপ হয়ে থাকে। (শিবানীকে) বসুন।

(শিবানী বস্‌লো)

ডাঃ। শরীর ভালো নয় কেন? এ বয়সে এরকম রোগা হোলে তো চলবে না।

সাতু। আজ্ঞে না, এত রোগা ছিল না। এই পুজোর সময়ে মামার বাড়ী গিয়ে—

[ভবদেব ও শিবানী বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইলো]

ভব। সাতু মামা।

সাতু। সেখানে পুকুরের জল, বুঝলেন না?

ভব। সাতু মামা, ওতো মামার বাড়ীতে—

সাতু। (হাত তুলে) হাঁ, সে আমি জানি, থামো না।

[সাতু চোখ টিপিলেন, ভবদেব বিমূঢ় হয়ে চুপ করে গেলেন।]

ডাঃ। হু। ম্যালেরিয়া?

সাতু। আজ্ঞে না, না। ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া কিছু নয়। এই একটু ইয়ে আর কি।

ডাঃ। এখনও কি জর হচ্ছে?

ভব। কই না, জর টর ওর কিছু নেই।

ডাঃ। খাওয়া দাওয়া কী রকম? হজম ঠিক হয়? ভাত কতগুলো খেতে পারো?

সাতু। হাঃ, হাঃ, হাঃ, সেকথা আর বলবেন না।

[দরজার কাছ থেকে ভদ্রার সংকেত এলো]

ফেলু, বৌমা কী বলছেন শোনো।

[ভবদেব দ্বারের কাছে গেল]

ডাঃ। দেখি হাতটা। [শিবানীর একটি হাত টেনে নিয়ে নাড়ী দেখলো না, নখ টিপে দেখলো]

ভব। (কাছে এসে) ওর খাওয়াটা বড় কম। যত বড় হচ্ছে ততই যেন খাওয়া কমছে। তার ওপর সম্প্রতি পরীক্ষা গেল, তার তাড়ায়—

সাতু। য়্যায়। সেইটাই হলো আসল রোগ। পরীক্ষা দেবে, না খাবে? নইলে স্বাস্থ্য ওর বরাবরই বেশ ভাল। কিন্তু হলে হবে কী, রাত্তিরে ঘুম নেই, দিনে খাওয়া নেই—

ডাঃ। খাওয়া দাওয়া কমছে কেন? ফিল্ম ষ্টার হবার সাধনা চলছে বুঝি?

[শিবানী মৃদু হেসে মাথা নীচু করলো]

সাতু। (উচ্চ হাস্য করে) আজ্ঞে না, না ওসব নেই, ঐ বায়োস্কোপ, কি থিয়েটার, কি নেচে গেয়ে বেড়ানো— ওসব নেই। ঐযে বল্লুম, আজকালকার নভেলিয়ানা মোটে নেই।

ডাঃ। না, না, খাওয়া কাজটাকে অবহেলা করবে না। জাতির ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে, কত কাজ করতে হবে।

সাতু। সে বলতে হবে না ডাক্তারবাবু, কাজ কর্ম্মে খুব দড়ো আছে। লেখাপড়া তো করছেই, তাছাড়া সেলাই ফোঁড়াই, রান্না বান্না, বুঝলেন, যাতে দেবেন—

ডাঃ। হুম্। [হঠাৎ শিবানীর চোখের কোল টেনে দেখলো। শিবানীর ভ্রূকুঞ্চিত হলো। ডাক্তার মাথা নাড়লো 'না' সূচক] উঁহুঃ খাওয়া বাড়াতে হবে। যা তা খাওয়া নয়, সাব্‌স্টানশ্যাল ফুড্ (Substantial food) বুঝছো তো? ক্ষুধা কেমন? ক্ষুধা?

সাতু। আজ্ঞে, ওইখানেই তো—

ডাঃ। (সাতুর দিকে ফিরে) কাকে দেখতে এসেছি? আপনাকে?

সাতু। আজ্ঞে না। (অপ্রস্তুত হয়ে)

ভব। বল্ না, যা জিজ্ঞেস করছেন উত্তর দে।

শিবানী। ক্ষিদে—যেমন হয় তেমনই তো—

ডাঃ। তার মানে, বেশ প্রখর ক্ষুধা নেই: ঐটের অভাব। জল কতটা খাও সারাদিনে? [শিবানী নীরব] জল প্রচুর খেতে হবে। ইন্‌টারন্যাল ওয়াশিং (internal washing) ভালো করে না হলেই, নানা ব্যাধি এসে জন্মে। কথাটা বুঝলে তো? ঘরবাড়ী নিত্য বেশ করে না ধুলেই জঞ্জাল জমতে থাকে, সায়েন্স পড়েছ। শরীরটা কত বড় আর কী জটিল ল্যাবোরেটারী তা বুঝেছ তো? রোজ ধুতে হবে। জল খাবে, ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ আড়াই সের জল খাবে। জিবটা বার কর দেখি। [শিবানী জিব বার করলো না]

বাওয়েল্‌স্ মুভ (bowels move) করে প্রত্যহ? রেগুলার হ্যাবিট (reguler habit)? কী, লজ্জা করছে বলতে? না, না, লজ্জার কিছু নেই। এও তো সায়েন্স্, শরীরটা ল্যাবোরেটারী বইতো নয়। বিশেষ করে মেয়েদের শরীরে আবার একটা স্পেশাল (Special) ল্যাবোরেটরী আছে, তার একটা স্পেশাল ফাংশন (function) আছে। আচ্ছা (ভবদেবকে) উনি বল্‌তে চাইবেন না, আপনার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করে আসুন তো—(শিবানী দ্রুত-পদে পলাইল) (সবিস্ময়ে) এ কী? চলে গেলেন কেন?

ভব। (মৃদু হেসে) সংস্কার। যতই সায়েন্স পড়ুক, সংস্কার যাবে কোথা? আপনার প্রশ্নগুলো, মাপ করবেন

ডক্টর বোস, একটু অ-সাধারণ, মানে আন্‌ ইউজুয়াল (un-usual) হচ্ছিল না কি ?

ডাঃ। মোটেই নয়, মোষ্ট অর্ডিনারী কোশ্চেনস্‌ (most ordinary questions), যা সকলই করে থাকে।

সাতু। তা বলে. অতো বড় মেয়েকে দেখতে এসে মশায় ওসব প্রশ্ন কেউ করে না। হ্যাঁ, প্রশ্ন করেন, লেখা-পড়া, গানবাজনা, এমন কি নাচও।

ডাঃ। তার মানে ? লেখাপড়া গানবাজনার খবর নিয়ে ডাক্তাররা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবেন, আপনি কি এই বলতে চান ?

সাতু। না, তা নয়। স্বাস্থ্য পরীক্ষার কথা অবশ্য আলাদা। তবে হ্যাঁ, আপনি ডাক্তার লোক, তাই বুঝি মেয়েকে দেখতে এসে আগে তার স্বাস্থ্য দেখেন, তারপর অন্য কথা বলেন ? তা অবশ্য ভালো, ভালো কথা।

[ডাক্তার কিছু বুঝতে পারে না, নীরবে চেয়ে আছে]

ভব। ঐটেই তো আসল কথা, সাতুমামা। অন্য কথা সব বাজে কথা, দোকানদারি কথা। অথচ ঐ কথাটাই কেউ তেমন বলেনও না, ভাবেনও না। কেবল—রঙচঙ করা একটা পুতুল দেখেই সন্তুষ্ট হ'ল। তারপর বিয়ের পর নাইনটি নাইন পারসেন্ট (99%) বউ নিয়ে হাহাকারের অন্ত থাকে না। বল ?

সাতু। তা ঠিক বলেছ। খাঁটি কথা। এই আমার বড় বৌমার কথাই ধর না। জানা ঘর, আমার ছোট শালী গৌরীই তো সম্বন্ধ করলে, বড় বৌমা তো গৌরীর আপন মামা-শ্বশুরের, মানে আমার ছোট ভায়রাভাইএর—

ভব। (হাত তুলে) সাতুমামা প্লিজ। [সাতু থেমে গেল] তুমি বরঞ্চ এঁর কাছে পাত্রটির সব খবর নাও।

সাতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, পাত্রটি আপনার কে হ'ল ডাক্তারবাবু ? কী করেন ?

ডাঃ। পাত্র ? কিসের পাত্র ?

সাতু। এই বিবাহের পাত্র। পাত্রের সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইছেন এঁরা।

ডাঃ। পাত্র !! বিবাহ ? এসব কথা উঠছে কেন, আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না।

সাতু। (সহাস্যে) বেশ মশায়। এসেছেন আপনি মেয়ে দেখতে আর বিবাহের কথা উঠবে না, পাত্রের কথা বলবেন না। আপনি যে হাসালেন ডাক্তারবাবু।

(মৃদু হাসি)

ডাঃ। তা হাসুন। কিন্তু আপনারা কি তাই মনে করেছেন নাকি ? আমি বিবাহের জন্য মেয়ে দেখতে এসেছি ? না, না, না, না, আমার তো সে রকম কোনও প্রয়োজন নেই। আপনারাই খবর দিয়েছিলেন. তাই—

ভব। প্রয়োজন নেই ? বলেন কী ? তাহ'লে আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন কার জন্যে ?

ডাঃ। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলুম পাত্রীর জন্যে ? কী বলছেন আপনি ?

ভব। সে বিজ্ঞাপন কি আপনি দেননি ? কিন্তু আমার স্ত্রী যে বল্লেন, তাহ'লে কি ঠিকানার ভুল—দাঁড়ান।

(ভবদেব ভেতরে গিয়ে একটা ছেঁড়া ঠোঙা নিয়ে এলো।) এই তো। এটা কি আপনার ঠিকানা নয় ? ১৭ নম্বর, যজ্ঞেশ্বর চ্যাটার্জির লেন—

ডাঃ। হ্যাঁ, আমারই য়্যাড্রেস (address)। দেখি, কাগজখানা। (কাগজ নিয়ে পড়ে) মাই গুডনেস্‌ ! (My goodness) এ বিজ্ঞাপন আমি দিয়েছিলুম মাসছয় আগে।

সাতু। তবে তো মশায়, ভুল নয়। মেয়ে তো একটি প্রয়োজন আছে আপনার। নাকি, সে হয়ে গেছে ?

ডাঃ। না, সে হয়নি বটে। একটি মেয়ে পেয়েছিলুম, কিন্তু সে আমার সুট (suit) করলো না। কিন্তু সে তো বিবাহের—

সাতু। ও আর কিছু টিক্স নয়, ডাক্তারবাবু। আমাদের মেয়েটি নিতে হবে। আপনারা সিঙ্গুরের বোস, এরাও বউ বাজারের মিত্তির, আর বড়ো ভালো মেয়ে। সর্বোপরি বড় কথা, এমন যোগাযোগ যখন হয়ে গেছে। ভাবুনদিকি একবার, ৬ মাস আগের বিজ্ঞাপন।

ভব। সে মেয়ে খুঁজছিলেন যাঁর জন্য, তিনি কী করেন ?

ডাঃ। আমার নিজেরই প্রয়োজন।

(ভবদেব ও সাতু বিস্ময়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।)

সাতু। আপনার--নিজের—প্রয়োজন ?

ডাঃ। হাঁ, কিছুদিন থেকে দেখছি, একা সবদিক দেখাশোনা করে উঠতে পারছি না। হিসেবপত্র রাখা, চিঠি লেখা, ছোটগুলোকে পড়াতেও পারবে একটি এডুকেটেড্ ইন্‌টেলিজেন্ট্ গার্ল (educated. Intelligent girl) খুঁজছিলুম।

সাতু। মশায়ের সংসার কতদিন গত হয়েছেন ?

ডাঃ। সংসার ? ও, ইউ মিন (yon mean) আমার স্ত্রী ? (মৃদু হেসে) না, তিনি আগতও হ'ননি, গতও হননি। তিনি থাকলে আর ভাবনা ছিল কী ?

সাতু। তাহ'লে ঐ যে ছোট ছেলেপুলের কথা বল্লেন —ওরা কার ছেলে ?

ডাঃ। ওদের ইতিহাস খুব প্রকাশ্য বা পরিষ্কার নয়—বোধহয়। যাক্, (ভবদেবকে) ভালো কথা, আপনার ভাই-ঝি বি-এস-সি পরীক্ষা দিয়েছেন বল্লেন না ? মেয়েটি ইন্‌টেলিজেন্ট, সোবার (sober), একটু রোগা বটে, তা হোক। আমার মনে হয় শি উইল ডু (She will do).

সাতু। আপনি কী বলছেন মশায় ?

অবশ্য ঘৃণা বর্জন করতে হবে। ভালোবাসতে হবে, স্নেহ প্রেম দিয়ে বশ করতে হবে। একবার ডাকুন তো দু'টো কথা—

ভব। মাপ করবেন, আমি সম্মত নই আপনার সঙ্গে আমার ভাইঝির বিবাহ দিতে।

ডাঃ। কী বিপদ ! আবার বিবাহ ? এমন বিবাহ পাগল লোক তো দেখিনি আপনাদের মত। বিবাহ করতে কে চাইছে ওঁকে ? আমি ব্যাচিলর লোক, বুড়ো বয়সে বিবাহ করতে যাবো ?

সাতু। তবে ?

ডাঃ। কেন, বিবাহ ছাড়া কি মেয়েদের আর পথ নেই ? Independent থাকবেন, মিসট্রেস হিসেবেই ধরুন টাকাকড়ি, এস্‌টাব্‌লিশ্‌মেণ্ট (establishment)—

ভব। হাউ ডেয়ার ইউ ! (How dare you) ! আপনার স্পর্দ্ধা তো কম নয়। আমার বাড়ীতে বসে নির্লজ্জের মতো—[উত্তেজনায় কথা শেষ করতে পারল না]।

সাতু। ছি, ছি, ছি।

ডাঃ। (বিস্ময় বিমূঢ়ভাবে ভবদেবকে) আমাকে বলছেন ? আমাকে আপনি এরকম অপমানকর কথা বলছেন কেন ?

সাতু। আর কথা বাড়াবেন না মশায়। যান, যান, সরে পড়ুন। ছি, ছি, ছি, ছি, ভদ্রলোকের পোষাক পরে এমন ইতর মন। ছিঃ, ছিঃ।

ডাঃ। (সাতুকে) আপনিও আমাকে অপমান করছেন ? কেন—কেন ?

সাতু। মার খেতে না চান তো সরে পড়ুন। অপমান ! ওঁর আবার অপমান ! কই উঠলেন ?

(ডাক্তার এতক্ষণ বিমূঢ় হয়ে উঠতে ভুলে গিয়েছিল এখন উঠলো।)

ডাঃ। (ক্ষুব্ধ স্বরে) আপনারা বাড়ীতে ডেকে এনে আমাকে অকারণে অপমান করলেন। (মাথা নেড়ে) এটা ভালো করলেন না। আমি যাচ্ছি। কিন্তু এটা আপনারা মোটেই ভালো করলেন না। হয় আপনারা খারাপ লোক, নয় তো আপনাদের মাথার ঠিক নেই। আমি চল্লুম। [দ্রুত প্রস্থান

সাতু। ছি, ছি, ছি, ছি, দেশটা কোন্‌দিকে যাচ্ছে বলতো ফেলু ? বয়স হয়েছে, ভদ্রলোক, স্বচ্ছন্দে বল্লে মিসট্রেস হিসেবে—

ভব। থাক্, থাক্ সাতুমামা, ওসব অন্যায় কথাগুলো আর রিনিউ করো না। [ডাক্তারের পুনঃ প্রবেশ]

সাতু। আপনি যাননি ?

ডাঃ। গিয়েছিলুম, ফিরে এলুম। মনটায় বড় কষ্ট হচ্ছে। কেউ দুর্ব্বাক্য বল্লে বড়ো কষ্ট হয়। (ভবদেবকে) বল্‌ছেন অন্যায় কথা, কী অন্যায় কথা বলেছি আমি ? আপনার মেয়ে যদি বি-এস-সি পাশও করেন, তাতেই বা কী ! আরো তো তিনজন মিসট্রেস আছেন আমার, তারাও সবাই গ্রাজুয়েট—

সাতু। তি-ন জন আছেন মিসট্রেস ? বলেন কী ?

ডাঃ। হাঁা, এসে দেখে যেতে পারেন। তারা সব এক্‌সপিরিয়েন্সড্ (experianced) ! ইনি তো কাঁচা। একজন আছেন হেড্‌মিষ্ট্রেস—

ভব। ইউ মিন্ স্কুল মিষ্ট্রেস ?

ডাঃ। Or what ? আপনারা কী মিন্ করেছিলেন ?

ভব। যাকগে, সে কথায় আর কাজ নেই !

ডাঃ। স্কুলটা ঠিক সাধারণ স্কুল নয়, ভদ্রলোকদের ছেলেদের স্কুল নয়। যাদের বলে ষ্ট্রীট আর্চিনস্ (street urchins)। বাপ-মা নেই, কিম্বা থাকলেও সেদিকটা বেশ পরিষ্কার নয়, জাতের বা ধর্ম্মের ঠিক নেই—সেই সব ছেলেদের স্কুল। সেই জন্যেই বলছিলুম ঘৃণা করলে চলবে না, ভালবেসে তাদের—

সাতু। আপনি স্কুলের মাষ্টারণী চান ? এ ছি,ছি ছি ছি।

ডাঃ। কী আশ্চর্য্য ! স্কুলের শিক্ষয়িত্রী চাই। তাতেও ছি ছি ছি বেশ তো আপনাদের মেয়ে না আসেন, নাই আসবেন। কিন্তু ছি ছির কী আছে ? না আপনারা কিছুতেই ভাল লোক নন। আপনাদের সঙ্গে আমার কথা কয়ে কাজ নেই। [চলে যেতে উদ্যত]

ভব। (তাড়াতাড়ি কাছে এসে) একটা কথা শুনে যান, ডক্টর বোস।

ডাঃ। (দ্বারের কাছে ফিরে) না, আপনারা বড় রূঢ় কথা বলেন, সব কথাতেই বলেন ছি ছি ; উনি বল্লেন মাষ্টারণী। কথাটাকে একটা বিশ্রী অশ্রদ্ধার ভাব মাখানো আছে। কেন, শিক্ষয়িত্রী বলতে পারেন না ?

সাতু। (অপ্রতিভ ভাবে) আরে মশায়, ঐ হ'লো। আমরা চিরকালই ঐ বলে এসেছি ; অশ্রদ্ধা করবো কেন ? খামোকা মানুষকে অশ্রদ্ধা করতে পারি ?

ডাঃ। খুব পারেন। এইতো আমাকে বল্লেন—মার খেতে না চান তো সরে পড়ুন। নির্লজ্জ, ইতর, কী সব বল্লেন। আপনারা চিরকাল মানুষকে এইসব বলে আসছেন ? তা বলুন। আমি চল্লুম।

ভব। সেই জন্যই আপনাকে অপেক্ষা করতে বলছি। (হাত জোড় করে) আপনি আমাদের মাফ করুন ডক্টর বোস, আমি জোড়হাতে মাফ চাইছি।

ডাঃ। (সবিস্ময় আনন্দে) আপনি মাফ চাইছেন ? আমার কাছে ?

ভব। আজ্ঞে হ্যাঁ, বার বার জোড় হাতে মাফ চাইছি। আমরা অত্যন্ত অপরাধ করেছি। উনি যে ছি-ছি বলছিলেন সে আমাদের নিজেদেরই প্রতি। আমরা নিদারুণ ভুল করেছি।

ডাঃ। (ভবদেবের হাত ধরে) স্তাটস্ অল্‌রাইট। আর বলতে হবে না। (হাসিমুখে) কিছু একটা ভুল করেছিলেন না ? আমিও তাই ভাবছিলুম। কেন এমন করে আমাকে অপমান—যাক্ যাক্। আপনি খুব ভালো কাজ করলেন, ভুল স্বীকার করে আপনার কর্ত্তব্য করলেন। এই তো চাই। আর উনি। উনিও তো ভুল করেছিলেন। তা হ'লে ওঁর-ও উচিৎ ভুল স্বীকার করা। অবশ্য যদি ভুল বলে বুঝতে পেরে থাকেন।

ভব। সাতু মামা।

সাতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমারও ওটা ঠিক—মানে প্রথমটা হ'লো কি জানেন—

ডাঃ। (কথা কইতে কইতে কাছে এসে) হাঃ, হাঃ হাঃ ! ওর অবস্থাটা দেখছেন ? বুঝতে পারছেন ভুল করেছেন, কিন্তু সেটা স্বীকার করতে লজ্জা বোধ করছেন। এসব ফল্‌স্ (false) লজ্জা। (গভীরভাবে) এ-ও ভালো নয়। ভুল করতে, রূঢ় কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করি না, অথচ ভুল স্বীকার করতে, নরম কথা বলতে, কুণ্ঠিত হই, লজ্জিত হই। এ ভালো নয়, ভালো নয়। জিবকে সে শিক্ষা দিইনি কিনা।

সাতু। বিলক্ষণ ! অবশ্যই স্বীকার করবো। আমার ভুল হয়েছিল ডাক্তারবাবু, I am sorry ! আমি—

ডাঃ। আর বলতে হবে না। আর বলবেন না। আপনারা চমৎকার লোক। (বলতে বলতে চেয়ার টেনে বসে) আজ বড় শুভদিন। যেখানে একটা মনোমালিন্য হয়ে তা দূর হয়ে যায়, হৃদয়ের মিল হয়, সেখানে মঙ্গলময়ের আবির্ভাব হয়। হ্যাঁ, আমারও কর্ত্তব্য বাকী রয়েছে। আমি আপনাদের দুজনের কাছে মার্জ্জনা চাইছি।

ভব। না, না, আপনি তো কিছু অন্যায় বলেন নি।

সাতু। সেকি কথা মশায় ?

ডাঃ। হ্যাঁ, অন্যায় করেছি বইকি। আমি আপনাদের খারাপ লোক বলেছিলুম, আমাকে আপনারা মাপ করুন, আমি ভুল বুঝে—

ভব। ওকথা বলবেন না, আপনার কোন দোষ হয়নি।

সাতু। আপনি অত করে বলছেন কেন ডাক্তারবাবু,

ওরকম তো হয়ই মানুষের। তবে বলি শুনুন, এই সেদিন আমার এক ভাগ্নে এসেছে, তার কাকার সঙ্গে—কাকা মানে আমার ভগ্নিপতির আপন ভাই নয়, পিসতুতো ভাই। সুধীরের কথা বলছি বুঝলে ফেলু—পিসতুতো ভাইও বলতে পারেন, পরিবর্ত্তে বিবাহ বুঝলেন না? এক দিক দিয়ে পিসে, আর একদিক দিয়ে—

ভব। I say সাতুমামা, Please……

(ডাক্তার কিছু না বুঝে ভদ্রতার খাতিরে সাতুর কথা শুনছিল, এখন বল্লো)

ডাঃ। আপনার কথাগুলো শুনতে, আমার ভাল লাগছে সাতুবাবু, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না। তা হোক্। আমি এইবার যাই।

ভব। আজ্ঞে না, আমার একটি অনুরোধ আছে, যদি বিশেষ কাজের ক্ষতি না হয়, তাহ'লে দয়া করে আর একটু বসুন।

ডাঃ। না কাজের ক্ষতি হবে না কিছু। Call যা ছিল সেরে এসেছি।

ভব। তাহ'লে দয়া করে একটু মিষ্টি মুখ করতে হবে।

ডাঃ। মিষ্টি মুখ? কেন? ওসবের কী প্রয়োজন?

সাতু। আহা, বসুন, বসুন। লোকে উপরোধে ঢেঁকি গেলে, আর একটু মিষ্টান্ন বইতো নয়।

ভব। আঃ সাতুমামা, ওটা বলো না। ঐ অসম্ভব নজীরটা সত্য কথা নয়।

সাতু। (সহাস্যে) আরে ওটা একটা কথার কথা। সত্যিই কি আর কেউ ঢেঁকি গিলেছে, না গিলতে পারে। ও আমরা বলে আসছি চিরকাল, কী বলেন?

ডাঃ। কিন্তু মিষ্টান্নের প্রয়োজনটা কী?

সাতু। প্রয়োজন আর কী, মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। মানে ওটা যত হয় ততই ভালো. এই কথা।

ভব। না ডক্টর বোস, যেদিক দিয়েই দেখুন, আপনার কাছে আমাদের একটা ঋণ হচ্ছেই।

ডাঃ। ঋণ? আমার কাছে? কী রকম?

ভব। দেখুন, আপনি জানেন আপনি এখানে রোগী দেখতে এসেছিলেন। [ডাক্তার হাসিমুখে মাথা নাড়লো] তাহ'লে আপনার ফিস্ (fees) পাওনা হয়। এদিকে আমরা মনে করেছি আপনি যাকে বলে মেয়ে দেখতে এসেছেন। সুতরাং—

ডাঃ। (শিশুর মত সরল হাসি) হাঃ, হাঃ, হাঃ, ভারী চমৎকার ভুল হয়েছিল তো। বা, বা। মেয়ে দেখতে এসেছি—ও ও, তাই বুঝি মেয়েটি কাঁদছিল বলছিলেন।

ভব। সুতরাং আপনাকে একটু জলযোগ করানো আমাদের আনন্দের ঋণ।

সাতু। সে আমার বৌমাটি নিশ্চয় সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। শুভকর্ম্মের সূচনাতে মিষ্টিমুখ না করিয়ে কি উনি ছাড়তেন? আমাদের বৌমাটিকে আপনি চেনেন না। হবেন না কেন? কত বড় ঘরের মেয়ে! এখন বলুন, ফিজ্ (fees), না মিষ্টান্ন? [হাস্য]

ডাঃ। ভারি চমৎকার যুক্তি। বাঃ। তাহ'লে বসি। "মিষ্টি মুখের" টানে নয়, আপনাদের "মিষ্টি" মুখের টানে বসছি। আপনাদের কথা বড় ভালোলাগছে। বড় ভালো লোক আপনারা।

সাতু। (খুসী হয়ে) ভাল লাগতেই হবে। ফেলু, তুমি একবার দেখ ভেতরে গিয়ে, চা-টা—[ভবদেব ভেতরে গেল] বলছি, ভালো তো লাগবেই। আপনি নিজে ভালো লোক যে। এই কথা বলেছিলুম সাধুমল্লিককে। বিপর্য্যয় ঝগড়া হয়েছে, তুলকালাম ব্যাপার। রাগে চারটে হয়ে ফুলে আছে সাধুমল্লিক। কেউ কথা কইতে পারছে না। আমি গিয়ে একটি কথা। স্রেফ একটি কথা বল্লুম, ব্যস্। সাধুমল্লিকের নাম শুনেছেন তো? দুর্দ্দান্ত লোক ছিল মশায়। হাতে মাথা কাটতো। হোলো বা গাঁসুদ্ধ আগুনই লাগিয়ে দিলে। তবে মনটা ভালো ছিল, বুঝলেন না, মনটা ভালো ছিল।

ডাঃ। আজ্ঞে না, মনটা ভালো, গাঁশুদ্ধ লোকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিলেন, আমি বুঝতে পারলুম না।

সাতু। ঐ রকম আর কী, ঐ রকম। হাঃ হাঃ—ভালো কথা ডাক্তারবাবু, আপনার ইস্কুলের জন্যে ঐ যে মাষ্টার—মানে শিক্ষয়িত্রী খুঁজছেন, তা সে কাজটি কি পুরুষ হ'লে চলে না? মানে, আপনার হিসেবটি সব রাখা, চিঠিপত্র লেখা, তারপর ধরুন সব ম্যানেজ (manage) করা,—ওসব কাজ, মশায়, যাই বলুন, আপনার মেয়ে-ছেলের, কি ছেলেমানুষের কাজ নয়। বেশ বয়স্ক একস্-

পিরিয়েন্সড্ (experienced) পাকা লোক চাই। হ্যাঁ?

ডাঃ। ঐ জন্তেই বয়স্ক লোক চাই না। বয়স হলেই মানুষ বড়ো বেশী পাকা হয়ে যায়। নানা রকম জট পাকিয়ে বসে মনের মধ্যে। জাতের জট, ধর্ম্মের জট, মান-সম্ভ্রমের জট। [ঘাড় নেড়ে] ছাড়ানো যায় না। তা ছাড়া বহুদিন ধরে বাঁকা পথে চলে আর ডিপ্লোমেটিক (diplomatic) বাঁকা কথা কয়ে সোজা পথে পা পড়ে না, সোজা কথা মুখে বেধে যায়।

সাতু। ঐ কথাটা মশায়, সাতু সিংগিকে বলতে পারবেন না। সাঁইত্রিশ বচ্ছর চাকরী করে রিটায়ার (retire) করেছি, একটি দিন লেট্ (late) নেই, একটি লালকালির আঁচড় পড়েনি খাতায়। Wood Craf সায়েব বলেছিলেন—"Sinha's den will lie vacant for ever," সিংহের গহ্বর চিরকাল শূন্য পড়ে থাকবে। হাঃ, হাঃ! আহা, কী সব সায়েব ছিল মশায়, সায়েবের মত সায়েব। হবে না কেন? কত বড়ো ঘরের ছেলে। ওর ঠাকুদ্দার বাপ চোদ্দ বছর বয়েসে খবরের কাগজ বিক্রী করতো রাস্তায় রাস্তায়। আর চুয়াল্লিশ বছর বয়েসে হ'লো Sir Laucalat Wood Craf Bart, এদিকে মাতুলবংশও কম নয়।ওর মামা ছিল Brigadier General—V. C. পেয়েছিল। মস্ত ঘর ওঁরা—[ভবদেবের প্রবেশ। পিছনে জলখাবার ও চায়ের ট্রে হাতে শিবানী]

ডাঃ। এসো, মা এসো, আর তো বিয়ের ভয় নেই। আমি মেয়ে দেখতে আসিনি। হাঃ, হাঃ, হাঃ। তাছাড়া আমার মতে এখন অন্ততঃ বিশ বছর ছেলেমেয়েদের বিবাহ না করা উচিত। [শিবানী মৃদু হাসিল] দেশে লোক যত আছে, কাজের লোক তত নেই। কী বল মা।

ভব। ঠিক বলেছেন। এ বিষয়ে শিবু আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। ও তো বিয়ের নাম করলেই পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসে। হ্যাঁ, সাতুমামা, কার কথা বলছিলে?

ডাঃ। উড্‌ক্র্যাফ্‌ট সায়েবরা মস্ত লোক, বড়ো বংশ তাই বলছিলেন।

ভব। কেন, সম্বন্ধ করছো নাকি সাতুমামা?

সাতু। (হেসে) তা নয়, তা নয়। কথাটা হচ্ছিল, ডাক্তারবাবু বল্লেন—আমরা বয়েস হয়ে সোজা পথে চলতে ভুলে গেছি—

ভব। নিন্ ডক্টর বোস, [খাবারের ডিস্ এগিয়ে দিল শিবানী চা ঢালতে লাগলো]

ডাঃ। চা আমি খাই না, আপনারা নিন।

সাতু। (চায়ে চুমুক দিয়ে) সোজা পথ ছাড়া বাঁকা পথ কোনদিন মাড়াইনি। ঐ যে বল্লুম, সাঁইত্রিশ বচ্ছর চাকরী করেছি, কেউ বলুকদিকি সাতু সিংগি কোনদিন একটি পয়সা—

ভব। আহা, উনি কি পার্সোনালি (personally) তোমাকে বলেছেন? সাধারণ ভাবে—

ডাঃ। তা personally এবং লিটারালিই (literally) যদি বলি। আমরা অনেকেই সোজা চলতে পারি না। তা লক্ষ্য করেছেন?

সাতু। তার মানে, আপনি বলছেন আমরা, ধরুন এই ফেলু, কি আমি, সোজা চলতে পারি না? (হাত দিয়ে দেখালো সোজা)

ডাঃ। I am afraid, পারেন না। বাড়ীতে গিয়ে, রাত্রে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে, আলো নিভিয়ে, চোখ বন্ধ করে পরীক্ষা করে দেখবেন। দেখবেন, মাথা কতক্ষণ সোজা পথের ধারণা রাখতে পারে! পা কতক্ষণ সোজা চলে?

সাতু। বহুত আচ্ছা, বাড়ী যাবার দরকার কী? এই-খানে দেখাচ্ছি। ফেলু, আসবে নাকি? (নিজে উঠে)

ভব। দেখি আগে তোমার পরীক্ষাটা।

(সাতু উঠে দেয়ালের কাছে দাঁড়াল।)

সাতু। নিন্ মশায়, চোখ বেঁধে দিন। শেষে বলবেন—

ডাঃ। চোখ বাঁধবার কোন প্রয়োজন নেই, সাতুবাবু।

সাতু। না মশায়, কাজ কী? শেষে বলবেন আপনি দেখে দেখে চলেছেন। (বলতে বলতে পকেট থেকে রুমাল বার করে নিয়ে নিজেই নিজের চোখ বাঁধতে লাগলো)

ডাঃ। এই দেখুন সাতুবাবু, আমি আপনাকে বিশ্বাস করলেও আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না।

সাতু। (চোখ বেঁধে) এইবার ষ্টার্ট করছি। ফেলু সামনে দাঁড়িও না যেন। (দেবব্রতের প্রবেশ। রুক্ষ চুল

চোখে চশমা, বেশভূষায় কোন পারিপাট্য নেই। কয়দিন দাড়ি কামায় নাই।)

দেবু। এ কী ব্যাপার? বাবা?

সাতু। কে কথা কইলে ফেলু? দেবু না?

ভব। হ্যাঁ। কি খবর দেবু? বহুদিন তোমায় দেখিনি। ভালো আছো তো?

দেবু। আজ্ঞে হ্যাঁ। এই আসিনি। বাবা, আপনি বাজারে যাবেন বলে বেরিয়েছেন, বৌদি বল্লেন, ভুলে গেছেন বুঝি?

সাতু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজারে যাবো তো। ভুলবো কেন? [বলতে বলতে চোখের বাঁধা খুলে ফেলে] বাঃ ভুলে যাবো কেন? আমি এসেই ফেলুকে বলেছি, "ফেলু, বাজারে যাচ্ছি, আর বসবো না।" বলিনি ফেলু?

[ভবদেব হাসিমুখে মাথা নাড়লো]

দেবু। কিন্তু আপনি এটা কী করছিলেন, কাণামাছি?

সাতু। ও তুই বুঝবি না। ও আমাদের একটা ইয়ে হচ্ছিল।

ভব। (সহাস্যে) বুঝবে না কেন? ঠিকই বুঝেছে। কাণামাছিই তো। সবাই কানামাছি, কী বলেন ডক্টর্ বোস? কই, আপনি যে খেলেন না কিছুই?

ডাঃ। এই যে খাই। (একটা মিষ্টি তুলে নিলেন)

দেবু। (সাতুকে) আপনার আর এই রোদে বাজারে গিয়ে কাজ নেই। আমিই যাচ্ছি।

সাতু। তা তো যাবি। কিন্তু কদিন ছিলি কোথায় শুনি? কোথায় গিয়েছিলি? (ডাক্তার জলের গেলাস তুলে নিলেন)

দেবু। বর্দ্ধমানের ওদিকে। (ডাক্তারকে) আপনি আর কিছু খাবেন না?

ভব। হাঁ, ডক্টর্ বোস—

ডাঃ। না। This is enough for me এই বেশী হলো। অসময়ে আর চলবে না।

[দেবব্রত খাবার রেকাব টেনে নিয়ে খেতে সুরু করলো।

সাতু। ও কি? তুই হঠাৎ খাচ্ছিস যে!

দেঃ আপনারা তো কেউ খেতেন না। আমার অত্যন্ত খিদে পেয়েছে। ট্রেনে এসেছি। (শিবানী অতিশয় বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেবুর দিকে চেয়ে উঠে গেল)।

ভব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাও। খাবে বই কি। আরও কিছু এনে দিক না। (চেঁচিয়ে) ওরে শিবু, তোর দেবুদাকে আর কিছু খাবার এনে দেনা!

[দেবু চিবোতে চিবোতে হাত নেড়ে বারণ করলো]

সাতু। ও কী কথা ফেলু! দেবুদা কী হে? শিবানী হলো সম্পর্কে একধাপ উঁচু! তোমার কিছু মনে থাকে না। দেখ না, তুমি হলে গিয়ে আমার মামা, সুতরাং তোমাদের মেয়ে আমার ছেলের সম্পর্কে পিসী হয় যে! ও কী কথা হে?

ভব। (সহাস্যে) অত সম্পর্ক বিচার আমার মাথায় আসে না।

[দেবব্রত খাওয়া শেষ করে ওঠে]

সাতু। ঐ ছাতার ভেতরে থলেটা আছে নিয়ে যা। গুচ্ছের কতকগুলো আনিস্‌নি।

[দেবু ছাতার ভেতর থেকে থলেটা নিয়ে যাবার আগে বল্লো।]

দেবু। আপনি একটু পরে বাড়ী যাবেন তো? কিছু আলু আসছে। আমি যদি না এসে পড়ি, নীচেকার মাঝের ঘরে তুলিয়ে রাখবেন, লরীর লোকেরাই তুলে দেবে।

সাতু। লরী? কত আলু?

দেবু। একশো মণ।

সাতু। এক-শো-মণ আলু? কে খাবে?

দেবু। খদ্দেরে খাবে। ফড়েরা নিয়ে যাবে। (সাতুর বিস্মিত দৃষ্টি লক্ষ্য করে) বর্দ্ধমানে একটা চালকলে বয়লার ফিট্ করে দিতে গিয়েছিলুম। শুনলুম আলুর দর কিছু নেমেছে, শিগ্‌গ্রী চড়বে। তাই মেমারীর হাট থেকে কিছু নিয়ে এলুম। [প্রস্থান

ডাঃ। আপনার ছেলেটি সোজা চলতে পারে মনে হচ্ছে।

ভব। হাঁ, দেবু বেশ ছেলে। মিথ্যে লজ্জা-টজ্জার বালাই নেই, চমৎকার ছেলে!

সাতু। লজ্জারও বালাই নেই, ভদ্রতারও বালাই নেই। জামা কাপড়, চেহারার হাল দেখলেন তো? পাগল না কম্যুনিষ্ট—কিছু বোঝবার যো নেই। কোথায় থাকে কি করে, তার ঠিক নেই। একদিন শুনলুম হাওড়ায়

হাটে গামছা বিক্রী করছে। লক্ষীছাড়া ছেলে! লেখা-পড়া ছেড়ে দিলি। দিলি, যা হোক একটা চাকরী-বাকরী কর, বিয়ে থা করে ভদ্দর লোকের মত থাক, তা নয়। ঐ যে বলুন লক্ষীছাড়া ছেলে!

ডাঃ। সাতকোটিকে তো মায়েরা শান্তশিষ্ট বাঙ্গালী করে রেখেছেন, সাতুবাবু, দু'একটা লক্ষীছাড়া সৃষ্টিছাড়া হোক না।

ভব। যা বলেছেন ডক্টর্ বোস। আমরা ভালো ছেলে হয়েই বা কী করেছি সাতুমামা? কিছু লক্ষীছাড়া ছেলেই আজ দরকার।

ডাঃ। তাই তো লক্ষীছাড়া ছেলেদের নিয়ে স্কুল করেছি আমি। লেখাপড়া শেখাবো বটে, কিন্তু ভদ্দর লোক করে তুলবো না, এই আমার উদ্দেশ্য। সাতুবাবু বোধহয় খুশী হবেন না—

সাতু। বিলক্ষণ, এতো ঠিকই বলেছেন আপনি। ভদ্দরলোক হয়েই তো মরেছি আমরা। ঠিকই বলেছেন।

ডাঃ। আচ্ছা, এইবার আমি উঠি। অনেকটা বেলা হ'লো, কিন্তু সময়টা বড়ো আনন্দে কাটলো। আজ বড় শুভদিন।

ভব। উঠবেন? আচ্ছা। আর ধরে রাখতে পারি না।

সাতু। আসবেন মধ্যে মধ্যে ডাক্তারবাবু, আলাপ হলো যখন, আসবেন। আসা-যাওয়া নিয়েই আত্মীয়তা, আর দেওয়া থোওয়া নিয়েই কুটুম্বিতা—বুঝলেন তো? (হাস্য)।

ডাঃ। (সহাস্যে) তা কুটুম্বিতা হোল না আত্মীয়তা-ই ভালো। আমি তো এলুম, এবার আপনারা আসুন আমার ওখানে একদিন।

সাতু। নিশ্চয়, নিশ্চয়। যাবো বইকি।

ভব। আপনার স্কুলটা দেখতে ইচ্ছে করছে, যাবো একদিন।

সাতু। তোমার তো করবেই, মাষ্টার লোক। আমারই যেতে ইচ্ছে করছে।

ডাঃ। একদিন কেন, প্রফেসার মিত্র? আজই আসুন না। আপনি একজন শিক্ষাব্রতী, অনেক পরামর্শ পাবো আপনার কাছে। আসুন আমার গাড়ীতো রয়েছে, এখনি ফিরে আসবেন।

ভব। তা মন্দ নয়। আজ কলেজ বন্ধ আছে। তাহ'লে এক মিনিট, জামাটা গায়ে দিয়ে আসি। হ্যাঁ সাতুমামা, তুমি ঐ বিপিন ডাক্তারের—

সাতু। ডাক্তার নয়, উকিল।

ভব। হ্যাঁ বিপিন উকিলের কাছে কথাটা একবার পেড়ে দেখো।

সাতু। চল না, একদিন তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাই। আলাপ করে দেখ, কথাবার্ত্তা কও, কী বল?

ভব। না, না, সাতুমামা, আমি যেতে চাই না। ও সব কথাবার্ত্তা কওয়া থেকে আমাকে তুমি রক্ষে কর। শিবু—মনে কর, ও তোমারই ভার।

সাতু। তাহ'লে তোমাকে একেবারে বিয়ের দিন এসে নেমতন্ন করে যাবো, এই বলছো?

ভব। বিয়ের পর আমাকে খবর দিলেও আমার আপত্তি নেই—যদি ওই কথাবার্ত্তা কওয়া থেকে রেহাই পাই। একটি সুস্থ সচ্চরিত্র ছেলের সঙ্গে শিবুর বিয়ে হয়েছে জানলেই হ'লো। ও, ডক্টর.বোসকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আই য়্যাম সরি (I am sorry), একমিনিট। (চলে যাচ্ছে)।

সাতু। আচ্ছা পাগল। বাঙ্গালীর ছেলে, কথ কইতে ভয়? হাঃ, হাঃ, হাঃ! শুধু কলেজেই কথা কইতে পারো।

ভব। (দরজার কাছে ফিরে) আর তোমার বৌমা কাছেও পারি। জিজ্ঞেস করে দেখো। [প্রস্থান]

সাতু। [ডেকে বল্লেন] কেল্, শিবুকে বল ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিতে।

ডাঃ। আপনি আসবেন না আমাদের সঙ্গে? আপনা তো অফিস নেই।

সাতু। আলু আসছে শুনলেন না? আর যা কী করে বলুন? তাইতো বলি ঘানিগাছে জুড়ে দিয়েছে বিরাম নেই। সংসার-ঘানির বিরাম নেই।

ডাঃ। ছুটি নিন্ না একদিন। ছুটি নিয়ে আসু আমার ওখানে। আপনি এলে সত্যি বড়ো খুশী হবে সাতুবাবু! আসুন।

সাতু। আপনি বলছেন কেন, ছুটিই তো চাইছি ডাক্তারবাবু, ছুটিই চাইছি। (দীর্ঘশ্বাস সহ) কবে

খালি সেই নোটিশের কাগজে তোমার সই করাবার জন্যে একদিন এসে—

শি। আমার মাথা কিনেছিলে, জানি।

দে। কিনেই যদি থাকি, মূল্য দিয়েই কিনেছি, ঠকাইনি। নিজের মাথাটি দিয়েছি আগে। যাক্, রাগটাগ এরপর সারাজীবন কোরো, এখন সময় নেই। লক্ষীটি। আড়াইটের সময় ডিসপোজালের [Dispeosal এর একটা অক্‌সন্ [auction] আছে, ভালো জিনিষ কিছু আছে, যেতে হবে। তারপর কাল কিংবা পরশু C. P, রায়পুর যাচ্ছি, কবে ফিরবো ঠিক নেই। সুতরাং আজই এবেলায় কাজটা সেরে যেতে চাই। সময় পাবো না বলে একটা চিঠি লিখে রাখছি।

শি। বেশ তো যাও না রায়পুর। কাজ সারবার তাড়া কিসের?

দে। না, তাড়া অবশ্য আমারও নেই, তোমারও নেই। কিন্তু দেখতে আসা সুরু হয়েছে, ওটা তোমার পক্ষে বড় কষ্টকর, আমি বুঝতে পারছি। না, আর দেরী করা নয়। আজই সেরে ফেলা ভালো। তুমি এগোও।

(শিবানীর কুটিল ভ্রূ সোজা হলো। সে ধীরে টেবিলের কাছে এসে দাড়ালো এবং বল্লো)

শি। না, আমি যাবো না।

দে। (তার মুখের দিকে একমুহূর্ত্ত চেয়ে) এটা তো রাগ করে বল্‌ছো না, শিবু কী হয়েছে? যাবে না বল্‌ছো কেন?

শি। [ধীরে ধীরে] আমি চলে গেলে মা থাকতে পারবে না। [তার গলা ভারী হয়ে এলো] আমি যাবো না, তুমি চলে যাও।

দে। আহা, তুমি তো চলে যাবে না। অন্ততঃ সম্প্রতি তো নয়। তুমি যেমন আছো, তেমনি থাকবে।

শি। তাছাড়া তোমার বাবার মনে কষ্ট দিয়ে—। না, না, ও থাক। উনি আমাকে খুব ভালোবাসেন।

দেবু। এরপর আরও ভালো বাসবেন, দেখো। আর বাবার মনে কষ্ট দেবো কেন? এখন রেজেষ্ট্রি করে একটা হোক্ না, এরপর বাবা যেমন চান, সেই রকম বিয়ে একটা করবো, তাহলেই হবে। কী বল? অদৃষ্টে যদি আমাদের দু'বার বিয়েই লেখা থাকে তা খণ্ডাবে কে বল। আর তোমারও সে ভালোই লাগবে, ভেবো না। অধিকন্তু ন দোষায়।

শি। [রাগ করে] তোমার নিজের কথা ভাবো, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। দুটো বিয়ে কর, পঞ্চাশটা বিয়ে কর, আমার তাতে কী? আমি কি সাধ্‌ছি নাকি তোমাকে? যাও না।

দেবু। [মৃদু হেসে] কথাটা বুঝলে না, তাই রাগ করছো। দু'বার বিয়ে বলেছি, দুটো বিয়ে বলিনি। রেজিষ্ট্রার সাহেবের আইনশাস্ত্রের আচারটা যদি মানতে পারি, পুরুত ঠাকুরের ধর্ম্মশাস্ত্রের আচারও এরপর মানা যাবে, যদি বাবা তাই চান, বুঝলে?

শি। [সুর এবার নরম হয়েছে, কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত] কিন্তু ঐ যে বলে কী সম্পর্কের বাধা আছে—

দেবু। [দৃঢ় অথচ কোমল কণ্ঠে] না, নেই। তোমাকে তো কত বার বলেছি শিবু, তুমি আমার মাসী, পিসী, ঠাকুমা, দিদিমা, কিছু হও না। বাবার বৈমাত্রেয় ভায়ের মামাতো মামার মেয়ে, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্কই নেই। আজ হবে। [চিঠি ভাঁজ করতে করতে] এই দেখ, আমার চিঠি হয়ে গেল, তুমি এগোলে না তো, তাহলে এক সঙ্গেই চল।

শিবা। না, না, তুমি আলাদা এসো। কি-ন্তু, বাড়ী এসে কী বলবো?

দেবু। [খাবার খেতে সুরু করেছে] তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

শিবা। হাঁ, কিছু বলতে হবে না! নিজে তো রায়পুরে গিয়ে বসে থাকবে, এদিকে যদি আবার দেখতে আসে?

দেবু। তা আসবে না। সে ব্যবস্থা, এই করেছি। এই চিঠিখানা মাষ্টার মশায়কে লিখে রেখে যাচ্ছি। তারপর রেজিষ্টারের সার্টিফিকেটটা পাঠিয়ে দেবো, ব্যস্।

শি। মেজকাকে লিখলে? ওমা! তোমার কি লজ্জা সঙ্কোচ কিছু নেই? কী লিখলে?

দে। হাঁ, অকারণ ও দুটো আমার নেই। লিখলুম মাষ্টারমশাই গৃহত্যাগ করতে শিবু চায় না, আমিও ওসব নভেলিয়ানার পক্ষপাতী নই। অনুমতি না পেলে পাছে অবাধ্য হ'তে হয়, তাই ওটা চাইনি। এখন আশীর্ব্বাদ

চাইছি। এই রকম লিখে দিলুম। হাঁ, আর লিখেছি, হিন্দু ল'য়ে [Hindu Law-এ] বাধে না, সে-কথা বাবাকে বোঝাবার ভার আপনার। [একটু চুপ করে থেকে] বাবা বুঝবেন। বাবা তোমাকে খুব ভালোবাসেন। আর দেখ, মা গিয়ে পর্যন্ত বাবাকে যত্ন করবার কেউ নেই। বৌদি একটু অন্য রকম, জানো তো? কিন্তু তুমি আর দেরী করো না। লক্ষীটি। [শিবানী ভেতরে যাচ্ছে] ও কী? ওদিকে আবার কেন? সময় নেই।

শি। পয়সা নিতে হবে না? বা-রে। ট্রামভাড়া চাই না?

[দেবব্রত পকেটে হাত দিল]

না, তোমার পয়সা এখন কেন নেবো। সম্পর্কই নেই। [প্রস্থান।

[দেবব্রত নীরবে খাবার খাচ্ছে, একটু পরে শিবানী ভেতর থেকে এলো, হাতে একটা ছোট ভ্যানিটি ব্যাগ]

দেবু। [খেতে খেতে] সামনে একটা ওয়েটিং রুম [waiting room] আছে।

শি। [দরজার কাছে ফিরে দাঁড়িয়ে] আমি হাঁ করে বসে থাকতে পারবো না। আমার অত গরজ নেই।

দে। না, গরজ আমার।

শি। আর দেখ, দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে একটু পরিষ্কার হয়ে এসো, বুঝলে? কী যে চেহারা হয়েছে!

দেবু। পছন্দ? টু লেট্ [Too late] শিবু! ভাবিতে উচিত, মানে দেখিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

[শিবানী চলে গেল। দেবব্রত খাচ্ছে, চায়ের কাপ হাতে ভদ্রার প্রবেশ।]

ভদ্রা। [চা টিবিলে রেখে] কোথায় গেল শিবু! বলুণ, দেবুর চা-টা নিয়ে যা। না, আমি পারবো না। তোমার সঙ্গে ওর আর বনলো না। কতদিন পরে এলে!

দেবু। [চায়ে চুমুক দিয়ে] নাঃ, ও ঝগড় চলবে সারাজীবন।

ভদ্রা। তাই বটে! এমন পাগল মেয়ে দেখিনি। কথা নেই, বার্তা নেই, ঠক্ করে একটা পেন্নাম করে এলো। কেনরে, কেন? উত্তর নেই। কোথায় গেল জানো?

দেবু। হুঁ-উ। এই পরীক্ষা-টরীক্ষার মত একটা কিছুর জোগাড়ে আছে নিশ্চয়।

ভদ্রা। আর পরীক্ষা দিয়ে কী হবে তা জানি না। যেমন কাকা! মেয়ের বিয়ের কথা কইতে হ'লে গায়ে জ্বর আসে। তোমার বাবার হাতে শিবুর বিয়ের ভার দিয়ে নিশ্চিন্দি হয়েছেন। আর তেমনি হয়েছে ভাইঝি। সম্বন্ধ করছি শুনলেই মুখ হাঁড়ি, চোখ ছল ছল। আমার ওপর কী রাগ মেয়ের! আচ্ছা, তুমি বলতো দেবু, শেঠের কোলে বড় হয়েছে, চেষ্টা করবো না? [দেবব্রত হাঁ সূচক মাথা নাড়লো] তবে হাঁ—বিয়ের ফুল না ফুটলে আমি কি বিয়ে দিতে পারি? বল? [দেবব্রত মাথা নাড়লো] আবার ফুল যদি ধর, আজই ফোটে, আজই বিয়ে হয়ে যাবে। আমি কি বন্ধ করতে পারবো? য়্যা?

(দেবব্রত না সূচক মাথা নাড়লো। চায়ের কাপ রেখে)

দেবু। কী করে করবেন? আপনারাই তো বলেন ওসব অদৃষ্টের কথা। যখন হবার, যেখানে হবার হবেই।

ভদ্রা। সে কথা একশোবার। বিধাতা যেখানে লিখেছেন, যার হাঁড়ীতে চাল দিইয়েছেন, সেখানেই হবে। তবে কী জানো, বিধাতা তো বরকে আমার দোরে পাঠিয়ে দেবেন না আমার মেয়েকে সাধতে। শিবু বলে, "না দিলে আর বিধাতা কিসের? আমিও সেধে কারও দোরে যাবো না।" এমন ধারা কথা শুনেছ কখনো?

দেবু। (মাথা নেড়ে) না, খুব বেশী শুনিনি, তবে শুনতে হবে ক্রমে।

ভদ্রা। যা বলেছ। যে কাল পড়েছে, কত শুনতে হবে। হাঁ, দেবু, তুমি তো অনেক জায়গায় যাও-আসো, কত ফন্দী-ফিকিরে কত কাজ কর শুনি, শিবুর বিয়ের একটা ব্যবস্থা করে দাও দিকি, লক্ষী ছেলে।

দেবু। আপনাকে বলতে হবে না, চেষ্টায় আছি। দেখি। আপনি ভাববেন না, হয়ে যাবে শীগ্‌গিরই।

ভদ্রা। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, তাই বল বাবা। এই দেখ, [মৃদু হেসে] তোমার বাবা শুনলে বলবেন, ও কী কথা বৌমা, দেবুকে বাবা বলছো কী?

দেবু। না, না, আপনি তাই বলবেন। এখন থেকে তাই বলবেন কাকীমা।

ভদ্রা। ওমা, তুমিও কাকীমা বলছো, তোমার বাবা শুনলে—

দেবু। কাকীমা কী, শিবুর মতন আমারও আপনাকে মা বলতে ইচ্ছে করে।

ভদ্রা। মা'র জন্যে মন কেমন করে! আহা, বাছারে!

ভদ্রা। উঠছো নাকি? এরই মধ্যে উঠবে? আর একটু বসবে না বাবা?

দেবু। আজ্ঞে, না। জরুরী কাজ আছে, একজনের সঙ্গে এনগেজমেণ্ট (engagement) করেছি, সে আমার জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকবে।

ভদ্রা। কাজ আছে? লাভের কাজ বুঝি?

দেবু। লাভ? হাঁা, লাভের বইকি। হ'লে লাভ আমারই বেশী হবে, গরজ তাই আমার।

ভদ্রা। ওমা, তবে আর বসতে বলবো না। তাহ'লে এসো। [দেবু ভদ্রাকে প্রণাম করলো] ওমা, এ কী? হঠাৎ পেন্নাম কেন গো? তুমিও কি শিবুর মতন পাগল হলে?

দেবু। একটা নতুন কাজে, মানে নতুন পথে নামছি। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

ভদ্রা। আহা বেশ, বেশ। সুখী হও, দীর্ঘজীবী হও। যে কাজে যাচ্ছো তাতে সিদ্ধিলাভ কর। আবার এসো, বাবা দেবু।

[দেবু চলে যেতে যেতে বল্লো]

দেবু। আজ্ঞে, হাঁা। আপনারা ডাকলেই আসবো।

[প্রস্থান।

ভদ্রা। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। [বাইরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল]

[অল্পক্ষণ পরে ভবদেবের প্রবেশ]

ভব। কী গো, তুমি এখানে একলাটি বসে আছ যে?

ভদ্রা। এমনি বসে আছি। শিবু কোথায় বেরোলো। দেবু এসেছিল। গল্প করলে, চলে গেল। তুমি যে এরই মধ্যে ফিরলে? ডাক্তারের ইস্কুল দেখা হয়ে গেছে?

ভব। [সহাস্যে] আজ স্কুল ছুটি দিয়েছেন, সে খেয়াল ছিল না ওঁর। আর একদিন যাবো। সাতুমামাও আসছেন। রাস্তায় দেখলুম কার সঙ্গে কথা কইছেন। সাতুমামাকে আবার বল্লুম শিবুর বিয়ের সম্বন্ধে কী বলছিলে, কবে ছেলে দেখতে যাবে। তোমার বৌমাকে সব বলে যাও। [ভদ্রা নীরব।] দেখেছ, শিবুর বিয়ের জন্যে কী রকম উঠে পড়ে লেগেছি?

ভদ্রা। দেখ, একটি সম্বন্ধের কথা বলবো? সাতুমামা যদি মনে করেন।

ভব। তা বেশ তো।

[ইতিমধ্যে ভবদেব জামা খুলে দেয়ালের হুকে কিম্বা চেয়ারের পিঠে রেখেছেন। এখন খবরের কাগজ তুলে নিলেন টেবিল থেকে। কাগজের নিচে চিঠি ছিল। দেখে]

ভব। এ চিঠি কার? (চিঠি তুলে নিয়ে) আমারই চিঠি দেখছি। কে দিয়ে গেল? (বলতে বলতে চিঠি খুলছেন)

ভদ্রা। তা তো জানি না।

ভব। (চিঠি পড়তে সুরু করেন) "শ্রীচরণ কমলেষু" এই এক সুসভ্য বাজে কথা। প্রাচীন অত্যুক্তি। চরণ হলো কমল, তার ওপোরেও শ্রী! যার কোনও মানে হয় না। এবং তাও গৌরবে বহুবচন! "মাস্টার মশায়,—"

ভদ্রা। কার চিঠি গো?

ভব। কোনও ছাত্রের। মাষ্টার মশায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছেন। মানে পার্সেণ্টেজ কম পড়েছে বোধহয়। লেখকটি কে? [চিঠি উলটে চিঠির শেষে নাম দেখে] হুম্। বটে! মনে মনে পড়তে লাগলেন। মুখে হাসির চিহ্ন ফুটে উঠলো। তারপর হাসির মৃদু শব্দ, ক্রমে শব্দ উচ্চ হতে হতে চিঠি শেষ হলো]

ভদ্রা। কী হলো গো? ছাত্তরের চিঠিতে এত হাসির কী আছে?

ভব। [হাসতে হাসতে] আছে, আছে। আচ্ছা, তখন তুমি দেবুর কথা কী যেন বল্লে? দেবু আবার এসেছিলে?

ভদ্রা। হাঁা। দেবু এসেছিল। বেশীক্ষণ বসতে পারলে না। কী একটা কাজে গেল। আমাকে পেন্নাম করে গেল। আহা, মা নেই।

ভব। তোমাকে পেন্নাম করে গেল? হঠাৎ?

ভদ্রা। হঠাৎ আবার কী? একটা নতুন কাজে যাচ্ছে তাই। বল্লে আশীর্বাদ করুন। হঠাৎ বরঞ্চ শিবু

করলে। দেবু তখন বসে আছে, শিবু কোথায় বেরোলো। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই আমাকে একটা পেন্নাম করে ছুটে পালিয়ে গেল।

ভব। শিবুও পেন্নাম করে গেল? তুমি আশীর্বাদও করলে নিশ্চয়? বাঃ। তবে তো সব সেরে রেখেছ। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। Straight indeed!

ভদ্রা। কী বলছো, বাপু, খুলে বল। আমি তোমার মতন অমন পণ্ডিত নই। পেন্নাম করেছে, তাতে হাসির কী হলো?

ভব। হয়েছে। এখন সাতুমামাটা খালি বাকী। আরে, এই যে, নাম করতে করতেই।

[সাতুবাবুর প্রবেশ]

এতক্ষণ কী কথা কইছিলে ভদ্রলোকের সঙ্গে? সম্বন্ধ করছিলে না তো?

সাতু। হাঁ, শিবুর জন্যে একটি চমৎকার সম্বন্ধ পেলুম। আমার অপিসের বন্ধু! ভদ্রলোকটি কে জানো? সাতক্ষীরের ঘোষ। ওঁরই ঠাকুর্দা, আপন ঠাকুর্দা, কাকাতুয়ার শ্রাদ্ধে পাঁচশো ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়েছিলেন, একটাকা করে দক্ষিণে দিয়েছিলেন। আমার বড়ো পিসিমার নন্দাই ছিলেন কিনা। লাটসায়েব-বাড়ীতে আসতেন। এক গেলাসে—বুঝলে না সেই সাতক্ষীরের বুঝলে—

ভব। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সম্বন্ধ আর করতে হবে না। আমি ভেবে দেখলুম, শিবুর বিয়ের সম্বন্ধ পরে হলেও চলবে, তার আগে—

ভদ্রা। বটে? শিবুর বিয়ের সম্বন্ধ পরে হবে? আমি জানি তো তোমাকে। যাকগে—তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। মামাকে বল—

সাতু। সম্বন্ধ করতে হবে না? এ আবার কী বলছো তুমি? তবে কী করতে হবে শুনি?

ভব। সবই বলবো। তার আগে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধটা ঠিক করে নেওয়া দরকার।

সাতু। (বিস্মিত) আমার সঙ্গে সম্বন্ধ? সে তো আছেই হে।

ভব। ও সাতুমামা টাকুমামা চলবে না। ভদ্রার বড়ো অসুবিধে হচ্ছে।

ভদ্রা। ওমা! আমার আবার কী অসুবিধে হচ্ছে কী যে বল তার ঠিক নেই।

ভব। তোমার না হোক, আমার অসুবিধে হচ্ছে। সাতুমামা বলতে পারবো না আর।

সাতু। তবে?

ভব। তোমাকে আমি সাতুদা বলবো। Show cause why I'shouldn't—

ভদ্রা। কী যে বলছো তার ঠিক নেই।

সাতু। বল তো বৌমা!

ভব। আমি ঠিকই বলছি। তুমি কী জন্যে আমার মামা হবে বলো? বলো কেন তুমি মামা হবে?

সাতু। না, না, মামা তো তুমিই। আমার ছোটো মা'র, মানে বিমাতার তুমি হলে মামাতো ভাই, সুতরাং—

ভব। না।

সাতু। না কী গো? ছোটো মা'র মা তোমার পিসিমা ছিলেন। আমি বয়সে বড়ো বলে সেই সম্বন্ধে—

ভব। না, ওটা কোনও সম্বন্ধই নয়।

সাতু। তা বটে। তবে কী জানো, সম্বন্ধ মনে করলেই সম্বন্ধ। একটা করে নিতে হয়।

ভব। There you are একটা করে নিতে হয়। সুতরাং আজ থেকে তুমি আমার সাতুদা হলে। ও পিসীমা বিমাতা-টিমাতা কিছু নয়। রাজী, সাতুদা?

সাতু। [সহাস্যে] বেশ। তাই বলে খুশী হও, বল। [হাস্য]

ভব। ভদ্রা, মামাশ্বশুর নয় সাতুদা। রাজী?

ভদ্রা। [হাসিমুখে] জানিনে বাপু।

ভব। এই হলো এক নম্বর। দু নম্বর হচ্ছে তোমাকে দেখবার শোনবার যত্ন করবার একটা লোক দরকার।

সাতু। আমার যত্ন? সে সব সেই একজনের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে ভাই। ও আর দরকার নেই।

ভব। না, শেষ হয়ে যায়নি। শেষ হতে দেবো না। তোমাকে আর তোমার নাতি দুটোকে লালন করবার লোক দরকার। তোমার বড়ো বৌমা তাঁর বাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত। সুতরাং দেবুর বিয়ে করা উচিত।

সাতু। উচিত তো বটেই। একশোবার উচিত। আজই করা উচিত। কিন্তু ও বাঁদরটা কি সেটা ভাবছে?

না, ভাববার মতো বুদ্ধি আছে? কখন কোথায় থাকে কী করে, ওর কি কোনও মতিস্থির আছে? কোন্ ভদ্র-লোক ওর হাতে মেয়ে দেবে বলো?

ভব। আচ্ছা, দেবুর বিয়ের সম্বন্ধ করার ভার আমি নিলুম। তুমি রাজী!

ভদ্রা। তুমি! তুমি সম্বন্ধ করে বিয়ে দেবে? তবেই হয়েছে!

ভব। কী বলো সাতুমামা I mean, সাতুদা, তুমি রাজী তো!

সাতু। এক্ষুণি, এক্ষুণি, এই দণ্ডে। তুমি যেখানে খুশী ওর বিয়ে দাও, ওটাকে স্থিতি কর, আমি কথাটি কইবো না। কেবল মেয়েটা যেন স্বজাত হয়, ভালো ঘরের হয়, লক্ষ্মী মেয়ে হয়। আর কিচ্ছু চাই না।

ভব। টাকা কড়ি?

সাতু। রাম, রাম! সাঁইত্রিশ বছর চাকরি করেছি, লাখ লাখ টাকার বিল পাস করেছি একটি পয়সা উপরি নিইনি। আর আজ মালক্ষ্মী ঘরে আসবেন, তার ওপোর উপরি চাইবো? না ভাই, আমার যেটুকু সাধ্য খরচ করবো, পরের পয়সায় লোক খাওয়াবো না। তুমি বড়ো বৌমার বাপকে জিজ্ঞেস করে দেখো।

ভব। আমি জানি সাতুদা, আমি জানি। you are a brick.

(বাইরে ট্যাক্সির শব্দ)

ভব। [জানালা দিয়ে দেখে] দেবু না? ও দেবু শোনো, শোনো।

[বলতে বলতে বাইরে যায় এবং পরক্ষণে দেবুর সঙ্গে ফিরে আসে।]

তুমি এসে দরজা থেকে পালাচ্ছিলে যে।

দেবু। আজ্ঞে, শিবুকে পৌঁছে দিয়ে গেলুম, একটু কাজ আছে, তাই যাচ্ছিলুম।

ভদ্রা। শিবু ফিরেছে। সকাল থেকে খায়নি, দেখি—

[বলতে বলতে ভিতরে গেল।

সাতু। কাজ আছে, তাই যাচ্ছিলি। কাজ আছে! কাজের তো অন্ত নেই। থাকুক কাজ, কোথাও যাবি না। ফেলু যা বলছে শোন।

ভব। দেখ দেবু, তোমার বাবার ইচ্ছা যে তুমি বিবাহ কর।

সাতু। ইচ্ছে-টিচ্ছে নয়, আমার হুকুম।

দেবু। আমাকে মাফ করুন।

সাতু। মাফ করবো? শুনলে, শুনলে ফেলু? লক্ষ্মীছাড়া ছেলের কথা তো শুনলে? ওঁকে মাফ করতে হবে। দূর করে দেবো বাড়ী থেকে। দূর করে—

(রাগের দমকে কাশতে থাকেন)

ভব। আহা, তুমি ঠাণ্ডা হয়ে বসো সাতুদা। ওরে, শিবু, সাতুদা'র জন্যে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল আর কিছু মিষ্টি নিয়ে আয়।

দেবু। [সবিস্ময়ে] সাতুদা!

ভব। হ্যাঁ, সাতুদা। তোমার আপত্তি আছে?

সাতু। [জোরে] হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওর আপত্তির কে ধার ধারে?

দেবু। আজ্ঞে না, আমার আপত্তি নেই।

[ভদ্রার প্রবেশ]

ভদ্রা। ওগো, শিবু ঘরে দোর দিয়ে বসে আছে, দোর খুলছে না। [কাতর ভাবে] কী হয়েছে জানিনা, তুমি একবার এসো।

ভব। কিছু হয় নি। তুমি বল সাতুদার জন্যে মিষ্টি আনতে। নতুন সম্বন্ধ হয়েছে, সাতুদা বলগে, দোর খুলবে।

[ভদ্রার প্রস্থান।

ভব। দেখ দেবু, তোমার বাবা শিবুর বিয়ের ভার নিয়েছেন। কাজেই আমি তোমার বিয়ের ভারটা নিলুম। বুঝলে। এখন দু জনকার ভারই এক সঙ্গে—

সাতু। অত কথা ওকে বলতে হবে? কোনও কথা নয়। আমি বলছি এক কথা। এই ফেলু তোর মাষ্টার মশাই যে মেয়ে ঠিক করবে, ঘাড় হেঁট করে তাকে বিয়ে করবি। না করিস তো দূর হয়ে যা বাড়ী থেকে।

[দেবু ভবদেবের দিকে চাইলে। ভবদেব প্রসন্ন মুখে চেয়ে আছে, নীরবে। কিন্তু যেন ঈষৎ মাথা নড়লো। প্রবেশ করলেন ভদ্রা ও শিবু। নতমুখী শিবুর হাতে মিষ্টান্নের রেকাবি ও জল। শিবু খাবার ও জল টেবিলে রাখলে।]

ভব। শিবু, তোর শ্বশুরকে প্রণাম কর। করে খাবার দে। লজ্জা করতে হবে না। প্রণাম কর।

ভদ্রা। (সানন্দে) হ্যাঁ গা, সত্যি? সাতুমামা—

ভব। ইউ, ইউ, ভদ্রা। সাতু মামা নয়, সাতুদা। বেয়াইকে কেউ মামা বলে না।

সাতু। য়্যাঁ? তুমি বলছো কী ফেলু? আমি যে গরীব। আর আমার এই লক্ষ্মীছাড়া ছেলেটাকে তুমি—(শিবু প্রণাম করে) এসো মা এসো। আমার মা এসো। (মাথায় চুমু খায়। চোখ মোছে) আমি আশা করতে সাহস করিনি, বলতে পারিনি ফেলু।

[শিবু ভদ্রাকে প্রণাম করে। দেবু ভবদেবকে প্রণাম করতে যায়, ভবদেব তাকে আলিঙ্গন করে।]

ভব। নো, নো, মাইডিয়ার বয়। প্রণাম নট ফর মি। ওটা তোমার শাশুড়ীকে কর। তোমার বাবাকে কর।

যবনিকা

সীমা রেখা

হরিসাধন গোলুই

যে যার ধর্ম মতে
ওরা চলে নানা পথে—
সুগম, দুরূহ, বন্ধুর।
চলেছে; হয়তো যাবে আরো দূর।
কিন্তু কার অন্বেষণে?
তা নাহি জানে!
তবু কোন পথ সত্য কত—
তাই নিয়ে অবিরত
করে হানাহানি। জীঘাংসার উল্লাসে মেতে
পৈশাচিক রক্তপাতে
রাঙায়ে পথের ধূলি—
সে পথে আবার চলে ধর্মের পতাকা তুলি'!
নেই আজ সত্য-অনুভূতি!
তাই সৃষ্টির বৈচিত্র্য মাঝে স্রষ্টার স্থিতি
পায় না খুঁজে।
তবু তারেই খুঁজিয়া চলে দু'চোখ বুজে।
অন্তরের দৃষ্টি আজ কুহেলী-ঘেরা,
তাই সুদূর নক্ষত্রলোকে গ্রহ-চন্দ্র-তারা—
বোঝে না, কার সে প্রকাশ!
আকাশ বাতাস,
শৈল, সিন্ধু, মরু-প্রকৃতির চারিধারে
সৃষ্টির বিচিত্র সম্ভারে,
মানুষের সুখে দুখে, আশা-নিরাশায়,
সর্বভূতে অদৃশ্য প্রেমের ধারায়—
দেখে না কার সে রূপ
অমলিন, অপরূপ!
সে রূপের জ্যোতি ওরা নাহি দেখে হায়
অজ্ঞান তমসায়!
তাই খুঁজে মরে সর্বব্যাপ্ত, অখণ্ড,
অভিন্ন ঈশ্বরে
ধর্মের ছাঁচে গড়ি খণ্ডিত, বিযুক্ত করে
চায় তাঁরে দেখিতে বৃথা
ইট আর পাথরে গাঁথা
গির্জায়, মসজিদে, মন্দিরে!
সর্ব ধর্ম ঘিরে
নিহিত যে মহাসত্য, তারে দেয় জলাঞ্জলি
সঙ্কীর্ণ স্বার্থবোধে ধর্মের কুৎসিত দলাদলি!
ওড়ায় যে যার ভিন্ন ধর্মের পতাকা,
মন্দির মসজিদ মাঝে তুলি সীমারেখা—
ঈশ্বরের নামের আড়ালে
মানুষবেশী দানবের খোলস খুলে ফেলে,
মুছে দেয় হৃদয়ের যত অনুভূতি—
স্নেহ-প্রেম-প্রীতি;
শুধু শতশিখা মেলে
স্বার্থান্ধ লালসার হিংস্রতা জ্বলে!
সে বীভৎস আগুনে
কি পাপে না জেনে
নিরীহ মানুষ মরে মূক পশুর মত
অসংখ্য, অগণিত।
আকাশ বাতাস ওঠে ভরে
শিশুহারা জননীর করুণ হাহাকারে,
সিঁথির সিঁদুর মুছি কত স্বামীহারা
ফেলে অশ্রুধারা!
সৃষ্টির সুষমা কত
হয় ভস্মীভূত!
সে ভস্মের কলঙ্ক ইতিহাস
সভ্যতার গর্বে যেন করে পরিহাস।
শুধু অলক্ষ্য থেকে ব্যথার আর্তনাদে
যীশু, হজরৎ, বুদ্ধ, বিবেক
গুমরি গুমরি কাঁদে!!

"চন্দ্রশেখর"-এর বঙ্কিমচন্দ্র

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য

'চন্দ্রশেখরে'র বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার বা জানবার আগে ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমের একটি চিত্র পাঠকের সামনে তুলে ধর্‌তে চাই—"১৮৫৩ সালে যে সময়ে হুগলী কলেজে একজন প্রধান ছাত্র বলিয়া গণ্য, ইনি তৎকালে গ্রাম্য চতুষ্পাঠীতে কোন এক অধ্যাপকের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, প্রত্যহ পুঁথি বগলে করিয়া চতুষ্পাঠীতে গমনপূর্বক অধ্যয়ন করিতেন. এক বৎসর মধ্যে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, রঘুবংশ, ভট্টিকাব্য, মেঘদূত, উদ্ধবদূত প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। এই অল্পসময় অধ্যয়ন করিয়াই ইনি সংস্কৃত ভাষায় ও সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরাজীর ন্যায় সংস্কৃত ভাষাতেও কৃতবিদ্য—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—"নববার্ষিকী" (১৮৭৬) পৃঃ ২৪০। এই উক্তিকারী এমন একজন ব্যক্তি যিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর দক্ষিণহস্ত এবং ঊনিশ শতকের শেষার্ধের ব্রাহ্মসমাজের একজন কৃতবিদ্য নেতা। সুতরাং বক্তার কথা প্রণিধানযোগ্য। যে ছাত্রের এইরূপ অনুসন্ধিৎসা ও জ্ঞানস্পৃহা, সে যে কালে যুগবরেণ্য বঙ্কিমচন্দ্র হবে তাতে কোন আশ্চর্য নেই। অন্ততঃ না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। ১৮৫৩ থেকে ১০৫৭—এই চারবৎসরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' বহু গদ্য ও পদ্য রচনা প্রকাশ করেন। 'এডুকেশন গেজেটে' তিনি এই সময় কিছু কিছু ইংরাজী রচনা লিখিতেন।—"While at Khulna, Bamkim Chandra began a serial story named 'Rajmohan's wife' in the Indian Field Newspaper, then edited by Kisori Chand Mittra. This was his first literary effort,"

'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'কপালকুণ্ডলা' যথাক্রমে ১৮৬৫ ও ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হল। ১৮৬৯ সালে 'মৃণালিনী' প্রকাশের পর বঙ্কিমের খ্যাতি বিদগ্ধসমাজে স্বীকৃত হল। যে প্রতিভার বীজ দেখা গেছল 'ললিতা ও মানসে'—তা কালক্রমে মহীরুহরূপে দেখা দিতে লাগল। ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত! গুপ্ত কবি ঠিক বুঝ্‌তে পেরেছিলেন প্রতিভার সুপ্ত বীজকে। আকর্ষণ কর্‌লেন বঙ্কিমকে, উৎসাহ দিলেন তাঁকে। কবি খ্যাতির পথে প্রধান সাহায্যকারীরূপে দাঁড়ালেন। শিষ্য শেষকালে গুরুচরিত কীর্তন করে গুরুদক্ষিণা দিয়েছে। জানিয়াছে লোকসমাজে গুপ্তকবির নেপথ্যচারিণী কবিদৃষ্টি ও প্রতিভাকে। যাই হোক্ বহরমপুরে থাকাকালে (১৮৬৯—১৮৭৪: ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট: অস্থায়ী ডেঃ ম্যাজিস্ট্রেট, বহরমপুরস্থ রাজসাহী কমিশনারের পার্শোন্থাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট—অস্থায়ী) তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই মধ্যে "বঙ্গ দর্শন" (১৮৭২) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশকালে শিল্পীসমাজের অবস্থা শিল্পীর নিজের কথাতেই দিই—"আমরা ইংরাজী বা ইংরাজের দ্বেষক নহি। ইহা বলিতে পারি যে, ইংরাজ হইতে এ দেশের লোকের যত উপকার হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষাই তাহার মধ্যে প্রধান। অনন্তরত্নপ্রসূতি ইংরাজী ভাষার যত অনুশীলন হয় ততই ভাল।……বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী,—ইহাদের সাধারণ মিলনভূমি ইংরাজী ভাষা। এই রজ্জুতে ভারতীয় ঐক্যের গ্রন্থি বাঁধিতে হইবে। অতএব ইংরাজী চলা আবশ্যক, ততদূর চলুক।"

(বঙ্গদর্শন, বৈশাখ, ১২৭৩)

এই ঘোষণার মধ্যে দুটো জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঊনিশ শতকী রেনেশাঁর সাধনালব্ধ বস্তুর প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে। দ্বিতীয় সর্বভারতীয় ভিত্তিতে মহামিলনের পূর্বপ্রস্তুতিসূচক উপায় নির্দেশও আছে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা এর বেশ কয়েক বছর পরে হয়েছে। সুরেন ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ইহার কয়েক বছর পরে অনুপ্রবেশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সত্য, শিব, সুন্দরের আরাধনা কর্‌তে গিয়ে

জাতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক চিন্তাকে উপেক্ষা করতে পারেন নি।

'বন্দেমাতরম্'—এই জাতীয় সঙ্গীতটি ১৮৭৬ সালে বঙ্গদর্শন সম্পাদনার সময়ে তিনি রচনা করেন। এর পর উহা 'আনন্দমঠে' অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়। এর পর 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) এবং সীতারাম (১৮৮৭) সালে প্রকাশিত হয়। এরই সমসাময়িক কালে জেনারেল এ্যাসেম্ব্লির অধ্যক্ষ (বর্ত্তমান স্কটিশ চার্চ কলেজ) পাদরি হেষ্টির সহিত কোন একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে, 'রামচন্দ্র'—এই ছদ্মনামে হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। "Letters on Hinduism"—এই ধরণের আলোচনারই ফল বিশেষ। পাদরি কৃষ্ণমোহনও বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত লেখনীকে সংযত করেন। ১২৯২ সালে 'কৃষ্ণ চরিত্র' নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য—"বঙ্গদেশ যদি অসাড় প্রাণহীন না হইত তবে কৃষ্ণচরিত্রে বর্তমান পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের উপর যে অস্ত্রাঘাত আছে, সে আঘাতে বেদনাবোধ এবং কথঞ্চিৎ চেতনালাভ করিত। বঙ্কিমের ন্যায় তেজস্বী প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আর কেহই লোকাচার, দেশাচারের বিরুদ্ধে এরূপ নির্ভীক স্পষ্ট উচ্চারণে আপন মত প্রকাশ করিতে সাহস করিত না।"—বক্তা রবীন্দ্রনাথ, বিষয় বঙ্কিম মানস ও কৃষ্ণচরিত্র। কি অপূর্ব বিশ্লেষণ ও বিচার। হাজার কথায় যার প্রকাশ হয় না, রবীন্দ্রনাথ এককথায় তার উত্তর দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সেই সমন্বয়বাদী পুরুষ যিনি প্রাচীনকে নূতনের মনীষায়, যুক্তিতে, পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে বিচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্বীকারও করেছেন। নির্জলা নূতন বা পুরাতন কোনটাকেই এককভাবে স্বীকার করেন নি। এইখানেই তাঁর প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য। পরিণত জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যাদর্শের একটি তীক্ষ্ণ ইঙ্গিত নানা রকম বিবাদের ঝুঁকি নিয়েও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন "বাংলা নব্য লেখকগণের প্রতি নিবেদন"—নামক রচনায় "যদি কেহ এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।"

"যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না। সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ। (বিবিধ প্রবন্ধ, ২য়ভাগ, পৃঃ—২০৬, পরিষৎ সংস্করণ)। ইনিই শিল্পী যাঁর কাছে ধর্ম ও সাহিত্য প্রায় সমার্থক। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি তাঁর চিন্তাবহির্ভূত নয় সত্য কথা, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যের সঙ্গে শিবের ও সত্যের আদর্শ লীনতাপ্রাপ্ত হয়ে আছে। এ যেন সেই প্রপানক রস—অর্থাৎ পাঁচমিশালি সরবৎ—কোনটি কতটা আছে তাহা ধরা মুস্কিল, বর্ত্তমান সময়ে বঙ্কিমের এই উক্তিকে লক্ষ্য করে কোন উগ্র প্রগতিবাদী বঙ্কিমের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে পারেন, কিন্তু তাতে বঙ্কিমকে বোঝা হয় না, একালের যুগ মনীষায় সেকালকে বিচার করা হয়, নিজের বিশেষ ভাব-দর্শনেই জাহির করা হয়। এই কথাটির সম্পর্কে বিশেষ ভাবে বলা প্রয়োজন। কারণ 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসটি এই প্রসঙ্গে জড়িত। উক্ত উপন্যাসে যে নীতি বা ধর্ম আছে তা অনেকের বিদ্রূপের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দাঁড়াবে। তাঁদের অভিযোগ যে 'প্রায়শ্চিত্ত' অংশের (চতুর্থ পরিচ্ছেদ, চন্দ্রশেখর উপন্যাস) মাধ্যমে শিল্পী বঙ্কিমের পরাজয় ঘটেছে। কারণ অপাপবিদ্ধ প্রেমের এ হেন প্রায়শ্চিত্তমূলক চরিত্রচিত্রণ নিছক নীতিমার্গ-গামিতার চূড়ান্ত পরিচয় দেয়। কিন্তু যাঁরাই বলুন এ কথা, তাঁরা আসলে বঙ্কিমকে ছেড়ে নিজেদের পাণ্ডিত্য স্পৃহাকে বলবতী করেন। কাজেই বিরোধ বাধে। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমের নিজস্ব উক্তি লক্ষ্যণীয়।—"সাহিত্যও ধর্মছাড়া নহে। কেননা, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন সুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্যমূলক ও অধর্মময় তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা ও বিকৃতরুচি পাঠক কেহ সুখী হয় না। কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্নসোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।"

"যাহারা কুকাব্য প্রণয়ন করিয়া পরের চিত্ত কলুষিত করিতে চেষ্টা করে, তাহারা তস্করাদির ন্যায় মনুষ্য জাতির শত্রু এবং তাহাদিগকে তস্করাদির ন্যায় শারীরিক দণ্ডের দ্বারা

দণ্ডিত করা বিধেয়"—(ধর্মতত্ত্ব। বঙ্কিম রচনাবলী—২য় ভাগ, পৃঃ ৬৭০ সংসদ সংস্করণ।)

আশা করি 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫-প্রকাশকাল) উপন্যাসের আলোচ্য অংশের পটভূমি হিসাবে মদীয় পূর্ব আলোচনা একটু বিস্তৃত হলেও প্রাসঙ্গিক হবে। আলোচ্য বিষয় শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তও প্রতাপের মৃত্যুর কারণ বিশ্লেষণ। প্রতাপ ও শৈবলিনী একই বৃন্তে দুটি পুষ্পের ন্যায়। নায়কের যখন পনের অথবা ষোল বছর বয়স, তখন সে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকার প্রতি প্রণয় নিবেদনার্থ জলে ডুবে, তার প্রেমের গভীরতার পরিচয় দেয়। যতই তারা নির্জনে বিবাহ বিষয়ক অসার ফন্দী আঁটুক, শেষপর্যন্ত বিবাহ প্রস্তাব-মাত্রেই পর্যবসিত হয়, কার্যে আর রূপান্তরিত হয় না। যে নায়িকার প্রেমের পরিচয় শিল্পী তাঁর উপন্যাসে দিচ্ছেন, তা ষোড়শবর্ষীয়ার, অষ্টমবর্ষীয়ার নয়। কারণ শিল্পী নিজের কথাতেই স্বীকার করেছেন যে কাহিনী অংশের আরম্ভ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর বিবাহের আট বছর পর থেকে। চন্দ্রশেখর পুঁথিগত বিদ্যাপ্রাণ, বিগত যৌবনের স্মৃতি বহন-কারী ঘর করণের জন্য কুরূপাকে চেয়েও দুর্ভাগ্যবশতঃ অপূর্ব সৌন্দর্য লাবণ্যময়ী শৈবলিনীর পাণিগ্রহণ করেছে। শৈবলিনী যখন পূর্বপ্রণয়ের সংস্কারবৃশ্চিকদংশনে কাতরা হয়ে ফষ্টরের সঙ্গে পলায়নের সম্ভাব্য ফলাফল কল্পনা করছে, তখন নায়ক (নায়ক চন্দ্রশেখর কিনা সূক্ষ্ম বিচার্য বিষয়) চন্দ্রশেখর ব্রহ্মসূত্র পাঠে বুঁদ হয়ে আছে। এ হেন যেখানে অবস্থা, সেখানে শৈবলিনীর পতি পরমগুরু হয়েও কামনার নর্মসহচর হতে পারে না। পারে না বলেই, সে গঙ্গার উপর ফষ্টরের নৌকায় বসে সুন্দরীকে স্বামীর আলয়ে থাকাকালীনই আত্মীয়বাড়ী যাবার অথবা কাশীবাসী হবার ইঙ্গিত যে মনে জেগেছিল, তা জানায়। তাহলে অতৃপ্ত যৌবনাকাঙ্ক্ষার বীজ শৈবলিনীর মনে যে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সে যদি তার প্রেমের বা রূপের অথবা সৌন্দর্যের একটু স্বীকৃতি পেত, তাহলে প্রতাপ 'চন্তা'র থাকতো কিনা সন্দেহের বিষয়। চন্দ্রশেখরের আচরণই তাকে প্রতাপচিন্তামগ্ন হতে বাধ্য করেছে। প্রতাপের বাড়ীতেই, প্রতাপের সম্মুখে, এই দুর্জয় রূপজ প্রেমের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি নায়িকার মুখের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ্য—

"তুমি কি করিয়াছ? কেন তুমি, তোমার ঐ অতুল্য দেবমূর্তি লইয়া আবার আমায় দেখা দিয়াছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, ও-রূপের জ্যোতি কেন আমার সম্মুখে জ্বালিয়াছিলে? যাহা একবার ভুলিয়াছিলাম, কেন তাহা উদ্দীপ্ত করিয়াছিলে? কেন আমি তোমাকে দেখিয়াছিলাম? দেখিয়াছিলাম তো তোমাকে পাইলাম না কেন? না পাইলাম তো মরিলাম না কেন? তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জাননা যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখনও তোমায় পাইতে পারি এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফষ্টর আমার কে?" "বিশের শতকের শেষের দিককার যে কোন দিল্‌খোলা, রেস্তোরাঁবেশী নায়িকার আচরণের সঙ্গে শৈবলিনীর এই জায়গার আচরণ তুলনীয়। তবে সামগ্রিক বিচারে পার্থক্য আছে বৈ কি। শৈবলিনী মুখে যতই বলুক "মরিলাম না কেন"—কিন্তু সে মরতে মনে ভয় পায়, মরতে পারে না। এর মধ্যে আছে তার রূপ সচেতনতা, দেহের প্রতি মমত্ব-বোধ, ব্যক্তি জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। প্রথম সন্তরণের সময় সে ডুবে নাই; দ্বিতীয় সন্তরণের সময় তার মনে বিপরীতভাব এলেও, 'প্রতাপ চিন্তা'কে সে দূর করতে চায়নি এবং পারেনি। একেবারে শেষে সে বলেছে, প্রতাপের সঙ্গে যেন তার আর দেখা না হয়। কারণ "রমণীর মন বড় অসার।" "আমি সুখী হইব না। তুমি থাকিতে আমার সুখ নাই"—এইরূপ বাক্য প্রতাপকে সে নির্বিবাদে বলছে। "স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার; কতদিন বসে থাকিবে জানি না। এ জন্মে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও না"—এইরূপ উক্তি শুনলে আমাদের খুব একটা অস্বাভাবিক মনে হয় না।

বরং এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। কিন্তু এর পশ্চাৎ পটভূমি দেখা প্রয়োজন। এইরূপ উক্তি কে করছে? দ্বাদশবার্ষিক ব্রতধারিণী, ফলমূলপত্রাহারগ্রহণকারিণী, চীরধারিণী শৈবলিনীর উক্তি। এই শৈবলিনীকে কমণ্ডলু-বারির দ্বারা বহু পরীক্ষা করা হয়েছে। রামানন্দ স্বামীর যোগবলে এই রমণীর অন্তঃকরণে পবিত্রতা সম্পাদনের চেষ্টা করা হয়েছে। গ্রামান্তে পর্ণকুটির নির্মাণ করে, ভিক্ষালব্ধ অন্নে নিজের পাপ কীর্তন করে জীবন যাপনের

অন্বেষণ

প্রত্যাবর্ত্তন

ফটো :
তরুণ কুমার ঘোষ

নির্দেশ রামানন্দস্বামী দিয়েছিলেন। সে নির্দেশ সবটা পুরোপুরি না হোক বহুলাংশেই প্রায় পালন করা হয়েছে। এ হেন রমণী পাগলিনী সদৃশ ছিল। তার সেই উন্মত্তদশা খানিকটা কেটে গেলেও, তার সন্ন্যাস ব্রতকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই তীব্র বৈরাগ্যের মূর্তিস্বরূপিণীকে যখন রমণীর মন বড় অসার—ইত্যাদি উক্তি করতে দেখা যায়, তখন পাঠক কি মনে করেন জানিনা, তবে আমার মনে হয় বঙ্কিম সমগ্র জীবন সন্দর্শন করেছিলেন—কোন বিশিষ্ট জীবনকে শিল্পায়ত মূর্তিদান করেন নি। তাই এইরূপই স্বাভাবিক। আজকের উগ্রন তিগত নিষ্ঠায় এটা অস্বাভাবিক হতেও পারে। কিন্তু বঙ্কিমকল্পিত সমগ্র জীবন দর্শনগত বীক্ষায় এইটেই স্বাভাবিক। তবে রামানন্দ স্বামীর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ বা যোগবল একটু যেন প্রহসন ঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামীর উক্তির অনুসরণে "আমি এতকাল সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলাম, সর্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ করিলাম, কিন্তু সকলই বৃথা। এই বালিকার মনের কথা বুঝিতে পারিলাম না। এ সমুদ্রের কি তল নাই ?"

আর সর্বশেষে রামানন্দ স্বামীর মুর্মূষু প্রতাপের প্রতি হাস্যকর প্রশ্ন আমাদের আরও বিস্মিত করে। ব্রহ্মাণ্ড জয় তোমার এই ইন্দ্রিয় জয়ের তুল্য হইতে পারে না—তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে ? এ প্রশ্ন যেমন হাস্যকর, তেমনি মনুষ্য জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাসূচক। প্রতাপের প্রেমের নাম এক কথায় "জীবন বিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।" মৃত্যুর কিছু আগে প্রতাপ জানিয়েছে—"পাপ চিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত নহি……। শিরে শিরে, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করিয়াছে, কখনও মানুষে তাহা জানিতে পারে নাই……।"

কথাটা সত্য। প্রতাপ চেয়েছিল শুধু তার প্রেমের স্বীকৃতি। শৈবলিনীর সুখে তার আত্মতৃপ্তি। শৈবলিনীর অনিষ্ট কামনা সে করতে পারে না। প্রতাপ স্বগৃহে তাকে পাপিষ্ঠা বলে সম্বোধন করেছে। কিন্তু শৈবলিনীর দুর্জয় প্রেমের আহ্বানে তার পূর্ব স্মৃতির আলোড়ন ঘটে। সেই স্মৃতি মাত্র সম্বল করে সে পরবর্তী জীবন রূপসীর সঙ্গে যাপন করতো। কিন্তু তারই প্রেমের আধারস্বরূপিণীর মুখে যখন সে শুনল যে, সে থাকতে শৈবলিনীর সুখ নেই তখন মৃত্যুই হল তার প্রেমের সমাধির একমাত্র পথ। প্রতাপের প্রেম খানিকটা আত্মবিলোপকামী, নিজের অহংচেতনার অবক্ষয়কারী। এর প্রমাণ প্রথমসন্তরণ দৃশ্যে সে নিজে দিয়েছিল এবং দ্বিতীয় সন্তরণ দৃশ্যেও তার অস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সর্বশেষে তার ঐ নীতিকেই সে প্রমাণ করল। প্রতাপ মরেও মরেনি। শৈবলিনী প্রতাপের মৃত্যুর খবর যখন পাবে, তখনই কি সে সুস্থির থাকতে পারবে ? পারবে না বলেই শৈবলিনী চরিত্রের সুক্ষ্ম গবেষক বলবেন আশা করি। প্রণয় বা প্রেম যে কি জিনিষ, সে চন্দ্রশেখরের কাছ থেকে পায় নি। প্রতাপের প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শেই তার রমণী সত্তার উদ্বোধন ঘটেছিল। প্রতাপের মৃত্যুতে সেই ক্ষণিকবিদ্যুতালোক-দীপ্ত রমণী সত্তার চিরকালীন সমাধিদশা ঘটবে— একথা হলফ করে বলতে পারা যায়। শৈবলিনীর জন্যই প্রতাপের মৃত্যুর প্রয়োজন ছিল। চিত্ত জয়ে ইন্দ্রিয় জয়ে সুখ—এই যেন নীতি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—"যাহার চিত্তশুদ্ধি নাই, তাহার কোন ধর্মই নাই। যাহার চিত্তশুদ্ধি আছে, তাহার আর কোন ধর্মে প্রয়োজন নাই। চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দু ধর্মেরই সার এমত নহে। ইহা সকল ধর্মের সার। ইসলাম ধর্মের সার, নিরীশ্বর কোমৎ ধর্মেরও সার।"

পুনরায়—"চিত্তশুদ্ধির প্রথম লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের সংযম। 'ইন্দ্রিয় সংযম'—ইতিবাক্যের দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে ইন্দ্রিয় সকলের একেবারে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে।"—(বিবিধ প্রবন্ধ। চিত্তশুদ্ধি—সংসদ সংস্করণ, পৃঃ ২৫৯)

প্রতাপ চিত্তজয় করেছে। শৈবলিনী চিত্ত জয় করতে পারেনি। তার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন ছিল। প্রায়শ্চিত্ত যদি সাধারণভাবে না দেখে, মনস্তত্ত্বমূলক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে বঙ্কিমের প্রতি অবিচারের সম্ভাবনা থাকে না। শৈবলিনীর এই প্রায়শ্চিত্ত কি চতুর্থ পরিচ্ছেদেই আরম্ভ হয়েছে ? সম্ভবতঃ নয়। তার গৃহ পরিত্যাগের পর থেকে চিত্তে জেগেছে অন্তর্দ্বন্দ্ব। একদিকে তীব্র সংস্কারের পিছুটান, অপর দিকে আগামী রূপোল্লাসময় প্রতাপ-মিলনের সম্ভাব্য আকাঙ্ক্ষা। এই দুয়ের টানা

পোড়েনে কি শৈবলিনীর অন্তর ব্যথিত হয়নি ? তা যদি না হতো, তবে পর্বতগুহায় চন্দ্রশেখরকে দেখবার জন্য সে রামানন্দ স্বামীকে বারবার অনুরোধ করতোনা। গৃহদাহের নায়িকা অচলার দোটানা মনোবৃত্তির সঙ্গে শৈবলিনীর আংশিক মিল আছে। এই দোলাচলচিত্তবৃত্তির মধ্যে প্রতাপকে সে স্বামীর আসনে বসাতে পারেনি। সেইসঙ্গে একথাও সত্য যে, সে ইন্দ্রিয় জয় করতে পারেনি। সে দ্বিচারিণী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে। এই দ্বৈধী মনোবৃত্তির জন্য তার বঙ্কিম প্রদত্ত শাস্তি। রূপজ মোহের অনলে নবকুমার সাগরে দেহ বিসর্জন দিয়েছিল, কুন্দ বিষ পান করেছিল, নগেন্দ্রনাথের সোনার সংসার ছারখার হয়েছিল—রোহিণীর রূপমুগ্ধ গোবিন্দলালের জন্য। রোহিণীকে বিদায় নিতে হল, গোবিন্দলাল সন্ন্যাসী হল। বঙ্কিম সাহিত্যের পাঠক আশা করি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, বঙ্কিম ইন্দ্রিয়ের অবাধ বিস্তার চাননি। তিনি মানুষকে বিশেষ কালবদ্ধ করে দেখেন নি, অথবা মানুষের জীবনের কোন একটি পর্য্যায়কে লক্ষ্য করে তিনি উপন্যাস রচনা করেন নি। তিনি সমগ্র মানবজীবনদর্শনের নিরপেক্ষ দ্রষ্টা।

বঙ্কিম চিত্তশুদ্ধির সম্পর্কে বলেন—"এই চিত্তশুদ্ধি মনুষ্যদিগের সকল বৃত্তিগুলির সম্যক স্ফূর্ত্তি, পরিণতি ও সামঞ্জস্যের ফল।"

[বিবিধ প্রবন্ধ। পৃঃ—২৬২]

"বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন সম্যক স্ফূর্ত্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য"— [ঐ পৃঃ— ৭৫]

"যখন মানুষের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা ঈশ্বরানুবর্ত্তিনী হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি।" [ধর্মতত্ত্ব পৃঃ—৬২০]

"স্থূল কথা, অনুশীলন ধর্ম greatest good of the greatest number, গণিততত্ত্বভিন্ন আর কিছুই নহে।"

[ঐ পৃঃ—৬৫৩]

উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলে, পাঠক বঙ্কিমের মানবিক মূল্যবোধ ও কর্তব্যজ্ঞান সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী উপলব্ধি করতে পারবেন! এ সমস্ত আলোচনার অনুসরণ করে কেউ যেন মনে না করেন, যে বঙ্কিম নিছক নীতি বা তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য উপন্যাস রচনা করেছেন। তিনি অমর কথাশিল্পী এবং সর্বত্র উপন্যাস অংশে তাঁর শিল্পী সত্তাই জয়যুক্ত হয়েছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তাঁর শিল্পী সত্তাই বিজয়মাল্যে ভূষিত হয়েছে। তবে তিনি "মঙ্গল সাধন ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি"—এ দুটোকে পৃথক জ্ঞান করতেন না। তাই একালের আনুবীক্ষণিক বিচারে বঙ্কিমের স্থানে অস্থানে অপব্যাখ্যা হয়—ঐ নীতি ও সৌন্দর্য্যের একক সত্তাকে দ্বৈতজ্ঞানের ভান করে।

নতুন পৃথিবী

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

ওরা কেন আসে কেন যায়
ওদের শান্তির নীড় ভেঙে গেছে ; কালের চিতায়
পুড়ে গেছে সুখ স্বপ্ন ক্ষুদ্র হৃদয়ের,
ওদের জীবনে নেই আলো, আছে অন্ধকার ঢের।
ওদের জীবন-নদী পথহারা, সাহারার বুকে
মিশেছে যে ; জীবনের দেওয়া নেওয়া সব গেছে চুকে।
হারিয়েছে ভাই বোন ভীড়ের মিছিলে,
সোনালী সবুজ আশা হারিয়েছে আকাশের নীলে

আর কি এ অন্ধকারে হে সূর্য্য সে সোনার আলোক
ফুটবে না ? আর নীল চোখ
দেখবে না সে আলোয় জীবনে কি আর ভাই বোন
আর সে সবুজ নীড় পাবেনা কি
আর গৃহ কোন্ ?
এই অন্ধকারে আর ফুটবে কি সে সোনার ছবি
সোনার আলোক ভরা সে সকাল
নতুন পৃথিবী।

মার্কো পলোর দৃষ্টিতে ত্রয়োদশ শতকের ভারত

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে তিন জন ইয়োরোপীয় বণিক্ ভেনিস নগরী থেকে পিকিং পর্যন্ত—তারপর সুমাত্রা, জাভা বার্মা, ভারত ও সিংহলের উপকূল ঘুরে পারস্য হয়ে ইটালীতে ফিরে গিয়েছেন বাণিজ্য করে, দৌত্য করে—তাঁরা হলেন, মার্কো পলো, তাঁর পিতা নিকোলো আর কাকা মেফিও। ছাব্বিশ বছর পরে সম্রাট কুবলাই খাঁর দরবারে ঐশ্বর্যের দীপ্তি আর ঔজ্জ্বল্য উপভোগ করে তাঁরা তাঁদের ভেনিসের পুরানো বাড়িতে ফিরে এলেন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে। তাঁদের পোষাক ছিল ছেঁড়া মোটা কাপড়ের। প্রাচ্য দেশীয় কাপড়ের পুটলী ছিল তাঁদের কাঁধে। দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্টে রৌদ্রবৃষ্টিতে ওদের গায়ের রঙ্ পুড়ে গিয়েছিল। মাতৃভাষা তারা প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। তাতারদের মত ছিল তাদের লম্বা দাড়ি আর পোষাক। তাঁদের ২৬ বছরের অনুপস্থিতিতে ভেনিস সহরও অনেক বদলে গিয়েছিল। তাঁরা প্রথমে তাঁদের বাড়ী খুঁজে বের করতে পারেন নি। কিন্তু শেষে যখন অনেক কষ্টে বাড়ী খুঁজে পেলেন, বাড়ীর দ্বার তাঁদের অভ্যর্থনার জন্যে খোলা হলো না। ভ্রমণে বেরিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের আত্মীয়রা এসে বাড়ী দখল করেছিল। তাঁরা যে জীবিত আছে একথাই তারা জানত না। অনেক ডাকাডাকিতেও কেউ বাড়ীর দ্বার খুলল না। তাদের বাড়ীর কুকুরই ঘেউ ঘেউ করে কামড়াতে এল তাঁদের। কোন রকমে মার্কো দরজা ঠেলে বাড়ীর ভেতর ঢুকে পড়লেন, আর তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাপ ও কাকা। বাড়ীর লোকেরা কেউ তাঁদের কথা বিশ্বাস করল না। শহরস্থিত অন্যান্য আত্মীয়রা খবর পেয়ে ছুটে এলেন। সব শুনে তারা তাঁদের কথা বিশ্বাস করলেন কিছুটা। সবাই মিলে একটা ভোজ সভার আয়োজন করলেন তাঁরা। ভোজের শেষে মার্কো পলো চাকরদের প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে দিয়ে তাঁদের জীর্ণ মলিন আলখাল্লা বের করলেন, আর ছুরি দিয়ে সেলাই কেটে হীরা, মুক্তা, পান্না খুলে দেখালেন। অবাক্ বিস্ময়ে সবাই তা দেখল, তখন আর তাঁদের সম্বন্ধে কারো সন্দেহ রইল না।

মার্কোপলোর জন্ম হয় ভেনিসে ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে। তার যখন বয়স ছয় বৎসর তাঁর বাবা আর কাকা বাণিজ্য করতে বেরিয়ে পড়েন, আর এগিয়ে যেতে যেতে কুবলাই খাঁনের রাজধানী পিকিং গিয়ে পৌছান। কুবলাইখানের দরবারে ওদের খুব আদর হয়। সম্রাট খৃষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে খুব উৎসুক হন। পোপের কাছে একশত পাদ্রী চেয়ে চিঠি লিখে নিকোলো আর তাঁর ভাইএর মারফত পাঠান। নিকোলো এ দৌত্য কার্যে সফল হন নি। কিন্তু ফিরে যাবার সময় তাঁর ছেলে মার্কো পলোকে নিয়ে চললেন। মার্কোর বয়স তখন মাত্র পনর বৎসর। ছেলে আর ভাইকে নিয়ে নিকোলো অনেক কষ্টে ফিরে গেলেন পিকিং। কুবলাই খাঁর দরবারে তাঁরা খুব সম্মানের আসনই পেয়েছিলেন। মার্কো চীনের একটি প্রদেশের শাসনকর্তাও হয়েছিলেন।

অনেক দিন পরে হঠাৎ পারস্যের রাজার (সম্পর্কে কুবলাইর ভাই এর নাতি) এক চিঠি পৌছল পিকিংএ। রাজার রাণী মারা গিয়েছিলেন। তিনি বিখ্যাত মোঙ্গল বংশের কন্যা ছিলেন। সেই বংশেরই একটি কন্যা চান তিনি। কুবলাই খাঁ ভাবলেন কি করে পাঠান যাবে। রাস্তা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। মার্কো পলো, তার বাপ ও কাকা প্রস্তাব করলেন সমুদ্রপথে তাঁরা কন্যাকে নিয়ে যেতে পারেন। কুবলাই খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হলেন। জাহাজে চড়লেন মার্কোপলো ধনরত্ন যা সঞ্চয় করেছিলেন সব নিয়ে। সুমাত্রা, জাভা, বর্মা, ভারতবর্ষ, সিংহল হয়ে পারস্য পৌছতে দুই বছরের বেশী সময় লেগে গেল। রাজা

ত্ত দিনে মারা গেছেন। নিকোলো রাজার ছেলের হাতে কন্যাকে সমর্পণ করে ইটালীর পথে যাত্রা করলেন।

ভেনিসে ফিরে গিয়ে কিছুকাল পরে দুর্ভাগ্য বশত মার্কো পলোকে জেলে কষ্ট পেতে হয়েছিল। কারাগারে বসেই তিনি তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত বলে যান। আর জেলের অন্য এক কয়েদী তা লিপিবদ্ধ করেন। মার্কোপলোর ভ্রমণবৃত্তান্ত ত্রয়োদশ শতাব্দীর এশিয়ার একটি প্রামাণ্য ইতিহাস। প্রথমে ইউরোপের লোকেরা এই ভ্রমণ বৃত্তান্তে বিশ্বাস করে নি। কিন্তু পরে যখন এশিয়ার ঐশ্বর্য সম্পর্কে আরও তথ্য সেখানে পৌঁছতে সুরু করল তখন মার্কোর ভ্রমণ কথায় তাদের প্রত্যয় ফিরে আসতে লাগল॥

মার্কোপলো বাংলা ও ভারতের অন্য জায়গা সম্পর্কে অনেক তথ্য রেখে গিয়েছেন। তিনি বলেছেন বাঙলা দেশের লোকেরা খুব পরাক্রমশালী ছিল। তাদের রাজাও ছিল খুব শক্তিমান্ আর দুর্দান্ত। যতদিন মার্কোপলো কুবলাই খাঁর দরবারে ছিল ততদিন পর্যন্ত কুবলাই খাঁ বাঙলাকে জয় করতে পারেন নি। বাঙলা ও মিশরের রাজার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সৈন্যদের যুদ্ধ হয় মার্কোপলো যখন ভারতে আসেন তার অনেক আগে। কুবলাই খাঁর দরবারে বসে বা তাঁর বীরত্ব কথার অন্তরঙ্গ শ্রোতা হিসাবেই মার্কোপলো এসব বৃত্তান্ত জানতে পেরেছিলেন। বাঙ্গালা ও মিয়েনের রাজার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সেনাদলের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন মার্কোপলো। সেই যুদ্ধে কুবলাই খাঁর যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছিল।

মার্কোপলো বলেছেন, বাঙলাদেশের লোকদের এক বিশেষ ধরণের ভাষা। তারা মূর্তি পূজা করে। এখানকার ষাঁড় প্রায় হাতীর মত উঁচু, কিন্তু তত প্রকাণ্ড নয়। অধিবাসীরা মাংস, দুধ আর ভাত খেয়ে থাকে—এসবই এখানে প্রচুর পাওয়া যায়। তুলোর চাষ এখানে প্রচুর। অন্যান্য প্রদেশের বণিকেরা এখানে নানা রকমের ঔষধ ও পণ্যদ্রব্য কেনার জন্যে আসে।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গারও বিবরণ তিনি দিয়েছেন। ভারতের উপকূলের সকল বন্দরেই তিনি নেমেছেন। ভারতবর্ষের জলবায়ু রীতিনীতির উপরও অনেক আলোকপাত করে গেছেন। তিনি বলেছেন ভারতের প্রচণ্ড তাপের জন্য লোকেরা প্রায় উলঙ্গ থাকে। রাজারা মূল্যবান্ পোষাক পরেন। গোবর দিয়ে ঘরবাড়ী লেপা হয়ে থাকে। মাটীর আসন শ্রেষ্ঠ আসন বলে গণ্য হয়। নারী পুরুষ সবাই দুই বেলা স্নান করে। স্নান না করে কেউ আহার করে না। ভারতের লোকেরা ডান হাতে খায়। আর বাঁ হাত দিয়ে নোঙরা পরিষ্কার করার কাজ করে। জলপানের জন্যে প্রত্যেকেরা পাত্র আলাদা। জলপাত্র মুখে লাগিয়ে কেউ জল পান করে না। জলের ঘটি মাথার উপর নিয়ে ঢক্ ঢক্ করে ওরা মুখে জল ঢেলে দেয়। খুব ন্যায়বিচারের সঙ্গে দোষীর শাস্তি হয়ে থাকে। ঋণ নিয়ে যে ঋণ শোধ করে না, তার শাস্তি বড় ভয়ঙ্কর। তাকে যদি উত্তমর্ণ একবার কুণ্ডলী এঁকে বন্দী করতে পারে তবে সে ঋণ শোধ না করে সেই কুণ্ডলীর বাইরে যেতে পারে না। যদি সে এই রকম যায় তবে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মার্কো পলো একবার নিজের চোখে দেখেছেন কেমন করে এক রাজাকে এক পাওনাদার কুণ্ডলী এঁকে বন্দী করেছিল। রাজা তার ঋণ শোধ না করে কুণ্ডলী থেকে বেরিয়ে যান নি। ভারতবর্ষে মার্কো পলো দেহবিজ্ঞান আর জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চা দেখে গেছেন। তিনি এদেশের অধিবাসীদের বিশেষ করে ব্রাহ্মণদের সচ্চরিত্রতার প্রশংসা করে গেছেন। তিনি বলেছেন—

ব্রাহ্মণেরা দেশের সর্বোত্তম আর সর্বপূজ্য। ব্যবসায়ী কোন প্রলোভনই তাদের মিথ্যা বলায় প্ররোচিত করতে পারে না—এমন কি প্রাণ গেলেও না। অন্যের দ্রব্য গ্রহণ করা বা অন্যকে বঞ্চনা করা তাঁরা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করেন। তাঁরা এক স্ত্রী নিয়েই তুষ্ট থাকেন। বহু বিবাহ তাঁরা পছন্দ করেন না। যদি কোন বিদেশী বণিক্ কোন ব্রাহ্মণের কাছে পরিচয় দেয় তখন সে ব্রাহ্মণ তার সব কাজ করে দেন, সে কাজের জন্য তিনি কোন পুরস্কার চান না, বা আশা করেন না। তাকে তিনি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব দিয়া থাকেন। তাঁরা মাংস খান, আর দেশে প্রস্তুত মদ্যও পান করেন। তাঁরা নিজে কোন জন্তু হত্যা করেন না, মুসলমানদের দিয়ে হত্যা করিয়ে নেন। অন্য জাতির লোকেদের থেকে নিজেদের পার্থক্য বোঝাবার জন্য তাঁরা গলায় এক ধরণের ব্যাজ অর্থাৎ সুতো পরে থাকেন। সুতোটি এমনভাবে পরেন যাতে এক হাতের নীচে দিয়ে

তা সামনে বুকের উপরও দেখা যায়, পিছন থেকে পিঠের উপরও দেখা যায়।

ভারতবর্ষের রাজগণ খুব ধনী ও শক্তিশালী ছিলেন, তাঁরা ধনরত্ন মণিমুক্তা আহরণে খুব মনোযোগী ছিলেন আর সকলের উপরে ছিলেন ন্যায় বিচার পরায়ণ।

দক্ষিণ ভারতের রাজাদের সম্বন্ধে আরো অনেক তথ্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন মার্কো পলো। এক রাজার সম্বন্ধে বলেছেন : তাঁর পাঁচ শত রাণী আর উপপত্নী ছিল। যখন তিনি কোন রমণীর সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন, তখনি তাকে পাওয়া চাই। এইভাবে তিনি তার ভাইয়ের স্ত্রীকেই অধিকার করেছিলেন। কিন্তু ভাই ছিলেন খুব ধীর স্থির ব্যক্তি। তাই তাকে নানাভাবে প্রভাবিত করলেন, যাতে তিনি কোন গোলমাল না করেন।

রাজা তার দেহ রক্ষী হিসাবে কয়েকজন সেনাপতি রাখেন। তারা রাজার জন্য উৎসর্গিত প্রাণ, তারা রাজার ইহকালের ও পরকালের সঙ্গী, তারা দরবারে রাজার সঙ্গে থাকে; মিছিলে পাশে পাশে থাকে। রাজ্যের সর্বত্র তাদের দোর্দণ্ড প্রতাপ। রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তারা রাজার শ্মশান চুল্লীতে ঝাঁপ দেয়, রাজার সঙ্গেই দগ্ধ হয়ে মরে, এই কার্য দ্বারাই তারা রাজার পরলোকের সঙ্গী হয়ে যায়।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির সম্বন্ধেও কিছু বিবরণ দিয়েছেন মার্কোপলো। প্রত্যেক মন্দিরেই অনেক দেবতার মূর্তি রয়েছে। এ দেবতাদের কাছে মা-বাপেরা তাদের কন্যাদের উৎসর্গ করে দেয়। দেবতার নিকট উৎসর্গিত কন্যাগণ মন্দির পুরোহিতের নির্দেশে দেবতার সেবায় যোগ দিতে বাধ্য। দেবতার কাছে ভোগ নিবেদনের সময়ে তারা গান করে ও বাজনা বাজায়। এই রকম ভাবে তারা দেবতার সেবা করে যতদিন না তাদের বিয়ে হয়ে যায়। ওরাই হয়ত ঐ যুগের দেবদাসী।

মালাবার ও গুজরাটের বর্ণনাও মার্কোপলো দিয়ে গিয়েছেন। মালাবারে ও গুজরাটে উভয় স্থানেই ভয়ঙ্কর জলদস্যুর আড্ডা ছিল। সেই দস্যুদের নৃশংসতা তাঁর বর্ণনায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

জেল থেকে মুক্তিলাভ করে মার্কো পলো ডোন্নাটা নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁর তিন কন্যা জন্মে—তাদের নাম ফস্টিনা, বেলেলা ও মোরেটা। চীন থেকে ফিরে আসার বার বছর পরে এক ফরাসী ভদ্রলোককে তার ভ্রমণ কাহিনীর এক কপি দান করেন। তাঁর কামনা ছিল ইউরোপের লোকেরা প্রাচ্যের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে জানুক। কিন্তু তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের মনেও তাঁর কাহিনী সম্পর্কে অবিশ্বাস ছিল। ১৩২৪ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি মৃত্যু শয্যায় তাঁরা তাকে সান্ত্বনা দিতে এসে অনুরোধ জানাল তাঁর কাহিনীর অবিশ্বাস্য বর্ণনাগুলি প্রত্যাহার করতে—যাতে তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে। কিন্তু মার্কো পলো শুধু বললেন, 'আমি যা দেখেছি তার অর্ধেকও বলি নি।'

মার্কো পলো ভারতবর্ষের সহর বা রাজ্যের যে সব নাম দিয়েছেন সে-সব থেকে স্পষ্ট প্রকৃত স্থানের পরিচয় জানা যায় না। তিনি তাতার বা মোঙ্গলদের দ্বারা ব্যবহৃত নামগুলিই ব্যবহার করেছেন। বঙ্গদেশকে বাঙ্গালা বলা হয়েছে। বাঙ্গালা ও মিয়েন-এর কোন্ রাজার সঙ্গে কুবলাই খাঁর সৈন্যের এত ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল তা বুঝা যায় না। মার্কো পলো রাজার নাম ব্যবহার করেন নি। কুবলাই খাঁর আমলে [১২৬০—১২৯৪] বাঙলার সিংহাসনে দুর্বল রাজারা রাজত্ব করতেন। লক্ষ্মণ সেন সুবর্ণ গ্রামে পালিয়ে যান, তাঁর পুত্র কেশব সেন বা পৌত্র মধু সেন [১২ ২] বীর রাজা বলে খ্যাতি লাভ করেননি। তবে মার্কোপলো কোন্ বাঙ্গলা রাজ্যের অধিপতির বীরত্ব কথায় মুখর হলেন! ত্রিপুরার রাজমালায় দেখা যায় বিদেশী আক্রমণকারীর সঙ্গে মহারাণী ত্রিপুরাসুন্দরীর ঘোরতর যুদ্ধ হয়েছিল ১২৩০ খ্রীষ্টাব্দে। ত্রিপুরা রাজ্য তখন বর্তমান বাঙলা দেশের পূর্বাঞ্চল ও বার্মার আরাকান প্রদেশ নিয়ে গঠিত ছিল। আরাকানকেই হয়ত মার্কো পলো মিয়েন বলেছেন। ত্রিপুরার সৈন্য বাহিনীতে প্রচুর প্রচুর হাতী ছিল। মার্কো পলো বাঙ্গালা ও মিয়েন রাজের হস্তী বাহিনীর অনেক প্রশংসা করেছেন। তারপর কুবলাই খাঁর সময়েই এ যুদ্ধ হয়েছিল। আর কুবলাই খাঁকেই হয়ত রাজমালাকার দিল্লীশ্বর বলে আখ্যাত করেছেন।

অস্য রাজ্যেশ্বরাবস্য স্থিরো বহু করপ্রদঃ ॥
বলাধ্যক্ষহতি দুর্বৃত্ত মহাবল পরাক্রমঃ।

তং রাজ্যানমঞ্জ্যায় দিল্লীশ্বরমুপাগতঃ ॥
ইতি শ্রুত্বা ততো রাজা ক্রোধাৎ প্রচলিতোন্দ্রিয়ঃ

বঙ্গে মেহের কুল সংপ্রেয়ামাস -মহাসেনাপতি এয়ম্। ীরাবস্থ নামক মেহের কুলের সমস্ত রাজ্য দিল্লীশ্বরকে ভেট াঠিয়েছিলেন। তাতে রাজা কীর্ত্তিধর মানিক্য ছংতুংকা ার রাজ্য কেড়ে নেন। তাঁর সাহায্যার্থেই দিল্লীশ্বর ুটে আসেন বাঙলা র জগাচার কিন্তু গৌড়েশ্বর বলা য়েছে। তখন রাজা ভয় পেয়ে সন্ধি করতে চান। কিন্তু ীরাঙ্গনা রাণী ত্রিপুরসুন্দরী রাজ্যের সে অপমান সহ ্যতে পারেন নি। তিনি সেনাপতি যুবরাজ রাজসূর্য ও সন্যগণকে ডেকে পাঠালেন।

মহাদেবী জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া
কি করিব পুত্র সব কহ বিবেচিয়া।
গৌড় সৈন্য আসিয়াছে যেন যমকাল
তোমার নৃপতি হইল বনের শৃগাল।
যুদ্ধ করিবার আমি যাইব আপনে
সেই জন বীর হও চল আসা মনে॥
রাণী বাক্য শুনি সবে বীর দর্পে বোলে।
প্রতিজ্ঞা করিল যুদ্ধে যাইবে সকলে॥ রাজমালা

রাণী সঙ্গে সৈন্যগণ যুদ্ধে প্রবেশিল।
ত্রিপুরা সুন্দরী রাণী হস্তী সোয়ার হইল॥
ছয় শত পঞ্চাশ সন ত্রিপুরা যখন
ত্রিপুরা সুন্দরী রাণী করে এই রণ॥

[ত্রিপুর বংশাবলী]

সেই যুদ্ধে আক্রমণকারীরা পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। রাজা কীর্তিধর মাণিক্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈন্য অশ্ব ও গজের মৃতদেহ দেখে স্তম্ভিত হয়েছিলেন ও আকাশে কবন্ধ দেখতে পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ ১২৪০ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধ হয়েছিল। কারণ ত্রিপুরাব্দ বঙ্গাব্দের তিন বৎসর আগে থেকে গণনা করা হয়।

মার্কোপলো অবশ্য অন্য জায়গায় বলেছেন বাঙ্গালা ও মিয়েনের রাজা ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দে কুবলাই খাঁর সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন। অন্যত্র বলেছেন, যতদিন তিনি কুবলাইর দরবারে ছিলেন ততদিন বাঙ্গলার রাজাকে পরাজয় করা সম্ভব হয় নি। এর মধ্যে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি রয়েছে। কুবলাই খাঁর প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্যবশতই হয়ত মার্কোপলো বাংলার রাজার পরাজয়কাহিনী লিখেছেন।

"হুগলী" নামের উৎপত্তি

শ্রীপরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশের সাহিত্য ও ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকারী হুগলী জেলা এ বিষয়ে সকলেই একমত। এই জেলার নাম কবে এবং কিভাবে সৃষ্টি হল সে বিষয়ে মোটামুটিভাবে দুইটি মত প্রচলিত আছে। সাধারণের মধ্যে যে মতটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় তাহা এই যে এতদঞ্চলে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে 'হোগলা' জন্মাইত এবং সেই জন্যই এই স্থানের নাম হুগলী বলা হয় [১]। অপর একটি মত অনুযায়ী পর্তুগীজ উপনিবেশ 'গোলিন' থেকে এই নাম প্রচলিত হয় [২]। উভয় মতেরই যাথার্থ্য বিদ্যমান তবে গত পাঁচ শত বৎসর ধরে ইতিহাস ও সমসাময়িক সাহিত্য আলোচনা করলে দেখা যায় যে শেষোক্ত মতটিই গ্রহণ যোগ্য। অবশ্য ভাগীরথীতীরবর্ত্তী হুগলী জেলা বা হুগলী সহরে হোগলা নিশ্চয়ই জন্মায় কিন্তু তাই বলে হুগলী নামটি কিন্তু যে খুব পুরাতন তা বলা চলেনা এবং পর্তুগীজ-

[১] Hooghly gzaetteer.

[২] হুগলী ও হাওড়ার ইতিহাস।

দের উপনিবেশের সময় থেকেই এই নামের প্রচলন এটাই ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা।

সর্ব্বপ্রথম এই নামের উল্লেখ পাওয়া যায় কবি বিপ্রদাস রচিত 'মনসামঙ্গল' কবিতায়। ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে রচিত এই কবিতায় ভাগীরথী বা গঙ্গার উভয় তীরবর্ত্তী অপর কয়েকটি নিকটবর্ত্তী স্থানের সঙ্গে এই নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু যে পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে ঐ কবিতা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় উহা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লিখিত হয় বলিয়া শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিমত। [৩] সেজন্য ঐতিহাসিক নজীর হিসাবে ঐ কবিতায় 'হুগলী' নামের উল্লেখ কোনও সাহায্য করেনা।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঠান সম্রাট ফিরোজ শাহের সময়ে জাফর খাঁ ভূদেও নামে এক হিন্দু রাজার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হন। এই ভূদেওকে কোনও কোনও ঐতিহাসিক "হুগলীর রাজা" বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু এই সব ইতিহাস অনেক পরবর্ত্তিকালে রচিত বলিয়া এর বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয় [৪]। ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'বাদশাহনামা' নামক দুইটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থে পর্ত্তুগীজদের উপনিবেশ বা বন্দরের কথা উল্লেখ থাকিলেও 'হুগলী' নামের উল্লেখ নাই [৫] ও [৬]। প্রায় একই সময়ে রচিত ফেরদৌসির বিবরণীতেও এই স্থানের পৃথক হুগলী নামে পরিচয় পাওয়া যায় না।

আনুমানিক ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং গোলাগঞ্জ বা ব্যবসাকেন্দ্র থেকেই তাঁরা উপনিবেশের নাম 'গোলিন' রাখেন। পরবর্ত্তীকালে বাংলা মুলুক ভ্রমণকারী প্রথম ইংরাজ Ralph Fitch প্রথম পর্ত্তুগীজ উপনিবেশকে 'হুগলী' নামে অভিহিত করেন। এথেকেই বোঝা যায় যে পর্ত্তুগীজদের দেওয়া নাম অনুযায়ী তিনিই প্রথম এই নাম তাঁহার বিবরণীতে ব্যবহার করেন। [৭]

এর পরবর্ত্তীকালে পর্ত্তুগীজদের প্রতিষ্ঠিত কনভেণ্ট Ogolym convent এর প্রস্তর ফলকে [৭] ১৫৯৪ খৃঃ লেখা থাকায় এই জাতিই যে এই নাম সৃষ্টির মূলে এতে কোনও সন্দেহ থাকে না। তবে মাত্র ৬০ বৎসর আগে ব্যাণ্ডেল চার্চ্চ পরিদর্শনকারী জনৈক ভদ্রলোক ঐ প্রস্তর ফলকটির সন্ধান পান নাই যদিও ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস্ জোশেফ উহা দেখিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। [৮] বর্ত্তমানকালে অনুসন্ধান করে শুধু এই মাত্র জানা গেল যে চার্চ্চটির স্থাপনের কয়েকবৎসর আগে উক্ত কনভেণ্ট স্থাপনা করা হয় এবং সামান্য পরিবর্ত্তন সাপেক্ষে উহা আজও বিদ্যমান।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিবরণীতে পর্ত্তুগীজের দখলে বন্দর এলাকার টোল (Toll) বা রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য 'বাক্স বন্দর' নামে একটি ক্ষুদ্র মহলের সৃষ্টি করেন [৯]। এমনকি এসময়ের কিছুকাল পরে মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকেও অনেক তদন্তের পর জানিতে হয় যে সাতগাঁও এর নিকটবর্ত্তী পর্ত্তুগীজ বন্দরকেই লোকে হুগলী বলে।

Ogulym বা Golin এই বানান থেকেই যে হুগলী নামের উৎপত্তি একথা আরও পরিষ্কারভাবে জানা যায় যদি পর্ত্তুগীজদের নিজস্ব উচ্চারণের পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করা যায়। এই জাতির উচ্চারণের স্বাভাবিক নিয়ম হচ্ছে কোনও শব্দের আগে [illegible] শেষের দিকে এক বা একাধিক অক্ষর উচ্চারণ না করা এবং উচ্চারণের প্রয়োজনাতিরিক্ত এক বা একাধিক অক্ষরের উল্লেখ করা। এ ছাড়া ভারতীয় কোনও শব্দকে ইয়োরোপীয় ভাষায় রূপান্তর করিতে উচ্চারণ বা বানানে আংশিক বিকৃতি সম্ভব। হুগলী এই নামটি কত রকম বানানে লেখা হয়েছে [১০]। বিভিন্ন ইতিহাসের পাতা থেকে উদ্ধার করা এই নামের

[৩] মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।
৪। Bengal past & present—vol III
৫। Ayinee Akbari
৬। Badshahnama

৭। Calcutta Review-vol IV
৮। One week at Bandel Church.
৯। Revenue Resource of Moghal Empire,
১০। Wilson's Glossaries of India terms.

নব ভারতের জীবন পুরোহিত

উপানন্দ

যে জিহ্বা, যে ওষ্ঠ জন্ম দিল শব্দকে, সে জিহ্বা, সে ওষ্ঠকে ফেলে রেখেই উড়ে চলে যায় শব্দ। একাই তাকে খুঁজতে হয় তার ইথারকে। একাই উড়ে যায় বিহঙ্গম তার নীড়কে ফেলে রেখে, চলে যায় তার সূর্য্যের দিকে। ফেলে রেখে যায় একটা পুরো হৃদয় স্মরণের নির্জ্জনতায়। যে শব্দ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে সমগ্র বিশ্বকে শান্তি ও মৈত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, যে শব্দ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে শব্দ আজ শূন্যে বিলীন। সে কণ্ঠ আজ নীরব। ভাবীকালের ঐতিহাসিক যাত্রাপথে যখন তোমরা মানব সভ্যতার নব অভ্যুদয় আনবে তখন প্রত্যক্ষ করবে সেই শব্দের দৈবী প্রভাব এরূপ বিশ্বাস আমার আছে।

ঈশ্বর প্রেরিত সেই শব্দ গ্রহণ করেছিল মর্ত্যকায়া, আজ সে কায়ামুক্ত—সর্ব্ব আবরণ তার জীর্ণ হয়ে ঝরে গেল ধুলার আসনে। তাকেই আমরা জেনেছিলাম মহাভারতের মহাজীবন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে তার জন্ম ১৪ই নবেম্বর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আর তার তিরোভাব নয়া দিল্লীতে ২৭শে মে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে বেলা দুটার সময়। প্রেম জানেনা সে কতখানি গভীর, যতক্ষণ না আসে বিদায়ের লগ্ন। বিরাট জনসমুদ্রের বুকে শোকের উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করে; দিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ক্ষেত্রের পার্শ্বে ২৮শে মে সায়াহ্নে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হোলো। মহান নেতারূপে তাঁর গৌরবময় ভূমিকা স্মরণ-মধুর। তিনি জাতির চির প্রণম্য, চির বন্দনীয়।

বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রতিনিধিবর্গ, শীর্ষস্থানীয় নরনারী ও বরেণ্য ব্যক্তিরা এসেছিলেন বিমান যোগে এই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের শবানুগমনে যোগদান করবার জন্যে। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এমন কি রাষ্ট্র সঙ্ঘের পতাকা অর্দ্ধনমিত তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। শোকাচ্ছন্ন সমগ্র বিশ্ব। অস্তমিত শতাব্দীর সূর্য্য। অস্তহিত মানব সভ্যতার অগ্রদূত। আমরা অসহায়। বাইবেলে উক্ত আছে—'Perfected soul unites with the creator.' এই মহান্ আত্মা সর্ব্বপ্রকার নিন্দা স্তুতি ও সমালোচনার উর্দ্ধে মৃত্যুর অতীতলোকে অমৃতময়।

পণ্ডিত জহরলাল শুধু ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জননায়কও ছিলেন। ভারতের পঁয়তাল্লিশ কোটি নরনারীর সংহতি শক্তি সুদৃঢ় করে গেছেন তিনি। পুষ্টিলাভ করেছে এই জাতি অর্দ্ধশতাব্দী ধরে তাঁরই বিরাট ব্যক্তিত্বের ছত্রচ্ছায়ায়। এলাহাবাদে যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই আনন্দ ভবন শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে। যে পরিবারে তাঁর আবির্ভাব, সে পরিবারের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, বিলাস

নব ভারতের জীবন পুরোহিত

উপানন্দ

যে জিহ্বা, যে ওষ্ঠ জন্ম দিল শব্দকে, সে জিহ্বা সে ওষ্ঠকে ফেলে রেখেই উড়ে চলে যায় শব্দ। একাই তাকে খুঁজতে হয় তার ইথারকে। একাই উড়ে যায় বিহঙ্গম তার নীড়কে ফেলে রেখে, চলে যায় তা অসীমের দিকে। ফেলে রেখে যায় একটা পুরো হৃদয় ক্রন্দনের নির্জনতায়। যে শব্দ অর্দ্ধশতাব্দী ধরে সমগ্র বিশ্বকে শান্তি ও মৈত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল, যে শব্দ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, সে শব্দ আজ শূন্যে বিলীন। সে কণ্ঠ আজ নীরব। ভাবীকালের ঐতিহাসিক যাত্রাপথে যখন তোমরা মানব সভ্যতার নব অভ্যুদয় আনবে তখন প্রকাশ করবে সেই শব্দের দৈবী প্রভাব এরূপ বিশ্বাস আমার আছে।

ঈশ্বর প্রেরিত সেই শব্দ গ্রহণ করেছিল মহাকায়া, আজ সে কায়ামুক্ত—সর্ব্ব আবরণ তার জীর্ণ হয়ে ঝরে গেল ধূলার আসনে। তাকেই আমরা জেনেছিলাম মহাভারতের মহাজীবন—পণ্ডিত জহরলাল নেহরু। এলাহাবাদে আনন্দ ভবনে তার জন্ম ১৪ই নবেম্বর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে আর তার তিরোভাব নয়া দিল্লীতে ২৭শে মে ১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে বেলা দুটার সময়। প্রেম জানেনা সে কতখানি গভীর, যতক্ষণ না আসে বিদায়ের লগ্ন। বিরাট জনসমুদ্রের বুকে শোকের উত্তাল তরঙ্গ মালা ভেদ করে, দিল্লীর রাজঘাটে মহাত্মা গান্ধীর সমাধি ক্ষেত্রের পাশে ২৮শে মে সায়াহ্নে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হলো। মহান নেতারূপে তাঁর গৌরবময় ভূমিকা স্মরণ মধুর। তিনি জাতির চির প্রণম্য, চির বন্দনীয়।

বিশ্বের নানা রাষ্ট্রের কর্ণধার ও প্রতিনিধিবর্গ, শীর্ষস্থানীয় নরনারী ও বহু ব্যক্তিরা এসেছিলেন বিমান যোগে এই বিরাট ঐতিহাসিক পুরুষের শবানুগমনে যোগদান করবার জন্যে। সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এমন কি রাষ্ট্রসংঘের পতাকা অর্দ্ধনমিত তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে। শোকাচ্ছন্ন সমগ্র বিশ্ব। অস্তমিত শতাব্দীর সূর্য্য। অন্তর্হিত মানব সভ্যতার অগ্রদূত। আমরা অসহায়। বাইবেলে উক্ত আছে—'Perfected soul unites with the creator.' এই মহান আত্মা সর্ব্বপ্রকার নিন্দা স্তুতি ও সমালোচনার উর্দ্ধে মৃত্যুর অতীতলোকে অমৃতময়।

পণ্ডিত জহরলাল শুধু ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জননায়কও ছিলেন। ভারতের পঁয়তাল্লিশ কোটি নরনারীর সংহতি শক্তি সুদৃঢ় করে গেছেন তিনি। পুষ্টিলাভ করেছে এই জাতি অর্দ্ধশতাব্দী ধরে তাঁরই বিরাট ব্যক্তিত্বের ছত্রচ্ছায়ায়। এলাহাবাদে যে গৃহে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই আনন্দ ভবন শতাব্দীর ঐতিহাসিক স্মৃতি বহন করছে। যে পরিবারে তাঁর আবির্ভাব, সে পরিবারের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য, বিলাস

ব্যসনের বৈশিষ্ট্য ও অহংমন্য আভিজাত্য একদিন মানুষের বৈঠকী গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছিল।

তাঁর শৈশব যে ভাবে অতিবাহিত হয়েছে, তাতে তাঁর পক্ষে আলালের ঘরের দুলাল, হওয়াই সম্ভাব্য ছিল কিন্তু তিনি তা হননি। ছেলে বেলায় তাঁর জননী স্বরূপরাণীর কাছে শুনতেন তিনি রামায়ণ মহাভারত। এই সব মহাকাব্যের মহান আদর্শ তাঁর শিশু মনে প্রভাব বিস্তার করতো। তাঁর ইচ্ছা হোতো তাদেরই মত একজন হোতে। স্বদেশের পাল পার্ব্বণ সমারোহে ছেলেবেলা থেকেই তিনি যোগ দিতেন, পুলকিত হয়ে উঠতেন স্বদেশের মৃত্তিকা সৌরভে। রোজ সন্ধ্যায় আনন্দ ভবনের চাতালে বসে বালক জহরলাল বৃদ্ধ মোবারক আলির কাছে শুনতেন বাবরের শেষ বংশধর বাহাদুর শার পুত্র আর নাতিদের হত্যাকাণ্ডের কথা—ইংরেজ ফৌজ কী নৃশংস ভাবেই না তাদের হত্যা করেছে দিল্লীর রাজপথে। বালকের চোখে জল আসতো। তিনি শুনতেন কেমন করে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে ইংরেজ, এই সঙ্গে মোবারক আলি যখন বলতো ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ আর তাঁর সহচর তাঁতিয়া তোপীর কথা, যখন বলতো নানা সাহেব আর স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রথম শহীদ মঙ্গল পাড়ের স্বদেশের জন্যে আত্মদানের কথা, তখন তার কোলে বসে তিনি অন্তরে স্পন্দন অনুভব করতেন।

মোবারকের কাছে আরব্য উপন্যাসের মজাদার কাহিনী শুনতে শুনতে তাঁর মনে হয়েছে আরব্য রজনীর বেপরোয়া পক্ষীরাজ ঘোড়াটায় চেপে সিন্দবাদ নাবিকের মত দূরে সুদূরে উধাও হয়ে যেতে। ফলে একদিন সে সুযোগ এলো। প্রাসাদপুরী আনন্দ ভবনের চারটি দেয়ালের বাইরে নতুন জগতের পরিচয় নেবার জন্যে তিনি সবার চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন আস্তাবল থেকে বাবার সাদা ধবধবে সুন্দর আরবী ঘোড়ার পিঠে উঠে। জোর কদমে ছুটল সে, উদ্দাম বেপরোয়া গতিবেগে সহরের ধূলি ধূসরিত পথ ধরে। ক্ষুদে ঘোড়সওয়ার জহরলাল সে বেগ সামলাতে পারলেন না। তাঁকে ফেলে রেখে ঘোড়া ফিরে এলো আস্তাবলে। বাবা মা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, একটা কিছু ঘটেছে এই আশঙ্কা হোলো। অনুসন্ধানীরা ছুটলো ছেলের খোঁজে। বেশী দূর যেতে হোলোনা। বালক জহর গায়ের ধুলো বালি ঝেড়ে নিজেই ফিরছিলেন ঘরে। সকলের মুখে তখন ফুটল হাসি। সবাই বলতে থাকে—বিজয়ী বালক! তুমি বুঝি ফিরলে নতুন দেশ জয় করে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে! বালক ওঠেন হেসে।

বাল্যকাল হোতে তাঁর ভারত আত্মার সঙ্গে পরিচয় হোতে থাকে। ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়েছিলেন স্বদেশের মুক্তির জন্যে, স্বজাতির ত্রাণ কল্পে। তাঁর বাল্য জীবনে কংগ্রেসের প্রাতঃসন্ধ্যা। তিনিই তাকে মধ্যাহ্ন তেজোদীপ্ত করেছিলেন উত্তরকালে। আরাম প্রকোষ্ঠে বসে ঐশ্বর্য্যের বস্তু সম্পদ উপভোগ করবার সময় তাঁর কানে আসতে থাকে পরাধীন ভারতবাসীর ওপর ব্রিটিশ শাসকবর্গের বর্ব্বর অন্যায় আচরণের কথা। তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠে। ট্রেণের যে সব কামরা ইংরেজদের জন্য নির্দিষ্ট সে সব কামরায় ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার ছিলনা। যারা প্রবেশ করতে যেতো, তাদের প্রহার করতো শ্বেতাঙ্গরা। এই রকম একজন ইংরাজ ভারতীয়কে খুন করেও কিভাবে নিষ্কৃতি পেয়ে গেল সেই সব গল্প শুনতে শুনতে শিশু জহরলালের অন্তরাত্মা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠতো, এর প্রতিকারের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি চঞ্চল হোতেন।

শিশুই ভাবী মানবের জনক এই মহান্ সত্য, তাঁর জীবনে উদ্ভাসিত। জন্মের পর এগারো বৎসর পর্য্যন্ত জহরলাল ছিলেন পিতার একমাত্র সন্তান, দুই কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। ছেলেবেলায় তাঁর পড়াশুনা সুরু হয় গৃহ শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর কাছে। বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। যখন তাঁর বয়স এগারো, তখন তাঁকে পড়ানোর জন্যে ডাঃ এ্যানি বেশান্ত পাঠিয়েছিলেন ইউরোপীয় শিক্ষক ফার্দিনান্দ ব্রুকসকে। উৎকৃষ্ট গ্রন্থপাঠের প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন এই গৃহশিক্ষকের কাছে। কবিতা পাঠের আগ্রহ আর কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁর মধ্যে ছিল ছেলেবেলা থেকে। তার জীবনে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গান্ধীজীর চেয়েও বেশী, একথা তিনি নিজেই বলেছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্পকলার দিকে অত্যন্ত আগ্রহ ছিল। ফার্দিনান্দ তাঁকে বিজ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট করেন। থিওসফির ওপর অনুরাগ এই শিক্ষকের জন্যেই তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। তাঁর বাল্যজীবনে ঘটেছিল রুশ-জাপান

যুদ্ধ। এ সময়ে তিনি ঘরে বসে তলোয়ার ঘুরোতেন আর ভাবতেন কেমন করে ভারতবর্ষকে যুদ্ধ করে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্ত করবেন। জাপানীদের জয় লাভ তাঁর অন্তরে জাগিয়ে তুলেছিল প্রগাঢ় জাতীয়তা বোধ আর দেশাত্মবোধ।

১৯০৫ সালে ১৯শে অক্টোবর পুত্র জহরলালকে পিতা মতিলাল বিলাতের হ্যারো স্কুলে ভর্তি করে মার্সেলিসের একটা হোটেলে এসে ওঠেন। রাত্রে পুত্রের জন্যে পিতার চোখে ঘুম নেই। কেটে গেল বিনিদ্র রজনী। পরদিন ভারতে যাত্রা করতে হবে। পুত্রকে লিখলেন—'তোমার মধ্যেই আমরা আমাদের ইহলোকের এবং অনাগত ভবিষ্যতের সমস্ত সম্পদ রেখে যাচ্ছি। একমাত্র তোমার মঙ্গলের জন্যই আমরা তোমার বিচ্ছেদ বেদনা সহ্য করছি। তোমার জন্য যে ব্যয় হবে, সেই প্রশ্নটা বড় নয়, কেন না সে অর্থ আমি এক বৎসরের মধ্যেই উপার্জ্জন করতে পারবো। তোমাকে প্রকৃত মানুষ করে গড়ে তোলাই বড় কথা। তোমাকে কোনরূপ শিক্ষা না দিয়ে প্রচুর ঐশ্বর্য্যের মধ্যে রেখে গেলে পাপ এবং স্বার্থপরতার কাজ হবে।... কোনরূপ গর্ব না করে বলতে পারি, নেহরু পরিবারের ঐশ্বর্য্যের বনিয়াদ আমি গড়ে তুলেছি। প্রিয়পুত্র, আমি আশা করি তুমি সেই ভিত্তি ভূমির ওপর সুমহান খ্যাতির প্রাসাদ গড়ে তুলবে। তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই'—পিতা মতিলালের এই আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে পণ্ডিত জহরলাল খ্যাতির নভোচুম্বী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করে গেছেন।

হ্যারো স্কুলে দুই বৎসর অধ্যয়ন করার পর ১৯০৭ সালে জহরলাল কেম্ব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে ভর্ত্তি হন। কেম্ব্রিজে তিনি তিন বৎসর ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে এই সময়ের কথা উল্লেখ করে পণ্ডিতজী বলেছেন—বহু বন্ধু সমাগম, কিছু পড়াশুনা ও খেলাধূলা এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিস্তার। আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপোস নিয়েছিলাম। আমার বিষয় ছিল রসায়ন, ভূবিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা কিন্তু আমার আগ্রহ ঐগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জীবনের সৌন্দর্য্যানুভূতিই আমাকে আকর্ষণ করতো। স্থূল ও অমার্জ্জিত রুচির ভোগলিপ্সাকে সংযত করে জীবন যাপন এবং জীবনের কর্মপ্রেরণার মধ্যে পূর্ণ উপভোগের আকর্ষণ ছিল বলে আমি জীবন উপভোগ করেছি এবং তার মধ্যে যে পাপ আছে একথা ভাবতে আমি অস্বীকার করেছি...

১৯১০ সালে প্রকৃতি বিজ্ঞানে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে গ্রাজুয়েট হয়ে কেম্ব্রিজ ত্যাগ করেন। এরপর দুই বৎসর লণ্ডনে থেকে একের পর এক আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১২ সালে ব্যারিষ্টারী পাস করে আর সাত বৎসর ইংলণ্ড প্রবাস শেষ করে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। এখানে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ। এই বৎসরে শ্রীমতী কমলা কাউলের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯১৮ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্যরূপে মনোনীত হন। এই সময় থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। ১৯২২ সালের মে মাসে প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তিনি কারারুদ্ধ হন। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লীতে অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে বারেবারে আত্মাহুতি দিয়েছেন, বারে বারে কারাবরণ করেছেন, শাসক শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন আর একাধিকবার নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে জাতিকে প্রেরণা দিয়েছেন আর শাসক শক্তির কাছে স্বাধীনতা দাবী করেছেন। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করলে, তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করেন. সেই থেকে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তিনি ভারতের নব জন্মান্তর ঘটিয়ে বিশ্ববাসীর সম্মুখে তাকে মহীয়ান্ করে তুলেছেন।

জীবের উপর ছিল তাঁর অত্যন্ত দরদ। তাঁর আত্মজীবনী থেকে এই সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'অবসর বিনোদনের জন্য আমি কখনও শিকারে যাইতাম। কিন্তু ইহাতে আমার বিশেষ যোগ্যতাও ছিলনা, আকর্ষণও ছিলনা।...একবার একটি কৃষ্ণসার মৃগ শিশু শিকার করিয়া আমার শিকারে যে সামান্য উৎসাহ ছিল তাহাও নিবিয়া গেল। সেই মরণাহত নিরীহ মৃগ শিশু আমার পায়ের তলায় পড়িয়া অশ্রু সজল আয়তনেত্রে করুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতর দৃষ্টির স্মৃতি এখনও আমাকে প্রায়ই উন্মনা করিয়া তোলে।' জীবে প্রেম ও করুনাই তাঁকে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দিকে আত্ম নিয়োগ করেছিল। মৃত্যুকালে একমাত্র কন্যা ইন্দিরা গান্ধী, দুই দৌহিত্র রাজীব ও সঞ্জীব, দুই ভগ্নী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও কৃষ্ণা হাতিসিং আর অসংখ্য অনুচর পরিচর রেখে গেছেন। বিশ্ব শতাব্দীতে সাম্প্রতিক

কালে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যজগতের মধ্যে যে নতুন বোঝা পড়া সুরু হয়েছে, তার মধ্যে আর আমরা পণ্ডিতজীকে পাবোনা, আমাদের কোন ভালোবাসা আজ তাঁকে ধরে রাখতে পারলো না, আমাদের কোন প্রয়োজন আর্জ আর রচনা করতে পারলোনা তাঁর মহাপ্রস্থানের পথের বাধা।

তোমরা যখন স্বাধীন চিন্তার উপাসনা আরম্ভ করবে তখন অনুধাবন করতে পারবে তাঁর কতখানি মানসিক ঐশ্বর্য্য ছিল, তাঁর ভেতর ছিলনা জাতি বিদ্বেষ, তিনি ছিলেন মানব প্রেমিক—সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের অন্যতম জীবন-পুরোহিত। তোমরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভবিষ্যৎ ভারতকে অমরাবতী করে তোলো এই আমার নিবেদন।

তুলসীদাস বলেছেন :—

'তুম্ যব জগ্ আও, জগ্ হসে তুম্ রোও।
এসা কাম্ করছে' চলো.
তুম্ জগ রোও তুম্ হসে।

তোমরা এমন কাজ জগৎ সংসারে করে যাও যেন মৃত্যুর সময়ে তোমরাও পণ্ডিতজীর মত হাসতে হাসতে চলে যেতে পারো আর জগৎবাসী তোমাদের বিয়োগে এম্নি ক্রন্দন করে ওঠে।

—

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত

দী কাউণ্ট অফ মণ্টি ক্রিষ্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৭)
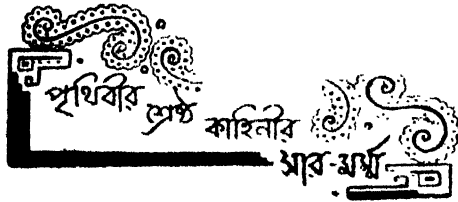
জাহাজের উপর থেকে উত্তাল-তরঙ্গময় সাগরের জলে ফেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে দান্তে অতল তলে তলিয়ে গেলেও, কিছুক্ষণ বাদেই সে সুকৌশলে তার আপাদমস্তক-জড়ানো চাদরের বন্ধনীর দড়ির ফাঁস কেটে নিজেকে মুক্ত করে জলের বুকে ভেসে উঠে রাতের অন্ধকারে প্রহরীদের নজর এড়িয়ে সন্তর্পণে সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চললো—প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অজানা যে কোনো একটা আশ্রয়ের সন্ধানে। দীর্ঘকাল জাহাজে নাবিকের কাজ করার ফলে, সাঁতারে সে ছিল বেশ পটু···কাজেই প্রাণপণ শক্তিতে সে অকূল-সমুদ্রে সাঁতার কেটে চললো। এমনিভাবে বহুক্ষণ সাঁতার কেটে পালিয়ে এসে সে অবশেষে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত অবস্থায় আশ্রয় নিলো সাগরের বুকে নিরালা-নির্জ্জন ছোট একটা দ্বীপে। দ্বীপে উঠে ভগবানকে ডেকে সে বারবার বললে,—দয়াময় ঈশ্বর···তোমার অনন্ত দয়ায় যখন বন্দী-দশার দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পেয়েছি—প্রাণে বেঁচেছি তখন বুঝছি এ যাত্রায় পরিত্রাণ পাবো!···কিন্তু আমার বুড়ো বাপ? ···মার্সেডিজ্?···তারা বেঁচে আছে তো?···কি তাদের অবস্থা ইদানীং?··· এই সব ভাবতে ভাবতেই দান্তের দুচোখ জলে ভরে উঠলো···তারপর কখন যে ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে বাকী রাতটুকু কেটে গেল—দান্তের কোনো খেয়ালই নেই!

পরের দিন একদল চোরা-কারবারী তাদের জাহাজে চড়ে এ পথে চলেছিল···তারা হঠাৎ সাগরের বুকে এই নিরালা দ্বীপে অসহায়-অবস্থায় দান্তেকে দেখতে পেয়ে, তাকে তুলে নিলে নিজেদের জাহাজে। তবে দান্তেকে দেখে তাদের মনে সন্দেহ হলো···কৌতূহল-ভরে প্রশ্ন করলে,—তোমার মাথায় লম্বা চুল আর মুখে ইয়া-লম্বা দাড়ি-গোঁফ দেখছি!···নিশ্চয় তুমি ডাকাত কিম্বা বোম্বেটে-দস্যু!

দান্তে বললে,—না, আমি ডাকাত নই···বোম্বেটে-দস্যুও নই!··বরাত-দোষে, সমুদ্রে জাহাজ-ডুবি হবার ফলে কোনোমতে সাঁতরে ভেসে এসে অজানা এই দ্বীপে উঠে প্রাণ বাঁচিয়েছি! তবে, মাথার এই লম্বা চুল আর মুখের দাড়ি-গোঁফ···এর কারণ,—আমি আজ দশ বছর হলো একটি সত্যপণ করেছি সে পণ রক্ষা না হওয়া পর্য্যন্ত এই দশ বছর মাথার চুল ছাঁটিনি, দাড়ি-গোঁফ কামাইনি।

চোরা-কারবারীরা বললে,—বটে!

দান্তে শুধোলো,—এখন কত সাল চলেছে? আজ কোন সালের কোন তারিখ?

চোরা কারবারীরা বললে,—এখন ১৮২৯ সাল চলেছে, আজ হলো—ফেব্রুয়ারী মাসের ২৮শে তারিখ!

মনে মনে হিসাব করে দান্তে ভাবলো,—আমার কয়েদ-খানায় বাস আজ চৌদ্দ বছর পূর্ণ হলো!···কিন্তু, বাবা? ···মার্সেডিজ্?···তারা কি এ দীর্ঘকাল আমাকে না দেখে, কোনো খোঁজখবর না পেয়ে বেঁচে আছে?···তাছাড়া ড্যাঙ্গলার্স?···ফার্নান্দ?···হাকিম ভিলেফোর্ট?···যে তিনটে দুর্বৃত্তের জন্য বিনাদোষে আমার এমন দুর্ভোগ-দুর্দ্দশা··· যখন বেঁচে ফিরেছি, তাদের উপর কড়ায়-গণ্ডায় এর শোধ

তুলবো ! সে শোধ না তোলা পর্যন্ত আমি কোনোমতেই তৃপ্তি পাবো না !

চোরা-কারবারীদের জাহাজে এসে দান্তে এতকাল বাদে তার মাথার চুল ছাঁটলো···দাড়ি-গোঁফ কামালো ! চোরা-কারবারীরা দান্তেকে দিলে নাবিকের পোশাক···এ ব্যবস্থার ফলে, তার চেহারা হলো নতুন মানুষের মতো !

এমনিভাবে চোরা-কারবারীদের জাহাজে চড়ে, তাদেরই দলের লোক হয়ে দান্তের দিন কাটে···সকলে তাকে ভালোবাসে···দান্তেও তাদের বন্ধুর মতো দেখে।

চোরা-কারবারীদের সঙ্গে জাহাজে যাবার কদিন পরে সাগরের প্রান্তে বহুদূরে জমির রেখার সন্ধান মিললো।

দান্তে শুধোলো,—ঐ দূরে···ওটা কোন্ দেশ ?

চোরা-কারবারীদের লোকজন বললে,—ওটা হলো মণ্টি-ক্রিস্টো দ্বীপ।

মণ্টি ক্রিস্টো !···

দান্তের মন উৎসাহে মেতে উঠলো। ঐ দ্বীপেই তো এ্যাবে ফারিয়ার ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডার !···ভগবানের অসীম দয়া ···নাহলে ও দ্বীপ পাবো কেন—বিনা সন্ধানে !

কদিন পরে চোরা-কারবারীদের জাহাজ ভিড়লো মণ্টি ক্রিস্টো দ্বীপে···অসুখের অছিলা করে দান্তে এ দ্বীপে রয়ে গেল···জাহাজে গেল না···চোরা-কারবারীদের বললে,— আমার শরীর খুব খারাপ···জাহাজে পাড়ি দেওয়া সহ্য হবে না···আমি এখানে পড়ে থাকি। যদি বাঁচি—তোমরা ফেরবার পথে এখানে সন্ধান করে আমাকে আবার জাহাজে তুলে নিও।

চোরা-কারবারীদের জাহাজে থাকবার সময় দান্তে পেয়েছিল প্রচুর গুলি-বারুদ···সেগুলি সবই দান্তে কাছে রাখলো···তাছাড়া কিছু অস্ত্র হাতিয়ারও সঙ্গে নিলো··· বললে,—যদি বাঁচি···দরকার হতে পারে !

চোরা-কারবারীরা দান্তেকে মণ্টি ক্রিস্টো দ্বীপে রেখে জাহাজ নিয়ে চলে গেল। তাদের জাহাজ চোখের আড়ালে মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দান্তে উঠলো দ্বীপে··· ভাবলো,—কি করে সে ঐশ্বর্য্যের সন্ধান পাবো ?···

এ্যাবে ফারিয়া যে হদিশ দিয়েছিলেন, সেই হদিশ মেনে ঘুরতে ঘুরতে সে এলো বড় একটি পাহাড়ের সামনে ! ফারিয়া বলেছিলেন,—পাহাড়ের পিছনদিকে এক গুহার মধ্যে আছে তাঁর রত্ন-ভাণ্ডার !

পাহাড়ের পিছনদিকে এসে দান্তে বারুদের সাহায্যে পাহাড়ের পাথর ফাটালো···তারপর সেই ফাটলের রন্ধ্রপথে খানিক এগিয়েই সে দেখলো এক গুহা···গুহার মধ্যে ঢুকে দেখে দীর্ঘ সোপান-শ্রেণী—সোজা পাহাড়ের নীচে নেমে চলে গেছে।

সিঁড়ি দিয়ে ক'ধাপ নেমে দান্তে দেখে—সামনেই আরেকটি গুহা ! দান্তের সঙ্গেই ছিল ছোট গাইতি···সেই গাইতি দিয়ে গুহার মুখের পাথরে ঘা মারতেই কিছুক্ষণ বাদে পাথরের চাঙড় খশে গিয়ে গাইতি লাগলো কাঠের গায়ে ! দান্তে বুঝলো,—নিশ্চয় কোনো কাঠের সিন্দুক আছে ওপাশে !

উৎসাহে মেতে এগিয়ে গিয়েই দেখলো—সিন্দুক সত্যই আছে···কাঠের প্রকাণ্ড সিন্দুক—লোহার পাত মুড়ে আঁটা ! সজোরে গাইতির ঘা মেরে সিন্দুকের মোড়ক খুলে ডালা তুলেই দান্তে দেখে—হীরা-মণি-মাণিকের স্তূপ···তাছাড়া প্রচুর সোনার মোহর···যেন সেই আলাদীনের গল্পের রত্ন-ভাণ্ডার ! আনন্দে আত্মহারা হয়ে দু'হাতে মুঠো ভরে তুলে দেখে দান্তে বলতে লাগলো,—এতদিনে বরাত ফিরলো তাহলে !···এর দৌলতে নতুন জীবন···খ্যাতি···প্রতিপত্তি··· সুখ···শান্তি···সবই পাবো···এমন কি, সমাজে সবার উপরে আসন পাবো···তারপর শোধ নেওয়া···কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ! যারা আমার এতদিনের অসহ্য নরক-যাতনার জন্ত দায়ী, তাদের উপর সেই সব অন্যায়-অপকর্মের চূড়ান্ত শোধ নিতে পারবো !···ভগবান আমার সহায় !

ভগবান সত্যই সহায় !···দুরন্ত সাগরের মাঝে নিরালা মণ্টি-ক্রিস্টো দ্বীপ থেকে প্রচুর সোনার মোহর আর দামী-দামী হীরা-মণি-মাণিকের বিপুল সম্ভার নিয়ে দান্তে ফিরলো ফ্রান্সে। দেশে ফিরে এসে খবর নিয়ে জানলো—সুদীর্ঘ এই চৌদ্দ বছরের মধ্যে, তার বুড়ো বাবা সরকারী কয়েদ-খানায় বন্দী-অবস্থায় অনাহারে-দুর্দশায় প্রাণ হারিয়েছেন ···তার জাহাজের মালিক মনিব মোরেল্ বেচারী দান্তেকে জেল থেকে খালাশ করবার চেষ্টা করেছিলেন বলে—তাঁর পশার-প্রতিপত্তি হারিয়েছেন···শয়তান ড্যাঙ্লার্শ আপাততঃ প্যারিসে পরম সুখে-স্বচ্ছন্দে বসবাস করছে— সে এখন লাখপতি মহাজন—নামজাদা ব্যাঙ্কের মালিক··· জেরার্ডেরও ইতিমধ্যে পদোন্নতি হয়েছে—সে এখন প্যারিসের সরকারী-আদালতের প্রধান-বিচারক···ফার্নান্দও ইদানীং খুবই প্রতিপত্তিশালী হয়েছে—সরকারী-ফৌজে কাজ করে বহু অর্থের মালিক হয়ে সেও প্যারিসে দিব্যি জাঁকিয়ে বসেছে···বেচারী মার্সেডিজ্ কিন্তু দান্তের কারা-গমনের পর সুদীর্ঘ দেড় বছর মনের দুঃখে চোখের জল ফেলে দিন কাটিয়েছে—তখন সবাই তাকে বুঝিয়েছে যে কারাগারে বন্দী দশাতেই দান্তের জীবনান্ত হয়েছে···তাই শেষ পর্য্যন্ত লোকের কথাতেই সে ফার্নান্দকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছে !

মার্সেডিজের খবর শুনে নিশ্বাস ফেলে দান্তে মনে

মনে বললে,—হায় নারী···তুমি এমন চটুল···এমনই দুর্বল!

ভ্যান্‌লার্ণ, ফার্নান্দ, এবং জেরার্ড···এ তিনজনের ভাগ্যোন্নতির পরিচয় পেয়ে দাস্তে ভাবলো,—মৃত্যু তো চকিতের ব্যাপার!···আমাকে যে দুর্ভোগ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে, ওদেরও তেমনি যাতনায় বিঁধে পলে-পলে মৃত্যুর দ্বারে পাঠাবো! আজ আমি বিপুল সম্পদের মালিক···আমাকে কাজের মানুষ হতে হবে।···দুর্জ্জনকে শাস্তি দেবার শক্তি ভগবান নিশ্চয় আমাকে দেবেন!

[ক্রমশঃ
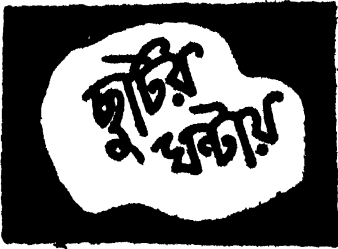
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের যে মজার খেলাটির কথা বলছি, সেটি থেকে শুধু আনন্দলাভই নয়, বরং বিজ্ঞানের এমন একটি বিচিত্র কারসাজির পরিচয় পাবে—যেটি ব্যবহারিক-জীবনে সকলেরই বিশেষ কাজে লাগবে।

ধরো, ছুটির দিনে বাড়ীতে হঠাৎ কোনো গণ্যমান্য অতিথি এসে হাজির···তাকে খাতির-যত্ন করে সাদরে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে বাসনের সিন্দুক থেকে রূপোর তৈরী বাসনপত্র বার করে মা তোমাদের কাউকে হাতের কাছে পেয়ে ফরমাশ করে বললেন,—"ওরে, চটপট এগুলো মেজে-ঘষে ঝকঝকে করে দে তো···মানী-গুণী অতিথি এসেছেন বাড়ীতে···যোগ্য-ব্যবস্থা করতে হবে তো তাঁর জন্য!"

মায়ের কথা শুনে তুমিও হয় তো তখনি মেতে গেলে—রূপোর তৈরী সেই সব বাসনপত্র মেজে-ঘষে পালিশ করে আগাগোড়া দিব্যি ঝকঝকে-তকতকে একেবারে নতুনের মতো জৌলুশদার চেহারা ফুটিয়ে তুলতে। কিন্তু কাজ করতে বসেই দেখলে যে রূপো-পালিশের (Silver-ware Polishing Lotion) লোশনের কৌটোটি দীর্ঘদিন অব্যবহারের কারণে ভাঁড়ার-ঘরের তাকের কোণে পড়ে থাকার ফলে বেবাক শুকিয়ে নিঃশূন্য হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। অথচ, এদিকে অতিথি চটপট চলে যাবেন বলে মায়ের এমন কড়া তাগাদা যে বাড়ী ছেড়ে চট্ করে দৌড়ে গিয়ে বড় রাস্তার মোড়ে বাজার থেকে রূপো-পালিশের নতুন কৌটো কিনে আনবে, তারও সময়-সুযোগ মিলছে না কোনমতেই। কাজেই এমনি সঙ্গিন-অবস্থায়, কি উপায়ে চটপট অতি সহজে সুষ্ঠুভাবে রূপোর বাসনপত্র সাফ করার কাজ হাসিল করতে পার—বলো তো?

শোনো তাহলে—সেই উপায়ের কথাই বলি। খুব সহজে এবং আগাগোড়া পরিপাটিভাবে রূপোর তৈরী যে কোনো সামগ্রী ঝকঝকে-তকতকে জৌলুশদার এবং সাফ্-সুতরোর জন্য বিশেষ-ধরণের যে উপায়টি আছে, একালের বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন—'Electrolytic Cleaning' বা 'বৈদ্যুতিক-প্রক্রিয়ায় পরিশোধন পদ্ধতি'। অর্থাৎ, আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে বিশেষ-ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে, সমগোত্রের বিবিধ-উপকরণ-বিশিষ্ট এবং কেবলমাত্র উৎকৃষ্টতম অণুবীক্ষণ যন্ত্রে (Visible only through a good and powerful microscope) দেখতে পাওয়া যায় এমনই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'প্রাণময়-কোষের' (The Living Cell) বিচিত্র রূপান্তর ঘটে বলেই ধাতু-নির্ম্মিত যে কোন পদার্থকে এভাবে পরিশোধন করা যায়। কিন্তু এ সব তো হলো—বিজ্ঞানের রহস্যময় তথ্য···আসলে হাতে-কলমে কাজ করে এমন আজব কাণ্ড কি উপায়ে চোখের সামনে ঘটানো যায়, আপাততঃ, তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।

এ কাজ হাসিল করতে হলে, টুকিটাকি যে সব ঘরোয়া সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন গোড়াতেই তার ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। এ সব সামগ্রী জোগাড় করা এমন কিছু কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়···সামান্য চেষ্টা করলেই তোমাদের প্রত্যেকের বাড়ীতেই এ সব সাজসরঞ্জাম সহজেই মিলবে। অর্থাৎ, এই আজব-কারসাজির জন্য চাই—প্রয়োজনমতো বড়, ছোট বা মাঝারি সাইজের একটি এ্যালুমিনিয়ম-ধাতুর তৈরী গামলা (Alluminium Bowl), রূপোর তৈরী সামগ্রী, একপাত্র ফুটন্ত গরম জল (Boiling water), খানিকটা রান্নার গুঁড়ো নুন (Some cooking salt) আর কেক-তৈরীর উপযোগী 'বেকিং-পাউডার'। তবে 'বেকিং-পাউডার' জোগাড় করার অসুবিধা ঘটলে বা অভাবে, রান্নার নুন আর 'বেকিং-পাউডারের' বদলে দু'এক মুঠো কাপড়-কাচা বা বাসন-মাজার উপযোগী 'গুঁড়ো-সোডা' (a handful of washing soda) হলেও, এ কারসাজি দেখানো চলবে—এতটুকু ব্যাঘাত বা অসুবিধা ঘটবে না। এ সব সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ হবার পর, আসল কারসাজির পালা।

কারসাজি সুরু করবার সময়, প্রথমেই উপরে যেমন

দেখানো হয়েছে. ঠিক তেমনিভাবে এ্যালুমিনিয়ামের গামলাটির ভিতরে রুপোর-তৈরী সামগ্রীগুলি সাজিয়ে রাখো…তবে নজর রেখো—প্রত্যেক রুপোর-তৈরী সামগ্রী যেন গামলার এ্যালুমিনিয়াম ধাতুর স্পর্শ পায় (all the silver-articles are in contact with the alluminium)। এবারে ফুটন্ত-গরম জলের পাত্রে 'গুঁড়ো-সোডা' কিম্বা 'বেকিং-পাউডার' আর গুঁড়ো-নুন ফেলে ভালো করে গুলে (stirring) জলে মিশিয়ে নাও। এ-ভাবে 'গুঁড়ো-সোডা' বা 'বেকিং-পাউডার আর গুঁড়ো-নুন' মেশানোর নিয়ম হলো—এক পাইট (one pint) ফুটন্ত-গরম জলে চায়ের-চামচের এক চামচ পরিমাণ গুঁড়ো মেশানো—এ হিসাবের যেন ব্যতিক্রম না ঘটে সেদিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা দরকার। তাছাড়া আরো একটি বিষয়ে বিশেষভাবে নজর রাখা চাই। সেটি হলো—রুপোর-তৈরী প্রত্যেকটি সামগ্রী যেন আগাগোড়া এ্যালুমিনিয়াম-গামলার জলে চোবানো থাকে। কারণ, এ কাজে ত্রুটি ঘটলে, রুপোর তৈরী সামগ্রীর যে-অংশটি গামলার-জলের উপরে ভেসে থাকবে, যথাযথভাবে না-চোবানোর ফলে, সেই অংশটিতে পালিশের ঝকঝকে-জৌলুশ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠবে না…অ-পরিপাটি ও মলিন দেখাবে। কাজেই, এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

যাই হোক, এ্যালুমিনিয়ামের গামলায় গুঁড়ো-মেশানো ফুটন্ত-গরম জলে রুপোর সামগ্রীগুলিকে কয়েক মিনিট পুরোপুরি চুবিয়ে রাখার পর, সেগুলিকে জল থেকে তুলে, একটুকরো শুকনো নরম-কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে আগাগোড়া ঝরঝরে করে মুছে নাও তাহলেই দেখবে—মলিন-অপরিচ্ছন্ন রুপোর-তৈরী সামগ্রীগুলি সদ্য-দোকান-থেকে-কেনা নতুন জিনিষের মতোই দিব্যি ঝকঝকে-তকতকে পরিপাটি ও জৌলুশদার-পালিশমণ্ডিত হয়ে উঠেছে—একালের বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত অভিনব-রহস্যময় Electolytic Cleaning' বা 'বৈদ্যুতিক-প্রক্রিয়ায় পরিশোধন-পদ্ধতির' কারসাজিতে।

কারসাজির আজব-রহস্যের সন্ধান তো পেলে, এবারে নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ছাখো—এর গুণাগুণ!

—

মনোহর মৈত্র

১। চিত্র-রচনার হেঁয়ালি
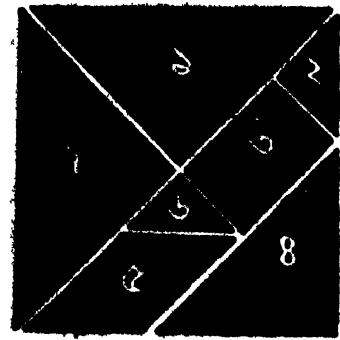
আমাদের চিত্রকর-মশাই সেদিন একখানা হেঁয়ালি-ছাঁদের আজব-ছবি এঁকে এনেছেন—তার নমুনা উপরেই দেখতে পাচ্ছো। উপরের ছবিতে ছোট-বড় নানান্ ছাঁদের যে কালো-রঙের সাতটি টুকরো দেখছো, চিত্রকর-মশাই বলছেন—সেগুলি যদি বুদ্ধি খাটিয়ে সুকৌশলে যথাযথভাবে সাজিয়ে বসাতে পারো তো দিব্যি-সুন্দর পথ-চলতি মানুষের একটি আজব-ছবির সন্ধান পাবে। এ ছবি ছাড়াও, একটু চেষ্টা করলেই, উপরের ঐ সাতটি কালো-রঙের টুকরোকে সামান্য অদল-বদল করে সাজিয়ে বসিয়ে, পথে পা-পিছলে পড়ে যাবার ভঙ্গীতে অন্য একটি মানুষেরও চিত্র-রচনাও সম্ভব হবে। দপ্তরে সবাই চেষ্টা করেছেন চিত্রকর-মশাইয়ের এই আজব হেঁয়ালি-চিত্রের রহস্য-সন্ধানের জন্য—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কোনো মীমাংসাই করতে পারেন নি কেউ! তোমরা ছাখো তো চেষ্টা করে—কোনো উপায়ে এ ছবির সঠিক-সন্ধান পাও কিনা। যদি পাও তো, অবিলম্বে উপরের ঐ কালো-রঙের সাতটি

টুকরোকে যথাযথভাবে সাজিয়ে পরিষ্কার একখানি কাগজে সেঁটে সোজা পাঠিয়ে দাও আমাদের দপ্তরে। চিত্রকর-মশাই যাদের পাঠানো ছবি দেখে বলবেন, সঠিক হয়েছে··· আগামী সংখ্যায় তাদের প্রত্যেকের নাম ধাম আমরা ছাপিয়ে দেবো।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা:

পাঁচটি অক্ষরেতে নাম আছে যার,
বলতে কি পারো ভাই, কিবা নাম তার ?
প্রথম, দ্বিতীয় নিলে খুবই কষ্ট হয়,
প্রথম, তৃতীয় নিয়ে সকলেই খায়।
প্রথম, চতুর্থ ছাড়া কবিতা না হয়,
দ্বিতীয়, চতুর্থ নিয়ে 'রব' উঠে যায়।
চতুর্থ, দ্বিতীয় বিবাহেতে আসে,
চতুর্থ, পঞ্চম হয় বারো মাসে।
ভাল করে ভেবে দেখো, জবাব কি আছে,
সহজেই মিলিবে তা নিজেদেরই কাছে !

রচনা : ওঙ্কারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বালী)

৩।
বাদ্য-বিশেষ হয় ভাই, নামটি তিনাক্ষরে,
ইংরাজীতে বোঝায় আইন, নিলে শেষাক্ষরে
দ্বীপের নাম বোঝায়, মধ্যমাক্ষর ত্যাগে,
সমষ্টি বোঝাতে হলে, আদ্যক্ষরটি ভাগে !
প্রথমাক্ষরের শ্রীচরণে শত প্রণাম জানাই
কি হবে উত্তর ঠিক, বলো দেখি ভাই !

রচনা : দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর :

১।

প্রথম কলমের নীচের ছবিতে যেমনভাবে চারটি ছোট এবং চারটি বড় সাইজের দেশলাই-কাটি সাজানো রয়েছে, তেমনি ধরণে সাজিয়ে বসালেই খুব সহজেই তোমরা গত সংখ্যায় প্রকাশিত হেঁয়ালিটির সঠিক সমাধান করতে পারবে। ছবির 'ক'-চিহ্নিত কাঠিগুলি হলো বড় সাইজের দেশলাই-কাঠি এবং 'খ'-চিহ্নিত কাঠিগুলি ছোট সাইজের দেশলাই-কাঠি।

২। আলতা

৩। শাল

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

হিরণ্ময়ী ও কল্যাণী মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বজু ও বিজু (আলিপুর), বাবু মিত্র (নৈনীতাল), রিণি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), লাড্ডু ও রুবি হালদার (কোরবা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারী ও সুনীল (ঝিলাই), পিণ্টু, বুতাম ও বাপি (বোম্বাই), মীরা, প্রণব, কৃষ্ণা ও কল্যাণ রায় (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

খুকু ও মিঠু রায় (কলিকাতা), বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), সুনির্মল দাস (মেদিনীপুর), দিপু, মুমু, কাজল ও প্রদীপ (কোঁচ), মণিকাঞ্চন (দীঘা), পিণ্টু, গোরা, টেপা, বুড়ি (জয়নগর), বাণী ও শুভ্র হাজরা (আড়ুই)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

সতীশচন্দ্র দাস (দীঘা), শ্রীপতিনাথ দে (মেদিনীপুর), নন্দকিশোর, তপতী ও তাপসী গোস্বামী (ভবলাইগড়া)।

ঘুড়ির কথা

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাতে দুরন্ত নায়েগ্রা নদীর বুকে প্রথম সেতু রচনাকালে কিশোর-বালকদের ঘুড়ি ওড়ানোর সুনিপুণ কৌশলের ফলেই অভিজ্ঞ-কর্মবিদ্‌ স্থপতি-যান্ত্রিক বৈজ্ঞানিকেরা বিচিত্র উপায়ে দুরতিক্রম্য জল-প্রপাতের বাধা কাটিয়ে নিজেদের [illegible] অনায়াসেই সফল করে তুলেছিলেন। এই ঘটনাটি থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে খেলার সৌখিন ঘুড়িও দরকারের সময় মানুষের কতখানি কাজে ও উপকারে লাগে।
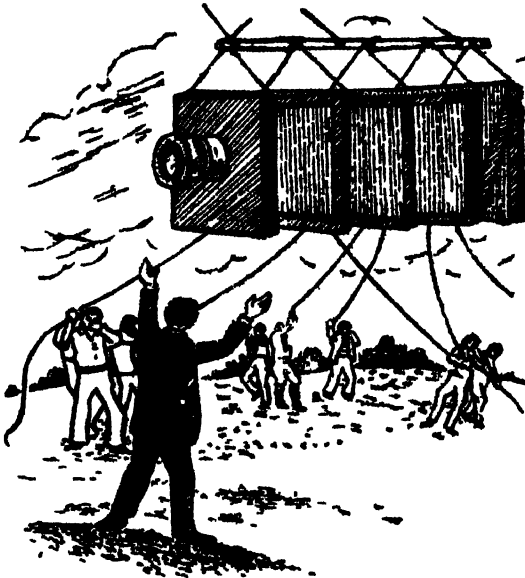
তাছাড়া এমনি ধরণের বিচিত্র-গড়নের আজব উপায়ে তৈরী এই 'ঘুড়ি ক্যামেরার' সাহায্যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আর্চিবল্ড নামে এক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক, ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এডি নামে এক মার্কিন বিজ্ঞানী এবং ১৯১৪ সালে [illegible] নামে আরো একজন আমেরিকান বিজ্ঞানী সুদূর আকাশের বুকে ঘুড়ির [illegible] ফটো তোলার ক্যামেরা উড়িয়ে নানা রকম ছবি তুলেছিলেন। এঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই আজকাল সুদূর থেকে ছবি তোলার রীতি সুপ্রচলিত হয়েছে।

সিঁড়ি
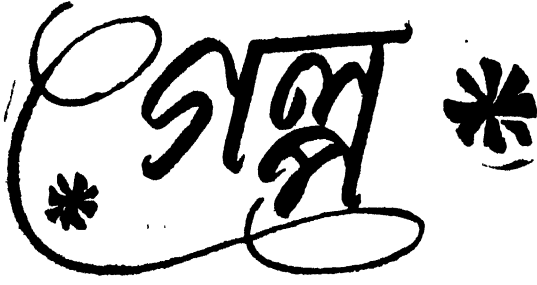
সঙ্কর্ষণ রায়

বিছানায় শুয়ে সামনের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারটির দিকে চেয়ে মনে মনে হিসেব করছিল অনাদি গত এক মাসের মধ্যে চন্দ্রা ক'বার এসেছে তার কাছে।

খুব সোজা হিসেব। ত্রিশ দিনের মধ্যে সাত দিন। দিনগুলি তার মনের মধ্যে চিহ্নিত হ'য়ে আছে গভীর ভাবে। ক্যালেণ্ডারের দিকে না তাকালেও হিসেব মিলত।

অনাদি অসুখে পড়ার আগে চন্দ্রাকে আসতে হ'ত না, অনাদিই যেত তার কাছে। মাসে ক'বার যেত সে হিসেব করবার প্রয়োজন হ'ত না অবশ্য চন্দ্রার। কারণ সে রোজই যেত।

চন্দ্রা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে রিসার্চের কাজের চাপে সময়ের ওপর তার নিজস্ব কর্তৃত্ব নেই। সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনাও দেয় যে তার শারীরিক উপস্থিতি যেখানেই থাকুক না কেন, মন তার সর্বদাই অনাদির রোগশয্যার শিয়রে উপস্থিত। নিদ্রায় জাগরণে এমন একটি মুহূর্ত নেই যখন অনাদির কথা সে ভাবে না।

অনাদি চন্দ্রাকে অবিশ্বাস করে না। কারণ চন্দ্রার ওপর আস্থা হারালে তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বনটি পড়বে ধ্বসে।

তবু অনাদির বুকের মধ্যে একটা তীব্র বেদনা মুচড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বোধ হয় তা' তার হৃদ্‌রোগের যন্ত্রণাকে ছাড়িয়ে যায়। কারণ চন্দ্রার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গী তার নেই। মানসলোকে চন্দ্রার আনাগোনা তার কাছে তেমন স্পষ্ট নয়, চন্দ্রার স্থূল সান্নিধ্যেই তার পরিতৃপ্তি।

হৃদ্‌রোগের আকস্মিক আক্রমণে প্রায় দু'মাস ধ'রে শয্যাগত হ'য়ে আছে অনাদি। চিকিৎসকেরা তার অস্তিত্বটাকে ক্ষুদ্র রোগশয্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখে-ছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের নিষ্ঠুরবিধানের নাগপাশে বন্দী সে।

চিকিৎসকদের বিশ্রামের বিধান সশ্রম কারাদণ্ডের চেয়েও দুর্বিসহ মনে হয় অনাদির। বিছানায় শরীরটাকে শুইয়ে রাখলেও অস্থির মনকে সে কী ক'রে বিশ্রাম দেবে!

চন্দ্রাকে কাছে পেলে অবশ্য তার এই বাধ্যতামূলক বিশ্রাম পরম রমণীয় হ'য়ে উঠতে পারে। কিন্তু চন্দ্রার সময় নেই। কাজেই শূন্য অবকাশের মধ্যে অসাড় হ'য়ে থাকে অনাদির অস্তিত্ব বোধ।

সেদিন অনেক দিন বাদে অনাদির কাছে এল চন্দ্রা। এসেই প্রশ্ন করল, অনেকদিন আসতে পারি নি ব'লে নিশ্চয়ই রাগ করেছ।

এ প্রশ্নের জবাবটা অনাদির গলার মধ্যে অশ্রুবাষ্পে আটকে থাকে।

চন্দ্রা ব'লে চলে, রাগ করারই কথা। কিন্তু আমি কী করব বল—আমার রিসার্চ—

ম্লান হেসে অনাদি বলে, জানি চন্দ্রা। তোমার রিসার্চ তোমাকে প্রায় পুরোপুরি অধিকার ক'রে রেখেছে, আমার জন্য বিশেষ জায়গা রাখে নি।

—আমার রিসার্চকে তোমার রাইভ্যাল ভাবছ নাকি! মাঝে মাঝে এমন অবুঝ হ'য়ে ওঠো তুমি যে মনে হয় এত-দিনেও আমাকে চিনে উঠতে পার নি।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চন্দ্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ ক'রে ঈষৎ তিক্ত স্বরে অনাদি বললে, ঠিকই বলেছ। এককালে যদিও তোমাকে চিনেছি ব'লে জানতুম, কিন্তু এখন সন্দেহ হচ্ছে বুঝি আমার চেনার বাইরে চ'লে গেছ তুমি। তোমার

পরণের এই লাল রঙের ঝলমলে সিল্কের শাড়িটাও তোমার-আমার এতদিনের জানাশোনাকে যেন চাপা দিতে চায়। এমন সুন্দর শাড়ি অনেক দিন পরো নি তুমি। আজ হঠাৎ কী উপলক্ষ্য হ'ল বুঝতে পারছি নে।

চন্দ্রার মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হ'য়ে ওঠে। গম্ভীর মুখে সে বললে, একটু সাজগোজ করলে কী দোষ আছে কিছু!

—না, না, দোষ থাকবে কেন। সাজগোজ করবে বই কি—নিশ্চয়ই করবে! এতদিন যে করো নি কেন তাই ভাবি। আমার তো মনেও পড়ে না আমার সঙ্গে যখন বেড়াতে বেরোতে তখন একদিনও এম্নি সাজ করেছ। যাচ্ছ নাকি কোথাও?

গাঢ়তর হ'য়ে ওঠে চন্দ্রার মুখের রক্তিমা। ঈষৎ ইতস্ততঃ ক'রে সে জবাব দিল, ভাবছিলাম আমার রিসার্চের ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্য আমার একজন সহকর্মীর কাছে যাব—থীসিস্ লিখতে শুরু করেছি কিনা। অবশ্য তার জন্য তাড়া নেই কিছু—না গেলেও ক্ষতি হ'বে না বিশেষ।

—ক্ষতি হ'বে না! আমার তো মনে হচ্ছে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। রিসার্চের ব্যাপার তো!

চন্দ্রার চোখ দুটো ঝলসে ওঠে। বুকের মধ্যে বিষাক্ত আবেগের রাসায়নিক প্রক্রিয়া শুরু হ'ল যেন। ঠোঁট কামড়ে ধ'রে সে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে।

অনাদি মুখ টিপে হাসে। হাসি তো নয়, যেন বিদ্রূপের ছুরি। গভীর বিতৃষ্ণার সঙ্গে অনাদির রোগ-শয্যায় লীন শীর্ণ দেহটির দিকে তাকায় চন্দ্রা।

হাসি থামিয়ে কী রকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, অনাদি। দু'চোখে দুর্নিবার তৃষ্ণা অঙ্গারের মত জ্বলতে শুরু করে। চন্দ্রার বুক কাঁপে। তার মনে হয় যেন অনাদির রুগ্ন সত্তা তাকে গ্রাস ক'রে ফেলে রবারের মত ঘ'ষে মুছে ফেলতে চায় তার স্বকীয়তা যা কিছু আছে। একদিন নিঃশেষ আত্ম-নিবেদনের মধ্যে নিজের পরিপূর্ণতা আবিষ্কার করেছিল চন্দ্রা। দেওয়া-নেওয়ার সেই রসায়ন কী শুকিয়ে গেছে যে অনাদির নিবিড় আকাঙ্ক্ষা তাকে শুধু আঘাতই হানছে।

মনে মনে শিউরে ওঠে চন্দ্রা। মালা থেকে ফুল খ'সে পড়লে অবশিষ্ট থাকে শুধু সুতোর ফাঁস—যা' শুধু বাঁধে, যন্ত্রণা দেয়।

অনাদির রোগশয্যার শিয়রে ব'সে থাকে চন্দ্রা রঙিন রেশমী শাড়ি থেকে বিকীর্ণ আত্ম-ধিক্কারের আগুনে নিজেকে আবৃত ক'রে। এই আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে নিঃশেষে ছাই ক'রে ফেললেই যেন তার নিজের কাছে মান রক্ষা হ'ত।

আস্তে আস্তে সেরে উঠে অনাদি হাঁটা-চলা করার ছাড়পত্র পেল ডাক্তারের কাছ থেকে। প্রথম যেদিন তার শোবার ঘর থেকে হেঁটে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল, সেদিন প্রথমেই সে টেলিফোন করল চন্দ্রাকে।

—চন্দ্রা আজ প্রথম টেলিফোনটা নাগালের মধ্যে পেলাম—এই খবরটা সবচেয়ে আগে তোমাকেই দিচ্ছি।

অপর প্রান্ত থেকে ভাবলেশহীন জবাব এল, তা' হ'লে সেরে উঠেছ পুরোপুরি।

—নিশ্চয়ই। সেরে উঠে নিজেকে যেন নতুন ক'রে ফিরে পেলাম। সেই সঙ্গে তোমাকেও।

আমাকেও!—চন্দ্রা যেন চমকে ওঠে।

পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে, আমাকে ফিরে পেতে হ'বে কেন! আমি তো যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি।

—কিন্তু এ কয়দিন সেখানে পৌঁছবার শক্তি তো আমার ছিল না—একটা বিছানার মধ্যে প্রায় তিন মাস আটকে ছিলাম ভুলে যেও না। শোন চন্দ্রা, ডাক্তার বলেছেন রোজ সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ির সামনের পার্কে বেড়াতে যেতে। আজ থেকে শুরু করব ভাবছি। তুমি এস—সন্ধ্যার আগেই এস।

—আমি—

—তুমি ছাড়া আর কে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবে!

ভয়ে ভয়ে চন্দ্রা বললে, রোজ যেতে হ'বে?

জোর দিয়ে অনাদি বললে, নিশ্চয়ই রোজ। রোজকার রুটিন। ইঞ্জেক্‌শন একদিন অন্তর অন্তর—কিন্তু বেড়ানো রোজ।

—কিন্তু আমার রিসার্চ—

—বন্ধ ক'রে দিতে হ'বে। আমি যখন সেরে বিছানা

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ই সময়ে শ্যামবাজারের ৺নবকৃষ্ণ নিয়োগীর পুত্র সুপ্রসিদ্ধ
শী বাজিয়ে শ্রীরাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী একটা একতান-
দনের দল বসাইয়াছিলেন। ইহারাই বাজাইবার জন্য
মন্ত্রিত হন। যথাসময়ে অভিনয় হইল, কিন্তু এই রাত্রিতে
তিপয় অভিনেতা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ায় অভিনয় ভাল হয়
ই। তাহার পর কোজাগরী পূর্ণিমায় রাত্রিতে গিরীশ-
বুর শ্বশুরালয়ে অভিনয়ের ব্যবস্থা হইল। এই অভিনয়ে
র্দ্ধেন্দুবাবু, গিরীশবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধববাবু বিশেষ
খ্যাতি লাভ করেন। এই অভিনয়ের পর রঙ্গমঞ্চ
রামতি হিসাবে ৪০৲ টাকার গোলমাল হয়। সেই
োলমাল লইয়া গিরীশবাবু রঙ্গমঞ্চ আটকাইয়া রাখেন।
ই সূত্রে গিরীশবাবুর সহিত সমগ্র দলের বিবাদ হয়, এবং
রীশবাবু দল ছাড়িয়া দেন। এই অভিনয়ের পর গড়-
রে জগন্নাথ দত্তের বাড়ী ইহাদের তৃতীয় অভিনয় হয়।
ই অভিনয়ের জন্য রঙ্গমঞ্চের অভাব হয়। শিবপুরে
ান কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় হইত। সেই দলের রঙ্গমঞ্চ
। করিয়া আনিয়া অভিনয় করা স্থির হয়। গিরীশবাবু
ই সংবাদ পাইয়া নিজে আসিয়া নিমচাঁদ অভিনয়ের জন্য
স্তত হইলেন। যথাসময়ে অভিনয় হইয়া গেল। ১২৭৫
লের মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার দিন (১৮৬৯ ফেব্রুয়ারী)
ই সম্প্রদায়ের ৪র্থ অভিনয় তোষাখানার দেওয়ান ৺রায়
মপ্রসাদ মিত্র বাহাদুরের বাড়ীতে হয়। এই অভিনয়
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। এই দিন ইহাদের রঙ্গমঞ্চের মুখ পটের উপর লেখা হইয়াছিল "He holds the mirror up to nature."। এই দিন অভিনয়ে আরও অভিনেতা পরিবর্ত্তন হইয়াছিল,—অর্দ্ধেন্দুবাবু জীবনচন্দ্রের ও অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কেনারামের অংশ লইয়াছিলেন, আর সব ঠিক ছিল। এই দিন দর্শকের মধ্যে গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনয় দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হন যে গিরীশবাবুকে তাঁহার নিমচাঁদ অভিনয়ের প্রশংসা করিয়া বলেন, নিমচাঁদ যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল। ২য় দৃশ্যের পর যখন জীবনচন্দ্র "আমি তোকে ত্যাজ্যপুত্র কল্লেম" বলিয়া প্রস্থান করে, অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুবাবু সেই সময় অটলকে একটি মৃদু পদাঘাত করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে দীনবন্ধুবাবুর এবং সমগ্র দর্শকের মধ্যে এমন সুন্দর ভাবোদয় হইয়াছিল যে, দীনবন্ধু অভিনয়ের পর জীবনচন্দ্রের অভিনেতাকে দেখিতে চাহেন এবং দেখিয়া বলেন, আপনি ব্রাহ্মণ, পায়ের ধুলা দিন, you have improved the author। সধবার একাদশীর ২য় সংস্করণে আমি ২য় দৃশ্যে এই পদাঘাতটুকু লিখিয়া দিব।" এই দিনই দীনবন্ধুবাবুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও ইহারা অভিনয় করেন।

রাজীব মুখোপাধ্যায়—শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী
রতানাপতে—শ্রীরাধামাধব কর,

পেঁচোর মা—গোপালচন্দ্র দাস,
কনের ভগিনী—৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

শিববাবুর এই প্রথম অভিনয়। গিরীশবাবু একটি কবিতায় ইহার একটা প্রস্তাবনা লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহা রঙ্গমঞ্চে পঠিত হইয়াছিল। তাহার পর এই সম্প্রদায়ের আর পাঁচটি অভিনয় হয়। ৬ষ্ঠ অভিনয় হয় খিদিরপুরে নন্দলাল ঘোষের বাড়ীতে দুর্গা পূজার সময়ে (১২৭৬ আশ্বিন, ১৮৭৬ অক্টোবর)। সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসুর সহিত এই অভিনয় উপলক্ষে এই সম্প্রদায়ের আলাপ হয়। মহেন্দ্রবাবুর নিকট একটা পেশোয়াজ ছিল, কাঞ্চনকে পরাইবার জন্য ইহারা তাহা চাহিয়া লয়েন। প্রস্তাবনাটি এই—

"মাত্‌লামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রঙ্।
বাসর-ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢঙ্॥
আয়না নসে, রতা কোথা যা পারিস তা বল।
ক্ষমা করিবেন দোষ, রসিক মণ্ডল।
আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো নসে রতা।
সভ্যগণ নমস্কার ফুরালো আমার কথা।"

এই সময়ে আর একটা ঘটনা ঘ'টে ছিল। বসুপাড়ায় গতিনাথ দত্তের বাড়ীতে একটা সখের যাত্রার দল ছিল। সেখানে শর্ম্মিষ্ঠার পালা গাওনা হইত। এই যাত্রার দলের এক ব্যক্তি এক দিন অর্দ্ধেন্দুবাবুকে লক্ষ্য করিয়া বলেন,—"এত আর রঙ্গ... পোষাক পরে, রঙ করা পরদার আড়াল থেকে শুনে শুনে চীৎকার আর লাফালাফি করা নয়, এতে রীতি মত নাচ গান বাজনা সুর ভাল জানা চাই, অর্দ্ধেন্দুবাবু উত্তরে বলেন—"বেশ আজ হতে ১১ দিন পরে তোমাদের এই নাচগান সুর তালওয়ালা যাত্রা শুনিয়ে দেব, কিন্তু তোমরা এক মাসে আমাদের মত একটা থিয়েটার কর দেখি।" সেই দিনই নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে যাত্রা করার পরামর্শ ঠিক হইয়া গেল। মণিমোহন সরকারের "উষা অনিরুদ্ধ" নাটকে গান জুড়ে পালা বাঁধা হইল। গিরীশবাবু ২৬ খানা গান বেঁধে দিলেন। ঠন্‌ঠনিয়ানিবাসী নিতাইচাঁদ চক্রবর্ত্তী ইহাদের দলে বাজিয়ে হলেন। বর্ত্তমান আমোদপুরের সুগায়ক উমাচরণ চক্রবর্ত্তী ও তাঁহার ভাগিনেয় কথক দুর্লভচন্দ্র গোস্বামী এই দলে জুড়ীর গায়ক হলেন। হিঙ্গুল খাঁ নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। ১৫ দিনের মধ্যে পালা প্রস্তুত হয়ে গেল। মহেন্দ্রবাবুর নিকট যাত্রার উপযুক্ত পোষাক ছিল। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে ১২৭৬ সালের জগদ্ধাত্রী পূজার পর এই যাত্রার প্রথম আসর গাওনা হয়। এই যাত্রার দলের অনুষ্ঠানের সময় প্রসিদ্ধ অভিনেতা মতিলাল সুর এই দলে যোগ দেন। এই যাত্রা গাওনার দিনে শর্ম্মিষ্ঠার দলও বসুপাড়ার মাঠে এক আসর গাইলেন, শেষে উভয় দলে সঙ দিবার ছলে গান বেঁধে উভয় দলকে শ্লেষ বিদ্রূপ করেন। তাহার পর চার পাঁচ আসর যাত্রার গাওনা হইয়া গেল। ইহার পরও দু একবার 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হইয়াছিল। এই সকল অভিনয়ে বাগবাজার অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ের সহিত গিরীশবাবুর কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তিনি নিমচাঁদের অংশ মাত্র অভিনয় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত শর্ম্মিষ্ঠা যাত্রার গানগুলিও গিরীশবাবুর রচিত এবং ইহাই তাহার প্রথম রচনা। কিছু দিন পরে অর্থাভাবে ঐ নাট্যসম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়।

যখন "কিছু কিছু বুঝি" অভিনয় হয়, সেই সময় মাইকেল মধুসূদন দত্ত অর্দ্ধেন্দুবাবুকে টিকিট বেচিয়া থিয়েটার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। এখন অর্থাভাবে দল গেল দেখিয়া অর্দ্ধেন্দুবাবু টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে আবার দল গড়িতে উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই দলে অর্দ্ধেন্দুবাবু "লীলাবতী" অভিনয় করিবেন বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতেই আখড়াই চলিত, নিয়মমত চলিত না, অল্পে অল্পে কার্য্য অগ্রসর হইতে লাগিল। শেষে একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার উপস্থিত হইল। "অরবিন্দ" ও "যোগজীবন" সাজিবার উপযুক্ত একাকৃতি দুইটি লোকের আবশ্যক হইল। সহজে তেমন লোক পাওয়া গেল না। সে অনুৎসাহের অবস্থায় তেমন আগ্রহ করিয়া খোঁজেই বা কে? কাজেই যেটুকু আখড়াই চলিতেছিল, তাহাও বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

এই সময়ে শ্যামপুকুরে ব্রজনাথ দেব (গিরিশবাবুর শ্যালক) নিজ বাটীতে একটি থিয়েটারের দল বসাইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুর হস্তে তাহার শিক্ষা ভার দিলেন। গিরীশ-

বাবুর সহিত এই দলের সংস্রব ছিল না। কৃষ্ণকুমারীর আখড়াই চলিতে লাগিল। ব্রজবাবুর সংকল্প ছিল, কোন স্থানে একটা রঙ্গমঞ্চ স্থায়ীভাবে বাঁধিয়া নিয়মিত ভাবে অভিনব চালাইবেন। ব্রজবাবু তখন জন-এট্‌কিন্‌সনের বাড়ীর বুককীপার ছিলেন। সেখানকার দালালদের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া এই উদ্দেশ্যে কিছু টাকাও তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই অর্থে শ্যামপুকুরে ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীর উঠানে স্থায়ী মঞ্চের আয়োজন হইতে লাগিল। পাটাতন পর্য্যন্ত হইলে ব্রজবাবু সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় শয্যাগত হইলেন, সব বন্ধ হইয়া গেল।

ব্রজবাবুর দল ভাঙিতে ভাঙিতে শ্যামপুকুরে যুবকদিগের আগ্রহে সেই দল হইতেই লোক সংগ্রহ করিয়া এক যাত্রার দল বসান হয়। অর্দ্ধেন্দুবাবুও যোগ দিলেন। তাঁহার আগ্রহে নিতাই চক্রবর্ত্তী, উমাচরণ চক্রবর্ত্তী, দুর্লভ গোস্বামী, হিঙ্গুল খাঁ প্রভৃতি গাইয়ে, বাজিয়ে ও নাচিয়ে ওস্তাদেরা যোগ দিলেন। পাথুরেঘাটার রাজবাড়ীর বিদ্যাসুন্দরে তিনি মালিনী সাজেন, সেই কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা "শকুন্তলা" প্রথম গাওনা হইয়াছিল। তাহার পর এই দলে "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ" গাওনা হইয়াছিল। তাহার পর উমাচরণ চক্রবর্তীর সাহায্যে আমোদপুরের যাত্রার সাট "সীতার বনবাস" আনাইয়া গাওনা হইয়াছিল। এই যাত্রার দল ও ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী উষা অনিরুদ্ধ যাত্রার দলে এই সকল থিয়েটারের অভিনেতারা থাকায় এবং অর্দ্ধেন্দুবাবু শিক্ষক থাকায় যাত্রার ঘটকালীর বা বক্তৃতার সুর বদলাইয়া সহজভাবে বা থিয়েটারী ঢঙে কতকটা পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার পর যাত্রার দল ভাঙিতে থাকে।

যখন এই শকুন্তলা যাত্রার দল বাগবাজারে চলিতেছিল, সেই সময়ে চড়কডাঙার জয়রাম বসাকের বাড়ীতে আবার একটি থিয়েটারের দল বসে। সেখানে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত "ভ্যালারে মোর বাপ" নামক প্রহসন অভিনীত হইবে বলিয়া আখড়াই চলিতেছিল। অবশেষে এই দল আহীরীটোলায় জনাইএর মুখোপাধ্যায় মহাশয়দিগের বাড়ীতে উঠিয়া যায়। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই দলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৭৬ সালের দোলের রাত্রিতে (১৮৭০ ফেব্রুয়ারীতে) মুখোপাধ্যায়দিগের বাড়ীতে ইহার অভিনয় হয়। নগেন্দ্রবাবু ও রাধামাধববাবু এই অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া আসিয়া তাঁহারা "ভ্যালারে মোর বাপের" উত্তর দিবার জন্য একটি ক্ষুদ্র থিয়েটারের দল গঠন করেন। "রত্নাবলীর" আখড়াই আরম্ভ হয়। প্রিয়মাধব বসু মল্লিক "ভ্যালারে মোর বাপের" উত্তরে এক প্রহসন লিখিয়া দেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু তখন যাত্রার দলে নিবিষ্ট ছিলেন, এই ক্ষুদ্র থিয়েটারের দলে যোগ দেন নাই। [ইতিপূর্ব্বে "কিছু কিছু বুঝি" অভিনয়ের পর বাগবাজার রাজবল্লভ পাড়ায় প্রিয়মাধব বসু মল্লিকের দ্বারা "রত্নাবলী" অভিনয়ের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভুল। ১২৭৬ সালের এই অভিনয়ের কথাই ভুলিয়া সেখানে লেখা হইয়াছে। ইহা অর্দ্ধেন্দুবাবুর ১৩১৭ সালের বক্তৃতায় ছাপা হইয়াছিল। —ন, ন, স]

এই রত্নাবলীর অভিনয় বাগবাজার রাজবল্লভ-পাড়ায় হয়। শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর দর্শক ছিলেন। প্রিয়বাবুর প্রহসনে ভোলানাথবাবুর নামে শ্লেষাত্মক গান ছিল। ভোলানাথবাবু তদুত্তরে প্রভাকরে প্রিয়বাবুর নামে কবিতা লিখিতেন। প্রিয়বাবুও প্রভাকরেই আবার তাহার উত্তর দিতেন। প্রিয়বাবুর কবিতাই বেশী সরস হইত।

অর্দ্ধেন্দুবাবু দুইবার যাত্রা করিয়া এই সময়ে বাজনার প্রতি একটু বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শকুন্তলা যাত্রার দল ভাঙ্গিয়া গেলে, প্রথমে ধর্ম্মদাসবাবুর বাড়ীতে তাহার পর ১৭৯নং আপার চিৎপুর রোডে একটি একতানবাদনের দল গঠন করেন। নগেন্দ্রবাবু, রাধামাধববাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, হিঙ্গুল খাঁ, নন্দবাবু, যোগেন্দ্রবাবু, এই দলে যোগ দেন, এই বাজনার দলেও অর্দ্ধেন্দুবাবু একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। এতদিন যত কনসার্টের দল হইয়াছে সবাই "ডি" সুরে বাজাইত। অর্দ্ধেন্দুবাবু নিজের দলে একেবারে "এফ" বাজনার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন। চড়াসুরে বাজাইবার খাতিরে এই দলের বিশেষ আদর ছিল। ১২৭৭ সালের রাসপূর্ণিমার দিন শোভাবাজার বেনেটোলায় ৺কান্তিচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে হাওড়া-ব্যাঁটরার এক নাট্য-সম্প্রদায় "প্রভাবতী" অভিনয় করেন। "প্রভাবতী" সেক্সপীয়ারের "মার্চেন্ট অফ্ ভিনিস্" অবলম্বনে লিখিত। এই অভিনয়ের সঙ্গে অর্দ্ধেন্দুবাবুর এই বাজসম্প্রদায় বাজাইয়া ছিলেন। এই সময়ে হাটখোলার প্রসিদ্ধ মহাজন ব্রজেনকুমার সাহা ওরফে বিশু সাহার গদীর কর্ম্মচারী শ্রীগোবিন্দনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এক ব্যক্তির সহিত নাট্যসম্প্রদায়ের আলাপ হয়। তিনি আখড়ার খরচ চালাইতে স্বীকৃত হওয়ায় অর্দ্ধেন্দুবাবু আবার থিয়েটারের দল গড়িতে প্রবৃত্ত হইলেন।

[ক্রমশঃ

উদ্ভট কাহিনী

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য

নীল আকাশ। নীল সমুদ্র। লীলায়িত নীলিমার বুকে লাক্‌সারি লাইনার চলছে। শান্ত প্রকাণ্ড সমুদ্রের বুকে লক্ষ লক্ষ স্তনায়িত উদগ্র তরঙ্গ দোদুল্যমান। আকাশের প্রান্তে ঘষা কাচের হাজার বাতির টুনি জ্বলছে—তার হলদে আলো হাওয়ায় ভেসে চলেছে হালকাভাবে। অফেন সমুদ্রে ফেনা তুলে চলেছে লাইনার।

ডেকে একা বসে আছি আমি। রাত্রি গভীর। ক্যাবিনে সব ঘুমিয়ে। মাথার উপর জ্বলছে জাহাজের বাতি—প্রশান্ত সাগরে অশান্ত শব্দ তুলে ছ এঞ্জিনটা। 'মেরিকা থেকে ফিরছিলাম। এই জাহাজটি পৃথিবীর একটা পকেট সংস্করণ। এর বিচিত্র বৈচিত্র্য একে মাসিক সাপ্তাহিকের মলাটের মত আকর্ষণীয় করে তুলেছে। রংএর সমারোহ—অর্থহীন অসার ক্ষণিক। পরবর্ত্তী বন্দরে ভিড়লেই মলাট পাল্‌টে যাবে।

'মেরিকান চল্লিশ বৎসরের তরুণী মিস্‌ সিলির সঙ্গে একদিনে ট্রামের দু'খানা গাড়ীর মত একটা নৈকট্য হয়েছে—অকপট। বিনিদ্র চোখ, আর বুভুক্ষিত হৃদয় মনে মনে সিলিকে চাইছিল। আহা,—বিয়ে করি করি করেও সে ভয়ে বিয়ে করতে পারেনি পাছে স্বামীটি মনের মানুষ না হয়। অবশ্য তাই বলে পুরুষভৃঙ্গকে সে চেনে, তার ভৃঙ্গার মধু অনেকেই আকণ্ঠ পান করেছে, চলে গেছে—মধুপ্রয়াসী হয়ে কেউ ডুব দেয়নি।

বিবাগীর মত চেয়েছিলাম—সিলি এসে পাশের ডেক চেয়ারে বসল। আস্তে সন্তর্পণে নিঃশব্দে—মনে হল সে আসেনি এইটেই বলতে চায়।

—কি হঠাৎ এলে যে! ঘুম হয়নি?

—মনে হল তুমি ডাকছ।

—হ্যাঁ কণ্ঠস্বরে ডাকিনি, তবে আমার ইগো তোমাকে ডেকেছে—চেয়েছে।

—তাই বোধ হয় এসেছি। একটা কথা শুনতে এলাম,—আমার মধ্যে যে ইগো রয়েছে সেটা তোমার মধ্যে একটা জিনিষ খুঁজছে—তাই এত রাত্রে উঠে এলাম।

নির্বাক—দুজন—পাশাপাশি। শ্বেতকায় তরুণীর শুভ্র দেহে হলদে জোছনা পড়েছে। হঠাৎ সিলি বলল,—তোমাদের দেশ, সাপ বাঘ ভালুকের দেশ। শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য। এ সব যখন ভাবি তখনই মনে হয় তুমি একটি কালো ময়াল সাপ।

—তারপর?

—হ্যাঁ মনে হয় তুমি কোন সময় ময়াল সাপের মত আমাকে জড়িয়ে ধরে পিশে মারবে—তুমি যেন সাপের মত কিলবিল করছ আমার মনের চারিপাশে, আর আমি ভয়ার্ত্ত হয়ে রয়েছি—

—তা সাপটাকে ঠেঙিয়ে মেরে ফেলে দাও, তোমার গা-বেয়ে যেন উঠতে না পারে। সিলি হেসে ক্রীড়াভঙ্গি করে বললো,—মনের সাপকে ঠেঙিয়ে মারবো কি দিয়ে?

—সে অস্ত্র তোমাদের নেই সে কথা সত্যি। ওটা আমাদের দেশে আছে—সেটা আধ্যাত্মিকতার ঠেঙা। আমার কি মনে হয় জানো? তুমি একটি বিরাট ময়দার বস্তা—আর আমি নেংটি ইদুর, তোমার উপর দিয়ে ছুটোছুটি করছি, ক্ষিধে পেলে একটু ফুটো করে খেয়ে বলশালী হচ্ছি। ময়াল সাপের মত জড়িয়ে ধরতে সখ নেই—ময়দার বস্তাকে। ইঁদুরের মত ফুটো করতে সখ করে—বেশ মজা—

আবার নির্বাক। জাহাজের ঘড়িতে ১২টা বাজলো—

—আচ্ছা তুমি ত বিয়ে করেছ। কেমন করে তোমাদের বিয়ে হয়—তোমরা সুখী ? তোমাদের জীবনে দুঃখ নেই, অপূর্ণতা নেই, অসামঞ্জস্য নেই ?

—দুস্তর প্রশ্ন, উত্তরও দীর্ঘ হবে।

—হোক্—

—তোমরা বিয়ে কর সুখী হতে—এই জড়জগতে মনের মানুষ খুঁজে বেড়াও। কিন্তু মনের মানুষ মিলে না, মনের মানুষ করে নিতে হয়। করে নিতে হলে তোমার ব্যক্তিত্ববাদকে, ইগোকো কিছুটা চেপে রাখতে হয়, চাপের বস্তু যেটা সেটা তোমরা হারিয়েছ। আমরা বিয়ে করি—গুরু মার আদেশে, অপরিচিত কোন কুমারীকে।

—অপরিচিত ?

—সম্পূর্ণ অপরিচিত। মেয়েদের সঙ্গে আমরা মিশি না, হঠাৎ পুরুতে যখন কুশ দিয়ে হাত বেঁধে দেয় তখনই দুটি জীবন সারা জীবনের মত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে যায়—নিষিদ্ধ এলেকার দরজা খুলে দেখি পরম বিস্ময়। বিস্ময়ে আত্মহারা হ'য়ে যাই—তোমাদের লক্ষ্মী নর্ম পত্নী, আমাদের পত্নী ধর্ম পত্নী। জানি গরমিল হলেও মিল করতে হবে, তাই ব্যক্তিত্বকে মেড়ে পুঁছে উভয়ে একটা জায়গায় এসে যাই—করতে হবে বলেই করি এতে যুক্তি নেই, হৃদয় আছে। জীবনের সঙ্গী তাই জীবনে ত্যাগ করতেই হয়—কিন্তু তোমরা মাথা দিয়ে হৃদয়ের কাজ করতে চাও তাই গরমিল—তাই চাওয়ার জিনিষ পাও না।

—জানি না, জানিনা, তুমি বলতে পারো তুমি সুখী ?

—হাঁা, জগতে যতখানি সুখী হওয়া সম্ভব। অতৃপ্তি আছে, অপূর্ণতা আছে কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ পেলে এটা আরও বাড়ত। আমরা বিচ্ছিন্ন হতাম—নতুনের খোঁজ করতাম।

—পরাধীনতার আনন্দ ?

—হাঁা, আমাদের ঘরে বধূ আসে সংগোপনে ভৃত্যাবেশে, ভৃত্য থেকে ধীরে ধীরে সে হয় রাণী—সংসারের সম্রাজ্ঞী—আর যারা ছিল প্রভু তারা হয় দাসানুদাস—তাতেই তার তৃপ্তি—সন্তানকে কেন্দ্র করে দাসী হয় রাণী, আর প্রভু হয় দাসানুদাস।

—এটা একেবারেই যুক্তিহীন।

—যুক্তিহীন নিঃসন্দেহে, তবে হৃদয়হীন নয়। হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলে বোঝা যায়। উপযুক্ত যন্ত্র না হলে তুমি দূরের আকাশ দেখবে কি দিয়ে—

—অবিশ্বাস্য দার্শনিকতা, দর্শন জীবনে অনুশীলন করা যায় !

—যায়, সেইটেই আমাদের বৈশিষ্ট্য—আমাদের জীবন ও সমাজে দর্শন মিশে রয়েছে অদৃশ্য ভাবে—সিলি কি যেন একটা কড়া কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু না বলে উত্তেজিত-ভাবে চলে গেল।

লাক্সারি লাইনার আবার চলেছে। নীল সমুদ্র—নীল আকাশ, হলদে জোছ্না,—আমি একা, একক, উদাসী। সমুদ্রের উচ্ছল উদ্ধত বুকের দিকে চেয়েছিলাম। ডেকের তারের বেড়ার একটি খুঁটির মাথায় একটা মোটা লোহার মুণ্ডু রয়েছে। কেন যেন সেটা মাঝে মাঝে বড় হচ্ছে আবার ছোট হ'চ্ছে। ওই মুণ্ডুটাই আমার দৃষ্টিকে বাধা দিচ্ছে। ওর দিকে তাকাবো না যতই ভাবছি, ততই তাকাতে হ'চ্ছে—কি আশ্চর্য্য।

মুণ্ডুটা বড় হ'চ্ছে—ছোট হচ্ছে, হঠাৎ বেশ বড় হ'য়ে একটা মানুষের মাথা হল। লোহার ডাণ্ডার মাথায়, মানুষের মুণ্ডু—বেশ বড়, চোখ, মুখ, নাক, কান, সোনালী চুল। এবার তাকাতেই ফিক্ করে হেসে ফেলল—

—কে, কে, তুমি—

—তোমাদের দেশে যাবো বেড়াতে।

—তুমি কে ? কেন যাবে আমাদের গরীবের দেশে ? তোমার ধড় কই ? তুমি ভূত ?

—হাঁা, ভূত। মারা গেছি অনেক দিন আগে।

—তোমার নাম ?

—জেমস্ জয়েস্।

—সর্ব্বনাশ, ইউলিসিস্, পোর্ট্রেট অফ্ দি আর্টিষ্ট এ্যজ এ ইয়ং ম্যান তোমার লেখা ?

—হাঁা—

—দোহাই তোমার, আমাদের দেশে যেও না। পৃথিবীর সর্বত্র যাও, আমাদের দেশটা বাদ দাও—

—কেন ? দেশভ্রমণে যাবো, দেখতে—তোমাদের সাগরময় দেশ, বিমল কল্লোজ্জ্বল ধরণী।

—কি দেখবে? তোমার ত শুধুই মাথা, ধড় নেই, হৃৎপিণ্ড নেই, হৃদয় নেই—কি দিয়ে দেখবে আমাদের দেশ? মাথা দিয়ে? মাথার দেশ ওটা নয় ওটা হৃদয়ের দেশ।

—মাথা দিয়েই দেখবো হৃদয়ের দেশ—

—সোনার পাথর বাটি—আর কি? মাইক্রোস্কোপে দিয়ে দেখবে গ্রহউপগ্রহ। বেয়াকুফ্—যেও না, ফিরে যাও—

—কিন্তু যেখানেই মানুষ আছে, তার মধ্যে ইগো আছে—ইগো আছে তার প্রকাশ আছে—তাই দেখবো—

—আছে ত, দেখ্‌বে কি দিয়ে? শোনো, তোমরা ছিলে স্বর্গের মানুষ, স্বর্গের ইডেন গার্ডেনে ছিলে, তার পরে বুদ্ধির ফল খেতেই, ভগবানের তাড়া খেয়ে পৃথিবীতে এসেছ কিন্তু বুদ্ধির ফল খাওয়া ছাড়লে না। আমরা পরম ব্রহ্মের অংশ, অমর আত্মা, আমরা জন্মজন্মান্তের দেহকে পুরাতন বস্ত্রের মত ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র গ্রহণ করছি, আত্মার সম্পূর্ণতার জন্যে। তোমরা বুদ্ধিবলে মূল্য দিয়েছ জড় জগতের ভোগকে, আমরা মূল্য দিয়েছি পরমার্থকে, হৃদয়কে, হৃদয় বৃত্তিকে। তুমি যেও না ওখানে, তুমিও নষ্ট হবে—আমাদেরও নষ্ট করবে—

—তোমরা কি জাগতিক জীবনের সুখদুঃখ ভোগ কর না—

—করি, কিন্তু নির্বিকার ঔদাসিন্যে ভগবানে সমর্পণ করে, জন্মজন্মান্তরের কল হিসাবে। তার জন্যে আমাদের ইগো ছটফট্ করে না, বিদ্রোহ করে না, চিত্তবিকার ঘটে না। ভগবানের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আমরা হাসি—সমাজ জীবনে, ব্যক্তি জীবনে—

মুণ্ডুটা হো হো করে হেসে উঠল—ভয় করছে। ভূতের সঙ্গে বসে গল্প করছি। বললাম,—শোনো, ভূতই হও আর প্রেতই হও, শোনো। সমাজ বা ব্যক্তি জীবনে আমাদের মন পুঞ্জীভূত গ্লানি সঞ্চয় করে না, চিত্ত বিকার ঘটায় না। কাজেই তোমাদের জড়বাদের ভোগ লালসা আমাদের কম—আমরা অধ্যাত্মবাদী—

—তুমি ত ঘোর রিয়্যাক্‌শনারী—

—বলা বাহুল্য মাত্র। জড়বাদপ্রসূত আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিবাদকে প্রগতিশীলতা বলে বিশ্বাস না করলে যদি রিয়্যাক্‌শনারি হতে হয় তবে যেন জন্মজন্মান্তর তাই থাকে। তাই বলছি হৃদয় আর হৃৎপিণ্ড যদি ফিরে পাও তবেই আমাদের দেশে যেও—নইলে যেও না—

—তোমাদের দেশে ত পৌঁছে গেছি—

জানি, জাহাজভর্তি যন্ত্রপাতির সঙ্গে তুমি গেছ, তোমার বুদ্ধিগ্রাহ্য হালকা সুখদুঃখের ভাষ্য গেছে, আমাদের প্রগতিবাদীরা তা নিয়ে চিলুবিলু লাগিয়েছে তাও জানি, কিন্তু জানো অধ্যাত্মবাদের মূল কত গভীরে? বুদ্ধি দ্বারা বিশ্বমানবিকতা কি তোমরা পেয়েছ? অধ্যাত্মবাদ ব্যতীত হৃদয়ের দরদ আসে না, মানবিকতাও আসে না—

মাথাটা আবার হাসল। এমনভাবে হাসলো যেন আমাকে হেসেই নির্বোধ বানাতে চায়। বললে—জাহাজটা এক্ষুনি দুভাগ হয়ে ভেঙ্গে যাবে, তুমি ছিটকে এই হাঙ্গর তিমিসঙ্কুল সমুদ্রে ছিটকে পড়বে,—তখন কি করবে?

—ভগবানের নামে চেষ্টা করবো, বাঁচি ভাল, নইলে জানি নতুন জীবন নিয়ে আবার পৃথিবীতে আসবো—হাঙ্গরে দেহটা খাবে। আমাকে ত খাবে না। তোমাদের দেহটাই যে সব তাই তোমরা ভয়ে আকুল হবে ভেবে, ব্যাকুল হবে—

মুণ্ডুটা আবার হাসলো,—যেন বড় একজন বিজ্ঞের হাসি। বললে,—জীবন থেকেও তা হলে কল্পনাটা বড়।

—তোমার যুক্তিগ্রাহ্য জগতের উপরেও আমরা আর একটা অতীন্দ্রিয় জগতে বিশ্বাসী, কাজেই তোমার ও বিদ্রূপ-হাসি নিরর্থক—বুদ্ধিগ্রাহ্য জড় জগৎ আমাদের কাছে মূল্যহীন।

—ওই যে মিস্ সিলি বললে তুমি কালো ময়াল সাপ। তাকে জড়িয়ে ধরবে বলে ভয়ে অস্থির—ওটা কি জানো? ওটা সিম্বল্ইজম্—

—হ্যাঁ, জানি। অর্থাৎ ওর ইচ্ছা আমি ময়াল সাপের মত ওকে জড়িয়ে ধরি কিন্তু ধরছি না বলেই ওর চিত্ত বিকার—

ঐ সিম্বলটা কিসের জানো?

—জানি,—যৌন প্রেরণা, ইগোর যৌন প্রকাশ।

—আর তুমি যে নেংটি ইঁদুর—ওটা?

—ওটা ঠাট্টা, ময়দার বস্তার মধ্যে নারীত্ব নেই—তাই নেংটি ইঁদুর. বুঝলে? মুণ্ডুটা প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে মিচ্‌কি হেসে বললে,—তোমাদের দেশে চিত্তবিকার বলে কিছু নেই? অবরুদ্ধ হৃদয়াবেগ ও কামনা কি চিত্তকে বিকারগ্রস্ত করেনি।

—ত্যাখো, চিত্তবিকার, হৃদয়াবেগ হৃদয়ের ব্যাপার, বুদ্ধি দিয়ে তোমরা তা বুঝতে চাও ত? কামনা বাসনা যখন রুদ্ধ হয় অর্থাৎ Strangulated হয় তখনই চিত্তবিকার ঘটে, কিন্তু যেখানে কামনাকে ত্যাগ করাই জীবনাদর্শ, সেখানে ব্রহ্মবিশ্বাসী অন্তরে কামনা রুদ্ধ হয় না, আমাদের চিত্তবিকার ঘটে না,—তাই পাগলামিটা আমাদের কম। জানো মানুষকে সুখী হতে হলে 'barrier of the unconscious' ভাঙ্গতে হবে আত্মচেতনা পেতে হবে কিন্তু জড়বাদী তোমরা ত সে ভাঙ্গার অস্ত্র হারিয়েছ।

মুণ্ডুটা একবার বুকে হাত দিতে চেষ্টা করলো, বোধ হয় ভাল করে নিশ্বাস নিতে। আমি হো হো করে হেসে উঠে বললাম,—বুকটাই ত নেই। মাথায় হাত দাও—মাথা দিয়ে নিশ্বাস নিতে চেষ্টা কর। মাথাটাই বুকের কাজ করুক, দেহটা ত তোমার লোহার—

মুণ্ডুটা একটু ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললে,—ওটা ত দর্শন, জীবন নয়।

—বললাম ত, আমাদের জীবন আর দর্শনে তফাৎ নেই। তোমরা ইন্দ্রিয়শক্তির রঙীণ কাচ দিয়ে, চিত্তবিকারের রঙীণ চশমা দিয়ে যে জীবন দেখেছ তা চরমসত্য নয়, তা আপাতসত্য! আচ্ছা বলত, তুমি ১৯০৪ সনে ডাবলিন শহরে, ডেডালাস রূপে যা দেখেছিলে, ইউলিসিস্‌ রূপী ব্লুম, পেনিলোপরূপী ম্যারিয়নের পরিক্রমার মধ্যে যে কশাইখানা, কাগজের অফিস, জাতীয় গ্রন্থাগার, আর সেই তরুণীর সম্বন্ধে উদগ্র কামনা, পঙ্কিল দিবাস্বপ্ন, প্রসূতি আগারের ছাত্রগণ, আর ম্যারিয়নের চারিত্রিক স্খলন তুমি দেখেছিলে তা তো তোমার রঙীণ চশমা দিয়ে, বেশ্যালয় থেকে তোমাকে যে ব্লুম উদ্ধার করলো সেও ত তোমার চিত্তবিকারের রূপ—তুমি বল ষ্টীম অব কন্‌সাস্‌নেস্‌—কিন্তু এ হচ্ছে ভ্রষ্ট আত্মার, নষ্ট চরিত্রের পাগলামী। বিংশ শতকের যে আদিম রূপ দেখেছ, সে ত ক্লেদাক্ত মানবজীবনের ভুল···তাই বলছি আমাদের দেশ দেখার সময় হয়নি তোমার। হিন্দুবিবাহবিচ্ছেদ বিল, হিন্দু নারীর উত্তরাধিকার বিল প্রভৃতি আইন দিয়ে ধর্মদর্শনাশ্রিত হিন্দু আত্মাকে যতদিন যান্ত্রিক জীবনের ব্যভিচারের মধ্যে এনে নিরন্ধ্র চিত্তবিকারের সৃষ্টি না করছে ততদিন তুমি যেও না। আমাদের প্রগতিবাদীরা তোমাকে লুফে নিয়েছেন পয়সা রোজগারের জন্যে, মস্তিষ্ক দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে পয়সা আদায় করছে। যদি যেতেই হয়, তবে আরও পরে—সমগ্র সমাজ যখন ভ্রষ্ট হবে তখন যেও। এটি অনুরোধ। তোমাদের দেশে যেমন পাগলের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে, অমনি যখন পাগলামি প্রকাশ পাবে তখন যেয়ো—

মুণ্ডুটা হিহি করে হাস্‌ছে। আকাশ আর সমুদ্রের রেখাটা মিশে গেছে ঠিক ওর সোনালী চুলের উপরে। ও হাস্‌ছে—দুপুর রাত্রে কি পাগল নিয়ে পড়লাম। বললাম, দেখ তুমি নিছক কাটা মাথা, তোমার পাগলামী সহ্য হচ্ছে না—

মুণ্ডুটা বললে,—তোমার পাগলামীও আমি দেখছি, কি স্বপ্নবাদী তুমি?

—স্বপ্ন যদি মধুর হয় তবে তাই দেখতে দাও, বাস্তবের যন্ত্রণায় টেনে এনো না—

হি হি—হি হি—মুণ্ডুটা ছোট হয়ে আবার লোহার খুঁটির গোলমাথা হয়ে গেল।

জাহাজ কাঁপছে, ইঞ্জিনের আঘাতে এর সর্বাঙ্গ কাঁপছে। প্রশান্ত সাগরের শ্রান্তিহীন অশান্ত ঢেউএর মাথায় দুলছে। জাহাজের সমস্ত স্নায়ু, পেশী, হৃদপিণ্ড কাঁপছে দু'লছে—ইঞ্জিনের আঘাত লেগেছে এর স্নায়ুকেন্দ্রে—তাই থর থর করে কাঁপছে। হৃদে আলোর নীলাকাশ আর তার সাদা মেঘ দেখছিলাম,—হনলুলু যেয়ে এ জাহাজ তার ললাট পাল্টাবে।

কাঁধের উপর মৃদু স্পর্শ পেয়ে ফিরে চেয়ে দেখলাম, বিবস্ত্রা সিসি! আমার সামনে ঘোলাটে আলোর অস্পষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

—কি আবার তুমি, এমনি ভাবে—নগ্ন দেহ নিয়ে—

—হ্যাঁ ইঞ্জিনের আঘাতে জাহাজের স্নায়ু কাঁপছে,

আমার স্নায়ুকেন্দ্র বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছে,—গায়ে বস্ত্রের ভার সহ্য হচ্ছে না তাই ফেলে দিয়ে এসেছি। জাহাজ দুলছে, বমি আসছে, তুমি দেখ—আমাকে দেখ, কি অমোঘ বিরাট ব্যাধি আমার দেহে মনে, কি যাতনা পাচ্ছি—কামড়েছে সাপে, সর্পদংশনের যন্ত্রণা—

একটু যেন আলো এল কোথা থেকে—দেখলাম, একটা বিরাট সাপ সিলিকে জড়িয়ে ধরেছে অত্যন্ত কঠিন আলিঙ্গনে। সে ছট্ ফট্ করছে—দংশনের ভয়ে চোখবুজে জাহাজটার মত থর থর করে কাঁপছে—

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—ভয় নেই, সিলি। ও সাপে বিষ নেই, ঢ্যামনা সাপ, দেখতে বড়, গায়েও খুব জোর—কিন্তু সহসা কামড়ায় না, কামড়ালেও লোক মরে না। ভয় নেই—ওটা কেউটে নয়, ওটা কেউটের জনক।

কিন্তু এই যে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আমাকে চাপছে, হাড় গোড় ভেঙ্গে যাচ্ছে, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে আসছে, নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে, আমাকে বাঁচাও। তোমরা সাপের দেশের লোক, মন্ত্র তন্ত্র জানো—

—মন্ত্র আমাদের আছে কিন্তু তোমাদের দেহের যন্ত্রে তা কি কাজ করবে? এই জাহাজে, সমুদ্রে, শূন্যে মন্ত্র কার্য্যকরী হয়না, সেজন্য মাটি চাই—

—কাপুরুষ, আমাকে বাঁচাবে না?

—কি করে বাঁচাবো,—তোমাদের ছুঁলে আমাদের জাত যায়। ও তোমার মনের ঢ্যামনা সাপ তোমাকে পিশে মারছে—ওটি তোমাকেই তাড়াতে হবে।

—তবে কি মরবো? তুমি বাঁচাবে না?

—মরবে না,—ও রোগটা দাদের মত, চুলকোতে খুব মজা, পরে জলে পুড়ে যায়। যাক্,—তুমি এসো, এগিয়ে এসো—

সিলি তার নগ্নদেহ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার বুকের মাঝে। আমি তাকে বুকের মধ্যে নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে দিলাম। তার দেহ সত্যিই কাঁপছে,—গালের উপর গালটা রেখে হাত বুলিয়ে বললাম,—ভয় নেই ছাখো, সাপটা নেই—চলে গেছে।

সিলি ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখলে,—সাপটা নেই। নিশ্বাস ফেলে বললে—, গেছে—চলে গেছে—তোমার মন্ত্রে?

—হাঁ, মন্ত্রে,—মন্ত্রটা শিখতে চাও?

—না, আমাকে জড়িয়ে ধরো, আমি তোমার কোলে ঘুমোবো, স্নায়ুকেন্দ্রের কম্পন থেমেছে, ঘুম পাচ্ছে—

—তবে ঘুমোও, কিন্তু ভোর হ'তে বাকী নেই—

মুণ্ডুটা আবার হাসছে—বড়, ছোট হচ্ছে। আমার দিকে তাকিয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। প্রশ্ন করলে,—সাপটা ছাড়িয়েছ দেখছি, কি করে?

—তুমি বুঝবে না, মন্ত্র দিয়ে—

মুণ্ডুটা আবার হাসলে অসভ্যভাবে। বললে,—জাহাজটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, এক্ষুণি ডুববে তা দেখছ। সিলিকে কি করবে?

—ডুবুক,—ওকে নিয়েই ডুববো—

সিলি আমার কোলের মধ্য থেকে মাথা তুলে বললে, —কি? কি হ'য়েছে—

মুণ্ডুটা বললে,—ওই দেখ জাহাজটা দু'ভাগ হয়ে গেছে, ডুবছে,—ডুবছে—ডুবল—

সিলি যেমন করে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তেমনি করেই সফেন সমুদ্র জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মুণ্ডুটা হাসলো—বললে,—জীবন! জীবন বড়ই মহার্ঘ, এখানে স্বপ্ন বিলাস নেই। তুমি ঝাঁপ দিলে না।

—না, আমি ধীরে ধীরে বিজয়া দশমীর প্রতিমার মত ডুববো। গৌরবে, জয়ধ্বনির মাঝে—

—স্বপ্ন ছাড়ো, বাঁচতে চেষ্টা কর—নিশ্চিন্তে মরবে কেন?

—বেঁচে আছি, মরলেও ত বেঁচে থাকবো, তার জন্যে ব্যস্ততা কি? তোমাদের মত একবার মরি না, আমরা বার বার মরি, মরাটা অভ্যাস হ'য়ে গেছে। মরায় আমাদের দুঃখ নেই। জন্মের মধ্যেই দুঃখ। পুনর্জ্জন্ম যাতে না হয় তাই আমাদের সাধনা।

মুণ্ডুটা বললে,—ডুব্‌ছে, ডুবছে জাহাজ দেখ্‌ছ? দু' ভাগ হ'য়ে গেছে, জলে ভর্ত্তি হ'য়ে গেছে জাহাজের খোল। ঐ দেখ কাৎ হ'য়ে উল্টে যাচ্ছে—এখানে সমুদ্রের সেরা হাঙ্গর কিলবিল করছে, তোমাকে একবারে গিলে ফেলবে।

আমি হেসে বললুম,—মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তার জন্যে, দুঃখ করে মোহান্ধ ব্যক্তি। স্থিত-

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তার জন্তে অনুশোচনা করেন না। সেই মহাজনের বাণী অনুসারে আমিও অনুশোচনা করি না। এই বস্তুজগতই তোমাদের জীবনের সব, তোমরা মৃত্যুকে জীবনের শেষ মনে করে আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করবে—

ঝুপ করে সমুদ্রের একটি প্রকাণ্ড ঢেউএর মাথায় এসে পড়লাম। ডুবেই যাচ্ছিলাম, কলাগাছের মত কি যেন একটা হাতের কাছে পেতেই তাতে চড়ে বসলাম—কালো শ্যাওলাধরা একটা বিরাট কাঠের মত, তাতে চড়ে বসতেই সেটা ঠিক টর্পেডোর মত ছুটতে সুরু করল। কোথাও কাছে যেন একটা আবছা দ্বীপ দেখাযায়—ঐ দূরে জোছনা-লোকের অস্পষ্ট আলোছায়ায়—

সেই মুণ্ডুটা আবার চলেছে সঙ্গে সঙ্গে, ঢেউএর উপর নাচ্‌তে নাচ্‌তে। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে আছে, মিটমিট করে হাসছে। বললে,—কিসে চড়েছ? কিছু বুঝতে পারছো—

—কি আবার হবে, সমুদ্রের একটা জানোয়ার হবে, পিঠে হঠাৎ সওয়ার চেপে পড়েছে তাই ভয়ে ছুটছে—

মুণ্ডুটা হি হি করে হেসে বলল,—পিছনে তাকিয়ে দেখ, ঐ দেখ।

চেয়ে দেখলাম, সাদা একটা বৃহৎ তিমি বা হাঙর পিছন পিছন ছুটে আস্‌ছে। বললাম,—সমুদ্রের জানোয়ার-টার হবে আর কি?

—ওটা হাঙর, তোমাকে খাবে বলে পিছনে পিছনে আসছে—তোমাকে ধরল বলে—

—ধরুক,—জাহাজ ত ডুবেছে, এখন তুমি দয়া করে দেশে ফিরে যাও,—তোমার ঐ ধড়হীন মুণ্ডুটা নিয়ে আর আমাদের দেশে যেয়ো না। তাতে আমাদের সাহিত্য যদি দীন দরিদ্র হ'য়ে থাকে থাক, কিন্তু তোমার ঐ হৃদয়হীন মস্তিষ্কবৃত্তি নিয়ে যেয়ো না,—ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের একাকিত্ব আর অসহায় মর্মবেদনার পঙ্কিল ক্লেদ দিয়ে আমাদের হৃদয়াশ্রিত জীবনকে ক্লেদাক্ত ক'রো না।

মুণ্ডুটা হি হি করে হাসছে, এমন ভাবে হাস্‌ছে যেন সে খুব বিজ্ঞ আর আমি একটি নির্বোধ। বললে,—তোমরা ব্যক্তিত্বকে বিনাশ করে মানুষ হবে?

—হ্যাঁ, তোমরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য দিয়ে কি পেয়েছ,—উচ্ছৃঙ্খল কেশের, নির্ভরহীন যৌবনের গৃহ, পিঁজরাপোলে বার্দ্ধক্যের নিঃসঙ্গতা, রিক্ততা। এ রিক্ত একক জীবন আমরা চাই না—আমরা পুত্র, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনি নিয়ে বার্দ্ধক্যকে সুন্দর ও ব্যাপক করতে চাই। তার জন্তে ব্যক্তিত্ব যদি একটু ধামাচাপা থাকে ত থাক্—

—ও ত সেন্টিমেন্ট—

—হ্যাঁ, ওই জীবনকে পবিত্র করুক, সুখী করুক। আগে একটা হৃদয় সংগ্রহ কর, সেই হৃদয়চালিত মাথাটা নিয়ে যাবে। এখন যেও না—

—হি হি—হি হি, তোমাদের সমাজ, পরিবার ত ভাঙছে, ভেঙেছে—

—জানি, সব জানি, হয়ত ভাঙবেও তোমাদের কৃপায়, কিন্তু যদি আরও কিছুকাল থাকে তাই বলছি ফিরে যাও আর ত্যক্ত করো না।

মুণ্ডুটা ড্যাব ড্যাব করে থাকিয়ে থাক্‌লো, ঢেউএর উপর ভাস্‌ছে।

পাণ্ডুর চাঁদ পশ্চিম আকাশে কান্তিহীন। দূরের আকাশে বোধহয় ফুটেছে সোনার আভা—আরক্তিম হ'য়েছে সফেন সমুদ্র। দূরে দেখা যায় নারিকেল কুঞ্জে ঘেরা জনহীন দ্বীপ। টর্পেডোর মত চলেছে আমার বাহন দ্বীপ লক্ষ্য করে। পিছনে আসছে সাদা হাঙর—মুণ্ডুটা ভাসতে ভাসতে চলেছে সঙ্গে সঙ্গে—

সমুদ্র বেলাভূমিতে উঠে এলো আমার বাহন—মৃত-কল্প। বালুবেলায় পড়ে আছে মৃতের মত। সাদা হাঙরটা জলের কিনারে এসে থেমে গেছে, ভাবছে হয়ত ডাঙায় উঠবে, না আবার গভীর সমুদ্রে ফিরে যাবে।

বালুবেলায় দাঁড়িয়ে পরিচ্ছন্ন পূর্বাকাশের দিকে চেয়ে, বিপুল বিশ্বকে প্রণাম জানালাম,—বাতাস মধুময়, মধুময় ধরণীর ধূলি—

মুণ্ডুটা বললে,—যে তোমাকে নিয়ে এল, এই দ্বীপে সে কে জানো? ওর ঢাকনা খুলে দেখ,—দেখবে ওটা তুমিই।

—আমি?

—হ্যাঁ, তোমার ইগো,—

—তুমি জানো না, ওটা কিছুই নয়। ওটা প্রকৃতির একটা শক্তি। এই দ্যাখো—আমি মৃতকল্প বাহনটার ঢাকনা খুলে দিয়ে বললাম,—দ্যাখো—চিনতে পারো—

—না, এ ত দেখিনি কোনদিন।

—ওটা ঢেঁকি। গালাগাল দিতে আমরা বলি বুদ্ধির ঢেঁকি।

মুণ্ডুটা ডুব্‌ ডুব্‌ করে ডুব দিয়ে উঠে বললে,—আর ওই সাদা হাঙরটা—

—ওটা সিলি, দেখবে?

ডাকলাম—সিলি সিলি, উঠে এসো, সর্পবন্ধন থেকে তুমি ত মুক্ত, উঠে এসো—

সদ্যঃস্নাতা শুভ্রদেহী নগ্না সিলি ভিজে তোয়ালের ভিতর থেকে মুখ বের করে বললে,—তুমি ডাকছো?

—হ্যাঁ,—

নগ্না সিলি উঠে এলো নিঃসঙ্কোচে, তার শুভ্র দেহ বেয়ে পড়ছে সমুদ্রজল, সোনালী চুলে পড়েছে ভোরের সোনালী আলো, প্রশস্ত বুকের উপরে, হৃদয়াবেগে স্পন্দিত হচ্ছে তার নিঃসঙ্গ যৌবন।

সে বললে,—আমি ভাবতে চাইনা, আমি আর বিচার করবো না, তোমার কাছে আমি আত্মসমর্পণ করছি, তোমার বুকে আশ্রয় দাও, এই আশ্রয় চিরন্তন হোক,—আমার চাওয়া আর নাই, আমি চাই তোমাকে, তোমাকেই সুখী করতে, তাই আমি ত্যাগ করলাম আজ আমার অহং—আমার ব্যক্তিত্বকে।

সিলি উদ্বেল হৃদয় নিয়ে ছুটে এসে আলিঙ্গন করলো আমাকে। বুকের মধ্যে আশ্রয় নিল শিশুর মত—

মুণ্ডুটা ডুবছে আর উঠছে। আমি হেঁকে বললুম,—তোমার বুদ্ধির ঢেঁকিটা নিয়ে যাও, ফেলে যেও না—

মুণ্ডুটা ডুবল,—আর উঠল না।

সিলির উত্তপ্ত আলিঙ্গন তখন রোমাঞ্চ এনেছে আমার দেহে মনে। আকাশে উঠেছে তরুণ সূর্য্য—সমুদ্র ভরে গেছে তরল সোনায়।

ডিহ্‌রি-অন্‌-শোন্‌

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত

মূর্ছিত বিস্তীর্ণ চর। ধূ-ধূ বালু। শোণ শীর্ণকায়:
প্রলম্বিত শীর্ণদেহ এক অজগর।
আরক্ত ইস্পাত-সেতু কালজীর্ণ যেন অতিকায়
শিলীভূত অস্থি ও পঞ্জর।
কান পেতে শোনা যায় ক্ষীণপ্রাণ শোণের ক্রন্দন:
উচ্ছ্বসিত অশ্রুধারা 'এজিকাট'-তলে।
দুর্দ্দম শোণের বুকে পাষাণের দুর্বার বন্ধন।
হাহাকার তাই জলে স্থলে।
উপরে নির্মেঘ নীল অবারিত আকাশ উদার।
তার নিচে মানুষের স্পর্দ্ধিত প্রকাশ।
চিম্‌নির কালো মুখে অবিরাম অগ্নির উদ্গার:
ডিহ্‌রিতে বিশ্রামের কোথা অবকাশ?

ও দেহের ভার

অমিতাভ বসু

তুমি সবে স্নান সেরে এসে
ভিজে চুল সারা পিঠময়
আয়নায় দাঁড়ায়ে নিজেকে দেখছিলে।
দেহের গঠনে কবে যেন বন্যা এসে গেছে।
হঠাৎ আমারে পড়ে মনে—
বন্যার জলে যদি ভেসে যাও তুমি
আমি ছাড়া কোন সে ডুবুরী—
তোমারে তুলিতে পারে তীরে?
তাই আজ এসে গেছি আমি;
তোমার দেহের ঢেউয়ে সংগীতের ধ্বনি
আমার রক্তের সাথে মিশে একাকার;
আমার দেহেতে রাখো ও দেহের ভার॥

কবি লেখে কেমন

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

"কবি তাঁর কাব্য লেখে—বিটপীফুল ফোটায় যেমন—" বলেন কবি কুমুদরঞ্জন। এর বেশী জিজ্ঞাসা করলে তিনি হয়তো বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে তাকাবেন। এর বেশী সৃষ্টিধর্মী কবির কাছে প্রশ্নও করা যায় না। অনেক সময় তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিজেদের লেখায় মধ্যেই এর উত্তর দিয়ে গেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন, অন্তরের এককে বাহিরের একের সঙ্গে মিলিয়ে কবি অপূর্ব আনন্দের জগৎ তৈরী করেন। রবীন্দ্রনাথ কি বলেন তা তাঁর ভাষাতেই দেখা যাক্। "আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হ'য়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনে আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে। অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা।" বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হ'য়ে যাওয়া মানে, বিষয়ের বস্তুসত্তার চিদ্‌ধর্মে রূপান্তরীকরণ। জড়বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য্য নেই, আছে আমাদের 'চিৎ' অংশে।

মনীষী কাণ্ট বাহিরের প্রকৃতিকে স্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে বুদ্ধিবৃত্তির (understanding) সহিত বিকল্প বৃত্তির (Imagination) সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য্য বা আনন্দানুভূতি। এই দুটি বৃত্তির সামঞ্জস্য স্বীকার করতেই হবে। শিল্পীর কাছে কল্পনার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আজ পর্য্যন্ত যত মনীষী কল্পনাবৃত্তির সম্পর্কে যা বলেছেন, তার মধ্যে কোলরিজের কথা আমার কাছে নির্ভর যোগ্য বলে মনে হয়। স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (১৭৭২—১৮৩৪) তাঁর Biographia literaria (১৮১৭) গ্রন্থে এই 'secondary imagination সম্পর্কে বলেন—"dissolves diffuses, dissipates in order to recreate" কাব্য সেই দ্বিতীয় সৃজনশীল কল্পনার কাজ বলে প্রচার করেছেন। কিন্তু তিনি অনুভবকে (feeling) একেবারে বাদ দেননি। কাব্যের লক্ষণ সম্পর্কে তিনি বলেন—

—"The excitement of emotion for the purpose of inmmediate pleasure through the medium of beauty."

কাব্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দ দেওয়া এই কথাটি নিয়ে এরিস্টট্‌ল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্য্যন্ত খুব একটা মতবৈষম্য হয়নি। কিন্তু ঐ আনন্দের স্বরূপ বা প্রকৃতি নিয়ে নানা মুনির নানা মত। "কাব্যের কাজ নীতিশিক্ষা দেওয়া"—এই কথাটিকে জোর গলায় টলস্টয় ঘোষণা করেছেন। টলস্টয়ের মতবাদ বড় বিপজ্জনক। তাঁর মত হচ্ছে, যে সাহিত্য কেবল আনন্দ দেয় ও সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করে, তা অতি নিন্দনীয় এবং ঘৃণার্হ। "The art of our time and of our circle has become a prostitute and this comparison holds good even in a minute detail. Like her it is not limited to certain times, like her it is always adorned, like her it is always saleable and like her it is enticing and ruinous. এই নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি অনেক পূর্বসূরীর কাব্যকে নির্মমভাবে নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে আর্টের কাজ হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনসেতু যোজনা করা। Art, all art has this characteristic that it unites people" রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এক্ষেত্রে টলস্টয়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে, রবীন্দ্রমতে 'সহিত' শব্দটিতে যে মিলনের, বন্ধুত্ব-সম্পাদনের অর্থ নিহিত আছে তা তাঁর উক্তিতে প্রমাণিত হয়। সাহিত্যের উদ্দেশ্যসম্বন্ধে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন—"লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইবার চেষ্টা করে, তবে পাইতেও পারে; কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষাদেবার জন্য চিন্তাই করে না। কোন দেশেই সাহিত্য ইস্কুল মাষ্টারির ভার লয় নাই।"

নীতিশিক্ষার আদর্শের সহিত সাহিত্যের কোন বিরোধ আছে কিনা না এ' এক সমস্যামূলক প্রশ্ন। অন্য প্রবন্ধে

তা' আলোচনা করবার ইচ্ছা আছে। এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সুন্দরের আদর্শের সহিত কল্যাণবোধের আদর্শ থাকলেই তবে পরম সৌন্দর্যানুভূতি থেকে আনন্দানুভূতি হয়। কোন মহৎ কাব্য আমাদের নীতিবোধকে আঘাত দিয়ে 'মহান্' এই আখ্যা পেতে পারে না। রামায়ণে রামচন্দ্র বড় না হয়ে যদি রাবণ বড় হ'ত, তাহলে তা মহাকাব্য হতে পারতো কিনা সন্দেহের বিষয়। এখন এই যে উপদেশ, একে ভারতীয় আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট তাঁর 'কাব্যপ্রকাশ' গ্রন্থে বলেছেন—"কান্তাসম্মিতয়া উপদেশযুজে" ; অর্থাৎ শিল্প কান্তার ন্যায় রসিককে উপদেশ দেয়। শিল্পী বা চিত্রী যে রসানুভূতির মাধ্যমে বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত রূপসাক্ষাৎকার করেছেন এবং নিখুত প্রকাশভঙ্গীর মাধ্যমে তার বর্ণনা করেছেন, পাঠক সেই সমস্ত পড়ে বা দেখে উক্ত রসানুভূত উপলব্ধ বিষয়কে পুনঃ পুনঃ ধ্যানপূর্বক সমবেদনার সহিত একটি সহমর্মিতা অনুভব করে। কাব্য বর্ণিত বিষয়ের সহিত একটি অর্থ যোগসূত্র অনুভব করে। এরিস্টট্‌ল ঠিক এই কথা না বললেও, 'ক্যাথারসিস্' কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দ্রষ্টার চিত্তের পরিবর্তন ও সহমর্মী মনোভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। "The katharsis, viewed as a refining process, may have primarily implied no more to Aristotle than the expulsion of the disturbing element, namely, the pain, which enters into pity and fear when aroused by real objects, (Aristotle's theory of poetry and fine art.—S. H. Butcher. page—267)

এরিস্টটলের মতে শিল্পীর লক্ষ্য "What ought to be"-র চিত্রণ করা, অর্থাৎ যেটা সম্ভাব্য তার বর্ণনা করা। তিনি আর্ট বলতে 'imitation' অর্থাৎ 'অনুকরণ' বলেছেন। কিন্তু এই অনুকরণ নিছক হুবহু ফটোগ্রাফি নয়। এরিস্টটলের মতে—"Poetry, therefore, is a more philosophical and a higher thing than history, For poetry tends to express the universal, history the particular." এখানে 'universal' কথাটির মানে তিনি বলেন—"By the universal I mean how a person of certain type will on occasion speak or act according to the law of probability or necessity." অতএব দেখা যাচ্ছে যে নিছক অনুকরণ বলতে যা বোঝায়, তা এরিস্টটল কোন কালে বলেননি। তাঁকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নেওয়া মানে তাঁর অপব্যাখ্যা করা। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে তিনি গঠন সামঞ্জস্যই বুঝেছিলেন। কিন্তু বহিরঙ্গের সম্পর্কে বললেও অন্তরঙ্গের কথা তিনি ভেবেছিলেন। সৌন্দর্য্য সম্পর্কে তিনি বলেন—"Again a beautiful object, whether it be a living organism or any whole composed of parts, must not only have an orderly arrangement of posts, but must also be of a certain magnitude ; for beauty depends on magnitude and order. (Aristotle theory of poetry and Fine art. P. 31) তবে এটা সত্য কথা যে, 'aesthetic' শব্দটি প্রথম বুম্‌গাটেনই প্রয়োগ করেন (বুচারের মতে ভিকোই প্রথম)। সৌন্দর্য্য বলতে আমরা বর্তমানে যে অভিমত পোষণ করি, তা এরিস্টটল প্রকাশ করেননি। তবে এর পূর্বসূত্র এরিস্টটলেও পাওয়া যায়। কল্পনা বলতে তিনি 'phantasia' বুঝেছিলেন ; এবং শিল্পসৃষ্টি যেন তাঁর মতে—"Pictures which exist for the phantasy." কল্পনা বলতে তিনি বলেন—"the movement which result upon the actual sensation." এটা সর্বৈব সত্য যে, Plato or Aristotle এর 'creative imagination' বা সৃজনশীল কল্পনাবৃত্তির কোন ধারণা ছিল না। এর ধারণা পরবর্তী যুগে হয়।

মনীষী কাণ্ট কবির কাব্যকে প্রয়োজন নিরপেক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে রসাস্বাদনের আদর্শ হচ্ছে—"the pure disinterested delight." তাঁর মতে কবির কাব্যসৃষ্টিকালে মনটি উদ্দেশ্যবহির্ভূত থাকে। কবি,—"Occupies itself, still it does so without ulterior regard to any other end and yet without a feeling of satisfaction and stimulaon (independent of reward) একে খানিকটা 'purposiveness without purpose' বলা যেতে পারে।

কাব্যের বাস্তবতাকে দার্শনিক হেগেলের মত রবীন্দ্রনাথও আধ্যাত্মিক পর্যায়ে টেনে এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য সমালোচনা' নামক প্রবন্ধে একস্থানে বলেছেন—'মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়,—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তোলে।" পুনশ্চ—"জগতের উপরে মনের কারখানা বসিয়াছে এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কারখানা,—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।" (সাহিত্য সমালোচনা—বঙ্গদর্শন, নবপর্যায়, ১৩১০)

অন্যত্র তিনি বলেছেন—"শেষ কথা হচ্ছে truth is beauty কাব্যে এই truth, রূপের ট্রুথ, তথ্যের নয়। কাব্যে রূপ যদি truth রূপে অত্যন্ত প্রতীতিযোগ্য না হয়, তাহলে তথ্যের আদালতে সে অনিন্দনীয় প্রমাণিত হলেও কাব্যের দরবারে সে নিন্দিত হবে।"

আরও সুস্পষ্টভাবে—"সেই বিশ্বব্যাপী যা—তা থেকে বাছাই হয়ে যা আমাদের আপন স্বাক্ষর নিয়ে আমাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়ায় তারাই আমাদের বাস্তব।"

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে, এই 'যা—তা' থেকে কে বাছাই করে এবং কার নির্দেশে এ সব বাছাই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়? এর সুস্পষ্ট আলোচনা রবীন্দ্রনাথে না থাকলেও, খানিকটা আভাস দিয়েছেন তিনি। 'সাহিত্যের তাৎপর্য্য' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"আর্টিষ্টের সামনে উপকরণ রয়েছে বিস্তর,—সেগুলির মধ্যে গ্রহণ বর্জন করতে হবে কল্পনার নির্দেশ মত।" কিন্তু কল্পনার সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক কিরূপ অথবা বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে কল্পনার সামঞ্জস্যের ফলেই এটা সম্ভব হয় কিনা, তার সদুত্তর রবীন্দ্রনাথে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও রহস্যময় হয়ে পড়েছে। স্রষ্টার বা কবির আনন্দ জানার বা পাওয়ার আনন্দ নয়, হওয়ার আনন্দ। "বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টি লীলায় উদ্বেল হয়ে উঠে।" (সাহিত্যের পথে'—১৩০ পৃঃ)। 'সাহিত্যতত্ত্ব' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"রূপপদার্থ বস্তুর অতীত এমন একটি ঐক্যবোধ যা আমাদের চৈতন্যে মিলিত হতে বিলম্ব করে না। এখানে তার প্রকাশ, আর আমার প্রকাশ একই কথা।"

'তথ্য ও সত্য' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—"আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।"

তথ্যানুগ নিস্পৃহ বর্ণনা, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর একটা সম্মিলন অথচ নিরপেক্ষ মনোভাবই শিল্পের সারাৎসার। মনীষী হেগেল অতিরিক্ত আধ্যাত্মিক। তিনি প্রকৃতিকে স্বীকার করেছেন, প্রকৃতির বা অচিৎ-এর সহিত চিৎ-এর মিলনেই কাব্য—এই হচ্ছে তাঁর মত। তাঁর মতে চিৎ-স্বভাব যখন কোন ঐন্দ্রিয়িক স্বরূপের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয় তখনই সৌন্দর্য্যের প্রকাশ ঘটে। আর্টে আমরা যা প্রকাশ করি তা আমাদের আত্মার ধর্মে চৈতন্যময়। "What indeed this dead stuff is not the material with which art deals. What it creates upon or within it belongs to the domain of the spirit, and is living as it is."

হেগেলের মতে প্রকৃতি ঠিক জড়পদার্থ নয়। তা আমাদের চিৎ-স্বরূপেরই একটি বদ্ধ ও অসীম প্রকাশ মাত্র। তাঁর মতে আর্ট মানুষের সিসৃক্ষাবৃত্তির ফল মাত্র। বলা বাহুল্য এই মতের সহিত রবীন্দ্রনাথের মতের প্রচুর সাদৃশ্য আছে।

যিনি যাই বলুন, শিল্পীর কাজ আনন্দ দেওয়া—এ কথা আমি স্বীকার করবই। কারণ এ আমার অন্তরের মধুর বিশ্বাস। তবে এ আনন্দের সঙ্গে কল্যাণধর্ম বা সামঞ্জস্যবোধ যে একেবারে বিচ্ছিন্ন তা নয়। এরিস্টটল কেন সেই খ্রীঃ পূর্ব ৪র্থ শতকে এই কথাটার অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন। কোন অনুকৃত বস্তু দেখে কেন মানুষ আনন্দ পায়—এই কথা বলতে গিয়ে এরিস্টটল বলেন—"The cause of this again is, that to learn gives the liveliest pleasure, not only to philosophers but to men in general...thus the reason why men enjoy seeing likeness is, that in contemplating it they find themselves learning or inferring." এরিস্টটলের অভিমত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত।

কান্টও সৌন্দর্য্যকে বিষয়-নিরপেক্ষভাবে দেখেন নি। এরিস্টটলের 'মাইমেসিস্' কান্টের "reflective judgme-

nt.". ক্রোচের 'Intuition'—হয়েদরে রকম ফের হলেও মূলতঃ প্রায় এক। তবে ক্রোচে বিষয় (content) বলে কিছু মানেন না। তাঁর কাছে প্রকাশভঙ্গীই (form) সর্বস্ব। Intuition আছে, অথচ প্রকাশ নেই, এ তার মতে চিন্তাবহির্ভূত ব্যাপার। প্রকৃত বৈক্ষিক দর্শন (aesthetic experience) মানেই রূপায়নিক (artistic) দর্শন। তাঁর মতে বিষয় ও বিষয়ীর কোন দ্বৈতভাব নেই। উভয়ে মূলতঃ অভিন্ন। ক্রোচের এই বিস্ময়কর মতবাদের সহিত রবীন্দ্রনাথেরও সাদৃশ্য আছে। কিন্তু বক্তব্য এই যে, প্রকাশভঙ্গী কখনও সর্বস্ব হতে পারে না। তাছাড়া বস্তুকে স্বীকার করতেই হবে। তাকে মনোময় করে নিতে হবে। বাস্তব সংসারের ধূলিমলিন জটিলতার উপর মানসী মায়ার সৃষ্টি করতে হবে। ক্রোচে প্রতিভা ব্যাপারকে অলৌকিক বলে মানতে নারাজ। প্রতিভা বলতে রসানুগ বা সৌন্দর্য্যানুগ শব্দাদির পরিস্ফূর্তি বোঝায়। তিনি 'Intuition' বা দর্শনকে (ঈক্ষা) বিশেষজ্ঞান, এবং logical knowledge' কে সামান্যজ্ঞান বলে বর্ণনা করেছেন। সমস্ত শিল্পলব্ধজিনিষ এই বিশেষ জ্ঞানের উপর নির্ভর করছে। সামান্যজ্ঞান বিশেষজ্ঞান ছাড়া থাকতে পারেনা। কিন্তু বিশেষ জ্ঞান সামান্যজ্ঞান ছাড়া থাকতে পারে। তাহলে ঈক্ষাবৃত্তি (Intuitive knowledge) সামান্যজ্ঞান ছাড়া দাঁড়াতে পারে। অথচ তিনি 'impression' এর ভেদ, বহুত্ব প্রভৃতি কল্পনা করেছেন এবং এই বহুত্ব বা ভেদ নিয়ে 'impression-গুলি ঈক্ষাবৃত্তির সম্মুখীন হয়। বহুত্ব বা ভেদ প্রভৃতি সামান্যজ্ঞান ছাড়া লব্ধ বা উহাদের বহুত্ব থেকে একত্ব অনুভূত হতে পারেনা। অথচ তিনি এই ঈক্ষাবৃত্তিকে সামান্য পরিকল্পনাবর্জিত করেছেন। তার চিন্তার দুর্বলতা এক্ষেত্রে লক্ষণীয়। তাছাড়া বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে কল্পনাবৃত্তির সম্পর্কের কথাও তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেননি।

কবির কাব্য লেখবার সময় সমস্ত কবিসত্তা চেতন-লোকের দ্বারা প্রভাবিত থাকে না। সেখানে জাগ্রত সত্তা ও অবচেতন স্তরের একটা সূক্ষ্ম যাতায়াত অনুভূত হতে থাকে। এর ব্যবধান সূক্ষ্ম কাঁচের ন্যায়। ফ্যাসাদ হচ্ছে এই যে, অনেকে এই ব্যাপারটিকে অলৌকিক, রহস্যময়, ব্যাখ্যার অযোগ্য, মায়াময়—ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাতে প্রশ্ন এড়ান যায়, সমস্যার সমাধান হয় না। রবীন্দ্রনাথ পর্যান্ত এই ধরণের রহস্যময়তার ইঙ্গিত দিয়েছেন—

> "অন্তর মাঝে বসি অহরহ
> মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
> মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
> মিশায়ে আপন সুরে।"

সমালোচকদের কাছে এই 'তুমি' একটি দেবতার আকার প্রাপ্ত হয়েছে; একটি রহস্যময়ী নারীরূপে প্রকল্পিত হয়েছে। কিন্তু সংক্ষেপে বলতে গেলে একে কবির কাব্য-সৃষ্টি কালীন একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া বা অবস্থাই বোঝায়। চেতন এবং অচেতন, বস্তু ও অবস্তু, রূপাগত উপকরণ এবং কল্পনার নির্দেশমত তার ছাঁটাই বাছাই ইত্যাদি নানা ব্যাপার কাব্যসৃষ্টি কালে চলে। অনেক-ক্ষেত্রে কবির অজ্ঞাত অবস্থাতেই চলে। কবিও তার অনেক সময় প্রকৃত ব্যাখ্যা হয়তো দিতে পারেন না। কিন্তু তাবলে একে অযথা দৈবী মায়া অথবা রহস্যময়ী রমণীর নির্দেশ ইত্যাদি বলে আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গেলে চিরন্তন সমালোচনার ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে অবিচারিত সম্মত কাজ হবে।
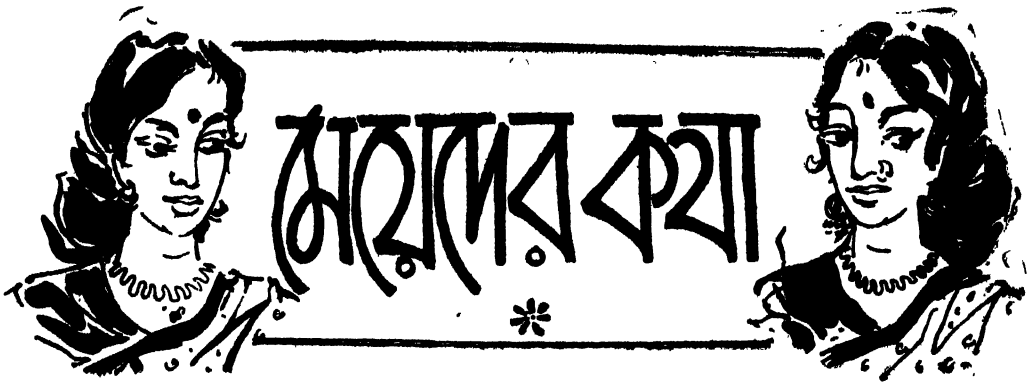
আত্মবিশ্লেষণ

আভা পাকড়াশী

সংসারের নানা রকম অশান্তি এড়াবার জন্য আত্মবিশ্লেষণ যে দরকার তা অনস্বীকার্য্য। এই সম্বন্ধে কিছুকাল আগে ভগিনী মহামায়া দেবী এই মেয়েদের বিভাগে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেই প্রবন্ধটি খুবই সময়োপযোগী হয়েছিল। এই সম্বন্ধে আরও কিছু লিখলাম। আশা করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নীট্‌শে বলেছিলেন "Man shall be trained for war and woman for the recreation of the warrior. All else is folly"। আবার লিখেছেন "Thou goest to woman? Don't forget thy whip." Russel এর উত্তরে বলেছেন নীট্‌শে সম্বন্ধে, His opinion of women, like every man's is an objectification of his own emotion towards them, which is obviously one of fear." ইনি Marriage and the population question প্রবন্ধে লিখেছেন "As religion dominated the old form of marriage, so religion must dominate the new, But it must be a new religion based upon liberty, justice and love, not upon authority and law and hell fire."

সমুদ্রপারের মহারথীদের এ বিষয় কিরূপ চিন্তাধারা তা নিয়ে আলোচনা করা গেল। এবার এদেশের চিরাচরিত "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" কতখানি তাৎপর্য্যপূর্ণ দেখা যাক্। মহাভারতের মধ্যে মেয়েদের প্রকৃতি সম্পর্কে এমন সব মন্তব্য আছে—যা পড়ে মনে হয় ওদের মধ্যে সকলেই আদৌ কিছু শ্রদ্ধার যোগ্য নয়। আমরা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগের মানুষ। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য এঁরা আপন আপন স্ত্রীকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসের পথ বরণ করেছিলেন! ঠাকুর কিন্তু সারদামণিকে দেবীর আসনে বসিয়ে রীতিমত পূজো করেছিলেন। নারীকে এই মর্য্যাদা দান ধর্ম্মজীবনের ইতিহাসে অনুপম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও গান্ধীজীও এই নবধর্মের জয়ধ্বনি করেছেন, যার ভিত্তি হবে স্বাধীনতায়, ন্যায়ে ও প্রেমে, কর্ত্তৃত্বে এবং অনুশাসনে এবং নরকাগ্নির বিভীষিকায় নয়। এঁদের দলে অবশ্য ইবসেন এবং তাঁর যোগ্য শিষ্য বার্ণার্ড শ'কেও টানতে পারি। রবীন্দ্রনাথের "যোগাযোগ"-এ বিপ্রদাসের কণ্ঠে এই গরিমাময় দাম্পত্য জীবনেরই জয়গান। "চিত্রাঙ্গদা"র সমাজ জীবনে নারীর আসন হবে কোথায় তার একটা সুস্পষ্ট ঘোষণা আছে।

> "আমি চিত্রাঙ্গদা
> দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী।
> পূজা করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি
> নই, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
> পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্শ্বে রাখো

মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী
আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

এই সংগ্রামের ঝড়কে সাহিত্যে বহন করে এনেছেন রবীন্দ্রনাথ। স্ত্রীর পত্রের মেজবৌ মৃণাল যেন ইবসেনের Doll's Houseএর 'নোরা'। স্বামীর ঘরে পুরুষের খেলার পুতুল হয়ে থাকতে মেজবৌ শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে অস্বীকার করেছে। স্ত্রী লিখেছে স্বামীকে, "কিন্তু আমি আর তোমাদের সেই ২৭ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে নেমে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা যে কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।"

প্রবন্ধকে দীর্ঘতর করবার ইচ্ছা মোটেই নেই। তবে ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি উদ্ধৃত না করলে আত্ম-বিশ্লেষণের রূপ সত্য যে কি তাহা পরিষ্কার হবে না। ইনি "চারুচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ গল্প"-র ভূমিকায় লিখেছেন সাম্প্রতিক কালে উপন্যাস ও ছোট গল্পের জীবন উপাদান ভাবকেন্দ্র ও তাৎপর্য বোধ এমন অভাবনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে যে, রবীন্দ্রযুগ-মানসের সহিত আমাদের একটা গুরুতর ব্যবধান দেখা দিয়াছে। সেযুগে যাঁহারা প্রগতিশীল লেখকরূপে রক্ষণশীল পাঠকসমাজের কাছে বিভীষিকার পাত্র ছিলেন, আজ তাঁহারা আমাদের নিকট অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ও নিতান্ত নিরীহ সমাজ-অনুশাসন-বাধ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছেন—আধুনিক গল্প উপন্যাসের নায়িকারা ইহাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অগ্রসর হইয়াছে। তাহারা তাঁহাদের হৃদয় হইতে একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের সমস্ত সংস্কারের মূল উপড়াইয়া ফেলিয়াছে ও ব্যভিচার-জীবনকে কোন মানসিক অস্বস্তি ব্যতিরেকেই এক সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যবস্থা রূপেই গ্রহণ করিয়াছে। শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের অনুরূপ অবস্থায় যে একটি সংস্কারগত অতৃপ্তি ও বিবেক-দংশন বোধ ছিল তাহা ইহারা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়াছে।

এই যে বিবেক দংশনবোধ ইহাই আত্ম-বিশ্লেষণের মূল। দেশের সাহিত্যে ও সিনেমায় যাহা প্রতিফলিত হয় তাহাই ঘরে ঘরে দাম্পত্য জীবনে কুশিক্ষা লাভের ফল প্রস্ফুটিত করে। সুতরাং "হিন্দুনারী অধিকার বিল," পাশ করেই সমাজের গোড়া কাটা যাবে না, যদি তার মূল ধর্মে বাঁধা থাকে। পণপ্রথাজনিত সাংসারিক কলহের চাইতে আধুনিকার সাথে অতি-আধুনিকার মতানৈক্যই সংসারে আজকাল বেশীর ভাগ বিভীষিকা আনে। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার দরকার। মা বাপ ঘরে ঘরে যে ভাবে তাদের শিক্ষা দেবেন, সেইভাবেই মেয়েরা শ্বশুর বাড়ীতে মানিয়ে নিতে পারবে। আমার তো মনে হয় যদি শিক্ষার দিকে জোর দেয়া যায় তাহলে আত্ম-বিশ্লেষণের সত্যিকার রূপ বুঝতে পারার অসুবিধে থাকে না। হিন্দু আইন পাশ হয়ে গেছে, কিন্তু উইল করার ক্ষমতা তো কেড়ে নেয়া হয়নি। জামাই শ্বশুরের সম্পত্তিতে দাবী করতে পারেনা যতক্ষণ না মেয়ে তার সন্তানাদির জন্যে ঐ বিষয়ে তাকে প্ররোচিত করে। তাই এ বিষয় অশান্তির কারণ কতকটা ভিত্তিহীন ও আশঙ্কাজনিত।

চিন্তন-মন অত্যন্ত মন্থর গতি। সে তাড়াতাড়ি ও সোজাসুজি কোন জিনিষ বোঝেনা। বড়ো কথাটা এই যে চিন্তন মনের বা মননশক্তির পরের ব্যবহৃত চিন্তা বা "সেকেণ্ড হ্যাণ্ড" বিষয় নিয়ে কারবার। সাধারণ মানুষ তাই অবলীলায় পরের মুখে ঝাল খায়।

কিন্তু মানুষ এমন করেই বা কেন? তারও একটা কারণ আছে। আমরা সামান্য যে মনন শক্তি নিয়ে ঘর করি সেটা চিন্তন-মনের ক্রিয়া। এ মনের ইংরেজী নাম intellect, ইউরোপ intellect এর দাম খুব বেশী দেয়, আমাদের দেশ অবশ্য অতটা এগোয়নি। মাঠের বাঁধা পথে যেমন ঘাস জন্মায় না, সংসারের গতানুগতিকতার বন্ধ্যাপথেও তেমনি স্বরূপজ্ঞানের বিবেকের উদয় হয়না। তাই মানুষ নিজের ভাগ্যটিকে সদা সর্বদা বিকৃত করে পিলসুজের মত সারাজীবন তেলকালি মাখা হয়ে থাকে, প্রদীপের সম্প্রকাশ শক্তিটি আর লাভ করেনা। সাধারণ মানুষ যন্ত্র বলেই চালাক লোকের সৃষ্টি করা নানা ধরণাই বুলির দাস হয়ে থাকে ও সাধারণ জীবন পরনির্ভর হয়ে কাটায়। স্বরূপ জ্ঞানের দ্বারা আত্মকর্তৃত্ব লাভ না করলে মানুষের দুঃখ ভাগ্য ও দাস ভাগ্য ধ্রুব হয়।

নারী জীবনকে সংসার অহরহ যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে

তাতে তার দাস ভাগ্যের কথা নেই। জীবন দুঃখের ওপর আধিপত্যের কথা বলে। এ স্বাধীনতা স্বরূপজ্ঞানের দ্বারা লভ্য, আর কিছু দিয়ে হয়না। আমাদের দেশ প্রগতি সম্পন্ন হয়েছে। অতএব আশঙ্কা জনিত চিন্তার ওপর নির্ভর করে নিজের ভাগ্যকে বিড়ম্বিত করার কোন অবকাশ নেই। আমার প্রবন্ধটি আমেরিকান কবি হুইট্‌ম্যান-এর একটি কবিতার অংশ দিয়ে শেষ করি।

"The wife, and she is not one just less
than the husband.
The daughter and she is just as good as
the son.
The mothers and she is every bit as much
as the father."

রমণী রত্ন

আনন্দলতিকা'র জন্ম

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

অপরূপ দৃশ্য দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন স্মৃতিরত্ন।

তের চৌদ্দ বছর বয়সের এক কিশোরী—গাছ কোমর বাঁধা। নীচের ডালে এক পা রেখে, উপরের ডালে আর এক পা দিয়ে, স্থলপদ্ম গাছের দুটি ডালে পা রেখে ফুল তুলছে। সুন্দর তার দাঁড়ানোর ভঙ্গি, যেন সিংহ আর অসুরের পিঠে পা দিয়ে দাঁড়ানো দুর্গা প্রতিমা।

গাছের উপর দাঁড়ানো দুরন্ত চঞ্চলা বালিকার লীলায়িত রূপ দেখে মুগ্ধ স্মৃতিরত্ন। বালিকার অধরে স্নিগ্ধ হাসি কাজলকালো মেয়েটির টানাটানা দুটি চোখে দুষ্টুমির মায়া। মেয়েটির সাবলীল কমনীয়তা ও হাসি মুখের মধুরিমা দেখে মুগ্ধ হলেন তিনি। কে এ মেয়েটি?

পরিচয় পেতেও বেশী দেরী হলো না।

পদ্মানদীর তীরে ধানুকা গ্রামে এসেছিলেন স্মৃতিরত্ন। পুত্র কৃষ্ণনাথের জন্য আশ্রয়ের সন্ধানে। সংস্কৃত কাব্যের পাঠ নেবে কৃষ্ণনাথ চতুষ্পাঠীতে—তারই ব্যবস্থা করতে এসেছিলেন স্মৃতিরত্ন। সব কিছু ঠিক ক'রে ফিরে যাচ্ছিলেন কোটালিপাড়ায়। এমন সময়ে পথের ধারে অপরূপ দৃশ্য দেখে থম্‌কে দাঁড়ালেন তিনি।

সন্ধান নিয়ে পরিচয় পেলেন—ব্রাহ্মণ কন্যা মেয়েটি। নাম বৈজয়ন্তী—তাঁদেরই পাল্টা ঘর। তবে বড়ই দুরন্ত; ছুটাছুটি আর চঞ্চলপনায় অনেক ছেলেও হার মানে ওর কাছে। আরও শুনলেন অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি মেয়েটির। পিতার টোলের পড়ুয়াদের পাঠ শুনে শুনে কণ্ঠস্থ ক'রে ফেলে সেগুলো। একবার শুন্‌লে আর ভোলে না কখনো। মুখে মুখে যখন আবৃত্তি করে সংস্কৃত কাব্যের ছন্দোময় পঙ্‌ক্তিগুলি – শুনে মুগ্ধ হয় সকলেই তখন।

সকল দিকে খোঁজ নিয়ে মনে ভাবলেন স্মৃতিরত্ন—এই মেয়েটিকে কৃষ্ণনাথের বৌ ক'রে নিলে কেমন হয়? ছেলে বেলার দুরন্তপনা বড় হলেই সেরে যাবে।

ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন তিনি স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন এক গৃহপ্রাঙ্গণে।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে কন্যার বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে বিহ্বল হয়ে উঠলেন বৈজয়ন্তীর পিতা। এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। মেয়ে যখন, একদিন তার বিয়ে দিতেই হবে। তবে এখনও বিয়ের বয়স হয়নি মেয়ের; তাই দ্বিধা জাগে মনে। কিন্তু স্মৃতিরত্ন মশাইয়ের পুত্রের মত কুলেশীলে বিদ্যায় বাঞ্ছনীয় পাত্র পাওয়াও ত সহজ নয়। নানা দিক চিন্তা ক'রে সম্মতি জানালেন বৈজয়ন্তীর পিতা বিবাহ প্রস্তাবে। পাত্র কৃষ্ণনাথকে আশীর্ব্বাদ ক'রে এলেন তিনি যথারীতি দিনক্ষণ দেখে।

বিয়ে হ'য়ে গেল; পিতৃগৃহে ফিরেও এলো বৈজয়ন্তী। স্থির হলো কৃষ্ণনাথের ছাত্রজীবন শেষ হলেই শ্বশুর-বাড়ি যাবে সে।

এক দুই ক'রে কয়েকমাস চলে গেছে। ডাগর হ'য়ে উঠেছে বৈজয়ন্তী। দেখতে দেখতে রীতিমত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে; বয়সের অনুপাতে দীঘল হ'য়ে উঠেছে সে। চতুর্দ্দশী বৈজয়ন্তী। দুরন্তপনা তখন তার দেহের তটে সীমাবদ্ধ হয়েছে; উন্নত হয়েছে ওর স্বাস্থ্য—মুখ চোখ বাহু হয়ে উঠেছে স্নিগ্ধশ্রীমণ্ডিত। কাঁধ ছাপিয়ে পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার কালো মেঘের মত চুলের রাশি।

ছেয়ে এসেছে নবযৌবনের প্লাবন। মুখে দেখা দিয়েছে ব্রীড়া সঙ্কোচ,—চলন ভঙ্গী ও ভাষা হয়েছে মন্থর ও মেদুর।

কাজল কালো রংএও অপরূপ সুন্দরী হয়ে উঠেছে বৈজয়ন্তী। কী সুন্দর ওর চোখ দুটি। যৌবনের প্রথম প্লাবনে ওর পেলব দেহ যেন ছন্দময় হয়ে উঠেছে—লীলায়িত হয়ে উঠেছে ওর কমনীয় তনু। যে দেখে সেই মুগ্ধ হয় লাবণ্যভরা দেহের মায়ায়।

একদিন ফুরিয়ে গেল অপেক্ষার কাল। এলো মিলনের লগ্ন। কৃষ্ণনাথের পাঠ সমাপন হয়েছে সংবাদ এলো ধান্থকা গ্রামে। স্বামীগৃহে যাত্রাকালে ব্যথা কাতর মুখে ছলছল চোখে তাকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন বৈজয়ন্তীর পিতা —"ঈশ্বরের করুণায় যাঁদের কুলবধূ হয়ে আজ তুমি ধন্য হয়েছ, তোমাকে নিজের কোলে স্থান দিয়ে যাঁরা তোমার বাপ-মার স্থান গ্রহণ করলেন, তাঁদের সে অন্তরের মহিমাটুকু কোনদিন যেন তোমার দ্বারা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ না হয়—শুধু এই কামনা করি আজ। স্বামী সোহাগিনী হও।"

কান্নাভরা চোখে নীরবে মাথা নীচু ক'রে রইল বৈজয়ন্তী। তারপর ধীরে ধীরে নৌকায় উঠল। পিছন ফিরে দেখলো কতকগুলি মৌন মূক সতৃষ্ণ দৃষ্টি তার যাত্রা-পথের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে। উচ্ছ্বসিত অশ্রু গড়িয়ে এলো বৈজয়ন্তীর দু'গাল বেয়ে।

স্বামী গৃহে এলো বৈজয়ন্তী। "এসো মা-লক্ষ্মী" বলে আদর ক'রে ঘরে নিয়ে গেলেন স্মৃতিরত্ন।

বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো—সন্ধ্যা গড়িয়ে এলো রাত্রি। ক্রমে গভীর হ'তে গভীর হলো রাত্রি, নিস্তব্ধ হয়ে এলো চারিদিক।

শয্যায় একা জেগে বসে আছে বৈজয়ন্তী। বুকখানা কাঁপছে কেন তার এমন দুরু দুরু ক'রে। লজ্জায়, আশঙ্কায় —বোধকরি বা খুশির ছোঁয়াচে দুলে উঠছে তার মন। বিয়ের সময় নানা হট্টগোলে পায়নি সে স্বামীসঙ্গ; বলতে গেলে আজই তার প্রথম স্বামী সম্ভাষণ। কে জানে কখন এসে স্বামী ডাকবেন তাকে—'বধূ জাগো!'

অনেক রাতে ঘরে এলো কৃষ্ণনাথ। বধূর দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল সে। বধূর কালো রং দেখে তার মন হঠাৎ এক দুঃসহ যন্ত্রণায় চঞ্চল হয়ে উঠলো। এ কি করেছে সে! এক চঞ্চলা বালিকার মুখের ছলনায় মুগ্ধ তার পিতার ভুলে এক কৃষ্ণকায়া রমণীকে বিয়ে করেছে সে? মনের যন্ত্রণা তীব্রতর হয় এবং মনের গভীরে গ্লানি বোধ করতে থাকে সে। এতদিন সংস্কৃত কাব্য-সমুদ্র মন্থন করে তার মনে যে রূপলক্ষ্মীর মূর্ত্তি জেগে উঠেছিল, তার সাথে কি প্রভেদ এই মেয়েটির! চেয়েছিল সে রূপৈশ্বর্য্যময়ী প্রেয়সী, যার রূপের প্রভাব-লাবণ্যে কল্লোলিত তনুর মায়ায় নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো তার মনে জেগে উঠ্‌লো কবিতার ছন্দ, তার বদলে এ কে এলো তার জীবনে?

বৈজয়ন্তীর প্রতি ঘৃণায় ভরে উঠ্‌লো তার মন। মনে হলো তার, বৈজয়ন্তী তার জীবনের অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে। মনে মনে স্থির করলো কৃষ্ণনাথ, মুক্তি পেতে হবে এই কৃষ্ণকায়া রমণীর কুৎসিত সংস্পর্শ হতে।

বধূর কাছে এসে বললো কৃষ্ণনাথ—"যেতে হবে তোমায়।"

"—কোথায়?"

"—তোমার পিতৃগৃহে। উদারতার বশে মনের বিভ্রমে বিবাহের পূর্ব্বে মেয়ে না দেখেই বিয়ে করে যে ভুল করেছিল, তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আজীবন আমাকে একাকীই থাকতে হবে, তুমি থাকবে তোমার পিতার কাছে।"

বৈজয়ন্তী চমকে উঠ্‌লো। তার হৃদ্‌-পিণ্ডটা বুঝি বা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। পৃথিবীর সব আলো যেন অকস্মাৎ তার চোখের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। যে শুভলগ্নের জন্য এতদিন সে কায় মনে অপেক্ষা করেছিল. সেই মধুর লগ্ন যেন চিরকালের জন্য তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দূরে চলে গেল। অন্ধকার হয়ে গেল তার ভবিষ্যত।

এই তার বিধিলিপি! হায়রে, এর চাইতে যে কুমারী জীবনও ভাল ছিল।

পিতৃগৃহে ফিরে এলো স্বামী-পরিত্যক্তা বৈজয়ন্তী। কৃষ্ণনাথের নিষ্ঠুরতার ব্যথা পেলেও কন্যাকে সমাদরে গৃহে স্থান দিলেন পিতা। ভাবলেন, স্নেহের প্লাবনে, করুণার সিঞ্চনে ঘুচিয়ে দেবেন তার মনের দুঃখ, সুমুখে তার সুবিস্তীর্ণ জীবন। সে জীবনে নূতন করে বৈজয়ন্তী

আঘাত না পায়। আশাভঙ্গ না হয় সেই দিকে রইল তাঁর দৃষ্টি।

প্রথম প্রথম বৈজয়ন্তী অত্যন্ত অসুখী, নিরানন্দ ও নৈরাশ্য বোধ করত। সব সময়ে মন মরা হয়ে থাকে সে। মনে হতো তার জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে যেন;—স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবন যেন তার আয়ত্বের বাইরে। হতাশায় ভেঙ্গে পড়তো সে।

বৈজয়ন্তী বিষাদ-ম্লান অন্তরে ভাবে, কি বিচিত্র তার জীবনের গতি। কে জানতো বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী গৃহে স্থান হবে না তার—পিতৃগৃহে ফিরে এসে আবার তাকে নতুন ক'রে জীবন সুরু করতে হবে। চোখের সামনে আলো নাই, আশা নাই, নাই কোন নূতনতর সান্ত্বনা। জীবনের বোঝা তবু টেনে নিয়ে যেতে হবে।

এই তার ভবিতব্য।

তাকে বুঝাতে থাকেন পিতা—মানুষের জীবনে দুঃখের দহন শোকতাপ তো নিত্যই আছে। সে সব সহ্য ক'রে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে হবে। না পারলে মনের মধ্যে দুঃখ মনের মধ্যে গুমরে গুমরে মরবে। শান্তি পাবে না কখনও। চেষ্টা করো নিজেকে বোঝাতে।

বৈজয়ন্তী হেসে বলে—আমার মনে তো কোন ক্ষোভ নেই বাবা। শোক দুঃখ আমার গা সওয়া হ'য়ে গেছে।

—"তবে এমন মুখ ভার কেন?"

—"এই তো হাসছি।"

বৈজয়ন্তী চেঁচিয়ে হেসে ওঠে। পিতা হেসে বলেন—"ওই হাসি দিয়ে কি আমাকে ভুলাতে পারবি মা? ও যে তোর দুঃখের কান্না। কিন্তু এ ভাবে তো চলবে না। সব দুঃখ ভুলে গিয়ে সাহিত্যের সাধনায় ডুবে মনের গভীরে গড়ে তোল সরস্বতীর ছন্দময় রূপ—তবেই সব পাবি। সে সাধনায় চাই নিষ্ঠা আর আত্ম বিশ্বাস। অনেক ত্যাগ আর দুঃখের মধ্য দিয়েই প্রত্যেকের জীবনে মহৎ প্রাপ্তি ঘটে। আশা রাখতে হবে জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত। তপস্যার মধ্য দিয়েই সফল হয়ে উঠুক তোর জীবন। দুঃখের গ্লানিমা যাক্ দূর হ'য়ে।

আশা জাগে বৈজয়ন্তীর হতাশময় প্রাণে। উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার কাজলকালো আঁখি।

পিতার প্রেরণায় নূতন চেতনায় সজাগ হ'লো তার জীবনে। বৈজয়ন্তীর পিতা তাকে শান্তি দেবার জন্য উজাড় ক'রে দিলেন নিজের ভাণ্ডার। ব্যাকরণের নিয়ম সূত্রগুলি আয়ত্ব ক'রে এগিয়ে গেল সে কাব্যের আঙিনায়। পুঁথি-পত্র পড়ে ফেলল বৈজয়ন্তী পিতার সস্নেহ শিক্ষায়—'ভট্টি-কাব্য' 'কুমারসম্ভব' শেষ করে তার মনে হলো কাব্য পাঠের একটা বিশেষ আনন্দ আছে, গভীরতর আবেদন আছে। তারপর যেদিন 'শকুন্তলা'য় হাত দিল, সেদিন অনুভব করলো বৈজয়ন্তী। রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের কন্যা শকুন্তলার জীবনেও নেমে এসেছিল এক দুঃখের দহন। যার নিবৃত্তি ঘটেছিল পরম শান্তিতে। দুঃখের পরে আছে সুখ—অশান্তি রয় না চিরস্থায়ী হয়ে।

মানুষের জীবনে এ প্রাপ্তির মূল্য কিছু কম নয়। নিজেকে শূন্য মনে হওয়ার যাতনা থেকে মুক্তি পেল বৈজয়ন্তী;—এগিয়ে চলে সে কাব্যলক্ষ্মীর আঙ্গিনা দিয়ে। ছন্দের ঝঙ্কারে কাব্যের সুরে ভরে উঠলো তার প্রাণ। ধীরে ধীরে উদার সহজ আত্ম-প্রত্যয়শীল হয়ে উঠল তার মন।

তবুও অনেক নিঃসঙ্গ অসতর্ক মুহূর্ত্তে বুকটা কেমন যেন ব্যথায় ভরে ওঠে তার। যৌবনের ছোঁয়া লাগে আর দশ-জন মেয়ে যে কামনা বাসনার তরঙ্গে উদ্বেল হয়ে ওঠে, তার ঢেউ এসে লাগে তার হৃদয়েও। পাড়ার সমবয়সী সখিদের প্রেম ও দাম্পত্যজীবন, শিশুপুত্র কোলে তাদের মাতৃহৃদয়ের মধুর ব্যঞ্জনা, স্বামী-পুত্রের সংসারে তাদের মিলিত প্রশান্তি বৈজয়ন্তীর মনকে চঞ্চল করে তোলে মাঝে মাঝে।

এমনিভাবেই এগিয়ে চলে বৈজয়ন্তীর জীবন।

ক্রমে সংস্কৃত শ্লোক রচনায় মনোনিবেশ করলো বৈজয়ন্তী। উৎসাহ দিলেন পিতা—'এই তো বেশ হয়েছে।'

পিতার আগ্রহে একই শ্লোক একাধারের জায়গায় দু' তিনবার আবৃত্তি করেছে বৈজয়ন্তী—উৎসাহে উদ্দীপনায় যেন ফেটে পড়তে চায় তার মন; ভিতরে ঢুকে আনন্দে জড়িয়ে ধরে ভ্রাতৃবধূকে বা কোন সখীকে।

কিন্তু এ শান্তিও বেশীদিন রইল না বৈজয়ন্তীর জীবনে, এক মেঘমেদুর সন্ধ্যায় হৃদযন্ত্র বিকল হয়ে দেহত্যাগ করলেন তার পিতা। ভস্ম হয়ে গেল তাঁর মরদেহ চিতার আগুনে।

শেষ হয়ে গেল বৈজয়ন্তীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

পিতার মৃত্যুতে বৈজয়ন্তী নিঃসঙ্গ বোধ করলো। স্বামী থেকেও নাই,—তাঁর স্নেহ মমতার কোন নিদর্শন সে পায় নি। মনের মাঝে সে বরাবরই একা। কিন্তু সে যে কত একা, সেটা একান্তভাবে অনুভব করলো পিতারমৃত্যুর পর। পতি-পরিত্যক্তা মেয়েকে ঘিরে ছিলেন একা তার পিতা। তাঁর স্নেহের আশ্রয়ে সে নিজেকে অনুভব করতে পারত। সে স্নেহের বন্ধনটুকুও তার মুছে গেল। পৃথিবী শূন্য হয়ে গেল তার কাছে। পৃথিবীর অর্থ গেল বদলে।

তার জীবনে আর রইল কি?

শুধু নৈরাশ্যের দাহ আর রিক্ততার বেদনা?

স্নেহ নাই, আশ্রয় নাই,—একমাত্র স্নেহময় স্পর্শটিও গেল মুছে। মাথার উপর রইল না কোন আচ্ছাদন; কোন বিকল্প সম্ভাবনা। রইল না তার কাছে জীবনের কোন নূতন পরিকল্পনা।

একটা বিরাট শূন্যতা যেন বৈজয়ন্তীকে গ্রাস ক'রে ফেলল। একটা অবিশ্রান্ত হাহাকার তার মনের মধ্যে গুমরে উঠ্‌তে লাগলো।

আর পারে না সে সহ্য করতে এই নিঃসঙ্গ জীবন,—দুর্বহ একাকিত্ব।

কাব্যের মধ্যে ডুবে মনের নিঃসঙ্গতা ঘুচাতে চাইল বৈজয়ন্তী। কিন্তু ব্যর্থ হল সে চেষ্টা। কাব্যে মন বসে না—রচনায় মনোনিবেশ করতে পারে না সে। কিছুতেই যেন ঘুচাতে পারে না, তার বিপর্য্যস্ত মনোভাব। চোখের সামনে ধূ ধূ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না সে।

এক মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্নে আনমনে পিতার শেষ চিহ্ন পুঁথিগুলির পাতা উল্টাচ্ছিল বৈজয়ন্তী। দিনান্তের শেষ দীপ্তিটুকু ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে আস্‌ছে। কালো মেঘে আকাশ যাচ্ছে ছেয়ে, বুকে তার বিজলীর খেলা। থেকে থেকে গুরুগুরু নিনাদে ডেকে উঠ্‌ছে বিদ্যুৎপ্রবাহিনী সজল কালো মেঘ—হয়ত মিলনের দুঃসহ আনন্দে, অথবা বিচ্ছেদের ভীরু আশঙ্কায়।

আষাঢ়ের এই ম্লান সন্ধ্যায় বৈজয়ন্তীর আনমনা মনখানি যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। ভুলে গেল সে তার পিতার কথা। ভুলে গেল তার হাতের পুঁথিখানির কথা। মনে জেগে উঠলো তার স্বামী কৃষ্ণনাথের কথা—বিরহের সুমধুর বেদনায়। কেমন আছে সে—মনে পড়ে কি তার এই পরিত্যক্তা বধূর কথা কোন অলস মুহূর্তে?

আকাশের দিকে নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে কতক্ষণ যে কাটিয়েছে এইভাবে টের পায়নি বৈজয়ন্তী। ঘরে আলো জ্বলে উঠতেই যেন তার চেতনার সঞ্চার হলো—দেখলে প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে ভ্রাতৃবধূ মন্দাকিনী, গলবস্ত্র হ'য়ে সন্ধ্যাবন্দনা করলো বৈজয়ন্তী।

পরক্ষণেই পাশ থেকে হাতে তুলে নিল একখানা পুঁথি নূতন করে পড়্‌বার জন্য। পাতা ওল্টাতেই চম্‌কে ওঠে বৈজয়ন্তী—স্পন্দিত হয়ে ওঠে তার বক্ষস্থল। হাতে তার বিবাহ পদ্ধতির পুঁথি—সম্মুখে বিস্তৃত রয়েছে সম্প্রদান মন্ত্র।

ওঁ দূর্ব্বাপুষ্পং ফলৈশ্চৈব বস্ত্রং তাম্বুলমেব চ।

এভিঃ কন্যা ময়া দত্তা, রক্ষণং পোষণং কুরু।

"রক্ষণং পোষণং কুরু"। কন্যার সম্পূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহীতার উপর ন্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হলো সম্প্রদাতা। রক্ষণ ও পোষণের ভার গ্রহণ করেছে স্বামী—এই যদি শাস্ত্রের বিধান তবে কেন তার এই আশ্রয়হীন জীবন?

আবার চোখে পড়লো তার গ্রহীতার প্রার্থনামন্ত্র—

"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ।

ধ্রুবাস্থ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবা স্ত্রী পতিকুলে ইয়ম্।"

দ্যুলোক ভূলোক অন্তরীক্ষ কান পেতে শোন। নভোমণ্ডলে তারাগণ সাক্ষী থাকো—পতিকুলে এর অবস্থান ধ্রুবনক্ষত্রের মত স্থির হোক, দ্যুতি হোক এর চির-অম্লান।

প্রশ্ন জাগে মনে, আর্য্য ঋষির বৈদিক মন্ত্র যদি সত্য, তবে কেন তার স্থান নাই পতিগৃহে?

মন্ত্রপাঠ ক'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে থাকে বৈজয়ন্তী। মনের মধ্যে তার আবেগের তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠ্‌লো। বিবাহ মন্ত্রের শ্লোকগুলি তার হৃদয়কে অভিভূত ক'রে তুলল। "ধ্রুবাস্থ পতিকুলে ইয়ম্"—কিন্তু তার জীবনে সেটা সম্ভব হলো না কেন? কেন তার স্থান হলো না স্বামীর ভিটায়? রূপ নাই সেটা তার অপরাধ? কেন ব্যর্থ হবে তার জীবন শুধুমাত্র রূপের অভাবে?

ছোট একটা তপ্ত নিঃশ্বাস বৈজয়ন্তীর বুকের মধ্য থেকে

বেরিয়ে আসে। ঈষৎ জ্যোৎস্নায় আবছা আলোর দিকে তাকিয়ে হৃদয়াবেগে তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ভারী হয়ে ওঠে। আর্য্য ঋষিদের অনেক সাধনার ধন এই মন্ত্র। সার্থক হবে না কেন তার জীবনেও। নিদারুণ একটা ব্যথার আবেগে তার চেতনাকে যেন অবশ ক'রে আনে। জাগে তার মনে অসহ্য সংবেদনা। নিজের অজ্ঞাতেই বৈজয়ন্তীর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস নেমে যায়।

মনের গভীরে অনেক কথাই আনাগোনা করে—শ্বশুর স্বর্গত, খাশুড়ী জীবিত। তাঁদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়ে গেছে তার মন থেকে দীর্ঘকালের অদর্শনে। একবারের বেশী দেখেও নি তাঁদের কোন দিন। কী ক'রেই বা মনে থাক্‌বে তাদের কথা!

আনমনাভাবে বৈজয়ন্তী হাতে তুলে নিলে লেখনী। স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখে ফেল্‌ল ছোট্ট একটি শ্লোক সংস্কৃত ভাষায়—

"জিত ধুম সমূহায় জিত ব্যঙ্গক বায়তে
মশকায় ময়া কায়ঃ সারম্ভারভ্য দীয়তে ॥"

সন্ধ্যা হতে আরম্ভ ক'রে সারারাত মশকগণ আমার দেহে ব্যথা দিচ্ছে। তারা ধুম বা ব্যঙ্গক কিছুরই বাধা মানে না।

বিশ্বাসী একজন লোকের হাতে চিঠিখানা স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো বৈজয়ন্তী। তার মনের মাঝে কোন উদ্বেগ নেই—নেই কোন দহন জ্বালা। ভালো করল কি মন্দ করল সে চিন্তা নিয়ে তার কোন ব্যাকুলতা নেই। মনে হলো তার একটা মুক্তির হাওয়া এসেছে যেন তার পথের বাধা দূর করে দিতে। দুঃখের অমানিশা কেটে গিয়ে তার জীবনের আকাশে ভোরের আলো দেখা দিয়েছে।

বৈজয়ন্তীর চিঠি পেলো কৃষ্ণনাথ। চিঠিখানা দেখলেন তাঁর মা ও বোনেরা।

কিছুক্ষণের মধ্যে আলোচনা বেশ জমে উঠ্‌লো। বাড়ির এঘর ওঘর থেকেও দু'চার জন এলো। সকলের কণ্ঠেই প্রায় এক সুর। বৈজয়ন্তী বিবাহিতা স্ত্রী বটে, কিন্তু বড়ই যে নিকষ কঠিন কালো। তাকিয়ে দেখা যায় না। দেখ্‌তে ইচ্ছা করে না। অনেকক্ষণ ধরে এই ধরণের আলোচনা চালিয়ে খেয়ে দেয়ে যে যার ঘরে বিছানায় শুয়ে পড়লো, আরাধনা করতে লাগলো নিদ্রাদেবীর নিশ্চিন্ত মনে।

শুধু ঘুম এলো না কৃষ্ণনাথের চোখে। মাথার কাছে পিলসুজের প্রদীপ জ্বালিয়ে চিঠির আকারে লেখা বৈজয়ন্তীর সংস্কৃত কবিতাটির দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে তার মন উধাও হয়ে উঠ্‌লো আর এক চিন্তায়। এ তো শুধু চিঠি নয়, এ যে প্রতিভাদীপ্ত ছন্দময় হৃদয়! অপরূপ যে প্রতিভা সে কি শুধুই কালো? কেন যেন মনে হলো কৃষ্ণনাথের একটা প্রতিভাদীপ্ত শক্তি লুকিয়ে আছে বৈজয়ন্তীর মধ্যে। বৈজয়ন্তীর কবিতার ছন্দে তারই স্পর্শ, তার ভাষায় তারই দীপ্তি। শ্লোকের আপাতদৃশ্যমান অর্থ ভেদ করে কৃষ্ণনাথের মনে জেগে উঠ্‌লো তার কাব্যময় ব্যঞ্জনা—

তোমার বিরহে আমার নিশীথের নিদ্রা চলে গিয়েছে। মশকেরা করছে আমার দেহে দংশন—তুমি ভিন্ন এসময়ে কে আমার পাশে থেকে রক্ষা ক'রবে?

কৃষ্ণনাথের বুক কাঁপতে থাকে একটা অদ্ভুত আবেগে। মনের মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের চেতনা দোল খায়। একটু শ্রদ্ধা, খানিকটা সহানুভূতি এবং কিছুটা প্রশংসার পথ ধরে ছোট একটা শ্লোকের মধ্য দিয়ে বৈজয়ন্তী যেন এতদিনে হৃদয়ের আঙ্গিনায় এসে দাঁড়িয়েছে কৃষ্ণনাথের। মনে হলো তার বৈজয়ন্তী যেন বল্‌ছে;—কবিহৃদয় তোমার—কাব্য ভালবাস। কবিতা দিয়েই অর্ঘ্য সাজাবো তোমার জন্য! সমস্ত মন-প্রাণ উজাড় ক'রে ছন্দের সাজি ভরে তুলবো। যদি সত্যি আমার কোন প্রতিভা থাকে, থাকে কাব্যের অনুভূতি, তার অর্ঘ্য পাবে তুমি। কিন্তু দূরে আর রেখো না আমাকে।

কৃষ্ণনাথ ছোট্ট একটা লিপিতে বৈজয়ন্তীর কবিতার উত্তর পাঠালেন।

স্বামীর কাছ থেকে স্নেহময় লিপি পেয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠ্‌লে বৈজয়ন্তীর অন্তর। মনে হলো তার—এতদিনে কি সদয় হলেন ভাগ-বিধাতা। আর একটী ছন্দোময় শ্লোক রচনা করে সে পাঠালো কৃষ্ণনাথের কাছে—

"পুন্নাগ চম্পকলবঙ্গ সরোজমল্লি
মাতঙ্গযূ বিয়সিকস্য মধুব্রতস্য।
যৎ কুন্দ বৃন্দ কুটকোহপি পক্ষপাতঃ
সদ্বংশজস্য মহতো হি মহত্ব মেতৎ ॥"

হে মধুকর, তোমার ব্রত হচ্ছে নাগকেশর, চাঁপা, লবঙ্গ, পদ্ম, মল্লিকা, যূথী যাতির সুরভি সরস মধুপান করা। আজ যে সেই সব পুষ্পের সুরভি ত্যাগ ক'রে এই সামান্য কুন্দফুলের মধুপানে অভিলাষী হচ্ছে, তাতে তোমারই মহৎ হৃদয় ও সদ্বংশের পরিচয় প্রকাশ পাচ্ছে; অনুভব করা যাচ্ছে তোমার হৃদয়ের অন্তস্থল।

বৈজয়ন্তীর ছন্দোময় লিপি পেয়ে বিচলিত বোধ করে কৃষ্ণনাথ। বৈজয়ন্তী তার স্ত্রী সন্দেহ নাই। কিন্তু পত্নী-ভাবে কখনো তাকে ভাবতে পারে নি সে, তার কালো রংএর জন্য। কিন্তু কবিতার অনবদ্য ছন্দে মুগ্ধ হলো কৃষ্ণনাথ, বিভোর হয়ে গেল তার কবিহৃদয়। বৈজয়ন্তীর মাঝে যে এত মাধুর্য্য আছে আজ সে প্রথম অনুভব করল। বীণার সবগুলি তার যেন তার মনের মধ্যে একসঙ্গে রিন্ রিন্ ক'রে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লো। বৈজয়ন্তীর অসহায় কাতরতা, তার ভগ্নহৃদয়ের বেদনা তাকে ব্যথিত ক'রে তুললো;—তাকে আকর্ষণ করলো। সেই ব্যথা আর আকর্ষণের মাঝে একটা আনন্দমধুর স্বপ্ন জেগে উঠ্‌লো তার মনে।

কাব্যলোকের অপরূপ ছন্দে মুকুলিত হয়ে উঠ্‌লো কৃষ্ণনাথের মন। নিজের কবিহৃদয় দিয়ে বৈজয়ন্তীর হৃদয় বেদনাকে অনুভব করলো। তার মনের চিরবঞ্চিত প্রেম আকুল উন্মাদনায় জেগে উঠ্‌লো। স্বর্গরাজ্যের মধুর স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠ্‌লো কৃষ্ণনাথ। অনুতাপের প্লাবনে ভেসে গেল সে; নূতন এক উন্মাদনায় তার দেহের রক্ত নেচে উঠ্‌লো। প্রেমের স্পর্শ পেয়ে শাখাপল্লব বিস্তার করে তার মনে ফুল ফুটে উঠ্‌লো। মনে হলো কৃষ্ণনাথের যেন এক অদৃশ্য শক্তি তাকে গ্রাস করতে আসছে—আর নিজেকে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তার কাছে উৎসর্গ করে দিয়ে কৃতার্থ হতে চাইছে তার মন।

বুঝলো কৃষ্ণনাথ, তার অবহেলিতা পত্নী বৈজয়ন্তী ছন্দের ঝঙ্কারে তার মনে সুরের প্লাবন এনে দিয়েছে—কাব্যলক্ষ্মীর কোমল স্পর্শে জেগে উঠেছে যে জিনিষ তা প্রেম ভিন্ন আর কিছুই নয়।

কৃষ্ণনাথ লিপি পাঠালেন বৈজয়ন্তীর কাছে—

যামিনী বিরহ ছল মানসঃ
ভ্যক্তপুট মালিত ভূরি ভূরুহ।
বিন্দু বিন্দু মকরন্দ লোলুপঃ
পদ্মিনীং মধুপ এব যাবতে॥

"হে আমার পদ্মিনী। সূর্য্যোদয়ে বিকশিত হয়ে তুমি যখন পুনরায় সূর্য্যাস্তে মুদিত হতে থাক, জানি তখন সমস্ত রাত্রি তোমার বিরহে কাটে, কিন্তু ভ্রমরেরও মধুপানে ব্যাঘাত হয়। জেগে থাকে আবার যখন সূর্য্যোদয় হবে তারই প্রতীক্ষায়, আর সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে ধেয়ে চলে পদ্মিনীর দিকে। বিরহের ক্ষণ চলতে আর দেরী নাই।"

বৈজয়ন্তীর আনন্দ আর ধরে না।

তার প্রতীক্ষার অমানিশা কেটে গিয়ে প্রেমের সূর্য্যোদয় দেখা দিয়েছে। জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছে সে। পায়ের তলায় ফিরে পেয়েছে ধরণীর কোমল মধুর স্পর্শ। স্বামীকে কেন্দ্র ক'রে এলো তার জীবনে নারীত্বের সম্মান—আর পাঁচ জন মেয়ের মতো স্বামীর পাশে পেলো সে সম্মানের আসন। আর কি চাই জীবনে! তার বঞ্চিত জীবনে যে এত সুখ দেখা দেবে তা কি ভাবতে পেরেছিল সে? স্বামীর সংসার, স্বামীর প্রেম, স্বামীর ভালবাসার আহ্বানে সঞ্জীবিত হ'য়ে উঠ্‌লো বৈজয়ন্তী।

ভাবের আবেশে তার দু'চোখ ভ'রে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো। তার আঁধার জীবনে যে আলোর রেখা দেখা দেবে তা কি ভাবতে পেরেছিল সে? তার নারী মনের ছিন্ন বিচ্ছিন্ন বাসনাগুলি সুসংবদ্ধ হবে সারি দিয়ে গ'ড়ে উঠ্‌লো।

মুক্তির স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে উঠ্‌লো সে।

যখন স্বামীর ভিটায় এসে পা দিল বৈজয়ন্তী, তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জলেছে ঘরে ঘরে। পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়েছে গৃহের প্রাঙ্গণে। মনের সব ভীতি ও আশঙ্কা তখন শান্ত হয়ে গিয়েছে। মনে হলো বৈজয়ন্তীর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার সাথে তার পিতার আশীর্ব্বাদ নেমে আস্‌ছে তার মাথায়।

কিন্তু কে দাঁড়িয়ে আছে ঐ আলোছায়া ঘেরা গৃহদ্বারে!

গৃহদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণনাথ, আহ্বান ক'রে নিতে এসেছিল সে তার হৃদয় লক্ষ্মীকে।

তার পায়ের কাছে প্রণাম ক'রে স্মিত হাসি হেসে বললো বৈজয়ন্তী—"আমি এসেছি।"

দু'হাতে স্ত্রীকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বলল কৃষ্ণনাথ—"এসো।"

এই আগ্রহে সেদিন আর অনাগ্রহ ছিল না। ধীরে বলে চললো কৃষ্ণনাথ—"আর একবার বিবাহ মন্ত্রের প্রার্থনাগুলি নূতন ক'রে স্মরণ ক'রতে হচ্ছে আমায়! 'ধ্রুবাস্মু পতিকুলে ইয়ম্'—সে তো তুমি! স্বামীর বংশে ধ্রুবতারার মত বিরাজমান থাকো—এই প্রার্থনাই জানাই আজ নূতন ক'রে। তোমারই কাছে আমি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম বিবাহকালে—"যদেতৎ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম'—আজ থেকে তোমার হৃদয়খানি আমার হৃদয়ের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাক্।'

একরাশ কালো চুলে কৃষ্ণনাথের মুখ ঢেকে গেল। দুই হাতে কৃষ্ণনাথের গলা জড়িয়ে ধরলো বৈজয়ন্তী নিবিড় ভাবে। এক মধুর চেতনার আবেশে তার দু'চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো।

দিন চলে যায়। বৈজয়ন্তী আর কৃষ্ণনাথ উভয়েই নিজ নিজ হৃদয়ের অনুরাগকে কাব্যের ছন্দে আর গানের সুরে পরিণত ক'রে কাব্য লক্ষ্মীর পায়ে নিবেদন করতে লাগলো—ক'রে ধন্য হলো। পূর্ণ হলো তাদের ছন্দোময় জীবনের মিলিত সাধনা।

জীর্ণ হয়ে গিয়েছে আজ ধানুকা গ্রামের হরিমন্দির। কয়েক শতাব্দীর জরা ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে তার ইটের পাঁজরে। ভেঙে মাটীতে লুটিয়ে পড়েছে তার চূড়া। কোটালিপাড়া গ্রামেরও আজ জীর্ণদশা। কৃষ্ণনাথের বংশধরেরা আজ কে কোথায় আছেন কে জানে? কিন্তু সব গেলেও আজো বেঁচে আছে একখানি কাব্য—যে কাব্য রচনা করেছিল বৈজয়ন্তী আর কৃষ্ণনাথ দুজনে মিলে। স্বামী-স্ত্রীর যুক্ত মনের মাধুরী মিশিয়ে রচিত সে কাব্য আজো জাগিয়ে রেখেছে দু'টি ব্যাকুল হৃদয়ের অম্লান প্রেমের ছন্দ। বিনাসূতায় গাঁথা দুটি নামের একখানি মালার মত বৈজয়ন্তী আর কৃষ্ণনাথের নাম আজো একত্রে যুক্ত হ'য়ে আছে যে কাব্যের সাথে তার নাম—"আনন্দলতিকা।" বাংলার কাব্য সাহিত্যে "আনন্দলতিকা" একখানি অপূর্ব গ্রন্থ—যে কাব্যের ছন্দের মায়ায় আর গানের সুরে সফলতায় ভরে উঠেছিল বৈজয়ন্তীর আর কৃষ্ণনাথের প্রেম—সেই কাব্য আজো পাচ্ছে বাঙালী-জাতির শ্রদ্ধা ও পূজার অর্ঘ্য।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-বি

খাদ্য:

অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন যে সন্তান-সম্ভাবনাকালে প্রসূতিদের সচরাচর ক্ষুধার বেশ আধিক্য হয়, এবং বিশেষ ধরণের ও রুচিকর খাদ্যেই শরীরের পুষ্টি লাভ ঘটে। বিশেষতঃ, দৈহিক স্বাস্থ্য যাঁদের ভালো, এ সময়ে তাঁদের শরীর আরো বেশী সুন্দর-শ্রীমণ্ডিত দেখায়। এর কারণ হলো—খাদ্য। আমরা সকলেই জানি—শরীর পুষ্টির জন্য খাদ্যের সবিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের পক্ষে কি ধরণের খাদ্য গ্রহণ করা দরকার এবং কোন কোন খাদ্য নিষিদ্ধ-বর্জনীয়, আপাততঃ, তারই মোটামুটি বিচার বিবেচনা করে দেখা যাক। কারণ আমাদের খাদ্য-তালিকায় এমন অনেক খাদ্যোপকরণ আছে, সেগুলি পুরোপুরিভাবে বর্জন না করলেও পরিমাণে কম খাওয়া উচিত। এছাড়া বিশেষ ধরণের এমন অনেক খাদ্য আছে সেগুলি প্রসূতির পক্ষে বেশী পরিমাণেই খাওয়া দরকার কিম্বা সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়াই সমীচীন। অনেকের ধারণা—প্রসূতি ও সন্তানের যথোপযুক্ত পুষ্টির প্রয়োজনবোধেই গর্ভধারণকালে বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এ ধারণা কিন্তু ভুল…গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদাই যে বেশী পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে—এমন কোনো বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। বরং, ধাত্রী-বিদ্যা-বিশেষজ্ঞেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে গর্ভধারণকালে অতি-ভোজন বা গুরু-ভোজনের ফলে, প্রসূতি ও সন্তান উভয়ের পক্ষেই উপকারের চেয়ে অপকার সাধনই বেশী ঘটে। তাই প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের সুস্বাস্থ্য রক্ষা করে তাঁরা সচরাচর সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর সাধাসিধা খাদ

গ্রহণের বিধান দিয়ে থাকেন এবং সে খাদ্য যেন আদৌ গর্ভিণীর শারীরিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত না হয় তার দিকেও সদা-সচেতন দৃষ্টি রাখেন। বাস্তবিকই, গর্ভস্থ সন্তানের যথোপযুক্ত পুষ্টির জন্যও প্রসূতির প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের কোনো কারণ নেই।...বরং এ সময়ে প্রসূতির পক্ষে বেশী পরিমাণে গুরুপাক খাদ্যাদি না খাওয়াই ভালো। কারণ, বেশী পরিমাণে গুরুপাক খাদ্য গ্রহণের ফলে, প্রায়ই পরিপাক যন্ত্রের বিশৃঙ্খলা ঘটে, হজমের গণ্ডগোল বাধিয়ে তোলে—এবং তার দরুণ খাদ্যের সারাংশ শারীরিক পুষ্টিসাধন ও ক্ষয় পূরণ করার বদলে, পাচক-যন্ত্রকে রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত এবং মূত্র-যন্ত্রকে ব্যাধি পীড়াময় করে তোলে। কাজেই গর্ভধারণকালে প্রসূতির খাদ্য সাধাসিধা ধরণের এবং ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে সাধারণতঃ যিনি যেমন খাবারদাবার খেতে অভ্যস্ত, তেমনি ধরণেরই হওয়া উচিত। অত্যধিক ঝাল বা মশলাদার এবং তৈলাক্ত খাদ্য প্রসূতির পক্ষে বিশেষ অপকারী। যে সব প্রসূতি মাছ বা মাংস খেতে ভাল-বাসেন, তাঁদের পক্ষে সপ্তাহে একদিন আমিষ জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করাই বিধেয়। সুউন্নত পাশ্চাত্য দেশেও প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আমিষ জাতীয় মাছ ও মাংসের বদলে উপযুক্ত পরিমাণে রুটি, বিস্কুট, কেক্, দুধ, সুজী বা সিমুইয়ের পায়েস, ভাত ও চিঁড়া প্রভৃতি পুষ্টিকর সহজপাচ্য নিরামিষ খাদ্যের সুব্যবস্থা করা হয়। আমাদের দেশের প্রাচীন পন্থী সুগৃহিণীরাও চিরাচরিত রীতি অনুসারে প্রসূতির স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাংসের ব্যবস্থা তো করেনই না, উপরন্তু মাছ সম্বন্ধেও সবিশেষ বাচ-বিচার করে থাকেন ও প্রসূতিকে নিয়মিতভাবে দুধ, সাগু, ছানা, ডাল, ফল, শাক-সব্জী ও মিষ্টান্ন আহার করতে বলেন। বাস্তবিকই অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের, প্রসূতি অবস্থায় আমিষ জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তে রুচি অনুযায়ী ও আবশ্যক মতো পরিমাণে কপি, কড়াই শুঁটি, লেটুস্-শাক টোম্যাটো ও ছানা, দুধ, সাগু, সুজী বা সিমুয়ের পায়েস, ডাল, শাক-সব্জী প্রভৃতি সুপুষ্টিকর নিরামিষ খাদ্যের নিয়মিত ব্যবস্থা থাকা উচিত। শাক-সব্জীতে প্রচুর খাদ্যপ্রাণ ও 'ক্যালসিয়াম' (Calcium) থাকে...গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টির-বৃদ্ধির পক্ষে যেটির বিশেষ প্রয়োজন আছে। দুধেও প্রচুর 'ক্যালসিয়াম' এবং 'ফস্ফরাস' (Phosphorus) থাকে...এ সব খাদ্য-সম্পদ সহজপাচ্য এবং সাধারণতঃ সকলেরই প্রিয়। তাই প্রসূতির পক্ষে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অন্ততঃ এক গ্লাস দুধ পান করা কর্তব্য। কারণ গর্ভস্থ সন্তানের অস্থি-পুষ্টির জন্য 'ক্যালসিয়াম' বা চুণ জাতীয় উপাদানের বিশেষ প্রয়োজন। তাছাড়া ভূমিষ্ঠ হবার পর, মায়ের দুধ পান করেই নবজাত সন্তান প্রাণ ধারণ ও পুষ্টি লাভ করে। তাই প্রসূতির খাদ্য-তালিকায় নিয়মিতভাবে দুগ্ধ পান করা যে বিশেষ প্রয়োজনীয়, সে বিষয়ে বিশ্বের সকল ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ চিকিৎসকেরাই একমত।

দুধ ছাড়াও নিয়মিতভাবে প্রত্যহ রাত্রে নিদ্রার পূর্ব্বে এবং প্রত্যূষে শয্যাত্যাগের পর এক গ্লাস জল পান করা প্রসূতির আরেকটি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে গর্ভধারণকালে প্রসূতির দেহাভ্যন্তরে সাময়িকভাবে নানা রকম পরিবর্তন ঘটে বলেই, এ সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অল্প বিস্তর কোষ্ঠ-কাঠিন্যের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রসূতি অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্যের উপদ্রব, শরীর, মন ও স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ অপকারী। অপকারক এই দুর্ভোগের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে প্রত্যেক প্রসূতিরই উচিত—নিয়মিতভাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে জল পান করা। নিয়মিতভাবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করার ফলে শুধু যে মল-মূত্ররূপে শারীরিক ক্লেদ আবর্জ্জনাদি পরিত্যাগের ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হয় তাই নয়, দৈহিক স্বাস্থ্যেরও সবিশেষ উন্নতি ঘটে। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি দরকারী কথা বলে রাখি। উপাদেয় এবং পুষ্টিকর হলেও প্রসূতি অবস্থায় খাদ্যাখাদ্যবিচারে অরুচিকর কোনো খাদ্য না খাওয়াই ভালো। কারণ অরুচিকর খাদ্য গ্রহণে প্রসূতির উপকার না হয়ে বরং শুধু অপকারই ঘটে।

খাদ্যপ্রাণের কথা ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। তাই খাদ্য-প্রাণ সম্বন্ধে আপাততঃ মোটামুটি কয়েকটি দরকারী হদিশ দিয়ে রাখি। প্রতিদিন আমরা সচরাচর যে সব খাদ্য গ্রহণ করি, তার মধ্যে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যার অভাবে দেহের পুষ্টিসাধনের ব্যাঘাত

ঘটে এবং নানা রোগ ব্যাধির উদ্ভব হয়। ইদানীং আমাদের দেশে মূল্য বৃদ্ধি, দুষ্প্রাপ্যতা ও বেপরোয়া ভেজাল মিশ্রণের ফলে, সচরাচর সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে বিশেষতঃ অন্ন রোজগারী পরিবারে যে সব খাদ্য গ্রহণ করা হয়, সেগুলিতে খাদ্য প্রাণের একান্ত অভাব দেখা যায়। কাজেই প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের যথোচিত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে, আজকাল এত সব অভাব অনটন, দুর্মূল্য অসুবিধার দিনে খাদ্য প্রাণ সমন্বিত টাটকা ফলমূল, শাকসব্জী, মাখন, ছানা, ডিম, দুধ প্রভৃতি আহার্য্যের সুব্যবস্থা করা বাস্তবিকই রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি উপায়ে এ সমস্যার সুচারু সমাধান করা যায়—সমাজের প্রত্যেকটি চিন্তাশীল ব্যক্তিই তাই নিয়ে নিবিড় আগ্রহে ভাবতে সুরু করেছেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুকরণে আমরাও তাই প্রসূতিদের উপযোগী খাদ্যাখাদ্য বিচারের প্রসঙ্গালোচনা করছি।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার অনুকরণে অধুনা আমাদের দেশীয় সমাজের বহু উগ্র আধুনিক সৌখিন সংসারে আজকাল কলে ছাঁটা চাল, ময়দা, টিনের-কৌটায় প্যাকিং করা মাছ, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, 'মার্গারিন' (Margarine), বনস্পতি ঘী, বোতলে প্যাকিং করা বাজারের মুখরোচক ঝাল-মশলাদার চাটনী, 'পিক্‌লস্' (Pickles), 'হুইস্কী' (Whisky), 'জিন' (Gin) প্রভৃতি মাদক পানীয়, সিগারেট প্রভৃতি তাম্রকূট জাতীয় খাদ্যাদি গ্রহণের ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং অনেকেরই ধারণা—এ সব বিলাতী রীতি অনুসরণ না করে চললে হয়তো তাঁরা প্রগতিশীল সুসভ্যস্তরের 'অভিজাত গোষ্ঠীর' মানুষ হিসাবে একালের বিলাসী উন্নাসিক সমাজে ঠাঁই পাবেন না। নিতান্তই 'একঘরে' এবং অবহেলিত হয়েই দূরে সরে থাকবেন। আমাদের দেশের প্রবীণ অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও ধাত্রীবিশারদদের মতে এ ধরণের খাদ্য গ্রহণ কিন্তু প্রসূতি ও গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে পরম অহিতকারী। কারণ টাটকা শাকসব্জী ফলমূল প্রভৃতিতে যে পরিমাণ খাদ্য-প্রাণ থাকে, টিনের কৌটায় বা বোতলে প্যাকিং করা দীর্ঘ সঞ্চিত ও বাসি খাদ্যোপকরণে তার যথেষ্ট অভাব নজরে পড়ে। টিনের কৌটায় বা বোতলে প্যাকিং করা খাদ্যোপকরণের প্রচলন—যুদ্ধ বিগ্রহ অভিযান, বিদেশ পরিভ্রমণ প্রভৃতি বিবিধ কারণ উপলক্ষ্যে সাময়িকভাবে বিশেষ কোনো অচল অবস্থায় একান্ত আবশ্যকীয় আহার্য্য বা 'Emergency Food' হিসাবে—নিত্যনৈমিত্তিক খাদ্য তালিকায় এগুলির শুধু রসনা তৃপ্তিকর, বিচিত্র সৌখীন বিলাসী খাবার ছাড়া অন্য কোন স্থান নেই। 'মার্গারিন' ও 'বনস্পতি-ঘীয়ের চেয়ে টাটকা মাখন ও ঘী, প্রসূতির স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক বেশী প্রয়োজনীয় এবং উপকারী। সন্তান প্রসবান্তে প্রসূতির স্বাস্থ্যোন্নতির উদ্দেশ্যে টাটকা গাওয়া ঘীয়ে ফুলকো লুচি ভেজে খাওয়ানো—আমাদের দেশের একটি পুরানো রীতি। পাশ্চাত্য রীতি অনুসারে প্রসূতির ও সন্তানের শারীরিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য নিয়মিতভাবে 'কড মাছের তেল' (Cod Liver Oil) ও 'মল্ট' (Malt) খেলেও সবিশেষ উপকার হয়। আমাদের দেশের মহিলা মহলে সচরাচর পান, দোক্তা, জর্দা প্রভৃতি খাওয়ার যে রীতি প্রচলিত আছে প্রসূতিদের পক্ষে সেটি পুরোপুরিভাবে সম্ভবপর না হলেও সাময়িকভাবে বর্জ্জন করা উচিত। তাছাড়া এদেশে নিম্ন সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে ধূমপান এবং মাদক দ্রব্য সেবনের যে কু-অভ্যাস আছে প্রসূতি অবস্থায় সেগুলিও একান্তভাবে বর্জ্জনীয়। কারণ এ সময়ে ধূমপান ও মাদক সেবনের ফলে প্রসূতি ও সন্তান উভয়েরই স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে সবিশেষ। [ক্রমশঃ

—

ষ্টেন্‌সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কাগজের উপরে ছুরি, ক্ষুরের ব্লেড (Safety Razor Blade) বা নরুণের সাহায্যে ষ্টেনসিলের কারু-শিল্পের

উপযোগী নক্সার ছাপ কি উপায়ে কাটতে হয়, গতবারে তার মোটামুটি আভাস দিয়েছি। এবারে বলছি—কাগজ, কাঠ, কাপড় প্রভৃতি উপাদানে তৈরী বিভিন্ন সামগ্রীর গায়ে কি প্রথায় এবং কেমনভাবে রঙ ফলিয়ে সেই সব ষ্টেন্‌সিলের নক্সার নিখুঁত-ছাপ তোলা যায়—তারই কথা।

ধরুন, যদি কাগজের তৈরী কোনো সামগ্রীর উপর ষ্টেন্‌সিলের নক্সার ছাপ তুলতে হয়, তাহলে সচরাচর ছবি-আঁকার জন্ম যে-ধরণের 'জল-রঙ' বা 'Water colours' ব্যবহার করার রীতি আছে, তেমনি-ধরণের রঙ হলেই চলবে। কিন্তু মাঝে-মাঝে ধোপার বাড়ী পাঠিয়ে কিম্বা ঘরে সাবান দিয়ে কেচে নিতে হবে—এমনি ধরণের কাপড়ের তৈরী কোনো সামগ্রীর উপর ষ্টেন্‌সিলের নক্সার ছাপ তোলার জন্য সাধারণ 'জল-রঙ' বা 'Water colours'এর পরিবর্তে কাপড়-ছোবানোর উপযোগী 'পাকা-রঙ' ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, বারবার সাবান দিয়ে কাচা ও জলে ধোয়ার ফলে কারু-শিল্প-সামগ্রীর উপরে সযত্নে রচিত ষ্টেন্‌সিলের নক্সার ছাপ সহজেই বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা···তাই এ সব ক্ষেত্রে সাধারণ কাঁচা-রঙের বদলে দীর্ঘস্থায়ী পাকা রঙ ব্যবহার করাই সমীচীন। তবে কাঠের বা কোনো ধাতু-নির্ম্মিত সামগ্রীর উপরে ষ্টেন্‌সিলের নক্সার ছাপ তুলতে হলে, 'তেল-রঙ' বা 'Oil-Colours' ব্যবহার করাই ভালো। এই হলো—বিভিন্ন ধরণের উপাদানে-গড়া সামগ্রীর উপরে বিবিধ-বিচিত্র রঙ ফলিয়ে ষ্টেন্‌সিলের নক্সার ছাপ তোলার চিরাচরিত রীতি। এই রীতি অনুসরণে ষ্টেন্‌সিল্ কারু-শিল্পের কাজ করবার সময়, আরেকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার—অর্থাৎ, কাপড়, কাগজ, কাঠ বা ধাতু-নির্ম্মিত যে কোনো সামগ্রীর উপরে ষ্টেন্‌সিলের নক্সার ছাপ তোলার জন্য যে রঙ ব্যবহার করবেন, সেটি যেন খুব পাতলা বা জলবৎ-তরল না হয়ে বরং ঈষৎ-গাঢ় বা ঘন থকথকে ধরণের হয়। কারণ, রঙ যদি জলবৎ-তরল বা খুব পাতলা হয়, তাহলে সেটি নক্সার ছাপ তোলার সময় অসমানভাবে ছাঁচের কিনারার চারিদিকে গড়িয়ে এবং ছড়িয়ে গিয়ে ষ্টেন্‌সিলের কারু-শিল্প-সামগ্রীটিকে রীতিমত অসুন্দর ও বেয়াড়া অপরিচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। কাজেই ষ্টেন্‌সিলের কারুশিল্পের কাজের সময় সর্ব্বদা এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এ-কাজে হাত-পাকাবার সময় শিক্ষার্থীদের অবশ্য গোড়ার দিকে অল্প বিস্তর দোষ-ত্রুটি ঘটতে পারে, তবে কিছুকাল নিয়মিত-অনুশীলনের ফলে, ক্রমশই তাঁরা এ বিষয়ে যে যথোচিত দক্ষতা লাভ করবেন--সে কথা বলাই বাহুল্য।

সচরাচর ছবি-আঁকার জন্ম শিল্পীরা যে ধরণের তুলি ব্যবহার করেন, ষ্টেন্‌সিল-কারুশিল্পের ছাপ তোলার সময় কিন্তু তেমনি ধরণের তুলি দিয়ে কাজ করা চলবে না। ষ্টেন্‌সিলের ছাঁচের উপরে রঙ-ফলানোর জন্য বিশেষ-ধরণের যে তুলি ব্যবহার হয়—নীচের ছবিতেই তার নমুনা দেখতে পাবেন।

এমনি ধরণের সরু, মোটা ও মাঝারি নানান ছাঁদের তুলি বাজারে রঙের দোকানে সহজে এবং স্বল্প-ব্যয়ে অনায়াসেই কিনতে পাওয়া যায়। তবে যদি কোনো বিশেষ কারণে শিক্ষার্থীদের কারো পক্ষে এই বিশেষ-ধরণের ষ্টেন্‌সিল্-কারুশিল্পের উপযোগী তুলি সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হয়, তাহলে সচরাচর বাজারে গঁদের আঠার শিশির সঙ্গে যে-ধরণের 'মুখ-ছাঁটা' তুলি পাওয়া যায়, সেগুলিও ব্যবহার করা যেতে পারে:···অন্যথায়, ভালো কাঁচির সাহায্যে উপরের ছবির নমুনামতো-ছাঁদে সাধারণতঃ 'জল-রঙ' বা 'তেল-রঙের' কাজের জন্য যে সব তুলি ব্যবহার করা হয়, সেগুলির ডগা বেশ সমান ও পরিপাটিভাবে খাটো-ছাঁদে ছেঁটে নিয়ে অনায়াসেই ষ্টেনসিল-কারুশিল্পের নক্সার ছাপ তুলতে পারবেন। প্রসঙ্গক্রমে, আরো একটি জরুরী বিষয় মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ, ষ্টেন্‌সিল্-কারুশিল্পের নক্সার ছাপে রঙ-ফলানোর সময়, কেবলমাত্র একটি তুলির সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা না করাই ভালো—তাতে বর্ণ-সুষমার পারিপাট্য সবিশেষ ব্যাহত হয়। এ রীতি অনুসরণ করার পরিবর্তে বরং বিভিন্ন রঙের জন্য আলাদা-আলাদা তুলি ব্যবহার করাই যুক্তি-সঙ্গত।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ এখানেই এ প্রসঙ্গ শেষ করছি। আগামী সংখ্যায় এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার বাসনা রইলো।

এমব্রয়ডারীর নতুন নক্সা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে, সচরাচর যে সব মহিলা নিজের হাতে সেলাই-ফোঁড়াই করে সূচী-শিল্পের নানারকম সৌখিন-সুন্দর সামগ্রী রচনার অনুরাগী, তাঁদের সুবিধার জন্ম এবারে সূতী, রেশমী অথবা পশমী কাপড়ের উপর বিচিত্র-ছাঁদে ও বিবিধ-বর্ণে মনোরম-ভাবে এমব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের কাজ করে ফুটিয়ে তোলার উপযোগী নূতন একটি 'প্যাটার্ণ' বা 'নক্সা-নমুনা' সাদরে উপহার দেওয়া হলো।

'ফুল ও পাতার' সরল-সুন্দর বিচিত্র-আলঙ্কারিক রূপ-সমাবেশে এমব্রয়ডারী সূচী-শিল্পের উপযোগী যে নূতন 'প্যাটার্ণ' বা 'নক্সার' নমুনা উপরে দেখানো হয়েছে, সেটি মহিলাদের ব্যবহার্য্য শায়া, পেটিকোট, ব্লাউজ এবং ছোট মেয়েদের ফ্রক প্রভৃতি পরিচ্ছদের কিনারায় সুদৃশ্য-সৌখিন 'বর্ডার' (Edge-Border) বা 'পাড়' হিসাবে এক বা একাধিক রঙের এমব্রয়ডারী-সূতোর সাহায্যে অনায়াসেই নিখুঁতভাবে সেলাইয়ের কাজ করে মনোহর-ছাঁদে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এছাড়াও, উপরোক্ত 'নক্সা-নমুনাটিকে' সহজেই বিছানায় চাদরের ও সুজনীর, এবং ঘরের দরজা-জানলার পর্দার কিনারায় সৌখিন 'বর্ডার' বা 'পাড়' হিসাবে বসিয়ে অভিনব-ছাঁদে সুশোভিত করা চলবে। এমন কি, সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারলে, এই অভিনব-সুন্দর 'প্যাটার্ণ' বা 'নক্সা-নমুনাটিকে' অনায়াসেই মেয়েদের ফ্রকের, বালিশের ওয়াড়ের, 'টেবিল-ক্লথের' ও 'টি-কোজির' (Tea-cosy) কিনারাতেও 'আলঙ্কারিক পাড়' (Decorative-Border) হিসাবে এমব্রয়ডারী করে অপরূপভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়।

কোন রঙের কাপড়ের উপরে কি ধরণের রঙীণ এমব্রয়ডারী সূতো ব্যবহারে উপরের এই 'ফুল পাতার বিচিত্র 'প্যাটার্ণ' বা 'নক্সা-নমুনাটি' ফুটিয়ে তুলতে হবে—সেটা একান্তভাবে নির্ভর করে—সূচী-শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও কলাজ্ঞানের উপর—কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো নির্দ্দিষ্ট মতামত না দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। তবে মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে—সূচী-শিল্পের কাপড়টি যদি গাঢ়-রঙের হয় তাহলে, নক্সা-এমব্রয়ডারীর জন্ম মানানসই-ধরণের হালকা-রঙের সূতো ব্যবহার করাই সমীচীন; এবং সেলাইয়ের কাপড়ের রঙ যদি হালকা-ধরণের হয়, সেক্ষেত্রে এমব্রয়ডারী সূতোর রঙ অপেক্ষাকৃত গাঢ়-জাতীয় হওয়াই বাঞ্ছনীয়! এ ছাড়াও আরো একটি অভিনব-বিচিত্র রীতি আছে...সে রীতিটি হলো—একই ধরণের—হালকা অথবা গাঢ় রঙের কাপড়ের উপর সেই রঙেরই ঈষৎ গাঢ় অথবা হালকা রঙের সূতো ব্যবহার করে নক্সাটিকে অপরূপ-ছাঁদে এমব্রয়ডারী করে তোলা। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে শাদা কাপড়ের উপর শাদা-রঙের এমব্রয়ডারী সূতো ব্যবহার করলে সূচী-শিল্পের শোভা শুধু যে সুন্দর হয়ে ওঠে তাই নয়, মাধুর্য্য-শ্রী-মণ্ডিত দেখায় নানা-রঙের সূতো দিয়ে রচিত সূচী-সামগ্রীর চেয়েও আরো অনেকখানি বেশী।

বারান্তরে, এমনি ধরণের আরো কয়েকটী সূচী-শিল্পের উপযোগী বিচিত্র-নূতন নক্সা-নমুনা প্রকাশিত করার বাসনা রইলো।

স্থপর্ণা দেবী

ইতিপূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে মুখশ্রী ও অঙ্গ-প্রসাধন সম্বন্ধে মোটামুটি যে হদিশ দিয়েছি, বর্ষাকালেও সচরাচর সেই রীতিগুলিই অনুসরণ করা চলবে। কারণ, আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালীন তপ্ত-আবহাওয়ার সঙ্গে বাতাস বইতে থাকে বলে দেহে তখন প্রচুর ঘর্ম্মোৎসারিত হলেও, সহজেই সে সব শুকিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু বর্ষাকালে বাতাস ও বারি-বর্ষণ হলেও, অধিকাংশ সময়েই বিশ্রী-বেয়াড়া ভ্যাপসা-গুমোট ও তপ্ততায় আবহাওয়া বিশেষ ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে বলেই অস্বাস্থ্যকর ক্লান্তি-অবসন্নতায় দেহ-মনের প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি ঘটে। তাই বর্ষাকালে দেহ-মনের ক্ষয়-ক্ষতি কারক এই ক্লান্তি-অবসাদের অস্বাস্থ্যকর উপদ্রবের কবল থেকে রেহাই পেতে হলে, রূপচর্চ্চা ও অঙ্গ-প্রসাধন সম্পর্কে একান্ত-প্রয়োজনীয় যে কয়েকটি রীতি মেনে চলা দরকার, আপাততঃ মোটামুটিভাবে তারই উল্লেখ করছি।

অনেকের ধারণা—রূপচর্চ্চা ও প্রসাধনের ব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া মানেই ব্যয়বহুল-বিলাসিতার প্রশ্রয় দেওয়া। কথাটা কিন্তু আদৌ ঠিক নয়। কারণ রূপচর্চ্চা ও অঙ্গ-প্রসাধনের মূল-উদ্দেশ্যই হলো—সুস্থ-সবল, সুন্দর-সুঠাম দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া…রূপ লাবণ্যের উন্নতি সাধন করা…বিশ্ব-প্রকৃতির বিচিত্র-সুষমার মাঝে ফুলের মতোই নিজের সৌন্দর্য্য-শ্রী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করে তোলা! কাজেই উপযুক্ত উপায়ে প্রসাধন চর্চ্চার ফলে, নিজের দেহ-ত্বক, শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির যথোচিত উন্নতিসাধন করে শুধু রূপ-লাবণ্য লাভই নয়, উপরন্তু সুস্থ-নীরোগ, সবল-সুন্দর, সুঠাম-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে ওঠার দিকে প্রত্যেক নারী-পুরুষেরই আজকাল সজাগ সযত্ন দৃষ্টি সম্প্রসারিত করা একান্ত কর্ত্তব্য।

সুস্থ-সবল সুঠাম দৈহিক-সৌন্দর্য্য লাভ করতে হলে, প্রথমেই দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার দিকে সচেতন-দৃষ্টি রাখা দরকার। অতিরিক্ত ঘি, তেল, লঙ্কা, মশলা প্রভৃতি দিয়ে রান্না করা গুরুপাক খাদ্য, খেতে রসনাতৃপ্তিকর হলেও আদৌ সহজপাচ্য নয় এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর—এ কথা দুনিয়ার প্রায় সকল অভিজ্ঞ-বিজ্ঞ শরীরতত্ত্ববিদ চিকিৎসক ও সৌন্দর্য্যবিশারদবৃন্দেরাই সুস্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন। অর্থাৎ দীর্ঘদিন সুস্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যশ্রী অম্লান ও অটুট রাখতে হলে, চর্ব্বি ও শর্করা জাতীয় উপকরণ যতখানি সম্ভব, দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকা থেকে কমিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত। যে সব খাদ্য-উপকরণে বিভিন্ন ধরণের 'ভিটামিন' সম্পদের প্রাচুর্য্য আছে, সেগুলিকে নিয়মিত ভাবে দৈনন্দিন খাদ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে শুধু যে অচিরেই শারীরিক সৌন্দর্য্য ও স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে তাই নয়, ব্যক্তিগত রূপ-লাবণ্যও অম্লান-অটুট থাকবে সুদীর্ঘকাল। আমাদের দেশের সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে সচরাচর যে ধরণের খাদ্য-তালিকা অনুসৃত হয়ে থাকে, সেগুলির পর্য্যালোচনা করে মোটামুটিভাবে বলা চলে যে—প্রত্যহ নিয়মিতভাবে কলা, বেল, পেঁপে, আম, আনারস, কমলা লেবু, মোজাম্বিক বা মৌসম্বী লেবু, বাতাবি লেবু প্রভৃতি কোনো না কোনো একটা টাটকা মরশুমী ফল, কলা-সমেত ভিজানো ছোলা, মুগ অথবা মাসকলাই ও কাবলী-মটর দানা, আদার কুচো, দই, দুধ, ছানা, মাখন, ডিম, মাছ, মাংস, আটার রুটি, শাক-শব্জী প্রভৃতি সুলভ ও সহজপাচ্য খাদ্যোপকরণগুলি আহারাদির সুব্যবস্থা করলে সুস্বাস্থ্য-অর্জ্জনের পক্ষে সবিশেষ সুবিধা হবে।

সুস্থ-সবল দৈহিক রূপ-লাবণ্যের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ-অটুট রাখার জন্য শুধু যথোপযুক্ত খাদ্যোপকরণের সুব্যবস্থা করলেই চলবে না—সে সব খাদ্য যাতে সহজপাচ্য হয় এবং প্রত্যহ নিয়মিতভাবে যাতে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে—তার দিকেও সজাগ দৃষ্টিদান করা দরকার। গুরুপাক খাদ্য-সেবনে হজমের গণ্ডগোল ছাড়াও, নিয়মিতভাবে দৈনন্দিন

কোষ্ঠ-পরিষ্কারেরও নানান্ বিশৃঙ্খলা ঘটে…ফলে, দৈহিক-স্বাস্থ্যের অবনতিকর অজীর্ণতা ও কোষ্ঠবদ্ধতার উদ্ভব হয় এবং খাদ্য-পরিপাক-যন্ত্রের অপটু-ক্রিয়ার উপদ্রবে শারীরিক রূপ-লাবণ্যও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ওঠে…নারী-পুরুষের ব্যক্তিগত শ্রী-সৌন্দর্য্য নিতান্ত অকালেই ঝরে পড়ে তাঁদের রীতিমত জরাজীর্ণ ও পাণ্ডুর-মলিন করে তোলে। কোষ্ঠবদ্ধতার উপদ্রব থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য, আমাদের দেশে অনেকেই আজকাল বাজারের ওষুধের দোকান থেকে বহু-বিজ্ঞাপিত ও সচরাচর-প্রচলিত নানা রকম সৌখিন 'জোলাপ' বা 'Purgative'-এর 'বটিকা' (pills and Tablets), 'চূর্ণ' (powder) ও 'তরল-ওষধি' (Liquid Mixture) নিয়মিত এবং পর্য্যাপ্তভাবে ব্যবহার করে থাকেন। এই বিশেষ-ধরণের 'জোলাপ' বা 'purgatives কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে উপকার সাধন করলেও, দীর্ঘকাল ব্যবহারের ফলে, অধিকাংশ-স্থলে অপকারসাধনই যে বেশী করে, সে কথা বিশদভাবে হয়তো বুঝিয়ে না বললেও চলে। কারণ, এ সমস্যা ইদানীং প্রায় প্রতি ঘরে-ঘরেই ব্যাপকভাবে নারী পুরুষ প্রত্যেককেই রীতিমত চিন্তাকুল করে তুলেছে। কাজেই প্রসঙ্গক্রমে, কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার কয়েকটি খুব সুলভ ও সহজসাধ্য 'ঘরোয়া-প্রক্রিয়া' সম্বন্ধে মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখছি।

প্রথমটি হলো—প্রত্যহ রাত্রে নিদ্রার আগে এবং প্রাতে শয্যাত্যাগের পরেই নিয়মিতভাবে এক গ্লাশ করে ঠাণ্ডা বা গরম জল পান করলেই দেখবেন—কোষ্ঠবদ্ধতার উপদ্রব থেকে সহজে এবং অচিরেই রেহাই পেতে পারবেন।

কোষ্ঠবদ্ধতার কারণে জোলাপ বা purgative ব্যবহারের প্রয়োজন হলে, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি অনুশীলনে সবিশেষ উপকার লাভ করবেন :—

(১) নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে ঘুম থেকে উঠেই প্রয়োজনমতো দুই বা তিনটি শুকনো হরিতকী, বয়ড়া ও আমলকী চূর্ণ-মিশ্রিত 'ত্রিফলার জল' পান ;

(২) নিয়মিতভাবে প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর, এক গেলাস ঠাণ্ডা বা গরম জলে প্রয়োজনমতো পরিমাণে এক বা দুই অথবা তিন চামচ হরিতকী বা ত্রিফলা চূর্ণের সঙ্গে দুই থেকে ছয় চামচ পরিমাণ চিনি মিশিয়ে পান ;

(৩) প্রত্যহ প্রাতে শয্যাত্যাগের পর, নিয়মিত-ভাবে একগেলাস গরম জলে পুরো একটি পাতিলেবুর রস মিশিয়ে পান।

উপরোক্ত এই তিনটি প্রক্রিয়ার যে কোনোটির সহায়তাতেই অনায়াসে কোষ্ঠকে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার রাখা চলবে। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে প্রত্যহ পেটের পেশী সুস্থ-সঞ্চালিত রাখার উপযোগী বিশেষ-ধরণের একটি ব্যায়াম-অনুশীলন করেও কোষ্ঠবদ্ধতার উপদ্রব থেকে সহজেই পরিত্রাণ লাভ করা যায়।

— –

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—বাঙলা দেশেরই বিচিত্র-মুখরোচক বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবার রান্নার কথা। অভিনব-সুস্বাদু এই খাবারটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। ছুটি-ছাটার দিনে বাড়ীতে কোনো ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রিয়জনদের পাতে সাদরে ও স্বল্প-ব্যয়ে নতুন-ধরণের এই মিষ্টান্ন-জাতীয় খাবার পরিবেষণ করে অনায়াসেই তাঁদের রসনায় পরিতৃপ্তি-সাধন করা যায়… এমন কি, বৈকালিক-জলযোগের আসরে চায়ের সঙ্গে মাঝে মাঝে বিচিত্র উপাদেয় এই 'কুমড়োর মালপোয়া' খাবারটির সুব্যবস্থা করলেও ছেলে-বুড়ো সকলের কাছেই রীতিমত উপভোগ্য হয়ে উঠবে বলেই ধারণা হয়।

'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার জন্ত যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে

রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্ত চাই— আধসের কুমড়ো, একপোয়া চিনি, একমুঠো আটা বা ময়দা, গোটা চার-পাঁচ সুগন্ধী ছোট এলাচ, সামান্ত কিছু গুঁড়ো-মৌরী এবং আন্দাজমতো পরিমাণে খানিকটা ঘি।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হলে, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে ছুরি বা বঁটির সাহায্যে পরিপাটিভাবে কুমড়োর ফালিটিকে খোশা ছাড়িয়ে দু'টুকরো করে কুটে ও পরিষ্কার-জলে আগাগোড়া ধুয়ে নেবেন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে আন্দাজমতো পরিমাণে জল দিয়ে কুমড়োর টুকরোগুলি সু-সিদ্ধ করে নিন। কুমড়োর টুকরোগুলি আগাগোড়া সু-সিদ্ধ হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে সযত্নে ফুটন্ত-জল থেকে সেগুলিকে অন্ত একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। এ কাজ সমাধার পর, পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে চিনির রস পাক করে নিন এবং কিছুক্ষণ ফোটানোর ফলে, রসটি বেশ ঘন গাঢ় হলেই রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে রেখে জুড়োতে দিন।

এবারে ইতিপূর্ব্বে আলাদা-পাত্রে তুলে-রাখা সুসিদ্ধ কুমড়োর টুকরোগুলিকে বেশ মিহি-ছাঁদে চটকে 'লেই' বানিয়ে নিয়ে, তার সঙ্গে আটা বা ময়দা, এবং ছোট-এলাচের ও মৌরীর গুঁড়ো মিশিয়ে দিন। তারপর পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সেই পাত্রে ঘি গরম করে নিন এবং রন্ধন-পাত্রের ঐ ফুটন্ত-তরল ঘিয়ে গোলাকৃতি মালপোয়ার আকারে একের পর এক কুমড়োর 'মিশ্রণ' ছেড়ে খুন্তীর সাহায্যে কিছুক্ষণ সেগুলিকে নাড়া-চাড়া করে আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে ভেজে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে এমনিভাবে ভাজার ফলে, কুমড়োর মালপোয়াগুলি বেশ বাদামী রঙের হলে, সেগুলিকে সযত্নে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে নিয়ে রসের পাত্রে চুবিয়ে রাখুন। অন্ততঃপক্ষে, আধঘণ্টাকাল রসে চুবিয়ে রাখার ফলে, কুমড়োর মালপোয়াগুলি যখন আগাগোড়া বেশ টুপ্‌টুপে হয়ে উঠবে, তখন সেগুলিকে রসের পাত্র থেকে তুলে নিয়ে সাদরে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণ করুন। আপনার হাতের রান্না এই অভিনব-মুখরোচক কুমড়োর মালপোয়ার সুস্বাদে তাঁরা যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠবেন—সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-উপাদেয় ভারতীয় খাবার রান্নার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

আশা কুঁড়ি চোখ মেলো

রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আশার কুঁড়ি তুমি চোখ মেলো,
বর্ণ ছড়াও, ছড়াও গন্ধ রাজি;
কেন সে ভ্রমর উন্মাদ ফিরে গেলো—
তারে ডাকো আর ভরাও পূজার সাজি।

অলি দলে ডাকো পরাগ পড়ুক হেসে,
হলুদ আভায় দীনতা পড়ুক ঢাকা।
লোভাতুর যারা তারাও দেখুক এসে,
কাঁটা নেই এর অথচ চয়ন বাঁকা।

কীট সে তো রবে! (কুট সে স্বভাব হোক!)
কাটবে এ ফুলে তার সে সাধ্য নেই;
মধুলোভী ভয়ে মধুরস ভরা রোক,
চোখ মেলো কুঁড়ি আমার আশা যে এই।

ম্যাদাম-দ্য-লুসি

আঁনাতোলে ফ্রাঁস্

ঘরের ভিতরে ঢুকেই ম্যাদাম-দ্য-লুসি আমার দিকে হাত বাড়ায়। মুহূর্তকাল নিস্তব্ধ আমরা। ওড়না আর টুপিটা হাতলওয়ালা চেয়ারের ওপর রাখে সে। জানালার কাছে আরো এগিয়ে এসে অস্তমান রক্তাভ সূর্যের পানে তাকায়।

আমিই সুরু করি, প্রিয়ে, মনে আছে কি তোমার বছর দুই আগের সেই কথাগুলো—ঠিক এমনি একদিনে এই রকম সময়ে নদীতটলগ্ন সেই পাহাড়ের তলায় যা বলেছ—তোমার দৃষ্টি সেইদিকে একবার ফিরিয়ে দেখ—সেখানে কি আছে? নিশ্চয়ই স্মরণে আছে তোমার, কেমন করে ভবিষ্যৎ বক্তার ভংগিমার ওপরে হাত দুলিয়ে আমারই সামনে স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো উচ্চকণ্ঠে বলেছ, অপরাধ বিচারের দিন এসেছে। জানো যে তোমায় কত ভালোবাসি আমি। আর তুমিও আদর্শের সুরে বলেছ, ন্যায় আর স্বাধীনতা-লাভে আত্মবিসর্জন দিও। বন্ধু, তোমার হাত পর্যাপ্ত চুম্বন দিয়ে সিক্ত করিনি বটে, কিন্তু সেই নির্দেশ যতদূর সম্ভব পালন করে এসেছি। তোমার কথামত চলেছি, সংগ্রামের জন্য লিখেছি বিস্তর আর বক্তৃতাও দিয়েছি অনেক। ঐক্যবোধ শক্তিহীন ঘৃণ্য নির্বোধ ঐ ক্ষুধিতের জন্যে, কপট সমবেদনায় বিভ্রান্ত বিপ্লবী জননায়ক আর ভবিষ্যতের প্রজাশক্তির হয়ে দু বছর ধরে লড়াই করেছি।

হাত তুলে ইংগিতে আমার বক্তব্য থামিয়ে দূরের একটা অস্পষ্ট ধ্বনি শোনার উদ্দেশ্যে লুসি ইসারা করে আমায়।

দুজনেই শুনতে পাই—পুষ্পিত বাগানের বিস্তৃত প্রান্তর পার হয়ে বহু দূরের চীৎকার,—মৃত্যু, অভিজাতদের ফাঁসি দাও, শূলে দাও ওকে।

বিবর্ণ স্তব্ধ হয়ে ওষ্ঠাধরের ওপর একটিবার অংগুলি রাখে সে।

আমি আস্তে আস্তে বলি, সর্বহারা কোনো হতভাগার পিছনে পিছনে তাড়া করে ছুটে আসছে কেউ। প্যারিসের ঘরে ঘরে দিনরাত অনুসন্ধান আর গ্রেপ্তারির কাজ চলছে। এখানেও জোর করে তারা ঢুকবার হয়ত চেষ্টা করতেও পারে। এখানে থাকার চাইতে আমার সরে যাওয়াই বরং বাঞ্ছনীয়। এ জায়গায় একরূপ অচেনা আমি। এমন দুর্দিনে ভয়ংকর অতিথি ছাড়া আমি আর কি হতে পারি?

অনুরোধ করে সে জানায়, চুপ করো ত।

দ্বিতীয়বার সান্ধ্য আকাশ বিদীর্ণ হয়ে চীৎকার শব্দ আকাশে ওঠে। মিলিত অসংখ্য কণ্ঠধ্বনির সংগে আগ্নেয়াস্ত্রের ঝনঝনানি আর পদক্ষেপ শব্দ মিশে যাচ্ছে। বিচিত্র ধ্বনি ক্রমে ক্রমে নিকটবর্তী হচ্ছে। তারপরই শুনতে পাচ্ছি—একটি কণ্ঠ থেকে চীৎকার ভেসে আসছে, চারদিক ঘেরাও করো যেন দুশমনটা পালিয়ে না যায়।

বিপদের বিভীষিকা ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসে যত কাছে, ম্যাদাম্-দ্য লুসি ততই শান্ত, আরো গম্ভীর মনে হয়। ধীরকণ্ঠে বলে, চল আমরা তেতলায় যাই। সার্সির মধ্যে দিয়ে বাইরের সমস্ত কিছুই তাহলে দেখতে পাবো।

কিন্তু দরজা খুলেই দেখতে পাই সুমুখে অর্ধনগ্ন এক পলাতক। মুখ তার আতংকে বিবর্ণ, দাঁতের ঠক্‌ঠক্ শব্দ আর হাঁটু দুটির ঠোকাঠুকির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মনুষ্যমূর্তি রুদ্ধস্বরে অস্ফুটে বলে, আমাকে বাঁচান, আমাকে

লুকিয়ে ফেলুন। ওই যে ওরা এলো বলে। আমার বাইরের ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকেছে ওরা। আমার বাগান তছনছ লণ্ডভণ্ড করছে। ওরা এসে গেছে প্রায়।

বৃদ্ধ দার্শনিক প্ল্যান্চনেট পাশের বাড়িতেই থাকেন। চিনতে পেরে তাঁকে লুসি কানে কানে বলে, আমার রাঁধুনী কি দেখতে পেয়েছে আপনাকে? মেয়েটি কিন্তু বিপ্লবী জ্যাকোবিন্ দলভুক্ত।

—না দেখতে পায়নি।

—প্রতিবেশী, ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।

শোবার ঘরে তাকে নিয়ে যায়। ওদের সংগে আমিও গেলাম। দরকার পরামর্শের। কোনো একটা গোপনীয় স্থানে প্ল্যান্চনেটকে সাতদিন কিংবা অন্তত ঘণ্টাকয়েকের জন্যও লুকিয়ে রাখা দরকার যেন সন্ধানকারীরা প্রতারিত হয়ে প্রান্তভাবে ফিরে চলে যায়। শেষে এটাই ঠিক করা হয় যে তাদের আগমন পর্যবেক্ষণ করবো আমি এবং ইসারায় যে মুহূর্তে জানাবো, হতভাগ্য লোকটি যেন বাগানের ফটকের ভিতর দিয়ে সংগে সংগে পলায়ন করতে পারে।

ক্ষণকাল মাত্র ভদ্রলোকটি অপেক্ষারত, কিন্তু পরমুহূর্তেই দাড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ এমনিই তিনি আতংকগ্রস্ত।

তিনি শুধু আমাদের এইটুকুই বোঝাতে চেয়েছেন যে মঁসিয়ে-ভু-ক্যাজোটের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার জন্যে তাঁকে শিকারীর মতো খুঁজে খুঁজে ওরা বেড়াচ্ছে এবং যেহেতু ১০ই আগষ্ট তারিখে টুইলারিস রক্ষাকারীদের মধ্যে তিনিও অন্যতমরূপে কাজ করেছেন। তিনিই হচ্ছেন রাজার এবং পুরোহিতদের শত্রু। বাস্তবিক এটা একটা কদর্য অপবাদের মতো। লুম্বিনের বরাবরের একটা ঘৃণা আছে তাঁর ওপরে। লুম্বিন এখন তো পুরোপুরি কসাই, জল্লাদ। কত শতবার মনে হয়েছে ওই লোকটাকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন। হীন প্রকৃতির ঐ নরাধমটা বর্তমানে একটা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সভাপতি। কিছুদিন আগেও সে ছিল একজন সাধারণ দোকানদার মাত্র।

ঐ নামটি রুদ্ধস্বরে বলতে বলতেই তিনি যেন প্রত্যক্ষ করছেন, অনুসন্ধান করতে করতে লুম্বিন তাঁর সুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সত্যিকার ঘটনাটা এই যে সিঁড়ি থেকে কতকগুলো পদধ্বনি কানে আসছে। লুসি ক্ষিপ্রহস্তে দরজা বন্ধ করেই বৃদ্ধকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে একটা পর্দার পিছনে। দ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত। রাঁধুনীর কণ্ঠস্বর লুসি চিনতে পারে। দরজা খোলার জন্যে তার ডাকাডাকি। বলে, মিউনিসিপাল কর্মচারীবৃন্দ জাতীয় রক্ষীবাহিনী নিয়ে ফটকে উপস্থিত, গোটা বাড়িটা খুঁটিয়ে তারা দেখতে চায়।

রন্ধনকারিনী বলে, ওদের বিশ্বাস, প্ল্যান্চনেট্ এই বাড়িতেই আছে। ভালো রকমে আমি জানি ওদের ভুল ধারণা এটা। আরো জানি, এ ধরণের দুর্বৃত্তকে কখনই আপনি আশ্রয় দেবেন না। আমার কথায় ওদের সন্দেহ যাচ্ছে না।

দরজার ফাঁকে মুখ রেখে লুসি জবাব দেয়, বেশ তো, উত্তম কথা। আসুক না কেন ওরা ওপরে চলে। ছোট বড়ো সব রকম ঘর থেকে আরম্ভ করে চিলেকোঠা পর্যন্ত সমস্ত বাড়িটাই ওদের দেখতে দিও।

এই কথোপকথনটা শুনতে শুনতে পর্দার পিছনে দাঁড়িয়ে বেচারা প্ল্যান্চনেট্ কেমন ধারা মূর্চ্ছিত মতন হয়ে পড়েন। তখন আর কি করারই বা আমার আছে—তাড়াতাড়ি কপালে, মুখে জলের ছাট দিয়ে দিয়ে অনেক কষ্টে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনি। সুন্দরী যুবতী ওই সময় প্রাচীন প্রতিবেশীর কানে কানে বলে, বন্ধু আমায় বিশ্বাস করো। মনে রেখো—স্ত্রীজাতি সাধারণত কৌশলী।

রোজকার মত বাড়ির কোনো না কোনো কাজে স্থির হয়ে সে নিযুক্ত আছে—এমনি ভাব দেখিয়ে আপন খাটিয়াটাকে সে ঘর থেকে বাইরে টেনে আনে। তারপর বিছানার চাদরপত্র তুলে নিয়ে আমার সাহায্যে এমনভাবে তিনটি তোষক সাজিয়ে রাখে যে দেওয়ালের পাশে দুটি উঁচু ও নীচু পাঁচিল তৈরী হয়ে মধ্যিখানে খালি জায়গায় মতো খানিকটা ফাঁকা থেকে যায়।

এই সব উদ্যোগ আয়োজনে যখন সে ব্যস্ত, এমনি সময় অনেকগুলো জুতোর মসমস্ শব্দ, চাষীদের কাঠের তৈরী পাদুকার আওয়াজ, বন্দুকের ঠকাঠক্ নির্মম ধ্বনি আর বহুকণ্ঠের কর্কশ চীৎকারে সিঁড়ির প্রতিটি ধাপই মুখর। আমাদের তিন জনের পক্ষে এই সময়টা একটা ভয়াবহ

মুহূর্ত। ওদিকে কিন্তু আওয়াজ একটু একটু করে সিঁড়ি ছাড়িয়ে মেজের ওপর দিয়ে আমাদের মাথার ওপরে ছড়িয়ে পড়ে। মনে মনে বুঝতে পাচ্ছি আমরা, অনুসন্ধান কারীদের একজন জ্যাকোবিন রাঁধুনীর নেতৃত্বে প্রথমত চিলেকোঠাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখে। ছাদ ফেটে যাওয়ার মতো চড়াৎ শব্দ করে ওঠে। চোখ-রাঙানো শাসানি আর অভদ্র হাসির শব্দ পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। গৃহভিত্তিলগ্ন কাঠের আবরণটিকে লাথি আর বেয়নেটের গুঁতো দেওয়ার শব্দ বেশ টের পাচ্ছি। আমরা নিঃশ্বাস ফেলছি বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত নষ্ট করার অবকাশ পর্যন্ত মেলে না। প্ল্যানচনেটকে তাড়াতাড়ি চাপাচাপি তোষক দুটির মধ্যেকার নির্দিষ্ট স্থানের ভেতর ঢুকিয়ে দিতে এই অবসরে কিছুটা আমি সাহায্য করি।

আমাদের এই চেষ্টা সে লক্ষ্য করছে যখন, লুসি সে সময় মাথাটা একটু নড়ায়। এই রকম বিপর্যস্ত বিছানা দেখলে যে কোনো লোকেরই মনে সন্দেহ জাগতে পারে।

বিছানাটিকে শেষরক্ষার মতো চেহারায় আনতে সাধ্যমত চেষ্টা করে সে। কিন্তু ঠিকমত হয় না। কারণ তক্ষুণিই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যে কতো কঠিন।

সে বলে, বিছানায় শুতে যাচ্ছি। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, কাঁটায় কাঁটায় সাতটা। মনে হয়, এত সকাল সকাল ঘুমুতে যাওয়া কেমন দেখাচ্ছে। অসুখের ভান অর্থহীন। জ্যাকোবিন রাঁধুনী এ ছলটা ধরে ফেলবে।

কয়েক সেকেণ্ড কি যেন চিন্তা করে। তারপর, রাষ্ট্র-সম্বন্ধীয় ব্যাপার যেন কিছুই ঘটেনি—এমনি স্তব্ধভাবে সরল মনে পোষাক পরিচ্ছদ খুলে বিছানায় শুতে যায় আর বলে, আমার জুতো জোড়া, কোটটা আর গলাবন্ধ সমস্ত নিয়ে যাও।

আমি বলি, এ রকম জায়গায় তোমার পক্ষে আমার প্রেমিক হওয়াটাই বিশেষ লাভ। ওদের আসার আগে ইতস্তত জড়ান তোমার কাপড়চোপড়গুলো পুনরায় সাজিয়ে গুছিয়ে রাখার মতো যে সময় দরকার, তা পাওয়া যাবে না হয়ত। তখন কিন্তু তোমার কুঞ্চিত কেশরাশি এলিয়ে শুধু সাদাসিদে ফতুয়াটা পরে দরজা খুলে দিও।

এই সমস্ত বন্দোবস্ত তখনকার মত ঠিক হয়। এরই মধ্যে সন্ধানকারীর দল চিলেকোঠা থেকে নানারকম চীৎকার করতে করতে নামতে থাকে—প্রতিজ্ঞা করছি, ধ্বংস চাই।

হতভাগ্য প্ল্যানচনেট ভয়ের দুরন্ত আক্ষেপে এমনভাবে কাঁপতে সুরু করে যে গোটা বিছানাটাই নড়বড় করে কেঁপে কেঁপে ওঠে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ এত স্পষ্ট যে সুমুখের লম্বা বারান্দা থেকে পর্যন্ত শোনা যায়।

লুসি বিড় বিড় করে বলে, হায়! কি দুঃখের কথা, আমার এই ক্ষুদ্র চাতুরীটায় এখন পর্য্যন্তও আমরা তুষ্ট। কিছু মনে করো না। নিরাশ কিছুতেই আমরা হবো না। ভগবান আমাদের সাহায্য করুন।

একটা জোরালো মুষ্ট্যাঘাতে দরজাটা থরথর করে কেঁপে ওঠে।

লুসি জিজ্ঞেস করে, দরজায় কে ঘা দেয়?

—জাতির প্রতিনিধিরা।

—এক মিনিট কি অপেক্ষা করতে পারেন না?

—খোল, নইলে দরজা ভেঙে ঢুকবো।

—বন্ধু! চল, গিয়ে দরজাটা খুলে দিই।

যেন কোন অলৌকিক কারণে প্ল্যানচনেটের কম্পন আর হাঁপানি হঠাৎ থেমে যায়।

গলায় স্কার্ফ জড়িয়ে, পিছনে বর্শা হাতে জনা বারো লোক নিয়ে প্রথমেই লুসিন প্রবেশ করে। লুসির প্রতি প্রথম দৃষ্টিক্ষেপ করে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলে, মনে হয়েছে, আমরা এক প্রেমিকযুগলকে বাধা দিচ্ছি। হে সুন্দরী! আমাদের ক্ষমা করো। সংগীদের পানে ফিরে বলে, আমরা জানি, লোকের সংগে কেমন করে ব্যবহার করতে হয়। কিন্তু উদার মতামত সত্ত্বেও এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে তার মনে একটা উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে।

শয্যার একাংশে বসে ঐ সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলার চিবুক তুলে ধরে সে বলে, পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, এই সুন্দর মুখ থেকে খ্রীষ্টীয় প্রার্থনা দিনরাতের কোনো সময়েই অস্পষ্ট ভাবেও উচ্চারিত হয়নি। সত্যই যদি তাই হতো, তাহলে সেটা কত বড়ো দুঃখের ব্যাপার। সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে শীর্ষস্থানীয় আমাদের এই প্রজাতন্ত্র। আমরা বিশ্বাসঘাতক

প্ল্যান্চনেটকে খুঁজছি। নিশ্চয়ই এখানে আছে। এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। যেমন করে হোক, তাকে পাওয়া চাই-ই। তাকে ধরে গিলোটিনে লটকাতে হবে। এতে আমার যে বহু ধনসম্পদের মালিক হওয়ার সম্ভাবনা।

ওদেরই একজন বলে, তাহলে তাকে খুঁজে বের করো।

চেয়ার-টেবিলের নিচে, আলমারীর ভেতর তারা অনুসন্ধান করে দেখে। বর্শা বিছানার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়। বেয়নেটের তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে তোষকগুলো ভালো রূপ পরীক্ষা করে।

লুম্বিন আপন কান চুলকিয়ে একবার আমার দিকে ধূর্তভাবে তাকায়। লুসির ভয়—পাছে আমাকে কোনো একটা বিপজ্জনক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সে বলে, প্রিয় বন্ধু, এ বাড়ির সব কিছু তো জানো আমারই মতো। চাবিটি নিয়ে মঁসিয়ে লুম্বিনকে বাড়ির সমস্ত জায়গা দেখিয়ে দাওগে। আমি নিশ্চয় জানি—প্রদর্শক হয়ে এই দেশসেবকদের কথামত কাজ করলে চমৎকার আনন্দ পাবে।

তাদের আমি কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে নিয়ে যাই। স্তূপীকৃত সাজানো কাঠের আঁটিগুলো ওলটপালট করে তারা দেখে। তারপর অনেকে কয়েক বোতল মদ পান করে। লুম্বিন বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ধাক্কা মেরে ওরা মদের পিপাগুলোর মুখ খুলে ফেলে। ঘরটি পলকেই মদে প্লাবিত হয়ে যায়। তারপর লুম্বিন চলে যাওয়ার একটা সংকেত ধ্বনি করতেই ওরা প্রস্থানোদ্যত ভংগীতে দাড়ায়।

তাদের গেট পর্যন্ত পৌছে দিয়ে সকলের সামনেই সদর দরজা আমি বন্ধ করে দিই। পরক্ষণেই ছুটে যাই লুসিকে খবর দেবার জন্য যে আমরা এখন বিপদমুক্ত।

এই কথাটা শুনেই সে দেওয়ালের পাশে শয্যার ওপর ঝুঁকে ডাকে, মঁসিয়ে প্ল্যান্চনেট। মঁসিয়ে প্ল্যান্চনেট।

উত্তরে শুধু একটুখানি ক্ষীণ শ্বাসমাত্র বের হয়ে আসে।

আনন্দে সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে, ভগবানকে ধন্যবাদ! মঁসিয়ে প্ল্যান্চনেট, আপনার জন্যেই এতক্ষণ ভয়াবহ আতংকের মধ্যেই কাটিয়েছি। ভেবেছিলাম, আপনি মৃত।

তারপর আমার দিকে চেয়ে সে বলে, বেচারা বন্ধু আমার, মাঝে মাঝে বলতো যে তুমি আমার ভালবাস এবং এতে প্রচুর আনন্দ পাও। আর কখনো ফিরে এ কথা বলো না।

অনুবাদক ঃ শ্রীসুনীলকুমার দাস
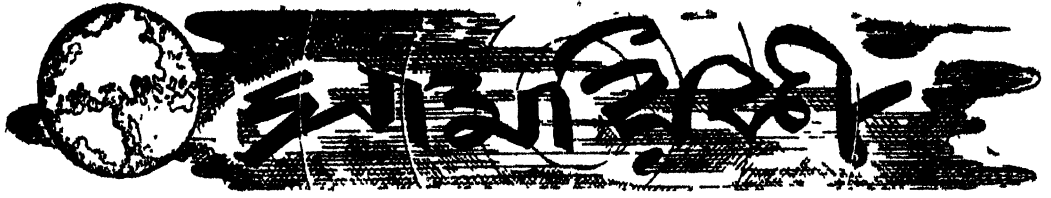
কেন্দ্রে নূতন প্রধান মন্ত্রী—

ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহরু হঠাৎ ২৭শে মে বুধবার বেলা ২টায় দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে লোকান্তরিত হন। কিছুদিন হইতে তিনি অসুস্থ থাকিলেও মৃত্যুর দিন সকালেও তাঁহার শরীর ভাল ছিল। হঠাৎ শরীর অবসন্ন হয় ও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার অমর আত্মা দেহত্যাগ করে। পরদিন উপযুক্ত মর্যাদার সহিত তাঁহার দেহ যমুনাতীরে ভস্মীভূত করা হয়। তাহার পর ২৯শে মে হইতে নূতন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচন সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকে. কামরাজ দিল্লীতে ছিলেন—তাঁহার ও বাংলার কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের অক্লান্ত চেষ্টা ও বুদ্ধির ফলে শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রী পরবর্তী প্রধান মন্ত্রী স্থির হন ১লা জুন। বলা বাহুল্য অতুল্যবাবু বর্তমানে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর সদস্য এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর কোষাধ্যক্ষ। লালবাহাদুর শাস্ত্রী বহু বৎসর কেন্দ্রে মন্ত্রী ছিলেন—কামরাজ পরিকল্পনায় তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের সহিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। তাহার পর গত জানুয়ারী মাসে প্রধান মন্ত্রী কটকে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে নেহরুজী শাস্ত্রীজিকে মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করেন ও সে সময় হইতে লাল-বাহাদুর দপ্তরহীন মন্ত্রীরূপে কাজ করিতেছিলেন। ঐ সময়ে তিনি নেহরুজী কর্তৃক একবার নেপালে ও কয়েক-বার কাশ্মীরে বিশেষ দূতরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১লা জুন দিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় লাল-বাহাদুর দলের নেতা নির্বাচিত হন। ঐ সভায় বহু প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। নির্বাচন সর্বসম্মত হওয়ায় সকলেই উল্লাস প্রকাশ করেন। নেহরুজীর মত নেতার মৃত্যুতে ভারতের মত বিরাট দেশে একজন সর্ব-সম্মতিক্রমে নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়া সত্যই আশ্চর্য জনক ব্যাপার বলিতে হইবে। কংগ্রেসদলে যতই দলাদলি ও মতভেদ থাক না কেন, ভারতের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিয়া সকলে কংগ্রেস-সভাপতি কামরাজ ও অতুল্যবাবুর এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করেন।

প্রধান মন্ত্রী পদের জন্য ৪ জনের নাম হইয়াছিল—(১) শাস্ত্রীজি (২) মোরারজী দেশাই (৩) জগজীবন রাম ও (৪) গুলজারিলাল নন্দ। শ্রীনন্দ প্রথমেই প্রধান মন্ত্রিত্ব গ্রহণে অসম্মত হন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে কাজ করিতে চাহেন। জগজীবন রামের নাম বিশেষ সমর্থন লাভ করে না—অধিকাংশ সদস্য শাস্ত্রীর পক্ষে মত প্রকাশ করায় শ্রীদেশাই শেষ পর্যন্ত প্রধান মন্ত্রী হইবার জন্য ভোটাভুটিতে রাজী হন নাই। কাজেই শাস্ত্রীজি সর্বসম্মতিক্রমে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত হন।

৮ই জুন নেহরুজীর শোককাল শেষ হইলে ৯ই জুন মঙ্গলবার সকালে রাষ্ট্রপতিভবনের অশোক হলে শ্রীলাল-বাহাদুর শাস্ত্রীর নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যগণ শপথগ্রহণ করেন। নেহরুজীর মৃত্যুর দিন হইতে শ্রীগুলজারিলাল নন্দ অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রীরূপে কাজ চালাইতেছিলেন। নূতন মন্ত্রিসভায় ৩ জন নূতন লোককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে—(১) এস-কে পাতিল (২) শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী। নেহরুজীর মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ১৩—এখন সংখ্যা হইল ১৬। পুরাতন মন্ত্রি-সভার সকলেই নূতন মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছেন। শ্রীপাতিল পূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন—কামরাজ পরি-কল্পনায় পদত্যাগ করিয়াছিলেন—এখন আবার ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরুজীর কন্যা—তাঁহাকে নূতন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করা হয়। শ্রীরেড্ডী—কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও বর্তমানে অন্ধ্ররাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাঁহাকে ও শ্রীমতী ইন্দিরাকে নূতন করিয়া এম-পি হইতে হইবে।

নূতন প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী পররাষ্ট্র ও আণবিক শক্তি

কমিশনের ভার লইবেন। (নেহরুজীর উপরও ঐ ২টি দপ্তরের ভার ছিল।) শ্রীমতী ইন্দিরা তথ্য ও বেতার দপ্তরের ভার পাইবেন। শ্রীপাতিল রেলওয়ে বিভাগ দেখিবেন। তা ছাড়া শ্রীরেড্ডী নবগঠিত ইস্পাত ও খনি দপ্তরের ভার পাইবেন। শ্রীনন্দ, শ্রীটি-টি-কৃষ্ণমাচারী, শ্রীঅশোককুমার সেন, শ্রীচ্যবন, শ্রীহুমায়ুন কবীর, শ্রীচাগলা, শ্রীডি, সঞ্জীবায়া ও শ্রীমহাবীর ত্যাগীর উপর পূর্বে তাঁহারা যে যে দপ্তরে কাজ করিতেন, সেই সেই দপ্তরের ভার দেওয়া হইবে।

ভারী এঞ্জিনিয়ারিং ও কারিগরি উন্নয়ন সম্পর্কে একটি নূতন দপ্তর খোলা হইবে—ভূতপূর্ব খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রী সেই বিভাগ পাইবেন। ভূতপূর্ব ইস্পাত মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মণ্যম্ কৃষি মন্ত্রী হইবেন। শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ সংসদীয় ব্যাপার ছাড়া অসামরিক বিমান বিভাগের ভার পাইবেন। ভূতপূর্ব রেল মন্ত্রী শ্রীদাসাপ্পা সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি বিভাগের ভার পাইবেন। এইভাবে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

শ্রীশাস্ত্রীজীর পরিচয়

ভারতের নবনির্বাচিত নেতা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্ম ১৯০৪ সালের ২রা অক্টোবর উত্তর প্রদেশের বারাণসী জেলার এক গ্রামে। কাশী বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি শাস্ত্রী উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন। ১৯৩০ সালে লবণ সত্যাগ্রহে আড়াই বছর জেল হয়। ১৯৩৫ সালে উত্তর প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও ১৯৩৭ সালে উত্তর প্রদেশ আইন সভার সদস্য হন। ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করিয়া আবার জেলে যান; ১৯৪২ সালে আবার ভারত ছাড় আন্দোলনে কারাবরণ ও ১৯৪৬ সালে আইন সভায় পুনর্নির্বাচিত হইয়া মুখ্যমন্ত্রীর পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হন। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের সম্পাদক হন ও ১৯৪৭ সালে পুলিশ ও পরিবহন মন্ত্রী হন। ১৯৫ সালে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫২ সালে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রে রেল ও পরিবহন মন্ত্রী হন। ১৯৫৬ সালে কয়েকটি স্থানে রেল দুর্ঘটনায় দায় কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস দলের নির্বাচন অধিকর্তা হইয়াছিলেন, ঐ বৎসর দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইয়া কেন্দ্রীয় পরিবহন ও যোগাযোগ মন্ত্রী হন। ১৯৫৮ সালে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করেন ও ১৯৬১ সালে কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ১৯৬১ সালে কাছাড় দৌত্য, ১৯৬২ সালে কেরল দৌত্য ও ১৯৬৩ সালে নেপাল দৌত্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে কামরাজ পরিকল্পনায় মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন ও ১৯৬৪ সালের ফেব্রুয়ারীতে জহরলাল কর্তৃক কেন্দ্রে দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ঐ সময় হইতে কাশ্মীরে বহুবার প্রধান মন্ত্রীর দূত রূপে প্রেরিত হন। নেহরুজীর জীবনাবসানের পর গত ১লা জুন ভারতের সর্বসম্মত নেতা নির্বাচিত হইয়া ৯ই জুন প্রধান মন্ত্রীর কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

১৩টি পণ্যের ফাটকা নিষিদ্ধ—

১লা জুন কেন্দ্রীয় সরকার এক আদেশ প্রচার করিয়া নিম্নলিখিত ১৩টি পণ্যের ফাটকা বন্ধ করিয়াছেন। (১) চীনাবাদাম (২) বাদাম তৈল (৩) সরিষা বীজ (৪) তিসি বীজ (৫) বাদাম খৈল (৬) সরিষা খৈল (৭) মেথি (৮) ধনিয়া (৯) তুলাবীজের খৈল (১০) তিল খৈল (১১) তিসি খৈল (১২) অড়হর (১২) ফুল ও (১৩) মৌরী। এই সকল জিনিষের ফটকা বাজারে খুব বেশী হইত।

পুঁজিপতির কুক্ষীগত কংগ্রেস—

১২ই জুন লক্ষ্ণৌয়ে কংগ্রেসকর্মীদের এক সভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বলেন—পুঁজিপতিরা আজ কংগ্রেসে প্রভুত্ব করিতেছেন—কংগ্রেসের ইহাই প্রকৃত অবস্থা। শ্রীনন্দ বলেন—জনৈক পুঁজিপতি তাঁহাকে জানাইয়াছেন যে সংসদের ৪৫ জন সদস্য উক্ত পুঁজিপতির কথায় উঠেন বসেন। পুঁজিপতিদের অর্থে কয়েকটি রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক নির্বাচন চালানো হইয়াছে। ফলে অকংগ্রেসীরা কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। শ্রীনন্দ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী—বর্তমান নূতন মন্ত্রিসভায় তাঁহার প্রভাব যথেষ্ট। তিনি চেষ্টা করিলে কি এই অবস্থার অবসান ঘটাইতে পারেন না?

মাদ্রাজে ডক—

মাদ্রাজে যে নূতন ডক নির্মাণ করিয়া জাহাজ ভিড়িবার স্থান করা হইয়াছে, ৫ই জুন কেন্দ্রীয় সরকার সেই ডকের

বিক্রমপুরের ইতিহাস লিখিয়া খ্যাতি লাভ করেন—পরে ১০ খণ্ড শিশুভারতী সম্পাদন করিয়া বাংলা সাহিত্যের একটি দিক পূর্ণ করেন। তিনি শিশুভারতীর পরিশিষ্ট খণ্ডও তৈয়ার করিয়া গিয়াছেন—তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। তাহা ছাড়া বঙ্গের মহিলা কবি, ভারত মহিলা, সাধক রামপ্রসাদ, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি সাহিত্যিক পেন্সন পাইতেন। তাঁহার ৩ পুত্র ও ৬ কন্যা বর্তমান। তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও সামাজিকতা তাঁহাকে জনপ্রিয় করিয়াছিল। তিনি দীর্ঘকাল রবিবাসরের সদস্য ছিলেন এবং ভারতবর্ষে তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাঁহার অমর আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করি।

আচার্য্য সুনীতিকুমার—

খ্যাতিমান্ অধ্যাপক ও কোবিদ্ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ৫ বৎসরের জন্য জাতীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি আছেন। সে কাজও করিয়া যাইবেন। এ পর্যন্ত ভারতে ৮ জন জাতীয়-অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন—তন্মধ্যে ৩ জন বাঙ্গালী (১) সত্যেন্দ্রনাথ বসু (২) স্বর্গত শিশিরকুমার মিত্র ও (৩) আচার্য সুনীতিকুমার। তিনি মোট ২৫০০ টাকা বেতন পাইবেন। তিনি মানববিদ্যা সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন ও কলিকাতায় থাকিবেন। আমরা তাঁহার সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন কামনা করিয়া তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়—

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় আজীবন দেশ সেবক ও কংগ্রেসনেতা। তিনি ১২ বৎসর সেচমন্ত্রীর কাজ করার পর কামরাজ পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, সম্প্রতি তিনি সর্বসম্মতিক্রমে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহার ও সৌজন্য তাঁহাকে সর্বজনপ্রিয় করিয়াছে। তিনি অবিবাহিত।

শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ—

হাওড়ার খ্যাতনামা কংগ্রেস সেবক শ্রীরবীন্দ্রলাল সিংহ কিছুকাল পূর্বে পশ্চিম বঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। গত ৪ঠা জুন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীহরেন্দ্রনাথ চৌধুরী স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করায় রবীন্দ্রলাল নূতন শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি অবিবাহিত এবং তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম শক্তি সকলকে মুগ্ধ করে। আমরা তাঁহার কর্মসাফল্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায়—

হুগলী জেলার কোন্নগর নিবাসী খ্যাতিমান দেশ সেবক ও কংগ্রেস-নেতা ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় গত ১লা জুন ৫৬ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার পিতা নৈহাটী কাঁঠালপাড়ানিবাসী কেশবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জ্ঞাতি ছিলেন—তাঁহার অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাঁঠালপাড়ার বাড়ী মিল কর্তৃক গৃহীত হইলে কোন্নগর সি-এস-মুখার্জি ষ্ট্রীটে বাড়ী কিনিয়া বাস করেন। ননীবাবু অবিবাহিত ছিলেন। তিনি সারা জীবন পরোপকার কার্য্যে নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়া ঐ অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিলেন।

পরলোকে গমন—

খ্যাতনামা আইনজীবী নকুলেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী লক্ষ্মীমণি দেবী গত ৫ই জ্যেষ্ঠ ৮০ বৎসর বয়সে কলিকাতা ৩২ জে সাহিত্য পরিষদ ষ্ট্রীটস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মীমণি সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্রের বংশে জন্মগ্রহণ করেন ও সম্পর্কে পৌত্রী ছিলেন। তিনি দানশীলা, ধর্মপরায়ণা ছিলেন এবং ২ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

দুর্ভোগের দাওয়াই

স্ত্রী—কি যে হয়েছে ওঁর কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছি না !···ক'দিন ধরেই দেখছি, অফিস থেকে বাড়ী ফিরে সব সময়েই কেমন যেন মনমরা আর উদাস হয়ে রয়েছেন···তাই আপনাকে টেলিফোন করে···

ডাক্তার—বটে !··· [রোগীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া] ···তা, কষ্টটা কি বোধ করছেন এখন, বলুন তো ?

স্বামী—কষ্ট !···সে আর কি বলবো, ডাক্তার !···সারারাত জেগেই কাটছে ক'দিন ··মুহূর্তের জন্যও দু'চোখের পাতা এক করতে পারিনে···ছিটে ফোঁটাও ঘুম নেইকো আমার !···গিন্নীর আবদারের ফর্দ আর ঝাঁঝালো বাক্যবানের ঠেলায় অফিস থেকে ফিরেই রোজ ক্লাবে পালিয়ে আড্ডা আর তাস-খেলা বন্ধ করে দেওয়া ইস্তক, দেখছি এই দুর্ভোগ !

ডাক্তার—হু !···তা, এ দুর্ভোগের আসল দাওয়াই হলো—গৃহিণীটিকে অবিলম্বে তাঁর পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে রোজ সন্ধ্যায় ক্লাবের বন্ধু-বান্ধবদের সাদরে বাড়ীতে ডেকে এনে চা, জলখাবার আর পান সিগারেট খাইয়ে আপ্যায়িত করে তোফা আরামে আড্ডায় আসর জাঁকিয়ে বসবেন !

স্ত্রী—তাহলেই ওঁর আগের মতোই রোজ রাতে আবার ভালো ঘুম হবে ?

ডাক্তার—ঘুম না হোক···সময়টা অন্ততঃ আনন্দেই কাটাবেন।·· আপনার আবদার আর উপদেশের দাপট থেকে রেহাই পেয়ে তবু দু'দণ্ড দম্ ফেলে বাঁচতে পারবেন তো !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্মা
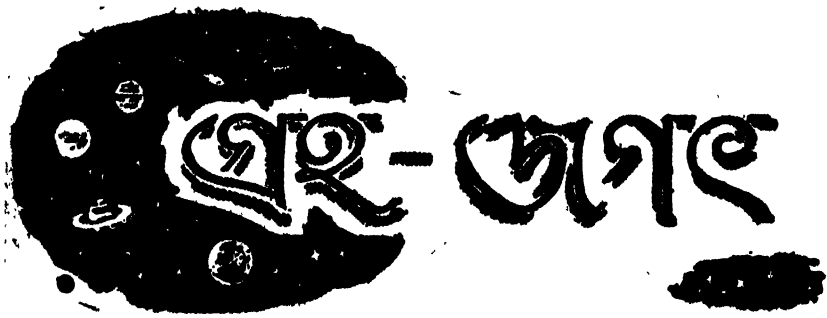
জ্যোতিষের আলোচনা

উপাধ্যায়

শুক্র দশমাধিপতি দ্বাদশাধিপতির সঙ্গে সংযুক্ত বা সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলে জাতক মৃত্যুর পর পার্থিব জগতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। দ্বাদশাধিপতি রাহু বা কেতুর সঙ্গে অনুরূপ ভাবাপন্ন হোলে জাতক বিষ্ণুলোক হতে ফিরে আসে। নবমাধিপতি ও দশমাধিপতি দ্বাদশে সহাবস্থান করলে জাতক ব্রহ্মলোকে গমন করে এবং সেখান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করে। যদি বৃহস্পতি দ্বাদশে থেকে শুভগ্রহের দৃষ্টি লাভ করে এবং দ্বাদশাপতি উচ্চস্থ হয় তাহোলে জাতক মোক্ষলাভ করে এবং পৃথিবীতে আর জন্ম গ্রহণ করে না। দ্বাদশাধিপতি এবং দ্বাদশস্থান পাপ-সংযুক্ত ও পাপদৃষ্ট হোলে মৃত্যুর পর জাতকের নরকবাস হয়। দ্বাদশাধিপতি নীচস্থ অথবা নীচস্থ গ্রহসংযুক্ত ও রাহুকেতুর সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট হোলে নরকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। দ্বাদশে মঙ্গল, শনি, রবি, রাহু এবং দ্বাদশাধিপতি নীচস্থ হোলে জাতক মৃত্যুর পর বিশেষভাবে নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। দ্বাদশাধিপতি পাপগ্রহসংযুক্ত বা পাপগ্রহদৃষ্ট; পরাজিত, নীচস্থ ও অস্তমিত হোলে জাতকের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। দ্বাদশে রবি, মঙ্গল এবং রাহু অবস্থান করলে এবং দ্বাদশাধিপতি দুর্ব্বল ও পাপগ্রহ দৃষ্ট হোলে জাতকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দোষ ও দুর্ব্বলতা প্রত্যক্ষ করা যায়। দ্বাদশাধিপতি পাপগ্রহ হয়ে দুঃস্থানগত বা শত্রুগৃহগত হোলে এবং পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট বা পাপ গ্রহের সহিত একত্র থাকলে দারিদ্র্যযোগ ঘটে। দ্বাদশাধিপতি পাপগ্রহের সহিত একত্র থাকলে দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকলে এবং পাপগ্রহের পূর্ণ দৃষ্টি দ্বাদশে পড়লে জাতক নানাদেশ পরিক্রমা করে বেড়ায়। দ্বাদশাধিপতি সপ্তমে রাহুর সঙ্গে থাকলে এবং রবি ও মঙ্গলের দ্বারা উক্ত স্থানে পূর্ণ দৃষ্ট হোলে চুরির জন্য ক্ষতি হয়। রবি, মঙ্গল, শনি এবং রাহুর দ্বার সংযুক্ত হোয়ে অথবা মঙ্গলের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হোয়ে দ্বাদশাধিপতি নীচস্থ অবস্থায় থাকলে ভৃত্যের দ্বারা বহু অনিষ্ট সাধিত হবে। দ্বাদশাধিপতি অষ্টম স্থানে থাকলে বিমলাযোগ হয়। এ যোগ শুভপ্রদ। জাতক সুখী স্বাধীন এবং সম্ভ্রান্ত পদাধিষ্ঠিত হয়ে প্রচুর অর্থ লাভ করে।

লগ্নাধিপতি একাদশ স্থানে শুক্র নবমে এবং বৃহস্পতি কেন্দ্রে থাকলে পিতার সৌভাগ্য সম্পদ সুনিশ্চিত। পঞ্চমাধিপতি নবম স্থানে অথবা নবমাধিপতির সহিত সহা-বস্থান বা পূর্ণ দৃষ্টিতে আবদ্ধ হোলে এবং বৃহস্পতি পঞ্চমে থাকলে পুত্রের মাধ্যমে জাতকের সৌভাগ্য সম্পদ লাভ হয়। চতুর্থ স্থান (মাতৃ স্থান) থেকে চন্দ্র ষষ্ঠ, অষ্টম অথবা দ্বাদশে অবস্থিত হয়ে পাপ গ্রহের দ্বারা দৃষ্ট বা সংযুক্ত হোলে জাতকের পিতার দুইটী স্ত্রী হয়। নবমাধিপতি অথবা রবি, শনি ও মঙ্গলের সঙ্গে সহাবস্থান করলে পাঁচ বৎসর বয়সের সময় পিতৃবিয়োগ ঘটে। দশমাধিপতি নবমে, লগ্নাধিপতি দশমে এবং চন্দ্র পঞ্চমস্থানে থাকলে জাতকের সৌভাগ্য লাভ হয়। দশমাধিপতি শুভগ্রহ হোলে এবং শুভগ্রহের সঙ্গে সহাবস্থান করলে বা দৃষ্ট হোলে জাতক বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি হয়। শুভগ্রহগণ

কেন্দ্রে বা ত্রিকোণে এবং শুভ দৃষ্ট হোলে অনুরূপ ফল হয়। দশমাধিপতি রাহুর সঙ্গে অষ্টম স্থানে থাকলে জাতক মনুষ্য-বিদ্বেষী ও কুখ্যাত বর্বর ব্যক্তি হয়। ষষ্ঠাধিপতি কর্ম-স্থানে এবং ভাগ্যাধিপতি দুঃস্থানে থাকলে অনুরূপ কুখ্যাত হয়। রবি ও শনি দশম স্থানে সহাবস্থান করলে অথবা উক্ত স্থানে পাপগ্রহ থাকলে বা স্থানটি পাপদৃষ্ট হোলে জাতক কুখ্যাত ব্যক্তি হয়। দশমে রাহু বা কেতু থাকলে এবং দশমাধিপতি নীচস্থ হোলে অনুরূপ ফল ঘটে। আমেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনসনের দশমস্থানে প্লুটো অবস্থিত। শুক্র নেপচুনের সঙ্গে অবস্থিত হয়ে হার্সেলের দ্বারা পূর্ণ দৃষ্ট হয়, এজন্ত এঁর পক্ষে কুখ্যাতি বা অপবাদের যোগ আছে। রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের জীবন ফুরিয়ে এসেছে, সুতরাং তিনি এখন সমালোচনার বাহিরে।

রবি এবং চন্দ্র শনির দ্বারা এবং চন্দ্র মঙ্গলের দ্বারা পীড়িত হোলে বহুলাংশে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যায়। লগ্ন অথবা লগ্নাধিপতি নেপচুনের দ্বারা, হার্সেল বা শনির দ্বারা রবি এবং শনি বা মঙ্গলের দ্বারা চন্দ্র পীড়িত হোলে মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধি ঘটে। মঙ্গল জন্মকুণ্ডলীতে সবল ও শুভ হয়ে দশম স্থানের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে জাতক চিকিৎসক হয়। শনির প্রতিকূল অবস্থা হোলে দন্তরোগ ঘটে। কর্কট লগ্নগত চন্দ্রের ওপর শনির পূর্ণ দৃষ্টি থাকলে জাতক কুব্জ হয়। সপ্তমে শনি থাকলে জাতক পরিচারিকা লোলুপ হয়। রবি, শুক্র ও শনি একত্র থাকলে দুশ্চরিত্র। রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি একত্র থাকলে জাতকের স্ত্রী কুলটা হয়। চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি একত্র থাকলে অত্যন্ত কাম-প্রবণতা। চতুর্থে মঙ্গল ও বুধ থাকলে বান্ধব রহিত। সপ্তমে বুধ ও শুক্র থাকলে বিবাহ হয় না, তবে শুভগ্রহের দৃষ্টি পেলে বেশী বয়সে বিবাহ হোতে পারে। লগ্নে শনি ও ত্রিকোণে মঙ্গল থাকলে স্ত্রীসম্বন্ধে উন্মাদ বুদ্ধি। লগ্নে লগ্নপতি ও সপ্তমে সপ্তমপতি অথবা উভয়েই লগ্নে বা সপ্তমে থাকলে জাতক ভ্রাতৃজায়াসক্ত হয়। সপ্তমে শুক্র থাকলে জাতক অত্যন্ত কামুক হয়। চন্দ্র দ্বিতীয়ে বা অষ্টমে থাকলে প্রচুর ঘর্ম হয়। দ্বাদশে শুক্র থাকলে জাতক স্ত্রীহীন, লজ্জাহীন, রোগার্ত্ত, শূলরোগী ও পরদাররত হয়। চতুর্থে একাধিক পাপগ্রহ থাকলে চিত্তের ভিতরে কপটতা। সপ্তমে রবি ও বুধ থাকলে ধ্বজভঙ্গ রোগ হয়। লগ্নে বুধ ও মঙ্গল থাকলে জাতক চোর হয়। লগ্নে বা অষ্টমে শনি এবং চতুর্থে বা অষ্টমে মঙ্গল থাকলে জাতক মহাপাপী হয়। ধনু বা বৃষ লগ্ন হোলে আর তাতে পাপগ্রহ থাকলে বা দৃষ্টি করলে জাতকের টাক রোগ হয়। সপ্তমে বুধ ও রাহু থাকলে দন্তুরা স্ত্রী লাভ। দশমে চন্দ্র ও বুধ থাকলে জাতকের শেষ বয়সে বন্ধুহীন অবস্থা ঘটে। দ্বিতীয়ে চন্দ্র ও মঙ্গল থাকলে ধননাশ। দ্বাদশে রাহু থাকলে জাতক অসদ্ব্যয়ী, পাপবুদ্ধিসম্পন্ন,' কপট ও কুলদূষক হয়। সপ্তম ভাব চররাশি হোলে স্ত্রীলোকের স্বামী প্রবাসী হয়। স্ত্রীলোকের কোষ্ঠীতে লগ্ন বা চন্দ্রের সপ্তমে বুধ বা শনি থাকলে স্বামী ক্লীব হয়। রবি সপ্তমে থেকে শত্রুগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হোলে জাতিকা পতিত্যক্তা হয়। মঙ্গলগৃহে লগ্ন এবং তাতে শুক্র ও মঙ্গল থাকলে জাতিকা পতিবিদ্বেষিণী হয়।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশির ফল

মেষ রাশি

কৃত্তিকাজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। অশ্বিনীজাত ব্যক্তির ফল মধ্যবিধ। ভরণীজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। শরীর মন্দ যাবে না তবে পিত্তপ্রকোপজনিত কিছু কষ্ট ভোগ। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা। আর্থিকক্ষেত্র মন্দ নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে একভাবেই যাবে, কোনপ্রকার ভাল-মন্দ অবস্থা দেখা যায় না। চাকুরির ক্ষেত্র অতীব উত্তম। পদোন্নতি, নতুন পদ মর্য্যাদা, প্রতিযোগিতায় সাফল্য প্রভৃতি শেষার্দ্ধে সূচিত হয়। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মোটামুটি মন্দ নয়। স্ত্রী-লোকের পক্ষে দুঃসময়। সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হোতে হবে। স্ত্রী-ব্যাধির প্রকোপ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকা জাতকের ফল উত্তম। রোহিণী জাতকের ফল মধ্যবিধ। মৃগশিরা জাতকের নিকৃষ্ট ফল। পারিবারিক

কলহ, একারণ উদ্বেগ ও অশান্তি। পিত্ত প্রকোপ ও উদ্ভূত জনিত কষ্টভোগ। পুরাতন বাতগ্রস্ত ব্যক্তির সতর্কতা প্রয়োজন। আর্থিক দুশ্চিন্তা হোলে ও অর্থ মোটামুটি হস্তগত হবে। ব্যয়াধিক্য সম্বন্ধে সতর্কতা প্রয়োজন। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশানুরূপ নয়। কিন্তু চাকুরির ক্ষেত্রে আশাপ্রদ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি মিশ্রফলদাতা। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। সামাজিকক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশানুরূপ নয়।

মিথুন রাশি

আর্দ্রাজাত ব্যক্তির পক্ষে কিছুটা ভালো। মৃগশিরা ও পুনর্বসুর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটবে না, আহারাদি সম্বন্ধে সতর্ক হোলে পেটের গোলমাল হবে না। পারিবারিক শান্তি থাকবে। সামান্য ক্ষতি ও কিছু ব্যয়াধিক্য হোলেও অর্থাগমবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীদের পক্ষে ভালো বলা যায় না। চাকুরির ক্ষেত্র শুভ নয়। উপরওয়ালার সঙ্গে মন কষাকষি। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীদের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। তাদের বিশেষ আয় বৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব উত্তম। অবিবাহিতাদের বিবাহ যোগ। জনপ্রিয়তা ও সামাজিক ক্ষেত্রে মর্য্যাদা বৃদ্ধি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

কর্কট রাশি

পুষ্যাজাতব্যক্তির পক্ষে উত্তম। পুনর্বসুজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম। অশ্লেষাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। সামান্য পারিবারিক কলহ। সন্তানদের শারীরিক অসুস্থতার সম্ভাবনা। আর্থিক স্বচ্ছলতা, শেষার্দ্ধে কিছু ক্ষতি। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীগণের পক্ষে উত্তম। প্রথমার্দ্ধে আয় বৃদ্ধি। চাকুরির ক্ষেত্রে শুভ। পদোন্নতি বা অনুকূল পরিবর্তনের সম্ভাবনা। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রণয়াদি ব্যাপার ব্যতীত সকল ক্ষেত্রেই শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে মন্দ নয়।

সিংহ রাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মঘার পক্ষে মধ্যম এবং পূর্বফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। গৃহে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে। স্পেকুলেশনেও সাফল্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র উত্তম। ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত বন্ধুত্বের দ্বারা লাভ। পদোন্নতি বা পদমর্য্যাদা লাভ। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে বিশেষ আয় বৃদ্ধি ও লাভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়। মঞ্চ বা চিত্রে নিযুক্ত নারীর পক্ষে অতীব উত্তম। দূর-ভ্রমণে সাফল্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, হস্তার পক্ষে মধ্যম, চিত্রার পক্ষে নিকৃষ্ট। শারীরিক দুর্বলতা, স্বাস্থ্যের অবনতি। সামান্য দুর্ঘটনা। বন্ধু ও স্বজনবর্গের সহিত কলহ। আর্থিক অবস্থা একই প্রকার। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি মন্দ নয়। চাকুরির ক্ষেত্র ভালো বলা যায় না, নানাপ্রকার উৎকণ্ঠা ও অশান্তির উদ্রেক হবে। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে শুভ। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি বিশেষ অনুকূল। খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা, পদমর্য্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি। উত্তমস্বাস্থ্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি।

তুলা রাশি

স্বাতীজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম। চিত্রা ও বিশাখাজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভাশুভ ফল। স্বাস্থ্যের অবনতি, দুর্বলতা, অস্ত্রাদির আঘাত, পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যতার অভাব। আর্থিক অবস্থা মন্দ নয়। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে একইভাব কোন পরিবর্তন নেই। চাকুরির ক্ষেত্রও উজ্জ্বল নয়। কোন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যলাভ কর্মক্ষেত্রে নেই। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে অতীব উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। অনেকের পক্ষে সন্তান প্রসব সূচিত হয়। আর্থিকোন্নতি। বিদ্যার্থীর ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ নয়।

বৃশ্চিক রাশি

অনুরাধা-জাতব্যক্তির পক্ষে উত্তম, বিশাখাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং জ্যেষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যের অবনতি। পেটের গোলমাল, চোখের অসুখ, শারীরিক দুর্বলতা, পারিবারিক কলহ, দাম্পত্য সুখের অভাব, সন্তা-

বিচ্ছেদ, শান্তির অভাব। আর্থিক অবস্থা আশানুরূপ নয়, নানাপ্রকার বিঘ্ন। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়, সম্পত্তিলাভও সূচিত হয়। চাকুরির স্থান সুবিধাজনক নয়। উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার সম্ভাবনা, ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মাসটি শুভাশুভ ফলদাতা। গার্হস্থ্যক্ষেত্র ছাড়া স্ত্রীলোকের অন্যান্য ক্ষেত্র নৈরাশ্যজনক। স্বাস্থ্যের অবনতি। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

ধনু রাশি

উত্তরাষাঢ়া-জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, মূলাজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম এবং পূর্ব্বাষাঢ়াজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্য ভালোই যাবে। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা, কেবল মাত্র স্ত্রীর সহিত মনকষাকষি ও কলহ বিবাদ। বন্ধুরূপী ছদ্মবেশী মতলববাজ ব্যক্তিদের সংসর্গ পরিহার কর্তব্য। আর্থিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও সন্তোষজনক আয়। লাভের অঙ্কবৃদ্ধি, নানাপ্রকার অর্থাগম। স্পেকুলেশনে লাভ। বাড়ীভাড়া বৃদ্ধি করায় সাফল্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে উত্তম। চাকুরিরক্ষেত্র বিশেষ আশাপ্রদ ও শুভব্যঞ্জক। ব্যবসায়ে প্রসার এই মাসে বিশেষ শুভকর। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে উত্তম। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম সময়, অবিবাহিতার বিবাহ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়া-জাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, শ্রবণার পক্ষে মধ্যম, ধনিষ্ঠাজাত ব্যক্তির পক্ষে অধম। স্বাস্থ্যের অবনতি এবং শারীরিক দুর্ব্বলতা। সন্তানের জন্য উদ্বিগ্নতা। দুর্ঘটনার আশঙ্কা এবং তৎসহ জ্বর। পারিবারিক স্বচ্ছন্দতা থাকলেও মধ্যে মধ্যে মতভেদজনিত কলহ। অর্থাগমের পক্ষে কষ্টভোগ। সুযোগ সুবিধা থাকলেও ঘটনাচক্রে অর্থ-প্রাপ্তির পক্ষে দুর্ভোগ্য—বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষিজীবীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়। চাকুরিজীবীর পক্ষে নৈরাশ্য-জনক। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে মন্দ নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে মাসটি ভালো বলা যায় না। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ।

কুম্ভ রাশি

শতভিষাজাত ব্যক্তির পক্ষে শুভ। ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্ব-ভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে আশানুরূপ নয়। হৃদয়ের ব্যাঘাত। স্বজনবর্গের জন্য কিছু পারিবারিক অশান্তি। আর্থিক অবস্থা অনুকূল নয়। সময়ে সময়ে নগদ টাকার অভাব। ব্যয়াধিক্য। বাড়ীওয়ালা, ভূম্যধিকারী ও কৃষি-জীবীর পক্ষে মাসটি কষ্টপ্রদ। চাকুরির ক্ষেত্রও সুবিধা-জনক নয়। উপরওয়ালার বিরাগভাজন। ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষেও ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে মাসটা চলে যাবে। স্ত্রীলোকের পক্ষে উত্তম। অনেকের কন্যাসন্তান প্রসব। আর্থিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রাচুর্য্য। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে আশাপ্রদ নয়।

মীন রাশি

উত্তরভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে উত্তম, পূর্ব্বভাদ্রপদজাত ব্যক্তির পক্ষে মধ্যম, রেবতীজাতকের পক্ষে নিকৃষ্ট। স্বাস্থ্যের অবনতি যোগ নেই। পারিবারিক সুখস্বচ্ছন্দতা ও স্বজনবন্ধুপ্রীতি। আর্থিক অবস্থা আশাপ্রদ নয়, তবুও কিছু লাভ যোগ আছে। বাড়ীওয়ালা ও কৃষিজীবীর পক্ষে মাসটি বিশেষ ভালো বলা যায় না। প্রথমার্দ্ধে ব্যবসায়ী ও বৃত্তিজীবীর পক্ষে সন্তোষজনক, শেষার্দ্ধ আশাপ্রদ নয়। শিক্ষাবিভাগীয় মহিলাদের উত্তম সময়, বৃত্তিজীবীদের পক্ষেও মন্দ নয়, অন্যান্য স্তরের নারীদের পক্ষে আশানুরূপ নয়। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে শুভ বলা যায় না।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ লগ্নের ফল

মেষলগ্ন—

দেহভাব শুভ। ধনাগম যোগ। ভাগ্যোন্নতি, নিজ-ক্ষমতা বৃদ্ধি, সহোদরের সহিত মনোমালিন্য। ব্যবসা-বাণিজ্যে লাভের আশা ফলবতী হবে না। সম্বন্ধলাভ। গুপ্তশত্রুবৃদ্ধি। স্ত্রীলোকের পক্ষে শুভ। বিদ্যার্থী ও পরীক্ষার্থীর পক্ষে উত্তম।

বৃষলগ্ন—

দেহভাব মধ্যম। স্বল্পবৃদ্ধি সম্পন্ন ধনাগম। ব্যয়াধিক্য। সহোদর ভাব সুবিধাজনক নয়। সহোদরের পীড়া।

ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে আট অংশ এবং দক্ষিণে আট অংশের মধ্যে যে নক্ষত্রপুঞ্জগুলি দেখা যায় সে গুলিকে একটি চওড়া পটির মত কল্পনা করলে, আকাশের গায়ে নক্ষত্র খচিত একটি চাকা পাওয়া যাবে। তাকে পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হবে যেন, সেটি পৃথিবীকে বেড় দিয়ে পুব থেকে পশ্চিমে রোজ একবার করে ঘুরে যাচ্ছে। নক্ষত্র খচিত এই পটির চাকাটিকেই "রাশিচক্র" বলা হয়ে থাকে। রাশিচক্র মানে হচ্ছে একরাশ নক্ষত্রের চাকা, অর্থাৎ যে চাকার উপর রাশীকৃত নক্ষত্র দেখা যায়। এই রাশিচক্রের মধ্যে যে সব নক্ষত্রপুঞ্জ আছে, তা ছাড়াও আকাশে অন্য অনেক নক্ষত্র দেখতে পাওয়া যায়, এবং তার মধ্যে সপ্তর্ষি ইত্যাদির মত ঢের বড় বড় জলজলে নক্ষত্রও আছে কিন্তু তাদের অবস্থানের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষের কোন সম্পর্ক নেই। এর কারণ কি? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে এইটুকু বোঝা যায় যে, শুধু সেই নক্ষত্রপুঞ্জগুলিরই আমাদের উপর প্রভাব আছে যারা সূর্যের গতিপথ অর্থাৎ ক্রান্তিবৃত্তকে প্রভাবিত করতে পারে। পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার দ্বারা এটা স্থিরীকৃত হয়েছে যে, শুধু সেই জ্যোতিষ্কগুলিরই পৃথিবীর উপর প্রভাব আছে যাদের দূরত্ব ক্রান্তিবৃত্ত থেকে উত্তরে বা দক্ষিণে আট অংশের বেশী নয়। কাজেই ক্রান্তিবৃত্তের উত্তরে ও দক্ষিণে আট অংশ করে ১৬ অংশ চওড়া জায়গাটুকুর মধ্যে যে সব নক্ষত্রপুঞ্জ আছে তাদের নিয়েই রাশিচক্র কল্পনা করা হয়েছে।

রাশি

রাশিচক্রটিকে সমান বার ভাগে ভাগ করে তার এক এক ভাগের নাম দেওয়া হয়েছে রাশি। সমস্ত রাশিচক্রটি বৃত্ত হিসাবে মাপলে হয় ৩৬০ অংশ। অতএব এক একটি রাশি হয়েছে ৩০ অংশ করে। রাশিচক্রটি গোল, তার আগাগোড়া নেই, কাজেই তাকে ভাগ করতে হলে, একটা জায়গাকে গোড়া বলে মেনে নিতে হয়। রাশিচক্রের মধ্যে চিত্রা (Spica Vigginis) নামে একটি খুব উজ্জল তারা আছে। এই চিত্রা তারার ঠিক বিপরীত দিকের বিন্দুটিকে (চিত্রা তারা থেকে ১৮০ অংশ তফাতে যে বিন্দু সেই বিন্দুটিকে) রাশি চক্রের গোড়া বলে ধরা হয়েছে। চিত্রা তারা যে সময় পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যায়, ঠিক সেই সময় পুব দিগন্তে রাশি চক্রের যে বিন্দুটি থাকে অথবা চিত্রা তারা যে সময় পূব দিগন্তে উদিত হয়, সেই সময় পশ্চিম দিগন্তে রাশি চক্রের যে বিন্দুটি থাকে, সেইটাই রাশি চক্রের আদি বিন্দু। এই আদি বিন্দু থেকে রাশি চক্রটি সমান বার ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগকে বলা হয়েছে রাশি। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এই বারটি রাশির আলাদা আলাদা নাম দেওয়া হয়েছে। নীচে পরপর বারটি রাশির সংস্কৃত ও ইংরাজি নাম এবং তার মানে দেওয়া গেল :—

সংস্কৃত নাম	পাশ্চাত্য নাম	অর্থ
মেষ—	Aries	ভেড়া
বৃষ—	Taurus	ষাঁড়
মিথুন—	Gemini	স্ত্রী-পুরুষ, দম্পতি
কর্কট—	Cancer	কাঁকড়া
সিংহ—	Leo	সিংহ
কন্যা—	Virgo	কুমারী
তুলা—	Libra	নিক্তি, দাঁড়িপাল্লা
বৃশ্চিক—	Scorpio	কাঁকড়া বিছা, বিচ্ছু
ধনু—	Sagittarius	ধনুক
মকর—	Capricorn	মকর, হরিণ
কুম্ভ—	Aquarius	কলসী
মীন —	Pisces	মাছ

উপরে রাশি চক্রের আদি বিন্দু এবং রাশির সম্বন্ধে যা বলা হল প্রাচ্য বা হিন্দু জ্যোতির্বিদেরা ফলিত জ্যোতিষের যা কিছু বিচার এই আদি বিন্দু ও রাশি ধরেই করে থাকেন। আদি বিন্দু বা রাশি সম্বন্ধে অন্য দেশে অন্য রকম ধারণাও আছে, কিন্তু আমার মনে হয়, উপরের এই প্রাচ্য ধারণাই ঢের বেশী বিজ্ঞান-সম্মত। কেন, তা বলছি। আমাদের দেশে আজকাল অনেকে ফলিত জ্যোতিষের পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলি পড়ে থাকেন। যে গ্রন্থগুলিতে রাশি চক্রের আদি বিন্দু বা রাশি সম্বন্ধে যা ধারণা দেওয়া আছে, তা প্রাচ্য ধারণা হতে স্বতন্ত্র।

উপরে বলেছি, যে ক্রান্তিবৃত্ত আর আকাশ বিষুব দু জায়গায় কাটাকাটি করেছে। এই দুটি কাটাকাটির জায়গায় দুটি বিন্দুকে ক্রান্তিপাত বলে। এই ক্রান্তিপাতের উপর যেদিন সূর্য আসেন সেদিন পৃথিবীর সব জায়গায় দিন আর রাত্রি সমান হয়। কাজেই বছরের দু'দিন

পৃথিবীর সব জায়গায় ১২ ঘণ্টা দিন আর ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়। একবার দিন রাত্রি সমান হবার পর, দিন ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং রাত্রি ছোট হতে থাকে। তারপর যতদূর বাড়বার বেড়ে উঠে আবার কমে কমে শেষে আর একবার দিন রাত্রি সমান হয় এবং তারপর ক্রমশঃ দিন ছোট ও রাত্রি বড় হতে থাকে। তারপর দিন যতদূর ছোট হবার হয়ে, ফের একটু একটু করে বাড়তে থাকে এবং আবার একদিন দিনরাত সমান হয়। এই রকম বরাবর চলে।

পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা রাশিচক্রে গোড়া ধরেন এই ক্রান্তিপাতকে। দুটি ক্রান্তিপাতের মধ্যে তাঁরা সেই ক্রান্তি-পাতটিকে গোড়া ধরেন যেখানে সূর্য আসবার পর আমাদের দেশে (অর্থাৎ ভূ বিষুবের উত্তরের দেশে) দিন ক্রমশ বাড়তে থাকে। এখন এই ক্রান্তিপাতটি ঠিক স্থির নয়; রোজ একটু একটু করে পূব থেকে পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। এক বছরে এর গতি ৫০৪ বিকলা। এই গতি যদিও খুব সামান্য, এবং এক আধ বছরে যদিও এতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, তাহলেও বেশীদিন পরে এর অনেক তফাৎ হয়ে যায়। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এমন একদিন ছিল, যখন প্রাচ্যদের রাশিচক্রের আদি-বিন্দু এবং এই ক্রান্তিপাত প্রায় ২৩ অংশ পেছিয়ে পড়েছে। অর্থাৎ প্রাচ্যদের মীন রাশির প্রায় ৭ অংশে ক্রান্তিপাত আছে। পাশ্চাত্যেরা এই ক্রান্তিপাতকেই রাশিচক্রের আদি বিন্দু ধরেন।

কাজেই, তাঁদের ধারণায় রাশিচক্র সচল। প্রাচ্যদের মতে যেটা মীন রাশি, পাশ্চাত্যদের মতে তার বেশীর ভাগই এখন মেষরাশির মধ্যে এবং আরও দেড় হাজার বছর পরে পাশ্চাত্যদের মতে এই মীন রাশির অর্দ্ধেকটা হবে মেষ এবং অর্দ্ধেকটা হবে বৃষ। তখন প্রাচ্যদের কুম্ভরাশির মাঝখান থেকে পাশ্চাত্যদের মেষরাশির সুরু হবে। যাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুইমতের গ্রন্থ পড়েন, তাদের অনেকের মনে এই রাশির ব্যাপার নিয়ে একটা বিষম গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কাজেই, গোড়াতেই কোন ধারণা বিজ্ঞান-সম্মত ও যুক্তির অনুকূল তা ঠিক করা দরকার। আগে বলেছি যে ক্রান্তিবৃত্তের দু'পাশে ৮ অংশের মধ্যে যে নক্ষত্র-পুঞ্জগুলি আছে, তাদের নিয়েই রাশিচক্র কল্পনা করা হয়েছে। অতএব, বুঝতে হবে ক্রান্তিবৃত্তের উপর কতক-গুলি নক্ষত্রের প্রভাব আছে, এ আমরা গোড়াতেই মেনে নিচ্ছি। এই নক্ষত্রগুলি স্থির, কাজেই রাশিগুলিও স্থির হওয়া দরকার। আমরা যদি স্বীকার করি নক্ষত্রগুলির এক এক রকম প্রভাব আছে, এবং এ যদি স্বীকার করি, যে প্রত্যেক রাশির কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় বৈশিষ্ট্য আছে, তা'হলে রাশি কোন মতেই সচল হতে পারে না। আজ যে নক্ষত্রগুলি মেষরাশির মধ্যে আছে, কিছুদিন পরে সেইগুলিই যদি বৃষ রাশির মধ্যে যায়, অথচ রাশি গুলির বৈশিষ্ট্য যে একই থেকে যায়, তাহ'লে নক্ষত্রের যে কোন প্রভাব আছে, একথা স্বীকার করা চলে না। আর নক্ষত্রের প্রভাব যদি স্বীকার করা যায়, তা'হলে পাশ্চাত্যদের কল্পিত রাশির বৈশিষ্ট্য বরাবর সমান থাকতে পারে না। যদি স্বীকার করতে হয় যে নক্ষত্রের প্রভাব আছে এবং রাশির বৈশিষ্ট্য বা কারকতা চিরকাল এক, তা'হলে নক্ষত্র ও রাশি দুই স্থির হতে বাধ্য। অতএব রাশির সম্বন্ধে প্রাচ্যদের ধারণা যে যুক্তি ও বিজ্ঞানের অনুকূল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রাচ্যধারণাই যে ঠিক সে সম্বন্ধে আরও অনেক যুক্তি ও প্রমাণ আছে, কিন্তু তার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

নক্ষত্র

রাশিচক্রকে যেমন আদিবিন্দু থেকে বার ভাগে ভাগ করে এক এক ভাগের নাম হয়েছে রাশি, তেমনি আদি বিন্দু থেকে সাতাশ ভাগে ভাগ করে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে নক্ষত্র। গোড়া থেকে পর পর সাতাশটি নক্ষত্রের নাম নীচে দেওয়া গেল—

[১] অশ্বিনী [২] ভরণী [৩] কৃত্তিকা [৪] রোহিণী [৫] মৃগশিরা [৬] আর্দ্রা [৭] পুনর্বসু [৮] পুষ্যা [৯] অশ্লেষা [১০] মঘা [১১] পূর্বফল্গুনী [১২] উত্তর ফল্গুনী [১৩] হস্তা [১৪] চিত্রা [১৫] স্বাতী [১৬] বিশাখা [১৭] অনুরাধা [১৮] জ্যেষ্ঠা [১৯] মূলা [২০] পূর্বাষাঢ়া [২১] উত্তরাষাঢ়া [২২] শ্রবণা [২৩] ধনিষ্ঠা [২৪] শতভিষা [২৫] পূর্বভাদ্রপদ [২৬] উত্তরভাদ্রপদ [২৭] রেবতী

রাশি বারটি, নক্ষত্র সাতাশটি, কাজেই এক এক রাশিতে সওয়া দুই ক'রে নক্ষত্র পড়ে এবং চারটি রাশিতে নয়টি নক্ষত্র শেষ। মেষরাশি আর অশ্বিনী নক্ষত্রের গোড়া একই জায়গায়, কাজেই মেষ থেকে চতুর্থরাশি কর্কট যেখানে শেষ হয়েছে, অশ্বিনী থেকে নবম নক্ষত্র অশ্লেষা ও সেইখানেই শেষ হয়েছে। আবার মেষ থেকে পঞ্চম রাশি সিংহ যেখানে আরম্ভ হয়েছে, অশ্বিনী থেকে দশম নক্ষত্র মঘাও সেইখানে আরম্ভ। কাজেই সিংহ থেকে চতুর্থরাশি বৃশ্চিক যেখানে শেষ হয়েছে, মঘা থেকে নবম নক্ষত্র জ্যেষ্ঠাও সেইখানে শেষ হয়েছে এবং ধনু রাশি ও মূলা নক্ষত্র আরম্ভ হয়েছে একই জায়গায়।

রাশি আর নক্ষত্রের এই সম্বন্ধ স্থায়ী হতে পারে না, যদি না নক্ষত্রের মত রাশিও স্থির হয়।

রাশিচক্র ৩৬০ অংশ সুতরাং এক একটি রাশি ৩০ অংশ এবং এক একটি নক্ষত্র ১৩ একের তিন অংশ]

[ক্রমশ

জহরলাল নেহেরু

যিনি ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণ হস্তরূপে দীর্ঘ ২৫ বৎসরকাল সে আন্দোলন পরিচালন করিয়াছিলেন ও ১৯৪৬ সালে নূতন কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হইলে প্রধানমন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হইতে ১৯৬৪ সালের ২৭শে মে পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ ১৭ বৎসরকাল ভারতের কর্ণধাররূপে ভারতের ৪০ কোটি নর-নারীর ভাগ্য বিধাতা ছিলেন, তিনি সহসা ২৭শে মে বুধবার সকাল সাড়ে ৬টায় অসুস্থ হইয়া অজ্ঞান হইয়া যান এবং বেলা ২টায় তাঁহার মহাপ্রয়াণ

জহরলাল

ঘটিয়াছে। তিনি তৎপূর্বে ৪ দিন ডেরাডুনে থাকিয়া বিশ্রাম লাভ করেন—সঙ্গে ছিলেন কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিমানে দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন—বিমান বন্দর হইতে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী তাঁহার সঙ্গে আসেন—সন্ধ্যায় ভারতের শাসন সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন। সুস্থ ও প্রফুল্ল জহরলাল রাত্রির আহার শেষ করিয়া নিদ্রা যান। ভোরে উঠিয়া কাগজপত্র পড়েন—এঘর হইতে ওঘর কয়েকবার যাতায়াত করেন—সাড়ে ৬টায় হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। জ্ঞান আর ফিরিয়া আসিল না। সব শেষ। ৭৫ বৎসর বয়স্ক কর্মঠ, সবল জহরলাল ভারতের ৫০ কোটি মানুষের মায়া—যাহারা জহরলালকে ভালবাসিত এবং যাহাদের জহরলাল শুধু ভালবাসিতেন না, যাহাদের মঙ্গলের জন্য তিনি অবিশ্রাম পরিশ্রম করিতেন—রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেন না—অতি অল্প সময় মাত্র শয্যাগ্রহণ করিতেন—যাহাদের সকল প্রকার উন্নতি বিধান তাঁহার সর্বদা চিন্তার বিষয় ছিল—সকলের কথা তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে হইল।

১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে যাইয়া তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন—তাহার পর দীর্ঘ ৫ মাস কাল তিনি অসুস্থ শরীর লইয়াই প্রধানমন্ত্রীর কাজ করিয়া গিয়াছেন—শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কামরাজ পরিকল্পনার নির্দেশে কয়মাস পূবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কার্য্য ত্যাগ করিয়াছিলেন- অসুস্থ জহরলাল তাঁহার ৪০ বৎসরের সহকর্মী বন্ধু লালবাহাদুরকে ডাকিয়া আনিয়া দপ্তরহীন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া—যে কাজ নিজে করিতে পারিতেন না—লালবাহাদুরকে দিয়া সে সব কাজ করাইয়া লইতেছিলেন—তাঁহার বিশ্বাস ছিল, শরীর আবার ভাল হইবে এবং তিনি পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া আবার কাজ করিবেন।

১৯৩৬ সালে তাঁহার পত্নী কমলা নেহরু একমাত্র কন্যা ইন্দিরাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন—পরে ইন্দিরার স্বামী ফেরোজ গান্ধীও পরলোকগমন করিয়াছেন—বর্তমানে ২ দৌহিত্র রাজীব ও সঞ্জীব বর্তমান।

১৮৮৯ সালে ১৪ই নভেম্বর এলাহাবাদে জহরলাল জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিলাল নেহরু খ্যাতনামা আইনজীবী ছিলেন—মাতার নাম স্বরূপরাণী। মতিলালের পিতা ১৮৬১ সালে মারা যান—তাহার কয়েক মাস পরে মতিলালের জন্ম হয়। মতিলালের অগ্রজ নন্দলাল মতিলালকে দেখাশুনা করিতেন। মতিলাল বি-এ পাশ না করিয়াই ওকালতি হন এবং জীবনের প্রথম ভাগ হইতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জহরলালের জন্ম সময়েই তিনি ধনী হইয়াছেন, তবে পরবর্তীকালে তাঁহার উপার্জন এত বাড়িয়া

যায় যে তাহা উত্তর ভারতের লোকের গল্পকথা হইয়াছিল। ৫০ বৎসর পূর্বে মতিলালের বাসগৃহ এলাহাবাদের আনন্দ-ভবন ও তাহার আসবাবপত্র দেখিলেই তাহা বুঝা যাইত।

জহরলালের বয়স যখন ১০ বৎসর তখন মহীয়সী মহিলা এনি বেসান্ট কর্তৃক প্রেরিত ফার্ডিনাণ্ড ব্রুকস নামক এক ইংরাজ ভদ্রলোক তাঁহার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্রুকসের নিকট ৫ বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৫ বৎসর বয়সে তিনি বিলাতের হ্যারো স্কুলে প্রেরিত হন। হ্যারো স্কুল বিলাতে সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের ছেলেদের জন্য স্থাপিত ছিল। তথায় ২ বৎসর পড়িয়া তিনি কেম্ব্রিজ কলেজে ভর্ত্তি হন এবং কেমিষ্ট্রি, জিওলজি ও বটানি পড়িয়া ১৯১০ সালে কেম্ব্রিজ হইতে ডিগ্রী পরীক্ষায় পাশ করেন। সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে তাঁহার সময়ে কেম্ব্রিজে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সইফুদ্দীন কিচলু, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি জহরলালের সহপাঠী ছিলেন। তৎপরে ২ বৎসর বিলাতে থাকিয়া ১৯১২ সালে জহরলাল ব্যারিষ্টারী পাশ করেন ও দেশে ফিরিয়া আসিয়া ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেন। ১৯১৬ সালে বসন্ত পঞ্চমীর দিন দিল্লীতে কমলা কাউলের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

বিলাতে কয় বৎসর থাকার সময় তিনি রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হন এবং একবার সেখানকার সাধারণ নির্বাচন দেখিয়া রাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। তিনি বাল্যজীবন হইতেই গ্রন্থকীট ছিলেন এবং হ্যারো ও কেম্ব্রিজে থাকার সময় রাজনীতি সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। দেশে ফিরে তিনি ১৯১২ সালের শেষ দিকে বাঁকিপুর কংগ্রেসে ও ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। ঐ সময় সিমলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি এলাহাবাদে ফিরে কিষাণ আন্দোলনে যোগদান করেন।

বিরাট ধনী পিতার পুত্র জহরলাল এত দিন ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশার কথা পুস্তকেই পাঠ করিতেন, কিষাণ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া দরিদ্র দেশবাসীদের প্রকৃত অবস্থার কথা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাতের পর হইতে তাঁহার জীবনের পরিবর্তন সুরু হয় ও ১৯১৮ সালে তিনি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি প্রথম কারাবরণ করেন ও পরে ১৯২৩ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হইয়া পুনরায় গ্রেপ্তার হন। ১৯২৩ সালের জানুয়ারীতে মুক্তি লাভের পর তিনি বিলাত যান ও ১৯২৬ সালের শেষে ব্রুসেলসে নিপীড়িত জাতিসমূহের কংগ্রেসে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের পর ভারতে ফিরিয়া আসেন।

১৯২৯ সালে তিনি প্রথম কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন—পূর্ব বৎসর ১৯২৮ সালে তাঁহার পিতা মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। জহরলাল ৬ বার কংগ্রেস সভাপতি হন—১৯২৯, ১৯৩৫, ১৯৩৭, ১৯৩৯, ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে। এত বার আর কেহ কংগ্রেস-সভাপতি হন নাই। ১৯৫৮ সালে জহরলালের কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস সভাপতি হইয়া ছিলেন।

১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ তিন বৎসর কারাবাসের পর জহরলাল মুক্তি লাভ করিয়া ১৯৪৫ সালেই আজাদ—হিন্দ ফৌজের বিচারে ব্যারিষ্টারী করেন্। ১৯৪৭ সালে তিনি নয়াদিল্লীতে এশিয়া সম্মিলন আহ্বান করেন। ১৯৫৫ সালে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচনার পর তিনি ইহা ব্যাখ্যা করিয়া বক্তৃতা করেন। ঐ বৎসর বান্দুং সম্মিলনে যোগদান করিয়া ভাষণ দেন। ঐ বৎসর সোভিয়েট দেশ ও পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ১৯৫৫ ডিসেম্বর ভারতে রুশ নেতা ক্রুশ্চেভ ও বুলগানিনের সম্বর্দ্ধনা করেন।

নেহরু সারা জীবন কত বক্তৃতা করিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই—সাধারণ নির্বাচনে তিনি এক এক দিন ৭।৮টি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। মোটরে ও প্লেনে সারা ভারতের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে যাইবার পথে ও ২।৩ দিন বহু স্থানে ভাষণ দিয়াছেন।

তিনি কখনও ক্লান্ত হইতেন না। একবার কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কয়েকজন বাঙ্গালী নেতা ১৫ মিনিটের জন্য তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিলে তিনি রাত্রি ১টায় (ডিসেম্বর মাসে) তাহাদের সহিত দেখা ও আলোচনা করেন। বাড়ীতে কয়েকজন ষ্টেনোগ্রাফার থাকিত, সারা রাত্রি (২।৩ ঘণ্টা নিদ্রা বাদে) তিনি অনেক সময় তাহাদের ডিক্‌টেসন দিতেন। লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে যাইয়া সকলের সহিত কথা বলিতেন। কল্যাণী কংগ্রেসে তাঁহাকে ভীষণ ভিড়ের মধ্যে যাইয়া সকলকে শান্ত করিতে দেখা গিয়াছে।

শেক্সপীয়ার

উপাচার্য্য শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

তোমার রচনা কবি, যত পাঠ করি,
যত স্মরি,
তত মনে হয়
কবি তুমি নয়,
বিশ্বের বিস্ময় তুমি, তুমি জাদুকর।
মহা শক্তিধর
লেখনী তোমার।
সে যেন মায়ার কাঠি স্পর্শ মাত্র যার
প্রাণহীনে প্রাণ দেয়, নিদ্রিতে জাগায়,
উত্তুঙ্গ আশায়
সহজ মানুষে দেয় উন্মত্ত করিয়া।

কুসুম কোমল যাহা ছিল নারী হিয়া
আচম্বিতে ধরে ভিন্ন বেশ,
দেয় উপদেশ
সকল মানব ধর্ম দিয়া জলাঞ্জলি
আপনার মান্য অতিথিরে নিজ হাতে দিতে বলি।
বলে দর্প ভরে,
উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিবার তরে,
স্তনন্ধয় অসহায় আপন তনয়—
যদি প্রয়োজন হয়
বক্ষ হতে ছিন্ন করি আপনার হাতে
চূর্ণ করি দিতে পারে নিষ্ঠুর আঘাতে।

যেথা ফুটেছিল শুভ্র প্রণয়ের ফুল
সৌরভে অতুল,
দুজনার সরল হৃদয় বেঁধেছিল প্রীতির বন্ধনে,
ভাগ্য দোষে কি কুক্ষণে
কুচক্রীর বিষদৃষ্টি পড়িল যেমন
ঈর্ষাদুষ্ট প্রণয়ীর মন
ধরিল বিভিন্ন রূপ
বিকৃত বিরূপ,
কুসুম কোরক সম নির্মলা বালার
নিজ হস্তে নিল প্রাণ শ্বাস রোধি তার।

যাহারে আঁকিলে তুমি অতি অনুদার মন,
কুসীদজীবী, লোভী ও কৃপণ,
অকস্মাৎ কি খেয়াল হল মনে,
সেই জনে
সাজালে নূতন করি।
মরি মরি,
মুখেতে নূতন ভাষা, নব তার সুর,
হৃদয় বিদারী কিবা
বেদনা আতুর—
নির্যাতন ক্লিষ্ট ক্ষীণ মূর্ত্তিখানি তার
পলকে হরিয়া নিল হৃদয় সবার।

তোমার মায়ার কাঠি শক্তির আধার—
নাট্যগুলি দেয় তব পরিচয় তার।
ভাষার বন্ধনে
মানবের হৃদয়ের সকল স্পন্দনে
অনায়াসে বাঁধিলে সকলি।
তব কথা বলি,
বিশ্ব মানবের মনে
জাগে আর লয় হয় ক্ষণে ও অক্ষণে,
যত ভাব, যত ব্যথা,
আকুতি ও আশা,
দিল তারে ভাষা ;
অনবদ্য দ্যুতি তার, সুন্দর মধুর
বিশ্ব মানবের মন করিল বিধুর।

আজি কবিবর,
তব জনমের চারি শতবর্ষ পর,
তাই হেরি
তব স্মৃতি তর্পণের ভেরি
বাজে এই দিশে দিশে, দেশে দেশে ;
প্রতিধ্বনি তার
বিশ্বের বাতাসে ভেসে,
করেছে মুখর
বিশ্বের আকাশখানি, ওগো জাদুকর।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ জীবন ও চিত্র ॥

মহাত্মা গান্ধী একদা বলেছিলেন, 'আমার জীবনই আমার বাণী'। শুধু কথার মধ্যে দিয়ে নয়, তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্ম্ম সাধনার মধ্য দিয়েই গান্ধীজী তাঁর বাণীকে রূপায়িত করে গেছেন—উদাহরণ স্বরূপ রেখে গেছেন তাঁর কঠোর সাধনা-সমৃদ্ধ জীবনের পূত কাহিনী ভারতের অপামর জনসাধারণের জন্য—তাদের পথ দেখাবার, বিপদে সাহস দেবার, সত্যপথে অবিচলিত নিষ্ঠায় অগ্রসর হবার প্রেরণা দেবার জন্য। গান্ধীজীর জীবন-কাহিনী যেন ভারতেরই মর্ম্মবাণী।

ভারতের আর একজন মহান সন্তান সম্বন্ধেও আজ ঐ কথাই বলবার দিন এসেছে। ভারতের এই সুসন্তান মহাত্মাজীরই মন্ত্রশিষ্য, নবীন ভারতের স্রষ্টা, বিংশশতাব্দীর অন্যতম মহামানব পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। গান্ধীজীর মতন নেহরুজীও কঠোর কর্ম্মসাধনার মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনকে অতিবাহিত করেছেন এবং কর্ম্মের মধ্যেই এই অক্লান্ত কর্ম্মবীর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কর্ম্মই ছিল তাঁর জীবন, তাঁর ধ্যান, তাঁর জ্ঞান। দেশ সেবক রূপে, কর্ম্মীরূপে, নেতারূপে, প্রধানমন্ত্রীরূপে সর্ব্বসময়ই তিনি অক্লান্তভাবে কর্ম্ম করে গেছেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য, ভারতের সমৃদ্ধির জন্য। নিজের সুখ, শান্তি, স্বাস্থ্যকে চরম অবহেলা করে তিনি বিশ্বের শান্তির জন্য চেষ্টা করে গেছেন আমরণ। তাই আজ সমগ্র বিশ্ব তাঁর বিয়োগে বেদনা-বিধুর।

স্বাধীনতা-পূর্ব্ব যুগে গান্ধীজী ভারতকে দিয়ে এসেছেন নেতৃত্ব। গান্ধীজীর অবর্ত্তমানে স্বাধীনতা-পরবর্ত্তীযুগে নেহেরুজীর নেতৃত্বে ভারত অগ্রসর হয়েছে দৃঢ় পদক্ষেপে, উদ্ধত শিরে, সমস্ত বাধাবিঘ্নকে সবলে সরিয়ে দিয়ে। ভারতের এই দুই মহামানব—এই গুরুশিষ্যের সংযম-সমুজ্জ্বল, সাধনা-সমৃদ্ধ জীবনের কাহিনী ভারতের অমূল্যসম্পদ। এই সম্পদকে রক্ষা করবার দায়িত্ব ভারত সরকারেরই শুধু নয় ভারতের তথা বিশ্বের অপামর জনসাধারণেরও। আর এই জীবন-কাহিনী শুধু বর্ত্তমানের জন্যই নয়, এর থেকে প্রেরণা পাবে, নির্দ্দেশ পাবে অনাগত কালের বংশধরগণও। তাই এই দুই মহান নেতার জীবনকে পুস্তকের মধ্য দিয়ে, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে, শিল্পের মধ্য দিয়ে, সম্ভাব্য সকল কিছুর মধ্য দিয়েই বাঁচিয়ে রাখতে হবে ভবিষ্যতের জন্য। তবে আধুনিক যুগের সবচেয়ে কার্যকরী ও জনমনের ওপর প্রভাব সৃষ্টি কারী শিল্প হচ্ছে চলচ্চিত্র। তাই, এই চলচ্চিত্রকেই সর্ব্বাগ্রে এগিয়ে আসতে হবে এই মহান দায়িত্ব গ্রহণ করতে। চলচ্চিত্রে জীবনীচিত্র রূপে ঠিকমত রূপায়িত করতে পারলে এই দুই মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী দীর্ঘস্থায়ী হবে এবং সর্ব্বত্র একাধিকবার প্রদর্শিত হয়ে জনমনেও প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবে।

গান্ধীজীর প্রামাণ্য জীবনী-চিত্র নির্ম্মাণের একটি প্রধান অসুবিধা হচ্ছে তাঁর জীবদ্দশায় প্রামাণ্য চিত্র গ্রহণের বিশেষ চলন না থাকায় এবং বিশেষ করে পরাধীন ভারতের বিপ্লবী নেতার চলচ্চিত্র গ্রহণে বিদেশী সরকারের আগ্রহ না থাকা প্রভৃতি নানা কারণে, তাঁর চলচ্চিত্রে তোলা চিত্র বেশী নেই। কিন্তু নেহরুজীর ক্ষেত্রে এ অসুবিধা একেবারেই নেই। স্বাধীন ভারতে চলচ্চিত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের "ফিল্মস ডিভিসন"-এর প্রবর্ত্তনের জন্য তথ্য ও সংবাদ-চিত্রের মাধ্যমে নেহেরুজীর অসংখ্য চিত্র ভারত সরকারের "ফিল্মস ডিভিসন"-এর ভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। তার থেকেই সুযোগ্য সম্পাদনায়নেহরু জীবনের একটি সুন্দর সুসঙ্গত প্রামাণ্য চিত্র নির্ম্মাণ করা সম্ভব। এর মধ্যেই নেহরুজীর শোক যাত্রা, ভস্ম নিমজ্জন প্রভৃতি কয়েকটি সংবাদ-চিত্র নির্ম্মিত হয়ে প্রদর্শিতও হয়েছে। "ফিল্মস ডিভিসন" নেহেরুজীর জীবনী অবলম্বনে একটি তথ্য চিত্রও নির্ম্মাণ করছেন বলে জানা গেছে। এগুলি খুবই প্রশংসনীয় ও সময়োপযোগী সন্দেহ

নেই। কিন্তু এতে আমাদের মন ভরছে না। জাতি চাইছে এই বিশ্ব-বন্দিত মহান নেতার একটি পূর্ণ দৈর্ঘের জীবনী-চিত্র। যে চিত্র নিষ্ঠা, একাগ্রতা, সাধনা ও সর্বোপরী সুপরিচালনার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে নির্মিত হয়ে ভারতকেই শুধু নয় বিশ্ব-বাসিকেও দেবে শান্তির নির্দেশ, কর্মের প্রেরণা। আমরা এই মহাজীবনের এই রকম এক মহাচিত্রের অপেক্ষায় আছি।

প্রসঙ্গান্তর :

জীবনী-চিত্র পরিচালনায় শ্রীমধু বসু সিদ্ধহস্ত। এবার তিনি হাত দিয়েছেন ঋষি বঙ্কিমের জীবনী-চিত্রে। তিনি এখন ছবিখানির চিত্রনাট্য রচনায় ব্যাপৃত আছেন।

* * *

অভিনেত্রী-পরিচালিকা মঞ্জু দে 'রক্তজবা' নামে একখানি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা নিয়েছেন। ছবিখানি প্রযোজনা করবেন শ্রীমতী দে নিজেই এবং তিনিই এই ছবিতে নায়িকার ভূমিকায়ও অবতীর্ণা হবেন। তাঁর বিপরীতে নায়কের চরিত্রে থাকবেন সম্ভবতঃ বসন্ত চৌধুরী।

* * *

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স 'বাদশার' পর যে ছবিটির প্রযোজনায় হস্তক্ষেপ করছেন সেটি গড়ে উঠবে সুবোধ ঘোষ রচিত 'তাপসী' উপন্যাস অবলম্বনে।

এই উপন্যাসের নাট্যরূপ বর্তমানে রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হচ্ছে।

* * *

'ফিল্ম গিল্ড'-এর অসিত সেন পরিচালিত "তৃষ্ণা" নামক ছবিখানির চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয়ে গেছে। বিশ্বজিৎ ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস ছবিখানির মুখ্য চরিত্রে রূপদান করছেন। চিত্রটির সঙ্গীত পরিচালনা করবেন শ্যামল মিত্র।

* * *

গৌর শী-র কাহিনী 'পতি সংশোধনী সমিতি'-র যে চিত্ররূপ দেওয়া হচ্ছে তার নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং নবাগতা স্বর্ণা প্রধান। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন মঞ্জু দে, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, অসিতবরণ, পাহাড়ী সান্যাল, জহর রায় প্রভৃতি।

* * *

"প্রোডাকশন্ সিণ্ডিকেট"-এর "নতুন তীর্থ" চিত্রটির কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। বিধায়ক ভট্টাচার্যের একটি গল্প অবলম্বনে চিত্রটি নির্মিত হচ্ছে। প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন উত্তমকুমার ও সুলতা চৌধুরী। অন্যান্য শিল্পীর মধ্যে আছেন মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, ভগবতী ঘোষ, জহর গঙ্গোপাধ্যায়, জীবেন বসু, তরুণকুমার প্রভৃতি। সুধীর মুখোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করছেন, আর সুর দিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

* * *

'কে-এম-বি পিকচার্স'-এর প্রথম প্রয়াস 'নিশিযাপন'-এর সঙ্গীত গ্রহণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

* * *

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের সঙ্গীতবহুল চিত্রার্ঘ্য "রাধাকৃষ্ণ" বর্তমানে মুক্তিপ্রতীক্ষায় রয়েছে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করেছেন অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং সুরারোপ করেছেন রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। ২৩খানি গান ছবিটিতে সংযোজিত হয়েছে। গানগুলি গেয়েছেন ধনঞ্জয়, মানবেন্দ্র, সতীনাথ, পান্নালাল ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা, উৎপলা, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, সুমিত্রা ও মানস মুখোপাধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার চরিত্রে রূপদান করেছেন উত্তর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্চিতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

* * *

বোম্বাইয়ে একখানি বাংলা ছবির প্রযোজনার পরিকল্পনা করেছেন প্রযোজক দিলীপ সরকার। ছবিখানি পরিচালনা করবেন 'লুকোচুরি'-খ্যাত কমল মজুমদার। দুই মুখ্য পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ ও কিশোরকুমার, আর নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন একজন নবাগতা।

* * *

সঙ্গীত পরিচালক সলিল চৌধুরী বোম্বাইকে তাঁর

দ্রুত সমাপ্তির পথে "অশ্রু দিয়ে লেখা" চিত্রের নায়িকা গীতাঞ্জলি রায়

ছবি 'পিঞ্জরে কে পঞ্ছী' ('খাঁচার পাখী') নিয়ে এখন ব্যস্ত আছেন। সলিল চৌধুরী নিজেই এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। সুরারোপও করেছেন তিনি নিজেই, আর সবচেয়ে বড় কথা, তিনি ছবিখানি পরিচালনাও করছেন।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক এস, ইউ, সুন্নি তাঁর ঈষ্টম্যান্ কলারের ছবি 'পাল্কি'র জন্যে লক্ষ্ণৌ সহরে আড়াই লক্ষ টাকায় এক ব্যয়বহুল 'সেট্'-এর পত্তন করেছেন। 'সেট্'টির পরিকল্পনা করেছেন শিল্প-নির্দেশক ভি যাদব রাও। ছবিখানির ভাষা উর্দু। নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন রাজেন্দ্রকুমার আর ওয়াহিদা রহমান।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক পি, এন, অরোরা তাঁর "সিন্দবাদ আলিবাবা ও আলাদিন" নামের রঙীন চিত্রের জন্যে আরব মুলুক থেকে দুইজন নর্তকী আমদানী করছেন। এই দুইজনের একজন আসছেন বেইরুট থেকে। নাম সুহাইলা আব্বাস। অপরজন আসছেন কায়রো থেকে। নাম জোহরা খামাল। অন্যান্য নাচের সঙ্গে 'বেলিড্যান্স'ও এঁরা নাচবেন। এই ছবির কতকগুলো 'ট্রিকশট্' নেওয়া হচ্ছে টোকিওতে। ছবিখানির ভাষা হবে হিন্দী। প্রধান ভূমিকায় আছেন প্রদীপকুমার, হেলেন, সঈদা খান, আগা প্রভৃতি।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা রাজকাপুরের বিরাট ব্যয়বহুল চিত্র 'সঙ্গম' ইংরেজীতে 'ডাব্' করে ভারতের

প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী

সুলতা চৌধুরী

বাইরে দেখানো হবে বলে জানা গেছে। ইংরেজী সংস্করণটিকে অবশ্যই দৈর্ঘ্যে অনেক ছোট করে দেখানো হবে।

৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত এই টেক্‌নিকলার ছবিখানির মোট ১৫০ খানা প্রিণ্ট সবই করানো হচ্ছে লণ্ডনে। এই উপলক্ষে রাজকাপুরকে অনেকদিন লণ্ডনে কাটাতে হয়েছে। ছবিখানির মুখ্যাংশে অভিনয় করেছেন, রাজকাপুর, বৈজয়ন্তীমালা এবং রাজেন্দ্রকুমার। আর চিত্র গ্রহণ করেছেন শ্রীরাধু কর্মকার।

* * *

আগামী ১৯৬৫ সালের ৬ই থেকে ২১শে জানুয়ারী তারিখে ভারতে আবার আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এটি হবে এদেশের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। প্রথমটি ১৯৫২ সালে এবং দ্বিতীয় উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬১ সালে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের জন্যে আপাততঃ যে কর্মসূচী নির্ধারিত হয়েছে তদনুযায়ী ৬ই থেকে ২১শে জানুয়ারী দীর্ঘ দুই সপ্তাহ ধরে রাজধানী দিল্লীতে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হবে। তারপর ২২শে থেকে ২৮শে জানুয়ারী কলিকাতায় ও মাদ্রাজে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। সর্ব্বশেষে ২৯শে জানুয়ারী থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বোম্বাইতে অনুষ্ঠানের পর উৎসবটি সমাপ্তি লাভ করবে।

এবারকার উৎসবের ধরণ পাল্টানো হচ্ছে। অন্যান্য বারের মত না হয়ে এবার প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্বের প্রত্যেক দেশ থেকে একখানা করে পূর্ণ দীর্ঘ এবং একখানা করে 'শর্ট ফিল্ম' গ্রহণ করা হবে এই উৎসবের জন্যে।

ভারত সরকারের এই উদ্যোগ যাতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির স্বীকৃতি লাভ করতে পারে, সেই মর্মে ভারত সরকার প্যারিসে ফেডারেশন্ কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

* * *

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও দশজন শিল্পীর একটি দল সম্প্রতি পাশ্চাত্য সফরে বেরিয়েছেন। দলে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের

সহধর্মিণী কণ্ঠশিল্পী বেলা মুখোপাধ্যায় এবং কন্যা রেণুও আছেন।

বিলাতে ব্রাডফোর্ড, বার্মিংহাম্ এবং লীডস্-এ তাঁদের অনুষ্ঠান শেষ করে এই শিল্পীদল এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। সেখানে তাঁদের অনুষ্ঠান করবার কথা নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন্ এবং লস্ এন্জেলীস্ শহরে। তারপর তাঁদের ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-এ যাবার কথা আছে। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-এ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও তাঁর দলের শিল্পীরা প্রায় কুড়িটি অনুষ্ঠান পরিবেশন করবেন। এর পর তাঁরা হনলুলু এবং হংকং হয়ে দেশে ফিরবেন আগষ্ট মাসে।

—

ছবি তোলার কথা

রবীন সরকার

(সভ্য, এসোসিয়েটেড সিনেমা ও টেলিভিসন টেকনিসিয়ান ইংলণ্ড)

আমি এদেশে সহকারী ক্যামেরাম্যান ও বুম ও সাউণ্ড ক্যামেরা অপারেটর হয়ে কাজ করি। এই কাজের ভিতর দিয়ে এদের টেকনিকগুলি দেখে চলি। আমাদের দেশের লোকেরা টেক্‌নিক্ টেক্‌নিক্ বলে হাঁকডাক দিয়ে চলে; কিন্তু টেক্‌নিক্ জিনিষটা প্রত্যেকের কাছে এখানে বিভিন্ন ধরণের। এরা যে যার মতে চলে। তবে যে জিনিষটা দেখাতে হবে বোঝাতে হবে তা যাতে ঠিক মত দেখানো ও বোঝান যেতে পারে সেইটিই হচ্ছে টেক্‌নিক্।

একটা চিঠি বার করে পড়ছে নায়ক। এখন লেখা ও ছবির মধ্যে পার্থক্য দেখাতে হবে। লেখা যদি ব্যাক্‌-গ্রাউণ্ডের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবে ক্যামেরার কৌশল ঠিক-মত হয় নি বুঝতে হবে। এখানে যদি ক্যামেরার "এপার-চার" আর 'ক্যামেরা এঞ্জেল' ঠিক থাকে তবে পার্থক্য দেখান সম্ভব হয়। আবার আলোর দিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড অর্দ্ধেক আঁধার ও অর্দ্ধেক আলোকময় যেন না হয়। যদি দৃশ্য সাজানো হয় সেই আলো আঁধারের খাঁজলা হলে ভাল হয়। আর আলো যেখানে কম সেখানে অক্ষরগুলি একটু ঘন হওয়া উচিত। তাতে পড়তে অসুবিধা হয় না। চিঠির অক্ষরগুলি যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় তাও দেখতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে ছন্দই হচ্ছে প্রাণ। যাতে ছবির ভিতর ছন্দ ঠিক মত চলতে থাকে তা দেখতে হবে। কাট্, ডিজলভ, মিক্স এবং ফেডস্ যখন হবে তখন তার মধ্যে ছন্দ রাখতে হবে। ছন্দ ঠিক না থাকলে ছবি দৃষ্টিকটু দেখাবে।

ক্যামেরা যখন প্যান করিয়ে দৃশ্যর ছবি দেখাচ্ছে তখন মাঝপথে ক্যামেরা থামিয়ে দিতে নেই। যদি থামান হয় তবে দৃশ্য দর্শনীয় হতে পারেনা।

গতির সময় "কাট্" করতে হয় যদি দরকার মনে হয়। যেমন বসতে যাচ্ছে বা দাঁড়িয়ে উঠছে, অথবা ঘুরতে যাচ্ছে তখন 'কাট্' করতে হয়, স্থির জিনিষ থেকে 'কাট' করা ভাল নয়। 'ক্লোজ আপ্' থেকে 'কাট' করা যায় যখন মাথার কোন গতি হয়ে থাকে। সবই নির্ভর করে সময় জ্ঞানের উপর।

দেখা যাচ্ছে 'লংসটে' যে দূরে একটা চেয়ার পড়ে আছে। নায়ক ঢুকলো দৃশ্যে। এগিয়ে চললো। এখন নায়ককে 'ক্লোজ্‌সটে' দেখাতে হবে। এর জন্য লংসটে ছবি নেওয়া হল যখন নায়ক বসতে যাচ্ছে। তখন কাট করে দেখাবো ক্লোজসটে যে নায়ক চেয়ারে বসে আছে। সেই রকম আবার ক্লোজসটে দেখান যেতে পারে যে নায়ক চেয়ার ছেড়ে উঠছে—আর দাঁড়ানো যখন, তখন তাকে লংসটে দেখা গেল। উঠবার আগে কোন মতেই লংসটে কাটা উচিত নয়। দেখতে হবে কাটের সময় যেন দুটি ক্যামেরা স্থিতি অবস্থায় থাকে। আবার, দুজনে কথা কথা বলছে। দরজায় টোকা মারার শব্দ ভেসে এল। মুখ ঘুরিয়ে দুজনে দরজার দিকে মুখ ফেরাল। তখনই 'কাট' করে দেখালাম যে কে টোকা দিয়েছিল দরজায়। যদিও এতে গতি খুব ছোট বা কম তবে একটু চোখের গতির জন্য এ রকম করা অস্বাভাবিক নয়।

স্থিতির উপর যেমন 'কাট' করা যায় তেমনি এ্যাক্‌-সনের উপর 'কাট' করা যায়।

উপর 'কাট' করতে হয়। আবার যে শুনছে তার উপরও 'কাট' করে দেখাতে হয়। সবই বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। যা করলে মানাবে—তা করতে হয়।

দৃশ্য বদল করতে হয় বলে দৃশ্য কিন্তু বদলাবে না। অর্থ না থাকলে কোন মতেই দৃশ্যবদল করা উচিত নয়।

'ডিজলভস্' ও 'মিক্স'—দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। ঠিকমত পার্থক্য না দেখানো যায় যদি—তবে অর্থ বোঝান যাবে না। ফলে কোন প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে না। এ সম্বন্ধে আগেও কিছু কিছু বলেছি।

ছবি কোন মতেই কেবল 'ক্লোজআপ্' দিয়ে তুলে যেতে নেই। তাতে মন অস্থির হয়, অর্থ বোঝা যায় না। সেই জন্য আগে 'লংসট' দিয়ে ছবি দেখিয়ে পরে 'ক্লোজ-আপ্' দিতে হয়। তবে স্থান বিশেষে আগে 'ক্লোজআপ্' দিতে পারা যায়। যেমন ছবি আরম্ভ হল একটী ছোরার ক্লোজআপ্ দিয়ে। ক্যামেরা পেছিয়ে নেওয়া হল তখন দেখা গেল যে একটী লোকের বুকে গেঁথে আছে। যখন ক্যামেরা আরও দূরে নেওয়া হল লংসটে তখন দেখা গেল যে একটি ঘরের ভিতর লোককে ছোরা মারা হয়েছে।

চোখের এক ঘেঁয়েমী দূর করবার জন্য গতি সৃষ্টি করার জন্য নানাভাবে 'কাট' করে নানা রকমের সটের বন্দোবস্ত করতে হয়।

নূতন সট আরম্ভের সময় লংসট দিয়ে ছবি নিয়ে স্থান বোঝাতে হয়, কেন না যেখানে অভিনয় হবে সেখানটা আগে দেখিয়ে না দিলে দর্শকদের মনে খটকা লাগতে পারে। তারা মনে মনে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে ঘটনাটি কোথায় হচ্ছে?

কোন সাসপেন্সমূলক ছবির আরম্ভ 'ক্লোজআপ্' দিয়ে আরম্ভ করা যেতে পারে। যেমন ছোরা মারার দৃশ্য যা আগে জানিয়েছি।

কোন মূল চরিত্রকে স্পষ্ট করে দেখাবার জন্য 'ক্লোজ-আপ্' দিয়ে দেখাতে হয়।

ঘর থেকে বার হয়ে গিয়ে যদি আবার মূলচরিত্র ফিরে আসে তখনও 'ক্লোজআপে' দেখাতে হয়। লংসটে জানাতে হয় উপস্থিতি। ক্লোজসটে রূপ দেখাতে হবে যে লোকটি কে। ক্লোজআপে মনের ভাব বোঝাতে হয়। নূতন কোন চরিত্র যদি দৃশ্যে আসে তাকেও এইভাবে দেখাতে হয়। দর্শকদের মনের ক্ষুধা দূর করবার জন্য শিল্পীদের মনোভাব বোঝাবার জন্য নানারূপ 'কাট' অবলম্বন করতে হয়।

কখনও লংসটের পর ক্লোজসট দেখাতে নেই। লংসটের পর দিতে হয় মিডিয়ম্ সট—পরে ক্লোজসট। নইলে ছবি জাম্প বা লাফ দেবে। তাতে অর্থ বোঝা যাবে না। তবে লংসটে চরিত্রের সম্মুখভাগ স্পষ্ট করে দেখিয়ে পরে ক্লোজসট দেখানো যেতে পারে।

নায়ক চলেছে পথ দিয়ে। লংসটে ছবি নিলাম, মিডিয়াম সটে দেখালাম একটা বাড়ী দেখা যাচ্ছে, সেখানে নায়ক এসে ঢুকলো বা ক্লোজসটে দেখালাম যে নায়ক এসে হাজির হয়েছে।

লংসট থেকে ক্লোজসটে এনে সকলকে দলের মধ্যে দেখানো যায় না। তবে দেখান যেতে পারে যদি কোন দর্শনীয় বা বিশেষ কোন অংশ দেখাতে হয়। কাউকে আগে থেকে না দেখিয়ে হঠাৎ ক্লোজসটে দেখানো উচিত নয়। তাতে গোলমাল হয়ে যেতে পারে।

ক্যামেরাতে বড় ওয়াইড এঙ্গেল লেন্স পড়িয়ে ক্যামেরা প্যান করতে নেই। তাতে গতি ঠিক থাকে না। রেখা এঁকে বেঁকে যায়। ক্যামেরা আবার এগিয়ে পেছিয়ে নিতে নেই যখন ওয়াইড এঙ্গেল লেন্স লাগানো থাকে। তবে ৪০° ডিগ্রির মধ্যে যেটুকু থাকে তাতে ভুল দেখা যায় না।

অনেকেই মনে করে যে ২০° ডিগ্রি কোণ ঠিক করে নিয়ে ক্যামেরাতে লেন্স লাগিয়ে ভিতরে ও বাইরে যেতে আসতে পারে। সেটা ভুল ধারণা। কেন না ২০° কোণ বড় সঙ্কীর্ণ। ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকলে একটু তফাৎ দেখা যাবে। এগিয়ে না গেলেই ভাল হয়। কোন জিনিষ ক্যামেরা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। এখন ক্যামেরা এগিয়ে চলতে থাকলে জিনিষটা ক্রমশঃ বড় হতে থাকে। ফলে অমানান দেখায়, সেই জন্য বুঝে বুঝে কাজ করতে হয়।

ক্যামেরাতে যদি সঙ্কীর্ণ কোণযুক্ত লেন্স ব্যবহার করা হয়—তখন যদি ক্যামেরা নড়তে থাকে তবে ছবি লাফাতে থাকে। সেই জন্য সঙ্কীর্ণ লেন্স লাগিয়ে ক্যামেরা এগিয়ে পেছিয়ে নেওয়া উচিত নয়। তাতে ছবি ভাল হতে পারে না।

অনেক সময় দূরের জিনিষ দেখাবার জন্য ক্যামেরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। তবে আজকাল আর কেউ অত কষ্ট করতে যায় না। একটা জুম লেন্স ব্যবহার করেই কাজ সেরে থাকে। সেটা ভাল কি মন্দ বলতে চাই না, কেননা সবই রুচির ব্যাপার। কে কি ধরণের ছবি দ্বারা অর্থ বোঝাতে চায় তা আমি জানবো কি ভাবে? ধরা যাক—ক্রিকেট খেলা হচ্ছে তা দেখাতে হবে। তখন জুম লেন্স ব্যবহার করে খেলা দেখান যেতে পারে। তবে তাতে মনের সাধ পূর্ণ হয় না। যাই হ'ক অবস্থা বিশেষে জুম লেন্স কাজ দিয়ে থাকে।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ২১৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জিওফ বয়কট ৪৮ রান। ডিভার্স ৩৯ রানে ৩ এবং হক ৬৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ১৯৩ রান (৯ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। টেড ডেক্সটার ৬৮ রান। ম্যাকেঞ্জি ৫৩ রানে ৫ উইকেট)

অস্ট্রেলিয়া ঃ ১৬৮ রান (ববি সিম্পসন ৫০ রান। ট্রুম্যান ৫৮ রানে ৩ এবং কোল্ডওয়েল ৪৮ রানে ৩ উইকেট)

ও ৪০ রান (২ উইকেটে)

ইংল্যাণ্ডের নটিংহাম সহরের অন্তর্গত ট্রেন্টব্রীজ মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার ৪ তম টেস্ট ক্রিকেট সিরিজের প্রথম টেস্ট খেলাটি বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হয়। ফলে খেলার ফলাফল অমীমাংসিত থেকে যায়। প্রথম দিনে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ৫২ রান (১ উইকেটে) দাঁড়ায়। বৃষ্টির জন্যে পুরো সময় খেলা হয়নি। লাঞ্চের আগে যা ৮৬ মিনিট খেলা হয়েছিল। দ্বিতীয় দিনের বৃষ্টিতেও খেলা ভণ্ডুল হয়। ইংল্যাণ্ডের ৮ উইকেট পড়ে ২১৬ রান দাঁড়ায়। বৃষ্টির জন্যে তৃতীয় দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড প্রথম ইনিংসের খেলার জের টানেনি, দ্বিতীয় দিনের ২১৬ রানের (৮ উইকেটে) উপরই প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের খেলা এই দিনেই ১৬৮ রানের মাথায়, শেষ হয়ে যায়। বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় কোন উইকেট না পড়ে ৭১ রান ওঠে। ফলে ইংল্যাণ্ড ১১৯ রানে অগ্রগামী হয়।

খেলার পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে ইংল্যাণ্ড তাদের ১৯৩ রানের (৯ উইকেটে) মাথায় দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা ক'রে অস্ট্রেলিয়াকে খেলার দান ছেড়ে দেয়। তখন খেলা ভাঙতে ১৯০ মিনিট বাকি ছিল এবং খেলায় অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভ করতে ২৪২ রানের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বৃষ্টি নামার দরুণ নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত খেলা হয়নি। যেটুকু সময় অস্ট্রেলিয়া খেলতে পেয়েছিল তাতে ৪০ রান (২ উইকেটে) উঠেছিল।

এশিয়ান ফুটবল কাপ ঃ

তেল আবিবে আয়োজিত এশিয়ান ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতায় ইস্রায়েল অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে। বিরাট এশিয়া মহাদেশের মাত্র এই চারটি দেশ প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছিলে—ইস্রায়েল, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ কোরিয়া এবং হংকং। সুতরাং প্রতিযোগিতার মহৎ উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হয়েছে সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। ভারতবর্ষ রানার্স-আপ হয়ে কোন

রকমে দেশের মুখরক্ষা করে এসেছে। চ্যাম্পিয়ান ইস্রায়েল ১-০ গোলে হংকংকে, ২-০ গোলে ভারতবর্ষকে এবং ২-১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে অপরাজিত থাকে। অপরদিকে রানার্স-আপ ভারতবর্ষ দু'টি খেলায় জয়ী হয়—দক্ষিণ কোরিয়াকে ২-০ গোলে এবং হংকংকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে।

চূড়ান্ত ফলাফল

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বঃ	বিঃ	প
ইস্রায়েল	৩	৩	০	০	৫	১	৬
ভারতবর্ষ	৩	২	০	১	৫	৩	৪
দঃ কোরিয়া	৩	১	০	২	২	৪	২
হংকং	৩	০	০	৩	১	৫	০

হকি টেস্ট ঃ

ভারত সফরে মালয়েশিয়া বনাম ভারতবর্ষের হকি টেস্ট খেলার ফলাফল :

ভারতবর্ষের জয় : দ্বিতীয় টেস্টে (বোম্বাই) ২-০ গোলে, চতুর্থ টেস্টে (জলন্ধর) ৪-১ গোলে, ৬ষ্ঠ টেস্টে (নিউ দিল্লী) ১-০ গোলে এবং সপ্তম টেস্টে (কটক) ২-০ গোলে।

খেলা অমীমাংসিত : প্রথম টেস্ট (ভিলাই) ০-০ গোলে, তৃতীয় টেস্ট (ইন্দোর) ২-২ গোলে এবং পঞ্চম টেস্ট (চণ্ডীগড়) ১-১ গোলে।

ফ্রেঞ্চ লন টেনিস প্রতিযোগিতা ঃ

১৯৬৪ সালের ফ্রেঞ্চ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিনিধি চারটি খেতাব নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়লাভ করেন : মহিলাদের সিঙ্গলসে কুমারী মার্গারেট স্মিথ, মহিলাদের ডাবলসে কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কুমারী লেসলী টার্ণার, পুরুষদের ডাবলসে রয় এমারসন এবং কেন ফ্লেচার এবং মিক্সড ডাবলসে কুমারী মার্গারেট স্মিথ এবং কেন ফ্লেচার। পুরুষদের সিঙ্গলস্ খেতাব যা অষ্ট্রেলিয়া পায়নি—সিঙ্গলস খেতাব পান স্পেনের ম্যানুয়েল সান্তানা। প্রতিযোগিতায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য আর একদিক থেকে লক্ষণীয়—অষ্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ একাই তিনটি অনুষ্ঠানের ফাইনালে খেতাব পান এবং পুরুষদের ও মিক্সড ডাবলসের ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলোয়াড় উঠতে পারেন নি। ১৯৬৪ সালের খেতাব নিয়ে অষ্ট্রেলিয়ার কুমারী মার্গারেট স্মিথ ফ্রেঞ্চ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার দু'বার সিঙ্গলস খেতাব পেলেন।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

গত ১১ই মে থেকে ১৯৬৪ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ খেলা সুরু হয়েছে। ২০শে জুন পর্য্যন্ত খেলার ফলাফল ধরে লীগ খেলার তালিকা তৈরী করলে দেখা যায়, তালিকার শীর্ষ দেশে আছে ইস্টার্ণ রেলওয়ে—১০টা খেলায় ১৫ পয়েণ্ট, খেলা জয় ৫ এবং ড্র ৫ ; গোলের সংখ্যা স্বপক্ষে ৮ এবং বিপক্ষে ০। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল এবং মহমেডান স্পোর্টিং এই তিনটি বড় ক্লাবের বিপক্ষে ইস্টার্ণ রেলদল গোলশূন্য অবস্থায় খেলা ড্র করেছে। গত বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান আছে দ্বিতীয় স্থানে—৮টা খেলায় ২ পয়েণ্ট। খেলায় তারা ৭টা গোল দিয়ে ২টো গোল খেয়েছে। মোহনবাগান ৪টে খেলা ড্র করেছে—মহমেডান স্পোর্টিং এবং হাওড়া ইউনিয়নের সঙ্গে ১—১ গোলে এবং ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং বালী প্রতিভা দলের বিপক্ষে ০—০ গোলে। লীগের তালিকার তৃতীয় স্থানে আছে ইস্টবেঙ্গল—৮টা খেলায় ১১পয়েণ্ট। ইস্টবেঙ্গল ৫ পয়েণ্ট নষ্ট করেছে—স্পোর্টিং ইউনিয়ন, ইস্টার্ণ রেলওয়ে এবং বি এন আর দলের সঙ্গে ০—০ গোলে, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সঙ্গে ১—১ গোলে এবং জর্জ টেলিগ্রাফ দলের সঙ্গে ২—২ গোলে খেলা ড্র ক'রে। বি এন আর দল আছে চতুর্থ স্থানে—৯টা খেলায় ১১ পয়েণ্ট।

ইংল্যাণ্ড সফরে অষ্ট্রেলিয়া দল ঃ

১৯৬৪ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে গত ১৬ই জুন পর্য্যন্ত অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ১৩টি খেলায় যোগদান করেছে। খেলার ফলাফল : অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৪, খেলা ড্র ৭ এবং বৃষ্টির জন্যে খেলা পরিত্যক্ত ২।

ইউরোপীয়ান নেশনস ফুটবল কাপ ঃ

মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ১৯৬৪ সালের ইউরোপীয়ান নেশনস ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে স্পেন ২—১ গোলে গতবছরের বিজয়ী রাশিয়াকে পরাজিত ক'রে কাপ বিজয়ী হয়েছে। গত ২৫ বছরের মধ্যে স্পেনের মাটিতে অনুষ্ঠিত ফুটবল খেলায় রাশিয়ার এই প্রথম পরাজয়।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে ১।৭।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রাবণ-১৩৭১

প্রথম খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | দ্বিতীয় সংখ্যা

প্রীতির ক্রমবিকাশ

শ্রীসুধাংশুকান্তি ভক্তিবিলাস এম-এ, পি এইচ-ডি

শাস্ত্রে প্রীতিরই প্রয়োজনীয়তা নির্ণীত আছে। কিন্তু অবিবেকীদের বিষয়প্রীতি যে লক্ষণযুক্ত, ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি সেই লক্ষণযুক্ত নহে। কারণ বিষয়ের আনুকূল্যই প্রীতির প্রাণ। প্রীতি অর্থ প্রিয়তা অর্থাৎ যদ্দ্বারা বিষয়ের আনুকূল্য হয়, তদনুগতভাবে বিষয়প্রাপ্তির জন্য যাহাতে স্পৃহা জাগে এবং সেই স্পৃহাহেতু বিষয়ানুভব জন্য যে উল্লাসময় ভাবের উদয় হয় তাহাকে প্রিয়তা বলে। বিশেষতঃ অবিবেকীদের বিষয়প্রীতি মায়াশক্তি বৃত্তিময়, আর ভক্তের ভগবৎ-প্রীতি স্বরূপশক্তি বৃত্তিময়।

ভগবৎ-প্রীতি ভাববস্তু হইলেও ভগবদ্ধামে মূর্তিমান হইয়া এই প্রীতির অবস্থান আছে। ভক্তিরসিকগণ এ জন্য তাহার স্বরূপ, আকার ও দেহ—এই তিনটির পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। বস্তুর মূল সত্তাই বস্তুর স্বরূপ, তাহার মূর্ত্ত অভিব্যক্তিই দেহ ও দেহের অবয়ব সংযোগে যে বৈশিষ্ট্য—তাহাই উহার আকার। এই প্রীতি মূলতঃ ভাববস্তুরূপে হ্লাদিনীসার বৃত্তিবিশেষ ও ভক্তের মনোবৃত্তি বিশেষরূপে উহার অভিব্যক্তি এবং আনুকূল্যাদিময় অভিলাষরূপে ইহার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ। অর্থাৎ এইরূপে ভগবৎপ্রীতির আবির্ভাব বৈশিষ্ট্য হইলেও প্রীতি কেবল ভক্তহৃদয়ের আনুকূল্যাদিময় অভিলাষের আধিক্য বিস্তার করে। এ

সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামী পাদ প্রীতিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—'প্রীতিঃ খলু ভক্তচিত্তমুল্লাসয়তি, মমতয়া যোজয়তি, বিস্রম্ভয়তি, প্রিয়ত্বাতিশয়েনাভিমানয়তি, দ্রবয়তি, স্ববিষয়ং প্রত্যভিলাসাতিশয়েন যোজয়তি, প্রতিক্ষণমেব স্ববিষয়ং নব নবত্বেনানুভাবয়তি, অসমোর্দ্ধচমৎকারেণোন্মাদয়তি চ'। অর্থাৎ, গুণান্তরের উৎকর্ষের তারতম্যানুসারে প্রীতির যে তারতম্যভেদ হয়, তাহা দুই প্রকারের। প্রথমতঃ—ভক্তচিত্ত সংস্কারের দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ—ভক্তের ভগবান সম্বন্ধীয় অভিমান বিশেষের দ্বারা। কারণ উক্ত গুণসকল ভক্তগণের অভিমানবিশেষের হেতু। এই প্রকারে প্রীতির গাঢ় হইতে গাঢ়তর অবস্থায় যে ক্রমপরিণতি, 'তাহাও চিত্তসংস্কারের দ্বারা সাধিত হয় বলিয়া প্রীতির উৎকর্ষেরও তারতম্য হয়। আর সেই অভিমানবশে প্রীতির যে তারতম্য, তাহাকে অবলম্বন করিয়া শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসতত্ত্ব। এই পঞ্চরসের মধ্যেও 'পূর্ব্বরসের গুণ পরে হয়।' এখানে জ্ঞাতব্য তথ্য এই যে, প্রীতির পরমানন্দরূপতা স্বতঃসিদ্ধ হইলেও কার্যসামান্য চেষ্টা হইল—স্বীয় আনুকূল্য তাৎপর্য্য, আর শুদ্ধ প্রীতি চেষ্টা হইল—প্রিয়ানুকূল্যতাৎপর্য্য। অর্থাৎ এই প্রিয়ানুকূল্য তাৎপর্য্যতাই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্য, এবং এই শুদ্ধা প্রীতির চরম পরিপাক বৃন্দাবনের গোপীভাব; সুতরাং ইহাই প্রীতির চরমোৎকর্ষ বৈশিষ্ট্য। অতএব শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছাই প্রেম· এই প্রেমই প্রীতির প্রাণ, এই প্রীতিই ভক্তচিত্তে নানা ক্রিয়ারূপে আত্মপ্রকাশ করে, চিত্তকে উল্লসিত করায়, মমতাবোধ দ্বারা প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুক্ত করায়, আশ্বস্ত করায়, প্রিয়ত্বের অতিশয়ত্বহেতু অভিমান করায় এবং স্ববিষয়ের প্রতি প্রত্যভিলাষাতিশয় দ্বারা (প্রচুর অভিলাষ দ্বারা) আসক্ত করে বা যুক্ত করে, প্রতিক্ষণ স্ববিষয়কে নব নবত্বের দ্বারা অনুভব করায়, অসমোর্দ্ধ চমৎকারিত্বের দ্বারা চিত্তকে উন্মাদিত করে। অতএব উক্তরূপে উল্লাসের মাত্রাধিক্যব্যঞ্জিকা যে প্রীতি তাহারই নাম রতি। যথা, তত্রোল্লাস মাত্রাধিক্য ব্যঞ্জিকা প্রীতিঃ রতিঃ। এই যে প্রীতি বা রতি, ইহা কেবল উল্লাসের আধিক্যব্যক্ত করে এবং শ্রীভগবানেই ইহার তাৎপর্য্য, অর্থাৎ একমাত্র প্রেমাস্পদেই তাৎপর্য্যবোধ, তদ্ভিন্ন অন্য সকল বস্তুতে তুচ্ছবুদ্ধি জন্মে। "রতি গাঢ় হইলে ধরয়ে প্রেম নাম"।

গোস্বামীপাদ প্রেম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মমাতিশয়াবির্ভাবেন সম্বদ্ধা প্রীতিঃ প্রেমা। অর্থাৎ মমতাবোধের আতিশয্যের আবির্ভাব সম্বন্ধে যে প্রীতি তাহাই প্রেম নামে অভিহিত। এই প্রেমের আবির্ভাব হইলে তৎপ্রীতিভঙ্গ-হেতুসমূহ তাহার উদাম বা স্বরূপকে বাধা দিতে পারে না, অতএব মমতার আধিক্য প্রেমভক্তির বৈশিষ্ট্য। প্রেমের আবির্ভাবে ভক্তচিত্ত সম্পূর্ণরূপে আর্দ্র হয় বলিয়া এ সংসারে কোন বাধাবিঘ্নই এই প্রীতির পথকে রুদ্ধ করিতে পারেনা।

বিস্রম্ভাতিশয়াত্মকঃ প্রেমা প্রণয়ঃ।

এই বিস্রম্ভাতিশয়প্রেম অর্থাৎ প্রিয়জনের সহিত অভেদবুদ্ধি-রূপ প্রণয়ের উদয় হইলে সম্ভ্রমাদি তিরোহিত হয়, অর্থাৎ স্বীয় মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত প্রণয়ীর অভেদবুদ্ধি হয়। ইহাতে নিজের প্রতি যেমন গৌরববুদ্ধির অভাব হয়, প্রিয়তমের প্রতিও সেই রূপ গৌরববুদ্ধির অভাব হয়। এই প্রণয়ই অবস্থাবিশেষে মানরূপে পরিণত হয়। যথা—

প্রিয়ত্বাতিশয়াভিমানেন কৌটিল্যাভাসপূর্ণভাববৈচিত্রীঃ দধৎ প্রণয়ো মানঃ।

অর্থাৎ প্রিয়ত্বাতিশয়ের অভিমান দ্বারা কৌটিল্যাভাসপূর্ব্বক ভাববৈচিত্রী দান করে যে প্রণয়, তাহা হইল মান। এখানে প্রিয়তার অতিশয়তাহেতু অভিমান এবং এই অভিমান হইতে প্রণয়ের কৌটিল্য (বক্রতা বা বামতা), ঐ কৌটিল্য হইতেই ভাবমৈত্রী সঞ্জাত হয়। অতএব এই মান জাত হইলে স্বয়ং ভগবানও সেই প্রণয়কোপ হইতে ভয় পান। এখানে প্রিয়তাতিশয়ের অভিমান এইরূপ—'আমি প্রিয়তমকে কত ভালবাসি তাহার সীমা নাই, আর প্রিয়তমও আমার প্রেমাধীন।' কিন্তু এই প্রণয় যখন বাহ্যিক কুটিলতা প্রকাশ করিয়া উহাকে কোন এক বিচিত্র অবস্থায় উন্নীত করে, তখন বাহিরে উপেক্ষা এবং অন্তরে প্রচুর প্রণয়ের সমাবেশ হয়। এজন্য মানে প্রণয়ের গাঢ়তা সম্পাদিত হয় বলিয়া শ্রীভগবানও প্রণয়কোপে ভয়প্রাপ্ত হয়েন।

এই প্রকার অত্যন্ত চিত্তদ্রাবক প্রেমই স্নেহ। যথা—

চেতোদ্রবাতিশয়াত্মকঃ প্রেমৈব স্নেহঃ। অর্থাৎ যে প্রেম চিত্তকে অতিশয় দ্রব করে তাহাই স্নেহ। এই স্নেহ সঞ্জাত হইলে প্রিয়তমের সম্বন্ধাভাসেই মহাবাষ্পাদিবিকার, প্রিয়দর্শনাদিতে অতৃপ্তি, প্রিয়ের অত্যন্ত সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তাহার কোন অনির্দ্দিষ্ট অনিষ্টের আশঙ্কা প্রভৃতির উদয় হয়। এখানে সম্বন্ধাভাস বলিতে যে কোনরূপে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ দর্শন, বাক্যশ্রবণ ও তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হইলে চিত্ত বিগলিত হইয়া প্রচুর অশ্রু নির্গমণ করাইয়া দেয় বলিয়া হৃদয়ের গোপনভাব ব্যক্ত হইয়া পড়ে। এই প্রকার অতিশয় অভিলাষাত্মক স্নেহই রাগ। যথা—স্নেহ এবাভিলাষাতিশয়াত্মকো রাগঃ। চিত্তে এই রাগ সঞ্জাত হইলে ক্ষণিক বিরহেও অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা বোধ হয়। আবার তাঁহার সহযোগে পরমদুঃখও সুখরূপে প্রতিভাত হয়। অতএব প্রণয়ের উৎকর্ষতাহেতু অতিশয় দুঃখও চিত্তে সুখ রূপে অনুভূত হইলে—সেই উৎকর্ষকে রাগ বলা হয়।

ব্রজদেবীগণই রাগের পরাকাষ্ঠা। পরম মর্য্যাদাসম্পন্ন কুলবধূগণের চরম দুঃখের কারণ হইতেছে—স্বজন ও আর্য্যপথ ভ্রংশন। অগ্নিপ্রবেশে বা বিষপানে মরণও তাঁহারা সাদরে অঙ্গীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের পক্ষে লজ্জা ত্যাগ সর্ব্বথা অসম্ভব। অথচ রাগাতিশয্যে বেদমর্য্যাদা ও কুলমর্য্যাদা অতিক্রমণেই তাঁহাদের রাগের পরাকাষ্ঠা প্রকাশিত হয়। অতএব এইপ্রকার শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্রবল তৃষ্ণাই রাগ নামে অভিহিত হয়। এই রাগই আবার নিজের বিষয় আলম্বন শ্রীকৃষ্ণকে অনুক্ষণ নব নব রূপে অনুভব করাইয়া নিজেও অনুক্ষণ নব নব ভাব ধারণ করে—তাহাই তখন অনুরাগ। যথা—স এব রাগোঽনুক্ষণং স্ববিষয়ং নবনবত্বেনানুভাবয়ন্ স্বয়ং চ নব নবী ভবন্নমুরাগঃ।

এই অনুরাগ সঞ্জাত হইলে পরস্পর বশীভাবের অতিশয়তা ঘটে, প্রেম বৈচিত্র্য (ইহা একপ্রকার বিরহ ভেদ, অর্থাৎ প্রিয় নিকটে থাকিলেও বিরহ অনুভূতি, ইহা প্রেমের উৎকর্ষতা হইলেও বিচ্ছেদ ভয়ে আর্ত্তিরূপে স্ফুরণ হয়) শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধী অপ্রাণীতেও জন্মলালসা এবং বিপ্রলম্ভে বিস্ফূর্ত্তি প্রভৃতির উদয় হয়।

এই উন্মাদক অনুরাগই অসমোর্দ্ধ চমৎকারিতা দ্বারা সম্বেদনযোগ্যদশা প্রাপ্ত হইলে ভাবরূপে পরিণত হয়। কোন কোন স্থলে এই ভাবই মহাভাব নামে অভিহিত হয়। যথা—

"অনুরাগ এব"সমন্দোচমৎকারেণোন্মাদকো মহাভাবঃ। এই মহাভাবের উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সংযোগে নিমেষ অসহিষ্ণুতা, কল্পপরিমিত কালকে ক্ষণকাল মনে করা। আর বিয়োগে ক্ষণকালকেও কল্পপরিমিত মনে করা ইত্যাদি অবস্থা দেখা যায়। এই মহাভাবই হইল শ্রীরাধিকার স্বরূপ এবং অপরাপর ব্রজসুন্দরীগণ তাহার কায়ব্যূহ বলিয়া তাঁহারাও মহাভাববতী। কিন্তু মহিষীগণ শ্রীরাধার প্রকাশরূপা বলিয়া তাঁহাদিগের মহাভাবের উন্মুখ অনুরাগ পর্য্যন্তই প্রীতির শেষ সীমা, ইহার পর মহিষীগণের আর কোন অধিকার দৃষ্ট হয় না।

এই মহাভাবেরও যে পরাকাষ্ঠারূপ অধিরূঢ় মহাভাব তাহা একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত অন্য কাহাতেও সম্ভবে না। এই অধিরূঢ় মহাভাবে যুগপৎ মিলন ও বিরহের স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।
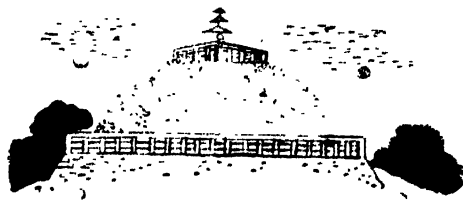
(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তেরো

আলোক হাসপাতাল থেকে ফিরতেই দেখে বারান্দায় নমিতা একটা চিঠি পড়তে পড়তে চোখ মুছছে। কাছে এসে তার মাথা বুকে টেনে নিতেই নমিতা কেঁদে ফেলল হুহু ক'রে।

"কী হয়েছে মা?"

নমিতা কোনো কথা না ব'লে নমিতার চিঠিটি তার হাতে দিয়ে একটু দূরে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, আর থেকে থেকে চোখ মোছে।

চিঠিটা পড়া শেষ হ'লে আলোক নমিতাকে ডাকে। সে পাশে এসে বসতেই আলোক তার কণ্ঠবেষ্টন ক'রে বলে: "সবই তো বুঝি মা, কেবল এইটা বুঝতে আজো বেগ পাই যে ঠাকুর ভক্তদের নিঃস্ব করবার একনিষ্ঠ সাধনা না ক'রে যদি অসুরদের দিকে একটু বেশি নজর দিতেন তো হয়ত দিন দুনিয়ার চেহারা আজ এমন সঙিন হয়ে দাঁড়াত না।"

নমিতা রাগ ক'রে বলে: "তোমার সব তাতেই ঠাট্টা!—যাও।"

আলোক (হেসে): না মা। ডি-এল-রায় একে বলতেন করুণ হাস্য। কিন্তু আমি সত্যি পার্বতী নই—বিশ্বাস কর্। কদিন থেকে কেবল কেবলই রমার কথা মনে হচ্ছে—মনে পড়ছে ওর অপরূপ মুখখানি—যেমন সুন্দর তেমনি ক্লান্ত। কিন্তু আজকাল কই ও আর তেমন আসে না তো পুনায়?

নমিতা: তোমার কি কিছুই মনে থাকে না বাবা? ওর যে আজ আট মাস—বললাম না সেদিন?"

আলোক: ও! (একটু থেমে) আহা, যদি এ সময়ে ওর মা থাকত রে! দেখ্ দেখি—সাধে কি আমি ঠাকুরকে বলি তাঁর ভক্তদের একটু কম করুণা করতে? এমন মেয়েটা—অথচ তার সব থেকেও যেন কিছুই নেই আজ—একেও বলতে হবে করুণাময়ের অপার করুণা? গৌতমটাকে একটু চলনসৈ ব'লে জানতাম মানুষ হিসেবে, কিন্তু সে-ও হ'য়ে দাঁড়ালো কি না—অখাদ্য!

নমিতা (চোখের জলের মধ্যে দিয়ে হেসে): যা বলেছ বাবা! আমি ওর কী নাম দিয়েছি জানো?—যমের অরুচি। একদিন মাথাও ধরে না ওর শুনেছি। কিন্তু সে যাক, রমার জন্যে কী করা যায় বলো তো? শুধু "আহা আহা" ক'রে চুপ ক'রে ব'সে থাকবে?

আলোক (হেসে): দাপাদাপি ক'রে হুহুঙ্কারী হ'লে কি ফল বেশি হবে মা? শোন্—এক কাজ করলে কী হয়? ওকে এখানে আনার চেষ্টা করলে—এখানেই প্রসব হ'লে?

নমিতা (খুশি হ'য়ে হাততালি দিয়ে): এই তো বাবার মতন বাবা: রোসো।

বলেই চিঠি লেখে খশ্‌খশ্ ক'রে। আলোক চুপ ক'রে বসে বাইরের আকাশের দিকে চেয়ে থাকে। কেবলই মনে পড়ে এই দুঃখিনী অপরূপার কথা। সব দিকেই সুখ হবার কথা যার—কিছুরই যার অভাব ছিল না তার আজ কী অবস্থা?……

একটু পরে নমিতা উঠে এসে ওর হাতে চিঠিটা দেয়। আলোক পড়ে :

"রমাদিদি আমার !

কী লিখব তোকে ভাই ? কীই বা সান্ত্বনা দিতে পারি আমরা বল্ ? তাছাড়া গুরুদেব প্রায়ই বলেন তুই মস্ত আধার—তোকে কী বলব যা তুই জানিস না ? তবু তুই আমার গুণগান সুরু করলি কেন বল্ তো ? আমি কেন বিয়ে করিনি—সে তোকে বলব একদিন। আজ শুধু একটি কথা বলতে চাই তোকে—শুধু সেইজন্যেই এ-চিঠি লিখছি। বাবা বললেন তোকে জানাতে যে, যদি তোর এখানে আসা সম্ভব হয় তবে তুই সোজা আমাদের এখানে চলে আয়। তোর স্বামীর মত করাতে পারবি না ?

"তুই আমার মনের জোরের কথা লিখেছিস। কম্‌প্লিমেণ্টটা ফিরিয়ে না দিয়ে পারছি না। আচ্ছা বল্‌তো আমি যদি এমন দেবতুল্য পিতা না পেতাম—(যিনি বলেন—বিয়ে মানুষের একবারই হয়)—তা হ'লে কী গতি হ'ত আমার ? যদি কোনো সংসার হাতে আমার নিজের ঠিক এই হাল হ'ত তা হ'লে কি আমি পারতাম তোর মতন এ দুর্ভাগ্যকে ঠাকুরের বর ব'লে মেনে নিতে ? না রমা, তোকে আশীর্বাদ করবার স্পর্ধা আমার নেই। তবে তোকে দেখতে ইচ্ছা হয়, তোর সেবা করতে ইচ্ছা হয় তোর এ-দুর্দৈবে।"

চোদ্দ

দুদিন বাদেই রমার উত্তর এল। নমিতা আলোককে দিয়ে বলল : "এবার চাই তোমার পরামর্শ—নৈলে হবে না।"

আলোক ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য হ'য়ে বলে : "মানে ?"

নমিতা হেসে বলে : "হাতে পাঁজি মঙ্গলবার ! পড়লেই মালুম হবে।"

আলোক পড়ল :

"নমিতা দি,

তোমার চিঠি পেয়ে এই প্রথম সত্যি ভরসা পেলাম—বিশ্বাস কোরো, একটুও বাড়িয়ে বলছি না। ভরসা পেলাম এই ভেবে যে ত্রেতা যুগে যক্ষপুরে বন্দিনী সীতার কাছেও আসন্ন ত্রাণের খবর পৌচেছিল যেমন অভাবনীয় দূতের মাধ্যমে, তেম্‌নি আমার কাছে কলিযুগে পৌছল তোমার আর আলোককাকার মাধ্যমে।

"কেবল প্রতি ফুলের পথেই কাঁটা বাদ সাধে দিদি। আমার স্বামী কিছুতেই মত দিতে পারেন না—বললেন। আর কেন জানো ? তিনি বলেন আমার কর্তব্য এখন বাবার কাছে গিয়ে যে ক'রে হোক উইল বদলাতে তাঁকে বাধ্য করা। তাই আমার প্রসব পুনায় পিতৃগৃহেই হবে এই-ই চান আমার শ্বশুর শাশুড়ী ননদ জা স্বামী সবাই। এরই নাম সংসার দিদি—যার ভিৎ হ'ল টাকা। তাই ওঁদের জুলুম—যে ক'রেই হোক বাবাকে বোঝাতে হ'বে তুতিয়ে পাতিয়ে। তাই তোমাদের ওখানে যাওয়া আমার অসম্ভব—বললেন আমার পতি পরম গুরু—সতীর কর্তব্য কী দেখিয়ে দিয়ে।

"এক হতে পারে যদি বাবা নিজে বলেন তোমাদের ওখানে যেতে। আমার শ্বশুরালয় তা হ'লে মত দেবেন কারণ তাঁরা সব আগে চান বাবাকে তুষ্ট করতে। কাজেই যদি তোমরা—মানে তুমি আর আলোককাকা বাবাকে ব'লে ক'য়ে তাঁর মত করাতে পারো তাহ'লে যক্ষপুরে বন্দিনীর কপাল ফিরলেও ফিরতে পারে, নৈলে নয়।

"নমিতাদি ভাই, পিতৃগৃহ আমার কাছে আজ জতুগৃহ মনে হয়। কেন—জানি না। মনে হয় সেখানে গেলে আমার মরণদশা ঘনাবেই ঘনাবে। তাই তোমাকে বলা—লক্ষ্মী দিদি আমার—যে ক'রে হোক বাবার মত করাও—আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই এ-দুঃসময়ে।"

আলোক (প'ড়ে) কিন্তু মন্তুভাই কি মত দেবেন ? মনে তো হয় না।"

নমিতা (উদ্দীপ্ত) : কেন দেবেন না শুনি ? তিনি কি জানেন না রমা তাঁর স্ত্রীর চক্ষুশূল ? এখানে অন্ততঃ রমা মনের শান্তিতে থাকবে। আর প্রসবের আগে যে প্রসূতির শান্তি দরকার একথা—

আলোক : ধীরে মা, ধীরে ! এ-তো যুক্তিতর্কের কথা নয় তোমার মনটি মমতার মাখন দিয়ে গড়া, তাই বুঝতে পারো না তাদের কথা, যাদের মন বিধাতা গড়েছেন ইট কাঠ চুন সুরকি দিয়ে। মন্তুভাই কী বলবেন জানো হব প্রফেট ? বলবেন—মেয়ের প্রসব পুনায় হ'লে তাঁ

ওখানেই হ'তে হবে নৈলে তাঁর মাথা-কাটা যাবে। (হেসে) সংসারী তো হও নি মা, তাই জানো না যে, সংসারী সব পারে, কেবল ঠাট বজায় রেখে তবে। অপিচ শ্রীমস্থিনী শোভনা দেবী কি অশোভন কিছু করতে পারেন?

নমিতা (ম্লান মুখে): তা হ'লে?

আলোক (একটু ভেবে): আচ্ছা, দু'জনে মিলে গিয়ে দরবার করা যাক। টাগ অফ ওয়ার যদি করতেই হয় তো আমার দিকে ওজন যত বাড়ানো যায় ততই ভালো। (থেমে একটু হেসে): কেবল—না, থাক্। তোমার মন খারাপ হবে ফের।

নমিতা: না, হবে না। বলো···বলতেই হবে।

আলোক: আমার মনে হয়—আমাদের এখানে রমা আসতে চায় শুনলে শ্রীলা শোভনা দেবী বলবেনই বলবেন: সে কি কথা? মেয়ে প্রসব হবে মা-র কাছে এইই হ'য়ে আসছে চিরকাল। তবু দেখা যাক একবার বেয়ে চেয়ে। গুরুদেব প্রায়ই আওড়ান একটি শ্লোক: যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ। আর জানোই তো হাড়ে হাড়ে আমি কী বিষম পরম-ভাগবত—গুরুবাক্য যার কাছে বেদ-বাক্য!

নমিতা: তুমি বাবা ভারি দুষ্টু। যা নও কেবলি তার ভঙ্গি করো। গুরুদেব তোমার বিশ্বাস সম্বন্ধে কী গল্প বলেছিলেন সেদিন?

আলোক: গল্প? কবে?

নমিতা: দিন পনের আগে? মনে নেই? যখন ধ্রুবদা তোমাকে অবিশ্বাসী বলে গাল দিল?

আলোক: কী? যে আমি বিশ্বাসকে অবিশ্বাস করলেও অবিশ্বাসে আমার বিশ্বাস অচল অটল?

নমিতা: ফে-র? যাও, তোমার সঙ্গে যদি আর কখনো কথা কই!

আলোক (হেসে): না মা, না, বল্ তুই। আমি আর প্রগল্‌ভতা করব না কথা দিচ্ছি। কী বলেছিলেন গুরুদেব?

নমিতা: দুই ভাই ছিল। বড় ভাই—পুরুত—খুব আচারী ও বিশ্বাসী কিন্তু একটু বোকা। ছোট ভাই ভবঘুরে। আজ এ-তীর্থে কাল সে-তীর্থে। একবার ফিরে এসেছে কৈলাস ঘুরে। বড় ভাই বললে: "ওরে আমি পাশের গাঁয়ে যাচ্ছি দুর্গাপূজা করতে, দিন তিনেক বাদে ফিরব। এর মধ্যে যদি কোনো যজমান আসে শাস্ত্র হাতড়ে বিধান দিস্।" পরদিন প্রতিবেশী এক ব্রাহ্মণকে সাপে কামড়ায়। ব্রাহ্মণী কেঁদে কেটে জিজ্ঞাসা করল: সর্পাঘাতে মরলে দাহ করতে হয়, না কবর দিতে হয়? ছোট ভাই বলল: "কবর দেওয়াই বিধি।" বড় ভাই তিন দিন বাদে ফিরে শুনে রেগে আগুন: "তুই নরকে যাবি। ব্রাহ্মণকে কবর? তুই হিন্দু না ম্লেচ্ছ—শাস্ত্রের কথাও বিশ্বাস নেই! ধিক্!" ছোট ভাই বললে: "দাদা কেন মিথ্যে অপবাদ রটাচ্ছ আমার? শাস্ত্রে বিশ্বাস আছে ব'লেই তো এত ভয় করে আমার বিধান দিতে—কি জানি কখন কোন্ অশাস্ত্রীয় বিধান দিয়ে বসি? তাই বলেছিলাম কবর দিতে এই ভেবে যে যদি তুমি ফিরে বলো—না দাহই বিহিত, তখন দিব্যি কবর থেকে তুলে ব্রাহ্মণকে চিতায় শোওয়ানো যাবে। কিন্তু ভাবো তো: যদি শাস্ত্রের বিধান হ'ত—সর্পাঘাতে মরলে কবর দেওয়াই বিধি, তা হ'লে কী হ'ত যদি বলতাম—দাহ করাই ঠিক? ব'লে গুরুদেব হেসে বলেছিলেন: আমার এই সুবুদ্ধি শিষ্যটিও এই জন্যেই যা জানেন তাকেও বলেন অজানা। তবে আমার মনে হয় একথা বলেন তিনি উপনিষদের এজাহারে তাঁর বিশ্বাস আছে ব'লেই যে. অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ অবিজ্ঞানতাম্—অর্থাৎ যে ভাবে ব্রহ্মকে জেনেছে সে জানে না তাঁকে, যে জানে না সে অন্তত এটুকু জানে যে তাঁকে পুরোপুরি জানা যায় না।

আলোক (হো হো ক'রে হেসে): আর আমার ভয় নেই তো, এমন উকিল যখন মা হ'য়ে এসেছে তখন আমাকে অজ্ঞান কি অবিশ্বাসী বলে কার সাধ্য—কিন্তু চল্ যাই মনুভাইয়ের কাছে—এখুনি না গেলে হয়ত দেখাই হবে না—সে দশটার আগেই বেরিয়ে যায় কাজে।

ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

নমিতা (টেলিফোন): হ্যালো! কে?···ওমা! ভক্তিদি!···কী?···হ্যাঁ, রমা আমাকেও লিখেছে সে আমেদাবাদে থাকতে চায় না।···কী?···তুমি পাশে একটি ঘরভাড়া নেবে?···না না, আমাদের ইচ্ছা প্রসব হবে আমাদের এখানেই—কী? রমার বাবা মত করবেন না?

হ্যাঁ, বাবাও ঠিক এই কথাই বলছিলেন, একটু আগে—তা শোন ভক্তিদি, আমার এই নিয়ে আলোচনা করতেই যাচ্ছিলাম মনুভাইয়ের ওখানে। কী? তাঁর অসুখ?··· কী সর্বনাশ। ক্যান্সার? (আলোককে) ধরো টেলিফোন—

আলোক (টেলিফোন ধরে): ক্যান্সার? মনুভাইয়ের?···কী? বম্বে টাটা ক্যান্সার ইনস্টিট্যুটে যাবেন কাল সকালে? আচ্ছা আমি যাচ্ছি এখুনি।···হ্যাঁ ব্যাপার তা হ'লে দেখছি রীতিমত সঙিন।···বেচারি মেয়ে! তবে ভেবো না দিদি—ওর জন্যে শুধু দেহুর তুকারাম নয়, কাশীর শিবও ভাবছেন।···হ্যাঁ হ্যাঁ—কাশীর শিব এখন বিষ্ণুঠাকুর ছাড়া আর কে?···হ্যাঁ, তিনি বলেছেন সাধুজিকে যে রমার দুর্গতি হ'তেই পারে না। কী?···আচ্ছা, আমি মনুভাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা ক'য়েই তোমাকে জানাব।

পনেরো

মনুভাই বাইরের "লন"-এ একটি আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে একটা অ্যালবামের পাতা উলটোচ্ছিল। ওদের মোটর ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো।

মুখ ম্লান, চোখের নিচে কালি···

আলোক: উঠো না হে—উঠো না, বোসো।

মনুভাই উঠে দাঁড়িয়ে: না, চলো ভিতরে যাই। এ ছবিটা দেখেছ কি তোমরা?

অ্যালবামের একটি পাতায় গৌরীর একটি চমৎকার ছবি···তিন বছরের ফুটফুটে মেয়ে রমা টলমল করতে করতে আসছে, আর গৌরী হাত বাড়িয়ে ডাকছে। নমিতার চোখে জল এল, কোনোমতে গোপন ক'রে বলল, কী সুন্দর ছবি! আমাকে এক কপি দেবেন? কপি না থাকলে আমি এ থেকে তুলে নেব। আমার খুব ভালো ক্যামেরা আছে।"

মনুভাই: তা বেশ তো। কিন্তু চলো আগে ঘরে—রোদের তাত বেড়ে উঠেছে।

* * *

ঘরে একটা ডিভানে আলোক ও নমিতা বসল, সামনে একটি আরাম কেদারায় মনুভাই। বলল: "আমার পেটে ব্যথা হয়েছে—শুনছি ক্যান্সার, তাই আরাম কেদারাতেই বসি। কোথাও বেরই না।"

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): শুনেছি। কিন্তু ক্যান্সার ব'লে ঠিক জানা গেছে কি? মানে ডায়াগনোসিস্—

মনুভাই (ম্লান হেসে): কয়াজির হাসপাতালে দুজন বড় সার্জন বলেছেন। তবে আমি কাল যাচ্ছি বম্বে—টাটা ইনস্টিট্যুটে।

নমিতা: হ্যাঁ, ভক্তিদি বলেছে। (একটু চুপ ক'রে থেকে) আশা করা যাক তাঁরা বলবেন ভুল ডায়াগনোসিস্ হয়েছে।

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): রমা জানে?

মনুভাই: না, তাকে বলি নি। ভাবছি বম্বে থেকে যাব সোজা তার কাছে।

নমিতা (প্রীত কণ্ঠে): খুব ভালো। সে খুব খুশি হবে আপনাকে—মানে একটু একলা পেলে। সে আজ বড় একলা।

মনুভাই (মুখ নিচু ক'রে): একলা এ জগতে কে নয় বলো? (একটু চুপ ক'রে থেকে) আমি খুব ভুল করেছিলাম।

আলোক: ভুল?

মনুভাই: ভুল ছাড়া আর কি? (দীর্ঘ নিশ্বাস) এখন সবাই জানে, তাই গোপন ক'রে আর ফল কী বলো? ভেবেছিলাম শোভনা আমাকে ভালোবাসে—blind old fool! বলে না—no fool like an old fool?

আলোক (একটু চুপ ক'রে থেকে): হ্যাঁ, আমরা সবাই জানতাম—ভক্তির কাছে নমিতাও শুনেছিল শোভনা তোমাকে কেন বিয়ে করেছিল। কিন্তু সে থাক, গতস্য শোচনা নাস্তি। সে বাড়ী নেই তো?

মনুভাই (তিক্ত হেসে): বাড়ীতে সে খুব কমই থাকে আজকাল। দিনকয়েক আগে গেছে জুহুতে প্রবীরকে নিয়ে। শুনলাম সেখানে রোজ বহু পুরুষের সঙ্গে সকাল বিকেল সাঁতার দেয়—আর সন্ধ্যায় হোটেলে নাচে। She's rippling along, don't you know.

নমিতা (ঈষৎ বিব্রত): সে জানে আপনার ক্যান্—অসুখের কথা?

মনুভাই: জানে না? সার্জন দুজন তাকেই তো আগে বলেছিল ডায়াগনোসিসের পরে।

নমিতা (আশ্চর্য): তবু আপনাকে ফেলে গেল জুহুতে নাচতে?

মনুভাই: যে নাচতে আর নাচাতেই জন্মেছে—কিন্তু মরুকগে। তুমি এইমাত্র বলছিলে রমা আমাকে একলা পেলে খুশি হবে। কী ক'রে জানলে? সে তোমাকে লিখেছে না কি?

নমিতা: হ্যাঁ। (একটু চুপ ক'রে) আর লিখেছে অনেক দুঃখ ক'রেই। বলতে কি, আমরা তার জন্যেই এসেছি (আলোককে) বলো না।

আলোক (জোর ক'রে): বলতে বাধে, কিন্তু না বললেও নয়।·· হয়েছে কি—রমাকে ওরা খুব গঞ্জনা দিচ্ছে—উইলের জন্যে। তাই আমি ভাবলাম তোমাকে··· মানে···

মনুভাই (বিষণ্ণ): Too late, Doctor! আমার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে এই—বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা—বলে না? The old old story.

আলোক: কিন্তু it's never too late to mend এ-ও তো বলে।

মনুভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে): না। আমি এখন—কী বলব?—more dead than alive···তা ছাড়া—

আলোক: Don't be a fool—You must—উইল তোমাকে বদলাতেই হবে—রমাকে অন্ততঃ অর্ধেক—

মনুভাই: সাহস নেই ভাই। শরীর যদি সুস্থ থাকত তো হয়ত পারতাম to rise to the occasion—কিন্তু অসুস্থ দেহে আর সয়না কুরুক্ষেত্র কাণ্ড। শোভনা রাগলে যে কী মূর্তি ধরে জানো না তো।

নমিতা: আপনি এ কী বলছেন? আপনি না পুরুষ মানুষ?

মনুভাই (ম্লান হেসে): ছিলাম একদিন। কিন্তু সে থাক্। রমা—

নমিতা: না, সে যাবে না। যদি আপনার ভুল না ভাঙত তাহ'লেও বা কথা ছিল, কিন্তু ভুলকে ভুল ব'লে চেনার পরেও—না, আপনাকে ছাড়ব না আমরা কিছুতেই রমাকে এভাবে বঞ্চিত করবে একজন বাইরের মেয়ে—কিন্তু তার কথা থাক—আমি কারুর নিন্দে করতে আসি নি। এসেছি শুধু রমার হ'য়ে কিছু বলতে।

মনুভাই: কেন মিথ্যে পণ্ডশ্রম করছ নমিতা? And why flog a dead horse? আমার কর্মফল—

আলোক (আতপ্ত): তোমার কর্মের ফল যদি শুধু তোমার উপরেই বর্তাতো তা হ'লে বলার কিছু ছিল না। কিন্তু রমা মাতৃহারা মেয়ে—তা ছাড়া এত চমৎকার মেয়ে সবাই ওকে ভালোবাসে—

নমিতা: শুধু ভালোবাসা নয়—শ্রদ্ধা করে সত্যিই। না। এত বড় অবিচার আমরা হ'তে দেব না। উইল আপনাকে পালটাতেই হবে ওকে অন্তত বিষয়ের অর্ধেক দিয়ে।

মনুভাই (একটু চুপ করে থেকে): উইল পাল্টানো?···ভয় করে।···যদি শোভনা টের পায়—

নমিতা: না, পাবে না। আপনি আজই দুপুরে আসুন আমাদের ওখানে আপনার উকিলকে নিয়ে। নতুন উইল হোক ও আজই রেজিস্টারি করুন।

মনুভাই: কিন্তু ও যদি কোনো সূত্রে জানতে পারে?

আলোক: না, পারবে না—যদি অবশ্য তোমার দুর্বল মুহূর্তে তুমি নিজে ব'লে না ফেলো।

মনুভাই (একটু ভেবে): আচ্ছা, একটু ভেবে কাল জবাব দেব। না, কাল না—পরশু—না, আমেদাবাদ থেকে ফিরতে তিনচারদিন হবে। সামনের রবিবার?

আলোক: ততদিনে আপনার গৃহলক্ষ্মী জুহু থেকে ফিরে আসবেন না তো?

মনুভাই (ম্লান হেসে): আনন্দ ছেড়ে কেউ কি ফিরতে চায় নিরানন্দ স্বামীর কাছে? ও চিরদিনই চেয়েছে টাকা আর আমোদ প্রমোদ।

নমিতা: তা বটে। কিন্তু যদি ধরুন, হঠাৎ ফিরে আসে?

মনুভাই (ভাবিত): তা হ'লে···তা হ'লে—কী করব?

আলোক (অসহিষ্ণু): এত ভয় কিসের তোমার—একটু বলবে খুলে? বিষয় তো তোমার—you have the whip hand.

মনুভাই (করুণ হেসে): বীরবর! তুমি হ'লে

উইডোয়ার, তাছাড়া (ইতস্ততঃ ক'রে) এখন আর গোপন ক'রে কী হবে বলো—যা সবাই জানে? আমি দুর্বল, কিন্তু অন্ধ নই তো। জানি আমার প্রতিবেশীরাও আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, বলে: I have bitten off more than I can chew! (আত্মধিক্কারী সুরে) জানো, গৌরী মারা যাবার পরে আমি ঠিক করেছিলাম আর বিয়ে করব না! বাইরণের সিনিক লেখায় সত্যিই রস পেতে সুরু করেছিলাম—তিনি লিখেছেন: "But—oh! ye lords of ladies intellectual···have they not henpecked you all? কিন্তু তখন কি ভেবেছিলাম যে intellectual lord যারা নয় তাদেরও ঐ একই অবস্থা?

নমিতা: কী বলছেন আপনি? একটু ইচ্ছে করলেই পারেন—

মনুভাই (ক্লান্ত হেসে): নমিতা, তুমি ছেলেমানুষ, তার উপরে শুনেছি আইডিয়ালিস্ট, চিরকুমারী থেকে দেশের দশের সেবা করতে চাও। তুমি কী বুঝবে—henpecked হয় মানুষ কিসের ফেরে পড়ে? তোমার বাবা হয়ত একটু বুঝলেও বুঝতে পারে—

আলোক (হেসে): বুঝিহে, বুঝি। কেবল আমার পিতৃভক্ত মেয়ের সাম্‌নে আমার গলদশা হবার কথা নাই বা বললে ভাই! কিন্তু সে থাক, আমার বক্তব্য এই যে তোমার স্ত্রীর সাম্‌নে যখন তুমি এতই কাবু তখন এইই তো মাহেন্দ্রলগ্ন উইল পালটানোর—যখন সে জুহুতে নাচ-গান ও সাঁতারে মশগুল আছে। Ther's a tide in the affairs of men জানোই তো!

মনুভাই (ইতস্ততঃ ক'রে): জানি··কিন্তু কাল যে আমাকে বম্বে যেতেই হবে—Tata Institute এ দুজন ডাক্তারকে ফোন করেছি—

আলোক: তাই তো বলছিলাম—শুভস্য শীঘ্রং—তুমি আজই আমাদের ওখানে একটার সময় লাঞ্চে এসো—তারপর—

মনুভাই: থ্যাংকিউ ডক্টর, কিন্তু আমি কিছুই খেতে পারি না আজ কাল—শুধু একটু দুধ সুপ ফলের রস মানে লিকুইড ডায়েট—

নমিতা: তাই দেব আপনাকে। আপনি আসুন আপনার উকিলকে নিয়ে—না দেরি নয় আর। আমরা ছাড়ছি না, আপনাকে আসতেই হবে—আজই নতুন উইল হয়ে যাক্—

মনুভাই: কিন্তু রেজিস্টারি করতে হবে তো—

আলোক: সে ভার আমার—আমি ফোন ক'রে সব ঠিক ক'রে রাখব। না, আর কথা না। let's make hay while the sun shines শোভনা দেবী জুহু তীর্থে আনন্দ করুন রমাকে ঠকিয়েছেন ভেবে, আমরাও এখানে আনন্দ করি তাঁকে পাল্টা ঠকিয়ে—oh the joy of double-crossing!

মনুভাই: কিন্তু···শেষটায়···মানে যদি পেরে না উঠি?

নমিতা: কেন এত ভড়কাচ্ছেন বলুন তো? পারবেন পারবেন পারবেন—আমরা আছি কী করতে? আপনাকে পারাবোই পারাবো। ভক্তিমাসিমাও আছেন আমাদের দিকে।

মনুভাই: ভক্তি? সে কি? শোভনা যে তার আদরের বোন। শোভনা আমাকে সেদিনও বলছিল: "দিদি কী যে খুসি হয়েছে—উইলে তুমি আমাকে সব দিয়েছ শুনে!"

নমিতা: নির্জলা মিথ্যে। ভক্তি মাসিমার মতন মন আমি দেখি নি আর একটিও—এক আমাদের গুরুমা ছাড়া। আর তিনি কী যে ভালো বাসেন রমাকে!

মনুভাই: বটে! কিন্তু শোভনা আমাকে যে বলল—

নমিতা: দেখুন, আপনি বুদ্ধিমান্, কৃতীপুরুষ, জগৎকে দেখেছেন আজ প্রায় ষাট বৎসর হ'তে চলল। সংসারে সচরাচর কেমন হয় এও কি আপনাকে ব্যাখ্যা ক'রে বলতে হবে? তাছাড়া টাকার লোভে ফন্দিবাজ হওয়া কি এতই বিরল যে আপনার স্ত্রী টাকার জন্যে মিথ্যা বলেছে ভাবতে আপনি এত বেগ পাচ্ছেন?

আলোক (হেসে): মা, মানুষ যখন মোহে পড়ে তখন এমনিই হয়—বিশেষ বৃদ্ধবয়সের মোহ—কিছু মনে কোরো না মনুভাই!

মনুভাই (ম্লান হেসে): মনে করতাম হয়ত ছমাস আগেও—কিন্তু আজ আমার মন ভেঙে গেছে ডক্টর—

নমিতা : জানি—আমি রাজি আছি।

মন্টুভাই (সবিস্ময়ে) : মানে? টেলিপ্যাথি?

নমিতা : তাই। সময়ে সময়ে আমি সত্যিই টের পাই কে কী ভাবছে। গুরুদেব বলেন কারুর কারুর জপ জমতে না জমতে এ ধরণের দৃষ্টি লাভ হয়—মানে, বিভূতি।

মন্টুভাই : ফের মুস্কিলে ফেললে চাপ দিয়ে। অতটা বিশ্বাসী হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

নমিতা : তাহ'লে প্রমাণ দিতেই হবে—আমার আর অপরাধ নেই। রাগ করতে পারবেন না কিন্তু। আপনি ভাবছিলেন আমি যদি আপনার সঙ্গে আমেদাবাদ যাই তা হ'লে রমা হয়ত একটু ভরসা পাবে আপনার সঙ্গে পুণায় আসতে।

মন্টুভাই : ওডহাউসের ভাষায়—Lord love a duck! তুমি কি দেবী?

নমিতা (হেসে) : না। বড় জোর ডানাকাটা পরী। কেবল নাকটা টিকোলো নয় এই যা। তা শুনুন। আমি যেতে রাজী। কাল বম্বে থেকে আপনি কখন রওনা হবেন?

মন্টুভাই : বিকেলের প্লেনে। আমেদাবাদে পৌঁছব সন্ধ্যাবেলা, পরশুই ভোরের প্লেনে ফিরব সোজা আমেদাবাদ থেকে পুণা। তুমি যদি আমাকে সান্তাক্রুজে meet করো বিকেল পাঁচটায়—

নমিতা : রাজি। কেবল এই সর্তে যে আজই দুপুরে আপনি উকিল নিয়ে আসবেন আমাদের ওখানে উইল পাল্টাতে।

মন্টুভাই : রাজী। I am a new man now—না না, ভেবো না—ভড়কাব না আর।

আলোক : যতক্ষণ না গৃহিণী ফিরছেন গোষ্ঠ থেকে।

তিনজনেই হেসে ওঠে।

ষোলো

ভক্তির ওখানে মোটরে ক'রে যেতে যেতে আলোক বলে : "মন্টুভাই লোক খারাপ নয়—"

নমিতা : অত সহজে গ'লে যেওনা বাবা। মন্টুভাই নিজেই কী বলেছেন মনে করো : বিষদাঁত ভেঙে গেছে। মা-জননী একটি মেয়েলি প্রবচন বলতেন প্রায়ই : উড়তে না পেরে পাখী পোষ মেনেছে।

আলোক : তুই ভারি সিনিক!

নমিতা : সিনিক? মোটেই না, তবে আমি যে মেয়ে-ছেলে বাবা! আকাশের স্বপ্ন দেখলেও পা আমাদের মাটি ছাড়া হয় না—বলেন স্বয়ং ভক্তিদি। তাঁকেও কি সিনিক বলবে? কিন্তু শোনো ভক্তিদির ওখানে দেরি কোরো না—মন্টুভাই খেতে আসবেন ঠিক বারোটায়। তবে ফলের রস ও সুপ। কাজেই ভাবনা নেই। তবু বারোটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে। এক কাজ করো বরং আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভক্তি মাসিমাকে গিয়ে নিয়ে এসো। আমি খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করি, উকিলও তো খাবেন। ভালো ক'রে খাওয়ালে প্রসন্নও হবেন বৈ কি একটু।

আলোক হেসে নমিতাকে বাহবা দিয়ে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভক্তির ওখানে গেল।

ভক্তি সব শুনে খুব খুসি হ'য়ে নীলমণিকে মালতীর কাছে রেখে আলোকের সঙ্গে এল সোজা ওদের বাড়িতে। সেখানে মন্টুভাই যথাকালে হাজির হ'য়ে ভক্তিকে দেখে বললেন হেসে : "এই যে ভক্তিমতী সিস্টার-ইন-ল!"

ভক্তি : শক্তিমান্ ব্রদার ইন-ল-র সঙ্গে শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে পারব না বলেই তো ভাই অগত্যা ভক্ত-বৎসলের কাছে হাত পেতে ভক্তিমতী হ'তে হয়েছে। কিন্তু ঠাট্টা থাক্, শোনো—তোমার ক্যান্সার হয়েছে এ কি সত্যি? ডাক্তারে ভুলও তো করে।

আলোক : আমার মন বলে ক্যান্সার নয়। কিন্তু এ-দুরন্ত আলোচনা থাক এখন। শোনো ভক্তিদি, মন্টু-ভাইয়ের সঙ্গে নমিতা কাল আমেদাবাদ যাচ্ছে রমাকে আন্তে। কিন্তু রমা পুণায় একটু একলা পড়বে তো এখন। তাই তুমি দুচারদিন ওর কাছে এসে থাকবে?

ভক্তি : সে কি?

মন্টুভাই : সে কি মানে? রমার প্রসবের আর মাত্র মাস দুই দেরি। আমার ওখানে শোভনা তো নেই।—জুহু থেকে ফিরবে দিন পনের বাদে। তারপরেই হয়ত যাবে কলম্বো—আলোক বলে নি এসব তোমাকে?

ভক্তি : হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি থাকব বৈ কি। রমার জন্তে শুধু মুখেই আহা উহু ক'রে থেমে যাব ভেবেছ? জানো, গত কদিন রোজই ওকে স্বপ্নে দেখেছি। সারাদিনই ওর কথা আমার মনে ঘোরাফেরা করে আজকাল। তবু তুমি

কী বলে ভাবতে পারলে যে আমি এ-ব্যাপারে তাকে ছেড়ে আমার বোনের দিকে হব? ছি ছি! রমার মতন মেয়েকে পেয়ে তুমি না চিনতে পারো—বলে না প্রদীপের নীচেই সবচেয়ে অন্ধকার?—কিন্তু আমরা তো জানি ও কী বস্তু। আর হবে না কেন? কেমন মা-র মেয়ে।

মন্নুভাই (করুণ হেসে): কিন্তু এবার হেরে গেলে দিদি—দুয়ো! কারণ এক্ষেত্রে বাপ যে মাকে ক্যান্সেল করল! ইংরাজিতে বলেন' beauty and the beast?

ভক্তি: ছি ভাই, অমন কথা বলে না। নারায়ণ সবার মধ্যেই আছেন—বলেন গুরুদেব। তোমার মধ্যেও—

মন্নুভাই: তিনি আছেন মানি—কেবল একটু ভোল বদ্‌লে—কারণ আমার মধ্যে তাকালে তাঁর শঙ্খী চক্রী রূপ দেখতে পাই না, দেখি শুধু নখী দন্তী রূপ—নৃসিংহ না কী দেব বলো তো?

ভক্তি: অমন কথা ঠাট্টা ক'রেও বলতে নেই। কাউকেই ঠাকুর ফেলেন না। তবে যে চায় তাঁর প্রসাদ সে আগে পায়—যে চায় না তাকে চাইতে হয় অনেক ভুগে—তাই সে পায় পরে। তোমার যখন শেষমেশ সুমতি হয়েছে তখন আর ভয় কী? কেবল একটা কথা—শোভনার সামনে এবার শক্ত হ'তেই হবে। আর তা হ'লেই দেখবে সে হবে নরম। ওকে আমি চিনি তো হাড়ে হাড়ে: ও শক্তের ভক্ত নরমের যম—তুমি এই শেষেরটাই দেখেছ এতদিন, এবার দেখতে পাবে প্রথমটা। কেবল দেখতেও পায় সে-ই যে চায় দেখতে।

এম্‌নি সময়ে উকিল কেশবরাও আপ্তে এলেন। খাওয়া দাওয়ার পরে নতুন উইলের স্পষ্ট লেখা হ'ল—রমা পাবে অর্ধেক বিষয় প্রায় দুলক্ষ টাকা, শোভনা ও প্রবীর পাবে বাকি অর্ধেক।

মন্নুভাই ও আপ্তে উইল রেজিষ্টারি করতে প্রস্থান করলেন বেলা তিনটেয়। আলোক ভক্তি ও নমিতার পানে চেয়ে বলল: একটু জয়ধ্বনি করা যাক এবার গুরু-কৃপার। খালি বিষয়-আশয়ের কথা ব'লে ব'লে মনটা কালো আলকাৎরা হয়ে গেছে। একটু আলো না আনলেই নয়।"

ভক্তি বলল নমিতাকে: "আগে তুমি ঐ গানটি গাইবে ভাই—তারপরে আরতি করব সবাই মিলে। ঐ গানটি—যেটি গতমাসে বন্দনার সঙ্গে তুমি গাইছিলে—সাধনপথে অশুভি বাধার গান।"

নমিতা গায়:

তোমার পথে যায় না বাধা গোনা
মেঘের পরে মেঘের মেলে দেখা!
তবু জানি—হবেই জানা শোনা
জানি যখন—নই আমি আর একা।

জানি বলি যেই—ভয় ছায় মনে,
বাধা তো নয় মনগড়া এ-পথে,
অশান্তিদের চেয়েও ক্ষণে ক্ষণে
শান্তি আড়াল করে শুভ ব্রতে।

একটু ভালোবেসেই থাকি সুখে,
অল্পে যে নেই সুখ—যাই হায় ভুলে!
ওগো অচিন! তাই কি যুগে যুগে
ব্যথার ঢেউয়েই আসো দুলে দুলে?

সরল তোমার পথ—বলে কোন্‌ জনা?
গন্ধ সোপান—আবছা চরণ রেখা!
তবু জানি—হবেই জানাশোনা
জানি যখন—নই আমি আর একা।

[ক্রমশঃ

আশুতোষ

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যজুর্বেদ মন্ত্রে ঋষির কণ্ঠে শুনেছি—শরীর ভস্মান্ত হোক্, হে মন স্মরণ করো, স্মরণ করো—ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর।

একশো বছর আগেকার তখনকার কলকাতার বুকে শ্রীমত্তাং গেহে ২৯শে জুন, ১৮৬৪ সালে একটি শিশু মায়ের কোলে এলো, পৃথিবীর আলো দেখলে—তারই কথা আজ স্মরণ করবো। তিনিই কবি কৃত্তিবাসবংশীয়, সুবিখ্যাত চিকিৎসক গঙ্গাপ্রসাদের পুত্র স্বনামধন্য আশুতোষ। আমাদের সত্যিকার শ্রদ্ধা পৌঁছুক তাঁর দুয়ারে—প্রত্যেক সৌম্য। গতকয়েক বছরে বহু মনীষির ও মহামানবের শতবার্ষিকী জন্মোৎসব আমরা করলাম—হৈ হল্লোড়, গানবাজনা, আলাপ আলোচনা, প্রশস্তি প্রবন্ধ, স্মারক পুস্তিকা, ইনিয়ে বিনিয়ে কতো ভাষণ নিবেদন—প্রধানরা এলেন, নবীনরা শুনলেন, প্রবীণরা করলেন স্মৃতির রোমন্থন, তবু রবীন্দ্রজয়ন্তীতে যে কথা আমি বলেছিলাম, তারই পুনরাবৃত্তি করি—

সেদিন প্রভাতে
মাল্য-চন্দন হাতে
স্নান সেরে, গান গেয়ে, ভরে নিয়ে সাজি
শালপ্রাংশু মহাভুজে প্রণাম নিবেদিতে আজি
চলেছি আসরে বাসরে স্মরণের উৎসবে
প্রধানগণের নিবেদন বোধন গৌরবে
কতো মন্ত্র হ'ল পাঠ, কতো গীত হ'ল গাওয়া
ভাষণের শাসনে প্রশস্তিতে চাওয়া
শুধু হ'ল না ধ্যানেতে তোমার উদ্দীপন
চেতনায় এলে না জীবনে জীবন করিতে উজ্জীবন

আজকের দিনে আমরা ভুলে যাই, সেদিন আমাদের কর্মক্ষেত্রের পরিধি কতটুকু ছিল, পরিবেশ কী ছিল, কতো বাদবিতণ্ডা বিরুদ্ধতার মধ্যে তাঁকে চলতে হয়েছিল। শুধু তীক্ষ্ণমেধা ও মনীষার অধিকারী সেই অক্লান্তকর্মী তাঁর স্থির অবিচলিত বিশ্বাসটির দীপ জ্বালিয়ে আহিতাগ্নি হাতে এগিয়ে চলেছিলেন—সে কথা আমরা, তাঁর উত্তরপুরুষরা যেন ভুলে না যাই, সেই পিতৃরিকথ্‌কে নষ্ট না করি।

আশুতোষ সরস্বতীর বরপুত্র—না বড় উকীল, আইনজ্ঞ—না গণিতজ্ঞ, মস্তো বড় জজ্ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনিপুণ কর্ণধার, দেশপ্রাণ মহান্ না আচারপরায়ণ ব্রাহ্মণ, এসব পরিচয় এহ বাহ্য। এসব ছাপিয়েও তাঁর ব্যক্তিস্বরূপের একটি অভাবনীয় রহস্য ছিল যা ধরা পড়েছিল বিশ্বকবির সাধনলব্ধ গভীর দৃষ্টিতে। আশুতোষের মহতী ইচ্ছার সম্পূর্ণ স্বরূপটির কথা এত স্পষ্ট করে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ বলেছেন কিনা জানি না—ভারত-পথ পথিক রবীন্দ্রনাথ মহামানবের সাগরতীরে দেখতে পেয়েছিলেন একজন সমধর্মী ও সমমরমী ভারতপুরুষকে, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমন্বয় যাঁর মধ্যে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নামক প্রবন্ধে আশুতোষ ভারতব্যাপী বিশাল ভূমিকায় তাঁর মনের সর্বোচ্চ কামনার ও সাধনার যে চিত্র এঁকেছেন, তাতে এই কর্মবীরের ধ্যানের মহত্ব আমি সুস্পষ্ট রূপে অনুভব করেছি। তাঁর বলিষ্ঠ প্রকৃতি শিক্ষা নিকেতনে দুরূহ বাধার বিরুদ্ধে আপন সৃষ্টিশক্তির ক্ষেত্র অধিকার করেছিল। এইখানে তিনি সমস্ত ভারতের চিত্তমুক্তি ও জ্ঞান সম্পদের ভিত্তি স্থাপন করতে প্রবৃত্ত ছিলেন। তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব ও উদার কল্পনাশক্তি সমস্ত দেশের ভবিষ্যৎকে ধ্রুব আশ্রয় দেবার অভিপ্রায়ে সেই বিদ্যানিকেতনের প্রসারীকৃত ভিত্তির উপর স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ করেছিল।

আশুতোষের নিজের কথাই তুলে দিই…কেহ কেহ বলেন—সমগ্র ভারতে এক ভাষার প্রচলন আবশ্যক, কেন না ভাষাভেদে মনোভেদ, সুতরাং মতভেদ অনিবার্য। তাই তাঁহাদের মতে অন্ততঃ হিন্দিভাষা সমগ্র ভারতের জাতীয়-ভাষা হওয়া উচিত। আমি কিন্তু এমতের সমর্থন করিতে

পারি না। যে কারণে ইংরাজী ভাষা আমাদের জাতীয় ভাষা হইতে পারে না, সেই কারণেই হিন্দি বা অন্তকোন একটা নির্দিষ্ট ভাষাও ভারতের একমাত্র সার্বজনীন ভাষা হইতে পারে না। ইংরাজী ভাষা ভারতের জাতীয় ভাষারূপে গৃহীত হইলে যেমন প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ তাহার নিজের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া অশ্বত্থপাদপজাত উপবৃক্ষের মত হইয়া পড়িবে. সেইরূপ হিন্দিকে সমগ্র ভারতের ভাষা করিতে গেলেও ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ-সমূহ তাহাদের নিজের নিজের বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব হারাইয়া ফেলিবে।

আশুতোষের উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্ট—প্রত্যেক প্রদেশ স্ব স্ব জাতীয় ভাষায় সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্পন্ন হইয়াও অন্য প্রদেশের ভাষার যাহা গ্রহণযোগ্য তাহা স্ব-স্ব ভাষার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লউক। এইরূপ করিতে পারিলে কিছু-কাল পরে ভারতের সকল প্রদেশের মধ্যে একটি ভাবের একতা, চিন্তার একতা এবং ক্রমে মনের একতা জন্মিবে। নানা ভাষা থাকা সত্ত্বেও একভাবে ভাবিত হইয়া ভারত একই লক্ষ্যের দিকে সমবেতভাবে অগ্রসর হইবে।

এই সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ছিল বলেই আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অসমীয়া, হিন্দী, তামিল, গুজরাটী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন, পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগ খুলতে পেরেছিলেন, রাসবিহারী ঘোষ, তারক পালিত, খয়রার রাজা প্রভৃতি দানবীরদের সাহায্যে নূতন করে বিজ্ঞানসদনের বোধন করতে পেরেছিলেন। স্বপ্ন দেখেছিলেন যে স্নাতকোত্তরেরা দেশে বিদেশে কলকাতার, তথা বাংলার, তথা ভারতের নাম নিয়ে যাবে—

ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জী, রমেশ মজুমদার, সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, হেম রায়চৌধুরী, সুরেন সেন প্রভৃতি অধ্যাপকরা বলতে গেলে তাঁরই আবিষ্কার। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন শীল, রাধাকৃষ্ণণ, রমণ, গণেশপ্রসাদ, কার্লিস, লেভী, ক্রল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেশ সেন তাঁরই সহযোগী।

কবির ভাষায় বলতে গেলে আশুতোষ চেয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু বিদ্যার ফসল জমানো নয়, ফসল ফলানোরও ক্ষেত্র তৈয়ারী হবে। লোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরিজনের প্রতিকূলতা কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এইখানেই। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথা মনে পড়ছে (বঙ্গবাণী অগ্রহায়ণ ১৩৩১) কবির বাণী উদ্ধৃত করে তিনি বললেন—The elements so mixed in him that nature might stand up and say to the world, this was a man." স্বদেশীয় আচার ব্যবহার যেমন শ্রদ্ধার সহিত পালন করেছেন তেমনি কর্তব্যবোধে বিধবা কন্যার বিবাহ দিতেও কুণ্ঠিত হন নি। রামমোহন বিদ্যাসাগর বঙ্কিমের প্রচ্ছন্ন আত্মা তাঁকে কুশলভিত্তিক কর্মে ক্রিয়াবান করেছে, শীলপালনে উদ্বুদ্ধ করেছে, সমুদ্রাগম চক্রবর্তী করেছে।

এই সেদিনেও অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করতে গিয়ে নজরে পড়লো আশুতোষ প্রবর্তিত "অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী" চল্লিশ বছর পরে আজও প্রামাণ্য গ্রন্থ। ভেবেছি যে কী দূরদৃষ্টি নিয়েই তিনি 'আমার এ ঘরে আপনার করে গৃহদীপ খানি' জেলে দিয়েছিলেন।

'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেশন বা জাতীয় সংহতির কথা ত আজ মুখে মুখে। মনে পড়ছে অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল প্লাবনের দিনে তিনি ধীর সংযত হয়ে বোঝাচ্ছেন ছাত্রদের যে অধ্যয়নই তাদের পক্ষে তপস্যা। গোলদিঘীর এক ধারে রবীন্দ্রনাথ বলছেন শিক্ষার মিলনের কথা, আর একদিকে আশুতোষ শিক্ষার ধারাবাহিকতার কথা, মাঝ-খানে বন্যার প্লাবন ধারার সাথে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ভগীরথের মত শঙ্খ বাজিয়ে চলেছেন। সেদিনকার সেই ত্রিভুবী প্রাঙ্গের ছবি আজও মনে আঁকা আছে। বিশ্ববিদ্যালয় গোলামখানা নয়—হয়নি যে তা আশুতোষের জন্যই। তাঁর মায়ের নাম ছিল জগত্তারিণী। মাতৃভক্ত এই মানুষটি সর্বক্ষেত্রেই মায়ের ডাক শুনেছিলেন. তাঁকে জীবনে প্রতীক করেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে তা প্রকাশ পেয়েছিল মাতা সরস্বতীর সেবায় যার সঙ্গে মিশেছিল অসাধারণ চরিত্র বল, তেজস্বিতা ও ব্যক্তিত্ব।

একটি দিনের গল্প বলেই শেষ করি—ব্যক্তিগত কথা অবশ্য, আবেদন নিবেদনে থালা নিয়ে চলেছি আশুতোষ সন্দর্শনে ৭৭ নং রসারোডে। যদি তিনি আশু তুষ্ট হয়ে বর দেন, মনের বাঞ্ছাপূর্ণ করেন সদ্য পিতৃহীন একটি কিশোরের

অন্নসংস্থান করে তরঙ্গক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে পাড়ি দেবার সুব্যবস্থা করে দেন। ভয়ে ভয়ে পৌছলাম—অর্থী প্রত্যর্থী প্রার্থীর দলে ভর্তি ঘর ও সংলগ্ন সিঁড়ি ও বারান্দা—কতো লোক আসছে, কতো লোক যাচ্ছে—সকাল আটটা থেকে বসে আছি—দুরু দুরু কম্পমান বুক। আশুতোষের দৃষ্টি পড়েছে এই ভীরু কালো শীর্ণ ছোকরাটির প্রতি। আজও সেই গুরুগম্ভীর আহ্বান কানে লেগে আছে—কী চাই—যেন ঘণ্টা বেজে উঠলো মন্দিরে—উদাত্ত কণ্ঠ,কিন্তু বিরক্তি-বিজড়িত নয়, আশ্বাসে ভরা। গমগম্ করে উঠলো ঘর, মন্‌মন্ করে উঠলো মন। আমার নামধাম ও পরিচয় শুনে বসতে বললেন অপেক্ষা করতে। গ্রীষ্মকাল, নিদাঘতপ্ত দিন। বিশালবপু মানুষটির লোমশ বুকের উপর ধপধপে সাদা পৈতে আজও যেন জ্বল জ্বল করে ওঠে চোখের সামনে। লোকে নাকি তাঁকে বলতো বাংলার বাঘ। ফরাসীনেতা ক্লেমাসার সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য ছিল বহিরঙ্গে ও অন্তরঙ্গে।

পরিচয় নিলেন আমার নতুন করে, মহামহোপাধ্যায় মহেশ ন্যায়রত্নের সঙ্গে সম্পর্কের কথা শুনলেন,পিতা ও পিতামহকে চিনতেনই। সঙ্গে ছিল দু একজন পূজনীয় শিক্ষকদের সহানুভূতিসূচক পরিচয়পত্র—তাঁদের মধ্যে একজন শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আজও 'ল' কলেজের অধ্যক্ষ, সেনেট সিণ্ডিকেটের সদস্য। অপরিচয়ের ব্যবধান কেটে যেতে সে কী সস্নেহ আদর, উদার আপ্যায়ন,বাইরের রুক্ষতার পিছনে কী অপূর্ব রসস্নিগ্ধ মন—যষ্টিমধুর মতন একটু না চিবুলে সে রসের সন্ধান মেলেনা। এর পূর্বেও দু'একবার দলে বেদলে দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংএ তাঁর কাছে গিয়ে প্রণাম জানিয়েছি, দূর থেকে তাঁর সন্দেশ খাওয়ার রোমাঞ্চিত দৃশ্য দেখেছি। একদিন আমার এক মাতুলের বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রণসভায় পরিবেশন করে খাওয়াবার সৌভাগ্যও হয়েছিল, তবু তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করা সেই প্রথম ও সেই শেষ। প্রায় বিশমিনিট ধরে আমার আবেদন নিবেদন মন দিয়ে শুনলেন, অকালে পিতৃ-বিয়োগের কথা, দুঃখদৈন্যের কথা, পড়াশুনার কথা, পাশফেলের কথা। তার পরে বলিষ্ঠ আশ্বাস দিলেন—এক পক্ষ পরে যখন পাটনা থেকে ফিরে আসবো, দেখা করিস্, একটা কিছু হয়ে যাবে। এলেন না তিনি—এলো শুধু তাঁর মরদেহ মর্ত্যকায়া শত সহস্র লোকের চোখের জলে অভিষিক্ত হয়ে ফুলের মালায়, পুষ্পস্তবকে ভূষিত হয়ে। শেষবারের মত দেখার জন্ত ছুটে গেলাম হাওড়া ষ্টেশনে। নাই নাই, তিনি নাই, তাঁর অমর যাত্রার পথ শাশ্বতলোকে গিয়ে মিশেছে—সমুদ্রপর্বত সে পথ রোধে নাই, তবু,

> মরিষ্যামি মরিষ্যামি মরিষ্যামীতি ভাষণে
> ভবিষ্যামি ভবিষ্যামি ভবিষ্যামীতি নেক্ষসে।

তাই আজ বলবো—তিনি আছেন বাঙালীর মনের অমৃত লোকে, ভারতবাসীর চিন্তার জগতে—তিনি আছেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি অণুতে ছন্দে, স্পন্দনে। আজও আমরা আশুতোষকে পাই তাঁর সৃষ্টির মধ্যে—শুনি Academic freedom-এর কথা, পড়ি লীটনের কাছে পাঠানো চিঠি। স্যাডলার কমিশনের গল্প আজও ফুরোয় নি, নটে গাছটি মুড়োয়নি। আজও স্মরণে পড়ে লক্ষ্ণৌ ইউনিভারসিটি ইউনিয়নকে কী উপদেশ তিনি দিয়েছিলেন —When a democracy imperiously demands control over the University; I answer without hesitation—Pause, my friends, your claim would be admissible only when democracy ceases to be democracy and is translated into an intellectual aristocracy.

No university man will seriously suggest that we should hand over the control of the university to a democracy which has not yet come under the influence, much less realized the value of the highest education in the life of the nation. It is the function of the university to raise the nation, to guide the nation, to elevate the leaders of the democracy not to be guided by them.

স্বদেশকে, সমাজকে সদাচারকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন বলেই স্বাধীনতার এই 'Qualitative aspect এর দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রখর।

আজকের লোকায়ত্ত সূত্রকারের কাছেও এ প্রশ্ন সমীচীন, এর সুষ্ঠু মীমাংসার প্রয়োজন। আশুতোষকে আজ আবার স্মরণ করি—বরণ করি—জয়তু আশুতোষ।

> একদা তোমার নামে সরস্বতী রাখিলা স্বাক্ষর
> তোমার জীবন তাঁর মহিমা ঘোষিলা নিরন্তর।
> এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত করুক তাঁরি জয়
> তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব হউক অক্ষয়।

মধুসূদনের সৌন্দর্যচেতনা ও রেবেকা

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

মাদ্রাজ প্রবাস (১৮৪৮-১৮৫৬) মধুসূদনের ব্যক্তি-জীবন ও কবি-জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই সময়ের মধ্যে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের বিচিত্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও আলোড়ন ঘটে—বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনঃ পত্নীগ্রহণ—এই সময়েরই ঘটনা। অন্য দিকে মাদ্রাজপ্রবাসই মধুসূদনের কাব্য-জীবনের যথার্থ প্রতিষ্ঠাভূমি, কবি-মানসের নির্দেশ-লগ্ন। মাদ্রাজের কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা এবং "ভিশনস্ অব দি পাস্ট" ও "ক্যাপটিভ্ লেডি" নামক দুখানি খণ্ডকাব্য প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজীতে লেখা "রিজিয়া"-নাটকও মাদ্রাজ-প্রবাসকালেই লিখিত। হিন্দু কলেজ ও বিশপস্ কলেজের যুগের রচনা-গুলি কবির কিশোর বয়সে রচিত—অপরিস্ফুট কামনা ও অপরিণত কবিস্বপ্নের অস্পষ্ট কুয়াশায় কবিমানসের দিগন্ত দুর্নিরীক্ষ্য। কিন্তু মাদ্রাজ-প্রবাসের রচনাগুলির মধ্যে কবিমানসের অভিপ্রায় স্ফুটতর—তরুণ কবির অধীর কবিস্বপ্নের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভিজ্ঞতার রঙ লেগেছে। ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের এক বৃন্তাশ্রয়ী অদ্বৈতরূপ একক লেই নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে। নবযুগের- কাব্যলক্ষ্মীর আবাহন মন্ত্রটি অবশ্য মাদ্রাজপ্রবাসের বহুপূর্বেই উচ্চারিত হয়েছিল :

> Fond Fancy, sweet enchantress
> oft with her visions gay
> Does chase my sad heart's dearin:ss
> And banish it far away."—

কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা পর্ব মাদ্রাজেই।

১৮৪৯-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে মধুসূদন গৌরদাসকে একটি চিঠি লিখেছেন—কলকাতা থেকে মাদ্রাজে আসার পর প্রথম চিঠি :

"Mrs. D is of English parentage. Her father was an indigo-planter of this presidency. I had great trouble in getting her. Her friends, as you may imagine, were very much against this match. However, all is well that ends well !"

নানা বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে মধুসূদন শেষ পর্যন্ত রেবেকাকে লাভ করেছিলেন। রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহিত জীবনের স্থায়িত্বকাল প্রায় সাত বছর। এই সাত বছরের পারিবারিক জীবনের একমাত্র সাক্ষী মধুসূদনের পত্রাবলীর অতি সংক্ষিপ্ত দু একটি মন্তব্য। মন্তব্য-গুলিতে পারিবারিক জীবন সম্পর্কে মধুসূদনের সুখাবেশ-তৃপ্ত মনোভাবই ফুটে উঠেছে। মাদ্রাজ থেকে তিনি গৌরদাসকে শেষ যে চিঠি লিখেছিলেন (২০শে ডিসেম্বর. ১৮৫৫) তাতে তাঁর পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন : "Yes. dearest Gour, I have a fine English wife and four children." এর স্বল্পকাল পরেই মধুসূদনের সঙ্গে রেবেকার বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়, হেনরিয়েটাকে তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। রেবেকার সঙ্গে মধুসূদনের বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে মধুসূদনের দুজন জীবনীকারই নীরব। হেনরিয়েটা প্রসঙ্গে জীবনীকারেরা উচ্ছ্বসিত ও সুপ্রশংস মন্তব্য করেছেন। তাঁর সহিষ্ণুতা ও কল্যাণী গৃহিণীমূর্তি মধুসূদনের চরমদুঃখের দিনেও একটি নম্র-সুন্দর স্নিগ্ধ জ্যোতি বিস্তার করেছিল। কিন্তু মধুসূদনের পরিত্যক্তা রেবেকা? জীবনীকার থেকে আরম্ভ করে মধুসূদন-বিশেষজ্ঞেরা সকলেই নীরব। কিন্তু মধুসূদনের মত সহৃদয় মানুষের পক্ষে মাদ্রাজের সাত বছরের বিবাহিত জীবনের স্মৃতি কেমন করে মুছে ফেলা সম্ভব হল?

প্রকৃতপক্ষে মধুসূদন রেবেকার স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারেন

নী। প্রামাণিক জীবনের মধ্যে তার কোন প্রমাণ নেই —প্রমাণ আছে মধুসূদনের কাব্যে। হেনরিয়েটা কল্যাণী বধূ, শান্ত-গৃহিণী—রেবেকা প্রেয়সী বন্ধনমুক্ত কবিকল্পনার স্বপ্নসঙ্গিনী। হিন্দু কলেজে যে নীলাক্ষী সুন্দরীর অলক্ষিত ও গোপন পদসঞ্চার কিশোরকবির স্বপ্নাবেশকে অধীর করে তুলেছিল. তাকেই "ক্যাপটিভ লেডি" কাব্যে কবি আরও নিঃসংশয়ভাবে উপলব্ধি করেছেন—নবযুগের কাব্য-লক্ষীর সৌন্দর্য ও প্রেমানুভূতির সেই প্রথম আরতি :

"Life hath its dreams to
beautify its sense—
And sun-light for its desert
—but there be
None softer in its stare—of
brighter scene—
Than love—than gentle
Love, and thou to me
Art that sweet dream mine
own ; in glad reality"

"ক্যাপটিভ লেডি" কাব্যের ভূমিকা কবিতাটি একাধারে প্রেম ও সৌন্দর্যানুভূতির স্বপ্নাবেশে রচিত হয়েছে। গৌর-দাসের কাছে লিখেছেন : "Talking of my good Lady puts in mind of the introduction of the 'Captive' addressed to her."

বাঙালীর রোমান্টিক কল্পস্বপ্নের অধীর আকাঙ্ক্ষা রেবেকাকে অবলম্বন করেই দূরদিগন্তের সন্ধানে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। "ক্যাপটিভ লেডি" কাব্য নবযুগের রোমান্টিক কবিদৃষ্টির প্রথম কাব্য। "ক্যাপটিভ লেডি" দুই সর্গের একটি আখ্যায়িকা-কাব্য। পৃথ্বীরাজ-সংযুক্তার সুবিখ্যাত কাহিনী তিনি অবলম্বন করেছেন। কিন্তু মধুসূদন ইতি-হাসের পথ অনুসরণ করেননি, ইতিহাসের আভাসটুকুই যেন তাঁর কবিস্বপ্নের পক্ষে যথেষ্ট। ইতিহাস এখানে মুখ্য নয়, কবিহৃদয়ের উদ্দাম বন্ধনমুক্ত প্রেম ও সৌন্দর্যের অনু-সন্ধানই এখানে মুখ্য। বন্দিনী সংযুক্তাই রেবেকা—নব-যুগের সৌন্দর্য-লক্ষ্মী। পৃথ্বীরাজ ভাটবেশে গিরিদুর্গে বন্দিনী রাজকুমারীকে হরণ করেন। পৃথ্বীরাজই ও মধু-সূদন দত্ত। ধর্ম ও সমাজের দুস্তর বাধা অতিক্রম করে মধুসূদনের রেবেকালাভের কাহিনীই কি "ক্যাপটিভ লেডি"র আখ্যায়িকা বস্তু নয়? পৃথ্বীরাজের কাহিনীর মধ্যে মধুসূদন তাঁর কবিস্বপ্ন খুঁজে পেয়েছেন। "ক্যাপটিভ লেডি" বিয়োগান্ত কাব্য। হস্তিনাপুরীতে মুসলমান আক্রমণ ও জ্বলন্ত আগুনে পৃথ্বীরাজ সংযুক্তার প্রাণত্যাগের কাহিনীতে এর উপসংহার। মধুসূদনের কবি-জীবন ও ব্যক্তিজীবনের নিয়তি কি একই সঙ্গে অনিবার্য ভাবীকালের ইঙ্গিত করেনি?

"ক্যাপটিভ লেডি" কাব্যে অপরিণতি ও অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাস, শব্দ ও অর্থের বৃথা উদ্ভাবন ও অসংযত খেয়ালী কল্পনার যদৃচ্ছ পদক্ষেপের আতিশয্য লক্ষণীয়। মাদ্রাজের "এথেনিয়াম" পত্রিকার সম্পাদকের কাছে একজন পাঠক এই কাব্য সম্পর্কে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানিতে মধুসূদনের এই সময়ের কবি-মানসের অভি-প্রায়টি পরিস্ফুট হয়েছে :

"The poem itself, too much and too fatally perhaps for its popularity recalls the over-burdened sentimentality of the Byron-school—and may probably, be the effusion of youth-ful unpractised musing"

এই সময়ে মধুসূদন পোপ, মূর ও স্কটের প্রভাব কাটিয়ে উঠেছেন—বায়রণের প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি।

"ক্যাপটিভ লেডি" মধুসূদনের কল্প পৃথিবীর অপরিণত কলিকা—কিন্তু প্রকৃতি ও প্রেম ঘিরে মধুসূদনের বন্ধ-হীন সৌন্দর্যস্বপ্ন এই স্বল্প-পরিসর কাব্যটিতে নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে। সমুদ্র-পর্বতবেষ্টিত গিরিদুর্গের বর্ণনায় একটি সূক্ষ্ম সুকুমার আবেশ আছে। বর্ণনাধর্মী আখ্যায়িকা কাব্যে দৃশ্যপটের বর্ণনায় একটি তন্দ্রাতুর স্বপ্নসাধ ফুটেছে। প্রথম সর্গে মধ্যরাত্রির বর্ণনাটি একটি স্বপ্নসার সুদীর্ঘ ব্যঞ্জনা! মধ্যরাত্রি, মেঘগুণ্ঠিত চাঁদের পাণ্ডুর আলো, শৈল-বন্ধুর দ্বীপে ম্লান আলোছায়ার রেখা—কবির রোমান্টিক সৌন্দর্যকে লালন করেছে। নামহীন রহস্য-ময়, অশরীরী ভাবনা ও বিষাদময় স্মৃতি রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির চিরসহচর—

"Some undefin'd—and nameless spell
Awakes the thoughts and dwell,

And tenant—all embalm'd with tears,
The sepulchre of by-gone years—
Where memory her vigil keeps,
And the lone Heart in sorrow weeps !"

নক্ষত্রচারী কল্পনা, নামহারা নির্দেশ আকাঙ্ক্ষা ও দূর-স্মৃতির বিষণ্ণ বেদনা রোম্যান্টিক কবিদের মনোজীবনের স্বরূপ নির্দেশ করেছে। অসংযত কল্পনা ও বর্ণময় উচ্ছ্বাস মধুসূদনের সৌন্দর্য চেতনার বিরোধী নয়। রেবেকাকে লাভ করার বিস্ময়োৎসব তাঁর "ক্যাপটিভ লেডি" কাব্যে স্বাক্ষরিত।

মধুসূদনের সৌন্দর্যচেতনার পরিণততর রূপ গ্রীক সৌন্দর্য-ভাবনায় প্রভাবিত হয়েছে। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এ কবি গ্রীক-সৌন্দর্যচেতনার নিগূঢ় মর্মার্থ রূপায়িত করেছেন। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"—এ কাহিনী অংশের কৃশতাকে বর্ণনার আতিশয্যে ভরে তুলতে হয়েছে। তিলোত্তমাসম্ভব মধুসূদনের কাব্য-কৌতূহল মাত্র—তাই পৌরাণিক কাহিনীর স্বল্পপরিসর আভাসটুকু নিয়ে অসম্ভব ও অবাস্তব রস-রহস্যের দিগন্ত-সীমায় কবি পাড়ি জমিয়েছেন। কিন্তু তিলোত্তমার উদ্ভব ও সুন্দউপসুন্দের মৃত্যুবৃত্তান্ত বাংলা কাব্যের রোমান্টিক সৌন্দর্যাভিলাষকে নূতন অর্থমণ্ডিত করেছে। তৃতীয় সর্গে বিশ্ব সৌন্দর্যরূপিণী নারীর উদ্ভবের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে—সংস্কৃত কবিপ্রসিদ্ধির অনুসরণ আছে,—কিন্তু সৌন্দর্য-চেতনার স্বরূপ রোমান্টিক ভাব কল্পনায় রঞ্জিত।

তিলোত্তমা মিল্টনের ঈভের মত আদিম নারী—সৌন্দর্যের আদিত্তমস্বরূপ তাকে ঘিরেই মূর্ত হয়েছে। তিলোত্তমা বিশ্ব সৌন্দর্যরূপিণী, আবার ঐ সৌন্দর্যই শেষ পর্যন্ত সর্বনাশের কারণ হয়েছে। সুন্দ ও উপসুন্দ দেবজয়ী বীর, কিন্তু তিলোত্তমার কাছে শৌর্য, বীর্য ভ্রাতৃপ্রেম ও স্বর্গসাম্রাজ্য সমস্ত কিছুই পরাজিত হয়েছে। কিন্তু বিশ্ব-সৌন্দর্যরূপিণী নারীর মোহিনীমূর্তির পায়ে তারা জীবন পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়েছে। ঊনিশ শতকের বাংলা কাব্যের রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির বৈভবরূপ। স্বর্গ মর্ত্যব্যাপী সৌন্দর্যকে সমন্বিত করে যার অপূর্ব মূর্তি রচনা করা হয়েছে, সে নদীজলে আপন সৌন্দর্য দেখে বিস্মিত হয়—একটি ভাব-মূর্তি আত্মভবর নির্দোষ সৌন্দর্য, তথাপি সে সৌন্দর্যনারী সম্পর্ক নিরবচ্ছিন্ন নয়—সেই মোহিনীরূপের মধ্যে একটি আত্ম-ঘাতী কামনাও জড়িত আছে। রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার সেই প্রথম যুগে বিশ্বসৌন্দর্যরূপিণীর ধ্যানে বাঙালী কবি চিত্তে যে বিভোরতা জেগেছিল, তার রূপ দুটি : তিলোত্তমারূপিণী বিশ্বসৌন্দর্য ও নারীর মোহিনীরূপ। "বিশ্ব-সৌন্দর্যকল্পনার মধ্যে যখন মানব-সম্পর্ক এসে দাঁড়িয়েছে তখনই গ্রীক জীবন রসিকদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে হয়েছে :

"And Fate is the name of her, and his name is death."

"তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য"-এ গ্রীক সৌন্দর্যভাবনা জয়যুক্ত হয়েছে। সৌন্দর্যের মধ্যে নিষ্করুণ নিয়তির অলঙ্ঘনীয় প্রভাবের কথা গ্রীক কবিরা বার বার বলেছেন। রোম্যান্টিক যুগের কবিরা সেই ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্য চেতনাকে অনেক সময় নূতন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুইন-বার্নের "অ্যাটলান্টা ইন ক্যালিডন" কাব্যে গ্রীক জীবন-দর্শনের অপূর্ব সুন্দর ব্যাখ্যা আছে। কাব্যটি "তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য"—এর পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির মূলতত্ত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে :

"...love is an extremely dangerous power. The Greek poets often dwell on this, and Swinburne agrees with them In this play the incalculable, reckless, pitiless power of love is at work" –(Romantic Imagination—C M, Bowra.)

তিলোত্তমাসম্ভব মত অপরিণত কাব্যই হক না কেন, গ্রীকসৌন্দর্য ভাবনার মূল সুর এখানে অনুরণিত। মধুসূদনের রোমান্টিক সৌন্দর্য চেতনারই পূর্ণতর রূপ পরবর্তীকালে কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে :

> "জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব
> তনুর তনিমা,
> ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব
> চরণ শোণিমা।"

"ক্যাপটিভ লেডি" কাব্যে নিয়তির শাসন খুব স্পষ্ট অনেকখানি বহিরাশ্রয়ী। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" প্রেম-সৌন্দর্যরূপিণীর আর এক নাম নিয়তি। "তিলোত্তমাসম্ভব" মধুসূদনের রেবেকা চেতনার শেষ কাব্য "ক্যাপটিভ লেডি"র পরিপূরক।

ক্ষণপ্রভা

অরুণ দে

টেলিফোনটা ছেড়ে দিল সুরুচি। কিন্তু যন্ত্রটার কাছ থেকে [illegible] পারল না। স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল।

[illegible] কত ফোন এসেছে। কিন্তু আজকের মত [illegible] অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর কোনদিন যন্ত্রটার মধ্যে বেজে [illegible]। প্রায় পাঁচমিনিট সে ফোনে কথা বলেছে। [illegible] ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। নিজেই [illegible] করতে পারছে না যে পাঁচ বছর আগে হারিয়ে [illegible] সঙ্গে সে এতক্ষণ ফোনে কথা বলছিল।

মনে পড়ল, অমিত বছর পাঁচেক আগে কলকাতা থেকে [illegible]। কোথায় গিয়েছিল সে কথা অবশ্য কেউ জানত না। এমন কি সুরুচিও নয়। সেই অমিত আজ সুরুচিকে হঠাৎ ফোন করেছে। সামান্য কয়েকটা কথা বলেছে [illegible] নাকি মাত্র কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছে। সুরুচির সঙ্গে সে একবার দেখা করতে চায়। বিশেষ দরকার। সুরুচি যেন অবশ্যই আগামী সাত [illegible] একবার অমিতের বাড়ী যায়। তার সঙ্গে [illegible] উপরই নাকি অমিতের ভবিষ্যৎ জীবন [illegible]।

সুরুচি প্রশ্ন করেছিল—"বিশেষ দরকারটা কি?"

"[illegible] সব বলব"—বলেই অমিত ফোন ছেড়ে [illegible]।

সুরুচি অনেকক্ষণ ভাবল "বিশেষ দরকার" কি হতে [illegible]। দরকার যাই হোক তার যাওয়া উচিত কি? ভাবল, সে যাবে না। কেনই বা যাবে? পাঁচ [illegible] মধ্যে যে [illegible] তার কোন খোঁজ পর্যন্ত নেয় [illegible] সে ডাকলেই ছুটে যেতে হবে? সে কি এতই সস্তা? বেশ তো, দেখা করার না হয় অসুবিধা ছিল—তা' বলে কি পাঁচ বছরের মধ্যে অমিত একটা চিঠিও লিখতে পারে নি? যে তাকে এতকাল উপেক্ষা করেছে তার কাছে সে যাবে কেন?

ফোনটার দিকে আবার তাকাল সুরুচি। ফোনটার পাশেই হরগৌরীর যুগল মূর্তির দিকে চোখ পড়তেই পুরানো দিনের কথা মনে পড়ল। এই মূর্তিটা অমিতই তাকে দিয়েছিল। জন্মদিনের উপহার। এটাই অমিতের শেষ উপহার। সেই জন্মদিনটার কথা আজও সুরুচির স্পষ্ট মনে পড়ে। উপহারটা পেয়ে সুরুচি খুব খুশী হয়েছিল। অমিতকে আলাদা ঘরে ডেকে উপহারটার সম্বন্ধেই সে কি যেন বলছিল। সেই সময় সুরুচির বাবা খুব গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকে অমিতকে বলেছিলেন—"অনেক হয়েছে। এ বাড়ীতে তুমি আর এসো না। আমি চাই না আমার মেয়ে একটা বেকার ছোকরার সঙ্গে মেলামেশা করুক।"

সামান্য কয়েকটা কথা। কিন্তু ওদের জীবনের মিলনের পথে তাই অসামান্য বাধা হয়ে দাঁড়াল। এরপর অমিত আর সুরুচির বাড়ী আসে নি। কয়েকদিন পর অমিত সেই যে কোথায় অদৃশ্য হল আর তার খোঁজ পাওয়া যায় নি। হয়ত বেকার বলেই তার পৌরুষে খুব আঘাত লেগেছিল।

সুরুচি ভাবল—অমিত কি জানে যে সে আজও বিয়ে করে নি। তার বাবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও না। শেষ পর্যন্ত মেয়ের কাছে হার মেনে তিনি হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সে যাই হোক সে যাবে না; একটা চাপা কান্না তার বুক পর্যন্ত ঠেলে উঠছে বলেই কি ডাকলেই যেতে [illegible] শিক্ষিতা মেয়ে হয়ে নিজেকে এত ছোট করবে কেন?

না, [illegible] কাছে সস্তা হওয়া ঠিক নয়। সহজে সে যাবে না।

কিন্তু কয়েকদিন পর অমিত চলে যাবে বলেছে। তা হয়ত আর জীবনেও দেখা হবে না। সেটা কি ভাল হবে! আচ্ছা, অমিত কি বিয়ে করেছে? যদি করে থাকে তবে তাকে কেন ডেকেছে? না, নিশ্চয়ই করে নি। এককালে তো ভালবাসত—এতকাল পরে সে ভালবাসা কি একেবারে মুছে গেছে!

হঠাৎ একটা অজানা আশায় সুরুচির মুখ লজ্জায় আরক্ত হল। ক্ষণপরেই মনে হল সে মিথ্যা স্বপ্ন দেখছে। এতকাল পরে অমিত কখনই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসে নি। পুরুষমানুষ এতকাল পুরানো ভালবাসা মনে রাখে না। কিন্তু অমিত যদি হঠাৎ বিয়ের প্রস্তাব করে তবে সে কি বলবে?

দেখা করতে না গেলে অবশ্য এসব কথা উঠবে না। তবে এতকাল পরে যখন বিশেষ দরকার বলেছে তখন ভদ্রতার খাতিরেও অন্তত একবার যাওয়া উচিত। তবে সহজে সে যাবে না। আজকে তো নয়ই। কালকেও নয়। অমিত সাত তারিখে চলে যাবে বলেছে। সে যদি যায় তো ঠিক তার আগের দিন অর্থাৎ ছয় তারিখে যাবে। তার আগে গেলে অমিত ভাববে যে তাকে সহজেই পাওয়া যায়। তার থেকে বরং কিছুদিন অপেক্ষা করুক। দেখা করার তৃষ্ণা গভীর হোক।

ছয় তারিখে যাবার দিন স্থির করে সুরুচি অন্য কাজে মন দিল।

ছয় দিন নয়, যেন ছয় বছর। প্রতিদিনটাই সুরুচির কাছে সুদীর্ঘ মনে হল। যাবার জন্য প্রতিদিনই ব্যাকুলতা অনুভব করল। তবু সুরুচি যায় নি। সে আর যাই করুক নিজেকে সস্তা করতে পারে না।

যাবার নির্দিষ্ট দিনে খুব ভোরেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ক'দিন ধরে সে ভেবেছে অমিতের জন্য কিছু নিয়ে যাবে কিনা। এতদিন পরে একেবারে খালি হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না।

একটু বেলা হতে সে দোকানে গেল। অমিত যা কিছু পছন্দ করত সবই তার মনে আছে। অমিতের খাঁটি বাঙ্গালীয়ানার কথা মনে পড়তে মনে মনে হাসল সুরুচি। বাংলা ভাষা, বাংলা গান—বাঙ্গালীর সব কিছু অমিতের প্রিয় ছিল। ধুতি পাঞ্জাবী ছাড়া অন্য কিছু পরত না। বাঙ্গালীর দোকান ছাড়া অন্য দোকানে জিনিস কিনত না। এমন কি ঘরে একটা ইংরেজী কালেণ্ডার রাখত না। যত খারাপই [illegible] বাংলা কালেণ্ডার ঘরে রাখত। এখনও কি সে সেরকমই আছে?

অমিত ছবি [illegible]। সুরুচি তাই চিত্রকলা সম্পর্কে অবনীঠাকুরের একটা বই কিনল। কি মনে করে একটা হরগৌরীর যুগল মূর্তিও কিনে ফেলল।..

সুরুচি দোকান থেকে বেরিয়ে সোজা অমিতের বাড়ীর দিকেই যাচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে [illegible] প্রজাপতি উড়ে এসে তার কাপড়ের উপর বসল। সুরুচি [illegible] থেমে তাকাল। হলদে প্রজাপতি। [illegible] প্রজাপতিটা সরিয়ে দিতে গিয়ে কি মনে করে আবার হাত গুটিয়ে নিল।

অমিতের সঙ্গে দেখা হলে প্রথমে কি বলবে এখনও [illegible] তা ঠিক করতে পারে নি। অথচ অনেক [illegible] ভেবেছে। কোনটাই মনের মত হয় নি। [illegible] যেতে যেতে আবার ভাবল কি বলা যায়। কিছুই [illegible] করতে পারল না। অমিত তাকে কি ভাবে অভ্যর্থনা [illegible] সে দৃশ্য একবার কল্পনা করল।

"বিশেষ দরকার" কথাটা মনে পড়তেই আবার সে অন্যমনা হয়ে গেল। কি এমন দরকার? [illegible] পাওয়ার উপর অমিতের ভবিষ্যৎ জীবন কেনই [illegible] করছে কিছুই ভেবে পেল না।

অমিতের বাড়ীর দরজার কাছে পৌঁছে [illegible] চমকে উঠল। কখন যে এতটা পথ অতিক্রম [illegible] খেয়াল ছিল না। দরজার কড়া নেড়ে সে [illegible] দাঁড়িয়ে রইল। নিজের হৃদয়ের স্পন্দন সে নিজেই শুনতে পাচ্ছিল। হঠাৎ তার মনে হল, দেখা না করে পালিয়ে যাবে। কিন্তু চলে যাওয়া হল না। ততক্ষণে দরজা [illegible] একজন অপরিচিত লোক তাকে বলল—"[illegible] চান?"

সুরুচি বলল—"এ বাড়ীতে কি অমিতবাবু থাকেন [illegible]"

লোকটি বলল—"থাকতেন। তবে এখন [illegible] গেছেন।"

সুরুচি বলল—"কোথায় গেছেন?"

লোকটি বলল—"তা তো জানি না। তিনি [illegible] সপ্তাহের জন্য এখানে এসেছিলেন। দিন পাঁচেক আগে চলে গেছেন।"

ঘরের মধ্যে বড় বাংলা কালেণ্ডারটা সুরুচির [illegible] পড়ল। আজ থেকে পাঁচ দিন আগে বাংলা মাসের [illegible] তারিখটা জ্বল জ্বল করছে। সে ভুলেই গিয়েছিল অমিত বাংলা মাসের তারিখ দেখে চলত। কিন্তু সে এসেছে তার সঙ্গে দেখা করতে ইংরেজী মাসের ছয় তারিখে।

উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে সামনের বাংলা কালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে রইল সুরুচি। অন্যমনস্কতায় তার হাত [illegible] হর-গৌরী[illegible]মূর্তিটা গেল পড়ে।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিক বোধ

অর্চনা মজুমদার

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনীতিক বোধ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথমেই মনে রাখতে হবে যে অন্য দেশনেতাদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য গভীর এবং ব্যাপক। কবির বহু প্রবন্ধ ও পত্রের মধ্য থেকে শুধু যে এই পার্থক্যই ধরা পড়ে তাই নয়, কবির নিজস্ব রাজনৈতিক দর্শন সম্বন্ধেও আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা হয়। কিন্তু কেবল প্রবন্ধাদিতে নয়, গল্প উপন্যাসেও কবির রাষ্ট্রনীতিক বোধ ও দর্শন নানাভাবে পরিস্ফুট হ'য়েছে।

'গোরা'র এই দর্শন এক সর্বজনীন রূপ পেয়েছে, কিন্তু 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে এটিকে নানাভাবে সমস্যাকারে আনা হয়েছে এবং বিশিষ্ট দর্শনানুসারে এর আলোচনাও হয়েছে। এখানে এই কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে রূপ আমরা দেখতে পাই তাকে শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ না বলে স্বজাতীয়তাবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা বলা চলতে পারে। এই নূতন জাতীয়তাবোধ পৌরাণিক হিন্দুত্বের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতেও এই হিন্দুজাতীয়তার কথাই রয়েছে।

তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি চরমপন্থী নেতারা যে পথ অনুসরণ করে দেশবাসীর মনে দেশের প্রতি ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে চাইছিলেন, তা ধর্মনিরপেক্ষ নয়। দেশের স্বাধীনতাকামী ব্যক্তিরা যেভাবে হিন্দুদের ধর্মপ্রাণতাকে উত্তেজিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত করছিলেন তাতে একটা মস্তবড় ত্রুটি থেকে গিয়েছিল। দেশের অহিন্দু জাতিরা নিজেদের ধর্ম-বিরোধী কোনো কিছুকেই অন্তরের মধ্যে মেনে নিতে পারেনি।

'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে গ্রহণ করে দেশকে দেবী-রূপে আরাধনা করা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হ'লেও মুসলমানদের পক্ষে তা সম্ভব হ'য়ে ওঠেনি।

এই ধরণের উৎকট স্বাদেশিকতা, যা দেশের উপরে আর কোনো কিছুকেই মানতে চায় না, যার কাছে ন্যায়-ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা এবং যারা বলতে চায় মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্যে যা করা যাবে তা অধর্ম হ'তে পারে না —তাদের সংগে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার সংগে বিশ্বমানবিকতার কোনো ভেদ নাই। ১১ই ডিসেম্বর, ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিনিকেতন থেকে পিয়রসনকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'দেশপ্রেমের অহংকার আমার জন্য নয়। এই পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে সর্বত্র আমি আমার ঘর খুঁজে পাব, এই একান্ত আশা আমার আছে।'[১] সমগ্র বিশ্বের ভাবনা থেকে দেশের ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে যে সার্থকতা লাভ করা যায় না একথাও কবি বারবার বলে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমকে কোনোদিনই মানেন নি। রবীন্দ্রনাথের যে জাতীয়তাবাদ তাকে বিশ্বজাগতিকতা (Internationalism) বলা যায়।

পাশ্চাত্য জগতে ন্যাশনালিজমের যে ভয়ঙ্কর রূপটি প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছে তাতে রবীন্দ্রনাথ ভীত হ'য়ে জগতের সম্মুখে ঘোষণা করলেন—'This nationalism is a cruel epidemic of evil that is sweeping over the human world of the present age and eating into its moral vitality,'[২]।

নৈবেদ্যের ৬৪ সংখ্যক কবিতায় তাই কবির কণ্ঠে শুনি—

১। বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০ পৃঃ ৩১৬

২। Nationalism in the west, Nationalism P, 16,

"স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে
ঘটেছে সংগ্রাম—প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি।
জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।"

ন্যাশনালত্বের চেয়ে মনুষ্যত্বকে রবীন্দ্রনাথ অনেক উপরে প্রাধান্য দিয়েছেন। ন্যাশনালত্বের মধ্যে একটা বিরাট স্বার্থপরতা রয়েছে তা ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে।

'বিরোধমূলক আদর্শ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ন্যাশনাল স্বার্থের আদর্শকে খাড়া করলেই বিরোধের আদর্শকে খাড়া করা হয়। সেই আদর্শ লইয়া আমরা কি কোনো কালে য়ুরোপের মহাকায় স্বার্থদানবের সহিত লড়াই করিয়া উঠিতে পারিব?' ৩

স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে কবি স্পষ্টভাবেই বলেছেন—'স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের উর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না—সেইখানেই ধর্ম বল, দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে, কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নীচে তল হইয়া যায়।' ৪

কিন্তু জাতীয় স্বার্থের উপরেও মনুষ্যত্বকে প্রাধান্য দিতে হবে, ধর্মকে রক্ষা করতে হবে। এ-ধর্ম কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, তা মানুষের অন্তর ধর্ম। বাহ্য ফললাভের মোহে মানুষ যেন নিজের মনকে না খোওয়ায়। এ কথা জানতে হবে যে অধ্যবসায়ই শক্তি আর অধৈর্যই দুর্বলতা, প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান। কিন্তু উৎপাতের সংকীর্ণ পথে এগিয়ে গেলেই মানুষের মনুষ্য ধর্মের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায় এবং সেই সংগে কাপুরুষতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

বিলাতী বস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে দেশময় যে বিরাট আন্দোলন উপস্থিত হ'ল এবং তারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে কাপড় পোড়ানোর আয়োজন চলছিল তার ফল যে কখনও শুভ হ'তে পারেনা তা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রত্যক্ষ হ'য়ে উঠেছিল। এই ধ্বংসমূলক কাজের প্রতি তাঁর গভীর বিদ্বেষ ছিল। তিনি বলেছেন—'এখানকার লোক তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তোলবার জন্য দল বাঁধে না, খুব বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে।...' দেশের একশ্রেণীর লোকেরা সমস্ত অন্তঃকরণ যে স্বদেশীর বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী হ'য়ে উঠছিল তা স্বদেশী-প্রচারকের দল উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হ'য়েছিল। রবীন্দ্রনাথ গঠনমূলক কাজে বিশ্বাস করতেন, ধ্বংসমূলক কাজে নয়। 'ঘরে বাইরে'তে নিখিলেশ বলেছে—'আমি বলছি—গড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার সিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।' উত্তেজনার দ্বারা, আড়ম্বরের দ্বারা কখনও কার্যসাধন হতে পারে না। 'উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজ গঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে।'৬

রবীন্দ্রনাথের এই রাষ্ট্রনৈতিক বোধ রাষ্ট্রনীতির পেশাদার নেতাদের মনের স্বীকৃতি পায়নি।

'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে সন্দীপ ও নিখিলেশের মধ্যে দিয়ে তৎকালীন দেশপ্রেমিকদের তীব্র স্বাদেশিকতার ভাব যেমন প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথের মতামতও সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে, তেমনি জীবনযাত্রার ক্ষেত্রেও ধ্যানস্তিমিত শান্তভাবকেই রবীন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। মননশীলতার প্রতি কবির গভীর বিশ্বাস ছিল।

৩। বিরোধমূলক আদর্শ: আত্মশক্তি ও সমূহ রবীন্দ্র রচনাবলী ১২শ খণ্ড পৃঃ ৮৮৩

৬। রবীন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত: শনিবারের চিঠি ৩৫শ বর্ষ, ৫র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৮০, পৃঃ ২৮৩

দেশপ্রীতির ক্ষেত্রেও এই ভাব দেখা যায়। উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খেয়ে ফিরতে তাঁর কখনও রুচি হয়নি। যাঁরা নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করে যান, অযথা শক্তির অপব্যয় ও চিত্তের বিক্ষেপ ঘটান না—রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সহানুভূতি তাঁদেরই প্রতি—

নিখিলেশ আত্মসমাহিত, সংযতচিত্ত ও সত্যের পূজারি। স্বাদেশিকতার উচ্ছ্বাসকে সে কোনোদিনই পছন্দ করেনি। উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মতো দেশের কাজে লাগবে না বলে সে পণ করেছে! সন্দীপের দল দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন অন্যায়কে কর্তব্য, অধর্মকে পুণ্য ব'লে চালাতে চেয়েছে তখনই তার হৃদয়ে আঘাত লেগেছে বেশি। দেশের উপরেও রয়েছে ধর্ম। তাই দেশের উপরেও যারা ধর্মকে মানছে না···তারা দেশকেও মানছে না।' কিন্তু সন্দীপ বলে 'দেশে আপনাআপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়, দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেইদিনই দেশ আমার হবে'···তাই অধর্ম, অত্যাচার, লুণ্ঠন—স্বার্থসাধনের পক্ষে এই তিনটিই প্রয়োজনীয়। সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ফললাভ। উপস্থিত প্রয়োজনের তাগিদে সে যে-কোনো পথ বেছে নিতে পারে। অসাধ্য সাধন করা চাই সেই জন্যেই দেশকে দেবতা করা দরকার। মানুষ দেশকে সহজে মানতে পারেনা কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মানতে পারে। মোহ না হ'লে তো ইতরলোকের চলেনা, তাই মানুষের মনে মোহের সৃষ্টি করতে হবে।

কিন্তু নিখিলেশ প্রমত্ততা থেকে দেশকে বাঁচাতে চায়। যে-কাজকে সত্য ব'লে শ্রদ্ধা করা যায় তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চলবে না। এ ছাড়াও মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়ো ক'রে দেখে, যে-মানুষের মনকে ভোলায়, সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই।

রাষ্ট্রনীতিতেও যে ধর্মনীতির স্থান আছে এ কথা সন্দীপের দল মানতে চায় না।

নিখিলেশ সত্যকে বিশ্বাস করে, সে জানে ফলের চেয়ে আত্মা বড়। দেশের উপরেও যেমন ধর্ম, তেমনি মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে তো বঞ্চিত করা চলতে পারে না।

স্বদেশী প্রচারকরা যখন বিলাতী বস্ত্র বর্জনের জন্য জোর করতে লাগলো তখন নিখিলেশ এবং তার মাষ্টারমশায় চন্দ্রনাথবাবু উভয়েই তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। দেশের লোক যখন দিশি জিনিস কিনছেনা তার একমাত্র কারণ সমস্ত দেশ তাদের ব্রত গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু জবরদস্তি করতে গেলে তার ফল কখনও ভালো হয়না।৭ কিন্তু নিখিলেশ বলেছে—'মানুষ নিজে কী কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিনবে, কী খাবে, কার সংগে বসে খাবে এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেইটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।'

'সদুপায়' প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ এই কথাই বলেছেন—'বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য-ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়ঃ, অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে—অথবা চালানোর সকলের চেয়ে সহজ উপায় জবরদস্তি।৮ কিন্তু এতে মানুষের বিদ্বেষই চিরস্থায়ী হয়ে উঠে। যাদের সংগে আমাদের কোনো হৃদয়ের যোগ নেই; যাদের আমরা চিরদিন উপেক্ষাই করে এসেছি আজ হঠাৎ তাদের উপকার করতে চাইলে তারা বিশ্বাসই বা করবে কেন, আর নিজেদের ক্ষতি স্বীকার ক'রে তা করতেই বা চাইবে কেন?

দেশের হিতের দোহাই দিয়ে নিখিলেশের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি জিনিস একেবারে উঠিয়ে দিতে বললে চন্দ্রনাথবাবুও তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন—'দেশ বলতে মাটি তো নয়, এই সমস্ত মানুষই তো। তা, তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেছ? আর, আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা

৭। এখানে প্রিয়রঞ্জনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয়—'সত্যি বলতে জোর খাটোনোটা মূর্খতা মাত্র। কারণ দিশা না পেয়ে জোর শেষে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। বিশ্বভারতী পত্রিকা মাঘ-চৈত্র ১৩৭০, পৃঃ ৩১৪

৮। আত্মশক্তি ও সমূহ: সদুপায়: র, র, র, ১২শ খণ্ড প. ৮৩০

কী খুদ খাবে আর কী কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেছ, ওরা সইবে কেন?'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধে লিখেছেন 'যে মানুষ ত্যাগ করছে তার অনেক কাপড় আছে, আর যাকে জোর করে দুঃখ ভোগ করাচ্ছি সে কাপড়ের অভাবে ঘরের বার হতে পারছে না। এমনতরো জবরদস্তির প্রায়শ্চিত্তে পাপক্ষালন হয় না।'৯ রবীন্দ্রনাথের এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চন্দ্রনাথবাবুর মুখে—

'তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ…

কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে।

ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত লড়ছে কেবলমাত্র কোনোমতে টিকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত, সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না'…

ধর্মকে সরিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসালে দিনে দিনে পাপেরই বোঝা বাড়িয়ে তোলা হয়।

আর সেই পাপের জবাবদিহিরও দিন একদিন আসবেই। য়ুরোপ একথা মানতে চায়না।

নিখিলেশ বলেছে—'বড়ো বড়ো ডাকাত-সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু, একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছনা— ওদের পলিটিক্সের ঝুলি ভরা মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেস্টিজ রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্ছে না?'

রবীন্দ্রনাথ বারবার বলেছেন 'বাহ্য ফল লাভই যে চরম লাভ—এ কথা সমস্ত পৃথিবী যদি মানে তবু ভারতবর্ষ যেন না মানে'১০…সেই কথাই চন্দ্রনাথবাবু বলেছেন—'সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাটি থেকে উঠুক শয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে'। বাহ্যত চমকপ্রদ সস্তা দেশপ্রেমকে মহৎ ব্যক্তিরা নিতান্ত অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেছেন। বার্ণড শ এই ধরণের দেশপ্রেমিকদের সম্বন্ধে বলেছেন—'They are not public-Spirited', only patriotic,'—১১

রবীন্দ্রনাথও 'প্যাট্রিয়ট'কেই সর্বোচ্চ ব'লে মেনে নিতে পারেননি। নিকৃষ্ট আদর্শের আকর্ষণে তথাকথিত দেশপ্রেমিকরা যে কতটা কপটতা, প্রবঞ্চনা ও অসত্যের পথে পা বাড়িয়েছে তা সন্দীপের মধ্যে দিয়ে সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। আরো একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ আবেগপ্রবণ মনের গতিকে খুব বেশি সমর্থন করতেন না। জনতার উচ্ছ্বাস (Crowd mentallity), তা যে প্রকারেই আসুক—দেশভক্তির মধ্যে দিয়ে, অথবা ধর্মের মধ্যে দিয়ে, রবীন্দ্রনাথ তাতে শ্রদ্ধা রাখতে পারেননি। সন্দীপের মধ্যে কৌশলপ্রবণতা তো ছিলই, কিন্তু তা না থাকলেও ঐ যে সে বহুজনের মুখপাত্র হ'য়ে উপস্থিত হ'ল—আর দেশবাসীকে ডাক দিতে লাগলো, ঐখানেই রবীন্দ্রনাথের আপত্তি।

'ঘরে বাইরে' সম্বন্ধে অধ্যাপক টমসন লিখেছেন—

'The novel would always keep a niche, if only for its historical interest, as the best picture of Bengal's time of political awakening. ১২

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'ঘরে বাইরে গল্প যখন লেখা যাচ্ছে তখন তার সংগে সংগে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হ'য়ে পড়েছে'…১৩

তাই সমসাময়িক কালের দেশপ্রেমের চিত্রটিও যেমন

৯। সত্যের আহ্বান : রাজা প্রজা : র, র, ব, ১২শ খণ্ড, পৃঃ ২১২

১০। ছোটো ও বড়ো : র. র. ব. পঃ ১০৩

১১। 'Men and Superman' Act III. p, 386 The'Complete plays of Bernard shaw, First volume

১২। Rabindranath Tagore by Edward Thompson, P, 246

১৩। র, র, ব, ৮ম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৫২১,

এখানে ফুটে উঠেছে, সেই সংগে দেশপ্রীতি সম্বন্ধে কবির ব্যক্তিগত ধারণাও প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে।

কিন্তু তারজন্যে কবিকে কম বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়নি। 'রাজা প্রজা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'যে কাল পড়িয়াছে এখন ধর্মের দোহাই দেওয়া মিথ্যা, কারণ রাষ্ট্রনীতিতে ধর্মনীতির স্থান আছে একথা যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ বিশ্বাসে প্রকাশ করে, লোকে তাহাকে হয় কাণ্ডজ্ঞানহীন, নয় নীতিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। প্রয়োজনের সময় প্রবল পক্ষ ধর্মকে মান্য করা কার্যহন্তারক দীনতা বলিয়া মনে করে'…১৪ নিখিলেশের ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই—দেশের লোক ভাবছে ভিতরে তার কুমতলব আছে বলেই বাইরে সে এমন ভালো মানুষ। বিমলাও তাকে দুর্বলভাবে আর সঙ্কীর্ণ বলে—আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে দেয়, তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হ'ল নিখিল। কিন্তু তবুও সে সত্যের থেকে বিচ্যুত হয়নি, অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেছে।…

এ অপমান রবীন্দ্রনাথকেও ভোগ করতে হয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি যা বিশ্বাস করেন তাকে জোর গলায় প্রকাশ করে গেছেন—'দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা, হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনার মিথ্যাচরণ করিনি।'১৫

১৪। রাজা প্রজা: র, র, ব, পৃঃ ৯১১

১৫। র, র, ব, অষ্টম খণ্ড, গ্রন্থ পরিচয় পৃঃ ৫২৬,

তুমি নেই

রতনচন্দ্র দাস

তুমি আজ নেই।
চলে গেছ কোন সে অনন্ত আলয়ে
রেখে গেছ প্রদীপ্ত জীবন মাঝে
আপন সত্তায় অমলিন এক
বীর্যবত্তা। মুকুটহীন ভারত;
দিকে দিকে অজস্র স্মৃতি তব
হ'তেছে আজ জীবন্ত, মূর্ত, বাক্যহীন
আঁধারের বুকে। অযুত তারার আলো
তোমারে করেছে সাথী নিঃসীম বিবরে।
হেথা মোরা করিতেছি সারা
ক্রন্দনে বাতাস ভারী: রক্তগোলাপ
ঝরে গেছে জীবনবৃন্ত হতে, কেড়ে নেছে
বিশ্বজয়ী অমৃতের হাসি—
নিয়তি নিষ্ঠুর।

ডিথিরাম্বো

শেখরচন্দ্র সেনগুপ্ত

এক

গ্রীক নাটকের জন্ম-কথা আমাদের বিস্ময়ের খোরাক।

উৎপত্তি এর গ্রীকদেবতা ডিওনিসাসের পূজা-উৎসব থেকে।

গ্রীক-দেবতাদের বংশ পরিচয় তালিকা থেকে আমরা জানতে পারি, ডিওনিসাস আদৌ কুলীন দেবতা নন। তাঁর নাম আমরা পাই পরবর্ত্তীকালের যোজনায়। তিনি দেবরাজ জেউস এবং থিবির সুন্দরী রাজকন্যা সিমিলের পুত্র। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার কাহিনীর সন্ধান আমরা পাই প্রাচীন গ্রীক-পুরাণে। সিমিল বার বার প্রার্থনা জানান দেবরাজ জেউসকে তাঁর স্ব-মহিমায় আবির্ভূত হতে। দেবরাজ প্রথমে সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই। পরে সিমিলের কাতর প্রার্থনায় স্থির থাকতে না পেরে আবির্ভূত হলেন নিজ মূর্তিতে। সাথে সাথে অবটন ঘটলো। তৎক্ষণাৎ চারধারে আগুন জ্বলে উঠলো দাউ দাউ করে। সেই আগুনে পুড়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন রাজকুমারী সিমিল।

সিমিল মারা গেলেন।

কিন্তু দেবরাজ তাঁর গর্ভজাত সন্তানকে অকালে বিনষ্ট হতে দেন নি। স্বয়ং নিজের উরুতে রক্ষা করলেন সেই অনাগত সন্তানকে, যথাকালে ডিওনিসাসের জন্ম হলো।

কুরোটিদের হাতে এই নব-জাতকের ভার অর্পণ করা হলো। কিন্তু ঈর্ষিতা দেবী হেরার প্ররোচনায় টাইটানরা শিশু ডিওনিসাসকে হত্যা করলো। এ' কথা জানতে পেরে জেউস্ ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।' নিক্ষেপ করলেন তাঁর ভয়ঙ্কর বজ্র। ধ্বংস হ'য়ে গেলো টাইটানদের সমস্ত পরাক্রম।

ডিওনিসাসকে আবার পুনর্জীবিত করা হলো।

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ডিওনিসাসই একমাত্র গ্রীক-দেবতা, যাঁর জনক স্বর্গ-নিবাসী দেবতা, কিন্তু জননী মর্ত্ত-মানবী!

চারণ কবি হোমারের কাব্যে ডিওনিসাসের স্থান অতি নগণ্য। তিনি মাত্র চারবার এই দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। হোমারের যুগে তাঁর মহিমা তেমন প্রকাশ পায় নি।

গ্রীক-নাটক সম্বন্ধে যাঁরা গবেষণা ক'রে গেছেন, তাঁদের অনেকেরই মত, ডিওনিসাস আসলে গ্রীক-দেবতা নন; মূলতঃ তিনি এশিয়া মাইনরের ফ্রিজিয় ও লিডিওদের দেবতা। এই জন্যই তিনি যখন থ্রেস ও থিবিতে পদার্পণ করেন, তখন তাঁকে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এশিয়া মাইনর থেকে তিনি এসে দাঁড়ালেন ইজিয়ান সমুদ্রের উত্তরকূলে। দুরন্ত সমুদ্র স্বাস্থ্যবান শিশুর উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে তাঁর পদ-চুম্বন করলো। বাতাস তাঁকে আহ্বান জানালো। দূরে বহুদূরের নগর, গ্রাম, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত তাঁকে হাতছানি দিলো। ডিওনিসাস তাই এগিয়ে চললেন। চলতে চলতে থমকে দাঁড়ালেন। থমকে দাঁড়ালেন ঠিক গ্রীসের মাটিতে দাঁড়িয়েই।

তাঁর এই একটানা অগ্রগতি নিরাপদ ছিল না।

সময় সময় প্রকৃতি উন্মত্ত হ'য়ে উঠেছে। আবার সময় সময় অনেক শত্রু, অনেক অপদেবতা তাঁর অগ্রগতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছে। কিন্তু জেউসের ঔরস-জাত সন্তান ডিওনিসাস তো অপ্রতিরোধ্য! তিনি তাঁর শত্রুদের, সমস্ত বাধা-বিঘ্নকে ছিন্ন-ভিন্ন করতে করতে এগিয়ে এলেন। শত্রুরা পরাজিত ও নিগৃহীত হ'য়ে মাথা হেঁট করলো।

প্রাচীন গ্রীসে ডিওনিসাস হলেন আঙ্গুর-খেত ও মদের দেবতা, কিন্তু অন্যান্য অনেক বস্তুর সঙ্গেই তাঁর নাম ও মহিমা ছিল জড়িত। বস্তুতঃ তিনিই ছিলেন সমগ্র অরণ্য প্রকৃতির দেবতা। আঙ্গুরের লতা-পাতায় মোড়া দণ্ড (Thyrsis) তাঁর একটি প্রতীক। মানুষকে তিনিই প্রথম-আঙ্গুরের চাষ শিখিয়েছিলেন। ফুল ও ফলের তিনি রক্ষক। তাই এক কথায় তাঁকে বলা হতো—'ফুটন্ত'!

ডিওনিসাস আবার কৃষি ও শস্যের দেবতা। তিনিই

গানের সাথে সাথে তাদের আবৃত্তি অথবা পদ্যে পরস্পরের সঙ্গে কথোপকথন করতে হত। এই কথোপকথনের বিষয়বস্তু ছিল ডিওনিসাসের জীবনের ঘটনাবলী। দার্শনিক এ্যারিষ্টটল বলে গেছেন, গ্রীক ট্র্যাজেডির মূলবীজ নিহিত ছিল এই ডিওনিসাসের পূজাপ্রাঙ্গণে পদ্যে পরস্পরের কথোপকথনের মধ্যে। ক্রমশঃ যুগ উন্নততর হয়; সভ্যতার আলো আরও তীব্রতর হয়ে আসে। গ্রীসের বুকে জন্ম নেন আরও শক্তিশালী কবি-নাট্যকারের দল। কালক্রমে তাই ডিথিরাম্বো রূপ পরিগ্রহ করে সর্বকালের বিস্ময় গ্রীক নাট্য সাহিত্যে।

[চার]

আরিয়নের মৃত্যুর পর তাঁর পরবর্তী গ্রীককবিদের হাতে ডিথিরাম্বো আরও উন্নত, আরও মার্জিত হয়ে উঠে। এই গানই কালক্রমে একটি বিশিষ্ট-শ্রেণীর কাব্য-শাখায় পরিণত হয়েছিল। এরপর দেখা দিল সম্পূর্ণ বিপরীত দুইটি শাখা—প্রথমটি সঙ্গীত-মূলক; অপরটি নাট্য-মূলক।

এথেন্সের উন্নত সভ্যতা এই ডিথিরাম্বোকে সাদরে গ্রহণ করলো। এর চাকচিক্য বৃদ্ধি পেলো। সাহিত্যের নানাশাখায় ডিথিরাম্বো তার প্রভা বিকীর্ণ করতে থাকে।

ডিথিরাম্বোর নাট্য-শাখার বিস্ময়কর উন্নতি ট্র্যাজেডি সৃষ্টিতে। ট্র্যাজেডিসৃষ্টির পূর্ণগৌরব এথেন্সবাসীদের প্রাপ্য। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য তথা আধুনিক বিশ্বের নাট্য সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রীকনাটকের প্রভাব অপরিসীম। তাই এই প্রসঙ্গে ডিওনিসাসের পূজা উৎসব এবং তাঁর ডিথিরাম্বো সঙ্গীত সাধনা শ্রদ্ধার সঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়।

সেদিনের স্মৃতি

শ্রীঅসিতবরণ চৌধুরী

সেদিনের স্বপ্নগুলো রঙিণ রঙিণ
কর্ম্মের পাষাণ দ্বারে মাথা খুঁড়ে মরে…
বেদনায় হতাশ্বাস,…অকাল মৃত্যুর মতো
নিস্তব্ধ অনড়……॥
জানি আমি, একদিন যতগুলো কুঁড়ি ছিলো
বৃন্তে তার নরম সুন্দর
বাস্তবের রুক্ষতায়—একান্ত নিষ্ঠুর দাহে
ঝরে গেল—অনাদৃত কবিতার মতো॥
সেদিনের বনলতা—বনলতা নয় আর…
মাধবীর শীর্ণ গালে ভ্রমরের
লাগেনা চুম্বন…
জ্যোছনার ফিকে নীল শাড়ী মনে আনেনা আবেগ-
রজনীগন্ধার ধূপ জাগায়না আর
বাসর শয্যার রাত্রি॥
সেদিনের ব্যথাগুলো—ব্যথা হোক—
তবুও সুন্দর…
সেদিনের অশ্রুগুলো—অশ্রু হোক—
তবুও নিটোল দুষ্প্রাপ্য মুক্তোর মতো…।
সেদিনের আশাগুলো—আশা বটে—
তবুও মধুর……॥
এদের তুলনা নেই—
অন্তরের কর্ণপটে এরা শুধু স্মৃতি॥

কল্যানবগ্রাম ও শিক্ষানিকেতন

"পথিক"

বর্ষে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম হবার পর হতেই ইংরেজী ধারা প্রচলিত হ'ল এই বিষয়ে মিশনারী পাদ্রীদের এর সম্পূর্ণ ভার পড়'ল এবং তারই সঙ্গে এগিয়ে সেই সব ভারতীয়, যাঁরা বিশ্বাস করেছিলেন যে র্ষের সর্বপ্রকার উন্নতির জন্ম ইংরেজী শিক্ষা ও তৎ-প্রবর্তিত শিক্ষানীতি অবশ্য অপরিহার্য। নানা ল অবস্থার মধ্যে দেখতে দেখতে সেই শিক্ষা সমগ্র সাড়া জাগিয়ে তুললো। ইংরেজের চিন্তাধারায়, বর্তনায় যাঁরা শ্রদ্ধাশীল তাঁরাই বিশেষ উৎসাহে পরোক্ষভাবে সর্বপ্রকার শক্তি নিয়োজিত ক'রে ছন। তাই খুব শীঘ্রই ইংরেজী শাসনের বিস্তারের সাথে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটেছে সারা বর্ষে। দেশের জননায়ক, দেশনায়ক ও মনীষী-কলেই ইংরেজী শিক্ষায় নিজেদের অজ্ঞানতার রকে আলোকিত করে সর্বলোকে পরিচিত হয়েছেন। ব সর্বজন-বরণীয় প্রতিভাবান্ ব্যক্তিরা ইংরেজী শিক্ষা-অনেক ত্রুটিও লক্ষ্য করেছেন—তার জন্ম দেশকে, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সচেতনও করেছেন। যাঁরা কথা শুনেছে তাঁরা অনেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে নানা বাগ বিতণ্ডার বিস্তার ক'রে স্বাধীনতা লাভের উপায় হাতিয়ারে সেই কুফল কতটা দেশের ক্ষতি সাধন তার কাজে লাগিয়েছেন। আর যাঁরা দু'চার জন তে তাঁদের চিন্তা ও ভাবনাকে গভীরভাবে বিশ্বাস ছন, নূতন পথের ঠিকানা লাভ ক'রে একা একা করে ছিলেন।

রেজের ভারতবর্ষে সেই পথ অনুসরণ করা খুব একটা ধ্য ব্যাপার ছিল না। কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথই নকেতনের মাধ্যমে একা এগিয়ে এসে শিক্ষাক্ষেত্রে ঘটালেন। ভারতের মর্মলোকে যে সত্য ও ঐতিহ্য ণী হ'তে জেগে আকাশস্পর্শী হয়েছিল একদিন, সেই সত্যকে সম্মুখে রেখে রবীন্দ্রনাথ তপোবন ও আশ্রমের চিন্তাধারায় "সর্বজনহিতায়" যজ্ঞে সর্বপ্রাণ সমর্পণ ক'রে এগিয়ে চলেছেন। সেদিন কবি ছিলেন প্রায় বহুলোকের কাছে "কল্পনাবিলাসী"। সমাজ গঠনে জাতি গঠনে শিক্ষার স্থান যে কত বড় অংশ জুড়ে আছে তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথই বার বার দেশের রাষ্ট্রনায়ক, দেশনায়কদের বলেছিলেন।

গান্ধীজীও বুঝলেন—বিশ্বাস করলেন—দেশের সর্বস্তরে মঙ্গল হ'বে তখনই যখন তার শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বস্তরের উৎকর্ষের দিকে আত্মনির্ভরশীল। তাই রাজনীতির সাথে সাথে 'চরকা' আন্দোলন এবং 'বুনিয়াদি শিক্ষা' প্রকল্পের উপর জোর দিলেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের নূতন সমাজ গঠনে, রাষ্ট্রগঠনে, মানব গঠনে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর প্রবর্তিত চিন্তাধারার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হ'বে—এই আশা পোষণ করতে লাগলেন অনেক স্বদেশ-প্রেমিক।

দেশ স্বাধীন হ'ল। চারিদিকে চললো একটা ধুলো-ঝাড়ার এবং নূতন কিছু ক'রবার বা ভাববার তীব্র আয়োজন—উৎসবও বটে। যে যেদিক দিয়ে পারছে—কিছু একটা করার মত্ততায় প্রায় মত্ত। কিন্তু দেশের শৃঙ্খল খসেছে, শৃঙ্খলাবোধও দিনে দিনে জাতীয় জীবন হ'তে অনেক দূরে সরে গেছে। জাতি গঠনে যে দিকটার কথা সবচেয়ে প্রথম ভাবা প্রয়োজন সেই দিকটা সকলের পেছনে লাইন দিয়ে নিজের নম্বর রাখলো। শাসনতন্ত্রের গঠনতন্ত্রের চিন্তায় দেশশুদ্ধ লোক মেতে উঠেছে। ভুলে গেছে রবীন্দ্রনাথের—গান্ধীর চিন্তাধারা—শিক্ষার পরিকল্পনার কথা। তাই তো স্বাধীন হ'বার দীর্ঘদিন পরেও হিসেবের খাতায় খুব একটা 'হাসি নেই' নেই 'আনন্দ'।

তার কারণ, যে কয়জন রবীন্দ্র-গান্ধীর শিক্ষাধারার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রাণবন্ত এবং হৃদয়ের সর্বস্ব উজাড় ক'রে

দিয়ে তার সার্থক রূপায়ণে 'ব্রতী,' তাঁরা সামান্য দু'চারজন। সমগ্র ভারতবর্ষে একশজনও হবেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু তার জন্য ভয় নেই। কারণ রবীন্দ্র-গান্ধী প্রবর্তিত শিক্ষাধারার মন্ত্র যাঁরা জপ ক'রে চলেছেন তাঁদের সংখ্যা যতই কম হোক না কেন, একদিন সকল 'পরীক্ষা—নিরীক্ষার' মাধ্যমে দেশের জন-সমাজে তা ব্যাপকতর রূপ পরিগ্রহ ক'রবে—যেমন করেছে একদিন ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা।

পুরাতনকে বর্জন করা যতই কঠিন হোক তার চেয়ে বেশী ভয় ও সংশয় নূতনকে গ্রহণ করতে। তাই তো শিক্ষাবিভাগ সর্বত্র খুঁজে চলেছেন সেই সব আদর্শবাদী দেশ সেবীদের—যাঁদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা রবীন্দ্র-গান্ধী শিক্ষা ও চিন্তার প্রতি সম্পূর্ণ সংশয়হীন—সর্ব-তর্কজড়িত বেড়া-জালের বাইরে। তাঁদেরই হাতে সরকার রবীন্দ্র-গান্ধীর শিক্ষার নূতন প্রকল্প যাচাই ক'রে নিচ্ছেন। এ চিন্তা খুবই বিবেচনা প্রসূত। সমগ্র ভারতবর্ষের জনমানসে যে শিক্ষা অক্টোপাসের মত মনো-জীবনকে আচ্ছন্ন করে আছে তাকে এক মুহূর্তে শেষ ক'রে দেওয়া যায় না।

নূতন ভারতবর্ষের সমাজগঠনে শিক্ষার ভূমিকা হবে সর্বজনীন। তার জন্য এখন হতেই প্রস্তুতি চলছে গুটী-কয়েক জায়গায়।

কলানবগ্রাম সেইরূপ একটি কর্মযজ্ঞশালা। নাম শুনেছি অনেকদিন থেকে, কিন্তু এতদিন তা দেখবার সুযোগ হয়নি। সেইদিন ভারতবর্ষের সম্পাদক সর্ব-জন শ্রদ্ধেয় ফণীদা ও আমি বেরিয়ে পড়লাম সেই কলানব-গ্রামের অভিমুখে।

কলানবগ্রাম। একটি মানুষের বিশ্বাস ও আত্ম ত্যাগের প্রাণ সম্পদে উজ্জ্বল। সেই মানুষটি সেই অঞ্চলে "মাষ্টার মশাই" বলে পরিচিত। সহজ সরল বিজয়দা। শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য। গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত একটি আহুতি। গান্ধীজির সহিত খুব সান্নিধ্য ছিল না। জীবনে ২।৩ বার দেখা হয়েছিল। ২।৩ কথা হয়েছিল। কাছে পাবার সুযোগ থাকলেও বিজয়দা তা গ্রহণ করতেন না বরং গান্ধীজীর চিন্তাধারা ও মানসিক সত্যের অনুসন্ধান করে জীবনে ও কর্মে তার রূপ দান করতে সর্বনিষ্ঠা ও প্রেরণাকে নিয়োজিত করেন।

বড় বড় কথা আর রাজনৈতিক আভিজাত্যের বাইরে থেকে 'সেবা'র মাধ্যমে দেশ ও দেশবাসীকে ভালবাসতে শ্রদ্ধা করতে এগিয়ে গেলেন গ্রামে-গ্রামে। হরিপালের সতীশদার প্রেরণা এবং আত্মার ব্যাকুলতা একত্রিত হয়ে বিজয়দাকে ঘর ছাড়া করল।

দেশ স্বাধীন হল। নেতৃত্বের মোহ এবং ক্ষমতার ভোটাভুটি যখন আদর্শের বেদীতে অশান্ত হয়ে উঠল তখন সহরের phone, fanএর মায়া কাটিয়ে কলানবগ্রামে নিজেকে নিয়োজিত করলেন ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের নব পরিকল্পনার শিক্ষাপ্রসারে।

১৯৩৫ সালে শিক্ষা-নিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়। নানা কারণে ১৯৪১ সাল হইতে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কাজ বন্ধ থাকে। ১৯৫১ সালেই নূতনভাবে এর কাজ নবপরি-কল্পনায় আরম্ভ হয়। এতদ্অঞ্চলে অনেকগুলি শিক্ষা ও সেবা প্রতিষ্ঠান আছে যার প্রায় অনেকগুলি শিক্ষানিকে-তনের অঙ্গীভূত। ৭ জন গান্ধীবাদী সহকর্মীর সহযোগিতায় [কর্মপরিষদের সদস্যরূপে] বিজয়দা কলানবগ্রামে যে সকল আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তা বাঙলা দেশে দুর্লভ। ভারতবর্ষের বহু স্থানের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান [বেসরকারী] লেখক দেখেছেন, কিন্তু এমন প্রাণবন্ত এমন ভবিষ্যৎ মানুষ গঠনের পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণ খুব একটা নজরে পড়েনি।

প্রথমেই এলাম শিশু বিদ্যালয়ে। প্রি-বেসিক-নার্সারী বিদ্যালয়। ৪২টি শিশু, যাঁদের হাতে হয়ত ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাবলম্বন শক্তির ও কর্মের পরিচয় বহন করবে। গাছের ছায়ায় ঘেরা, পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা, মনকে প্রথমেই আকর্ষণ করল। বারে বারে ভুল হতে লাগল, শান্তিনিকেতনে এলাম না তো! ২জন মাত্র শিক্ষিকা রয়েছেন। এদের সকলের দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। প্রধানতঃ অনুন্নত শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে উচ্চ শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের দেখলাম। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধুলা এবং গানের মাধ্যমে শিক্ষা। ৫ বৎসর বয়সের মধ্যে সবাই বেশ পুষ্ট, আনন্দ যেন হাসিতে ফুটে উঠছে। ঘরে ঢুকে দেখি ক, খ, গ সাজিয়ে নিয়ে বসে আছে। সরকারী সাহায্য নাম মাত্র। এর সম্পূর্ণ খরচ শিক্ষা নিকেতন বহন করেন। বাকে

মাঝে পালা করে school mother-রা এসে এদের তদারক করেন। গ্রামের চাষী, মজুর মেয়েরা তাদের সন্তানদের আলের ধারে পাতার আড়ালে শুইয়ে রেখে কাজ করত, মাঝে মাঝে এসে মাই দিত। এই দৃশ্য বিজয়দার হৃদয়কে বেদনা দিল। আমাদের ভবিষ্যৎ সন্তানদের সম্ভাবনা এইভাবেই প্রতিদিন প্রতিটি গ্রামে অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায়। শিক্ষানিকেতনের কিছু কিছু কাজের মাঝে এর উপায় সম্পর্কে চিন্তা হল। চোখে পড়ল একটি তাড়ির ভাটিখানা। বেশ জায়গা; কিন্তু লোকজন খুব একটা জমছে না। মালিক ছেড়ে দেবে ভাবছে। এমন সময় বিজয়দার লোভ এল—তাড়িখানা হয়ে উঠলো জাতিগঠনের সাধনার তীর্থ। এই বিভাগের শিক্ষার বিষয় হচ্ছে—পথ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে কথা বলার অভ্যাস করা, নিজের প্রয়োজনীয় কাজ নিজেরা করতে শেখা। পাঁচজন মিলে মিশে থাকা ও ভাগ করে খাওয়া। 'রঘুপতি রাঘব' ওদের প্রার্থনার মন্ত্র। হাতে তালি দিয়ে আধো আধো কণ্ঠে ওরা মনের আনন্দে গেয়ে যায়।

এরই পাশে রয়েছে গুরুমা—শিক্ষণ-কেন্দ্র। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্য উপযুক্তবয়স্ক মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা। তাছাড়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন ও সামাজিক কল্যাণকর কাজে যুক্ত থাকা এর মাধ্যমে সম্ভব। লেখাপড়া তো আছেই, তার সাথে শিল্প ও হাতের কাজের শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এঁরাই এখান হ'তে উপযুক্ত হয়ে পূর্ব বনিয়াদী বিদ্যালয় বা বনিয়াদী বিদ্যালয়ের প্রাক্ প্রাথমিক বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবার কাজে ব্রতী হন। এই কেন্দ্রের শিক্ষাদান তিন মাস। ২০ জন শিক্ষার্থী একসঙ্গে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। শিক্ষার্থীদের মাসে ৩০৲ টাকা সরকারী বৃত্তি দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও কুলোয় না। বাকী অনেকটাই শিক্ষানিকেতনকে বহন করতে হয়। পশ্চিম বাংলায় এই ধরনের গুরুমা শিক্ষণ কেন্দ্র এইটাই প্রথম। বর্তমানে হুগলী জেলার হরিপাল গ্রামে আর একটি গুরুমা শিক্ষণকেন্দ্র হয়েছে।

সেখান থেকে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়। 'রাস্তাটা এত পরিষ্কার'—জিজ্ঞাসা ক'রতেই বিজয়'দা ব'ললেন, 'ছেলে মেয়েরা নিজেরা ভোর হতেই পরিষ্কার করে'। কথা শেষ না হতেই দেখলাম ঝাড়ু হাতে কয়েকটি ছেলে মেয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পথ বাগান ঝাড়ু দিচ্ছে। মনটা বেশ স্ফীত হ'ল। আমাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে এমন কর্তব্য—অনুরাগ! জীপ আগতেই চোখে পড়লো বিদ্যালয়ের পরিবেশ। ৪ বিঘা জমির উপর—বেল আর রজনীগন্ধার গাছ—এক সঙ্গে এত ফুল ফুটতে আমি এর পূর্বে কোথাও দেখিনি। সবটাই ছেলে মেয়েদের দ্বারা। নূতন সমাজ-গঠনে সমাজের কল্যাণকর উৎপাদনাত্মক শ্রমই গান্ধীর উদ্দেশ্য। শুধু লেখাপড়া নয়, মানুষ করে তোলা। বিজয়দা বললেন, এ বিভাগে আমার কাজের সার্থকতা কিছুটা অনুভব করি—ছেলেরা একে অন্যের দুঃখ লাঘব করে এবং পরস্পর সহযোগিতা করে কাজ করে।

কাজের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ। সামনেই চোখে পড়লো রান্নার ঘর। ১৭০টি স্থানীয় ছেলে মেয়ে (ছয় হইতে দশ বৎসরের) পাঁচটি শ্রেণীতে পড়ে। সামনের ক্ষেতে ছেলেরা আপন আনন্দে কাজ করছে—নূতন ফসল কিছু বসাবে। বিদ্যালয়ের দরিদ্র ছেলেদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করা হয়। তার জন্য ছেলেদের দ্বারা উৎপন্ন আলু ও কুমড়া এবং গ্রাম হ'তে সংগৃহীত মুষ্টিভিক্ষা। পূর্বে গ্রামের ছেলেরা বাবুদের বাড়ীতে রাখালি করত, লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেত না। এই বিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ ভার রয়েছে মনীষবাবু ও তাঁর স্ত্রী রেণু বসুর উপর। বিজয়দার পরিকল্পনায় রেণু দেবীর সহযোগিতার কথা বার বার আমাদের কানে এসেছে। স্বামীস্ত্রীর সম্মিলিত নিষ্ঠায় ও শ্রমে বিদ্যালয়ের শ্রী উত্তরোত্তর বেড়ে উঠেছে। ৫ জন শিক্ষক ও ১ জন স্কুল মাদার রয়েছেন। স্কুল বোর্ড সাহায্য করে থাকেন। কিন্তু শিক্ষানিকেতনকেই সবচেয়ে বেশী খরচ বহন করতে হয়।

শিক্ষানিকেতনের প্রাণস্বরূপ উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়। বিজয়দা'র সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া সাধনা দেবীর সজীব স্পর্শে এই বিদ্যালয় যেন একটা বৃহৎ সৃষ্টিশালা। একদিকে চলেছে কর্ম, আর একদিকে চলেছে ছায়ায় ঘেরা বিস্তার পরিবেশে মানসিক উন্নতির সাধনা। ৭৬টি ছেলে মেয়ে; (এগার হ'তে তের বৎসর পর্যন্ত) তার মধ্যে ১৪ জন মেয়ে, বাকী সব ছেলে। দূরে জেলে আসছে স্কুল, এগিয়ে

যেহেতুই ভেসে এ'ল—'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু' গান। এমন পরিবেশে এ-গানই ভাল শোনায়। সহরের কৃত্রিম পরিবেশে যত ভাল ভাবেই গীত হোক না কেন, এমন আকুল করা, উজাড় করা, দরদ উপলব্ধি করা যায় না। গানটি শেষ হ'বার পর আর একটি গান শুনলাম। গানটি শান্তিনিকেতনের কবি প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত। সুরও খুব পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের 'আমাদের শান্তিনিকেতন, সবচেয়ে আপন'—সেই সুর, সেই সব কথার মায়া—"আমাদের শিক্ষানিকেতন। আমাদের প্রাণের প্রিয় ধন, আমাদের পরশ রতন' তার আকাশ-ঘেরা মাঠে মোদের আনন্দে দিন কাটে, ও তার বনের ছায়া জাগায় মায়া মায়েরই মতন॥ ইত্যাদি। ভ্রম হয়, এ শান্তিনিকেতন! কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ছেলে-মেয়েরা কাজ করছে। কেউ ড্রিল, কেউ আবার গাছের কলমে ব্যস্ত; কেউ কাঠের কাজ; তাঁত ও চাষ। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়া হয়। এখানকার পড়া সমাপ্ত করে ছাত্ররা উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে পারে। শিক্ষার সময় সকাল ৭টা হ'তে ৪টা পর্যন্ত। মাঝখানে বিরাম আছে—সেই সময় যাদের বাড়ি নিকটে তারা খেয়ে আসে। অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে আহার করে। রান্নার কাজও ছেলে-মেয়েদের। দেখলাম, ছেলেরা কয়লা ভাংগছে, পেয়াজের ও পটলের খোলা ছাড়াচ্ছে, মেয়েরা রুটি বেলছে, উনান ধরাচ্ছে। সারাদিন বিদ্যালয়ে থেকে পড়াশোনা, কাজকর্ম ও খেলাধুলা। যে সব ছেলে-মেয়েরা বিদ্যালয়ে আহার করে তাদের মাসে পাঁচসের করে চাল দিতে হয়। এই বিদ্যালয়ে আছে দারুকর্মশালা, বয়নশালা, গ্রন্থাগার, কলাভবন ইত্যাদি। সব কটাই প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরপুর।

এই বিদ্যালয়টি নামকরণ করা হয়েছে "অরবিন্দপ্রকাশ বিদ্যায়তন" এই নামে। অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অকালপোষ গ্রামে তাঁর পিতৃভূমি। হিন্দু-স্কুলের বিখ্যাত কেদার পণ্ডিত মহাশয় তাঁর পিতা। হিন্দু স্কুলে শিক্ষকতা করবার সময় ভারতের আদিম অসহযোগ আন্দোলনে অরবিন্দপ্রকাশ অংশ গ্রহণ করেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্নস্বরূপ যাঁরা গভর্ণমেন্ট স্কুলের শিক্ষকতা ত্যাগ করেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, তারাপচন্দ্র চাকলাদার, বিনয়কুমার সরকার ও অরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ অন্যতম। তারপর হ'তেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করলেন। অরবিন্দপ্রকাশ হাতে-কলমে কখনও বিপ্লব করেন নি; বোমা রিভলভার ছোড়েন নি। কিন্তু তিনি ছিলেন বিপ্লবের স্রষ্টা-পুরুষ—ভাববিপ্লবী। তাঁদের শিক্ষায়, অনুপ্রেরণায় তদানীন্তন যুগে বহু দেশ-সেবক বিপ্লব-কর্মে ব্রতী হয়েছিলেন।

নিকটেই আশুতোষ গ্রন্থাগার, ডাঃ আশুতোষ দাস মহাশয়ের স্মৃতিতে নামাঙ্কিত ঠিক শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা। সভার জায়গা, সামনে প্রকাণ্ড বেদী—চারদিকে তপোবনের স্নিগ্ধতা সামগ্রিক পরিবেশ মোহ জাগায়। শ্রীহরলাল শীল মহাশয়ের পরিকল্পনানুসারে উপাসনার 'বেদী'টি নির্মিত। গ্রন্থাগারটি সরকারী অর্থানুকূল্যে অত্যন্ত আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত। কলিকাতা মহানগরীতে এমন পাঠাগার দেখা যায় না। দ্বিপ্রহর দু'ঘটিকায় এর কাজ আরম্ভ হয়, রাত ৮টা পর্যন্ত চলে। শিশুদের, মহিলাদের ও বয়স্কদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ব্যবস্থা। গ্রামের বহুলোক এই গ্রন্থাগারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে থাকেন। শিক্ষানিকেতনের তত্ত্বাবধানে এ গ্রন্থাগার গ্রামের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার মান উন্নত করার কাজে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

শিক্ষানিকেতনের অঙ্গীভূত শিল্পবিদ্যালয় বর্ধমান জেলার নামকরা বিদ্যালয়। সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের নামে এই বিদ্যালয় উৎসর্গীকৃত। সতীশবাবুর বাড়ী শ্রীরামপুর। কর্মজীবনে তিনি প্রথম হরিপালে পরে কলকাতার মডার্ণে ও শেষবয়সে মেট্রোপলিটন মেইনে প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ করেছেন। উচ্চস্তরের বক্তা ও লেখক হিসেবে খুব খ্যাতি ছিল। বিনয় সরকার সম্পাদিত "গৃহস্থ" কাগজে নিয়মিত লেখা প্রকাশিত হত। স্বদেশীযুগে নানা সমস্যার একমাত্র সমাধানবন্ধু ছিলেন সতীশ সেনগুপ্ত। প্রথমে 'বিপ্লব আন্দোলনে' যুক্ত হলেন, পরে বিপিন গাংগুলির "আত্মোন্নতি সমিতির" সদস্য হন। নিজে বিপ্লবী দল গঠন করে বহু লোককে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। ১৯২১ সালে সব ত্যাগ করে সতীশবাবু গান্ধীবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজী যখন কলকাতায় এলেন সতীশবাবু একটি লেখায় লিখেছিলেন

ভবিষ্যৎ ভারতের ভার একদিন এই গান্ধীকেই নিতে হবে—।'

অষ্টমশ্রেণীর পাঠ শেষ করে বা উচ্চ বুনিয়াদী পাঠ শেষ করে ছেলেরা এ বিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। জীবিকা অর্জনের উপযোগী শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হবার শিক্ষাও দেওয়া হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষণ-মহাবিদ্যালয়, বৃত্তি-শিক্ষা-বিভাগ, সঙ্গীত ও চিত্র শিক্ষা-বিভাগ, সমাজ-সেবা-কেন্দ্র, চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদি সবটাই শিক্ষানিকেতনের অঙ্গ।

কলানবগ্রাম ভারতের গ্রামগুলির অন্যতম। সহরের Phone-fan এর মোহ ত্যাগ করে আমরা গ্রামে গিয়ে কাজ করতে কেউ চাই না। আদর্শের নামে অনেক কথাই বলি। আমাদের দেশের যুবকরা কিম্বা নেতৃগণ যদি গ্রামে গ্রামে ভোট ভিক্ষা না করে বিজয়দার আদর্শে কাজ করতে অগ্রসর হতেন তবে এই ১৬৷১৭ বৎসরে ভারতবর্ষের চেহারা বদলে যেতো নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা হল না। গান্ধীজীর অতি নিকটসান্নিধ্যে যাঁরা ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই আজ মন্ত্রী কিংবা সহরের নেতা।

বিজয়দার চিন্তা গ্রামের উন্নতি। তাই স্বাধীনতা লাভের পর গ্রামের কল্যাণে ও মঙ্গলকর্মে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করলেন নিজেকে। আর তাঁর সাথে শক্তিরূপা হয়ে এলেন তাঁর সহধর্মিণী সাধনাদি। হাসিটি মুখে লেগেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ, ডিগ্রী পাওয়া মেয়ে সকল জ্ঞান, ধারণা, নিষ্ঠা, শ্রম উজাড় ক'রে দিয়ে স্বামীর পাশে যেন হর-পার্বতী। সেই মোটা লাল পেড়ে শাড়ী আর সকলের জন্য উৎকণ্ঠা।

নিজের হাতে সকল কাজ দেখা-শোনা করার পর যতটুকু সময় পান—তাও স্বামীর সেবায় নিযুক্তা সেই পরমা-স্নিগ্ধা সাধনাদি। চোখে মুখে অভাবনীয় তৃপ্তি, বিজয়দার প্রেরণা ও কর্মশক্তিকে যেন সকল সময় প্রসন্নতা দান করে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিরকালের আশা গ্রামে গ্রামে 'সমবায়' গড়ে তোলা। আমাদের দেশে অধিকাংশ 'সমবায়' নানা কারণে অসার্থক হ'য়ে উঠে। তা জানা সত্ত্বেও বিজয়দা রবীন্দ্রশতবার্ষিকীতে কলানবগ্রামে একটি 'সমবায়' গড়লেন। ৫টি পল্লী নিয়ে এই সমবায়। গ্রামের লোকের উদাসীনতা আছে—কিন্তু তবুও শিক্ষানিকেতনের পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে আজ উহা সার্থকরূপ লাভ করেছে গ্রামের লোকদের এ এক পরম আশ্রয়, পরম নির্ভর।

পরিশেষে এই কথা বলতে হয় যে, রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে কর্মে ও তপস্যায় বিজয়দা কলানবগ্রামে শিক্ষানিকেতনে সঞ্চার করতে চেয়েছেন। শিক্ষা-প্রসংগে কবি বলেছিলেন, "আদর্শ বিদ্যালয় যদি স্থাপন করিতে হয় তবে লোকালয় হইতে দূরে নির্জনে মুক্ত আকাশ ও উদার প্রান্তরে গাছপালার মধ্যে তাহার ব্যবস্থা করা চাই। ......যদি সম্ভব হয় তবে বিদ্যালয়ের সঙ্গে খানিকটা ফসলের জমি থাকা আবশ্যক; এই জমি হইতে বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আহার্য সংগ্রহ হইবে, ছাত্ররা চাষের কাজে সহায়তা করিবে।......পাঠের বিশ্রাম-কালে তাহারা স্বহস্তে বাগান করিবে, গাছের গোড়া খুঁড়িবে, গাছে জল দিবে, বেড়া বাঁধিবে। এইরূপে তাহারা প্রকৃতির কেবল ভাবের নহে, কাজের সম্বন্ধও পাতাইতে থাকিবে।"

রবীন্দ্রনাথ পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণে দেশব্রতী যুবকদের আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে,

"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটি গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষিশিল্প ও গ্রামের ব্যবহার সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্তিত কর; গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয় তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহের সঞ্চার কর, এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্তব্য সম্পন্ন করে সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এ কর্মে খ্যাতির আশা করিয়ো না; এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই, কোন ঘোষণা নাই; কেবল ধর্ম এবং প্রেম, নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে এই একটি মাত্র পণ যে, দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পণ করিব।"

বিজয়দা ও সাধনাদির জীবনে সেই ব্রত—সেই দুঃখীদের দুঃখ দূরীকরণে সমর্পিত প্রাণ।

সুতনুকা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পাকুড়, পাথরমণ্ডি, নাহারটিলা কোথাও এমন জায়গা নেই যে লীজ নিয়ে পাথর কেটে একসঙ্গে গভর্ণমেণ্ট এবং রেলোয়েকে পাথরকুচি যোগান দেওরা যায়, কিন্তু এই অবস্থাতেও মোটা লাভের লোভে আমাদের ঈষ্টার্ণ সাপ্লায়ার কোম্পানী লড়াইয়ের বাজারে বিরাট এক অর্ডার নিয়ে এলো। রেলোয়ের জন্ম পঞ্চাশ লক্ষ কিউবিক দুইঞ্চি পিওর এবং মিলিটারীদের জন্ম এক ইঞ্চি, তিনপো, পাঁচ-সুতো, আধ ইঞ্চি, নানা সাইজের পাথর কুচি মোট বারো লাখ কিউবিক, সেই সঙ্গে পূর্ব্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় এয়ার স্ট্রিপ তৈরীর জন্ম ছোট পাথর কুচি, তার পরিমাণও কম নয়। কর্ত্তা ডেকে বল্লেন, যত পার বন্দোবস্ত কর। বল্লেন, যেখান থেকে পারো, সন্ধান করে কালো পাহাড়ের খবর নিয়ে এস, এখুনি লীজ নিতে হবে। কাছাকাছি রেলোয়ে সাইডিং না থাকলেও চিন্তা কোরো না, পাঁচ, সাত দশ মাইল ব্রড গেজ মিটার গেজ-যে কোন লাইন পাতার দরকার হলে পাতা যাবে; কিন্তু পাহাড়ের সন্ধান চাই অন্ততঃ কুড়ি তারিখের মধ্যে এবং মনে রাখবে আসছে মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে আমাদের ডেলিভারী সুরু করতে হবে।

ডালহৌসী স্কোয়ারে ষ্টিফেন হাউসের তিনতলার ঘরে পাখার তলায় মোটা গদি আঁটা চেয়ারে বসে কাঁচমোড়া সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাঁচের তলায় পাতা ক্যালেণ্ডারের তারিখ দেখিয়ে কাপুর সাহেব বল্লেন, কুড়ি তারিখের মধ্যে পাহাড়ের সন্ধান পেলে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখের মধ্যে পাহাড়টা এ্যাকুইজিশন করিয়ে একই সঙ্গে পাহাড়ে ব্লাষ্টিং ও ব্রেকিং চলতে থাকবে এবং সেই সঙ্গে যতটুকু দরকার রেলের সাইডিং পাতাও হয়ে যাবে। এই ভাবে প্রিলিমিনারী ও সেকেণ্ডারী সমস্ত কাজ শেষ করে আমি চাই আগামী মাসের পঁচিশ তারিখে ওয়াগনে লোডিং সুরু করতে। দেখবেন এই হিসেবের যেন এদিক ওদিক না হয়।

উত্তর বিহার থেকে ছোটনাগপুর পর্য্যন্ত সমস্ত অঞ্চলের সার্ভেম্যাপ আলমারী থেকে নামিয়ে টেবিলের ওপোর গম্ভীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করতে করতে বল্লুম, কোন্, অঞ্চলে খোঁজ করি বলুন ত। ৮০।৯০ লক্ষ কিউবিক মাল এখনই চাই এবং সাইডিং পাততে হলে অন্ততঃপক্ষে একশ কোটি কিউবিকের প্রস্পেক্ট রেখে কাজ করতে হবে। এতখানি বেগার ব্ল্যাক রক পাই কোথায়?

তিনি বল্লেন, ছাটস্ ইওর হেড-এক। আপনারা টেক্নিক্যাল্ ম্যান, আপনারা বুঝবেন। কিন্তু টাইমের ডেড্ লাইনের মধ্যে মাল আমার চাই।

কাপুর সাহেব কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হলেও আমাদের কাছে খুবই 'মাইডিয়ার' লোক। মুখে যাই বলুন, মনে মনে আমার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা আছে। ওর হুম্কীতে ভ্রূক্ষেপ না করে ম্যাপ দেখতে দেখতে বল্লুম, সরগুজা স্টেটের রামগড় পাহাড়টা কেমন হবে বলুন ত? জিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট থেকে—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে কাপুর বল্লেন, এনি ড্যাম্ হিল, আই ডোণ্ট মাইণ্ড—। একটু থেমে বল্লেন, ওটা কোথায়? খুব বেশী দূর হলে রেলোয়ে ফ্রেট পড়বে অনেক।

বল্লুম, ছোটনাগপুরে।

তিনি বল্লেন, ছাটস্ রাইট। আপনি খোঁজ করুন।

মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে মোটা কাপুর আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, হপ্তাখানেকের জন্য আমি বেরুব। আপনাদের টি এ বাবদ কত দরকার হবে বলুন, অর্ডার দিয়ে যাই।

বললুম, হাজার দুয়েক দিয়ে যান। গোটা এরিয়ার স্টাফ নিয়ে ঘুরতে হবে ত!

তিনি বল্লেন ও, কে। তাঁর পি, এ-কে ডেকে পে-অর্ডার লিখতে বল্লেন।

দুই

আমার স্টাফ্ নিয়ে বেরিয়েছি। স্টাফের প্রথম ব্যক্তি শ্রীনির্মল সেন জিওলজিতে এম-এস-সি, মাত্র দু'বছর হোল পাস করেছে, স্মার্ট, চটপটে, কাজ পাগল ছেলে। দু'টো কাঠের সিন্ধুকে তার চলমান ল্যাবোরেটারী নিয়ে আমার সঙ্গে এসেছে, আর এসেছে আমার বহুদিনের সঙ্গী রাইফেলধারী বনগবাহাদুর রানা। বাহাদুর নেপালী, ভয় কাকে বলে সে জানে না, তার সঙ্গে আছে তার দশজন অনুচর যাদের বলা হয় পোর্টারম্যান, অর্থাৎ কুলী। তারা মালপত্র বয়, তাঁবু খাটায় ও গোটায়, বুনো জন্তু জানোয়ার তাড়ায় এবং কোন বিপদকে বিপদ বলে মনেই করে না। এ ছাড়া আমার নিজস্ব বৃদ্ধ বয় শরণ সিং পাঞ্জাবী। যে কোন বেখাপ্পা অবস্থায় রুটী ও মাংস বানাতে ওস্তাদ, বুটের লাথি মেরে গোখরো সাপের মাথা থেঁতে দিয়ে জঙ্গল কাঁপিয়ে হাসে, এক বোতল বিলাতী মদ গিলেও এতটুকু টলে না। এক সময় মিলিটারীতে ভারী ট্রাক চালাত, এখন বুড়ো হয়ে আমার কাছে হাল্কা রান্নার কাজ নিয়ে প্রায় স্বাধীনভাবেই চাকরী করে। কোম্পানী তারও হাতে একটা রাইফেল তুলে দিয়েছে।

ক'দিন ঘুরে ঘুরে রামগড়ে এসে তাঁবু ফেলেছি। জায়গাটা দুর্গমই বটে। নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশন থেকে আঠারো মাইল মোটরে এসে সেখান থেকে হস্তীপৃষ্ঠে দশ মাইল পাহাড় ও জঙ্গল ভেঙ্গে তবে এই রামগড়; নিকটবর্ত্তী লোকালয় ঐ দশ মাইল দূরে। এখানে এসেই মনে হোল, পথশ্রম সার্থক হয়েছে, কারণ—

কিন্তু পথশ্রম সার্থক হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পেলুম পরের দিনে, যে দিন দেখলুম, পাহাড়ের পশ্চিম দিকে উঁচু উঁচু অনেকগুলি কালো পাথরের মসৃণ টিলা, যেখানে একটা ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় নি, ধুলো বালি পর্য্যন্ত পাহাড়ের গায়ে জমতে পারে নি। ছেনী হাতুড়ী নিয়ে নমুনা পাথর কেটে নির্মলকে দিতে সে তার ল্যাবোরেটরীতে পরীক্ষা করে বল্লে, দাদা, এই কোয়ালিটির পাথর কংক্রীটের পক্ষে একেবারে আইডিয়েল। এ রকম নন্-পোরাস্ অথচ হাল্কা পাথরে যে এতখানি কম্প্রেসন দিতে পারে এবং এই পাথর যে এমন বিপুল পরিমাণে কমার্শিয়াল স্কেলে এখানে আছে তা আমাদের কোন সার্ভে কেতাবে কোথাও পাই নি। আমি জোর করে বলতে পারি, এই পাথরের কংক্রীটে লোড বেয়ারিং সমান রেখে পাকুড়-চীপের তুলনায় এর টেয়ার-ওয়েট শতকরা পনর থেকে কুড়ি ভাগ কম হবে।

সেদিক থেকে এটা অবশ্য আবিষ্কারই বটে, কিন্তু অন্য দিকে অনেক ঝামেলাও আছে। নিকটবর্ত্তী লোকালয় দশ মাইল দূরে, সেখান থেকে রেল লাইন আঠারো মাইল। এই আঠারো মাইল পথ এমনই সুন্দর যে ফোর্ডের টি-মডেল গাড়ীতে, অথবা জীপে ছাড়া যাওয়াই যায় না। ম্যাপ ধরে হস্তীপৃষ্ঠে সোজা রেল লাইন বাবার জন্য দু'দিন ধরে চেষ্টা করে দেখলুম, রেল লাইনের সর্ব্ব-নিম্ন দূরত্ব উনিশ মাইল; কিন্তু জায়গাটা এমনই অসমতল যে, রেলের লাইন পাততে গেলে উনিশ মাইলের মধ্যে বারো মাইলের কতকটা জায়গায় ২৫।৩০ ফিট পর্য্যন্ত কেটে নামাতে হবে এবং বাকী জায়গা কোথাও কোথাও এমন কি ৩০।৪০ ফিট ভরাট করে তবে লেভেল পাওয়া যাবে। এছাড়া তিনখানা দু'শো ফিট চওড়া সাঁকো বানাতে হবে এবং নীচু জমি ভরাট করার ফলে অন্ততঃ দুডজন দু'ফুটী কালভার্ট দেওয়া অবশ্যই দরকার। তবে এ পথে সুবিধে এই যে, সিরগুজা ষ্টেটের হুকুমটা নিতে পারলেই কাজ আরম্ভ করা যেতে পারবে, কারণ এখানে কোথাও কোন লোকালয় বা ক্ষেত খামার না থাকার জন্য কাজে অন্য কোন বাধা পড়বে না বা কাউকে কোন ক্ষতিপূরণও দিতে হবে না। অপরপক্ষে দেহাতী রাস্তার পাশে পাশে রেল লাইন চালাতে গেলে মোট দূরত্ব হবে আটাশ মাইল এবং আটাশ মাইলের প্রথম দশ মাইল বিশ্রী উচু নীচু পাহাড়—যেখানে হেভি গ্রাডিং-এর দরকার এবং পরের আঠারো মাইল ক্ষেতখামার লোকালয় থাকার

জন্য মালিকদের মোটা টাকা খেসারত দিতে হবে। অথচ এদিকে জংলী উনিশ মাইল পথে কাজ করবার আর একটা বড় অসুবিধা এই যে, এই পথের কাছাকাছি কোন লোকালয় না থাকার দরুণ প্রত্যেকটি শ্রমিককে বাইরে থেকে এনে তাদের থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করতে হবে এবং এই লাইনের একজায়গায় একটানা সাত মাইল পথে নদী বা জলাশয় না থাকায় এই সাত মাইলে যখন কাজ হবে তখন প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় সমস্ত জল দূর থেকে আনাতে হবে।

আগাগোড়া সমস্ত সরেজমিনে তদারক করে জায়গাটার একটা পেন্সিল-স্কেচ ম্যাপ এঁকে নির্ম্মলকে সমস্ত বুঝিয়ে মিঃ কাপুরের কাছে একখানা রিপোর্ট নির্ম্মলের হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিলুম এবং কাপুর সাহেবের পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের জন্য অপেক্ষা করে এখানকার তাঁবুতেই রয়ে গেলুম। যে চারটে হাতী ভাড়া করে আমরা মোটর থেকে নেমে এখানে এসেছিলুম তার তিনটে হাতী ছেড়ে দিয়ে শুধু একটা হাতীকে রেখে দিলুম, আমাদের দৈনিক বাজার ও অন্য যোগাযোগ রক্ষার জন্য।

তিন

দুদিন আগে নির্ম্মল চলে গেছে। ওদিককার কোন খবর এখনও পাইনি। আমার এখানে খবর বলে কিছুই নেই, খবরের কাগজ নেই। বুড়ো মাহুত সকালে হাতীকে খাওয়াবার জন্য জঙ্গলে নিয়ে যায়, বেলা ১টা নাগাদ জঙ্গল থেকে ফিরে নিজে আহারাদি শেষ করে বেলা আড়াইটে-তিনটে নাগাদ গ্রামে যায় হাট করতে; সেখান থেকে আমাদের সকলের জন্য বাজার সেরে সন্ধ্যার পর ফিরে আসে। কাল সে খবর এনেছিল, কোথায় নাকি বাঘ বেরিয়েছে, তবে মানুষ-খেকো নয়, অতএব—ইত্যাদি। বলেছিলুম, খবরের কাগজ পেলে নিয়ে এসো। সে হেসে বলেছিল, তাদের গ্রামে কেউ কোনদিন পয়সা দিয়ে খবরের কাগজ কেনে না, কোন কাগজ বিক্রীও হয় না।

আপন মনে ডেক চেয়ারে বসে থাকি। একএকবার মনে হয় কাছাকাছি সমস্ত জায়গা থেকে স্যাম্পল নিয়ে নির্ম্মলের ল্যাবরেটারীতে টেস্ট করে দেখি, আরও কি কি কোয়ালিটি আছে, কিন্তু ভালো লাগে না। চুপ করে বসেই থাকি। পাঞ্জাবী বয় আমার ও বাহাদুরের জন্য রসুই করে এবং আরও খানিকটা দূরে দশজন পোর্টারের রান্না তারা নিজেরাই পালা করে সেরে নেয়। কাপুর কোম্পানীর পয়সায় হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়ে সেই খাবার দশমাইল দূরের হাট থেকে আসে। প্রায় যেন অন্যমনস্ক হয়েই দুটো দিন ও দুটো রাত্রি পার হয়ে গেল।

লোকে বলে, গোলামী জীবনে সুখ নেই। আমি কিন্তু এই সুখদুঃখ জিনিষটা ঠিক বুঝি না। কেন জানি না এটা হয়ত আমার স্বাভাবিক অনুভূতির খর্ব্বতা, কোন কিছুতেই আমার কষ্ট অথবা আনন্দ হয় না। একথা আমি জোর করেই বলব যে, আমি মহাপুরুষ নই, অন্যায় কাজ দরকার হলেই করি, কিন্তু তবুও যে আমি সুখ-দুঃখের অতীত তার কারণ আমি স্থির জানি, আমার অনুভূতি শক্তির অভাব, ঐ বিষয়ে আমি নিশ্চয়ই বিকলাঙ্গ। জন্মান্ধের কাছে আলো-আঁধারীর কোন ভেদ নেই, জন্মবধির গান ও গালাগালির কোনটিতেই বিচলিত হয় না, আমিও বোধ হয় সেইরূপেই সুখদুঃখের অনুভূতি সম্বন্ধে অসাড়, তা এতে আমি মহাপুরুষ না হলেও [illegible] তুলনায় ভালই থাকি। পদ্মপত্রে জলের দাগ না-লাগাটা পদ্মপত্রের মাহাত্ম্য না বলে জল-টানবার অক্ষমতা বল্লেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে অধিকতর সত্যভাষণ হয়। বসে বসে এই সব সাত পাঁচ এলোমেলো ভাবতে ভাবতে দিন কেটে যায় এবং নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে যাই, এরকম অলস অপ্রয়োজনীয় চিন্তা আগে আগে কখনও-কখনও মনে এলেও এখানে এই জঙ্গলে এসে দেখছি, এই জাতীয় কর্ম্মনাশা অসার চিন্তা যেন আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই পেয়ে রয়েছে। এটা বোধ-হয় প্রাকৃতিক প্রভাব।

তৃতীয় দিন সকালেও তাঁবুর সামনে চুপ করে অন্যমনস্কভাবে বসে আছি, বাহাদুর এসে খবর দিলে, দেহাতীমে দু'জন সাহেব আসছে।

বল্লুম আমাদের অফিসের কেউ আছে? নির্ম্মলবাবু?

সে বল্লে, নেহি জী।

চেয়ার ছেড়ে উঠে এগিয়ে এলুম। একটু পরেই হস্তী-পৃষ্ঠে সোলা-টুপি মাথায়, সিভিল স্যুটে আগন্তুকদের দেখা গেল। ভালো করে দেখলুম, কাউকেই চিনি না।

তাঁবুর কাছাকাছি এসেই হাতী দুটো দাঁড়াল' তারপর মাহুতের ইঙ্গিতে সে দুটো বস্‌ল। লোকগুলো হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল।

বিস্মিত জিজ্ঞাসুনেত্রে তাদের দিকে এগিয়ে যেতেই ওদের মধ্যে যিনি ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি গুড্‌মর্নিং না দিয়ে দুহাত জোড় করে কপালে তুলে পরিষ্কার বাংলায় বল্লেন নমস্কার, মাহুতের কাছে শুনলুম আপনি এখানে তাঁবু ফেলে আছেন, তাই প্রথমেই আপনার কাছে এলুম।

বললুম, বেশ বেশ, খুব ভালো কথা, আসুন আপনারা। বাহাদুরকে বললুম, বাহাদুর, তাঁবু থেকে গ্রাউণ্ড শীটটা এনে এইখানেই পাতো একসঙ্গে বসা যাক্। আগন্তুকদের বললুম, ভূমিশয্যা ভিন্ন আর গতি নেই দাদা, কারণ আমার সম্বল আছে মাত্র দু'খানি ক্যাম্প চেয়ার।

তিনি বল্লেন, ঠিক আছে, সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। বয়ঃকনিষ্ঠ পাঁচজনকে তিনি বল্লেন, বোসো, একটু বিশ্রাম করে নাও, তারপর এই দাদার সাহায্য নিয়েই—

বললুম—কি ব্যাপার বলুন ত? শিকার টিকারের উদ্দেশ্য আছে বুঝি?

তিনি বল্লেন, না ভাই, শিকারের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এসেছি বেড়াতে এবং একটা জিনিষ দেখতে।

বিস্মিত হয়ে বললুম—বেড়াতে এবং জিনিষ দেখতে! এখানে বেড়াবার স্থান এবং দেখার জিনিষ ত কিছুই নেই।

তিনি বল্লেন, কি জানি, আছে কি না বল্‌তে পারি না, তবে ছিল বলেই ত জানি। তা যাক্ আপনি ত এসেছেন রেল লাইন বসাবার জন্য। তা আপনি বি, এন্, রেলের তরফ থেকে এসেছেন, তাই না।

হাসি এল। বল্লুম, তা ঠিক নয়, তবে এ আপনি শুনলেন কোথা থেকে?

বল্লেম, কেন, মাহুতরা বল্লে। ওরাই ত আপনাদের এখানে এনে বসিয়ে গেছে। ওরাই ত আপনার কাছে আমাদের নিয়ে এল।

তা বটে! এই মাহুতদের পরশু আমি ছেড়ে দিয়েছি। শেষে বল্লুম, আমি এসেছি একটা জিওলজিক্যাল সার্ভের ব্যাপারে, তা সে কাজ কতদূর কি হবে বল্‌তে পারি না, কিন্তু আপনাদের দ্রষ্টব্য জিনিষটা কি বলুন ত?

তিনি বল্লেন, আমাদের হচ্ছে ইতিহাসের পাগলামি। এখানে এই রামগড় পাহাড়ে কোথায় নাকি যোগিমায়া গুহা আছে, সেই গুহাটা আমরা দেখতে এসেছি। ঐ গুহায় খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর মাগধী প্রাকৃতে ব্রাহ্মী অক্ষরে খোদাই করা একটা গিরিলিপি আছে,ঐটা দেখব।ইতিহাসে ঐ লিপিটার নাম দেওয়া আছে 'সুতনুকা গুহা লিপি'।

কেন জানি না, নামটা শোনা মাত্রই আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠল। অকারণে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হ'ল। কিছুক্ষণ কোন উত্তরই দিতে পারি নি। শেষে প্রায় তোৎলার মত কণ্ঠস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম, ঐ গুহালিপির কথা কে বল্লে আপনাদের?

তিনি আমার মানসিক ভাবান্তর বোধ হয় লক্ষ্য করেন নি। প্রাণপণে চেষ্টা করেই আমি আমার ভাবান্তর গোপন রেখে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছিলুম, এই অকারণ আকুলতার কারণ কি!

তিনি বল্লেন, ঐ গুহালিপির কথা আমরা পেয়েছি ১৯০৩-০৪ সালের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়ার বার্ষিক বিবরণী থেকে। ঐ গুহালিপি থেকে দুটো বিশেষ জিনিষ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পূর্ব্বদেশীয় মাগধী প্রাকৃতের প্রত্যক্ষ রূপ এবং দ্বিতীয়তঃ বারাণসীর তৎকালীন প্রচলিত ব্রাহ্মী লিপি। ওগুলোর ফটোস্টাট ছাপানো বইয়ে আছে, আমরা চেষ্টা করব ওর আশে পাশে আরও যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়, কারণ আমার বিশ্বাস ওখানে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে তিনি থেমে গেলেন, কিম্বা হয়ত আরও কিছু বলেছিলেন যা আমার কানে ঢোকে নি। সর্ব্বশেষ তিনি বল্লেন, গুহাটা কোথায় আমাদের কিছু হদিস্ দিতে পারেন।

বল্লুম, গুহাটা ঠিক কোনখানে জানি না, তবে জায়গাটা বোধহয় যেন দেখেছি বলেই মনে হচ্ছে।

কথাটা বলা শেষ করেই মনে হোল, একি কথা বলে ফেল্লুম, গুহা-টুহা ত কোথাও দেখি নি।

ছোকরাদের মধ্যে একজন উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেও এখান থেকে কতদূরে স্যার?

নিজের মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিয়ে বল্লুম, আপনারা বুঝি ইতিহাসের গবেষণা নিয়ে বেরিয়েছেন।

তিনি বল্লেন, হ্যাঁ, ঐ রকমই একটা ব্যাপার। এরা পাঁচজন হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের এম এ ক্লাশের ছাত্র, আর আমি এদের সঙ্গে আসছি।

বল্লুম, ও, আপনি বুঝি ইউনিভারসিটির প্রফেসর।

ঘাড় নেড়ে তিনি বল্লেন, লেকচারার।

মুখে হাসি এনে বল্লুম—যাক্, ভালই হোল, আজ সকালে এতগুলি শিক্ষিত লোকের সাক্ষাৎ পেলুম। বাহাদুরকে ডেকে বল্লুম, বাহাদুর, বয়কে বল, চট করে চা, হালুয়া এবং ডিম যদি থাকে তাহলে আমলেট করে দিতে।

অধ্যাপক বল্লেন—এই সব আবার কেন হাঙ্গামা করছেন। আমরা আহারাদি পর্ব্ব শেষ করেই এসেছি।

বললুম, তা হোক। এই জঙ্গলের মধ্যে আর ত কিছুই নেই, এমন কি বসবার জায়গা পর্য্যন্ত দিতে পারলুম না।

ছাত্রদের মধ্যে ঔৎসুক্য প্রবল। ওরা আবার প্রশ্ন করলে, গুহাটা এখান থেকে কতদূরে স্যার, কোন্ দিকে?

বললুম. তা ত জানি না ভাই। আমি এখানে মোটে হপ্তাখানেক হোল এসেছি এবং গুহা-টুহা কিছুই দেখি নি।

অধ্যাপক বল্লেন, আপনার মাহুত কোথায়? শুনলুম সে নাকি সব জানে।

একজন ছাত্র বল্লে, আমাদের মাহুত বল্লে যে, আপনার কাছে হাতী নিয়ে যে বুড়ো মাহুতটা আছে সে হচ্ছে ওদের সর্দ্দার এবং সে এখানকার সমস্ত জায়গা জানে। তাকে পেলে সব সন্ধান পাওয়া যাবে।

বললুম, তবেই হয়েছে। সে সকালে তার হাতী নিয়ে জঙ্গলে গেছে হাতীকে খাওয়াতে, একটার আগে সে কোনদিন ফেরে না।

ছেলেটি বল্লো—আমাদের একজন মাহুতকে হাতী দিয়ে তাকে খুঁজে আনবার জন্য পাঠালে হয় না?

অধ্যাপক চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বল্লেন, মুস্কিল। আমাদের কিন্তু বেলা তিনটের মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়া দরকার। কারণ জিনিষপত্তর সঙ্গে কিছু আনা হয় নি, সমস্তই ওখানে পড়ে আছে।

বাহাদুর ধারে কাছে কোথায় যেন ছিল। সে যে আমাদের কোন কথা শুনছে তা আমার মনে হয় নি। হঠাৎ এগিয়ে এসে সেলাম ঠুকে বল্লে, বাহুত আগয়া সাব। বল্‌তে বল্‌তেই দেখা গেল, আমাদের হাতীটা বুড়ো মাহুতকে নিয়ে ওপাশ থেকে এগিয়ে আসছে।

ওকে দেখে খুসিমনে মাহুতকে বললুম, কি হে, এরই মধ্যে আজ যে ফিরে এলে?

সে বল্লে, ঐ যে ওরা সব এসে গেছে, তাই। বললুম, টের পেলে কি করে?

সে বল্লে, আমি টের পাই নি স্যার, হাতী টের পেয়ে আমাকে জানালো, তাই ওদের সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

প্রফেসারকে বললুম, তাহলে দেখুন, জন্তু জানোয়ারদেরও নিজস্ব একটা ওয়ারলেস্ আছে। মাহুতকে বললুম, তুমি এসেছ, ভালোই হয়েছে; এখন রামগড় পাহাড়ে যোগীমরা গুহা কোথায় আছে বলতে পার? সাহেবরা সেই গুহা দেখতে এসেছেন।

মাহুত একটু ভেবে নিয়ে বল্লে, ও ধারে একটা গুহা আছে সা'ব। সেখানে সাহেবরা দু'বার এসেছিল আমি জানি। একবার যখন আমি খুব ছোট ছিলুম, সেই তখন। আমার বাবা সেই সাহেবদের এনেছিল। দ্বিতীয় বারে আমি অন্য একটা দল নিয়ে এসেছিলুম। আমার এই হাতীই এসেছিল। হ্যাঁ জী, সে গুহা আমি জানি।

বললুম এখান থেকে কত দূর?

মাহুত বল্লে, দো মিল হোগা সা'ব।

বললুম—এখন গেলে বিকেলে ফেরা যাবে ত?

সে বল্লে, জরুর।

ছাত্রদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলে, হাতী থেকে নেমে কতটা হাঁটতে হবে?

মাহুত বল্লে, বাস্, থোড়াই।

অধ্যাপক আমাকে নিমন্ত্রণ জানালেন। বল্লেন, আপনিও চলুন না কেন আমাদের সঙ্গে, যদি [illegible] আপনার কাজের কোন ক্ষতি না হয়।

বল্লুম, নাঃ, ক্ষতি আর কি, যেতে পারি। সত্যি কথা বলতে কি, আজ আমার হাতে কোন কাজই নেই।

তিনি বল্লেন, বাস্, তা হলে তৈরী হয়ে নিন।

ইতিমধ্যে চা এবং হালুয়া তৈরী হয়ে এল। [illegible]

সেরে অজানা গুহার দিকে তিনটে হাতী নিয়ে রওনা হওয়া গেল।

চার

প্রথম যাচ্ছে আমার হাতীটা, তার পিঠের ওপোর আমি আর প্রফেসার। চালক সেই সর্দ্দার মাহুত। পেছনের দুটো হাতীতে পাঁচটি পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ছাত্র। প্রফেসার বল্লেন, এই ভাল হোল, না হলে ছেলেগুলো আমার সঙ্গে থাকলে সিগারেট খেতে না পেয়ে পেট ফুলে মরত, আর আমাদের অভিশাপ দিত।

আমি বল্লুম, ঠিক আছে। সামনের দিকে মুখ করে বসুন, পেছন ফিরে চাইবেন না যেন।

তিনি হাসতে লাগলেন। বল্লুম, আপনারা এত খরচ-পত্তর করে রামগড় পাহাড়ে আসছেন, কিন্তু ঐ যোগীমরা গুহায় কি এমন অপূর্ব্ব জিনিষ আছে!

তিনি বল্লেন, দেখুন, ঐ গুহায় যে গুহালিপিটা আছে সেটা নানা দিক দিয়ে খুব দামী। প্রথমতঃ, ওর ভাষাটা হবে প্রাচীন। পণ্ডিতরা অনুমান করছেন যে ওটা হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রাচীন মাগধী-প্রাকৃত ভাষা। ভাষার দিক দিয়ে ওটা রাজা অশোকের শিলালিপিগুলির সমসাময়িক। দ্বিতীয়তঃ ঐ ভাষার আর একটা মাধুর্য্য আছে, যেটা প্রিয়দর্শীর লিপিতে নেই।

বল্লুম, প্রিয়দর্শী কে?

তিনি একটু হেসে বল্লেন, অশোক অনুশাসন বলে যেগুলো প্রচলিত আছে সেগুলোর কোনটায় অশোকের নাম নেই। ওর সবগুলোর নির্দ্দেশদানকারীর নাম পাওয়া যায় 'দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা' এই নামে। পণ্ডিতরা মনে করেন যে প্রিয়দর্শী হচ্ছেন অশোক। তা প্রিয়দর্শীই হোন আর অশোকই হোন, তাঁর লেখায় একেবারে অন্তরের স্বতঃউৎসারিত ভাষার রূপ ঠিক পাওয়া যায় না। কারণ রাজারাজড়ার ব্যাপার, যেটুকু স্থায়ীভাবে খোদাই করে লেখা হবে সেটা নিশ্চয়ই পণ্ডিতদের দিয়ে ভাল করে ঘষামাজা করিয়ে তবে লেখানো হয়েছে। অর্থাৎ ওর মধ্যে সভাপণ্ডিতের মুন্সিয়ানা থাকবেই। কিন্তু এখানকার এই রচনায় সে রকম কোন গুছিয়ে লেখবার চেষ্টা নেই। এটা হচ্ছে তেইশ-শ' বছরের আগেকার একজন ব্যর্থ প্রেমিকের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস। কাজেই এখানে যে ভাষা আর যে বানান পাওয়া যাবে তা একেবারে খাঁটি সাধারণ লোকের ভাষা। দ্বিতীয়তঃ, এই লিপিতে যে ব্রাহ্মী অক্ষর পাওয়া যায়, তাই হচ্চে সত্যিকার ব্রাহ্মী অক্ষরের রূপ। কারণ এটা ঐ ভাস্কর-লেখক স্বহস্তে খোদাই করেছেন এবং ভাস্করটিও বড় কম নন। ইনি সেকালের কাশীর এমন নামকরা ভাস্কর ছিলেন যে একে নির্ব্বাসন দিতে তৎকালীন কাশীর রাজা বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলেন। অতএব এই লিপিটার সব দিক দিয়ে একটা শ্রেষ্ঠত্ব আছে।

বল্লুম, ভাস্কর-লেখকটি কে ছিলেন বলুন ত? তিনি যদি এতই ভাল, তাহলে কাশীর রাজা নির্ব্বাসনই বা দিয়েছিলেন কেন?

অধ্যাপক হাতীর পিঠে একটু নড়েচড়ে ঠিক হয়ে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে বল্লেন, যেটুকু বোঝা যায়, এর মধ্যে খুব একটা মর্ম্মান্তিক দুঃখ আছে। আজ থেকে তেইশ শ' বছর আগে কাশীতে দেবদত্ত নামে এক ভাস্কর ছিল। তার হাতের কাজ খুব ভালো দেখে তৎকালীন কাশীরাজ এঁকে মন্দিরের দেওয়ালে কারুকার্য্য করার জন্য স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করেছিলেন। মনে করুন, একজন তরুণ শিল্পী, সেকালের খাঁটি আর্য্য সন্তান। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বংশানুক্রমে বাস করার ফলে দুধে-আলতায় রং, চওড়া বুক, তাতে ঝুলছে হার, বাতির মত নিটোল হাত তাতে কংকণ, সরু লম্বা আঙুলগুলি শিল্পীমনের পরিচায়ক। খাড়া নাক, টানাটানা চোখ, জোড়া ভ্রু, প্রশস্ত কপাল, ঘন কৃষ্ণ চুল বাবরী করে মাথার পেছন দিকে ঘাড় পর্য্যন্ত নেমে এসেছে, কুণ্ডলভূষিত কর্ণ, অতলস্পর্শী স্বপ্নাতুর দৃষ্টি। সে চাউনিতে পারিপার্শ্বিক কঠোর বাস্তব অবাস্তব হয়ে কল্পনার মায়াজালেই বাস্তবতার মূর্ত্ত হয়ে ওঠে। এমনি এক তরুণ শিল্পী প্রবলপ্রতাপ কাশীরাজের একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকতায় সব রকম সামাজিক নিয়ম-কানুনের গণ্ডী ভেঙ্গে নিজের খুসিখেয়াল মত রূপচর্চ্চাই করত। সেই শিল্পী রাজার নিজস্ব দেবালয়ের কারুকার্য্য করতে গিয়ে সেই দেবালয়ে দেখল এক তরুণী নর্ত্তকীকে। সে দেবদাসী। সেকালের নিয়ম জানেন ত? বিবাহের পর যদি দু'চার বছরের মধ্যে দম্পতির কোন সন্তান-সম্ভাবনা না হোত তাহলে স্বামী স্ত্রী একত্রে মানসিক হোত যে সেই অপুত্রক কোলে ভগবান্ যদি সন্তান দেন,

তাহলে প্রথম সন্তানটিকে তাঁরা দেবসেবায় নিযুক্ত করবেন। প্রথম সন্তান কন্যা হলে তাকে মন্দিরে দেবদাসী করে দেওয়া হবে, পুত্র হলে তাকে দেবদাস বা সন্ন্যাসী করে দেওয়া হবে। পরবর্ত্তী সন্তানগুলি পিতামাতার সঙ্গে সংসারী হয়ে থাকবে।

অধ্যাপককে বাধা দিয়ে বল্লুম, বাস্তবিক, নিয়মটা কি নিষ্ঠুর ছিল বলুন ত? সেকালের লোকেরা নবজাতকের জীবনের যে অন্য কোন সার্থকতা থাকতে পারে তা যেন স্বীকারই করত না!

জিভ দিয়ে তালুর সঙ্গে একটা শব্দ করে অধ্যাপক বল্লেন, এ ত অনেক ভাল নিয়ম মশাই। পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতায় এবং আমাদের এখানেও পরবর্ত্তী কাল, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও বটে, এর চেয়ে আরও যে কত নিষ্ঠুর নিয়ম প্রচলিত ছিল তা শুনবেন? কার্থেজীয়রা দেবতাকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রথম ছেলেটি পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করলে তাকে জীয়ন্তে বেড়া-আগুনের মধ্যে ফেলে দিয়ে দেবতার মানসিক রক্ষা করত। সেই ছেলে বাপ মায়ের সামনে প্রাণান্তকর চিৎকার করতে করতে আগুনে দগ্ধ হোত। ফিনিসীয়রা দেবতার মন্দিরে জীয়ন্ত ছেলের বুকে ছুরি বিঁধিয়ে তার গরম রক্তের ধারা দেবতার নামে অর্পণ করত। সেই পৈশাচিক কাজে ছেলের মা ছেলেকে চেপে ধরে থাকত এবং বাপ তার বুকের মধ্যে ছুরি চালিয়ে দিত। খাস ইংলণ্ডের কর্ণওয়াল নামক জায়গায় যে ষ্টোনহেঞ্জ আছে সেটা এখনও পর্য্যন্ত দর্শকরা দেখতে যায়। সেখানে একশ'জন জীবন্ত মানুষকে মাথা নীচে পা ওপোরে—এই অবস্থায় পাথরের থামে খুব ক'ষে বেঁধে মাথার তলায় আগুন জ্বেলে দেওয়া হোত, এবং সেই ধোঁয়ায় মাথা নিচু করে বাঁধা মানুষগুলোর প্রথমে দম বন্ধ হয়ে আসত এবং তারপর আগুন জলতে সুরু হলে একশটা জীবন্ত লোকের মাথার খুলি খুব ধীরে ধীরে পুড়তে থাকত। এই একশটা লোকের আকুল আর্ত্তনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ইংলণ্ডের কেল্ট জাতি এবং তার ড্রুইড পুরোহিত দেবতার উপাসনা করে আত্মতৃপ্তি লাভ করত মাত্র দুহাজার বছর আগে।

আমাদের দেশেই বা কি! প্রাচীন কামরূপে ছেলের করে অর্থাৎ মন্দিরে বলিদান দিয়ে দেশবাসীর মধ্যে গৌরব অর্জ্জন করতেন। সতীদাহই বলুন, গঙ্গাসাগরে ছেলে ফেলাই বলুন, আর নরবলিই বলুন—সবই ত ঐ এক, সে হিসেবে মেয়েকে দেবদাসী করা ছেলেকে সন্ন্যাসী করা কি বেশী খারাপ?

অধ্যাপক আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন, দেখুন, ধর্ম্মের নামে মানুষ মানুষের ওপোর যে পরিমাণ অত্যাচার পরম আগ্রহে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সারা পৃথিবী জুড়ে চালিয়ে এসেছে, শুধুমাত্র শত্রুতার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে পরিমাণ অত্যাচার আজও অত বিপুল পরিমাণে বোধহয় করা হয়নি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলুম—সত্যি, সেকালের লোকেরা অন্ধ বিশ্বাসে বাস্তবিকই বড় নিষ্ঠুর ছিল।

তিনি ফোঁস করে উঠলেন, সেকাল মানে? এখনও, এই কালেও এই রকম অত্যাচার অহরহ হয়ে চলেছে। এখনও বামুনের ঘরে বিধবা মেয়েকে একাদশীর দিন নির্জ্জলা উপোসী রেখে বাপ মা নিজেরা পেট ভরে খায় না? এখনও এইকালেও বিধবা মেয়ে, বোনকে বসবাসের অযোগ্য একটা ঘরে একলা ফেলে রেখে তার বাপ, দাদারা সস্ত্রীক রাত্রি যাপন করে না? এখনও এই সভ্য জগতের আইন অনুসারে অপরাধীকে পঁচিশ ত্রিশ পঞ্চাশ ঘা বেত মারা হয় না? প্রাণদণ্ড কি সারা পৃথিবী জুড়ে বন্ধ হয়ে গেছে? ভেবে দেখুন ত, আইনানুগ প্রাণদণ্ড কি খুনের চেয়েও অনেক বেশী নৃশংস এবং ঘৃণিত নয়? ভাল করে বুঝে দেখুন, আপনা'র সঙ্গে আমার একটা তুমুল ঝগড়া হোল। টাকাকড়ি নিয়ে, মেয়েমানুষ নিয়ে, মান সম্মান নিয়ে এমনই একটা মানসিক অবস্থার সৃষ্টি হোল যে আপনাকে আমি আর এক তিলও সহ্য করতে পারছিনা, মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ আমি আপনাকে মেরে বসলুম, তাতে আপনার জীবনান্ত হোল। এ-খুনের তবু একটা কৈফিয়ৎ আছে। কিন্তু এই খুনের অপরাধে বিচারের নামে দেশের একজন শিক্ষিত সম্মানিত বিবেচক ব্যক্তি বিচারকের আসনে বসে লিখিতভাবে প্রাণদণ্ড দিলেন। জেলখানার আর-একজন শিক্ষিত কারাবিভাগের অফিসার, যিনি

তত্ত্বাবধান করে এসেছেন, তার সামনে আর একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ঠিক সময়মত ঘড়ি ধরে গলায় দড়ি দিয়ে একজন জীবন্ত মানুষকে ঝুলিয়ে হত্যা করা হোল। এই যে আইনসম্মত খুন, একে cold blooded নয় coldest blooded murder বলা উচিত। এই খুনের কী কৈফিয়ৎ আপনি দিতে পারেন বলুন ত? তা ছাড়া আজ আমরা সারা পৃথিবী জুড়ে প্রতি নিয়ত কসাইখানায় যে পরিমাণ প্রাণীহিংসা করছি তার কি কৈফিয়ৎ আছে? আজকের সুসভ্য পৃথিবীর সঙ্গে সাড়ে তিন হাজার বছর আগেকার মিশরীয় রাজা দ্বিতীয় র‍্যামেসেসের রাজত্বের তুলনা করুন। তেইশ শ বছর আগেকার ধর্মাশোকের রাজত্বের তুলনা করুন। মানবিকতার দিক থেকে ওদের তুলনায় আমরা এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছি। তবুও আমি বলব যে নিষ্ঠুরতার দিক থেকে আমরা অর্থাৎ ভারতীয়েরা অনেক কম। আমাদের তান্ত্রিকদের ক্রিয়াকলাপ স্মরণ রেখেই বলব, তারা অন্ধ বিশ্বাসে নরবলি দিয়েছে বটে, কিন্তু মানবিকতার দিকটাও একেবারে ভোলে নি। নরবলির পূর্ব্বে সেই মানুষটিকে প্রসাদের নামে এমন সব ভাঙ্ মিশ্রিত সরবৎ খাওয়াত যে তার বোধশক্তি লুপ্ত হোত, বলির নিয়মও ছিল এক কোপে কাটা, জবাই করা দূরের কথা এক কোপে না কাটলে তারা সেটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ বলে মনে করেছে। ছেলে মেয়েদের জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে না মেরে তাদের যে দেবদাসী এবং দেবদাস করে ছেড়ে দিত, আমি বলব এটা দেবতার নামে সন্তান অর্পণ করার একটা অহিংস ভদ্র সংস্করণ। সারা পৃথিবীর নিষ্ঠুর পরিবেশের মধ্যে এটাই যে সে আমোলের সব চেয়ে ভদ্র এবং সহৃদয় ব্যবস্থা, সেকথা স্বীকার না করে উপায় নেই।

অধ্যাপকের বক্তৃতায় বাধা দিয়ে মাহুত বল্লে, উধার দেখিয়ে সাব—ওহি হ্যায় আপকো গুহা।

দুজনেই চেয়ে দেখলুম, পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা গুহামুখ দেখা দিয়েছে।

অধ্যাপক বল্লেন, ও, তাহলে খুব বেশী দূর নয় দেখছি. পেছন ফিরে ছেলেদের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আমরা এসে গিয়েছি।

সকলেই উৎসুক হয়ে উঠল। মাহুতরা হাতী তিনটেকে বসালে আমরা মাটীতে নেমে পড়লুম।

ওধারের মত এধারেও কালো পাথর, তবে খুব খাড়াই নয়। ঘুরে ঘুরে স্বচ্ছন্দে ওঠা যায়, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, জায়গাটা যে আজ প্রথম দেখছি একথা কিছুতেই মনে হয় না। কেমন যেন মনে হয়, এর সবটাই আমার পরিচিত। পায়ে পায়ে সকলের সঙ্গে গুহামুখে এসে দাঁড়ানো গেল।

গুহার মধ্যে বিশ্রী এক দুর্গন্ধ। অন্ধকার গুহাভ্যন্তরে টর্চের আলো ফেললেই এক রাশ চামচিকে উড়তে শুরু করলে। প্রফেসার সিগারেট ধরালেন—আমিও পকেট থেকে পাইপ বার করে অগ্নি সংযোগ করলুম। টর্চের আলো নিয়ে একজন ছাত্র উৎসাহের আতিশয্যে গুহার মধ্যে ঢুকে পড়ল। পেছন থেকে অধ্যাপক বল্লেন—সাবধান, ভাল করে দেখে পা ফেলো। সাপ খোপ বাঘ ভালুক না থাকলেও বোলতা-ভীমরুলের চাক থাকতে পারে। ভাঙ্গা চোরাও অসম্ভব নয়। আমার দিকে ফিরে বল্লেন, আপনি কি এর আগে এদিকে এসেছিলেন?

চলুন হ্যাঁ, এ-ত—

থেমে গেলুম। মনে মনে ভেবে বললুম, কই না ত।

আমার উল্টো পাল্টা কথায় প্রফেসার আমার মুখের দিকে রীতিমত সন্দেহের দৃষ্টি দিতে লাগলেন। আমিও যেন কেমন সঙ্কোচ বোধ করলুম।

ইত্যবসরে ছেলেরা সকলেই ভেতরে ঢুকে পড়েছে। একটি ছেলে বল্লো—স্যার এদিকে—এই দিকে।

গুহার শেষ প্রান্তে সোজা সোজা লম্বা লম্বা অক্ষর পাথুরে দেওয়ালের গা খোদাই করে সারি সারি সাজানো রয়েছে। অধ্যাপক কাছে গিয়ে সেই লেখার গুলোর হাত বুলিয়ে বল্লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই ব্রাহ্মী অক্ষরই বটে। পকেট হাতড়ে বার করলেন এক মাঝারী সাইজের লেন্স। টর্চের আলোয় লেন্সের সাহায্যে সেই অক্ষরগুলি বড় হয়ে চোখে পড়ল। ওরা এক একটা করে অক্ষর পড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ অকারণেই আমার চোখের জলে আমার নিজের দৃষ্টি এমন ঝাপসা হয়ে এল যে কিছুই দেখতে পেলুম না। কেবলই মনে হতে লাগল, পঞ্চাশ একশ বছর নয়, পাঁচশ সাতশ বছর নয়, হাজার, দেড়-

হাজার এমন কি দুহাজারও বছর আগেও নয়, দুহাজার তিনশ বছর আগে আমারই মত একজন মানুষ, এক নির্ব্বাসিত প্রেমিক, এই জনশূন্য পাহাড়ে একাকী বাস করেছে, এর প্রাণের আবেগ রোধ করতে না পেরে যা মনে এসেছে তাই লিখেছে, পাগল, সে নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গিয়েছিল। হয়ত এই আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এইখানেই দাঁড়িয়ে কাঁদত হাসত, নিজের মাথার বাবরী জটা নিজেই দুহাতে ছিঁড়ত, নিজের চোখের নোনতা জলের আস্বাদ নিজের জিভ দিয়ে একা একাই গ্রহণ করত সে। কথা বলার একটি লোক নেই, অসুস্থ হলে মুখে এক ফোঁটা জল দেবার কোন সহায় নেই, খাদ্যের সংস্থান নেই, পানীয় বহনের কোন পাত্র নেই, পরিধেয় যা ছিল কালক্রমে পচে নষ্ট হয়ে গেলে লজ্জা নিবারণের কোন উপায় নেই, নিজের চোখ ছাড়া লজ্জা করার উপযুক্ত কোন দৃষ্টি নেই, হিংস্র জন্তুর কাছ থেকে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা নেই, হয়ত আত্মরক্ষার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না। এই ভাবে দিনের পর দিন বছরের পর বছর অতিবাহিত করে—শেষে একদিন এই নির্ব্বান্ধব গিরিগুহায় রুগ্ণ অশক্ত দেহ নিয়ে হয়ত বা এইখানেই মুখ থুবড়ে পড়েছিল এবং সেদিন যতক্ষণ জ্ঞান ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই হতভাগ্য ক্ষুধায় তৃষ্ণায় একান্ত ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়ে শেষে এক সময় অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় সব দুঃখের হাত থেকে নীরবে অব্যাহতি পেয়েছিল। দীর্ঘদিনের নিশ্চিন্ত অবস্থায় তার সেই শীর্ণ অশক্ত দেহখানি মৃত্যুর কোলে হিমশীতল কাঠিন্যে দিনের পর দিন এই গুহাভ্যন্তরেই পড়েছিল। কোন শবভুক্ জন্তুর কবলে না পড়লেও অসংখ্য জীবাণু ও মাংসাশী কৃমিকীটের খাদ্য হয়ে সমগ্র গুহায় পূতিগন্ধ বিকীর্ণ করে সেই দেহ যে কতদিন ধাবৎ এই গুহার সমস্ত পরিবেশকে কলুষিত করে রেখেছিল, তা কে বলবে? যে রাজশক্তি তাকে নির্ব্বাসন দিয়েছিল, সে কি কোনদিনও সংবাদ নিয়েছে সেই হতভাগ্য নির্ব্বাসিতের পরিণাম কি হোল! হয়ত সেই অপরাধীর তেমন কোন অপরাধই ছিল না, কিম্বা হয়ত তার অপরাধ এতই তুচ্ছ ছিল যে তার চেয়ে অনেক বেশী অপরাধের বিচার তারা অহরহ করে থাকত, কিন্তু সে কথা ভেবে কোন সান্ত্বনা আছে কি? কেবলই মনে হচ্ছে পাগল একজন সামাজিক মানুষ সমাজবর্জ্জিত অবস্থায় ধীরে ধীরে তিলে তিলে সহায়সম্বল শূন্য অবস্থায় এইখানে, এই গুহার মধ্যে মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

হঠাৎ আমার জ্ঞান হোল ফটো ক্যামেরার ফ্লাস্ বাল্বের আলোয়। অধ্যাপক নিজে ফটো তুললেন, ছেলেরাও কেউ কেউ ফটো তুলতে লাগল। শেষে অধ্যাপক আমাকে ডেকে বল্লেন, আপনিও আসুন, এই গুহাকে ব্যাক গ্রাউণ্ড দিয়ে আমাদের সাতজনের ফটো তোলা হবে।

বল্লুম সাতজনের তোলা হবে কি করে—যিনি তুলবেন তিনি ত অবশ্যই বাদ পড়বেন।

একজন ছাত্র বল্লে, না স্যার, আমার ক্যামেরা আছে। এক মিনিট টাইমে বেঁধে দিয়ে আমিও এসে গ্রুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ব, তারপর ঠিক এক মিনিট পরেই এক্সপোজার পড়বে। ষ্টাণ্ডে দাঁড় করিয়ে ঠিকমত ফোকাস্ করতে পারলে চমৎকার ছবি ওঠে!

ওদের সঙ্গে অগত্যা দাঁড়াতে হোল। হঠাৎ পেছন দিকে মনে হোল কে যেন আমার পিঠে এসে হাত দিলে। ভাবলুম, দু লাইনে ফটো উঠছে না কি? কিন্তু না আমরা ত এক লাইনেই ঘেঁষা ঘেঁষি করে সাতজনে দাঁড়িয়েছি। কে জানে পেছনে বোধহয় কে এসেছিল পরে সরে এসে লাইনে দাঁড়িয়েছে।

ফটো শেষ করে অধ্যাপক ও ছাত্রের দল এদিক ওদিক ঘুরতে লাগল, যদি অন্য কোন লেখা বা স্বাক্ষর কোথাও কিছু পাওয়া যায় তারই সন্ধানে। আমিও ওদের সঙ্গে একটু ঘুরে হঠাৎ কেন জানি না, পশ্চিম-উত্তর কোণের দিকে এগিয়ে চলে গিয়েছিলুম। সে দিকটায় যাওয়া বড়ই দুরূহ, একটু অসাবধান হলেই পড়ে যাওয়ার ভয়। অধ্যাপক একবার মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, ওদিকে কোথায়? তার পর থেমে গেলেন। ভাবলেন, আমি বোধহয় প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দিতেই দলছাড়া হয়ে ওপাশে সরে যাচ্ছি। কিন্তু ওদিকে গিয়েই একটা মসৃণ পাথরের ওপোর বসে পশ্চিম দিকে সোজা চেয়ে চেয়ে আমি কি দেখেছিলুম, জানি না। হঠাৎ সেই পাথরের বাম দিকে পাহাড়ের সমতল গাত্রে অঙ্কিত এক অপরূপ-ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। ঠিক মনে হয় যে পাথরে আমি বসেছি সেই পাথরে বসে ডান হাত দিয়ে বাঁ দিকের গিরিগাত্রে কেউ বোধহয় ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে ঐ নারী মূর্ত্তি অঙ্কন

করেছে। অপরূপ প্রাণবন্ত ছবি! পূর্ব্বে হয়ত আরও' সুন্দর, আরও স্পষ্ট ছিল, জল আর রোদে পাথর ক্ষয়ে বর্ত্তমানে ছবিখানা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে পুনরায় দুচোখ জলে ভরে এল, কিন্তু সেদিক থেকে কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারি নি, দলের কাউকে ডাকতেও পারি নি। দলের মধ্যে কার যেন দৃষ্টি পড়েছিল আমার দিকে. শেষে অধ্যাপক এবং জন দুই ছাত্র ওদিকে এসে আমার গায়ে হাত দিতে আমি চমকে ওদের দিকে ফিরেছিলুম। অধ্যাপক বল্লেন—কি মশাই এখানে বসে কি দেখছেন? মুখে কিছু বলতে পারি নি—আঙুল দিয়ে গিরিগাত্রের ছবিখানা ওদের দেখিয়ে দিয়েছিলুম। অধ্যাপক আমার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর লেন্স বার করে ছবিখানা নিরীক্ষণ করে দেখেই বল্লেন, এই ত, এই ত নতুন জিনিষ পেয়েছি। তাহলে এই—এই সেই সুতনুকা—

সুতনুকা! অভদ্রের মত চিৎকার করে ফেলেছিলুম। আমার সেই চিৎকারে ওরা সকলেই আমার দিকে এমন করে চেয়েছিলেন যে হঠাৎ লজ্জিত হয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম. আর একটু হলে হয়ত বা খাদে পড়েই যেতুম।

অধ্যাপক আমাকে ধরে নিরাপদ স্থানে এনে আমার চোখের দিকে পূর্ণভাবে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, অসুস্থ বোধ করছেন নাকি? হঠাৎ ওরকম করলেন কেন?

ঢোঁক গিলে বলেছিলুম—কিছু না।

ক্যামেরার সাহায্যে ওরা সেই ছবিখানার ফটো তুল্লেন। অধ্যাপক সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বল্লেন, দেখতে পাচ্ছেন, অন্য সব পাথরের তুলনায় এখানকার এই পাথরটা কত মসৃণ। মনেহয় এই পাথরের ওপোর বহুদিন ধরে বসে বসে কোন লোক এটাকে এত মসৃণ করে ফেলেছে।

ছেলেরা সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিলে। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যে দেখেছিলুম স্মরণ নেই, তবে মনে মনে বোধ হয় যেন হাজারবার উচ্চারণ করেছি— 'সুতনুকা' 'সুতনুকা' 'সুতনুকা'।

আমাদের বৃদ্ধ মাহুতটা কাছে এসে বল্লে, ওখানে কিছু আছে নাকি স্যার? ওখানে ত এর আগে কেউ আসে নি।

ছাত্রদের মধ্য থেকে কে যেন ওকে কি বলতেই এগিয়ে এসে উঁকি মেরে গিরিগাত্রের ছবিখানা দেখে গেল।

এবার ফেরার পালা। যে যার হাতীতে ফিরে এলুম। হাতী চলতে সুরু করতেই অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলুম, গুহালিপিতে কি লেখা আছে?

তিনি বল্লেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, আসল গল্পটাই যে আপনাকে বলা হয় নি। ব্যাপারটা কি জানেন, দেবদত্ত নামক একটি ভাস্কর সুতনুকা নামক দেবদাসীর প্রেমে পড়ে। কিন্তু সেকালের নিয়মে দেবদাসীরা বিবাহ করতেও পেত না, বা প্রধান পুরোহিতের নির্দ্দেশ ছাড়া কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্টতা করতেও পেত না। সুতনুকা, অর্থাৎ সুন্দর তনু বা দেহ যাহার। মেয়েটি নিশ্চয়ই খুব বড় ঘরের মেয়ে ছিল। কারণ তা না হলে রাজার প্রধান মন্দিরের দেবদাসী হতে পেত না। মানে খারাপ চেহারা বা নিম্নঘরের মেয়ে দেবদাসী হলে ছোটখাটো মন্দিরেই স্থান পেত, রাজমন্দিরে আসতে পারত না। তা সেই মেয়েটি দেবদত্তকে ভালবাসলে, দেবদত্তও তাকে ভালবেসেছিল। ফলে পুরোহিতরা ক্রুদ্ধ হয়ে একাধিকবার সাবধান করে দিয়েছিল। ওরা কিন্তু কেউই পুরোহিতদের নিষেধ শোনেনি। সেই অপরাধে পুরোহিতরা দেবদত্তকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিয়ে রাজার মারফৎ জোর করে সেই হুকুম খাটিয়ে দেবদত্তকে এই রামগিরি বনে নির্ব্বাসন দেয়। দেবদত্ত তার বাকী জীবন এইখানেই কাটিয়ে দেয় এবং মনের দুঃখে এই পাহাড়ের গুহায় স্পষ্ট করে খোদাই করে দিয়েছিল যে— সুতনুকা আমার, আর কারুর না।

বল্লুম এ্যাঃ? কি লিখেছিল?

অধ্যাপক বল্লেন, ভাষাটা শুনতে চাইছেন? ভাষাটা হচ্ছে :—

সুতনুকা নাম দেবদাসিক্যি
তম্ কমযিথ:
বলানসেয়ে দেবদিন্নে নাম লুপদক্ষে।

অর্থাৎ সুতনুকা নামক দেবদাসী তাহাকে কামনা করে বারাণসীর দেবদত্ত নামক রূপদক্ষ। হ্যাঁ, একি আপনার কি হোল হঠাৎ? বুঝলুম, অধ্যাপক আমাকে ধরে ফেলেছেন।

কি যে হোল ঠিক বুঝলুম না, হঠাৎ যেন মাথাটা ঘুরে গিয়ে চোখের ওপোর বিদ্যুতের চমকানি দেখেছিলুম। অধ্যাপক আমাকে চেপে ধরতেই আবার সুস্থ হয়ে গেলুম।

ততক্ষণে মাহুতও হাতী চালাতে চালাতে পেছনে ফিরে আমাকে দেখছিল। শেষে বল্লে—বাবু সাহেবের তবিয়ৎ ঠিক নেই কি?

বল্লুম, না. ঠিকই আছে, তুমি চালাও।

কিছুক্ষণ পরেই তাঁবুতে ফিরে এসেছিলুম এবং অল্প কিছুক্ষণ পরেই অধ্যাপক তার পঞ্চ শিষ্য নিয়ে তাঁদের দুটো হাতীতে চেপে রওনা দিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, এবং আমি না থাকলে তাদের যে বহু অসুবিধা হোত, এমন কি ঐ ছবিটা যে তারা আবিষ্কার করতেই পারতেন না এই সব বলে অনেক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে গেলেন, কিন্তু আমি এমনই আচ্ছন্ন অভিভূতের মত হয়ে পড়েছিলুম যে ওদের আর একবার চা খেওয়ার কথা কি দুটো মিষ্ট আপ্যায়ন করার কথা প্রায় যেন ভুলেই গিয়েছিলুম।

পাঁচ

ঘুম ভেঙে গেল। হ্যারিকেনের স্তিমিত আলোয় দেখি, আমার খাটিয়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে, মুখ টিপে হাসছে। হতভম্বের মত তাড়াতাড়ি উঠে বসে ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়েছিলুম। লীলায়িত ছন্দে মেয়েটি আমার খাটিয়ার এক কোণে চুপ করে বসে পড়ে, আমার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল।

স্পষ্ট মনে আছে, চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম, যেমন আর সব পদার্থকে দেখি তেমনই ভাবে দেখলুম, মেয়েটি খাটিয়ায় আমার সামনে হাসি মুখে বসে আছে। ভয়ে ভয়ে বল্লুম তুমি—আপনি—

চিনতে পারলে না? মধুর কণ্ঠস্বরে কি আবেগময়ী ভাষা!

হঠাৎ মনে হোল এই সুতনুকা? হাত বাড়াতেই সে তার হাতখানা এগিয়ে দিলে। ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে ধরে বল্লুম—সুতনুকা সুতনু।

কান্নার উচ্ছ্বাসে একেবারে ভেঙে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে পড়ল আমার কোলের ওপোর। ওর পিঠে—ওর মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে ডেকেছিলুম; সুতনুকা, সুতনু, সু—

সে তার মুখখানি উঁচু করে আমার দিকে চেয়ে দেখলে। দু চোখ দিয়ে গালের ওপর জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখে বল্লে কতদিন—ওঃ, কতদিন পরে তোমায় আবার পেলুম। আস্তে আস্তে কাৎ হয়ে আমার কোলে মাথা রেখে এমনভাবে শুলো যাতে আমার মুখ সে স্পষ্ট দেখতে পায়।

ওর কপালে ওর গালে হাত বুলোতে বুলোতে বল্লুম, এতদিন কোথায় ছিলে সু, কেমনভাবে এতদিন কাটিয়েছ?

সেই শোয়ার অবস্থাতেই দুহাত দিয়ে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরে সে বল্লে—কোথায় কাশী, আর কোথায় রামগিরি! শেষ তোমাকে পেয়েছিলুম মার্গশীর্ষের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে। মনে পড়ে দেব, সেদিনের কথা কি তোমার মনে আছে?

ওর কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেশ সজ্ঞানে আমার যেন সমস্ত কথাই মনে পড়ে গেল। সেদিন, সেই তেইশশ' বছর আগেকারের অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী রাত্রির তৃতীয় যাম অন্তে কলনাদিনী খরস্রোতা গঙ্গার কূলে ওরই জন্য আমি অপেক্ষা করে বসে যখন প্রহর গুনছিলুম তখন পেছন থেকে হঠাৎ নিঃশব্দচরণে এসেই ও তার পেলবকোমল দুই করপল্লব দিয়ে আমার চোখ দুটি বন্ধ করেই খিল্ খিল্ করে হেসে উঠেছিল। তারপর লীলায়িত ভঙ্গীতে আমার কোলের ওপোর এলিয়ে পড়ে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিল—রাগ কর নি ত, আসতে দেরী হোল বলে?

মুখে কোন উত্তর দিই নি, শুধু ব্যবহারে বুঝিয়ে দিয়েছিলুম যে ওর ওপোর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

গম্ভীর মুখে সেদিন ও বলেছিল, ওগো দেব, এ-ভাবে আর চলবে না। তোমাকে আমাকে একসঙ্গে মন্দিরের গর্ভগৃহে দেখার পর থেকেই বড় পুরোহিত অত্যন্ত ঘৃণিতভাবে সন্দেহ করছে। একটুও চোখের আড়াল করতে চায় না, সব সময়ই কেমন যেন আড়াল দিয়ে রাখার চেষ্টা, যেন আমি কত অপরাধী!

বলেছিলুম, অপরাধী কি নও? তুমি দেবতার নৈবেদ্য হয়ে সামান্য মানুষের কাছে—

অসহিষ্ণুভাবে মাথায় ঝাঁকি দিয়ে সেদিন ও বলেছিল না—না—না, আমি পাথরের প্রাণহীন দেবতার নই, দেবতাকে নিয়ে ব্যবসা করে যে সমস্ত অসুর আমি তাদেরও নই, আমি একান্ত ভাবে আমার প্রাণের দেবতার, আমার

দেবদত্তের আমার দেবের। এর পর বহুক্ষণ যাবৎ আমার কোলের ওপোর মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল, তারপর ঠিক আজকের মতই অশ্রুসিক্ত চোখ তুলে সেদিন, সেই তেইশশ বছর আগেকার নৈশ আকাশতলে শুক্লাচতুর্দ্দশীর চন্দ্রালোকে একান্ত আকুতির সঙ্গে বলেছিল, এখানে আর নয় দেব আর নয়। চল তোমাতে আমাতে চলে যাই, কোন দূর দেশে—দূর দূর অনেক দূর—যে দেশে কোন রাজা নেই কোন মন্দির নেই, কোন পুরোহিত নেই, ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্যের অতীত কোন দেশে গিয়ে এমনি এক নদীর তীরে ছোট্ট এক পর্ণকুটির নির্ম্মাণ করে তোমাতে আমাতে বাস করব। এমনি চাঁদনী রাতে সেই লোকবর্জ্জিত স্থানে আমি তোমাকে তোমার সামনে আমার সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা উজাড় করে নৃত্যকলার পরাকাষ্ঠা দেখাব, আর একমাত্র তুমি হবে সেই লীলাছন্দের দর্শক। অন্য কেউ থাকবে না, কোন নিয়ম নীতি থাকবে না, কোন ধর্ম্মাধর্ম্মের বালাই থাকবে না।

সুতনুকার সেদিনকার সেই করুণ মুখ আজ তাঁবুর মধ্যে খাটিয়ার ওপোর বসে বসে স্পষ্ট মনে পড়ল। মনে হোল এ যেন কালকের ঘটনা—এমন ইস্পষ্ট, এমনই প্রত্যক্ষ। সুতনুর হাতখানি হাতের মধ্যে ধরে আজ বল্লুম, মনে আছে সু, সেদিনকার সেই কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন সেই জ্যোৎস্নালোকিত নৈশ গঙ্গার প্রবাহধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছিলুম, তোমাতে আমাতে একই সঙ্গে দেশে দেশে প্রবাহিত হয়ে চলব, যেমন চলেছে এই গঙ্গার ধারা এমনই অবাধ, এমনই নির্ম্মল, আমাদের প্রেম জ্যোৎস্নায় সেই জীবনধারা হবে এমনই উজ্জ্বল। বলেছিলুম, কাল পূর্ণিমার রাত্রে মন্দিরের দেবতার শ্রীচরণে তোমার শেষ প্রণাম প্রণতিলাস্তে তুমি বিদায় নিবেদন করে আমার কাছে এমনই ভাবে রাত্রির দ্বিতীয় যাম অন্তে চলে আসবে, আমি তোমার জন্য উপযুক্ত শিবিকার ব্যবস্থা রাখব, তারপর তুমি যাবে শিবিকায় আমি যাব পদব্রজে, এই ভাবে আমরা এই পবিত্র অথচ কলুষিক্ত বারাণসী পরিত্যাগ করে চলে যাব —দূর হতে দূরান্তরে। শিবিকাকে বিদায় দিয়ে দুই পথিক পদব্রজে গ্রামের পর গ্রাম অতিবাহিত করে নদ নদী পার হয়ে অরণ্য পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করে ক্রমান্বয়ে চলে যাব পূর্ব্ব হতে আরও পূর্ব্বে সূর্য্যোদয়ের দেশে। সেদিন আমার জানা ছিল হিরণ্যপর্ব্বতে অর্থাৎ, বর্ত্তমানের কামাখ্যায় প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনে কোন বাধা ছিলনা, তাই সেদিন সেই পবিত্র নদীতীরে তোমার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলুম, তোমাকে নিয়ে সেই হিরণ্যপর্ব্বতে গিয়ে নীড় রচনা করে বাকী জীবন তুমি থাকবে সুর-স ধনা নিয়ে, আর আমি থাকব আমার রেখা শিল্প অবলম্বন করে। ওঃ, সেদিনের সেই সুন্দর মুহূর্ত্তটি আমার মনে এখনও এমন স্পষ্টভাবে জেগে রয়েছে যে মনে হচ্চে আমরা—যেন সেই জ্যোৎস্নাস্নাত নদীসৈকতে এখনও বসে আছি।

শুনতে শুনতে হঠাৎ আমার মুখের ওপোর হাত চাপা দিয়ে সুতনুকা বল্লে, আর নয়, আর নয় দেব, এবার থেমে যাও। কারণ এর পরেই যে পৈশাচিক ব্যাপার সুরু হয়েছিল সে কথা মনে পড়লে আমি এতদিন পরেও আর একবার সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ব।

সত্যিই' ত, সেই দুর্দ্দিন আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ভীমদর্শন তিনজন শত্রু নিঃশব্দপদে আমাদের পেছন থেকে এসেই সেই শেষরাত্রে সেইখানেই আমাদের আক্রমণ করে। প্রধান পুরোহিতের বিশ্বস্ত অনুচর তারা। প্রধান পুরোহিত যে কবে থেকে সেই তিনজনকে আমাদের পেছনে চররূপে লাগিয়ে রেখেছিল তা জানতুম না। মন্দিরের নৃত্য অন্তে কালো রঙের কাপড়ে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করে চীরখণ্ডে দুই পায়ে নূপুরকে বন্ধন করে নিঃশব্দ চরণে সুতনুকা যখন আমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গোপনঅভিসারে নদীতীরে এসেছিল তখন কি সে জানত যে তার এবং আমার মৃত্যুদূত নীরবে সঙ্গোপনে এমনই ভাবে তার পশ্চাদনুসরণ করেছে। আমরা কেউই জানতুম না, কিন্তু তারা এসেছিল গোপনে, আমাদের পরামর্শ সমস্তই শুনেছিল এবং আমাদের বিশ্রম্ভালাপের মধ্যেই এক সময় আমাদের আক্রমণ করেছিল। তাদের সঙ্গে শক্তিতে আমি পারি নি, দৈহিক শক্তিতে কোনরূপ-কার কোনদিনই জল্লাদের সঙ্গে পারে না। তারা আমাদের দুজনকেই বন্দী করেছিল। মনে আছে সুতনুকা সেদিন একজনের হাতের উপর এমনই এক প্রাণান্ত দংশন দিয়েছিল যে সেই পাষণ্ড ওকে ভীম মুষ্টির আঘাতে অচৈতন্য করে শেষে পদাঘাত পর্যান্ত করেছিল। পরে অবশ্য

দেবদাসী বলে ভক্তিভরে প্রণামও করেছিল, পদধূলিও গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমরা বন্দী হয়েছিলুম এবং ওকে যে পরে কোথায় সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তা আর আমি জানতে পারি নি। তারপর সকালে রাজার সভাকক্ষে বসেছিল বিচারসভা। প্রধান পুরোহিত আমাকে শূলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। রাজমন্ত্রী বিচার সভায় বলেছিলেন—আমাকে এবং সুতনুকাকে একত্রে বদ্ধ করে তুষানলে দগ্ধকরা উচিত। এই মন্তব্যে প্রধান পুরোহিত আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,সুতনুকার শাস্তির ব্যবস্থা তিনি নিজেই করবেন, কিন্তু আমার শাস্তি হওয়া উচিত শূলাসনে প্রাণদণ্ড। সেদিন কাশীরাজের মুখে ফুটে উঠেছিল কি অপরিসীম করুণা, কি অসহায় আর্ত্ততা। তিনি যেন কোনদিক দিয়েই কোন সামঞ্জস্য বিধান করতে পারছিলেন না। শৃঙ্খলিত রুদ্ধপদে অগ্রহায়ণের শীতের ঘর্মাক্ত দেহে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেদিন সেই বিচারসভায় বহুসংখ্যক সভাসদের সামনে আকুল আগ্রহে হতভাগ্য আমি রাজমুখনিঃসৃত আদেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলুম। শেষে রাজার আদেশ বাণী শ্রুত হোল। তিনি বলেছিলেন, এই শ্রেণীর রূপদক্ষ লক্ষেও একটিমাত্র বিরল, এই অলোকসামান্য রূপকারকে মুক্তি দিতেই আমি চাই। এই পর্য্যন্ত বলেই—তিনি সকলের মুখের দিকে দৃষ্টি পাত করে সভাসদগণের মনোভাব পর্যবেক্ষণ করতেই চেয়েছিলেন, এবং যেমনই বোঝা গেল যে প্রধান পুরোহিত এবং সভাপণ্ডিতদের মুখে প্রতিবাদের ইঙ্গিত স্পষ্ট ফুটে উঠেছে তেমনই তিনি বল্লেন, কিন্তু দেবকন্যাদের সঙ্গে ব্যভিচার কখনই ক্ষমাযোগ্য নয়, উপরন্তু এর পূর্ব্বে অপরাধীকে একবার সাবধান করে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সে সুযোগ যে গ্রহণ করে নি—

মনে আছে, সেই চরম মুহূর্ত্তে সভার সমস্ত প্রাণী নিঃশব্দে রুদ্ধশ্বাসে রাজমুখের দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসেছিল, প্রহরী পাষাণ পুত্তলির মত জড়বৎ স্থির ছিল। চামরধারিণী বারেকের জন্যই চামর বীজন করতে বিস্মৃত হয়ে পড়েছিল, রাজকক্ষের বাইরে দৌবারিকও তার নিয়মিত পদচারণা থামিয়ে দ্বারপথ দিয়ে রাজাজ্ঞা শোনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা করেছিল। রাজা একবার মাত্র আমার দিকে দৃষ্টিপাত করেই নতাক্ষে মন্ত্রমুগ্ধের মত যেন অপরের কণ্ঠেই ঘোষণা করলেন—আমার রাজ্য থেকে দেবদত্তের যাবজ্জীবন নির্ব্বাসন, তাহার নৈপুণ্যের জন্য এই মৃদু শাস্তিই তার উপযুক্ত।

তবু সভা সেদিন আর মুখর হয় নি। ঘাড় হেঁট করে রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন, সভাসদরা আপন আপন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেদিনকার শৃঙ্খলিত আমাকে প্রহরীগণ সভার গভীর কারাকক্ষে নিয়ে গিয়েছিল এবং পরদিবস প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় আমার নির্ব্বাসনযাত্রা সুরু হয়েছিল।

এর পরের কথাগুলো স্মৃতিপটে অস্পষ্ট। কত গিরি নদী গ্রাম জনপদ অতিক্রম করে প্রহরীদের অধীনে পদব্রজে আমাকে যেতে হয়েছিল। ভগ্নমনে ভগ্নদেহে স্খলিত পদে ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হয়ে বহুদিন পরে অরণ্যসমাকুল রামগিরি বনপ্রান্তে প্রহরীরা আমাকে বর্জ্জন করে এবং যাবার সময় তীব্রভাবে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে এই নির্ব্বাসন থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের চেষ্টা আনবে শূলাসনে মৃত্যু। মৃত্যুভয় নয়, মনের দুঃখে এবং সুতনুকাকে না পাওয়ার অবসাদে আমি আর লোকালয়ে ফেরবার কথা কোনদিন মনেও করি নি। এই রামগিরিতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেছিলুম। উদ্দেশ্যবিহীনভাবে অরণ্যে পরিভ্রমণ করতে করতে গুহাটি নজরে পড়েছিল এবং তারপর সেখানেই বাস করি। বনের ফল, নদীর জল আমার প্রাণধারণে সাহায্য করেছিল। জীবনের বাকী কটা দিন সুতনুকার স্মৃতি স্মরণ করেই সেই তেইশ শ' বছর আগেকার দেবদত্তের অবসান হয়েছিল।

কিন্তু সুতনুকা! সে তার বাকী জীবনে কি করেছিল। সুতনুকা বল্লে, তুমি জানো দেব, সেদিন সেই শেষ রাত্রে তোমাকে শেষ দেখেছিলুম, কিন্তু তারপর থেকে তুমি তাও জানো না, সেই শেষ রাত্র থেকে আজ পর্য্যন্ত সদাই আমি আমার মনের মানুষ দেবদত্তের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে একত্রই বাস করছি। আমাকে জোর করে বন্দিনী ভাবে নিয়ে গেল প্রধান পুরোহিতের বাড়ীতে —মাটীর তলায় এক অন্ধকার ঘরে। সেখানে পুরোহিত আমাকে একদিকে দিয়েছিল অশেষ প্রলোভন এবং

গুলমার্গের পথে (কাশ্মীর)

ফটো : রথীন চক্রবর্তী

রাজমার্গের পথে (কাশ্মীর) — ফটো : সন্তোষ কুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

অন্যদিকে দিয়েছিল প্রাণভয়। কিছুতেই আমি বিস্মিত হই নি, তবে আমার সেই জীবনের পার্থিব দেহটাকে নিয়ে তারা যথেষ্ট ব্যবহার করেছে। আমি বাধা দিইনি, বাধা দেওয়ার ক্ষমতাও আমার ছিল না, কিন্তু সেদিনের পরে আর একবারের জন্যও মন্দিরে যাই নি। কি করে যাব? তুমিই বল দেব, অন্তরের নৃত্যগীত শুষ্ক হয়ে গেলে দেবতার কাছে কি নিয়ে নিবেদন করব।

শুষ্ক কণ্ঠে বল্লুম, তারপর?

সে বল্লে, তারপর কোন একদিন, আমি জানি না, প্রধান পুরোহিত বাইরে প্রচার করে দিয়েছিল সুতনুকা রোগে দেহত্যাগ করেছে। একথাও জানলুম আমি অনেক পরে। কত দিন পরে তা জানি না, কারণ যে অন্ধকূপে আমায় বন্দিনী করে রাখা হয়েছিল সেখানে সূর্যোদয় সূর্যাস্তের সংবাদ পৌঁছত না, ঋতু পরিবর্তনের কোন আভাস পেতুম না, আমার সঙ্গে বহির্জগতের কোন যোগ ছিল না, আমি ছিলুম পুরোহিতের খেলার পুতুল, শুধু পুরোহিতের নয়, তার ছেলেও আমার কাছে লুকিয়ে আসত। আমি কাউকেই বাধা দিইনি, কোন কিছুতেই আপত্তি করি নি, কারণ তখন আমার মনে হোত, আমি জীবন্তভাবেই দেহত্যাগ করেছি। মৃত্যুর পর দেহের সঙ্গে যেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না, জীবন্ত অবস্থাতেই আমার তখন সেই বোধটা এসে গিয়েছিল। কে, কি ভাবে আমার দেহটাকে নিয়ে পৈশাচিক খেলায় মত্ত হোত সে খবরও আমি রাখি নি, শেষে ওরা আমাকে সেই অন্ধকূপ থেকে এক অন্ধকার বর্ষণমুখর রাত্রে শিবিকায় তুলে কাশী থেকে বহুদূরে এক লোকালয়হীন শূন্য প্রান্তরে পরিত্যাগ করে চলে যায়। ওরা কেন আমাকে হত্যা করে নি, তা জানি না, কারণ মনে হয় কৌতশালী [illegible] হত্যা করলে আর কোন রাজদণ্ডের ভয় থাকত [illegible]। কিন্তু তা ওরা করেনি। হয়ত এক সময় য[illegible] দেবনর্তকী ছিল তাকে হত্যা করলে কোন প্রত্যবায় [illegible] ভেবে এই আশংকাতেই ওরা হত্যা থেকে বিরত হল।

রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লুম, তারপর?

সে বল্লে—তারপর প্রায় মাসাধিককাল লেগেছে আমার সুস্থ হতে। প্রথম কয়েকদিন সূর্যালোক কিছুই দেখতে পেতুম না, কারণ বহুদিন যাবৎ সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত ছিলুম। তারপর চলাফেরা করাও কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ ক্ষুদ্র একটি প্রকোষ্ঠে দীর্ঘকাল বন্দিনী অবস্থায় বাস করার ফলে শরীরের শিরা পেশী সমস্তই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আহার ও বাসস্থানের অভাব হয়নি। সেই প্রান্তরের এক অংশে এক সিদ্ধযোগী বাস করতেন। তিনি আমাকে তাঁর কুটীরে স্থান দিয়েছিলেন।

বল্লুম তারপর?

সে বল্লে—একদিন সেই যোগী আমায় প্রশ্ন করেছিলেন আমি কে, কি চাই, এবং সেখানে রয়েছি কেন। এর পূর্বে তিনি আমার সঙ্গে বিশেষ কোন বাক্যালাপই করেন নি। যোগীবরকে সমস্ত জ্ঞাপন করার পর তিনি কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে বল্লেন—তোমার দয়িত তোমার চিন্তায় শীর্ণ ক্লান্ত অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে একমাসের পথ রামগিরি; সেই গিরির এক গুহায় সে মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছে।

আকুলভাবে তাকে বলেছিলুম—তাত, এ অভাগিনীকে তার কাছে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করে দিন। তিনি ধ্যানস্থ থেকে বলেছিলেন—আমার প্রারব্ধ আমাকে রামগিরিতেই আকর্ষণ করছে। সেইখানেই আমার জীবনান্ত হবে। বলে তিনি বলেছিলেন যে তিনি শুক্লা ত্রয়োদশীতে রামগিরি অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং তাঁর সঙ্গেই হবে আমার যাত্রা। আর একবার কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে নিবেদন করেছিলুম, অত বিলম্ব অসহ্য, কারণ তোমার সংবাদ পেয়ে এবং তুমি মুমূর্ষু শুনে আমি তত অপেক্ষা করতে পারছিলুম না। তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, সে হয় না মা, দেবদত্তের নশ্বর জীবন তুমি জীবিত অবস্থায় এ জন্মে দেখতে পাবে না, এই তোমার প্রারব্ধ। এর পর যেদিন সেই সিদ্ধ যোগীর সমভিব্যাহারে রামগিরির গুহায় আমি সেদিন তোমার মৃতদেহের দর্শন পাই। সেই দেহ দেখে মনে হয়েছিল, তুমি মাত্র কয়েক মুহূর্ত পূর্বেই দেহত্যাগ করে গেছ।

এই পর্যন্ত বলেই সুতনুকা নীরব হোল। মনে হোল সেইদিনকার সেই দুঃখে সে আর একবার মুহ্যমান। কিছু পরে বল্লুম, তারপর?

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে সুতনুকা আবার [illegible]

থেকে যেন কথাবলার শক্তি সংগ্রহ করছিল। তারপর ধীরে ধীরে আবার আরম্ভ করলে। বল্লে, গুহার বাইরে তোমার শেষকৃত্য সম্পাদন করে সেইদিন থেকে বৈধব্য গ্রহণ করেছিলুম। তারপর দীর্ঘদিন যাবৎ এইখানে এই রামগিরিতে তুমি যেখানে যেখানে ঘুরতে, যেখানে বসতে, সেই সমস্ত স্থানেই ঘুরেছি, বসেছি। সিদ্ধযোগী আমাকে বলেছিলেন; তোমার দেবদত্তর সাধনা বড় কম নয়। তিনি বলেছিলেন, তুমি প্রেমের স্বরচিত রেখা মন্ত্রে তোমার অন্তরের দয়িতাকে দেবীর আসনে বসিয়ে অহর্নিশি ধ্যান করেছ। তোমার রচিত ভাষামন্ত্র তুমি ঐ গুহাগাত্রে উৎকীর্ণ করে রেখেছ। গুহার পশ্চাতে ঐ শিলাখণ্ডে বসে বসে তুমি বারাণসীর দিকে মুখ করে আপন মনেই তোমার নিপুণ হাত দিয়ে গিরিগাত্রে আমার রূপ অঙ্কন করেছ—যে অঙ্কন তুমি আজ নতুন করে আবিষ্কার করে আগন্তুকদের কাছে তুলে ধরেছ। আমি তোমার ঐ ফেলে-যাওয়া শিলাসনে দীর্ঘকাল ধরে বারাণসীর অভিমুখীন হয়ে তোমারই প্রতীক্ষায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় শতাব্দী ও সহস্রাব্দী অতিবাহিত করেছি। এই-খানেই ছেদহীন চিন্তায় স্মরণ করেছি গঙ্গাতীরের সেই শেষ মিলনরাত্রিকে। এখানে আমার অনন্যসঙ্গী দিনগুলি অসাড়ে কেটে যেত, দৃষ্টিপটে একের পর এক ভেসে যেত দিনের সূর্য্য, রাতের জ্যোৎস্না। পরিবর্ত্তনশীল জগৎ আমার কাছে স্তব্ধ, আর সেই নিশ্চল প্রচ্ছদপটে চির-ভাস্বর ছিল তোমার অমলিন স্মৃতি।

একটু স্থির হয়ে বল্লে, এতদিন—এতদিন পরে আমি তোমাকে আবার পেয়েছি। এ আমি জানতুম, আমি জানতুম তুমি আসবে; সেইজন্যই ত আমার প্রতীক্ষা। কত হাজার হাজার বসন্ত বিফলে পার হয়ে গেছে, কত অগণিত মার্গশীর্ষ তার শুক্লা চতুর্দ্দশীর জ্যোতির্ম্ময় চাঁদকে নিয়ে আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে চলে গেছে, কতদিন কত হতাশায় আমার বুক ভরে উঠেছে। কিন্তু একবারের জন্যও নিরাশ্বাস হয় নি, একবারের জন্যও নয়—

তার পিঠের ওপোর হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলুম, আমি যে আসব, তা তুমি জানলে কি করে?

সে বল্লে, আমি জানি। সেই সিদ্ধ যোগী তার দেহ-ঐকান্তিক আকর্ষণ তাকে আকৃষ্ট করে এইখানেই নিয়ে আসবে। তুমি তার প্রতীক্ষায় থেকো। তাই আমি জানতুম, তুমি আসবে, একদিন না একদিন তোমার দর্শন আমি পাবই। আজ আমার শুভদিন, আমার প্রতীক্ষা আজ সার্থক।

গভীর আরামে ও পরম নির্ভরে সে আমার অঙ্কশায়িনী। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বল্লে, আচ্ছা দেব, কোন বিখ্যাত কবি কি তোমাকে নিয়ে কোন কাব্য রচনা করে তোমাকে অমরত্ব দান করেছে?

ভাবতে ভাবতে আমি বল্লুম—কই, তা ত জানি না, তবে হ্যাঁ আজকে যে অধ্যাপক এসেছিলেন, তিনি বলছিলেন কোন গ্রন্থে নাকি দেবদত্তর লেখা ঐ গুহার যা আছে সেগুলো মুদ্রিত হয়েছে।

সে বল্লে, না—না, তা বলি নি। কোন বিখ্যাত কবি এই রামগিরিকে নিয়ে কোন নির্ব্বাসিত প্রেমিকের হতাশা কি মূর্ত্ত করে তুলেছে?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল কালিদাসের মেঘদূত। কিন্তু সংস্কৃত মেঘদূত আমার পড়া হয় নি, গল্পটা মাত্র জানতুম। বল্লুম, হ্যাঁ হ্যাঁ শুনেছি বটে কবি কালিদাস তাঁর মেঘদূত কাব্যে রামগিরি বনের নির্ব্বাসিত যক্ষকে নিয়ে এক অমর কাব্য করেছিলেন, কিন্তু—কিন্তু সে ত আমাদের নিয়ে নয়, সে এক নির্ব্বাসিত যক্ষের কথা—তার বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশে বিরহ নিবেদন, আর সে রামগিরি বন এখানে নয়, সেটা বিন্ধ্যাচলের পশ্চিম অংশে।

হাসিমুখে ঘাড় নাড়তে নাড়তে সুতনুকা বল্লে, ঠিকই হয়েছে। সিদ্ধযোগী বলেছিলেন, এক বড় কবি জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি তোমার দয়িতকে নিয়ে এক অমরকাব্য রচনা করবেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তোমাদের নাম এবং ঘটনার স্বরূপ প্রকাশ করতে পারবেন না। ঘটনাকে তিনি বিকৃত করতে বাধ্য হবেন, কিন্তু অন্তরের গভীরতাকে যথাযথ পরিস্ফুট করবেন। শুধু রামগিরি নামটুকুমাত্র রক্ষা করে বাকী সমস্তই গোপন রাখতে বাধ্য হবেন।

বাইরে দু'একটা পাখীর ডাক শোনা গেল। সুতনুকা পরম আরামে আলস্য পরিহার করে শয্যাপ্রান্তে উঠে বসে বল্লে তাহলে আমার আশা পূর্ণ হয়েছে, তোমার দর্শন আমি

বল্লুম, সে কি, তুমি উঠছ নাকি ?

তেইশ'শ বছর আগেকারের দুষ্টু হাসি হেসে খুকীর মত কণ্ঠস্বরে সে বল্লে, উঠব না! আমার সময় যে ফুরিয়ে এল!

বল্লুম, তার মানে ? এখানে প্রধান পুরোহিত নেই, রাজার প্রহরীও নেই, তোমার ব্যস্ততার কারণ কি ?

তেমনি হাসিমুখেই সে বল্লে, তা ত নেই, কিন্তু আমিও যে নেই! আমি বাস্তব নই, আমি যে একটি ঘনীভূত বাসনা, দিনের আলোয় মুক্তির আঘাত সহ্য করতে অপরাগ আমি, বাস্তব মানুষের দৃষ্টি আমি সইব কি করে ?

বল্লুম—তাহলে—তাহলে আমার কি হবে ?

পরম আগ্রহে সে আমার হাত দুটি ধরে বল্লে, কেন গো, তুমি তোমার দেবদত্ত জন্মে নিরবচ্ছিন্ন আঘাত সহ্য করে করে এমনই পাষাণ হয়ে গেছ যে কোন দুঃখই ত তোমার দুঃখ বলে মনেই হয় না। তা ছাড়া কাল রাত্রি পর্য্যন্ত তুমি ত আমাকে ভুলেই ছিলে, আজ সকাল থেকে আবার আমাকে ভুলে যাবে। পারবে না ?

দু হাত দিয়ে জোর করে তাকে চেপে ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেছিলুম, সে হয়না সু। তুমি আসবে সেই আশায় এতদিন কোন দুঃখকেই দুঃখ বলে মনে করিনি, কিন্তু আজ তোমাকে পেয়ে যদি আবার হারাতে হয়, তা হলে সেই দুঃখ ভুলব কি মূলধন দিয়ে ? সে হয় না, তুমি যেও না।

কপট গাম্ভীর্য্যে শক্ত হয়ে সে বল্লে, ছিঃ, অবুঝ হোয়ো না। বাস্তবের সঙ্গে অবাস্তবের স্থায়ী মিলন অসম্ভব। তুমি বাস্তব আমি অবাস্তব, এই কঠোর সত্যকে স্মরণ রেখ।

আকুল হয়ে বলেছিলুম, আমি বাস্তব থাকতে চাই না, অথবা তোমাকে অবাস্তব থাকতে দেব না—

দুষ্টামির হাসি হেসে সে বল্লে, ঠিক আছে, তুমি যখন বাস্তব থাকবে না, তখন আমি তোমার সামনে আত্মপ্রকাশ করব, আর তুমি যখন বাস্তব থাকবে তখন আমি তোমারই মধ্যে লীন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ব। বলতে বলতেই সুতনুকা—আমার স্পষ্ট প্রত্যক্ষ বাহুলগ্ন সুতনুকা—অস্তিত্বহীন অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাঁবু থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। উষালোকে জনশূন্য দিগন্ত পাখীর ডাকে ও প্রহরারত বাহাদুরের বুটের শব্দে অল্পে অল্পে জাগরিত হচ্ছিল।

সারাদিন দারুণ অস্বস্তিতে কেটে গেল। বিনা প্রয়োজনে আজ আর একবার সেই গুহা দেখে এসেছি। সেই লেখা, সেই ছবি, সেই শিলাখণ্ড। কিন্তু কালকের মত আজ আর কোথাও কারুর কোন প্রাণস্পর্শ পাই নি। রাত্রেও কেউ এল না। আর কোনদিন সে আসবে কিনা জানিনা। তবে একটা আশা আমি মনে মনে এখনও পোষণ করি, যেদিন যে শুভ মুহূর্ত্তে আমি অবাস্তব হব, সেদিন আমার তেইশশ বছরের অবাস্তব সুতনুকা হয়ত আবার কাছে ফিরে আসবে, যেমন করে এসেছিল তেইশ'শ বছর আগে এবং সর্ব্বশেষ তেইশ'শ বছর পরে মাত্র গতকাল রাত্রে।

তাঞ্জোর

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক

মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্যে তাঞ্জোর একটি ঐতিহাসিক সহর। মাদ্রাজ সহর হইতে ২১৮ মাইল দক্ষিণে, কাবেরী নদীর তীরে এই পৌরাণিক সহরটি অবস্থিত। এই সহরের মধ্যে বৃহদীশ্বর মহাদেবের সুবৃহৎ দেবালয়টি জগৎবিখ্যাত। গত বর্ষে কার্ত্তিক মাসে কুণ্ড কোম্পানির স্পেশাল ট্রেনে ভারত-প্রদক্ষিণের সময় সমগ্র ভারতের প্রধান প্রধান দেবালয়-গুলির মধ্যে দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরম্,মাদুরা এবং তাঞ্জোরের যে তিনটি দেবালয় দেখিয়াছি সত্যই সেগুলি বর্ণনাতীত। ইহার মধ্যে শিল্প ও ভাস্কর-কার্য্য সত্যই অতুলনীয়।

বাহির হইয়াছি তীর্থ ভ্রমণে কিন্তু প্রাচীন যুগের শিল্প, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য বিদ্যা দেখিয়া মোহিত ও স্তম্ভিত হইলাম। ষ্টেশনের পার্শ্বেই ঝটকা বা আচ্ছাদিত গোশকট ভাড়া করিয়া বাহির হইলাম। ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে মন্দির, বহু দূর হইতেই মন্দিরের গগনভেদী চূড়া দেখা যাইতেছে। তাঞ্জোর সহরটি বহু প্রাচীন, ঘনবসতিপূর্ণ এবং মধ্যে মধ্যে দুই ধারে বৃক্ষ লাগান। অনেক প্রশস্ত রাস্তা।

এই নগরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে জনপ্রবাদ যে পুরাকালে এই স্থানে তাঞ্জোর নামে এক ভীষণ দৈত্য বাস করিত। তাহার উৎপাতে জনসমূহ ভীত হইয়া বিষ্ণুর আরাধনা করিলে, বিষ্ণু এই দৈত্যকে দমন করিয়া প্রাণিগণকে পরিত্রাণ করেন। ঐ দৈত্য মৃত্যুকালে বিষ্ণুকে অনুরোধ করে যে তাহার নামানুসারে যেন এই নগরের নামকরণ হয়। সেই কারণে এই সহরের নাম তাঞ্জোর হইয়াছে।

মন্দিরটি যেন একটি দুর্গের মত। চতুর্দ্দিকে খালকাটা এবং উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত। মন্দিরের চারিধারে চারটি গোপুরম্। দাক্ষিণাত্যের প্রত্যেক বৃহৎ মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের প্রথমেই সুবৃহৎ গোপুরম্ রহিয়াছে। প্রত্যেক গোপুরম চতুষ্কোণাকৃতি এবং উচ্চতায় একশত হইতে দুইশত ফিট এবং পর পর ছয় হইতে দশতালায় বিভক্ত। প্রত্যেক গোপুরমের উপর অসংখ্য দেবদেবী প্রাণী ও ফুল-ফলের আকৃতি নিপুণ ভাস্করের দ্বারা ক্ষোদিত। প্রত্যেক গোপুরমের উপর অপূর্ব্ব শিল্প নৈপুণ্য ও কারুকার্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অধিকাংশ গোপুরম্ মূলমন্দির অপেক্ষা উচ্চ হয়,কিন্তু তাঞ্জোরে মন্দিরের প্রথম গোপুরমটি এক শত ফিট উচ্চ এবং প্রধান মন্দিরটি প্রায় আড়াই শত ফিট উচ্চ। প্রধান গোপুরমের পর আরো দুইটি ষাট ফিট উচ্চ গোপুরমের মধ্য দিয়া গিয়া প্রধান মন্দিরের প্রবেশ দ্বার।

প্রধান মন্দিরটির চতুর্দ্দিকের গাত্রে পাথরের উপর অপরূপ ভাস্করকার্য্য করা নানা মূর্ত্তিসমূহ। মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্রীশ্রীবৃহদীশ্বর মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। একখণ্ড গ্রেনাইট প্রস্তরের বার ফিট্ উচ্চ এই মূর্ত্তি, এত বড় লিঙ্গমূর্ত্তি দক্ষিণ ভারতের আর কোন মন্দিরে দেখি নাই। প্রধান মন্দিরের একধারে পার্ব্বতী দেবীর এবং অন্যদিকে সুব্রহ্মণিয়ার বা কার্ত্তিকের কারুকার্য্য-করা ষাট ফিট উচ্চ দুইটি মন্দির রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন আসে-পাশে কারুকার্য্য-করা নানা দেবদেবীর ছোট ছোট কয়েকটি মন্দির রহিয়াছে।

প্রাঙ্গণের পশ্চিমভাগে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ গ্রেনাইট প্রস্তরে প্রস্তুত বারফিট উচ্চ এবং ষোল ফিট্ লম্বা শিবের বাহন নন্দী বা ষাঁড় পা দুটি মুড়িয়া দেবতার সম্মুখে উপবিষ্ট। একটি বারাণ্ডার মধ্যে ছোট বড় শতাধিক শিব-লিঙ্গ বসান রহিয়াছে।

দেবালয়ের মধ্যে একধারে চতুর্দ্দিক পাথরের ঘাট-বাঁধান শিবগঙ্গা নামক একটি জলাশয় রহিয়াছে—ইহাতে মন্দিরের সৌন্দর্য্য আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। সকল মন্দিরের গায়ে মণ্ডপের মধ্যে এবং বারাণ্ডায় বড় বড় পাথরের উপর ক্ষোদাই করা অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সমূহ এবং এক স্থানে মন্দিরের মধ্যে পাথরের উপর নিপুণভাবে ক্ষোদাই করা রামায়ণে বর্ণিত রাম-সীতা এবং মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চ পাণ্ডবের উপাখ্যান পর পর দেওয়ালের গাত্রে বসান। এক স্থানে দেওয়ালের গাত্রে কৃষ্ণরাধার নানা লীলা ও নানা দেব

মাহাত্ম্য বিষয়ে রঞ্জিত বহু চিত্র সুন্দরভাবে নিপুণ চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত রহিয়াছে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকের কারুকার্য্য ও শিল্পসম্ভার দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। প্রাচীন যুগের হিন্দু ভাস্করগণ ছেনি ও হাতুড়ি দিয়া কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি সকল গঠন করিয়াছে! কালের কোন ছাপই এ যাবৎ এগুলিকে ম্লান করিতে পারে নাই।

মন্দিরের মধ্যে কোন পাণ্ডা দেখিলাম না। পূজার জন্য নানা ফুল এবং সুন্দরভাবে গাঁথা মালা সকল মন্দিরের মধ্যে বিক্রয় হইতেছে। দাক্ষিণাত্যের কোন দেব-দেবীর মন্দিরের অভ্যন্তরে গিয়া স্পর্শ করিতে বা পূজা করিতে কোন যাত্রীকেই দেয় না। নাটমন্দির হইতে দেবতার দর্শন হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন আমার স্ত্রী, কন্যা ও রাণী সাহেব। তাঁহারা পূজার জন্য ফুলমালা খরিদ করিয়া মন্দিরের মধ্যে পুরোহিতের হস্তে প্রণামী সহ দিলে তিনি তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিলেন এবং অল্প প্রসাদী ফুল ফেরৎ দিলেন।

মন্দিরের পার্শ্বেই একটি প্রাচীন বৃহৎ রাজপ্রসাদ ও দুর্গ দেখিতে যাইলাম। অনুমান ৮৭০ খৃষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের পল্লব রাজবংশকে জয় করিয়া চোল রাজবংশের বিজয়ালয় এক মহাপরাক্রমশালী রাজা স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র রাজরাজ প্রবল নৌশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তিনি সিংহল ও ভারত সাগরের অনেক দ্বীপ অধিকার করেন। তিনি সুদূর জাভা সুমাত্রা অবধি রাজ্য বিস্তার করেন। এই চোল বংশের নির্ম্মিত বহু সুবৃহৎ কারুকার্য্য-করা মন্দির এখনও সুমাত্রা ও জাভায় প্রাচীন ভারতের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। রাজরাজের পুত্র বিখ্যাত রাজা রাজেন্দ্র চোল গঙ্গার উপকূল ও ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ এবং আন্দামান, নিকোবর প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ জয় করিয়া রাজ্য বিস্তার করেন।

প্রবাদ যে এই রাজা রাজেন্দ্র চোল ১০২৩ হইতে ১০৬৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ৪১ বর্ষ ধরিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মহামূল্য প্রস্তরাদি আনাইয়া, শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের দ্বারা তাঞ্জোরের এই বিশাল মহিমময় অপরূপ মন্দির নির্ম্মাণ করান। এই তাঞ্জোর চোল রাজবংশের রাজধানী ছিল। ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের সময় ইহা দখল করেন কিন্তু বেশী দিবস রক্ষা করিতে পারেন নাই।

পশ্চিম ভারত হইতে মারাট্টারা আসিয়া তাঞ্জোর দখল করে। সহরের চতুর্দ্দিকে মারাট্টাদের অতীত কীর্ত্তির নানা নিদর্শন এখনও দেখা যায়। প্রধান মন্দিরের পার্শ্বেই এই সুবৃহৎ প্রাসাদ ও দুর্গ রাজা বিজয়-রাঘব নির্ম্মাণ করান। প্রাসাদের দুই ধারে দুইটি উচ্চ মিনার এবং মধ্যে একটি পাথরের উপর কারুকার্য্য করা বৃহৎ দরবার হল। ইহার মধ্যে একটি পাথরের সিংহাসন রহিয়াছে। প্রবাদ যে বীর শিবাজী কয়েক বর্ষ এই সিংহাসনে বসিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভোঁসলা বংশীয় রাজারা একসময় এই স্থানে রাজত্ব করিতেন।

তাঞ্জোর মন্দিরের পার্শ্বেই একটি কলা-মন্দির বা যাদুঘর রহিয়াছে। ইহার মধ্যে মনুষ্যাকারে গঠিত পুতুলসমূহ দেখিলে মনে হয় যেন জীবন্ত মানুষ।

দক্ষিণ ভারতের মধ্যে তাঞ্জোর একটি বিখ্যাত শিক্ষা-কেন্দ্র। এখানে সংস্কৃত ও তামিল ভাষা শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় ও প্রাচীন টোল রহিয়াছে। তাঞ্জোরের 'সারস্বত মণ্ডল' একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার ও শিক্ষালয়। শুনিলাম ইহার মধ্যে সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় লিখিত আঠারো হাজার প্রাচীন পুঁথি আছে। প্রাচীন হিন্দু রাজারা কেবল যুদ্ধ বিগ্রহ বা মন্দির-প্রাসাদ ও দুর্গ-নির্ম্মাণই করান নাই, তাঁহারা বিদ্যা-শিক্ষার জন্যও নানা ভাবে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

তাঞ্জোর সহরের চতুর্দ্দিকে বহু নদীনালা রহিয়াছে এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়। সেই কারণে জমিসকল বঙ্গদেশের ন্যায় উর্ব্বর। এখানে ধান্য ও নানা শস্য এবং নারিকেল, কলা, আম প্রভৃতি নানা ফল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

হিন্দু রাজাগণের শাসনকাল হইতে এযাবৎ এই স্থানে নানারূপ শিল্প কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। সহরের মধ্যে বিবিধ বস্ত্র ও বহু প্রকার শিল্প দ্রব্যের দোকান অনেকগুলি দেখিলাম। তাঞ্জোর হইতে নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত বস্ত্র, কার্পেট সিল্ক ও রৌপ্যের দ্রব্য ভারতের চতুর্দ্দিকে রপ্তানি হয়। কাঞ্জীভরম্ ও মাদুরার ন্যায় তাঞ্জোরের সূতা ও সিল্কের শাড়ী এখনও জগৎ বিখ্যাত। ভারতের বাহিরেও রপ্তানি হয়।

কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যার দিবস রাত্রে ছিলাম তাঞ্জোরে। আজ ৺কালীমাতার পূজা। উত্তরভারতে সর্ব্বত্রই এই দিবস দেওয়ালী উৎসবের কি ধুম, চতুর্দ্দিক আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে দেওয়ালী উৎসব কিছুই দেখিলাম না। বাঙ্গালীরা মা কালীর বিশেষ ভক্ত। পল্লীতে পল্লীতে ও কলিকাতার গলিতে গলিতে মাটির কালী প্রতিমা গঠন করিয়া পূজার কত ধুম। দক্ষিণ ভারতে কোথাও মা কালীর মূর্ত্তিও দেখি নাই।

দক্ষিণ ভারতে অধিকাংশ মন্দিরে শিব বা মহাদেবের মূর্ত্তি প্রধানভাবে পূজিত হয়, পরে বিষ্ণুর আরাধনা হয়। রামসীতা বা কৃষ্ণ-রাধার মন্দির বা পূজা কম। দাক্ষিণাত্যে শঙ্করাচার্য্যের শৈবধর্ম্মের প্রাধান্যই সর্ব্বত্র বেশী বলিয়া মনে হয়।

সৌভাগ্য ক্রমে আমাদের স্পেশ্যালট্রেণে ছিলেন শ্রীশ্রী গুরু মহারাজ মোহনানন্দ স্বামী ও তাঁহার অনেক শিষ্য ও শিষ্যা। রাত্রি আটটা হইতে একটি কমপার্টমেণ্টে মাইক ফিট্ করিয়া এবং মাথায় লাউড স্পিকারের সাহায্যে প্রাণ-মন মাতোয়ারা মহারাজের সুললিতকণ্ঠের ধর্ম্ম সঙ্গীত ও কীর্ত্তন শ্রবণে প্রত্যেক যাত্রীই তন্ময় হইয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথের দুইটি কলি মনে উদয় হইল :—

'কবি বলে যাত্রী আমি চলিব রাত্রির নিমন্ত্রণে।
যেথানে সে চিরন্তন দেয়ালির উৎসব প্রাঙ্গণে॥"

শ্রাবণে

শক্তি মুখোপাধ্যায়

শ্রাবণের রিম্ ঝিম্ বৃষ্টি ধারায়
উতলা হয়েছে মন, জীবনে জোয়ার
এসেছে আজকে এই হৃদয়ের নীড়ে ;
আবার পেলাম খুঁজে পুরণো স্মৃতি।

সবুজ বনস্থলী বাতাসের সাথে
কাঁপছে, অবিশ্রাম বৃষ্টির রেখা
ছড়িয়ে পড়ছে নিচে, পাতার আড়ালে
পাখিরা ভিজছে বসে ; ভিজে স্যাঁৎসেতে।

উৎসব ঘনঘটা মেঘের প্রাসাদে
বৃষ্টির গান শুনি রিম্ ঝিম্ ঝিম্,
কত পরিচিত মুখ আজকে আবার
ক্রমাগত ভিড় করে সজল স্মৃতিতে।

কল্পিতা এখন তুমি দূর বাতায়নে
বসে আছো আনমনে, স্নিগ্ধ চোখে
স্বপ্নিল ছায়া পড়ে, মনোরম চুলে
কনক চাঁপার বাস, মিষ্টি···মধুর···।

আজ তুমি পরবাসী ; ভালোবাসা নাম
এখনো যায়নি মুছে, বৃষ্টি রেখায়
তোমার পদধ্বনি শুনেছি বলেই
হৃদয়-বীণায় বাজে ইমন···বেহাগ···।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

পূর্ব্বে যে হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীটে শ্রীঅরুণচন্দ্র হালদারের বাড়ীতে বাগবাজার "অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায়" সধবার একাদশীর আখড়া দিতেন, সেই ষ্ট্রীটের ৩৮ নম্বর বাড়ী গোবিন্দবাবুর শ্বশুরবাড়ী। ইহার উত্তরপূর্ব্বকোণে বড় বৈঠকখানায় এবার দল বসিল। এই দলের প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, রাধামাধববাবু ও ধর্ম্মদাসবাবু। এইবার যে দল বসিল, ইহাই সুপরিচিত ন্যাশান্যাল থিয়েটারের মূল।

এই দলের প্রতিষ্ঠাতা চারিজন ব্যতীত "সধবার একাদশীর" সময়কার হিঙ্গুল খাঁ, যোগেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সকলেই যোগ দিলেন। কেবল গিরীশবাবু যোগ দিলেন না। উষা-অনিরুদ্ধ যাত্রা হইতে মতিলাল সুর এবং সধবার একাদশীর অভিনয়ের সময় হইতে মহেন্দ্রলাল বসু ইহাদের সহিত মিশিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই দলে রহিলেন। এতদ্ভিন্ন যদুনাথ ভট্টাচার্য্য, শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্র, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল প্রভৃতি কতকগুলি নূতন লোক এই দলে যোগ দিলেন। ধর্ম্মদাসবাবু বিশেষ উৎসাহে কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১২৭৭ সালের পৌষ মাসে (১৮৭১ সালের প্রথমে) এই দল বসে। অর্দ্ধেন্দুবাবু শিক্ষাদাতা হইলেন। লীলাবতীর আখড়াই চলিতে লাগিল।

গোবিন্দবাবু যে সাহায্য করিতেন, তাহাতে আখড়া খরচ চলিত মাত্র। তাহাতে রঙ্গমঞ্চ বা পোষাক-পরিচ্ছদাদি হইবার আশা ছিল না, সুতরাং অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রস্তাব করিলেন, এ রকমে অর্থনষ্ট না করিয়া কোন ষ্টেজভাড়া করিয়া আনিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করা হউক। বিক্রয়ের অর্থে শেষে কোথাও একটা স্থায়ী মঞ্চ প্রস্তুত করা যাইবে। এই পরামর্শ গৃহীত হইল। অবশেষে ১২৭৮ সালের বৈশাখে (১৮৭১ এপ্রিলে) নগেন্দ্রবাবুর বাড়ীতে একদিন পরীক্ষার্থে অভিনয় (Dress-rehearsal) হইল, এই অভিনয়ে ধর্ম্মদাসবাবুই "ললিতের" অংশ অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়ের সুখ্যাতি রাষ্ট্র হইলে গিরীশবাবু আসিয়া যোগ দিলেন। টিকিট বেচিয়া অভিনয় করার প্রস্তাবে তিনি কোন মতেই সম্মত হইলেন না। শেষে তিনি বলিলেন, মাইকেলের প্রস্তাব মত বরং পাঁচ হাজার টাকা তুলিবার চেষ্টা করব। "কিছু কিছু বুঝির" অভিনয়ের সময় মাইকেল অর্দ্ধেন্দুবাবুকে বলিয়াছিলেন, এরূপে ব্যক্তিবিশেষের অর্থানুকূল্যের উপর নির্ভর করিয়া কোন থিয়েটার চলিবে না।

যাহা হউক অতঃপর চাঁদার খাতা প্রস্তুত হইল। একখানি খাতায় রাধামাধববাবু, ধর্ম্মদাসবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রত্যেকে ২০৲ করিয়া সহি করেন। তাহার পর মতিবাবু ও গোলাপবাবু এই খাতা লইয়া প্রথমেই নাট্যামোদী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ী যান। সেখানে কোন ফল হয় না, বরং শ্লেষবাক্য শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারা ফিরিয়া আসেন এবং আর কোনও বড় লোকের দ্বারস্থ হইবেন না, এইরূপ স্থির করা হয়। পরে প্রতিবেশী গৃহস্থগণের নিকট হইতে দুই একটাকা করিয়া ৩০০৲ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। ইহার ২৫০৲ টাকা মাত্র আদায় হয়। তাহা লইয়াই রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত আরম্ভ করা হয়। গোবর্দ্ধন পোটো একখানি রাজপথের দৃশ্য আঁকিয়া দিলে টাকা ফুরাইল। রং ও কাপড় কেনা ছিল। পোটো বিদায় করিয়া ধর্ম্মদাসবাবু নিজেই তুলি ধরিলেন। এই সময় আবার গোবিন্দনাথবাবু দেশে যান। অর্থাভাবে আখড়াই প্রায় বন্ধ হইয়া আসিল। মতিবাবু, মহেন্দ্রবাবু, নগেন্দ্রবাবু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু মাঝে মাঝে ১০৲ টাকা ২০৲ টাকা দিয়া দল বজায় রাখিলেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু এই সময় অর্থাভাব

পরলোকে 'কিশোর জগৎ' পরিচালক

কিশোর বন্ধুরা,

আজ তোমাদের শোকভারাক্রান্ত মনে জানাচ্ছি "কিশোর জগৎ"-এর পরিচালক 'উদয়ানন্দ', যার আসল নাম কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, তিনি গত ২৫ই আষাঢ় হৃদরোগে পরলোকগমন করেছেন। গত ১৩ বৎসর ধরে তিনি এই "কিশোর জগৎ" বিভাগটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করে এসেছেন এ তো তোমরা জানই। তাছাড়া বাঙ্গালী কিশোরদের মন ও মস্তিষ্ক যাতে সুগঠিতরূপে তৈরী হয়, তারা যাতে দেশমাতৃকার সুসন্তানরূপে গড়ে উঠতে পারে, স্বাধীন দেশের সু-নাগরিক রূপে যাতে তারা পরে পরিচয় দিতে পারে, জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে যাতে তারা এগিয়ে চলতে পারে, জ্ঞানে ও গরিমায় যাতে তারা ভূষিত হয়ে উঠতে পারে, সৎবুদ্ধি ও সৎ-সাহসে যাতে তারা উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, আধুনিক কালের দোষগুলি যাতে তাদের স্পর্শ না করে, অথচ কালোপযোগী সুশিক্ষা তারা পায় এবং সর্বগুণান্বিত হয়ে গড়ে উঠতে পারে—এই মহৎ উদ্দেশ্য মনে রেখেই তিনি এই বিভাগটি পরিচালনা করে এসেছেন। আজ তিনি নেই, কিন্তু তাঁর আদর্শ বজায় থাকবে এবং এই বিভাগটিও সেইভাবেই পরিচালিত হবে।

তোমরাও আশাকরি এই বিভাগটির আদর্শ অনুযায়ী নিজেদের গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে—চেষ্টা করবে সুশিক্ষিত, সুসভ্য, সুনাগরিক হয়ে উঠতে ভবিষ্যৎ জীবনে। মনে রাখবে তোমাদের ওপরই নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ। ইংরাজীতে একটি কথা আছে—"Child is the father of man" আজ যারা ছোট আছ কিছুদিন পরে বড় হয়ে তোমরাই হবে পিতা, অভিভাবক, নেতা, শিক্ষক—তোমরাই চালিয়ে নিয়ে যাবে জাতিকে, সমাজকে, দেশকে। তাই তোমাদেরই আগে গড়ে উঠতে হবে এই গুরুদায়িত্বের যোগ্য হয়ে। কবি অপূর্বকৃষ্ণ এই "কিশোর জগৎ"-এর মধ্য দিয়ে এতদিন সেই শিক্ষাই, সেই জ্ঞানই তোমাদের দিয়ে এসেছেন। আশাকরি তোমরা সেই শিক্ষা, সেই আদর্শের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠবে।

গত "আষাঢ়" সংখ্যায় 'কিশোর জগৎ'-এ পরিচিত জনৈক লেখকের উদ্দেশ্যে যে কথাগুলি তিনি লিখে গেছেন তারই কিছুটা অংশ তুলে দিলাম তাঁরই উদ্দেশ্যে।

"...একাই উড়ে যায় বিহঙ্গম তার নীড়কে ফেলে রেখে, চলে যায় তার স্বর্গের দিকে। কেবল রেখে যায় একটা পুরো হৃদয় স্মরণের নির্জনতায়। সে কণ্ঠ আজ নীরব... আজ সে কারামুক্ত—সর্ব আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে বসে গেল দুলার আসনে"। কবি অপূর্বকৃষ্ণ আজ আর নেই। কণ্ঠ তাঁর আজ নীরব। কিন্তু বাণী সরস্বতীর যে সাধনা তিনি করে গেলেন তা বঙ্গ-ভারতীর ভাণ্ডারে সংরক্ষিত হবে। তোমরাও তাঁর কবিতাবলী ও উপন্যাসগুলি পড়ে দেখ—আনন্দ পাবে নিশ্চয়ই।

কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে এই সংখ্যায় "সাময়িকীতে" যা লেখা হয়েছে তাও তোমরা পড়ে দেখ।

—শ্রীজ্ঞান

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত

দী কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিষ্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৫)

তারপর দীর্ঘ নয় বছর ধরে ডাঙ্গ্লার্স, ফার্নান্দ আর ভিলেফোর্ট—এদের তিনজনের শাস্তি বিধানের জন্ত দান্তের চললো নিপুণ প্রস্তুতি…তার বিশ্বাস—ওদের শাস্তি দেবার জন্যই ভগবান তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে এখানে এনেছেন…এত বিত্তশালী করেছেন!

এমনিভাবে দিনের পর দিন তিলে-তিলে-নিজেকে প্রস্তুত করে তুলে অবশেষে ১৮৩৮ সালে দান্তে এলো প্যারিসে বাস করতে—কাউণ্ট্ অফ্ মণ্টি ক্রিষ্টো ছদ্মনামে। ফার্নান্দ তখন, গণ্যমান্য অভিজাত-পুরুষ…কাউণ্ট্ অফ্ মর্সার্ফ—ফরাসী দেশের রাজা-সভার (French parliament) 'চেম্বার অফ্ পিয়ার্সের' (Chamber of Peers) অন্যতম সদস্য…তার পত্নী মার্সেডিজ্…তাদের একটি পুত্র হয়েছে…পুত্রের নাম—আলবার্ট। প্যারিসে আসবার আগে দারুণ এক বিপদের দিনে দান্তে করেছিল আলবার্টের জীবন-রক্ষা। ওই প্যারিসে পদার্পণ করেই সে এলো আলবার্টের গৃহে…তার সঙ্গে দেখা করতে।

আলবার্ট কৃতার্থ হয়ে বললে,—আমার বাড়ীতে প্রাণের আপনি বিপদে আমার প্রাণরক্ষা করেছেন…আমার বাবা-মা শুনেছেন, আপনার মতো দরদী-উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষীর সঙ্গে দেখা এবং আলাপ করবার জন্য তাঁরা দুজনেই আকুল।…আপনি বসুন…আমি তাদের খবর দিই!

ছেলের মুখে কাউণ্টের মতো হিতৈষী-অতিথির আগমন সংবাদ পেয়ে ফার্নান্দ এলো আলাপ-পরিচয় করতে। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে দেখা…কাজেই দান্তেকে সে চিনতে পারলো না…সাদরে অভ্যর্থনা করে তাকে বহু ধন্যবাদ জানালো। উভয়েই যখন আলাপ-পরিচয়ে ব্যস্ত, এমন সময় সে ঘরে এসে হাজির হলো ফার্নান্দের স্ত্রী মার্সেডিজ। মার্সেডিজ্ দেখলো মণ্টি ক্রিষ্টোর কাউণ্টকে…দেখবামাত্র মার্সেডিজের মাথা গেল ঘুরে…তার মুখ হলো বিবর্ণ! মার্সেডিজের হঠাৎ এমন মানসিক-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আলবার্ট শুধোলো —শরীরে কোনো অসুখ বোধ করছো, মা?

কোনোমতে আত্মসম্বরণ করে মার্সেডিজ্ বললে,—না…ইনিই তোমার প্রাণরক্ষা করেছিলেন?…এঁকে দেখে আবেগে আমি কেমন চঞ্চল হয়েছিলুম!

মৃদু হেসে কাউণ্ট্ বললে,—মাদাম, আপনি আমাকে বড় বেশী কৃতার্থ করলেন! কোনো মানুষকে বিপদ থেকে বাঁচানো…তার মা-বাপের যাতে দুঃখ-ব্যথার কারণ না ঘটে—এমন কাজ করায় মহত্ত্ব নেই আদপে! এ কাজ করায় মানুষ মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয় মাত্র…যে তা না করে, সে অমানুষ!

মার্সেডিজ্ বললে—আপনি যদি দয়া করে আমাদের এখানে অতিথি হয়ে দু'চারদিন বাস করেন, তাহলে আমরা বাস্তবিকই ধন্য হবো!

নিশ্বাস ফেলে কাউণ্ট জবাব দিলো,—আমাকে ক্ষমা করবেন, মাদাম…আমার দ্বারা তা সম্ভব হবে না!

—তাহলে আবার আসবেন, বলুন?…

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাউণ্ট বললে, নিশ্চয় আসবো মাদাম!

পরের দিন কাউণ্ট গিয়ে দেখা করলো তার প্যারিস-শহরের ব্যাঙ্কার (Banker) ডাঙ্গ্লার্সের সঙ্গে… আগেকার সামান্য ডাঙ্গ্লার্স, এখন অভিজাত ব্যারণ

মাদাম্ জেরার্ড ছেলেকে বললে,—যাও তো এডোয়ার্ড, তোমার বোন ভ্যালেন্টিন্ কোথায় কি করছে, দেখে এসো!...

এডোয়ার্ডকে বিদায় দিয়ে মাদাম্ জেরার্ড নানা কথা কইতে লাগলো কাউন্টের সঙ্গে।

কথায় কথায় মাদাম্ জেরার্ড কাউন্ট্‌কে জানালো যে নানারকম বিষের সম্বন্ধে তার খুব ঝোঁক...বিষ আর বিষের প্রতিষেধ কি, এ বিষয়ের অনুশীলনে তার বড় আনন্দ! মাদাম্ বললে,—'আর্সেনিক' (Arsenic) বা শেঁকো-বিষ...আমি জানি, অব্যর্থ! কিন্তু 'আর্সেনিকে' যাদেরো মৃত্যু হয়, তার দেহ পরীক্ষা করলে, সে বিষের চিহ্ন প্রমাণ পাওয়া যায়!

কাউন্ট্ বললে,—কিন্তু মাদাম্, এমন বিষও আছে, যা খাওয়ালে মানুষ মরবেই, অথচ লক্ষণাদি দেখে তা কেউ ধরতে পারবে না...বলবে—সন্ন্যাস-রোগে মৃত্যু হয়েছে...বড়-বড় ডাক্তারেরও সাধ্য নেই যে বিষের ফল বলে বুঝবে!

কাউন্টের কথা শুনে একটু চিন্তা করে মাদাম জেরার্ড বললে,—কিন্তু অপরাধ তো...অপরাধ সব সময়েই অপরাধ...পাপ! ধরা না পড়লেও, বিবেক...বিবেকের কাছে কি কৈফিয়ৎ দেবেন?

কাউন্ট বললে,—কিন্তু বিবেককে বোঝাবার জন্য হাজার হাজার কারণ থাকতে পারে, মাদাম!

—কি রকম?

কাউন্ট্ বললে,—ধরুন, মায়ের স্নেহ...সন্তানের মঙ্গলের জন্য, যদি প্রয়োজন হয়, বিষ খাইয়ে তার শত্রুকে হটানো...তার বাধা-বিঘ্ন দূর করা!

একটু চিন্তা করে মাদাম্ জেরার্ড বললে,—না, মানে, এ সব কথা বলা...মানে, বললুম তো...রসায়নে আমার খুবই ঝোঁক!

—বটে! কাউন্ট্ বললে,—আপনি তাহলে পরখ করে দেখুন...আমি কতকগুলো নমুনা আপনাকে পাঠাবো কাল সকালে!

সেদিনকার মতো কাউন্ট্ বিদায় নেবার পর, মাদাম্ জেরার্ড ভাবলো,—ভালোই হলো...আমার আশা-তরু এবার তাহলে মুঞ্জরিত হবে!

কাউন্টের এবার লক্ষ্য হলো—ড্যাঙ্গলার্স। প্যারিসের একজন টেলিগ্রাফ-প্রেরককে মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে তার মারফৎ টেলিগ্রামে একটা মিথ্যা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করলো কাউন্ট্...সে খবর প্যারিসের কাগজে-কাগজে প্রচারিত হলো। খবরটি হলো—

স্পেনে দারুণ বিপ্লবের আশঙ্কা—প্রচণ্ড বিপ্লব বাধবে!

এ খবর পড়ে ড্যাঙ্গলার্স্ ভাবলো—তাহলে দেরী নয়...আমার 'স্প্যানিশ্-বণ্ডগুলো' (Spanish Bonds) এখনি বেচে দেবো।

এই ভেবে সে আর এতটুকু বিলম্ব না করে তার জমানো সব 'স্প্যানিশ-বণ্ডগুলো' জলের দরে বাজারে বেচে দিলে।

পরের দিন কিন্তু খবরের কাগজে খবর ছেপে বেরুলো—

স্পেনের সম্বন্ধে যে খবর কাল কাগজে প্রকাশিত হয়েছে, সে খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ভুল টেলিগ্রাফ ছাপা হয়েছিল।

সামান্য এই একটি অসত্য-খবরের ফলে, ড্যাঙ্গলার্সের রাতারাতি লোকসান হলো—নগদ দশ লক্ষ টাকা!

তাহলে কি জবাব দেবে তাঁকে ? কথাটা শুনে তোমরা হয়তো খুবই অবাক্‌ হবে বলবে,—এমন কাজ আবার সম্ভবপর নাকি।

বাস্তবিকই, সাধারণভাবে বিচার করে দেখলে, এমন কাণ্ড ঘটানো সম্ভবপর নয়। তবে বিজ্ঞানের রহস্যময়-কৌশলটি যাদের জানা আছে, তাদের পক্ষে অবশ্য এ-ধরণের আজব কাণ্ড ঘটিয়ে তোলা নিতান্তই সহজসাধ্য কাজ। কি উপায়ে এত আজব কাণ্ড সম্ভবপর করে তোলা যায়—শোনো তাহলে। আপাততঃ তারই আসল কলা কৌশলের পরিচয় দিই। কিন্তু কলা কৌশলের কথা খুলবার আগে বিজ্ঞানের এই মজার খেলাটি দেখানোর জন্য যে সব সাজসরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলির মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ এ খেলার জন্য চাই—দুটি বড় সাইজের বোতল, একপাত্র জল একখানা চেয়ার অথবা টুল এবং ২।০।৩ ফুট লম্বা একফালি 'টোয়াইন' সুতো (Twine-chord)।
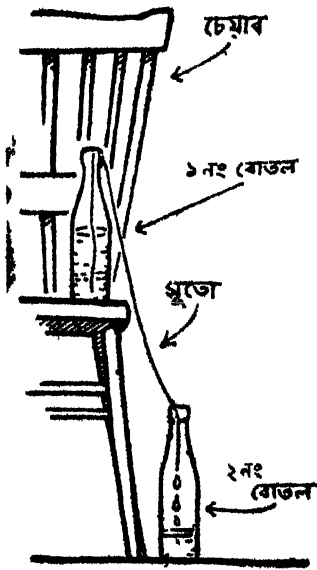
সামান্য এই সাজসরঞ্জাম কয়েকটি জোগাড় হবার পর আমাদের সঙ্গী সাথী, আত্মীয়-পরিজনদের সামনে খেলা দেখানোর সময় প্রথমেই বোতল দুটির মধ্যে একটি জল ভরে নাও এবং সেটিকে উপরের ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে ঐ চেয়ার বা টুলের আসনে বসিয়ে রাখো। এবারে শূন্য-বোতলটিকে বসিয়ে রাখো—চেয়ারের পদ-প্রান্তে মেঝের উপর ছবিতে যেমন দেখছো, অবিকল তেমনিভাবে। এ কাজ সারা হলে, চেয়ারের আসনে ও মেঝেতে বসিয়ে-রাখা বোতল দুটির ভিতরে লম্বা 'টোয়াইন' সুতোর দুই প্রান্ত ঝুলিয়ে দাও—উপরের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে। এভাবে রাখার ফলে, কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—সুতোর যে-প্রান্তটি চেয়ারের আসনে জল ভরা বোতলের ভিতরে ডুবে রয়েছে, সেটি থেকে অল্প অল্প জল চুঁইয়ে ছোট-ছোট ফোঁটার আকারে ক্রমশঃ মেঝের উপর বসিয়ে রাখা শূন্য বোতলটির মধ্যে ঝরে পড়ে, খালি বোতলটিকে বিনা-কসরতে দিব্যি-অনায়াসে জলপূর্ণ করে তুলছে। এই হলো—এ খেলার আজব-কারসাজি।

কারসাজির কাহিনীর পরিচয় তো পেলে কিন্তু এমনটি কেন ঘটে, জানো ? এর কারণ হলো—সুতোর শোষণ আকর্ষণ ক্রিয়া। অর্থাৎ, সচরাচর ব্লটিং-কাগজ বা আর্দ্র-কাপড়ের টুকরো অথবা জলসিক্ত তুলোর পুঁটলি যেমনভাবে কালি কিম্বা জল শুষে নেয়, এক্ষেত্রেও তাই ঘটে বলেই। বিজ্ঞানীদের মতে, এ ধরণের শোষণ-ক্রিয়ার নাম—'ক্যাপিলারী অ্যাট্রাকশন্' (Capillary Attraction) বা 'কৈশিক-আকর্ষণের' ফলেই, চেয়ারের আসনে রাখা জল-ভরা বোতল থেকে লম্বা সুতোর অঙ্গ চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল ক্রমান্বয়ে নীচে গড়িয়ে এসে মেঝেতে বসিয়ে রাখা শূন্য বোতলটিকে জলে পরিপূর্ণ করে তোলে। এবারের মজার খেলাটির এই হলো আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি আজব মজাদার বিজ্ঞানের খেলার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। চক্রের হেঁয়ালি ঃ
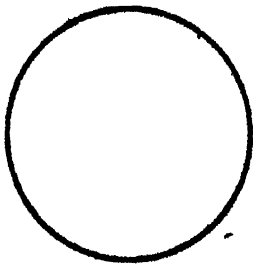
উপরের ছবিতে যে গোলাকার চক্রটি দেখছো—মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে সেটিকে মাত্র তিনটি বক্র-রেখার (Curved Line) আঁচড় কেটে এমন নিপুণ-কায়দায় চার-ভাগে বিভক্ত করো, যার ফলে—ঐ চক্রের ভিতরকার চারটি বিভক্ত-অংশ যেন প্রত্যেকটি সমান-মাপের হয়·· অর্থাৎ, এদের কোনোটি যেন আকারে অপরটির চেয়ে কোনোমতেই ছোট বা বড় না হয়ে যায়। এ কাজটুকু যদি সুষ্ঠুভাবে করতে পারো তো, তোমার আঁকা সেই ছবিটি আমাদের দপ্তরে পাঠিয়ে দিও।

২। 'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

চার অক্ষরে নাম আমার···খেতে সুস্বাদু বিশেষ এক-ধরণের মরশুমী ফল। প্রথম ও শেষাক্ষরের সাহায্যে মাছ ধরা যায় এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অক্ষর জোড়া দিলে বালুকাময় বিস্তীর্ণাঞ্চল বোঝায়। প্রথম অক্ষর দুটিতে এক-রকম ফলের নাম বোঝায় আর শেষের দুটি অক্ষর দিয়ে কাগজের বুকে লম্বা লাইন আঁকা যায়।· বলো তো আমি কি ফল?"

রচনা : গৌতম ঘোষ (কলিকাতা)

৩। প্রথম বর্ণের মাঝে প্রাণীদের ধাম;
দ্বিতীয়াক্ষরে পাবে পরিষ্ক-পক্ষর নাম,
তৃতীয়ের অর্থ হয়—ইংরাজী 'অ ইন',
দ্বিতীয় তৃতীয় মিলে বলে চলাকার 'লাইন'।
তিন বর্ণ একাকারে গড়ে যেই কথা—
প্রথমেরই তরে তার সৃষ্টি জেনো তথা!

রচনা দিলীপকুমার দত্ত (নাগেরবেড়িয়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র

আমাদের খামখেয়ালী চিত্রকর মশাইয়ের আঁকা আজব-ছবির সাতটি টুকরোকে ঠিকমতো কায়দা করে সাজিয়ে বসালে, উপরের ছবিতে যেমন দেখছো তেমনি ধরণের পথ চলতি মানুষের চিত্র-রচনা করতে পারবে তোমরা অনায়াসেই।

১। ভারতবর্ষ

৩। মাদল

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

ভুজু ও বিজু (আলাপুর), কমু মিত্র (কলিকাতা), রবি ও রিবি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), কিশোর ও ব হালদার (কোরবা), সন্তোষ, সঞ্জয়, মুরারি ও স্ব (ভিলাই), পুপু ও টুটন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)।

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

বুবু ও মিশু গুপ্ত (কলিকাতা), শর্মিলা ও রায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা, হাবলু (হাওড়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে

দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (গয়া)

খেলনা-পুতুলের ইতিকথা

পৃথ্বী দেবশর্ম্মা রচিত ও চিত্রিত

ভিক্টোরীয় যুগচেতনা ও টমাস হার্ডি

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডির (Thomas Hardy : 1840-1928) নাম আজ বিশ্বের সাহিত্যাঙ্গনে সুপরিচিত। হার্ডিকে যুগোত্তীর্ণ ঔপন্যাসিক বলতে কোন দ্বিধার অবকাশ নেই। কেন না ভিক্টোরীয় যুগকে অতিক্রম করে তাঁর সাহিত্য সময়োচিত বলে বিবেচিত হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যের ধারায় তাঁর একটি স্বতন্ত্র স্থান রয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্-দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর জন্ম হলেও এই বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত, জীবিত থেকে জীবনের শেষ দিন অবধি তাঁর সাহিত্য সাধনা অব্যাহত ছিল।

কাব্য অথবা উপন্যাস—সাহিত্যের এই দ্বিমুখী ধারার কোনটিতে হার্ডির শ্রেষ্ঠত্ব তা নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলেছে। আজ সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করেন কাব্য অপেক্ষা উপন্যাস রচনাতেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। হার্ডি একালের একজন শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাঁর কবিতা সংখ্যায় খুব কম। তিনি বহু কবিতা লিখেছেন এবং সেগুলি সহৃদয় কাব্য-পাঠকের মন জয় করতে সক্ষম।

ভিক্টোরীয় যুগের মানস-জগতে সাহিত্যের বিচিত্র গুঞ্জন শোনা গেলেও একথা জোরগলায় বলা যায় উপন্যাসেই এ যুগের সার্থক স্ফূর্তি। টমাস হার্ডি ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যপ্রতিভার অগ্রণী বলেই তাঁর উপন্যাস রচনায় আবেদন এত গভীর। হার্ডি তাঁর পূর্বজ এবং সমকালীন প্রখ্যাত রুশ ও ফরাসী ঔপন্যাসিকদের রচনা পড়েছিলেন। হার্ডির উপন্যাস জটিল ঘটনায় বাঁধা পড়েনি কোথাও—তাঁর প্রায় সবগুলি উপন্যাসের কাহিনীই সরল রেখাঙ্গ, বিশেষ কোন 'ism' প্রচারের উদ্দেশ্য তাঁর ছিল না। মানব-মনের উচ্চাভিলাষ, ঈর্ষা, লোভ, মোহ, প্রেম ইত্যাদিকে উপন্যাসের উপজীব্য করবার জন্য তিনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। হার্ডির উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর সংখ্যাও অল্প। ফলে কাহিনী কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি।

টমাস হার্ডি সাহিত্যের আসরে উপস্থিত থেকে একটি স্বতন্ত্র মতামত প্রকাশ করেছেন। তৎকালীন বস্তুবাদ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্মবোধের মধ্যে তিনি আপনাকে আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর The return of the native, Tess of D' Urbervilles এবং Jude the obscure খুবই প্রসিদ্ধ। রক্ষণশীল সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার মূলে কুঠারাঘাত করলেন হার্ডি। Tess D. Urbervilles উপন্যাসে তিনি তাঁর নায়িকার সংজ্ঞা দিয়েছিলেন—'A pure woman!' বিশেষ ক'রে ভিক্টোরীয় যুগে এই জাতীয় উক্তি ঔদ্ধত্য বলেই গণ্য হতো। হার্ডির সঙ্গে এ ব্যাপারে প্রাচীন গ্রীক ও সংস্কারমুক্ত এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের মনের মিল হয়েছিলো বলে তিনি তাঁদের প্রশংসা জানিয়েছিলেন।

হার্ডির উপন্যাসগুলির পটভূমিকায় রয়েছে গ্রামের সরল পরিবেশ, বড়জোর তা এগিয়ে এসেছে সহরতলীতে। সেখানেও প্রাণ দিয়ে অনুভব করলে পাওয়া যাবে সবুজের গন্ধ। হার্ডি তাঁর উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, নাম যার 'ওয়েসেক্স' (Wessex)। তাঁর 'ওয়েসেক্স' অঞ্চলের 'সূর্যহারা অরণ্য' জীবনের নৈসর্গিক প্রকৃতির অভিজ্ঞতা, বিচিত্র। হার্ডি এই অঞ্চলে প্রায় কুড়িবছর বাস করেছিলেন, পরিচয় পেয়েছিলেন অঞ্চলটির একদিকে গ্রীষ্মের গাছের শ্যামলরূপ অন্যদিকে এগডনহিথের দুর্জ্ঞেয় নিষ্ঠুর আগ্রত জড়-শক্তি! 'ওয়েসেক্স' অঞ্চলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অপূর্বভাবে রূপায়িত হয়েছে Tess D. Urberilles উপন্যাসে।

টেস্ জন্মে'ছ গ্রামে। তারপর বাধ্য হয়েছে সে শহরে ধনী আত্মীয় অ্যালেকে-র বাড়ীতে আসতে—আর নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে অ্যালেকের সন্তানকে গর্ভে ধরতে হয়েছে তাকে। সন্তানটি বাঁচেনি, হয়ত বা এই বিশ্বের আলোর সে তার মুখ দেখাতে চায়নি। টেস তারপর একটি কাজ নিয়েছিলো—সেখানে সে ভালোবাসলো শিক্ষিত যাজক-পরিবারের সন্তান এনজেলকে। টেস্ এত দিনে বুঝলো সে নারী, সে কামনারাজ্যের রানী। বিয়ের আগে অনেক চেষ্টা করেও পূর্বের কথা বলতে পারেনি টেস্, মধুযামিনীর পর টেস্ জানালো তার রোদনভরা কাহিনী। তার কথা শোনার পর ক্ষমা করতে পারেনি এনজেল। টেসের বুকের সামান্য মাত্র দুঃখের অগ্নিস্পর্শ সে অনুভব করতে পারেনি। টেস্ কত অনুনয় বিনয় করেছে ক্ষমা চেয়েছে—পায়ে লুটিয়ে পড়ে মার্জনা ভিক্ষা করেছে. কিন্তু গ্রামের কৃষক কন্যা টেসের সেই বুকফাটা ক্রন্দন এনজেলকে তার শ্রেণীগত, সমাজগত সংস্কারের পথ থেকে সরাতে পারেনি। এনজেল তাই বলেছে—

'Do't Tess , don't argue. Different societies, different manners. You almost make me say you are an unapprehending peasant woman, who have never been initiated into the proportions of social things'

টেসকে ত্যাগ করলো এনজেল। অথচ এবার কিন্তু টেস্ কাঁদলো না, করুণা ভিক্ষা করলো না। টেস ফিরে গেল স্নেহস্নিবিড় গ্রামটিতে, আর এনজেল ফিরে গেল তার বাবা-মা র কাছের থেকে দূরে ব্রেজিলে।

এর পরের কাহিনী বিচিত্র। পবিত্র ধর্মে দীক্ষিত অ্যালেকের সঙ্গে আবার যখন দেখা হলো টেসের তখন তাদের দারিদ্র্যের সীমা নেই। অ্যালেকের 'মিসট্রেস' হলো টেস—এদিকে অনুতাপে দগ্ধ হয়ে ফিরে এলো এনজেল। টেস কিন্তু কঠোর হলো—ফিরিয়ে দিল তাকে। এনজেল চলে যেতে টেসের বুকটা হাহাকার করে উঠলো—অ্যালেককে ছুরি দিয়ে খুন করে এনজেলের পাশে এলো টেস, আবার কয়েকটি দিন অপরূপ মাধুরীতে কাটলো অজ্ঞাতবাসে। শেষে ধরা পড়লো টেস, তার ফাঁসী হলো। হার্ডির বিদ্রোহ উপন্যাসের শেষাংশে ফুটে উঠেছে। হার্ডির উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রের মত টেসও বারবার নিয়তির বিধানে দুঃখে জর্জরিত হয়েছে, কোন এক অজানা হাতের খেলায় সে হয়ে পড়েছে অসহায়। সেই নিয়তিই তাকে অবধারিত দুঃখের পথে, চরম Tragedy-র পথে চালিত করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও হার্ডি তাকে দিয়েছেন চরম শক্তি ইবসেনের নোরার মত তাঁর টেসও মুখ বুজে থাকে নি। সে বিদ্রোহ করেছে।

টমাস হার্ডির Jude the obscure (1895) একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ। হার্ডির আধুনিক মননের অন্যতম আলোচ্য উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের উপর সমসাময়িক সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। উপন্যাসের মুখ্যচরিত্র জুডএর জীবনে দুটি নারী এলো, আরাবেল্লা আর স্যু। আরাবেল্লার মধ্যাহ্ন খরতাপ আর স্যু'র গোধূলি ছটা—এ দুয়ের মধ্যে জুড দুটি তত্ত্ব আবিষ্কার করলো। আরাবেল্লার মাতৃত্বের ছলনায় জুড বুঝলো শিক্ষার ফলে রুচিহীনতা কী পর্যায়ে পৌঁছুতে পারে অন্যদিকে গ্রামের মেয়ে স্যু'কেও সে চিনতে পারলো অনেক পরে—যখন জানলো স্যু'ও নারী, তারও মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলছে—তখন ঘৃণা ছাড়া তার আর কোন সঙ্গী রইলো না। এরপর আবার স্যু এলো—জুড বিয়ে করলো তাকে। ক'দিন মাত্র বিবাহ-জীবন কেটেছে এমন সময় রাহুর মত তাদের মধ্যে উপস্থিত হলো জুড এবং আরাবেল্লার সন্তান ফাদার টাইম। এরপর সমাজপতিরা ক্ষেপে উঠলো স্যু ও জুডের চার্চ বিহিত বিবাহ না হওয়ায়। চাকরী রইলো না জুডের। তারপর একদিন দু'জনে বাড়ী ফিরে দেখে ফাদার টাইম স্যু-এর ছেলে দুটিকে খুন করেছে আর নিজে করেছে আত্মহত্যা। এরপর আর একটি মৃতসন্তান প্রসব করলো 'স্যু', ভাবলো নিশ্চয়ই 'পাপ' হয়েছে তার, সে ফিরে গেল পূর্বের স্বামী ফিলটসনের কাছে। ওদিকে স্যু-এর জন্যে জুড দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে তখন বিধবা আরাবেল্লা ফিরে এলো, জুডকে মদ খাইয়ে চার্চে নিয়ে গিয়ে বিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে জুড আবার ফিরে গেল স্যুর কাছে,

—'I was gin drunk, you were creed-drunk. Either form of intoxication takes away the 'nobler vision,' স্যু পুনরায় ফিরে তখনও মুখোমুখি

উপেক্ষা করতে পারলো না। এবার জুড অসুখে পড়লো। আরাবেল্লা তখন জুডকে হারিয়ে যাতে না ডাক্তারকে হারায় তার চেষ্টায় ব্যস্ত। তৃষ্ণার্ত জুডের গলায় জল দেবার তখন কে আছে?

জনৈক সমালোচক * বলেছেন—'জুড দি অবস্কিওর' পড়তে পড়তে গ্যেটের 'ফাউস্ট'-এর কথা মনে পড়ে।... ফাউস্টের একদিকে মর্ত্যের বন্ধন ফেলে ঊর্ধ্বলোকে দিব্য-সুধা পানের কামনা, অপরদিকে নরকের অন্ধকারে দেহ-ক্ষুধার আদিম লালসা। গ্যেটে মৃত্যুর পূর্বে বলে উঠেছিলেন 'আলো, আরও আলো।' তাঁর ফাউস্টও আলোক-তীর্থের অম্লান যাত্রী। তেমনি হার্ডির এ চরিত্রেরও একদিকে দেখি স্যু অপরদিকে আরাবেল্লা ঊর্ধ্বের spirit ও নিম্নের fleshএর দ্বন্দ্ব। একদিকে স্বর্গের সুষমা, অপরদিকে নরকের তমসা। একদিকে প্রেমের সুধা, অন্যদিকে দেহের ক্ষুধা।'

ভিক্টোরীয় যুগের উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে হার্ডির এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ চিন্তাধারার স্বকীয়তা এবং গভীর মনন শক্তি। বস্তুতঃ ভিক্টোরীয় যুগের সাহিত্যের প্রত্যেক লক্ষণ এবং বৈশিষ্ট্য তাঁর উপন্যাসে প্রতিভাত। হার্ডির উপন্যাসে মাটির গন্ধ, উপন্যাসগুলি যেন মৃত্তিকার উদ্ভিদ আর সব মিলিয়ে হার্ডি তাই ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক।

---

* উপন্যাসের কথা: দেবীদাস ভট্টাচার্য, পৃঃ ১৩৫-৩৬।

প্রেয়সী

শ্রীক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায়

হৃদয় জুড়িয়া র'য়েছে প্রেয়সী তোমার ছবিটি আঁকা
তোমার বিহনে হ'য়ে গেল মোর জীবনের সব ফাঁকা,
দিবসে নিশিতে শয়নে স্বপনে তোমারেই ভাবি মনে
তোমার প্রণয়ে পাগল হইয়া ঘুরি আমি বনে বনে,
কৈশোর হ'তে খুঁজিতেছি তোমা যৌবন চ'লে যায়
ওগো অকরুণা! তবুও তোমার দেখা না পাইনু হায়,
দেবালয়ে কত ক'রেছি মানত তোমারে পাবার লাগি
কত নিশি মোর হ'য়ে গেছে ভোর
তোমার ধেয়ানে জাগি।
কত ফাল্গুন এসে গেছে ফিরে, কত চৈতালী-সন্ধ্যা
তুমি নাই ব'লে কিছু নাই মোর হ'য়ে আছি যেন বন্ধ্যা,
তাই ভাবি তোমা ছিনায়ে আনিব রক্ষিত পুরী হ'তে
তস্কর বেশে চুপি চুপি গিয়ে গভীর আঁধার রাতে।
তোমারে লইয়া গর্বিত বুকে ধর্ষিত পদ-ভরে
রণ-জয়ী বীর সম উল্লাসে ফিরিয়া আসিব ঘরে।
লুন্ঠিত ধন কুন্ঠিত-মনে শঙ্কিত হ'য়ে উঠি
মনে প'ড়ে যায় জেলখানা আর দারোগার মারপিটি।
নিজ জীবনের ভগ্ন-অংশ মনে মনে ক'ষে দেখি
দুটি ভাগ প্রায় হ'য়ে গেছে শেষ আর একভাগ বাকী,
এর লাগি আর পাপ করিবারে ভীরু মন নাহি চায়
তোমারে পাবার সোজাপথে হ'ল বিবেক অন্তরায়।
তব কৃপালাভে বঞ্চিত হ'য়ে—হ'য়ে গেল ভস্মকর
হ'য়ে গেল মোর মহাজীবনের সবখানি অপচয়,
এখনও তোমারে পেলে
শীর্ণ শরীরে যৌবন মোর ভ'রে ওঠে ফুলে ফুলে,
এখনও তোমারে পেলে
সার্থক হয়, বঞ্চিত যাতে হয়ে আছি পলে পলে,
এখনও তোমারে পেলে
লঙ্ঘিতে পারি দুর্গম গিরি কান্তার অবহেলে।
তাই বলি তুমি সদয় হইয়া একবার দাও দেখা,
সুন্দরীতম প্রেয়সী আমার ওগো অপরূপা "টাকা"

পুরীতে সংস্কৃত নাট্যাভিনয়

পণ্ডিত শ্রীঅনাথশরণ কাব্যব্যাকরণতীর্থ

স্নানযাত্রা! ভারতবর্ষীয়দের যুগযুগান্তব্যাপী আনন্দ-মহোৎসব! এই মহাপবিত্র উৎসব উপলক্ষ্যে পুরীতে আমন্ত্রণ পাইয়া আমরা সকলেই বিশেষ উৎফুল্ল হইলাম। আমন্ত্রণ জানাইলেন পুরীর দুইটী সুবিখ্যাত সংস্থা—দুর্গা-বাড়ী এবং উড়িষ্যাসরকারের সর্ব-উড়িষ্যা সংস্কৃত সমিতি (Orissa Govt. Association of Learning and Culture for Sanskrit) শেষোক্ত সংস্থার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে বিদুষীপ্রবরা অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরী সমাবর্তন ভাষণ প্রদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীও।

এই সূচী অনুসারে বিগত ২০শে জুন ১৯৬৪, আমাদের "প্রাচ্যবাণীর" সংস্কৃত-পালি-নাট্যসঙ্ঘের ১০ জনের একটী দল কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া ২১শে জুন সকালে এই পুণ্যভূমিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইল "শিবনাথ-সংস্কৃত কলেজে"। অতি সুন্দর এই কলেজভবন ও তৎসংলগ্ন উদ্যানটী।

আমাদের প্রথম দিনের অভিনয় হয় ২১শে জুন, ১৯৬৪ সাল—সন্ধ্যা ৭-৩০ হইতে ১০টা পর্যন্ত—দুর্গা-বাড়ীতে। অতি সুন্দর ব্যবস্থাদি করেন পুরীর রামকৃষ্ণ-মিশনের পরমপূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ, শ্রীমদ বিধান মহারাজ এবং সুবিখ্যাত ব্যবহারাজীব শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, ইঁহাদের নিকট আমাদের ঋণের সীমা-পরিসীমা নাই। শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ রামকৃষ্ণ-মিশনের অতি সুন্দর Guest houseটী আমাদের কয়েকজনের ব্যবহারের জন্য প্রদান করিয়া এবং শ্রীযুক্ত জিতেন মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের কয়েকজন মেয়েকে নিজগৃহে অতি সমাদরে রাখিয়া আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। বস্তুতঃ এরূপ সাধুসঙ্গের সঙ্গলাভ কচিৎ কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটে। সে জন্য আমরা সকলেই পরম-ধন্য।

দুর্গা-বাড়ীতে অভিনীত হয় ভক্ত শ্রীমীরাবাঈয়ের পুণ্য-জীবনী অবলম্বনে ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত এবং বহুবার অভিনীত সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক "অমর-মীরম্"। শ্রীভগবৎকৃপায় ঐদিনের অভিনয় অতি সুন্দর হয় এবং উপস্থিত জনমণ্ডলীর বিশেষ তৃপ্তি সাধন করে। অভিনয়ের পরে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং অন্যান্য সুধীগণ প্রাচ্যবাণীর অভিনেতৃমণ্ডলীকে বিশেষ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং প্রত্যুত্তরে ডক্টর চৌধুরীও তাঁহাদিগকে হার্দিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

পরেরদিন ২২শে জুন, ১৯৬৪, পুরীর সুবিখ্যাত নারী-সেবা-সদনে উড়িষ্যাসরকারের সংস্কৃত-সমাবর্তন-উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। সভায় সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ হইতে বহু সুবিখ্যাত পণ্ডিত ও ছাত্র সমাগত হইয়াছিলেন এবং উড়িষ্যা সরকারের ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকসন, শ্রদ্ধেয় ডক্টর সদাশিব মিশ্র মহাশয় ৪টা হইতে ৯টা পর্যন্ত সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় পরম শ্রদ্ধেয়া ডক্টর রমা চৌধুরীর ভারতের প্রাণস্বরূপ "ব্রহ্মবাদ" সম্বন্ধীয় অতি সুললিত ভাষণ এবং ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর উড়িষ্যা প্রদেশের সংস্কৃত সাহিত্যে দান এবং উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের যুগযুগান্তরের হার্দিক মিলন বিষয়ক বক্তৃতা উপস্থিত সকলেরই অত্যন্ত প্রশংসালাভ করে। পণ্ডিতবর্গ সকলেই এবং সভাপতি শ্রীকিশোরীমোহন ত্রিবেদী, সচিব শ্রীলাডুকেশ্বর শতপথী প্রভৃতি সকলে ডক্টর চৌধুরী-দম্পতীর সংস্কৃত সাহিত্যের এই প্রচার ও প্রসারের প্রচেষ্টাকে শত-মুখে সাধুবাদ প্রদান করেন।

সভান্তে "অমর-মীরম্" নাটকটি পুনর্বার মঞ্চস্থ করা হয়। এই অতি মহিমময় পরিবেশের নিমিত্তই নিশ্চয় ঐ

দিনের অভিনয় অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল। এই বিশাল পণ্ডিত-মণ্ডলী প্রায় আড়াই ঘণ্টা কাল চিত্রাপিতবৎ বসিয়া আমাদের এই অভিনয় দর্শন করিলেন—তাহাতে আমরা সকলে কৃতকৃতার্থ বোধ করিলাম। সভান্তে সকলকে হার্দিক অভিনন্দন ও আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিলেন ডিরেক্টর অব পাবলিক ইন্‌স্ট্রাকসন্ শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীসদাশিব মিশ্র, সংস্কৃত এসোসিয়েশনের সচিব শ্রীলাডুকেশ্বর শতপথী এবং প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীমুরারিমোহন পাণিগ্রাহী প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। ডক্টর শ্রীসদাশিব মিশ্র আবেগভরে বলেন যে, ডক্টর চৌধুরী-দম্পতী যে এইভাবে ভারতবর্ষের প্রতি প্রান্তে সংস্কৃত-শিক্ষার আলোকবর্তিকা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছেন বহু বৎসর ধরিয়া—তাহার তুলনা সত্যই নাই। অন্যান্য সকলেও ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর অপূর্ব সংস্কৃত রচনা-শৈলীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। বিশেষ করিয়া মীরার রচিত কয়েক খানি সংস্কৃত ভজনের অতি সাবলীল সংস্কৃত রূপায়ণ সকলেরই মন এক মধুরভাবে আপ্লুত করিয়া তোলে।

মীরার ভূমিকায় পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী চক্রবর্তী অভিনয় করেন। তিনি বয়সে নবীনা—কিন্তু তাঁহার অতি ভাবগম্ভীর অভিনয় সকলেরই বিশেষ করিয়া প্রাণ স্পর্শ করে। মীরার গানগুলি করেন অশেষ স্নেহভাজন অধ্যাপিকা শ্রীমতী স্বপ্না মুখোপাধ্যায়। যেমন গানের কথা, তেমনি গানের সুর, তেমনি গায়িকার সুমধুর কণ্ঠ, এই তিনের সম্মেলনে, "ভক্ত মীরম্" এর সঙ্গীতাংশ ভাবাবেগে সকলেরই চক্ষু অশ্রুসিক্ত করিয়া তোলে।

অন্যান্য ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মিত্র, শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিরাপদ গাঙ্গুলী, শ্রীঅসীমসুন্দর চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা শ্রীমতী শান্তি চক্রবর্তী, শ্রীউর্মি চট্টোপাধ্যায় এবং এই দীন লেখক।

সত্যই সর্ব দিক দিয়াই আমাদের পুরীভ্রমণ অত্যন্ত আনন্দের হইয়াছে। এই মহাপুণ্যভূমি, প্রেমভূমি, সেবাভূমিতে যে আমরা প্রেম-সেবার মূর্ত প্রতিমা শ্রীশ্রীমীরার পরমপবিত্র নামগান করিয়া আসিতে পারিয়াছি সকলের সস্নেহ আশীর্বাদ ও অভিনন্দন সহ—তাহাই আমাদের 'প্রাচ্যবাণীর' জীবনের একটি মহাসম্পদ হইয়া রহিল চিরকাল। সংস্কৃত মহাবাণীর বিজয়-বৈজয়ন্তী কিভাবে ভারতের সর্বত্র আজও উড্ডীন হইয়া রহিয়াছে তাহাও পুনর্বার স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়া পরম ধন্য হইলাম। এই যে সহস্র সহস্র লোক আড়াই ঘণ্টা ধরিয়া বসিয়া সংস্কৃত-নাটকের রসসুধা পান করিলেন, তাহাতে কি ইহাই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় না যে, সংস্কৃত ভাষা কোনও দিনও ভারতবর্ষে মৃতা হয় নাই?

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

হে যতীন্দ্র যতি-শ্রেষ্ঠ হে জ্ঞান তাপস,
ছাত্রকুল চিত্তজয়ী উন্মুক্ত মানস,
আদি ভাষা জননীর বর পুত্র তুমি,
তোমারে ধরিয়া বুকে ধন্য জন্মভূমি।

তুমি কবি প্রাচ্যবিদ্যা-ধারক বাহক,
কালিদাস ভবভূতি-উত্তরসাধক।

কাব্যে গানে নাট্যে আর বিদ্যা বিতরণে,
সেবিলে দেশেরে নিত্য দেহে প্রাণে মনে,

কোন নব রাজ্যে আজ বিদ্যা বিতরিতে
যাত্রা তব কোন লোকে প্রদীপ্তি সাধিতে?
জানিতে চাহিনা তাহা শুধু জানি তুমি,
রহিবে অমর হয়ে যত দিন ভূমি

মানুষের রবে বাস, রবে কাব্য রাশি,
দীপ্ত [illegible] তুষ অন্ধ তমোনাশি।

অভিমান (একাঙ্কিকা)

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী

পাত্রপাত্রীগণ

বিকাশ	:	নব বিবাহিত যুবক।
রেবা	:	বিকাশের শিক্ষিতা, রূপসী স্ত্রী।
হরি	:	বিকাশের ছোকরা চাকর।
মনীশ	:	রেবার দাদা।
সুরমা	:	মনীশের স্ত্রী।
টুটু, পুটু	:	মনীশ-সুরমার বাচ্চা মেয়ে।

বন্দনা: মণিমালা গার্লস্ স্কুলের শিক্ষিকা। রিক্সা-অলা, কুলি, আসানসোল ষ্টেশনের কয়েকজন যাত্রী, টিকিট কালেক্টার ইত্যাদি।

সময় অপরাহ্ন।

অল্প দূরের রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ট্রাম-বাসের শব্দ ভেসে আসছে।

কড়া নাড়ার শব্দ।

বিকাশ। (ঠক্ ঠক্ ঠক্ ঠক্) রেবা দোর খোলো, আমি বিকাশ।

[দোর খোলার শব্দ]

রেবা। আজ শনিবার, তাও এত দেরী যে বিকাশ?

বিকাশ। (দোর বন্ধ করবার শব্দ) আর বোলো না। সলিল মিত্তির একটা পলিসি করবে বলে আশা দিয়েছিল, আপিস ছুটির পর ছুটে গেলাম ওর বাড়ি—

রেবা। দেখা হল?

বিকাশ। তা হল বৈকি, সলিলের সঙ্গে তো বটেই, উপরন্তু—

রেবা। ও'র বৌ এর সঙ্গে?—খুব রূপসী শুনেছি—

বিকাশ। আরে দূর দূর,…তার বৌ হচ্ছে যাকে বলে আলট্রা-মডার্ণ লেডী, সখের সমাজসেবিকা, আমাদের মতো হেঁজিপেজি ইনসুরেন্স এজেন্টের সঙ্গে দেখা করবে? ফুঃ:

রেবা। তবে?

বিকাশ। দেখা হল আগে ভাগে বসে থাকা নিউ ইণ্ডিয়ার ছোকরা এজেণ্ট মতিলাল দত্তর সঙ্গে—

রেবা। ও, সেই লোকটা? ওই তো তোমার সব. শাঁসালো মক্কেলদের ভাঙিয়ে নিচ্ছে, তাই না?

বিকাশ। ঠিক ধরেছ। আমাকে দেখেই পাশের ঘরে নিয়ে গেল সলিল, বলল—তুই রাগ করিস নে বিকাশ। মতিদত্ত আমার শ্বশুর মশায়ের হাত—চিঠি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে। কি আর করি,—গৃহশান্তি রক্ষা করতে গিয়ে ওর কাছেই তিরিশ হাজার—

রেবা। সে কি গো। সলিল মিত্র না তোমার ক্লাস ফ্রেণ্ড?

বিকাশ। বিয়ের পর মিত্রতাটাকে ওর পদবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে সলিল।

রেবা। দুনিয়ার সবাই বৌএর বাধ্য, অবাধ্য শুধু তুমি—

বিকাশ। কথাটা কিঞ্চিৎ অবোধ্য হল না কি? কিন্তু বাধ্যতার পরীক্ষাটা একটু পরে করলে হয় না রেবা? গলা যে এদিকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে এলো—

রেবা। চা আর জলখাবার তৈরী, মশায়ের এখন হাত পা ধুয়ে এলেই হয়—

[সেতারে পিলু বাজতে লাগল। চায়ের পেয়ালার টুং টাং শব্দ ভেসে এলো]

রেবা। (রান্নাঘর থেকে) হরি, বারান্দায় চায়ের টেবিলটা পেতে দে—

হরি। দিচ্ছি দিদিমণি—

বিকাশ। ওরে বাবা, রসগোল্লা, অমলেট পরোটা চা,—এযে ভূরিভোজের আয়োজন করেছ রেবা—

রেবা। তা না হলে ভুঁড়িটি ভরবে কি দিয়ে?

বিকাশ। তা বটে। (চায়ে চুমুক দিয়ে) আঃ, চায়েও যে আজ আলাদা স্বাদ দেখছি—

হরি। (ঘর থেকে গলা বাড়িয়ে) হবেক নাই কেনে আইজ্ঞা! দিদিমণির মন আজ ভাল আছে যে—

রেবা। (বিরক্ত ভাবে) আঃ, তুই থাম তো হরি—

বিকাশ। না রে, থামিস নে, বল তো খুলে কি ব্যাপার—

হরি। (দাঁত বার করে) দিদিমণির বাপের বাড়ির লোক এসেছিলেন যে, তাতেই তো মোড়ের দকান থেকে মিষ্টি কিনে আইনলম,—সিকি পাউণ্ড ভাল চা আইনলম—

বিকাশ। অ, তাই বুঝি এই বিশেষ বিপুল আয়োজন, এদিকে আমি ভাবছি যে এসব বুঝি এই হতভাগ্যের জন্যেই—

রেবা। তা কেন? তোমার ভাগটুক্ কি পাচ্ছনা তুমি?

বিকাশ। আংশিক। বৌ এর আদর যত্নের ভাগ আর কেউ পাক তা আমি চাই না রেবা, আমি চাই সবটুকুন—

রেবা। (চাপা গলায়) আঃ কী বকছ, হরি রয়েছে না?

রেবা। (জোরে) হরি, উনুন খালি যাচ্ছে, ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে দে—

হরি। যাচ্ছি দিদিমণি—

(প্রস্থান)

বিকাশ। আমাদের কুঁড়ে ঘরে কোন্ রাজাধিরাজ এসেছিলেন শুনি—

রেবা। সমীরদা গো, পাটনার পিসেমশায়ের বড়ো ছেলে, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে—

বিকাশ। সমীর? কৈ, আমার তো—

রেবা। বাঃ, বিয়ের সময়ে দেখেছিলে মনে নেই! সেই যে কোঁকড়ানো চুল, লম্বা, ফর্সা, চশমা চোখে—

বিকাশ। ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে—

রেবা। এ বাসার ঠিকানা জানতো না তো তাই এ্যাদ্দিন আসে নি। তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসেছিল, এই তো কাল—

বিকাশ। তা তাঁর হঠাৎ আগমনের উদ্দেশ্য, নিছক ভগ্নীস্নেহ না আরো কিছু?

রেবা। তোমার সব তাতেই খুঁত ধরাটা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে বিকাশ—

বিকাশ। আচ্ছা মুস্কিল, ঠাট্টার ভরও সয় না দেখছি—

রেবা। না। বাপের বাড়ি নিয়ে ঠাট্টা কোনো মেয়েরই সয় না।

বিকাশ। বেশ। ত্রুটিস্বীকার করছি—ক্ষমাপ্রার্থী আমি বরাননে—

রেবা। আঃ, ছাড়ো ছাড়ো, হরি দেখতে পাবে—

বিকাশ। আচ্ছা বেশ। মুলতুবী রইল রাত্রিরের জন্য, এবে কহ আর—

রেবা। সমীরদার বোন সুনন্দার বিয়ে সাতই অঘ্রাণ—তাই বলতে এসেছিল। আমাকে তো দশ বারো দিন আগেই পাটনা যেতে হবে, বার বার বলে দিয়েছেন পিসিমা—

বিকাশ। দশ বারো দিন! বিরহের সূক্ষ্মতার কি অত ভার সইবে?

রেবা। সইবে গো সইবে। ছ'মাস হল বিয়ে হয়েছে আমাদের, এর মধ্যে একটি দিনের জন্যও তো যাইনি কোথাও—

বিকাশ। সেই জন্যেই তো বেশী ভাবনা। বিরহ-বস্তুটার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়নি বলেই তো ভয়টা আরো বেশী—

রেবা। ঈশ্, দেখো, বুক ফেটে না যায় আবার!

বিকাশ। মন্দিরে যতদিন দেবতা থাকেন ততদিনই তার মর্য্যাদা, তা না হলে সেটা ইঁট কাঠ আর পাথরের ঢিবি ছাড়া আর কিছুই না। তেমনি হৃদয়েশ্বরী না থাকলে হৃদয়েরই বা কী দাম বলো?

রেবা। বাবা বাবা! একটু যাবার নাম করেছি অমনি—

বিকাশ। তা হলেই বুঝে দেখ, যাবার নাম করতেই যখন হৃৎকম্প উপস্থিত হয়েছে তখন সত্যি সত্যি চলে গেলে আমার অবস্থাটা কী হবে—

রেবা। আহা তুমিও তো যাবে ক দিন পরে। ষ্টেশনে নেমে জজ সায়েব-ক-কোঠি যায়গা—বললেই যে কোনো লোক পিসেমশায়ের বিরাট বাঙলোটা দেখিয়ে দেবে।

বিকাশ। নিতান্তই যাবে রেবা?

রেবা। আচ্ছা তুমি কী গো। পিসিমা এত করে লিখেছেন, না গেলে কি চলে? তা ছাড়া সুনন্দাকে দেখি না কতকাল? কটা দিন বৈ তো নয়—

বিকাশ। সে জন্য ভাবছি না রেবা, ভাবছি যে আমরা গরীব আর ওঁরা অত বড়লোক—

রেবা। বড়োলোক হলে কী হবে, পিসিমার মোটেও দেমাক নেই,—

বিকাশ। তাঁর না থাকতে পারে, কিন্তু আর সবাই কি কেরাণীর বউ বলে তোমাকে কৃপার চক্ষে দেখবে না? —যাওয়া আসা, মেলামেশা নিজের গণ্ডীর মধ্যেই ভালো।

রেবা। এটা তোমার হীনমন্যতা বিকাশ, আত্মীয়-স্বজন সবাই এক স্তরে থাকে না, তাই বলে কি তাদের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে? আমি দেখিয়ে দেব যে আমিও কারুর চেয়ে কম নই—

বিকাশ। না না, সামাজিক স্তরে তাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিতে যেও না রেবা, নিজের সামর্থ্যের কথাটাও একবার ভাবো। আমাদের সব চেয়ে দামি প্রীতি উপহারও জজ সাহেবের বাড়ির মহার্ঘ উপহারের স্তূপে দেখাবে নেহাৎই বেমানান—

রেবা। আমার প্রীতির স্পর্শে তাই হয়ে উঠবে সব চেয়ে মূল্যবান্।

বিকাশ। একদিন তাই হয়তো সত্য ছিল, কিন্তু আজকের সামাজিক জীবনে তার চেয়ে মিথ্যে আর নেই রেবা। ব্যক্তিগত গুণপণা বা প্রতিভার চেয়ে পৈত্রিক-বিত্তের সমাদরই বেশী—

রেবা। ও সব বড়ো বড়ো কথা ভাববারটের সময় পাওয়া যাবে পরে, এখন সুনন্দাকে কি দেওয়া যায় তাই বলো—

বিকাশ। ছাত্র ফেল করায় ট্যুশনি দুটোও গেছে, এ বছরে কেসও দিতে পারিনি তেমন, মাইনেটুকু ভরসা—

রেবা। আমাদের বিয়ের পর এই প্রথম একটা বিয়েতে যাচ্ছি আর এতেই তুমি এমন কাহিল হয়ে পড়লে?

বিকাশ। যার যেমন অবস্থা তার [illegible] তাই যে উচিত—

রেবা। আমি কী এমন হাতি ঘোড়া খরচ করছি যে এ সব কথা শোনাচ্ছ? বেশ তো ঝিকে ছাড়িয়ে দাও আমি একাই পারব সংসার চালাতে—

বিকাশ। আহা, তুমি কথাটা ওভাবে নিচ্ছ কেন রেবা, আমি কি তাই বলছি? আমি বলছি যে—

রেবা। ঠিক আছে, মাসে দু'টো সিনেমা দেখি তোমার সঙ্গে—এ মাস থেকে আর যাবো না।

বিকাশ। কী মুস্কিল! সিনেমায় যাবার কথা আসে কি করে? সে সব তো দু'চার টাকার মামলা, বৃহৎ খরচের ব্যাপার তো নয়।

রেবা। বৃহৎ খরচ! কেন, আমি কি দু'দশ হাজার টাকার জিনিষ দিতে বলছি—

বিকাশ। না., স্কুল-কলেজে লজিক পড়লে কী হবে, লোকে যে বলে মেয়েরা তর্কের বেলা যুক্তির ধার ধারে না তা একেবারে মিথ্যে নয় দেখছি—

রেবা। এখন তো এ সব বাজে কথা বলবেই, কথা এঁটে উঠতে পারছ না কিনা—

বিকাশ। 'বেশ আমার আমদানী রপ্তানী তো তোমার অজানা নয়, তুমিই বলো কী দেওয়া যায়—

রেবা। আমি বলব? বেশ। একটা লেডিস্ রিষ্ট ওয়াচ।

বিকাশ। রিষ্ট ওয়াচ্। তার দাম জানো?

রেবা। কতো আর হবে দেড়শো টাকা—

বিকাশ। আড়াইশ'র এক নয়া পয়সা কম নয় আর যদি জজ দুহিতার উপযুক্ত ঘড়ি কিনতে চাও তবে সাড়ে চার শো টাকা—

রেবা। তা হলে ঘড়ি থাক। সোনার জিনিষ তো দেওয়া চলবেনা, কী দেওয়া যায় তা হলে? শাড়ি এক খানা ঢাকাই শাড়ি কিনে দেওয়া যাক, কী বলো—

বিকাশ। একশো টাকা দাম যাতায়াতে আর একশ—

রেবা। (রেগে উঠে) তবে খালি হাতেই যাই—

বিকাশ। তা কেন? একখানা ধনে খালি নিয়ে যাও—

রেবা। [illegible] উঃ। ওটা নিয়ে পিসিমার সামনে মাথা উঁচু করে আমি দাঁড়াতেই পারব না—

বিকাশ। বেশ তো, তিনি তো গুরুজন, মাথা নীচু করেই দাঁড়িও—

রেবা। আমার মাথা কাটা যাবে—

বিকাশ। দারিদ্র্যের মধ্যে লজ্জা নেই রেবা, আমার দারিদ্র্য একটা সামাজিক অসাম্যের অনিবার্য ফল—

রেবা। ও সব আমি বুঝি না, আমার ঢাকাই শাড়িই চাই, তুমি ধার করে কিনে দাও—

বিকাশ। ধার এ তুমি কি বলছ রেবা?

রেবা। ঠিকই বলছি। সামাজিকতা রক্ষা করতে গেলে কিছুটা আত্মত্যাগ করতেই হয়।

বিকাশ। কিন্তু এতো আত্মত্যাগ নয়, এ যে আত্মহনন।

রেবা। কিসে?

বিকাশ। ধারের জালে একবার জড়িয়ে পড়লে জীবনেও আর মুক্তি পাবো না।

রেবা। আমি অত শত শুনতে চাই না। ঢাকাই শাড়ি আমার চাই-ই চাই। এই আমার শেষ কথা।

বিকাশ। আমার পক্ষে যা সম্ভব নয় তা আমি পারব না, আমারও এই শেষ কথা।

রেবা। আমার মুখ হেঁট করতে চাও যত ইচ্ছা করো, কিন্তু মা র মুখ হেঁট হবে আর তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাই দেখবে?

বিকাশ। মা-র মুখ।

রেবা। মা সবার কাছে জাঁক করে বলে বেড়িয়েছেন যে, তাঁর জামাই ভালো রোজগেরে, কলকাতার ওপর এক খানা বাড়ি আছে—

বিকাশ। মা-র এ কথা বলা উচিত হয় নি।

রেবা। কী? আমার মা-র নিন্দে কর তুমি? এত খানি সাহস তোমার—

বিকাশ। নিন্দে নয়, উচিত কথা—

রেবা। আমাকে অপমান করলে আবার আমার মা কেও? ঠিক আছে, এ বাড়িতে আর এক দণ্ডও না—হরি—হরি—

হরি। (দূর থেকে) কি দিদিমণি।

রেবা। একটা ট্যাক্সি ডেকে আন, হাওড়া ষ্টেশনে যাবো।

হরি। যাচ্ছি দিদিমণি।

বিকাশ। ওকি, শাড়ি জামা সব সুটকেশ ভরছ যে? কোথায় যাচ্ছ?

রেবা। (রুদ্ধ কণ্ঠে) আসানসোলে দাদার ওখানে—

বিকাশ। কী আশ্চর্য, সামান্য কথা নিয়ে—

রেবা। তোমার কাছে সামান্য হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে অসামান্য—

[ট্রাঙ্ক খোলার শব্দ, ঝণাৎ করে চাবি ফেলার শব্দ। পাশের বাড়িতে রেডিওতে সেতারে বেহাগের সুর]

বিকাশ। একি, তুমি যে সত্যি সত্যিই চললে দেখছি—

রেবা। হরি—হরি—

হরি। টেক্সী আইনলাম দিদিমণি।

রেবা। এই নে ভাঁড়ারের চাবি।

বিকাশ। কিন্তু এখন কি আসানসোলে যাবার ট্রেণ পাবে?

রেবা। (কঠিন কণ্ঠে) না পাই তো ষ্টেশনে পড়ে থাকব, সে-ও এ বাড়িতে থাকবার চেয়ে ভালো হবে—

বিকাশ। কিন্তু—

রেবা। আমাকে বাধা দিও না, আমি চললাম—এই হরি, হাঁ করে দেখছিস কি, সুটকেসটা নে—

(তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল)

[জুতোর শব্দ। ট্যাক্সির শব্দ। হাওড়া ষ্টেশনের মিশ্র কলরব। ট্রেণের শব্দ]

রেবা। (স্বগতঃ) উঃ, কী জেদ। আমি যেন একটা মানুষই না। আমার ইচ্ছা অনিচ্ছার যেন কোনো দামই নেই। ঠিক আছে, আমিও আর সহজে ফিরছি না। শত সাধ্যসাধনা করলেও না। দাদা তার একটি বোনকে দু' মুঠো ভাত দিতে খুব পারবে।

[ট্রেণ থামার শব্দ।]

জনতা। আসানসোল—আসানসোল। চা-গ্রম্। পান-বি়ি-সিগারেট-পান। ও বুঁচি ইদিকে আয় ইদ্দিকে আয়। ঐ ববুয়া কঁহা যেব? বড়া ঠণ্ডা লগতিয়া হো—(ইত্যাদি)

রেবা। এই কুলি, এই স্যুটকেশটা। হাঁ। রিক্সা সে যায়গা।

টিকিটবাবু। টিকিট প্লিজ—

রেবা। এই নিন। কুলি। রিক্সামে স্যুটকেস রাখো। হাঁ ঠিক হায়, এই নাও চার আনা—

কুলি। বকশিশ মাইজী—

রেবা। এই নাও ছ নয়া পয়সা। এই রিক্সা অলা, চলো হটন রোড, উকিল বাবুকা কোঠি—

রিক্সাঅলা। (ঠুন্ ঠুন্ শব্দ) কোন উকিলবাবু মাইজী? বিশম্ভর বাবু?

রেবা। না না, সান্ন্যালবাবু, মণীশ সান্যাল, চেনো তাঁর বাড়ি?

রিক্সাঅলা। সানিয়াল বাবু? হাঁ হাঁ, হম পছান্তা মাইজী—

[ঠুন ঠুন শব্দ। মোটরের হর্ণ।
ট্রাকের শব্দ ইত্যাদি]

রিক্সাঅলা। আ গিয়া মাইজী—

রেবা। আচ্ছা, এই নাও ভাড়া—

রিক্সাঅলা। সেলাম মাইজী। জয় হিন্দ্—

(প্রস্থান)

রেবা। জয় হিন্দ্। (স্বগতঃ) বৈঠকখানা ঘর তো অন্ধকার দেখছি। দাদা কি বাড়িতে নেই? ঐ যে কে যেন আসছে—

মণীশ। (দূর থেকে) কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

রেবা। দাদা! আমি রেবা—(প্রণাম করল)

মণীশ। থাক থাক। একি, রেবা? তুই হঠাৎ? ওগো দেখে যাও রেবা আর বিকাশ এসেছে—

রেবা। (বিব্রতভাবে) না না, ও আসেনি, আমি—আমি একাই এসেছি—

সুরমা। (দূর থেকে) কে এসেছে বললে? রেবা? কই দেখি—দেখি, আরে, সত্যিই তো, রেবাই তো, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো?

টুটু ও পুটু। (নাচতে নাচতে এসে) কই মা, কই মা—

রেবা। (পুটুকে কোলে তুলে নিয়ে) ওমা, টুটু পুটু কত বড়ো হয়ে গেছে।

সুরমা। আয় ঘরে আয় রেবা, পুটু কুটি এবার পিসিমণির কোল থেকে নামো তো, ওরে ভজহরি—স্যুটকেসটা নিয়ে আয়। আয় রেবা, বোস ঐ চেয়ারটায়। তারপর কী ব্যাপার? এমন একা একা—

রেবা। কেন, আসতে নেই?

সুরমা। না না, সে কথা নয়। বলছি যে বিকাশ যে তোকে ছেড়ে দিল বড়ো—

রেবা। মাঝে মাঝে ছাড়াছাড়ি হওয়া তো ভালোই বৌদি—

টুটু। মা, পিসিমণি এসেছে আজ আর পড়ব না কিন্তু, গল্প করব পিসিমণির সঙ্গে—

পুটু। আমিও মা—

সুরমা। আচ্ছা রে আচ্ছা, এখন ওকে একটু জিরোতে দে, কতদূর থেকে এসেছে, মনও বিশেষ ভালো নেই হয়তো—

টুটু। কেন মা? মন কেন ভালো নেই মা?

সুরমা। সে তোমরা এখন বুঝবে না, আগে বড়ো হও। রেবা কলঘরে সাবান তোয়ালে, জল সবই আছে—

রেবা। যাই বৌদি— (প্রস্থান)

[রেডিওতে কেদারা রাগে সেতার]

টুটু। মা, আমি কিন্তু পিসিমণির সঙ্গে শোব—

পুটু। না মা, আমি। লক্ষ্মী মেয়ের মতো সবটুকু দুধ খাইনি আমি?

সুরমা। আজ পুটু শোও, টুটু কাল শোবে, কেমন? নাও শুয়ে পড়ো এবার, রাত সাড়ে দশটা বেজে গেছে।

পুটু। পিসিমণি গল্প বলো।

রেবা। গল্প? আচ্ছা শোনো। এক ছিল পিসি, সে দাঁতে দিত মিশি, মিশি নিলো চোরে, পিসি রেগে মরে। (স্বগতঃ) ঘুমিয়ে পড়েছে পুটু। আমিও ঘুমুই।

(সেতারে টুং টাং শব্দ)

(স্বগতঃ) নাঃ ঘুম আসছে না। রাত এখন কত কে জানে? অন্যমনস্ক মানুষ! হরি কি আর সব দিক সামলে রাখতে পারবে? অসুবিধে হচ্ছে নিশ্চয়, সাত পাতা চিঠি পাঠাবে। যেমন এক গুঁয়ে মানুষ, হোক একটু শিক্ষা। সংসার যেন ওর একার, আমার নয়। বেশ তো বুঝুক

টাকা নেই ভালো মুখে বুঝিয়ে বললেই হোত, তা না, একেবারে ফোঁশ। নাঃ, ঘরে গরম লাগছে, বারান্দার খোলা বাতাসে যাই।

[দোর খোলার শব্দ]

আঃ কী আরাম। রাতের জি, টি, রোডটা যেন একটা ঘুমন্ত অজগরের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে। আকাশের থালায় কে যেন লক্ষ প্রদীপ জেলে দিয়েছে, কলকাতায় এমন আকাশ দেখা যায় না। ফিসফিস শব্দ আসছে কোত্থেকে? দাদা-বৌদি কি ঘুমোন নি এ'নো। আমার নামে কী আবার বলছে বৌদি? দরজায় কান পেতে শুনি তো—

সুরমা! আমার মনে হয় কিছু হয়েছে ছুটিতে, তা না হলে এ ভাবে আসে কখনো? না চিঠি, না পত্তর—

মণীশ। ঠিকই বলছ তুমি সুরমা। এর আগে কত-বার এখানে আসবার জন্য চিঠি দিলাম। বিকাশচন্দর ফ্ল্যাট্‌লি রিফিউজ করে দিলে—

সুরমা। (হেসে উঠে) নতুন বিয়ে কলকাতার নিরি-বিলি ফ্ল্যাট ছেড়ে আসবে কেন বলো?

মণীশ। ব্যাপার স্যাপার বেশ সন্দেহজনক, কী বলো?

সুরমা। তা আর বলতে! মাঝে মাঝে রেবার মুখখানা থমথমিয়ে উঠেছিল, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল মাঝে মাঝে --

মণীশ। ঝগড়া ঝাঁটি নয় তো?

সুরমা। তাই তো মনে হয়। তোমারই তো বোন, পেছনে লাগতে ওস্তাদ—

মনীশ। আহা নিজে যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানো না—উ—

সুরমা। আরে, ছাড়ো ছাড়ো, টুটু ঘুমিয়ে আছে না পাশে, জেগে উঠবে যে—

মণীশ। তাই বলে দুষ্টুমীর সাজা দেব না?

রেবা। (স্বগতঃ) ছি ছি! আড়ি পাতা আমার উচিত হয় নি। কিন্তু অবাক কাণ্ড, বৌদি আসল ব্যাপারটা আঁচ করল কী করে। কলকাতায় রেখে এলাম যাকে, সে এতদূরেও আমায় জ্বালাচ্ছে! যাই ঘুমিয়ে পড়ি এবার নইলে সকালে বৌদির কাছে এ মুখ আর বার করা যাবে না—

কয়েক দিন পরে [সেতারে ভৈরবী ঠুংরি পাখির কলরব।]

ভোর

পুটু। পিসিমণি তুমি আমার কাছে বোসো, দেখ আমি কী সুন্দর পড়তে শিখেছি: মহারাজা অশোক যখন কলিঙ্গ দেশ জয় করেন—

টুটু। না পিসিমণি, তুমি আমার কাছে বোসো। পুটুটা তো পুঁচকে, ইংরিজী জানে না, আমি কেমন ইংরিজী শিখেছি শুনবে? M-O-R-N-I-N-G মর্ণিং, মর্ণিং মানে, সকাল। D-A-R-L-I-N-G ডার্লিং, ডার্লিং মানে—

পুটু। ইংরিজী না জানলেও ক্ষতি নেই, আমরা তো এখন স্বাধীন, তাই না পিসিমণি?

রেবা। লক্ষ্মী মেয়ে পুটু। কে শিখিয়েছে এ কথা তোমাকে।

পুটু। বন্দনা মাসি।

রেবা। বন্দনা মাসি? সে আবার কে?

টুটু। ওমা, তাও জানো না? তবে মা যে সেদিন বাবাকে বলছিল যে বন্দনা মাসির সঙ্গে পিসেমশায়ের খুব ভাব ছিল আগে?

রেবা। (স্বগতঃ) টুটু বলে কি! খোঁজ নিতে হচ্ছে তো?

সুরমা, (দূর থেকে) এই দুষ্টুরা, পিসিমণিকে খুব জ্বালাচ্ছ বুঝি? রান্নাঘরে এসো সবাই, চা হয়ে গেছে—

[চায়ের পেয়ালার টুং টাং শব্দ]

সুরমা। ওকি রেবা, টোষ্টখানা রেখে দিলে যে!

রেবা। খিদে নেই বৌদি—

সুরমা। আর এক কাপ চা ঢেলে দি?

রেবা। না, থাক—আচ্ছা—ইয়ে—আচ্ছা বৌদি টুটু পুটুকে এ সব আজে-বাজে কথা বাইরের লোক এসে শিখিয়ে যায়, আর তোমরা চুপ করে থাকো!

সুরমা। আজে-বাজে কথা শেখায়? কে যে—

রেবা। ঐ যে পুটুই বলছিল, বন্দনা না কোন একটা মেয়ে—

সুরমা। (হেসে) ও, তাই বল। এরই মধ্যে বন্দনার কথা বলা হয়ে গেছে ওদের? খুব ভালোবাসে ওরা বন্দনাকে।

রেবা। কে এই মেয়েটা?

সুরমা। সে কি! বন্দনাকে চিনিস না? কেন বিকাশ কিছু বলে নি তোকে?

রেবা। (থেমে থেমে আড়ষ্টভাবে) বিকাশ? কৈ, না তো—মানে হয়তো বলেছিল ভুলে গেছি আমি—

সুরমা। ভুলে যাবার মতো ঘটনা তো নয় এটা। নিশ্চয়ই ওর কথা তোর কাছে লুকিয়েছে বিকাশ। এটা কিন্তু অন্যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ সব ব্যাপার গোপন থাকা মোটেই উচিত নয়—

রেবা। (দুর্বল স্বরে) কী বলছ তুমি বৌদি? আমি তো কিছুই—

সুরমা। বন্দনা থাকে ডক্টর নিকলস্ রোডে! মণিমালা গার্লস্ স্কুলে টিচারী করে আর অবসর সময়ে লাইফ-ইনশিওরের এজেন্সি করে। বিকাশ তো আগে আসানসোলেই ছিল, তখন থেকেই খুব আলাপ অন্তরঙ্গতা দু'টিতে। এমন কি—

রেবা। বলো বলো, থামলে কেন?

সুরমা। শুনেছি যে বিকাশ ওর প্রতি খুব ঝুঁকেও ছিল,—অবশ্য এ সবই তোর সঙ্গে বিয়ে হবার আগের ঘটনা।

রেবা। (স্বগত:) ও:, ভেতরে ভেতরে এত! ওর মিষ্টি মিষ্টি মন কেড়ে নেওয়া কথাগুলো তা হলে আসলে শূন্যগর্ভ! হয়তো ঠিক সেই কথাগুলোই বন্দনারও কানে কানে একদিন বলেছিল বিকাশ!

সুরমা। কি রে, গুম মেরে গেলি কেন? বলেছি তো, ওসব কবেই চুকে-বুকে গেছে, বিকাশের দিক থেকে অন্তত:—

রেবা। (তীক্ষ্ণ কণ্ঠে) তার মানে?

সুরমা। মানে বন্দনা বোধ হয় এখনো ভুলতে পারেনি বিকাশকে।

রেবা। (স্বগতঃ) বিকাশই কি ভুলতে পেরেছে বন্দনাকে? উঃ কী শঠ আর কপট এই পুরুষ জাতটা——একদিনের জন্যও ওর নাম করে নি আমার কাছে—

(টুটুর প্রবেশ)

টুটু। মা-মা বাবা ডাকছে তোমাকে, শিগ্‌গির এসো—

সুরমা। এই যে যাই, টুটু তুমি পিসিমণিকে তোমার ছবির বইটা দেখাও, কেমন—

টুটু। আচ্ছা। এসো পিসিমণি— (প্রস্থান)

[সেতারের টুং টাং]

মণীশ। কৈ গো পাঁচটা টাকা দাও, বাজারে যাবো—

সুরমা। বাজারে তো যাবে, কিন্তু খাবার আজ মুখে রুচবে তো তোমার বোনের?

মণীশ। কেন, কী হল আবার?

সুরমা। বন্দনার কথা শুনেই কেমন গুম মেরে বসে আছে, একবার দেখেই এসো না—

মণীশ। (গলা নামিয়ে) ওষুধ ধরেছে তা হলে? বিকাশকে লিখে দি যে আর দেরী হবে না—

সুরমা। না না, এখুনি লিখতে যেও না ওসব। আর এক ডোজ পড়ুক তার পর—

মণীশ। বেশ তেজী ওষুধ, কি বলো?

সুরমা। (তরল সুরে) বিলক্ষণ তেজী—

[সেতারে তিলোক কামোদ] দুপুর বেলা

রেবা। এই টুটু, শোন্ শোন্—

টুটু। কী পিসিমণি?

রেবা। (গলা নামিয়ে) পিওন এসেছিল?

টুটু। হ্যাঁ—

রেবা। আমার কোনো চিঠি ছিল?

টুটু। কৈ, না তো।

রেবা। (অধীর স্বরে) ছিল ছিল, তুই জানিস না, দেখে আয় না দাদার বৈঠকখানায়। যদি আনতে পারিস তবে লেবেঞ্চুশ্ দেবো। লক্ষ্মী, সোনা আমার, যা—

টুটু। তোমার চিঠি আমি চিনব কি করে?

রেবা। দেখবি সবুজ বা গোলাপী খাম—

টুটু। আমি তা হলে পাঞ্জাব মেল হয়ে যাই, কেমন? পু—ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্—

[শব্দ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল। আবার ফিরে এলো]
না পিসিমণি নেই। আমার লেবেঞ্চুশ ?

রেবা। এই নে দশ নয়া পয়সা। এ কথা কাউকে বলিসনে কিন্তু, লক্ষ্মী ছেলে। (স্বগতঃ) চার দিন হয়ে গেল আজও একটা চিঠি এলো না। আমি চলে আসায় ও যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। হয়তো বন্দনার কাছেই প্রেম-পত্র লিখছে মনের আনন্দে,—উঃ, কী যে করি আমি -ঐ যে বৌদি আসছে আবার জ্বালাতে—

সুরমা। দুপুরে তো কিছুই মুখে তুললি না। শরীরের যা হাল করেছিস, শেষকালে বিকাশ আমাদের নামে ক্ষতি-পূরণের মামলা না করে বসে—

রেবা। (আর্তস্বরে) ওর কথা আর বোলো না বৌদি—ও একটা,—ও একটা—

সুরমা। ছি ছি ছি, কী যা তা বলছিস। বিকাশের মতো ছেলে হাজারে একটাও মেলে না তা জানিস ?

রেবা। (ক্লান্তকণ্ঠে) ওর কথা থাক বৌদি। (স্বগতঃ) বৌদিকে তো আর ভুগতে হচ্ছে না, তাই প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ—

সুরমা। ক' দিন হল এসেছিস, কোথায় হৈ হুল্লোড় আমোদ আহ্লাদে বাড়ি মাথায় করে রাখবি, তা না, একেবারে ঝিম মেরে বসে আছিস—

রেবা। শরীরটা কেমন ম্যাজ-ম্যাজ করছে বৌদি, ভাই—

সুরমা। তা শরীরের আর দোষ কি ? এসে অব্দি তো ঘরেই বসে আছিস। না গেলি মাইথন বাঁধ দেখতে, না গেলি কল্যাণেশ্বরী। কাল এত করে বললাম যে, চল 'সাতপাকে বাঁধা' দেখে আসি "গোধূলি"তে, তা ও গেলি নে।

রেবা। ওটা যে আমার দেখা ছবি।

সুরমা। বেশ তো, 'ডুরাণ্ডে' চল, 'মহানগর' দেখে আসি—

রেবা। আজ থাক বৌদি—

সুরমা। তা হলে চল্ ঘুরে আসি একটু—

রেবা। কোথায় বৌদি—

সুরমা। বন্দনার ওখানে। তোকে তো দেখে নি ও। খুব খুশী হবে।

রেবা। (স্বগতঃ) বন্দনা! সবই তো জানলাম, চোখের দেখাটা আর বাকী থাকে কেন ? (জোরে) আচ্ছা:, তুমি যখন এত করে বলছ—

সুরমা। তা হলে চট্‌পট্‌ তৈরী হয়ে নে।

[সেতারে কাফি]

সুরমা। ওরে বাব্বা:, তুই যে দারুণ সেজেছিস রেবা—

রেবা। কী আর এমন। যাও, যাবে ? না—হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আমার দিকে ?

সুরমা। তা আমার তাকানোটা না হয় ধমক দিয়ে বন্ধ করলি, কিন্তু রাস্তার সব লোক যখন তোর ঐ আগুনের মতো রূপের দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে, তখন ?

রেবা। অমন করলে আমি যাবো না কিন্তু বৌদি—

সুরমা। বাব্বা:, ঠাট্টাও সয় না মেয়ের—

[সাইকেল রিক্সার ঘন্টির শব্দ, ট্রাক চলবার শব্দ, জনতার কোলাহল ইত্যাদি]

সুরমা। ঐ যে লাল রং এর একতলা বাড়িটা দেখছিস ওটাই বন্দনাদের বাড়ি,—ঐ যে গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বন্দনা—

বন্দনা। ওমা, সুরমাদি যে! কী ভাগ্যি আমার। আসুন আসুন, ভেতরে আসুন—বসুন, দাঁড়ান, পাখাটা খুলেদি—

সুরমা। তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না বন্দনা, আমার সঙ্গে এই রূপসীটি কে বলো তো ?

বন্দনা ? কৈ, আমি তো ঠিক—

সুরমা। পারলে না তো বলতে। এ হচ্ছে আমার ননদ—রেবা, বিকাশের বৌ—

বন্দনা। (কলকণ্ঠে) ওমা। বিকাশদার বৌ আপনি ? কী ভাগ্যি যে দেখা হ'ল আপনার সঙ্গে। ভীষণ ঝগড়া আছে কিন্তু বিকাশদার সঙ্গে আমার। চুপি চুপি বিয়ে করে মিষ্টির অঙ্কে শূন্য বসানো বার করব আমি, দেখা হোক না একবার! মজাটা টের পাইয়ে দেবো না—

রেবা। (স্বগতঃ) কী নির্লজ্জ আর কী অসভ্য মেয়েটা। অতখানি লো—কাট ব্লাউজ বুঝি পরে কেউ।

গায়ের রং তো মাজা-মাজা আর ঐ তো শিড়িঙ্গে শরীর, কী দেখে ভুলেছে বিকাশ।

বন্দনা। সুরমা দি, একটু বসুন, চায়ের কথা বলে আসি—

সুরমা। না না। চা থাক। তুমি বোসো, গল্প করো রেবার সঙ্গে—

বন্দনা। গল্প কি এক তরফা হয় সুরমাদি? উনি তো কথাই বলছেন না আমার সঙ্গে—

রেবা। আচ্ছা বাসন্তী রং এর শাড়ির সঙ্গে লাল রঙের ব্লাউজ পরেছেন কেন বলুন তো?

সুরমা। (স্বগতঃ) ছি ছি, এসেই যে ঝগড়া সুরু করল রেবা—

বন্দনা। (শান্ত স্বরে) লাল রংএ আমাকে মানায় না জানি তবু পরি এই রংটা আমার ভাল লাগে, আর বিকাশদাও তো এই রংটা খুব পছন্দ করেন, তাই না—

রেবা। (স্বগতঃ) ওঃ, এত দূর। (প্রকাশ্যে) বৌদি, বাড়ি চলো, ভয়ানক মাথা ধরেছে আমার—

সুরমা। সে কি রেবা, ফাঁকা হাওয়ায় বেরিয়েও মাথা ধরা সারল না?

বন্দনা। একটু বসুন না, চা খেলেই সেরে যাবে, আমি না হয় একটা সারিডন ট্যাবলেট্ আনিয়ে দিচ্ছি বাজার থেকে, ওরে,—ও মুনিয়া—

রেবা। আপনার সৌজন্যের কথা মনে রাখবার চেষ্টা করব কিন্তু চা বা সারিডনের দরকার হবেনা। কই বউদি, ওঠো না—

সুরমা। চল তবে। কী যে স্বাস্থ্য হয়েছে আজকাল-কার মেয়েদের! দেখ তো আমাকে,—তোর দাদা বলে যে দশটা বাঘেও খেতে পারবে না—

(রেবার প্রস্থান)

বন্দনা। (হেসে) বাড়িয়ে বলাটা জামাইবাবুর একটা অবোসে দাঁড়িয়েছে—দশটা বাঘ নয়, পাঁচটা বাঘ—

সুরমা। বন্দনা! তুমিও আমার শরীরের ওপর নজর দিচ্ছ? কিন্তু আর না, পালাই এবার, রেবা আগে-ভাগেই রাস্তায় গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—

রেবা। (দূর থেকে) আঃ, বউদি! কী করছ ঘরের ভেতরে, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব?

সুরমা। বাবা বাবা, মেয়ের যেন আর তর সয় না—আচ্ছা:, তা হলে চলি বন্দনা—

বন্দনা। রেবা বউদিকে নিয়ে আর একদিন আসবেন কিন্তু সুরমা দি—

[সেতারে খাম্বাজ]

সুরমা। রেবা, এই নে তোর চিঠি।

রেবা। চিঠি! কই দেখি, আঃ দাও না, কেন মিছে জ্বালাচ্ছ?

কাগজ ছেঁড়ার শব্দ

সুরমা। কার চিঠি রে?

রেবা। মা লিখেছেন নবদ্বীপ থেকে, আমি কেন বিকাশের অসুবিধা ঘটিয়ে এতদিন এখানে পড়ে আছি তাই—হ্যাঁ বৌদি, আমি কি তোমাদের ভার বোঝা হয়ে আছি?

সুরমা। বালাই ষাট, ভার বোঝা হবি কেন তুই?

রেবা। তা যদি হয়ে থাকি তবে স্পষ্ট ভাবে বলো, বি-এ পাশ যখন করতে পেরেছি, একটা স্কুল-মাষ্টারীও জুটিয়ে নিতে পারব।

সুরমা। ছি ছি, এমন কথা মনেও আনিস নে রেবা, তোর দাদা শুনলে কিন্তু ভয়ানক রাগ করবে—

মণীশ। (দূর থেকে) ওগো শুনছ,—আমার চশমাটা কোথায় গেল!

সুরমা। আসছি— (প্রস্থান)

রেবা (স্বগতঃ) নিজে লেখেনি, মাকে দিয়ে লিখিয়েছে। যাবো না তো, কক্ষনো যাবো না। কী এমন অন্যায়টা করেছিলাম আমি? যেখানে ভালোবাসা নেই সেখানে কেনই বা যাবো?

সুরমার প্রবেশ

সুরমা। আয় রেবা, তোর চুল বেঁধে দি। ইশ কী ছিরি হয়েছে, এমন অযত্ন করলে ক'দিন থাকবে এমন মেঘের মতো চুল—

নাচতে নাচতে টুটুর প্রবেশ

টুটু। মা, মা, বন্দনা মাসি এসেছে, এই ছাখো, আমাকে চকোলেট দিয়েছে—

সুরমা। কোথায় সে,—একি! তুই উঠলি কেন রেবা?

বন্দনার প্রবেশ

বন্দনা। এই যে আমি।

সুরমা। এসো বন্দনা, বোসো ঐ চেয়ারটায়—

বন্দনা। ওকি! আপনি কোথায় চললেন রেবা বৌদি! আমার যে আপনার সঙ্গেই বিশেষ দরকার—

রেবা। (রুষ্ট মুখে) আমার সঙ্গে কারুর কোনো দরকার নেই, থাকতে পারে না— (প্রস্থান)

(দড়াম করে দরজা বন্ধ হবার শব্দ)

বন্দনা। ব্যাপার কি সুরমা দি?

সুরমা। কী জানি ভাই। তোমরা হচ্ছ আধুনিকা শিক্ষিতা মেয়ে, তোমাদের মনের ভাব আমাদের মতো মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ কি করেই বা বুঝবে বলো—

বন্দনা। কিন্তু ওর মতটা না জানতে পারলে—

সুরমা। কিসের আবার মত?

বন্দনা। স্কুল থেকে বি, টি পড়তে আমাকে পাঠাতে চায় কলকাতায়। বোর্ডিংয়ে যা খরচ। তাই ভাবছিলাম যে এই ন'টা মাস বিকাশদার ওখানেই থাকবো, দুটো ঘর আছে শুনেছি—কিন্তু রেবা বউদির যা তিরিক্ষি মেজাজ দেখছি—

সুরমা। তা তুমি সরাসরি বিকাশকেই লেখ না কেন বন্দনা?

বন্দনা। তা অবশ্য লিখতে পারি, আর এও জানি যে আমাকে না করতে পারবে না বিকাশদা—

সুরমা। সেই ভালো—কালকের ডাকেই একটা চিঠি লেখো তুমি।

বন্দনা। রেবা বউদিকে এ সব কথা আবার বলবেন না কিন্তু, বাগড়া দিতে পারে তো?

সুরমা। না না, আমি কিচ্ছু বলব না। বি টিটা পাশ করতে পারলে মাইনেও বাড়বে নিশ্চয়?

বন্দনা। তা তো বাড়বেই। সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো, আজ তা হলে উঠি সুরমাদি—

সুরমা। এসো ভাই—আমিও উঠি এবার, ঠাকুর ঘরে আলো দিতে হবে— (উভয়ের প্রস্থান)

রেবার প্রবেশ

রেবা। (স্বগতঃ)—কী মেয়েরে বাবা! লাজ লজ্জা কিছুই কি নেই! পাশের ঘর থেকে সব শুনেছি। হুম্, যাওয়াচ্ছি তোমাকে। কালই আমি কলকাতা যাবো, তারপর দেখে নেবো, কী করে আমার বাড়িতে ঢুকতে পাও তুমি। বৌদিটাই বা কি। মুখে এমন মিষ্টি, কিন্তু মনটা একেবারে বিষে ভরা। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করছে না···বিকাশ হয় তো হাসবে, হাসুক, তা বলে আমি তো আর আমার সাজানো সংসারের কর্তৃত্ব ওই মেয়েটার হাতে তুলে দিতে পারি না। আস্পর্ধা কতো! বলে কিনা বিকাশদা আমাকে না করতে পারবে না—

[সেতারে পূরবীর সুর]

পরদিন

মণীশ। সে কি রে! আজই যাবি? এই তো সেদিন এলি। মাস দুই থাক না এখানে—

রেবা। না দাদা; আমি আজই কলকাতা যাবো তুফান এক্সপ্রেসে—

সুরমা। অন্ততঃ টুটুর জন্মদিনটা পর্যন্ত থেকে যা রেবা—

রেবা। বৌদি, তুমি আর বাধা দিও না, আমি ওখানে থেকেই ওকে আশীর্বাদ করব—

সুরমা। শরীরটা ভালো নেই বলছিলি, ওখানে গিয়েই তো আবার সংসারের জোয়াল কাঁধে তুলে নিতে হবে।

রেবা। মেয়েমানুষ হয়ে যখন জন্মেছি তখন তুলতে হবে বৈ কি বৌদি,—তবে কেউ তা আনন্দে তোলে, আর কেউ বা নিরানন্দে—

সুরমা। বুঝলাম না তোর কথা—

রেবা। আর বুঝে কাজ নেই। ও দাদা, একটা রিক্সা ডাকো না, ট্রেনের যে আর দেরী নেই।

মণীশ। যাচ্ছি রে যাচ্ছি— (প্রস্থান)

সুরমা। রেবা, এই খামে আঁটা চিঠি খানা বিকাশের হাতে দিস, নিজে খুলে পড়িস না কিন্তু, সাড়ে চুয়াত্তর দিয়ে দিলাম।

রেবা। আচ্ছা গো আচ্ছা। দাঁড়াও, প্রণাম করি—

সুরমা। আশীর্বাদ করি, সুখী হও—

মণীশের প্রবেশ

মণীশ। কৈ রে রেবা, রিক্সা এসেছে—

রেবা। এসেছে। তা হলে চলি বৌদি। টুটু পুটুতো এখন ইস্কুলে, ওদের আমার আদর দিও—

সুরমা। এসো বোন। দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা—

[রিক্সার টুং টাং। ট্রাকের শব্দ। ষ্টেশনের কোলাহল। ধাবমান ট্রেণের শব্দ]

(সেতারে জয়-জয়ন্তীর সুর)

রেবা। (কড়া নাড়ছে) খট্‌ খট্‌ খটা-খট্‌।

বিকাশ। (ভেতর থেকে) কে ?

রেবা। আমি, রেবা। দোর খোলো।

বিকাশ। (দোর খোলার শব্দ) একি, রেবা তুমি !!

রেবা। হ্যাঁ, আমি। কেন ? আসতে নেই ?

বিকাশ। না না। তা নয়, কিন্তু…এত রোগা হলে কি করে রেবা ? ওকি চোখে জল কেন ? কাঁপছ কেন ? পড়ে যাবে যে—

রেবা। (কাঁপা গলায়) তুমি কি নিষ্ঠুর বিকাশ—

বিকাশ। নিষ্ঠুর আমি ! তা তো বলবেই। সুনন্দার জন্য ঢাকাই শাড়ি কিনবার জন্য নাওয়া-খাওয়া ভুলে নতুন পাঁচটা কেস করলাম কিনা—

রেবা। দরকার নেই ছাই শাড়ির—

বিকাশ। সেকি রেবা ! যার জন্য এত কাণ্ড—

রেবা। হ্যাঁ, যাবো না আমি সুনন্দার বিয়েতে—

বিকাশ। এ তুমি বলছ কি রেবা ?

রেবা। তুমি আমাকে ভালোবাসো না, একটুও না, একটুও না—তা না হলে কি আবার দূরে পাঠিয়ে দিতে চাইতে ?

বিকাশ। তোমার আজ হয়েছে কি বলো তো ?

রেবা। জানি, জানি। তোমার সব ভালোবাসা লুটে-পুটে নিয়েছে আর একজন—

বিকাশ। তুমি কি পাগল হলে রেবা ! কী সব আবোল-তাবোল বকছ ?

রেবা। পাগল ? তা তো বলবেই এখন। বন্দনাকে আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, বুঝলে—

বিকাশ। বন্দনা ? কোন বন্দ—ওঃ হো, বুঝেছি বুঝেছি। আমার মামাতো বোন বন্দনার কথা বলছ তো ?

রেবা। (অবিশ্বাসের সুরে) বোন ! বললেই হল ?

বিকাশ। কি আশ্চর্য ! বোনকে বোন বলব না তো কি ভাই বলব ?

রেবা। ঈশ্‌, বোন হলে আমি বুঝি আর জানতুম না—

বিকাশ। আচ্ছা মুস্কিল তো ! চিনি-মামার নাম শোনোনি ? তাঁরই বড়ো মেয়ে বন্দনা। মণিমালা গার্লস স্কুলের টিচার—

রেবা। তবে যে বৌদি বলল—

বিকাশ। কী বলল তোমার বৌদি ?

রেবা। (হাল্কা সুরে) নাঃ, কিছু না, ও হ্যাঁ, বৌদি একটা চিঠি দিয়েছে তোমায়,—এই নাও—

বিকাশ। আমার চিঠি ! কৈ দেখি—

কাগজ ছেঁড়ার শব্দ

উম্‌ উম্‌, একি ! এ যে তোমাকেই লেখা—

রেবা। কৈ দেখি,—হ্যাঁ, তাইতো : পড়ি :—

রেবা,

তোমার অভিমান ভাঙাতে গিয়ে একটু জোরালো ওষুধ দিয়েছিলুম। মাথা ধরা, গা ম্যাজ-ম্যাজ ইত্যাদি ব্যাধি সব সেরে গেছে তো ?

ইতি

বৌদি।

উঃ, বৌদিটা কী দুষ্টু। এমন ভাবে ঘটনাগুলো সাজিয়েছিল যে—

বিকাশ। কিন্তু আমি তো কিছুই বুঝলাম না, ও ব্যাধি তো একটা বিশেষ অবস্থারই উপসর্গ বলে জানি, তোমার কি—

রেবা। ধেৎ, অসভ্য কোথাকার। নাও খাবে এসো। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে আজ—

বিকাশ। সকাল সকাল শুয়ে পড়তে অবশ্য আপত্তি নেই, কিন্তু সকাল সকাল ঘুমোনো নৈব নৈব চ, বুঝলে ?

রেবা। (হেসে উঠে) বুঝলাম।

(সেতারে বসন্ত-বাহার বাজতে লাগল)

সমাপ্ত
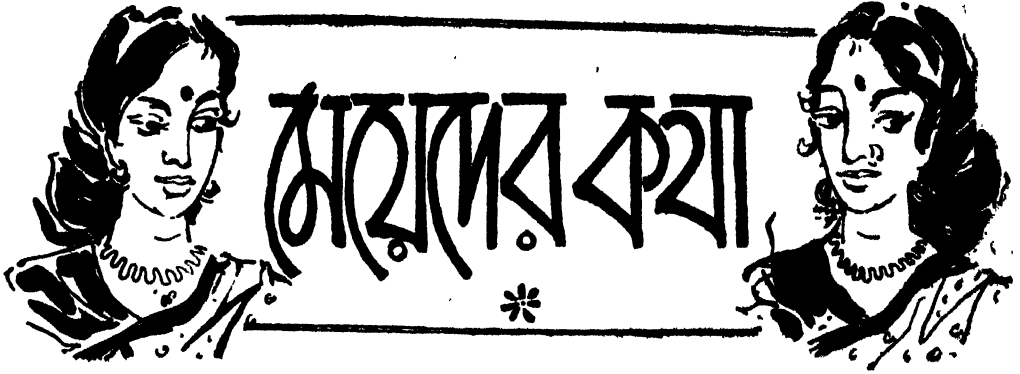
শিক্ষার সমস্যা

শৈল চট্টোপাধ্যায়

আজকাল স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক চলন হয়েছে। যে সব গৃহে আগে মেয়েরা সামান্য মাত্র এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু বর্ণপরিচয় অবধি পাঠের সুযোগ পেত, বর্ত্তমানে সেই সব গৃহের নবীনারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চশিক্ষিতা হবার সুবিধা পাচ্ছেন। সমাজের এবং অভিভাবকদের মনের এই প্রশংসনীয় পরিবর্ত্তন অবশ্যই অভিনন্দনের যোগ্য। স্ত্রীশিক্ষার প্রচার এবং প্রসার হওয়া যে কত বাঞ্ছনীয় তা একালের শিক্ষিত মানুষের অজানা নয় বলেই, দেশে দেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে।

যে দেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার নেই, যে সমাজে স্ত্রীশিক্ষার আদর নেই—সে দেশ, সে সমাজ অগ্রসর হতে পারে না এই চলমান যুগের সঙ্গে তাল রেখে। এই যন্ত্রসভ্যতার দিনে প্রগতিশীল যে কোনও দেশের দিকে দৃষ্টি দিলেই দেখতে পাওয়া যায় সে দেশের নারীরা শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর। রাষ্ট্রের দিক থেকে, সমাজের দিক থেকে, সংসারের দিক থেকে শিক্ষিতা নারীর প্রয়োজন আজ অনস্বীকার্য্য। তাই সব দেশেই, সব সমাজেই এবং সব সংসারেই আজ স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন হয়েছে এবং প্রসারও হচ্ছে ব্যাপক ভাবে। কিন্তু, স্ত্রীশিক্ষার এই প্রবর্ত্তন, প্রচলন ও প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের, সমাজের ও সংসারের আত্মিক, নৈতিক, চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতিও কি সমান তালে হচ্ছে? না অবনতি হচ্ছে?—এ প্রশ্ন আজ চিন্তাশীল, দায়িত্বশীল অনেকের মনেই জাগছে। কারণ? কারণ, একটু চোখ খুলে আশেপাশে দেখলেই দেখা যাবে আজকালকার শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের নীতি বোধ কোথায় নেমেছে, চারিত্রিক সংযম তো লুপ্ত প্রায়, আর মানসিক দৌর্ব্বল্য প্রকটিত হয়ে উঠছে পদে পদে! কিন্তু, কেন? এ কেনর উত্তর রয়েছে অনেক গভীরে। তার বিস্তারিত আলোচনায় সুযোগ এখানে নেই: তবে মোটামুটি ভাবে বলা চলে পাশ্চাত্য ভাবপুষ্ট শিক্ষাধারার কিছুটা দুষ্ট প্রভাব এবং তার সঙ্গে অভিভাবকদের গাফিলতিই অর্থাৎ সন্তানদের নীতি ও সংযমের পথে ঠিকমত চালিত করবার চেষ্টার ত্রুটিই, এই অধঃপতনের জন্য মুখ্যতঃ দায়ী। অবশ্য পারিপার্শ্বিকের প্রভাব, অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রভৃতিও এর মধ্যে আছে। আমার এই মতের সঙ্গে অনেকেই হয়ত একমত হবেন না তা জানি,—বিশেষ করে শিক্ষিতা আধুনিকারা তো আমার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন। কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমি তাঁদের প্রশ্ন করব আধুনিক শিক্ষিতারা ক'জন সংসারে শ্রীবৃদ্ধি আনতে পারছেন, ক'জন শান্তি ও সুখ বজায় রাখতে পারছেন? ক'জন পুত্র কন্যাদের সুষ্ঠু ভাবে মানুষ করতে পারছেন? আজ যিনি কন্যা, কাল তিনি হবেন বধূ এবং এবং তারপর মাতা ও গৃহকর্ত্রী। দায়িত্ব ক্রমশঃ বাড়তে

বাড়তে গুরুদায়িত্বের বোঝারূপে স্কন্ধে চাপবে এবং তাঁর ওপরই নির্ভর করবে গৃহের সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি। কিন্তু এই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতা আধুনিকারা কি সেই গুরুদায়িত্বের যোগ্য হয়ে গড়ে উঠছেন? অনেক অভিভাবিকা মনে করেন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই শিক্ষা লাভ সম্পূর্ণ হয় এবং ছেলে মেয়েরা যাতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে সেই দিকেই শুধু দৃষ্টি দেন না। তার ফলে দেখা যায় অনেক মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারিণী হয়েও সাংসারিক সৎ-শিক্ষার অভাবে সংসার জীবনে অনভিজ্ঞার ন্যায় আচরণই শুধু করেন না, নিজেদের এবং বিবাহ পরবর্তীকালে শ্বশুরালয়েও অশান্তির সৃষ্টি করে সংসারে বিপর্য্যয় আনয়ন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার যে তাঁরা বা তাঁদের পিতামাতারা একবার ভেবেও দেখেন না যে এই অশান্তির প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁদের কন্যাদের অশিক্ষা বা কুশিক্ষা। লোক চক্ষে পাশ করা মেয়েদের শিক্ষিতা বলে চালান গেলেও মেয়ে যে পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে কোনও শিক্ষাই পায় নি এটা অভিভাবকরা বোঝেন না বা বুঝতে চান না। আর তাঁরা বোঝেন না বা স্বীকার করতে চান না বলেই তাঁদের কন্যারা অনেক ক্ষেত্রেই সৎ ও মেয়েদের উপযুক্ত শিক্ষার থেকে বঞ্চিত থেকে যান। কালিদাস, শেক্সপীয়ার, রবীন্দ্রনাথ মুখস্থ করতে পারলে পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাওয়া যেতে পারে। নিউটন্, এডিসন্, আইনষ্টাইন্, জগদীশ, সত্যেন্দ্রনাথ, হয়েল-নারলিকরের থিওরী মনে রাখতে পারলে পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব হতে পারে, কৌটিল্য, কাণ্ট, হেগেল, মিল্ এমারসন্, রাধাকৃষ্ণণের প্রবন্ধ বিবৃত করতে পারলে পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার সঙ্গে হয়ত ভাল চাকরীও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পারিবারিক জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে, সংসারে শান্তি বজায় রাখতে হলে, সুখী ও মানসিক সুস্থ থাকতে হলে, এই পুঁথিগত শিক্ষাকে শুধু পরীক্ষা পাশের সহায় বলে মনে না করে, তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে সংসার-জীবনেও কাজে লাগতে হবেই শুধু নয়, এর বাইরেও অনেক কিছু শিখতে হবে, বুঝতে হবে, জানতে হবে। তবেই শিক্ষা কিছুটা সম্পূর্ণ এবং সফল হয়ে ছাত্রীকে দেবে তার অভীষ্ট ফল। কিন্তু এই স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা পুস্তকের বাইরের সংসার জীবনের উপযোগী এই শিক্ষা মেয়েরা পাবে কোথায়?—এ প্রশ্ন অনেকেই করতে পারেন। তার উত্তরে বলব এ শিক্ষা তারা পাবে মায়ের কাছ থেকে; পাবে ঠাকুমা, দিদিমা, পিসিমা, মাসিমা, দিদি প্রভৃতি গুরুজনদের কাছ থেকে, পাবে প্রাতঃস্মরণীয়া মহীয়সী মহিলাদের জীবনীর থেকে। শিখবে কি করে কুমারী জীবনের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়; শিখবে কি করে বিবাহিত জীবনে চরিত্র মাধুর্য্যে, শান্ত ব্যবহারে, সুষ্ঠু আচরণে স্বামী ও শ্বশুরালয়ের সকলকে সুখী করে নিজেও সুখী হতে হয়; শিখবে কি ভাবে মাতা রূপে সন্তানকে চরিত্রবান, নিষ্ঠাবান, ন্যায়বান, সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী, ধীমান করে তুলতে হয়; শিখবে কি ভাবে পরিণত বয়সে গৃহকর্ত্রীরূপে সত্য, শিব ও সুন্দরের আরাধনা করে, সদাচার, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সেবার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে, সংসারে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হয় ও পারিবারিক শান্তি ও সুখ বজায় রাখতে হয়। যে সংসারে এরূপ আদর্শ নারীর অবস্থান হয় সে পরিবারের সন্তানেরা দেশের মুখোজ্জ্বলকারী রূপেই গড়ে ওঠে। আর যে সব মেয়েরা এ সব বিষয়ে লক্ষ্য না রেখে, পুঁথিগত বিদ্যার্জ্জনেই সন্তুষ্ঠ থেকে, নিজেদের আমোদ, আহ্লাদ ও উচ্ছৃঙ্খলতায় গা ঢেলে দিয়ে চলেন, তাঁদের সন্তানদেরই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় রোয়াকে, রাস্তায় আড্ডা জমাতে, আর রেস্তঁরায় 'ড্রেন্ পাইপ্' ও 'স্ল্যাক্স্'-এর প্রাধান্যে প্রগতির পরিচয় দিয়ে নক্কারজনক 'টুইষ্ট' ও 'শেক্' নৃত্যের আনন্দে ও পান ভোজনে মত্ত হয়ে আছে। ('টপ্‌লেশ্' এর আবির্ভাব এখনও হয়নি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না)। প্রগতির পরীক্ষায় এরা অবশ্যই কৃতকার্য্য, স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতেও এরা অনেকেই সাফল্যলাভও হয়ত করেছে; কিন্তু সামাজিক জীবনের পরীক্ষায় তারা হয়ত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়ে যাবে এবং তাদের ব্যর্থতাই সংসারকে, সমাজকে, দেশকে টেনে নিয়ে যাবে অধঃপাতের পথে। তাদের ইন্দ্রিয়সর্বস্ব আনন্দ একদিন তাদের জীবনেই হয়ত ডেকে আনবে মহানিরানন্দ!

এর ওপর আছে বিদেশী প্রভাব দুষ্ট শিক্ষায়তনগুলি। সেখানে বিদেশী ভাষা, বিদেশী ধর্ম, বিদেশী ভাব, বিদেশী

অভ্যাস, প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। বিদেশী ভাষা, বিশেষ করে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করা নিন্দনীয় তো নয়ই, বরঞ্চ প্রশংসার যোগ্য—অবশ্য যদি ঐ সঙ্গে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা না করে নিজ ভাষাতেও ব্যুৎপত্তি লাভ করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছোট বেলার থেকে ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি লাভ করতে গিয়ে মাতৃভাষাকে সম্পূর্ণরূপে অবজ্ঞা করা হয় এবং ফলস্বরূপ নিজ ভাষাতে হয়ে পড়ে দুর্ব্বল। অবশ্য তাতে তারা লজ্জা পায় না ইংরাজী ভাষা জানার অন্ধ গর্ব্বে! কিন্তু একজন ইংরাজ কখনও ফরাসী বা জার্ম্মাণ ভাষা শিখতে গিয়ে নিজ মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করেছে বলে শোনা যায় না। এর পর আছে বিদেশী ধর্ম্মের প্রচার ও বিদেশী অভ্যাসের প্রভাব, যা আমাদের সংসারে সব সময় চলে না তো বটেই বরঞ্চ আনে অশান্তি। কিন্তু আজকালকার ফ্যাসনই হচ্ছে খরচ করবার সামর্থ থাকলে অকারণ খরচ করেও ছেলে মেয়েদের ঐ সব বিদেশী প্রভাবিত স্কুলে শিক্ষা দেওয়া। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই যে ফল খারাপ হচ্ছে তা বলব না। আমাদের দেশীয় স্কুল-কলেজেও অনেক 'শিব গড়তে বাঁদর গড়া' হচ্ছে।

যাই হোক, আমার এত কথা বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে শিক্ষার গোড়াপত্তনের সময়ই যদি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করা যায় তাহলে উত্তরকালে কুশিক্ষার বা অনুপযুক্ত শিক্ষার প্রভাবে ছেলে মেয়েরা অসুখী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই কুশিক্ষার প্রভাব সুদূর প্রসারী হয়। এই কুশিক্ষা স্কুল-কলেজ থেকেই আসুক বা পিতা-মাতার কাছ থেকেই পাক, মেয়েদের জীবনে ঘোর বিপত্তির সৃষ্টি করে। সুতরাং এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান প্রত্যেক পিতা-মাতার, বিশেষ করে মায়েদের হওয়া উচিত। কারণ মায়েদের প্রভাব মেয়েদের ওপর খুব বেশীই পড়ে।

এই প্রবন্ধটি পড়ে আমার অনেক পাঠিকা বোনেরই হয়ত ভ্রু হয়ত কুঞ্চিত হবেই শুধু নয়, সনাতন পন্থী বলে অনেকেই হয়ত আমাকে বিদ্রূপও করবেন। কিন্তু তার উত্তরে আমি শুধু এই কথাই তাঁদের বলব যে অতীতের বুদ্ধদেব, শ্রীগৌরাঙ্গর কথা ছেড়ে দিলেও, এই আধুনিক কালের রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র প্রমুখ দেশ বরেণ্য মণীষীদের, যাঁদের অনেকের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করে দেশ আজ ধন্য হচ্ছে, তাঁদের ন্যায় সুসন্তান এই আধুনিক যুগের আলোক প্রাপ্তা, উচ্চশিক্ষিতা মহিলাদের ক'জন তৈরী করেছেন এবং ক'জন করবার আশা রাখেন? ঐ সব মণীষীদের জননীরা উচ্চশিক্ষিতা তো ছিলেনই না, অনেকে আবার নিরক্ষরও ছিলেন! কিন্তু তাই বলে সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে তাঁরা অপারগ ছিলেন না। তাঁদের সহজ, সরল ও নীতি, নিষ্ঠায় সমুজ্জ্বল জীবনাদর্শ; অস্বার্থপর ও ধর্ম্মনিষ্ট আচরণ; শান্তিকামি, সেবাপরায়ণ সহৃদয় মন প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই ঐ সব মহীয়সী মহিলাদের সন্তানদের সুশিক্ষিত করে তুলত। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি বর্ত্তমান ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর স্ত্রী, ভারতের মহিলা প্রধানা শ্রীমতী ললিতা দেবীর কথা। তিনি স্বল্পশিক্ষিতা হয়েও তাঁর চরিত্রগুণে, হৃদয় মাধুর্য্যে, ঐকান্তিক নিষ্ঠায়, ধর্ম্মাচরণে আজ ভারতের মহিলাগ্রগণ্যা বলে বিবেচিত হচ্ছেন। তাঁর চরিত্রই ভারতীয় মহিলাদের নিকট আদর্শ চরিত্রের উদাহরণ হওয়া উচিত বলেই মনে করি। আশা করি আমার মা বোনেরা আমার এই সব কথাগুলি ভেবে দেখবেন।

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

ডাঃ কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৩)

প্রসূতি-অবস্থায় প্রত্যহ নিয়মিতভাবে দুধ পান ও ছানার তৈরী মিষ্টান্ন, শাকসব্জী, ফলমূল প্রভৃতি 'ক্যাল্সিয়াম্' (Calcium), 'ফস্ফরাস্' (Phosphorous) ও 'ভিটামিন' (Vitamins) উপাদান-বিশিষ্ট পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ জননী ও শিশুর পক্ষে উপকারী। গর্ভধারণকালে প্রসূতি ও ভ্রূণ-সন্তানের অস্থি-পুষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলি যেমন প্রয়োজনীয়, সন্তান-প্রসবের পর মাতৃদুগ্ধ পান করে শিশুর

শারীরিক উন্নতির জন্য এ সব খাদ্যোপকরণের ঠিক তেমনি আবশ্যকতা আছে। কারণ, গর্ভনিষেকের পর জননীর খাদ্যের যাবতীয় পুষ্টিকর উপাদান পাচন-ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহের রক্তনালী ও লসিকা-পথে বাহিত হয়ে জঠরাভ্যন্তরে জরায়ুস্থিত 'ফুল' বা 'প্ল্যাসেণ্টার' (placenta) ভিতর দিয়ে ভ্রূণ-শরীরে উপনীত হয়। বিধাতার বিচিত্র নিয়মানুসারে এই 'ফুল' বা 'প্ল্যাসেণ্টার' ভিতর দিয়ে শুধু পুষ্টিকর রাসায়নিক-পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণ মাত্রই ভ্রূণ-শরীরে প্রবেশ লাভ করে এবং যাবতীয় রোগ-জীবাণু ও বিষাক্ত-পদার্থকে গন্তব্য-পথের গোড়াতেই বাধা দিয়ে প্রসূতির গর্ভস্থ-ভ্রূণের জীবন-রক্ষার সহায়ক হয়। এই সব রাসায়নিক ও খাদ্যপ্রাণ উপাদানের দৌলতেই জননী-জঠরস্থ ভ্রূণ-সন্তান তিলে-তিলে দৈহিক-পুষ্টিলাভ করে উত্তরোত্তর আকারে-আয়তনে ও গঠন-বৈশিষ্ট্যে পূর্ণাঙ্গ শিশুরূপে বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। এ সময়ে কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান সেই ভ্রূণের পক্ষে মুখ দিয়ে খাদ্যগ্রহণ করা কোনোমতেই সম্ভবপর হয় না। কাজেই 'ফুল' বা 'প্ল্যাসেণ্টার' ভিতর দিয়ে জননীর শরীরের রক্ত থেকে সংগৃহীত অম্লজান (Oxygen) ও বিবিধ পুষ্টিকর-উপাদান সেবন ছাড়া গর্ভস্থ ভ্রূণ-সন্তানের জীবন-ধারণের আর কোনো উপায় থাকে না। এই কারণেই গর্ভাবস্থায় প্রসূতির শারীরিক সুস্থতা রক্ষা এবং খাদ্যাখাদ্য-বিচারের দিকে সবিশেষ দৃষ্টিদান করা দরকার। গর্ভাবস্থায় যে সব প্রসূতি নিয়মিতভাবে ও যথোচিত পরিমাণে দুধ, ডিম, মাংস, শাকসব্জী, ফলমূল, ছানা-জাতীয় মিষ্টান্ন, কড্ মাছের তেল (Cod Liver Oil) প্রভৃতি সুপুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ করেন, তাঁদের সন্তান সচরাচর বেশ সজীব-স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম-দৈহিক-গঠনের অধিকারী হয়ে ওঠে। গর্ভধারণকালে প্রসূতির খাদ্যে উপযুক্ত 'ক্যালসিয়াম' বা চূর্ণ-জাতীয় উপাদান ও 'ভিটামিন' বা খাদ্যপ্রাণের অভাব ঘটলে, নবজাতকের 'রিকেটস্' (Reckets] বা অস্থি-পুষ্টির ব্যাঘাত ও রোগপ্রবণতা দেখা দেয়···এমন কি, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুরারোগ্য-ব্যাধি, সরাসরি মাতৃগর্ভ থেকে সংক্রামিত না হলেও, অতি সহজেই এই সব অপরিপুষ্ট সন্তানকে প্রাণঘাতী-রোগের কবলে টেনে অকালেই বিশেষভাবে জীর্ণ-ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে। সুতরাং সন্তানের জীবন রাহুমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক প্রসূতিরই নিজের শারীরিক-স্বাস্থ্যোন্নতি ও যথোচিত খাদ্যাখাদ্য-বিচারের সম্বন্ধে রীতিমত সাবধানতা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন। এ সম্পর্কে পাশ্চাত্য জগতের সুবিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ পিঙ্ক যথার্থই বলেছেন—গর্ভসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক জননীই এমন এক অমূল্য সম্পদের অধিকারিণী হন, সেটি দুনিয়ার কোনো কোটিপতির অর্থের বিনিময়ে লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়।" বাস্তবিকই আজকালকার দিনে সুঅভিজ্ঞ মণীষীর এই সারগর্ভ উক্তিটি সকল প্রসূতিরই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কারণ অধুনা বিবিধ সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা-কণ্টকিত আমাদের দেশে ব্যক্তিগত সুবিধা-সঙ্গতির দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক শত-সহস্র অভাব অভিযোগ, লাভ-লোকসান ও দায়-দায়ীত্বের প্রশ্ন মীমাংসা করে চলতে হয় ছোট-বড় প্রত্যেকটি গৃহস্থকেই। কাজেই ঘরে-ঘরে সুস্থ-সবল আনন্দোজ্জ্বল শিশুর আবির্ভাব সম্ভবপর করে তোলা এবং ভবিষ্যতে রোগ-শোক ও নিদ্রাহীন সহস্র রজনীর উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অস্বাচ্ছন্দ্যকর উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে, শুধু যে প্রসূতির খাদ্যাখাদ্য বিচার আর পরিচর্য্যার দিকেই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য তাই নয়, উপরন্তু, অহেতুক বহু সন্তানের জন্মদান রীতিও যথাযথভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিকল্পিত করে তোলা বিশেষ আবশ্যক। তাহলেই এদেশের সকল গৃহস্থের পক্ষেই সাংসারিক ও সামাজিক জীবনে সুষ্ঠুভাবে সর্ব্বাঙ্গীন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

গর্ভ-লক্ষণ ঃ

এ সম্বন্ধে প্রত্যেক মহিলারই অল্প-বিস্তর ধারণা আছে, তাই বিশদভাবে আলোচনা না করে, আপাততঃ, মোটামুটি কয়েকটি দরকারী কথা বলে রাখি।

সাধারণতঃ, কোনো বিবাহিত-মহিলার স্বাভাবিক 'ঋতু বা মাসিক রজঃস্রাব (Mensturation) যদি একাদিক্রমে দুইমাসকাল বন্ধ থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় যে তিনি গর্ভবতী হয়েছেন। তবে সকল ক্ষেত্রেই যে এ ধরণের লক্ষণ প্রকাশ পেলে গর্ভ-সঞ্চার হয়েছে বা সন্তান-সম্ভাবনা

সুনিশ্চিত, এমন ধারণা পোষণ করাও যথাযথ নয়। কারণ, দেখা যায় যে অনেক সময় ভয়ে-ভাবনায়, শোকে-দুঃখে, মানসিক দুশ্চিন্তা-অশান্তির ফলে এবং যক্ষ্মা, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ফুসফুসের প্রদাহ, মধুমূত্র প্রভৃতি বিবিধ রোগের প্রকোপেও কোনো কোনো মহিলার স্বাভাবিক 'ঋতু' বা 'মাসিক রজঃস্রাব' সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে। এমন কি, যথাযথভাবে গর্ভ-সঞ্চার হওয়া স্বত্বেও, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মহিলাদের কারো কারো বা হঠাৎ নিয়মিত ঋতু-স্রাবের পরিবর্তে দু'একদিন সামান্য রজঃস্রাব হবার পর, একাদিক্রমে নয়-দশমাসকাল 'ঋতু' বা 'মাসিক-স্রাব' বন্ধ থাকে এবং সন্তান-প্রসবের কয়েক মাস বাদে পুনরায় স্বাভাবিক রীতি-অনুসারে 'স্রাব' হয়।

গর্ভ-সঞ্চারের সুস্পষ্ট এবং সনাতন লক্ষণ হলো—সকালের দিকে প্রসূতির গা বমি-বমি করা। তবে সকল প্রসূতিরই যে এমনটি হবে, তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। প্রকৃতপক্ষে, সকল প্রসূতিরই অবশ্য সকালে ঘুম থেকে উঠবার পর অল্প-বিস্তর এ ধরণের উপসর্গ দেখা যায়। সাধারণতঃ, সকালে প্রাতরাশের পর, রুচিকর খাদ্য-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই এ উপসর্গের উপশম ঘটে। উপরন্তু, অলসভাবে চুপচাপ শুয়ে বসে সময় না কাটিয়ে সংসারের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকলে ও স্বাস্থ্য সম্মত যথাযথ নিয়মাদি পালনেও প্রসূতিদের এই 'গা-বমি-বমি' উপসর্গের উপদ্রবটি সবিশেষ প্রশমিত হয়ে যায়। তাছাড়া নিয়মিত ভাবে পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহণ যথাযথ বিশ্রাম ও সুনিদ্রা এবং কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণের উপযুক্ত ব্যবস্থাদি অনুসরণের ফলে, প্রসূতির পক্ষে এ-ধরণের উপসর্গের দুর্ভোগ থেকেও রেহাই পাওয়া সম্ভব হয়। অভিজ্ঞ-চিকিৎসকদের মতে, প্রসূতি অবস্থার এই সময়টিতে, কমলালেবু, টাটকা ফল, শাকসব্জী, মধু, ফলের রস প্রভৃতি বেশ উপকারী। প্রসূতিদের মধ্যে কারো কারো আবার আচার, চাট্‌নী, মোরব্বা প্রভৃতির রসাস্বাদনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ থাকে এবং এ সব মুখরোচক উপকরণগুলি খেলেও তাঁদের শরীরের কোনো গোলযোগ ঘটে না। তবে সাধারণতঃ প্রসূতি-অবস্থায় এ সব খাদ্য-বস্তু বর্জ্জন করাই যে বিধেয়—বহু বিচক্ষণ প্রবীণ চিকিৎসক এমন অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। পাশ্চাত্য-চিকিৎসকদের মতে, প্রসূতি-অবস্থায় রুটি বা পাউরুটি অথবা ঢোকল-যুক্ত [Whole meal] বিস্কুটের সঙ্গে মধু দিয়ে খাওয়া যেতে পারে। আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে প্রসূতিদের মধ্যে ভাজা-চিড়া, মুড়ি, মুড়কী, খই প্রভৃতি খাদ্যগ্রহণের সবিশেষ রেওয়াজ আছে। নিয়মিতভাবে পাতিলেবুর রস দিয়ে চিনি বা মিছরীর সরবৎ পান প্রসূতি-অবস্থায় বিশেষ তৃপ্তিকর হবে। তবে যে সব প্রসূতির বেশী মিষ্টতায় অনুরাগী নন, তাঁদের পক্ষে, 'সুগার অফ্ মিল্ক' [Sugar of Milk] অথবা 'ল্যাক্‌টোজ' [Lactose] ব্যবহার করাই উপযুক্ত। প্রসূতি-অবস্থায় অনেকে লেবুর রস মিশিয়ে চা পান করতে ভালবাসেন ও আরাম পান। তবে প্রসূতি-অবস্থায় চর্ব্বি-যুক্ত খাবার কম খাওয়াই ভালো এবং নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ-পরিষ্কার রাখার উদ্দেশ্যে মাছ, মাংস আহার করাও কমিয়ে দেওয়া উচিত। যে সব প্রসূতি কোষ্ঠকাঠিন্যতার ফলে কষ্ট পান, তাঁদের পক্ষে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে খেজুর, কিসমিস্, মনাক্কা, ডুমুর, 'প্রুণ' [Prunes] খাওয়া পরম-উপকারী। প্রতি সপ্তাহে মাত্র তিনটি ডিম [অর্থাৎ একদিন অন্তর একটি] হিসাবে খাওয়াই প্রসূতির স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। এছাড়া নিয়মিতভাবে সাগু কিম্বা সুজির পায়েস খাওয়াও প্রসূতির স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হিতকারী। যথোচিত খাদ্য ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজকর্ম্মের ফলেও, যদি প্রসূতির বমন-ভাব বন্ধ না হয়, তাহলে অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।

[ক্রমশঃ

সুপর্ণা দেবী

সুস্থ-সুন্দর দৈহিক রূপ-লাবণ্যের মাধুর্য্য অক্ষুণ্ণ-অটুট রাখার উদ্দেশ্যে, শুধু যে নিয়মিত স্নান-প্রসাধন, যথোপযুক্ত

খাদ্যোপকরণের সুব্যবস্থা ও সাময়িকভাবে জোলাপাদি সেবনের দিকেই নজর রাখা দরকার তাই নয়, প্রত্যহ সহজ-সরল বিশেষ-ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম-অনুশীলনের আবশ্যকতা আছে। প্রতিদিন প্রাতে বা সন্ধ্যায় সামান্য কিছুক্ষণ নিয়মিতভাবে এই সব সহজসাধ্য 'ঘরোয়া'-ব্যায়ামগুলির চর্চ্চার ফলে, শরীরের পেশী-অন্ত্র, রক্ত-সঞ্চালন ও পাচন-ক্রিয়া প্রভৃতির ক্রমোন্নতি হয় এবং দেহ-মন সজীব-সুঠাম হয়ে ওঠে। শারীরিক-সুস্থতার জন্য নারী-পুরুষ প্রত্যেকেরই প্রত্যহ অল্প-বিস্তর ব্যায়াম-চর্চ্চা যে একান্ত প্রয়োজনীয়—এ বিষয়ে বিশ্বের সকল অভিজ্ঞ-চিকিৎসকেরাই একমত। অথচ, আমাদের দেশে সকল সমাজের নারী-পুরুষেরই এদিকে তেমন বিশেষ আগ্রহ-অনুরাগ নেই···নিয়মিত ব্যায়াম-অনুশীলন করা, অনেকের কাছেই নিতান্ত অসার-অপ্রয়োজনীয় এবং সময়ের অপ-ব্যবহারেরই সামিল মনে হয়। তাই তাঁরা রূপচর্চ্চার এই একান্ত-আবশ্যকীয় কর্ত্তব্যটি সম্বন্ধে আদৌ সচেতন হতে চান না! অটুট-স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে নীরোগ-দীর্ঘ-জীবনের আনন্দ-শান্তি উপভোগের বদলে, তাঁরা নিত্য-দিন ছোট-বড় শারীরিক-ব্যাধির উপদ্রব সহেন আর ডাক্তার-বদ্যির ওষুধের দৌলতে দৈনন্দিন-দুর্ভোগের সঙ্গে রীতিমত লড়াই চালিয়ে অসার বিলাস-প্রসাধনের মোহে তিলে-তিলে নিজেদের প্রাণ-শক্তির অপব্যয় করে অকালে জরা-জীর্ণ হয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকাটাই যেন বেশী পছন্দ করেন। কিন্তু সামান্য কষ্ট স্বীকার করলেই, এ দুর্ভোগের কবল থেকে তাঁরা সহজেই এবং সারা জীবনের মতো মুক্তি-লাভ করতে পারেন···প্রতিদিন মাত্র কিছুক্ষণের জন্য সরল-সহজসাধ্য কয়েকটি ব্যায়াম-অনুশীলনের ফলে, অটুট-সুন্দর দৈহিক-রূপ-স্বাস্থ্যের কল্যাণে নীরোগ দীর্ঘ জীবন তাঁদের পরম মধুময় ও আনন্দোজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

রূপচর্চ্চা-প্রসঙ্গে এবারে তাই সরল-সহজসাধ্য নিতান্তই 'ঘরোয়া'-ধরণের কয়েকটি ব্যায়াম-পদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছি। এ ব্যায়ামগুলি যে মহিলাদের উপযোগী—সে-কথা বলাই বাহুল্য।

পাশের ছবিতে যে ব্যায়ামের বিশেষ-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে—সেটি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে,—মহিলাদের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ, বাহু, স্কন্ধ এবং উদরাংশের পেশী-ধমনী সমূহ পরিপাটি-সুঠামসৌষ্ঠব মণ্ডিত হয়ে ওঠে। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অনুশীলন-পদ্ধতি হলো—পায়ের পাতা দুটি একত্রে জোড়া রেখে ঘরের মেঝের উপর সোজা-সটান দাঁড়িয়ে, ১নং ছবির ধরণে হাত দুখানিকে সিধাভাবে মেলে দিয়ে ধীরে ধীরে নীচে থেকে মাথার উপরে তুলুন। তারপর পুনরায় মাথার উপর থেকে ধীরে ধীরে হাত দুখানিকে বরাবর সিধাভাবে দেহের সামনে প্রসারিত রেখে শরীরটিকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে ক্রমশঃ (কোমরটিকে দেহের সামনের দিকে নীচুভাবে বাঁকিয়ে) দেহের নীচের দিকে নামিয়ে এনে দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের পাতার উপরাংশ স্পর্শ করুন। ক্ষণকাল শরীরটিকে নিচু ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে দুই হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে দুই পায়ের পাতা স্পর্শ করে থাকবার পর, পুনরায় হাত দুখানিকে আগের মতোই শরীরের সামনের দিকে সিধাভাবে প্রসারিত করে ধীরে ধীরে মাথার উপর তুলে রাখুন। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটি অভ্যাসের সময়, হাত দুখানি উপরে-তোলা ও নীচে-নামানোর গতি-ছন্দের সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস নেবেন। এই হলো—

১নং ব্যায়মের ভঙ্গীটির মোটামুটি পদ্ধতি। এ ভঙ্গীটি, অন্ততঃপক্ষে, দশবার আগাগোড়া অভ্যাস করা প্রয়োজন।

উপরে ব্যায়ামের যে ২নং ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে সেটি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, প্রথম ভঙ্গীটির অনুরূপই দৈহিক-সৌষ্ঠব সুগঠিত করবে। ২নং ব্যায়াম-ভঙ্গীটির পদ্ধতি হলো —পায়ের দুটি পাতা একত্রে জোড়া দিয়ে ঘরের মেঝেতে আগের ভঙ্গীর মতোই সোজা-সটান দাঁড়িয়ে দুই হাতের কনুই বাঁকিয়ে মাথার পিছনে হাতের তালু দুইটি ছুঁইয়ে রাখুন এবং ধীরে ধীরে নিশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কেবলমাত্র কোমর থেকে দেহের উপরাংশটুকু ঈষৎ বামে ও দক্ষিণে বাঁকিয়ে একবার এদিকে এবং আরেকবার ওদিকে হেলান। এই ভঙ্গীটিও অন্ততঃপক্ষে, দশবার অভ্যাস করা দরকার।

স্থানাভাবের কারণে, আপাততঃ ব্যায়ামের বাকী ভঙ্গীগুলি প্রকাশ করা সম্ভব হলো না। আগামী সংখ্যায় সেগুলির চিত্র ও যথাযথ পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

—

ষ্টেন্সিলের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কাঠের, কাগজের, কাপড়ের অথবা পোড়া-মাটির কিম্বা টিন বা লোহার তৈরী কোনো সামগ্রীর উপর ষ্টেন্সিল্-কারুশিল্পের নক্সার ছাঁচে রঙ ফলানোর সময় সচরাচর একখানি 'ছাঁইচ' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ রীতি মেনেই যে সব সময়ে ষ্টেন্সিল্ কারুশিল্পের নক্সার ছাঁচে রঙ-ফলানোর কাজ করতে হবে, এমন কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই। আসল কথা, সুষ্ঠুভাবে শিল্প কাজ-করবার জন্য এক বা একাধিক 'ছাঁচ' ব্যবহার—শিল্পীর যেমন সুবিধা হবে, তেমনিভাবেই 'রঙ-ফলানোর' পদ্ধতি অনুসরণ করা উচিত। তাছাড়া মাত্র একটি 'ছাঁচ' সম্বল বলেই যে আগাগোড়া এক-বর্ণে নক্সায় 'রঙ-ফলানোর' কাজ সারতে হবে—এমন ধারণা রাখাও ঠিক নয়। নক্সার ছাঁচ একটি হলেও, এক-রঙার বদলে সেটিকে সুন্দরভাবে বহু-বর্ণে বিচিত্রিত করে তোলাও সম্ভব। এ প্রসঙ্গে দৃষ্টান্ত হিসাবে, ইতিপূর্বে গত জ্যৈষ্ঠ-১৩৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত ফুল-পাতার সহজ-সরল নক্সা-নমুনাটি এবং এবারের সংখ্যায় প্রকাশিত পরপৃষ্ঠার আলঙ্কারিক-নক্সার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ষ্টেন্সিল্-কারুশিল্পের উপযোগী এ দুটি নক্সা-নমুনাকে তুলির সাহায্যে অনায়াসেই যে কোনো সৌখিন-সামগ্রীর উপর মনোরম-ছাঁদে বহু বিচিত্র বর্ণে রঙ-ফলিয়ে তোলা যাবে। অর্থাৎ, ফুলের পাতা ও ডাঁটা ফুটিয়ে তুলতে হবে

হাল্‌কা অথবা গাঢ় সবুজ রঙে···পাতার রঙ হালকা-ধরণের হলে, পাতার শিরাগুলিকে গাঢ় সবুজ রঙের রেখা টেনে

ষ্টেন্‌সিল্‌ কারুশিল্পের কাজ করতে হবে। পক্ষান্তরে, পাতার রঙ গাঢ়-সবুজ হলে, পাতার শিরাগুলি ফুটিয়ে তুলবেন—হালকা-সবুজ অথবা কাস্‌চে-সবুজ রঙের সাহায্যে। ফুলের পাপড়ীর রঙ হবে—যে সামগ্রীটির উপর ষ্টেন্‌সিল-কারুশিল্পের নক্সার ছাঁচ তুলছেন, সেটির পশ্চাদ-পটের রঙের (Colour of the background) সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, লাল, হলদে শাদা, নীল, গোলাপী, আশমানী, হালকা-বেগুনী (Mauve or violet) এমনি কোনো মানানসই ও পছন্দমত রঙে।

এক বা একাধিক রঙে সুরঞ্জিত করে সৌখিন কোনো সামগ্রীর উপর মনোরম-ছাঁদে উল্লিখিত ষ্টেন্‌সিল-কারু-শিল্পের নক্সা দুটির ছাঁচে রঙ-ফলানোর সময়, প্রথমেই পাতা ও ডাঁটার অংশগুলি ভরাট করে তুলবেন। পাতা ও ডাঁটার অংশে প্রলেপিত-রঙটুকু আগাগোড়া বেশ শুকিয়ে যাওয়ার পর, সযত্নে-সতর্কভাবে সরু-তুলির সাহায্যে পাতার শিরাগুলিকে যথাযথ রঙ-ফলিয়ে ফুটিয়ে তুলতে হবে। শিল্পীর সুবিধা অনুসারে, পাতা ও ডাঁটার ছাঁচে প্রথমবার ও দ্বিতীয়বার রঙ-ফলানোর ফাঁকে অথবা এ দুটি পর্ব্ব পুরোপুরিভাবে সারা হলে, প্রয়োজনমতো লাল, হলদে, শাদা, গোলাপী, নীল, হাল্‌কা-বেগুনী, অথবা আশমানী যে কোনো একটি রঙ ব্যবহার করে ফুলের পাপড়ীগুলিকে সযত্নে রঙ-ফলিয়ে তুলবেন। তাহলেই দেখবেন—কত সহজে আর কি অপরূপ-সুন্দর পরিপাটি ছাঁদে সৌখিন সামগ্রীটির উপর ষ্টেন্‌সিল-কারুশিল্পের বিচিত্র নক্সা-ছাঁচটি সুচিত্রিত হয়ে উঠেছে।

ষ্টেন্‌সিলের কারু শিল্পের এই হলো মোটামুটি পদ্ধতি সামান্য চেষ্টা করলেই কয়েক দিন সযত্নে অনুশীলনের পর শিক্ষার্থীরা যে অনায়াসে শুধু ফুল-পাতার নক্সার ছাঁচই নয়, ষ্টেনসিল-কারুশিল্পের আরো নানান্‌ বিচিত্র সুন্দর সুদৃশ্য মনোরম ছাঁদের আলঙ্কারিক চিত্র রচনা করতে পারবেন—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।

আগামী সংখ্যায় আরেকটি অভিনব-অপরূপ কারুশিল্প সামগ্রীর রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করার বাসনা রইলো।

ম্যাগিয়ার্‌ ব্লাউশ

সুলতা মুখোপাধ্যায়

সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে সব সুগৃহিণী সূচী-শিল্পের অনুশীলন করেন, তাঁদের সুবিধার জন্য বিচিত্র সৌখিন-সুন্দর বিশেষ এক ধরণের ইউরোপীয়-ফ্যাশানের ব্লাউশ রচনা-পদ্ধতির মোটামুটি পরিচয় দিচ্ছি। এ ধরণের ব্লাউশের নাম—'ম্যাগিয়ার্‌ ব্লাউশ'···এ পরিচ্ছদের প্রচলন সুরু পূর্ব্ব-ইউরোপ অঞ্চলে···এখন অবশ্য

দুনিয়ার প্রায় সকল দেশেই এ পোষাক ব্যবহারের রীতি-মত রেওয়াজ আছে।

(১) ম্যাগিয়া ব্লাউজ
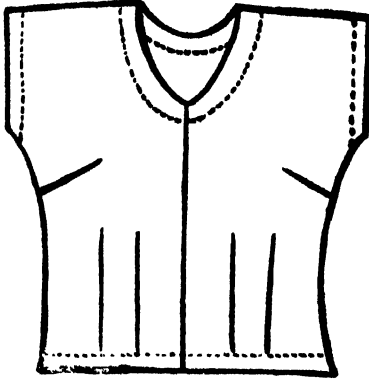
'ম্যাগিয়ার্' ব্লাউশের ছাঁদ কি ধরণের হয়, উপরের ১নং ছবিটি দেখলেই তার নিদর্শন পাবেন। এ ধরণের ব্লাউশ রচনার জন্য চাই—১ গজ বহরের ১ গজ কাপড়।] ব্লাউশের কাপড়টি কিভাবে ছাঁটাই করতে হবে, নীচের ২নং ছবিটিতে তার মোটামুটি হদিশ পাবেন।
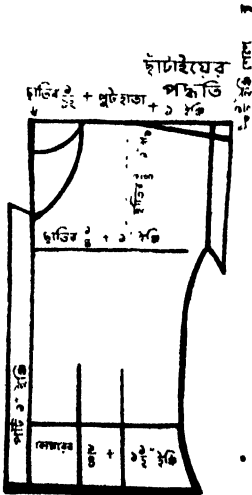
(২)

সেলাইয়ের আগে, 'ম্যাগিয়ার্' ব্লাউশের কাপড়টিকে কি মাপে ও কেমনভাবে ছাঁটকাট করতে হবে নীচে তার হিসাব দেওয়া হলো। হিসাবটি যে প্রমাণ-সাইজের মাপ অনুসারে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

(ক) ছাতি=৩০″ ইঞ্চি+৪″ ইঞ্চি (বাড়তি কাপড়)=৩৪″ ইঞ্চি÷৪=৮½″ ইঞ্চি।

(খ) ব্লাউশের ঝুল=১৮″ ইঞ্চি+১″ ইঞ্চি (বাড়তি কাপড়)=১৯″ ইঞ্চি।

(গ) সেস্ত=১৫″ ইঞ্চি+½″ (বাড়তি কাপড়)=১৫½″ ইঞ্চি।

(ঘ) পুট ও পুট-হাতা=৯½″ ইঞ্চি+১″ ইঞ্চি (বাড়তি কাপড়)=১০½″ ইঞ্চি।

(ঙ) কোমর=২৬″ ইঞ্চি+৬″ ইঞ্চি (বাড়তি কাপড়)=৩২″ ইঞ্চি÷৪=৮″ ইঞ্চি।

ব্লাউশের কাপড় ছাঁটাইয়ের সময় কয়েকটি বিশেষ-নিয়ম মনে রাখা দরকার। অর্থাৎ—

ব্লাউশের সামনের ও পিছনের অংশের কাপড় এক-সঙ্গে কাটা চলবে না এবং কাপড়টিকে লম্বালম্বিভাবে ভাঁজ (Fold) করে নিতে হবে। সামনের অংশের দু'দিকে ৪টি ½″ ইঞ্চি মাপের 'ডার্ট' পড়বে। কিন্তু পিছনের অংশে, প্রত্যেকটি ½″ ইঞ্চি মাপের—দুটি 'ডার্ট' দিতে হবে এবং এ দুটি 'ডার্টের' মাঝে ৫″ ইঞ্চি ব্যবধান থাকবে। জামার গলার ছাঁট এঁকে নিয়ে ১½″ ইঞ্চি মাপের কাপড় রেখে, কাপড়ের অপর টুকরোটি ছাঁটাই করতে হবে। তবে সেলাইয়ের জন্য দু'পাশে খানিকটা বেশী বা বাড়তি কাপড় রাখতে হবে। জামার গলায় পটি বসানোর পর, সেটিকে নিখুঁত-পরিপাটি-ছাঁদে মুড়ে 'হেমিং' বা 'Hemning Stitch' সেলাই দিতে হবে। জামার হাতা দুটিতেও 'হেমিং-সেলাই' (Hemning Stitch) সেলাই দেবেন। ব্লাউশের বুকের পটিও মুড়ে এবং 'হেমিং-সেলাই' দিয়ে রচনা করতে হবে। ব্লাউশের নীচের অংশের কাপড়টিতেও অনুরূপ 'হেমিং-সেলাইয়ের' কাজ সেলাই-কলের সাহায্যে অথবা কল-ব্যবহারের অসুবিধা বা অভাব ঘটলে, বকেয়া-সেলাই দিয়ে সেরে নিতে হবে। ব্লাউশের সামনের অংশ দুটিতে, বোতাম বসানোর জন্য—বাঁ-দিকে বাড়ানো-পটি ও ডান-দিকে চাপা-পটি থাকবে।

'ম্যাগিয়ার' ব্লাউশ তৈরীর এই হলো মোটামুটি রীতি।

—

সুধীরা হালদার

এবারে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অপরূপ সুস্বাদু অতীব-উপাদেয় একটি আমিষ-খাবার রান্নার কথা বলছি। এ খাবারটির নাম 'টিক্কাকাবাব'।

দু-তিন জনের আহারোপযোগী 'টিক্কা-কাবাব' রান্নার জন্য উপকরণ চাই—একপোয়া মেটুলি, আধখানা পাতিলেবু এবং প্রয়োজনমতো পরিমাণে ঘি, গোলমরিচের গুঁড়ো আর নুন। এছাড়া এই খাবারটির প্রধান উপকরণ—অর্থাৎ, মেটুলির টুকরোগুলিকে আগুনের আঁচে ঝলসে বা শেঁকে-নেবার জন্য বিশেষভাবে দরকার সূচ্যগ্র-প্রান্তবিশিষ্ট লম্বা একটি লোহার শিক। এ ছাড়া প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের সময় খাবারটিকে উপাদেয় করে তোলার উদ্দেশ্যে চাই—সরু-ছাঁদে কুচানো কাঁচা-পেঁয়াজ ও টোম্যাটোর ফালি।

উপরের ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ করে রান্নার কাজে হাত দেবার আগে, ধারালো একটি ছুরির সাহায্যে মেটুলিটিকে আগাগোড়া ½"।¾" ইঞ্চি আকারের ছোট-ছোট টুকরো করে কেটে, মেটুলির টুকরোগুলিকে পরিষ্কার-জলে ধুয়ে সাফ্ করে নিন এবং সেগুলিকে ভালোভাবে নুন, গোলমরিচের গুঁড়ো ও লেবুর রস মাখিয়ে রাখুন। এ কাজ সারা হলে অল্প একটু ঘি গলিয়ে নিয়ে লোহার শিকটির গায়ে পরিপাটিভাবে সেই উষ্ণ তরল ঘিয়ের প্রলেপ মাখিয়ে আগাগোড়া বেশ 'তেলা' (Greasy) করে ফেলুন। এবারে ঐ 'তেলা-শিকের' সঙ্গে মেটুলির টুকরোগুলিকে একের পর এক সুষ্ঠুভাবে গেঁথে দিন এবং মেটুলির টুকরো-আটা লোহার-শিকটিকে দুই হাতে ধরে উনানের গরম-আঁচের ঈষৎ-উর্দ্ধে রেখে, সেটিকে অনবরত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে মেটুলির টুকরোগুলিকে আগুনের তাপে বেশ ভালোভাবে শেঁকে-ঝলসে নিন। এভাবে ঝলসানোর ফলে, লোহার-শিকে আটা মেটুলির টুকরোগুলির প্রত্যেকটি আগাগোড়া বেশ 'সু-সিদ্ধ' (Perfectly roasted) হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে, সেগুলিকে সযত্নে ও সাবধানে লোহার শিক থেকে খুলে ফেলে পরিষ্কার একটি পাত্রে সজ্জিত করে রেখে, সদ্য রান্না-করা 'টিক্কা কাবাবের' টুকরোগুলির উপরে কাঁচা পেঁয়াজের কুচো ও টোম্যাটোর ফালি ছড়িয়ে দিয়ে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখুন। তাহলেই ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রন্ধন-প্রণালী অনুসারে 'টিক্কা-কাবাব' বানানোর কাজ শেষ হবে।

এবারে প্রিয়জনদের পাতে বিচিত্র-মুখরোচক এই আমিষ-খাবারটি সযত্নে পরিবেষণ করুন—আপনার হাতের রান্না 'টিক্কা কাবাবের' স্বাদ গ্রহণ করে তাঁরা প্রত্যেকেই যে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবেন – সে কথা বলাই বাহুল্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-উপাদেয় ভারতীয় খাবারের রন্ধন-প্রণালীর হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

——

পশ্চিমবঙ্গের হস্তশিল্প—২

কাশ্যপ শর্মা

আবরণে রূপসৃষ্টি

মেশিনের যুগেও যে গ্রামের কারিগরের হাতের কাজ একেবারে মরে যায়নি, তার কয়েকটা কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে—এ কাজের শিল্প সৌকর্য, এর বিশিষ্ট রূপ, এর মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসা মেটানর ক্ষমতা। আজ যে করেন নি; করেছিলেন নেহাৎই মানুষের প্রয়োজন মেটানর জন্য। আদিযুগে তাই অত্যন্ত সাধারণ জিনিষ, মাটি দিয়েই এদের প্রবর্তন হয়েছিল। অভ্যাসের বিবর্তন, জীবনধারার বিবর্তনের সঙ্গে এলো ধাতু—তামা, পিতল, লোহা। তৈরী জিনিষগুলি আরো টেকসই হোল, হোল
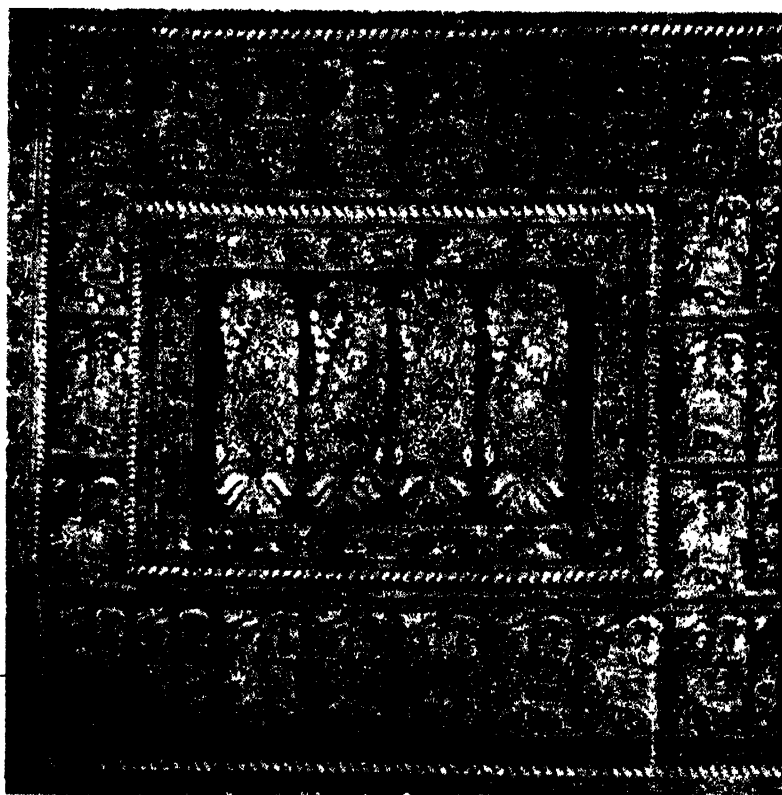
বালুচর সাড়ীর আঁচলায় কল্কার কাজ। চারদিকে হাতীর পিঠে সওয়ার দেখা যাচ্ছে।

জিনিষকে নিছক শিল্পকলার নিদর্শন বলে আমরা যাদুঘরে রেখে দেই, গতকাল তা ছিল দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাবার সাধারণ জিনিষ। একটা প্রদীপ বা পিলসুজ, মাটির ঘট, খাবার থালা, জলখাবার গেলাস—এগুলির উদ্ভবের আদিতে এদের স্রষ্টা রূপের কথা চিন্তা করে এদের সৃষ্টি আরো কাজের উপযোগী। নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কেমন করে মাটির প্রদীপের জায়গায় ঘর আলো করল নিয়নের টিউব—সেকথা এখানে অবান্তর। শুধু একটি কথাই মনে করা যেতে পারে যে এই ক্রমবিবর্তনে প্রদীপ গড়বার

ধাতু ইত্যাদির যেমন বদল হয়েছে, তেমনই নানা সময়ে এর আকৃতিরও হয়েছে পরিবর্তন। কালের যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে এর স্রষ্টাশিল্পী প্রয়োজন মেটাবার উদ্দেশ্য ছাড়াও, এর সঙ্গে নূতন রূপ সৃষ্টি করে মানুষের মনে আনন্দ দিতে চেয়েছে।

হস্তশিল্পের এই রূপসৃষ্টির একটা দিক আলোচনা করি।

সভ্যতার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজেকে আবৃত করতে শিখেছে। দেশে দেশে জলবায়ুর তারতম্যের অনুসারে, এই আবরণ বা পোষাকের রীতিভেদ দেখা যায়। সূক্ষ্ম-বস্ত্র বয়নের ঐতিহ্য বাংলায় অতি প্রাচীন। কার্পাস তুলোর ব্যবহার বাংলাদেশে সুদূর অতীতে ছিল এবং মিশরের মমির গাত্রাবরণ সূক্ষ্মবস্ত্র যে বাংলাদেশজাত, কোন কোন ঐতিহাসিক এমন ধারণাও পোষণ করেন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত খৃষ্টপূর্ব তিনচারশ বছর আগেকার পোড়া-মাটির মূর্তি থেকে সেকালের এদেশের পরিধেয় সম্পর্কে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। আরো পরবর্তীকালের বাংলার পাথরে গড়া মূর্তিতে নানাকারুকার্য-খচিত সূক্ষ্ম-বয়নের নিদর্শন প্রচুর দেখতে পাই। বাংলার কুশলী তাঁতশিল্পীদের একদা সবিশেষ নাম ছিল প্রাচীন রোমে। এখানকার বয়ন-শিল্পীদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন সেকালের রোমীয় ঐতিহাসিকেরা। বাংলার মসলিনের নাম ত' ভুবনবিখ্যাত।

বাংলার তাঁত-শিল্পীরা তাঁদের সৌন্দর্যসৃষ্টির এক অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন রেখেছেন সুনিপুণ-কৌশলে বোনা নানা-রকম নকসা-করা রেশমী ও সূতীর সাড়ীতে। এমনই এক শিল্প-সৃষ্টি বালুচর সাড়ী। মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ সহরের উত্তরে বালুচর গ্রামের থেকেই এ সাড়ীর নাম। 'মটকা' বা 'কেটে' জাতীয় রেশমী সুতো দিয়ে এ সাড়ী বোনা। সাধারণতঃ রেশমী সাড়ী যে সুতো দিয়ে বোনা হয়, তাকে বলে 'খয়ক'। এই সুতো বের করতে গুটি কেটে গুটিপোকা বেরিয়ে যাবার আগেই গুটিগুলিকে সিদ্ধ করে নিতে হয়। মটকার সুতো, পোকা গুটি কেটে বেরিয়ে যাবার পরে—সেই গুটি থেকে কাটা। ধর্মপ্রাণা হিন্দুনারী ধর্মীয় কাজে শুদ্ধ-বস্ত্রের ব্যবহারই শ্রেয় মনে করে থাকেন। মটকার সুতো কাটায় জন্য প্রাণীহত্যা করা হয় না, তাই এই সুতোর কাপড় বিশুদ্ধ বলে ব্যবহার করা হোত। আর হিন্দুসমাজে নারীর সেকালে যে উৎসবেই যোগদান করতেন, তারই মূলে ছিল ধর্মানুষ্ঠান—তাই এ সাড়ী ধনীগৃহের গৃহিণীদের উৎসবের সাজ হিসাবে বিশেষ আদরের জিনিষ ছিল।

সৌন্দর্যের দিক দিয়ে বালুচর সাড়ীর তুলনা নেই বললেই চলে। পনরটি রং বালুচর সাড়ী বয়নে ব্যবহার দেখা যায়। জামনী, কালো, আসমানী, গাঢ় নীল, আনারদানা, হলুদ, কমলা, সাধারণতঃ বালুচর সাড়ীতে সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্য এই রংগুলিরই প্রয়োগ দেখা যায়।

বালুচর সাড়ীর রূপসৃষ্টির কথা বলতে গেলে, যার কথা না বলে আরম্ভ করা যায় না—তার নাম দুবরাজ দাস। ১৮১১ সালে তাঁর জন্ম। বালুচর সাড়ী যদিও নবাবী-আমলের সৃষ্টি, তথাপি এর প্রসারে দুবরাজের দান অসামান্য। নক্সা-তাঁতে বালুচর বোনা হয়। দুবরাজ তাঁর সাড়ীর রূপবিন্যাসের জন্য তাঁত-গঠনের কাজেও ছিলেন সুদক্ষ কারিগর। দুবরাজই শেষশিল্পী যিনি বাজারের জন্য বালুচর সাড়ী বয়ন করে গিয়েছেন। দুবরাজই শেষ শিল্পী যিনি তাঁর স্বাক্ষর-সমন্বিত কাজ রেখে গেছেন। দুবরাজের তাঁতগুলি এখনও আছে। এই ধরণের তাঁতে তাঁর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীহেরম্ব ভট্টাচার্য কিছুদিন আগে একটি সুন্দর বালুচরী রুমাল বয়ন করেছেন। একাজে তাঁর সময় লেগেছিল ১৪ মাস।

দুবরাজ দাস ও তাঁর সাকরেদরা যে বিচিত্র নক্সার সৃষ্টি করে গিয়েছেন, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। যে বর্ণাঢ্য বয়নসম্ভার সত্ত্বেও দুবরাজের কোন সাড়ীর রংই চোখের পীড়াদায়ক ত' হয়নি—বরং নয়নানন্দকর হয়েছে। অথচ প্রচলিত রীতি লঙ্ঘন করে নক্সা রচনা ও রংএর ব্যবহার করে যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তা সে যুগে অতুলনীয়। যে বিচিত্র সাড়ী তিনি বয়ন করেছেন, তার জমির লহরের কাজ, পাড়ের অলঙ্কার, কোণার "কুঞ্জর ছবি, জমকাল নক্সা করা আঁচলার কাজ সেকালের অভিজাত নারী-সমাজে বহুল সমাদর লাভ করেছে। এ সাড়ীগুলি দৈর্ঘ্যে ১০ হাতের বেশী আর চওড়ায় ৪২" থেকে ৪৫" ইঞ্চি হোত। সেকালে এরকম এক একখানা সাড়ীর দাম ১০৲ টাকা থেকে ৫০৲ টাকা পর্যন্ত হোত। অবশ্য

এখনকার হিসাবে, এর দাম অন্ততঃ পক্ষে দশগুণ বেশী হবে। সম্ভাদরের সাড়ীগুলির আঁচলার বদলে থাকত চার কোণায় চারটি 'কুঞ্জ' বা 'কলকা'। দুবরাজ তাঁর তাঁতে চৌকোণা রুমাল, আর টেবিলক্লথও বুনেছেন। টেবিলক্লথগুলি ৬ হাত লম্বা আর ৩ হাত চওড়া হোত, দাম হোত, ৫০।৫০্ টাকা। এছাড়া নামাবলী ধরণের একরকমের গাত্রবস্ত্রও দুবরাজ তাঁতে বুনতেন—যার অঙ্গে ধর্মগ্রন্থ হতে উদ্ধৃত শ্লোক বোনা থাকত। কিন্তু শোনা যায়, বৃদ্ধ বয়সে তিনি নিজে এধরণের অঙ্গবস্ত্র বোনা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কারণ এধরণের বস্ত্রবয়নের সময় পা দিয়ে সুতো সরিয়ে দিতে হোত। এতে তাঁর ধর্মবিশ্বাসে আঘাত লাগত। তাই এ জিনিষ বোনার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হেরম্বচন্দ্র ভট্টাচার্যকে তাঁর শিষ্যত্বে গ্রহণ করেছিলেন।

দুবরাজের নক্‌সা তাঁতের এক আধুনিক সংস্করণ কিছুদিন হোল চালু হয়েছে। বাংলায় তার কোন নাম আছে কিনা জানিনা, তবে ইংরেজীতে তাকে 'জ্যাকার্ড-লুম' (Jecquered Loom) বলা হয়। এ তাঁতে নক্‌সাদার কাপড় বোনা যায়। তবে, নক্‌সা তাঁতের অনেক কাজ, যেমন পর পর চৌখুপী-নক্‌সা আঁচলের চারপাশে পর পর বোনা—যা বালুচর সাড়ীর এক বৈশিষ্ট্য—সেটি এ তাঁতে সম্ভব হয়নি এখনও।

বালুচর সাড়ী এখন আর বোনা হয়না। যে সব সাড়ীর নমুনা এখনও দেখা যায়, তার বৈশিষ্ট্য তার জমি, আঁচল আর পাড়ের নক্‌সায়। নক্‌সাগুলি বিশেষভাবে রঙানো রেশমী সুতোয় বোনা। সম্ভবতঃ প্রথমে নক্‌সাগুলি কাগজে এঁকে নেওয়া হোত—তারপর সেই নক্‌সা দেখে বোনা হোত। বুটিদার বালুচর জমিতে সাধারণতঃ, 'বুটি' বা 'ফুল' বা 'কল্‌কা' বোনা হোত। নিপুণ শিল্পবোধ দিয়ে সৃষ্ট এই বুটিগুলি—এত সুন্দরভাবে সাজান যে দেখলে মনে হয়—যেন ফুলে-ঢাকা একটি সুসজ্জিত বাগান। বুটিদার বালুচর সাড়ীর প্রধান আকর্ষণ—এর আঁচলার কাজ। এই আঁচলা-বোনার মধ্যেই বয়নশিল্পীর শিল্প-উৎকর্ষ দেখা যায়। নানা ঢঙের নানা চিত্রের সাহায্যে বোনা আঁচলার শিল্পশৈলীর—অর্থাৎ যাতে পাড়ের কাজের সঙ্গে সমন্বয় থাকে, সে সম্বন্ধে শিল্পী যথেষ্ট সতর্ক। বালুচর সাড়ীর আঁচলায় মধ্যে যেমন ফুল, কল্‌কা ইত্যাদির সমাবেশ থাকে তেমনই থাকে বিশেষভাবে আঁকা সমাজজীবনের বিচিত্র নক্‌সা। কোনটাতে যুগলমূর্তির চৌকো প্যানেলে আঁচলের চারিদিক ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনটাতে নর্তকী, কোনটাতে আবার জনাকীর্ণ রাজসভার ছবি। ১৮২০ সালের পরে বোনা বালুচর সাড়ীতে সাহেব, মেমসাহেব, সিপাই, সান্ত্রী, গোলন্দাজ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব দেখা গিয়েছে। একখানা বালুচর সাড়ী এখনও দেখা যায়, যার আঁচলার প্যানেলে বোনা হয়েছিল—রেল ইঞ্জিন তাতে টুপিমাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইঞ্জিন ড্রাইভার, আর সে ইঞ্জিনের পেছনেই রেলগাড়ীর কামরায় বসে আছে যুগল ইয়োরোপীয় আরোহী। সাড়ীর আঁচলার বিচিত্র নক্‌সাদার প্যানেলগুলি বিষ্ণুপুর বা বীরভূমের প্রাচীন মন্দিরগাত্রের পোড়ামাটির প্যানেলকে মনে করিয়ে দেয়। আগেকার দিকের বোনা বালুচর সাড়ীর আঁচলার দেখা যায় কল্‌কার প্রাধান্য। কল্‌কার ও নানা রূপবিন্যাস। কখনও কখনও বড় বড় কল্‌কার ভেতরে ছোট কল্‌কা অথবা কল্‌কার ভেতরে ফুল বা শঙ্খের প্রতিলিপি। আর একটি নক্‌সার প্যানেল এ যুগের সাড়ীতে দেখা যায়—তাতে অশ্বারোহিণী এক মহীয়সী মহিলার চিত্র। স্থানকাল বিবেচনা করে অনেকে মনে করেন, এ চিত্রটি রাণী ভবানীর প্রতীক। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বালুচর অথবা মীরপুর গ্রামের ওপারে গঙ্গাতীরে বড়নগরে ছিল এই মহীয়সী নারীর আবাসস্থান।

বাংলার তাঁতশিল্প তথা হস্তশিল্পের ঐতিহ্যে বালুচর সাড়ী এত বিশাল স্থান অধিকার করে আছে যে অল্পকথায় বলে সে কাহিনী শেষ করা যায়না। বালুচর ছাড়াও বাংলার তাঁতশিল্পীদের কীর্তির আরো বহু নিদর্শন রেশমে ও কার্পাসে আজও বাংলাদেশে ছড়িয়ে আছে। সারা পশ্চিমবাংলায় আজও পাঁচলক্ষ বয়ন-শিল্পী বাংলার হাটে হাটে তাদের যে শিল্প নৈপুণ্যের পসরা প্রতিদিন নিয়ে আসছেন, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য আরো অনেক কিছুই আছে। শান্তিপুর, ধনেখালি, বেগমপুর, রাজবলহাট, ফরাসডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, মুর্শিদাবাদ আর মালদার এই সব সুনিপুণ শিল্পীদের কথা বারান্তরে বলবার ইচ্ছা রইল।
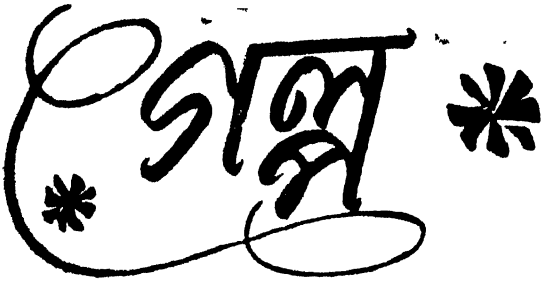
অবশেষে

বুদ্ধদেব গুহ

তাপস গত দু'মাস ধরে রেবাকে পড়াচ্ছে। সিনিয়ার ডিভিশন ছাত্রী। ইংরাজীতে কাঁচা। তাপসকে রাখা ইংরেজীটা দেখিয়ে দিতে।

পড়াবার সময় লক্ষ্য করেছে তাপস মেয়েটির হাবভাব। তেমন ভাল লাগেনি। পড়া শুনতে শুনতে অযথা অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। কখনো সোজা তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খুব অল্পকারণেই হেসে লুটিয়ে পড়ে। তাপস মুখ গম্ভীর করে থাকে প্রবীণশিক্ষকের ভঙ্গিতে। ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে তিলমাত্র ভেজাল থাকা উচিত নয়। নিজের ক্ষেত্রে ভেজাল থাকার কোন প্রয়োজনও বোধ হয়নি তাপসের। কারণ, সে ইতিমধ্যেই প্রেমাভিষিক্ত হয়েছে অন্যত্র। নায়িকা থাকেন অবশ্য প্রবাসে—জামসেদপুর। তাই পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ নেই অনেক দিন। গত পুজোয় শেষ দেখা। তা বলে পত্রবিনিময়ে ত্রুটি নেই কোন। ইদানীং নায়িকা প্রতিটি পত্রেই নায়ককে জামসেদপুর যাবার ব্যাকুল আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

তাপসের নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে এক এক সময়। তার খুবই উচিত অন্তত একটিবার করবীর সাথে দেখা ক'রে আসা। এমন কীইবা দূর। মেলে চাপলে ঘণ্টা চারেক। প্রত্যেকবার ভাবে তাপস আগামী মাসে নিশ্চয় যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অর্থে ঘাটতি পড়ে যায়। হয় জামাগুলো সব একসঙ্গে ছিঁড়তে আরম্ভ করে, নইলে সুরু হয় মা'র হার্টের অসুখটার বাড়াবাড়ি। যাওয়া আর হয়ে ওঠেনা শেষ পর্যন্ত। করবীকে জানায় সে-কথা পত্রযোগে।

করবী উত্তর দেয় ওটা ওর নিছক ছল। আসলে ও অন্যত্র···। এখানে ইনটারেষ্ট ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

কোন কোন মুহূর্তে এ-কথাটা তাপসেরও যে মনে হয়নি তা নয়। করবীর প্রতি আকর্ষণ ঠিক আগের মতই অটুট আছে এমন কথা সে নিজেই হলপ্ করে বলতে পারেনা। ভেবে মনে মনে লজ্জা পেয়েছে তাপস। কিন্তু কথাটায় যেহেতু কিছু সত্য আছে, সেহেতু ভাবনাটাকে মন থেকে এক নিমেষে উড়িয়ে দেওয়া যায় কেমন করে?

করবীর প্রতি আকর্ষণ কমে যাচ্ছে কেন? মনকে প্রশ্ন করেছে তাপস। যে কারণটা তার প্রথম এবং খুব সহজেই মনে হয়েছে তা আর কিছুই নয়, করবী বড্ড পুরনো হয়ে গেছে। খুব স্বাভাবিক। করবীর সাথে প্রেম তার বহু কালের।

এছাড়া অন্য কোন কারণ? নতুন কারোও দিকে তার আগ্রহ বাড়ছে নাকি? অবচেতন মনটার গভীর সমীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে। নতুন পরিচিতাদের মধ্যে ···রেবা? দূর, ছোট্ট একটা মেয়ে, কীইবা বোঝে এ-সবের। কীই বা বোঝে—কথাটা মনঃপুত হল না। কারণ রেবার চলনে বলনে ও যে অনেক কিছু বোঝে এটাই বরং তার সময় সময় মনে হয়েছে।

'রেবা ছাত্রী', অন্ততঃ এ কথাটাই ব'লে বন্ধুদের মুখ বন্ধ করেছে বহুবার। কেউ কেউ অবশ্য তীক্ষ্ণ প্রশ্ন আরও ছুঁড়েছে! বলেছে, ছাত্রী তো কি? লাভ্ ইজ ব্লাইণ্ড। বলে হেঃ হেঃ করে গেঁহায়ার মতো মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেসেছে।

পরের দিন যথারীতি পড়াতে গেলো তাপস। সেদিনও সে লক্ষ্য করল রেবার মাত্রাতিরিক্ত চঞ্চলতা। মাষ্টার মশাইর চেয়ে সে-ই বেশী কথা বলে। নানা রকম বায়না ধরে। বলে, আজ থাক ল্যাম্বের প্রবন্ধটা। ওটা বড় শক্ত। তার চেয়ে একটা কবিতা পড়ি আজ, কেমন?

'ট্রাভেলিং এ্যাজ্ এ পার্ট অব্ এডুকেশন' ইংরাজী আলোচনা শুনতে শুনতে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন তুলতে থাকে রেবা। বেড়াতে কি মজাঃ লাগে না? আপনি বেড়াতে ভালবাসেন? বেড়াতে কোথাও গিয়েছেন?

তাপসের ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রমণ অভিজ্ঞতা খুবই সংক্ষিপ্ত। চিন্তা করে দেখলে বড়জোর গিরিডির কথাই মনে পড়ে। গত মহাযুদ্ধে বোমার ভয়ে পালিয়ে ছিল সেখানে। তখন তার ছোটবেলা। এ ছাড়া—হঠাৎ মনে পড়ে যায় জামসেদপুরের কথা। করবীদের বাড়ি জামসেদপুর। বেশ কয়েকবার গিয়েছিল সে সেখানে। রেবাকে জানালো তাই তার বিশাল ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা। এক গিরিডি, দুই জামসেদপুর।

জা-ম-সে-দ-পুর ? চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল রেবা, দুই ভুরু তার কপালে গিয়ে ঠেকেছে।

জামসেদপুরের কোথায় ? আবার কৌতূহল।

উত্তরটা দেবার ইচ্ছে ছিলনা তাপসের। প্রেমের ব্যাপারে একটা গোপনতা রক্ষা করার প্রবণতা সব প্রেমিকেরই অল্পবিস্তর থাকে। তবু বলল, বিষ্টুপুরে।

বি-ষ্টু-পুরে ? মাত্রাতিরিক্ত বিস্ময় রেবার।

সেখানে আমার এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী আছে জানেন ?

হবে। নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল তাপস। কে আছে, কি আছে, সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ কি দূর তাতে তার প্রয়োজন কি ? তাই প্রসঙ্গান্তরে তৎক্ষণাৎ চলে গিয়ে চড়া গলায় বোঝাতে সুরু করল শিক্ষা ক্ষেত্রে দেশভ্রমণের ভূমিকা কি।

সেদিন জরুরী একটা কাজ ছিল বলে তাপস একটু আগে উঠল। কিন্তু তবু বাধা পড়ল বেরুতে গিয়ে। আগামী রোববার সকালে মেট্রোতে জুলিয়াস্ সীজার আসছে, দেখেছেন ?

না, দেখিনি।

আপনি যাবেন দেখতে ?

না।

কেন ? চলুন না, আমিও যাবো। একটু থেমে বলল, বাড়িতে নিয়ে যাবার মত কেউ নেই তো, তাই বলছি। বাবার মামলার কতগুলো জরুরী কাজ পড়ে গিয়েছে, উকিলের কাছে দৌড়তে হবে।

রেবার মাও ঠিক সেই সময় এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঢুকলেন। এমনি কপাল, আলোচনার বিষয়বস্তু পুরোপুরি না শুনলেও তিনি মেয়ের কথায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে যন্ত্রবৎ সায় দিয়ে গেলেন।

অগত্যা তাপসের গররাজী হবার উপায় রইল না।

ছবিটা দেখার আত্মপক্ষসমর্থনে শেষ কৈফিয়ৎ দিল রেবা : 'জুলিয়াস্ সীজার' আমাদের কোর্সে আছে তো। ছবিটা দেখলে পড়ার কাজটাও হয়ে যাবে।

'জুলিয়াস্ সীজার' দেখার পর থেকেই রেবার সঙ্গে তাপসের অন্তরঙ্গতা অপ্রতিরোধ্যভাবে বেড়ে গেল। ছবি দেখার দিন থেকেই সুরু হয়েছিল খুব স্বাভাবিক রীতিতেই। পাশাপাশি বসে দেখতে দেখতে সেক্সপীয়রের শক্ত লাইনগুলোর তর্জমা করে দিচ্ছিল। রেবা খুব কৃতার্থ বোধ করছিল। তাই ছবিটা দেখতে দেখতে সে একসময় বলল, আপনি না এলে বইটা কিছুই উপভোগ করতে পারতাম না। তাই না ?

শো' ভাঙলে হলের পাশের কাফে ডি মনিকোতে চা খাওয়া হল ছোট্ট কেবিনে ঢুকে মুখোমুখি বসে। কেমন কেমন বোধ হচ্ছিল তাপসের। তারা যেন শহরের আর পাঁচটা প্রেমিকের মত। এক সময় মনেও পড়ল করবীর কথা। করবীকে নিয়ে মনিকো'তেও একসঙ্গে বসে চা খেয়েছে গত পুজোয়। করবী তখন কলকাতা বেড়াতে এসেছিল।

পরের দিন টিউশনিতে যেতে নিজের পরিবর্তনটা নিজের কাছেই ধরা পড়ল তাপসের। রেবার প্রগল্‌ভতা, মাত্রাতিরিক্ত উজ্জ্বলতা, প্রসাধনের আতিশয্য কোনটাই খারাপ লাগছে না তার। পড়াবার ফাঁকে ফাঁকে বিষয়ান্তরে চলে যাচ্ছে নিজের অগোচরে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে একটা দুর্লভ জগতের সন্ধান দেবার বাসনা অহরহ মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে, রেবাও তাপসের মুগ্ধচোখের ভাবসাব তার স্বভাবসুলভ কৌতূহলের সঙ্গে নিরীক্ষণ করে চলেছে এবং মাঝে মাঝে অকস্মাৎ বেসামাল হাসিতে তাপসের বক্তৃতাকে অভিনন্দিত করছে।

করবীর একখানা চিঠি এল। এবার চিঠির মধ্যে কিছু ফুলের আলগা পাপড়ি পুরে দিয়েছে সে। চিঠিতে অদ্ভুত একটা স্বপ্নের কথা লিখেছে। স্বপ্নটা দেখেছে যে রাত্রে—তার পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই চিঠিটা লিখে ফেলেছে বিছানায় শুয়ে শুয়ে। সম্প্রতি অসুখে ভুগছে সে। স্বপ্ন দেখেছে, তাপস গিয়েছে জামসেদপুর। অর

বিছানার পাশে রাখা ছোট্ট কাঠের চেয়ারটায় বসেছে সে। বসে বসে তার জ্বরতপ্ত মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। পরে কোয়া ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে নিজে হাতে কয়েকটা কমলাও খাইয়েছে। করবী আনন্দে মরতে চেয়েছে সেই মুহূর্তে।

আশ্চর্যের কথা এই চিঠিতে সে আর যেতে লেখেনি তাপসকে। লিখেছে, তোমার যা খুশী তাই কোরো। দু'ছত্র কবিতাও উদ্ধৃত করেছে চিঠির সমাপ্তিতে—

যদি আর-কারে ভালবাসো, যদি আর ফিরে
নাহি আসো
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি
যত দুঃখ পাই গো।

চিঠিটা পড়ে একটা বৃশ্চিক দংশন অনুভব করল তাপস। নাঃ, এরপর আর চুপ করে কলকাতায় পড়ে থাকা যায় না। ধার করেই হ'ক বা নিজের টাকায় হ'ক একটিবার জামসেদপুর যেতেই হবে, গিয়ে দেখা করে আসতেই হবে করবীর সাথে।

আর যেতে হলে এখনই। করবীর অসুখের খবরটা ওকে সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে। কিন্তু যাওয়ার প্রধান উপকরণ টাকা, সেই টাকা পাবে কোথা থেকে। এ মুহূর্তে কার কাছেই বা হাত পাতবে। মাসের শেষ, সবার হাতই খালি। সেদিন পড়াতে পড়াতে একসময় রেবার কাছে বিনয় প্রকাশ করে বলল, কয়েকদিনের জন্য তোমার পড়ার ক্ষতি হবে রেবা। আমি জামসেদপুর যাচ্ছি।

রেবার ঠোঁটে সকৌতুক হাসি ফুটে উঠল, কবে?

টাকা পেলেই। বলেই ভাবল—চাইবে নাকি কিছু টাকা ধার? চাইবার কথাটা ঠোঁটের কাছে এসেই পরমুহূর্তে মিলিয়ে গেল। আত্মসম্মানে বাধল মুখ ফুটে বলতে।

কিন্তু রেবার কাছে রেহাই নেই, রোজ পড়াতে এলেই একবার জিজ্ঞেস করবে, টাকা পেলেন?

সত্য কথা গোপন করবার পথ ছিল না,ফলে প্রতিদিনই একবার করে লজ্জার সম্মুখীন হতে হল।

অবশেষে একদিন পড়িয়ে উঠে আসতে যাবার সময় রেবা প্রায় একরকম জোর করেই বাট্টা টাকা গুঁজে দিল তাপসের হাতে। আর আবদারের ভঙ্গিতে বলল, আগামী সপ্তাহটা আমার ছুটি, আমি পড়ব না।

তাপস বুঝতে পারল সে কথার অর্থ। তবু আত্ম-সম্মানের খাতিরে বুঝলাম কি বুঝলাম না—এমন একটা ভান করে সেদিনের মত বিদায় গ্রহণ করল।

এতদিন পর জামসেদপুরে গেল তাপস। কিন্তু প্রায় প্রথম সাক্ষাতেই করবীর সাথে ঝগড়া হয়ে গেল। দেখল, ওর অসুখের খবরটা বানানো। ও স্বপ্নে দেখেছিল ওর অসুখ হয়েছে, যার আনুপূর্বিক ঘটনা ইতিমধ্যেই সবিস্তারে চিঠিতে জানিয়েছে। নানান কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে আর সবকথার সারমর্ম হল এই যে সে নিজেদের এত-দিনকার গোপন সম্পর্কের ব্যাপারখানা এখন পাকাপাকি করে ফেলতে চায়। না হলে বাড়ির পাঁচজনের প্রবল গঞ্জনা সহ্য করতে হচ্ছে। একসময় কথার ফাঁকে এও জানাতে ভুলল না যে ইতিমধ্যে ওর বেশ কয়েকটা বাঘা বাঘা সম্বন্ধ এসেছিল, শুধু তাপসের কথা মনে করেই সে সব প্রত্যাখ্যান করেছে।

তাপসের ইচ্ছে হচ্ছিল তার পরের দিনই চলে আসে। শুধু ভদ্রতা করে থাকার মেয়াদ আর একটি দিন বাড়ালো সে।

রেবা খুব অবাক হয়ে গেল তাপসকে দেখে। একি! আপনি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন?

হাঃ—যেন একটা বিরক্তিসূচক স্বর বেরিয়ে পড়ল মুখের থেকে।

তাহলে জামসেদপুর ভাল লাগল না? দুষ্টু দুষ্টু হাসতে লাগল রেবা, যেন কিছু একটা বুঝতে পেরেছে। বইয়ের পাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল একবার তাপস রেবার মুখের দিকে। একেক সময় তাপসের মনে হয়েছে রেবা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। আপশোষ করেছে ওর বুদ্ধির সিকিপরিমাণও যদি করবীর থাকত!

টাকাটা ও মাসের গোড়ায় দিয়ে দেবো। তোমার হয়ত বেশ কিছু অসুবিধা হচ্ছে। ক্ষেদ প্রকাশ করল তাপস।

না—না—কিছুমাত্র নয়। আপনার যখন সুবিধা হবে দেবেন।

তাপস রোজই এসে এই টাকার বিষয়ে একবার করে দুঃখ প্রকাশ করে এবং রেবাও যথারীতি প্রত্যুত্তরে সৌজন্য প্রকাশ করতে কার্পণ্য করে না।

হঠাৎ একেক সময় তাপসের মনে হয়েছে রেবা তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে ভালবাসে। টাকাটা যত সামান্যই হ'ক ওটা দিয়ে সাহায্য করে ও মনে মনে একটা তৃপ্তি লাভ করছে। তবে রেবা কি তাকে মনে মনে কামনা করে? একই সঙ্গে এও মনে পড়ল তাপসের জামসেদপুর থেকে ফিরে এসে করবীকে কোন পত্র দেওয়া হয়নি। এমনকি একটা মামুলি পৌঁছ সংবাদও না।

পরের দিন টিউসনিতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য পড়ল রেবা আজ ভীষণ সেজেছে।

কি ব্যাপার? অগোচরে প্রশ্নটা মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ল তাপসের।

বাঃ, আমার সাজতে ইচ্ছে করে না? আমি কি বুড়িয়ে গেছি নাকি?

না, না, তা কেন।

জানেন? গলাটা অনেক নামিয়ে বলল, আজ আমার জন্মদিন। বুড়ো হয়ে গেছি তো তাই জন্মদিনটা আর পালন করার কথা কেউ বলেনা।

তাই নাকি? এঃ, আগে জানলে তোমাকে কিছু উপহার দিতাম নিশ্চয়। বিব্রত বোধ করে তাপস।

আচ্ছা উপহার আমি চেয়েই নিচ্ছি। বলে হাসতে থাকে রেবা।

কি?

আজ আমার ছুটি।

ওঃ! এই। খুব হাসতে থাকে তাপস। ওঃ, তুমি এত অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারো রেবা? সত্যিই তুমি অসাধারণ। কেমন বেফাঁস কথাগুলো বলে ফেলে তাপস। বলে ফেলে লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়ে মুহূর্তকয়েক।

রেবা কিছু মনে করে না। দাঁড়ান, বলে অন্দরমহলে কোথায় কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়।

কিছুক্ষণ পরে এক কাপ চা হাতে নিয়ে ঢোকে। আর অন্য হাতে ভাঁজ করা—তাপস লক্ষ্য করে ভালো করে—একটা নীল চিঠি।

বুকটা এবার কেমন একটু একটু করে কাঁপতে থাকে তাপসের।

চায়ের পেয়ালাটা সামনে নামিয়ে রাখে রেবা। বলে চা খান। তারপর অনর্গল কত কথা, হাসি, গল্পের ফোয়ারা ছোটে।

রেবার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে গল্প শুনতে ভাল লাগে তাপসের।

তাপসকে এগিয়ে দিতে রেবা বেরিয়ে আসে বারান্দায়। সিঁড়ির আলোটা জ্বালিয়ে দেবার আগেই হাতে কি একটা গুঁজে দেয় তাপসের।

তাপস বুঝতে পারে সেই নীল চিঠিটা, আনন্দে হৃৎপিণ্ডটা গলার কাছে যেন লাফিয়ে উঠতে চায়। হন্ হন্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে গলিটা পার হয়ে একটা নির্জন গ্যাসপোষ্টের নিচে তৎক্ষণাৎ খুলে ধরে দুর্লভ চিঠিখানা। এক মুহূর্তে নির্দ্বিধায় সিদ্ধান্ত করে ফেলে, করবীর চেয়ে রেবা অ-নে-ক ভাল।

প্রথম নজরেই হাতের লেখাটা কেমন চেনাশোনা ঠেকে, দু'লাইনের ছোট্ট একটা চিঠি।

সুপ্রিয় তাপস,

রেবাকে টাকাটা ফেরত দেবার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবেনা। টাকাটা আমার। আমিই পাঠিয়েছিলাম রেবাকে। নিজে গরজ করে তো আসতে না জামসেদপুর, টাকার অজুহাত দেখিয়ে পড়ে থাকতে কলকাতায় অ-ন-ন্ত-কা-ল।

ইতি
তোমার
করবী।

পুঃ ছাত্রীর দিকে নজর রেখো। রেবাও খুব ভাল মেয়ে।

কবি অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—

বাংলার খ্যাতিমান্ কবি ও লেখক অপূর্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য গত ২৯শে জুন সোমবার রাত্রিতে তাঁহার কলিকাতা শোভাবাজারের বাসাবাটিতে মাত্র ৬০ বৎসর বয়সে করোনারী থ্রম্বোসিস্ রোগে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ২৪ পরগণা জেলার গোবরডাঙার নিকটস্থ গৈপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং দীর্ঘকাল হাইকোর্টে কাজ করিয়া

কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

এসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার হইয়াছিলেন—আগামী ডিসেম্বর মাসে তাঁহার অবসর গ্রহণের কথা ছিল। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র ও ৪ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা লেখা আরম্ভ করেন এবং বাংলা দেশের সকল সাময়িক পত্রে তাঁহার লিখিত বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং ভারতবর্ষে তাঁহার অসংখ্য কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। গত কয় বৎসর তিনি উপানন্দ নামে ভারতবর্ষের কিশোর জগৎ বিভাগ ও উপাধ্যায় নামে গ্রহজগৎ বিভাগ সম্পাদন করিতেন—ঐ ২টি বিভাগেও তাঁহার বহু মূল্যবান্ লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি সর্বদা লিখিয়া যাইতে পারিতেন—সারাদিন হাইকোর্টে কাজ করার পর রাত্রিতে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস প্রভৃতি লিখিতেন। প্রথম বয়সে তিনি জ্যোতিষ চর্চায় আকৃষ্ট হন এবং রায় বাহাদুর কৈলাস চন্দ্র জ্যোতিষার্ণব মহাশয়ের অধীনে দীর্ঘকাল জ্যোতিষ আলোচনা করিয়া জ্যোতিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিতা গ্রন্থ মধুচ্ছন্দা, সায়ন্তনী, দীপায়ন, নিরাঞ্জন প্রভৃতি পাঠকসমাজে খ্যাতি ও আদর লাভ করিয়াছিল এবং উপন্যাস—প্রথম প্রণাম, উনিশে আষাঢ়, তৃষিত মরু, নূতন দিনের কথা, ভগ্ননীড়, অন্তরীপ প্রভৃতিও সর্বজনসমাদৃত হইয়াছিল। মূলতঃ তিনি কবি ছিলেন এবং যৌবনে কবিতা রচনা আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত হাজার হাজার কবিতা লিখিয়াগিয়াছেন। সহৃদয়, বন্ধুবৎসল অপূর্বকৃষ্ণের কথা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে—আমরা তাঁহার আত্মার চিরশান্তি কামনা করি ও তাঁহার আত্মীয় স্বজনকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী—

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক, কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক, খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী গত ১০ই জুলাই রাত্রিতে পৌনে ১টার সময় কলিকাতা মেডিকেল

কলেজ হাসপাতালে মাত্র ৫৬ বৎসর বয়সে সহসা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্মাহত হইয়াছি ও স্বজন বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি। তিনি ঐ দিন সন্ধ্যায় কলিকাতা ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে এক সভায় বক্তৃতা করার সময় অসুস্থ হইয়া পড়েন—তখনই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত অবশ হইয়া যায় ও মেডিকেল কলেজে নীত হইয়া কয় ঘণ্টার মধ্যে পরলোক গমন করেন।

যৌবনে বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতি প্রচারে মনোযোগী হন। খ্যাতনামা দেশনেতা ও কংগ্রেসের অন্যতম জনক আনন্দমোহন বসুর পুত্র ব্যারিষ্টার সুধাংশুমোহন বসুর বিদুষী কন্যা রমা দেবীকে বিবাহ করিয়া উভয়ে প্রায় গত ৩০ বৎসর ধরিয়া সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া সময় কাটাইতেছিলেন। রমা দেবী বর্তমানে কলিকাতা লেডী ব্রেবোর্ণ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল। তাঁহাদের সন্তান হয় নাই। উভয়ে বহু সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থের সম্পাদন ও পুনর্মুদ্রণ করিয়া ও প্রায় ৫০খানি নূতন সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিতেছিলেন। গত কয়েক বৎসর কাল তাঁহারা তাঁহাদের বাসগৃহ ৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীটে প্রাচ্য-বাণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বহু পুরাতন সংস্কৃত নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন ও ডক্টর যতীন্দ্রবিমল ও রমা দেবী নিজেরা বর্তমান সময়োপযোগী কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়া ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃতি কেন্দ্রে প্রাচ্য-বাণীর সদস্যদিগের দ্বারা সেগুলির অভিনয়ের ব্যবস্থা করিতেছিলেন। নাটকগুলি সহজ ও সুললিত সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বলিয়া জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং আমরা গত কয়েক বৎসরের ভারতবর্ষে বিভিন্ন নাটক অভিনয়ের বিবরণ সম্বলিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া সে বিষয়ে দেশবাসী সংস্কৃতানুরাগী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সেজন্য যতীন্দ্রবিমলের অকাল মৃত্যুতে আজ শুধু বাংলার নহে, সারা ভারতের সংস্কৃতানুরাগী মানুষের দল শোক সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যে ভাবে তাঁহারা সংস্কৃত নাটকাভিনয়ের দ্বারা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বজনপ্রিয় ও সকলের বোধ্য করিয়া তুলিতেছিলেন, তাহাতে একদল লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে একদিন সংস্কৃত ভাষাই সর্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষারূপে পরিণত হইবে।

যতীন্দ্রবিমল ছাত্রাবস্থায় বিলাতে বাসকালেই ভারতবর্ষ পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ রচনা করিয়া পাঠাইতেন এবং তদবধি গত প্রায় ৩০ বৎসর ভারতবর্ষে তাঁহার লিখিত কত প্রবন্ধ যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।

তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ রূপে ও বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সম্পাদকরূপে এদেশে সংস্কৃত ভাষাকে পঠন-পাঠন পুনঃ প্রবর্তনের জন্য সর্বদা পরিশ্রম করিতেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা তাঁহাকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মহলে বিশেষ জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল - তিনি ও রমা দেবী তাঁহাদের উপার্জিত প্রায় সমস্ত অর্থ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের সেবায় নিয়োজিত করিতেন—সে জন্য আজ যতীন্দ্রবিমলের মৃত্যুতে সারা ভারতের সংস্কৃত শিক্ষালয়সমূহের (টোল) অধ্যাপকগণ শুধু তাঁহাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইলেন না—তাঁহাদের বিপদের সময় সাহায্য করার লোক হারাইয়া নিজেদের নিঃসহায় মনে করিতেছেন। বিলাতে শিক্ষা লাভ করিয়া বা ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহ করিয়াও যতীন্দ্রবিমল ভারতীয় মনোভাব বর্জন করেন নাই, বরং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া আমরা অনেক সময় বিস্ময়ানুভব করিয়াছি। ইংরাজী না পড়া পণ্ডিতের দল যাহাতে সর্বদা সর্বত্র উপযুক্ত সম্মান, শ্রদ্ধা ও অর্থ লাভ করেন, সে জন্য যতীন্দ্রবিমল শুধু নিজে চেষ্টা করিতেন না, বা নিজের কার্য দ্বারা তাহা প্রকাশ করিতেন না, সুযোগ পাইলে সকলকে সে কাজে প্রেরণা দান করিতেন। আমাদের সহিত তাঁহার দীর্ঘদিনের পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতার ফলে আজ তাঁহার বহু দিনের বহু কার্যের কথা মনে হইতেছে এবং সে জন্য তাঁহার কথা লিখিবার সময় চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিতেছে। মাত্র ১ সপ্তাহ পূর্বে তাঁহার সহিত দেখা হইলে তিনি বাংলা দেশে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে দীর্ঘ সময় ধরিয়া আমাদের সহিত আলোচনা করিয়াছিলেন, সেকাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ পত্রিকাকে তিনি ভালবাসিতেন এবং ভারতবর্ষ দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার সংস্কৃত

প্রচার কার্যে যে সাহায্য দান করিয়াছে সে কথা অকপটে সকলের কাছে স্বীকার করিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদালাপী, নিরহঙ্কার ও বন্ধুবৎসল ছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াও তিনি ও রমা দেবী সহজ ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইত। বহু সময়ে লেখকের তাঁহাদের গৃহে যাওয়ার সুযোগ ঘটিয়াছে—বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্তা ধনী ও অভিজাত পরিবারের কন্যা রমা দেবী যতীন্দ্রবিমলের সহিত একাত্ম হইয়া উভয়ে যে বিনয়, মাধুর্য ও সহৃদয়তাপূর্ণ ব্যবহার করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। আজ ডক্টর রমা চৌধুরীর এই শোকে সান্ত্বনা জানাইবার ভাষা নাই—তিনি দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞা, পাণ্ডিত্যের অধিকারিণী—কাজেই আমাদের বিশ্বাস ভগবৎকৃপা তাঁহাকে সকল দুঃখ সহ্য করিবার শক্তি দান করিবে। আমরা আজ যতীন্দ্রবিমলের স্বর্গত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া প্রার্থনা করি তাঁহার আত্মা শান্তিধামে চিরশান্তি লাভ করুক এবং তাঁহার অসমাপ্ত কার্য সম্পাদনের জন্য যেন সর্বনিয়ন্তা উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

কলিকাতায় ফ্ল্যাটের মালিকানা—

এতদিন পর্যন্ত কলিকাতাবাসী ভাড়াটিয়ারা ফ্ল্যাট ভাড়া করিয়া বাস করিতেন। গত ১লা জুলাই কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট নির্মিত ৫০টি ফ্ল্যাটের মালিকানা স্বত্ব ৪০ জনকে প্রদান করা হইয়াছে। বাড়িটির নাম বিদ্যাসাগর ভবন—উত্তর কলিকাতা গোয়াবাগান, রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বিদ্যাসাগর সমবায় সমিতির ৪০ জন সদস্য ৪০টি ফ্ল্যাট পাইয়াছেন। প্রতি ফ্ল্যাটে ২টি শয়ন ঘর ছাড়া অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আছে। এক একটির দাম ১৭ হইতে ২১ হাজার টাকা। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের সেক্রেটারী শ্রীবিমল মুখোপাধ্যায় ঐ দিন বাড়ীর চাবি সমবায় সমিতির সভাপতি শ্রীহরপ্রসাদ দে'কে অর্পণ করিয়াছেন। কলিকাতার মধ্যস্থলে এত কম টাকায় নিজস্ব বাস-গৃহ প্রাপ্তি সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। সহরে বোম্বায়ের মত এরূপ বহু গৃহ নির্মিত হইলে লোক উপকৃত হইবে।

ডাঃ সতীনাথ বাগচী—

কলিকাতার খ্যাতনামা ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ সতীনাথ বাগচী গত ২রা জুলাই বৃহস্পতিবার ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি আর-জি-কর মেডিকেল কলেজের ধাত্রীবিদ্যা ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসার অধ্যাপক-ডিরেক্টরের পদ হইতে ১৯৫২ সালে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন।

২২৩০০ ছাত্র ছাত্রীকে বৃত্তি—

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় ১৯৬৪-৬৫ সালে ২২৩০০ ছাত্রছাত্রীকে প্রবেশিকা-উত্তর বৃত্তিদানের প্রস্তাব করিয়াছেন। প্রাক্-স্নাতক পর্যায়ের ২২ হাজার, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২২০০ এবং এম-এ, এম-এস-সি পর্যায়ের ১০০ ছাত্রছাত্রী বৃত্তি পাইবে। পূর্বে শিক্ষা-ঋণ হিসাবে যে বৃত্তি দেওয়া হইত এখন তাহার পরিবর্তে দান হিসাবে এই সকল বৃত্তি দেওয়া হইবে। শুধু যোগ্যতাই বৃত্তির মাপকাঠি হইবে।

প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি জোরদার—

চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের পর হইতে ভারতে প্রতিরক্ষা-প্রস্তুতি জোরদার করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতে যুদ্ধসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছিল ৫ কোটি টাকা দামের। ১৯৬২-৬৩ সালে ৬৪ কোটি টাকা ও ১৯৬৩-৬৪ সালে ১০০ কোটি টাকা টাকা মূল্যের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯৬৪-৬৫ সালে ১৫০ কোটি টাকা দামের যুদ্ধ সরঞ্জাম প্রস্তুত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। ভারতে ২৫টি অস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা পুরো দমে কাজ করিতেছে। ১৯৬৪ ৬৫ সালে আরও ৪টি নূতন কারখানা খোলা হইবে। নাগপুরের নিকট যে কারখানা হইয়াছে তাহা ভারতের সর্ববৃহৎ অস্ত্র উৎপাদন কারখানা। ইছাপুর কারখানার উৎপাদনও দ্বিগুণ করা হইয়াছে। অস্ত্র উৎপন্ন হউক ভাল কথা, কিন্তু যুদ্ধ যাহাতে না বাধে, সে জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্তব্য।

ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের মূর্তি -

গত ৩০শে জুন মঙ্গলবার সকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য্য, খ্যাতনামা রাজনীতিক ও শিক্ষাবিদ্ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের একটি আবক্ষ মূর্তির প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। ঐ মূর্তি দান করিয়াছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার ম্যান

ড্রাইভার কৃষ্ণকুমার দে মহাশয়। ১৯৩০ সালে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ কৃষ্ণকুমারকে চাকরী দিয়াছিলেন। সে জন্য কৃষ্ণকুমার সারা জীবনের সঞ্চয় ৪ হাজার টাকা দিয়া ঐ মূর্তি করাইয়া দিয়াছেন—মূর্তি নির্মাণ করিয়াছেন, কৃষ্ণনগরের শিল্পী কে-সি-পাল। মূর্তি-প্রতিষ্ঠা উৎসবে কৃষ্ণকুমার উপস্থিত ছিলেন ও রাষ্ট্রপতি তাঁহার সহিত করমর্দন করিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণকুমারের এই আদর্শ অনুকরণীয়।

সমৃদ্ধ ভারতের পথে—

গত ১লা জুলাই স্বর্গত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ৮২তম জন্মদিবস ও দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিক দিবসে বাংলার কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ কলিকাতা মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে সমৃদ্ধ ভারতের পথে নামে একখানি গ্রন্থ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনকে উপহার দিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ খানির সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ। বই খানিতে ডাঃ বিধান চন্দ্রের বক্তৃতা ও লেখার মধ্য দিয়া তাঁহার কর্মজীবন দেখানো হইয়াছে। ৪৬০ পৃষ্ঠার পুস্তকের দাম ২০ টাকা। সে অনুষ্ঠানে কংগ্রেসসভাপতি শ্রীকামরাজ নাদার উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া পরলোকগত নেতাদের জন্মদিবস পালন করিলে দেশ সব দিক দিয়া উপকৃত হয়—দেশনেতাকে স্মরণ করা হয় ও গ্রন্থ সম্পদ বর্ধিত হয়। আমরা এই কার্যের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল কর্মীকে অভিনন্দিত করি।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়—

গত ২৯শে জুন সোমবার কলিকাতায় বাংলার পুরুষশ্রেষ্ঠ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জন্ম শতবার্ষিক উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্বে স্যার আশুতোষ পাটনায় লোকান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহারা কেহ দিন স্যার আশুতোষের কথা ভুলিতে পারিবেন না। আজিকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্যার আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার মত স্বাধীনচেতা মানুষ সে যুগে সত্যই বিরল ছিল। তিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে সরকারী চাকরী করিতেন বটে, কিন্তু সে জন্য তাঁহার মনের স্বাধীনতা বা কর্ম-স্বাধীনতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের বিভিন্ন বিষয়ে এম-এ ক্লাসে পঠন-পাঠনও তাঁহার অপূর্ব কীর্তি। তিনি বিশ্বাস করিতেন, সংস্কৃত না শিখিলে ভারতের মানুষ ভারতীয়ত্ব হইতে বঞ্চিত হইবে। কিন্তু তাঁহার কীর্তি আরও মহৎ ছিল—ইংরাজ এদেশ জয় করিয়া দেশবাসীকে ইংরাজি শিখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। স্যার আশুতোষ সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় এম-এ পড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বাংলার সহিত তিনি ভারতের অপর সকল ভারতীয় ভাষা—হিন্দী, আসামী, উড়িয়া, গুজরাটী, মারাঠি, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম, কানাড়ী, পুস্তু প্রভৃতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করেন।

তিনি দেশের শিক্ষা সুলভ ও সহজ করিয়া দিয়া, পরীক্ষার পাশের হার বাড়াইয়া দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারই কৃপায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হাজার হাজার বেকার যুবক সে যুগের রাজনীতিক আন্দোলনকে পুষ্ট করিত। স্যার আশুতোষ সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার সাহায্যে রাজনীতিক তথা বিপ্লব আন্দোলন পুষ্ট হইয়াছিল।

পরাধীন ভারতে সহস্র শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি যে ভাবে স্বাধীনচিন্তার পরিচয় দেখাইয়া গিয়াছেন, আজ তরুণ দেশবাসীদের সে সকল কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করা কর্তব্য। তাঁহার জন্মদিনে রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতায় আসিয়া বিরাট জনসভায় সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য স্যার আশুতোষ চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। তাঁহার একান্ত আগ্রহে দানবীর স্যার রাসবিহারী ঘোষ ও স্যার তারকনাথ পালিতের অর্থসাহায্যে সেদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বতন্ত্র বিজ্ঞানকলেজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল। ২৯শে তারিখে ভারত সরকার স্যার আশুতোষের ছবি সমেত ডাক টিকিট বাহির করিয়া তাঁহার প্রতি উপযুক্ত সম্মান দান করিয়াছেন। স্যার আশুতোষ ৭৭, রসা রোডে যে গৃহে বাস করিতেন তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের চেষ্টায় তাহা এখন জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে এবং ২৯শে জুন রাষ্ট্রপতি সে গৃহে একটী নূতন ভাষা বিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন। সেখানে বিভিন্ন ভাষা সম্বন্ধে গবেষণা ও শিক্ষা দান হইবে।

আমরা স্যার আশুতোষকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া জন্ম শতবার্ষিকীতে প্রার্থনা করিব, আমাদের মধ্যে যেন তাঁহার ভাবধারা সংক্রামিত হইয়া তাহা দেশবাসীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়।

শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী—

গত ২৯শে জুন বোম্বায়ে প্রেসট্রাষ্ট অফ ইণ্ডিয়ার বার্ষিক সাধারণ সভায় অমৃতবাজার পত্রিকার শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী সর্ব-সম্মতিক্রমে নূতন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন, কলিকাতা কর্পোরেশানের কাউন্সিলারের কায করিয়াও শ্রীগাঙ্গুলী সুনাম অর্জন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি।

শ্রীচৈতন্য গবেষণা পরিষদ্—

গত ২৯শে জুন সোমবার রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কলিকাতায় আসিয়া রাসবিহারী এভেনিউতে শ্রীচৈতন্য-গবেষণা পরিষদের উদ্বোধন করেন ও নূতন গৃহের শিলান্যাস করেন। তাঁহার তথায় ১০ মিনিট ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তিনি ২০ মিনিট ভাষণ দিয়াছিলেন। পরিষদের সভাপতি ত্রিদণ্ডী স্বামী ভক্তিবিলাসতীর্থ রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন উপস্থিত সকলের সহিত রাষ্ট্রপতির পরিচয় করাইয়া দেন। রাষ্ট্রপতি তাঁহার ভাষণে বলেন—সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে যে ধর্ম বিবর্তিত না হয়, সে ধর্ম মরিয়া গিয়াছে। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াই আজিকার সবধর্মের মূলকথা হওয়া উচিত। ধর্মের অপর নাম সক্রিয় সত্য। সত্যের আবিষ্কার ও প্রয়োগই ধর্মের মূলকথা। বিজ্ঞান বাদ দিয়া ধর্ম হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতির মুখে এই সকল কথা শুনিয়া বর্তমান ধর্মহীন জগতের লোক বিস্মিত হইয়াছিল।

কলিকাতায় কংগ্রেস সভাপতি—

কংগ্রেসের নূতন সভাপতি, অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকুমারস্বামী কামরাজ নাদার গত ১লা জুলাই কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রথম কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। সে দিন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ৮২তম জন্মদিন থাকায় তিনি বিধানচন্দ্রের গৃহে ও মহাজাতি সদনে যাইয়া বিধানচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে এক জনসভায় তিনি ভাষণ দিয়াছিলেন এবং কলিকাতা কর্পোরেশন ঐ দিন কলিকাতাবাসীদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভাষণে নূতন সমাজ ব্যবস্থা প্রচলনে ও দেশ গঠনের কাজে বাংলাদেশের নেতৃত্ব কামনা করেন। তিনি বলেন দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করিয়া সমাজবাদ প্রতিষ্ঠায় বাংলাই সারা ভারতকে পথ দেখাইবে। তিনি বাংলার নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের প্রশংসা করিয়া বাঙ্গালীকে তাঁহার নেতৃত্বের অনুগামী হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী—

জুন মাসের শেষ ভাগে ভারতের নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় চিকিৎসক-গণ তাঁহাকে লণ্ডনে কমনওয়েলথ্ প্রধানমন্ত্রী সম্মিলনে যাইতে নিষেধ করেন। সে জন্য তিনি ঐ সম্মিলনে নিজে না যাইয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীটি-টি-কৃষ্ণমাচারী এবং তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে তাঁহার প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। বর্তমানে শ্রীশাস্ত্রীর স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে। যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণমাচারী ও শ্রীমতী গান্ধী উভয়েই যোগ্য ব্যক্তি—তাঁহারা লণ্ডনে যাইয়া ভারতের সকল প্রকার স্বার্থরক্ষায় সমর্থ হইবেন বলিয়া ভারতবাসী আশা করে।

পাঞ্জাবের নূতন মুখ্যমন্ত্রী—

সর্দার কাইরণ পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীপদ ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়ায় নূতন মুখ্যমন্ত্রী হইয়াছেন—শ্রীরাম কিষণ। তাঁহার জন্ম ১৯১৩ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের ঝান জেলার এক ক্ষুদ্র গ্রামে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। দেশ বিভাগের পর তিনি জলন্ধর জেলার অধিবাসী হন। ১৯২৯ সালে ছাত্রাবস্থায় তিনি প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনে কারাবরণ করেন, তারপর ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৪১ ও ১৯৪২—৬বার তিনি কারাবরণ করেন—২বার তাঁর স্ত্রী তাঁর সঙ্গে জেলে যান—একবার ২ পুত্র ও বৃদ্ধ পিতাও কারাবরণ করেন। তিনি সর্বসাধারণের কাছে কমরেড রামকিষণ নামে পরিচিত। ১৯৫২ সালে প্রথম বিধান সভায় প্রবেশ করেন। দেশ বিভাগের পূর্বে মিউনিসিপাল কমিশনার ছিলেন—১৯৫৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে পরাজিত হন—১৯৬২ সালে আবার লোকসভার সদস্য ও রাষ্ট্রমন্ত্রী হন কিন্তু কামরাজ পরিকল্পনায় মন্ত্রিত্ব যায়। এখন তিনি

মুখ্যমন্ত্রী—তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি তাঁর জীবনকে গঠন করিবে।

নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়—

স্বর্গত জহরলাল নেহরু প্রায় ২০ বৎসর কাল ভারতের মত এক বিরাট ও বিবিধ সমস্যাসঙ্কুল দেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে যে অসাধারণ কর্মশক্তি, অপূর্ব কুশলতা, অনন্যসাধারণ শ্রমশীলতা প্রভৃতির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহার তুলনা ইতিহাসে বিরল। কাজেই যত অধিক স্থানে, যত অধিক প্রকারে আমরা তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করি না কেন, কিছুই নেহরুর উপযুক্ত হইবে না। তথাপি সকলে জানিয়া আনন্দিত হইবেন যে শীঘ্রই দিল্লীতে একটি নূতন দ্বিতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে ও তাহার নাম দেওয়া হইবে নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে বিজ্ঞান ও কারিগরী শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিবে। দিল্লীর উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণপুরের নিকট মনিরকা গ্রামে এক হাজার একর জমি লইয়া তথায় নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে। সেজন্য প্রয়োজনীয় আইন রচনা করা হইতেছে ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা জমি দেখিয়া আসিয়াছেন। ভারতের সকল রাজ্যে নেহরুজীর উপযুক্ত স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন।

শরণার্থী আগমন অব্যাহত—

গত ১লা জুন হইতে ৩০শে জুন পর্যন্ত এক মাসে পেট্রাপোল, গেদে, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ ও মোগড়াঙ্গা সীমান্ত দিয়া মোট ৬১ হাজার শরণার্থী পূর্বপাকিস্তান হইতে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করিয়াছেন। ২৮শে জুন পর্যন্ত তন্মধ্যে মাত্র ২৫০০ পরিবারে ১০৩৯ জনকে দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হইয়াছে। ভারতের বহু রাষ্ট্র পূর্ববঙ্গ হইতে আগত শরণার্থীদের চাষ ও বাসের জন্য ভূমি দিতে উৎসুক কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য, একদল বিপথগামী নেতা শরণার্থীদের ভুল বুঝাইয়া তাহাদের পশ্চিমবঙ্গের বাহিরে যাইতে দেন না। মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাষ্ট্রে যাইলে বাঙ্গালী শরণার্থীরা তথায় ভালভাবে থাকা ও উপার্জনের পথ পাইতে পারেন। কিন্তু কে শরণার্থীদের বুঝাইবার ভার লইবে? একদল কংগ্রেস-সেবকের এ বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

সাম্প্রদায়িক দল নিষিদ্ধ—

মুসলেমলীগ, হিন্দু মহাসভা, রামরাজ্য পরিষদ, জনসংঘ প্রভৃতি কয়েকটি সাম্প্রদায়িক দলের কার্য—বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি—বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ হইতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনের নেতৃত্বে একটি বিশেষ কমিটি গঠিত হইয়াছিল—ঐ কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। ৭ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জন সাম্প্রদায়িক দলগুলির কার্য নিষিদ্ধ করার পক্ষে মত দিয়াছেন—আর ২ জন সদস্য শ্রীমহাবীর ত্যাগী ও শ্রী এম-তারিক দলগুলির কার্য নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে মত দিয়াছেন। সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক দলের মধ্য দিয়া কাজ করেন, তাঁহাদের ঐ কাজ বন্ধ করা হইলে তাঁহাদের কারাগারে রাখার প্রয়োজন হইবে। সাম্প্রদায়িকতা প্রচার যে দেশবাসীর পক্ষে ক্ষতিজনক সে বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলেও বিষয়টির গুরুত্ব কেহ অস্বীকার করিবে না।

রূপকুণ্ড ও হোমকুণ্ড অভিযান—

অভিযাত্রী সংঘের ৭জন সদস্য হিমালয়ের ১৮ হাজার ফিট উচ্চ রূপকুণ্ড এবং ১৮ হাজার ফিট উচ্চ হোমকুণ্ড ঘুরিয়া গত ৩রা জুন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের নাম—(১) দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের বর্মী সুনীল চৌধুরী—নেতা (২) বৈদ্যনাথ রক্ষিত (৩) জ্যোতি পাল (৪) কেন্দ্রীয় খাদ্যদপ্তরের সমর বন্দ্যোপাধ্যায় (৬) গেষ্টকিন্ উইলিয়মসের অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ও (৭) জেসপ কোংর সুভাস রায়। এ যাত্রাও দারুণ কষ্টসাধ্য। বাঙ্গালী তরুণের দল স্বেচ্ছায় এ সকল অভিযান করিতেছেন—ইহা খুবই আনন্দের কথা। আমরা সকলকে অভিনন্দিত করি।

দপ্তরে দপ্তরে যোগাযোগের অভাব—

কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য এবং পশ্চিম বাংলার কৃষির উন্নতি সম্বন্ধে পর্যবেক্ষক দলের নেতা খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও কংগ্রেস সেবক শ্রীমন্ নারায়ণ গত ৪ঠা জুলাই কলিকাতায় আসিয়া জানাইয়া গিয়াছেন যে ক্ষুদ্র সেচ ও ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রসারের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পরিকল্পনা কমিশন ১৯৬৪—৬৫ সালে নির্দিষ্ট ১৩ কোটি টাকা ছাড়াও অতিরিক্ত ৯০ লক্ষ টাকা দান করিবেন। তাহার পূর্বে পর্যবেক্ষকদলের সদস্যগণ বিভিন্ন জেলায় ঘুরিয়া দেখিয়াছেন যে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি, পশুপালন, মৎস্য চাষ, সেচ, ভূমি সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগের কাহারও সহিত অপরের কোন যোগাযোগ নাই। সেজন্য সকল খাতে বহু টাকা ব্যয় না হইয়া পড়িয়া থাকে। শ্রীমন্ নারায়ণ মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে অন্যান্য মন্ত্রীদের সম্মুখে ঐ কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সতর্কতাসূচক বাণী কি শাসন কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছিবে।

সাহসিকা-আধুনিকা

আধুনিকা ভার্য্যা :—ওগো···শুনছো···লক্ষ্মীটি, অফিস থেকে বাড়ী ফেরবার সময় দোকান থেকে নতুন আরেকটা ইঁদুর ধরা কল কিনে এনো আজ মনে করে!

অফিস-গমনোদ্যত ভর্ত্তা :—সেকি!···কাল বিকালেই তো একটা আনকোরা-নতুন ইঁদুর ধরা কল কিনে এনে দিলুম তোমার হাতে! ···সেটা কি তাহলে।

আধুনিকা-ভার্য্যা :—বারে···সেটার মধ্যে যে একটা নেংটে ইঁদুর আটকে রয়েছে···ছুঁতে ভয় করছে···হাত দিই কেমন করে!··· তাই তো বলছি তোমাকে···আজই একটা নতুন কল নাহলে···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

ত্রিবেণী-সঙ্গমে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর ভস্ম-বিসর্জন। চিত্রটি ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি হেলিকপ্টর হইতে গৃহীত হইয়াছে
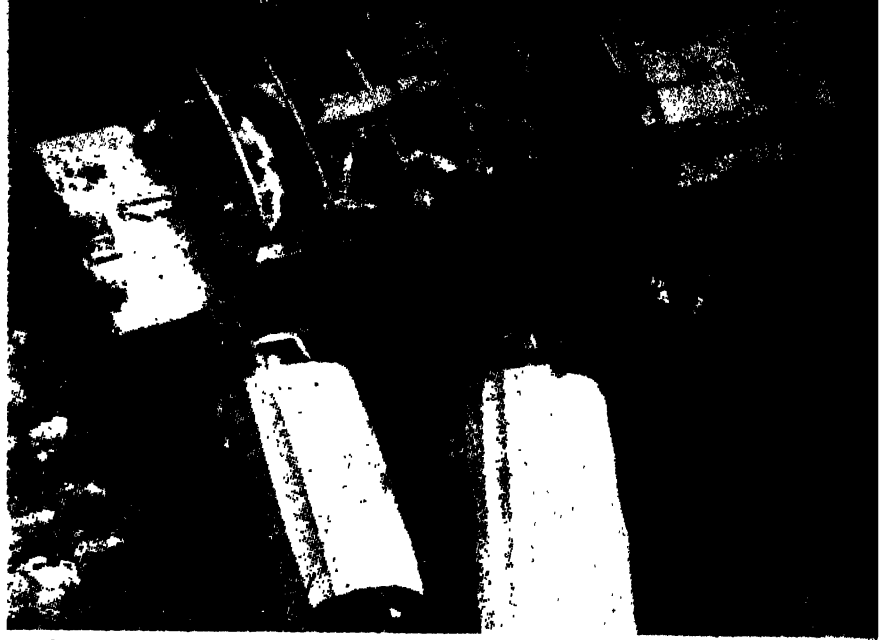
জহরলালজীর প্রৌত্রদ্বয় সঞ্জয় ও রাজীব এলাহাবাদের সঙ্গমে চিতাভস্ম বিসর্জন দিতেছেন। পার্শ্বে শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতকে যুক্তকরে প্রণাম জানাইতে দেখা যাইতেছে

গত ২৬শে জানুয়ারীর প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু।
পার্শ্বে শ্রীমতী গান্ধীকে ও পশ্চাতে শ্রীচাগলাকে দেখা যাইতেছে।

কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পৌত্রদ্বয় সহ পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের সেই স্মরণীয় দিবসের প্রাতঃকালে ৮-৩০ মিনিটের সময় লর্ড মাউন্টব্যাটেন পণ্ডিত নেহেরুকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করাইতেছেন।

নেহেরু পরিবার—যুবক জহরলালকে পিছনের সারিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে দেখা যাইতেছে।

মিহিরাচার্য্য

যুগটা এখন অর্থনৈতিক। সুতরাং অর্থচিন্তা চমৎকারা। সবাই ভাবেন, হঠাৎ যদি মবলগ কিছু পেয়ে যান, তাহলে বোধহয় এ-যাত্রা কোন রকমে উঠতে পারেন। এই হঠাৎ মবলগ পাওয়া ঘটতে পারে যাতে তা হচ্ছে লটারী বা ঐ জাতীয় কিছু। অনেকে আশায় আশায় টিকিট কেনেন, আবার কেউ কেউ কেনেনও না। যাঁরা কেনেন না, তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, দূর, আমার ভাগ্যে ও হবে না, পাথর-চাপা কপাল। কেউ যদি যুক্তি দেখান যে, তা যদি বলেন তো, আমাদের অমুক কর্মকার, সে কি কোরে পেলো! একটা টিমটিমে শান-পালিশের দোকান থেকে কোনদিন একবেলা জুটত, কোনদিন বা তাও নয়। মশাই শাস্ত্রে বলেছে, পুরুষস্য ভাগ্যম্।

শুনতে শুনতে ইতিমধ্যে তিনি কিন্তু 'অপটিমিষ্ট' হয়ে গেছেন। জ্যোতিষ যেহেতু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে, সেখানে এ সম্বন্ধে কি নির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাই নিয়েই এ আলোচনা।

সেকালে লটারী ছিলনা বটে, তবু দ্যূতক্রীড়া ও ব্যসনাদি ব্যাপারকে অনুরূপ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ এতেও বাজি ধরা হোত, হারজিতে লাভ-লোকসান নির্ণীত হোত। জ্যোতিষে শাস্ত্রকার একটি যোগের কথা উল্লেখ করেছেন, যার নাম অযত্ন-লাভযোগ। অর্থাৎ যত্ন না করেও যে লাভ হয়, এ হচ্ছে তাই। শাস্ত্রকার বলেছেন—লগ্নপতি ও ধনপতি যদি ক্ষেত্র বিনিময় করে, তাহলে এই যোগের সৃষ্টি হয়। ক্ষেত্র বিনিময় কথাটির মানে হচ্ছে, ক্ষেত্র অর্থাৎ ঘর বদলাবদলি করা। একেই লটারী প্রাপ্তি বলে অনুমান হয়।

অভিজ্ঞতায় ওটি ছাড়াও আরো অনেক প্রকা যোগাযোগে লটারী প্রাপ্তি দেখা গেছে। কথা হচ্ছে কে কোন্ ভাব (মোটামুটিভাবে ঘরও বলা যেতে পারে) বল থাকলে লটারী বা ঐ জাতীয় কোন কিছুর সংস্পর্শে হঠ মবলগ কিছু পাওয়া যায় তা-ই দেখা যাক। এ ব্যাপা নিম্নোক্ত ভাব বা ঘরগুলি বিচারে বলবান এবং পর কোন না কোন সম্বন্ধযুক্ত হওয়া চাই।

যথা, দ্বিতীয় (যাকে ধনস্থান বলা হয়), পঞ্চম (যা পুত্র, মন্ত্র, বা প্রতিভা ও আংশিকভাবে ধনস্থান বলা হয় নবম (যাকে পূর্বপুণ্য বা ভাগ্য স্থান বলা হয়) ও একা অর্থাৎ বিনা আয়াসে লাভ স্থান। তাহলে ২য়, ৫ম, এবং একাদশ এই চারটি। এ ছাড়াও আরো একটি দেখতে হবে সেটি লগ্ন বা তনুস্থান। জ্যোতিষে হয়েছে যে, যত বড় ও বলবান শুভযোগই থাকুক, লগ্নপ বা লগ্নস্থান যদি দোষযুক্ত বা পীড়িত হয় তো, সে জাতকে রাজযোগ বা শুভযোগ ব্যর্থ হবে।

এখন বলবান্ বলতে কি বোঝায়, তা নিয়ে আলোচ করা যাক। ধরা যাক দ্বিতীয়ভাব। প্রথমে দেখতে হ সেই ঘরের অধিপতি অর্থাৎ মালিক যিনি, তিনি কোথা তিনি যদি কেন্দ্র-কোণ-গত না হয়ে দুঃস্থানগত (অ ষষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ) হন, তা হলে তিনি দুর্বল। আ যদি কেন্দ্র-কোণ গত হয়েও কোন শত্রুগৃহস্থ বা শত্রু বা পাপগ্রহ দৃষ্ট বা যুক্ত হন, তাহলেও তার বলক্ষয় হয়ে বলে ধরে নিতে হবে। তাহলে অধিপতিগ্রহ বলব হবেন, যদি তিনি কেন্দ্র-কোণ-গত হন, মিত্রের গৃ থাকেন, শুভগ্রহের দৃষ্টিলাভ করেন, শুভযুক্ত হন কি

তুঙ্গী, স্বগৃহী, মূল ত্রিকোণস্থ কিম্বা নবাংশ বিচারে ঐ সব গুণ পান বা বর্গোত্তমী নবাংশে থাকেন তাহলে তিনি বলযুক্ত হবেন। প্রথমে সেই ভাব বা ঘরের অধিপতির অবস্থা দেখা দরকার। যদি ঘরের মালিকই নিপীড়িত হন তো শান্তি আসতে পারে কি? এ ছাড়া আর একটি বিচার আছে তাকে বর্গবিচার বলে। উপরোক্ত গুণগুলি পেয়ে বর্গবিচারে সেই অধিপতি গ্রহ যদি উত্তরে যান অর্থাৎ স্ববর্গ বা শুভবর্গ বেশী পান, তাহলে সেই অধিপতি গ্রহকে বিশেষ বলবান বলে রায় দেওয়া যাবে। এইবার দেখতে হবে ঐ যে চারটি ঘর এবং লগ্নস্থানের কথা বলেছি, তাদের অধিপতির সঙ্গে এই দ্বিতীয়স্থানের অধিপতিগ্রহ কোন সম্বন্ধ করেছে কি না? যদি ওদের কারো সঙ্গে ধনপতিগ্রহ যুক্ত, দৃষ্ট, বিনিময় বা একেতর প্রভৃতি সম্বন্ধ কোরে থাকে ত তার ধনলাভ সম্বন্ধে বলবত্তা আরো কায়েম হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। এরপর দেখতে হবে অষ্টমে (ধনস্থানের ঠিক বিপরীত ঘর) অর্থাৎ রন্ধ্রস্থানে কোন পাপগ্রহ বসে থেকে ধনপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছেন কিনা। কোন গ্রহ লগ্ন থেকে কেন্দ্র ত্রিকোণ পতি হয়ে যদিতুঙ্গ, স্বগৃহী, স্ব-নবাংশ, মূলত্রিকোণ বা বর্গোত্তমী প্রভৃতি যে গুণগুলির কথা আগে বলেছি, সে গুণ পেয়ে অষ্টম থেকে ধনস্থানে দৃষ্টি দেন, তাহলে তা অর্থপ্রাপ্তির পথ আরো সুগম করবে।

তারপর দেখতে হবে ঐ দ্বিতীয়, পঞ্চম, নবম ও একাদশ স্থানগুলিতে কোন গ্রহ আছে কিনা? যদি থাকে সে গ্রহ, শুভ কি অশুভ? আর দেখতে হবে ওরা (তৃতীয়), ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশস্থানের অধিপতি কিনা? উপরোক্ত ঘরগুলির অধিপতি হলে তারা প্রাপ্তিযোগকে পণ্ড করে দিতে পারে। অবশ্য তৃতীয়স্থানের অধিপতি ওদের মত অতটা ক্ষতি করতে পারে না,তবু, কিছুটা করে।

অভিজ্ঞতায় আরো একটি দেখা গেছে—যথা ধনপতি স্বগৃহী এবং তুঙ্গ নবাংশপ্রাপ্ত এবং ধনপতির সপ্তম ছাড়া তিনটি কেন্দ্রেই বলবান্ তিনটি গ্রহ এবং লগ্নপতি স্বগৃহী। ইনিও লটারী পেয়েছেন। এক্ষেত্রে যুক্তি হচ্ছে যে কোন গ্রহ পূর্ণমাত্রায় সুফল দিতে পারে, যদি তার কেন্দ্রে বলবান্ গ্রহ থাকে। অবশ্য এ কোষ্ঠীটিতে একাদশ ও ভাগ্য বলবান্ না হোলেও দুর্ব্বল ছিল না।

ঐ যে আমরা কথায় কথায় বলি না, ভাগ্যে নেই। এর আসল অর্থ হচ্ছে, পূর্ব্বজন্মে বিশ্বাসী হিন্দুরা ভাবেন, পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির কথা। এই পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির বিচার করা হয়, লগ্ন থেকে নবম স্থানে।

এর মধ্যে আরো একটি কথা বলা উচিত। সেটি হচ্ছে, লগ্ন ছাড়াও আরো একটি ঘর আছে, যেখানে চন্দ্রগ্রহ অবস্থিতি করেন। একে চন্দ্রলগ্ন বলা হয়। এই ঘরটি থেকেও ঠিক লগ্নের মত বিচার করা উচিত। গুরুত্ব উভয় ঘরেরই সমান। বর্গবিচারে যেটি উত্তীর্ণ হয় এবং বেশী পরিমাণে শুভবর্গ পায়, সেই ঘরের গুরুত্ব অপর ঘরটির চেয়ে বেশী বলে ধরে নেবার জন্যে জ্যোতিষে উপদেশ আছে।

ব্যক্তিগত দ্বাদশ রাশি ও লগ্নের ফল

[যাঁর রাশি ও লগ্ন ভিন্ন তিনি দুটি ফলই পড়ে দেখবেন।]

শ্রাবণের গ্রহ পরিস্থিতি

রবি সংক্রমণকালীন চন্দ্র ধনুরাশিতে, পরদিন প্রত্যূষে মকর রাশিতে ও পরে সওয়া দুদিন এক এক রাশিতে অবস্থান করে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে পুনরায় মকর রাশির শ্রবণা নক্ষত্রে। রবি-কর্কটে, বুধ-সিংহে বক্রী হচ্ছেন ২৮ তারিখে—শুক্র মাসের প্রথমে বৃষে, পরে সমস্ত মাসই মিথুনে—মংগল সারা মাসই মিথুনে—বৃহস্পতি মেষে ১৩ই শ্রাবণের পর বৃষে—শনি বক্রী অবস্থায় কুম্ভে।

মেষ রাশি

মাসের প্রথমদিকেই একটু ভাল যাবে—ব্যয় সঙ্কোচ করার জন্যে পরিকল্পনা করতেও পারেন। মংগল সারা মাস বৃষে থাকায় আয় কিছুটা বৃদ্ধি পেতে পারে, অর্থনৈতিক দিকটায় একটু সুবিধা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। প্রথমদিকে চিঠিপত্রে সুসংবাদ পাওয়ার আশা দেখা যায়। শেষের দিকে প্রায় সব কাজেই অনাবশ্যক বিলম্ব দেখা দেবে। কৃত্তিকা নক্ষত্রে বৃহস্পতি মেষে থাকায় গুপ্তশত্রুতায়

রুদ্ধে দাড়াবার সাহস পাবেন। মায়ের শরীর মোটামুটি ন্দ যাবে না। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য ভালই যাবে। ছোট টি ভ্রমণে অনুরাগ দেখা দেবে। ব্যবসায়ী হলে এ মাসে াভ হবার বিশেষ সম্ভাবনা, সেই সঙ্গে সম্মানও। স্ত্রীর ঙ্গে ব্যয়াধিক্য নিয়ে বচসা হবে। পিতার অর্থলাভ যোগ খা যায়।

বৃষ রাশি

আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষদিকে কান কাজ সম্পূর্ণ করতে গিয়ে অকারণ বিলম্ব সৃষ্টি হতে ারে। আফিস বা কর্মক্ষেত্রে খাটাখাটুনি বেশী বাড়বে। দি কেউ ঋণের জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত করে াকেন এ মাসে তা পাবার আশা করতে পারেন। কনিষ্ঠ াতা ভগিনীদের কেউ চাকরীতে নিযুক্ত থাকলে উন্নতির ম্ভাবনা। কণ্ট্রাক্ট বা এজেন্সি পাবার জন্যে চেষ্টা করলে, থবা ঐ জাতীয় কোন কাজ হলে সুফল পাবেন। মায়ের াস্থ্য ভালই। তাঁর কথায় কোন কাজ করে লাভবান্ বার যোগ আছে। স্ত্রী কোনস্থানে যাতায়াত বাবদে াতিরিক্ত ব্যয় জন্য বিরক্তিভাজন হতে পারেন। পিতার ানা মানসিক অশান্তি ও বিঘ্ন ঘটতে পারে।

মিথুন রাশি

মাসের প্রথম দিকটা ভালই যাবে। সরকারী চাকুরে লে অনেক সুযোগ এসে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু ২২ ারিখের মধ্যে যদি সে সুযোগ কাজে লাগাতে না পারেন, ল্টো পরিস্থিতির উদ্ভব হবে। কিন্তু রাহু যদি আপনার ন্ম-সময়ের কোষ্ঠীতে বলবান্ ও সুফলদায়ী থাকেন, াহলে অনেক ভাল সুযোগ আপনি কাজে লাগাবেন বলে াশা হয়। মাতার মানসিক দুশ্চিন্তা, পিতার সম্মান াভ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার চাকরী প্রাপ্তি প্রভৃতি ফলাফল াশা করতে পারেন। চিত্র-শিল্পী বা সঙ্গীত-শিল্পীরা নাম পাবার ভরসা করতে পারেন। স্ত্রীর শরীর, মাঝে াঝে উদররোগে ব্যতিব্যস্ত হবার সম্ভাবনা।

কর্কট রাশি

১৮।১৯—৩৬।৩৭—৫৫।৫৬ বয়সের লোকেরা রোগ ভোগ করবেন এ মাসে। বাত, হৃদ্‌যন্ত্রণা, উদরাময় প্রভৃতির ম্ভাবনা দেখা যায়। অন্য বয়সের লোকেদের দিনকতকের ন্য কর্মস্থলে অদল-বদল বা বদলীর নির্দ্দেশ আসবে। কাজে কখনও কখনও শত্রুতার দ্বারা ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেবে। মায়ের শরীর সম্ভবস্থলে মরণাপন্ন পীড়ার সম্মুখীন হবে। পিতার উন্নতি। পত্নীর মাঝামাঝি। পুত্রকন্যাদের মধ্যম ফল। বন্ধুবান্ধব বা নিকট প্রতিবেশীর কবলে পড়ে কিছু খেসারৎ দিতে হতে পারে।

সিংহরাশি

পত্নীর ওপর মন আপনার প্রায়ই অপ্রসন্ন থাকবে। সমস্ত কাজেই বিলি-ব্যবস্থার অভাব দেখা দেবে। ভাড়া-বাড়ীতে থাকলে মালিকের সঙ্গে কলহের সম্ভাবনা। ভাগের বাড়ী হলে ভাগীদারদের সঙ্গে বিবাদ। তবে আর্থিক যোগাযোগ এ মাসে আপনার ভালই। ডাক্তার বা কনট্রাকটর হলে অর্থ এবং সুনাম দুই-ই। ছেলে-মেয়েরা অসৎ সঙ্গে পড়ে সামাজিক ও পারিবারিক সুনাম ক্ষুণ্ণ করবে। মায়ের শরীর ভালই যাবে—পিতার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। মাসের শেষাশেষি কনিষ্ঠ ভ্রাতার দূরে যাবার সংবাদ আসতে পারে।

কন্যারাশি

এ মাসে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরত থাকলে আশাতীত পরিমাণ লাভের সম্ভাবনা আসবে। চাকুরেদের পদোন্নতি হবার আশা আছে। কোন স্ত্রীলোকের যোগ-সাজসে কিছু লাভের আশা করতে পারেন। উপরি লাভের উপায় থাকলে এ মাসে আয় ভালই হবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা জাগাতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য মন্দ যাবে না। পিতার উন্নতি হতে পারে কিম্বা পদবৃদ্ধি। ছোট ভায়ের কোন রকম দুর্ঘটনা কিম্বা মানহানি ঘটতে পারে। ছেলে মেয়েরা গুরুজনের বিরুদ্ধতা করতে পারে—কিন্তু তাদের লেখাপড়া বাধা-বিঘ্নের ভেতর দিয়ে ভালই যাবে। স্ত্রীর সাহায্যে আপনি নিজে কিছু সুযোগ সুবিধার সন্ধান পেতে পারেন।

তুলা রাশি

মাসটি বড় সুন্দর যাবে। অর্থাগম বেশ মনোমত হবে। যদি ব্যবসাদার হন, সরকারের সংস্রবে এসে সম্মান পাবেন। যদি চাকুরে হন, কাজে কর্ম্মে দায়িত্ব নিয়ে সুনাম কুড়োবেন, বেতন বৃদ্ধির অভাব কিন্তু পদোন্নতির আশা পেতে পারেন। সম্ভব স্থলে সন্তান লাভ হতে পারে। পুত্রকন্যারা লেখা-পড়ায় সুসংবাদ বহন করে আনবে। শিল্পীরা সহসা

প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান পেয়ে খুশি হবেন। মায়ের স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। সম্ভবস্থলে বিবাহ হতে পারে। পিতৃসুখ বৃদ্ধি হবে। ভাগ্যের জোরে কিঞ্চিৎ লাভ করে ফেলতে পারেন। ধর্ম্মকার্য্যে বা পূজানুষ্ঠানে কিছু ব্যয়াধিক্য ঘটার সম্ভাবনা। পত্নীর প্রীতি জন্মাবে এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া স্বাভাবিক।

বৃশ্চিক রাশি

এ মাসে কোন ফন্দিবাজ স্ত্রীলোকের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হোয়ে ফাঁদে পড়তে পারেন। ফলে অর্থব্যয়, সম্মান-হানি, গৃহিণীর গঞ্জনা, প্রভৃতি হবার সম্ভাবনা আছে। যাঁদের অর্শাদি গুহ্য রোগ আছে, তাঁদের রোগবৃদ্ধি হতে পারে। শারীরিক দুর্ঘটনা ঘটারও কিছু লক্ষণ দেখা যায়। পত্নীর সঙ্গে সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা ছেলে-মেয়েরা শারীরিক অসুস্থতায় দু'একদিন বিছানা নিতে পারে। লেখাপড়ায় কোন বিঘ্নের সম্ভাবনা নেই। মাসের শেষে কোন প্রকার উদ্বেগজনক খবর পেতে পারেন। মায়ের স্বাস্থ্য ভালই। পিতার দৈহিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

ধনু রাশি

১লা এবং ২৭।২৮।২৯শে শ্রাবণ কিছু অর্থলাভের সম্ভাবনা দেখা যায়। দ্যুতাদিতে যাদের আসক্তি আছে তাঁদের ভাল যেতে পারে। ছাত্রদের, বিশেষ করে বিজ্ঞানের ছাত্রদের এ মাসটি পড়াশোনায় উন্নতি দেখা যায়। স্ত্রীর সাহচর্য্যে কিঞ্চিৎ সঞ্চয়ের যোগ দেখা যায়। কারো কারো বিশেষ করে যাঁরা সরকারী চাকুরে, তাঁদের পদবৃদ্ধির সম্ভাবনা। মাসের শেষে বদলীর সংবাদ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে। পুত্রকন্যাদের পড়াশোনায় সুফল দেখা যায়। পত্নীর সঙ্গে মতৈক্য না হতে পারে। সম্ভবস্থলে সন্তান লাভ। পিতামাতার স্বাস্থ্য অনুকূল। কনিষ্ঠ ভ্রাতার কর্ম্মলাভ।

মকর রাশি

আর্থিক সঞ্চয়ের যোগ পরিদৃষ্ট হয়। শত্রুবৃদ্ধি হবে কিন্তু নির্বিষ ভুজঙ্গমের মত তাদের আপশোষই বাড়বে। হঠাৎ স্বাস্থ্য কষ্ট উপস্থিত হতে পারে। অনূঢ়-অনূঢ়া বিবাহ যোগ দেখা যায়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য অনুকূল যা[illegible] মাতুল গোষ্ঠীর মধ্যে কলহের সম্ভাবনা। পরিবারে বে[illegible] স্ত্রীলোক ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করতে পারে। আপ[illegible] জন্ম কোষ্ঠীতে যদি রাহু শুভফলদায়ী হয় কিম্বা তৃতীয়, একাদশে বলবান থাকে তাহলে এ মাসে বিশেষ উন্নতি আর্থিক সুবিধা লাভ ঘটবে। ১৩ই শ্রাবণের পর কনি[illegible] ভ্রাতার পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি পেতে পারে। পিতামাতার স্ব[illegible] অনুকূল যাবার সম্ভাবনা।

কুম্ভ রাশি

স্বাস্থ্য ভালই যাবে। শ্রাবণের ৫।৬ তারিখে বি[illegible] অর্থ লাভের সম্ভাবনা আছে। পুত্রকন্যাদের পরীক্ষ[illegible] সাফল্যের সংবাদ এ মাসে পেতে পারেন। প্রণয়ার্থী[illegible] শুভ যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে। অকারণ ভীতি আশঙ্কার মাঝ দিয়ে কাটানর জন্যে মানসিক শান্তি ব্যাহ[illegible] হতে পারে। কর্ম্মস্থানে গুপ্তশত্রুতারও কিছু আশঙ্কা দে[illegible] যায়। স্ত্রীর স্বাস্থ্য অনুকূল। সম্ভব স্থলে পত্নীর বিদ্যালাভে[illegible] যোগ দেখা যায়। সঞ্চয়ের চেষ্টা থাকবে, কিন্তু না[illegible] পরিস্থিতিতে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না।

মীন রাশি

স্বাস্থ্য মাঝে মাঝে খারাপ যাবে। বায়ুবৃদ্ধি, রক্তচা[illegible] প্রভৃতিতে উদ্বেগ দেখা দেবে। আর্থিক যোগাযোগ মধ্য[illegible] প্রকারের। ব্যবসায়ীদের অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটা[illegible] হবে। স্ত্রীর কোন রকম শারীরিক দুর্ঘটনার সম্ভাবনা দে[illegible] যায়। পরিবারে কোন মহিলার আবির্ভাব পরিস্থিতি জটি[illegible] কোরে তুলতে পারে। ওপরওয়ালার বিরাগভাজন হ[illegible] মানসিক গ্লানি বৃদ্ধি হবার আশঙ্কা। ভাড়া বাড়ীতে বা[illegible] করলে বাসস্থান নিয়ে বিবাদ বিসম্বাদের সম্ভাবনা। ১৩[illegible] শ্রাবণের পর পরিস্থিতি জটিলতর হবে। দ্যুতাদি[illegible] আসক্তি থাকলে শ্রাবণের ৭।৮ তারিখ ভাল যেতে পারে পিতার স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। মাতার মধ্যম প্রকার।

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ভাব

ভাব ফলিত জ্যোতিষের বিচারের একটি প্রধান অবলম্বন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, ভাব বস্তুটি যে কি, সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা কোন গ্রন্থে কোথাও নেই। ভাব কষবার নানারকম পদ্ধতি নানাগ্রন্থে আছে বটে, কিন্তু তা থেকে বোঝা যায় এই যে ভাব সম্বন্ধে এক একজনের ধারণা এক একরকম এবং স্পষ্ট যুক্তিসঙ্গত বা বিজ্ঞান-সম্মত ধারণা কারও নেই। অন্ততঃ সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী, ইংরাজি ও ফরাসী ভাষার যে গ্রন্থগুলি আমি পড়েছি তার মধ্যে কোথাও ভাবের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেখেছি ব'লে মনে পড়েনা। ভাব বলতে আমি যা বুঝি এবং যা আমি যুক্তি ও বিজ্ঞানের বিরোধী নয় বলে মনে করি, তা নীচে লেখা হল।

পূর্বে বলেছি যে পৃথিবীর দৈনিক ও বার্ষিক এই দু' রকম গতির দুটি রেখা আছে—একটি আকাশ-বিষুব, আর একটি ক্রান্তিবৃত্ত। এর মধ্যে ক্রান্তিবৃত্তের সঙ্গে রাশিচক্র রাশি ও নক্ষত্রের যেমন সম্বন্ধ আছে, তেমনি আকাশ-বিষুব নিয়ে আমাদের ভাব গণনা করতে হয়। ভাবের সঙ্গে মুখ্য সম্বন্ধ হচ্ছে আকাশবিষুবের আর গৌণ সম্বন্ধ ক্রান্তিবৃত্তের কি ভাবে তা দেখা যাক্। ক্রান্তিবৃত্তের দুপাশে ৮ অংশের মধ্যে যে তারা, গ্রহ বা জ্যোতিষ্ক থাকে তারই প্রভাব ক্রান্তিবৃত্তের উপর পড়ে। কিন্তু, ক্রান্তিবৃত্তের উপর গ্রহনক্ষত্রের এই প্রভাব পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হয় কি করে? পৃথিবী কোন্ রেখা বা কোন বিন্দু দিয়ে এই প্রভাবগুলি নিজের মধ্যে আকর্ষণ করে? এর উত্তর এই যে, পৃথিবী প্রত্যেক জায়গায় বিষুবরেখার বারটি বিন্দু দিয়ে রাশি চক্রের প্রভাব পৃথিবীতে টেনে আনে। এই বারটি বিন্দুর মধ্যে চারটি বিন্দু মুখ্য। তাদের কেন্দ্র করেই অপর ভাবগুলি গড়ে উঠেছে। এই চারটি বিন্দু কি? পৃথিবীর যে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে সেইখানকার আকাশে আমরা যদি মনে মনে আকাশ-বিষুব রেখাটির কল্পনা করি, তাহলে আমাদের মনে হবে যে রেখাটি দু জায়গায় পৃথিবীকে স্পর্শ করেছে। এক পূর্বদিগন্তে, আর পশ্চিমদিগন্তে। জ্যোতিষের ভাষায় এই দুটিকে উদয়লগ্ন ও অস্তলগ্ন বলে। কিন্তু জ্যোতিষে শুধু লগ্ন বললে উদয়লগ্নকে বোঝায়, লগ্ন কথাটির মানে, যা পৃথিবীর সঙ্গে লেগে আছে। তাহ'লে আমরা আকাশ-বিষুব রেখার উপর প্রথমেই দুটি বিন্দু পাচ্ছি এক উদয়লগ্ন আর এক অস্তলগ্ন।

আমরা যে কোন জায়গায় যদি আকাশের গা দিয়ে আর একটি রেখা কল্পনা করি, যা খাড়া উত্তর থেকে দক্ষিণে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে রয়েছে, তাহ'লে যে বৃত্তটি পাব, তাকে সেই জায়গার যাম্যোত্তর-বৃত্ত (Meridian) বলা যেতে পারে। এই যাম্যোত্তর-বৃত্তটি উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীকে বেড় দিয়ে থাকাতে যে কোন সময়ে আকাশ-বিষুববৃত্তটি একে দু জায়গায় স্পর্শ করবে, এক মাথার উপরে মাঝ আকাশে, আর এক পায়ের নীচে উল্টো দিকের মাঝ আকাশে। উপরের আকাশের এই বিন্দুটিকে স্বর্গ এবং উল্টোদিকের আকাশের বিন্দুটিকে পাতাল বলা হয়ে থাকে।

উপরের এই ব্যাপারটি আর এক রকমে প্রকাশ করা যেতে পারে। যদি মনে করা যায়, এক ব্যক্তি যে কোন জায়গায় এক দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, যে প্রান্তরের কোন জায়গায় গাছপালা বা বাড়ীঘর নেই, তাহলে সেই ব্যক্তি প্রত্যক্ষ দেখতে পাবে যে, দিগন্ত তাকে ঘিরে একটি বৃত্ত রয়েছে। এই বৃত্তটির নাম ক্ষিতি

চক্রবাল (Horizon)। এখন সে যদি ঠিক উত্তরমুখো দাঁড়ায় এবং কল্পনা করে যে ঠিক তার মাথার উপরে আকাশের গা দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে আর একটি বৃত্ত আছে, যা এই দিক্‌চক্রবালকে উপর-নীচে বেড় দিয়ে রয়েছে, তাহলে সেই বৃত্তটিই হবে যাম্যোত্তরবৃত্ত উত্তরে এক জায়গায় এবং দক্ষিণে এক জায়গায় কাটাকাটি ক'রে পরস্পরকে সমান দু'ভাগে ভাগ করেছে এবং কাটাকাটির জায়গা দুটিতে যে কোণ হয়েছে তা সমকোণ।

তাহ'লে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় আমরা দুটি করে বৃত্ত পাচ্ছি—এক সেই জায়গার দিক্‌চক্রবাল (Horizon,) আর এক সেই জায়গার যাম্যোত্তর বৃত্ত (Meridian) যে কোন জায়গায় এই দুটি বৃত্ত স্থির, কিন্তু আকাশ-বিষুব কিংবা ক্রান্তিবৃত্তও পূব থেকে পশ্চিমে জায়গাটিকে বেড় দিয়ে ঘুরছে। আকাশ বিষুব বা ক্রান্তিবৃত্তের এক পাক ঘোরা শেষ হ'তে ঘড়ির সময়ের প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট লাগে। কাজেই যে কোন জায়গায় সারা রাত-দিনে আকাশ-বিষুব এবং ক্রান্তিবৃত্তের প্রত্যেক বিন্দুটি দিক্‌চক্রবাল এবং যাম্যোত্তর বৃত্তকে স্পর্শ করে যায়। যখন যে বিন্দুটি দিক্‌চক্রবালের পূর্বদিক স্পর্শ করে তখন সেইটাই হয় উদয়লগ্ন, আর আকাশ-বিষুবের যে বিন্দুটি দিকচক্র-বালের পশ্চিমদিক স্পর্শ করে সেইটি অস্তলগ্ন। যে বিন্দুটি যাম্যোত্তর বৃত্তকে মাথার উপরকার আকাশে স্পর্শ করে সেইটি হয় স্বর্গ এবং যে বিন্দুটি পায়ের তলার উল্টোদিকের আকাশে যাম্যোত্তরবৃত্তকে স্পর্শ করে সেইটি পাতাল। অতএব প্রত্যেক জায়গায় আকাশ-বিষুবরেখার মধ্যে আমরা চারটি বিন্দু পাচ্ছি—(১) উদয়লগ্ন (২) অস্তলগ্ন (৩) স্বর্গ (৪) পাতাল।

এই চারটি বিন্দুর প্রত্যেকটিকে মাথা মনে করে আমরা যদি চারটি সমবাহু ত্রিভুজ মনে মনে আকাশ-বিষুবের মধ্যে এঁকে নিই, তাহলে আমরা আকাশ-বিষুবের মধ্যে আর আটটি বিন্দু পাব। গোড়ার চারটি আর তাদের প্রত্যেক ত্রিকোণের দুটি করে আটটি বিন্দু নিয়ে আকাশ-বিষুবের মধ্যে তাহলে সর্বসমেত বারটি বিন্দু পাওয়া গেল। এই বিন্দুগুলিকে যদি আকাশ-বিষুবের একটা ছবি এঁকে দাগ দিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে ৩০ অংশ অন্তর একটি করে বিন্দু পড়েছে। অর্থাৎ এই বারটি বিন্দু দিয়ে আকাশ-বিষুবকে যেন সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এখন যদি উদয়লগ্নকে গোড়া ধরে এই বারটি বি[ন্দু] পশ্চিম থেকে পূবে গুণে যাওয়া যায়, তাহলে উদ[য়লগ্ন] হবে প্রথম, তার পরের বিন্দুটি দ্বিতীয়, তার পরেরটি তৃ[তীয়] এইভাবে দ্বাদশ পর্যন্ত। এই রকম গুণে গেলে দেখা [যাবে] যে, আমরা যে বিন্দুকে পাতাল বলেছি সেটি হবে চ[তুর্থ] যাকে অস্তলগ্ন বলেছি সেটি হবে সপ্তম, যাকে স্বর্গ ব[লেছি] সেটি হবে দশম।

প্রত্যেক জায়গায় এই বারটি বিন্দু দিয়ে রাশিচ[ক্রের] প্রভাব পৃথিবী গ্রহণ করছে। রাশিচক্রের উপর যা [কিছু] প্রভাব সবই সমানভাবে যদি এই বারটি বিন্দু দিয়ে পৃ[থিবী] গ্রহণ করত, তাহলে একই সময়ে সব জায়গার উপর রা[শি]চক্রের প্রভাব সমানই হ'ত এবং তাহলে ভাব কথবার কে[ান] সার্থকতা থাকত না। বস্তুতঃ আকাশ-বিষুবের উপর বা[রটি] বিন্দু রাশিচক্রের উপর অনুরূপ বারটি বিন্দু থেকে প্র[ভাব] গ্রহণ ক'রে পৃথিবীকে দান করে।

কোন এক স্থানে কোন একটি বিশেষ সময়ে রাশিচ[ক্রের] এই বারটি বিন্দুর উপর গ্রহনক্ষত্রের যা কিছু প্রভাব থ[াকে] সেই স্থানে সেই সময়টিতে শুধু সেই প্রভাবটুকুই অভিব[্যক্ত] হয়। যদিও প্রকৃতপক্ষে ভাববিন্দুগুলি আকাশ-বিষু[বের] উপর কল্পনা করা হয়, তাহলেও রাশিচক্রের উপর যে অ[নু]রূপ বারটি বিন্দু পাওয়া যায়, ফলিত জ্যোতিষে সেইগু[লি]কেই ভাব বলা হয়ে থাকে। ফলিত জ্যোতিষে লগ্ন প্রথম ভাব বলতে রাশিচক্রের সেই বিন্দুটিকে বোঝায়— বিন্দুটির প্রভাব আকাশ-বিষুবের উদয়লগ্নের মধ্যে দি[য়ে] পৃথিবীতে অভিব্যক্ত হচ্ছে।

আকাশ-বিষুবের বারটি বিন্দু দিয়েই প্রত্যেক জায়[গায়] রাশিচক্রের বারটি বিন্দু নিরূপিত হয়। কিভাবে নি[রূ]পিত হয় তা মৎপ্রণীত "সরল জ্যোতিষে" বর্ণিত হয়েছে।

অতএব ফলিত জ্যোতিষের ভাব শব্দটির আসল মা[নে] রাশিচক্রের মধ্যে বারটি বিন্দু, যে বিন্দুগুলি উপর রা[শি] গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাব একটি বিশেষ স্থানে একটি বি[শেষ] মুহূর্তে পৃথিবীর উপর অভিব্যক্ত হচ্ছে।

যে কোন স্থানে ২৪ ঘণ্টায় রাশিচক্রের চাকা একব[ার] করে পূব থেকে পশ্চিমে ঘুরে যাচ্ছে। কিন্তু সেই স্থা[নে]

আকাশের পূব-দিগন্ত, পশ্চিমদিগন্ত, মাথার উপরকার মাঝ-আকাশ প্রভৃতি দিকগুলিও যেমন স্থির আছে, ভাব-বিন্দুর অবস্থানের দিকগুলি তেমনি স্থির আছে। অতএব রাশিচক্র একবার ঘুরে গেলেই রাশিচক্রের সবখানি প্রত্যেক ভাববিন্দুকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। এ থেকে বোঝা শক্ত নয় যে রাশিচক্র রাতদিন ঘুরছে, তখন যে কোন স্থানে প্রত্যেক মুহূর্তে রাশিচক্রের ভিন্ন অংশ ভাব-বিন্দুগুলিকে স্পর্শ করছে, কাজেকাজেই বিভিন্ন মুহূর্তে রাশিচক্রের ভিন্ন অংশের প্রভাব সেই স্থানে অভিব্যক্ত হচ্ছে। এ থেকে এও বোঝা যায় যে একই মুহূর্তে বিভিন্ন স্থানের ভাব-বিন্দুগুলি বিভিন্ন। কাজেই একই মুহূর্তে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের রাশিচক্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রভাব অভিব্যক্ত হয়ে থাকে। ভাব-বিন্দু নির্ণয় করতে হলে স্থান ও সময় দুটিই জানা চাই। অনেকে মনে করতে পারেন যে ভাবসম্বন্ধে এত বিস্তারিত করে বলার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আমার মনে হয় ভাবের ব্যাপার সংক্ষেপে বলতে গিয়ে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করার চেয়ে, অনাবশ্যক বাহুল্যও বাঞ্ছনীয়, যদি তাতে ব্যাপারটা স্পষ্ট করে বোঝার পক্ষে সাহায্য করে। তা' ছাড়া ভাবের ব্যাপারটি এত বিস্তারিত করে বলবার আরও আবশ্যক আছে। এরপরে বিচারের ব্যাপারে "আত্মকারক" নির্ণয় সম্বন্ধে যা বলব, তার সঠিক মর্ম ততক্ষণ কখনই বোঝা যাবে না—যতক্ষণ ভাব সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা না হয়। পরিশেষে প্রথম শিক্ষার্থীকে দু'টি কথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি।

১। বারটি ভাব রাশিচক্রের উপর বারটি বিন্দু মাত্র।

২। বারটি ভাব-বিন্দু আমাদের জানিয়ে দেয়, কোন এক বিশেষ স্থানে কোন এক বিশেষ সময়ে রাশিচক্রের কোন অংশগুলির প্রভাব সেই স্থানের উপর অভিব্যক্ত হচ্ছে।

[ক্রমশঃ

নীলমণি বাইলেন

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সময়ের সুতো হুইলে আটকে নিয়ে
কে দ্রুত টানছে ? ক'বছর বাদ দিয়ে
শেফালিকা বোস এল আমাদের বাড়ি
জৌলুস টেনে—ধুপছায়া-রং শাড়ি।

নিঃঝুম বাড়ি নীলমণি বাইলেনে
হঠাৎ হলদে মিহি রোদ্দুর টেনে
ঝলকে উঠল। দেখি—আকাশের নীল
ছুঁয়ে আছে বাড়িটার ইটের পাচিল।

শেফালি নামল, মুখর কথার ঢেউ
ছিটকিয়ে দিল ভিড়ল অনেক কেউ।
কথা অগুণতি—তা'তেই সাঁতার কাটে।
নীড়াভিমুখীন পাখিরাও পাথ্‌সাটে—

সময় গড়ায়—সে খেয়াল একটু কী
মনের মুকুরে একটু দিল না উঁকি ?
আমার সঙ্গে একটি কথাও নয়,
দৈবাৎ কানে চুড়ির আওয়াজ হয়।

জানিনা তাকে তো কে-যে সময়ের সুতো
ঘুরিয়ে চলছে ? হুকুম মাফিক—দ্রুত
শেফালি বোসকে তুলে দিতে হয় ট্রেণে,
মেঘ কি করল নীলমণি বাইলেনে ?

ট্রেণ ছেড়ে দিল, কি বলব—অপলক
চেয়ে রইলাম, মনে হল তার চোখ
কী কথা বলছে, মোম-গলা মিহি স্বর,
থমকে গেলাম—হাওড়ায় নামে ঝড়।

(ক) নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য" —রামকৃষ্ণ।

(১) সত্য বলতে কি বোঝা যায়? প্রতিনিয়তই আমরা এই শব্দটা ব্যবহার করি। আমরা বলি সত্যমেব জয়তে। রামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছেন—সত্যই কলিযুগের তপস্যা। সত্য কি পদার্থ?

(২) বস্তুতঃ সত্য কোনও পদার্থ কিনা তাও জানা দরকার। তাহলে আরও দুরূহ প্রশ্ন উঠবে, পদার্থ কি?

(৩) এই পরিদৃশ্যমান জগতে আমরা যা—কিছু না কেন দেখি বা অনুভব করি বা জানি বা ভোগ করি বা ইচ্ছা করি, তারই পরিবর্ত্তন আছে, তারই নাশ আছে ও অপলাপ বা অবসাদ আছে। আমাদের এই বাক্যটা সত্য কেন? আমাদের এই বিচারের সত্যতাটা কি জিনিষ? সত্য কোনও দ্রব্য নয়, কোনও দেশদিক্‌কাল সম্পন্ন বা গুণবিশিষ্ট সামগ্রী নয়। সত্য এক বিশেষ প্রকারের ধর্ম্ম। কিসের ধর্ম্ম? আমাদের অনুভবের, আমাদের বিচারের একবিধ ধর্ম্ম হল সত্য। সত্যকে জানা মানে সত্যনামক কোনও বস্তুকে জানা নয়। সত্যকে জানা মানে এমন কোনও বস্তু জানা—যার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সত্য। সত্যের ধর্ম্ম বস্তুত্ব নয়। বস্তুর একরকম ধর্ম হচ্ছে সত্য। এই ধর্ম্মটা কি?

(৪) ধাবমান জলস্রোতের মধ্যে একটা সরল যষ্টি স্থাপন করলে সেটাকে বাঁকা দেখা যায়? এই প্রতীতি বা অনুভব বা জ্ঞানকে সত্য বলা চলে কি না? অর্থাৎ এমত অবস্থায় যষ্টিটাকে যেরূপ প্রতীতি হচ্ছে যষ্টিটা সেরূপ এই বাক্য বা বিচার সত্য, না যষ্টিটাকে এমত অবস্থায় ঋজু বা সোজা বলা সত্য? সুরার নেশায় কাউকে যদি দুষ্ট ব'লে প্রতীতি হয় তাকে দুষ্ট ব'লে বিচার করা কি সত্য বিচার? বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হ'য়ে কারও চরণ যদি বাঁকা মনে হয় তাকে বক্রপদী বিচার করা কি সত্য বিচার?

(৫) প্রশ্নটা কঠিন। দুই দিক থেকে বিচার করতে হয়। প্রতীতি যতক্ষণ হচ্ছে—ততক্ষণ কোনও একটা জিনিষকে যেরূপ প্রতীয়মান হচ্ছে—সেটা সেইরূপ না বলতে চাইলে সত্যের অপলাপ হয়। এই একটা দিক। যদি লালসূর্য্যের দিকে কিছুক্ষণ তাকাবার পর সাদা দেওয়ালে তাকান যায় সবুজ রঙ দেখা যায়; সেই দেখাটা ও সেই দেখাসম্বন্ধীয় বাক্যটা না স্বীকার ক'রে উপায় কি? কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সবুজ রঙের ঘোর কেটে যায়। সুতরাং আমরা বলি দেওয়ালকে সবুজ দেখাটা ও কালের জন্য, অতএব সত্য হ'লেও দেওয়ালটা কোনও কালেই সবুজ নয়। সুতরাং সেই দেখাটা ও তদ্দর্শনসংক্রান্ত বাক্যটা মিথ্যা। সত্যের আর একটা অর্থ আছে। এটা আর এক দিক। সেটা কি? কোনও একটা দ্রব্যকে এখন মিষ্ট মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ পরে যদি সেটাকে তিক্ত মনে হয় তাহ'লে দ্রব্যটাকে মিষ্ট বা তিক্ত কিছুই বলা চলে না। কোনও একটা জীবকে এখন সবুজ আবার পরক্ষণে হলুদ মনে হলে জীবটাকে সবুজ বা হলুদ কিছুই বলা চলে না। তাকে কোনও এক বিশেষ বর্ণের অধিকারী বলা চলে না। কারণ তাহ'লে সংশয় জাগে কোনও একটা বিশেষবর্ণের অধিকারী হ'য়ে সে অন্য বর্ণ ধারণ করে কি ক'রে? জীবটাকে সেইজন্য হয় বহুরূপী, নতুবা অরূপ বললে সত্য বলা হয়। সুতরাং সত্য কি?

(৬) অগ্রসর হওয়ার আগে পদার্থ সম্বন্ধে ধারণাটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার। দ্রব্য, গুণ, দেশ, কাল, পরিমাণ, ধর্ম্ম, সংখ্যা, কার্য্য, কারণ, এগুলির প্রত্যেকটাকে আমরা এক এক রকম পদার্থ বলে থাকি। সুতরাং পদার্থের অর্থ হচ্ছে চিন্তার প্রধান প্রধান বিষয়। এই অর্থে সত্যকেও পদার্থ বলতে বাধা নেই। তবে এই পদার্থটার স্বরূপ বুঝতে বেশ বেগ পেতে হয়।

(৭) যে-জীবকে এখন সবুজ ও পরক্ষণে হলুদ দেখা যাচ্ছে সেটাকে কেবল সবুজ বা কেবল হলুদ বললে মিথ্যা

হবে; কারণ পরক্ষণে হলুদ মানে পরক্ষণে সেটা অসবুজ হচ্ছে এবং জীবের পক্ষে সবুজ হতে গেলে এক্ষণে সবুজ ও পরক্ষণে অসবুজ হওয়া চলে না। অন্যরূপে বলতে হয় জীবটাকে সবুজ হতে গেলে সবসময়ের জন্য সবুজ হওয়া দরকার; অন্তত যতক্ষণ জীবটা টিকে থাকে ততক্ষণ সবুজ থাকা দরকার। আবার এখন সবুজ ও পরক্ষণে হলুদ (অ-সবুজ) এবং এখন হলুদ ও পরক্ষণে সবুজ (অ—হলুদ) হওয়াতে জীবটা অন্য কোনও এক বিশেষ বর্ণের অধিকারী এরকম বর্ণনাতেও ভুল হয়। কারণ একই; সব সময়ের জন্য কোনও একই বর্ণ আসছে না। অপরিবর্তনশীলতা সেইজন্য সত্যের একটা মাপকাঠি।

(৮) প্রশ্ন উঠবে জীবটা বিভিন্ন বর্ণের অধিকারী এরকম বলাতেও কি মিথ্যাত্ব আছে? এইক্ষেত্রে পরিবর্তনশীলতা জীবটার স্বভাব, এরকম বিচারকে বা বোধকে মিথ্যা বলা চলে না। কারণ তাহলে এখন সবুজ ও পরক্ষণে অসবুজ, এখন নীল পরক্ষণে অনীল, এরূপ বাক্যগুলোর মধ্যে কোনও সংঘর্ষ হয় না; প্রত্যেক বর্ণনাটাই আর একটা বর্ণনার সঙ্গে খাপ খায়, কোনও বিরোধ হয় না। অবিরোধ বা সংঘর্ষহীনতা বা সামঞ্জস্য সেইজন্য সত্যের আর একটা লক্ষণ বা পরিচয়।

(৯) কিন্তু ধরুন যদি এমন হয়—যে জীবটাকে লাল কাচের মধ্যে দিয়ে দেখার ফলে লাল দেখাচ্ছে এবং পরক্ষণে সবুজ কাচের মধ্যে দিয়ে সবুজ দেখাচ্ছে, আবার আর এক সময় স্বর্ণবর্ণ কাচখণ্ডের মধ্যে দিয়ে সোনালী দেখাচ্ছে—এই অবস্থায় জীবটা বহুরূপী অর্থাৎ বহুরূপ ধারণ করা জীবটার স্বভাব এই জ্ঞান বা বাক্য সত্য হবে কি? স্বভাবগত গুণ বলতে আমরা বুঝি এমন গুণ যা বাহ্য কতকগুলো নিমিত্তের দ্বারা উৎপন্ন নয়: সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রের বহুবর্ণসম্পন্নতাকে স্বভাব বললে এই দুরকম বাক্যের ও তন্নিহিত জ্ঞানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। বিচার্য্য বোধটির বহিঃস্থ অন্যান্য সর্ব্ববিধ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি হল সেইজন্য সত্যের আদর্শ।

(১০) যে বস্তুকে রঙীণ কাচের মধ্যে দিয়ে রঙীণ দেখা যায় তার সম্বন্ধে যদি বলা হয় যে কতকগুলো অবস্থাবিশেষে সে বস্তুর স্বাঃনিজ বর্ণ—তার চেয়ে অন্য বর্ণ তার হতে পারে এরকম বাক্য সত্য ও নির্দোষ হবে কি? অর্থাৎ কোনও এক বস্তুর একটা যথার্থ রূপ ও আর একটা আবর্ভাসিক রূপ থাকতে কোনও বাধা আছে কি? আমরা বলতে বাধ্য যে কোনও বাধা নেই। তবে আবভাসিক বা তাত্ত্বিক রূপ কখনও এমন কিছু হতে পারে না যা বুদ্ধির কাছে অসম্ভব। যেমন কোনও বস্তুর যুগপৎ ত্রিকোণ এবং গোলাকার এ দুটো রূপ থাকতে পারে না; অর্থাৎ স্বরূপত বস্তুটি বর্ত্তুলত্রিকোণ কিংবা ত্রিকোণবর্ত্তুলাকাররূপে বস্তুটির অবভাত হচ্ছে, এরকম উক্তির দুটোই মিথ্যা। সুতরাং কতকগুলো ক্ষেত্রে মিথ্যাকে সোপাধিক সত্য বলা চলে। কিন্তু যা অসম্ভব তা কখনও সত্য হতে পারে না; এমন কি সেটা সোপাধিক বা অবস্থাবিশেষের সত্যও হতে পারে না। এটা সত্যের আর একটা নির্ণায়ক।

(১১) ট্রেণে চলবার সময় যখন গাড়ী জোরে চলে, তখন স্থির গাছগুলো দৌড়ুচ্ছে বলে প্রতিভাত হয়। গাছগুলো সত্য সত্য চলে না, কিন্তু চলমত্তার অবভাস স্পষ্ট হয়। যে সময় দৌড়চ্ছে মনে হয়—সে সময় গাছগুলো ধাবন্ত ও স্থির দুই-ই একথা বললে কি মিথ্যা হবে? অর্থাৎ স্বরূপতঃ গাছগুলো স্তব্ধ, ভূমিবদ্ধ কিন্তু অবভাসতঃ সেগুলো চলন্ত ও ধাবন্ত এরকম বলাতে কি মিথ্যা আছে? এ রকম বলাকে মিথ্যা বলা চলে না। তবে স্বরূপত বা অবভাসত গাছগুলো যুগপৎ স্থির ও অস্থির এরকম উক্তি সত্য হতে পারে না, কারণ দুই বিপরীত ধর্ম্মের যৌগপদ্য অসম্ভব। সূর্য্য নড়ে না অথচ সূর্য্য নড়ে মনে হয়। কিন্তু যথার্থতঃ নড়ে এবং নড়েও না—এরকম বিচার গ্রহণীয় নহে। কতকগুলো অবস্থায় সূর্য্য অস্থির রূপে প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বহুতর জ্ঞাত তথ্যাদির দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে সূর্য্য হচ্ছে যথার্থতঃ স্থির। অতএব জ্ঞানের অস্তিত্ব দ্বারা জ্ঞান বাধিত হয় না। জ্ঞানের রূপান্তর সম্ভবপর। যেমন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তি অতিক্রম ক'রে অনেক উর্দ্ধে গিয়ে পৃথিবীকে ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা সম্ভবপর হ'লে আমাদের ধরাকে সচল ব'লেই দেখা যাবে। পরমসত্যনির্দ্ধারণ করবার সময় এই সূত্রটাও মনে রাখতে হয়। এবার বিচার্য্য বিষয়ে আসা যাক।

(১২) পরমসত্তা সাকার ও নিরাকার। আমরা কি নিয়ত দেখছি না যে সাকার নিয়েই আমাদের

অধিকাংশ কারবার। সাকার বা আকারবান্ সত্তাগুলো নেই—এই বলে চোখকানকে অস্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না। তবে থেকেও সেগুলো অলীক বা মিথ্যা এরকম হয়ত কেউ বলতে চাইবেন; কিন্তু এগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারলেও সত্য বস্তুর সাকাররূপে প্রতীয়মান হওয়ার সঙ্গত ও সমর্থ কারণ থাকতে হয় এবং যখন সমস্ত সাকার বস্তু নিয়ে কথা উঠেছে, তখন কারণটা সত্যবস্তুর মধ্যেই মিশে থাকতে বাধ্য, যেহেতু সেই বস্তুর বাইরে কোনও দেশ বা রাজ্য নেই। এই দিক থেকে দেখলে পরমবস্তুকে সাকার ও নিরাকার দুইই বলাতে খুব দোষাবহ হয় না। নিরাকারের মধ্যেই আকারিত হওয়ার অভিসন্ধি বা সংকল্প আছে মনে করতে হয়।

(১৩) শুধু নিরাকার আছে এ উক্তি প্রাকৃত অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত নয়। ব্যবহারিক সত্যরূপে সাকারকে স্বীকার করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত এবং কি তার তাৎপর্য বিচার ক'রে দেখা দরকার। ব্যবহারিক সত্তা ব'লে আমরা বুঝতে চাই যে যাকে সাকার বলি তাকে সাকার বলা একরকম সংস্কার বা একরকম রেওয়াজ। কিন্তু সংস্কারই বলি বা রেওয়াজই বলি, আকারকে কাজে কর্মে চিন্তায় ভাবনায় মেনে নিয়ে চলতে হয়। কোনও রকম আকারকেই বেকার ব'লে পরিত্যাগ করা যায় না। আমাদের কাছে আকারের বিপরীত হল শূন্য। আমাদের চৈতন্য বা মন সম্বন্ধীয় ধারণাও আকারগত। কারণ মনস্বতার কম বেশি বা পরিমাণ আছে এবং পরিমাণও একরকম আকার। সুতরাং সংস্কার বলতে চান বলুন। সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে স্বীকার করতে হবে এই সংস্কার অবিনাশিক। যতক্ষণ প্রচলিত জগতের জ্ঞান আছে, আত্মা ও অনাত্মার মোহ আছে, আমি এবং ইদংএর জ্ঞান আছে, ততক্ষণ সাকার সত্তার বিশ্বাসকে এক রকম সংস্কার বা ব্যবহারিক সৌকর্য্য বলা শুধু শব্দের খেলা মাত্র, বস্তুতঃ সেই বিশ্বাসকে ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া অবধি অন্য বিশ্বাস দ্বারা বিনিময় করা অসম্ভব। যেখানে বিনিময়ে বা পরিবর্তে অন্য কোনও বিশ্বাস রাখা অসম্ভব, সেখানে ব্যবহারিক সত্তাই হ'ল কার্য্যতঃ বাস্তবিক সত্তা।

(১৪। যুক্তি দ্বারা যদি সাকার ও সীমার বোধ্যতা প্রতিপন্ন না করতে পারা যায় তাহ'লে সেগুলো সত্য নয় বলতে হয়। কারণ সত্য কি? আমরা আগেই দেখেছি যে কোনও উক্তিকে স্বীকার করার ফলে যদি বাধা, বিরোধ বা অসামঞ্জস্য আসে, তাহ'লে সেই উক্তিকে অসত্য বলতে আমরা বাধ্য। পৃথিবীকে কমলালেবুর আকারে না দেখতে পারলেও পৃথিবী যে অনেকটা কমলালেবুর আকার, আমরা সত্য ব'লে এই কারণেই মানি।

(১৫) আকার হল দেশকাল নিমিত্ত ও শক্তি দ্বারা অবিচ্ছিন্নতার এক বিশেষ রূপ। কিন্তু দেশ, কাল শক্তি ও নিমিত্ত প্রত্যেকটারই ধারণা অত্যন্ত দুর্বোধ্য। দেশকে বুঝতে হ'লে কালের ধারণার সাহায্য নিতে হয়। কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা ও দিক নির্ণয় বা পরিমাপ করতে সময় লাগে, এই সময়টুকুকে স্বীকার ক'রে তবে বস্তুটার প্রকৃত দেশগত ধারণা সম্ভবপর, অথচ পরিমাপের জন্য যতটুকুই না কেন সময় লাগুক সেই সময়ের মধ্যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সময়ের শাসনাধীন না হ'য়ে দেশকে নির্দ্ধারিত করা যায় না। সময় থেমে গিয়েছে—এরকম কল্পনা ক'রে দেশের যে-রূপ আমরা পাই তা হল একেবারে কাল্পনিক দেশ। সেরকম দেশ শুধু একটি বিন্দুমাত্র। অংশের অংশ, তার অংশ কল্পনা করতে করতে বিন্দুতে আশ্রয় নিতে হয়, কিন্তু কালের ধারণা ব্যতীত বিন্দু থেকে বৃহতে আগমন নিতান্তই অসম্ভব। বৃহৎকে দেশ দ্বারা ক্ষুদ্রে পরিণত করা যায়, ক্ষুদ্রকে কাল দ্বারা বৃহতে পরিণত করা যায়। দেশের ধারণা ব্যতীত আবার কালের ধারণাও অসম্ভব। কোনও একটা কিছুর আর একটা কিছুতে পরিণতি হল কালের লক্ষণ। পরিণতি হচ্ছে পরিবর্তন এবং দেশ থেকে পৃথক্ ও অসংযুক্তরূপে এবং দেশের সহায়তা বিনা পরিবর্তনকে মাপা যায় না। শুদ্ধ কলনী নামক কিছু পদার্থ আমাদের গোচরে নেই। অতএব আকারের সত্য প্রতীত হ'লেও বিচার দ্বারা প্রতিপাদিত নয়, এর সত্যতা বুদ্ধির কাছে রহস্যময়ী।

১৬। রহস্যময় আকার ও নিরাকারের মধ্যে বড় কোনও বিরোধ নেই। নিরাকার বস্তুর পক্ষে রহস্যময় আকারে আকারিত বা প্রতীয়মান হওয়ার মধ্যে সাংঘাতিক কোনও অসুবিধা বা ব্যাঘাত ধরা পড়ে না। এই দৃষ্টিতে নিরাকারও সত্য, আকারও সত্য। আকারের স্বরূপ যদি অনির্ব্বচনীয় না হত, আকারের মধ্যে যদি সংশোধন বা

সম্পূরণের কোনও অবকাশ একেবারেই না থাকত তাহ'লে আকারকে নিরাকারের সঙ্গে সত্য বলা যেত না। যেহেতু আকারের স্বভাব রহস্যময়, এরকম ধারণা করা অসঙ্গত নয় যে রহস্যভেদ করলে বোঝা যাবে যে সাকার ও নিরাকার অপ্রভেদ; সাকার স্বরূপ ও নিরাকার স্বরূপ দুইই এক বস্তু।

১৭। বর্ত্তমান বিজ্ঞানে যেমন শক্তি ও জড়কণার মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী নয়, তেমনি পরমবস্তুর পক্ষে আকারশূন্যতা ও আকারযুক্ততা দুইই সম্ভবপর এবং বর্ত্তমান বিচারে সম্ভবপরতা মানেই সত্যতা। কারণ, বর্ত্তমান প্রশ্নটা হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের সম্বন্ধে এবং সব-কিছু এই বিশ্বের মধ্যে নিহিত এবং এই দুই দিকের সামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। আকার প্রত্যয় থেকেই নিরাকারের জ্ঞান আসতে বাধ্য। এই জগতে আকারকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভবপর কি করে? তবে আকার আকার দ্বারা প্রতিবাদ্য নয়। নিরাকারকে স্বীকার না করলে আকারের উদ্‌ভব বোধ্য নয়। যা-কিছু কোনও বিশিষ্ট আকারে আকারী তার আকার-পরিবর্ত্তন বোঝা যায়; কিন্তু আকারের জন্ম কি ক'রে হয়? আকার দ্বারা আকার-সাধারণ্য বা আদ্যাকারের জন্ম বোঝা যায় না। কারণ, আদ্যাকারের মানে হল যেখানে কোনও আকার বা আকারের আভাস নেই, সেখানে আকারের উদয়। সেইজন্য নিরাকারকেই আকারের আধার-ভূত মনে করতে হয়। নিরাকারই হল সব আকারের আকর। আকার ও নিরাকারের অদ্বৈত অবশ্যস্বীকার্য্য। নিরাকার থেকে জিগমিষার ফলে আকার জন্মে। এই জিগমিষার ক্রিয়া সর্ব্বত্র দেখা যায়। এরই প্রভাবে যেখানে কোনও বিশিষ্ট ভাব নেই, সেখানে বিশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। এই জিগমিষাই মহামায়া।

(১৮) আকারজ্ঞান নির্ভর করে ইন্দ্রিয়াদির ক্রিয়ার ওপর ও মানুষের মন ও বুদ্ধি ও সংকল্পের কার্য্যশীলতার ওপর। যতক্ষণ সেগুলো ক্রিয়মান থাকবে, দেশ-কাল-নিমিত্তাদির বোধ থাকবে, ততক্ষণ আকারকে অস্বীকার করা অসম্ভব। আকারজ্ঞান যখন আছে তখন পরমবস্তুকে মুখে নিরাকার বললেও, সাকাররূপে ধারণা করতে আমরা বাধ্য। এই অবস্থায় নিরাকার আমাদের কাছে অপ্রমেয়াকার ব্যতীত আর কি? এই অবস্থায় পরমচৈতন্য আমাদের কাছে সর্ব্বশক্তিমান্, সর্বজ্ঞ ও অশেষকারুণিক এক ব্যক্তিবিশেষ। এই বোধকে অবহেলা করা চলে না, উপেক্ষা করা চলে না, অস্বীকার করা চলে না। অহং-প্রত্যয় ও সীমা-প্রত্যয় যতক্ষণ জাগরূক থাকে ততক্ষণ পরমেশ্বর এক পরমপুরুষ সেই প্রত্যয়ও যায় না, চেষ্টা করলেও যায় না। সুতরাং জড়বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আধ্যাত্মিকবোধের ক্ষেত্রেও তেমনি আপেক্ষিকতা হচ্ছে একটা অত্যন্তরূঢ় সত্য।

(খ) "তিনি নিরাকার। আবার সাকার। ভক্তের জন্য তিনি সাকার—যাঁরা জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাঁদের স্বপ্নবৎ মনে হয়েছে তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার। ভক্ত জানে আমি একটি জিনিস। জগৎ একটি জিনিস। তাই ভক্তের কাছে ঈশ্বর ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন। জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে। তিনি যে কি মুখে বলতে পারে না। কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই; তাঁর 'আমি' আর খুঁজে পান না। আর খুঁজবেই বা কে? সেখানে ব্রহ্মের স্বরূপ বোধে বোধ হয়। কিরূপ হয় কে বলবে?"—রামকৃষ্ণ।

(১) পরমবস্তুকে যে অসামান্য ব্যক্তিরূপে প্রতীতি হয় মানুষী বুদ্ধির সংস্কারগুলো তার অন্তর্নিহিত ও মৌলিক কারণ। তাহারও আর একটা কারণ আছে। পরম-বস্তুর প্রতি যখনই ভক্তি ও উপাসনার বৃত্তিগুলো উদিত হয় তখন একপ্রকার মানসিক সৃষ্টি-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। যাকেই বা যে-বস্তুকে ভালবাসা যায় তার সম্পর্কে এক-প্রকার কল্পনাসৃষ্টি অনিবার্য্য। এই ক্রিয়াকেই জনৈক ফরাসী মনীষী "crystallisation" (দানাবাঁধার ক্রিয়া) নাম দিয়াছেন।

(২) প্রেমাস্পদের মধ্যে পূর্ণব্যক্তিতা দেখা প্রেমের স্বভাব এবং সেই দেখাতেই তার রস, বৈশিষ্ট্য ও আনন্দ। ব্যক্তি হয়েও যিনি ব্যক্তির বাড়া সেই ব্যক্তি যে কেবল-ব্যক্তির বাড়া সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ব্যক্তি হ'য়ে ব্যক্তির বড়ো হওয়া সম্ভবপর কি না সে অন্য কথা। ভক্তির কাছে পরমাত্মা হল ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং এটা হয় ভক্তির আবেগবশতঃ। শুদ্ধচৈতন্য বা সন্মাত্রের জ্ঞান যখন হয় তখন আত্মা বা অনাত্মা, আমি বা ইহা, কিছুই নেই। সুতরাং সেই বোধের মধ্যে কোনও

ভেদজ্ঞানই নেই। এইজন্য রামকৃষ্ণ বলেছেন: "ব্রহ্মবোধে বোধ হয়। কিরূপ বোধ হয় কে বলবে।" তাহ'লে কি বিশ্বের দুটো দিক: একদিকে নির্বিশেষ চিন্মাত্র ও অন্যদিকে ঈশ্বর জীব-জগৎ বিশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ড। এ দুটোর মধ্যে কি একটা বিরাট ফাঁক? বিশ্ব কি তাহ'লে দুটো আলাদা আলাদা টুকরো? তা হতে পারে না। যা-কিছু আছে সবই এক বিশ্বের অন্তর্গত থাকতে বাধ্য। সুতরাং এই দুই দিকই হচ্ছে একই পরমবস্তুর দুই কলা। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন: "তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার, আবার সাকার। যিনি নির্গুণ, তিনিই সগুণ।"

(গ) "জল স্থির থাকলেও জল, তরঙ্গ ভুড়ভুড়ি হলেও জল। অনুলোম, বিলোম। ঘোলেরই মাখন, মাখনেরই ঘোল। যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা। যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য। সা, রে, গা, মা, পা, নি,। নি'তে অনেকক্ষণ থাকা যায় না। "আমি যায় না": তখন দেখে 'তিনিই আমি, তিনিই জীব, জগৎ সব। এর নাম বিজ্ঞান।"

(১) স্থির জল ও বহতা জলের মধ্যে উপাদানগত ঐক্য বা অভেদ আছে। সংস্থিতাবস্থা থেকে চঞ্চলাবস্থায় যাওয়া হল তরঙ্গাদি আকারের উৎপত্তির নিমিত্ত এবং অধীরাবস্থা থেকে শান্তাবস্থায় গমন হল তরঙ্গাদি নাশের কারণ। সুতরাং উপাদান-অতিরিক্ত আর একটা জিনিষ আছে: সেটা হচ্ছে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়ার শক্তি বা প্রবণতা। প্রতীয়মান জগতের পদার্থের ক্ষেত্রে এই প্রবণতার কারণ হচ্ছে অগণ্য বাহ্য কারণস্থানীয় ঘটনাসমূহ। যেমন, জলের ক্ষেত্রে বাতাসের বেগের কমিবেশী, বৃষ্টির জলের প্রকোপ ইত্যাদি বাহ্য ঘটনাগুলো এই প্রবণতার কারণ। প্রত্যক্ষ ব্রহ্মাণ্ডে দেশকালনিমিত্ত গঠিত অসংখ্য নামরূপের। প্রবাহের নিরসনে যা থাকে তা হচ্ছে নির্বিকার ও নিরাকার সচ্চিদানন্দ। সব সময়েই এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ হচ্ছে প্রতিভাত বিশ্বের অধিক; সুতরাং তা বিশ্বাতীত। কিন্তু বিশ্বাতীতের অনুভব অপ্রকাশ্য। সমগ্র ও পূর্ণ পরমবস্তুর একদেশমাত্র এই নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ, এই নামরূপহীন দেশকালাদি বর্জিত শুদ্ধ সত্তা। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সসীম ও সমস্ত জগৎও পূর্ণসত্তারই এককলার প্রকাশ; সুতরাং পূর্ণসত্তাই প্রত্যক্ষ বিশ্বের উৎস বা কারণ। পূর্ণসত্তার অন্তরে এমন একটা অন্তর্গূঢ় আকুতি আছে যার রহস্যময় স্বতঃক্রিয়ার ফলে নামরূপ ও দেশকালনিমিত্তের সসীম ও সগুণ সংসার উদ্ভূত হয় এবং তারই বক্ষে সমগ্র সংসার আবার প্রলয়ের সময় প্রত্যাবর্তন করে। বর্ণগন্ধময় জগৎকে স্বরূপতঃ মিথ্যা বলাই মিথ্যা; সেগুলোকে খণ্ডজ্ঞানের তথ্যাভূতরূপে মিথ্যা বলা চলে। এই জগতের কারণরূপে সচ্চিদানন্দ বা পূর্ণসত্তার যে-অংশ অবস্থিত তার নাম কালী বা শিব বা ঈশ্বর। সুতরাং বলতে হয় পূর্ণ সৎই ঈশ্বর, জীব, জগৎ ইত্যাদি রূপে প্রকাশিত হয়েছে। এবং পূর্ণসত্তের মধ্যেই আছে মহামায়াশক্তি অর্থাৎ অপ্রমেয় বা অসীম থেকে মেয় বা সীমারূপে প্রকাশিত হওয়ার প্রচণ্ড আবেগ। রামকৃষ্ণ তাই বলতেন: "তিনি ঈশ্বর, মায়া জীব জগৎরূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন। তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়েছেন। আদ্যাশক্তি ও ব্রহ্ম অভেদ।"

(২) বিশ্বকে চার রকম চোখে দেখা যায়। বাহ্যতঃ এই পরিদৃশ্যমান প্রকাশিত জীবজগৎ সমন্বিত বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মের ক্ষর বা অপর রূপ। এই বিশ্বরূপ দুর্বোধ্য ও রহস্যময় এর অন্তর্গত তথ্যগুলোর মধ্যে সংগতি এবং সামঞ্জস্য নেই। এই রূপ মূলতঃ মেয়। মাপ ও মানের অভ্রান্ত প্রয়োগের ফল আধুনিক বিজ্ঞান। মেয় ব'লেই এই রূপকে মায়া (মীয়তে যেন) বলে। বিশ্বের দ্বিতীয় রূপ হচ্ছে তার অমেয় রূপ, এই দৃষ্টিতে সর্বশক্তির নিদানস্বরূপ হচ্ছে ঈশ্বর, তিনি এই বিশ্বের মধ্যে ওতপ্রোতোরূপে অনুস্যূত হ'য়ে আছেন। মেয় ও মায়ার জগৎ এই অপ্রমেয় ঈশ্বর শক্তির প্রকাশ। ঈশ্বরই হচ্ছেন আদ্যাশক্তি অর্থাৎ মৌলিক শক্তি; তাকে মাপা যায় না; ঈশ্বরসম্বন্ধে কোনও বিজ্ঞান সম্ভবপর নয়। তৃতীয়রূপ হচ্ছে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত রূপ। প্রকাশের মধ্যেই পরব্রহ্মের সমস্ত সত্তা নিঃশেষিত হয় না। ঈশ্বর, জীব জগৎ, সবরকম প্রকাশ; আকার ও গুণের অধিক সত্তাও আছে। ব্রহ্মের এই রূপ হচ্ছে নির্গুণ, নিরাকার, অব্যক্তিক ও চিৎস্বরূপ। এই তৃতীয়রূপের জ্ঞান হচ্ছে অদ্বৈতজ্ঞান। এ ছাড়া আর এক দৃষ্টিতে বিশ্বকে দেখা যায়। সেটা হল পূর্ণদৃষ্টি। পরমব্রহ্ম যিনি তিনিই এক সঙ্গে (১) নির্গুণ ব্রহ্ম (২) সগুণ ঈশ্বর ও (৩) তার

প্রকাশ ; ব্রহ্মই বিশ্বাতীত সত্তা, ঈশ্বর, আত্মাশক্তি ও চেতনাচেতন বিশিষ্ট, বহু জীব ও বহু জড় পদার্থের প্রকাশমান ও প্রত্যক্ষ জগৎ। সত্তার সমগ্ররূপ হল ব্রহ্ম। এই পূর্ণ বা অখণ্ড সত্তার তত্ত্বই গোটা বেলের উপমা দিয়ে রামকৃষ্ণ বুঝাতে চেয়েছেন। এই মতে, সত্তার একাংশ মাত্র পরম ব্রহ্ম নয়; সত্তার সমগ্রটা নিয়ে পরমব্রহ্ম। এই জ্ঞানকেই রামকৃষ্ণ বিজ্ঞান বলতেন। বিজ্ঞান শব্দের সেই জন্য দুটো অর্থ। এক অর্থে অপর ব্রহ্মের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হচ্ছে বিজ্ঞান, এর আধুনিক নাম সায়েন্স। এই বিজ্ঞানকে অপর-বিজ্ঞান বলা চলে; এইটে হল নিম্নতম জ্ঞান। দ্বিতীয় অর্থে বিজ্ঞান হল ব্রহ্মের স্বরূপের পূর্ণ বা বিশেষ জ্ঞান ; পরমসত্তার চতুর্থ রূপের জ্ঞান ; এই বিজ্ঞানকে পরবিজ্ঞান বলতে হয় ; এবং এইটেই হল পরম বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। রামকৃষ্ণের দর্শনে পূর্ণ ও অখণ্ড সত্তাই হল পরমবস্তু ; সমগ্রই ব্রহ্ম ; পরমসত্তা সমগ্রের একাংশমাত্র নয় অদ্বৈতজ্ঞান একাংশের জ্ঞান মাত্র।

ওরে বৃষ্টি তুই সৃষ্টির চেতনা নিয়ে আয়

শ্রীশিশির মুখোপাধ্যায়

ওরে বৃষ্টি তুই সৃষ্টির চেতনা নিয়ে আয়
ও মেঘ তুই ময়ূর পঙ্খী হবি ?
আকাশ পটে বাতাস হোল ঢেউ আর
হালে পানি তুই দেখিস পাবিই পাবি।

সজনে গাছে ভিজবে বলে কাকটা।
ডানা মেলে আকাশটাকে ঢাকছে
চড়ুই গুলো এধার ওধার করছে হুড়োহুড়ি
কতই কথা কিচির মিচির ডাকছে।

ওরে বৃষ্টি তুই সৃষ্টির চেতনা নিয়ে আয়
ও মেঘ তুই ময়ূর পঙ্খী হবি ?
আলসে বেয়ে আইভি লতার গাছটায়
ঘুম জড়ানো শান্তি পরশ দিবি।

ওদিক পানে মুখ ফিরিয়ে কাজের ছলে দেখিস দিকি
দীন ঘরণী সজল চোখে আকাশ পানে চায় ;
বীজতলার বীজগুলো সব পায়রা তিতির মুখে
ওরে বৃষ্টি তুই সৃষ্টির চেতনা নিয়ে আয়।

এমন কেন হয়

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রায়

তোমায় দেখে এ মন আমার এমন কেন হয়,
প্রথম দেখেই ভাবছি যেন অনেক পরিচয়।
দূর আকাশের চাঁদ দেখেছি, ফুল দেখেছি গাছে—
তাদের চেয়ে কোন্ মাধুরী আছে তোমার কাছে ?

তোমায় যেন এদের চেয়ে অনেক ভালো লাগে,
এমন কথা বলবে না কেউ তোমায় দেখার আগে।
তাইতো ভাবি এমন দেখার কিসের প্রয়োজন—
দূরে থাকার জ্বালায় যদি জ্বলবে এ জীবন।

অনেক কথা বলবো ভেবে ভাবছি কি যে বলি,
এ পথ দিয়ে চলবো ভেবে, ওপথ দিয়ে চলি।
একটি কথাই শিখেছি আজ তোমায় ভালোবেসে—
মনের মানুষ দেয়না ধরা সবার কাছে এসে।

হয়তো কত জনম যাবে, হয়তো দুজনার—
এমন করে হয়তো দেখা মিলবে নাকো আর।
এ মন আমার হারিয়ে ফেলে ভাবছি শুধু তাই—
অধিকারের কোন দাবীতে তোমার কাছে চাই।

এই তো জীবন

শ্রীযমুনা ঘোষ

"ধর! ধর! ধর! আমায় মারলে। আমায় মারলে। দেখ, দেখ, মারছে, মারছে। না! না! আমি আর করব না। আমাকে মের না! আর আমাকে মের না। নয়নতারা, মা, মা, নয়নতারা, ও নয়নতারা, মা, মা, দেখ, দেখ আমায় মারছে। কে? কে তোমরা? আমাকে অমন করে মারছ? মের না! কৈ, কৈ, আমার নয়ন তারা কোথায়? কোথায় আমার মা, নয়নতারা, না, না, ভু'লে গেছি—আমার মা কোথায়? হাঃ! হাঃ! হাঃ! আমি এখন গান গাইব। না, না, কাঁদব না? কাঁদব কেন? কিসের জন্য আমি কাঁদব—আচ্ছা, তোমরা আমাকে কেউ দেখবে না! দেখি, আমায় কেউ দেখে কি না! যিনি দিনরাত্রির দেবতা, আমি তাকেই জানাব! সেই তিনিই আমায় দেখবেন। তিনিই আমার সব শাস্তি করে দেবেন।"

বৌমা, ও বৌমা! দরজা খোল—আমি এসেছি। আমি তোমার মা নয়নতারা। দরজা খোল—

—ঐ আবার এসেছে! আবার এসেছে আমায় মারতে, না! না! আমি খুলব না! আমি খুলব না দরজা—ও নয়নতারা ওমা দেখ, দেখ—আবার কারা এসেছে—আমায় মারবে—আমি খুলব না! খুলব না দরজা।

—ও বৌমা, আমি, আমি তোমার নয়নতারা। তুমি দরজা খোল। বলিয়া তিনি দরজাতে করাঘাত করিতে লাগিলেন।

উন্মাদিনী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আমি দরজা খুলব না। আমায় তোমরা মারবে। না! না! না, খুলব না"—

—'বৌমা, লক্ষী মা আমার, দরজাটা খুলে দাও, আমি যে তোমার মা নয়নতারা—তোমার শাশুড়ী—লক্ষীমা আমার, ওঠ মা—একবার তুমি দরজাটা খুলে দাও—তুমি যে এতক্ষণ আমায় ডাকছিলে—আমি এসেছি—আমি তোমার মা, নয়নতারা"

"এঁ্যা! মা তুমি"—বলিয়া উন্মাদিনী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া শাশুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কহিল,—"দেখ মা, আমায় কি রকম করে মেরেছে—আমার গায়ে সব ব্যথা হয়ে গেছে—তুমি দেখ"—

শাশুড়ী বধূকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আঁচল দিয়া তাহার চোখমুখ মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, ছিঃ! কেঁদ না মা—কেউ তোমায় মারবে না। তুমি ওঠ—চলো আমার সঙ্গে—নীচে চলো—স্নান করবে, কাপড় ছাড়বে।

—না! না আমি যাব না। আমায় আবার ধরবে, ওরা—আবার মারবে—আমি যাব না—

—না মা, তোমায় কেউ মারবে না। তুমি চলো—চলো আমার সঙ্গে। বলিয়া তিনি বধূর হাত ধরিয়া নীচে নামাইয়া আনিলেন।

নয়নতারা নীচে আসিয়া বড় চৌবাচ্চা থেকে জল তুলিয়া বধূর মাথায় ঢালিয়া দিলেন। তাহার পর এক-খানি পরিষ্কার কাপড় তাহ'কে পরাইয়া ঠাকুরঘরে লইয়া আসিলেন। কহিলেন, "এইখানে বসো—ঠাকুরকে প্রণাম করো।"

উন্মাদিনী অমনি মাথায় কাপড় দিয়া গলায় আঁচলটা জড়াইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া হেঁট হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিল। প্রণাম সারিয়া উঠিয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শাশুড়ী বড়ঘটীতে করিয়া কাঁচা দুধ ও মিছরীর জলের

সরবৎ করিয়া আনিয়া বধূকে কহিলেন, এই নাও, বৌমা, সরবৎটা খেয়ে ফেলো—

আজ্ঞাবহ গোলামের মত বৌমা সরবৎটা খাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা আমি গান গাইব—

"গাও"। বলিয়া শাশুড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ পর একটা ঔষধের ট্যাবলেট লইয়া আসিয়া জলে গুলিয়া কাঁচের গ্লাসে করিয়া উন্মাদিনীকে খাওয়াইয়া দিলেন।

—বৌ আবার কাঁদিয়া উঠিল। "ও মা! দেখ, দেখ আবার সব কি বলছে—তুমি শোন, এসে দেখ—

—না মা, তোমায় কেউ কিছু বলবে না।

—না! না! আমি এখান হতে যাব না। আমি তোমার কাছে থাকব—

—আচ্ছা, তুমি এইখানেই ঘুমোও।

পাগলিনী শুইয়া পড়িতেই গিন্নী ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

* * *

কর্ত্তা নলিনবাবু বাজার আনিয়া ডাক দিলেন,—কই গো—তোমরা সব কোথায় গেলে—! ছোট বৌমা, ও ছোট বৌমা, তোমার, মা কোথায় গেল—

শিবানী তাড়াতাড়ি বঁটি রাখিয়া মাথায় কাপড় দিতে দিতে আসিয়া কহিল, "আমায় ডাকছেন বাবা"—

—হাঁ৷ তোমার মা কোথায় গেলো? এই বাজার এনেছি দেখ—ডাক তোমার মাকে—

—মা এখন দিদিভাইকে ঘুম পাড়িয়ে ওদিকে গেছেন।

—পাগলীটা তাহলে ঘুমিয়েছে—! উঃ! কাল শেষরাত্রি থেকে কি চীৎকারই না করতে আরম্ভ করেছে, মানুষকে জ্বালিয়ে খেলে—বলিয়া বাজারের ঝুড়ি হইতে মুখ তুলিতেই দেখিলেন গৃহিণী তাহার দিকেই আসিতেছেন। কাছে আসিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায়, গেছলে—? পাগলীটা কোথা? ঘুমিয়েছে তো?

—আবার তুমি বৌমাকে পাগলী বলে কথা কইছ—তোমায় না আমি বারণ করে দিয়েছি, বৌমাকে কেউ পাগলী বলে কথা কইবে না। তোমাদের জন্যেই তো ওর রোগ আরও বেড়ে গেছে।

কর্ত্তা কহিলেন,—"আমাদের জন্যে বেড়ে গেছে—

দৃঢ় স্বরে গিন্নী উত্তর দিলেন হাঁ৷। তোমাদের জন্যই—তোমার উপর ভার দিয়েই বৌমাকে রেখে উত্তরপাড়া গেছলুম বাবার মৃত্যুর সময়—

কর্ত্তা কহিলেন—ওর এখন শাসনের প্রয়োজন। শাসন না করলে ওর পাগলামী কমবে না। মানুষকে একেবারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে—

তীব্রস্বরে গিন্নী কহিলেন, কারুর ক্ষমতা নেই আর আমার বৌমাকে শাসন করবে বা তার চুল স্পর্শ করবে—তোমরা কেবল জান শাসন করলেই পাগল ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু তা হয় না। পাগলকে ঠাণ্ডা করতে হলে চাই ধৈর্য্য, চাই স্নেহ, মমতা। মায়া, দয়া না থাকলে পাগল ঠাণ্ডা হয় না। আগুন নেবাতে হলে প্রয়োজন হয় জলের।

—আক্ষেপের স্বরে কর্ত্তা কহিলেন,—"এতবড় পাষণ্ড। আমার এত বড় শত্রু ছিল, সে নিজে চলে গেল, আমাদেরও শাস্তি দিয়ে গেল।"

এমন সময় একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া কহিল,—দিদা, আমি—মার কাছে যাব"—

—যাবে বাবা! তুমি এসো, আমার কোলে এসো, খোকন তুমি দুধ খেয়েছ? জিজ্ঞাসা করিয়া গৃহিণী তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

—না দিদা, আমি দুধ খাইনি।

—ছোট বৌমা, তুমি আমার খোকনকে এখনও দুধ দাওনি—খোকনের দুধ দিয়ে যাও।

—আমি দুধ খাব না। আমি মার কাছে যাব।

—যাবে বাবা মার কাছে। মা যে এখন ঘুমুচ্ছে, মার অসুখ করেছে—তুমি এখন আমার কাছে থাক—বলিয়া তিনি নাতিকে কোলে লইয়া ভাঁড়ার ঘরে বসিয়া নীরবে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। উঃ! কত দুঃখ, কত ব্যথাই তুমি দিয়েছ দেবতা—

শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুকণায় নয়নতারার বক্ষ আবরণি সিক্ত করিয়া তুলিল। আজ সে জীবনসায়াহ্নে উপস্থিত হইয়াছে, তবু সুখের মুখ দর্শন হইল না। কত দুঃখই না নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। মেঘাবৃত

আকাশের চিকিমিকি বিদ্যুতের আলো দু'দিন দেখা দিয়েছিল, মাত্র কয়েকটা বছর। কিন্তু বিধাতা তাহাও সহিতে পারিলেন না।

সে আজ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা।

রজত আই, এ, পড়িতে পড়িতে ছাড়িয়া দিয়াছে। কারণ টিউশনী করিয়াও আর পড়ার খরচ চালাইতে পারে না। যাহা কিছু উপার্জ্জন করে সামান্য মাত্র পড়াইয়া মাসকাবারে সেটা জননীর হাতেই তুলিয়া দেয় সংসার চালাইবার জন্য। পিতা স্বাদেশিকতার জন্য আজ তিন বৎসর জেল বাস করিতেছেন। সংসার একেবারে অচল। আপনার কলেজ এবং কনিষ্ঠের স্কুল এবং সংসার এই দুর্দ্দিনের বাজারে বোঝা হইয়া উঠিয়াছে। বহু সন্ধান করিয়াও যখন সামান্য একটি চাকরী কোথাও জুটাইতে পারিল না, অবশেষে ছোট্ট একটি কাঠের ব্যবসা আরম্ভ করিল। এখন তাহা বিশালকায় হইয়া উঠিয়াছে।

সংসারে আজ দুঃখের অবসান হইয়াছে দেখিয়া জননী পুত্রকে বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। গরীবের ঘরে বিধবার একটি মাত্র সন্তান। মেয়েটির রূপ তেমন না থাকলেও গুণ আছে অসাধারণ।

যোগমায়ার পদার্পণে নয়নতারার সংসার উথ্‌লাইয়া উঠিল। মেয়েটি অত্যন্ত ধীর, নম্রপ্রকৃতির স্বল্পভাষী এবং সুনিপুণ, কর্ম্মশক্তিও অপরিমিত। নয়নতারাকে সংসারের আর কোন কর্ম্মই করিতে হয় না। সকলেরই মুখে মুখে জোগাইয়া থাকে প্রয়োজনীয় বস্তু।

শাশুড়ী বলিয়া থাকেন, বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। আজ আমার অভাব মোচন হয়েছে। রজু আমার সব পূর্ণ করেছে। সে বেঁচে থাক। তার পয়সাতেই তো আজ ভাই বিলেতে বসে আছে। বৌমা আমায় বলেছে, 'মা আপনি ৺দুর্গাপূজা করুন, আমি আপনার সব কাজ করে দেব। আপনার কোন ভাবনা নেই—

তা শাশুড়ীকে দিয়ে যোগমায়া চারিবৎসর পূজাও করাইয়াছিল।

একদিন স্বামীস্ত্রী বসিয়া গল্প করিতে করিতে এক সময় যোগমায়া বলিল—"আচ্ছা, তুমি দিনরাতই কাজ নিয়ে থাক। একবারও একটু বিশ্রাম করো না। এমন কি আমার কাছেও আস না। আমার কি ইচ্ছে করে না যে তুমি এসে আমার কাছে একটু বসো বা গল্প কর? আর যদি বিশ্রাম না করো তবে শরীর থাকবে কেমন করে?—আমি বলি কি, তুমি দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে কোন বিদেশে চলো। এক সঙ্গে থাকাও হবে, আর মনেরও পরিবর্ত্তন হবে, হাওয়াবদলও হবে।

পত্নীর পিঠের উপর হাতটি রাখিয়া রজত উত্তর দিল— কিন্তু কি করে যাই বলো মায়া—কত কাজ। যদি আমি না থাকি—না দেখি, তাহলে সব চুরিতে আমার লোকসান করে দেবে।

অভিমানের সুরে যোগমায়া কহিল—"তাহলে তোমার ব্যবসাই হলো শরীর অপেক্ষা বড়। যদি শরীরই ঠিক না থাকে, তবে ব্যবসা চালাবে কি করে—? আর সেইটাই কি তোমার স্ত্রী, পুত্র—সেই জন্য তার কাছেই থাক, দিবারাত্র।

স্ত্রীকে আদর করিয়া নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া রজত কহিল,—না! না। তা কি কখনও হয়! তুমিই যে আমার সবস্ব—আমার লক্ষ্মী। তোমার জন্যেই তো আজ আমার এত নাম ডাক—তোমায় কি কোন মুহূর্ত্তে অবহেলা করতে পারি—

স্বামী স্ত্রীর মধুর মিলনে বাধা পড়িল। চাকর আসিয়া কহিল,—দাদাবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন।

"যাচ্ছি।" বলিয়া স্ত্রীর পানে চাহিয়া কহিল, "মা কেন ডাকছে, একবার শুনে আসি" বলিয়া মাতৃসন্নিধানে সে চলিয়া গেল

—মাতৃকক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—আমায় ডাকছ মা—

"হাঁ। আমার কাছে একটু তুমি বসো। বলিয়া তিনি বিছানার উপর একটু সরিয়া শুইয়া পুত্রকে বসিতে স্থান দিলেন। তারপর কহিলেন—দেখ, আজ আমার মনটা কি রকম করছে, কিছু ভাল লাগছে না। তাই তোকে ডাকলুম। অজানা আশঙ্কায় বড় ভয় করছে।

—ও কিছু নয়। একলা শুয়ে আছ। আর মন খারাপের কি আছে। প্রভোৎ বিলেত হতে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরেছে। এখানে প্র্যাকটিস করছে—তাতেও মন কেমন করছে? ও কিছু নয়, তুমি ঘুমিয়ে পড় মা।" বলিয়া রজত চলিয়া গেল।

রাত্রে স্বামী-স্ত্রী ঘুমাইতেছে, এমন সময় টেলিফোন আসিল—তাহার কাঠের গোলায় আগুন ধরিয়াছে। রজত তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাঞ্জাবীটা গায়ে দিয়া চটী পায়ে দিতে যাইতেছে। যোগমায়া তাহার হাতটা চাপিয়া ধরিল। কহিল,—"ওগো, তুমি যেও না। আমার বড় ভয় করছে। তুমি আগুনের কাছে যেও না—

—বাঃ। আমার ব্যবসা পুড়ছে, আর আমি যাব না। এক্ষুণি কত টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে, সমস্ত কাগজ পত্র আমার সেইখানেই আছে। বলিয়া সে আর কাল বিলম্ব না করিয়া গ্যারেজ হইতে গাড়ী বাহির করিয়া নিজেই ড্রাইভ্ করিয়া চলিয়া গেল।

সেখানে গিয়া দেখিল লোকজন সব জিনিষপত্র সরাচ্ছে। কিন্তু অনল তাহার লেলিহান জিহ্বা দিয়া সমস্তই গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়াছে। দমকল কয়েকখানি আসিয়াছে কিন্তু তাহাকে আয়ত্তে আনা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। রজত স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতেছে, এমন সময় একটি ভোজপুরী কর্ম্মচারীর স্ত্রী তাহার পায়ের উপর আসিয়া পড়িল,—বাবুগো,—আমার ছেলেটা ওই ঘরে আছে পুড়ে গেল গো—বাহির করে দিন গো—ছেলে আমার পুড়ে গেল গো—বলিয়া সে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রজত তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল—"আমি তোমার ছেলে এনে দিচ্ছি—তুমি কেঁদ না, চুপ করো বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ আগুনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি করেন, কি করেন—যাবেন না, চলে আসুন—"

"আর যাবেন না।"—ততক্ষণে সে ভিতরে প্রবেশ করিয়া পুত্রটিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া কোলে তুলিয়া যখন আসিল, তখন তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া গিয়াছে।

তাহাদের উভয়কেই তাড়াতাড়ি হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল। শিশুটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেল এবং ইহারই দিনদুই পরে রজতও এই মায়ার সংসার ত্যাগ করিল।

স্বামীর শোকটা যোগমায়া কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রমে মস্তিষ্কবিকৃতির লক্ষণ দেখা দিতে লাগিল। শাশুড়ী অনেক সান্ত্বনা দেন, কিন্তু সকলই মরুতে বীজ বপন করা হয়। অবশেষে একদিন তাহাকে লইয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইল। বধূ কিন্তু কিছুতেই সম্মত হইল না। শাশুড়ীকে জানাইয়া দিল, স্বামীর ঘর ছাড়িয়া কোথাও সে নড়িবে না।

ডাক্তার মতামত দিল,—শোকটা বড্ড বেশী আকস্মিক পেয়েছেন কিনা, সেইজন্য দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সেটা সরাতে পারছে না। প্রচুর ঘুম, এবং আনন্দই হলো এঁর ঔষধ এবং পথ্য—

*　　　*　　　*

চিন্তার স্রোতে বাধা পড়িল। কনিষ্ঠ পুত্র প্রদ্যোৎ আসিয়া ডাক দিল,—"মা কোথায়—মা"—

রান্নাঘরে ব্যঞ্জন কষিতে কষিতে শিপ্রা উত্তর দিল,—"মা ভাঁড়ার ঘরে।

"মা, মা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রদ্যোৎ ভাঁড়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল।

কক্ষে প্রবেশ করিয়াই অভিযোগের সুরে কহিল,—তুমি ওখানে বসে আছ—আর আমি তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

জননী উত্তর দিলেন,—"কেন আমায় কিসের প্রয়োজন"—

—একি! মা—! তুমি কাঁদচ—না! তোমায় আর কাঁদতে হবে না, আমি তোমার সব দুঃখ মোচন করবার ব্যবস্থা করেছি। একটা কথা আছে মা—

—কিসের কথা—বলিয়া তিনি অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিয়া পুত্রের পানে চাহিলেন।

—আমি মা একটা ব্যবস্থা করে এসেছি।

—কিসের ব্যবস্থা—?

—বাঃ! তুমি কিছু জান না—! বাবা তোমায় কিছু বলেনি—। যাকগে আমি বলি শোন—উঃ! সে কত কাণ্ডকারখানাই না করে তবে আজ সব কিছু ঠিক হলো।

—আমি বাপু তোমার অত হেঁয়ালীর কথা বুঝি না। কি হয়েছে! কিসের ব্যবস্থা তাই বলো আমায়—

—কেন! বৌদিকে রাঁচী পাঠাবার সমস্ত ঠিক করে এলুম। কালই নিয়ে যাওয়া হবে। কোন কষ্ট হবে না। ফার্ষ্টক্লাসে থাকবে। এখান হতে মাসে মাসে তিনশো করে

টাকা পাঠান হবে। বাবাও বলেছেন, যা হয় একটা ব্যবস্থা করো প্রদ্যোৎ তাড়াতাড়ি করে—আর তো পারা যায় না। তাই আমি এখন তোমায় বলতে এলুম।

ক্রুদ্ধ শার্দ্দূলের মত তীব্র গর্জ্জন তুলিয়া নয়নতারা কহিলেন,—"কি! এতবড় স্পর্দ্ধা তোদের! তোরা ওকে রাঁচী পাঠাবি! কেন, আমি কি মরে গেছি! বলি, কার পয়সাতে আজ এখনো নবাবী করছিস্! কার পয়সাতেই বা মুখে অন্ন উঠছে -তা কি জানিস্ না। কেন, নিষ্কণ্টক পুরী হয়ে সুখে রাজত্ব ভোগ হবে। আর এই দুগ্ধপোষ্য শিশুটার উপর অত্যাচার করে মেরে ফেলবে—বাপ-বেটাতে মিলে সেই পরামর্শই চলছে বুঝি দিবারাত্র—। তাই রাঁচীর ব্যবস্থা হয়েছে। শুনে রেখে দাও, যতক্ষণ আমি বেঁচে থাকব, ওকে কেউ কিছু করতে পারবে না। আর সুখের রাজত্ব ভোগও হবে না।

কেন—এখানে কি চিকিৎসা হয় না, যে রাঁচী পাঠান হবে। কত অসুখের চিকিৎসার ব্যবস্থা এদেশে আছে, আর পাগলের চিকিৎসা এখানে নেই? কেন সেটা কি অসুখ নয়? মাথার অসুখ বুঝি অসুখ নয়?—আমি ওর চিকিৎসা করাব। দেখি আমার বৌমা ভাল হয় কি না—। আজ ওর জগতে কেউ নেই বলে কি যথেচ্ছাচার হবে ওর উপর—। মনে রেখে দাও তোমরা, বৌমার কেউ না থাকলেও, সে পথের ভিখারী হলেও, আমি আছি। আমিও বাপের বেটী—

* * *

সেদিন দুর্গাষষ্ঠী। চারিদিকেই ঢাক ঢোলের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে। যোগমায়াকে তাহার ঘরে বন্ধ করিয়া শাশুড়ী আসিয়া নিজের ঘরে প্রবেশ করিল। দেখিল, শিবানী তাহার বিছানা করিতেছে। কিছুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তারপর বধূকে লইয়া 'গল্প' করিতে বসিলেন—যোগমায়া তাঁহাকে দিয়া কেমন করিয়া পূজা করাইয়াছিল। আজ দুর্গাষষ্ঠী। তাহার বুকের ভিতরটা যেন কেমন করছে—এই ঢাকের বাদ্য শ্রবণে। একদিন তাহার বাড়ীও এইরূপ উৎসব মুখরিত হইয়া উঠিত। আর আজ কিনা তাঁহার সেই বৌ'এর কি দুঃসহ অবস্থাই না হইয়া গিয়াছে। বলিয়া চোখের জল মুছিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া নীচে নামিতে গিয়া সিঁড়িতে পা পিছলাইয়া একেবারে কয়েক ধাপ নীচে গড়াইয়া পড়িয়া গেলেন। আঘাতটা বুকেই লাগল বেশী।

শিবানী চীৎকার করিয়া উঠিল,—মা পড়ে গেছেন—সকলেই ছুটিয়া আসিল। তাহাকে তুলিয়া আনিয়া ঘরে শোওয়াইয়া দিল। ডাক্তার আসিল, মন্তব্য করিল, বুকে আঘাত লেগেছে, তিন দিন না কাটলে কিছু বলা যাব না।

নয়নতারা চোখ মেলিয়াই প্রথমে কহিলেন—আমার যোগমায়া—তাকে তোমরা দেখ। সে যেন ঠিক সময়ে খেতে পায়। সে যে আমার সাক্ষাৎ যোগমায়া—তাকে আমার কেউ চিনতে পারলে না।

৺মহানবমীর দিন ভোর বেলা নয়নতারা শিবানীকে কহিল,—ছোট বৌমা, আমার যোগমায়াকে একবার তুমি এনে দাও। তাকে আমি একবার দেখব—সে কেমন আছে—

শিবানী উত্তর দিল, "সে যে কাল সমস্ত রাত্রি ঘুমোয়নি মা—কেবলই চীৎকার করেছে। এখন কাঁদছে—যদি আমি কাছে যাই, তাহলে আমায় হয়ত মারবে—

শাশুড়ী কহিলেন,—"না তুমি একবারটি তাকে এনে দাও—প্রদ্যোৎকে বলো, তাকে আনতে। আমার কাছে এলেই সে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে—

অনেক বলা কওয়ার পর কনিষ্ঠ পুত্র তাহাকে মায়ের কাছে আনিয়া দিল।

আলুথালু বেশে বধূকে দেখিয়া শাশুড়ী কহিলেন,—"এসো! এসো। এসো আমার মা এসো—তুমিই যে আমার সাক্ষাৎ দুর্গা! তুমি আমার কাছে এসো—এখানে বসো, বলিয়া তিনি নিজের বালিশের পাশে তাহাকে বসাইলেন।

মন্ত্রপূতবারি সিঞ্চন করিলে মানুষ যেমন তাহার বশীভূত হইয়া যায়, সেই রকম বশীভূত হইয়া উন্মাদিনী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া দুইটি পা ধরিয়া উপুড় হইয়া পড়িল। যেন বাঁধন হারা তটিনীর মত অশ্রুরাশি দিয়া শ্বশ্রুমাতার পদধূলি ধৌত করিয়া দিতে থাকিল।

গিন্নীও বধূর হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া বোধ হয় পরম স্নেহের পুত্রের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিলেন।

দেবর যোগমায়াকে সজোরে আকর্ষণ করিয়া তাহার কক্ষে পুরিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল।

কর্তা কহিলেন, প্রদ্যোৎ তোমার তো সমস্ত বন্দোবস্তই

আছে, কাল ফিরে এসে একাদশীর দিন ওকে পাঠিয়ে দাও। তা না হলে,তোমার আর কাজকর্ম হবে কি করে—

পুত্র উত্তর দিল,—হ্যাঁ, তাই করতেই হবে। আর এখন তো কোন বাধাই রইল না।

পাড়া-পড়শি সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। হ্যাঁ, সতীলক্ষ্মী ছিল বটে! বৌমার কি যত্নই না করত—অমন উন্মাদিনী কিন্তু ওর কাছে যেন একেবারে কলের পুতুল। এইবার বৌটার কি দুর্দশাই না হবে।

অপর একজন কহিল,—"না, না, পাগলীকে পরশুদিন রাঁচী পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

জননীর শেষকৃত্য সারিয়া সকলেই ফিরিল। বিকালে শিবানী স্বামীকে কহিল, কাল থেকে দিদিভাইকে কিছু খাওয়ান হয়নি, সেই মার হাতে যা সরবৎ খেয়েছেন।

প্রদ্যোৎ কহিল, তাও তো বটে। কি করেই বা খাওয়ান যাবে—। তা তুমি একবার চেষ্টা করে দেখলে না কেন—

"বাবারে! আমি পারব না পাগলের কাছে যেতে।

স্বামী উত্তর দিল,—"কাল তো পাঠিয়ে দিচ্ছি। একটা রাত্রি না হয় নাই খাওয়া হলো—আর চীৎকার করেনি তো—

শিবানী উত্তর দিল,—'না মাকে যখন তোমরা নিয়ে যাও, জানালা দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। তারপর আর কোন সাড়াশব্দ পাইনি—

পিতা আসিয়া কহিলেন,—হ্যাঁরে, পাগলীকে কিছু খেতে দিয়েছিস তো—

না! কি করে দেওয়া হবে! কিছুতেই পারা যাচ্ছে না।

"মরে যাবে যে। একবার চেষ্টা করে দেখ—উন্মাদিনীকে আহার করাইবার জন্য যখন স্বামী-স্ত্রী খাদ্য লইয়া ঘরের দরজা খুলিয়া স্তম্ভিত হইয়া দেখিল কখন সে মা নয়নতারার ডাকে স্বামীর সান্নিধ্য লাভের জন্য মহাযাত্রা করিয়াছে!

দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ-স্মরণে

শ্রীসুধীর গুপ্ত

দর্শন-গহনারণ্য ভীষণ—সুন্দর;
বঙ্কিম—বন্ধুর বর্ত্ম বিভ্রান্তি জাগায়;
পদে পদে পান্থ-প্রাণে
চমক লাগায়;
চিত্ত-স্থৈর্য্য-সংরক্ষণ সেথা যে দুষ্কর।
তবু পান্থ মুগ্ধ হয়; পন্থা নিরন্তর
রহস্য-জটিল যত ছায়ায় মায়ায়।
কী আশ্চর্য্য! জলদর্চ্চি মাঝে মাঝে যায়

সহসা সুদীপ্ত করি' অরণ্য দুস্তর।
সেই মহারণ্যে তুমি বিমুগ্ধের মত
শত শত উপপথে—পথে আজীবন
আন্দোলিত-মহানন্দে চলেছো সতত
অরণ্য-মর্ম্মরে রচি' রহস্য-স্বপন।
এক যেথা মত—পথ—সত্য—
মিথ্যা যত,
মৌন বিচরণই সেথা 'ব্রজেন্দ্র'-লক্ষণ।

রেলের রাত্রি

—শ্রী·মঃ·চঃ

যাত্রী বোঝাই ট্রেণ ছুটে চলেছে ষ্টেশন থেকে ষ্টেশনে উদ্দাম গতিতে। ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার আশেপাশের দ্রুত অপসৃয়মান পথে, প্রান্তরে, পুষ্করিণীর ঘাটে ঘাটে। রাত্রি এল নেমে। কামরায় কামরায় জ্বলে উঠল বৈদ্যুতিক আলো, ছড়িয়ে পড়ল তার কিছুটা অংশ তির্য্যক্ ভাবে কামরার গরাদ লাগান জানালার বাইরের জমাট অন্ধকারের বুকে —যেন ক্ষণিকের জন্যেও আলোকের স্পর্শ লাগিয়ে দিতে চায় অন্ধকারে প্রেতের মত সরে যাওয়া গাছপালার গায়।

আপনি যে কামরায় আছেন সেটির মধ্যেও ঘনিয়ে এল অন্ধকার রাত্রির আগমনে। কোনও এক যাত্রী উঠে হয়ত বৈদ্যুতিক আলোকের সুইচ্ টিপলেন কামরাটিকে আলো-কোজ্জ্বাসিত করবার জন্যে। সুইচ্ টেপার আওয়াজ হল 'খট' করে,—আলো কিন্তু জ্বলল না! অন্ধকার যেন আরও চেপে বসল কামরার মধ্যে। উচ্চকিত, বিরক্ত কয়েকটি কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ল অন্ধকারের মধ্যে—"কি হল মশাই, আলো জ্বলে না কেন?" "আরে, ভাল করে জ্বালুন না" —আর ভাল করে জ্বালুন না। যতবারই জ্বালা যায় সেই খট্ খট্ আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই হয় না। "কোথায় আলো,কোথায় আলো"—কোরে 'ড্রেন্ পাইপ' ও ছুঁচাল জুতা পরা ফক্কড় কোনও ছোকরা হয়ত দু'লাইন গানই গেয়ে ফেলল, অন্ধকারের সুযোগে দরজার কাছে বসে থাকা তরুণীটির উদ্দেশে। দু'চারটে দেশলাইএর কাঠি জ্বলে উঠল অন্ধকারের মাঝে ফস্ ফস্ করে, ফক্কড় ছোকরা মুখ ঘুরিয়ে ফেলল চট্ করে, গম্ভীর নির্লিপ্ত মুখে তরুণীটি চেয়ে রইল জানালার বাইরের অন্ধকারের মাঝে, আর স্ত্রীকন্যাসমভিব্যাহারে সতর্ক যাত্রীর হাতের টর্চ্চ অন্ধকারের বুক চিরে গিয়ে পড়ল বৈদ্যুতিক আলোকের স্থানে। বিস্মিত সকলে চেয়ে দেখল আলোর ডুমই হয়ত নেই যথাস্থানে, কাঁচের আধারও নেই, সুইচ্ থেকে যে তার থাকে সে তারও হয়ত নেই—শুধু রয়ে গেছে সুইচ্টাই! অনেক ক্ষেত্রে আবার সুইচও উধাও হয়ে যায়—লেগে থাকে শুধু কয়েকটা আঁচড়ের দাগ চৌর্য্যবৃত্তির সাক্ষ্য হয়ে।

তারপর হয়ত দেখা গেল সুন্দর ছোট্ট বৈদ্যুতিক পাখাগুলির দু'টি একটিও উধাও হয়ে গেছে—পড়ে আছে শুধু শূন্য গহ্বর? বাথরুমের জলের কলের কলটারই হয়ত পাত্তা পাওয়া গেল না, আর দামী ফোম্-রাবার আসনের রেক্সিন্ আচ্ছাদনের অনেকটাই হয়তো দেখা গেল কেউ ছিন্ন ক'রে নিয়ে গেছে তীক্ষ্ণ ছুরিকার নির্ম্মম আঘাতে।

কিন্তু, কেন এমন হচ্ছে—কেন, কেন? এ প্রশ্ন আজ জাগছে ভদ্রযাত্রীসাধারণের মনেই শুধু নয়, তাঁরা চাইছেন এর প্রতীকারও। কিন্তু এই নির্ম্মম, নিষ্করুণ, নিকৃষ্ট-স্তরের উচ্ছৃঙ্খলতা ও চৌর্য্যবৃত্তির প্রতিকার শুধু রেলওয়ে রক্ষীদের দ্বারা করা সব সময় সম্ভব নয়—এর জন্য চাই জনসাধারণেরও অকুণ্ঠ সহযোগিতা। এই উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে সর্ব্বসাধারণের সদিচ্ছা ও সহযোগিতা থাকলে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষও মনে করেন তাঁরা অচিরেই এই চৌর্য্যবৃত্তি দমন করে যাত্রীসাধারণের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক করে তুলতে পারবেন।

জনসাধারণের অবগতির জন্য পূর্ব্ব-রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন রেলওয়ে তথা জনসাধারণের সম্পত্তির কি বিপুল ক্ষতি সাধিত হচ্ছে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য। ১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৬৩ সালের মে মাসের মধ্যে—এই মাত্র ছয় মাসে পূর্ব্ব-রেলওয়ের হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগের যথাক্রমে ২৯৯,৯৮৬ টাকা ও ৪৩৭, ৩১৩ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। শুধু-মাত্র মে মাসেই হাওড়া ও শিয়ালদহ বিভাগে চুরি ও নষ্ট ক'রে যথাক্রমে ৬১,৮১২ টাকা ও ৬৬,৯১৬ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি করা হয়েছে।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথমে শিয়ালদহ বিভাগে বৈদ্যুতিক ট্রেন্ চালু হবার পর চরম উচ্ছৃঙ্খলতার

রেল কামরার ছিন্ন, উৎপাটিত ও বিনষ্ট মূল্যবান্ আসনগুলির এই দৃশ্য, পূর্ব্ব রেলপথের উচ্ছৃঙ্খলতা ও নাশকতার সাক্ষ্য বহন করছে।

ও সম্পত্তি নষ্টের যেন হিড়িক লেগে যায়। গত এপ্রিল মাসেই পূর্ব্ব-রেলওয়ের শিয়ালদহ বিভাগের ট্রেণগুলির থেকে ৬০,০০০ টাকা মূল্যের যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির ক্ষতি করা হয়।

ভাবলে সত্যই আশ্চর্য্য লাগে যে কি নিকৃষ্ট মনোভাব নিয়ে একটা সমাজ-বিরোধী শক্তি এই বিরাট ক্ষতি সাধন করে চলেছে। তাদের লোলুপ হস্ত থেকে রেলকামরার মূল্যবান্ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, শয্যাদ্রব্য, ফোম-রবারের বসবার আসন, রেক্সিনের চাদর প্রভৃতি কিছুই রক্ষা পাচ্ছে না। অথচ এইগুলি জাতীয় রেলকর্তৃপক্ষের অত্যন্ত গর্ব্বের সম্পত্তিই শুধু নয়, যাত্রীসাধারণের আরাম ও সুখ-সুবিধার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বিশেষ। তাই আজ পূর্ব্ব-রেলপথের কর্তৃপক্ষ এই উচ্ছৃঙ্খলতা, এই নাশকতা, এই চৌর্য্যবৃত্তি রোধের জন্য রেলপথের যাত্রীদের কাছে তাঁদের সর্ব্বপ্রকার সহযোগিতা চেয়ে আবেদন জানাচ্ছেন। আশা করি যাত্রীসাধারণও রেলকর্তৃপক্ষের এই আবেদনে সাড়া দিয়ে দেশের বুক থেকে এই জঘন্য অন্যায় ও অত্যাচার উৎপাটনে সহায়তা করবেন।
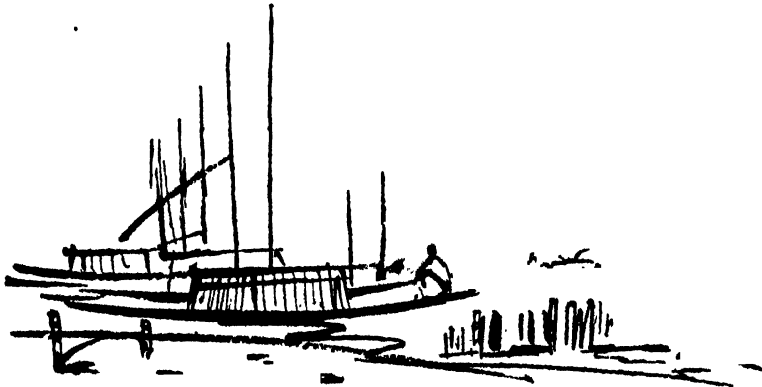
পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ পরিচালক ও পুরস্কার ॥

১৯৬৪ সালের চতুর্দ্দশ বার্লিন্ আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায় তাঁর "মহানগর" চিত্রটির পরিচ্ছন্ন পরিচালনার জন্য শ্রেষ্ঠ চিত্র-পরিচালকের সম্মান লাভ করলেন। অবশ্য এর আগেও তিনি দু'বার শ্রেষ্ঠ পরিচালকের আন্তর্জ্জাতিক সম্মান অর্জ্জন করেছেন। ১৯৫৫ সালে সান্-ফ্র্যান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে "পথের পাচালী" শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান পায় এবং পরিচালক সত্যজিৎ রায় পান শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার। ১৯৫৭ সালে আবার সান্-ফ্র্যান্সিস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রীরায় তাঁর "অপরাজিত" চিত্রের পরিচালক রূপে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর পরিচালিত "পথের পাঁচালী" ১৯৫৫ সালে সান্ সান্-ফ্র্যান্সিস্কো চলচ্চিত্রোৎসবে এবং "অপরাজিত" ১৯৫৭ সালে ভেনিস্ চলচ্চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ আন্তর্জ্জাতিক সম্মানে ভূষিত হয়ে ভারতীয় চিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। তাঁর পরিচালিত "দুই কন্যা" চিত্রের অন্যতম "পোষ্টমাষ্টার" চিত্রটিও ১৯৬৩ সালে মেলবোর্ণ চিত্রোৎসবে শ্রেষ্ঠ চিত্ররূপে 'গোল্ডেন্ বুমেরাং' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল। এছাড়া শ্রীরায়ের প্রায় প্রতিটি চিত্রই স্বদেশে-বিদেশে সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছে।

"মহানগর"-এর ভাগ্যে হয়ত আরও পুরস্কার লাভ ঘটতে পারে। মন্ট্রিল আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "মহানগর" আমন্ত্রিত হয়েছে। তাছাড়া শ্রীরায়ের এক মহান কীর্ত্তি "চারুলতা" চিত্রটিও ভেনিস্ চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠান হবে। আশা হয় "চারুলতা"ও আন্তর্জ্জাতিক সম্মান অর্জ্জন করতে পারবে।

সত্যজিৎ রায় আজ শুধু বাংলারই নয়, সারা ভারত তথা এশিয়ার মহা গর্ব্বের ও সম্মানের পাত্র। নব নব সৃজনীশক্তির প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করে চলেছেন নতুন নতুন চিত্র—নবীন ভাবে, নতুন টেক্‌নিকে, নব আঙ্গিকে। তাঁর জয়যাত্রা জগৎজোড়া হোক, তাঁর পরিচালনা প্রতিদ্বন্দ্বী বিহীন হোক, তাঁর প্রচেষ্টার পরিণতি সিদ্ধি ও সাফল্যে গরীয়ান হয়ে উঠে আমাদের অনন্ত গর্ব্বের বস্তু হয়ে উঠুক।

"চারুলতা" ও তাঁর আগামী চিত্রগুলিও আরও আন্তর্জ্জাতিক সম্মান ও পুরস্কার অর্জ্জন করে বাংলা তথা ভারতীয় চিত্রকে অধিকতর গৌরবে ভূষিত করে তুলবে বলেই আমরা আশা করে আছি।

খবরাখবর ঃ

"ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি" বাংলা চলচ্চিত্রশিল্পের সামগ্রিক পরিচয়বাহী একটি চলচ্চিত্র উৎসবের পরিকল্পনা করেছেন। দু-তিন মাসের মধ্যেই তাঁরা এই উৎসব আরম্ভ করতে চান। নির্ব্বাক যুগের শুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলা ছবির অগ্রগতির একটি পরিচয় যাতে দর্শকরা পান সেই ভাবে উৎসবসূচী গঠন করা হবে। উদ্যোক্তারা ইতিমধ্যেই ছবি সংগ্রহের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

* * *

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় সাধনার বিষয়বস্তু অবলম্বনে সম্প্রতি একটি প্রামাণিক চিত্রের দৃশ্য গ্রহণ শুরু হয়েছে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনদর্শন কীভাবে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র ও নেহরুর চিন্তাধারায় প্রভাব বিস্তার করেছিল তারও একটি পরিচয় এতে সন্নিবেশিত হবে।

মিহির ঘোষের প্রযোজনা ও সম্পাদনায় এই চিত্রটি পরিচালনা করছেন সুকুমার রায়চৌধুরী ও বীরেন বসু-মল্লিক। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন আমীর খাঁ

ও ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য্য। আর ধারাভাষ্য করছেন মমতাজ আমেদ।

* * *

'তারা চিত্রম'-এর প্রথম ছবি 'তারাপীঠ'-এর শুভারম্ভ অনুষ্ঠিত হয়েছে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে। অনন্ত চট্টোপাধ্যায়ের কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ভোলা আঢ্য। আলোকচিত্র গ্রহণ ও শিল্প-নির্দেশনায় রয়েছেন যথাক্রমে প্রবোধ দাস ও বটু সেন।

* * *

বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় অভিনেতা ধর্মেন্দ্রকে সর্বপ্রথম যে বাংলা ছবিটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে, সেটি হ'ল "নিউ ইণ্ডিয়া পিক্‌চার্স"-এর 'পরী' নামক চিত্রটি। এই সামাজিক চিত্রটি প্রযোজনা করছেন প্রণতি ঘোষ এবং তিনি স্বয়ং এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকাতেও অংশ নেবেন।

জরাসন্ধর লেখা ঐ নামেরই কাহিনী অবলম্বনে 'পরী'র চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য এবং সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন প্রখ্যাত সুরকার সলিল চৌধুরী। অসীম পালের পরিচালনায় কলিকাতা'র উপকণ্ঠে এবং আন্দামানের পরিবেশে ছবিটির চিত্রগ্রহণ করা হবে।

* * *

প্রযোজক দীপচাঁদ কাঁকরিয়ার নতুন ছবি হচ্ছে 'অন্তরাল'। অগ্রদূতগোষ্ঠী ছবিটি পরিচালনা করছেন। দু'টি জটিল চরিত্রে রূপদান করছেন ছায়া দেবী ও বিকাশ রায়। অন্যান্য কয়েকটি বিশিষ্ট ভূমিকায় আছেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অনুপকুমার, তরুণকুমার, দিলীপ রায়, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। সুধীন দাশগুপ্ত চিত্রটির সুরকার।

* * *

সঙ্গীতশিল্পী শ্যামল মিত্র প্রযোজক রূপে ঋত্বিক ঘটক রচিত কাহিনী অবলম্বনে একখানি ছবি প্রযোজনার পরিকল্পনা করেছেন। উত্তমকুমার ও নবাগতা রিণা এই ছবির দুই প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন বলে মনে হয়।

প্রযোজক শ্রীমিত্র নিজেই এর সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

* * *

পরিচালক তরুণ মজুমদার মনোজ বসুর একটি কাহিনী অবলম্বনে তাঁর নতুন ছবি "একটুকু বাসা"-র কাজ সুরু করে দিয়েছেন।

নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় আছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চরিত্রগুলিতে অভিনয় করছেন পাহাড়ী সান্যাল, রবি ঘোষ, অনুপকুমার ও জহর রায়। তরুণ মজুমদার নিজেই ছবিখানি প্রযোজনা করবেন।

* * *

'বি-এস ফিল্মস'-এর প্রথম ভোজপুরী ছবি "গোরিয়া চলি নইহরবা"-র চিত্রগ্রহণ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় ছবিখানি পরিচালনা করছেন। চিত্রটিতে বোম্বের শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অসীমকুমার, বদ্রীপ্রসাদ, ইন্দ্রাণী মুখার্জি, মনোমোহনকৃষ্ণ, মদনপুরী, সুরেখা, অমল সেন প্রভৃতি এবং কলিকাতার শিল্পীদের মধ্য আছেন বিপিন গুপ্ত, লিলি চক্রবর্ত্তী, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও আশীষকুমার।

ইতিমধ্যে বেগুসরাই ও পাটনায় কয়েকটি প্রয়োজনীয় বহির্দৃশ্য তোলা হয়ে গেছে এবং আটখানি গানও রেকর্ড করা হয়েছে। গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, সুমন কল্যাণপুরী প্রভৃতি।

* * *

প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'চিত্তরঞ্জন ফিল্মস'-এর 'দেবতার দীপ' ছবিটির চিত্র গ্রহণের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এলো। এর কাহিনী-সূত্রটি ডঃ খগেন সুরের এবং পরিবর্দ্ধন ও চিত্রনাট্য রচনার কৃতিত্ব পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায়ের নিজের। ছবিটি সম্পর্কে অপর উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই কাহিনীর ভিত্তিতে পরিচালক শ্রীমুখোপাধ্যায় ইতিপূর্বে যে অসমীয়া চিত্রটি তৈরী করেন এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে যা প্রথম স্থান লাভ করে রৌপ্যপদক লাভ করে, এটি তারই বাংলা রূপ।

ছবিটির ভূমিকালিপিতে অংশ নিয়েছেন :—অনীল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমান সুমন প্রভৃতি।

সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন চট্টোপাধ্যায়, আর এই ছবিটির পরিবেশক হচ্ছেন 'টাস্ পিকচার্স'।

*　　*　　*

শম্ভু মিত্র, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, অসিতবরণ, মঞ্জু দে, সুমিত্রা সান্যাল, গীতালি রায় প্রভৃতি। সুরকার কালীপদ সেন ছবিটিতে সুরারোপ করেছেন এবং

নবাগতা সুধীরা রায় "রাধাকৃষ্ণ" ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সুশীল মজুমদার প্রযোজিত 'লালপাথর' চিত্রেও একে দেখা যাবে।

'সি, কে, প্রোডাকশন্স'-এর হাসির ছবি "মেরী দত্তের ফ্ল্যাট"-এর কাজ সমাপ্তির পথে। ছবিটির কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুপকুমার, নবগতা আরতি বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণকুমার, উৎপল দত্ত, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে, রেণুকা রায়, শ্যাম লাহা প্রভৃতি। 'পথিক' গোষ্ঠী চিত্রটি পরিচালনা করছেন।

*　　*　　*

ভূপেন রায় পরিচালিত 'গুপ্তশ্রী প্রোডাকশন্স'-এর রহস্যচিত্র "নিশাচর"-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় সমাপ্তির পথে। ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়,

সঙ্গীতে কণ্ঠদান করেছেন শ্যামল মিত্র, নির্মলা মিশ্র ও আরতি মুখোপাধ্যায়।

*　　*　　*

'মাধবী পিকচার্স'-এর "মোমের আলো ছবিটির কাজ প্রায় শেষ হয়ে এল। সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের একটি নৃত্য দৃশ্যের সুটিংও একাডেমি অফ ফাইন্ আর্টস-এর হলে নেওয়া হয়ে গেছে। চিত্রটি পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত।

*　　*　　*

প্রযোজক-পরিচালক সুধীর মুখোপাধ্যায় তাঁর নূতন চিত্র 'নতুন তীর্থ'-র চিত্র গ্রহণ শেষ করেছেন। আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি ছবিখানি মুক্তিলাভ করবে।

অথবা এ একটা বাসের বিভিন্ন শ্রেণীর এবং বিচিত্র চরিত্রের যাত্রীদের নিয়ে ছবির কাহিনীটি রচনা করেছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য। আর এই চরিত্রগুলিকে অভিনয়ে জীবন্ত করে তুলেছেন উত্তমকুমার, সুলতা চৌধুরী, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, রেণুকা রায়, তপতী, তরুণকুমার, জহর গাঙ্গুলী এবং আরো অনেকে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত এই চিত্রের এক বিশেষ আকর্ষণ হবে।

দেশে-বিদেশে ঃ

যে বাঙ্গালীর ছেলে বিলাতে বসে ইংরাজীতে চিত্র-নাট্য লিখে এবং প্রযোজনা করে যশস্বী হয়েছেন, সেই উমেশ

শ্রীউমেশ মল্লিক

মল্লিক বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলাকে কেন্দ্র করে তাঁর লেখা "ট্রাম্‌স্‌ এণ্ড ট্রাম্পেটস্‌" নামের চিত্র-নাট্যটি হলিউডের এক চিত্র-প্রতিষ্ঠানকে সত্তর হাজার টাকায় বিক্রী করে দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ছয় কোটি টাকা খরচ করে এই চিত্রটি নির্ম্মিত হবার কথা ছিল, কিন্তু শ্রীমল্লিকের চিত্র-প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদার অন্ধকূপ হত্যায় দৃশ্যটি চিত্র-নাট্য অনুযায়ী না করে পরিবর্তন করতে চাওয়ায় তাঁর সঙ্গে শ্রীমল্লিকের মতানৈক্য ঘটে এবং শ্রীমল্লিক চিত্র-নাট্যটি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে না দিয়ে হলিউডের ঐ চিত্র প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে দেন। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁর প্রতিষ্ঠান থেকেও তিনি সর্ব্বসমেত এক লক্ষ টাকা পেয়েছেন।

মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর ছেলে উমেশ মল্লিক বিলাতে গিয়ে বর্ণবিদ্বেষ, অসহযোগিতা, অর্থসঙ্কট প্রভৃতি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে নিজের চেষ্টায় ও যত্নে আজ অর্থ, প্রতিষ্ঠা ও সুনামই শুধু অর্জ্জন করেন নি—এই চিত্র-নাট্যের ব্যাপারে অসামান্য সৎ-সাহস প্রদর্শন করে তাঁর স্বদেশ প্রীতির পরিচয়ও প্রদান করেছেন।

বর্ত্তমানে শ্রীউমেশ মল্লিক তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান "Molliko Films (London) Ltd"-এর মালিক। এঁরা "Kubla-Khan" নামে একটি চিত্র শীঘ্রই নির্ম্মাণ করবেন বলে জানিয়েছেন। শ্রীমল্লিকের এই অসামান্য সাফল্যের পিছনে আছেন তাঁর ভ্রাতা শ্রীপ্রভাস মল্লিক ও বিলাতে তাঁর সহকর্ম্মী ও পরামর্শ দাত্রী জ্যানেট্‌ বেনেট্‌।

* * *

আর, ডি, বনশল্‌ প্রযোজিত ও সত্যজিত রায় পরিচালিত 'মহানগর' ছবিখানি পঞ্চম মস্কো আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চিত্র হিসেবে প্রদর্শনীর জন্য আমন্ত্রিত হয়েছে।

এবারের বার্লিন আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও এই ছবিখানি ভারতীয় ছবি রূপে সরকারীভাবে প্রেরিত হয়েছিল এবং পুরস্কারও লাভ করেছে। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ও শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।

* * *

সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'চারুলতা' চিত্রটিও এ-বছরের ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে পাঠানো হবে। উৎসব আরম্ভ হবে আগস্ট মাসে।

* * *

ভারত সরকার কার্লোভীভ্যারী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিমল রায় প্রযোজিত "বন্দিনীকে" সরকারীভাবে প্রেরণ করেছেন। শ্রীরায়ও ঐ উৎসবে যোগদান করতে গেছেন।

* * *

কে, এ, আব্বাস প্রযোজিত ও এ বৎসরের রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত "শেহর ঔর সপ্না" ছবিটিও কার্লোভীভ্যারী চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রিত হয়েছে। প্রযোজক শ্রীআব্বাস এবং ছবির নায়ক-নায়িকা দিলীপরাজ ও সুরেখাও এই উৎসবে যোগদান করেছেন।

* * *

"ধূল কা ফুল" নামক ছবিটি ব্যবসায়িকভিত্তিতে রাশিয়ায় পরিবেশনার্থ ক্রয়ের জন্য 'সোভেকস্‌পোর্ট ফিল্ম'-এর ভারতস্থ প্রধান প্রতিনিধি মিঃ এ, ডি, ডোব্রাভস্কি এবং বি, আর ফিল্মসের শ্রী বি, আর, চোপরার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

ওই একই চুক্তি অনুযায়ী বি, আর, "ফিল্মস মেডেন শিপ" নামক সোভিয়েত চিত্রটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এদেশে পরিবেশনের জন্য ক্রয় করবেন।

বিদেশী খবর :

ছায়াচিত্রে টার্জানের ভূমিকা অভিনয়ে বিখ্যাত এবং একদা অলিম্পিক-সাঁতারু জনি উইসমূলার বর্তমানে ঋণের দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। তিনি সাত হাজার টাকা ঋণ শোধ করেন নি বলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। আদালতে দাঁড়িয়ে উইসমূলার বলেছেন সপ্তাহে তাঁর মোট খরচ ৩৯০০৲ টাকা, আর আয় ৬৫০৲ টাকা, তাই তিনি আজ ঋণগ্রস্ত।

বিচারকের রায় জানা যায়নি।

* * *

শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে এ বছরে যিনি আকাদেমি পুরস্কার লাভ করেছেন, সেই বিশিষ্ট মার্কিন নিগ্রো শিল্পী সিডনি পোইটিয়ার কলম্বিয়া পিকচার্সের আরও তিনখানি ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আগামী ১৮ মাসের মধ্যে এই ছবি তিনখানি তোলা হবে।

এই ছবিগুলির মধ্যে প্রথম যেটি তোলা হবে তার নাম 'সিনানন হাউস'।

* * *

'প্যারামাউণ্ট পিকচার্স কর্পোরেশন' এবং 'সেভেন্ আর্টস প্রোডাকশন্স' যুগ্মভাবে একখানি ছবি তৈরীর পরিকল্পনা করেছেন। ছবিটির অবলম্বন টেনিসি উইলিয়ামের একাঙ্ক নাটক "দিস্ প্রপার্টি ইজ কনডেম্‌ড্"। রিচার্ড বার্টনের পরিচালনায় এই চিত্রে নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন শ্রীমতী এলিজাবেথ টেলর (বার্টন)।

"দিস্ প্রপার্টি ইজ কনডেমড্" ছবিটির শুটিং শুরু হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে। হলিউড এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের 'লোকেশন'-এ ছবিটি তোলা হবে এবং এই ছবিতেই অভিনেতা রিচার্ড বার্টনকে সর্বপ্রথম পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে অভিনেতা রূপে এই চিত্রে তাঁর কোনো ভূমিকা থাকবে না।

* * *

ইস্রায়েল-এর একটি নতুন ছবিতে অভিনয়ের জন্য এলিজাবেথ টেলর ও তাঁর স্বামী রিচার্ড বার্টনকে দৈনিক ১৬৮০০০ ডলার (প্রায় ৮৩০০০০৲ টাকা) প্রদানের প্রতিশ্রুতিতে একটি প্রস্তাব এসেছে। এই প্রস্তাবটি দিয়েছেন, কার্ল কুৎগার যিনি প্রাচীন ও আধুনিক ইস্রায়েলের উপর একটি ছবি তৈরী করতে চান। ছবিটির সুটিং করতে লাগবে প্রায় নব্বই দিন।

জাপানের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া এবং ইতালির অভিনেতা মার্চেলো মাস্ত্রোয়ানি এবছরের সেল্‌জ্‌নিক "গোল্ডেন ট্রফি" লাভ করেছেন। শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে "গোল্ডেন লরেল" অর্জন করেছে ফেদারিকো ফেলিনির "এইট অ্যাণ্ড এ হাফ" চিত্রটি।

'সিলভার লরেল'-এ ভূষিত চিত্রের তালিকাগুলি হচ্ছে : "দি এল শেপ্‌ড রুম' (ব্রিয়ান্ ফরবেশ), "দি স্পোর্টিং লাইফ' (লিণ্ডসে অ্যাণ্ডারসন্), 'টম্ জোনস্' (টনি রিচার্ড), "দি সান্ লাইফ" (দিনো রিশি), 'দি সাউণ্ড অব ট্রাম্পেটস্, (আরমানো ওলমি), 'উইন্টার লাইট' (ইঙ্গমার বের্গম্যান্) এবং 'মাই নেম ইজ ইভান্' (তারকোভস্কি)।

* * *

'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্স' তাদের "দোজ ম্যাগনিফিসেণ্ট মেন ইন দেয়ার ফ্লাইং মেশিন" নামক ছবিটির জন্য জাপানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ইউজিরো ইশিহারাকে চুক্তিবদ্ধ করেছেন। টড্ এও এবং ডিলুকস্ কলারে তোলা এই অ্যাডভেঞ্চার-কমেডি চিত্রটির সুটিং সম্প্রতি শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ভূমিকা সমৃদ্ধ এই "দোজ ম্যাগনিফিসেণ্ট মেন ইন দেয়ার ফ্লাইং মেশিন" ছবিটিতে এ যাবৎ বিভিন্ন দেশের যে সব শিল্পীরা অংশ নিয়েছেন, ইশিহারার স্থান দেশের দিক থেকে সেখানে ষষ্ঠ। উল্লেখযোগ্য যে ইশিহারা এ পর্যন্ত প্রায় ৬০খানি জাপানী ছবিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। টেলিভিশনেও তিনি অভিনয় করেন এবং গায়ক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি আছে। তাঁর নবতম ছবিটি 'মাই এনিমি, দি সী' কান্ চলচ্চিত্র উৎসবের অন্যতম প্রতিযোগী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

গত "আষাঢ়" সংখ্যার ও এই সংখ্যার কয়েকটি লেখার ছাপার ভুল সংশোধন করে দেওয়া হল।

স্থানাভাবের কারণে, গতমাসের 'ধাঁধা ও হেঁয়ালির' যে সকল উত্তরদাতার নাম 'কিশোর-জগৎ' স্তম্ভে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই, সেগুলিও নীচে প্রকাশিত হল।

—সম্পাদক

গত 'আষাঢ়' সংখ্যায় শিকানাই বসু লিখিত "গৃহত্যাগ" নাটিকাটিতে যে ছাপার ভুলগুলি থেকে গেছে তা নীচে সংশোধন করে দেওয়া হল —

পৃষ্ঠা	কলম বা স্তম্ভ	যা আছে	যা হবে
৪৫	প্রথম	"ডা, কার বমি হচ্ছে ?"	'কার মাথা ঘুরছে ?'
৪৮	প্রথম	"অবশ্য পথ্য বজন করতে হবে "ইত্যাদি কথা-গুলির বক্তার নাম নাই	ঐ কথ গুলির বক্তা— ডাক্তার।"
৬৮	দ্বিতীয়	"·আর রিনিউ কবোনা।"	" আর রিনিউ কবো না।"
৫০	প্রথম	"পিসতুতো ভাইও বলতে পারেন, পরিবর্তে বিবাহ…"	'পিসতুতো ভাইও বলতে পারেন, মামাতো ভাই ও বলতে পারেন. পরিবর্ত্ত বিবাহ…"
৬১	প্রথম	Laicclat wood eıal	Laicclot woodcroft
৫৪	দ্বিতীয়	"শিবুকে নিয়ে", "শিবু নীরব" "শিবুসহ"	শিবু'র স্থানে শিশু।

* * *

এই "শ্রাবণ" সংখ্যার "মেয়েদের কথা" বিভাগের "শিক্ষার সমস্যা" প্রবন্ধটির নিম্নলিখিত কয়েটি বিশেষ ছাপার ভুলগুলি সংশোধিত করা হল :—

পৃষ্ঠা	কলম্	যা আছে	যা হবে
২২৬	প্রথম	"সেই দিকেই শুধু দষ্টি দেন না।"	"সেই দিকেই শুধু দৃষ্টি দেন।"
২২৬	দ্বিতীয়	"স্ত্যাক্সম্"	"স্ল্যাক্স"

"কিশোর জগৎ" বিভাগে·

গত মাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

ধীরেন্দ্রনাথ, সহদেব, সুনীল, শ্যামল, সত্যবান্ (পাথর মহুডা) শমিতকুমার ঘোষাল (কলিকাতা), ধর্ম্মদাস রায় (বিদ্যাধরপুর), মিঠু ও চৈতালী (দুর্গাপুর), সন্তু, মন্টি, গাব্বু, বুটু, মন্টিলা, টুটু ও টুকি সিংহ (মদনপুর), বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই), প্রভাতরঞ্জন সরকার (আড়ুই), প্রদীপকুমার বসু (বাঁশবেড়িয়া), পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময়, ধীরাগময়, সিপ্রাধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), নিতাইচাঁদ পাল, শচীন্দ্রনাথ ও নীলমণিচাঁদ পাল। (পূর্ব্বচিন্তা গ্রাম)

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

শিবরাম, ক্ষুদিরাম, গোপাল ও শশাঙ্কশেখর মিত্র (কুইনান), সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর)।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়া ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ২৬৮ রান (জিম পার্কস ৬৮ এবং টেড ডেক্সটার ৬৬ রান। নীল হক ৭৫ রানে ৫ উইকেট এবং গ্রাহম ম্যাকেঞ্জি ৭৪ রানে ৪ উইকেট পান)

ও ২২৯ রান (কেন ব্যারিংটন ৮৫ রান। কর্লিং ৫২ রানে ৩, ম্যাকেঞ্জি ৫৩ রানে ৩ এবং ভিভার্স ৭০ রানে ৩ উইকেট পান)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৮৯ রান (পিটার বার্জ ১৬০ রান এবং উইলিয়ম লরী ৭৮ রান। ফ্রেডি টিটমাস ৬৯ রানে ৪ এবং ফ্রেডি ট্রুম্যান ৯৮ রানে ৩ উইকেট পান)

ও ১১১ রান (৩ উইকেটে। রেডপাথ নট আউট ৫৮ রান। টিটমাস ২৫ রানে ২ উইকেট পান)

লিডস মাঠে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার চলতি ৪৭ তম টেস্ট সিরিজের তৃতীয় টেস্ট খেলায় অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে জয়ী হয়ে বর্ত্তমান টেস্ট সিরিজে ১—০ খেলায় অগ্রগামী হয়েছে। বৃষ্টির দরুণ ট্রেন্ট ব্রীজের প্রথম টেস্ট এবং লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা পরিত্যক্ত হয়—জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। সুতরাং অষ্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় অগ্রগামী থেকে আগামী ২৩শে জুলাই তারিখে ম্যাঞ্চেষ্টারের চতুর্থ টেস্ট খেলার আসরে নামবে। পঞ্চম টেস্ট-খেলা সুরু হবে ওভাল মাঠে, আগামী ১৩ই আগষ্ট থেকে। খেলার এই অবস্থায় ইংল্যাণ্ডের থেকে অষ্ট্রেলিয়া অনেক সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। আর একটা টেস্ট খেলায় তারা জয়ী হলে তারা সম্মানের সঙ্গেই ঐতিহাসিক 'এ্যাসেজ' পুরস্কার হাতে রাখতে পারবে। এমন কি বাকি দুটো খেলা ড্র গেলেও অষ্ট্রেলিয়ার কোন ক্ষতি হবে না, পুরস্কার তাদের হাতেই থেকে যাবে। অষ্ট্রেলিয়া কর্ত্তৃক অধিকৃত 'এ্যাসেজ' পুরস্কার পুনরুদ্ধার করতে হ'লে ইংল্যাণ্ডকে ৪র্থ এবং ৫ম টেস্ট খেলায় জয় লাভ করতেই হবে। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়দের যথেষ্ট মানসিক শক্তি এবং ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে হবে। ইংল্যাণ্ডকে আজ অগ্নি-পরীক্ষার সামনে দাঁড়াতে হয়েছে।

লিডসের আলোচ্য তৃতীয় টেস্টে ভাগ্যদেবী প্রথমে ইংল্যাণ্ডের পক্ষেই ছিলেন। ইংল্যাণ্ড টসে জয়ী হয়ে ব্যাট করার প্রথম সুযোগ পায়। কিন্তু এই সুযোগের পুরো সদ্ব্যবহার করতে তারা পারেনি। প্রথম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১০ মিনিট আগে ২৬৮ রানের মাথায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হয়। খেলার উপযুক্ত আলো ছিল না বলে এই দিন অষ্ট্রেলিয়া আর ব্যাট ধরেনি।

দ্বিতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলা শুরু ক'রে ৮ উইকেট খুইয়ে ২৮৩ রান তুলেছিল। পিটার বার্জ ১০০ রান ক'রে অপরাজিত ছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ারও প্রথম ইনিংসের খেলার এক সময়ে দারুণ ধস্ নেমেছিল।

তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ৩৭২ রানের মাথায় ৯ম উইকেট (গ্রাউট) পড়ে যায়। নবম উইকেটের জুটিতে গ্রাউট (৩৭ রান) এবং পিটার বার্জ মোট ৮৯ রান যোগ করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়ার পিটার বার্জ নিঃসন্দেহে তৃতীয় টেস্ট খেলায় নায়কোচিত ভূমিকায় অংশ নিয়েছিলেন এবং তাঁকে খেলায় সহযোগিতা করেছিলেন ৮ম উইকেটের জুটি হক (৩৭ রান) এবং ৯ম উইকেটের জুটি গ্রাউট (৩৭ রান)।

তৃতীয় দিনের খেলার বাকি সময়ে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয়

ভাদ্র—১৩৭১

প্রথম খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | তৃতীয় সংখ্যা

যোগ-জীবন

বিমলানন্দ স্বামী

যোগজীবন লাভ করিতে হইলে ইহকালের উপযোগী গীতোক্ত যোগই শ্রেষ্ঠ সহায় বলিয়া মনে হয়। ইহা সার্ব্বজনীন যোগ অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খৃষ্টান সকল জাতিই এই যোগের আচরণ বা সাধনা করিতে পারেন। আর তা ছাড়া এই গীতোক্ত যোগের সাধনা-করাও বেশ সহজ বা অনায়াসসাধ্য। কিন্তু “গী[illegible] সম্বন্ধে অনেকেরই অনেকরকম ধারণা। তাই “গীতোক্ত যোগ” বলিলেই হয়ত তাঁহাদের সেই সেই ধারণার মূলে কুঠারাঘাত হইতে পারে। ইহার কারণ, প্রায় বেশীর ভাগ ব্যক্তিই নির্ব্বিচারে এক-একটা মতের পক্ষপাতী। যদি শাস্ত্র সঠিকভাবে বুঝিতে হয় তবে সব দিক [illegible] বুঝিতে হয়। অবশ্য সে বেশ কঠিন ব্যাপার। অক্ষরার্থ আছে তার অন্তরার্থ বা আধ্যাত্মিক অর্থ। এই “আধ্যাত্মিক” কথাটাই আবার অনেকে মানিতে চাহেন না বা গোলমেলে ঠেকে। আত্মার কথা শুনিতে চাই ও আত্মাকে বুঝিতে চাই, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা মোটেই মানিব না—এ কথা মহামূর্খের মুখেই কি শোভা পায় না? তবে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শাস্ত্র ব্যাখ্যাকারিগণও এদিকে সেরূপ দৃষ্টি না দিয়া নিজ নিজ বুদ্ধিপ্রসূত ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তাঁহারা শাস্ত্র পড়িয়া

নিজ নিজ পণ্ডিত বা গুরুর নিকট যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহার দ্বারাই তাঁহারা ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন, সুতরাং তাঁহাদেরও বিশেষ দোষ দিয়া লাভ নাই। শুধু একথা দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ কেবলমাত্র শাস্ত্র পড়িলেই জানা যায় না, সাধন করিয়া তত্ত্ব বা আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, নতুবা চর্ব্বিত চর্ব্বণই মাত্র সার হয়, আর নিজেকে 'পণ্ডিত' মনে করিয়া আত্মাভিমানের মাত্রা আর একটু বাড়ানো হয়।

সাধনার জন্য বরং শাস্ত্র না পড়িলেও ক্ষতি নাই, শুধু গুরুমুখী সাধন প্রণালী অনুসারে সাধনা দ্বারাই প্রকৃত সত্য বা ভগবানকে পাওয়া যায়। আর যাঁহারা ভগবানকে লাভ করিয়াছেন তাঁহারা সত্য দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া যাহা বলেন তাহাই "আপ্তবাক্য" বা "শাস্ত্র-বাক্য" বলিয়া শাস্ত্র-গ্রন্থে লিখিত হয়। সুতরাং তাঁহারাই সত্যিকার শাস্ত্র-প্রণেতা, পাঠয়িতারা নহেন। কিন্তু সাধন-বিহীন পণ্ডিতকে ঠিক ঠিক ভাবে শাস্ত্রের মর্ম্মকথা প্রণিধান করিতে হইলে সাধনা না করিয়া উপায় নাই। তাই ঋষি বা তত্ত্বদ্রষ্টা বলেন—

"মথিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি।
সারন্তু যোগীভিঃ পীতং তক্রং পিবন্তি পণ্ডিতাঃ॥

—অর্থাৎ চারিখানি বেদ ও সমুদয় শাস্ত্রকে দুগ্ধ ভাবিয়া উহাকে দধিতে পরিণত করা হইল। ঐ দধি মন্থন করতঃ মাখন ও ঘোল প্রস্তুত হইল। যাহারা যোগী বা সাধক, তাঁহারাই ঐ মাখন বা সারবস্তুটুকুই খাইয়া আত্ম পরিপুষ্টি লাভ করিলেন। আর পুঁথিপড়া পণ্ডিতগণ মাখনে বঞ্চিত হইয়া ঘোল খাইয়াই আত্মতৃপ্তি লাভ করিলেন।

অতএব বুঝা যাইতেছে যে, সাধনেই জীবনের সার্থকতা বচনবাগীশতায় নয়।

শাস্ত্রও তাই বলিতেছেন—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"

সাধনের নাম শুনিলেই যাঁহারা নিজেদের সাধনে অক্ষম মনে করিয়া দূরে সরিয়া যান, তাঁহাদের এ বিষয়ে আলোচনা করা কেবলমাত্র পাণ্ডিত্যের বড়াই ছাড়া কিছুই নয়।—শাস্ত্রবচন—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"

তাঁহাদের সম্বন্ধে বলিবার কিছুই নাই, আর তাঁহাদেরই বা বৃথা এ সব বুঝিয়া লাভ কি?

যাক্, যাহা বলিতেছিলাম। একটু প্রণিধান করিলেই প্রায় সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, এতাবৎ যে-কেহ ধর্ম্মপ্রচারকরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং যে যে ধর্ম্মমত তাঁহাদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল, সে সবের মধ্যে এত বাধা-নিষেধ যে তাহার আচরণ করা সাধারণের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু একমাত্র গীতোক্ত ধর্ম্মের আচরণের পক্ষে ওরূপ বাধা নাই; বরং ইতিকর্ত্তব্যতা-বোধে সংসারের যাবতীয় কর্ম্মকরিয়াও এই সহজকর্ম্মের আচরণ করিতে সেরূপ কোনই বাধা দৃষ্ট হয় না। স্বয়ং ভগবানই গীতামুখে সর্ব্বকর্ম্ম করিবারই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। গীতার কর্ম্মসংন্যাস মানে কর্মফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ নহে। আর কর্ম্মত্যাগ কি কেহ ইচ্ছা করিলেই করিতে পারে?

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥

—জ্ঞানীই হউক আর অজ্ঞানই হউক, কোন লোকই কর্ম্ম না করিয়া মুহূর্ত্তকালও থাকিতে পারে না; প্রকৃতি-জাত গুণসকল (রাগ দ্বেষাদি) মানুষকে অবশ করিয়া কর্ম্ম করাইয়া থাকে।

"গীতা-ধর্ম্ম"কে নেহাৎই সাধারণ ধর্ম্মমত মনে করিয়া প্রায় অনেকেই আবার কি ভুলই না করেন! তাই গীতার ভাষ্য ও ব্যাখ্যার চাপে সত্যকারের গীতা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে! গীতার প্রকৃষ্ট পরিচয় গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকটি একটু লক্ষ্য করিলেই পাওয়া যাইবে।

"ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ॥

—অর্থাৎ জগতের প্রসবকর্ত্তা সূর্য্যকেই এই যোগ শ্রীভগবান কর্ত্তৃক বহুবহুদিন পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছিল। সূর্য্য মনুকে ও মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। তারপর মহৎকালের দ্বারা এই যোগ ইহলোক হইতে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল

(অবশ্য তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণের নিকট তাহা পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে ও পরেও থাকিবে)।

তাই সেই অতি পুরাতন, অব্যয়, সনাতন ও শাশ্বত ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মহাযোগেশ্বর শ্রীহরির আবির্ভাব। তাঁহার মুখ নিঃসৃত এই পবিত্র ও উত্তম যোগের নাম রাজবিদ্যা, রাজগুহ্য যোগ। ধর্ম্মসম্মত, অব্যয়, প্রত্যক্ষ অনুভূতিগ্রাহ্য এই যোগে যাঁহারা অশ্রদ্ধাবান, তাঁহারা সেই প্রাণের প্রাণ সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীভগবানকে না পাইয়া এই মৃত্যুসংসারবর্ত্মে জনমে জনমে যাতায়াত করেন ও ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করেন। সর্ব্বশেষ কথা এই যে মানুষের বুদ্ধিপ্রসূত যে ধর্ম্মমত, তাহা কখনও অব্যয় হইতে পারে না। একে গড়ে, অন্যে ভাঙ্গে। বুদ্ধ যাহা গড়িয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্কর তর্কযুক্তিবলে তাহা নস্যাৎ করিলেন। আবার তাঁহার প্রচারিত বেদ বা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম মহাপ্রভু প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মায়াবাদ বলিয়া খণ্ডন করিলেন। সর্ব্বশেষে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়বাদী পরমহংসদেব একমাত্র হরিনাম ব্যতীত অন্য যে কোনও ধর্ম্মযাজন দ্বারাও যে ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়া তাহার প্রমাণ ও প্রচার করিলেন। সুতরাং জীবে জীবে প্রেমভাব প্রতিষ্ঠার স্থলে সম্প্রদায়ভাবেরই যে প্রসারতা ঘটিল ও পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ ভাবই যে বৃদ্ধি পাইল; একের কাছে যাহা বিধি, অন্যের কাছে তাহা অবিধিরূপে প্রতিভাত হইয়া প্রেমের পরিবর্ত্তে শত্রুতায় পর্য্যবসিত হইল। হায় রে ধর্ম্ম! সুতরাং এইভাবে চিন্তা করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে গীতার ধর্ম্মই একমাত্র এ সব হইতে মুক্ত—তাই সকলেরই উচিত এই সার্ব্বজনীন নিঃস্বার্থ প্রেমের একমাত্র নিদান গীতোক্ত যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক যোগ-জীবন লাভ করা।

বেদনা অশ্রু

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মসী জমে গেছে ঝরণা কলমে
ভাষা আজ মূক স্তব্ধ মনে।
কি কথা বলিব ভুলে যাই সব—
বেদনায় মন প্রহর গণে।

বাসর রজনী হয়নিক ভোর
ভারতের বুকে উল্কাপাত,—
সত্য হলেও নিষ্ঠুর এযে
বজ্র দহনে নামিল রাত।

দিকে দিকে আজ বিজলী রেখায়,
অশ্রু ঝরাণো বেদনা গাথা।
নব্য ভারত কর হানি বুকে
শিলার উপরে কুটিছে মাথা।

সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে যার
ন্যায়ধর্ম্মের বারতা ছিল;
নব ভারতের সেই যে দুলাল
নিয়তি শাসন তারেও নিল।

দুর্ভাগা দেশ কাঁদিস নে আর
শিয়রে দেখ না দাঁড়ায়ে অরি।
এ সময় নহে বেদনা গাথার
উজানে ঠেলিয়া ভিড়াও তরী।

একটি জীবন পুষ্প স্তবক
ফুটে রবে ভারত জননী কোলে।
উজ্জ্বল তার দীপ্ত আভায়,
দুলিবে জননী নূতন দোলে।

অর্দ্ধশতক একটি জীবন
একটি মনের সাধনা বাণী—
বিশ্ব মনের মণিকোঠা মাঝে,
ভারত মায়েরে সাজালো রাণী।

শান্তি যজ্ঞের পুরোহিত আজ
ঢলিয়া পড়েছে অস্তাচলে।
নিভে গেছে দীপ দেউটি আঁধার
জোনাকির জ্বালা মিছিল চলে।

দুর্য্যোগ ঘেরা আঁধার রজনী
কে ধরিবে আজ মশাল আলো।
আগামী দিনের নূতন পুরুষে
কে আর আদরে বাসিবে ভালো?

ধন্য জননী তোর কোলে মাগো
এমন সন্তান জনম দিলি।
বিশ্ব কাঁদায় চলে গেল সে যে,
আবার রিক্ত, কাঙাল হলি।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সতেরো

নমিতা সান্টা ক্রুজে বিকেল পাঁচটায় পৌঁছতেই এক নোটিস সামনে: "আকাশ-গরুড় উড়বেন আধঘণ্টা দেরিতে—ছটায়।" খানিকক্ষণ বুকস্টলে এ-বই ও-বই দেখতে দেখতে চোখে পড়ল "পাদ্রে পিও"। এ মহাত্মার সম্বন্ধে ও কাগজে পড়েছিল—ইতালিতে কোন্ এক বিজন প্রদেশে পাহাড়ে এক ক্যাথলিক মঠে তিনি হাজার হাজার ধর্মার্থীকে আজও অক্লান্তভাবে দিনের পর দিন ভাগবতী কথা বলেন, কত দুশ্চিকিৎস্য রোগ সারান—ক্যান্সার, পক্ষাঘাত, আর্থরাইটিস। একাহারী, ঘরটি প্রায় গুহার মতন, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য—তাঁর দেহে ক্রসের চিহ্ন ও ক্ষত থেকে প্রত্যহ রক্তক্ষরণ হয়। আলোকের সঙ্গে এ নিয়ে কত যে আলোচনা হয়েছে তার। পরে আলোক ইতালিতে গিয়েছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—প্রধানতঃ এই ক্রসের ক্ষত থেকে রোজ রক্তক্ষরণ হয় এই জনশ্রুতি সত্য কি না জানতে। সম্প্রতি কিছুদিন থেকে নমিতা অস্কার দে লিসোর লেখা এই বিখ্যাত বইটির খোঁজ করছিল।*

বইটি নিয়ে রেস্তরাঁ গৃহে ঢুকে এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিতে দিতে নমিতা বইটির এ-পাতা ও-পাতা উল্‌টায়, আর আনন্দে ওর চোখে জল আসে। হঠাৎ পাদ্রে পিওর একটি বহু উদ্ধৃত উক্তি পড়তে না পড়তে ওর বুকের তার বেজে উঠে "মানুষ স্বভাবে এত অহঙ্কারী যে, যখন তার স্বাস্থ্য ও টাকা থাকে তখন সে নিজেকে ভাবে সর্বশক্তিমান্ ভগবান, কিন্তু শেষে যখন নিয়তির আঘাতে সে বিকল হয়ে পড়ে তখন তার মনে পড়ে যে ভগবান্ আছেন।"

পিছনে পায়ের শব্দে নমিতা চম্‌কে ওঠে। মন্নুভাই হেসে "এত তন্ময় হ'য়ে কী পড়ছিলে গো পরদুঃখকাতরা দেবী? আগাথা ক্রিস্তির পোয়ারো, না না ওডহাউসের জীভস্?"

নমিতা (হেসে উঠে): দুয়ের একটাও না। পড়ছিলাম—বসুন দেখাচ্ছি—আপনার কথাই মনে হচ্ছিল, সত্যি বলছি। ওয়েটার! আর এক পেয়ালা চা।

* * *

চায়ে চুমুক দিয়ে মন্নুভাই বলল: "বড় ভালো পাগল পাদ্রে পিওর কথা শুনে—বিশেষ ক'রে সুখের সময় ভগবানকে ভুলে থেকে শুধু দুঃখের সময়ে তাঁর কাছেই ধর্ণা দেওয়ার কথা"

নমিতা: এর আগে কখনো শোনেন নি এ মহাপ্রাণ মানুষটির কাহিনী?

মন্নুভাই: আমি কি তোমাদের মতন বিশ্বাসী নমিতা যে—

নমিতা: ফের self pity—আত্মধিক্কার ছাড়ুন।

মন্নুভাই: আত্মধিক্কার নয়। তবে কি জানো? এযুগে আমাদের পক্ষে ধর্মে বিশ্বাস করা যে কী কঠিন হয়ে উঠেছে—সায়েন্সই আজ বসেছে ঈশ্বরের সিংহাসনে।

নমিতা (মৃদুহেসে): মানে পিন্টো তো—আপনার কাছে অন্ততঃ?

* Oscar De Liso—Padre Pio (All Saints Press)

মন্নুভাই: না না পিপ্টো কেন—যদিও সে একজন মস্ত—

নমিতা: জগতে এক ভগবান ছাড়া মস্ত কেউ নেই—তবে ব্যস্ত বলতে পারেন। সেদিনও গুরুদেব ফের বলছিলেন যে এ-যুগে পিপ্টোদের আমরা অভ্রান্ত দিশারি মনে করি ব'লেই আমাদের আজ এ দুরবস্থা। একটু আগেই পড়ছিলাম পাদ্রে পিওর মন্তব্য, শুনুন—না, শুনতেই হবে—বিশেষ যখন আপনার সুমতি হয়েছে আজ। (বইটি খুলে) পাদ্রে পিও শেষ অধ্যায়ে বলছেন একদল ধর্মার্থীকে: "ভগবানকে জানা যায় সত্যিই। কিন্তু আজ তোমরা যে চলেছ ভুল পথে মিথ্যা ও অহঙ্কারের নির্দেশে। বিজ্ঞানের পথে তাঁকে জানা যায় না। বিজ্ঞানের ধন্যতম কীর্তিও ভাগবত মহিমার পাশে নগণ্য। যদি ভাগবত সত্যকে চাও তবে কাম ক্রোধ লোভ দর্প ছাড়ো—ধূলোয় লুটিয়ে ডাকো তাঁকে।"* না শুনুন—এঘরে তো কেউ নেই তখন একটু মন খুলেই ভগবানের কথা কওয়া যাক—কারণ কী জানেন?

মন্নুভাই: কী? শুধু সায়েন্সে বিশ্বাস ক'রেই আমি আজ ভুগছি ব'লে?

নমিতা: না, আঘাত পেয়ে নত হয়েছেন ব'লে—বুঝতে পেরেছেন ব'লে যে রমাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত ক'রে ভগবানের চোখে অপরাধী হয়েছেন।

মন্নুভাই: সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত অন্ততঃ করেছি কাল। রমাকে অধেক সম্পত্তি দেব ভেবেছিলাম—কিন্তু ভেবে দেখলাম যে, যে স্ত্রী আমার টাকার জন্যেই বিয়ে ক'রে আমাকে ঠকিয়েছে তাকে একটু পাল্টা ঠকালে ভালোই হবে—quits, শোধবোধ। তাই উইলে আমি রমাকে দিয়েছি তিনলক্ষ, শোভনাকে ও প্রবীরকে একলক্ষ। তবে বাড়িটা শোভনাকেই দিয়েছি কারণ রমার থাকার জায়গা আছে, এদের নেই। কী? ঠিক করেছি তো? না, বলবে once a স্ত্রৈণ always a স্ত্রৈণ?

নমিতা (উৎফুল্ল): না না ঠিকই করেছেন। আপনি স্ত্রীর ভয়ে মেয়ের'পরে অবিচার না করলে আপনাকে স্ত্রৈণ বলবই বা কেন? তাছাড়া আমরা গুরু-মন্ত্র নেওয়ার পরে চাইবই বা কোন্ মুখে যে আপনার স্ত্রীর অপরাধের জন্যে ছেলে দুঃখ পাক? তবে একটা জায়গায় আমরা বাঁকা ঠাকুরের সঙ্গে একমত যে, যে কুটিলতার সঙ্গে সরল ব্যবহার করা চলে না। অর্থাৎ শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ আর কি। এইখানেই পাদ্রে পিওর সঙ্গে বিষ্ণু-ঠাকুরের তফাৎ।

মন্নুভাই (আশ্বস্ত): একটু ভরসা পেলাম—সত্যি বলছি নমিতা। কারণ...কারণ আমি যে আজ কী রকম দুর্বল হ'য়ে পড়েছি তোমরা—মানে সবলারা—কল্পনাও করতে পারবে না। এই তোমার সামনে এত জোর দিয়ে বলছি তো যে, রমার পাওয়া উচিত বারো আনা—কিন্তু যদি ধরো শোভনা জানতে পেরে কুরুক্ষেত্র করে তবে হয়ত আমি পারব না শেষপর্যন্ত—ফের হয়ত উইল বদলে ফেলব—

নমিতা (ব্যস্ত হয়ে): না না না—অমন কথা মুখেও আনবেন না আপনি। পারতেই হবে আপনাকে। পরমহংসদেব বলতেন যে নিজেকে যে অষ্টপ্রহর পাপী পাপী বলে সে পাপীই হয়ে যায়। আপনার এখন জপবার সময় হয়েছে যে আপনি মানুষ, আপনি কর্তা, আপনি মরদ, বুঝলেন? তবে একথা আমিও জানি যে আপনার স্ত্রীকে আপনার এই উইল বদলাবার কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে দিলে চলবে না—

মন্নুভাই: শ্—শ্—!

নমিতা: কী?

সঙ্গে সঙ্গে পিছনের টেবিল থেকে একটি veil-পরা মহিলা ওঠে গেল।

নমিতা: কেউ শুনছিল পিছনে ব'সে?

মন্নুভাই: হ্যাঁ, আর কে জানো? অলিভিয়া।

নমিতা (চমকে): অলিভিয়া? সেই রমার গভর্নেসটা?

মন্নুভাই: তাকে কি দেখেছ তুমি?

নমিতা: না দেখিনি, তবে (থেমে) তার সম্বন্ধে শুনেছি অনেক কিছুই।

মন্নুভাই (সভয়ে): কী শুনেছ বলবে?

নমিতা (এড়িয়ে গিয়ে): মানুষ কত কি শোনে—

---

* Padre Pio—The priest who bears the Wounds of Christ—১৭ পৃষ্ঠা

গর।ক মনে থাকে ছাই? তবে…রমা বলেছে সে খুব খারাপ মেয়ে ব'লে আপনি তাকে ডিসমিশ করেছিলেন—তবে সে কলম্বো গিয়েছিল না?

মন্নুভাই (বিব্রত): হ্যাঁ—তবে পিন্টো বললে সম্প্রতি ফিরে এসেছে। শুনলাম…মানে…পিন্টোই বলছিল… আমাকে একটু সতর্ক থাকতে।

নমিতা: কেন?

মন্নুভাই (এড়িয়ে গিয়ে): স্বভাবে কুচক্রী তো—তাছাড়া She has to live by her wits, আর তার মানে কী—বুঝতেই তো পারো।

নমিতা (ভাবনায় প'ড়ে): তা হ'লে? ও যদি কিছু শুনে থাকে?—শুনুন, শোভনাকে ও জানে?

মন্নুভাই: না…তবে (ইতস্ততঃ ক'রে) পিন্টো নাকি ওকে দুঃখ ক'রে বলেছে যে আমি রমাকে বঞ্চিত ক'রে শোভনাকে সব বিষয় দিয়েছি শোভনার পীড়াপীড়িতে।

নমিতা: সে কি? পিন্টো এতে খুসি হয়নি?

মন্নুভাই (উদ্দীপ্ত): পিন্টোকে প্রহ্লাদ দেখতে পারে না জানি—তার কোনো দোষ ত্রুটি নেই এমন কথাও বলব না। কিন্তু তাই ব'লে সে নীচ নয়। আমাকে বকেছে কতবারই স্ত্রীর মন রাখতে গিয়ে রমার 'পরে অবিচার করেছি ব'লে। (চারিদিকে তাকিয়ে) না কেউ নেই। (সুর নামিয়ে) তোমাকে বলি একটি কথা আজ: পিন্টো বলে ও খবর পেয়েছে—(ফিশ ফিশ ক'রে)—অলিভিয়া ব্ল্যাক মেল করার পেশা নিয়েছে।

নমিতা (শিউরে উঠে): ব্ল্যাকমেল! মানে—

মন্নুভাই: হাঁ, মানে তাই। পিন্টোর কাছে ওর এক বন্ধু বলেছে—সে বড় জঘন্য কথা, থাক গে। মোট কথা, ও বড় ঘরের নানা গুপ্ত খবর রাখে—কয়েকটি চরও নাকি লাগিয়েছে।

নমিতা (শক্ পেয়ে): বিলেতে এ রকম বদমায়েস আছে বইয়ে পড়েছি—কিন্তু আমাদের দেশেও—

মন্নুভাই: ঐ ঐ ঐখানেই তো আমাদের মতন অবিশ্বাসী বিপদে পড়ে নমিতা! আমাদের দেশ কী এমনি আহামরি দেশ শুনি? মানুষের স্বভাব—হিউম্যান নেচার—সবত্রই এক-এক-এক। পিন্টো বেশ বলে কোনো বেড়ালকে বনে পাঠিয়ে বনবেড়াল করা যেতে পারে, কিন্তু ফলমূল খাইয়ে সেন্ট বেড়াল করা যায় না—কী?

নমিতা: না, দেখছিলাম—ও কোথায়। অনেক দূরে বুকিং অফিসে।

মন্নুভাই (তাকিয়ে): ওকি আমাদের পিছু নিয়েছে মনে হয়?

নমিতা (হেসে): আগাথা ক্রিসটির রুদ্ধ কাউন্ট না ইতিহাসের মাতাহরি?

মন্নুভাই: না ইতিহাস নয় নমিতা। কোথায় পড়েছিলাম বার্টরাণ্ড রাসেলের একটি কথা: "বাইবেলের ভগবান্ আছেন বিশ্বাস করতে না পারলেও শয়তান আছেন এ-বিশ্বাস আমার অচল অটল।

নমিতা (হেসে): বলেছেন ভালো। তবে ও যে মেয়েছেলে হয়ে আমাদের পিছু নেবে গুপ্তচরের মতন—এতটা—

মাইক্রোফোনের অট্টনাদ: "আমেদাবাদের প্লেনের যাত্রীরা এগিয়ে আসুন, প্লেন ছাড়ল ব'লে।"

আঠারো

নমিতা ও মন্নুভাই পাশাপাশি বসে—শেষের দিকের সীট-এ। তাদের সামনে চার পাঁচটা সার সীটে একটিও আরোহী নেই দেখে ওরা নিশ্চিন্তি হ'য়ে বসল। মন্নুভাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল: "থ্যাংক গড্! সে আসে নি।"

নমিতা বলল: দাঁড়ান, রথ উড়ুক আগে। মা জননী বলতেন: মরবে নারী উড়বে ছাই, তবে নারীর গুণ গাই। আগে শেষ পর্যন্ত দেখুন ধূমকেতু উদয় হল কি না।"

ভ র্…র্…র্…র্…

মন্নুভাই (বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে) এ-বার?

নমিতা (ঈষৎ হেসে): এবার সংকটতারণের গুণ গাই:

হরি! বাঁচালে বাঁচালে বাঁচালে হে!
তাকে খেদালে খেদালে খেদালে হে!

মন্নুভাই (হেসে): তোমাকে আর তোমার বাবাকে এইজন্যে আমার এত ভালো লাগে, জানো? You have not a care in the world—যেন উড়ে চলেছ সর্বদাই।

নমিতা (হেসে): আর আপনি?

মনুভাই (হঠাৎ বিষণ্ণ) : আমার দিন ফুরিয়েছে—কোনো আশাই নেই আর।

নমিতা (সান্ত্বনার সুরে) : অমন কথা বলে না। যদি সত্যিই ক্যান্সারই হয় তা হ'লেও আজকাল তত ভয় নেই, রেডিয়ামে কত রোগীকে সারতে দেখেছি।

মনুভাই (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে) : সে আশা দুরাশা। অপারেশন করলে হয়ত বাঁচতেও পারি, কিন্তু না করলে বড়জোর আর তিন চার মাস—

নমিতা : ডাক্তার কি স্পষ্ট বলেছেন একথা ?

মনুভাই। নৈলে কি আমি বানিয়ে বলছি ? ঠিক হয়েছে আগষ্টের প্রথম সপ্তাহেই অপারেশন হবে—আজ জুলাই মাসের পয়লা তো ? মাত্র আর এক মাসের মেয়াদ, হয়ত অপারেশন টেবিলেই—

নমিতা : কী যে ছেলেমানুষি করেন! আজকাল সার্জারির এত উন্নতি হয়েছে—

মনুভাই : কেন ছেলে ভোলাচ্ছ নমিতা ? আমার বয়স আজ পঞ্চান্ন হ'তে চলল। আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট বেঁচেছি।

নমিতা : অমন করবেন না। বারবার কুডাক ডাকতে নেই। আপনি ভালো হয়ে যাবেন—আমি বলছি। তাই তো আপনার সুমতি হয়েছে।

মনুভাই : সুমতি ? সাহেবেরা বলে : "Coo!"

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ। সামনের সীটে তিনচারজন মেম ও সাহেব তন্দ্রালু হ'য়ে এলিয়ে পড়ল। নমিতাও চোখ বুঁজল।

মনুভাই : নমিতা! ঘুমোলে ?

নমিতা (চোখ খুলে) : না। এম্নি ভাবছিলাম।

মনুভাই : ঘুমিও না। একটু কথা বলো।

নমিতা : কী বলব বলুন ?

মনুভাই (সহসা) : নমিতা, আমি অনেক অন্যায়ই করেছি। গৌরীকে কষ্ট দিয়েছি, প্রহ্লাদকে সাবিত্রীকে রমাকে—কাকে নয় ? কিন্তু আমি এরকম ছিলাম না, সত্যি বলছি। বড় একলা আমি···তাই।

নমিতা : একলা এ জগতে কে নয় বলুন ? গুরুদেব প্রায়ই বলেন : 'মা, মানুষ জন্ম থেকে মরণ পর্যন্ত তার ছোট আমি-র দ্বীপান্তরে কাটায়। মানুষের সঙ্গ যেন নৌকা ক'রে এ দ্বীপ থেকে ও-দ্বীপে যাওয়া বা ও-দ্বীপের লোক এদিকে আসা—খানিকক্ষণের জন্যে। তারপরই যে একলা সেই একলা—বরং আরো একলা—ঠিক যেমন হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলকের পরে অন্ধকার গভীর হয়। একমাত্র ভগবানের সঙ্গ পেলে তবেই কাটতে পারে মানুষের একলা হবার দুঃখ—ওঁকে বন্ধু—আমি বা দেহের খাঁচায়-বন্দী আমির দুঃখ। ভাবুন তো কী দুঃখ এ? আমার পঁচিশ বৎসর বয়স, আপনার পঞ্চান্ন, কিন্তু আমি এ পঁচিশ বছরে নিজের সঙ্গে ঘর ক'রে নিজেকে যতটা জেনেছি চিনেছি বুঝেছি, আপনি পঞ্চান্ন বৎসরেও তার চেয়ে বেশি জানেন নি, চেনেন নি, বোঝেন নি। যখন নিজেরি কাছে নিজেকে অচিন বিদেশী মনে হয় তখন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবকে কি পরদেশী মনে না হ'য়ে পারে ? রমার কাছে শুনেছি—আপনি উঠতে বসতে সাধুদের বিশ্বাসকে নিয়ে হাসা-হাসি করেন, বলেন গুরুটুরু সব কুসংস্কার, ভগবান্ একটা মনগড়া মিথ্যে কল্পনা, আরো কত কী। ·কিন্তু আমরা—যারা আপনার চেয়ে জগৎকে অনেক কম জানি—এইটুকু বুঝেছি যে, সাধুকে গুরুকে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করলে শুধু যে নিজেকে আর তেমন একলা মনে হয় না তাই নয়, গভীর দুঃখেও শান্তি পাওয়া যায়, নিরাশায়ও ভরসা আসে। কিন্তু আপনি, হয়ত মনে মনে হাসছেন আমার বক্তৃতা শুনে—ভাবছেন হয়ত blue stoching!

মনুভাই (নমিতার হাত চেপে ধ'রে) : ছি নমিতা! অমন কথা বলে?—(হাত ছেড়ে দিয়ে) বলো কী বলছিলে—সত্যিই ভালো লাগছিল, যদিও কেন—জানি না।

নমিতা : দুঃখ পেলে মন গ্রহিষ্ণু—receptive হয়, তাই হয়ত শুনতে চাইছেন—আমারও বলতে ভালো লাগছে। বলতে যাচ্ছিলাম কী জানেন ? গুরুদেবের একটি প্রিয় শ্লোক—মহাভারতে—যুধিষ্ঠির বলেছিলেন দ্রৌপদীকে :

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাৎ চরিতো ধর্মচারিভিঃ
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতদ্ জগন্মজ্জেৎ অনিন্দিতে।

এর মানে—ধার্মিকের আদর্শ ধর্ম যদি নিষ্ফল হ'ত তাহ'লে এজগৎ বহুদিন আগেই অন্ধকারে ডুবে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে

যেত। কিছু মনে করবেন না কিন্তু—ভাববেন না আমি উপদেশ দিচ্ছি। আপনি এত দুঃখ পাচ্ছেন ব'লেই বলছি এসব কথা, বিশ্বাস করবেন।

মনুভাই: করি নমিতা। আর তুমি রমার সখী, বোন শুভার্থিনী ব'লেই নয়, তার সুবাদে তোমাকে মনে হয়—সত্যি বলছি—যেন নিজের মেয়ে। তাই আমার অনুরোধ তুমিও একথা অবিশ্বাস কোরো না। না, হাসি নয়, যদি সত্যি বিশ্বাস করো—তবে আর একটা কথা বলব, যদিও বলতে বাধছে।

নমিতা: বলুন না। আমি বিশ্বাস করেছি আপনার কথা। তাই নির্ভয়েই বলুন।

মনুভাই (ওর হাত চেপে ধ'রে): আমার মনের মধ্যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। শুধু মৃত্যুভয় নয়—তার চেয়েও বেশি ভয় যদি রমাকে ফের হারাই—

নমিতা (চমকে): কী অলুক্ষুণে কথা বলছেন।

মনুভাই: না, শোনো। আমি রমার মৃত্যুর কথা বলছি না। বলছি যদি শোভনার মোহ কাটাতে না পারি শেষ পর্যন্ত?

নমিতা: উত্তর দিতে পারি এ কথার—কেবল যদি চান সত্যি উত্তর।

মনুভাই: বলো না—লক্ষ্মীটি। আমি সত্যিই চাই একটু আলো—একটু মনের জোর। বললাম না—আমার মনের মধ্যে শুধু অন্ধকার—পথ দেখতে পাচ্ছি না।

নমিতা: তাহলে শুনুন: আপনি গোড়ায় যে ভুলটি করেছেন সেটি শুধরে নিলে তবেই পথের দিশা স্থির হবে। বেঠিক পথে যতই এগোবেন ততই ঠিক পথ থেকে দূরে স'রে যাবেন। আপনি—

মনুভাই: শোনো নমিতা। আমি জেনেও কবুল করতে চাইনি যে, আমি ভুল করেছি। গৌরী তাই একদিন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ভুলকে ভুল ব'লে চিনেও যে-গুরুদ্রোহী অনুতাপ করতে চায় না তার কপালে অশেষ দুঃখ আছে। সে প্রায়ই গাইত কবীর সাহেবের একটি বিখ্যাত শ্লোক যে, ভগবান রুষ্ট হ'লে গুরু বাঁচাতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হ'লে কেউ বাঁচাতে পারে না।

নমিতা: জানি, বন্দিতা প্রায়ই আবৃত্তি করত:

কবীর তে নর অন্ধ হৈঁ, গুরু কো কহতে ঔর,
হরি রূঠে গুরু ঠৌর হৈ; গুরু রূঠে নহিঁ ঠৌর

মনুভাই: হ্যাঁ এই গানটিই সে গাইত আর বলত আমাকে যে, আমার প্রতি যখন গুরু বিমুখ হয়েছেন তখন I am doomed.

নমিতা: কিন্তু গুরু তো আপনার প্রতি বিমুখ হন নি—আপনিই বিমুখ হয়েছেন তাঁর প্রতি। ক্ষমা চাইলেই ফের দয়া পাবেন তাঁর।

মনুভাই (সাগ্রহে): পাব? সত্যি বলছ? না, অনুমান?

নমিতা: অনুমান নয়, আমি জানি। কারণ গুরুদেব আমাকে বলেছেন এ কথা।

মনুভাই: কী? যে, আমার গুরুদেব আমাকে ক্ষমা করবেন এত অপরাধের পরেও?

নমিতা: করবেন করবেন করবেন—আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারি—কেবল একটি সর্তে: যে, অধর্মের পথে আর চলবেন না। গুরুদেব বলেন: আলো আর অন্ধকার একসঙ্গে বাস করতে পারে না। পুব দিকে চলতে হ'লে পশ্চিমের দিকে পিঠ ফেরাতেই হবে। কি বলেন? রাজী?

মনুভাই: আমার সাহস হয় না। তুমি একবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করবে?

নমিতা: কেন করব না? আপনি রমার জন্মদাতা, গৌরীদেবীর স্বামী—সবচেয়ে বড় কথা: গুরুদেবের গুরু-ভাই—আপনি তো আমাদের আপনজন। আর আপন-জনকে কাছে টানতে না চায় কে বলুন? কেবল একটি কথা বলতে চাই যদি ভরসা দেন—কিছু মনে করবেন না।

মনুভাই: না না বলো না। তোমাকে কি বলি নি তুমি আমার মেয়ের মতন, সত্যি নমিতা, তোমাকে হঠাৎ কেন এত আপন মনে হ'ল···মনে হয় যেন কত কালের চেনা···যেন—(অশ্রু আভাষে কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসে)

নমিতা (কোমল কণ্ঠে): আমি বুঝতে পারি: গুরুকৃপায়ই এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। গুরুদেব প্রায়ই বলেন একটি কথা যে, গুরুকে শিষ্য ছাড়লেও গুরু ছেড়ে যান না, শিষ্য যখন ছেড়ে যায় তখনও তিনি অপেক্ষা

করেন। রজনী সেনের একটি গান আছে আমার কী যে ভালো লাগে: (মৃদু স্বরে আবৃত্তি করে):

(আমি) অকৃতী অধম ব'লে তো আমায়
কম ক'রে কিছু দাও নি।
(পরে) যা দিয়েছ তার অযোগ্য ভাবিয়া
ফিরিয়েও কিছু নাও নি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শতবার যাই বাঁধন কাটিয়া,
(পরে) ভাবি—ছেড়ে গেছ, ফিরে চেয়ে দেখি—
এক পাও ছেড়ে যাও নি!

নমিতার চোখে জল ভ'রে আসে, মনুভাইয়েরও চোখ চিক চিক ক'রে ওঠে, সে ওর হাত কপালে ঠেকিয়ে পরে চোখ ঢেকে খানিকক্ষণ মাথা হেঁট ক'রে থেকে বলে গাঢ় কণ্ঠে: "কী কথা বলতে চাইছিলে?"

নমিতা (একটু ভেবে সাবধানে): বলা একটু মুস্কিল···কারণ আপনি ভুল বুঝলে—

মনুভাই: না না ভুল বুঝব না। তবে আমি জানি কী বলতে চাইছ—শোভনার কথা তো?

নমিতা (মুখ নিচু ক'রে): হ্যাঁ। মানে, গুরুদেবের কৃপা যদি ফিরে পেতে চান তবে শোভনা দেবীর প্রসাদের মায়া কাটাতেই হবে। অর্থাৎ, রমার সম্বন্ধে, কি আপনার উইল সম্বন্ধে, কি গুরুদেবের সম্বন্ধে—তাঁকে কিছুই বলবেন না আর এখন থেকে। কথা দিতে হবে।

মনুভাই (একটু চুপ ক'রে থেকে): আমি কিছু বলব না কথা দিতে পারি। কেবল···যদি সে কোনো সূত্রে জানতে পারে?

নমিতা: মানে?—অলিভিয়া?

মনুভাই: হুম্। আমার মনে হয় We have n't seen the last of her ladyship.

নমিতা: একথা আমারও মনে হয়েছে। কিন্তু—থাক এখন ভাববেন না। এখন শুধু ভাবুন গুরুদেবকে। আর ডাকুন তাঁকে।

মনুভাই (জোর ক'রে হেসে): ঠিক বলেছ। সাহেব পুরাণেও বলে: you don't have to cross the bridge before you get to it.

আকাশ-গরুড় আমেদাবাদে নামবার মুখে ফের দুলে ওঠে। ওরা কোমর বন্ধ বাঁধে ফের।

উনিশ

রমাকে বুকে ক'রে মনুভাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—প্রায় শিশুর মত।

কান্না থামলে রমা বলল চোখের জলে হাসির আলোর ঝিলিক দিয়ে: "বাবা, একটা কথা বলব এখন?"

মনুভাই (হেসে): একটা কথা কেন মা? একশো একটা কথা বলতে পারিস। তোর নমিতাদিকে জিজ্ঞাসা কর না—কী বলেছি আমি তাকে।

রমা (নমিতাকে): কী দিদি?

নমিতা (মনুভাইকে): আপনি তো অনেক কথাই বলেছিলেন—

মনুভাই: কিন্তু কথার মত কথা একটিই বলেছি: যে, আমার বিষদাঁত ভেঙ্গে গেছে।

রমা (পিতার দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে): অমন কথা বলে না বাবা। গুরুদেব বলেন: চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। দুঃখ পেয়েছেন আপনি অনেক, এবার ঘুরে সুখের দিন ফিরে আসবে—যদি অবিশ্যি সব আগে ধর্মকে চান।

মনুভাই (দীর্ঘ নিশ্বাস): সুখের দিন? সে আশা আর করি না মা, কেবল···যদি দিন আমার ফুরিয়েই এসে থাকে তবে···যেন ক্যান্সারের অপারেশনের টেবিলেই সব শেষ হয়ে যায়—বৎসরের পর বৎসর কাৎরাতে কাৎরাতে মরতে চাই না।

রমা: অমন কথা বলে না বাবা! অপারেশন তো না করতেও হ'তে পারে?

মনুভাই (গাঢ় কণ্ঠে): সে আশা নেই মা, ডাক্তার বলেছে অপারেশন না করলে বাঁচবার কোনো আশাই নেই।

নমিতা (ব্যাগ থেকে "পান্দ্রে পিও" বইটি বের ক'রে) রমুন। (কয়েকটি পাতা উল্টিয়ে) পড়ুন—কাকাবাবু—আপনাকে এখন থেকে কাকাবাবু বলব, কেমন?

মনুভাই (ম্লান হেসে): তোমার দয়া মা। তবে গৌরী আমাকে উপাধি দিয়েছিল: "গুরুদ্রোহী।"

রমা : কিন্তু আপনি তো আর এখন সে-মানুষ নেই বাবা।

মনুভাই : মা, মানুষের পঞ্চান্ন বৎসরের অভ্যাস সংস্কার দুর্বলতা কি একদিনেই যায় ?

রমা : যায় বাবা, যায়। গত গুরুপূর্ণিমার দিন গুরুদেব গীতার একটি শ্লোক বলেছিলেন যে অতি দুরাচারও যদি ঠাকুরকে একমনে ডাকে তাহ'লে সে ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা—দেখতে দেখতে ধর্মাত্মা হয়। গীতার কথা কি কাটা যায় বাবা ?

মনুভাই : মা, অতটা বিশ্বাস আমার হয়নি এখনো—হবেও না হয়ত কোনো দিন। আমি এই পঞ্চাশ বৎসরে একটি মানুষকেও রাতারাতি ধর্মাত্মা হ'তে দেখি নি তো—গীতা বললে কী হবে ? আমি শুধু দেখেছি যে, মানুষ বহু চেষ্টায় তবে একটু এগোয়। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা ?—ও হয়ত গীতার দ্বাপর যুগে ঘটত—কিন্তু এ-যুগে হবার নয় মা, the age of miracles is past—অঘটন আর ঘটেনা এ-ঘোর কলিতে।

নমিতা : কে বললে ঘটে না ? (পাদ্রে পিওর বইটি খুলে) মন দিয়ে শুনুন ডাক্তার জিওভান্নি গিলিয়োৎসির (Giovanni Gigliozzi) কাহিনী—এই বারোর অধ্যায়ে আরো অনেক অঘটনের কথা পাবেন, আমি শুধু একটা পড়ে শোনাচ্ছি (ব'লে ফের পড়ে) "তিনি পাদ্রে পিওকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। ১৯৫৬ সালে এপ্রিল মাসে রোমে তাঁদের ডাক্তার তাঁকে বলেন যে তাঁর মা-র ক্যান্সার হয়েছে। (মুখ তুলে) এরপর অনেক খুঁটিনাটি আছে। তার সারমর্ম এই যে জিওভান্নি পাদ্রে পিওর কাছে যেতেই পাদ্রে পিও তাঁকে বলেন : "তোমার মা জানেন যে আমি তাঁর জন্যে প্রার্থনা করব।" এক সপ্তাহ পরে ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে দেখে ক্যান্সার সেরে গেছে।*

মনুভাই : বলো কি ? দেখি।

নমিতা : পড়বেন পরে—এখন বিশ্রামের সময়—শুয়ে ঘুমোন, আপনি বড় ক্লান্ত, অসুখ শরীরে রাতজাগা ভালো নয়। কাল সকালে পড়বেন শেষ দুটো অধ্যায়—দেখবেন ইতালীর বিখ্যাত পত্রিকায় বড় বড় ডাক্তারের রিপোর্ট : (পাতা উলটোতে উলটোতে) জিওর্নালে দেলেমিলিয়াতে (Giornale dell' Emilia) লিখেছে—১৯৫৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর—ক্রোমোনিনি ব'লে এক ৬১ বৎসরের বুড়ির লিউকেমিয়া হয়। তার ছেলে পাদ্রে পিওর একটি ছবি মা-র বালিশের নিচে রেখে দেয়—সঙ্গে সঙ্গে বুড়ী নিরাময় হয়। (রমাকে) তুই ওঁকে কেবল বলবি—উঠতে বসতে—যে, পিন্টোর বিজ্ঞানের চেয়ে ঢের বেশি অঘটন ঘটাতে পারে সাধুর আশীর্বাদ, গুরুর কৃপা। কেবল চাই বিশ্বাস করা।

মনুভাই : সত্যি কথা এ সব ? না, আষাঢ়ে গল্প—old wives' tales ?

নমিতা (হেসে) : কাকাবাবু—এ যাত্রা এজাহার দিচ্ছে সাহেবরা। লুর্‌দ্‌-এর জলেও কত শত রোগ আরোগ্য হয়েছে পড়েন নি কি ?

মনুভাই : শুনেছি কিছু কিছু। তবে পিন্টো বলে এ-সব গুজব।

নমিতা (অধীর কণ্ঠে) : কাকাবাবু পিন্টো কিছুই জানে না এ সব দৈবী অঘটনের। সাহেব পুরাণে একেই বলে talking through one's hat. বিখ্যাত সার্জন নোবেল লরিয়েট অ্যালেকসিস ক্যারল লিখেছেন যে তিনি বারবারই প্রার্থনায় অনেক সাংঘাতিক অসুখ সারতে দেখেছেন ডাক্তাররা হাল ছেড়ে দেওয়ার পরেও।

মনুভাই (ভাবিত) : তাই তো মা !...আচ্ছা আমি ভেবে দেখব, কেবল ভয় করে কেন বলব ? পাছে বিশ্বাস ক'রে ঠকি।

রমা : অবিশ্বাস করেও কি মানুষ কম ঠকে বাবা ? যদি তুমি তোমার গুরুদেবকে অবিশ্বাস না করতে তাহ'লে আজ তোমার হয়ত ক্যান্সার হ'তই না।

মনুভাই : কী বলছিস তুই রমা ? ক্যান্সার যে কার কবে কেন হয় কেউ জানে না।

নমিতা : ঠিক তেমনি সাধুর শক্তি গুরুর কৃপাও যে কেন ও কী ভাবে মানুষকে বদলে দেয় কেউ জানে না—এমনকি আপনার সবজান্তা পিন্টোও না।

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

রমা (উঠে টেলিফোন ক'রে) : কে ?...আমি রমা। ...আপনি কে ?...নাম বলবেন না ?...না, বাবা ক্লান্ত তার

* Padre Pio—১৭২—১৭৪ পৃষ্ঠা।

উপর অসুস্থ—যারা নাম বলে না তাদের জন্যে টেলিফোনে আসতে পারবেন না।…কী? হ্যালো!…শুনতে পাচ্ছি না একটু জোরে বলুন…আপনি কী চান কেবল তাঁকে বলতে পারেন?…না, এক মিনিটের জন্যেও আসতে পারবেন না তিনি?…কী? ফের বলুন…আপনি যা বলতে চাইছেন না শুনলে তাঁরই ক্ষতি?…আপনি কোথা থেকে কথা কইছেন?…বম্বে থেকে? আচ্ছা দাঁড়ান একটু (রিসীভারের মুখ হাত দিয়ে ঢেকে): এক মেম সাহেবই মনে হয়—চাইছেন আপনাকে একটি কথা বলতে—আপনার সঙ্গে তিনি আপয়ণ্টমেণ্ট করতে চান। কথা কইতে চান?

মনুভাই (নমিতার দিকে তাকায় বিব্রত মুখে): না, না, না—ব'লে দে, আমি দেখা করতে পারব না।

রমা (টেলিফোনে): হ্যালো! শুনুন ম্যাডাম। বাবা এখন ক্লান্ত…আপনি মিথ্যে বকছেন…না। কাল তিনি পুনায় ফিরবেন। চান তো সেখানে তাঁকে টেলিফোন করবেন ফের।…না, মিথ্যে পীড়াপীড়ি করবেন না ম্যাডাম—গুড্ নাইট!

কুড়ি

মনুভাই আমেদাবাদ থেকে বম্বে ফিরে নমিতা ও রমাকে নটরাজ হোটেলে রেখে গেল টাটা ইনষ্টিটুটে। সেখান থেকে টেলিফোন করল দুপুর বেলা—ডাক্তারেরা আরো কী একটা পরীক্ষা করতে চান, তাই রমা ও নমিতা যেন ডেক্কান কুইনে বিকেলে পুণা রওনা হয়, তিনি পরদিন সকালে ফিরবেন মোটরে।

নমিতা রমাকে একটি কথাও বলে নি অলিভিয়া সম্বন্ধে। পুণায় ডেক্কান কুইন পৌঁছল রাত সাড়ে আটটায়। আলোক নিজে এসেছিল স্টেশনে। নমিতা বলল: রমা একা, রাতে সে থাকবে তার ওখানে, মনুভাই পরদিন ফিরলে আলোক যেন তাকে নিয়ে যায়। রমা ফোন ক'রে তিন জনের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছিল।

মনুভাইয়ের সুন্দর বাড়িতে পৌঁছে ওরা গিয়ে বসল ড্রয়িং রুমে। রমা স্নান করতে গেল।

আমেদাবাদ ও বম্বের গরমের পর পুণায় ফিরে নমিতা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তরা জুলাই—বর্ষাকাল—পুণার বসন্ত কাল হ'ল আষাঢ় শ্রাবণ ভাদ্র। নমিতা আলোককে বলল প্রথমে মনুভাইয়ের অনুতাপের কথা।

আলোক (ভেবে): হুঁম্। লক্ষণ তো মোটের উপর ভালোই মনে হচ্ছে। ভোলও ফিরেছে, রংও ধরেছে কেবল ধোপে টি'কলে হয়।

নমিতা (ধমকে): অমন অবিশ্বাসের কথা বলে না। (হেসে) এতক্ষণ আমরা গুরুদ্রোহীকে বোঝাচ্ছিলাম বিশ্বাসের মহিমা। কিন্তু এখন দেখছি গুরুভক্তকে বোঝানো আরো বিষম দায়!

আলোক (হেসে): মা, তোমরা মেয়েছেলে—উচ্ছ্বাসের হাউইকে হাওদা ক'রে চলতে ভালোবাসো, আকাশ টিপ ক'রে প্রথম দিকে ভশ্ ক'রে ওঠোও অনেক উঁচুতে—

নমিতা (পাদ পূরণ করে): কেবল যা উঠতে না উঠতে ধ্বসে পড়ি ছাই হ'য়ে, এই না? বাবা! বাবা বাবা! তোমাকে সব আগে পড়াতে হবে পাদ্রে পিওর বই। কিন্তু সে হবে পরে, এখন একটি জরুরি পরামর্শ আছে। কী করি বলো তো?

ব'লে বলল অলিভিয়া সম্বন্ধে সব কথা—টেলিফোন পর্যন্ত।

আলোক (মন দিয়ে শুনে চিন্তিত সুরে): হুঁম্। রাত না পোহাতে আঁধি এল ছেয়ে। অলিভিয়াকে আমি বিলক্ষণ চিনি। দু তিনবার সে আমাকে ডেকেছিল। শরীরে তার নানা নোংরা রোগ। এরকম স্বৈরিণীরা থাকতে থাকতে শেষে ব্ল্যাকমেলারই হয়ে দাঁড়ায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ও মনুভাইকে সহজে ছাড়বে না—মানে চাইবে hush money.

নমিতা: আমারও তাই মনে হয়েছিল বাবা, কিন্তু তা হ'লে কী করা যায়? শোভনাকে ও জানালে সে তো কুরুক্ষেত্র করবেই করবে। অথচ মনুভাই ব্ল্যাকমেলারকে hush-money দেবে কোন্ মুখে? সবে ধর্মের দিক মুখ ফিরিয়ে অধর্মের সঙ্গে চুক্তি করা চলে না তো।

আলোক (চিন্তিত মুখে): ভাবনার কথা বৈ কি। বিশেষ রমার এই অবস্থায়। আমাদের প্রতিপদেই সব আগে ভাবতে হবে ওর কথা। তা ছাড়া মনুভাইয়ের জন্যেও দুঃখ হয়। কারণ তোমার বিশ্বাসের বহর দেখে

আমি বাহবা দিতে পারলেও "বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর" বলে সেন্টিমেন্টাল দোয়ার দিতে পারি না তো।

নমিতা: না, তা পারবে কেন? তোমরা পারো শুধু 'বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি'-র মধ্যে বোকা বিজ্ঞতার তুফান তুলতে। কিন্তু সে যাক। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—রমাকে অলিভিয়ার কথা বলব, না বলব না? একটু ব'লে রাখা ভালো নয় কি? ধরো, যদি ও হঠাৎ এখানে এসে হাজির হয়?

আলোক (করুণ হেসে) আমি শুধু নামেই আলো মা—কাজে—জোনাকি, পারি শুধু অন্ধকারকেই দেখাতে, পথ দেখাতে না। সে পারেন কেবল গুরুদেব যাঁর দৃষ্টিপাতে কালোও হ'য়ে ওঠে আলো। তাই এ-সংকটে তাঁর কাছে দরবার করাই পন্থা।

নমিতা (ওর হাতে চাপড় মেরে হেসে): তবু জাঁক ক'রে বলা হয়—বিংশশতাব্দীর ডাক্তারের আলোকিত মন বিশ্বাসের কুয়াশার সঙ্গে ঘর করতে পারে না। কবে ছাড়বে এই উল্টো পাল্টামি—বলতে পারো?

আলোক (হেসে): যেদিন অনুতাপে তনু জলে পুড়ে হবে ছাই। এখন জলুনি সবে আরম্ভ হয়েছে। দীক্ষা পাওয়ার দিন সেই গান বেঁধেছিলাম মনে নেই? (সুর ক'রে)

> হাঁচি টিকটিকি চরণতুলসী তিলফুল কোশাকুশি গো,
> এই শুধু পুঁজি এই শুধু খুঁজি এ-দেরই আদরে পুষি গো।
> বুদ্ধিরে মেনে বিশ্বাসে হায় এতদিন মানিনি যে গো,
> যত ভাবি অনুতাপে হায় তনু জ্ব'লে যায়,
> হবে কী যে গো।

নমিতা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

রমা (ঢুকে হাসিমুখে): কাকাবাবুর হাসির হরির লুটের একটু ভাগ পাই না দিদি?

নমিতা: না। বাবা বিশ্বাসকে নিশানা ক'রে যে-ব্ল্যাসফেমি সুরু করেছেন তোর মত ভক্তিমতীর কানে শোনাও পাপ। হাওয়াও অশুদ্ধ হ'য়ে গেছে তাই হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি।

রমা (হেসে): নৈলে পাছে কেঁদে ভাসাতে হয় এই ভয়ে?

খাওয়া দাওয়া শেষ হ'লে সিগার ধরিয়ে আলোক বলল: "শোভনা দেবী এখন তা হ'লে ফিরছেন না জুহু থেকে?"

রমা: বাবা তো তাই বললেন। তবে মা-র তো জানেনই—মতিস্থির নেই। হয়ত হঠাৎ একদিন ফিরে আসবেন ছুট্‌ ক'রে।

নমিতা (হেসে): আমরা প্রার্থনা করব গুরুদেবের কাছে যেন এ-দুর্মতি তাঁর না হয় অন্তত আরো দু-মাস।

আলোক (গম্ভীর হ'য়ে): না, এ হাসির কথা নয়। রমাকে বড় দুর্বল দেখাচ্ছে। খুব সাবধানে রাখা চাই। আর সবচেয়ে বেশি চাই প্রফুল্ল রাখা। তুমি মন খারাপ করবে না মা কিছুতেই, কেমন?

রমা: না, কাকাবাবু। কেবল...বাবার কথা ভাবতে বড় কষ্ট হয়। ক্যান্সার শুনেছি সারে না।

নমিতা (ধমকে): কে বললে সারে না? ডাক্তারিতে সারতে না পারে। কাল কী শুনলে পাদ্রে পিওর কথা?

ক্রিং...ক্রিং...ক্রিং...

রমা (উঠে টেলিফোন ধ'রে): কে?...গুরুদেব? প্রণাম।...হ্যাঁ আমি আজই ফিরেছি।...হ্যাঁ, কাকাবাবু ও নমিতাদি এখানে।...কী?...হ্যাঁ নমিতাদি কথা দিয়েছেন রোজ আসবেন সকাল সন্ধ্যা। আপনি আশীর্বাদ করুন গুরুদেব।...জানি। কেবল আরো আশীর্বাদ চাই।...হ্যাঁ গুরুদেব, ঠাকুরের কৃপায় অবশেষে বাবার সুমতি হয়েছে।...হ্যাঁ, ক্যান্সার, আপনি কী ক'রে জানলেন?...কী? কাশী থেকে গুরুমা বলেছেন?...কিন্তু কী হবে তাহ'লে?...বাবা কি ক্ষমা পাবেন না?...না গুরুদেব, আপনি গুরুমাকে ধরুন—তাঁকে পায়ে ঠাঁই দিতে।...না, তিনি না চাইলেও চাওয়াতে হবে—তাঁদের কৃপায়ই বাবার সুমতি হয়েছে—আমি জানি। কিন্তু আরো অনেক অনেক অনেক কৃপা চাই।...হ্যাঁ গুরুদেব, তিনি সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছেন—তাছাড়া কী যে অশান্তির উদ্বেগের মধ্যে তাঁর দিন কাটছে কী বলব! হ্যাঁ। মা জুহুতে, তবে ফিরে আসতে পারেন যে কোনোদিন, বলা যায় না। আর তিনি ফিরে আসবেন ভাবতেও আমার মনের সব আলো ভরসা নিভে যায়। আপনি শান্তি দিন। কী?...আচ্ছা বাঁচলাম।

আপনি কাশীতে গুরুমাকে বললে সব ঠিক হ'য়ে যাবেই যাবে।…হ্যাঁ আমি ভালোই আছি…প্রণাম।

বাইশ

নমিতা পরদিন সকালবেলা নারায়ণ পেটে ধ্রুবর ওখানে রমার খবর দিতে গেল পরমানন্দে। আলোক এসে ওকে নিয়ে গেল সেখানে। ওরা গিয়েই দেখে—কী আনন্দ!—সাধুজি!

ধ্রুব কাজে বেরিয়ে গিয়েছিল। মালতীর সঙ্গে চা খেতে খেতে নমিতা সাধুজিকে সব বলল। শেষে বলল অলিভিয়ার কথা।

সাধুজি সব শুনে গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে ছোট্ট একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন: "এই-ই হ'য়ে এসেছে মা আবহমান কাল। হয় কি জানো?—সাধনা যারা মন দিয়ে করতে চায় না তাদের পরীক্ষা কম—কিন্তু যারাই ঠাকুরকে সত্যি চায় তাদের তিনিও বাজিয়ে নেন। তাই মন খারাপ কোরো না—মনে রেখো—যা কিছু ঘটে যদি ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে পারি তবে আঘাতও হবে বর, কালোও আলো। ভুগতে হয়ত হয় প্রথমটায়, কিন্তু শেষরক্ষা হয়ই হয়। গুরুদেব আমাকে বলেছেন—রমাকে ঠাকুরের কৃপা আগলে থাকবে।

নমিতা: শুনে ভরসা পেলাম গুরুদেব। তবে কি জানেন? শোভনা দেবী হঠাৎ ফিরে এসে রমাকে দেখে যদি ক্ষেপে ওঠেন—

সাধুজি: তা হ'লেও রমাকে শান্ত থাকতে হবে। "সমত্বং যোগ উচ্যতে"—এ-গীতার কথা মা। প্রতিকূল অবস্থায় যদি শান্ত না থাকতে পারি তবে পরীক্ষায় পাশ হব কেমন ক'রে?

মালতী: কিন্তু মন যখন কাতর হয় তখন যে অধীর হ'য়ে উঠি গুরুদেব—বিশেষ দেহ যখন অপটু থাকে। রমার এখন সব আগে দরকার শান্তি। আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে মনুভাইয়ের এ-সুমতি রাতারাতি উবে না যায় তাঁর দজ্জাল স্ত্রীর দাপাদাপি হানাহানিতে।

নমিতা: আমি বলি কি, আপনি এবার নিজ মুখে মনুভাইকে বলুন। এখন সে শুনবে আপনার কথা। রমা চ'লে আসুক আমাদের ওখানে। ও-ও তাই চায়। কারণ ওর মনে ভয় আছে—ওর সৎমা কবে হঠাৎ ফিরে আসেন তাঁর তো মতিস্থির নেই।

সাধুজি (শান্ত কণ্ঠে): না মা, পরীক্ষাকে এড়িয়ে গেলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না—পাশ করতে হয়। রমাকে ওর বাপের বাড়িতেই থাকতে হবে।

আলোক: কেন গুরুদেব?

সাধুজি: এখন বলতে পারব না—কারণ সবটুকু দেখতে পাই নি। তবে এটুকু ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, রমার এখন আর কোথাও আশ্রয় পেতে গেলে চলবে না।

নমিতা (আতপ্ত): কেন চলবে না গুরুদেব? নরকে ব'সে মাথা না খুঁড়লে কি স্বর্গের সিঁড়ির খোঁজ পাওয়া যায় না?

সাধুজি (কোমল কণ্ঠে): মা, মনে রেখো তুমি দীক্ষা নিয়েছ।

নমিতা (মাথা নিচু ক'রে): আমার অন্যায় হয়েছে গুরুদেব। কিন্তু ওকে অশান্তির ব্যূহের মধ্যেই বা থাকতে হবে কেন—বলুন দয়া ক'রে—আপনার দুটি পায়ে পড়ি।

সাধুজি: তুমি তো ঠাকুরের কথামৃত পড়ো রোজই। মনে নেই—তিনি কী বলতেন? যে সয় সে-ই রয়?

মালতী (গাঢ় কণ্ঠে): আপনি নিজে যখন বিধান দিলেন গুরুদেব, তখন আর কী বলব বলুন? কেবল ভয় হয়—এমন লক্ষ্মীপ্রতিমাকে পাছে অকালে বিসর্জন দিতে হয়।

সাধুজি: ঠাকুর অর্জুনকে বলেছিলেন 'মচ্চিত্তঃ সর্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি'—যে মন্ময়তা কাটিয়ে তন্ময় হয় তাকে তিনি সমস্ত বিপদ থেকে ত্রাণ করেন। (ব'লে ফের সেই ব্যর্থক হাসি হেসে) তবে কি না, ভক্তকে তিনি একটু পরীক্ষা করেন মাঝে মাঝে।

আলোক (টুকল): সবই ত বুঝলাম গুরুদেব! কিন্তু সবাই ত আপনার মতন তন্ময় হতে পারে না—তাই সয়ে যাও বললেই সওয়া যায় না। পরীক্ষার চাপ বেশি হ'লে যদি ভেঙে পড়ে?

সাধুজি (হেসে): বাবা, একটা ধোপাও তার গাধার পিঠে এমন বোঝা চাপায় না যাতে সে ভেঙে পড়ে। আমাদের দয়াল ঠাকুরটি কি ধোপার চেয়েও বোকা যে

তিনি তাঁর ভক্তকে এমন চাপ দেবেন যাতে সে পিষে যাবে? আর একটা কথা ভুলো না—ভুলো না—ভুলো না—অনেকবার বলেছি আবার বলছি: যে রূপা পাওয়ার দায়িত্ব আছে। যে যত বড় হয় তাকে তত সইতে হয়। গড়-পড়তা লোককে অধীরতা মানায়, মানাতে পারে কিন্তু মহৎকে না। (একটু থেমে) তোমাদের সামনে আর একটি মেয়ে আছে তাকে দেখেও অনেক কিছু শিখবার আছে তোমাদের সকলেরই। সে ভক্তি। জানো তো—ওর স্বামী মারা যাওয়ার পরে এক ধনী ওকে বিয়ে করতে চায় ওর রূপে পাগল হয়ে—বলে: "আমি তোমাকে রাণীর হালে রাখব।" ও তাতে বলেছিল: "আমি দীক্ষা নিয়েছি—রাণীর হালে থাকতে নয়, ঠাকুরের পায়েই থাকতে—তাতে আমার যে হালই হোক না কেন।" রমাকে একথা মনে করিয়ে দিয়ে বলো সে, মনে যদি ফের অশান্তি আসে তা হ'লেও যেন সে এই কথাটি না ভোলে যে, ঠাকুর তার চোখের সামনে শুধু তো সংযমকেই দাঁড করান নি, ভক্তিকেও ধরেছেন ভরসা দিতে। কত দুঃখে পড়ে ও কী ভাবে অটল আছে ভেবে দেখেছ কি একবার?

নমিতা। গুরুদেব! আপনি নিজে রমাকে বলবেন চলুন এসব কথা। ও সকাল থেকে ঠাকুরঘরে কেবল আপনারই নাম করছে।

[ক্রমশঃ

মধ্যযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীজগবন্ধু নাথ

মধ্যযুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আজ আমাদের জীবন হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। আজ বাংলার সমাজ জীবনের বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বাংলায় ইংরাজের আগমনের পর সমাজ জীবনে বিরাট পরিবর্তন ঘটে। বাংলার মানুষ ইংরাজের সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর অনুকরণ-প্রিয় বাঙ্গালী ইংরাজের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিতে শুরু করে। সেদিন আমাদের এই জাতীয় চরিত্রের দোষত্রুটি ঈশ্বরচন্দ্রকে পীড়া দিয়াছিল। কলিকাতায় বসিয়া কবি স্বচক্ষে সব দেখিয়াছেন, আর পীড়া অনুভব করিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতা ব্যাঙ্গাত্মক। তিনি ছিলেন কলিকাতার সমাজ জীবনের সার্থক বাণীকার। একদিকে যেমন ব্যাঙ্গাত্মক কবিতা, অন্যদিকে তেমনি স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার দ্বারা বাংলার দোষত্রুটির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

আমরা জানি তিনি প্রাচীন যুগের কবি। বঙ্কিমচন্দ্রও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যকে প্রথমে স্বীকৃতি দেন নাই। এখানে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি স্মরণীয়। "He was ignorant and uneducated man and uncultivated. His writings were generally disfigured by the grossest obscenity. "কিন্তু পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। আধুনিক যুগের কবিবৃন্দও তাঁহার কাব্যের মূল্য অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্য সম্বন্ধে সব চাইতে বড় অভিযোগ এই যে, তাঁহার কাব্য অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট ও তিনি প্রাচীনপন্থী। ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যে অশ্লীলতা বর্তমান—একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তখনকার সমাজ জীবনের কথা যদি চিন্তা করি, তাহা হইলে দেখিব যে ঐ অশ্লীলতার বিষ সমাজের মধ্যেই বর্তমান ছিল। কবি সমাজকে অস্বীকার করিতে পারেন না। সমাজের ছাপ তাঁহার কাব্যের উপর পড়িতে বাধ্য। বাংলা সাহিত্যে জয়দেবের কাব্যেও অশ্লীলতার ছাপ বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনও অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। তাহা ছাড়াও ভারতচন্দ্রের কাব্যের মধ্যেও ঐ অশ্লীলতার ছাপ প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। সুতরাং ঐ একমাত্র অপরাধে যদি গুপ্ত কবিকে অপরাধী করি, তাহা হইলে জয়দেব, শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্তন ও ভারতচন্দ্র একই অপরাধে অপরাধী। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার কাব্যের বিরুদ্ধে প্রাচীন পন্থার অভিযোগ আনা হইয়াছে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁহার প্রাচীনতার প্রতি স্বভাবসুলভ অনুরাগ ছিল। তিনি যেমন বিধবা বিবাহকে সমর্থন করিতে পারেন নাই, ঠিক তেমনি সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ করার ব্যাপারে তিনি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রথাকে অস্বীকার করিবার একমাত্র কারণ এই যে বেশী বয়সের বিধবা বিবাহে তিনি সমাজের অকল্যাণ দেখিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যে সমাজের ছাপ পড়িয়াছে। কলিকাতার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের সুন্দর প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করিলে এই বিষয়ে ভালভাবে অবগত হওয়া যাইবে।

বিধবা বিবাহ প্রসংগে তিনি বলিয়াছেন,—

"সকলেই এইরূপে বলাবলি করে
ছুড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি তরে॥

অথবা,

"যারে ইচ্ছা তারে হয ডাকিয়া আনিয়া
ঘরেতে বিধবা কত পরিচয় নিয়া॥
গোপনেতে এই কথা বলিবেন তাবে।
জননীর বিয়ে দিতে পাবে কিনা পারে॥"

এই জননীর বিয়ে দেওয়াতেই তাঁহার ঘোর আপত্তি।

স্ত্রী শিক্ষা প্রসংগে তিনি বলিয়াছেন,—

"যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে
নিচ্ছে যবে।
তখন এ, বি, শিখে বিবি সেজে বিলাতী
বোল কবেই কবে॥"

অথবা,

"এরা পর্দা তুলে ঘোমটা খুলে সেজেগুজে সভায় যাবে।
ড্যাম হিন্দুয়ানী বলে বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাবে॥"

এখানে দেখা যায় সমাজের ত্রুটির প্রতিই তিনি ইংগিত করিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে তিনি কোন দিন মত প্রকাশ করেন নাই। তাঁহার আপত্তি ঐ অনুকরণ প্রিয়তার জন্য। ইংরেজের ভাল গুণ আছে ইহা সত্য। আমরা ঐ সকল গুণাবলী নিশ্চয় অনুসরণ করিব। কিন্তু ইংরেজের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া আমরা যখন হিন্দুর আদর্শ ত্যাগ করি, তখনই আমাদের এই ইচ্ছার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রতিবাদ জানান। স্ত্রীশিক্ষা লাভ এ, বি, শিখে বিলাতী বোল কেন বলিব? কেন ড্যাম হিন্দুয়ানী বলিয়া বিন্দু বিন্দু ব্র্যাণ্ডি খাব? এইখানেই ঈশ্বর গুপ্তের ঘোর আপত্তি। সংবাদ প্রভাকরে বার বার তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষার অভাবে দেশের ক্ষতি হইতেছে একথা স্বীকার করিয়া তিনি পীড়াবোধ করিয়াছেন।

আর একটি কবিতার মধ্যে তৎকালীন বাংলার সমাজের নিঁখুত ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"মানমদে বিবি সব হইলেন ক্রেস।
খোদরের ফোলোরিম দুটি কাটা ড্রেস॥
দিশী কৃষ্ণ মানেনেক ঋষি কৃষ্ণ জয়।
মেরি দাতা মেরি সুত ভেরি গুডবয়॥
যা থাকে কপালে তাই টেবিলেতে খাব।
ডুবিয়া ভবের টবে চ্যাপেলেতে যাব।"

ইংরাজের অনুকরণে ব্যস্ত বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে তিনি তাঃ প্রতিবাদ করিয়াছেন। এই কবিতাটির মধ্য দিয় তৎকালীন দেশী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে তাব্র ব্যঙ্গ ধ্বনিত হইয়াছে।

কতকগুলি কবিতার মধ্য দিয়া বিমল ও শুভ্র হাস্যরস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"পাঁটা" কবিতায়:—

"ত্রিতাপের তরে লোক তব নাম নিয়া।
বাঁচালে দক্ষের প্রাণ নিজ মুণ্ড দিয়া॥
পরম বৈষ্ণবী যিনি দক্ষের দুহিতা।
ছাগ মাংস রক্তে তিনি সদাই মোহিতা॥

অথবা,

"এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ" কবিতায়:—

"কষিত কনককান্তি কমনীয় কায়।
গালভরা গোফদাড়ি তপস্বীর প্রায়॥

"আনারস" কবিতাটিও সুন্দর। এখানে আনারসের বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি সুন্দর রস পরিবেশন করিয়াছেন।

"বন হতে এলো এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর॥"

অথবা,

"সকল নয়ন মাঝে রক্ত আভা আছে
মনে হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে ॥"

'পৌষ পার্বণ' কবিতায় হাস্যরসের ইংগিত আছে।

"সুখের শিশির কাল সুখে পূর্ণ ধরা।
এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা ॥
মধুর মধুর ধনি মুখ শতদল।
সলিলে ভাসিয়া যায় চক্ষু শতদল ॥"

"পৌষড়ার গীত" কবিতার মধ্য দিয়া সাধারণ মানুষের মর্মবেদনা সুন্দরভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঘরে বাড়ি ধনধনাস্তি
মশা মাছি ভনভনাস্তি
শীতে শরীর কনকনাস্তি
একটু কাপড় নাইক পিটে।
দারাপুত্র জন জনাস্তি
অস্তি নাস্তি ন জানাস্তি
দিবে রাত্রি খেতে চাস্তি
আমি ব্যাটা মরি খেটে ॥"

ইহা ছাড়াও ঈশ্বচন্দ্রের কাব্যের মধ্যে স্বদেশ বৎসলতার ছায়া বর্তমান। তিনি দেশকে ভালবাসিয়াছেন তাই দেশের দুর্দশা তাঁহাকে পীড়া দিয়াছে। ঈশ্বরগুপ্তের এই স্বদেশপ্রীতি শুধু তাঁহার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। "সংবাদ-প্রভাকর" তখন বাংলার সাহিত্যজগতে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বরূপ। ঐ সংবাদ প্রভাকর বাংলার বহু সাহিত্যিককে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, অক্ষয়-কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, মনোমোহন বসু ঐ সংবাদ প্রভাকরের নিয়মিত লেখক ও পাঠক ছিলেন। তাঁহারা ঐ পত্রিকার রচনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এক দৃঢ় পদক্ষেপ স্থাপন করিয়াছিলেন। "মাতৃভাষা, স্বদেশ, ভারতের অবস্থা' ভারতের ভাগ্য বিপ্লব"প্রভৃতি কবিতায় ঐ স্বদেশ বৎসলতার ছায়া বর্তমান।

মাতৃভাষা কবিতায় বাংলা ভাষার প্রতি দরদ সুন্দর-ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

"যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণ গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা, পুরালে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥"

অথবা 'স্বদেশ' কবিতায় স্বদেশের প্রতি কবির ব্যাকুলতা প্রকাশ পাইয়াছে।

"জান না কি জীব তুমি জননী জন্মভূমি,
সে তোমায় হৃদয়ে রেখেছে।
আসিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে তোমায় এমন দেখেছে।

'ভারতের ভাগ্যবিপ্লবে' কবির ব্যথিত হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ পাইয়াছে।

'জননী ভারতভূমি, আর কেন থাক তুমি,
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার মত যত, সকলেই জ্ঞান হত,
মিছে কেন মর ভার বয়ে?
পূর্বকার দেশাচার কিছুমাত্র নাহি আর
অনাচারে অবিরত রত।
কোথা পূর্বরীতি নীতি অধর্মের প্রতি প্রীতি,
শ্রুতি হয় শ্রুতিপথ হত।
দেশের দারুণ দুঃখ দেখিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে ম্লানমুখ মসিছাঁদে,
শোক অশ্রু করে বরিষণ ॥

"ভারত সন্তানের প্রতি" কবিতায়, কবি ভারতের সন্তান-দের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছেন।

"উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর।
বাহিরিতে কি হয়েছে দেখ একবার ॥
কেন আর ঘুমাইয়া সময় হারাও।
মশারির দ্বার খুলে মুখ তুলে চাও ॥
এখন আলস্য নহে বিধান বিহিত।
সাধ্যমতে সিদ্ধকর স্বদেশের হিত ॥

এইভাবে আরও বহু কবিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে কবি ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশবৎসলতার মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। তিনি স্বদেশকে প্রাণ দিয়া ভাল-বাসিয়াছেন। স্বদেশের দোষ ত্রুটি; দুরবস্থা দর্শনে কবি পীড়া অনুভব করিয়াছেন।

ইহা ছাড়াও কবি ঈশ্বর গুপ্তের আরও বহু কবিতা

আছে। ধর্মমূলক রঙ্গমূলক কবিতা ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে কবিতা বর্তমান। ঐ সকল কবিতার মধ্যে একদিকে যেমন রসের খোরাক পাই, অন্যদিকে তেমনি কবির হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগও ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুধর্মের দোষ ত্রুটিও তাঁহার মনকে পীড়া দিয়াছে। আর কবি ভালবাসিয়াছেন বাংলা দেশকে। বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস, প্রকৃতির আহ্বান কবিকে বার বার অনুপ্রাণিত করিয়াছে। আবার পরক্ষণেই বাংলার দোষ ত্রুটি কবিকে পীড়া দিয়াছে। ঐ সকল কবিতার মধ্যে আমরা কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পাইয়া থাকি। তিনি শিল্পী—তিনি কবি। এইখানেই তাঁহার সার্থকতা।

আর একদিক দিয়া কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে বিচার করা যায়। তিনি অতীত ও বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে অতীত বাংলার সমাজের ছাপ বর্তমান। কবি যুগকে অস্বীকার করিতে পারেন না। যুগের প্রভাব তাঁহার উপর পড়িতে বাধ্য। এ যুগসন্ধিক্ষণের পটভূমিকায় গুপ্তকবির আবির্ভাব।

তাঁহার উপর অতীতের ছাপ বর্তমান। পয়ারের বন্ধনকে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতাকে তিনি কখনও ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া ঐ সময় কবিওয়ালাদের প্রভাব বাংলার কাব্যের উপর পড়িয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবিওয়ালাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। কবিওয়ালাদের অনুকরণে শ্লেষ, যমক, প্রভৃতি অলংকার তিনি তাঁহার কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের অনুসরণে দেবতা কণ্টকিত বাংলা কাব্যকে সমাজের সমস্যার মধ্যে নামাইয়া আনিয়াছেন। সমাজের সাধারণ মানুষ ও তাহাদের আচরণকে উপেক্ষা না করিয়া, কবি তাহার কাব্যে স্থান দিয়াছেন। এইভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে তিনি সত্যই প্রাচীনপন্থী।

কিন্তু আর একটা দিক আছে। যে দিক হইতে বিচার করিলে তাঁহার কাব্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রাচীনপন্থী বলা যায় না। তিনি আধুনিকতাকে অস্বীকার করেন নাই। আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার প্রতি তাঁহার আকুল আগ্রহ সত্যই বিস্ময়ের বিষয়। তিনি ইংরাজী সভ্যতাকে অস্বীকার করেন নাই। ইংরাজের ভাল গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন গুপ্ত কবি। একদিকে প্রাচীন অন্যদিকে আধুনিক, একদিকে অতীত, অন্যদিকে আগামীকাল; উভয়ের সংমিশ্রণে কবির কাব্য সার্থকতার সীমা স্পর্শ করিয়াছে। তিনি নারী শিক্ষার বিরোধী নহেন। ইংরাজী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি তাঁহার আগ্রহ অসীম। আবার হিন্দুয়ানীর সংরক্ষণে অধিক ব্যস্ত। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরোধী—আবার বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী নহেন। একদিকে তিনি প্রাচীনকে স্বীকার করিয়াছেন, আবার অন্যদিকে তিনি আধুনিকতাকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

গুপ্তকবির যুগ যুগসন্ধিক্ষণের যুগ। এই যুগসন্ধিক্ষণে তাঁহার কাব্য বার বার আলোড়িত হইয়াছে দুই দিক হইতেই। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর একশত বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইল। এই যুগে একমাত্র তিনিই শক্তিমান্ কবি। কবিওয়ালাদের কাব্য-কৃতিকে অস্বীকার না করিয়াও কবি অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, যাহা কবিওয়ালাগণ পারেন নাই।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইল। আর ১৮২৪ সালে স্থাপিত হয় সংস্কৃত কলেজ। একদিকে আধুনিকতার প্রতীক আর অন্যদিকে প্রাচীনতার সংরক্ষণ। দুই দিক দুই পথে। প্রাচীন বলিয়াই যে তাহার সব কিছুই ভাল একথা সত্য নয়। আবার আধুনিক বলিয়া তাহার সব কিছুকেই বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে একথাও যুক্তিগ্রাহ্য নহে। উভয় মতের মধ্যে যেমন ভাল আছে, ঠিক তেমনি দোষও আছে। আমরা যেমন ভালকে গ্রহণ করিব, ঠিক তেমনি ত্রুটিগুলিকেও ত্যাগ করিব বিনা দ্বিধায়। এইখানেই তো মানবজীবনের সার্থকতা। এই বিচার না থাকিলে সভ্যতার রূপান্তর ঘটে না। একদিকে জড়বাদ আর অন্যদিকে আধ্যাত্মিকতাবাদ। উভয় দিক লইয়া স্থিরচিত্তে শান্তমস্তিষ্কে আলোচনা করিতে হইবে। গুপ্ত কবি ঐ আধুনিক সভ্যতাকে যেমন আহ্বান জানাইয়াছেন, ঠিক তেমনি ঐ সভ্যতার ত্রুটিগুলির প্রতিও ইংগিত করিয়াছেন। আবার ভারতের আধ্যাত্মিকতা-মণ্ডিত সভ্যতার প্রতিও অকুণ্ঠ সমর্থন জানাইয়াছেন। সুতরাং বলা যায় যে তিনি অতীত ও বর্তমানের সেতুবন্ধন রচনা করিয়াছেন। বর্তমান যুগে জড়বাদ ও আধ্যাত্মিকতাবাদের সমন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল রূপ ধারণ করিয়াছে। এই সমন্বয়ের মধ্যেই মানবসভ্যতার প্রকৃত মুক্তি ঘটিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে ঐ সমন্বয়ের বীজ নিহিত ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কাব্যজগতে ও সাহিত্যক্ষেত্রে যে মিলন-তীর্থ রচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার জন্যই অমর হইয়া থাকিবেন।

বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান

শ্রীজীতেন্দ্রনাথ সেন

এখানে বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট জ্ঞান (knowledge of material essence) আর প্রজ্ঞানের অর্থ প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান অর্থাৎ যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই তদ্বিষয়ক জ্ঞান (পরমাত্মজ্ঞান)। নির্বিশেষ নিষ্ক্রিয় শান্ত ব্রহ্মের বুকে যখন তাহার ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, তখন ঐ ক্রিয়া শক্তির নাম হইতেছে প্রকৃতি। ঐ প্রকৃতি হইতে প্রকাশ পাইয়াছে অনন্ত দৃশ্যরূপে, পদার্থরূপে জীব-জগৎ। ঐ জীব-জগতের পদার্থসমূহকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া যন্ত্রাগারে যন্ত্র সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ হয় উহার নামই বিজ্ঞান। আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি-সমূহ সসীম ও অপূর্ণ, তাই নানাবিধ যন্ত্র সাহায্যে উহাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া প্রকৃতির অজ্ঞাত বিষয়কে আমাদের জ্ঞান গোচর করাই এই বিজ্ঞানের কার্য্য। যতকিছু আবিষ্কার এই বিজ্ঞানবলেই সাধিত হইয়াছে। মানুষের অভাববোধ দূর করিয়া দুঃখের নিবৃত্তি করিবার জন্যই মানবমনের এই প্রয়াস। অনাদিকাল হইতেই এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছে। যতই বিজ্ঞান সহায়ে মানুষ তাহার অভাব দূর করিতেছে ততই মানুষের অদমিত কামনা বাসনা নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করিতেছে এবং বিজ্ঞান তাহা দূর করিতে করিতে বর্ত্তমানে এই সভ্য জগৎ গড়িয়া তুলিয়াছে। মানুষ যাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই সেই সমস্ত সুখ-সম্পদ লাভ করিয়া মানুষ কি প্রকৃত সুখ লাভ করিয়াছে? মানুষ কি তাহার বাসনার তাড়না হইতে নিবৃত্তি লাভ করিয়া প্রকৃত শান্তিলাভ করিয়াছে? বিজ্ঞান দিয়াছে মানুষকে অতুল সম্পদ মানুষের দুঃখ নিবারণের জন্য এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়াইয়া দিয়াছে তাহার অতৃপ্ত দ্বিগুণ অভাব। আবার বিজ্ঞানই দিয়াছে মারণাস্ত্র মানুষের সর্ব্বনাশের জন্য। তাই আমরা দেখিতে পাই বিজ্ঞান জন-কল্যাণে এতদূর অগ্রসর হইয়াও মানবের অভাববোধকে আদৌ দূর করিতে পারে নাই, বরঞ্চ তাহাদের সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়াছে। কামনায় প্রলুব্ধ মানুষ তাহার নিজের দেশকে বড় করিবার জন্য, তাহাদের স্বকীয় যশঃ সম্পদ, ও সুখসমৃদ্ধি বাড়াইবার জন্য বহু যুদ্ধ সরঞ্জাম, এটম বম, হাইড্রোজেন বম প্রভৃতি সৃজন করিয়া অপর রাষ্ট্রকে পদদলিত করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা তাহাদের সমকক্ষ বা শ্রেষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে তাহাদের ধ্বংসের নিমিত্ত কতই ষড়যন্ত্র ও মতলব আঁটিতেছে। কেহই চেষ্টা করিতেছেনা এই সমগ্র বিশ্বকে একই সংসার, একই পরিবার মনে করিয়া বন্ধুত্ব-সূত্রে গ্রথিত করিতে। কেহই মানুষে মানুষে, রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে, জাতিতে জাতিতে ভ্রাতৃভাব স্থাপন করিয়া এই সংসারকে সুখময় করিবার চেষ্টা করিতেছে না। ইহার কারণ মানুষ চায় প্রধানতঃ নিজ সুখ, তারপর নিজের সঙ্গে যাহারা জড়িত অর্থাৎ যাহাদের সুখের সহিত নিজের স্বার্থ জড়িত তাহাদের সুখ, আর চায় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য অপরের সঙ্গে একত্র হইয়া বা সংঘবদ্ধ হইয়া যে নিজস্ব সমাজ ও ক্ষুদ্র দেশ গড়িয়া তুলিয়াছে, সেই নিজ দেশ ও নিজ সমাজের সুখ ও উন্নতি। স্বার্থসংকীর্ণ মানবচিত্ত নিজ স্বার্থ লাভের জন্যই সর্বদা প্রয়াসী, তাই অপরের স্বার্থে হানা দেয়, অপরের দেশ জয় করিয়া তাহাদের দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে। মানবগণ নিজ সমাজ ও ধর্মকে বড় করিতে গিয়া অপরের সমাজ, দেশ ও ধর্মকে আক্রমণ করে, তারই ফলে মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে, দেশে দেশে, ধর্মে ধর্মে মারামারি। ইহাই যত যুদ্ধ বিগ্রহের ও সাম্প্রদায়িক অশান্তির কারণ। মানুষের মনে যতদিন হিংসা, দ্বেষ, সংকীর্ণতা ও স্বার্থ লোলুপতা থাকিবে ততদিন পরপীড়ন প্রবৃত্তি থাকিবেই থাকিবে এবং ততদিন বিশ্বে কিছুতেই প্রকৃত শান্তি আসিতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান যতই উন্নতি করুক প্রজ্ঞানবিহীন বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রকৃত শান্তি ও পূর্ণানন্দ কিছুতেই দিতে পারিবে না। বিজ্ঞান

দিয়াছে আমাদিগকে প্রকৃতির বাহ্য বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত যে পদার্থ ও জীব-সমূহ তাহাদেরই জ্ঞান (knowledge of material science) আর প্রজ্ঞান দিয়াছে প্রকৃতির অন্তরে অর্থাৎ প্রতি পদার্থে ও প্রতিজীবের অন্তরে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন যে চৈতন্য, ওই আনন্দময় চৈতন্য সত্তার জ্ঞান। ওই চৈতন্যময় সত্তাই সূত্রাত্মারূপে (প্রাণরূপে) সমগ্র বিশ্বের জীবসমূহকে, পদার্থসমূহকে এবং অগণিত গ্রহনক্ষত্রাদিকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন একই সূত্রে -গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন "ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোক্তং সূত্রে মণিগণা ইব" অর্থাৎ সূত্রে যেমন মণিসমূহ গ্রথিত থাকে তেমন আমাতে (ভগবানে] সমস্ত জীব-সমূহ ও সৃষ্ট পদার্থ-সমূহ গ্রথিত রহিয়াছে। শাস্ত্র বলেন যে এই সমগ্র বিশ্বের জীবগণ সেই ব্রহ্ম বা ভগবানেরই ইচ্ছায় তাঁহারই প্রকৃতির নিয়মে সকলেই প্রকৃতিনির্দ্দিষ্ট নিজ নিজ কর্ম্মানুবর্ত্তন করিতে করিতে এই সমগ্র সংসারকে ক্রমোন্নতির পথে লইয়া যাইতেছে। সুতরাং বিশ্বের মানবগণ একই প্রকৃতির কোলে জন্ম গ্রহণ করিয়া একই মাতার কোলে ভ্রাতৃভাবে পালিত হইতেছে এবং পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হইয়া, ওই ব্রহ্ম প্রকৃতির ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়া ব্রহ্মকর্ম্মই করিতেছে। এই যে ব্রহ্মপ্রকৃতির বা ব্রহ্ম-শক্তির নিয়ম উহা পালন করাই জীবের কর্ত্তব্য কর্ম ও ধর্ম। পূর্বে বলিয়াছি যে প্রকৃতি আর ব্রহ্ম একই বস্তু, কারণ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ। সুতরাং প্রকৃতির যে নিয়মে এই বিশ্ব শাসিত হইতেছে, চালিত হইতেছে উহাই ভগবৎ ধর্ম, উহাই বেদ বা প্রজ্ঞান। ওই প্রজ্ঞান যখন প্রকাশ পায় তখন আমরা প্রত্যক্ষ সত্য জ্ঞান উপলব্ধি করি। তখন আমরা বুঝিতে পারি যে আমরা সকলে পরস্পরে এমনই অংশাংশিভাবে প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত যে প্রকৃতির কোন অংশ অর্থাৎ কোন জীব নিজ স্বার্থের জন্য অপর কোন জীবের প্রতি অন্যায় আঘাত করিলে প্রকৃতির বুকেই লাগে। কোন জাতির প্রতি কোন জাতি অন্যায় করিলে, কোন ধর্ম্মের প্রতি অপর ধর্মাবলম্বীজীব অন্যায় আঘাত করিলে প্রকৃতির নিয়ম (Administrative laws of god) সেই আইনভঙ্গকারী জীবকে বা জাতিকে শাস্তি দিবেনই—ইহাকেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রতিশোধ নহে—ইহা হইতেছে প্রকৃতিরূপিণী জননীর সন্তানকে শিক্ষা দিয়া প্রকৃত জ্ঞান দিবার ব্যবস্থা। সুতরাং ইহাও তাহার করুণা, সুতরাং প্রজ্ঞান মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে ভ্রাতৃভাবেরই শিক্ষা দিয়া প্রকৃত শান্তি বিশ্বে স্থাপন করে। এই প্রজ্ঞানই মনুষ্যগণের কামনা বাসনা শান্ত করিয়া এবং তাহাদের উদ্দাম লালসাকে সংযত করিয়া তাহাদের অহিংসা সত্য অস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাদি গুণাবলিতে প্রতিষ্ঠিত করে। এই প্রজ্ঞানই মানবজাতিকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ এবং প্রজ্ঞানের অনুশীলনই আমাদিগকে সর্ব অভাবের তাড়না হইতে বিনিবৃত্ত করিয়া পরম শান্ত অবস্থায় স্থিত করে। সুতরাং যতদিন বিজ্ঞানের সহিত প্রজ্ঞানের (ধর্মের) অনুশীলন না হইবে ততদিন মানবের প্রকৃত সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না এবং এই প্রজ্ঞান মানুষ যতটুকু লাভ করিবে ততটুকু তাহার সুখশান্তির কারণ হইবে। একদিন এমন আসিবে এবং সেদিনের দেরী নাই, যেদিন এই ভারতই তাহার প্রজ্ঞান বা প্রকৃষ্ট বেদজ্ঞান সমগ্র পৃথিবীকে দান করিয়া জগতের বরেণ্য হইবে।

পরম আত্মরসের আস্বাদন বা পরম আত্মমিলনানন্দ সম্ভোগ

রস শব্দের অর্থ আনন্দ, যে বিশুদ্ধ আনন্দ হইতে এই বিশ্ব প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে স্থিত রহিয়াছে এবং যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয় বা হইতেছে তিনিই "রসো বৈ সঃ"। জীব কি ভাবে ঐ পরম রসের আস্বাদন বা সম্ভোগ করিতে পারে এবং উহার সহিত মিলিত হইতে পারে তাহাই এখানে আলোচ্য বিষয়।

যে অখণ্ড বিষ্ণু সত্তা অখণ্ড রস-রূপে, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ-রূপে এই সৃষ্টির অন্তর-বাহ্যে "অস্তি, ভাতি, প্রিয়রূপে" নাম রূপের আবরণে অদৃশ্য রূপে রহিয়াছেন, ঐ আনন্দময় সত্তা তোমারও অন্তর বাহ্যে চিন্ময় আকাশের মত রহিয়াছেন। বিশ্বাস কর ঐ চিন্ময় আকাশ সত্তার অস্তিত্বে, তারপর ধীরে ধীরে মন একাগ্র করিয়া নিজের আত্মবোধকে অর্থাৎ আমিত্ব রূপ জীব-বোধকে চিন্তার সাহায্যে—কল্পনা বলে উপবিষ্ট করাও ঐ ব্যাপক আকাশবৎ বিষ্ণুসত্তার মাঝে। তারপর চিন্তা কর যে যেমন রসের মাঝে একটা রসে পূর্ণ রসগোল্লা ভাসিতে থাকে, যেমন একটি জলপূর্ণ ঘট

অখণ্ড জলসমুদ্রের মাঝে ডুবিয়া থাকে, তেমনি তুমিও ঐ বিষ্ণুসত্তার মাঝে ডুবিয়া আছ। তোমার ঊর্দ্ধে, নিম্নে, সম্মুখে, পশ্চাতে অন্তরে বাহিরে অখণ্ড আনন্দময় চিন্ময় রস ব্যতীত আর কিছুই নাই। তারপর তোমার নিজ জীব চৈতন্যকে (নিজ দেহস্থিত খণ্ড জীব বোধকে)—আমিত্ব বোধকে ঐ অন্তর-বাহ্যব্যাপী চিন্ময়বোধের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিতে থাক। এই রূপ সাধন কালে তোমার অন্তরস্থিত চৈতন্যকে আবরিত করিয়া তোমার যে দেহান্দ্রিয়াদি বোধ ও সংস্কারাদি নানা চিন্তার আকারে প্রকাশ পাইতে থাকিবে এবং তোমাকে তোমার চিন্ময় আনন্দময় বোধ হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে উহাদিগকে লয় করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে তোমার অন্তর-বাহ্য-ব্যাপী ঐ প্রাণময় বিষ্ণু সত্তার দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রার্থনা করিতে থাক—"হে করুণাময় প্রাণ-রমণ, তুমি আমার এই দেহবোধ ইন্দ্রিয়বোধ ও সংস্কারবোধসমূহ যাহারা আমাকে তোমার ঐ অখণ্ড আনন্দময় প্রাণ সত্তাকে উপলব্ধি করিতে এবং উহাতে পূর্ণ-ভাবে মিলিত হইতে বাধা দিতেছে উহাদিগকে গ্রাস কর, লয় কর"। এই প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মন একাগ্র করিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর যে ঐ অখণ্ড প্রাণসত্তা তোমার দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রবিষ্ট হইতেছেন। কিছুদিন মানস-পটে এইরূপ ধ্যান বা চিন্তা প্রবাহকে চালিত করিবার অভ্যাস করিলেই দেখিতে পাইবে যে ক্রমে ক্রমে তোমার অন্তরে একটা সময়, হ্লাদময় পরশ তোমার ঐ স্থূলবোধকে এক অখণ্ড আনন্দময়বোধে পরিণত করিতেছেন। ক্রমে ক্রমে তোমার অন্তর্বাহ্যে এক আনন্দরসের আবির্ভাব হইবে।

এই যে সত্তার কথা বলিলাম—ইহা যতই সাধক তাহার মনকে স্থির করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান প্রবাহকে ধরিয়া রাখিতে পারিবেন, ততই ঐ সত্তা ঘন আকাশবৎ তাহার অন্তর্বাহ্যে ফুটিতে থাকিবে এবং সাধক এক অপার আনন্দ-সাগরে ভাসিতে থাকিবেন। ইহাই পাতঞ্জল যোগ দর্শনোক্ত "বিশোকা জ্যোতি" দর্শন। ইহাই "ওঁ" মিলন।

তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"। অর্থ——জ্ঞানিগণ সর্বদাই এই সর্বব্যাপী বিষ্ণু সত্তাকে তাঁহাদের চতুর্দ্দিক আকাশবৎ একটি বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় দেখিতে পান অর্থাৎ তাঁহারা দেখিতে পান ঐ আকাশবৎ ব্যাপক সত্তাটি যেন তাহাদের দিকে জীবন্ত প্রাণময় সত্তারূপে চাহিয়া আছেন এবং তাহার ঐ আকাশ-বৎ ব্যাপক সত্তার মাঝে ডুবিয়া আছেন। ইহাই চিদাকাশ দর্শন।

এই যে সর্বব্যাপক প্রাণময় আনন্দময় সত্তার কথা বলিলাম ইনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। যিনি যাহারই উপাসনা করুন না কেন—সকলেই জ্ঞানে বা অজ্ঞানে ঐ ব্রহ্মসত্তারই—ঐ সচ্চিদানন্দ সত্তারই উপাসনা করিতেছেন। ঐ যে ব্রাহ্মণগণ ত্রিসন্ধ্যা "ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" বলিয়া গায়ত্রী মন্ত্রের উপাসনা করিতেছেন, উহা আনন্দময় ব্রহ্ম-সত্তারই উপাসনা। ঐ মন্ত্রের সহজ ও সরল অর্থ হইতেছে এই—যিনি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-রূপে এই চতুর্দশ অর্থাৎ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করিয়াছেন বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন তিনিই আবার আমাদের প্রতি জীবের অন্তরে থাকিয়া আমাদিগকে প্রতিকর্মে ব্রহ্মাণ্ড মুখে (অথবা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের দিকে) পরিচালিত করিতেছেন। এখানে কেহ কেহ পরিচালিত করিতেছেন এইরূপ অর্থ ধরিয়া ধ্যান করেন, অথবা কেহ কেহ পরি-চালিত করুন এই প্রার্থনা সহ ধ্যান করেন। ফল কথা এই গায়ত্রী মন্ত্রেরও ভাব হইতেছে—ধ্যান সহায়ে সেই অখণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্য যিনি এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রসব করিয়াছেন এবং চালিত করিতেছেন তাহার সহিত আমাদের অন্তরস্থ ব্যষ্টি চৈতন্যের একত্ব উপলব্ধি করা।

সকল সাধনারই প্রাণ হইতেছে নিজের ব্যষ্টি-বোধকে এক আনন্দময় অখণ্ড প্রাণ-বোধে (চৈতন্য-বোধে) ডুবাইয়া দিয়া দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিপূর্ব্বক পরমানন্দ লাভ করা। ইহাই পরম রসের আস্বাদন ও পরম-

গৃহ-সজ্জা
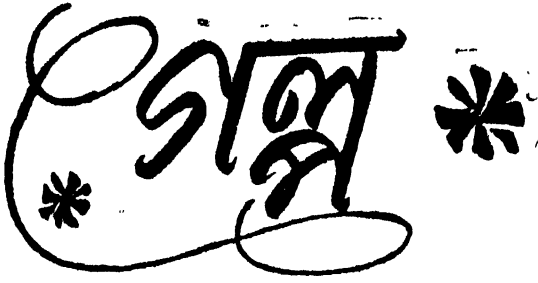
অরবিন্দ ভট্টাচার্য

মাত্র চোদ্দ দিনের ব্যবধানে সপ্তম চাকরের গর্দ্দান যা'বার পর রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। গৃহে গৃহিণীর এ'হেন সামরিক আইন আর কতদূর সহ্য করা যায়। ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করতে গেলাম অগত্যা, "সন্ধ্যা, তুমি বুঝছো না—"

—"আমি কি বুঝি না বুঝি সে' আমি বুঝবো। তোমায় তা বলে দিতে হ'বে না।" হাইকোর্টের বিচার-পতির মত কড়া রুলিং। সামান্য একটু থতমত খেয়ে আবার চেষ্টা করলাম।

—"কিন্তু হারাধন তো চাকর হিসেবে"—

—"পুকুর-চোর। পাইকারী হারে চুরি করে ও'। পর পর দু'দিন লক্ষ্য করে দেখেছি। তারপরও যদি তুমি রাখতে চাও তা'হ'লে," নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল সন্ধ্যা, "তোমার সংসার তুমিই—"

—"আঃ, রাগ করছো কেন। আমি এমনি- তা' যা'ক। তোমার নতুন লোকটি কে ?"

—"মনে হচ্ছে এ'বার একটি খাঁটি চাকরের সন্ধান পেয়েছি।" চেয়ারে বসে বলল সন্ধ্যা, "কাবেরীদি অত্যন্ত স্ট্রংলি রেকমেণ্ড করেছে।"

প্রত্যেকটি চাকর নিযুক্ত করার সময় উচ্চ-প্রশংসা শুনেছি এই রকম, তাই বিস্মিত হ'লাম না মোটেই। মনে মনে দীর্ঘায়ু কামনা করলাম নতুন লোকটির।

নতুন বাড়ীতে উঠে আসবার পর থেকেই সন্ধ্যার মেজাজের এই ঊর্দ্ধগতি। বাড়ীর মধ্যে তার একাধিপত্য। তা'র কথার ওপর কথা বলবার মত বুকের পাটা নেই কারুর। বকুনীর গুলিতে খুন হয়ে যা'বে সে তৎক্ষণাৎ।

—"আমার বাড়ী আমি মনের মত করে সাজাব।" বলল সন্ধ্যা একদিন, "ফুলের বাগান থেকে চাকর-বাকর পর্য্যন্ত।"

উত্তম প্রস্তাব। প্রশংসা করলাম সন্ধ্যার ইচ্ছার। উৎসাহিত হয়ে বলল সে—

—"ভাল হ'বে না? বাড়ীটা হ'বে ছবির মত। বাইরের লোক এসে দেখবে আমাদের দু'জনার ছোট্ট সংসারটি। আমরা বিকেলবেলা সামনের লনে গিয়ে বসব সবুজ ঘাসের ওপর—"

আমার রোল এ'খানে শ্রোতার। দাম্পত্য নাটকে বিধাতা আমার জন্য খুব বেশী কথা বলার সুযোগ রাখেন নি। তাই সন্ধ্যাকে ফাঁকা মাঠ ছেড়ে দিয়ে আমি গোল পোষ্টের পেছনে দাঁড়িয়ে বললাম, "বেশ হয়।"

অচিরেই সন্ধ্যার প্ল্যান কার্য্যকরী হ'তে শুরু করল। বাগানে নতুন মালীর আবির্ভাব ঘটার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে নতুন রাঁধুনের মুখ দেখতে পেয়ে শঙ্কিত হ'লাম। সর্বনাশ, অষ্টম চাকরের পর থার্ড রাঁধুনী!

—"আগেরটা বড় ন্যাষ্টি ছিল," কৈফিয়ৎ দিল সন্ধ্যা, "আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাটা বেশী পছন্দ করি।"

সন্ধ্যার বাড়ী সাজাবার কথা শুনে যে' ভয় করেছিলাম, অবশেষে তাই হ'ল। বিকেলে চা' খেতে খেতে বলল সে, "চলো আগামীকাল দাদার বাড়ী যাই। একদিন থেকেও আসা যা'বে, আর এ'দিকে—"

"এ'দিকে?" এখন আর উৎকর্ণ হই না, নেহাৎ অভ্যাসবশতঃ প্রশ্ন করলাম।

—"বসবার ঘরটাকে রঙ করাব ভাবছি," বলল সন্ধ্যা, "ম্যাটম্যাটে সাদা রঙ বিচ্ছিরি লাগে দেখতে।"

—"থাক না, মিছিমিছি—"

—"কিন্তু একটা ডিসেন্সী আছে তো," একটু যেন আহত হয়ে বলল সন্ধ্যা।

অগত্যা। গোবিন্দ মিস্ত্রীকে তলব করা হ'ল। যথা-কালে গোবিন্দ হাজির হ'ল।

—"এই ঘরটাকে রঙ করবে, বুঝলে," বলল সন্ধ্যা, "ঠিক এই রঙ হ'বে," ঘরের কোণে রাখা ফুলদানীটা হাতে নিয়ে দেখিয়ে দিল।

—"হ্যাঁ মা।" গোবিন্দ বলল।

গোবিন্দ বহুদিনের পরিচিত এ'বাড়ীর সঙ্গে। আমি তো প্রায় ছেলেবেলা থেকেই জানি তা'কে। ফুলদানীর রঙ দেখে তাই স্বভাবতঃই সহানুভূতি জেগে উঠল গোবিন্দের জন্য। বললাম।

—"কিন্তু সন্ধ্যা, ও'রকম টাইপের সবুজ রঙ দে'য়া কি সম্ভব হবে? আমার তো মনে হয় না।"

—"হ'বে, নিশ্চয়ই হ'বে। ফুলদানীতে যদি এ' রঙ দে'য়া যেতে পারে তো দে'য়ালেও দে'য়া যা'বে।" দৃঢ়তার সঙ্গে বলল সন্ধ্যা।

—"ও' রঙ দিতে পারবো বাবু," গোবিন্দও সায় দিল দেখলাম। এরপর, আর কিছু বলতে যাওয়া অনুচিত, অতএব চুপ করে থাকতে হ'ল।

সন্ধ্যা ভেতরে যেতেই উদ্বিগ্ন হয়ে বললাম গোবিন্দকে "কি রে, পারবি তো? ওকে তো জানিস, কি রকম কড়া মেজাজ—"

—"ও' আমি ঠিক করে নেব বাবু," হেসে বলল গোবিন্দ।

এবং আশ্চর্য্য, করলও তাই। এই প্রথম কারুর কাজ দেখে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করতে শুনলাম সন্ধ্যাকে। "দেখলে? বলেছিলাম না—সত্যিকারের কাজের লোক ও'। যা' বলে গিয়েছিলাম ঠিক তাই করেছে।"

অবাক হ'লাম আমিও। আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলাম গোবিন্দকে। প্রশ্ন করলাম।

—"কি হে, ব্যাপার কি বলতো?"

একগাল হাসল গোবিন্দ। বলল,—"বাবু, আপনি ঠিক-ই বলেছিলেন। ও' রঙ হচ্ছে কাঠে মাটির জিনিষে লাগাবার রঙ। ও'তে কি দে'য়াল রাঙানো যায়?"

—"তবে? তুমি এ'কাজ করলে কি করে?"

—"ফুলদানীটাকেই দে'য়ালের রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি বাবু।" হাসল গোবিন্দ, "পাকা কাজ, ধরবার উপায় নেই কারুর।"

নিঃশেষিত প্রেম

শ্রীভবানীপ্রসাদ দাশগুপ্ত এম-এ

ফেলে এসে পশ্চাতের সব কোলাহল,
আনন্দে বিহ্বল,
তোমারেই সঁপেছিনু দুঃখ ব্যথা সুখ;
কোলে তুমি তুলে নিলে
উৎসুক উন্মুখ।
হে অস্থির, হে উদ্দাম, হে চঞ্চল,
নির্বিকার টেনে নিলে আমার অঞ্চল।
অধরে অধীর উষ্ণ চুম্বন তোমার,
উচ্ছ্বাসে উচ্ছলিয়া উঠি বার বার,
তোমার দুর্নিবার দুরন্ত কল্লোল
আমারেই করেছিল বিস্মিত বিহ্বল।

(সেদিন) তব উদ্বেলিত উদ্দাম যৌবন,
উল্লসিয়া উঠেছিল তীর-ভাঙা ঢেউএর মতন।
সঙ্গ স্বপ্নলীন, ছিলে নিশিদিন,
আজ প্রিয় কেন উদাসীন?
উচ্ছল গান তব সকরুণ সুরে—
ক্ষীণ কণ্ঠে বাজে কেন দূরে বহু দূরে
যেন বেহাগের সুরে
বল প্রিয়, আজ তুমি আনমনে যেন
অন্তরালে নিজেরে লুকাতে চাও কেন?
দীপ্ত তব স্মৃতি আজ চিত্তে আনে ব্যথা উতরোল
সাহারার বুকে মোর ক্রন্দন কল্লোল।

সাগর-সংগমের মহামিলনে

শ্রীপ্রবোধ রাউৎ

পৌছুবার জন্যে পথ, না পথের জন্যে পৌছুনো—এ প্রশ্ন সে-দিন ছিলনা, যে-দিন মটরমাসী তার মিশি-মাখানো কালো দাঁত বের করে মাকে বললো—সত্যিই দিদি, সাগর একবার—তারপর যে বর্ণনা শুরু করলেন তাতে আমি মায়ের কোল ঘেঁসে বসে' হা-হ'য়ে গেলুম। মানুষ-খেকো সাগরটা যেন সরে আসতে লাগলো আমার কাছে, তাই আস্তে আস্তে মায়ের কোলে উঠে বসলুম। শুনতে শুনতে ভগীরথ যখন শাঁখ-বাজিয়ে গঙ্গা এনে সাগরে ফেললো, যখন গঙ্গা-সাগর একাকার হয়ে গেলো, তখন আমিও বোধহয় ঘুমের সঙ্গে একাকার হ'য়ে গিয়েছিলুম। তারপর সমুদ্র স্বপ্নে ঢেউয়ের তালে তালে জীবনটা কত নেচেছে কেঁদেছে হেসেছে, কিন্তু যে-দিন স্বপ্ন সত্য-রূপ পেলো, সত্যিই ককিয়ে উঠে ঝাড়া পাঁচহাত একটা লাফ দিয়েছিলুম। অবশ্য, সাগর পার হ'তে পারিনি।

গঙ্গা পার হ'তে পত্রখানি দিয়ে ডাকলেন আমার জীবন-দ্যুতি "জীবনদা।" খুলেই লিখেছেন—গঙ্গার খেয়াঘাটে অপেক্ষা করছে সাগরগামী ষ্টিমার-লঞ্চ-নৌকো, তাড়াতাড়ি এসো জোয়ার আসতে দেরিনেই, "কপ্‌লে-বাবাকী জয়" বলে লাফিয়ে পড়ি।

পত্র পেয়ে আমি উঠি-পড়ি ভাবে বোচ্‌কা বুচকি বাঁধতে লেগে গেলুম। অবশ্য, আজ স্বর্গে গেছেন মটরমাসী—মর্তে রেখে গেছেন তাঁর বোচ্‌কাতে একটা জপের মালা, নামাবলী, আর একটা লোটা। খুঁজে পেলুম চরম-পথের পরম-পাথেয় হিসাবে-এগুলো। তাই, বেডিং ফোল্‌ডারে গুটিয়ে নিলুম, আর নিলুম ফ্ল্যাস্ক ও ক্যামেরা, যদিও এগুলো বিশেষণের বিশেষণ, তবুও সভ্য ব্যাকরণের ব্যক্তি-ব্যবহারিকা হিসাবে চলন্তিকা।

"জয় কপ্‌লে-বাবা!" যাত্রায় পা বাড়িয়েছি, অমনি আমার জীবনের একাধারে প্রভু, একাধারে ভৃত্য, পঞ্চশস্ত পঞ্চগব্য স্বরূপ পঞ্চভৌতিক একটি কায়া করজোড়ে "কম্‌বক্ত" বলে উঠলো। ইনি চলতি-যুগের কহরাম পাল, দাবী—শুধু সাথী হবার নয়, সব দুঃখে ভাগী হবার। এ হেন পাল মশাইকে তার দাবী থেকে দমন করা বোধহয় এ যুগের বেল্‌চি কোদালেরও সাধ্য নেই, বৈজ্ঞানিক চেষ্টা করতে গেলে হয়তো সে নিজের বুকটাতেই ছুরি বসিয়ে বলে' উঠবে—এ দুনিয়া ঝুটা হ্যায়!

আমার কিছু বলবার আগেই সে বোচ্‌কা-বুচকি ঘাড়ে চাপিয়েছে, আমার ওপর দৃঢ় নির্দেশ—আগে বাড়ো। পা বাড়িয়েছি, মা পিছু ডাকলেন—"বাবা, সাবধান!" আমি থমকে গেলুম, পাল মশাই গর্জে উঠলো—আগে থেকে পিছু ভালো, যদি ডাকে মায়, ওহে, এ যে খনার বাক্যি—অকাট্য, আগে বাড়ো!

পথ পরিক্রমায় কখন বেড়েছি—কমেছি, জানিনা, তবে যে-জীবনদা শবরী-প্রতীক্ষায় কালযাপন করছিলেন, একেবারে তাঁর কোলে গিয়ে পড়লুম। জীবনদার একটি চাটনি-চাপড় পড়লো পিঠে, মুখে ফুটলো—মেরে জান, জড়িয়ে ধরলেন বুকে। পাল-মশাই বোচকা ফেলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ঝেড়ে' তার অভ্যাসমতো কাপড়ের কুঁপিটা নাকে গুঁজে শরীরটা ফোলাতে লাগলেন, বোধহয় হাঁচবেন! এ পদ্ধতি সম্বন্ধে পাল-মশাইয়ের আট্ কাট্ অর্থাৎ অকাট্য মত এই যে, হাঁচলে শুধু দেহ মন কোন ছার, কোনো বিপদ বালাই-ই কাছ ঘেঁষতে পারেনা।

আমাদের সাগর যাত্রার আলোচনা যখন গুরুত্বরূপ ধরেছে, পাল মশাই তখন লোটা সাক্ষী রেখে সাক্ষাৎ চিড়ে-গুড়ের গুরুত্ব ভোগ করছেন।

সিদ্ধান্ত হলো—সা-দ্বীপ পর্যন্ত স্টেট্ বাসে, বাকি লঞ্চ্ কিংবা নৌকোয় সমুদ্র-বুকে। "তথাস্তু" বলেই পাল-মশাই কোমর কষে তৈরি, জীবনদা বললেন—ধীরে, বন্ধু! ধীরে, যাত্রী হ'তে হ'লে আগে অধিকারী হতে হবে। পাল-মশাই তো অগ্নিশর্মা—বলো কী দাদা, আমরা কি

যাত্রার দল, তাই অধিকারী সাজবো? জীবনদা বললেন—আরে, না-না, তা' নয়, তবে—কলেরা বসন্তের টীকে ফিকে গুলো তো নিতে হবে!···চেঁচিয়ে উঠলেন পাল-মশাই—দেখিস মা ওলাইচণ্ডী!

টিকিট এবং টীকের জন্যে সকালে যেতেই হলো—হাওড়ায়। সেখানে দেখি ছোট্টুলাল আর তেওয়ারি-গুষ্টি বেশ গণ্ডগোল পাকিয়েছে টিকিট-লাইনে, টিকে-ওয়ালারা বসে আছে লাল ফেস্টুনে খবরদারির হুঁশিয়ারি ছড়িয়ে। সামনে যেতেই প্যাট প্যাট ক'রে ফুড়ে দিয়েই হাতের পেশীটা দিলো চিরে, তারপর নাম-গোত্রের নিকুচি লিখে একটা চিরকুট হাতে দিয়ে বললো—যান! পাল-মশাইয়ের চোখ-দুটো দপ্-দপ্ করে উঠলো—যেমন উঠেছিলো শকুন্তলার ওপর দুর্বাসার! চোয়াল চেপে তিনি চিবিয়ে বলেছিলেন—ব্যাটারা পাকা-পাষণ্ড।

বিকেলেই বেরিয়ে পড়লুম সোজা হাওড়ায়, চড়তে হবে কাকদ্বীপের স্টেট্-বাসে, চড়তে হবে বললেই কি হলো? এ যে ভীষণ গুঁতোগুঁতি পবরে বাবা! সাগরী-ঘাঘরী ঘরণীরা সবাই কোমর বেঁধেছে—শুধু পালমশাই উর্ধ্বে দুটো হাত তুলে খোলা-খুলি আকাশওয়ালাকে বললেন—দেখো প্রভু, এ-সময় আমার হাত দুটো যে-শালারা ফোঁড়া ফুঁড়ি করে বেহাত করে দিলে, সেই কুলাঙ্গারদের তুমি কান্তে দিয়ে কোতল ক'রো। এদিকে চেঁচিয়ে উঠলেন জীবনদা—আরে, বাস এসেগেছে, এক-ধাক্কায় চোখে ধাঁধা, শুধু "উঠিয়ে-হাঁটিয়ে" শব্দ, মাত্র এক মিনিটে পিছুওয়ালারা সামনের মানুষগুলোকে যেন বস্তা গোঁজা করে' দিলো বাসের ভিতর, ভাগ্যে জীবনদা পালমশাইয়ের বোঁচকাটা সামলেছিলো, নইলে পাল মশাইয়ের নিপাতনে সিদ্ধ অনিবার্যই ঘটে যেতো।

মহামেলার যাত্রী, মহামন্ত্রে দীক্ষিত, অন্তরে অন্তঃসলিলা মহামিলন, তাই দেহ-জাতের কোনো বাধা নেই, বালাই নেই। বাসের ভিতর দিসারি দোসাদের পায়ের তলায় একটু ঠাঁই পেলুম, তাও আবার তার লোটাটা আর আমার ফ্লাক্সটা ঠোকাঠুকি লেগে গেলো, মিঠ্ঠি যদি তাঁর কোলের মেয়েটাকে একটু কাৎ করে' কোমরটা না ব্যাঁকায়, তাহোলে দিসারি দোসাদের নাগরা-জুতোর শুঁড়টি নিশ্চয়ই মাথা নাড়তো। পালমশাই তো দু বাহু বাড়ায়ে ক্রুশ-বিদ্ধ কয়েদীর মতো দণ্ডায়মান, সৌভাগ্যবান জীবনদা শ্রীখণ্ডী ছেদী-মহারাজের দাবনা-সেবার ভার পেয়েছেন—অর্থাৎ, দু'জনের আসনে তিনজন স্থানাধিকারী হোলে অপর একজনের অর্ধাংশ যে—নিজ-অংশের গুরুত্বরূপ ধারণ করে, এ-বিষয়ে মার্কেস্ বা শুভঙ্করের একমত।

বাঙালী কণ্ডাক্টার হিন্দীতে খেঁকিয়ে উঠলো—আউর নেহি হোগা। বাস ছাড়লো, সন্ধ্যে শরতে বাড়াচ্ছে, সদন্তে ছেদী-মহারাজ চিমটে ঠুকে বলে উঠলেন—জয় গঙ্গামাইকী!···যাত্রীরা সোল্লাসে···জয়! আবার সদন্তে—জয় কপ্‌লে বাবাকী—জয়!

পাল-মশাই চট ক'রে একবার নাক-কান মলে' নিলেন। বাস চলছে মহানগরীর ভিড় ঠেলে, দেখতে পাচ্ছি কি ছাই, তবু উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখলুম—তখনো অট্টালিকার আড়ালেই চলেছি, মনটা চাইছে ফাঁকা মাঠ—নিরালা পথ, তাই মাঝে-মাঝে সে গুমরে উঠছে, বিদেশি-যাত্রীরা স্বদেশি-গান ধরেছে—জয় সীয়ারাম জয়, জয় সীয়ারাম!···পাল-মশাই মাথা চালছেন, আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হোয়ে একটা সিগারেট বের ক'রে ফেলুম—দেশলাই জ্বালতেই একটা অপরিচিত হাত এগিয়ে এলো—দাদা, আমায় একটু ··ফিরে দিখি, বাংলার সরস-মাটির একটি বিশুদ্ধ মানুষ—শ্যামবাজারের শিবু নন্দী আর তার সঙ্গী ভৃগুরাম কোলে। বেশ আলাপ জমালুম নন্দী ভৃঙ্গীর সঙ্গে, শীত যে কখন সরে' পড়েছে—জানতে পারিনি, লং-কোটের বোতামটা খুলতেই হলো, যাক্—এবার বাঁচলুম, শহর ছাড়িয়ে পড়লুম ডায়মণ্ড-হারবারের সোজাপথে। বাঁকা আলপথটা দূরে আঁধার রাজ্যে মিশে গেছে, যে যার শীতের ঠ্যালায় ধোঁয়া চাপা দিয়েছে, কাছাকাছি দু' চারটে নারকেল গাছ মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছে, সব চুপচাপ, শুধু বাসের চাকার চট্-চট্ শব্দ···

ভৃঙ্গীমশাই, অর্থাৎ ভৃগুরাম কোলে একবার গলা-ঝাড়া দিয়ে বললেন—খান দাদা, একটা শ্যামবাজারের কড়াবিড়ি, ফস করে' নিজেও ধরিয়ে ফেললো একটা, নন্দী-মশাই প্রশ্ন করলেন—কখন নাগাদ কাকদ্বীপ পৌঁছুবে দাদা, কণ্ডাক্টারই উত্তর দিল—আরে মশাই, লাগে তো তিনঘণ্টা, তবে রাত্রিকাল, খাল-ডোবা-রাস্তা,

তাতে আবার আমাদের বাসটার একটা চোখ নেই—তাই ঘণ্টা-চারেক লাগবে। সবিস্ময়ে পাল-মশাই বলে উঠলেন—তার মানে? কণ্ডাক্টার জবাব দিলো—মানে কিছু নেই মশাই, একটা হেড-লাইট জ্বলে—আর একটা দেখে। দিসারি দোসাদ মুখে খৈনি গুঁজে বললো—সরকারি হাল ওই কিসমকিই হ্যায় বাবুজি! গর্জে উঠলো নন্দী—ভৃঙ্গী -হোলেই হলো! নগদ যাতায়াতের আট আটটা টাকা কান মলে' নিয়েছে। বেশ সোরগোল উঠলো যাত্রী মহলে। সামনের যাত্রীরা এক বাক্যে হাসতে হাসতে সায় দিল—সত্যিই, আমাদের বাসটার একটা চোখ কানা—আলো নেই।

পিছু বাসগুলো শন-শন্ পেরিয়ে যাচ্ছে টিটকারি দিয়ে, দাঁত কড়মড় করছেন পাল-মশাই। এ-দিকে মিঠ্ঠি আমার কাঁধটাকে বালিশ করে' নিশ্চিন্ত হোয়েছে, তার কোলের মেয়েটা মাঝে-মাঝে খুঁৎ-খুঁৎ ক'রছে, কী জ্বালা, দিসারি দোসাদের জুতোর শুঁড়টা আবার খোঁচা দিচ্ছে কেন, কে-একজন গরম হোয়ে উঠলো—আরে ঠিকসে বৈটো!

ছেদী মহারাজ ছোটো-কলকের ছিলিম চড়িয়েছেন—চোঁয়াটে ধোঁয়া বেশ আমেজ আনছে। লাফিয়ে উঠলো নন্দী-মশাই -ঐ তো আলো, এসে গেছি। অনেকেই হকচকিয়ে উঠলো।

শ্লেষটানে কণ্ডাক্টার বললো—বসুন বসুন, ওটা তো ডায়মণ্ডহারবার, এখনো ত্রিশ-মাইল বাকি।

বাস দাঁড়ালো, যে যার হাত-পা ছাড়াতে নামলো, পালমশাই গালে হাত দিয়ে পথে বসলেন, জীবনদা ধাঁ করে' এক-কপ্‌টী চা ধরলেন পালমশাইয়ের সামনে, পিছনদিকে চায়ের কপ্‌টিটাকে উল্টে দিয়ে করজোড়ে প্রার্থনা করলেন পালমশাই—এক গেলাস্ জল—দয়াময়! কেউ বিড়ি ফুঁকছে, বড়ো-কলকের ভুটরার মাথায় মাথায় আগুন ছাপিয়েছে ছাপরা জেলার মিছরি-দুবে। জীবনদা আঙুল বাড়ালো—আরে, ঐ তো বন্দর, ঐ তো সমুদ্র। চির-রহস্য সমুদ্র, চির চঞ্চল, চির স্বাধীন, দূর থেকে যেন একটা রুপোলি রেখা…পালমশাই তো একবার নাক-কান মলে' প্রণাম ঠুকেই ফেললেন। কণ্ডাক্টার তাড়া দিলে—উঠে পড়ুন, পালমশাই দেখি নৃত্য ভঙ্গিমায় পা-হাত ছোড়াছুড়ি করছেন, অর্থাৎ শেষ-বারের মতন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবশতা ছাড়াচ্ছেন। হুড়মুড় করে' সব উঠে পড়লো, এ কী কাণ্ড! সেই না চেকিং-অফিসার পালমশাইকে প্রশ্ন করলেন—টিকে নিয়েছেন? পরশুরামের ভঙ্গী আর দুর্বাসার চোখ নিয়ে খিচুড়ি-ভাষায় শুনিয়ে দিলো—আরে মশাই, তা' নাহ'লে এতক্ষণ আপনি কি আসতো রাখতেন? এই দেখুন—ডান হাতে টিকে আর, বাঁ-হাতে ফোঁড়—এক-হাতে ওলাই-চণ্ডী, আর এক হাতে বসন-চণ্ডী, হাত দু'টোই শালা বেহাত! মুচকি হেসে অফিসার নেমে গেলেন, গাঁটরি-চাপা মানুষটা টিকি নেড়ে জিগ্যেস করলো—বাবুজি, সুইওয়ালা সাহাব ভাগ্ গিয়া?

বাস ছুটছে, জীবনদা গোটাকতক নেবু-কোয়া কোলে ছুড়ে দিলো, আমি আবার ছুড়ে দিলুম দু'-চারটে নন্দী-ভৃঙ্গীকে, এক-কোয়া চুষতে লাগলুম, মনে হোলো মিঠ্ঠিকে দিই, পারলুমনা, তবে পেরেছিলুম তার পিঠে ঠেস রেখে ঘুমিয়ে পড়তে। মিটিঠর মিষ্টি আওয়াজ—বাবুজি, আগিয়া চমকে উঠেদেখি—এ কী মিটিঠকে যে একবারে তাকিয়া করেনিয়েছি! ধড়মড় করে' সোজা হোলুম, গায়ে গা বুলিয়ে সোহাগ জানালো দিসারি দোসাদের নাগরা জুতোটা। হাঁপ ছাড়লো বাসটা, কাকদ্বীপের কয়েদীদের নিয়ে। যে যার মত নেমে পড়লো, আবার যেতে হবে আধ-মাইল রাস্তা, নইলে গঙ্গার জেটি পাবোনা, জেটি না পেলে লঞ্চ পাবোনা। উধাও বুচকি' পালমশাই প্রস্তুত, তবে একচোট টিকাওয়ালাদের গালদিয়ে। পিছুনিলো নন্দী-ভৃঙ্গী, মালবাহী রিকশার প্যাঁক-পোঁক শব্দ, সদম্ভে পাল-মশাইয়ের স্পষ্ট জবাব—নেহি মাঙতা হ্যায়। জীবনদা তো জোর করেই বোচকা বুচকি নামালো রিকশায় পাল-মশাইয়ের খেদোক্তি—উচ্ছন্নদিলে দেশটা তোমাদের মতো ফটিকচাঁদ ফুটকলাই বাবুরা।

সর্বনাশ…এ যে দাঁতকপাটি পর্বরে বাবা! রাতকে দিন ক'রেছে হ্যাসাক আলোয়, অসংখ্য-মানুষ কিলবিল করছে, শান্তিরক্ষীরা হাঁকাহাঁকি ছুটোছুটি করছে, মাইকে ঘোষণা করছে শান্তি শৃংখলার কথা, কিন্তু কে কার কথা শোনে, বিশৃংখলাতে মানুষের একটা বিশেষ বীরত্ব রয়েছে বইকি, সেটাকে আবার বিশেষণে ফেললে বেশ

আমোদ পাওয়া যায়, তাই সোজা দরজায় কপাট ঠ্যালার চেয়ে পাঁচিল টপকানোয় ঢের আনন্দ।

আঁৎকে উঠলুম মিঠ্‌ঠিকে দেখে, গদগদভাবে—বাবুজি হামারা আদমী ছুটগিয়া, নাও ঠ্যালা, কী করি, এ-দিকে জীবনদা চাদর ধরে টানাটানি—আরে জলকরের টিকিটটা কেটেনিয়ে এসো, নইলে লঞ্চে কিংবা নৌকোয় স্থান হবেনা। আবার মিঠ্‌ঠির কাতরোক্তি বাবুজি, হায় ক্যা করেঁ।…চুলো জালাগ হারামজাদী—পালমশাইয়ের স্পষ্ট জবাব, তারপরেই এক ধাক্কা আমাকে। দশহাত ছিটকে পড়লুম একেবারে যাত্রীস্রোতের ভেতর, ব্যাস। টেনেনিলো চুম্বকের মতন, কোথায় যাচ্ছি, কেমন করে যাচ্ছি জানিনা, পা-দু'টো নামমাত্র মাটিতে ঠেকে আছে, তখনো একটা ক্ষীণ-স্বর কানে বাজছে—"বাবুজি"…আর এক ধাক্কায় পাসপোর্টের গেটপাস করলুম, পাস ফেল জীবনদা বুঝছে—আমিতো হুমরি খেয়ে পড়লুম মা গঙ্গার কোলে। কত পাসকরা যাত্রী দেখি কম্বল মুড়ে' এ পাশ ও পাশ করছে। ধুরন্ধর ধুহুরিয়ার মতো একজন লম্বা লোককে জিজ্ঞাসা করলুম—"লঞ্চ কব ছোড়েগা জী?" হেসে ফেললো লোকটা, উত্তর দিলো বাংলায়—শুনছি তো যখন তার মর্জি হবে। মুচড়ে গেলো পেটের নাড়িগুলো, সঙ্গে ফ্লাস্ক ছিলো, দু'-ঢোঁক চা খেয়েনিলুম। নন্দী-ভৃঙ্গীকে দেখতে পাচ্ছিনা, পালমশাইয়েরো পাত্তা নেই, জীবনদা এলেন হন্তদন্ত ভাবে—হাতে পাসপোর্টের টিকিট, হাঁপ ছাড়লেন কোমরে-কষা র‍্যাপারটা খুলে নন্দী-ভৃঙ্গী দেখছি নেদিয়ে নেদিয়ে আসছেন, পালমশাই এলেন যুদ্ধে জয় করার মতন কাদা-মাটি মেখে, কোটের পিছনটা বেশ খানিকটা ফেটে গেছে। বিশুদ্ধ বাংলায় জীবনদা বাণী দিলেন—যাক্, জলকর তো দেওয়া হলো এখন জলপোত পেলেই বাঁচি, হেঁচে ফেললেন ধুরন্ধর ধুহুরিয়া, বেশ পরিপাটিতে দক্ষিণ বাহু প্রসারিত ক'রে দেখালেন, "ঐ দেখুন, জেটি যাবার বাঁধ, তারপর জেটি—তারপর লঞ্চ।" সে কী—জীবনদা খেপে উঠে জবাব দিলেন—কক্‌খনো না, সরকারি-লোক বললো, এইঘাটেই লঞ্চ ছাড়বে। পাগ্‌ড়িটা কষে নিয়ে ধুহুরিয়া হাসতে হাসতে বললো—সরকারি লোকের শব্দার্থ আজো সব-লোক খুঁজে পেয়েছে বাবুজি? জীবনজোরই ধর্ণা দিচ্ছি শুধু ধাঁধা আর ধোঁকা!…ধমক দিলো পালমশাই—চলোনা হে মুটকলাইয়ের দল, ঐ-দপে ঢুকেই ঢোঁক গিলিগে, কথাটা খুব সহজ, কিন্তু কাজটা? আবার বেরুতে হবে মানুষের জমাট ঠেলে, আর যে-পথ রয়েছে তার পথিক নেই—কাঁটাতারে ঘেরা, ঘোরা ফেরাই সার।

এ কী কাণ্ড। এ-দিক ও-দিক যাত্রীদের বাঁধ দিয়েছে দু'টো পুলিশ-ভ্যান, ভ্যান ভ্যান করছে যাত্রীরা ঐখানেই, এগুবার জো নেই। আর যাবেইবা কোথায়, তার আগেই তো জমে আছে প্রায় হাজার দশেক লোক, মা গঙ্গা ওদের টানলে তবে আমাদের টান পড়বে, তার আগে লটান দেওয়াই ভালো। পালমশাইয়ের কাঁচ-পাকা-খবর—লঞ্চ ছাড়বে রাত-বারোটায়, ততক্ষণ পেটটাকে পুরো করে' নিই এসো। তাই হলো, নন্দী-ভৃঙ্গী তো রুটির দিস্তা খুললো, পালমশাই তো গণ্ডে-পিণ্ডে গিলে ঘটিটাকে মাটিতে ঠুকলেন, জীবনদা তো একটা গানই ধরে ফেললেন গুনগুন ক'রে—"ওরে পথিক, পথচলা তোর অনেক বাকি।"

একদল হ্যারিকেন যাত্রীকে দেখলুম, দলপতি কামাক্ষ্যাচরণ, আমার ক্যামেরাবক্সটার দিকে কটাক্ষ হানছেন, একটু তফাতে আড়চোখে দামিনী-বৌ, পঞ্চুদাসের মাথায় পুঁটুলি, তাতে ঝুলছে দু'টো হ্যারিকেন। সহযাত্রীর সহানুভূতির অন্ত নেই, কামাক্ষ্যাচরণ চরণের মশা চাপড়ে বলে' উঠলো—হাঁগো বাবু-মশাই,তোমরা বুঝি জাহাজে যাবেন? শুধু সায়দিলুম। এ-দিকে হাঁপুচুপু খেয়ে হেঁকে উঠলেন নন্দীমশাই—আরে এইতালে দেখছেন তো কত যাত্রী পাস করছে পুলিশ-গাড়ির তলাদিয়ে। পালমশাই তো বোঁচকা বাগিয়ে বলে উঠলেন—মাভৈঃ। গিয়ে দেখি—ওমা, এযে ত্রিশঙ্কুর স্বর্গলাভ। কতক যাত্রী ঢুকেছে বটে ফাঁক পেয়ে, তার পরেই যাদুরা টের পেয়েছে, মাঝখানে আটকে গেছে, ও-দিকে পুলিশ-লাঠির গুঁতো, জান বাঁচাও জান বাঁচাও রব, কিন্তু বাঁচাবে কে? ভাগ্যে বংশী পাকড়ে আর জবরদস্ত খাঁ ছিলো, তাই ঠেংরী ধরে টেনে-হিঁচড়ে গোটা-কতককে উদ্ধার করলো। কেঁদে উঠলো সিন্না তপী, তার সর্বসম্বল পোঁটলাটাকে কে হজম করেছে!

কাঁচা-খবর কানে এলো—ও-দিকে পুলিশ নাকি ব্ল্যাক্ পুশ করছে, তাই চলো। হায় অদৃষ্ট! কোথায় কী! শুধু হৈ হৈ—রৈ-রৈ শব্দ, চিড়ে চ্যাপ্টা হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো কার একটা কোলের বাচ্চা, বাজখাই আওয়াজে একজন

বলে উঠলো—আরে রাম, কোন্ গরম-পানি ঢালতে হে। হো হো করে' হেসে উঠলো পূর্ব-বঙ্গের পুলিশটা, প্রাণপণে সে রুলটা ঘুরিয়ে রুখে দাঁড়ালো। তবে একটি সাচ্চা কথায় সে সাফ বলেদিলো—লঞ্চের আশা ছেড়ে নৌকায় যাবার চেষ্টা দেখুন, কারণ আপৎকালীন অবস্থায় অল্প লঞ্চ দেওয়ায় আরো আপদ বাড়িয়েছে। সে পথে প্রণাম ঠুকে পালমশাই তো মুখ ফেরালেন, চলো গঙ্গার ধারে—নৌকোয় যাবো, সবাই সায় দিলো—তবে যেইনা গঙ্গার পলিতে পা দেওয়া, অমনি প্যাঁক করে পা-টা পাঁচ ইঞ্চি বসেগেলো, পালমশাই তো হেসেই খুন, ক্ষমা করলোনা মাথার পুঁটলিটা, পাল-মশাই যতই হাসেন পোঁটলাটা ততই টিপে ধরে নন্দী-ভৃঙ্গী আবার টানাটানি করে সে ক্ষেত্রে উদ্ধার করলো।

এখন গঙ্গার ভাটা, তাই নৌকোগুলো ভার নেবে না, শুধু দেখবে যাত্রীদের ভাব-তামাসা। আর তাকাবো না জেটীর দিকে—যা' থাকে কপালে—যাবো নৌকোয়। লেংচে-লেংচে এবার শীতের আবির্ভাব, একে খালি-পা, তার ওপর জল-কাদার ঠাণ্ডা, পা-দু'টো আছে কিনা তাই দেখবার জন্যে সরে গিয়ে দাঁড়ালুম হ্যাসাক-লাইটটার তলায়, এখন বেশ অনুভব করলুম—আমার পদোন্নতি ঘটেছে—মানে, পা-দু'টো জল-কাদায় কেজি-দশেক ভারি হ'য়েছে। মন চাইছে—চাওয়া-চায়ির বালাই চুকুই। চমকে উঠলুম বামা-কণ্ঠে—তোমরা কি নৌকোয় যাবে বাবা? ঠিক মটর-মাসীর মতো, তবে দাঁতে মিশি নেই, উত্তর দিলুম—ইচ্ছা তো নৌকোয় যাবো, তারো তো উপায় দেখছি না। সহাস্যে তিনি তাঁর দলকে ডেকে বললেন—"এখানে উপায় করে নিতে হবে রে বাবা!" কথায় বেশ স্নেহের চুমকি, গলায় তুলসীর মালা, পরণে কেটের কাপড়, কাঁধে একটা পুঁটলি, পিছু ফিরে ডাকলেন—ওরে ও কান্ত, এইখানেই সব দাঁড়া। পিল্-পিল্ করে' জন-পনেরো এসে জমলো বেশ, বেশিক্ষণ তারা হাঁপ ছাড়তে না ছাড়তেই আর এক যুবা-যাত্রী হাজির—"দাদা কি বোটে যাবেন?" কী জ্বালা! জ্বলে' উঠেই জবাব দিলুম—ইচ্ছে তো হচ্ছে দাদা, পাচ্ছি কই? শাদা দাঁতে সদুত্তর—"পাবেন বইকি, নিশ্চয়ই পাবেন! এতদূর যখন টানিয়েছে, তখন কি টান মেরে ফেলে দেবে ভাবছেন?" কী বিপদ, এত হেঁয়ালি কে শুনতে চায় বাপু, কে যেন ফিক করে হেসে উঠলো—আর চাইতে হবে না, চাইলেই, চাক-চাঁদি, মাসীমার দলে একটা উনিশ-বছরের খুকি হাসছে।

আমি হাঁক দিলুম—ও জীবনদা, হেথায় এসো, হোথায় আর পাক ঘেঁটে কাজ নেই। জীবনদা সাড়া দিলেন—সবুর ভায়া একটা কূল পেয়েছি। দুত্তোর কূল, এদিকে আমি যে নির্মূল হতে বসেছি। আবার যুবাযাত্রী প্রশ্ন করলো—তাহলে বোটেই যাবেন তো? রেগে উত্তর দিলুম—কেন বলুন তো?—তাহলে আপনাদের সঙ্গী হতুম, আমরাও আছি তেইশজন, উথলে উঠলেন মাসীমা, গলা চড়িয়ে বললেন—ভালোই হলো, আমরাও যে আছি—দিব্যি একটা মাঝার নৌকো রিজার্ভ যাবে। এ-দিকে জীবনদাও এসে পড়েছেন, মাসীমার মতেই মত, যুবক ছুটলো তার দল ডাকতে, কেন জানি না, পালমশাই আবার নাক কান মলে' করজোড় কপালে ঠুকলেন, ভৃঙ্গী রণে ভঙ্গ দিয়ে জুতো জোড়াটাকে গলায় ঝুলিয়েছেন, উপস্থিত সবাই ক্ষয় ক্ষতি ভুলে ক্ষান্ত হয়েছি, কে খুক-খুক করে কেসে উঠলো, আর-কেউ নয়—সেই মাসীমার দলের উনিশ-বছরের খুকিটি, ডব-ডবে চোখে চাওয়া-চাওয়ি করছে, চিমটি কেটে বললো জীবনদা—ছিঃ, চাইতে নেই, তুমি না তীর্থযাত্রী?

বলতে গিয়ে উলটে পড়লো নন্দীমশাই, মুখে তার খই ফুটছে—ঐ তো, ঐ তো হনহন করে' আসছেন ওনারা। সত্যিই আসছেন সেই তেইশ-যাত্রীর দল। বাঃ! একটা খোলও আছে দেখছি, তাহলে করতাল নিশ্চয় থাকবে। এসে পড়লেন সব। সবার আগে একটি সংযত সধবা মূর্তি, সাক্ষাৎ পল্লীসমাজের জ্যেঠাইমা, তবে সধবা, মিষ্টি ডাক—খোকা, আমরা তাহলে কতজন হচ্ছি দেখো।...সে আর দেখতে হবে না মা, আমি সব দেখে নিয়েছি, হবে, খুব হবে—একটা মাঝার নৌকো রিজার্ভ হবে, উত্তর দিলো মেদিনীপুরের মাসীমা, খোকা তখনো গুণছে—থার্টি-ফর্টি করে, একটু গলা কমালো খুকিকে দেখে, তারপর গলা ছেড়ে গা ঝেড়ে বলে উঠলো—ফর্টিথ্রি অনলি, পিসিমা। শান্তভাবে সম্মতি দিয়ে পিসিমার দৃঢ় নির্দেশ—ডাক একজন মাঝিকে, মাসীমা বাধা দিয়ে—ডাকতে হবে না মা, সময় হলে ওরা আপনিই

আসবে, পিসিমার সংযত উত্তর—একটু আগে আসাই ভালো।

মাঝির এক কথা একট্রাপে—একশো টাকা, মাসীমার জিদ—আশি, পিসিমার—পঁচাশি, সাতে-পাঁচে সময় যাচ্ছে, সবাই এগুচ্ছে, পিছুচ্ছে—মাথা নাড়ছে, শুধু হেসে মরছে মাসীমার দলের খুকিটা, যেন খোস্তা দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে, তাই খেঁকিয়ে উঠলুম মাঝিকে—ভেড়ে ব্যাটা নৌকো, তাই দোবো। মাঝি তো আহ্লাদে আটখানা, মাসীমা, বললো—ছেলে বড্ডো বোকা, ওতেই তো ও রাজি হতো—তা হতো, তবে রাত পোয়াতো,উত্তর দিলো খুকি। খোকা দেখি আমার পিছুদিকে ধোঁয়া ছাড়ছে। একটা জীর্ণ-শীর্ণ যাত্রী জড়িয়ে ধরেছে—হামভি চলেগা মাইজী। পিসিমার ক্ষমাহীন চোখে প্রত্যুত্তর—নেহি হোগা। মাসীমা দাঁতনিকুচে—আহা, তাতে ক্ষতি কী দিদি, ওতো ভাড়া দেবে। ভাড়ার চেয়ে ওর' ভারটা হবে বেশি—স্পষ্ট জবাব পিসিমার। পিছিয়ে এলেন মাসীমা পাঁচ হাত। ও-দিকে অন্য যাত্রীরা মার-মার শব্দে নৌকায় উঠছে, আমাদের মাঝিটা হাত নেড়ে হাঁকছে, হাতটা তার শুধু উত্তর থেকে দক্ষিণে ঘুরছে, মনে হচ্ছে অটো-মেটিক, অর্থাৎ নৌকো আমাদের কাছে আসবে না, আমাদিকেই যেতে হবে নৌকোর কাছে, তাও আবার তটের ক্ষুদে-খালটা পেরিয়ে—তাই চলো।

পিচ্ছিল পথ—দুর্মদ কাদা—যাত্রীরা হুঁশিয়ার! হন হন করে পা বাড়ালো পালমশাই, হঠাৎ থমকে চেঁচিয়ে উঠলো—এ কী হে, এ যে ভীষণ বৈতরণী, বাঁধের জল বোধহয় এই-পথেই নামে বর্ষায়, এখন একটা ফুটো জল-ডিঙ্গি পুল হয়েছে, পেরুতে হবে তার কানায়-কানায় ধীর কদমে, কোমর বেঁকলেই কাৎ, তখন আর শ্রীহরির হাত থাকবে না, তাই তার আগে চোখ বুঁজে শ্রীহরি স্মরণ করে জীবনদার হাত ধরলুম, জীবনদা যে কী ক'রে জড়িয়ে-মড়িয়ে পার করলেন, তা' জানতেই পারলুম না, চোখ খুলে দেখি—পার হয়েছি।

সামনেই গঙ্গাতীরে আছাড় খাচ্ছে আমাদের নৌকো জলে পাটা ফেলে আদর ক'রে ডাকছে আমাদের মাঝিরা—চলে আসুন বাবুরা, খুব সামলে, বড্ডো পিছল, ডানদিক চেপে, বাঁয়ে খাল। এইতো আসল বৈতরণী, এ সময় একটা এঁড়েবাছুরও নেই। হড়বড় করে তো সব নেমে পড়লুম, কাপড় চোপড় বেশ উর্দ্ধে উঠতে লাগলো, শুধু নামো নামো শব্দ. নাজেহাল যাকে বলে হতে হচ্ছে, তবু নাছোড়বান্দা যাত্রী, যেমন ক'রে হোক জল ঠেলে, পাঁক ঠেলে, শীত ঠেলে উঠতেই হবে নৌকোয়। মাঝিরা একটা দশ-ফুট লম্বা আর দশইঞ্চি চওড়া পাটা ফেলে পাঁয়তারা কষছে, কিছু ভয় নেই বাবুরা, উঠে আসুন, চলে আসুন, খুব সামলে।

সর্বনাশ! পা যে পাটায় দাঁড়াতেই চায়না, শুধু পিছিয়ে আসে। আসবেই তো, একে পায়ে পাঁক, তাতে আবার পাটাটার পেটটা চিতিয়ে আছে, তার ওপর অবলম্বনের কোনো বালাই নেই, শ্রেফ্ নিরালম্ব মিশন। স্মরণ করলুম তেনজিং-হিলারীকে, সঙ্গে সঙ্গে ফল পেলুম, শুরু করলুম বাঁদরের মতো হাতে পায়ে উঠতে, ককিয়ে উঠলো হেসে সেই কচি খুকিটা, আমার দাঁত কড়মড়িই সার হলো, ঘাড় ফেরাবার উপায় নেই, শুধু সখেদে শ্রীহরি, মনে মনে বলতে লাগলুম—সগ্‌গো চাইনা প্রভু, শুধু ওপরের ঐমাঝি ব্যাটার দিগ্‌ দরাজ হাতটা ধরিয়ে দাও। যখন মাঝির কড়াহাতটা আমায় ধরেছে না কামড়াচ্ছে বুঝতে পারছিনা, এমন সময় ভৃঙ্গীমশাইয়ের গলার ভয়ঙ্কর শব্দ—গেলো, গেলো, সব গেলো, ধরো-ধরো, কী ধরবে, কাকে ধরবে, না পেয়ে সবাই চেঁচিয়ে উঠলো—ধরো ধরো, শুধু পালমশাই হাঁকড়াচ্ছেন, পাকড়াও পাকড়াও, তারপর সত্যিই একজন পাকড়ে ফেললো, তবে সাত-পাঁচ এমন কিছু নয়, মাত্র ভৃঙ্গীমশাইয়ের একপাট জুতো। আমি তখন জুত ক'রে নৌকোয় বসেছি, হেলে বেঁকে নেদিয়ে লেংচে যাত্রী উঠছে পাটাবেয়ে, ম্যাগনেটের মতো টেনেনিচ্ছে মাঝির হাতটা—তারপর হাতড়ে হুতুড়ে, হেঁকে ডেকে নৌকোর ওপর হাঁপ ছাড়া।

নৌকোর মিটমিটে হ্যারিকেনটা যখন তীরের হ্যাজাকটা দেখে হাসছিলো, ভৃঙ্গীমশাই তখন গায়ে চাদর ঢুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন তাঁর হাবুডুবু খাওয়া জুতোটাকে। যে যার ছড়িয়ে গুছিয়ে বসেছে, বসবেই তো. একশো জনের জায়গায় মাত্র তেতাল্লিশজন, কে যেন জিজ্ঞেস করলো কটা বাজলো দাদা? হাত ঘুরিয়ে দেখি ধাক্কা খেয়ে ঘড়িটা ঘুমিয়ে গেছে, তাই হেসেই বলতে হলো—

ঘড়িটার বারোটা বেজে গেছে, খোকা সায় দিয়ে উঠলো ঠিকই বলেছেন তো, বারোটাই বাজছে এখন, অবশ্য দশ মিনিট ফার্স্ট আছে।

ঘড়ঘড়ে গলায় মাঝি বলে উঠলো—তাহলে পাটা তুলে দিই বাবুরা, সবাই উঠেছেন তো—না, নির্লজ্জভাবে উত্তর দিলো সেই ফিকফিকে খুকিটা। খুনকরাভাবে ক্ষেপে উঠলেন মাসীমা—বলি, তুই কেন ফড়ফড় করছিস বলতো যূথি—কেন করবোনা, দেখছোনা এখনো একজন জলে দাঁড়িয়ে হি-হি করছে? হঠাৎ সবার দৃষ্টি হুমড়ি খেয়ে পড়লো তার দিকে, সেই জীর্ণ-শীর্ণ মানুষটা, যকে পিসিমা বলেছিলেন—ভাড়ার চেয়ে ভার হবে বেশি। পিসিমা বেশ পাকাভাবেই পোঁটলার ওপর পা তুলে বললেন—কেন অনেক আগেই তো বলেছি, ওকে নিয়ে অনর্থক আর ভার বাড়াবো না। খুকি সহাস্যে সহজ ভাবে—তাহলে সবই যে অভার হবে মা! কেন হবে—কিসে হবে, কে যেন বারফাটকা প্রশ্ন করলো, নির্ঘাৎ উত্তর—লজ্জা করে না সহযাত্রীর সহানুভূতি ভুলতে? ভড়কে গেলো সবাই, উত্তেজিতভাবে খোকাই হুকুম ঝাড়লো—উঠাও উসকো।

মাকড়িপরা মাঝিটা হাল ধরলো, আর দুজন ধরলো দাঁড। পিসিমার দলের একজন বলে উঠলো—"জয়। গঙ্গা-মায়িকী", শব্দ উঠলো সহযাত্রীদের—"জয়"। যাত্রা হলো শুরু, ঝপ্-ঝপ দাঁড়ের শব্দ, জয়ধ্বনি আরো আসছে অন্য নৌকো থেকে, আগে-পিছে নৌকাগুলো সার ধরেছে, মিট-মিটে আলোর একটা মালা যেন ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে যাচ্ছে. শাঁখ-ঘণ্টার শব্দ উঠছে, তার মাঝে উঠছে সংকীর্ত্তনের স্বাবলীল সুর, এ যেন এক মহালগনের মন্ত্রধ্বনি বিরাটের বুকে সরাটের প্রাণোচ্ছ্বাস।

কোথায় চলেছি, কেন চলেছি তার প্রশ্ন নেই, চলার ধর্মই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চলার পথে শুধু সহযাত্রীদের সোল্লাস জয়ধ্বনি সারা সাগরে ছড়িয়ে পড়েছে।

অশান্ত জলধি, আপন খেয়ালে আত্মহারা, কুয়াশা-রাতের কুহেলি কেলি করছে, তাই প্রাণে বাজছে তার কল-কল-ছল ছল ছেলেমানুষের হাসি। যাত্রীরা যে যার মত ছড়িয়ে মড়িয়ে বসেছে, একধারে একঘরে হয়ে বসেরয়েছে ভাগী-বাবা, পিসিমার সেই ভাগী-মানুষটা, হঠাৎ চাটি পড়লো খোলে, ঝন-ঝন করে উঠলো করতাল, সুর উঠলো সাগর সঙ্গমে—হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ রাম রাম হরে হরে। এই কণ্ঠ যে আদিম-অকৃত্রিম, অনাহত নাদের আহ্লাদিনী-রসে মাখানো মানুষের, আমাদেরি সহযাত্রী নদীয়ানন্দন আর ব্রজমণি। পরনে গেরস্থ বাস গেরুয়া নয়, স্মরণে কৃষ্ণদাস, ক্লান্ত নয়, চাতকের মতো চায়।

সুরের মূর্চ্ছনা মন কেড়ে নেয়—স্মরণ করায় সেই কাল-জয়ী কৃষ্ণকে। ককিয়ে উঠার মতো সবাই সুরে সুর দিলো, নন্দীমশাই মাথা চালতে লাগলো, কেউ হাসলো, কেউ কাঁদলো, কেউ তাল ঠুকলো ঘণ্টাখানেক ধরে, ক্রমে এলো কলকণ্ঠ,কিন্তু কমে নাই পালমশাইয়ের পোঁটলার ওপর পদনৃত্য, তার ছায়াটা তখনো নাচছে খুকির মাথার ওপর, চাঁদ এবার মেঘের ফাঁকে মুখবাড়িয়ে সাগরকে চুমু দিলো, ছমছমে রাত, জলের ছিনিমিনি খেলা, কতক-কেউ সটান শয্যাশায়ী, কতক ঢুলে ঢুলে মাথা খুঁড়ছে, মাত্র দু' চারজন সোজা আছে, তার মধ্যে একজন সরে এসে আমায় প্রশ্ন করলো—কী দেখছো? উত্তর দিলুম—জলধি—কী বুঝছো? পার হতে হবে মূর্খ—বলেই সে-মুখটা বিপরীত দিকে ঘুরে গেলো, এবং বিনা কথায় একেবারে কাঠ হয়ে গেলেন, আর মোটেই কথা কইলেন না, তিনি জীবনদা, ডাকলুম—ও জীবনদা, এ কী হলোরে বাবা। অথমভাবে জীবনদা বললেন—মূর্খ, ঝড় উঠবে, হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই উঠবে। ভেবে কূল পাইনা, একে তো অকূলে ভাসছি, তাতে আবার ঝড়, ঝট-পট করে উঠলো আত্মারাম পাখিটা। ডানহাতের তর্জনীকে তীরের মতো করে বললো জীবনদা—কী দেখছো? অনন্ত অদৃশ্য, কখনো না, ও ঝড়ের ঝংকার মূর্খ, ঝেড়ে তেড়ে উঠেপড়লো খোকা, দূরবীণের মতো দেখতে লাগলো হাতের মুঠো ফাঁক করে, এ-দিকে ফুঁপিয়ে কাঁদছে স্বপ্নদেখে পাগীর মা, পিসিমার দেহরক্ষী, ঝড় কই? খোকার গলায় ঝাঁঝ ফুটলো, ফেটে পড়লেন জীবনদা, দেখতে পাবেকি অন্ধ…তবে তোমরাই তার উত্তরসাধক, সবাই যেন একটু-একটু করে সরে এলো জীবনদার কাছ ঘেঁষে, শুধু একপ্রান্তে সেই জীর্ণ বেশ শীর্ণকায় মানুষটা। খোকা মাফলারটা খুলে গলা ঝেড়ে প্রশ্ন করলো—তারপর? জীবনদা উত্তর দিলেন—এই মহান ভারতে ধর্মবিপ্লবই আনবে প্রকৃত রাষ্ট্রচেতনা, আর সেই

রাষ্ট্রই মানুষের অন্তঃসত্তাকে সঞ্জীবিত করবে মানবিক সাম্য-মন্ত্রে, শান্তি-সখ্য সংযোজিত হবে ঠিক এই গঙ্গাসাগরের মতো, প্রকৃতই সত্য-সাম্যের হোমাগ্নি জ্বলবে এই ভারত-ভূমিতে, তাতে সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীদের আহুতি দিতেই হবে এই মহাযজ্ঞের যজ্ঞ-কুণ্ডে।

কনকনিয়ে উঠলো আমার ভিতরটা, ধানভানতে শিবের গীত কেনরে বাবা। খুকি বেশ এক খোঁচা মারলো—আপনি যে অভ্রান্ত, তার প্রমাণ?—প্রমাণ আমার আত্ম-চেতনার পরাকাষ্ঠা আর বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞান-সংস্থা,—আপনি ইমোশন্যাল, অস্তিত্বে আধিক্যই এ্যাবনর্মাল এবং ইমোশন্যাল, তাকে পাগলামি বলতে বাধা কী?—বাধা এইটুকু, মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত-সত্বার সহগামী বলেই কম-বেশি পাগল, তবে পাগলা-গারদে নয়।—পাগলারা তাহোলে গারদের আশাও রাখে বলছেন?…পালমশাই পাশ ফিরলেন—রাধে মাধবঃ বলে, নদীয়ানন্দন বেশ নিচু গলাতেই সাড়া দিলো—এ যে ভাবের পাগল মা, অভাবের তো নয়!—তা বুঝছি-কত্তা-গোঁসাই, তাই তো আপনারা কৃষ্ণ-কালীতে সারা দেশটাকে কালো করে, রেখেছেন!—তারো তো একটা কারণ রয়েছে মা!—অকারণটাই বেশি, কেন বলতে পারেন—আপনারা অভাবের ঝাঁঝে চোখের জল ফেলে তাকে কৃষ্ণভাব বলেন? কেন বলতে পারেন ঈশ্বর—ঈশ্বর করে সারা জাতির ইচ্ছাশক্তিকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিচ্ছেন?—তারো একটা প্রয়োজন আছে মা!—আছেই তো, নিশ্চয়ই আছে! যেমন প্রাণটাকে ছুড়ে দাও কৃষ্ণ বলে' সে-কেউ আছে, আর হাত দুটো তুলে দাও হাত-ঝাড়া ন্যাংটা বলে—ব্যস হ'য়ে গেলো ইহকালের ইস্তফা।

নৌকোটা যেন দাঁড়িয়ে গেলো, নিংড়ে দিলো মনটা, চুরুটটা দাঁতে চেপে একবার চাইলুম মুখের দিকে, দেখতে পেলুম না, কার যেন মাথাটা আড়াল করেছে। এ-সংসারে যারা জয়মাল্য চায়না, অথচ জানতে চায়, জীবনদা তাদেরি একজন, তাই জাগিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে দেখেন, আর যারা জয় করতে চায়, জয়মাল্য চায়, নিজেরা জাগে, অপরকে ঘুম পাড়ায়, তাই বোধহয় নদীয়ানন্দন, খোকা-খুকি আর ব্রজমণি জেগেছিলো।

একদিন যেমন সাগরের ভয়ে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে-ছিলুম, আজ কিন্তু মানুষের ভয়ে সাগরের কোলে জেগে রইলুম, চেয়ে আছি আর মাঝে মাঝে চুরুট টানছি, আর দেখছি ঢেউয়ের তালে চাঁদ নাচছে। কে যেন ভাবগাঢ় স্বরে বলে উঠলো—সুন্দরই সত্য, সত্যই ঈশ্বর।—প্রতিবাদ করলো চড়া-পর্দায় কে একজন—আধি-ব্যাধি সত্য তা বলে কি সুন্দর?। অতএব সেখানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোথায়?—তাহলে ঈশ্বর মানেন না?—মানি, তর্কে নয়, তামাশায়।

ঠক করে যেন কার মাথাটা ঠুকে গেলো, এ কী, সেই শীর্ণ মানুষটা হঠাৎ পড়ে গেলো কেন? বসেই তো ছিলো, ব্যস্তভাবে মাঝি হেঁকে উঠলো—গীর গিয়া, গীর গিয়া, উঠাও জলদি। উঠে পড়ে সব হুটোপাটি লাগিয়ে দিলো, হোঁচট খেয়ে আমি পড়লুম টপ্পরের বাইরে, এদিকে নৌকো কাৎ, মাঝি চেঁচাচ্ছে—নৌকো ডুবলো, এক-পেশে হয়ে গেছে, কে কার কথা শোনে, শুধু দেখতে হবে—মানুষটা রইলো না মলো'। দেখা গেলো পিসিমাই তার মাথাটা কোলে নিয়ে নাড়া-চাড়া করছেন, ব্রজমণি পা দুটো টানাটানি করছে, কেউ বললো—মৃগীরোগ, কেউ বললো—শীতে, আবার কেউ বললো—অনাহারে, শেষে শুধু জীবনদা বললেন—সকল সব, ও-সব কিচ্ছু নয়, একে ভাব-সমাধি বলে। সবাই শিউরে উঠলো, সত্যই তো সাধারণ মানুষ জলসমাধি দেখেছে, মাটি-সমাধি দেখেছে, ভাব-সমাধি আবার কী? ভাবতে দিলো না ব্রজমণি, আর নদীয়ানন্দন, যখন তারা ভাবকণ্ঠে শুরু করলো ভারীবাবার কর্ণকুহরে—"কুলকুণ্ডলিনী ঘুমভঞ্জক হে, হৃদিগ্রন্থি-বিদারণ কারণ হে, মম মানস চঞ্চল রাত্র-দিনে, গুরুদেব দয়া কর দীনজনে।"

ফুলের পাপড়ি খোলার মতো চোখের পাতা খুললো সেই জীর্ণ মানুষটা—যেন মৃন্ময়ের কোলে জাগলো চিন্ময়, সবই যেন এ-ভূমায় ভূমিষ্ঠ হলো। শাঁখ বাজিয়ে উঠলো নদীয়া-নন্দন। খোল-করতালের কলরোল সোরগোল তুললো, আবার, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে"…কিছুক্ষণ পর সব ঠিকঠাক হয়ে গেলো, তবে যেঠিক লাগলো আগেকার আবহাওয়া, এখন অনেকেই পেয়ে বসেছে ভারীবাবাকে, নিমেষে যেন লালবাতিটা নীল হোয়ে উঠলো। নাস্তিকান্তির মা তো নিজের কম্বলটাই চড়িয়ে দিলো ভারীবাবার ওপরে, নৌকোর টপ্পরের ভেতর আনা হলো ভারীবাবাকে, খোকা বিছিয়ে দিলো তার দামী

শালটা, মেদিনীপুরের মাসীমা তো একথালা কলা-নেবু ধরলো মুখের কাছে, মুচকি হাসিতে খুকি মুখ টিপে আছে, জীবনদা আর নদীয়ানন্দন হাততালি দিয়ে হরিনাম করছে, হঠাৎ হ্যারিকেনটা দপ্‌দপিয়ে নিবে গেলো, একটা ঝড়োহাওয়া গায়ে বাজলো, মাঝি বলে উঠলো—বাবুরা হুঁশিয়ার, জোয়ার এসেছে। এক আঁচলা জল যেন কে ছুঁড়ে দিলো গায়ে, এ কী, নৌকোটা ডুববে নাকি, এত দুলছে কেন! বাতি তো নিবে গেছে, পরস্পর চেনা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যাচ্ছে, আবার জানিয়ে দিলো মাঝি—বাবুরা, হুঁশিয়ার, ঝড়ো হাওয়া চলছে, এদিকে ত্রাহিত্রাহি রব, দে দোল দে দোল, ডোবে আর দেরি নেই।

ঢেউগুলো ফণা তুলে যেন ফোঁসফোঁস করছে, ফিসফিস করে খোকা বললো—সাঁতার জানেন? উত্তর দিলুম—ডুবতে জানি, পালমশাই আমার পাটা প্রাণপণে টিপে ধরছে, খোকা তো খুলেই ফেললো গায়ের জামা, যে যার পোঁটলা-পুঁটলি ফেলে কোমর বাঁধছে, মাসীমা জপমালাটা বেশ করে জড়িয়ে নিলো গলায়, যাক দেহ—যাক প্রাণ, বেঁচে থাক ধর্ম-মান! যে যার মানৎ-মানসিক দিতে লাগলো অশান্ত সাগরকে, পালমশাই তো একটা গুঁড়ওয়ালা ডাল ছুড়েই মারলো, সর্বনাশ, এ যে আরো ক্ষেপে উঠলো সাগর, যেন বলতে চাইলো—এখন তোরা ফাঁকি দিচ্ছিস! জানিস, একদিন মা কোল থেকে ছেলে ফেলেছে; তবু ফাঁকি দিয়েছে, দেয় নি তার মনের মানত, তাই আজও চাইতে হচ্ছে নির্লজ্জ মানুষের কাছে, সে যুগেও ফাঁকি দিয়েছিল, আবার এযুগেও কাঙালামি করছিস।

ভাবছি—এ সাগরের দাবি কী, এর ফাঁকিই বা কী আর মানতই বা কী? ঠিক দৈববাণীর মতো কানের কাছে অস্ফুট আওয়াজ—আপনার মানত দিয়েছেন? মর্মে স্পর্শ করলো—এ যেন এক মহামন্ত্র, সর্বাঙ্গ শিউরে উঠলো, কিন্তু এ মধুকণ্ঠ কার? এ যে কোকিলের চেয়েও কমনীয়, দাবানলের চেয়েও দহনীয়—মাত্র দু'টি কথা—মানত দিয়েছেন! এ সাগরকে তো এ সংসারে অদেয় কিছুই নেই, জাতকুলধনমান সবই দিয়েছে কালের যাত্রীরা, এমন কি সার্থক সৃষ্টি শিশুকেও মা নাড়ি ছিঁড়ে ছুঁড়ে দিয়েছে সাগরকে, আরো দিচ্ছে—আরো দেবে, তাই তো যাত্রা এদের থামেনি, তবে আবার কী অদেয় মানত আছে এ জন্মভোগী মানুষের। শান্ত হলো না সমুদ্র, যেন সাক্ষাৎ রুদ্র, তাণ্ডবনৃত্যে আত্মহারা। দেহ খাঁচায় আত্মারাম, অতলস্পর্শ মুক্তির স্বাদ, চোখের নোনা জলেই মিটিয়ে নিচ্ছেন। মাটির মানুষ মিলিয়ে যাবে জলে, তার জন্যে এত খেদ, এত ভয়, এত ভাবনা কেন? জ্ঞানীরা "বাণী দিয়েছেন—ভবসাগর পার হতে হবে", তার জায়গায় অজ্ঞানীরা মানে করেছে—ভাবনা সাগর, তাই ডুবে মরেছে।

যাত্রীরা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছে তাথৈ নাচন নৌকোটাকে, "হায়! মরিতে কি চাহে মন সুন্দর ভুবন ছাড়ি'! কার একটা হাত যেন চট করে কাঁধে পড়লো, আবছা-আঁধারে দেখা না গেলেও বোঝা গেলো জীবনদার, যে-হাত বহু ক্ষেত্রে বহুবার জীবন-সঙ্গিকে সন্ধান দিয়ে জাগিয়েছে ঠিক শলতে কাঠির মতো সমসত্যে, সেই পেশীপোক্ত হাতই যেন হাতুড়ির ঘায়ে হটিয়ে দিলো মৃত্যু-কল্পনা। বালমাখানো বাতাস ঠেকলো মুখে, আবার প্রশ্ন—মানত দিয়েছেন? মরীয়া হয়ে মুখ বেঁকিয়ে দেখি, খুকির আবছা আকৃতি, চোখ পেলো না তার রূপ দেখতে, মন পেলো না গুণ বুঝতে, তবু, তবু যেন মনে হলো—যেন এ সমস্ত-কালের অনবদ্য নায়িকা, তাই এতক্ষণে এই মানত নিয়ে যে মনটা মাথা-কুটছিলো; সেই রুক্ষ মেজাজে প্রশ্ন করলো—কী, কী সেই সর্বগ্রাসী কালান্তক সাগরের শাশ্বত মানত? টুপ করে বলে উঠলো খুকি আপনার পাপ।

প্রাণটাকে কে খামচে ধরলো—পাপ? প্রাণি-জগতে প্রাণরক্ষার যদি প্রয়োজন থাকে, তাহলে পাপেরও প্রয়োজন আছে, প্রত্যক্ষভাবে এইটুকুই বুঝি, অবশ্য বুঝিয়েছেন শাস্ত্রপাতা—সর্বযুগের শেষ কথা পুণ্য। পুণ্যার্থী যাত্রীরা তো পাপকে প্রলেপ দিয়েছে পুণ্যে, দান দিয়ে, দানা দিয়ে প্রার্থনা করেছে—প্রভু, পূর্ণ করো মনোবাসনা, এই বাসনাই তো দেহ পেয়ালার মরুপিপাসা, এই পিপাসাই যদি পাপ হয়, প্রয়োজন কী তার পুণ্যে, প্রয়োজন কী তীর্থে, প্রয়োজন কী কৃচ্ছে? জন্ম-জরা-জীবন্মৃত্যু যখন সত্য, তখন বাসনা

কামনা, তৃষ্ণা-ভোগ কেন সত্য নয়, যদি পাপকেই খুঁট খুলে মানত দিতে হয়, তাহলে পুণ্যকেই বা খুঁটে গাঁট দেবো কেন? এ দ্বন্দ্ব-সংশয়ের সীমা কোথায়? তাই খুকিকে সস্নেহে বললুম—পাপ দিলে পুণ্যও দিতে পারবো। খুকির বজ্রাহতের মতো প্রশ্ন—পারবেন? পরিষ্কার জবাব—পারবো, পারতেই হবে, সর্ব-কালের সর্ব-যাত্রীর মানত যদি পাপই হয়, তাহলে তার কড়ায়-গণ্ডায় সুদসহ পুণ্য দিয়েই শোধ করবো! শুকিয়ে গেলো ভেতরটা, সাগর যেন সত্যিই স্বকর্ণে শুনলো, এগিয়ে আসছে একটা বিরাট ঢেউ ঠিক কাল—নাগের মতো মুখময় ফেনা নিয়ে, আঁৎকে উঠলো নৌকোটা আছাড়-কাছাড়ভাবে, মনে মনে করলুম—জুড়িয়ে যাক জন্ম-জ্বালা, নাস্তির মা কেঁদে উঠলো—আমার নাস্তি-কাস্তির কী হবেগো! কার কী হবে কে বুঝছে, কৈ—কোথায় গেলো নামকীর্তন, কোথায় গেলো ঈশ্বর—নিরীশ্বর কোথায় গেলো নন্দীভৃঙ্গীর নাক ডাকা, এখন যূপকাষ্ঠই জপমালা, জন্ম-জীবন-যৌবন সব মিথ্যা, শুধু-শুধু সত্য মৃত্যু, শুধু সত্য এই সুনীল ফেনিল বারি-সমাধি, কী সুন্দর দু' বাহু তুলে এখনি আলিঙ্গন দেবে, কী সুন্দরতম এই একটি লগ্ন, হয়তো বলতেও সময় পাবোনা, "মরণ রে, তুহুঁ মোর শ্যাম সমান।"

থাক কল্পনা, শোধ করতেই হবে ওর মানত, তা স্বেচ্ছায় দেওয়াই ভালো, কেড়ে নেবে কেন? সাপটে ধরলুম লংকোটের কলারটা, খুলে ছুড়ে ফেলে দিলুম, খপ করে কে ধরলো আমার কব্জিটা, এ-হাত তো পেশিপোক্ত নয়, এ যে সুধাসিক্ত সম্বিৎ, কে বলে মৃত্যু সত্য? কখনো না, কখনোই না, বাঁচাই সত্য, বাসনাই সত্য, হোক মৃত্যু, আবার জন্মাবো, আবার যৌবন পাবো, আবার ভোগ পাবো! নেয় নিক সাগর কায়াটা, নিক পাপ-পুণ্য, বাসনাটা তো নিতে পারবে না!

ছিঃ, এ যে খুকির হাত, এ তো বন্ধন, এ তো সেই কুহেলি কবোষ্ণ, এই হাতই তো চামেলি-চন্দ্রিমা রাতে মুঠোয় ধরেছিলো সুরাপাত্র, কৈ সে-সুখ তো সুখী করতে পারেনি, কেন পারেনি—সেই প্রশ্ন নিয়ে ছুটেছি জ্বালামুখী জন্ম-পিপাসায়, দুঃখতত্ত্বী কপিলকে জিজ্ঞাসা করতে।

খুকি এখন হাতটা ছেড়ে সামনে দাঁড়িয়েছে, দৃপ্তকণ্ঠে বললো—কী করতে চান?—মানত শোধ! পারবেন? নিশ্চয়ই, বলেই খুকিকে ধাক্কা দিয়ে পা বাড়িয়েছি অমনি খপ করে পড়লো ঘাড়ে সেই পেশীপোক্ত হাত, পিছিয়ে আসতেই হ'লো, শান্ত-গম্ভীর স্বরে জীবনদা বললেন—মূর্খ, খাঁচাটা জলে ফেললে পাখিটা উড়ে যাবে, কে শুধবে সাগর—মানত, তোমার কায়া-কংকাল?

কানে এলো স্তিমিতকণ্ঠের সুমিষ্ট সুর—ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ! এযে ঋক্-বেদের ঋদ্ধি-বাণী, ঊর্ধ্বে দুটো হাত তুলে ভারীবাবা প্রার্থনা করছেন।

কোথায় গেলো পাহাড়-প্রমাণ ঢেউ, কোথায় গেলো ঝড়, সত্যিই শান্তি ধীরে ধীরে ফিরে এলো, আবার জ্বললো বাতি, আবার বিছানো হ'লো কম্বল, যাক, এ-যাত্রা বাঁচা গেলো, নৌকো-খলে যাত্রী-বাট্‌না শেষ হ'লো। খোকা ফার্স্ট-এড্ বক্স খুলে যাত্রীদের কাটা-ছেঁড়ায় তুলো টিপলো, ভক্-ভক্ বমি করছে ব্রজমণি, পালমশাই ঘন ঘন হাই তুলছেন, তখনো টিপ-টিপ করছে আমার বুকটা, বাড়িয়ে দিলো হাতটা নন্দীমশাই, বললো—নিন এবার কোটটা চাপান! আড়চোখে মুচকি হেসে খুকি মুখ ফেরালো।

পিসিমার সংযত কণ্ঠ—প্রকাশ, স্টোভ জ্বালা, চা কর। পোঁটলা খুললো কাস্তির মা, চেঁচিয়ে উঠলো—চিনি কই? বাধলো হট্টগোল, ভুলটা কার? পিসিমা বললো—তোর, কাস্তির মা বললো—সেই কেষ্টা ক্যাব্‌লার, খোকা তো স্টোভে স্টার্ট দিলো। মীমাংসা করলো মেদিনীপুরের মাসীমা—নুন দিলেও তো হবে মা, বেশ ভালো লাগবে। হেসে উঠলো যাত্রীরা, গুজ-গুজ ক'রে নন্দীর কানে ভৃঙ্গী বললো—তার সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ লংকা-গুঁড়ো।...এদিকে লংকাকাণ্ড বাধালো খোকা, লেআও চিনি—লেআও সুগার, লেআও জলদি। নাস্তির মা তো কেঁদে-কেঁদে বলে উঠলো—আমার কী কসুর বাবু, সেই কেষ্টা মুখপোড়াই তো পুঁটলি বেঁধেছিলো।...ও-সব নেই জানতা, লেআও জলদি—লেআও হারিআপ্, নইলে স্টোভ ছুঁড়ে তোর মুখ পোড়াবো! সত্যিই খোকা স্টোভ ধরলো, সর্বনাশ! কেঁদে উঠলো কাস্তির মা, হাসতে হাসতে খুকি বললো—এই নিন, এতেও মিষ্টি হবে, তবে মিছ্‌রি, ফল হলো বিশ্রী, খোকা ছুড়ে দিলো কৌটোটা, লাগলো নদীয়ানন্দনের কোলে, নীরবে একটা হাত এলো এগিয়ে, কষে দিলো

খোকার গালে এক চড়। হৈ-চৈ পড়লো যাত্রীমহলে, হাসতে হাসতে পিসিমা বললো—খোকা পঞ্চাননের মানত-ছেলে, তাই মাঝে মাঝে পঞ্চমুখী হয়, তাই পঁচিশ বছরেও ওকে পাঁচটা আঙুল না দেখালে থামে না।

অবশ্য আমরাও থেমে গেলুম কিছুক্ষণ, কার সুমিষ্ট সুর জমিয়ে তুললে—"সম্মুখে শান্তি পারাবার···পার করোহে কর্ণধার", অশ্রুধারায় বুক ভিজছে, সবার দিকে পিঠ পড়েছে খোকার, যেন সাগরকেই সুর শোনা'চ্ছে।

ক্ষান্ত হলোনা খুকি, কেট্‌লি চাপানো স্টোভে, জহুরী জহর চিনেছে, জীবনদা আর নদীয়ানন্দন জমে আছে ভারী বাবার কাছে। নাক সিঁটকে, মুখ বেঁকিয়ে, গলা কমিয়ে পালমশাই বললো—জাত-জন্ম জানা নেই, ওর হাতে চা খাবে?···মোক্ষম প্রশ্ন—জাত-জন্ম···সামাজিক চোখে জন্মালেই জাত থাকবে, প্রাণি-জগতে জাত কী? আজ যে প্রয়োজনে জাতিভেদ, ভাবীকালে অন্য প্রয়োজনে জাতি এক হবেনা কেন?···জাত জন্মের কোন কথা শুনলে পাল মশাই তো বটেই, আরো অনেকেই হয়তো নৌকো থেকে লাফ মারবেন।

চায়ের কাপ ঠুকলো খুকি, ধরলো খোকার সামনে, খোকা তখন নিষ্পলক-চোখে চেয়ে আছে সাগরের দিকে, খুকির কথায় কান নেই,তাই খুকি ধরিয়ে দিলো কাপটা তার হাতে।···চায়ে চুমুক দিয়েছি, চিমটি কাটলো পালমশাই —খবরদার, এ-খবরদারির আমি একজন পাকা সমঝদার, তাই না খেতে পেয়ে ঢোক গিলছি, গলায় ঠেকছে গরম, মুখে ঠেকছে কথা, তবু চুপচাপ, যেহেতু নেশা। খুকি কাপটা পালমশাইয়ের কাছে ধরতেই ঠিক শিং নাড়ার মতো মাথা নাড়লেন তিনি, চায়ের কাপের চা একটু চলকে পড়লো খুকির হাতে, বেজার মুখে বলে ফেললেন—ঐ ফটিকবাবুকেই দিন, আমার দিকে চোখ পাকিয়ে - এটাকেও চালিয়ে দাওনা হে চান-জল ভেবে!

দূরে দৈত্যপুরীর মতো লাগলো, কুয়াশা ঢাকা কতক-গুলো মিটমিটে আলো, মাঝি বললো,—ওটা নামখানা বাবু, সরকারি সড়ক ঐদিকেই সাগরমেলা যাবে, সার্থক হবে জনপদ, এ-দুর্গমের সেই সাধনাই তো একদিন ছিলো, ঐ পথই আরো স্পর্শ দেবে কালযাত্রীকে কপিলাশ্রমে।

ফিসফিস করে কী আলোচনা চলছিলো ভারীবাবার মহলে, ব্রজমণির বিনীত সুরে কৃষ্ণকান্তার তাৎপর্য, নদীয়া-নন্দনের জীব-জগতের জন্মরহস্য, জীবনদা পরা-অপরার পরাকাষ্ঠা বেশ জমিয়ে তুলেছে, পালমশাই মুখ ফিরিয়েছেন, বোধহয় এ-বদন আর দেখবেন না, কোমরটা কট-কট ক'রে উঠলো, তাই একটু কাৎ হোলুম নৌকোর কাণায় মাথা রেখে, একটা অযাচিত হাত মাথায় গুঁজে দিলো একটা পোঁটলা, ভৃঙ্গীতো শুরু করেছে—ভোঁস-ভোঁস, আবার দাঁড়ের ছপ্-ছপ শব্দ তালিম দিচ্ছে সমুদ্রের সুর-লহরীতে, লটকে পড়েছে যে যার মত, মাত্র দু-চারজন ইষ্ট-অনিষ্টকে নিয়ে বাটনা বাটছে। রাতের শেষদিকে ঠাণ্ডা বেশ চেপে ধরলো, কার একটা গরম হাত আমার পাটাকে টেনেই বালিশ করলো, একটা ঠ্যাং পড়লো পিঠে, বোধহয়, নন্দীমশাই পাশ ফিরলেন, ঘুম তো অনেকক্ষণ থেকেই ঘুর-ঘুর করছিলো, এবার ঘুরিয়ে দিলো মুখটাকে চোখ দুটো টিপে।

স্বপ্নকে যদি অকপটে স্বীকার করতে হয়, তাহ'লে সত্য কথাই বলবো—"পালমশাই একটা আধপোড়া কাঠ নিয়ে প্রাণপণে তাড়া করছে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলেকে, সাত সমুদ্র পার করে হাঁপ ছাড়লো পালমশাই, সঙ্গে সঙ্গে নন্দী সহাস্যে সলজ্জে বাড়িয়ে দিলো একঘটি সিদ্ধি, সঙ্গে সঙ্গে এক লাথি নন্দীকে, নন্দী এসে পড়লো ভৃঙ্গীর ঘাড়ে, ভৃঙ্গী পড়লো খোকার ওপর, খোকা ঝাড়লো এক ঘুষি কান্তির মায়ের নাকে, ঘুম তো ধায়েল হলো, এতকাণ্ডে মাত্র একটা মশার অপমৃত্যু ঘটলো অবশ্য আমারি গালে—পালমশাইয়ের চাপড়ে। পায়ের চামড়া চিন-চিন ক'রে উঠলো কার কানঘষায়, তুলতে পারছিনা পা-টাকে, খোঁচা দিচ্ছে কানের দুলটা, তাই চুপ-চাপ পড়ে আছি।

সূর্য উঠছে, বেশ সাড়া পড়লো সারা নৌকোয়, সবাই স'রে—ফিরে সোজা হলো, আমি শুধু শুয়ে আছি, কে যেন শুইয়ে রেখেছে, জলদ গম্ভীরে জীবনদা শুরু করলেন সূর্য স্তব—"আদিদেব নমস্তভ্যং প্রসীদ মম ভাস্কর। দিবাকর নমস্তভ্যং প্রভাকর নমস্ততে॥"···সবার কণ্ঠ মিললো এক কণ্ঠে। ব্রজমণির ব্রজবুলি করতালে ঠোকা দিলে—"রাই জাগো, রাই জাগো -শারী-শুক ডাকে," আবার জেগে উঠলো নদ-নদী-গিরি-কান্তার, বনানী-প্রান্তর, এবার পা-টাকে জোরেই নাড়া দিয়ে খুকি বললো—উঠুন, সূর্য উঠছে,

উঠতেই হলো কাঁথা-কম্বলের মায়া ছেড়ে, উঠেই দেখি সূর্যের মুখে ক্যামেরা ধরেছে খোকা, করজোড়ে চোখ মুদে পালমশাই।

অপূর্ব অনবদ্য অনাদি উঠছে শান্ত সমাধিস্থ জলধি হ'তে, ঝাপসা তমসা কুয়াশায় ধরেছে রক্তিমাভাস। ওগো ভাস্কর, কে বলে নশ্বর ভূমা, নমস্কার করি, কোটি নমস্কার তোমায়, শতকোটী নমস্কার তোমার শাশ্বত সৃষ্টিকে, তোমার দিব্য-জ্যোতিঃ দীপ্তিকে। দাও, আরো দাও দিব্যময় দিব্য-জ্যোতিঃ, ঘুচুক আঁধার, ঘুচুক অসার আসক্তি। ওগো অনন্ত, ওগো অমৃত্যু, দাও আরো, দেখাও অখিল—অসীমকে নিখিল-নিত্যে। চর্মচক্ষে চেয়ে আছি চিন্ময়ের দিকে, সমুদ্র গর্ভে যেন একটি ভ্রূণ, নির্বিকার, নিরাকার, তুলতুলে রক্তপিণ্ড। মাথা হলো যেন আবির-থালায় নব জাতকের নগ্ন কলেবর, খেলা হলো শুরু, ভ্রূণপিণ্ড পেলো প্রেরণা, পেলো প্রাণ, পেলো আকৃতি, আকৃষ্ট হলো ইহ-লোক, সরে' গেলো তমসাবৃত আঁধার, ফুটলো দিব্যজ্যোতি চক্ষু, স্রষ্টা দেখলো সৃষ্টিকে, সৃষ্টি দেখলো স্রষ্টাকে, হলো শুভলগ্নে শুভদৃষ্টি।

সসীম সাগরে সতীর্থ যাত্রী নৌকো; রাত্রে দেখেছি একরূপ, আবার দেখলুম অন্যরূপ, গাঁদাফুলের মালা ঝুলছে নৌকোর গলায়, শাদা পালে বাতাস লেগেছে, যাত্রী দিচ্ছে জয়ধ্বনি জয়যাত্রার, দাঁড় পড়ছে একতালে, এক কায়দায়, জীবনযোদ্ধা চলেছে পুণ্য পথে, প্রাণকে স্পর্শ দিতেই হবে আদি—বিধানের পাদপীঠে. জয় করতেই হবে পাপকে, লাভ করতেই হবে পুণ্য।

গাংচিল ঘুরছে মাথার ওপর, শুশুক মাছ চিৎপাৎ খেলছে, ঢেউয়ের ওপর ঢেউগুলো ঠেলাঠেলি করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মানত দেওয়ার ফুল ফল। চোখ এবার কূল পেলো, ঐ তো চড়া, চমৎকার বালুবেলা, কোলে যেন সবুজের কার্পেট, কাৎ হয়ে একটা নৌকো আটকে রয়েছে, বালুকণার সঙ্গে খেলছে রশ্মিকণা যেন সাতরঙা ছড়ানো মাণিক। চোখ দু'টো এন্তার কুড়ুতে লাগলো, আমিও ভরতে লাগলুম মনের আঁচলে, কচি ঘাসগুলো হাসতে লাগলো কচি গালে।

শক্ত শুকনো বিস্কুটটা ঠোঁটে ঠুকে দিলেন পালমশাই, ফ্লাস্কটা খুলতে হুকুম দিলো, নন্দী দেখি বেশ তরিবৎ করেই মাথায় চিরুণী বুলুচ্ছে, ভৃঙ্গী একটা বিড়ির মুখে ফুঁ দিচ্ছেন—বোধহয় মুখাগ্নি করবেন, খোকা মাঝির কাছে হালধরা শিখছে, ভারীবাধার দল জীব জগতের বাটনা বাটছে। খুকি খোঁপাটা জড়িয়ে পিছু ফিরলো, এ-কী, এত চুল খুকির, সে-কালের সেই কবির কথা মনে এলো—"কুঁচবরণ কন্যারে সেই মেঘবরণ কেশ," কিন্তু এ-কালের কবি হয়তো বলবেন—"খোঁপায় সংবদ্ধ যার জীবনের লোকায়ত কূল!"...পিসিমা বেশ পরিপাটি করে পানের খিলি গুঁজছেন, মাসীমা মমতা-মাখানো মুখে হাসতে হাসতে আমায় বললেন—ছেলের বড়ো কষ্ট হচ্ছে, খুকি সায় দিলো—সত্যিই তো,—উনি প্লেনে এলেই পারতেন, পরিষ্কার দেখলুম খুকিকে—নিত্যকালের পান্থনাটিকায় এ যেন শুধু একদৃশ্যের পার্শ্বনায়িকা, স্পর্শ দেয়—পরিচয় দেয় না।

পালমশাই হঠাৎ আমার কানটাকে টেনে নিলেন তাঁর মুখের কাছে, মন্ত্র দেবার মতে বললেন—এখানে মল-মূত্রের ব্যবস্থা কী হে? সত্যিই তো, এ-প্রশ্নের সদ্দিমেলা শক্ত, তবে জলের মতো সহজ করে দিলো মাঝিভাই, দেখিয়ে দিলো দিব্যি একটা বাঁশের ত্রিখণ্ড-ত্রিভুজকে, যেটা নৌকোর গায়ে দোল দিচ্ছিলো, ত্রাহি মধুসূদন বলে রসি ধরে ঝুলে পড়া তার ওপরে।

আবার দেখা দিলো একটা চড়া, এ এক দৃশ্য, নিবিড় বনানী, বেণুবন, কেমন ক'রে উঠলো চোখ দুটো, শুনলুম খুকি শোনাচ্ছে মাসীমাকে সে কালের কপালকুণ্ডলার কাহিনী। ঐ বনে কাপালিক থাকতো, হয়তো এইরকম চড়ায় নবকুমারের নৌকো ঠেকেছিলো...মাসীমা চোখ বড়ো করে' থামিয়ে দিলো—থাক থাক খুখি, ও-সব অমঙ্গল কথা এখন রাখ।

খুকি তো হেসেই খুন—তা বলে আর কাপালিক তো খাঁড়া হাতে বসে নেই মাসীমা! বলে ফেললুম—তবে, খুঁজলে কপালকুণ্ডলাকে পাওয়া যাবে, খুকির সাফ জবাব—সেটা নবকুমারের কাজ। আবার চোখ চেয়ে নিলো চড়ার দিকে, নৌকোটা যেন চড়ার দিকেই চলেছে। একপাল গোরুও চরছে, গোটাকতক ন্যাংটা-ছেলে বালি ঘেঁটে খেলা করছে, মাঝি জিগ্যেস করলো—নৌকো চড়ায় ঠ্যাকাবো কি বাবুরা? পাল্টা জিগ্যেস করলেন

পিসিমা—সাগর-দ্বীপে কখন পৌঁছুবে বাবা ? মাঝি একবার সূর্যের দিকে মুখ করে উত্তর দিলো—আর ঘণ্টা-দুই লাগবে মা। অনেকেই বলে উঠলো—তবে আর দরকার নেই। তখন সকাল সাতটা।

দিল খুলে পালমশাই কাঁদছেন না হাসছেন বোঝা গেলো না, তবে একটা দরদী সুর কানে শুড়শুড়ি দিতে লাগলো, একটু পরেই বোঝা গেলো তিনি শুক-শারীর দ্বন্দ্ব পড়ছেন। খোকা এবার হাল ছেড়ে দাঁড় ধরেছে, বেশ এঁটে-সেঁটে মাঝি সেজেছে, কারো সাধ্যি নেই খোকা বলবার, এখন সে পাকা মাঝি, হাতের শক্ত পেশী ফুলে উঠছে খোকার দাঁড়টানার তালে তালে, বজ্রমুঠিতে দাঁড় ধরেছে, যেন নব-নওজওয়ান ধরেছে জীবনতরঙ্গে নিশানদণ্ড, খণ্ড-খণ্ড করছে দাঁড়ের ঘায়ে ঢেউগুলো, খোকা তালে-তালে সুর দিচ্ছে—"হিঁড়োমারি, খেলনা বারি, নৌকো যাবে সাগর-দাঁড়ি, ও ভাই শ্বশুরবাড়ী"…

শন-শন নৌকা চলছে, দু'-একটা লঞ্চ ভট্-ভট্ করে ভেঙচি কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে, ভৃঙ্গীমশাইয়ের কৌতুক-কটাক্ষ পড়লো সেই দিকে, অমনি ঘুরিয়ে দিলো তার মুখটাকে আলতো-আঙুলে পালমশাই, সস্নেহে বলে উঠলেন—দাদারে, ও বঁধুর মুখ আর দেখিস না, তবে পিতিজ্ঞে করলাম পাঁচের কাছে, আসবার সময় ঐ ভট্-ভটের ঘাড়ে চড়ে' আসবো আসবো আসবো। পাল-মশাইয়ের পিতিজ্ঞেয় ভীষ্মও ভয় পায়, তবে ভয় পেলো না খুকি, বেশ ভারিক্কি মেজাজে বললো—ধরুন, যদি ভাগ্যে না জোটে !…ইট ছুড়বো, পাথর ছুড়বো, বালি ছুড়বো, শেষে জুতো ছুড়বো—তিরিক্কিমেজাজে পালমশাই তড়পে উঠলেন।

সর্বনাশ—খুকি আবার হেসে উঠলো, তাতে জ্বলন্ত আগুনে ঘি পড়লো, ছুড়ে ফেললেন গায়ে জড়ানো চোব্বা-চাদর—পালমশাই, খুকির দিকে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন—তুমি কী জানো হে লবঙ্গলতিকা, এই কৃদান্ত কহরাম পালকে কত শালা দিকপাল সাত হাত মেপে চলে, আর তুমি ফ্যাক্-ফ্যাক করছো ? খুকি মুখে কাপড় গুঁজে তখনো হাসছে, পালমশাই রুদ্রমূর্তিতে পোঁটলা খুলে তছ্‌নছ্ করতে লেগে গেলো, ভয় পেলো অনেকেই, এমন কি মাসীমাও, মাসীমা তো হিড়হিড় করে টানতে লেগে গেলো খুকিকে। দিগ্বিদিকশূন্য হোয়ে পালমশাই দুহাতে কী যেন ছুড়তে লাগে সারা নৌকোয়, সর্বনাশ, শুধু ভটাভট শব্দ, হৈ-চৈ পড়ে গেলো যাত্রীদের—আঃ, গেলুমরে, মলুমরে শব্দ, তারপরেই কী একটা হাতের কড়া মুঠোয় টিপে এগিয়ে গেলেন পালমশাই খুকির দিকে, মাসীমা তো আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠলেন—ঠিক ছোরা মারার মতো খুকির হাতে বসিয়ে দিলেন পালমশাই একটা মর্তমান কলা। তারপরেই প্রাণখোলা হাসিতে ফেটে পড়লো কহরাম পাল। হাসতে হাসতে তার চোখে জল এসে গেলো। যাত্রীমহলে হাসির ধুম পড়ে গেলো, পালমশাই সেগুলো ছুড়েছিলেন—সেগুলো নেবু। তাই খোকা খুলেই বললো—দাদা, আর একটা ছুড়ুন না। যেই না বলা, পালমশাই গেলেন আবার বিগড়ে, এবার সত্যিই একটা ভোঁতা ছোরাকে ঘষতে লাগলো নৌকার কাণায়, কেঁদে উঠলো কান্তির মা—ওমা, কী হবে গো ! দাঁত খিঁচিয়ে কথা চিবিয়ে পালমশাই বলে উঠলেন—তোমার মাথা উড়োবো—নির্ঘাৎ উড়িয়ে দেবো, ঠিক এম্নি করে…বলেই একটা ডাবের মাথা উড়িয়ে দিলেন পালমশাই এককোপে, ধরলেন আমার মুখের সামনে, বললেন সহাস্যে—সসম্মানে—ধরুন দয়াময়, ফাটকা-বাজারের ফটিকচাঁদ !

নৌকোটা এগুচ্ছে, না চড়াটা পেছুচ্ছে—বোঝা শক্ত, ঠিক কলম্বাসের মতো লাফিয়ে উঠলো খোকা, সোজা দাঁড়িয়ে সদম্ভে চেঁচিয়ে উঠলো—নাইসল্যাণ্ড এসে গেছি—হুররে !…হুটোপাটি লাগিয়ে দিলো যাত্রীরা, লাফিয়ে উঠলো অনেকেই, নৌকোটা টলমল করে উঠলো !

মায়াবী-কুয়াশার আঁচলে ঢাকা ঐ তো মায়াপুরী, ঐ তো কাঞ্চন-চূড়া, ঐ তো আদি জ্ঞানীর আশ্রমপীঠ ঐ তো নিরীশ্বরবাদীর লীলাতট। খেপে উঠলো যাত্রীরা, জয়ধ্বনি দিলো জীবনদা—জয় কপিলে বাবাকী—জয় ! জয় তীর্থ-পথিককী জয়, জয় গঙ্গা-সাগরকী—জয়। অন্য নৌকো থেকেও যাত্রীরা প্রতিধ্বনি তুললো—জয় !…এ-জয় যেন আর ফুরোয় না, এ জয় যেন জীবনের জয়মাল্য ছিঁড়ে পড়ছে, তাই এর শেষ নেই—

এই তো তৃষ্ণার্ত পথিকের তিতিক্ষাতট, মনে হয় জড়িয়ে ধরি বুকে, সারা অঙ্গে মাখি ওর পদরেণু, লুটিয়ে দিই অজ্ঞান অন্ধ এই নাস্তিক মাথাটাকে। দূর থেকে

সাগর-দ্বীপকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, অসংখ্য তাঁবু পড়েছে জীবন-যোদ্ধা যাত্রীদের, কত রঙের কত বিচিত্র পরিচ্ছদ, কত যাত্রীর কতভাবের পরিক্রমা, স্নানে মত্ত কত বিচিত্র ভংগির নর-নারী। আর পারা যাচ্ছেনা নৌকোয় থাকতে. তীরে নৌকো ঠেকতে আর মিনিট দশেক দেরি, আবার উঠলো জয়ধ্বনি, পালমশাই বেশ করে নাক-কান মলে' হাতে কপাল ঠুকলেন, মাঝি বললো—আর তো এ-নৌকো যাবে না বাবুরা, এ-বার ঐ ছোটো ছিপ-নৌকোতেই আপনাদের তীরে যেতে হবে।···সে আবার কী, সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন পিসিমা, মাঝি বললো—এখন যে ভাঁটা মা, বড়ো নৌকো আটকে যাবে!···ইয়ারকি পেয়েছো! একেবারে অগ্নিবৎ ভৃঙ্গীমশাই, নন্দীমশাইও তাই, পাল-মশাইয়ের তো কথাই নেই, খোকা আবার এইতালে টিনের টপ্পরে দামামা বাজাচ্ছে, বেশ বেধে গেলো হট্টগোল! হার কেউ মানতে চায় না, শেষে হাসতে হাসতে জীবনদা বললো—আমরা পুণ্যপ্রার্থী, মানেই কষ্টপ্রার্থী, তাছাড়া, যে-ক্ষুদ্রকে আমরা এতদিন ক্ষুদ্র বলেই ভেবেছি, এ-তীর্থে সেই ক্ষুদ্রই নেবে আমাদের প্রথম তর্পণ, তাতে ক্ষতি কী!···তড়পে উঠলো কে একজন—ভারি মজা আর কি! পারবো না···পারবো না আমরা মোটবহর নিয়ে ঝাঁপা-ঝাঁপি করতে, সবার মাঝখানেই ঝাঁপিয়ে পড়লো খুকি, বেশ খুশি-আমেজেই হেলে-দুলে বলতে লাগলো "পারিব না একথাটি বলিও না আর, কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।"···পোঁটলার ওপর বসে পালমশাই প্রথম হাঁকড়ে উঠলেন—নিশ্চয়, নিশ্চয় পারতে হবে, অবশ্য কী পারতে হবে, সেটা জানলে পালমশাই হয়তো পাষাণ ফাটাতেন। জেলেডিঙ্গিটা যখন হেলেদুলে এসে আমাদের নৌকোটায় সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলো, সেই সঙ্গে আমাদেরও এই দশঘণ্টা সহঅবস্থানের গাঁট যেন শিথিল হলো, পিসিমা খোকাকে পরিষ্কারভাবেই বললেন—খোকা, আর একটা জেলেডিঙ্গি ডাকো, আমরা অন্য ঘাটে নামবো!

মেদিনীপুরের মাসীমা দাঁতের মাড়ি বের ক'রে বললেন—তা' হবেনা দিদি, একসঙ্গে এলুম, একসঙ্গে থাকবো, একসঙ্গে যাবো, কথাটা কানে না নিয়েই পিসিমা লটবহর ছুড়তে শুরু করলো আর একটা জেলে ডিঙ্গিতে, নির্বাক মাসীমা যেন—হাঁ হোয়ে গেলো। পিসিমার দল পাড়িদিলো আগে, খোকা যেতে-যেতে হাতনাড়তে লাগলো নদীয়ানন্দন-ব্রজমণি চলেগেলো, রেখেগেলো একটা অস্বস্তির আঁচল। আমরাও লাফিয়ে পড়লুম একে-একে জেলেডিঙ্গির ওপর, ডিগবাজি দিয়ে পড়লেন ভৃঙ্গীমশাই, কী আশ্চর্য প্রতিশোধ যে-ভিজে জুতোটাকে এতক্ষণ কোলে রেখে শুকনো করলেন, পায়ে গলাতেই সে প্রেষ্টিজ বোধে স্লিপ কাটলো, ফেটেপড়লো খিল খিল হাসিতে খুকি—মুখটা তার লাল হয়ে উঠলো, ডিঙ্গিটাও ডিগবাজি দেয় আরকি, ধমক দিল মাসীমা, খুকি জবাব দিল—আর ধর্মে কাজ নেই মা, পায়ের জুতোও পাপের মর্ম বুঝেছে। যখন ঠ্যাংটাকে নন্দীর ঘাড়ে চাপিয়ে শুয়ে শুয়েই জয়ধ্বনি দিলেন ভৃঙ্গীমশাই সাগরদ্বীপের তীরে ঠেকলো ছোট্টো ডিঙ্গিটা, আর পারিনা, সত্যিই আর পারছিনা, লাফিয়ে পড়লুম বালুতটে, কিন্তু বালু কই, এতো পাঁক! হায়রে চর্মচক্ষু, আরও চেয়ে দেখ, ভালোকরে দেখ. এযে যুগযুগের লক্ষপদরজ পলি, হাতে মাখলুম, মাথায় মাখলুম, মনেহ.লা তপ্ত বাসনাতেও মাখাই, খপকরে হাত ধারলেন জীবনদা—সাবধান, বড্ডো পিছল, পা টিপে একবার দাঁড়ালুম, চেয়ে দেখলুম সামনের দিকে, দ্বীপের ওপর দুঃখদর্শী দিব্যজ্ঞানীর মূর্তমন্দিরে কৌশিক নিশান, কিন্তু এতো নিশান নয়, এতো নশ্বর মর্তে অবিনশ্বর দণ্ড, কো-দণ্ড কালতন্ত্রী পঞ্চভৌতিক কায়ায় পঞ্চবিংশ-তত্ত্বের পাদপীঠ মর্তপ্রেমিক, বাসনাবিলাসী মানুষের মিলন-পীঠ।

হাতদুটো আপনা-আপনিই যুক্ত হয়ে কপালে ঠেকলো, মুক্তকণ্ঠ চাইলোগান গাইতে, গলা নেই তাই হলোনা, তবুও গুন-গুন করতে ছাড়লুম না, "যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ"···

মাসীমা বললো—বাবা এ জায়গা বড্ডো নোংরা, চলো ওপরে উঠে হাঁপ ছাড়বো, সত্যিই চন্দন বিষ্ঠায় সমজ্ঞান চাই এখানে, থুথু ফেলবার অবকাশ নেই, তবে বমি করতেও বাধা নেই, ছটফট করে উঠলুম সবাই—শুধু নির্বিকার জীবন-দার দৃঢ় নির্দেশ—এগিয়ে চলো কিন্তু এগুবে যে পাদুটো, সে দুটোই যেন ধর্মক্ষেত্রে ধর্মঘট করে বসলো। ধর্মঘটি-দের ওপর যেন ঘটি ছুড়ে মারলো খুকি, এলানো খোঁপা জড়িয়ে আঁচলটাকে কোমরে কষে আগে পা বাড়ালো। খোঁড়ার পা খানায় পড়ে, পরিত্রাহি চিৎকার ভৃঙ্গীমশাইয়ের পলি-

মাটির গোরাগর্ভে বিনাশত্তে ভৃঙ্গীর প্রথম পাটা জমে গেছে, এক ঝটকায় খুকি তাকে তুলে নিলো এ কি! একি প্রমীলা না উত্তরা, এ পদক্ষেপ কি যুদ্ধযাত্রার না লগ্নভ্রষ্ট অভিসারিকার? এ দিকে পালমশাই চিৎপাত চন্দন বিষ্ঠার সমজ্ঞানে চৈতন্যরহিত, শুধু তার খেদোক্তি রক্ষা করতে আর বলবোনা প্রভু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ করো, আপাততঃ এক্ষেত্রে হাত ধরে জীবনদাই তার বাসনা পূর্ণ করলেন।

এবার বালুতটে হাঁপ পড়লো, হাসি ফুটলো, 'বাধা নামলো। জীবনদাই বলে উঠলেন—ভারীবাবা কই? ভারি মজাতো এইতো ছিলো, ছিলো মানে দস্তুর মতো আমার আগে আগেই তো আসছিলো—উত্তরদিলো নন্দীমশাই আশ্চর্য ব্যাপার একমুহূর্তে উবে গেলো। এইতো—এইতো তার পায়ের পাঁজ, প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলো পালমশাই আমারো চোখদুটো তাকে কতবার কতভাবে এইখানেই ঘোরাঘুরি করতে দেখলো অথচ। এটা ভৌতিক না ভোজবাজি। মাসীমাও বললেন—এইমাত্র তো আমাকে "মাইজী ব'লে কী বললে!"...এর জন্যে এত হট্ট-চট্টের কারণ কী—খুকি প্রশ্ন করলো উত্তর দিলো জীবনদা—কার্যটা যখন রয়েছে তখন কারণটা খুঁজতে দোষ কী?

গর্জে উঠলো পালমশাই—দোষগুণের মুখে আগুন, আগে পেটের আগুনটা নেভাই চলো, চলতে মন চাইছে না, অথচ লোকটা কী করে চলে গেলো, ঐতো মেলায় ঢোকবার গেট দিব্যি দেখা যাচ্ছে, ভিড়ওতো তেমন নেই, অথচ-অনর্থক ভারি হলো মনটা, সেইকালেই পিসিমা বলেছিলেন—ভার বাড়াবোনা, কত মজার ম্যাজিক দেখেছি আশ্চর্য হয়েছি, বিশ্বাসী হইনি, এ ঘটনায় কিন্তু আশ্চর্যের চেয়ে বিশ্বাসী হলাম বেশি।

নন্দীমশাই আমার কানে কানে বললো—চলুন, এবার আমরা কেটে পড়ি, জীবনদাও সায়দিলো—সত্যিই তো, আবার বাঁধন কেন? ফোড়ে টেনে বলে উঠলো খুকি—এটা তো যুক্ত ক্ষেত্রে নয় জীবনবাবু, এটা যে মুক্তক্ষেত্রে, জীবনদাও ধীরগম্ভীরে উত্তর দিলেন—যুক্তের জীবন-মন্ত্রই তো মুক্তমন্ত্রে, তাই তো সীমার মাঝেই অসীমকে খুঁজি, খিল-খিল করে খানিক হেসে উঠলো খুকি, মুখটিপে বললো—ও বলতে চাইছেন আপনি বন্ধনহীন গ্রন্থী। জীবনদা ঠোঁটে লবঙ্গ টিপে বললেন—তাহলে তো রজ্জুতে সর্পভ্রমই রয়ে গেলো। গেলো গেলো বয়েই গেলো, তা' এখন চলোদেখি চেঁচিয়ে উঠলো পালমশাই, তাকে আবার রহিত করলেন মাসীমা, আমার কাছে সরে' এসে বেশ মিষ্টি কথায় স্মৃতি শোনালেন—কী ভাবছো বাবা, জগৎ থাকবে, মায়া থাকবে, আর তোমার এই মাসীমাও থাকবে, এটা যে কলারের জায়গা বাবা, এখানে সাধু, সংসারী, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সবাই মায়ার পাথরবাটিতে কলার মেখে খামচে তুলে খাবে, প্রসাদ পাবে কোথা? এটাতো ঠাকুরতলা নয়, যে হাত পেতে পিত্যেশ করবে। এসো, চলে এসো, আমি থাকতে যাবে কোথা, বোকা ছেলে!

কেপ্‌ হোটেল

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

এ'খানে সন্ধ্যা নামে
ধাপে ধাপে ইমণ কল্যাণে।
সোঁদা গন্ধ। নীচে কোন সশব্দ পাতালে
ঘুঙুরের দ্রুত শব্দ। নৃত্যরতা ভারতনাট্যম
নর্ত্তকী পায়ের তালে

অসংখ্য সাপের স্বপ্ন মধুর, পরম
উপভোগ্য করে তোলে সন্ধ্যায় সকালে।
এ'খানে সময়
মলবার-কন্যার মত সুডৌল, মসৃণ আর অনিন্দ্য
বলে মনে হয়।

অনলস সংস্কৃতসেবী যতীন্দ্রবিমল

অধ্যাপক শ্রীধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী

বিশ্বের বিস্ময় এবং ভারতের গৌরব সংস্কৃত ভাষার মর্মকোষে বিধৃতা হ'য়ে আছে, ভারতের চিরন্তন কালের অখণ্ড সংস্কৃতি। ১৯৪৭এর ১৫ই আগষ্ট খণ্ডিত ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার আমরা পেলেও পাইনি সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা। তাই খণ্ডিত দেশের মতো আমাদের স্বাধীনতাও আজ খণ্ডিত। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তিযোদ্ধাদের আমরা এখনো স্মরণ করি, আলোচনা ক'রি তাঁদের সাধনার অবদান এবং আত্মত্যাগোজ্জ্বল মহিমার কথা। কিন্তু, স্বাধীনতার অপর অংশের অর্থাৎ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতার সেনানীদের অপরিমিত দানের কথা যথাযথভাবে আলোচিত হয় না। তার কারণ, পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা আমরা এখনো অর্জন ক'রতে পারিনি। ভারতীয় সাংস্কৃতির ধাত্রী সংস্কৃত ভাষায় আমাদের যথাযথ জ্ঞান এবং শ্রদ্ধার অভাবই র'য়েছে এই কারণের পশ্চাতে তাই, প্রাক-স্বাধীনতার যুগে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে সংস্কৃত ভাষার পুনঃপ্রচারে এবং অনুশীলনে যাঁরা জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন, তাঁ'রা আমাদের সাংস্কৃতিক মুক্তিযোদ্ধা রূপে নন্দনীয়। সেই স্বল্পসংখ্যক দুর্লভ মুক্তিব্রতীদের অন্যতম নায়ক ছিলেন সদ্যঃস্বর্গত পরম শ্রদ্ধেয় ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। প্রাক্ স্বাধীন যুগে এবং স্বাধীনোত্তর ভারতে জনসমাজের মধ্যে সংস্কৃত ভাষাকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে তিনি যে অনলস পরিশ্রম ক'রে গেছেন, তা অতুলনীয়। সংস্কৃত প্রচারের বেদীমূলেই তাঁর অমূল্য জীবনটি তিনি উৎসর্গ ক'রে গেছেন।

প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের বাংলার পূর্বতম প্রান্তবর্তী এবং বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্গত চট্টগ্রাম জেলার কচুরখিল গ্রামে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে আদর্শনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত গৃহী রসিকচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পুত্ররূপে যতীন্দ্রবিমলের আবির্ভাব। যতীন্দ্রবিমলের জন্মভূমি পুরাণবন্দিতা, ইতিহাসশ্রুতা, শৈলকিরীটিনী, সাগরকুন্তলা, সরিন্মালিনী চট্টলা বহুবরেণ্য পুরুষের মাতৃভূমিরূপে নন্দিতা হ'লেও আজ যতীন্দ্রবিমলের জন্মসূত্রেও বিশেষ গৌরবিতা। প্রকৃতির অনিন্দ্যসুন্দর এই লীলা নিকেতনে শৈশব এবং কৈশোরের বিদ্যাভ্যাস সমাপন ক'রে যৌবনে তিনি ক'লকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্ররূপে প্রবিষ্ট হন। কৈশোরেই চট্টলের দুইজন বরেণ্য সন্তান মহাকবি নবীনচন্দ্রের বাংলা এবং সাহিত্যাচার্য রজনীকান্তের সংস্কৃত রচনাবলী পাঠে তাঁর সহজাত সাহিত্যরসপিপাসু চিত্ত পরম পরিতৃপ্তি লাভ ক'রত। কৃতিত্বের সংগে প্রেসিডেন্সী কলেজ হ'তে স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে তিনি উচ্চতর জ্ঞানার্জনের অদম্য স্পৃহায় যাত্রা করেন লণ্ডন মহানগরীর উদ্দেশে। বিশেষ উল্লেখনীয় যে বর্তমানের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সংস্কৃত কলেজাধ্যক্ষ ডক্টর শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে তাঁর অন্যতম প্রিয়তম সুহৃৎ ও সতীর্থ। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সংগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ওপর গবেষণা ক'রে "পি এইচ ডি" উপাধি অর্জন ক'রে যতীন্দ্রবিমল বিশ্বের বিদগ্ধ গোষ্ঠীতে বিশেষ সম্মানের আসন লাভ করেন। তখন তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে School of Oriental Stduies এ সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষার অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং লণ্ডনস্থ India House Library এবং British Museumএ সংরক্ষিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলী এবং পাণ্ডুলিপির বিরাট ভাণ্ডারে গবেষণায় নিমগ্ন হন। সেই গবেষণাকালে ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, বিশেষ ক'রে সংস্কৃত সাহিত্যের ক্রমপরিণতির বহু নতুন তথ্যের তিনি সন্ধান পান। ফলে তাঁর লেখনীতে প্রকাশিত হ'ল নব নব সন্দেশ-বহ একাধিক গবেষণা গ্রন্থ।

বিলেত থেকে ফিরে কিছুদিন ক'লকাতা সিটি কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি এসিয়ার প্রখ্যাততম মহাবিদ্যালয় ক'ল্‌কাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। বিশ্বের বহু মনীষী তখন এই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। এই প্রতিভাধরদের মধ্যে যতীন্দ্রবিমল অচিরকালেই সহকর্মী এবং আচার্যরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর স্বাধীনতার অব্যবহিতপূর্বে তিনি বিশ্বের প্রাচ্য বিদ্যার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ক'ল্‌কাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ অলংকৃত করেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দার্শনিকমূর্ধন্য সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ মনস্বীদের দ্বারা অলংকৃত সংস্কৃত কলেজের এই বরেণ্য অধ্যক্ষপদ লাভ ক'রে তিনি বহুবিধ সৎকর্মের দ্বারা স্বাধীনোত্তর ভারতে সংস্কৃত কলেজের হৃতগৌরবকে পুনরুদ্ধার করেন। তখন তিনি ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও আংশিক সময়ের অধ্যাপক রূপে অধ্যাপনা ক'র্‌তে থাকেন। তারপরে "বংগীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের" সম্পাদকপদে নিযুক্ত হ'য়ে আমৃত্যু সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন।

এত গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকেও সরকারী কর্মের বাইরেও তাঁর কর্মধারাকে তিনি প্রসারিত ক'রে দিয়েছিলেন। ইংরেজী, বাংলা এবং সংস্কৃত অসংখ্য প্রবন্ধ, গবেষণ গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্রের রচনা ও সম্পাদনায় এবং ইদানীন্তনকালে মৌলিক নাট্য-রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়। ভারত বিভাগের পর পূর্ববাংলাগত পণ্ডিত-মণ্ডলীকে অপ্রকাশিত সংস্কৃত পুঁথিমালার সম্পাদনায় নিযুক্ত ক'রে তিনি এই অর্থদান অথচ বিদ্যাভূয়িষ্ঠ পণ্ডিত-মণ্ডলীর জীবনধারণের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যেমন মানব প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন, তেমনি সূচিত করেন বিদ্যাবিবর্ধনে তাঁর অতুলনীয় আগ্রহ। সমাজ-রাষ্ট্র-অবহেলিত, ভারতাত্মার ধারক-বাহক এই বঞ্চিত সংস্কৃত-পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রতি এতো সম্মান এবং এতো সহানুভূতি বাংলাদেশে আর কেউ প্রদর্শন ক'রেছেন কিনা জানি না। তাই এই পণ্ডিতবর্গের অফুরন্ত স্নেহ এবং অমেয় আশীর্ধারায় তিনি নিয়ত অভিষিক্ত হ'তেন। উচ্চতম সরকারীপদে অধিষ্ঠিত, ইংরেজী বিদ্যায় নিষ্ণাত, বিলাত ফেরত এই পদস্থ ব্যক্তির মস্তক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত (তিনি পরিচিত অপরিচিত যেই হোন না কেন), সাধক এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের চরণধূলি নেবার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র থাকতো। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং" এই সনাতন বাক্যের দুর্লভ প্রতিরূপ ছিলেন তিনি।

সংস্কৃত প্রচার এবং জ্ঞানসাধনার ক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় অবদান রেখে গেছেন দুটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। বলা বাহুল্য প্রতিষ্ঠান দুটি হ'চ্ছে সর্বজনপরিচিত "প্রাচ্যবাণী মন্দির" এবং "বংগীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ"। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে ক'ল্‌কাতায় ৩ সংখ্যক ফেডারেশন ষ্ট্রীটস্থ তাঁর বাসগৃহে প্রাচ্যবিদ্যা প্রচারের জন্য কিছু সংস্কৃতপ্রেমিক বদান্য ব্যক্তির দানে ও উৎসাহে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "প্রাচ্যবাণী মন্দির" নামক এই বিখ্যাত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানের জন্মলগ্ন থেকে আজীবন তিনিই ছিলেন সম্পাদক এবং প্রাণপুরুষ। অবশ্য, তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী বিখ্যাতা বিদুষী অধ্যক্ষা ডক্টর শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী ছিলেন যুগ্ম-সম্পাদিকা এবং তাঁর সকল কল্যাণ-কর্মের একান্ত সহকারিণী। এই প্রতিষ্ঠান থেকে শতাধিক গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হ'য়েছে, সম্পাদিত হয়েছে, গবেষণাপত্র এবং নিখিল ভারতে অভিনীত হ'য়েছে প্রাচীন ও আধুনিক শতাধিক সংস্কৃত নাটক। এই সকল কর্মের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্যরূপে সরকার হ'তে নিয়মিত অর্থানুদানও তিনি সংগ্রহ ক'র্‌তে পেরেছিলেন। "প্রাচ্যবাণী" নামে ইংরেজী এবং বাংলায় যে দুটি গবেষণা মুখপত্র এই প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি সম্পাদনা ক'র্‌তেন, তা' এক সময়ে গবেষণা জগতে আলোড়ন তুলেছিল। কত অমূল্য অতি প্রয়োজনীয় রচনা বিভিন্ন বিদগ্ধ ব্যক্তির লেখনীতে প্রসূত হ'য়ে এই পত্রিকাদ্বয়ে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'য়েছে তার ইয়ত্তা নেই। বেশ কয়েক বছর ধ'রে এই পত্রিকা দুটি আর প্রকাশিত হ'চ্ছে না দেখে দুঃখ হয়। এই প্রতিষ্ঠান থেকেই বহু অমূল্য মৌলিক এবং গবেষণাগ্রন্থ পূর্বে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'য়ে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। মহামহোপাধ্যায় ডঃ যোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্য-বেদান্ততীর্থের "প্রাচীন ভারতে দণ্ডনীতি", "ভারতীয় দর্শনের সমন্বয়", ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন," "চৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা", ডঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর "পৌরাণিকী", ডঃ রমা চৌধুরীর "সূফী ও বেদান্ত দর্শন" প্রভৃতি বিখ্যাত

গ্রন্থ তাঁরই সম্পাদনায় "প্রাচ্যবাণী" থেকে প্রকাশিত হ'য়েছে

তা'ছাড়া তাঁ'র নিজের রচিত বহু মৌলিক এবং গবেষণাগ্রন্থ ও সংস্কৃত নাটকাবলী এই প্রতিষ্ঠান থেকেই হ'য়েছে প্রকাশিত। গোড়ার দিকে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনাতেই ছিল তাঁর প্রবণতা। বিশেষ ক'রে তাঁর "The contribution of Muslims to Sanskrit Literature" এবং "Muslim Patronage to Sanskrit Learning" এই গ্রন্থদ্বয়ে তিনি ভারতে সংস্কৃত চর্চার এক অজ্ঞাত অধ্যায় উদ্ঘাটিত করেন। সংস্কৃত ভাষার মন্দাকিনী ধারা যে ভারতের মননভূমিতে কখনো বিলুপ্ত হ'য়ে যায়নি, তা'র নিদর্শন মেলে এই গ্রন্থদ্বয়ে। এই সুমধুর এবং সুপরিণত দেবভাষার স্বাভাবিক গুণেই বিজেতা মুসলমানরাও বিজিতদের ভাষা এই সংস্কৃত চর্চায় আগ্রহ প্রকাশ ক'রেছিলেন। তাঁরা যেমন সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা ক'রেছিলেন, তেম্‌নি অনেকে সংস্কৃতে প্রভূত পরিমাণ রচনাও রেখে গেছেন। সম্রাটপুত্র দারা শিকোহ্, খান্‌খানান্ আব্দুর রহমান, মহম্মদ শাহ, দরাফ খাঁ প্রভৃতির সংস্কৃত রচনা তিনি সম্পাদিত ও প্রকাশিত ক'রে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত করেন। এই সুর ভাষার মাধ্যমেই সেদিন যে হিন্দু মুসলমানের রাখীবন্ধন হ'য়েছিল, এই শুভ সন্দেশ তিনিই বোধ হয় আমাদের প্রথম দান করেন। তা'ছাড়া সংস্কৃত ভাষায় রচিত তাঁর "বংগীয় দূতকাব্যেতিহাসঃ" বাংলার সংস্কৃত চর্চার একটি বিশিষ্ট ধারাকে বিশেষ ভাবে তুলে ধ'রেছে। এ ছাড়া "The position of women in the Vedic Rituals" "The Contribution of Bengal in Smriti Literature" এবং "The Contribution of women to Sanskrit Literature" এই তিনটি গ্রন্থ রচনায় তিনি অসাধারণ ধীশক্তি পরিশ্রম এবং বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া আরো বহু গ্রন্থ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'য়ে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ ক'রেছে। জীবনের শেষের দিকে তিনি সংস্কৃত নাটক রচনাতেই বিশেষ ক'রে আত্মনিয়োগ করেন। ভারতের বিখ্যাত ধর্মসম্প্রদায়গুলির যাঁরা ছিলেন বরেণ্য প্রবক্তা, তাঁদের প্রায় সকলের জীবনকে নিয়েই তিনি নাটক রচনা করেন। বিশেষ ক'রে শক্তিরূপিণী নারীসাধিকাদের জীবনকে নাটকে রূপান্তরিত করার দিকে ছিল তাঁর সবিশেষ প্রবণতা। তাঁর রচিত সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে "মহাপ্রভু হরিদাসম্", "শ্রীতিবিষ্ণুপ্রিয়ম্" "নিষ্কিঞ্চন যশোধরম্" এবং "দীনদাসরঘুনাথম্"—এই নাটক চতুষ্টয়কে সংলাপের সারল্য, ভাবের বৈচিত্র্য এবং ঘটনার সংঘাতের দ্বারা রসোত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণীর নাটকরূপে অনায়াসে চিহ্নিত করা চলে। এ ছাড়া "শক্তিসারদম্" "ভক্তিবিষ্ণুপ্রিয়ম্", "ভারতহৃদয়ারবিন্দম্", "ভারতভাস্করম্", "ভেনিসবণিজম্", "বিমল যতীন্দ্রম্", "মুক্তিসারদম্", "অমরমীরম্", "রক্ষক গোরক্ষম্" প্রভৃতি তাঁরই লেখনীপ্রসূত বহু অভিনীত নাটক। পালি ভাষায় রচিত প্রথম নাটক "বিশ্বসুন্দরীপটিবিম্বনম্" তাঁরই রচনা। এ ছাড়া আরো বহু গ্রন্থ তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেন।

তাঁর আর একটি মহৎকর্ম হ'চ্ছে বাংলাদেশে "সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি। বহুদিন পূর্বে, স্বাধীনতার সংগে সংগেই সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বহু সভাসমিতির মাধ্যমে তিনি জনচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেন। আজ, তা' ফলপ্রসূ হ'তে চলেছে। কিন্তু, হায়, সে ফল দর্শন ক'রে যাবার মতো আয়ু তিনি পেলেন না। সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা এবং অবশ্য পাঠ্য করার জন্যে তাঁর প্রয়াসের কথা সর্বদাই স্মরণীয়। "আকাশ বাণী"তে সংস্কৃত নাটকের অভিনয় এবং সংস্কৃতমূলক ভাষণাদির নিয়মিত অনুষ্ঠান অনেকটা তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় আরম্ভ হয়েছিল।

নানাভাবে সংস্কৃতপ্রচারের জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করতেন বিশেষ ক'রে সংস্কৃত নাটকের অভিনয়কে তিনি তার শ্রেষ্ঠ উপায় রূপে গ্রহণ করেছিলেন। অর্ধশতাব্দী পূর্ব হ'তে বাংলা দেশে যদিও "সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ" নিয়মিত ভাবে সমুন্নতমানের সংস্কৃত অভিনয় বাংলায় ও বহির্বংগে ক'রে আস্‌ছিল, তা প্রধানতঃ সীমিত থাক্‌তো সংস্কৃতজ্ঞ বিদগ্ধ গোষ্ঠীর মধ্যেই এবং অভিনয়ও হত বছরে দুয়েকবার মাত্র। কিন্তু, ডঃ চৌধুরীর অদম্য উৎসাহে সর্বভারতে সর্বজনের কাছে প্রতিবৎসর বহুবার সংস্কৃত নাটকের রসধারা পরিবেশিত হতে লাগলো। সংস্কৃতের গণসংযোগে তিনিই এক রকম পথিকৃৎ। প্রথমের দিকে "প্রাচ্যবাণীর" বার্ষিকোৎসবে একটি ক'রে প্রাচীন সংস্কৃত

নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হ'ত। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯৪৪ এ "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্", ১৯৪৬ এ "মিবারপ্রতাপম্" এবং "মধ্যমব্যায়োগম্", ১৯৪৭ এ "চণ্ডকৌশিকম্" ১৯৪৯ এ "বেণীসংহারম্", ১৯৫০ এ "মৃচ্ছকটিকম্", ১৯৫১ তে "প্রতিমানাটকম্, ১৯৫২ তে "চণ্ডকৌশিকম্", ১৯৫৩ এ "নাগানন্দম্", ১৯৫৪ এ "অভিষেকম" প্রভৃতি নাটকের সুপ্রযোজিত অভিনয় বিদগ্ধগোষ্ঠীকে মুগ্ধ করেছে। স্বাধীনতার পর অধিকাংশ নাটকই "রাজভবনে" অভিনীত হ'য়েছে রাজ্যপালগণের পৃষ্ঠপোষকতায়। ১৯৫৬ হ'তে তাঁর স্বরচিত নাটক অভিনীত হ'তে সুরু হ'ল। ১৯৫৭ এর জানুয়ারীতে অভিনীত "স্বপ্নরঘুবংশম্" নামক নাটকটি তাঁরস্বরচিত নাটকের প্রথমাভিনয়। তারপর তিনি দশ-বারোটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন এবং প্রায় প্রতি সপ্তাহেই সেগুলোর অভিনয় নানাস্থানে নানাভাবে করাতে থাকেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং অসীম স্নেহে আকৃষ্ট হ'য়ে বাংলার প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের প্রখ্যাত অধ্যাপকদের অনেকেই এবং অন্যান্য পদস্থ শিক্ষিত নরনারী এই অভিনয়গুলিতে প্রথমের দিকে অংশগ্রহণ করতেন। ফলে অভিনয়ও প্রায়ই হ'ত সর্বাংগ-সুন্দর। এই নাট্য-গোষ্ঠী নিয়ে সারা ভারত এবং ভারতের বাইরেও তিনি গমন করেন এবং অভিনয় প্রদর্শনের দ্বারা অনেককেই পরিতৃপ্ত করেন। পূর্বের অভিনেতৃমণ্ডলীর প্রায় সবাই নানা অসুবিধায় নিয়মিত ভাবে তাঁর অভিনয়ে যোগদানে অপারগ হ'য়ে প'ড়লেও অতুলনীয় তৎপরতার সংগে বহু নতুন অভিনেতাকে শিক্ষিত ক'রে তিনি নিখিল ভারতে অভিনয় করিয়েই যেতে থাকেন। নাটকের অভিনয় কেবল অর্থসাধ্য নয়, প্রভূত শ্রমসাধ্য ব্যাপারও বটে। বহুজনকে একত্রিত করে, বহুদিকে লক্ষ্যরেখে, সকল প্রকারের দায়িত্বের ভার নিজে বহন ক'রে অভিনয় করাতে হ'ত বলে তাঁকে অমানুষিক পরিশ্রম ক'রতে হ'ত। মনে হয় এই অভিনয়ের জন্যে যে অপরিমিত পরিশ্রম তাঁকে করতে হ'য়েছে, তাতেই তাঁর জীবনীশক্তি নিঃশেষ হ'য়ে গিয়ে তাঁর অকালমৃত্যুকে ত্বরান্বিত ক'রেছে। দেশের বৃহত্তর কল্যাণে এবং সংস্কৃতের প্রশস্ততর প্রয়োজনে তাঁকে এই অমানুষিক পরিশ্রম হতে সংযত ক'রে বাঁচাবার সেদিন কেউ ছিলনা ব'লে দুঃখ হয়।

যাই হোক, সংস্কৃতভাষার সর্বাংগীণ প্রচার এবং প্রসারে তাঁর মতো এই ভাবে আত্মোৎসর্গ আর কেউ করেছেন ব'লে মনে হয় না। বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও সংস্কৃতের দীপশিখাটি তিনি যে ভাবে নিজের জীবনের বিনিময়ে জ্বালিয়ে রেখে গেছেন, তা অতুলনীয়। মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক। অতি সাধারণ অবস্থা হ'তে পরিশ্রম এবং একাগ্রতার দ্বারাই তিনি যশ এবং উন্নতির সমুচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। কখনো তাঁকে বিচলিত হ'তে দেখা যেতো না। শান্ত, অনলস এবং স্থিতধী এই মনীষীর দুর্লভ মধুর ব্যক্তিত্বে পরিচিত—অপরিচিত, ছোট বড়ো সবাই মুগ্ধ না হ'য়ে পারতোনা। মতান্তরেও কখনো তাঁর মনান্তর হতনা। সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজীতে তাঁর বাগ্মিতাও ছিল অনন্যসাধারণ। যে কোন বিষয় নিয়ে তিনি অনর্গল ভাবে সংস্কৃতভাষায় ভাষণ দিতে পারতেন।

যে "সংস্কৃত শিক্ষা পরিষৎ" ভারতের সনাতন সংস্কৃত-শিক্ষার ধারাকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে চ'লেছে, তার সরকারী নিয়ন্তা ছিলেন তিনি। তাঁরই কর্মকুশলতায় বাংলার এই শিক্ষাপরিষদের পরীক্ষাকেন্দ্র সারাভারতে দূরদূরান্তেও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে। টোলের উন্নয়নের জন্যে তাঁর চেষ্টায় তাঁরই হাত দিয়ে প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকা সরকার হ'তে ব্যয়িত হ'ত। তাঁরই অদম্য কর্মনৈপুণ্যে এই পরিষদের দিন দিন বিবর্ধন সম্পাদিত হইয়াছে এবং প্রায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ক'রে চ'লেছে এই প্রতিষ্ঠান।

যাক্, এই ভাবে জ্ঞান-কর্মের সমন্বয় সাধন ক'রেছিলেন তিনি তাঁর জীবন-সাধনায়। এই প্রকার জ্ঞান-কর্মাশ্রিত জীবনই আদর্শ জীবন এবং এই সমন্বয়-মার্গের পথিকেরাই দেহান্তে ব্রহ্মপদ লাভ করেন ব'লে আমাদের শাস্ত্রকারেরা ব'লেছেন। যোগবাশিষ্ঠে র'য়েছে—

> "উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
> তথৈব জ্ঞান-কর্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥"

তাই, মনে হয়, এই সমন্বয়-সুন্দর জীবনের অধিকারী, কল্যাণকর্মা, জ্ঞানব্রতী যতীন্দ্রবিমল আজ দেহান্তে পরমপদ লাভ ক'রে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ সুখ অনুভব করছেন। বিশ্ব-ভারতের কল্যাণে সংস্কৃত ভাষা এবং তদাশ্রিত সংস্কৃতির প্রসারে আমরা যদি আজ সবাই মিলিতভাবে তাঁর প্রারব্ধ কর্মাবলীকে সমাপ্তির পথে নিয়ে যেতে পারি, তবেই তাঁর অমর আত্মার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি সার্থক হ'য়ে উঠবে। তাঁর মহনীয় কর্মাদর্শ ভবিষ্যৎ ভারতের পট-ভূমিকায় চিরকালের জন্যে সঞ্জীবিত থাকুক—"জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ" এই তো প্রার্থনা।

রসকলি

গুরুপ্রসাদ রায়

মহেশ্বর বাড়ী ফিরল, সন্ধ্যা তখন রাত্রির দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, বর্ষাকাল, বন বাদাড়ে ঝিল্লির অবোধ্য ঐক্যতান এতটুকু সজাগ করতে পারল না। মাথার ভেতর ছিল নেশার একটানা ঝিমঝিম প্রলাপ, উপোসী পাকস্থলীর বিশ্রী হাহাকার সে শুনছিল।

আগড় ঠেলে ঢুকলো মহেশ্বর। অস্পষ্ট প্রদীপের আলোয় তার আরক্ত চোখ দুটো বন্য হায়নার মতো জল্‌ছিল, কমলা এগিয়ে এসে বলে—কি এত রাত করলে যে বড়। চাঁপিটা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লো—কিছু এনেছ?

মহেশ্বরের মুখে একটা কথা নেই, ভাঙা পিঁড়েটা পেতে বসে পড়ে বলে—নে ভাত নিয়ে আয়। ভাত! কমলা স্বামীর রক্ত চক্ষুর দিকে চেয়ে থাকে। ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পারে সে। কমলার বহু কষ্টে সঞ্চিত দশটা পয়সা স্বামীর নেশার সেবায় উবে গেছে। হা ভগবান! কমলা ছেঁড়া কাঁথার এক কোণে বসে দীর্ঘশ্বাসটা চেপে নেয়।

মহেশ্বর খিঁচিয়ে ওঠে—কি হারামজাদির কানে কথাটি গেল না। ভাত নিয়ে আয় শিঘগির...পিটিয়ে ছাল খুলে নেব।

কমলা আর সামলাতে পারে না নিজেকে, ঝাঁঝিয়ে ওঠে—রাত দুপুরে মরদগিরী ফলাচ্ছেন, বলি মিন্‌সে, মুড়ী ভাজানির যে দশ দশটা পয়সা দিনু কোন গব্বে খুইয়ে এলে শুনি। আমার দুধের বাছা না খেয়ে ঘুমুলো, আর উনি তম্বি করে বলছেন, ভাত নিয়ে আয়, মরণ মরণ আরকি? মুয়ে আগুন!

—কাল যে বোসেদের ঠেঙে একপালি ধান নি'এনু-কি করলি শুনি? বল কার সাথে পিরীত করতে বেচেছিস, সেই ছোড়াটা বুঝি এয়েছিল। হারামজাদি বল শিগ্‌গির, নচ্ছার মাগী...।

—আহা ক্যানা ঢ্যাপা মিন্‌সে। তোমার ধান ঐ তো চক্ষের সামনে ভিজুনি আছে ইর মধ্যে চাল্লিশে ধরল।

—বলি ভিজুনি থাকলে কি পেট ভরবে? রোদে দিসনি কেন?

—আহা কথার ছিরি দেখনা—সুর্য্যি ঠাকুর যেন আমার বাবা। উঠ বল্‌লিই উঠ্‌বে, বলে আজ কদিন ধরে ভিজে পান্‌সি কাপড় পিঁদে কাটাচ্ছি, আর ওনার এক পালি ধান শুকুতে সুয্যি উঠ্‌বে—বলিহারি! রাত দুপুরে মিনসের ভিমরতি ধরেছে।

এর পরেও শেষ হয়না। আরো অনেকক্ষণ চলে। চাঁপা কাঁথার তলা থেকে বাপ মায়ের এই বিচিত্র দৈনন্দিন জীবন নাট্য দেখতে থাকে। বয়েস তার আট। অভিজ্ঞতায় আঠার। এর পরের অবস্থাটা চাঁপা বলে দিতে পারে। মা কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় লুটিয়ে পড়ে তাকে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরবে। অনেক গভীর রাতে বাবার গরম নিশ্বাস মার মুখে এসে পড়বে। এই সময়টা ভারী অস্বস্তি লাগে ওর। ছোট বুকটা কি এক অব্যক্ত আশংকায় টিপ্‌ টিপ্‌ করতে থাকে।

দাম্পত্য কলহের শেষ দৃশ্যে দেখা যায় কমলা লক্ষ্মীর পটের সামনে অক্লান্ত ভাবে মাথা কুটে চলেছে—ভাগ্যি ভাগ্যি, সব আমার এ পোড়া কপালের দোষ, নেশাখোর সোয়ামী, বৌপুতের ভাত যোগাতে পারে না, তা আবার কত রোখ, মা লক্ষ্মী গো তুলে নাও—কবে আমি সতীমার মতো এক চিতেয় যাবো...।

চাঁপার এ সবে আর তেমন বিস্ময় লাগে না। বরং মনে মনে একটু যেন হাসি পায়।

কিন্তু আজ মায়ের শেষ কথায় ও মুষড়ে পড়ে। সতীমার কথা মনে পড়লে সেদিনের ছবিটা ভেসে ওঠে।

মাসখানেক আগের কথা। পাঁচ-সাতটা গ্রামের লোক ভেঙে পড়েছিল 'বামুনগাছির' বিশালাক্ষী শ্মশান ঘাটে। কি সমারোহ, বাদ্যিবাজনা। মুখুজ্যে বাড়ীর ছোট তরফের বৌ, যেন দুর্গা প্রতিমা, মাথায় কপালে সিঁদুরের গাঢ় লেপ, লাল চওড়া পাড় তাঁতের কাপড়, পা দুটো আলতায় ডুবে গেছে, শান্ত দৃষ্টি, দেখলে শ্রদ্ধায় মাথা নুয়ে পড়ে।

কিন্তু চাঁপার সেদিন সমস্ত সমারোহ বাদ্যি বাজনাকে চাপা দিয়ে একটা কুটিল ভীতি গলা চেপে ধরেছিল। শুধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়া ফুড়ে মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা নেচে নেচে উঠছিল। বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারেনি, চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। চাঁপার শিশু অন্তর সেই ভীষণ দৃশ্যের কথা ভাবলে ঘুমের মধ্যেও চমকে ওঠে। সতীমার অদ্ভুত আচরণের ব্যাখ্যা সে আজোও তৈরী করতে পারেনি। এখনোও চোখ বুঝলে সে শুনতে পায় সেই প্রচণ্ড হট্টগোল—তূর্য্য নিনাদ, 'সতীমাকি জয়—সতীমার জয়!"

* * *

এ কাহিনীর আখ্যানবস্তু আজকের নয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা দেশ। শাস্ত্র আর কুসংস্কার শাণিত শস্ত্রের মতো সাধারণের জীবনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল। তখনও বেণ্টিঙ্ক সাহেব বাংলা মুলুকে আসেনি। সবে মাত্র রামমোহন দ্বারকানাথের নোতুন কথা একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছিল। কিন্তু পল্লীর ধূমাচ্ছন্ন চণ্ডীমণ্ডপের গুমোট ঠেলে প্রবেশ করতে পারেনি। ষষ্ঠী শেতলা জগাবুড়ী মাকাল চণ্ডী কালী—পাঁজী পুথি আর আটপৌরে নীতিবাক্য নিয়ে বাংলার পল্লীমা তখন ইহকালের জীবনকে পরকালের ফাঁসে ঝুলিয়ে কেঁদে মরছে। সে গ্রন্থীর প্রচণ্ড বন্ধনে কারও মুখ থেকে বের হতো না প্রতিবাদ। 'মনু' আর খনার বচন সোনার দামে বিকাতো; ভট্‌চায্যির টিকি থাকতো উর্দ্ধমুখী—স্বর্গের দেবতাদের কাছ থেকে নীতি ধর্ম শাস্ত্রের অমৃত বাণী গ্রহণ করবার জন্যই বুঝি সবার ওপর শিখিপুচ্ছ বিরাজ করতো, জমিদারের রক্তচক্ষু যে অধমকে বরাভয় দান করতো, রাতের অন্ধকারে জমিদারের লেঠেল সে অধমের সর্বস্ব ধূলিসাৎ করে দিলেও প্রতিবাদ করার কোন শক্তি ছিল না।

গাঁয়ের মহামান্য মাতব্বররা ব্যভিচারের পাঁকে ডুবে, ব্যভিচারের বিচার করতেন, তাঁদের রায় ছিল চূড়ান্ত, জীবন ছিল ধর্মের ফাঁকা উপদেশে কণ্টকিত। সাধারণে যথার্থ অর্থ বুঝতো না, তাই মেনে নিয়েও মানতে পারতো না। নারীর মর্য্যাদার কথা বলতে গিয়ে উদাহরণের অভাব ঘটতো না, তবু সমাজ আর ধর্মের দোহাই দিয়ে ৬০ বছরের বৃদ্ধ ৯ বছরের মেয়েকে ঘরে আনতো। এ বিষয়ে কুলীন ব্রাহ্মণরা একটু বেশী অগ্রণী ছিল। অনেকের জীবনী থেকে দু একশো শ্বশুর বাড়ীর সংবাদ অনায়াসেই মিলতো। নারীর নারীত্বের থেকে বড় ছিল সতীত্ব। আর সেই সতীত্বের চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হত জলন্ত চিতায়। স্ব-ইচ্ছায় যাও ভাল, তোমার জন্যে স্বর্গের পুষ্পক রথ তোমারই অসহায় ছেলেটাকে চাপা দিয়ে উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। তোমার আশা আকাঙ্ক্ষা ভালবাসা সমস্ত মায়া—সবার উর্দ্ধে স্বর্গের পুণ্য সুখ।

আর যদি না যাও, শক্তি আছে। ধর্মের দেশে ব্যভিচার হতে দিতে তো পারি না!' ধর্মের জয়নাদ, ধর্মরাজের কানে পৌছায় কিনা কেউ জানে না. যদি বা পৌছায় নিশ্চয়ই তিনি কানে আঙুল দিতেন। যদি মহামান্য ধর্মরাজ একবার কোন রকমে নীচের দিকে তাকাতেন, দেখতেন যে অভাগিনীকে এইমাত্র দাহ করা হল, তারই পাঁচ বছরের ছেলেটা ঘরের দাওয়ায় লুটোপুটি খাচ্ছে। হ্যাঁ, প্রচুর সমবেদনা ছিল বৈকি? পুরুত ঠাকুর ফর্দ করতে বসেছেন। শুধু 'সতী' হলেই চলে না ব্রাহ্মণ ভোজন আর দক্ষিণা না দিলে যে ৯০ ভাগ পুণ্যিই উবে যাবে। তাই অভাগিনীর আত্মীয়কে ছুটতে হত মহাজনের কাছে। সমারোহের কিছু বাদ যায় না। কেবল সেই দেখল না যার জন্যে এত কাণ্ড সে কোন পুণ্য সাগরে এখন হাবুডুবু খাচ্ছে।

"সতীদাহ"! ধর্মের নামে সমাজের চরম ব্যাভিচার নিষ্ঠুরতম জঘন্যতম নিয়ম। পরকালের অজ্ঞাত পুণ্যের মহত্ত্বের ছলাকলায় আশাদীপ্ত জীবনের সমাপ্তি। কল্পনায় সীতার আদর্শে বাস্তবের শত সীতার আত্মাহুতি, পরম লাভ পুণ্য—লোকসান এতটুকু নেই।

সত্যই কি স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়? স্বর্গ বলে কিছু আছে তো? সতীমা নিশ্চয়ই এখন

স্বর্গে স্বামীর সঙ্গে আছে। তবু কোথায় যেন একটু সন্দেহ! কমলা মনে মনে এর বেশী চিন্তা করতে পারে না। না,. আজন্ম সঞ্চিত সংস্কারকে ধুলায় নামালে যে পাপ হবে। কমলা আর ভাবে না, এসব ভাবনাও পাপ—অন্যায়। শুধু নিজের দুর্ভাগ্যের কথা আর একবার ভেবে লক্ষ্মীর পটে মাথা নোয়ায়।

* * *

কদিন পরে আজ রোদ উঠেছে। কমলা ঝাঁত্‌লার ওপর ধানগুলো বিছিয়ে দিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। না, আজ বোধহয় তাকাবে না। মুখপোড়া আকাশের কথা কিছুই বলা যায় না। ভাদরের শেষ, ঘন সবুজ ধানের ডগাগুলো জলের ওপর উঁকি দিচ্ছে। বেশ লাগে ভাদরের এই রোদ চকচকে সকাল। কমলার দৃষ্টি আলের দিকে পড়ে। উঁচু আলপথ দিয়ে হেঁটে আসছে সেই ছেলেটা। কপালে রসকলি, কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি, পরণে আটহাতি কাপড়, বয়েসটা ১৪।১৫, দেখে মনে হয় আরো বেশী।

বাপ মায়ের কথা জিগ্যেস করলে বলে—সে কি গো তুমিই তো আমার যশোদা মা-ঠাক্‌রুণ, গান ধরে রাখাল, খঞ্জনীর শব্দ ওঠে—

খেনে খেনে কান্দি লুটই রাই রথ আগে
খেনে খেনে হরি মুখ চাহ,
খেনে খেনে মনহি করত জানি ঐছন
নাহ সঞে জীবন যাহ।

ডাগর ডাগর চোখ তুলে চাঁপা এসে দাঁড়ায়। অবাক হয়ে রাখালের গান শোনে। এক একদিন দুজনে গল্প করে, রাখাল শোনায় অদ্ভুত সব কাহিনী, তেঁতুল গাছে ঠেস দিয়ে চাঁপা শোনে কেমন করে কোন মহান্ত বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসে শুধু গানের জোরে, পদাবলীর মহিমায়। কোনদিন রাখাল শোনায় জগাই মাধাইয়ের কথা, 'মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।' চাঁপা গোবা বিস্ময়ে স্তব্ধ। চোখের সামনে ফুটে ওঠে অনেক ছবি।

কচি আমড়া মুখে ফেলে বলে—তুমি এতো কোথায় শিখলে গা। রাখাল হাসে, তুই শিখবি, রসকলি কেটে দেব, দিনেরবেলায় গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষে করে বেড়াব, বেশ মজা হবে, থাকবি আমাদের আখড়ায়, চুল বেঁধে দেব মোহন চুড়া করে…কিচ্ছু ঝক্কি নাই…যাবি!

এতকথা শোনার বা বোঝবার দরকার নেই চাঁপার—সে হয়তো তখন খঞ্জনীটা কেড়ে নিয়ে বাজাতে আরম্ভ করেছে। রাখাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—না বাবু পারবনি এ বড় বেয়াড়া. এক দৌড়ে চলে যায় চাঁপা। রাখাল তখন আর একখানা ধরে…

খেনে মুখে তৃণ ধরি রাখল আগুসারি
আছাড়ি পড়য়ে নিজ অঙ্গে
খেনে পুন মুরছই খেনে পুন উঠই
ডুবল বিরহ তরঙ্গে।

ধীরে ধীরে রাখাল চলে যায়। কমলার বড় ভাল লাগে রাখালকে। সবুজ মাতৃত্ব যেন টনটন করে ওঠে। এমনি করে রাখাল আজ দুবছর আসে আর যায়।

বিছান ধানের ওপর এক ঝাঁক শালিক উড়ে বসে। কমলা তাদের তাড়িয়ে বাদলকে স্বাগত জানায়। কি গো কানু, এদ্দিন কোথা ছিলি?

—আর বলো ক্যানো, কদিনের তরে গেলুম চলে হরিদাসপুরের আখড়ায়। আহা নটহরি বাবা এ্যামনি মচ্ছপ করলো—প্রাণ জুড়িয়ে যায়। লাভপুর থেকে ত্রিশূলী মহান্ত এয়েছিল, আরো কত বড় বড় গায়েন—কি সব পদ! জানো ঠাক্‌রুণ, ত্রিশূলী বাবা বলে কি…।

আশে পাশে একটু দেখে নেয় রাখাল। এতবড় একটা কথা চাঁপার অসাক্ষাতে প্রকাশ করতে মন চায় না। কিন্তু চাঁপার ছায়া কোথাও নেই। নিরাশ হয়ে কমলাকেই বলে—

—ত্রিশূলী বাবা কইলেন কি আর বচ্ছরে আমি মূল গায়েন হতে পারবো। ঠাকুরের পায় ধুলি নিয়ে কইলুম—সেই আশীর্বাদ করো মোহান্ত বাবা…আর যায় কোথা, বুকে জড়িয়ে নিল।'

চাঁপা সত্যিই খুব ব্যস্ত। কঞ্চির ছিপটা একহাতে, অন্যহাতে কচু পাতায় মোড়া কি যেন ধরা, হয়তো চার অথবা চারা মাছ। খঞ্জনীর শব্দে চমক ভাঙে চাঁপার,—কখন এলে গো রাখালদা?

—এয়েছি তো অনেক আগে, তোর দেখাই মেলেনা যে—কি করছিস? রাখাল ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়, চাঁপা

পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর ভর দিয়ে একটা যুৎসই জায়গায় বড়শী ফেলে।—

—এই দেখনা, কিছুতেই গড়ুইয়ের বাচ্চাটা গিলতে চায়না। শুধু ফুটুর ফুটুর করে বেড়ায়। ঠিক তোমার মতো।

বাড়ন্ত গড়নে ওকে অনেকখানি বড় দেখায়। এই বয়েসেই চুলের ঝারি আষাঢ়ের মেঘের মতো কোমর পর্যন্ত নেমে গেছে। অদূরের দূরবিস্তৃত ধানের চারার মতো ওর চোখে নেমেছে গাঢ় শ্যামলিমা। ওর কটাক্ষে যেন আগত বসন্তের নিশ্চিৎ পূর্বাভাস, রাখাল হাসে—

—আমার মতো? আমি কি গড়ুই মাছ।

—তা নয়তো কি, আজ এগাঁ কাল উগাঁ, পরশু বারুই চণ্ডিপুর। একবার ইথানে ফুট কাটো, একবার উথানে ফুট কাটো-গড়ুই ছানার মতো, কো'া থিতু হলে নি!

—তা যা বলেছিস চাঁপি! বোষ্টমের এই তো রীতি। ভিক্ষে করে বেড়ালে কেউ কি থিতু হয়। নামগান আমাদের সওদা, এই বেচেই দিন কাটে। পথ আমাদের ঘর, সেই যে পদাবলীতে আছে মাধুকরী লইছি…।

চাঁপা বাধা দেয়, ক্ষ্যামা দে রাখালদা। খনজুনির বালে গড়ুই ছানা পালাবে। হ্যাঁগা ই-কথাটি কী হোল, মাধুকরী…ওটা আবার কী কথা?

—ভিক্ষে, ভিক্ষে করাকে মাধুকরী বলে—

একটুক্ষণ চুপচাপ। চাঁপা জয়ের আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। গড়ুই ছানা এবার ধরা পড়েছে।

চলতে চলতে রাখাল হঠাৎ বলে—হ্যাঁরে মাছ খেতে খুব ভালবাসিস, না?

—খুউব বাসি।

—তাহলে বোষ্টমী হতে পারলিনি!

—কেন?

—বোষ্টমদের মাছ খাওয়া নিষেধ।

—ধুৎ ই কি কথা। না বাপু বোষ্টমী হব নি। নাকে তিলক কেটে ই গাঁ উ গাঁ, মাধুকরী…ছি-ছি-ছি…

রাখাল মুষড়ে পড়ে। তবু গলায় জোর এনে বলে—তাকে বোষ্টমী হতেই হবে।

চাঁপা কেমনধারা চুপ হয়ে যায়। জীবনের এই গূঢ় দিকটার ইশারা ও যেন ভালভাবে বুঝতে পেরেছে। যেকালে বার বছরে মা হ'তে হতো, সেকালে ৯ বছরের চাঁপার পক্ষে জীবনের গভীর রহস্যটাকে জানা কী খুব অন্যায়!

রাখাল প্রসঙ্গ বদলায়।—জানিস ত্রিশূলী বাবা কি কয়েছেন?

—কি?…

—কয়েছেন আর বছরে আমি মূল গায়েন হতে পারব। ভারি মজা হবে চাঁপি। হরিদাসপুরের আখড়ায় দুজনে থাকবো, রোজ সকালে রসকলি কেটে দেবো, মাথায় বেঁধে দেব মোহন চূড়া মাধুকরী করতে বেরুবো ভিন্ গাঁয়ে, ভারি মজা হবে…।

রাখালের চোখে একরাশ স্বপ্ন টলমল করে। চাঁপা হাসে, সকালের চাঁপার মতো, হাসতে হাসতেই সে ছুটে চলে যায়। রাখালের হঠাৎ খেয়াল হ'ল অনেকটা বেলা হয়েছে।…আপনা আপনি গান বের হয়…

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর'
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

* * *

মহেশের বুকটা আজ আনন্দে ভরা, গামছার খুটে বাধা সের তিনেক চাল, কিছু আনাজ, আর হাতে দুটো বড় ঝুনো নারকেল। হাটুর ওপর কাপড়, খোলা বুক। কোমরের এক কোণে একখণ্ড সুতো দেখা যাচ্ছে। নারকেল দুটো সশব্দে দরজায় আছড়ে ফেলে হাঁক পাড়ে—কিগো কোথা গেলে? দাওয়ায় আগলে চাঁপা মাছ কুটছিল, কমলা গিয়েছিল বাসন মাজতে। চাঁপা আশ্চর্য হয়ে গেল বাবার দরাজ গলা শুনে। বাবার এমন গলা তো ক্বচিৎ দেখা যায়। কাজেই পরিচিত চিত্রের পরিবর্তন দেখে চাঁপা বাবার দিকে এগিয়ে এলো।

—এই চাঁপি, এগুলো তুলে রাখ—মা কোথা?

চাঁপা হাত ধুয়ে এসে জিনিস দেখতে বসে। কিছু কাঁচা আনাজ, আস্ত কপ, মশলা আরো কিছু টুকিটাকি।

—বাঃ ভারী সোন্দর গামছাটা, এটি আমি নেব[illegible]।

—জানিস এর দাম কতো? বারুইচণ্ডির গামছা যেসে গামছা নয় হ্যাঁ। গাঙ্গুলী গিন্নি কথা দিয়ে তোয়ের করে এনেছে। পেত্যেকখানার দাম চৌদ্দ পয়সা।

চাঁপা হাঁ করে বাবার কথা গেলে। কমলা ঘাট সেরে এসে কাছে দাঁড়াতে মহেশ্বর গম্ভীর স্বরে বলে—নাও তুলে রাখ, গাঙ্গুলী গিন্নির আজ ব্রেত (ব্রত) উদ্‌যাপনের দিন ছিল…

কমলা জিনিসগুলো ঘরে তোলে আর মহেশ্বর আক্ষেপের সুরে বলে—আর কি সেদিন আছে! লোকে সিদে বললে চমকে উঠ্‌তো। দুটো লোক বয়ে নিয়ে যেতে হিমসিম খেয়ে যাবে না? আর সে কী সামগ্রী, ন্যায় তেজপাতাটি পেরজন্ত—বামুনের বাড়ীর দুমাসের খোরাক! রাম রাম! সে বামুনও নেই আর দরাজ ভূস্বামীও নেই, এখন সব ব্যাপার ঠ্যেলা কোন রকমে সারা, ই আবার সিদে, ব্যাটা কিপ্টের জাসু, সুদের পয়সায় মাগের গয়না গড়াবে…কলি কলি—কলিকাল!

চাঁপার ছোট্ট মাথায় কিছুতেই এর অর্থ ঢুকলো না যে যার বাড়ী থেকে এতোগুলো চাল ডাল আনাজ বিনা পয়সায় এলো সেই দাতার প্রতি কেন এই কটূক্তি!

কমলা বলে—হ্যাঁগা গাঙ্গুলী গিন্নীর কি বেরতো ছিল…

—ওই যে কি বলে সাবিত্রী ব্রেত। মাগো সিদের কি ছিরি দেখনা…পয়সায় ছাতলা পড়ে যাচ্ছে তবু বামুন পুরুতদের নামে আঁৎকে ওঠে।—ওর নরক নির্ঘাৎ।

কমলা ভাবে গাঙ্গুলী গিন্নীর কথা; তার চেরা-চেরা জীবনের বিক্ষিপ্ত ঘটনা। সেই গাঙ্গুলী গিন্নী যে বছর দশেক আগে একমাত্র আলোচনার বিষয় ছিল।

গাঙ্গুলীমশাইয়ের বয়েসের সীমাটা অপরাহ্ণের একটা বিশেষ ধাপে থমকে দাঁড়ালেও সন্ধ্যায় বোধ হয় বিশেষ দেরী নেই। সেই সময়ে ঘরে আনলেন একজোড়া বৌ। তা একজোড়া কেন বিশ জোড়া বৌ পোষার অবস্থা তাঁর আছে। তেজারতি কারবারটা বর্ষার পুকুরের মতো ফেঁপে উঠেছে। রূপোর জোরে মল্লিকপুরের ষাদশী রূপসী মণি-মালা যখন গাঙ্গুলী বাড়ীর অন্দর মহলে প্রবেশ করলো, গাঁয়ের লোকের মুখ হাঁ হয়ে গিয়েছিল এবং তা বুজাতেও হয়েছিল। গাঙ্গুলী মশাইয়ের এক জায়গায় একটু ভুল হয়েছিল—চাঁদির জোরে মণিমালাকে কিনলেও কিনতে পারেন নি মণিমালার মনকে—তার ভালবাসাকে। সুন্দরী মণিমালা পঞ্চাশোর্দ্ধ গাঙ্গুলী মশাইকে সময় সময় 'দাদা-মশাই' বলতেও ইতস্ততঃ করতো না। বাপ-মায়ের আদুরে মেয়ে, যেমনি তেজী তেমনি মুখরা। সুতরাং গাঙ্গুলী মশাই তৃতীয়ার হৃদয়সাগরে প্রেমের তরঙ্গ তুলতে পারলেন না। তীরে দাঁড়িয়ে শুধু নিশ্বাস চেপে গেলেন। এমনি ভাবেই কেটে গেল কটা বছর। তারপর একদিন মণিমালার মা হবার সম্ভাবনার কথাটা অন্দর মহল ডিঙিয়ে বার মহলে ছড়িয়ে পড়লো। সবাই অবাক। সন্দেহ উঁকি দিল—

গাঙ্গুলীমশাই চমকালেন! তারপর একটুখানি ম্লেপ হাসি টেনে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

তার মাস চারেক পরের কথা, গাঙ্গুলীর প্রিয়দাসী সতু এক সন্ধ্যায় আমবাগানের ধারে কি যেন পুঁতে রেখে গেল। ভাগ্যক্রমে কজনার চোখেও পড়েছিল। কিন্তু তারা মুখ খুলতে পারেনি, গাঙ্গুলী তাদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন কখানা কাগজে। মরণাপন্ন মণিমালা বাপের বাড়ী গেল।

আজ সতুমাসী নেই, মরার কদিন আগে কমলাকে গল্পটা বলেছিল। গাঙ্গুলী মশাইয়ের ছোট ভাই লক্ষ্মী-নারায়ণ এই ব্যাপারের পর গাঁ ছেড়ে ছিল। আর গাঙ্গুলী মশাই দিয়েছিলেন উদ্ধত মণিমালাকে চরম শাস্তি!

মণিমালা ভুল করে ঝাঁঝাল পানীয়টুকু খেয়ে ফেলে-ছিল। শরীরটা কিছু বাদেই টলতে থাকে—ঢুলে পড়েছিল মণিমালা। অজস্র ক্লান্তির মধ্যে একবার ককিয়ে উঠেছিল শুধু। পেটের ওপর তখন ভারী দুখানা পা আলোড়িত হয়ে উঠেছিল…কি এক অসহ্য যন্ত্রণা…ব্যাথায় চীৎকার করে উঠ্‌তে গিয়ে কেমন বিবশ হয়ে গিয়েছিল…

আজ সেই মণিমালা স্বামীর কল্যাণের জন্যে সাবিত্রী-ব্রত উদ্‌যাপন করলো! জগতের কী বিচিত্র নিয়ম!

—কি হে মহেশ আছ নাকি? কমলা ধড়মড়িয়ে ওঠে। সিদ্ধান্তবাগীশের গলা। এই লোকটা সম্পর্কে অনেক কথা রটেছে। তবে এর চরিত্রে একটা নির্ভুল সত্য আছে। সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই যা কিছু করার সিদ্ধান্ত করেন—তা স্থির, ধ্রুব। চাঁপা যখন নোতুন গামছাটা নিয়ে বাইরে এলো এঁর বুদ্ধি তখন একটা চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। চাঁপার সবল গতির পিছনে সিদ্ধান্তের চক্ষুমন ছুটে চলল।

—কি দেখছেন গো কাকামশাই…ও হো ও আমাদের চাপি!

নিজেকে সংযত করে বাগীশমশাই দেঁতো হাসি হেঁসে বলেন—হেঁ হেঁ তাইতো বলি চাপি না হলে হবে কে?… তা ইদিকে কি করছ, গড়ন দেখে তো মনে হয় এগারোয় পড়লো…বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে…হেঁ হেঁ…

—কি যে বলেন কাকামশাই, চাপি তো সবে আট পের হল, তবে হ্যাঁ বাড়ন্ত গড়নে বার তের তো ত্থাথায়।… হ্যাঁ, কি জন্যে এয়েছেন…।

—আর বলোনা আমার হল গিয়ে শাঁকের করাত। গেলেও কাটে আসলেও কাটে। ইপক্ষ রাখি তো উ পক্ষ যায়, আবার উপক্ষ রাখি তো এ পক্ষ যায়। প্রেথম (প্রথম) পক্ষের উনি হঠাৎ আবদার ধরলো—দুঃস্বপ্ন দেখিছি শেতলার কাছে পাঁটা বলি দিতে হবে, গেল থাম্‌কা কটা টাকা। আজ দ্বিতীয় পক্ষ ধরেছে বিশালাক্ষী ব্রেত করবে।…

—এতো আহ্লাদের কথা গো কাকামশাই। অমন পরিবার কজনে পায়। সোয়ামীর কল্যাণের জন্যে বার ব্রেত, উপোসতিরেস, পুজো-আচ্ছা—এ তো সতীধর্ম। আমাদের শাস্ত্রে আছে।…

—তা যা কয়েছ মহেশ। এমন পরিবার কজনে পায়, একালে যা সব দেখছি…মাগো বলিহারী বলিহারী নন্দ-গিন্নীর কাণ্ডটা শুনেছ? ছিঃ ছিঃ এই বুড়ো বয়েসে…

বাগীশ মশাই চুপি চুপি নন্দ ঘোষালের হেঁসেলের খবর মহেশের কানে ঢেলে দিল। এ কাজটা তিনি নিজের কর্তব্য বলেই ধরে নিয়েছেন, খবর আদান প্রদান করা তিলকে তালে পরিণত করার বুদ্ধিটা এঁনার বিশেষ আয়ত্বাধীন।

যাবার আগে বলেন—ভাখ মহেশ, একটা কথা আছে, আমার কথা ছেড়ে দাও, আজ বাদে কাল গঙ্গায় যাবো। দুঃখ রয়ে গেল ছেলেটাকে সংসারী করতে পারলুম নি। তাই বলি কি…তোমার চাঁপি তো আর নেহাৎ ছোট নয় যদি,…আহা তোমাকে এক্ষুণি কথা দিতে কইছি না… ভাখ ভেবে যদি…।

মহেশ্বর চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঘর থেকে কমলাও কথাটা শুনেছে! বাগীশ মশাইয়ের পুত্ররত্ন শ্রীমান হাবুল-চন্দ্রের খুব সুনাম আছে। এখন হয়তো সে বাউরী পাড়ায় একটা বিশেষ বাড়ীতে তাড়ি খেয়ে আড্ডা দিচ্ছে।

চাঁপার অনাগত কুৎসীৎ ভবিষ্যতের কল্পনায় কমলা শিউরে ওঠে। লক্ষ্মীর পটে কমলা প্রণাম করে, মহেশ বেরিয়ে গেল বাগীশ গিন্নীকে ব্রত কথা শোনাতে।

* * *

কাল সুধা পিয়া তাপিত ই হিয়া
না পুরিল অভিলাষ,
তেজি আসি ফিরি ছল করি হরি
পরি-আ কলঙ্কী ফাঁস।
আমি আমি গো বঁধুয়া……

কমলার উঠানে এসে শেষ করল রাখাল। চাঁপা দাওয়ার এক কোণে ঠেস্ দিয়ে বসে হাসছে। কমলা ঘর থেকে বলে—কি গো থামলি কেন কানু, আর একখানি গা…

চাঁপা ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল—ই আবার গাওন—ম্যাগো ছ্যা…খঞ্জনীতে গিটকিরি তুলে রাখাল ধরলো নূতন পদ—

মধু বোলী পাখী শ্যাম দিলা ফাঁকি
ছিকল ছিঁড়িয়া সই
ধৈরয যাতনা আর গো সহেনা
কত যুগ কহ রই।
বিশথা ললিতে পার-ই বলিতে
(কোথা) মথুরা নিঠুরা পুরী
তিতিয়া তিতিয়া বিরহ আসারে
পিরীতি অনলে পুড়ি…

গান থামলেও রেশ কাটে না। চাঁপার চোখে প্রশংসা। রাখাল দাওয়ার ওপর জাঁকিয়ে বসে।

—হ্যাগা রাখালদা ই পদ তো কুনদিন গাউনি…

রাখাল হাসে—ই পদ আমার নিজের বাঁধা…

—ইস্…তোমার বাঁধা, পদাবলী লিখা যে সে কথা নয়…

—সত্যি চাঁপি ই আমার নিজের। আরো অনেক বেঁধেছি—শুনবি…

উ কালা কালিয়া গেলা যে চলিয়া
বাঁকার পিরীতি লভি'
বিজনে বিপিনে সি কানু বিহনে
কাঁদে গো ধবলী গাভী

যমুনে সলিলে কালো মেঘ দলে
কালো রূপ হেরি তারা
রাখালে স্মরিয়া নাচে ধিয়া ধিয়া
বিভুল পাগল পারা।
মুঁহ হতে তৃণ পড়ি যায়
লাঙুল উপরি চলে ধীরি ধীরি
গোপালে হেরীতে পিছ চায়।

চাঁপা মুগ্ধ হয়ে গেল, তবু বিশ্বাস হয়না এটা রাখালদার বাঁধা।

—সত্যি তোমার বানানো···

—হ্যাঁরে, মিথ্যে কয়ে কি লাভ। চাঁপি আমার ওপর তোর একটু প্রেত্যয় নেই, কই সিদিনের কথার জবাব দিলিনি তো—

ধৈরয যাতনা আর গো সহেনা
কত যুগ কহ রই।

রাখালের চোখে আবেশ। চাঁপা নিরুত্তর।

—কি চাঁপি কথা ক', কথা দে তোর জন্যে···

চাঁপার চোখে ভয়। ব্যাকুল ভাবে চার পাশ তাকায়। বুকের ভেতর হাতুড়ীর শব্দ ওঠে।

রাখালের হাতটা সরাতে গিয়েও ইতস্ততঃ করে···

—ছিঃ রাখালদা, মা ঘরে আছে···আমার বড় ভয় কচ্ছে। গাঁ-দেশ বুঝতো রাখালদা, কে কোথা ঠেঙে দেখে ফেললে মুখ দেখাতে পারবনি ··আজ যাও।

রাখাল তবু ছাড়ে না,— আমায় কথা দে ··

—কোন্ কথা?

—বোষ্টমী হবি, তোর জন্যে আমি আখড়া বানাবো···

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ওঘর থেকে কমলা ডাকে—কি গো কাহু বের হলি নাকি?

—এই যে মা ঠাকরুণ—চাঁপির সনে কথা কইছি। রাখাল উঠে দাঁড়ায়।

চাঁপা অনাবশ্যকভাবে রাখালের পিছু পিছু অনেকদূর এগিয়ে গেল। বিলের পাড়ে আমড়া-তলায় দুজনে দাঁড়াল কিছুক্ষণ। রাখাল খঞ্জনীতে বোল তুলে বলে—

—চলি গো সই, শনিবারে আসব।

মহেশ্বর ব্রতকথা শুনিয়ে ফিরছিল সেই সময়। সিংগীদের বাগান আড়াল ছিল বলে এতক্ষণ দুজনে দেখ[illegible] পায়নি, হঠাৎ মহেশ্বরকে সামনে দেখে রাখাল মুখ[illegible] পড়লো।

রাখাল চেনে চাঁপার বদমেজাজি বাবাকে। তা[illegible] ওপর যে মহেশের বদ সন্দেহ আছে—রাখাল তা বোঝে।

—এ্যাঁ। ইখানে তোরা কি করছিস। এ ভরদুপু[র] প্রহর—ফাজিল ছোঁড়া কোথাকার—তিলক কেটে মে[য়ে] ফুসলাতে এয়েছ—বেরো। বোষ্টমগিরী একবা[রে] জাহান্নামে পাঠাব। ব্যাটা কেষ্টের অনুচর···

রাখাল একরকম ছুটেই পালাল। মহেশের রা[গ] মেয়ের ওপর পড়ে—ধেড়ে ধিঙ্গি মেয়ে, ই ভর দুপুরে পা[ড়া] বেড়াতি বেরনো, পরপুরুষের সাথে ঢলানি, কুলে কা[লি] দিবি যে···মরনা·· মরনা।

হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে কমলার সামনে দা[ঁড়] করাল।···

—নাও এখন সামলাও। ভরদুপুরে বোষ্টমের সা[থে] পিরিত করতে গেছল, আমি পইপই করে কয়েছিনু [illegible] ছোঁড়াকে বাকুল মাড়তে দিও না! নাও এখন [illegible] ধরো···কোন দিন কুলে কালি দেবে। ও ঢলানি [illegible] চোখে পড়লে আর বিয়ে খা হবে? একঘরে করে রা[illegible] বুঝলি!

কমলা ব্যাপারটা সমস্ত না বুঝলেও গুরুত্ব দেয় ন[া]। স্বামীর এ শাসানী তো আজ নোতুন নয়! কেব[ল] একটা জিনিস আজ কমলার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠলো—চাঁপা সত্যিই বেয়াড়া রকম বড় হয়ে উঠেছে। কম[লা] অনেকক্ষণ মেয়ের দিকে চেয়ে রইল। তারপর বাংলা[র] দেশের মা-বাবাদের যা চিন্তা হয় সেইটাই গভীরতা ধার[ণ] করল—নাঃ এইবার একটা পাত্র দেখতে হয়। সময় অনেক, ঘর খরচ আর অন্তত দেড় কুঁড়ি টাকা পণ আগরতলির জমিটা যতদিন আছে সে ভাবনা নেই কিন্তু ভাবনা হচ্ছে সৎ পাত্রের সন্ধান পাওয়া!

মহেশ্বরও হুঁকাতে টান দিতে দিতে ভাবছি[ল] বাগীশ মহাশয়ের কথা। একমাত্র ছেলে হাবুলচন্দ্র। দু[টো] গুড়ের দোকান। তিলের একটা ব্যবসা আছে। জ[মি] জমা নেহাৎ কম নয়। ছেলেও কুৎসিত নয়—জোয়া[ন] ছেলে। দোষের মধ্যে একটু বাউরী পাড়ায় ঘনঘ[ন]

যাতায়াত করে। তা তো একটু করবেই। যৌবনে ও-রোগ সবারই থাকে, কথায় বলে চাঁদেরও কলঙ্ক আছে…

মহেশ্বর মনে মনে একটা হিসাব নিকাশ সেরে নেয়। কমলা কাছে আসতেই বলল—এবার চাঁপির তো একটা বিয়ের ঠিক করতে হয়, কি বল কমলমণি। মহেশ্বরের আদরের ডাক, অবশ্য চাঁপার কান বাঁচিয়ে।

—তা তো বটে! চেষ্টা চরিত্তির করে ছাখ ভাল পাত্তর যদি মেলে—

—হা হা…চেষ্টা করবো কি গো! পাত্তর তো হাতের নাগালে, কথা দিলেই—

কমলা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। এত বড় সুসংবাদের সে এতটুকু জানে না! কৌতূহলী কমলা বলে—কোথা ঠিক করলে গো! বাব্বা, তুমি এত্তো চাপা!

নাক মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে মহেশ্বর উত্তর দেয়—এ কি তোমার মত মেয়েছেলে, আমি মরদবাচ্চা… চাঁপির সম্বন্ধ আপনি পায়ে হেঁটে ঘরে এয়েছ… হা-হা।

—সত্যি কও কোথা ঠিক করলে?

—কেন সকালে বাগীশ মশাইয়ের কথা শোননি, হাবুলের সনে…

কমলা নিমিষে জল হয়ে গেল। উঠে যেতে যেতে বলল—মরণ! মরণ আর কি—এ বয়েসে ভীমরতি ধরলো, বিয়ে দেবার আগে গলায় ফাঁস দিয়ে দিও, মা হয়ে কইছি তাতে চাঁপি আমার সুখী হবে।

মহেশ্বর এক কথায় বিচলিত হবার পাত্র নয়। বিয়ের হিসাবে ব্যস্ত রইল।

আর এদিকে যার বিয়ের জন্যে বাবা মায়ের ঠাণ্ডা লড়াই হয়ে গেল সে তখন সিংগীদের বাগানে কাঁচা পেয়ারা চিবাতে ব্যস্ত। সিংগীদের বৌ বলে—কি দজ্জাল মেয়েরে বাবা! তাড়া খেয়েও পাড়া জ্বালানির চোখ ট্যারানি যায় না।

* * *

সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই আবার এলেন। কমলার মন গললো না। আর আশ্চর্য—মহেশ্বর চাঁপার বিয়ের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে, মুখে রা নেই।

শ্রীমান্ হাবুল সামনের রাস্তায় দিনে কয়েকবার করে আসাযাওয়া সুরু করে দিল। কমলার নজর এড়ালো না। চাঁপা যে তার লক্ষ্য বস্তু, তা অতি বড় বোকারও চোখও ভুল ক'রবে না। কমলা প্রমাদ গুণলো।

আজ একেবারে উঠানে এসে হাজির হল শ্রীমান্। কদ্দিন আর দূর থেকে তৃষ্ণা মেটান যায়। সিদ্ধান্তের ছেলে চক্রান্তের ষোলকলা পূর্ণ করেই এসেছে। হাতে একটা মাটির তিজেল।

—ও কাকিমা কি করছ?

—কে গা? ও তুমি, কি মনে করে…

হাবুল পান খাওয়া দাঁত বের করে বলল—মা পাঠালো, কি আর করি নি' এলুম মাটির তিজেলটা রাখল।

কমলাকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাবুল বললো—তা একেবারে সরেস মাল, কাঁথি থেকে এক নাগরী সরেস এ্যাকো এনেছিলুম, বাবা কইলে—দি' আয় মহেশ কাকাকে কিছু। নাও তুলে রাখ।

কমলা সব বুঝেও গুড়ের তিজেলটা ফেলে রাখতে পারলো না। কমলা চলে যেতে হাবুলের দৃষ্টি চারধার ছুটে বেড়ায়। ঝপরীর ফাঁক দিয়ে একজোড়া ডাগর চোখ তাকে যে অনুসরণ করছে তা জানতে পারলো না। সে চোখে বিস্ময়ের সঙ্গে চাপা জিজ্ঞাসা উগ্র হয়ে উঠেছে। সেই বহুশ্রুত বর্বরটাকে বোধ হয় ভাল করে দেখে নিচ্ছে।

কাঁচা মুখের সন্ধান করে হাবুল নিরাশ হল। কোন সুযোগ পেলনা।

—ও কাকিমা, বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। ভেবেছিল এই-বার চাঁপা আসবে জল নিয়ে। কমলার হাত থেকে নিরাশ-ভাবে জল নিয়ে হাবুল বলল—বাড়ীতে আর কেউ নাই নাকি? বড় চুপচাপ যে?

কমলার বুঝতে দেরী হ'লনা কি বলতে চাইছে হাবুল। ঘুরিয়ে উত্তর দিল কমলা—থাকবার মধ্যে আর কে—চাঁপি! ভেতরে কুট্‌নো কুট্‌ছে। তা আজতো তোমার কাজ নি।

—উ তা বলতে? এক্ষুনি হরিদাসপুরে যেতে হবে… ব্যস্ত ভাবে হাবুল পথে নামে।

মহেশ্বর সব শুনলো. কিছু বলল না। কমলা বুঝল, কথা অনেক দূর গড়িয়েছে। এর পর থেকে সময়ে অসময়ে

কিছু না কিছু সংসারে আসতে লাগল। আগে থেকে 'দাদন' দিচ্ছে বোধ হয়। চাঁপার কানেও কথাটা গেল।

* * *

শনিবার সারা সকাল আনমনা হয়ে কাটাল চাঁপা, সকাল দুপুর সন্ধ্যা গেল—আবার সকাল এলো শুধু এলোনা রাখাল, বাজল না খঞ্জনীর বোল—রাখালের বাঁধা গানের মতো—

লাখো বরষ ধরিয়া বঁধুয়া লাগিয়া কত না জাগিব নিশি
ঋতুতে ঋতুতে ব্যথুর হৃদিতে কাটে কাল আশীবিষি॥

চাঁপার সবুজ মন অবুজ ব্যথায় ভরে গেল। বাঞ্ছিত তরে একাগ্র আগ্রহ কেন এমন উন্মুখ চঞ্চল করে তোলে! তবে এই কি পিরীতি! কি জানি কি এটা, শুধু চাঁপার ভাবনা রাখালকে ঘিরেই চক্রাকারে আবর্তিত হয়।

ভাদ্র গেল, আশ্বিনের মাঝামাঝি একদিন রাখালের কণ্ঠ শোনা গেল। চাঁপা ছুটে এলো না, আমড়া গাছে ঠেস্ দিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল।

রাখাল বলে গেল একটানা অজস্র কথা। ত্রিশূলী মহান্ত তাকে ডেকেছিল লাভপুরে গান গাইতে যাবার জন্যে। জমিদার বাড়ীতে বিরাট মচ্ছব। পঞ্চাশখানা দল এসেছিল। সে এক এলাহি ব্যাপার। যেমন যত্নআত্তি তেমনি গান। আহা প্রাণ জুড়িয়ে যায় যখন শ্রীরামপুরের গোপাল দাস প্রভাস মিলন ধরল। "মানভঞ্জন" পালা দিননাথের মতো কে গাইতে পারে?…

রাখালের হঠাৎ খেয়াল হল চাঁপার কানে কথা যাচ্ছে না। রাখাল মান ভাঙাতে বসল, বহু সাধ্য সাধনা, চাঁপার মুখে রা নেই।

—এই চাঁপি কথা ক, নইলে আবার চলে যাবো।

—রাখালদা তুমি বড্ড · এদ্দিন পরে…

রাখাল হাসে—মনে আছে গো সই মনে আছে, তোকে কি ভুলা যায়। জানিস্ সভাতে আমিও একটুখান পদ গেয়ে দিয়েছি।

এতক্ষণে চাঁপা স্বাভাবিক হয়—তাই নাকি? কি গাইলে গো। মোহান্তরা কিছু কইল না?

—কইবে না? বলিস কি? তাজ্জব করে দেছি সব্বাইকে—

—জ্ঞানিগণ জানে, শাস্ত্র কথনে, দুয়া দুয়া হয় চারি
প্রেমিক সুজনে, পিরীতি গণনে গরমিল হয় ভারি
রসের সায়রে রসিক ডুবিয়া রতন খুঁজিছে দেখ,
গণিত বুদ্ধি তল নাহি পায়—দোঁহে দোঁহে হয় এক।

চাঁপা ডাগর চোখে রাখালের দিকে তাকিয়ে থাকে, একটু পরে চাঁপা ফিস্‌ফিসিয়ে বলল—জান রাখালদা আমার বিয়ে—

—তাই নাকি? কোথা? কার সাথে? কবে?

—চাঁপার লজ্জা আসে বলতে। মুখে বিষাদের ছায়া ঘনায়—

—উপাড়ার বাগীশমশাইয়ের ছেলে—

—হাবুল! রাখাল আনমনা হয়ে পড়লো, গুণগুণিয়ে গান ধরে—মনের উত্তাল চিন্তাকে বুঝি এমনি ভাবে চাপা দিতে চায়। আবার নিজের কাছেই বড় বেসুরো ঠেকল সে সুর

—আজ আসি গো সই।

—ফির কবে আসছ?

রাখাল ক হাত এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিল—জানিনি।

রাখাল ক্রমে ক্রমে দূরে চলে যাচ্ছে, সিংগীদের পুকুর, আগরতলির ক্ষেত, বিলের পাশ ফেলে সিংগীদের বড়-বাগানের বাঁকে রাখালের ছবিটা অন্তর্হিত হল।

চাঁপার দৃষ্টি ফিরে আসে, পিছনে তাকাতেই চমকে উঠল চাঁপা, ভূত দেখে বুঝি অমন কেউ চমকায় না। জ্যান্ত ভূত হাসে।

—কি গো চাঁপামণি! ইখানে কি করছিস, বা সোন্দর দেখাচ্ছে তোকে। বিশ্রীভাবে এগিয়ে আসে হাবুল, চাঁপা একটুও কাঁপল না। এক ঝটকায় হাত ছিনিয়ে দৌড় দিল। হাবুল তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল।

না,মেয়েটার দেখছি তেজ আছে। দেখা যাবে আগামী অঘ্রাণে এই তেজের কতটুকু থাকে, হাবুল আবার হাসে।

কমলার চোখে ঘুম নেই। সর্বক্ষণ একটা গুমোট অস্বস্তি তার কণ্ঠরোধ করে রেখেছে। চাঁপার পেলব দেহটা বুকের মধ্যে ঘন করে নিয়ে মার চোখে নামে অগাধ স্বপ্ন, অফুরান্ত চিন্তা, ভাষাহীন অনুচ্চারিত অব্যক্ত কাঁপন! এই সোনার প্রতিমাকে কেমন করে বর্বরের সামনে বলি দেবে!

যুক্তির সমস্ত অস্ত্র শেষ হয়ে গেল এক একে। শেষে কমলা কাঁদল। নারীর আদি অকৃত্রিম অস্ত্র। সেখানেও ব্যর্থতা। চোখের জলের বাঁধ মহেশ্বরের দুর্বার ইচ্ছার স্রোতকে আটকাতে পারল না।

সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে মহেশ্বর নিজের কথাই বজায় রাখল। বিয়ের নোতুন কাপড়, শাঁখা, চেলি, কড়ির মালা সব একে একে এলো। চাঁপা দেখল সমস্ত—একটা চাপা চঞ্চলতা মনের কোণে ঢেউ তুললো বৈকি? নোতুন জীবনটা কেমন হবে? খেলা-ঘরের খেলা ছেড়ে জীবন-খেলায় এমনি কি আনন্দ থাকবে?

তবু অনিবার্য্য কারণে অঘ্রাণে বিয়ে হল না। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ছাড়া শুভদিন নেই, অতএব···। কমলার মনে খুশীর হাওয়া লাগল।

এর মধ্যে একদিন রাখাল এলো। কমলা মনের কথা বলে রাখালকে— বলি কানু, তুই তো ই-গাঁ উ-গাঁ করে বেড়াস, একটা জানা শোনা সৎ পাত্তর দেখনা বাবা। আমার চাঁপিকে তো দেখিস, দশখানি গাঁয়ের মধ্যে এ্যামনি রূপ নেই। যদি খোঁজ পাস তো খবর দিস্ কানু।··· দেখিস,কাক-পক্ষী যেন টেরটি না পায়,কথা দে তুই,দেখবি।

রাখালের বুকটা হঠাৎ বড্ড বেশী ভারী হয়ে গেল। কেন এমন হয়? অনেক কষ্টে বলল—আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব। রাখাল পথে নামে।

রাস্তার বাঁকে চাপা দাঁড়িয়ে আছে, কোমরে আঁচল বাঁধা। কপালে স্বেদ বিন্দু। ছোট্ট বাছুরটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। রাখাল মুগ্ধ হয়। ভাবে এগিয়ে গিয়ে কথা বলে, কিন্তু দূর থেকে কি কম ভাল লাগে—

বিদ্যাপতি ধরে—

জনম অবধি হাম রূপ নিহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনল
শ্রুতিপথে পরশ না গেল,
কত মধু যামিনী··· ··

রাখালের গলা ধীরে মিলিয়ে যায়। চাঁপা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেন? সে কি জানে, হয়তো জানে—হয়তো জানে না।

* * *

এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব ঘটে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর নব মত, তাঁর প্রতিভা মনীষার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রচারপত্রের মাধ্যমে তিনি হিন্দু সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করতে আরম্ভ করলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাংলার প্রতি স্তরে তিনি জ্ঞানের আলোকে যুক্তির আলোকে উদ্ভাসিত করতে চাইলেন। তাঁর নোতুন কথা শহরের সীমানা ছাড়িয়ে গাঁ অঞ্চলেও পৌছাতেও দেরী হয়নি। হয়তো সর্বত্র যায়নি, অনেকেই তাঁর মতকে অসার বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, তবু সমাজের বিশেষ কয়েকটা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ সমাজের বড় কর্তাদের যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছিল।

সতীদাহনিবারণ, অস্পৃশ্যতাবর্জন, কুশিক্ষা দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তখন এক চাপা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল।

নোতুন কথা নোতুন সুরে বাজল। ধর্মভীরু সমাজের ভিত্তিমূলে কিসের যেন সাড়া জাগে। চণ্ডিমণ্ডপে সমাজপতিদের সভা হয়ে গেল।

—শুনছ হে তর্কালঙ্কার, রামকান্তের ব্যাটা একটা ব্রেহ্মজ্ঞানি, কবছর বিলেতে গিয়ে নাকি অখাদ্য সব খেয়ে এসেছে, রাম রাম কোলকেতার পালিশী বাবু সব কথায় ভড়ং।

—তা আর কইতে, ঐ কেষ্টকে ছোঁড়া। বলে কিনা সতীদাহ দূর কর, সব মানুষ সমান সবাইকে কোল দাও। এ্যাঃ, দুপাতা ইংরেজী পড়ে দিগ্‌গজ হয়ে পড়েছে! ছোটলোককে লাই দিয়ে মাথায় তুললে, সমাজ থাকবে, ধর্ম থাকবে? আরে বাবু বর্ণ শ্রম আমরা তৈরী করেছি? সমস্ত মুনিরা মানে দেবতাদের সৃষ্টি।

—আমরা মাত্র তাদের অনুসরণ করছি। তাঁদের লেখা বেদবাক্য, সমাজকে বাঁচাতে গিয়ে তো অধর্ম করতে পারিনা, আর দেখ ঐ সব শহুরে ছোঁড়াগুলোকে গাঁয়ে ঢুকতে দিওনা, হিন্দু শাস্ত্র কি যে সে জিনিস, কটা লোক বুঝতে পারে?

হাঁ সত্যই হিন্দু শাস্ত্র বড় শক্ত জিনিস। আর শক্ত জিনিষের পাল্লায় পড়ে নিচের দিকটা ক্রমে ক্ষয়ে চলেছে। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন সেই ক্ষয়ে যাওয়া জীবগুলো হঠাৎ

মাথানাড়া দিয়ে ওঠে তখন একটা বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। বাউড়ী পাড়ায় কেমন একটা থমথমে হাওয়া।

ঐ সব ছোট লোকগুলোর হঠাৎ যে কি হল কে জানে, আজ তারা প্রতিবাদ করতে উঠেছে। বিপিন মোড়ল বুক ফুলিয়ে জমিদারের সামনে দাঁড়াল।

আজ আর ওর কোমর নুয়ে পড়েনি, প্রশান্ত বুক আরও একটু যেন প্রশান্ত ঠেকল। জমিদার আশ্চর্য হয়। একটু যেন খাপছাড়া লাগে—

—কি রে তোরা আবার শিমুলতলির বিলে মাছ ধরেছিস—বল সত্যি কিনা?

বাউরী পাড়ার মধ্যে এই শিমুলতলির বিল। বছরের কয়েকমাস এর ওপরেই এদের অনেকটা নির্ভর করতে হয়। কয়েক পুরুষ আগে থেকে এই বিলটার ওপর ওদের অধিকার চলে আসছে। ওরা যত মাছ ধরে—তার তিন ভাগের এক ভাগ জমিদারের পাওনা, তা ছাড়া আমলা পেয়াদারা যা পায় সেটা ফাউ।

একমাস আগে জমিদারের আদেশ হয়েছে—মাছ ধরতে পাবে না। বাউরীদের বিল জমা নেবার অর্থ নেই, কাজেই এতদিন চুপ করে ছিল। কিন্তু গত কাল আর তারা নিজেদের আটকাতে পারল না।

বিপিন হাতজোড় করে বলল—হাঁা রাজাবাবু, মোরা মাছ ধরিছি।

—বলি তোদের বাবারকেলে বিল নাকি? শুয়ার ছোটলোক জানোয়ার, কার হুকুমে ধরেছিস? পঁচিশ টাকা জরিমানা কবুল কর—এক্ষুণি!

মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বিপিন জানালো—পঁচিশ পৈসে দিতে লারব রাজাবাবু, আপুনি প্রেজাদের মা বাপ, কন, পোলাপানরা যখন বিলে লাগে, ক্যামনে বাধা দি, মাপ করেন বাবু, বিল না বইলি তিন মাস লা খেয়ে মরব।

—তোরা মরবি কি বাঁচবি আমার তাতে কি? পঁচিশটাকা খেশারৎ নিয়ে আয়···

কঠিন ভাবে বিপিন দাঁড়িয়ে রইল—মুখে একটা [illegible] —মাপ করি দেন।

—বেশ মাপ করতে পারি কিন্তু এক সর্ত্তে, ফিরে পারবি তো এক মাস 'বেগার' দিতে। বল রাজি আছিস?

বিপিন চলে গেল। বলাবাহুল্য সেই সময়ে সমাজ-পতিরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। জমিদারের ন্যায় বিচার সমর্থিত হল। একমাস বেগার অর্থাৎ ছোটলোক-গুলো উপোস করে মারবে।

দুদিন বেগার দিতে বাউরীদের জোয়ান মরদগুলো এলো, জমিদার খুশী, তার থেকে খুসি সাঙ্গপাঙ্গরা। কিন্তু সবাই অবাক হল তৃতীয় দিনে। কারু দেখা নেই। পাইক ছুটলো খবর নিতে ছোট লোক গুলোর হল কি?

পাইক ফিরে এলো। সবাই বেরিয়ে গেছে মজুরী খাটতে। জমিদারের মুখ শক্ত হয়ে গেল। পরের দিন দুজন সেপাই বিপিনকে ধরে আনল। ওর ইঙ্গিতেই বাউরী পাড়া ওঠে বসে, সুতরাং ওকেই কিছু উত্তমমধ্যম দেওয়া যাক—সব ব্যাটা চুপ হয়ে যাবে।

সকালে যে বিপিনকে লোকে জমিদার বাড়ীতে ঢুকতে দেখেছিল, দুপুরে সেই বিপিনকে আর চেনাই যায় না। কালো শরীরটার সর্বত্র রক্ত জমে গিয়ে আরো কালো হয়ে উঠেছে। কপালের একপাশে রক্তের রেখা তখনো শুকায়নি।

বাউরী পাড়ায় যাবার সোজা পথ চাঁপাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে। বিপিন যাবার পথে ক্লান্ত হয়ে মহেশ্বরের উঠানে বসে পড়লো। চাঁপার গলায় কাতর বিস্ময় ফুটে উঠল—বিপিনকা···একি হাল হইছে···

চাঁপার ছোট্ট মন বিপিনের নির্ম্মম অবস্থার জন্যে কেঁদে ওঠে। বিপিনকে চেনে না কে? সাতখানা গাঁয়ে তার নাম ছড়ানো, বিপিনকাকাকে যেন আজ চেনাই যায় না! সেই ছোট্ট বেলা থেকে চাঁপা চেনে। ওই তো আগরতলির লক্লকে ধানের ক্ষেতটা বিপিনকাকার নিজের হাতে করা।

—চাঁপি মা···এটটু জল। বিপিনের গলা শুকনো।

ঘটিভরা জল এগিয়ে দিলে চাঁপা। না, তা হবে না, ঢেলে দিতে হবে হাতে। চাঁপারা যে বামুন।

—ই দশা, কে করলে গো বিপিনকা···ইস্ কপালটা ফেটে গ্যাছে···কষ্টের মধ্যেও বিপিন হাসে—ও কিছু লয়, তুদের জমিনদারের পাউনি শুধে এনু—

—জমিদারের পাওনা, কি কইছ বিপিনকা—

—হাঁাগো চাঁপি মা, মোদের তাজা রক্ত না পেলি

জমিনদারের পাউনি শুধ হয়নে; এক মাইনে 'বেগার' না দিবার ফল। তু কইতে পারিস এক মাইনে 'বেগার' দিয়া মোদের পোলারা প্যাটে কি দিবে? রাজাবাবু নারাজ—

—হঁ, বুঝ্ছি, ইর জবাব দিতে পারুনি? তুমরা না মরদ, মেয়েদের মতে'ন জমিদারের নবাবি সইছ···বুকে তাগদ নাই···

পঞ্চাশ বছরের বিপিন অবাক হয়। ন' বছরের চাঁপার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে অনেকক্ষণ। কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করে।

ঠিক এই সময় মহেশ্বর উপস্থিত হয়। বিপিনকে উঠ্তে হয়। প্রহারগ্রস্ত বিপিন যে এ বাড়ীতে বসে জল খেয়েছে একথা জমিদারের কানে গেলে কি যে হবে কে জানে। কথায় বলে—বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

টল্তে টল্তে বিপিন চলেছে। তার মাথার মধ্যে ঘুরে চলেছে একটা কচি গলার শক্ত কথাগুলো—তুমরা না মরদ, ইর জবাব দিতে পারুনি।

* * *

এরা মাটির জীব, মাটির বুকে যেমন জীবনের বীজ অঙ্কুরিত হয়ে আবার একদিন শুকিয়ে যায় তেমনি এরাও হঠাৎ জেগে ওঠে আবার শান্ত হয়ে যায়।

ওদের জাগরণের সাক্ষী হয়ে থাকে বিক্ষিপ্ত ধ্বংস স্তূপ। ওদের মনের গভীরে সৃষ্টি হয় বড় বড় রক্তাক্ত ক্ষত। বিক্ষত মানবাত্মা গুমরে মরে আক্রোশে।

বাউরী পাড়ার তাজা রক্তবীজগুলো, শক্তিবানের নিষ্ঠুর চক্রান্তে হিম হয়ে গেল আশ্চর্য রূপে। কিন্তু পরাজিত হয়েও অদূর ভবিষ্যতের জন্যে তারা চূড়ান্ত জবাব খাড়া করে রাখলো।

* * *

দিন বসে থাকে না, এগিয়ে চলে, অবসরহীন ক্লান্তিহীন কাল-স্পন্দনের তালে তালে চাঁপার জীবনের পরম লগ্ন শঙ্খধ্বনির অপেক্ষায় দিন গুণছে। বাগীশমশাই এবার ব্যস্ত হয়েছেন। আর দেরী নয়, হাতে মাত্র ১৫টা দিন। হাবুল আসে। ভবিষ্যতের স্বপ্নকে এখনই পূর্ণভাবে পেতে চায়। চাঁপা ধরা দেয় না!

মনমরা কমলা বিয়ের জোগাড়ে ব্যস্ত হয়। আর চাঁপা হয় আনমনা···সিংগীদের বাগানের শেষ প্রান্ত অবধি তার চঞ্চল দৃষ্টি বার বার ঘুরে আসে। বাছুরটাকে অনাবশ্যকভাবে রাস্তার অনেক দূরে টেনে নিয়ে চলে, জ্যৈষ্ঠের সোনালী বিকেলে।

সামনের আগরতলির জমিটা ধু-ধু করছে। অ-শ্যামল শস্যহীন। চাঁপার দৃষ্টি স্থির হয়ে গেছে। সত্যিই কে একজন আসছে। তার রাখালদা!

রাখাল হাসে মিষ্টি করে, চাঁপা অভিমানে, না দেখার ভান করে।

—কি গো সই। এখুনি ভুলবার চেষ্টা করছিস, আর কটা দিন সবুর কর সব ভুলবি···

চাঁপা নিচু হয়ে বাছুরের গায়ে হাত বোলাচ্ছে। রাখাল এগিয়ে এলো—

—সত্যি আর কথা কইবিনি সই।—আস্তে চিবুকটা তুলে ধরল রাখাল।

চাঁপার কাজল চোখে ভরা বাদলের আভাস। রাখাল আবার হাসি টেনে বলে—কাঁদিসনি চাঁপি! বিয়ে হবে, কত আনন্দ, কত সুখে রইবি সোয়ামির আদর যত্ন···

চাঁপা ঝাপ্টা দিয়ে থামিয়ে দেয়—তুমি থাম রাখালদা-ই বিয়ে করবনি।

—সে কি সই! উ কথা বলতে নাই। লোতুন ঘরে গিয়ে পলক তরে রাখালদার কথা আর মনে পড়বেনি, সব ভুলে যাবি।

রাখাল এগিয়ে যায়। চাঁপার গলা করুণ হয়ে ওঠে—তুই কথা দে রাখালদা বিয়ের পরেও আসবি।

—কি লাভ? যার তবে আসা তাকে কি আর দে'তে পাব, তুই তখন পর ঘরণী।

—না. উ কথা শুনতে চাইনে। রাখালদা তোদের রাধাও তো পর ঘরণী ছিল।

—হ্যাঁ, তুই সেই রাধা! জলকে যাবার ছল করে পরপুরুষের সাথে দেখা করলে সোয়ামী তোকে দুধের বাটী দেবে? দেখা দিয়ে শুধু ব্যথা বাড়ানো, ওতে কাজ নাই, কাল হরিদাসপুরে চলে যাবো।

—কাল চলি যাবে? আর দেখা হবে নি?

—না, আসি সই। রাখালের ঠোঁট কাঁপছে।

দশ পনের হাত গিয়ে থমকে রাখাল দাঁড়াল আবার।

চাঁপা কাঁপছে। রাখালকে আঁকড়ে ধরলো পরম নিশ্চিন্তে। ভুলে গেল কুটীল পল্লীসমাজকে, বাবা মায়ের শাসন, পরিবেশের অনুদারতা, শাস্ত্রের কটাক্ষ।

—কিছু দিয়ে যাও রাখাল দা। চাঁপার গলার স্বরে আর্তি।

রাখাল ক্ষণকাল ভাবে। তারপর গলা থেকে একছড়া তুলসীর মালা খুলে দেয় চাঁপার হাতে।

—ইতে আমার সব রইল সই। আমার সব কথা ইতে লিখা আছে···

রাখাল চলে যাচ্ছে। নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে চাঁপা।

রাখাল যাচ্ছে তার হরিদাসপুরে, রাখালের স্বপ্নে গড়া হরিদাসপুরের আখড়ার কথা মনে পড়লো চাঁপার। চাঁপা শুনতে পাচ্ছে এখনো—তুই কথা দে, দুজনে চলে যাবো হরিদাসপুরে, সকালে এঁকে দেব রসকলি, মাথায় বেঁধে দেব মোহনচূড়া, ভিন গাঁয়ে যাবো—মাধুকরী করতে, ভারী সোন্দর হবে চাঁপি,—তুই বোষ্টমী হবি?

চাঁপার মনে পড়ছে অনেক কথা। অনেক স্বপ্ন—অনেক আশার কথা। সেই রাখাল আজ শেষ ভিক্ষা দিয়ে বিদায় নিল চাঁপার জীবন থেকে।

—মধুকররূপে গিয়াছিনু হায়
মাধুকরী হইল সার
হৃদয় দহন জুড়াইল না তায়
বিরহ কণ্ঠ হার।

চাঁপা তন্ময় হয়ে শোনে। চাঁপা জানে এ গান রাখালদার বাঁধা। শেষ সুরের রেশটা হৃদয়ে ভরে নিল সে। পশ্চিম আকাশ তখন দিবাকর বিরহে লাল হয়ে গেছে।

* * *

সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই পুত্রকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে চেয়েছিলেন। ভেবেছিলেন রূপসী চাঁপা হাবুলের জীবন-তরীর হাল ধরে গতি পরিবর্তন করবে।

কিন্তু ঘটলো তার বিপরীত। চাঁপা হাল-তো ধরলোই না, পরন্তু গভীর জলে ভাসিয়ে দিল। সুন্দরী তেজী মেয়েটাকে বশ মানাতে সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। চাঁপার ভাগ্যে জুটলো অনেক কিছু। লাঞ্ছনা—অত্যাচারের কথা বাদ দিয়ে যতটুকু অবশিষ্ট থাকে, সেটা হ'ল নিষ্ঠুর অবহেলা, এই জায়গায় চাঁপার একটু লাগে।

মার-ধর বাপ-বাপান্ত করো তাতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু এই অবহেলা সে সইতে পারে না, অবহেলাই তো পরিশেষে ঘৃণার রূপ নেয় তার এই উষর জীবনে একটি মাত্র সান্ত্বনা ছিল। মরুভূমির বুকে জেগেছিল একটু শ্যামল আভাস। একটা দরদি প্রাণ।

গিরিবালা।

বাগীশমশাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। চাঁপার সৎ-শাশুড়ী। রূপের ছটা ছিল না বটে, গুণের ঘটা ছিল। বামুনগাছির চৌধুরী বাড়ীর মেয়ে। বাবার কাছে লেখা-পড়া শিখেছিল লুকিয়ে। গিরিবালা সত্যাই এক স্ফুলিঙ্গ!

সিদ্ধান্তবাগীশমশাই অবশ্য এসব জানতেন না। জানলে নিশ্চয়ই তিনি লেখাপড়া জানা মেয়েকে ঘরে তুলতেন না। আর গিরিবালাও নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আড়াল করেই রেখে এসেছে এতকাল। তখনকার দিনে শিক্ষিতা মেয়ের নাম শুনলে লোকে চমকে উঠতো। মাগো! খেৃষ্টানির আর বাকী রইল কি? কুললক্ষ্মী, মা-লক্ষ্মীদের মুখে পাণ্ডিত্য শুনে ধৈর্য্য ধরতে পারেন এমন মহাশয় ব্যক্তি গ্রামে ছিল কিনা সন্দেহ।

মেয়েরাও চেষ্টা করতো না। লক্ষ্মী, ভগবতী, জগৎ-জননী মহামায়া —কড়া কড়া চড়া বিশেষণের ধাঁধায় পড়ে অসাড় হয়ে থাকতো মেয়েরা। এই বিশেষণের তোষামোদ-টুকুই ছিল তাদের লাভ—পরম পুণ্য! নিজেদের অজ্ঞাতে এই ফাঁকির বোঝা আরো কটা শতাব্দির জন্যে তুলে রাখছিল তারা।

চাঁপা আঁকড়ে ধরলো গিরিবালাকে। গিরিবালাও হাঁফ ছাড়ে। এতদিন পরে মনের মতো একজনকে পেয়ে আনন্দ পায়। শোনায় নূতন কথা-কাহিনী। পুরাণ, মহাকাব্য, রামায়ণের গল্প। মনের ভেতরের চাপাভাষা এত-দিন পরে আত্মপ্রকাশ করে।

চাঁপা সব বুঝতে না পারলেও শুনতে খুব ভাল লাগে। গিরিবালার মুখ থেকে গার্গী, মৈত্রেয়ী, লোপামুদ্রার কাহিনী শুনে অবাক হয় চাঁপা।

—কি লো অবাক হলি যে? ওরা সব ভিন দেশের মেয়ে নয়, ওরা আমাদের দেশের মেয়ে! সভ্য সমাজে

পুরুষের পাশে বসে ধর্ম-শাস্ত্রের বড় বড় তর্ক যুদ্ধ করতো। কত বড় বড় বিদ্বান্ পুরুষ তাদের কাছে হেরে গেছে। তারাও তোর আমার মতো মেয়েমানুষ, ঘর-সংসার করতো—

চাঁপার চোখে ঘোর বিস্ময়। গিরিবালা পুরুষের কারসাজির রহস্য ভেদ করে শোনায়। মেয়েদের শিক্ষা দেয় না পুরুষ, পাছে তাদের অজ্ঞতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। মেয়েদের স্থান শুধু রান্নাঘর আর আতুড়ঘর নয়, তারা সুযোগ পেলে অনেক বড় কাজ করেও দেখাতে পারে।

পুরুষরা আমাদের পায়ে যে শিকল পরিয়ে দিয়েছে তা আমাদেরই ভাংতে হবে, আমার মনে হয় কি জানিস,—ওদের চোখের তারা উপড়ে ফেলে দেখাই নারীত্ব মাতৃত্ব দেবীত্ব এই সব বড় বড় কথাগুলো কত অসার—অর্থহীন! আমাদের দেবীর মর্য্যাদা দিয়ে তোমরা আমাদের ঠকিয়েছ, অত্যাচার করেছ, সব রকমে বঞ্চিত করে এসেছ—এখনো করছো! ভোগের বেলায় তোমরা, উচ্ছিষ্ট পাবো আমরা। চাইনা তোমাদের স্তুতি পাঠ, চাইনা ধর্মের ভড়ং! নীতি, শাস্ত্র ধর্মের খোলস ঢাকা তোমাদের মধ্যে থেকে সর্ব্বদা উঁকি মারছে নগ্ন স্বার্থের ইঙ্গিত! নারী শুধু বাজারের পণ্য, ভোগের উপকরণ!

গিরিবালা ভুলেই গেল শ্রোতা মাত্র দশ বছরের বধূ। তা হোক! গিরিবালা তৃপ্তি পায়। অবরুদ্ধ চিন্তার মুক্তির আনন্দ!

তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় এ রকম বিস্ফোরণ একান্ত অসম্ভব। কোন নারীর মধ্যে এই রকম বিদ্রোহ-মনোভাব, একটা অচিন্তনীয় ব্যাপার ছিল।

গিরিবালা সত্যই এক বিস্ময়। একবার পুকুর ঘাটে তর্কালংকারের স্ত্রীকে কটা কথা বলায় তিনি মাথায় হাত দিয়ে বলেছিলেন—ওমা, ইসব কি কথা বৌ মাথার সিঁদুর হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্, মঙ্গলচণ্ডী, শেতলা ষষ্ঠির কিরপা থাক, পাঁচু গোপালের দোর ধরা পঞ্চাননের অযুত আয়ু হোক, কামনা কর বৌ ও'দের রেখে যেন যেতে পারি।

গিরিবালা মুচকি হেসে বলেছিল—জ্যেঠাইমা, তা না নয় গেলে তোমার স্বর্গে, কিন্তু বলি, জ্যেঠামশাই যে পঞ্চান্নে পা দিয়ে, আবার একটা ন'বছরের মেয়েকে ঘরে তুলছে কবছর পরে বিধবা করবার জন্যে—কৈ একটা তো বাধা পর্যন্ত দিচ্ছ না। তোমার না হয় বয়েস হয়েছে, সাদ আহ্লাদ মিটেছে, কিন্তু যে আসছে তার কী হবে ভেবেছ? গঙ্গামুখো বুড়ো কী তাকে সুখী করতে পারবে, তুমি মেয়েছেলে হয়ে আর একটা মেয়ের সর্ব্বনাশে বাধা দিতে পারছ না—ছিঃ—

—কি? কি বললি ছুড়ী! আমার সোয়ামী গঙ্গামুখো! তোর চোখে ছানি পড়ুক, কড়ে রাড়ী হ', ওলাই বিবির···

গিরিবালা দাঁড়ায় নি। হাসতে হাসতে চলে এসেছিল। নির্য্যাতনের চাপা আগুন হঠাৎ একটু বেরিয়ে গিয়েছিল।

আজ চাঁপার কাছে মুখ খুলে খানিকটা হাল্কা হয় সে। এতক্ষণ গিরিবালার ঘরের দরজা বন্ধ করে কথা হচ্ছিল। শিতলপাটীর ওপর চাঁপা গা এলিয়ে দিয়েছে। এমন সময় বাইরে ডাক পড়ে—

—ছোটমা, বৌ আছে।

—যা লো, হাবুল এয়েছে।

চাঁপার উঠতে ইচ্ছা করেনা, তবু গিরিবালা জোর করে পাঠিয়ে দেয়। হাবুল খিঁচিয়ে ওঠে—

—বলি হারামজাদীর বেটীকে কতবার ডাকতি হয়—গাল গলা ফুলে গেল। জোর তলবের কারণ না বুঝে চাঁপা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে।

—দাঁড়িয়ে আর ঢং দেখাতে হবে না! লাও, এক ঘটি জল নি'এস, কি আমার লবাব পুত্তুর রে, শেতলপাটিতে আরাম নেওয়া হচ্ছিল···অমন গতর লাথিয়ে ভেঙ্গে দেব না···"

চাঁপা জল দিয়ে মনে মনে খানিকটা আশ্বস্ত হয়। তবু ভাল আজ এখনো লাথিটা পড়েনি।

এরপর হাবুল চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমাবার চেষ্টা করছে বোধহয়। চাঁপা একটু অপেক্ষা করে ঘরের চৌকাট পার হবার আগেই হাবুলের তন্দ্রা টুটে গেল।

—কোথা যাস, শোন।

—কওনা, কি দরকার।

—মাজাটা বড্ড বেদনা করছে একটু টিপে দে···

—একটু পরে আসবখন সন্ধে দি আসি···ভর সন্ধেতে শুতে নেই লক্ষীছাড়ে।

—হারামজাদী লক্ষী ছাড়ে?—ছাড়ে ছাড়ুক তোর কি? সোয়ামীর আদেশ যা হয়েছে পাল্‌তে হবে। শিগগির আয়।

চাঁপা জলতে থাকে। রাগে নয়—একটা শিরশিরে ক্লেদাক্ত ঘৃণায়। মাজার ব্যথা উপলক্ষ মাত্র—এ আহ্বানের মধ্যে একটা বিশেষ কিছু আছে।

সেই বিশেষটাকে ভাবতে চাঁপা শিউরে ওঠে। গলায় ক্ষীণ অনুনয় এনে বলল—গেরস্থি বাড়ীর বৌ, ভর সন্ধেতে সোয়ামীর পাশে বসে থাকলে লোকে কি কইবে শুনি, ছিঃ দেবেনা। একটু অপিক্ষে কর সন্ধে দি আসি। কিন্তু হাবুল অতো কাপুরুষ নয়। মেয়েছেলের যুক্তিতে সে টলেনা, কাজেই যা হবার তাই হল। চুলের গোছাটা সজোরে ধরে একটানে তক্তাপোষের ওপর আছড়ে ফেলে, নেয় চাঁপাকে। অস্ফুট গোঙানি, ছায়াচ্ছন্ন ঘরকে আরো রহস্যময় করে তুলল।

শিশু যেমন খেলাচ্ছলে ফুলকে দলে পিষে ফেলে তেমনি হাবুলের কঠিন বাহুর নিস্পীড়নে জীবন্ত চাঁপা গুমরে ওঠে।

এই তার দু'বছরের বিবাহিত জীবনের ইতিহাস।

বাপের বাড়ী মাত্র ক' মিনিটের পথ। দুবছরে দুবার ছাড়া ভাগ্যে যাওয়া ঘটেনি। যার জন্যে মন কেমন করে, বাবা মাঝে মাঝে আসে, তাও নেহাৎ প্রয়োজনে, খুঁচিয়ে সমস্ত কিছু জিগ্যেস করবার সুযোগ ঘটেনা। রাখালদার কথা, আগরতলির জমির কথা, সিংগীদের বাগানের পিয়ারা গাছের কথা—কিছুই জানা হয়না। চাঁপা ভাবে এত কাছে থেকেও সে যেন অনেক দূরের মানুষ, দুর্ভেদ্য কারার বাইরের জগতের সন্ধান পাওয়ার অধিকার তার যেন নেই!

মাকড়সার জালে শিকারের মতো সাতপাকের বাঁধনে পড়ে তিল তিল করে সে যেন চরম লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে। মুক্তির আকুতি গলা ফেটে বের হবার পথ খোঁজে! সে যেন আজ পথভ্রান্ত। একজন পথ দেখাতে পারতো। কে জানে হয়তো সে আজ হরিদাসপুরে। হয়তো এখন মাধুকরী করে ফিরছে! চাঁপাকে কি ভুলে গেছে! ভুলে গেছে কি শেষ দিনের শেষ দানের কথা, চাঁপা তো তাকে কোন প্রতিদান দেয়নি, তবে?

নকসা করা কাঁথাটায় সূচের শেষ ফোড়দিয়ে ভাবে—না অসম্ভব, রাখালদা তাঁকে কিছুতেই ভুলতে পারেনা।

—কি লো কাঁথাটা শেষ হল?

ঘাট সেরে ফিরলো গিরিবালা, নিটোল স্বাস্থ্য। চুলের ঝাঁরি বেয়ে তখনও দু এক ফোঁটা জলপড়ছে। বিয়ে হয়েছে ন বছর। অথচ বিয়ের ফল ফলেনি। লোকে বলে বন্ধ্যা। কথাশুনে গিরিবালা হাসে। মনেহয় এর পিছনে এক গভীর রহস্য লুকোচুরি খেলছে। সেটা কি, একমাত্র গিরিবালাই জানে, আর জানেন সিদ্ধান্তবাগীশ মশাই।

প্রথম প্রথম চাঁপা ডাকতো মা' বলে। হাজার হোক শাশুড়ীতো। কিন্তু গিরিবালাই দমকা হাসিতে উড়িয়ে দিল সে সম্পর্কটাকে।

—না না আমি ওসব মা টা হতে পারে না লো। কি বলবি জানিস্?—সই। আবার এক দমকা হাসি, চাঁপা বিস্ময়ে বলেছিল—সই। যাঃ উ বলতি পারবনি···

তবু গিরিবালা জোর করে নিয়েছিল—বল সই মনের কথা কই।

অবশ্য সম্বোধনটা একমাত্র গোপনেই প্রকাশ পায়। চাঁপাকে এতক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে গিরিবালা বলল—

—কি লো. হাঁ করে তাকিয়ে রইলি কেন? ভাখ পছন্দ হল নাকি? বল তাহলে আর একবার বিয়ের সাজ পরি।

—যা-ও! ইচ্ছে হয়তো আর একবার বসন., মানা করছে? কে ওরূপে আরো দশবার বিয়া দিয়া আন; যায়।

—বাঃ বেশ কথা ফুটেছে, থাম, কাপড় ছেড়ে আসি কথা আছে। একটু পরেই ফিরে এলো সে। যতখানি পারে ঘৃণা মিশিয়ে জানাল কেমন ভাবে তর্কালঙ্কার মশাই তর্কযুদ্ধে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছে।

এ আর যে সে লোক নয়—রামমোহন রায়। তার সংগে তর্ক করবার জন্যে তর্কালঙ্কার মশাই কলকাতায় গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন হিন্দুধর্মের সংস্কারকে জয়ী করে ফিরে আসবেন। কিন্তু রামমোহনের যুক্তি, বিদ্যার কাছে সমস্ত সূত্র-শাস্ত্র স্তব্ধ হয়ে গেছে। সমাজে নারীর অধিকার,

স্ত্রীশিক্ষা, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ ইত্যাদির বিষয়ের অনুকূলে যে সকল যুক্তি তিনি দেখিয়েছেন, তা খণ্ডন করার শক্তি তর্কালঙ্কারের নেই। সুতরাং পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন এবং নোতুন উদ্যমে রামমোহনকে বিপদ-গ্রস্ত এবং অপদস্থ করার জন্য উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

—বুঝলি সই, ওরা এতকাল আমাদের ঠকিয়ে এসেছে, অত্যাচার করেছে, ভাবে যে আমরা বুঝি কিছু বুঝি না, ওদের এ অত্যাচার আর বেশী দিন নয়। একদিন এর প্রতিফল ওরা পাবেই···দেখিস একদিন মেয়েরাই বাইরে বেরিয়ে পড়বে···

—বলি দিনরাত এত ফুসুর-ফুসুর, গুজুর-গুজুর কি হয় লা বৌ। এদিকে ডা'লে যে পোড়া গন্ধ উঠলো, ম্যাগো দিন দিন কি সব আদিখ্যেতা—

হেঁসেল থেকে বাগীশ মশাইয়ের প্রথমার তীক্ষ্ণস্বরে আসরটা ভেঙ্গে গেল। চাঁপা কাজ করতে করতে ভাবে গিরিবালার কথা। এত কথা কেমন করে আর কোথা থেকে শিখল সই! চাঁপা যদি লেখাপড়া জানতো তাহলে সেও এমনি কথায় লেখা বই পড়তে পারতো!

কিছুদিন আগে চাঁপা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কেমন করে যেন হাবলু জানতে পারে। ব্যস্! বন্ধ ঘরে কি যে ঘটেছিল কেউ জানে না, তবে তার পরদিন থেকে চাঁপার অক্ষর শেখার চেষ্টাটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

দাওয়ার ওপর খানিকটা জল পড়েছিল। খেয়াল বশে তারি ওপর ভুলে যাওয়া অক্ষরগুলো আঁক কাটে, বড় বড় করে লেখে—'অ' 'আ'। আর সেই মুহূর্তে শাশুড়ীর স্বর চাঁপাকে চমকে দিল—যত বড় হচ্ছেন বুদ্ধি পাকছে, হ্যাঁরে হারামজাদী জলের উপর আঁক কাটলে যে সোয়ামীর দেনা হয় এটাও কি শিখুতে হবে? হাড় হাভাতে, ছোটলোকের বাড়ীর মেয়ে—ধেড়ে শালিকি!

হায়রে! জলের ওপর আঁক কাটলে নাকি দেনা হয়? রবি মঙ্গলে বাঁশ কাটতে নেই, বৃহস্পতিতে টাকা দিতে নেই, গোয়ালের গোবরদিতে নেই; পেটভরে খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে, পঞ্চমীতে পটল খাওয়া নিষেধ, এমনি শত শত সংস্কারের বেড়াজালে বাংলার পল্লী সমাজ জরাগ্রস্ত মুমূর্ষু! শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যা চলে আসছে তার অন্যথা কে করবে?

ঠিক দুপুর। হাবুল এখনো ফেরেনি। যদি নাও ফেরে চাঁপার চিন্তায় কোন কারণ নেই। হয়তো গুড়ের কাজে ব্যস্ত, নয়তো বাউরী পাড়ায় একপাক ঘুরে আসতে গেছে। যতক্ষণ হাবলু না থাকে—চাঁপার মুক্তি।

বাদাম গাছটাকে কি অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে। গাছটা যেন দোল খেলেছে—ময়ূরকণ্ঠী রঙে। চকচকে পাতার ওপর রোদ পড়ে আরো পিচ্ছিল মসৃণ সুন্দর দেখাচ্ছে। দুপুরের মেঠো পথ নীরব মায়াময়। মন যেন কি পেতে চায়, পায়না; কার পিছু ছুটে যায়—নাগাল মেলে না।

আশ্চর্য মানুষের চিন্তার মিল। চাঁপা কি ভাবছিল কেউ জানে না! হঠাৎ খঞ্জনীর মিষ্টি বোল। শুনে চমকে ওঠে। নিজের কাছে ধরা পড়ে গেছে চাঁপা। নিশ্চয়ই এই খঞ্জনীর বোল, গলার স্বর তার—সেই তার রাখালদার।

বাল্যের চাঁপাকলিকে যে জাগিয়েছিল, সকালের আলোর স্পর্শে, দীর্ঘ দিন পরে চাঁপা ওর সেই রাখালদাকে দেখল। জানালার একটা কপাটের আড়াল থেকে, সমস্তই ঠিক আছে অনেকখানি যেন লম্বা আর রোগা হয়ে গেছে রাখালদা।

কেন, কে জানে ও কিছুতেই রাখালের সামনে দাঁড়াতে পারল না। একটা অব্যক্ত ব্যাকুলতা এসে আচ্ছন্ন করে দিল ওকে।

বড়গিন্নীর অনুরোধে রাখাল পরপর ক'খানা গান গাইল। রাখাল কয়েকবার আড়চোখে দরজাগুলোর দিকে দেখে নিল, কিন্তু যাকে দেখার জন্যে রাখালের এত-দূরে আসা তার দেখা মিললনা সে তখন জানালার ফাঁক দিয়ে তারি দিকে চেয়েছিল। আবেগে দুলছিল চাঁপা। মনে হল ছুটে গিয়ে বলে তার বিড়ম্বিত জীবন-কাহিনী। শোনাতে চায় লাঞ্ছিতা বঞ্চিতার জীবনের অকথিত ব্যথা। অজস্র কথা আবেগে মুখ ফুটে বের হতে চাইল। তবু চাঁপা একবার সামান্য দেখা দিতেও পারল না।

চাঁপা বুঝি দুলছে চৈত্রের ঝড়ে, এখুনি বুঝি ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়বে তার পাপড়ীগুলো।

রাখাল তখন ধরেছে—

মধু বোলী পাখী শ্যাম দিলা ফাঁকি

ছিকল ছিঁড়িল সই

ধৈরয যাতনা আর গো সহে না
কত যুগ কহ রই।

সেই পুরানো গান। অনেক স্মৃতি মাখা, কত স্বপ্নে ভরপুর। কত মোহমুগ্ধ ভাবের আবেশে তন্ময়! মনে পড়লো বিলের ধার, আমড়া গাছের তলা, আগরতলীর জমি সেই ছোট্ট বাছুরটাকে…

রাখাল বেরিয়ে আসছে বাড়ী থেকে। রাখালকে যেতে হবে তারি জানালার কোল দিয়ে। চাঁপা দেখা দেবে নাকি?

আস্তে ডাকে—রাখালদা!

রাখাল নিষ্পলকে চেয়ে থাকে মিনিটখানেক। একটু এগিয়ে আসে। রাখাল হাসে সেই বহুপরিচিত মিষ্টি হাসি—আসি সই।

মাত্র দুটো কথা, চারটে অক্ষরের মধ্যে কি ছিল জানি না। চাঁপার চোখে বাদল ঘনিয়ে এলো। একটু পরে ঝাপসা চোখে যখন দেখল, রাখাল তখন চলে গেছে অনেক দূরে। চোখের জলে বুক ভারি হয়ে ওঠে। চারটে অক্ষর তেমনি ঘুরে ঘুরে আসে—আ-সি স-ই।

গিরিবালা নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে, চাঁপা জানে না। ছল ছল চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—কি লো, মন খুইয়ে বসলি নাকি?

—অনেক আগেই।

—পোড়ার মুখী একি ভুল করেছিস তুই, পরপুরুষকে ভালবাসা মেয়েদের পাপ-শুনিস নি পাঁচালীতে…

—শুনিছি, কিন্তুক পাঁচালী লিখবার আগেই মন তৈরী হয়। পাঁচালী পড়া যায়, খুশী মতন বদলানি যায়, কিন্তুক মন বদলানি যায় না, পড়াও যায় না।

—হ্যাঁলো, নাগরটিকে চিনিস্ নাকি—ভারী মিষ্টি গলা। নামটা কি? চাঁপা নিঃশব্দে হেসে বলল—আমার রাখাল।

* * *

দীর্ঘ চার বছর পর আবার সেই পোড়ামাটিগুলো নড়ে চড়ে উঠলো। বাউরীপাড়ার কালো কালো ছোট-লোকগুলো একহাতে আহত পাঁজর চেপে অন্য হাতে ধরলো সড়কী লাঠি। সে বিদ্রোহের কাহিনী কোন ঐতিহাসিকের গবেষণায় স্থান পায়নি। তার চিহ্ন কালের গহ্বরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবু সেই একরাত্রির জাগরণী, আগামী কালকে শুনিয়েছিল, নব উন্মেষের বাণী।

সেই শিমুলতলির বিল। যার প্রত্যেক জলবিন্দুর সাথে মিশে আছে বাউরীদের কয়েক পুরুষের বাল্য কৈশোর বার্ধক্যের স্মৃতি। একবার হেরেছিল বিপিন। এবার সে হারবে না—জীবন মৃত্যুর বাজী ধরেছে। চার বছর আগের কালশিরেগুলো এখনো মিলায় নি। তারি ওপর না হয় নোতুন করে আঁকবে রক্ত আঁচড়। নড়বে না তারা বিলের ধার থেকে।

—কদিন আগে জমিদারের খেয়াল হয়েছে এ বছরে বিলের মাছগুলো বিক্রি করে দেবে। কে এক মাছ ব্যবসায়ী লোভ দেখিয়েছে। কিন্তু মাছধরা তো মুখের কথা নয়। দস্তুর মতো লড়াই করতে হবে। জমিদার বললেন—ঠিক আছে, জাল নামাও, মাছ ক্রেতার তাঁবেও কিছু লোক আছে।

হৈ রৈ করে জাল নিয়ে ছুটলো সবাই। বিলের পাড়ে এসে সবার চক্ষুস্থির। বাউড়ীদের ছেলে বুড়ো সবাই দাঁড়িয়ে পড়েছে বিলের পাড়ে। কিছুতেই তারা জাল নামাতে দেবে না। হল বাকবিতণ্ডা, গালাগালি, কিন্তু বাউরীরা অটল।

ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল জমিদারের লোক। জমিদার গম্ভীর হলেন। আবার লোক গেল। বারবার তিনবার বাউরীদের চকচকে লাঠির সামনে থেকে পালিয়ে গেল ওরা—এবার জমিদার চাতুর্য্যের আশ্রয় নিলেন।

রাতের অন্ধকারে জাল নামলো। কিন্তু ততক্ষণে বাউরীদের সমর সজ্জা আরম্ভ হয়ে গেছে। যে যা পেলো তাই নিয়ে ছুটলো—রাতের অন্ধকারেও ধারালো সড়কী-গুলো ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

বিপিন চিৎকার করে—জান কবুল রইল ভাই সব, এগিয়ে চল, হঠাও দুষমণ।

শিমুলতলির বিল সেই রাত্রে শিমুলের মতো লাল হয়ে গেল। তাজা রক্ত বিলের জলকে ঘোলা করে তুললো।

বিপিনের লাঠির ঘায়ে নায়েব পড়লো লুটিয়ে। বড় ছেলে এসে রক্তাক্ত দেহটাকে ভাসিয়ে দিল বিলে। এই বার মিটাক ও অনন্ত পিপাসা।

কিন্তু পারবে কেন এই সব ছোট লোকেরা। শতাব্দীর সঞ্চিত ক্ষোভ মুহূর্তের জন্যেই জ্বলে উঠে। শক্তিমানের নবনব অত্যাচারের কৌশল সদাজাগ্রত। শিমুলতলির বিলের পাড়ে এরা যখন জয়োল্লাসে মত্ত, ঠিক সেই সময় সবার চোখ ঠিকরে পড়লো জ্বলন্ত পল্লীর দিকে।

ধু ধু সর্বগ্রাসী কুটিল গ্রাসে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে একটার পর একটা ঘর। উত্তপ্ত বাতাস গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে নিয়ে চলে সর্বহারাদের বেদনার্ত বাণী নির্মম নিষ্ঠুর।

বাউরীরা এগিয়ে যায়। কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেছে। যে চোখে ছিল জয়ের দীপ্তি সেখানে ঘনিয়ে এলো অসহায়ের করুণ ছায়া।

ওরা চেয়ে থাকে। ঘরের ঘুমন্ত শিশুগুলোর কান্না কারো কানে গেল না।

সেই রাত্রেই বিপিনের দল নোতুন জীবনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো, নিঃসম্বল নিরুপায় বিক্ষুব্ধ দলটা শেষবারের জন্যে চেয়ে দেখল তাদের স্মৃতি বিজড়িতপল্লীটাকে। শিমুলতলির বিল নির্মম ঔদাসীন্যে অচঞ্চল অবস্থায় তেমনি তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সারা গাঁয়ের পুরুষরা দেখতে গিয়েছিল দাঙ্গা। মেয়েরাও বাইরে থেকে দেখছিল বাউরীপাড়ার আগুন। গিরিবালা আর চাঁপা দাঁড়িয়েছিল একটু ফাঁকা জায়গায়। প্রথমে চাঁপা ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে। বিপিনের কালো দীর্ঘ দেহটাকে অন্ধকারে ভূতের মতই দেখায়।

—চল্লু চাঁপি মা।

—কে? বিপিন-কা! চাঁপায় গলায় বিস্ময়, গিরিবালা নিরুত্তর, বিপিন হাসে। ফিকে হাসি—চল্লু চাপি মা। আর বোধায় দেখা হবে না, শুধু বলতি এনু, মোরা জবাব দেছি, মোরা মরদ, শুধু ইচ্ছে রয়ি গেল, ভুস্বামীর নাগাল পেলুমনি, ই লাঠি ই গাঁয়েই রেখে গেনু যেদিন ই লাঠি রক্তে রাঙা হবে সিদিন ফিরি আসব…

—কোথা চল্লে বিপিনকা?

—রায়গঞ্জে। নীল কুঠিয়ালদের ওখানে। হেথায় মোদের ঠাঁই হলনি, দেখি ইবার লতুন ধর্ম কি শিক্ষে দেয়—চলি গো—

বিপিনের পিছু পিছু চলে গেল দলটা। দূর থেকে দূরান্তরে। এগিয়ে চলেছে ওরা পথ থেকে পথান্তরে, ধর্ম হতে ধর্মান্তরে তারা পরিণত হতে চলেছে। রায়গঞ্জে খৃষ্টান মিশনারীদের আস্তানা খুঁজে নিতে খুব বেশী দেরী হবেনা ওদের।

*　　*　　*

সময়ের বড় কাজ হ'ল ভুলিয়ে দেওয়া। কয়েকদিন আগে যে বাউরীপাড়ায় একটা প্রলয় হয়ে গেছে, তার লক্ষণ এখন একটুও বোঝা যায় না। বাউরীদের ভিটের ওপর জমিদারের মজুরগুলো কাজের ফাঁকে বাউরীদের কথা বলে। জমিদার ওদের ভিটের ওপর আবাদী জমি বের করছেন। কয়েকমাস পরে হয়তো চেনাই যাবে না, এখানে একদল লোক বাস করতো, জমিদারের নায়েবকে ভাসিয়ে দিয়েছিল ঐ বিলে। এখানেই একদিন কতকগুলো ছোটলোক শক্তিমানের বিরুদ্ধে লাঠি ধরেছিল—জবাব দিয়েছিল। এখান দিয়েই চলতো একজন লৌহ মানুষ, যার সামান্য ইশারায় বাউরীরা উঠতো বসতো। দশ-বিশ বছর পরে হয়তো ভুলে যাবে অনেকে।

চাঁপা সে রাত্রে ঘুমাতে পারেনি, গিরিবালাও নয়। এই জঘন্য অত্যাচারের সমাধান খুঁজেছে দুটো মন, গিরিবালা তাকে নোতুন কিছু শোনাতে পারেনি।

কদিন পরে স্বামীকে জিগ্যেস করলো চাঁপা—হ্যাগা এটা কি ঠিক হল?

—কোনটা? হাবুল আড়মোড়া খায়।

—এই জমিদারটা বাউরীদের ভিটামাটি খেয়ে দেশান্তরী করলো তোমরা একটু প্রতিবাদ করলে নি?

—এ্যাঁঃ! কি কইছ, ভুস্বামী কি হেলা-ফেলা লোক, ওনার বিপক্ষে কথা কয়—কার কটা জান? পাঁচখানি গেরাম ওঁর। আঙুলের ডগায় ওঠে বসে। তর্কালঙ্কার জ্যেটা কয় ভুস্বামী আমাদের সাক্ষেৎ নরসিংহ।

—তা বলে, নরসিংহকে পুজো করতে হবে নাকি? এতগুলো মানুষ যে বেধর্মী হয়ে গেল, কার পাপে শুনি! তোমাদের গায়ে রক্ত নাই—থাকলে এ অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করতে না!

হাবুল একটু নরম হয়—তা আমরা কি করতে পারি কও। সাহেবরা ভুস্বামীর হাতের লোক, কলকাটি যেমনি ঘোরায় তেমনি চলে।

—হ্যাঁ ঠিক কয়েছ। আর ইদিকে যে তলে তলে

হিঁদুরা দলে কমে যাচ্ছে তার হিসেব রাখো। তোমাদের অত্যোচারে হাজার হাজার ডোম, দুলে, বাউরী, বাগ্দী, বেধর্মী খেষ্টান হয়ে যাচ্ছে; সাহেবরা এই তো চায়, বিদেশে তাদের দল ভারী হ'ক, তারপর তোমাদের অস্তর দিয়ে তোমাদের গলা কাটবে।

হাবুল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। এতটুকু মেয়ে এসব শিখলো কোথা থেকে। মনে মনে বৌয়ের প্রশংসা না করে পারে না।

কথাগুলো চাঁপার নয়। গিরিবালা শুনিয়েছিল হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণ আর জমিদারের অত্যাচারের ফলাফল। কেমন করে আজ মিশনারিদের খাতায় হিন্দুদের একটা বৃহত্তম অংশ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে। সমাজের অপাংক্তেয়ের দল কেমন ভ বে ধর্মান্তরিত হচ্ছে। গি'রি-বালা একজনের নাম কিন্তু বারবার করে বলে। চাঁপা যেন খুব চিনে ফেলেছ দেওয়ান রামমোহন রায়কে।

* * *

মহেশ অনেকদিন ধরেই শয্যাশায়ী। কিন্তু চাঁপার কানে তা ওঠেনি। আজ শ্বশুরমশাই নিজে এসে খবরটা দিলেন। শুধু বললেন—বাবার অসুখ চাঁপাকে একবার দেখতে চায়।

চাঁপার যাবার কথা শুনেই হাবুল জ্বলে উঠলো—এ্যাঁ রোজ রোজ বাপের বাড়ী।অতো যদি ছটফটানি বাপের বাড়ী রওগে যাও, সোয়ামীর ঘর করতে হবে না।

চাঁপা নিঃশব্দে কাঁদল। গিরিবালা হাবুলকে অনেক-ক্ষণ বোঝাবার পর হাবুল জানাল, আজ সন্ধ্যার পর নিজে গিয়ে দেখে আসবে; যদি তেমন কিছু বোঝে তো পাঠাবার ব্যবস্থা করবে।

সে সন্ধ্যায় হাবুলের সময় হলনা। তার নোতুন গুড়ের হিসাব সেরে ব ড়া যখন ফিরল – রাত দশটা।

পরের দিন সকালেও কাজের চাপে যাওয়া হলনা—দুপুরেও নয়, বৈকালের দিকে প্রতিবেশী হিয়েন ঘোষাল বাগীশমশাইয়ের কাছে এলেন চাঁপাকে নিয়ে যাবার প্রার্থনা জানিয়ে। অবস্থা শুনে বাগীশমশাই চাঁপাকে পাঠিয়ে দিলেন।

পাড়াগাঁয়ের অনেক অসুখের মতো, এ অসুখটাও ঠিক ধরা গেল না। কবিরাজ খলনুড়ি দিয়ে ওষুধ করলেন, তুকতাক হল, ঝাড়ফুক হয়ে গেল।

ভোর রাত্রে পূর্ব আকাশে শুকতারাটা যখন হাসতে আরম্ভ করেছে ঠিক সেই সময়ে কমলার চোখ বেয়ে নামলো কান্নার প্লাবন। সেই অশান্ত বুকফাটা বিলাপে পল্লী-প্রকৃতি গুমরে উঠলো।

বাগীশ এলেন, হাবুল এলো আরো অনেকে এলো, সমাজের মাথারা ফর্দ করলেন, হাঁক পাড়লেন, আহা উহু করে ক্ষান্ত হলেন। উঠানে সভা বসলো। পাঁজি এলো, পুঁথি এলো, শাস্ত্রের বুলি ছুটলো, একাদশীতে মৃতের ক'-পোয়া দোষ হয় তাও ঠিক হয়ে গেল।

সিদ্ধান্তবাগীশ স্ব-ইচ্ছায় মহেশ্বরের দাহ খরচের ভার গ্রহণে সিদ্ধান্ত করলেন। কিন্তু কঠিন সমস্যা হল কমলাকে নিয়ে। কে নেবে কমলার ভার? চাঁপা একবার কি যেন বলতে গিয়ে হাবুলের রক্ত চক্ষু দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল।

কমলার ছাব্বিশ পেরুনো শরীরে যেটুকু যৌবন অবশিষ্ট আছে তা নেহাৎ অবহেলা করা যায় না, ব্রাহ্মণ-কুলে ব্যভিচারের আশঙ্কায় সবাই শিউরে উঠলেন। যৌবনপুষ্ট একক জীবনের বিপদের সম্ভাবনায় পণ্ডিতকুল আর একবার শাস্ত্রমন্থনে প্রবৃত্ত হলেন।

উপায় স্থির হয়ে গেল। এ উপায় ছাড়া কমলার আর দ্বিতীয় কোন বাঁচার পথ নেই। অর্থাৎ সতী পুণ্যবতী হয়ে স্বর্গে বাঁচার প্রকৃষ্টতম পন্থা—সহমরণ।

কমলার সামনে বর্ণনা করা হল—স্বর্গের সুখ, অক্ষয় পুণ্য, সংসারের অসারতা,আগামী জন্মের উজ্জ্বল সৌভাগ্য। কমলা কিছু বলল না, চাঁপাকে বুকে নিয়ে কাঁদলো অশান্ত-ভাবে।

কমলা জানে সমাজের বিধান না মানলে, তার ভাগ্যে কি আছে। সামান্য বিদ্রোহ প্রকাশ পেলে তার পরিণতিটা কি রকম কুৎসিত হয়ে উঠবে।

অনেক বছর আগে কমলা প্রার্থনা জানিয়েছিল কবে সে সতীমার মতো এক চিতায় উঠবে। সেই কামনা পূরণের দিন সমাগত। কিন্তু কোথায় ছিল লুকিয়ে এই ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভয়টা। একটা দুরন্ত শিহরণ বারবার শরীরটা অবশ করে আনছে।

সবাই এলো সাজাতে, রক্তরাগে, রক্তপাড় শাড়ী,

সীমন্তে রক্ত সিঁদুর—চরণে অলক্ত রাগ। লালে লাল হয়ে গেল কমলা। কমলার চরম অভিসার-লগ্ন হ'ল আসন্ন। নীল নীল শিখার সহস্র বাহু প্রসারিত করে নিবিড় আলিংগনে বাঁধবার জন্যে হাতছানি দিচ্ছে সর্বভুক্। মরণের মহাতৃপ্তি জীবনের আহুতিতে।

চাঁপা পালাল। পালিয়ে এলো মার শেষ যাত্রা দেখে, শত শত হিংস্র কুটীল কটাক্ষের সম্মুখ থেকে। শতকণ্ঠের 'হরিবোল' চাঁপার কানে বিষ ঢেলে দিল। সমস্ত মিথ্যা, মিথ্যা! তোমরা মুক্তি দাও, এই গলিত পিষ্ট সমাজ-বন্ধন থেকে মুক্তি দাও। চাঁপা যেন শুনতে পেলো - ওগো আমি আরো বাঁচতে চাই! এই বিশাল পৃথিবীর সুন্দর জিনিসকে ভোগ করতে—উদার বাতাসে মুক্তিশ্বাস নিতে।

মধ্যাহ্ন সূর্য্য ঠিক তেমনি ভাবে নির্লজ্জের মতো চেয়ে আছে। কে বলে তোমায় রুদ্র? সত্যি যদি রুদ্র—এই মুহূর্তে তোমার ঐ রুদ্রতেজে ভস্মীভূত করে দাও এই সমস্ত জরাজীর্ণ অত্যাচারী সমাজের কঙ্কালগুলো।

বাড়ী ঢুকতেই গিরিবালা এসে চাঁপাকে বুকে টেনে নিল।

গিরিবালা সান্ত্বনা দেয়—ছিঃ সই, এখন কাঁদতে নেই। সমাজের বিধানে তোর মা এখন সীতা সাবিত্রীর মতো পুণ্যবতী হতে চলেছে, যুগ যুগ ধরে এই নিয়ম চলে আসছে—আরো কতকাল এ অত্যাচার চলবে কে জানে! মনে রাখিস্ সই, আমাদের ভাগ্যেও যদি এই দুর্দিন আসে সেদিন যেন কাঁদতে বসিসনি. আর চোখের জল নয়—এবার নিষ্ঠুর প্রতিবাদ! সমাজ শাসন, ভুয়া ধর্মনীতি—শাস্ত্রের পাঁক ঠেলে আমরা এগুবো নোতুন পথে, মরণের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে যদি জীবনের পরাজয় ঘটে ক্ষতি নেই—তবু জীবন্তে মরণকে আলিংগন করবো না। পরলোকের অলীক পুণ্যের প্রত্যাশার ইহলোকের সমস্ত আশাকে চূর্ণ করে দিতে পারবো না। এ অত্যাচার অপমান শুধু তোর আমার ওপর নয়, মানুষের স্রষ্টার বুকেও সমান ভাবে আঘাত করে।

চাঁপা অবাক হয়ে দেখলো গিরিবালার চোখে চমকে ওঠা বিদ্যুৎ।

রাত্রে স্বামী শ্বশুর ফিরল দাহ সেরে। চাঁপার মন হাবুলের ওপর বিষিয়ে রইল। কেন এমন কি ক্ষমতা নেই যে একজনের প্রতিপালন করা অসম্ভব। মায়ের একটা সামান্য ভার নিলে কি খুব অভাবে পড়তো?

হাবুল সত্যই আজ উন্মনা, প্রতিদিনের মতো আজ দেহ নিয়ে কাটা ছেঁড়া করলো না। নিঃশব্দে শুয়ে পড়লো, চাঁপা একটু আশ্চর্য হলেও কিছুই বললো না। হাবুল কি ভাবছে? অনেক রাত্রে চাঁপা যখন ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠলো—হাবুল বিরক্ত তো হলই না, উপরন্তু চোখের জল বড় মমতায় মুছিয়ে দিল, এতদিন পর সত্যই যেন তার চোখে ভালবাসার রঙ লেগেছে। চাঁপার মনের কাছাকাছি যেন পৌছুবার চেষ্টা করছে।

কি আশ্চর্য? আজ হল কি হাবুলের। চাঁপার তন্দ্রালস মাথাটা কোলের ওপর নিয়ে সেও কাঁদছে শিশুর মতো। চাঁপা যদি এতটুকু সজাগ থাকতো নিশ্চয়ই বুঝতো স্বামীর পশুত্বের আড়ালে একটা ক্ষমাকরুণ সমব্যথী অন্তর তারিই জন্যে সদা জাগ্রত।

হাবুলের চোখে সারারাত্রি ঘুম নেই। কেঁপে কেঁপে ওঠা লালচে তপ্ত জটার বন্ধনে একটা জীবনের মর্ম্মন্তুদ আকুলতার খোলা খোলা স্বপ্নে জেগে রইল সারারাত। চাঁপা তখনো ঘুমের ঘোরে ফোঁপাচ্ছে!

* * *

এই বিশাল পৃথিবীর পরীক্ষাশালায় মানুষকে প্রতি পদক্ষেপে পরীক্ষা দিতে হয়, তার মনুষ্যত্ব, ধর্ম, শিক্ষা, অর্থ, প্রেম সব কিছুর জন্য। প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের যাচাই করে নিচ্ছে আমাদের শক্তিকে, যোগ্যতাকে।

হাবুল এতদিন পর সত্যই চাঁপাকে ভালবাসতে চাইল, নিবিড় করে পরিপূর্ণভাবে; কিন্তু ধীরে ধীরে জমে ওঠা অজস্র ভুলের মাসুল কে দেবে? চাঁপাকে মনের কাছে আনতে গিয়ে আরো নাগালের বাইরে ছুঁড়ে দিল হাবুল। স্বামীর এই হঠাৎ সোহাগ চাঁপার মনকে বিষিয়ে তুলল। হাবুল শেষে হয়ে উঠলো দুর্দান্ত।

চাঁপার পঞ্চদশী মনের বন্ধ কবাট তেমনিই বন্ধ হয়ে রইল।

অতৃপ্ত বাসনা মেটাতে হাবুল তার পুরাণো পথ আবার নোতুন করে চিনে নিল।

ভিন্ গাঁয়ে খুঁজে নিল মনের মতো আস্তানা। দিনরাত্রির বেশীরভাগটা সেখানেই কাটাতো। চাঁপা হাঁপ

ছাড়ে। পরিপূর্ণভাবে গিরিবালার সংস্পর্শে আসতে পারল চাঁপা। প্রথম প্রভাতের নবীনালোকে নিঃশব্দে জেগে ওঠা চাঁপার মতো চাঁপাও পাপড়ি মেলে ধরল।

আরো কটা মাস কেটে গেল। কমলার আলোচনাটা থিতিয়ে এসেছে। সমাজপতিরা বিধান দিয়ে বেড়াচ্ছেন তেমনি। আরো কিছু নোতুনের প্রতীক্ষায় তাঁরা চঞ্চল বুঝি!

সন্ধ্যা হব হব। বকুলিবাগানের শৃগালগুলো সবে মাত্র স্বাগত জানাতে আরম্ভ করেছে রাত্রিকে। সামনের পাকুড়গাছটায় একঝাঁক বাদুড়ের কলহ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে চামচিকের অস্পষ্ট পাখা ঝাপটানো। সমস্ত পরিবেশটা বিষাদকরুণ। চাঁপা শাঁখে শেষ ফুঁটা দিয়ে পিছন ফিরতেই দেখে সামনে হাবুল। চোখ দুটো পাকা করমচার মতো।

হাবুল বড় ক্লান্তিতে দরজায় বসে পড়ল। বেশ ঝিমাচ্ছে।

—কি হোল? বসলে যে—দোর ছাড়…

—বড় কষ্ট, একটুখানি জল……

হাবুলের ভেজা করুণ স্বর শুনে চাঁপার একটু বিস্ময় জাগে। এই রকম স্বর চাঁপা জীবনে প্রথম শুনল। লোকটার কি কিছু হ'ল নাকি? এমন সময় তো কোন দিন বাড়ী ফেরে না? নিশ্চয়ই অঘটন কিছু ঘটেছে। ভাবতে ভাবতে জল নিয়ে এল চাঁপা।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একবার স্পর্শ করল। ও যা ভেবেছে, গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে, মুখে দুর্গন্ধ।

—ফের গিলেছ ছাই পাশ। ছিঃ ছিঃ ঘেন্না ধরে না। মদ অভ্যেস মলেও যাবে না—হাবুলের কাতরোক্তি শুনে চাঁপা থমকে গেল। সত্যিই লোকটার কষ্ট হচ্ছে।

শাশুড়ী কেঁদে আকুল—মা শেতলা গো, কি হবে গো …এই ভরা বিষ্যুৎবারের বার বেলা, বাছার আমার রোগ বালাই সারিয়ে দাও মা। কি অলুক্ষণে হারামজাদী বৌ এনেছিনু বাবা…দিন রাত কোঁদল ঝগড়া। বাছাকে আমার বৈরেগী করে দিলে গা। ওরে আবাগীর বেটি, তোর দড়ি কলসী জোটেনা। মা ওলাইবিবি তোকে দেখেনা।

চাঁপা রাগলও না, হাসলও না। শাশুড়ীর এ রকম আশীর্বাদে প্রথম প্রথম ভয় করতো। এখন গা সওয়া হয়ে গেছে। আড়ালে গিরিবালার কাছে অনেকদিন হেসেছে চাঁপা।

আজ চাঁপা গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবছে। দুর্দান্ত লোকটার চোখ দুটো কি রকম অসহায় করুণ দেখাচ্ছে। পুরু ঠোঁট দুটো কাঁপছে, কপালের রেখাগুলো আরো কুঞ্চিত, দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত।

চাঁপার মনে কি সমবেদনার কম্পন জেগেছে? যন্ত্রণা-কাতর হাবুলের চোখ দুটো কি এক পরম নির্ভরতার খোঁজে চঞ্চল হয়ে পড়েছে!

বিশু বদ্যি এসে নাড়ী ধরল। বিশু বদ্যিকে লোকে বলে ধন্বন্তরী। বয়স আটের কোঠা পার হতে চলল। তিন আঙুল চেপে তিনি সমস্ত বুঝে নিলেন—শ্লেষ্মা, বায়ু, পিত্ত।

খল নেড়ে ওষুধ হল, বটিকা বের হল, যাবার আগে বদ্যি জানালেন—কাল সকালে যদি রোগী ভাল থাকে তো আসব।

আড়ালে বাগীশমশাই শুনলেন রোগের বৃত্তান্ত। কাল এসে বাসা বেঁধেছে। জীবনের আশা কম।

বাগীশগৃহিণী সেই রাত্রে আনলেন শেতলামায়ের চরণামৃত। মান্‌সিক করলো জোড়া পাঁঠার। গিরিবালা করলো অক্লান্ত সেবা। চাঁপা হয়ে গেল অচল পাথর। মাত্র ক'ঘণ্টায় হাবুলের দেহটা হয়ে উঠেছে ফ্যাকাশে রক্তহীন।

বিরাট ভূমিকম্পে যেন সমস্ত ওলোট পালোট হয়ে গেল। চোরাবালুর ধ্বসে চাঁপার জীবননদী বুঝি অন্যখাদে বইবে এবার, কিসের আহ্বান শুনতে পেয়েছে চাঁপা! সাগরের, যে সাগরের ডাক্ আজ সাত বছর ধরে তার অন্তর-তটিনীকে উদ্‌ভ্রান্ত উত্তাল করে রেখেছে।

প্রদীপের সলতেটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল গিরিবালা। ভেতরে মাত্র দুজন, গিরিবালা আস্তে ডাকল—চাঁপা! বসে বসে সারা রাত ভাবলে—যা হয়ে গেছে তা আর কি ফিরবে? এখনো রাত অনেক আছে কথাটা ভেবে দেখ।

ভেজা স্বরে উত্তর দিল চাঁপা—তা হয়না সই, না আমি পারবনি…তোকে পারতেই হবে। এই রাত্রেই তোকে

ঘর ছাড়তে হবে···যেখানে ইচ্ছা, যেথা খুশী চলে যা, এই বিষাক্ত মানুষগুলোর ছায়া এড়িয়ে তোকে বাঁচতে হবে চাঁপা। সে জায়গা যদি নরকও হয় ক্ষতি নেই—এই সমাজের মতো এমন নির্মম নয়, অত্যাচারী নয়, গলিত বিষাক্ত পঙ্গু নয়···

—ওঃ চুপ কর সই, যা ভাগ্যে লিখা আছে তাই ঘটুক আমি যেতে পারবনি, না—পারবনি।

গিরিবালা ঘন হয়ে বসল—ওরে পোড়ারমুখী, অবুঝ হসনি, রাত পোহালে কাল কি অবস্থা ঘটবে জানিস না? তোর মার মতো নির্মমভাবে নিজেকে আগুনে সঁপে দিতে হবে। সমাজের শাসন, শাস্ত্রের বিধান, ধর্মের দোহাই, সতীত্বের অলীক পুণ্য—সমস্ত তোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে হবে সই। আমার সময় আসেনি, যদি আসে দেখাব কেমন করে জবাব দিতে হয়···। কি তুই পেয়েছিস? জীবনের কতটুকু তুই জানতে পেরেছিস···অত্যাচার, অবিচার আর চোখের জল, এই তোর সারাবয়েসেরপুঁজী। আজ সমস্ত পাক সরাতে হবে চাঁপা। জীবনকে ভরাতে হবে নোতুন স্বপ্নে। আর কতকাল আমরা এই অন্ধকারে হাতড়ে মরবো। অন্ততঃ তুই একজন সত্যকারের মুক্তির আনন্দ পা, তুই-ই প্রথম দেখা আলোপথ। তোর কঠিন আঘাতে এই ঘুন-ধরা সমাজটা একবার কেঁপে উঠুক। আমি চোখ ভরে দেখি ওদের ভীতিবিহ্বল, অসহায় ধর্মভীরু পাণ্ডুর মূর্ত্তিগুলো···ওঃ তুই কাঁদছিস? কাঁদবার এ সময় নয় সই, তোকে আজ পথে নামতেই হবে, আয় সাজিয়ে দি, আজ চরম পরীক্ষার রাত্রি। জানি জানি তুই পারবি পারবি।

চাঁপা অঝোরে কাঁদছে বাড়ীর উঠানে বাইরে অনেকগুলো চাপা স্বর ঘুরে বেড়াচ্ছে। শাশুড়ীর সুউচ্চ ক্রন্দন বহুদূর থেকেও শোনা যায়, কয়েক জন দরজায় ধাক্কা দিয়ে গেছে গিরিবালা দরজা খোলেনি।

—আমার কথা রাখ চাঁপা। সকাল হতে আর দেরী নেই। এ সুযুগ হারালে জীবনও হারাবি। ওরা তোকে পুড়িয়ে মারবে। ঐ সুন্দর দেহটা আগুনের তাপে ঝলসাবে, না না অসহ্য! পোড়া মাংসগুলো দেখে ওদের চোখ আনন্দে নাচবে, তোর ছাই দিয়ে ওরা গাঁথবে সমাজের কঙ্কাল ভিত্তি।···ভেবে দেখ, একদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে জীবনের ইশারা। একদিকে মনগড়া ফাঁকা পুণ্য সতীত্ব, অন্যদিকে—প্রেম ভালবাসা সুখ, তোর হরিদাসপুর—তোর রাখাল দা···

শেষ কথায় চাঁপা চমকে ওঠে, অস্পষ্ট শিহরণ সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে।

তবু এই অন্ধকার অনিশ্চিতের মধ্যে পা বাড়াতে গা ছম ছম করে। বিরাট একটা শঙ্কা পথ আগলে দাঁড়াতে চায়। সামনের নিঝুম রাত্রির মতো তারও ভবিষ্যৎ কি অন্ধকার?

দুই সখী শেষ বারের মতো আলিংগনে বুক ভরে নিল। সঙ্গে কিছুই নিল না চাঁপা, শুধু বহু যত্নে রক্ষিত কি একটা জিনিস আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিল।

গিরিবালা সমস্ত ঠিক করেই রেখেছিল। আগুনের মালসাটা মাথার ওপর বসিয়ে দিয়ে একবার পেছনে চেয়ে নিল। না কেউ নেই, বাইরে বাঁশ কাটার শব্দ।

কোঁচড ভর্ত্তি রইল গুঁড়ো ধুনো। তার পথের অস্ত্র আগুনের মালসা আর ধুনো—এই নিয়ে কাটাতে হবে দীর্ঘপথ।

এক মুঠো করে ধুনো ছড়িয়ে দেয় আগুনের মালসার ওপর তখনি জ্বলে ওঠে দপ করে। তারি আলোয় পথ চিনে চলে চাঁপা। নাক পর্য্যন্ত ঘোমটা সাদা কাপড়ে ঢাকা মূর্ত্তিটা খিড়কির দোর দিয়ে এসে দাঁড়াল বাঁশ বাগানে। এগিয়ে চলেছে চাঁপা। ঐ তো সামনে বাউরীদের ভিটের জমি, শিমূলতলির বিল বিপিনকাকার হাতে লাগান আমগাছ।

আবছা অন্ধকারে চাঁপা দেখল আগড়তলির জমি শস্যহীন। আম গাছটায় বোধহয় বোল এসেছে। তেঁতুল তলায় এসে একটু দাঁড়াল চাঁপা, অদূরে আধ-ভাঙা পৈত্রিক ভিটেটা তারি দিকে যেন চেয়ে আছে।

এক মুহূর্ত্তে যেন সমস্ত বাল্য কৈশোরটা ছলাৎ করে উঠল। না, আর দাঁড়ালে চলবে না, অজানার পথে নেমে জানাকে নিয়ে মিথ্যা টানাটানি! হে প্রিয় অতীত, তুমি স্মৃতি হয়েই থাকো, বিদায়।—

সেই রাত্রে গ্রামের অনেকেই দেখল আলেয়া ভূত। প্রাচীনরা বললেন--নিশ্চয়ই অমঙ্গল কিছু ঘটবে। গ্রামের ছেলে বুড়ো বিস্মিত হয়ে দেখল কেমন করে আলেয়া ভূত

দূরে বহুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একবার জলে আর নেভে প্রেতযোনির প্রত্যক্ষ দর্শনে সেই রাত্রে অনেকেরই চোখে ঘুম এলো না।

*   *   *

এখানেই এই রাত্রে মাঠের মধ্যে চাঁপাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা ফিরে যেতে পারি। কিন্তু তবু মনটা কেমন খচ্‌খচ্‌ করে। এই অভিসারিকাটির শেষ পরিণতিটা দেখবার জন্যে আর একটু এগিয়ে চলুন।

*   *   *

রাত ভোর হল। পাখীর ডানায় জাগল শব্দ, পদ্মকলির বুকে জড়িয়ে গেল জাগরণী সুর, নবদিবসের বার্তাবাহী ঊষা ছুটলো দিক হতে দিগন্তে—গ্রাম থেকে গ্রামান্তে। জাগল সবাই, পড়ল সাড়া, কাঁপল সূর্য্যমুখী!

আলো ফুট্‌লো, চিরশ্যামল বনে—চাঁপার মনে। রাখালের ছোট্ট আঙিনায় লুটিয়ে পড়ল সোনালী আলো। রাখাল গাইছে গোবিন্দদাসের পদ:

> নন্দনন্দন চন্দচন্দন গন্ধ নিন্দিত অঙ্গ
> জলদ সুন্দর কম্বু কন্দর নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
> প্রেমে আকুল গোপ গোকুল কুলজ কামিনী কান্ত
> কুসুম রঞ্জন মঞ্জু বঞ্জুল কুঞ্জ মন্দিরে শান্ত॥

ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে আঙিনায় এসে দাঁড়াল চাঁপা—রাখালদা!

ভোরের শুকতারা যেমন এসে দাঁড়ায় উষার দ্বারে। চাঁপার এ আসা নয়—আবির্ভাব। সেই বহুশ্রুত ডাকটা আজ এই নির্জন নিস্তব্ধ দ্বারে নোতুন সুরে আলোড়িত হয়ে ওঠে। এ ডাক শুধু নীরব শব্দই নয়—ছন্দিত নন্দিত সুর মাধুর্য্যে ভরা।

রাখাল এগিয়ে এসে হাত ধরে—এতো দিনে মনে পড়ল সই! এসো—

চাঁপা আঁচল থেকে খোলে বহুযত্নে রক্ষিত সেই তুলসীমালা।

রাখাল গান ধরলো। এঁকে দিল তার সাধের "রসকলি"। এতদিনে ফুটল চাঁপাকলি।

কেমন এক উদাস দৃষ্টিতে চাঁপা পিছন ফিরে তাকাল। ফেলে আসা পথটা কি যেন বল্‌তে চায়। কে জানে গিরিবালার লাঞ্ছনা কতদূর এগিয়েছে। চাঁপা তাকে কি দেবে? কিছু নয়, শুধু কৃতজ্ঞচিত্তে জানাল একটা ভক্তিনম্র প্রণাম।

দুই তীর

শ্রীপ্রতীপ দাশগুপ্ত

কোমল রৌদ্র-ছোঁয়ান আলো আর ভীরু ভীরু
চোখে ম্লানিমা-ঝরা মানসের দুই তীর,
দ্যুতিমান, মহীয়ান আর অস্বর্গ-কালোয়
যারা করে ভীড়
তাদেরই কথা—তরুণ রৌদ্র, বৃদ্ধ আঁধার
মানসের; যুবক আমি এঁকে যাই,
শুধু আঁকি; ভাল, না-ভাল লাগার
বিশ্লেষণে মন স্থবির, তবু অবসর নাই।

এক তীরে মনসিজ স্বপনের
ঊর্ণ শুধু বোনে,
অন্য তীরে অ-যাযাবরী রাতের
বিষাক্ত প্রহর সে গোণে।
সুমধুর-কাকলি-ঘেরা সুরভিত
ছায়াচ্ছন্ন পুষ্প-বীথি,
আরো আছে বীভৎস বিভীষিকা,
প্রেতের কারাগার···অশুভ তিথি।

এক দেশ গহন সুপ্তি-মগন
স্বপ্নের আলোভরা,
অন্য দেশ মৃত, অসুন্দর
অন্ধকার-ঝরা।

বিশ্রাম

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

*

বিলাপ

*

ফটো : আনন্দ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

রাজনীতিবিদ শরৎচন্দ্র

অজিত ভট্টাচার্য্য

(১)

স্বাধীনতা স্বপ্নের যুগে যে কয়জন দেশনেতার নাম আমাদের সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে, তার অন্যতম হলেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ইংরাজকে দেশ থেকে বিতাড়িত করে স্বদেশী শাসন প্রতিষ্ঠায় তাঁর ছিল মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা। কিন্তু দেশ-প্রেমিক হিসাবে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের সেদিনের ভূমিকা আজ আমাদের অনেকেরই কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। এ প্রবন্ধে সেদিনের স্বাধীনতা আন্দোলনে কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের কিছু ঘটনা সম্বন্ধে আলোকপাত করিবার চেষ্টা করছি।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে এলেন কলকাতায় ১৩০৩ সালে। লেখক হিসাবে তখন তাঁর খ্যাতি বাংলাদেশে যথেষ্ট—পল্লী-সমাজ, চন্দ্রনাথ, বৈকুন্ঠের উইল, আর অরক্ষণীয়া তখন প্রকাশ হয়েছে। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে সারা ব্রহ্মদেশে কটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সে সময় "ভারতবর্ষ" পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। বন্ধু প্রমথবাবুর অনুরোধে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস "বিরাজ-বৌ" ভারতবর্ষে প্রকাশিত হল। ভারতবাসী শরৎচন্দ্রকে প্রতিভাশীল সাহিত্যিক বলে মেনে নিলেন। এর পর যমুনায় প্রকাশিত হতে থাকল "চরিত্র হীন"। দেশ-বাসীগণ বিস্মিত হোল এক প্রবাসী সাহিত্যিকের এই অপূর্ব্ব প্রতিভায়।

রেঙ্গুনে চাকরী করা কালীন এক ইংরাজ অফিসারের সাথে শরৎচন্দ্রের একদিন প্রায় খণ্ডযুদ্ধের সূচনা হয়। সাহেব ইরেস্পনসিবল্ ননসেন্স বলায় শরৎচন্দ্র সেদিন তাকে ক্ষমা করেন নি। সাহেবের নাকের উপর হাত তুলে সেদিন তিনি বলেছিলেন—"তোমার চাকরীর পরোয়া করিনে সাহেব, জেনো আমরা বাঙ্গালী, চিনি লাঠি আর বুলেট।" সেদিন আর সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আরম্ভ হয়েছিল সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন।

শরৎচন্দ্র ফিরে এলেন কোলকাতায়, প্রমথবাবুর চেষ্টায় "ভারতবর্ষে"—শ্রীকান্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হতে আরম্ভ করল। সারা দেশে আলোড়ন পড়ে গেল "শ্রীকান্ত" নিয়ে। তাঁর অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তাও প্রমথবাবু প্রকাশক হরিদাসবাবুর মারফৎ মাসিক ১০০৲ (এক শত টাকা)র ব্যবস্থা করে কিছুটা লাঘব করে দিয়েছিলেন। সে সময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ কিছু কিছু সাহিত্য চর্চ্চা করতেন। তাঁর পরিচালনায় একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ হতো তখন, শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে নিজেই আলাপ করলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এবং তাঁর বন্ধুত্বপ্রার্থী হলেন। দেশবন্ধুর সাথে তাঁর প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল সাহিত্যের মাধ্যমেই।

দেশবন্ধুর পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের সে সময় কয়েকটি গল্প প্রকাশ হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখ যোগ্য গল্প হোল "স্বামী।" এই সময় শরৎচন্দ্র আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের নেতৃত্বে চরকা আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধুর সংস্পর্শে শরৎচন্দ্র হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হয়ে প্রকাশ্য আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কোলকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসল কংগ্রেসের অধিবেশন। আফ্রিকায় জয় লাভের পর মহাত্মাজী ফিরে এলেন দেশে। গান্ধিজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হোল, শরৎচন্দ্রও সেদিন পিছিয়ে থাকলেন না। সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার নিলেন তিনি। আই, সি, এস, এর চাকরীর মায়া ত্যাগ করে সুভাষচন্দ্র এ সময় ফিরে এলেন দেশে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের এ সময় বন্ধুত্ব হোল, ইলেকসন, বর্জ্জন নীতির বিরোধিতা করলেন শরৎচন্দ্র। দেশবন্ধুও তাঁর সঙ্গে এক মত হলেন। ১৯২২ সালে গয়া অধিবেশনে দেশবন্ধু সভাপতি হলেন।

রাজাগোপালাচারী মহাত্মাজীর বর্জ্জন নীতির পক্ষ হয়ে এক মুলতুবী প্রশ্ন তুললেন। দেশবন্ধুর পরাজয় আসন্ন

দেখে শরৎচন্দ্র নির্ব্বাচনের পূর্ব্বেই অসুস্থতার অজুহাতে কোলকাতায় ফিরে এলেন। দেশবন্ধুও এ সময় কংগ্রেস সভাপতিত্বে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতায় ফিরে এসে স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার স্থির করলেন। দেশবন্ধুর পার্শে এসে সেই সময় দাঁড়িয়েছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্র সে সময়ও ছিলেন হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" তখন প্রকাশিত হয়েছে। দেশের বহু যুবক শরৎচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। শরৎচন্দ্র বুঝিয়েছেন সব্যসাচীর অবলম্বিত পথেই দেশের মুক্তি সম্ভবপর, দেশের কাজে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, শরৎচন্দ্র গোপনে যোগদান করলেন এনার্কিষ্ট পার্টির সঙ্গে। এ সময় গোয়েন্দা বিভাগও তৎপর হয়ে উঠল। শরৎচন্দ্রের সহযোগী বিপিন গাঙ্গুলী ও কানাই গাঙ্গুলী পুলিশের শ্যেন দৃষ্টিতে নজরবন্দী হলেন। শরৎচন্দ্র কিন্তু নির্বিকারভাবে কাজ চালিয়ে চলছেন। গোয়েন্দা বিভাগ আগলে বসেরইল তাঁর দরজা। এই সময় প্রকাশ হোল "দেনা-পাওনা", "নব-বিধান।" লেখক হিসাবে উৎসাহী পাঠকের ছদ্মবেশে সহযাত্রীর মাধ্যমে গোয়েন্দা পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। অহিংসা নীতির সমর্থক শরৎচন্দ্র কোন দিনই ছিলেন না। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এ নিয়ে তার প্রায়ই আলোচনা হোত। তিনি বলতেন, "সব্যসাচীর অবলম্বিত পথেই দেশের স্বাধীনতা আসা সম্ভব। তার জন্যে বীরের মত লড়তে হবে। পড়ে মার খাওয়াকে যারা সমর্থন করেন আমি তাদের দলে নেই।" দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে দেশবন্ধুর নীতির সমর্থনে রেজ'লউশন পাশ হবার পর গান্ধীজী পদত্যাগ করলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু সভাপতি হলেন। এর অল্পদিন পরেই দেশবন্ধু পরলোক গমন করেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ শরৎচন্দ্রের কাছে এসে পৌঁছাতে ছোট শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠলেন তিনি। তিন দিন তিন রাত জল স্পর্শ না করে শুধু অঝোর ধারায় কাঁদলেন।

সুভাষচন্দ্র যখন কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, শরৎচন্দ্র তখন হাওড়া কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে তখন জে, এম, সেনগুপ্ত আর সুভাষচন্দ্র। এদের দুটি দল নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তারে চেষ্টা করে চলেছেন। এ সময় বীরেন শাসমলের অভ্যুদয় ঘটেছে রাজনৈতিক আকাশে সুভাষচন্দ্রের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ। শরৎচন্দ্র অসুস্থতার জন্য রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে চাইলেন। বীরেন শাসমল বললেন, "দেশবন্ধু নেই, আপনি যদি এ সময় সরে দাঁড়ান, তা'হলে এই মূক দেশবাসীর জন্য লড়বে কে?"

শরৎচন্দ্র সান্ত্বনা দিলেন, আমি জানি তোমরা অজেয়, তোমরাই একমাত্র পারবে দেশবাসীর এই চরম দুর্দ্দিনে দাঁড়াতে। সুভাষচন্দ্রকে বললেন, "জান সুভাষ, তোমাকে নিয়ে আমার কত স্বপ্ন। পথের দাবীর সব্যসাচীর স্বপ্ন কোন দিন মিথ্যা হতে পারে না।" সাহিত্য সাধনায় মন দিলেন তিনি, প্রকাশ হোল "শ্রীকান্ত" তৃতীয় পর্ব্ব আর "রমা"। এ সময় সুভাষচন্দ্র ও জে, এম, সেনগুপ্ত উভয়েই বন্দী হলেন। কর্ত্তৃপক্ষের খামখেয়ালীর প্রতিবাদে সুভাষচন্দ্র অনশন সুরু করলেন। শরৎচন্দ্র তখন অসুস্থ। তাঁর কাছে এখন পৌঁছাতে তিনি ছুটলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সুভাষচন্দ্রকে বোঝালেন, "আমার পথের দাবীর সব্যসাচীর সাধনা কি এই? সুভাষ, তুমি অনশন ত্যাগ কর। তোমাকে ভুললে চলবে না, তুমি বীর। ওঠ, তাজা রক্ত নিয়ে তোমাকে খেলা করতে হবে। যদি মরতে চাও, বীরের মত মর। আমার পথের দাবীর সব্যসাচীর এভাবে মৃত্যু হতে পারে না। আমি অসুস্থ শরীরে তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমায় নিরাশ করো না।" শরৎচন্দ্রকে গুরুদেবের মত মান্য করতেন সুভাষচন্দ্র, তিনি অনশন ত্যাগ করলেন।

শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন, শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্ব্ব, স্বদেশ ও সভ্যতা এর কিছুদিন পরে প্রকাশ হোল। সুভাষচন্দ্র অসুস্থ হয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইউরোপ যাত্রা করলেন। গুজবে শোনা গেল যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। শরৎচন্দ্র একেবারে মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন তার সব্যসাচীর স্বপ্ন তাহলে কে সফল করবে? শরৎচন্দ্র দেবতার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন, এবার রাজনীতি হতে সত্য সত্যই বিদায় নিলেন তিনি। চারিদিক তখন তাঁর অন্ধকার ঠেকতে লাগল। কারণ মনের সাথী তখন তাঁর কেউ ছিল

না। শরৎচন্দ্র রাজনীতি থেকে বিদায় নিচ্ছেন শুনে কাজী নজরুল ইসলাম এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অনুরোধ জানা'লেন, "দেশের কাজ থেকে আপনি সরে যাবেন না। এখনো আপনার কাছে দেশ অনেক কিছু আশা করে।" শরৎচন্দ্র নজরুলকে অনেক বোঝালেন। বললেন, আমার শরীর ভেঙে গেছে, তোমরা মিথ্যা অনুযোগ করছ আমাকে। শরৎচন্দ্র ধীরে ধীরে ত্যাগ করলেন তাঁর রাজনৈতিক জীবন। কারণ সব্যসাচীর অভাব তখন তিনি এতই অনুভব করলেন যে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করবার মত মানসিক অবস্থা তাঁর তখন আর ছিল না।

এরপর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বহু পরিবর্তন এসেছে; কিন্তু সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জীবনের এই দিকটা আমাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে, যা ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়।

বাঙলার চর্যাপদ

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ, পি-এইচ-ডি, অধ্যাপক, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রাগ পটমঞ্জরী।

কাআ তরুবর পঞ্চ-বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিঅ মহাসুহ-পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥
সকল সমাহিঅ কাহি করিঅই।
সুখদুখেতেঁ নিচিত মরিআই॥
এড়ি এউ ছান্দকবান্ধ করণক পাটের আস।
সুনুপাখ ভিড়ি লাহরে পাস॥
ভণই লুই আম্‌হে সাণে দিঠা।
ধমণ চমণ বেণি পাণ্ডি বইঠা॥

পটমঞ্জরী রাগিণীতে গেয় পদটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন। পদকর্তা যে লুই বা লুইপাদ তা ভণিতাতেই সুস্পষ্ট।

দেহ একটি বিশাল বৃক্ষ এবং পঞ্চেন্দ্রিয় তার শাখা। পঞ্চেন্দ্রিয়কে সংযত না করায় চিত্ত হয়েছে চঞ্চল; পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের মধ্যে মন আছে একবারে ডুবে; তাতে কামনা-বাসনা ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে; সুতরাং এই দেহকে রক্ষা করা বড়ই সুকঠিন। কাল অর্থাৎ মৃত্যু দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে তাকে কবলিত করতে উদ্যত। এই অবস্থায় সিদ্ধাচার্য লুইপাদ দেহীকে লক্ষ্য করে উপদেশ দিলেন যে মৃত্যু তার অতিনিকটবর্তী। এখনও তুমি সাবধান হও; চিত্তকে দৃঢ় করে সংযমী হও; ইন্দ্রিয়ের শক্তিকে একেবারে নষ্ট করে দাও এবং বস্তুজগৎ থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মাভিমুখী করে। যে-স্বল্প সুখের সন্ধানে ছুটছ ইন্দ্রিয়-চালিত হয়ে, সে-সুখ মরীচিকাবৎ মায়াশ্রয়ী। সুতরাং সেই মায়াসুখের মোহে তার পেছনে না ছুটে 'মহাসুখের' অনুসন্ধান কর। সেই মহাসুখ-লাভে তুমি হবে অজয়, অমর। একমাত্র গুরুই সেই মহাসুখের সন্ধান দিতে পারেন। তথাকথিত জপ-তপ, তন্ত্র-মন্ত্রে মহাসুখের সন্ধান মেলে না। দেহ সাধনে এই সুখের অধিকারী হওয়া যায়; কিন্তু এই দেহসাধন কি করে করা যায় তা অভিজ্ঞ গুরুই শুধু জানেন; সুতরাং এই সাধনবিদ্যা অধিগত করতে হলে কেবল গুরুকেই আশ্রয় করতে হবে; অনভিজ্ঞ অন্য কাউকে অবলম্বন করলে তোমার কায়সাধন হবে না। অতএব কায়যোগী গুরুর কাছে গিয়ে সাধনার প্রণালী জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও।

কেউ হয়ত বলতে পারেন, দেহসাধনের প্রয়োজন কি? সমাধিস্থ হলেই তো প্রকৃত সুখ লভ্য। চিত্তবৃত্তিনিরোধে সমাধির কথা শাস্ত্রেও আছে এবং মুনি ঋষিরা যখন সমাধিতে অবস্থান করতেন, তখন জাগতিক জ্ঞান তাঁদের থাকতো না এবং চিত্তের বৈক্লব্যও আসত না। কাজেই শাস্ত্রসম্মত সমাধির ব্যবস্থাই তো গ্রহণ করা যেতে পারে। এর উত্তরে কায়যোগী বলছেন, সমাধিতে ইন্দ্রিয়বর্গ সংযত হওয়ায় সুখের অভ্যুদয় হয়; কিন্তু সমাধিভঙ্গে মন পুনরায় ইন্দ্রিয়-বশীভূত হয়ে বস্তুজগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং আপাত সুখের মায়াপাশে আবদ্ধ হয়ে চরম দুঃখকেই বরণ করে। সুতরাং সমাধি অবস্থায় সুখ এবং সমাধিভঙ্গে দুঃখ—এই দুইয়ের মধ্যে পড়ে দেহী অনতিকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই হেতু সিদ্ধাচার্যরা চিরদিনই সমাধির বিরুদ্ধে। লুইপাদ স্পষ্টতঃ নির্দেশ দিচ্ছেন যে প্রকৃত সুখ বা 'মহাসুখ' লাভ করতে হলে ছন্দোবদ্ধ ইন্দ্রিয়ের পরিপাটিতাকে ত্যাগ কর। করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রাশি ছন্দোবদ্ধের ন্যায় সর্বদাই অবিচ্ছিন্ন। ইন্দ্রিয়গুলির এমনই অদ্ভুত শক্তি যে চোখে কিছু দেখলে বা কানে কিছু শুনলে মন পরিতৃপ্ত হয় না; তার আঘ্রাণ, স্বাদ গ্রহণের পর তাকে স্পর্শ করতে ইচ্ছা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের কাজ আরম্ভ হলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলি পরপর এসে সহায়তা করে। এইরূপে দেহকে সম্যক আয়ত্তে এনে তারা হয় পরিপুষ্ট এবং ফলে হয় দেহের অনতিকালেই বিনাশ সাধন। সেইজন্য সিদ্ধযোগী নির্দেশ দিলেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের কৌশল বুঝে তাদের ত্যাগ করে শূন্যতারূপ পক্ষকে পাশে চেপে ধর। 'শূন্যতা করুণা ভিন্নম্ বোধিচিত্তম্'। জগৎ সংসারের শূন্যতাজ্ঞান ও বিশ্বব্যাপী করুণায় বোধিসত্ত্ব বা মহাসুখ। জগতের কোনো বস্তুরই নিজের কোনো অস্তিত্ব নেই, নিজের বর্তমান স্বরূপের জন্য প্রত্যেকেই অন্য কোন স্বরূপ-ধর্মে নির্ভরশীল; সুতরাং প্রত্যেক বস্তুই অস্তিত্বহীন—এই বোধই শূন্যতাজ্ঞান। এই শূন্যতাজ্ঞানে জাগতিক তথাকথিত সব সুখ মায়া বা মিথ্যা বলে মনে হয়। সেইজন্য লুইপাদ বললেন, শূন্যতাকে গ্রহণ কর। তিনি সাণে অর্থাৎ ইঙ্গিতে ইশারায় বা অনুভূতি দিয়ে এই শূন্যতাকে জেনেছেন। পুঁথি-পত্র, তন্ত্র-মন্ত্র, ব্যাখ্যা আলোচনায় তিনি এই জ্ঞানের সন্ধান করতে পারেন নি। তিনি আরও বলেছেন, এই শূন্যতার সাহায্যে মহাসুখ লাভ করতে হলে ধমন-চমনকে আসন করে বসতে হবে। এই ধমন-চমন হল যথাক্রমে ইড়া ও পিঙ্গলা। দেহযোগী সাধনায় সুপ্ত কুল-কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত ও ঊর্ধ্বাভিমুখী করে যখন তাঁকে নিয়ে যান সুষুম্নার পথ দিয়ে, তখন সেই কুণ্ডলিনী বা অবধূতিকা শক্তি পার্শ্বস্থিত নাড়ীদ্বয় ইড়া-পিঙ্গলার সঙ্গে মিলিত হবার বিশেষ চেষ্টা করেন। যদি মিলন-সংঘটন হয়, তবে সাধকের সব সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়; আর যদি সেই শক্তি এই দুইটি নাড়ীকে এড়িয়ে মধ্যবর্তী সুষুম্নার পথে ষট্‌চক্র ভেদ করে মস্তকস্থিত সহস্রারপদ্মে মিলিত হতে পারেন, তবেই সাধকের হয় 'মহাসুখ' লাভ। এই মহাসুখ লাভে সাধকের মধ্যে সব একাকার হয়ে যায়; আত্ম-পর জ্ঞান হয় লুপ্ত, ভবমোহের হয় অবসান; দিন-রাত্রির কোনো ভেদ থাকে না, সুখে সুখানুভূতি বা দুঃখে দুঃখবোধ হয় বিনষ্ট, বস্তু-জগতের জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়। এই মহাসুখ-লাভের পথে কণ্টকস্বরূপ হল ধমন-চমন বা ইড়া পিঙ্গলা নাড়ীদ্বয়। তাই সিদ্ধাচার্য লুইপাদ বিশেষ করে বলেছেন যে কায়সাধনে ঐ দুই নাড়ীকে আসন করে বসে থাকতে হবে, যাতে তাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায়। পিঁড়িতে চেপে বসলে যেমন তার নিচের থেকে কোনো জিনিস উঠতে পারে না, তেমনই অত্যন্ত সংযমী হয়ে মহাসুখের পরিপন্থী উক্ত নাড়ীদ্বয়কে নিস্তেজ করে রাখলে তবেই হবে শূন্যতাজ্ঞান বা মহাসুখ-লাভ।

পদকর্তা লুইপাদ আদি সিদ্ধাচার্য বলে বিদিত। এঁকে কোথাও কোথাও রুইপাদও বলা হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি মৎস্যেন্দ্রনাথ নামে পরিচিত। সুতরাং লুই বা রুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন বলে মনে হয়। এঁর জন্মস্থান বাংলাদেশে চন্দ্রদ্বীপে। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন যে লুই 'অভিসময়বিভঙ্গ', শ্রীভগবদভিসময় ও তত্ত্বস্বভাব দোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি' নামে তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। [দ্রষ্টব্য, চর্যাগীতি পদাবলী, পৃ ৭] অভিসময়-বিভঙ্গ-রচনাকালে দীপংকর শ্রীজ্ঞান লুইকে সাহায্য করেন। ১০৩৮ খৃষ্টাব্দে দীপংকর যখন তিব্বত যাত্রা করেন, তখন তাঁর বয়স ৫৮ বৎসর। লুই দীপংকরের সমসাময়িক হলে তিনি একাদশ শতকের প্রথমার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অনুমান করা যায়।

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে আবার অর্থ কষ্ট ঘটিল। রাজেন্দ্রবাবুর উঠানে বর্ষায় ভিজিয়া ষ্টেজ খারাপ হইতে লাগিল। অর্দ্ধেন্দু বাবু আবার টিকিট বেচিবার প্রস্তাব তুলিলেন। গিরীশ-বাবু আবার বাঁকিয়া বসিলেন। তিনি এবার বলিলেন, যদি ছাতুবাবুর মাঠে প্যাভিলিয়ন (নাট্যশালা) বাঁধিতে পার, সম্মত আছি, তখনকার পক্ষে এ অসম্ভব প্রস্তাব শুনিয়া সকলে চমকাইয়া উঠিল। গিরীশবাবু আবার দলত্যাগ করিলেন। রাজেন্দ্রবাবুর বাড়ীর উঠান এত বড় নয় যে তাহাতে টিকিট বেচিয়া দর্শকের স্থান কুলাইতে পারা যায়, কাজেই ইতিকর্ত্তব্যতা ভাবিতে ভাবিতে দিনও চলিয়া গেল, ষ্টেজও পচিয়া গেল, দলও ভাঙ্গিয়া গেল। নগেন্দ্র বাবু, ধর্ম্মদাস বাবু, মতিবাবু ও অর্দ্ধেন্দু বাবু অতি নিকট প্রতিবেশী ছিলেন। ইহারা নূতন পন্থা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ইতিপূর্ব্বে চাঁদা আদায় সূত্রে ইহারা কয়েক জন ব্যক্তির সহানুভূতি পাইয়াছিলেন। শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পাল, শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পাল [২য়] ওরফে বুধো পাল, অমৃতলাল পাল, শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ইনস্পেকটার, ব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল নিয়োগী [পরে এটর্ণী], কটিক ওরফে হরকুমার গঙ্গোপাধ্যায় [যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতা], নগেন্দ্রবাবুর বড় ভাই দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পিসতুতো ভাই কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ইহারাই যেন শেষে এই নাট্যসম্প্রদায়ের অভিভাবকরূপে দেখা শুনা করিতেন ও পরামর্শ দিতেন।

চাঁদা আদায়ের সময় ৺রসিকমোহন নিয়োগীর মধ্যম পৌত্র শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী ইহাদের কিছু চাঁদা দেন। শেষে এই ব্যক্তি ইহাদের দুর্দ্দশার সময়ে সাহায্য করিতে আপনা হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভুবনবাবু তখন কিশোর-বয়স্ক তাঁহার ভরসা পাইয়া অর্দ্ধেন্দু বাবু আবার দল গড়িতে প্রস্তুত হইলেন। স্থানের কথা বলায় ভুবন বাবু স্বীয় পিতামহ-প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণার ঘাটের চাঁদনীর উপর বার-দ্বারী বৈঠকখানা ছাড়িয়া দিলেন। ১২৭৮ সালের শীতকালে ১২৭২ সালের প্রথমে এই বাড়ীতে দল বসিল। গিরীশবাবু ব্যতীত লীলাবতীর দলের সকলেই আসিয়া জুটিলেন। পূর্ব্বোক্ত বন্ধুবান্ধবগণের যত্নে এবার কার্য্যের একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। নগেন্দ্রবাবু সম্পাদক [সেক্রেটারী], ধর্ম্মদাস বাবু কর্ম্মাধ্যক্ষ [ম্যানেজার], কার্ত্তিকবাবু বেশকারী [ড্রেসার] আর অর্দ্ধেন্দু বাবু পরিচালক ও শিক্ষক [Director ও Teacher] হইলেন আদি ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় আবশ্যক মত নেপথ্য হইতে গান গাইতেন। এই সময় হইতে সুরেশ চন্দ্র মিত্র, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীনন্দলাল ঘোষ, শ্রীমহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েক জনে

আর থিয়েটার করিবেন না বলিয়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার পর শ্যামবাজারের বেণীমাধব মিত্র এই দলের সভাপতি হন। অর্দ্ধেন্দু বাবুর প্রস্তাবে "নীলদর্পণ" অভিনয় করা স্থির হয়। আখড়াই আরম্ভ হইল। অতি উৎসাহে কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র অগ্রসর হইতে লাগিল। বেণীবাবুও অতি যত্ন সহকারে ইঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে গিরীশ বাবু একটি সখের যাত্রার দল বসাইয়া দিলেন। এই দলে তিনিই একটি সঙের পালা বাঁধিয়া দেন। তাহাতে একটি গানে প্রয়াগের লুপ্ত বেণী ত্রিধারা ভাগীরথী বর্ণনাত্মক একটি বড় সুন্দর গান ছিল। ঐ গানটীতে অর্দ্ধেন্দু বাবুদিগের নাট্যসম্প্রদায়ের সভাপতি হইতে গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধু মিত্রের নাম পর্য্যন্ত এমন কৌশলে গাঁথা যে, শুনিলে গিরীশবাবুর কবিত্বশক্তি ও শব্দচয়নক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। রাধামাধব বাবু এই সময়ে কোন কারণ বশতঃ বিদেশে যান। বিদেশ হইতে আসিয়া তিনি গিরীশবাবুর দলে যোগ দেন। তিনিই গিরীশবাবুর এই গানটি গাইতেন—

"লুপ্তবেণী ব'চ্ছে তেরো ধার।
তাতে পূর্ণ অর্দ্ধ-ইন্দু-কিরণ, সিঁদুরমাথা মতির হার।
নগ হতে ধারাধর সরস্বতী ক্ষীণকায়,
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায়,
শিব শম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি অবতার।
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু করে গান, কিবা ধর্ম্মক্ষেত্র স্থান,
অবিনাশী মুনিঋষি করছে বসে ধ্যান,
সবাই মিলে ডেকে বলে দীনবন্ধু কর পার।
কলঙ্কিত শশী হরষে অমৃত বরষে,
জ্ঞান হয় দীনের গৌরব যায় বুঝি খসে,
স্থানমাহাত্ম্যে হাড়ী শুঁড়ী পয়সা দে দেখে বাহার।
কিবা বালুময় বেলা, পালে পালে রেতের বেলা
ভুবনমোহন চরে করে গোপালে খেলা।
মিলে যত চাষা করে আশা নীলের গোড়ায় দিচ্ছে সার॥

এই গানটির বর্ণিতার্থ সহজেই বুঝা যাইতেছে। ইহার ফলিতার্থ এইরূপ,—"লুপ্তবেণী"—সভাপতি বেণীমাধব মিত্র, "তেরোধার"—১২।১৩ জন পৃষ্ঠপোষক ও অভিভাবক, "তাতে পূর্ণ-অর্দ্ধ-ইন্দু"—পূর্ণচন্দ্র মিত্র, শ্রী অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। "সিঁদুরমাথা মতির হার"—মতিলাল সুর। "নগ হতে ধারাধর"—নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী, তাঁহা হইতেই দল চলিতেছে। "সরস্বতী ক্ষীণকায়"—সকলেরই বিদ্যাভাব। "বিবিধ বিগ্রহ" অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর এই সকল বিগ্রহ অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল যুবক জুটিয়াছে। "শিবশম্ভুসুত মহেন্দ্রাদি অবতার"—শিবচন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কার্ত্তিকচন্দ্র পাল, মহেন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি। "অলক্ষ্যেতে গান"—বিষ্ণুবাবু নেপথ্য হইতে গান গাহিতেন। "কিবা—ধর্ম্মক্ষেত্রস্থান" শ্রীধর্ম্মদাস সুর ও শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। "অবিনাশী"—অবিনাশচন্দ্র কর। "দীনবন্ধু কর পার"—দীনবন্ধু মিত্রের পুস্তক অবলম্বন। "কলঙ্কিত শশী"—শশিলাল দাস শ্লেষাত্মক নাম বিসাড়ী হইয়া কলঙ্কিত। "অমৃতবরষে"—অমৃতলাল পাল একজন অভিভাবক। "পয়সা দে দেখে বাহার"—টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য। "বালুময় বেলা"—অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ওরফে (কাপ্তেন) বেলবাবু। "পালে পালে"—রাজেন্দ্রনাথ পাল, কার্ত্তিক পাল প্রভৃতি পাল উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ। "ভুবনমোহন চরে"—শ্রীভুবনমোহন নিয়োগী তাঁহার গঙ্গাতীরের বারদ্বারী বৈঠকখানায়। "গোপালে খেলা"—গোপালচন্দ্র দাস। "মিলে যত চাষা"—সদ্গোপ জাতীয় অভিনেতা ও বন্ধুবান্ধবগণ। "নীলের সার"—নীলদর্পণ লইয়া আখড়াই চলিতেছে।

গিরীশবাবুর এই গান শ্লেষাত্মক হইলেও ইহা লইয়া উভয় পক্ষে কোন শত্রুতা ঘটে নাই।

যাহা হউক এইরূপ আমোদ আহ্লাদে উৎসাহের মধ্যে ন্যাশান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায় অন্নপূর্ণার ঘাটের উপর ভুবন নিয়োগীর বৈঠকখানার দৃঢ় অধ্যবসায়ে ও মহাযত্নে নীলদর্পণের আখড়াই চালাইতে লাগিলেন। ১২৭৯ সালের কার্ত্তিক মাসে (৮৭২ নবেম্বরে) জগদ্ধাত্রী পূজার দিন নগেন্দ্রবাবুর বাড়িতে ইহাদের ড্রেস্ রিহার্সাল হইয়াছিল। এই অভিনয়ের কিছু পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ নাটককার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এই সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। তিনি তৎপূর্ব্বে কাশীতে হোমিওপাথী ডাক্তারী করিতেন। এই সময়ে তিনি কলিকাতায় আসিলে অর্দ্ধেন্দুবাবুর আগ্রহে

নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করেন। অমৃতবাবুর পূর্ব্বে যদুনাথ ভট্টাচার্য্য "সৈরিন্ধ্রীর" অংশ লইয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘচ্ছন্দ পুরুষ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে বধূ সাজাইলে মানাইত না। অমৃতবাবু সেই অংশ লইলেন। অমৃতবাবুর নিজের মুখে শুনা গিয়াছে যে অর্দ্ধেন্দুবাবুর নিকট তাঁহার থিয়েটারের হাতে খড়ি হইল। নবীনমাধবের মৃত্যু শয্যার দৃশ্যে সৈরিন্ধ্রীকে যে 'মড়াকান্না' কাঁদিতে হইত, অমৃতবাবু সহজে তাহা আয়ত্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। শেষে অমৃতবাবু নিজ বাড়ীর পার্শ্বস্থ একটা খালী ভাঙ্গা বাড়ীতে প্রত্যহ দু'প্রহর বেলায় গিয়া এই ক্রন্দন শিখিবার জন্ম সাধনা করিতেন। অর্দ্ধেন্দুবাবু সেখানে গিয়া কাঁদিতে শিখাইতেন, উভয়ে গলা মিলাইয়া কান্না অভ্যাস করিতেন। আট দশ দিন এইরূপ কঠোর সাধনায় অমৃতবাবু "মড়াকান্না" আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রত্যহ এই সাধনার বিষয় পল্লীস্থ স্ত্রীলোকেরা জানিত না, কাজেই রটিয়া গেল যে ভাঙ্গা বাড়ীতে ভূতে রোজ কাঁদে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে অভিনয়টিকে সর্ব্বপ্রকারে সহজ এবং ভাবশুদ্ধ করিবার জন্য এই সম্প্রদায় কিরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেন। ১৩০৭ সালের ২২ অগ্রহায়ণ তারিখে অর্দ্ধেন্দুবাবু বাঙ্গলা-থিয়েটারের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে এইরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন। ফল কথা যতদিন প্রত্যেক কথার প্রত্যেক শব্দের উপযুক্ত উচ্চারণভঙ্গী অভিনেতাদের হৃদয়ঙ্গম ও আয়ত্তীকৃত না হইত, ততদিন তাঁহারা ছাড়িতেন না। উক্ত অভিনয়ে নিম্নলিখিত দর্শন ও ভূয়োদর্শনের জন্যই ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতৃবর্গ যাহা শিক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নাট্যকলা-কৌশল প্রদর্শনে সর্ব্বতোভাবে উপযুক্ত হইয়াছিল। এই ব্যক্তিগণ এইরূপ অংশ লইয়াছিলেন,—

গোলক বসু	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
উড্ সাহেব	"
জনৈক রাইয়ত	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
নবীনমাধব	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
বিন্দুমাধব	কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
তোরাপ	মতিলাল সুর।
সাইচরণ	"
গোপ	মতিলাল সুর
নীলকরদিগের মোক্তার	"
সাধুচরণ	মহেন্দ্রলাল বসু
ম্যাজিষ্ট্রেট্	"
রোগ্ সাহেব	অবিনাশচন্দ্র কর
গোপীনাথ দেওয়ান	শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
নবীনমাধবের মোক্তার	গোপালচন্দ্র দাস
কবিরাজ	শশিলাল দাস
লাঠিয়াল	শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিত্র
রাখাল	যদুনাথ ভট্টাচার্য্য
পালাদী	গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়
সাবিত্রী	শ্রীঅর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী
সৈরিন্ধ্রী	শ্রীঅমৃতলাল বসু
সরলতা	শ্রীক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়
রেবতী	তিনকড়ি মান্না
পদী ময়রাণী	মহেন্দ্রলাল বসু
খুড়ী	অবিনাশচন্দ্র কর
আদুরী	গোপালচন্দ্র দাস

নগেন্দ্রবাবুর বাড়ী ড্রেস রিহার্সাল হইয়া যাইবার পর, অভিনয়ের অতিমাত্র সুখ্যাতি হইয়াছিল। এই উৎসাহে আর কাল বিলম্ব না করিয়া টিকিট বেচিয়া অভিনয় করিবার জন্য চেষ্টা চলিতে লাগিল। অবশেষে পাথুরেঘাটার মোড়ে মধুসূদন সান্যালের বৃহৎ বাড়ী পাওয়া গেল। এই বাড়ী এখন জোড়াসাঁকোর ঘড়ীওলাবাড়ী নামে খ্যাত। সান্যালদিগের তখন ভগ্নদশা। তাঁহারা মাসিক ৩০৲ টাকা ভাড়ায় উঠানটা ছাড়িয়া দিলেন। ধর্ম্মদাস সুর উঠানে ষ্টেজ বাঁধিতে লাগিলেন। ১২৭৯ সালের ২৩ অগ্রহায়ণ (১৮৭২। ৭ই ডিসেম্বর) শনিবার এখানে টিকিট বেচিয়া প্রথম অভিনয় হইবে স্থির হইল। বেলা চারিটার সময় হইতে টিকট বিক্রয় আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে সমস্ত টিকিট বিক্রীত হইয়া গিয়াছিল। সহরের অধিকাংশ ধনী রিজার্ভ সিটের টিকিট লইয়াছিলেন। তখন নাচের মজলিসে লোকে যেমন পোষাক পরিধান করিয়া যাইত, এই থিয়েটার দেখিতেও সেইরূপ পোষাক পরিয়া দর্শকেরা আসিয়াছিলেন। এখনকার মত যথেচ্ছবেশে তখন কোন মজলিসে যাওয়া ঘৃণাকর ছিল। সেদিন যে একতান

বাদ্য বাজিয়াছিল, তাহাতে কালিদাস সান্যাল হারমোনিয়াম, নিমাই ওস্তাদজী, গৌরদাস বাবাজী ও বসুপাড়ার সুবিখ্যাত রাজাবাবু বেহালা বাজাইয়াছিলেন, এবং শ্যামপুকুরের শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ঢোল বাজাইয়াছিলেন। নীল-দর্পণের ইহা প্রথম অভিনয় নহে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে যখন ঢাকায় ইহা প্রথম মুদ্রিত হয়, তখন গ্রন্থকারের উৎসাহে ঢাকাতেই ইহার অভিনয় হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রথম রাত্রিতেই ১০০৲ টাকা বিক্রয় হওয়ায় ন্যাশন্যাল থিয়েটারের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। পরে ইংলিসম্যানের ছাপাখানা (জোন্স কোম্পানীর ছাপাখানা) হইতে দস্তুর মত কেবল ইংরাজীতে প্ল্যাকার্ড ছাপান হইয়াছিল। ৩০শে অগ্রহায়ণ শনিবারে নীলদর্পণ অভিনীত হইল। বিক্রয় বাড়িয়া গেল। পর সপ্তাহে অর্থাৎ ৭ই পৌষ শনিবারে ইঁহারা "জামাই বারিক" অভিনয় করেন। দুই রাত্রির উৎসাহে তৃতীয় সপ্তাহে নূতন অভিনয় করিবার ইচ্ছা হয়। অর্দ্ধেন্দু-বাবুর প্রস্তাব মত জামাই বারিক গৃহীত হয়। নীলদর্পণের অভিনয়ে দর্শকেরা কাঁদিয়া হাপাইয়া উঠিত, জামাই বারিকের অভিনয়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িত, আবার করুণ রসে আর্দ্র হইয়া পড়িত। বুধবার রাত্রি হইতে শনিবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার রিহার্সাল দিয়া জামাই বারিক খোলা হয়। নীলদর্পণের রিহার্সাল এক বৎসর চলিয়াছিল। ৫ম রাত্রিতে নবীন তপস্বিনী খোলা হয়। ইহাও আড়াই দিনের পরিশ্রমে অভিনীত হইয়াছিল। বুধবারে ৯২ খানা নবীন তপস্বিনী আনিয়া প্রধান প্রধান অভিনেতারা অভ্যাস করেন। এইরূপে ন্যাশন্যাল থিয়েটারের এই মঞ্চে একে একে দীনবন্ধুর নীলদর্পণ, জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী ও বিয়ে পাগলা বুড়ো অভিনীত হয়। তাহার পর মাইকেলের "কৃষ্ণকুমারী" অভিনীত হয়। কৃষ্ণকুমারীর অভিনয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গিরীশবাবু এই দলে মিলিত হন নাই এবং তিনি "Fathers" এই গুপ্ত নামে Indian Daily News এ ন্যাশান্যাল থিয়েটারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিতেন। ১৩১০ সালের বক্তৃতায় অর্দ্ধেন্দুবাবু বলিয়াছিলেন,—"নীলদর্পণ ও জামাই বারিকে সাময়িক ও সামাজিক ছবি দেখাইয়া থিয়েটারের অভিনয়ে আদর্শের সমান অনুকৃতি না হইলে যে হৃদয়গ্রাহী ও সুসঙ্গত হয় না, তাহা আমরা বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং থিয়েটারে সামাজিক কুপ্রথার নাটক অভিনয় করিলে যে তাহা সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে, তাহাও বুঝিতে দিয়াছিলাম। তাহার পর নবীন তপস্বিনী দর্শককে কল্পনা সাহায্যে একটু উচ্চ আদর্শের প্রতি লক্ষ্য করিতে অবসর দিলাম। তাহার পর কৃষ্ণকুমারীতে এই উচ্চ আদর্শ আরও উচ্চ করা হইয়াছিল। পুস্তক নির্ব্বাচনের এ সকল হেতু আমারই মনে মনে থাকিত, এ সকল কথা নিয়ে কাহারও সহিত কোন দিন পরামর্শ করিতাম না।" [ক্রমশঃ

রামের সুমতির অভিনয়

লীলা বিদ্যান্ত

লখনৌ পুজো উপলক্ষ্যে আমাদের কলেজের মেয়েদের অভিনয়, ষষ্ঠীর দিনে বাঁধা বরাদ্দ, অনেক বছর ধ'রেই চলে আসছে। প্রত্যেক বছর আমরা একটা করে নূতন বই অভিনয় করাই। পুজোতে নূতন কিছু না করলে আমাদের চলে না, যেমন নূতন কাপড় জামা চাই—তেমনি নাটকও নূতন হ'তেই হবে, এই আমাদের মন।

এবারে অনেকগুলো অলটারনেটিভের কথা ভেবেছি, অনেকদিন ধ'রে। রক্তকরবী বই অভিনয় ক'রে কল্‌কাতার লোকেরা নাম করেছেন, সেই নামে ভাগ বসাবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাও যে মনে মনে হয়নি তা নয়।

কারো কারো ধারণা যে, শিশু অভিনেতার অভিনয় বুঝি নিতান্তই ছেলে খেলা। এই জন্যে আমরাও কয়েক বার অভিনয় কালে ষ্টেজের উপর থেকে সমবেত দর্শকদের সামনে শিশুদের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছি। কিন্তু পরে ভেবে দেখ্‌লাম এ ক্ষমা-ভিক্ষা নিতান্তই বৈষ্ণব-বিনয়। শিশু অভিনেতা বুড়ো অভিনেতার চেয়ে কোনখানে কম তো নয়ই, বরং অনেক বিষয়ে সে বুড়োকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে কোন গুরুগম্ভীর বিষয় হ'ল, যেমন মাতৃস্নেহ, বিচ্ছেদের বেদনা, ইত্যাদি—সেখানে শিশুকে কষ্টে হাসি চেপে অভিনয় করতে হয় বটে, কিন্তু যেখানে অভিনয়ের বিষয় শিশুর স্বভাবের সঙ্গে মেলে সেখানে বড়োরা তার সঙ্গে পাল্লা দিতেই পারে না। শিশুর মত অমন উচ্ছল প্রাণাবেগ বড়োদের মধ্যে কখনই আস্‌তে পারে না। বড়োরা যেখানে প্রাণাবেগের উচ্ছলতা দেখায়, সেখানে সেটা খানিকটা কৃত্রিম—কিন্তু শিশুর মধ্যে সেই প্রাণোচ্ছলতা একান্তই স্বাভাবিক। তাই দুষ্টুমি আর হাসিখুসির অভিনয়ে ছোট বাচ্চাদের জুড়ি নেই।

কিন্তু 'রামের সুমতি' তো হাসির বই নয়। এতো সেই মাতৃস্নেহের আবেগ আর মাতৃহৃদয়ের বেদনা নিয়েই লেখা। তবু এবারকার আমাদের পুজো প্রোগ্রামে স্থির হ'ল 'রামের সুমতিই।' 'রক্তকরবী' ঢের উঁচুদরের বই বটে, কিন্তু আমাদের পুজো মণ্ডপে যে দর্শক সমাবেশ হবে সেই আমাদের মা মাসীমা এবং দিদি ও বোনদের সামনে রক্তকরবী পরিবেশন করতে আমার একটু দ্বিধা হ'ল। ভাবলাম, সে দেখা যাবে অন্য কোন সময়ে। এখন যখন আমাদের ঘরের মেয়েরা আশা ক'রে আস্‌বেন আনন্দ, তখন যদি কোন দুরূহ তত্ত্ব তাদের সামনে পরিবেশন করি তো তাকে অনেকটা সরল রূপ দিতে হবে যাতে সবাই বুঝতে পারে। ঐ বইকে অতখানি সরল যে কী ক'রে করব, তা নিয়ে ভাবতে সময় লাগ্‌বে, আপাতত হাতে অত সময় ছিল না। এদিকে আবার আমাদের বিদ্যান্ত-কলেজের সিল্‌ভার-জুবিলী নিয়ে অন্য তিনদিন অভিনয় করাতে হবে, ঐ অক্টোবর মাসেই। তাছাড়া রামের সুমতির জিত হ'ল আরো একটা কারণে। একদিন বইখানা পড়ছিলাম, পড়্‌তে পড়্‌তে শেষ দিকে যেখানে রাম নিজেকে বৌদির পরিত্যক্ত মনে করে মামার বাড়ী আশ্রয় নেবার জন্যে তৈরী হ'য়ে হাতে একটি ছোট পুঁটুলি নিয়ে এসে বৌদির কাছে দাঁড়াল, তখন চোখের জলে আর বইয়ের অক্ষর দেখতে পাই না। এমনি হ'ত যখন অনেক দিন আগে ছোট বেলা এ বই পড়েছিলাম। ইতিমধ্যে বয়স এবং নিজের ধারণায়, বিদ্যা—দুইই অনেক বেড়ে গেছে। কিছু দিন হ'ল মনে মনে ভাবতাম, শরৎচন্দ্র পড়ে যে বয়সে কেঁদেছি সে বয়স বুঝি পার হ'য়ে এসেছি। শরৎচন্দ্র বুঝি অপরিণত মনের খোরাকই দিতে পারেন, আমার মত এমন সুপরিণত, এমন রবীন্দ্রনাথ এবং সেক্সপীয়ার এবং বার্ণার্ড শ পড়া বিদুষীর কাছে বুঝি তিনি অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে উঠেছেন! নিজেকে সবাই এমনি একটা কিছু ভয়ঙ্কর বিদ্বান ব'লে মনে করে, তাই আমার এই অপরাধ যেন ক্ষমা করা হয়। কিন্তু সেদিন 'রামের সুমতি' পড়ে অবশেষে আমারও সুমতি ফিরে এল, বুঝলাম মাষ্টার-লেখক আজও তেমনি অপ্রতিহত ক্ষমতাই রাখেন আমার মনের ওপরে। তাঁর বই পড়ে অভিভূত হব না,

এমন বিদ্যা আজও উপার্জন করতে পারিনি, এবং কোন দিন পারবও না।

অথচ 'রামের সুমতি' বইতে আছে কি? ও সে নিতান্তই ঘরোয়া ব্যাপার। মেয়েদের ঝগড়া দ্বন্দ্ব, আর তার মাঝখানে অবুঝ পুরুষের পরুষ হস্তক্ষেপ, এতো বাংগালী সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার।

পুরুষ মনে করে তার ভারি ক্ষমতা, তার ভারি বুদ্ধি, সে তার তীব্র বুদ্ধিতে উজ্জ্বল চোখ ও কান দিয়ে সংসারের সমস্ত খবরই রাখে এবং সেই হিসেবে তার অপ্রতিহত ক্ষমতা নিয়ে আদেশ নির্দেশ জারী করে। আসলে যে সংসারের ব্যাপারে এবং অন্যান্য কোন কোন ব্যাপারেও সে নিতান্তই চক্ষুকর্ণহীন, একথা সে বুঝতেই পারে না। সে দেখে মেয়ে মানুষের চোখ দিয়ে, শোনে মেয়ে মানুষের কান দিয়ে। সংস্কৃত আলঙ্কারিক বলেছেন— 'কান্তাসম্মিত তত্তয়োপদেশযুজে'। অর্থাৎ কাব্যের উপদেশ হ'ল প্রিয়ার উপদেশের মতই সরস। পুরুষ মানুষের জীবন ও সংসার সম্বন্ধে যে মতামত সেটাও অনেক সময়েই কান্তার উপদেশে সরস হ'য়েই তার কাছে ভিন্ন ভিন্ন রঙে রঙীণ হ'য়ে দেখা দেয়। কান্তা তাকে যে রসে রসিয়ে যে রঙে রাঙিয়ে, চাখান এবং দেখান তিনি তাঁর রূপরসের অনুভব তেমনি করেই করেন। শুধু তাঁর অহঙ্কার টুকু বজায় থাকে যে তিনিই সংসারের হর্তা কর্তা বিধাতা।

এখানে কান্তা মানে সাধারণ অর্থে মেয়েমানুষ বুঝতে হবে, সে যে স্ত্রীই হবে এমন নাও হতে পারে। সে বোনও হতে পারে, মাসী, পিসী কি শাশুড়ীও হ'তে পারে। রামের সুমতির 'শ্যামলালের' বেলায় এই কান্তা হ'লেন তাঁর শাশুড়ী, নারায়ণীর বিধবা মা।

আহা বিধবা নিরাশ্রয় মেয়ে মানুষ! তার একমাত্র সম্বল কান্না। অর্থাৎ অন্ততঃ শ্যামলালের সামনে তিনি তাঁর গলার অন্যান্য স্বাভাবিক ক্ষমতা তো প্রয়োগ করেন না, শুধুই করুণ সুরের চর্চা ক'রে থাকেন। তাই শ্যামলাল তার প্রতি করুণায় অভিভূত হ'য়ে উঠেন। নিরাশ্রয় নারীর প্রতি পুরুষের যে করুণা তারই জন্যে শ্যামলাল নিজের বৈমাত্র ভাই রামের ওপরে রেগে গেলেন। তা নইলে এর আগে রামের প্রতি তার কোন বিরাগই ছিল না। রামের প্রতি শ্যামলালের মনোভাব যেন অনেকটা উদাসীন। এর মধ্যে হয়ত মনস্তত্ত্ববিদরা শ্যামলালের মনের গোপন কোণায় রামের প্রতি একটু গোপন ঈর্ষার কথাও খুঁজে বার করতে পারেন। শ্যামলাল জানতেন নারায়ণী রামকে কতখানি স্নেহ করেন। কিন্তু এটা তাকে মেনে নিতেই হয়েছিল, কারণ শরৎচন্দ্র বলে দিয়েছেন শ্যামলাল প্রকাশ্যে না হ'লেও মনে মনে স্ত্রীকে ভয় করতেন। স্ত্রীকে মনে মনে ভয় করে না এমন বাঙালী বীর দুনিয়ায় কম আছে। আহা, কথায় কথায় কেবল বাঙালীর বদনামই বা দিই কেন, যা বাঙালী প্রকৃতি তাই নিশ্চয় বিশ্ব প্রকৃতি।

কিন্তু যখন অসহায়া নারীর প্রতি করুণা এসে যোগ দিল এই গোপন ঈর্ষার কণাটির সঙ্গে, তখন সে প্রবল হ'য়ে উঠে নারায়ণীর স্নেহের ঝর্ণাটির পথ রোধ ক'রে দাঁড়াতে চাইল।

'রামের সুমতি'র অকিঞ্চিৎকর সোজা গল্পটি নিয়ে কখনো এমন ক'রে ভাবিনি। কিন্তু ড্রামা করাতে গিয়ে আমি ঐ সহজ গল্পটির অন্তরে একটি গভীর সত্যের সন্ধান পেয়ে অবাক্ হয়ে গেছি।

শরৎচন্দ্র সমাজদ্রোহী লেখক। সমাজ-প্রচলিত অনেক সংস্কারকেই তিনি অমান্য করেছেন, তাঁর অনেক রচনায়। সমস্ত বড় লোকের মধ্যেই রয়েছে সমাজদ্রোহিতা অর্থাৎ সমাজের কুসংস্কারগুলোকে দূর করবার একটা চেষ্টা। সমাজপ্রচলিত রীতিনীতির জয়গান করেছেন এমন কোন বড়লোকের নাম করা যাবে না। তা যাঁরা করেছেন তাঁরা ব্রতকথা, পাঁচালির ছড়া আর মংগলকাব্য লিখে গেছেন। অবশ্য ওসব লেখা ভালো করে জানি না, কে জানে ওঁদের মধ্যেও কোন সমাজদ্রোহী লেখক ছিলেন কিনা। আমার জানায় সমাজদ্রোহিতা বাংলা সাহিত্যে প্রথম নিয়ে এলেন কবি মধুসূদন—বাংলা সাহিত্যের সেই নূতন যুগের প্রবর্ত্তক। রাম-লক্ষ্মণকে হীন ক'রে রাক্ষসবীরদের বড় ক'রে তোলা সেদিন কম দুঃসাহসের কাজ ছিল না।

এই সমাজদ্রোহিতা দেখেছি রবীন্দ্রনাথে, দেখেছি শরৎচন্দ্রে। 'চরিত্রহীন' বইতে, 'গৃহদাহে' শরৎচন্দ্রের সমাজ-দ্রোহিতা তো স্পষ্টই বোঝা যায়। এই জন্যে অনেক দুর্নীতি-বিরোধী মানুষ শরৎচন্দ্রের এই বই দুখানাকে বিশেষ ক'রে নিন্দা করেন। কিন্তু আমার মতে তাঁরা শরৎচন্দ্রকে ভুল বোঝেন।

'গৃহদাহ' বইতে শরৎচন্দ্র এমন পরামর্শ দেননি যে লোকে যেন বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি শুধু এই বলতে চেয়েছেন যে অনেক মানুষ এমন আছে যারা হৃদয়াবেগকে দমন করতে জানে না। এতে যেমন তারা অনেক অপরাধ করে তেমনি অনেক মহৎ কাজও করতে পারে। শরৎচন্দ্র বলতে চান একটা মানুষকে যেন আমরা তার চরিত্রের সমস্ত ভালো এবং মন্দ মিলিয়ে বিচার করি। শুধু তার একটা দোষ বা একটা গুণ যেন আমাদের চোখে একমাত্র সত্য বলে দেখা না দেয়। যে সুরেশ বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল, সেই যে আবার প্লেগের খবর পেয়ে দূর গ্রামে গেল তাদের সেবা করতে, এটাও যেন আমরা ভেবে দেখি। ও বেচারার হৃদয়াবেগটা ছিল প্রবল, তাকে ও সব সময়ে সামলাতে পারেনি। ও যেমন অচলাকে ভালোবেসেছে, সেই একই প্রবল হৃদয়াবেগ নিয়ে ও বিপন্ন মানুষকে দয়া ক'রেছে। অচলার প্রতি ভালোবাসার আবেগে ও যেমন বন্ধুকে বঞ্চনা ক'রেছে, তেমনি মানুষের প্রতি দরদের বশে ও নিজের জীবনকেও বিপন্ন ক'রেছে।

শরৎচন্দ্র দেখেছেন হৃদয়াবেগশূন্য স্বার্থপর মানুষ অনেক সময় সুচরিত্র হ'তে পারে, কারণ তাদের হৃদয়ের বালাই নেই। তারা মেয়ে মানুষকে ভালোবাসে না, তারা অনেক হিসাব ক'রে পণের টাকার সংগে জীবনযাত্রা নির্বাহের অনুরোধে স্ত্রীকে ঘরে নিয়ে আসে।

যাই হ'ক, শরৎচন্দ্র সুরেশের ভুল দেখিয়েই বই সমাপ্ত করেছেন। শেষকালে শরৎচন্দ্র এই কথাই বলেছেন যে এমন ক'রে ছিঁড়ে আনলে তো ফুলকে পাওয়া যায় না। তখন সে যে শুকিয়ে কালো হ'য়ে ওঠে। ফুল যে তার আপনার বোঁটাতেই সুন্দর।

আমি যে ক্লাশে বাংলা পড়াই তাদের পাঠ্য আছে রবীন্দ্রনাথের 'চরিত্রপূজা'। ওতে বিদ্যাসাগরের স্তবগান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এবং তাঁর মাতৃদেবী ভগবতী দেবীর প্রসঙ্গে এই কথাই বলেছেন যে ওঁদের দয়া ছিল উদার উন্মুক্ত। ওঁদের দয়ার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দয়ার পার্থক্য বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সাধারণ মেয়েদের দয়া যেন দেশলাইয়ের বাক্সবন্দী। অর্থাৎ তা সংস্কারের গণ্ডী দিয়ে ঘেরা। এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছাত্রীদের সামনে বছরের পর বছর যে উদাহরণ আমাকে দিতে হয় সে ঐ একমাত্র 'গৃহদাহ' উপন্যাসের একটি কাহিনীর। এমন চমৎকার উদাহরণ আমি যা কিছু পড়েছি তার মধ্যে অন্য কোথাও খুঁজে পাইনি।

সুরেশ গেছে অচলাকে নিয়ে ডিহিরিতে। সেখানে তারা বাসা বেঁধেছে। সেখানে এক সম্রান্ত ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের আলাপ হ'ল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অচলাকে ভালোবাসলেন মেয়ের মত। তিনি স্বপাক ছাড়া খেতেন না কিন্তু তিনি স্নেহবশে অচলার হাতের রান্নাও খেলেন। অবশেষে যেদিন প্লেগে আক্রান্ত সুরেশের কাছে এল অচলা, এক অপরিচিত দূরের গ্রামে, তখন এই বিপদের খবর পেয়ে সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ছুটে এলেন অচলা ও সুরেশকে সাহায্য করতে। সংক্রামক রোগের ভয় তাঁর দয়াকে নিরস্ত করতে পারেনি। কাজেই তিনি যে সহৃদয়, তিনি যে দয়ালু—একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু নিদারুণ সংক্রামক রোগ যেখানে তার পথ রোধ করতে পারল না, সেখানেও কিন্তু সংস্কার এসে তার দয়াকে বিকল ক'রে দিল। যে মুহূর্তে তিনি জানতে পারলেন যে অচলা ও সুরেশের সম্পর্ক সমাজবিহিত নয়, সেই মুহূর্তে তিনি সেই বিপন্ন মেয়েটিকে ত্যাগ ক'রে চলে এলেন, তাকে যে সেই মুহূর্তে ট্রেণ ধরতেই হবে, কাশী গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্যে তিনি যে অচলার হাতের রান্না খেয়েছেন। একেই তো বলে দেশলাই বাক্সের মধ্যে বন্ধ দয়া। যতক্ষণ সংস্কার সে দয়ার অনুকূল ততক্ষণই সে কাজ দেয়, যে মুহূর্তে সমাজ সংস্কারের দেয়ালে ধাক্কা লাগে অমনি তা বিকল হ'য়ে ফিরে আসে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়া তাঁর প্রবল পৌরুষ দিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছে সমস্ত সংস্কারের দেয়াল। তিনি মেথরের কলেরা রোগীকেও নিজের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেছেন। কলেরাও তাঁকে ভয় দেখায় নি, মেথরও নয়। আর ঐ ব্রাহ্মণ—তাকে প্লেগ তো ঠেকাতে পারেনি, কিন্তু শুচিবাতিক পেরেছে।

যাক্‌গে, সে তো হ'ল, কিন্তু 'রামের সুমতিতে' সমাজদ্রোহ কোথায়? সেটাই আমি এবার নতুন আবিষ্কার করেছি। এ বইটা যে এমন বিপ্লবাত্মক, একে যে সমাজ নীতির অনুরোধে অবিলম্বে বাজেয়াপ্ত করা দরকার এ কথা আর কেউ যদি জেনেও না থাকেন, অন্ততঃ আমি তো

জান্‌তাম না। আমার মনে হয় কেউই জানতেন না, কারণ তা হ'লে শরৎচন্দ্র এতদিন তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন না। শরৎচন্দ্রের অনেক বই-ই সমাজহিতৈষীদের হাতে লাঞ্ছিত হ'য়েছে কিন্তু এই আপাতনিরীহ বইখানির প্রতি কারো দৃষ্টি পড়েছে ব'লে মনে হয় না। কিন্তু আসলে এ বইখানিও ঠিক ততটা নিরীহ নয়। এতেও আছে শরৎচন্দ্রের সমাজবিপ্লবের অগ্নিকণা।

সেটা কী? প্রচলিত সমাজ মতে নারীর ধর্ম পতি-দেবতার কথা মেনে চলা। আর মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি এত সামাজিক অনুশাসন। যখন কোথাও কোন বিরোধ নেই তখন নারী এই সমস্ত অনুশাসন নম্রচিত্তে, ভক্তিভরে মেনে চলে। নারায়ণী স্বামীকে ভক্তি করে না এমন নয়। স্বামী অভুক্ত থাক্‌লে সে খায় না, সে কখনো স্বামীর প্রতিকূলচারিণী নয়। স্বামীর অমঙ্গলের কথা কেউ উচ্চারণ করলেও সে শিউরে ওঠে। তার বোন সুরধুনী যখন রামকে, শ্যামলালের দিব্যি, যে রামকে খেতে দিলে কথা বল্‌লে তিন দিনের মধ্যে নারায়ণীকে তার মড়া মুখ দেখতে হবে, এটা বল্‌তে যায়, তখন এই সব অশুভ কথা উচ্চারণ করতেও সে সুরোকে বাধা দেয়। এই সব থেকে বোঝা যায় নারায়ণীর, স্বামীর প্রতি সদা-শংকিত ভালোবাসা কতখানি গভীর।

আর নারায়ণীর প্রকৃতিতে মাতৃভক্তিও দৃঢ়মূল। মাকে নিরাশ্রয় জেনে সে তাকে নিজের বাড়ীতে আনিয়ে নিল। তারপরে তার মা যখন রামের সঙ্গে দুর্ব্যবহার শুরু করল তখনও সে চেষ্টা করল রামকেই শান্ত করতে। রাম যখন বল্‌ল, আমি আর ওকে কিছু বল্‌ব না—কিন্তু ও কেন আমাকে অমন ক'রে বলে, তখন নারায়ণী যুক্তি দিলেন, 'বল্‌লেই বা, মা হয় যে।' এমনি ক'রে বারে বারে তিনি এই যুক্তিহীন যুক্তি দিয়ে রামকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করলেন—'চুপ্ কর পাজি, মা হয় যে।' দিগম্বরী তার মা, এই জন্যেই নারায়ণী তার সমস্ত উপদ্রব নীরবে সহ্য করতে চাইলেন। তাকে সাধারণ ভাবে ন্যায় অন্যায়ের মাপকাঠি দিয়ে তিনি মাপবেন না—এই তার মন। এমনি ক'রে নারায়ণী তার নারীপ্রকৃতির উপরে বাইরের সামাজিক অভিভাবকদের উপদ্রব এবং আক্রমণ সহ্য ক'রেই যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন এই আক্রমণ একেবারে চরমরূপ নিল, তখন নারীর অন্তরের যে প্রাকৃতিক শক্তি সেও প্রস্তুত হ'ল চরম প্রত্যুত্তর দেবার জন্যে।

বাইরের হুকুম যখন তাকে তার প্রকৃতি থেকে ভ্রষ্ট করবার জন্যে স্পর্ধিত উল্লাসে এগিয়ে গেল, তার নম্রতা, তার বাধ্যতা, তার ভক্তিকে দুর্বলতা মনে করে যখন সে তার ওপরে আরো বেশি উৎপাত কর্‌বার জন্যে এগিয়ে এল, তখন সেই দুর্বল নারী, সংসারের বশে বশীভূতা নারী, ভক্তিমতী কর্তব্যপরায়ণা নারী আপনার প্রকৃতিকে রক্ষা কর্‌বার জন্যে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে ফিরে দাঁড়াল।

অসহায় শিশুকে ত্যাগ কর্‌তে বলা নারী-প্রকৃতির উপরে চরম অত্যাচার। সে আর সমস্ত অত্যাচার সহ্য কর্‌তে পারে কিন্তু এখানে তার প্রকৃতি কোন মতেই হার মান্‌তে পারে না।

প্রকৃতিই তাকে দিয়েছে এই মাতৃপদ। সে যে এই সৃষ্টির মাতৃরূপিণী। এখানে প্রকৃতি আপন প্রবল শক্তিতে নারীকে দেয় তার সমর্থন। নারী প্রকৃতির বলে বলীয়ান হ'য়ে সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত কর্‌বার শক্তি লাভ করে। এমনটি যে হ'তেই হবে, তা না হ'লে প্রকৃতির উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হবে। নারীর মাতৃস্নেহ না হ'লে প্রকৃতি তার এই বিপুল প্রাণীজগৎকে বাঁচাবে কেমন ক'রে? তাই সে এই নারীকে কোন প্রতিকূল শক্তির কাছেই হার মান্‌তে দেবে না—এই তার পণ।

প্রতিকূল সমাজশক্তির উর্ধ্বে নারীর এই প্রাকৃতিক শক্তির জয় ঘোষণা কর্‌বার জন্যেই শরৎচন্দ্রের এই বই লেখা।

অন্যান্য অনেক বাঙালী বড় লেখকদের মতোই শরৎ-চন্দ্রের লেখারও প্রধান উপজীব্য নারী। নারীর শক্তিকে শরৎচন্দ্র সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছেন এবং তার বেশির ভাগ রচনা সেই উপলব্ধিরই প্রকাশ।

নারী তার আপাতনম্র বিনীত দুর্বল প্রকৃতির অন্তরালে গোপন ক'রে রেখেছে প্রকৃতির হাতের দেওয়া আগুন। তাকে জ্বালিয়ে তুল্‌লে তার তাপে বাইরের বাধাকে পুড়ে ছাই হ'তেই হবে।

দিগম্বরী যখন বল্‌লেন—"যে দিব্যি দিয়েছে তার হুকুমটাও তো নিতে হবে," তখন নারায়ণী বল্‌লেন, "তুমি কী ক'রে জান্‌বে মা, আমি কার কাছে কখন হুকুম নিয়েছি।

মা, যার মুখ আছে সেই দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে এতবড় ক'রে তুলতে হয় সেই জানে হুকুম কোথা দিয়ে কেমন ক'রে আসে।"

নারায়ণী হুকুম পেয়েছে কার কাছে? সে তার অন্তর-প্রকৃতি, তার চরম নারীস্বভাব, তার কাছে, অন্য সমস্ত হুকুমের বাড়া হুকুম।

গল্পটাকে যদি আরও একটু টেনে নেওয়া যায় তো কী হয়? শ্রেষ্ঠ লেখক অনাবশ্যক একটা কথাও বলেন না। এর যদি সিনেমা হয় তো—হয়ত' সিনেমা প্রযোজক দেখাতেও পারেন যে এর পরে নারায়ণীও শ্যামলালের মধ্যে একটি কথোপকথন চ'লছে। কিন্তু এখানে সে ভয় নেই, কারণ এটা তো প্রচলিত অর্থে প্রেমের গল্প নয়। প্রেমের গল্পে অসাধারণ লেখক যেখানে থামেন, সাধারণ অভিনয় বা সিনেমা প্রযোজক বেশির ভাগ সেখানে থামতে পারেন না। এটা শরৎচন্দ্রের অনেক বইয়ের সিনেমা এবং মঞ্চ অভিনয়ে আমি দেখেছি।

তবু থামলে কি হবে, শ্রেষ্ঠ লেখকের লেখা ছাপাখানার সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হয় না। তার ধ্বনি, তার ব্যঞ্জনা অনুরণিত হ'তে থাকে, আরো অনেক দূর কালকে ব্যাপ্ত ক'রে। 'রামের সুমতি' গল্পে এর পরে কী হ'ল সেটা লেখক না বললেও তার ইঙ্গিত আসছে আমাদের কানে। সে ইঙ্গিত এই,—শ্যামলাল যদিও শাশুড়ীর প্রতি করুণাবশে, তার প্ররোচনায় প্ররোচিত হ'য়ে এবং সেখানে নিজের স্বার্থ-বুদ্ধির অনুকূলে প্রেরণা পেয়ে নারায়ণীর মাতৃ-স্নেহের পথরোধ করতে উদ্যত হ'য়েছিলেন, তবু পরিণামে তিনি তাঁর স্ত্রীর মধ্যে নারী-প্রকৃতির এই সুন্দর বিকাশকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন তাতে সন্দেহ থাকে না।

স্বার্থবুদ্ধি মানুষের সহজাত প্রকৃতি। রাম শ্যামলালের বৈমাত্র ভাই, তাকে নিয়ে থাকলে অনেক বিপদ, সে বাইরের ক্ষমতাশালী লোকদের পর্যন্ত খাতির ক'রে চলে না। এমন লোককে ঘরে রাখা বিপদ—এটা হ'ল শ্যামলালের স্বার্থেরই প্ররোচনা। তার সঙ্গে এসে যোগ দিল নিরাশ্রয় আশ্রিতা-নারীর অনুনয়। সেখানে কুটিল নারী-প্রকৃতির ছলনা, তার পুরুষের বুদ্ধি বুঝতে পারেনি। তাই তার দয়া সে আকর্ষণ ক'রেছে। এমনি ক'রেই এই দয়া তার স্বার্থ-বুদ্ধি যোগ দিয়েই তাকে প্ররোচনা দিয়েছে নারায়ণীকে দিব্যি দিয়ে তার প্রকৃতির প্রতিকূলে তাকে দিয়ে জোর ক'রে কাজ করিয়ে নিতে। কিন্তু যখন সে জোর খাটল না তখন সে কি রাগ করবে, মনে করবে অপমানিত হচ্ছে তার পৌরুষ? না, তা সে করবে না, আপনার ঘরের স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির মানস-শতদল-বাসিনী সত্যিকারের নারীকে পেয়ে সে ধন্য হবে।

নারায়ণী যদি রামকে ত্যাগ করত, তা হ'লে সে নারী-প্রকৃতির প্রতিকূলচারিণী রাক্ষসীর হাতে শ্যামলালের নিজেরও রক্ষা ছিল না, এটা সে নিশ্চয় বুঝে থাকবে।

'রামের সুমতি'কে নাটক ক'রে রচনা ক'রে তার অভিনয়ের অনুমতির জন্যে সরকারী দপ্তরে তার সারমর্ম পাঠাতে হ'ল, তাতে লিখে দিয়েছি—

"এই গল্পে আছে সমাজ-সম্মত অনুশাসনের সংগে নারী-প্রকৃতির সংঘর্ষ, তার আপাত-পরাজয় এবং তার চরম জয়ের কথা।"

নারীর কাছে যা তার নিজস্ব প্রকৃতি সে তো কোন মতেই অধর্ম হ'তে পারে না, চাই সে সামাজিক অনু-শাসনের সংঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক। এই একই বিচার নিয়ে শরৎচন্দ্র পতিতা নারীর মধ্যেও নারীর সত্য-রূপকে দেখেছেন।

নারী গৃহত্যাগ করে কেন? সে তা করে তার হৃদয়া-বেগের প্রবলতায়, তার ভালোবাসার নিবিড় আকর্ষণে। ভালোবাসাকে নারী প্রতিহত করতে পারে না, তার হাতে তাকে অসহায় হয়ে আত্ম-সমর্পণ করতে হয়। তার পরে তার জীবনে দুর্গতি আসে সেই-দিন, যেদিন পুরুষ তার লালসা মিটিয়ে নিয়ে নারীকে পথের মধ্যে ত্যাগ করে চলে যায়।

তখনি আসে নারী প্রকৃতিতে বিকৃতি। কিন্তু আবার যেদিন কোন পুরুষ তাকে সত্যি ক'রে লালসা-নির্মুক্ত মন নিয়ে ভালোবাসে সেই মুহূর্তে সে আবার আপনার সত্য-প্রকৃতিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা লাভ করে—এই কথাটাই শরৎচন্দ্র বলেছেন তাঁর সমস্ত পতিতা জীবনীতে।

আমাদের কলেজে সিলভার-জুবিলী উপলক্ষ্যে তিন দিনের অভিনয় আমরা করেছি হিন্দী অনুবাদে 'রামের সুমতি', নৃত্যনাট্য চিত্রাংগদা, আর সেক্সপীয়রের টুয়েলভথ্ নাইটের বাংলা অনুবাদ থেকে হিন্দী অনুবাদ অভিনয়।

শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং সেক্সপীয়র অভিনয় করতে গেলে কার জিত হবে, কোন্‌টা সব চেয়ে লোককে বেশী আকৃষ্ট করবে, এ-নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। রিহার্সালের সময় দেখেছি 'রামের সুমতি' দেখবার জন্যে আমাদের ছাত্রীরা তত ভিড় করেনি, যত করেছে চিত্রাংগদা এবং টুয়েলভ্‌থ নাইট্‌ দেখবার জন্যে। এমন কি যারা রামের সুমতিতে পার্ট নিয়েছে তারাও ফাঁক পেলেই গেছে চিত্রাংগদা ও টুয়েলভ্‌থ নাইটের রিহার্সাল দেখতে। তাদের ডাকতে ডাকতে প্রায় আমাদের হয়রাণ হতে হয়েছে। এমন কি আমার নিজেরও রামের সুমতির চেয়ে চিত্রাংগদা ও টুয়েলভ্‌থ নাইটের রিহার্সাল দেখতে বেশী ভাল লেগেছে। অবশ্য তার কারণ এও বটে যে ও-দুটো আমার আগেকার তৈরী করাছিল, তাই দ্বিতীয়বার অভিনয়ের জন্যে আমাকে আর খাটতে হয়নি। কিন্তু 'রামের সুমতির' জন্যে নূতন ক'রে সব কিছু তৈরী করতে হচ্ছিল বলে সেটা বেশী কষ্টকর লাগছিল।

কিন্তু যেদিন অভিনয় হ'ল সেদিন দেখলাম দর্শকের ভিড় এবং দর্শকের মনোযোগ রামের সুমতিতে কম ছিল না। তা ছাড়া অন্য অভিনয়গুলো ছিল বিনা পয়সার নিমন্ত্রণ, আর রামের সুমতিতে ছিল টিকেট। অভিনয়ের দিন পেছন এবং পাশে থেকে দর্শকদের যে কথোপকথন শুনলাম তাতে মনে সন্দেহ থাকল না যে এ অভিনয় সবার খুব ভাল লেগেছে। পরিচিতাদের সংগে যখন পূজো বাড়ীতে দেখা হ'ল তাঁরা আমাকে বললেন—"অভিনয় দেখে বড় আনন্দ পেলুম"। তাঁরা বেশির ভাগ অল্প-শিক্ষিতা। আমাকে যিনি রান্না ক'রে খাওয়ান, আমার সেই মাসী বললেন, "ছেলেটির জন্য বড় মন খারাপ হ'য়ে গেল, আহা ওর মা বাপ কেউ নেই।" তিনি দিগম্বরীর ওপরে ভারী চ'টে গেছেন, যেন সত্যিই সে কোথাও আছে।

কিন্তু এই আমাদের ঘরের মাতৃরূপিণী নারায়ণীদের মতামতের কথা ছেড়ে দিলেও যারা আমাদের সার্বজনীন পূজোর অল্পবয়সী কর্মীর দল, তারাও এসে আমাকে বলল, অভিনয় অপূর্ব হ'য়েছে, এমন কি আপনাদের নৃত্যনাট্যের চেয়েও এ অভিনয় আমাদের বেশি ভাল লেগেছে।

তবু সংসারে রুচিভেদ তো আছেই। দু এক জায়গা থেকে বিরূপ মন্তব্যও যে শুনিনি তা নয়। কিন্তু তারা সংখ্যায় অনেক কম, আমার জানায় মাত্র দুজন। তার মধ্যে একজন হ'লেন আমারই এক বান্ধবী। তিনি বললেন, "আমার তো 'ভাল' লাগছিল না, খানিকক্ষণ দেখার পরে আমি তো এসে গ্রীণরুমে ব'সে রইলাম।"

উনি আমাকে ভাবিয়ে তুললেন, এ কী ক'রে সম্ভব হ'ল। আমার নিজের কথা যদি ভাবি তো দেখ্‌লাম আমার তো 'রামের সুমতি' সবচেয়ে বেশী ভাল লেগেছে। সে নিজের তৈরী ব'লে নয়। অন্যগুলোও তো আমারই তৈরী। আমি ঠিক অল্পশিক্ষিত লোকও নয় যে অন্যগুলো বুঝিনি ব'লেই আর শরৎচন্দ্রের ঘরোয়া কাহিনীটাই বুঝেছি ব'লে, ভাল লেগেছে। ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, যে মানুষের মন বাৎসল্য রসে বঞ্চিত, সে এ বইয়ের রস উপলব্ধি করতে পারবে না।

রামের সুমতির রস বাৎসল্য রস ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমি এ অভিনয়ের সমাপ্তিতে যে গানটি লিখেছিলাম সে হ'ল :—

> হাদে গো নন্দরাণী
>
> ঐ ননীচোরা তোমার কানু
>
> খেয়েছে মোর ঘরের ননী।
>
> ওরে ধরতে গেলে যায় পালিয়ে
>
> ওরে মারতে গেলে দেয় কাঁদিয়ে
>
> ও যে মন চোরের শিরোমণি।

আর একজন পরিচিতা রিপোর্ট দিলেন যে দিল্লী শহর থেকে কয়েকজন লোক এসেছিলেন আমাদের অভিনয় দেখবার জন্যে। তারা নাকি রামের সুমতির মাঝখানে উঠে চ'লে গেলেন এবং ব'লে গেলেন যে এ বই বড় নীরস! আমরা তো শশিভূষণ কলেজের নৃত্যনাট্যের নাম শুনেই দেখতে এসেছিলাম।

আবার ভাবতে বসলাম। দিল্লী শহরে বুঝি বাংলার পল্লীদের ধারাটুকু আর বয়না। সে ধারাটি বুঝি রাজধানীর, রাজপথের পাথরতলায় চাপা পড়ে গেছে। যারা পদমর্য্যাদা আর পদোন্নতি নিয়ে মত্ত তারা শরৎচন্দ্রের লেখায় এবং তার সুঅভিনয়েও রস খুঁজে পায় না। আর সত্যি কথা বলতে কি যারা রামের সুমতিতে রসের সন্ধান পায় নি তারা চিত্রাংগদার রসের কাছে গিয়ে পৌঁছতে

পারুও তাও সত্যি নয়। তবে চিত্রাংগদায় পোষাকের ঝলমলানি আর নাচের মত্ততা তাদের কোন এক রকমের একটা মত্ততার আবেদন এনে দিত বুঝি এই রকম দর্শকরা মনের গভীরতর স্তরে যে রসলোক আছে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, এরা শুধু চোখ দিয়ে দেখে, মন দিয়ে নয়। তাই যেখানে চোখ ভোলানোর আয়োজন কম, সেখানে ওদের নীরস মন রসের পথ খুঁজে পায় না।

রামের সুমতির আবেদন মানুষের শান্ত সমাহিত মনের কাছে। এব রস মানব মনের আদিমতম প্রেরণা, যে প্রেরণার বলে এই সৃষ্টি রক্ষা পেয়ে এসেছে আদিমতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত। তাই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন:—

"মাতৃস্নেহ সব চেয়ে পবিত্র প্রাচীন
· একেলা জাগিয়ে ব'সেছিল
তরুণ বিশ্বেরে কোলে লয়ে।"

যে মা আদিম সৃষ্টিকে কোলে ক'রে বসেছিল সেই মা আজও তেমনি ব'সে আছে। তার কথা যাদের ভালো লাগে না, তাকে যাদের নীরস ব'লে মনে হয় তারা মানব মনের আদিমতম রসতীর্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের কথা এই যে বেশীর ভাগ লোক এরকম নয়। তাই বহুর সম্মতিতে জয় হয়েছে অপরাজেয় কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্রের।

সম্প্রতি শিশু স্নেহের একটি উৎসপথ খুলে গেছে আমারও জীবনে, বুঝি সেই জন্যেই আমি বেছে নিয়ে ছিলাম এই বই। আমার সেই স্নেহাস্পদা ৪।৫ বছরের দুষ্টু মেয়েটি ক'রেছে শিশু রামের পার্ট। ওর পার্ট এত চমৎকার হ'য়েছে যে ওর জীবনের এই প্রথম অভিনয়ে ও স্থানীয় অন্য এক অভিনয় ডাইরেক্টরের কাছ থেকে পুরস্কার পেয়েছে একটি ছোট্ট কাপ, ঠিক ওরই মাপে তৈরী।

আর আমার যে ভয় ছিল আমার কলেজের মেয়ে ১৫ বছরের 'লিলি'কে নিয়ে যে—সেও বুঝি পল্লীঘরের লক্ষ্মী ২৬ বছরের নারায়ণীর মনোভাবটিকে আয়ত্ত ক'রে তাকে ফুটিয়ে তুলতে পারবে না। অভিনয়ের দিনে আমার সে আশংকাও মিছে প্রমাণ হ'ল। ও আমাকে সেদিন কাঁদিয়েছিল এবং আমার মত অন্য অনেককেও।

ভগবানের অনেক দয়া যে শরৎচন্দ্রের লেখা প'ড়ে এবং তার অভিনয় দেখে আমার চোখে আজও জল আসে। এই অভিনয়ের পালা এবার এই নান্দী-বাক্য উচ্চারণ ক'রে শেষ করি—

"সব গুরুতে তব আন এ পরিষদে
বিমুখ চিত্ত যত হ'ক নত তব পদে।"

রসরাজ অরসিক বিমুখ চিত্তে রসের সঞ্চার করুন।

রসের মধ্যে প্রণয় রসের আবেদন সব চেয়ে বেশী এবং সবচেয়ে সহজ। এই জন্যেই সংস্কৃত আলংকারিকরা ওকে রসের তালিকায় প্রথম জায়গা দিয়ে ওর নাম দিয়েছেন আদিরস।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখায় বাৎসল্যরসও কম সার্থক হ'য়ে ওঠেনি। বাৎসল্যরস বিশেষ ক'রে বাংলার আপন রস। এই জন্যেই বাংলার নিমাই এমন সর্বজনপ্রিয়। নিমাই কোন ধর্মতত্ত্ব প্রচার করেছেন বাংগালী মনের কাছে সে আবেদন বড় নয়। নিমাইর মা যে কেমন ক'রে ব্যথা পেয়ে কেঁদেছেন, সেই গান বাংগালীর বাড়ীর আঙ্গিনায় বৈষ্ণবীর গানে আর তার যাত্রার আসরে নিমাই সন্ন্যাস পালায়, তাকে চিরদিন ধ'রে অভিভূত ক'রে তাকে কাঁদিয়েছে। কিন্তু এই বাংগালী প্রকৃতি কি বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত নয়? এখানে কি বিশ্বের অন্য মানুষের সংগে বাংগালীর কোন বিশেষত্ব বা কোন অমিল সত্যিই আছে? যদি বা থাকে তো থাক্ না। শরৎচন্দ্র যদি বিশ্ব কবি নাও হন তবু তিনি আমাদের আপন কবি।

কিন্তু মনে জানি যিনি বাংগালীর আপন তিনি বিশ্বেরও আপন। বাংগালী নিশ্চয় সৃষ্টিছাড়া জীব নয়। সমগ্র সৃষ্টির সংগে তার মিল নিশ্চয়ই আছে।

আদর্শ

শ্রীজ্ঞান

'আদর্শ'।—এই কথাটার অর্থ তোমাদের কারুরই অজানা নয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় কথাটির মূলগত অর্থ জানা থাকলেও সাধারণতঃ দেখা যায় সেই অর্থ অনুযায়ী কাজ খুব কম লোকেই আজকাল করে থাকেন। একটা আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত প্রত্যেক মানুষেরই। প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন অনুযায়ী, শিক্ষা অনুযায়ী, পরিবেশ অনুযায়ী তার 'আদর্শ' গড়ে ওঠে এবং সেই আদর্শকেই সে রূপ দিতে চায় তার জীবনে। তবে সব মানুষেরই যে একটা আদর্শ থাকে, আর সেই আদর্শকেই সে অনুসরণ করে চলে, তা অবশ্য নয়। অনেক লোক আছে যাদের জীবনের কোনও আদর্শই নেই। তারা শুধু গতানুগতিক ভাবে কাজ করে যায়, কিংবা হয়ত কিছুই করে না বা অকাজে সময় নষ্ট করে—কোনও আদর্শেরই তারা ধার ধারে না। এটা কিন্তু মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা আদর্শ থাকা উচিত—বিশেষ করে তোমাদের মতন কিশোরদের, যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের সব সময়ই একটা উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত। তা নইলে আদর্শচ্যুত হয়ে জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারবে না কোনও সুনির্দিষ্ট পথে লক্ষ্যহীন ভাবে শুধু ভেসে বেড়াবে।

আদর্শ অবশ্য একরকমেরই হয় না—তার রকমফের আছে। আর, কার জীবনের কি আদর্শ হবে সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের রুচি অনুযায়ী। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত চাও বড় পণ্ডিত বা জ্ঞানী হয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে, কেউ হয়ত বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে চাও, লেখক হবার ইচ্ছাও হয়ত অনেকে মনে পোষণ কর, শিল্পের সাধনাতেও অনেকে হয়ত মগ্ন থাকতে চাও, কেউ হয়ত বা বড় ব্যবসাদার হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে, কারো মনে হয়ত সরকারী অফিসের বড় কর্মকর্তা হওয়ার ইচ্ছা জাগছে আবার কেউ বা হয়ত চাও দেশের নেতা হয়ে দশের সেবা করতে। সৈনিক হবার, বৈমানিক হবার, ভূপর্যটক হবার, বড় খেলোয়াড় হবার, এমন কি অভিনেতা হবার স্বপ্নও হয়ত তোমরা অনেকেই দেখে থাক। কিন্তু যে ইচ্ছাই তোমাদের মনে থাক, তাকে আদর্শরূপে নিতে হলে অর্থাৎ সেই অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলতে হলে—পরম নিষ্ঠা ভরে, সুষ্ঠু ভাবে, স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে সেই আদর্শের রূপায়ণে। আদর্শচ্যুত হলে চলবে না, বা খামখেয়ালী করে আদর্শের ঘন ঘন পরিবর্তন করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

আদর্শ ঠিক করবার আগে ভাল করে ভেবে দেখবে তোমার জীবনে তা সফল করে তোলা সম্ভব হবে কি না। আকাশ-কুসুম গড়ে তুলে দিবা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাল কাটান বা নিজের পক্ষে যা করা অসম্ভব

আদর্শ

শ্রীজ্ঞান

'আদর্শ'!—এই কথাটির অর্থ তোমাদের কারুরই অজানা নয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয় কথাটির মূলগত অর্থ জানা থাকলেও সাধারণতঃ দেখা যায় সেই অর্থ অনুযায়ী কাজ খুব কম লোকেই আজকাল করে থাকেন। একটা আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত প্রত্যেক মানুষেরই। প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন অনুযায়ী, শিক্ষা অনুযায়ী, পরিবেশ অনুযায়ী তার 'আদর্শ' গড়ে ওঠে এবং সেই আদর্শকেই সে রূপ দিতে চায় তার জীবনে। তবে সব মানুষেরই যে একটা আদর্শ থাকে, আর সেই আদর্শকেই সে অনুসরণ করে চলে, তা অবশ্য নয়। অনেক লোক আছে যাদের জীবনের কোনও আদর্শই নেই। তারা শুধু গতানুগতিক ভাবে কাজ করে যায়, কিংবা হয়ত কিছুই করে না বা অকাজে সময় নষ্ট করে—কোনও আদর্শেরই তারা ধার ধারে না। এটা কিন্তু মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রত্যেক মানুষেরই জীবনে একটা আদর্শ থাকা উচিত—বিশেষ করে তোমাদের মতন কিশোরদের, যারা আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ, তাদের সব সময়ই একটা উচ্চ আদর্শকে অনুসরণ করে চলা উচিত। তা নইলে আদর্শচ্যুত হয়ে জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারবে না কোনও সুনির্দিষ্ট পথে - লক্ষ্যহীন ভাবে শুধু ভেসে বেড়াবে।

আদর্শ অবশ্য একরকমেরই হয় না—তার রকমফের আছে। আর, কার জীবনের কি আদর্শ হবে সেটা নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের রুচি অনুযায়ী। তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত চাও বড় পণ্ডিত বা জ্ঞানী হয়ে জ্ঞান বিতরণ করতে, কেউ হয়ত বৈজ্ঞানিক হয়ে বিজ্ঞানের সাধনায় জীবন উৎসর্গ করতে চাও। লেখক হবার ইচ্ছাও হয়ত অনেকে মনে পোষণ কর, শিল্পের সাধনাতেও অনেকে হয়ত মগ্ন থাকতে চাও, কেউ হয়ত খুব বড় ব্যবসাদার হয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে, কারো মনে হয়ত সরকারী অফিসের বড় কর্মকর্তা হবার ইচ্ছা আছে। আবার কেউ বা হয়ত চাও দেশের ও দশের সেবা করতে। সৈনিক হবার, বৈমানিক হবার, ভূপর্যটক হবার, বড় খেলোয়াড় হবার, এমন কি অভিনেতা হবার স্বপ্নও হয়ত তোমরা অনেকেই দেখে থাক। কিন্তু যে ইচ্ছাই তোমাদের মনে থাক, তাকে আদর্শরূপে নিতে হলে অর্থাৎ সেই অনুযায়ী জীবনকে গড়ে তুলতে হলে—পরম নিষ্ঠা ভরে, দৃঢ় ভাবে, স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হবে সেই আদর্শের রূপায়ণে। আদর্শচ্যুত হলে চলবে না, বা খামখেয়ালী করে ঘন ঘন আদর্শের [illegible] পরিবর্তন করাও যুক্তিযুক্ত নয়।

আদর্শ ঠিক করবার আগে ভাল করে ভেবে দেখবে তোমার জীবনে তা সফল করে তোলা সম্ভব হবে কি না। আকাশ-কুসুম গড়ে তুলে দিবা স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাল কাটান বা নিজের পক্ষে যা করা অসম্ভব

এমন কোনও পরিকল্পনাকে আঁকড়ে পড়ে থাকা অন্যায়ই শুধু নয়, নিজের প্রতি অবিচার করাও। এরকম কোনও অসম্ভব বা অবাস্তব আদর্শকে অনুসরণ করতে গেলে অসাফল্য আসবেই, আর সেই আশাভঙ্গজনিত মনস্তাপ হয়ত তোমার ভবিষ্যৎ জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। তাই কোনও আদর্শ নির্বাচন করবার সময় বা অনুসরণ করবার সময় স্থির মস্তিষ্কে ভেবে দেখবে তোমাদের রুচি, পরিবেশ, শিক্ষা প্রভৃতি অনুযায়ী সেটা হচ্ছে কি না। আদর্শ যদি তোমাদের মনের ঠিক উপযোগী হয়, আর তাকে যদি সঠিক ভাবে অনুসরণ করে রূপ দিতে পার তোমাদের জীবনে তাহলে তোমরাই শুধু সুখী হবে না, আরও পাঁচ জনে তোমাদের দৃষ্টান্ত দেখে এর অনুসরণ করে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে

যদি তোমাদের কারও মনে এই 'আদর্শ' স্থির করা সম্বন্ধে কোনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, তাহলে এই 'কিশোর জগৎ' বিভাগে পত্র লিখে সব জানিও। সাধ্যমত চেষ্টা করব উপদেশ দিয়ে তোমাদের সাহায্য করতে।

—

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত

সৌম গুপ্ত

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(৬)
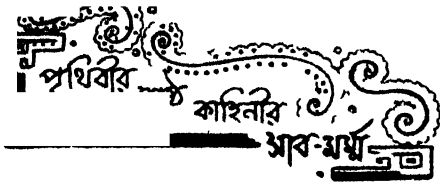
তারপর কাউণ্টের লক্ষ্য—ফার্ণান্দের উপর।

গ্রীস আর তুর্কীর যুদ্ধের সময় ফার্ণান্দ্ চাকরী করতো গ্রীস পক্ষীয় নেতা আলি তেবেলিনের কাছে। সে যুদ্ধের হাঙ্গামায় তেবেলিন নিহত হয় তুর্কীদের হাতে...তার মৃত্যুর পর, আলির বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছে ফার্ণান্দ্।...এ খবরটুকু কাউণ্ট ইতিমধ্যেই সংগ্রহ করেছিলেন।

কিছুদিন বাদেই ফরাসী রাজ্যের খবরের কাগজে কাউণ্ট মাত্র কয়েকটি ছত্রে একটি সংবাদ ছাপিয়ে বার করলো। সংবাদটি হলো—

একটি বিশেষ খবর—এতকাল যা অপ্রকাশিত ছিল, সম্প্রতি সেটি জানা গিয়েছে। অর্থাৎ, আলি তেবেলিনকে তাঁর এক ফরাসী কর্মচারী বেইমানী করে সঁপে দিয়েছে তুর্কীদের হাতে। চরম এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার-হিসাবে তেবেলিনের সেই ফরাসী অনুচর বিশলক্ষ ক্রাউন-মুদ্রা পেয়েছিল তুর্কীদের কাছ থেকে। নিহত তেবেলিনের সেই ফরাসী-অনুচরের নাম—ফার্ণান্দ। জাতে ফরাসী এবং বিদেশী হলেও, ফার্ণান্দ নামে এই কর্মচারীটিকে আলি তেবেলিন একান্ত আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন।

সংবাদ-পত্রে এ খবর ছেপে বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গেই সারা ফরাসী-রাজ্যে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল এমন কি, রাজ্যের বিধান-পরিষদের 'চেম্বার অফ্ পিয়ার্সের' (Chamber of peers) গণ্যমান্য-সদস্যেরা পর্য্যন্ত বিশেষ বিচলিত হয়ে এ ব্যাপারের তদন্ত সুরু করলেন। তাঁদের তদন্তের উত্তরে ফার্ণান্দ্ জবানবন্দী দিলে—আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।

কিন্তু তাতেই এ তদন্তের নিষ্পত্তি হলো না। নিহত আলি তেবেলিনের ছিল একটি কন্যা। বহু চেষ্টায় কাউণ্ট তাকে প্যারিসে এনে হাজির করলেন। তদন্তকালে সে কন্যাকে কাউণ্ট বিচার-সভার এজলাসে সাক্ষী-হিসাবে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সভার আসরে ফার্ণান্দ্‌কে দেখে তেবেলিনের কন্যা বললে,—তোমার ললাটে আমার পিতার রক্ত-রেখা...তুমি খুনী...নির্মমভাবে খুন করেছো আমার পিতাকে।

বিচার-সভায় তেবেলিনের কন্যাকে দেখে ফার্ণান্দ উত্তেজিতভাবে পাগলের মতো সভা-কক্ষ ত্যাগ করে

গেল···তার আচার ব্যবহার লক্ষ্য করে বিচারে তাকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত রায় দিলেন—বিশ্বাসঘাতকতা, দেশদ্রোহিতা এবং হত্যাপরাধে সহায়তা করার অপরাধে ফার্ণান্দ্‌কে শাস্তি পেতে হবে।

আদালতের বিচারে ফার্ণান্দ্ হলো প্যারিস থেকে বহিষ্কৃত।

ফার্ণান্দের তরুণ-পুত্র এ্যাল্‌বার্ট · তার কিন্তু দৃঢ়-ধারণা হলো—পিতার এই দুর্ভোগ-তদন্তের অন্তরালে রয়েছে কাউণ্ট অফ্ মন্টি ক্রিষ্টোর নিপুণ চক্রান্ত! সে ভাবলো—কেন···কেন · কি কারণে কাউণ্ট হঠাৎ তার পিতাকে এমন গুরু-অপরাধের ফাঁসে জড়িয়ে দোষী সাব্যস্ত করলো?

সুকৌশলে এ ব্যাপারের আসল মর্ম্ম অনুসন্ধানের আগ্রহে সেই রাত্রেই তরুণ এ্যালবার্ট কাউণ্ট অফ্ মন্টি ক্রিষ্টোকে অনুসরণ করে সটান এসে হাজির হলো প্যারিসের সৌখিন-নাট্যশালা 'অপেরা-হাউসের' আসরে। সেখানে অভিনয়-বিরতির এক ফাঁকে সে সরাসরি দেখা করলো কাউণ্টের সঙ্গে ··সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলো,—কেন আপনি আমার পিতাকে এমন কদর্য্য-অপমানকর অপরাধে দায়ী করলেন?

কাউণ্ট বললে,—বটে! · তুমি দেখছি, অনর্থক গায়ে-পড়ে আমার সঙ্গে বিরোধ বাধিয়ে তুলতে চাইছো হে ছোকরা!

দৃঢ়কণ্ঠে এ্যাল্‌বার্ট বললো,—আমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট-জবাব জানতে চাইতে এসেছি আপনার কাছে।

এমনি কথায়-কথায় দুজনের তুমুল তর্ক চললো! 'অপেরা-হাউসে' যাবার সময় এ্যালবার্টের ক'জন বন্ধুও ছিল তার সঙ্গী·· উভয়ের তর্ক বিতর্কের ঝড় ক্রমেই সঙ্গীণ হয়ে উঠছে দেখে, তারা শশব্যস্ত হয়ে মিটমাটের চেষ্টা করলো···কিন্তু এ্যালবার্ট নাছোড়বান্দা ··কারো কথাই শুনলো না উপরন্তু, ঝোঁকের মাথায় কাউণ্টকে সে সদর্পে তার সামনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'ড্যুয়েল্' (Duel) বা 'দ্বন্দ্ব যুদ্ধে' আহ্বান জানিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সে রাত্রের মতো 'অপেরা-হাউস' থেকে বিদায় নিলো।

এ্যালবার্টের সঙ্গে এই বাক-বিতণ্ডার সময়, 'অপেরা-হাউসে' কাউণ্টের সঙ্গেই ছিলেন [illegible]বাসী-সহচর ম্যাক্স-মিলিয়ান। এ্যালবার্ট বাইরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাক্স্‌মিলিয়ান উদ্বিগ্নভাবে কাউণ্টকে জিজ্ঞাসা করলো,—এ্যাল্‌বার্টের সম্বন্ধে কি আপনি করতে চান?

শান্ত-দৃঢ়কণ্ঠে কাউণ্ট জবাব দিলো,—আমি ওর প্রাণ নেবো, ম্যাক্স্‌মিলিয়ান · 'ড্যুয়েল' (Duel) লড়াই হবে কাল ভোরে ছ'টায়—সেই সময়।

—কিন্তু কাউণ্ট···ঐ ছেলে হলো ওর বাপের প্রাণ-স্বরূপ।··

কাউণ্ট গম্ভীরভাবে বললে,—ও কথা আমি শুনতে চাই না! ··বাপ ভয়ানক শোক পাবে—এই কথা বলতে চাও।···কিন্তু আমি চাই, ওর বাপ পাক পুত্রশোক।··

সেদিন গভীর রাত্রে কাউণ্টের সঙ্গে দেখা করতে এলেন আপাদমস্তক-বস্ত্রাবৃতা এক মহিলা।

তাঁকে দেখে কৌতূহলভরে কাউণ্ট শুধোলে', আপনি কে, মাদাম?··

মুখের আবরণ সরিয়ে মহিলা অনুনয় করে বললেন,—আমার ছেলের তুমি প্রাণবধ করো না, এডমণ্ড্।···

মহিলার কথা শুনেই কাউণ্ট ভ্রূকুঞ্চিত করলো · বললে,—কার নাম করছেন?

আবেগ-ভরা কণ্ঠে মহিলা বললেন;- তোমার · তোমার নাম।·· এতদিন কেটে গেছে আমি শুধু ও নাম ভুলিনি, এডমণ্ড্। চিনতে পারছো না? আমি মার্সেডিজ ··তোমার কাছে এসেছি।

মুহূর্তের জন্য মহিলার মুখের পানে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে কাউণ্ট বললে,—কিন্তু মার্সেডিজ তো বেঁচে নেই, মাদাম্·· বহুদিন আগেই মারা গেছে।

—না।··মার্সেডিজ মরেনি এখনো বেঁচে আছে··· তোমাকে দেখবামাত্র সে তোমাকে চিনতে পেরেছে। কিন্তু কেন · কেন ফার্ণান্দের উপর তোমার এত আক্রোশ? ···তুমি যখন সরকারী-গারদে বন্দী তখন তাকে বিবাহ করার জন্য অপরাধ যদি কেউ করে থাকে তো সে আমি মার্সেডিজ্।

—কিন্তু জানো, মাদাম্···ঐ ফার্ণান্দই আমার কারাবাসের মূলে।

—তার মানে? ··মার্সেডিজ্ শিউরে উঠে প্রশ্ন করলো।

কাউণ্ট তখন মার্সেডিজ্‌কে বললে—তার কারাদণ্ডের মূলে ফার্নান্দের চক্রান্তের কাহিনী···ড্যাঙ্‌লার্সের সঙ্গে মিলে তার শয়তানী কীর্ত্তি-কলাপের ইতিহাস।

[ক্রমশঃ

—·—

বিণ্টুবাবুর বিচার

রমেশ মজুমদার

রাতদিন কাঁদে বিণ্টু। সংসারে তার মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। সারাবিশ্বে ঐ টুকুই সম্বল মাত্র। বাবা মরে গেছে যখন বিণ্টুর বয়স তিন বছর। সেদিন কিছু বোঝেনি শোক কি। মাকে কাঁদতে দেখে সেদিন চোখ ঘষে একটু কাঁদতে চেষ্টা করেছিল।

আজ সব কিছু বুঝতে শিখেছে। তাই মায়ের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েছে। মা তাকে কতকি এনে খাইয়েছে। নিজে না খেয়ে বিণ্টুকে খাইয়েছে। কত আদর-যত্ন করেছে। তাই মায়ের জন্য এত ব্যথা, এত অশ্রু বিসর্জ্জন।

পুজোর সময় নিজের কাপড় কিনতে পারেনি, কিন্তু বিণ্টুকে প্যাণ্ট-জামা-জুতো পরিয়েছে। যে বাড়ীতে কাজ করতো তার মা, সেই বাড়ী থেকে চেয়ে এনেছে অগ্রিম টাকা। কাজ করে পরে শোধ করবে বলেছে।

রাতে খেয়ে-দেয়ে মায়ের বুকে মাথা গুঁজে ঘুমিয়েছে বিণ্টু। সে আশ্রয় আর সান্ত্বনা আজ নেই। আজ সে অসহায়, সর্ব্বহারা।

শেষরাতে মা মরে গেল। তখনও বিণ্টু তার পাশে ঘুমিয়ে ছিল। বুঝতে পারেনি প্রথমে। পরে ডাকাডাকি করেছে 'মা মা' বলে। জবাব পায়নি। আজ দু'দিন হলো জ্বর হয়েছিল। মাঝে-মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়তো। বিণ্টু ভাবলে, এবারও হয়তো তাই হয়েছে। তাই খানিকটা জল নিয়ে মাথায় ঢেলেছিল। দিয়েছিল চোখে-মুখে।

তারপর পাখা নিয়ে বাতাস করেছিল কচি হাত দুখানা দিয়ে। আর মাঝে মাঝে ডেকেছে 'মা-মা' বলে। মা তেমনি নিঃসাড় হয়ে রইলো। আট বছরের বিণ্টু তখন মায়ের গায়ে ধাক্কা দিয়ে ডাকলে। সাড়া পেলোনা। তখন একটা আশঙ্কায় কেঁদে ফেললে মাকে জড়িয়ে ধরে। কি হয়েছে মায়ের?

ওর মাকে চিকিৎসা করবার জন্য কোন ডাক্তার আসেনি। পয়সার অভাবে ডাক্তার আনতে পারেনি। কোথায় পাবে ডাক্তারের 'ফী' আর অষুধের দাম? ঘরে চার আনা পয়সা মাত্র সম্বল, আর আধসের চাল। দু'টো টিনের থালা।

দুঃখীদের ঘরে এর বেশী আর কি থাকতে পারে? কোথায় পাবে তারা এর বেশী?

তাই ওর মা আজ দু'দিন বিণ্টুকে দিয়ে আনিয়ে নিয়েছে শেফালী গাছের পাতা, ক্ষেত পাপড়ী। পাচন করে খেয়েছে। ফল হয়নি। জ্বর বেড়েছে বৈ কমেনি। অসুস্থ অবস্থাতেই বিণ্টুকে শাক-অন্ন রেঁধে দিয়েছে।

সকাল বেলা চারিদিক রোদে ঝল্‌মল্ করে উঠলো। বিণ্টুর রোজকার মত ফুল কুড়ানোর সময় হলো, সময় হলো শাবলা-দীঘির পাড়ে গিয়ে লগা দিয়ে ফুল ছিঁড়ে আনবার। কিম্বা বকুলতলায় যাবার।

মায়ের ঐ অবস্থা দেখে আজ যাওয়া হলো না। দূরের ঐ বাড়ী থেকে এলো এক বৃদ্ধা। দেখতে এলো বিণ্টুর মাকে। কেমন আছে আজ?

ডাকাডাকি করলো প্রথমে। সাড়া পেলো না। পরে গায়ে হাত দিয়ে দেখতে পেলে গা ঠাণ্ডা। চোখ দুটো মেলে আছে।

এবার বৃদ্ধাও কেঁদে ফেললে। সরলা মরে গেছে রে! ওগো, তোমরা কে কোথায় আছ, এগিয়ে এসো। মৃতদাহ করে এসো।

সহসা বিণ্টু যেন আকাশ থেকে পড়লো—মাটীতে 'মা-মা' বলে কেঁদে গড়াগড়ি দিল। আকাশ বাতাস সে কান্নায় ভরে উঠলো। দূর থেকে চেয়ে দেখলো কয়েকটি লোক। সান্ত্বনা দিতে কাছে গেল না।

বেলা বারোটা নাগাৎ কয়েকটা লোক এসে নিঃশব্দে মড়া নিয়ে গেল। বিণ্টু তখন কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে মাটিতে।

বিকেল বেলা ঘুম ভাঙ্গলো। চেয়ে দেখলো মা নেই। এবার বুক ভেঙ্গে গেল। কান্নার দাপটে ভেঙ্গে পড়লো বিণ্টু। কেউ সান্ত্বনা দিতে কাছে গেল না—পাড়ার বিনোদিনী বোষ্টুমী ছাড়া।

বোষ্টুমী কাছে গিয়ে অনেক বুঝিয়ে বললে। অনেক সান্ত্বনা দিলে। বললে, আজ থেকে আমায় 'মা' বলে ডাকবি। যা চাইবার আমার কাছে চাইবি। আমার কাছে থাকবি, খাবি, লেখাপড়া শিখবি।

রাজী হলো না বিণ্টু। এ বাড়ী ছেড়ে সে যাবে না, [illegible] কাছে না।

কোন কথাই যখন শুনলো না সে, তখন বোষ্টুমী [illegible] হয়ে চলে গেল। ছেলেটার কথা ভেবে বুক-পোড়া একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে [illegible]। ভাবলো, সন্ধ্যার পর এসে

দেখা যাচ্ছে কি বলে বিন্টু। তখন অন্ধকারে এই ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর তারি ভয় করবেই।

ক্রমে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। চারিদিক থেকে ডেকে উঠলো ঝিঁঝি পোকা। জোনাকীরা চারিদিকে পিট্ পিট করে আলো জালিয়ে ছুটাছুটি করলো। গাছের মাথা থেকে ডেকে উঠলো পেচা।

বিন্টু ক্রমশ ভীত হলো। চারিদিকে চাইলো ভয়ে। নিজেদের ছোট ঘরখানি ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। ঘরের ভেতরও থাকতে পারে না, বাইরেও না।

নিরুপায় হয়ে কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকারের ভেতর ছুটতে আরম্ভ করলো পথের দিকে। পথ বেয়ে ছুটলো সেনবাবুদের বাড়ীতে। তাঁদের বাইরের রকটাতে গিয়ে বসলো। শান্তি পেলো মনে। শুয়ে পড়লো রকের উপর।

পাশের গ্রাম থেকে বাউলের দল মেতে উঠলো শুয়ে চুপ করে শুনলো। মাঝেমাঝে মায়ের কথা মনে পড়ে। মোচড় দিয়ে উঠে বুকটা। নিঃশব্দে ঠোঁট দু'টো ফুলিয়ে কাঁদে। আজ নিজেকে একান্ত অসহায় মনে করলো। আপন বলতে তার আর কেউ নেই।

একটু পরেই সেনবাবু দরজা খুলে বের হতেই দেখলেন একটা ছেলে শুয়ে আছে। হাঁকলেন, কেরে? কে তুই এখানে শুয়ে?

—আমি বিন্টু!

—বিন্টু! তা তুই এখানে কেন রে লক্ষীছাড়া? যা, দূর হয়ে যা এখান থেকে! এখানে থাকতে পাবিনে!

প্রায় তেড়ে উঠলেন সেনবাবু। ভয়ে আর ব্যথায় কেঁদে ফেললো বিন্টু। বললে, আমার মা মরে গেছে তাই—

—তাই কি হয়েছে! যা, বাড়ী চলে যা! ভারী আস্পর্দ্ধা পেয়ে গেছে!

বিন্টু এবার এই আঁধার রাতে নিজেকে চরম অসহায় বোধ করলো। পথে বের হলো কাঁদতে-কাঁদতে। বাড়ীর দিকেই রওনা দিলে চারিদিক চাইতে চাইতে।

বোষ্টুমীও লণ্ঠন হাতে এতক্ষণ খুঁজছিল বিন্টুকে। বাড়ীতে না পেয়ে পথে-পথে ফিরছিল বিন্টুর নাম ধরে ডাকতে-ডাকতে। সহসা দেখা বিন্টুর সাথে। তখনও বিন্টু কাঁদছিল।

বোষ্টুমী বললে, কোথায় গিয়েছিলি, বাবা? আমি যে তোকে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি।

সব কথা বললে বিন্টু। বললে সেনবাবুর কথা। শুনে ব্যথিত হলো বোষ্টুমী। অনেক বুঝিয়ে নিজের আবাসে নিয়ে গেল বিন্টুকে। তাকে নিজের ছেলের মত আদর যত্ন আর স্নেহ-মমতা দিয়ে ভুলিয়ে রাখলো। তাছাড়া জামা-প্যান্ট দিলে।

বিন্টুর মায়ের শ্রাদ্ধে যা খরচ করবার বোষ্টুমীই করলে। তারপর এলো লেখাপড়ার পালা। বই-স্লেট্-পেন্সিল কিনে স্কুলে ভর্তি করে দিলে ছেলেটাকে।

রাতে বিন্টুকে কোলের কাছে শুইয়ে কত পরামর্শ, কত উপদেশ দেয় বড় হবার জন্য। তা শুনে বিন্টু মনে-মনে উচ্চাশার স্বপ্ন দেখে। খুব বড় হবে সে। মস্ত বড় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান হতে হবে। দেখাতে হবে সবাইকে।

বোষ্টুমী লোক দিয়ে বিন্টুদের বাড়ীর জায়গাটুকুতে শাক-সব্জি লাগিয়েছে। বিক্রী করে যা পয়সা পায়, তা সব পোষ্টাফিসে জমা করে বিন্টুর নামে। তার বিন্টুর উপর ভারী আশা। মস্ত বড় লোক গড়তে হবে বিন্টুকে। ছেলেটাও বেশ মন দিয়ে লেখা-পড়া করে। বিকেল বেলা ছাড়া আর কখনো খেলা ধূলা করে না।

ক্রমে ছ'মাস গত হতেই একদিন সেনবাবুরা ঢোল পিটিয়ে বিন্টুর জায়গাটুকু দখল করে নিলে। কাছে এগিয়ে গেল বোষ্টুমী ছেলেটাকে নিয়ে। প্রতিবাদ করলো। বললে, নাবালক ছেলের সম্পত্তি কি করে দখল করেন?

সেনবাবু হেসে ভুঁড়িটা দুলিয়ে বললে, বটে! তাহলে ছেলেটার উপর ভারী দরদ দেখা যাচ্ছে!

—তা দরদ আছেই তো। অসহায়কে সহায়তা করাই মানুষের ধর্ম্ম।

সেনবাবু তেমনি হেসে একখানা কাগজ দেখিয়ে বললে, তাহলে দেখে নাও বিন্টুর মায়ের অর্থাৎ সরলা দেবীর টিপসহি। মরবার কয়েকদিন আগে বিক্রী করে গেছে।

বোষ্টুমী কাছে গিয়ে দেখলো বটে. কিন্তু সে টিপসহি যে কার, কে জানে? অজানার পেছনে ছুটতে সাহস পেলো না সে। ফিরে এলো বিন্টুকে নিয়ে। বিন্টু বারংবার ফিরে চাইলো তাদের জমিটুকুর দিকে। ও জায়গার উপর তাদের আর দাবী থাকবে না।

এদিকে বোষ্টুমীর উৎসাহে আর উদ্দীপনায় দিনে-দিনে মানুষ হয় বিন্টু। ক্রমে উন্নতির সোপান বেয়ে উঠ্তে থাকে। বড় কষ্টে দিন চলে বোষ্টুমীর।

উচ্চশ্রেণীর মাইনা এবং বই দিতে হাঁপিয়ে ওঠে বিন্টুর মা। শেষে বিন্টু চুপে-চুপে ছোট ছেলেদের পড়িয়ে যে টাকা পেয়েছে, তা দিয়ে কিনেছে বই-খাতা, জামা-কাপড়। স্কুলের হেডমাষ্টার এবং সেক্রেটারীকে ধরে মাইনা 'ফ্রী' করিয়ে নিয়েছে। মায়ের অত কষ্ট আর দেখতে পারে না

বোষ্টুমীমা একদিন ছেলের দিকে চেয়ে বললে, এত কষ্ট করছিস বাবা, তা যেন সার্থক হয়। দশ বিশ গাঁয়ের ভেতর নাম করা লোক হওয়া চাই।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে বি । তাকে একদিন বড় হতেই হবে। শুনে খুশী হলো বোষ্টমী।

ক্রমে নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বি-এ পাশ করে বি । গ্রামের লোক বিস্ময়ে তার দিকে চেয়ে থাকে। খুশী হয়েছেন ও কলেজের শিক্ষকগণ। আনন্দিত হলো তার মা, তাই বলে এতটুকু অহঙ্কার নেই বিল্টুর। যেমনি সরল সহজ, তেমনি পরোপকারী। কেউ কোনদিন তাকে কটুকথা বলতে শোনেনি।

এবার বিল্টু বি সি-এস্ পড়বে সাব্যস্ত করলো। অনেক কষ্টে টাকা সংগ্রহ করে বের হলো মাকে রেখে। যাবার সময় কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন মা। তিনি যেন এই অসহায় সন্তানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন।

বোষ্টুমী আবার একা। ছেলেটা নেই বলে আজ চারিদিক শূন্য বলে মনে হলো। মাতৃহৃদয় ছেলের জন্য ব্যথিত হলো। ভাল থাক্, সুখে থাক্। বিজয়মালা পরে ফিরে আসুক।

কয়েক বছর পর সসম্মানে বি সি-এস্ পাশ করে ফিরলো বিল্টু। মায়ের বুক ভরে গেল। মুখে ফুটলো হাসি। আনন্দে ছেলেকে বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরে শিরশ্চুম্বন করলো। গ্রামে গ্রামে হৈ চৈ পড়ে গেল। ছুটে এলো অনেকেই। এলো না কেবল ধনী মানী সেনবাবুরা।

এরপর বিচারকের আসন পেলো বি । সহরে সুন্দর একটি বাসা পেয়েছে। মায়ের সাথে সেখানেই থাকে। ঠাকুর চাকর রেখেছে। মাকে বলেছে, বিশ্রাম করতে। সারা জীবন বড় কষ্ট সইতে হয়েছে, আর কেন? মায়ের আনন্দ আর ধরেনা। কষ্ট করে ছেলেটাকে মানুষ করা সার্থক হয়েছে। তাই ভিখারিণী থেকে আজ সে রাজ মাতা।

রাত দিন কত বড় জ্ঞানী গুণী লোক যাতায়াত করে তা দেখে হরিকে স্মরণ করে আনন্দে।

কোর্ট থেকে বাড়ীতে ফিরেও বিল্টুবাবুর কত কাজ। রাত দিন তার বই পড়া, আর কাগজপত্র নিয়ে মেতে থাকা। তা দেখে মা ঠাকুরকে পরামর্শ দেয় তাড়াতাড়ি খাবার ছেলেটার সামনে দিতে। নইলে মাথা ঠিক থাকে নাকি।

এমনি আনন্দের মাঝে তাদের প্রায় বছর দুই কেটে গেল। একদিন বিল্টু জানতে পারলো যে, তাদের গাঁয়ের সেই সেনবাবুদের বাড়ী ঘর দেনার দায়ে নিলামে উঠেছে। জমিদার টাকার পরিবর্তে বাড়ীটাই দখল করতে চায়। শুনে যেমন দুঃখিত হলো বিল্টু, তেমনি মৃদু হাসলো। একদিন ঐ সেনবাবু তাদের জমিটুকু বেআইনী ভাবে দখল করেছে—মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। আজ সেই সেনবাবুর বাড়ী ঘর সব চলে যায় পাঁচ হাজার টাকার জন্য।

অসহায় সেনবাবু। মনে পড়ে বিল্টুবাবুর কথা। তার কাছে সাহায্য চাইতে যাবে, ভাবে। কিন্তু তাদের উপর যে সে অত্যাচার করেছে, বিল্টুবাবু নিশ্চয়ই তা ভুলে যায়-নি। তবু আশায় বুক বাঁধে বারংবার, সেনবাবু বিল্টুবাবুর বিচারকক্ষে ঢুকে চায় বিচারকের দিকে।

বিচারাসনে বসে তা লক্ষ্য করে বিল্টুবাবু। পরে আর্দালীকে দিয়ে খবর পাঠায় সেনবাবুকে বাসায় গিয়ে দেখা করতে।

এদিকে বাড়ী নিলামে কিনে নিলে জমিদার। সন্ধ্যায় সেনবাবু বিল্টুবাবুর বাসায় গেলেন লজ্জাবনত শিরে। খবর পেয়ে বেরিয়ে এলো বিল্টুবাবু। নমস্কার করে সেন-বাবুকে একখানা চেয়ারে বসতে বললে। একটু পরে বললে বিল্টুবাবু, আপনার বাড়ী ঘর নিলাম হয়ে গেল শুনলাম।

সেনবাবু একটু মৌন থেকে বললে, আপনাদের বাড়ী অন্যায় করে নিয়েছিলাম, এ তারই প্রতিফল।

—তা যাক্, আপনার কাজ আপনি করেছিলেন, আমার কাজ আমি করি। আপনাকে পাঁচ হাজার টাকা সংগ্রহ করে কাল দেবো। অবশ্য অঙ্গীকার পত্রে আপনাকে সহি করতে হবে যে, পাঁচ বছরের ভেতর এটাকা পরিশোধ করবেন।

—ধন্যবাদ। তাহলে আপনার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। বলে চলে গেলেন বৃদ্ধ সেনবাবু। আজ তাঁর চোখ খুলে দিলে তরুণ বিচারক বিল্টুবাবু।

মনোহর মৈত্র

১। তাসের হেঁয়ালিঃ
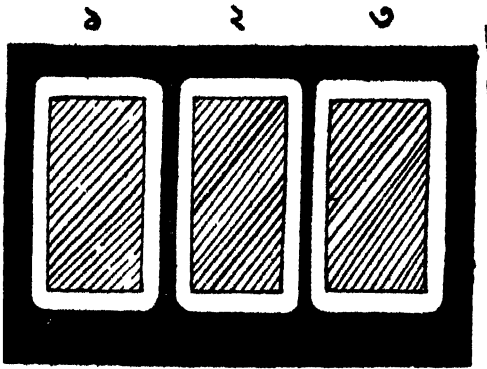
উপরের ছবিতে দেখছো—তিনখানা তাস উবুড় করে পেতে রাখা আছে। উপুড়-করে ঢেকে রাখা এই তাস খানির মধ্যে—একটিতে লুকোনো রয়েছে হরতন কিম্বা ইস্কাপনের 'সাহেব' (King) এবং অন্য দুটির একখানিতে আছে হরতনের 'বিবি' (queen of Hearts), অপরটিতে ইস্কাপনের 'বিবি' (queen of spades)। আসল হেঁয়ালিটি হলো—এই তাস তিন-খানির কোনোটিকে আদৌ স্পর্শ না করে, শুধু চোখে দেখে এবং মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে মনে-মনে হিসাব করে সঠিকভাবে তোমাকে বলতে হবে—এর মধ্যে কোন তাসটিতে লুকোনো রয়েছে হরতনের বিবি, কোনটিতে ইস্কাপনের সাহেব। তোমাদের হিসাব করে দেখার সুবিধার জন্য, আমরা অবশ্য নীচে কয়েকটি হদিশ দিয়ে রাখলুম। সেই হদিশগুলির যথাযথ মর্মানুসরণ করে তোমরা যদি একটু মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে বিবেচনা করে দ্যাখো তো খুব সহজেই এ হেঁয়ালির সঠিক-সমাধান করতে পারবে। কাজেই সবার আগে নীচের হদিশগুলি ভালোভাবে পড়ে নাও আগাগোড়া। তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে হিসাব করে খুঁজে বার করো, উবুড় করে ঢেকে রাখা এই তাস তিনখানির মধ্যে কোনটিতে লুকোনো রয়েছে হরতনের বিবি, কোনটিতে ইস্কাপনের বিবি এবং কোনটিতে আছে হরতন অথবা ইস্কাপনের সাহেব। নীচের হদিশগুলি হলো—

(ক) সাহেবের ঠিক ডানদিকেই রয়েছে, হরতন কিম্বা ইস্কাপন—কোনো একটি তাসের বিবি।

(খ) হরতন কিম্বা ইস্কাপন, কোনো একটি তাসের বিবির বাঁ দিকে রয়েছে—এ দুটি তাসের রঙের অপর একটি বিবি।

(গ) কোনো একটি হরতন-রঙের তাসের বাঁদিকেই রয়েছে—ইস্কাপন রঙের আরেকটি তাস।

(ঘ) কোনো একটি ইস্কাপন-রঙের তাসের ডান-দিকেই রয়েছে—ইস্কাপন-রঙের অপর একটি তাস।

যাই হোক, হদিশের হদ্দ তো মোটামুটি পেলে, এবার তোমরা বুদ্ধি খাটিয়ে বলো দেখি—উবুড় করে সাজিয়ে-রাখা ১নং, ২নং আর ৩নং তাসের মধ্যে কোনটিতে লুকোনো রয়েছে ইস্কাপনের বিবি, কোনটিতে হরতনের বিবি এবং কোনটিতে আছে ইস্কাপনের কিম্বা হরতনের সাহেব?... তোমাদের মধ্যে যারা এ হেঁয়ালির সঠিক উত্তর দিতে পারবে, আগামী সংখ্যায় তার নাম-ধাম আমরা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে সবাইকে জানিয়ে দেবো—প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলুম।

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা

২। ১০০ সংখ্যাটিকে এমন চারিটি অংশে বিভক্ত করো, যাহার প্রথম অংশের সহিত ৪ যোগ করিলে, দ্বিতীয় অংশ হইতে ৪ বিয়োগ করিলে, তৃতীয় অংশকে ৪ দ্বারা গুণ করিলে এবং চতুর্থ অংশকে ৪ দ্বারা ভাগ

করিলে—যোগফল, বিয়োগফল, গুণফল ও ভাগফল একই সংখ্যা হইবে? চারিটি অংশ কি কি হইবে—বলো তো দেখি?

রচনা : দিলীপকুমার দত্ত (বাঁশবেড়িয়া)

৩। তিন অক্ষরে নাম তার···পুরোটিতে বোঝায়—আগুন-জ্বালানোর উপকরণ···মাঝের অক্ষর ছেড়ে দিলে আমাদের প্রিয়-সুখাদ্য এক রকম ফল বোঝায়। বলো তো, সেটি কি জিনিষ?

রচনা : সুলতা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর :
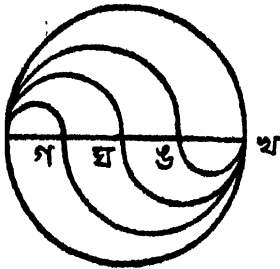
উপরের ছবিটি দেখলেই, তিনটি মাত্র বক্র-রেখার আঁচড় টেনে কি উপায়ে গোলাকার-চক্রটিকে সমান-মাপের চার-অংশে বিভক্ত করা যাবে—তার সঠিক পরিচয় জানতে পারবে।

২। জামরুল

৩। ভূগোল

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), পুতুল, সুমা ছাবলু ও টাবলু (হাওড়া), কবি ও লাড্ডু হালদার (পানাগড়), গৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা সত্যেন, মুরারি, সুনীল ও সঞ্জয় (ভিলাই), কুলু মিত্র (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যা (বোম্বাই), মিঠু ও বুবু গুপ্তা (কলিকাতা), সব্যসাচী সেন (মাদ্রাজ), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো) শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), বুড়ো দেবশর্ম্মা (লক্ষ্মৌ)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (নওয়াদা), ইন্দ্র দাস (কটক), হিমাংশু মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), হারাণ, ঘুঘু ও বালু (কাঁচড়াপাড়া) মদন, সত্যনারায়ণ, বুবু, মিঠু ও মঞ্জু সরকার (নওগাঁ), মমতা ও বাবুই ভট্টাচার্য্য (ধুবড়ী), প্রিয়রঞ্জন নাথ, রবি, নারায়ণ, সুনীল ঘোষ, গোপী মণ্ডল ও অনিসুর রহমান (খুজুটিপাড়া), প্রদীপকুমার বসু (বাঁশবেড়িয়া), দীপালি, অপর্ণা, রীতা ও প্রদীপ বাগচী (কোঁচ), গোপালচন্দ্র পাঁজা (কলিকাতা), তৃপ্তি মিত্র (গুড়াপ), মিঠু ও চৈতালী বসু (কলিকাতা), ধর্ম্মদাস রায় (বিদ্যাধরপুর), নন্দকিশোর ও রামকমল গোস্বামী (ভালাইগোড়া), সহদেব, সুনীল, শ্যামল, শক্তি, তারাপদ ও কবিতা (ভেলাইগড়া), সুকৃতিকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), অংশুকুমার মিত্র (কটক), পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময় ধীরাগময়, সিপ্রাধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), সীতেশপ্রসাদ ও নির্ম্মলচন্দ্র দত্ত চৌধুরী (জনাদাড়ী)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রবিন রায় (বোম্বাই), নিপু ও সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), রাণা ও বুনা (কলিকাতা), রীণা ঘোষ ও গোপীকান্ত মণ্ডল (খুজুটীপাড়া), গৌতম, কল্পনা ও নীতা (কলিকাতা), শাশ্বতকুমার গোস্বামী ও প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় (যাদবপুর)।

বিচিত্র-ছাঁদের এই যে সব
ঘুড়ির নমুনা দেখছো —
আকাশের বুকে এমনি ধরণের
বাক্স-প্যাটার্নের আর নানান্
রঙে পরিপাটি-সাজে সাজানো
ঘুড়ি ওড়ানোর রেওয়াজ আজো
পাশ্চাত্য-দেশের বহু ছোট-বড়
গ্রামে-শহরে নিত্যই
নজরে পড়ে। শুধু
নিছক খেলার জন্যই
নয়, বিজ্ঞানের বহু
নব-নব তথ্য-রহস্য
আবিষ্কার আর
গবেষণার
উদ্দেশ্যেও
এমনি সব
ঘুড়ি
ওড়ানোর
রীতি অনুসৃত
হয়ে থাকে
ওদেশে।

... আর
বিশ্বকর্ম্মা-পূজোর
দিন আমাদের দেশের আকাশ
ছেয়ে যায় ছোট-বড় হরেক রঙের
কত সব সৌখিন-ছাঁদের বিচিত্র-
অভিনব ঘুড়ির
লীলা-খেলায়
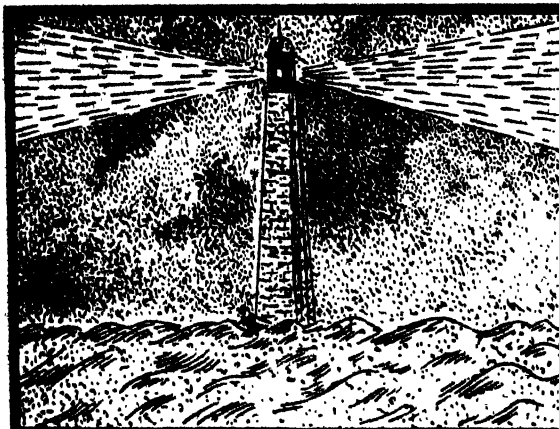
জলে-ডাঙ্গায়

সমুদ্রের মধ্যে বিপজ্জনক জায়গায় আলোক স্তম্ভ স্থাপিত হয়। রাত্রে ও ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন দিবসে ইহার আলো পাইলে জাহাজগুলি দূরে সরিয়া যায়। ফলে বহু জাহাজ বিপদের হাত হইতে রক্ষা পায়

অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে ক্যাঙ্গারু দেখিতে পাওয়া যায়। পিছনের পা দুইটির তুলনায় সামনের পা দুইটি খুব ছোট। সেইজন্য ইহারা দ্রুত লাফাইয়া চলিতে পারে। ইহাদের স্ত্রীজাতির পেটের নীচে শাবক রাখিবার থলি আছে।

—আব্রাহাম রচিত

ডিসটেন্ট সিগন্যাল

সমীর চট্টোপাধ্যায়

ট্রেণ থেকে নেমে প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে কয়েক পা এগিয়ে যেতেই একজন লোক প্রায় ছুট্তে ছুট্তে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। আমার আপাদ মস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল,—আপনার নাম কি সুপ্রকাশবাবু? কোলকাতা থেকে আসছেন?

বললাম—হ্যাঁ, হাওড়া থেকে এখানে বদলি হয়ে এলাম—আমার মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে, সুট-কেশটা হাতে তুলে নিয়ে লোকটি বলল,—আর বলতে হবে না। আপনিই এখানকার নতুন এস্. এম্ হয়ে এলেন তো?—আজ্ঞে আমার নাম শ্রীপতি মোহন। আপনার জন্যেই আমি এখানে অপেক্ষা করছি। পুরাণো এস, এম্ মালতীবাবুই পাঠিয়েছেন আমাকে আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। তিনি আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন যাতে পথে আপনার কোন অসুবিধে না হয়। ইষ্টিশানের বাইরে আমি টাঙ্গা ঠিক করে রেখে এসেছি,—এখন হুজুরের হুকুম হলে জিনিস-পত্তর গাড়ীতে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।

ভাল করে লোকটির দিকে চাইলাম। চেহারায় বয়েসের ছাপ পড়েছে। অবশ্য বয়েসের থেকে একটু বেশী শৈথিল্যের আভাস টেনে এনেছে যেন ওর দেহে। পরণে একটা আধময়লা ধুতি। তার ওপর একটা পুরাণো কালো রঙের গলাবন্ধ কোট। কোটটা রেল-কোম্পানীর বলেই মনে হল। পায়ে একটা পুরাণো তালি দেওয়া ব্রাউন রঙের কেড্স্ জুতো। দু'পাশে দুটো আঙুলের চাপ পড়ে ছিঁড়ে গেছল বোধ হয়, সেখানটিতে একটা বেমানান কালো চামড়া বসিয়ে তালি দেওয়া হয়েছে। ফলে, লম্বাটে জান্তব-মুখের মত দেখতে জুতো জোড়ার মাথায় ওই তালি দুটোকে কালো-কালো চোখের মত দেখায়।

আমার বলার অপেক্ষা না করেই সঙ্গের বাক্স-বিছানা পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীপতি। এবার আমার কাছে এগিয়ে এসে হাত দুটো জোড় করে অত্যন্ত কুণ্ঠাভরা গলায় বলল, —এবারে আসুন স্যার। অনেকক্ষণ গাড়ীতে এসেছেন, এখন তাড়াতাড়ি করে বাসায় ফিরে একটু বিশ্রাম করবেন।

শ্রীপতিকে দেখতে দেখতে একটু আনমনা হয়ে পড়ে-ছিলাম। ওর সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য যেন স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। একটা অপরিচ্ছন্ন ভাব সারা দেহে। মুখে বেশ বড় বড় দাড়ি গোঁফ। অথচ ঠিক যে ধরণের দাড়ি-গোঁফে মানুষকে অসুন্দর দেখায় না, এ ঠিক সে ধরণের নয়। মনে হয় বেশ কিছুদিন গালে ক্ষুরের ছোঁয়া পায়নি। খোঁচা খোঁচা একরাশ ঘাসের মত অযত্ন বর্ধিত।

ষ্টেশন ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। পাশে একটা টাঙ্গার আড্ডা। সোয়ারী পেয়ে তাদের অনেকেই আমার চারদিকে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। কিন্তু আগে থেকে গাড়ী নির্দিষ্ট করে রেখেছিল শ্রীপতিমোহন। কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে আমার জিনিসপত্র তোলাতে লাগল সেই গাড়ীটাতে। সেই সঙ্গে কুলিগুলোকে ধমকে-ধমকে অস্থির করে তুলল।

—এ্যাই—এ্যাই—অত জোরে নয়। আস্তে! আস্তে! স্যারের সব দামী দামী জিনিস আছে ওর মধ্যে। —খবরদার, একটা যেন নষ্ট না হয়। এ্যাই—ফেললিতো জিনিসটা?

এমনিভাবে অতি ব্যস্ত হয়ে উঠল যেন শ্রীপতি। দাঁড়িয়ে দেখছিলাম শ্রীপতির কার্যকলাপ। ওর ওই ধরণের মাত্রাতিরিক্ত আচরণে বেশ বাড়াবাড়ি বলে মনে হচ্ছে আমার। অবশ্য এ রকম ব্যবহার আমার কাছে নতুন নয়। রেলের চাকুরী করে এই যাযাবরী-জীবনে

অনেক রকম মানুষ দেখেছি। বুঝলাম যে কোন কারণেই হোক লোকটি মনিবকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে। সেটা অবশ্য অনেকেই করেন। কিন্তু শ্রীপতিমোহনের এই মনিব-ভক্তির পিছনে অন্য কারণ ছিল, আগে সেটা আমি জানতে পারিনি। জেনেছিলাম বেশ কিছুকাল পরে। তখন আমি এস, এম হয়ে পুরোপুরিভাবে ওই শঙ্করপুরেই বসবাস করছি।

গাড়ীতে উঠে বসলাম। শ্রীপতি কিছুতেই আমার পাশে বসতে সম্মত হল না। সে টাঙ্গাচালকের পাশে বসল।

গেরুয়া রঙের ধুলো আর নুড়ি পাথরে বোঝাই রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলল টাঙ্গা। দু'পাশে মাঠ। মাঠের অপর পারে সারি-সারি শাল আর মহুয়া গাছের সমাবেশ। পথের দুপাশে শেয়াকুলের জঙ্গল। ভুট্টা আর যেধানের চাষ হয়েছে মাঠে। বাতাসে মৃদু মৃদু দুলছে সেগুলি। এখানে ওখানে শিশু-পর্বত মাথা তুলেছে। অনেক দূরে থমকে দাঁড়িয়ে থাকা মেঘের মত বয়স্ক পর্বতের সারি।

মন্দ লাগছেনা জায়গাটা। বেশ জনবিরল। মানুষের ভীড় আর কোলাহল বর্জিত। যেন কোন ধ্যানমগ্ন মৌন সন্ন্যাসী। নির্জনতা আমি ভালবাসি। বহুদিন কোল-কাতার জনারণ্যে বাস করে মনটা যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। তাই মনের রুচি বদলাতেই বাইরে চলে এসেছি। এখানে এসে আমার সেই প্রসুপ্তি-মনে যেন নতুন করে রুচির ছোঁয়া জাগল।

একটা রেল কোয়ার্টারের কাছে গাড়ী দাঁড়াতেই দরজার সামনে এসে দাঁড়াল শ্রীপতিমোহন। আমার নামতে বলে বাক্স-বিছানা নামাতে লাগল।

বাইরের একটা ঘরে আমার জিনিসপত্র রেখে ভিতরে চলে গেল শ্রীপতি।

কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে আমাকে বলল,—ভেতরে চলুন স্যার, মুখ হাত ধুয়ে নিন্।

হাত-মুখ ধুয়ে চা খাচ্ছি। হঠাৎ অত্যন্ত ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল শ্রীপতি। দু'চার বার ঘরের মধ্যে পায়চারি করল। একবার দরজার বাইরে ঘুরে এল। তার হাব-ভাব দেখে আমার মনে হল, যেন কোন কারণে সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আমার কাছে এসে দাঁড়াল শ্রীপতি। বলল,—আপনার হাত-ঘড়িতে এখন ক'টা বেজেছে স্যার ?

ঘড়ি দেখে বললাম,—চারটে।

কথাটা শুনে অত্যন্ত ব্যস্ত হল শ্রীপতি, বলল,—দয়া করে আমাকে একটু ছেড়ে দিন স্যার। একটা জরুরী কাজ সেরে আমি এখুনি আসছি।

কথাটা বলে আমার কোন মতামতের অপেক্ষা না করেই দ্রুতপদে চলে গেল সে।

পরদিন সকালে মালতীবাবু চলে গেলেন আমাকে সব চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে। শ্রীপতিমোহনের সম্পর্কে দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করবার ছিল আমার, কিন্তু তাড়াতাড়িতে কিছুই হল না।

আপিসে দেখা হল শ্রীপতির সঙ্গে। আমার সামনে এগিয়ে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল,—আমিই আপনার জন্য এই জায়গাটাতে বসবার ব্যবস্থা করলাম স্যার। এখানে বসলে আপনি খোলা আলো আর বাতাস দুই-ই পাবেন। বিকেলে চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপতি এসে দাঁড়াল আমার সামনে। নতুন জায়গায় এসেছি। ফাইল আর খাতাপত্তর বেশ ভাল করে দেখছিলাম। শ্রীপতি বলল,—আমাকে একটু ছুটি দিতে হবে স্যার!

বললাম,—কোথায় যাবেন এখন ?—এই তো সবে চারটে বেজেছে। আপনার ডিউটি তো রাত্রি পর্যন্ত। কি একটা কথা খুব অস্পষ্টভাবে বলল শ্রীপতি। ঠিক শুনতে পেলাম না।

ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি জিজ্ঞেস করলাম,—আমাকে আর কিছু বলবেন ?

শ্রীপতি বলল,—এখন একবার আমাকে যেতেই হবে স্যার! বড় দরকার!

এরপর আমার সম্মতির অপেক্ষা না করেই চলে গেল সে।

ভয়ানক রাগ হল আমার শ্রীপতির—ওই ধরণের ঔদ্ধত্যের জন্য। পরপর আরও কদিন দেখলাম, ঠিক একই সময়ে আপিস থেকে চলে গেল সে। ভাবলাম, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একই সময়ে যায় কোথায় লোকটা। কোন খারাপ নেশাটেশা করে নাকি! যে ধরণের চেহারা তাতে নেশাখোর হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

একদিন শ্রীপতিকে বললাম,—প্রতিদিন এমনভাবে আপিস ছেড়ে যাওয়া চলবে না। এটা অফিস ডিসিপ্লিন নয়। এরপরও যদি আপনি আমার নিষেধ না শোনেন, তাহলে আপনার নামে আমি ওপরওলার কাছে লিখে চার্জসীট দিতে বাধ্য হবো!

আমার কথা শুনে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে। তার মুখে যেন একটা বেদনার ছাপ।

কিন্তু আমার নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিদিন আপিস ছেড়ে চলে যায় শ্রীপতি। কোন পরিবর্তন হল না তার।

একদিন সত্যি সত্যি একটা দরখাস্ত লিখে ফেললাম। এ, এস, এম সুধীরবাবুকে বললাম,—এখানা টাইপ করিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

পরদিন টাইপ করা দরখাস্তটা আমার সামনে ধরে সুধীরবাবু বললেন,—নিন্ স্যার, একটা সই করে দিন এটাতে—

কলমটা তুলে নিয়ে বললাম,—কথাটা শ্রীপতি শুনেছে?

সুধীরবাবু বললেন,—হ্যাঁ স্যার!—ওর কথা আর বলবেন না। আগে এইভাবে প্রতিদিন এসে আমাকে জ্বালাতন করত। শেষে আমি দিতাম ওকে মালতীবাবুর কাছে পাঠিয়ে!—একটা পাগল মেয়ে নিয়ে ও যেন জ্বলে—পুড়ে মরছে!

বললাম.—ওঁর সংসারে আর কে আছে?

সুধীরবাবু বললেন,—শুধু একটা পাগলা মেয়ে!—কিন্তু কি বরাত দেখুন মেয়েটার, অমন সুন্দর ছেলের সঙ্গে বিয়ে খা হল, কিন্তু হতভাগীর ভাগ্য বুঝি সে সুখ মেনে নিল না!

সুধীরবাবু বলতে লাগলেন,—সিগ্ন্যালার শ্রীপতির মেয়ে মল্লিকা। কিন্তু যেন পটের ছবি। নামের সঙ্গে রূপের এমন সাদৃশ্য বড় একটা দেখা যায় না। শুভ্র-মল্লিকা ফুলের মতই নিষ্কলঙ্ক সে রূপ। আমাদের এই শঙ্করপুর টাউনটার মধ্যে অমন রূপবতী মেয়ে আমি আর একটিও দেখিনি। শুনেছি, শ্রীপতির স্ত্রীও নাকি ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু যাক সে কথা। আমাদের এস, এম, তখন ছিলেন ধরণীবাবু। তিনি ফ্যামিলি নিয়ে বাস করতেন এই শঙ্করপুরে। ধরণীবাবুর বড় ছেলে অবনী কোলকাতায় থেকে পড়াশুনা করতো। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় আসতো এই শঙ্করপুরে। হঠাৎ বুঝি কেমন করে তার দৃষ্টি পড়েছিল শ্রীপতির মেয়ে মল্লিকার ওপর। তারপর যা হয়, চোখের ভালো লাগা থেকে মনের ভালোবাসা। অবনী প্রায়ই লুকিয়ে চুরিয়ে যাতায়াত করতো শ্রীপতির বাড়ী। সে মনে মনে স্থির করেছিল যে, মল্লিকাকেই বিয়ে করবে।

ক'থাটা কেমন করে যেন ধরণীবাবুর কানে উঠেছিল। তিনি ছেলের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষে যখন ব্যাপারটা বাড়াবাড়িতে পৌঁছালো তখন ছেলের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করার জন্য এই শঙ্করপুর থেকে বদলী হয়ে গেলেন।

কিন্তু নিজেকে ঠাঁই নাড়া করলেও, ছেলের আসা-যাওয়ার পথ বন্ধ করতে পারলেন না ধরণীবাবু। বাপের অমতেই শঙ্করপুরে এসে মল্লিকাকে বিয়ে করেছিল অবনী।

‥কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা! নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। কে জানতো তখন যে, ওই বিয়ের মিলন-টুকুই তাদের জীবনের চরম লগ্ন হয়ে থাকবে।

বিয়ে বেশ নির্বিঘ্নেই কেটেছিল। সবাই একবাক্যে বলেছিল, হ্যাঁ, জামাইভাগ্য বটে শ্রীপতির। না হলে ওর যা অবস্থা, তাতে অমন ছেলে পাওয়া ওর পক্ষে কোনদিনই সম্ভব হ'ত না। কেউ কেউ আবার ঈর্ষা করে বলত ও'সব ওই ব্যাটারই কারসাজী। সুন্দরী মেয়েরা টোপ করে ছেলেটার মাথা খারাপ করে দিয়েছিল, তারপর তাকে গেঁথে তুলেছিল শয়তানটা! নাহলে কোলকাতায় কি সুন্দরী মেয়ের অভাব ছিল কিছু? কিন্তু তখনও কেউই জানতো না যে, মল্লিকার দুর্ভাগ্যই অবনীকে টেনে এনেছিল এই শঙ্করপুরে।

সকালে কুশণ্ডিকা শেষ করে বিকালের ট্রেনে অবনী যাবে কোলকাতায়। সেখানে বাসা ঠিক করে মল্লিকাকে নিয়ে যাবে। ওখানেই বৌভাত হবে।

অবনীকে ট্রেনে তুলে দিতে গেছে শ্রীপতি। সঙ্গে মল্লিকাও আছে। গাড়ী দাঁড়িয়ে। মল্লিকা আর অবনী প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে কথা বলছে। সে কথার যেন আর শেষ নেই। কিছুদূরে দাঁড়িয়ে আছে শ্রীপতি।

ঝাড়া-হাত-পা যাচ্ছে অবনী। একা মানুষ, তার পুরুষ, গাড়ীতে উঠতে আর কতক্ষণ।

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে। দূর থেকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে শ্রীপতি, চিৎকার করে বলছে,—গাড়ী যে ছেড়ে দিল অবনী! ওই গাড়ীর পর আর কোন গাড়ী নেই কোলকাতা যাওয়ার। অবনীও যেন কেমন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

—তাই ওই ট্রেন ধরার জন্যই সে চেষ্টা করল। অবনীকে চলন্ত-ট্রেনের দিকে যেতে দেখে মল্লিকাও যেন কেমন ভয় পেয়ে গেল। সে অবনীকে বাধা দেবার জন্য চিৎকার করে উঠল,—যেও না, ও গাড়ীতে তুমি উঠতে পারবে না, তুমি যেও না—।

—কিন্তু অবনীর সেই দুর্বার গতি তখন রুদ্ধ করে কে? সে যে মৃত্যুর ডাকে এগিয়ে চলেছে!

সেদিন আর গাড়ীতে উঠতে পারেনি অবনী। বাপ আর মেয়ের চোখের সামনে একটা মানুষের রক্তাক্ত দেহ ছিটকে পড়েছিল লাইনের পাশে! তখন আর অবনীকে চেনাই যায় না।

…তাই চারটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে যখন ওই ট্রেনের শব্দ শুনতে পায় মল্লিকা, তখন সেই বেদনাভরা মুহূর্তটি এসে দাঁড়ায় তার সামনে। ওই সময় সে কাঁদে! চিৎকার করে! কোন সময় বা ছুটে চলে যেতে চায়। বলে,—আমাকে এমন করে আটকে রেখোনা তোমরা! তোমার দুটি পায়ে পড়ি বাবা! সে যে বলেছিল, খুব তাড়াতাড়ি আসবে। আমাকে নিয়ে যাবে।—বাবা, আমার কাপড় দাও? গয়না বার করে দাও আমি পরবো। শ্বশুর বাড়ী যাবো না? বাবা, আমি শ্বশুর বাড়ী যাবো না?

ঠিক ওই সময়ে শ্রীপতিও আপিস ছেড়ে বাড়ী চলে যেতে চায়। ঘরে তালাচাবি দেওয়া থাকে মল্লিকা।

শ্রীপতি ছুটে চলে যায় নিজের বাড়ীতে। মল্লিকার ঘরের জানালার সামনে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর ওই সময়ের ছুটিটুকু পাবার জন্য বাবু মহলে সকলকে সন্তুষ্ট রাখে শ্রীপতি।

সুধীরবাবু তাঁর বক্তব্য শেষ করে বললেন,—নিন্ স্যার, সইটা করে দিন, আজই ফার্ষ্ট আওয়ারে ওটাকে ডেস্‌প্যাচ করার ব্যবস্থা করি—

দরখাস্তটা যেন ভয়ানক ঝাপসা হয়ে আসছে আমার চোখের সামনে,—ভয়ানক অস্পষ্ট।…সই করতে আর কলম উঠল না!

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বর্ষা তুমি, ঝর্ণা ঝরাও, মূর্ত্তিমতী পবিত্রতা,
নবীনতা জলে স্থলে, মনে আনো প্রসন্নতা।
ধুয়ে ফেল আবর্জ্জনা,
রাখ না মালিন্য কণা,
বাড়াও রাঙা-পলির জলে তুমি ধরার উর্ব্বরতা।

২

শান্তি আনো, কান্তি আনো, তরুলতায় শ্যামলিমা
তোমার রৌদ্র মেঘের খেলায় গরিমা যে পায় নীলিমা।
ফুটাও নভে রামধনুকে,
ভূমিকম্পা ধরার বুকে,
ভুবন-ভবন আলো করা রূপের তোমার নাই যে সীমা।

৩

মুগ্ধকরী, স্নিগ্ধকরী, তৃপ্তিকরী, শুভঙ্করী—
বুক যে ভরে হর্ষে হর্ষে তোমায় বরণ করি।
তোমার বন্যা তোমার পাথার,
স্মরায় অপার কৃপা যে তাঁর,
আনন্দে মোর প্লাবন আনে সকল বাধা লয় যে হরি।

৪

তুমি মহালক্ষ্মী মোদের, অন্নপূর্ণা, সত্যি গো।
সোনার ধানের সম্ভাবনায় বুক যে কর ভর্ত্তি গো।
ভাগ্যবতী, রূপবতী,—
গুণবতী তুমিই সতি,
নববধূর মতন এলো ভবিষ্যতের কর্ত্রী গো।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত—
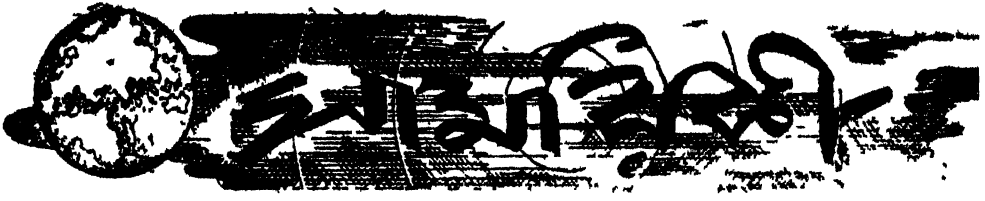
একাডেমী পুরস্কারপ্রাপ্ত খ্যাতনামা সাহিত্যিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান, তথা রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, 'ভারতবর্ষে'র দীর্ঘদিনের লেখক শশিভূষণ দাশগুপ্ত গত ২১শে জুন মঙ্গলবার বিকাল ৩টার সময় মাত্র ৫৩ বৎসর বয়সে ১০ মাস কর্কট রোগে কষ্ট পাইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি টালীগঞ্জ-চারু এভেনিউতে নিজগৃহে বাস করিতেন এবং বিধবা পত্নী, একমাত্র পুত্র অমিতাভ ও একমাত্র কন্যা সংঘমিত্রাকে রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ৮৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা মাতা ও দুইজন অগ্রজ সোদপুরে বাস করেন। তিনি শুধু অধ্যাপনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া সুনাম অর্জন করেন নাই, বহুসংখক, প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প ও উপন্যাসগ্রন্থ রচনা করিয়া সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকালমৃত্যু দেশবাসীর প্রত্যেককে ব্যথিত করিয়াছে—কারণ তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিলে ছাত্রসমাজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাংলাভাষা ও সাহিত্য তাঁহার বহু দানে সমৃদ্ধ হইত।

১৯১২ সালে বরিশাল জেলার চন্দ্রহার গ্রামে তাঁহার জন্ম এবং তিনি ১৯৩৫ সালে বাংলার এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথমস্থান লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক নিযুক্ত হন। ৩ বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯৫৫ সাল হইতে ঐ বিভাগের প্রধান তথা রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক পদে কাজ করিতেছিলেন। তিনি পি-আর-এস এবং পি-এইচ্-ডি হইয়াছিলেন এবং ১৯৬২ সালে বাংলার শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯৬১ সালে তিনি ইউ-নেস্কো আয়োজিত বিশ্বধর্ম সম্মিলনে যোগদান করিয়া হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সদাচারী, সরল ও অনাড়ম্বর ছিলেন। তিনি গান্ধীজির ভক্ত এবং খাদির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন—সারাজীবন খদ্দর ব্যবহার করিতেন। তিনি সন্ত বিনোবাজীর সর্বোদয় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন এবং সে বিষয়েও বহু প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সহৃদয় সুমধুর ব্যবহার তাঁহাকে সকল সমাজে প্রিয় করিয়াছিল এবং ঐরূপ উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি সাধারণত যে মনোভাবাপন্ন হন, শশিভূষণ তাহা হন নাই। সারা জীবনই তিনি নিজকে পল্লীগ্রামের একজন সাধারণ অধিবাসী বলিয়া মনে করিয়া সকলের সহিত প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। তিনি ছাত্রাবস্থা হইতে আমাদের পরিচিত ছিলেন এবং যখনই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তিনি বিনয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারের দ্বারা আপ্যায়িত করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার বিয়োগে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুগণের সহিত আমরা স্বজন-বিয়োগ-বেদনা অনুভব করিতেছি এবং ভগবৎচরণে প্রার্থনা জানাই, তাঁহার বিদেহী আত্মা চিরশান্তি লাভ করুক!

ব্যারাকপুরে সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়—

গত ২৪শে জুলাই শুক্রবার গুরুপূর্ণিমার সন্ধ্যায় ব্যারাকপুর মণিরামপুরস্থ ভোলানন্দ গিরি আশ্রমে একটি নূতন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব হইয়াছে। আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি মহারাজের চেষ্টায় ঐ আশ্রমে কয়েকটি নিম্ন বুনিয়াদি, উচ্চ বুনিয়াদি, বালক ও বালিকাদের উচ্চ বিদ্যালয়, নিম্ন টেকনিকাল স্কুল, ছাত্রাবাস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত ও পরিচালিত হইয়েছে। সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন উৎসবে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় সভাপতি, পণ্ডিত প্রবর শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ প্রধান অতিথি ও শ্রীবন্দীন্দ্র-

নাথ মুখোপাধ্যায় বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ফণীন্দ্রবাবু প্রথমে আশ্রম সম্বন্ধে ইতিহাস বিবৃত করিলে সভাপতি ও প্রধান অতিথি সংস্কৃত ভাষা ও স হিত্য পঠন-পাঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তৃত ভাবে জানাইয়া দেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ প্রতি জেলায় একটি করিয়া সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় প্রস্তাব করায় আনন্দ প্রকাশ করা হয় এবং মণিরামপুর আশ্রমে যাহাতে তাহার একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, সে জন্য আবেদন জানানো হয়। স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ সর্বশেষে সকলকে ধন্যবাদ দানকালে সকলকে আশ্রমের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে আবেদন জ্ঞাপন করেন। সভায় বহু জনসমাগম হইয়াছিল এবং তারকেশ্বরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মোহন সাংখ্যতীর্থ সভারম্ভে মঙ্গলাচরণ করিয়াছিলেন।

কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ স্মৃতি—

কন্যা কুমারিকায় সমুদ্রের মধ্যে একখণ্ড প্রস্তরের উপর বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ সাধনা করিয়াছিলেন। ঐ স্থানে একটি বিবেকানন্দ স্মৃতিমন্দির নির্মিত হইয়াছে এবং ঐ মন্দির মধ্যে স্বামীজির এক আবক্ষ মূর্তি রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এ সংবাদে দেশবাসী সকলেই আনন্দলাভ করিবেন। স্বামীজির আগামী জন্মদিনে ঐ মন্দির ও মূর্তির প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্পাদিত হইবে।

নারিকেল ও সুপারির চাষ—

গত ২১শে জুলাই সুন্দরবন উন্নয়ন পরিষদের সভায় স্থির হইয়াছে যে এ বৎসর সুন্দরবন অঞ্চলে ৫০ হাজার নারিকেল গাছ ও এক লক্ষ সুপারি গাছের চারা বণ্টন করা হইবে। লবণ জল ঐ সকল গাছের অনিষ্ট করিতে পারে না। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সুন্দরবন উন্নয়নপরিষদের সভাপতি ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনার শ্রীরঘুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ পরিষদের সম্পাদক। এ চেষ্টা আরও ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন।

নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী—

আন্তর্জাতিক রোটারী আন্দোলনের নেতা নীতীশচন্দ্র লাহিড়ী গত ২১শে জুলাই বিকালে তাঁহার কলিকাতা-বালীগঞ্জ গরচা লেনস্থ বাটিতে ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯২৭ সালে রোটারী আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি সারা জীবন রোটারী আন্দোলনকে নানাভাবে পুষ্ট করিয়াছিলেন এবং বিদেশে বহু স্থানে নিজ কৃতিত্বের জন্য নানাবিধ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। বহু বৎসর তিনি আন্তর্জাতিক রোটারী ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। তিনি ফিল্ম নির্মাণের ব্যবসা করিয়া খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। বিদেশে বাঙ্গালীর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশনের পুনর্বিন্যাস—

আগামী মার্চ মাসে বয়স্কের ভোটাধিকারভিত্তিতে কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার নির্বাচন হইবে। সে জন্য কলিকাতায় ৮০টি ওয়ার্ডের স্থলে ১০০টি ওয়ার্ড করা হইয়াছে—এবার ১০০ জন কাউন্সিলার নির্বাচিত হইবেন। গত ১৭ই জুলাই কলিকাতা গেজেটে নূতন ওয়ার্ডগুলির এলাকা ঘোষণা করা হইয়াছে। মনে হয়, প্রতি ওয়ার্ডে ১৭ হাজার করিয়া ভোটার থাকিবে। পুরাতন ওয়ার্ড-গুলি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় একদল লোক বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। পুরাতন কাউন্সিলারদের এখন নূতন ভোটারদের ভোট প্রার্থনা করিতে হইবে। লোকসংখ্যা যে ভাবে বাড়িতেছে ও কলিকাতা সহরের সমস্যা যে ভাবে সঙ্গীণ হইতেছে, তাহার প্রকৃত সমাধানের উপায় নির্ণয় সহজ নয়। দেখা যাক, নূতন ব্যবস্থায় কি ফল হয়।

খাদ্য পরিস্থিতি—

গত কয়েক মাস ধরিয়া সারা ভারতে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম বাংলায় যে খাদ্য পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চাল পাওয়া যায় না—রেশনে প্রতি মানুষকে সপ্তাহে এক কিলো করিয়া চাল দেওয়া হয়—তাহাতে ৭ দিন এক বেলা ভাত খাওয়া যায় না। ফলে বাজারে চালের দাম প্রতি কিলো ১ টাকা ২০ পয়সা হইয়াছে। মানুষ অভাবে তাহা কিনিতে বাধ্য হয়। তাহা শুধু দুর্মূল্য নহে, দুষ্প্রাপ্যও। আটাও প্রতি মানুষকে সপ্তাহে ১ কিলো দেওয়া হয়—তাহাও আজকাল নিয়মিত ভাবে পাওয়া যায় না—কাজেই এক বেলা আটাও জুটে না। দেশে চাল আছে, অন্যান্য রাজ্য বা ভারতের বাহিরের দেশগুলি হইতেও চাল আমদানী করা হইতেছে কিন্তু সরকারী বণ্টনব্যবস্থার দোষে মানুষকে কষ্ট পাইতে

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধা-কৃষ্ণণ নূতন দিল্লীর ন্যাসন্যাল্ ফিজিক্যাল্ লাবরেটরীর সভা-গৃহে "সায়ান্স এণ্ড দি নেশন্" ("Science and the Nation") বক্তৃতা-মালার উদ্বোধন করিতেছেন।

সুদূর হিমালয়ের অগ্র-বর্ত্তী ঘাঁটির ভারতীয় সৈনিকদের জন্য এক নতুন ধরণের তুষারের উপযোগী সম্পূর্ণ পোষাক প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই পোষাক ওজনে হাল্কাই শুধু নয়, অত্যন্ত গরম এবং বিদেশে প্রস্তুত এই ধরণের পোষাকের সমতুল্য। চিত্র এই পরিচ্ছদে ভূষিত জওয়ানদের দেখা যাইতেছে।

হইতেছে। বহু দুর্নীতিপরায়ণ চোরাকারবারীকে ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের শাস্তি হয় না—এ বিষয়ে সরকারী শাসনযন্ত্র শুধু দুর্বল নহে, সেখানেও উপযুক্ত বিধান ও ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অভাব। সরকার একদল দুর্নীতি-পরায়ণদের কাছে যে চাল ধরে—তাহা জনসাধারণ না পাইয়া আর একদল দুর্নীতিপরায়ণের হাতে চলিয়া যায়। সরকারী কর্মচারীরা তাহা দেখিয়াও দেখে না। ইহা চাল ও আটার অবস্থা। সরিষার তৈল ব্যবসায়ে গত ৬ মাসে যে খেলা দেখান হইতেছে, তাহাতে হাসিব কি কাঁদিব বুঝিতে পারি না। আড়াই টাকা কিলোর তেল সরকারী ব্যবস্থার ফলে ৪ টাকা কিলো হইয়াছে—কেহ দেখিয়াও দেখে না। মন্ত্রিমণ্ডলী দুর্বল, বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা এ বিষয়ে উদাসীন এবং নিম্নস্তরের কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ—দেশবাসী সংঘবদ্ধ হইতে বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে জানে না—তাহাদের সে শক্তি বা বুদ্ধি নাই। কাজেই দেশ ধ্বংসের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। তৈল সমস্যার সমাধান হইল না। বাঙ্গালী বহু শত বৎসর ধরিয়া সরিষার তেল ব্যবহার করে, তাহা ত্যাগ করাও তাহার পক্ষে সহজ নহে। 'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা'—সকলের এক অবস্থা। তাহার পর মাছের কথা। মৎস্য মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী মাছ সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন—কোন স্থান হইতে মাছ আনিতে পারেন না। চোরাবাজারে ৬ টাকা কিলো দরে গোপনে মাছ পাওয়া যায়—তাহা ক্রয়ের ক্ষমতা সাধারণ লোকের নাই। মৎস্য-প্রিয় বাঙ্গালীকে মাছ খাওয়া ছাড়িতে হইয়াছে। সপ্তাহে এক বেলাও মাছ খাওয়া সম্ভব নয়। চাল, আটা, তেল, মাছ প্রভৃতির মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে তরি-তরকারী, ডাল, মশলা প্রভৃতির দাম বাড়িয়া গিয়াছে। বাজারে দুধ দুষ্প্রাপ্য। সরকারী দুধও পর্যাপ্ত পাওয়া যায় না—তাহা যে খাঁটি দুধ নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। ১৩৫০ সালের দুর্ভিক্ষের সময়ও জিনিষের দাম এত বাড়ে নাই—হয় ত মানুষের আয় বাড়িয়াছে—সে জন্য আজও পথে মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় না। গত কয়দিন বিধান সভায় বিরোধী দলের সদস্যগণ চীৎকার করিয়া তাহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিলেন—কিন্তু দরিদ্র মানুষের দুঃখ কষ্ট যাহা ছিল, তাহাই থাকিয়া গেল। আমরা—সাংবাদিকরা কাগজে লিখি—কর্তৃপক্ষ পড়াও প্রয়োজন মনে করেন না—কাজেই অরণ্যে রোদনই সার। কে এ বিষয়ের প্রতীকার করিবে? মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন জনগণের প্রতিনিধি ও বন্ধু—তাঁহার নিকট জনগণ অনেক কিছু আশা করিয়াছে—কিন্তু সব আশাই নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে। কেন্দ্রে নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ বড় বড় কথা বলিতেছেন—কিন্তু দুর্নীতি কমিতেছে না, দুর্নীতি-পরায়ণ লোক ধরাও পড়ে না—ধরিলেও তাহাদের শাস্তি হয় না। এই শাসন ব্যবস্থার ফলে লোক কংগ্রেসের উপর আস্থা হারাইতেছে—সকল শাসন ব্যাপারে শাসকগণ অকর্মণ্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, খাদ্যাবস্থা ছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সমবায়, সেচ, শিল্প—কোন ক্ষেত্রেই শাসক-গণ দেশবাসীর দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিতে পারেন না। তাহার পর কি হইবে?

শশিভূষণ রায় চৌধুরী—

শশিভূষণ রায় চৌধুরী ২৪ পরগণা জেলার সোদপুরের পূর্বদিকে তেঘরিয়াগ্রামের অধিবাসী ছিলেন—তিনি ৫০ বৎসর পূর্বে বিপ্লব আন্দোলনে যোগদান করিয়া বৃটীশ সরকারের আইনে আটক হন ও মুক্তির পর যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া ৪০ বৎসর পূর্বে পরলোকগমন করেন। তিনি এদেশে প্রথম শ্রমজীবী-শিক্ষা আন্দোলন প্রবর্তন করেন এবং কিছুকাল শান্তিনিকেতনে থাকিয়া কবিগুরুর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। মৃত্যুকালে—দরিদ্র হইলেও তিনি কয়েক বিঘা জমি দান করিয়া যান—এখন তথায় সরকারী সাহায্যে বুনিয়াদি বিদ্যালয় ও পল্লী-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। গত ২৬শে জুলাই রবিবার সন্ধ্যায় শশিভূষণ শ্রমিককল্যাণ ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে বুনিয়াদি বিদ্যালয় সংলগ্ন মাঠে তাঁহার বার্ষিক স্মৃতিসভা হইয়াছিল। সভায় ২৪ পরগণা জেলার কংগ্রেস-নেতা শ্রীহংসধ্বজ ধাড়া সভাপতিত্ব করেন, পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী শ্রীকমলধর রহমন প্রধান অতিথি ও পশ্চিম-বঙ্গের স্বাস্থ্যবিভাগের জয়েন্ট ডাইরেক্টার ডাক্তার শিবদাস বসু বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ট্রাষ্টের সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভামধ্যে শশিভূষণ-বাবুর জীবন ও কর্মের পরিচয় দিয়া সকলকে অভ্যর্থনা

করিলে স্থানীয় প্রবীণ-কর্মী শ্রীহরিমোহন রায়চৌধুরী শশিবাবুর সুদীর্ঘ জীবনী নিবেদন করেন। সভাপতি ধাড়া মহাশয় ও প্রধান অতিথি মন্ত্রী মহাশয়ও সুদীর্ঘ ভাষণে শশীবাবুর আদর্শ ধরিয়া বর্তমান সঙ্কটে দেশবাসীকে কর্তব্য পালনে উপদেশ দেন—উভয়ের বক্তৃতাই হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। ট্রাষ্টের সম্পাদক শ্রীপ্যারীমোহন রায়-চৌধুরী ও স্থানীয় কর্মী শ্রীচিত্তরঞ্জন সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়। বহুদিন পরে এ ভাবে উৎসব হইতে দেখিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন।

আর্য্যশাস্ত্র—

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ কিছুকাল যাবৎ আর্য-শাস্ত্র নামক সাময়িক পত্র প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গত ৩৭০ সালের পৌষ মাস হইতে (দ্বিতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা) ১৩৭১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত ৬ মাসে বাল্মীকি রামায়ণ একাংশ প্রকাশিত হইয়াছে। যুগ্ম-সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য ও শ্রীশ্রীজীব ভট্টাচার্য ন্যায়তীর্থ। মূল সংস্কৃতের সহিত বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা হইতেছে। অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র গোস্বামী ন্যায়াচার্য বঙ্গানুবাদ করিতেছেন। প্রতি খণ্ডের মূল্য ১ টাকা ৫০ পয়সা। ৬ খণ্ডে মোট ৬৩৬ পৃষ্ঠায় আদি ও অযোধ্যা কাণ্ড সম্পূর্ণ ও আরণ্য কাণ্ডের যে ডশ সর্গ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে ২৮ পৃষ্ঠায় রামায়ণ মাহাত্ম্য প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্বে পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে মূল রামায়ণ ও তর্করত্ন মহাশয়কৃত উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা মাত্র ১ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইত। এখনও বহু গৃহে তাহা পাওয়া যায়। তাহার পর প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে মেট্রপলিটান পাবলিসিং কোম্পানীও মূল সংস্কৃত রামায়ণ প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহার মূল্য ৫০ টাকারও অধিক ছিল। ইদানীং মূল সংস্কৃত রামায়ণ বঙ্গাক্ষরে ছাপা পাওয়া যাইত না। সে জন্য শ্রীশ্রীসীতারাম-দাস আর্যশাস্ত্র প্রকাশ কালে রামায়ণ প্রকাশ করিতেছেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি কল্পে সরকারী অর্থসাহায্য পাইয়া ঠাকুর এই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেশের লোকের মন হইতে এখনও সংস্কৃত পাঠের অনুরাগ যায় নাই—কাজেই সীতারামের এই প্রচেষ্টা সর্বত্র প্রশংসিত হইতেছে। আমাদের বিশ্বাস, এই রামায়ণ বাংলার শিক্ষিত সমাজে উপযুক্ত সমাদর লাভ করিবে এবং লোক সংস্কৃত রামায়ণ পাঠ করিয়া নিজ সংস্কৃতির কথা জ্ঞাত হইয়া বিপথগমন হইতে বিরত হইবে। পূজ্যপাদ সীতারামের এই সাধু প্রচেষ্টা আমাদের সকলের কল্যাণকর হউক।

আড়াই লক্ষ উদ্বাস্তু—

গত জানুয়ারী মাস হইতে পূর্বপাকিস্তানের কমবেশী আড়াই লক্ষ হিন্দু অধিবাসী মুসলমানগণের অত্যাচারের ফলে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের একাংশ—কয়েক হাজারকে বাংলার বাহিরে দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইয়াছে—বাকী অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গে বাস করিতেছে। আগে হইতেই পশ্চিমবঙ্গে স্থানাভাব ও ঘন লোকবসতি থাকায় তাহাদের পুনর্বাসন সমস্যা সরকারকে বিব্রত করিতেছে। শ্রীমহাবীর ত্যাগী পুনর্বাসন মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া অনেক আশার কথা শুনাইয়া ছিলেন, কিন্তু কাজে কিছু করিতে পারিতেছেন না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস—নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ এ বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। সম্প্রতি ভূপালে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এই সমস্যার কথা সর্ব-ভারতীয় নেতাদের জানাইয়াছেন। বাংলার একদল বাম-পন্থী নেতা উদ্বাস্তুদের বাংলার বাহিরে যাইতে বাধা দেয় ও সে জন্য আন্দোলন করে। তাহার ফলে বহু উদ্বাস্তু বাংলার বাহিরে যাইতে ভয় পায়। কিন্তু বর্তমান অবস্থায় বাংলায় স্থানাভাব, সে জন্য বহু উদ্বাস্তু বাংলার বাহিরে না যাইলে উদ্বাস্তু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব হইবে না। আমরা এ বিষয়ে বাংলার কংগ্রেসী নেতা ও কর্মীদের অবহিত হইয়া আন্দোলন করিতে অনুরোধ করি। রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরাও একদল নূতন উদ্বাস্তুকে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিয়া তথায় তাহাদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলায় জনসংখ্যা-সমস্যাই বাংলার খাদ্যাভাবের মূল কারণ—অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে অধিবাসী আসিয়া বাংলায় বাসস্থান করিয়া লয়—তাহাতেও বাধা প্রদান করা প্রয়োজন। বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে কোন প্রদেশে যাইলে বসবাসে

বাধাপ্রাপ্ত হয়—আর অবাঙ্গালী বাংলায় আসিয়া সহজে বসবাস ও কর্ম সংগ্রহ করে—এ ব্যবস্থার প্রতি দেশ-নেতাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন হইয়াছে।

মুসলমান বিতাড়ন—

পূর্বপাকিস্তান হইতে যেমন হিন্দুরা আসিয়া ভারত-রাষ্ট্রে প্রবেশ করিতেছে, তেমনই গত কয় বৎসর ধরিয়া মুসলমানরা দলে দলে ভারতরাষ্ট্রে চলিয়া আসিতেছে। বহু মুসলমান আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করায় তথায় ক্রমে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বহু পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। বহু মুসলমান বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে। সে সকল মুসলমানকে ভারতরাষ্ট্র হইতে বিতাড়ন করা ভারতরাষ্ট্রের এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ বিষয় লইয়া পাকিস্তান ও ভারতের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আলোচনা করিয়াছেন, কোন সুফল ফলে নাই। কলিকাতার মত সহরেও মুসলমান অধিবাসীরা—পুরাতন অধিবাসী হউক আর নবাগতই হউক, এমন অন্যায় আবদার করিয়া বসেন, যে ভারতরাষ্ট্রের পক্ষে সে সমস্যার সমাধানে হিমসিম খাইতে হয়। বস্তীবাসী মুসলমানগণকে অন্য বাসস্থান দিয়াও বস্তী হইতে তাহাদের উচ্ছেদ করা কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের এক সমস্যা হইয়াছে—মুসলমানগণের জন্যই বহু বস্তী আজও ভাঙ্গা সম্ভব হয় নাই। পাকিস্তান-কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সকল কথা জানিয়া কর্তব্য সম্পাদন করেন না, উদাসীন থাকেন। সীমান্ত অঞ্চলে মুসলমানরা মধ্যে মধ্যে বলপূর্বক হিন্দু এলাকায় প্রবেশ করিয়া যে অনর্থ সৃষ্টি করে, সে বিষয়েও পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ নীরব। এখন ভারতের রাষ্ট্রনেতাদের কঠোর হস্তে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। তাহার জন্য বলপ্রয়োগ ও অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করিলে চলিবে না। আমরা এ সকল বিষয়ে ভারতরাষ্ট্রের নূতন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দৃঢ়তার সহিত কর্তব্য পালন করিতে আহ্বান জানাই।

দুর্গাপুরে ৬০জন পাকিস্তানী গ্রেপ্তার—

বর্দ্ধমান জেলার বহু স্থানে বিশেষত দুর্গাপুর অঞ্চলে বহু পাকিস্তানী—(তাহারা অন্যায়ভাবে ভারতে প্রবেশ করিয়াছে—ভিসা বা পাসপোর্ট নাই) আসিয়া স্থায়ী-ভাবে বসবাস করিতেছিল এবং স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে হিন্দুবিরোধী প্রচার কার্য্য চালাইতেছিল—গত ৪ঠা আগষ্ট দুর্গাপুরে সেরূপ ৬০ জন পাকিস্তানী গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—ফলে বহু মুসলমান পলায়ন করিয়াছে—অনেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকিলেও তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। ভারতরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কঠোরতার সহিত কর্তব্য পালন করিলে ভারত অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে। আমরা এ বিষয়ে শাসন কর্তৃপক্ষকে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির বন্ধুত্ব—

সর্দার শরণ সিং কেন্দ্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া প্রথমেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতি অধিক বন্ধুত্ব করার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়াছেন। ১৫ই সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে রাষ্ট্র-পুঞ্জের বৈঠকে যোগদানের পূর্বে তিনি কলম্বো, কাবুল, কাঠমুণ্ডু ও রেঙ্গুনে শুভেচ্ছা সফরে যাইবেন। তিনি নিউইয়র্ক হইতে ফিরিয়া কায়রোতে অক্টোবরের প্রথমে জোট-নিরপেক্ষ সম্মিলনে যোগদান করিবেন। তাঁহার এ সকল কার্য হইতে বুঝা যায় যে চীন ও পাকিস্তানের সহিত ভারতের বিরোধ বাধিবার সম্ভাবনা বাড়িয়া গিয়াছে। ভারতবাসী সকলকে আজ এই সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য পালন করিতে হইবে।

কংগ্রেস সভাপতি সম্মিলন—

গত ৮ই ও ৯ই আগষ্ট ২ দিন মধ্যভারতের ভূপালে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নাদারের সভাপতিত্বে সকল রাজ্যের কংগ্রেস সভাপতি ও সম্পাদকগণ এক সম্মিলনে মিলিত হইয়া সারা ভারতের কংগ্রেস-সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। কংগ্রেসের ২ জন সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও কোষাধ্যক্ষ শ্রীঅতুল্য ঘোষ সম্মিলনে উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশকংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তথায় পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যায় অন্যান্য সকল রাজ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। ভারতের সকল রাষ্ট্রেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত—কাজেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিগণের মিলনে সকলের উপকার হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।

সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

বর্দ্ধমান জেলার আকুই গ্রামের অধিবাসী ও কলিকাতার প্রসিদ্ধ গন্ধদ্রব্য আবিষ্কারক সুরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ৩রা শ্রাবণ ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার ৬৬ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট, কলিকাতা বাসভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। কোন্নগর নিবাসী স্বর্গত শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা হেমন্তকুমারীকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে দেশসেবক ছিলেন ও উপার্জিত বহু অর্থ দেশের কল্যাণকার্যে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী, তিন পুত্র, ৩ কন্যা প্রভৃতি বর্তমান।

ভেজাল-বিভ্রাট

সরকারী-আদালতের বিচারক : বটে! বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলে!...জানো, ফৌজদারী আইনে আত্মহত্যা করা গুরুতর অপরাধ! এ. অপরাধের সাজা...

বাঙালী-গৃহস্থ : আজ্ঞে...কি করবো বলুন হুজুর! ঘরে চাল নেই, তেল নেই, মাছ নেই, দুধ নেই, শাক-সব্জী, তরী তরকারীর দামও আগুন...হাতে পয়সাও নেই এমন যে বৌ-ছেলেমেয়েগুলোর মুখে দু'বেলা দু'মুঠো অন্ন জোগাই! তাই লজ্জায় দুঃখে ক্ষিদের জ্বালায় মরবো বলে বিষ খেয়েছিলুম! কিন্তু এমনই দিনকাল—যে বিষেও ভেজাল মিশিয়েছে!...শেষ পর্য্যন্ত প্রাণে তো মরলুম না...উপরন্তু, বিষ-খাওয়ার অপরাধে পেয়াদায় পাকড়াও করে টেনে আনলো এই সরকারী আদালতে!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

গান
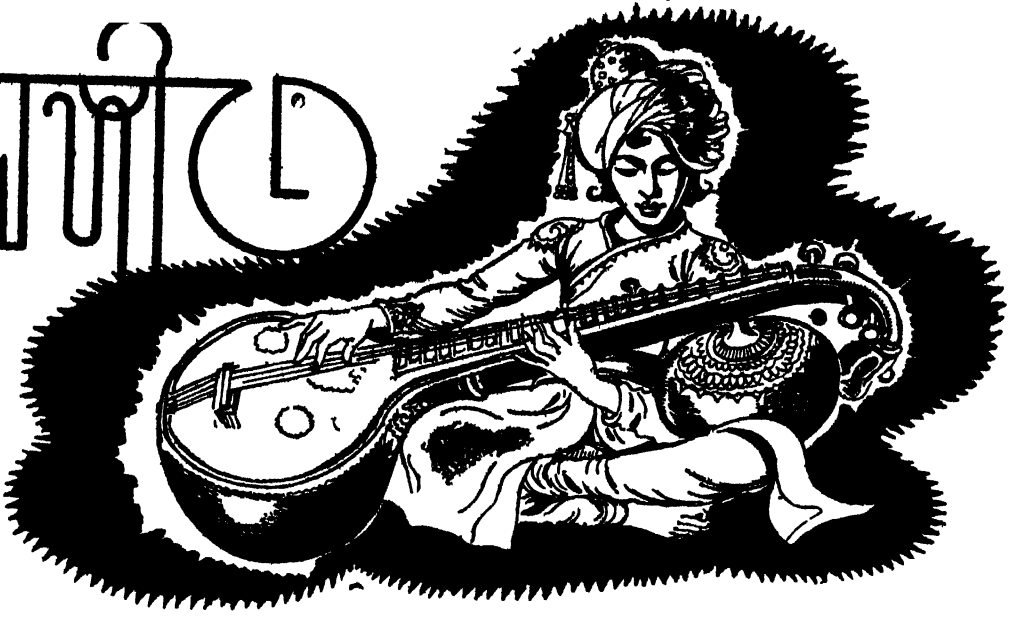
(মিশ্র কাহারবা)

দূর হ'তে শুধু গান ভেসে আসে
তোমারে দেখিনি চোখে
অবগুণ্ঠনে আছ কি লুকায়ে
অপরূপ মায়া লোকে।
শুনি দূর থেকে নূপুরের তান
শুনি কান পেতে কণ্ঠের গান
কুয়াশায় তব মুখটি দেখিনা
দূর থেকে ভাবি ও কে।

দূরে থাকিলেও তোমার প্রাণের
সুধা যে গো মোরে টানে
কখনো সে ডাকে মধুর হাসিতে
কভু সে বেদনা হানে—
আশা নিরাশার জাগায় যে দোল
তব মুখ চেয়ে পরাণ উতোল
আকাশের চাঁদ টেনেছে সাগরে
জোয়ার যে মরলোকে।

কথা—অখিল নিয়োগী ঃ   সুর ও স্বরলিপি ঃ ক্ষিতীশ দাশগুপ্ত

II পা -র্সা র্সা না | র্সা -র্সা -না -র্সা I -া -পণা -র্সণা -পা | জ্ঞমা -পমা -জ্ঞা -রা I
০ দূ র হ   তে ০ শু ধু   ০ গা ন্ ভে   সে ০ আ সে

-া -ণা -সা -সা | -া -রা -গা -মা I জ্ঞমা -জ্ঞা -রা -সা | -া -া -া -া I
০ তো মা রে   ০ দে খি নি   চো ০ খে ০   ০ ০ ০ ০

সা -গা -মা -দা | পা -পা পা -া I পা -দা ণা -র্সা | পা পদা -পা -মা I
অ ব গু ণ্   ঠ ০ নে ০   আ ছ কি লু   কা ০ য়ে

মা -ধা ণা -র্সা | ণধা -া -পা -মা I পা -া -া -া | মা -জ্ঞা -রা -া II
অ প রূ প মা ০ য়া লো কে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
তোমারে দেখিনি ইত্যাদি····

II মা -পা -পা -র্সা | র্সা -না -র্সা -া I র্সা -র্রর্সা -ণা -পণা | পর্রা -া -া -র্রা I
শু নি দূ র থে ০ কে ০ নূ পু রে র ভা ০ ০ ন্
র্রা -র্জ্ঞা -র্সা -র্রা | র্সা -ণা -ণা -ণা I ণা -র্সা -ণর্সা -ণা | পা -া -া -পা I
শু নি কা ন্ পে ০ তে ০ ক ন্ ঠে র গা ০ ০ ন্
সা -মা -মা -মা | মা -পমা -মজ্ঞা-া I পা -ধা ণা -র্সা | ণধা -ণা -ধা -পা I
কু য়া শা য় ত ০ ব ০ মু খ টি দে খি ০ না ০
-া -সা -মা -মা | মা -মা -পা -জ্ঞা I মা -মা পা -পা | জ্ঞা -রা -মা -মা I
০ দূ র থে কে ০ ভা বি ও ০ কে ০ ০ ০ ০ ০
সা -মা -মা -মা | মা -মা -মা -মা I মা -পা -পা -দা | মপা -মপমা -মজ্ঞা -া I
কু য়া শা য় ত ০ ব ০ মু খ টি দে খি ০ না ০
-া -জ্ঞা -মা -পা | না -না -র্সা -র্রা I না -র্সা -র্সা -র্সা | পদা -মপা -জ্ঞমা -মা II
০ দূ র থে কে ০ ভা বি ও ০ কে ০ ০ ০ ০ ০
তোমারে দেখিনি ইত্যাদি·····

II পা -ণা -পা মা | মজ্ঞা -া -া -জ্ঞা I পা -মজ্ঞা -মজ্ঞা -রা | সা -া -া সা I
দূ রে থা কি লে ০ ০ ও তো মা র প্রা ণে ০ ০ র্
-া ণা সা -সা | রা -গা -মধা -পা I মজ্ঞা -া -রা -বা | -া -া -া -া I
০ সু ধা যে গো ০ মো রে টা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০
সা -মা -মা -মা | মা -পা -জ্ঞা -মা I পা -না -না -না | র্সা -না -র্সা -া I
ক খ নো সে ভা ০ কে ০ ম ধু র হা সি ০ তে ০
র্সা -রর্সা -ণা -ণা | ধা -পমা -পা -ণা I ধা -পা -পা -া | -া -া -া -া I
ক ভু সে ০ বে ০ দ না হা ০ নে ০ ০ ০ ০ ০
মা -পা -পা -সা | র্সা -র্সা -র্সা -া I র্সা -র্রর্সা -ণা -পণা | পর্রা -া -া -র্রা I
আ শা নি রা শা ০ ০ র জা গা য় সে দো ০ ০ ল
র্রা -র্জ্ঞা -র্সা -র্রা | র্সা -ণা -ণা -ণা I র্সা -ণর্সা -ণা -ধা | পা -া -া -পা I
ত ব মু খ চে ০ য়ে ০ প রা ন্ উ তো ০ ০ ল
সা -মা -মা -মা | মা -পমা পমা -মা I পা -ধা -ণা -র্সা | ণধা -ণা -ধা -পা I
আ কা শে র্ চা ০ ০ দ টে নে ছে সা গ ০ রে ০
সা -মা- মা -মা | মা -মা -পা -জ্ঞা I মা -মা -পা -পা | ধা -ধা -ণা ণা IIII
জো য়া র যে ম র লো ০ কে ০ ০ ০ ০ ০ ০
তোমারে দেখিনি ইত্যাদি······

"শিক্ষার সমস্যা"

(আলোচনা)

সুচিত্রা রায়

গত "শ্রাবণ" সংখ্যায় শ্রীমতী শৈল চট্টোপাধ্যায়ের 'শিক্ষার সমস্যা' প্রবন্ধটি আজকালকার যুগের মননশীল ব্যক্তিমাত্রকেই ভাবিয়ে তুলবে। এর কারণ, লেখিকা দেশের নারী-শিক্ষার পদ্ধতিতে যে-সব গলদ রয়েছে সে সকলের নগ্নরূপ তুলে ধরেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে যদিও অনেক বিষয়েই একমত, তবুও কয়টি কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না।

লেখিকা আধুনিকাদের সমালোচনা সমাপ্ত করে খুব ভীত হয়ে বলেছেন: "এই প্রবন্ধটি পড়ে আমার অনেক পাঠিকা বোনেরই বঙ্কিম ভ্রূ হয়ত কুঞ্চিত হবেই শুধু নয়। সনাতনপন্থী বলে অনেকেই হয়ত আমাকে বিদ্রূপও করবেন।" লেখিকা যে ধরণের তথ্য সরবরাহ করেছেন তাতে যে তিনি সনাতনী সমাজের নন, বরং শিক্ষিত আধুনিকাদের দলেরই একজন, তা আমরা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে স্বয়ং শিক্ষিতা ও আধুনিকা হয়েও আধুনিকাদের প্রতি তিনি এত বিগত-স্পৃহা কেন তাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। খুব সম্ভবতঃ আজকালকার আধুনিকাদের পক্ষে যে বুদ্ধ, শংকর, চৈতন্য দূরে থাক, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, আশুতোষ, প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, সুভাষচন্দ্রের মত সু-সন্তানদের জন্মদান করা সম্ভব হচ্ছে না, সেটাই তাঁকে সবচেয়ে বেশী চিন্তাকুল করে তুলেছে। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে তিনি ভুলে গিয়েছেন, ভক্ত সাধক প্রহ্লাদ, ধ্রুব, যীশু, কবীর, যে সমাজ ও যে ধরণের ঘরে জন্ম নিয়েছিলেন তাতেই প্রমাণিত হয় কোন রকমের কদাচারই মহামানবের আবির্ভাবকে আটকে রাখতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়ের কথাই ভাবুন। তিনি যে সমাজ ও সংসারে জন্ম নিয়েছিলেন, তা তাঁর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক তো ছিলই না, বরং প্রতিকূল ছিল। তবু রামমোহন এসেছিলেন—তবু রামমোহন আসবেন। শৈল দেবীর এ বিষয়ে নিরাশ হওয়ার বিন্দুমাত্র কারণ নেই।

ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত বিদেশী শিক্ষায় যে একশ্রেণীর উচ্ছৃংখল তরুণ-তরুণীর উদ্ভব ঘটেছে তা অবশ্যই

এই বিভাগে প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সম্বন্ধে কোনও পাঠিকা যদি আলোচনা করতে চান, তবে "মেয়েদের কথা" বিভাগ, "ভারতবর্ষ" পত্রিকা, ২০৩।১।১ বিধান সরণী—এই ঠিকানায় প্রবন্ধাদি অল্প কথায়, পরিষ্কার করে লিখে পাঠাবেন।

—সম্পাদক

স্বীকার্য। কিন্তু আমি শৈল দেবীকে অনুরোধ করছি ডিরোজিওর যুগের ছাত্র-সমাজের ছাত্রী-সমাজের কথা একটু স্মরণ করতে। সেকালের ছাত্র-ছাত্রী সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা তৎকালীন প্রাচীনদের চোখেও বড় বিসদৃশ ঠেকেছিল। তবু তাঁদের মধ্য থেকেই তো আবির্ভূত হয়েছিলেন মধুসূদন, ভূদেব প্রভৃতি। আজকালকার 'টুইষ্ট' ও 'শেক্' ড্যান্সারদের মধ্য থেকেই আগামীকালের মধুসূদন বেরিয়ে আসবে সেকথা আমি বলতে চাই না। শুধু বলতে চাই—যদি মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটবার মুহূর্ত এসেই যায়, তখন এই উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশ তাকে প্রতিহত করতে পারবে না—এই অশালীনতার মধ্যে থেকেই সে জন্ম নেবে।

শৈল দেবী যেসব আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছেন সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু পশ্চিমীশিক্ষার প্রতি তিনি যেরূপ মনোভাব ধারণ করেছেন তা কিন্তু সমর্থন যোগ্য নয়। পাশ্চাত্য-শিক্ষা নিয়ে এসে যদি কেউ নীতিগর্হিত আচরণ করে থাকে, সেটাকেই তিনি পাশ্চাত্যশিক্ষার দোষ বলে প্রমাণ করবেন কি করে? পাশ্চাত্য শিক্ষা না পেয়েও তো অনেকে অশোভন আচরণ করে। তাছাড়া আমাদের এদেশীয় শিক্ষারও যে অনেক দোষ ত্রুটি আছে এ কথা তো অনস্বীকার্য্য। শৈল দেবী নিজেও তো বলেছেন যে, এ দেশীয় শিক্ষাতেও অনেক সময় 'শিব গড়তে বাঁদর গড়া'ই হচ্ছে। সুতরাং পাশ্চাত্য বা মিশনারী স্কুল কলেজের শিক্ষাকেই এই নীতিগর্হিত আচরণের জন্য একান্তভাবে দায়ী করা যায় না। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে যে বিদেশী শিক্ষায়তনে শিক্ষিতা মেয়েরা তাদের শিক্ষার দোষে বা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যে বাঙ্গালী হিন্দুসংসারে অশান্তির সৃষ্টি করছে এ কথাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু তবুও বলব—পাশ্চাত্য ধরণের শিক্ষা বা বিদেশী শিক্ষাই যে এই উচ্ছৃঙ্খলতার জন্য একান্তভাবে দায়ী তা মনে করা অন্যায়। ওদেশের শিক্ষায় কি ওদেশের লোক বয়ে যাচ্ছে না? বরঞ্চ বলব আমাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী গুণেই তারা গুণান্বিত হয়ে উঠেছে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রেও বহুদূর এগিয়ে আছে। তবে অনাচার, দুর্নীতি, আর অপরাধ-প্রবণতায় আমাদের দেশও পাশ্চাত্যের তুলনায় পিছিয়ে নেই।

তাই আজ সমাজে শান্তি নেই, প্রতিটি মানুষ যেন দেশলাইএর বাক্স আর কাঠি; কোন রকমে একটু ঘষা লাগলেই আগুন জ্বলে উঠছে। এর কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই আছে। দেশের চিন্তাশীল নর-নারীকে আজ সে কারণ ও তার প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

—

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

৪

প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের স্তন-স্ফীতি গর্ভসঞ্চারের আরেকটি লক্ষণ। গর্ভে ভ্রূণ-আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের বিশেষভাবে প্রথম প্রসূতির স্তনদ্বয় স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে আকারে অপেক্ষাকৃত বড় ও স্ফীত হয়ে ওঠে এবং এই সময়ে স্তনস্পর্শ করলেই অনেকে অল্প-বিস্তর ব্যথা অনুভব করেন। তবে সকলক্ষেত্রেই যে স্তনস্ফীতি এবং বেদনা-বোধের উপসর্গ দেখা দিলে, মহিলাদের গর্ভ-সঞ্চার হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করতে হবে—এ কথাটাও ঠিক নয়। কারণ, গর্ভ-সঞ্চার না হলেও, বহু মহিলাই অনেক সময় মাসিক-ঋতুর পূর্বাভাসকালে তাঁদের স্তন-যুগলে এ-ধরণের ব্যথা-বেদনা অনুভব করে থাকেন। কিন্তু কোনো মহিলার মাসিক-ঋতুস্রাব যদি একাদিক্রমে আট সপ্তাহ বন্ধ থাকে এবং সেই সময় তাঁর স্তনের বোঁটার চারিদিকে বাদামী-রঙের বৃত্ত বা 'ভেলা' (Areola) বেশ সুগভীর হয়ে ওঠে, তাহলে সেটিকে গর্ভ-সঞ্চারের সুস্পষ্ট-লক্ষণ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম-প্রসূতির ক্ষেত্রে, স্তনের বোঁটার চারিদিকে এমনি ধরণের বৃত্ত বা ভেলা রীতিমত সুস্পষ্ট-প্রতীয়মান হয়ে ওঠে এবং গর্ভের ভ্রূণ ক্রমশঃ পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভিণীর স্তন-যুগলও ধীরে ধীরে ভবিষ্যৎ-সন্তানের খাদ্যোপকরণ-প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে ক্রমান্বয়ে স্ফীত ও সুপুষ্ট হয়ে বৃহদাকার ধারণ করতে থাকে। ধাত্রী-বিদ্যাবিশারদ সুচিকিৎসকদের মতে—প্রসূতির পক্ষে, এ-অবস্থায়, সচরাচর মহিলারা যে-সব আঁটসাঁট 'বডিস্'

'ব্রেশিয়ার্' কাঁচুলী বা 'বক্ষ-বন্ধনী' ব্যবহার করেন, সেগুলি সাময়িকভাবে বর্জ্জন করাই উচিত। কারণ, এমন অবস্থায় সর্ব্বদা আঁটসাঁট বক্ষ-বন্ধনী ব্যবহার করা, প্রসূতিদের শারীরিক-স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর।

প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের উদর-স্ফীতি যে গর্ভ-সঞ্চারের অন্যতম প্রধান লক্ষণ—এ কথা সকলেরই জানা আছে। গর্ভাধানকালে প্রসূতি যখন চতুর্থ মাসে উপনীত হন, তখন তাঁর উদরের তলদেশাংশ (তলপেট) আকারে দিনে-দিনে ক্রমশঃ স্ফীত ও বিরাট হয়ে ওঠে এবং নরাকৃতি 'দেহ-ভাণ্ডের' বা বস্তীর অস্থির (Peleric Bones) উপরে মহিলাদের জরায়ুর অবস্থান ঘটে। ছয়-মাসকালে জরায়ুর অবস্থিতি প্রসূতির নাভিদেশে এবং আটমাসকালে সেটি থাকে গর্ভিণীর নাভিদেশ ও বক্ষাস্থির মাঝামাঝি-স্থানে।

এছাড়া প্রসূতি-অবস্থায় গর্ভস্থ-ভ্রূণের নড়াচড়ার সুস্পষ্ট-স্পন্দন (Quickening) প্রথম অনুভূত হয়—গর্ভাধানের প্রায় আঠারো থেকে কুড়ি সপ্তাহ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে অন্ততঃপক্ষে চার-পাঁচ মাস পরে। গোড়ার দিকে প্রসূতি গর্ভস্থ সন্তানের মৃদু-মন্দ নড়াচড়া-স্পন্দনের অনুভব-উপলব্ধি করেন এবং দিনে-দিনে গর্ভের ভ্রূণ-শিশু ক্রমেই যত পরিণত হয়ে ওঠে আর প্রসবের শুভক্ষণ এগিয়ে আসে, ততই এ-ধরণের নড়াচড়া-স্পন্দনের গতি-বেগ আগেকার চেয়ে আরো বেশী-বেশী, ঘন-ঘন ও জোরালো হয়ে উঠতে থাকে। প্রসূতিদের কাছে গর্ভস্থ-সন্তানের এই নড়াচড়া-স্পন্দনের অনুভূতি বিচিত্র-অপরূপ এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা…অনাগত-শিশুর আবির্ভাব-মুহূর্ত্তের আশায়—আগ্রহে মন তাঁর নিরন্তর আকুল-বিভোর…রঙীণ স্বপ্ন কল্পনায় ভরপুর হয়ে থাকে। এমন কি, গর্ভস্থ-সন্তানের এই অশান্ত-স্পন্দনের উপদ্রব, প্রসূতির পক্ষে অনেক সময় অসহনীয় এবং রীতিমত অস্বস্তিকর হয়ে উঠলেও, অপরিসীম ধৈর্য্যবলে অনাগত সন্তানের স্নেহময়ী জননী হিসাবে তাঁরা শারীরিক কষ্ট-দুর্ভোগের সকল অসুবিধাই অকাতরে সহ্য করে চলেন। কিন্তু এ-ধরণের অস্বস্তিকর-দুর্ভোগ-অনুভূতিকালে, কোনো কারণে গর্ভস্থ-সন্তানের স্পন্দন-লীলা হঠাৎ যদি বেশ কিছুদিনের জন্য নিস্তব্ধ হয়ে যায়, তাহলে অবিলম্বে অভিজ্ঞ-

ধাত্রী অথবা সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ এবং প্রসূতি শারীরিক-স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তাঁদের উপদেশ মতো যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। অন্যথায়, প্রসূতি গর্ভস্থ-শিশু—উভয়েরই সবিশেষ ক্ষতি হবার সম্ভাব দেখা দিতে পারে।

প্রসূতি-অবস্থায় সচরাচর সকল মহিলাদের মনে মোটামুটিভাবে গর্ভস্থ-সন্তানের প্রসব-কাল কখন আস সেটির পূর্ব্বাভাস জানবার জন্য সবিশেষ ঔৎসুক্য জাগে এ তথ্যটি সব সময় সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হলেও, অভিজ্ঞ ধাত্রী এবং সুচিকিৎসকেরা প্রসূতি এ গর্ভস্থ-সন্তানের বিবিধ শারীরিক-লক্ষণাদি পরীক্ষা ক পূর্ব্বাহ্ণেই কাছাকাছি সময়টুকুর যথাযথ হদিশ দিতে পারে ধাত্রী-চিকিৎসকের সহায়তা ছাড়াও, প্রসূতির প মোটামুটিভাবে সন্তান-প্রসবের কাল নির্দ্ধারণের এ সহজ উপায় আছে। সে উপায়টি হলো—প্রসূ মাসিক ঋতুস্রাব স্থগিত থাকার দিনটি থেকে দুইশত-ত দিন গণনা করে নেওয়া। যদিও গর্ভস্থ-সন্তান যে ি সেই নির্দ্দিষ্ট-দিনেই ভূমিষ্ঠ হবে—এ কথা জোর করে যায় না, তাহলেও এইভাবে হিসাব করে দেখে মোটা ভাবে একটা কাছাকাছি সময়ের আন্দাজ করা সম্ভ হয়। অর্থাৎ সেই সময়ের এক থেকে সাতদিনের মধ্যে প্রসূতির গর্ভস্থ-সন্তান যে ভূমিষ্ঠ হবে—সে সম্বন্ধে কত সুনিশ্চিত থাকা যায়।

প্রসঙ্গক্রমে প্রসূতিদের আরেকটি দরকারী কথা ে রাখা ভালো। সন্তান-সম্ভাবনার কারণ ঘটলেই অবি অভিজ্ঞ ধাত্রী এবং সুচিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ উচিত। ব্যক্তিগত-চক্ষুলজ্জা, সাংসারিক-অসুবিধা ব আর্থিক অসঙ্গতির কারণে এ বিষয়ে আদৌ বিলম্ব বা গ লতী করা উচিত নয়…এসব অহেতুক-সঙ্কোচের ফলে, পর্য্যন্ত প্রসূতি এবং গর্ভস্থ-সন্তানের জীবন-বিপন্নেরও আশঙ্কা আছে। কাজেই যথাসময়ে সুচিকিৎ সাহায্যে প্রসূতির মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধের তিন মাসের প্রাথমিক-পরীক্ষার সুব্যবস্থাদি করা একান্ত আব সাংসারিক-অসুবিধা কিম্বা আর্থিক অসচ্ছলতার ক প্রসূতির পক্ষে নিজ-ব্যয়ে সুচিকিৎসকের সহায়তা-লাভ সম্ভবপর না হলে, যে কোনো প্রসূতি-সদনে গ্র

পাঠালে গিয়ে প্রাথমিক-পরীক্ষার সুযোগ নেওয়া একান্ত-কর্ত্তব্য। তাছাড়া প্রাথমিক-পরীক্ষার সময়, ধাত্রী-চিকিৎসকের কাছে অকপটে প্রসূতির শারীরিক-স্বাস্থ্যের সব কিছু খুঁটিনাটি অবস্থার ও লক্ষণাদির পূর্ব-বিবরণ খোলাখুলিভাবে অভিব্যক্ত করা উচিত। এ সম্বন্ধে এতটুকু সঙ্কোচ বা দ্বিধার ভাব পোষণ করে সুচিকিৎসার অন্তরায় সৃষ্টি করা কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, গর্ভে সন্তান-সম্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতি বা ভাবী-জননীর দায়িত্ব বৃদ্ধি পায় সবিশেষ এবং সেই গুরু-দায়িত্বভার সুষ্ঠুভাবে পালনের উদ্দেশ্যে অনাগত-শিশুর মাতাকে অভিজ্ঞ ধাত্রী-চিকিৎসকের সুপরামর্শ ও উপদেশানুসারে যথারীতি সকল রকম পরীক্ষার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত থাকতে হয়। এ বিষয়ে এতটুকু অসাবধানতার প্রশ্রয় দিলেই, অনর্থক বিপদ ডেকে আনা হবে। সুতরাং প্রসূতি-অবস্থায় প্রত্যেক মহিলার গোড়া থেকেই নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের মঙ্গলের জন্য যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন এবং শারীরিক-সুস্থতার প্রতি সজাগ-দৃষ্টিদান ঐকান্তিক পালনীয় কর্ত্তব্য। (ক্রমশঃ)

—

সুপর্ণা দেবী

রূপচর্চা-প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে মহিলাদের উপযোগী ঘরোয়া-ধরণের সরল-সহজসাধ্য যে দৈহিক-ব্যায়াম পদ্ধতির আলোচনা করেছি, আপাততঃ তার বাকী ভঙ্গীগুলির [illegible] পরিচয় দিই।

৩
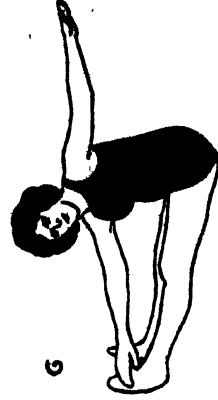
উপরের ৩নং ছবিতে ব্যায়ামের যে বিশেষ-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, মহিলাদের উদরাংশের পেশী, ধমনী ও স্নায়ু, পাক-যন্ত্র (Liver), মেরুদণ্ড, বস্তী এবং [illegible] পরিপুষ্টি-সাধনের পক্ষে সেটি পরম-উপকারী। প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার এ ভঙ্গীটি নিয়মিত-অভ্যাসের ফলে, নারী-দেহ ক্রমেই সুঠাম-সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়ে উঠবে—অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য-স্বাস্থ্যবিদেরা এই অভিমত পোষণ করেন। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অনুশীলন-পদ্ধতি হলো—সমতল-জমির উপর দাঁড়িয়ে, পা দুটিকে পাশাপাশি বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা হেলিয়ে দেহের উর্দ্ধাংশটিকে সামনের দিকে বাঁকিয়ে, ইংরাজী '×' হরফের ছাঁদে বাম-হাতের আঙুলের ডগার সাহায্যে একবার ডান-দিকের পায়ের পাতার কিনারা স্পর্শ করবেন এবং ক্ষণকাল স্তব্ধ থেকেই ধীরে ধীরে প্রশ্বাস-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাথা ও দেহের উর্দ্ধাংশ উপরদিকে উঁচু করে পুনরায় সটান-সিধা হয়ে দাঁড়াবেন। তারপর ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থেকে, আবার আগের বারের মতোই ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ও দেহের উর্দ্ধাংশ সামনের দিকে হেলিয়ে নীচু করে ইংরাজী '×' হরফের ছাদে ডান-হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে বাঁ-দিকের পায়ের পাতার প্রান্ত-সীমা স্পর্শ করবেন এবং আগের বারের মতো এবারেও ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকার পর, ধীরে ধীরে প্রশ্বাস ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় মাথা ও দেহের উর্দ্ধাংশ উপরদিকে উঁচু করে সটান সিধা খাড়া হয়ে দাঁড়াবেন। এমনিভাবে একবার বাঁ-হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে ডান-দিকের পায়ের পাতার কিনারা স্পর্শ এবং

আরেকবার ডান-হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে বাঁ-দিকে পায়ের পাতার কিনারা স্পর্শ...বার-বার এই নিয়মে ব্যায়ামটি সুষ্ঠু ভাবে অভ্যাস করতে হবে।

৪

৫

উপরের ৪নং ছবিতে ঘরোয়া-ব্যায়ামের যে বিশেষ-ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, মহিলাদের পিঠ, বুক, পেট ও কাঁধের পেশী-ধমনী সুঠাম-সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে তোলার পক্ষে সেটি পরম-উপযোগী। এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর পা দুটি পাশাপাশি ঈষৎ তফাতে রেখে সটান সিধা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিশ্বাস নিয়ে মাথা নীচু করে দেহের ঊর্দ্ধাংশটিকে সামনের দিকে হেলিয়ে, হাত দুখানি দুই পায়ের মধ্যবর্ত্তী ফাঁকা জায়গার ভিতর দিয়ে পিছনদিকে সুপ্রলম্বিত করে দিন। এভাবে দাঁড়ানোর ক্ষণকাল বাদেই পুনরায় ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথা এবং দেহের ঊর্দ্ধাংশ নীচের দিকে হেলানো অবস্থা থেকে ক্রমশঃ উপরদিকে উঁচু করে তুলে ইতিপূর্ব্বে যেমন সটান্ সিধা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই ভঙ্গীটিতে ফিরিয়ে আসুন। এমনিভাবে ব্যায়ামের ভঙ্গীটি প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার।

৫নং ছবিতে ব্যায়ামের যে বিশেষ ভঙ্গীটি দেখানো হয়েছে, মহিলাদের কোমর, বক্ষোদেশ, পদযুগল, বাহুদ্বয়, গ্রীবা ও স্কন্ধের পেশী-ধমনী সুপুষ্টশ্রী গড়ে তোলার পক্ষে, সেটি খুবই উপযোগী। ব্যায়ামের এই বিশেষ ভঙ্গীটিও প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার নিয়মিত ভাবে অনুশীলন করা প্রয়োজন। এই ব্যায়াম পদ্ধতিটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর সটান্ খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে হাত দুখানি উঁচু করে বাঁকিয়ে মাথার পিছনে রাখুন এবং তালেতালে দক্ষিণ পদটিকেও ক্রমশঃ উপরদিকে দক্ষিণবাহুর কনুইয়ের প্রান্তভাগ স্পর্শ করুন। ক্ষণকাল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকবার পর, পুনরায় ধীরে নিশ্বাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণপদটিকে উপর নীচে নামিয়ে, ইতিপূর্ব্বে যেমন সটান্ খাড়া দাঁড়িয়ে সেই ভঙ্গীটিতে ফিরে আসুন। অতঃপর দ উপরে তুলে ব্যায়ামের যে বিশেষ ভঙ্গীটি ধারণ করে ক্ষণকাল স্তব্ধ দাঁড়িয়ে থাকার পর, পুনরায় বাম বাহুর সাহায্যে অনুরূপ ভঙ্গীটির অনুশীলন করুন। ভাবেই অন্ততঃপক্ষে দশবার, একবার ডানদিকের ও বাঁ দিকের পদ এবং বাহু উত্তোলন-অবতরণের পুনরাবৃত্তি করতে হবে।
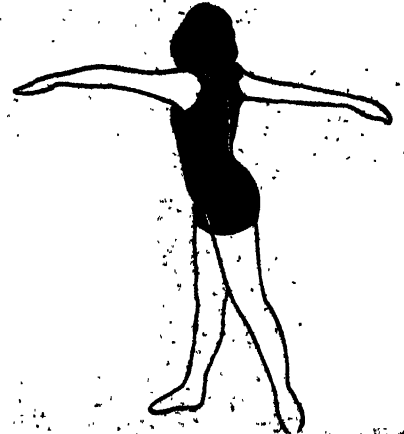
উপরের ৬নং ছবিতে ব্যায়ামের যে বিশেষ

দেখানো হয়েছে, মহিলাদের পেট, পিঠ, বুক, কাঁধ, গ্রীবা, বক্ষদেশ ও বাহুযুগলের মেদবাহুল্য কমানো এবং পেশী, ধমনী সুপুষ্ট সৌষ্ঠবমণ্ডিত করে তোলার পক্ষে সেটি একান্ত উপযোগী। ব্যায়ামের এই ভঙ্গীটিও, প্রতিদিন অন্ততঃপক্ষে দশবার নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার। এই ব্যায়াম পদ্ধতিটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ঘরের সমতল মেঝের উপর সটান্ সিধা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে, ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণ ও ত্যাগের তালে-তালে, দুই বাহু সুপ্রসারিত করে দেহের ঊর্দ্ধাংশটিকে একবার ডানদিকে এবং অন্যবার বাঁ-দিকে হেলাবেন। এভাবে হেলানোর সময়, দেহের ঊর্দ্ধাংশটিকে দক্ষিণে বা বামে—যেদিকে যখন হেলাবেন' মুখটিকেও সেই তালের সঙ্গে তাল রেখে অনুরূপভাবে সেদিকেই হেলিয়ে দিতে হবে।

প্রবন্ধে উল্লিখিত সহজ-সরল ঘরোয়া-ধরণের এই ব্যায়াম-ভঙ্গীগুলির নিয়মিত-অনুশীলন অচিরেই স্থূলাঙ্গী এবং কৃশাঙ্গী—সকল শ্রেণীর মহিলাদেরই দৈহিক-সৌন্দর্য্য গঠনে যে বিশেষ সহায়তা করবে—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

—

মাছের আঁশের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

এবারে অভিনব-ধরণের যে কারুশিল্পের কথা বলছি—সেটি আমাদের বাংলাদেশের মহিলাসমাজে বহুদিন আগেই প্রচলিত হয়েছে। আজকাল শহরের সৌখিন-সাহায্যে রঙীণ-কাপড়ের জমির বুকে সূচী-শিল্পের কাজ করে ফুল-পাতা, পশু-পক্ষী প্রভৃতি নানা ছাঁদের আলঙ্কারিক চিত্র (Decorative Motifs) রচনার প্রথা নিতান্তই 'সেকেলে' এবং 'পস্তা-খেলো'-জাতের কারুকলা হিসাবে উপেক্ষিত-অনাদৃত হলেও, পল্লী অঞ্চলের বহু ছোট-খাট গৃহস্থ-সংসারে এখনও এই অভিনব-শিল্পটির কিছু-কিছু নিদর্শন মেলে। সেই নিদর্শনগুলি দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সুদক্ষ শিল্পীর নিপুণ হাতের স্পর্শে সামান্য কয়েকটি মাছের আঁশ আর রঙীণ পুঁতি-চুমকীর সাহায্যে কাপড়ের বুকে কী অপরূপ-সুন্দর আলঙ্কারিক-চিত্র রচনা করা সম্ভব! আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলাদেশের ঘরে ঘরে এই ধরণের 'মাছের আঁশের কারুশিল্পকলার' ব্যাপক-অনুশীলন ছিল—সে স্মৃতি একালের প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধদের অনেকেরই হয়তো মনে আছে। কাজেই একদা বাংলার ঘরে ঘরে যে বিচিত্র শিল্পকলার এতখানি প্রসার ছিল, সেই কারুশিল্পের পুনরনুশীলন একালের সৌখিন-কলারসিক সমাজে হয়তো নিতান্তই অবহেলিত হবে না—এই ধারণাতেই এবারের প্রসঙ্গটির আলোচনা করছি।

উপরে যে সহজ সরল নক্সার নমুনাটি দেওয়া হয়েছে, রঙীণ-কাপড়ের বুকে মাছের আঁশ আর পুঁতি-চুমকীর কাজ করে নিখুঁত-ছাঁদে তার প্রতিলিপি-রচনা খুব একটা কঠিনসাধ্য এবং ব্যয়বহুল ব্যাপার নয়...

কারুশিল্প সামগ্রী বানানো যেতে পারে। তবে শিক্ষার্থীদের পক্ষে গোড়ার দিকে জটিল-ধরণের আলঙ্কারিক নক্সা-চিত্রণের বদলে কিছুদিন সহজ-সরল প্রতিলিপি-রচনার অনুশীলন করাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, কাঁচা হাতের তৈরী শিল্প-কাজে নানান্ ত্রুটি থাকারই সম্ভাবনা এবং তার ফলে, অল্প-বিস্তর আর্থিক-লোকসানও ঘটতে পারে। কাজেই কিছুকাল হাতে-কলমে কাজ করে মোটামুটি অভিজ্ঞ পারদর্শী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এ-ধরণের কারুশিল্প রচনার কলা-কৌশলগুলি ভালোভাবে আয়ত্তাধীন হলে, তখন জটিল-নক্সা চিত্রণের দিকে দৃষ্টিদান করাই সমীচীন।

এ-ধরণের শিল্পকাজ করতে হলে, যে সব কলা-কৌশল পদ্ধতি জেনে রাখা দরকার—আপাততঃ তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে হাত দেবার আগে, সুষ্ঠুভাবে কয়েকটি একান্ত-আবশ্যকীয় প্রাথমিক-আয়োজন সেরে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমেই কারুশিল্পের উপযোগী নক্সাটিকে শুধু মনে মনে পরিকল্পনাই নয়, আগাগোড়া পরিপাটি ছাঁদে প্রয়োজনমতো আকারে পরিষ্কার একটি কাগজের উপর পেন্সিল, কলম বা তুলির রেখা টেনে নিখুঁতভাবে এঁকে নিতে হবে। যাঁরা নিজের হাতে ছবি আঁকতে পারেন, তাঁদের পক্ষে এ কাজটুকু এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার হবে না। তবে যাঁদের ছবি-আঁকার দক্ষতা নেই, তাঁদের পক্ষে, প্রয়োজন ও পছন্দমতো ছাঁদের কোনো ভালো নক্সা বেছে নিয়ে পরিচিত কোনো শিল্পীর সহায়তায় সেটিকে অবিকল 'ট্রেসিং (Tracing) বা 'নকল' (Copy) করে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কারণ, 'মূল-নক্সাটি' (Original Design) যদি নিখুঁত-পরিপাটি না হয়, তাহলে শেষ পর্য্যন্ত রঙীণ কাপড়ের জমিতে রচিত কারুশিল্প প্রতিলিপিটিও যে ত্রুটিপূর্ণ ও অসুন্দর দেখাবে—সে কথা বলাই বাহুল্য। কাজেই মূল নক্সাটি যেন আগাগোড়া সুষ্ঠু পরিপাটি এবং নিখুঁত ছাঁদের হয়, অন্তন, 'ট্রেসিং' বা 'নকলের' সময় সেদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখা দরকার।

কাগজের বুকে সুষ্ঠুভাবে মূল নক্সাটির 'খসড়া-চিত্র' (Motif-chart) এঁকে নেবার পর, শিল্পকাজের উপযোগী পছন্দমতো রঙীণ কাপড়ের টুকরো বেছে নিয়ে, সেটির উপর নক্সার প্রতিলিপিটিকে আগাগোড়া হুবহু নিখুঁত ছাঁদে 'ট্রেসিং' করে ফেলুন। তাহলেই কাপড়ের বুকে নক্সার অবিকল ছাপ তোলার কাজ চুকবে।

এবারে কারুশিল্প সামগ্রী রচনার সাজ-সরঞ্জাম জোগাড়ের পালা। এ কাজে হাত দেবার সময় প্রথমেই সিদ্ধান্ত করে নিতে হবে—আসল শিল্পসামগ্রীটি রচনার জন্য ছোট, বড় অথবা মাঝারি···কোন্ মাপের মাছের আঁশ ও কোন্ রঙের আর আকারের পুঁতি এবং চুমকি ব্যবহার করবেন। এ সম্বন্ধে সচরাচর যে রীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, সেটির মোটামুটি ব্যবস্থা হলো—রুই, কাতলা প্রভৃতি বড় মাছের আঁশের সঙ্গে বড় সাইজের পুঁতি ও চুমকি ব্যবহার এবং ছোট সাইজের মাছের আঁশের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের পুঁতি আর চুমকি বসিয়ে শিল্প কাজ করা···মাঝারি ধরণের মাছের আঁশের সঙ্গে অনুরূপ ছাঁদের পুঁতি আর চুমকি গেঁথে দেওয়া। এছাড়া প্রয়োজনানুযায়ী মাছের আঁশ সংগ্রহেরও বিশেষ পদ্ধতি আছে। অর্থাৎ, প্রথমেই বঁটিতে কুটে সযত্নে মাছের আঁশ ছাড়িয়ে, সেগুলিকে আগাগোড়া পরিষ্কার জলে পরিপাটিভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নিতে হবে। এভাবে ধুয়ে সাফ্ করে নেবার পর, চুণের জল ভর্ত্তি একটি পাত্রে মাছের আঁশগুলিকে অন্ততঃপক্ষে পুরো একদিনকাল বেশ ভালোভাবে ভিজিয়ে রাখবেন। চুণের জলে ভিজিয়ে রাখার ফলে, মাছের আঁশগুলি আগাগোড়া বেশ নরম হয়ে যাবে এবং আঁশের আঁশ্টেগন্ধও সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে। মাছের আঁশগুলি নরম ও গন্ধহীন হয়ে যাবার পর, সেগুলিকে পুনরায় গরম জলের পাত্রে চুবিয়ে বেশ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেবেন। তাহলেই মাছের আঁশগুলি শিল্পকাজের উপযোগী হয়ে উঠবে। তবে এভাবে বারবার ধোয়াধুয়ির আর সাফ্সুতরোর ফলে, মাছের আঁশগুলির চেহারা ক্রমেই মুক্তোর মতো ঝকঝকে শাদা হয়ে উঠবে। কেবলমাত্র শাদা রঙের মাছের আঁশ ব্যবহার করেও কারুশিল্পের সামগ্রী রচনা সম্ভব···তবে প্রয়োজন বোধে মাছের আঁশগুলিকে বেশ কিছুক্ষণ বিভিন্ন ধরণের রঙ-গোলা জলের পাত্রে চুবিয়ে সেগুলিকে ইচ্ছামতো রঙ করে তোলা যায়। মাছের আঁশগুলিকে রঙীণ-জলে চুবিয়ে নেবার জন্য সর্ব্বদা কাপড়-ছোপানোর উপযোগী

ভালো এবং পাকা-রঙের গুঁড়ো ব্যবহার করাই উচিত। এ ব্যবস্থার ফলে, মাছের আঁশের গায়ে রঙের ছোপ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে।

মাছের আঁশগুলিকে প্রয়োজনমতো রঙে পাকা পাকি-ভাবে রাঙিয়ে নেবার পর, কারুশিল্পীর পছন্দ অনুসারে কাপড়ের সঙ্গে মানানসই দেখায় এমনি ছাঁদের ও রঙের পুঁতি আর চুম্‌কি জোগাড় করে নেওয়া আবশ্যক। কিন্তু স্থানাভাবের কারণে, এবারে সে সম্বন্ধে বিশদ-আলোচনা করা সম্ভবপর নয়। তাই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করবার বাসনা রইলো। (ক্রমশঃ)

কাঁথা-সেলাইয়ের নক্‌সা-নমুনা

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

বাংলাদেশের কাঁথা-সূচীশিল্পের সুপ্রসিদ্ধি বহু প্রাচীনকাল থেকেই। অধুনা যান্ত্রিক-সভ্যতার আমলে, বাংলার বিশিষ্ট লোক-কলা কাঁথা-সূচীশিল্পের পূর্ব্ব-গৌরব অপেক্ষা-কৃত ম্লান হয়ে এলেও, যুগযুগান্তব্যাপী অভিনব-ঐতিহ্যের অবসান ঘটেনি। শহরের সুসভ্য-সৌখিন পাশ্চাত্য-রীতি-অনুকারী আধুনিক-সমাজে দেশী-বিদেশী মিলের তৈরী সামগ্রীর সস্তা-জৌলুশের মোহ আর কদর বেশী হলেও, বাংলার পল্লী-অঞ্চলে সাধারণ গৃহস্থ-সংসারে কাঁথা-শিল্পের সমাদর আজো বজায় রয়েছে বলেই, জাতীয় শিল্প-কলার অনুরাগিণী সূচীশিল্প-নিপুণা মহিলাদের অনুশীলনের উদ্দেশ্যে এবারে সুদৃশ্য-সুন্দর কাঁথা-সেলাইয়ের একটি সহজসরল অথচ বিচিত্র-অভিনব ছাঁদের নক্সা-নমুনা সাদরে উপহার দিতে অগ্রসর হয়েছি। ঘর-সংসারের দৈনন্দিন-কাজকর্ম্মের অবসরে এ-ধরণের নক্সাদার কাঁথা সেলাই করা খুব একটা দুঃসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়…এমন কি, নবীন সূচীশিল্প-শিক্ষার্থিনীরাও সামান্য চেষ্টাতে নিজের হাতে সেলাইয়ের কাজ করে অনায়াসেই পরিপাটি ভাবে জাতীয় লোক-কলার এ সব অপরূপ সামগ্রী রচনা করতে পারবেন।
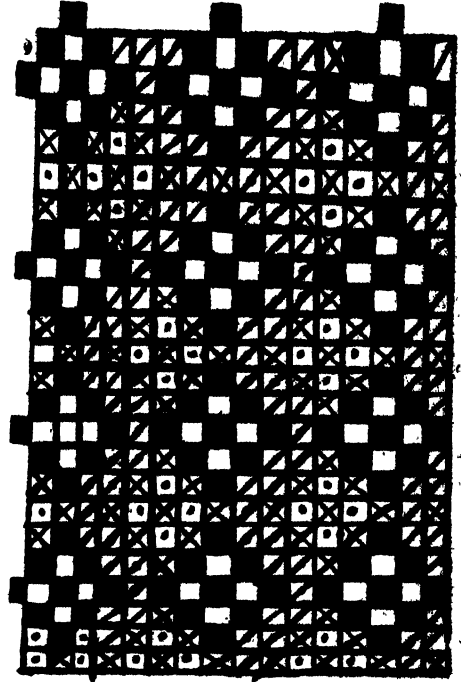
উপরে যে নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটি একটি একটি প্রমাণ-আকারের কাঁথার আংশিক-চিত্র মাত্র।

প্রয়োজনমতো মাপে সম্পূর্ণ-কাঁথাটি রচনার জন্য উপরোক্ত আংশিক নক্সা-নমুনাটিকে কয়েকবার আড়াআড়ি এবং লম্বালম্বিভাবে পুনরাবৃত্তি করে গেলেই খুব সহজ পন্থায় যে কোনো বড় আকারের সূচীশিল্প সামগ্রীতেই এটিকে ব্যবহার করা চলবে। তাছাড়া সূচীশিল্পের কাজ করে সাদা কিম্বা রঙীণ কাপড়ের বুকে উপরোল্লিখিত নক্সা নমুনাটি ফুটিয়ে তুলতে হলে, সূচীশিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি এবং অভিপ্রায় অনুসারে মানানসই ধরণের যে কোনো রঙের সুতোর সাহায্যে—নক্সার প্রতিটি ঘর, হয় আলাদা আলাদাভাবে বিভিন্ন রঙের সুতো দিয়ে কার্পেট বোনার ধরণে আগাগোড়া 'ভরাট' করে, কিম্বা 'এম্ব্রয়ডারী-সূচীশিল্পের' ধরণে কেবলমাত্র নক্সার রেখাগুলিকে 'লাইন্' সেলাই দিয়ে রচনা করা যেতে পারবে। সরল নিপুণভঙ্গীতে এ দুটি পদ্ধতির যে কোনোটি অনুসরণে যথাযথভাবে সূচীশিল্পের কাজটুকু শেষ করতে পারলে ঘরে বসে নিজের হাতে রচিত এ-ধরণের মনোরম-সুন্দর কাঁথাগুলি ছোট-বড়, পরিচিত অপরিচিত সকল শ্রেণী

নর-নারীর কাছেই যে সবিশেষ সমাদরলাভ করবে—সে কথা বলাই বাহুল্য।

প্রসঙ্গক্রমে, একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন। সূচী-শিল্পের কাজে যাঁরা পারদর্শিনী, তাঁদের পক্ষে এই ধরণের সহজ সরল নক্সাদার রঙীণ কাঁথা রচনা করা আদৌ অসুবিধার নয়। কিন্তু যাঁরা নবীন শিক্ষার্থিনী—তাঁদের কাজের সুবিধার জন্ত উপরের নক্সা নমুনাটি বিভিন্ন রঙের সুতো ব্যবহারের 'সঙ্কেত চিহ্ন' হিসাবে প্রত্যেকটি 'ঘর' আলাদা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট করে দেখানো হলো। আশা করি, এই 'সঙ্কেত চিহ্নের' হিসাব অনুসারে, মানান-সই রঙের কাপড়ের উপরের শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও অভিপ্রায়মতো যথাযথভাবে বিভিন্ন মানানসই-রঙের সুতো ব্যবহার করে নবীন শিক্ষার্থিনীরা অনায়াসেই বিচিত্র নক্সাদার কাঁথা রচনার কাজে তাঁদের নিজস্ব শিল্প প্রতিভার সুযোগ্য পরিচয় দিতে পারবেন।

বারান্তরে বাংলার বিশিষ্ট লোক-কলা সূচীশিল্পের আরো কয়েকটি নতুন নতুন নক্সার নমুনা উপহার দেবার বাসনা রইলো।

—

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—বাংলাদেশের বিচিত্র-সুস্বাদু বিশেষ এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার কথা। এ মিষ্টান্নটির নাম—'কুমড়োর মালপোয়া'। প্রিয়জনদের পাতে পরিবেশনের পক্ষে, এ মিষ্টান্নটি শুধু অভিনবত্বের দিক দিয়েই নয়, ঠিক মতো পাক করতে পারলে, খেতেও অপরূপ মুখরোচক হিসাবে সবিশেষ উপভোগ্য হয়ে উঠবে।

চার-পাঁচ জনের আহারোপযোগী অভিনব এই 'কুমড়োর মালপোয়া' মিষ্টান্ন রান্নার জন্ত উপকরণ চাই—আধসের কুমড়ো, একপোয়া চিনি, একমুঠো ময়দা কিম্বা আটা, গোটা চার-পাঁচ ছোট এলাচ সামান্ত কিছু মৌরী এবং প্রয়োজন মতো পরিমাণে অল্প একটু ঘি।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে ম দেবার আগে কুমড়োর খোসা ছাড়িয়ে নিয়ে ছোট ছো টুকরো করে কুটে জলে ধুয়ে নিন। এ কাজ সারা হ মৌরী আর ছোট এলাচগুলিকেও জলে ধুয়ে পরিষ্ক করে ফেলুন।

এবারে উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে কুমড়ো টুকরোগুলিকে আগাগোড়া সুসিদ্ধ করে নিন। কুমড়ো টুকরোগুলি ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে গেলে, সেগুলি রন্ধন-পাত্রের ফুটন্তজল থেকে তুলে সযত্নে অন্ত এ পরিষ্কার পাত্রে সরিয়ে রাখুন। অতঃপর পুনরায় উনা আঁচে ডেকচি চাপিয়ে, সেই ডেকচিতে আন্দাজম পরিমাণে খানিকটা জল ও চিনিটুকু মিশিয়ে 'মিশ্রণটি কিছুক্ষণ ভালোভাবে ফুটিয়ে চিনির রস পাক করে নি এভাবে পাক করার ফলে, চিনির রসটুকু প্রয়োজনম ঘন-তরলাকারের হয়ে উঠলেই, ডেকচিটিকে উনানের উ থেকে নামিয়ে নিয়ে সযত্নে আলাদা সরিয়ে রাখুন।

চিনির রসটুকু সুষ্ঠুভাবে পাক করে নেবার পর, ই পূর্ব্বে সুসিদ্ধ করে তুলে-রাখা কুমড়োর টুকরোগুলি হাতের তালুর সাহায্যে আগাগোড়া বেশ মিহিভাবে চট 'মণ্ড' (Pulp) বানিয়ে ফেলুন। এবারে এই সু কুমড়োর-মণ্ডের সঙ্গে মৌরী, ছোট এলাচের দানা এ আটা কিম্বা ময়দা মিশিয়ে পুনরায় ভালোভাবে চট মেখে নিন। তাহলেই মালপোয়া-রান্নার 'মিশ্রণ'-রচ কাজ শেষ হবে।

'মিশ্রণ' রচনার পর, মিষ্টান্ন-রান্নার পালা। রা কাজ সুরু করতে হবে—উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপি সেই পাত্রে প্রয়োজনমতো পরিমাণে ঘি ফুটিয়ে নি আগুনের উত্তাপে ঘিটুকু বেশ তরল ও ফুটন্ত হয়ে উঠ রন্ধন-পাত্রে একের পর এক মালপোয়ার আকারে রা কুমড়োর 'মিশ্রণগুলিকে ছেড়ে কিছুক্ষণ খুন্তির সাহা নাড়াচাড়া করে, সেগুলিকে বেশ ভালোভাবে ভে নিন। ফুটন্ত-ঘিয়ে এভাবে ভাজার ফলে, মালপো আকারে টুকরোগুলি আগাগোড়া বাদামী রঙের হয়ে উঠ সেগুলিকে খুন্তির সাহায্যে সযত্নে রন্ধন-পাত্র থেকে তু নিয়ে চিনির রসে পাত্রে চুবিয়ে রাখুন। অন্ততঃপ আধঘন্টাকাল চিনির রসের চুবিয়ে রাখার ফলে, কুমড়ে মালপোয়ার প্রত্যেকটি আগাগোড়া শীতল ও বেশ র সিক্ত হয়ে উঠলে, মিষ্টান্নটি প্রিয়জনদের পাতে পরিবে করবেন।

এই হলো 'কুমড়োর মালপোয়া' রান্নার মোটা রীতি।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ পরিবেশের পরিবর্ত্তন ॥

অধুনা ভারতীয় চলচ্চিত্রে একটা নতুন ধারার দেখা পাওয়া যাচ্ছে। গতানুগতিক ষ্টুডিও অভ্যন্তরের দৃশ্যের মাধ্যমে চিত্র-গ্রহণের রীতির একঘেয়েমি চিত্র-নির্মাতাদেরও বোধ হয় স্পর্শ করেছে। তাই আজকাল প্রায়ই ভারতীয় চিত্রে বহির্দৃশ্যের দর্শন দর্শকেরা পাচ্ছেন।
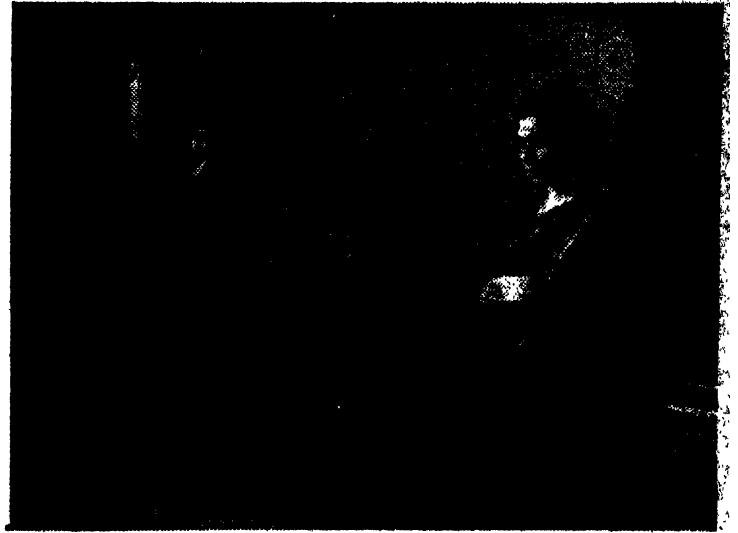
প্রযোজক-পরিচালক-অভিনেতা রাজকাপুরের সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত রঙিন, ব্যয়বহুল, সুদীর্ঘ চিত্র "সঙ্গম"ই এই দিক থেকে ভারতীয় চিত্রজগতে শীর্ষস্থান অধিকার করল। ভারতীয় চিত্রে বহির্দৃশ্যের প্রচলন থাকলেও সাগর পারের ইউরোপ প্রভৃতি দেশের দৃশ্য এবং সেই পরিবেশে ভারতীয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় বড় একটা দেখা যায় না। এর প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যয়বাহুল্য। অবশ্য সুযোগ, সুবিধা প্রভৃতি অন্য নানা কারণও আছে। সেই সব অসুবিধার অপসারণ করে, ব্যয়ের দিক দিয়ে, নতুন আঙ্গিকের দিক থেকে, চিত্র-গ্রহণের ব্যাপারে এবং পটভূমিকার নতুনত্বে "সঙ্গম" ভারতীয় চিত্র-জগতে নতুন যুগের সূচনা করেছে বলা চলে। রাজকাপুরের এই প্রচেষ্টা প্রশংসার্হ।

বাংলা চিত্রেও আজকাল এই পরিবেশের পরিবর্ত্তন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে। গৃহাভ্যন্তরের একঘেয়ে কথোপকথনের বদলে আজকাল প্রায়ই রাজপথের চিত্র, পল্লী দৃশ্য, নদী-নালা-সমুদ্র-পর্ব্বত-বনানীর ছবি পর্দায় ফুটে উঠে দর্শকচক্ষু তৃপ্ত করছে। কিন্তু এখনও প্রয়োজনের তুলনায় এসব দৃশ্য অনেক কম দেখান হয়ই শুধু নয়, অনেক সময় চিত্রগ্রহণের অপটুতায় দৃশ্যগুলিও ঠিক মত ফুটে উঠতে পারে না। এ বিষয়ে ক্যামেরার কাজ আরও নিখুঁত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া আগেই বলেছি ব্যয়বাহুল্যের কথা। বাংলা চিত্রের নির্মাতারা বিরাট ব্যয়বহুল বহির্দৃশ্য সম্বলিত চিত্র যদি নির্মাণ করতে পারেন, তাহলে বাংলা গল্পের

আর, ভি, বনশল নিবেদিত ও বিমু বর্ধন পরিচালিত 'মুভী ফাইনান্সিয়ার্স এণ্টারপ্রাইজেস্'-এর "দুই পর্ব" চিত্রে নবাগত **সুমন মুখোপাধ্যায় ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস।**

শ্রেষ্ঠত্বে, বাঙালী শিল্পীদের অভিনয় কুশলতায় এবং বাঙালী পরিচালকের নৈপুণ্যে তা ভারত তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্ররূপে পরিগণিত হতে যে পারবে এ বিশ্বাস আমাদের আছে। বাংলা চিত্র-নির্মাতারা আশা করি এ বিষয়ে অবহিত হবেন এবং বিদেশী চিত্রের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা চিত্রের পরিবেশের বা পটভূমিকার নানা রকম পরিবর্ত্তন সাধন করে ও নতুনত্ব আনয়ন করে দর্শকমন জয় করবেন।

আমরা সর্বভারতীয় ও বাংলা চলচ্চিত্রের এই পরিবেশের পরিবর্ত্তনের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার জন্ম চিত্র-নির্মাতাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি ও তাঁদের এই সু-প্রচেষ্টার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করছি।

[illegible] ঃ

সত্যজিৎ রায় তাঁর পরবর্ত্তী যে ছবিটি তৈরীরপরিকল্পনা করেছেন তার নামকরণ করা হয়েছে "কাপুরুষ ও মহা-পুরুষ"। দু'টি গল্প নিয়ে এই চিত্রটি রচিত হবে। প্রযোজনা করবেন আর, ডি, বন্‌শল।

এই চিত্রের প্রথমাংশ অর্থাৎ 'কাপুরুষ' অংশ তৈরী হবে প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত "জনৈক কাপুরুষের কাহিনী" অবলম্বনে, আর দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ "মহাপুরুষ" অংশ তৈরী হবে পরশুরাম রচিত "বিরিঞ্চিবাবা" গল্প অবলম্বনে।

প্রথমাংশের তিনটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। আর দ্বিতীয়াংশের প্রধান চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হবেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, রেণুকা রায়, গীতালি রায় প্রভৃতি।

* * *

যে চারণ কবি একদা সারা বাংলাদেশকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন, সেই মুকুন্দদাসের জীবনী অবলম্বনে "চারণ কবি মুকুন্দ দাস" নামে একটি ছবির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। 'ফিল্ম ক্লাসিক' ছবিটি নির্মাণ করবেন এবং পরিচালনা ও সুরযোজনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে নির্মল চৌধুরী ও পবিত্র চট্টোপাধ্যায়।

এই চিত্রে মুকুন্দ দাসের গাওয়া গানগুলিতে কণ্ঠদান করবেন সবিতাব্রত দত্ত ও নির্মল চৌধুরী এবং ছবিটির নামভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন সবিতাব্রত দত্ত।

* * *

শোনা যাচ্ছে বৈজয়ন্তীমালা ও রাজেন্দ্রকুমার শীঘ্রই বাংলা চিত্রে অভিনয় করবেন। প্রযোজক আর, ডি, বনশলের একটি বাংলা ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয় করবেন বৈজয়ন্তীমালা এবং বনশলের অপর একটি বাংলা চিত্রে রাজেন্দ্রকুমারের অভিনয়ের কথা আছে।

* * *

প্রযোজক দিলীপ সরকারের পরবর্ত্তী বাংলা ছবিটির নাম হ'ল 'একটুকু ছোঁয়া লাগে'। বোম্বাইয়ে ছবিটি তোলা হবে এবং প্রধান তিনটি ভূমিকায় অভিনয় করবেন কিশোরকুমার, বিশ্বজিৎ ও আজরা।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক কনক মুখার্জি তাঁর পরবর্ত্তী যে ছবিটি নিবেদন করছেন তার নাম "মায়াবিনী লেন।" সঙ্গীতে কণ্ঠদান করবেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে "মায়াবিনী লেন" ছবিটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করবেন শ্রীমুখার্জি নিজে। ছবির বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে আত্মপ্রকাশ করবেন বিকাশ রায়, সুলতা চৌধুরী, সন্ধ্যারাণী, নির্মলকুমার, অরুণ-কুমার, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

প্রযোজক বিজয় চট্টোপাধ্যায়কে এবারে পরিচালকের ভূমিকায় দেখা যাবে এবং যে চিত্রটি তিনি পরিচালনা করবেন সেটির নাম হচ্ছে 'রঙের খেলা'। এর কাহিনী রচনা করেছেন শেখর চট্টোপাধ্যায় এবং তিনি স্বয়ং এ-ছবির একটি প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণও হবেন।

রবি ঘোষ, জহর রায় ও ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই কমেডি চিত্রের অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করবেন।

* * *

'লক্ষ্মীনারায়ণ পিকচার্স'-এর প্রথম ছবি "কুলায়

গত ১৫ই আগষ্ট ক্যালকাটা মুভিটোন্ ষ্টুডিওতে কল্পনা প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'লতার স্বপ্ন'র শুভ-মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্বরচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করবেন কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চিত্র গ্রহণ, সঙ্গীত পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করবেন যথাক্রমে নির্মল গুপ্ত, কৃষ্ণ ঘোষাল ও সুকুমার মুখোপাধ্যায়।

...গা"র শুভ-সূচনা উৎসব রাধা ফিল্ম ষ্টুডিওতে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে।

ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অর্ধেন্দু সেন। বসন্ত চৌধুরী ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় এই চিত্রের নায়ক-নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করবেন। সুর-যোজনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত।

* * * * * *

বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগদানকারি প্রযোজক আর, ডি, বনশল ও "মহানগর" চিত্রের নায়ক অনিল চট্টোপাধ্যায়কে অভিনন্দন জানাচ্ছেন 'আর, ডি, বি'র সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে

"সন্ধ্যা দীপের শিখা' চিত্রের কয়েকটি বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য পরিচালক হরিদাস ভট্টাচার্য্য তাঁর দলবল সহ কর্মী রওনা হচ্ছেন।

শিল্পীদের মধ্যে তাঁর সঙ্গে থাকবেন সুচিত্রা সেন, বিকাশ রায়, দিলীপ মুখোপাধ্যায় ও অনিল চট্টোপাধ্যায়।

কৃষ্ণ ফিল্মসের "একটি নাটকী ঘটনা" নামে একখানি ছবির শুভ-সূচনা সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে। শ্যামল মিত্র এবং আরতি মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে দু'খানি গান প্রথমেই রেকর্ডিং করা হয়।

শৈলেন দে রচিত কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিখানি পরিচালনা করছেন শরৎ দে।

পরিচালক তপন সিংহ বনফুল রচিত "হাটে বাজারে" কাহিনীটির চিত্ররূপ দেবেন হিন্দীতে।

ছবিখানি প্রযোজনা করবেন বোম্বাইয়ের প্রযোজক-অভিনেতা দিলীপকুমার।

দিলীপকুমারই সম্ভবতঃ এই চিত্রের নায়কের ভূমিকায় অভিনয়ও করবেন।

* * *

'শুভকল্প চিত্রম'-এর 'রূপ সনাতন' ছবিটির চিত্রগ্রহণ শেষ হয়েছে এবং ছবিটি মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেম মন্ত্রে দীক্ষিত রূপ ও সনাতনের কাহিনী অবলম্বনে এই ছবিটির গল্পাংশ ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং পরিচালনা করেছেন তরুণ পরিচালক সুনীলবরণ।

ছবিটির প্রধান চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটক একটি ভোজপুরী ছবি নির্মাণ করছেন এ খবর আগেই দেওয়া হয়েছে। এই চিত্রটির নাম হচ্ছে— 'শ্যাম সে নেহা লাগে'। রাজকুমার মৈত্রের লেখা একটি গল্প এই ছবিটির অবলম্বন।

শ্রীঘটক বলেছেন যে তাঁর ধারণা ভোজপুরী ছবির মধ্য দিয়ে দেশের মাটির কথা বলা যায়—ছবিতে এনে দেওয়া যায় সেই মাটির স্পর্শ। বর্তমানে কলিকাতার ষ্টুডিওতে ভোজপুরী ছবি তৈরি হওয়ার ফলে বাংলা দেশের কলাকুশলী এবং শিল্পীরা কাজ পাচ্ছেন—তিনি এই আশাপ্রদ ব্যাপারটিরও উল্লেখ করেন।

ছবিটি কলিকাতার ষ্টুডিওতে নির্মিত হবে এবং প্রধান চরিত্রে অসীমকুমার রূপ দেবেন। শুটিং আরম্ভ হবে সেপ্টেম্বরে।

* * *

গুজরাটের প্রেক্ষাগৃহ সমূহে "অখণ্ড সৌভাগ্যবতী" নামের গুজরাটি ছবিখানি বিনা প্রমোদ করে প্রদর্শিত হচ্ছে ৩০শে জুলাই থেকে।

গুজরাটের রমণীদের ব্যাপক আত্মহত্যা—এই বৃহৎ সমস্যার পটভূমিকাতেই চিত্রটি নির্মিত হয়েছে। মহেশ দেশাই এই ছবির নায়ক ও আশা পারেখ এর নায়িকা। প্রযোজনা করেছেন রাজা সইদা, আর পরিচালক হলেন মনোহর রাজকাপুর।

"অখণ্ড সৌভাগ্যবতী"ই একমাত্র গুজরাটি ছবি, যা গুজরাট সরকারের প্রমোদকর থেকে অব্যাহতি পেলো। গুজরাট রাজ্যের এক জটিল সমস্যার পটভূমিকাতে ছবিখানি তৈরী হয়েছে বলেই হয়তো ছবিটি রাজ্যে প্রমোদ কর থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে।

* * *

যে নাটক দর্শনে একদা শ্রীরামকৃষ্ণদেব অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন, মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সেই "চৈতন্য-লীলা" নাটকটি গিরিশ সংসদ কর্তৃক পরিবেশিত হয়ে অসংখ্য দর্শককে বিমুগ্ধ করেছে।

এই "চৈতন্য-লীলা" নাটকটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে নাটকখানিকে পঞ্চাশটি গানে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। সঙ্গীতাংশে আছেন পবিত্র দে, ছাপী চৌধুরী, কল্যাণী রায়চৌধুরী, মঞ্জু দে, পূরবী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

বাংলা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র জগতের প্রবীণ ও যশস্বী অভিনেতা নটশেখর নরেশচন্দ্র মিত্র তাঁর স্বর্গতা সহধর্মিণী মুকুল মিত্রের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি শয্যা স্থাপনের জন্য, দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার পরিচালিত বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তন টি, বি হাসপাতালে ৭,৫০০৲ টাকা দান করেছেন।

সেবাধর্মের জন্য শ্রীমিত্রের এই দান বিশেষ প্রশংসনীয়।

* * *

দেশে বিদেশে ঃ

সত্যজিৎ রায়-কৃত "মহানগর" চিত্রটি নিউইয়র্কের দ্বিতীয় বার্ষিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শনের জন্য নির্ব্বাচিত হয়েছে। আগামী ১৩ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর "মহানগর" ঐ উৎসবে প্রদর্শিত হবে। এই উৎসবের উদ্যোক্তারা ঘোষণা করেছেন যে "মহানগর" সহ আরও তিনটি ইউরোপীয় চিত্রও নির্ব্বাচিত হয়েছে এবং মোট নির্ব্বাচিত চিত্র হচ্ছে এগারটি।

* * *

চেকোস্লোভাকিয়ার সংগীত নাটক একাডেমি খাজা মহম্মদ আব্বাস কৃত, রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত "শেহর

অওয় সপ্না" চিত্রটিকে পুরস্কৃত করেছেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে একাডেমির রেক্টর প্রোফেসর এ, এম, ক্রসিল্ শ্রীআব্বাসের হাতে পুরস্কারটি প্রদান করেন।

* * *

কার্লোভি ভ্যারি চলচ্চিত্র উৎসবের সম্প্রতি সমাপ্তি হয়েছে। উৎসবের সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছে চেক্ চিত্র 'দি ডিফেন্ড্যাণ্ট'। মার্কিন্ যুক্তরাষ্ট্রের ছবি 'দি বেষ্ট ম্যান্' উৎসবের বিশেষ পুরস্কারটি জয় করেছে। এই ছবিটির প্রধান চরিত্রে হেন্রি ফন্ডার অভিনয়ও বিচারক-মণ্ডলীর বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে।

নীতিগত মূল্যের জন্য সোভিয়েট চিত্র "দি লিভিং অ্যাণ্ড দি ডেড" এবং শিল্প মূল্যের জন্য হাঙ্গেরির ছবি 'কারেণ্ট' উৎসবের আরও দুটি প্রধান পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে।

শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছেন শ্রীমতী জেয়ান্ মরো, বুনুয়েল-কৃত 'দি ডায়ারি অফ্ এ চেম্বারমেড' ছবিতে অভিনয়ের জন্য এবং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার লাভ করেছেন পোলিশ চিত্র 'একো'র নায়ক জ্বিগ্নিউ সিনস্কি। রুমানিয়ার 'দি ট্রেন্জার' এবং স্পেনের 'সান্-টেনিয়াস্'—এই দুটি ছবির দুই তরুণ অভিনেতা স্তেফান্ ইওরদাশ্ এবং লুই ফেরিন্ উৎসবে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

* * *

হলিউডের একটি হাসপাতালে বর্তমানে রোগশয্যায় শায়িত বিখ্যাত হাস্যরসিক অভিনেতা ষ্ট্যান্ লরেল্ তাঁর অনুরাগীদের কাছ থেকে প্রতিদিন প্রায় একহাজার করে চিঠি পাচ্ছেন। ষ্ট্যান্ লরেল্ এখন পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধ। অধুনামৃত অলিভার হার্ডির সঙ্গে কৌতুক অভিনয় করে লরেল্ হার্ডি জুটি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে জনচিত্তে স্থায়ী আসন দখল করেন। হার্ডি আগেই পরলোকগমন করেছেন, আর লরেলও আজ রোগশয্যায়। কিন্তু বিশ্বের চিত্রানুরাগী জনতা তাঁদের ভোলে নি, তাই বৃটিশজাত এই ক্ষীণদেহী মানুষটি এখনও শত শত পত্রের মধ্য দিয়ে অনুরাগীদের অভিনন্দন পেয়ে চলেছেন।

আগামী শারদীয়া (আশ্বিন) সংখ্যায় এঁদের এবং আরও অনেকের লেখা আপনারা পড়তে পারবেন ঃ

গল্প লিখবেন :—

পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য	নরেন্দ্রনাথ মিত্র
হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	অখিল নিয়োগী
মায়া বসু	কানাই বসু
শক্তিপদ রাজগুরু	প্রফুল্ল রায়

ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (শিকারকাহিনী), প্রভৃতি

প্রবন্ধ লিখবেন ঃ—

রমেশ মজুমদার	হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিতা লিখবেন ঃ—

দিলীপকুমার রায় (গান ও স্বরলিপি) কুমুদরঞ্জন মল্লিক

হাসিরাশি দেবী যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী শান্তশীল দাশ

মিহিরাচার্য্য

জ্যোতিষে জীবিকানির্ণয় সম্বন্ধে উপদেশ আছে যে, চন্দ্রলগ্ন বা লগ্ন থেকে যেটি ষড়বর্গ বিচারে বলবান, সেই ঘর থেকে দশম ঘরে জীবিকার বিচার করতে হবে।

প্রথমে জানা উচিত চন্দ্রলগ্ন বা লগ্ন কি? লগ্ন হচ্ছে জাতকের জন্ম সময়ে যে রাশির উদয় হয়েছিল, সেই রাশিই তার লগ্ন। আর চন্দ্রলগ্ন হচ্ছে যে রাশিতে জন্মের সময় চন্দ্রগ্রহ অবস্থিত ছিলেন। ষড়বর্গ কি এবার তাই বলছি। বর্গবিচার করতে হলে স্ফুট জানা দরকার। স্ফুট মানে হচ্ছে সূক্ষ্মভাবে গণিতের বিচার। যেমন ধরুন অঙ্ক কষে বের করা হোল যে আপনার লগ্ন সিংহরাশিতে—কিন্তু ঐ সিংহরাশির ঠিক কোনখানে আপনার লগ্ন তা জানতে হলে কষে বের করতে হবে কত অংশ কত কলায় আপনার লগ্ন। চন্দ্রের বেলায়ও তাই। চন্দ্র সেই রাশিতে কত অংশ কত কলায় আছেন, এ না জানলে বর্গবিচার করা যায় না। ষড়বর্গের নাম হচ্ছে (১) ক্ষেত্র (২) হোরা (৩) দ্রেক্কাণ (৪) নবাংশ (৫) দ্বাদশাংশ (৬) ত্রিংশাংশ। ক্ষেত্র অর্থে যে রাশি তার অধিপতি গ্রহ। এক একটি গ্রহ এক একটি রাশির মালিক—অর্থাৎ ঐ ঘরের তিনিই হবেন অধিপতি। হোরা মানে আধাআধি করে একটি রাশিকে দুভাগ করা। যেমন একটি রাশির বিস্তৃতি হচ্ছে ত্রিশ অংশ। একে দুভাগ করলে ১৫ অংশ করে এক একটি ভাগ হয়। এই এক একটি ভাগের আবার এক একজন মালিক। দ্রেক্কাণ হোল তিনভাগে ভাগ। প্রত্যেক ভাগ ১০ অংশ করে। নবাংশ হোল ৯ ভাগে ভাগ। প্রত্যেক অংশ ৩ অংশ ২০ কলা। এই ন' ভাগের এক একজন মালিক। এই রকম দ্বাদশাংশ হোল এক একটি ভাগ আড়াই অংশ করে আর ত্রিংশাংশ হোল এক একটি এক অংশ কোরে। এই সব ভাগেরই এক একটি গ্রহ অধিপতি বা মালিক। যখন লগ্ন ও চন্দ্রের স্ফুট পাওয়া গেল তখন ঐ ষড়বর্গের বিচারে দেখতে হবে চন্দ্রলগ্ন বা লগ্ন কোনটি বেশী শুভ বা মিত্রবর্গ পেয়েছে। যেটি বেশী বর্গ পাবে তাকেই বলবান বলে গ্রহণ কোরে গুণে দেখতে হবে দশম ঘর কোনটি—সে ঘরে কেউ আছে কিনা—যদি না থাকে তার অধিপতি গ্রহ কোথায় আছে? কোন্ কোন্ গ্রহ তার ওপর দৃষ্টি দিয়েছে প্রভৃতি। একটা উদাহরণ দিয়ে দেখালে বক্তব্যটা আরও পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজনের লগ্ন সিংহ, রাশি মকর। ঐ যে বর্গ বিচারের কথা ওপরে বলেছি, স্ফুটের সাহায্যে বর্গবিচার কোরে দেখা গেল চন্দ্রলগ্ন, লগ্নের চেয়ে বেশী শুভ ও মিত্র বর্গ পেয়েছে। তাহলে নিয়ম অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে চন্দ্র লগ্নকেই গ্রহণ করা গেল। মকর থেকে গুণে দশম ঘর পাওয়া গেল তুলারাশি যার অধিপতি হচ্ছেন শুক্র। দেখা গেল, দশম ঘর ঐ তুলারাশিতে বুধগ্রহ আছেন, তাহলে বুধই হবেন এর কর্ম্মদাতা। কিন্তু যদি কোন গ্রহ দৃষ্টি দেয় তারও মিশ্রণ থাকবে কর্ম্মের সঙ্গে—তাছাড়া শুক্রের ঘরে থাকার জন্য শুক্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মেরও স্পর্শ থাকবে।

এইবার দেখা যাক জ্যোতিষে কোন গ্রহ সম্বন্ধে কি কি জীবিকার উল্লেখ আছে।

রবি গ্রহের : চিকিৎসা, স্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়, ঔষধ বিক্রয়, মণি বা তাম্রের ব্যবসা (বিক্রয়াদি), শাস্ত্রোপদেশ, কৃষি, দৌত্যকার্য্য, দালালি, সৈনিকবৃত্তি, বিবাদ, সরকার বা রাজার সংশ্লিষ্ট কার্য্য।

চন্দ্রগ্রহের : বস্ত্র, তুলা, ঘৃতাদি স্নেহদ্রব্য (বর্তমানে নিশ্চয়ই ডালডা—কি বলুন ?), সুগন্ধদ্রব্য, পুষ্প, অলঙ্কার, শঙ্খ, মুক্তা, জলজাতবস্তু, ঔষধের ক্রয় বিক্রয়, স্ত্রীজনপ্রেম, গীত, বাদ্য, চিত্র (ফোটোগ্রাফী) প্রভৃতি।

মঙ্গলগ্রহের : সৈনিক—আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী পুলিশ, খনি বা ভূমিজাত দ্রব্য, সহজদাহ্য পদার্থ বা বিস্ফোরক, অগ্নি, বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কর্ম্ম, ঔষধ প্রস্তুত (কেমিষ্ট), চিকিৎসা, কৃষিকার্য্য, বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, কুশীদজীবী।

বুধগ্রহের : সংগীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, লেখক, কেরাণী, কাব্য, গণিত, শিল্পকর্ম্ম, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রাসায়নিক, শান্তি প্রচার, বিবাদে মধ্যস্থতা (আরবিট্রেটার) প্রভৃতি।

বৃহস্পতিগ্রহের : দেবপূজা, উপদেশ, ধর্ম্মচর্চ্চা, শাস্ত্রানুশীলন, আইনব্যবসা, মন্ত্রিত্ব, রাজসরকারে উপদেষ্টা, জননেতৃত্ব, বিচারক প্রভৃতি।

শুক্রগ্রহের : গো, মহিষ, অশ্ব, হস্তী, গুড় প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয়, স্ত্রীসেবা, স্ত্রীসম্পত্তি ভোগ, অধ্যাপনা, রাজকার্য্য, নাগরিকের সঙ্গে রাজা বা সরকারী যোগাযোগ, কাব্যচর্চ্চা, বক্তৃতা, আইনজ্ঞ বা ব্যবসায়ী, গীত-বাদ্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

শনিগ্রহের : চাকুরী, শ্রমিক, কনট্রাকটর, লৌহ, কাষ্ঠ প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়, এজেন্সী, যন্ত্রচালনা, যানবাহন পরিচালনা, শ্রমিক নেতৃত্ব, দৈহিক পরিশ্রম, ঋণ-দান, লৌহযন্ত্র নির্ম্মাতা, কূটমন্ত্রণাদাতা, সঞ্চয় কার্য্য প্রভৃতি।

রাহুগ্রহের : পশু, অঙ্গার, মাংস, মদ্য, প্রস্তর, লৌহ, তৃণ ক্রয়-বিক্রয় দুঃসাহসিক কর্ম্ম, যাবতীয় দুর্নীতি, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি প্রভৃতি।

কেতুগ্রহের : গুপ্তশত্রুতা, চরবৃত্তি, নীচতা, গুপ্ত-প্রতিষ্ঠানের পরিচালক, দুর্বুদ্ধি, কৃতঘ্নতা প্রভৃতি।

তাহলে আগে যে মকররাশি থেকে দশমস্থান বিচারের কথা বলেছি, দেখা যাক, সেটি ওপরে দেওয়া তালিকার সঙ্গে মিলিয়ে। হ্যাঁ মিলছে। এই জাতক জ্যোতিষ জানেন, সাহিত্যকে আংশিকভাবে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এতদিন গেল, বুধের জন্য, আর উনি চাকরী করেন আয়ারল্যাণ্ডে। এটি শুক্রের ঘরে থাকার জন্য।

এবার নিশ্চয়ই মনে হচ্ছে যদি কোন গ্রহ ঐ বলবান্ লগ্ন থেকে দশম ঘরে না থাকে ?

মনে করুন, তুলায় বুধ নেই। তাহলে দশম ঘরের অধিপতি শুক্র কোথায় আছেন দেখতে হবে। তিনি যদি ১০ম ঘরের অধিপতি হয়ে কেন্দ্রে অর্থাৎ এক, সাত, চার, দশ এই চারটি ঘরের কোন একটিতে থাকেন তাহলে সেই ঘরগুলির মালিক যে গ্রহ সে গ্রহের প্রভাব থাকবে কর্ম্মের মধ্যে। আর যদি ৬ষ্ঠ, অষ্টম, দ্বাদশ ঘরে দশম ঘরের অধিপতি থাকেন, তাহলে কর্ম্ম লাভ কঠিন হবে এবং পেলেও তা স্থায়ী হবে না। মোট কথা কোন গ্রহ যদি দশম ঘরে না থাকে তাহলে দশমপতি যে গ্রহের ঘরে গেছেন এবং যে গ্রহের নবাংশ পেয়েছেন তারই সংমিশ্রণে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হবে।

ব্যক্তিগত রাশি ও লগ্নফল

[যাঁর রাশি ও লগ্ন ভিন্ন তিনি দুটিই পড়ে সামঞ্জস্য করবেন]

ভাদ্রের গ্রহ সংস্থান

রবিসংক্রমণের সময় চন্দ্র ধনুতে। রবি সিংহে, মঙ্গল মিথুনে—১৯শে ভাদ্র কর্কটে। বুধ সিংহে বক্রী ২১শে মার্গী। বৃহস্পতি বৃষে—২৩শে বক্রী। শুক্র মিথুনে ১১ই কর্কটে। শনি কুম্ভে বক্রী। রাহু মিথুনে। কেতু ধনুতে।

মেষ রাশি

প্রথম সপ্তাহে মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। গৃহে নানা ঝঞ্ঝাটে অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। ২৪ তারিখ পর্য্যন্ত অর্থ সাচ্ছল্য থাকবে। মাসের শেষাশেষি অর্থ-কৃচ্ছ্র তার কারণে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হলে ৬ তারিখে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা—ভরণী বা কৃত্তিকা হলে ৭ তারিখে। ১১ তারিখের পর কর্ম্মে নতুন সুযোগের

আভাস পেতে পারেন। ২১ তারিখের পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনের সংবাদ বা অন্য কোন সু-খবর পেতে পারেন।

বৃষ রাশি

২৭শে পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য ভালই যাবে। পত্নীর স্বাস্থ্যের উন্নতি ও গৃহস্থালীতে পটুতা দেখা যায়। সন্তানদের জন্যে ২১শে তারিখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উদ্বিগ্ন থাকার সম্ভাবনা দেখা যায়। ৮।৯ তারিখ দুটি দিন আপনার পক্ষে কিছু প্রাপ্তির দিন। দ্যূতাদিতে আসক্তি থাকলে এবং সুযোগ পেলে কিছু লাভ করবেন। কর্ম্মস্থানে উপরওয়ালার বিরাগভাজন হবার আশঙ্কা আছে—অনেক প্রকার দায়িত্ব ঘাড়ে নিতে হতে পারে। কোন কিছুতে সই করে ক্ষতি স্বীকার করার সম্ভাবনা। চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হতে পারেন মাসের শেষ দিকে।

মিথুন রাশি

২১শে তারিখ পর্য্যন্ত নানা প্রকার শারীরিক পীড়ায় ও মনঃকষ্টে জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে পড়তে পারেন। তবে এ সবই সাময়িক ভাবে প্রভাবিত করবে। ১৯শে তারিখের পর অর্থসাচ্ছল্য হবার আশা দেখতে পাবেন। ১০।১১ তারিখে ব্যসনাদি ব্যাপারে কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে বলে অনুমান হয়। স্ত্রীর সংগে মনান্তর হতে পারে এ মাসে। পিতার স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। প্রণয়ার্থী ছেলে-মেয়েরা ২১শে তারিখের পর প্রমোদবিহারে মনোমত সঙ্গী পেয়ে আনন্দ লাভ করবেন।

কর্কট রাশি

১২।১৩ তারিখ দুটিই আপনার পক্ষে ভাগ্যবৃদ্ধির সহায়ক। চাকুরীর জন্যে দেখা করা। উচ্চপদ বা কোন সুবিধার জন্যে তদ্বির করলে ভাল ফল পাবেন। ধনসঞ্চয়ে অক্ষমতা দেখা দেবে। ১৯শের পর আয়বৃদ্ধি হবে কিম্বা অনাদায়ী টাকা বা কিছু উপরি পেয়ে যেতে পারেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। ব্লাড-প্রেশার থাকলে তা বৃদ্ধি পাবে। মাসের প্রথমে কিছু খোয়া গিয়ে ক্ষতি হতে পারে। সন্তানেরা মাসের শেষের দিকে উন্নতি করবে।

সিংহরাশি

পুরো মাসটি প্রায় ভাল যাবে। পূর্বফল্গুনী (১১) নক্ষত্রে যদি জন্ম হয়ে থাকে—এমাসে অনেক সুযোগ আপনার হাতে আসবে। ২১ তারিখে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যা আপনার মানসিক, আর্থিক প্রভৃতি অনেক দিকে আনন্দ দিতে পারে। প্রণয়ার্থী ছেলে-মেয়েরা বিবাদ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারেন। অনেক সম্মানজনক দায়িত্ব নিয়ে সম্মানের সঙ্গে উত্তীর্ণ হতে পারেন। কোন সন্তান বিদেশে কার্য্যান্তরে যেতে পারে। মোটামুটি মাসটি ভাল।

কন্যারাশি

কর্ম্মে ১৯ তারিখের পর পরিবর্ত্তন আসতে পারে—সেই সংগে জটিলতাও। তবে এই সব ভবিষ্যতের শুভসূচনা করবে। অর্থসাচ্ছল্য ভালই, সঞ্চয়ের তেমন আশা নেই। রোজগার পরিমিত হলেও খরচের প্রাবল্যে টানাটানি কিছুটা থাকবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য মাসের শেষের দিকে কিছুটা খারাপ হবে। ২১শে পর্য্যন্ত আপনার শরীরও মাঝে মাঝে গণ্ডগোল করবে—লো-প্রেশার দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা, সন্তানেরা বিপরীত আচরণ করবে।

তুলা রাশি

ব্যবসায়ী হলে ২১।২২ তারিখে সরকারের কোপে পড়ে খেসারৎ দিতে হতে পারে। চাকুরে হলে কোন কারণে ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ৎ দাখিল করতে হতে পারে। ২৫ তারিখটিতে কিছু প্রাপ্য বা লাভ হবার সম্ভাবনা আছে। ১৯ তারিখের পর স্ত্রীর সাহায্য পাবেন নানা দিক থেকে। কিছু পরিবর্ত্তন বা অদল-বদলের সম্ভাবনা দেখা যায়। সন্তানরা উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে তাদের জন্যে মনঃকষ্ট দেখা দেবে।

বৃশ্চিক রাশি

২৭ তারিখটি আপনার পক্ষে ভাল। বেকার হলে এইদিন কাজ কর্ম্মের জন্যে দেখা-করা বা তদ্বির করে দেখতে পারেন। স্ত্রীর সাহচর্য্যে ভাগ্যবৃদ্ধির আশা দেখতে পাওয়া যায়। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। শরীর মাসের শেষের দিকে খারাপ হতে পারে। প্রেশারের গণ্ডগোল হওয়ারই আশঙ্কা। সন্তানদের ২৪ তারিখের পর সুফল পাওয়ার আশা কমে যাবে। ব্যাবসায়ী যদি অংশীদার-সূত্রে আবদ্ধ থাকেন, তা হলে কলহ ও বিবাদ হবার আশঙ্কা।

ধনু রাশি

২৪শে চৈত্রের পর থেকে মানসিক ও শারীরিক ক্লেশের সম্ভাবনা। মাসের প্রথম দিনটি আপনি বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ও অর্থনাচ্ছল্য পেয়ে যাবেন। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে কারো সংবাদ না পেয়ে উৎকণ্ঠা হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সাংসারিক বা কুটুম্বিতা ব্যাপার নিয়ে বচসা ও মন কষাকষি হতে পারে। সম্ভবস্থলে সন্তানলাভের যোগ আছে। ভাগ্যহানির ভয়ে শঙ্কিত হতে পারেন। পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়া দেখা দিতে পারে। বন্ধুদের সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

মকর রাশি

সমস্ত কাজেই বিলম্ব ও কিছু কিছু বিঘ্ন দেখা দেবে। দূর ভ্রমণ না করাই উচিত। ফিরে আসতে দেরী এবং বিঘ্ন দুইই হবার সম্ভাবনা। মাসের ২৭।২৮ তারিখ দুটি ভাল যাবার সম্ভাবনা। পত্নীর শরীরে মাসের মাঝামাঝি থেকে কিছু ক্লেশ দেখা দিতে পারে সন্তানদের তেমন কিছু পরিবর্ত্তনের আশা দেখা যায় না। অংশীদারী হিসেবে ব্যবসা করতে ইচ্ছে থাকলে এ মাসে শুরু করতে পারেন শেষের দিকে চাকরীজীবীদের মাসটি ভাল যাবে।

কুম্ভ রাশি

স্ত্রীর শরীর নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হবে। অমাবস্যায় ভীষণ ভাবে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ভা-বনার ভারে আপনারও শরীর ভাল যাবে না। কোন কন্যার সম্বন্ধে শুভসংবাদ এ মাসে পেতে পারেন। অর্থব্যয় হবে কিন্তু আয়ের পথও সুগম হবে। কনিষ্ঠ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আপনাকে বিচলিত করবে। মাতার স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা। ভৃত্য কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মাসের ৫।৬ তারিখ আপনার পক্ষে শুভদিন।

মীন রাশি

মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতিতে ব্যয় হবার সম্ভাবনা। শত্রুতা কোরে কেউ ক্ষতি করে দিতে পারে। রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়ে জরিমানা দেবার আশঙ্কা দেখা যায়। উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর বিরাগভাজন হয়ে কাটাতে হতে পারে। গৃহস্থালী ব্যাপারে সামঞ্জস্য থাকবে না। দীর্ঘদিনের শত্রুতায় কোন বন্ধু আপনাকে কাবু করে ফেলতে পারে। কোন ছোট দুর্ঘটনায় মাসের তৃতীয়-চতুর্থ সপ্তাহে সামান্য রক্তপাত হতে পারে। স্ত্রী লোক শত্রু থেকে অপবাদ কুড়োতে পারেন।

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

গ্রহ

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ফলিত জ্যোতিষের গ্রহের ধারণা এবং গণিত জ্যোতিষের গ্রহের ধারণা ঠিক এক নয়। গণিত জ্যোতিষের হিসাবে সূর্য একটি স্থির তারা, চন্দ্র একটি উপগ্রহ, রাহু ও কেতু এ দুটি চন্দ্রের কক্ষার দুটি গাণিতিক বিন্দু মাত্র, কিন্তু ফলিত জ্যোতিষে এ সবগুলিকে গ্রহ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। ফলিত জ্যোতিষে গ্রহ কথাটির মানে হচ্ছে আকাশের এমন কতকগুলি ভ্রমণশীল পদার্থ, তা' তারাই হোক, উপ-গ্রহই হোক বা বিন্দুই হোক—যারা রাশি চক্রের উপর একটা বিশেষভাবে প্রভাব স্থাপন করে। ফলিত জ্যোতিষের গ্রহের সংজ্ঞা যদিও গণিত জ্যোতিষের গ্রহকে লক্ষ্য করে করা হয়েছে সূর্যের দিক থেকে। যে সব গগনচারী নিজের কক্ষায় সূর্যের চারদিকে ঘোরে তাদেরই বলা হয়েছে গ্রহ। কিন্তু ফলিত জ্যোতিষের গ্রহকে লক্ষ্য করা হয়েছে পৃথিবীর দিক থেকে। যে সব গগনচারী পৃথিবী থেকে দেখলে রাশিচক্রের গা দিয়ে রোজ একটু করে সরে যাচ্ছে মনে হয়, তাদেরই গ্রহ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, কি পৃথিবীকে বেড় দিয়ে গ্রহ নক্ষত্র ঘুরছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এ সত্য বিচার করে কোন লাভ নেই। যেখানে ফল নিয়ে কথা, সেখানে পৃথিবীর দিক থেকে আমাদের দেখতেই হবে সত্য যাই হোক। যদি কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে সূর্য উদিত হন না অস্তও যান না, তিনি যেমন তেমনি আছেন, তোমাদের দেখাটা ভুল ধারণামাত্র, তাতে বাস্তব জগতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে সূর্যের আলোর দীপ্তি পাবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না। সূর্য যেখানকার সেখানকার থাকলেও পৃথিবীর দিক থেকে তার গতি স্বীকার করতেই হবে। ফলিত জ্যোতিষ ব্যবহারিক প্রয়োগের শাস্ত্র, কাজেই তার গ্রহের ধারণা পৃথিবীর দিক থেকেই করা হয়েছে।

ফলিত জ্যোতিষের মতে এখন গ্রহ বারটি যথা :—

রবি, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু, কেতু, প্রজাপতি (ইউরেনাস) বরুণ (নেপচুন) রুদ্র (প্লুটো)।

গ্রহ যে বারটি একথা জোর করে বলা চলে না। এইটুকু শুধু বড় জোর বলা যায় যে আজ পর্যন্ত বারটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। এরপর হয়ত আরও গ্রহ আবিষ্কৃত হতে পারে। আমাদের প্রাচীন পুঁথিগুলিতে নবগ্রহের নামমাত্র উল্লেখ আছে। অনেকে বলেন ন'টি মাত্র গ্রহ দিয়ে প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদরা যখন এত ফল মেলাতে পারতেন, তখন আর বেশী গ্রহ নিয়ে বিচার করবার দরকার কি? এ কথা যুক্তিযুক্ত নয়। শুধু রবির অবস্থান (মাসফল) দিয়ে এবং লগ্নরাশি (লগ্নফল ও রাশিফল) দিয়ে মোটামুটি অনেক কথা মেলান যায়। তা বলে কে এমন কথা বলতে পারে যে, অন্য গ্রহের সংস্থান বা সূক্ষ্ম ভাব স্ফুটের কোন আবশ্যকতা নেই। ভাল করে বিচার করতে পারলে অনেক সময় দুটি তিনটি গ্রহ দিয়েও অনেক সময় অনেক কথা বলা চলতে পারে, কিন্তু সঠিক ফলাদেশের জন্য সূক্ষ্ম গ্রহ-সংস্থান এবং সমস্ত গ্রহের পরস্পর সম্বন্ধ ভালভাবে বিচার করা চাই। দুটি তিনটি গ্রহ কম হলেও কতক বিচার চলে, এবং তাতে কতক ফল মেলে, কিন্তু তাতে ফলাদেশ কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

রাহু, কেতু, ছাড়া বাকি দশটি গ্রহ এক একটি স্থূল জড় পদার্থের গোলকমাত্র—এই গোলকগুলির মধ্যে সূর্য সব চেয়ে বড় এবং চন্দ্র সব চেয়ে ছোট। কিন্তু, গোলকগুলির গুরুত্ব বা আয়তন ধরে জ্যোতিষে ফল বিচার করা হয় না। পৃথিবীর উপর তাদের বেটির যেমন প্রভাব অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা যায়, সেই হিসাবেই তাদের বিচার

করতে হয়। গ্রহগুলির প্রভাব মূলতঃ পড়ে ক্রান্তিবৃত্তের উপর, এবং ক্রান্তিবৃত্তের যে বিন্দুর উপর গ্রহের প্রভাব পড়ে, সেই সেই বিন্দুগুলিকেই গ্রহের অবস্থান বলে ধরা হয়। পৃথিবী থেকে দেখলে সূর্য বা চন্দ্রকে বেশ বড় এবং ক্রান্তিবৃত্তের অনেকখানি জায়গা জুড়ে তারা থাকতে পারে, কিন্তু সূর্য বা চন্দ্র যতখানি জুড়ে থাকে তার সবখানিকে তাদের অবস্থান বলে ধরা হয় না। সূর্য বা চন্দ্রের মধ্যবিন্দুটি যেখানে পড়ে সে বিন্দুটিকে সূর্য বা চন্দ্রের অবস্থান বা স্ফুট বলা হয়। সূর্য এবং রাহু কেতু বরাবর ক্রান্তিবৃত্তের উপরেই থাকে, কিন্তু চন্দ্র এবং বাকি আটটি গ্রহ সব সময় ক্রান্তিবৃত্তের ঠিক উপরে থাকে না। তারা কখনও ক্রান্তিবৃত্তের একটু দক্ষিণে কখনও বা উত্তরেথাকে। কোন একটি গ্রহ ক্রান্তিবৃত্ত থেকে যত অংশ উত্তরে বা দক্ষিণে থাকে তত অংশ গ্রহটির সর (Latitude)। গ্রহ ক্রান্তিবৃত্তের উপর না থাকলে, গ্রহটির মধ্যবিন্দু থেকে একটি লম্বরেখা যদি ক্রান্তিবৃত্তের উপর টানা যায়, সেই রেখাটি ক্রান্তিবৃত্তের যে বিন্দুকে স্পর্শ করবে, সেই বিন্দুটির উপরেই গ্রহের পরিপুর্ণ প্রভাব।

গ্রহটি ক্রান্তিবৃত্তের কোন খানে আছে অর্থাৎ গ্রহটির স্ফুট স্পষ্ট বা সূক্ষ্ম অবস্থান কি তা' দু'রকমে জানা যেতে পারে :—

(১) আদিবিন্দু থেকে তা কত অংশ দূরে আছে (২) তা কোন্ রাশির কত অংশে আছে। একটি গ্রহ যদি আদিবিন্দু থেকে ২৭১ অংশ দূরে থাকে, তাহলে এও-বলা যেতে পারে যে, গ্রহটি মকরের ১ অংশে আছে। আমাদের দেশীমতে এটা অনেক সময় ৯।১ লিখেও জানানো হয়, ৯।১ এর মানে গ্রহটির অবস্থান আদিবিন্দু থেকে ৯রাশি ১ অংশ দূরে। অনেক সময় একটি গ্রহের অবস্থান অংশের চেয়ে সূক্ষ্ম করে দেখানো হয়ে থাকে। তার পর্যায় এই রকম :—

৬০ অনুকলায় ১ বিকলা
৬০ বিকলায় ১ কলা
৬০ কলায় ১ অংশ
৩০ অংশে ১ রাশি

অনুকলার চিহ্ন ('।।), বিকলার চিহ্ন (।।) কলার চিহ্ন (।) অংশের চিহ্ন (॰)।

গ্রহের মত ক্রান্তিবৃত্তের ভাবের অবস্থানও, আদিবিন্দু থেকে কত অংশ দূরে তাই দিয়ে কিংবা রাশি, অংশ প্রভৃতি দিয়ে প্রকাশ করা যেতে পারে। সে কথা পরের অধ্যায়ে বলছি। (ক্রমশঃ)

—

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধ

পণ্ডিত শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য
স্মৃতিরত্ন, সরস্বতী

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন প্রচলিত নিয়মে ভারতীয় সময় দিবা ১১টা ৩০ মিনিটে, দিল্লী মহানগরীতে মাননীয় শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রধান মন্ত্রীত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া নূতন ভারতীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

তৎকালে গগনপটে পূর্ব্বদিকে হোরাইজাণ্ডেলে সিংহ-রাশি উদীয়মান। উক্ত লগ্নাপেক্ষা সপ্তমে স্বগৃহগত শনি ও সৌভাগ্যগগনে বৃহস্পতি। উর্দ্ধাকাশে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল এবং বুধ। প্রধানে উপচয়ে (লাভে) রাহু শুক্র ও পঞ্চমে কেতু এইরূপ গ্রহ সংস্থানে, বিশেষ শুভ লগ্নে ও অপূর্ব্ব গ্রহসংযোগে মাননীয় শাস্ত্রীজী ৪৪ কোটি ভারতসন্তানের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য। রাশিচক্র দৃষ্টে বিবেচিত হয়, জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ দ্বারাই সময় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।

এইরূপ গ্রহসংস্থানে যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষগণই নররূপে যুগে-যুগে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এমন কি যাত্রা, অভিষেকাদি মাঙ্গলিক কার্য্যেও সুফল লাভ হয়। রাজস্থানীয় ধনকুবের ব্যবসায়িবৃন্দ, স্থির পরিচায়ক ঐ সিংহলগ্নেই লক্ষ্মী, গণেশাদি পূজা, এবং খাতা মহরৎ প্রভৃতি করিয়া থাকেন।

১৯৬২ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী মকর রাশিতে অষ্ট-গ্রহের সমাবেশ হইতে পৃথিবীর, বিশেষতঃ ভারতের বক্ষে, যে গরল-রশ্মি নিক্ষেপিত হয়, তাহার দ্বারা গোল-যোগ ও কালকূট নামক যোগের উৎপত্তি ঘটে। উক্ত যোগদ্বয়ের ফল সমূহ ১৯৬১ সনে ভারতের বিভিন্ন সংবাদ-

পত্রে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং ১৯৬২ সনে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীপ্রমুখ নেতৃবৃন্দকেও পত্রের দ্বারা জানানো হইয়াছিল।

অষ্টগ্রহ যোগের স্থিতিকাল ২দিন ৬ ঘণ্টা মাত্র। সমবেত গ্রহশক্তির প্রভাব ৫ বর্ষ ৪ মাস ২ দিন ৬ঘণ্টা মতান্তরে ৬ বর্ষ ১০ মাস ২ দিন ৬ঘণ্টা। উক্ত বর্ষকাল পর্য্যন্ত বিশ্বে, বিশেষ করিয়া যে দেশের রাশিতে গ্রহবৃন্দের মিলন হয় সেই দেশ, উক্ত গ্রহশক্তির প্রভাবে চালিত হইয়া থাকে। এ স্থলে মকর রাশিতে গ্রহসংযোগ হেতু ভারতবর্ষেই যোগের কুফলসমূহ ফলবতী হইবে।

উক্ত বর্ষকাল মধ্যে বিভিন্ন রাশিতে গ্রহসংযোগে ফলের কথঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে এবং অংশাদির তারতম্যানুসারে নির্দ্দিষ্ট বর্ষকাল মধ্যে আশু বা বিলম্বে অষ্টগ্রহজনিত কুফল সমূহ নানারূপে প্রকট হয়।

পুরাণ, ইতিহাস এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি হইতে ইহাও দৃষ্ট হয়, যে কোন সময়ে মকর রাশিতে সমগ্র গ্রহশক্তির মিলন ঘটে উক্ত যোগের ১০ মাসকাল মধ্যে বিশেষতঃ কার্ত্তিক মাসে ভারতের "ঐ ঈশাণ কোণে" অকস্মাৎ ঘনাইয়া আসে দুর্য্যোগের ঘন অন্ধকার। ঋষি বাক্যানুসারে গ্রহযুদ্ধ বিচারে বিবেচিত হয় ১৯৬৭ সনের ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত সীমান্ত-বিরোধ পূর্ণ মাত্রায় অব্যাহত থাকিবে এবং পাকিস্তানের সহিত ভারতের ১৯৬৮ সনের মধ্যে আপোষ মীমাংসার সম্ভাবনা কম।

১৯৬৭ সনের ৫ই জুলাই পর্য্যন্ত বিশ্ব-যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিলেও যুদ্ধ হইবে না। ভগবৎকৃপায় উক্ত বর্ষাদি কাল অতিক্রম হইলে ১৯৬৮ সনের প্রথমার্দ্ধে ক্ষণস্থায়ী বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াছে। উল্লিখিত অভিশপ্ত ৬৮ সন বিশ্বের পক্ষে অতীব অশুভ।

তদ্রূপ ভারতের পক্ষে ১৯৬৪ সন ১৯৬২ সন হইতেও অধিকতর অশুভ। ৬২ সনে ভারতবর্ষ 'কালকূট' যোগের তীব্র বিষে জর্জ্জরিত। কালকূট ও গোলযোগ নামক যোগদ্বয়ের শাস্ত্র লিখিত কুফল সমূহ ভারতের বক্ষে ৬৪ এবং ৬৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত পূর্ণমাত্রায় ফলবতী হইবে যথা—প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রপীড়া, অকাল মৃত্যু, পৈশাচিক যুদ্ধ, বিশ্বশান্তিকামী নেতৃবৃন্দের জীবন সংশয়, পশুমনোভাবাপন্ন নরঘাতকরূপী দস্যুদের সাময়িক বলবৃদ্ধি, জনগণের বুদ্ধিভ্রংশ, ধর্ম্মভ্রষ্ট প্রভৃতি বহুবিধ ঘটনা ঘটিবে। শাস্ত্রীয় প্রমাণ আন্দোলন পূর্ব্বক ইহাও অনুমিত হয়, অষ্টগ্রহজনিত গোলযোগে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রের মৃত্যু হয় কিনা বলা অসম্ভব, তবে ইন্দ্রত্ব পদ হইতে মুক্তিলাভ ঘটে। সুতরাং শান্তিকামী অধিনায়কগণের জীবনাবসান বা পদচ্যুতিতে কা চিন্তা? কেনেডি ও জহরলালের মৃত্যুর কারণও অষ্টগ্রহের মিলিত শক্তি। যদি কোন জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে সন্দেহ উপস্থিত হয় যে অষ্টগ্রহ যোগ তো কবে শেষ হইয়াছে, তবে ৬৩ সনে কেনেডি ও ৬৪ সনে জহরলালের মৃত্যুর সহিত ইহার সম্বন্ধ কি? ইহার উত্তরে বলিব—

বীজবিশেষ রোপণমাত্রই কি বৃক্ষবিশেষ রূপধারণ করে? ডিম্ব হইতে পক্ষীর জন্ম ইহা ধ্রুব নিশ্চিত, কিন্তু সময়ের প্রয়োজন। ১৯৬২ সনের অষ্টগ্রহজনিত দুষ্ট ফল সমূহ—১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত বিশ্বের নানা দেশে বিপর্য্যয় ঘটাইবে।

শনি এক রাশিতে ২ বর্ষ ৬ মাস অবস্থান পূর্ব্বক নিজ স্বভাবানুযায়ী ফল দান করিয়া থাকেন। যদি একটি গ্রহের ফল দানের শক্তি ২ বর্ষ ৬ মাস হয়, তাহা হইলে অষ্টগ্রহের মিলন শক্তির যোগজ ফল, ২ দিন ৬ ঘণ্টার মধ্যে সংঘটিত হইয়া কখনও কী যোগজ ফলের সমাপ্তি হইতে পারে? ১৯৬৮ সন পর্য্যন্ত বিশ্বে যাহা যাহা ঘটিবে সমস্তই অষ্টগ্রহের যোগজ ফল।

উক্ত গ্রহযোগ অস্বীকার করিয়া যাঁহারা বিশ্ব-পরিস্থিতি বা রাষ্ট্রফল গণনা করেন অথবা সময়োপযোগী বিশ্ব-পরিস্থিতি অনুমান পূর্ব্বক গ্রহগণের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া রাষ্ট্রফলের নির্দ্দেশ দেন তাঁহাদের বিচারগত ফল, দৈববলে সাময়িক দুই একটি ফলবতী, হইলেও, উহা গজভুক্ত কদ্‌বেলের ন্যায়!

উক্তযোগে (ব্যক্তিগত) শ্রেষ্ঠ রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও জীবন বিষময় হইয়া রাজযোগ সমূহের ফল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

বিষ সংস্পর্শে অমৃতও যেমন জীবননাশের হেতু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্বর্গত প্রধান মন্ত্রীর শূন্য আসন পূর্ণ কালীন, ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের কালকূট বিষে জর্জ্জরিত ৬৪ সনের ভারতবর্ষে পুনরায় কালসর্প যোগজনিত বিষের সংমিশ্রণে ভারতের সৌভাগ্যাকাশ দূষিত হইয়া ৪৪ কোটি ভারত-সন্তানের সংশয়ের কারণ হইতেছে। ১৯৬৫ সনের ১০ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত কালসর্পদ্বয়ের অজস্র দংশন সহ্য করিয়াও যিনি উক্ত আসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হইবেন "তিনি" স্বয়ং নীলকণ্ঠ এবং তাঁহার দ্বারাই সোনার ভারত ক্রমশঃ পুনরায় রামরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। বেদকর্ত্তা শ্রীহরির নিকট অনতিবিলম্বে উক্ত শুভ দিনের কামনা করি।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া ঃ

চতুর্থ টেস্ট ঃ

অস্ট্রেলিয়া ঃ ৬৫৬ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। ববি সিম্পসন ৩১১, বিল লরী ১০৬ এবং ব্রায়ান বুথ ৯৮ রান। প্রাইস ১৮০ রানে ৩, রামসে ৯৯ রানে ২ এবং কার্টরাইট ১১৮ রানে ২ উইকেট) ও ৪ রান (কোন উইকেট না খুইয়ে)।

ইংল্যাণ্ড ঃ ৬১১ রান (ব্যারিংটন ২৫৬, ডেক্সটার ১৭৪, পার্কস ৬০ এবং বয়কট ৫৮ রান। ম্যাকেঞ্জি ১৫৩ রানে ৭ এবং ভিভার্স ১৫৫ রানে ৩ উইকেট)।

ম্যাঞ্চেষ্টারে ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ইংল্যাণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ৪৭তম টেস্ট সিরিজের ৪র্থ টেস্ট খেলা ড্র যায়। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের বিরাট ৬৫৬ রানের (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড) বোঝা মাথায় নিয়ে ইংল্যাণ্ড যে প্রথম ইনিংসের খেলায় ৬১১ রান তুলতে পারবে তা কেউ আশা করেননি। এই খেলা ড্র যাওয়ার ফলে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার হাত থেকে 'এ্যাসেজ' সম্মান পুনরুদ্ধার করার সকল সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যায়। আলোচ্য টেস্টে কয়েকজনের ব্যক্তিগত সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই চতুর্থ টেস্টে উভয় দলের মোট চারজন সেঞ্চুরী করেন : অস্ট্রেলিয়ার ববি সিম্পসন (৩১১ রান) এবং বিল লরী (১০৬ রান); ইংল্যাণ্ডের কেন ব্যারিংটন (২৫৬ রান) এবং টেড্ ডেক্সটার (১৭৪ রান)। অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান বুথ মাত্র দু' রানের জন্যে সেঞ্চুরী রান করার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন। বোলিংয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য—গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জির (অস্ট্রেলিয়া) ১৫৩ রানে ৭টা উইকেট লাভ

অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক ববি সিম্পসনের প্রথম ইনিংসে তিন শত রান (৩১১ রান) আলোচ্য চতুর্থ টেস্ট খেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই ৩১১ রান তুলতে সিম্পসনের ১২ ঘণ্টা ৪৩ মিনিট সময় লেগেছিল। ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় যে-কোন দেশের খেলোয়াড়ের পক্ষে সময়ের দিক থেকে এইটি দীর্ঘতম ইনিংসের রেকর্ড। তাছাড়া যেকোন দেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের পক্ষেও দীর্ঘতম ইনিংসের রেকর্ড হিসাবে গণ্য হয়েছে। আরও উল্লেখযোগ্য, ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে প্রথম শ্রেণীর খেলায় সিম্পসনের এই ৩১১ রান এক ইনিংসের খেলায় ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান হিসাবে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে।

তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া তাদের ৬৫৬ রানের (৮ উইকেটে) মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলার সমাপ্তি ঘোষণা করে। এই দিন ইংল্যাণ্ড দুটো উইকেট খুইয়ে ১৬২ রান করে।

পঞ্চম দিনে খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মাত্র পাঁচ

মিনিট আগে ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস ৬১১ রানের মাথায় শেষ হয়। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে ডেক্সটার এবং ব্যারিংটন দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে ১৪৭ রান যোগ করেন। এই দু'জনই ইংল্যাণ্ডকে 'ফলো-অন' করার অপমান থেকে রক্ষা করেন। কেন ব্যারিংটন তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলায় সর্বোচ্চ ২৫৬ রান করেন।

অষ্ট্রেলিয়া পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনের খেলার বাকি ৫ মিনিটে কোন উইকেট না খুইয়ে ৪ রান করলে খেলাটি অমীমাংসিত থেকে যায়।

পঞ্চম টেষ্ট ঃ

ইংল্যাণ্ড ঃ ১৮২ রান (কেন ব্যারিংটন ৭ রান। নীল হক ৪৭ রানে ৬ এবং ম্যাকেঞ্জি ৮৭ রানে ৩ উইকেট)

ও ৩৮১ রান (৪ উইকেটে। জিওফ বয়কট ১১৩, এফ জে টিটমাস ৫৬, কলিন কাউড্রে নটআউট ৯৩ এবং কেন ব্যারিংটন নটআউট ৫৪ রান। ম্যাকেঞ্জি ১১২ রানে ৩ উইকেট)

অষ্ট্রেলিয়া ঃ ৩৭৯ রান (বিল লরী ৯৪, ব্রায়ান বুথ ৭৪ এবং ভিভার্স ৬৭ রান। ফ্রেডী ট্রুম্যান ৮৭ রানে ৪ এবং কার্টরাইট ১১০ রানে ৩ উইকেট)

ওভাল মাঠে ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার ৪৭তম টেস্ট সিরিজের ৫ম অর্থাৎ শেষ টেস্ট খেলাটিতে জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি—খেলা ড্র যায়। ফলে আলোচ্য ৪৭তম টেস্ট সিরিজে অষ্ট্রেলিয়া ১—০ খেলায় ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে 'এ্যাসেজ' খেতাব লাভ করে। ইংল্যাণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার এই ৪৭তম টেস্ট সিরিজে প্রাকৃতিক দুর্যোগ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। বৃষ্টির জন্যে পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে এই তিনটি খেলা পরিত্যক্ত হয় ট্রেন্ট ব্রীজের প্রথম, লর্ডস মাঠের দ্বিতীয় এবং ওভাল মাঠের পঞ্চম টেস্ট খেলা। জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়েছে কেবল লিডস মাঠের তৃতীয় টেস্টে—অষ্ট্রেলিয়া ৭ উইকেটে ইংল্যাণ্ডকে পরাজিত করে। এবং এই জয়লাভের দৌলতেই অষ্ট্রেলিয়া কাল্পনিক 'এ্যাসেজ' পুরস্কার লাভ করেছে।

আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—ইংল্যাণ্ডের বোলার ফ্রেডী ট্রুম্যান প্রথম ইনিংসের খেলায় অষ্ট্রেলিয়ার নীল হককে বোল্ড আউট ক'রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৩০০ উইকেট পূর্ণ করেন। আলোচ্য পঞ্চম টেস্ট খেলা শেষ হওয়ার পর টেস্ট ক্রিকেট খেলায় তাঁর উইকেট পাওয়ার সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০১টি। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে একমাত্র ফ্রেডী ট্রুম্যান ৩০০ উইকেট পেয়েছেন। দু'শত উইকেট পাওয়ার পরে আছেন এই পাঁচজন: ইংল্যাণ্ডের ব্রায়ান স্ট্যাথাম—২৪৫ উইকেট এবং এ্যালেক বেডসার ২৩৬ উইকেট, অষ্ট্রেলিয়ার রিচি বেনো—২৩৬ উইকেট, রে লিণ্ডওয়াল ২২৮ উইকেট এবং ক্লারি গ্রিমেট ২১৬ উইকেট। আলোচ্য টেস্ট ক্রিকেট খেলায় ইংল্যাণ্ডের কলিন কাউড্রে তাঁর টেস্ট ক্রিকেট খেলোয়াড়-জীবনে ৫০০০ রান পূর্ণ করেন।

ইংল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংসের মাত্র ১৮২ রানের উত্তরে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসের খেলায় ৩৭৯ রান তুলে ১৯৭ রানে অগ্রগামী হয়। খেলার তৃতীয় দিনে অষ্ট্রেলিয়ার ৩৭৯ রানের মাথায় প্রথম ইনিংসের খেলা শেষ হলে ইংল্যাণ্ড দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় দুটো উইকেট খুইয়ে এইদিন ১৩২ রান করে। চতুর্থ দিনে ইংল্যাণ্ড আরও দুটো উইকেট খুইয়ে তৃতীয় দিনের ১৩২ রানের সঙ্গে ২৪৯ রান যোগ করলে তাদের ৩৮১ রান (৪ উইকেটে) দাঁড়ায়। তখন প্রথম ইনিংসের ১৯৭ রানের খাটতি শোধ হয়ে ইংল্যাণ্ড ১৮৪ রানে অগ্রগামী হয়—হাতে জমা ছিল ৬টা উইকেট। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ওপনিং ব্যাটসম্যান জিওফ বয়কট সেঞ্চুরী (১১৩ রান) করেন—টেষ্টে তাঁর প্রথম সেঞ্চুরী। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বয়কট এবং টিটমাস দলের ৮০ রান যোগ করেন এবং পঞ্চম উইকেটের জুটিতে কাউড্রে (৯৩ রান) এবং ব্যারিংটন (৫৪ রান) ১২৬ রান যোগ ক'রে অপরাজিত ছিলেন।

বৃষ্টির জন্যে পঞ্চম অর্থাৎ শেষ দিনে খেলা আরম্ভ করা কোনক্রমেই সম্ভব হয়নি। ফলে খেলাটি পরিত্যক্ত হয় এবং খেলাটি অমীমাংসিত থাকে।

বর্তমানে ইংল্যাণ্ড বনাম অষ্ট্রেলিয়ার টেষ্ট সিরিজ এবং টেষ্ট খেলার ফলাফল এই রকম দাঁড়িয়েছে : টেষ্ট সিরিজ ৪৭—অষ্ট্রেলিয়ার জয় ২২, ইংল্যাণ্ডের জয় ২১ এবং ড্র ৪

টেষ্ট খেলা ১৯৩—অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৭৮, ইংল্যাণ্ডের জয় ৬৪ এবং ড্র ৫১।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ ঃ

১৯৬৪ সালের ক্যালকাটা ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতার প্রথম বিভাগে মোহনবাগান ক্লাব অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়ে উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৬২-৬৪) এবং মোট ১২ বার লীগ বিজয়ের গৌরব লাভ করেছে। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান একবার উপর্যুপরি তিন বছর (১৯৫৪-৫৬) লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৪৬ সালে লীগ চ্যাম্পিয়ান ইষ্টবেঙ্গল দলের থেকে এক পয়েণ্ট কম পেয়ে মোহনবাগান অপরাজিত অবস্থায় রানার্স-আপ হয়েছিল। প্রথম বিভাগের লীগ খেলার ইতিহাসে অপরাজিত অবস্থায় রানার্স আপ হওয়ার নজির একমাত্র মোহনবাগান দলেরই। মোহনবাগানকে নিয়ে এ পর্য্যন্ত ১০টি দল প্রথম বিভাগের লীগ প্রতিযোগিতায় অপরাজিত অবস্থায় চ্যাম্পিয়ান হয়েছে—৬টি সামরিক দল এবং ৪টি বে-সামরিক দল। এদের মধ্যে লীগের সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছে মাত্র এই তিনটি ক্লাব—১৯০১ সালে রয়েল আইরিস রাইফেলস, ১৯০৮ সালে [illegible] গর্ডনস এল আই এবং ১৯১২ সালে ব্ল্যাকওয়াচ। মাত্র এই দুটি দল দু'বার ক'রে অপরাজিত অবস্থায় লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে: ১৯০০ ও ১৯০১ সালে রয়েল আইরিস রাইফেলস এবং ১৯১৬ ও ১৯২২ সালে ক্যালকাটা এফ সি। ১৯০১ সালে রয়েল আইরিশ রাইফেলস দল কোন গোল না খেয়ে এবং সমস্ত খেলায় জয়ী হয়ে লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল—এ রেকর্ড অন্য কোন দল এ পর্য্যন্ত করতে পারেনি।

১৯৬৪ সালের প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান ক্লাব।

প্রথম বিভাগের ফুটবল লীগ প্রতিযোগিতায় সর্ব্বাধিক বার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার রেকর্ড মোহনবাগানের—মোট ১২ বার। তিন বা তার বেশীবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে এই ৬টি ক্লাব—মোহনবাগান ১২ বার (রেকর্ড), মহমেডান স্পোর্টিং ৯ বার, ক্যালকাটা এফ সি ৮ বার, ইষ্টবেঙ্গল ৭ বার, ডালহৌসি ৪ বার এবং ডারহাম্‌স এল আই ৩ বার।

কণশিখা : অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে যাঁরা বাণীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কীর্ত্তিলাভ করেছেন, কবি অপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য তাঁদের অন্যতম। তিনি যে শুধু কবি ছিলেন তাই নয়—শিশু-সাহিত্যে, জ্যোতিষশাস্ত্রে, তন্ত্রবিদ্যায়ও তাঁর অসাধারণ অধিকার ছিল। এর ওপর উপন্যাস রচনাতেও তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং কবিতা রচনার সঙ্গে অল্প কয়েক বৎসরে তিনি পাঁচখানি উপন্যাসও রচনা করে গেছেন। জীবিত থাকতে পারলে হয়ত আরও উপন্যাস রচনা করে বঙ্গসাহিত্যের ভাণ্ডারকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁর জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়ায় সে আশা আর ফলবতী হতে পারল না।

এই "কণশিখা" উপন্যাসটি অপূর্ব্ববাবুর শেষ রচনা। এই উপন্যাসে আধুনিক ভারতের সরকারী অফিসে যে সব অনাচার, অবিচারের রাজত্ব চলছে তারই এক নিখুঁত চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন পাঠকের সম্মুখে। আর সৌমিত্র, অজয়ার পরকীয়া প্রীতি, বাসবীর ভালোবাসা, অরুন্ধতীর মত পরিপূর্ণ নারীত্বের ছবি নিয়ে যে কাহিনীর মায়াজাল রচনা করেছেন সুনিপুণ কৌশলে তাও এই উপন্যাসটিকে জনপ্রিয় করে তুলবে বলেই আশা হয়।

[প্রকাশক—বিমলারঞ্জন প্রকাশন, ৮.১ বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ২·৫০ পয়সা]

—শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা : সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে বিজ্ঞানতত্ত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় যে গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে, হাওড়া-উন্নয়ন সংস্থার মুখ্যবাস্তুকার শ্রীযুক্ত সুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'প্রয়োগ বিজ্ঞান কথা' তাহার প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থে নাগরিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া সমূহ নগর স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় তাহাদের একটি সুখপাঠ্য সহজবোধ্য বর্ণনা বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে সমস্ত পরিভাষিক শব্দের বাংলা রূপ উদ্ভাবন করিয়াছেন সেগুলি সুষ্ঠু প্রয়োগের নিদর্শন রূপে অভিনন্দিত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে বৈদেশিক ভাব বা অনুবাদ আড়ষ্টতার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। এই নবনির্মিত শব্দাবলী ভাবের স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রবাহ ও বিষয়ের সহজবোধ্যতার পথে কোন বাধা সৃষ্টি করে না। গ্রন্থকার শুধু ইট-কাঠ-লৌহ-পাইপ প্রভৃতি জড় উপকরণের বিন্যাস কৌশলেই পারদর্শী নহেন, তাঁহার শব্দ প্রয়োগ নৈপুণ্যের মধ্যেও তাঁহার বাস্তু-নির্মিতি বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় মিলে। তাঁহার ছোট সুলিখিত বইখানি আমাদের মনে এই আশাই জাগায় যে আমরা হয়ত মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থরচনার দুরূহতাকে বেশী বড় করিয়া দেখিতেছি। তাঁহার এই সার্থক পথিকৃৎ রচনার জন্যে তাঁহাকে অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানাই।

[প্রকাশক—বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন। ২০৩।২বি বিধান সরণী কলিকাতা—৬ মূল্য—৮·০০ টাকা]

—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বিউটি স্পট :—জগন্নাথ সরকার

বিউটি স্পট, লেখক ও নায়িকা, সার্বজনীন নব দুর্গোৎসব নাম করণ, অথ শাড়ীঘটিত, প্রপোজাল, বৈষ্ণব কবি ত্রিলোচন দাস, সাইকো-এনালিসিস, আশীর্বাদ প্রার্থনীয় নিজের ঢাক, (নয়া টেকনিক) বিরহ মিলন কথা, দেবী মাহাত্ম্য, রবীন্দ্র জয়ন্তী, সাহিত্য সম্রাট্, এই কয়টি রম্য রচনা ও ছোট গল্পের মধ্যে যেন হাস্যরসের বান ডেকেছে। রসরচনায় লেখকের সামর্থ্য প্রত্যেকটি গল্পে ফুটে উঠেছে। রসিকসমাজে এ গ্রন্থের সমাদর হবে নিঃসন্দেহ।

[প্রকাশক—বেঙ্গল বুক ব্যাংক, ৫৫, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র]

—স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩/১/১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ২৭[illegible] তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

আশ্বিন-১৩৭১

প্রথম খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | চতুর্থ সংখ্যা

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

ভূয়শ্চ শতবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যামনম্ভসি।
মুনিভিঃসংস্তুতা ভূমৌ সম্ভবিষ্যামযোনিজা।
ততঃ শতেন নেত্রাণাং নিরীক্ষিষ্যামি যন্মুনীম্।
কীর্তয়িষ্যন্তি মনুজাঃ শতাক্ষীমিতিমাং ততঃ॥
ততোঽহমখিলং লোকং আত্মদেহসমুদ্ভবৈঃ
ভরিষ্যামি পুরাং শাকৈরাবৃষ্টৈপ্রাণধারকৈঃ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভুবি॥
তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরং।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী, দেব্যাঃ স্তুতি—৪৬-৫০

ঋগ্বেদে দেবী উমা

শ্রীঅমিয়কুমার চক্রবর্ত্তী এম-এ

ভারতীয় শক্তি সাধনার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণাকারী অধিকাংশ পণ্ডিতেরই ধারণা যে ভব-পত্নীর উমা নামের উল্লেখ সামবেদীয় তলবকার বা কেনোপনিষদ্ ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যায়না। তাই সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ সম্পর্কিত কোন গবেষণামূলক পুস্তক বা প্রবন্ধে উমা নামটির প্রয়োগ চোখে পড়েনা; কারণ পণ্ডিতগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে দেবী ভবানীর এই নামটি খুব প্রাচীন নয় এবং পরবর্ত্তী কোন যুগেই সম্ভবতঃ ইহা বৈদিক সাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকিবে। কোন কোন পুরাণ ও পুরাণোত্তর গ্রন্থে উমা শব্দটি নানা অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। শব্দটির অর্থ-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে নামটি সম্ভবতঃ আদবেই একটি বৈদিক বা সংস্কৃত শব্দ নয়, অন্য কোন ভাষা হইতে সংগৃহীত হইয়া, পরবর্ত্তীকালে বৈদিক ও সংস্কৃতসাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছিল। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত "ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য" নামক গ্রন্থে এই শেষোক্ত মতবাদটি ব্যক্ত হইয়াছে দেখা যায়। প্রখ্যাত গবেষক হিসাবে সুপরিচিত কতিপয় বৈদেশিক ও ভারতীয় পণ্ডিতের মতে উমা শব্দটি সম্ভবতঃ বেবিলোনীয় "উম্মু বা উম্ম" অথবা দ্রাবিড়ী "উম্ম" শব্দ হইতে গৃহীত হইয়া উপনিষদ্ ও আরণ্যকে স্থানলাভ করিয়াছিল। এই সকল অনুমান বা ইঙ্গিত সংশ্লিষ্ট গবেষকগণের সূক্ষ্মবুদ্ধির পরিচায়ক হইলেও, মূলতঃ ভুল; কারণ একটু পরেই আমরা দেখিতে পাইব যে, শব্দটি কেবল সংস্কৃতই নয়, পুরাপুরি ঋগ্বেদীয় এবং ঋগ্বেদে শব্দটি দৈবাৎ ব্যবহৃত হয় নাই, বহুরূপে এবং বহুক্ষেত্রে ইহার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বেবিলোনীয় বা দ্রাবিড়ী উম্মু বা উম্ম শব্দের অর্থ মাতা। আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে,বৈদিক সাহিত্যে ত' নয়ই—এমন কি, পুরাণাদিতেও কুত্রাপি উমা শব্দটি মাতা অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। সুতরাং যেদিক দিয়াই বিচার করা হউক না, কেন এই প্রচলিত ধারণা বা সিদ্ধান্তসমূহ ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন সন্দেহ নাই। ইহাতে অনুমান হয় যে, এক্ষেত্রে আদি গবেষকগণের কাহার দৃষ্টিতে মূল ঋগ্বেদে উমা শব্দটির অবস্থিতি, যে কোন কারণেই হউক ধরা পড়ে নাই, এবং তাঁহারা কেনোপনিসদ্ বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ধৃত শব্দটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া, অথবা প্রচলিত ২১ খানি বৈদিক পদ-কোষের উপর অতি-নির্ভরশীল হইয়া, এ সম্পর্কে স্ব-স্ব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী গবেষকগণের মধ্যেও কেহই হয়ত স্বাধীনভাবে বিষয়টির বিচার করেন নাই এবং তাঁহারা মোটামুটিভাবে পূর্ব্ব-সূরিগণকেই অনুসরণ করিয়াছেন মাত্র; কারণ তাঁহাদের কাঁহারও গ্রন্থে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মতের পুনরাবৃত্তি ছাড়া, নূতন কোন অভিমত বা সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

বৈদিক সাহিত্যে উমা শব্দের প্রয়োগ

আমাদের মন্তব্য একটু রূঢ় শুনাইলেও যে একেবারে অমূলক নয়, তাহার একটা উদাহরণ দিতেছি। কেনোপনিষদের ৩।১২ অধ্যায়ে উমা শব্দের অবস্থিতি সম্পর্কে কোন গোলযোগ দেখা যায়না। কিন্তু তৈত্তিরীয় আরণ্যকে ধৃত উমা শব্দটি সম্পর্কে একটু বক্তব্য আছে। আরণ্যকের (১০ম প্রপাঠক) যে অংশে এই শব্দটি ধৃত আছে বলিয়া কথিত হয়, তাহার প্রকৃত নাম নারায়ণীয়া বা যাজ্ঞিকী উপনিষদ। সে যাহা হউক, এই উপনিষদে ধৃত যে মন্ত্রটিতে দুর্গা বা দুর্গা নামের সমার্থক হিসাবে উমা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তাহা বাস্তবিক পক্ষে উপনিষদমন্ত্র নয়, ঋগ্বেদের মন্ত্র (১।৯৭।৪০), উপনিষদে, উপনিষদ-মন্ত্র বা বাক্যের সমর্থনে, অথবা উপনিষদ্-মন্ত্রের সঙ্গে একত্রে পঠিত হইবার উদ্দেশ্যে, উদ্ধৃত হইয়াছে মাত্র। সুতরাং তৈত্তিরীয় আরণ্যকসম্পর্কিত অভিমতটি ভুল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভাষ্যকার আচার্য্য সায়ন এজাতীয় প্রতিটি মন্ত্রের প্রথমে, ইহারা যে ঋক্ মন্ত্র, তাহার উল্লেখ করিলেও, গবেষকগণের কাঁহারও দৃষ্টিতে এই তথ্যটি এযাবৎ ধরা পড়ে নাই! সুতরাং এই একটি মাত্র উদাহরণেই প্রমাণিত

হয় যে, উমা শব্দটি মূলতঃ ঋগ্বেদীয়, আরণ্যকীয় বা উপনিষদীয় নয়।

এবার আমরা ঋগ্বেদের নানা স্থান হইতে "উমা" শব্দটির নানা-রূপে প্রয়োগের উদাহরণসমূহ দেখাইব। আমরা দেখিব যে, প্রায় সবকয়টি ক্ষেত্রেই দীর্ঘ-উকারান্ত উমা শব্দটির পুংলিঙ্গে এবং বহুবচনে ব্যবহার হইয়াছে :—

উমা :—

ঋগ্বেদ :—৩।৬।৮ উমা বা যে সুহবাসো যজত্রা আযেমিরে ইত্যাদি॥

৪।১৯।১ এবা ত্বামিন্দ্র বজ্রিন্নত্র বিশ্বে দেবাসঃ সুহবাস উমাঃ।

৫।৫২।১২ তে মে কে চিন্ন তায়ব উমা আসন্দৃশি ত্বিষে॥

৭।৩৯।৪ তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস উমাঃ সধস্থং বিশ্বে অভিসন্তি দেবাঃ।

১০।৬।৭ তং তে দেবাসো অনু কেতমায়ন্নধাবর্ধন্ত প্রথমাস উমাঃ॥

১০।৩১।৩ অধায়ি ধীতিরস সৃগমংশাস্তীর্থে ন দস্মমুপ যন্ত্যূমাঃ।

১০।৭৭।৮ তে হি যজ্ঞেষু যজ্ঞিয়াস উমা আদিত্যেন নাম্না শংভবিষ্ঠাঃ।

১০।১২০।১ সত্যো জজ্ঞানো নি রিণাতি শত্রূনন্থ যং বিশ্বে মদন্ত্যূমাঃ॥

১০।১২০।৩ ত্বে ক্রতুমপি বৃঞ্জন্তি বিশ্বে দ্বির্যদেতে ত্রির্ভবন্ত্যূমাঃ।

উমাসঃ :—১।১৬৬।৩ যস্মা উমাসো অমৃতা অরাসত রায়স্পোষং···

উমেভিঃ :—৫।৫১।১ অগ্নে সুতস্য পীতয়ে বিশ্বৈরূমেভিঃ আগহি।

উমেভ্যঃ :—১০।৩২।৫ জরা বা যেষমৃতেষু দাবনে পরি উমেভ্যঃ সিঞ্চতা মধু॥

উমৈঃ :—১।১৬৯।৭ যে মর্ত্যং পৃতনায়ন্ত মূমৈ ঋণাবানং ন পতয়ন্ত সর্গৈঃ॥

ওমাসঃ :—১।৩।৭ ওমাসশ্চর্ষণীধৃতো বিশ্বে দেবাস আগভ।

উমা :—৯।৯৭।৪০ বৃষা পবিত্রে অধি সানো অব্যে বৃহৎসোমো বাবৃধে স্বুবান ইন্দুঃ॥

তৈত্তিরীয় সংহিতা :—উমাঃ

৪।৪।৪।৭ পাঙ্ক্তজনেনপোধ্যায়েশাবা অযাবা এবা উমাঃ সব্দঃ সগরঃ সুমেকঃ।

উমাশব্দের বৈদিক অর্থ

উল্লিখিত উদাহরণ সমূহ হইতে দেখা যাইবে যে, একটিমাত্র ক্ষেত্র ব্যতীত, অন্য সব ক্ষেত্রেই দীর্ঘ-উকারান্ত "উম" শব্দটি নানা-বিভক্তিতে এবং নানা-রূপে পুংলিঙ্গ ও বহুবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে। আচার্য্য যাস্কের (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) নিরুক্ত গ্রন্থে (৬.৯ ও ১২।৪০) ঋগ্বেদের ১'৩।৭ম মন্ত্রে ব্যবহৃত "ওমাসঃ" শব্দটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, "অবিতারঃ" বা রক্ষকবৃন্দ ঋগ্বেদের অন্যতম ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী এই মন্ত্রটির ব্যাখ্যাকালে "ওমাসঃ" শব্দের যাস্ককৃত ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী বেদভাষ্যকার বেঙ্কটমাধব ও সায়ন প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত ও বহুবচনান্ত উমাঃ এবং উমাসঃ শব্দদ্বয়ের "অবিতারঃ" বা রক্ষকগণ, এরূপ অর্থই সাব্যস্ত করিয়াছেন। এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, ঋগ্বেদের ১।৩।৭ মন্ত্রটি শুক্লযজুর্বেদ (৭।৩৩ এবং ৩৩·৪৭) এবং শতপথব্রাহ্মণেও (৪।৩.১।২৭) ধৃত আছে। ভাষ্যকার উবট এবং মহীধর উভয়েই "ওমাসঃ" শব্দে রক্ষকগণ, এই অর্থই ধরিয়া লইয়াছেন। সুতরাং প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত ও বহুবচনান্ত ওমাসঃ, উমাঃ ও উমাসঃ, এই তিনটি শব্দেরই অর্থ হয় রক্ষকাঃ বা রক্ষকবৃন্দ, এবং ঠিক একই অর্থে তৃতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত উমৈঃ উমেভিঃ এবং উমেভ্যঃ, এই শব্দত্রয়ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, দীর্ঘ-উকারান্ত "উম" শব্দটি যে বিভক্তিতে এবং যে ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হইয়া থাকুক না কেন। তাহা কতিপয় দেবতাই হউন, আর বহু দেবতাই হউন, অথবা বিশ্বদেবগণ বা পিতৃদেবতা-গণই হউন,—সর্ব্বত্রই ইহার একটিমাত্র অর্থ দেখা যাইবে, দ্বিতীয় কোন অর্থ নয়। সুতরাং প্রথমা-বিভক্তি-যুক্ত ও একবচনান্ত পুংলিঙ্গ "উম" শব্দের অর্থ দাঁড়ায় রক্ষক, আর একবচনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ "উমা" শব্দের অর্থ হয় রক্ষিকা বা রক্ষিণী।

বৈদিক পদের রূপ ও বানান বৈচিত্র্য

বহুবচনান্ত উমাঃ ও উমাসঃ রূপ দুইটির ন্যায় বেদে একই পদের দুইপ্রকার রূপ প্রায়শঃ দেখা যায় :—যেমন, হস্তাঃ ও হস্তাসঃ, দেবাঃ ও দেবাসঃ, বজ্রাঃ ও বজ্রাসঃ, রুদ্রাঃ ও রুদ্রাসঃ ইত্যাদি। তেমনই বানানের ক্ষেত্রেও হ্রস্ব ও দীর্ঘস্বরের প্রয়োগে কোন বাঁধাধরা নিয়ম অনুসরণ করা হয় নাই, যেমন :—উর্ব ও উর্ব, উষা ও উষা, উরু ও উরু, রাত্রি ও রাত্রী, পথিভিঃ ও পথিভীঃ ইত্যাদি। এই বৈদিক নজীর অনুযায়ী স্ত্রীলিঙ্গাত্মক উমা ও উমা শব্দদ্বয় এক এবং একার্থবোধক, এই সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয়। সুতরাং হ্রস্বউকারান্তই হউক, আর দীর্ঘ উকারান্তই হউক, উমা শব্দের (স্ত্রীলিঙ্গের) একবচনে প্রথমা বিভক্তিতে বৈদিক অর্থ হইবে রক্ষিকা বা রক্ষিণী। শব্দটি দ্রাবিড়ী কিংবা বেবিলোনীয় হইলে ইহার একটি মাত্র অর্থই হইত "মাতা", রক্ষিকা বা রক্ষিণী নয়; এবং ইহা কদাপি পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইত না, সর্ব্বত্রই একমাত্র স্ত্রীলিঙ্গেই ব্যবহৃত হইত। পক্ষান্তরে আমরা দেখিয়াছি যে, একটিমাত্র ক্ষেত্র ব্যতীত সর্ব্বত্রই শব্দটি ঋক্ ও যজুঃ, এই দুই বেদে পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং সেই একটিমাত্র ক্ষেত্রেও শব্দটির অর্থ মাতা নয়। মুসলমান রাজত্বের সময় যেমন বহু বহু আরবী ও ফারসী শব্দ ভারতীয় ভাষাসমূহে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তেমনই ইংরেজ আমলেও বহু-বহু ইংরেজী ও ইউরোপীয় শব্দ ভারতীয় ভাষায় স্থান পাইয়াছে। এই সকল বহিরাগত শব্দের কোন কোনটির ক্ষেত্রে অর্থ-বিষয়ে কিছুটা হের-ফের ঘটিলেও, কোথাও লিঙ্গান্তর ঘটিয়াছে বলিয়া জানা যায় না,. সম্ভবতঃ ভাষাতত্ত্ববিদ্গণও ইহার কোন নজীর দেখাইতে সক্ষম হইবেন না। আমীর, সুলতান, নবাব, বাদশাহ প্রভৃতি শব্দ যেমন ভারতীয় ভাষায় "বেগমে" রূপান্তরিত হয় নাই, তেমনই বাঁদী, আম্মা প্রভৃতি স্ত্রীলিঙ্গ বাচকপদও 'গোলাম', আব্বা ইত্যাদিতে পরিণত হয় নাই। ইংরেজী বা অপর ইউরোপীয় ভাষা হইতে গৃহীত শব্দাবলীও পুরুষের ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকে, এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে পুরুষে রূপান্তরিত হয় নাই। ভাষাতত্ত্বের এই নজীরে, এবং ঋগ্বেদে ও যজুর্ব্বেদে "উম" শব্দটির লিঙ্গ, বানান ও রূপ-বৈচিত্র্যের নজীরে এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, এ ব্যাপারে ধারকর্জ্জের কোন প্রশ্ন উঠিলে, সম্ভবতঃ তাহা অপর পক্ষ হইতেই ঘটিয়া থাকিবে। ভারত এ ব্যাপারে উত্তমর্ণ বা ঋণদাতা, অধমর্ণ বা ঋণগ্রহীতা নয়। মাতা বুঝাইতে ঋগাদি বেদে 'মাতা', জনিতা, জনয়িত্রী ইত্যাদি পদই বহুলভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীলিঙ্গবাচক উমা শব্দটি বহিরাগত, এই মতবাদ ভ্রান্ত ও গ্রহণের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

উমা-শব্দের নানা অর্থ ও তাহাদের উৎপত্তিস্থল

বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে উমা পদটি নানা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অর্থ অন্ততঃ পক্ষে বিগত ৩০০০ বৎসর ধরিয়া ভারতে প্রচলিত আছে বলিয়া অনুমান করা যায়। উমা নামটি দেবী ভবানীর বহুবিধ নামের অন্যতম মাত্র। আদিতে হয়ত যাহা একটি ডাক-নাম বা উপাধি মাত্র ছিল, পরবর্ত্তী যুগসমূহে তাহাই ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্য ও পণ্ডিতের হাতে ভিন্ন ভিন্ন অর্থপরিগ্রহ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। নিম্নে আমরা এজাতীয় কয়েকটি প্রয়োগের উদাহরণ দিলাম :—

(ক) উমা পদের বৈদিক অর্থ রক্ষিকা বা রক্ষিণী। ঋগ্বেদীয় ৯।৯৭।৪০তম মন্ত্রের ব্যাখ্যায় (তৈত্তিরীয় আরণ্যক বা যাজ্ঞিকী উপনিষদের ব্যাখ্যাকালে) আচার্য্য সায়ন উমা অর্থে হিমবদ্দুহিতা দেবী পার্ব্বতীকে বুঝাইয়াছেন। এখানে উমা একটি বিশেষ্যপদ বা নামমাত্র এরূপ মনে করা যায়। উমা শব্দে এখানে নাম না ধরিয়া যদি রক্ষিকা বা রক্ষিণী ধরা হয়, তাহা হইলেও বেদ-মন্ত্রটির সামগ্রিক অর্থ বিষয়ে বিশেষ কোন তারতম্য হইবে না। যাজ্ঞিকী উপনিষদে উমা পদটি দেবী দুর্গা বা দুর্গিরই নামান্তর হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

(খ) কেনোপনিষদে দেবী উমা হৈমবতী যক্ষ-রূপী ব্রহ্মের স্থলবর্ত্তিনী, এবং সেই হিসাবে তিনি ব্রহ্মশক্তি বা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী,—আচার্য্য শঙ্কর তদীয় ভাষ্যে এরূপ আভাসই দিয়াছেন। আচার্য্য অবশ্য একথাও বলিয়াছেন যে দেবী হৈমবতী সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের (শিবের) নিত্যসঙ্গিনী। এখানে উমা পদটিকে দেবী হৈমবতী তথা দেবী দুর্গা বা পার্ব্বতীর একটি নাম বলিয়া ধরিয়া লইলেও উপনিষদমন্ত্রের অর্থের কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না।

(গ) কোন কোন পুরাণ অনুযায়ী "উমা", দেবী

পার্ব্বতীর পিতামাতার দেওয়া অপর একটি নাম মাত্র। দেবী উমা দেবাদিদেব শঙ্করের দ্বিতীয়া পত্নী। প্রথমা পত্নী দেবী সতী দক্ষ-দুহিতা ছিলেন; দ্বিতীয়া পত্নী দেবী উমা-পার্ব্বতীর সঙ্গে তৎকালীন প্রজাপতি দক্ষের বা তদ্‌বংশের কাহারও কোন সম্পর্ক ছিলনা। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রবন্ধের শেষদিকে সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

(ঘ) কোন কোন পুরাণে আবার উমা পদটি দেবী পার্ব্বতীর একটি উপাধি হিসাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে উমা অর্থে, যাঁহাকে কোন বিষয়ে নিষেধ করা হইয়াছে, এমন কোনও মহিলাকে বুঝাইতেছে:—যথা

নিষেধয়ন্তী চোমেতি মাতৃস্নেহেন দুঃখিতা ॥৮৫
সা তথোক্তা তয়া মাত্রা দেবী দুশ্চরচারিণী।
তেনৈব নাম্না লোকেষু বিখ্যাতা সুরপূজিতা ॥৮৬

ব্রহ্মপুরাণ, ৩৪শ অধ্যায়।

অর্থাৎ মাতা মেনা বা মেনকা কন্যার কঠোর তপস্যার ক্লেশ দর্শনে দুঃখিত হইয়া, স্নেহভরে তাঁহাকে "উ-মা" বলিয়া এরূপ কঠোর তপস্যা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। (মাতার নিষেধ সত্ত্বেও তিনি স্বকীয় সঙ্কল্প হইতে বিরত হন নাই)। এই নিষেধের জন্যই উত্তরকালে তিনি উমা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

পুনশ্চ:—

উ মেতি চপলে পুত্রি ন ক্ষমং তাবকং বপুঃ।
সোঢ়ুং ক্লেশস্বরূপস্য তপসঃ সৌম্যদর্শনে ॥২৯৪
…　　…　　…
উ মেতি চপলে পুত্রি ত্বয়োক্তা তনয়া ততঃ ॥২৯৮
উমেতি নাম তেনাস্যা ভুবনেষু ভবিষ্যতি।২৯৯

মৎস্য পুরাণ, ১৫৪ অধ্যায়।

এখানে পিতা শৈলরাজ তদীয় দুহিতাকে বলিতেছেন, "উ, মা", অর্থাৎ তুমি এরূপ উদ্যম করিও না; তোমার এই কোমল শরীর তপস্যার উপযুক্ত নয়, তপস্যা ক্লেশস্বরূপ; সুতরাং সে ক্লেশ তোমার সহ্য হইবে না।……কিয়ৎক্ষণ পরে দৈববাণী হইল যে, "উ, মা" এই বলিয়া তপস্যা বিষয়ে নিষেধ করার জন্য অতঃপর এই কন্যা বিশ্বে উমা নামে কীর্ত্তিতা হইবেন।

মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভব কাব্যে উমা শব্দের এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন, দেখা যায়:—

তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না
বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা
পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥

—২৬শ শ্লোক, ১ম সর্গ।

বন্ধুজন, বন্ধুপ্রিয়া সেই পার্ব্বতীকে 'পার্ব্বতী' এই পৈত্রিক নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাহার পর, "উ-মা" এই বলিয়া মাতা মেনকা তপস্যা করিতে নিষেধ করেন বলিয়া, সেই সুমুখী উমা আখ্যা লাভ করেন।

(ঙ) উমা = উ + মা: উ অর্থে শিব বা মহেশ্বর, আর মা অর্থে শ্রী বা লক্ষ্মী = শিবলক্ষ্মী = শিবপত্নী।

এতদ্ব্যতীত পরবর্ত্তী যুগসমূহে এই উমা নামের আরও ২।১টি ব্যাখ্যা হয়ত প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু এগুলি তেমন সুপ্রচলিত নয় বলিয়া আর এখানে উল্লিখিত হইল না।

ক হইতে ঘ পর্য্যন্ত যে ব্যাখ্যাসমূহ এখানে দেখান হইল, এই সবকয়টি অর্থেই সংস্কৃত সাহিত্যে উমা নামের ভূরিভূরি প্রয়োগ দেখা যায়। ক ও খ সম্পর্কে আর বিশদ-ভাবে বলিবার বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। গ সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, কারণ এখানে উমা দেবী পার্ব্বতীর অপর একটি নাম মাত্র। কিন্তু ঘ ও ঙ সম্পর্কে বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। ক ও খ-এর মত ইহাদেরও কোন বৈদিক নজীর আছে কিনা, তাহার অনুসন্ধান করা যাইতে পারে; কারণ ইহা একান্ত সম্ভবপর যে, প্রাচীন আচার্য্য ও পুরাণপ্রবক্তাগণের মধ্যে এই দুইটি অর্থেও উমা নামের প্রয়োগ প্রচলিত ছিল।

আচার্য্য যাস্কের নিরুক্ত গ্রন্থ অনুসারে বৈদিক (সংহিতা গ্রন্থে প্রযুক্ত) "উ" নিপাতটি কোন কোন ক্ষেত্রে "এব" অথবা নিশ্চিত অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে (অথাপ্যুকার এতস্মিন্নেবার্থে উত্তরেণ। ১।৫)। আর "মা" নিপাতটি নিষেধ বা প্রতিষেধ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে (যেমন, মেতি প্রতিষেধে ১।৫)। উভয়ক্ষেত্রেই আচার্য্য ঋগ্বেদ হইতে উদাহরণ তুলিয়া নিপাত দুইটির উল্লিখিত অর্থে প্রয়োগ দেখাইয়া দিয়াছেন, যেমন:—নিরুক্ত ৩।২, ৩।১০, ৩।১২, ৩।২০ প্রভৃতি, এবং ৩.২, ৩।৫, ৫।৮, ৬।২৪ প্রভৃতি অধ্যায়। সুতরাং উ + মা = উমা অর্থে নিশ্চিত নিষেধ বা কোন

ব্যাপারে বিশেষভাবে নিষেধ বুঝাইবে। এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এই "উমা" শব্দটি প্রযুক্ত হইলে বুঝিতে হইবে যে তাহাকে কোন কিছু সম্পর্কে বিশেষভাবে নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং ঘ-এ উল্লিখিত উমা নামের ব্যাখ্যার বৈদিক নজীর আছে বুঝিতে হইবে। আদি কবি বাল্মীকি-রচিত রামায়ণের আদিকাণ্ডের দ্বিতীয় সর্গে (১৭শ শ্লোক) এই নিষেধার্থেই "মা" নিপাতের প্রয়োগ আছে দেখা যায় :—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

কুমারসম্ভব কাব্যের কোন কোন টীকাকার অবশ্য উমা শব্দের "উ" অর্থে ওহে (সম্বোধনে) এরূপ অর্থও করিয়াছেন, দেখা যায়। কিন্তু এরূপ অর্থ বৈদিক অর্থের বিরোধী, সন্দেহ নাই।

শ্রী বা লক্ষ্মী অর্থে "মা" পদের (নিপাত নয়) ব্যবহার ঋগ্বেদীয় শ্রীসূক্তে দেখা যায়। শ্রীসূক্তটি ঋগ্বেদের একটি খিল সূক্ত, এবং ইহা পঞ্চম মণ্ডলের সর্বশেষ সূক্তের (৮৭ সূক্ত) পর পঠিতব্য। সূক্তের ৩য় মন্ত্রের শেষাংশে আছে, "শ্রীর্মা দেবী জুষতাম্"। এখানে শ্রী ও মা একার্থ বোধক। তৈত্তিরীয় সংহিতা বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে মাধব পদটি দেখা যায় :—মাধব পাত্বস্মান্ দিবো বরুণঃ পৃথিব্যা অন্ত্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী ইত্যাদি ৪।৪।৪।১২। মাধব অর্থে মা+ধব বা লক্ষ্মী+পতি বা লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে বুঝায়। আর বেদের আদ্যক্ষর বা প্রণবমন্ত্র ওঁ—এ, অ+উ+ম, এই তিনটি অক্ষর আছে। ভাষ্যকারগণের মতে এই তিনটি অক্ষরে যথাক্রমে বিষ্ণু, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা, এই প্রধান ত্রিমূর্ত্তিকে বুঝায়। ঋগ্বেদের ৪।৫৮।৩ মন্ত্রের এরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। এখানে উ অক্ষরে মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে বলিয়া, উ+মা=উমা অর্থে মহেশ্বরপত্নী দেবী উমা-পার্ব্বতীকেই বুঝাইতেছে। সুতরাং এক্ষেত্রেও উমা শব্দের অর্থের বৈদিকনজীর আছে বলিয়া ধরা যায়। পরবর্ত্তীকালে রচিত মেদিনী ত্রিকাণ্ডশেষ, একাক্ষরকোষ প্রভৃতি কোষগ্রন্থে এ জাতীয় ব্যাখ্যা দেখা যায়। সাহিত্যে এ শ্রেণীর প্রয়োগ পূর্ব্ব হইতে চলিত থাকিলে তবেই তাহা কোষগ্রন্থে স্থান লাভ করে, নতুবা নয়। ঋগ্বেদের সেই প্রসিদ্ধ মন্ত্রটি হইল :—

চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত
হস্তাসোঅস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহো দেবো মর্ত্যাং
আ বিবেশ॥ ৪।৫৮।৩

উপরে উমা শব্দের যে ৫টি প্রচলিত অর্থের উদাহরণ দেখান হইল, তাহাতে এই বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, কোন ক্ষেত্রেই উমা শব্দে "মাতা"-কে বুঝাইতেছে না, এবং এই শব্দে মাতৃ-অর্থের আরোপ নিতান্তই গৌণ, বেবিলোনীয় বা দ্রাবিড়ী শব্দদ্বয়ের মত একমাত্র বা মুখ্য অর্থ নয়। ইহাও সুস্পষ্ট হইয়াছে যে, একমাত্র গ ব্যতীত অন্য সব কয়টি ক্ষেত্রেই শব্দটির অর্থের বৈদিক নজীর বর্ত্তমান। গ-এর ক্ষেত্রেও যে প্রয়োগটি অবৈদিক, এমন কথাও কিছুতেই বলা যায় না; কারণ দেবী উমা হৈমবতীর শুভ আবির্ভাব আদি-বৈদিক যুগেই ঘটিয়াছিল এবং আমরা দেখিয়াছি যে উমা শব্দটি একটি অতি বিশুদ্ধ বৈদিক পদ। বৈদিক ও বেদোত্তর সাহিত্যে শব্দটির প্রয়োগের ব্যাপকতা বা নানা অর্থে প্রয়োগ নিঃসন্দেহে ইহার প্রাচীনত্ব এবং মৌলিকত্বেরই দ্যোতক, বহিরাগত শব্দরূপে বৈদিক সাহিত্যে প্রবিষ্ট হইয়া একটি মাত্র অর্থে প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হইবার দ্যোতক অবশ্যই নয়। ইহা বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষার ধাতু এবং পদকোষের সমৃদ্ধিরই সূচক মাত্র। আচার্য্য যাস্কের নিরুক্তে আমরা বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাচীনতর বেদাচার্য্য কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত একই পদের বিভিন্ন অর্থ দেখিতে পাই। কোন কোন ক্ষেত্রে একই পদের ৬।৭টি পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেখা যায়; অথচ সর্ব্বক্ষেত্রেই শব্দগুলি খাঁটি বৈদিক পদ হিসাবে অবিসংবাদিতরূপে স্বীকৃত। উমা শব্দ সম্পর্কে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে আপত্তি কি, আর বাধাই বা কি? ঋগ্বেদে ও কৃষ্ণযজুর্ব্বেদে ব্যবহৃত পুংলিঙ্গাত্মক উম বা উম পদ, এবং ইহার স্ত্রীলিঙ্গাত্মক উমা বা উমা রূপ যদি গবেষকগণের দৃষ্টি এযাবৎ এড়াইয়া গিয়া থাকে, তবে দোষটি অবশ্যই পদদুইটির নয়, এতৎ সংশিষ্ট গবেষকবৃন্দেরই, কারণ পদদুইটি স্মরণাতীত কাল হইতেই সংহিতা গ্রন্থদ্বয়ে বর্ত্তমান আছে। যে সকল প্রখ্যাত বৈদেশিক

গবেষক প্রথমে এতৎ সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বেদজ্ঞ হিসাবে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি ও সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অথচ তাঁহাদের ক্ষেত্রে এরূপ মারাত্মক ভুলের কারণ কি? কারণ সম্ভবতঃ এই হইতে পারে যে, তাঁহারা প্রথমাবধিই এ সম্পর্কে মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া, সেই সিদ্ধান্তেরই অনুকূলে প্রাপ্ত কয়েকটি হাল্কা ধরণের প্রমাণ পত্র লইয়া গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এবং নানা প্রকার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, সেই ভুলসিদ্ধান্তের সমর্থনেই সকল প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, মূল গ্রন্থের প্রতি ততটা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। ক্ষেত্রবিশেষে এমনও হইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট গবেষক প্রচলিত ও প্রকাশিত অসম্পূর্ণ বৈদিক নির্ঘণ্ট বা পদসূচী, অথবা বিগত শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপখণ্ডে প্রণীত বৈদিক শব্দকোষজাতীয় গ্রন্থের উপরই অত্যধিক নির্ভরশীল ছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের নিকট কেনোপনিষদ, বা তৈত্তিরীয় আরণ্যকই এতৎ সম্পর্কিত প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, যেখানে উমা শব্দের উল্লেখ আছে। সে যাহা হউক, কেনোপনিষদে উল্লিখিত দেবী উমা হৈমবতী সম্পর্কে একটু বক্তব্য হয়ত এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবেনা। কেনোপনিষদ খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিলেও, উহাতে উল্লিখিত উমা নামটিও খৃঃ পূঃ ৬ষ্ঠ বা ৭ম শতাব্দীরই, এই ধারণা বা যুক্তি অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। কেনোপনিষদে যে ঘটনাটি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বহু প্রাচীন কালের, গ্রন্থ-রচনার কালের অবশ্যই নয়। অথচ পাশ্চাত্য গবেষক-সমাজ নামটি যে অপ্রাচীন, তাহা প্রমাণের জন্য এই শ্রেণীর অনৈতিহাসিক যুক্তিজালেরই অবতারণা করিয়াছিলেন, আর শক্তি সাধনার ইতিহাস রচয়িতা কতিপয় ভারতীয় গবেষকও এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গীটিকেই বিনাদ্বিধায় অনুসরণ করিয়াছেন। বাইবেলের old Testament বর্তমানে যে আকারে পাওয়া যায়, তাহা খ্রীষ্টীয় কোন সালে রচিত বলিয়া পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন। এ ক্ষেত্রে এই যুক্তি যদি দেখান হয় যে, যেহেতু বর্তমান আকারে প্রাপ্ত গ্রন্থটি অপ্রাচীন, সেহেতু তাহাতে বর্ণিত Genesis, Exodus প্রভৃতি অধ্যায়গুলি বা সেখানে উল্লিখিত আদি পিতা-মাতা অথবা আদি পয়গম্বরগণের নাম ও কাহিনীসমূহও অপ্রাচীন, তবে তাহা ন্যায়সঙ্গত বা ইতিহাস-সম্মত বা বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি হইবে কি?

বৈদিক দেবতার বহু-নামের রহস্য

বৈদিক প্রধান দেবদেবীগণের প্রত্যেকেরই বহু নাম ছিল। ভবপত্নী দেবী ভবানীর উমা নামটিও তাঁহার অনেকানেক নামের মধ্যে একটি মাত্র। প্রাচীন ঋষি, আচার্য্য ও নিরুক্তকারগণ এই বিভিন্ন নামের উৎপত্তির কারণসমূহ সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন, এবং যাস্ক রচিত নিরুক্ত (৭ম অধ্যায়), শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা (১ম অধ্যায়) এবং কাত্যায়ন-কৃত ঋগ্বেদীয় সর্বানুক্রমণী প্রভৃতি বৈদিক ব্যাখ্যাগ্রন্থে তাহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিতও আছে। পরবর্ত্তী কোন কালে যাহাতে কেহ এই সন্দেহ করিতে না পারে যে, একই দেবতার এত নাম কেন এবং কি ভাবে হইল, তজ্জন্যই ক্রান্তদর্শী ঋষি ও আচার্য্যগণ এতৎসম্পর্কীয় প্রকৃত কারণ সমূহ সম্ভবতঃ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বৃহদ্দেবতায় যাস্ক ও তাঁহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষি ও আচার্য্যগণের মতামতসমূহ লিপিবদ্ধ আছে। যেমন, মধুক, শ্বেতকেতু (ঋষি উদ্দালক আরুণির পুত্র) ও গালব প্রভৃতি প্রাচীন ঋষি ও নিরুক্তকারগণের মতে ৯ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইতে, এবং যাস্ক, গার্গ্য ও রথীতর (শাকপূণি) প্রভৃতি বেদাচার্য্যের মতে ৪ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইতে বৈদিক দেবদেবীগণের বিভিন্ন নামকরণ হইয়াছিল। এই ৯ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইল:—নিবাস, কর্ম্ম, রূপ, মাঙ্গল্য-দান, বাক্য, আশিষ বা প্রার্থনা, যদৃচ্ছ বা ঘটনা, উপবসন বা প্রবৃত্তি ও জন্মরহস্য; আর ৪ প্রকার বিভিন্ন কারণ হইল:—আশিষ, অর্থ-বৈরূপ্য (বিভিন্ন অর্থ-সাধন), বাক্য ও বিভিন্ন কার্য্য প্রভৃতি (বৃহদ্দেবতা—১২৩।৮)। সুতরাং প্রতিটি প্রধান বৈদিক দেবদেবীর অন্ততঃ পক্ষে ৯টি বা ৪টি বিভিন্ন কারণপ্রসূত ভিন্ন ভিন্ন নাম ছিল। এতদ্ব্যতীত কৃতজ্ঞ ঋষি ও স্তাবক কর্ত্তৃক বিভিন্ন উদ্দেশ্য-সাধক উপকার প্রাপ্তির জন্যও দেবতাগণের আরও অনেক নামকরণ হইত, সন্দেহ নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এতৎ সম্পর্কে বিভিন্ন সুপ্রাচীন ঋষি ও

বেদাচার্য্যের সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ বর্ত্তমান থাকা সত্বেও বৈদেশিক গবেষকগণ ইউরোপীয় নজীর অনুসারে ভারতীয় দেবদেবীর বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, বৈদিক দেবদেবীগণের মধ্যে বহু বিভিন্ন দেবতার সংমিশ্রণ আছে বলিয়া পাকা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহাতে এই কথাই মনে হইবে যে, হয় তাঁহারা মনোযোগ সহকারে এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, নয় সবকিছু জানিয়া শুনিয়াও প্রকৃত রহস্য অনুধাবনে তাঁহারা অসমর্থ হন, অথবা ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা সত্যের বিকৃতি ঘটাইয়াছেন। বৈদিক ব্যাখ্যাগ্রন্থ সমূহ পাঠ না করিয়া, যে সমস্ত ভারতীয় গবেষক দেবদেবী সম্পর্কে ইউরোপীয় মতের অনুসরণে গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেশের ও ধর্ম্মের উপকারের পরিবর্ত্তে যথেষ্ট অপকারই সাধন করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ। অপরের অন্ধ অনুকরণে অগৌরব ছাড়া গৌরবের কিছুমাত্র নাই এবং ইহা আত্মাবমাননারই নামান্তর মাত্র। প্রাচীন ইরাক, ইরাণ, এশিয়া মাইনর, মিশর এবং ইউরোপখণ্ডে যে সকল দেবদেবীর পূজা-উপাসনা প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও একটি অথবা দুইটির বেশী নামের অস্তিত্বের প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের একই বৈদিকদেবতার বহুবিধ নামের অস্তিত্বের জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন আছে, এবং এই বৈশিষ্ট্য একমাত্র ভারতেরই নিজস্ব বস্তু। আর্য্যজাতির প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত বেদের অস্তিত্ব যেমন একমাত্র ভারতবর্ষেই আছে, তেমনই আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থানও হয়ত এই ভারতের উত্তর ও উত্তরপশ্চিমাংশের পর্ব্বত সংলগ্ন পার্ব্বত্যপ্রদেশ সমূহেই ছিল, এই ধারণাই ইহাতে দৃঢ়তর হয়। এই ভারতভূমি হইতেই হয়ত সুদূর এক অতীতে আর্য্যজাতির বিভিন্ন শাখা পৃথিবীর নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদিতে মহাদেবী ভবানীর বহু বহু নামের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সে-সকল নামের তালিকা উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত করা নিষ্প্রয়োজন। তবে এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধপণ্ডিত অমর সিংহ-কৃত অমরকোষ নামক গ্রন্থ হইতে মহাদেবীর কয়েকটি মাত্র প্রধান প্রধান নামের উল্লেখ এ-স্থলে করা দরকার বলিয়া মনে করা যায়:—যেমন, উমা (সর্ব্বপ্রথম নাম), কাত্যায়নী, গৌরী, কালী, হৈমবতী, ঈশ্বরী, শিবা, ভবানী, রুদ্রাণী, সর্ব্বাণী, সর্ব্বমঙ্গলা, অপর্ণা, পার্ব্বতী, দুর্গা, মৃড়ানী, চণ্ডিকা ও অম্বিকা। (স্বর্গবর্গ) বলা বাহুল্য যে, এই বৌদ্ধগ্রন্থকার তৎকালীন সমাজে বহুল-প্রচলিত এবং উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একই মহাদেবীর কয়েকটি বিভিন্ন নামের উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রভাবিত হইয়া মহাদেবী শিবানীকে লোকচক্ষে বিশিষ্ট করিয়া দেখাইবার জন্য এই সমস্ত নামের একত্র সমাবেশ করেন নাই।

ভব-পত্নী সতী ও পার্ব্বতী

পুরাণাদিতে দেখা যায় যে, দেবাদিদেব শঙ্কর প্রথমে প্রজাপতি দক্ষের কন্যা সতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। দৈবকারণে এই বিবাহ দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। বিবাহের কিয়ৎকাল পরেই দেবী সতী স্বামীর অবমাননায় ক্ষুব্ধ হইয়া পিতার যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। পতিপ্রাণা দেবী সতীর এই অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গ পিতার যজ্ঞনাশই শুধু ঘটায় নাই, ইহার ফল হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী। তদীয় পুত দেহাবশেষ সর্ব্ব-ভারতের বহু-স্থানকে, এমন কি, সুদূর তিব্বত ও লঙ্কাদ্বীপের ২১টি স্থানকে পর্য্যন্ত, পবিত্র পীঠ-স্থানে পরিণত করিয়াছিল। তাঁহার এই অনন্যসাধারণ পতিপ্রেম ও পতিভক্তির স্মারক হিসাবেই সম্ভবতঃ ভারতের তাবৎ পতিব্রতা রমণীর শ্রেষ্ঠতম সম্মান হইল এই "সতী" উপাধিটি। সতী শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হইল, যিনি বর্ত্তমান আছেন, এমন কোন মহিলা (সৎ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ-রূপ)। সৎ শব্দ অস্‌ ধাতু হইতে আসিয়াছে। কেহ কেহ অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, সতী দেবীর পূজা প্রচলিত না থাকিলেও তিনি দেবী পার্ব্বতীর ভিতর দিয়াই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। কথাটা সত্য হইলেও সম্ভবতঃ পুরাপুরি সত্য নয়। দেবী সতী ভারতের তাবৎ পতিপ্রাণা রমণীর মধ্যেই অক্ষয় ও অমর হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

মহাদেবী সতী পরজন্মে হিমালয়-রাজের দুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে কোন পুরাণেই দ্বিমত দেখা যায়না। এমন কি, মহাকবি কালিদাস-রচিত কুমার-সম্ভব কাব্যেও, সতী দেবীই যে পরজন্মে হিমালয়-রাজ-দুহিতা দেবী পার্ব্বতী নামে পরিচিতা ছিলেন, এই পৌরাণিক তথ্যেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। যে ২১টি পুরাণে সতী দেবীর আত্মোৎসর্গজনিত ঘটনার উল্লেখ নাই,

সেগুলির নীরবতার কারণ ব্যাখ্যা এস্থলে অবান্তর। কুমারসম্ভব কাব্যে মহাকবি বলিতেছেন :

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা
দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
সতী সতী যোগ বিসৃষ্টদেহা
তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥ ১ম সর্গ ২১শ শ্লোক।

তাহার পর মহাদেবের পূর্ব্বপত্নী পতিব্রতা (সতী) দেবী সতী পিতৃদত্ত অপমানে প্রণোদিত হইয়া যোগবলে দেহত্যাগ করিয়া (পুনরায়) জন্মগ্রহণ করিবার নিমিত্ত সেই শৈলরাজ-বধূর গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ :— যদৈব পূর্ব্বে জননে শরীরং
সা দক্ষ রোষাৎ সুদতী সসর্জ্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্তসঙ্গঃ
পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ॥ ১ম সর্গ, ৫৩ তম শ্লোক।

সেই শোভনদন্তী পার্ব্বতী পূর্ব্বজন্মে দক্ষের প্রতি ক্রোধবশতঃ যখন দেহত্যাগ করেন, তখন হইতে পশুপতি শঙ্কর পত্নীবিহীন হইয়া বিষয়াসক্তিশূন্য হইয়াছেন।

কোন কোন গবেষক (ইঁহাদের মধ্যে ভারতীয়ও আছেন) এই পুনর্জ্জন্মের ঘটনাটিকে বিশ্বাস করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। যুক্তিটা এই যে, পুনর্জ্জন্ম ঘটিত এই কাহিনীর সত্যতার কোন প্রমাণ নাই। পুরাণ-রচয়িতাগণের বাক্য ছাড়া সত্যসত্যই আর কোন প্রমাণ এস্থলে অনুপস্থিত। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যে এজাতীয় উদাহরণ অজস্র। রামায়ণ ও মহাভারতে যত্রতত্র এ-শ্রেণীর উদাহরণ দেখা যাইবে। মহাভারতে কৃষ্ণার্জ্জুনের পূর্ব্বজন্মের কথা বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে। (পূর্ব-জন্মের নারায়ণ ও নর নামক ঋষিদ্বয়)। মহাভারতেরই অন্তর্গত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণীতে আছে :—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৪র্থ অধ্যায়, ৫ম শ্লোক

হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন, তুমি এবং আমি বহুজন্ম পার হইয়া আসিয়াছি ; আমি তৎসমুদয় জ্ঞাত আছি, কিন্তু তুমি তাহা বিস্মৃত হইয়াছ।

এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ নিজের এবং সখা অর্জ্জুনের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সমুদয় জন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও কয়েকজনের পূর্ব্বজন্মের কথা বলিয়াছেন বলিয়া মহাভারতে দেখা যায়। পিতামহ ভীষ্ম দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডীর পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত অবগত ছিলেন বলিয়া, তাহার শরীরে অস্ত্রাঘাত না করিয়া, স্বয়ংই মৃত্যুবরণ করেন। ভগবান্ বুদ্ধও জাতিস্মর ছিলেন। বৌদ্ধ-জাতক গ্রন্থসমূহে তাঁহার বহু-বহু জন্মের কাহিনী বিবৃত আছে, এবং সেই সঙ্গে সারিপুত্র, মহামুদ্গলায়ন প্রভৃতি তদীয় প্রধান কয়েকজন শিষ্যের পূর্ব্ব-পূর্ব্ব জন্মের কাহিনীও তিনি বিবৃত করিয়াছেন, দেখা যায়। এ-যুগের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসও জাতিস্মর ছিলেন। কথামৃত ও অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, তিনি উপদেশ প্রসঙ্গে কেবল নিজের জন্মকথাই ব্যক্ত করেন নাই, বিবেকানন্দ, গিরিশচন্দ্র, বলরাম বসু, রাখাল মহারাজ, সারদানন্দ মহারাজ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ অনেক শিষ্যেরই পূর্ব্বজন্মের কাহিনীও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে অতীত যুগের ২।১টি উদাহরণ এস্থলে দিতেছি। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের প্রখ্যাত ঋষি গৌতম বামদেব মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই দেবগণের জন্মবৃত্তান্ত অবগত ছিলেন।

গর্ভে নু সন্নন্বেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা।
৪।২৭।১

এবং তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের বহু সৃষ্টি ও বহু কার্য্যের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত দেখিয়াছিলেন (৪।২৬ সূক্ত)। ঠিক এই জাতীয় কথাই ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলস্থ ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ-দৃষ্ট সূক্তত্রয়ে (১০-৪৭-৩৯) উক্ত হইয়াছে। ঋষি বামদেবের এই অদ্ভুত জাতিস্মরতার প্রশস্তি বৃহদারণ্যকোপনিষদেও আছে। এ শ্রেণীর আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। সুতরাং ভারতীয় ঋষি ও অবতারকল্প মহাপুরুষগণের পক্ষে নিজের জন্মকথা জানা যেমন একটি সাধারণ ব্যাপার তেমনই, ইচ্ছা হইলে, অপরের জন্মবৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়াও ঠিক একটি সাধারণ ব্যাপার মাত্র। যাঁহারা সতী-পার্ব্বতী কাহিনীকে বানান কথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান, বামদেব, শ্রীকৃষ্ণ, তথাগত বুদ্ধ অথবা শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী বলিয়া কথিত এই সব ঘটনাকে অস্বীকার করার সাহস তাঁহারা রাখেন কি ?

জাতক সমূহের সংখ্যা ৫৫০টি বলিয়া ধরা হয়। প্রতি জাতকে একটি করিয়া জন্মবৃত্তান্ত ধরা হইলে, ৫৫০টি জাতকে মোট ৫৫০টি বিভিন্ন জন্মের বৃত্তান্ত ধৃত আছে, একথা বলা যায়। জাতক গ্রন্থের অন্যতম অনুবাদক Prof Cowell তৎপ্রকাশিত অনুবাদ-গ্রন্থের মুখবন্ধে বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে মুনি-ঋষি ও মহাপুরুষগণের পক্ষে জাতিস্মরতা একটি সাধারণ ব্যাপার বলিয়া গণ্য হইলেও, সমগ্র ইউরোপখণ্ডে মাত্র একটি ঐতিহাসিক উদাহরণই আছে, এবং তাহা গ্রীক দার্শনিক Pythagorus এর, যিনি নিজস্ব ৮টি জন্মের কথা বলিতে পারিতেন।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আখ্যান অনুযায়ী ইহাই বুঝা যায় যে, শিব দুই বার দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। সতী দেবীর মৃত্যুতে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ রুদ্র শিব প্রথমবার দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস করেন। দ্বিতীয়বারের ঘটনা ইহার অনেক পরবর্ত্তীকালের। তখন শিব হিমালয়-রাজ-দুহিতা দেবী পার্ব্বতীর স্বামী। এবারও যজ্ঞকর্ত্তা নবজন্মলব্ধ সেই প্রাচীন দক্ষ প্রজাপতি, যিনি এবারে প্রাচীন বর্হির পৌত্র এবং প্রচেতার (বা প্রচেতাগণের) পুত্র প্রজাপতি দক্ষ; যজ্ঞস্থলও সেই প্রাচীন গঙ্গাদ্বার বা স্বর্গদ্বার বা হরিদ্বার-সংলগ্ন কনখল নামক স্থান। এ জন্মেও দক্ষ পূর্ব্ব-বিদ্বেষবশে শিবকে যজ্ঞে আহ্বান করেন নাই। দেবী পার্ব্বতী ইহাতে ক্রুদ্ধা হইয়া স্বামীকে উত্তেজিত করেন এবং দক্ষের ধৃষ্টতার সমুচিত শাস্তি বিধানের নিমিত্ত, স্বামীসহ বিনা আমন্ত্রণেই যজ্ঞস্থলে উপনীত হইয়া, সেই যজ্ঞ ধ্বংস করেন। সুতরাং এই জন্মে দেবী পার্ব্বতী দক্ষ বা তদ্‌বংশের কেহ নহেন। শৌনকীয় বৃহদ্দেবতা-মতে মরীচিপুত্র ঋষি কশ্যপ, অদিতি দিতি, দনু,দনায়ু, কদ্রু, বিনতা প্রভৃতি ত্রয়োদশ দক্ষকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন (৫।১৪৮)। এই প্রজাপতি দক্ষবংশীয় রাজগণের রাজত্ব হরিদ্বার ও তৎসংলগ্ন প্রদেশে বহুকাল বিদ্যমান ছিল বলিয়া জানা যায়। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ-ব্রাহ্মণে প্রসঙ্গক্রমে এই দাক্ষায়ণ রাজবংশের কাহিনী কতকটা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে কথিত আছে যে (২।৪।৪), প্রজাপতি দক্ষ সন্তান কামনায় একটি বিশেষ-ধরণের পৌর্ণমাসীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন এবং তাঁহার নামানুসারে এই যজ্ঞের নাম হয় দাক্ষায়ণ যজ্ঞ। ঋষি প্রতিদর্শ শৈব্র এই যজ্ঞবিধি আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং তিনি এতৎ সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া সেই যুগে পরিজ্ঞাত ছিলেন। সৃঞ্জয়বংশীয় (পাঞ্চালগণের আদি নাম) সুপ্লন্ শৈব্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া এই দাক্ষায়ণ যজ্ঞ ও সৌত্রামণি নামক অপর একটি যজ্ঞবিধিও শিক্ষা করেন। সুপ্লন্ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার পৌরোহিত্যে সৃঞ্জয়গণের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তৎপর প্রখ্যাত ঋষি দেবভাগ শ্রৌতর্ষ ইহা আয়ত্ব করেন, এবং তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, কুরু ও সৃঞ্জয়, এই উভয়-রাজ্যেরই প্রধান রাজপুরোহিতের পদে বৃত হন। ইহার পরে দক্ষবংশীয় রাজা দক্ষ-পার্ব্বতি পুনরায় এইযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং শতপথ ব্রাহ্মণের রচনাকালেও এই দক্ষবংশীয় রাজগণের রাজত্ব বজায় ছিল বলিয়া এই গ্রন্থে উল্লিখিত আছে (ঋগ্বেদের দেবী অদিতি শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, ভারতবর্ষ, চৈত্র-১৩৭০)। শতপথ ব্রাহ্মণের প্রকৃত রচয়িতা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য অথবা তদীয় কোন শিষ্য, তাহা সঠিক জানা যায়না। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য পরীক্ষিত পৌত্র রাজা শতানীকের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন, ইহা বৃহদারণ্যকোপনিষদের প্রমাণ অনুযায়ী জানা যায় (৩ ৩য় ব্রাহ্মণ)। সুতরাং এই দক্ষবংশীয় রাজগণের রাজত্ব হরিদ্বার অঞ্চলে মহাভারতীয় যুদ্ধের পর অন্ততঃ পক্ষে ৪।৫ পুরুষ পর্য্যন্ত বলবৎ ছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। অষ্টাধ্যায়ী রচয়িতা আচার্য্য পাণিনিকে দাক্ষীপুত্র বলা হইত। তাঁহার মাতা দক্ষবংশের কন্যা ছিলেন, দাক্ষীপুত্র নাম হইতে এই তথ্যটি জানা যায়! পাণিনীয় ৬।২।১২৯ সূত্রের উদাহরণে, "দাক্ষিসংকু" ও "দাক্ষিকর্ষঃ, এই দুইটি পদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদ দুইটিতে দক্ষবংশীয়গণের অধ্যুষিত অঞ্চলকে বুঝায়। সুতরাং পরবর্ত্তী কোন কালে দক্ষবংশের রাজত্ব লোপ পাইলেও তাহাদের বংশলোপ ঘটে নাই, ইহা স্পষ্ট বোঝা যায়। পাণিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত শলাতুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। শলাতুরের পরবর্ত্তী নাম লাহোর বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। ইহাতে বোঝা যায় যে প্রাচীন দক্ষবংশের কোন শাখা সম্ভবতঃ সীমান্তপ্রদেশ বা পাঞ্জাবের কোন স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, যেখানে পাণিনির মাতুলালয় অবস্থিত ছিল।

উপসংহার

বৈদিক গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে প্রাচীন আর্য্য জাতি অত্যন্ত গর্ব্বিত প্রকৃতির ছিলেন, এবং তাঁহারা আর্য্যেতর জাতিসমূহকে যাতুধান, রাক্ষস, দস্যু, দাস ইত্যাদি ঘৃণার্হ আখ্যায় আখ্যায়িত করিতেন। এমন কি, জাতিকুলের মধ্যেও ধর্ম্মাচরণ ও আচারব্যবহারে সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি দেখা গেলে, তাঁহাদিগকে অসুর, দৈত্য ইত্যাদি বলা হইত। এহেন গর্ব্বিত জাতি ঘৃণিত অনার্য্য জাতি হইতে কোন দেবীকে আমদানী বা গ্রহণ করিয়া মহাদেবীর আসনে বসাইয়া দিবেন, ইহা কিছুতেই আশা করা যায় না। ধর্ম্মান্তর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, কিন্তু যেখানে ধর্ম্মান্তরের কোন প্রশ্ন নাই, সেখানে অপর কোন জাতির সঙ্গে ধর্ম্ম-সম্পর্কিত আদান-প্রদান সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অবান্তর। ইতিহাসে এরূপ কোন নজীর নাই বা দেখা যায় না। বিদ্যার্জ্জন এবং সভ্যতা সংক্রান্ত ব্যাপারে আদান-প্রদান অনেকটা চলিতে পারে, এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় শব্দ-চয়নও চলিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম-চয়ন চলিতে পারে না। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক জাতি অপর তাবৎ জাতিকেই "বর্ব্বর" বলিয়া অভিহিত করিতেন। খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে তাঁহারা সংখ্যা-গরিষ্ঠ তথাকথিত বর্ব্বর জাতিসমূহ হইতে কোন দেবদেবী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কোন প্রমাণ বা নজীর আছে কি? ঠিক তেমনই জিজ্ঞাসা করা যায় যে, ভারতে বস-বাসকারী খ্রীষ্টান ও মুসলমান সংখ্যালঘু সম্প্রদায়দ্বয় বিগত ১৫০০ বৎসর অথবা ১২০০ বৎসরের মধ্যে সংখ্যাগুরু হিন্দু সম্প্রদায় হইতে কোন দেবতা বা মহাপুরুষকে গ্রহণ করিয়াছেন কি? যদি ধারকর্জ্জের প্রশ্ন এসব ক্ষেত্রে না উঠে বা না খাটে, তবে তাহা একমাত্র হিন্দুধর্ম্মের বেলায়ই বা উঠিবে কোন্ ঐতিহাসিক যুক্তিতে? "এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে" বহু জাতির মিলন হইয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মহিমায় কোন্ খ্রীষ্টান বা মুসলমান ভদ্রলোক, গীর্জা বা মসজিদ্ ছাড়িয়া, হিন্দুর দেবালয়ে যাইয়া পূজা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন? বা জয় শিবশঙ্কর, জয় মা দুর্গে, জয় মা কালি, জয় রাধে গোবিন্দ, বা জয় রামজীকি, ইত্যাদি ধ্বনি তুলিয়া দোহাই পাড়িতেছেন? আর কয়টি হিন্দুই বা ভাবে বিগলিত হইয়া, আল্লা হো আকবর, অথবা জয় প্রভু যীশু, ইত্যাদি বলিয়া মাতামাতি করিয়া থাকেন?

সুতরাং প্রাচীন আর্য্যগণ কোন অনার্য্য দেবীকে গ্রহণ করিয়া মহাদেবীর পাটে বসাইয়া দিয়াছিলেন, এই যুক্তি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক। উমা নাম মহাদেবীর বিভিন্ন নামের অন্যতম মাত্র, উমা নামে আলাদা কোন দেবী আর্য্যসমাজে কোন কালে ছিলও না, বা বর্ত্তমানেও নাই। নাম-সাদৃশ্য দেখিয়াই যাহারা দিশাহারা হইয়া পড়েন, তাঁহারা একথা স্বীকার করিবেন কি যে, যীশু-খৃষ্ট নামটি খৃষ্টের আবির্ভাবের প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্ব-বর্ত্তী ঈশ কৃষ্ণ বা ঈশ কৃষ্ট হইতে ধার করা? ঋগ্বেদে অন্ততঃপক্ষে ৪০টি দেবীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই সংখ্যা অপ্রচুর ছিল কি?

আদিকালে যাহাই থাকুক, পরবর্ত্তীকালে অসবর্ণ-বিবাহ বা সঙ্গমের ফলে অনেক সঙ্কর বা মিশ্রজাতির উদ্ভব আর্য্যসমাজে ঘটিয়াছিল, এবং মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র-সমূহে আমরা ইহার ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। স্ব-সমাজের মধ্যে বর্ণ-রক্ষণ সম্পর্কেই যেখানে এত কড়াকড়ি ছিল, সেখানে, সেই পরবর্ত্তী যুগেই, এক বৈদেশিক দেবীর আমদানী ঘটিল, এবং তিনি একেবারে শ্রেষ্ঠ দেবীর আসনে যাইয়া বসিয়া গেলেন, এরূপ কল্পনা উদ্ভট ও অবাস্তব। কেবল দেবদেবীর কথাই নয়, ভাষার বিশুদ্ধতা পরিরক্ষণেও যে অপরিসীম সতর্কতা অবলম্বিত হইত, তাহার প্রমাণ, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আমরা বহু-পরবর্ত্তী কালে পতঞ্জলির মহাভাষ্যেও পাইয়া থাকি, ভুল শব্দের উচ্চারণের মারাত্মক ফল এবং শুদ্ধ শব্দের উচ্চারণে ধ্বনির সামান্য ত্রুটিতে। ফললাভে যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান ঘটিয়াছিল, তাহারই দুইটি উদাহরণ মহাভাষ্যকার গ্রন্থের প্রথমভাগেই দিয়াছেন। সুতরাং দেবী উমা হৈমবতী বহিরাগতা, এই যুক্তি পরিপাক করা অসম্ভব। আমরা দেখিয়াছি যে, উমা পদটি একটি বিশুদ্ধ ঋগ্বেদীয় শব্দ। এ সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজও জনসাধারণের সম্যক্ ওয়াকিবহাল হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় ও বাঞ্ছনীয়।

আবার দুঃস্বপ্ন !

খস্ খস, দপদপ্, ঠক্ ঠক্, দুম্‌দাম, ঝন্‌ঝন্, নানা রকম শব্দ হচ্ছে চারিপাশে,—বাড়ীর চতুর্দিকে, উপরে, নীচে। ব্যাপার কি ? ডাকাত কি দলে দলে এল ? এসে অবশ্য মেটে হাঁড়ি আর কলাইকরা বাসন ছাড়া নেবার কি আছে ? না কি ভৌতিক ব্যাপার ! ফিস্ ফিস্ করে ডাকলাম,—ওগো—হ্যাগো—[সেকেলে আমরা এই-ভাবেই ডাকি—]

গভীর নিদ্রামগ্ন, 'হ্যাগো'র কোন সাড়া নেই, নিঃসাড়।

তারপরেই ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ। গভীর রাত্রি, নিঝুম অন্ধকার, কে ডাকবে আমাকে ? যাই হোক্ যদি কোনরূপ ব্রহ্মভক্তি থাকে বলা ত যায় না। জাত বিচার উঠে গেছে, সরস্বতী পূজায় সবই একাকার, কিন্তু তবুও পূজার ব্যাপারে 'বামুন' চাই, ওটা নিজেরা এখনও সেরে নিতে পারেনি। তাড়াতাড়ি নামাবলীটা কাঁধে ফেলে, পৈতাটা বেশ ভাল করে রোমশ বুকের উপর দিয়ে টান করে দিয়ে, দরজাটা খুললাম, নইলে হয়ত ভেঙ্গে ফেলত—অন্ততঃ বামুনকে নিরীহ মনে করে ছেড়ে দিতেও পারে—

অন্ধকারেও বুঝলাম মিলিটারী। তাদের মধ্যে একজন বললে, আপনি শ্রীঅমুক ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—তা আপনারা ?

—ভিতরে চলুন বলছি—গোপনীয়—

—একটু দাঁড়ান আমার গোপনীয়াকে সরে যেতে বলি—

ঘরে এসে আলো জালিয়ে দেখি তিনি আমাকে একাকী ফেলে পালিয়েছেন। বললুম—আসুন আপনারা—

সর্বনাশ!—আলোয় দেখলুম,—একেবারে সেনাপতি সব, তেমনি ড্রেস্। কত কি ষ্টার, ষ্ট্রাপ লাগানো, কোমরে তরবারি।

মিলিটারী কায়দায় পা ঠুকে সেলাম করে দাঁড়ালেন। আমি হরিনাম জপ করে নিয়ে বললুম,—আপনারা, এত রাত্রে—

—হ্যাঁ, পরিচয় করিয়ে দি,—আমি ফিল্ড মার্শাল থাপ্পা, উনি এ্যাডমিরাল ধাপ্পা, আর ইনি এয়ার মার্শাল লারেলাপ্পা।

—তা আপনাদের শুভাগমনের হেতু? কি ভাবে আপনাদের আপ্যায়িত করি?

—কিছু না, কিছু না,—আমরা ব্যস্ত, তাড়াতাড়ি কাজ সারতে হবে—

সবিনয়ে বললাম,—দেখুন, আমি সত্যিকার সেনাপতি কোনদিন দেখিনি, যাত্রাগানের সেনাপতিই দেখেছি। আপনারা কি রকম সেনাপতি তা জানি না, কি করে আপ্যায়িত করতে হয়—আমার ত্রুটি নেবেন না—

থাপ্পা জানলা খুলে দিয়ে বললেন,—দেখুন—

ও বাবা! একি সামনের মাঠে, কোটি কোটি মশার জন্মস্থান পবিত্র এই ড্রেণসমৃদ্ধ মাঠে, সৈন্য সামন্ত গিস্ গিস্ করছে—সব সসঙ্গীণ রাইফেল কাঁধে দাঁড়িয়ে, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল, সৈনিক, নাবিক, এয়ারবাহিনী।

—বুঝলেন, আমরা যাত্রার সেনাপতি নয়, আসল সেনাপতি। আপনাকে আমাদের বিশেষ দরকার—

কাঁদ কাঁদ স্বরে বললাম,—আমি? বুড়ো বামুন, আমাকে দিয়ে কি করবেন—আমাকে ছেড়ে দিন,—কোন পাপ করিনি—

—সেই জন্যেই চাই আপনাকে। শুনুন, কথাটা গোপন, —দেশ অরাজক হয়েছিল, নীতি ধর্ম বলে কিছু ছিল না, তাই আমরা কুপ করে দেশের শাসনযন্ত্র দখল করেছি—এখন আমাদের দরকার মনের মত একটি ডিক্টেটর।

—ডিক্টেটর? তা এখানে কেন?

লারেলাপ্পা বললেন,—এই শাসন তরণী, তথা ঝড়ের এই দুর্দিনে দেশের ডুবু ডুবু নৌকার হাল আপনাকে ধরতে হবে—

থাপ্পা বললেন,—আপনি মধুমতীতে যেমন পালের নৌকায় হাল ধরতেন তেমনি ভাবে—

ধাপ্পা বললেন,—আপনার পাঠশালায় অটলা পটলা ভূতোর মত ছেলেকে যেমন নীলু বুধু ভুলুকে দিয়ে ঠাণ্ডা করেছেন, তেমনি করে—

—কিন্তু রাজনীতি, বৈদেশিক নীতি—এসব ত জানি না, ধারও ধারি না—

—দরকার নেই।

থাপ্পা থাপ্পা হ'য়ে বললেন,—অত শত বুঝি না, আমরা মিলিটারী লোক। ডিক্টেটর আমাদের এক্ষুণি চাই। দেশ দখল হয়ে গেছে,—এখন জাতির উদ্দেশ্যে রেডিওতে একটা বাণী দিতে হবে। শিগগির জীপে উঠে চলে আসুন—নইলে—

যাত্রাগানে সেনাপতি যেমন রক্তচক্ষু করে তরবারিতে হাত দেন, তেমনি করে হাত দিতেই বললুম,—যাচ্ছি, আপনারা যখন বলছেন তখন যাবোই ত, কিন্তু—

—কিন্তু কি?

—না কিন্তু নেই, তবে জাতির উদ্দেশ্যে একটা বাণী দিতে হবে,—অভ্যাস নেই। একটু এখানে রিহার্সাল দিয়ে নিলে হত না? ধরুন যদি বেফাঁস কথা বলে ফেলি, তার পরে আমি ডিক্টেটর, আপনারা আমার কথা অবশ্যই মানবেন। সেখানে মতের মিলও হওয়া দরকার—

—দেশের মঙ্গলের জন্যেই আমরা কুপ্ করেছি, দেশের মঙ্গলের জন্যে আপনার আজ্ঞাবহ আমরা—কিন্তু মঙ্গলটা প্রকৃত কিসে হবে তাই বুঝতে পারি না বলেই আপনার শরণাপন্ন। যাক্, অত কথার সময় নেই, আপনি রিহার্সালটা আরম্ভ করুন—

—হুঁকোটা সেজে নিলে ভাল বলতে পারতাম, তা—

—না না, সময় নেই, আরম্ভ করুন।

—আচ্ছা বলছি—শুদ্ধ ভাষায়ই বলি—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু—

আমি দেশের স্থল জল অন্তরীক্ষবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ডিক্টেটররূপে দেশবাসীর প্রতি ভগবানের নামে আজ যে ঘোষণা করছি, তা ঘোষণা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সংবিধানরূপে গণ্য হবে এবং আইনরূপে বলবৎ হবে।

আজ দেশ উত্তর পূর্ব পশ্চিম তিন দিক থেকে বহিঃ-

শত্রুর দ্বারা বেষ্টিত, যে কোন সময় আমরা আক্রমণে বিপন্ন হতে পারি। সেই হেতু আজ দেশবাসীকে প্রস্তুত হতে হবে—এমন ভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে যে যদি কেউ এদেশের মাটি দখলই করে তবে যেন দেশে একটিও জীবন্ত মানুষ বেঁচে না থাকে। পাঁচ বছরের শিশু থেকে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে রণাঙ্গণে প্রাণ দেবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করতে হবে,—হাতিয়ার থাকে ভাল, জোটে ভাল, নইলে তীর ধনুক নিয়েই আমরা এ্যাটম বোমার সঙ্গে যুদ্ধ করে মরবো —মরবো কিন্তু পরাজিত হব না—দেশের মাটি পরাধীন হলেও দেশের মানুষ পরাধীন হবে না—

বৈদেশিক নীতি হবে আমাদের একটি,—যারা আমাদের এক ইঞ্চি দখল করবে আমরা তাদের এক মাইল দখল করবো, যারা আমাদের একটি মানুষ হত্যা করবে আমরা তাদের একশ' মানুষ হত্যা করবো। যে বন্ধুভাবে হাত বাড়াবে তাকে আলিঙ্গন করবো, তার জন্যে প্রাণ দেবো, যে শত্রু বলে মনে করবে তাকে সংহার করবো। যে বন্ধুর বেশে এসে শত্রুতা করবে তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারবো—

দেশদ্রোহিতার শাস্তি আজ থেকে ঘোষণা করা হচ্ছে —দেশদ্রোহিতার একটি মাত্র শাস্তি মৃত্যু, ভয়াবহ মৃত্যু। এই দেশদ্রোহিতার নীতি হ'চ্ছে যে,—যার জীবন, যার অবস্থিতি, জীবিকা, কার্য অন্যের পীড়াদায়ক হবে, যার বাক্য, কার্য, চলন অন্যকে দুঃখ দেবে, তার বেঁচে থাকবার কোন অধিকার নেই এই দেশে। যার কার্য বচন ও জীবন অন্যকে সুখী করবে, যাওয়ার পথে আনন্দ ছড়িয়ে যাবে কেবল সেই এ দেশের নাগরিক বলে গণ্য হবে। মানুষ কাজ করবে নিষ্কাম ভাবে দেশের জন্যে, দশের জন্যে, অর্জন করবে দান করতে,—অপ্রতিগ্রহ, অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় দেশদ্রোহিতা বলে গণ্য হবে। এই পৃথিবীতে প্লাবন, ভূমিকম্প, ঝড়, মহামারী বাঘ-ভালুক মানুষকে যত দুঃখ দিয়েছে মানুষ মানুষকে দুঃখ দিয়েছে তার অনেক বেশী, এই দুঃখের অবসান করবো আমি।

ওঁনারা তিনজন পরস্পর একটু মুখ চাওয়াচায়ি করতেই বক্তৃতায় ফ্লো'টা কেমন থেমে গেল। বললুম,—তা কি রকম হ'চ্ছে বলুন, আপত্তি থাকলে তাও বলুন—

লারেলাপ্পা বললেন,—না ঠিক হ'চ্ছে, আপনি বলে যান। বাইরের সৈনিক-সমুদ্র আপনার বাণী শুনে উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। তাদের সমর্থন আপনি এখুনি বুঝতে পারবেন। এই উদ্বেল সমুদ্রই দেশের জনগণ, জনগণের প্রতীক—

ফস্ করে একটা বিড়ি ধরিয়ে দু'টান দিয়ে নিয়ে বললাম, তা হলে রিহার্সলটা সুরু করি—

—হাঁ—করুন।

দেশের এবং দেশবাসীর স্বার্থ বিরোধী যারা তারাই দেশদ্রোহী, তাদের শাস্তি গুলি করে হত্যা। যে গয়লা দুধে জল দেয় আর যে ভেজাল ঘি তৈরী করে, চালে কাঁকর মেশায়—এরা সমান বধ্য। তারা দেশের জনস্বাস্থ্য নষ্ট করছে, তিলে তিলে দেশবাসীকে ব্যাধি দিয়ে হত্যা করছে। আমার নীতি হচ্ছে, হাসপাতাল তৈরী করে রোগীর চিকিৎসা করা নয়, দেশবাসীকে পুষ্টিকর নির্ভেজাল খাদ্য দিয়ে স্বাস্থ্যবান করা, যাতে হাসপাতালের প্রয়োজন নগণ্য হ'য়ে যায়। দেশভর্তি ভেজাল খাদ্য, ঔষধ দিয়ে জনগণকে স্বাস্থ্যহীন করে, আর বড় বড় হাসপাতাল তৈরী করে করতালি পেতে আমি চাই না। এদের সব ময়দানে দাঁড় করে গুলি করা হবে, যারা এই মজা দেখতে যাবে তাদের একটাকা করে দর্শনী দিতে হবে, এটা জাতীয় ভাণ্ডারে যাবে—

যারা বেশী লাভের মোহে আজ চিনি, কাল চাল, পরশু মাছ, তার পরদিন সরিষার তৈল উধাও করে জনগণের গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাচ্ছে, তাদের গায়েরও মাংস ছিঁড়ে নেওয়া হবে অভিনব উপায়ে—জাহাজ বোঝাই করে এদের নিয়ে যাওয়া হবে সমুদ্রে—যেখানে প্রচুর মাংসাশী হাঙ্গর আছে। এদের কাণে বঁড়শী দিয়ে জলে নামিয়ে দেওয়া হবে, হাঙ্গর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে—এই চমৎকার সুন্দর দৃশ্য দেখবার দর্শনী হবে মাত্র দশ টাকা। এটাও জাতীয় তহবিলে যাবে।

খাপ্পা ধাপ্পার দিকে একটু চেয়ে বললেন,—আমার শ্বশুর মশায় যে চিনির টকিষ্ট। কণ্ট্রোল চিনিতে ত ব্যবসা পোষায় না—

বাইরের সৈনিকসমুদ্রে কেমন যেন একটু বেসুরো আলোড়ন দেখা গেল।

—আরও বলবো?

লারেলাপ্পা বললেন,—বলুন, তবে গোড়ায় বেজায়

আদর্শের কথা বলছিলেন সেটা বেশ লাগছিল কিন্তু এখন একেবারে বৈষয়িক কথা বলছেন, এটা ঠিক সাহিত্যধর্মী হ'চ্ছে না, কিন্তু—তবুও বলুন—

—দেখুন, ওটা ত ঠিক সাহিত্যকর্ম নয়, ওটা বিষয় কর্মই বটে।

ধাপ্পা বললেন,—আচ্ছা বলুন দেখি কতদূর যায়—

—যারা আফিসে রেলে ডকে কেরাণী, অফিসের কাজ করে, তাদের উপর নির্ভর করছে সমস্ত জনগণের সুবিধা অসুবিধা, তাদের কাজে যদি গাফিলতি হয়, এতটুকু কর্তব্যকর্মে শিথিলতার জন্যে যদি একজন লোকেরও অসুবিধা হয়, তবে তাকে জু-গার্ডেনের বাঘ-ভালুকের খাঁচায় পুরে দেওয়া হবে,—এতে দেশের মাংসের খরচ কমবে এবং অভুক্ত জন্তু জানোয়ারদেরও পেট ভরবে। জু-গার্ডেনের এই দৃশ্য দেখবার দর্শনী হবে মাত্র পাঁচ টাকা।

তারপরে শিক্ষা ব্যবস্থা—[এইবার একটু সাহিত্যধর্মী ভাবে ভাষণ দেব] দেশের শিক্ষা হবে এমন যে দেশের তরুণ-তরুণী সব দেশের জন্য প্রাণ দেবে। তারা হবে মহানুভব, ব্যক্তিকে ছেড়ে তারা ব্যষ্টিকে আপনার করে নেবে। তারা সৃষ্টি করবে ঝটিকা-বাহিনী,—দেশের সমস্ত অনাচার অবিচারকে ব্যক্ত করবে, কণ্ঠরোধ করবে। বাবা যদি ভুয়ো ঔষধের কারখানা করে, তবে ছেলে এসে খবর দেবে পুলিশে। পুলিশের দারোগা ঘুষ খেলে তার মেয়ে এসে বলে দেবে সে খবর সরকারে—

থাপ্পা বললেন,—এটা কিন্তু ঠিক আদর্শ শিক্ষা হ'চ্ছে না, পিতামাতার প্রতি এমন অশ্রদ্ধা শিক্ষা দেওয়া ভারতের মাটিতে অন্ততঃ চলা ঠিক নয়—

ধাপ্পা বললেন,—দেশপ্রেম, ত্যাগ, ব্যষ্টি সমষ্টি যা বলছিলেন তা একটা আদর্শবাদ বটে কিন্তু ওটার বৈষয়িক ব্যাখ্যা যেন ঠিক খাপ খাচ্ছে না। দেশের জন্য জীবন অবশ্যই দেব, তবে তার সঙ্গে, নকল পেনিসিলিন কারখানার কি যোগাযোগ আছে—ওটা বোঝা যাচ্ছে না।

লাবেলাপ্পা বললেন,—বাইরে জনসমুদ্রে ঢেউ উঠেছে, সামাল তরণী এবার—

আজ্ঞে এটা ত রিহার্সাল, পছন্দ না হয় আবার অন্যরকম বলব।

—হ্যাঁ তবে বলুন—

কলেজ স্কুল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক হবে আদর্শ, জ্ঞান তপস্বী, পাশ তপস্বী নয়—বই সামনে খুলে দিলেও নকল করবে না এমন ছাত্র, লাখটাকা ঘুষ দিলেও অসৎ পথে পা বাড়াবে না এমন শিক্ষক। এমনও এখন হচ্ছে যে বাইরের ছেলে কলকাতার কলেজে পরীক্ষার মার্কসিট নিতে চারদিন এসে ২০৲ টাকা খরচ করেছে, পঞ্চম দিনে এসে বেয়ারাকে একটাকা ঘুষ দিয়ে তবে মার্কসিট পেয়েছে, রোজ ১০৲ টাকা খরচ করে তিন চার দিন বর্ধমান যেয়েও একখানা সার্টিফিকেট পায়নি,—আর এক দিন এসো বলে ভাগিয়ে দিয়েছে। এই অবিবেচনা ও সহানুভূতিহীনতার জন্যে একটা অভিনব শাস্তির ব্যবস্থা হবে। ইডেন গার্ডেনের ক্রিকেট মাঠে এদের নিয়ে যাওয়া হবে এবং ক্রিকেট মাঠের খাঁচায় ভরে ২৬টা সুন্দরবনের বাঘ ছেড়ে দেওয়া হবে। এই খেলা দেখার দর্শনী হবে টেষ্ট ক্রিকেটের সমান।

এমনি করে যদি এক বছর দেশ শাসন করা যায় তবে দেখতে দেখতে খাদ্যসমস্যা সমাধান হ'য়ে খাদ্যের এমন প্রাচুর্য হবে যে খাদ্য খাওয়ার লোকই দেশে থাকবে না বলে অনুমান হয়—

বাইরের বীরবৃন্দ হঠাৎ উদ্বেল হয়ে দাপাদাপি সুরু করল। ওঁনারা ছুটে বাইরে চলে গেলেন—যাক্ বাবা।

নিভন্ত বিড়িটায় দু'টো টান দিয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেললাম।

লাবেলাপ্পা ছুটতে ছুটতে এসে বললেন, ভয়ানক ব্যাপার, আবার বিপ্লব সুরু হয়েছে, এক্ষুণি স্থলবাহিনী জল-বাহিনীতে যুদ্ধ বেধে যাবে। পুনরায় আরম্ভ করুন। অন্য সুরে, অন্য আদর্শ নিয়ে, অত ব্যবহারিক হবেন না। শিগগির—নইলে ওরা এক্ষুণি এসে পেটে সঙ্গীন ঢুকিয়ে দেবে—

বিড়িটা ফেলে দিয়ে সুরু করলাম—

ভ্রাতৃবৃন্দ,—আমাদের এই রাষ্ট্র হবে সেকুলার, এখানে সকলে সমান। হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান জৈন কোন ভেদাভেদ নেই—সকলে সমান, সকলে স্বাধীন। স্বাধীন ভাবে বুদ্ধিবলে, কৌশলে, বুদ্ধির জোরে, গায়ের জোরে, যে যেমন ভাবে করে খেতে পারে সে তেমনি ভাবেই করে খাবে। মামার জোরে, খুড়োর জোরে যে যেমন করে পারে

উপার্জন করবে, বড় হবে, এতে কোন বাধা নেই, আমরা হব এই ন্যায়নিষ্ঠ সাম্যের পূজারী। ভেজাল দিয়ে, দাম-বাড়িয়ে, সংঘ করে, সমিতি করে আমরা পরস্পরের মাংসে উদর পূর্তি করবো, এতে কেউ কোন আপত্তি করবে না—পররাষ্ট্রকে খুশী করতে নিজরাষ্ট্রের জনগণকে আমরা গুলি করবো, এত মহৎ হবে আমাদের আদর্শ।

বাইরে ঘন ঘন জয়ধ্বনি হল,—আনন্দে উদ্বেল হ'য়ে উঠল বীরবৃন্দ। তরবারির ঝন্ ঝন্, সঙ্গীনের ঠন্ ঠন্। বুটের উচ্ছ্বাস চারিদিক মুখরিত করে দিল।

ধাপ্পা ছুটে এসে বললেন,—চমৎকার চমৎকার, চালিয়ে যান, চালিয়ে যান—

আমরা সব ভাই-ভাই, সব সমান। উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই, রাজা প্রজা নেই, শিক্ষিত অশিক্ষিত নেই। দ্বিজ-চণ্ডাল নেই, সব সমান—কেবল যারা ছিল অন্ত্যজ, যারা ছিল আদিবাসী তারা থাকবে কুলীন। তারা বেশী করে ভাল চাকুরী পাবে। আমরা হব পরম বৈষ্ণব, আদর্শ বৈষ্ণব, যদি কোন বিদেশী এসে এক কান ধরে টানে, আমরা অন্য কান এগিয়ে দেব মলবার জন্যে বলবো ভাই হাতে ব্যথা লাগে নি ত? আমার কানটা বড়ই শক্ত। যদি কেউ বলে তোমার দেশের কিছু জায়গা দাও, তখুনি দেশের অন্ততঃ সিকিটাক্ দিয়ে দেব। কারণ দানই ধর্ম, এটা দাতাকর্ণের দেশ।

বাইরে শ্লোগান শোনা গেল,—সাধু! সাধু!

মানুষ হবে সব স্বাধীন, আইন আর শৃঙ্খলার শৃঙ্খল দিয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করা চলবে না।

আমাদের মধ্যে এমন মহানুভবতা ও উদারতার আদর্শ প্রচার করতে হবে যে, যে লোক পরদ্রব্য নিজের প্রয়োজনে নেবে, বুদ্ধি বলে, কৌশলে, ঠেকিয়ে, ঠকিয়ে নেবে, তাকে কেউ 'চোর' আখ্যা দিতে পারবে না। সবই জাতীয় সম্পত্তি যে-কারও কাছে থাকলেই হবে। এমন মানসিকতা ও মানবিকতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকলেই মনে করতে পারে টাকা ব্যাঙ্কে থাকলেও যা, নিজের নিজের বাড়ী নিয়ে গেলেও তাই অর্থাৎ তোমার টাকাও আমার টাকা আমার টাকাও আমার টাকা, এমনি একটা আত্মগত ভাবের সৃষ্টি করতে হবে—

বাইরে ধ্বনি উঠল,—তোফা! তোফা!

দেশে নানাবিধ সৎকার্যের জন্য প্রভূত পুরস্কার দেওয়া হবে। আমাদের কালচার হবে এসথেটিক, ontology ও axiologyর উর্দ্ধে যাবে আমাদের কৃষ্টি। কাজেই যারা যুদ্ধ ক্ষেত্রে সুকৌশলে, সুন্দরভাবে ত্বরিৎগতিতে পশ্চাদপসরণ করতে পারবে তাদের আকাদেমী পুরস্কার দেওয়া হবে।

বাইরে জয়ধ্বনি হল,—জয় ডিক্টেটর জী কি জয়—

—সিনেমায় যে সব ছবির গান এমন জনপ্রিয় হবে যে তরুণ-তরুণীরা একসঙ্গে রক-বৈঠকে বসে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তা গাইতে বাধ্য হবে, যে সব নটনটী মুক্ত করে, ব্যক্ত করে চারিপাশে মৃত-সঞ্জীবনী ছড়িয়ে দিতে পারবে, তাদের সকলকে পরম-মহাবীর পদক দেওয়া হবে।

তারপরে যে সব দেশকর্মী সার্বজনীন দুর্গাপূজা-সরস্বতী পূজার জন্যে জন-পকেট নিংড়ে যত চাঁদা আদায় করতে পারবে, এবং যত বেশীক্ষণ ধরে, যত বিকট সুরে যারা মাইক বাজাতে পারবে এবং এমনভাবে বাজাতে পারবে যাতে পাচমাইলের মধ্যেও কোনও দুর্জন লেখাপড়া নামক কুকার্য করতে সাহসী না হয়, সেইসব নির্ভেজাল দেশকর্মীকে স্বর্ণপদ্মালঙ্কার উপাধি দেওয়া হবে।

—ডিক্টেটরজী কী জয়! ডিক্টেটরজী কী জয়—

লায়েলাপ্পা ছুটে এসে বললেন,—কোন ভাবনা নেই। চমৎকার! চমৎকার! জনসমুদ্র আপনাকে অভিনন্দিত করবার জন্যে উদ্বেগ-ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আর আমাদের কুপ যদি অকৃতকার্যও হয় তাতেও আপনার ভাবনা নেই, আপনি নির্বাচনে জয়লাভ করে জাতির নায়ক হবেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—আপনিই সত্যিকার জননায়ক। আমাদের ডিক্টেটর!

—আর একটুও ত বলবার ছিল—

—বলুন—বলুন—

আর যে সমস্ত বৈশ্য সাহিত্যিক এমন বেগবান আদর্শ প্রচার করতে পারবেন, ভাষায় ও ভাবে এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে পারবেন, চরিত্রচিত্রণের অপূর্ব বিকাশে তরুণ-তরুণীগণকে এমন বেসামাল করতে পারবেন, আত্মবিশ্লেষণ ও অজ্ঞান মন বিশ্লেষণে এমন আপন ভোলা করতে পারবেন যাতে দেশের ভবিষ্যৎ

তরুণ-তরুণীরা পরস্পরের প্রেমে ভাবোন্মাদ হ'য়ে বিবসনা হয়ে, রাস্তাঘাটে পথে পার্কে আত্মনিবেদন ও আলিঙ্গন করতে পারবে, সেই সমস্ত প্রতিভাধর সাহিত্যিককে এক লক্ষ টাকার সেক্সপিয়র পুরস্কার দান করা হবে।

—জয় ডিক্টেটর জী কি জয়! হুড় হুড় করে জনসমুদ্র দেয়ালভেঙ্গে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাকে কাঁধে করে হাঁকলো,—চল দিল্লী চল, রাজভবন চল—

তারা সত্যিই চলল। চীৎকার করে বললাম—গোপালের মা রইল যে, তাকে ডেকে আনি। সেও ত রাজভবনে যাবে। কে-কার কথা শোনে, তারা চললো—আমি গৃহিণীর শোকে চীৎকার করে কেঁদে উঠলাম—

—ওগো, ওগো শুনছ, এমন গোঁ গোঁ করলে ঘরের মধ্যে আর একটা লোক ঘুমোয় কি করে? সারাদিন খেটে খুটে রাত্রে যে ঘুমোবো তারও উপায় নেই—

অ্যা—ও আজ ভাস্কর লবণ খেতে ভুলে গেছি তাই একটু বায়ুর প্রকোপ হয়েছে।—

মর্ত্ত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

মোদের মর্ত্ত গঠিত হয়েছে,—
স্বর্গের অনুকরণে।
অমৃতের ছিটা লাবণ্যে তার,
গীতে ও গন্ধে বরণে।
স্থায়িত্ব নাই কিছুতেই তার,
ক্ষণিক লইয়া শুধু কারবার,
অপূর্ণতার চিহ্ন তাহার
সকল অঙ্গে গড়নে।

২

নরক তাহার অতিকাছে বটে
স্বর্গও নহে বেশীদূর,
স্বরগের দান কম নহে তার
ঠাঁই ঠাঁই তাহা সুপ্রচুর।
পুণ্যের চেয়ে পাপ বেশী তার,
সুধা আছে বটে, গরল বেজায়
সুর ও অসুর বেসুরে তাহার
ভাণ্ডার সদা পরিপুর।

৩

তার স্নেহ মায়া প্রীতি ও ভকতি
নিবিড় তাহার অনুরাগ,
তাহার আকুতি তাহার মিনতি
দেবতারো বুকে রাখে দাগ।
তাহার মিলনে, তাহার বিরহে,—
অমৃতের ধারা অবিরাম বহে
তার তপস্যা তাহার সাধনা
খণ্ডয়ে সব অভিশাপ।

৪

ভগবান সেথা আগাইয়া যান
সকল শঙ্কা হরণে,
হেথাকার ফুল চন্দন আসি
নিতি পড়ে তাঁর চরণে।
তাঁহার কৃপার অধিকারী সে যে,
প্রেমাশ্রু ধারে বুক উঠে ভিজে
করে সুন্দর মহিমান্বিত
জন্ম জরা ও মরণে।

রবীন্দ্র সাহিত্যে দেবী আরাধনা

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত

রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রধান অঙ্গ সুসজ্জিত ভক্তির মনোহর সাজে। অনবদ্য তার মাধুরী। মানবের তিমিরঘন চিত্তের দুঃখের আঁধার ঘুচাবার প্রচুর দীপ জ্বেলেছেন কবি। অথচ যে বাস্তব প্রতীতি বিশ্ব জুড়ে—তাকে এক কথায় কবি মায়ার খেলা বলে মুছে দেবার প্রয়াস করেননি। মায়া প্রতিষ্ঠা করে নিজের প্রাণহীনতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোমল রূপেরই অন্তর-নিহিত জ্ঞানে উপলব্ধি পুষ্ট করে চিত্তকে যখন বুঝি—

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ আছে তার মাঝ খানে।

তিনি বহুবার উপনিষদের শিক্ষা আমাদের পরিবেশন করে বলেছেন—বাক্য মন ফিরে আসে তার মন্দির দুয়ার থেকে। কিন্তু মাভৈঃ। তাঁর আনন্দের উপলব্ধি প্রফুল্ল করে চিত্তকে।

যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্যমনসা সহ।
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন।

সেই আনন্দঘনই ব্রহ্ম বিদ্যা, কবি তাঁর হাতের বীণার নানা ললিত ঝঙ্কারে কবিতার মহিমা গরিমা শোনাবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি সীমাহীন কিন্তু সীমার মধ্যে বিহার করেন। আমাদের সসীম প্রাণকে আনন্দ লোকে প্রয়াণের আয়োজন করেছেন নিজ লীলায়। মধুর গান—

সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এতো মধুর।

তিনি অসীম অরূপ, তবে প্রকাশ আমার মাঝে। এই বোধ জাগালেন তিনি—তাই রবি বিশ্বকবি। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এ সত্যের ব্যাখ্যা তাঁর অফুরন্ত কাব্য-রচনায় বোঝালেন—

কত বর্ণে. কত গন্ধে, কত গানে কত ছন্দে,
অরূপ, তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়পুর।

মায়াময় অখিলকে চোখ বুজে বোঝবার উপদেশ রবীন্দ্রনাথের নয়, ভোগের দিব্যরূপ দেখলে আসে ত্যাগ।

মানুষের মন যখন আপ্লুত হয় পরম ভক্তির বানের জলে, তখন সে অরূপের রূপ দেখে আনন্দে করে পূজা। ভগবানকে সাধারণ জ্ঞান গণ্ডীর মাঝে নামিয়ে আনতে হয়। যাকে ভালবাসি তাকে রূপ দিতে হয়। রাম-প্রসাদ তাকে "মা" বলে ডাকতেন—কিন্তু মানতেন বেদের সত্যতা।

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ।
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।

অথচ

শ্রীরাম প্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্বঘটে
ওরে, আঁখি অন্ধ দেখরে মাকে
মা আমার তিমির হরা।
এমন দিন কি হবে তারা।

ভক্তিরস রবীন্দ্র রচনায় যেমন প্রচুর তেমনি অনবদ্য। তাঁর বিশ্ব প্রাণ উদ্ভাসিত ছিল স্পষ্ট চেতনায়—

—হে পূর্ণ তোমার চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে। কারণ তিনি

উপলব্ধি করেছিলেন—

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।

বলছিলাম ভক্তের চেতনার জ্যোতি এক—যদিও সাধনার ভঙ্গী বিভিন্ন। যেভাবে রামপ্রসাদ পরমহংসদেব প্রভৃতি ভগবানকে মাতৃ সম্বোধন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নাথ, দেব, পিতা, দেবতা, গুণী, দণ্ডবিধাতা রাজা, বিশ্বভুবনরাজ, জীবনস্বামী প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত করেছেন।

আমায় দাও সুধাময় সুর
আমার বাণী করো সুমধুর

আমার প্রিয়তম তুমি এই কথাটি

বলতে দাও হে বলতে দাও।

মাতৃ-সম্বোধনে দেবীর নামে স্তবস্তুতি অপেক্ষাকৃত অতি অল্প রবীন্দ্র সাহিত্যে সাক্ষাৎভাবে। নৈবেদ্য, শেফালী, গীত্য-গুলির অবশ্য বহু কবিতায় পিতা বা মাতার বিশিষ্টতা নাই। তবে অধিকাংশই পুরুষ কল্পনা—দাস্য, সখ্য প্রভৃতি ভাবের অভাব নাই। সেদিন বল্লেন না তিনি মাতা কি পিতা, যেদিন গাইলেন—

কাঁদিয়া তোমায় এনেছি ডাকিয়া

ভাঙা মন্দির দ্বারে।

কিন্তু দুঃখের নিবেদন যে অভিমানী ছেলের মায়ের কাছে।

যে লতাটি আছে শুকায়েছে মূল

কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল

আমার জীবনে তব সেবা তাই

বেদনার উপহারে।

এমন অর্ঘ্য আছে প্রচুর। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে দাস্য, সখ্য ভাবে তিনি পুরুষ দেবতাকে দেখেছেন হৃদয় মন্দিরে।

"বলাকা"য় জননী লক্ষ্মীর যে প্রভেদ দেখিয়েছেন বিশ্বের বাসনা রাজ্যের রাণী, স্বর্গের অপ্সরী উর্বশীর সাথে তা উপভোগ্য।

কোন্ ক্ষণে

সৃজনের সমুদ্রমন্থনে

উঠেছিল দুই নারী

অতলের শয্যাতল ছাড়ি।

একজন উর্বশী—

অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী

বিশ্বের জননী তাঁরে জানি

স্বর্গের ঈশ্বরী।

উর্বশী মাত্র ভোগ স্পৃহা জাগায়—

রাগরক্ত কিংশুকে গোলাপে

নিদ্রাহীন যৌবনের গানে।

মা লক্ষ্মী—

আরজন ফিরাইয়া আনে

অশ্রুর শিশির স্নানে

স্নিগ্ধ-বাসনায়;

হেমন্তের হেমকান্ত সকল শান্তির পূর্ণতায়,

ফিরাইয়া আনে

নিখিলের আশীর্বাদ পানে

অচঞ্চল লাবণ্যের স্মিতহাস্য সুধায় মধুর।

জননী লক্ষ্মীর দয়া মানে অচঞ্চলভাব যদি লক্ষ্মীবন্ত বোঝে—

ফিরাইয়া আনে ধীরে

জীবন মৃত্যুর

পবিত্র সঙ্গম তীর্থ তীরে

অনন্তের পূজার মন্দিরে।

কবির বীণায় মাতৃ—আরাধনা মধুর মন্দ্রে ঝঙ্কার দিল দেশ-মাতার স্তবস্তুতিতে। সে সুরের আগুন চিরদিন রাঙিয়ে তুলবে দেশ-ভক্তের অন্তরাত্মা। বহু রচনায় মাতৃ-পূজার আন্তরিকতা কবির ললিত কণ্ঠে অমোঘমন্ত্র হয়ে উঠেছে ফুটে।

হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে

জাগরে ধীরে—

প্রভৃতি গানটিকে কবি নাম দিয়েছিলেন—মাতৃ অভিষেক। এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে ক্লিষ্ট হল কবির চিত্ত যখন দেখলেন—

সেই হোমানলে হেরো আজি জ্বলে দুঃখের রক্তশিখা,

কিন্তু মার প্রতি বিশ্বাস এ ছেলের অগাধ। তিনি আর্য্য, অনার্য্য, হিন্দু-মুসলমান সবাইকে ডেকে বল্লেন—

মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা

মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা

সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে।

দেশের পূজোপকরণ হোম, তীর্থনীর প্রভৃতিকে পবিত্র করতে পারে সব সন্তানের একপ্রাণতা।

তরুণ কবি রবি ১৩০৩ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের শুভ-মিলনে কলিকাতার মঞ্চ হতে যখন গাইলেন আবেগভরে মাতৃ-সঙ্গীত, শুনেছি স্তম্ভিত হয়েছিলেন দেশহিতৈষীর দল। সত্যই কল্যাণ-মধুর মনোরম মনোভাব মিলনে।

—আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

গাহিলেন—

কত দিনের সাধন ফলে

মিলেছি আজ দলে দলে

ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয়রে মাকে।

কথা সরল, কিন্তু ভাব হিল্লোল তোলে মনের গহনে।

কংগ্রেস ফোটাচ্ছে সেদিন দেশাত্মবোধ। শাসনযন্ত্রের কঠোরতা ছিল নির্ম্মম। রাজপুরুষের হঠকারিতা ছিল দুর্ব্বিষহ। কবি, সাহিত্যিক, সংবাদপত্র সেবক, দেশ-ভক্ত মায়ের ছেলের ঘুম ভাঙ্গাতে ছিল বদ্ধ-পরিকর। রবীন্দ্র জ্যোতির ভাতি ছড়িয়ে পড়ল সেদিন দেশের দিক্‌দিগন্তে।

১৮৯৭ সালে বিডন উদ্যানে হ'ল কংগ্রেস সভার দ্বাদশ অধিবেশন। ডাক পড়ল কবির। তিনি গাহিলেন সেই সালের কলিকাতা জাতীয় সভায়—চিরস্মরণীয় গান—যার পুলকে চেতনার প্রেরণা উৎস হয় উচ্ছ্বসিত দেশ-প্রীতি মাতৃভক্তি এবং গৌরবের গরিমায়। ভৈরবী সুরের মধুর ছন্দে গাহিলেন গায়কেরা কবির নেতৃত্বে—

অয়ি ভুবন মন-মোহিনী
অয়ি নির্ম্মল সূর্য্য করোজ্জ্বল ধারিণী
জনক জননী জননী।

মোহ-পর্দ্দা সরে গেল দাসত্ব মনোবৃত্তির। দেশ-বাসীর চোখের সামনে জ্বলে উঠলো জ্যোতির্ম্ময়ী মাতৃ-মূর্ত্তি—গৌরবদীপ্ত মায়ের অঙ্গশোভা। মন্ত্র আবাহন করলে প্রাণবীণার সুর। সে মিলে গেল প্রাণের সুরে। সত্যই তো—

নীল সিন্ধু জল ধৌত চরণতল
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল
শুভ্র তুষার কিরীটিনী।

কিন্তু এ তো মৃন্ময়ী রূপ ভারত মাতার। কবি চিন্ময়ী রূপের আভাষ দিলেন—

প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্য-কাহিনী।

শুধু কি তাই। মা যে আমাদের দেবী অন্নপূর্ণা।

চির কল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবী যমুনা বিগলিত করুণা
পুণ্য পীযূষ স্তন্য বাহিনী।

যেমন ছন্দ তেমনি ভক্তির উচ্ছ্বাস। নাই জননীর মারাত্মক ক্ষেপণাস্ত্রের কথা, বিদেশ জয়ের রক্ত-স্রোতের নৃশংসতার আস্ফালন।

পরব্রহ্মকে পিতৃ-সম্বোধন যেমন রূপক, মা বলে ডাকাও তেমনি—তাঁর সৃজন ও সংরক্ষণপ্রকৃতি স্মরণ ক'রে। মাতৃ রূপে তাঁর বিভূতির আরাধনা বা আবাহন সঙ্কেত মাত্র—কিন্তু তার সঙ্গে জড়ানো থাকে বাস্তব-জীবনের মাতৃ-প্রাণের কোমল স্নেহের চেতনা। কবি নিজে ছিলেন বাণীর বর-পুত্র। সরস্বতীর প্রভাব তাঁর উপর অপার। তাই মাঝে মাঝে তিনি বাগ্‌দেবীর উল্লেখ করতেন—তাঁর প্রকাশ্য স্তব করতেন। এ কথা বিশদভাবে পরে বলব। এখন দেশ সেবার উল্লেখ করছি—যে সেবা বিদ্বানের অর্ঘ্য এবং উপকরণ। ১৩১৩ সালে সেদিনের দেশ-বরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথের এক অভ্যর্থনা সভায়—"দেশ-নায়ক" প্রবন্ধে কবি পড়েছিলেন—"ব্রাহ্মণের ধৈর্য্য ও ক্ষত্রিয়ের তেজ যাঁহাতে একত্রে মিলিত, যিনি সরস্বতীর নিকট হইতে বাণী পাইয়াছেন"—সেই সুরেন্দ্রনাথকে বরণ করেছিলেন, সরস্বতী দেবীর বর-পুত্র রবীন্দ্রনাথ।

তাঁর দেশ-মায়ের পূজার অর্ঘ্য প্রচুর। আমি মাত্র আর দু-একটির উদাহরণ দেবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারছি না। গানে স্বদেশকে মাতৃ সম্বোধন না করলে উচ্ছ্বাস হয়না নির্ম্মল ও প্রাণস্পর্শী।

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

মার বাহিরের রূপ কী কম তৃপ্তিকর।

ওমা ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে কী দেখেছি
মধুর হাসি।

সেই মার সবাই তো ছেলে, সাংসারিক অবস্থা যার যেমন হ'ক,

ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই তোমার রাখাল
তোমার চাষী।

তাই কবির কণ্ঠে শুনি—

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।

আমাদের জাতীয়সঙ্গীতে জনগণমন অধিনায়ক—দেশ-নায়ককে পিতৃ সম্বোধন করেছিলেন কবি। ১৩১৮ সালের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সঙ্গীতটি প্রকাশিত হ'ল, কংগ্রেসে গীত হবার পর। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সে পত্রিকার সম্পাদক। গানের নাম দেওয়া হয়েছিল "ভারত বিধাতা"।

"ব্রহ্ম-সঙ্গীত"। শ্রীমতী সরলা দেবী "ভারতী" পত্রিকার সম্পাদিকা। "নমো হিন্দুস্থান"ও কংগ্রেসে গীত হয়েছিল। "ভারতী" বলেছিল—"সুমধুর বালিকাকণ্ঠের সহিত যুবকদের সু-গম্ভীর কণ্ঠে যখন এই স্তব গান সকল ধ্বনিত হইত, তখন হৃদয় ভক্তিপরিপূর্ণ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। ধূপ-সুগন্ধ যেমন মনকে পূজার অনুকূল অবস্থা দান করে, এই সকল বন্দনা গান তরুণ যুবক ও বালিকাদের কণ্ঠে গীত হইয়া অন্তরে এই প্রকার ভক্তি সঞ্চার করিত।

পিতৃরূপেও রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে দেখেছিলেন ১৯০৩-৪ খৃষ্টাব্দে।

হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি দেখা দিলে
আজ কী বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ব্ব গগনে, দেখিনু তোমারে
স্বদেশে।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে, হেরিনু আজিকে নিমেষে
মিলে গেছ ওগো বিশ্ব দেবতা মোর সনাতন স্বদেশে।

অপূর্ব্ব দেশ-ভক্তি।

বলেছি কবি বিশ্ববিধাতাকে নাথ, প্রভু, জীবনস্বামী প্রভৃতি সম্বোধন ক'রে প্রাণের আবেগ নিবেদন করেছেন। কিন্তু তাঁর চিত্ত ভাবাবেশে পরব্রহ্মের প্রকৃতির রূপেও করেছে প্রসাদ লাভ। তাই অনেক কবিতায় তিনি মাতৃসম্বোধন করেছেন বিশ্বনিয়ন্তাকে। একদিন চিত্তের গহন হ'তে গাহিলেন—

তোমার সোনার থালায় সাজাব আজ
দুঃখের অশ্রুধার
জননী গো গাঁথব তোমার গলার মুক্তাহার।
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুঃখের অলংকার।

গভীর অনুরাগ যেথা নাই, সেথায় আসতে পারেনা অভিমান। সেই আবেগ ভরে গড়তেন অলংকার। মা আনন্দময়ী সুসজ্জিতা—

চন্দ্রসূর্য্য পায়ের কাছে
মালা হ'য়ে জড়িয়ে আছে।

এ রচনা ১৩১৫ সালের।

আর একটি কবিতা ঋতু বর্ণনা নিশ্চয়। কিন্তু তার প্রেরণামূখে আছে মরালগামিনী দেবী সরস্বতীর চেতনা। আনন্দ দল বেঁধে ছুটে আসে যখন কবির বীণায় শুনি—

আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ আমরা গেঁথেছি
শেফালি মালা

আবাহন করলেন কবি বীণার ঝঙ্কারে—

এসগো শারদলক্ষ্মী তোমার
শুভ্র মেঘের রথে
এসো নির্ম্মল নীল পথে
এসো ধৌত শ্যামল আলো ঝলমল
বন-গিরি পর্ব্বতে
এসো মুকুট পরিয়া শ্বেত শতদল
শীতল শিশির ঢালা।

মরাল-বাহিনী বাণী দেবী। সে উচ্ছ্বাসে কবি গাহিলেন—

ফিরিয়ে মরাল ডানা পাতিবারে
তোমার চরণ-মূলে

গাহিলেন—

গুঞ্জরতান তুলিয়ো তোমার
সোনার বীণার তারে
মধু মধু ঝঙ্কারে
হাসি ঢালা সুর গলিয়া পড়িবে
ক্ষণিক অশ্রুধারে।

আর একটা উদাহরণ দিই। ঋতু বর্ণনায় মুগ্ধ কবি জননীর রূপ দেখেছিলেন, রুদ্রদেবের দহন দুঃখে আবার বরষার আনন্দে। শেষ-সপ্তকে তিনি গেয়েছিলেন—

বিশ্বলক্ষ্মী,
তুমি একদিন বৈশাখে
বসেছিলে দারুণ তপস্যায়
রুদ্রের চরণতলে।

গ্রীষ্মের দুঃখের দহনেও তিনি দেখলেন লক্ষ্মী—

শুষ্ককে জালিয়ে ভস্ম করে দিলে
পূজার পুণ্য ধূপে
কালোকে আলো করলে
তেজ দিলে নিস্তেজকে
ভোগের আবর্জ্জনা লুপ্ত হ'ল
ত্যাগের হোমাগ্নিতে।

যা প্রকৃত কবি তার বিরুদ্ধবাদ করে বৃথা ক্লেশ পাননি।

তাই অবশ্যম্ভাবীকে তিনি মেনে নিয়ে, বৈশাখের রুদ্রতেজের নিকট মাথা নত করে বিশ্বলক্ষ্মীর কৃপা ভাবলেন সে অবস্থাকে।

আবার "সংযোজনে" যখন আষাঢ় কবিতা পাঠ করি, দেখি প্রকৃতির বর্ষার মনোরমতা আদর অভ্যর্থনা পেয়েছে কবি-বীণার মধুর ছন্দে। শুনি—

নব বরষার দিন
বিশ্বলক্ষ্মী তুমি আজ নবীন গৌরবে সমাসীন
রিক্ত তপ্ত-দিবসের নীরব প্রহারে
ধরণীর দৈন্য পরে
ছিলে তপস্যায় রত
রুদ্রের চরণ তলে নত।

বলেছি মেনে নিয়েছেন গ্রীষ্মের উত্তাপ। বর্ণনা করলেন তাকে।

উপবাসশীর্ণ তনু, পিঙ্গল জটিল কেশ পাশ
উত্তপ্ত নিঃশ্বাস
দুঃখেরে করিলে দগ্ধ দুঃখেরি দহনে
অহনে অহনে

তারপর পূর্ব্বোক্ত শেষ সপ্তকের কবিতার অংশ এ কবিতায় স্থান দিলেন—শুষ্কের জ্বলনকে পূজার পুণ্য ধূপ বিশ্বাসে।

"নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা"। সেথায় হেমন্ত সম্বন্ধে শুনি—

হায় হেমন্ত লক্ষ্মী তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা।

কিন্তু তা' হলেও—

ভরেছ, হেমন্ত-লক্ষ্মী, ধরার অঞ্জলি পক্ক ধানে,
দিগঙ্গনে দিগঙ্গনা এসেছিল ভিক্ষার সন্ধানে
শীতরিক্ত অরণ্যের শূন্য পথে। বলেছিল ডাকি—
"কোথায় গো অন্নপূর্ণা ক্ষুধার্ত্তেরে অন্ন দিলে নাকি।"

এতো বিশ্ব-প্রাণ না হ'লে রবীন্দ্রনাথ কি বিশ্ব-কবিরূপে বরণীয় হতেন?

এবার দিনের কথা বলি। অবশ্য ঊষা উল্লসিত করে সকলকে। দিনের প্রথম আলোক দেখে একদিন কবি গাইলেন বিশ্বদেবতাকে মাতৃরূপে আরাধনায়—

জননী তোমার অরুণ চরণখানি
হেরিনু আজি এ অরুণ কিরণরূপে

সে আলোকে বাণী শুনলেন কবি—

জননী তোমার মরণ হরণ-বাণী
নীরব গগনে ভরি উঠে চুপে চুপে

অংশ হ'তে বিরাটের চেতনা—

প্রাণ ছড়িয়ে পড়ল ভুবন মাঝে
তোমারে নমি যে সকল জীবন কাজে
তবু ধন মন নিবেদন করি আজি
ভক্তি পাবন তোমার পূজার ধূপে।

বহু কবিতায় কবির আবেগ স্পষ্ট ক'রে উল্লেখ করে নিবেদন ক'রেছেন মাতার কি পিতার চরণে। তেমন আরাধনাও বহু তাঁর রচনায়। যথা—

জগৎ জুড়ে উদার সুরে
আনন্দ গান বাজে,
সে গান কবে গভীর রবে বাজবে হিয়ার মাঝে।

বিশ্বপ্রেমের আকাঙ্ক্ষায় বল্লেন—

বাতাস জল আকাশ আলো
সবারে কবে বাসব ভালো
হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা—
বসিবে নানা সাজে।

এ-প্রত্যয়ে ভক্তি আসবে যখন

রয়েছ তুমি এ-কথা কবে
জীবন মাঝে সহজ হবে—
আপনি কবে তোমারি নাম
ধ্বনিবে সব কাজে।

ভক্তি মানুষকে নিয়ে যায় উর্দ্ধমুখে। ভক্তি উদ্দীপিত হয় নামে—কিন্তু ভক্তি যদি হয় আন্তরিক, কোন নামে শ্রদ্ধা নিবেদন করে মানুষ সে সমস্যা আপনি ঘুচিয়ে দেয় নিষ্ঠা। অতি কঠোর হীন নৃশংস কাজে যদি ভ্রমবশতঃ মানুষ আপনাকে নিযুক্ত করে এবং সেই কর্ম্মে সাফল্য লাভ করবার জন্য দেবদেবীর উপাসনা করে। সে উপাসনা আন্তরিক হলে প্রাণে জেগে ওঠে ধারণা সে কুকর্ম্মের অসারতা সম্বন্ধে। কামনার ভক্তিও প্রাণে তোলে স্নেহ, প্রেম, বিশ্ব-সম্প্রীতি যদি ভক্তি হয় গভীর ও অমল।

এই সত্যকে ফুটিয়েছেন কবি তাঁর "বাল্মীকি প্রতিভা" নাটকে। লুটতরাজের কাজে সাফল্য লাভ করবার অসাধু উদ্দেশে বাল্মীকি কালী-পূজায় আত্মনিয়োগ

করত। উদ্দেশ্য অসাধু হলেও তার মন বুদ্ধি প্লাবিত হত প্রকৃত ভক্তির স্রোতে। নরবলি দিত দস্যুর দল নরের অহিত উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাল্মীকির ভক্তি পরা-ভক্তির পথে হ'ল অগ্রসর। লোল জিহ্বা কালীকে সে জানতো মণি-রক্ত-লোলুপা। ভক্তি ফোটালে তার চেতনা, যার ফলে সে বুঝলে দয়াও তাঁরই দান। যেমন তিনি করালবদনী তেমনি তিনিই বাণী—যে দেবী বিতরণ করেন স্নেহ, দয়া, জ্ঞান, প্রকৃত বিদ্যা।

তাই বাল্মীকির কালীভক্তি পরিণত হল সরস্বতী-ভক্তিতে। বাল্মীকির জীবনের উভয় ভাগের স্তব স্তুতি মন্ত্র মাতৃ-আরাধনার বিশিষ্ট নৈবেদ্য।

ডাকাত-কালীর উপাসক বাল্মীকি যে স্তোত্রে মাতৃ আরাধনা করত, তাদের মধ্যে মলিনতা ছিল না। তারা তাই জাগালে তার প্রাণ, ভাঙলে তার মোহ নিদ্রা।

দস্যু দলপতি গদ্‌গদ কণ্ঠে গাহিল—

ত্রিভুবন মাঝে আমরা কাহারে করি না ভয়
যাহার উপরে রহেছেন কালী, সম্মুখে রয়েছে জয়।

এ ধারণা তার আন্তরিক ও স্পষ্ট। সংশয়াত্মা বিনষ্ট হয়। বিশ্বাসে ও শ্রদ্ধায় যে ভক্ত যে দেবতার উপাসনা করে সে সাধনারূপ ফল পায়। কিন্তু সে ফল স্বার্থসিদ্ধি মাত্র, ক্ষণিক।

অমাবস্যার রাত্রে বলি দেবার জন্য দস্যুরা ধরে আনলে এক কুমারী। বাল্মীকি স্তবমগ্ন। স্তবে মাতৃরূপ দেখছে দস্যুরাজ আন্তরিক সাধনায়।

রাঙা পদযুগে প্রণাম করিগো ভবদারা
আজ এ ঘোর নিশিতে পূজিব তোমারে তারা।

প্রার্থনা কিন্তু দস্যুরাজের উপযুক্ত।

ঝলসিয়ে দিশি দিশি ঘুরাও তড়িত অসি
ছুটাও শোণিত স্রোত ভাসাও বিপুল ধরা।

অবশ্য পুষ্পাঞ্জলি দেবার সময় চিত্তে জাগলো চেতনা—তিনি পরাৎপরা। সেদিন ডাকাত বাল্মীকি গাহিল—

উরোকালী কপালিনী মহাকালি সিমন্তিনী
লহ জবা-পুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী পরাৎপরা।

এই প্রার্থনাটি উল্লেখযোগ্য। কারণ এর প্রথম অংশে চিত্ত দেখলে মা কালীকে রক্ত লোলুপা মূর্ত্তিতে। কিন্তু প্রার্থনা আন্তরিক তাই দেবীকৃপা অভিব্যক্ত করলে, প্রকৃত লুকিয়ে থাকা মানব-চরিত্রে আধ্যাত্মিকতা। মহা-দেবী পরাৎপরা—স্তুতির ভাষা আন্তরিক, তাই মন আকৃষ্ট হ'ল সেই বিভূতিতে।

দস্যু বাল্মীকির স্তবের উভয় অংশই প্রভাব বিস্তার করলে তার মনে। প্রথম ভাগে চাহিল মন শোণিতাঞ্জলি নিবেদন করতে।

দস্যুরা সেই বন্দিনী বালিকাকে নিয়ে এলো বলির যূপ-কাষ্ঠের সমীপে। কাতরা বল্লে—

দয়া করো অনাথারে, কে আমার আছে
বন্ধনে কাতর তনু মরি যে ব্যথায়।

নেপথ্যে বনদেবীও দয়া ভিক্ষা করলেন।

দেবী মাহাত্ম্য জাগালো বাল্মীকির অন্তরাত্মা। সে মহাদেবী পরাৎপরাকে নিবেদন করেছে পুষ্পাঞ্জলি। সে রক্তজবা রঙীণ করলে তার প্রাণ—রক্ত-লাল নয়, স্নেহ-দীপ্তির উজ্জ্বলতা। তার চেতনার অভিব্যক্তি ওঠালো দস্যুকে সুরভাবের স্তরে অসুর নিষ্ঠুরতা হতে। মন বল্লে—

সব ভেসে গেল গো সব ভেসে গেল গো
মরুভূমি ভরে গেল বরষার প্লাবনে।

বন্দিনী কুমারী বন্ধন মুক্ত হ'ল। বাল্মীকি মুক্তি লাভ করলে নির্দ্দয় আবেগের করাল বেগ হতে। রুধির-লোলুপতা দৃষ্টি পথে এলো না—লোল-জিহ্বা নিষ্ঠুরতা নিধন বলি চায়।

বাল্মীকি প্রতিভা রচিত হয়েছিল ১২৮৭ সালে—প্রায় আশী বৎসর পূর্ব্বে: এর মাঝে দেবী-বিভূতির মহান দিক ফুটিয়ে তুলেছিলেন তরুণ কবি। বোঝালেন ভক্তি যদি হয় প্রবল, ভগবানের কল্যাণময় বিশ্বকরুণার জ্যোতি হয় উদ্ভাসিত নর-ঘাতক দস্যুরও চিত্তে।

বাল্মীকির অন্তরাত্মা সত্যের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করলে। মৃগ-শিকার করতে গিয়েও সেই পরিস্থিতি। অহিংসার দীপ জ্বলে উঠেছে প্রাণে। দেখলেন—হরিণ শাবক দুটি, প্রাণভয়ে ধায় ছুটি। শিকারী দস্যুদের বল্লেন সর্দ্দার—

থাক্ থাক্ থাক্ ওরে এ দারুণ খেলা রাখ
আজ হতে বিসর্জ্জিনু এ ছার ধনুক-বাণ।

অনুচরেরা বিস্মিত হল—ত্যাগ করলে অহিংসক রাজাকে। বল্লে—

তোর দশা রাজা ভালো তো নয়।
পাখিটি মারিলে কাঁদিয়া খুন
না জানি কে তোরে করিল গুণ
হেন কভু দেখি নাই।

তারপর সেই ঐতিহাসিক ক্রৌঞ্চ-মিথুন বধ। কবিতার সুললিত বাণী, দেবভাষার অপ্রত্যাশিত প্রকাশ তাকেই বিস্মিত করলে। অতীত দিনের দস্যুরাজ দেবভাষায় প্রাণস্পর্শী ভাষায় বল্লে—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।

এ যে বাণীদেবী প্রণোদিত বাণী। দেবী সরস্বতী এলেন। সে শুভ্র প্রতিমা অভিভূত করলে আদিকবিকে। হৃদি কমল হতে উঠলো স্তব—

পূর্ণ হ'ল বাসনা দেবী কমলাসনা
ধন্য হ'ল দস্যুপতি গলিল পাষাণ

ভক্তি-বিগলিত প্রাণ গাহিল—

তব কমল পরিমলে রাখো হৃদি ভরিয়ে
চিরদিবস করিব তব চরণ সুধা পান

একি ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তন? এক দেবীর বিসর্জ্জনে অন্য দেবীর পূজার বেদী সাজানো। মা কালীর ভক্তিই তো দস্যু ভক্তকে পৌছে দিয়েছে বাণী-মন্দিরে। ভক্তি উদ্দীপন করে জ্ঞান। মা তো এক—নাম বিভিন্ন। পূজার উপকরণে নৈবেদ্য সাজানো হয় রুচি অনুসারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন—বাল্মীকি যুগের অবশ্য পরে—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্।

যে যে ভক্ত, সশ্রদ্ধভাবে যে দেবতার আরাধনা করতে ইচ্ছা করে, সেই ভক্তের সেই দেবতার প্রতি অচলা শ্রদ্ধার বিধান করি আমি।

সেই শ্রদ্ধাই পথ চিনে নেয়। তাই বাল্মীকির কালী ভক্তি প্রেরণা আনলে বাণী উপাসনার। বুঝলেন মা কালী—এতদিন পরে প্রকৃত পথ দেখালেন। সেই পথে চলবার প্রয়াসে আত্মনিয়োগ করলেন উপাসক।

এতদিন কি ছল করে তুই পাষাণ করে রেখেছিলি
(আজ) আপন মায়ের দেখা পেয়ে নয়ন
জলে গলেছি মা।

যে কালো সেই মা-ইতো আলো। গাহিলেন—

কালো দেখে ভুলিনে আর আলো দেখে ভুলেছে মন
আমায় তুমি ছলে ছিলে, (এবার) আমি তোমায়
ছলেছি মা।

মায়ের মায়া কাটিয়ে এবার মায়ের কোলে চলেছি মা। অপরূপ স্তোত্র। মা মায়াময়ী শ্মশানকালী আবার সেই মায়েরই কেলি—জ্যোৎস্নাভরা আশ্রয় শুভ্রকরণ মায়ার আঁধার কাটে সে শুভ্র-বরণার জ্যোতিতে।

প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে মা সরস্বতী বর দিলেন—

বসি তোর পদতলে কবি বালকেরা যত
শুনি তোর কণ্ঠস্বর শিখিবে সঙ্গীত কত,
এই নে আমার বীণা দিনু তোরে উপহার
যে গান গাহিতে সাধ ধ্বনিবে ইহার তার।

আদিকবি বাল্মীকির মুখের স্তব আমাদের বিশ্বকবির আন্তরিক আরাধনা।

কবিগুরু বাল্মীকিকে নমস্কার করে আমাদের কবি মধুসূদন আরম্ভ করেছিলেন—মেঘনাদবধ কাব্য

নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
বাল্মীকি হে ভারতের শিরশ্চূড়ামণি
তব অনুগামী দাস।

অবশ্য কৃত্তিবাসের মতে রত্নাকর দস্যু রাম নাম জপে হয়ে ছিলেন বাল্মীকি।

রামনাম ব্রহ্ম স্থানে পেয়ে রত্নাকর
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বৎসর।
তাঁর সর্ব্বাঙ্গ খাইল বল্মীক কীটগণ।"

ব্রহ্মা তাকে নাম দিলেন বাল্মীকি, গাহিতে আজ্ঞা দিলেন রাম নাম।

তখন বর দিলেন—

সরস্বতী রহিবেন তোমার জিহ্বায়
হইবে কবিতা রাশি তোমার ইচ্ছায়।
শ্লোকছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা
জন্মিয়া শ্রীরামচন্দ্র করিবেন তাহা।

কবিগুরুর আর একটি মাত্র স্তোত্রের উল্লেখ করব। এ কবিতা বাণী বন্দনা। কাব্য-কাহিনী পুরস্কারের এটি অন্তর্ভুক্ত। কবির প্রাণে সরস্বতী-ভক্তি অমল উৎসে বিতরণ করেছেন তিনি দারিদ্র্যতুষ্ট পণ্ডিতের মুখে।

বিমলমানস সরসবাসিনী। শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী বীণাগুঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী কমল কুঞ্জাসনা জননীরে হৃদয়ে রেখে, ব্রাহ্মণ বল্লেন—

"ক্ষ্যাপার মত আছি চিরদিন উদাসীন আনমনা—যদিও অপরে চারিদিকে সব দুনিয়া বাঁটিয়া নিতেছে। মার রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনী অমৃত উৎসধারা।

যে রাগিণী শুনি নিশি দিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত্ত্যমাঝে বহমান নিয়ত আত্মহারা।
যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া
হোমশিখা সম উঠিছে কাঁপিয়া
অনাদি অসীমে পড়িছে ঝাঁপিয়া বিশ্বতন্ত্রী হতে।
যে রাগিণী চিরজন্ম ধরিয়া
চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া
অশ্রুহাসিতে জীবন ভরিয়া ছুটে সহস্র স্রোতে।

কবির রাশি রাশি কবিতার স্রোত বিশ্লেষণ করলে সত্যই কি মনে হয় না কত আন্তরিক উপলব্ধির উপাদানে গড়া এই স্তোত্র।

প্রাণের উৎস মুখের পবিত্র নিবেদন—

তুমি মানসের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতিবিকাশি
কুন্দ-ধবল সুন্দর হাসি বীণা হাতে বীণাপানি।
শেষে ভাসিয়া চলিবে রবিশশী তারা
সারি সারি যত মানবের ধারা
অনাদি কালের পান্থ যাহারা তব সঙ্গীত স্রোতে
দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল
ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল
দশ দিগবধূ খুলি কেশজাল নাচে দশ দিক হতে।

এর ওপর টীকা ভাষ্য চলেনা। কাব্যের নায়কের মুখে ফুটেছে বিশ্ব কবির চিত্তের আকুতি—বাণী বন্দনায়।

"বৌঠাকুরাণীর হাট" আগমনী কবিতা মর্ম্মস্পর্শী।

সারা বরষ দেখিনি মা, মা তুই আমার কেমন ধারা
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হল নয়ন-তারা
এলি কি পাষাণী ওরে
দেখব তোরে আঁখি ভরে
কিছুতেই আসেনা যে মা পোড়া এ নয়নের ধারা।

একি মাত্র অভিনেতার উক্তি?

বলা বাহুল্য, মাত্র আবেগ ভরে সামান্য দু একটা উদাহরণ দিলাম বিশাল রচনাবলী হতে কবীন্দ্র রবীন্দ্রের। প্রকৃতির মাধুরী স্বদেশের মাধুরী তাঁর মধুর অন্তরাত্মায় বিরাজ করতো সুন্দর বিমোহন আবেগে।

মাত্র বঙ্গলক্ষ্মী হতে দুকথা তুলে প্রলোভন শেষ করছি তাঁর মাতৃ বন্দনার মনোলোভা শোভা।

তোমার মাঠের মাঝে, তব নদী তীরে
তব আম্রবনে ঘেরা সহস্র কুটীরে
দোহন মুখর গোষ্ঠে, ছায়া বটমূলে
গঙ্গার পাষাণ ঘাটে সহস্র দেউলে
হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী হে বঙ্গ জননি
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।

বিশ্বের সৌন্দর্য্য বঙ্গলক্ষ্মীর সর্ব্বাঙ্গ। বিশ্বকবি এ বিশ্বের সৌন্দর্য্য প্রাচুর্য্যের প্রতিফলনে পরমানন্দ লাভ করেছেন।

সকালে বের হয়ে যায় অলক, চেম্বার সেরে সেখান থেকে হাসপাতাল, সেখানে কাযের চাপ রোগীদের ভিড় তো আছেই। বড় সড় অপারেশন থাকলো তো কথাই নেই। অনেকদেরী হয়ে যায় বাড়ী ফিরতে।

কাযকে কোনদিন অবহেলা করেনি অলক, ভয়ও করেনি। সারাদিনরাত ওর মাঝে মশগুল হয়ে থাকতে পারে, থাকেও।

ছক বাঁধা জীবন ডাক্তার অলক সেনের।

হাসপাতাল থেকে ফিরে লাঞ্চ সেরে ঘণ্টা দুয়েক বাড়ীতে একটু বিশ্রাম নিয়েই আবার বৈকালে বের হয়ে যায় চেম্বারে। ফেরে গভীর রাত্রিতে কাযে, ঠাসবুনোন দিনগুলো কোনদিকে কেটে যায় জানতেই পারেনা।

এ নিয়ে শমিতা প্রথম প্রথম একটু বিরক্ত হোত।

একটা মেয়েকে জীবনে সঙ্গিনী করে এনে—তাকে দূরে সরিয়ে রেখেছে অলক নির্মম ভাবে। চেষ্টা করেছিল শমিতা কথাটা জানাতে। সারাটা দিন তার কাটতে চায় না।

কিন্তু অলক হেসেছিল ওর কথায়। জবাব দিয়েছিল—কি করি বল, ডাক্তারদের সময় থাকেনা।

শমিতা চুপকরে শুনেছিল কথাটা, জবাব দেয়নি। মনে হয়েছিল তার অসীম নিঃসঙ্গতাকে সে বোঝাতে পারবেনা। বোঝাতে পারবেনা কি নিবিড় বেদনা তার মনে জমে ওঠে।

অলক গাড়ী নিয়ে বের হয়ে যায় বৈকালেই। কয়েকটা জরুরী কেস আছে। একটা রোগীকে কিছুতেই সুস্থ করে তুলতে পারছেনা, একটা ছেলের হাতে গ্যাংগ্রিণ ফর্ম করেছে কোন উপায় নেই। হাতটা কেটে বাদই দিতে হবে।

নিজের জগতে হারিয়ে যায় অলক, এখানে শমিতার কোন ঠাঁই নেই।

সেদিন লাঞ্চের সময় ওরা খেতে বসেছে।

শমিতা এই একটুকু সময় অলককে কাছে পায়, ক' বছরই কেটে গেছে। ক্রমশঃ শমিতার এই নির্জনতা সয়ে গেছে। অজানার ঘরে অখণ্ড অবসরের মাঝে সে যেন নিজেকে নোতুন করে খুঁজে পেয়েছে।

খাওয়ার পরই অলক সিগারেট টানতে টানতে উপরের ঘরে গিয়ে একটা মোড়কে কখানা বই দেখে একটু অবাক হয়।

একই বই কয়েককপি প্রকাশকের দোকান থেকেই সোজা এসেছে। মোড়কটা খোলা। লেখক নয়, কোন ভদ্রমহিলার লেখা বইটা।

শমিতার পত্র-পত্রিকা আসে কয়েকখানা, বইও কেনে। অলক বাধা দেয় না, সে জানে সময় কাটাতে গেলে এগুলোর দরকার।

শমিতা একাই রয়ে গেছে, ক'বছর তাদের বিয়ে হয়েছে ঠিক খেয়াল নেই অলকের। তাদের ঘর শূন্যই রয়ে গেছে।

শমিতাও এই শূন্যতার মাঝে নিজের সময় কাটাবার ব্যবস্থা করে নিয়েছে, বলে ওঠে অলক।

—একই বই এতগুলো কপি কি হবে?

হাসে শমিতা। মিষ্টি একটু হাসি। নির্জন অলস মধ্যাহ্নে ওকে কেমন ভালো লাগে দেখতে। স্নান সেরে একরাশ ভিজে চুল খুলে দিয়েছে, সাদা শাড়ীর সঙ্গে পরেছে লাল একটা ব্লাউজ। মেঘনামা আকাশের মত ওকে রহস্যময়ী বলেই মনে হয় অলকের।

ওকে ঘিরে ফুটে উঠেছে মৃদু একটা সুবাস।

শমিতা খুশীভরা কণ্ঠে বলে ওঠে—আমার লেখা বই, ছাপাতে আমি চাইনি। ওরা কপিটা দেখে একরকম জোর করেই নিয়ে গেল।

অলক অবাক হয়ে চেয়ে থাকে স্ত্রীর দিকে। ওর ডাক নাম ওই রঞ্জনাই—নামটা তার খুব চেনা, কিন্তু কল্পনাও করেনি যে এই বই শমিতারই লেখা ওর ছেলেবেলার নামে।

...কখন লিখল তাও জানেনা অলক, শমিতাও তাকে কিছু বলেনি, প্রকাশকরাই বা কি করে খবর পেল, এই কপি নিয়ে গেল তাও জানায়নি এর আগে।

শমিতা অনেক কাযই করে যার কোন খবরই রাখে না অলক, শমিতা ও তাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনা।

বই এর কথা ও এতদিন জানায়নি। বইটা বের হয়েছে মাস খানেক হয়ে গেল। শমিতা ওর হাতে একখানা বই তুলে দেয়।

—পড়বে না?

অলক সহজ ভাবে বলবার চেষ্টা করে—দাও। সময় তো নেই। তবু পড়তেই হবে। তোমার লেখা বই।

বইখানা হাতে নিয়েই বিছানায় শুয়ে পড়ল অলক। দুএক পৃষ্ঠা খুলে দেখছে। শমিতা এ সময় আর ওকে বিরক্ত করতে চায় না। তবু পড়ছে বইটা পড়ছে সে।

অলক ভাবছে হাসপাতালের কথা, সাল্‌ফা ড্রাগস ব্যবহার করে বেশ সুফলই পাচ্ছে অনেক কেসে। সেই ছেলেটার হাতের ঘাটা শুকিয়ে আসছে, মনে হয় অপারেশন্‌ করতে হবেনা।

ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে আসে—বইটা কয়েকপাতা পড়েছে মাত্র, ঠিক ভালো লাগেনা। কেমন একঘেঁয়ে লাগে। চোখবুঁজে আসে ঘুমে।

বৈকালবেলায় চেম্বারে রোগী দেখে চলেছে। বেয়ারা এক জনের পর অন্যজনকে ডাকছে। এমন সময় ওর পাশের চেম্বারের আই-স্পেশালিষ্ট ডাক্তার করকে ঢুকতে দেখে মুখতুলে চাইল।

ডাঃ কর বলে ওঠে

—কনগ্রাচুলেশন জানাতে এলাম।

ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারে না অলক, ডাঃ কর বলে চলেছেন,—চমৎকার লিখেছেন বইটা। আপনার স্ত্রী যে এমন একজন সুলেখিকা তাতো বলেননি মশায় কোনদিন। লাকি ফেলো।

অলক হাসবার চেষ্টা করে, ও। হ্যাঁ হ্যাঁ লেখেন বটে।

—লেখেন মানে? রীতিমত জাতলিখিয়ে। একদিন দেখা করে অভিনন্দন জানিয়ে আসবো।

ডাঃ কর বের হয়ে গেলেন। অলক চুপকরে কি

ভাবছে। তার স্ত্রীর খবর এরা যেন তার থেকে বেশী রাখে। তার জন্য অলককে এসে ধন্যবাদ জানায়।

—স্যার। বেয়ারার ডাকে চমক ভাঙ্গে তার, বলে ওঠে অলক,—হ্যাঁ, অন্য রোগীকে আসতে বলো।

সব যেন তার কেমন ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। বই খানা পড়তে দিয়েছিল শমিতা। কপিটা এনেছে এখানেও।

পরবর্তী রোগী মিঃ দত্ত, মস্ত বড় ব্যবসায়ী তাঁর স্ত্রী। ভদ্রমহিলা টেবিলে বইটা দেখে বলে ওঠে—আপনার স্ত্রীর লেখা শুনছিলাম।

অলক যেন মুখের উপর একটা আঘাত খেয়েছে। জবাব দিলনা। ভদ্রমহিলা বলে চলেছেন।

—পত্রিকায় বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি পড়েছি। কি চমৎকার লেখা। একদিন গিয়ে আলাপ করে আসবো। এতবড় লেখিকা আপনার স্ত্রী—আপনি তো ভাগ্যবান, ডাক্তারবাবু।

অলক হাসবার চেষ্টা করে, মিসেস দত্তও যেন আজ তাকে অন্য চোখে দেখছে।...অলক গম্ভীরভাবে ওকে পরীক্ষা করে প্রেসক্রপশন লিখতে থাকে।

..আজ মনে হয় তার ডাক্তারীর চেয়ে রাতারাতি শমিতা অনেক খ্যাতি পেয়ে গেছে, সমাজের অনেক উপরে উঠে গেছে।

...একটু সকাল সকালই আজ ফেরবার আয়োজন করে অলক। দেহমনে মাঝে মাঝে কেমন ক্লান্তি বোধ করে, সত্যিই সে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে চলেছে দিনরাত। একটু বিশ্রাম চায় সে।

বাড়ী ঢুকছে।...বাইরের ঘরে কাকে বসে থাকতে দেখে একটু অবাক হল। এসময় সে বাড়ী ফেরেনা। অসময়ে ওকে ফিরতে দেখে শমিতা এগিয়ে আসে। মুখে-চোখে একটু বিস্ময়ের চিহ্ন। আগে এসব লক্ষ্য করতো না অলক, আজ সে করে। সেও অবাক হয়েছে।

শমিতাই পরিচয় করিয়ে দেয়—ইনিই প্রগতি প্রকাশক-এর মালিক নিখিলবাবু, আমার স্বামী ডক্টর সেন।

ভদ্রলোক উঠে নমস্কার করেন। নিখিলবাবু বলে চলেছেন—তিন মাসে দুটো এডিশন শেষ হয়ে গেছে, সত্যিই এমন বই অনেকদিন বাংলা সাহিত্যে বের হয়নি। পুরস্কার পাবেই—সিনেমাতেও উঠবে। এমন করে প্রেমের গল্প অনেকদিন কেউ বলেনি। জীবনে প্রেম আসে, তা আবার হারিয়ে যায় সেইটাই চিরন্তন সত্য, কিন্তু সেই হারা.ণা প্রেম মনে যে সুরভি রেখে যায় তা শাশ্বত। উনি সেই চিরন্তন প্রেমের জয়গান গেয়েছেন। উপন্যাস কবিতা কাব্য সবই বলতে পারেন একে। এই তো সমালোচক বিধুশেখরবাবু লিখেছেন—

ব্যাগ থেকে একটা দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠা বের করে এগিয়ে দেন তিনি।

...শমিতা ইতিমধ্যে উঠে গেছে ভেতরে, চায়ের পেয়ালা প্লেটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অলক, এসব কথা তার মাথায় ঢোকেনা। লোকটির দিকে চেয়ে থাকে। অনেক কষ্টে যেন তাকে সহ্য করছে সে। শমিতার কোন প্রেম কাহিনী নিয়ে এত প্রকাশ্য আলোচনা তার বিশ্রী লাগে। কথাটা কেমন আপত্তিজনকও।

শমিতা ইতিমধ্যে চা—কিছু সন্দেশও এনেছে। নিখিল-বাবুর সামনে সেগুলো রেখে দিয়ে শমিতা বলে ওঠে—নিন।

নিখিলবাবু খেতে খেতে বলে চলেছে অলককে।—পরশু সন্ধ্যায় একটা পার্টি দিচ্ছি, ফিলিমে উঠছে বইটা, পুরস্কারও পেয়েছে। ক'জন সাংবাদিক সাহিত্যিককেও ডাকবো। যদি আপনি দয়া করে আসেন।

শমিতার দিকে চাইল অলক। শমিতা স্বামীর দিকে চেয়ে আছে। মুখে-চোখে তার খুশীর আভাষ। শমিতাকে এত হাসি-খুশী অনেককাল দেখেনি সে!

শমিতাই বলে ওঠে—সময় করতে পারলে ইনিও যাবেন।

অলককে কোন জবাব দেবার অবকাশ দিল না শমিতা, যেন অলকের সব কিছুর ভার তার উপরই।

...বইখানা আজ পড়তে বসে অলক। নিখিলবাবুর কথাগুলো ভোলেনি সে। কেমন একটা কালো ছায়ার মত ওই কথাগুলো মনের নির্মল আকাশটুকুকে ঘিরে তুলেছে।

শমিতার কোন প্রেমের কাহিনী, শমিতা তার স্ত্রী, তার প্রেমের কাহিনী মন দিয়ে পড়ে চলেছে সে, এটা তার জানা দরকার।

রাত্রি কত জানে না, আজ অলক পড়ায় মন দেয়। এতদিন যাকে কোন আমলই দেয়নি, আজ তাকে যেন এড়াতে পারে না।

ক্রমশঃ বইএর মধ্যে ডুবে গেছে সে। শমিতা এগিয়ে আসে।—কতো রাত হয়েছে, শোবেনা?

—উহুঁ।

অলক মাথা নাড়ে, পাতার পর পাতা উল্‌টে যায়। শমিতাও মনে মনে খুশী হয়েছে। এতদিন দেখেছে কাষ নিয়েই ব্যস্ত থাকে অলক, কোনদিন খবরের কাগজ আর মেডিক্যাল জার্নাল ছাড়া আর কিছু পড়েনি। আজ তার বইখানা পড়তে দেখে খুশীই হয়।

শমিতাকে তা হলে আজ অলকও স্বীকৃতি দিয়েছে, এতদিন বাইরের অনেক লোকের মুখেই শুনেছে নানা প্রশংসা, কিন্তু অলক বইখানা পড়েওনি। আজ সে পড়ছে।

...এই পরিবেশ অলকের চেনা। সেদিন সেও এই বাড়ীতে গিয়েছিল, সামনেই বাঁধানো বকুল গাছ—পিছনে একটু বাগান, ছায়াঘন বকুল গাছের নীচে এমনি চাঁদনী রাতে সেও বসেছিল, শমিতাকে সেদিন কি এক অন্য দৃষ্টিতে দেখেছিল সে।

চেনেনি, জানেনি—শমিতা এই বকুল ছায়ায় ইতি-পূর্বেও বসেছিল—সেদিনকার সুরভি ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল ওর নীরব বেদনার সুরে।

কিন্তু আর একজনকে ঘিরে। অন্য কোনজনকে ঘিরে শমিতার নারীমনের প্রথম মুকুল প্রস্ফুটিত হয়েছিল, মনের আকাশ ভরে তুলেছিল আনন্দের সৌরভে সার্থকতার স্বপ্নে।

কিন্তু সব সেই আয়োজন তাকে কেন্দ্র করে নয়।

সারা বই এর ছত্রে ছত্রে কি অসীম ব্যাকুলতা ফুটে উঠেছে—একটি হারানো মানুষের জন্যে। কে সে জানে না অলক।

আজ মনে হয় শমিতার সব কিছুই কেমন অর্থপূর্ণ, এতটা সে কোনদিনই ভাবেনি, আজ সব কথা তার এই এড়িয়ে থাকার অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বারো বৎসর এক সঙ্গে বাস করেছে তারা, এক যুগই বলা যায়; কিন্তু শমিতা তার অতীতের স্মৃতির মধ্যেই ডুবে রয়ে গেছে—মনে মনে অন্যজনকে কামনা করে এসেছে, স্বপ্ন দেখছে সেই হারানো মানুষটিকে, তাই এড়িয়ে গেছে অলককে।

রাত হয়ে গেছে, নিস্তব্ধ তারাকিনী রাত্রি। রাতের বাতাস হু হু ঝড় তুলেছে গাছগাছালির মাথায়, ওরই সংক্রমণ লেগেছে অলকের মনে। আজ জীবনের অনেক পথ সহজভাবেই এসেছে—ভাবেনি সেই পথের নীচে এতবড় ফাঁক আর ফাঁকি রয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ সেটা ধরা পড়তে সে চমকে উঠেছে।

এতদিনের বিশ্বাসের কোন মূল্য নেই। সব প্রীতি প্রেম ভালবাসা নিছক অভিনয় মাত্র।

ওদিকের বিছানায় শমিতা নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে—ঘুমের স্তব্ধতায় তার মুখে একটা প্রগাঢ় শান্তি ফুটে উঠেছে। অলকের মনে হয় ও কোন রহস্যময়ী রাত্রি, অন্ধকারে ঢেকে রেখেছে নিজের সব কিছু। ওকে চেনা যায় না—ধরা যায় না।

দূর আকাশে তারার মতই রহস্যময়ী, অধরা সে।

...ওকে নিয়েই এতদিন বাস করে এসেছে, স্বপ্ন দেখেছে মনে, নানা রংএর স্বপ্নজাল বুনেছে।

নিজের কাযে মন দেবার চেষ্টা করে অলক।

কোথায় একটা প্রশ্ন বারবার তার মনে জেগে উঠেছে, কাঁটার মত বিঁধছে খচ্‌খচ্‌ করে। শমিতা চায়ের টেবিলে বসে টোষ্টে মাখন মাখাতে মাখাতে বলে ওঠে—

—আজ সন্ধ্যায় তাহলে যাচ্ছো?

অলক কথাটা ভুলেই গিয়েছিল, ওর দিকে চেয়ে থাকে, শমিতাই বলে।

—এত করে বলে গেলেন ভদ্রলোক, গেলে খুশী হবেন, অনেকেই আসবেন। আজ অলকও মনে মনে যেতে চায়।

সেও যেন দেখতে চায় অনেকের মধ্যে শমিতার সেই হারানো মানুষটি আছে কিনা।

এসব অনুষ্ঠানে কোনদিন আসেনি অলক। তার নিজের পরিচয়ে এখানে সে আমন্ত্রিত নয়, এসেছে শমিতার পরিচয়ে।

অনেক অধ্যাপক সমালোচক সাহিত্যিক বোদ্ধা পাঠক পাঠিকারা এসেছেন, অলক ওদের কথাবার্তা, দর্শন আর আলোচনায় বিরক্তি বোধ করে।

শমিতা ওদিকে কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে কথা বলছে, একজন অধ্যাপক কাম্ কলা-সমালোচক ওকে কি একটা সাহিত্যের সমস্যা নিয়ে বোঝাতে চাইছে। দর্শনের অধ্যাপক বোধ হয়।

তাই প্লেটো—এরিলাস থেকে শোপেনহাওয়ারের নেতিবাচক দর্শনের তত্ত্ব নিয়ে পড়েছে, বর্তমান সাহিত্যে শোপেনহাওয়ারের প্রভাব যে অপরিসীম তাই প্রমাণ করতে তিনি বদ্ধপরিকর, এই নেতিবাচক পরিবেশে শমিতাদেবীর বই যে একটা বিস্ময়, এর মাঝে প্রতিটি ছত্রে যে প্রাণের সত্যকার আবেগ ধ্বনিত হয়েছে—তাই বলতে চান তিনি।

অলক ঘড়ির দিকে চাইল। রাত হয়ে গেছে। শমিতার কাছে পৌছাবার উপায় নেই, অনেকেই ওকে ঘিরে রয়েছে।—অপরিচিতের মত এককোণে দাঁড়িয়ে আছে অলক। এখানে যেন সে রবাহূত। এতগুলো রোগী আজ ফিরে যাবে, হাসপাতালে একটা জরুরী কায আছে।

দুএকজন মহিলা ওর দিকে চেয়ে কি বলাবলি করছে, হাসছে! অলক চমকে ওঠে। এই অর্থপূর্ণ হাসির অর্থ সে জানে, যেন ব্যঙ্গ করছে ওরা তাকে।

কোন বক্তা তখন শমিতাদেবী প্রেমের যে শাশ্বত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তারই বর্ণনা করে চলেছে। প্রেম মানুষের জীবনে আসে—সেই প্রেম মানুষকে সার্থক করে তোলে।

...অলক বের হয়ে এল ভিড় থেকে, মেয়েদের অর্থপূর্ণ হাসিটা তখনও চোখের সামনে ভেসে ওঠে; এখানে এসে সে ভুলই করেছিল। এখানে তাকে সম্মান করবার কেউ নেই, সে এখানে অপরিচিত অনাহূত।

রাগে—অপমানে আজ অলকের মন বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

শমিতা এখানে এসে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে; তাকে ঘিরেই সব আয়োজন, নিজেও জানে না এসবের যোগ্য কিনা।

লেখাটায় হাত দিয়েছিল নেহাৎ সময় কাটাবার জন্যই। একা একা বিশ্রী লাগলো, কি খেয়াল বশে সে চেষ্টা করেছিল লিখতে।

...নিজের অতীত পরিবেশ—আর চেনাজানা মানুষগুলোকে এনে উপন্যাসের মধ্যে হাজির করেছিল; সেই বই যে রাতারাতি তাকে এত খ্যাতি পরিচিতি এনে দেবে ভাবেনি। সকলেই জিজ্ঞাসা করছে—নোতুন কি লিখছেন? প্রকাশক নিখিলবাবু তো এখন থেকেই কপির জন্য তাড়া দিচ্ছেন। হিতবাণী পত্রিকার সম্পাদক লেখার জন্য ঝুলোঝুলি, তার মাঝে ওই সভায় তার মানপত্র কে পাঠ করে চলেছে; কেমন যেন হারিয়ে যায় শমিতা নোতুন কোন জগতের ভিড়ে। নিঃসঙ্গ জীবনের ঘেরাটোপ থেকে সে এসে পৌচেছে একেবারে হাটের মাঝে, আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে ভিড়ে—তার ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেছে হাজারো কণ্ঠের কলরবে।

...অভিনন্দনপর্ব শেষ হতে হঠাৎ শমিতার মনে পড়ে অলকের কথা, কোন কর্মকর্তাদের হাতে ওকে সঁপে দিয়ে সে ডায়াসে গিয়ে উঠেছিল, সে কর্মকর্তাকেও ঠিক খুঁজে বের করতে পারে না।

অলকও নেই। এদিক ওদিক খুঁজেও পায় না। চলে গেছে। সেই প্রকাশক ভদ্রলোকই গাড়ীতে করে ওকে পৌছে দিচ্ছে বাড়ীতে।

রাত হয়ে গেছে। নির্জন পথে চাঁদের আলো পড়েছে. স্তব্ধ হয়ে বসে আছে শমিতা।

অলকের সামনে নিজেকে আজ অপরাধী মনে করে শমিতা। মনটা খুশীতে ভরপুর। হাতে এক গাছা রজনী গন্ধার স্তবক, ম্লান সুরভি ওঠে ওর থেকে।

...অলক ওকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে চাইল মাত্র, ভদ্রলোক ওকে নামিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে বের হয়ে গেল, শমিতার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। অলক চাঁদের আলোয় ওর দিকে চেয়ে আছে। এই লাস্যময়ী শমিতাকে হঠাৎ সে বারো বছর পর নোতুন করে দেখছে।

—চলে এলে যে?

শমিতাই অভিযোগটা করে তার কাছে। অলক বলে ওঠে—দেখলাম ওখানে আমাকে কেউ চায় না। তাই চলে এলাম।

শমিতার মুখ-চোখে একটা পরিবর্তন ফুটে ওঠে। অলক বলে চলেছে—তোমার জগৎ তোমারই থাক।

—তাই বলে রাতের বেলায় একা ফেলে রেখে চলে এলে ?

অলক বিরক্তি বোধ করে ওর কথায়। দেখেছে সেখানে ওর স্তাবকের ভিড়, বলে ওঠে—তোমাকে পৌঁছে দেবার লোকের অভাব হবেনা তা জানতাম।

তুমিও চাওনা যে আমি ওখানে থাকি।

—মানে! শমিতা চমকে ওঠে ওর কথায়।

অলক কথার জবাব দিল না। উঠে পড়ে।—রাত হয়েছে। কাল আবার সারাদিন কায করতে হবে। গুড নাইট।

অলক এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শমিতা, হাতের ফুলগুলো কেমন ভারি ঠেকে। অলকের মুখে-চোখে আজ কি নোতুন একটা পরিবর্ত্তন দেখে চমকে উঠেছে সে। কি বলতে চেয়েছিল কিন্তু বলেনি।

শমিতার রাতে ঘুম আসে না। দুটো পাশাপাশি ঘর —মধ্যে একটা দরজা, সেইটাই আজ ব্যবধান রচনা করেছে। শমিতা অবাক হয়, যেদিন সে ছিল অপরিচিত কেউ তাকে চিনতো না, সেদিন অলকও তাকে অবজ্ঞার ফেলে রেখেছিল ঘরের কোণে, আজ বাইরের জগতে তার ডাক শুনেও সে কেমন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। হয়তো মনে মনে হিংসা করে শমিতাকে। না হয় আরও কিছু ভাবে। এ প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি সে কোনদিনই।

অলক জানলার দিকে চেয়ে আছে—ঘুমের প্রশান্তি আজ চোখে নামেনি। অগুণতি তারার মাঝে নীল ধ্রুব-তারাটা জলছে কি অসীম বেদনায়।

আজ মনে হয় অলকের জীবনের একটা দিককে অবহেলা করেছিল, সেই অবহেলিত দিকটাই তার অজ্ঞাতে এতবড় আঘাত হানবে জানতো না। স্বপ্নেও ভাবেনি অলক।

ওই ভদ্রলোককে ঠিক চিনতে পারেনি। মনে হয় ও যেন শমিতার অনেক দিনের চেনা। ওই ওকে লেখার ব্যাপারে উৎসাহিত করেছে, নিজেই প্রকাশ করেছে ওর বই।

অতীতে একদিন কোন যোগাযোগে পরিচয় ছিল দুজনের মধ্যে তাকে আজও ভোলেনি তারা। দুজনেই তাই ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠেছে এই লেখার ব্যাপারে।

মানসীকে আজ লেখিকার মর্যাদা দিয়ে নিখিল অতীতের সেই স্বপ্নস্মৃতিকে সার্থক করে তুলতে চায়। পেরেছেও।

অলককে তাই আজ অবজ্ঞা করে শমিতা, ডেকে নিয়ে গিয়ে প্রকাশ্যে আজ তাকে বোঝাতে চেয়েছে তারও একটা মর্যাদা আছে, প্রতিষ্ঠা আছে।

যাকে সে এতদিন অবহেলা করেছে সে সেই আঘাত বেদনা আজ ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। রাত কত জানেনা —জানলা দিয়ে হু হু হাওয়া আসে—মনের মাঝে সেই ঝড়টা কেমন স্তব্ধ হয়ে আসছে।

সকালে চেম্বারে বের হওার আগেই একজন ভদ্র-লোককে আসতে দেখে বেয়ারা তাকে খবর দেয়। কোন রোগীই হবে বোধ হয়।

অলকের মনটা এমনিতেই ভাল নেই। কাল রাত্রের সেই ঘটনাটা মনে একটা নীরব জ্বালার তীব্রতা এনেছে। তবু কায তাকে করতে হয়। অভ্যাসবশতঃই বের হয়েছে সে।

সামনেই ভদ্রলোককে দেখে থামল।

—আমি শমিতা দেবীর সঙ্গে দেখা করতে চাই।

অলক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। মুখে-চোখে একটা কাঠিন্য ফুটে ওঠে। চারিদিক থেকে একজনের জন্যই সাড়া পড়ে গেছে। অনেক কষ্টেই ভদ্রতার মুখোস বজায় রেখে জবাব দেয়—

বেয়ারা ডেকে দিচ্ছে আপনি বসুন।

অলক আর দাঁড়াল না, বের হয়ে গাড়ীতে উঠে চলে গেল। শমিতা বার বার তার মনের সব শান্তি—তার বাড়ীর সম্ভ্রমটুকুও বিপন্ন করে তুলেছে।

ঘরে-বাইরে অলক ক্রমশঃ নিজেকে যেন অসহায় হাস্যাস্পদ বলে মনে করে। শমিতা রাতারাতি তাকে সামাজিক মর্যাদার আসন থেকে টেনে নামিয়ে নিজেই সেখানে উঠে বসেছে।

কি মূল্য দিতে হয়েছে এর জন্য তা জানে না শমিতা। আজ সেও বুঝেছে অলকের মনের অবস্থা।

প্রকাশকরা অনেকেই আসছেন, কিন্তু শমিতা কাউকে কোন কথা দেয়নি। সে বুঝতে পারছে না কি করবে।

…দুপুরে খেতে আসে অলক, বহুদিন পর আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ফোন করে খবরটা তবু দেয়।

…শমিতাই ধরেছিল ফোনটা।

দুপুরের নির্জনতার মাঝে কথাটা বার বার ভেবেছে সে। আজ একদিকে কর্মব্যস্ত স্বামী—তার সংসার—পরিচয়, অন্যদিকে তার নিজের লেখার প্রতিষ্ঠা। দুটোর মাঝখানে আপোষের কোন আশাই কি নেই? ভেবেও পথ পায় না সে। সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার ক্ষমতা নেই, এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সে।

অলকের মনের প্রশ্নটাও জানে না সে, তার জবাব দিতে পারতো, ফোনটা বেজে ওঠে। অলক বলে চলেছে হাসপাতাল থেকে।—আজ যেতে পারছি না, তুমি লাঞ্চ খেয়ে নিও।

প্রাণহীন কণ্ঠস্বর। শমিতা মনে মনে যে আপোষের সুর খুঁজেছিল—একটা আঘাতেই তা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কথা জোগায় না মুখে। হঠাৎ যেন প্রতিবাদ করে ওঠে শমিতা।…শুনছ! না—না!

…ওদিকে লাইনটা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওর কোন কথাই শুনতে পেলনা অলক।

বৈকালের আলো বাগানের গাছের মাথায় বিবর্ণতা এনেছে। পাখীগুলো ফিরে আসছে বাসায়, শমিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ভাবনার শেষ নেই। অলকের মনের বেসুর আজ তাকেও বিচলিত করে তুলেছে। এ-ভাবে বাঁচতে সে চায়নি, এতদিন অবহেলা সয়ে এসেছে। সয়েছে তার মনের বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা। তবু প্রতিবাদ করেনি সে।

…আজ অলক তাকে ভুল বুঝবে এটা কল্পনাই করেনি সে।

অলক কায করার অনুপ্রেরণা আজ পায়নি। নিজের জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা আজ তাকে মনে মনে দুর্বল করে তুলেছে। রোগীর ভিড় বেড়ে ওঠে।

বেয়ারাকে বলে দেয়,—

আজ ওদের আসতে বলো।

বেয়ারা অবাক হয়ে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে। এতকাল সে দেখছে ডাক্তারবাবুকে, কোনদিন কাযে ফাঁকি দিতে দেখেনি। শরীর খারাপ নিয়েও চেম্বারে এসেছে ইতিপূর্বে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

—সাব!

অলক ওর কথায় বিরক্ত হয়। বলে ওঠে

—বললাম তো! জানিয়ে দাও ওদের।

…সুইং ডোরটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে। কি ভাবছে অলক। রোগীরা ফিরে গেছে। স্তব্ধতা নেমেছে ঘরখানায়।

…আনমনে কি ভাবছে।

…শমিতার কথাই মনে আসে। আজ থেকে বারো বৎসর আগেকার কথা, সেদিন শমিতাকে চেনেনি। ভুলই করেছিল।

অন্যমন, তবু কৃপণের মত যা কিছু সঞ্চয় তাই নিয়েই বাঁচতে চায়; সে বলে—অতীতের ঘটনা অতীতেই থাক। আজ সব ক্ষমায় প্রেমে তাকে আপন করে নিয়েই বাঁচতে হবে।

কিন্তু তবু মন মানে না। সারা সমাজ যেন তার দিকে চেয়ে হাসছে, যাকে আপনতম বলে জেনে সব বিশ্বাস ভাল-বাসা সে উজাড় করে দিয়েছে, সে যে এতবড় একটা বঞ্চনা তা ভাবতেই পারে না।

অলক মুক্তির পথ জানে না।

কদিনেই অনুভব করেছে দমবন্ধ হয়ে আসছে, এখান থেকে মুক্তির আশা খোঁজে সে। তার জগৎ; এই কায নিয়েই বাঁচতে চায় সেখানে কোন আপোষ নেই।

আজ দুজনেই তারা যেন সহজ পথ চলতে চলতে এসে একটা অতলস্পর্শী খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ পথ আর এগোয়নি—এইখানে ওই অতল খাদের মুখে এসে থেমে গেছে।

…হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে!

বিরক্ত হয়ে ওঠে অলক, কোন রোগীই হবে বোধ হয়, দিনরাত রোগ আর রোগী, তার জগতে সুস্থ মানুষের ঠাঁই নেই। মনের সব কি পঙ্কিল কদর্যতা মাথা ঠেলে উঠেছে এখানের চারিদিকে।…ফোনটা ধরে বিরক্তি ভরে।

বাড়ী থেকে সরকার ফোন করছে। শমিতা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু বাড়াবাড়িই।

…কেমন চমকে ওঠে অলক! মুক্তি!…মনের মাঝে

একটা সাড়া যেন জেগে ওঠে। প্রায়ই দেখেছে এমন ঘটে। অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর শিল্পীমন সামান্যতম অবহেলা আর অপমানে একটা সাংঘাতিক কিছু বাধিয়ে বসে। নিজের জীবনটুকুকে পর্যন্ত তারা শেষ করে দিতে দ্বিধা করে না।

—কি হয়েছে ?

সরকার এসব বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। শুধু তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি একবার এখুনি আসুন।

কেমন যেন নিজেও ঠিক করতে পারেনা অলক।… কে জানে কি কাণ্ড ঘটে গেছে। শমিতার মুখে বেদনায় কালো ছায়া তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এমনি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটানোর জন্য সেও তৈরী হতে পারে।

বের হয়ে পড়ল অলক। ডাঃ করকেও সঙ্গে নেয়! কে জানে যদি তেমন কিছু হয় তাহলেও সাহায্য করতে পারবে। একটা ভয় জাগে একটা আনন্দের মুক্তির আভাসও মনে আসে। একটা সমস্যার সমাধান হবে অলকের।

…রাত নামছে।

চাঁদের আলো ঢাকা রাত, পাখী-ডাকা এই আলো-আঁধারির রাজ্যে জেগে উঠেছে বকুলগন্ধ। বিছানার উপর একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে শমিতার পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে।

আজ একটা শান্তশ্রী ছড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে, অলক চুপ করে বসে আছে—ওর হাতটা শমিতার হাতে। সারা ঘরে একটা প্রশান্তি নেমেছে।

প্রশান্তি নেমেছে ওদের মনে।

…পূর্ণতার প্রশান্তি।

শমিতা মা হতে চলেছে। ওদের শূন্য ঘর—শূন্য মন তাই পূর্ণতার আবেশে মধুময় হয়ে উঠেছে। কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখী। ওর ডাকটা ছড়িয়ে পড়েছে আলো-আঁধারি ঢাকা আকাশ বাতাসে।

বন্দনা

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নমামি ভারত জননী আমার,
নমামি নিখিল নন্দিতা।
নমামি অচল জলধি কন্যা,
সুর নর চির বন্দিতা॥

শিয়রে তোমার
গিরি হিমালয়,
তরুণ অরুণ কিরণ দীপ্ত।
অমল ধবল তুষার কিরীট,
স্নিগ্ধ শুভ্র শুচিতা লিপ্ত।
পদতলে তব কন্যা-কুমারী,
চির কল্লোল ছন্দিতা॥

গগনে গগনে শত গ্রহতারা,
গাহিছে তোমার কীর্ত্তি গান
শস্য শ্যামলা, তুমি মা কমলা,
দশ ভুজে কর অন্নদান॥
পিক কুহরিত বন উপবন,
বিকশিত ফুল গন্ধিতা॥

কৃচ্ছ্র সাধনে নহ মা ক্লান্ত,
শত্রু শাসনে অকুতোভয়।
বিতরি' জগতে শান্তি-মন্ত্র,
বিশ্ব হৃদয় করিলে জয়।
নমো নমো নমঃ জগজ্জননী,
নিখিল বিশ্ব বন্দিতা॥

...দুপুরে খেতে আসে অলক, বহুদিন পর আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। ফোন করে খবরটা তবু দেয়।

...শমিতাই ধরেছিল ফোনটা।

দুপুরের নির্জনতার মাঝে কথাটা বার বার ভেবেছে সে। আজ একদিকে কর্মব্যস্ত স্বামী—তার সংসার—পরিচয়, অন্যদিকে তার নিজের লেখার প্রতিষ্ঠা। দুটোর মাঝখানে আপোসের কোন আশাই কি নেই? ভেবেও পথ পায় না সে। সমস্ত সংস্কারের বিরুদ্ধে মাথা তোলার ক্ষমতা নেই, এটাকে অগ্রাহ্য করতে পারে না সে।

অলকের মনের প্রশ্নটাও জানে না সে, তার জবাব দিতে পারতো, ফোনটা বেজে ওঠে। অলক বলে চলেছে হাসপাতাল থেকে।—আজ যেতে পারছি না, তুমি লাঞ্চ খেয়ে নিও।

প্রাণহীন কণ্ঠস্বর। শমিতা মনে মনে যে আপোষের সুর খুঁজেছিল—একটা আঘাতেই তা যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

কথা জোগায় না মুখে। হঠাৎ যেন প্রতিবাদ করে ওঠে শমিতা।...শুনছ! না—না!

...ওদিকে লাইনটা তখন স্তব্ধ হয়ে গেছে। ওর কোন কথাই শুনতে পেলনা অলক।

বৈকালের আলো বাগানের গাছের মাথায় বিবর্ণতা এনেছে। পাখীগুলো ফিরে আসছে বাসায়, শমিতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এ ভাবনার শেষ নেই। অলকের মনের বেসুর আজ তাকেও বিচলিত করে তুলেছে। এ-ভাবে বাঁচতে সে চায়নি, এতদিন অবহেলা সয়ে এসেছে। সয়েছে তার মনের বেদনাদায়ক নিঃসঙ্গতা, নির্জনতা। তবু প্রতিবাদ করেনি সে।

...আজ অলক তাকে ভুল বুঝবে এটা কল্পনাই করেনি সে।

অলক কাষ করার অনুপ্রেরণা আজ পায়নি। নিজের জীবনের নিদারুণ ব্যর্থতা আজ তাকে মনে মনে দুর্বল করে তুলেছে। রোগীর ভিড় বেড়ে ওঠে।

বেয়ারাকে বলে দেয়,—

আজ ওদের আসতে বলো।

বেয়ারা অবাক হয়ে চাইল ডাক্তারবাবুর দিকে। এতকাল সে দেখছে ডাক্তারবাবুকে, কোনদিন কাযে ফাঁকি দিতে দেখেনি। শরীর খারাপ নিয়েও চেম্বারে এসেছে ইতিপূর্বে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

—সাব!

অলক ওর কথায় বিরক্ত হয়। বলে ওঠে

—বললাম তো! জানিয়ে দাও ওদের।

...সুইং ডোরটা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে। কি ভাবছে অলক। রোগীরা ফিরে গেছে। স্তব্ধতা নেমেছে ঘরখানায়।

...আনমনে কি ভাবছে।

...শমিতার কথাই মনে আসে। আজ থেকে বারো বৎসর আগেকার কথা, সেদিন শমিতাকে চেনেনি। ভুলই করেছিল।

অন্যমন, তবু কৃপণের মত যা কিছু সঞ্চয় তাই নিয়েই বাঁচতে চায়; সে বলে—অতীতের ঘটনা অতীতই থাক। আজ সব ক্ষমায় প্রেমে তাকে আপন করে নিয়েই বাঁচতে হবে।

কিন্তু তবু মন মানে না। সারা সমাজ যেন তার দিকে চেয়ে হাসছে, যাকে আপনতম বলে জেনে সব বিশ্বাস ভাল-বাসা সে উজাড় করে দিয়েছে, সে যে এতবড় একটা বঞ্চনা তা ভাবতেই পারে না।

অলক মুক্তির পথ জানে না।

কদিনেই অনুভব করেছে দমবন্ধ হয়ে আসছে, এখান থেকে মুক্তির আশা খোঁজে সে। তার জগৎ; এই কাষ নিয়েই বাঁচতে চায় সেখানে কোন আপোষ নেই।

আজ দুজনেই তারা যেন সহজ পথ চলতে চলতে এসে একটা অতলস্পর্শী খাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ পথ আর এগোয়নি—এইখানে ওই অতল খাদের মুখে এসে থেমে গেছে।

...হঠাৎ ফোনটা বেজে ওঠে!

বিরক্ত হয়ে ওঠে অলক, কোন রোগীই হবে বোধ হয়, দিনরাত রোগ আর রোগী, তার জগতে সুস্থ মানুষের ঠাঁই নেই। মনের সব কি পঙ্কিল কদর্যতা মাথা ঠেলে উঠেছে এখানের চারিদিকে।...ফোনটা ধরে বিরক্তি ভরে।

বাড়ী থেকে সরকার ফোন করছে। শমিতা হঠাৎ কেমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু বাড়াবাড়িই।

...কেমন চমকে ওঠে অলক! মুক্তি!...মনের মাঝে

একটা সাড়া যেন জেগে ওঠে। প্রায়ই দেখেছে এমন ঘটে। অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর শিল্পীমন সামান্যতম অবহেলা আর অপমানে একটা সাংঘাতিক কিছু বাধিয়ে বসে। নিজের জীবনটুকুকে পর্যন্ত তারা শেষ করে দিতে দ্বিধা করে না।

—কি হয়েছে ?

সরকার এসব বিশেষ কিছুই বলতে পারে না। শুধু তার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি একবার এখুনি আসুন।

কেমন যেন নিজেও ঠিক করতে পারেনা অলক।… কে জানে কি কাণ্ড ঘটে গেছে। শমিতার মুখে বেদনায় কালো ছায়া তার দৃষ্টি এড়ায়নি। এমনি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটানোর জন্য সেও তৈরী হতে পারে।

বের হয়ে পড়ল অলক। ডাঃ করকেও সঙ্গে নেয়! কে জানে যদি তেমন কিছু হয় তাহলেও সাহায্য করতে পারবে। একটা ভয় জাগে একটা আনন্দের মুক্তির আভাসও মনে আসে। একটা সমস্যার সমাধান হবে অলকের।

…রাত নামছে।

চাঁদের আলো ঢাকা রাত, পাখী-ডাকা এই আলো-আঁধারির রাজ্যে জেগে উঠেছে বকুলগন্ধ। বিছানার উপর একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে শমিতার পাণ্ডুর বিবর্ণ মুখে।

আজ একটা শান্তশ্রী ছড়িয়ে আছে ওকে ঘিরে, অলক চুপ করে বসে আছে—ওর হাতটা শমিতার হাতে। সারা ঘরে একটা প্রশান্তি নেমেছে।

প্রশান্তি নেমেছে ওদের মনে।

…পুর্ণতার প্রশান্তি।

শমিতা মা হতে চলেছে। ওদের শূন্য ঘর—শূন্য মন তাই পুর্ণতার আবেশে মধুময় হয়ে উঠেছে। কোথায় ডাকছে রাতজাগা একটা পাখী। ওর ডাকটা ছড়িয়ে পড়েছে আলো-আঁধারি ঢাকা আকাশ বাতাসে।

বন্দনা

মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

নমামি ভারত জননী আমার,
নমামি নিখিল নন্দিতা।
নমামি অচল জলধি কন্যা,
সুর নর চির বন্দিতা॥

শিয়রে তোমার
গিরি হিমালয়,
তরুণ অরুণ কিরণ দীপ্ত।
অমল ধবল তুষার কিরীট,
স্নিগ্ধ শুভ্র শুচিতা লিপ্ত।
পদতলে তব কন্যা-কুমারী,
চির কল্লোল ছন্দিতা॥

গগনে গগনে শত গ্রহতারা,
গাহিছে তোমার কীর্তি গান
শস্য শ্যামলা, তুমি মা কমলা,
দশ ভুজে কর অন্নদান॥
পিক কুহরিত বন উপবন,
বিকশিত ফুল গন্ধিতা॥

কৃচ্ছ্র সাধনে নহ মা ক্লান্ত,
শত্রু শাসনে অকুতোভয়।
বিতরি' জগতে শান্তি-মন্ত্র,
বিশ্ব হৃদয় করিলে জয়।
নমো নমো নমঃ জগজ্জননী,
নিখিল বিশ্ব বন্দিতা॥

আচার্য্য শঙ্কর

জ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা দেশে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব বা তিরোভাব-উৎসবের কথা খুব কমই শোনা যায়। জন্মশতবার্ষিকীর ত কথাই নাই। প্রধান কারণ বোধ হয় তাঁর জন্মবর্ষ বা জন্ম-মৃত্যুর তারিখের সঠিক নির্দ্ধারণ আজও হয়নি। অথচ তাঁর রচিত "মোহমুদ্গরে"র প্রথম কয়েকটি শ্লোক অল্পবিস্তর সকলেরই জানা আছে। পণ্ডিতেরা ইংরাজী সপ্তম হইতে নবম শতাব্দীর মধ্যে তাঁহার ৩২ বৎসর ব্যাপী কার্য্যকাল স্থির করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন ইং ৭৮৮তে জন্ম, ৮২০ খ্রীষ্টাব্দে শেষ।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মানবের উদ্ধারের জন্য গীতায় জ্ঞানপথ, কর্ম্মপথ ও ভক্তিপথের নির্দ্দেশ দিয়া তিনেরই সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যান। দুর্ব্বল মানব সে শিক্ষা ধারণ করিতে পারে নাই—ক্রমশঃ নানা ধর্ম্মশিক্ষকের ধর্ম্মশিক্ষা মানব চরিত্রের বিকৃতি অনুসারে বিকৃত হইয়া পড়ে—আচার ও কুসংস্কার সমাজ দেহে ক্ষত উৎপন্ন করিয়া ধর্ম্মকে কেবল জীবঘাতী যাগযজ্ঞে পরিণত করিল। তখন শ্রীবুদ্ধদেব (আবির্ভাব ইং ৫৫৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) আবির্ভূত হইয়া এই শোচনীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন করেন। কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার নীরবতার জন্য ও অন্যান্যকারণে তাঁহার পরবর্ত্তী বৌদ্ধ-যাজকেরা বহুলাংশে স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া ঘোরতর নিরীশ্বরত্ব ও জড়ত্ব, চরিত্রহীনতা ও নির্ম্মমতার আতিশয্যে হিন্দুসমাজকে ধ্বংসের পথে লইয়া গেলে ভারতের সৌভাগ্যক্রমে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া জ্ঞানপথের সহজ সরল আবেগময়ী ভাষায় ব্যাখ্যার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া উহাকে তাঁহার সার্ব্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন।

দক্ষিণভারতের কেরলে ত্রিবাঙ্কুর জেলার পূর্ণা-নদী-তীরে অবস্থিত কলাদী নামক একটি ক্ষুদ্রগ্রামে এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম হয়। পিতা শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা। তিন বৎসর বয়সে পিতাকে হারাইয়া শঙ্কর মাতার স্নেহনীড়ে থাকিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপালাভ করিয়া শৈশবে জিজ্ঞাসু মন লইয়া শাস্ত্রপাঠে নিবিষ্ট হন। অল্পদিনের মধ্যেই ধর্ম্মশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠেন। সংসারে আসক্তির পরিবর্ত্তে দারুণ অনাসক্তি ও বৈরাগ্য তাঁহাকে সন্ন্যাসের দিকে প্রভাবিত করিল; মাতা কিন্তু সর্ব্বদা তাঁহাকে ঐ পথ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিতেন এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও কিশোর সুদর্শন পুত্রের বিবাহের চেষ্টায় বিফল হইয়া তাহার মঙ্গলার্থে নিবিড়ভাবে মহাদেবের শরণ লইলেন। একদিন শঙ্কর মাতার সহিত নদীতে স্নান করিতে গিয়া কুমীরের দ্বারা আক্রান্ত হন; মাতার আর্ত্তনাদ শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—কে যেন আমায় সাহস দিতেছে, মা যদি আমায় সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দেন, তিনি রক্ষা পাইবেন। মাতা তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলে শঙ্কর অক্ষতদেহে তাঁহার কোলে আসিল। এইবার সন্ন্যাস গ্রহণে আর কোন বাধা রহিল না—কিছু পরে গোবিন্দ আচার্য্য নামক এক শিবভক্ত সন্ন্যাসীর নিকট যোগ শিক্ষা করিয়া কঠোর সেবা দ্বারা ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ প্রাপ্ত হন। গুরুর আদেশে এই লব্ধবিদ্যা কাশীধামে গিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তীর্থে তীর্থে শাস্ত্রবাক্যসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রচার করিতে উদ্‌যোগী হইলেন। স্নান সারিয়া একদিন কাশীর গঙ্গাতটে এক চণ্ডাল কর্ত্তৃক তাঁহার গতি অবরুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে তিরস্কারের উত্তরে তাহার নিকট অনেক বৈদান্তিক তথ্যের সন্ধান পাইয়া মুগ্ধবিস্ময়ে নিজের ক্ষুদ্রতা ও শিক্ষার ত্রুটি বুঝিতে পারিলেন। এইভাবে তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান সম্পূর্ণ হইল!

কাশী পরিক্রমায় একদিন তাঁহার ১৪ জন শিষ্য লইয়া এক বিশিষ্ট পণ্ডিতের গৃহের পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলেন, বৃদ্ধ পণ্ডিত মহাশয় ব্যাকরণের সূত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতেছেন। শুনিয়াই তাঁহার মনে হইল, পণ্ডিতজী শ্রীভগবান গোবিন্দের কথা চিন্তা না করিয়া বৃথা ব্যাকরণের সূত্র মুখস্থ করিতেছেন।—কথিত আছে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীমুখ হইতে নির্গত হইল—

"ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং
ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
সংপ্রাপ্তে সন্নিহিতে কালে
নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঙ্ করণে ॥
[ডুকৃঙ্ করণে = ব্যাকরণ সূত্র]

এইখানে "মোহমুদ্গারে"র জন্ম হইল।

ওই শ্লোকটির পরবর্ত্তী দ্বাদশটি শ্লোক মহাত্মা শঙ্কর মুখে মুখে রচনা করেন। মূল শ্লোকটির শেষের লাইন ধুয়া করিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকগুলিকে বলা হয় "দ্বাদশ মঞ্জরিকা স্তোত্রম্"; প্রথমটি বহুজন বিদিত—

"মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং
কুরু সদ্বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজ কর্ম্মোপাত্তং
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥
(ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ইত্যাদি)

Oh, fool ! give up the thirst to possess wealth.
create in your mind, devoid of passions, thoughts
of the Reality, With whatever you get (as a reward)
of the past, entertain your mind (be content).
Seek Govind, Seek Govind

Translation Swami Chinmoyananda, "Bhaja Govindam" Chinmaya Pullicatins Trust
MADRAS

আচার্য্য শঙ্করের অপূর্ব্ব প্রেরণায়, তাঁহার মুখনিঃসৃত দ্বাদশটি ছন্দমধুর, প্রাণময় শ্লোকের মধুর শব্দঝঙ্কারে তদ্গতচিত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গী ও শিষ্য ১৪ জনের প্রত্যেকে একটি করিয়া শ্লোকের যোজনা করেন। শঙ্কর শেষে চারিটি শ্লোকে মোহমুদ্গার সমাপ্ত করেন। শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীপদ্মপাদ ("জটিলঃ মুণ্ডী লুঞ্ছিতকেশঃ) শ্রীতোটকাচার্য্য "অঙ্গংগলিতং পলিতং মুণ্ডং" শ্রীহস্তামলক (অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানুঃ") শ্রীসুবোধ ("কুরুতে গঙ্গাসাগর গমনং"), শ্রীসুরেশ্বর ("সুরমন্দিরতরুমূলনিবাসঃ") শ্রীনিত্যানন্দ ("যোগরতো বা ভোগরতো বা") শ্রীআনন্দগিরি ("ভগবদ্গীতা")…ইত্যাদি।

এই চতুর্দ্দশ শ্লোকের সম্ভার "চতুর্দ্দশ মঞ্জরিকা-স্তোত্রং" নামে অভিহিত। এইগুলি শুনিয়া শঙ্কর পুনরায় ৪টি ছন্দমধুর শ্লোক যোজনাদ্বারা শিষ্যগণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ৩১টি শ্লোকে মোহমুদ্গার সমাপ্ত করেন। স্বামী চিন্ময়ানন্দ সতর্ক করিয়া দিয়াছেন—শ্লোকগুলির পারম্পর্য্য বা রচয়িতার নামের যাথার্থ্য বিজ্ঞানসম্মত নহে।

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয় পরিব্রাজক রূপে ১৮৯০ সালের মে মাসে যোশীমঠ গিয়াছিলেন। [আচার্য্য শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত মঠের অন্যতম—দ্বারকায় "শারদামঠ" দক্ষিণভারতে "শৃঙ্গেরি মঠ" পুরুষোত্তমে "গোবর্দ্ধন মঠ" ও হিমালয়ের দুর্গম প্রান্তে "যোশীমঠ"] অনেক প্রাচীন পুঁথি ও নিদর্শন আছে, এবং অভিজ্ঞ মঠাধ্যক্ষের বিশ্বাস সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু যে শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে সেকালের সামাজিক অবস্থা, তাৎকালিক রাজনীতি, হিন্দুধর্ম্ম ও ধর্ম্মাদির উন্নতি বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্ম্মে আস্থা ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বর্ণিত আছে। জলধরবাবু ঠিকই বলিয়াছেন "এ সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন লুপ্ত সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকার সাধন করা যেতে পারে তার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই—কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার ক'রে এই দুর্গম দুরারোহ পর্ব্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ করবে ?"

সাধারণ বাঙালীর কাছে আচার্য্য শঙ্কর বিশেষ প্রিয় বলিয়া মনে হয় না। রামানুজ, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি পরবর্ত্তী বৈদান্তিক-গণ তাঁহার সহিত একমত হইতে পারেন নাই। নৈয়ায়িক চূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় ৺রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয় অদ্বৈতবাদ-খণ্ডন লিখিয়া শঙ্করের অদ্বৈতবাদের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সুবিদ্বান্ পুত্র ৺হরকুমার শাস্ত্রী বাংলা ভাষায় উক্ত পুস্তকখানির মর্ম্মার্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে শঙ্করের বিরুদ্ধমতাবলম্বী আনন্দগিরি মাধবাচার্য্য চিদ্বিলাস, সদানন্দ প্রভৃতির রচিত "শঙ্করবিজয়" নামক গ্রন্থানুসরণে

বাংলাভাষায় (অধুনা দুষ্প্রাপ্য) "শঙ্করাচার্য্য" নামে একটি নাটক রচনা করেন। উপরোক্ত শঙ্কর বিজয় গ্রন্থে শঙ্করের জন্মবিষয়ে একটি অবাস্তব, স্বকপোলকল্পিত ঘটনার অবতারণা করা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ ইহা বিদ্বেষপ্রসূত ও প্রক্ষিপ্ত। তাহা এই—"শঙ্করের মাতা বিশিষ্টা দেবীর স্বামী বিশ্বজিৎ বিবেকী হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; বিশিষ্টাদেবী শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কালপর্য্যন্ত সধবার চিহ্নসকল রক্ষা করিয়া বৈধব্য-ব্রত পালন করিতে লাগিলেন। মহাদেবের কৃপায় সেই বৈধব্যাবস্থাতেই তিনি শঙ্করাচার্য্যকে লাভ করিয়াছিলেন" [উদ্ভটসাগর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন বি, এ সংকলিত "মোহমুদ্গর ও মোহকুঠার" পৃ ২১ খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৮ বঙ্গাব্দ ১৩৪৫]

পিতার নাম শিবগুরু, মাতা বিশিষ্টা একথা দে মহাশয় ওই পুস্তিকার অন্যত্র লিখিয়াছেন। নাট্যসম্রাট গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার "শঙ্করাচার্য্য" নাটকে (প্রথম অভিনীত ১৩১৬ সাল ২রা মাঘ) সপ্তম গর্ভাঙ্কের শেষে শঙ্করের মাতা বিশিষ্টা দেবীর শবদাহের দৃশ্যে পিতার নাম শিবগুরু উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায় বেদের কিয়দংশের অপূর্ব্ব ইংরাজী অনুবাদের জন্য সুপ্রসিদ্ধ; ঈশোপনিষদের এক অধ্যায় অনুবাদ প্রসঙ্গে ১৮১৬ তিনি পুস্তিকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন "The present is an endeavour to translate the principal chapters of the Vedas in conformity to the comments of the great Sankar-Acharya.

পুস্তিকার প্রচ্ছদপটে দেখা যায় "Translation of the Ishopanishad one of the Chapters of the Yajur-Ved according to the celebrated Shankara acherya establishing the unity and incomprehensibility of the suprem-being and that His worship alone can lead to Eternal Beatitude" শঙ্করের নানা উচ্চ প্রশংসায় প্রত্যেকটি অনুবাদ-পুস্তিকার প্রচ্ছদপট অলঙ্কৃত।

মনীষী জবাহরলাল নেহরু তাঁহার সুবিখ্যাত The Discovery of India গ্রন্থে বলেন ইং অষ্টমশতাব্দীতে ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদিগের অন্যতম শঙ্করাচার্য্য সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সংঘের ধারায় কয়েকটি সংস্থা বা মঠ হিন্দু ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদের জন্য স্থাপিত করেন। ধীরে ধীরে যুক্তিসহ বিচারে অদ্বৈত বা একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে করিতে কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া অপূর্ব্ব প্রেরণা ও উদ্দীপনার পরশ দিয়া বহু বিবদমান মতবাদকে একত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করিতে সমর্থ হন। তিনি একাধারে দার্শনিক ও সুপণ্ডিত কবি ও ঋষি, an agnostic and a mystic এবং সর্ব্বোপরি a practical reformer রূপে অপূর্ব্ব মনীষা ও সংগঠন শক্তি বলে তদানীন্তন যানবাহনের অভাব ও পথের দুর্দ্দশা সত্বেও ভারতের চারি কোণে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল পরিক্রমায় সংস্কৃত ভাষার সম্যক্ ব্যবহারে বুঝা যায় সেকালের ভারতে অন্তর্নিহিত ঐক্য ও ঐতিহ্যের অস্তিত্ব। শঙ্কর এই উপাদানের সহিত যোগ করিয়াছিলেন জাতীয় একতা ও সাধারণ বোধশক্তি। অজস্রপ্রশংসায় নানাদিকবিচারে নেহরুজী শঙ্করকে ভরিয়া দিয়াছেন। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে তুষারাচ্ছন্ন কেদারনাথে মহাদেবের বরপুত্র প্রতিভার অবতার শঙ্করাচার্য্য তনুত্যাগ করেন।
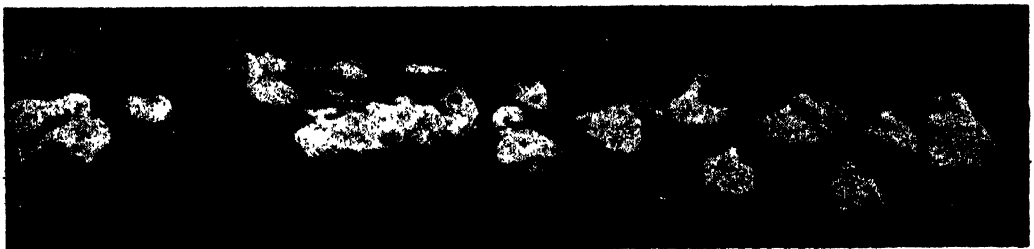
পটুয়া

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আমাদের রাঢ় অঞ্চলে একটি সম্প্রদায় ছিল পটুয়া। লোকে ইহাদিগকে পেটো বলিত। আমাদের গ্রামে পেটোপাড়া আছে, কিন্তু পটুয়ারা নাই। নিকটবর্ত্তী কুল তোড় গ্রামে বাল্যকালে প্রায় কুড়ি ঘর পটুয়ার বাস দেখিয়াছি। এখন সেখানে একটি মানুষও নাই। সম্প্রদায়টাই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। সিউড়ীর নিকটবর্ত্তী পাথুড়িয়া গ্রামে বোধহয় এক আধ ঘর আছে, মানুষ দুই চারিজন। আমি ইহাদের অনুসন্ধানে মুর্শিদাবাদ জেলারও দুই-এক জায়গায় ঘুরিয়াছি। দক্ষিণখণ্ডের নিকট কয়েক ঘর আছে, আউগাঁয়ে দুইএক ঘর। অন্যত্র আছে কিনা জানি না।

এখন হইতে প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে যে কুশাগ্রধী ব্রাহ্মণের মন্ত্রণাকৌশলে মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত ভারতবর্ষে প্রথম চাতুরন্ত বা সার্ব্বভৌম নরপতি রূপে পরিচিত হইবার সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই মহামতি চাণক্যের গুপ্তচর ছিল জমপট্টিক সম্প্রদায়। মহাকবি বিশাখদত্ত স্বপ্রণীত মুদ্রারাক্ষসে এই কথা বলিয়া গিয়াছেন। নন্দ-মন্ত্রীর গুপ্তচর ছিল বাদিয়ার দল। ইহারা গ্রামের লোকের বাড়ী বাড়ী বিষধর সর্পের খেলা দেখাইয়া বেড়াইত। সর্পবিষ কবিরাজগণ এই সেদিন পর্য্যন্ত ঔষধে ব্যবহার করিতেন। বাদিয়ার দল নানারূপ জড়িবুটীও বিক্রয় করিত। সুতরাং লোকে তাহাদের আদর করিবে ইহাই স্বাভাবিক। এই সুযোগ লইয়াই ইহারা গুপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিত। সৈন্য শিবিরেও ইহাদের যাতায়াত ছিল।

জমপট্টিক দল জমরাজার পট দেখাইয়া বেড়াইত। গান করিত "পণমহ জমস্স চলনে" × × "জমের চরণে প্রণাম কর। অন্য দেবতার কাজ কি? জমরাজ অন্য দেবতাদের ভক্তদের মারেন, তাহারা ধড়ফড় করে।" বাণভট্টের "হর্ষচরিতে" ইহাদের উল্লেখ আছে। হর্ষবর্দ্ধন নগর প্রবেশ মুখে ইহাদের দেখিয়া অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়াছিলেন। রাজ অন্তঃপুরে গিয়া দেখিলেন পিতা প্রভাকরবর্দ্ধনের অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে। এক সময় ইহারা "অযাত্রা" ছিল। ইহাদের মুখদেখা অমঙ্গলের চিহ্ন বলিয়া মনে হইত।

আমরা দেখিয়াছি পটুয়া পুরুষেরা রামলীলা এবং কৃষ্ণলীলার পট দেখাইয়া বেড়াইত। কচিৎ গৌরাঙ্গলীলার পটও দেখাইত। কিন্তু যে পটই দেখাইত তাহারই শেষে জমরাজা, চিত্রগুপ্ত ও জমালয়ের ছবি থাকিত। সমাজে যাহারা পাপাচরণ করে, তাহারা জমালয়ে গিয়া জমদূতগণের কত না কঠিন কঠিন শাস্তি পায়—তাহারই জীবন্ত ছবি। ছবি দেখিয়া লোকে শিহরিয়া উঠিত, সাবধান হইত। ইহারা উচ্চকণ্ঠে গান করিতে করিতে ছবির সঙ্গে নানাবিধ পাপ ও তাহার শক্ত শাস্তির বিবরণ দিত। এই পট সমাজশিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। হাজার বক্তৃতায় যাহা হয় না, গ্রামের মধ্যে একজন পটুয়া একখানা পট দেখাইয়াই তাহাতে সাফল্য লাভ করিত।

কিন্তু সম্প্রদায়টা দুইহাজার বৎসর বাঁচিয়া ধীরে ধীরে নির্ব্বংশ হইয়া গেল কেন? যে সদাশয় সরকার বনের পশুর খোঁজ খবর রাখেন, তাহাদের কমতি-বাড়তির হিসাব খতাইয়া দেখেন, তাঁহারা এমন একটা সম্প্রদায়কে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিলেন না, বা রাখিবার কোন চেষ্টাও করিলেন না। আমার মনে হয় ইহারা না-হিন্দু না মুসলমান বলিয়া বাঁচিল না। মুসলমান রাজত্বে হয়তো ইহাদের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্মগ্রহণের প্রলোভন জাগিয়াছিল, কিন্তু যে কারণেই হউক ইহারা সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। ইহাদের মধ্যে একটা অংশ ছিল মুসলমান ভাবাপন্ন, ইহাদের বাড়ীর মেয়েরা শণকাঠী-প্যাকাটীকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া তাহারই দুই মুখে গন্ধক গলাইয়া লাগাইয়া বিক্রয় করিত, নাম ছিল "জিয়া কাঠী"। তখনো "ক্রয়েথ বাক্স" অথবা দিয়াশলাই আমদানী হয় নাই। লোকে ঐ জিয়াকাঠী আগুনে দিয়াই প্রদীপ জ্বালিত। এই জন্য একটু আগুন

যে কোন উপায়েই হউক সংগ্রহ করিতে হইত। জিয়া-কাঠীর সঙ্গে থাকিত চাব্‌কী, ঘুন্‌দী, চুসিকাঠী লাটু, (ছেলেদের খেলিবার বিঘৎ প্রমাণ রাঙ্গালাঠী, সোহাগের নাম লাটু) নূতন আমদানী কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি। পুরুষেরা জনমজুর খাটিত, পট দেখাইয়া বেড়াইত। অপর সম্প্রদায় প্রায় হিন্দু, তবে পুত্রের শৈশবেই প্রত্যঙ্গ বিশেষের ত্বকচ্ছেদের অনুষ্ঠান করিত। মসজিদেও যাইত, মুসলমানদের বাড়ীতেও খাইত, কিন্তু পুত্রের নাম রাখিত সুরেন্দ্র, কালিদাস। ইহাদের মেয়েরা কোনকিছু বিক্রয় করিতে বাহির হইত না। পুরুষেরা পট দেখাইয়া বেড়াইত, দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণার প্রতিমা গড়িত। কেহ কেহ ভাল খোল বাজাইতে শিখিয়াছিল। তাহারা বৈশাখ মাসে হরিনামের দলের গ্রামপ্রদক্ষিণে যোগ দিত। চব্বিশ প্রহরে খোল বাজাইতে যাইত। আমাদের ব্রজেন্দ্র পটুয়া এমন খোল বাজাইত যে নামকীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে আমার মাতামহ তাহাকে জড়াইয়া ধরিতেন। গায়ের দোপাট্টা তাহার মাথায় বাঁধিয়া দিতেন। বাল্য কালে এমন কত গল্পই না শুনিয়াছি।

ইহাদের কৃষ্ণলীলার পটে একটা বৈশিষ্ট্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কৃষ্ণলীলার পটের এক অংশে "ভারখণ্ডের" ছবি আছে। বড়ু চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে ভারখণ্ড পালা আছে। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ভারখণ্ডের বিবরণ আছে। আর একখানি গ্রন্থেও ভারখণ্ডের শ্লোক পাইয়াছি। পটে ছবি আছে,—আগে পশরা মাথায় রাধিকা, মাঝখানে ভার কান্ধে কৃষ্ণ, পিছনে বড়াই বুড়ি। কিছুদিন পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদ জেলার আউগাঁয়ের তিনু পটুয়া গান শুনাইয়া গেল—

> খেয়েছ মজুরীর কড়ি হয়েছ বেগারি।
> এখন কেন বলছ কৃষ্ণ ভার বইতে নারি॥

বাল্যকালে এমন কি যৌবনেও ইহাদিগকে পট লইয়া গ্রামে গ্রামে ফিরিতে দেখিয়াছি। বিশেষ করিয়া ৺পূজার পূর্ব্বে ইহারা দলে দলে আসিত। এখন আর বড় একটা দেখিতে পাই না। বেলের আঠা দিয়া কাগজ জুড়িয়া পুরু কাগজে, কেহ বা কাপড়ের সঙ্গে কাপড় জুড়িয়া লম্বা পট তৈরী করিত। তেতুল বিচি সিদ্ধ করিয়া তাহারই ঘন অংশও ইহারা কাজে লাগাইত। ইহাদের ছবি আঁকিবার পদ্ধতি ছিল কালীঘাটের পটের মত। নানান্ ঐতিহ্যের সঙ্গে ছবি আঁকিবার একটা অতি প্রাচীন ধারাও ইহারা পুরুষানুক্রমে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। বংশলোপের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুই গিয়াছে।

দক্ষিণখণ্ডের নিকট যে পটুয়াদের দেখিয়া আসিয়াছি, তাহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর মত। মেয়েরা সিঁথিতে সিন্দূর পরে, নাম হিন্দুর মত। কিন্তু ইহাদের মেয়েরা আর চুড়ি চাব্‌কী বিক্রী করে না, পুরুষেরাও পট দেখায় না। সাপ ধরে, সাপ খেলাইয়া বেড়ায়, সাপের বিষ ও জড়িবুটি বিক্রী করে। অথচ ইহারা বেদিয়া নয়—পটুয়া।

রাঢ়ের সিদ্ধল গ্রামে কয়েকঘর বাজীকরকে দেখিয়াছিলাম। মুখ হইতে সূতা বাহির করা, হাতের গুটীকে অদৃশ্য করিয়া দেওয়া, একটা ছোট নলী মুখে গিলিয়া পিঠ দিয়া বাহির করা ইত্যাদি বাজী দেখাইয়া পুরুষেরা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মেয়েরা হাবু গাহিত। হাবুর আবার খেউড় গান ছিল। গ্রামের মধ্যে গৃহস্থবাড়ীর মেয়েরা যাহা শুনিত, তাহার মধ্যে অশ্লীলতা থাকিত না। কিন্তু গ্রামপ্রান্তে যুবকের দল যাহা শুনিত তাহা খেউড়। প্রৌঢ়া এবং যুবতীরাই হাবু গাহিয়া বেড়াইত। ইহারা নিজেদের ভট্টরাজার চর বলিত। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি সিধল গ্রামে গিয়া ইহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছিলাম। বীরভূমের এই সম্প্রদায়টিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। জানি না এখন কেহ বাঁচিয়া আছে কি না। আমি ইহাদিগকে ভবদেব ভট্টের গুপ্তচর বলিয়া অনুমান করিয়াছিলাম।

মহামতি চাণক্যের একটি নাম বিষ্ণু গুপ্ত। অপর নাম কৌটিল্য। বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারি, পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজন্যবৃন্দ গূঢ় পুরুষ বা চর নিয়োগ করিতেন। এই গূঢ়পুরুষদের এক সম্প্রদায়ের নাম ছিল সংস্থ। ইহারা একস্থানে বসিয়া চেলা-চামুণ্ডার দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। সংস্থগণ মধ্যে পাঁচ শ্রেণীর নাম পাওয়া যায়।

(১) কাপটিক—পরমর্ম্মবিদ্ প্রৌঢ় ছাত্র।

(২) উদাস্থিত—সন্ন্যাসভ্রষ্ট পর্য্যটক।

(৩) গৃহপতি ব্যঞ্জন—কৃষক শ্রেণীর গৃহস্থের ছদ্মবেশ-ধারী।

(৪) বৈদেহক ব্যঞ্জন—বণিকের ছদ্মবেশধারী।

(৫) তাপস ব্যাজন—ন্যাড়ামাথা বা জটাধারী তাপসের ছদ্মবেশধারী। এই তাপস ব্যাজন গুপ্তচরগণ বলিত আমরা লোকের ভবিষ্যৎ বলিতে পারি। ভবিষ্যৎ বলিয়া শিষ্যদের দ্বারা সেই ঘটনা ঘটাইয়া বলিত—দেখ যাহা বলিয়াছি তাহাই তো হইল। লোকে ইহাদিগকে সম্মান করিত।

গুপ্তচরদের দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল সঞ্চারী। ইহারা দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। ইহারা চারিটি বিভাগে বিভক্ত ছিল। ১ম বিভাগ সত্রী—ইহারা রাজার গোষ্ঠীভুক্ত স্বজন হইতে নির্ব্বাচিত হইত। ইহারা লক্ষণ বিদ্যা, অঙ্গ বিদ্যা, বশীকরণাদি ও অন্তর্দ্ধানাদি বিদ্যা,ইন্দ্রজাল, আশ্রম ধর্ম্ম, শাকুন বিদ্যা, ও পক্ষিবিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিত। ২য় বিভাগে থাকিত তীক্ষ্ণ—প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যাহারা দুঃসাহসের কাজ করিত। ৩য় রসদ-বিষ প্রদানকারী। ৪র্থ পরিব্রাজিকা—রমণী গুপ্তচর। ইহারা কেহ কাহাকেও চিনিত না। আর এক শ্রেণীর চর ছিল "উভয় বেতন"। ইহারা দুই রাজারই মাহিনা খাইত। তবে যে রাজার ইহারা প্রকৃত সাহায্যকারী সেই রাজার নিকট ইহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি প্রতিভূ স্বরূপ থাকিত।

দূতগণও আর এক শ্রেণীর চর। নিসৃষ্টার্থ দূত—রাজ-প্রতিনিধি, পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া কাজ করিত। অমিতার্থ বা পরিমিতার্থ দূত,—কোন বিশেষ বিষয় নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত হইত। শাসনহর দূত—মাত্র পত্রবাহক। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী নায়ক-নায়িকার দূতীপ্রকরণেও এই বিভাগই গ্রহণ করিয়াছেন। নিসৃষ্টার্থ দূতী, নায়ক বা নায়িকা বলিয়া দেন নাই, নিজ দায়িত্ব লইয়া সেই কথা বলিয়া আসিতেন, যে কাজের ভার লইতেন, অতিরিক্ত কিছু করিয়াও সেই কার্য্য উদ্ধার করিয়া ফিরিতেন। অমিতার্থা দূতী—আজ্ঞাবাহিকা, নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিতেন, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত কিছু করিবার সামর্থ্য রাখিতেন না। পত্রহারী—মাত্র পত্রবাহিকা। আমাদের দেশে একটা কথা আছে "চার চক্ষু", অর্থ চারিটি চক্ষু নয়, যিনি চরের চক্ষুতে দেখেন। চাণক্য স্বপ্রণীত অর্থশাস্ত্রে যম পট্টিক বা বাদিয়ার সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন নাই। তবে "সত্রি" চরেরা যে সব বিদ্যা শিখিতেন, সেই সমস্ত বিদ্যালয়বিশেষজ্ঞগণের যে চর নিযুক্ত হইতে কোন বাধা নাই, ইহা সহজেই বুঝা যায়। আমরা মুদ্রারাক্ষসের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া যমপট্টিকগণ যে চাণক্যের গুপ্তচর ছিল ইহা মানিয়া লইয়াছি, এবং ইহারাই যে পরে পটুয়া নামে পরিচিত হইয়াছিল, ঐতিহ্য অনুসরণে তাহা নিশ্চিত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।

ছায়া-ঘর

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

সোনালী রোদের ছায়া-ঘরে
মেঘ আলো হরিণের আয়ু রং-খেলা
কোনদিন তুমি দেখেছ কি?
নূপুরের নুড়ি-ছোঁয়া ঘ্রাণে
সাগরের উৎসবে, প্রাণে
লতা, ফুল, পাখীদের ছবি।

নক্ষত্রের, জোনাকীর আলো—
যে নয়নে জলে সারারাত,
মাধবীর সেই মধু-তিথি
কখনও বেসেছ নাকি ভালো?

এ-নদীর ছবি আঁকব না!
সীমাহীন ভূগোলের স্বরে—
জানি সব স্মৃতি আছে গাথা।
প্রত্যহের প্রবল হাওয়ায়,
ভীরু-পাতা ক্রমে ঝরে যায়
সঙ্গীত-সুরভি আনে কবি।

তবু, চাওয়া—পাওয়া এই নিয়ে
পৃথিবীর রূপ চলে গড়া।
দূর্বা বোঝে না তার শিশিরের আয়ু,
হয় না যে হৃদয়ের শেষ-বই পড়া॥

ভেড

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

সেদিনের কথা মনে পড়ে শুক্লার।

একটি কচি তরুণ, কাঁচা ঢলঢলে মুখ; সেই তাকে আশ্বাস দিয়েছিলো। তার বিপদে অযাচিতভাবে সেই সাহায্য-কর প্রসারিত করেছিলো। অথচ, কোন প্রত্যাশার বিনিময়ে নয়। স্বার্থেরো কোন সম্পর্ক ছিলো না তার সঙ্গে। আপিসের আর আর সহকর্মীদের মাঝে সে এক ব্যতিক্রম। স্বল্পভাষী তরুণ, সবেমাত্র কৈশরের সীমানা অতিক্রম করেছে। হিসেব করে দেখতে গেলে দেখা যাবে সেও বোধহয় শুক্লারই সমবয়সী।

ড্যালহাউসি স্কোয়ারের আপিস-পাড়ায় তখন এখনকার মতন মেয়েদের এতো ভিড় ছিলো না। যুদ্ধের বাজারে কিছু লেখা-পড়া জানা মেয়ে কেবল চাকরির দরজায় পা দিয়েছে। যুদ্ধের দরকারে হঠাৎ গজিয়ে-ওঠা আপিস। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সে-সব আপিসেরো দরজা বন্ধ হয়ে গেলো।

শুক্লার ভাগ্য নিতান্তই সুপ্রসন্ন। সাপ্লাই আপিসের মাত্র কয়েকমাসের চাকরিতেই সে এক মাদ্রাজী-সাহেবের সুনজরে পড়ে যায়। তাঁরই রেকমেণ্ডেশনে তাঁর এক স্বজাতি বন্ধু শুক্লাকে টেনে নিলেন তাঁদের সওদাগরী আপিসে।

শুক্লাই সেখানে প্রথম মহিলা-কর্মী।

'মেয়ে মানুষের আবার পুরুষালি কাজ কেন?'—ছড়া, টিপ্পনি, এপাশে, ওপাশে গুঞ্জন,—শুক্লার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

'হের শুক্লা একাদশী,

নিদ্রাহারা শশী!'—টেবিলের ওপর লেখা স্লিপ। শুক্লা নিঃশব্দে হজম করে। এতবড় আপিসে সেই একমাত্র মেয়ে; তাই প্রতিবাদের কণ্ঠ জোরালো নয়। 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন!' শুক্লার রং কালো; তাই এ মন্তব্য। অপর দিক থেকে কে একজন আবার বলে ওঠে—কোকিল যে কালো তাতে কি বা আসে যায়!

আর বড়বাবুও বিরূপ। হয়ত কোন শ্যালক-শ্রেণীর আত্মীয়ের প্রবেশ-পথ বন্ধ করেছে আঠার বছরের শ্যামলাঙ্গী এই ছিপছিপে মেয়েটি। তবে নেহাৎ বড়-সাহেবের ক্যাণ্ডিডেট্; তাই ভাতে মারা যায় না।

আই-এ পর্যন্ত পড়া শ্যামাঙ্গী মেয়ে। রূপ নেই, কিন্তু রূপের চটক আছে। আর গগনস্পর্শী গাম্ভীর্য। চল্লিশ টাকা'র জুনিয়র গ্রেডের চাকরিতে মাটিতে যেন পা পড়ে না। সকলকে এড়িয়ে চলে। কথার পিঠে কথার প্রত্যুত্তর দেওয়ারো কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না।

তবুও নিমাই দত্তই প্রথমে শিভ্যালরি দেখাতে এগিয়ে এসেছিলো ক্যান্টিনে একদিন চায়ের টেবিলে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

শুক্লা স্পষ্টই জবাব দিয়েছিলো, 'ক্যান্টিনে আমি খাই নে। আমার টিফিন বাড়ি থেকেই আসে।'

আর একদিন হাফ্ হলিডেতে আপিসের ছুটির পর মিড-ডে-শোতে বিলিতি সিনেমা দেখার আমন্ত্রণ এলো আর এক চটপটে তরুণ সহকর্মীর কাছ থেকে।

শুক্লা জানালে, পুরুষমানুষ বন্ধুর সঙ্গে বসে সিনেমা দেখার অভ্যেস তার নেই।

'ওঃ, ভারি আমার সতীপণারে!'

'কী বললেন? স্কাউণ্ড্রেল কোথাকার!'—শুক্লার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেলো। তার তীর্যক কণ্ঠস্বরে সহকর্মী তরুণ ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো।

শুক্লা তবু ছাড়লে না। তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'ভদ্রলোকের মতন কথাবার্তা বলতে শিখবেন। না হলে আমাকে আইন নিজের হাতেই নিতে হবে।'

শুক্লাকে সেইদিন থেকেই সকলে চিনে নিয়েছে। এরপর আর তার কাছে এগুবার সাহস আর কারুর হয়নি।

তবে বড়বাবু সহজে ছাড়েন নি।

ডেসপ্যাচ সেকশনে কাজ শুক্লার। চিঠির খামে পরিচ্ছন্ন হরফের ঠিকানা লেখা। তাতে ভুলচুক নেই। ভুলচুক শুধু এর চিঠি ওর খামে, ওর চিঠি এর খামে। সহকর্মীদের মধ্যে যোগসাজসে তাকে বিপদে ফেলা।

বড়বাবু নালিশ জানালেন উপরওয়ালার কাছে—'ওকে দিয়ে একাজ চলবে না। চিঠির ভীষণ গোলমাল হচ্ছে।'

এমন কী শুক্লার কাজের নমুনাও তুলে ধরেছিলেন সাহেবের নজরে। বড় সাহেবের ঘরে ডাক পড়লো।

মাদ্রাজী সাহেব শুনলেন, সংসারে একমাত্র রোজগেরে মেয়ে। একটি মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারের একমাত্র আশা-ভরসা। অথর্ব পিতার চাকরি যাওয়ায় বাঙলাদেশের পর্দানসীন পরিবার থেকে কলেজের পাঠ চুকিয়ে দিয়ে সেই নেমেছে শহরের রাজপথে একটি নিমজ্জমান সংসারকে টেনে তুলতে।

স্বল্প কথাতেই মাদ্রাজী-সাহেব মুগ্ধ হলেন।

বড়বাবুকে ডেকে বড়সাহেব নিজে আদেশ দিলেন, 'ডেসপ্যাচে নয়, ওকে দাও ফাইলিং-এ।'

সেখানেও বিপদ।

রাশি রাশি চিঠির তাড়া। দরকার অদরকারে বড়-বাবু চিঠির রেফারেন্স চেয়ে পাঠান।

সুজিতই তাকে তখন রক্ষা করলে। কচি ঢলঢলে মুখ, তারই সমবয়সী তরুণ-কিশোর।

'কী চিঠি চাইছেন?'

'নতুন একটা পারচেজের করসপণ্ডেন্স।'

'ফার্মের নাম?'

শুক্লার জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুজিত একটি ফাইল টেনে বার করলে। তাইতে সবকিছুই পাওয়াগেলো।

শুক্লার কৃতজ্ঞতার আর অন্ত নেই। অথচ সুজিত কাজ করে তার পাশের সেকশনে, রের্কডসে। সলাজ, নম্র-প্রকৃতির ছেলে, ঢলঢলে মুখকান্তি। আশ্বাসভরা কণ্ঠে জানালে, যখনই দরকার পড়বে ডাকবেন আমাকে।

প্রায় সর্বক্ষণই দরকার পড়ে শুক্লার সুজিতকে। নিজের নির্দিষ্ট কাজের চেয়ে শুক্লার কাজেই তাকে রত থাকতে দেখা যায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। শুক্লা নিশ্চিন্ত। বড়বাবুর আক্রমণ প্রতিহত হয়।

কিন্তু শুধু একখানি সাহায্য-করই প্রসারিত মাত্র। সুজিতের আর কোন আগ্রহ নেই। বিপুল সহানুভূতি-ভরা মন। একটি বিপন্না সহকর্মিণীকে বিপদের আওতা থেকে রক্ষা করা মাত্র।

দিনের পর দিনের পরিচয়ে এবং সাহচর্যে সুজিতের মধ্যে অপর কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করা যায় না।

শুক্লা শুনেছে শুধু একটি অভাবগ্রস্থ পরিবারের ছেলে সুজিত। অত্যন্ত কায়ক্লেশে তাকে এই অল্প বয়সেই একটি সংসারের গুরুভার কাঁধে তুলে নিতে হয়েছে।

শুক্লার সঙ্গে সুজিতের অবস্থা এবং দায়িত্বের ঘন মিল। এক জায়গায় শুধু অমিল। এতো অল্প বয়সেই বিধবা মায়ের চোখের জলের অনুনয়ের কাছে সুজিতকে হার মানতে হয়েছে। কুড়ি বছরের ছেলে এরই মধ্যে বিবাহিত। সংসার শুধু তার বিধবা মা, কনিষ্ঠ ভাই-বোনদের নিয়েই নয়,—তার সঙ্গে নব পরিণীতা স্ত্রীও আছে। আর দিনে দিনে আরো আরো আগন্তুকের সম্ভাবনা।

শুক্লার সে দায়িত্ব নেই। তবু দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত মিল। দু'জনেই স্বল্পবাক্, সংযত, সংহত। কাজের কথার বাইরে কেউ কারুর ব্যক্তিগত কথায় থাকে না। অহেতুক আগ্রহের চাপল্যও তাদের দু'জনের কারুর মধ্যে নেই।

শুধু ফাইলিং আর রেকর্ডস্ কেন, আপিসের নানা সেক্শনে এখন মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে কাজ-কর্ম করে।

বড়বাবুদের আর চোখ টাটানি নেই। সহকর্মী পুরুষ কেরাণিদেরো কণ্ঠে এখন আর মেয়েদের নিয়ে প্রকাশ্যে ছড়াগান, ব্যঙ্গ কবিতা কিংবা ইতর রসিকতার কথা প্রকাশ পায় না।

ট্রামে, বাসে, রাজপথে প্রকাশ্যে মেয়েদের ভিড়। আপিসের টেবিলে পাশাপাশি বসা, এক সঙ্গে ক্যান্টিনে টিফিন খাওয়া, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের আদান-প্রদান এখনকার চাকরি-জীবনে সাধারণ ঘটনা। মেয়ে আর পুরুষ এক সত্তা। দশটা-পাঁচটায় একই জীবন-ধারায় প্রবাহিত ঢেউ।

আপিস থেকে খেলার মাঠে, সিনেমা বা থিয়েটার যাওয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা।

সেক্‌শনে সেক্‌শনে মিল। এর ওর কাজে সহায়তা। এক সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন করা, ধর্মঘটের পথের ধুলোয় নামা, মিটিং করা।

সিভিল ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের খাতায় সহকর্মী সহকর্মিণীদের দু'চারজনের নাম যে ওঠে না এমন নয়। স্বামী-স্ত্রীর যৌথ রোজগারে সংসার চলে। একই আপিসে পাশাপাশি দু'জন। যেমন একই সংসারে পাশাপাশি দু'জন। এখন অনেক পরিবর্তন। পরিবর্তন যুগের, পরিবর্তন কালধর্মের। পরিবর্তন মানুষের মধ্যে। স্ত্রী-পুরুষের সত্তায় সত্তায়।

পরিবর্তন নেই কেবল শুক্লা দাশের। বিশ বছরের চাকরি-জীবনে সেই একই ধারা। অথর্ব পিতার সংসারের জোয়াল আজো কাঁধ থেকে নামেনি। ভাইয়েরা বিশেষ কেউ মানুষ হলো না। আর যেবা একটু আধটু রোজগারের মুখ দেখেছে—সেই স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ভিন্ন সংসারী। বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্য নেই। বোনেরা কেউ কেউ বিবাহিতা। নিজের সংসারের ভাবনার বাইরে আর তাদের বাপের বাড়ির ভাবনা নেই।

শুক্লার দায়িত্ব এখনো অনেক। নিজের ভাবনা ভাববার সময় কই? চল্লিশ টাকার জুনিয়র গ্রেড থেকে চারশো টাকার সেকশন-ইন্‌চার্জ। কিন্তু এই মাগ্‌গি-গণ্ডার দিনে শহরের জীবনে এ আয়ের মূল্য কী?

সুজিত বসুও আছে। ফাইলিং-এর পাশে রেকর্ড্‌সে নয়। অন্য সেকশনের এখন ইনচার্জ। শুক্লার সেকশন থেকে অনেক দূরে।

ফরসা ধবধবে চেহারার আর সে জৌলুস নেই। ঢল-ঢলে চোখ দুটির মাদকতাও মসীবর্ণ। ছাঁ-পোষা মানুষ।

তবে স্বভাবটি তেমনিই আছে। সেই স্বল্পবাক্‌, পরোপকারী, অপিসের কাজে চৌখস কাজের লোক।

কখনো-সখনো দেখা হয় বৈকি সুজিতের সঙ্গে শুক্লার। কুশল বিনিময়ের সৌজন্যমূলক ব্যবহার। তার বেশি আর কিছুই নেই।

আপিসে সেদিন ভীষণ-কাণ্ড।

হঠাৎ খবর পাওয়া গেলো পারচেজ সেকশনের বাসুদেব চক্রবর্তী আত্মহত্যা করেছে। ওই সেকশনেই কাজ করতো শোভনা নন্দী।

বাসুদেবের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা তার ঘনিষ্ঠ। আপিসে তাই নিয়ে সকাল থেকেই আলাপ-আলোচনা।

মাত্র কয়েকদিন আগেও দেখা গেছে চৌরঙ্গীর সম্ভ্রান্ত রেঁস্তোরাঁয় আপিসের ছুটির পর স্বতন্ত্র কেবিনে দু'জনে পাশাপাশি বসে কফি পান করেছে। শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত সিনেমা হাউসে পাশাপাশি দু'জনে বসে ইভ্‌নিং শোতে বিলিতি ছবিও দেখেছে।

তারপর শোভনা নন্দী হঠাৎ আপিসে আসা বন্ধ করেছে। আর বাসুদেবের মনও বিমর্ষ। হলো কী?

হঠাৎ খবর পাওয়া গেলো শোভনা নন্দীর অন্তর্ধানের খবর। বড় গাছের মগ ডালে সে নাকি বাসা বেঁধেছে। একজন অবাঙ্গালী বড় কনট্রাক্‌টরের সঙ্গে দু'চার দিনের কোর্টসিপের পর সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্টে মিস নন্দী মিসেস চোপরা হয়ে দূর দেশে পাড়ি জমিয়েছে। সওদাগরী আপিসের জুনিয়র গ্রেডের মেয়ে-কেরাণীর আর সহকর্মী বাসুদেবের পাশে ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই।

সেই আঘাতেই সেন্টিমেন্ট্যাল বাসুদেব সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। রাত্রে ঘরে খিল দিয়ে শুয়েছিলো। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয় তবু দরজা খোলে না। দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বাপ-মা, ভাই-বোনের আর্ত চীৎকার—বাসুদেব আর নেই!

মাথার বালিশের তলায় চিরাচরিত দুটি ছত্রের স্লিপ। বাসুদেবের নিজের হাতের লেখা,—'জীবনের আর কোন অর্থ নেই। স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছি। আমার মৃত্যুর জন্যে কেউই দায়ী নয়।'

আপিসময় ছড়িয়ে পড়লো খবরটা। 'পুয়োর বাসুদেব!' সমস্ত দিন ধরেই এখানে সেখানে চাপা গলার ফিস-ফিসানি—'পুয়োর বাসুদেব!' এই কালকেও যার সঙ্গে একত্রে বসে কাজ কর্ম করা গেছে, দিনের পর দিন যা[illegible] সাহচর্যের স্মৃতি, তাকে চিরকালের মতন হারিয়ে আজ কি আর আপিসের কাজ করা চলে? সকলের মধ্যেই কেম[illegible] যেন একটা শূন্যতাবোধ।

আর কী শয়তানী মেয়ে শোভনা নন্দী! একটা মানুষের জীবন নিয়ে এ কী কৌতুক তার!

গায়ের রংটা মাজা মাজা। অনেকটা শুক্লার মতনই। দেহের গড়নটি সুন্দর। দেহের যৌবনকে সব সময়ে পুরুষের চোখের সামনে মেলে ধরার কায়দা তার আয়ত্তে। বাসুদেব তাইতেই মজেছিলো। মিষ্টার চোপরা, তিনিও তাইতেই মজেছেন।

হঠাৎ যেন একটা জোয়ারের ধাক্কা এসে লাগলো শুক্লার বুকে। তার দেহের গড়নেও মাধুর্য ছিলো। শ্যামল অঙ্গশ্রী ঘিরে ভরন্ত দেহ-যৌবন। চোখ দুটিও সুন্দর। লম্বাটে চেহারা কুঞ্চিত কেশদাম। শোভনা নন্দী নিজেকে সাজাতে জানতো, পুরুষের চোখের সামনে নিজেকে মেলে ধরার কায়দাও জানতো।

আর শুক্লা ঠিক তার বিপরীত। সে নিজেকে ঢেকে রাখতেই শিখেছিলে; আঠারো বছর বয়সে যে শুক্লা এসেছিলো জুনিয়র ক্লার্ক হয়ে, কুড়ি বছর বাদে সেকশন্যাল ইনচার্জ সেই শুক্লাই আছে। দেহ বল্লরীতে এখন আরো কিছু মেদ। কুঞ্চিত কালো চুলগুলিতে একটু একটু পাক ধরেছে। টানা টানা চোখ দুটিতে বয়েসের ছাপ।

প্রথম থেকেই নিজেকে শুধু আড়াল করে রাখা! রূপ কিছু ছিলো, যৌবনও ছিলো।

অনেকেই তো তার দিকে এগিয়ে এসেছিলো। শুধু আপিসে কেন, পাড়াপ্রতিবেশীদের মধ্যে, ট্রাম-বাসের সহযাত্রীদের মধ্যে, দূর এবং নিকট আত্মীয়দের মধ্যে, টুকিটাকি কথার আদান-প্রদানে, শুক্লার নারীত্বকে সম্বর্ধনা জানাতে এসেছিলো বৈকি অনেকেই! কিন্তু শুক্লা শুধু নিরুত্তাপ। মজা নদী—স্রোতের আবর্ত নেই সেখানে।

হঠাৎ বাসুদেব চক্রবর্তীর আত্মহত্যা তাকে নাড়া দিলে। বোকা বাসুদেব, প্রেম করতে জানে; অথচ ছিনিয়ে নিতে জানে না!

চুপ করে বসেছিলো শুক্লা। কাজে আজ তারো মন নেই।

আপিস ফাঁকা হয়ে গেছে।

সেকশনের সবাই চলে গেছে। শুক্লা শুধু চুপচাপ বসে। এই নির্জনতা এখন তার ভালো লাগছে। আপিসের মধ্যে এই নির্জনতা। বাইরে বেরুলেই এখনি জনারণ্যে মিশে যেতে হবে। বাড়ি ফিরলে আরো ভয়ঙ্কর। অথর্ব পিতার মনস্তাপ, মায়ের শরীরের নানা জটিল ব্যাধির ফিরিস্তি, আর শুক্লার এই আত্মত্যাগে মহিমান্বিত জীবনের যশোগাথা বর্ণনা—অসহ্য, অসহ্য আজ শুক্লার কাছে।

তার থেকে আপিসের মধ্যে নিজের এই সংরক্ষিত জায়গাটুকু এখন বেশ নির্জন। নিয়মের আলোতে বেশ মাদকতা মাথার ওপর ঘূর্ণায়মান দ্রুতগতি পাখার হাওয়ায় ক্লান্তি বিনোদনের আমেজ।

আত্মস্থ হয়ে বসেছিলো শুক্লা। নিজন তন্ময়তা। হঠাৎ কার ডাকে তার আত্ম-সম্বিৎ ফিরে এলো।

'মিস দাস, শরীরটা আজ খারাপ নাকি?'

শুক্লা মুখ ফিরিয়ে দেখলে, সুজিত বসু। আশ্চর্য হয়ে গেলো সে। অন্য সেকশনের মানুষ,—আপিস-বাড়ির অন্যতলার লোক। এ-ঘরে তার আসবার দরকারো হয় না।

'বাড়ি যাবেন না?'

সুজিতের দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে শুক্লা বললে, 'হ্যাঁ, যাবো এইবার।'

সুজিত শুক্লার আরো কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়,—'চুপ-চাপ নিরিবিলি এমনি ভাবে বসে আছেন! শরীর-টরীর খারাপ নাকি?'

'না, এমনি বসে আছি। ভাল লাগছেনা কিছুই।

'যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিগ্যেস করবো?

শুক্লা তাকিয়ে দেখে সুজিতের দিকে,—'কী বলুন!'

'সংসারে কোন কিছু—'

শুক্লার চোখে বিস্ময়। এতো আত্মীয়তার কণ্ঠ কখনো শোনেনি সে। সুজিত বসু তার চাকরী জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধু। অনেক করেছে সে তার জন্যে। তবে সে শুধু আপিসের কাজে সাহায্য। কিন্তু এমন অন্তরঙ্গতাকে কোনদিনই প্রকাশ করেনি সে।

'কই উঠুন!' সুজিত আবার তাগিদ দিলে।

'আমার সঙ্গে আপনার কী কোন দরকার আছে?—' শুক্লা প্রশ্ন করলে।

'না, দরকার কিছু নেই। তবে এইদিক দিয়ে যাবার সময় দেখলাম একলাটি বসে আছেন। মুখ ভার। ভাবলাম, যদি কিছু উপকারে আসি!'

সুজিতের কথায় শুক্লা বললে, 'আচ্ছা, আপনি কী শুধু মানুষের উপকারই করেন?'

সুজিত বললে, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন? কেন বলুন তো!'

'এই তো আমারই কতো উপকার আপনি করেছেন। আপনি না থাকলে এ আপিসে আমার চাকরি কী থাকতো?'

'কী যে বলেন!' কুণ্ঠিত স্বরে সুজিত বললে।

শুক্লা জিগ্যেস করলে, 'আপনি কারুর কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন না?'

'মানে?'

'মানে প্রতিদানে কিছু—'

'দানটা স্বতঃস্ফূর্ত, প্রতিদান চেয়ে নেওয়া। না, ও ভিক্ষাবৃত্তিতে আমার আগ্রহ নেই।'

শুক্লা বিস্মিত-চোখে সুজিতের দিকে তাকিয়ে থাকে। এ যেন অন্য সুজিত, স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল, বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রখর।

'রেখা মিত্তিরের চাকরি যাচ্ছিলো। বড় সাহেবকে বলে-কয়ে আপনিই তাকে বাঁচিয়ে দিলেন।' শুক্লা আবার কথার জের টানলে।

'রেখা মিত্তিরের অনেক লায়বেলিটিস্। এই বাজারে চাকরি গেলে ভারি বিপদে পড়তো মেয়েটি!'

'এতো জনের এতো উপকার করেন, আর বাসুদেব চক্রবর্তীকে আত্মহত্যার কবল থেকে বাঁচাতে পারলেন না?'

শুক্লার হঠাৎ এ-কথায় সুজিত বসু বিস্মিত হয়ে ওঠে। বাসুদেব চক্রবর্তীর আত্মহত্যার সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? ফ্যাল ফ্যাল করে সে শুক্লার দিকে তাকিয়ে রইলো। এতোক্ষণের বুদ্ধিমত্তা বোকাটে অন্ধকারে ডুবে গেছে।

শুক্লা আবার বললে, 'মানে, হয় শোভনা নন্দীকে বাসুদেবের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পারতেন, না হলে বাসুদেবকে তার হাত থেকে উদ্ধার করতে পারতেন!'

'মানে, আপনি কী মনে করেন শোভনা নন্দীর চোপরা-ঘটিত ব্যাপারে আমার কোন হাত ছিলো?'

'না, না, ছিঃ, ছিঃ, ওকথা কী বলছেন?'

'তবে?'—সুজিত বসুর কণ্ঠে উত্তেজনা।

শুক্লা হেসে ফেললে, 'না, আপনি এখনো দেখছি সেই ছেলেমানুষটিই থেকে গেছেন। সামান্য একটা ঠাট্টাও বোঝেন না!'

সুজিত আশ্বস্ত হলো।

'বাসুদেবের কথা আর বলবেন না। বামন হয়ে আকাশের চাঁদে হাত বাড়াতে গেছলো।'

শুক্লা আগ্রহের সুরে জিগ্যেস করলে, 'চাঁদটা কে?'

'কেন, শোভনা নন্দী!'

'চিনতেন ওকে?'

'ওকে আবার কে না চেনে? কতো ঘাটের জল খেয়ে কতো ঘাটের জল ঘোলা করে তবে বাসুদেবকে ধরেছিলো। আর বাসুদেব তো উপলক্ষ মাত্র! বাসুদেবকে ভর করেই ধরতে চেয়েছিলো চোপরা সাহেবকে, এ্যাণ্ড সী হ্যাজ বিন সাকসেসফুল!'

'বাসুদেবের সঙ্গে চোপরা সাহেবের সম্পর্ক?'

'অফিসিয়াল কন্‌টাক্টে এসে তারপর পারসোন্যাল রিলেশনস্। চোপরা সাহেব ওকে রেসের টিপস্ দিতো। তা না হ'লে ওই মাইনেতে অত নবাবী করতে পারে?'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। এসব খবর আপনি জানতেন না? আপিসের আর সবাই তো জানে।

সুজিতের কথায় শুক্লা বললে, 'আমি আর কতোটুকুই বা জানি! কিন্তু আমার ধারণা ছিলো আপনিও আমার মতন কিছুই জানেন না।'

শুক্লার দিকে সুজিত তাকালে, 'কেমন করে বুঝলেন?'

'পুরুষদের মেয়েরা সহজেই চিনতে পারে।'—শুক্লা হাসলে।

সুজিত আগ্রহ প্রকাশ করলে, 'আচ্ছা, আর কী জানেন আমার সম্পর্কে বলুন তো!'

'তাতে আমার লাভ?'

'লোকসানই বা কী?'

শুক্লা তাকিয়ে দেখলে সুজিতের দিকে। সুজিত বসু একদিন যে নিজেকে আড়ালে বিচ্ছিন্ন করে রাখতো, আজ সে নিজেকে মেলে ধরেছে।

শুক্লা জিগ্যেস করলে, 'কোথায় যাবেন এখন?

'কোথায় আর যাবো বলুন!

'কেন, বাড়ি, ঘর, সংসার?'

সুজিত বিমর্ষ কণ্ঠে বললে, 'আপনি তো সবই জানেন। ঘর ভেঙে গেছে। ঘরে ফিরতে আর মন চায় না!

হঠাৎ শুক্লা ক্ষেপে গেলো, 'তাই কী এসেছেন আমার সঙ্গলাভ করতে? ছিঃ, ছিঃ, আপনি যে এতো ছোটো আমার তা ধারণাতেই আসে নি। দু'মাসও হয়নি এখনো আপনার স্ত্রী বিয়োগ ঘটেছে, এরই মধ্যে সব স্মৃতি মুছে ফেলে দিলেন?'

শুক্লার হঠাৎ এ ভাবান্তরে সুজিত বসু অপ্রস্তুত হয়ে ওঠে। কী বলতে কী বলে ফেলেছে বুঝি! অনুনয়ের সুরে বললে সে, 'ক্ষমা করবেন! আপনার প্রতি ইঙ্গিত করবার মনোভাব নিশ্চয়ই আমার নেই। ভেবেছিলাম আপনার নিঃসঙ্গতার সঙ্গে আমার নিঃসঙ্গতার হয়তো কোনো মিল আছে।'

শুক্লা তখন আপিসের চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

সুজিত বসু আবার কুণ্ঠা প্রকাশ করলে, 'আশা করি আমার প্রতি কোনো অবিচার করবেন না। আমার কথারো অন্য কোনো অর্থ বুঝবেন না।'

দু'জনেই বের হয়ে এলো ড্যালহাউসি স্কোয়ারের আপিস বিল্ডিং থেকে। ড্যালহাউসি স্কোয়ার তখন পাতলা।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। নিঝুম হয়ে পড়েছে রাজপথ। একখানা ফাঁকা ট্যাক্সি যাচ্ছিলো।

শুক্লাই তাকে সংকেতে থামালো। সুজিত বসুকে আহ্বান জানিয়ে বললে, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাবো।'

কুণ্ঠিত সুজিত ট্যাক্সিতে উঠে গেলো। শুক্লাও।

সুজিত খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রাখতে একপাশে সরে বসেছিলো। শুক্লা কিন্তু অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, 'এই বয়সে স্ত্রী বিয়োগ, সত্যিই আনবেয়ারেবল!'

বিমূঢ় সুজিত তাকিয়ে দেখে শুক্লার দিকে।

শুক্লার কণ্ঠস্বর আরো আর্দ্র—আরো সহানুভূতিশীল, 'আচ্ছা সুজিতবাবু আপনার ছেলে পুলে কটি?'

'কাচ্চা-বাচ্চা সমেত জন ছয়েক।'

'তাদের দেখা শুনো করে কে?'

'সেইখানেই তো বিপদ মিস দাস। বড় মেয়েটিই সাবালিকা। তাও বিয়ে হয়ে যাওয়ায় সে এখন পরের ঘরের বউ। নিতান্ত দায়ে পড়ে তাকে এই দু'মাস এনে রেখেছি।' সুজিতের গলার স্বর ভারি হয়ে আসে।

'একটা বয়স্কা মেয়েকে বিয়ে করুন। কাচ্চা-বাচ্চাদের তো দেখাশুনা চাই!

শুক্লার কথায় সুজিত চমকে ওঠে, 'ঠাট্টা করছেন? এই বয়সে আবার বিয়ে?'

'ঠাট্টা করবো কেন? বিয়ে করা ছাড়া আপনার অন্য উপায়ই বা কী?'

চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু ধরে তখন ট্যাক্সি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গাড়ির ঝাঁকানিতে দুজনেই দুলছিলো। সামনে একখানি দোতলা ভারি বাস এসে পড়ায় ট্যাক্সি ড্রাইভার দ্রুত গতিতে গাড়িটাকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। সেই ঘূর্ণীতে সুজিত একেবারে শুক্লার গায়ের ওপর পড়ে গেছে। ভয়ার্ত শুক্লাও তাকে জড়িয়ে ধরলো।

'খুব বেঁচে গেলাম। ভীষণ এ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছিলো এক্ষুণি।'

মৃদু হেসে শুক্লা বললে, ক্ষতি কী ছিলো তাতে? কাল আপিসে আমাদের নিয়েই শোকসভা হতো!'

পাঞ্জাবী ড্রাইভার বাসওয়ালাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে আবার গাড়ি চালাচ্ছে।

শুক্লা আর সুজিত এতোক্ষণে পাশাপাশি সোজা হয়ে বসেছে!

শেষ প্রশ্ন

ডক্টর মতিলাল দাস

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমায় বাতাস
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।"

বাংলা মায়ের সজল শ্যামল কোলে প্রাত্যহিক জীবনের ধাঁধায় ঘুরে মরছি—আর মনে ভাবছি কি পেলাম এই জগৎ পরিভ্রমণে? বিশ্বময়ীর যে মাধুর্য্য অনুপম, তা দুচোখ ভরে পান করেছি—সেই ত পরম সার্থকতা। পার্থিব অভ্যুদয়ের আশালতা ছিঁড়ে পড়েছে—আজ এ বোধ সম্পূর্ণ জাগ্রত—বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়।

পৃথিবীর ইতিহাস এই শিক্ষা দেয়—গতি ঋজু ও সরল নয়, সে বৃত্তাকার। আজ আমরা পতনের গভীর গহ্বর তলে—আজ উদ্ধার অসম্ভব, তথাপি অমারাত্রির নিবিড় অন্ধকারে—রুদ্রবীণা বাজাতে হবে—বলতে হবে ভাবীকালের কথা। যে অনাগতকাল আসছে, তাকে মহোজ্জ্বল করতে চাই দধীচির তপস্যায়। চাই দুর্জ্জয় শক্তিসম্পৎ।

ভারতবর্ষে আজ রিক্তের জয়োল্লাস। যে সুভাষচন্দ্র ছিল ভারতের স্বাধীনতা, তাকে ভুলে শুধু চলেছে চক্রান্তের আবর্ত্ত। অক্ষমের হাতে ক্ষমতার দর্প অসহনীয়। তাই এই মহাদুর্দ্দিনে নবীন আশার ধ্বজা হাতে নিয়ে বাঙালীকে চলতে হবে—দুঃখের পথে, দুঃসহ বেদনার মাঝে তাকে লড়তে হবে—জীর্ণতার নাগপাশ ছেদন করে আনতে হবে নব অরুণোদয়—নব জাগ্রত প্রাণে অপরাজিত বাণী প্রকাশ করতে হবে।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥"

কবিগুরুর এই গান আজ বাংলার প্রতি তরুণ ও তরুণীর কণ্ঠমালা হোক—তারা জীবনের নিষ্ঠুর দ্বন্দ্বে লোভের মোহে যেন জড়িয়ে না পড়ে—তারা যেন মনে রাখে বাঙ্গালীকে মৃত্যুর হলাহলের মাঝে আনতে হবে অমৃত-বাণী—পূর্ব্ববঙ্গের ছেলেরাই ফাঁসির কাষ্ঠে মরণের জয়গান গেয়ে স্বাধীনতা এনেছে—আজ সেখান থেকে সেই বীর শহীদগণের পরমাত্মীয়ের দল—তাদের মা ও বোনেরা পথকুক্কুরের মত রাজপথে আজ একান্ত অসহায়ের মত ঘুরে বেড়ায়—তাদের জন্য কি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নাই? তাদের ভারত আগমনের পথ রুদ্ধ করে, ক্ষীর সর ননী উপভোগের দুর্ব্বল লোভে পাকিস্থানের সকল অপমান ক্লীবের মত সহ্য করে চলা কি আমাদের উচি? আর সেই ক্লেদ ও কলুষ থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরাবার জন্য কেবল চলছে মিথ্যা গরিমার হুঙ্কার।

"প্রাণ লভুক সকল ভুবন, নয়ন লভুক অন্ধ।"

অজ্ঞানের অন্ধকারের গভীরতম গহ্বরে থেকে চলছে যে বিলাস সমারোহ—কোটি কোটি টাকা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলা চলছে—তার শেষ যতদিন হবে না—ততদিন বৃথা আস্ফালন।

হে আমার বাংলার ভাই বোন, মনে রেখো তুমি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবধারার উত্তরাধিকারী, তুমি বিবেকানন্দের দীক্ষিত শিষ্য, তুমি রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের সাধনার ফল-ভোগী, তোমাকে যেন কেউ ভ্রান্ত না করে। তুমি গড়বে মহাভারত—অখণ্ড, অপূর্ব্ব, কল্যাণ-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ। বল, পুনরায় তারস্বরে বল "বন্দেমাতরম্।" ভারত জননীর অঙ্গকে আজ দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে। সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাদেরই

করতে হবে। তোমরা নির্ভয় হও, জ্যোতির্ময় জাগবেনই জাগবেন। ভারতের যে বিধাতা পুরুষ, তিনি গম্ভীর, স্তব্ধ, শান্ত, নির্ব্বিকার, আজকের কলকোলাহলের মাঝে তোমরা ভুল না—তাঁর প্রসন্ন প্রসাদ, তাঁর স্নেহঘন আশীর্ব্বাদ তোমাদের জন্য অক্ষয় ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।

ভারতের মহামানবের সাগরতীরে হে বীরব্রত সৈনিকের দল, তোমরা ভেরী মন্দ্রিত করো—ভারতের শাশ্বত ধ্রুব সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করো—দেবভাষা সংস্কৃতের পীযূষ সর্ব্বমানুষের দ্বারে পৌঁছে দাও—ভারতের ব্রহ্মদর্শন সকলের অবিচল মঙ্গলের জন্য প্রচারিত করো—সেই চিরসারথির চিন্ময় কর্ত্তাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করো।

ভাবীকালের হে নায়কগণ! সঙ্কটের দুর্জ্জয় আহ্বানকে তোমরা বরণ করো, ধুলিশয্যা ছেড়ে জগতের জয়যাত্রায় আপন আসন গ্রহণ করো—বল দর্পে, বল বিজয় গর্ব্বে—

"বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ,
বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান্।"

তোমাদের পণ কি? তোমাদের ব্রত কি, হে তরুণ ও তরুণীর দল, তোমাদের কাম্য কি?

তোমাদের পণ এক অদ্বিতীয় অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠা—আসমুদ্র হিমাচল যে জননীর অঞ্চল প্রসারিত সেই জগন্মোহিনী জগজ্জননীর জ্যোতির্ম্ময়ী আবির্ভাবের জন্য তোমাদের হবে আমৃত্যু ব্রতসাধন। কিন্তু ভারতীয়তা বাঙালিত্বেরই পরিপূর্ত্তি একথা ভুলো না—ভুলো না। বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুহীন অপরাজিত বাণী স্মরণ করো—

"চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী-মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক্ দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দ্দিত, পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত—এ মূর্ত্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না—কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগ্‌ভুজা, নানা-প্রহরণধারিণী, শত্রুমর্দ্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞান মূর্ত্তিময়ী, সাথে বলরূপী কার্ত্তিকেয়, কার্য্যসিদ্ধিরূপী গণেশ—আমি সেই কালস্রোত মধ্যে দেখিলাম এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

অবিবেচনায়, লোভে ও দুর্ব্বলতায় সে স্বর্ণপ্রতিমা আজ দ্বিখণ্ডিতা—তাহার সঞ্জীবনের জন্য চাই মহান ত্যাগ—দুর্ব্বার সংকল্প, অবিচল উৎসাহ, আর অপরাজেয় কল্পনা।

তোমরা স্মরণ করো নেতাজীর অনমনীয় বীর্য্য। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যর্থ মন্ত্রকে যিনি রূপ দিয়াছিলেন, সেই মহাসাধক সাগ্নিক তপস্বীর তপস্যা অনুসরণ করো—সমস্ত সংশয়, সমস্ত ভয়, সমস্ত সংকীর্ণতা দূর হয়ে তোমাদের জীবনে আসবে অকুতোভয়তা, আসবে সর্ব্বজগৎ আলোকিত করবার মত ভাস্বর প্রেমের যজ্ঞাগ্নি শিখা।

বর্ত্তমানের সংকোচ, পরিবেশের বিহ্বলতা তোমাদের যেন ম্রিয়মাণ না করে—তোমরা দুরূহ কাজে ব্রতী, তোমাদের আপন জন হয়ত তোমাদের সাথে চলবে না, কিন্তু তা বলে ভাবনা করা চলবেনা—তোমাদের সম্মুখে রয়েছে কেবল পথ—সীমাহীন দুস্তর দুর্লঙ্ঘ্য পথ। দুঃখ করিনা—শোক করিনা। এই অধঃপতন আমাদের প্রাপ্য ছিল—আমাদের নীচতা, আমাদের অপরাধ—আমাদের পাপ আজ রুদ্রদহন হয়ে দেখা দিয়েছে, একে ভোগ করতেই হবে—কিন্তু তাই বলে নিরাশা নয়। সমস্ত বিরূপতার মাঝে মুক্তকণ্ঠে কবির আন্তরিকতা দিয়ে বলব—এ দুঃখ চিরন্তন নয়। এ ক্রন্দন শাশ্বত নয়। নূতন আলোক জাগবে—আসবে অভয়, আসবে অশোক, জগৎ সভায় আবার বাঙ্গালী শ্রেষ্ঠ আসন নেবে।

বিশ্বমানবতার পটভূমিকায় আমরা আজ গড়ব আমাদের অভ্যুদয়ের মন্দির। এই বাংলার মাটিতে আমরা বলিষ্ঠ ও দৃঢ়িষ্ঠ বাঙ্গালী চরিত্রের প্রতিষ্ঠা করব, বাংলার সংস্কৃতিকে সাম্রাজ্যবাদীর আত্মসর্ব্বস্ব নিষ্ঠুর নিপীড়ন থেকে আমরা বাঁচাবো—ইসলাম একদিন বাংলাকে ডোবাতে চেয়েছিল সেদিন চৈতন্যদেব এনেছিলেন মহাজাগৃতি—বৃটিশের সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রীয় সংঘাতের মাঝে বঙ্কিমচন্দ্র এনেছিলেন অনন্যসাধারণ ও অদ্বিতীয় উজ্জীবন—আর আজ এক নবনির্য্যাতনের সন্ধিক্ষণে আমাদের আত্মস্থ হতে হবে।

বর্তমান আক্রমণ একান্ত গুরুতর—কারণ আক্রমণকারীর হাতে শুধু ক্ষমতার বজ্র আছে তাহাই শুধু নয়—তাহার মধ্যে ভারতীয়তার ঐক্যবোধের এক ভাণ আছে। আজ তাই প্রতিরোধ সর্বত্র হয়ত স্বতঃস্ফূর্ত হবেনা—বহু লোকেই বিভ্রান্ত হয়ে যাবে—আত্মীয়-বিরোধ মনে করে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হবে।

কিন্তু এখানেই আমরা যেন স্মরণ রাখি—ঐক্য ও সমন্বয়ই ভারতধর্ম। কিন্তু সে সমন্বয় বহুকে অস্বীকার করে নয়—সে বিচিত্রকে পূর্ণতায় পরিপূর্ণ করে সফল হয়। যে নেতৃমণ্ডল বাংলার অবদান এবং বাঙ্গালীকে অস্বীকার করে পশ্চিমের অনুকরণে এক অপভারত সৃষ্টিতে ব্যস্ত তাহাদের সহিত সহযোগিতা করতে যাওয়া মূর্খতা।

আমি বাংলাকে এবং বাঙ্গালীকে বলব—বাঙ্গালীর নেতৃত্ব এবং বাঙালীর মনীষা আজ ম্রিয়মাণ মনে হতে পারে—কিন্তু এই বাংলায় এই বাংলার মাটিতেই হবে সে নবযুগের সূচনা।

সে নবযুগের মত্ত ঈশান কখন আপন বিষাণ বাজাবেন কেহ তা জানে না—সেই মহামহোৎসবের কোনও আয়োজনই আজ আর চোখে পড়ছেনা—কিন্তু তবু সেই ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি।

বাংলাকে হোমাগ্নি জ্বালাতে হবে তার আপন প্রতিভার বেদীমূলে। ভারতবর্ষকে নব জীবন দিয়েছে বাঙালী—বাংলার রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, সুভাষ, রবীন্দ্রনাথ ও অরবিন্দ নব ভারতের স্রষ্টা ও দ্রষ্টা। তাদের পথেই বাঙ্গালীকে চলতে হবে। বাংলার সাধনা, বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য, বাংলার সংস্কৃতিকে আমরা কিছুতেই ভুলতে পারিনা।

জীবন রথের সারথিকে নমস্কার করে আজ নূতন তপস্যায় ব্রতী হতে হবে। চারিদিকে বিপদের ঝঞ্ঝা—কাতরতার আর্তি—মৃত্যুর জগঝম্প, এই শ্মশানেই মুণ্ডমালিনী বরাভয়দায়িনী চণ্ডিকার পূজা করতে হবে—মাভৈঃ মায়ের সন্তানেরা. তার আবির্ভাব-সমারোহ দিকদিগন্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—ভারত কলঙ্কশূন্য হয়ে মহাভারত হবেই হবে। আমার অনুরাগী পাঠক হয়ত ভাবছেন—ধান ভানতে শিবের গীত কেন? তাদের বলব তা নয়।

পান্থ তুমি, পান্থ জনের সখা হে
পথে চলা সেইত তোমায় পাওয়া।
যাত্রাপথের আনন্দগান যে গাহে
তারি কণ্ঠে তোমারি গান গাওয়া।

পথে চলেছি পথিক। কিন্তু সে যাত্রা ত ভূমার পানেই যাওয়া। বাংলার সাগ্নিক, বাংলার কবি, বাংলার তপস্বী যে মহাভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন—যে মহাভারতের জাগরণের কথায় আত্মোৎসর্গ করেছিলেন—যে ভারতের সত্য ও চিন্ময় বাণী প্রচারে দেশে দেশে ঘুরে এলাম—সে ভারতবর্ষ কোথায়?

কোথাও নেই! ফিরে এসে দেখলাম—পরিকল্পনার মোহময় নামে ভারতের ধনসম্পৎ অপব্যয়িত হচ্ছে—ভারতের অন্ধ মূঢ় মূক মানুষদের জাগরণে অর্থব্যয় না করে—আতপনিয়ন্ত্রিত হোটেলের জন্য, বৈদ্যুতিক রেলওয়ের জন্য টাকার হরির লুট হচ্ছে, তখন বুঝলাম—আমরা পতনের গুহাতলে ছুটে চলেছি—আর এই অধোগতি দুর্নিবার্য্য—কারণ অধোগামী বিমূঢ়তায় স্বপ্ন দেখছে যে তার ঊর্দ্ধাভিসরণ হচ্ছে।

কোথায় তবে পথ? কোথায় মুক্তি? কোথায় ব্যাধির ঔষধ? আমি যে নিদানের কথা বলছি—অনেকের হয়ত তা ভাল লাগবে না—কিন্তু যা আমার সত্য অনুভূতি—সমানধর্মা সংবেদনশীল মানুষের জন্য সেই কথা, একান্ত বিশ্বাসে লিপিবদ্ধ করছি—জানি পৃথিবীতে কিছুই হারায় না।

আজ দেশে চাই চরিত্র ও ঋত। আমাদের কলঙ্কিত জীবনের কোথাও আজ নেই সুস্থ মানবতা। রাষ্ট্রে, সমাজে পরিবারে এবং ব্যক্তিতে ষোলআনা ঘুণ ধরে গেছে। ধনমোহ স্বার্থ ও লোভ দেশের মেরুদণ্ডকে বাঁকিয়ে দিয়েছে, সর্বাঙ্গে দূষিত ক্ষত, মন পীড়িত ও ব্যাধি কাতর।

আজ বিবেকের জাগরণ চাই। কলুষ-নাশন ভীষণতা চাই। সকল পাপহর প্রেমের উদ্দীপনা করতে হবে। সংশয় উদ্ভ্রান্ত আমাদের আশ্রয়—ভারতের যুগসঞ্চিত ধর্ম্মবোধ।—ভারতের সেই সংস্কৃতিকে যদি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তবেই দেশে আসবে মহাশক্তি এবং মহাপ্রেম।

কিন্তু ভারত-সংস্কৃতি তার মৃত্যুঞ্জয় মহিমা পাবে বিচিত্রের সমন্বয়ে। বাঙ্গালীকে তাই সত্যকার বাঙ্গালী

হতে হবে—শিখকে শিখ হতে হবে—নরনারীকে হতে হবে সরণী। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেক লোককে পরিপুষ্ট হয়ে সমগ্র ভারতকে পরিপুষ্ট করতে হবে।

কিন্তু তা ঘটছেনা—বাংলা দেশ সবচেয়ে সমস্যা-সঙ্কুল—বাঙ্গালীর ছেলেরাই দেশে দেশে মৈত্রীর বন্ধন প্রতিষ্ঠা করে ভারতের স্বাধীনতা এনেছে।

অতএব বাঙ্গালীকে আত্মস্থ হতে বলা দূষণীয় নয়. একান্ত কর্ত্তব্য। এটা বিরোধের কথা নয়—প্রদেশিকতার কথা নয়, মৃত্যুর গ্লানিমলিন বাংলার পুনরুজ্জীবনের কথা। বাংলার এই ঘোর দুর্দ্দিনে এই ভাবে কেহ ভাবেন না। কেবল অধ্যাপক মোহিতলাল মজুমদার এই ধরণের চিন্তা করতেন। সে চিন্তাকে আজ বহুব্যাপক করতে হবে। বাঙ্গালী একদিন ভারতের চিন্তানায়ক ছিল—সর্ব্বকর্ম্মে অগ্রণী ছিল—সেজন্য সঞ্জাত যে ঈর্ষ্যা ও হিংসা তা আজ নগ্ন হয়ে প্রকাশ হয়েছে—এই সত্যকথা সবাই জানি অথচ ভয়ে ভয়ে সে কথা কেউ বলি না। এই ভয়ই আমাদের চরম পরাজয়। এই ভয়কে দমন করে অভয়-বীর্য্যের উপাসনা করতে হবে।

কতিপয় রাজনীতিক ছাড়া শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান৷ ভারতবর্ষের উজ্জীবনে বাংলার অবদানকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। সেই অগণিত সংস্কৃতি-উপাসক সাধারণ মানুষে৷ প্রীতি ও প্রেমের উপরই বাংলার বুদ্ধির সংগঠন শক্তি, ভাবাবেগ সমৃদ্ধ সাধনাকে পরিচালনা করতে হবে। বাংলা মরেনি, মরতে পারেনা এবং মরবে না—সেই অনাগত কালের স্রষ্টাদের অভিনন্দন জানিয়ে আমার শেষপ্রশ্নের সমাধান করছি।

জীবনের মহৎ পরিক্রমায় আসছে প্রাণহিল্লোলে হিল্লোলিত অমৃত রস, আসছে নব নব মাধুরী। মঙ্গলের শঙ্খধ্বনি বাজছে—তার মৃদু নিক্কণ আসছে তাই 'ভবিষ্যতের পানে চাহি আশা-ভরা আহ্লাদে৷' সন্তাপহরণ নব উদ্বোধনের অসীম সম্পদ ও অসীম মহিমা বাঙ্গালী কোটি কণ্ঠেই গাইবে—সুন্দরের উপাসনা তার শক্তির উপাসনা হয়ে আনবে সংহতি, আনবে অমিতবীর্য্য, আনবে অপরাজেয় সাধনদুর্ল্লভ বিভূতি। সেই তিমিরবিদারী উদার অভ্যুদয় বহুদূরে নয়, বহুদূরে নয়।

আমার বেদনায় ক্ষোভের সুর বেজেছে, কিন্তু সে সুর ঈর্ষ্যার নয়, ঘৃণার নয়, সে হল মনুষ্যত্বের। অন্যায়কে সইতে আমাদের ঋষিরা বারণ করেছেন। কিন্তু এই প্রতিরোধ ত বড় কথা নয়।

বিশ্বমানুষের প্রেমধন্য সঙ্গলাভ করে যে বার্ত্তা এনেছি দুঃখতপ্ত দেশে, সে বার্ত্তা মিলনের—সেবাণী প.ম প্রেমের। নবীন সামঝঙ্কারে বিশ্বজগৎ ঝঙ্কৃত হয়ে উঠবে। সাম্যের মৈত্রীর পতাকা হস্তে আমরা বিশ্বজনীনতার জয়ধ্বনি করব। বলব জয় জগৎ—সর্ব্বজগতের বিজয় হোক, সর্ব্বমানুষের মঙ্গল হোক।

তার জন্য চাই শিক্ষা। বাগদাদের একটি ইংরাজী কাগজে এই কথাই বলেছিলাম—জগতের মানুষকে এক করতে চাই এক ভাষা, এক বর্ণমালা, এক ধরণের শিক্ষা দিয়ে। পৃথিবীতে ইংরেজী ভাষাই সর্ব্বাধিক প্রচারিত জগজ্জনের ভাষা হওয়ায় সুযোগ ও ভাবগৌরব তারই—তাই ইংরেজী বর্জ্জনের কথা আমাদের মরণের পথ—ইংরেজীকে ভারতের সর্ব্বমানুষের ভাষা করলেই ভারত জগৎসভায় সকলের সাথে চলতে পাবে অবাধ সুযোগ। রোমক লিপিই গ্রহণীয়, তার বদবদল করে ভারতীয় সমস্ত ভাষা লেখা যাবে—ফলে টাইপ রাইটার, লিনোটাইপ প্রভৃতি আধুনিক যান্ত্রিক যুগের সকল সুবিধা আমরা পাব।

কিন্তু তাই নয়—শুধু লিখতে হবে বিশ্বমানুষের সমান স্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে পৃথিবীর ভূগোল ও পৃথিবীর ইতিহাস। 'জগৎজুড়ে এক জাতি—সে জাতি মানুষ জাতি—এটা শুধু কাব্য হলে চলবে না, এটা হবে প্রতি মানুষের ধ্যান, কল্পনা ও মননের বস্তু। নমস্কার করি বিশ্বমানুষের দেবতা বৈশ্বানরকে ঋষি সংবননের অমোঘ মন্ত্র আজ সফল হোক—জগতের মানুষ এক পথে চলুক, একই কথা বলুক। এক হোক তাদের মন্ত্র, এক হোক তাদের আরাধনা—এক হোক তাদের সমিতি। সব সংঘাতের নিবৃত্তি এই সুগভীর ঐক্যে—এই প্রেমেই মানুষের পরমা নিষ্কৃতি। হে বিশ্বপাবন! পাপক্ষালন! তোমার অমোঘ আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করি—দেবজন্মের দিব্যজীবনের এই স্বপ্ন সত্য হোক, সুন্দর হোক ও সার্থক হোক।

পা মুড়ে বসে ফিরোজাবাঈ তানপুরা তুলে নিল। এতক্ষণ ধরে সুর বাঁধছিল। এইবার মনের মতন হয়েছে।

গান শুরু করার আগে মুখ তুলে একবার জমজমাট আসরের দিকে দেখে নিল।

তাকিয়ায় হেলান দিয়ে রায়-বেরিলির ছোট নবাব। চারপাশে পারিষদ আর বয়স্য। যখন বসেন, এইভাবেই বসেন, বয়স্য-পরিবৃত হয়ে। বলেন, সঙ্গীত হচ্ছে আসমানের জিনিস। খোদাতাল্লার দান। এ জিনিস একলা ভোগ করলে গুনাহ্ হয়। সবাইকে নিয়ে উপভোগ করতে হয়।

এ লোকটা সত্যিই সঙ্গীত-পাগল। যতক্ষণ ফিরোজাবাঈয়ের গান চলে, দুচোখ বন্ধ করে বসে থাকেন। মনে হয় ডুবে গেছেন সুরের সাগরে। সাড় নেই, চেতনা নেই।

ফিরোজাবাঈয়ের নিখুঁত রূপ, নিটোল যৌবন কোথায় তলিয়ে যায়। শুধু অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠ। সুরের গমকে গমকে ওঠানামা করে।

ঝাড়ের বেলোয়ারী কাঁচগুলোর পর্যন্ত একটু শব্দ হয় না। বাতাসও যেন তাদের স্পর্শ করতে ভয় পায়।

শুধু সমের মাথায় ছোট নবাবসাহেবের তারিফ শোনা যায়। কেয়াবাত, কেয়াবাত, শোভানাল্লা।

ফিরোজাবাঈ মুচকি হেসে হাত মাটিতে ঠেকিয়ে কুর্নিশ করে আবার গানের তরঙ্গে ভেসে যায়।

সবাই ছোট নবাব নয়। অন্যলোকও আসে। অন্য ধরণের মানুষ। সরাবে বে-এক্তিয়ার, টলতে টলতে কোন রকমে আসরের ওপর বসে পড়ে। সুরের লহরীতে তাদের আসক্তি কম। তারা আসে রূপের মদিরা পান করতে।

পরে শুধু ফিরোজাবাঈ বললেই চক এলাকার সবাই চিনতে পারত, কিন্তু প্রথম প্রথম বলতে হত ফিরোজাবাঈ

ফৈজাবাদী। ফৈজাবাদ থেকে এসেছিল বলে। নিজে আসে নি, এরা নিজে আসে না। তবলচি ইকবাল রসুল নিয়ে এসেছিল।

তখন সারা চক জুড়ে আর এক ফিরোজাবাঈয়ের প্রতিপত্তি। ঠুংরি আর গজলের রাণী। দূর দূরান্তর থেকে রহিস আদমিরা গান শুনতে আসত।

সবাই বলল, তোমার নাম হোক ছোটি ফিরোজাবাঈ। এই নামে একজন যখন রয়েছে।

তন্বী ফিরোজাবাঈ বেঁকে দাঁড়িয়েছিল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বলেছিল, ছোটি? ছোটি কেন? তার মানে মোড়ের ওই ফিরোজাবাঈ বড়? কিসে বড়? গানের গলায় না রূপযৌবনে?

ভঙ্গী দেখে কেউ আর এ নিয়ে আলোচনা করে নি। ফিরোজাবাঈ নিজেই নিজের নাম দিয়েছে ফিরোজাবাঈ ফৈজাবাদী।

বেশীদিন এ নাম ব্যবহার করতে হয় নি ফিরোজাবাঈকে। তিন বছরের মধ্যেই বড় ফিরোজাবাঈয়ের এন্তেকাল হয়েছিল। বিচিত্র মৃত্যু। জলসার আসরে গান গাইতে গাইতে গলা চড়াতে গিয়ে বুকে একটু ব্যথা। প্রথমে সামান্য, তারপর অসহ্য যন্ত্রণায় সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছিল।

আসরের ওপরই ঢলে পড়েছিল, আর ওঠে নি।

ফিরোজাবাঈ চলে যাবার পর, ফৈজাবাদী বলার এই ফিরোজাবাঈয়ের আর প্রয়োজন হয় নি।

চোখের সামনে ছবির মত ভেসে ওঠে। ইকবাল রসুল এনেছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে থাকে নি। বড় বড় আমীর ওমরাহদের ভীড়ে সে হারিয়ে গিয়েছিল।

ইদানীং বয়সও হয়েছিল। তবলায় সব বোল ফোটাতেও পারত না। হাত কাঁপত। তাল কেটে যেত। কাউকে কিছু না বলে নিজেই সরে গিয়েছিল।

ফিরোজাবাঈ ভেবেছিল ইকবালের জন্য তার কষ্ট হবে। অনেকদিনের সম্পর্ক। মানুষটা বুঝি মজ্জায় মজ্জায় মিশেছিল।

কিন্তু না, অল্প কিছুদিনের জন্য ফিরোজাবাঈ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তারপরই সামলে নিয়েছে নিজেকে।

না সামলে উপায়ও ছিল না। কাণপুরের কামতাপ্রসাদ তখন আসাযাওয়া করছেন। বিরাট ধনী। এক এক রাতের মুজরোয় আশাতীত খরচ করেন। তাঁর অর্থের ঝঙ্কারের মধ্যে মধ্যবিত্ত একটা মানুষের তবলার বোল কোথায় হারিয়ে গেল। তারপর তবলচী এসেছিল মিশিরলাল। বেনারস থেকে। ফিরোজাবাঈয়ের গুরুদেবের চিঠি নিয়ে।

ছোকরা বয়স, কিন্তু এলেম আছে মিশিরলালের। হাতের ছোঁয়ায় তবলায় মেঘের গর্জন তুলত। মিশিরলালের সঙ্গত ছাড়া ফিরোজাবাঈয়ের গান জমত না।

সেদিনও তাই ফিরোজাবাঈ আড়চোখে মিশিরলালের দিকে একবার দেখল।

আসরে টুঁ শব্দ নেই। সবাই উন্মুখ।

হাত জোড় করে ফিরোজাবাঈ গুরুকে প্রণাম করে গান শুরু করল। সুরেলা কণ্ঠে খাম্বাজ ঠুংরি। বালমওয়া, মেরে ঘুংঘট খোল গয়ি।

ছোট নবাব সাহেবের দুটি চোখ নিমীলিত। গানের তালে তালে শুধু মাথাটা অল্প অল্প দুলছে। বসন্তদেবেরও সেই অবস্থা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ফিরোজাবাঈ যেন সকলের চেতনা হরণ করল। গমক, মীড়, তান, রমকের অপূর্ব লীলা নৈপুণ্যে শ্রোতারা সম্মোহিত। বোলতান, পলটতান, ছুটতানের নিপুণ কারুকার্য। উদারা, মুদারা, তারায় অবলীলাক্রমে বিহার করল কণ্ঠস্বর।

গান শেষ হতে নবাবসাহেব সব চেয়ে আগে ইনাম ছুঁড়ে দিলেন রূপোর থালায়। সিল্কের রুমালে বাঁধা আশরফি। তারপর অন্য সকলে টাকা দিল। এটাই রেওয়াজ।

এই রেওয়াজ না মানার জন্য একবার কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়েছিল।

ফিরোজাবাঈয়ের স্পষ্ট মনে আছে ঘটনার খুঁটিনাটি।

আসরে নবাবসাহেব ছিলেন। অবশ্য তখন তাঁর পড়তি অবস্থা। তবু শের শেরই। আর ছিলেন মনোহর পুরী। কোটিপতি বাপের শিবরাত্রির সলতে। কাপড়ের মিল, তেলের কল, মাঝারি ব্যাঙ্ক একটা, তার ওপর আখের চাষ তো ছিলই। উত্তর ভারতে সুরেন্দর পুরীকে

বাণিজ্যিকমহলে লোকে একডাকে চেনে। মনোহর পুরীর জন্ম বাপের পয়সা ওড়াতে।

ফিরোজাবাঈ মালকোষ রাগে একটা খেয়াল শেষ করতেই তারিফের ঝড় বয়ে গেল, তারপরই গণ্ডগোল শুরু হয়েছিল।

মনোহর পুরী রুমালে বাঁধা টাকার তোড়া ছুঁড়তেই মাঝপথে ছোট নবাব লুফে নিলেন। দুএক মুহূর্ত তোড়াটা হাতে রেখেছিলেন, তারপরই ফেলে দিলেন আসরের বাইরে।

কর্কশ একটা শব্দ করে টাকাগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

তার চেয়েও কর্কশ শব্দ করে মনোহর পুরী রুখে দাঁড়াল।

ছোট নবাব নিরুত্তেজ, শান্ত কণ্ঠে বললেন, আসরের একটা নিয়ম কানুন আছে, সহবত আছে, সেটা না জেনে আসরে ঢোকা উচিত নয়। বয়স কম বলে কিছু বললাম না, তা না হ'লে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতাম।

মনোহর পুরী বেশ কিছুক্ষণ চেঁচামেচি করল, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। কারণ সে একেবারে একলা, আর ছোট নবাবের সাঙ্গপাঙ্গ অনেক।

ফিরোজাবাঈ রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এইবার বুঝি একটা খুনোখুনি, রক্তারক্তি কাণ্ড হবে। এ আসরে সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু হয়নি। মনোহর পুরী টলতে টলতে আসর ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যাবার মুখে শুধু বলে গিয়েছিল—এর বদলা সে নেবেই। উপযুক্ত প্রতিশোধ।

দিন দুয়েক পরে প্রতিশোধ নিয়েছিল। প্রতিশোধের ধরণটা এই রকম হবে ফিরোজাবাঈ ভাবতেও পারে নি।

এক দুপুরবেলা একেবারে অসময়ে মনোহর পুরী এসে হাজির। ফিরোজাবাঈ শুয়েছিল। একজন পরিচারিকা দু হাতে মেহ্দী মাখিয়ে দিচ্ছিল। চোখে তন্দ্রার ভাব আসতেই ফিরোজাবাঈ মাথাটা ঝেঁকে নিয়ে ঘুমটা সরিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। দুপুরে ঘুমালে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে। আসরে বসার মন থাকে না। তা ছাড়া চর্বির বলয় জমে পেটের চারপাশে। সৌন্দর্যের অপমৃত্যু।

মনোহর পুরীর আসার খবর শুনে বিরক্ত হল। ভ্রূ কুঁচকে বলল, এখন দেখা করতে এসেছেন? এই অসময়ে?

চকে দিনের বেলা কেউ ঢোকে না। দিনের চক যেন কবরভূমি। সাড়া নেই, শব্দ নেই, নিষ্প্রাণ। চক রাত্রে জাগে। গানের সুরে, ভাবের ঝঙ্কারে, ফুলের সুবাসে চকের নবযৌবন শুরু হয়।

বিশেষ দরকার। মিনিট পাঁচেকের বেশী বিরক্ত করবেন না।

মন না চাইলেও ফিরোজাবাঈকে উঠতে হ'ল।

এ জীবিকায় মনকে আমল দিলে চলে না। মন অনেক কিছুই চায় না। বিদ্রোহ করে, বেঁকে বসে। তবু তাকে শান্ত করতে হয়। তার অস্তিত্ব ভুলতে হয়।

বিশেষ করে রহিস আদমিদের চটালে এ পেশার পক্ষে ক্ষতিকর।

একটু প্রসাধন সেরে ফিরোজাবাঈ গিয়ে দাঁড়াল।

মনোহর পুরী একটা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়েছিল। পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল।

ফিরোজাবাঈ কুর্নিশ করল। মুখ থেকে অসন্তোষের শেষ রেখাটুকুও মুছে ফেলল, তারপর যৌবনপুষ্ট দেহের খাঁজে খাঁজে হিল্লোল তুলে বলল, কি ব্যাপার হুজরত, দাসীকে অসময়ে স্মরণ করেছেন!

মনোহর পুরী দু পা এগিয়ে এল। তার শরীর বেশ টলছে। এই ভর দুপুরেও বে-সামাল অবস্থা।

তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে ফিরোজা।

বলুন। গরীবাইন আপনার সামনেই হাজির।

ওই বুড়ো শিয়ালকে তুমি ছেড়ে দাও ফিরোজা। ওর নবাবী তো খতম। ধারদেনা করে ফুর্তির পয়সা জোটাচ্ছে। আর কদিন আসবে তোমার কাছে। তুমি আমার হও। আমি তোমায় রাণীর হালে রাখব। আমিনাবাদে আমার দু খানা বাড়ী রয়েছে। তার একখানা লিখে দেব তোমার নামে।

এই ভাবে নির্জন দুপুরে লোভের'পর লোভের আগুন জ্বালিয়েছিল মনোহর পুরী। সেই আগুনে ফিরোজাবাঈয়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল কিনা আড়চোখে চেয়ে চেয়ে সেটা পরখ করার মতন খেয়াল মনোহর পুরীর ছিল।

দু-এক মুহূর্তের দ্বিধা আর ইতস্তত ভাব। পায়ের

আঙুল দিয়ে মেঝের ওপর কিছুক্ষণ ঘষল। ছোট নবাব-সাহেবের পড়তি অবস্থার কথাটা তার অজানা নেই। আজকাল উপঢৌকন দেওয়া আশরফি-গুলো কি করে সংগৃহীত হচ্ছে তার ইতিহাসও ফিরোজাবাঈয়ের জানা।

কথায় কথায় ছোট নবাব সাহেব হুঙ্কার ছাড়ার চেষ্টা করেন, বুড়ো হ'লেও শের শেরই থাকে।

হয়তো থাকে, কিন্তু নখদন্তহীন, স্থবির অথর্ব সেই ব্যাঘ্রের ব্যাঘ্রত্ব থাকে না। অমিত তেজ, শক্তি, সাহস সব অন্তর্হিত, শুধু অতীতের কৌলীন্য-নির্ভর পঙ্গু সেই শেরের ওপর ফিরোজাবাঈয়ের লোভ কম!

কেবল ফিরোজাবাঈয়ের কেন, সারা চক এলাকাটার দস্তুরই আলাদা। এখানে অর্থই মনুষ্যত্ব. যেমন বাঈজীদের যৌবনই জীবন।

মনোহর পুরীর হাতে অঢেল পয়সা। উঠতি বয়স, উচ্ছৃঙ্খল মন। এদের প্রসাদধন্য হতে পারলে ফিরোজা-বাঈয়ের চিন্তা করার কিছু থাকবে না।

কি ফিরোজা, রাজী!

অতিষ্ঠ মনোহর পুরী মেঝের ওপর নাগরা ঠুকল। অসহিষ্ণু আরবি ঘোড়ার মতন।

শুধু বুঝি পলকের জন্য, ছোট নবাব সাহেবের জরা-রেখাঙ্কিত মুখটা ফিরোজাবাঈয়ের মানসপটে ভেসে উঠল। অসহায়, ক্লান্ত মুখ। তারপর ফিরোজাবাঈ মনোহর পুরীর দিকে চেয়ে বিলোল কটাক্ষ করে বলল, আমি তো চির-দিনই আপনার।

ছোট নবাবসাহেব গেলেন, এল মনোহর পুরী। মনোহর পুরীও থাকল না।

বাঈজীর জীবনে কেউ থাকলেই সর্বনাশ। ছলা, কলা, বিলাস, বিভ্রম সব সাময়িক। বিশেষ কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে অনুভূতি প্রকাশ পেলেই বাঈজীর মৃত্যু। প্রেম, ভালবাসা, ঐকান্তিকতা ওসব কথার চক এলাকায় কোন দাম নেই। যারা দাম দেয়, তারা মরে।

এদের জীবন শুধু ভেসে যাওয়া। তরঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। তরঙ্গ পার হয়ে দ্বীপের জীবন যারা খোঁজে, তারাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মনোহর পুরী থাকার জন্য আসে নি। গান তার কোনদিন ভাল লাগে নি। তার আসক্তি যৌবনপুষ্পিত দেহে। তাই ফিরোজাবাঈয়ের আসরে বসল বটে, কিন্তু চর পাঠাল এদিক ওদিক। আনকোরা দেহলতার অনুসন্ধানে।

জুটেও গেল! দিল্লী থেকে সিনেমার অভিনেত্রী যমুনা এসেছিল সুটিংয়ের ব্যাপারে। মনোহর পুরী তাকে সিনেমা ছাড়িয়ে নিজের কুক্ষীগত করল।

কোন ক্ষোভ নয়, দুঃখ নয়, গানের অস্থায়ী, অন্তরা, আভোগ, সঞ্চারীর মতন মানুষের এ আসা যাওয়ায় ফিরোজাবাঈ যথেষ্ট অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল।

তারপর সুদূর মীরাট থেকে এল বেণীপ্রসাদ।

লম্বায় ছ-ফুটের কাছাকাছি। অগ্নিবর্ণ, প্রদীপ্ত লোচন। বয়স একেবারে কম।

গান শোনবার ভাণ করে এল, কিন্তু কয়েকদিন যেতেই অন্য কথা শোনাল।

মস্ত বড় তালুকদার। অর্ধেক পরগণা জুড়ে তার জমিদারী। এ ছাড়া ব্যবসাও আছে। মাথার ওপর কেউ নেই। বাপ যাবার পর মার দিন কাটে ঠাকুরদেবতা নিয়ে।

বেশ মনে আছে ফিরোজাবাঈয়ের। বাইরে ঝিরি-ঝিরি বর্ষণ। জানলায় জানলায় চিক ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘরে আর কেউ নেই। শুধু ফিরোজাবাঈ আর বেণীপ্রসাদ। সামনে থালার ওপর আশরফি নয়, রাশীকৃত ফুল। বেল, জুঁই, চামেলী। ফুল ছাড়া বেণীপ্রসাদ কখনও আসে না।

ফিরোজা! বেণীপ্রসাদের কণ্ঠ আবেগতরল।

বল। কোন গানের ফরমায়েসের জন্য অপেক্ষা করছে এমনই ভঙ্গীতে ফিরোজাবাঈ উত্তর দিল।

আমি তোমাকে বিয়ে করব ফিরোজা। আমার ঘরের বৌ হবে তুমি।

আচমকা শঙ্খচূড়ের ছোবলেও বুঝি ফিরোজাবাঈ এত বিচলিত বোধ করত না। এত সন্ত্রস্ত।

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে প্রসাদ। তুমি হেকিম দেখাও।

ফিরোজা বাঈ প্রশ্নটার পাশ কাটাল।

না, না, মাথা আমার ঠিক আছে। এ নরকে আমি তোমাকে থাকতে দেব না।

নরক! ফিরোজাবাঈ হাসল। এ নরক নয়, এ

আমাদের স্বর্গ। বাঈজীদের দেহেস্তে। আমরা ছোটবেলা থেকে এই স্বর্গের সান্নিধ্য পাবার আরাধনা করি।

বেণীপ্রসাদ আর কিছু বলল না। চিক সরিয়ে বাইরের মেঘপুঞ্জের দিকে চেয়ে রইল।

কিন্তু ফিরোজাবাঈ প্রমাদ গণল। এ সব বিকারের লক্ষণ। এ লক্ষণ ভাল নয়।

আসরে এস, গান শোন, ফুর্তি কর, বাড়ী যাও। এই রেওয়াজ। এখানে এই সুর। এই গৎ। অন্য সুরে কেউ কিছু বললেই চিন্তার কথা।

মাঝে মাঝে বেণীপ্রসাদ ফিরোজাবাঈকে নিয়ে বাইরেও বেরিয়েছে। চারদিক পর্দা দিয়ে ঘেরা টাঙ্গায় চড়ে। ভুলভুলাইয়া বাগ, ইমামবাড়া, শা নাজফ, গোমতীর ধার।

সেখানেও কিন্তু পাগলামী। এক কথা।

উর্দ্দু কবিদের লেখা বয়েৎ শুনিয়েছে। প্রেয়সীকে নিয়ে নীড় বাঁধার ছন্দোবদ্ধ স্তব।

ফিরোজাবাঈ অন্য কথা বলেছে। নতুন অলঙ্কারের কথা, নতুন পরিচ্ছদের ফিরিস্তি, মাসোহারার অঙ্ক।

অতিষ্ঠ ফিরোজাবাঈ অন্য পথ ধরল। বাঁকা পথ।

শরীর খারাপের অজুহাতে বেণীপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিল। দরজা থেকে বেণীপ্রসাদ ফিরে ফিরে গেল।

তারপর একদিন ফিরোজাবাঈয়ের লোক গেল বেণীপ্রসাদের কাছে। স্পষ্ট কথা। আর তার সঙ্গে দেখা করা ফিরোজাবাঈয়ের সম্ভব নয়। মাসোহারা নজরানা দুটো বাড়ালেও, নয়।

বেণীপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল, একটি কথাও না বলে। যখন মুখ তুলল, দুচোখ জলে ভর্তি।

বেণীপ্রসাদ আর আসে নি। বাঈজীর জীবনে কাব্যের প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু বিনিময় প্রথা। একজন দেবে, আর একজন নেবে। এই দেহ, এই সুর, এই জীবন—সবই টাকার মূল্যে ক্রয় করা সম্ভব। কিন্তু দেহ ছাড়িয়ে, বাইরের জীবন পার হয়ে যারা মনের দিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা করবে, তারাই ঠকবে। এখান থেকে তাদের সরে যেতে হবে।

লালারামের গোকুলনারায়ণ লক্ষ্ণৌ এসেছিল জমিদারির কাজে। জমিদারির কাজ চুলোয় গেল। এক রাত গান শুনতে এসে সে ফিরোজাবাঈয়ের আসরে বাঁধা পড়ল।

খানদানী ঘরের ছেলে। সুগায়ক। এক সময়ে খুব রেওয়াজ করত, কিন্তু ফিরোজাবাঈয়ের কণ্ঠে ভৈরবী ঠুংরি আর দরবারি কানাড়ায় খেয়াল শুনে নিজের টুপি খুলে কার্পেটের ওপর রাখল।

এই সময়টা ফিরোজাবাঈয়ের যৌবনের মধ্যাহ্ন। অগ্নিশিখাকে ঘিরে উন্মত্ত পতঙ্গের দল আত্ম-বিলয়ের ব্রত গ্রহণ করেছিল। কেউ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হ'ল, কেউ পাখা পুড়িয়ে ফিরে গেল।

পরিবর্তে ফিরোজাবাঈয়ের অঙ্গে উঠল চুণী-পান্না-বৈদূর্যমণির বিন্দিয়া, আর ঝাপটা, জুমকো, বেসর, কেয়ূর, কঙ্কণ, বাহুবন্দে যৌবন দীপ্তিময়ী হয়ে উঠল। সারা চক তখন ফিরোজাবাঈয়ের নামে মশগুল।

দু-চোখে ঈর্ষার ঝিলিক, অন্তরে তীব্র বেদনার রেশ, চকের অন্য বাঈজীরা মুহ্যমান, মনক্ষুণ্ণ। তবু তারা ভীড় করে এসে দাঁড়'য় ফিরোজাবাঈয়ের চারপাশে। মনের নিভৃতে পুড়তে পুড়তেও তারিফ করে তার কণ্ঠের, তার ঐশ্বর্যের।

গোয়ালিয়র থেকে ফিরোজাবাঈয়ের ডাক এল। বিরাট জলসার বন্দোবস্ত। সারা দেশ থেকে গুণী ব্যক্তিরা এসে হাজির হবে। সঙ্গীত-পাগল শ্রোতার দল।

ফিরোজাবাঈ গাইবে ঠুংরি আর খেয়াল। তবলচী মিশিরলাল সঙ্গে চলল।

জয়মাল্য গলায় নিয়ে ফিরোজাবাঈ ফিরল। শুধু জয়মাল্য নয়, সঙ্গে এল বরোদার মকবুল হোসেন। গানের পোকা। ঐশ্বর্যের পড়তি, তবু এখনও যা আছে, নিন্দার নয়।

কেবল গান আর গান। ফিরোজাবাঈ গায়, মকবুল হোসেন শোনে আলবোলার নল মুখে ঠেকিয়ে।

এক মুহূর্তের জন্য ফিরোজাবাঈয়ের মনে হয়েছিল, জীবনটা বুঝি এমনই কেটে যাবে। এমনই তর তর করে বায়ুর অনুকূলে পানসী বয়ে যাওয়ার মতন।

কিন্তু সুর কাটল।

মকবুল হোসেন মারা গেল। ফিরোজাবাঈয়ের বাড়ীতে।

আগের দিন শরীরটা খারাপ হয়েছিল। আসরে বসে গান শুনতে শুনতেই বলেছিল মাথার অসহ্য যন্ত্রণা। বসে থাকতে পারছে না।

থাকতে পারেও নি। শুয়ে পড়েছিল। লোকজন দিয়ে ধরাধরি করে তাকে নীচের ঘরে ফিরোজাবাঈ শুইয়ে দিয়েছিল। ভেবেছিল বয়স হয়েছে, শরীর একটু খারাপ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। তাই আর ডাক্তার বদ্যি ডাকার কথা ভাবেনি।

পরের দিন সকালেই খবর পেল মকবুল হোসেন নেই।

সব কিছুর নশ্বরতার কথা ফিরোজাবাঈয়ের খুবই জানা ছিল, কিন্তু এ ভাবে, এত দ্রুত সরে যাওয়াটা কিছুতেই যেন বরদাস্ত করতে পারল না।

সে রাতে ফিরোজাবাঈ আর আসরে বসল না। দু একজন ছুটকো-ছাটকা যে মেহমান এসেছিল, তবিয়ত খারাপ বলে তাদের ফিরিয়ে দিল।

সন্ধ্যা থেকে বিছানায় শুয়ে রইল। প্রসাধন করল না। উঠল না। খেলও না। মকবুল হোসেনের চলে যাওয়ার জন্যই শুধু নয়, আর একটা কিসের বেদনা, অব্যক্ত, দুর্জ্ঞেয় একটা শূন্যতা ফিরোজাবাঈয়ের সমস্ত অন্তর ছেয়ে রইল।

আবার ফিরোজাবাঈ সামলে নিল। নতুন মানুষ নিয়ে আসর শুরু হল। গান, হৈ-হল্লা, ফূর্তির মধ্যে ডুবিয়ে দিল নিজেকে।

কিন্তু পারল না। একদিন ধরা পড়ে গেল।

বার কয়েক চেষ্টা করেই থেমে গেল। গলা চড়াতে পারল না। তাল কেটে গেল। তবলচীর সামনে ফিরোজাবাঈ অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল।

একদিন নয়, পর পর তিন দিন। অবলীলাক্রমে গলা চড়াতে খাদে নামাতে পারত। কোন কষ্ট হত না। স্বর যেন ওর নিজের বশ। যেভাবে দরকার সেভাবে খেলাতে পারত।

আসরে ছিল বাদশাবাগের মোহন সাকসেনা। গানের সমজদার লোক। সে বিরক্ত হল। ভ্রূ কোঁচকাল।

সবাই চলে যেতে ফিরোজাবাঈ তবলচীর দিকে ফিরল। গলা একেবারে ওঠাতে পারছি না কেন বল তো? কদিনই এরকম হচ্ছে।

তবলচী বলল, নির্মম নিষ্ঠুর সত্য।

বয়স তো হচ্ছে, সেইজন্য দম পাচ্ছেন না। গলা চড়াতে গেলেই হাঁপ লাগছে।

বয়স হচ্ছে! ফিরোজাবাঈ চমকে উঠল। তার মানে রূপ-যৌবন সব বিদায় নেবে এইবার। একটু একটু করে। সেই সঙ্গে সম্মান, প্রতিপত্তি, অর্থ।

রাত্রে শুতে যাবার আগে দেয়াল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ফিরোজাবাঈ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিজেকে দেখল। তন্ন তন্ন করে।

চুলের মতন সরু সরু আঁচড় পড়েছে কপালে, হাতের উল্টো পিঠে। চোখের দুপাশে মাকড়সার জালের মতন অস্পষ্ট দাগ। মেয়ের বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে থুতনিতে, কটিতে। প্রসাধন ভেদ করে বয়সের ছাপ স্পষ্টতর।

তারপর খুব দ্রুত। কয়েকটা বছরের মধ্যেই শরীর ভেঙে গেল। দুএক কলি গেয়েই থেমে যেতে হয়। দম পায় না। বুকের মাঝখানে একটা যন্ত্রণার অনুভূতি।

আস্তে আস্তে আসর ফাঁকা। যারা ফিরোজাবাঈয়ের দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল ছিল, তারা এ পথও মাড়ায় না। বাড়ীর সামনে রহিস আদমিদের গাড়ী আর ভীড় করে না। যারা দু একজন আসে তারা নিতান্ত মধ্যবিত্ত, এককালের নামকরা বাঈজী ফিরোজাবাঈকে দেখতে আসে। কম দর্শনীর বিনিময়ে।

ঝাড়ের বাতির সংখ্যাও কমে আসে। কার্পেটের বদলে জাজিম। তবলচী অন্য কোন বাঈজীর ঘরে আশ্রয় নেয়। ঝড়ে কাত হয়ে পড়া পোত থেকে যেমন সবাই সরে পড়ার চেষ্টা করে নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য, তেমনই একে একে সকলে বয়স্থা বাঈজী ফিরোজাবাঈকে পরিত্যাগ করে।

সঞ্চিত অর্থ দিয়ে সংসার চলে। মেপে মেপে, হিসাব করে করে। তাও সঞ্চয় একদিন শেষ হয়। জানাশোনা দু একজন রহিসকে ফিরোজাবাঈ পত্র পাঠায়, সাহায্য চেয়ে। পত্রের উত্তর পায় না।

বড় বাড়ী থেকে ফিরোজাবাঈ ছোট বাড়ীতে উঠে আসে। একতলায়। মহার্ঘ আসবাব মহামূল্য পরিচ্ছদ

জীবন বাঁচাবার তাগিদে সব যায়। পরিচারিকারা বিদায় নেয়।

সঙ্গী শুধু তানপুরা। বসে বসে ফিরোজাবাঈ সুর বাঁধে। তার ছিঁড়ে গেলে যত্ন করে আবার তার পরায়। আঙুল দিয়ে দিয়ে টুং টাং করে। বাঈজীর জীবনে সুর থাকবে না, তা কি হতে পারে!

ছোট ঘুলঘুলি দিয়ে আকাশ দেখা যায়। নীল মেঘশূন্য আকাশ। তারার চুমকি দেওয়া।

ফিরোজাবাঈয়ের অনেক পুরোনো কথা একটা মনে পড়ে গেল।

অদ্ভুত ধরণের সব লোক আসত আসরে। বিচিত্র তাদের শখ।

বেনারসের তিলকচাঁদই বোধ হয়, না না, তিলকচাঁদ নয়, রামগড়ের বিজয় সিং। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, জলসা হবে নীল আকাশের তলায়। মাথার ওপর অন্য কোন আচ্ছাদন থাকবে না।

তাই হ'ল। গোমতীর ধারে আসর বসল। তবলচী মিশিরলাল। প্রায় সারা রাত ধরে গাওনা চলল। উটকো মানুষের ভীড় জমে গেল চারপাশে। লক্ষ্ণৌ শহর ঝেঁটিয়ে লোক এল। সঙ্গীত মত্ত জনতা।

গানের সুরে কাঁপন লাগল গোমতীর জলে, গাছের পাতায় পাতায়। ফিরোজাবাঈ একটার পর একটা গেয়ে চলল। অফুরন্ত সুরের স্রোতে ভাসিয়ে দিল নিজেকে।

ঠিক তেমনই তারা-ছাওয়া রাত আজও। ফিরোজাবাঈ পরিবেশ ভুলল। নিজের ছিন্ন, মলিন পরিধেয় দিয়ে তানপুরাটা সযত্নে মুছে নিল। তবলচী নেই, না থাক। ফিরোজাবাঈয়ের কোন অসুবিধা হবে না।

সে রাতের মতনই দরবারি কানাড়ায় খেয়াল শুরু করলে। প্রথমে আলাপ। সুরের বিস্তার। একটা হাত কানে দিয়ে,আর একটা হাতে তানপুরার তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

দুটি চোখ নিমীলিত। সে রাতের সমস্ত আসরের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রশংসমান এক রাশ চোখ মুখের সার।

তন্ময় হয়ে ফিরোজাবাঈ গেয়ে গেল। বিরতি নয়। সারা রাত ধরে চলবে এই গানের আসর।

হঠাৎ সুর ছিঁড়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরোজাবাঈ চমকে চোখ খুলল।

গোমতীর ধারে সে রাতের আসর নিশ্চিহ্ন। আধঅন্ধকার প্রকোষ্ঠ। কোণে কোণে আবর্জনার স্তূপ, মাকড়সার জাল। একেবারে কোণের দিকে শানকিতে রাতের আহার্য। সোরাইতে জল।

দরজার সামনে একপাল মেয়ে। হাসি-টিটকারিতে তাদের যৌবনোচ্ছল দেহ আছড়ে আছড়ে পড়ছে।

বা, নানী, থামলে কেন, আর একটা হোক!

কে একজন পরিহাসের ছিটে ছড়াল!

বুকের মাঝখানে পুরোনো ব্যথাটা আবার জেগে উঠল। দু হাতে বুক চেপে ফিরোজাবাঈ উদ্‌ভ্রান্তের মতন এদিকে ওদিকে দেখতে লাগল।

আবার সেই তীক্ষ্ণ হাসি বিদ্রূপাত্মক।

আসরের রেওয়াজ জানে না, নিয়মকানুন মানে না, বেতমিজ মেয়েরা। এমন চমৎকার আসর একেবারে মাটি করে দিল!

চীৎকার করে গালাগাল দিতে গিয়েই ফিরোজাবাঈ থেমে গেল। না, চীৎকার ক'রে, গালিগালাজ করে, এদের শায়েস্তা করা যাবে না। এদের সর্বনাশ এদের সঙ্গে সঙ্গেই ফিরছে!

মুন্নাবাঈ, সরযূবাঈ, আলোয়ারী, ছোটি কেশরীবাঈ এরা কেউ জানে না, কেউ বুঝতে পারছে না, অলক্ষ্যে সময় এদের পিছু নিয়েছে। ছায়ার মতন অনুসরণ করছে। কাল পূর্ণ হলেই টুঁটি টিপে ধরবে। দেহের বাঁধন শিথিল হবে, রূপযৌবনলাবণ্য সব মুছে যাবে তিলে তিলে, মধুর কণ্ঠস্বর কর্কশ, ভগ্ন হয়ে যাবে।

তারপর এক এক করে সবাই চলে আসবে আধোঅন্ধকার এই কুঠুরিতে। আজকের লাস্যময়ী যৌবনবতী সবাই একদিন ফিরোজাবাঈ হয়ে যাবে।

অবশ্যম্ভাবী সেই দিনের কথা স্মরণ করে ফিরোজাবাঈ খিল খিল করে হেসে উঠল। লোল, জরাজীর্ণ, হাজার রেখাঙ্কিত দেহ কাঁপিয়ে।

দরজার সামনে দাঁড়ানো মেয়ের দল সেই বীভৎস হাসির শব্দে শিউরে উঠল। বুড়ী নানীর বুঝি মাথাটা খারাপ হয়ে গেল।

তানপুরার তার ছুঁয়ে ছুঁয়ে একি উৎকট হাসি ফিরোজাবাঈয়ের।

আগমনী : বাঙলার মাতৃহৃদয়ের গান ॥

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসব। বার মাসের তের পার্বণের নিত্যনৈমিত্তিকতাকে অতিক্রম করে হৃদয়ের একটা গভীর আলোড়ন যেন নিয়ে আসে প্রতিবৎসর বাঙালীর ঘরে ঘরে অকাল বোধনের মন্ত্র। আবালবৃদ্ধ-বণিতা এই উৎসবে মেতে উঠেন। সানাইএর সুরে, শেফালিকা কুসুমের স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে যেন কি এক মোহময় আবেশ রচিত হয়। মায়েরা ভাবেন মেয়ে এসেছেন ঘরে, ছেলেরা ভাবেন, মা এসেছেন ঘরে। কিন্তু বিজয়া দশমীর ঢাক বেজে উঠলেই যেন সকলের মন একটা বিচ্ছেদের করুণ রসে ভরে উঠে, প্রতি হৃদয়ে বেদনা জাগে—মা যে চলে যাচ্ছেন—মেয়ে যে চলে যাচ্ছেন।

সারা ভারতে দুর্গা, বিজয়দাত্রী দেবী। শত্রুনাশনের অমোঘ মন্ত্রে তাঁর আবাহন, পূজা। কিন্তু বাঙালী মায়ের কাছে দুর্গা তাঁর এক স্নেহের মেয়ে। বাঙলার মায়েদের প্রাণ মেনকা-মায়ের অন্তরের সমস্ত দরদ নিঙড়িয়ে নিয়ে গড়া। তাই শরতের সুনীল আকাশে তারা ফুটে উঠতে না উঠতেই কেঁদে উঠে তাঁদের সারা অন্তর। গিরিরাজ, মেনকা, উমা, আর মহেশ্বরকে নিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দীতে কবিরা যে গান গেয়েছেন সেই সব গানের সুর বেজে উঠে তাঁদের মনে। উমার জন্যে মেনকা-মায়ের যে হৃদয়ের আকুলি বিকুলি সে ব্যাকুলতা তাঁদেরও জেগে উঠে। তাঁরা গান :

গিরিরাজ,
যাও দেখি আজ
আনতে উমা ধনে।
বিগত রজনী যোগে
(উ) মাকে দেখেছি স্বপনে।
তুমি রাজ্য অধিকারী
আমি তো অবলা নারী,
জীবন শূন্য হলে ভাল
উমা তারা অদর্শনে।
(৺রত্নাকর ভট্টাচার্য)

উমাতারার অদর্শনে মেনকা মায়ের দুঃখই ব্যাকুল করে তাঁদের। বাৎসল্যের এ কী রস ঘন মূর্তি!

উমা হরের ঘরে কত কষ্টে থাকে, সে কথা স্মরণ করে মেনকা-মায়ের বুক কেঁপে উঠে। তিনি গিরিরাজকে আরো মিনতি করেন :

ভয়ে তনু কাঁপিছে আমার,
ওহে প্রাণনাথ গিরিবরহে।
কি শুনি দারুণ ব্যথা দিবসে আঁধার।
বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল,
বেরোও গণেশমাতা ডাকে বার বার
তব দেহ হে পাষাণ, সে দেহে পাষাণ প্রাণ
এই হেতু এত ক্ষণ না হলো বিদায়।
তনয়া পরের ধন বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় একি বিড়ম্বনা বিধাতার।
প্রসাদের এই বাণী হিমিগিরি রাজরাণী
প্রভাতে চকোরী যেমন নিরাশা সুধায়।
(রামপ্রসাদ সেন)

উমার কথা ভেবে ভেবে মেনকার আর চিত্তে শান্তি নেই। তাঁর রাত্রির নিদ্রা দুঃস্বপ্নে বার বার ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর সে দুঃস্বপ্নের কথাই গিরিরাজকে বলেন :—

কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী,
অসিত বরণা উমা মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা।
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বালশশী,
যোগিনী দল সঙ্গিনী ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।

উঠহে উঠ অচল, পরাণ হল বিকল,
ত্বরায় কৈলাসে চল. আন উমা সুধারাশি।
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মেনকার মিনতিতে অচলের মন টলেছে। তিনি কৈলাস থেকে উমাকে আনবার ব্যবস্থা করছেন। মেনকা এবার তাঁকে ধরে বসেছেন, উমা এলে পরে আর তাঁকে কৈলাসে পাঠান হবে না।

গিরি এবার আমার উমা এলে
আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
যদি আসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া করব
জামাই বলে মানব না।
দ্বিজ রামপ্রসাদে কয় এ দুঃখ কি প্রা.ণ সয়,
শিব শ্মশানে মশানে ফিরে
ঘরের ভাবনা ভাবে না।
(রামপ্রসাদ সেন)

বোধনের বাঁশী বেজে উঠেছে। উমা এসে পৌছে গিয়েছেন পিত্রালয়ে। পর্বতের প্রাণেও আনন্দের লহর উঠেছে। তিনি মেনকাকে ডেকে বলেছেন, কোথায় আছ, এসো, আমার উমাকে দেখবে।

আমার উমা এলোরে দেখ গো রাণী নয়ন ভরে।
দশ ভুজ ধরি, আহা মরি মরি, বিহরে সিংহোপরে।
কিবা হেমোজ্জ্বল বরণে, লোটে চাঁচর চিকুর চরণে,
কিবা রক্তোৎপল আভা হেম জড়িত বিজলী প্রভা,
মরি ঢল ঢল ঢল, সুধা চল চল, বিমল মধুর অধরে।
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মেনকা ছুটে গিয়ে উমার কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করেন। হরের ঘরে উমা কেমন করে ছিল সেই ভাবনাই তাঁকে ব্যাকুল করে বেশী।

ওমা, কেমন করে হরের ঘরে
ছিলে উমা বলমা তাই।
কত লোকে কত বলে শুনে ভেবে মরে যাই
মার প্রাণে কি ধৈর্য ধরে
জামাই নাকি ভিক্ষা করে,—
এবার নিতে এলে বলবো হরে
উমা আমার ঘরে নাই।
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

উমা মায়ের কাছে হৃদয় খুলে পতি-গৃহের সমস্ত সুখ-দুঃখ বর্ণনা করেন :

তুমি তো মা ছিলে ভুলে
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই।
ভাং খেয়ে মা সদাই আছে
থাকতে হয় মা কাছে কাছে
ভাল মন্দ হয় গো পাছে, সদাই মনে ভাবি ওই।
দিতে হয় মা মুখে তুলে
নয় তো খেতে যায় গো ভুলে,
ক্ষেপার দশা ভাবতে গেলে
আমাতে আর আমি নই।
ভুলিয়ে যখন এলেম ছলে
ওমা ভেসে গেল নয়ন জলে
একলা পাছে যায় গো চলে,
আপন-হারা এমন কই।
(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)

মেনকা-মায়ের দুঃখ জেগে আছে বাঙলার ঘরে ঘরে মায়েদের বুকে। পতি-গৃহে মেয়েরা কী দুঃখে দিন কাটাচ্ছে, সে-ভয় আর ভাবনাতেই মায়েদের প্রাণে শান্তি নেই। মেয়ে যখন ঘরে আসে মায়ের বুকে বাৎসল্যের যেন বান ডাকে। প্রতিবৎসর শারদীয় উৎসবে বাঙলার ঘরে ঘরে আগমনীগানের যে-সুর বেজে উঠে তাতে যেন দুঃখ-দুশ্চিন্তা-পীড়িত বাঙলার মায়েদের হৃদয় বেদনারই প্রতিধ্বনি। মেয়ে যখন স্বামীগৃহের অভাব, অনটন, দুঃখ, লাঞ্ছনা সত্ত্বেও হতভাগা স্বামীর ভাবনায় ব্যাকুলতা প্রকাশ করে, তখনই মায়ের মনে কেমন একটা প্রশান্তি ফিরে আসে। পতিপরায়ণা কন্যার প্রতি মমতার সঙ্গে একটা শ্রদ্ধার ভাবও জেগে উঠে। তাতে করে দশমীর রাতে মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় বিচ্ছেদের দারুণ দুঃখও সমবেদনার করুণ রসে ধুয়ে মুছে যায়। পুনরাগমনের আকুতিতে বিদায়ের ক্ষণটি মধুর হয়ে উঠে।

ভণ্টুর সঙ্গে প্রথম মোলাকাৎ

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

জোড়া ভালুকশিকারের কাহিনী শেষ করেই অর্জুন সেন মন্তব্য করে—

—এ সবই প্রাক্ ভণ্টুযুগের ঘটনা।

প্রশ্ন করি—

—ওকে পেলে কোথায়? ডিটেকটিভ্ রবার্ট ব্লেকের সহকারী স্মিথের মত এমন করিৎকর্ম্মা অনুচর তো সচরাচর দেখা যায় না।

মেজর সেন তার গোঁফে হাত বুলিয়ে নেয়, তারপর আত্মপ্রসাদের সুর তার কণ্ঠে বেজে ওঠে,

—অনুগত কী এমনি হয়? করে নিতে জানা চাই। তবে হ্যাঁ, করিৎকর্ম্মা ও চিরদিনই। আমার কাছে আসার আগেকার যে কাহিনী আমি যোগাড় করেছি—তার মধ্যেও ওর সদাজাগ্রত কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও বেপরোয়া সাহসের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়।

—কোথায় প্রথম দেখা হল ?

—ডুয়ার্সে। মিলিটারী ট্রেনিং শেষ হবার পর চালান হলাম ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডে—পোষ্টিং হল ভোটান ফ্রন্টিয়ারে। দালসিংপাড়ার কাছাকাছি সন্তলাবাড়ীতে আমাদের ক্যাম্প।

বেশ আছি, খাই দাই, ঘুরে বেড়াই। দালসিংপাড়ার হাট রবিবারেই বেশ জমে ওঠে। একবার গিয়েছি সেই হাটে কিছু নেপালী, কিছু ভুটিয়া, হিন্দুস্থানী আর বাঙালী-ব্যবসায়ীরা হাটে দোকান করে। মাঝে মাঝে লামা গোছের দু চারজন তিব্বতীও দেখা যায়। আমদানীর মধ্যে দেখলাম, মাখন, কমলালেবু, ডিম, মুরগী, আলু, কোয়াস আর গারো কচু। তেল, লবণ, মশলারদোকানও আছে। কাঠের আসবাবপত্র তৈরী করে গ্রামের লোকেরা হাটে এনে বিক্রয় করে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি, একপাশে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। কৌতূহল আমারও কম নয়—সেই ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম।

ব্যাপারটা কী ?

ব্যাপার আর কিছুই নয়—মোরগের যুদ্ধ। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি মোরগ—পাখা ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—তাদের পায়ে দড়ি বেঁধে মোরগের মালিক দুজন দরের আদান প্রদান চালাচ্ছিল, সমবেত দর্শকদের মধ্যও কেউ বা বাজি রাখে।

বুঝে নিতে কষ্ট হলনা—মোরগের ওপর বেটিং চলছে—মজা মন্দ নয়।

বেটিং এর কথা বাদ দিয়ে মোরগের কথায় আসা যাক! জাঁদরেল দুটো মোরগ—দুটোর মাথায় বড় বড় ঝুঁটি—বুকের ওপর খানিকটা জায়গা লাল—পালক নেই। একটা সাদা আর একটা মেটে লাল রংএর। দুটোরই পায়ের বুড়ো আঙুলের সঙ্গে ছোট ধারালো ভোজালির মত ছুরি বাঁধা আছে। তাই দিয়েই যুদ্ধ হবে। নিয়মটা এই—যে মোরগ ছুরি দিয়ে প্রথম তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে আঘাত করবে সেই জিতবে। লড়াই এর ওপর বাজি রাখা হয়—যার মোরগ জিতবে বাজির টাকা ও ঘায়েল করা কুক্কুট তারই প্রাপ্য।

লড়াই দেখছিলাম। মোরগ দুটো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, আর এ ওকে আঘাত করতে চায়। কখনও বা দুটো ছুরিতে ঘষা লেগে ক্যাঁচ করে আওয়াজ ওঠে, কখনও বা একটা মোরগ অপরটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠোকর মারে। শেষ পর্য্যন্ত লাল মোরগটাই সাদাটার ওপর ছুরি বসিয়ে দিলে।

একটা হৈ হৈ আওয়াজ উঠল—ভিড়ের মধ্য থেকে গুণ্ডাগোছের একটি লোক ছুটে এসে আহত মোরগটিকে বুকে তুলে নিয়েই সে কী কান্না!

পলকের মধ্যে যেন একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। যে লোকটি সাদা মোরগের মালিক বলে জাহির করেছিল সে উধাও। বেগতিক বুঝে দর্শকের মধ্যে অনেকেই কেটে পড়ে। শুধু লাল মোরগের মালিকটি এসে বুঝতে চেষ্টা করে, ব্যাপারখানা কী!

কৌতূহল আমারও কম নয়। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। সেই গুণ্ডাগোছের মানুষটির চোখে আর জল নেই—তার বদলে ফুটে উঠেছে একটা মারাত্মক প্রতিজ্ঞা—চোখ দুটো যেন আগুনের গোলা। দাঁত কিড়মিড় করে সে যা বল্লে, তার অর্থ সেই মোরগ-চোরের রক্তে সে তর্পণ করবে।

লোকটি বাঙালী, কিন্তু এমন সুগঠিত দেহ সচরাচর চোখে পড়ে না। তাকে ডাকতেই, আমার মিলিটারী পোশাক দেখে প্রথমটা সে বেশ হকচকিয়ে গেল—তারপর সটান আমার সামনে এসেই লম্বা সেলাম।

বুঝলাম—লোকটি কায়দা-দুরস্ত। তাকে একপাশে ডেকে খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞেস করি। লোকটি জাতে কুর্ম্মী, আদি বাড়ী ভাগলপুর—পূর্ব্বপুরুষ রুজি-রোজগারের সন্ধানে বাংলায় আসে—এখন তারা পুরোদস্তুর বাঙালী।

জিজ্ঞেস করি—তোর নাম কী রে—

—ভল্টু রাম—

—কোথায় থাকিস ?

—কিচ্ছু ঠিক নেই, যেখানে রাত সেখানেই কাত্। তবে আপাততঃ এক কমলালেবুর ব্যাপারীর সঙ্গে আছি। সেই খেতে পরতে দেয়।

—কী কাজ করিস ?

—এমন কিছুই নয়—কমলালেবুর দর নিয়ে ভুটিয়াদের সঙ্গে কাজিয়া হলে আমি সামনে দাঁড়াই—বাস্ কিস্সা খতম্।

—সাদা মুরগীটা কার ?

ভল্টু বুক ফুলিয়ে বলে—

আমার নিজের—আবার কার!

তাকে উস্কে দিই—

মোরগটা হেরে গেল যে!

—বাচ্চা কিনা, ধাড়ী মোরগটার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে কেন?

লোকটার ভাবভঙ্গী, কথাবার্তায় তার ওপর আমার কী রকম আকর্ষণ হ'ল। সরাসরি প্রস্তাব করি—আমার কাছে কাজ করবি?

—কী কাজ?

—সব কাজ—

—যুদ্ধ করতে হবে?

—হবে বৈকি! আমি যখন যেখানে থাকব, তোকেও সঙ্গে থাকতে হবে। আমি যখন মিলিটারী, তুইও মিলিটারী হবি। শিকার করেছিস কখনো?

অম্লানবদনে ভল্টু বলে যায়—

ঢের ঢের শিকার করেছি। আমার ঠাকুরদার একটা গাদা বন্দুক আছে—সেটা এখন আমার দখলে।

—তা হলে ঠিক তো? কত মাইনে চাস্?

ভল্টু দাঁত বের করে হাসে—তারপর একটু লজ্জার ভাব দেখিয়ে বলে—

মাইনে আর কী চাইব? এই খাওয়াপরা—আমি আবার একটু বেশী খাই কিনা—তাই মাইনে যে যা দেয় আপত্তি করি না।

—বেশ, তবে চলে আয় আমার কাছে! তোর মনিবের কাছে বল্‌তে হবে না?

—কে মনিব? ইঃ ভারী তো কমলালেবুর ব্যাপারী! আপনার কাছে থাকতে পেলে আমি আর কিছু চাই না। তবে একবার গিয়ে আমার টিনের তোরঙ্গ আর বন্দুকটা নিয়ে আসতে হবে।

—তবে চল্ আমার সঙ্গে ক্যাম্পে—

আসার পথে তাকে একটু একটু করে তালিম দিতে থাকি। আচার ব্যবহার, কাজ-কর্ম, পোষাক পরিচ্ছদ—সব কিছুতেই তাকে নূতন করে ঢেলে সাজতে হবে। আজ পর্য্যন্তও তাকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনা যায়নি। মাঝে মাঝেই গোঁয়ার্তুমি করে বসে। তবে হ্যাঁ, বিশ্বাসী খুব, আর আমাকে প্রাণের চাইতেও ভালবাসে।

মেজর সেন ভল্টুর কথায় যেন পঞ্চমুখ। সেই মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলি—

সে কথা একশ'বার। তোমার কাছেই শুনেছি, শিকারে তার বিক্রমের কথা। শেষ পর্য্যন্ত তোমাকে আগলে রাখার মধ্যে যদি কখনো অন্যায় সাহস দেখিয়ে থাকে, সেটা যে তোমাকে ভালবাসে বলেই করে, এটা সুনিশ্চিত। ভল্টুর তোমার প্রথম শিকারের কাহিনীটা আজ শুনতে চাই।

—সেই কথাই বলব—তার আগে সামান্য ভূমিকা।

ভল্টু আমার কাজে বহাল হয়ে গেল। বেশ দিব্বি কাজকর্ম করে—বিশেষ কিছু বলে দিতে হয় না—কিন্তু মাঝে মাঝেই দুতিন ঘণ্টার জন্যে সে যে কোথায় উধাও হয়ে যায়—অনেক জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাই না।

চিন্তার কথাই বটে! যে গুণ্ডাধরণের লোক—ঝোঁকের মাথায় তাকে পছন্দ করে ফেললাম—কিন্তু যদি কোনও বদমাইসের দলে থাকে—কিংবা খুনে ডাকাত হয়—তাহলেই হয়েছে আর কি—কোন্ দিন কোন্ ফ্যাসাদে না পড়তে হয়।

আমার ক্যাম্পেই সহযোগী মিঃ তলোয়ারকরকে একদিন কথাটা খুলে বলি। ভদ্রলোক মারাঠী ব্রাহ্মণ, মিলিটারীতে এসেও দৈনন্দিন পূজা-আহ্নিক ত্যাগ করেন নি। সমস্ত শুনে তিনি ভার নিলেন, এ রহস্য উদ্ধার করবেন।

হপ্তাখানেকের মধ্যেই ভল্টুর গোপন আড্ডার খোঁজ পাওয়া গেল। সেটা আর কিছুই নয়—যাকে ইংরেজীতে বলে জিম্‌ন্যাসিয়াম—আমাদের ভাষায় ব্যায়ামাগার, সেই ধরণের একটি খুদে প্রতিষ্ঠান। আটদশজন পাহাড়ী, নেপালী আর হিন্দুস্থানী ছোকরাদের নিয়ে সেই আখড়া—ভল্টু তাদের মাষ্টার। নিজের হাতে গড়া জিনিষের ওপর মানুষের যে মায়া থাকে—তারই টানে ভল্টু মাঝে মাঝে গরহাজির হয়।

তলোয়ারকর উপদেশ দেয়।

—লোকটা বিশ্বাসী আর সরল—গোঁয়ার বটে তবে সাকরেদরা ওকে ভালও বাসে খুব, ভক্তিও করে—ওকে যদি পোষ মানাতে পারো কোনো দিন আফশোস্ করতে হবেনা।

একদিন কথায় কথায় ভল্টুকে শিকারের বিষয়ে বলেছিলাম। সেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, খুব শীগ্‌গীর খবর আনবে।

শীতকাল, বিকেল চারটে বাজতেই পাহাড় আর জঙ্গলের ছায়া নেমে আসে। অকালে অন্ধকার এসে আমাদের ক্যাম্পে বাসা বাঁধে। কাজেই আমরাও হাত পা গুটিয়ে পেন্সনভোগী বৃদ্ধের মত চুপ করে হয় বই পড়ি, নয়তো অফিসের চিঠি পত্রে মন দিই। সাতটা বাজতেই নৈশভোজন শেষ—তারপর কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতের প্রহর গোণা ছাড়া আর কিছু থাকে না। পাশের ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়তেই ভল্টুর নাসিকা গর্জ্জন সেই যে সুরু হয়, একটানা ঘরর ঘরর সেই আওয়াজ থামে সেই ভোর রাত্রে।

সেদিনও বিছানায় শুয়ে ঘুম আসেনা। এলোমেলো আকাশ পাতাল কত কী চিন্তা করি—শেষ খুঁজে পাইনা। এদিকে হেড্ কোয়ার্টার থেকে চিঠি এসেছে—আমার মেয়াদ সেখানে আর দিন পনেরো—তার পরেই যেতে হবে আসামে। বাংলা দেশের শেষ প্রান্তে থেকেও মনে হত বাংলাতেই আছি—এবার দেশছাড়া হতে হবে!' এই সব এলোমেলো চিন্তার মধ্যেই কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা—হঠাৎ ক্যাম্পের মধ্যে কোনও প্রাণীর জোরে নিঃশ্বাস ফেলার শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলে সেই অন্ধকারের মধ্যেই একজোড়া জলন্ত বিন্দু দেখতে পেলাম। চট করে বিছানার ওপর উঠে বসার ঝুঁকি নেওয়া উচিত নয়। বালিশের নীচে আমার রিভলবার আর টর্চ্চটা থাকেই। এক হাতে রিভলবার ধরে, অপর হাতে টর্চ্চটা জ্বেলে সেদিকে ফেলতেই দেখি গায়ে ডোরা-কাটা একটি প্রাণী বিচিত্র ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে—যেন কিছু একটা মতলব আঁটছে।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে যাবার উপক্রম। টর্চ্চটা নিভিয়ে শোয়া অবস্থায়ই রিভলবার ছুঁড়ব কিনা ভাবছি এমন সময় হঠাৎ ভল্টুর নাসিকা ধ্বনি থেমে গেল—সঙ্গে সঙ্গেই সেই জলন্ত চোখের অধিকারী জানোয়ারটা ঘাবড়ে গিয়ে ছুটে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার সময় ভল্টুর খাটে এমন একটা ধাক্কা দিয়ে গেল যে বিছানা থেকে সে পড়ে যায় আর কি?

ভূমিকম্প ভূমিকম্প, বলে এক চীৎকার দিয়ে ভল্টু লাফিয়ে ওঠে। তলোয়ারকরও তার ক্যাম্প থেকে ছুটে আসে। আমি ভল্টুকে আশ্বাস দিয়ে বলি—

ভূমিকম্প নয়, ব্যাঘ্রকম্প—হৃৎকম্প থামাও—তোমার বরাত ভাল। তোমার শরীর থেকে বাঘ দুএক সের মাংস খাবলে নিয়ে যায়নি।

বাঘের নাম শুনেই ভল্টু তার গাদা বন্দুক হাতে তখনই ছুটে সেই অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে আর কি।

আমি আর তলোয়ারকর তাকে অনেক কষ্টে নিরস্ত করি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে—আলো দেখা দিতে বড় জোর আধঘণ্টা বাকী।

তখনই ক্যাম্পের মধ্যে আমাদের তিনজনের বৈঠক বসে গেল।

বাঘের দেখা যখন মিলেছে—তখন একটু কষ্ট করে জঙ্গলে ঢুকলে মোলাকাৎ নিশ্চয় হবে।

ভল্টু তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে—আলবৎ, আমার সাকরেদদের খবর দিলে তারাও আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। আর দেরী নয়—কাল সকালেই এর ব্যবস্থা করা উচিত।

তলোয়ারকর বয়সেও বড়—বিচক্ষণও কম নয়, সে প্রস্তাব করে—

ভল্টুর সাকরেদ তো বেশী নয়—আরও লোকজন চাই যে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ভল্টু বলে—তার জন্যে ভাবতে হবেনা, কুলী লাইনে গিয়ে আমি আরও কিছু নেপালী জোগাড় করে আনবো।

আমাদের দিক থেকে আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ, ভল্টু একবার বাজারের দিকে গিয়েই মাঝ পথ থেকে ফিরে এল, তার সঙ্গে একটা নেপালী।

ভয়ে বিবর্ণ, মুখে একটি কথা নেই, ঠোঁট দুটো থরথর করে কাঁপে। ভল্টুই তার হয়ে জানালো—আজ ভোরে তার গোয়াল ঘরে একটা বাঘ ঢুকেছিল—বাছুরকে ঘায়েল করে গাইগরুটার ওপরেও হামলা চালিয়েছিল, কি লোকজন উঠে পড়ায়, জানোয়ারটা পালিয়েছে।

তাকে সাহস দিয়ে বলি—

কিছু ভয় নেই—এই এখুনি আমরা যাচ্ছি—তোমার দুষমনকে খতম না করে ফিরবনা।

ভল্টুকে তাড়া দিয়ে বলি—

বাজার বন্ধ থাক—যাও, তোমার সাকরেদদের খবর দাও—আর অমনি কুলী লাইনেও লোক জোগাড় কর। ন'টার মধ্যেই বেরুতে হবে।

ভল্টুর উৎসাহ দেখে মনে হ'ল, অনেকদিন পরে একটা কাজের মত কাজ সে পেয়েছে। সে ছুটে চলে গেল। নেপালীটা এক কোণে বসে বিড়বিড় করে কী সব বক্‌তে থাকে।

মিঃ তলোয়ারকর ছাড়া ক্যাম্পের আর কেউ আমাদের সঙ্গী হতে চাইল না। কে-না-কে একটা খবর এনেছে আর তাই নিয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো কারো পোষাবে না।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লোকজন সব হাজির। প্রত্যেকের হাতেই লাঠি, বল্লম,ছোরা, টাঙ্গি--যার যা কিছু অস্ত্র-সম্বল ছিল, তাই নিয়েই চলে এসেছে। কারো হাতে বা ক্যানেস্তা টিন।

আমার কোমরে রিভলবার, আর হাতে বন্দুক—ভল্টুও তার ঠাকুরদার আমলের গাদা বন্দুকটা সঙ্গে নিলে। গুলীর পেটিটা তার কাছে দিইনি—নিজেই গলায় ঝুলিয়ে নিয়েছি। তলোয়ারকর শিকারে যাওয়ার কথা শুনেই কখন যে নিজের ক্যাম্পে ঢুকে ধ্যান-ধারণায় মন দিয়েছিল খেয়াল করিনি, কিন্তু সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে সে যখন বেরিয়ে এল, তার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ আমারও মুখে কথা নেই।

তলোয়ারকরের প্রশস্তললাটে রক্তচন্দনের তিলক জ্বল জ্বল করছে—উন্নত নাসিকাটি যেন খাপ খোলা বাঁকা তলোয়ার, পরণে খাকি প্যান্ট ও হাফ সার্ট—হাতে বন্দুক।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে পাহাড় বেয়ে চলেছি।

প্রায় মাইলখানেক এই দলবল নিয়ে যখন আঁকা-বাঁকা পথে নীচে নেমে যাই—মনে হল আমরা যেন খুব বড় একটা এ্যাড্‌ভেঞ্চারে চলেছি। সকলের আগে ভল্টু আর সেই নেপালী, তারপর আমি, পেছনে তলোয়ারকর। ভল্টুর সাকরেদরা সব একজোট হয়ে গল্প গুজব করতে থাকে—তার মধ্যে বেশীর ভাগই কে কোথায় কোন বীরত্বের কাজ করেছে তারই ব্যাখ্যান। নেপালী কুলীর দল বিটারের কাজ করবে, তারা নিঃশব্দে আসতে থাকে।

আমরা একটা বস্তীর কাছে আসতেই সংবাদদাতা সেই নেপালী তার কুঁড়ে ঘরটির কাছে আমাদের নিয়ে গেল। তার গোয়ালঘর বলে যা দেখালো—তাকে ঘর বলা চলেনা। ওপরে খড়ের ছাউনি—নিচে চারিদিকে বাঁশের বেড়া তার মধ্যে যা ফাঁক—ভেতর দিয়ে হিংস্র জানোয়ারের অবাধ প্রবেশ।

গোয়ালঘরে ঢুকে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পেলাম। বাছুরটা মরে গিয়েছে—গাই গরুটার কাঁধে একটা বড় গোছের থাপ্পড়ের দাগ—নখের আঁচড়ে বেশ খানিকটা মাংস উঠিয়ে নিয়েছে।

গরুর মালিক,সংবাদদাতা সেই গ্রাম্য লোকটি হাউ মাউ করে কেঁদে উঠতেই ভল্টু তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় তারপর আমাকে বলে—

—চলুন, এই পায়ের ছাপ ধরে আমরা এগিয়ে যাই!

নরম মাটির ওপর বাঘের পায়ের ছাপ কিছুদূর পর্য্যন্ত পরিষ্কার দেখা গেল—কিন্তু তারপর যে কোন্ দিকে যাওয়া উচিত কিছুই ঠাহর করতে পারিনা।

তলোয়ারকরের সুবিজ্ঞ মন্তব্য

—বাঘটা ধারে কাছেই কোথাও আছে। মুখের গ্রাস ছেড়ে যে সে দূরে চলে যায়নি এটা সুনিশ্চিত।

ভল্টুর সাকরেদরা অস্থির হয়ে ওঠে—তারা তখনই বিক্রমপ্রকাশের সুযোগ চায়। তাদের বুঝিয়ে বলি—

—এখন নয় ভাই—কার্য্যকালে কার কতখানি হিম্মত দেখিও; এখন চল, সবাই মিলে সামনের জঙ্গলে ঢুকে পড়ি।

জঙ্গলে ঢুকে প্রথমে তেমন কিছু ঝোপঝাড় দেখা গেলনা। সরু মোটা, লম্বা লম্বা শাল গাছ—তারই ফাঁকে ফাঁকে লতাকুলের ঝোপ। এর মধ্যে বাঘমশাই যে কিছুতেই থাকতে পারেনা—সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হয়ে আরও খানিকটা এগোতেই এক জায়গায় এসে থমকে গেলাম।

জায়গাটি বিচিত্র। দুধারে শাল গাছগুলো সতর্ক প্রহরীর মত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সামনের কিছুটা অংশ ঘন ঝোপজঙ্গলে ঢাকা—সোজা ঢালু হয়ে নিচে নেমে

গিয়েছে। তার মধ্যে ঢুকে পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কারণ সেই জঙ্গল থেকে উপরের দিকে বাঘটা যদি আচমকা ছুটে আসে আমাদের পক্ষে সেই ঢালু জমিতে দাঁড়িয়ে এধার ওধার এক পাও নড়বার উপায় থাকবে না।

ঠিক ঢালু হবার মুখেই কিছু ছাড়াছাড়ি কয়েকটা জংলী গাছ ডাল-পালা ছড়িয়ে যেন আমাদের আশ্রয় দেবার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিল। তলোয়ারকরকে একটা গাছে তুলে দেওয়া হল। ভল্টু আমার সঙ্গ ছাড়ে নি, আর একটা গাছে আমার পেছনে উঠে শক্ত হয়ে বসে। তার সাকরেদদের দুজন অপর একটি গাছে উঠে পড়তেই, ভল্টুর নির্দেশে বাকী সবাই নেপালীকুলীদের নিয়ে জঙ্গলের এক পাশ দিয়ে বিট সুরু করে। উদ্দেশ্য এই তাড়া খেয়ে যদি সেই নিচের জঙ্গল থেকে জানোয়ারটা ওপরে উঠে আসতে চায়, আমাদের নজরে তাকে পড়তেই হবে। আর ভল্টুর গাদা বন্দুকে না হোক, তলোয়ারকর কিংবা আমার ১৪ বোরের বন্দুকের হাত থেকে নিস্তার পাবে না।

কিছুক্ষণ পরেই জঙ্গল খেদা সুরু হল। ক্যানেস্তা টিন বাজিয়ে কানে তালা লাগানো-চীৎকারে বিটারের দল এগিয়ে আসে—আমরাও যে যার জায়গায় চক্ষু কর্ণ সজাগ রেখে বসে থাকি।

হঠাৎ নিচে থেকে চীৎকার ভেসে এল

—বাঘ, বাঘ, ঐ বাঘ!

আমরা এদিক ওদিক তাকাই কিছুই দেখতে পাই না—হঠাৎ ভল্টুর কণ্ঠে একটা চাপা উত্তেজনা—

—ঐ যে ব্যাটা—

—কৈ, কোথায়?

ভল্টু অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখায়।

—ঐ যে বাঁ দিকের বড় ঝোঁপের আড়ালে আমাদের দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে!

আমাদের কাছ থেকে দুশো গজের ওপর দূরত্ব, কাজেই এত দূরপাল্লায় আওয়াজ করার ঝুকি নেওয়া যায়না। তাছাড়া জানোয়ারের পেছনে গুলী করে লাভ নেই।

কিন্তু বাঘটা সম্ভবতঃ বিটারদের হৈ-হুল্লোড়ে বিরক্ত হয়েই তার নিভৃত নীড় থেকে বেরিয়ে এসে দেখতে চায় কারা তার বিশ্রামের ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। তারপর হয় তো নিজেকে কোনো নিরাপদ জায়গায় লুকোবার চেষ্টাতেই সেই জানোয়ারটা সেই ঢালু জমি বেয়ে ওপরে আসতে থাকে। ঠিক ওপরে উঠে আমার মুখেই আমার আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নি উদ্গীরণ করে।

একটা ক্রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা গেল। একবার ঘুরপাক খেয়েই পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে পরমুহূর্ত্তেই যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে কিন্তু নিচে নামতেই সামনে সেই জনপঞ্চাশেক বিটার এমন একটা হুল্লোড় বাধিয়ে এগিয়ে এল যে পথ না পেয়ে ব্যাঘ্র মশাই ফিরে আবার আমাদের দিকেই ছুটে আসে। কিন্তু, হঠাৎ একী হল, বাঘটা গেল কোথায়?

ভল্টুকে সে কথা বলতেই সে সাহস দেখিয়ে বলে, একবার নেমে দেখব না কী?

—থাক্—তার দরকার নেই—তুমি চুপটি করে বসে থাকো।

ভল্টুর সাকরেদ দুজন কিছু দূরেই অপর একটি গাছে আশ্রয় নিয়ে ছিল—হঠাৎ তারা আওয়াজ দিলে—

—ঐ যে বাঘ—বাঘ। এই গাছের তলা দিয়ে ছুটে পালালো।

সঙ্গে সঙ্গেই আর একটি বন্দুকের আওয়াজ শুনলাম। বুঝলাম, সেটা তলোয়ারকরের। জানোয়ারটা ছুটে আমাদের গাছের কাছাকাছি আসতেই আমার দ্বিতীয় গুলীতে বাঘ মাটিতে ছিটকে পড়ে গেল—একটা গর্জ্জন পর্য্যন্ত করে নি।

গাছের ডাল ধরে ঝুলে ভল্টু মাটিতে লাফিয়ে পড়ে—তলোয়ারকরও ছুটে আসে।

ভল্টুর সাকরেদ দুজনে গাছ থেকে নেমে লাঠি হাতে সদর্পে পা ফেলে—যেন বাঘ বাঘ বলে চেঁচিয়ে ওঠাও কম বীরত্বের নয়।

ভল্টু তার গাদা বন্দুকের ওপর হাত বুলিয়ে বলে—কেমন পয়লা নম্বর শিকার করিয়ে দিলাম, দেখলেন হুজুর? এবার আমাকে আর সাকরেদদের একদিন ফিষ্টি খাইয়ে দিন।
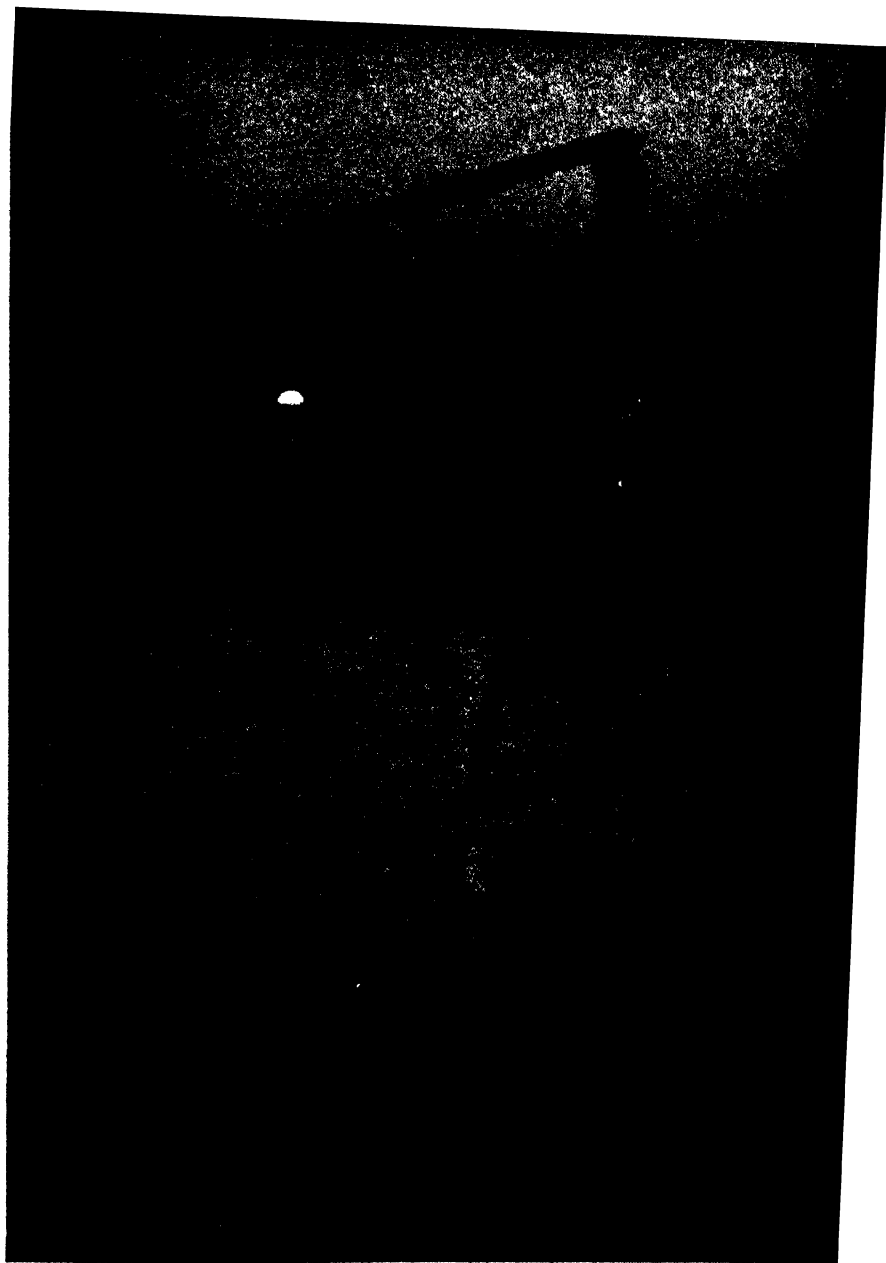
দৃষ্টিকোণ

সৈকতে (মাউণ্ট ল্যাভেনীয়া—কলম্বো)

ফটো : রণেন ঘোষ

মিশ্র-লঘুগুরু—মদিরা ছন্দে

উচ্ছল শিঞ্জনে ঝঙ্কারিয়া হিয়া শ্যামপ্রিয়া,
এসো লাস্তলীলায়।
সন্ধ্যা বিষণ্ণ পরাজিত অন্তর চন্দ্রিকা ফুল্ল
করো করুণায়।
প্রেম বসন্ত সুরে এসো ক্ষেমময়ী অপরাজেয়া
মঞ্জু বিভায়।
এসো উষা বরদাত্রী চিরন্তনী! রাত্রি বিশঙ্কিনী
ম্লান হিয়ায়॥

কামনা ভ্রান্তি বিলাস জয়ে রমা শান্তিময়ী,
এসো প্রাণ কূলে।
পাণ্ডুর মর্মের বালুচরে এসো গাঙ্গ বিভঙ্গে
তরঙ্গ তুলে।
বন্দন ধন্য করো মনো মন্দির নন্দন মূর্ছনা
রাগ মালায়।
এসো উষা বরদাত্রী চিরন্তনী! রাত্রি বিশঙ্কিনী
ম্লান হিয়ায়॥

শ্রীচরণে বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে তব
যাচি শরণ।
মা, শুভদা, ধনদা! পুলকে ঝলকে ঝলকে তব
জ্বালো তপন।
ছন্দময়ী! তব কান্তি দোলে তোলো আন্দোলিয়া
কালো মন্থরতায়।
এসো উষা বরদাত্রী চিরন্তনী! রাত্রি বিশঙ্কিনী
ম্লান হিয়ায়॥

কোকিল কূজনে পল্লব নর্তনে ফাল্গুন ফাগে
আনন্দময়ী,
রঙ্গি' করো লয় ক্লান্তি নিরাশা নবীন যুগান্তর
বাণী বহি'।
লুপ্ত করো রাধা গর্বনিশা বাধা! সর্বনিবেদন-
মন্ত্রদিশায়।
এসো উসা বয়দাত্রী চিরন্তনী! রাত্রি বিশঙ্কিনী
ম্লান হিয়ায়॥

কথা ও সুর—শ্রীদিলীপকুমার রায়

সংস্কৃত মদিরা ছন্দ

মা ধ ব | মা সি বি | ক ম্ব র | কে শ র | পু ষ্প ল | স ন্ম দি | রা মু দি | তৈঃ

শ্রী চ র ণে বি র হে মি ল নে শ য় নে স্ব প নে ত ব যা চি শ রণ

উ চ্ছ ল শি ঞ্জ নে ঝং কা রি য়া হি য়া শ্যা ম প্রি য়া এ সো লা স্য লী লায়

মিশ্র লঘুগুরু ছন্দে অনেক পদ পাওয়া যায় বৈষ্ণব পদাবলীতে তথা হিন্দি কবিদের গানে। তাঁরা এসব পদে পর্বের প্রথম অক্ষরে মুক্তদল গুরুস্বরে দুমাত্রার মর্যাদা দিতেন। পর্বের মাঝের কোনো অক্ষরে মুক্তদল গুরুস্বর থাকলে একমাত্রাই ধরতেন। হেতু এই যে পর্বের প্রথম অক্ষরে একটি স্বাভাবিক প্রস্বন যাতে—মুক্তদল গুরুস্বরকে (অর্থাৎ আ ঈ উ ও) তাই সহজেই দু-মাত্রা ধরা হয়। উপরের শ্রীচরণে…পংক্তিটি আদ্যন্ত বিশুদ্ধ লঘুগুরু ছন্দে পড়া যায়, কিন্তু উচ্ছল শিঞ্জনে পংক্তিটির নে, দ্বিতীয় য়া, এ, সো লী এক মাত্রা। অথচ প্রথম য়া, তৃতীয় য়া ও শ্যা দুমাত্রা পর্বের প্রথম অক্ষর ব'লে।

ইতি।

চতুর্মাত্রিক ছন্দ—

০ ১ + ৩

সা রা রা রা | সা গা গা গা I রা মা মা মা | গা পা পা পা I

উ চ্ ছ ল শি ন্ জ নে ঝ ং কা রি য়া - হি য়া

হ্মা ধা ধা ধা | পা না না না I ধা র্রা র্রা না | র্সা -া -া -া II

শ্যা - ম প্রি য়া - এ সো লা - স্য লী লা - - য়

র্গা -া র্রা র্সা | না -া ধা না I র্রা -া র্সা না | ধা -া পা ধা I

স ন্ ধ্যা বি ষ ণ্ ণ প রা - জি ত অ ন্ ত র

র্সা -া না ধা | পা হ্মা পা ধা I পা মা গা রা | সা -া -া -া I

চ ন্ দ্রি কা ফু ল্ ল ক রো - ক রু ণা - - য়

সা পা পা গা | পা পা পা গা I রা ধা ধা ধা | ধা ধা ধা ধা I

প্রে - ম ব স ল্ ত স্বু রে - এ স ক্ষে - ম ম

ছ ন্ দ ম য়ী - ত ব কা ন্ তি দো লে - তো লো

হ্মা না না না | না না না না I পা র্রা র্রা না | র্সা -া -া -া I

য়ী - অ প রা - জে য়া সা ন্ দ্র বি ভা - - য়

আ ন্ দো লি য়া - কা লো ম ন্ থ র তা - - য়

র্সা র্গা র্গা র্গা | র্গর্মা র্পা র্হ্মা র্পা I র্গা র্মা র্গর্রা র্গা | র্রর্মা র্রা র্সনা র্সা I

এ - স উ ষা - ব র দা - ত্রী চি রন্ - ত নী

নধা না ধপা ধা | পহ্মা পা মগা মা I গরা গা রমা রা | সা -া -া -া I

স্বা - ত্রি বি শং - কি নী স্না - ন হি য়া - - য়

সা মা গা মা | রা গা মা পা I গা ধা পা ধা | হ্মা পা ধা না I

কা - ম না ভ্রা ন্ তি বি লা - স জ রে - র মা

পা র্সা না র্সা | ধা না র্সা র্রা I না র্গা র্রা না | র্সা -া -া -া I

শা ন্ তি ম য়ী - এ সো প্রা - ণ কু লে - - -

র্সা -া র্সা র্সা | পা -া পা পা I না -া না না | মা -া মা মা I
পা ণ্ডু র ম রু মে র বা - লু চ রে - এ সো
ধা -া ধা ধা | গা -া গা গা I পা -া পা পা | সা -া -া -া I
গা ং গ বি ভ ং গে ত র ং গ তু লে - - -
না -া না র্সা | ধনা -া ধপা ধা I না র্রর্সা না র্সা | ধনা -া না না I
ব ন্ দ ন ধ ন্ ন ক রো - ম নো ম ন্ দি র
লু প্ ত ক রো - রা ধা গ র ব নি শা - বা ধা
পা না র্সা র্রা | র্রা -া র্রা র্গর্রা I না র্রা র্রা র্সা | না -া -া -া I
ন ন্ দ ন মূ র্ ছ্ ন্ রা - গ মা লা - - য়
স র ব নি বে - দ ন ম ন্ ত্র দি শা - - য়
মা পা পা পা | পা -া পা ধা I মা ধা পা ধা | মা পা গা মা I
শ্রী - চ র ণে - বি র হে - মি ল নে - শ য়
মা পা পা পা | পা -া ধা না I পা না ধা না | ধপা -া -া -া I
নে - স্ব প নে - ভ ব ষা - চি শ র - - .ণ্
মাপা ধা ধা পা | ধা -া ধা না I পধা না না না | না -া না র্সা I
মা - শু ভ দা - ব ল দা - পু ল কে - ঝ ল
ধগ র্সা র্সা র্সা | নর্সা র্রা র্রা র্রা I না র্গা র্রা না | র্সা -া -া -া I
কে - পু ল কে - ত ব জা - লো ত প - - ন্
সা মা মা মা | মা মা মা মগা I গা পা পা পা | গা পা পা গা I
কো - কি ল কু - জ নে প ল্ ল বঁ ন বৃ ত নে
মাপা পা ধা ণা | ধা -া পা ধা I মাপা ধা পা ধা | পমা -া -া -া I
ফা ল্ গু ন ফা - গে আ নন্ - দ ম য়ী - - -
পা -া পা গা | ধনা র্সর্রা র্সা র্সা I র্সধা -া ধা ণা | ধপা -া পা পা I
র ণ্ কি ক রো - ল য় ক্লা ন্ তি নি রা - শা ন্
রা -া গা মা | ধা -া পা পা I মা গা রা গা | গসা -া -া -া I
বী - ন যু গা ন্ ত র বা - নী ব হি - - -

অন্তঃসলিলা

হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফরিদপুর জেলার দক্ষিণে আড়িয়ালখাঁ নদী প্রবাহিত। ভারি খরস্রোতা নদী। কখন কোন পাড় ভাঙ্গে তার ঠিক নেই। আর যখন ভাঙ্গন ধরে তখন গ্রামকে গ্রাম শেষ করে দেয়। কোন দয়া মায়া নেই। কীর্তিনাশা কোথায় লাগে? এ যেন রাক্ষসের মত খাই খাই করছে।

তারই তীরে নূতন চরের ধারে একটা গ্রাম সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। এদিক হতে সেই সর্বগ্রাসী নদীর কুদৃষ্টি সরে আছে বলেই বোধহয় গৃহস্থরা নূতন ঘর বেঁধে সেখানে উঠে আসতে সাহস করেছে। যার যেমন অবস্থা তার তেমন বাড়ী। কুঁড়ে ঘরের পাশে টিনের ঘর পরম সৌহার্দ্যের সূত্রে আবদ্ধ হয়ে অবস্থান করছে। দু একটা যে পাকা বাড়ীও দেখা যায় না তা নয়।

সেটা ছিল শীতের দিন। পৌষ মাসের শেষাশেষি হবে। পাশেই বড় নদী। কাজেই সুবিধা পেয়ে শীত বাড়াবাড়ি সুরু করেছে। হাড় কাঁপান শীতের দৌরাত্ম্য এড়াতে গ্রামের মানুষ খাওয়া দাওয়া সেরে প্রথম রাতেই আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়েছে। নিঝুম রাত। নীরবতার একছত্র রাজ্য। আশপাশের জঙ্গলে একটানা ঝিঁঝির ডাকের শব্দ ছাড়া তার কোন ব্যাঘাত নেই। বরং সেই একটানা ডাক নিশার গভীর নীরবতাকে যেন একটা গাম্ভীর্য্য দান করেছে।

শীতের সেই অনবচ্ছিন্ন নীরবতাকে ভেদ করে হঠাৎ গ্রামের কুকুরগুলো এক সঙ্গে ডেকে উঠল। গোলমালটা যেন চরের দিক থেকেই আসছে। ফলে অনেক গৃহস্থেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল, কিন্তু অজানা বিপদের আশঙ্কায় কেউ ঘরের বাইরে এসে খবর নিতে সাহস পেল না। দিন-কাল ত ভাল নয়, বন্ধ জানলার আড়ালে থেকে কৌতূহল নির্বাপিত করার চেষ্টাই সুবুদ্ধির কাজ।

তারপর হঠাৎ দেখা গেল তাদের বীরত্ব ব্যঞ্জক ডাক পরিহার করে একান্ত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে চরের উল্টোদিকে গ্রামের সদর রাস্তা ধরে ছুটে পালাচ্ছে। তারা যে রীতি-মত ভয় পেয়েছে তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। লেজ-গুলো তাদের পেছনের দুই পায়ের মাঝের ফাঁক দিয়ে পেটের তলায় ঢোকান। তাদের বীরদর্পের ডাক এখন কাঁদুনিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

ব্যাপারটা হল কি? সকলের মনে একটা অজ্ঞাত ভয়ের আশঙ্কা উঁকি মারে। তারা অধীর অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওদিকে যেমন পলায়মান কুকুরদের কান্না ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল, এদিকে চরের দিক থেকে একটা নূতন শব্দ কাণে এসে ঠেকল। সে শব্দের একটা ছন্দ আছে, তাল আছে। সে শব্দ ক্রমশ উচ্চতর হয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠল। এখন বোঝা যায় শব্দটা কিসের।

শব্দটা অনেক মানুষের সবুট পায়ে তালে তালে এক সঙ্গে চলার শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে নায়কের কণ্ঠধ্বনিও শোনা যাচ্ছে। তাও এখন স্পষ্টতর হয়ে উঠল। তা' তালের সঙ্গে মিশিয়ে চলছে—লেফট্ রাইট, লেফট্ রাইট, লেফট্ রাইট।

তবে কি জাপানীরা দেশে ঢুকে পড়ল না কি? ইংরেজরা আগার রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল? এখন এই সহায় সম্বলহীন প্রজাদের উপায়!

গৃহস্থদের এমন কথা ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হওয়া মোটেই অন্যায় হয়নি। সেটা ছিল ১৩৫০ বাংলা সাল। ইতি-হাসের পাতায় তার নাম উঠেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের বর্ণিত ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের মতই তার সম্ভ্রম। হয়ত খানিকটা বেশী।

যেদিন অতর্কিতে পার্লহারবার আক্রমণ করে মার্কিন-দের অনেকগুলি রণতরী ডুবিয়ে দিয়ে জাপানীরা মার্কিন আর ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নেমে পড়ল সেদিন ভারতের পূর্বাঞ্চলের ভাগ্যে অতি দুর্দিনের ইতিহাস রচনা সুরু হয়ে

গেল। ইংরেজ যখন হিটলারের ঝটিকা-বাহিনীর তড়িত-যুদ্ধে মার খেয়ে প্রাণ নিয়ে ইউরোপ মহাদেশ ত্যাগ করে দেশে পালিয়ে গেল, মার্কিনরা তখন কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় বিভোর। তাদের দেশে দুই দিকে মহাসমুদ্র যখন আছে, তারা নিজেদের একরকম নিরাপদই মনে করেছিল। তাই ইউরোপের রণমঞ্চে হিটলার বাহিনীর কুচকাওয়াজ উপভোগ করে চিত্তবিনোদন ছাড়া আর কিছু করবার আছে বলে তাদের মনে হয় নি। মার খেয়ে তবে তাদের ঘুম ভেঙ্গেছে। প্রস্তুত হতে এখনও অনেক দেরি।

এদিকে ইংরেজ ঘর সামলাবে না সাম্রাজ্য সামলাবে—কাজেই জাপানীদের আক্রমণ হতে সাম্রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য তারা তৈরি ছিলনা। তাই আক্রান্ত হলে ধীরে ধীরে সরে আসা ছাড়া কোন নীতি প্রয়োগ করা তাদের সাধ্য ছিলনা। সিঙ্গাপুর গেল, রেঙ্গুন গেল, মান্দালয় গেল, আকিয়াব গেল। এখন কক্সবাজার অঞ্চলে যুদ্ধের সীমারেখা এগিয়ে এসেছে। ওদিকে জাপানী রণতরী অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে ওলন্দাজের নৌশক্তি ধ্বংস করেছে। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিস্তৃত এলাকা হতে ওলন্দাজদের তাড়িয়ে নিজেরা জাঁকিয়ে বসল। ওদিকে ঘর সামলাতে ইংরেজের হাত জোড়া। সর্বাধিনায়ক উইনস্টন্ চার্চিল দুখানি বড় রণতরী পাঠিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেছিলেন। কিন্তু জাপানী বোমারু বিমান তাদের অতি সহজে ডুবিয়ে দিয়ে বিশ্বের মানুষকে যেমন বিস্ময়ান্বিত করল, তেমনই বঙ্গোপসাগর হতে ইংরেজের নৌশক্তিকে সম্পূর্ণ বিতাড়িত করল।

তারপর ইংরেজদের করবার কিছু রইল না। কোন রকমে বর্মার সীমান্ত অঞ্চলে জাপানী স্থল বাহিনীকে আটকে রেখে মার্কিণদের সহায়তায় ধীরে ধীরে তারা সামরিক শক্তিসঞ্চয়ে মন দিল। পূর্বাঞ্চলে সৈন্যদের খোরাকের জন্য রীতিমত খাদ্য শস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা হল। সাধারণ মানুষের খাবার মত চাল বাজারে রইল কিনা তাদের ভাববার প্রয়োজন হলনা। ওদিকে রণাঙ্গণে পরিণত হয়ে জাপানীদের দখলে চলে যাওয়ায়, বর্মা হতে যে লক্ষ লক্ষ টন চাল আসত বাংলায়, তা রপ্তানি বন্ধ হয়ে গেল। ফলে কতকগুলি কৃত্রিম কারণে বাংলার অসম্ভব রকম খাদ্য শস্যের ঘাটতি সৃষ্টি হল। যে মোটা চালের দাম ছিল তিন টাকা মণ, তার রাতারাতি দাম উঠে গেল চল্লিশ হতে পঞ্চাশ টাকায়। সাধারণ মানুষের মুখে আর অন্ন জোটেনা। আর চাইলেই কি কিনতে পাওয়া যায়! লোক খুদ খেতে সুরু করল। যখন খুদ জুটলনা তখন শাক পাতা খেতে সুরু করল। পুষ্টির অভাবে দেহ শুকিয়ে অস্থিচর্মসার হল। খাদ্যগুণের অভাবে মানুষের বেরি-বেরির লক্ষণ প্রকাশ পেল। যখন গ্রামে আর কিছু জুটলনা মানুষ সহরের দিকে চলতে সুরু করল। আশা, ভিক্ষা করে যদি কিছু জোটে। কোথাও কোথাও সাধারণের সংগৃহীত অর্থে লঙ্গরখানা খোলা হ'ল। সেখানে যদি এক মগ খিচুড়ি পাওয়া যায় এই আশায় গ্রামের লোকের যাত্রা সুরু হল সহরের পথে -অস্থিচর্মসার দেহ আর ফোলা ফোলা পা নিয়ে। কিন্তু তা' প্রায় পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থানের অবস্থায় পরিণত হল। পথে চলতে চলতে মরণের বুকে আশ্রয় পেয়ে অনেকে বেঁচে গেল। যাদের ভাগ্যে তা' জুটলনা তাদের জন্য ইংরেজ এক অভিনব ব্যবস্থা করল। মফঃস্বলের সহরগুলির প্রান্তে রাতারাতি দর্মার বেড়া আর খড়ের ছাউনি দিয়ে বড় বড় চালা তৈরি হল। তাদের নাম দেওয়া হল অক্সিলিয়ারি জেনারেল হস্পিটাল, ছোট কথায় এ, জি, হাসপাতাল। তার কাজটা হল ততটা চিকিৎসা নয়, যতটা না যেতে পেরে যারা পথেও মরতে পারেনি তাদের মরবার একটা জায়গা নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া।

এরই নাম হল পঞ্চাশের মন্বন্তর। এখন জাপানী সৈন্য কক্সবাজারের কাছে। বাংলা দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল তাদের নাগালের মধ্যে। মাঝে খালি মেঘনার মোহনা! ইংরেজের জলবাহিনীর এখন অস্তিত্ব নেই যে বাধা দেবে। কাজেই জাপানীদের যে কোন মুহূর্ত্তে ফরিদপুরের দক্ষিণ অংশে নেমে পড়া বিচিত্র নয়। ব্যাপারটি সম্পূর্ণ তাদের ইচ্ছাধীন। এক্ষেত্রে ইংরেজ করে কি? তাদের উর্বর মস্তিষ্ক একটা কর্তব্য নির্দ্ধারণের নীতি ঠিক করে ফেলল। তার নাম হল 'ডিনায়াল পলিসি।' অর্থাৎ না দেওয়া নীতি। এ অঞ্চলের যাতায়াতের জন্য রেলপথ নেই, পাকা রাস্তাও নেই। যা কাঁচা রাস্তা আছে তা বছরে অন্তত ছ'মাস কর্দমাক্ত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য থেকে যায়। এ অঞ্চলের প্রশস্ত রাজপথ হল

অসংখ্য নদী-নালা। নৌকা এখানে মানুষের বাহন। গ্রামের অভ্যন্তর দেশ পর্য্যন্ত তার গতি। ঠিক হল, সব গৃহস্থের নৌকা জবরদস্তি করে কেড়ে নিয়ে নষ্ট করা হবে —যাতে জাপানীরা এদেশে নামলে ব্যবহার করতে একখানিও নৌকা না পায়। কাজেই মানুষের চলাচলের উপায় নষ্ট হয়ে গেল। মানব জাতির তাদের বিপদ হতে রক্ষা করবার শক্তি নেই বলে তাদের নিজেদের নিজস্ব যে পালাবার শক্তিটি ছিল তাও তারা নষ্ট করে দিল। এখন জাপানীরা আসলে, ভাগ্যের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় রইলনা।

সুতরাং সামরিক কায়দায় কদমে পা ফেলে নদীর চর হতে যদি একদল মানুষ আকস্মিক ভাবে গ্রামের বুকের মধ্যে এগিয়ে আসতে থাকে, গ্রামের মানুষের তাদের জাপানী আততায়ী ভাবা মোটেই যুক্তিহীন নয়। হিন্দু বলল—হায় ভগবান্, তুমিই এখন ভরসা। মুসলমান বলল, আল্লা, তুমি আমাদের দেখো প্রাণটা যেন বাঁচে।

ওদিকে তারার অস্পষ্ট আলোয় ফুটে উঠল সৈন্যবেশী একদল মানুষ। তাদের পায়ে বুট, পরণে খাকি রং এর হাফপ্যাণ্ট, আর গায়ে খাকি রং-এর হাত ঢাকা গরম গেঞ্জি। মাথায় একই রং-এর খাকি বালাক্লাভা টুপি। ইংরেজ সরকারের অনুরোধে এই ধরণেরই পশমের গেঞ্জি আর টুপি সরকারী কর্ম্মচারিদের বাড়ীর মেয়েরা কত বুনে দিয়েছে, ভারতীয় সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য। সারিবদ্ধ জন কুড়ি লোক হবে, প্রতি সারিতে ৪ জন করে আর আগে আসছে একজন মাত্র মানুষ। সেও একই ধরণের পোষাকে সজ্জিত, তবে তার মাথার টুপি অন্যধরণের। সেই মুখে বলছে লেফট্, রাইট্, লেফট্ রাইট, লেফট রাইট, আর তার কথার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবুট পদক্ষেপে দলটি এগিয়ে আসছে।

গ্রামের বড় রাস্তা-বরাবর মাঝামাঝি এসে হঠাৎ তাদের নায়ক চিৎকার করে হুকুম দিল 'হল্ট'। আর সঙ্গে সঙ্গে বিশ জোড়া সবুট পায়ের সগর্ব্ব ধ্বনি হঠাৎ থেমে গিয়ে একটা থম থমে ভাব সৃষ্টি করল। যেখানে থামল তার সামনেই একটা সুন্দর দোতলা বাড়ী! বাড়ীটা নূতন এবং সহজেই এই গ্রামের পরিবেশে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বাড়ীটা তারাপদর বাবা করে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন আসামের চা বাগানের বড়বাবু। বয়স হওয়ায় চাকুরী ছেড়ে কয়েক বছর আগে দেশে চলে এসেছিলেন। সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থে তিনি মনের মত করে এই বাড়ীখানি করেছেন। কিছু জমি-জমাও কিনেছেন। বড়মানুষ বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়েছে। বড় ছেলে তারাপদ যুবক হয়েছে। সম্প্রতি ঘটা করে বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূকে ঘরে তুলেছেন। কিন্তু ভাগ্যে বেশীদিন এ সম্পত্তি তাঁর ভোগে আসেনি। পত্নী, দুটি নাবালক সন্তান আর এই নবীন দম্পতীকে রেখে তিনি সম্প্রতি দেহরক্ষা করছেন।

ঠিক তারাপদর বাড়ীর সামনে এই দলটি থামল কেন? আশে পাশে প্রতিবেশীরা ঠিক বুঝে উঠতে পারলনা এই জাপানীগুলির মতলব কি। তবে কি ওদের বাড়ীতেই ঘাঁটি স্থাপন করবে নাকি?

তাদের আচরণে ব্যাপারটা শীঘ্রই পরিষ্কার হয়ে গেল। দলপতি একটা শক্তিমান টর্চ বার করে বাড়ীটার চারিদিকে আলো ফেলে দেখতে লাগল। সেই আলোতে দলের মুখগুলোও খানিকটা ফুটে উঠল, মুখগুলো কিন্তু জাপানীদের মত ঠেকলনা। চ্যাপটাও নয় নাকগুলো, থ্যাবড়াও নয়, রংও ফরসা নয়। এযে আমাদের দেশের মানুষের মুখ। শ্যামবর্ণ মুখে মাঝারি নাক। তবে এরা কারা? এরা কি দেশী সৈন্য নাকি? তারা যে আসলে তাও-নয়, তাদের আচরণ তা' শীঘ্রই প্রমাণ করে দিল। দলপতি তারাপদের বাড়ীর সামনে সুসংবদ্ধ দলটী থামিয়ে পকেট থেকে একটা হুইসিল বার করে বাজাল। তারপর দলের চার জনকে ডাক দিল, নাম ধরে নয় নম্বর ধরে। দলের দু নম্বর, চার নম্বর, ছ নম্বর আর আট নম্বর তার সামনে এসে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। সে তাদের হুকুম দিল তারাপদদের বাড়ীর উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম চারিদিকে বাড়ীর দিকে পিছন করে দাঁড়াতে। অর্থাৎ তাদের কাজ হল বাড়ীর চারিদিকে নজর রাখতে হবে। তারপর দলের বাকি সঙ্গীদের দুভাগ করল। এক ভাগ রইল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আর অন্য দলটির সঙ্গে সে এগিয়ে চলল তারাপদের সদর দরজার দিকে।

এখন আর কারও বুঝতে বাকি রইলনা যে এরা জাপানী সৈন্যও নয় দেশী সৈন্যও নয়। এরা স্রেফ ডাকাতের দল। যুদ্ধের আবহাওয়ার যুগে এরা সেপাই এর বেশে

আবির্ভূত হয়েছে তারাপদদের বাড়ী ডাকাতি করতে। তাদের ভাগ্যে আজ কি আছে কে জানে?

তারাপদদের বাড়ীর সদর দরজার যোগ সোজা বৈঠক-খানার সঙ্গে। সেখানে কতকগুলি নীচু তক্তপোষ পাতা, উপরটা মাদুর দিয়ে ঢাকা। এখানে দিনের বেলা, গোমস্তারা কাজ করে, বাহিরের মানুষ বাড়ীর কর্তার সঙ্গে দেখা করে, আর রাতে এখানে বাড়ীর বামুন ও দুজন চাকর শুয়ে থাকে। তার থেকে বেরিয়ে গেছে একটা সরু দালান, আর সঙ্গে সংলগ্ন দুটি ঘর। দালানের অন্য প্রান্তে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। ওপরেও ঠিক এই রকম ব্যবস্থা।

ডাকাতের দলটি যেমন সদর দরজার দিকে এগিয়ে এল বৈঠকখানা ঘরের যে জানালাটা আধখানা খোলা ছিল, সেটা হঠাৎ সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। আসলে হয়েছিল কি তারাপদর বামুন আর চাকরদ্বয় জানালা অল্প ফাঁক করে এই আগন্তুক দলটির কুচকাওয়াজ দেখছিল। খানিকটা ঔৎসুক্য, খানিকটা ভয় জড়ানো একটা অনুভূতি তাদের বুকের ধড়ফড়ানি সুরু করে দিয়েছিল। এখন ডাকাতদের আচরণটা যখন তাদের প্রকৃতরূপটি প্রকাশ করে দিল এবং দেখিয়ে দিল তাদের বাড়ীতেই তাদের হানা দেবার ইচ্ছা, তারা তখন নিজেদের জীবন একান্ত বিপন্ন বোধ করল। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্যে করে কি?

এদিকে ডাকতরা ত এসে দরজায় সজোরে ধাক্কা দিচ্ছে, ডাক দিয়ে বলছে দরজা খুলে দিতে। তাদের আদেশ পালন করলে ত তাদের মুখোমুখি পড়তে হয়। দুই চাকর দুই হাতে তাদের বামুন দাদার কাঁধ ধরে ভারি স্বরে বলতে থাকে—বামুন দাদা, রক্ষা কর। বামুন দাদা তাদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই অস্থির, তা তাদের কথা ভাববে কি?

এদিকে বাহিরে ডাকাতের দল ভেতরে মানুষের কোন সাড়া না পেয়ে নিজেরাই দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকবে ঠিক করল। দরজাটা ছিল নতুন মোটা কাঠের খিলেন বসান, শক্ত শাল কাঠের হুড়কো দিয়ে বন্ধ। সহজে তাই খুলতে চাইল না। খুলবার কৌশল এসব পটু ডাকাতদলের অজানা নয়। জ্বালানির জন্যে অনেক কাঠ পড়েছিল উঠোনে। তার থেকে একটা মোটা কাঠ তিনচার জনে বয়ে নিয়ে এসে তাল ঠুকে একযোগে তারা দরজায় আঘাত দিতে আরম্ভ করল। আঘাতের পর আঘাত পেয়ে দরজার পাল্লা কেঁপে উঠল। তারপর কব্জা আলগা হয়ে নড়ে উঠল। আর দুচার ঘা খেলেই ভেঙ্গে খুলে পড়ে।

ওদিকে ঘরের ভেতর বিপদ ঘনায়মান দেখে বামুনদাদা মরিয়া হয়ে এবার আত্মরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইল। প্রাণবান বলে তাদের দুজনকে ঠেলে দিয়ে সেই তক্তপোষের তলায় সে কোন রকমে দেহটাকে ঢুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে পড়ল। চাকর দুজনও তার অনুসরণ করে আত্মগোপনের ব্যবস্থা ঠিক শেষ সময়টিতে ক'রে নিল।

সুতরাং ডাকাতদের দল যখন দরজা ভেঙ্গে ফেলে বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করল তারা দেখল তা' শূন্য। দল-পতি টর্চ ফেলে চারিদিকে একবার দেখে নিয়ে পাশের বারাণ্ডায় প্রবেশ করল। সেখানেও কারো সাক্ষাৎ না পেয়ে তারা সিঁড়িবেয়ে ওপরে উঠে গেল। সেখানেও বারাণ্ডায় কাউকে পেলনা। তবে ওপরে বড় ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে দলপতি দরজায় আঘাত করে, বলল, কে আছ, দরজা খোল।

এটাইছিল বাড়ীর বড় শোবার ঘর। এখন তারাপদ তার সদ্যবিবাহিতাপত্নীকে নিয়ে এখানেই শোয়। দম্পতীর ঘুম অনেক আগেই ভেঙ্গেছিল। এতক্ষণ কি ঘটছিল তাও যে তারা পর্য্যবেক্ষণ করে দেখেনি তাও নয়। কিন্তু করবে কি? অজ্ঞাত বিপদের আশঙ্কায় তাদের উভয়ের মন আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কি করবে ভেবে পাচ্ছিলনা। বিপদ যখন অত্যন্ত কাছে এসে দরজায় আঘাত হানল তখন তারাপদ নিরুপায় হয়ে তার চাকর বামুনদের ডাকল। কিন্তু তারা যে প্রাণভয়ে আত্মগোপন করে আছে, তারা সাড়াদেবে কেন?

হঠাৎ তারাপদ কি রকম বেপরোয়া হয়ে গেল। বিপদের সম্মুখে কি করতে হবে ভেবে না পেয়ে সে চটকরে এসে দরজা খুলে দিয়ে দরজার সামনে ডাকাতদের মুখো-মুখি হয়ে আস্ফালন করে গর্জন করে উঠল, খবরদার।

কিন্তু বীরের মত গর্জন করে উঠে হবে কি? সেত সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। একখানা ছড়িও হাতে ছিলনা তার।

এদিকে পাঁচ সাতজন ডাকাত সশস্ত্র দাঁড়িয়ে। দলপতি টর্চ জেলে দেখে নিয়ে অবস্থাটা বুঝে ফেলল। বেশ ধীর ভাবেই বলল, হাঁক ডাক দিয়ে লাভ হবেনা বাপু। ভাল চাওত চুপ করে দাঁড়াও দেখি।

তারাপদ একটা অন্ধ আক্রোশে কি রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। সে দলপতির কথায় কর্ণপাত করলনা। আবার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে গর্জে উঠল, খবরদার।

সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতদের একজন তার হাতের ব্যাটন দিয়ে করল আঘাত তার মাথায়। কপালের চামড়া কেটে দর দর ক'রে মুখ বেয়ে রক্ত পড়তে আরম্ভ করল।

তারাপদর স্ত্রী এতক্ষণ ঘরের একটু ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল। সদ্য-বিবাহিতা নবীনা বধূ সে, কি করবে। কিন্তু স্বামীর ওপর এই আকস্মিক আক্রমণ তারমধ্যে এমন এক অভিনব প্রতিক্রিয়া সুরু করল, যা তাকে বুঝিয়ে দিল যে স্বামীকে রক্ষা করতে তাকেই এখন ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে। তার মধ্যে এক নিদ্রিতশক্তি হঠাৎ জেগে উঠে তার মনে বুদ্ধি জোগাল, মুখে ভাষা জোগাল—আর বুকে জোগাল চরম দুঃসাহস। নলিনী তারাপদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে এসে তাকে আড়াল করে ডাকাতদের সামনে দাঁড়াল। ধীর শান্ত গলায় সে বলল—

দোহাই তোমাদের,তোমরা আর মার ধোর কোর না। তোমরা যা চাও, তা নাও, আমরা কোন বাধা দেবনা।

ডাকাতদের সর্দ্দার বলল, বেশ বলেছ, মা। তুমি যা বললে তাই হবে। তারাপদর বড় শোবার ঘরেই লোহার সিন্দুকটা ছিল। তারপ্রতি নলিনীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে সর্দ্দার বলল, ঐ সিন্দুকের চাবিটা দাও ত মা।

নলিনী বলল, সিন্দুকের চাবিটা মার কাছে আছে, এনে দিচ্ছি। তারাপদর মা-ই বাড়ীর গৃহিণী। কাজেই সিন্দুকের চাবি তাঁর কাছেই থাকত। তিনি পাশের ঘরে শুতেন। দুটি ঘরকে সংযোগ করে মাঝখানে একটা দরজাও আছে। সেটি বন্ধ ছিল।

সর্দ্দারকে কথা দিয়ে নলিনী শাশুড়ী ঠাকরুণের দরজার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখল যে সেই দরজার চৌকাঠের ওপরেই তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। আসলে হয়েছে কি—ছেলের ঘরে হৈ হল্লা ও পুত্রবধূর উত্তেজনাপূর্ণস্বর শুনে অজানা আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি দরজা খুলে ফেলেছি-লেন। সামনেই ডাকাতের দলকে দেখে তিনি কি রকম হক চকিয়ে গিয়েছিলেন।

এই নিদারুণ বিপদের পরিবেশে, কিন্তু নলিনীর স্বেচ্ছায় নেওয়া নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করবার ক্ষমতা, তার মধ্যে অবস্থিত কোন অজ্ঞাত শক্তি তাকে দিল। সদ্য-বিবাহিতা ঘরের বধূ লজ্জা ও জড়তা ত্যাগ করে ডাকাতের সর্দ্দারের সঙ্গে যেমন সহজে বাক্যালাপ করবার সাহস পেল তেমনি সহজে শাশুড়ীর নিকট সোজা গিয়ে বলে বসল, সিন্দুকের চাবিটা দাও ত মা।

তিনি যন্ত্রচালিতের মত পুত্রবধূর হাতে বিনা বাক্য-ব্যয়ে তখনি চাবি তুলে দিলেন। চাবি সঙ্গে সঙ্গে অতি তৎপরতার সঙ্গে সর্দ্দারের হাতে গিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে সিন্দুকের তালাও খোলা হয়ে গেল। সর্দ্দার এক এক করে গয়নাগুলি বার করে তার এক সঙ্গীর হাতে তুলে দিতে লাগল, আর সে সেগুলি মেঝেতে সাজিয়ে রাখতে লাগল। সম্ভবত সেই দলের উপসর্দ্দার হবে, তা না হলে এমন গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তার ওপরে পড়বে কেন?

অল্পক্ষণের মধ্যেই সিন্দুকের গর্ভটি খালি হয়ে গেল আর তার মধ্যে যা সোনা-দানা আশ্রয় পেয়েছিল মাটিতে জড় হল। সর্দ্দার বললে, তোমার গায়ের গয়নাগুলো খুলে দাও ত মা। সদ্য-বিবাহে লব্ধ সেগুলি তার বাপমার দেওয়া উপহার। কত মায়া তার তাদের ওপর। নলিনীর হৃদয়ের ভেতরটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল। তার সুবুদ্ধি বলল না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এদিকে অনিচ্ছা প্রবল বাধা দেয়। তাই সর্দ্দারের কথায় তার সাড়া দিতে দেরি হয়ে যায়-তার মনের মধ্যে যে দো-টানার যুদ্ধ চলেছে সর্দ্দার বেশ তা' বুঝতে পারছে। তাই তার কর্ত্তব্য ঠিক করে নিতে সাহায্য করতে সে বলে উঠলো।

কথা কি জান মা, তোমার এ গয়নাগুলো আমাদের চাই। এখনি নিজেই যদি খুলে দিতে ভালো হত, তোমার গায়ে হাত দিতে হতনা। তুমি যদি না সাহায্য কর, অগত্যা নিজেদেরই ও-গুলো খুলে নিতে হয়।

এ উক্তিতে ছিল বৃশ্চিকদংশনের জ্বালা। ডাকাতদের হাতের কলুষ স্পর্শের কথা ভাবতে ঘৃণায় তার সর্বাঙ্গ

শিউরে উঠল। তার দোমনা ভাব সে তখনি ত্যাগ করল। সে বলল, আমি নিজেই খুলে দিচ্ছি। তোমাদের খুলে নিতে হবেনা।

নিজের অঙ্গের ভূষণগুলি নিজেই খুলে ডাকাতদের হাতে তুলে দেবার পালা সুরু হয়ে গেল। আট গাছি চুড়ি নলিনী এক এক গাছি করে খুলছে আর তুলে দিচ্ছে সর্দ্দারের হাতে। এমন সময় নীচে একটা সোর-গোল পড়ে গেল। খানিকটা হৈহল্লা খানিকটা কান্না আর গোঙানি মিলিয়ে একটা শব্দ। উপসর্দ্দারকে লক্ষ্য করে সর্দ্দার বলল—তুই এগুলো বুঝে নে। আমি একবার নীচ হতে আসছি। বলেই সে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

নীচের তলায় যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তা খানিকটা করুণও বটে, খানিকটা হাস্যকরও বটে। বৈঠকখানায় দরজার কাছেই দুজন ডাকাত পাহারায় ছিল। এখন হয়েছে কি, বাড়ীর যে তিনজন চাকর বামুন তক্তপোষের তলায় আত্মগোপন করেছে তারা আশ্রয় নিয়েছিল খালি মেঝের ওপর। একে শীতকাল, তায় রাত্রি। সে মেঝে যেমন ঠাণ্ডা তেমনি স্যাঁতসেঁতে। তার ওপর খানিকক্ষণ শুয়ে সে বেচারীদের শীত ধরে গেছে। হাত পা কাঁপতে সুরু করে দিয়েছে। কিন্তু উপায় কি, বাহিরে গেলেই যে ডাকাত ধরবে। তাই তারা চুপ করে পড়ে থাকে।

কিন্তু ভাগ্য যে হয়ে দাঁড়াল তাদের প্রতিকূল। খানিক শীতভোগের পর যেমন হয়ে থাকে, বামুনটার ঠাণ্ডার দাপটে নাক শির শির করতে লাগল। সে প্রাণপণে হাঁচি থামাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারল কৈ? হঠাৎ পটকা ফাটাবার মত আওয়াজ ক'রে সে হেঁচে উঠল।

সেই বিকট হাঁচিধ্বনি পাহারারত ডাকাতদের কানে না গিয়ে পারে? তারা তখনি ঘরে ঢুকল। সামনে কাউকে না দেখে তক্তপোষের তলায় টর্চ ফেলল। ওমা, একজন নয়, দুজন নয়, তিন তিনটে মানুষ উপুড় হয়ে শুয়ে আছে।

শালা, তোমরা এখানে লুকিয়েছ। এই বলে তারা তাদের পা ধরে টানতে লাগল। আর ওদিকে তারা তখন হাউমাউ ক'রে ভয় পেয়ে কাঁদতে সুরু করে দিল। সেই শব্দ ডাকাত সর্দ্দারের কাণে গিয়েছিল বলেই সে নেমে এসেছিল। তার ওপর গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। যেখানে গোলমাল সেখানেও তার নজর দিতে হয়।

ব্যাপারটা কি হয়েছে হৃদয়ঙ্গম করতে সর্দ্দারের বেশী সময় লাগল না। চাকর-বামুনের দুর্দ্দশা দেখে আর তাদের আত্মপ্রকাশের কাহিনী শুনে সে হেসে ফেলল। তারপর পাহারাদারদের বলল তাদের পিঠমোড়া করে বেঁধে তক্তপোষের ওপর ফেলে রাখতে। তার বেশী নজর দেবার এ ব্যাপারে সে প্রয়োজন বোধ করলে না। সে আবার ওপরে উঠে গেল।

ওদিকে ওপর তলায় নলিনীর ভূষণ বর্জ্জন পর্ব্ব শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু একটা নতুন ব্যাপার নিয়ে উপসর্দ্দারের সঙ্গে লেগেছে তার বাদানুবাদ।

উপসর্দ্দার বলছে, আর তোমার ওই বাঁ হাতে যে ওটা রয়ে গেল ওটা এবার খুলে দাও।

নলিনী বলছে, ওটা আমি খুলতে পারব না।

বেশ তাহলে আমি খুলে নিচ্ছি।

ওটাও তোমার চাই? তোমাদের ত সব দিয়েছি। ওটা খুললে যে আমার স্বামীর অকল্যাণ হবে।

সেটা ছিল হাতের লোহা। হিন্দুনারীর বহুকাল ধরে গড়ে ওঠা সংস্কারমতে সেটা এয়োতীচিহ্ন এবং খুলতে বারণ, খুললে স্বামীর অকল্যাণ হয় যে। সেই পুরুষানুক্রমিক সংস্কারই তাকে সেটা খুলতে দেয়নি। তা না হলে যে বিনা দ্বিধায় সব অলঙ্কার স্বহস্তে খুলে দিয়েছে, সেটা তার খুলে দিতে বাধা কি?

ওদিকে উপসর্দ্দারটিও দারুণ লোভী। অনেক সময় হাতের লোহার ওপরটা সরু সোনার পাত দিয়ে মোড়া থাকে। এ লোহাটা সেই ধরণের। তাই ওই দুচার রতি ওজনের সোনার পাতের ওপর তার লোলুপ দৃষ্টি।

নলিনীর আপত্তি শুনে উপসর্দ্দার রাগে ফেটে পড়ল। সে বলল, বটে খুলে দেবে না? তাহলে নিজেই খুলে নিচ্ছি। সে অর্থ চায়।

এদিকে সর্দ্দার কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল কেউ দেখতে পায়নি। সে ব্যাপারটা সব শুনেছে। নলিনীর সোনার পাত দেওয়া নোয়া খুলে দিতে কেন আপত্তি তাও জেনেছে। হঠাৎ সে কথা বলল। তার গলার স্বর শুনে

সকলে তার দিকে ফিরল। উপ-সর্দ্দারেরও দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল।

সর্দ্দার বলল, সত্যিই ত মা, তুমি যা বলেছ ঠিক। এ নোয়া ত' তোমার হাত থেকে খোলা চলবে না!

তারপর উপসর্দ্দারের দিকে চেয়ে বলল, তুই মাকে বিরক্ত করিসনি, থাক।

এদিকে সব সংগৃহীত গয়না একটা থলেতে ভরা হয়ে গেছে। সেটা উপসর্দ্দারের পাশেই ছিল। সর্দ্দার তাকে বলল, থলেটা আনত দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে থলে তার কাছে হাজির করা হল। সর্দ্দার তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে হাতড়ে নলিনীর হাতের থেকে নেওয়া কয়েকগাছি চুড়ি বার করল। তার কাণ্ড দেখে ডাকাতরা তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবে, করে কি সর্দ্দার?

সর্দ্দার যা করল, তা' যাদের বাড়ী ডাকাতি হল, না তাদের কারও, না সঙ্গীদের কারও কল্পনায়ও আসতে পারে! সে সেই চুড়িগুলো নলিনীর হাতে দিয়ে বলল, এই নাও মা এইগুলো। তোমার হাতে পর। তোমার হাত কি খালি রাখতে আছে, মা? স্বামীর অকল্যাণ হবে যে!

তার এই বদান্যতা ডাকাতদের কারও পছন্দ হল না। তবে সর্দ্দারের ওপর কথা বলবে কে? সকলে চুপ করে রইল। কিন্তু উপসর্দ্দারের কাছে এটা বড় বাড়াবাড়ি ঠেকল। তার সহ্যশক্তি হাল ছেড়ে দিল। সে মৃদু প্রতিবাদ করল, এ কাজটা কি ভাল হচ্ছে সর্দ্দার?

সর্দ্দার গর্জ্জন করে উঠল, খবরদার, তোদের কাজ সর্দ্দারের হুকুম তামিল করা। বাড়াবাড়ি করলে মুখে জুতো মারব।

তার উত্তরে কারও টু শব্দ করবার সাহস হল না।

সর্দ্দারের হুইসিল বাজল। দলকে নিয়ে সর্দ্দার বাইরে এল। আবার হুইসিল। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছটকান মানুষ একসঙ্গে জড় হল। তারপর সারিবদ্ধভাবে সর্দ্দার তাদের সাজাল। তারপর হুকুম এল, কুইক মার্চ, লেফট্, রাইট, লেফট্ রাইট।

যে দিক দিয়ে তারা এসেছিল সেই নদীর চরের দিকে দলটা এগিয়ে চলল। খানিক বাদে তারা অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও খানিকক্ষণ দলবদ্ধ পদপাতের শব্দ বাতাসে ভেসে এসে তারপর মিলিয়ে গেল।

সেকস্পীয়ার-মহোদয়স্য ষট্সপ্ততিতমা চতুর্দ্দশপদী কবিতা

ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চতুর্ধুরীণেন অনূদিতা

কথং শ্লোকাবলী মম নবগর্ব বিবর্জিতা।
ভিন্নমার্গং ন জানাতি ত্বরিতত্যাগ-মোহিতা ॥২
কথং বা সময়ে নাহং কৃত্বা বহির্নিরীক্ষণম্।
নবীনাং পদ্ধতিং যামি বৃত্তা সমাসভূষণম্ ॥৪
রচনা মে সদা সমা নবীনতা-বিবর্জিতা।
নববিভাবনা তত্র স্রোতসি বেতসী যথা ॥৬
প্রতিশব্দো ননু স্পষ্টো লেখকনামসূচকঃ।
ঘোষিতজন্মবৃত্তান্তো গতিপথপ্রদর্শকঃ ॥৮
প্রাণপ্রিয়তমে বিদ্ধি লেখস্তা বিষয়ো ধ্রুবম্।
কেবলং ত্বঞ্চ মে প্রেম প্রচার-কারণং নবম্ ॥১০
প্রকৃষ্টং মম রচনং নবীন-বেশ-সংবলম্।
প্রাচীনভাবপেশলং পূর্বব্যয়ৈঃ নবং কলম্ ॥১২
যথা সূর্য্যো নবো ভাতি প্রাচীনোঽপি স্বনূতনঃ।
ভাষতে প্রেম মে তদ্বৎ পুনরুক্তং পুনঃ পুনঃ ॥১৪*

* ২৭শে এপ্রিল, ১৯৬৪ তারিখে শেক্সপীয়ার চতুঃশতজন্মশতবার্ষিক উৎসবে কবি-সম্মেলনে পঠিত

কীটসের কাব্য

অরুণ দে

মহাকালের প্রাঙ্গণে জীবন ক্ষণিকের খেলাঘর। সেই খেলাঘরে যারা সার্থকভাবে কাব্যের বীণা বাজান, তাদের সুরের মূর্ছনা জীবনের মত ক্ষণস্থায়ী নয়। সে সুর দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে চিরন্তনের সম্পদ হয়ে ওঠে। ইংরাজীসাহিত্যে রোমান্টিক যুগের কাব্য তেমনই চিরন্তনের সম্পদ। সেই রোমান্টিক যুগের অন্যতম প্রতিনিধি হলেন কীটস।

সে যুগের নিসর্গপ্রীতি, সৌন্দর্যপিপাসা, রহস্য ও বিস্ময়বোধ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী ও কোলরিজের মত কীটসের কাব্যেও ধ্বনিত হয়েছে। তবু সমসাময়িক কবিদের মধ্যে থেকে তাকে আলাদা করে চেনা যায়।

কীটসের কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন সৌন্দর্যলক্ষ্মী। সৌন্দর্য পিপাসাই তার কাব্যের প্রধান সুর। সে সৌন্দর্য কোন অলৌকিক সৌন্দর্য নয়। রূপের মধ্যে অরূপের আরাধনা নয়। বরং পৃথিবীর রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ ও গানে যে সৌন্দর্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ধরা দেয়, কীটস তারই আরাধনা করেছেন। প্রেম ও সৌন্দর্যসুধাপানের আকণ্ঠ পিপাসায় তাঁর কবিচিত্ত মথিত হয়েছে। সৌন্দর্যতৃষ্ণার পরম আবেগই তার কবিকর্মের মূল প্রেরণা। তার কাছে—

"A thing of beauty is a joy for ever :
Its loveliness increases ; it will never
Pass into nothingness ; but still will keep.
A bower quiet for us and a sleep
Full of sweet dreams."

কীটসের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক যুগের কবিদের সৌন্দর্যবোধের পার্থক্য আছে। প্রকৃতির সৌন্দর্য ওয়ার্ডসওয়ার্থকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিয়েছিল। ভাবতন্ময় কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে সৃষ্টির প্রাণধারার রহস্য উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি প্রকৃতির মধ্যে দেখেছিলেন এক "all pervading spirit"কে। রূপজগতের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তিনি রূপাতীতের স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। কীটসের মধ্যে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় ধ্যানপরায়ণতা ছিল না। খণ্ড সৌন্দর্যের সুষমায় তার কবিচিত্ত মুগ্ধ হয়েছে, কিন্তু সৌন্দর্য নিজের অখণ্ডতা নিয়ে কীটসের কাছে ধরা দেয় নি। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত প্রকৃতির মধ্যে সৌন্দর্যের বাহ্যপ্রকাশের আড়ালে যে প্রাণরসের প্রবাহ চিরবহমান তার সন্ধান তিনি পান নি।

শেলীর কবিতা বস্তু থেকে ভাবের দ্বারা বেশী অনুরঞ্জিত। তার কবিতায় রূপজগতের মূর্তি প্রাধান্য পায় নি। তার স্বপ্নময় গীতিপ্রবণ কবিচিত্ত কল্পনার ডানায় ভর করে মিষ্টিসিজমে পরিণতি লাভ করেছে।

'Homage to Intellectual Beauty' কবিতায় শেলী বিশ্বের অন্তরালে সৌন্দর্যের এক অধিষ্ঠাত্রী দেবীর আরাধনা করেছেন। কীটস শেলীর মত নিরালম্ব সৌন্দর্য পূজারী নয়।

রূপজগতের ইন্দ্রিয়ভোগ্য সৌন্দর্যই কীটসের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। শেলীর মত সৌন্দর্যের মধ্যে অসীমের উপলব্ধির সুর তাঁর কাব্যে বড় একটা শোনা যায় না। তিনি শেলীর মত আদর্শবাদী হলেও, রূপজগতের মূর্তি অতিক্রম করে শেলীর আকাশবিহারপ্রবণতার পথে যান নি।

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন যে সৌন্দর্যের স্বরূপ প্রকৃতির খণ্ড খণ্ড রূপের মধ্যে বিকশিত, কিন্তু খণ্ড সৌন্দর্যের কোন একটিতে সীমাবদ্ধ নয়। খণ্ডরূপের মধ্যে থেকেও সে রূপাতীত, সীমার মধ্যে থেকেও তা অসীমের আভাসে আলোকিত। কীটসের সৌন্দর্যবোধের মধ্যে এই রবীন্দ্রঅনুভূতি অনুপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ একাধারে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও ইন্দ্রিয়াতীত রূপের পূজারী। কীটসের মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যবোধেরই প্রাধান্য।

ওয়ার্ডসওয়ার্থীয় নীতিবোধ বা শেলীর অপার্থিব ভাবলোকের দ্বারা অনুরঞ্জিত না হলেও কীটসের সৌন্দর্যবোধ

একটা দার্শনিক উপলব্ধিতে পরিণতি লাভ করেছে। উপলব্ধির গভীরতায় 'সত্যম্-শিবম্-সুন্দরম্-এর একাত্মবোধের প্রতিভাস তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। তিনি মনে করেছেন যা সত্য তাই সুন্দর। যা শাশ্বত তাই সুষমামণ্ডিত। সত্য ও সুন্দরের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। তাই তিনি বলেন—

Beauty is truth, truth is beauty—that is all
Ye know on earth and all ye need to know.

জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আর্টের মধ্যে সৌন্দর্যের রূপায়ণ সত্য বলেই চিরস্থায়ী। শিল্পকলায় ও সাহিত্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের যে মূর্তি চিত্রিত হয় তা' ক্ষণস্থায়ী জীবনের চিরস্থায়ী মূর্তি। ক্ষণস্থায়ী রূপজগতে ও পরিবর্তনশীল ভাবজগতে মহাকালের রথচক্রে ব্যক্তিজীবনের অনুভূতি, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ বিলুপ্ত হয়। কিন্তু সেই প্রেম, সৌন্দর্য ও অনুভূতি যখন শিল্পের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে তখন তা সহজে নিশ্চিহ্ন হতে পারে না তাই Grecian Manকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন —

"Cold Pastoral !
When old age shall this generation waste
Thou shalt remain in midst of other woe
Than ours, a friend to man—"

কীটস জগতের নশ্বরতার উপর শিল্পের চিরন্তনতার জয়গান গেয়েছেন। জগতের নশ্বরতা কীটসের মনে বেদনাবোধের সৃষ্টি করেছিল। রূঢ় বাস্তব জগৎ থেকে সৌন্দর্যের জগতে প্রবেশ করার যে ব্যাকুলতা তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে, তার মধ্যে কীটসের পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় অস্বীকার করা চলে না। দুঃখ, শোক, ভয় ও নিরাশ-প্রণয়ে আকীর্ণ যে বস্তু জগৎ তার থেকে সৌন্দর্যজগৎ কীটসের কাছে অনেক বেশী প্রিয় ও সত্য। প্রথম জীবনে তিনি অবশ্য তাঁর Sleep and Poetry কবিতায় বলেছিলেন—

"Yes, I must pass them for a nobler life
Where I may find the agonies, the strife
of human hearts."

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই সংকল্প কার্যে পরিণত হয়নি। মানবজীবনের বাস্তব-স্পন্দন তাঁর কাব্যে প্রাধান্য পায় নি।

ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণীতে রোমান্টিক যুগের প্রত্যেক কবিই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিপ্লবের দুন্দুভিনিনাদের প্রভাব বায়রণ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর কাব্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বিপ্লবপন্থী শেলী মানবসমাজকে নতুন করে গড়বার প্রয়াসী ছিলেন। ফরাসীবিপ্লবের তরঙ্গ-বিক্ষোভের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাবতন্ময় শান্তিবাদের পটভূমিকা রচনা করেছিল। প্রাচীন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বায়রণের যে বিদ্রোহ, তার মধ্যে ফরাসীবিপ্লবের ভাবোন্মাদনার প্রভাববিস্তার অলক্ষিত নয়। এক মাত্র কীটসের উপরই সে সময়ের রাজনৈতিক ঘটনাগুলি কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। নিজের কল্পলোকে ও সৌন্দর্যলোকের মধ্যে তিনি আত্মনিমগ্ন ছিলেন। তাঁর সৌন্দর্যপিপাসু কবিচিত্ত কঠোর বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল।

নিরাশ-প্রণয়, রোগযন্ত্রণাময় ক্ষয়িষ্ণু জীবন, ভ্রাতার মৃত্যু ও ব্যক্তিজীবনের অতৃপ্তি তাঁর মনে এই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে ধারণার সৃষ্টি করেছিল তা' তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি—

"Here men sit and hear each other groan
Where palsy shakes a few sad, last grey hairs,
Where youth grows pale and specture thin and dies.
Where but to think is to be full of sorrow
And leaden-eyed despairs.
Where beauty can not keep her lustrous eyes
Or new love pine at them beyond to-morrow."

কীটস এই জীবনযন্ত্রণাময় জগতের কুশ্রীতা থেকে মুক্তি নিয়ে এক চিরস্থায়ী সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। তাই সৌন্দর্য ও অমরত্বের বার্তাবাহী নাইটেঙ্গলের কাছে তাঁর আর্ত-নিবেদন—

Fade far away, dissolve and quiet forget
What thou amongst the leaves hast never known
The weariness, the fever and the fret.…

যদিও কীটসের কাব্য প্রধানতঃ আনন্দেরই বার্তাবাহক, যদিও রূপকথা ও রোমান্সের রাজ্য থেকে আনন্দের আহরণেই তিনি উৎসাহী ছিলেন তবু তাঁর কাব্যে মাঝে মাঝে ক্লান্ত দুঃখবোধ করুণরাগিণীতে ঝংকৃত হয়েছে। সেই বেদনাবোধ যে কেবল La Beke Danne Sans Merci এবং Ode to Nightingle কবিতায় শিহরিত হয়েছে তাই নয়, তাঁর সৃষ্টির প্রথম পর্বের Endymion কাব্যেও Indian Maid এর কণ্ঠে কবির আত্মবিলাপ শোনা যায়—

To sorrow
I bade good morrow
And thought to leave her far away behind
But cheerly, cheerly
She loves me dearly ,
She is so constant to me and so kind
I would deceive her.
But ah ! she is so constant and so kind.

কবি নিজে আনন্দ ও সৌন্দর্যের অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু কবিকে অনুসরণ করেছিল দুঃখ ও যন্ত্রণা। তাই আনন্দ ও সৌন্দর্যের জয়গানে কীটসের কাব্য মুখরিত হয়ে উঠলেও সূক্ষ্ম বেদনাবোধ সেই কাব্যবধূর রঙীণ ঘোমটার আড়ালে মাঝে মাঝে উঁকি দিয়েছে।

মধ্যযুগের স্বপ্নময় আবেশ ও গ্রীসের রূপকথা ও রোমান্সের রাজ্য কীটসের কাব্যে যে একটা বিরাট স্থান অধিকার করে রয়েছে তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে সমসাময়িককালের দ্বিধাগ্রস্ত ক্লান্তিকর বাস্তব-জীবন কবিকে আকর্ষণ করতে পারে নি। সে-জীবন তাঁর কাছে যন্ত্রণাময় বোধ হয়েছিল বলেই তিনি নিকটকালের জীবন ত্যাগ করে দূরত্বের মহিমায় স্বপ্নময় রাজ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর স্বভাব-রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি মধ্যযুগীয় রহস্যের এবং বীরত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি বিভিন্ন দেব-দেবীর লীলায় সৌন্দর্য তৃষ্ণা তৃপ্ত করেছিল। রোমান্টিক যুগের কবিদের মধ্যে কীটসই ছিলেন সবচেয়ে বেশি গ্রীকভাবাপন্ন বা হেলেনিক কবি। তার কারণ একমাত্র এই নয় যে তিনি গ্রীসের রূপকথা কেন্দ্র করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। গ্রীকসুলভ অপার বিস্ময়বোধ, ক্লাসিকাল সংযম ও পরিমিতি-বোধ এবং প্রকৃতির লীলাকে কেন্দ্র করে উপকথা রচনার দক্ষতা তাঁকে হেলেনিক বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করেছে। গ্রীকসুলভ প্রাণপ্রাচুর্যেই তিনি এক ফুল থেকে আর এক ফুলে, এক রূপকথার রাজ্য থেকে অন্য রোমান্সের রাজ্যে সৌন্দর্যসুধা আহরণ করেছেন। কীটসের কাব্যে নেই নীতি উপদেশ; নেই গভীর অধ্যাত্মবোধ; নেই অতীন্দ্রিয় কল্পনার আকাশবিহার। তিনি শুধু অন্তর-লোক হতে বচন আহরণ করে আনন্দলোক রচনা করেছেন। তাঁর কবিকর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন :—

What though I am not wealthy in dower
Of spanning wisdom , though I do not know
This shifting of mighty winds that blow
Hither thither all the changing thoughts
Of man : though no great ministering reason sorts
Out the dark mysteries of human souls
To clear conceiving : yet there ever rolls
A vast idea before me and I glean
Therefrom my liberty : thence too I have seen
The end and aim of poesy"

রোমান্টিক যুগের অল্পায়ুকবি কীটস মাত্র চার বছরের প্রচেষ্টায় যে অতুল ঐশ্বর্যময় কাব্য রচনা করে গেছেন তা সকলের সীমানা অতিক্রম করে আজও আমাদের মনে দোলা দেয়। ক্ষয়রোগে যদি মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর জীবনদীপ নিভে না যেত তবে তিনি রোমান্টিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে স্বীকৃতি লাভ করতেন।

তেলের বোতলটা ঠকাস্ করে মেঝেতে রাখ্‌তে গেল পঞ্চানন পাকড়াশী।

গিন্নি ভুরু কুঁচ্‌কে জিজ্ঞেস করলে, ও কি? তেল না

গিন্নি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস্ করলে—ওকি? তেল না নিয়েই ফিরে এলে যে!

নিয়েই ফিরে এলে যে বড়? আমি এদিকে উনুনে কড়াই চাপিয়ে বসে আছি!

পঞ্চানন পাকড়াশী গোঁফ্ বেঁকিয়ে বল্লে, ওই কড়ায়ের তলা আগুনের আঁচে ফেঁসে যাবে, তবু একফোঁটা তেল মিলবে না।

গিন্নির মেজাজ ততক্ষণে সপ্তমে চড়ে গেছে। তাই ফোঁড়ন কাটলে, এই কি তোমার রসিকতা করবার সময় হল? সেই সকাল থেকে আমি শুধু উনুনে কয়লা ঠাস্‌ছি। ছেলেরা ওদিকে হা-পিত্যেশ্ করে বসে আছে! আর তুমি কিনা এতক্ষণ বাদে খালি বোতল নিয়ে ফিরে এলে?

পঞ্চানন পাকড়াশী ঊর্দ্ধনেত্র হয়ে উত্তর দিলে, ফিরে এলাম কি আর সাধে? যত সরষের তেলের দোকান ছিল—প্রত্যেক দরজায় গিয়ে জনে জনে খোসামুদ করেছি। বলে, একফোঁটা তেল নেই। আবার এক মোটা দোকানদার খ্যাক্-খ্যাক্ করে হেসে রসিকতা করলে, সরষে নিয়ে আসুন, পিষে তেল তৈরী করে দিচ্ছি! শোনো কথা ব্যাটাদের! না হয় তেলই বিক্রী করিস! তাই বলে এত তেলাতে হবে তোদের। এতক্ষণ ওদের পেছনে না ঘুরে যদি ইলেকট্রিক ট্রেণে চেপে তারকেশ্বরে বাবার দোরে হত্যা দিতেম—তা হলে বাবা ভোলানাথ তুষ্ট হয়ে নিশ্চয়ই একটিন তেলের বর দান করত!

আসল ব্যাপারটার স্থচনা হয়—সেইদিন রোববার খুব সকালবেলা।

পঞ্চানন পাকড়াশীর একপাল ছেলেমেয়ে। প্রতিবেশীরা বলে, হাত গুণে শেষ করতে পারবেন না মশাই। পরিসংখ্যানতত্ত্ব অফিসে ছুট্‌তে হবে।

সেই বালখিল্য দলে আজ খুব ভোরেই আনন্দ-কোলাহল জেগে উঠেছিল।

বহুদিন বাদে দেশ থেকে দাহু এসেছেন। সঙ্গে চিঁড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু আর আমসত্বের টিন—দিদিমা পাঠিয়েছেন—নাতি-নাত্‌নীদের জন্যে। যাদুকরের ইন্দ্রজালের মতো তা কয়েক মুহূর্ত্তেই অদৃশ্য হয়ে গেছে!

তারপর নাতিরা দাহুকে বলেছে, দাহু, তুমি দিদিমার হাতের এত সব মজার মজার জিনিস খাওয়ালে,—আমরা এইবার তোমাকে কল্‌কাতার এক আজব চীজ খাওয়াবো। তার স্বাদ তুমি জীবনে ভুলতে পারবে না।

দাহুর মুখে-চোখে তখন কৌতুক। তিনি নাতি-নাতনীদের শুধোলেন, সে আবার কি খাবার? খুলে বল্—

বড় নাতি বল্লে, হুঁ-হুঁ। বাগবাজারের তেলেভাজা! একবার চাখ্‌লে—চিতেয় উঠেও লোকে ভুল্‌তে পারে না।

দাহু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, অ্যাঁ। এখন আবার তোদের বাগবাজারে ছুটতে হবে নাকি?

আর এক নাতি বুদ্ধি বাত্‌লে দিলে, না-না দাহু, সে সব তোমায় কিছু করতে হবে না। বাজার থেকে টাট্‌কা তাজা বেগুন, পটল আর কুমড়ো নিয়ে এসো,—আর।

ভয় পেয়ে দাহু জিজ্ঞেস করেন,—আর?

নাতি জবাব দেয়, আর, একটিন সরষের তেলের দাম দাও। বাবাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি বাজারে। একটু বাদেই দেখ্‌বে—মার ল্যাবরেটরীতে কেমন—বেগুনী, পটলী, আর কুমড়ি ছ্যাক্—ছ্যাক্ করে বেরিয়ে আসে—।

নাত্‌নী বল্লে, হ্যাঁ দাহু, মুখে দিয়েই মানস-সরোবরে উধাও হয়ে উড়ে যাবে—

সঙ্গে সঙ্গে আর এক নাতি দার্শনিকের মতো মন্তব্য করলে, তখন তুমি নিজেই বলে উঠ্‌বে দাহু,—পৃথিবীতে যদি কোথায়ও স্বর্গ থাকে ত—তা—এইখানে—এইখানে—এইখানে!!!

শুনে দাহুর টেকো মাথায় যে কটি পাকা চুল ছিল—তা একেবারে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল। বল্লে, অ্যাঁ! এমন পদার্থ বাগবাজারের বেগুনী—পটলী—আর কুমড়ি? তা হলে ত' আমার চেখে দেখতে হচ্ছে। নইলে তোর দিদিমার কাছে গিয়ে কি গল্প করবো?

নাতি-নাত্‌নীদের নিয়ে দাহু ওই ভোরেই বাজার ঢুঁড়ে কচি কচি বেগুন—পটল-আর কুমড়ো নিয়েএলেন। আর ঝাঁজওয়ালা সরষের তেলের টিন আন্‌তে কড়কড়ে একটা নোট বের করে দিলেন নাতির হাতে।

তার পরবর্ত্তী যে নাটকীয় ঘটনা ঘটল—সে কথা গল্পের গোড়াতেই বিবৃত হয়েছে।

নাতি-নাত্‌নীরা যখন জান্‌তে পারল যে, বাজারে এককোঁটা সরষের তেল মিল্‌লো না—তখন ঝাঁঝের অভাবে তাদের লোচনগুলি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল!

নাতনীরা আক্ষেপ করে উক্তি করলে, দাহু, তোমাকে আমরা বেগুনী, পট্‌লি আর কুমড়ি খাওয়াতে পারলাম না, তবে দিদিমার জন্যে চকোলেট পাঠিয়ে দেবো। দাঁত নেই বলে তাঁর কোনো অস্থবিধে হবে না। ক্ষুণ্ণ মনে দাহু জবাব দিলেন, তাই দিস তোরা। আমিও হয় ত' খানিকটা ভাগ পাবো। কিন্তু মনে দুঃখ রয়ে গেল—তোর মার ল্যাবরেটরীর বেগ্‌নী, পট্‌লি, কুমড়ির স্বোয়াদ না পেয়েই বোধ করি দেশে ফিরতে হল। যা বয়েস হয়েছে—আর কি কখনো কল্‌কাতায় ফিরতে পারবো? মনে অতৃপ্ত আশা নিয়েই চলে যেতে হবে। হয়ত আবার এই বাগবাজারের তেলে ভাজার জন্যেই নতুন করে জন্ম নিতে হবে।

বড় নাতি সান্ত্বনা দিয়ে বল্লে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না দাহু। আমার এক বন্ধুর বোনের শ্বশুরের তেলের কল আছে। আমি সেইখান থেকে ঝাঁঝালো সরষের তেল জোগাড় করে নিয়ে আস্‌বো। আগে থেকেই তোমায় খবর দেয়া থাক্‌বে। তুমি মায়ের ল্যাবরেটরীর হ্‌তে-গরম বেগ্‌নী, পটলী, কুমড়ি খেতে কল্‌কাতায় আস্‌বে! তোমার নাতি-নাত্‌নীর দল সব তোমায় ষ্টেশনে' 'রিসিভ' করতে যাবে। চিয়ার আপ্‌ দাহু—

বশম্বদবাবু বড় মাতৃ-ভক্ত-ব্যক্তি। প্রতিদিন মায়ের পাদোদক পান না করে বাড়ীর বাইরে পা বাড়ান না।

মা বিশ্বম্ভরী দেবীও ছেলে বলতে অজ্ঞান। যখন দিনে একবার অন্নগ্রহণ করবেন—ছেলের জন্যে একটু প্রসাদ না রেখে উঠবেন না। ছেলেও তেমনি। অফিস থেকে ফিরেই সেই মায়ের প্রসাদ মুখে দিয়ে তবে তার অন্য কাজ।

তবে বিশ্বম্ভরী দেবীর কি একটা মানত আছে। তাই তিনি প্রতি হপ্তায় 'শনিবার' করেন।

বাজারে যত রকম আনাজ-তরকারী পাওয়া যায় সব একসঙ্গে আতপ চালের সঙ্গে তুলে দিয়ে মুখ ঢেকে সেদ্ধ করেন। দিনের শেষে তাই নামিয়ে নিয়ে 'এক ঢালা' করেন। এক ঢালা মানে ওতে আর দ্বিতীয় বস্তু মাখ্‌বেন না। এক সঙ্গে সব সেদ্ধ হবে। একবারে ঢেলে নিয়ে—তাই সারা দিনের মতো খাওয়া। এর সঙ্গে শুধু চাই ঝাঁজালো সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা।

মায়ের পাতের এই 'এক ঢালা' থেতে বশম্বদবাবুও খুব ভালো বাসেন। তাই প্রতি শনিবার অফিস ছুটি হলেই তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে আসেন,—মায়ের পাতের একঢালা খেতে হবে।

বশম্বদবাবুর স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী এমনি খুব ঠাণ্ডা মানুষ। সাত চড়ে রা বেরোয় না।

কিন্তু যখন শাশুড়ী বউতে লাগে—তখন কাক-চিল বাড়ীর ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না।

সেই শনিবারের কাহিনী বলি।

বশম্বদবাবু সারা কল্‌কাতা শহর চষে ফেলে—নতুন-বাজারের আলু, কলেজ ষ্ট্রীটের সরেস পটল, মানিকতলার মান কচু, বউবাজারের পেঁপে, শেয়ালদর কুমড়ো আর চেত্‌লার বড় বেগুন কিনে দিয়ে গেছেন।

সেদিন মা-জননী বিশ্বম্ভরী দেবী 'এক ঢালা' করবেন। বশম্বদবাবু বার বার করে বলে দিয়ে গেছেন,—ন্যাকড়ায় বেঁধে ভাজা মুগের ডালও যেন সেদ্ধ দেয়া হয়। কেন না এই বস্তুটি মা-ব্যাটার অতি প্রিয় খাদ্য।

ছেলেকে টাকা দিয়ে গেছেন,—সে যেন মাণিকতলা থেকে ঘানির খাঁটি সরষের তেল এনে মাকে দেয়। শ্রীমানী মার্কেটের লঙ্কায় খুব ঝাঁজ। সেখান থেকেও ও বস্তুটি সংগ্রহ করতে হবে। সৈন্ধব লবণ ত' ঘরেই আছে।

নিশ্চিন্ত মনে মায়ের পাদোদক পান করে বশম্বদবাবু অফিসে চলে গেছেন। মা-জননী বিশ্বম্ভরী দেবী ঠাকুর-পূজো সমাপন করে এক ঢালা চাপিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু নাতি আর সরষের তেল নিয়ে ফেরে না! বশম্বদবাবুর স্ত্রী বসুন্ধরা দেবী উদ্বেগের সঙ্গে ঘর-বার করতে থাকেন।

কল্‌কাতার রাস্তায় এতটুকু বিশ্বাস নেই। যে দানবের মতো লরীগুলো ছুটে চলে। ঘরের মানুষগুলো ঘরে ফিরে না এলে প্রাণে শান্তি আসে কি করে!

ওদিকে "এক ঢালা"ও ফুটে উঠেছে।

বিশ্বম্ভরী দেবীও বড় অস্বস্তি বোধ করছেন। সারা দিন খাটা-খাট্‌নি গেছে। বয়েস হয়েছে। উদরের আগুনটাও বোধ করি একটু বেশী জ্বলে উঠেছিল,—এমন সময় ভগ্নদূতের মতো নাতি খালি হাতে ফিরে এলো।

ঠাকুমাকে ডেকে বল্লে, কোনো দোকানে সরষের তেল পাওয়া গেল না!

ঠাকুরমাকে ডেকে বল্লে, কোনো দোকানে সরষের তেল পাওয়া গেল না। সারা কল্‌কাতা শহর থেকে তেল উধাও হয়েছে।

বসুন্ধরা দেবী এই খবর শুনে প্রমাদ গন্‌লেন। বল্লেন, তা হলে উপায়? তোর ঠাকুমার এক ঢালা যে ফুটে গেছে!

নাতি চীৎকার করে জবাব দিলে, ফুটে গেছে তার আমি কি করবো? সারা কল্‌কাতা শহর টহল দিয়ে এলাম। সরষের তেলের পাখা গজিয়েছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারবো না। আজ আবার মোহন-বাগানের খেলা আছে। দেরী হয়ে গেলে যায়গা পাবো না! আমি চল্লাম—

—কিন্তু সরষের তেল?

—চুলোয় যাক্ সরষের তেল। ভি, আই, পি-দের পায়ে মালিশ করে সরষের তেল ফুরিয়ে গেছে! যা হয় করো তুমি, আমার আর দাঁড়াবার সময় নেই। ফর্ ফর্ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল নাতি।

আগ্নেয়গিরি বোধকরি এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল। এই বার ধীরে ধীরে তার ঘুম ভাঙ্ছে বলে মনে হল।

বিশ্বম্ভরী দেবী এগিয়ে এলেন—বসুন্ধরা দেবীর কাছে।

—বলি হ্যাঁ বৌমা, আমি বুড়ী বিধবা,—সংসারের এক কোণে জঞ্জালের মতো পড়ে আছি,—তা বুঝি আর সইছে না! ঝাঁটার মুখে বাড়ীর বার করে দিলেই হয়।

বসুন্ধরা দেবী লজ্জিত হয়ে বল্লেন, এ সব কথা আপনি কি বল্ছেন মা? আপনার ছেলে হল বাড়ীর কর্ত্তা। আপনি জঞ্জাল হতে যাবেন কোন্ দুঃখে।

বিশ্বম্ভরী দেবী উত্তর দিলেন, জঞ্জালই যদি না হবো তবে বিধবার জন্যে দিনান্তে এক ফোঁটা সরষের তেল জোটেনা তোমার সংসারে? এই যে তোমরা মা-ব্যাটায় ইলিশ মাছের মুড়ো দিয়ে কচুঘণ্ট খেলে—আমি তা কিছু বলেছি?

বসুন্ধরা দেবীও এইবার তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন। বল্লেন, আজ শনিবার, আপনি আমাকে আজ মাছ খাওয়ার খোঁটা দিলেন? আপনারা মা-ব্যাটায় যে এক ঢালা খাবেন—সেটাও কি আমার দোষ। আপনার ছেলে আজ মাছ খাবেনা। কিন্তু স্বামীর কল্যাণের জন্যেই ত' শনিবার আমাকে মাছ খেতে হয়। না খেলে আপনিই আমাকে কত অকথা কুকথা শোনাবেন।

বিশ্বম্ভরী দেবীও গলা উঁচু করে বলেন, বেশ কথা, ভালো কথা। শনিবার বাড়ীর বৌয়ের এয়োতি রক্ষার জন্য মাছ মুখে দিতে হয়। কিন্তু এই যে বুড়ী বিধবা সারা-দিনে গলায় এক ফোঁটা জল দেয়নি, তার জন্যে কি এতটুকু সরষের তেলও জোটেনা? তুমি জানো,—সরষের তেল আর কাঁচা লঙ্কা না হলে ভাত আমার গলায় নামে না;—তবু ছেলের সঙ্গে ষড় করে তুমি সেই সরষের তেল আনালে না! আমি উপোস করে থাকি—এই কি তুমি চাও?

বসুন্ধরা দেবী চুল এলো করে হাত নেড়ে উত্তর দিলেন, আমার বাবার কি সরষের তেলের ঘানি আছে যে, ফরমাস করলেই আমি টিন ভর্ত্তি করে বাপের বাড়ী থেকে নিয়ে আস্বো? আর এতই যদি সরষের তেলের সকসকানি—তাহলে একটি কলুর মেয়েকে বৌ করে ঘরে আন্লেই পারতেন। আর কোনো দুঃখ থাকত না।

বিশ্বম্ভরী দেবী তখন সপ্তমে চড়ে গেছেন। কী? আমরা কলু? তাই কলুর মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেবো? তোমার মুখে যা আসে তাই আমায় বল্বে? আচ্ছা, আজ আসুক বংশধর, তোমার সংসারের জলটুকু পর্য্যন্ত আমি মুখে তুল্তে চাইনে! আজই আমায় কাশী পাঠিয়ে দিক। এ পাপ পুরীতে আমি আর থাক্তে চাইনে। বিশ্বনাথের চরণে গিয়ে পড়ে থাক্বো। তোমরা মা-ছেলেতে খুব করে মাছ মাংস খাও। আমি উঁকি মেরে দেখ্তেও আস্বো না। যে সরষের তেলের খোঁটা তুমি আমায় দিলে, জেনে রাখো, বিশ্বনাথের রাজত্বে তার অভাব ঘটবে না।

হেড্মাষ্টার মশাই মাথায় হাত দিয়ে তাঁর খাস্কামরায় বসে পড়লেন।

এবার এত ছেলে বার্ষিক পরীক্ষায় ফেল করল কি করে? মাষ্টার মশাইরা কি সারা বছর ছেলেদের কিচ্ছু পড়ান নি?

এখন স্কুল কমিটির কাছে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন? এমনিতেই ত' নানা কারণে স্কুলের আয় কমে গেছে। ছেলেরা সময় মত মাইনে দেবেনা। বেসরকারী স্কুল। চাঁদার ওপর চলে। অধিকাংশ অভিভাবক চাঁদা দেবার নামও করেন না। স্কুলবোর্ড থেকে যে সাহায্য পাওয়া যায়—পরীক্ষার এই ফল দেখ্লে তাও বন্ধ হয়ে যাবে!

এখন উপায়!

অনেক উচ্চ-আদর্শের কথা ভেবে তিনি এই শিক্ষা-দানের ক্ষেত্রে পা বাড়িয়েছিলেন।

শ্বশুরমশাই নামকরা ব্যবসায়ী। তিনি বহুবার জামাইকে তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে বলেছিলেন। কিন্তু আদর্শ-চ্যুত হবার ভয়ে হেড্মাষ্টার মশাই সম্মত হননি। এখন যে শিক্ষিতসমাজে মুখ দেখাবার যো রইল না।

গৃহিণী প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠে খোঁটা দেন যে, বারো বছর মাষ্টারী করে বুদ্ধি সুদ্ধি যা কিছু ছিল সব গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে হবে। এখনো নাকি সময় আছে, এখনো তাঁর বাবাকে হাতে-পায়ে ধরলে তিনি তাঁর ব্যবসার মধ্যে ঢুকিয়ে নেবেন!

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।

হেডমাষ্টার মশাই নিজের পথে অচল-অটল আছেন। তাঁকে সেখান থেকে এক চুলও নড়ানো যাবে না!

যাই হোক এইবার বুঝি হেড্‌মাষ্টার মশায়ের আদর্শের খুঁটি একটুখানি নড়ে উঠল।

ইস্কুলে একজন ছোকরা আছে—সে প্রতি ক্লাশের পর ঘণ্টা বাজায়। এই ছেলেটিকে তিনিই চাকরী দিয়েছিলেন। বেশ বুদ্ধিমান, বিশ্বাসী আর চট্‌পটে। নামও তার চট্‌পটি।

অনেক ভেবে-চিন্তে হেড্‌মাষ্টার মশাই চট্‌পটিকে ডেকে পাঠালেন।

চট্‌পটি স্কুলে হেড মাষ্টার মশায়ের গুপ্তচরের কাজ করে। শিক্ষক মশাইরা তাঁর অবর্ত্তমানে কি জাতীয় মন্তব্য করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোথায় কি জাতীয় গলদ ঢুকেছে সব খবর চট্টপটি গিয়ে তাকে জানায়। এই জন্যেই চট্টপটিকে তাঁর সময় মতো হাতের কাছে চাই।

হেড্‌মাষ্টার মশায়ের খাস-কামরায় তখন আর কেউ উপস্থিত নেই।

চট্টপটি এসে প্রণাম করে কাছে দাঁড়ালো। হেড্‌-মাষ্টার মশাই জিজ্ঞেস্ করলেন, হ্যাঁরে ক্লাশ ঠিক মত চল্‌ছে ত?

চট্টপটি মাথা নেড়ে জবাব দিলে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তবে এত ছেলে এবছর ফেল্ করলে কেন? কেউ কি পড়াশোনা করেনি? সারা বছর ফাঁকি দিয়েছে?

চট্‌পটি বিনয়ের অবতার।

উত্তর দিলে, আজ্ঞে ভেতরের রহস্য জান্‌তে আমাকে একদিনের সময় দিতে হবে।

হেড্‌মাষ্টার মশাই বল্লেন, আচ্ছা, তাই হবে। কাল কিন্তু খাঁটি-খবর চাই।

চট্‌পটি কম কথা বলে। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন টিফিনের ঘণ্টায় চট্‌পটির আবার ডাক পড়ল।

চট্‌পটি ঘরে ঢুকে গরুড়পক্ষীর মতো দুই হাত জড়ো করে মাথা নীচু করে নীরবে হেড্‌মাষ্টার মশায়ের সাম্‌নে দাঁড়ালো।

—কারণ কিছু জান্‌তে পারলি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, জেনেছি।

—কি কারণ?

—কি কারণ?
—আজ্ঞে কারণ তেল!

—আজ্ঞে কারণ তেল।

—তেল!!!

হেড্‌মাষ্টার মশাই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। অবাক হয়ে খানিকক্ষণ চট্‌পটির মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

—অ্যাঁ! তেল কিরে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ তেল। তেল ছাড়া আর কিছুই নয়।

—তা হলে সেই তেলের ভাঁড়টা খোল। আসল কারণটা বুঝিয়ে দে।

—আজ্ঞে, কারণ অতি সোজা। বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না! মাষ্টার মশাইরা গিন্নিদের কাছ থেকে কেবলি তাড়া খাচ্ছেন। তাই মরিয়া হয়ে ছেলেদের ডেকে বলেছেন, যারা একটিন করে সরষের তেল নিয়ে আসতে পারবে—তারাই পাশ। নইলে সব ফেল!

হেড্‌মাষ্টার মশাই নিজের গৃহিণীর তাগিদের কথা মনে করলেন। নিজের হেঁসেলের খবরও তাঁর অজানা নয়। তাই নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। মাষ্টার মশাইদের ডেকে আর ছেলেদের ফেল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন না।

তেলের জন্যেই ইস্কুলটা তা হলে বন্ধ হবে!

সেদিন জোর ফুটবল ম্যাচ্।

মোহনবাগানের সঙ্গে ইষ্টবেঙ্গলের সেমি-ফাইনাল খেলা।

সারা কল্‌কাতাশহরের মানুষ খেলার মাঠে ভেঙে পড়েছে।

টিপি-টিপি করে বৃষ্টি পড়ছে।

তাতে লোকদের ভ্রূক্ষেপ মাত্র নেই।

কখনো সমুদ্রের জল-কল্লোলের মতো তাদের মনোবাসনা উদ্বেল হয়ে উঠ্‌ছে,—আবার পর মুহূর্ত্তেই নিভে-যাওয়া দেশালাই কাঠির মতো হু—স্ করে মিলিয়ে যাচ্ছে! কখনো অতি উল্লাসে ছাতা জুতো নিক্ষিপ্ত হচ্ছে—ঊর্দ্ধ নীলাকাশে,—আবার তার পরক্ষণেই মানুষের সমবেত ক্ষোভের তীব্র দীর্ঘশ্বাস বাতাসে হারিয়ে যাচ্ছে।

বিজয়লক্ষ্মী কার অঙ্ক-শায়িনী হবেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সেই বিরাট জন-সমুদ্রে ক্ষণে ক্ষণে উত্তাল-তরঙ্গ জাগছে। শেষ মুহূর্ত্তে একটি পেনালটি সটে মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলকে হারিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল—'বাঙাল' আর 'ঘটির' বাক্‌-যুদ্ধ। শেষকালে বাক্য বিনিময় ছেড়ে একেবারে হাতাহাতি। কত রসিকের নাক ভাঙ্‌ল, কত উদ্যোগীর চরণ যুগল মচ্‌কে গেল, কত পেটুকের পেটে অবিরাম ঘুঁষি বর্ষিত হল।

কেনারাম যখন এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কৌশলে পশ্চাদপসরণ করে বাইরে বেরিয়ে এলো, তখন তার পাঞ্জাবীর পিঠের অংশটি অপহৃত হয়েছে এবং আর দুটি পায়ের মধ্যে একটি জুতো অবশিষ্ট আছে!

কেনারাম খোঁড়াতে খোঁড়াতে গঙ্গার ধারে চলে গেল। সেখানে বহুক্ষণ শীতল সুরধুনী-সমীরণ সেবন করে সুস্থবোধ করল!

হঠাৎ তাকিয়ে দেখে নীচে গঙ্গার একেবারে কিনারায় জেলেরা একেবারে তাজা রূপোলী ইলিশ মাছ বিক্রী করছে।

'গতরের' সব গ্লানি গঙ্গার জলে বিসর্জ্জন দিয়ে কেনারাম এক জোড়া ইলিশ মাছ কিনে ফেল্‌ল, তারপর একটা রিক্সা ভাড়া করে সগৌরবে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করল।

বাড়ীতে পৌছেই সে সিংহ-গর্জ্জন সুরু করে দিল।

দাদার চীৎকারে বই ফেলে বিনি ছুটে এলো। বল্লে, এমন করে পাড়া মাতিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ বের করছ কেন দাদা? পাড়ার লোক অন্য কিছু ভাবতে পারে।

কেনারাম হুঙ্কার দিয়ে বল্লে, হুঁ! বিচ্ছিরি আওয়াজ! —এই নে একজোড়া ইলিশ! একটা এক্ষুণি ভেজে ফেল্, আমরা সবাই মিলে চা দিয়ে খাবো। বাকিটা দিয়ে ইলিশ

এই নে এক জোড়া ইলিশ।

ভাতে হবে। বিনি তার বেণী দুলিয়ে বল্লে, মোহনবাগান খেলায় জিতেছে বুঝি দাদা? নইলে তুমি হঠাৎ জোড়া ইলিশ কিনে আনো?

কেনারাম এবার আনন্দের আস্ফালন করলে। বল্লে, যা—যা, আর বখামি করতে হবে না। যা বল্লাম, তাড়াতাড়ি তাই করে ফেল। চায়ের জলও চাপিয়ে দে—

বিনি জবাব দিলে, তা না হয় দিচ্ছি। কিন্তু তুমি খোঁড়াচ্ছ কেন দাদা? অতি আনন্দে নাকি?

কেনারাম সে কথার আর কোনো জবাব দিলেনা, হাত-পা ধুতে বাথরুমের দিকে চলে গেল।

একটু বাদেই বিনি বিচিত্র নাচ নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলো। দাদার সামনে গিয়ে দুই হাত উচু করে জয়দূতীর মতো বল্লে, ইলিশ মাছ ভাজা হবে না—

—কেন ?

—বাড়ীতে সরষের তেল এক ফোঁটা নেই।

—সে কি কথা ? এই সে দিন একটিন তেল কিনে দিলাম।

বিনি ওরই ফাঁকে এক পাক ঘুরে নিলে। বল্লে, ঠাকুমার বাতের ব্যাথা বেড়েছে। কবরেজদাদু এসেছিলেন, তিনি বল্লেন, কি একটা কবরেজী তেল তৈরী করে দেবেন রশুন ফুটিয়ে। তাই বাড়ীতে যে সরষের তেল ছিল সব তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন রান্নার জন্যেও এক ফোঁটা তেল নেই। ধীরু খানিক আগে দোকানে গিয়েছিল—ফিরে এসে বল্লে, বাজারে এক ফোঁটা সরষের তেল পাওয়া যাচ্ছে না!

—তাহলে এখন উপায় ?

—চা আর মুড়ি দিচ্ছি খাও—

—হুঁ! মুড়ি খাবো। তুই খা মুখপুড়ি—। আমি ক্লাবে চল্লাম।

পায়ের ব্যথার কথা বেমালুম ভুলে কেনারাম ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

বিনি জোড়া ইলিশ হাতে নিয়ে সেই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

জামাইষষ্ঠী এসে গেছে!

তাই গণপতি গোস্বামীর চোখে ঘুম নেই!

কিছুদিন আগেই একমাত্র মেয়ে মাধুরীর বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে-জামাইকে জোড়ে আনবেন, জামাই-ষষ্ঠীতে একটু ঘটা করবেন—কর্ত্তা-গিন্নির বড় সাধ।

কিন্তু সব সাধে বাদ সাধল সরষের তেল। মুখপোড়ারা বাজার থেকে তেল লুকোলো কোথায় ? সবই কি মন্ত্রীদের পায়ে মালিশ করতে ফুরিয়ে গেছে ?

ভেবে ভেবে গণপতি গোস্বামীর অনিদ্রা রোগ হল। এক পরিচিত বন্ধুর ভেড়ী আছে। তিনি মাছ দেবেন কথা দিয়েছেন। ফলের দোকানের সঙ্গে দীর্ঘ কালের আলাপ। তারা ল্যাংড়া আম আর মর্ত্তমান কলা পাঠিয়ে দেবে। বেহালায় এক বন্ধু পাঁঠার ব্যবসা করেন। তিনি জামায়ের জন্য কচি পাঁঠা পাঠিয়ে দেবেন। দৈ-সন্দেশেরও ভাবনা নেই। মানিকতলার এক ময়রা ছেলেবেলায় এক সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। তাকে সব কথা বলা আছে। ছেলেবেলার বন্ধু খাতির করেই বলেছে, তোমার জামাই কি আর আমার জামাই নয় ? না হয় তোমার বাড়ী একদিন পাত পেতে খেয়ে আসবো। দৈ মিষ্টির জন্যে তুমি কিছু ভেবোনা। আমি সরেস মাল পাঠিয়ে দেবো।

সব ব্যাপারে নিশ্চিন্ত আছেন গণপতি গোস্বামী। কিন্তু ওই সরষের তেলই তার চোখে সরষের ফুল ফুটিয়েছে!

গণপতি গোস্বামী ভেবে ভেবে কুল-কিনারা পান না! বাড়ীর কর্ত্তার অনিদ্রা—গিন্নির অরুচি, আর ছেলেমেয়েরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে…!

এমন সময় বেনারস থেকে একটি দেশোয়ালী লোক এসে হাজির। তার এক হাতে চিঠি, আর এক হাতে ইয়া বড়া একটি টিন!
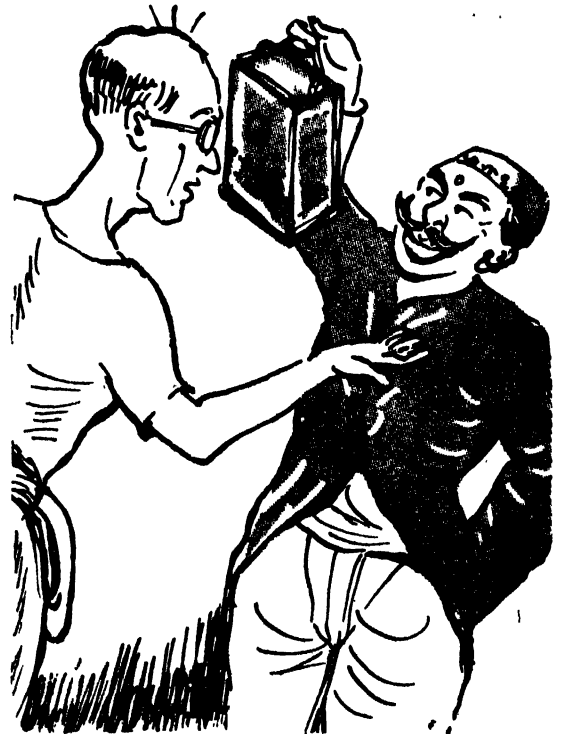
আর এক হাতে ইয়া বড়া এক টিন।

গণপতি গোস্বামী শুধোলেন, কাঁহাসে আয়া ভাই ?

লোকটি জবাব দিলে, চিঠিমে সব কুছ লিখা হায়। আপ পড় লিজিয়ে।

হাত বাড়িয়ে চিঠি নিলেন গণপতি গোস্বামী। আরে! এ যে তার বড়ছেলে নিরঞ্জনের পত্র। ছেলে লিখেছে—

"বাবা" কাগজে দেখলাম, কলকাতা থেকে সরষের তেল কালো বাজারে উধাও হয়ে গেছে। সাম্‌নে জামাই ষষ্ঠী। তোমরা নিশ্চয়ই বিপদে পড়েছ। আমাদের বিরিজলাল তার দোকানের জিনিস-পত্র কেনাকাটা করতে কল্‌কাতায় যাচ্ছে। তার সঙ্গে বড় এক টিন সরষের তেল পাঠালাম। কাশীর তেল খুব ভালো। এখানে ভেজাল দেয়া হয়না। আশাকরি এই টিনেই তোমাদের জামাই ষষ্ঠীর ব্যাপার নির্বিঘ্নে সমাধা হবে। ততদিনে বাজারের আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আস্‌বে।

আমি এখানে ভাল আছি। পত্রোত্তরে সকলের কুশল প্রার্থনা করি। টিনের প্রাপ্তি সংবাদ দিও।

ইতি—প্রণতঃ নিরঞ্জন

কাশীর তেলের টিন পেয়ে বাড়ীর কর্ত্তা-গিন্নির মুখ আবার খুশীতে ঝল্‌মলিয়ে উঠল।

গিন্নি কর্ত্তার কাছে এগিয়ে এসে ফিস্‌ফিস্ করে বল্লে, এইবার বাছাদের ভালো করে মাছের কালিয়া কোর্মা খাওয়াতে পারবো। সরসের তেল না হলে কি আর বাঙালীর মনোমত রান্না হয়?

গিন্নি একটু চুপ করে থেকে কর্ত্তার পিঠে হাত বুলিয়ে গদগদ কণ্ঠে কইলে, আচ্ছা, তোমার মনে আছে, প্রথম যে বছর জামাই ষষ্ঠীতে তুমি আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে, মা তোমায় কত মাছের রান্না করে খাইয়েছিল—রুই, ইলিশ, পাবতা, আড়মাছ, শিলং, চিতোল—

কর্ত্তা নিজের টেকো মাথায় একটা চাপড় মেরে বল্লে, সে সব কথা আর মনে করিয়ে দাও কেন গিন্নি? তোমার চেহারাটার জৌলুষই বা তখন কেমন ছিল!

—মরণ আর কি!

বলে গিন্নি সরে গেল।

সেদিন অফিসে যেতেই গণপতি গোস্বামীকে বড়বাবু ডেকে পাঠালেন।

ঘরে ঢুক্‌তেই বড়বাবু গণপতিবাবুর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বল্লেন, ভাই, তোমরা অফিসের পুরোণো মানুষ, আমাকে একটা বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

বড়বাবুর মুখে এই জাতীয় কথা শুনে গণপতি গোস্বামী হক্‌চকিয়ে গেল!

অঁা! ব্যাপারটা কি? বড়বাবুর বিপদ?

বড়বাবু বল্লেন, শোনো গণপতি, হঠাৎ মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। এই জামাই ষষ্ঠীর দিন তারিখ পড়েছে। সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি। একটিন সরষের তেল আমায় জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে আমার মান ইজ্জত যায়!

গণপতি গোস্বামীর চোখে তখন কাশীর সেই বড় টিন সরষের তেল ভেসে উঠল। আবার পরমুহূর্ত্তেই গিন্নির মুখ ভেবে চুপ করে রইল।

বড়বাবু বল্লেন, চুপ করে থেকো না গণপতি। যে করে হোক, ব্যবস্থা করে দিতেই হবে। আমি কথা দিচ্ছি, আস্‌ছে মাসে তোমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেবো।

লাফাতে লাফাতে গণপতি গোস্বামী ঘরে ঢুক্‌লেন। গিন্নি বল্লেন, আজ এত খুশী কেন? জামায়ের চিঠি এসেছে বুঝি? কবে ওরা রওনা হচ্ছে?

কর্ত্তা নিজের ছেঁড়া ছাতাটা টেকো মাথার ওপর একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বল্লেন, চুলোয় যাক ওই জামাই ষষ্ঠী, আসছে মাসে আমার পঞ্চাশ টাকা মাইনে বাড়ছে। শীগ্‌গির ওই কাশীর তেলের টিনটা বের কর ত! বড়বাবুর আবার মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল সাম্‌নের জামাই ষষ্ঠীর দিনে! এক্ষুণি আমায় ওই টিনটা নিয়ে ছুটতে হবে বড়বাবুর বাড়ী। ফিরে এসে তোমায় সব বুঝিয়ে বলব'খন!

ত্যাগ

স্বামী বিজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

ঊষার অরুণালোকে আকাশ রাঙা। বনে বনে ফুটে অজস্র ফুল। বাতাস বয়ে আনে গন্ধ। ভোরের পাখিরা ধরে গান। ছল ছল করে বয়ে যায় নদী। এ সবই স্রষ্টার দিব্যোল্লাস। সৃষ্টির বুকে নব সৃষ্টির জন্যে সবারই অফুরন্ত আত্মত্যাগ। এ এক আনন্দময় পরিপূর্ণ বিভাব, তিনি নিজেই নিজের স্বরূপ থেকে হ'লেন বিচ্যুত। ত্যাগ মন্ত্রে অভিষিক্ত হ'য়ে হ'লেন দ্বিখণ্ডিত। হ'লেন পুরুষ (নর) আর প্রকৃতি (নারী) (দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ। অর্ধেন নারী তস্যাংস বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ) আনন্দ আর হ্লাদিনী শক্তি—এর ফলে জীবও ছুটে চলেছে যুগ যুগ ধরে ঐ প্রেম ও আনন্দ লাভের জন্যে। যে পথে অবতরণ করেছে আবার সেই পথেই আরোহণ করছে। এই হ'ল দেবযান পথ। পরমানন্দকে লাভ করতে হলে, সত্যকে জানতে হলে, কর্তৃত্বকে, দ্বিত্বকে বিলুপ্ত করতে হ'লে ত্যাগাশ্রয়ী হ'তে হবে। এষণা ও লোভের গর্ত থেকে উঠে আসার মই হল ত্যাগ। মান যশের প্রাচীর যখন সামনে পড়ে, তখন ত্যাগের মুদ্গরই সে প্রাচীরকে ভেঙ্গে দিয়ে পথ করে দেয়। মনের অসংখ্য তৃষ্ণায় ত্যাগই একমাত্র নির্মল পবিত্র গঙ্গোদক—যা ঐ তৃষ্ণাকে নিবারণ ক'রে আনে শান্তি। মানুষ প্রবৃত্তির বেগেই সর্বদা ধাবিত হয়।

বন্ধং প্রবৃত্তিতো বিদ্ধি মুক্তং বিদ্ধি নিবৃত্তিতঃ।
প্রবৃত্তিরেব সংসারো নিবৃত্তিমুক্তি রিষ্যতে॥ সার্ববেদান্ত-
সিদ্ধান্ত সার সংগ্রহ

প্রবৃত্তির দ্বারা জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তি লাভ করে। পণ্ডিতগণ প্রবৃত্তিকেই সংসার এবং নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়া থাকেন।

এই প্রবৃত্তির প্রবেগকে নির্মূল করে নিবৃত্তিকে আশ্রয় করাই হচ্ছে ত্যাগ। প্রবৃত্তি থেকে ভোগ, নিবৃত্তি থেকে ত্যাগ। ত্যাগের প্রতিবন্ধক হচ্ছে মর্তাতৃষ্ণা। মর্ত্য ভোগতৃষ্ণা যখন মানুষের ঘাড়ে চেপে বসে তখন ত্যাগের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থের আশায় দীর্ঘপথ ভ্রমণ করে, জাতিকুল জলাঞ্জলি দিয়ে ধনীজনের সেবা করে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই সুখকর হয়। সুখ পেতে চায় ভোগোপকরণে। 'সুখ সুখ করে খোঁজে অনিবার, সুখাভাবে দুঃখ আসে বারে বার।' মানিক পাবার আশায় সাগর-তলা হাতড়ায়। হীরকের খোঁজে ঝিনুক কুড়ায়। তথাপি তৃষ্ণা মিটেনা। এ চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই। যতই পায় ততই চায়। এই ভাবে তৃষ্ণা ক্রমেই বেড়ে যায়। ফলে প্রাকৃত নিয়মেই আসে চরম আঘাত। সে আঘাতে চাওয়া পাওয়ার নেশা টুটে যায়। চাওয়া পাওয়ার ক্ষুদ্র আবেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে আসে প্রদীপ্ত চেতনার মাঝে। বুঝতে চেষ্টা করে এই ধনরত্ন তো অনিত্য, এরা তো দেয় না কভু নিত্যের সন্ধান। পুরাণে যযাতির উপাখ্যানে তা দেখতে পাওয়া যায়। যযাতি মহর্ষি শুক্রাচার্যের অভিশাপে জরাগ্রস্ত হলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পুরু তাঁর জরা নিয়ে যৌবন দিলেন। যযাতি পুত্রের যৌবন নিয়ে হাজার বছর ধরে যৌবন ভোগ করলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর তৃষ্ণা মিটলো না। আগুনে ঘি ঢাললে যেমন আগুন বেড়েই চলে তেমনি কাম-কামনা উপভোগের দ্বারা বেড়েই যায়—বললেন—"ন জাতু কামঃ কামানাং উপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ এ পথে সুখ নাই, এ পথে শুধু তৃষ্ণাই বর্দ্ধিত হয়! ভূমা সুখ পাওয়া যায় না, শাশ্বত আনন্দ মিলে না। তিনি পুরুকে যৌবন ফিরিয়ে দিলেন। পুনরায় জরাগ্রস্ত হলেন, ব্রহ্মারাধনার জন্যে বনে গেলেন।

যথার্থ ত্যাগেতে অসীম প্রশান্তি
সদা জেগে রয় মনের ভিতর।
হিয়াতল হ'তে অশেষ অশান্তি
হয়ে যায় পার দূর দিগন্তর॥
মনের যা কিছু ধূলি আবিলতা,
গঙ্গাজলে যেন ধুয়ে মুছে যায়॥

নীচতা দীনতা আর কুটিলতা
তখন ঘেঁসতে পারে নাক গায় ॥
অজ্ঞানতা মাঝে জ্ঞানের বিকাশ
হ'তে পারে নাক কখনো এ ভবে।
নিশীথ আকাশে থাকে কালো রাশ
তপনকে কেহ দেখেছে কে কবে ॥
রজনীর শেষে উঠলে তপন—
সব কালো যায় সাগরের পার।
আলোকে উজল সকল ভুবন—
আলোকে আলোকে সবি একাকার ॥

কোন বৃহত্তর বস্তুকে লাভ করার উপায় হ'ল ত্যাগ, ক্ষুদ্রতম বিষয়কে পরিহার করা—অতএব ত্যাগের জন্যও আকৃতি থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভালহওয়ার কামনা করে মন্দ ভাবকে ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। ব্যাপারটা হ'ল এই প্রেয় বস্তুকে হটিয়ে দিয়ে শ্রেয় বস্তুকে গ্রহণ করতে হয়। জাগতিক প্রলোভনের ক্ষমতাও অসামান্য এর হাত থেকে রেহাই পেতে হবে একটা নিশ্চিত মহতী আশ্রয়কে আঁকড়িয়ে ধরেই। তা না হলে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যের দাস হ'য়ে মানুষ পশুর স্তরে নেমে যায়, রূপ রস গন্ধ স্পর্শের মোহনীয় তৃষ্ণায় হয় আকুল। এই আকুলতা চঞ্চলতার মাঝে ত্যাগের বাতিগুলো একে একে নিভে যায়। যার পরিণাম উদ্দালক—

উদ্দালক স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন, তাতে দক্ষিণা দান করেন রুগ্না প্রজনন-অক্ষম গাভীগুলিকে, যে আর কখনো দুধ দেবে না। এরূপ দানের ফলে স্বর্গতো পায়ই না বরং দুঃখময় লোকে গমন করে। কিন্তু যে ঐ সব প্রলোভনের হাত থেকে মুক্ত হয় অর্থাৎ লোভনীয় বস্তুকে ত্যাগকরে নির্লোভ হয় সেই দিব্যবস্তুর অধিকারী হতে পারে। তাই উদ্দালকের পুত্র নচিকেতা পিতার এই অন্ধ তামস বুদ্ধি নিরীক্ষণ করে ত্যাগের বহ্নিতে উদ্দীপ্ত হ'য়ে পিতাকে বললেন—"পিতঃ। আমাকে কার কাছে অর্পণ করছেন?" একবার দুবার তিনবার একই প্রশ্ন করায় উদ্দালক অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন "তোমাকে যমরাজকে অর্পণ করছি।" পিতার আজ্ঞা পেয়ে নচিকেতা যমরাজের দ্বারে উপস্থিত হ'লেন। সে সময় যমরাজ ছিলেন প্রবাসে, তিনদিন পরে ফিরে এলেন। দেখলেন এক তরুণ ব্রাহ্মণ অতিথি তিনদিন উপবাসী হয়ে আছেন যে বাড়ীতে ব্রাহ্মণ অতিথি অনাহারে অবস্থান করে সে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়, যাগযজ্ঞ ব্রত দান সব কিছুরই ফল বিনষ্ট হয়। তিনদিন ধরে অভুক্ত অতিথিকে দেখে যমরাজ ভীত ত্রস্ত হলেন। যমরাজ নচিকেতাকে নমস্কার করে যথোচিত অভ্যর্থনা করলেন এবং তিনটি বর প্রার্থনা করতে বললেন।

নচিকেতা প্রথম চাইলেন "পূর্বে যেমন পিতা আমার প্রতি প্রসন্ন ও স্নেহপরায়ণ ছিলেন, তেমনি যেন থাকেন—' দ্বিতীয়টি চাইলেন "অগ্নিবিদ্যা সহায়ে অমরত্ব প্রাপ্তির বিষয় উপদেশ করুন"। যমরাজ নচিকেতার দুটি প্রার্থনাই পূরণ করলেন সন্তুষ্টচিত্তে এবং খুশী হয়ে চতুর্থবর দিলেন অগ্নি নচিকেতা নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করবে। অতঃপর নচিকেতা তৃতীয় বরটি প্রার্থনা করলেন "হে যমরাজ! মৃত্যুরহস্যটি কি তাই দয়া করে বলুন"। যমরাজ মৃত্যুরহস্য বিষয় প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হলেন। বললেন এ প্রার্থনা না করে তুমি অন্য প্রার্থনা কর। শতায়ু পুত্রপৌত্রসমূহ প্রার্থনা কর, তাছাড়া যত বৎসর বাঁচতে চাও ততকাল জীবন ধারণ কর—বহু গবাদি পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ এবং এই পৃথিবীতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রার্থনা কর, নৃত্যগীতপরায়ণ অপ্সরাদি সুন্দরী রমণী প্রার্থনা কর, কিন্তু এই মৃত্যু রহস্য জানতে চেওনা। নচিকেতা বললেন, হে যমরাজ। আপনার বর্ণিত এই সব ভোগ্যবস্তুসমূহ কালপর্যন্ত থাকবে কিনা সন্দেহ. উহা তো ইন্দ্রিয়গণের শক্তিই কেবল ক্ষয় করে (সর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ) এবং জীবন তো স্বল্প (জীবিতমল্পমেব) এ সব আপনারই থাক। এ সব কিছুই চাই না (যৎ সম্পরায়ে মহতি ব্রূহি ন স্তৎ। কঠোপনিষদ ১।১।২৯) যা পারলৌকিক বিষয়ের মহৎ সাধক কল্যাণকর তাই আমাকে বলুন।

যমরাজ নচিকেতাকে এই ভোগ্য বিষয়ের লোভ দেখিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। নচিকেতা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। যমরাজ বললেন—

স ত্বং প্রেয়ান প্রিয়রূপাংশ্চ কামা-
নভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাং সৃঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো
যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ ॥ কঠ ১।২।৩

হে নচিকেতা! তুমি প্রিয় ও সুখোৎপাদক ভোগ্য বিষয়-সমূহকে পরীক্ষা করে ত্যাগ করেছ। যে ধনবহুল মার্গে অনেক মনুষ্য নিমজ্জিত হয় তা তুমি গ্রহণ কর নাই, অতএব তুমি আত্মতত্ত্ব অবগত হওয়ার অধিকারী।

প্রাকৃত বুদ্ধিতে যে জন মজে রয় সে ত্যাগ করতে পারে না। তার কাছে ত্যাগ বিষয়টা দুর্বোধ্য। ধন জন ও জীবনের তৃষ্ণা—ভোগসুখের পিপাসা অদম্য। একে বর্জন করে ত্যাগের পথে যাওয়া দুরধিগম্য। কিন্তু একবার ত্যাগব্রতে ব্রতী হলে ত্যাগের পুণ্য সলিলে স্নান করলে ভোগ সুখের আবিলতা আর তনু মনকে মলিন করতে পারে না। সেখানে জীবন যৌবন সবই তুচ্ছ প্রতিপন্ন হয়। তাই তো কর্ণ তার কবচকুণ্ডল ত্যাগকরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। ভীষ্ম গাণ্ডীব ত্যাগ করে শরশয্যা গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। দধীচি আত্ম-ত্যাগ করে অস্থিদান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু জ্বলেনি যেখানে ত্যাগের প্রদীপ, সেখানে দুঃখ যন্ত্রণায়, লাঞ্ছনায়, কষ্ট পেতে হয়—যার পরিণাম রাবণ, কংস, দুর্যোধন এণ্টনী, ব্রুটাস সীজার, কেউ সুখের জন্য, কেউবা যশঃ স্পৃহায়, কেহ আধিপত্য বিস্তার হেতু, ত্যাগের পথ ভুলে গিয়ে এই চরমাবস্থায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

মানুষ বিত্ত নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে না (ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো-কঠ ১।১.২৭)

এতে কেবল স্বার্থ বুদ্ধি বেড়ে চলে। জনগণ মঙ্গল কর্মে অগ্রসর হওয়ার পথ একমাত্র ত্যাগ। ত্যাগাদর্শে অনুপ্রাণিত হলে ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি সাময়িক মর্ত্যসুখ-আনন্দ তুচ্ছ মনে হয়। তখন কৃচ্ছ্রতার আশ্রয় নিতে কুণ্ঠিত হয় না। জয়-পরাজয়ের শোক সুখ থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে এক মাত্র ত্যাগের মহিমাময় পথে হয় অগ্রসর, তার ফলে ধ্রুবকেই লাভ করে, সত্যকে অবগত হয়, জীবন পরমানন্দ-ময় হ'য়ে উঠে।

যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন—নিজেকে মহাপুণ্যবান বলে ভাবলেন। শ্রীকৃষ্ণ মনে মনে হাসলেন। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার, এই ভেবে এক মায়ার খেলা খেললেন। অর্দ্ধেকটাদেহ সোনা হয়ে গেছে এমন একটি বেজি এসে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থলে লুটোপুটি দিতে লাগল। যুধিষ্ঠির বললেন, কি ব্যাপার বলতো কৃষ্ণ! কৃষ্ণ বল্লেন—বুঝলেন না এক ব্রাহ্মণের কুটিরে গিয়ে এমনটি হয়েছে, বাকী আধখানা যাতে সোনা হয় তাই এখানে এসেছে, গড়াগড়ি দিচ্ছে। যুধিষ্ঠির বললেন কিছুই বুঝ-লামনা। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রী পুত্র নিয়ে বাস করতো আপনার রাজ্যে। সপরিবারে কয়েকদিন ক্ষুধার্ত থেকে ভিক্ষাকরে এনেছে কিছু ছাতু। এমন সময় এলো এক অতিথি। ব্রাহ্মণ অতিথি সৎকার করলো সবটুকু ছাতুদিয়ে। ব্রাহ্মণ পরিতৃপ্ত হয়ে চলে গেল। আর না খেতে পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণী ও ব্রাহ্মণপুত্র মারা গেল, সেই পুণ্যবান ব্রাহ্মণের বাড়ীতে খাদ্যান্বেষণে ঐ বেজিটি গিয়েছিল। ঐ পুণ্যভূমির স্পর্শে ওর অর্দ্ধেকটা দেহ সোনা হয়ে গেছে। আধখানা যাতে সোনা হয় তাই আপনার এই পুণ্যযজ্ঞস্থলে এসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। যুধিষ্ঠির লজ্জিত হলেন, এই বিরাট যজ্ঞে সেই ব্রাহ্মণের দানের তুল্য পুণ্য হয়নি। যুধিষ্ঠির যে তুষ্টির ভাব করেছিলেন তা ভুলে গেলেন। এই যে তুষ্টি—এও এক প্রকার প্রলোভন। অতএব ত্যাগের ফলে যে একটা নিষ্কৃতির ভাব আসে তাকেও ত্যাগকরা একান্ত অপরি-হার্য্য। মহানারায়ণোপনিষদে উক্ত হয়েছে (ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনেকে নমমৃতত্বমানশু।) কর্ম, যজ্ঞ কর্ম বা পুত্র বা ধনাদি দ্বারা ব্রহ্মকে লাভ করা যায় না, কেবল মাত্র ত্যাগেই অমৃতত্ব লাভ হয়। রাজার ছেলে হয়েও ত্যাগের পথে গিয়েছিলেন গৌতমবুদ্ধ। শঙ্কর, যিশু, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, এই ত্যাগপথ অবলম্বন করে, ত্যাগমন্ত্রে অভিষিক্ত হয়ে জগতের পরমপূজ্য হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষ, ক্ষুদিরাম, নিবেদিতা এঁরা সবাই ত্যাগব্রতে ব্রতী হয়ে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়েছেন। ত্যাগের পুণ্যে একবার তনুমনপ্রাণ উদ্ভাসিত হ'লে ভোগাকাঙ্ক্ষা আর থাকেনা। কেবল ত্যাগের মহৎ প্রত্যয়ে চিত্ত শান্ত হ'য়ে যায়। মানুষ আশাপাশে বদ্ধ হ'য়ে যুগ যুগ ধরে প্রবৃত্তির পথে এগিয়ে চলে। জন্ম-জন্মান্তর ধরে যাগযজ্ঞ দানব্রত করে একটা আত্মকেন্দ্রিক পরিতৃপ্তির ভাবে জড়িয়ে পড়ে, ফলে জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। অন্তরে অযুত তৃষ্ণা জাগে। জীবনকে সর্বস্ব সার বলে মেনে নিয়ে কামিনী কাঞ্চন বিষয়ের মধ্যে ডুবে গিয়ে আনন্দ খোঁজে। কিন্তু এগুলো যে ছেলেখেলা, পুতুল নাচ

সে কথা ভাবতেই পারে না। মর্ত্য-বাসনার মাঝে নিজেকে একান্তই জড়িয়ে ফেলে। বলা বাহুল্য বাল্যকালে বালক পুতুলখেলা নিয়েই সুখ পায়। কৈশোরে এসে সে খেলা কখন যে বিদায় নেয় জানতেই পারে না, কৈশোরে সে সঙ্গী সাথী নিয়ে যে আনন্দলোক গড়ে যৌবনে পদার্পণ করলে তা চলে যায় তখন যৌবনের প্রাবল্যে জাগে প্রেম, সে প্রেম দিয়ে, সুন্দরী রমণী নিয়ে রচনা করে পুষ্পশয্যা, সেও কয়েকদিন পরেই উবে যায় যখন আসে বার্দ্ধক্য। এমনি করে মর্তের ধন-জন-যৌবন বিদায় নেয়। অতএব দেখা যাচ্ছে ভোগের সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে ত্যাগের মণিকোঠায় আরোহণ করে। এই ভাঙ্গাগড়ার সংসার থেকে একটি মহৎ পরিবেশে আসার জন্য ঋষিগণ ব্রহ্মচর্য-গার্হস্থ্য-বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম প্রবর্তন করেছেন।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে জীবন সৌধ গড়ে উঠে একটা মহান আদর্শে। তারপর সংসারাশ্রমে এসে সে জীবন আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত। তার ফলে হচ্ছে মহৎ সৃষ্টি। জীবনী শক্তি বিলিয়ে ঈশ্বর জীবন গড়ছে। অনাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে পরমাচারে একনিষ্ঠ হয়ে উঠে। অতঃপর বাণপ্রস্থে এসে শান্ত জীবনযাপন করতে চেষ্টা করে, ধ্যান তন্ময়তায় লিপ্ত হয়। সর্বশেষে সবই ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করে, ঈশ্বরে সমস্ত অর্পণ করে, নিশ্চেষ্ট হয়ে স্থিতপ্রজ্ঞ হয়। এই হ'ল ত্যাগের মোটামুটি একটা পন্থা।

যখন মানুষ সমস্ত বিষয় ভোগস্পৃহা ত্যাগ করে তখনই হয় যথার্থ সন্ন্যাস। বিষয় বাসনাময় অশুদ্ধ চিত্তে সন্ন্যাস হয় না বা বিষয়ে বৈরাগ্যভাব উদিত হয় না। শঙ্করাচার্য বলেছেন—

> ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়ে নন্থ।
> যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধিনির্মলম্॥

সর্ববেদান্ত সিদ্ধান্ত সারসংগ্রহ ১১৪

অর্থাৎ কাকের বিষ্ঠায় যেমন বিরক্তি থাকে ব্রহ্মলোক হতে স্থাবর পর্যন্ত ভোগ্যবস্তুতে সেরূপ বৈরাগ্য থাকাই নির্মল বৈরাগ্য বা তৃষ্ণা শূন্য বলে বিবেচিত হয়।

মানুষ জাগতিক ত্রিবিধ এষণায় সংক্ষুব্ধ, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা।

পুত্র, বিত্ত ও যশ লাভের আশায় জীব উদ্‌ভ্রান্ত। কামোপভোগ দ্বারা পুত্র কন্যাদি লাভ করে, পৃথিবীতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, ধন রত্ন দিয়ে পৃথিবীকে একান্ত করে ভোগ করতে কামনা করে এবং নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তি বিস্তার করে নিজেকে বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে দিতে চায় এইভাবে মানুষ ত্রিবিধ এষণার ভৃত্য। এ সবই পার্থিব ভোগ (লোকৈষণা বলতে স্বর্গাদি লাভের আশাও হতে পারে, আচার্য শঙ্কর বলছেন—

> ঐহিকামুষ্মিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ।
> নৈস্পৃহং তুচ্ছবুদ্ধির্যৎ তদ্‌বৈরাগ্যমিতীর্যতে॥

সঃ বেঃ সিঃ সাঃ ২৩

অর্থাৎ ঐহিক ও পারলৌকিক সর্বভোগ্য বস্তুতে অনিত্যত্ব রূপে নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত যে নিস্পৃহতা বা তুচ্ছ বুদ্ধি তাহাই প্রকৃত ত্যাগ বা বৈরাগ্য।

এইসব পার্থিব ভোগ বাসনা ত্যাগ না করলে যথার্থ সন্ন্যাস হয় না। তাই জাগতিক ভোগস্পৃহাকে বর্জন করে ত্যাগের দ্বারা নিরাসক্ত চিত্ত হলে প্রকৃত সন্ন্যাস হয়। এবং তখনই প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। ঈশোপনিষদে উক্ত হয়েছে "তেনত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" নিরাসক্ত চিত্তে ভোগ কর অর্থাৎ নিরাসক্ত চিত্ত হয়ে ত্যাগের দ্বারা চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে পারলে ব্রহ্মবোধ জন্মে। এই ব্রহ্মানুভক্তি দিয়ে তখন যে ভোগ হবে তা দিব্য ভোগ। তখন অন্তর ও বাহির ত্যাগের দ্বারা পরিমণ্ডিত। সেকালে গ্রহণ ও বর্জন দুটোই সমান। ত্যাগ তখন আত্মকেন্দ্রস্থ হ'য়ে আস্পৃহা ও অস্পৃহাকে আকর্ষণ করে রাখে ব্রহ্মানন্দকে প্রকাশ করে। কারণ কিছুকে তো দূরে ফেলে রাখার মতো নাই সবই যে ব্রহ্মদ্বারা পরিবৃত (ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্)। সে ক্ষেত্রে ত্যাগই আনিয়ে দিচ্ছে নূতন করে সেই পরমকে যা জীবনে মরণে জনমে জনমে চিরসঙ্গী। রাজর্ষি জনক তাই ত্যাগী হয়েও ছিলেন ভোগী আবার গৃহস্থ হয়েও ত্যাগী সন্ন্যাসী। এই পরিবেশে এসেও নিস্তার নাই কিছু করতেই হবে। তবে এখানের যা করণ তা যোগযুক্ত হয়ে। করেও করে না। বন্ধনেও বদ্ধ হয় না। ক্ষুদ্র চেতনার সঙ্গে বৃহৎ চেতনা মিশে একাকার হয়ে আছে। ব্যক্তিত্বকে কর্তৃত্বকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে ঈশ্বরকেই আশ্রয় করে ব্রহ্মকর্ম সমাধা করে। ত্যাগের প্রোজ্জ্বল আলোয় শুভাশুভ একাকার হ'য়ে যায়। একটি শাশ্বত

ধ্রুবের পানে সত্যের পানে নয়ন মেলে ধরে। সকল কর্ম ও কর্মফল ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দেয়।

"সর্বকর্ম ফল ত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ গীতা ১৮।২ এবং পরিশেষে নিজেকেও তারি পায়ে লুটিয়ে দিয়ে ত্যাগের মহাব্রতে অবস্থান করে। তাই বলি—

ঈশ্বরের কৃপা হলে কারো প্রতি
সত্যই সেজন ত্যাগে হয় ব্রতী
তবে তার কাছে অতি দ্রুত যায়
সাধক জীবন প্রশান্তিরে পায়।
তার আকর্ষণ আমার সাধনা
আমার আকুতি তাঁহার প্রেরণা
রাখবে না মোটে আত্মপ্রবঞ্চনা
একেই বলবো ত্যাগের সাধনা।
করতে হয় যে এই অনুভব
তাঁর কৃপা হলে সবি সম্ভব
চলে যায় দূরে ভোগস্পৃহা সব
ফুটে রয় চিতে তাঁহারি বৈভব॥

অতএব সত্যকে লাভ করতে হলে ত্যাগের পথই পরম পথ। ত্যাগেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ, অনন্ত সুখ, অসীম শান্তির মুখোমুখি হতে পারা যায়। ত্যাগের শক্তি অসীম ও অমোঘ। অতএব ত্যাগের জন্যও এষণা ত্যাগ করা দরকার। অর্থাৎ ত্যাগব্রত পালনের নিমিত্ত সর্বাপণ একান্ত আবশ্যক। সর্বাপণ না করলে ত্যাগ হয় না। আর যেখানে ত্যাগের পথ শেষ হয় সেখানেই ঈশ্বরের সঙ্গে ঘটে মিলন।

আর এই ত্যাগমার্গে যেতে হলেও ঈশ্বরের কৃপা সর্বাগ্রে চাই-ই। তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হয় না। তাঁর কৃপা হলে জীব এক মুহূর্তে মহাত্যাগী হয়ে যেতে পারে। তাই এসো এই ত্যাগ পথে অগ্রসর হওয়ার জন্যে সেই পরম প্রেমময় পুরুষোত্তমের শরণ বিশ্বাস করি।

তোমাদের কাছে

হাসিরাশি দেবী

নাম লেখ, নামটাকে লেখ,—
সাদা এ কাগজে তবু লিখে রাখ নাম,
যে নামে নিজেকে চেনো, যে নামেতে নিজেকে জেনেছ,'—
সে নামের অক্ষর ক'টিকে
একে একে বসাও সাজিয়ে।
না, তোমার ভয় নেই, এতে নেই ক্ষতির ভাবনা,
অমূলক আশঙ্কা,—সন্দেহ!
তবু যদি দ্বিধা জাগে
না হয়—তা মুছে ফেল—কাটাকুটি ক'রে,—
কিম্বা শুধু জলে ধুয়ে ধুয়ে।
কারণ,—এ ধাতু নয়, তাতে নয় অক্ষর খোদাই,
কিম্বা নয় পাথরেতে লেখা,
যা রবেনা প্রাসাদে,—দেউলে
কৌশলে বসানো।
এ শুধু কাগজে লেখা!
সস্তায় যা পাওয়া যায়,—সুবিধায় যা হয় খরচ—
অসংখ্য হাতের স্পর্শে ছাপ পড়ে ধূসর রঙের,
মুছে যায় উজ্জ্বল শুভ্রতা!
বেচা আর কেনা নিয়ে ঘোরে হাতে হাতে,
তারপর চিহ্নহীন হয়—
কিম্বা হয় কুটি কুটি কীটের কল্যাণে।
তবু ফিরি তোমাদের কাছে
লেখা চেয়ে চেয়ে শুধু, তোমাদের নামের সঞ্চয়।
কারণ, হয়তো হবে একদিন বিখ্যাত মানুষ,
না হয়তো মিশে য'বে
না চেনা—না-জানার আড়ালে।
তবুও তোমার দিকে চেয়ে
আমরা দাঁড়িয়ে আছি হাতে নিয়ে কলম কাগজ,
যেখানে তোমরা-পারো হাসাতে,—কাঁদাতে
কাগজের পাঠকেরে।
কারণ, তোমরা আমাদের
সাহিত্য সৃষ্টির স্রষ্টা!—তোমরা নায়ক,—
আমাদের লেখনীতে—ঝরে ঝরে তোমাদের নাম
আর প্রকৃতির ছায়া
আর তার সাক্ষী রব আমি একধারে—
কারণ আমি যে সাহিত্যিক।

রবীন্দ্রনাথ ও গীতা

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সেদিন কলকাতার আকাশে মেঘমেদুর প্লাবন, বাতাসে তার সজল হাওয়া, পায়ের নীচের মাটি জলমগ্ন, বসে বসে রবিবাসরীয় আড্ডা জমাচ্ছি জোর। কারো কণ্ঠে বরষা-মঙ্গলের সুর,—আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো, শ্রাবণগগন অঙ্গনে, ভাদ্র নদীর ভরা স্রোতে, এমন সময় হঠাৎ তালভঙ্গ করে একজন বলে বসলো—রবীন্দ্রনাথ গীতা মানতেন, গীতার কোন প্রভাব তাঁর চেতনায়, চিন্তায়, লেখায় পড়েছে কিনা, সঙ্গে সঙ্গে আর একজন উতোর গাইলেন—তিনি ত ভক্তদের কাছে গুরুদেব ছিলেন, কিন্তু মনে মনে গুরুবাদী ছিলেন কি?

ভাবলুম দুটি প্রশ্নেরই জবাব দিই বাউলের হেঁয়ালীতে—

ভিতরে রস না হইলে কি
বাইরে কিরে রং ধরে

বা

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন্
তোর অথিক গুরু, পথিক গুরু, গুরু অগণন
গুরু যে তোর বরণডালা
গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর হৃদয় ব্যথা
যে ঝরায় দু নয়ন।

বা

ওরে কাজলে আর করবে কত
যদি নয়নে নজর না থাকে
প্রেম যদি না মিললো ক্ষ্যাপা
তবে সাধন ভজন,কদিন রাখে।

কথাটা কিন্তু মনে লেগে রইলো—ভাবলাম রবীন্দ্রনাথ নিজে সহস্রকর সাহিত্যিক, বেদব্যাস বিশেষ—তাঁর সারাজীবনের রচনা ও বাণী এক মহাভারত এবং যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে এ কথা মনেহয় কবিগুরুর সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। অতএব খোঁজো কোথায় কী বলেছেন গীতার সম্বন্ধে। অপরোক্ষভাবে গীতার আদর্শ ও উপদেশ তো ভারতবর্ষের সব সাধনার শুধু সমন্বয় নয়, পরিপূর্ণ ইতিহাসও। ভারতের কোনো মনীষীই আজ কেন, হাজার হাজার বছর ধরেও, তার প্রভাব থেকে মুক্তি পান নি। অবশ্য সবাই এক-মতাবলম্বী নন, যুগে যুগে ভক্ত ও পাষণ্ডী এসেছে, কেউ তত্ত্বের দিকে ঝোঁক দিয়েছে, কেউ তথ্যের দিকে, মার্গ হিসাবে কেউ কর্মকে ধরেছে, কেউ জ্ঞানকে নিয়েছে, কেউ বলেছে—না, না, না, কেউ বলেছে হাঁ, হাঁ, হাঁ, চেতনায় রং লাগাও, রসে জারিত করে নাও, পান্না হবে সবুজ। তবু গীতার ভাষায় "মোঘাশা", "মোঘকর্মা", "মোঘজ্ঞানা", মোহিনী, রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতির লোকেরাও আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন "আতস কাচের একপিঠে যেমন ব্যাপ্ত সূর্যালোক এবং আরেক পিঠে যেমন তাহারই সংহত-দীপ্তি রশ্মি, মহাভারতেও তেমনি একদিকে ব্যাপক জনশ্রুতিরাশি আরেকদিকে তাহারই সমস্তটির একটি সংহত জ্যোতি—সেই জ্যোতিটিই ভগবদ্গীতা।...মানুষের সকল চেষ্টাই কোনখানে আসিয়া অবিরোধে মিলিতে পারে মহাভারত সকল পথের চৌমাথায় সেই চরম লক্ষ্যের আলোটি জ্বালাইয়া ধরিয়াছে। তাহাই গীতা...বৃহৎ একটি জাতীয় জীবনের অনির্বচনীয় ঐক্যতত্ত্ব"।

গীতা 'উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদ'। উপনিষদরূপ গাভীকে দোহন করে গীতারূপ দুগ্ধ দিয়েছেন ভগবান্। রবীন্দ্রনাথ উপনিসদের বৃহৎ ছায়ায় গড়ে উঠেছেন—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ তাঁর মন্ত্র—ঈশাবাস্যমিদং সর্বং। তা ছাড়া গীতার প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে—ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্। শ্রীঅরবিন্দের কথায় এর জন্য প্রয়োজন ভিতরের ত্যাগ, অন্তরের সাধনা, বাহিরের সন্ন্যাস নয়, ভাগবত চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা। কৃষ্ণ অর্থাৎ যে শক্তি আমাদের সর্বদা ও সর্বত্র আকর্ষণ করছে, সে শক্তি 'যোগেশ্বর' যুক্ত করে দিচ্ছে সকলের সঙ্গে এবং যোগ মানেই কর্মের

কৌশল। কবির কাছে তাই সহজ কর্ম করার পন্থাই হচ্চে—

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো

এই মহাযোগেশ্বরই অর্জুনকে দেখিয়েছিলেন—

দর্শয়ামাস পার্থায় পরমরূপমৈশ্বরম্‌

কবি মাত্রেই সেই বিশ্বরূপের দর্শনার্থী, সেই খেলাঘরের অংশীদার। সেখানে নিত্য যাওয়া আসা চলছে রূপ থেকে ভাবে। রূপ নিয়ে আমরা বাঁচি না, অরূপের দিকে ছুটি, অপরূপকে পাবো বলে—তাই তো আমরা মহামায়াকে বলি রূপমোহিনী আবার তিনি রূপাতীতা রূপশূন্যা।

বিশ্বরূপং হরিণং জাতবেদসং
পরায়ণো জ্যোতিরেকম্‌ তপন্তম্‌
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্তমানঃ
প্রাণাঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্যঃ

রবীন্দ্রনাথের কাছে এবং আরো সূক্ষ্ম ও ব্যাপকভাবে শ্রীঅরবিন্দের কাছে বস্তু রস রূপ এরা মায়া নয়, বন্ধন নয়। অরূপ আবহমান কাল এদের মধ্য দিয়েই নিজেকে জানান দিয়েছেন। যে কষে বাঁধে তার নাম আসক্তি। তাই বর্জনীয় রূপ নয়, রূপের মোহ। কিন্তু মোহকে কাটাতে হবে বলে প্রাণের দোললীলাকেও পাশ কাটিয়ে নিস্তরঙ্গ নীরসশূন্যে মজতে চাইলে আমরা যে দেবতার দানের অমর্যাদা করে শুধু যে অপরাধী হব তা নয়, হব আত্মঘাতী। এই ছিল কবির নিঃসংশয়িত মত।

বহুদিন পূর্বে 'পূর্বাশায়' প্রকাশিত হয়েছিল "বাসুদেব কৃষ্ণ ও গীতা" সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রবোধচন্দ্র সেনের একটি সুচিন্তিত অভিমত। তাতে তিনি দেখিয়েছিলেন যে গীতার প্রভাব সদ্‌ধর্ম-পুণ্ডরীকে আছে, মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতে আছে, নাগার্জুনের লেখায় আছে, কালিদাসে আছে (বিশেষ করে রঘুবংশে), মহাকবি বাণভট্টের কাদম্বরীতে আছে। বাসুদেব কৃষ্ণের সর্বপ্রথম উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদে - যাদব জাতির অন্তর্গত সাত্বত কুলে জন্ম এঁর। তাঁর গুরু ঘোর আঙ্গিরস ছিলেন সূর্যোপাসক—পুরুষ যজ্ঞ বিদ্যা দেন ইনি—যার দক্ষিণা হচ্চে—'তপোদানমার্জবমহিংসা সত্যবচনম্‌'। শান্তিপর্বে এই সাত্বত ধর্মকে "প্রাক্‌ সূর্যমুখনিঃসৃত" বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং আঙ্গিরসী শ্রুতি' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের 'মানুষ' কৃষ্ণ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে 'ভক্তির পাত্র ক্ষত্রিয় প্রধান', পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে তিনি 'দেবতা', কোস্তার গরুড়স্তম্ভে তিনি 'দেবদেব', গীতায় তিনি কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং" কিন্তু "গীতা" গ্রন্থটি কৃষ্ণের সমকালীন কিনা তা বলা যায়না, মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত কিনা তাও জানা যায় না। মনেহয় বড় দর্শনের সমন্বয় সাধনের জন্যই এর উদ্ভব যখন সমাজ বিপ্লব, স্বধর্মত্যাগ, ধর্মগ্লানির আশঙ্কা এসেছিল। নবমশতাব্দীতেই গীতার চারজন টীকাকারের নাম পাওয়া যায় বসুগুপ্ত, ভাস্কর, আনন্দবর্ধন ও রামকণ্ঠ। 'সর্বতোভদ্র' টীকার প্রসিদ্ধি তখনই। অভিনব গুপ্তও এর উল্লেখ করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতপুরুষ শংকরাচার্যের নাম স্মরণীয়—তিনিই গীতার প্রথম ভাষ্যকার—যদিও তাঁর ভাষ্য, অদ্বৈতবাদের প্রচার। তারপরে এলেন কতো আচার্যের দল রামানুজ, যামুন, নিম্বার্ক, মধ্ব বিষ্ণুস্বামী—মহারাষ্ট্রে উঠলেন জ্ঞানেশ্বর (তাঁর জ্ঞানেশ্বরী টীকার আজও প্রসিদ্ধি, সৌভাগ্যের বিষয় বাংলাভাষাতেও এর অনুবাদ হয়েছে সম্প্রতি)। শ্রীধর স্বামীর টীকা ত অতি প্রসিদ্ধ। বল্লভাচার্য বা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব গীতার প্রত্যক্ষ টীকা করেন নি বটে, কিন্তু তাঁদের জীবনই গীতার টীকা। এ ছাড়াও মধ্যযুগে ছিলেন কেশব কাশ্মীরী, মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীহনুমৎস্বামী, রাঘবেন্দ্র স্বামী প্রভৃতি।

আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পিতা স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ, তাঁর দুই ভ্রাতা, দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, কাশীনাথ ত্র্যম্বক্‌ তেলঙ্গ, বঙ্কিমচন্দ্র, তিলক, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীন সেন প্রভৃতি কতো মনীষী কৃষ্ণচরিত্র ও গীতার সম্বন্ধে লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। তাই স্পর্শকাতর রবীন্দ্রনাথের মনেও গীতার প্রভাব যে পড়েনি তা কেমন করে বলা যায়।

তাঁর নিজের কথাতেই পড়ি (জীবনস্মৃতি) যে ভগবদগীতায় পিতার মনের মত শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ সমেত আমাকে কপি করতে মহর্ষি দিয়েছিলেন। 'যাত্রী'তে তিনি লিখছেন—মানুষকে নারায়ণ সখা বলে তখনই সম্মান করেছেন যখন তাকে দেখিয়েছেন তার উগ্ররূপ, তাকে দিয়ে যখন বলিয়েছেন—

দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্
যখন মানুষ প্রাণমন দিয়ে এই স্তব করতে পেরেছে
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব :
তুমিই অনন্তবীর্য, তুমিই অমিতবিক্রম, তুমিই সমস্তকে গ্রহণ করো, তুমিই সমস্ত (রবীন্দ্ররচনাবলী ঊনবিংশখণ্ড পৃঃ ৪৬৪)। অবশ্য সাহিত্যের আদর্শের দিক থেকে গীতাকে তিনি অন্যভাবে দেখেছিলেন। তিনি বলছেন—ভগবদগীতা আজও পুরাতন হয়নি, হয়তো কোনো কালেই পুরাতন হবে না। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে থমকিয়ে রেখে গীতাকে আবৃত্তি করা সাহিত্যের আদর্শ অনুসারে নিঃসন্দেহই অপরাধ—(সাহিত্যের স্বরূপ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)। মনে পড়ছে আমাদের পরলোকগত আত্মিক-সম্পর্কীয় বিশিষ্ট বন্ধু শশীভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয়ের কথা—মূল্যবোধের মধ্যদিয়েই প্রকাশিত মানুষের অন্তরের পরিচয় জীবনকে যেখানে ভালোবাসি সেখানে তাহার সার্বজনীন এবং সর্বকালিক তত্ত্বরূপটিকেই ভালোবাসিনা, ভালোবাসি তাহার স্বাদ-বর্ণ-গন্ধ-ময় সমগ্র রূপটাকে···

ঋষি কাকে বলি—যিনি দ্রষ্টা, যিনি দর্শন করেন, বেদ হচ্ছে জানা, প্রেরণাময় স্বীকৃতি—আমরা পেয়েছি বেদের মেধাবী কবিগণের সাক্ষ্য, আরণ্যক উপনিষদের ঋষি রাজর্ষিদের সাক্ষ্য, মহাভারতের বিপুল জীবন কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণার্জুনের সাক্ষ্য—কিন্তু যতই তিনি বলেন ক্ষর ও অক্ষর উভয়ের অতীত তুমি আমার শরণ লও—তবু মানুষ শংকরাচার্য বললেন—কৃষ্ণ একটা ব্যক্তি ভগবানের কল্পনা। দ্বৈতবাদীর সাক্ষ্য নিয়ে আসলেন রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভাচার্য—শাস্ত্রপ্রমাণ তর্কজালকে এড়াইয়া এলেন চৈতন্য, রামানন্দ, কবীর, তুলসীদাস, নানক—আজও রামকৃষ্ণ, অরবিন্দ, রমণ মহর্ষি যেমন এসেছিলেন ঈশা, মুসা মহম্মদ।' (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩৭০)।

এরই সঙ্গে আমরা রবীন্দ্রনাথের কথা জুড়ে দিই—
বৈদিক মন্ত্রের বাণী কণ্ঠে যদি থাকিত আমার
মিলিত আমার স্তব স্বচ্ছ এই আলোকে আলোকে
ভাষা নাই, ভাষা নাই

"একটা মুক্তির আনন্দ পেলুম। চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখন, ইচ্ছে করছে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করে তুমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি কাউকে। কে সেই আমার পরম অন্তরঙ্গ সঙ্গী যিনি আমার সমস্ত ক্ষণিককে গ্রহণ করছেন তাঁর নিত্যে। তখনই মনে হল, আমার একদিক থেকে বেরিয়ে এসে আর একদিকের পরিচয় পাওয়া গেল—এষোঽস্য পরম আনন্দ।" এই বাণী বৃহদারণ্যকের ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের—

তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছাসিয়া শুন বিশ্বজন
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেথায় মানুষ
শুনে দৈববাণী।

সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিমান
দিক্‌সীমা প্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
গীতা তাই সুগীতা। সেই সন্ধানই দেয়।

আমার জন্মভূমি

শান্তশীল দাশ

স্বর্গ হতেও গরীয়সী তুমি জন্মভূমি আমার,
তোমার এ মাটি সব সেরা মাটি,
সকল তীর্থ সার।

জন্ম লভেছি এ মাটির বুকে,
কেঁদেছি হেসেছি দুঃখে ও সুখে;
আলোকে আঁধারে সদা প্রসন্ন
দিয়েছ আশিস্ ভার।

দেবভূমি কোথা কোন দূর লোকে,
চাহিনা সেথায় ঠাঁই;
মা তোমার মাটি চির আরাধ্য
তুলনা তাহার নাই।
এই ধূলিকণা মাখি সারা দেহে
স্বর্গ সুষমা লভি এই গেহে;
এই মাটিতেই শেষ ঠাঁইটুকু
পাই যেন মা তোমার।

কুঞ্জমামা

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

কুঞ্জমামার কথা জীবনে ভুলবো না; অর্থাৎ ভোলা যায় না। বরং কোনও দিন যদি নিজেকে ভুলে যাওয়া সম্ভব হয়, তা'ও যেতে পারি, কিন্তু 'কুঞ্জমামাকে' ভুলতে পারা যায় না। আমাদের বালক এবং কিশোর বয়সে তাঁর প্রভাবের যে ছাপ আমাদের ওপর পড়েছিল, স্মৃতি থেকে সে দাগ তুলতে হোলে, তার ঘর্ষণে আমাদের অস্তিত্ব বজায় থাকে কিনা সন্দেহ।

কুঞ্জমামার পুরো নাম কুঞ্জবেহারী বা কুঞ্জলাল নয়,—নিকুঞ্জ; নিকুঞ্জমোহন। ওঁদের পদবী গাঙ্গুলী। তিনি আমাদের সকলকারই কুঞ্জমামা, হোতেন; অর্থাৎ আমার কুঞ্জমামা, আমার মায়ের কুঞ্জমামা, আমার মাসিদের কুঞ্জ-মামা, আমার মামাদের কুঞ্জমামা, আমার দিদিমারও—প্রত্যক্ষে না হোক, পরোক্ষে—কুঞ্জমামা। কুঞ্জমামার এক বুড়ী মা ছাড়া সে সময় সংসারে আর কেউ ছিল না।

যখনকার কথা বলচি, তা ষাট-পঁয়ষট্টি-সত্তর বছর আগেকার কথা। তখন আমাদের ঐ কালীঘাট ছিল ঠিক একটা পল্লীগ্রামের মত। আজকালকার মত এমন কোরে কোলাহল-হট্টগোল আর জন-সমুদ্রের মাঝে হারিয়ে যায় নি। তখন দুটি অন্নের জন্যে কা'কেও এমন কোরে হন্যে হোয়ে আফিস-আদালত ছোটাছুটি করতে হোত না। যে গরীব তারও নির্ভাবনার মধ্যেই দুটি অন্ন-বস্ত্রের সহজ সংস্থান ছিল। সকলেই এক রকম সুখে-আনন্দে দিন কাটাতো। বাড়ী-বাড়ী গান-বাজনার খুব রেওয়াজ ছিল। এর-থেকে সেকালে একটা ঘরোয়া-প্রবাদের সৃষ্টি হোয়েছিল :—

'তাল-মান গান-সুর,
কালীঘাট আর ভবানীপুর'।

কালীঘাটে তখন বাছা-বাছা লোক নিয়ে, উচ্চ-সঙ্গীত—'হাফ্-আখ্ড়াই'য়ের দল ছিল। বোধ হয়, শেষ হাফ্-আখড়ায় প্রতিযোগিতা হয়—কালীঘাট আর জোড়া-সাঁকোর মধ্যে—জোড়াসাঁকোর নন্দমল্লিকের বাড়ীতে। আমি তখন ছোট, কিন্তু কুঞ্জমামার সঙ্গে আমি গিয়েছিলুম। মনে পড়ে, কালীঘাট দলের পক্ষে সেদিন গানের বাঁধনদার ছিলেন—স্বনামধন্য নাট্যকার ও অভিনেতা ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষ। সে আসরে কালীঘাটেরই জিত্ হোয়েছিল। কুঞ্জমামা দোয়ারকীতে গাইতেন ও গেয়েছিলেন। 'চিতেন', 'পর্-চিতেন', 'ফুকো', 'ডবল-ফুকো' 'মেল্তা'—ইত্যাদি হাফ্-আকড়াই গানের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ বা কলি থাক্তো, হাফ্-আকড়াই গান আমাদের ছেলেদের মোটেই ভালো লাগতো না এবং আমরা তার একটি বর্ণও বুঝতুম না। তবু যেতাম; যেতাম—পেস্তা-বাদাম-কিস্‌মিস্-দেয়া, ঘি জব্‌জবে-হালুয়া আর গরম দুধের লোভে। এ দুটি দ্রব্যের ঢালাও ব্যবস্থা, যে যত পার—খাও। তখন চা'য়ের রেওয়াজ হয় নি। 'হাফ্-আখ্ড়াই'য়ের দলে কমপক্ষে ১০০।১৫০ জন লোকের দরকার হোত। ওর মধ্যে জনা-পঞ্চাশ থাকতো ঐক্যবাদনের জন্যে—তানপুরো, বেহালা, এস্রাজ, সেতার, হারমোনিয়াম, বাঁশী, করতাল মন্দিরে, ঢোল, পাখোয়াজ…কত কি! বাকী শ'খানেক লোক মিলে গাওয়া হোত; তার মধ্যে মূল গায়ক থাকতো জনা-পঁচিশ, আর বাকী '৭৫ জন থাকতো—দোয়ারকী'। তা ছাড়া, হেড্-বাঁধনদার, য়্যাসিস্ট্যান্ট বাঁধনদার, সুর-দার, লিপিকার,—আরো কত-কি! লিপিকারদের কাজ থাকতো—গানের ভেতর দিয়ে বিপক্ষ দল যে কূট্-কচালে প্রশ্নটা কোরেচে, তাদের গাইবার সময় মধ্যে যে যে-পংক্তি পারে লিখে নিয়ে, সেটা এ-পক্ষের বাঁধনদারের কাছে দাখিল করা। তিনি সেই খণ্ড-খণ্ড পংক্তিগুলি এক কোরে এবং তার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় কোরে, তার প্রত্যুত্তর

রচনা করবেন ও সঙ্গে সঙ্গে সুরকার তাতে সুর যোজনা কোরে, গায়কদের দ্বারা তার মহলা দেওয়াবেন। আসল কথা, হাফ্-আক্ড়াইটা 'তর্জা-গানে'রই উচ্চতম পর্য্যায়। এর গানের সুর—ধ্রুপদী। এসব ব্যাপারে আমার নিজের কোন জ্ঞান নেই, একেবারেই আমি থাজা। গানের বিষয়ে যে সব বিবরণ দিলাম, তাতেও কিছু ভুল হয় ত থাকতে পারে, তবে ঘটনার মধ্যে কোন ভুল নেই।

গাওনা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই কুঞ্জমামা আমার কাছে এসে বল্লেন—"আয়, এইবার সট্‌কে পড়ি", বলে আমার হাতটা ধোরে বাইরের দিকে নিয়ে যেতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন কুঞ্জমামা?" কুঞ্জমামা বললেন—"আরে, হয় ত মারামারি বেধে যেতে পারে!" অর্থাৎ প্রায়-স্থানেই এ জিনিসটার ভয় না কি থাকতো। যে পক্ষ হেরে যেত, অন্য পক্ষকে তাদের কবলে পেলে, নাকি মারামারি বাধাবার চেষ্টা করতো। যাইহোক আমাদের জন্যে অনেকগুলো ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ী রাস্তার ওপর তৈরী ছিল; ওরি একখানায় কুঞ্জমামা আমাকে নিয়ে উঠে বসলেন। আরো আমাদের কালীঘাটের তিন জন তাতে উঠলেন।

আমরা বাড়ী এসে পৌঁছাবার ঘণ্টা দুই পরে, হৈ-হুল্লোড় করতে করতে দলের সবাই এসে পড়লেন ও সরাসরি একেবারে কালীমন্দিরের সুবৃহৎ চত্বরে গিয়ে জমায়েৎ হলেন। সকলের কপালে কালী-মায়ের সিঁদুরের বড় বড় ফোঁটা, আর গলায় ফুলের মালা—জয়মাল্য। তারপর, সে কী আনন্দ। কী উৎসব! সমস্ত কালীঘাট সে আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হোয়ে উঠলো; আর সেই সঙ্গে সারা কালীঘাটে কুঞ্জমামার গলাবাজি ছুটে বেড়াতে লাগলো—"আরে, কালীঘাটকে কেউ কখনো হারাতে পারে? কালীঘাটের জয় সর্বদা। মা অসুরনাশিনী এখানে হাতের খাঁড়া উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েচেন!—

জয় মা কালী—
কলকাত্তা-ওয়ালী!"

একদিন সকালে আমাদের রাস্তার ওপরকার রোয়াকের ওপর আমরা তিন-চার জন ছেলে বোসে আছি। সামনেই মহানন্দ ঠাকুরের খাবারের দোকান। মহানন্দ রোজ দোকান খুলেই প্রথমে এক কড়াই হালুয়া তৈরী করতো; তারপর করতো কচুরি, আর কচুরির পর করতো সিঙ্গড়া। কুঞ্জমামা মাঝে মাঝে এসে সিঙ্গড়া কিনে খেতেন। আমরা থাকলে, আমাদেরও এক-আধ খানা দিতেন। কুঞ্জমামা এসে দেখলেন, সিঙ্গড়া তখনো ভাজা হয়নি, হ'ব হ'ব হচ্চে। কুঞ্জমামা আমাদের রকের ওপর এসে, পা ঝুলিয়ে বসলেন। আমাদের মধ্যে একজন বলল—"সিঙ্গড়া ত সবে চাপালে, দেরী হবে; তার চেয়ে গরম-গরম কচুরি খান্না কেন।" কুঞ্জমামা বললেন—"তা কি হয় রে! সিঙ্গড়া যে কি-জিনিস তাও তোরা জানিস্ না!" আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কি জিনিস কুঞ্জমামা?" কুঞ্জমামা একবার মহানন্দর সেই উনানে-চাপানো বড় কড়াইটার দিকে একটুখানি চেয়ে নিয়ে বললেন—"ওটা কি যা' তা খাবার না কি! ও হোল সগ্‌গের জিনিস!"

আমরা ক'জনেই চম্‌কে উঠলুম—"সগ্‌গের জিনিস!

"নয় ত কি? ওর লোতে, ওর তিন শৃঙ্গে তিন দেবতা চেপে বোসে আছেন। বুঝলি না?"

"তিন দেবতা!"

"হ্যাঁ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। তার মানে……

মানেটা আর বলা হোল না, মহানন্দ ভাজা সিঙ্গড়াগুলো ঝাঁঝরি হাতা দিয়ে ছেঁকে চুবড়ীতে রাখতে-রাখতে কুঞ্জমামার উদ্দেশে হাঁক দিল—"এসো গো কুঞ্জবাবু!

একবার একজন বিলিতী সাহেব কালীবাড়ীটা দেখতে এসেছিলেন। কুঞ্জমামা তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন। হাড়-কাঠ-তলায় পাঁঠা-বলি দেখে সায়েব সেখানে দাঁড়ালেন। কুঞ্জমামার মুখের দিকে চেয়ে সায়েব যেন কিছু জিজ্ঞাসা করলেন। যা জিজ্ঞেস করেছিলেন, হয় ত কুঞ্জমামা তা বুঝতে পারলেন না, কিন্তু জবাব একটা দিলেন। বললেন—"জয়মাকালী speaking হাড়কাঠ cutting goat going sky"—মানে, জয়মা কালী বোলে হাড়কাঠে পাঁঠাকে বলি দিলে, সে পাঁঠা স্বর্গে চলে যায়। সাহেব কি বুঝলেন জানিনা, চুপ কোরে থেকে অন্যত্র গেলেন। নকুলেশ্বর শিবকে দেখিয়ে কুঞ্জমামা বললেন—'Husband of মা-কালী here is।" পাথরের ষাঁড়টার বিষয়ে বুঝিয়ে দিলেন—"শিব's cow—শিব sit it।" মানে বলা নিষ্প্রয়োজন। যাই হোক ঘুরে ঘুরে সব

দেখাবার পর, সায়েব তাঁর হাতে দুটো টাকা দিতে এলে, কুঞ্জমামা বললেন—"two rupee! very little, sir!" সাহেব আর একটা টাকা পকেট থেকে বার করলেন। কুঞ্জমামা তাও না নিয়ে বললেন—three enemy is sir, four give"—মানে, 'তিন শত্রু' হয়, দিতে নেই; চারটে দিন। সায়েব আন্দাজে বুঝে নিয়ে আর একটা টাকা বার কোরে, তাঁকে চার টাকা দিলেন। আমরা ছেলের দল বরাবর কুঞ্জমামার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছিলাম। হায় কুঞ্জমামা তোমাকে কি ভুলতে পারি। ভোলা কি সম্ভব?

কুঞ্জমামার গায়ে শক্তিও ছিল যেমনি, খেতেও পারতেন তেমনি। শিবু বাঁড়ুয্যের বাড়ী কিসের উপলক্ষ্যে একটা নেমন্তন্ন ছিল। তখনকার দিনে এখনকার মত রাত্রে কারো বাড়ী খাওয়ানোর ব্যবস্থা হোত না,—এক বিয়ে ছাড়া। সবই হোত—মধ্যাহ্ন-ভোজন। কিন্তু সব স্থলেই মধ্যাহ্নটা অপরাহ্ণে গিয়ে দাঁড়াতো। বাঁড়ুয্যে বাড়ীর ভোজে সারি সারি সব খেতে বসা হোয়েচে। খাওয়াও প্রায় শেষ হোয়েচে। এমন সময় শম্ভু বাঁড়ুয্যে বললেন—"আচ্ছা কুঞ্জ, এই ভরা পেটে আর ক'গণ্ডা সন্দেশ তুমি খেতে পার?"

কুঞ্জমামা বললেন—"পেটটা বড্ড ভরে গেছে, আর বেশী পারবো না খুড়ো।"

"তবু?"

"গণ্ডা পাঁচ-ছয় হয় ত পারি।"

তখনি পাঁচ গণ্ডা সন্দেশ আনিয়ে তাঁর পাতে দেওয়া হোল। কুঞ্জমামা উবু হোয়ে বোসে ছিলেন, আবার আসন-পিঁড়ী হোয়ে বোসলেন; বললেন—তা হোলে, কিছুটা দই ত চাই; তা না হোলে অসুবিধে হবে।"

আধ হাঁড়ী টাক্ দই তাঁর পাতের সামনে দেওয়া হোল।

আস্তে আস্তে, একটা-একটা কোরে সেই পাঁচ গণ্ডা সন্দেশ-আর আধ হাঁড়ী দই কুঞ্জমামা নিঃশেষ কোরে উঠে পড়লেন। তখন সকলের আনন্দপূর্ণ কণ্ঠের হরিবোল ধ্বনিতে বাড়ুয্যে বাড়ীর সুবৃহৎ অঙ্গন মুখরিত হোয়ে উঠলো।

একদিন কি একটা কথার সূত্রে জিতু হালদার কুঞ্জমামাকে বললেন—"তুই কুঞ্জ যদি একটু লেখাপড়া শিখতিস্, তা হোলে লাট-বেলাটের মাথা একেবারে চিবিয়ে খেতিস্। কুঞ্জমামা বললেন—"সেটি ত আর হবার জো নেই, জিতুদা!"

"তার মানে?"

"তার মানে,—ছোটবেলায় আমাদের বাড়ীশুদ্ধ সবাই যখন পুরীতে তীর্থ করতে গিয়ে ছিল, সে কথা তোমার মনে আছে ত? সেখানে বাবা, মা, জ্যেঠামশাই, জ্যেঠাইমা, বিন্দুপিসি ওরা সকলে জগন্নাথকে এক একটা ওদের প্রিয় ফল দান করলে; কেউ আম, কেউ ডাব, কেউ আতা, কেউ পেঁপে…এই রকম। আমার ন'বছর বয়স, কিছুই বুঝিনা; জগন্নাথের সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে বললুম,—'ঠাকুর! আমার লেখাপড়াটা আমি তোমায় দিয়ে গেলুম।"—হো হো কোরে হেসে উঠে জিতু হালদার কুঞ্জমামার পিঠে একটা কিল্ মেরে বললেন—"তাই না কি?"

কেউ বলুক, এ-হেন কুঞ্জমামাকে কি ভোলা যায়? যায় না। কুঞ্জমামা যে আমাদের জীবন-স্মৃতির আষ্টে-পিষ্টে জড়িত। কুঞ্জমামাকে সে দিনই ভুলবো, যেদিন এ জীবনের শেষ হবে, তার এই স্মৃতি চিরতরে লুপ্ত হবে।

এ জগতে অনেকদিনই কাটালাম। অনেক—অনেক দিন! একটা একটা কোরে আজ নব্বইয়ের কোঠাতে পা ফেলে চল্‌চি। বর্ত্তমান ভাল লাগে না। নীরস, কঠোর মনে হয়, মনে হয়, এ যেন নিজেদের দেশ নয়, এ যেন কোনো অচেনা-অজানা বিদেশ-ভুঁই। হেথা দয়া, মায়া, স্নেহ ভালবাসা, সহানুভূতি, সখ্য হাসিখুসি—কিছুই নেই। তাই, বাল্য-কৈশোরের মধুময় স্বপ্নময় স্মৃতি নিয়েই আজ একান্তে পড়ে থাকি। তাতেই সুখ, তাতেই আনন্দ, তাতেই তৃপ্তি। জীবন-প্রভাতের সেই ফেলে-আসা দিনগুলির কত কথা, কত হাসি-কান্না, খেলা ধুলো আজ মনের গহনে স্বপ্নের তুলি বুলিয়ে দেয়। আজ কবির অনুসরণ কোরে তাঁরই কথায় বলি—

'এই খেলাইত আমি ভালোবাসি।
একদিকেতে ভাসাও আঁখিজলে,
আরেক দিকে জাগিয়ে তোল'হাসি।'
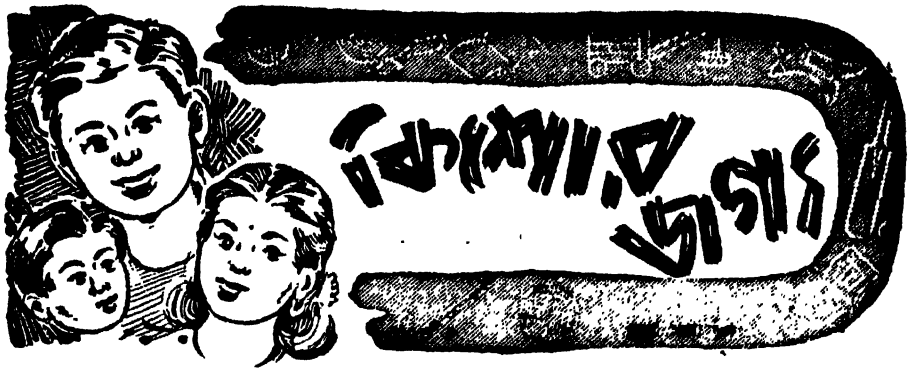
পূজার প্রার্থনা

শ্রীজ্ঞান

শরতের আগমনের সাথে সাথেই আগমনীর সুর বাঙ্গালীর প্রাণে একটা আনন্দের—একটা অনির্বচনীয় সুখের পরশ যেন বুলিয়ে দেয়। বালক, কিশোর, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনই খুশীতে ভরে ওঠে, আর অপেক্ষা করে থাকে বিশেষ ক'টি দিনের জন্যে যখন মহাদেবীর আগমন হবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে। এই যে আগমনীর আনন্দ এর একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য নানা পূজায় পাওয়া যায় না।

দেবী দুর্গার এই পূজা বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব। এই উৎসবের উৎস বাংলাদেশে যে নয় তা তোমরা জান। শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বিজয়ের জন্য লঙ্কার সমুদ্রতটে দেবী দুর্গার আবাহন করেছিলেন। তখন দেবীর পূজার কাল নয়। এখন যে বাসন্তীপূজা হয়, তাই দুর্গাপূজার আসল কাল। কিন্তু রামচন্দ্রকে সেই অকালেই দেবীর আরাধনা করতে হয়েছিল রাবণ বধ করে সীতাকে উদ্ধারের জন্য। তাই এই দুর্গাপূজার আর এক নাম অকাল-বোধন এবং সেই থেকেই এই অকাল দুর্গাপূজার প্রচলন হয় ভারতবর্ষে। তারপর সেই সুদূর ত্রেতাযুগ থেকে কিভাবে ধীরে ধীরে এই পূজা বাঙালীর জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে তার সঠিক ব্যাখ্যা করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে প্রায় পাঁচশ বছর আগে থেকে বাংলার কে কে-জন রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই মহিষাসুরমর্দ্দিনী দশভুজা দুর্গা দেবীর পূজা লোকপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। বাঙ্গালী আজ অসুর-বিনাশিনী দেবী দুর্গাকে অন্তর দিয়ে আরাধনা করে, আবাহন করে, তাঁর আগমনের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে থাকে সারা বৎসর ধরে। দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে নিধন করে জগৎকে তার পীড়ন থেকে মুক্ত করেছিলেন। আজকের দিনেও সেই রকম অবস্থাই যেন ঘনিয়ে আসছে বলে মনে হয়। দুষ্টের প্রভাব আজ সর্বত্র, দুর্নীতি আজ চতুর্দিকে, দুর্দিনের মেঘে চতুর্দিক আজ অন্ধকার প্রায়, দুর্বল আজ সমস্ত সবলের পীড়নে। এই দুর্দিনের মাঝে মহাদেব-পত্নী মহাদেবীর আগমন, মহামায়ার আবির্ভাব, মহাশক্তির বিকাশ আমাদের প্রাণে নতুন আশা জাগিয়ে তুলবে, নবীন বলে তোমাদের বলীয়ান করে তুলবে, নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় সকল কর্মে তৎপর করে তুলবে।

আজ এই বস্তুতান্ত্রিক যুগে আধুনিক কালের আত্ম-সর্বস্ব আবহাওয়ায় অনেকেই আজ ভগবান বা ঠাকুর দেবতাকে মানতে চান না। পুরাণের দেবী দুর্গার অসুর বিনাশের কথা ইতিহাস বলে প্রমাণিত হয় নি ঠিক কথা, কিন্তু এই পৌরাণিক কাহিনীর যে বিশেষ মূল্য আছে সে কথাও অস্বীকার করা যায় না। রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনীরও ঐতিহাসিক সত্যতা নিরুপিত হয় নি বটে, কিন্তু অজস্র কাহিনী, উপদেশ, তত্ত্ব, তথ্য, নীতি, বিধি, আচরণ, অনুষ্ঠান সংবলিত এই দুই অতুলনীয় মহাকাব্য আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। এ সম্পদ সব জাতির ভাগ্যে মেলে না। কিন্তু ভাগ্যবান আমরা ভগবৎ কৃপায় এই সম্পদ লাভ করেছি। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত সম্পূর্ণ

রামায়ণ ও মহাভারত পড় নি। মুখে মুখে কিছু কাহিনী শুনেছ বা সংক্ষিপ্তাকারে পড়েছ। কিন্তু আমার অনুরোধ তোমরা বিশ্বের এই শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য দু'টি পড়ে ফেল। মূল সংস্কৃত থেকে পড়া হয়ত তোমাদের অনেকের পক্ষেই সম্ভব হবে না। তবে বাংলায় এদের সুন্দর অনুবাদ করে গেছেন কবি কৃত্তিবাস ও কবি কাশিরামদাস। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশিরামদাসের মহাভারতের প্রাঞ্জল অনুবাদ অতি সুন্দর। তোমরা পড়লেই তা বুঝতে পারবে।

সামনেই তোমাদের পূজার দীর্ঘ অবকাশ। এই ছুটিতে তোমাদের মধ্যে অনেকেই, যারা কলকাতায় থাক তারা হয়ত বাইরে যাবে ভ্রমণ বা হাওয়া বদলানর উদ্দেশ্যে। আবার যারা বাইরে থাক তারা হয়ত অনেকে বাড়ীতেই থাকবে। যেখানেই থাক ছুটির সময়টা সদ্ব্যবহার কর ঐ মহাকাব্য দু'টি পড়ে। গল্প পড়ার আনন্দ ও সু-শিক্ষার উপকার একই সঙ্গে লাভ করবে। হাল্কা গল্প, উপন্যাস পড়ে বা শুধু আলস্যে, আরামে ও আড্ডায় অমূল্য সময় ব্যয় কর না। তোমাদের এখনও প্রকৃত জীবন আরম্ভ হয় নি। এই সময় সুশিক্ষার দ্বারা জীবনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে তুলতে পারলে তবেই সারা জীবন আনন্দে কাটাতে পারবে—জীবন-সংগ্রামে কখনও পর্যুদস্ত হবে না। প্রাতঃস্মরণীয় প্রাচীন, প্রাজ্ঞ মুনি ঋষিরা মানুষকে শিক্ষা দেবার জন্যে যে অমূল্য উপদেশাবলী গল্প, কাহিনীর মাধ্যমে রেখে গেছেন তার থেকে শিক্ষা লাভ করে আজ জগৎ ধন্য হচ্ছে। ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানদর্শী এই ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষদের বাণীকে তোমরা অবহেলা কর না, এর থেকে জ্ঞান আহরণের চেষ্টা কর, সুফল লাভ করবেই তাতে।

আজ দিকে দিকে দুর্নীতি, দুষ্কৃতির যে প্লাবন দেখতে পাচ্ছ তার কারণ "অহং" ভাবাপন্ন অন্তঃসারহীন, অহঙ্কারী আধুনিক যুগের মানুষ এই সব নীতিকে, উপদেশকে, আচার-আচরণকে দম্ভ ভরে হেয় করে, অবহেলা করে, মিথ্যা গর্ব্বে আত্মপ্রসাদ লাভ করে সমাজের বুকের ওপর দুরাচারের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। জাতির জনক গান্ধীজীর রামরাজ্যের স্বপ্ন আজ কোথায়? তাই আজ তোমাদের অনুরোধ করছি আমাদের প্রাচীন কিন্তু চিরন্তন, শাশ্বত, সুমহান শিক্ষাধারাকে অবহেলা কর না—তাকে বাঁচিয়ে রাখ, পুনরুজ্জীবিত কর এবং নিজেরাও উজ্জীবিত, উদ্দীপিত হয়ে উঠে দেশকে, জাতিকে, সমাজকে রক্ষা কর। জগজ্জননী দেবী দুর্গা দুষ্কৃতিকারী অসুরকে সংহার করে জগৎকে রক্ষা করেছিলেন, তোমরাও সংশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আচারে, আচরণে, সংযমে, শাসনে সেই মহামায়ার আশীর্ব্বাদ-পূত উপযুক্ত সন্তানরূপে গড়ে ওঠ—এই প্রার্থনাই আমি আজ জানাই মহাদেবীর চরণে।

তোমরাও আগামী পূজায় পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে দেবী দুর্গার বরাভয়দাত্রী মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করবে যেন ভারতমাতার সদাচারী, সুশিক্ষিত, সুসন্তানরূপে তিনি তোমাদের গড়ে তোলেন, যাতে তোমরা জাতির গর্ব্ব হয়ে উঠতে পার। এবারকার পূজায় এই প্রার্থনাই তোমরা কায়মনোবাক্যে জগন্মাতার চরণে জানাও, আর উচ্চারণ কর ঋষি বঙ্কিমের অমর মন্ত্র 'বন্দে মাতরম্'।

বাজছে পূজোর বাঁশী

শ্রীরঞ্জিতবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎ এলো ভুবন ভরে
নীল আকাশের গায়:
শিউলিগুলো সুর ঝরিয়ে,—
তাই কি বরে যায়।
নীল আকাশে মেঘের ভেলা,
যায় সে দূরে সকালবেলা,
শরৎ ভোরে উঠলো হেসে
শরৎ সোনার রবি,
মা এসেছেন আজকে ঘরে
তাই তো আঁকি ছবি

হাসছ হাসি খিল্‌খিলিয়ে
ছোট্ট শিশুর হাসি,
এমনি দিনে মা এসেছেন,
বাজিয়ে পূজোর বাঁশী।
ভাটীয়ালীর সুরের সাথে,
গাইছে মাঝি বৈঠা হাতে,
উছলে উঠে নদীর জলে
ছড়িয়ে গানের ধারা,
ফুলের রেণু হাওয়ায় মেশে,
মাতায় পাগল পারা।

দামাল সুরেশ

শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চরিত্র

সুরেশচন্দ্র	
গিরীশচন্দ্র	সুরেশচন্দ্রের বাবা
কৈলাসবাবু	ঐ কাকা
নিস্তারিণী দেবী	ঐ মা
মন্মথ	ঐ ভাই
জিতেন	
পলাশ	সুরেশচন্দ্রের বাল্যসঙ্গী
শিশির	
ভবানন্দবাবু	জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক
রতন	ঐ পুত্র
রহিম	জনৈক চাষী
মালী	বাগান রক্ষক

প্রথম দৃশ্য

ফুলবাগান। ভবানন্দবাবু লুঙ্গি পরে খোলা গায়ে নিড়ানী হাতে নিয়ে ফুলগাছের গোড়া সাফ করছেন। এমন সময় কর্ণেল সুরেশচন্দ্রের ছবি হাতে পুত্র রতনের প্রবেশ

রতন। বাবা—এটা কার ছবি?

ভবানন্দবাবু। (রতনের দিকে ফিরে) কৈ দেখি—(রতন ছবিখানা দেখালো) প্রণাম করো।

রতন। কেন, প্রণাম করবো কেন বাবা? ইনি কে?

ভবানন্দবাবু। ইনি একজন মস্ত বড়ো বীর। নাম কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস। অন্যান্য বরেণ্য বাঙালী সন্তানের মত ইনিও আমাদের নমস্য।

রতন। কেন কী করেছেন ইনি? (ছবির দিকে চাইলো)

ভবানন্দবাবু। (নিড়ানীর মাথায় মাটি সাফ করতে করতে) ইনি আমাদের ভীরুতার অপবাদ ঘুচিয়েছেন। বাঙালী বীর—বাঙালী দুরন্ত দুবার তারই পরিচয় বয়ে নিয়ে গেছেন সাগরপারের দেশে। জাতির ললাটে ইনি এঁকে দিয়েছেন বীরত্বের জয়তিলক। (ছবিখানির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে রতনের দিকে চেয়ে) নাও প্রণাম করো।

রতন। (প্রণাম ক'রে) আচ্ছা বাবা, এঁর সম্বন্ধে জানো তুমি কিছু?

ভবানন্দবাবু। নিশ্চয়। বাঙালী হ'য়ে এতো বড়ো দুরন্ত দামাল বাঙালীর পরিচয় আমাদের সকলেরই জানা উচিত রতন। ইংরাজী ১৮৬১ সালের ১২ই জানুয়ারী নদীয়া জেলার নাথপুর গ্রামে ইনি জন্মেছিলেন।

রতন। আমাদের কবি-দাদু রবীন্দ্রনাথের জন্মও তো ঐ বছরেই—

ভবানন্দবাবু। হ্যাঁ।

রতন। তাহলে এঁরও তো বয়স রবীন্দ্রনাথের মত একশো বছর পেরিয়ে গেছে।

ভবানন্দবাবু। হাঁ তা গেছে—

রতন। তাহলে এঁর জন্মশতবার্ষিকী উৎসব হোলো না কেন?

ভবানন্দবাবু। আমিও তাই ভাবছি রতন। হয়তো আজকের বাঙালী তাঁকে ভুলে গেছে। কিন্তু তোমরা, আগামী দিনের বাঙালীরা তাঁকে ভুলো না। যে সাহস—যে শৌর্যের পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তা থেকে অনেক কিছু আমাদের শেখবার আছে।

রতন। এঁর সম্বন্ধে জানতে আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছে বাবা—বলো না এঁর জীবনটা শুনি—

ভবানন্দবাবু। ইচ্ছে হোয়েছে? বোলবো বৈ কি, নিশ্চয় বোলবো। এসো ঐ কামিনী গাছের গোড়াটায় বসি। (দুজনে একটা কামিনীগাছের গোড়ায় বসল, নিড়ানীটা পাশে রেখে ভবানন্দবাবু সোজা হয়ে বসলেন। রতন বসল তাঁর সামনে) সুরেশচন্দ্রের বাবা গিরীশচন্দ্র ছিলেন সরকারী কর্মচারী। দুই ছেলে, স্ত্রী নিস্তারিণী দেবী আর তিন মেয়ে নিয়ে তার সংসার। ছেলে দুটির মধ্যে সুরেশচন্দ্রই বড়ো—রোগা ছিপছিপে গড়ন। কিন্তু বুকটা ছিল উঁচু। চোখে মুখে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা, ভারি জেদী ছিলেন সুরেশচন্দ্র।

রতন। আচ্ছা অতো যে জেদী ছিলেন—ওঁর মা বাবা কিছু বলতেন না ওঁকে?

ভবানন্দবাবু। বলতেন বৈকি, একেক সময় বিরক্ত হোয়ে তাঁরা ধমকাতেন—কঠিন সাজা দিতেন মারও লাগাতেন।

রতন। তখন উনি কি করতেন?

ভবানন্দবাবু। তখন ওঁর জিদ আরো চেপে বসতো। দুরন্তপনার চূড়ান্ত ক'রে ছাড়তেন। কিন্তু যদি তিনি অন্যায় কিছু করেছেন ব'লে বুঝতেন, তাহলে নির্বিচারে পাওনা শাস্তিটুকু সহ্য করতেন। তবে কাপুরুষের মত কখনো চোখের জল ফেলতেন না একটুও। বাবা ছিলেন গোঁড়া বৈষ্ণব, সৌম্য শান্ত সুপুরুষ। অথচ সুরেশচন্দ্র কিন্তু ধর্মের গোঁড়ামিকে কখনো প্রশ্রয় দিতেন না।

রতন। (ছবিখানির দিকে চেয়ে মুখ তুলে) বাঃ রে—বেশ তো!

ভবানন্দবাবু। হ্যাঁ—বড়ো যাঁরা হন—মানুষের মত মানুষ হোয়ে যারা দেশের গৌরববৃদ্ধি করেন তাঁরা এই

রকমই হন্। (রতনের হাত থেকে ছবি-খানা নিয়ে দেখতে দেখতে) দ্যাখোনা ছবিখানার মধ্যে কেমন একটা বলিষ্ঠ ভাব! এ ছবি দেখলে কে বলবে বাঙালীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়েছে?

রতন। তুমি ঠিকই বলছ বাবা—

ভবানন্দবাবু। আর একটা মজা কি জানো—বিপদকে জয় করার একটা প্রচণ্ড নেশা ছেলেবেলা থেকেই ছিল সুরেশচন্দ্রের মধ্যে। তাই বিপদে পড়ে ভয়ে তিনি পিছিয়ে আসতেন না কোনদিন। খু-উ-ব ছোট্ট বেলাকার একটা ঘটনা বলি শোনো—

রতন। (ঘন হ'য়ে বসল) বলো—

ভবানন্দবাবু। বয়স তখন সবে বছর খানেক। ওই বয়সেই ওঁর সংগে পেরে উঠতেন না ওঁর মা নিস্তারিণী দেবী। জিনিস পত্তর ভেঙ্গেচুরে ছিটিয়ে ছড়িয়ে একাকার করতেন সব। একদিন নিস্তারিণী সন্ধ্যাবেলায় ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখে কী একটা কাজে গেছেন। দুষ্টুটা তক্ষুণি গিয়ে ধরেছে প্রদীপটা। জ্বলন্ত শিখার সামনে মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে, অবোধ্য ভাষায় কী সব আবোল তাবোল বলছে। এমন সময় ঘরে ঢুকলেন ওঁর মা। দুষ্টুটা পুড়ে মরবে ভেবে হাত থেকে কেড়ে নিলেন প্রদীপটা। জেদী ছেলে তক্ষুণি একটা চীৎকার দিয়ে মাটিতে গড়াতে লাগল। রাগে মা তখন প্রদীপটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নে ধর্ দেখি, ধর্—মা তখন কি করলেন জানো?

রতন। কি করলেন?

ভবানন্দবাবু। জ্বলন্ত প্রদীপের শিখার ওপরে সুরেশ-চন্দ্রের একটা আঙ্গুল ঠেসে ধরলেন। উদ্দেশ্য অন্য কিছু নয়, ভবিষ্যতে যাতে ছেলেটা আর কখনো আগুনে হাত না দেয় তার জন্যে একটু সজাগ করে দেওয়া।

রতন। উঃ কী সাংঘাতিক! তার পর কি হোলো?

ভবানন্দবাবু। সবার বেলায় যা হয় তাই হোলো। যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল শিশু, কিন্তু কেঁদে রসাতল করলে না। সমস্ত যন্ত্রণাটুকু মুখ বুজে সহ্য করলে!

রতন। ভারি আশ্চর্য তো!

ভবানন্দবাবু। আর একবার—বয়স তখন মাত্র দু বছর। সেই সময় একদিন প্রাচীরের গায়ে একখানা মই খাড়া ছিল। ছেলে সেই মই বেয়ে দিব্যি তর্তর্ করে উঠে গেল! ভয় ডর কিচ্ছু নেই। কুড়ি ফুট আন্দাজ উপরে ব'সে খিল্‌খিল্ ক'রে হাসতে লাগল। একটা চাকর তাই দেখে ছুটতে ছুটতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে খবর দিল্। হৈচৈ পড়ে গেল বাড়ীতে—সবাই ছুটে এলো। ভয়ে তাঁরা অস্থির। লোকজন দেখে ছেলে তো আরো খুশী হোয়ে মইয়ের ওপর থেকেই লাফ ঝাঁপ সুরু করে দিল। সর্ব্বো-নাশ—পড়ে গেলে হাড়গোড় সমেত একেবারে ছাতু হয়ে যাবে! কি হবে এখন! কেমন ক'রে নামানো যায় ছেলেটাকে! মায়ের বুক ঢিপ্ঢিপ্ করছে। ভয়ে তাঁর বুক ঠেলে কান্না আস্‌ছে।

রতন। খুব সাংঘাতিক ব্যাপার তো।

ভবানন্দবাবু। হ্যাঁ—তাই ভাবো—দু বছরের একটা শিশু—অথচ কেমন নির্ভীক। একটুও না ঘাবড়ে ছেলে দিব্যি মই ধ'রে দাঁড়িয়ে রইল।

রতন। তারপর কি হোলো?

ভবানন্দবাবু। তারপর খুব সাবধানে একজন মই বেয়ে উঠে গিয়ে তাকে কোলে করে নামিয়ে নিয়ে এলো। সবাই স্বস্তি পেলো। মায়েরও ধড়ে প্রাণ এলো। ঐ বয়স থেকেই সুরেশচন্দ্রের দুষ্টুমি সুরু। দুষ্টুমি আর দস্যিপনার মধ্যে দিয়েই কেটেছে তার শৈশব আর কৈশোরের দিন-গুলি। বনে বনে—গাছে গাছে ঘুরে বেড়ানো ছিল তার নেশা। পড়াশুনার চেয়ে দুষ্টুমিতেই মন ছিল তার বেশী। তবু বড় হয়ে অনেকগুলো ভাষা শিখেছিলেন সুরেশচন্দ্র। ইংরাজী-জার্মান ফ্রেঞ্চ, স্পেনিশ-ডাচ, পোর্তুগীজ, ইটালী, ডেনিশ আরো অনেকগুলো ভাষা তিনি গড়গড় করে বলে যেতে পারতেন।

রতন। বারে, কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে চললে—আগে ছোটবেলার কথাগুলো সব বলো—

ভবানন্দ। হ্যাঁ ছেলেবেলাকার কথাই আগে বোল্‌বো—কিন্তু—

রতন। আবার 'কিন্তু' কি? বলো—

ভবানন্দবাবু। (চারদিকে তাকিয়ে) না—মানে, সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলো তো—আচ্ছা ওঠো রতন হাত মুখ ধুয়ে ঘরে গিয়ে বসি।

রতন। বোল্‌বে তো।

ভবানন্দবাবু। (দুজনেই উঠে দাঁড়াল) নিশ্চয় তুমি তাঁরই দেশের ছেলে। তাঁর দুর্বার জীবন থেকে অনেক কিছু তোমায় নিতে হবে। শুধু তুমিই বা কেন বল্‌ছি—তোমার মতো যারা কিশোর—জীবন যাদের একটু একটু করে গোলাপ কুঁড়িটির মত ফুটে উঠছে তাদের প্রত্যেকেরই উচিত সুরেশচন্দ্রের মধ্যে যে বীরত্ব—যে দুঃসাহস ছিল হৃদয় দিয়ে তা অনুভব করা। বাঙালী আজ জীবনসংগ্রামে পিছিয়ে পড়ছে। ভীরুতার অপবাদ আবার তার ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করছে। বেশ বুঝতে পারছি শক্তিমান সাহসী আর দুরন্ত-দামাল না হতে পারলে বাঙালীর পতন অনিবার্য। এ পতন রোধ করতে হ'লে চাই বীরত্বের সাধনা—চাই মহাশক্তির জাগরণ। চলো—ঘরে গিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আবার সুরেশচন্দ্রের কথা তোমায় শোনাবো।

রতন। বেশ, চলো।

[উভয়ের প্রস্থান ও পর্দা]

দৃশ্য

[আমবাগান। পলাশ ও জিতেন। দুজনে ঘুরে ঘুরে একটা গাছের দিকে তাকিয়ে আম খুঁজছে।]

পলাশ। ইস্, মাইরি জিতেন—কী ফাসকেলাস্—পেকে একেবারে টস্‌টস্ করছে—

জিতেন। কইরে, আমি তো দেখতে পাচ্ছি নে—

পলাশ। দেখতে পাচ্ছিস্‌নে—চোখের মাথা খেয়েছিস্ নাকি (জিতেনের গলা ধরে আঙুল উঁচিয়ে) উই ত্থাখ্ আমার আঙুল বরাবর তাকা—দেখেছিস ?

জিতেন। কই রে—

পলাশ। ধোৎ, আচ্ছা দুটো ডাল জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে দেখেছিস্ ?

জিতেন। হুঁ, ডাল দুটো তো দেখতে পাচ্ছি।

পলাশ। পাচ্ছিস ?—এই ডাল দুটোর মধ্যে দিয়ে চোখ চালা দিকিনি—পেয়েছিস ?

জিতেন। ই-স্ (লাফিয়ে উঠে) এ্যাত্তোবড়ো একটা —রাঙা টুকটুক করছে রে—

পলাশ। এবার তাহ'লে ঝাঁ ক'রে উঠে পড় দিকিনি—

জিতেন। অ-নেক উঁচুতে যে—একেবারে মগডালে—

পলাশ। তা' হোক্, পাড়তেই হবে —

জিতেন। গাছের গুঁড়িটা কি রকম মোটা দেখছিস্ ?

পলাশ। হোক্—তোকে উঠতেই হবে—নে ওঠ্ শিগগীর।

জিতেন। নারে ভরসা হচ্ছেনা—যদি পড়ে যাই।

পলাশ। পড়্‌বি কেন—সাবধানে ওঠ্। দেখিস্‌নি সুরেশ কেমন চটপট করে উঠে যায়—

জিতেন। সুরেশের কথা বাদ দে—ওতো একটা পাক্‌কা গেছুড়ে। এই সময় সুরেশটা থাকলে ভালো হোতো। তাই না ?

পলাশ। তা'হলে দাঁড়া এখানে—চট্ ক'রে ডেকে আনি ওকে এ্যাঁ ?

জিতেন। তাই যা—দৌড়ে যাবি বলো (পলাশের দ্রুত প্রস্থান) দেখিই না চেষ্টা ক'রে পারি কিনা—সবতাতেই সুরেশটা বাহাদুরি নেবে কেন ! (উইংগ্‌সের গা ঘেঁসে একটা গাছ জড়িয়ে ধরে উঠবার মত হাবভাব করবে এবং কিছু পরে মঞ্চের মধ্যস্থলে স'রে এসে) ওঃ বুকটা ছাঁচড়ে গিয়েছে—জ্বালা করছে বড্ডো—(উপরের দিকে চেয়ে উস্‌খুস্ করতে থাকবে। এমন সময় সুরেশ ও পলাশের প্রবেশ)

সুরেশ। মাত্তোর একটা আমের জন্যে অদ্দূর উঠে কি হবে রে ?

জিতেন। (ওদের দিকে ঘুরে) একটা নয় রে অনেকগুলো পেকে রয়েছে।

সুরেশ। কই—কোথায় ? দেখা দিকিনি—

জিতেন। উ-ই যে একেবারে সকলের উঁচু ডালটা (সুরেশকে আম দেখালো)।

সুরেশ। আচ্ছা, ঠিক আছে। দাঁড়া (গায়ের জামাটা খুলে) ধর্ এটা—

পলাশ। (জামাটা হাতে নিয়ে) সবগুলো চুটিয়ে পাড়বি কিন্তু।

সুরেশ। (উইংগ্‌সের কাছে গিয়ে) তোরা দেখিস্, মালীটা যেন টের না পায়। আমি একটা একটা করে ছুঁড়ে ফেলবো—ক্যাচ্ ধরবি—বুঝলি তো ?

পলাশ ও জিতেন। আচ্ছা—(কেউ আসছে কিনা দেখার জন্য চারপাশে ঘন ঘন তাকাবে, সুরেশ উইংগ্‌সের পাশে দাঁড়িয়ে গাছে উঠবার মত উইংগ্‌সের পাশে রাখা মই বেয়ে উঠে যাবে)।

সুরেশ। নে ধর্—

পলাশ। (ক্যাচ ধরার ভংগীতে উপরের দিকে চেয়ে) দে ফেলে দে ··(সুরেশ আম ফেলতেই ক্যাচ্ ধরে নিলো)

সুরেশ। ধর্—আর একটা—

জিতেন। দে—(ক্যাচ্ ধরল। এইভাবে ৭।৮টা আম পাড়া হোলো)

নেপথ্যে মালী। কে রে বাগানে !—

জিতেন। এই সেরেছে—সুরেশ, শীগ্‌গীর নেমে আয়।

সুরেশ। দাঁড়া, আরো গোটা কতক।

পলাশ। না-না, শীগ্‌গীর নেমে পড়্ (উঁকি দিয়ে দেখে) মালীটা হয়তো এই দিকেই আসছে···

জিতেন। নেমে পড় সুরেশ—

নেপথ্যে মালী। এই ছোঁড়ারা, দাঁড়া—দেখাচ্ছি মজা—

পলাশ। এই মরেছে, এসে পড়েছে যে !—

সুরেশ। (নামতে নামতে) কদ্দূর রে মালীটা ?

জিতেন। (উঁকি দিয়ে দেখে) বড়ো কাঁঠাল গাছটার কাছে শীগ্‌গীর নাম্—

সুরেশ। তোরা আম কটা নিয়ে পালা—

(পলাশ ও জিতেন আম ক'টা কোঁচড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল। মালীর প্রবেশ)

মালী। ধরতে পারলে কান ছিঁড়ে দিতাম একেবারে। (গাছের দিকে চেয়ে) গাছে ও কে ? ও—বিশ্বেস-মশাইয়ের হনুমানটা (তেড়ে গিয়ে) নাম বলছি—নাম—

সুরেশ। নামছিই তো দেখতে পাচ্ছো না ! (একটা লাল পিঁপড়ের বাসা মালীর গায়ের ওপর ফেলে দিয়েই ঝপ করে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে আচমকা পায়ে চোট পেলো। তবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদৃশ্য হয়ে গেল। পিঁপড়ের ঝাঁকের আক্রমণে মালী লম্ফঝম্ফ সুরু করল। দুহাতে গায়ের পিঁপড়েগুলো ঝাড়তে ঝাড়তে)

মালী। পাজীটার জ্বালায় একেবারে অতিষ্ঠি হ'য়ে পড়লাম যেন এ্যাঁ! গাছের আম, কলা, পেঁপে, পেয়ারা কিছু কি থাকতে ছ্যায়। পই পই করে বলি, খা'বি খা—চেয়ে নিয়ে খা। তা নয়, চুরি করে খাওয়া—ছিঃ ছিঃ কাউকে যেন গেরাহ্যির মধ্যেই আনতে চায় না—উঃ—(চোখের পাতা থেকে একটা পিঁপড়ে ছাড়িয়ে নিয়ে) ভাগ্যি চোখটায় কামড়ায়নি। বাগানের ফলপাকড় একটাও ঘরে ওঠে না ওই দস্যি ছেলের জ্বালায়।

(রহিম মণ্ডলের প্রবেশ)

রহিম। কার কতা বল্‌চো গো খুড়ো?

মালী। কার কথা বল্‌ছি বুঝতে পারছ না? (বিরক্ত হয়ে) বলি, এই গায়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভয় পাও কাকে মণ্ডল?

রহিম। ভয়! ভয় আবার কাকে পাবো?

মালী। পাও না?

রহিম। উঁহু—মোটেই না।

মালী। তাহ'লে তোমার মর্তমানের গাছটায় কাঁদি পড়েছে—খবরটা সুরেশচন্দরের কানে পৌঁছে দিই—কি বলো?

রহিম। না, না খুড়ো, দোহাই তোমার, ওই কম্মোডা কো'রো না।

মালী। ক্যান ভয় পাওনা কাউকে?

রহিম। উরে বাব্বা—উডা তো একটা ক্ষুদে ডাকাত—

মালী। অ-হ্—ওরই কথা বল্‌ছিলাম। ব্যাটার হাড়ে হাড়ে দুষ্টুমি বুদ্ধি। দেখনা—চুরি ক'রে আম পাড়তে উঠেছিল। বল্‌তে গেছি তো এই এ্যাত্তোবড়ো একটা লাল পিঁপড়ের বাসা ওপর থেকে দিলে ফেলে গায়ের ওপর!

রহিম। তা এ হ'নে দাঁড়ায়ে বক্‌বক্ করলি কি হবি! যাও-বিশ্বেস মশাইকে গিয়ে কও।

মালী। বল্‌ছ কি মণ্ডল—নালিশ? সুরেশচন্দরের নামে? তাহ'লেই হয়েছে। উল্টোফল ফল্‌বে বুঝেছ? যাওবা দুচারটে ফলপাকড় বচ্ছর অন্তর ঘরে ওঠে তাও যাবে। গাছ শুদ্ধ কেটে লোপাট করে দিতে পারে। মনে করছ বুঝি একা ঐ ছেলে! গাঁয়ের সবকটিই তেনার চ্যালা—বুঝেছ? ওর বাবা গিরীশবাবু কি বলেন জান?

রহিম। কি কন?

মালী। বলেন ছেলেবেলায় একটু আধটু দুষ্টুমি সকলেই করে থাকে। তা বলে যখন তখন নালিশ করাটা ভাল নয়। বুড়ো বয়সে কেউ দুষ্টুমি করে না হে বাও। মারাত্মক কিছু ঘটলে তবেই এসো—

রহিম। তা-কতাডা বিশ্বেস মশাই ঠিকই কন। না কি কও খুড়ো।

মালী। কথাটা অবিশ্যি মিথ্যে নয়। সেই জন্যেই তো ওই একটু আধটু হুমকি হাম্‌কা ছাড়া আমিও বিশেষ কিছু বলিনে। সুরেশচন্দর এমনিতে ভাল মানুষের সাথে কথাবার্তাও কয় ভাল। একটু ডানপিটে এই যা দোষ ওর। তা তুমি হঠাৎ বাগানে? যাচ্ছিলে কোথায়?

রহিম। তোমার কাছেই আলাম। তোমার বাবু-মশাই নাকি চরের জমিটে ভাগে দেচ্ছেন? বাবুকে ব'লে ক'য়ে একটা বন্দোবস্ত করে দাও না আমাকে। গরীব মানুষ—বেঁচে যাই।

মালী। তুমি নেবে? তা চলো, বাবু এখন বাড়ীতেই আছেন। (গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে) উঃ এখনো জ্বলে যাচ্ছে মণ্ডল।

রহিম। জ্বলবেই তো, গেছো পিঁপড়ের কামড়ে ভারি যন্‌তরণা হয় যে—

[উভয়ের প্রস্থান ও পর্দা]

তৃতীয় দৃশ্য

[রান্নাঘরের দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছেন নিস্তারিণী দেবী। সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে রহিম মণ্ডল]

নিস্তারিণী। তুমি বলবে কি রহিম আমার ছেলে—আমি চিনি নে ওকে! ওই ছেলের জ্বালায় হাড় মাস ভাজা ভাজা হ'য়ে গেল আমার। সেই সকাল থেকে তার টিকিটি পর্যন্ত দেখবার উপায় নেই। লেখাপড়া নেই কেবল টো টো ক'রে বেড়ানো। বলি ও মনো—মনো, সে কুচকে বাঁদরটারই কি পাত্তা আছে! মন্মথ অ-মন্মথ, বাঁদরগুলো সব গেল কোথায় এ্যাঁ!

[কৈলাসবাবুর প্রবেশ]

কৈলাসবাবু। আঃ গলাটা একটু খাটো করো বৌদি। বাইরের ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে। পাঁচটা ভদ্রলোক রয়েছেন। ভাববেন কি তাঁরা?

নিস্তারিণী। ভাবলে আর করবো কি বলো! যে সব অপোগণ্ড পেটে ধরেছি, ওদের জ্বালায় মান সম্মান সবই যাবে। শোনো ঠাকুরপো, রহিম কি বলে শোন।

কৈলাসবাবু। কি বল্‌ছ রহিম?

নিস্তারিণী। বলি কালই বাঁদরটাকে সারাদিন ঘরে আটকে রেখেছিলে না?

কৈলাসবাবু। কেন আজ আবার করল কি?

নিস্তারিণী। আজ আবার নাকি কার বাগানে ঢুকেছিল। সেই একেবারে মগডালে উঠে আম পাড়ছিল। ও ঠাকুরপো-ও যে প'ড়ে মরবে একদিন—

রহিম। তা অসম্ভব নয় মা ঠাকরুণ। গাছের পাতায় পাতায় ঘোরে বুনো খরার গর্তে হাত ঢুকোয়। একটা বিপদ ঘটতি কতক্ষুণ! সাপ খোপের হাতেও তো পড়তি পারে—

নিস্তারিণী। আর বোলো না বাপু। ওকে নিয়ে আর পারছিনি। সেই বচ্ছর খানেক বয়েস থেকে সুরু

হয়েছে ওর দস্যিপনা-এর মধ্যে একটুও ছেদ পড়লো না তাতে। যতো বড়ো হচ্ছে ততোই বেশী বেয়াড়া হয়ে উঠছে। (মৃদু হেসে) সেই বেড়ালের মুখ থেকে কাঠ-বেড়ালি ছিনিয়ে নেবার কথা তোমার মনে আছে ঠাকুরপো ?

কৈলাসবাবু। মনে আবার নেই ! ওর সমস্তই অদ্ভুত। তাইতো ওকে আমার ভালই লাগে। বড় হলে একটা অসম্ভব কাণ্ড কিছু ও করবে, বুঝলে বৌদি ? ওর সম্বন্ধে আমার ধারণাটা বরাবরই উঁচু। তাই মাঝে মাঝে নেহাৎ দায়ে প'ড়ে যখন শাস্তি দিই ওকে তখন মনে হয় ক্ষুদ্র ওই আগ্নেয়গিরির মধ্যে যে প্রচণ্ড অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা রয়েছে তাকে ঠেকিয়ে রাখা কি সম্ভব !

নিস্তারিণী। তোমাদের দুই ভাইয়ের আস্কারাতেই বাঁদরটা অমন মাথায় চ'ড়ে বসেছে। সে না হয় যাক কিন্তু অমন করতে করতে কবে যে মরেই যাবে ও ! সেবার সেই কাঠবেড়ালির বাচ্চা কেড়ে নিতে গিয়ে হাতখানা ক্ষত বিক্ষত হোয়ে গেল বোম্বেটে বেড়ালের আঁচড়ে। ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে। বুঝলে রহিম, ছেলের চোখে তবু এক ফোঁটা জল নেই ! বছর পাঁচেক মাত্রের বয়স-ঐ রকম একটা কাণ্ড ঘটল অথচ একটুও ভয় ডর নেই। গোবিন্দ আসছিল খামার থেকে। দেখতে পেয়ে ছেলেকে বেড়ালের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলো। অষুদ পত্তর ব্যাণ্ডেজ এটা ওটা কতো কি চললো ক'দিন ধ'রে সমানে। তবে সে যাত্রা রক্ষা পায়। (পেয়ারা খেতে খেতে মন্মথর প্রবেশ) হ্যাঁরে পেয়ারা পেলি কোথায় ?

মন্মথ। (অন্যমনস্কভাবে পেয়ারায় কামড় বসিয়ে) দাদা দিয়েছে। অ-নেক পেয়ারা আছে মা দাদার কাছে—এই এ্যাত্তো বড়ো বড়ো (ছিবড়ে ফেলে দিয়ে) আঃ কী মিষ্টি।

নিস্তারিণী। দাদা কোথায় ?

মন্মথ। খিড়কি দোরের আড়ালে—লুকিয়ে লুকিয়ে পেয়ারা খাচ্ছে। দেখ মা—দাদাকে বললাম ছোড়দিকে দুটো দে তা দিলে না—বললে বড়দিকে দেবে।

নিস্তারিণী। ও ঠাকুরপো, ডাকোনা বাঁদরটাকে একবার।

কৈলাসবাবু। সুরেশ —এই সুরেশ—

নেপথ্যে সুরেশ। যা-ই কা—কা—(কিছুক্ষণ পরে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে সুরেশের প্রবেশ। চুলগুলো উসকো খুসকো--প্যান্টের দুই পকেটে ভর্তি পেয়ারা।)

কৈলাসবাবু। লেখাপড়ার বালাই নেই—রাতদিন শুধু বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্—পড়াশোনা করতে ইচ্ছে করে না তোর ?

নিস্তারিণী। অমন ক'রে নয়। দু'চার ঘা বসাও—গায়ে কি ওর মানুষের চামড়া আছে যে ভালো কথা শুনবে ?

কৈলাসবাবু। কিরে, চুপ করে আছিস্ যে—জবাব দে। লেখাপড়া করতে ভাল লাগে না ?

সুরেশ। না—

কৈলাসবাবু। বনবাদাড়ে জানোয়ারের মত ঘুরে বেড়ালে জীবনে বড় হওয়া যায় না বুঝেছ হে ? লেখাপড়া তোমাকে করতেই হবে। আচ্ছা এই যে সেদিন শিবাজীর গল্প শুনে বললি বড় হয়ে শিবাজীর মত বীর হবি। যোদ্ধা হবি। এই নাকি তার নমুনা ?

সুরেশ। হবোই তো—

নিস্তারিণী। হবি ? ছাই—বাঁদর ছাড়া আর কিচ্ছুই হবি নে তুই।

সুরেশ। উঃ বাঁদর হোতে যাব কেন ? দেখবে—শিবাজীর মতই বীর হব আমি। ইয়া বড়ো এক ঘোড়ায় চ'ড়ে মাথায় পাকড়ি দিয়ে হারে-রে-রে করতে করতে ছুটবো। লোকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে আর বলবে—সুরেশচন্দ্র-কি-জয়। মস্তবড় এক সৈন্যদল থাকবে আমার। তাই নিয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। ভয়ে তারা কাঠের পুতুলের মত ঠকঠক্ করে কাঁপবে। আমি কোমর থেকে তরবারি বার করে তাদের কচুকাটা করে ছাড়ব।

(সকলের হাসি)

মন্মথ। ইস্ সত্যি দাদা—তাহ'লে কী মজাই যে হবে। আমাকে নিবি তো তোর দলে ?

সুরেশ। আলবৎ—শুধু তুই কিরে--পলাশ, জিতেন, অনন্ত, শিশির ওরাও থাকবে।

কৈলাসবাবু। আচ্ছা বেশ, কেমন বাহাদুর হও দেখা যাবে। এখন যাও দিকিনি চান করে খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে নাও দিকিনি। রোববার আছে দুপুরে অর্জুনের গল্পটা বলব কেমন ? মহাভারতের সেই বীর অর্জুন।

সুরেশ। ঠিক—বলবে তো ?

কৈলাসবাবু। ঠি—ক বোলবো।

সুরেশ। আচ্ছা কাকা, শিবাজী অর্জুনের চেয়ে বড়ো—নয় ? আমার কিন্তু তাই মনে হয়। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সাহায্য করেছিলেন আর শিবাজী একাই একশো।

কৈলাসবাবু। দুজনেই বীর—দুজনেই যোদ্ধা—দুজনেই বড়। মহাপুরুষদের ছোট বড়ো বাছতে নেই। (সুরেশচন্দ্র ও মন্মথর প্রস্থান। কৈলাসবাবু রান্নাঘরের দাওয়ায় বসলেন) দাদা এলে এবার তুমি কোলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করো বৌদি। কোলকাতায় দাদার হেপাজতে থাকলে ওর পড়াশুনাতেও মন বসবে আর নিয়মিতভাবে কোন ব্যায়ামের আখড়ায় যাওয়া-আসা করলে শরীরটাও মজবুত হবে। মাঝে মাঝে ছুটিছাটায় আসবে—দেখা সাক্ষাৎ হবে।

রহিম। সেই ভাল মা ঠাকরুণ—

নিস্তারিণী। তা আমি তো তোমার দাদাকে কবে থেকেই বল্‌ছি। আমার সে কথায় উনি তো কানই দেন না।

কৈলাসবাবু। আচ্ছা-এবার দাদা আসুন। সেই ব্যবস্থাই করা যাবে বুঝলে? (রহিমের দিকে চেয়ে) তা রহিম, তোমাকে যে আজকাল দেখাই যায় না। বহু-দিন আসো নি—ব্যাপার কি?

রহিম। হেঁ হেঁ কত্তামশাই থাক্‌লি তেনার কাছে আসি। দুদণ্ড ব'সে আলাপ সালাপ করে একটু আধটু সুখশান্তি পাই। তা তিনি তো সেই কোইলকাতায় তাই—

কৈলাসবাবু। তাই আর আসতে নেই কেমন? আরে আমরা তো আছি। তা গেছিলে কোথায়?

রহিম। এজ্ঞে হ'রে মালীর কাছে গিয়েলাম।

কৈলাসবাবু। কেন? তার কাছে আবার কি?

রহিম। হ'রে মালীর বাবু নাকি চরের জমিটা ভাগে দেবেন। তাই গিয়েছিলাম সন্ধানে—যদি পাই। তা'হলি এবার আসি—কত্তা আদাব—

কৈলাসবাবু। আচ্ছা এসো। প্রস্থান

রহিম। আসি মাঠাকরুণ্—(নত হয়ে হাত জোড় করে নমস্কার জানাল)

নিস্তারিণী। এসো—

[রহিমের প্রস্থান ও পর্দা]

চতুর্থ দৃশ্য

[হাডুডু খেলা চল্‌ছে। সুরেশ মঞ্চে প্রবেশ করতেই ছেলেরা হৈ হৈ করে তাকে ছেঁকে ধরল।]

জিতেন। এই যে সুরেশ কখন্ এলি? একেবারে যে সাহেব বনে গেছিস। বাব্‌বা, ক'মাস হোলো গিয়ে অব্দি একখানা চিঠি পর্যন্ত দিলিনে?

পলাশ। ওকি আর নাথপুরের ছেলে এখন—খাঁটি ক্যালকাটার বাবু কি বলিস্? কোলকাতায় গিয়ে নিশ্চয় পড়াশুনায় খুব মন দিয়েছিস। আচ্ছা ওখানে কোন্ ইস্কুলে ভর্তি হোয়েছিস্?

সুরেশ। লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি ইন্‌ষ্টিটিউশন। কিন্তু যাই বলো বাপু আমি নাথপুরেরই ছেলে। কোলকাতা আমার আদৌ ভাল লাগছেনা। ইচ্ছে মতন ছুটোছুটি করার জো নেই সেখানে। কথায় কথায় শুধু শাসন আর মানা। পথ চলতেও আইন। ক'মাসেই যেন হাঁপিয়ে উঠেছি একেবারে। অথচ এখানে এই গ্রামের বুকে কতো অবাধ আমার গতি। কদিন বেশ খুশীমত বেড়াতে পারব-তারপর আবার সেই খাঁচা। যাকগে—আচ্ছা জিতেন, যাবার সময় তোকে যে হ'ড়েলের বাচ্চাটা ধরে দিয়েছিলাম সেটা আছেতো?

জিতেন। আরে ধ্যুৎ ঐ টুকুন্ বাচ্চা বাঁচে কখনো?

পলাশ। এক জায়গায় গেলে কিন্তু হ'ড়েলের বাচ্চা ধরা যায় সুরেশ—যাবি?

জিতেন। কোথায় রে?

পলাশ। আচ্ছিবেড়ের সেই বুড়ো আমগাছটা দেখেছিস তো—ওখানে অ-নেক গুলো হ'ড়েল বাসা বেঁধেছে।

সুরেশ। মাইরি-সত্যি বল্‌ছিস্?

পলাশ। সত্যি বল্‌ছি—

সুরেশ। তবে চল্ এক্ষুণি যাবো। একটু দাড়া তোরা চট্ করে জামা জুতোটা খুলে আসি।

পলাশ। তুই আয় আমরা এগোই। (সুরেশের প্রস্থান) এই ফণ্টে, শিশির, আজ আর খেলা হবে না ভাই। আমরা হ'ড়েল পাখী ধরতে যাচ্ছি (সুরেশের বিপরীত দিক দিয়ে জিতেন ও পলাশের প্রস্থান। খেলা সুরু হোলো আবার। খেলা চলতে চলতেই পর্দা নেমে এলো)।

পঞ্চম দৃশ্য

[পর্দা উঠলেই উইংগ্‌সের পাশে দেখা যাবে সুরেশ, পলাশ ও জিতেনকে, সুরেশের পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট গায়ে গেঞ্জি]

সুরেশ। তোরা নীচে দাঁড়িয়ে থাক্ আমি উঠ্‌ছি। (উইংগ্‌সের পাশে রাখা মই বেয়ে এমনভাবে উঠে যাবে যেন দর্শক দেখতে পায়। জিতেন ও পলাশ ওর দিকে চেয়ে থাকবে)

পলাশ। এ-ই আছে আছে—(আনন্দে লাফিয়ে উঠে) মা-ই-রি অ-নেকগুলো ধাড়ী হড়েল। তোকে দেখে ভয় পেয়েছে সুরেশ।

জিতেন। খু-উ-ব সাবধানে, পারিস তো ধাড়ীও একটা ধরবি।

(কিছুক্ষণ সকলেই নীরব)

সুরেশ। (মইয়ের ওপর এমনভাবে দাঁড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে দেবে যাতে দর্শক তাকে দেখতে পায়) আরে ব্-বাপ্ কী প্রকাণ্ড সাপ! ফণা উঁচিয়ে আছে।

জিতেন ও পলাশ। স্—সা—প্! ওরে ব—বাবা! নেমে আয়—দরকার নেই সুরেশ নেমে আয় নেমে আয় শীগ্‌গির।

সুরেশ। চু—প্! (কিছুক্ষণ পরে শক্ত মুঠোয় একটা গোখরো সাপের গলা চেপে ধরে ধীরে ধীরে এমনভাবে নেমে আসবে যেন দর্শক তার লেজটা দেখতে পায়। মাটিতে এসে সাপটাকে উঁচু করে ধরে রইল। জিতেন ও পলাশ বেশ কিছুটা দূরত্ব নিয়ে দাঁড়াবে)।

জিতেন। উঃ কী সাংঘাতিক! এ যে সাক্ষাৎ যম রে বাবা।

পাপ। বংশের কুলাঙ্গার তুমি। আজ থেকে আমার এ সংসারে তোমার স্থান হবে না। ক্ষমতা থাকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজের ভাত নিজে করে খেও।—যাও—আর কখনো যেন তোমাকে এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখতে না পাই। কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলে যে! যাও! দূর হয়ে যাও, আমার সামনে থেকে। (সুরেশ এগিয়ে এসে পায়ের ধুলো নিতে গেল। গিরীশচন্দ্র চেয়ার ঠেলে উঠে পিছিয়ে গিয়ে)। না—না, ছুঁয়ো না তুমি আমাকে—সে অধিকার তুমি হারিয়েছ।

সুরেশ। (দূর থেকেই মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে) না জেনে—না বুঝে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে আপনার অন্তরে হয়তো আঘাত দিয়েছি। যদি পারেন ক্ষমা করবেন। কিন্তু আপনার আদেশ যতো কঠোরই হোক্ মাথা পেতে নিলাম। জীবনে যতো দুঃখই পাই না কেন, তবু আপনার ওপরে আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ আপনি পিতা প্রণম্য-গুরু।

(ধীরে ধীরে প্রস্থান)

গিরীশ। (চঞ্চলভাবে পায়চারী করতে করতে সুরেশের গমন পথের দিকে চেয়ে) চ'লে গেল—চ'লে গেল—হয়তো আর কখনো ফিরবে না। দুরন্ত দুর্বার অবাধ্য সন্তান সুরেশ আমার চলে গেল! হায় ধর্ম, তোমার কাছে কি পিতৃস্নেহেরও কোন মূল্য নেই! (কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে) যা—ক্, যাক্—কিন্তু যেখানেই যাক—হে ভগবান, তুমি তাকে রক্ষা কোরো! ওর জীবনে একমাত্র তোমার করুণা ছাড়া আজ আর কোন সম্বলই রইল না। আমি ওকে ক্ষমা করতে পারলাম না—তাই ব'লে তুমিও যেন ওর ওপরে বিরূপ হোয়ে থেকো না ঠাকুর!

(দুহাতে মাথা ঢেকে বসে পড়লেন)

দৃশ্যান্তর

(পর্দা উঠলেই দেখা যাবে ভবানন্দবাবু ও রতন মুখোমুখি মেঝের ওপর বসে)

রতন। তারপর?

ভবানন্দবাবু। তা—র—পর—মরি কি বাঁচি, যাহোক একটা কিছু করতেই হবে সংকল্প নিয়ে একদিন ডায়মণ্ড-হারবারের বন্দরে এক বিলাতী জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে আলাপ করলেন। নিজের দুঃখের কথা সমস্ত তাঁকে বললেন। সাহেবের মন গললো। শেষে জাহাজের রন্ধনশালার পরিদর্শক রূপে বিনে মাইনের একটা কাজ তাঁকে দিলেন। কথা রইল, জাহাজে থাকা খাওয়া আর লণ্ডন সহরে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া সুরেশচন্দ্রের অন্য কোন পারিশ্রমিক তিনি গ্রহণ করবেন না।

রতন। লণ্ডন শহরে পৌঁছে তিনি কি করলেন?

ভবানন্দবাবু। (আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। রতনও দাঁড়ালো) খবরের কাগজ, খেলনা, নানারকমের পুতুল বিক্রী সুরু করলেন। শেষে জার্মানীর এক সার্কাস দলে পেলেন একটা চাকরী। এই সার্কাস দলের সঙ্গেই একদিন দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল রাজ্যে পৌঁছে গেলেন সুরেশচন্দ্র।

রতন। তার পর?

ভবানন্দবাবু। তার পর। ব্রেজিলের রাষ্ট্রীয় সৈন্য বিভাগে একটা চাকরী জুটিয়ে নিলেন। ১৮৮৯ কি ৯০ সালে মাত্র পঞ্চাশ জন সৈন্য নিয়ে ব্রেজিল সরকারের পক্ষে সমুদ্রতীরে নাথীরয় নামে এক জায়গায় শত্রুপক্ষের সঙ্গে তার প্রচণ্ড লড়াই হোলো। একদিন গভীর রাত্রে হঠাৎ শত্রু পক্ষের দুর্গে আগুন লাগিয়ে দিলেন। দুর্গের অস্ত্রাগার পুড়ে ছাই হোয়ে গেল। সুরেশচন্দ্রের জয় হোলো। তাঁর অদ্ভুত রণকৌশলে খুশী হোয়ে ব্রেজিল সরকার তাঁকে লেফ্‌টেন্যাণ্ট্ করে দিলেন। তারপর একদিন নিজ প্রতিভাবলে তিনি হলেন ব্রেজিলের সৈন্য বিভাগের সর্বময় কর্তা অর্থাৎ কর্ণেল।

রতন। তার পর?

ভবানন্দবাবু। তার পর? তারপর আর নাই বা শুনলে রতন। মহাপুরুষদের জীবনের তো শেষ নেই। তাই সুরেশচন্দ্রের জীবনেরও মৃত্যু নেই। তবু মৃত্যু এসেছিল। ১৯০৫ সাল—। তখন আমাদের বাংলাদেশ জুড়ে চল্‌ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। লর্ড কার্জনের বাংলা বিভাগ রোধ করবার জন্যে বাঙালী তখন মরিয়া। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পথে পথে ঘুরে রাখী বেঁধে বেড়াচ্ছেন। পার্কে পার্কে চলছে লর্ড কার্জনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার। সেই বছরই বাইশে সেপ্টেম্বর মাত্র পয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে সুদূর ব্রেজিলের মাটিতেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন সুরেশচন্দ্র।

রতন। এমনি এমনি হঠাৎ মারা গেলেন?

ভবানন্দবাবু না-এমনি এমনি ঠিক নয়। হঠাৎ তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। দূরের শহর থেকে ডাক্তার আর অষুধ পত্র এসে পৌছোবার আগেই তিনি মারা গেলেন। (কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে) না, না, ভুল হোলো আমার রতন, ভুল হোলো। মারা তিনি যান নি। বাঙালীর বুকে নতুন আশা ও প্রেরণার সঞ্চার ক'রে বাঙালীর বাহুতে মহাশক্তির ঢেউ জাগিয়ে, তার উন্নত ললাটে বিজয়ীর জয়তিলক এঁকে তিনি নোতুন করে বাঁচলেন বাঙালীর ইতিহাসের পাতায়। এমন ক্ষণজন্মা পুরুষ জগতে বেশী জন্মগ্রহণ করেন না। জীবন এঁদের হয়তো দীর্ঘস্থায়ী নয়। কিন্তু এঁদের কীর্তি সৌরভ দেশ-কাল-পাত্রের সংকীর্ণ সীমা পেরিয়ে ছড়িয়ে যায় বাতাসে বাতাসে। আমরা বাঙালী। আমাদের মধ্যেই জন্মেছিলেন সুরেশচন্দ্র। এ আমাদের

পরম সৌভাগ্য। এসো, আমরা তাঁকে আবার স্মরণ করি। এসো সহস্রবার তাঁকে প্রণাম করি। তাঁর জীবন থেকে নতুন প্রেরণা নিয়ে দুরন্ত দুর্বার গতিতে জেগে উঠি।

(উইংগ্‌সের সাথে টাঙানো সুরেশচন্দ্রের প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে উভয়ের প্রণাম ও ধীরে ধীরে পদা)

যবনিকা

—

সাদা আর হলদে

(জাপানী উপকথা)

সতীন্দ্রনাথ লাহা

অনেক দিন আগে একটা পোড়ো নিচু জমিতে সাদা আর হলদে দুটি সুন্দর চন্দ্রমল্লিকা পাশাপাশি ফুটে ছিল। তারা যেন দু'টি রূপসী বোন, পাশাপাশি দাড়িয়ে সারা জায়গাটা মাতিয়ে তুলেছে, তাদের আলো করা রূপে।

এক বৃদ্ধ মালী হঠাৎ একদিন এদের দুটিকে দেখে ফেলে। এদের অপরূপ লাবণ্য দেখে বৃদ্ধ মালীর মন ভরে যায়।

হলদে ফুলটির দিকেই মালীর বেশী নজর পড়ে। হলদে সুন্দরীকে মালী জিজ্ঞেস করে,—কি গো হলদে মেয়ে! আমার সঙ্গে আসবে? আমি তোমাকে খাইয়ে পরিয়ে আরো অনেক সুন্দরী করে তুলতে পারি। রাজি থাক তো আমার সঙ্গে আমার বাগানে চল। ভাল ভাল রেশমের শাড়ি দোব। নানা রকম মিষ্টি জল দোব। আরো কতো কি দোব।

বুড়ো মালির কথা শুনে হলদে সুন্দরীর মন ভরে গেছে। লোভ বেড়ে গেছে। পাশে সাদা বোনটির কথা তার মনেই পড়লো না।

আহ্লাদে আটখানা হয়ে সে মালীকে বলে,—কেন যাব না! আমি তো তোমার সঙ্গে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে আদর করে কত কি দেবে, আর আমি তোমার সঙ্গে যাব না। তাও কি কখনো হয়? এখানে নিচু জমিতে পড়ে থেকে আমায় কি হবে? এখানে কেউ আমাকে চেয়ে দেখেও না। রূপের তারিফও করে না। এক দণ্ডও আমার এখানে ভাল লাগছে না, তুমি আমাকে হাত ধরে নিয়ে চল। হেলা ফেলায় পড়ে থাকতে চাই না।

বুড়ো হলদে সুন্দরীকে বুকে করে নিয়ে এসে নিজের বাগানে একটা ভাল জায়গা বেছে যত্ন করে বসিয়ে দিলে।

শ্বেতসুন্দরীকে তাঁর একমাত্র বোন ছেড়ে যাবার পর বেচারা দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তার শান্ত কোমলমুখখানি চোখের জলে মলিন হয়ে গেল। সারা বুকখানা তার ব্যথায় টনটন্ করে উঠলো। ফ্যালন জমির একধারে সে একাই পড়ে রইলো। যাকে ছাড়া সে আর কাউকে জানতো না, সে-ই যখন তাকে ছেড়ে গেল তখন না কেঁদে সে কখনো থাকতে পারে? মনের কথা শোনাতে একজনও কেউ পাশে রইলো না। মনপ্রাণ দিয়ে যাকে এতো ভালবাসতো সে-ই মালীর মিষ্টি কথায় ভুলে তাকে একলা ফেলে ড্যাং ড্যাং করে চলে গেল। শ্বেতসুন্দরী কাঁদে, আর নিজেই নিজের বুকে হাত বুলোয়।

যতই দিন যায় হলদে সুন্দরীর রূপ ততই আরো খোলে। মালির বাগানে তার আদরের শেষ নেই। এখন আর কেউ বলবে না,—এই সে সেই নিচু জমিটার এক পাশে সাদা ফুলটার গা-ঘেঁষে একদিন দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে কি এখন চেনবার উপায় আছে! রূপের গুমোরে সুন্দরীর মাটিতে আর পা পড়ে না এখন। রূপের জাঁকে তিনি যেন ফেটে পড়ছেন। সব সময় মেজে-ঘুজে পটের বিবিটি হয়ে আছেন।

তার লম্বা লম্বা পাপড়ি আরো ঠাস হয়ে কোঁচকালো। তার প্রতিটি পাতা কেমন থরে থরে করে সাজানো। তাকে দেখে অবাক হয়ে যায়। মালির আদরযত্নই ... এই অবশেষ ... এতো আরামে থেকেও হলদে সুন্দরীর মাঝে মাঝে মনে পড়ে তার হতভাগী সাদা বোনটির কথা। সে বুঝতে পারে না—একা একা এখনো কি করে সে নীচু পোড়ো জমিটার এক কোণে পড়ে আছে! হেলায় ছেলায় অমন করে একপেশে পড়ে থাকতে ভালও লাগে তার! তার সাদা বোনটি পোড়া বরাত নিয়ে কেন যে বেঁচে আছে সে তা' বুঝে উঠতে পারে না।

—মালিকে তখন তো (শ্বেত সুন্দরী) বললেই পারতো—আমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে চল, হলদে বোনকে ছেড়ে একলা আমি এই বন বাদাড়ে নীচু জায়গায় থাকবো কি করে? মালির কাছে নীচু হয়ে মিনতি জানাতে তখন বাধলো,—এখন থাকো বন-বাদাড়ে একলা পড়ে! বরাতে ভোগ না থাকলে কেউ কি ভোগ দিতে পারে!

রূপের গুমোরে হলদে সুন্দরী এখন সবাকে সরা জ্ঞান করে। ছোট বোনটির জন্যে তার মনে এতটুকু দরদ নেই। শুধু বিড় বিড় করে গালাগাল দেয়।

গাঁয়ের এক মোড়ল হঠাৎ একদিন বুড়ো মালির বাগানে এসে হাজির। তার মালিকের জন্যে একটা আসল জাতের বাছাই চন্দ্রমল্লিকার চারা চাই।

বুড়ো মালিকে তিনি বললেন যে লম্বা লম্বা অনেক পাপড়ি'য়ালা চন্দ্রমল্লিকা তার পছন্দ নয়। ষোলটি পাপড়ি'য়ালা চন্দ্রমল্লিকাই তিনি খুঁজছেন।

সাদর আহ্বান জানিয়ে বুড়ো মালি তাঁকে তার হলদে-সুন্দরীর কাছে নিয়ে গেল। মোড়ল হলদে চন্দ্রমল্লিকা

দেখে বললেন,—এর তো অনেক পাপড়ি, বড় মোটাসোটা, আমি আসল জাত চন্দ্রমল্লিকা চাই। ছিম্‌ছাম্‌ গঠন হবে। যোলটির বেশী পাপড়ি হলে চলবে না। মালির বাগানে তেমন চন্দ্রমল্লিকা নেই।

মোড়ল বুড়ো মালির বাগান ছেড়ে অন্যদিকে চলে গেলেন। বাড়ি ফেরার পথে মোড়ল ছাখে বন-বাদাড়ে পোড়ো নীচু জায়গাটায় একটা সাদা চন্দ্রমল্লিকা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

মোড়ল জিজ্ঞেস করে—কাঁদছো কেন? কি হয়েছে?

শ্বেত সুন্দরী বলে, আমাকে একলা ফেলে হলদে-দি' ড্যাং ড্যাং করে মালির কাঁধে চেপে তার সাজানো বাগানে চলে গেল, যাবার সময় আমার দিকে ফিরেও চাইলে না। একটা কথাও বললে না। বন-বাদাড়ে দুটো কথা বলতেও কেউ আমার কাছে আসে না। কেউ জিজ্ঞেসও করেনা কেমন আছি—তাই কাঁদছি। তা ছাড়া হলদে দি'র অনেক রূপ, অনেক গুণ, আমার তো সে সব কিচ্ছু নেই। পোড়া বরাত ছাড়া দেবতা কিছুই দেন নি আমাকে।

সান্ত্বনা দিয়ে মোড়ল বলে—মালির বাগান থেকে এই তো আমি ফিরছি। তোমার হলদে বোনের কথা আর বোলো না। তোমার রূপের সিকি ভাগও তার নেই। এক গাদা পাপড়ি থাকলেই তো আর ভাল বলবো না। আগে দেখবো বংশ, আগে দেখবো জাত, তারপর অন্য কথা। যোলটির বেশী পাপড়ি হলেই তার পতন, সে জাত হারিয়েছে।

মোড়লের আদর মাখানো কথা শুনে শ্বেত সুন্দরীর মুখে হাসি আর ধরে না। চোখের জল নিমেষে শুকিয়ে গেল। সারা অঙ্গে নাচের ঢেউ খেলে গেল। আর তার নেতিয়ে পড়া ভাব নেই, এখন সে ছোট্ট পা দুটিতে ভর করে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডগমগ করছে আনন্দে।

মোড়ল বলে—চল, তোমাকে নিয়ে যাই আমার মালিকের কাছে। তিনি খুব সুখী হবেন তোমাকে পেয়ে।

সাজানো পাল্কীতে বসিয়ে মাননীয় দেইমিওর প্রাসাদে শ্বেত সুন্দরীকে নিয়ে আসা হলো।

প্রাসাদের লোকজন সকলেই ছুটে এসেছে তাকে দেখতে। সকলের মুখেই এক কথা—এমনটি কোথাও কখনো দেখিনি, যেমন সুঠাম গঠন তেমনি কোমল মুখ। আহা! এ যে নিখুঁত সুন্দরী।

দূরে,কাছের নামকরা শিল্পীরা রং তুলি নিয়ে ছুটে এলো শ্বেত সুন্দরীর ছবি আঁকবে বলে। মুহূর্তের মধ্যে তার রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। দলে দলে লোক আসছে তাকে দেখতে।

রূপের এতো খ্যাতি শুনলে কা'র না ইচ্ছে করে—আয়নাতে মুখখানা একবার দেখি। কিন্তু শ্বেত সুন্দরীর আয়নার দরকার হলো না। তারই মুখখানি আঁকা আছে দেইমিয়োর সব আসবাবপত্রে, তার জামায়, তার হাতার আস্তিনে, গালার বাক্সে, গদীমোড়া কেদারায়—সর্বত্র। যে-দিকে চোখ ফেরানো যাবে সেখানেই যোল পাপড়িওয়ালা জাত চন্দ্রমল্লিকা।

সে কি জানতো তার রূপের এতো কদর! এতো মহিমা!

জাপানে একবাক্যে সকলেই স্বীকার করবে যোল পাপড়ি'য়ালা চন্দ্রমল্লিকার রূপের তুলনা নেই। শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সেই একমাত্র করতে পারে। তারই কদর সর্বত্র।

এদিকে মালির বাগানে হাজার পাপড়ির ভারে হলদে সুন্দরীর মাথা পড়েছে ঝুঁকে। পরের পর অনেক পাপড়ি ছড়িয়ে সে ভেবেছে—আমার মত রূপসী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। সে তো জানে না তাঁর ঝুঁকে পড়া মুখের আর কোন কদর নেই। কেউ ফিরেও চাইছে না তার দিকে।

একদিন মালি সকলকে বললে—মাথা মোটাটাকে জঞ্জালের গাদায় বসিয়ে দিয়ে আসি। বাগান থেকে আপদ বিদায় হোক।

— —

একটি মাথা, আটটি পা

গৌর আদক

একটি মাথা আটটি পা! কথাটা শুনে ভাবছ এটা আবার কি রে বাবা, মাথা নয় একটা হয়, পা আবার আটটা হয় নাকি, হাত-পা মিলিয়ে নাহয় চারটে হয়। এ একেবারে আটটা পা! এ আবার কি জন্তু? এই শুনেই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছ। এ রকম কত অদ্ভুত অদ্ভুত জন্তু আছে সমুদ্রের তলায় তা জান! সে তোমরা না দেখলে ভাবতেও পারবে না। হয়তো এমন একদিন শুনবে যে, এ রকম একটি জন্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে যার আটটি মাথা একটি পা।

যেটির কথা তোমাদের কাছে বলছি এটি কি জান? এটি একটি মাছ। কথাটা শুনে একেবারে অবাক হয়ে গেলে, নয়? যে মাছের আবার হাত-পা হয় নাকি!' শুধু হাত-পা নয়, আরো অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিষও দেখা যায় সমুদ্রের মাছের। এ মাছটির নাম হচ্ছে 'কটল' মাছ'। ঐ পাগুলিই হচ্ছে ওদের সব। ঐ দিয়েই ওরা সাঁতারও কাটে এবং শিকারও ধরে। পাগুলিই হচ্ছে ওদের শিকার ধরার এক-একটি অস্ত্র। ঐ অস্ত্রের উপরে দেখা যায় গোল গোল মাংস পেশীযুক্ত চামড়ার গুটি, ঐ গুটিগুলির মধ্যে বাতাস পরিপূর্ণ থাকে। যখন এরা

কোন শিকার ধরে তখন ওদের মধ্যে থেকে বাতাস বার করে দিয়ে শিকারকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে। তখন কার সাধ্যি আছে যে ওগুলোকে ছাড়ায়।

শিকার যদি একবার এরা দেখতে পেয়েছে তাহলে আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরে মেরে ফেলবে—সে থাক আর নাই থাক। এদের স্বভাবটাই এ রকম।

তা বলে মনে করো না যে এদের কোন শত্রু নেই। এরা যেমন একজনের শত্রু, তেমন এদেরও একজন শত্রু আছে। এদের সব চেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে মানুষ, কারণ বহু লোক আছে যারা এদের মাংস খেতে খুব ভালবাসে। আর জল জন্তুদের মধ্যে ভোঁদড়, মাছ তো আছেই—এ ছাড়া সমুদ্রের আরো অনেক বড় বড় মাছও আছে যারা এদের শত্রু। এই সমস্ত শত্রুর হাত থেকে এরা কেমন ভাবে রক্ষা পায় জান? তবে বলি শোন। এ কথাটা শুনলে সত্যি তোমরা বেশ একটু আশ্চর্য হয়ে যাবে। এই সমস্ত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রকৃতি এদের একটি উপায় দিয়েছেন। এদের শরীরের ভেতরে একটি থলি আছে, সেই থলিতে কালির মতন কালো রং-এর এক রকম তরল পদার্থ থাকে, যখনই কোন শত্রু এদের আক্রমণ করতে আসে সঙ্গে সঙ্গে সেই কালো রং-এর জিনিষটি জলে ছেড়ে দেয়, ছড়িয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জলের কিছুটা অংশ কালো হয়ে যায় এবং সেই কালোজলের মধ্যে এরা অদৃশ্য হয়ে গভীর জলে পালিয়ে যায়। তারপর আর কেউ খোঁজও পায় না এদের।
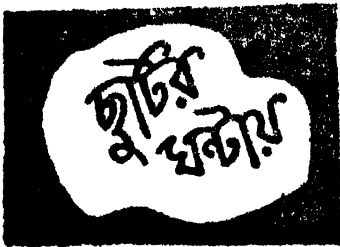
চিত্রগুপ্ত

এবারে তোমাদের আরেকটি আজব-মজার বিজ্ঞানের খেলার কথা বলছি। এ খেলাটির নাম—"কাঠি বা পেন্সিলের ডগায়-আঁটা সুরঙ্গ কাগজের সাপের উড়ন্ত-কারসাজি'। খেলাটির নাম যেমন অদ্ভুত-ধরনের, কলা-কৌশলও তেমনি বিচিত্র-অভিনব। আজব-মজার এই অপূর্ব-কারসাজিটি দেখিয়ে, তোমরা শুধু যে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে তাই নয়, নিজেরাও সেই সঙ্গে হাতে নাতে পরিচয় পাবে—রহস্যময়-অপরূপ বিজ্ঞানের এক অজানা-তথ্যের!

খেলাটির কলা-কৌশল আয়ত্ত করা খুবই সোজা-সহজ এবং এ খেলা দেখানোর জন্য টুকিটাকি সামান্য যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন, সেগুলিও নিতান্তই ঘরোয়া-সামগ্রী…তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে বিনা-ব্যয়ে এ সব উপকরণ অনায়াসেই জোগাড় করা যাবে। তাই গোড়াতেই এ সব উপকরণের একটা মোটামুটি ফর্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলার জন্য চাই—সুতো-বাঁধার একটা খালি কাটিম, একটি লম্বা পেন্সিল অথবা শক্ত-মজবুত কাঠি, সাধারণ নিমন্ত্রণ-পত্রে যেমন ব্যবহার হয়—তেমনি-ধরনের এক টুকরো ঈষৎ পুরু-মোটা কাগজ বা 'কার্ডবোর্ড',—কাগজ কাটবার উপযোগী একখানা ভালো কাঁচি, কয়েকটা আলপিন, এক টুকরো 'শোলা' কিম্বা 'কর্কের' (Cork) ছিপি, কাঠি-সমেত একবাক্স দেশলাই, মোটা-ছাঁদের বড় একটি মোমবাতি কিম্বা তেল-সলিতা-সমেত একটি 'কুপি আলো' (Oil lamp with oil and wick) এবং পেন্সিল-কাটার উপযোগী একখানা ধারালো ছুরি।

ফর্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, প্রথমেই পুরু-কাগজ বা পাতলা-কার্ডবোর্ডের একপিঠে চক্রাকারে পেন্সিলের রেখা টেনে নীচের ১ নং ছবির নমুনা-অনুসারে পরিপাটি ছাঁদে সাপের চেহারাটি এঁকে নিয়ে, কাঁচির সাহায্যে সেটিকে আগাগোড়া নিখুঁতভাবে ছাঁটাই করে নাও। তাহলেই নিতান্ত সহজ উপায়ে দিব্যি চমৎকার একটি কাগজের-সাপ বানিয়ে ফেলতে পারবে। তবে
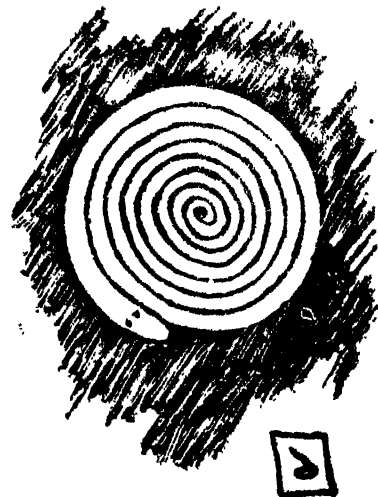
হুঁশিয়ার…এভাবে ছাঁটাইয়ের সময় খেয়াল রেখো—

কাগজে-আঁকা সাপের ল্যাজের মাঝখানে গোলাকার যে কালো-চিহ্নটি রয়েছে, অসাবধানতার ফলে, সেটুকু যেন কোনোমতেই কাটা না পড়ে—তাহলেই খেলার মজা সব মাটি হয়ে যাবে…আজব-কারসাজি দেখানোও সম্ভব হবে না শেষ পর্য্যন্ত। কাজেই এদিকে সজাগ-নজর রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

সুষ্ঠুভাবে এ কাজটুকু শেষ হলে. উপরের ২নং ছবির নমুনা-অনুসারে সমতল টুল, টেবিল, চেয়ার কিম্বা ঘরের জানলার ধারে অথবা দেয়ালের তাকের কিনারায় সুতোর কাটিমটিকে খাড়াখাড়িভাবে সাজিয়ে রেখে, কাটিমের মাঝামাঝি অংশে আপাদমস্তক এফোঁড়-ওফোঁড় যে গর্ত্তটি (hole) রয়েছে, সেই গর্ত্তের মাথায় বেশ পাকাপোক্ত-মজবুত ধরণে ঐ লম্বা পেন্সিল বা কাঠিটিকে এঁটে বসিয়ে দাও। এবারে উপরের ২নং ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে সদ্য-ছাটাই-করা কাগজের-সাপের ল্যাজের প্রান্তভাগটিতে সযত্নে সামান্য একটু ফুটো করে সেটিকে ছুরির সাহায্যে সরু-ছুচোলো-ছাদে-কাটা ঐ লম্বা পেন্সিলের বা কাঠির মাথায় গেঁথে বসিয়ে রেখে, পেন্সিল বা কাঠির ডগা পাকাপোক্তভাবে বন্ধ করে দাও—আলপিন দিয়ে শোলা বা কর্কের ছিপির টুপি এঁটে। তাহলেই দর্শকদের সামনে খেলার কশরতী দেখানোর সময়, দুরন্ত অবস্থায় ঐ উড়ন্ত কাগজের-সাপটি আর কোনোমতেই ছিপির টুপি-আঁটা পেন্সিল বা কাঠির মাথা থেকে ছিটকে-খসে বেরিয়ে আসার সুযোগ পাবে না—বরাবর যথাস্থানেই সুষ্ঠুভাবে বন্ধ-আটক থাকবে এবং খেলা-দেখানোর আসরের মাঝে আদৌ বিভ্রাট সৃষ্টি করবে না।

এমনিভাবে উদ্যোগ-পর্ব্বের ব্যবস্থাদি সেরে নেবার পর লোকজনের সামনে খেলার আসল-কারসাজি দেখানোর পালা সুরু করতে হবে। সে কারসাজি দেখানোর উপায়টিও নিতান্ত সহজ-সরল…বিশেষ কোনো হাঙ্গামার প্রয়োজন নেই।

আসরে খেলা-দেখানোর সময়, দর্শকদের চোখের সামনে কাটিমের-উপর-বসানো ছিপি-আঁটা পেন্সিল বা কাঠির ডগায় গেঁথে রাখা কাগজের-সাপের মূর্ত্তিটিকে, উপরের ৩নং ছবির নমুনা-অনুসারে সমতল একটি টুল, টেবিল বা চেয়ার অথবা ঘরের জানলার ধারে কিম্বা দেয়ালের তাকের প্রান্তসীমায় সুষ্ঠুভাবে স্থাপন করে সেটির ঈষৎ নীচে… অর্থাৎ ঠিক-তলদেশে, মোমবাতি কিম্বা তেলের আলোর কুপিটিকে বসিয়ে দেশলাই শলাকার সাহায্যে সলিতাটি জেলে দাও। তবে এই কাজটুকু খুব হুঁশিয়ার হয়ে করা দরকার…কারণ, দেশলাই-কাঠি জ্বালবার সময় সামান্য অসাবধান হলেই আগুনের শিখার স্পর্শে কাগজের সাপটি পুড়ে গেলেই কারসাজির কেরামতী সব পণ্ড হয়ে যাবে! কাজেই খেলা-দেখানোর সময় এদিকে সজাগ-দৃষ্টি রাখতে ভুলো না যেন!

বাতিটি জ্বলে ওঠার কিছুক্ষণ বাদেই দেখবে—বিজ্ঞানের বিচিত্র-নিয়মে কাগজের তৈরী সাপটি ক্রমশঃ দিব্যি-সজীব হয়ে উঠে অবিরাম-গতিতে ঘুরপাক খেয়ে কাঠিমের গর্ত্তে-বসানো পেন্সিল বা কাঠির নীচের দিক থেকে উপর দিকে নিজে-নিজেই বেশ স্বচ্ছন্দ্যভঙ্গীতে উড়ে চলতে সুরু করেছে। কাগজের সাপের এই আজব-লীলা দেখে আসরের দর্শকরা যে বিস্ময়ে অভিভূত হবেন—তার প্রমাণ তোমরা নিজেরাই চোখে দেখতে পাবে।

এমনটি কেন হয়, জানো?…এই আজব-কাণ্ড ঘটবার কারণ—শীতল-বায়ুর চেয়ে উষ্ণ-বায়ু ওজনে হাল্কা…কাজেই শীতল-বায়ুর চেয়ে উষ্ণ-বায়ু অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে উর্দ্ধে ভেসে ওঠে। কাটিমের উপর গেঁথে-রাখা কাগজের সাপের নীচে বাতি-জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের শীতল-বায়ুস্তর ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তখন সেই উষ্ণ-বায়ু উর্দ্ধে ভেসে উঠে যায় বলেই, উষ্ণ-বায়ুর গতিবেগে কাগজের সাপও ঘুরপাক খেয়ে উপরের দিকে উড়ে চলে। এবারের আজব-খেলাটির এই হলো—আসল রহস্য।

মনোহর মৈত্র

১। বুদ্ধির-দৌড়ের হেঁয়ালী ঃ

উপরের ছবিতে কালির আঁচড় টেনে যে সমান-রেখা (Straight Line) আঁকা রয়েছে, সেটির কোনো অংশ আদৌ স্পর্শ না করে, শেফ মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে এমন কৌশল ঠাওরাও, যে তার ফলে, খুব সোজা উপায়ে ঐ সমান-রেখাটিকে অনায়াসেই মাপে খাটো···অর্থাৎ সাইজে বেশ অনেকখানি ছোট দেখানো যাবে। বুদ্ধি খাটিয়ে এই কৌশলের সাহায্য যদি সে কাজটুকু যথাযথভাবে হাসিল করতে পারো তো, চিঠির কাগজে তার হুবহু নক্সা এঁকে সরাসরি 'কিশোর-জগতের' দপ্তরে পাঠিয়ে দিও। নক্সা-আঁকা হেঁয়ালির উত্তরটি সঠিক হলেই, পরের মাসের সংখ্যায় ছাপার হরফে তোমার নাম-ধাম ছেপে সবাইকে জানিয়ে দেবো—বুদ্ধিতে তুমি কতখানি বাহাদুর হয়ে উঠেছো এই কিশোর-বয়সেই।

রচনা : কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের

:রচিত ধাঁধা:

২।

কালী-পদপ্রান্তে থাকি—নাম দু'অক্ষরে,
উলটিয়ে দিলে মোরে—সংহার করি নরে!

রচনা : নবকুমার শাসমল (চেতুয়া রাজনগর)

৩।

গাছে আছে তিন নারিকেল—পাড়ো বাপু, খাই!
তোমরা দুই বাপ-বেটা, আমরা দুই বাপ-বেটা—
সবাই মোরা একটা-একটা করে যেন পাই।

রচনা : পরেশ মজুমদার (ওকরাবাড়ী)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র

উত্তর :

১। 'ক' তাসের হদিশ থেকে বোঝা যায় যে ৩নং তাসখানি সাহেব হতে পারে না। 'খ' তাসের হদিশ থেকে বোঝা যায় যে ২নং তাসখানি সাহেব হতে পারে না। সুতরাং ১নং তাসখানাই সাহেব। আবার 'গ' তাসের হদিশ থেকে বোঝা যায় যে ১নং আর ২নং তাস দুখানি, দুটিই হরতন হতে পারে না; এবং 'ঘ' তাসের হদিশ থেকে বোঝা যায় যে,দুখানি ইস্কাপনের তাসই পাশা-পাশি থাকবে। কাজেই ১নং আর ২নং তাস দুখানি হলো ইস্কাপন। এভাবে হিসাব করে বোঝা যায় যে ১নং তাসটি হলো ইস্কাপনের সাহেব, ২নং তাসখানি হলো—ইস্কাপনের বিবি এবং ৩নং তাসটি হলো—হরতনের বিবি। এই হলো—তাসের হেঁয়ালির উত্তর।

২। প্রথমাংশ,—১২; দ্বিতীয়াংশ,—২০; তৃতীয়াংশ,—৪; এবং চতুর্থাংশ,—৬৪। অর্থাৎ—

যোগফল :১২ + ৪ = ১৬; বিয়োগ ফল : ২০ − ৪ = ১৬; গুণফল : ৪ × ৪ = ১৬; ভাগফল : ৬৪ ÷ ৪ = ১৬; ১২ + ২০ + ৪ + ৬৪ = ১০০।

৩। কয়লা।

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক

উত্তর দিয়েছে :

পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), বুজু ও বিজু (কলিকাতা), কবি ও পাড়ু হালদার (পানাগড়), কুলু মিত্র (কলিকাতা), রিনি ও রণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), রাণা ও বুনা (কলিকাতা), সত্যেন, সঞ্জয়, মুরারি ও সুনীল (ভিলাই), পুপু ও ভুটিন মুখোপাধ্যায়

(কলিকাতা), জবা চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেবাশিষ ও শুক্লা মৈত্র (কলিকাতা), ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া), সৌম্যেন মুখোপাধ্যায় (কালনা), ন, চ, মি, ও ঞ, ম (রাইনান), সুকৃতিকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রাগপুর), গোপী মণ্ডল, রবি ঘোষ, মীনা ঘোষ, নারায়ণ ঘোষ, দেবপ্রসাদ ধাড়া (খুজুটীপাড়া), প্রেমানন্দ, সাতু, ধীরেন্দ্রনাথ ও সদানন্দ (হুনজা), চন্দন সাহা (আহানগর), শিবরাম, ক্ষুদিরাম, গোপালচন্দ্র ও শশাঙ্কশেখর মিশ্র (রুইনান সবং), মদন, বাণ্টি, ভারতী, মিঠু ও মঞ্জু সরকার (নন্দী), ভূদেব, সুদেব, জয়দেব, বাসুদেব, আলোক ও পুলক মুখোপাধ্যায় (রাজপুর), মিঠু ও চৈতালী বসু (কলিকাতা), রুমা, সীমা, দীপালী, রীতা, জয়ন্ত, অপর্ণা ও প্রদীপ বাগচী (কোঁচ), নন্দকিশোর ও রামকমল গোস্বামী (ভালাইগোড়া), অমলকুমার দে (দামিন্যা কবিকঙ্কণ), সীতেশ ও অলকা (জেনাদাড়ী), গোপালচন্দ্র পাজা (কলিকাতা), চিত্রলেখা, পূর্ণিমা, ইলা, বাসুদেব, রেভিরাম ও সুকুমার (কলিকাতা) জয়ন্তী, দীপঙ্কর, তীর্থঙ্কর ব্যানার্জী (মেদিনীপুর)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুবু ও মিঠু গুপ্তা (কলিকাতা), সব্যসাচী সেন (মান্দ্রাজ), শর্ম্মিষ্ঠা ও সঙ্ঘমিত্রা রায় (কলিকাতা), পিণ্টু, বুতাম ও বাপি (বোম্বাই), দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (নওয়াদা), জ্যোৎস্না, রুবি, বাপি ও মিঠু (তমলুক), কড়ি, ঝুমকো, টুকি, নণ্টু ও মিলু বসু (কাংরাসগড), সমীর, শিশির ও প্রবীর দে (চন্দননগর), বিশ্বনাথ অধিকারী (খুজুটপাড়া), বিবেকা-হল, বাণিজ্য-বিভাগ, দশম শ্রেণী, 'খ' বিভাগের সভ্যবৃন্দ (?) অশোক দাস, প্রিয়নাথ ও শীতল রায় (খুজুটীপাড়া), কাশী, কৃষ্ণ, শঙ্করী, ও প্রতিমা নন্দী (চকহানা), রীতা, রেণু, রুণু, সোমা ও মঞ্জুশ্রী (শিবপুর), পরাগময়, বিরাগময়, সুরাগময় ধীরাগময় শিপ্রাধারা ও মণিমালা হাজরা (বড়বড়িয়া), সুনীল, তপন ও ছায়া ঘোষ (বঙ্গছত্র), অশেষ ও অংশু বন্দোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাণী ও শুভ্র হাজরা (আডুই শাকনাড়া), অনুভা সেনগুপ্ত (যাদবপুর), ধর্ম্মদাস রায়, বিজয় গড়াই খাঁদু, বুলু, বাবলু ও বাবু (বিদ্যাধরপুর), রণবীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), সুকান্ত, সুমন্ত, সুশান্ত ও বনানী সিংহ (মদনপুর), অংশুকুমার মিত্র ও ইন্দ্রাণী রায় (কটক), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (হুগলী) তৃপ্তি, যুগল, মুকুল মিত্র (হুগলী)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

প্রমীলা দাস (বারুইপুর), হরিদাস মহলানবিশ (কলিকাতা), অজয় মিত্র (চন্দননগর), কল্যাণ, শচীন, রজত, ইন্দ্র ও বিমল (কলিকাতা), শকুন্তলা, শান্তনু, সাত্যকি, সুনন্দা ও সুমিত্রা হাজরা (নাগপুর), পৃথ্বীশ ও মনতোষ মজুমদার (কালনা), অভিরাম সেন-রায় (নন্দগাও), আনিসুর রহমান, নজরুল জেহান (?), পূরবী ও অমিতাভ কোঙার [বাতানল], অনিতা বসু [কটক], রবীন্দ্রনাথ পাল [লোহাপুর]।

শরৎ-এল

অর্পিত মজুমদার

শরৎ এল। মিষ্টি আলো,
সুয্যি-মামা ছড়িয়ে দিলো,
ধানের ক্ষেতে—নদীর জলে।
লক্ষ 'তারা'র প্রদীপ জেলে,
গগন তলে শরৎ শশী
মুছিয়ে দিলো—আঁধার মসী।
শিউলি গাছে শিউলি ফোটে
ঊষার আলোয়—মধুপ ছোটে,
কাজল-কালো—দীঘির জলে
পদ্মকলি চক্ষু মেলে।
নহবতের মিষ্টি সুরে...
জানিয়ে দিল কোন সুদূরে,
'মা'—আসছে—দশভুজা,—
হাসবো মোরা,—কেমন মজা!

খেলনা-পুতুলের ইতিকথা

পৃথ্বী দেবশর্ম্মা রচিত ও চিত্রিত

রঙচঙে দামী-বাহারী রেশমী-জরিদার কাপড়ের পোষাক-পরিচ্ছদ পরা, পায়ে রঙীন-মখমলের জুতো-আঁটা মহিলা-বেশী এই যে বিচিত্র 'ডল্' পুতুলটি দেখছো — এ-ধরণের পুতুল নিয়ে খেলা করতো খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের ইংলণ্ডের ছেলেমেয়েরা। তবে সেকালে এই সব সৌখিন-পুতুল তৈরী হতো কাঠের ছোট-বড় টুকরো খোদাই করে এবং সেগুলিকে ইচ্ছামতো সাজসজ্জায় সাজিয়ে। পরে এমনি পুতুল ক্রমশঃ তৈরী হতে লাগলো — কাদা-মাটি, কাঁচ, পোর্সিলেন প্রভৃতি নানা উপকরণে।

আর এই যে দোলন্ত-বিরাট কাঠের তৈরী চিত্র-বিচিত্রিত ছাঁদের ঘোড়া-খেলনার নমুনা দেখছো — এটির প্রচলন সুরু হয়েছে — পাশ্চাত্য-দেশে খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতক থেকে...
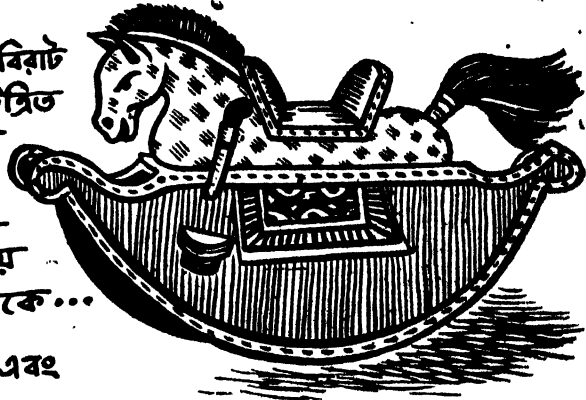
এবং
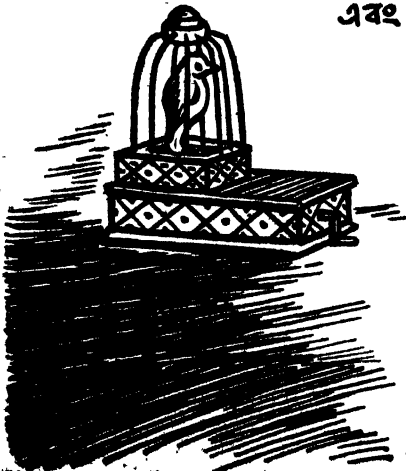
খাঁচায়-রাখা দম-দিয়ে চালানোর ব্যবস্থা সমেত এই যে বিচিত্র-ছাঁদের 'কলের পাখী' খেলনাটির নমুনা দেখছো — এমনি ধরণের আরো কত সব মজার-মজার দম-দেওয়া কলে-চলা খেলনার আবির্ভাব ঘটলো ইংলণ্ডে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ-শতকের শেষাশেষি। একালের মতো সেকালেও এমনি সব দম দিয়ে চালানো কলের খেলনা-পুতুলের রীতিমত কদর-আদর-আগ্রহ ছিল ছোট ছেলেমেয়েদের মহলে।

জলে-ডাঙ্গায়

—আব্রাহাম রচিত

শেষ অংক

অজিত চট্টোপাধ্যায়

বাসটা থামতেই নেমে পড়ল নিরঞ্জন। পিছনে পিছনে সুলতা, পা রাখবার জায়গায় সুটকেসটা ঠেসিয়ে রেখেছিল। কণ্ডাক্টর নিজের হাতে নামিয়ে দিল সেটি। ওরা নামতেই আবার নড়ল বাসটা, ধুলোবালি, মবিল আর ডিজেলের একটা মিশ্রগন্ধ নাকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। নাকের কাছে রুমাল চাপা দিয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল দুজনে। ধুলো-ওড়া একটু কম্‌লে এদিক ওদিক চাইল নিরঞ্জন। না, কেউ আসেনি। নিরঞ্জনই ভুল করেছে। অন্তত চাপরাশীটাকে সঙ্গে নিয়ে এলে দুর্ভোগটা কম হত।

অঘ্রাণের শেষ। বেলা মর মর। আলো নিভতে বেশী বাকী নেই আর। গ্রামটা বেশী দূর নয়। বাসের রাস্তা থেকে মাইলখানেকের মত হবে। কিন্তু ডাকবাংলোটা কোনদিকে হবে? নিরঞ্জন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে চিন্তা করতে লাগল। সুলতা হেসে বলল,—'কি, কেউ আসেনি'ত? আচ্ছা হাকিম হয়েছিলে বটে। চৌকিদারেও খাতির করে না।'

নিরঞ্জন কথাটা গায়ে মাখল না। ওকে বিয়ে করে খুব আশাভঙ্গ হয়েছে সুলতার। নিরঞ্জন তা জানে। তাই সময় আর সুযোগ পেলেই ওর পদমর্যাদার অক্ষমতাটা খোঁচা দিয়ে জানাতে সে ভোলে না। একটু গম্ভীর হয়ে নিরঞ্জন উত্তর দিল,—ভাবছি তোমার কথা, মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে ডাকবাংলো পর্যন্ত যেতে পারবে কি? ভারী কষ্ট হবে—

ততক্ষণে চৌকিদারটা কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। আভূমি প্রণত হয়ে বলল,—'একটুকুন দেরী হয়ে গেল মশায়। বাসটাকে আসতে দেখে পেরায় দৌড় লাগিয়েছি।

ওর কাঁধে সুটকেসটা তুলে দিল নিরঞ্জন।

সুলতা বলল—ডাকবাংলোটা কতদূর হবে?'—

—'দূর কুথায়?' লোকটা একগাল হেসে ফেলল। বলল,—'হুই যি দেখা যায়'। সে আঙুল বাড়িয়ে একটা বাড়ীর দিকে নির্দেশ করল।

অপরিসর মেঠো পথ, ওরা হেঁটে চলল। দুপাশে পাকা ধানের ছবি। মাঠের উপর শুয়ে পড়েছে গাছগুলো। ধান কেটে নিয়ে গোরুর গাড়ী চলেছে। ধুলো উড়ছে পথে। শব্দ হচ্ছে ক্যাঁচকোঁচ। আকাশে শংখচিল পাক খেয়ে খেয়ে ঘুরছে। কোথায় দূরে মেঠোসুরে গান করছে রাখালছেলে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছল।

খড়ে ছাওয়া ডাকবাংলো, নতুন হয়েছে, পাকা মেঝে। দেওয়াল মাটির হলেও বেশ নিকোনো পোঁছানো, বারান্দায় চেয়ার পেতে একটা সিগারেট খাচ্ছিল নিরঞ্জন। সুলতা ঘরের মধ্যে ষ্টোভ জালিয়ে রান্নাবান্নার চেষ্টা করছে। নিজের মনে নানাকথা ভাবছিল নিরঞ্জন। অতীতের কথা, যে অতীত আজ টুকরো টুকরো ছবিতে বারংবার উঁকি দিয়েছে ওর মনে।

প্রায় বিশ বছর আগে। এই গ্রামেই পড়াশুনো করত নিরঞ্জন। ওর বাবা তখন এখানকারই সাবরেজিষ্ট্রার। কতদিন আর ছিল নিরঞ্জনরা? বছর দুই হবে। তার বেশী নয়। টুরে আসবার আগে থেকে ওর মনে সেই পুরানো অতীতটাই বারবার কথা বলছিল। পুরানো বন্ধুবান্ধব আর মাষ্টারমশাইরা কে কেমন আছেন? কি করে সবাই?...

সুলতা এসে ওর অন্যমনস্কতা দেখে ডাকল।

—'এই, কি ভাবছ বসে?'—

—'কই, কিছু না তো'।—নিরঞ্জন হাসল।

—'চা খাবে এখন? করে আনব'—

—'আনো না। তুমিও এক কাপ নিয়ে এসে বস।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল নিরঞ্জন। চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে নিল গায়ে, এ অঞ্চলে শীত আছে খুব। ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে কামড় বসিয়ে দেয়।

সেলসট্যাক্সের অফিসার নিরঞ্জন। কেস করতে এসেছে এখানে। জায়গাটা গঞ্জ মতন। এখন বিস্তৃত হয়েছে খানিকটা, বড় বড় দোকানপাট হয়েছে। তারাই ট্যাক্স জোগায়। দোকানের খাতাপত্র দেখে ট্যাক্স ঠিকমত ধার্য করতে প্রতিবছরই আসতে হয় একজন অফিসারকে। নিরঞ্জনের এবারই প্রথম। কলকাতা ছেড়ে মফঃস্বলে এসেছে বেচারা। টুরে আসবে শুনে সুলতা ছাড়েনি। খাস কলকাতার মেয়ে। জন্ম, শিক্ষাদীক্ষা সব ওখানেই। ওর কাছে মফঃস্বলই বিভীষিকা। পল্লীগ্রামের তো কথাই উঠে না।

টুরের কথা শুনে সুলতা প্রবল আপত্তি জানাল। বলল,—'রাত্তিরে আমি একা থাকতে পারব না কিন্তু। আমাকে তাহলে কলকাতায় রেখে আসবে চল।'

কলকাতায় মানে বাপের বাড়ীতে। নিরঞ্জন তাই হাসল। বলল,—আমাকে তো প্রতিমাসেই বেরোতে হবে দু তিন দিন করে। তুমি কি ফি বারই কলকাতা যাবে?'

শেষটা রফা হল। টুরে সুলতাও যাবে, নিরঞ্জনের সঙ্গে। ডাকবাংলোতে উঠলে এমন আর অসুবিধা কি!

—'তাছাড়া', সুলতা বলল—'এইটুকু শহরে থেকে হাঁফিয়ে উঠেছি বাপু। তোমার সঙ্গে একআধবার ঘুরে এলে মনটা ভাল হয়। তা সে পাড়াগাঁই হোক, আর যাই হোক।'

রাত্তিরে শুয়ে প্রথমটা ঘুম আসেনি নিরঞ্জনের। নতুন জায়গা আর অপরিচিত পরিবেশে চোখের পাতা জোড়া লাগেনি। তবু সারাদিনের ক্লান্তিতে শরীরটা ভারী হয়ে উঠেছিল। একটা ঘুমঘুম ভাব আচ্ছন্ন করে তুলেছিল তাকে।

চারিদিক নিঝুম আর নিঃস্তব্ধ, শীতের রাত, নিঃসাড়, নিস্পন্দ পৃথিবী, শিয়ালের দল ডেকে উঠল বাঁশবনে। ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল একটা নিশাচর পাখী।

ঠেলা দিয়ে সুলতা ঘুম ভাঙাল ওর।—'এই, তুমি ঘুমোবে নাকি এখন?'

নিরঞ্জন রসিকতা করল।—'না, সারারাত জেগে তোমায় পাহারা দেব।'

—'ফাজলামি রাখ। আমার ভীষণ ভয় করছে।

—'ভয় কিসের? আমি তো আছি।'

—'হুঁ, ভারী বীরপুরুষ, এই ডাকবাংলোয় শুয়ে আছি, যদি চুরি ডাকাতি করতে আসে।'

—'ভয় নেই তোমার, কেউ আসবে না।'

—'তুমি হাত গুণতে জান বুঝি?'

চোখ বড়ো বড়ো করে নিরঞ্জন বলল—'বড় বড় সব ব্যবসাদার থাকতে ছোটখাটো সরকারী অফিসারের ঘরে চোর আসবে কেন? চোর যে লজ্জা পেয়ে যাবে। আসবে কিসের জন্য?'

একটু পরেই মুচকি হেসে বলল,—'অবিশ্যি তুমি আছ। তাহলে চোর আসতেও পারে।'

অন্ধকারেই একটা মোক্ষম চিমটি খেল নিরঞ্জন। একটু কাৎরে উঠল।

সুলতা বলল,—'কাল বিকেলের বাসেই উঠছ তো?'

—'কাল বিকেলে? তা কি করে হয়? আটটা কেস আছে। অন্তত দুটো দিন লাগবে। তাছাড়া এখানে পুরাণো বন্ধুবান্ধব, মাষ্টারমশাইরা আছেন। দেখাসাক্ষাত করে যাব না?'

মুখ ঘুরিয়ে সুলতা শুয়ে রইল। নিরঞ্জন বুঝতে পারল ভীষণ রেগে গেছে সে। এখন আর রাগ কমবার আশা নেই। নিরঞ্জনও ঘুমোতে চেষ্টা করল।

সকাল হতেই দোকানীরা ভীড় করল ডাকবাংলোর বারান্দায়। একটা টেবিল আর চেয়ার পেতে ঘরের মধ্যে বসেছিল নিরঞ্জন। লাল মলাটের খতিয়ান আর জাবেদা খাতাগুলি পরীক্ষা করছিল। এখানে সেখানে দাগ দিয়ে কেনাবেচার হিসেব মিলিয়ে নিচ্ছিল। মাঝে মাঝে ছোট ছোট কাগজে লিখছিল কিছু।

দোকানীরা কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ হতে চাইছিল।—'কাল আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো স্যর?'

—'কষ্ট? না তেমন কিছু নয়—

—'রাতে খাওয়া দাওয়ার কোন অসুবিধে···

নিরঞ্জন হেসে ঘাড় নাড়ল।

ওদের আন্তরিকতা ভাল লাগছিল নিরঞ্জনের। তবু খানিকটা গম্ভীর হয়ে বসেছিল সে। ছোটবেলায় হয়ত এদের দোকানেই পেন্সিল খাতা কিনতে গিয়েছে নিরঞ্জন।

একজনকে জিজ্ঞেস করল,—'আপনার বেচাকেনা তো বেশ বেড়ে গিয়েছে।' নিরঞ্জন ফাইলের পুরাণো রেকর্ড-গুলো ঘাটছিল।

—'আজ্ঞে হ্যাঁ। জায়গাটাও দিন দিন বড় হচ্ছে। দেখুন না, পনের বছর আগে এখানে একটা এম-ই স্কুল ছিল মাত্র। আর এখন বিরাট হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল। অফিস বলতে ছিল পোষ্ট-অফিস আর রেজিষ্ট্রি অফিস, এখন ছোট বড় মিলিয়ে পনের ষোলটার কম হবে না।

ঘরের মধ্যে রোদ এসে পড়েছে। নরম আর নিরুত্তাপ, উত্তুরে হাওয়া ঢুকছে জানালার ফাঁক দিয়ে। ডাকবাংলোর পিছনের একটা বুনো ঝোপে তিন চারটে বুলবুলি উড়ে উড়ে বসছে।

হঠাৎ খাতা থেকে মুখ তুলে নিরঞ্জন প্রশ্ন করল,—'আপনার এই খাতাপত্র কে লিখেছেন বলুন তো?

—'সরকারমশাই এসে পৌঁছুননি হুজুর'। লোকটি সবিনয় নিবেদন করল। বলল,—'বুড়োমানুষ। ছাড়াতেও মায়া করে। তিনদিনের ছুটি নিয়ে মেয়ের বাড়ী গিয়েছেন। আজও এলেন না।'

নিরঞ্জন অফিসারের ভঙ্গীতে রায় দিল—'খাতাপত্র ঠিক লেখা হয়নি আপনার। এখানে সেখানে ভুল।' খানিকটা বিরক্তি প্রকাশ করল। লোকটি ভীত ত্রস্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ওর দিকে।

ছোট ছোট কাগজে এটা সেটা লিখে নিল নিরঞ্জন—সদরে গিয়ে রায়টা লিখে ফেলবে। এই স্লিপ কাগজগুলোই তখন ভরসা।

বিকেলের দিকে গরম প্যাণ্ট আর কোট পরে বেরুল নিরঞ্জন। চৌকিদারটাকে রেখে গেল সুলতার কাছে। একটু ঘুরে দেখবে। শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত স্থানটা, কত দিনকার কত সব কথা ভীড় করে মনে আসে।

প্রথম ধাক্কাটা খেল নিরঞ্জন স্কুল বাড়ীটার কাছে এসে। সেই ছোট্ট এম-ই স্কুলটা কোথায় হারিয়ে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছে তিনতলা উঁচু বিল্ডিং। স্কুল বাড়ীর সামনে নানাধরণের ফুলগাছ লাগিয়েছে ওরা। শীতের প্রথমে মরশুমি ফুলে ভরে গেছে বাগানটা। কিন্তু সেই খড়ের ছাওয়া এম-ই স্কুলটা? বুনো ঝোপেঝাপে ভরা প্রাঙ্গণটুকু? নিরঞ্জন বুঝতে পারল সে ছবিটা শুধু মনেই আঁকা হয়ে থাকবে। আর কোনদিন দেখতে পাবে না।

বাজারটার কাছে এসে একটু দাঁড়াতে হল। একটা সিনেমা হল হয়েছে। সামনের দেওয়ালে কোন একটি অভিনেত্রীর ছবি। পূবদিকে খানিকটা ধোঁয়া ধোঁয়া কি যেন বেরুচ্ছে। নিরঞ্জন শুনল একটা রাইস মিল হয়েছে ওদিকে। আর সিনেমা হলটা বারো মাস চলে না। শুধু শীতের সময়।

পথে লোক চলাচল কম। ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে পড়েছে। নিরঞ্জন একটা খড়ে ছাওয়া বাড়ীর কাছে এসে দাঁড়াল।

দাওয়ায় একজন বুড়োমানুষ বসে। ওকে দেখে বলল,—'কাকে চাই আপনার?'

—'সন্তোষকে। সন্তোষ রায় আছে?'

—'ঐ'ত পেরিয়ে এলেন দোকানটা। গলির মোড়ে তেলে ভাজার দোকান আছে না? ওখানেই পাবেন ওকে—''

এবারও ফিরতে হল। তেলেভাজার দোকানে ছেলে-বেলার বন্ধু সন্তোষ রায়কে খুঁজে পাওয়া যাবে না। নিজের গায়ের দামী গরম স্যুটটার দিকে চাইল একবার। এই পোষাকে ছোট্ট তেলেভাজার দোকানে গিয়ে কোথায় বসবে?—

ডাকবাংলোতে ফিরতেই সুলতা এগিয়ে এসে বলল,—'শোনো, এক বুড়ো ভদ্রলোক তোমার জন্য কখন থেকে বসে। যত বলি আপনি কাল সকালে আসবেন তা কিছুতেই শোনেন না।'—

নিরঞ্জন ঘরে ঢুকে দেখল সুতির চাদর জড়িয়ে এক বুড়ো ঘরের কোণে বসে ঝিমুচ্ছে। ওকে দেখে শশব্যস্ত হয়ে দাঁড়াল।

—'কি চাই আপনার?'—

—'সকালে মালিকের সঙ্গে আসতে পারিনি। মেয়ের বাড়ী গিয়েছিলাম হুজুর। কাল কিছুতেই ছাড়ল না মেয়েটা'—

—'বেশ'ত তাতে কি হয়েছে ?'

—'আমার খাতা লেখা নাকি ঠিক হয়নি ? সব ভুল হয়েছে হুজুর।'

নিরঞ্জন উত্তর দিল না। চুপ করে রইল।

—'বেশী ট্যাক্স হলে আমাকে ছাড়িয়ে দেবে। বুড়ো বয়সে কি খাব তাহলে ? আপনি একটু দেখুন হুজুর –

—'খাতাপত্র লেখেন না কেন ঠিকমত ?'—

—'আগে স্কুলে মাষ্টার ছিলাম অংক করাতাম। এখন বুড়োবয়সে'—লোকটা চাদরের খুঁটে চোখ দুটো মুছল।

—'মাষ্টার ছিলেন ? কোথায় ?'—

—'এখানেই। আগে এম-ই স্কুল ছিল,—তখন পড়াতাম।'

—'ছাড়লেন কেন ?'

—'ওরা ছাড়িয়ে দিল। বলল,—বড় স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ মাষ্টারের প্রয়োজন নেই আর।

লণ্ঠনটা তুলে বুড়ো মানুষটার মুখখানা ভাল করে দেখল নিরঞ্জন। পাকা চুল দাড়িতে মুখখানা আচ্ছন্ন। তবু অংকের মাষ্টার গুণধরবাবুকে চেনা যায় বৈকি। এত বুড়ো হয়ে গেছেন মাষ্টারমশাই। আজ খাতা লিখছেন দোকানে।

গুণধরবাবুকে হাত দুটো ধরে চেয়ারে বসাল নিরঞ্জন। ভিতর থেকে সুলতাকে বলল,—চা আর খাবার দিতে। ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে জিজ্ঞেস করল,—'আপনি আমাকে কখনও দেখেছেন !'

—'আপনাকে হুজুর ?'—মাষ্টারমশাই ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

পরিচয়টা ইচ্ছে করেই চেপে গেল নিরঞ্জন। কিছু বলল না। শুনলে মাষ্টারমশাই হয়ত চাঁদ পান হাতে। কিন্তু আর একটা দিক রয়েছে। সুযোগ বুঝে এখানকার ব্যবসায়ীর দল মাষ্টারমশাইকে পাঠাতে শুরু করবে তার কাছে। তখন ফ্যাসাদে পড়বে নিরঞ্জন। শ্যাম আর কুল দুই ভেসে যাবে।

ডাকবাংলো ছেড়ে আর একবার বেরুতে হল নিরঞ্জনকে। এসে দাঁড়াল মাষ্টারমশাইয়ের মালিকের দোকানে। ওকে দেখে সবাই কাজ ফেলে উঠে দাঁড়াল।

নিরঞ্জন বলল,—'আপনার সেই বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে সব বুঝিয়ে বলেছেন। আমারই ভুল হয়েছিল মশায়। খাতাটা সুন্দর লিখেছেন তিনি। আচ্ছা আসি—

মালিক কিছু বলবার আগেই নিরঞ্জন দোকান থেকে নেমে এল। মুখ ফিরিয়ে আবার বলল,—'ওকে ছাড়াবেন না যেন! বুড়ো হলেও ভদ্রলোক কাজের। সুন্দর রেখেছেন হিসেবপত্র।'

ভোরের দিকে সুলতার ঘুম ভাঙিয়ে নিরঞ্জন বলল,—
—'চল, আজ সকালের বাসেই ফিরে যাই। শরীরটা ভাল লাগছে না।' সুলতা ওর গায়ে কপালে হাত বুলিয়ে দিয়ে দেখল একবার।

বলল,—'কই তেমন কিছু তো দেখছি না, তোমার কেসগুলোর কি হবে ?'

—'পরে দিন দিয়ে দেব। চৌকিদারটা বলবে'খন যে শরীর খারাপ। তাই, চলে গেছেন।'

অল্প-অল্প রোদ উঠেছে। চৌকিদারটার কাঁধে সুটকেসটা চাপিয়ে ওরা এগিয়ে চলল। আগে আগে সুলতা। নিরঞ্জন পিছনে। মাঠের পথ শিশিরে ভেজা। গাঁয়ের শেষে আগুন জ্বালিয়ে কারা যেন শীত পোয়াচ্ছে।

কি ভেবে একবার পিছন ফিরে চাইল নিরঞ্জন। সব কিছু বদলে গেছে। আর এক দিন থাকলে আরো কত কি দেখতে হত নিরঞ্জনকে। তার চেয়ে সরে পড়াই ভাল।

বড় ভাল অংক কষাতেন গুণধরবাবু। খুব সুন্দর করে বোঝাতে পারতেন। নিরঞ্জনের সব মনে পড়ল। কিন্তু পরক্ষণেই হাসল সে। আসল অংকটাই কষতে পারেননি মাষ্টারমশাই। জীবনের অংকটা। তাই আজ শেষ অংকে জাবেদা খতিয়ান হাতে দাঁড়াতে হয়েছে নিজের ছাত্রের কাছে।

অনেকটা এগিয়ে গেছে সুলতা।

নিরঞ্জন দম দেওয়া খেলনা-গাড়ীর মত নিষ্প্রাণ হেঁটে চলল।

গিরিবালা

দুর্গানামের ফল

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
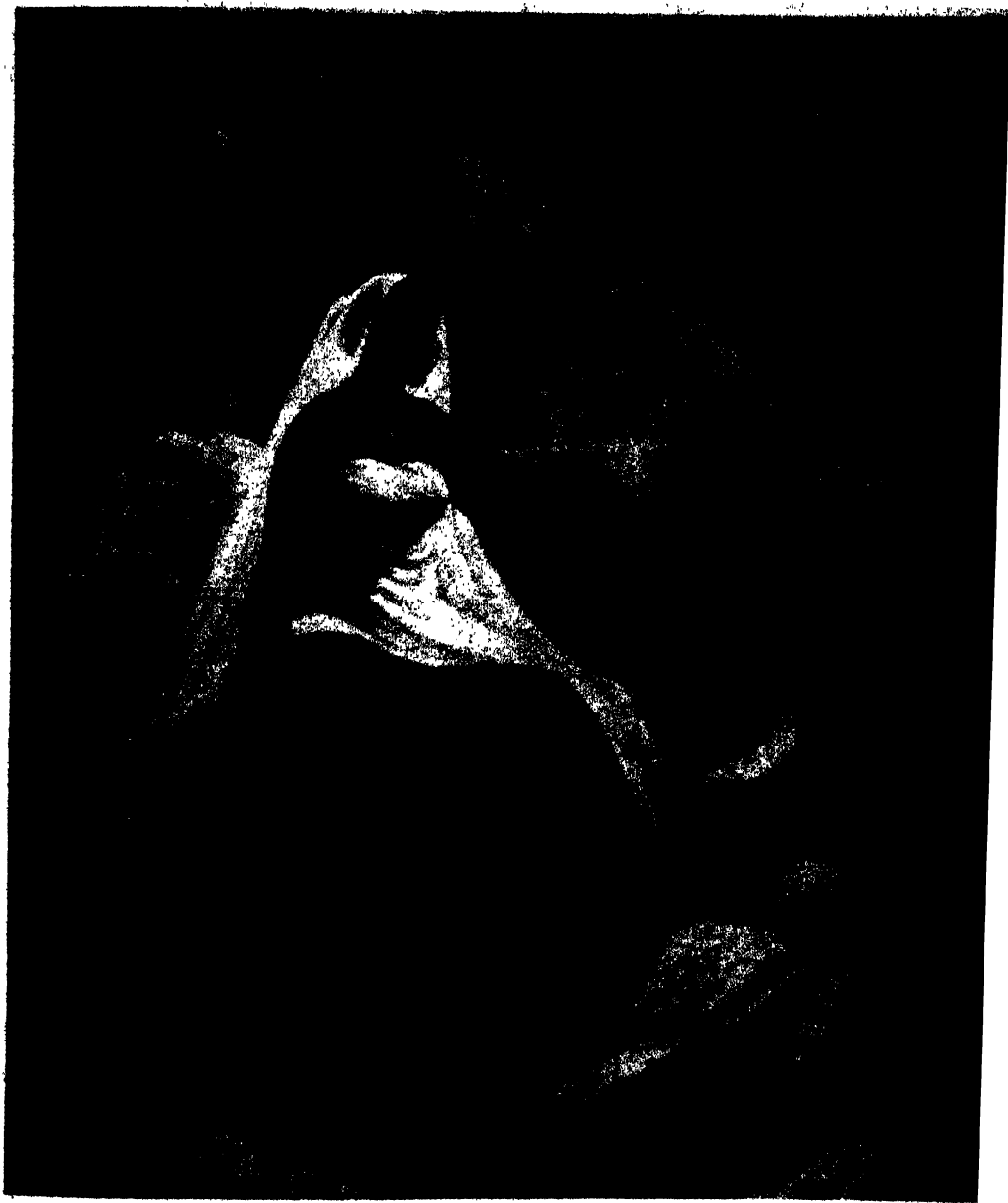
হরিচরণের নাম হরিচরণ হইলেও লোকে তাহাকে দুর্গানাম বলিয়া ডাকিত। অবশ্য তাহার একটু কারণও ছিল। সে যখন দীক্ষা লয়, তখন তাহার গুরুদেব বলিয়াছিলেন, 'বাবা! সর্ব্বদা দুর্গা দুর্গা জপ করিবে।'

দুর্গা দুর্গেতি দুর্গেতি দুর্গানাম পরং মন্ত্রঃ।
যো জপেৎ সততং চণ্ডি জীবন্মুক্ত সঃ মানবঃ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা—এই দুর্গানামই পরম মন্ত্র, এ নাম যে মানব সতত জপ করে সে জীবন্মুক্ত। শ্রীগুরুদেবের মুখে এই কথা শুনিয়া পর্য্যন্ত হরিচরণ দুর্গা দুর্গা বলিতে আরম্ভ করিল। হরিচরণ সকালে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে উঠে, অবিরাম দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে স্নান করিয়া আসে, পূজা জপান্তে দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে শাঁখার পুঁটুলি কাঁধে করিয়া যাত্রা করে।

হরিচরণ জাতিতে শাঁখারি, শাঁখা বিক্রয় দ্বারাই তাহার জীবিকানির্ব্বাহ হয়। এইরূপ কিছুদিন দুর্গা দুর্গা করার পরই সকলে সম্মুখে তাহাকে দুর্গা দাস আড়ালে দুগো পাগলা বলিতে লাগিল। হরিচরণ সে সব কথায় লক্ষ্য না করিয়াই আপন ভাবে দুর্গা দুর্গা করিত। সারাদিন দুর্গা দুর্গা করিত, শাঁখা বিক্রয় করিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার পর কর্ম্মক্লান্ত দেহে দুর্গা দুর্গা বলিয়া শয়ন করিত। তাহার এইরূপ অবস্থা হইল—সে নিদ্রিত থাকিলেও তাহার জিহ্বা জপ করিত।

তাহার এইরূপ মতিভ্রম দেখিয়া কামিনী-কাঞ্চনের ক্রীতদাস ভোগবিষ্ঠার কৃমি প্রতিবাসিগণ স্থির করিল—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে—নচেৎ দিবারাত্রি দুর্গা দুর্গা করিবে কেন? যখন রোগে, শোকে, সুখে দুঃখে সকল সময়েই হাসিমুখে দুর্গা দুর্গা করিতেছে তখন এ পাগল না হইয়া যায় না। এ একটা পুরা পাগল। যাঁহারা বয়স্ক তাঁহারা দুর্গাদাস বলিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিলেন, আর দুষ্টছেলেরা ছড়া বাঁধিয়া বলিত—

দুর্গা বলে দুগো খ্যাপা শাঁখা নিয়ে যায়।
দুর্গা তার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়॥

হরিচরণের শরীরটা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত, সে পিছু ফিরিয়া দেখিত বাস্তবিক দুর্গা তার পিছুতে আছে কিনা। আর ছেলেরা হাত তালি দিয়া হাসিয়া উঠিত এবং তাহার গায়ে যে ধুলা না দিত এমন নয়। সে সে-সব অত্যাচার সহ্য করিত ও শাঁখার পুঁটলি কাঁধে করিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে প্রস্থান করিত।

যাই হোক, অবিরাম দুর্গানাম করার জন্য তাহার পিতামাতার দত্ত 'হরিচরণ' নামটি লোপ হইয়া গেল। জনসমাজে দুর্গাদাস বলিয়া সে পরিচিত হইল, তাহাতে তাহার কোন দুঃখ ছিলনা। সে এইরূপ দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর 'দুর্গা দুর্গা' বলিয়া অতিবাহিত করিতে লাগিল।

২

বৈশাখ মাস। দুপুরবেলা রৌদ্র খাঁ খাঁ করিতেছে, দুর্গাদাস শাঁখার পুঁটুলি কাঁধে লইয়া দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে তারিণীপুরের সীমা ছাড়াইয়া মাঠে পড়িল।

কিছুদূরে যাইবার পর মাঠের মাঝখানে একটি দীঘি আছে, দুর্গাদাস দীঘি পার হইয়া গিয়াছে এমন সময় তাহার কানে একটা আওয়াজ গেল—ওছেলে 'আমায় শাঁখা দিবে?' দুর্গাদাস এমন মিষ্টি কথা কখনও শুনে নাই। সে পিছু ফিরিয়া দেখিল একটা মেয়ে [illegible] দাঁড়াইয়া পা রগড়াইতে রগড়াইতে তাহাকে ডাকিতেছে। সে পিছু ফিরিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। অনেক বড় বড় লোকের বাড়ী সে শাঁখা পরাইয়াছে, কিন্তু এমন রূপ কখনও দেখে নাই। সে বলিল, 'কেন দিব না মা!'

একটা বট-গাছের তলায় সে বসিল। ধীরে ধীরে মেয়েটি তাহার নিকটে আসিল, সে অপরূপ রূপ দেখিয়া দুর্গাদাস ভাবিল যে, ছেলেরা বলে দুর্গা তাহার পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়—আজ সত্যই তাহা হইল না কি। মেয়েটি বালিকা কি যুবতী দুর্গাদাস ঠিক করিতে পারিল না। কখনও তাহার মনে হইতেছে যুবতী—কখনও মনে হইতেছে বালিকা। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে কাছে আসিয়া বলিল, 'বেশ ভাল দেখে আমায় শাঁখা দাওনা ছেলে।'

দুর্গাদাস বাছিয়া বাছিয়া খুব ভাল শাঁখা বাহির করিয়া পরাইতে লাগিল। যেমন মেয়েটির অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে, অমনি তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া সে তাহা সামলাইয়া লইল। দুর্গা দুর্গা বলিয়া শাঁখা পরাইতেছে। মেয়েটি—হ্যাঁ ছেলে! অমন করে দুর্গা দুর্গা বলছ কেন? আর বললে কি হয়?'

দুর্গাদাস কথা কহিতে পারিতেছে না। খানিক পরে দুর্গাদাস বলিল, 'গুরু ঠাকুর দুর্গা দুর্গা বলতে বলেছেন তাই বলি মা, আর দুর্গা দুর্গা বললে মা দয়া করেন।

—হ্যাঁ ছেলে, তুমি মাকে দেখেছ?

—না মা! আমি এমন পুণ্যি কি করেছি যে মাকে দেখতে পাবো?

—কেন দুর্গা দুর্গা করলে কি দেখা যায় না? যদি দেখা না যায়, তবে ডাক কেন?

দুর্গাদাস বলিল, 'মা! আমি মুখ্যু মানুষ অত জানিনে। যদি নাম করলে দেখতে পাওয়া যায় তবে দেখা পাবই।'

শাঁখা পরান শেষ হইল। মেয়েটি হাসিতে হাসিতে বলিল, ওই যা! ও ছেলে! আমার কাছে তো পয়সা নেই। তোমায় কি ক'রে দাম দেবো? তোমার শাঁখা খুলে নাও।'

দুর্গাদাস যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। 'না থাকুকগে এয়োস্ত্রী মানুষ সাক্ষাৎ ভগবতী, আমি হাতথেকে শাঁখা খুলতে পারবো না; আমার দামের কাজ নেই, বলিয়া পোঁটলা বাঁধিতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল, 'তা হবে কেন? আমিই বা তোমার কাছে অমনি শাঁখা পরব কেন? তুমি যেও না, তুমি এক কাজ কর; গ্রামের ভিতর যাও। আমার বাবার নাম উমাপদ ভট্টাচার্য্য। তাঁর কাছ থেকে দামটা আনগে। বলগে আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছে, দাম দিন। তিনি যদি বলেন—কৈ আমার মেয়ে তো নেই! মেয়েকে তো এখনও দেখিনি। তুমি সে কথা শুনো না, বোলো—এই মাত্র শাঁখা দিয়ে এলাম। মেয়ে নেই বল্লে শুনবো কেন? ওই দুর্গাঠাকুরের পায়ের তলায় সিঁদুরের কৌটাতে একটা আধুলি আছে তিনি দিতে বলেছেন বলো। যাও ছেলে, যাও।'

'আবার যাব আবার যাব—'বলিতে বলিতে দুর্গাদাস অগ্রসর হইল, আর মেয়েটি জলে নামিল।

[৩]

দিন তো আর চলে না। দোকানদার অনেক দিয়াছে তাহার গতিক খারাপ বুঝিয়াও এখনও ধার দিতেছে। প্রতিবেশীরা বুঝিয়াছে উমাপদ ভট্টাচার্য্যকে ধার দিলে আর পাইবার আশা নাই, তথাপি ধার দেয়।

উমাপদ ভট্টাচার্য্যের অবস্থা যে চিরদিন এরূপ তা নয়, আগে অবস্থা খুব ভালই ছিল। এক্ষণে উমাপদ ভট্টাচার্য্য দীক্ষা লইল—দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মতি ও অবস্থা দুইই পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বাড়ীতে দুর্গা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা, পাঠ, নামজপ, ধ্যান, আত্মবিচারে দিবা-রাত্রের অধিকাংশ ভাগ কাটাইতে লাগিলেন। সাধ্বী পত্নী অন্নপূর্ণাও পূজা-পাঠের সঙ্গিনী হইয়া সহধর্ম্মিণী নামের সার্থকতা করিলেন। পাঁচ ছয় বৎসরের পুত্র শিবরাম দুর্গা দুর্গা করিয়া হাততালি দিয়া নৃত্য করিয়া পিতা-মাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিত। তাহাদের ভোগের বাসনা ক্ষীণ হইতে লাগিল। শ্রীভগবানের মন্দির দেহ; তাহার রক্ষার জন্য আহার, আর রহিল অতিথিসেবা।

উমাপদ ভট্টাচার্য্য নিত্য ব্রাহ্মমুহূর্ত্তের পূর্ব্বে উঠিয়া দুর্গা দুর্গা বলিতে বলিতে স্নান করিয়া আসিতেন, প্রাতঃ-সন্ধ্যা, জপ ইত্যাদি সারিয়া পুষ্পচয়ন করিতেন, তদন্তে গীতা ও চণ্ডী পাঠ করিতেন, অধ্যায় অন্তে পূজা, হোম, মার ভোগ দিতেন, তাহার পর বৈশ্বদেব-বলি, গোগ্রাস দিয়া অতিথির অপেক্ষা করিতেন। অতিথি সেবার পর প্রসাদ-গ্রহণ করিয়া দেবীভাগবত, মহাভাগবত, দেবীপুরাণ, দেব্যুপনিষৎ ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনায় অপরাহ্ণ অতি-বাহিত করিতেন। যথাসময়ে সায়ংসন্ধ্যা সারিয়া দেবীর আরত্রিক করিয়া শীতল দিয়া জপে বসিতেন। বহুক্ষণ জপান্তে লীলাচিন্তা করতঃ কণ্টকিতদেহে আত্মবিচার করিয়া সায়ংকৃত্য সমাপনান্তে অতিথি থাকিলে অতিথির সেবার পর কিছু প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। আবার মধ্য-রাত্রে জগৎ যখন নিস্তব্ধ হইত তখন হৃৎকমলে চিত্ত ধারণা করিয়া মার আশাপথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

(৬)

অন্নপূর্ণা সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। তিনি দুর্গা দুর্গা করিতে করিতে সাংসারিক কাজ করিতেন। গৃহকর্ম, স্বামীসেবা দেবসেবা, অতিথিসেবা লইয়াই তিনি সর্ব্বদা থাকিতেন। জিহ্বা কিন্তু একদণ্ড দুর্গা দুর্গা না করিয়া স্থির থাকিত না।

উমাপদ ভট্টাচার্য্যের পৈতৃক যজমান কয়েক ঘর ছিল। উপনয়ন ও বিবাহ ভিন্ন আর পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, কাজেই যজমান থাকা-না-থাকা সমান হইয়াছিল। তিনি অন্য কোন প্রকারে অর্থ চেষ্টা করিতেন না।

উপার্জ্জনের ঔদাসীন্যে ধীরে ধীরে অভাব আসিয়া আপন প্রভাব দেখাইতে লাগিল। বাজারে ধার হইয়া পড়িল, যদি কোন দিন অভাবের কথা মনে পড়িত, অমনি গুণ গুণ করিয়া গাহিতেন—

ভাবিলে শঙ্করীপদ সমপদ কোথা পাবে।
সমপদনাশা সে পদ নইলে শিব কেন
শ্মশানবাসী হবে॥

গাহিতে গাহিতে তৃপ্ত হইয়া যাইতেন, অভাব আর বোধ হইত না। প্রাণের ভিতর একটা সাড়া পেতেন, অভয় আশ্বাস মাভৈঃ ধ্বনি শুনিয়া দুর্গা দুর্গা করিতেন।

একটি সংশয় তাঁহার মনে মাঝে মাঝে উঠিত—দেবতার দর্শন ভাবের উপরই হয়, অথবা চর্ম্মচক্ষে হয়। কলির জীব চর্ম্মচক্ষের দ্বারা দেবদর্শন লাভ করিতে পারে কিনা? এ সংশয়ের কোন মীমাংসা করিতে পারেন নাই। জয়-দেবের গীতগোবিন্দ "দেহি পদপল্লবমুদারম্" মিলাইয়া দিয়াছিলেন একথা তিনি জানিতেন। গীতাভক্ত ব্রাহ্মণকে উপলক্ষ্য করিয়া "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই বাক্যের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন, সে উপাখ্যানও তাঁহার অবিদিত ছিল না। তুলসীদাস মহারাজজী একাধিক বার শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ করিয়া ছিলেন—তিনি তুলসীদাসের জীবনীতে তাহা পড়িয়াছিলেন। সাধক রামপ্রসাদের বেড়া বাঁধার কথা ও যে শুনেন নাই তাহা নয়; তথাপি তাঁহার সংশয় ছিল। ক্রমশঃ যখন অধিক ঋণ হইয়া পড়িল তখন তিনি বলিলেন—না, আর ঋণও করিব না, কাহারও নিকট প্রার্থনা ও করিব না। মা দেন খাব, না দেন না খাব; ঋণ করিয়া অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত করিব কেন? দেখি মা কি ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি মা ছাড়া আর কাহারও কাছে প্রার্থনা করিব না। সন্ধ্যাপূজাদি করিলেন; আর আর ভোগ দিবার কিছুই নাই। মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, তিনি ধ্যানমগ্ন, শিবরাম ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিতেছে, অন্নপূর্ণা দুর্গা দুর্গা করিতেছে। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ও শিবরাম! একবার বাহিরে এস না! শিবরাম চক্ষু মুছিয়া বাহিরে যাইল, একটু পরে একটি ঝুড়ি করিয়া কয়েকটি আম ও চারিটি সন্দেহ লইয়া বাড়ীতে আসিয়া মাকে দিয়া বলিল, মা—কে একজন ঠাকুরের ভোগের জন্য আম সন্দেশ দিয়া গেলেন। কে যে দিয়াছেন অন্নপূর্ণার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, অশ্রুসিক্ত নয়নে সেই সমস্ত লইয়া গিয়া দেবীর সম্মুখে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে উমাপদর ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন মার ভোগের যোগাড় হইয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব কোথায় পেলে? অন্নপূর্ণা বলিল, কে দিয়া গেছেন। উমাপদ মনে করিলেন আমার অভাব আর ত কেউ জানে না, তবে কি তিনি নরাকারেও আসেন। আচ্ছা দেখা যাক্।

দেবীর ভোগ দিলেন—বলিলেন শিবরামের জন্য মা পাঠিয়েছেন, আমরা উপবাস করি এস। তাহাই হইল। দুর্গা দুর্গা করিয়াই ব্রাহ্মণ দম্পতীর দিবারাত্র চলিয়া গেল। দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্নে কে এক ঘটী দুধ শিবরামের হাতে দিয়া গেল, তাহার দ্বারা ভোগ হইল, শিবরামের জীবন রক্ষা হইল। ব্রাহ্মণ দম্পতী দুর্গা দুর্গা করিয়া দিবারাত্র উপবাসে অতিবাহিত করিলেন। তৃতীয় দিন পূজা শেষ হইল, মধ্যাহ্ন অতীত হইয়া গেল, ক্ষুধার জ্বালায় শিবরাম অত্যন্ত কাঁদিতেছে, তাহাকে আর কিছুতেই রাখা যাইতেছে না।

উমাপদ প্রতিমার নিকট গিয়া মার মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মা তুমি কি আছ? তিনি যেন তাঁর অধরকোণে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখিলেন। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাড়ী আছেন? একবার বাহিরে আসুন, আমরা অতিথি।

উমাপদ তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া দেখিলেন, তিন জন সন্ন্যাসী দাঁড়াইয়া আছেন; সাদরে বাহিরের ঘরে লইয়া গিয়া পা ধোয়াইয়া দিয়া বসিবার আসন দিলেন, তারপর পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। এইবার তাঁহাদের মধ্যে যিনি প্রধান তিনি বলিলেন, কাল হইতে আমাদের আহার হয় নাই আমরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত আমাদের আহারের ব্যবস্থা করুন।

উমাপদর মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল,—কি করবো কেমন করে অতিথির সেবা করবো—কিছুই যে নাই, কি হবে অন্নপূর্ণা! অন্নপূর্ণা দুর্গা দুর্গা বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। উমাপদ উন্মাদের মত মার কাছে ছুটিয়া গিয়া বলিল, মা অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। ওমা বিপৎতারিণী, ওমা মহাভয়নাশিনী, মা দুর্গা রক্ষা কর মা। এমন সময়, দেওয়ালের গায়ে মুণ্ডমালাতন্ত্রের একটা শ্লোক লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহাতে লক্ষ্য পড়িল।

মহোৎপাতে মহারোগে মহাবিপদসঙ্কটে।
মহাদুঃখে মহাশোকে মহাভয়সমুত্থিতে॥
য স্মরেৎ সততং দুর্গা জপেৎ য পরমং মনুঃ।
স জীবলোকে দেবেশি নীলকণ্ঠত্বমাপ্নুয়াৎ॥

দুর্গা দুর্গা দুর্গা। মা আমি নীলকণ্ঠ হইতে চাইনা আজ এ দায় হইতে রক্ষা কর। ছেলে যায় দুঃখ নাই, অতিথি বিমুখ হয়ে যায়। রক্ষা কর মা।

বাহির হইতে অতিথিরা ডাকিলেন, দেরী কচ্ছেন কেন? আমরা কি অন্যত্র যাব? উমাপদ পাগলের মত বলিতে লাগিলেন—বাড়ী থেকে অতিথি ফিরে যাবে. কি করবো? কাহার কাছে কি প্রার্থনা করবো! আমি মার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি, মা ভিন্ন আর কাহারও কাছে কিছু চাহিব না, কি করি, কি করি? বাহির হইতে অতিথিরা বলিলেন—আমরা অত্যন্ত পিপাসিত, একটু জল নিয়ে আসুন। অন্নপূর্ণা সেইখানে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতেছে, সর্ব্বনাশ হলো, আজ অতিথি বিমুখ হয়ে যায়, মা-মা মাগো।

উমাপদ বলিলেন, 'অন্নপূর্ণা! ভাঁড়ার ঘর বেশ ক'রে তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ, যদি কিছু মিষ্টি থাকে নিয়ে এস, এখানে জল আছে এই নিয়ে যাই।' অন্নপূর্ণা চলিয়া গেল। সহসা একটা বিড়াল লাফাইয়া পড়িয়া জলের কলসীটা ফেলিয়া দিল। কি সর্ব্বনাশ! বাড়ীতে জল পর্য্যন্ত নাই! না না, অতিথি বিমুখ দেখবো না—তার আগে আত্মহত্যা করি'—এই বলিয়া তাড়াতাড়ি মায়ের হাত হইতে খাঁড়া গ্রহণ করিয়া আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলেন।

ঠিক্ এমন সময় দুর্গাদাস গিয়া ডাকিল, 'ভট্টাচার্য্য মশাই! ও ভট্টাচার্য্য মশাই! কি ক'রছেন, একবার আসুন না। তিনি, খাঁড়া ফেলিয়া বলিলেন, 'আবার কে ডাকে?' দেখি আরও কি আছে।' মা-মা বলিতে বলিতে বাহিরে গেলেন। দুর্গাদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি বাপু?' অতিথিরা বলিলেন, 'দেরী করেন কেন?' তিনি যোড়হাতে কাতরস্বরে বলিলেন, 'দয়া ক'রে একটু অপেক্ষা করুন।'

দুর্গাদাস বলিল, 'আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন, দাম দিন।'

—কি বলছো?

—আপনার মেয়ে শাঁখা পরেছেন দাম দিন।

উমাপদ সাশ্চর্য্যে বলিলেন, 'সে কি! আমার তো মেয়ে নাই!' দুর্গাদাস বলিল, 'আপনি ও কথা বলবেন—তিনিও তাহা বলেছেন। আমায় তিনি ব'লে দিয়েছেন—তুমি সে কথা শুনো না।'

—মেয়েকে কোথায় দেখলে?

—ঐ মাঠের মাঝখানে দীঘিতে।

—এ কি ব্যাপার—আমার মেয়ে। আচ্ছা দেখতে কেমন! দুর্গাদাস বলিল, 'দুর্গা প্রতিমা, আমি অমন রূপ আর কখন দেখিনি। হাঁ, তিনি ব'লে দিয়েছেন—আপনার প্রতিমার পায়ের তলায়, সিঁদুরের কৌটায় একটা আধুলি আছে আমায় দিতে।'

তিনি তাড়াতাড়ি ছুটিলেন, দেখিলেন—সত্যই একটা সিঁদুরের কৌটা—তাহাতে একটা আধুলি রহিয়াছে। তিনি সেই আধুলিটা লইলেন। এ কি! আবার একটা আধুলি রহিয়াছে! আবার লইলেন, আবার আধুলি। 'এ কি ব্যাপার! শুধু কৌটায় এত আধুলি কোথা থেকে আসছে!' হাত পূর্ণ হইয়া গেল। একটা ছোট কৌটায় এত আধুলি! একি ব্যাপার! এ কি ইন্দ্রজাল। মার মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, 'বাজিকরের মেয়ে! একি বাজি মা!"

এমন সময় বাহিরে আবার কে ডাকিল, 'ভট্টাচার্য্য মহাশয়! বাড়ী আছেন?' ভিতর হইতে বলিলেন, 'কে হে?' এই জমিদারবাবুরা মায়ের ভোগের জন্য সিধা পাঠাইয়াছেন। তিনি বাহিরে গিয়া দেখিলেন—এক বড় ধামায় দশ বারোজনার উপযোগী চাল, ডাল, তেল, নুন, তরকারি, আম, সন্দেশ। এইবার উমাপদ—'করুণাময়ি করুণাময়ি বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। একটু স্থির হইয়া বলিলেন, 'মহাশয়গণ! এইবার আপনাদের আহারের ব্যবস্থা ক'রছি।' ঘরপানে চাহিয়া দেখিলেন—কেহই নাই। কি সর্ব্বনাশ! অতিথি বিমুখ হইয়া গেলেন। দুর্গাদাস বলিল, 'ও ঘর থেকে কেউ বেরোন নি; এখান দিয়ে কেউ যান নি।' উমাপদ বলিলেন, 'ও গৃহের ত অপর দ্বার নাই—এ প্রকাশ্য দিবালোকে কি আমার দৃষ্টি-ভ্রম হলো? আমি কি জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্ন দেখিতেছি মা মা! এ কি—প্রহেলিকা মা! দুর্গা দুর্গা দুর্গা! মা! একি পরীক্ষা মা! মা যেমন বিপদ দিস্, তেমনি বিপদ থেকে উদ্ধার করিস্।'

তিনি আম ও মিষ্টি দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া দুর্গাদাস ও শিবরামকে প্রসাদ দিলেন; নিজে চরণামৃত লইলেন। দুর্গাদাস ভোজন করিবার পর তাহার হাতে আধুলি দিয়া উমাপদ বলিলেন, 'বাবা! কোথায় আমার মেয়েকে দেখেছ শীঘ্র আমায় সেখানে নিয়ে চল!' দুর্গাদাস কেমন হতভম্ব হইয়া গিয়াছে। সে অতিথিগণকে য দেখিয়াছিল, তারপর তাহারা কোথা দিয়া চলিয়া গেল কিছু ঠিক করিতে পারিল না। যাহা হউক উভয়ে দীঘি দিকে ছুটিলেন।

'কোথায় দেখেছিলে বাবা?' দুর্গাদাস বলিল, 'এ স্থানে ছিলেন।' সে স্থানে কেহ কোথাও নাই। 'ও ম অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস চূর্ণ ক'রে দিয়ে কোথা লুকালি মা! একবার দেখা দেমা, একবার আয় ম এত করুণা তোর আমি তা'ত জানি না মা।' উন্মা মা মা বলিয়া বালকের মত আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

দুর্গাদাস এইবার ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল—আ কাহাকে শাঁখা পরাইয়াছে, এতক্ষণে তাহার জ্ঞান হইল সেও হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। 'ওরে! আ পেয়েও পেলুম না রে, ওরে! ধরেও ধরতে পারলুম ন রে' বলিয়া বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে কাঁদিতে লাগিল 'ওমা তোকে পেয়েও চিনতে পারলাম না। ওমা একবা দেখা দে মা। তুই শাঁখা পরেছিস্—একবার বল ম আমার কথা সত্য কর মা!'

ধীরে ধীরে দীঘির কালজল ভেদ করিয়া শাঁখা-প লাল টুকটুকে দুখানি ননীর মত হাত বাহির হইল। 'ঐ যে মা' বলিয়া দুজনে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

প্রার্থনা

শান্তি মুখোপাধ্যায়

আঁধার ঘরের মাণিক আমার—হে রাজাধিরাজ!
তোমার কাছে জানাই আমার, এই মিনতি আজ।—
পূজার মত নিষ্ঠা নিয়ে
কায়মনপ্রাণ সঁপে দিয়ে
ক'রে যেন যেতে পারি জীবনভরা কাজ।
যতই তুচ্ছ হ'কনা কেন
করিনা কাজে ঘৃণা যেন
মাথায় ক'রে তুলে নিতে পাইনা যেন লাজ।

সব দেহ যে দেবালয়
সদাই যেন মনে রয়
সঙ্গ যেন পাই তোমারই সবার সঙ্গ মাঝ।
মুখোস পরা অভিনয়
আর যেন না করিতে হয়
অঙ্গ হ'তে নাও খুলে নাও, এ ভণ্ডামির সাজ।
প্রবঞ্চনা শঠতা আর
হিংসা দ্বেষ দুর্ব্ব্যবহার
ধ্বংস কর হৃদয় হ'তে, শিরে হানি বাজ।
তোমার কাছে জানাই আমার এই মিনতি আজ॥

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

ইহার পর "কৃষ্ণকুমারীর" আখড়াই বসিয়াছিল। এই সময়ে গিরিশবাবু আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। তিনি ভীমসিংহের অংশ গ্রহণ করেন। নাটোরের রাজা চন্দ্রনাথের পরামর্শে পোষাকের আদর্শ প্রস্তুত হইল। রাজা চন্দ্রনাথ এই সময়ে কলিকাতায় ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অভিনয় দেখিতে আসিতেন এবং ইহার হিতৈষী ছিলেন। তিনি কয়েকটি পোষাক, কয়েকখানি তলওয়ার, আর একটা মছলন্দ দান করেন। গিরিশবাবু প্রথমদিন "ভীমসিংহ" অভিনয় করিয়াই বিনা কারণে দল ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ে অর্দ্ধেন্দুবাবু একাই "ভীমসিংহ" এবং তাঁহার নিজের অংশ "ধনদাস" অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে এক ব্যক্তি দ্বারা যুগপৎ দুই বিরোধী রস—করুণ ও হাস্য রসের অভিনয় দেখিয়া রাজা চন্দ্রনাথ মুগ্ধ এবং বিস্মিত হইয়া অর্দ্ধেন্দুবাবুকে উপহার দিয়াছিলেন। তখন সহরে যে সকল প্রাত্যহিক ঘটনা ঘটিত, তাহা হইতেই অভিনয়ের বিষয় নির্ব্বাচিত হইত। ইহার জন্য পূর্ব্ব হইতে বিশেষ আয়োজন করা হইত না। অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃতবাবু, গিরীশবাবু, মহেন্দ্রবাবু প্রভৃতি প্রধান প্রধান অভিনেতারা কোন একটা বিষয়ে আপন আপন বক্তব্য স্থির করিয়া লইয়া ষ্টেজে বাহির হইয়া পড়িতেন। এইরূপে "চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সরী" "মডেল স্কুল" ক্যাম্বেল সাহেবের "সাবডেপুটি একজামিনেশান" "পাবলিক সবস্ক্রিপসান লিষ্ট", "গ্রীণরুম অফ্ এ প্রাইভেট থিয়েটার" "বিলাতীবাবু" "মুস্তবী সাহাবকা পাক্কা তামাসা" "ভারতে যবন" "পরীস্থান" ইত্যাদি বিষয় অভিনীত হইয়াছিল। এইগুলিতে অর্দ্ধেন্দুবাবু ও অমৃতবাবুকে সর্ব্বাপেক্ষা খাটিতে হইত। এই সময়ে রাজা চন্দ্রনাথের ন্যায় সার্ ডাব্লিউ, ডাব্লিউ, হাণ্টার ইঁহাদের আর একজন হিতৈষী বন্ধু হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি প্রতিরাত্রে ইংরাজ দর্শক সংগ্রহ করিয়া আনিতেন, এক মঙ্গলবারে তখনকার বড়লাট সাহেব নিজে থিয়েটার দেখিতে আসেন। তিনি পূর্ব্বে কোন সংবাদ না দিয়াই অভিনয়ের প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একেবারে দরজায় গাড়ী আসিয়া লাগিলে, সকলেই জানিতে পারিলেন, বড়লাট সাহেব আসিয়াছেন। এই সময়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাও ইঁহাদের বিশেষ হিতৈষী হইয়াছিলেন। তাঁহারা আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতা করিতেন বটে, কিন্তু কখনও দোষ প্রদর্শনে ত্রুটী করিতেন না বা কেবল প্রশংসামূলক সমালোচনা ছাপিতেন না। এই সময়ে অমৃতবাবুকে প্রকৃত-প্রস্তাবে ম্যানেজার বা অধ্যক্ষের কার্য্য করিতে হইত। ১২৭৯ সালের বর্ষার প্রাক্কালে (১৮৭৩ মার্চ্চ) ন্যাশান্যাল থিয়েটার অভিনয় বন্ধ করিতে বাধ্য হন। বন্ধ হইবার কিছু-দিন পূর্ব্বে গিরীশবাবু আবার আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। যে দিন থিয়াটারের শেষ অভিনয় হইল, সেই দিন গিরীশ-

বাবুর রচিত নিম্নলিখিত গানখানি গাহিয়া নাট্যসম্প্রদায় সেসময়ের জন্য বিদায় লইলেন। গানটি থিয়েটারের উক্তিতে লেখা। বন্ধ হইবার কিছু পূর্ব্বে গিরীশবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা নাটকাকারে পরিবর্ত্তন করিয়া দেন। উপন্যাস হইতে নাট্য গঠন এই প্রথম। ইহার অভিনয় হইয়াছিল।

"কাতর অন্তরে আমি চাহি বিদায়।
সাধি ওগো সুধীব্রজ ভুল না আমায়॥
এ সভা রসিকে মিলিত,
হেরিয়ে অধীন-চিত, আধ-পুলকিত,
আধ হুতাশে শুকায়।
অস্তগামী দিনমণি,
যেমতি হেরি নলিনী অভিমান-বিমলিনী,
আধ হাসি চায়॥
মমপ্রতি ঋতুপতি,
হয়েছে নিদয় মতি, হাসাইছে বসুমতী,
আমারে কাঁদায়।
* * * *
নির্ম্মাইয়ে নাট্যালয়, আরম্ভিব অভিনয়॥"

সান্যালদিগের বাড়ীতে ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে আসিয়া ৺আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) দৌহিত্র ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় সাধারণ থিয়েটার করিতে প্রলুব্ধ হন। ছাতুবাবুর বাড়ীতে ইহার আখড়াই বসে। অনেকগুলি মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোক এই দলের হিতৈষী ও পরামর্শদাতা ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত (W. C. Dutta Esqr.) পণ্ডিত শ্রীসত্যব্রত সামশ্রমী প্রভৃতি। অভিনেতার মধ্যে শরচ্চন্দ্র ঘোষ, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (স্থূলকায়), দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, বটকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন ঘোষ, শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র মজুমদার, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন। বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শরচ্চন্দ্র ঘোষ ইহার প্রধান উদ্যোক্তা। হাটখোলার মহাজনদিগের মধ্যে অনেকে এই দলের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। ছাতুবাবুর বাড়ীর সম্মুখের মাঠে ৪০ টাকায় জমী ভাড়া লইয়া শরৎবাবু খোলার ঘরে এই নাট্যশালা স্থাপন করেন। ১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র (১৮৭৩ আগষ্ট) বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয়। "শর্ম্মিষ্ঠা" এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। প্যারীমোহন রায় ইহার ধনাধ্যক্ষ ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠার অভিনয়ে ইহাদের সুবিধা হয় নাই। শেষে মাইকেলের "মায়া-কানন" ও "বিষ কি ধনুর্গুণ" নামক দুই খানি নূতন নাটকের গ্রন্থস্বত্ব ক্রয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল। শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয়ের সময় মাইকেল জীবিত ছিলেন না। নূতন নাটকের গ্রন্থস্বত্ব তাহার পূর্ব্বেই ক্রীত হইয়াছিল। নূতন থিয়েটার হইলেও বেঙ্গলে মাইকেলের মৃত্যুর পর একদিন তাঁহার নামে সাহায্যরজনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উমেশবাবু, পণ্ডিত সত্যব্রত ও মাইকেলের পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারে প্রথম হইতেই বারাঙ্গনা লইয়া স্ত্রীচরিত্র অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ছাতুবাবুদিগের বাটীর দেওয়ান রামচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের যাত্রার দলে স্ত্রী অভিনেত্রী দেখিয়া শরৎবাবু এ বিষয়ে সাহসী হইয়াছিলেন। প্রথমে চারিটি মাত্র স্ত্রীলোক লওয়া হইয়াছিল। এই চারিজন ব্যতীত আবশ্যকমত পুরুষেও স্ত্রীচরিত্র অভিনয় করিত। শর্ম্মিষ্ঠার ন্যায় "মায়াকাননেও" বেঙ্গল থিয়েটার সুবিধা করিতে পারিলেন না। অখিলবাবু মায়াকাননের প্রকাশক হইয়াছিলেন। এই সময়ে এলোকেশী মোহান্ত-বিভ্রাট লইয়া দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটার এই হুজুগে "উঃ মোহান্তের এই কি কাজ" নামে একখানি নাটক অভিনয় করেন। ইহা হইতেই এই দলের যথেষ্ট প্রতিপত্তি হয়। তাহার পর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী নাটকাকারে গঠিত করিয়া দেন। দুর্গেশনন্দিনীর অভিনয়েই বেঙ্গল থিয়েটারের যশঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িল। দুর্গেশনন্দিনীতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রথমে অভিনয় করেন,—

অভিরাম স্বামী	বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়।
জগৎসিংহ	শরচ্চন্দ্র ঘোষ।
ওসমান	হরিদাস দাস (বৈষ্ণব)
বিমলা	গোলাপ।
তিলোত্তমা	জগত্তারিণী।
আসমানী	এলোকেশী।
আয়েসা	চোরে, ওরফে চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ইহার পর ১২৮০ সালের ফাল্গুন মাসের শেষে (১৮৭৪। ২৮ ফেব্রুয়ারী) বেঙ্গল থিয়েটারে "রত্নাবলী" ও "এঁরাই আবার বাঙ্গালী সাহেব" নামে প্রহসন অভিনীত হয়। এই-দিন বহুবাজারের অবৈতনিক একতান-বাদন-সম্প্রদায় বাজাইয়াছিলেন। ইহার পর চৈত্র মাসে (১৪ই মার্চ্চ তারিখে) "বিদ্যাসুন্দর" ও "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" অভিনীত হইয়াছিল। মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পান্নালাল শীল, ছক্কনলাল রায় প্রভৃতি এই দিন উপস্থিত ছিলেন। এইদিন শ্রীযুক্ত মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়ীর অভিনেতৃ-সম্প্রদায়ের দু'একজন অভিনেতা অবৈতনিক ভাবে এই অভিনয়ে যোগ দিয়াছিলেন।

ন্যাশনাল থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর দুইটি দল হইয়া যায়। একদলে ধর্ম্মদাসবাবু প্রভৃতি ও অপর দলে অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রভৃতি।

ধর্ম্মদাসবাবু ২৯এ মার্চ্চ তারিখে টাউনহলে ষ্টেজ বাঁধিয়া ন্যাশনাল থিয়েটার নাম দিয়া "দেশীয় হাসপাতালের সাহায্য-রজনী" বলিয়া "নীলদর্পণ" অভিনয়ের বিজ্ঞাপন দিলেন। এই সময় হইতে গিরীশবাবু রীতিমত সাধারণ নাট্যশালায় মিশিলেন। ধর্ম্মদাসবাবুর দলে গিরীশবাবু উড সাহেবের অংশ লইয়াছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছিল,—"The National Theatre will reopen for the benefit of the native Hospital at the Town Hall." ৪৲, ২৲, ১৲ তিন প্রকার মূল্যে টিকিট বিক্রয় হয়। এই অভিনয় উপলক্ষে উক্ত হাসপাতালের সাহায্যার্থে ইহারা ৫০০ টাকা দান করেন। ৯ই এপ্রেল তারিখে আবার অভিনয় করেন। এই দিন বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়াছি,—"For the benefit of the charitable section of the Indian Reform Assciation," এই দিন "সধবার একাদশী" ও "ভারতমাতা"র অভিনয় হইয়াছিল।

টাউনহলে ধর্ম্মদাস বাবুর দলকে অভিনয় করিতে দেখিয়াই অর্দ্ধেন্দুবাবুর দলও লিণ্ডসে ষ্ট্রীটে "অপেরা হাউস" ভাড়া লইয়া "হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার" নাম দিয়া অভিনয় করিয়াছিলেন। ৫ই এপ্রেল তারিখে ইহাদের অভিনয় আরম্ভ হয়। মাইকেলের "শর্ম্মিষ্ঠা" অভিনীত হয়, সঙ্গে সঙ্গে "নতেল ভুল" "বিলাতী বাবু" "উপাধি বিতরণ", মুস্তফী সাহেবের পাকা তামাসা ও অভিনীত এবং ব্যায়ামবীর অখিলবাবুর ক্রীড়া প্রদর্শিত হইয়াছিল।

অর্দ্ধেন্দু বাবুর দল অপেরা হাউসে দুই রাত্রি অভিনয় করিয়াই ঢাকায় গমন করেন। ধর্ম্মদাসবাবুর দল ৯ই মে শুক্রবার শোভাবাজার নাট্য-মন্দিরে কপালকুণ্ডলা অভিনয় করিয়াই ঢাকায় যান। ঢাকায় এই সময়ে "পূর্ব্ব-বঙ্গ-রঙ্গভূমি" নামে একটি বাঁধা নাট্যশালা ছিল, অর্দ্ধেন্দু-বাবুর দল এই নাট্যশালায় অভিনয় আরম্ভ করেন।

কিছুদিন পরে উভয় দল কলিকাতায় আসেন, কিন্তু মিলন হয় নাই। তাহার পর দিঘাপতিয়ার কুমার (এখন রাজা * * * অর্থাৎ শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত "বিশ্বকোষ" গ্রন্থ-প্রকাশকালে] প্রমদানাথ রায়ের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে দীঘাপতিয়ায় যাইবার জন্য ন্যাশনাল থিয়েটারের বায়না হয়। এই উপলক্ষে উভয় দল একত্র হয়। পূর্ণদল দীঘা-পতিয়ায় চারি রাত্রি অভিনয় করে, পরে বহরমপুরে আসে।

এই সময়ে বেঙ্গল-থিয়েটারে "মোহান্তের এই কি কাজ" অভিনীত হইতেছিল। একদিন ধর্ম্মদাসবাবু আর ভুবন-বাবুতে এই অভিনয় দেখিতে যান। পথে ইহাদের সঙ্গে নগেন্দ্রবাবু মিলিত হন। সে দিন এত লোক হইয়াছিল যে চারি টাকার টিকিট আট টাকা দিয়াও ইহারা কিনিতে পান নাই। এই বিক্রয় দেখিয়া ভুবনবাবু উত্তেজিত হইয়া উঠেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনজনে পরামর্শ স্থির করেন, একটা নাট্যশালা বাঁধিতেই হইবে। ভুবন বাবু তখনও নাবালক হইলেও টাকা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ইহার পর একটি ছোট দল লইয়া ধর্ম্মদাসবাবু চুঁচড়ায় ব্যারাকে ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া "মোহান্তের এই কি কাজ" অভিনয় করেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবারে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ধর্ম্মদাসবাবু তখনকার লুইস থিয়েটারের (বর্ত্তমান রয়াল থিয়েটারের আদর্শে * * * অর্থাৎ "বিশ্বকোষ" গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনার আমলের) এই নাট্যশালা প্রস্তুত করান। ভিত্তিস্থাপনের দিন সভা হইয়াছিল, অনেক মান্যগণ্য লোক উপস্থিত ছিলেন।

তাহার পরে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর শনিবার

কোম্পানীর আমলে প্রাচীন কলিকাতায়
একটি বিলাতী নাট্যশালা

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার খোলা হয়। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে ন্যাশানাল থিয়েটারের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি হইয়াছিলেন। নবগোপাল মিত্র, মনোমোহন বসু ও অর্দ্ধেন্দুবাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন; তখনও উভয় দল স্বতন্ত্র ছিল। অর্দ্ধেন্দুবাবু একা ধর্ম্মদাস বাবুদের সঙ্গে যোগ দিয়া গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার নাম গ্রহণ করেন এবং মতিবাবু, বেলবাবু প্রভৃতি ন্যাশানাল থিয়েটার নামে স্বতন্ত্র রহিলেন। বার্ষিক উৎসব একত্র হইল বটে, কিন্তু কার্য্যাবলীর মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে উভয় দলের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ব্বচন পাঠ এবং ন্যাশানাল থিয়েটারের পক্ষ হইতে সঙ্গীত দ্বারা কার্য্যারম্ভ হইয়াছিল।

তাহার পর ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারের অনুকরণে গ্রেট ন্যাশানালে স্ত্রী-অভিনেত্রী লইবার প্রস্তাব হয়। এই সূত্রে অর্দ্ধেন্দুবাবু ও মতিবাবুর মধ্যে মত ভেদ হওয়ায় অর্দ্ধেন্দুবাবু স্বতন্ত্র দল করিয়া ঢাকা, বগুলা, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পরে ভুবনবাবুর আগ্রহে উভয় দল একত্র হইয়া গেল। তখন বেশ্যা অভিনেত্রী লওয়া হইয়া গিয়াছে। ১৯ সেপ্টেম্বর (১৮৭৪) "সতী কি কলঙ্কিনী" খোলা হয়। এই থিয়েটারে প্রথমে ছয়জন অভিনেত্রী লওয়া হইয়াছিল। তখন ম্যানেজার ধর্ম্মদাস বাবু, সেক্রেটারী নগেন্দ্রবাবু, শিক্ষক অর্দ্ধেন্দুবাবু।

কিছুকাল পরে দশচক্রে ভুবনবাবুর অবস্থা-বিপর্য্যয় ঘটিলে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার উঠিয়া যায়। নাট্যশালা ভাড়া দেওয়া হয়। প্রথমে গিরীশবাবু, তাহার পর তাঁহার শালক দ্বারকানাথ ঘোষ, তাহার পর কেদারনাথ চৌধুরী, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু, তাহার পর কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যা উহা ভাড়া লইয়াছিলেন। তাহার পর উহা বিক্রীত হইয়া গেলে প্রতাপচাঁদ জহরী ক্রয় করেন।° গিরীশবাবু ম্যানেজার হন। প্রতাপ জহুরীর আমলেই গিরীশবাবু নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রথম নাটক রাবন-বধ। তাহার পর নগেন্দ্রবাবুর ভ্রাতা কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা প্রলোভিত হইয়া গুরুমুখ রায় নামক এক ব্যক্তি থিয়েটার করিতে প্রস্তুত হইলে গিরীশবাবু, অমৃতবাবু প্রভৃতি কয়েক জন মিলিত হইয়া ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ষ্টার থিয়েটার (৬৮নং বীডন ষ্ট্রীট * * * "বিশ্বকোষ" গ্রন্থ প্রকাশনাকালে) স্থাপন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই ষ্টার থিয়েটার খোলা হয়। গিরীশবাবুর দক্ষযজ্ঞ নাটক এখানে প্রথম অভিনীত হয়। গুরুমুখ রায়ের মৃত্যুর পর ষ্টার থিয়েটারের প্রধান অভিনেতা শ্রীঅমৃতলাল বসু ও শ্রীঅমৃতলাল মিত্র, কর্ম্মাধ্যক্ষ হরিপ্রসাদ বসু ও ধর্ম্মদাসবাবুর ভাগিনেয় শ্রীদাশুচরণ নিয়োগী এই চারিজনে ষ্টার থিয়েটারের নাট্যশালা ক্রয় করিয়া লয়েন। তাহার পর যখন বাবু গোপাললাল শীল এমারেল্ড থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ইঁহারা ষ্টার থিয়েটারের বীডনষ্ট্রীটের নাট্যশালা বেচিয়া কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বর্ত্তমান নাট্যশালা (যেটি অধুনাবধি সুপ্রতিষ্ঠিত রয়েছে) প্রতিষ্ঠা করেন। ষ্টারের বর্ত্তমান নাট্যশালার জমি ও বাটি উভয়ই থিয়েটারের সম্পত্তি। এই নূতন বাটি হইতেই অমৃতবাবু ইহার অধ্যক্ষতা করিতেছেন (৺অমৃতলাল বসু মহাশয়ের জীবিতকালে)। "নসীরাম" এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। ষ্টারে কর্তৃত্ব লইয়া কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তবে গিরীশবাবু উত্তরকালে নানা নূতন থিয়েটারে যাতায়াত করায় এবং মধ্যে মধ্যে ষ্টারে যোগ দেওয়ায় কিছুদিন এই সম্প্রদায়ে সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিবার পক্ষে অনেক বাধা ঘটিয়াছিল। ষ্টার বরাবর সমান আদর পাইয়া প্রতিপত্তির সহিত সুশৃঙ্খলে কার্য্য করিয়া এখন বর্ত্তমান রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

সদাশিবও আজ উদ্বাস্তু

শ্রীচৈতন্যচরণ বড়াল

পৌষমাসের হাড় কাঁপানো শীতে ঘনকুয়াশাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রে কাশীর মহামহিম পাণ্ডারা ধুতুরা ও ভাঙের নেশায় বিভোর বাবা বিশ্বনাথকে মন্দির থেকে সরিয়ে কাশীর সীমানা পার করে গঙ্গার ধারে এক নির্জন অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় রেখে মন্দিরে ফিরিল—উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিল আজ হরিজনস্পর্শে কলুষিত লিঙ্গ-মূর্তি—তিনি ছেড়ে চলে গেছেন—আবার নব-কলেবরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলে তিনি ফিরবেন—নচেৎ নয়!

আঁধার—আলোর লুকোচুরি খেলা শেষ হ'লে উত্তর-বাহিনী গঙ্গাজলকণা-মাখানো উষার বায়ুহিল্লোল-স্পর্শে ধীরে ধীরে সদাশিবের জ্ঞান ফিরিল—তিনি শ্লেষ্মাজড়িত-কণ্ঠে হাঁক দিলেন—কোথায় গেলিরে সবাই?

ভৃঙ্গীর নেশা অনেক আগে কাটিয়াছিল—বিরক্তির স্বরে বলিল,—কি চান্ ঠাকুর!

সদাশিব—শুনতে পেয়েছ? তবু ভাল—এক ছিলিম সাজ না বাবা।

ভৃঙ্গী—ভাল করে চেয়ে দেখুন না কোথায় আছেন!

সদাশিব চোখ খুলিলেন, দেখিলেন—বিস্মিত হইলেন! এযে বৃক্ষতল—তিন দিকে প্রান্তর—বামে গঙ্গা। ভাবিলেন এখনো নেশা কাটে নাই, বলিলেন—না, তোকে নিয়ে আর চলে না—কাল রাত্রে ভাংয়ের সঙ্গে কালকূট খুব বেশী দিয়েছিলি দেখ্‌ছি—এখনো মাথাটা সাফ হয়নি। পূজারীরা গেল কোথা? মঙ্গলারতি হবে না?

ভৃঙ্গী। হায়! হায়!! ঠাকুর বেশ আছেন! মনে পড়্‌ছেনা তো—কাল রাত্রে মন্দিরে গোলমাল—যখন হরিজনেরা আপনার লিঙ্গদেহ স্পর্শ করতে চাইলো! পাণ্ডারা সদলে বাধা দিল—হাঙ্গামা হোল—হরিজনেরা জোর করে মন্দিরের ভেতর এল—পূজা দিল! ফলে সেই রাগে সব পূজারীরা একজোট হয়ে আপনাকে মন্দির থেকে বার করে এনে এখানে ফেলে দিয়ে গেল! কিছুই মনে নাই? সার্থক আপনার ভোলানাথ নাম!

ঠাকুরের মনে পড়িল,—লোহার কাঁটা তার দিয়ে ঘেরা তাঁর লিঙ্গ মূর্তির চারধারের খাঁচা—যার ভিতর মন্দিরের খাস পূজারী ছাড়া কারও আস্‌বার অধিকার ছিল না!

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—তা এ ফাঁকার হাওয়াটা মন্দ লাগ্‌ছে না!

ভৃঙ্গী। বাঃ—বেশ! এই কন্‌কনে পাথুরে শীতে থাকতে পারবেন?—আচ্ছা পূজা আরতি না হয় না হোল—সেবার কি হবে?

সদাশিব। সেবা তো বহুদিন ভুলে গেছি বাপধন!

ভৃঙ্গী। আফিং—গাঁজা ও ভাং সেবাও?

সদাশিব। না না—ওর জোরেই তো এতদিন কোন রকমে সেখানে আট্‌কে ছিলাম—ছুঁৎমার্গের অত্যাচার কতকাল ধরে সহ্য করেছি ভাব্‌ দেখি!

সে কত অতীত যুগযুগান্তের কথা! ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর কথামত পার্বতীকে নিয়ে আবার সংসারী সাজলাম! অন্নপূর্ণা দুর্গা—উমারূপে তোদের মা আমার এই ছন্নছাড়া শ্মশানবাসীর পাশে এসে দাঁড়ালেন—আমার ভিক্ষার ঝুলি ষড়ৈশ্বর্যে ভরে দিলেন! তখন এদিকে বড় বড় সাধকেরা মহাজনেরা যুগ যুগ ধরে তপস্যায়—সাধনায় আমার ভক্তি-ডোরে বেঁধে ফেল্‌লেন—আমায় দিয়ে বলিয়ে নিলেন যে তাদের সাধনার ধাম, এই আনন্দ-কানন বারাণসী—আমি কখনো ছাড়্‌বো না!—উচ্চকণ্ঠে বলেছিলাম—

যেষাং কাপি গতির্নাস্তি—তেষাং গতিঃ বারাণসী!

যদিও আমার সাধকরা—পূজারীরা কাশী ছাড়া

আরও এগারটি লিঙ্গমূর্তি স্থাপন করেছিল এই প্রিয় ভারতে।

সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওংকারমমরেশ্বরে॥
পরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
সেতুবন্ধে রামেশ্বরং নাগেশং দারুণে বনে॥
বারাণস্যাং বিশ্বেশ্বরং ত্র্যম্বকং গোমতীতটে—
হিমালয়ে কেদারঞ্চ ঘুসৃণেশং শিবালয়ে॥

এদের কত উৎসাহ কত ধুম—কত জপ, কত তপ, কত কামনা—কত সাধনা আমায় পাবার জন্য! আবার এদের মধ্যে সৌরাষ্ট্রে সোমনাথের মন্দিরের পূজা! মনে আছে তো—সাড়ে তিনশো ক্রোশেরও বেশী পথ বেয়ে রোজ ডাক্ বসিয়ে ঘড়া ঘড়া গঙ্গাজল আসতো আমার পূজার জন্য!

ভৃঙ্গী। মনে তো আছে—কিন্তু যখন বিধর্ম্মীরা বার বার আপনার মন্দির অপবিত্র করল—চূর্ণ করল, আপনার চোখের সামনে নৃশংস হত্যার তাণ্ডবলীলা করল তখন তো আপনিও কোন সাড়া দিলেন না!

সদাশিব। কি করে করব? তখন আমরা যে গৃহ-বিবাদে আত্মহারা! নারায়ণ সাগর-ছেঁচা লক্ষ্মীদেবীকে নিয়ে সরে গেলেন ক্ষীরোদসাগরে—আর সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমার দেহরক্ষী সাপের দলকে। তাদের দিয়ে শয্যা তৈয়ারী করে লক্ষ্মীদেবীর পদসেবা উপভোগ কর্ত্তে কর্ত্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। ব্রহ্মা তাঁর মানসকন্যা সন্ধ্যার পেছনে ধাওয়ার খবরে আমি রাগের মাথায় তাঁকে ত্রিশূল নিয়ে তাড়া করেছিলাম—তাই তিনি লজ্জা ঘৃণা রাগ বা অভিমানে আমার সামনে আসা দূরে থাক, তাঁর একমাত্র আড্ডা পুষ্করের সাবিত্রী মন্দির থেকেও উধাও হয়ে গেলেন! আজও যোগী ঋষিরা তাঁর সন্ধানে বৃথা ঘোরা-ঘুরি করছে!

ভৃঙ্গী। সব তো জানি! কিন্তু তারপর—এই আপনার সাধের বারাণসী—সাধকদের লক্ষাধিক মন্দির-শোভিত বারাণসী—ভক্তের আনন্দকানন বারাণসী বিধর্মী কালাপাহাড় ভেঙে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিল—আপনার লিঙ্গমূর্তি জ্ঞানবাপীতে ফেলে দিল, কৈ—তখনো তো আপনি কিছু করেন নি!

সদাশিব। কি করে করব বল—যে ব্রহ্মা বিষ্ণু আমার ধনুক বাণ হয়েছিলেন—যাঁদের প্রেরণায় ত্রিপুর ধ্বংস করে-ছিলাম—ত্রিপুরাসুরকে বধ করেছিলাম—তারা তো একবার এল না আমার পাশে!

আর আমি যে বিরক্ত সন্ন্যাসী—বৈরাগী—শ্মশানবাসী—নরকপালধারী ছাই-ভস্মমাখা দিগম্বর। আমি কি নিজের জন্য কিছু করতে পারি?

তারপর জানিস তো কালাপাহাড় ছিল খাঁটি হিন্দু, নাম কালাচাঁদ সান্যাল—এই নিত্য গঙ্গাস্নায়ী সুপুরুষটি বিধর্মী বাদশাহ কন্যার নজরে আসে—ফলে তাকে জোর করে মুসলমান করা হয়। সে হিন্দুদের মধ্যে ফিরে আসবার জন্য কি আপ্রাণ চেষ্টা না করেছিল, কিন্তু তখন আত্মসর্বস্ব অদূরদর্শী ব্রাহ্মণরা তার অন্তর্ভেদী আর্তনাদে, কর্ণপাত করেনি। তারপর শ্রীক্ষেত্রের পাণ্ডারা যে শ্রীক্ষেত্রে অন্নগত—জাতিভেদ নাই—একাদশী পর্যন্ত নাই—যেখানে জগন্নাথদেবের শক্তি হলেন বিমলা দেবী—যাঁর প্রসাদ না পেলে জগন্নাথকে উৎসর্গীকৃত অন্ন মহাপ্রসাদ হয় না, যাঁর শারদীয় পূজায় নবমীর দিন ছাগবলি দিয়ে পূজা হয়—সেই জগন্নাথ-বিমলা-মন্দিরের পাণ্ডারা—বৈষ্ণব বিগ্রহের পূজারী হ'লেও সব শাক্তধর্মাবলম্বী (আরও আশ্চর্য্য যে কামরূপ কামাখ্যার পূজারী সবই বৈষ্ণব) তারা একমত হয়ে বেত্রাঘাতে জর্জরিত করে কালাচাঁদ সান্যালকে মন্দিরদ্বার থেকে বিতাড়িত করে—তখন তার প্রতিশোধস্পৃহা আমার সহ্য করা কিছু অন্যায় হয়নি। যার ধমনীতে খাঁটি ব্রাহ্মণ—আর্য্যরক্ত—যে ব্রাহ্মণের শাপে বিষ্ণুকেও মানুষ হ'তে হয়েছিল—শ্রীরামরূপে দুঃখ কষ্ট-ভোগ কর্ত্তে হয়েছিল—যে বিষ্ণুকে মহর্ষি ভৃগুর পদাঘাত বুকে সহ্য করে তাঁর পাদপূজা কর্ত্তে হয়েছিল—যে ব্রাহ্মণ-দের মহিমাকীর্ত্তনে ব্যাসদেব মহাভারত প্রণয়ন করে গর্ববোধ করেছিলেন—সেই ব্রহ্মণ্যযুগে ব্রাহ্মণকে শাস্তি দিতে গিয়ে আমি নতুন ফ্যাসাদের সৃষ্টি করব! তাই যখন কালাপাহাড় চিল্কাহ্রদে জগন্নাথের লুকানো মূর্তি খুঁজে বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করল—কাশীতে আমার লিঙ্গমূর্তি জ্ঞানবাপীতে ফেলে দিল—আমি কোনরকমে এক-লক্ষ লিঙ্গমূর্তির মধ্যে একমাত্র অকলুষিত কেদারেশ্বরের মন্দিরে আশ্রয় নিলাম। তারপর রাণী অহল্যাবাঈ

নাটোরের রাণী ভবানী আরও কত ভক্তিমতী নারী বারাণসীকে আবার নতুন সাজে সাজালো। অন্নপূর্ণার মন্দির, দুর্গাবাড়ী, বীরেশ্বর, সঙ্কটা, আরও নানা দেব-দেবীর মূর্তির সঙ্গে ফুটে উঠলো সোনার কিরীট নিয়ে রূপার তামার আর নানা রংয়ের পাথর দিয়ে তৈয়ারী আমার নতুন মন্দির। তখন গঙ্গাতীরে নগরের অলিতে গলিতে সাধু সন্ন্যাসী সাধক ভক্ত গৃহী পূজারী নরনারীর মিশ্রিত আহ্বানে—স্তোত্রপাঠে—বেদ উপনিষদ ইত্যাদি শাস্ত্র-চর্চায়—আবার বারাণসী হোল ভারতের পীঠস্থান—সে সব কি দিনই গিয়েছে!

ভৃঙ্গী। যাক্—এখন কি অনুমতি করেন—আপনার এ দুর্দশা আমায় দেখতে হবে?

সদাশিব। (আপন মনে বলিতে লাগিলেন)

সেদিন যখন গোঁড়া পাণ্ডার দল শুধু আমায় নয়—অন্নপূর্ণার দরোজাও লোহার কাঁটাতারে ঘিরে জীবরূপী শিবের অপমান কর্ল—এমন কি তোর মায়ের সঙ্গেও আমার বিচ্ছেদ ঘটালো সেইদিন থেকে যে আমার তৃতীয় নয়ন, জ্ঞান-নয়ন ঘোলা হয়ে গেল! এখন যে আমি একেবারে দৈবাধীন! ফ'লে গেল সেই আপ্তবাক্য—

হরির্ণাপি হরের্ণাপি ব্রহ্মণাপি সুরৈরপি।
ললাটে লিখিতা রেখা ন শক্যা পরিমার্জিতুম্॥

শোন্—মানস সরোবর যেতে পারবি?

ভৃঙ্গী। সে রাস্তা তো চীনারা বন্ধ করে দিয়েছে।

সদাশিব। নন্দীকে ডাক—দু'জনে যদি চেষ্টা করিস একবার! মানস সরোবর পার হয়ে কৈলাস পাহাড় থেকে ঈশান দিকে চলে গিয়ে এক বিরাট ন্যগ্রোধ বৃক্ষ দেখতে পাবি—সেখানে থাকে জরামরণের অতীত বায়স-প্রবর ভুষণ্ডী—সে ত্রিকালজ্ঞ—তাকে ধরে আনতে পার যদি—

বাধা দিয়া ভৃঙ্গী বলিল—

হায়! হায়! সত্যই দেখছি আপনার বাহাত্তুরে পেয়েছে! ভুলে গেলেন যে নন্দী কবে অন্তর্ধান হয়েছে!

সদাশিব। কেন? তার আবার কি হোল?

ভৃঙ্গী। বাঁদর ধরার হিড়িক ভুলে গেলেন? দেশ স্বাধীন হতেই রামচন্দ্রের বাহনদের বিদেশে চালান দিয়ে বিক্রী করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা ব্যাপকভাবে সুরু হোল। বিদেশী চিকিৎসকের দল বাঁদরের গ্রন্থি নিয়ে মানুষের সঙ্গে লাগিয়ে কত ভেল্কী কত পরীক্ষা সুরু করে দিল। সে সময় আপনার নন্দী আপনার নেশার জোগাড়ে বনে বনে গাঁজা ভাংয়ের জোগাড় কর্তে গিয়ে শিকারীর জালে ধরা পড়ে! শুনেছি কোন রকমে জাল ছিঁড়ে পালিয়েছে—কিন্তু কোথায় যে পালিয়েছে তাতো আজ অবধি জানি না!

সদাশিব। তোমায় ধরে নি?

ভৃঙ্গী। আমি তো নন্দীর মত গোঁয়ার নই—আপনার মন্দির ছেড়ে যেতে ভরসাই হয়নি।

সদাশিব। তাহ'লে কি হ'বে?

ভৃঙ্গী। দিন একটু পায়ের ধুলা—দেখি চেষ্টা করে আপনার—বায়সপ্রবরের সন্ধানে!

* * *

অনেক খোঁজাখুজির পর ভৃঙ্গী ন্যগ্রোধ বৃক্ষ পাইল—তার ঘন পত্র পল্লবের আড়ালে ভুষণ্ডীকে দেখিল। দেখিল, সে একটি সোনা ব্যাংএর অস্তস্থলী চঞ্চুতে ধরে প্রাতরাশ সমাপনের উদ্দেশ্যে বাসায় ফিরিতেছিল। ভৃঙ্গী নমস্কার জানিয়ে বলিল,—সদাশিব আপনাকে স্মরণ করেছেন!

ভুষণ্ডী। চলে এস আমার বাসায়—সব শুন্‌বো।

ভৃঙ্গী। আপনার অত সরু ডালে কি যেতে পারব—বরং আপনিই একটু নেমে আসুন—বিশেষ দরকার—সদাশিব আজ বিপন্ন!

ভুষণ্ডী। দাঁড়াও আগে খাওয়াটা শেষ করি। পরে বলিল,—কেন এসেছ জানি–কিন্তু আমাদ্বারা বিশেষ সুবিধা হবে বলে মনে হচ্চে না—কারণ, আমি লোকালয়ে যাব না—কিছুতেই না।

ভৃঙ্গী। সদাশিবের অনুরোধ!

ভুষণ্ডী। রাখ তোমার সদাশিবের অনুরোধ। তাঁর এখন না আছে জ্ঞান বুদ্ধি, না আছে অস্ত্র শস্ত্র, না আছে বাহন, না আছে শক্তি। তিনি এখন বেকার ভবঘুরে—উদ্‌বাস্তু–তাঁর জন্যে লোকালয়ে গিয়ে কি বিপদ ডেকে আনবো।

ভৃঙ্গী। আপনার বিপদ?

ভুষণ্ডী। ওহে কপিমুখ শোন তবে।—একবার গিয়েছিলাম নীলাচলে—ব্রহ্মার আদেশে নীলমাধবের প্রকটিত হবার জন্য সাহায্যে!

সেটা সত্যযুগ! নীলাচলের রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বৈষ্ণব-চূড়ামণি—তাঁর খেয়াল হল ব্রহ্মা স্বয়ং গিয়ে নীলাচলে নীলমাধবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবেন। অতএব ব্রহ্মলোকে গিয়ে ব্রহ্মার কাছে হত্যা দিলেন। কিছুদিন কেটে গেল। তারপর ব্রহ্মাকে রাজী করে যখন নীলাচলে ফিরলেন—দেখলেন—তখন না আছে নীলমাধব, না আছে তাঁর রাজত্ব, না আছে কোনকিছু। ব্রহ্মার একদিন মর্ত্তের এক হাজার বছর—সেটা তিনি খেয়াল রাখেন নি। ব্রহ্মার ক'দিনে যে—সত্য ত্রেতা দ্বাপর চলে গিয়ে কলিযুগ আরম্ভ হয়েছে। তখন সেখানকার রাজা গালমাধব—তিনি ইন্দ্রদ্যুম্নকে মন্দিরে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিলেন না—বিবাদ মেটাতে ব্রহ্মাকে আসতে হোল এবং তাঁর কথামত দু'রাজা আমায় সাক্ষী মানলেন—আমিও ব্রহ্মার আদেশে গিয়ে ইন্দ্রদ্যুম্নের পক্ষে রায় দিলাম। গালমাধব হেরে গেল। আর নীলমাধব প্রতিষ্ঠা করে ইন্দ্রদ্যুম্ন আমায় পরম যত্নে কিছুদিন আটকে রাখলেন, আমিও তাঁর উপরোধে চর্বচোষ্য খেয়ে পরমানন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। তারপর একদিন ব্যাধের জালে ধরা পড়লাম—তখন রাজভোগ খেয়ে আমার যৌবন ফিরে এসেছে বললেই হয়; আমার চকচকে রং দেখে নীলকণ্ঠ পাখী ভেবে পিঞ্জর যোগে প্রয়াগ প্রেরণ কর্লে ব্যাধ। সেখানে প্রায় অনাহারে অনিদ্রায় অনেকদিন কাটিয়ে শেষে এক মাড়ওয়ারী ধনী দম্পতীর নজরে আসি। তাঁরা নগদ মূল্যে আমায় কেনেন ও আমি তাঁদের স্বর্গের পথ দেখিয়ে দোব এই আশায় আমায় প্রয়াগের তীরে মুক্ত করে দেন।

তারপর অনেক বাধা বিপত্তি কাটিয়ে—আবার ডেরায় ফিরেছি। এই চিরকালের আশ্রয় আমার বাসা ছেড়ে আর কোথাও যাব না—কারও অনুরোধ উপরোধে নয়।

এই বলে বায়স-প্রবর গুটি কয়েক সুপক্ক ন্যগ্রোধ ফলে মুখশুদ্ধি করলেন।

অবশেষে ভৃঙ্গী ধৈর্য্য হারাইয়া বলিল,—যিনি রামচন্দ্রের আদেশে বিশল্যকরণী ওষধী না পেয়ে গন্ধমাদন পর্ব্বত মাথায় করে নিয়ে লঙ্কায় গিয়েছিলেন—আমি তাঁরই বংশধর—আবার সদাশিবের পূজারী ভক্ত। যদি স্বেচ্ছায় না যান সমস্ত পাহাড়টি যায় আপনার বাসস্থান—এই ন্যগ্রোধ গাছটি পর্য্যন্ত নিয়ে যাব—কেউ রাখতে পারেবে না!

অগত্যা বায়সপ্রবর যাত্রা করলেন—ভৃঙ্গীর সঙ্গে সদাশিবের কাছে!

* * *

প্রণত ভূষণ্ডীর গলায় পালকে সুড়সুড়ী দিতে দিতে সদাশিব বলিলেন,—সব তো শুনেছো! এখন পরামর্শ দাও কি করি—তার আগে আমার বাহন বৃষরাজটি কোথা গেল বলতে পার?

ভূষণ্ডী। সে ইংরেজ আমলের ব্যাপার। তখনকার বড়লাট নানা দেশ থেকে ভাল ভাল ষাঁড় আনাতে লাগলেন—রাজধানীতে তাদের প্রদর্শনী খুললেন। তাঁর লোকদের নজর গেল আপনার বাহনের উপর। তিনি যে কাশীতে আপনার ভক্তদের প্রদত্ত হালুয়া জিলেপী চান্দৌশী গমের রুটি ইত্যাদি পুষ্টিকর ও সুখাদ্য খেয়ে এমন স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করেছিলেন, যে প্রদর্শনীতে ষণ্ডশ্রেষ্ঠ খেতাব পেয়ে গলায় সোনার মালা শৃঙ্গে সোনার টোপর দিয়ে সরকারী গো-প্রজনন বিভাগে সর্দারী কর্চেন। আর তাঁকে পেয়েই বা কি হবে? ঐ আদ্যিকালের বাহন এ যুগে শুধু অচল নয়—পশু রক্ষা সমিতি হয়তো আপনার নামে জীবকে নিষ্ঠুরভাবে যখন তখন চালানোর জন্য ফৌজদারী মামলাও কর্ত্তে পারে! মাটির ওপর এখন আগুনে টানা—তেলে টানা—বিদ্যুৎ টানা গাড়ী ছুটছে—আকাশে শত শত পুষ্পকরথ—যা দেখতে আমাদের নারায়ণ দেবতার বাহনের মত—শুধু উড়ছে না—গ্রহ উপগ্রহকে তাড়া করছে—বিষ্ণুর বাহন গরুড়কে হার মানাচ্ছে। এ যুগে ষাঁড়ের পিঠে চেপে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র!

জটা চুলকে সদাশিব বললেন।—বিনা বাহনে এ বয়সে কি কর্ব বল!

আচ্ছা এক কাজ কর—গঙ্গাকে খবর দাও—তার মকরটা আমায় বাংলা দেশে অগত্যা জলপথেই পৌঁছে দিক! সেখানে শুনেছি এখনো আমার তৈয়ারী আগম-মতে—তন্ত্রমতে দুর্গার, কালীর, দশমহাবিদ্যার পূজা হয়—অন্নপূর্ণার, লক্ষ্মী-সরস্বতী ইত্যাদিরও পূজা হয়।

খক্ খক্ করে কাশতে কাশতে বায়সপ্রবর বলিল।—ভাল কথা! বাংলা দেশে ঐ সব পূজার ব্যাপারে

মা গঙ্গা খুব ওয়াকিবহাল, তাঁর অবস্থা যে খুব ভাল তা নয়—তাঁর আর তাঁর স্তনধারাপুষ্ট সন্ততিদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে কোথাও বা ভরাট করে—যা অবস্থা করেছে অধুনা স্বাধীন এই দেশ—তা' মা গঙ্গার মুখেই শুনবেন! দেখি তাঁকে খুঁজে!

* * *

গঙ্গা দেবী আসিয়া সদাশিবের পদধূলি নিলেন—তাঁর দু'ফোঁটা তপ্ত অশ্রু সদাশিবের পায়ে পড়িলে তিনি চক্ষু উন্মিলিত করিলেন—দেখিলেন, শীর্ণকায়া কোটরগত আঁখি, ধুলিবালিমাখা কেশরাশি—আভরণহীনা মলিনবসনা গঙ্গা!

ব্রস্ত বিস্ময়ে বলিলেন—একি—তুমি গঙ্গা, তোমার একি চেহারা! লজ্জা নিবারণের জন্য একখানা ৮ হাত মলিন শাড়ী মাত্র তোমার সম্বল! গহনা কি হোল—বাহন কোথায় গেল? শুনেছিলাম বাংলায় শাঁক-ঘণ্টা বাজিয়ে তোমার পূজা হয়—তোমার বাহনের পূজা হয়!

সাশ্রুনয়নে গংগা ধীরে ধীরে বলিলেন,—হায়রে অতীত! তখন ভগীরথের স্তোকবাক্যে ভুলে সদম্ভে আপনার জটাজুট ভেদ করে ইন্দ্রের ঐরাবতকে তরঙ্গাঘাতে ভাসিয়ে দিয়ে সোনার বাংলায় পদার্পণ করেছিলাম—সে বাংলা এ বাংলা নয়—তখন তৈয়ারী করেছিলাম পঞ্চগৌড়—আমার ক্রোড়ে চড়ে যায় বিরাট নৌবাহিনী শুধু ভারতের বন্দরে বন্দরে নয়—সুদূর সিংহল—সুমাত্রা যবদ্বীপ কম্বোজ—চম্পা সুবর্ণপুর চীন জাপান ঘুরে আসতো—দক্ষিণ ও পূর্ব সাগরে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল! আমি সেই গঙ্গা যার বুকে নৌবাহিনী দেখে বিশ্বজয়ী আলেকজান্দার চমকে যায়—পিছু হটে যায়। আমি সেই গঙ্গা যার পবিত্র স্রোতবারি নেবার জন্য চোল গঙ্গা ও শিব গঙ্গা সরোবর আমার জলে ভরিয়ে পবিত্র কর্বার জন্য জলও স্থল বাহিনী নিয়ে রাজেন্দ্র চোল গৌড় পর্য্যন্ত ছুটে আসে—দ্বিতীয় মহীপালকে মাথায় করে গঙ্গাজলের কলসী বহায়! আমি সেই গংগা যে নিজেও তার ক্রীড়া সঙ্গিনীদের নিয়ে প্রত্যেক জমিটি উর্বর শস্য সমৃদ্ধ করে, পথের দু'পাশে কত নগরনগরী তীর্থভূমি গড়ে যৌবন জোয়ার-তরঙ্গে নাচতে নাচতে সাগর সঙ্গমে কপিল মুনির আশ্রমের উদার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম! তখন কত সাধক, কত তাপস, কত সন্ন্যাসী, কত গৃহী আমার এক-ফোঁটা জল মাথায় নিয়ে ধন্য হোত—ঘাটে ঘাটে ঘরে ঘরে আঙিনায় আঙিনায় আমার স্তব স্তোত্রপাঠ হোত!

তারপর? তারপর ধূর্ত লোভী বিদেশী বণিকরা ছলে বলে কৌশলে রাজা হয়ে বোসলো। তাদের বাংলায় প্রথম কাজ হোল—ভগীরথের পূর্তবিদ্যার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রাজমহলের উত্তর মোহানায়—যেখানে আমি দক্ষিণগামী ভাগীরথী ও পূর্বগামী যমুনা হয়েছিলাম—সেখানে দেড়-ক্রোশব্যাপী তাম্রপট দিয়ে আমার জলধারা ভাগীরথীর বুকে ফেরানো ছিল—সেইখানে অর্থের লোভে সরিয়ে নিয়ে বিদেশে চালান দিল। ফলে সেই থেকে আমার ভাগীরথীর দুর্দিন সুরু! যেখানে বড় বড় বাণিজ্য পোত রণপোত আমার ক্রোড়ে আনন্দখেলা করে বেড়াতো সেখানে আজ শৃগাল কুকুর হেঁটে পার হয়ে চলেছে। আমার ক্রীড়াসঙ্গীরা সরস্বতী, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণি, জলঙ্গী, ইছামতী আর কত নাম কর্ব—শুকিয়ে কুঁকড়ে শ্মশানে বালিচরে পরিণত! তারপর বড় বড় বাঁধ জলধারা সাঁকো—বিদেশী আমল থেকে সুরু আজও তার গতি অব্যাহত। সময়ে জল না পাওয়ায় অজন্মা। এখন জল নিয়ন্ত্রণ—শস্য-নিয়ন্ত্রণ আরও কত নিয়ন্ত্রণ!

সেদিন আকাশ জল দেয়নি—সুতরাং খাল কেটে আমার সব জল নিয়ে নেওয়া হোল—এ শুধু বাংলায় নয়—বিষ্ণুপাদপূতঃ হয়ে হিমালয়ের বক্ষোভেদ করে—আপনার জটা ভেদ করে বেদগানমুখরিত হরিদ্বারের কুম্ভঘাটে যেখানে আমি প্রথম ধরণীবক্ষে ধরা দিয়েছিলাম, যেখানে আমার বাহন মকর সপরিবারে মৎস্যকুল নিয়ে খেলা কর্ত—পরস্পর জীবহিংসা ভুলে গিয়ে—সেখানেও খাল কেটে সব জল টেনে নিয়ে গেল! শুকনো পাথর আর পরিত্যক্ত ঘাটগুলি পড়ে রইল আমার—আমার বেদনামথিত হাহাকার শোনবার জন্য! এ অবস্থাও একদিন আমার হয়েছিল। আবেগে তাঁর স্বর রুদ্ধ হইল।

ভৃঙ্গী। মা বাংলাদেশের খবর তুমি ভাল জান—সেখানে সদাশিবকে নিয়ে যাও না কেন?

গংগা। হায় আমার কপাল! সেখানে আমার যেমন অবস্থা বাঙালীদেরও সেই অবস্থা। নদী-মাতৃক দেশ আজ

ছিন্ন-ভিন্ন। স্বার্থান্বেষী বাঙালীর তথা ভারতীয়ের চক্রে আসল বাঙালীরা আজ সন্ত্রস্ত—রিক্ত রিক্ত !

ভৃঙ্গী। কেন ? সেখানে তো আজও মা দুর্গা—কালী—অন্নপূর্ণা—লক্ষ্মী—সরস্বতী—কার্তিক মায় বিশ্বকর্মার পর্যন্ত পূজা হয়, খুব ধুমধাম হয় ! সার্বজনীন পূজা হয়—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত আনন্দে মাতোয়ারা হয়।

গংগা। আনন্দ ? শোন তবে—সবারই—সব প্রতিমারই বিসর্জন হয় আমার বুকে। তখন কি দেখি জান ? দেখি যে—পূজার নৈবেদ্য নাই—যাগ, যজ্ঞ, হোম নাই—মন্ত্রচৈতন্যকে জাগাবার কোন আহ্বান বৈদিক বা তান্ত্রিক কিছুই নাই, প্রাণভরা শুধু মুখের আকুল আহ্বানও নাই। আছে কি জান ? শুধু বাজনা-বাদ্য, বিজলীর আলো, বেতারযন্ত্রের চীৎকার। নর্দমার ধারে পথের ধুলার উপর ঘাটে মাঠে যেখানে অন্য সময় বিড়াল কুকুরে মলত্যাগ করে—পাড়ার সবাই প্রাত্যহিক জঞ্জাল ফেলে, সেখানে চাঁদোয়া খাটিয়ে, প্রতিবেশিদের কাছ থেকে জোর করে চাঁদা তুলে, আলো জ্বালিয়ে আর বেসুরো বেতালা নোংরা, এমনকি শালিনতাবর্জিত গান গেয়ে, রকমারী দৃষ্টিকটু পোষাক পরা কিশোরী যুবতীদের নিয়ে আনন্দের উৎস বয়ে যায়। উৎকট অর্থাৎ পৌরাণিক অপ্সরী—কিন্নরীর সাজে যাকে সাজিয়ে প্রতিমার অধিষ্ঠান হয়, আর তাদের না হয় প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হয় আরতি বা হোম। এ পূজার নাম কি জান ? এর নাম সার্ব্বজনীন পূজা ! অলিতে গলিতে রাজপথে নর্দমার ধারে শুধু হয় নিজেদের মধ্যে শালীনতাবিহীন প্রতিযোগিতা আর—হৈ-হল্লা ! দিনরাত খালি শুনবে পরস্পরের প্রতিযোগিতামূলক চীৎকার !

দুর্গাপূজা ? বিজয়া দশমীর দিন যে কোন বিসর্জনে ঘাটে গেলে দেখবে তিন দিন কেন কোথাও সপ্তাহভোর শুধু হৈ-হল্লা। পূজার মাঝে দুর্গা অভুক্ত থাকেন সপরিবারে, ফলে আমার জলে বিসর্জন হলে—কাদামাটিমাখা জলে শুধু অঙ্গ শীতল করেন না—সেই জলপান করে ক'দিনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করেন !

সদাশিব। সেকি ? তবে তিনি যান কেন সেখানে ?

গংগা। মহামায়া—নিজেও যে মায়ার অতীত নন—এটা প্রমাণ করার জন্য বোধহয়। কোন অতীতের স্মৃতির ডাক এখনো ভুলতে পারেননি যে। প্রতিবারই বলেন এই শেষ আর আসবো না—আবার সেকথা ভুলে যান আগমনীর গান মনে পড়লে !

সদাশিব। অতো আলো বাজনা—অমন পোষাক পরিচ্ছদ সব প্রাণহীন ভক্তিহীন—আচারহীন !

গংগা। প্রতিমার গঠন—পোষাক দেখেছ। দেখলে লজ্জায় চোখ বুঁজতে হবে—দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী—যেন ইন্দ্রসভার উর্বশী-মেনকা-রম্ভার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আসরে নেবেছেন—মাতৃত্বের মহান ছাপ, না দেহে না সাজ পোষাকে। আছে, আছে শুধু নগ্ন—কদর্য উৎকট—শিল্পকলার ছাপ সেই শুধু অতীত যুগের বিলাসিতার অন্ধ অনুকরণ !

সদাশিব। সঙ্গে কার্তিক গণেশ থাকে তো—তারা আপত্তি করে না ?

গংগা। তাঁরা এরকম পূজায় গা ঢাকা দিয়ে থাকেন নিশ্চয়। আর যাবেনইবা কি করে—বাহনরা কোথা ? ইঁদুর বংশ তো অহিংস ধর্মঘট করে গণেশের চাকরী ছেড়েছে—বস্তীতে মালগুদামে নর্দমার ধারে এত উপভোগ্য খাদ্য পায় যে তাদের শুধু বংশবৃদ্ধি নয় চেহারাও বিষম ফিরে গেছে। কুর্কুর বিড়ালকে তারা শুধু ভয় করেনা নয়—তাদের সঙ্গে সমানে লড়ে যায়—পরাজিত করে। তাদের জ্ঞাতি-কুটুম্ব খরগোস, গিনিপিগ ইত্যাদিরাও যৌন জানিক পরীক্ষার বন্ধ হয়ে জীবন দিচ্ছে ! আর কার্তিকের বাহন ময়ূর সম্প্রতি রাজ্যের সেরা পাখী বলে স্বীকৃতি পেলেও সহরের স্বৈরিণী—বিনোদিনীরা ময়ূরবাহন কার্তিককে নিয়ে পূজার নামে যে বিকট বেলেল্লার সৃষ্টি করে—তাতে কুমারপ্রবরের আত্মগোপন ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না ! যখন অর্ধনগ্ন ফকির গান্ধীজী—অহিংসার উদাত্ত আহ্বান আর দেশাত্মবোধের শক্তিমন্ত্রের মূর্ত প্রতীক নেতাজীর ভৈরব রণহুঙ্কার তাঁর আজাদ ফৌজের দিল্লী চলো চীৎকার সামলাতে না পেরে বিদেশীরা দেশবিভাগের বিষবৃক্ষ রোপণ করে দেশ ছাড়লো বটে—কিন্তু হোল কি রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি সব যে উল্টে পাল্টে গেল ! ত্যাগীর দল রাজনীতি হাতে নিয়ে বিষম ভোগী হয়ে গেল, হাতী ঘোড়া উটের মিছিল সোনার ছাতা সোনা রূপার ধ্বজা এসবের বিলাস ব্যসনের ছড়াছড়ি হোল—দেশবিদেশে

ভারতের নামের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হোল—একদল লোক ক্রোড়পতি হোল। কিন্তু যে দরিদ্র সে দরিদ্রই রয়ে গেল। বিদেশে এক সম্প্রদায়ের ও তাঁদের আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব জাঁকজমকে আগেকার জমীদার তো দূরের কথা রাজামহারাজাদেরও ছাড়িয়ে গেল—বিদেশীরা মোটে বুঝতে পার্লনা যে ভারত কত গরীব! তারপর আগেকার জমীদাররা যেমন ঋণ করে দোলদুর্গোৎসবে নাচগানে খানা-পিনায় সাধারণের চোখ ঝল্‌সে দিত এখনকার কালেও ক্রোড় ক্রোড় টাকা বিদেশ থেকে ঋণ ও দান হিসাবে নিয়ে সমান জৌলুসে রাজত্ব চালান হচ্ছে—ঋণের তাজমহল তৈয়ারি হচ্ছে! হায়! হায়—গান্ধীজীর আদর্শবাদ কোন অন্ধকারে মুখ লুকিয়েছে! চাষীদের, যথার্থ গরীবদের, এমনকি মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের—যারা দেশের মেরুদণ্ড তাদের দুপায়ে পিষে তাদের অন্ন-বস্ত্রের একটু মাথা রাখবার কোন ব্যবস্থাই নাই—আছে কি না কোটি কোটি টাকার ঋণ বা ভিক্ষা করা পরিকল্পনা—বিদেশ থেকে আনা অনেক খরচ করে বিশেষজ্ঞের দ্বারা তৈয়ারী কাজ আরম্ভ—তারপর গলদ বাহির—ফলে প্রায় সব পরিকল্পনা বানচাল। আর দেশের আসল লোক যে তিমিরে—সেই তিমিরে।

আর বিলাসিতার ব্যয়? শুনেছি এক একজন দৈনিক খরচ করেন হাজার টাকা। নইলে যে তাঁর মান-সম্ভ্রম থাকে না!

সদাশিব। তাহ'লে আসলে সবারই আমার মত অবস্থা!

ভূষণ্ডী। আপনি তো সন্ন্যাসী, সাধারণের জ্বালা আপনি কি বুঝবেন।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া সদাশিব ভূষণ্ডীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তো আমার একটা পীঠস্থান আছে, সেখানে—

ভূষণ্ডী। ওরে বাবা! সে তো এখন পাকিস্তান—শুধু ভিসা পাসপোর্ট নয়—বিধর্মীর তাড়া আছে—এ বয়সে পার্বেন থাকতে? তার চেয়ে এক কাজ করুন—সোমনাথের মন্দির নতুন করে তৈয়ারী হয়েছে-যাবেন সেখানে?

সদাশিব। একটা বাহন তো চাই!

ভূষণ্ডী। আমার পরামর্শ শুনুন—জটাজুট কামিয়ে ফেলুন, চলুন উদ্বাস্তু শিবিরে নাম লিখিয়ে দি। ভিক্ষাবৃত্তি তো আপনার অভ্যাস আছে—সরকারী ভোল নিয়ে কিছু দিন চালিয়ে দিন—লক্ষ লক্ষ নরনারী এখন এই বৃত্তি নিয়েছে।

সদাশিব। সরকার ভিক্ষা দিচ্ছে?

ভূষণ্ডী। না দিলে উপায় কি—ষোল আনা থেকে কেটে কুটে নিয়ে দেয়—তাতে আপনার মত ভিখারীর চলে যেতে পারে!

সদাশিব। ভিক্ষা কর্ব শেষে?

ভূষণ্ডী। কেন ভিক্ষায় আপনার অরুচি হোল কবে?

সদাশিব। আরে মূর্খ! আমি কি নিজের জন্য কখনো ভিক্ষা করেছি, না-যার তার কাছে ভিক্ষা করেছি? যে ভক্ত আমায় মনে প্রাণে ডাকে সে ছাড়া আর কারও দ্বারে আমি গেছি! আর তোর মার কাছে—অন্নপূর্ণার কাছে ভিক্ষা? সে তোর মা জানেন আর আমি জানি! নাঃ—বিষ্ণুর পথই নোব—"অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্"। দেখ্‌না বিষ্ণু কেমন শ্বশুর বাড়ী ক্ষীরোদ সমুদ্রে গা ঢেলে দিয়ে লক্ষ্মী দেবীর সেবা নিচ্ছেন! যাক্ তাহলে আমি হিমালয়েই যাব! সেই আমার শেষ আশ্রয় হোক্।

ভূষণ্ডী। সেখানে কে খুঁজে দেবে আপনার ডেরা? হিলারী, তানজিং আরও অনেকে তুষার মানুষের খোঁজ কর্বার ছলে সব পাহাড় তোলপাড় করে ফেলেছে। তারপর চীনা হামলা হ'য়ে পথঘাট সব বন্ধ হয়ে গেছে।

সদাশিব। চীনারা তো বৌদ্ধ?

ভূষণ্ডী। এরা বৌদ্ধ বটে কিন্তু কমিউনিষ্ট—ঠাকুর দেবতা তো দূরের কথা বাপমায়েরও ঋণ স্বীকার করে না! বাপমায়ের চেয়ে এদের কাছে বড় হোল কমরেড্—কমরেডনী!

সদাশিব। সে আবার কি বাবা!

ভূষণ্ডী। সে সব আমি বোঝাতে পার্ব না! বড় জটিল তত্ত্ব। এখন বলি শুনুন—উদ্বাস্তু বলে নাম লেখান।

গংগা। সে কি? এঁকে কি দণ্ডকারণ্যে পাঠাবে?

ভূষণ্ডী। বেকার বুড়ো দেখে নাও পাঠাতে পারে—

সেখানেও তো সব ভর্ত্তি হয়ে গেছে। শুনেছি শীঘ্র আবার নাম লেখানোও বন্ধ হবে!

সদাশিব দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন বলিলেন, কাজ নাই অত গোলমালে। বাবা নন্দী একটা বড় করে কল্কে তৈয়ারী কর বাবা—একটু বেশী করে কালকূট মিশিও—প্রলয় না হওয়া পর্য্যন্ত নেশা করেই কাটিয়ে দিই!

মস্‌লিন্

শ্রীসুধীর গুপ্ত

(১)

একী রূপার্ত্তি—রূপ-মাধুর্য্য-মাখা,
রূপ-কল্পনা—রূপের স্বপন আঁকা,
রূপসী নগরী মস্‌লিনময়ী ঢাকা!

(২)

অনুভূতি-ভরা রূপ-দ্রব-করা হাতে
বোনে মস্‌লিন্ শিল্পের মৌতাতে
মশ্‌গুল হ'য়ে রূপসী কল্পনাতে।

(৩)

সূক্ষ্মতম সে রূপ-কল্পনাটিও
বুনিয়া বুনিয়া করে কত কমনীয়,—
চিরন্তনী সে তন্বী-তনুরও প্রিয়!

(৪)

বোনে মস্‌লিন্—বোনে মস্‌লিন্ সুখে;
রূপসী বুঝি বা বসিয়া শিল্পী-বুকে
মস্‌লিন্-বোনা দেখে অপলক সুখে!

(৫)

বিস্মিত চোখে কত না উৎসুকতা!
মস্‌লিনে-রূপে মিশিয়া একাত্মতা;—
শিল্পী সুতায় ফুটায় তন্ময়তা।

(৬)

মস্‌লিন্-পরা শ্রেয়সী প্রেয়সী রূপ
শিল্পী কি হেরে অপরূপ নিশ্চুপ!
বোনে মস্‌লিন্ রূপসীর রস-কূপ।

(৭)

মিহি মস্‌লিনে শিল্পের লেখালেখি;
বোনে মস্‌লিন্—বোনে মস্‌লিন্, একী
মস্‌লিন্-পরা প্রিয়ারে যে পাশে দেখি!

(৮)

অনুভূতি-ভরা শিল্পীর যাদু-হাতে
রূপসী যে ধরা পড়েছে কল্পনাতে;
মস্‌লিনী-মধু উপজে নয়ন-পাতে।

(৯)

মেঘ-মস্‌লিনে অভ্রে চন্দ্র রাকা;
তা'রও চেয়ে মিহি অঙ্গ-রাগে যে পাকা
মস্‌লিনী-বাস শিল্প-সুধায় মাখা।

(১০)

দুরন্ত গতি ছুটিছে কালের চাকা;
উড়ন্ত আয়ু যেন রে পাখীর পাখা,—
যায় না জগতে কিছুতে যে ধ'রে রাখা!

(১১)

তবু রূপসীর মস্‌লিনী-মায়া-মাখা
ধ্যানী শিল্পীর রূপাবেশে চেয়ে থাকা
চিরন্তনী যে মস্‌লিনময়ী ঢাকা!

(১২)

বোনে মস্‌লিন্—চলে চির-রূপ চাখা;
চির-রূপসীরে মস্‌লিন্ বুনে ভাকা;
ওগো, মস্‌লিনে একী রূপারতি আঁকা!

(১৩)

রূপ-মস্‌লিনে রূপ তো পড়ে না ঢাকা!
রূপ ঠিকরে গো চমকিত চোখে বাঁকা;—
শিল্পী-মোহিনী মস্‌লিনময়ী ঢাকা!

পিতা-পতি-বিরোধে তু

শ্রীমতী কমলা ভট্টাচার্য্য

সংসারে দেখা যায় বাপ আর স্বামীর মধ্যে অনেক সময়, মনের অমিল, এমন কি গুরুতর কলহ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই প্রকারের বিরোধ কেন হয় ফ্রয়েডীয় মনোবিজ্ঞানীরা তার কারণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কারণ তাঁরা বিশ্লেষণ করিয়াছেন, কিন্তু এই সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে সতী নারীর কর্তব্য কি তাহা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। শ্রীমদ্ ভাগবতে কিন্তু সে কর্তব্য সুষ্ঠু নির্ধারিত হইয়াছে। সতীর দক্ষ-যজ্ঞে উপস্থিতিতেও আত্মবলিদানের উপাখ্যানে —সেই উপাখ্যানেরই পুনরাবৃত্তি করিতেছি।

"মৈত্রেয় কহিলেন, ভগবান ভব সতীকে এই প্রকার কহিয়া নীরব হইলেন। কিন্তু শিবের এই চিন্তা উদিত হইল, 'যাইতে অনুমতি দিই, কি বলপূর্ব্বক নিবারণ করি, দুই দিকেই সতীর শরীর নাশের সম্ভাবনা। এদিকে সতীও বন্ধুদর্শন বাসনায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া একবার গৃহ হইতে নির্গতা হন, আবার ভবের ভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন;—তাঁহারও চিত্ত উভয় দিকে দুলিতে লাগিল, ক্রমে বন্ধুজনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা প্রতিহত হইল ভাবিয়া সতী অতিশয় দুর্ম্মনা হইয়া পড়িলেন এবং স্নেহবশতঃ রোদন করিয়া অশ্রুধারায় ব্যাকুল হইয়া অতুল্য পুরুষ ভগবান ভবকে যেন ভস্মসাৎ করিবেন এই ভাবে তাঁহার প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিলেন। তৎকালে ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পমান হইতে লাগিল, তিনি বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর ভাবপ্রযুক্ত তাঁহার বুদ্ধি এতদূর বিমূঢ় হইয়া পড়িল যে, যে সাধুপ্রিয় ভব প্রীতিবশত আপনার দেহার্দ্ধ প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে পিতৃগৃহে যাত্রা করিলেন। সতী একাকিনী অতিবেগে যাইতে আরম্ভ করিলে, পার্ষদ মণিমান্ আদি যক্ষ, এবং মদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র শিবের অনুচর নির্ভয়ে বৃষেন্দ্রকে অগ্রে করিয়া তাহার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ ধাবমান হইল। অনন্তর তাহারা দেবীর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে সেই বৃষে আরোহণ করাইল। সারিকা, কন্দক, দর্পণ, অম্বুদ, শ্বেতচ্ছত্র, ব্যজন, মাল্য, গীতাশ্রয় শঙ্খ বেণু ও দুন্দুভি প্রভৃতি রাজোচিত দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা সুসজ্জিত হইয়া সকলে যাইতে লাগিল। অতঃপর সতী পিত্রালয় প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞস্থানে প্রবেশ করিলেন। তথায় যজ্ঞীয় পশুবধের কোলাহল, বেদপাঠের শব্দে মিশ্রিত হইয়া অপূর্ব্ব মধুরভাবে শ্রুতিগোচর হইতেছিল। দেবগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ সকলে স্থানে স্থানে উপস্থিত ছিলেন যজ্ঞ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদি সংস্থাপনার্থ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, লৌহ, স্বর্ণ, কুশ এবং চর্ম্মনির্ম্মিত নানাবিধ পাত্র সর্ব্বত্র আযোজিত রহিয়াছে। কিন্তু দক্ষ সতীকে দেখিয়া কোন প্রকার অভ্যর্থনা করিলেন না। সতীর জননী ও ভগিনীগণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই যজ্ঞকারী দক্ষের ভয়ে তাঁহার সমাদর করিল না। কেবল তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ প্রেমাশ্রু দ্বারা নিরুদ্ধ কণ্ঠ হইয়া সাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। সতী দেখিলেন, পিতা ত কথা দ্বারাও আদর করিলেন না। যদি ভগিনীগণ সহোদরা বলিয়া তাঁহাকে সমুচিত সম্ভাষণ পুরঃসর প্রীতিপ্রদর্শন করিল এবং মাতা ও মাতৃষসাগণ উৎকৃষ্ট আসন ও অলঙ্কার প্রদান করিলেন, তথাপি তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তিনি দেখিতে পাইলেন, এই যজ্ঞে ভগবান্ রুদ্রের অংশ নাই। তাহাতে তাহার স্পষ্ট বোধ হইল যে, দক্ষ দেবদেব রুদ্রকে অবজ্ঞা করিয়াছেন। আর যজ্ঞ সভায় নিজেরও বিশেষ সমাদর না দেখিয়া কোপান্বিতা হইলেন। অবি-

অমেই তাঁহার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিল, যেন তদ্দ্বারা সমস্ত লোক দগ্ধ হইয়া ভস্মসাৎ হইয়া পড়ে। সতীর ক্রোধাবেশ হইবামাত্র দক্ষবিনাশার্থ তৎক্ষণাৎ সতীর তেজে কতকগুলা ভূত সমুত্থিত হইল। কিন্তু দেবী তাহাদিগকে নিবারণ করিলেন। শিবদ্বেষী দক্ষ কর্ম্মমার্গে বহুতর পরিশ্রম করিয়া গর্ব্বিত হইয়াছিল, সতী পৃথিবীস্থ সমস্তলোকের সমক্ষেই রোষ জন্য অপরিস্ফুট বাক্যে কহিলেন,—পিতঃ! ইহলোকে যাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, যাঁহার প্রিয় অথবা অপ্রিয় কাহাকেও দেখিনা এবং যিনি দেহধারীদিগের প্রিয় আত্মার কারণ স্বরূপ,—কাহারও সহিত যাঁহার বিরোধ নাই, তোমা-ব্যতীত আর কোন্ ব্যক্তি সেই ভগবানের প্রতিকূল আচরণ করিবে? তোমার মত ব্যক্তিগণ প্রায় অসূয়া-পরবশ হইয়া থাকে, তাহারা পরের গুণ সহ্য করিতে পারে না,—অন্যের বহু গুণ বর্ত্তমান থাকিলেও গুণ পরিহার করিয়া দোষই গ্রহণ করে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি তোমাদের তুল্য অসূয়া পরবশ নহেন, তাঁহারা কাহারও দোষ গুণ থাকিলে দোষমাত্র গ্রহণ করেন না,—দোষ গুণ যেমন থাকে, তেমনি বিচার করিয়া গ্রহণ করেন। ইহাদিগকে মহৎ বলা যায়। আর যে সকল সাধু পুরুষ কেবল গুণই গ্রহণ করেন, কখন দোষ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা মহত্তর। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি অন্যের দোষ থাকিলেও তাহা গ্রহণ করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত অতি সামান্য যৎকিঞ্চিৎ গুণ দেখিতে পাইলে, তাহাকেই বহুমান্য করেন, তাঁহারা মহত্তম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি সেই সকল মহত্তম পুরুষের প্রতি পাপ কল্পনা করিলেন! যাহারা এই জড় দেহকেই আত্মা কহে, তাদৃশ দুর্জ্জন পুরুষেরা ঈর্ষাবশত ঐ প্রকার মহাজনদিগের নিন্দা করিবে আশ্চর্য্য নহে, বরঞ্চ তাহা আবশ্যক, কারণ যদিও সাধু ব্যক্তিরা আত্মনিন্দা সহ্য করেন, তথাপি তাঁহাদের পদরেণু তাহা সহিতে সমর্থ হয় না, তাঁহাদের চরণধূলি ঐ সকল ব্যক্তির তেজ নাশ করে। অতএব সতঃ প্রতিফল পাওয়াতে অসৎ পুরুষের পক্ষে মহাজনের নিন্দা করাই ভাল। পিতঃ! যাঁহার নাম 'শিব'—এই দুইটি অক্ষর কেবল কথা দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেও তৎক্ষণাৎ মানবদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যাঁহার কীর্ত্তি অতি পবিত্র, যাঁহার শাসন কাহারও লঙ্ঘনীয় নহে তুমি সেই শিবের বিদ্বেষ করিতেছ, কি আশ্চর্য্য! তুমি এমনই অমঙ্গল স্বরূপ। যাঁহার পাদপদ্মে মহৎ ব্যক্তিদিগের মনোভৃঙ্গ, ব্রহ্মানন্দরূপ মকরন্দ পানার্থী হইয়া নিরন্তর ভজনা করে এবং যাঁহার চরণ সকাম পুরুষদিগের সম্বন্ধে অভিলষিত মঙ্গল বর্ষণ করিয়া থাকে—তুমি সেই বিশ্ববন্ধু শিবের বিদ্বেষ করিতেছ। পিতঃ! তুমি গর্ব্বান্ধ হইয়া শিবনামে যে সেই অশিব তত্ত্ব আরোপ করিয়াছিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কি সেই তত্ত্ব অবগত নহেন? কেননা ভগবান্ ভব, জটাজাল বিকীরণ পূর্ব্বক চিতামালা, ভস্ম ও মৃত মনুষ্যের কপোল ধারণ করিয়া পিশাচগণ সহিত শ্মশানে বাস করিলেও, দেবগণ তাঁহার চরণভ্রষ্ট নির্ম্মাল্য স্ব স্ব মস্তকে ধারণ করিতেছেন। তোমার ন্যায় তাঁহারা যদি শিবের তত্ত্ব জানিতেন, তবে তাঁহার চরণ বিগলিত নির্ম্মাল্য কখনই তাঁহারা মস্তকে ধারণ করিতেন না। যাহা হউক, দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি যে স্থানে ধর্ম্মরক্ষক স্বামীর নিন্দা করে, পতিব্রতা কামিনী সেখানে যদি তাহাদের বিনাশ করিতে সমর্থ না হয়, তবে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্ব্বক তথা হইতে তাহার নির্গত হওয়া কর্ত্তব্য। যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে যে দুরাত্মা ঐরূপ অকল্যাণ কথা প্রয়োগ করে, তাহার জিহ্বা বলপূর্ব্বক ছেদন করিয়া দিবে; পরে আপনার প্রাণও পরিত্যাগ করিবে;—এইরূপ করাই ধর্ম্ম। তুমি ভগবান্ নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী; তোমা হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা আমি আর ধারণ করিব না। নিন্দিত অন্ন যদি মোহবশতঃ ভক্ষণ করে, তাহা হইলে তাহা বমন করিয়া ফেলিলে তবে তাহার শুদ্ধি হয়। যে পুরুষ আত্মানন্দ-সম্ভোগেই পরি-তৃপ্ত, তাঁহার বুদ্ধি কখন বিধি-নিষেধরূপ বেদ-বাক্যের অনুগামী হয় না। দেব ও মনুষ্য—এই দুয়ের গতি যেমন পৃথক্, সেইরূপ যাহার যে ধর্ম্ম, তিনি তাহাতেই অবস্থিত থাকিবেন; অন্য ধর্ম্মের বা অন্য ব্যক্তির কখনও তিনি নিন্দা করিবেন না। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি—এই দুই প্রকার কর্ম্মই সত্য। বেদে এই উভয় কর্ম্মেরই বিধান আছে। ঐ দুই কর্ম্ম বিবেচনাপূর্ব্বক ব্যবস্থা দ্বারা বিহিত হইয়াছে,—অবশেষে বিধান হয় নাই। ঐ দুই কর্ম্ম একইকালে এক কর্ত্তাতে পরস্পরবিরুদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু শিব সাক্ষাৎ ব্রহ্ম; তাহাতে কোন কার্য্যই নাই। হে পিতঃ! আমরা

অণিমাদি যে সমস্ত ঐশ্বর্য্য আশ্রয় করিয়াছি, তোমরা কখন তাহা চক্ষেও দেখ নাই। তোমাদের ঐশ্বর্য্য ত কেবল যজ্ঞশালাতেই থাকে। যজ্ঞান্ন পরিতৃপ্ত মানবগণই তাহার প্রশংসা করে এবং কর্ম্মকাণ্ড-পথাশ্রিত পুরুষেরাই তাহা ভক্ষণ করিয়া থাকে। আমাদের ঐশ্বর্য্য সেরূপ নহে, তাহা ইচ্ছামাত্রে উৎপন্ন হয়। তাহার হেতু অব্যক্ত। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণই তাদৃশ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন। তোমার সহিত আর কথার প্রয়োজন নাই। তুমি ভগবান্ ভবের নিকট অপরাধী, তোমার দেহ হইতে আমার এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার জন্ম অতি কুৎসিত। ইহা আর ধারণ করা উচিত হয়না। তুমি অতি কু-জন। তোমার সম্বন্ধ বশতঃ আমার বড় লজ্জা হইতেছে। মহতের অপ্রিয় কর্ত্তা হইতে যে জন্ম হয়, সে জন্ম ধিক্। ভগবান্ বৃষধ্বজ আমার সহিত পরিহাস সময়ে যখন আমাকে 'দাক্ষায়ণি' বলিয়া সম্বোধন করেন, তখন আমার পরিহাস-বিষয়ক হাস্য অন্তর্হিত হয়; তখন আমি অতিশয় দুঃখিত হই। তোমার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন এই অঙ্গ আমি ত্যাগ করিব। ইহা মৃতদেহের তুল্য। মৈত্রেয় কহিলেন, 'হে শত্রুনাশন বিদুর! দাক্ষায়ণী সতী এই প্রকারে যজ্ঞ মধ্যে দক্ষের প্রতি নিন্দাবাক্য প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন পুরঃসর উত্তরমুখী হইয়া ক্ষিতিতলে উপবিষ্ট হইলেন। তৎপরে আচমনপূর্ব্বক পীতবর্ণ পট্টবসন দ্বারা শরীর আচ্ছাদন করিয়া মুদ্রিত চক্ষে যোগপথের পথিক হইলেন। হর-সুন্দরী তখন আসন জয় করিয়া, প্রাণ ও অপান বায়ুকে নিরোধ দ্বারা সমান করিয়া নাভিচক্রে স্থাপন করিলেন। তদনন্তর নাভিচক্র হইতে উদান-বায়ুকে অল্পে অল্পে উত্তোলন করিয়া বুদ্ধির সহিত হৃদয়ে স্থাপন করিলেন। পশ্চাৎ উদান বায়ুকে কণ্ঠমার্গ দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে লইয়া গেলেন। মহৎ ব্যক্তিদিগের পূজ্যতম ভগবান্ রুদ্র, যে দেহকে আদর করিয়া ক্রোড়ে স্থাপন করিতেন, সতী, দক্ষের প্রতি ক্রোধ করিয়া এইরূপে সেই দেহও পরিত্যাগ করিবার বাসনায় সর্ব্বাঙ্গে বায়ুকে রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তিনি জগদ্‌গুরুপতির পদারবিন্দের মকরন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন; তখন পতি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলেন না। এদিকে তাঁহার দেহ পাপশূন্য হইয়া সমাধি সমুৎপন্ন অনল দ্বারা স্বতঃ প্রজ্জ্বলিত হইল। (৪।৪ শ্রীমদ্ভাগবত)

তারপর সতীর পরিত্যক্ত দেহ লইয়া শিব কি করিলেন তাহা সকলেই জানেন। আসমুদ্র হিমাচল ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইল বাহান্ন পীঠস্থান। ভারতের সতী নারীদের সম্মুখে স্থাপিত হইল এক অতুলনীয়, সমুন্নত আদর্শ—পতি আর পিতার বিরোধে সতী নারীর অবশ্য কর্ত্তব্যের জলন্ত দৃষ্টান্ত। তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

সার্কাসে বঙ্গনারী

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চৌধুরী

অনেকদিন আগে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আইন-সভায় স্বর্গগত গোখলে মহোদয় বাঙ্গালীর নব-জাগরণের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাঙ্গালীগণ বহু বিষয়ে সর্ব্ব-ভারতে গণনীয়। ভারতবাসীর সম্মুখে যতগুলি কর্ম্ম-পথ মুক্ত রহিয়াছে, তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।" বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার যুবক-গণের মত বাঙ্গালার রমণী সমাজেও নূতন যুগের নবীনমন্ত্রে জাগরণের সাড়া উঠিয়াছিল। জ্ঞানে ধর্ম্মে, শিল্পে সাহিত্যে, সমাজসেবা ও রাজনীতিতে তাঁহারা যেমন সমুদয় ভারতে অগ্রণী হইয়াছিলেন, তেমনি ক্রীড়াকৌশলেও অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়া বঙ্গরমণীগণ সমগ্র ভারতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

এই নবজাগরণের প্রথম পর্য্যায়ে "হিন্দু-মেলার" অবদান অপরিসীম। সে মেলার কাহিনী আজ বিস্মৃত ও বিলুপ্ত-প্রায়। "জীবনস্মৃতিতে" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই মেলার বিষয়ে লিখিয়াছেন—"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলার সৃষ্টি হইয়াছিল। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়া-ছিলেন।" এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের

কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণিলোক পুরস্কৃত হইত। হিন্দুমেলার অন্যতম প্রবর্ত্তক নবগোপাল মিত্রের প্রচেষ্টায় হিন্দুমেলার তত্ত্বাবধানে একটি ব্যায়াম বিভালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, নবগোপাল এদেশে সার্কাসেরও সূত্রপাত করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁহার 'আত্মজীবনীতে' লিখিয়াছেন— "কতকগুলো মড়াখেকো ঘোড়া লইয়া নবগোপালবাবুই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী সার্কাসের সূত্রপাত করেন।" শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি তথায় তাঁহার কন্যা কুসুমকেও ঘোড়ায় চড়ানো শিখাইতেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় সুদক্ষ ব্যায়ামবীর প্রিয়নাথ বসুর অধীনায়কত্বে প্রফেসার বোসের গ্রেটবেঙ্গল সার্কাস গড়িয়া উঠে। ক্ষুদ্র বালিকা কুসুমকে লইয়া যাহার উদ্ভব, কালক্রমে তাহাতে যোগদান করিয়া কয়েকজন বঙ্গরমণী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশ্ব-জগতকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

যে সময়ের কথা হইতেছে, সে যুগে কোন বাঙ্গালী মেয়ের পক্ষে প্রকাশ্য সার্কাসে অবতীর্ণ হইয়া ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। নব জাগরণের উন্মাদনায় জাগ্রত হইয়া সার্কাসে অবতীর্ণ হইয়া বাঙ্গালার বীর রমণীগণ বাঙ্গালীর ভীরুতার কলঙ্ক দূর করিয়াছিলেন।

সার্কাস জগতে প্রথম বাঙ্গালী মহিলা যিনি যোগ দেন, তাঁহার নাম সুশীলাসুন্দরী। ইহার পূর্ব্বে অপর কোন বাঙ্গালী মহিলা সার্কাস খেলায় যোগদান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই। শুধু যোগদান করাই নহে, সুশীলা-সুন্দরীর কৃতিত্ব—তাঁহার শারীরিক শক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। অনেকের মতে, সুশীলাসুন্দরী সমগ্র ভারতের মধ্যে—হিংস্র বাঘের খেলা দেখাইতে প্রথম মহিলা খেলোয়াড়। শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী ব্যতীত অন্য কোন ভারতীয় রমণী বন্য ব্যাঘ্রকে লইয়া প্রকাশ্য সার্কাসে খেলা দেখাইয়া যশস্বিনী হইতে পারেন নাই। নির্ভয়ে কোনরূপ অস্ত্র না লইয়া, আত্মরক্ষার জন্য একগাছি ছড়ি পর্য্যন্ত না লইয়া সুশীলা বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করিয়া যে আশ্চর্য্য ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা যাহারা না দেখিয়া-ছেন তাঁহাদের বুঝানো অসাধ্য। সেকালের "ইংলিশম্যান" পত্রের ইংরাজ সম্পাদক তাঁহার বিষয়ে লিখিয়াছিলেন— "হিন্দু রমণীগণ অবলা বলিয়াই কথিত; কিন্তু সুশীলাসুন্দরী একাকী নির্ভয়ে আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া অর্দ্ধ-ঘণ্টার অধিককাল দুইটী বন্য ব্যাঘ্রের সহিত একাকী নির্ভয়ে ও অবিচলিত ভাবে তাঁহার কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। রিক্তহস্তে, সামান্য বস্ত্রে, আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া অর্দ্ধঘণ্টার উপর বাঘে-মানুষে প্রকৃত মল্লযুদ্ধ এবং ব্যাঘ্রগুলিকে ভীষণ উত্তেজিত করিয়া পিঞ্জরের প্ল্যাটফর্ম্মের উপর একেবারে লম্বমান হইয়া শয়ন ও লম্ফত্যাগ পূর্ব্বক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক গ্রীবাদেশ ঘন ঘন দংশন করান ও পরস্পর ঘন ঘন চুম্বন ও আলিঙ্গন গ্রহণ—এরূপ লোমহর্ষক শোণিত-শোষক ব্যাপার আর কেহ দেখাইয়াছেন কিনা সন্দেহ! ব্যাঘ্রের খেলা ব্যতীত সুশীলাসুন্দরী ট্রাপিজ ও লেডার প্রভৃতিতেও ব্যায়াম কৌশল দেখাইতে পারিতেন এবং সেই সকল খেলায় তিনি অল্প সাহস, কৌশল ও শক্তিমত্তার পরিচয় দেন নাই।

সার্কাসক্রীড়ায় সুশীলার পরে যে বঙ্গরমণী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাঁহার নাম মৃন্ময়ী। ইনি হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া সুন্দরবনের ব্যাঘ্রের সহিত খেলা দেখাইয়া অভূতপূর্ব্ব খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুশিক্ষিত হস্তি-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উপবিষ্ট বন্য ব্যাঘ্রের সহিত তিনি যেরূপ আশ্চর্য্য কৌশল ও বীরত্বের সহিত ক্রীড়া করিয়াছেন, তাহা স্বপ্নে দেখিলেও লোকে আতঙ্কিত হইয়া উঠে। ইহারই উল্লেখ করিয়া সেকালে কবি গাহিয়া-ছিলেন—

"কাঁদায়ে কল্পনা
গর্জ্জে বাঘাসনা
বঙ্গবীরাঙ্গনা বয়ে মরণে!"

সুশীলাসুন্দরীর ভগিনী কুমুদিনীও লেডার ও অন্যান্য খেলা ব্যতীত অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নানাবিধ নয়নরঞ্জক খেলা দেখাইতেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালী অবলা জাতির একজনের দ্বারা অশ্বারোহণ ও অশ্বপৃষ্ঠে নানারূপ অঙ্গচালনা দর্শককে কিরূপ বিমুগ্ধ করিত তাহা অনুমান করা যায়। গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের সহিত এই তিনজন বীর রমণী ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, জাভা, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশের নগরে নগরে যাইয়া বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তথা হইতে পিনাং ও পরে সিঙ্গাপুর

পর্য্যন্ত বিজয়-গর্ব্বে খেলা দেখাইয়া অর্থে ও সম্মানে ভূষিতা হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

"গ্র্যাস ব্যানাল্সিং", "ক্রীণ লেভার", "বল", তার এবং ট্রাপিজের খেলা দেখাইয়া যে বঙ্গবালিকা বোসেস্ সার্কাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম মুলতানবালা। পরে ইনি ঘোড়ায় চড়িতে শিখেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই একজন "বেয়ার ব্যাক রাইডার" হয়েন। ঘোড়ার কাছে ফেল্ট ধরিয়া কোন একটি বেড়া বা আগড় লাফাইবার কালে (hurdle jum) ঘোড়ার সহিত উঠানামা করিয়া ঐ বেড়া ডিঙ্গানকে "ভল্টিং এক্ট" বলা হয়। মুলতানবালা অতি দ্রুত এবং সুন্দরভাবে এইরূপ "ভলটিং এক্ট" করিতে পারিতেন।

অল্প বয়স হইতেই মুলতানবালার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বয়স আট কি নয় বৎসর হইবে, সেই সময়ে জাহাজের উপর এক হাতী তাঁহাকে শুঁড়ে জড়াইয়া ধরিয়া উঁচু করিয়া লইয়া শুঁড়টি একেবারে ডেকের বাহিরে সমুদ্রের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। বালিকা ভীত না হইয়া জলের উপরে শূন্যে ঝুলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পরে হাতীটি মুলতানবালাকে নিরাপদে ডেকে নামাইয়া দেয়।

প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী মেয়ে প্রমীলাসুন্দরী এ্যাক্রোব্যাটস্ সার্কাসে খেলা দেখাইয়া লোকের বিস্ময় জন্মাইয়াছিলেন। বেণীবাবুর এ্যাক্রোব্যাটস্ সার্কাসে ইনি খেলা দেখাইতেন। লোক বোঝাই পাকী গাড়ী বর্শা দিয়া ঠেলিয়া দিতেন, ত্রিশমণ ওজনের পাথর বুকের উপর ভাঙ্গিতেন, তিনমণ ওজনের গোলা লইয়া খেলা করিতেন। ইনি বোসেস্ সার্কাসেও খেলা দেখাইয়াছেন।

বোসেস্ সার্কাসে অপর যে সকল বঙ্গরমণী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে সুচিন্তা ও সুকুমারীর নাম উল্লেখযোগ্য। সুচিন্তা বল, 'ল্যাডার' ও 'শ্লাক্ওয়্যার' (Slack wire) প্রভৃতির খেলা দেখাইতেন এবং কনিষ্ঠা সুকুমারী ভাল "বেয়ার ব্যাক রাইডার" হইয়াছিলেন। অন্যান্য স্ত্রী খেলোয়াড়গণের মধ্যে রাজুবালা, শশীকলা, গোলাপ ও বসন্তের নাম উল্লেখযোগ্য। শশীকলা "শুম্ভ" ও "নিশুম্ভ" নামক দুইটি ব্যাঘ্রের সহিত খেলা দেখাইতেন। গায়ত্রী দেবী নাম্নী একজন বঙ্গমহিলা অশ্বারোহণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

ইদানীং কালে "জেমিনী সার্কাসে" কুমারী রেবা রক্ষিত নাম্নী এক বঙ্গ বীরাঙ্গনা নানাবিধ ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করিয়া রমণী বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী রক্ষিত বক্ষের উপর ভারী "রোলার" উত্তোলন, কণ্ঠ দ্বারা বর্শা ফলকের মুখে লৌহদণ্ড বাঁকান, পৃষ্ঠদেশে ধারালো তরবারি রাখিয়া পেটের উপর প্রস্তর ভগ্ন করা এবং বন্দুকের লক্ষ্যভেদে কৃতিত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল স্বর্গীয় হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে "দেবী চৌধুরাণী" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সার্কাসে যোগদান করিয়া বুকের উপর হস্তি উত্তোলন করিয়া এবং ২৫০ পাউণ্ড স্প্রীং টানার খেলা দেখাইয়া প্রভূত যশ ও গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

পরবর্ত্তীকালেও কয়েকজন বঙ্গরমণী বিভিন্ন সার্কাসে যোগদান করিয়াছেন। ইহা ঘটনা হিসাবে যেমন আনন্দদায়ক তেমনি অপরিসীম গৌরবাত্মকও। দুষ্কর ব্রতের পরীক্ষায় এবং দুঃসাহসের তপস্যায় বাঙ্গালার নারীসমাজ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়া আসিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালী-জাতির মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে। বঙ্গরমণীর এই শরীর পটুতার কাহিনী জাতির ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য।

—

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম.বি

গর্ভাবস্থায় প্রসূতির নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের মঙ্গল ও ছোট-বড় বিপদ-দুর্ঘটনার আশঙ্কা-মোচনের উদ্দেশ্যে সুচিকিৎসক ও অভিজ্ঞ ধাত্রীর কাছে শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার্থে যাবার সময়, পরিষ্কার একটি শিশি বা বোতলে প্রসূতির প্রাতঃকালীন মূত্রের নমুনা (sample of the first urine in the morning of the would-be

mother) সংগ্রহ করে, অন্যথায় উপযুক্ত কোনো বিশেষজ্ঞের দ্বারা ইতিপূর্বে বিশেষভাবে-পরীক্ষিত প্রসূতির 'মূত্র-বিবরণী' (Urine Examination Report) সঙ্গে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ, এই 'মূত্র-পরীক্ষার' (Urine-Test) ফলাফলের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি বিবেচনা করেই চিকিৎসক এবং ধাত্রী প্রসূতির ও গর্ভস্থ-সন্তানের শারীরিক-অবস্থার ও মঙ্গল-অমঙ্গলের সঠিক-তথ্য নির্ণয় ও সময় থাকতে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন আর প্রয়োজন মতো ঔষধ পরিচর্য্যার ব্যবস্থাদি করতে সক্ষম হবেন। উপরন্তু, এভাবে পরীক্ষাকালে—চিকিৎসক বা ধাত্রীর কাছে সুস্পষ্ট-বিশদভাবে প্রসূতির সাম্প্রতিক শারীরিক অবস্থা, হাম-বাত-বসন্ত বা অন্ত কোনো সংক্রামক-রোগে আক্রান্ত হবার বিবরণ প্রভৃতি বিবিধ ব্যক্তিগত-কারণেরও তথ্য-পরিচর্য্যাদিও জানিয়ে রাখা দরকার। কারণ, এ বিষয়ে অহেতুক দ্বিধা-সংকোচ বা লজ্জা, অনেক ক্ষেত্রেই প্রসূতি ও গর্ভস্থ-সন্তানের পক্ষে শেষ-পর্য্যন্ত যথেষ্ট দুর্ভোগ-যন্ত্রণা... এমন কি, জীবন-সংশয়েরও উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবাঞ্ছনীয় চক্ষুলজ্জা, অজ্ঞতা আর সময়মতো প্রসূতি-পরিচর্য্যার বিধি অনুসরণ না করার ফলে, এ-ধরণের দুর্ঘটনার অল্প-বিস্তর প্রমাণ বাঙলাদেশের প্রায় প্রতি ঘরে-ঘরেই পাওয়া যায়...তবে পল্লী অঞ্চলের তুলনায় ইদানীং শহরে এ সব মর্ম্মান্তিক ঘটনার ব্যাপকতা যে ক্রমেই কমে আসতে সুরু করেছে—সেটাই হলো বিশেষ আশাপ্রদ ব্যাপার। মোটকথা, যথাসময়ে উপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন এবং অভিজ্ঞ ধাত্রী-চিকিৎসকদের সুপরামর্শ গ্রহণ ও তদনুসারে যথোচিত বিধি-নিয়মাদি মেনে সুনির্দিষ্ট-পন্থায় আহার বিশ্রাম উপভোগ, ঔষধ পথ্য সেবন আর শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখার দিকে সজাগ-তৎপর দৃষ্টিদান করলে, প্রসূতি ও ভবিষ্যত-সন্তান—উভয়েরই শুধু যে সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল সম্ভাবনা তাই নয়, উপরন্তু ছোট বড় সকল সংসারেই আর্থিক অসচ্ছলতা ও মানসিক অশান্তি লাঘবের যথেষ্ট সুবিধা হবে।

এ ছাড়া প্রসূতি-অবস্থায়, প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, সর্ব্বদাই কোন অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকের (Dentist) সুপরামর্শ নেওয়া দরকার। কারণ, প্রসূতি-অবস্থায় কারো কারো অল্প বিস্তর নানারকম দাঁতের রোগ দেখা দেয়...অর্থাৎ, দাঁতের গোড়া ফোলা, মাড়ি থেকে পুঁজ রক্ত পাত —এমনি নানান্ উপসর্গ...এবং এ সব উপসর্গের ফলে, খাওয়াদাওয়াদি চিবুতে কষ্ট হয় আর হজমাদিরও বিশৃঙ্খলা ঘটে। শেষ পর্য্যন্ত শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখাও সম্ভবপর হয়ে ওঠে না যথোচিতভাবে। উপরন্তু, প্রসূতি অবস্থায় কারো কারো আবার অনেক সময় দাঁতের ক্ষয়-রোগ দেখা দেয়...তার ফলে, রক্তদুষ্টিও ঘটে। দাঁতের রোগ দেখা দিলে শুধু যে প্রসূতিরই স্বাস্থ্যহানি হয় তাই নয়, গর্ভস্থ-সন্তানের শারীরিক সুস্থতারও রীতিমত ক্ষতিসাধন করে। এই সব কারণেই, সন্তান-সম্ভাবনার সঠিক পরিচয় পেলেই অভিজ্ঞ দন্ত-চিকিৎসকেরা প্রসূতিদের দাঁত এবং শারীরিক সুস্থতা যথাযথভাবে বজায় রাখার দিকে সদা-সজাগ দৃষ্টিদান ও প্রয়োজনমতো সুপরামর্শ চিকিৎসা ঔষধ-পথ্যাদির সুব্যবস্থা করে থাকেন।

দাঁতের সুস্থতা বজায় রাখা ছাড়া স্তনের যত্ন নেওয়াও যে প্রত্যেক প্রসূতিরই অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য—এ কথা স্মরণ করিয়ে দিলে অনেকেই হয়তো নিতান্ত 'বাড়াবাড়ি' বা অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা মনে করতে পারেন। এমন ধারণা পোষণ করা কিন্তু যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ, পাশ্চাত্য সভ্যতা রীতির অন্ধ-অনুকরণে আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে আজকাল মাতৃ-স্তন্যদান প্রথা আজকাল প্রায় তিরোহিত হতে সুরু করেছে...তার পরিবর্ত্তে ইদানীং 'বোতল দুধ (Milk Bottle) বা 'মাইপোষ' আর 'কৌটো-দুধ' (Milk Powder) খাওয়ানোর প্রথা শহর ছেড়ে পল্লীগ্রাম অঞ্চলেও ব্যাপক প্রসারলাভ করেছে। তার ফলে, প্রসূতি ও নবজাত শিশু—উভয়েরই যথেষ্ট অপকার ঘটেছে। কারণ, এ যুগের প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ৺স্যার কেদারনাথ দাস, ডাঃ উইলিয়ামস্ প্রভৃতি মনীষীরা ছাড়াও, বিশ্বের অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসক ও ধাত্রীরা সকলেই একমত প্রকাশ করেছেন যে সন্তান প্রসবের পর প্রসূতির জরায়ুর সুব্যবস্থার জন্য নবজাত শিশুকে স্তন্যপান করানো একান্তভাবে আবশ্যক। কিন্তু এই সব আধুনিক বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত অগ্রাহ্য অবহেলা করে এ যুগে ক্রমশঃই কৃত্রিম-খাদ্যে আমরা এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে নবজাতকের দেহ-মনের উত্তরোত্তর গঠন, বৃদ্ধি এমন কি, জীবনধারণের জন্য মাতৃ-দুগ্ধই যে একমাত্র পুষ্টি-

কর—শ্রেষ্ঠ ও সুসম-খাদ্য, সেই আসল সত্যটুকুও আজ আধুনিক সভ্যতার চোখ-ধাঁধানো মোহিনী-মায়ার অলীক জৌলুষের ঝলকানিতে শোচনীয়ভাবে ভুলতে বসেছি, ভুলতে বসেছি বলেই—আজ আমাদের বাঙলাদেশের ঘরে ঘরে অপুষ্ট শীর্ণকায়, স্বাস্থ্যহীন রোগজীর্ণ স্বল্পায়ু-পঙ্গু-নিস্তেজ নিরানন্দময় শিশুদের ভীড়…ভবিষ্যতে এরাই কি সদর্পে তুলে ধরে রাখবে—বাঙলার আর বাঙালীর গৌরবময় ঐতিহ্যের পতাকা ?…মনে রাখতে হবে—শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ…আজ যারা মাতৃস্তন্য সুধা-পান করে তিলে তিলে বড় হয়ে উঠছে, আগামীকাল তারাই দৈহিক ও মানসিক সম্পূর্ণতা লাভ করে সামনে এসে দাঁড়াবে—দেশের ভাগ্য-নিয়ন্তা হয়ে ! তাই সবার আগে প্রয়োজন—তাদের সুপুষ্ট, সতেজ, সুদীপ্ত-বলীয়ান দেহে-মনে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করে গড়ে তোলা…এবং সে কাজের গুরুদায়িত্ব ভার রয়েছে শুধু আমাদের দেশের প্রত্যেক প্রসূতি-জননীর হাতে সুচিকিৎসকের হাতে…অভিজ্ঞা ধাত্রীর হাতে। সেইজন্য ভবিষ্যৎ সন্তানের খাদ্য ভাণ্ডার যাতে তার সুস্থ-সবল দেহ-মন গঠনের উপযুক্ত পুষ্টিকর আহার্য্য উপাদান পরিবেষণ করতে পারে, সেদিকে যথোচিত দৃষ্টিদান করা আজ একান্ত প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করেই প্রত্যেক প্রসূতিরই উচিত—নিজের শারীরিক সুস্থতার সম্বন্ধে সদা-সজাগ দৃষ্টি রাখা। প্রসূতিদের পক্ষে বিশেষ কোনো কার্য্যকারণে অন্যান্য ধরণের শারীরিক যত্নাদির যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সব সময়ে সম্ভবপর না হয়ে উঠলেও, নিয়মিতভাবে প্রত্যহ সকালে এবং রাত্রে গরম ও ঠাণ্ডা জলে স্তনদ্বয় সাফ্ করে, স্তনের 'বোঁটা' বা চুষী (Tits of both the breasts) দুটিকে শুকনো-নরম তোয়ালে বা কাপড়ের সাহায্যে মুছে পরিষ্কার রাখা একান্ত আবশ্যক। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য-চিকিৎসক স্যার ট্রবি কিং ও স্বনামধন্যা প্রবীণা ধাত্রী লিড়িয়ার্ডের মতে, এ ব্যবস্থা অনুসরণের ফলে, প্রসূতির স্তন সুপুষ্ট, সুগঠিত ও পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ-সম্ভারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে এঁরা দুজনে সুস্পষ্টভাবে আরো অভিমত প্রকাশ করেছেন যে প্রয়োজনবোধে, প্রসূতিরা স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষী' দুটিতে অল্প একটু 'অলিভ অয়েল' (Olive oil) কিম্বা 'বোরো-গ্লিসারিনের' (Boroglycerine) প্রলেপ লাগিয়ে হাতের আঙুলের সাহায্যে ভালোভাবে মার্জ্জনা করে নিলেও অনেক সময় বিশেষ উপকার পাবেন। এ ভাবে স্তনের 'বোঁটা' বা 'চুষী' মার্জ্জনার জন্য, অলিভ অয়েল বা বোরোগ্লিসারিনের পরিবর্ত্তে 'স্পিরিট' বা 'মলম' ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, 'স্পিরিট' ব্যবহারে স্তনের চামড়া শুষ্ক হয়ে ফেটে যায় এবং 'মলমে' হেজে ওঠে। মার্জ্জনা-কালে, হাতের আঙুলের সাহায্যে স্তনের 'বোঁটা' দুটিকে ঈষৎ জোরে টানাটানি করে অথবা শক্ত বুরুষ দিয়ে ঘষে নেওয়া প্রয়োজন। প্রথম দিকে এ ভাবে ঘষা-মাজার ফলে, প্রসূতির সামান্য কষ্টভোগ হলেও, পরে সবিশেষ উপকার পাবেন। তাছাড়া স্তনদ্বয়ও এভাবে মার্জ্জনা করা দরকার। কারণ নিয়মিত মার্জ্জনার ফলে, স্তনে অচিরেই দুগ্ধধারা সুপ্রবাহিত হয়। মার্জ্জনা ছাড়াও, প্রসূতির স্তনে নিয়মিতভাবে সূর্য্যকিরণের তাপ দেওয়া দরকার। এ ছাড়া অভিজ্ঞ ধাত্রী-চিকিৎসককে দিয়েও পরীক্ষা করিয়ে প্রসূতির স্তনদ্বয়ের ভালমন্দ অবস্থা, সময় থাকতেই সুনির্ণয় করে নেওয়া উচিত এবং যথোপযুক্ত পরীক্ষার পর, তাঁদের উপদেশ পরামর্শানুসারে প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা-বিধি নিয়মিতভাবে মেনে চলা সকল প্রসূতিরই একান্ত পালনীয় কর্ত্তব্য।

এ সব নিয়ম-পালন ছাড়াও প্রসূতির শারীরিক স্বাস্থ্য এবং মানসিক প্রফুল্লতা বজায় রাখার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসক-ধাত্রীর পরামর্শমতো প্রত্যহ যথোচিত ব্যায়াম ও বিশ্রামের ব্যবস্থার দিকে সজাগ-দৃষ্টিদান করা বিশেষ আবশ্যক। অনেকেরই ধারণা—প্রসূতি-অবস্থায় আদৌ কোনো শারীরিক ব্যায়াম অঙ্গসঞ্চালন বা কাজকর্ম্ম করা উচিত নয়। এমন ধারণা রাখা কিন্তু ভুল। কারণ, বিশ্বের প্রবীণ ও প্রখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদবৃন্দের মতে, প্রসূতি-অবস্থায় নিতান্ত অলসভাবে দিন কাটানো শুধু অনুচিতই নয়, ভবিষ্যৎ জননী ও গর্ভস্থ-সন্তানের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষেও যথেষ্ট ক্ষতিকর। কারণ, প্রসূতি-অবস্থায় ভবিষ্যৎ-জননীর দেহে-মনে যে সব আভ্যন্তরিক-পরিবর্ত্তন সূচিত হয় এবং জঠর-কন্দরে ক্রম-বর্দ্ধমান ভ্রূণ-শিশুর গঠন-পুষ্টি ও ভূমিষ্ঠলাভের উদ্দেশ্যে নিরন্তর যে অভিনব-প্রক্রিয়া চলে, তার কষ্ট-দুর্ভোগ, বিপদাশঙ্কা অনেকাংশে লাঘব হতে পারে—যদি সকল প্রসূতিই সুচিকিৎসক-ধাত্রীদের

পরামর্শানুসারে নিতান্ত অলসভাবে শুয়ে-বসে দিন না কাটিয়ে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে অল্প-বিস্তর শারীরিক-ব্যায়াম, অঙ্গ-সঞ্চালন এবং হালকা-ধরণের সাংসারিক কাজকর্ম্মে লিপ্ত থেকে নিজেদের ও অনাগত-সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে যথোচিত দৃষ্টিদান করেন। তবে যে সব মহিলা স্বেচ্ছায় অথবা নানান্ কার্য্যকারণে পড়ে প্রসূতি অবস্থাতেও অল্পক্ষণের জন্ম প্রয়োজনীয় বিশ্রাম-সুখ উপভোগের সুযোগ-সুবিধা বা ফুরসৎটুকুও পান না, প্রসঙ্গক্রমে তাঁদের এ বিষয়ে দু'একটি দরকারী কথা বলে রাখি। অর্থাৎ, প্রসূতি-অবস্থায় নিতান্ত অলসভাবে দিন কাটানো, যেমন বাঞ্ছনীয় নয়, তেমনি দৈনন্দিন বিশ্রাম উপভোগের প্রয়োজনীয়তা-টুকু উপেক্ষা করে সারাক্ষণ শুধু সংসারের হাড়ভাঙা-পরিশ্রম বা স্বাভাবিক-অবস্থায় থাকাকালীন অভ্যাস মতো দৌড়-ঝাঁপ, খেলাধূলা, ব্যায়াম অনুশীলন প্রভৃতি অত্যধিক অঙ্গ-সঞ্চালন করাও অনুচিত। একালের অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে সাধারণতঃ, প্রসূতি-অবস্থায় নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের শারীরিক-স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক মহিলারই স্বাভাবিক নিয়মে সাধ্য মতো এবং যথোচিত ঘরসংসারের কাজকর্ম্ম করা উচিত··· তবে অহেতুক খুব বেশী পরিশ্রম বা ছুটোছুটি-লাফঝাঁপ কিম্বা ভারী জিনিসপত্র উঠানো-নামানো অথবা ঘন ঘন উঁচু সিঁড়ি ওঠা-নামা প্রভৃতি সাময়িকভাবে বর্জ্জন করাই ভালো। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব মহিলার টেনিস, ব্যাডমিন্টন, বা স্কেটবল, সাঁতার প্রভৃতি খেলাধূলা করার অভ্যাস আছে, প্রসূতি-অবস্থায় গোড়ার দিকে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের উপদেশ পরামর্শানুসারে, বিশেষ সাবধানে এমনি ধরণের ক্রীড়ানুষ্ঠানে সাময়িকভাবে যোগদান করতে পারেন···তবে কিছুদিন বাদেই এ সব শ্রমসাপেক্ষ শারীরিক অনুশীলন মুলতুবী রেখে, উন্মুক্ত মাঠে, ময়দানে, বাগানে কিম্বা বাড়ীর ছাদে, বারান্দায়, উঠানে বা কোনো সমতল স্থানে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে হেঁটে বেড়ানোই তাঁদের শরীর, মন সুস্থ রাখার জন্ম একান্ত কর্ত্তব্য। এ ছাড়া প্রসূতি-অবস্থায় পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মুক্ত-বায়ু সেবনেরও সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। তাই প্রসূতির পক্ষে, সারাক্ষণ ঘরে আটক হয়ে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়···বরং যতটা সম্ভব—খোলা-জায়গায় থেকে বিশুদ্ধ-বায়ু সেবন করলে শুধু যে তাঁদের শারীরিক অবস্থার প্রচুর উন্নতি হবে তাই নয়, উপরন্তু মানসিক প্রফুল্লতাও বৃদ্ধি পাবে সবিশেষ। কারণ, প্রসূতির শারীরিক অবস্থার উন্নতি-অবনতির মাত্রা বিচার ঘনিষ্ঠভাবে অনেকখানি নির্ভর করে তাঁর মানসিক স্ফূর্তি, প্রফুল্লতা বজায় রাখার উপর। এই জন্যই প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের সর্ব্বদাই শান্তি, আনন্দময় পরিবেশে রাখা এবং হাসি-খুশী স্বভাবের আত্মীয়পরিজন, বন্ধুদের প্রীতিদায়ক সংসর্গে প্রফুল্লভাবে কালাতিবাহিত করার পর্য্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া একান্ত আবশ্যক। এ ব্যবস্থার ফলে, প্রসূতির শরীর, মন উভয়েরই যে যথেষ্ট ক্রমোন্নতিলাভ ঘটে, এমন দৃষ্টান্তও আমাদের আশেপাশে নিত্যই নজরে পড়ে।

তবে প্রসূতির পক্ষে, গর্ভস্থ-সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার আগের তিনমাস বিশেষ সাবধানে থাকা প্রয়োজন। কারণ, মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণাবস্থা থেকে দিনে দিনে অপ্রসূত শিশু ক্রমেই সুপুষ্ট পরিণত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতির শারীরিক অবস্থারও, যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তাঁর দৈহিক ওজনও প্রায় সাত-আটসের বৃদ্ধি পায়। এই পরিবর্ত্তন ও ওজন-বৃদ্ধির ফলে, সন্তান-প্রসবের কয়েকমাস পূর্ব্বে প্রসূতির দেহের ভারসাম্যের ব্যতিক্রম ঘটে বলেই, তাঁর পক্ষে আগের মতো সহজে ও স্বাভাবিকভাবে ওঠা-বসা, বা নড়া-চড়া করা সম্ভব হয় না···বরং এতটুকু অসাবধান হলেই, দৈহিক ভারসমতা যথাযথ বজায় রাখার ক্ষমতা হারিয়ে অনেক সময় অতর্কিতে পা টলে পড়ে গিয়ে গুরুতর আঘাত পান, এমন কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের ও গর্ভস্থ-সন্তানের জীবনসঙ্কটেরও সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ান। এই সব কারণেই প্রসূতি অবস্থার শেষভাগে, প্রত্যেক মহিলারই, নিজের ও অনাগত-সন্তানের মঙ্গলের জন্ম, চলা-ফেরার বিষয়ে সবিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। তাই অভিজ্ঞ-ধাত্রীবিদ্যাবিশারদেরা অধুনা সর্ব্বদাই প্রসূতিকে উঁচু-গোড়ালীর জুতো ব্যবহার, অথবা সিঁড়ি ওঠা-নামা বা অসমান-জমিতে চলাফেরা, অবাধে গাড়ী চড়ে দূর ভ্রমণে বেরুনো প্রভৃতি নানা বিষয়ে সাময়িকভাবে নিরস্ত থাকতে সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া নিয়মিত ব্যায়ামানু-শীলনে শরীর, মন, পুষ্ট, সবল ও সুস্থ থাকে বলেই, আজ-কাল ধাত্রীবিদ্যাপারদর্শী চিকিৎসক এবং ধাত্রীরা অনেকেই

প্রসূতিদের জন্য বিশেষ ধরণের যে সব ব্যায়াম পদ্ধতিরও ব্যবস্থা বিধান করেন, তাঁদের উপদেশ মতো সেগুলি প্রত্যহ কিছুক্ষণ অভ্যাস করা দরকার। প্রসূতিদের পক্ষে, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী, এ সব সহজ সরল অনায়াস-সাধ্য হালকা ধরণের ব্যায়াম—গোড়ার দিকে দু'তিন মিনিট থেকে সুরু করে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ দশমিনিটকাল পর্য্যন্ত নিয়মিতভাবে অনুশীলন করা চলে। এমন কি, প্রসূতির শারীরিক অবস্থা যথোচিত সুস্থ সবল থাকলে, সন্তান প্রসবের মাত্র সপ্তাহ খানেক পরেও, চিকিৎসকের উপদেশানুসারে আঁতুড়-ঘর, হাসপাতালে শয্যাশায়িত থেকেও বিশেষ নির্দ্দিষ্ট কয়েকটি ভঙ্গীতে শুধু হাত-পা সঞ্চালন করে প্রসূতির অনায়াসেই তাঁদের পূর্ব্ব অভ্যাস মতো ব্যায়াম চর্চ্চার রীতি অব্যাহত রাখতে পারেন।

প্রসূতি-পরিচর্য্যার বিষয়ে এবারের আলোচনা শেষ করবার আগে, আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদেরা নিয়মিতভাবে অনুশীলনার্থে ভবিষ্যৎ-জননীর প্রাত্যহিক-বিশ্রামের উপযোগী যে বিশেষ-ব্যবস্থা-বিধি প্রণয়ন করেছেন, তারও মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি। তাঁদের মতে, প্রসূতি-অবস্থায়—বিশেষভাবে সন্তান-প্রসবের মাস তিনেক আগে থেকেই, প্রত্যেক ভাবী-জননীরই উচিত—প্রত্যহ প্রতিবার পূর্ণ-আহারাদির পর, নিজের কোমরের পরিধান-বস্ত্র আলগা করে দিয়ে সমতল ও নরম শয্যায় চিৎ হয়ে শুয়ে অন্ততঃপক্ষে ঘণ্টাখানেক সময় নিশ্চিন্ত-আরামে 'গড়িয়ে' (আমাদের দেশের সনাতন মেয়েলী ভাষায়) পরম শান্তিতে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করা। এমনিভাবে পরিপূর্ণ-বিশ্রাম গ্রহণের ফলে, শুধু যে প্রসূতিরই স্বাস্থ্যোন্নতি হবে তাই নয়, গর্ভস্থ-সন্তানের ক্রমিক-গঠন, পুষ্টি ও পরিণতির পক্ষেও যথেষ্ট সহায়তা করবে!

সুপর্ণা দেবী

মহিলাদের দৈহিক শ্রী-সৌন্দর্য্য সুদীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণ-অটুট রাখার উপযোগী বিশেষধরণের কয়েকটি ব্যায়ামভঙ্গী-অনুশীলনের কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি···এবারে মেয়েদের মুখের রূপলাবণ্যশোভা সম্পাদনের জন্য যে সব ব্যায়াম-চর্চ্চা প্রয়োজন—তারই মোটামুটি পরিচয় দিই।

শুধু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুঠাম-গড়ন আর গাত্র-ত্বক মসৃণ গৌরবর্ণের হলেই কোনো মহিলাকে পুরোপুরিভাবে 'সুন্দরী,রূপসী' বলা চলে না···কারণ, এ সব দৈহিক-সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখের গঠনও বেশ পরিপাটি নিখুঁত ধরণের হওয়া আবশ্যক। তবে সচরাচর লোকে কথায় বলে যে—'চাঁদেও কলঙ্ক আছে'! এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই! বাস্তবিকই, সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর দেহের গঠন, আগাগোড়া মসৃণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ গায়ের ত্বক আর নিখুঁত মুখশ্রী লাবণ্যের অধিকারিণী অতুলরূপবতী নারী সহজে বড় একটা নজরে পড়ে না—সারা দেশে খুঁজে বেড়ালে, হয়তো বা হাজারে মাত্র দশজন, সব বিষয়ে নিখুঁত সুন্দরী এমন সুরূপা-নারীর দর্শন মেলে! কাজেই সর্ব্বতোভাবে রূপসী নারীরত্ন দুনিয়াতে যখন এতই দুর্লভ, তখন চেহারায় অল্প-বিস্তর খুঁত-ত্রুটি থাকলেও, মোটামুটিভাবে সচরাচর আমরা যাঁদের সুন্দরীরূপবতী বলি, সেই সব মহিলা যদি নিয়মিত রূপচর্চ্চার কয়েকটি অত্যাবশ্যকীয় সহজ সরল বিধি নিয়মাবলী···অর্থাৎ, দৈহিক স্নান, অঙ্গ-প্রসাধন, সুনিয়ন্ত্রিত খাদ্য পানীয় আহার, কোষ্ঠপরিষ্কার, ব্যায়াম অনুশীলন, যথোচিত কায়িকপরিশ্রম ও বিশ্রাম

জলভোগ, সুষুম্বাদু সেবন, প্রয়োজনানুযায়ী বেশভূষা ধারণ প্রভৃতি, বিবিধ বিষয়গুলি সযত্নে অনুসরণ করে চলেন, তাহলে অনায়াসেই তাঁরা দেহের, মুখের ও গাত্রত্বকের লাবণ্য-শ্রী, সৌকুমার্য্য এবং সুসামঞ্জস্য বজায় রাখতে পারবেন সুদীর্ঘকাল—এমন কি, পরিণতবৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে,—মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির পুষ্টি এবং গাত্রত্বকের বর্ণ-লালিত্য প্রধানতঃ নির্ভর করে—সুবিবেচিত খাদ্য-পানীয়ের উপর…তাছাড়া নিয়মিতভাবে উপরোক্ত বিধি-নিয়মাবলী পালনে ও প্রাত্যহিক ব্যায়াম অনুশীলনেও শারীরিক রূপ-লাবণ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন সম্ভব হয়। এমন কি, দেহের বা মুখের গড়নে যদি অল্পবিস্তর খুঁত থাকে, একালের শরীর-তত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের পরামর্শানুসারে বিধিবদ্ধ অভিনব কয়েকটি ব্যায়ামপালনে সহজ উপায়েই সে সব দোষ ত্রুটিরও সুসংস্কার করা চলে। ব্যায়াম অনুশীলনের ফলে, দেহের গঠন কি উপায়ে নিখুঁত সুন্দর করে তোলা যায়, তার মোটামুটি পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি। সুতরাং সে বিষয়ে বিশদ আলোচনা না করে, আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, মুখের শ্রী-সম্পাদনে সহজ, সরল, অনায়াসসাধ্য যে কয়টি ব্যায়াম অনুশীলন প্রয়োজন, আপাততঃ, তারই মোটামুটি হদিশ দিই।

সচরাচর বয়স বৃদ্ধি, অথবা অনিয়ন্ত্রিত খাদ্য, পানীয় গ্রহণ, অসংযমী বিলাস বা অত্যধিক দিবানিদ্রা কিম্বা বংশগত শারীরিক গ্রন্থির গোলযোগ প্রভৃতি নানান্ কারণে অনাবশ্যক মেদ-বৃদ্ধির ফলে, অনেক রূপসী-মহিলারই মুখের নীচের দিকে অর্থাৎ, চিবুকের তলদেশে বেশ পুরু আরেক প্রস্থ মাংস চর্ব্বির স্তর বা 'ডবল্ চিন' (Double Chin) দেখা দেয়। এ ধরণের 'ডবল্ চিন্' বা 'দু-পুরু চিবুক' মহিলাদের রূপ-সৌন্দর্য্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। কারণ, এভাবে চিবুকের তলদেশে মেদ বৃদ্ধির ফলে, তাঁদের মুখের সুশ্রী-সুডৌল রমণীয়তা ক্রমেই স্থূলও বিশ্রী-বেমানান ধরণের হয়ে ওঠে…দেখলে মনে হয়, বয়স যেন হঠাৎ অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে। আধুনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এ-ত্রুটি নিশ্চিহ্ন করে মুখের সুশ্রী-সুঠাম গঠন আর রূপলাবণ্য অটুট অক্ষুণ্ণ বজায় রাখতে হলে, নীচের ১ নং ছবিতে 'চিবুক-মর্দ্দনের' (Chin Massage) যে অভিনব ব্যায়াম পদ্ধতিটি দেখানো হয়েছে, সেটি নিয়মিতভাবে প্রত্যহ রাত্রে শয্যাগ্রহণের পূর্ব্বে অন্ততঃ পক্ষে মিনিট দশেককাল সযত্নে অনুশীলন করা প্রয়োজন। এ ব্যায়ামটির অনুশীলন পদ্ধতি হলো—দুই হাতের তালুতে প্রথমে অল্প

পরিমাণে ক্রীম বা পমেড-ভ্যাসেলিন অথবা অলিভ-অয়েল কিম্বা নারিকেল তেল ঢেলে, হাতের তালু দুটিকে তৈলাক্ত করে নিন। তারপর ডান হাতের আঙুল-গুলির সাহায্যে জোরে চাপ দিয়ে, মুখের তলদেশে অর্থাৎ, বাঁ-দিকের চিবুকের গোড়া থেকে সুরু করে বাঁ-দিকের ঘাড়ের পিছনদিক পর্য্যন্ত তৈলাক্ত হাতে বেশ ভালো ভাবে অবিরাম রগড়ে বেশ কিছুক্ষণ সযত্নে 'মর্দ্দন' (massage) করুন। কয়েকবার এভাবে 'মর্দ্দনের' পর, হাত বদলে নিন এবং পূর্ব্ববর্ণিত পদ্ধতিতে এবারে বাঁহাতের আঙুলের সাহায্যে, উপরের ১নং ছবির ভঙ্গীতে ডানদিকের চিবুকের গোড়া থেকে ডানদিকের ঘাড়ের পিছন দিক পর্য্যন্ত অনুরূপভাবে কিছুক্ষণ তৈলাক্তহাতে-বার কয়েক 'ঘর্ষণ-মর্দ্দন' করবেন। এমনিভাবে মিনিট দশেককাল একবার ডানহাতের তৈলাক্ত আঙুলের সাহায্যে বাঁদিকের চিবুক ও ঘাড়, এবং রীতি বদল করে আরেকবার বাঁহাতের তৈলাক্ত আঙুলের সহায়তায় অনুরূপ ভঙ্গীতে ডানদিকের চিবুক ও ঘাড়ের অংশ অবিরাম 'ঘর্ষণ-মর্দ্দন' করা প্রয়োজন। প্রত্যহ রাত্রে নিয়মিত এভাবে 'ঘর্ষণ-মর্দ্দনের' ব্যায়াম পদ্ধতিটি অনুশীলনে চিবুকের তলদেশে ও ঘাড়ের অংশে রক্তচলাচল ক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত হবার ফলে, মুখের নীচের দিকে অনাবশ্যক মেদ সঞ্চয় বা চর্ব্বি আধিক্য লোপ পাবে এবং মহিলাদের

রূপ-সৌন্দর্য্য হানিকর 'ডবল্ চিন্' অর্থাৎ, 'দু-পুরু চিবুকের' চিহ্নমাত্রও থাকবে না।

মহিলাদের চিবুকে বা থুত্নীতে দোষ ত্রুটি থাকলে··· অর্থাৎ, মুখের তলদেশের গড়ন বাঁকা বা বেয়াড়া বেমানান ছাঁদের হলে, সে খুঁৎ সংস্কারের জন্য বিশেষ ধরণের যে ব্যায়াম পদ্ধতিটি অনুসরণ করা দরকার—নীচের ২নং চিত্রে তার মোটামুটি হদিশ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যায়ামের অনুশীলন পদ্ধতি হলো—ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত প্রথায় দুই হাতের তালু তৈলাক্ত করে নেবার পর, উপরের ২নং ছবির ভঙ্গীতে আঙুলের সাহায্যে বাঁদিকের কানের নীচের ও থুত্নীর উপরের গালের মাংসল মেদবহুল অংশ দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আর তর্জ্জনীর সজোর চাপ দিয়ে, গালের হাড়ের উর্দ্ধে তুলে ধরুন এবং কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সে জায়গাটিতে তৈলাক্ত হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে বার কয়েক ধীরে ধীরে গালের অংশ টিপে ও ছেড়ে, পরক্ষণেই রীতি বদল করে, হুবহু আগের মতো ভঙ্গীতে—তবে এবারে হাতের আঙুলের চাপ দিয়ে বাঁদিকের গালের উপরদিক থেকে ক্রমশঃ চিবুকের নীচের দিকে নেমে গিয়ে পুনরায় চিবুকের মাংসল মেদবহুল অংশ সযত্নে কিছুক্ষণ 'ডলাই-মলাই' (massage) করুন। এমনিভাবে অন্ততঃ পক্ষে দশ মিনিট ধরে হাতের আঙুলের সহায়তায় কিছুক্ষণ বাঁদিকের চিবুক-গাল ও থুত্নী, এবং কিছুক্ষণ অনুরূপ ভঙ্গীতে ডানদিকের চিবুকগাল ও থুত্নী ভালভাবে চাপ দিয়ে অবিরাম 'ডলাই-মলাই' ও 'টেপাটিপি' করতে হবে, তাহলেই চিবুক আর থুত্নীর দোষ ত্রুটি অচিরেই নিশ্চিহ্ন হয়ে অপরূপ শ্রীসৌন্দর্য্যে মহিলাদের মুখের গড়ন ও লাবণ্য আরো বেশী রমণীয় মনোরম করে তুলবে।

স্থানাভাবের কারণে এবারে মহিলাদের মুখের শ্রীসম্পাদনের উপযোগী আরো কয়েকটি ব্যায়াম পদ্ধতির পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠলো না। আগামী সংখ্যায় সেগুলির মোটামুটি হদিস দেবার বাসনা রইলো।

—

মাছের আঁশের কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

গত সংখ্যায় আলোচনা প্রসঙ্গে মাছের আঁশের গায়ে বিভিন্ন রঙের ছোপ ধরানো এবং আবশ্যকমতো ছাঁদের রঙচঙে পুঁতি, চুমকি সংগ্রহের বিষয়ে মোটামুটি যে সব হদিশ দিয়েছি, সেই মতো এই বিশেষ ধরণের কারুশিল্পের উপযোগী বিবিধ উপকরণ জোগাড় হবার পর, কাপড়ের জমিতে ইতিপূর্ব্বে 'ট্রেসিং' পদ্ধতিতে ছকে রাখা হাতির নক্সাটিকে আগাগোড়া নিখুঁত পরিপাটিভাবে একের পর এক নানারঙে ছোপানো ভিজা নরম মাছের আঁশ সাজিয়ে ভরাট করে তোলার কাজে হাত দিতে হবে। সুনিপুণ সুন্দর ছাঁদে এমনিভাবে কাপড়ের জমিতে আঁকা বিচিত্র নক্সাটিকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, সচরাচর যে বিশেষ শিল্পরীতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে, আপাততঃ তারই পরিচয় দিই।

কাপড়ের জমিতে আঁকা হাতীর নক্সা চিত্রটিকে যথাযথ ভাবে রূপদানের জন্য, পছন্দমতো নীল, শাদা অথবা ছাই রঙে ছোপানো মাছের আঁশগুলি যেন আগাগোড়া ভিজা নরম অবস্থায় থাকে—সেদিকে সজাগ দৃষ্টিদান করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, এধরণের কারুশিল্পসামগ্রী রচনাকালে

মাছের আঁশগুলি ভিজা নরম অবস্থায় না থেকে যদি শুকিয়ে শক্ত কড়কড়ে হয়ে ওঠে, তাহলে কাজের সময় রীতিমত অসুবিধা ভোগ করতে হবে...তাছাড়া শিল্প সামগ্রীটিও শেষ পর্য্যন্ত অসুন্দর বেয়াড়া ছাঁদের হয়ে ওঠার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। কাজেই এ বিষয়ে সতর্ক নজর রাখা একান্ত দরকার। কাপড়ের জমিতে আঁকা নক্সাটিকে কি ভাবে একের পর এক মাছের আঁশ সাজিয়ে বসিয়ে সুচারুছাঁদে ফুটিয়ে তুলতে হবে, তার সুস্পষ্ট হদিশ মিলবে —নীচের ছবিটি থেকে। র্থাৎ, কাপড়ের জমিতে
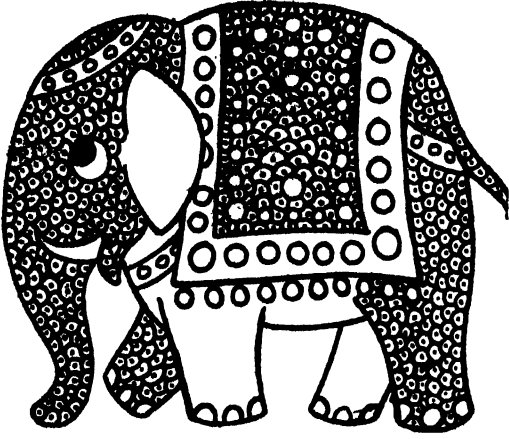
হাতীর যে নক্সা চিত্রটি আঁকা রয়েছে, সেটির কোনো একদিকের প্রান্ত সীমা থেকে একের পর এক পাশাপাশি সারবন্দীভাবে পছন্দমতো বিভিন্ন রঙে ছোপানো মাছের-আঁশগুলিকে নিখুঁত ও পরিপাটি ধরণে সাজিয়ে বসাতে হবে। কাপড়ের জমিতে পাশাপাশি সারবন্দীভাবে মাছের-আঁশগুলিকে সাজিয়ে বসানোর সময়—প্রত্যেকটি আঁশের উপরে মানানসই-রঙের চুম্‌কি আর পুঁতি বসিয়ে সূচ-সুতোর সেলাই দিয়ে সেটিকে পাকাপোক্ত-ধরণে গেঁথে নিতে হবে। কাপড়ের জমিতে এমনিভাবে মাছের-আঁশ বসানোর চিরাচরিত-নিয়ম হলো—একটি আঁশের উপরে চুম্‌কি ও পুঁতি বসিয়ে সুতোর ফোঁড় তুলে পাকা-সেলাই দিয়ে সেটিকে বেশ আঁটসাটভাবে গেঁথে নিয়ে, প্রথমোক্ত আঁশের প্রায় অর্দ্ধেকটুকু ঢেকে অপর আঁশটিকেও পূর্ব্বোল্লিখিত-প্রথায় চুম্‌কি পুঁতির চাপ-সমেত সেলাই দিয়ে পাকাপোক্তভাবে কাপড়ের জমির সঙ্গে সেঁটে বসিয়ে দেওয়া। সূচী-শিল্প সম্বন্ধে যাঁদের অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে, উপরের নক্সাটি দেখলেই তাঁরা বিশেষ ধরণের এই কারুশিল্প-রচনার পদ্ধতিটি সহজে এবং সুস্পষ্টভাবেই অনুধাবন করতে পারবেন। অর্থাৎ, উপরের নক্সা-চিত্রে হাতীর দেহের বিভিন্ন অংশে 'ফুটকি-চিহ্নিত' ছোট-ছোট যে সব 'গোলাকৃতি-নিশানা' দেখানো রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবেই কাপড়ের জমিতে একের পর এক ভিজা নরম ও পছন্দ মতো রঙে ছোপানো মাছের আঁশগুলিকে পাশাপাশি সারবন্দী ছাঁদে চুম্‌কি পুঁতি গেঁথে সেলাই করে সাজিয়ে বসাতে হবে। এইভাবেই শুধু নক্সায় আঁকা হাতীর দেহাংশেই নয়, কারুশিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে, সুসজ্জিত সালঙ্কারা হাতীর গলায়, মাথায় ও পিছন দিকের মালা বন্ধনীগুলি এবং পিঠের উপরের ঝালরদার চাদর প্রভৃতিও যথোচিত-উপায়ে রঙচঙে মাছের-আঁশ আর পুতি-চুম্‌কি বসিয়ে অনায়াসেই অপরূপ শোভামণ্ডিত করে তুলতে পারবেন। তবে আমাদের মতে, হাতীর পিঠের ঝালর এবং মাথার, গলার ও পিছনের মালা-বন্ধনী প্রভৃতির জন্য, মাছের-আঁশের বদলে, শুধু ছোট-বড় নানাধরণের চটকদার পুঁতি-চুম্‌কি ব্যবহার করাই বিধেয়। কারণ, কারুশিল্প-সামগ্রীটি তাহলে একঘেয়েমীর ত্রুটিমুক্ত হবে, আরো অপরূপ-মনোরম সর্বাঙ্গ-সুন্দর অভিনব রূপধারণ করবে—এই আমাদের ধারণা। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আপাততঃ, সহজ-সরল অতি-সাধারণ একটি নক্সার সাহায্যে মাছের-আঁশের কারু-শিল্পের অভিনব-পদ্ধতির মোটামুটি আভাস দেওয়া হলো। শারদীয় উৎসব উপলক্ষ্যে আগামী সংখ্যায় এই ধরণের কারু-শিল্পের আরো কয়েকটি বিচিত্র-আলঙ্কারিক নতুন-নতুন নক্সা-নমুনার কলানুরাগিণীদের সাদরোপহার দেবার বাসনা রইলো।

এমব্রয়ডারীর নতুন নক্সা-নমুনা

হিরণ্ময়ী দেবী

ঘর-সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে যে সব মহিলার ছোট-বড় সৌখিন ও দরকারী নানারকম সূচী

শিল্প-সামগ্রী রচনার দিকে ঝোঁক আছে, তাঁরা সর্ব্বদাই নতুন-নতুন ধরণের বিচিত্র 'প্যাটার্ণ' (Patterns) বা 'নক্সা-নমুনা' (Design-motifs) সংগ্রহের জন্ম বিশেষ উৎসুক। এবারে তাই তাঁদের সেলাইয়ের কাজের সুবিধার জন্ম, অভিনব-ছাঁদের একটি এমব্রয়ডারীর নতুন নকসা-উপহার দিচ্ছি।
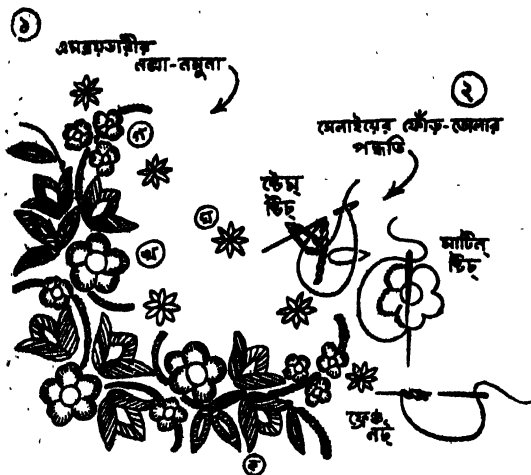
উপরে ফুল-লতা-পাতায় সাজানো এমব্রয়ডারী-সূচী-শিল্পের উপযোগী যে 'আলংকারিক-নক্সার' (Decorative-motif) কাপড়ের জমির সঙ্গে মানানসই এমনি ধরণের বিভিন্ন রঙের সুতোর সাহায্যে সেলাই দিয়ে নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকে সুচারুভাবে রুমাল, 'স্কার্ফ' (Scarf) কুশ্যানের ওয়াড়, টেবিল-ক্লথ, 'রানার' (Runner), বিছানা-ঢাকা, পর্দ্দা, বালিশের ওয়াড়, কাপড়ের তৈরী ব্যাগ প্রভৃতির 'কিনারা-চিত্রণের' (Corner Design) কাজে ব্যবহার করা যাবে। তবে খেয়াল রাখবেন—কাপড়ের জমির রঙ্ যদি গাঢ়-ধরণের হয়, তাহলে হালকা-রঙের সুতো এবং কাপড়ের জমির রঙ্ হালকা-ধরণের হলে নক্সাটি যাতে আগাগোড়া মানানসই দেখায় এমন সব গাঢ় রঙের সুতো বেছে নিয়ে এমব্রয়ডারী সূচিশিল্পের কাজ করতে হবে। ধরুন—কাপড়ের জমি পাতি-লেবুর মতো ফিকে-হলদে রঙের (Lemon Yellow Colour)...এক্ষেত্রে, উপরের 'প্যাটার্ন' (Pattern) বা নক্সার 'ক'-চিহ্নিত ঘণ্টার মতো ছাঁদের ফুলগুলি এমব্রয়ডারী করতে হবে—গাঢ়-লাল (Scarlet বা Crimson Red) রঙের সুতো দিয়ে; 'খ' চিহ্নিত ফুলগুলি রচনা করবেন—ফিকে নীল (Light Blue) বা আশমানী কিম্বা ফিরোজা (Mauve) রঙের সুতোর সাহায্যে; 'গ' চিহ্নিত ছোট ছোট ফুলগুলি সেলাই করার জন্ম বেছে নেবেন সাদা রঙের (Cream or white Colour) সুতো। এ সব ফুলের ভিতরকার গোলাকার অংশ রচনা করবেন কমলা লেবুর মতো ফিকে কমলা রঙের সুতো দিয়ে এবং উল্লিখিত প্রত্যেক ধরণের ফুলই এমব্রয়ডারী করতে হবে উপরের ২নং চিত্রে দেখানো 'সাটিন্ ষ্টিচ্' সেলাইয়ের ফোঁড় তুলে। 'ঘ' চিহ্নিত তারার মতো ছাঁদের ছোট ফুলগুলি এমব্রয়ডারী করবেন উপরোক্ত গাঢ় লাল রঙের সুতো এবং 'সাটিন্ ষ্টিচ্' সেলাই পদ্ধতির সাহায্যে। নক্সায় দেখানো পাতার অংশ রচনার জন্ম—সবুজ রঙের সুতো ব্যবহার করে উপরের ২নং চিত্রের ভঙ্গীতে 'ষ্টেম্ ষ্টিচ্' (Stem Stich) পদ্ধতিতে সুতোর ফোঁড় তুলে সেলাই দিতে হবে। লতার অংশ এমব্রয়ডারী করবেন—গাঢ় সবুজ রঙের সুতো এবং উপরের ২নং ছবিতে দেখানো 'ফ্রেঞ্চ নট্' (French Knot) সেলাইয়ের সাহায্যে। তাহলেই দিব্যি সুষ্ঠু সুন্দর সহজ উপায়ে উপরের নক্সা নমুনার বিচিত্র প্রতি লিপিটিকে এমব্রয়ডারীর কাজ করে নিখুঁত ছাঁদে সূচীশিল্পের কাপড়ের জমিতে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে।

মোটামুটি এই হদিশটুকু জানিয়েই এবারের মতো আলোচনা শেষ করছি। বারান্তরে এমনি ধরণের আরো কয়েকটি নতুন নতুন সূচীশিল্পের নক্সা নমুনার আভাস দেবার চেষ্টা করবো।
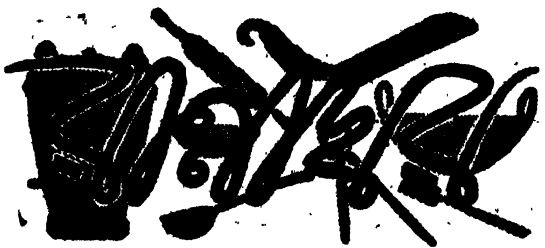
সুধীরা হালদার

বাঙলা দেশে চিরকালই মাছ, দুধ, তরী-তরকারী আর ফল-পাকুড়ের জন্ম বিখ্যাত। কিন্তু সম্প্রতি এমনই দুর্দ্দিন

সুরু হয়েছে যে বাজারে আজকাল টাটকা-সরেস এ সব সামগ্রী সংগ্রহ করাই দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠছে ক্রমশঃ··· মাঝে মাঝে অল্প-সল্প যা কিছু বা মেলে—তাও অগ্নিমূল্য··· সাধারণ গৃহস্থের কেনার ক্ষমতার বাইরে! অথচ, সংসারে প্রিয়জনদের পাতে ভালমন্দ পাঁচ রকমের সুস্বাদু মুখরোচক খাবার রান্না করে সযত্নে পরিবেশনের বাসনা কোন সুগৃহিণীরই বা নেই! তাছাড়া সেই আবহমানকাল থেকেই বাঙালীর ঘরেঘরে 'বারো মাসে তেরো পার্ব্বণের' পালা তো লেগেই রয়েছে। ছোট-বড় এ সব উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বাড়ীতে লোকজনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সাদরে ভূরি-ভোজনে আপ্যায়িত করাও দিন-দিন খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে···তরী-তরকারী, ফল-পাকুড়, দুধ-মিষ্টান্নের কথা ছেড়ে দিলেও, রসনা-তৃপ্তিকর মাছ-মাংস জোগাড় করাও ইদানীং রীতিমত কঠিন কাজ! বাঙলাদেশে মাছের এমন সঙ্গীণ অভাব ঘটবে—এ কথা কেউ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি এবং এ সঙ্কট-মোচন যে কবে সম্ভব হবে—তারও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই কারো। কাজেই এই অপ্রত্যাশিত খাদ্য-সঙ্কটের দিনে আমিষ-রান্নার কথা আলোচনা না করে বরং, অভিনব মুখরোচক একধরণের নিরামিষ খাবারের রন্ধন-প্রণালীর পরিচয় দিই।

এবারে যে নিরামিষ খাবার রান্নার কথা বলছি, সেটির নাম—'বাটাট্যাচা প্রকার'। এটি ভারতের মহারাষ্ট্রীয় অধিবাসীদের বিশেষপ্রিয় অপরূপ সুস্বাদু এক ধরণের নিরামিষ খাদ্য। এ খাবার রান্নার প্রণালী নিতান্তই সহজ সরল এবং এ জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন—সেগুলিও রীতিমত সুলভ ঘরোয়া ধরণের। কাজেই বাড়ীতে নিজের হাতে অভিনব উপাদেয় এই মহারাষ্ট্রীয় নিরামিষ খাদ্যটি রান্না করা যে কোনো মহিলার পক্ষেই এমন কিছু কঠিন বা ব্যয়বহুল ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে বলে ধারণা হয় না।

অন্ততঃপক্ষে, চার-পাঁচজন আত্মীয়-অতিথিকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রীয় প্রথায় 'বাটাট্যাচা প্রকার' খাবার রান্নার জন্যে যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবার বানানোর জন্য চাই—৪টি পুরুষ্টু বড় আলু, ৪টি বড় সাইজের পেঁয়াজ, ৪টি কাঁচা লঙ্কা, সিকি [$\frac{1}{4}$] আঁটি ধনেশাক, সিকি [$\frac{1}{4}$] খানা নারিকেল, চায়ের পেয়ালার এক-পেয়ালা পরিমাণ সুজি, চায়ের চামচের আধচামচ পরিমাণ জীরা, বড় চামচের তিনচামচ পরিমাণ ঘি এবং আন্দাজ-মতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো নুন।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলির সংগ্রহ হবার পর, উনানের আঁচে ডেক্‌চি চাপিয়ে, সেই ডেক্‌চিতে প্রয়োজনমতো পরিমাণে জল দিয়ে আলুগুলিকে সুসিদ্ধ করে নিন। ফুটন্ত জলে আলুগুলি সুসিদ্ধ হবার অবসরে, ছুরি বা বঁটির সাহায্যে ধনেশাক, লঙ্কা আর পেঁয়াজগুলিকে মিহি-ছাঁদে কুচো করে নিন এবং নারিকেলের টুকরোটিকে সুষ্ঠুভাবে কুরে রাখুন। এ কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্র থেকে আগাগোড়া-সুসিদ্ধ আলুগুলিকে নামিয়ে, সেগুলির খোসা ছাড়িয়ে আটি-ফালিতে ভাগ করে পরিষ্কার একটি পাত্রে আলাদা সরিয়ে রাখুন। এবারে পুনরায় উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে আন্দাজমতো ঘি-সহযোগে মিহিছাঁদে কুচোনো পেঁয়াজ ভেজে নিন। এভাবে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচোর রঙ বাদামী-ধরণের হলে,সেগুলিকে রন্ধন-পাত্র থেকে তুলে অন্য একটি পাত্রে সযত্নে তুলে রাখুন এবং রন্ধন-পাত্রটিকে পুনরায় উনানের আঁচে বসিয়ে গরম-ঘিয়েতে সুজির দানাগুলিকে বাদামী-রঙের করে ভেজে নিন। এবারে শুধু নারিকেল-কোরাটুকু বাদ রেখে, রান্নার বাকী উপকরণগুলি মিশিয়ে ফেলুন উনানের আঁচে-বসানো রন্ধন-পাত্রের ঐ গরম-ঘি আর সদ্য-ভাজা সুজি-দানার সঙ্গে। তারপর উপরোক্ত এই মিশ্রণের সঙ্গে রন্ধন-পাত্রে $1\frac{1}{2}$ কাপ পরিমাণে জল মিশিয়ে আলুর টুকরোগুলি ভালোভাবে গরম না হওয়া অবধি কিছুক্ষণ খুটিয়ে নিয়ে রন্ধন-পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে সদ্য রান্না-করা খাবারটিকে সযত্নে অন্য একটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখুন। তাহলেই মহারাষ্ট্রীয়-প্রথায় 'বাটাট্যাচা প্রকার' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে। রান্নার পালা চুকলে, খাবারটি পরিষ্কার পাত্রে তুলে রাখার পর, সেটির উপর সুষ্ঠু-পরিপাটিভাবে আন্দাজমতো পরিমাণে কিঞ্চিৎ নারিকোল-কুরো ও পেঁয়াজ-কুচো ভাজা ছড়িয়ে দিয়ে সাদরে প্রিয়জনদের পাতে অভিনব এই মহারাষ্ট্রীয় খাদ্যটি পরিবেশন করুন। অপরূপ-মুখরোচক এই নতুন-ধরণের 'বাটাট্যাচা-প্রকার' খাবারটির সুস্বাদ গ্রহণ করে তাঁরা সবাই আপনার হাতের রান্নার রীতিমত তারিফ করবেন।

আগামী সংখ্যায় এমনি অভিনব ধরণের আরেকটি ভারতীয় খাবার রান্নার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

প্রশ্রয়

মায়া বসু

সাত বছর বিয়ে হয়েছে। চার বছরের ছেলের মা—। তবু বিনতার গলাছেড়ে চেঁচাবার উপায় নেই। মাথার ওপর শ্বশুর শাশুড়ী বর্তমান। গলা ফাটিয়ে হাঁক ডাক করাটা এখনো ঠিক আসেনা। মানায় না। আর পারেও না।

হন্ত দন্ত হয়ে এঘর ওঘর দেখে, দু একবার চাপা গলায় ডাক দিয়েও যখন সাড়া মিলল না, তখন অগত্যা বিমলার শরণাপন্ন হতে হল। যা তো বিমলা একবার রাস্তার দিকে। দেখতো মুখপোড়া কোন বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে—না গুলি খেলছে! না কি কোন পানের দোকানে আড্ডা মারছে?

অর্ধেক ঝাঁট দেওয়া ঘর ফেলে একেবারেই নড়বার ইচ্ছে ছিলনা বিমলার। তবু যেতে হল। তবে যাবার আগে ঝাঁটাখানা সজোরে মেঝেতে আছড়ে ফেলে বিমলা সেই অনুপাতে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: দেখ বৌদি, এবার থেকে তোমাদের ঐ সোহাগের নবাব-পুত্তুরকে ডাকবার আর একটা লোক রেখে দিও। দিনের মধ্যে তোমাদের হাজারবার ফরমাস্। দেখ্‌তো বিমলা, ছোট্‌তো বিমলা। বলি কেন শুনি? এক-আধদিন নয়, পেরত্যেক দিন। কই বিমলা তো মরে গেলেও বাড়ির বাইরে পাটি বার করেনি? রাত দিন ঐ এক কাজ হয়েছে আমার! হাতের কাজ ফেলে ফেলে রাস্তা ঘাট দোকান ছুটব; কি, না নবাবের ব্যাটা নবাবকে ডেকে ডেকে বাড়ি আনতে হবে। কই, এই যে এত কাজ পড়ে থাকে, কেউ তো 'আহা' বলেও নিজেরা করে দেয়না?

বিমলার এ হেন মুখ শোনা বিনতার পুরোনো অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। মিনতি করে জবাব দিল, আহা অত রাগ করছিস কেন বলতো? আজ বাড়িতে খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা, তাই সকাল সকাল—

বিমলার চড়া কাংস্য কণ্ঠে বিনতার নরম মৃদু গলা চাপা পড়ল। বলি হ্যাগা বৌদি, চোখের ওপর মাছটাকে তুমি

আর শাক চাপা দিওনি। আজ খাওয়া দাওয়ার ঝামেলা বলি অন্তদিন কি? কোন্ দিন চোদ্দবার ও ছোঁড়াকে হাঁক না পাড়তে হয়? কোন সময় ও রান্নাঘরে দুদণ্ড থির হয়ে বসে থাকে? তোমাদের পয়সা সস্তা, তাই অত মাইনে দিয়ে অমন লোক রেখেছ। হত অন্য বাড়ি, কবে দূর করে খেদিয়ে দিত। আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছ তোমরা। যা বলব বাবা, পষ্ট মুখের ওপর বলব। আমার নাম বিমলা। ঢাক গুড় গুড় কথা বলিনা আমি। হুঁ।

চাকের মত চেঁচাতে তুই খুব পারিস। এখন চুপ কর তো। বিনতা ইসারায় শ্বশুর শাশুড়ীর ঘরের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল বিমলার। শুনতে পাবেন। গলাখানা বটে তোর বলিহারি!

শুনল তো ভারী বয়েই গেল। চোখ মটকে ঠোঁট উল্টে যেতে যেতে বিমলা গজ গজ্ করতে লাগল। একেই বলে এক চোখো নজর। একটা প্রাণী, সারাদিন খেটে খেটে মরে যায়, তার দিকে কেউ তাকিয়েও দেখে না। আর একটা ফচকে ছোঁড়া, গাল টিপলে দুধ বেরোয়, ফাঁকি বাজের একশেষ, তাকে একেবারে মাথায় তুলে রেখেছেন। কি বিত্তান্ত, কি মহাভারত কম্মো উনি করেন, না দুবেলা মাত্তর দু হাঁড়ি ভাত উনি ফুটিয়ে দিচ্ছেন! পোড়া কপাল আমার।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এখন বিমলার পোড়া কপালের 'বিত্তান্ত' শোনার মত সময় নেই বিনতার। কার্তিক মাসের ছোট বেলা। এখনি সন্ধ্যা হবে। রান্নাবান্না এখন কিছুটা বাকী। ছুটির দিন আজ। খেয়ে, কিছুটা কাজ গুছিয়ে উঠতেই দেরী হয়ে গেল। আর খেয়ে উঠেই গোপলা এমন ডুব মারল যে এখন কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে বিনতার।

বিমলাও এই সুযোগে একহাঠি মেজাজ চড়িয়ে রেখেছে। ওকে দিয়েও যে আজ কোন সুবিধা হবে, মোটেই সে ভরসা হচ্ছে না বিনতার।

কে জানতো ছোঁড়াটা আজই আবার এমন হাওয়া হয়ে যাবে?

হতভাগা নেমকহারাম গোপালচন্দ্র আজ একবার বাড়ি ফিরলে হয়! বিনতা মজা টের পাইয়ে দেবে। সত্য সত্য আর সহ্য হয় না। বারোমাস তিরিশ দিন ওর এই টহল মারা। যখন তখন। সময় অসময় নেই। বিকলা কি আর মিথ্যে রেগে যায়?

ড্রইংরুমটা এখনো পুরো পরিস্কার করা হয়নি। নতুন নতুন মোরাদাবাদী ফুলদানি দুটো বার করতে হবে। টেবিল ক্লথ পালটাতে হবে। নতুন পর্দার সেটটাও লাগাতে হবে দরজা জানলায়।

ঘরের লোকটিও হয়েছে বিশ্বকুঁড়ে। কালই বলেছিল ডজন দুই রজনীগন্ধার ঝাড় আনতে। কাল সন্ধ্যা গেল। সারা সকাল গেল, ফুল এলোনা। একটা কথা কানে তোলেনা। কোন কাজ বললেই এখন নয়, তখন হবে। এক বুলি। এবেলা নয় ওবেলা হবে। শুয়ে বসে গড়িয়ে ছুটির দিনটা দিব্যি কাবার করে দিল। একটা উপকার তাকে দিয়ে হয়না বিনতার। বিনতা একলা মানুষ। কদিক সামলাবে? নতুন বিয়ে হওয়া দাদাবৌদি, সেই সঙ্গে ননদ নন্দাই এদের খেতে বলে এখন পুরো ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে ওকেই।

অবশ্য মাংস আরও কটা রান্না ওবেলাই হয়ে গেছে। শীত পড়েছে। খারাপ হবেনা। কিন্তু এবেলার ঝামেলাও তো বড় কম নয়? মাংসের চপ, ভেটকির ফ্রাই, ফ্রায়েড্ রাইস্—সবই বাকী।

আর সময় বুঝেই গোপাল ডুব মারল?

এত সব কাজ সারা করার পর আছে নিজের সাজসজ্জা।

ভাগ্যিস ছেলের কাজকর্ম কিছুই করতে হয়না বিনতাকে। সে সব তো শাশুড়ীর ঘাড়ে। খাওয়ানো সামলানো। সেদিক দিয়ে খুব বেঁচে গেছে বিনতা।

উত্তেজিত অবস্থায় শোবার ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলল, ওগো শুনছো? তোমাদের আদরের গোপাল ঠাকুর এখনো আসেনি। সবকাজ পড়ে আছে। একলা হাতে কী করব বলতো? কী হবে এখন?

কর্মহীন ছুটির দিনের আলস্য পরমানন্দে উপভোগ করছিল পরিতোষ। একলা নয়। চারবছরের ছেলের সঙ্গে। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছিল এতক্ষণ বিছানার ওপর। বালিশের পর বালিশ সাজিয়ে হিমালয় পাহাড়। খোকন জওয়ান সৈনিক। তার টয় বন্দুকটা দিয়ে সে বহু শত্রু

খায়েস করেছে। ভারি খাকর বিছানাময়। চাদর তোষক ওলোট পালট। যেন ঝড় বয়ে গেছে।

সেই দিকে তাকিয়ে কী হবের উত্তর পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেলনা। তার আগেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটল বিনতার। কী আক্কেল তোমার বলতো? কী অবস্থা করে রেখেছ বিছানাটার? পরিষ্কার তো আমাকেই করতে হবে। ছি ছি! এমন করে কোন মানুষে ঘরদোর বিছানাপত্তর তছনচ্ করে, ভাবতেও পারিনা।

আমি কিচ্ছু করিনি। সব ঐ তোমার ছেলে করেছে। তোমার পায়ের শব্দ পেয়েই ঠাকুমার ঘরে পালিয়েছে। একান্ত ভালমানুষের মত পরিতোষ নির্বিকারচিত্তে অনুপস্থিত ছেলের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে শুয়েই একটা সিগারেট ধরাল।

এই রেঃ! এক্ষুণি বিছানাময় ছাই উড়বে। কী হচ্ছে শুনি? বিনতা ব্যস্ত হয়ে পরিতোষের হাত থেকে সিগারেটটা কেড়ে নিয়ে ধমক লাগাল। একটা দিন কি পরিষ্কার রাখতে পারনা ঘরটা? যত সব নোংরা কাণ্ড! দুচোখে দেখতে পারিনা।

পরিতোষ অগত্যা উঠে বসল। অনুনয় বিনয় করে বলল, প্লীজ্! দাও লক্ষ্মীটি!

আগে একটা কাজ করে দেবে বল, তারপর দেব। বিনতা নরম হল না।

আচ্ছা করে দেব। বল কি কাজ?

ঘর ছেড়ে দয়া করে একবার বেরোও।

কোথায়? সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে? আমেরিকা? ইংলণ্ড আফ্রিকা জার্মানী বুলগেরিয়া? হুকুম কর। সিগারেটায় সুখটান দিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে বিনতার দিকে তাকাল পরিতোষ।

থাক থাক। আর অতদূরে যেতে হবে না। সদর রাস্তায় একটু এদিক ওদিকে গেলেই হবে। গোপাল এখনো আসেনি। যেখান থেকে পারো ওকে ধরে নিয়ে এসো। অর্ধেক রান্না, ঘরদোর গুছোনো সব পড়ে আছে। উনুনে আঁচ পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। মায়ের আবার কাল থেকে অম্বলের ব্যথাটা বেড়েছে। আমি একা কি করি বলতো?

কেন এখন কেন? রাখবার সময় হুঁশ ছিল না? হাজার বার তখন বারণ করিনি? ওসব বাচ্চা ছোঁড়া ঠাকুর দিয়ে রান্নার কাজ চলে না। দায়িত্ব জ্ঞান নেই। সময়ের জ্ঞান নেই। তখন তো কান দাওনি আমার কথায়? ছেলে মানুষ, হাতে ধরে শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে পরে ভালই হবে, কে বলেছিল এসব বড় বড় কথা? লেকচার দেবার সুযোগ পেয়ে পরিতোষ আর নিজেকে সামলাতে পারল না।

আমি? আমি ওকথা বলেছিলাম? আমি কি বাড়ির গিন্নি? আমার কথায় কোন্ কাজটা হয় শুনি? বিনতাও সমানে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। তোমার মা-ই বললেন, আহা কতকালের পুরোনো লোকটা! দেশে গিয়ে মারা গেল! তারি ছেলে। এসেই যখন পড়েছে অতদূর থেকে, কি আর করা যাবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও তো সায় দিলে। আহা! ছেলেমানুষ! বিদেশে এইটুকু বয়সে এসেছে কোথায় আর যাবে! তুমি বল নি এ কথা?

বলেছিলাম বুঝি? কি জানি, মনেও নেই। ব্যাপারটা ক্রমশ জটিল গণ্ডগোলের দিকে এগিয়ে চলেছে দেখে মিনমিন করে উঠল এবার পরিতোষ। না হয় বলেছিলাম, কিন্তু আস্কারা তো আর দেইনি তা বলে। আদর দিয়ে দিয়ে ওকে মাথায় তুলেছে কে শুনি?

যা তা বল না বলছি আমার নামে। আমার বয়েই গেছে ওকে প্রশ্রয় দিতে। বাবা মা আর তুমি তিনজনের আদরেই ও গোল্লায় গেছে।

আমি! বিনতার অভিযোগ নস্যাৎ করে হেসে উঠল পরিতোষ। নিজের স্ত্রী পুত্রকেও পর্যন্ত প্রশ্রয় দেইনা, তাতে আবার রান্নার ঠাকুর! সকাল দশটায় বেরিয়ে যাই, সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসি। বাছাধনের চুলের টিকিটাও আমার নজরে পড়েনা। হাঁক ডাক করে নিজের স্ত্রীকেই কাছে পাই না একদণ্ড। থাক থাক চোখ রাঙাতে হবে না। যাচ্ছি যাচ্ছি।

শোন। রজনীগন্ধাও নিয়ে এসো ঐ সঙ্গে। ঐ শোনো বিমলা। আবার চেঁচাচ্ছে—কি হল দেখি আবার।

শাশুড়ীর ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বিমলা হাত মুখ নেড়ে চেঁচাচ্ছে। উনি নাতিকে দুধ খাইয়ে জামা পরাতে পরাতে বিমলাকে ধমক দিলেন, একটু আস্তে কথা বলনা।

অমন পাড়া কাটিয়ে চেঁচাচ্ছিস কেন? পাওয়া গেল না?

না মা। কোথাও নেই।

ভাল করে দেখেছিস? দেখ গে যা—হয়তো ছাতে, ঘরের কোণে, খাটের তলায় কি কোন ঘুপচিতে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বেহুঁশ হয়ে।

সব জায়গা গরু খোঁজা খুঁজেছি মা। কোথ্থাও নেই। বিমলা দুদিকে দুখানা হাতে 'নেই'এর মুদ্রা দেখাল। এ কি তোমার ছুঁচ? যে চোখে দেখা যাবে না? সুতো? যে হাওয়ায় উড়বে? সোনা দানাও নয় যে চোরে চুরি করে নিয়ে যাবে। তাও বলি মা,পরের বাড়ি কাজ করতে এয়েছে ছোড়া, মনেই হয় না। ঠুঁটো জগন্নাথের মত বসে বসে তোমাদের আদর কাড়ছে! এত আদিখ্যেতা ভাল নয়। তুমি কিছু বলনা বলেই তো এত বাড় বেড়েছে—

তুই থামতো বিমলা। এ বাড়িতে কোন কথা বলার জো আছে? আস্কারা আমি দিইনি। যারা দেবার, তারাই দিচ্ছে। বাড়ির কর্তা কিছু বলে না বলেই তো অমন হয়েছে।

কর্তা প্রস্তুত হয়ে নাতিকে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গিন্নির কথা বলার ধরণটা বাঁকা পথে যাচ্ছে দেখে নাতির হাত ধরে টানলেন, আর দাদুভাই, সন্ধ্যেবেলা হিম পড়তে সুরু হয়েছে আজকাল। একটু তাড়াতাড়ি না গেলে বেড়ানো হবে না। সন্ধ্যার আগেই ফিরতে হবে তো আবার?

গৃহিণী শুনেও শুনলেন না। ভারী মুখে জেরা করলেন, কাল শুনছিলাম ছোঁড়াকে কি যেন বলছিলে? তুমিই কোথাও পাঠিয়েছ বুঝি ওকে? আক্কেলের মাথা কি একেবারেই খেয়েছ? শুনছো রাতে ওরা সব আসবে, খাবে। বৌমা একা হাতে সব সামলাচ্ছে। আমার শরীর ভাল নয়। আর তুমি তাকে চিঠি দিয়ে ভবানীপুর পাঠালে?

আঃ, কী যে বল। বিরক্ত হয়ে জবাব দিলেন কর্তা। আমি আবার কখন ওকে চিঠি দিয়ে পাঠালাম? কাল সকালে একবার বলার মধ্যে বলেছিলাম, সময় হলে রমাপদর বাড়ি একখানা চিঠি দিয়ে আসিস। তা ছোঁড়া তো তোমার সামনেই আমার মুখের ওপর বলে বসল, ওর নাকি কাল থেকে আজ অবধি মরবার অবকাশ হবে না। যত দোষ নন্দ ঘোষ! এখন আমার ঘাড়ে চাপাও বসে বসে। কথাটা বলেছিলাম, তার ফল।

গৃহিণী বেগতিক দেখে রণকৌশলের ধারা বদলালেন। আজই না হয় কোথাও পাঠাওনি। পাঠাও তো প্রায়ই। ডাইং ক্লিনিংএ যা, পোষ্টাপিসে যা, অমুকবাবুর বাড়ি যা—কাজে ফাঁকি দিতে শিখেছে তোমার এখানে ওখানে পাঠানোর চোটে। একবার বাড়ি থেকে বার হলে আর ও তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরে কখনো?

আমার কাছ থেকে ও কাজে ফাঁকি দিতে শিখেছে? আমি ওকে এখানে ওখানে পাঠাই? কর্তা রাগে আগুন হয়ে উঠলেন। আসুক আজ হারামজাদা বাড়িতে। দূর করে দেব। একটা কাজের না, মাইনে নেবার গোঁসাই। মাস গেলে এক কাঁড়ি টাকা তো ঠিক নেয়,কোন উপকারে লাগে ওকে শুনি? তখনি আমি পই পই করে বারণ করেছিলাম, ওইটুকু একটা বাচ্চা ছোঁড়াকে আমার কাজে রেখনা রেখনা। তা কেউ আমার কথায় কাণ দিল তখন?

আমি রেখেছি না তুমি? গৃহিণীর গলা সপ্তমে চড়ল। তুমি আর তোমার ছেলে, বৌ একেবারে গলে গেলেন। আহা! বাপটা মরে গেল! যাবে কোথায়, খাবে কি। থাক, এখানেই থাক। তখন মনে ছিলনা? একটা দশ এগারো বছরের এতটুকু ছেলে ওঁদের রান্না করে খাওয়াবে দুবেলা। কি করে ও? কিচ্ছু না। পয়সাও যাচ্ছে, গতরও যাচ্ছে। সব কাজ ঐ বৌমাই করে দিচ্ছে। আমার কি চোখে পড়ে না? আসুক আজ। ওর একদিন কি আমার একদিন।

চার বছরের নাতি এতক্ষণ দাদু দিদির ঝগড়া শুনে রুষ্ট হয়ে উঠছিল। তার এখন বেড়াবার সময়। দাদুর হাত ধরে টানাটানি করে সেও সুর ধরল, তলনা ও দাদু, বেলাতে তলনা। ঝগড়া কলছো কেন, চল—

সত্যি সত্যি এ বাড়ির প্রত্যেকটি মানুষের মেজাজ খারাপ করে দেবার মত অসীম ক্ষমতা গোপালচন্দ্রের আছে।

নেহাৎ ছেলেমানুষ। কিন্তু সেটা বয়সে। তুষ্টুমি-বুদ্ধিতে বোধ হয় বুড়োদের ও হার মানায়।

ওর বাবা এ বাড়ির রাঁধুনীর কাজ করেছে বহু বছর। লোকটি কাজের ছিল। বছরে দুবার করে দেশে যেত। দুচার দিন এদিক ওদিক করলেও কটক থেকে আবার যথাসময়ে ফিরে এসে মনিববাড়ি কাজে লাগত। লোকটা ভালমানুষ ছিল। কর্তা গিন্নি ভালও বাসতেন খুব।

কিন্তু বছর খানেক আগে ছুটি নিয়ে প্রত্যেকবারের মত দেশে গিয়ে আর ফিরে এলোনা। উদ্বিগ্ন হয়ে চিঠি লেখা হল। তার উত্তরও এলোনা।

মাস ছয়েকের মাথায় বছর দশেকের কচি মুখের গোলগাল ফর্সা ছেলেটা চোখ মুছতে মুছতে এবাড়ি এসে দাঁড়াল একটা গামছা আর একটা ফতুয়া সম্বল করে। গলায় একগাছা পৈতেও ছিল অবশ্য।

ওর রুক্ষ একমাথা চুল, ছেঁড়া ময়লা ধুতি আর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে বাড়ির কারু মুখ দিয়েই আর কোন কথা সরল না।

ওই মুখ খুলল। বাবা মারা গেছে। ওর মা আর খুড়োই ওকে এখানে পাঠিয়েছে দেশের লোকের সঙ্গে। চাকরি না করলে খাবে কি? বাবা বলে গেছে, এ বাড়ি ঢুকলেই ওর চাকরি হয়ে যাবে।

চাকরি! রান্নার কাজ করবে ঐ ছোঁড়া? বলে কি?

পাগল, না মাথা খারাপ?

কথা শুনে বাড়ির লোকেরা হাসবেন কি কাঁদবেন ভেবে পেলেন না। কিন্তু তখনকার মত ছেলেটার মুখের উপর কেউ আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু আড়ালে সবাই একমত হলেন। এসেই যখন পড়েছে, ছেলেমানুষ, থাকুক কটা দিন। এর মধ্যে দেখে শুনে একটা লোক রেখে দিলেই হবে। আর তারপর ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দেশে পাঠিয়ে দিলেই হবে। ওই টুকু ছেলে রান্না করবে? একি ছেলে খেলা না কি?

কিন্তু কটা দিন গেল। কটা সপ্তাহ গেল। কটা মাস গিয়ে প্রায় বছর ঘুরতে চলল, গোপাল এ বাড়ি কায়েমী হয়েই অধিষ্ঠান করল। অন্য কোন রাঁধুনীও আর এলোনা।

আর সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, ওকে দেশে পাঠাবার কথা আর কারু মনেও এলোনা। মুখ ফুটেও কেউ সে কথা।

রান্না? নেহাৎ পুরুষানুক্রমে ওর বাবা, তস্য বাবা, তস্য বাবা এই কর্মই করে এসেছিল বলেই বোধ হয় কিছুটা জানে। কোনমতে ভাত, ডাল, ভাজাটা করতে পারে। বাদবাকী সবই বিনতা অথবা তার শাশুড়ীই করে নেন। সদাসর্বদা গোপালের সঙ্গে সঙ্গে একজনকে রান্না ঘরেই থাকতে হয়। তাই ঠিক সময়ে ভাত পান অফিসের লোক দুটি।

এই আছে। এই নেই। খোকনের ভারী প্রিয়পাত্র। তার সঙ্গে খেলাতেই জমে গেছে তরকারির কড়া উনুনে চাপিয়ে। দোকানে গেল তো বাড়ি ফেরার নাম নেই। গুলি খেলছে রাস্তায় সমবয়সী ছেলেগুলোর সঙ্গে। ভাত চাপিয়ে পান খেতে ছুটবে দোকানে।

কাঁহাতক সহ্য করা যায়? দিনের পর দিন?

বাড়ির গিন্নি রেগে আগুন হয়ে ওঠেন। মাইনের বেলা তো এক পয়সা কম নেবেনা। ওর বাবা এতকাল কাজ করে যে মাইনে নিয়ে গেল, এ মুখপোড়া চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতেই সেই মাইনেয় বহাল হল। তবু যদি একটু কাজের হত! মাস কাবার হোক একবার। দূর করে তাড়িয়ে দেব। কেন, লোকের অভাব? মাইনে কি কম দি? ঝকমারি হয়েছে ওকে রাখা।

কর্তাও সমানে সায় দেন। বড় মুখ ছোঁড়ার। একটা কাজ করতে বললে মুখের ওপর জবাব, পারবনা, করব না। সকাল থেকে রাস্তায় গিয়ে খেলা? একটা উপকার যদি না হয়, মিছিমিছি অমন লোক রাখার কি মানে হয়? টাকা কি সস্তা?

রেগে যায় বিনতাও। অফিস টাইমের কর্ম ব্যস্ততায় ছুটোছুটি করতে করতে, তরকারি চাপাতে চাপাতে গলা না ছাড়লেও, মুখ ছাড়তে কসুর করেনা। সব রান্নাই যদি নিজেরা রেঁধে নেব, তবে ধর্মের সাক্ষী গোপাল ঠাকুরকে আর রেখে লাভ কি? বেশ মজা হয়েছে দেখছি। সাত সকালে বাবু চাট্টি খেয়েই একেবারে উধাও। ও বিমলা, যা না লক্ষীটি, দেখনা একবার গেল কোথায়? সদরে দাঁড়িয়ে না হয় একবার হাঁক পাড়—

সুযোগ পেয়ে বিমলাও একেবারে রণচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে। সাত সকালেই সুরু হল তো? একটু আগেই না হাঁক পাড়লাম? দেখ বৌদি, তোমাদের বাড়ি বাসন

মাজব, কাপড় কাচব, ঘর মুছব, মশলা পিষব এই সব কাজের জন্যেই মাইনে নি। বাড়তি কাজের জন্যে বাড়তি মাইনে না দাও তো অন্য একটা লোক রাখ। সত্তেয়ো বার গলা ফাটিয়ে সেই বজ্জাত ছোঁড়াটাকে আমি ডাকতে পারব না।

রাগ করে পরিতোষও। বলিহারি বাবা বাড়ির লোককে! পঁচিশ টাকা মাইনে দিয়ে কী লোকই রেখেছে সব! আরে বাপু, ওর বাপ পুরোনো লোক ছিল, অনেক কাল কাজ করে গেছে, সেন্টিমেন্টে লাগে—মাস মাস দু-পাঁচ টাকা দেশে পাঠিয়ে দাও। কিন্তু এমন অকর্মার ধাড়ীকে রেখে লাভটা কিসের? এক প্যাকেট সিগারেট আনতে দিয়েছি ঘণ্টা খানেক আগে, সে বোধ হয় একেবারে খাস সিগারেট কারখানা থেকে তৈরী করে নিয়েই ফিরবে! কি মুশকিল।

রাগ করেনা শুধু এ বাড়ির বড় আদরের বাচ্চা ছেলেটা। খোকন।

গোপালকে না হলে তার একদণ্ড চলে না।

অন্য কোন খেলাধুলো না থাক, দাদুর কিনে দেওয়া রঙিণ ছবির বইগুলো খুলে খুলে ও গোপালকে ছবি দেখাবে বসে বসে। তখন গোপালের হাজার কাজ থাকলেও কারু ডাকবার উপায় নেই। কেঁদে কেটে অনর্থ করবে তা হলে খোকন।

সুতরাং গোপালকে পায়কে?

ঘোড়া ঘোড়া খেলা। গল্প বলা। গুলি, ঘুড়ি লাটাই ইত্যাদিতে হাতে খড়ি দেওয়া, পরমানন্দে চলে গোপালের তিন বছরের খোকনের সঙ্গে।

যত দোষ থাক গোপালের, সব চেয়ে বড় দোষ ও খেতে ভুলে যায়। স্নান করতে ভুলে যায়, ঘুমোলে ওকে টেনে তুলতে হয়। রাস্তায় গেলে ও বাড়ি ফিরতে চায়না।

ওর পেছনে তাই রাত দিন টিক টিক করতে হয় বিনতাকে। বাড়ির গিন্নিকে। এক বাচ্চা সামলাতে হিমশিম, আবার কপালে জুটেছে আর একটা! মজা মন্দ নয়!

কিন্তু অন্যদিন যা ইচ্ছে করুক গে, আজ পই পই করে বলা সত্ত্বেও খেয়ে উঠেই ও হাওয়া হয়েছে। বাড়ি শুদ্ধ লোক রেগে আগুন হয়ে আছে গোপালের উপর।

না আর নয়। আর প্রশ্রয় আহ্লাদ আস্কারা কিছু দেওয়া চলবে না ওকে। বাড়ি ঢুকলেই সোজা বলে দেওয়া, তোমার দ্বারা হবেনা বাপু, তুমি অন্য কোথাও কাজ জুটিয়ে নাও। কিম্বা দেশে চলে যাও।

এ রকম ফাঁকিবাজ উড়নচণ্ডীকে দিয়ে আর যাই চলুক, রান্নার কাজ চলে না।

প্রত্যেকেই একমত। প্রত্যেকেরই এক কথা। ওকে তাড়াও। ঢের হয়েছে। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল।

গোপালের কপাল এবার সত্য সত্যই পুড়ল। এ বাড়ির অন্ন উঠল তার।

* * * *

ডজন দুয়েক রজনীগন্ধা কেনবার পর মনে হল, একটা অগুরু কেনা একান্ত দরকার। বাড়ি ফেরার পথে পরিতোষ ষ্টেশনারী দোকানের দিকে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল। হেলতে দুলতে গান গাইতে গাইতে শ্রীমান্ গোপালচন্দ্র বাড়িমুখো চলছেন।

ওহে গোপালচন্দ্র, এদিকে এসো। পরিতোষ দাঁড়াল।

দাদাবাবুর গলা শুনে চট্ করে গান বন্ধ করে, মুখখানা যথাসম্ভব করুণ করে, গোপাল এগিয়ে আসে।

আজ যে বাড়িতে লোকজন খাবে, কাজকর্ম আছে, হুঁশ নেই? কোন চুলোয় গিয়েছিলি হতভাগা?

আপনার সেই বেরাণ্ডের সিক্রেট এদিকের দোকানে পাওয়া যায়না কিনা, তাই একটু ওদিকের দোকানগুলোয় খুঁজতে গিলাম যে দাদাবাবু—

সিগারেট খুঁজতে তুমি পথে পথে টহল মেরে বেড়াচ্ছ কাজে ফাঁকি দিয়ে? হতভাগা শয়তান কোথাকার! কে তোকে বলেছিল সেই ব্র্যাণ্ডের সিগারেট আজই কাজ কামাই করে দোকানে দোকানে খুঁজে বেড়াতে? যা, বাড়ি যা একবার, তোর জন্যে সবাই সন্দেশের ঠোঙা নিয়ে বসে আছে। এত করে বলি, একটু কাজে মন দিতে পারিস না বাপু?

গোপালের চোখ ছল ছল করে। হাতখানা মাথার টিকিতে চলে যায়।

এদিক ওদিক তাকিয়ে পরিতোষ পকেট থেকে কয়েক আনা পয়সা বার করে ওর হাতে গুঁজে দেয়। আজ তোর কপালে যা আছে, তা ভগবানই জানেন। যা, চায়ের

দোকান থেকে চা খেয়ে পান খেয়ে বাড়ি ঢোক্। এমনিতেই দেরী করেছিস, না হয় আর দু-পাঁচ মিনিট লেট হবে।

পয়সা কটা নিয়ে ট্যাঁকে গুঁজতে গুঁজতে গোপাল বলে, দাদাবাবু, আপনি আমায় বাড়ির মধ্যে একটু ভাল-বাস। দুটো ভাল কথা কও। আর কেউ গোপালকে দু-চোখে দেখতে পারে না। গালমন্দ করে।

পরিতোষ যেতে যেতে ধমক দেয়, যা যা, আর ফাজ-লামো করতে হবেনা। এই শোন, সিগারেটের কথা যেন বলিসনি—বাড়িতে। খবরদার!

ধূর্ত চতুর চোখে মুচকে হাসে গোপাল। না দাদাবাবু। কক্ষণো বলব না।

নাতিকে বেলুন কিনে দিচ্ছিলেন কর্তা। নাতিই দেখাল, দাদু, ও দাদু, গোপালকে দেখে। ওকে বেলুন দাওনা একটা।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন কর্তা, এই গোপ্‌লা, সমস্তদিন ছিলি কোথায় অ্যাঁ? বাড়িতে কাজের ঝঞ্ঝাট, আর তুই জেনে-শুনে ডুব মারলি? কোন কথা তোর মনে থাকে না?

মনে তো ছিল বড়বাবু। গোপাল যথাসম্ভব গলাটা কাঁদো কাঁদো করল। কিন্তু আপনার সেই কাজটার জন্যে দেরী হয়ে গেল।

আমার কাজ! আমার আবার কোন কাজে তুই কোথায় গিয়েছিলি? কর্তা আকাশ থেকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কিতও হন মনে মনে।

সেই যে ফরম, ঐ যে টাকা পাঠায় যাতে করে লিখে, আর আপনার খাম পোষ্টকার্ড আনতেই পোষ্টাপিসে গেলাম বড়বাবু। কী ভীড় বাবু, কী ভীড়! লম্বা লাইন। দাঁড়াতে দাঁড়াতে পা ব্যথা হয়ে গেল বাবু, মাথা ধরে গেল।

পেয়েছিস? টাকা পেলি কোথায়? খাম পোষ্ট-কার্ডের?

পেলাম আর কোথায় বাবু? এখনো মস্ত লাইন—মাথার যন্তরনা—

ছুটির দিন। পোষ্টাপিস খোলা কি বন্ধ এসব ভাববার সময় পেলেন না কর্তা। খেঁকিয়ে উঠলেন, আজ তোকে পোষ্টাপিসে কে যেতে বলেছিল শুনি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাইন দিয়ে মাথা ধরাতেই বা বলেছিল কে? যা একবার বাড়ি। ভাল করে তোর মাথাধরা সারিয়ে দেবে'খন বাড়ির লোকেরা। এই ছোঁড়া, আবার চললি কোথায়?

আজ্ঞে বাড়িতে বাবু। লাইনে দাঁড়িয়ে দেরী হয়ে গেল, গিন্নিমাকে বলতে হবে—

দাঁড়া। শোন এদিকে। কর্তা ভ্রূকুঞ্চিত করে ভেবে নিলেন তাঁর সঙ্কটজনক অবস্থাটা। তারপর পকেট থেকে কয়েক আনা পয়সা বার করে ওর প্রায়-প্রসারিত হাতে ফেলে দিলেন। মোড়ে ডাক্তারখানা থেকে মাথাধরার দুটো বড়ি কিনবি। আর চায়ের দোকানে চা। ওষুধ, চা গিলে তারপর বাড়ি ঢুকবি। বুঝলি?

আজ্ঞে হ্যাঁ বড় বাবু। ওঃ খুবঃ মাথার যন্ত্রণা। গোপাল কপালে হাত দিয়ে মুখ কোঁচকাল।

সমস্ত দিন টো টো করে ঘুরলে হবেনা? যা ডাক্তার-খানায়। হ্যাঁ শোন, পোষ্টাপিসের কথা যেন বলিসনি বাড়িতে।

না বাবু, তাই কি বলতে পারি? গোপাল আকর্ণ-বিস্তৃত হাসি হেসে প্রচণ্ডবেগে এধার থেকে ওধার ঘাড় নাড়ল। কক্ষণো বলব না। বাড়িতে এত লোক আছে, কিন্তু আপনার মত কেউ আমাকে এত ভালবাসেনা বড়-বাবু। সবাই গাল মন্দ করে। দুটো মিষ্টি কথা বলেনা। আপনি আছো, তাই—

গোপালের চোখ ছল ছল। মুখ কাঁদো কাঁদো।

বলবে কি? তোর স্বভাবের জ্বালায় বাড়ির সবাই অতিষ্ঠ। যা পালা। বেশী দেরী করিসনি যেন। বকুনি তো কপালে আছেই, না হয় দু-পাঁচ মিনিট দেরীই হবে। বড়িটা কিনে খাস কিন্তু—

হ্যাঁ বাবু। এই ডাক্তারখানায় যাচ্ছি।

ঢোকবার মুখেই বিমলার সঙ্গে দেখা।

হন্তদন্ত হয়ে বাইরে ছুটছিল। গোপালকে দেখেই থমকে দাঁড়াল। এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে চোখ মুখের গম্ভীর ইঙ্গিত করে বলল, এই যে মুখপোড়া হতচ্ছাড়া এয়েছ? বাড়ি ঢোকবার কথা মনে পড়েছে? যা, যা একবার। খেলা আর খেলা! কতদিন বলিছি,

ওরে বাঁদর, লোকের বাড়ি কাজ করতে এসে অত খেলা কেন? তা বিমলা যে বাসন মাজে! ছোটলোক! ঝি! তার কথায় কান দিবি কেন? বোঝ এবার ঠেলা —তোর চাকরির দফারফা!

বিমলা কথাকটা শেষ করেই আবার পা চালাল। গোপাল ওর দিকে তাকিয়ে মুখ ভেংচে জিভ বার করে ভেতরের দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকল।

এই যে! বাবুর বাড়ির কথা মনে পড়েছে এতক্ষণে! তা বাপু আর একটু বাদে একেবারে ভাত খাবার সময়ে হাজির হলেই পারতে!

গিন্নি গলার জোরে বাড়ি মাথায় করলেন। গোপাল কোন জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে দাঁড়াল তাঁর সম্মুখে। অপরাধীর মত।

গিন্নি আবার চড়া গলায় সুরু করলেন, ছিলি কোথায় বাঁদর? বাড়িতে লোকজন খাবে, বৌমা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে, রান্না তো ছাই করবি, একটু হাতে হাতে জোগাড় দেওয়া, একটু রান্নাঘরে স্থির হয়ে বসা, তাতেও ফাঁকি? আসুক আজ কর্তা, দেখিস তোর কি হাল হয়।

গোপাল যতদূর সম্ভব করুণ কণ্ঠে মিন মিন করল, আমি কি করব বড়মা, আপনি সেই সুগন্ধি জরদার কথা বলেছিলেন, আমি তাই ভাবলাম, আমার দেশের লোক বাড়ি যাবে, তাকে একবার বলে আসি, মায়ের জন্যে ভাল জর্দা এক কৌটো যেন আনে। কি বলব মা, কটক সহরে তেমন জর্দা আর কেউ বিক্রি করে না। একদিন মুখে দিলে আর আপনি জীবনেও ভুলতে পারবেন না। মনে নেই বড়মা, সেই একদিন আপনাকে এনে দিয়েছিলাম?

মুখপোড়া, আজ তোকে কে যেতে বলেছিল? বেলা কাবার করে তুই বাড়ি ঢুকলি? এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান নেই? দাদাবাবু, বৌদি, বড়বাবু সবাই রেগে আগুন হয়ে আছে। আচ্ছা আক্কেল তো তোর?

কোন্ সময় গলাটা নরম হয়ে গেছে, টের পান নি গিন্নি। কয়েক পা এগিয়ে এসে এধার ওধার ভাল করে নজর করে চাপা গলায় আবার বললেন, হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে দয়া করে ঘরে এসো একবার, কাজ আছে।

মাথা চুলকাতে চুলকাতে গোপাল ঘরে ঢুকল।

ঐ যে চা টা আছে। নে চট করে খেয়ে নে। খোকন সন্দেশ খায়নি, ডিসের সন্দেশ দুটো খেয়ে নে। সকাল দিন হটর হটর। খেয়ে হাত মুখ ধুয়ে তবে রান্নাঘরে ঢুকবি।

গোপাল আদেশ পালনে তৎপর হল।

গোপাল বাড়ি ফিরেছে মা? বৌমার সাড়া পাওয়া গেল রান্নাঘর থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে গিন্নি আবার সুর বদলালেন। হ্যা গো বৌমা। তোমাদের আলালের ঘরের দুলাল বাড়ি ঢুকেছেন। নাও এবার ফুল বিল্বপত্তর দিয়ে পুজো কর। মাসকাবার হলেই মাইনে নিয়ে দূর হয়ে যাবি হতচ্ছাড়া। ঢের সহ্য করেছি। আর নয়। টাকা ছড়ালে লোকের অভাব? ঘরে ঘরে মানুষে রান্নার লোক রাখছে না? শোন বৌমা, আজ তো বাছা তোমার ননদ নন্দাই দাদা বৌদি সবাই আসছে। একটা ভাল রান্নার লোকের কথা বলে রেখো। যেন একটু ভার ভারিক্কি হয়। এমন অল্পবয়সী অকাজের ছোঁড়া আর নয়। পষ্ট কথা বলে দিলাম বাপু। একটা ব্যবস্থা না করলে আর চলছে না। এ ছোঁড়াকে রেখে আমার হাড় মাস ভাজা ভাজা হয়ে গেল।

গিন্নির কথার স্রোতের মধ্যে গোপালচন্দ্রের চা সন্দেশ খাওয়া সারা হয়ে গেছে। ধীরে সুস্থে সে এবার বৌদির মুখোমুখি হবার জন্যে পা বাড়াল রান্নাঘরের দিকে।

গিন্নি গলা নামিয়ে ফিস ফিস করে বললেন, এই হতভাগা, শোন। বৌদি একটু গালমন্দ করলে চুপ করে থাকবি। বুঝলি তো?

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করল গোপাল। বুঝেছি বড়মা! আপনি যা একটু আমাকে ভালবাস বাড়ির মধ্যে। আর কেউ দেখতে পারে না। সবাই গালমন্দ করে।

তোর দোষে করে। কথা শুনলেই পারিস সবার? যা যা, দাঁড়িয়ে থাকিসনি আর। বেলা পড়ে এলো যে।

গোপাল রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে চলল।

গিন্নি আবার গলা ছাড়লেন, বৌমা, আমি এখনি যাচ্ছি। চপগুলো গড়ে দিচ্ছি গিয়ে। ওর দ্বারা তো কোন কাজ হবে না।

বিনতা রান্নাঘর থেকেই চেঁচিয়ে জবাব দিল, না মা। আপনাকে এখন আসতে হবে না। চা-টাটা হয়ে যাবে।

আপনি বরং চা খেয়ে কাপড় কেচে একেবারে আসুন। পুর তো করাই আছে। দু'জনে মিলে করে নেব'খন। আর এতক্ষণ ফাঁকি দিয়েছে ঐ গোপালকে দিয়েই দেখুন না সব কাজ আমি করিয়ে নিচ্ছি। ওর মজা বার করছি।

ঐ ছোঁড়ার কাজের কথা তুমি আর বলনা বৌমা! আবার জ্বলে ওঠেন গিন্নি। সমস্ত বেলা কাটিয়ে অকম্মার ঢেঁকি এখন হাজির দিতে এলেন!

যা বলেছেন মা! রাগ রাগ গলায় বিনতা জবাব দেয়। এই তো পাশের বাড়ির মাসিমারাই দেখুন না কেমন লোক রেখেছেন। কী কাজের! আর খুব ভাল রান্নাও নাকি জানে। কোন ঝামেলা নেই। হাঁক ডাক নেই। বাড়ি তোলপাড় নেই। শুধু রান্না'র কথাটি বলে দাও, ব্যস! আর উঁকি মেরে দেখতে হয় না। দশজন বিশজন থাক, ঝামেলা পোয়াতে হয় না, কেন মা—আমার বাপের বাড়ি? দেখেন নি? কি চমৎকার কাজের লোক? তার হাতের রান্নাও তো খেয়েছেন মা। একেবারে মন্দও তো নয়। মাইনেও কম।

মন্দ বলছো কি বৌমা। চমৎকার রান্না। কেমন হাসি খুশী ঠাণ্ডা মানুষটা। তোমার মাকে বলে রেখ, ঠিক অমন একটা লোক সন্ধান হলেই যেন আমাদের খবর দেন। আচ্ছা, আমি তবে কাপড়খানা কেচেই আসি বৌমা। তুমি জলখাবারটা খেয়ে নাও ততক্ষণে।

গিন্নির সাড়া আর পাওয়া গেল না। বাথরুম থেকে বেরোতে ওঁর বেশ কিছুক্ষণ লাগবে। নিশ্চিন্ত হল বিনতা। এখনি উনি কাপড় কাচতে যাবেন।

শাশুড়ীর কান পর্য্যন্ত পৌছয় এমন ভাবে গলা তুলে বিনতা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, দয়া করে তাহলে বাড়ি ফিরেছ? আসুক আজ তোর দাদাবাবু আর বাবা, তোর কি দশা হয় দেখ। একটা কাজ যদি তোর দ্বারা হয়। বলি সব রান্নাবান্নার কাজগুলো যদি আমরাই করব, তবে, তুই কি করবি? পথে পথে টহল মেরে বেড়াবি? গুলি খেলবি? ঘুড়ি ওড়াবি? খোকনের সঙ্গে রাতদিন খেলা করবি, আর বসে বসে মাইনে নিবি?

এবার আর এতটুকুও কাবু হল না গোপাল—সমানে জবাব দিল, তোমার জন্তেই তো ফিরতে দেরী হল। আমার জন্তে! আমি আবার তোকে কোথায় পাঠালাম? বিনতা অবাক হয়ে গোপালের মুখের দিকে তাকাল। গলার জোর নিস্তব্ধ হয়ে এলো।

তুমিই তো বলেছিলে সেদিন, কোন বাজারে জলপাই আমলকি পাওয়া যায়? ডাঁশা পেয়ারা আর কামরাঙ্গা পাওয়া যায়? আমাকে দেখে আসতে বলনি?

শঙ্কিত বিনতা গলা নামাল, আ গেল যা মুখপোড়া! তোকে কি আমি আজ যেতে বলেছিলাম? কোথায় ডাণ্ডাগুলি খেলছিলি, বাড়ি এসে এখন আমার নামে দোষ দিচ্ছিস। আচ্ছা শয়তান ছেলে বাবা তুই?

বিশ্বাস হল না, গোপাল শুধু মিথ্যে কথা বলে বুঝি? ন'হাত ধুতিখানার খুঁট খুলে গোপাল দুটো ডাঁসা পেয়ারা আর গোটাকতক জলপাই বার করে বিনতার কোঁচড়ে ফেলে দিয়ে মুখ ভার করে হাঁড়ী হেঁসেলে হাত লাগায়।

তাড়াতাড়ি সেগুলো যথাস্থানে লুকিয়ে রেখে মুখ টিপে হাসে বিনতা। নে হয়েছে। আর কান্না দেখাতে হবে না। সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছিস—চট করে কিছু খেয়ে নে। মা বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে। এখুনি তোর দাদাবাবু, বড়বাবু বাড়ি আসবেন। কপালে আজ তোর অনন্ত দুর্গতি আছে। রেগে সবাই আগুন হয়ে আছেন। শুনলি তো মায়ের কথা? তোকে ছাড়িয়ে দেবেন মাসকাবারে। কোন কম্মের নোস তুই।

ইস্ ছাড়ালেই হল আর কি? আমি গেলে তো?

গোপালের গলাও সমানে চড়ে।

যাবি না মানে? নতুন লোক রাখবে এরা। আর এদেরই বা দোষ কি বল? তুই রোজ রোজ আমাদের জ্বালিয়ে খাবি? কে সহ্য করবে বল? এই নে ধর, এই দিকে সরে আয়। পরোটা দুখানা আলুর দম দিয়ে খেয়ে নে। ওই চা রেখেছি তোর জন্তে। গরম আছে এখনো। আগে খেয়ে নে। মুখ শুকিয়ে গেছে। কোথায় ঘুরিস বলতো সারাদিন? খিদে পায়নি?

খুব খিদে পেয়েছিল বৌদি। ভাল হয়ে বসে পরোটা-আলুর দম খেতে খেতে ধরা গলায় গোপাল জবাব দেয়।

তাতো পাবেই। এই যে আর একখানা। ছেলে মানুষ, সমস্ত দিন হুটর হুটর করলে কি হয়? কাল থেকে ঘুমোবি। বুঝলি? দুপুরে বেরুনো ছাড়তে হবে।

তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো বৌদি। চা টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বৌদি?

ওমা? দাঁড়া দাঁড়া গরম করে দি একটু।

হ্যাঁ তাই দাও। বাড়ির মধ্যে তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে একটুও ভাল বাসেনা বৌদি। ডেকে দু'টো ভাল কথাও বলেনা। কেউ দেখতেও পারেনা। তুমিই যা একটু—

ছায়া নেই শুধু আলো

শ্রীগোবিন্দপদ মুখোপাধ্যায়

দু'ধারে ভরা ক্ষেত, মাঝেতে আলিপথ,
তাহারি বুক বেয়ে ছোটে যে মনোরথ।
উদার নীলাকাশে,
শারদ আলো হাসে,
বসুধা অপরূপা শ্যামল সুষমায়,
পল্লী-মাঠে-মাঠে মাধুরী মুরছায়।

প্রভাতী আলো ঝরে বনানী তরুশিরে,
সোনালী মায়া আঁকে তটিনী নীরে-নীরে।
বলাকা উড়ে চলে—
আকাশ-তলে-তলে—
দখিন-সমীরণে আসে যে আগমনী
বরণ-ডালা হাতে মাটির মা-ধরণী।

বনের পথে পথে শেফালি আলিপনা
দোপাটি-শতদলে কাহারি আরাধনা।
কাশের ফুলে ফুলে
অমল হাসি তুলে,
স্বর্গ হ'তে কি গো জননী নামে আজি
শিশিরে ধোয়া-মোছা তাই কি তৃণরাজি!

তাই কি ভরে মন খুসীর আমেজেতে,
হৃদয় মন্থর সুখের আবেশেতে!
হারানো সুখস্মৃতি,
অতীত কলগীতি,
ভরিছে আজি-যেন হৃদয় কূলে কূলে,
দুখেরি শত জ্বালা গেতেছি যেন ভুলে!

তাই কি ডাকে যেন দূরেরি নীলাকাশ
প্রকৃতি-বনে-বনে গীতির পরকাশ।
বাতাসে শিহরণ,
পুলক হরষণ,
অসাড় মনে জাগে জীবন-জাগরণ,
শরৎ-ঋতু-সোনা-কাঠির পরশন।

জীবনে কত দুখ, কত শত নিরাশা,
অভাব, অনটন কত যে গো হতাশা।
সবই যে মুছে যায়
বারেক যেন তায়
শরতের মধুমায়া জীবনের সবদিক,
ছায়া নেই, শুধু আলো, চেয়ে থাকি অনিমিখ।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক গগনে ক্ষুদ্র এক-খণ্ড মেঘের উদয় হইয়াছে। হয়ত ইহা শরতের মেঘের মতই অচিরে মিলাইয়া যাইবে। কিম্বা ক্রমে ক্রমে বড়হইয়া ইহা আকাশ ছাইয়া ফেলিবে এবং বৃষ্টি ও ঝড়-ঝঞ্ঝার সৃষ্টি করিয়া বিষম উপদ্রবের কারণ হইবে—অনেকে এরূপ আশঙ্কাও করিতেছেন এবং এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। এই উপদ্রব ঘটিলে যে ভারতেও তাহার ঢেউ পৌছিতে পারে এরূপ আশঙ্কাও অস্বাভাবিক নহে।

ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দুরা চিরদিনই বাহিরের জগতের সম্বন্ধে উদাসীন—অবস্থা-বিপর্যয়ে যে বাহির হইতে কোন বিপদ ঘটিতে পারে এই সম্ভাবনা কোন দিনই তাহাদিগকে বিচলিত করে নাই। সুতরাং বিপদ যতক্ষণ না একেবারে ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, ততক্ষণ তাহারা এ বিষয়ে কোন সন্ধান বা উদ্বেগবোধ করে না। আরবে নবজাগ্রত মুসলমানশক্তি যখন পারস্ত ও অন্যান্য দেশ ধ্বংস করিয়া ভারতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল; যখন একে একে প্রাচীন রাজ্যগুলি দ্রুতবেগে তাহাদের হাতে পরাজিত হইতেছিল, তখনও ইহা এদেশে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। মুসলমানেরা সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিবার পূর্বে ভারত এ বিষয়ে সচেতন হয় নাই। ইহার সহস্র বৎসর পূর্বে গ্রীকবীর আলেকজান্দার সমস্ত পশ্চিম-এশিয়া জয় করিয়া সিন্ধুনদ পার হইবার পূর্বে তাঁহার আক্রমণের সম্ভাবনামাত্র কোন ভারতবাসী আশঙ্কা করে নাই। সম্প্রতি চীনদেশ ধীরে ধীরে তিব্বত আত্মসাৎ করিয়া যখন ক্রমে ক্রমে হিমালয় পার হইয়া ভারতে একটির পর একটি ঘাটি দখল করিতেছিল—তখন ভারতসরকার কয়েক বৎসর যাবৎ ইহার প্রতি কোন গুরুত্ব আরোপ করে নাই এবং সযত্নে এই সংবাদটি পর্যন্ত কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। তারপর যখন একেবারে বিপুল চীনাবাহিনী লাডাক ও আসামের মধ্য দিয়া ভীমবেগে অগ্রসর হইল তখন অকস্মাৎ ভারতবাসী জাগিয়া উঠিল। কিন্তু সে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ। অস্ত্র নাই, পোষাক নাই, যুদ্ধের জন্য কোন প্রস্তুতি নাই—সুতরাং ভারতসৈন্য পশ্চাৎ হটিতে লাগিল—সরকারী কর্মচারীরা তেজপুর সহরের মায়া ত্যাগ করিয়া ভীত ত্রস্ত নরনারীকে পশ্চাতে রাখিয়া নিজেদের প্রাণ বাঁচাইলেন। দুর্বলের সহায় ভগবান্—তাই চীনারা আর অগ্রসর হইল না। প্রকারান্তরে বলিল তোমাদের কান মলিয়াছি, জুতা মারিয়াছি, আর অপমান করিব না। আমরাও প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিয়াছি ইহাতেই খুশী হইলাম। চীন-ভারতের এই যুদ্ধের কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। এই যুদ্ধে সহস্রাধিক ভারতীয়সৈন্য (সম্ভবতঃ আরও অনেক বেশী) হত, আহত ও বন্দী হইয়াছে, কিন্তু একটি চীনা সৈন্য বন্দী হয় নাই, হত বা আহত হইয়াছে এরূপ সংবাদও জানা যায় নাই। জীবনভরিয়া ইতিহাসে কত যুদ্ধের কথাই তো পড়িয়াছি—কিন্তু এরূপ যুদ্ধের কাহিনী শুনি নাই বা কোন বইয়ে পড়ি নাই!

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত বেগে যে পট পরিবর্তন হইতেছে আমাদের দেশে তাহার সন্ধান খুব কম লোকই রাখে। স্বাধীনতা লাভের পর আমরা বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিয়াছি—এখনও করিতেছি এবং ভবিষ্যতেও করিব। কিন্তু আমাদের পরম গর্বের বিষয় যে পণ্ডিতজীর পররাষ্ট্রনীতি ভারতের মুখ পৃথিবীতে উজ্জ্বল করিয়াছে। কিন্তু কেবল গৌরব লইয়া পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা যায় না—প্রত্যক্ষ বাস্তবকে কোন মতেই অস্বীকার করা যায়

প্রাচীন দুর্গ (কাশ্মীর)

গুলমার্গ (কাশ্মীর)

ফটো : সন্তোষকুমার দাস

না। স্বাধীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দুইটি সমস্যা প্রবল হইয়া উঠিল—পাকিস্তানের সহিত সম্বন্ধ ও কাশ্মীর সম্বন্ধে ব্যবস্থা। ১৭ বৎসরের মধ্যে এ দুইটি সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা তাহার সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না। ভারতসীমান্তে পাকিস্থানের হানা পূর্ববৎ চলিতেছে। ভারতসরকারের মৌখিক প্রতিবাদ ভারতে ও পাকিস্থানে সমানরূপে হাস্যজনক বলিয়া গণ্য হইতেছে। পূর্বপাকিস্থানের হিন্দুদের শোচনীয় অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই, বরং ইহা ক্রমশঃই খারাপ হইতেছে। কাশ্মীর-সমস্যাও ক্রমশঃই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। সতর বৎসর যাবৎ গৌরবোজ্জ্বল বৈদেশিক নীতি পরিচালনার এই এক দিক। আর একদিক হইল চীনাদের সঙ্গে পঞ্চশীলের মালা বদল ও তাহার ফলে তিব্বতের ধ্বংস ডাকিয়া আনা। সন্ধির শর্ত ভাঙ্গিয়া চীন যখন তিব্বত দখল করিল তখন ভারতসরকার নিরপেক্ষ। এই তিব্বতের পথ দিয়াই যে এক দিন চীন ভারত আক্রমণ করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনার কথা কলিকাতায় সভা করিয়া ভারতের অনেক গণ্যমান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলিয়াছিলেন। ভারতসরকার এই আশঙ্কাকে বিদ্রূপ করিয়াছিল এবং বাংলার কংগ্রেসসদস্যেরা কলিকাতার ঐ সভা বয়কট করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহা সত্য সত্যই ঘটিল, তখন ভুল ত্রুটি লজ্জা স্বীকার না করিয়া দামামার শব্দে আমাদের বৈদেশিক নীতির মহিমা চতুর্দিকে প্রচারিত হইল।

এবারে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মেঘ ঘনাইয়া উঠিয়াছে। অবশ্য ইহা একেবারে আকস্মিক নহে, কারণ গত দশ বৎসর ধরিয়াই ইহার সূচনা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ভারত এদিকে দৃষ্টি দেয় নাই। তাই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিষয়ের একজন অধ্যাপক বলিয়াছেন যে কঙ্গো, কিউবা ও বেলগ্রেডের ব্যাপারে ভারতের যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু লাওস্ ও ভিয়েৎনামের যে সকল ঘটনায় ভারতের নিরাপত্তা বিপদ্‌গ্রস্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা সে সম্বন্ধে ভারতসরকার তেমন কোন উৎসাহ দেখায় না।

ভারতের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্বন্ধ এবং কিরূপে এখানকার ঘটনায় ভারত বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে তাহা বুঝাইতে হইলে কিছু পূর্বকথা আলোচনার দরকার।

ভারতবর্ষের পূর্বে ও চীনের দক্ষিণে এশিয়া মহাদেশের যে অংশ অবস্থিত তাহাই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া নামে অভিহিত। ইহার মধ্যে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড আছে তাহা ইন্দোচীন এবং তাহার দক্ষিণের দ্বীপময় অংশ ইন্দোনেশিয়া নামে খ্যাত। এই দুই অংশেই প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আদিম অসভ্যতা বিদ্যমান ছিল। ভারতবাসীরা যাইয়া এই সব অঞ্চলে রাজ্য ও বড় বড় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ঐ সমুদয় দেশের চিরস্থায়ী বাসিন্দা রূপে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্তার করে। ইন্দোচীনে ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), মলয় উপদ্বীপ, কম্বুজ (কাম্বোডিয়া), চম্পা (ভিয়েৎনাম) ও লাওস প্রভৃতি অনেক পার্বত্য প্রদেশে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজা রাজত্ব করেন। সংস্কৃত ও পালি ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়, বিরাট সৌধ, মন্দির, স্তূপ ও বিহার এবং বহু দেবদেবীর মূর্তি নির্মিত হয় এবং ভারতীয় সামাজিক ও শাসনপদ্ধতি আচার-ব্যবহার প্রভৃতি প্রচলিত হয়। ইন্দো-চীনে কম্বুজরাজগণ এবং দ্বীপময় ইণ্ডোনেশিয়ায় শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণ বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আঙ্কোরভাট, বড়বুদুর প্রভৃতি বহু মন্দির ও স্তূপ আজও তাঁহাদের কীর্তি বহন করিতেছে এবং ভারতীয় শিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে বিশ্বের বিস্ময়স্থল হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

খ্রীষ্ট জন্মের পর প্রায় দেড় হাজার বৎসর পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অব্যাহত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে ইসলাম সভ্যতা ইহার কোন কোন অংশে প্রভাব বিস্তার করে। ত্রয়োদশশতাব্দীর শেষে ইহা সুমাত্রা দ্বীপে এবং পরে ক্রমে ক্রমে বলিদ্বীপ ও আর কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ও বড় বড় দ্বীপের অংশ ব্যতীত ইন্দোনেশিয়ার সর্বত্রই পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলাম সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দো-চীনে চম্পা (ভিয়েৎনাম) ও মলয় উপদ্বীপ মুসলমান সভ্যতা গ্রহণ করে কিন্তু ব্রহ্ম, শ্যামদেশ, ও কম্বুজ পূর্বের ন্যায় বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অন্যান্য অঞ্চলে বৌদ্ধ এবং কনফুসিয়াসের ধর্মের প্রভাব ছিল।

ইসলাম ধর্মের প্রভাব সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই ইউরোপীয়গণ দক্ষিণ-এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করে। ষোড়শশতাব্দী হইতে বিংশশতাব্দীর

মধ্যে একমাত্র শ্যামদেশ ব্যতীত আর সকল অংশেই ইউরোপীয়গণ প্রভুত্ব করে। ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজেরা বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করে। ইন্দোচীনে ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপে বৃটিশ এবং কম্বুজ, ভিয়েৎনাম ও লাওস অঞ্চলে ফরাসীরা প্রভুত্ব করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা দ্রুতবেগে এই সমুদয় দেশ অধিকার করে এবং বৃটিশ,ফরাসী ও ওলন্দাজদের প্রভুত্ব একেবারে বিলুপ্ত হয়। এই সকল দেশেই জাপান "এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য" এই নীতি প্রচার করে। ফলে লোকের মনে স্বাধীনতা লাভের স্পৃহা জাগিয়া ওঠে। জাপান যুদ্ধে পরাজিত ও ঐ সমুদয় দেশ হইতে বিতাড়িত হইলেও ইউরোপীয়দের প্রতি বৈরিতা ও তাহাদের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষা—এই দুয়ের যে বীজ জাপান-আক্রমণকারীরা রোপণ করিয়াছিল তাহা ক্রমে বিশাল বৃক্ষের আকার ধারণ করিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজেরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তাহাদের প্রভুত্ব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করিল—কিন্তু দেখিল যে অবস্থার গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে।

ইংরেজেরাই প্রথমে বিনা গোলমালে নূতন পরিবেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইল। ব্রহ্মদেশে কিছু পরিমাণ প্রভুত্ব রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া তাহারা ব্রহ্মদেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিল। ভারতবর্ষেও দুইটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইল। মলয় উপদ্বীপে বহুকাল পর্যন্ত তাহারা প্রভুত্ব বজায় রাখিল, ইহার কারণ পরে আলোচিত হইবে।

ফরাসিগণ কাম্বোডিয়া ও লাওস এই দুই দেশের উপর অধিকার ত্যাগ করিলেও এ দুয়ের পূর্ববর্তী ভিয়েৎনাম প্রদেশে অর্থাৎ টংকিং,আনাম ও কোচিন-চায়নায় পুনরায় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। কারণ সমুদ্রের উপকূলস্থিত এই সুদীর্ঘ ভূখণ্ডে লালনদী (Red River) ও মেকংনদীর মোহানা ধনজনে ও শস্যসম্পদে সমৃদ্ধিশালী ছিল ও ইহার বন্দরগুলিতে বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভেই এখানে ভিয়েৎ-মিন্ (viet menh অর্থাৎ ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা সংঘ) নামে একটি দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহার নায়ক ছিলেন রাশিয়া ও চীনে কমিউনিষ্টতন্ত্রে দীক্ষিত হো-চি-মিন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই দেশের ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মিত্রশক্তিদের মধ্যে মতভেদ হয়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট বলিলেন—ইহা আর ফরাসিদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে না—চীনের জাতীয়তাবাদী চিয়াং কাই সেকের গভর্নমেণ্ট ইহা দখল করুক। কিন্তু বাদানুবাদের পর স্থির হয় যে আপাততঃ সাময়িকভাবে চীন ও বৃটেন যথাক্রমে ইহার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ দখল করুক—পরে ফরাসিরা ফিরিয়া আসিলে সমগ্র দেশটি তাহাদের হাতেই দেওয়া হইবে। জাপানী সৈন্য আত্মসমর্পণ করিবার প্রায় একমাস পরে বৃটিশসৈন্য ভিয়েৎনামে পৌঁছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে হো-চি-মিন ভিয়েৎনাম গণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলেন। ১৯৪৬ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে চীনাসৈন্য উত্তর ভিয়েৎনাম পরিত্যাগ করিল এবং ফরাসিরা হো-চি-মিনের সঙ্গে একটা আপোষ করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু স্বাধীনতা তো দূরের কথা, পুরাপুরি স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারও ফরাসিরা দিতে স্বীকৃত হইল না। অবশেষে ১৯৪৬ খৃঃ শেষভাগে ফরাসিরা হো-চি-মিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। কিন্তু ফরাসীরা যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। ১৯৪৯ খৃঃ চীনে কমিউনিষ্ট দলের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহাদের সাহায্যের ফলে হো-চি-মিন দুর্ধর্ষ হইয়া উঠিল। তখন ফরাসিরা বাও দাই নামে আনামের ভূতপূর্ব সম্রাটকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিল। ফরাসিরা যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝাইল যে প্রকৃতপক্ষে হো-চি-মিনের সহিত যুদ্ধ কমিউনিষ্ট চীনের সঙ্গে যুদ্ধেরই নামান্তর। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্রও ফরাসিদের সাহায্য করিল। কিন্তু যুদ্ধে ফরাসিরা কোন মতেই জয়লাভ করিতে পারিল না। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের পূর্বেই ৩৩,০০০ ফরাসিসৈন্য নিহত হয়, ইহা হইতেই যুদ্ধের গুরুত্ব বোঝা যাইবে। মাঝে মাঝে কিছু সাফল্য লাভ করিলেও ১৯৫৪ খৃঃ ফরাসিরা যুদ্ধে জয়ের আশাত্যাগ করিল। ১৯৫৪ খৃ জেনেভাতে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, রাশিয়া ও চীনের বৈদেশিক মন্ত্রীরা সমবেত হইয়া দুই দলের মধ্যে নিম্নলিখিত শর্তে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করিল:

ভিয়েৎনামের যে অংশ সপ্তদশ-সমাক্ষরেখার (latitude) উত্তরে অবস্থিত, তাহা ভিয়েৎমিনের অর্থাৎ হো-চি-মিনের অধিকারে থাকিবে। ইহার দক্ষিণ-অংশে বাও দাই স্বাধীনভাবে (?) রাজত্ব করিবে—অবশ্য ফরাসিরা তাহাকে সাহায্য করিবে। ১৯৫৬ সনে সমগ্র দেশে নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং নির্বাচিত সদস্যগণ ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ শাসন প্রণালীর ব্যবস্থা করিবেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থা কার্যকরী হইল না। কারণ দেশের দুই অংশের দুই গভর্ণমেন্টের মধ্যে নানা অজুহাতে গোলমাল চলিতে লাগিল। হো-চি-মিন সম্পূর্ণরূপে চীনের কমিউনিষ্ট গভর্ণমেন্টের দলভুক্ত হইলেন। দক্ষিণ-ভিয়েৎনামে আভ্যন্তরিক অনেক গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইল। হো-চি-মিনের কমিউনিষ্টদল গোপনে প্রচার কার্য চালাইতে লাগিল। বাও দাইর পরিবর্তে অন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত হইল—বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী অধিবাসীগণের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়নের ফলে দেশমধ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। হো-চি-মিনের দল ইহা অনায়াসেই জয় করিতে পারিত, কিন্তু তাহা হইলে কমিউনিষ্ট চীনের প্রভুত্ব সমগ্র ইন্দোচীনে বিস্তৃত হইবে এই আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য ও অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাইয়া ইহা রক্ষার ব্যবস্থা করিল। মোটের উপর এখন ফরাসিরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনীতিক ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্ররক্ষিত দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সহিত চীনের সাহায্যে পরিপুষ্ট উত্তর ভিয়েৎনামের রেষারেষি চলিতেছে। সম্প্রতি উত্তর ভিয়েৎনাম যুক্তরাষ্ট্রের নৌবহর আক্রমণ করিয়াছে—এই অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্রও উত্তর ভিয়েৎনামে বিমান পোত হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। আসল ব্যাপার এই যে নূতন নির্বাচন হইলে হো-চি-মিনের দল যে সমগ্র ভিয়েৎনামে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিবে শত্রু-মিত্র কাহারও সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং তাহার ফলে যে সমগ্র দেশটি কমিউনিষ্টদলের অন্তর্ভুক্ত হইবে সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র ও হো-চি-মিনের বিরোধ গণতন্ত্রের সহিত কমিউনিষ্ট নীতির যুদ্ধের একটি অধ্যায় মাত্র এবং সম্ভবতঃ ইন্দোচীনে ইহাই শেষ অধ্যায়। কারণ কাম্বোডিয়া ইতিমধ্যেই কমিউনিষ্ট চীনের মিত্রতা—অর্থাৎ আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। লাওসে ভিয়েৎনামের মতন কমিউনিষ্টদল বেশ প্রবল, কারণ ইহারা চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের সাহায্য পাইতেছে। আরও দুইটিদল আছে—একদল কমিউনিষ্টের বিরুদ্ধবাদী—আর একদল নিরপেক্ষ। যুক্তরাষ্ট্র এই দুই দলের কখনও একটি কখনও অপরটির সাহায্যে কমিউনিষ্টদলকে পরাভূত করিতে চাহেন। এদেশের জন্যও জেনেভাতে ব্যবস্থা হইয়াছে যে লাওসের লোকেরাই শাসনের ব্যবস্থা করিবে—বাহির হইতে চীন, উত্তর-ভিয়েৎনাম বা যুক্তরাষ্ট্র কোন দলকে কোন সাহায্য করিতে পারিবে না। যে কমিশনের উপর এই ব্যবস্থানুযায়ী কার্যপরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে ভারতগভর্ণমেন্ট তাহার সভাপতি। কিন্তু যতদূর নির্ভরযোগ্য সংবাদ পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় ভারত এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন—একদিকে কমিউনিষ্ট-চীন ও ভিয়েৎনাম, অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় প্রকাশ্যেই সৈন্য, অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্রের আমদানি করিতেছে। কমিশন তাহার প্রতিরোধ করিতে অনিচ্ছুক অথবা অসমর্থ। এক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র একাকী গণতান্ত্রিক পক্ষ হইয়া লড়িতেছে।

ইন্দোনেশিয়াতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই জাতীয়তাবাদী দল প্রবল হইয়া ওঠে। এই দলের নায়ক সুকর্ণকে ওলন্দাজসরকার কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত করে—কিন্তু জাপানীরা যখন ইন্দোনেশিয়া জয় করে তখন সুকর্ণও তাহার দল জাপানীদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং জাপানীরাও তাহাদের হাতে দেশশাসনের কতক ভার দেয়। ওলন্দাজেরা যখন যুদ্ধের পর ফিরিয়া আসিল তখন সুকর্ণ জাভা ও সুমাত্রার গণতন্ত্রশাসনের অধিনায়করূপে প্রতিষ্ঠিত। ওলন্দাজেরা বহুদিন যাবৎ ইহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে কিন্তু অবশেষে ১৯৪৯ খৃঃ শেষভাগে ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা স্বীকার করে।

মলয় উপদ্বীপে মালয় জাতি ছাড়া আরও বহু জাতির বাস—ইহাদের মধ্যে চীনা, ভারতীয় ও ইউরেশিয়ান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে চীনারাই সংখ্যায় বেশী। সমগ্র অধিবাসীর শতকরা ৪৪'৭ জন চীনা ও ৪৩'৫ জন মালয়। সমগ্র দেশটিও ১০।১২টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। এই জন্যই বৃটিশ এখানে তাহাদের অধিকার অনেকদিন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কারণ মলয়ের

অধিবাসীরা স্বাতন্ত্র্যের দাবী করিলেও সকলে মিলিত হইয়া কোন একটি শাসনতন্ত্র স্থায়ীভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে নাই। প্রথমে সিঙ্গাপুর বাদ দিয়া বাকী এগারটি রাজ্য লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র (Malay federation) গঠিত হয়। পরে ১৯৬৩ খৃঃ এই এগারটি রাজ্য এবং সিঙ্গাপুর ও বোর্ণিও দ্বীপে বৃটিশ অধিকৃত তিনটি রাজ্যের মধ্যে দুইটি সারাওয়াক ও সাবা (উত্তর বোর্ণিও) লইয়া "মলয়াসিয়া যুক্তরাষ্ট্র" গঠিত হইয়াছে। কিন্তু বৃটিশ অধিকৃত তৃতীয় প্রদেশ—ব্রুণেই ইহাতে যোগদান করিতে অস্বীকৃত হইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য এক মুক্তিফৌজ গঠন করিয়া বিদ্রোহ করে (১৯৬২)। বোর্ণিওর কতক অংশ ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্রশাসিত রাষ্ট্রের অধীন। ইহার নায়ক সুকর্ণ এই বিদ্রোহের সমর্থন ও সাহায্য করেন। পরে মলয়াসিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে তিনি প্রকাশ্যে ইহার প্রতিবাদ করেন এবং ইহাকে ধ্বংস করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। কারণ তাঁহার বিশ্বাস যে বৃটিশেরা মলয়ে তাহাদের আধিপত্য পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠা করার জন্যই মলয়াসিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে। সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ার সৈন্য মলয় উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে—এবং সুকর্ণ একজন কমিউনিষ্টকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং এরূপ সন্দেহ করা অযৌক্তিক নহে যে তিনিও চীনের সাহায্যে [illegible] বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইতে মনস্থ করিয়াছেন।

[illegible] এই পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থা কি তাহা [illegible]না করা যাউক। চীন যে পূর্ব-এশিয়ায় কমিউনিষ্ট আধিপত্য স্থাপনের অভিলাষী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রই ইহার প্রতিবন্ধক। ভারতের দুই প্রতিবেশী পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে পাকিস্থান। পাকিস্থান প্রকাশ্যে চীনের সহিত ভারতের বিরুদ্ধে যোগদান করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ যে চীনের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষণে বিশেষ আগ্রহান্বিত তাহাও বেশ বোঝা যায়। চীনদেশ ভারত আক্রমণ করিয়া যেরূপ অনায়াসে জয়লাভ করিয়াছে তাহাতে চীনের সামরিক ও রাজনীতিক মর্যাদা যথেষ্ট বাড়িয়াছে—এবং এশিয়ায় ভারতের প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। ভারতের সামরিক শক্তি যে কত দুর্বল ও অন্তঃসারশূন্য তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কোন রাজশক্তি চীনের বিরোধিতা করিয়া ভারতের সহিত মিত্রতা করিবে তাহার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারত স্বাধীন হইবার পরে পৃথিবীর মধ্যে এই বৃহত্তম গণতন্ত্র যে এশিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামে নায়কের পদ গ্রহণ করিবে অনেকে এরূপ আশা করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের গৌরব ও প্রতিপত্তি সমূলে ধ্বংস করিয়া চীন সকলের মন হইতে সে আশা দূরীভূত করিয়াছে। এ বিষয়ে চীনের ভারত অভিযান সম্পূর্ণরূপে সার্থক ও সফল হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই যে চীন কি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে—না ভারতে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা করিবে। এই দ্বিতীয় আশঙ্কা একেবারে অমূলক বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই। অন্ততঃ ইহার জন্য সর্বরকমে প্রস্তুত থাকা আবশ্যক। ভারতের চারিদিকে যদি সর্বত্রই কমিউনিষ্টচীনের প্রভাব ও প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে তবে চীনের পক্ষে যে পরিমাণ সুবিধা ভারতের পক্ষে সেই পরিমাণ অসুবিধা। সুতরাং সময় থাকিতে থাকিতেই ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা উচিত। এ বিষয়ে আমাদের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী যে খুব অবহিত ছিলেন তাহা মনে হয় না। কারণ লাওস্ ও ভিয়েৎনামে কমিউনিষ্ট দলের প্রতিপত্তি কমাইবার জন্য তিনি কোন চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানা নাই এবং ইউরোপীয় ও আমেরিকার রাজনীতিকেরা এজন্য তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছেন। পূর্বে বলিয়াছি ভারতবাসী চিরদিনই পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি উদাসীন থাকায় পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে দিয়া বহুবার তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। কেহ দেখিয়া শেখে—কেহ ঠেকিয়া শেখে। পুনঃ পুনঃ ঠেকিয়াও কি আমরা অতীত ইতিহাসের নিকট হইতে কিছুমাত্র শিক্ষালাভ করিব না?

ডিকসন লেনে এক বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ সেরে গ্যালিফ ষ্ট্রীটের ট্রামে একা একা ফিরে চলেছিল মিনতি, স্বামী নিরুপম সঙ্গে আসতে পারেনি, জরুরী কাজে আটকে পড়েছে। চার বছরের ছেলে সন্তু আসবার জন্য বায়না ধরেছিল, আনে নি। শাশুড়ীর কাছে রেখে এসেছে, আসবার সময় তার সে কি কান্না? কিন্তু কাঁদলে কি হবে— তরুণী বান্ধবীর বাড়িতে স্বামীর সঙ্গে আসা যায়, কিন্তু ছেলেকে আনতে কেমন যেন লজ্জা করে। তা ছাড়া বেলার এখনও ছেলেপুলে হয়নি, ওই বা কি ভাবত!

কিন্তু ফেরার সময় মিনতি ভাবছে অন্য কথা। আনলেই হোত, আনলেই হোত ছেলেটাকে। ওর সেই অভিমানে ফুলে-ওঠা সুন্দর তুলতুলে দুটি ঠোঁট বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে মিনতির। ওর সেই অবিরাম কান্না ভেসে আসছে কানে—আহা, নিজের রঙীণ জামাটি: ছোট জুতো নিজেই এগিয়ে এনেছিল, কত সাধ করেছিল, কত আশা করেছিল মায়ের সঙ্গে বেরুবে। মিনতি তাকে আনেনি, আনলেই পারত, অরুণ আর বেলা দুজনেই তো ছেলেপুলে খুব ভালবাসে, আনলে ওরা খুশিই হোত।

ট্রামে ওঠার আগে মোড়ের দোকান থেকে ছেলের জন্য এক বাক্স চকোলেট কিনে নিয়েছে মিনতি, চকোলেট ভারী ভালবাসে সন্তু, পেলে খুব খুসী হবে। বাড়ী গিয়েই চকোলেটগুলো ওর হাতে তুলে দিয়ে মিনতি চেয়ে চেয়ে দেখবে ওর খুসি-ভরা মুখ। মেঘ বৃষ্টির পরে সোনালী রোদের ঝিকিমিকি। কিন্তু হাতে কি আর দিতে দেবে এই ট্রাম কোম্পানী। কত আস্তে আস্তে গাড়ী চালাচ্ছে দেখ, যেন গরুর গাড়ী চলেছে। প্রত্যেক ষ্টপে দেরী করছে। কত আর লোক ওঠবে। অফিস ফেরৎ লোক; গাড়ী তো বোঝাই হয়ে গেছে। দাঁড়াবার জায়গা নেই মানুষের, বড় আহাম্মক এই কণ্ডাকটরটি।

যা হোক রাজাবাজারের এই ষ্টপটায় আর বেশী দাঁড়ায়নি গাড়িটা, একটু তাড়াতাড়িই ছেড়েছে, গাড়ীটার

এই স্বস্তিটুকু শেষ পর্যন্ত বজায় থাকলে মিনতি বাঁচে। তাড়াতাড়িই পৌঁছতে হবে ওকে, না হলে ছেলে আবার ঘুমিয়ে পড়বে, বেশি কান্নাকাটি করলে বেশী তাড়াতাড়ি ঘুমোয়।

"টিকিট"। একটু চমকে উঠে বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল মিনতি, কণ্ডাকটর এসে দাঁড়িয়েছে, শুধু দাঁড়িয়ে নেই —অপলক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কি অভদ্র!

মুখ ফিরিয়ে ছোট ব্যাগটি খুলে একখানি দু-আনি বের করল মিনতি, দিতে গিয়ে দেখে কণ্ডাকটর নেই, একবার টিকিট চেয়ে কণ্ডাকটর যদি চলে যায়, গিয়ে আশে-পাশের অন্য লোককে টিকিট দিতে থাকে তাহলে মানুষ বিরক্ত না হয়ে পারে! দু-আনিটি ব্যাগে না রেখে হাতে করে বসে রইল মিনতি। কণ্ডাকটর যখন চলে যাচ্ছিল পয়সা দেওয়ার জন্য হাতটা একটু এগিয়ে দিল। কিন্তু কণ্ডাকটর যেন তার কথা ভুলে গেছে। মিনতির দিকে সে তাকালও না। তাকে পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে গিয়ে টিকিট কাটতে লাগল। বড় অস্বস্তি বোধ করল মিনতি। কণ্ডাকটরের এই আচরণের মধ্যে কোথায় যেন এক ধরণের অবজ্ঞা আছে, আছে অসম্ভ্রম আর তাচ্ছিল্যের ভাব, 'তোমার ওই দুটি পয়সা ট্রাম কোম্পানীর না হলেও চলতে পারে।' কিন্তু ট্রাম কোম্পানির চলতে পারে, মিনতির চলবে না। টিকিট মিনতিকে নিতেই হবে। কারো অবজ্ঞা সহ্য করতে পারবে না। কণ্ডাকটর আসুক এদিকে, ওকে তখন ডেকে হুকুম করবে মিনতি, বলবে 'টিকিট দাও'।

কিন্তু কণ্ডাকটরের আসবার লক্ষণ নেই, ওর জন্য তো আর সারাক্ষণ ঘাড় ফিরিয়ে থাকা যায় না, তাই ফের সামনের দিকে তাকাল মিনতি। একটু বাদেই আড়চোখে চেয়ে দেখল কণ্ডাকটর আবার কাছাকাছি এসেছে আর বারবার তাকাচ্ছে তার দিকে। মিনতি আবার পয়সা দিতে গেল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাকটর উধাও। আবার সেই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে মিনতি, অমনি ও এসে কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে মিনতিকে চোখে সেই নিষ্পলক লুব্ধ দৃষ্টি।

একবার মনে মনে একটু হাসল মিনতি। এতক্ষণে সে বুঝতে পেরেছে ব্যাপারটা। অবজ্ঞা নয়, অমনোযোগ নয়, তার সম্বন্ধে অতি মনোযোগী হয়েছে শ্রীমান্ কণ্ডাকটর। তাই চলছে এই লুকোচুরির পালা। একবার টিকিট কেটে নিলে তো পালা ফুরিয়েই যায়, শেষ হয়ে যায় নাটক। বারবার এদিকে আসবার, এদিকে ঘোরাঘুরি করবার কোন অজুহাতই থাকে না। কিন্তু কণ্ডাকটরের তা ইচ্ছে নয়। ও চাইছে অজুহাতটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে, নাটকটাকে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে না ফেলতে, যবনিকা ফেলতে ওর মন চাইছে না।

অথচ কাণ্ড দেখ, লোকটির বয়স হয়েছে, যথেষ্টই বয়স হয়েছে, পঞ্চাশ তো বটেই, বেশীও হতে পারে চেহারায় যেন আরো বেশী বলেই মনে হয়। এতক্ষণ ওর বয়স আর চেহারার দিকে মিনতির নজর পড়েনি। কণ্ডাকটরের আবার বয়স কি, তার আবার চেহারা কি? মোটা খাকীর পোষাকে ঢাকা, কাঁধে ব্যাগ ঝোলানো, ওরা সবাই তো এক রকম দেখতে, সব বয়সে সব চেহারায় ওরা এক। অন্য সময় কে বা ওদের দিকে তাকায়, পয়সা দিতে টিকিট নিতে তাকাবার দরকার হয় না। কিন্তু আজ তাকিয়ে দেখল মিনতি, বয়স হয়েছে লোকটির। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চোয়ালজাগা বিশ্রী মুখ—গাল দুটি বসে গেছে, চোখ দুটির তো সবই গেছে। যায়নি শুধু মেয়েছেলের দিকে তাকাবার লোভ। আশ্চর্য্য পুরুষের এই লোভ বোধহয় মরলেও যায় না, যখন কোন মেয়ের দিকে তাকায়, তখন একবার নিজের কথা ভাবেনা। ভাবে না নিজের বয়স, নিজের চেহারা। নিজের সামনে তো আয়না থাকে না, নিজের চোখকে তাই দেখতে পায়না তারা। যদি পেত তাহলে অতি বড় কামুক লম্পটের চোখও বোধ হয় লজ্জা পেত।

অবশ্য ট্রামে, বাসে, রাস্তায় নানাবয়সী পুরুষের এই-ধরণের দৃষ্টি সহ্য করবার অভ্যাস মিনতির আছে। সুন্দরী বলে খ্যাতি আছে মিনতির, স্বাস্থ্যও ভাল, বোঝা যায়না তার চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, সিঁদুর না পরলে বোঝা যায় না বিয়ে হয়েছে, ছেলে হয়ে গেছে। কেবল স্বামী কেন তার বন্ধু-বান্ধবদের মুগ্ধদৃষ্টিও যে মিনতিকে খুসি করে না তা নয়। কিন্তু তাই বলে কি সকলের দৃষ্টিই সওয়া যায়, তার স্থান-কাল-পাত্র ভেদ নেই!

কিন্তু লোকটি বড়ই বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, টিকিট তো দিচ্ছেই না, কেবল আসছে আর যাচ্ছে। আর লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল তাকাচ্ছে তার দিকে, মাঝে মাঝে নিষ্পলক নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছে। মিনতিকে একটু নড়তে চড়তে উসখুস করতে দেখলেই ও সরে যাচ্ছে। যখনই একটা ষ্টপেজ আসছে ওর যেন আশঙ্কা হচ্ছে মিনতি এই বুঝি নেমে যায়। যাওয়ার জো থাকলে মিনতি নামতও। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য তাকে একেবারে ডিপো পর্য্যন্তই যেতে হবে। ডিপোর কাছেই তাদের বাসা। অবশ্য ট্রামটা বদলে নিতে পাবে, কিন্তু এই ভিড় ঠেলে উঠা-নামাও তো কম অসুবিধা নয়।

ট্রামে দ্বিতীয় কোন মেয়ে নেই, অফিস ফেরৎ কেরাণী-কুল কেউ বসে কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বা ঝুলতে ঝুলতে ঝিমোতে ঝিমোতে যাচ্ছে। আর কোন দিকে তাদের চোখ নেই। কোন ব্যাপারে কোন ঔৎসুক্য নেই। শ্রান্ত ক্লান্ত দেহটাকে এখন কোন রকমে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পারলেই যেন বাঁচে। মনে পড়ল স্বামীর কথা, নিরুপমও এদেরই একজন। সেও এমনি করে নিজেকে পৌঁছে দেয়।

সহযাত্রীদের উপর রাগ করতে পারল না মিনতি। ওদের কাছে নালিশও জানাতে পারল না। কি হবে নালিশ করে? নালিশ করবার কোন প্রত্যক্ষ কারণ তো নেই! কণ্ডাকটরের আচরণ আর তো কেউ বুঝতে পারছে না। মিনতিই কেবল টের পাচ্ছে, সত্যিই কতখানি অশোভন, কতখানি অসম্মানকর এই কণ্ডাকটরের ব্যবহার। অস্বস্তিতে মন ভরে উঠল, রাগে গা জ্বলে যেতে লাগল মিনতির।

ওমা, কাণ্ড দেখ, এরই মধ্যে একেবারে ডিপোর মধ্যে এসে পড়েছে! ট্রাম থেকে সবাই নেমে গেছে। নামেনি শুধু সে আর কণ্ডাকটর—একেবারে মুখোমুখি একেবারে সামনা সামনি, একেবারে একা, কিসের একটা ভয়ে গা শিরশির করে উঠল মিনতির। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ভীরুতাকে নিজেই ধমক দিল, দিনের বেলা রাস্তাভরা লোকজন তার ভয় কিসের কিন্তু কেবল নিজেকে ধমক দিলেই চলবে না। ধমক দিতে হবে ওই কণ্ডাকটরটাকেও শোধ নিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে।

মিনতি উঠে দাঁড়াল, একেবারে মুখোমুখি দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে মনের সমস্ত তেজ, সমস্ত জ্বালা, সমস্ত রুক্ষতা গলায় ঢেলে দিয়ে বলল, 'টিকিট দাও, টিকিট দিচ্ছ না কেন?' কণ্ডাকটর মুহূর্ত্তকাল তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, এবার তার কোন সংকোচ নেই, লজ্জা নেই, লুকো-চুরি নেই, তাকিয়ে থেকে একটু বাদে আস্তে আস্তে বলল—'টিকিট দরকার নেই, টিকিট আমি তোমার কাছ থেকে নেব না মা।'

মিনতি স্তম্ভিত হয়ে গেল, মা! কি বলছে লোকটি! একেবারেই মা? কিন্তু পরক্ষণেই মিনতির হাসি পেল, পুরুষেরা এমন ভীরু সুবিধেবাদী জাতই বটে। শক্ত মেয়ের কাছে ওরা এমনিই নরম হয়ে পড়ে। এক ধমকেই ওর মুখ থেকে কেমন মা বুলি বেরিয়েছে দেখ!

মিনতি বলল, 'কেন, টিকিট দেবে না কেন।' কণ্ডাকটর একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, "আমার মেয়েটি ঠিক অবিকল তোমার বয়সী, তোমার মতই দেখতে ছিল, আজ তেইশ দিন হোলো সে মারা গেছে।" কণ্ডাকটরের চোখ দুটি ছল ছল করে উঠল। খাকীর মোটা হাতায় চোখ মুছল কণ্ডাকটর।

ট্রাম এসে ডিপোতে থেমেছে, দুজনে নিঃশব্দে নেমে এল গাড়ী থেকে, মিনতি একটু থেমে দাঁড়াল। কণ্ডাকটর বলল 'আমার ডিউটি শেষ হয়ে গেছে।' ও আরো কি বলতে চায় বুঝতে পারল মিনতি, বলতে চায় তুমি যেয়ো না। তুমি একটুকাল দাঁড়াও তোমার মুখে আমার মরা মেয়ের মুখ আরও একবার দেখে নি। মিনতি দাঁড়াল বেশীক্ষণ ওকে অপেক্ষা করতে হোল না। তিন-চার মিনিটের মধ্যেই অফিসে চামড়ার ব্যাগটা রেখেই তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল কণ্ডাকটর।

এর মধ্যে মিনতির অনেক কথা মনে হয়েছে, সত্যি ওর তো বোঝা উচিত ছিল। চেহারা দেখে চেনা উচিৎ ছিল। এই শোকার্ত্ত পিতৃমূর্ত্তিকে সে চিনতে পারেনি রূঢ় ভাষায় অপমান করেছে ভেবে মনে মনে লজ্জিত হোল মিনতি। ভাবল ক্ষমা চেয়ে নেবে।

'তুমি এখনো দাঁড়িয়ে আছ মা।' কণ্ডাকটর এসে পাশে দাঁড়াল, ঠিক আনুষ্ঠানিক ভঙ্গীতে ক্ষমা চাইতে সংকোচ হোল মিনতির। বলল, 'আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কি হয়ে মারা গেল আপনার মেয়ে।'

দুজনে সামনের দিকে এগোতে লাগল, কণ্ডাকটর বলল, 'টাইফয়েড। কিন্তু তুমি আর আমাকে আপনি আপনি করো না মা—তুমিই বলো। সে-ও তুমিই বলতো। শেষ-বয়সের বড় আদরের মেয়ে ছিল কি না। ওই একটিই ছিল। একটু চোখের আড়াল করতে পারতাম না, মা, আড়াল করতে চাইতাম না। এখন কি করে থাকব, মা। এই বুড়ো কণ্ডাকটরের মা ডাক নিজের সেই কচি ছেলের মা বুলির মত বড় মধুর, বড় মমতায় ভরা মনে হোল মিনতির, মনে পড়ল নিজের ছেলের কথা। চোখের আড়াল করা, চোখের আড়ালে রাখা কঠিনই বটে। মাত্র অল্প সময়ের জন্য ছেড়ে কি ছটফটানিটা সে করছিল, সব মনে পড়ল মিনতির। একটা সরু গলির মুখে এসে কণ্ডাকটর বলল, 'তুমি কোন্ দিকে যাবে?' মিনতি বলল, 'আর একটু এগোতে হবে আমাকে, এই সামনের গলি, কণ্ডাকটর বলল, 'আমিও এই গলিতে থাকি যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা বলি, এই কাছেই আমার বাসা। আমি তো দেখলুম এবার ওর মাকে একটু দেখিয়ে নিতুম!

মিনতি থেমে দাঁড়াল, একটু যেন ইতস্তত: করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আচ্ছা চলুন', কণ্ডাকটর খুশি হয়ে বলল, 'আমার লক্ষ্মী, রূপে গুণে ঠিক আমার সেই লক্ষ্মীটি, কিন্তু চলুন নয় মা বল চল' সে-ও তাই বলত। কোথাও স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারত না বলত চল, চল, তোমার গলায় আমি তার গলা শুনতে পাচ্ছি মা।'

পুরনো একতলা বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট পাশাপাশি দুখানা ঘর, একখানার দরজা বন্ধ, আর একখানার খোলা। সেই খোলা দোরের সামনে দাঁড়িয়ে কণ্ডাকটর ডাকল, 'ওগো, দেখ এসে কি এনেছি, কাকে এনেছি'।

'কাকে এনেছ'? বলতে বলতে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একখানা শাড়ী পরণে হাতে দুগাছা মোটা মোটা শাঁখা, বেরিয়ে এল কণ্ডাকটরের স্ত্রী, আটপৌরে আধময়লা এক-হারা চেহারা, তবু যৌবনে সুন্দরী ছিল বোঝা যায়। টানা টানা বড় বড় নাক চোখ, মাজা ফর্সা রঙ।

কণ্ডাকটরের স্ত্রী একমুহূর্ত মিনতির দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল, তারপর হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল, 'ওরে আমার লক্ষ্মীরে! ওগো তুমি কি পাষাণ, তোমার মনে কি দয়ামায়া নেই। একে তুমি কেন আনলে এ জিনিষ তুমি কেন আমাকে কেন দেখালে। যাকে আর কোন কালে দেখতে পাব না তাকে ফের কেন দেখলুম। কণ্ডাকটর বোধহয় ঘটনার এই পরিণতি আশা করেনি, মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে আর ঘরে রইল না সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। স্ত্রীর দৃষ্টি, স্ত্রীর সেই করুণ কাতর তিরস্কার সহ্য করা আর বোধহয় তার পক্ষে সম্ভব নয়, এতদিন ধরে অনেক সয়েছে।

মিনতির চোখের সামনে থেকে খাকী পরা সেই কণ্ডাকটরের মূর্তিটি এতক্ষণ বাদে অদৃশ্য হয়ে গেল। মিনতিও চলে আসছিল। কিন্তু কণ্ডাকটরের স্ত্রী আসতে দিল না। এক হাতে চোখ মুছে, আর এক হাতে হাত ধরল মিনতির, বললে এলেই যদি ঘরে এসো, একটু বসে যাও।'

মিনতি ঘরে ঢুকল, আসবাবপত্রবিরল দরিদ্রের সংসার দেয়াল থেকে চুণবালি ঝরে পড়ছে, একটি পাটি ছিল এককোণে খাড়া করা কণ্ডাকটরের স্ত্রী সেটি এনে পেতে দিয়ে বলল, 'বোসো, পাটিতে শুতে সে বড় ভালবাসত।

বসল মিনতি বসে বসে অনেক কথাই শুনতে হল। কণ্ডাকটরের মেয়ের গুণ বুদ্ধির কথা, মা-বাপের উপর তার ভক্তি শ্রদ্ধার মায়া মমতার কথা, শেষে উঠল অসুখের প্রসঙ্গ ভুগে ভুগে কি করে মারা গেল। ওষুধ খেতে চাইত না। চাইত কেবল কুপথ্য করতে, বলত, একবার উঠতে পারলে হয়। আমি তোমাদের কোন মানা শুনব না সব খাব, সব দেখব, সব জায়গায় যাব সব সাধ মিটাব। অভাগী সব সাধই মিটিয়েছে। ফের চোখের জল মুছল কণ্ডাকটরের স্ত্রী।

কার সঙ্গে কথা বলছ দিদা, চার পাঁচ বছরের ফর্সাপানা সুন্দরী একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল, যেন স্প্রিং-দেওয়া পুতুলটির হঠাৎ স্প্রিং কেটে গেছে। কণ্ডাকটরের স্ত্রী বলল—টুনি, এদিকে আয় কিন্তু টুনি মোটেই সেদিকে গেল না। ঝাপিয়ে পড়ল মিনতির কোলে, বলল, 'তবে নাকি তুমি মরে গেছ, তবে নাকি তুমি নেই! এই তো তুমি আমাকে ছেড়ে কোথায় লুকিয়ে ছিলে, এতদিন কোথায় ছিলে!'

মিনতি ছল ছল চোখে নিঃশব্দে ওর পিঠে হাত বুলোতে লাগল তারপর এক সময় চকোলেটের পুরো বাক্সটা ওর হাতে তুলে দিলো, ওর হাতে খুলে দিল; চকোলেট ছাড়া টুনিকে তার দেওয়ার আর কি-ই-বা আছে।

টুনি তখন চকোলেট পেয়ে খুব খুসি। খুব অন্যমনস্ক মিনতি এক ফাঁকে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, সঙ্গে সঙ্গে টুনির চোখ পড়ল তার দিকে। বলল, 'ওকি পালাচ্ছ যে, বাবা দেখবে না বুঝি! বাবা তো এক্ষুণি এসে পড়বে। দিদা, দেখ আবার পালাচ্ছে,বাবার সঙ্গে দেখা না করেই পালাচ্ছে।'

মিনতির মুখ হঠাৎ আরক্ত হয়ে উঠল, দিদার উপর চৌকিদারীর ভার দিয়ে মিনতি আবার চকোলেটের বাক্সে মন দিয়েছে। ঘর থেকে দুজনেই বেরিয়ে এল সরু বারান্দায়। টুনির দিদা বলল জামাই পাশের ঘরেই থাকে। মেয়েকে যাতে চোখের আড়াল না করতে হয় সে জন্য কাছেই রেখেছিলাম, দেখবে ওদের ঘরটা।'

মিনতি ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না, না, আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে। আমি এবার যাই।'

টুনির দিদা বলল, একটু দেখেই যাওনা।'

মিনতি বলল, 'চলুন।'

ভেজানো দরজা একটু হাত দিয়ে ঠেলে দিল টুনির দিদা। মিনতি ঘরে ঢুকল না। আগের ঘরের সঙ্গে এ-ঘরের তেমন কিছু তফাৎ নেই, মেঝেতে গুটানো ছোট্ট বিছানা, আর শিয়রের কাছে দেয়ালে ঝোলানো একটি বেহালা।

তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল, বলল, 'এবার আমি যাই।' টুনির দিদা বলল, আর একটু বসবে না, আর একটু দেরী করে যাবে না। এই অনুরোধের মধ্যে লজ্জার আভাসটুকু একেবারে গোপন রইল না। সে লজ্জা মিনতির সমস্ত মনে ছড়িয়ে পড়ল।

মিনতি অস্ফুট স্বরে বলল, 'না'। সদর দরজার দিকে এগুতে এগুতে টুনির দিদা বলতে লাগল। একেবারে কার্ত্তিকের মত চেহারা, কে বলবে বামুন কায়েতের ঘরের ছেলে নয় অনেক খুঁজে-পেতে জোড় মিলিয়ে ছিলুম। একটু নিঃশ্বাস ফেলে টুনির দিদা ফের বলল, 'এক্ষুণি এসে পড়বে, বেশিক্ষণ বাইরে থাকেনা কাজ হয়ে গেলে চলে আসে—ঘরে বসে বসে বাজায়।'

মিনতি জিজ্ঞেস করল, 'কি কাজ করে।' টুনির দিদা বলল, 'ওই একই কাজ, ট্রাম কোম্পানীর কণ্ডাকটারি। উনিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন,শ্যামবাজার লাইনে আছে এখন। ডিউটি শেষ হয়ে গেছে। এবার এল বলে।' মিনতি বলল, 'কণ্ডাকটর। সেও কণ্ডাকটর।'

টুনির দিদা আবার বলল, 'হ্যা, উনিই দিয়েছেন ঠিক করে। মিনতি আর দাঁড়াল না। গলিতে নেমে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। পাছে দেখা হয়ে যায়। কিন্তু দেখা তো যে কোন দিন হতে পারে, শ্যামবাজার লাইনে তো কম যাতায়াত করেনা মিনতি। যে কোন দিন খাকী পরা অথচ সুন্দরপানা একটি যুবক কণ্ডাকটর তার কাছে এগিয়ে টিকিট কাটতে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে পারে। তারপর টিকিট না কেটে সেও সরে যাবে। আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখবে, কাছে আসতে চাইবে। তবু আসতে পারবে না।

মিনতি সব টের পাবে। সব জানবে, সব বুঝবে, তবু কিছু বলতে পারবে না।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

প্রসিত রায়চৌধুরী

রামেন্দ্রসুন্দর তব কি সুস্মিত হাসি,
সে হাসিতে জেগেছিল দীনা বঙ্গবাণী,
জীর্ণ যত বঙ্গপুঁথী হ'য়েছিল জানি
হাতের ছোঁয়ায় তব কুসুমের রাশি।

সুন্দর হৃদয় তব রামেন্দ্রসুন্দর,
গরিমার লেশ হীন আনত শ্রদ্ধায়
স্বাক্ষর রয়েছে তার গ্রন্থ "জিজ্ঞাসায়,"
বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞান-নির্ঝর।
সে সুন্দর হাসি আর সুন্দর হৃদয়

উৎসবে গেয়েছিল রবীন্দ্রের জয়
পঞ্চাশৎ জন্মবর্ষে স্মরি জন্মতিথি।
রবীন্দ্রের প্রীতিধন্য রামেন্দ্রসুন্দর
বাঙালীর "সংস্কৃতি" জেনেছিল সার,
বাঙালীর চিত্তলোকে অতিথি আবার।

কুমুদরঞ্জন সম্বর্দ্ধনা—

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের বিগত বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হইয়াছিল যে প্রবীণ সাহিত্যিকগণকে একে একে সম্মানিত সদস্যরূপে গ্রহণ করা হইবে এবং সম্মিলন কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের গৃহে যাইয়া তাঁহাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিবেন। ঐ নির্দ্দেশ মত গত ১৩ই সেপ্টেম্বর রবিবার সম্মিলনের কার্য্যকরী সভাপতি শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, সহ-সভাপতি শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ নিয়োগী, সদস্য শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায় বর্দ্ধমান হইয়া ২৫ মাইল দূরে কাটোয়া মহকুমার নূতন হাটের নিকট কোগ্রামে যাইয়া কবিবর শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিককে সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন শ্রীসিদ্ধানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরানন্দ চট্টোপাধ্যায়। বেলা ১১টায় জিপ-যোগে পৌঁছিয়া তাঁহারা কুনুর নামক ছোট নদী পার হইলে কবি পুত্রদ্বয়, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীপৃথ্বীলাল মল্লিক ও অধ্যাপক শ্রীকৌশাম্বীনাথ মল্লিক নদীর ঘাটে সকলকে অভ্যর্থনা করেন। কবিবর সারা জীবন কুনুর ও অজয় নদের সঙ্গম স্থলে নিজ গৃহে বাস করেন। ৩২ বৎসর নিকটস্থ মাথরুণ উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করার পর প্রায় ২০ বৎসর তিনি অবসর জীবনযাপন করিতেছেন। কবিগৃহে পৌঁছিয়া কবিকে মাল্য, অভিনন্দন পত্র, নামাবলী ও যষ্টি দ্বারা অভিনন্দিত করিয়া সকলে প্রণাম করেন। কোগ্রাম চৈতন্য-মঙ্গল প্রণেতা সাধককবি লোচন দাসের পাট। সকলে সে পাট, স্থানীয় মঙ্গলচণ্ডী মন্দির ও কবি কুমুদরঞ্জন প্রতিষ্ঠিত নীল-লোহিত শিবমন্দির দর্শন করেন। ৫।৬ ঘণ্টা কবিগৃহে থাকিয়া সকলে কবির আতিথ্য, স্নেহ শ্রীতিলাভের পর ৫ টায় যাত্রা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—

খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও আইনবিদ্ ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত গত ১৯শে সেপ্টেম্বর বিকালে তাঁহার বালীগঞ্জের বাটীতে ৮১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগদান করিয়া তিনি ১৯০৭ সালেই কংগ্রেসে বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কর্মী বলিয়া পরিচিত হন। তিনি আইনজীবী হিসাবে যৌবনেই প্রভূত খ্যাতিলাভ করেন। তিনি আজীবন সাহিত্যসেবী ছিলেন এবং 'ভারতবর্ষে' তাঁহার লিখিত বহু উপন্যাস প্রকাশিত হইয়াছিল। তাঁহার ২ পুত্র ও ৫ কন্যা বর্ত্তমান। ঢাকায় ও কলিকাতায় আইনের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট আইনজীবী হিসাবে সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় হইয়া ছিলেন। আমরা তাঁহার মৃত্যুতে স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি ও তাঁহার শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতায় নূতন প্রধান মন্ত্রী—

ভারতরাষ্ট্রের নূতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী গত ২০শে সেপ্টেম্বর এক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনের মানপত্র গ্রহণ করেন ও গড়েরমাঠে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহার পত্নী ললিতা দেবী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন এবং শ্রীমতী ললিতা কালীঘাটে কালীমন্দিরে যাইয়া কালীমাতাকে পূজা করিয়া আসিয়া ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, প্রদেশ কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ সারা দিন শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত থাকিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার উপযুক্ত সম্মানের ব্যবস্থা করেন। সে দিন আরও কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কলিকাতায় ছিলেন এবং প্রধান-মন্ত্রীর সকল কাজে সাহায্য করিয়া ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ আজ নানা সমস্যায় জর্জ্জরিত—শ্রীশাস্ত্রীর আগমন ও

ভারতরাষ্ট্রের সপ্তদশ স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষ্যে অবিরাম ধারাবর্ষণকে উপেক্ষা করে দিল্লীর ঐতিহাসিক লাল কেল্লার ময়দানে সমবেত বিরাট জনতার উ:দ্দশ্যে ভাষণদানরত প্রধান মন্ত্রী শ্রীলাল্‌বাহাদুর শাস্ত্রীকে দেখা যাইতেছে।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ দিল্লীর রবীন্দ্র ভবনে "Jawaharlal Nehru's Vision and our Goal" নামক প্রদর্শনীটি দেখছেন। রাষ্ট্রপতির সহিত তথ্য ও বেতার দপ্তরের মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও উপমন্ত্রী শ্রীপি, আর, পট্টভি রমণকেও দেখা যাইতেছে।

কলিকাতা দর্শনের ফলে কোন কোন সমস্যার সমাধান হইলে তাঁহার পশ্চিমবঙ্গে আগমন সার্থক হইবে।

মায়ারাণী ঘোষ—

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্য, রবিবাসরের সদস্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভার সদস্য, কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের ট্রষ্টী ব্যারিষ্টার শ্রীনন্দ-

মায়ারাণী ঘোষ
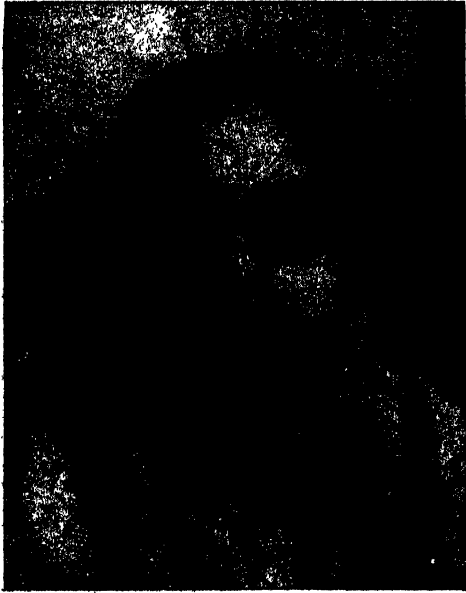
কিশোর ঘোষের পত্নী মায়ারাণী ঘোষ গত ২রা সেপ্টেম্বর মাত্র ৫২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তাঁহার এক মাত্র পুত্র শ্রীঅজয় কুমার ঘোষও ব্যারিষ্টার। মায়ারাণী মেদিনীপুরের খ্যাতিমান্ ৺মন্মথনাথ বসুর একমাত্র কন্যা ছিলেন। তিনি সমাজসেবিকা হিসাবে ও তাঁহার বাসস্থান ১২৭এ শরৎবসু রোড অঞ্চলে তিনি সর্ব্বজন পরিচিতা ছিলেন।

অনাগরিক ধর্ম্মপাল—

গত ১৭ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ নেতা ও ভিক্ষু অনাগরিক ধর্ম্মপাল মহাশয়ের জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনিও স্বামী বিবেকানন্দের মত ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো ধর্ম্মসম্মিলনে যোগদান করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে কলিকাতা ও ভারতের নানাস্থানে যে সব নূতন বৌদ্ধমন্দিরাদি নির্মিত হইয়াছে, ধর্ম্মপাল মহাশয়ের চেষ্টা তাহাদের সাফল্য দান করিয়াছে। তিনি কলিকাতায় নূতনভাবে বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরাও এই শতবার্ষিক অনুষ্ঠানে তাঁহার দানের কথা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করি ও তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই।

মনোরঞ্জন গুপ্ত—

খ্যাতিমান লেখক ও সাহিত্যিক মনোরঞ্জন গুপ্ত ৮ই সেপ্টেম্বর সহসা কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৬২বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। ১৯০২ সালে তাঁর জন্ম, ১৯২২ সালে বি-এস সি পাশ করিয়া ২ বৎসর টাটার কারখানায় কাজ করার পর ১৯২৪ সাল হইতে তিনি বেঙ্গল কেমিকেল কারখানায় রাসায়নিকের কাজ করেন। তিনি 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকার লেখক ছিলেন এবং প্রমথনাথ বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বহু বৈজ্ঞানিকের জীবনী লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রামপ্রাণ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র আনন্দপ্রাণ গুপ্ত পিতার মৃত্যুর সময় রাশিয়ায় ছিলেন—১০ই সেপ্টেম্বর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। আমরা তাঁহার বিধবা পত্নী, একমাত্র পুত্র, দুই কন্যা, দুই জামাতা প্রভৃতিকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—

গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলিকাতায় খ্যাতনামা দার্শনিক ও অধ্যাপক আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের জন্মশতবার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করার পর মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি বিরাট পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করা কঠিন। তিনি অধ্যাপক হিসাবে ও দর্শন সম্বন্ধে বহু গ্রন্থের লেখক হিসাবে বিদগ্ধ সমাজে চিরকাল সমাদৃত ও পূজিত হইবেন। আমরা তাঁহার জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা প্রণাম জানাই এবং প্রার্থনা করি, বাংলাদেশে তাঁহার মত বহু মনীষার আবির্ভাব হইয়া বাংলা দেশকে সমৃদ্ধ করুক।

প্রতিরক্ষা দপ্তরের জন-সংযোগ কমিটির একটি অধিবেশনে তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।
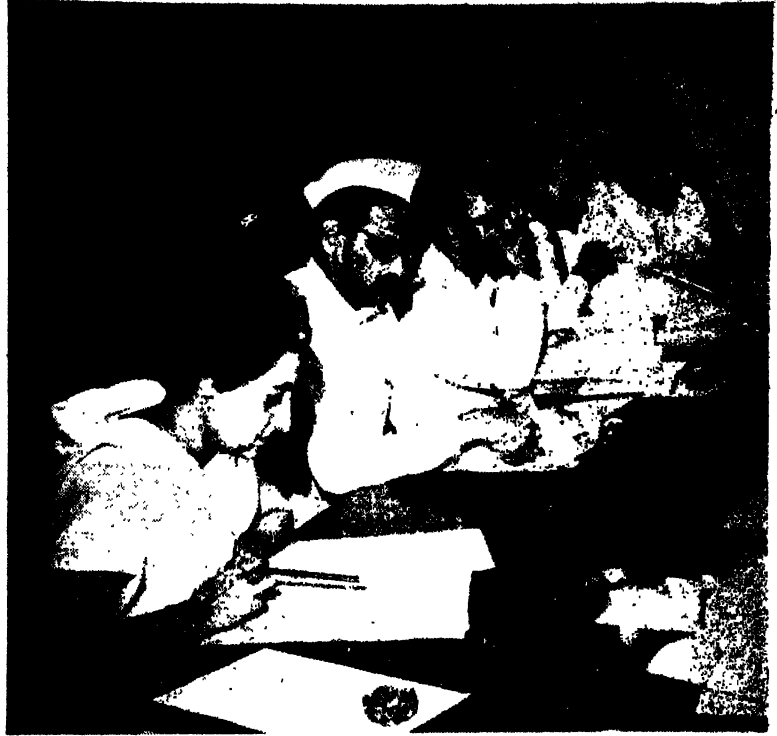
মস্কো গমনের প্রাকালে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণকে নতুন দিল্লীর পালাম বিমান বন্দরে বিদায় জানাচ্ছেন উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন, প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগণ এবং কূটনৈতিক দপ্তরের সভ্যগণ।

লোকনাথ বল—

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঘটনার অন্যতম নেতা, কলিকাতা কর্পোরেশনের ১নং ডেপুটী কমিশনার লোকনাথ বল গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যার পর সহসা ৫৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন জানিয়া আমরা মর্ম্মাহত হইলাম। তিনি সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত অফিসে কাজ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পথে মোটরগাড়ীতেই অসুস্থ হন এবং মেডিকেল কলেজে নীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সেদিনও আমরা কলিকাতা মিউনিসিপাল মিউজিয়াম হলে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্বন্ধে তাঁহার সুদীর্ঘ ও প্রাণবন্ত ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। তাঁহার পত্নী শ্রীমতী প্রতিমা বল প্রসিদ্ধ সমাজসেবী—তাঁহাদের একটি ১৪ বৎসরের মেয়ে ও একটি ৮ বৎসরের ছেলে। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীবীরেন মিত্র—

উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবীরেন মিত্র পদত্যাগ করায় তাঁহার স্থানে নূতন নেতা নির্ব্বাচনের জন্য গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ভুবনেশ্বরে উড়িষ্যার কংগ্রেসদলের সদস্যদের এক সভা হইয়াছিল। কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ কংগ্রেসসভাপতি ও কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রীর নির্দ্দেশে ঐ সভা পরিচালনা করিতে গিয়াছিলেন। আইনসভায় ৮৬ জন সদস্যের মধ্যে ৮৩ জন ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৭৫ জন সদস্যের ভোটে শ্রীবীরেন মিত্র পুনরায় কংগ্রেসদলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন। মাত্র ৭ জন সদস্য তাঁহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলেন ও ১ জন সদস্য শ্রীবনমালী পট্টনায়ক নিরপেক্ষ ছিলেন। শ্রীমিত্রের নির্ব্বাচনে উড়িষ্যার সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ—

ভারতের কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীসি-সুব্রহ্মণ্যম্ গত ২৭শে আগষ্ট এক প্রবন্ধে ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদের ইতিহাস ও কার্য্যাবলীর কথা প্রকাশ করিয়াছেন। ৩৫ বৎসর পূর্বে ১৯২৯ সালে এই পরিষদের জন্ম হয় এবং এত দিন ধরিয়া ঐ পরিষদ কৃষি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ভারতে কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছে। আজও ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল—কিন্তু ভারতে অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধে যত ব্যাপক চেষ্টা ও গবেষণা হইয়াছে, কৃষি সম্বন্ধে তাহা করা হয় নাই। পাট চাষ করিয়া আমরা ভারতের বাহির হইতে সব চেয়ে বেশী বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করিয়া থাকি—সে জন্য পাট চাষের গবেষণা বেশী হইয়াছে। কিন্তু আটা, চাল প্রভৃতি শস্য ও দুগ্ধ আমদানীর জন্য আমাদের কম টাকা ব্যয় হয় না। চেষ্টা করিলে সে টাকা বিদেশে না পাঠাইয়া আমরা দেশে রাখিতে পারি। কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী সে বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে কি ব্যাপক চেষ্টা হইবে?

কেন্দ্রে অনাস্থা প্রস্তাব—

দিল্লীর লোকসভায় একদল বিরোধী সদস্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করায় ৬ দিন ধরিয়া তাহার আলোচনার পর গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ঐ প্রস্তাব ভোটে-অগ্রাহ্য হইয়াছে। ৬ দিন বহু বিরোধী সদস্য সরকারী কার্য্যের সমালোচনা ও নিন্দা করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সরকার পক্ষের সদস্যগণও তাহার উত্তর দিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী সর্ব্বশেষে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের নেহরু নীতিতে অটল বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করেন এবং বিশ্ব শান্তি, নিরপেক্ষতা ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ সম্বন্ধে সরকারের কর্ম্ম পদ্ধতি ঘোষণা করেন। অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ৫০ জন ও বিপক্ষে ৩০৭ জন সদস্য ভোট দেন এবং ১৩ জন সদস্য কোন পক্ষে ভোট দেন নাই। ভোটের সংখ্যা হইতে বুঝা যায়—ভারত এখনও নেহরুনীতিই পূর্ণভাবে সমর্থন করেন এবং শ্রীশাস্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভার প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ আস্থা আছে।

অন্নদাপ্রসাদ চৌধুরী—

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী, আজীবন কংগ্রেস-সেবক ও সমাজ কল্যাণ কার্য্যে নিযুক্ত নেতা অন্নদা প্রসাদ চৌধুরী গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ৬৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন, তাঁহার বিধবা পত্নী বর্ত্তমান। তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং এম-এসসিতে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া ছিলেন। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের মুখ্যমন্ত্রীত্বে যে মন্ত্রিসভা গঠিত

হয়, তিনি তাহার সদস্য ছিলেন এবং গত ১১ বৎসর নানা গঠনমূলক কাজের সহিত নিজেকে যুক্ত রাখিয়া ছিলেন। তিনি নানা গুণের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।
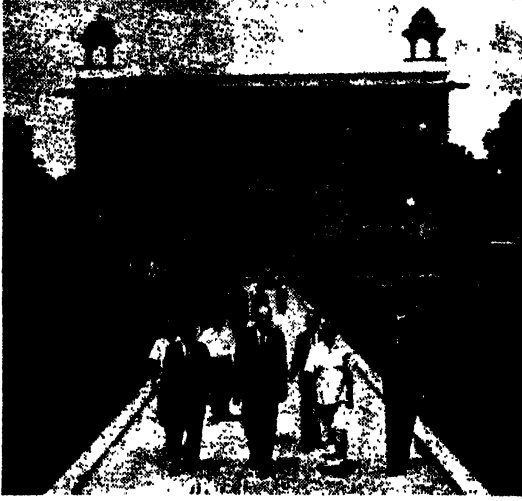
নেদারল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মাননীয় ডঃ জে, এম, এ, এইচ লুনস্ কিছুদিন আগে নূতন দিল্লীতে আগমন করেছিলেন। ঐতিহাসিক লাল কেল্লা দর্শনের সময় ডঃ লুনস্ ও তাঁর দলবলের এই চিত্র গৃহীত হয়।

দিল্লীতে হেম সান্যালকে হত্যা—

কেন্দ্রীয় সরকারের সলিসিটার জেনারেল, কলিকাতার খ্যাতিমান্ আইনজীবী হেম সান্যাল মহাশয় গত ৯ই সেপ্টেম্বর রাত্রিতে তাঁহার দিল্লী ২২ আকবর রোডের বাসাবাড়ীতে নিজ শয়ন ঘরে দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নিহত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর—তাঁহার পত্নী ও ২ কন্যা বর্ত্তমান। বাড়ীতে তিনি একাই ছিলেন। কলিকাতা সমাজে সান্যাল মহাশয় শুধু প্রসিদ্ধ আইনজীবী বলিয়া পরিচিত ছিলেন না, সামাজিক লোক হিসাবেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার গৃহের পাচক, ভৃত্য প্রভৃতিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। হত্যার কারণ অজ্ঞাত. সে বিষয়ে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলার একজন খ্যাতনামা মনীষীর অভাব হইল।

রামেন্দ্রসুন্দর জন্ম শতবার্ষিক—

গত ২৩শে আগষ্ট বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান সাহিত্যিক, অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী আচার্য্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর জন্মশত বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্য পরিষদের সভাপতি আচার্য্য শ্রীসুনীতিকুমার চটোপাধ্যায় সভায় পৌরোহিত্য করেন এবং মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন সভার উদ্বোধন করেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী চঞ্চলা দেবী এক শত প্রদীপ জ্বালিয়া সভার কার্য্যারম্ভ করেন। সভায় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ ঘোষণা করেন যে আচার্য্যের কতকগুলি অপ্রকাশিত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ লইয়া পরিষদ এক স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন। সাহিত্য সাধক চরিত-মালায় প্রকাশিত আচার্য্য ত্রিবেদীর জীবনীও এই সময়ে পুনঃপ্রকাশিত হইয়া সুলভে প্রচারের ব্যবস্থা হওয়া উচিত। ত্রিবেদী মহাশয়ের দানে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ আমরা যেন সে কথা কোন সময়ে বিস্মৃত না হই। বাংলার সকল সমাজের পাঠকগণের মধ্যে ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা প্রচার করিলে তাহা জানিয়া বর্ত্তমান যুগের মানুষ উপকৃত হইবে।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য্য সম্বর্দ্ধনা—

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় খড়দহ গ্রামে মিউনিসিপাল কমিশনার শ্রীসত্যঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে ব্যারাকপুর মহকুমা সমিতির উদ্যোগে এক সভায় ভাটপাড়া-নিবাসী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতা মিউনিসিপাল গেজেটের স্থায়ী সম্পাদক নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন এবং নৈহাটির শ্রীঅতুল্যচরণ দে পুরাণরত্ন, ব্যারাকপুরের শ্রীশচীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, কুলীনপাড়ার শ্রীকরবীবরণ মুখোপাধ্যায়, ভাটপাড়ার শ্রীভোলানাথ ভট্টাচার্য্য, বন্দীপুরের শ্রীশরদিন্দু নারায়ণ ঘোষ, নাটাগড় পানশীলার শ্রীঅশোক-কুমার চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের জীবন ও গুণাবলী বর্ণনা করিয়া বক্তৃতা করেন। গৃহস্বামী সত্যঞ্জয়বাবুও সময়োচিত ভাষণ দেন ও সকলকে আদর যত্নে তুষ্ট করেন।

কুমারী ছন্দা আচার্য্য—

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগের সংকারী অধিকর্তা ৩২।৭ বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী ডাক্তার রমেশ আচার্য্যের কন্যা কুমারী ছন্দা আচার্য্য এ বৎসর কলা ভারতীর বাৎসরিক প্রতিযোগিতায় ফোক নৃত্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে এবং কিশোর কল্যাণ পরিষদ হইতে লোকনৃত্যে অভিজ্ঞান-পত্র লাভ করিয়াছে। আমরা কুমারী ছন্দার জীবনে অধিকতর সাফল্য কামনা করি।

ব্যারাকপুর মণিরামপুরে ভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমে নূতন সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধনে উপস্থিত—দক্ষিণ হইতে—পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি।

ডঃ শ্রী পঞ্চানন ঘোষাল

তখনও আমি পুলিশের ডিপুটি কমিশনর-এর পদে উন্নীত হই নি। সহনগরপালরূপে দক্ষিণ শহর-তলি বিভাগে বহাল আছি। বেলগাছিয়া পশুচিকিৎসালয় হতে ফিরে সবেমাত্র কালীঘাট ফাঁড়ি সংলগ্ন আমার নিজস্ব অফিসে এসে বসেছি, এমন সময় অফিসের মুন্সীবাবু একটি জরুরী ফাইল আমার সামনে মেলে ধরলেন। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আজই এই ফাইল আমার মন্তব্য সহ ফিরে পেতে চান। দুই জন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী—রাজ্যপালের নিকট আবেদন করেছে। তাদের বক্তব্য যে "তারা যৌবনের শেষ সীমায় এসে পৌচেছে। এক্ষণে তারা বিবাহ করে সদ্ভাবে জীবনযাপন করতে ইচ্ছুক। এইজন্য তাদের বাকী মেয়াদ রদ করে এখুনি মুক্তি না দিলে তাদের জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।" আমি আড় চোখে চেয়ে দেখলাম—ভবানীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার অমুক বাবু দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করেছেন। আমি এই ফাইলের কয়টি পাতা উল্টানো মাত্র আমার দশবৎসর পূর্ব্বেকার একটি করুণ ঘটনা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ। দশ বা বারো বৎসর পূর্ব্বে আমার বাল্যসুহৃদ ভবানীপুর থানার তৎকালীন অফিসার-ইনচার্জের সাথে সাথে এই মামলাটি আমিও তদারক করেছিলাম তো বটে! আদিম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে এই ফাইলের শেষ পাতায় আমি এইদিন মন্তব্য লিখেছিলাম—'না না। আমি ভবানীপুর থানার অফিসারের সঙ্গে এক মত হতে পারছি না। এরূপ এক নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের হোতাদের মেয়াদ রদ করে এতো শীঘ্র তাদের মুক্তি দেওয়া কোনও ক্রমেই উচিৎ হবে না।'

আমার এমন স্বভাব যে কোনও এক স্থির সিদ্ধান্তে আসতে আমার কখনও এক মিনিটও দেরী হয় নি। একটু আগে পশুহাসপাতালেতেও এমনি একটি হুকুম এমনিভাবে আমি দিয়ে এসেছি। কয় বৎসর যাবৎ আমার একটি অতি-প্রিয় টেরিয়ার ডগ ছিল। বহুরাত্রে বাড়ী ফিরলেও সে জেগে থেকে আমার গাড়ীর আওয়াজের জন্য অপেক্ষা করতো। রাত্রি দুটা পর্য্যন্ত আমার অপেক্ষায় জেগে বাড়ীর পরিজনগণ ঘুমিয়ে পড়লে দরজা খোলার জন্য হাঁক-ডাক করে সেই তাদের জাগিয়ে দিয়েছে। এই কুকুরটিকে কয়দিন আগে আমি হাসপাতালে দিয়ে এসেছিলাম। এই দিন অতি প্রত্যুষে আমি টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে ঐ হাসপাতালে যাই। চিকিৎসা-কারী চিকিৎসক আমাকে হতাশ করে জানিয়ে দেয়—আপনার এই কুকুরকে বাঁচানো যাবে না। এদিকে যন্ত্রণায়ও বড্ড কষ্ট পাচ্ছে, তাই কয়েক

সেকেণ্ড মাত্র ভেবে তাঁকে আমি উত্তর করেছিলাম—'দেন্ কিল্ হিম। ইন্‌জেকশন দিয়ে মারুন। আমার আশে পাশে আরও তিনজন বহিরাগত মানুষ আমার আদেশ শুনতে পেলো। এদের মধ্যে হাসপাতালে অবস্থিত তাঁর প্রিয় পাপির জন্য উদ্বিগ্না একটি কুকুর-বিলাসী মহিলা অতর্কিতে বলে উঠেছিল—'ওঃ কি নিষ্ঠুর! আমার ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ছিলেন নাভানা প্রেসের প্রোপ্রাইটর অমুকবাবু। তিনি অবাক হয়ে আমাকে উদ্দেশ করে বলে উঠেছিলেন, আপনার খুব ক্লিয়ার কাট অর্ডার তো। অন্ দি স্পট এমন ডিসিসন্ নেওয়া আমি কল্পনা করতে পারি না। আমি কিন্তু আমার অন্তরের নিভৃত প্রদেশে এই সময় অনুভব করেছিলাম—একটি মমতাহীন চাপা নিষ্ঠুরতা। এইরূপ এক নিষ্ঠুর মনোবৃত্তির পরে আমি এইদিন সকালে নিজের অফিসে ফিরেছি। তাই এত শীঘ্র এমন একটা মন্তব্য লিখতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি।

এই সময় আমার মনে পড়ে যায় যে বারো বৎসর পূর্ব্বে এমনি পশুপক্ষীর মতই বিনাদোষে দুজন নিরীহ অসহায়া আত্মীয়া-স্থানীয়া নারীকে অতীব নিষ্ঠুরতার সহিত হত্যা করতে এরা ইতস্ততঃ করে নি। অফিসের সুযোগ্য মুন্সীবাবু নির্লিপ্তভাবে এই জরুরী ফাইল নিয়ে চলে গেল, এতক্ষণে ডেস্‌প্যাচ্ রুমে চলে গেল। এই ভুলে যাওয়া ঘটনাটি আমার চোখের সামনে তাজা ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

আমি এই সময় কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দাবিভাগে মার্ডার এক্সপার্টরূপে বহাল আছি। গোয়েন্দাবিভাগের তৎকালীন ডিপুটি পুলিশ কমিশনার শ্রীহীরেন্দ্র সরকার আই, পি, মহোদয়ের নিকট হতে একটা স্লিপ পেলুম। তাতে ব্লু পেনসিলের আঁচড়ে লেখা ছিল—'ডবল মার্ডার ইন্ ভওয়ানীপুর। গো! এসিষ্ট লোক্যাল পুলিশ। দে নিড্ ইওর হেল্প।' স্থানীয় পুলিশ এবিষয়ে আমার সাহায্য প্রার্থী। আমিও তাদের সাহায্য করার জন্য উৎসুক। আমি দ্রুতগতিতে প্রথমে ভবানীপুর থানায় উপস্থিত হয়ে প্রাথমিক সংবাদ বইতে এই খুন সম্পর্কে প্রদত্ত প্রাথমিক সংবাদটি পড়ে নিলাম। এই প্রাথমিক সংবাদের সারমর্ম্মের কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দিলাম:—

আমার নাম শ্রী অমুক—পিতার নাম অমুক। আমি এই ষ্ট্রীটের এতো নম্বর বাড়ীতে বাস করি। বর্ত্তমানে আমি বেকার জীবনযাপন করছি। বেশীদূর লেখাপড়া না শেখায় চাকুরী পাই নি। আমার অতিবৃদ্ধা দিদিমাতা এবং ত্রিশ বা তদূর্দ্ধ বৎসর বয়স্কা মামীমা অমুক ষ্ট্রীটের অতো নম্বরের নিজস্ব বাড়ীতে থাকেন। আমার অপুত্রক মামাবাবু বিদেশে চাকুরী করেন ও এক্ষণে তিনি বিদেশে কর্ম্মস্থলে আছেন। দিদিমা ও মামীমা একজন ঠিকা ঝি'র মদতে তাঁদের কলকাতার বাড়ীতে বসবাস করেন। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁদের ঐ বাড়ীতে যাই ও খবরাখবর নিই এবং প্রয়োজন হলে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী কাযকর্ম্ম করে দিই। আমার মামী ও মামা অপুত্রক থাকলে আমিই তাঁদের উত্তরাধিকারী হবো। আমি একমাত্র ভাগিনেয় বিধায় মামীর স্নেহ আমার উপর অপরিসীম। এইদিন সকাল আটঘটিকা আন্দাজ সময় আমি ওঁদের বাড়ীতে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে যাই। আমি দেখি যে বৃদ্ধা দিদিমা ঠাকুর ঘরের দুয়ারে এবং মামীমা তাঁর শোবার ঘরে কর্ত্তিত-গলা অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। এই দেখে আমি হতবিহ্বল হয়ে এক দৌড়ে থানায় এসে এই জোড়া-খুন সম্পর্কে আমার ধ্যান ধারণা মত এজাহার দিতেছি।"

আমি একটি চেয়ারে বসে এই প্রাথমিক সংবাদ আরও একবার সাবধানে পড়ে চিন্তামগ্ন হলাম। আমি থানায় উপস্থিত আর সবদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে এই সংবাদ অনুযায়ী তদন্তের জন্য থানার খোদ বড়বাবু দু'জন সহকারী সমভিব্যাহারে প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে গিয়েছেন। এরপর আর দেরী না করে আমি এই এলাকার পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত ঘটনাস্থলে এসে পৌছলাম।

বড় রাস্তা হতে একটা গলির-পথ একটি পাঁচিলঘেরা একতলা বৃহৎ সাবেকী বাটীর সদর দুয়ার পর্য্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। এই দুয়ারে প্রবেশ করে সামনে দেখা যায় একটা নাতিদীর্ঘ মেটো উঠান। এই উঠানের পশ্চিমে ও দক্ষিণ দিকে পর পর ঘরের সারি। এই ঘরগুলির সম্মুখ ভাগে উচু প্রশস্ত L-সেপড্ পাকা রোয়াক। এই কলকাতা শহরের বাড়ীতেও উঠানে একটি তুলসী মঞ্চ দেখা যায়। এই তুলসী গাছের উপরে ঝুলানো মালবীর ঝাঁপি হতে তখনও টপ্ টপ্ করে জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছে।

এই তুলসীমঞ্চের সম্মুখে ঠাকুরঘরটির চৌকাঠে মাথা রেখে রোয়াকের উপর একটি তুলসীর মালা মুঠির ভিতর ধরে এক অশীতিপর বৃদ্ধা শুয়ে পড়ে রয়েছে। তাঁর কুঞ্চিত-চর্মের বর্ণের ঔজ্জল্য হতে বুঝা যায় যে তিনি একদা বড়-ঘরে জন্মে বড় ঘরের বৌ হয়েছিলেন। ঠাকুর ঘরের মধ্যস্থলের সিংহাসনে উপবিষ্ট আরাধ্য গৃহদেবতা গোপাল ঠাকুরের দিকে তাঁর উন্মুক্ত কঠিন চোখ তখনও ফিরানো রয়েছে। আমি এইবার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম যে এই অশীতিপর বৃদ্ধার গলদেশের তলে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে। এই অধুনা হতভাগ্যা বৃদ্ধার গলদেশের উপরিভাগ সম্ভবতঃ কোনও ক্ষুরধার অস্ত্র দ্বারা পেঁচিয়ে কেটে দেওয়া হয়েছে। দূর হতেই সেই ক্ষতের গহ্বরে লাল মাংসের পেশী ঘেরা রক্তরাঙা কণ্ঠনালীটি সুস্পষ্ট রূপে দেখা যায়। অলক্ষ্যে আমার মুখ দিয়ে অস্ফুটস্বরে একটি মাত্র শব্দ বার হয়ে এলো—ওঃ বাপস্!

মৃতদেহের উপর পাহারারত জনৈক হুকুমের নোকর যষ্টিধারী সিপাহী এতক্ষণ অন্য দিকে মুখ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আসার পর আর একবার মৃতা বৃদ্ধার দেহের দিকে চেয়ে দেখে পরক্ষণে আবার তার মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিল। কিন্তু এতো বিহ্বল হওয়া কোনও তদন্তকারী অফিসারের সাজে না। এদিকে নিকটে কোনও থানা অফিসারকেও দেখা যায় না। শুধু একজন জমাদার সদর দরজার ওপারে ভীড় সরাতে ব্যস্ত।

'আরে! অফিসার লোক কাঁহা গিয়া?' আমি এই-বার উপস্থিত এই সিপাহীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'হাম্ শুনা কি বড়বাবু খুদ আ'গয়া। উনলোক সব আভি কাঁহা কাঁহা হ্যায়।'

'হুজুর! এক খবর মোতাবেক উনে লোক কুঠিকো পিছুমে বাগিচাপর গিয়া'। মৃতদেহের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে পাহারারত সিপাহী একটু দূরে সরে দাঁড়িয়ে উত্তর করল, 'আউর একঠো জননাকো লাস পিছুকো কামরামে গিরা-হুয়ে হ্যায়। আপ যাইয়ে না উধার। এক সিপাহী উহা-পর ভি মজুত হ্যায়।

কোনও এক অজ্ঞাত মনস্তাত্ত্বিক কারণে অফিসাররা হত্যার তদন্তে দল বেঁধে এসে দল বেঁধে এক স্থান হতে অন্যত্র গিয়ে থাকেন। কদাচ তাঁরা ঘটনাস্থলের চতুর্দ্দিকে নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন। আমি দেখলাম যে এই ক্ষেত্রেও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। মৃতদেহগুলি না সরানো পর্য্যন্ত অবচেতন মনে একজন অপরজনের অবর্ত্তমানে বোধ হয় অসহায় তাব অনুভব করেন। এই একই কারণে বোধহয় আমিও অন্যান্য অফিসারদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। তবুও একবার এই বাড়ীর এক শয়ন ঘরে পড়ে থাকা অপর মৃত-দেহটি দেখা প্রয়োজন মনে করলাম। এই শয়ন ঘরের দুয়ারের এপারে অপর এক পাহারারত যষ্টিধারী সিপাহী মোতায়েন ছিল। আমাকে চিনে সে সেলাম করে একটু সরে আমার জন্যে পথ করে দিল।

একটি অর্দ্ধবয়স্কা শুভ্রবস্ত্র পরিহিতা নারী তাঁর বৃদ্ধা শাশুড়ীর মতই কর্ত্তিত-গলদেশ অবস্থায় ঘরের চৌকীর সামনে পড়ে আছে। উপরে কড়িতে ঝুলানো দাঁড়ে বসা একটি তোতা পাখীর দিকে তাঁর হাতটি প্রসারিত। তাঁর ডান হাতের অদূরে ছড়িয়ে পড়া ভেজা ছোলার মধ্যে একটা খালি বাটি—এই বাটী পাখীর খাদ্য কয়েকটি ছোলা বুকে করে পড়ে রয়েছে। হঠাৎ পাখীটি শিকলশুদ্ধ মৃত-দেহের দিকে যাবার কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে। তারপর দুর্ব্বোধ্য ভাষায় কয়েকটা বাক্য উচ্চারণ করলো। প্রথম শব্দ দুটি হতে শেষের শব্দ দুটির সুর আমার কাছে সম্পূর্ণ পৃথক ঠেকে। আমার মনে হয়, সদ্য সদ্য যেন এই পাখী দুই ব্যক্তির কাছে এই দুইটি শব্দ শিখে নিয়েছে। কিন্তু কোনও অনুমান কদাচ প্রমাণরূপে গণ্য হতে পারে না। তবে ছোলাসহ বিপর্য্যস্ত বাটিটি হতে আমি বুঝতে পারি যে নিহত হবার অব্যহিত পূর্ব্বে এই মৃতা নারী তার প্রিয় পক্ষীটিকে আহার করাচ্ছিলেন। চৌকীর কিনারায় একটি সিঁদুরের কৌটা ও এক কোণে সিঁদুর মাখানো একটা মোটা চিরুণীও পড়ে থাকতে দেখা যায়। আমি এ থেকে বুঝতে পারি যে এর আগে শেষ বারের মত তিনি একটু সিঁদুরও পরে নিয়েছেন। এরপর আমি সন্তর্পণে ঘরে ঢুকে দেখি যে ঘরের কাঠের মজবুত আলমারী খোলা। ঐ আলমারীর দুয়ারের গায়ে একটি চাবি লাগানো। ঐ মৃতা মহিলার আঁচলে একটি কোণের কুঞ্চিত খুঁট হতে বুঝা যায় যে এই কোণ হতে ঐ চাবিটা

খুলে নেওয়া হয়েছে। এই আলমারীর ভিতরকার দ্রব্য ও বস্ত্রাদির বিপর্য্যস্ত ভাব হতে বুঝা যায় যে এখান থেকে কয়েকটি মূল্যবান দ্রব্য বা অলঙ্কারাদি অপহৃত হয়ে থাকবে। এই হত্যার অন্ততঃ একটি উদ্দেশ্য যে রাহাজানি তথা দ্রব্যাপহরণ—তা আমার বুঝতে বাকী থাকে নি। এরপর আমি এই বাড়ীর পিছনে বাগানে গিয়ে অবগত হই যে সেখানে একজন মাত্র সিপাহীকে পাহারারত রেখে তদন্তকারী অফিসাররা পিছনের গেটের পথে অন্যত্র তদন্তে গিয়েছেন। এই ঘটনাস্থলের গেটে একজন জমাদার ও ভিতরে এই তিন সিপাহী ব্যতীত অন্য কোনও ব্যক্তি উপস্থিত নেই। কিন্তু এতে নিরবচ্ছিন্ন চিন্তার সুযোগ পাওয়ায় আমার কোনও অসুবিধে হয় নি। আমি বাড়ীর ভিতর ফিরে এসে তুলসীমঞ্চের পাদপিঠে পড়ে থাকা তৈলসিক্ত মাটীর প্রদীপটির দিকে একবার চেয়ে দেখলাম। এই তুলসীমঞ্চে এই প্রদীপটি আর কোনও দিন জ্বলবে না। তারপর ঘরের ভিতর হতে একটা কেনাস্তারার খালি টিন বার করে তার উপর বসে ভাবতে লাগলাম যে, এই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী সম্ভাব্য হত্যাকারী কে বা কারা হতে পারে? আমি এই সময় লক্ষ্য করলাম যে ঐ নিহত বধূটির কক্ষে যেতে হলে ঠাকুরঘরের গা ঘেঁসে রোয়াকের উপর দিয়ে সেখানে যেতে হবে। আমি এবার বেশ বুঝতে পারি যে কোনও অপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে শাশুড়ীকে এড়িয়ে তার ঘরের বৌ-এর কক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয় যে নিশ্চয় কোনও পরিচিত ব্যক্তি ঐ বধূর ঘরে ঢুকে অতর্কিতে তাকে পর্য্যুদস্ত করে হত্যা করেছে। এই পরিচিত হত্যাকারীর পক্ষে ঐ বৃদ্ধা শাশুড়ীকে সাক্ষিণীরূপে বেঁচে থাকতে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই পরক্ষণেই তাকেও তাদের ঐ ভাবে হত্যা করতে হয়েছিল। এ ছাড়া আমি আরও বুঝি যে এই পরিচিত হত্যাকারীর সাহায্যকারীরূপে আরও এক বা দুই ব্যক্তি উপস্থিত না থাকলে এতো সহজে এদের পর্য্যুদস্ত করে নিহত করা সম্ভব হতো না। আমি অনুভব করতে থাকি যে আমার তদন্তক্ষেত্রের আয়তন যেন সঙ্কুচিত হয়ে এসে উহার কেন্দ্রস্থলের দিকে এগিয়ে আসছে। এখন এই স্বল্প-আয়তন ক্ষেত্রের মধ্য হতে প্রকৃত অপরাধীদের খুঁজে বার করা আর খুব অসম্ভব মনে হয় না। ঠিক এই সময়ে আমার চিন্তাজাল ছিন্নভিন্ন করে সেখানে ভবানীপুর থানার বড়বাবু ও তাঁর সহকারীরা এক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এই ব্যক্তিটি ছিল এই বাড়ীর ঠিকা ঝি অমুক রাণী।

'আরে! আপনি তা'হলে এসে গিয়েছেন'—অতি আগ্রহের সহিত বড়বাবু অমুকবাবু বললেন, 'সকালে দু'বার আপনাকে ফোন করেছি। পরিশেষে গোয়েন্দাবিভাগে একটা মেসেজ পাঠাতে বাধ্য হলাম। মামলাটা বোধ হয় ডিটেক্ট হয়ে গেল। আমাদের সংবাদদাতা অমুকবাবু আর এই ভদ্রবংশীয়া ঝি অমুকরাণীর সাক্ষ্যেই বোধহয় আসামীর সাজা হয়ে যাবে। এই ভদ্রবংশীয়া দাসী অমুকরাণীর বিবৃতিটা আমি ইতিমধ্যে লিখে নিয়েছি। এটা একবার পড়ে দেখুন—

আমি ধীরে স্থানীয় থানার বড়বাবুর হাত হতে ডায়েরীবুকটি গ্রহণ করে এই ভদ্রবংশীয়া সুন্দরী যুবতী দাসী অমুকরাণীর বিবৃতিটি পড়তে সুরু করেদিলাম। এই বিবৃতিটি বিশ্বাস করলে এই মামলার সমাধানের জন্য আর কোনও চিন্তা থাকবার কথা নয়। কিন্তু আমার অন্তস্তলের আমার পুলিশী মন যে এতে সায় দিতে চায় না। আমার মনে হয়—যে হয় কোথায়ও একটু গোলমাল হয়ে গিয়েছে কিংবা নিপুণতম এক ষড়যন্ত্র গভীর হতে গভীরতর হয়েছে। আমি এই বিশ বৎসর বয়স্কা সুবেশা নিটোল স্বাস্থ্যের অধিকারিণী সুন্দরীর দিকে একবার সন্দিগ্ধভাবে চেয়ে দেখে তার বিবৃতিটি আরও একবার পড়ে নিলাম। এই প্রয়োজনীয় বিবৃতির প্রয়োজনীয় অংশ নিয়ে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

'আমার নাম অমুকরাণী, পিতার নাম ৺অমুক। আমি অতো নম্বর বাড়ীর একটি কামরায় থাকি। এই বাড়ীর দিদিমা ও মামীমার পরিচর্য্যার জন্যে এক সদ্বংশীয়া কর্মঠ মেয়ের প্রয়োজন হওয়ায় আমি ছয় মাস পূর্ব্বে এখানে নিযুক্ত হই। আমি সকাল আটটায় এসে এদের রান্নাবান্নায় সাহায্য করতাম এবং রাত দশটায় এদের অন্যান্য কায-কর্ম্ম সেরে আমি বাড়ী ফিরতাম। এইদিন সকালে সাতটার সময় যথারীতি আমি ও-বাড়ী যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। এমন সময় একজন নাম না জানা যুবক সেখানে এসে আমাকে কাযে না আসতে বলে

গেল। ভদ্রলোক বললে যে ওনারা দুজনা সকালে পদ্ম-পুকুরে আত্মীয়ের বাড়ীতে যাবেন। এজন্যে আমি যেন দু'দিন পরে ও'বাড়ীতে যাই। এই খবর পেয়ে খেয়ে দেয়ে আমি শুয়ে পড়েছিলাম। এমন সময় থানার বড়বাবু আমাকে এই সাংঘাতিক ও মর্মান্তিক সংবাদ দিলেন। উপরোক্ত নাম না জানা যুবককে এর আগে আমি মাত্র একদিন দেখেছি। এই বাড়ীতে সে সেদিন দাদাবাবুর সঙ্গে কথা কইছিল, সে প্রায় আজ হতে মাস দুই আগেকার ঘটনা হবে।

মৃতা শাশুড়ী ও তাঁর বধুর যে আত্মীয় যুবকটি থানায় এই খুন সম্পর্কে খবর দিয়েছে, সে তখনও পুলিশের সাথে থেকে তদন্ত কার্য্যে সহায়তা করছিল। এমন কি সেই ব্যক্তি থানার অফিসারদের ঐ পরিচারিকার বাড়ীতেও নিয়ে গিয়েছে। আমি স্থির নেত্রে একবার ঐ যুবকটির আপাদমস্তক দেখে নিলাম। এই বিষয়ে আমি তাকে যা যা প্রশ্ন করেছিলাম এবং ঐ দিন সে তার যা যা উত্তর দিয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হলো।

প্রঃ—তোমাদের এই পরিচারিকাটি যা ব-বার তা তোমার সামনেই বলেছে। এখন ঐ নাম না জানা যুবকটি তোমার কোনও বন্ধু কি-না তা আমাকে বলে দিতে হবে। অবশ্য এই পরিচারিকারও বুঝা উচিৎ ছিল যে এই ভাবে তাকে খবর দেওয়ার মধ্যে যথেষ্ট অস্বাভাবিকতা আছে, এই অশিক্ষিতা স্ত্রীলোক তার ধ্যান-ধারণা মত কায করেছে। কিন্তু এজন্য তাকে আমি খুব বেশী দায়ী করতে পারছি না। কিন্তু, বাপু, তুমি এই বিষয়ে তোমার দায়িত্ব এইভাবে এড়াতে পারো না। তোমার ঐ বন্ধুটির নাম তোমাকে বলতে হবে।

উঃ—আজ্ঞে! আমি এই অদ্ভুত কাহিনী শুনে পর্য্যন্ত ভাবছি যে আমার পরিচিত-মণ্ডল ঐ যুবকটি কে হতে পারে? এমনও হতে পারে যে কোনও দুষ্ট লোক ছুতা করে এই বাড়ীতে এসে সুলুক সন্ধান নিয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমি অত ভেবে চিন্তেও কারুর সঙ্গে ঐরূপ একটা মূলা-কাতের বিষয় মনে আনতে পারছি না।

এই সময় হঠাৎ আমার লক্ষ্য পড়লো নিহতা নারী দ্বয়ের আত্মীয় স্থানীয় ঐ যুবকটির কেশ ও বেশের প্রতি। এই যুবকটির পায়ে লপেটা পামসু ও পরণে ইজের ও একটা নীল সার্ট। মাথার তৈলবিহীন চুল ব্রাক্‌ব্রাসড করা রয়েছে। আমি আরও লক্ষ্য করলাম ঐ নীল সার্টের এক স্থানে দগ্ধকৃত কয়েকটি ফুটা। আগুনের স্ফুলিঙ্গ অতর্কিতে পড়লে মাত্র এইরূপ ছিদ্রের সৃষ্টি হতে পারে। আমি গবেষকের দৃষ্টিতে এই দগ্ধকৃত সছিদ্র সার্টটির প্রতি দৃষ্টি প্রসারিত করে বুঝলাম যে এই মামলার কিনারা হতে আর দেরী নেই।

'হুম্! তুমি তো দেখছি একজন বিচক্ষণ ও সাবধানী ছোকরা'। আমি মৃতাদের আত্মীয় স্থানীয় ঐ যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখন বলো দিকি তোমার সার্টে অতো পোড়া দাগ ও ছিদ্র কি করে হলো? ঐ ছিদ্রসমূহের চার পাশে তো সদ্য সদ্য পোড়ার দাগ দেখা যায়!'

'আজ্ঞে! আজ সকালে দিদিমাদের বাড়ী আসার সময় আমি কয়েকটা বিড়ি খেয়েছি।' আমার এই প্রশ্নে একটু-মাত্রও অপ্রতিভ না হয়ে ঐ যুবকটি উত্তর করলো, 'ঐ সময় কয়েকটি আগুনের স্ফুলিঙ্গ অতর্কিতে আমার জামার উপর ছিটকে পড়ে। আমি তাড়াতাড়ি ওগুলো নিবিয়ে ফেলি বটে, কিন্তু জামাটা আমার তাতে স্থানে স্থানে পুড়ে যায়। এই গোলমালের মধ্যে এটা আর আমি বাড়ীতে ছাড়তে যেতে পারি নি।'

এই যুবকটির এই উত্তরে তার উপর আমার সন্দেহ না কমে বরং তা আরও বেড়ে যায়। আমি তার মাথার ব্যাক্‌-ব্রাসড চুল ও পায়ের লপেটা জুতা হতে বুঝি যে, এই যুবক দেশী বিড়ি খাবার মানুষ নয়। যদিও কিছু খায় তো দামী বিলাতী সিগারেট খাবে। এইটুকু মনে উদয় হওয়া মাত্র আমি অতর্কিতে তার একটি পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার মুঠির মধ্যে একটা হাভানা সিগারেটের টিন বার হয়ে এলো। এরপর এই যুবকটির মুখে আর কোনও কথা সরে না।

[তদন্তে প্রকাশ পায় যে এই যুবক তার ঐ বন্ধুর সাথে এদের খুন করে গহনা অপহরণ করে তা বিক্রী করে। এদিকে সার্টে রক্তের ফোঁটা লাগাতে বাড়ীর আগুনে ঐ সকল স্থান পুড়িয়ে দেয়।]

স্বপ্নশেষ

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

মধু নেই,—শুধু আছে শূন্য এ ভাণ্ড !
দুঃসহ বিদ্রূপ একী রে প্রকাণ্ড !
নিঃসীম রিক্ততা
আনে কোন্ তিক্ততা ,—
হলাহল-সিক্ত যে আজ ব্রহ্মাণ্ড !

সংসার নয়,—এ যে আছি কারাকক্ষে ;—
কোথা মায়া-কজ্জল—উজ্জ্বল চক্ষে ?
কই সেই কল্পনা,—
ছন্দের আল্পনা ?—
একী রাক্ষস-ক্ষুধা জ্বল্‌ছে রে বক্ষে !

কোথা তোর মনোচোর সুন্দর ?—ভ্রান্ত,
কুশ্রীর হাটে তুই কোথা পাবি কান্ত !
শেষ হ'ল শিকার,
জাগে আজ ধিক্কার ;—
স্বপ্নবিহীন প্রাণ ক্ষিপ্ত অশান্ত।

অলি নেই —আছে শুধু ভাগাড়ের মক্ষি,
কুঞ্জে কোয়েল কই ?—ডাকে পেঁচা পক্ষী !
ফাল্গুন-মায়া নাই,
অশথের ছায়া নাই ;—
তরুহীন মরু হ'য়ে উঠ্‌লো ভূলোক কি ?

একী ঘোর দুর্দিন ! একী দুর্ভাগ্য !
পাপিয়ার ঝাঁকে স্থাখ্ লাখ লাখ কাক গো !
নিদারুণ রিষ্টি যে
উল্‌টেছে সৃষ্টিকে ;—
পঙ্কজ নেই তাই—আছে শুধু পাঁক গো।

কাঁচ আর কাঞ্চন নয় আজ ভিন্ হে,—
মাকালের মরশুম ! পাঁকালের দিন এ !
আয় তবে চল্ যাই,
আর দরকার নাই ;—
বিদায়ের সঙ্গীতে বাঁধ্ তোর বীণ্‌কে !

আগন্তুক গৃহস্থ : হ্যাঁ মশাই···সাত সকালে এই লম্বা 'লাইন' দিয়েছে কি জন্য ?

'লাইনে' অপেক্ষমান মৎস্য-সন্ধানী : যদি কোনো মাছওয়ালা ভুল করে হঠাৎ এদিকে এসে হাজির হয়—তাই !

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

আগমনী

শরৎকালে মায়ের পূজা
ডালি কে সাজালে।
জলেতে পাতা পদ্ম পাতা
সরসী ছেয়েছে শত কমলে।
স্থল পদ্মগুলি পাপড়ি খুলি
ফুলেরি নেশা প্রাণে জাগালে

কি পরিপাটী রাঙা দোপাটী
অর্ঘ্য সাজালে জবা বিল্ব দলে
গগন মাঝে শঙ্খ বাজে
মঙ্গল ঘট বারিদ জলে
পথ দেখাতে উলকা হাতে
তড়িৎ বালা চলে দলে দলে।

কথা—৺অনুরূপা দেবী সুর ও স্বরলিপি—শ্রীরবীন্দ্রমোহন বসু সঙ্গীতবিশারদ

II পা দা মা পা | দা পদা ণর্সা র্রণর্সা | ণা ধা ণা পা | ণা দপা -া -া
শ র ৎ কা ০ লে ০ ০ মা য়ে র পূ ০ জা ০ ০
জ্ঞা রা জ্ঞা দা | মা -া জ্ঞা রজ্ঞা | ঋা সা -া -া | -া -া -া -া II
ডা ০ লি কে ০ ০ সা ০ জা লে ০ ০ ০ ০ ০ ০
সা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | -া জ্ঞা -া -া | জ্ঞা রা মা জ্ঞা | রা সা -া -া
জ লে তে পা ০ তা ০ ০ প ০ দ্ম পা ০ তা ০ ০
সা রা মা পা | দা র্সা -া -া | ণধ ণা পা ণদা | পা -া -া -া II
স র সী ছে য়ে ছে ০ ০ শ ত ক ম লে ০ ০ ০

II মা মা ণা দা | দা দা দা ণা | ণা র্সা র্সা র্সা | ণা ঋর্া র্সা -া
স্থ ল প ০ দ্ম গু লি ০ পা প ড়ি ০ খু ০ লি ০
র্সা জ্ঞা র্মজ্ঞর্া -া | ঋর্া র্সা -া -া | ণা র্সা ঋর্সা ণা | দা পা -া -া
ফু লে রি ০ নে শা ০ ০ প্রা ণে জা ০ গা লে ০ ০
পা পা পা -া | পা পা -া -া | দা ণা পদা দপা | মা মা -া -া
কি প রি ০ পা টী ০ ০ রা ঙা দো পা টী ০ ০ ০
সা -া মা মা | মা মা পা মা | জ্ঞা রজ্ঞা সা ঋা | সা -া -া -া II
অ ০ র্ঘ্য সা জা লে জ বা বি ০ ল্ব দ লে ০ ০ ০

II মা মা মা ণা | দা দা ণা -া | র্সা -া র্সা -া | জ্ঞর্া ঋর্া র্সা -া
গ গ ন মা ০ ঝে ০ ০ শ ০ ঙ্খ ০ বা ০ জে ০
র্সা জ্ঞর্া র্রা জ্ঞর্া | -া ঋর্া র্সা -া | ণা র্সা ঋর্সা -া | ণা দা পা া
ম ০ ঙ্গ ল ০ ঘ ট ০ বা রি দ ০ জ ০ লে ০
পা পা দা পা | -া পা -া -া | পা দা ণা পণা | দা পা মা -া
প থ দে খা ০ তে ০ ০ উ ল কা হা ০ তে ০ ০
সা মা মা মা | মা -া পা মা | জ্ঞরা জ্ঞা সা ঋা | সা -া -া -া II
ত ড়ি ৎ বা লা ০ চ লে দ ০ লে দ লে ০ ০ ০

মিহিরাচার্য্য

অনেক অনুরাগী শ্রাবণে প্রকাশিত লটারী প্রাপ্তির সম্বন্ধে আরো কিছু আলোচনার জন্যে অনুরোধ করেছেন। তাই এবারে সেই সম্বন্ধেই কিছু আলোচনা করব।

লটারী পাওয়ার জন্য তিনটি ঘরের বিচার বিশেষভাবে দরকার। সে তিনটি হচ্ছে, ধনস্থান (লগ্ন বা চন্দ্রস্থিত রাশি যেটি বর্গবিচারে বলবান হবে—সেই ঘরটিকেই এক নম্বর ঘর বলে ধরে নিতে হবে—একথা আগেই বলেছি) অর্থাৎ দ্বিতীয় ঘর, পঞ্চমস্থান ও একাদশস্থান। এই ঘরের অধিপতি গ্রহ যদি নবাংশে বলবান হয়ে নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করে, তাহলেই সেই জাতকের লটারীপ্রাপ্তি ঘটতে পারে। লটারীর ব্যাপারে পঞ্চম স্থানকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কারণ এই পঞ্চম স্থানটি দ্যূত (Speculation) স্থান। কিম্বা ঐ তিনটি ঘরের অধিপতি যদি নিজের ঘরে কুগ্রহ দৃষ্ট বা কুগ্রহযুক্ত হয়ে না থাকেন, তাহলেও পাবার বিশেষ সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে ঐ তিন অধিপতিরা কোন সম্বন্ধ না করলেও হবে। কিম্বা ঐ তিনটি ঘরের অধিপতি যদি বর্গোত্তমী নবাংশ পান তাহলেও পাবার সম্ভাবনা।

এইবার নবাংশ ও বর্গোত্তমী নবাংশ কাকে বলে তা বলছি। যে কোন বর্গবিচারে গ্রহস্ফুট অর্থাৎ গ্রহটি রাশির কোন অংশ, কোন্ কলা বা বিকলায় আছে তা জানা চাই। এ না হলে বর্গবিচার সম্ভব নয়। বারোটি রাশির মধ্যে চারটি করে রাশি এক একটি জাতের। তাদের সংজ্ঞা হল—চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক। চর মানে গতিশীল, স্থির মানে গতিহীন, আর দ্ব্যাত্মক মানে গতিশীল ও গতিহীন এই উভয় গুণসম্পন্না। আরো একটু পরিষ্কার করে দিই। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর হল চররাশি। বৃষ, সিংহ, বৃশ্চিক, কুম্ভ হল স্থির রাশি। আর বাকীগুলি, মিথুন, কন্যা, ধনু, মীন হল দ্ব্যাত্মকরাশি।

নবাংশ হচ্ছে, একটি রাশিকে (এক একটি রাশি ৩০ অংশ—এক অংশে ৬০ কলা—এক কলায় ৬০ বিকলা) সমান ভাগে নভাগ করা। প্রতি ভাগের পরিমাণ হল ৩ অংশ ২০ কলা।

এই এক একটি ভাগকে নবাংশ (নব+অংশ) বলে। এই এক একটি ভাগের এক একজন মালিক। কেমন কোরে মালিক নির্ণীত হবে, তার নিয়ম নীচে দিলাম।

চররাশির প্রথম বিভাগের মালিক, সেই রাশিরই অধিপতি গ্রহ। যেমন ধরুন মেষ (চররাশি) রাশি, এর প্রথম ভাগের (৩।২০) মালিক মেষরাশিরই অধিপতি গ্রহ মংগল। এইখান থেকে পরের পর ন'রাশি ন'টি ভাগের অধিপতি। দ্বিতীয়ের বৃষ, অর্থাৎ শুক্রগ্রহ, তৃতীয়ের মিথুন অর্থাৎ বুধগ্রহ, চতুর্থ অংশের কর্কট অর্থাৎ চন্দ্রগ্রহ। এমনি ভাবে নটি ঘর পরের পর হবে।

স্থিররাশির আরম্ভ হবে, সেই রাশি থেকে নবম ঘর বা রাশি যেটি, সেইটি থেকে পর পর নটি রাশি। ধরা যাক বৃষ। বৃষ হল স্থিররাশি। অতএব এর প্রথম ভাগের অধিপতি হবেন নবমরাশির অধিপতি। বৃষ থেকে গোণা যাক নবম ঘর। গুণে পাওয়া গেল মকররাশি নবম ঘর। অতএব নিয়মানুযায়ী প্রথম ভাগের অধিপতি হল মকররাশির অধিপতি শনিগ্রহ। ওই ঘর থেকে পরের পর গুণে আসুন নয়টি ঘর। দেখবেন কন্যায় এসে নয় শেষ হবে। অতএব দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ কোরে

পরের পর এই সব রাশির অধিপতি গ্রহেরা ঐসব নবাংশ-ভাগের অধিপতি হবে।

এইবার দ্ব্যাত্মকরাশি। এর আরম্ভের নিয়ম হচ্ছে সেই রাশি থেকে পঞ্চমরাশি যেটি। সেই পঞ্চমরাশি থেকে শুরু হয়ে ডানদিক ঘুরে পরের পর নটি রাশি। যেমন ধরা যাক মিথুনরাশি। এটি দ্ব্যাত্মক। অতএব এর আরম্ভ হবে পঞ্চম রাশি থেকে। গুণে দেখা গেল মিথুন থেকে পঞ্চমরাশি হচ্ছে তুলা। তুলার অধিপতি শুক্র। অতএব মিথুনের প্রথম যে ৩ অংশ ২০ কলার ভাগ, তার নবাংশাধিপতি গ্রহ নির্ণীত হল শুক্র। এইবার পরের পর নটি রাশি গুণে আসুন। শেষ হবে দেখবেন ঐ মিথুনেই। পরের পর এই গুণে আসা রাশিগুলির অধিপতি গ্রহগুলি হোল এই নটি ভাগের নবাংশাধিপতি। আশা করি, নবাংশ ভাগ ও তার অধিপতি সম্বন্ধে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছেন। এইবার তিনটি রাশিরগ্রহ দিয়ে উদাহরণ দিচ্ছি।

ধরুন আপনার রবিগ্রহ কর্কটে আছে ০, ১৬ অংশ ২২ কলায়। কর্কটরাশিটি চররাশি। প্রথমে যে ভাগ করে দিয়েছি কোন্ কোন্ রাশি, চর, স্থির, দ্ব্যাত্মক—তাই দেখলেই বুঝতে পারবেন। তাহলে নিয়ম অনুযায়ী চর রাশির আরম্ভ হচ্ছে সেইরাশি থেকে। এইবার এক একটি রাশিতে আঙুল রাখুন, আর মুখে মুখে ৩ অংশ ২০ কলা কোরে (কারণ ৩।২০ কোরে একটি ভাগ) যোগ করে যান ও সেই সংগে পরের পর রাশিতে আঙুল দিতে থাকুন ও লক্ষ্য করুন রবিগ্রহ যে অংশে যে কলায় আছে আপনার যোগ-দেওয়া অংশ এবং কলা তাকে অতিক্রম করছে কি না

যেমন আঙুল দিলেন আপনি প্রথমে কর্কটে। কারণ চররাশির আরম্ভ হচ্ছে সেই রাশি থেকে। তারপর ৩।২০+৩।২০ যোগ করে মুখে বললেন ৬।৪০ এবং আঙুল বাড়িয়ে দিলেন পরের রাশি সিংহে। তারপর ঐ ৬।৪০ এর সঙ্গে যোগ করলেন মুখে মুখে ৩ ২০—যোগফল হল ১০ অংশ। অমনি আঙুল চলে গেল পরের রাশি কন্যায়। একবার তাকিয়ে দেখে নিলেন রবির অংশ কলাটিকে আপনার মুখে উচ্চারণ করা অংশ কলা অতিক্রম করে যাচ্ছে কি না! না, যায় নি। অতএব ঐ দশ অংশ যোগফলে আবার যোগ করলেন ৩।২০—হোল ১৩ অংশ ২০ কলা। অমনি আঙুল এগিয়ে দিলেন পরের রাশি তুলায়। না, এখনও রবির অংশ-কলাকে আপনার মুখে মুখে যোগ দেওয়া অংশ-কলা ছাড়িয়ে যায় নি। আবার ১৩ অংশ ২০ কলায় ৩।২০ যোগ করলেন, যোগ-ফল হোল ১৬ অংশ ৪০ কলা, আঙুলও সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে বৃশ্চিকে। তাকিয়ে দেখলেন রবির ১৬ অংশ ২২ কলা পড়ছে এরই মধ্যে। অতএব রবিগ্রহের নবাংশাধিপতি হল বৃশ্চিকরাশির অধিপতি মংগল। রবির অংশ-কলা যদি ১৬।৪২ হত (?) তাহলে বৃশ্চিক উত্তীর্ণ হয়ে নবাংশভাগ পড়ত ধনুতে। নবাংশাধিপতি হোত বৃহস্পতি।

তদ্রূপ ঐ রবি যদি সিংহে থাকত ঠিক ঐ অংশ কলাতে, তাহলে স্থিররাশির নিয়মানুযায়ী আরম্ভের রাশি হোত নবমরাশি অর্থাৎ সিংহ থেকে নবম মেষ রাশি থেকে। তারপর ঐ মেষে আঙুল দিয়ে ঠিক ঐ পদ্ধতিতে গুণে বার করতে হত। আর রবি যদি থাকত কন্যারাশিতে, তাহলে কন্যা দ্ব্যাত্মকরাশি হওয়ার জন্য কন্যা থেকে পঞ্চমরাশি মকর থেকে সুরু হয়ে ঠিক ঐ ভাবে পরের পর গুণতে হোত যতক্ষণ না রবিস্থিত অংশ-কলা আপনার মুখে মুখে যোগ করা অংশ-কলার অন্তর্গত হয়। বর্গোত্তমী নবাংশ কাকে বলে? গ্রহ যে রাশিতে থাকবে, সেই রাশির নবাংশ পেলেই সে বর্গোত্তমী নবাংশ পাবে। তাহলে চররাশিতে বর্গোত্তমী পেতে হলে গ্রহকে ৩ অংশ ২০ কলার মধ্যে থাকতে হবে। স্থিররাশিতে ১৩ অংশ ২০ কলা থেকে ১৬ অংশ ৪০ কলার মধ্যে থাকতে হবে, দ্ব্যাত্মক রাশিতে থাকতে হবে ২৬ অংশ ৪০ কলা থেকে ৩০ অংশের মধ্যে।

এ ছাড়া অর্থাৎ ঐ তিনটি ঘর দ্বিতীয়, পঞ্চম ও একাদশ ছাড়া আরো দুটি ঘর দেখতে হবে, যে কথা আগেও বলেছি, এখনও বলছি। লগ্ন বা চন্দ্রলগ্ন, যেটিকে প্রথম ঘর বলে ধরবেন, সেইটি ও সেই প্রথম ঘর থেকে নবম ঘরটি।

প্রথম ঘরের অধিপতি যদি দুর্ব্বল, পীড়িত, কুগ্রহযুক্ত বা দৃষ্ট হয়, তাহলে পাবার আশা অনেক কমে যাবে। প্রথম ঘর মানে, যাঁর জন্মকুণ্ডলী তিনি নিজে। অজীর্ণ-পীড়িতমানুষের কাছে যেমন নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্যের

ভাণ্ডার থাকলেও ভোগ করার উপায় নেই, এও তেমনি। আর নবমস্থান হচ্ছে ভাগ্য স্থান। ভাগ্যস্থান থেকে পূর্ব্ব-পুণ্যের বিচার হয়। হিন্দুজ্যোতিষীরা পূর্ব্বজন্মের সুকৃতি-দুষ্কৃতিতে বিশ্বাসী। সুতরাং পূর্ব্বপুণ্য আছে কিনা দেখতে হবে। জ্যোতিষীদের অভিমত পূর্ব্ব পুণ্যস্থান ভাল না হলে, ঐশ্বর্য্য, সুখ, অর্থ, যশ, সম্মান প্রভৃতি ভোগ সম্ভব হয় না।

আশ্বিনের গ্রহ-সংস্থান

রবি কন্যায়—উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে। ১০ই হস্তা নক্ষত্রে। ২৩শে আশ্বিন চিত্রায়। সংক্রমণ সময়ে চন্দ্র ধনু রাশি—পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে। বুধ সিংহে, মঘায়। ২রা পূর্ব্বফল্গুনীতে। ১১ই উত্তরফল্গুনীতে—১০ই কন্যায়—১৮ই হস্তায়—২৩শে চিত্রায়। ৩০শে আশ্বিন চন্দ্র ধনিষ্ঠায়। শনি কুম্ভে শত-ভিষা নক্ষত্রে। বৃহস্পতি বৃষে কৃত্তিকায়। মংগল প্রথমে পুষ্যায়—১৫ই অশ্লেষায়।

ব্যক্তিগত রাশি ও লগ্নফল

(যাঁদের লগ্ন ও রাশি ভিন্ন তাঁরা দুটি ফলই সামঞ্জস্য করে পড়বেন)।

মেষ রাশি

এ মাসে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সুখকর হবে। কিঞ্চিৎ লাভের আশা দেখা দেবে—কিন্তু মনের মত হবে না, দেরী হতে থাকবে। এ মাসে ভাগ্যবল আপনার বিশেষ বলবান্। ৩রা তারিখের পর পত্নীর শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ হতে পারে। ১৩ তারিখের পর অসুস্থতা না থাকার সম্ভাবনা। অশ্বিনী-নক্ষত্রে জন্ম হলে ৮৷৯ তারিখে লাভের সূচনা দেখা যায়। ২৬শে আশ্বিনের পর বেশ কিছু আনন্দ পাবেন। ১৩ তারিখের পর কর্ম্মস্থানে কোন সহকর্ম্মী অপবাদের সৃষ্টি করতে পারে। অনূঢ়া প্রণয়ার্থী ছেলে-মেয়েরা ২৬শে আশ্বিনের পর শুভফল পাবেন নিজ নিজ সম্বন্ধে।

বৃষ রাশি

এ মাসে নানা প্রকারে সাংসারিক সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য উপলব্ধি করবেন। পত্নীর কারণে ব্যয়বৃদ্ধি হতে পারে। কর্ম্মের জায়গায় ১১ তারিখের পর কোন সুসংবাদের আশা করতে পারেন। আত্মীয়-কুটুম্বের কারণে সংসারে সামান্য চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ১০ই আশ্বিন (রোহিণী নক্ষত্রে জন্ম হলে) হঠাৎ অর্থপ্রাপ্তিতে উৎফুল্ল হবেন। সন্তানেরা বিনীতভাব দেখাবে। চিঠিপত্রের জবাব সহজেই পাবেন। নিজের শরীর সামান্য গণ্ডগোল করতে পারে, কিন্তু তেমন ভয়ের কারণ নেই। অনাদায়ী কোন টাকা অনেকদিন পড়ে থাকলে, এমাসে আংশিক পাবার আশা করতে পারেন।

মিথুন রাশি

আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্মালে ১৩ তারিখে অথবা ১৬ তারিখে বিনা আয়াসে অর্থলাভ হতে পারে। শারীরিক ছোট-খাট ক্লেশের সম্ভাবনা। আর্থিক সঞ্চয়ের অবকাশ নেই বললেই হয়। ব্যবসাদার হলে ১৩ই আশ্বিনের পর উন্নতির পথ খুঁজে পাবেন। গৃহের আসবাব, সংস্কার প্রভৃতিতে কিছু ব্যয় হওয়ার সম্ভব। ১৩ই তারিখের পর পুত্র-কন্যাদের অসহিষ্ণুভাব আপনাকে চঞ্চল কোরে তুলবে। ভূসংক্রান্ত বা ঘরবাড়ীর ব্যাপারে, যদি কোন গোলযোগ থাকে, এবার তা মেটার আশা দেখতে পাবেন।

কর্কট রাশি

গত কয়েকমাস ধরে যে বাধা-বিঘ্ন, শত্রুতা, ঋণ প্রভৃতিতে নাজেহাল হয়ে পড়ছিলেন, এ মাসে সে সবের মীমাংসা করার হদিশ খুঁজে পাবেন। ক্রমশঃ মাসটি ভালই যাবে। ১০ তারিখে দ্যূতাদিতে আকর্ষণ থাকলে লাভ হবার সম্ভাবনা দেখা দেবে। পত্নীর প্রখরা ভাব আপনাকে মাঝে মাঝে পীড়া দিতে পারে। পুত্রকন্যারা উন্নতির অভিমুখে যাবার চেষ্টা করবে। কোন প্রতিদ্বন্দ্বী মামলার ভয় দেখাবে। নিজের স্বাস্থ্য অবহেলার জন্যে ক্লিষ্ট বোধ হতে পারে; কনিষ্ঠ ভ্রাতারা ভাল ব্যবহারের দ্বারা সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবে।

সিংহ রাশি

বেশ আনন্দেই কাটবে মাসের গোড়ার দিকটা। আয় বাড়বে। প্রয়োজনের সময় যার সাহায্য চাইবেন, সেই তা হাসিমুখে দেবে। ১২৷১৩ তারিখের মধ্যে প্রায় কাজেই সাফল্য লাভ করবেন। কিন্তু শেষ দিকের একটা সপ্তাহ কিছুটা মন্দা যাবে। হঠাৎ গুপ্তশত্রুতা আবিষ্কার করে

নিজের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সাবধান হবেন। ব্যবসায়ী বা ঠিকাদার হলে নতুন কাজের চুক্তি পেতে পারেন। চাকুরেদের পদস্থ ব্যক্তি বা ওপরওলাদের নজরে পড়ার আশা আছে মাসের শেষের দিকে। অভিনেত্রী, শিল্পী প্রভৃতি পেশাজীবীদের এ মাসে নতুন কাজ ও আর্থিক সুবিধা দেখা দেবে।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রজাত ব্যক্তিরা এ মাসে ভাগ্যবৃদ্ধির আশা করতে পারেন। অপর নক্ষত্রজাত ব্যক্তিরা ভ্রমণে আনন্দ পাবেন। ১৩ তারিখের পরে সম্মান লাভ, চাকরীতে উন্নতির আশা, অর্থলাভ প্রভৃতি ঘটবে। মাসের প্রথম দিকে ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। পুত্রকন্যারা এ মাস বিশেষ আনন্দে কাটাবে। অনুজের উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেবে। কোন কোন চাকুরে বদলী হওয়ার সংবাদ পাবেন এবং তা আর্থিক উন্নতিসূচক হবে। স্ত্রীর সাহচর্য্য ও সাংসারিক বুদ্ধি আপনার গৃহস্থালীর শৃঙ্খলাকে সুদৃঢ় করবে।

তুলা রাশি

পত্নীর স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে অবশ্য জন্মকোষ্ঠিতে মঙ্গল যদি কুপ্রভাবশালী হয়। ধনভাগ্য বেশ ভালই যাবে। অনাদায়ী টাকা আদায় না হতে পারে, কিন্তু নানাপ্রকারে অর্থপ্রাপ্তি হবে। ভূসম্পত্তি কেনার ইচ্ছা হতে পারে—গৃহসংস্কারেরও যোগ আছে। ভাগ্যবলে অনেক অর্থ পাবার যোগ দেখা যায়। যদি কোষ্ঠী বলবান্ ও হঠাৎ প্রাপ্তির যোগ সম্পন্ন হয়, লটারীও পেতে পারেন। পুত্রকন্যারা কিঞ্চিৎ দুর্বিনীত হয়ে উঠবে। নিজের শ্লেষ্মাধিক্য কারণে শারীরিক ক্লেশ সম্ভব। স্বাতী নক্ষত্রজাত ব্যক্তির ২১শে আশ্বিন শুভ কিছু ঘটার সম্ভাবনা।

বৃশ্চিক রাশি

শনি-মংগলে নক্ষত্র কারণে যোগাযোগ হওয়ায় অনেক আশা-ভরসা পাবেন। কিন্তু সাফল্য তদনুরূপ হবে না। রক্তচাপ বৃদ্ধি বা কোন কারণে রক্তপাত হতে পারে। কনিষ্ঠের সঙ্গে সামান্য কারণে বচসার সম্ভাবনা। শত্রুরা ঝুঁকি নিয়ে আপনার ক্ষতির চেষ্টা করতে পারে। ব্যয় এতো বৃদ্ধি পাবে যে, সামলে ওঠা কঠিন হবে। দ্যূতাদি কারণে লোকসান হবার সম্ভাবনা। পত্নীর ব্যবহার রুক্ষ হবে—প্রতিকথায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ পাবে। মাসের শেষের দিকে কিছুটা সান্ত্বনা পাবেন।

ধনু রাশি

মাসের প্রথম দিনটি বেশ ভাল যাবে। পুত্রকন্যার উন্নতি এ মাসে তেমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। যারা পড়াশোনা করে, তাদের লেখাপড়ায় বিঘ্ন দেখা দেবে। পদস্থ ব্যক্তিরা নিম্নতন কর্মচারীদের ওপর বিরাগভাজন হবেন। ব্যবসাদারেরা অনাদায়ী টাকা আদায়ে বেকার ঘোরাঘুরি করে বিরক্ত হবেন। সব দিকেই জবুথবু অবস্থা দেখা দেবে। মাসের প্রথম দিকে স্ত্রীর স্বাস্থ্যহানি ঘটার সম্ভাবনা। নতুন লাভজনক কাজ ব্যবসায়ীদের হাতে ভবিষ্যতের জন্য আসতে পারে। সাংসারিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। কুটুম্ব আগমনে মানসিক অশান্তি দেখা দেবে।

মকর রাশি

এর আগের মাসটি যেমন গেছে, এ মাসটিও তেমনি যাবে। ব্যবসাদার হলে ব্যবসার, চাকুরে হলে পদোন্নতির বা কোথাও সুযোগ-সুবিধামত বদলীর কথা চলবে, আশাও হবে—কিন্তু কিছুতেই সফল হবেন না। কোথাও ভ্রমণে আনন্দ পেতে পারেন ২৩ তারিখের পর।

প্রথমের দিকে যতটা হতাশার চাপ বৃদ্ধি পাবে শেষের দিকে ততটা নয়। চাকুরীজীবিরা শেষের দিকে সুবিধা কিছু কিছু পাবেন। অনূঢ়া মেয়েদের বিয়ের কথাবার্তা পাকা হতে পারে।

কুম্ভ রাশি

কনিষ্ঠভ্রাতার উন্নতির সূচনা হবে। কোন কিছুর চুক্তিতে সই করে লাভবান হতে পারেন। বাসস্থানের কাছাকাছি কোন ভূমি কেনবার ইচ্ছা দেখা দেবে। অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর শরীর মোটামুটি মন্দ যাবে না। উদর-পীড়ায় সামান্য ক্লেশ পেতে পারেন। ৭।৮ তারিখ আপনার পক্ষে শুভ সূচনা করতে পারে। ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধে শুভ সংবাদ পেতে পারেন। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হতে পারে। বেকারব্যক্তি সাময়িক ভাবে চাকরী পেতে পারেন।

মীন রাশি

হঠাৎ সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। অবিবাহিতেরা বিবাহের কথাবার্তা পাকা করে ফেলতে পারেন কিম্বা রেজেষ্ট্রি বিয়ে হতে পারে। গৃহভূমি বাবদে বেশ কিছু ব্যয় হবে। কন্যার সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া সম্ভব। স্ত্রী কিন্তু পুজোর মাসটা বেশ মানিয়ে চলবেন হাসিমুখে। অসুস্থ মাতুলের নিরাময় সংবাদ পাবেন। আপনার শরীর মোটামুটি ভালই যাবে। মাসের শেষে কিছু সঞ্চয়ের আশা করতে পারেন।

বেদাঙ্গ দর্পণে নেতাজী

পণ্ডিত শ্রীকামাখ্যাচরণ ভট্টাচার্য্য, স্মৃতিরত্ন সরস্বতী

আশা ও নিরাশায় সুদীর্ঘ উনিশটি বৎসর অতিক্রম হইল। আজও দেশবাসীর চিত্তপটে প্রশ্ন জাগে—নেতাজী কি জীবিত?

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির মতামত এবং কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিচার করিলে মনে হয়, নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ হয়তো ভ্রান্ত।

শৌলমারীতে নেতাজীরূপ "সাধুজী"র রহস্যপূর্ণ আবির্ভাব প্রচারিত হওয়ার পর হইতে কিছুসংখ্যক সাধারণ সংবাদপত্র, কয়েকজন জ্যোতিষী—এমন কি কোন কোন সাধু সন্ন্যাসী পর্যন্ত, তেজোদীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন—"নেতাজী জীবিত এবং সময় হইলেই তিনি আত্মপ্রকাশ করিবেন"।

কেহ কেহ বলেন-"নেতাজী আত্মপ্রকাশ করিবেন—নিজ পরিচয়ে নহে, গুরুজীরূপে"।

আবির্ভাবের নির্দ্দিষ্ট সময় না বলিয়া—"সময় হইলেই বা গুরুজীরূপে"—এই সমস্ত ঘোষণা যেন হেঁয়ালীর মতই মনে হয়।

"নেতাজী যথা সময়ে আত্মপ্রকাশ করিবেন"—এই রূপ সমবেত কণ্ঠ ধ্বনি হইতে, যে ঢেউ বাতাসে জাগে, উৎসাহে-ভরা সেই দোলা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালীর হৃদয়েই লাগে এবং জনগণ কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারেও শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিতে পান।

অগণিত দেশবাসী "ঐ" মধুময় দিনের প্রতীক্ষায়—কিন্তু কালের গতি বহিয়া যায়।

লীলাময় নেতাজী! তুমিই কি কলিযুগে কৃষ্ণ ভগবান? তোমার জীবন চরিত্রে একি অপরূপ মায়া!

স্বদেশ হইতে অন্তর্ধান, ফৌজ গঠন, বিবাহ, সন্তানলাভ, মৃত্যু সংবাদ, জীবিত ঘোষণা, শৌলমারীর সাধুজী পর্য্যন্ত, সব কিছুই কি প্রহেলিকা?

নেতাজীর ন্যায় দেশহিতৈষী একনিষ্ঠ বীর সাধক, এইরূপ পরাধীন দেশে দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ কোথায়?

সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কোন ব্যক্তি আছেন, যিনি নেতাজীর আত্মপ্রকাশে—তাঁহার পতাকাতলে উপস্থিত না হন? যিনি স্বয়ং দল সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার জন্য দল গঠনের প্রয়োজন কি?

বেদাঙ্গের চক্ষু জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান; উক্ত বিজ্ঞান রূপ দর্পণে দেখা যায়—১৮৯৭ সনে ২৩শে জানুয়ারী দিবা ১২ টার পর ১টার পূর্ব্বে নেতাজী কটক নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

আবির্ভাবের সময়, মৃত্যু-সংবাদের মতই রহস্যাবৃত। ঐ সময়ে মাদ্রাজের স্থানীয় সময়ানুসারে-ভারতীয় সময়ের প্রচলন থাকায়, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই উহা ব্যবহৃত হইত।

মাদ্রাজ সময় দিবা ১০টা ৩৯ মিনিট ও কটক স্থানীয় সময় ১১টা ২ মিনিটে মেষলগ্নের উদয় হইয়া মাদ্রাজ সময় ১২টা ২০ মিনিট ও কটক স্থানীয় সময় ১২টা ৪৩ মিনিটে সমাপ্তি ঘটে। উহার পর বৃষ লগ্নের উদয় হয়।

১২টা হইতে ১ টার মধ্যে মেষ ও বৃষ উভয় লগ্নের উদয় হওয়ায়, জ্যোতির্ব্বিদগণ অনেকেই মেষ, আবার কেহ কেহ বৃষলগ্নের কল্পনা করেন।

নেতাজীর পিতার হস্তলিপি হইতে জানা যায়-"১২ টার পর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নেতাজী জন্মগ্রহণ করেন"।

মাদ্রাজ ১২টা ২০ মিনিট ও কটক স্থানীয় সময় ১২টা ৪৩ মিনিটের মধ্যে জন্ম হইলে, মেষ লগ্নের তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইয়া থাকে। কোন রাশির নবাংশে, তুলা অথবা ধনু—ইহা লইয়াও সংশয়।

নেতাজীর জীবনে সকল বিষয়েই যদি ভারতবাসীর অন্তরে সন্দেহ জাগে, তবে জন্মলগ্ন নির্ণয়ে জ্যোতির্ব্বিদগণ নিঃসন্দেহ হইতে পারেন, কোন পুণ্যবলে?

যদি বৃষ লগ্নে জন্ম হয়, তাহা হইলে লগ্নে, শনি ও রাহু-দৃষ্ট মঙ্গল। তৃতীয়ে, রবি ও বুধ-দৃষ্ট কেতু। চতুর্থে, শুক্র ও শনি-দৃষ্ট বক্রী-বৃহস্পতি। পঞ্চমে, রাহু-দৃষ্ট চন্দ্র। সপ্তমে মঙ্গল-দৃষ্ট শনি। নবমে, রবি, বক্রী-বুধ এবং রাহু!

জৈমিনি মতে পরমায়ু গণনায়—লগ্নপতি ও অষ্টমপতি, লগ্ন এবং চন্দ্র, লগ্ন ও হোরালগ্ন, তিন প্রকার নিয়মের মধ্যে দুই প্রকারে অল্পায়ু যোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, অল্পায়ু যোগই স্থিরীকৃত হয়। কোন প্রকার আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি না হওয়ায় ও বিবিধ নিয়মে অল্পায়ু যোগ প্রাপ্ত হওয়ায়, বিশেষতঃ লগ্নপতি ও অষ্টমপতি এবং আয়ুস্থান দূষিত হওয়ায়, পরাশর মতে দীর্ঘায়ু যোগ পাওয়া গেলেও, জাতক অধম-মধ্যায়ু-ভোগী হইয়া থাকেন—ইহাতে সন্দেহ নাই।

দশমস্থান হইতে রাজ্য, আকাশ, প্রভুত্ব প্রভৃতি বিচার করিবার নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। কর্ম্মাধিপতি শনি অষ্টমে শক্রগৃহে, শক্রদৃষ্ট হইয়া থাকায় এবং অষ্টমপতি মঙ্গল পুনরায় লগ্নপতি হইয়া দ্বিতীয়ে অবস্থান পূর্ব্বক শনি ও রাহু দ্বারা দৃষ্ট হওয়ায়, উচ্চস্থান অথবা আকাশ হইতে পতন, অগ্নিদগ্ধ, রাজ্য উদ্ধার হেতু প্রাণত্যাগ প্রভৃতি মৃত্যুর কারণ না হইবার যুক্তি কোথায়?

সাধু মহাত্মাদের ভবিষ্যদ্বাণী ব্রহ্মবাক্য ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই। নেতাজী আত্মপ্রকাশ করিবেন কিনা তাহা ভবিষ্যতই বলিতে পারে।
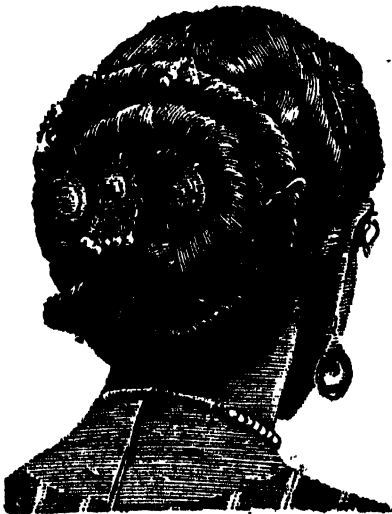
বন্ধ জানলার কাঁচের গায়ে একটি দু'টি করে জমছে বৃষ্টির ফোটা। আর সেই দিকে অপলক নয়নে চেয়ে বসে আছে বাসুদেব বসুরায়। মনের মধ্যে তার আসা যাওয়া করছে বিগত পাঁচ বছরের কত লেখা।—হ্যাঁ, লেখাই। শুধু লেখা, আর লেখা! শুধু উত্তর, আর প্রত্যুত্তর! চিঠির পরে চিঠি। সে এক বিরাট কথপোকথন শুধু লেখার মধ্য দিয়ে। কত আশা, কত আনন্দ, কত উচ্ছ্বাস, কত উৎসাহ, সব এইক্ষণে মনে পড়ে যাচ্ছে বাসুদেবের। ···হঠাৎ যেন সে নীচের দিকে নেমে গেল চট্ করে। চম্‌কে উঠে আসনের হাতল শক্ত করে ধরে বাসুদেব। কিন্তু তারপরই জোরে দুলে উঠল সব। মেঘ ঘন হয়ে চেপে এসেছে জানলার কাঁচের ওপর। সামনেই ফুটে উঠল আলোয় লেখা—"Fasten Seat Belt," ইউরোপ-গামী প্লেনের যাত্রী বাসুদেবের এই প্রথম প্লেনে চড়া। তাই 'বাম্পিং'-এর অভিজ্ঞতা তার নেই। ঘন মেঘের মধ্যে প্লেনের দুলুনিতে অসোয়াস্তি বোধ করলেও সামলে নিতে তার সময় লাগে না। সিট্ বেল্ট শক্ত করে বেঁধে সে এই উত্থান-পতনের বেগ সহ্য করতে লাগল। বমি তার হল না অন্যান্য অনেক যাত্রীর মতন, আর অসোয়াস্তিটাও সহ্য হয়ে গেল আস্তে আস্তে। একটু পরেই মেঘ পাতলা হয়ে গেল। দেখা গেল মেঘমুক্ত সুনীল আকাশ, আর সেই নীলের ওপর দিয়ে সাঁতরে চলল স্বচ্ছন্দ গতিতে তাদের প্লেন্। বাসুদেবও আস্তে আস্তে আবার ফিরে আসতে লাগল তার সেই ফেলে আসা ভাবনায়। প্রথমেই মনে পড়ে গেল সেই প্রথম চিঠির কথাটা। সেই চিঠি, যা তার জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল! যার জের টেনে চলেছে সে এই সুদীর্ঘ পাচ বছর—আর যার টানে সে

চলেছে আজ সুদূরের সন্ধানে। সেই চিঠি—সেই সূত্রপাত, সেই শেষের আরম্ভ! সেই আরম্ভকে শেষ করতে, তাকে পূর্ণতা দিতেই আজ বাসুদেব চলেছে ফরাসী রাজধানী প্যারিসের পথে। মনে পড়ে গেল পাঁচ বছর আগের সেই সকালের কথা।

সকাল বেলায় চা খেতে খেতে খবরের কাগজের পাতাটা উল্টে-পাল্টে কর্ম্মখালির বিজ্ঞাপনগুলো দেখছিল বাসুদেব। এমন সময় পিয়ন দরজার তলা দিয়ে চিঠিটা গুঁজে দিয়ে চলে গেল। নীল খামের চিঠিটায় যেন কি একটা বিশেষত্ব রয়েছে বুঝে তাড়াতাড়ি বাসুদেব তুলে নেয় চিঠিটা। ঠিকই তো, চিঠিটা আসছে সাগরপারের দেশ থেকে। একেবারে ফরাসী রাজধানী প্যারিস্ থেকে। অবাক হয়ে যায় বাসুদেব। কিন্তু নাম ঠিকানা সবই তার—ভুল কিছু হয়নি পোষ্ট-অফিসের। আস্তে আস্তে কাঁপা কাঁপা আঙুলে খাম খুলে বার করে টাইপ্ করা একখানা চিঠি। ইংরাজীতে লেখা চিঠিটার মর্ম্মার্থ হচ্ছে:—

প্রিয় মিঃ বসুরায়, অপরিচিতা মহিলার কাছ থেকে এরকম চিঠি পেয়ে নিশ্চয়ই আপনি অবাক হয়ে গেছেন। ভাবছেন আপনার ঠিকানা আমি পেলাম কোথায়। সব কথাই লিখছি, আপনি একটু ধৈর্য্য ধরে পড়ুন। কিছুদিন আগে আপনার এক সহপাঠি বন্ধু এদেশে এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল। তাঁর দেশের কথা, তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কথা প্রভৃতি অনেক গল্পই তিনি আমার কাছে করেছেন। আপনার অনেক প্রশংসাও আমি তাঁর কাছে শুনেছি। তিনি যখন প্যারিস ছেড়ে যান তখন আমি আপনার ঠিকানাটা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নি। তারপর অনেকদিন ভেবেছি আপনাকে চিঠি লিখে জানি যে আপনি আমার লেখনি-বন্ধু ('পেন্-ফ্রেণ্ড') হতে রাজী আছেন কিনা। কিন্তু সাহস হয় নি। ইংরাজী ভাষায় আমার দখল কম। লেখাতে হয়ত ভুল অনেক হয়েছে এবং হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবুও আশা করি আমার বক্তব্য বুঝতে আপনার বিশেষ অসুবিধা হবে না। ইংরাজী আপনারও নিজের ভাষা নয়, আমারও নয়। চেষ্টা করলে আমিও হয়ত একদিন আপনাদের মতই ভাল ইংরাজী শিখে ফেলতে পারব—হয়ত আপনার মাতৃভাষা বাংলাও শিখতে পারি। তবে এর জন্য চাই প্রেরণা, আর সেই প্রেরণাটাই পাব যদি আপনি আমার সঙ্গে পত্র-বিনিময়ে রাজী থাকেন।

নিজেকে আমার অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ হয়। বয়স আমার মাত্র কুড়ি। আপনি হয়ত ভাবছেন এই বয়সের মেয়ের প্যারিসের মতন জায়গায় নিঃসঙ্গ বোধ হওয়াটা একটু অস্বাভাবিক। হয়ত তাই। কিন্তু আমি ঠিক অন্য মেয়েদের মতন নই। আমার বয়সী মেয়েদের মতন হুল্লোড় করে বেড়ান আমার ধাতে সয় না। আমি ভালবাসি নির্জ্জনতা, আর প্রকৃতির সান্নিধ্য। তাবলে মনে করবেন না যেন আমি কবি বা লেখিকা। তবে সাহিত্য আমি ভালবাসি এবং কবিতা ও গল্প ইত্যাদি নিয়মিতরূপেই পড়ে থাকি। লেখবার চেষ্টা কখনও করিনি—এই চিঠি-টাই বোধ হয় আমার সবচেয়ে বড় লেখা।

যাই হোক, আপনি যদি আমার মতন একটি সাধারণ বিদেশী মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে বিশেষরূপে বাধিতা হব। আর একটা কথা আপনাকে জানাই ভারতীয়দের আমি খুবই পছন্দ করি। তাদের যেন আপন জন বলেই মনে হয়—কেন তা বলতে পারব না।

এত বড় চিঠি লিখে ফেলে আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করেছি। এবার আপনাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে এখানেই শেষ করছি। আর আশা করছি আপনার কাছ থেকে শীঘ্রই উত্তর পাব। ইতি, আপনার বিশ্বস্ত——

—ফ্রাঁসোয়া বার্দো

হ্যাঁ, উত্তর দিয়েছিল বাসুদেব, তবে খুব শীঘ্র নয়। ভাবতে হয়েছিল ক'য়েকদিন। তারপর একদিন—প্রায় সারাদিনই চিঠির মুশবিদা করে, অনেকগুলি কাগজ ছিঁড়ে, শেষকালে একটা চিঠি খাড়া করেছিল এবং দুরু দুরু বক্ষে ও কম্পিত হস্তে তা পোষ্টও করেছিল। আজও সেই প্রথম চিঠির প্রতিটি অক্ষরই তার মনে আছে—এখনও যেন তা চোখের সামনে ভাসছে। সেই চিঠিতে লিখেছিল বাসুদেব—

"প্রিয় মাদামোজেল্ বার্দো,

আপনার চিঠির জন্য আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এই চিঠি লিখে এবং আমার লেখনী

বন্ধু হতে চেয়ে আপনি আমাকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছেন। সে সম্মানের যোগ্য হয়ত আমি নই এবং আপনার সুন্দর চিঠির যোগ্য উত্তরও হয়ত হচ্ছে না—তবুও যদি আপনার ভাল লাগে তাহলে প্রত্যুত্তর দেবেন, আর আমাদের বন্ধুত্বও তাতে পাকাপাকি হয়ে যাবে। কেমন?

আচ্ছা, এইবার আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু আপনাকে জানাই। আমার বয়স এখন পঁচিশ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এ যাবৎ চেষ্টা করছি কোনও লাভজনক ব্যবসা গড়ে তোলবার বা ভাল চাকুরি জোগাড় করবার। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোনটাই হয়ে ওঠে নি। তবে আশা ছাড়ি নি। চেষ্টা করে যাচ্ছি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার, কিন্তু কবে তা হবে বলতে পারি না। আপনাদের দেশে এবং ইউরোপ ও ইংলণ্ডের শহরগুলিতে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা মনের কোণে জমে রয়েছে অনেকদিন থেকেই; কিন্তু এই ব্যয়বহুল ভ্রমণের উপযুক্ত অর্থসঙ্কুলান করে উঠতে পারি নি বলেই সে ইচ্ছাও ফলবতী হয় নি। ভবিষ্যতেও হবে কি না জানি না। তবে চেষ্টা ছাড়ব না, বিশেষ করে আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর এই ভ্রমণের ইচ্ছা যেন দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়েছে।

যাই হোক, আশা করি আপনি এ পত্রের উত্তর সত্বর দিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব বন্ধনকে সুদৃঢ় করে ফেলবেন, এবং আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যে আমি নিয়মিতভাবে আপনার চিঠির উত্তর দিয়ে যাব।"

... ...

বাসুদেব তার কথা রেখে চলেছে এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। প্রতিটি চিঠির সে উত্তর দিয়ে গেছে নিয়মিত ভাবে। ফ্রাঁসোয়াও তাকে চিঠি লিখে এসেছে ঠিক নিয়মে। প্রথম প্রথম মাসে একটি, পরে মাসে দু'টি, শেষে প্রতি সপ্তাহে একখানি করে উত্তর প্রত্যুত্তর দিয়ে এসেছে দু'জনে এই দীর্ঘকাল ধরে।

কত রকমের সে চিঠি। প্রথম প্রথম লেখালিখি হয়েছে অতি সতর্কভাবে সম্ভ্রম, শালীনতা ও ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে। তারপর চিঠিও যত বেড়েছে, অন্তরঙ্গতাও সেই অনুপাতে বেড়ে গেছে। হয়েছে ফোটোর আদান-প্রদান, উপহার বিনিময় এবং শেষে যা হবার তাই হয়েছে—দু'টি হৃদয় বাঁধা পড়েছে প্রেমের বাঁধনে। হাজার হাজার মাইলের ব্যবধান পেরিয়ে অদেখা অজানা দু'টি মন ধরা দিয়েছে দু'জনের কাছে আকুল আগ্রহে। সাগরপারের বিদেশিনী এ দেশের ছেলেকে ভালবেসেছে শুধু তার লেখা পড়ে, তার ছবি দেখে। তার চিঠির ভাষা তাকে প্রেমে উন্মাদিনী করে তুলেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে সে বাসুদেবের কাছে, যদি বিয়ে করে তো তাকেই করবে, আর কারুকে নয়! পাল্টা প্রতিজ্ঞা বাসুদেবও করেছে। লিখেছে তার বধূ একমাত্র সেই হতে পারে—অন্য নারীর স্থান বাসুদেবের হৃদয়ে নেই। আরও লিখেছে বাসুদেব, সে একদিন তার দেশে যাবেই, তাকে বরণ করে নিয়ে আসবার জন্যে। সেই কথার বুঝি আজ রাখতে চলেছে বাসুদেব।

এর পর আছে আরও কত চিঠি—কত অনুরাগ, কত অনুযোগ, কত অভিযোগ, কত অভিমান, কত আশা, কত নিরাশা, কত দুঃখ, কত সুখ, কত আনন্দ, কত আহ্লাদ, কত যে বেদনা, কত উল্লাস। আর কত সে সম্বোধন মিষ্টি, মধুর। বাসুদেবকে ফ্রাঁসোয়া লেখে 'দেব' বলে। 'দেব'-এর মানে সে জেনেছে 'দেবতা'। বাসুদেব যে তার জীবন-দেবতা। তার নামও পালটে একটা মিষ্টি বাঙ্গালী নাম চেয়েছিল ফ্রাঁসোয়া। বাসুদেব অনেক ভেবে তার নামকরণ করেছে 'পত্রলেখা'। মানেটা বুঝে এ নাম তার খুবই পছন্দ হয়েছে। ছোট করে বাসুদেব শুধু 'লেখা' বলেও তাকে সম্বোধন করে।

সব কথা এসে আজ ভিড় করছে বাসুদেবের মনে—মুখে তার ফুটে উঠছে মৃদু হাসির রেখা, পরিতৃপ্তির প্রকাশ। চিঠির মাধ্যমে তাদের নৈকট্য এত ঘনীভূত হয়েছে যে আজ বাসুদেবের সব ভাবনা চিন্তার অংশীদার হয়ে দাঁড়িয়েছে ফ্রাঁসোয়া—তার অদেখা দয়িতা। তার হাতেই যেন বাসুদেব তুলে দিয়েছে তার সব ভাবনা চিন্তার ভার নিঃশেষে। চিঠি লিখে তার মতামত না জেনে সে করে না কিছুই। তার পারিবারিক, সাংসারিক সব ব্যাপারেই তার মত নিয়ে সে চলে। ফ্রাঁসোয়াও জানায় তাকে তার সব কিছু। বাসুদেবের পরামর্শ মত সেও চলে। নিঃসঙ্গ বাসুদেবকে হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও সে চালিয়ে নিয়ে চলেছে স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায়। বাসুদেবকে কেন্দ্র করেই তার সব ভাবনা আর চিন্তা।

আর কিছু যেন তার মনে নেই। বাসুদেবের অবস্থাও ঠিক তাই। শয়নে স্বপনে সে খালি তার ফ্রাঁসোয়াকে তার 'পত্রলেখা'কেই ভাবে। আর পরিশ্রম করে চলে সব কিছুই যেন বাসুদেব অনুভব করে, উপভোগ করে ফ্রাঁসোয়ার চিঠির মধ্যে দিয়ে। কল্পনায় সে মাঝে মাঝে চলে যায় ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে কখনও নোতরদাম্-এর শান্ত

নোতরদামের শান্ত পরিবেশে……

অর্থোপার্জ্জনের জন্যে। শুধু এক চিন্তা প্রচুর অর্থ না হলে সে তো তার প্রিয়তমার কাছে যেতে পারবে না, দেখতে পাবে না তাকে ও তার দেশকে। মহানগরী প্যারিসকে সে ভালবেসেছে তার প্রিয়ারই মতন। ফ্রাঁসোয়ার চিঠি থেকে তার পাঠান অজস্র ছবির মধ্য দিয়ে প্যারিসের পথ-বিপথ, অলি-গলি, হোটেল-রেঁস্তোরা, বিপণী, আর্ট-গ্যালারী প্রভৃতি সব দ্রষ্টব্য স্থানের সঙ্গেই যেন বাসুদেবের পরিচয় হয়ে গেছে। নিজের চোখে না দেখলেও বাসুদেব তার প্রিয়ার চোখের মধ্যে দিয়েই যেন প্যারিসের সব কিছুই আজ জেনে ফেলেছে, দেখে ফেলেছে। প্যারিসের আলো, হাওয়া, গন্ধ; তার চপলতা, চঞ্চলতা, বিলাসিতা; তার শান্তি ও শিষ্টতা; তার প্রাচীনতা ও আধুনিকতা—পরিবেশে, কখনও আর্ক-দু-ট্রাম্প-এর আসে পাশে—সাঁজে-লিস এর পথে পথে, কখনও আইফেল্ টাওয়ার-এর উচ্চ শিরে, কখনও বা লুভের-এর শিল্প সম্ভারের মধ্যে। আবার কখনও সে চলে যায় কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে রাতের প্যারিসের অলিতে-গলিতে ফ্রাঁসোয়ার হাত ধরে, গিয়ে ঢোকে 'মুলা রুজ'-এর মতন কাফেতে ও রেঁস্তোরায়—নাচে, গায়, পান করে, হুল্লোড় করে সারা রাত ধরে, ঘরে ফেরে স্খলিত চরণে ফ্রাঁসোয়ার কাঁধে ভর দিয়ে, শেষ রাতে। ফ্রাঁসোয়াকে নিয়ে, প্যারিসকে নিয়ে তার কল্পনার যেন শেষ নেই।

বাসুদেবের মনে হয় পূর্ব্ব জন্মে সে নিশ্চয় জন্মেছিল ইউরোপে, খুব সম্ভব ফরাসী দেশেই। তা না হলে প্যারিসের

ওপর তার এত টানই বা হবে কেন, আর ফরাসী ভাষাই বা এত তাড়াতাড়ি সে শিখল কি করে। অবশ্য ফ্রাঁসোয়ার প্রেরণা ও কল্‌কাতার ফরাসী শিক্ষকের সাহায্যও তার নিজের একনিষ্ঠ চেষ্টাই তাকে ফরাসী ভাষা শিখতে সাহায্য করেছে। এখন সে অনর্গল না হলেও চলন সই কথাবার্তা বেশ বলতে পারে ও ফরাসী ভাষাতে লিখতেও পারে, যদিও খুব শুদ্ধ হয় না।···হ্যাঁ, ফ্রাঁসোয়াও কি কিছু শেখে নি বাসুদেবের কাছ থেকে? নিশ্চয়ই শিখেছে। ইংরাজী সে সুন্দর লিখছে, আর বাংলা ভাষায়ও কিছু কিছু বাক্য সে ভালই লিখতে পারে, বিশেষ করে সব চিঠিতেই সে একটি কথা বাংলায় লিখে থাকে—'আমি তোমায় ভালবাসি'।

একবার তাদের এই ভালবাসা সম্বন্ধে ফ্রাঁসোয়া লিখেছিল—"সত্যই কি এ সম্ভব? আমরা দু'জন কাউকে চাক্ষুষ দেখি নি, নেই কোনও সম্পর্ক অথচ শুধু চিঠির মধ্যে দিয়ে এত দীর্ঘস্থায়ী গভীর প্রেম কি করে সম্ভব হল দেব?" অনেক ভেবে, অনেক মন ঘাঁটাঘাঁটি করে লিখেছিল বাসুদেব—"মানুষের মন যেন একটি তারের যন্ত্র। ঠিক হাতের ছোঁয়াটি পেলেই তা ঠিক সুরে বেজে উঠবে, তা দূর থেকেই হোক বা অতি কাছ থেকেই হোক। তবে ভাল লাগা আর ভালবাসা কিন্তু এক নয়। প্রথম দর্শনে অনেককেই অনেকের ভাল লাগে, কিন্তু তাই বলে সেটাই যে খাঁটি ভালবাসা বা প্রেম তা যেমন নয়, আবার সত্যিকার ভালবাসা হলেই যে তা চিরস্থায়ী হবে, কোন দিনই ভাঙ্গন ধরবে না, তাও তেমনি সত্য নয়। প্রেমকে, ভালবাসাকে স্থায়ী করতে হলেও চাই স্বার্থত্যাগ, চাই সাধনা। গভীর দীর্ঘস্থায়ী প্রেমও সামান্য কারণে ভেঙ্গে যায়, বয়স্ক স্বামী-স্ত্রীর পুরাতন দাম্পত্য প্রেমও নষ্ট হয়ে যায়—হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ। আমাদের সনাতন ভারতীয় প্রথায় বিবাহিত অদেখা, অচেনা, অজানা দুটি নর নারীর বিবাহোত্তর কালের ধীরে ধীরে জেগে ওঠা প্রেম আজীবন স্থায়ী হয়—প্রদীপের অচঞ্চল স্নিগ্ধ শিখার মতন জেগে থাকে চিরজীবন। আবার তোমাদের পশ্চিমী প্রথায় বহুদিন ধরে দেখা শোনা, মেলামেশা, মন বোঝাবুঝি অর্থাৎ কোর্টশিপ্‌ করে যে বিবাহ হয়, তাও হয়ত ভেঙ্গে যায় দু'দিনেই। তাই বলি, প্রেমের গতি বড়ই দুর্বোধ্য।" "সুতরাং", লিখেছিল বাসুদেব, "ও নিয়ে মাথা ঘামিও না। কেন যে হয়, কেন যে হয় না, আর কেন যে টেঁকে না—তা বোঝা শক্ত মানুষের পক্ষে। তবে যুগে যুগে মানব-মানবী পরস্পরের প্রেমে পড়েছে—সুখও পেয়েছে, দুঃখও পেয়েছে, হাসি কান্নায় ভরে গেছে তাদের মন, কিন্তু এই প্রেমকে এড়াতে পারে নি মানুষ। কারণ, এ যে সৃষ্টি রক্ষার জন্য ভগবানের অমোঘ বিধান।"

হঠাৎ কার হাতের মৃদু স্পর্শে চমকে ওঠে বাসুদেব। ফিরে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল এক জোড়া নীল চোখের সঙ্গে। মধুর হাসিমাখা মুখে সুন্দরী এয়ার-হোষ্টেস্‌ এগিয়ে দেয় খাবারের ট্রে। খিদে, তেষ্টার কথা এতক্ষন যেন ভুলে ছিল বাসুদেব। সামনে এই সুখাদ্য সম্ভার দেখেই তার ক্ষুধার উদ্রেকও হল চকিতে, আর ক্ষুধা নিবৃত্তিতে মনঃসংযোগও করল তৎক্ষণাৎ।

খেতে খেতেই ভেবে নিল বাসুদেব, হয়ত এমনি করেই তার তরুণী প্রিয়া তাকে খাবার এনে দেবে—এমনি মধুর হেসে, এমনি হরিণ নয়নে চেয়ে। কত কথাই হবে তাদের খেতে খেতে। কল্‌কাতায় এক বৃদ্ধা মা ছাড়া তার সংসারে আর কেউ নেই। কথা বলার অভাবে তাই বাসুদেব মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। ভাবে ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে দেখা হলে কথা হয়ত তার থামবেই না দিনে রাতে। চিঠিতে কি আর সব বলা হয়েছে? জমে রয়েছে কত কথা মনের আনাচে কানাচে। দেখা হলেই সব বেরিয়ে আসবে অবরোধমুক্ত স্রোতের মত।

খাওয়া শেষ করে আসনে গা এলিয়ে দেয় বাসুদেব। পকেট থেকে বার করে সযত্নে রক্ষিত ফ্রাঁসোয়ার একটা ফোটো। এই ফোটোটি সে পাঠিয়েছিল যখন বাসুদেব নিজের একটি ফোটো পাঠিয়ে তাকেও একটা ফোটো পাঠাতে অনুরোধ করেছিল। ফ্রাঁসোয়া রক্ষা করেছিল বাসুদেবের সে অনুরোধ এই ফোটোটা পাঠিয়ে। এটা একেবারে গোড়ার দিকের ব্যাপার। তারপর বাসুদেব তার নিজের কয়েকটি ফোটো মাঝে মাঝে তুলে তাকে পাঠিয়েছে। কারণ ফ্রাঁসোয়া প্রায়ই তার নতুন ফোটো দেখতে চায়—দেখে দেখে যেন তার আর সাধ মেটে না। কিন্তু নিজের বেলায় সে 'ক্যামেরা-সাই'। নিজের ছবি ঐ একটিই সে পাঠিয়েছে, আর পাঠাতে চায় না। লেখে—ক্যামেরার সামনে বসতে, আর ফোটোগ্রাফারের নির্দ্দেশে এদিক ওদিক

ফ্রাঁসোয়া

ঘাড় ফিরিয়ে, মুখের নানা রকম 'এঙ্গেল্' করে, ফোটো-গ্রাফারের দিকে চেয়ে মিষ্টিহাসি মুখে এনে ছবি তুলতে তার মোটেই ভাল লাগে না। তাছাড়া সে তো প্রথমেই জানিয়েছে সে সাধারণ তরুণীদের মতন প্রগল্‌ভা নয়। ফোটো তোলান, মাত্রাতিরিক্ত সাজ-গোজ করে নিজেকে দেখান, এ সব তার ভাল লাগে না। সে নবীনা হলেও অতি-আধুনিকা নয়।—বাসুদেবের বোধ হয় সেই জন্যেই এত ভাল লাগে তাকে। লিখেছে বাসুদেব "যা তোমার ভাল লাগে না তা করে ছবি তুলতে হবে না। এ-কালের সাজ-সর্ব্বস্ব আধুনিকা যে তুমি নও তা জেনে খুসিই হয়েছি, ফ্যাশন্ ফ্যান্সি ফরাসী মেয়েদের মতন অতটা না হলেও আমাদের দেশেও আজকাল ম্যাক্সফ্যাক্টরে এনা-মেল্ করা মুখ ও বিসদৃশ সজ্জায় সজ্জিতা অতি-আধুনিকা-দের সাক্ষাৎ পথে-ঘাটে হামেশাই পাওয়া যাচ্ছে। পাইপ্-প্যান্ট্ ও সরু-সু মণ্ডিত উৎকট সাজে ছেলেরাও পাল্লা দিচ্ছে। তোমার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে প্রসাধনের আতি-শয্যে দৃষ্টিকটু করে তোলবার প্রয়োজন নেই। তোমার সৌন্দর্য্য যে কত অপরূপ তা তোমার ছবি থেকেই বোঝা যায়। যে একখানি ছবি পাঠিয়েছ তাই আমার কাছে যথেষ্ট! এই ছবির মধ্যে দিয়েই তোমাকে আমি পাচ্ছি, আর রক্তমাংসের তোমাকে দেখব যেদিন ওখানে তোমার কাছে গিয়ে হাজির হব।" বাসুদেবের সেই সাধ পূর্ণ হতে চলেছে। কয়েক ঘণ্টা পরেই সে তার অদেখা, অন্তর-তম মানুষটিকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে, কথা বলতে পারবে, স্পর্শ করতে পারবে।

... ...

ফ্রাঁসোয়ার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল বাসু-দেব। কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল নেই। এয়ার হোষ্টে-সের মৃদু আহ্বানে চোখ খুলে দেখে সামনেই জ্বলছে আলোর লেখা—'Fasten Seat Belt'.—রোম্ এয়ার-পোর্ট-এর ওপর এসে গেছে তাদের প্লেন্—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে নীচে রোম নগরীর সৌধ শ্রেণী, সেণ্ট পীটারস্ স্কোয়ারের বিরাট চত্বর, কলসিয়মের ভগ্নাবশেষ আর পথে পথে অসংখ্য ফোয়ারার জলোচ্ছ্বাস। এই প্রাচীন নগরীর বিশেষ আকর্ষণ থাকলেও বাসুদেব কিন্তু এখানে থাকতে চায় না, শুধু এখানে কেন কোনখানেই সে আর অপেক্ষা করতে চায় না—সে শুধু ছুটে যেতে চায় তার প্রিয়তমার কাছে। দেশ দেখা, ঘুরে বেড়ান এ সব পরের কথা, এখন শুধু তার একমাত্র চিন্তা ফ্রাঁসোয়ার সাক্ষাৎলাভ।

বেশিক্ষণ তাকে আর অপেক্ষা করতে হল না এয়ার পোর্টে। প্লেনে ওঠবার ডাক পড়ল। এবার সোজা প্যারিসের পথে। বাসুদেবের স্বপ্ন-নগরী, সৌন্দর্য্য ও ফ্যাশনের লীলাভূমি, তার প্রিয়ার আবাসস্থল।...আবার বার করল বাসুদেব পকেট থেকে ফ্রাঁসোয়ার ছবিটা আর তন্ময় হয়ে চেয়ে রইল তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখের দিকে। কতক্ষণ পরে এয়ার হোষ্টেসের হাতের মৃদু স্পর্শে ধ্যান ভঙ্গ হল বাসুদেবের। স্মিতমুখে একবার ছবিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে,উজ্জ্বল চোখে মধুর ভঙ্গিমায় হেসে এয়ার হোষ্টেস জানিয়ে দিল তার যাত্রা ও প্রতীক্ষার শেষ হতে চলেছে—নীচেই প্যারিস নগরী। ঈষৎ আরক্ত উজ্জ্বল মুখে বাসুদেব জানাল তাকে ধন্যবাদ, আর উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল নীচের দিকে, যেন ফ্রাঁসোয়াকে সে এত ওপর থেকেই দেখতে পাবে কোন জানালায় বা পথের ধারে!

কিছুক্ষণ পরেই তার অধীর প্রতীক্ষার শেষ হল।

প্লেন্ এসে নামল প্যারিস্ এয়ার পোর্টে। কাষ্টমসের হাঙ্গামা চুকিয়ে বাইরে এসে হাফ্ ছাড়ল বাসুদেব। মনে হল একবার, ফ্রাঁসোয়াকে তার আগমনের খবর দিলেই বোধ হয় ভাল হত। এখনই দেখা হয়ে যেত, আর তার থাকবার ব্যবস্থাও সে করেই রাখতো। তাকে আর এখন ভাবতে হত না থাকা খাওয়ার জন্যে। কিন্তু তখনই মনে হল তাহলেতো আর ফ্রাঁসোয়াকে চমকে দেবার, তার আকস্মিক আগমনের আনন্দের আলোড়নে তাকে উদ্বেলিত, উচ্ছ্বসিত, উচ্ছলিত, উদ্দীপিত করবার সুযোগ মিলত না। মনে মনে বাসুদেব কল্পনা করে নিল আকস্মিক আনন্দে উদ্ভাসিত ফ্রাঁসোয়ার রমণীয় মুখচ্ছবি।

কাজ চালানোর মত ফরাসী ভাষা জানা থাকায় বিশেষ কোনও অসুবিধা হল না তার। অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে উঠে একটি মাঝারি গোছের হোটেলে এসে উঠল বাসুদেব। ঠিক করল খাওয়া দাওয়া সেরে বিকালের দিকে ফ্রাঁসোয়ার ঠিকানায় গিয়ে দেখা করবে ওর সঙ্গে। তারপর রাত্রের খাওয়া, কালকের প্রোগ্রাম ইত্যাদি সব ঠিক হবে তারই কথা মত।

লাঞ্চ-এর পরই বেরুবে মনে করল বাসুদেব কিন্তু ফরাসী খাদ্যের গুণে সুকোমল শয্যার আকর্ষণ সে কিছুতেই কাটাতে পারল না। শুয়ে পড়ল একটুক্ষণের জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে তন্দ্রা এসে ভর করল তার চোখের পাতায়। কিন্তু ফ্রাঁসোয়ার চিন্তা সে ছাড়তে পারল না—তন্দ্রামগ্ন বাসুদেবের সামনে অভিমানভরা মুখে যেন এসে দাঁড়াল ফ্রাঁসোয়া। তার কাছে এখনই না গিয়ে, তার সঙ্গে দেখা না করে বাসুদেব কিনা এখন ঘুমুচ্ছে! তার অনিন্দ্যসুন্দর মুখে অনুরাগের সঙ্গে রাগের অভিব্যক্তিও যেন ফুটে উঠেছে। বাসুদেব তার হাত ধরে তাকে কি বোঝাতে গেল, কিন্তু ফ্রাঁসোয়া ছুটে চলে গেল তার কাছ থেকে, তার স্বর্ণ-কেশদাম হাওয়ায় উড়িয়ে। বাসুদেব "ফ্রাঁসোয়া" বলে চিৎকার করে ডেকে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গেল তার স্বপ্ন। ধড়মড় করে উঠে বসল বাসুদেব। তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে তৈরী হয়ে নিল। ঘোর নীল রঙের দামী সুট্-টা পরে নিল। নীল রং ফ্রাঁসোয়ার ভারী পছন্দ, তাই এই সুট্-টা অনেক খরচ করে করিয়ে এনেছে কলকাতায় এক বিখ্যাত টেলরিং শপ্ থেকে। ফ্রাঁসোয়ার জন্যেও এনেছে একটি দামী আকাশ নীল রঙের বেনারসী শাড়ী ও তার সঙ্গে ম্যাচ্ করা ব্লাউজ-পিস্। ভারতীয় মেয়েদের মতন শাড়ী পরবার ইচ্ছা ওর অনেকদিনের। আজ সে সাধ তার মেটাবে বাসুদেব—নিজে হাতে তাকে শাড়ী পরাবে।

সাজগোজ শেষ করে বাসুদেব শাড়ীর প্যাকেট্টা হাতে করে হোটেলের রিসেপ্সন্ কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াল। তরুণী রিসেপ্সনিষ্ট মিষ্টি হেসে তার কি দরকার জানতে চাইল। বাসুদেব ফ্রাঁসোয়ার ঠিকানা বলে জেনে নিল কোন রাস্তা দিয়ে সে ঐ ঠিকানায় সহজে যেতে পারবে। তারপর সে যেন হাওয়ায় উড়ে চলল। রাস্তায় নেমে প্রথমেই চোখ পড়ল এক ফুলওয়ালীর দিকে। কিনল একগুচ্ছ রক্তগোলাপ। স্মিত হেসে ফুলবালা পরিয়ে দিল একটি গোলাপ কুঁড়ি তার কোটের বাটন্ হোলে। ধন্যবাদ জানিয়ে লঘু পায়ে হেঁটে চলল বাসুদেব। রাস্তার দুধারে সুসজ্জিত বিপণীগুলির শো-কেসে থরে থরে সাজান রয়েছে মনোলোভা দ্রব্যসম্ভার। দেখলেই যেন নিতে ইচ্ছে করে। একটি জুয়েলারী দোকানের সামনে থমকে দাঁড়াল বাসুদেব। শো-কেসের মধ্যে সাজান রয়েছে কত সুন্দর সব আংটি—"এন্‌গেজ্‌মেণ্ট রিং"! বাসুদেবের ইচ্ছে হল এক্ষুণি একটা কিনে নেয়, আর ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে দেখা হবা মাত্র তার চম্পক-কলি সদৃশ সুকোমল, সুগঠিত অঙ্গুলীতে পরিয়ে দিয়ে তাদের 'এন্‌গেজমেণ্ট'কে একেবারে পাকাপাকি করে ফ্যালে। কিন্তু ফ্রাঁসোয়ার ঠিক কোন আংটিটি পছন্দ হবে তা বাসুদেব মনে মনে ঠিক করতে পারল না। তার চেয়ে বরঞ্চ ওকে সঙ্গে করে এনে, ওর পছন্দমত কিনে ওর হাতে পরিয়ে দেবে। এই ভেবে বাসুদেব আর দাঁড়াল না। দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল আশে পাশে আর বিশেষ না তাকিয়ে। কিছুদূর গিয়ে পেয়ে গেল একটা ট্যাক্সি। ঠিকানাটা ড্রাইভারকে বলে উঠে পড়ল।

এপথ ওপথ ঘুরে শহরের প্রায় প্রান্তে একজায়গায় এসে ট্যাক্সি থামল। ড্রাইভার নেবে অঙ্গুলী সংকেতে দেখিয়ে দিল একটা সরু রাস্তা। এই সেই রাস্তা—যে রাস্তার নাম সে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে লিখে আসছে চিঠির খামের ওপর! ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে হেঁটে চলল বাসুদেব। সরু রাস্তার দুধারে ছোট ছোট অসংলগ্ন বাড়ী। রাস্তাটাও পুরাণ আমলের

বলে মনে হয়। কিন্তু বাসুদেবের এখন রাস্তার ভালমন্দ বিচার করবার মতন মনের অবস্থা নয়—সে আগ্রহ ব্যাকুল মনে, উৎসুক দৃষ্টিতে দুধারে লক্ষ্য করতে করতে চলেছে। হয়ত এখন দেখা হয়ে যাবে তার অদেখা কিন্তু অতিজানা প্রিয়তমা পত্রলেখার সঙ্গে। হঠাৎ একটা বিবর্ণ দরজার পাশের নম্বরটায় তার চোখ পড়ে গেল। হ্যাঁ, এই তো সেই তার অতিপরিচিত, বহুলিখিত নম্বর! থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বাসুদেব। শরীরের মধ্যে কেমন একটা শিহরণ খেলে যায় যেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে কয়েকটা সিঁড়ি উঠে দরজাটার সামনে এসে দাঁড়ায় বাসুদেব। দরজার পাশে কোনও কলিং বেলের বোতাম দেখতে পেল না সে। অগত্যা দরজার ওপরে লাগান বড় কড়াটাকেই জোরে ঠুকে দেয় দরজার ওপর। কড়া ঠোকার আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাসুদেব নিজের হৃৎপিণ্ডের আওয়াজও যেন শুনতে পেল! অদম্য আগ্রহে, অধীরতায় যেন সে ফেটে পড়ছে! আর বুঝি নিজেকে সামলে রাখতে পারছে না বাসুদেব! এখুনি চিৎকার করে উঠবে কি সে "ফ্রাঁসায়া, আমি এসেছি" বলে! নিজেকে সংযত করে বাসুদেব। আবার ভারী কড়াটাকে ঠোকে জোরে জোরে দরজার ওপর। চুপ করে দাঁড়ায় একটু। কপালে জমে ওঠা ঘামটা মুছে ফেলে রুমাল দিয়ে। এবারে যেন দরজার ওপারে একটা আওয়াজ পাওয়া যায়। হঠাৎ খস্ করে দরজার ওপরের একস্থানের খানিকটা কাঠ সরে গিয়ে একটা চতুষ্কোণ ফোকরের সৃষ্টি হয়। তার ওপারে দেখা যায় একগোছা সোনালী চুলে ঢাকা কপালের তলায় একজোড়া উৎসুক নীল চোখ। নীল চোখ স্থিরদৃষ্টিতে চেয়েথাকেতার দিকে। আনন্দে,উত্তেজনায় বাসুদেব চিৎকার করে ওঠে ফরাসী ভাষায়—"পত্রলেখা, আমি এসেছি।" নীল চোখে ঘনায় বিস্ময়! চোখ সরে যায়, ফোকর বন্ধ হয়। থমকে যায় বাসুদেব—থমকে যায় যেন তার বুকের ধুকধুকানী! হঠাৎ শব্দ হয় ভেতর থেকে দরজার হুড়কো খোলার। সোজা হয়ে দাঁড়ায় বাসুদেব—দ্রুত তালে আবার চলতে থাকে বুকের স্পন্দন, কপালে ফুটে ওঠে আবার স্বেদের রেখা। একটা শব্দ করে খুলে যায় দরজাটা—ওধারে দেখা যায় নীলনয়না, স্বর্ণকেশী একটি মেয়েকে। উত্তেজিত, উৎফুল্ল বাসুদেব হাত বাড়িয়ে দিল তার দিকে গোলাপগুচ্ছ শুদ্ধ। মেয়েটির মুখে-চোখে ফুটে ওঠে বিস্মিত হাসির রেখা। সুমিষ্ট ফরাসী ভাষায় প্রশ্ন করে—'মঁসিয়ে,আপনি কার জন্যে এসেছেন দয়া করে জানাবেন কি?' হকচকিয়ে যায় বাসুদেব। তাইতো! এতো ফ্রাসোয়া নয়! এযে একেবারে বালিকা! পঁচিশ বছরের যুবতী বলে একে সে ভুল করল কি করে? তাছাড়া সুন্দরী হলেও ফ্রাঁসোয়ার পাঠান ছবির মতন অত সুন্দর মুখতো এর নয়! প্রসারিত হাত গুটিয়ে ফেলে চট্ করে নিজেকে সামলে নেয় বাসুদেব। মাথাটা স্বল্প নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে বাসুদেব তার ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে, আর জানায় সে এসেছে সুদূর ভারতবর্ষ থেকে মাদামোয়াজেল্ বার্দোর সঙ্গে দেখা করতে। তার শিষ্টাচারে খুশী হয় মেয়েটি কিন্তু বিস্ময়ের ভাব লেগে থাকে তার মুখে। আহ্বান জানায় তাকে ভেতরে আসবার জন্যে। পুলকিত অন্তরে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করে বাসুদেব। সামনেই বসবার ঘর। দরজায় তার ঝুলছে একটা ভারী পর্দা, আর তার পাশ দিয়ে উঠে গেছে কাঠের সিঁড়ি দোতলার দিকে। মেয়েটি তাকে বসতে বলে তার নাম জানতে চাইল। বাসুদেব স্পষ্টকরে উচ্চারণ করে তার নাম বলল। মেয়েটি তার ফরাসী উচ্চারণে বার দু'য়েক নামটা আওড়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল।

একটা চেয়ারে বসে পড়ে বাসুদেব। আবার আরম্ভ হল তার সেই উদগ্র প্রতীক্ষা। খালি মনে হচ্ছে এই বুঝি সিঁড়ি দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটে নেবে আসবে ফ্রাঁসোয়া আর ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকে! তারপর? না আর ভাবতে পারে না বাসুদেব। অধৈর্য্য হয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে শুরু করে দেয় সে। পুরাণ আসবাবে সজ্জিত বন্ধ ঘরটার মধ্যে তার যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। টাই-এর বাঁধন একটু আলগা করে দিয়ে সে আবার বসে পড়ে। শাড়ীর প্যাকেট্টা একবার হাতে নিয়ে নামিয়ে রাখে। গোলাপগুচ্ছ নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করে। হঠাৎ মনে হল কেউ যেন নিবদ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে! কিন্তু ঘরে তো কেউ নেই? তবু তার মনে হতে লাগল কেউ যেন তাকে সন্তর্পণে একাগ্র দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে। উঠে দাঁড়াল বাসুদেব। পিছনের দিকে ফিরতেই দরজার ভারী পর্দাটা যেন নড়ে উঠল। চকিতে বাসুদেবএগিয়েযায় আগ্রহ

ব্যাকুল মনে—সরিয়ে দেয় পর্দাটা একটানে! সঙ্গে সঙ্গে সে মুখোমুখি হয়ে পড়ে এক বর্ষীয়সী মহিলার! স্থূলাঙ্গী তার ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে হস্তধৃত লাঠির ওপর ভর দিয়ে, আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন

মহিলাটি চমকে ওঠেন, আর হতচকিত বাসুদেব তার ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতেও ভুলে গিয়ে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে থাকে। পুরু চশমার মধ্য দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে মহিলাটি তার দিকে চেয়ে থেকে তাকে ইঙ্গিতে বসতে বলেন। এবারে সম্বিৎ ফিরে পায় বাসুদেব। তাড়াতাড়ি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিয়ে, বলে "আমি আসছি ভারতবর্ষের কলিকাতা নগরী থেকে, ফ্রাঁসোয়ার সঙ্গে দেখা করতে চাই। তার সঙ্গে কি দেখা করার এখন সুযোগ হবে?" বৃদ্ধা মহিলাটি তার কথার উত্তর না দিয়ে, তাঁর হাতে ধরা কাগজের উপর কিছু লিখে, তাঁর পিছনে দাঁড়ান সেই কিশোরীটির হাতে কাগজটি দিয়ে তাকে কি ইঙ্গিত করলেন। বালিকাটি কাগজটির লেখা পড়ে নিয়ে বাসুদেবের সামনে এসে বলল—"উনি বাক্‌শক্তি হারা, তাই আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারলেন না। আপনি যেন এজন্য কিছু মনে করবেন না। উনি আপনাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলছেন। আপনি দয়া করে আসন গ্রহন করুন। আর আপনার পারির ঠিকানাটিও উনি জানতে চান।" মেয়েটি চুপ করতেই বাসুদেব এখানকার হোটেলের ঠিকানাটা বলে আরও কিছু বলবার উপক্রম করতেই দেখল, বৃদ্ধা তার একাগ্র দৃষ্টি

ওপরে উঠতে লাগলেন। বিস্মিত বাসুদেব আর কোনও কথা বলার সুযোগ না পেয়ে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ঘরের মধ্যে এসে বসে পড়ল।

কেটে গেল বেশ কিছুক্ষণ। সেই মেয়েটির দেখা নেই। ভাবতে থাকে বাসুদেব—ফ্রাঁসোয়ার কি কিছু হয়েছে? সে কি এখানে নেই? ঐ বৃদ্ধাই বা কে? ওর কি কোনও আত্মীয়া বা অভিভাবিকা? কিন্তু ফ্রাঁসোয়া তো এঁর কথা কখনও তাকে জানায় নি। মহিলাটি ওরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতেই বা তাকে লক্ষ্য করছিল কেন? ভেবে ভেবে কোনও কূল কিনারা পায় না বাসুদেব। ফ্রাঁসোয়ার কোনও অজানা বিপদাশঙ্কাও তাকে উদ্বিগ্ন করে তোলে।

পায়ের শব্দে তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। চোখ তুলে দেখে সেই মেয়েটি একটি চিঠির খাম হাতে করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। খামটি তার হাতে দিয়ে মেয়েটি বলল—"কর্ত্রীর শরীর ভাল নয়, তাই আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ আলাপ করতে পারলেন না। আপনি তাঁকে ক্ষমা করবেন। তিনি আপনাকে বিদায় জানিয়েছেন আর এই চিঠি দিয়েছেন। আপনার হোটেলে গিয়ে এটি পড়ে দেখবেন।" কথা কটি বলে চিঠিটা তার হাতে দিয়েই

মেয়েটি সোজা গিয়ে বাহিরের দরজা খুলে দাঁড়াল। অগত্যা বাসুদেবকে তার বিহ্বলতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে এসে দাঁড়াতে হল দরজার কাছে। কিন্তু মেয়েটি তাকে কোনও কথা বলবার সুযোগ দিল না। মিষ্টি হেসে শুভরাত্রি জানিয়েই দরজার পাশে সরে দাঁড়াল। বাসুদেবকেও বেরিয়ে আসতে হল রাস্তায়। দরজাও বন্ধ হয়ে গেল সশব্দে—তার আশা, আকাঙ্খার যেন সমাধি রচনা করে!

স্বল্পান্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাড়ীটার দিকে চেয়ে বাসুদেবের বুক থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। নিজের নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল বাসুদেব, তারপর বিহ্বল ভাবটা কাটিয়ে ফেলে ধীরে ধীরে হেঁটে চলল। হাতে ধরা খামটাকে একবার ভাবলে খুলে ফেলে। কিন্তু রাস্তায় পড়ার অসুবিধে হবে ভেবে সে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার দিকে। মনে তার তখন চিন্তার তরঙ্গ খেলছে। ফ্রাঁসোয়া যে ও বাড়ীতে নেই তা সে বেশ বুঝতে পারছে। সে থাকলে বাসুদেব এসেছে জানলে সে স্থির থাকতে পারত না—ছুটে আসত তার কাছে। কিন্তু ঐ বোবা বৃদ্ধা যেন কেমন রহস্যময়ী—কিছু যেন গোপন করতে সে চায়। কি সে গোপন করতে চায়? ফ্রাঁসোয়াকে কি তার সঙ্গে দেখা করতে দিতে সে চায় না? তাতে তার কি লাভ? ফ্রাঁসোয়ার জীবনে গোপনীয় রহস্যময় কি কিছু আছে?—ভেবে পায় না বাসুদেব। নিজের ওপর তার রাগ হয়। কেন এরকম ছেলেমানুষি করতে গেল। ফ্রাঁসোয়াকে জানিয়ে এলেই তো হত, তাকে ভয়ানক রকম 'সারপ্রাইস্' করতে গিয়েই তো এই রকম হল! এখন একমাত্র ভরসা তার পকেটে রাখা চিঠিটা। ঐ চিঠিতেই হয়ত এই রহস্যের সমাধান আছে।

চলার গতি বাড়িয়ে দিল বাসুদেব। বড় রাস্তায় পড়ে ট্যাক্সির সন্ধানে এদিক ওদিক চাইতে চাইতেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। তার হোটেলের ঠিকানা বলে উঠে পড়ে বাসুদেব। পকেটের চিঠিটা একবার হাত দিয়ে অনুভব করে নেয়। তারপর চুপ করে গা এলিয়ে দিয়ে বসে থাকে বাসুদেব। রাস্তার দু'ধারের সাজান বিপণির দ্রব্যসম্ভার, আলোকজ্জ্বল কাফে-রেঁস্তোরার সারি, আলোকোদ্ভাসিত পথে সুবেশ নর-নারীর ভীড়, আধুনিকতম পোষাকে সজ্জিতা প্রাণোচ্ছল তরুণ-তরুণীদের কলহাস্য—কিছুই আর বাসুদেবের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারছে না যেন। তার স্বপ্ন-নগরী প্যারিসের সব আকর্ষণ যেন তার কাছে শেষ হয়ে গেছে—প্যারিস যেন আজ তার কাছে মৃত!

হোটেলের দরজায় এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। স্বপ্নোত্থিতবৎ বাসুদেব ভাড়া ও বক্‌শিস্ দিয়ে ভিতরে গেল। রিসেপসনিষ্ট-এর স্মিত হাসির প্রত্যুত্তর না দিয়ে, নিরাসক্ত মুখে ঘরের চাবি নিয়ে লিফ্‌টে উঠে পড়ল। চারতলায় তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই খামটা পকেট থেকে বার করল বাসুদেব। একটু স্থির হয়ে নিজেকে সংযত করে নিয়ে খামটা ছিঁড়ে বার করল দীর্ঘ চিঠিটা! কম্পিত আঙুলে চিঠিটা খুলেই অতি পরিচিত হস্তাক্ষর দেখেই বিস্মিত আনন্দে চমকে উঠল বাসুদেব! এ যে ফ্রাঁসোয়ার লেখা—তার পত্রলেখার পত্র! কিন্তু বাড়ীতে থেকেও সে কেন দেখা করল না তার সঙ্গে? তবে কি অন্য কারও সঙ্গে তার ইতিমধ্যে,...কিন্তু তা কি সম্ভব? আর ভাবতে পারে না বাসুদেব। টেবল্ ল্যাম্পটা জ্বেলেই চেয়ারে বসে পড়ে সে, আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করে দেয়।

ফ্রাঁসোয়া লিখছে—

"দেব, প্রিয়তম আমার,

আমার মন বলছে, অশ্রুভারাক্রান্ত আমার এই মন বলছে, এই আমার তোমাকে লেখা শেষ চিঠি! অস্থির হয়ো না প্রিয়, ধৈর্য্য ধরে চিঠিটা সবটা পড়, তাহলেই সব কিছু তোমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের অতৃপ্ত নয়ন আমার তোমাকে আজ দেখে তৃপ্ত হল। ধন্য হলাম আমি, ধন্য হল আমার গৃহ। চমকে উঠলে তুমি? এখনি এতটা উতলা হয়ো না প্রিয়, আরও অনেক বিস্ময় তোমার জন্য সঞ্চিত হয়ে আছে এই চিঠির মধ্যে। চোখ আমার জলে ভরে আসছে ক্ষণে ক্ষণে, হাত কাঁপছে তাই লিখতেও দেরী হচ্ছে। কিন্তু তুমি যে বসে আছ নীচে! কতক্ষণ বসিয়ে রাখব অধীর প্রতীক্ষায় আমার দেব্‌কে, 'দেব'-কে? কিন্তু কি করব বল? চিঠিই যে আমায় লিখতে হবে, কথা বলবার

শক্তি যে আমার নেই—আমি যে বোবা! হ্যাঁ দেব, তুমি যা আশঙ্কা করছ তাই। তোমার ফ্রাঁসোয়া প্রিয়া, তোমার প্রিয়তমা পত্রলেখা হচ্ছে সেই, যে কুরূপা বৃদ্ধাকে একটু আগেই তোমার সামনে তুমি দেখেছো! হ্যাঁ দেব, আমিই সেই বৃদ্ধা!

ঘৃণায় তোমার মুখ কি কুঞ্চিত হয়ে উঠল দেব? ঘৃণা ভরে আমার চিঠিটা কি তুমি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ? না, না, দেব, তা কর না। আমার অনুরোধ, তোমার ফ্রাঁসোয়ার অনুরোধ, তোমার পত্রলেখার শেষ ভিক্ষা—চিঠিটা তুমি দয়া করে সবটা পড়, তারপর আমার সম্বন্ধে যা ইচ্ছা তুমি তাই মনে করবে, আমি তো আর বাধা দিতে যাব না। আমি জানি দেব তুমি এই ভাগ্যহীনার অনুরোধ রক্ষা করবে, কারণ তুমি যে দেব—আমার দেবতা।

এবারে তোমাকে জানাচ্ছি এই অভাগিনীর কাহিনী যা এতদিন সযত্নে লুকিয়ে রেখেছিলাম তোমার কাছ থেকে। পাছে তুমি চিঠি না লেখ, পাছে তোমার বন্ধুত্ব, তোমার অন্তরঙ্গতা, তোমার প্রেমকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে হয় সেই ভয়েই তোমাকে সব কথা জানাতে পারি নি। প্রতারণা করেছি তোমার সঙ্গে, তোমার জীবনকে বইয়েছি অন্য খাতে, হয়ত নষ্টই করেছি তোমার জীবনকে। আমার এ ত্রুটির সংশোধন নেই, আমার এ দোষের ক্ষমা নেই, আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই—তা আমি জানি দেব। আমি অতি স্বার্থপরের মতন কাজ করেছি—আমি স্বীকার করছি দেব, কিন্তু তোমার প্রতি আমার প্রেম, প্রীতি, ভক্তি, ভালবাসা যে অকৃত্রিম তা তুমি জেনো। তোমাকে আমি প্রাণের চেয়ে অধিক ভালবেসেছি এ কথা তুমি বিশ্বাস কর দেব।...হয়ত তুমি হাসছ, ঘৃণাভরে হাসছ এই কপটচারিণী বৃদ্ধার প্রেম নিবেদনে। কিন্তু সত্যি বলছি দেব, তোমাকে প্রেম জানাবার জন্যে এই চিঠি আমি লিখছি না—আমার উদ্দেশ্য সব কিছু আজ পরিষ্কার ভাবে তোমাকে জানিয়ে সংশয় ভারাক্রান্ত তোমাকে মুক্ত করা, আর আমার এত দিনের কপটাচরণে ভারাক্রান্ত মনকে তীব্র অনুশোচনার দহন থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করা।

এবারে শোন আমার কথা—একেবারে গোড়ার থেকেই বলি। বাপ-মায়ের একমাত্র সন্তান আমি। ছেলে বেলাতেই মাকে হারাই। তারপর বাবার কাছেই মানুষ হই। বাবা কাজ করতেন এক সংবাদ পত্রের অফিসে। তাঁর লেখার হাত ছিল ভাল, মাহিনাও ভালই পেতেন। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এবং আমাকে মানুষ করবার চেষ্টা করতেন। ভাল স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়েছিলেন। পড়া-শোনাতেও আমি ভালই ছিলাম। তারপর স্কুল ছাড়বার বয়স হল আমার। স্কুলের শেষ পরীক্ষা হয়ে গেল। এক সহপাঠির সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে। মাঝে মাঝে তার সঙ্গে থিয়েটারের শো-তে, পিক্‌নিকে, নাচের আসরে যেতাম। একদিন তার রেসিং মোটারে করে নাচের আসর থেকে বাড়ী ফিরছি—রাতের প্যারিসের বুকের ওপর দিয়ে রেসিং কার ছুটে চলেছে উদ্দাম গতিতে, হঠাৎ পাশের এক গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একখানা বড় গাড়ী! আমার সঙ্গী ছেলেটি পারল না দুর্ঘটনা এড়াতে—ঘটল প্রচণ্ড সংঘর্ষ! মাথায় ও পায়ে দারুণ আঘাত লেগে সজ্ঞাহীনা হয়ে পড়লাম—দু'দিন পরে জ্ঞান ফিরল হাসপাতালে। ডান পায়ের হাড় ভেঙ্গে গেছে, আর মাথায় প্রচণ্ড আঘাতের ফলস্বরূপ বাকশক্তি লোপ পেয়েছে। সঙ্গী ছেলেটির ঘটনা স্থলেই মৃত্যু হয়েছিল। কয়েকমাস হাসপাতালে থেকে ভাঙ্গা পা জোড়া লাগল বটে, কিন্তু বাকশক্তি আর ফিরল না—সেই থেকে হয়ে গেলাম বোবা! যৌবনের প্রারম্ভেই আমার সব আশা আকাঙ্ক্ষাও যেন হয়ে গেল বোবার মত স্তব্ধ!

সেই থেকে দেব, আমি একাকি, নিঃসঙ্গ, নিস্তব্ধ! আমার সঙ্গী ছেলেটির ঐ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পর থেকে আমার কেমন যেন মনে হত আমিই তার মৃত্যুর জন্য দায়ী এবং আর কারও সঙ্গে মিশতে পারতাম না। তাছাড়া বোবা মেয়ের সঙ্গে কেই বা মিশতে আসবে? বাবা যতদিন জীবিত ছিলেন আমাকে ভাল করবার, সুখী করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর আগ্রহেই আমি বাড়ী বসে বসে জার্মান, ইংরাজী প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করি। কিন্তু বাবারও বয়স হয়েছিল, আর আমার এই অবস্থা তাঁর মনেও হেনেছিল প্রচণ্ড আঘাত। একদিন তিনিও চলে গেলেন এই পৃথিবীতে আমাকে একেবারে একলা রেখে।

বাবা মারা যাবার আগে আমার জন্তে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করে গেছলেন। তাঁর বহু কষ্টে জমান টাকার স্থদ থেকে এবং বসতবাড়ীর পিছনের অংশটুকু ভাড়া দিয়ে আমার মতন একটি প্রাণীর একরকম করে চলে যায়। থাওয়া পরা ও বইপড়া ছাড়া আমার আর কোনও বিশেষ খরচও নেই। মাঝে মাঝে জার্মান ও ইংরাজীতে তর্জ্জমা করেও কিছু কিছু আয় হয়।

এই ভাবেই চলছিল আর চলেও যেত হয়ত শেষ পর্য্যন্ত। কিন্তু বিধাতার বিধানে ঘটে গেল অন্য রকম। একদিন একটি মেয়ে এল আমার কাছে একটি জার্মান ভাষায় লেখা চিঠির তর্জ্জমা করিয়ে নিতে। তারপর প্রায়ই মেয়েটি আসত শুধু তর্জ্জমা করাতেই নয়—জার্মান ভাষায় চিঠিও লিখিয়ে নিত আমাকে দিয়ে, আর শিখতও আমার কাছ থেকে। যদিও সে আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট তবুও সিমোনের সঙ্গে হয়ে গেল বিশেষ বন্ধুত্ব। চিঠি লেখালেখি করত সিমোন একটি জার্মান ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি যখন প্যারিসে এসেছিল তখন দু'জনের ভাব হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি ফরাসীভাষা বুঝত অতি সামান্যই আর সিমোনেরও জার্মান ভাষায় জ্ঞান ছিল ঐ রকমই, কিন্তু তবুও দু'জনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারপর কার্ল জার্মানীতে ফিরে গিয়েও সিমোনকে ভুলতে পারে নি—প্রায়ই চিঠি লিখত তাকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফরাসী ও জার্মান ভাষায়। ফরাসী ভাষায় চিঠি দিলে সে বুঝতে পারবে না বলে, সিমোন আমাকে দিয়ে চিঠিগুলি লিখিয়ে নিত জার্মান ভাষায়। চিঠিগুলি লিখতে হত আমাকে সিমোনের কথা শুনে এবং নিজের ভাষায় প্রেমপত্রাকারে। এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল তাদের গভীর ভালবাসা। তারপর একদিন কার্ল-এর কাছ থেকে আহ্বান এল। সিমোনও সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে হামবুর্গ-এ চলে গেল। তাদের বিবাহের সংবাদ দিয়েছিল সিমোন। তারপর আর তাদের কোনও খবর পাই নি। বিবাহিত জীবনে নিশ্চয়ই তারা সুখী হয়েছে।

যাইহোক, সিমোনের এই পত্র-প্রেমের ঘটনার থেকে আমার মনেও ঐ রকম একটা কিছু করবার বাসনা বেন দানা বাঁধতে থাকে। সেই সময় আলাপ হল তোমার বন্ধু অসীম রায়ের সঙ্গে। অসীম প্যারিসে এসে থাকবার জায়গা খুজছিল। বিজ্ঞাপন দেখে আমার এখানে এল। আমিও ভারতীয় ছাত্রকে সাদরে আহ্বান জানালাম থাকবার জন্য। সুদর্শন, মিষ্টভাষী অসীমকে আমার খুব ভাল লেগেছিল। আমার নিজের কোন ভাই ছিল না। তাকে আমার নিজের ছোট ভায়ের মত মনে হত। তার সঙ্গে মিশে আমার মনে ভারতীয়দের ওপর, বিশেষ করে বাঙ্গালীদের ওপর বিশেষ শ্রদ্ধা ভাব জন্মে ছিল। কথা প্রসঙ্গে একদিন তাকে জানাই তার দেশের কোনও বাঙ্গালী ভদ্রলোক কি আমার সঙ্গে পত্রালাপে রাজী হবে? একটু ভেবে নিয়ে সে তোমার নাম ঠিকানা আমায় দিয়েছিল। আর তোমার গুণের, জ্ঞানের ও স্বভাবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে আমায় বলেছিল, আপনি ওর সঙ্গে পত্রালাপ করে আনন্দ পাবেন। কিছুদিন পরে অসীম প্যারিস থেকে চলে যায়। পরে বিমান দুর্ঘটনায় তার শোচনীয় মৃত্যু সংবাদে স্তম্ভিত হয়ে যাই। আজও অসীমের কথা মনে পড়লে চোখ আমার জলে ভরে ওঠে, দেব। আজও তার স্মৃতিতে তার মৃত্যু দিনে আমি প্রার্থনা করে থাকি।

হ্যাঁ, তারপর যা বলছিলাম, অসীম চলে যাবার পর অনেক ভেবে তোমাকে প্রথম চিঠিটা লিখলাম। তার আগে রোম ও লণ্ডনের দুটি ভদ্রলোকের ঠিকানা পেয়েছিলাম এবং আমার প্রকৃত পরিচয়, বয়স, অবস্থা সব খোলাখুলি ভাবে জানিয়ে, তাঁদের পত্র-বন্ধু হবার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিয়ে ছিলাম। লণ্ডনের ভদ্রলোক দুঃখ প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে আমার পত্র-বন্ধু হওয়া সম্ভব হবে না। আর রোমের ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোনও উত্তর আজ পর্য্যন্ত পাই নি। পাছে তোমার কাছ থেকেও প্রত্যাখ্যাত হই তাই ভেবেচিন্তে প্রতারণার আশ্রয় নেওয়াই ঠিক করলাম। কিন্তু সত্যি বলছি দেব, ভগবানের নামে শপথ করে বলছি তোমার ক্ষতি করবার, তোমাকে দুঃখ দেবার, তোমাকে হতাশ করবার ইচ্ছা—তোমার সামান্যতম ক্ষোভের কারণ হবার অভিপ্রায় আমার একেবারেই ছিল না। যখন তুমি আমার ফোটো চেয়ে পাঠিয়েছ তখনও প্রতারণা করেছি। আমি জানতাম আমার সত্যকার ফোটোগ্রাফ দেখলে তুমি হয়ত আর

আমার সঙ্গে পত্রালাপ করবে না। তাই তোমার কাছে পাঠালাম কার ফোটো জান? সিমোনের! সিমোন সত্যই সুন্দরী। ওরকম সৌন্দর্য্য সচরাচর দেখা যায় না। এখান থেকে যাবার আগে সিমোন আমার প্রতি তার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তার একটা ফোটো আমাকে উপহার দিয়েছিল। সেই ফোটোটাই আমি তোমার কাছে পাঠিয়েছিলাম। যার ফোটো দেখে তুমি ভুলেছিলে, যার মানস-মূর্ত্তির ধ্যানে তন্ময় হয়েছিলে, সে আমি নই দেব, সে সিমোন—যে তোমাকে চেনে না, যাকে তুমিও জান না! আর যার লেখা পড়ে তোমার ভাল লেগেছে সে হচ্ছি এই অকাল বৃদ্ধা, কুরূপা পৌঢ়া ফ্রাঁসোয়া, তোমার 'পত্রলেখা'!

সবই তোমায় আজ পরিষ্কার করে জানালাম দেব—জানালাম হতভাগিনী ফ্রাঁসোয়ার ব্যর্থ জীবনকাহিনী। তোমাকে আর বসিয়ে রাখব না। আমি বুঝতে পারছি তুমি অধৈর্য্য হয়ে উঠছ—সংশয় দোলায় দুলছে তোমার মন, তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া ঠিক নয়; কিন্তু তোমাকে যেতে দিতেও ইচ্ছে করছে না, কারণ আমি জানি তোমাতে আমাতে আর দেখা হবে না—প্রথম ও শেষ দেখা আমাদের হয়ে গেছে। কিন্তু আমি এ রকম চাই নি, স্বার্থপরের মতন চেয়ে ছিলাম তুমি যেন কখনও এখানে না আস—তোমার সামনে যেন আমাকে দাঁড়াতে না হয়। তাই কোনদিন আমি তোমাকে এখানে আসতে উৎসাহিত করি নি। প্যারিস সম্বন্ধে তোমার সমস্ত কৌতূহল মিটিয়ে এসেছি ছবি পাঠিয়ে, বিষদ বর্ননা দিয়ে। আর তোমায় মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে যে আমিই তোমার দেশে যাব, তোমাকে আসতে হবে না। কিন্তু তোমাকে কি আটকে রাখতে পারলাম? সেই তুমি এলে, আমাকে দেখলে, আমার সব কিছুই জানলে! আমার দুর্ভাগ্য আবার আমাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত হানল! তবে আমারও কি কিছু লাভ হয় নি? হয়েছে বই কি। তোমাকে দেখেছি আমি দু'চোখ ভরে। ছবি দেখে তোমার সম্বন্ধে যা ধারণা ছিল তার চেয়ে তুমি অনেক সুন্দর, অনেক কান্তিময়। তোমাকে দেখে দেখে আমার আশা মিটছিল না, কিন্তু প্রতারকের মন নিয়ে তোমার সামনে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারি নি, তোমার সামনে যাবার সাহসও আমার আর নেই।

কিন্তু আর নয়। এবারে আমি শেষ করছি আমার শেষ পত্র—শেষবারের মতন তোমাকে আমার স্নেহ, প্রীতি, প্রেম জানিয়ে।

বিদায় প্রিয়তম বন্ধু, বিদায়—

ইতি,

তোমার

অভাগিনী "পত্রলেখা"।

চিঠি পড়া শেষ হয়ে যায়—নিস্পন্দ বাসুদেব বসে থাকে প্রস্তর মূর্ত্তির মত। মস্তিষ্ক যেন তার ফাঁকা হয়ে গেছে, চিন্তাশক্তি যেন তার লোপ পেয়েছে! হঠাৎ দরজায় করাঘাতের শব্দে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। অবশ দেহটাকে কোনও রকমে তুলে এনে দরজা খুলে দেয়। অপেক্ষমানা পরিচারিকা জানায় ডিনারের সময় প্রায় শেষ হতে চলেছে, মঁশিয়ে এখন খেতে যাবেন কি? স্বপ্নোত্থিতবৎ বাসুদেব বলে রাত্রে সে কিছুই খাবে না। বিস্মিত পরিচারিকা তার রক্তলেশশূন্য ফ্যাকাশে মুখের দিকে চেয়ে উদ্বিগ্ন সুরে জানতে চায়, মঁশিয়ের কি শরীর খারাপ হয়েছে? সামলে নিয়ে বাসুদেব বলে সে বাইরে খেয়ে এসেছে—এখন আর তার ক্ষুধা নেই। পরিচারিকা চলে যায়। বাসুদেব আবার দরজা বন্ধ করে এসে চেয়ারে বসে পড়ে। চিঠিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে খানিকক্ষণ। বড্ড গরম মনে হয়। সামনের ভিনিসিয়ান্ উইণ্ডোটা খুলে দেয়—চোখের সামনে জেগে ওঠে রাতের প্যারিসের আলোকমালা। সারাদিনের কর্মক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে সুন্দরী প্যারিস যেন আলোকে, গন্ধে, পুষ্পে, বসনে সজ্জিতা হয়ে জেগে উঠছে।

নিশ্চল মূর্ত্তির মতন খোলা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বাসুদেব—নির্নিমেষ্ নেত্রে আকাশের গায়ে লেগে থাকা আইফেল্ টাওয়ারের আলোর দিকে চেয়ে থাকে, আর হাতের মুঠিতে তার ধরা থাক পত্রলেখার শেষ পত্র।

হঠাৎ যেন তার চৈতন্যোদয় হয়। ঘরের মধ্যে পায়চারী করে অস্থির পদে, তারপর মনস্থির করে তুলে নেয় ফোনের রিসিভার। রিসেপসন্ কাউণ্টারে জানায় সে কালকেই প্যারিস ত্যাগ করতে চায়। ভারতগামী কোনও প্লেনে যেন তার যাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। আবার এসে দাঁড়ায় জানলার ধারে। প্রাণভরে দেখে রাতের প্যারিসকে—তার স্বপ্ন-নগরী প্যারিসকে, তার কল্পনা-সুন্দরী পত্রলেখার প্যারিসকে।

একটু পরেই বেজে ওঠে ফোনের ঘণ্টা। হোটেলের রিসেপসন্ কাউণ্টার থেকে তাকে জানিয়ে দেয় আগামী কাল সকালের বোম্বাইগামী প্লেনে তার যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তার বিল্ ঠিক করে রাখতে বলে বাসুদেব রিসিভার রেখে দেয়।

চেয়ারটা টেনে নিয়ে এসে জানালার ধারে বসে বাসুদেব। তারকাখচিত আকাশের আর আলোকোদ্ভাসিত পথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে তার মনে খেলতে থাকে চিন্তার লহরী। অদেখা, অচেনা সিমোনের অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর পাশে ভেসে ওঠে ফ্রাঁসোয়ার বার্দ্ধক্যে জীর্ণা, বলীরেখাঙ্কিত স্থূল মুখচ্ছবি। তার সাথে মনে পড়ে যায় ফ্রাঁসোয়ার লেখা অগণিত অপূর্ব্ব চিঠিগুলির কথা। তাদের

লালিত্যে, ভাবের মাধুর্য্যে, প্রেমের প্রকাশে, স্নেহের আতিশয্যে, মনের আবেগে, হৃদয়ের উত্তাপে ভরপুর সেই সব অতুলনীয় পত্রাবলীর কথা মনে পড়ে যায় বাসুদেবের। প্রশ্ন জাগে তার মনে, কাকে সে ভালবেসেছে? সিমোনের ছবিকে, না ফ্রাঁসোয়ার পত্রাবলীকে? ভেবে পায় না বাসুদেব। কিন্তু মনস্থির সে করে ফেলেছে। প্যারিসে আর সে থাকতে পারবে না। ভেঙ্গে গেছে তার স্বপ্নের ঘোর, কেটে গেছে তার বীণার তার।—তার দীর্ঘদিনের স্বপ্ন হল না সম্ভব, মর্ম্মাহত বাসুদেব তাই পালাতে চায় এখান থেকে—প্যারিস থেকে, ইউরোপ থেকে, এখান থেকে বহুদূরে তার নিজের ঘরে সে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে চায়।

* ঁ * ঁ *

ধীরে ধীরে ফুটে ওঠে ভোরের আলো। ছাওয়ার মত দাঁড়িয়ে থাকা আইফেল্ টাওয়ার আলোর পরশে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় তার লৌহশরীর নিয়ে। উৎসব শেষে ক্লান্ত নর্ত্তকীর মত রাত্রের প্যারিসও যেন ঝিমিয়ে পড়ে উষার আগমনে। অনিদ্রা ক্লান্ত বাসুদেবও চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। মুখ হাত ধুয়ে সুটকেশটা ঠিক করে নেয়। আর ফ্রাঁসোয়ার চিঠিটা সযত্নে ভাঁজ করে খামে ভরে পকেটে রাখে। তারপর ধীরে ধীরে নীচে নেমে এসে বসে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে। ব্রেকফাষ্ট শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটার জানায় ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে তাকে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাবার জন্যে। হোটেলের বিল্ ও বক্‌শিশের পর্ব্ব মিটিয়ে, বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে সুটকেশ ও এয়ারব্যাগ্ হাতে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে এসে ওঠে বাসুদেব। কিন্তু তার চোখ পড়ে না রাস্তার ওপারে ল্যাম্পপোষ্টের আড়ালে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলা মুর্ত্তিটির দিকে। ট্যাক্সি ছুটে চলে বিমান বন্দরের পথে।

এয়ারপোর্টে এসে পাসপোর্ট ইত্যাদির ব্যাপার চুকিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় বাসুদেবকে। তারপর ডাক পড়ে প্লেনে ওঠবার। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে অপেক্ষমান বিমানের সিঁড়ির কাছে এসে পৌছায় বাসুদেব, তারপর একবার শেষবারের মত পিছনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্যারিসকে বিদায় জানিয়ে উঠে যায় প্লেনের মধ্যে, বসে গিয়ে জানালার ধারের একটি আসনে। বন্ধ হয় প্লেনের দরজা, সিঁড়ি যায় সরে। একটু পরেই সুতীব্র শিষ-শব্দে গর্জ্জন করে ওঠে জেট্‌চালিত ইঞ্জিন।

আকাশে জমছে মেঘ, বাসুদেবের মনেও। জানলার ধারে ভারাক্রান্ত মনে উদ্‌গত অশ্রুকে যেন রোধ করবার জন্যে মুখে হাত চেপে বসে থাকে বাসুদেব। কিন্তু সে দেখতে পায় না দূরে দাঁড়িয়ে থাকা সেই মহিলাটিকে—তার পত্রলেখাকে। গর্জ্জন করে লাফিয়ে উঠে প্লেন্ আকাশের গায়ে, সাশ্রুনয়নে ঊর্দ্ধ দিকে চেয়ে থাকে ফ্রাঁসোয়া—এক হাতে বুকে চেপে ধরা আছে তার নীল শাড়ীর প্যাকেট আর অর্দ্ধশুষ্ক গোলাপ গুচ্ছ!

দেখতে পায় না দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাটিকে

জানলার কাঁচের ওপর জমছে একটি দু'টি করে বৃষ্টির ফোঁটা, আর জলভরা চোখে সেই দিকে চেয়ে নিথর হয়ে বসে থাকে বাসুদেব বসুরায়।

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ চলচ্চিত্রের চাহিদা ॥

ভারতে নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণ আরম্ভ হয়েছে পঁচিশ বৎসরেরও আগে। সুদীর্ঘ এই কালের মধ্যে ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীও শিল্পীরা নিষ্ঠাভরে ভারতীয় চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য চেষ্টা করে এসেছেন। এতদিনে তাঁদের সে ঐকান্তিক চেষ্টার, নিষ্ঠার, অধ্যবসায়ের সুফল ফলছে। বাংলা চিত্র আজ বিশ্বময় খ্যাতি ও সম্মান লাভ করছে। বোম্বাই-এর হিন্দী চিত্রও কলাকৌশলের দিক থেকে প্রায় পাশ্চাত্য চিত্রের সমতুল্য হতে চলেছে।

ভারতীয় চিত্রের এই উন্নতির জন্য বিদেশে ভারতীয় চিত্রের রপ্তানিও বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে বিদেশে ভারতীয় ছবি রপ্তানির আয়ও যে নির্ভরযোগ্যভাবে বেড়ে চলেছে সরকারী পরিসংখ্যানে সেই তথ্যটিও উদ্ঘাটিত হয়েছে।

১৯৬৪ সালের প্রথম তিন মাসে সর্বাধিক চিত্র রপ্তানি করা হয় এবং তা থেকে উপার্জিত হয় ৭৪ লক্ষ টাকা। গত বছর ঠিক একই সময়ে এই আয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা।

চলচ্চিত্র রপ্তানির আয় ১৯৬১-৬২ সালে ১৪৯ লক্ষ টাকা থেকে ১৯৬৩-৬৪ সালে ২১২ লক্ষ টাকায় উঠেছে। ভারতীয় চিত্রের রপ্তানির সকল কেন্দ্রেই এই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

ভারতীয় চিত্রের এই উন্নতির দিনে ভারতীয় চিত্র-শিল্পের সেই পূর্বসূরীদেরই স্মরণ করা উচিত, যাঁরা শত প্রতিকূলতার মধ্যে—বিঘ্ন, বিপদ, বিপত্তিকে উপেক্ষা করে চিত্র-শিল্পের সাধনায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন—এই শিল্পের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের সাধনালব্ধ ঐকান্তিক চেষ্টার ফলই আজ আমরা ভোগ করছি! তাঁদের মধ্যে অনেকেই হয়ত আজ আর ইহ-জগতে নেই। সেই অমর আত্মাদেরই আজ আমরা শ্রদ্ধাপ্লুত চিত্তে স্মরণ করছি।

* * *

খবরাখবর ঃ

চলচ্চিত্র প্রযোজক সংস্থাসমূহের আন্তর্জাতিক ফেডারেশন ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আগামী জানুয়ারী মাসে নয়াদিল্লীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইবে। পরে ২২শে থেকে ২৮শে জানুয়ারী পর্যন্ত কলিকাতায় এই চলচ্চিত্র সপ্তাহ পালিত হবে।

উৎসবে চলচ্চিত্র প্রেরণের জন্য ৭০টি দেশকে আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। অংশ গ্রহণকারী দেশগুলি একটি করে কাহিনী চিত্র ও একটি করে খণ্ড চিত্র পাঠাতে পারে। ছবিগুলি ১৯৬০ সালের ১লা জানুয়ারীর পর নির্মিত হওয়া উচিত।

প্রতিযোগিতামূলক এই উৎসবে অ-প্রতিযোগী চিত্র প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হবে। তা ছাড়া এই সময় একটি আলোচনা চক্রেরও আয়োজন করা হবে বলে জানা গেছে।

* * *

টোকিওতে ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত যে আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে তা'তে ভারতও অংশ গ্রহণ করছে।

এই চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় ছবি হিসেবে প্রদর্শনীর জন্য নির্বাচিত হয়েছে ভারতের তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয়ের 'ফিল্মস ডিভিসন' কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্য ছবি "মালওয়া"।

* * *

সম্প্রতি লণ্ডনে সত্যজিৎ রায়ের 'দেবী' চিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছে এবং শীর্ষস্থানীয় বৃটিশ চিত্রসমালোচকগণ এই ছবিটির উচ্ছসিত প্রশংসাও করেছেন।

'ডেইলী টেলিগ্রাফে'এর চিত্র-সমালোচক প্যাট্রিক

জ্যোৎস্না বিশ্বাস—অল্প দিনের মধ্যে চিত্র রসিকদের অন্তর জয় করেছেন।

গিবস্ লিখেছেন, সত্যজিৎ রায়ের 'প্রতিটি ছবি স্বাতন্ত্র্য-চিহ্নিত এবং 'দেবী' তার ব্যতিক্রম নয়।

মিঃ গিবস্ আরও লিখেছেন, সত্যজিৎ রায়ের বিশেষত্ব এই যে, তিনিই একমাত্র পরিচালক, ইয়োরোপে যাঁর ছবি নিয়মিতভাবে প্রদর্শিত হয়।

'দি গর্ডিয়ান্'এর সমালোচক আয়ান্ রাইট্ সত্যজিৎ

শর্মিলা ঠাকুর—বাংলা ও বোম্বের চিত্র জগতের সর্ব্বজন স্নেহধন্যা।

য়ের 'দেবী'কে চলচ্চিত্রে এক আশ্চর্য সাহিত্যরূপে খ্যাত করেছেন।

ডেভিড্ রবিন্সন্ ফিনান্সিয়াল্ টাইমস'এ লিখেছেন :

মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় এবং অনুভূতির দিক থেকে শ্রীরায়ের ছবিগুলিতে একটি সার্ব্বজনীন আবেদন আছে, অথচ ভাবে ও ভঙ্গীতে তাঁর ছবি সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়।

"ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রিকাটিতেও 'দেবী' ছবিটির উচ্চ প্রশংসা করা হয়।

* * *

কলিকাতার সিটি ব্যাঙ্ক ক্লাবের একটি বিচিত্রানুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছেন প্রখ্যাতা কোয়েম্বাটুর ভগিনীদ্বয় হেমা ও গীতার ছাত্রী কুমারী গীতা গোপালকৃষ্ণন। সঙ্গীত পরিবেশনরতা কোয়েম্বাটুর ভগিনীদ্বয়কেও দেখা যাচ্ছে।

* * * * *

জাপানের চলচ্চিত্র শিল্পে মন্দা চলছে। এই মন্দা বছরে জাপানে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস পেয়েছে বলে এক আমেরিকান সার্ভে রিপোর্টে প্রতিপন্ন হয়েছে।

এই সার্ভে রিপোর্টে প্রকাশ, ১৯৬০ সালে জাপানে সিনেমা দর্শকের সংখ্যা ছিল ১০,০০০০০০০০; কিন্তু গত মন্দা বছরে জাপানে সিনেমা-দর্শকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫,১১,০০০০০০।

জাপানের চলচ্চিত্র শিল্পকেন্দ্র থেকেও জানা গেছে যে জাপানের চলচ্চিত্র শিল্পের বর্তমানে বড় দুর্দিন চলছে এবং এর প্রধান কারণ হলো টেলিভিশন্।

জাপানে বর্তমানে চলচ্চিত্র শিল্পের এমন দুরবস্থা চলছে যে কয়েকটি ফিল্ম কোম্পানী টেলিভিশন-ছবি প্রযোজনা সুরু করেছে, আর কোনও কোনও কোম্পানী হোটেল বা অন্যান্য ব্যবসা খুলছে।

আমেরিকান সার্ভে রিপোর্টে আরও প্রকাশ, হলিউডেও কিছুকাল আগে চলচ্চিত্র শিল্পে ঠিক এই রকম সঙ্কট দেখা দিয়েছিল; কিন্তু বর্তমানে হলিউড পুনরায় প্রায় সেই আগের মতই অবস্থায় ফিরে এসেছে।

হাওড়ার "নৃত্যম্" সংস্থার একটি অনুষ্ঠানে নৃত্যরতা দু'জন শিশুশিল্পী।

'নৃত্যম'-এর সদস্যগণ পণ্ডিত নেহরুর স্মৃতিতে মৌনতা পালন করছেন। ফটো: রণেন ঘোষ

রঙীন চিত্রের সেন্সারের ব্যাপারে বোম্বাইতে এক নূতন পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ছবির দৃশ্যগুলি প্রথমে সেন্সরের জন্য পেশ করতে হবে এবং সে-গুলো অনুমোদন পেলে তবেই গানের চিত্রায়ণ করা চলবে।

সেই কারণে সুবোধ মুখার্জির ইস্টম্যান্ কলারের 'এপ্রিল ফুল্' ছবিটি সেন্সরের নিকট প্রেরিত হয়েছে। এর দুটি গানের চলচ্চিত্রায়ণ এখনও বাকি আছে।

ছবিটির গানে সুর দিয়েছেন শঙ্কর জয়কিষণ এবং প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন বিশ্বজিৎ ও সায়রা বানু। আগামী অক্টোবর মাসে ছবিটি মুক্তিলাভ করবে।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসু কিছুদিন পূর্বে যখন লণ্ডনের বুস্ হাউস-এ 'বি-বি-সি'-র ষ্টুডিওতে গমন করেছিলেন তখন 'বি-বি-সি'-র বাংলা অনুষ্ঠান "বিচিত্রা"-র প্রযোজক শ্রীবিনয় রায় শ্রীবসুর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে অংশ গ্রহণ করেন। চিত্রে শ্রীবিনয় রায় (বামে) ও শ্রীকেশবচন্দ্র বসুকে দেখা যাচ্ছে।

বোম্বাইয়ের অভিনেতা-পরিচালক সুনীল দত্ত এবারে একখানি নতুন ধরণের ছবি তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন।

চিত্রটির কাহিনী রচনা করেছেন শ্রীমতী নার্গিস, সুনীল দত্ত। ছবিটি তৈরী হবে মাত্র একটি 'সেট'এ এবং চরিত্রও থাকবে মাত্র একটি। সুনীল দত্ত স্বয়ং এই চরিত্রে অভিনয় করছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলি শুধু নেপথ্য কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাবে। সারা ছবিতে মাত্র দুটি গান থাকবে। আর ছবিটি পরিচালনা করবেন সুনীল দত্ত নিজে।

* * *

গতবছরের বহু জনপ্রিয় বাংলা চিত্র 'উত্তর ফাল্গুনী'কে হিন্দীতে রূপায়ণের আয়োজন চলছে। প্রধান দুটি পুরুষ চরিত্রে অশোককুমার ও ধর্মেন্দ্র অভিনয় করবেন। মা ও মেয়ের দ্বৈত-ভূমিকায় সুচিত্রা সেনই রূপ দেবেন। পরিচালনা করবেন অসিত সেন এবং সুর রচনার দায়িত্ব রোশনের।

* * *

উত্তমকুমার ফিল্মস-এর পরবর্তী চিত্র "গৃহদাহ"-র সুটিং সুরু হচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসে। প্রধান তিনটি চরিত্রে অবতীর্ণ হবেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

শরৎচন্দ্রের এই বহুপঠিত উপন্যাসটিকে প্রথম চলচ্চিত্রে রূপায়িত করেন নিউ থিয়েটার্স। তখন এর পরিচালনার দায়িত্বে ও প্রধান চরিত্রে ছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া।

* * *

ইউনাইটেড সিনে প্রডিউসার্সের প্রথম প্রয়াস 'থানা থেকে আসছি' চিত্রটির কাহিনী বিদেশী কাহিনীর ছায়া নিয়ে রচিত। নাটকের প্রধান চরিত্র এক পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর। এই ভূমিকায় উত্তমকুমার রূপ দিচ্ছেন আর অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করছেন মাধবী মুখোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, কমল মিত্র, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, অঞ্জনা ভৌমিক, জহর রায় প্রভৃতি।

* * *

হেমেন গুপ্তর পরবর্তী ছবিটির নাম হচ্ছে 'অনামিকা'। অক্টোবরের প্রথমই এর সুটিং সুরু হবে। ছবির মুখ্য দুই শিল্পী হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকায় থাকবেন রত্না গুপ্তা, পৃথ্বীরাজ কাপুর ও গীতাবলী। হেমন্তকুমার ছবিটিতে সুরারোপ করবেন।

* * *

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও এগারো জন লেখকের লেখা 'রসচক্র' উপন্যাস অবলম্বনে "জয়া" নামের একটি ছবি তৈরী হচ্ছে। পরিচালনা করছেন চিত্ত বসু।

সন্ধ্যারাণী, সাবিত্রী চ্যাটার্জি, মলিনা দেবী, লিলি চক্রবর্তী, অনিল চ্যাটার্জি, পাহাড়ী সান্যাল, তরুণকুমার এবং অনুপকুমারকে এর বিভিন্ন চরিত্রে দেখা যাবে।

শ্রীঅমল সরকার রচিত ও রঙমহলে অভিনীত ঐতিহাসিক নাটক "মসনদে মোগল"-এর একটি দৃশ্যে শ্রীজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী গীতা দেকে দেখা যাচ্ছে।

কাপুরুষ ও মহাপুরুষ এবং সত্যজিৎ রায়

শৈলেশ মুখোপাধ্যায়

কাপুরুষ সে নিশ্চয়ই। অসহায়া নারীর অশ্রু তাকে জাগাতে পারিনি। নির্বাক বিস্ময় স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে—দেহমন বুঝি দুর্বলতায় আচ্ছন্ন। ভবিষ্যতের স্বপ্ন সৌধ বিলীন হয়ে যাচ্ছে—ব্যর্থতায় ভরে উঠছে প্রেমাভিসার তবুও কোন চাঞ্চল্য নেই—নেই পুরুষের দীপ্ত কণ্ঠের প্রতিবাদ।

বাইরে বৃষ্টিঝরা রাত্রি আর ভিতরে বক্ষলগ্না প্রেয়সী —অশ্রুসিক্তা করুণা। তথাপি অমিতাভ মূক—পৌরুষ তাকে বিদায় জানিয়েছে। করুণা ছুটে এসেছে আসন্ন-বিচ্ছেদের বার্তা নিয়ে। করুণার মামা উভয়ের প্রেমানুরাগ সহ্য করতে পারেননি তাই তিনি বদলী হবার আজুহাতে করুণাকে নিয়ে বাইরে চলে যাবার সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছেন।

করুণা মামাকে অস্বীকার করতে চায়। আর্টস্কুল ছেড়ে দিয়ে চাকুরী করবে,—স্বাধীন হবে। শুধু অমিতাভ তার পাশে থাকলে আর কোন চিন্তা নেই কিছু ভাবতে হবে না। করুণা বিদুষী সুন্দরী। বি, এ পাশ করে আর্টস্কুলে পড়ছে। অমিতাভ সবল—সুন্দর যুবক, উচ্চতর অর্থনীতির ছাত্র। কলেজজীবনের পারস্পরিক ভাব-বিনিময় উভয়ের মাঝে যে পূর্বরাগ সৃষ্টি করেছিলো—কল্পনার রঙীন আকাশে যে ইন্দ্রধনু রচিত হয়েছিলো—আজ বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সব কিছু ভেঙ্গে যাবে। ব্যর্থ হবে জীবন সাধনা। করুণা তাই স্থির সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। চাকুরী নেবে—পরাধীনতার হবে অবসান। কিন্তু অমিতাভ যেন দ্বিধাগ্রস্ত। চোখের সামনে বুঝি কুয়াশার ঘন আবরণ। কি করে সম্ভব হবে? রঙীন আকাশে কালবৈশাখীর রুদ্র তাণ্ডব দেখা দেবে। না—না এ হতে পারেনা। মমতাহীন সংসার তাদের ক্ষমা করবেনা।

আর, ডি, বানশাল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত কাপুরুষ ও মহাপুরুষ চিত্রের কাপুরুষ চিত্রাংশে মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

বাস্তবের কঠোরতা চূর্ণ করে দেবে তাদের স্বপ্ন ও সাধনা—করুণাকে অমিতাভ বুঝাতে চায় জলধারা নেমে আসে করুণার চোখে। অমিতাভকে সে বোঝাতে চায়—দুদিন হয়তো সাময়িক অসুবিধা দেখা দেবে কিন্তু পরম আনন্দে সে তা সহ্য করবে। তাইতো আজ এসেছে অমিতাভর কাছে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে, পার্থিব মিলনের মাঝে অপার্থিব প্রেমের পূর্ণ মর্যাদা দিতে। শিশুর মত কেঁদে ওঠে করুণা। অমিতাভ তাকে আরও কাছে টেনে নেয়। প্রিয়তমা নারীর অশ্রু মোছাতে যেয়ে পুরুষের চোখেও জলধারা নেমে আসে অমিতাভও বুঝি কাপুরুষের মত বিচলিত হয়ে ওঠে।

উপরতলার তিনকোণা ঘরখানিতে চলছিলো এই মর্মস্পর্শী নাটকের অভিনয়। অপরিসর হলেও ঘরখানিতে যুবক অমিতাভর ব্যক্তিগত জিনিষগুলি ইতস্ততঃ সাজানো রয়েছে। অর্থনীতির বই খাতা পেন্সিল টেবিলের উপর শোভা পাচ্ছিলো। এ্যাসট্রেতে অর্ধদগ্ধ অনেকগুলো সিগারেট তক্তপোষের অবিন্যস্ত শয্যার উপর দাবাখেলার সরঞ্জাম। ঘরের মাঝে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল অমিতাভর আঁকা ছবি। নিভৃত অন্তরে যে পুরুষ আশ্রয় পেয়েছে—দরদী শিল্পী তার নিপুণ তুলিতে এনেছে তার জীবন্ত প্রতিকৃতি। ছবির উপর 'কে' অক্ষরটি ইংরেজীতে লেখা রয়েছে।

বিচিত্র পরিবেশের এ কাহিনীর উৎস সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ" চিত্রের "কাপুরুষ" চিত্রাংশের প্রযোজনা করছেন প্রখ্যাত চিত্র-প্রযোজক আর, ডি, বনশল। কথা সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত 'জনৈক কাপুরুষের কাহিনী' অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে—'কাপুরুষ'। চিত্রনাট্য রচনা করছেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়।

করুণা ও অমিতাভ রূপে আত্ম প্রকাশ করবেন মাধবী মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নিউ থিয়েটার্স দু'নম্বর ষ্টুডিওতে সেদিন স্যুটিং হচ্ছিল। শিল্পীদের সুষ্ঠু অভিনয় সত্যজিৎ বাবুকে আনন্দ দিয়েছে কারণ তাঁর মুখে দেখলাম পরিতৃপ্তির চিহ্ন। সেদিনের চিত্রগ্রহণ দেখতে এসেছিলেন আর, ডি. বি সর্বাধ্যক্ষ বিমল দে। কর্মব্যস্ত মানুষটি রবিবারের অবকাশকেও প্রশ্রয় দেন নি—একান্ত মনে চিত্রগ্রহণ দেখছিলেন।

স্রষ্টা সত্যজিতের নবতম সৃষ্টি "কাপুরুষ ও মহাপুরুষ।" দুটো পৃথক্ গল্পের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মিত হবে। 'মহাপুরুষ' চিত্রাংশ গড়ে উঠবে পরশুরাম (রাজশেখর বসু) রচিত 'বিরিঞ্চিবাবা' কাহিনীকে কেন্দ্র করে।

চিত্রগ্রহণ সময়ে সত্যজিৎ রায় যেন রহস্যালোকে চলে যান। নিজের তন্ময়তা অন্যকেও প্রভাবিত করে, শিল্পী ও কলা-কুশলীরাও মেতে উঠেন কাজের উন্মাদনায় ধ্যান। গম্ভীর পরিচালকের সৃজনীশক্তি ব্যক্তিস্বাচ্ছন্দ্য ভুলে যায়। সৃষ্টি করে মহৎশিল্প কর্ম। সত্যদ্রষ্টা সত্যজিৎ রায় মহাসত্যের সাধনায় আত্মমগ্ন থাকেন। বিরতির সময় শিল্পী ও কলা কুশলীরা যখন আহার্য গ্রহণ করে সাময়িক অবকাশ আনন্দে মেতে ওঠেন, পরিচালক সত্যজিৎ রায় সেটে বসেই সামান্য আহার গ্রহণ করেন এবং একান্ত মনে পরবর্তী 'শট' এর পরিকল্পনা করেন। কাজের সময় তিনি হয়ত সামান্যতম বিশ্রাম গ্রহণ করতে রাজী নন। এ তাঁর প্রাত্যহিক অভ্যাস। বহুদিন বিভিন্ন সেটে তাঁকে দেখছি অথচ এ অভ্যাসের কখনও ব্যতিক্রম দেখিনি। ব্যক্তিগত আহার্য সম্পর্কে তিনি উদাসীন কারণ কয়েক টুকরো 'স্যাণ্ডউইচ' তাঁর প্রধান খাদ্য। তাও ঐ সময় সেটে অন্য কেউ উপস্থিত থাকলে তিনি ভাগ করে খেতে চান। সেদিন আমি খুবই বিব্রত বোধ করছিলাম। বিরতির সময়ে আলোচ্য মেস ঘরের বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করছিলাম, তিনি আমায় তাঁর আহার্যের অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানালেন। চমকে উঠলাম—তাঁকে উপেক্ষা করবার ধৃষ্টতা আমার নেই অথচ এই কর্মক্লান্ত পুরুষসিংহের ঐ সামান্য আহার্যের অংশ গ্রহণ করতে আমার বিবেক কষাঘাত করছিলো। সৌভাগ্যবশতঃ আমি রক্ষা পেলাম সত্যজিৎবাবুর একান্ত সচিব অনিল চৌধুরীর অহ্বানে। ফ্লোরের দরজা থেকে তিনি আমায় উচ্চকণ্ঠে জানালেন যে টেলিফোন-এ আমায় ডাকছে—দৌড়ে পালিয়ে এলাম।

সত্যদ্রষ্টা সত্যজিৎ রায়, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক। 'চারুলতার' গগন চুম্বী সাফল্যের পর 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' সৃষ্টির মধ্যে আত্মমগ্ন। প্রতিটি ক্ষুদ্রতম জিনিষের প্রতিও তার সজাগ দৃষ্টি। সৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি কোনরূপ আপোষ করতে রাজী নন। মেস্ ঘরের বাস্তব পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি কলকাতা শহরের বিভিন্ন মেস্ পরিদর্শন করে এসেছেন।

'কাপুরুষ' চিত্রাংশের অন্য একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অংশ নিচ্ছেন হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মহাপুরুষ' চিত্রাংশের প্রধান চরিত্রগুলিতে থাকবেন চারুপ্রকাশ ঘোষ, রবি ঘোষ, গীতালি রায় প্রভৃতি। আলোচ্য চিত্রের সুর-সৃষ্টি করবেন পরিচালক স্বয়ং।

'কাপুরুষ' ও 'মহাপুরুষ' বাংলা তথা ভারতীয় চিত্র-জগতে নতুন আলোক শিখা প্রজ্বালিত করবে। মুগ্ধ বিস্ময় চিত্রামোদী জনসাধারণ সত্যজিৎ রায়ের নবতম সৃষ্টিকে অভিবাদন জানাবে একথা নিশ্চিত। বিশ্বের দরবারে ভারতীয় চিত্রের যে মর্যাদা তিনি এনেছেন—'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' সে-আসন আরও দৃঢ় করবে।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

আই এফ এ শীল্ড :

১৯৬৪ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে উঠেছিল দুই পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বী—মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল। খেলাটি শেষ পর্য্যন্ত ১—১ গোলে ড্র যায়। প্রথমার্দ্ধের খেলায় কোন গোল হয় নি। দ্বিতীয়ার্দ্ধের ১৬ মিনিটে ইষ্টবেঙ্গল দলের মৌলিক প্রথম গোল দিয়ে দলকে ১—০ গোলে অগ্রগামী করেন। খেলা ভাঙ্গার নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রায় তিন মিনিট আগে মোহনবাগান' পেনাল্টি কিক্' পায় এবং তা থেকে জার্ণেল সিং গোল করেন (১—১)। এই দিনের খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। খেলার শেষে ইষ্টবেঙ্গল তাঁবুতে জলপানের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে মোহনবাগান-দলের দু'জন খেলোয়াড় একদল উগ্র সমর্থকের হাতে নিগৃহীত হন। 'পেনাল্টি কিক্' সম্পর্কে ইষ্টবেঙ্গল ক্লাব কর্ত্তৃপক্ষ যে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন আই এফ-এর টুর্ণামেণ্ট কমিটি তা অগ্রাহ্য করে পুনরায় ফাইনাল খেলার দিন (শনিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর) ধার্য্য করেছেন।

এই নিয়ে মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে ৭ বার আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল খেলা হল। এই দুই দলের মধ্যে অনুষ্ঠিত পূর্ব্বের ৬টি ফাইনাল খেলার ফলাফল—ইষ্টবেঙ্গল দলের জয় ৪ এবং মোহনবাগানের জয় ১। ১৯৬১ সালে মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দল যুগ্ম বিজয়ী হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৫৯ সালেও মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল দল ফাইনালে উঠে'ছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত খেলা হয়নি।

এই নিয়ে আই এফ এ শীল্ডের ফাইনালে উঠলো মোহনবাগান ১৭ বার এবং ইষ্টবেঙ্গল ১৩ বার। ১৯১২ সালে মোহনবাগান বনাম রাজস্থান দলের শীল্ড ফাইনাল দু'দিন ড্র যায় এবং খেলাটি পরিত্যক্ত হয়। ১৯৫৯ সালে মোহনবাগান বনাম ইষ্টবেঙ্গল দলের শীল্ড ফাইনাল খেলা হয় নি। ইতিপূর্ব্বে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড জয়ী হয়েছে ৮ বার এবং ইষ্টবেঙ্গল ৭ বার।

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দল :

ভারতীয় অলিম্পিক হকি দলের নিউজিল্যাণ্ড সফর শেষ হয়েছে। সফরের ১৪টি খেলার মধ্যে ভারতীয় হকি দলের জয় ১৩টি খেলায় এবং মাত্র ১টি খেলায় (১ম টেষ্ট) পরাজয় ঘটেছে। সফরের খেলার তালিকায় ছিল ৩টি টেস্ট খেলা। প্রথম টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড ৩—১ গোলে জয়ী হয়ে অগ্রগামী হয়। দ্বিতীয় টেস্টে ভারতবর্ষ ৫—১ গোলে জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ১—১ দাঁড়ায়। তৃতীয় অর্থাৎ শেষ টেস্টে ভারতবর্ষ ৮—২ গোলে নিউজিল্যাণ্ডকে পরাজিত ক'রে ২—১ খেলায় অগ্রগামী হয়ে টেস্ট সিরিজে 'রাবার' সম্মান লাভ করে।

মারদেকা ফুটবল :

মালয়ের স্বাধীনতা দিবস উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ৭ম

বার্ষিক মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে ব্রহ্মদেশ ১—০ গোলে ভারতবর্ষকে পরাজিত ক'রে এই জয়লাভের পুরস্কার 'আব্দুল রহমন ট্রফি' পেয়েছে। ব্রহ্মদেশ এই প্রতিযোগিতায় এই প্রথম ট্রফি জয় করলো। ফাইনাল খেলার ৬৫ মিনিটে ব্রহ্মদেশ গোল দেয়।

১৯৬৪ সালের মারদেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী দেশের সংখ্যা ছিল ৯টি। প্রথমে এই ৯টি দেশকে দু'ভাগ ক'রে ('ক' গ্রুপে ৫ ও 'খ' গ্রুপে ৪টি দেশ) লীগ প্রথায় খেলানো হয়। 'ক' গ্রুপে ভারতবর্ষ অপরাজিত অবস্থায় লীগ তালিকায় শীর্ষস্থানলাভ করে। 'খ' গ্রুপে শীর্ষস্থান পায় ব্রহ্মদেশ। ভারতবর্ষ ৪—০ গোলে কম্বোডিয়াকে ২—১ গোলে থাইল্যাণ্ডকে, ৩—২ গোলে জাপানকে এবং ২—১ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত করে। অপর দিকে 'খ' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ান ব্রহ্মদেশ ৩—১ গোলে মালয়েশিয়াকে এবং .—০ গোলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে, পরাজিত করে। ব্রহ্মদেশের পরাজয় ঘটে ২—৪ গোলে ফরমোজার কাছে। গত বছরের রহমন ট্রফি বিজয়ী ফরমোজা ২—৫ গোলে 'খ' গ্রুপের সর্বনিম্ন স্থান অধিকারী মালয়েশিয়ার কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজিত হ'লে ব্রহ্মদেশের পক্ষে 'খ' গ্রুপের তালিকায় শীর্ষ স্থান লাভ সহজ হয়।.

রহমন ট্রফি বিজয়ী দেশ: ১৯৫৮ ও ১৯৫৯ মালয়; ১৯৬০ মালয় এবং কোরিয়া (যুগ্ম বিজয়ী); ১৯৬১ ও ১৯৬২ ইন্দোনেশিয়া; ১৯৬৩ ফরমোজা; ১৯৬৪ ব্রহ্মদেশ।

গিলেট ক্রিকেট কাপ:

ইংল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বার্ষিক নট আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইনালে গত বছরের বিজয়ী সাসেক্স কাউন্টি ক্রিকেট দল ৮ উইকেটে ওয়ারউইকসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দলকে পরাজিত ক'রে 'গিলেট কাপ' জয়ী হয়েছে।

কাউন্টি ক্রিকেট লীগ:

১৯৬৪ সালের ইংলিস কাউন্টি ক্রিকেট লীগ প্রতিযোগিতায় ওরস্টারসায়ার কাউন্টি ক্রিকেট দল লীগ চ্যাম্পিয়ান হয়েছে।

অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল:

১৯৬৪ সালের ইংল্যাণ্ড সফরে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল ৩০টি প্রথম শ্রেণীর খেলায় যোগদান করেছিল। এই খেলার ফলাফল: অষ্ট্রেলিয়ার জয় ১১, পরাজয় ৩ (গ্লামর্গান, ওয়ারউইকসায়ার এবং এসেক্সের বিপক্ষে) এবং খেলা ড্র ১৬।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান দলের পক্ষে ব্যাটিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথমস্থান পান অধিনায়ক ববি সিম্পসন—খেলা ২২, ইনিংস ৩০, নট আউট ৮ বার, মোট রান ১,৭১৪, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান ৩১১ (৪র্থ টেস্ট) এবং গড় ৫৭'১৩। এই তালিকার দ্বিতীয় স্থান পেয়েছেন দলের সহ অধিনায়ক ব্রায়ান বুথ—মোট রান ১,৫৫১, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান নটআউট ১৯৩ এবং গড় ৫৫'৩৯। সফরের প্রথম শ্রেণীর খেলায় অষ্ট্রেলিয়ান দলের এই সাতজন খেলোয়াড় হাজার রান বা তার বেশী রান করেছেন: সিম্পসন (১,৭১৪), বুথ (১,৫৫১), কাউপার (১,২০৭), ও'নীল (১,৩৬৯), লরী (১,০০১), বার্জ (১,১১৪) এবং রেডপাথ (১,০৭৫)।

প্রথম শ্রেণীর খেলায় বোলিংয়ের গড়পড়তা তালিকায় প্রথম স্থান পেয়েছেন নীল হক—১,৬৪৪ রানে ৮ টি উইকেট (গড় ১৯·৮০)। অবিশ্বি দলের পক্ষে সর্বাধিক উইকেট পেয়েছেন গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি— ১,৯৭৬ রানে ৮৮টি উইকেট (গড় ২২·৪৫)। অস্ট্রেলিয়ান দলের পক্ষে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এই আটজন সেঞ্চুরী করেছেন: সিম্পসন (৫টি), লরী (৫টি), ও'নীল (৪টি), বুথ (৩টি), কাউপার (৩টি), বার্জ (৩টি), রেডপাথ (২টি), এবং জার্মান (১টি)— মোট ২৫টি।

ভারতীয় অলিম্পিক দল:

জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে আগামী ১০ই অক্টোবর তারিখে অষ্টাদশ অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধন হবে। এই অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভারতীয় অলিম্পিক দল গঠন করা হয়েছে। ভারতবর্ষ নয়টি অনুষ্ঠানে যোগদান করবে এবং এইভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে: এ্যাথলেটিক্সে ১৩ জন, হকিতে ১৮ জন কুস্তিতে ৮ জন, ভারোত্তোলনে ৩ জন, মুষ্টিযুদ্ধে ২ জন, সুটিংয়ে ৩ জন, সাইকেল চালনায় ৫ জন, জিমন্যাষ্টিকে ৫ জন এবং ডাইভিংয়ে ২ জন।

ডাঃ বি সি রায় শীল্ড :

পশ্চিমবাংলার আন্তঃ জেলা স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে বড় জাগুলিয়া গোপাল একাডেমী (নদীয়া) ৩—১ গোলে কৃষ্ণনাথ কলেজিয়েট স্কুলকে (মুর্শিদাবাদ) পরাজিত ক'রে ডাঃ বি সি রায় শীল্ড পুরস্কার লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে ১৯৬৪ সালের সর্ব্বভারতীয় স্কুল ফুটবল প্রতিযোগিতায় (সুব্রত মেমোরিয়াল কাপ) পশ্চিমবাংলার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা লাভ করেছে।

পশ্চিমবাংলার পক্ষে এপর্য্যন্ত সুব্রত কাপ জয় করেছে ১৯৬১ সালে রাণী রাসমনি স্কুল এবং ১৯৬৩ সালে বাটা-নগর হাইস্কুল।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা :

ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজাদ হিন্দ বাগে অনুষ্ঠিত বাৎসরিক সন্তরণ প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের ১১টি সন্তরণ রেকর্ড ভঙ্গ হয়। মহিলা বিভাগে (জুনিয়র) সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা অপু ব্যানার্জ্জি দু,টি অনুষ্ঠানে (১০০ মিটার ব্যাক স্ট্রোক এবং ১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল) রাজ্য রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

দলগত চ্যাম্পিয়ান

পুরুষ বিভাগ (সিনিয়র)—বি এন রেলওয়ে; পুরুষ বিভাগ (ইণ্টারমিডিয়েট), পুরুষবিভাগ (জুনিয়র) এবং মহিলা বিভাগ (সিনিয়র)—ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন, মহিলা বিভাগ (জুনিয়র)—সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব এবং বালক বিভাগ (১৬ বছরে নীচে)—ন্যাশন্যাল সুইমিং এসোসিয়েশন।

আজাদ হিন্দ বাগে আয়োজিত সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের বাৎসরিক সন্তরণ প্রাতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের চারটি

সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী অপু ব্যানার্জি

সন্তরণ রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী অপু ব্যানার্জি ১০০ মিটার ব্যাকস্ট্রোক এবং ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে নতুন রাজ্য রেকর্ড স্থাপন করেন।

ডেভিস কাপ :

১৯৬৪ সালের ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার ইণ্টার-জোন ফাইনালে অষ্ট্রেলিয়া ৫—০ খেলায় সুইডেনকে পরাজিত করেছে। এই জয়লাভের ফলে অষ্ট্রেলিয়া চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে অর্থাৎ ফাইনালে আমেরিকার সঙ্গে খেলবার যোগ্যতা লাভ করেছে।

ফেডারেশন টেনিস কাপ :

মহিলাদের আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ফেডারেশন কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনালে অষ্টেলিয়া ২—১ খেলায় গত বছরের বিজয়ী আমেরিকাকে পরাজিত করেছে। মহিলাদের এই দলগত আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস প্রতিযোগিতাটি ১৯৬৩ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে।

প্রহ্লাদ গীতা
পাতঞ্জল দর্শন } ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার

ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার ইতিমধ্যেই হিন্দু ধর্মগ্রন্থের অনেক অনুবাদ প্রকাশ করে ধর্মপিপাসু জগতে নিজের আসন তৈরী করে নিয়েছেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রহ্লাদোপখ্যানের বাঙলা অনুবাদকে তিনি প্রহ্লাদ-গীতা নামে অভিহিত করেছেন। পাতঞ্জল দর্শন যোগপ্রণালী বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ব্রহ্মচারীজীর সরল সহজ অনুবাদ ও তার সঙ্গে সঙ্গে অনুধ্যান অতি জটিল বিষয়কেও সহজবোধ্য করেছে। এই সকল অনুবাদ গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্ব সময়েই বাঞ্ছনীয়।

(৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা ১৩ থেকে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। প্রতিটির মূল্য পঞ্চাশ নঃ পঃ)

শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

সাংখ্য-জ্যোতিষ : সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

আলোচ্য গ্রন্থে সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে ভাগ্যগণনার পদ্ধতি ব্যক্ত করা হয়েছে। পাশ্চাত্য ভাবধারায় অবগাহন করে গ্রন্থকার বিষয়বস্তুর ওপর নিজস্ব চিন্তাধারা ও উদ্ভাবনীশক্তির অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। সাংখ্য-জ্যোতিষ বা Numeroolgy প্রাচীন মিশরে প্রচলিত ছিল, বহু শতাব্দী পরে তার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছেন কেরো প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্যোতিষীরা। সংখ্যার ওপর যে মানব জীবনের বিশেষ প্রভাব আছে ভারতবর্ষ সুপ্রাচীন কাল থেকেই অবগত। সংখ্যাকে অবলম্বন করে পার্থিব ও অপ্রার্থিব স্তরে আর্যঋষিরা বিশেষ আলোকসম্পাত করেছেন। তাঁরাই বলে গেছেন যে মানব জীবনে সংখ্যার উল্লেখযোগ্য প্রভাব আছে। ভবিষ্যৎ বিষয়ে গণনা সম্পর্কে হিন্দু-জ্যোতিষীরা সংখ্যাকে বহুকাল আগে প্রাধান্য দিয়েছেন। মাত্র একটি নম্বরের সাহায্যে কি ভাবে প্রশ্ন কর্তার জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুন্দররূপে বলা যায়, সাংখ্য-জ্যোতিষের মধ্যে সে সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকারের বিদগ্ধতা ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া গেল। গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকারের সংখ্যাতত্ত্বমূলক গবেষণা ও অনুশীলন সার্থক হয়েছে। আশা করা যায় জ্যোতিষের প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সাংখ্যজ্যোতিষ পড়ে আনন্দ লাভ করবেন।

[প্রকাশক—শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায় সেকপুরা, মেদিনীপুর। মূল্য—২'২৫ পঃ]

উপাধ্যায়

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১।১০।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কার্ত্তিক—১৩৭১

প্রথম খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | পঞ্চম সংখ্যা

পল্লীকেন্দ্রিক ভারতবর্ষ ও তাহার ত্যাগধর্মী সভ্যতা

শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল

পৃথিবীর আদিভূত সভ্যতার জন্মস্থান—জগজ্জননী, জগৎ-তারিণী, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। এই সভ্যতার মূলে সত্যাশ্রয়ী, সত্যধর্মী তপঃনিষ্ঠ, ত্যাগধর্মী ঋষিকুলের পারমার্থিক স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। তপোবনের শান্ত-স্নিগ্ধ সমাহিত ভাবধারার পরিবেশে ইহার বিকাশ। এই সভ্যতা শাশ্বত ও সনাতন। এজন্য এই সভ্যতা অন্তর্মুখী ও ত্যাগধর্মী। পরাধীন ভারতে এই ত্যাগধর্মী সভ্যতা রাজনৈতিক কোলাহল ও ভোগবিলাস হইতে দূরে পল্লীর নিভৃত অঞ্চলে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। স্বাধীন ভারতেও এই সভ্যতা কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে পল্লীমাতার রিক্ত-বঞ্চিত-শতছিন্ন অঞ্চলে প্রসুপ্ত!

বর্তমান পৃথিবী পাশ্চাত্য ভোগধর্মী সভ্যতার মোহে মুগ্ধ। পাশ্চাত্য সভ্যতা মূলতঃ সহরকেন্দ্রিক। এই সভ্যতার মূলে রাজনৈতিক ক্ষমতালব্ধ কতিপয় মনীষিসৃষ্ট আইন। ইহা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত জীবনের ও তাহার ভোগের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। পারমার্থিক ভাবধারার সহিত ইহা সম্পূর্ণ সম্পর্কবিহীন। এজন্য এই সভ্যতা ভারতীয়-সভ্যতার বিপরীতধর্মী। ভারতীয়-সভ্যতার উন্নতি হইয়াছিল তাহার অধ্যাত্মবাদকে কেন্দ্র করিয়া এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার উন্নতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহার নরজীবন ভোগকে কেন্দ্র করিয়া জড়-বিজ্ঞানের বিস্ময়কর উন্নতির পথে।

পরাধীন ভারতে ভারতীয় ত্যাগধর্মী সভ্যতা আশ্রয়লাভে সমর্থ হইয়াছিল পল্লীবাসী শিক্ষিত, অশিক্ষিত নরনারীর সহজ-সরল-নিরাড়ম্বর জীবনবোধের মধ্যে এবং তাহাকে উদ্দীপ্ত এবং উজ্জীবিত রাখিয়াছিল যাত্রা, কথকতা, লোকগীতি, নানারূপ ব্রত, পূজাপার্বণ এবং তাহার নানাবিধ আচার ও অনুষ্ঠান। পরাধীন ভারতে এইরূপ লক্ষ লক্ষ পল্লীগ্রামে ভারতীয় সভ্যতার দীপশিখা অম্লান ছিল এবং রিক্ততা ও বঞ্চনা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণ ছিল। পরাধীনা ভারতমাতার লক্ষ লক্ষ পল্লীকন্যার একটি পল্লীর কথা আমি এখন বলিব। সেই শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবনের ভাবধারায় সঞ্জীবিত পল্লীর নাম বলিয়া কোন লাভ আজ আর নাই। কারণ, ভারতমাতার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যে লক্ষাধিক পল্লীকন্যা স্বাধীনতার নির্মম পরিহাসে রিক্তা-বঞ্চিতা-দীনা-হীনা-ধর্ষিতা-নিগৃহীতা হইয়াছে—এই পল্লীটি তাহাদের অন্যতমা।

কেন এবং কোন্ অপরাধে ভারতমাতার স্তন্যক্ষরিত পীযূষধারা হইতে এই সকল পল্লীকন্যা বঞ্চিত হইল—এই প্রশ্ন সেই সকল পল্লীবাসীর কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তদশবর্ষ পূর্বেও তাহাদের অসহায় বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ হইতে কোন শব্দ বহির্গত হইত না—শুধু তাহাদের ক্ষোভ ও দুঃখপূর্ণ অশ্রুময়ী বাণী তাহাদের বক্ষঃকে প্লাবিত করিয়া তাহাদের পদতলের মৃত্তিকাকে সিক্ত করিত। কিন্তু আজ সেই সর্বহারাদের চক্ষু হইতে সমস্ত অশ্রুর উৎস বিশুষ্ক হইয়াছে। আজ যদি তাহাদের চক্ষু হইতে কিছু বহির্গত হয় তাহা তাহাদের রিক্ত-বঞ্চিত হৃদয় হইতে সদ্য উদ্গত ও তপ্ত জীবন্ত কয়েক ফোঁটা রক্ত! সুতরাং ঐ প্রশ্ন এই প্রবন্ধে নিরর্থক এবং দুঃখগর্ভ বলিয়া পরিত্যক্ত।

ঐ পল্লীগ্রামটি ছিল একটি আদর্শ ব্রাহ্মণ পল্লী। প্রায় অর্ধ সহস্র ব্রাহ্মণ পরিবারের বাস্তুভূমি ছিল ঐ গ্রামে। দুই চারিঘর ধোবা, নরসুন্দর, দাই, বাজনাদার, সূত্রধর প্রভৃতি যাহা গ্রামবাসীর জীবন ও ধর্ম রক্ষার জন্য নিত্য ও নৈমিত্তিকভাবে প্রয়োজন, তদতিরিক্ত ঐ গ্রামে অন্য কোন জাতির বাসভূমি ছিল না। পূর্বে অধিকাংশ বাড়ীতে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল ছিল—সে স্থানে ছাত্রগণের বিনা ব্যয়ে আহার, বাসস্থান ও শিক্ষা মিলিত। অবশ্য ইংরাজী শিক্ষার আক্রমণে এবং জীবিকার সুযোগ অন্বেষণে ইহার বহু পরিবর্তন হইয়াছিল তথাপি একেবারে নিঃশেষিত হয় নাই। ঐ গ্রামের কেহ জমিদার ছিল না। সকল পরিবারের কিছু কিছু নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর ছিল। সকলের ছিল সহজ-সরল-নিরাড়ম্বর জীবন। 'দেশগুরু ভট্টাচার্য' বলিয়া সেই স্থানে তাহাদের অফুরন্ত সম্মান ছিল। ধন ও পার্থিব সম্পদ তাঁহাদের সামান্য ছিল কিন্তু তাঁহারা দরিদ্র ছিলেন না। অভাববোধের তারতম্যেই দরিদ্রতা। ভোগবিলাসের অভাব একজন কোটীপতিকে দারিদ্র্য দুঃখে ক্লিষ্ট করিতে পারে; আবার ভোগবিলাসত্যাগী একজন ব্যক্তিকে রাজ্যভোগ সুখে সুখী রাখিতে পারে। বাংলার তথা ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক 'বুনো রামনাথ' তিন্তিড়ী পত্রনির্যাসসহ অর্ধপেট আহার করিয়া পরম সুখী ছিলেন। তাঁহার কোন অভাব ছিল না—কি শাস্ত্র বিষয়ে কি পার্থিব সম্পদে। তাঁহার মত পরম ধনী ব্যক্তি বর্তমান ভোগায়তন অর্বুদ কোটীপতিগণের কল্পনার বাহিরে। আমাদের বাল্যকালে ঐ গ্রামে দুই চারিটি ভিন্ন ইষ্টক নির্মিত গৃহ ছিল না। প্রতি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিয়া দগ্ধ মৃত্তিকা দর্শনকে তাঁহারা অশুভ মনে করিতেন। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে গ্রামটি একটি দ্বীপের আকার ধারণ করিত। তখন নৌকা ভিন্ন চলাচল অসম্ভব ছিল। তখন গ্রামবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়গণ নৌকাযোগে শিষ্যবাড়ী গমনাগমন করিতেন—দীক্ষিত শিষ্যগণকে পারমার্থিক বিষয়ে উপদেশ দিয়া এবং অদীক্ষিতগণকে দীক্ষাদান করিয়া তাঁহাদের শিষ্যগণের পরম কল্যাণ করিতেন। সেই সময় শিষ্যগণ তাঁহাদিগকে যাহা কিছু দান করিতেন তাহা তাঁহারা তাঁহাদের বাৎসরিক শারদীয়া পূজায় ব্যয় করিয়া রাজা হর্ষবর্ধনের মত সম্পূর্ণ রিক্ত হইতেন। প্রায় প্রতি গৃহে গৃহদেবতা ছিল। তাঁহাদের বারমাসে তের পার্বণ হইত। সেই গৃহদেবতার ভোগ উপকরণ তাহাদের দৈনিক ক্ষুধানিবৃত্তি করিত। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্মে ভূরিভোজনের ব্যবস্থা সামাজিকভাবে সকলের জন্য তাঁহারা করিতেন। পল্লীসমাজের অলংকার দলাদলি থাকিলেও তাহা গ্রামের মুরুব্বি বা দলপতিগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত। গ্রামবাসী যুবকগণ জাতিধর্ম-দলাদলি নির্বিশেষে গ্রামবাসীর আপদে বিপদে বা শুভকর্মে একপ্রাণ মন লইয়া যোগদান করতঃ নিবিড় আনন্দ লাভ করিতেন। ঐ গ্রামে ইংরাজী

শিক্ষার কোন ব্যবস্থা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত ছিল না। পরে অবশ্য একটি মধ্য ইংরাজী স্কুল এবং পরে তাহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। স্বাধীনতা লাভের সময়ে ঐ গ্রামে এমন কোন পরিবার ছিল না যে পরিবারে কোন স্নাতক ছিলেন না। তথাপি আগে যেরূপ গ্রামে বিদ্যালংকার, ন্যায়ালংকার, তর্কভূষণ, বিদ্যাভূষণ প্রতি গৃহে দুইএকজন থাকিতেন পরবর্তী পর্যায়ে সেইরূপ কাব্যতীর্থ, স্মৃতিতীর্থ, তর্কতীর্থ প্রভৃতির অভ্যুদয় চলিত। মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ ঐ গ্রামের একজন কৃতী বিদ্বান্ পুরুষ। ইংরাজীশিক্ষার প্রবল বন্যা প্রাচীন শিক্ষাধারাকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করিতে সক্ষম হয় নাই।

ঐ গ্রামের প্রথম ইংরাজীশিক্ষিত পুরুষ অনাদিনাথ। স্বগ্রামে ইংরাজী শিক্ষার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহার মাতুলালয়ে ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। ঐ বিদ্যালয়ে তাহার সহপাঠী ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ রায়-বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র। খগেন্দ্রবাবুর সহিত অনাদি-নাথের সকল বিষয়ে প্রতিযোগিতা থাকিত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনাদিনাথ প্রতিযোগী খগেন্দ্রনাথকে অতিক্রম করিতেন। তথাপি খগেন্দ্রনাথ ও অনাদিনাথ অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। অনাদিনাথ যখন ডাফ্ কলেজে বি, এ, পড়িতেন তখন তাঁহার সহপাঠী ছিলেন স্বনামধন্য রাজ-কর্মচারী শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুরেশচন্দ্র ঘটক, শ্রীতারকচন্দ্র রায়। তখন এই চারিটি ছাত্র ডাফ্ কলেজের চারিটি সমুজ্জ্বল তারকার মত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে অনাদিনাথ পল্লীগ্রামের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন এবং যতীন্দ্রমোহন, সুরেশচন্দ্র এবং তারকচন্দ্র ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে অভিষিক্ত হন এবং পরিশেষে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেটপদে কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে শ্রীতারকচন্দ্র রায় ভিন্ন সকলেই স্বর্গত। শ্রীতারকচন্দ্র রায় একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এবং 'ভারতবর্ষের' লেখক-গোষ্ঠীর অন্যতম।

অনাদিনাথ 'ডবল অনার্স' লইয়া বি, এ, পাশ করেন এবং সামান্য বেতনে পল্লীগ্রামের একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড্মাষ্টার পদে ব্রতী হন। তাঁহার অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু খগেন্দ্রনাথ সেই সংবাদ অবগত হইয়া কলিকাতায় একটি প্রসিদ্ধ স্কুলের হেডমাষ্টারীপদ গ্রহণ জন্য অনাদি-নাথকে সংবাদ দেন। অনাদিনাথ ছিলেন পল্লীপ্রাণ। এজন্য তিনি খগেন্দ্রনাথকে পত্রের উত্তরে জানান—কলিকাতায় শিক্ষা দিবার জন্য শিক্ষিত লোকের অভাব কোন দিন হইবে না। পল্লীগ্রামে শিক্ষা দিবার লোকের বিশেষ অভাব। পল্লীর বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিয়া শহরবাসী হওয়া এবং মাতৃভূমি ত্যাগ প্রায় এক কথা। সুতরাং তিনি নিজের পল্লীভবন ত্যাগ করিবেন না। তিনি প্রতিদিন অধিকাংশ শিক্ষাব্রিগণের মতো দু'তিন মাইল পায়ে হাঁটিয়া স্কুলে যাইয়া শিক্ষাদান করিতেন এবং দিনান্তে স্বগ্রামের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাঁহার অটুট স্বাস্থ্য ছিল এবং তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় তাঁহার স্বগ্রামে রণজিৎ (রাজতী) টীমের উদ্ভব হয় এবং তাহার 'এ' 'বি' 'সি' তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। বিভিন্ন গ্রামের মাঠে খেলিয়া তাঁহার দল জয়মাল্য গ্রহণ করে। তাঁহার শিক্ষাদানপদ্ধতি এবং ক্রীড়াশক্তি তদানীন্তন যুবক সমাজে আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার হৃদয় ছিল কুসুমের মত কোমল—অথচ কর্তব্য পরিচালনে বজ্রের মত কঠোর। কর্তব্যরত অনাদিনাথ এবং অবসর-যাপক অনাদিনাথ সম্পূর্ণ দুই বিভিন্ন ব্যক্তি। যাহারা তাঁহাকে এই দুই রূপে দেখিয়াছেন, তাহারা কোন্‌টি তাঁহার প্রকৃতরূপ বুঝিতে না পারিয়া বহু সময় বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তখনকার দিনের পল্লীগ্রামের স্কুলের বেতন ছিল সামান্য। তাহাও সকল মাসে সময়মত প্রাপ্তব্য ছিল না। পল্লীপ্রাণ অনাদিনাথের এই দুঃখবরণ এবং কৃচ্ছ্র সাধন ছিল—বিলাসের নামান্তর। অনাদিনাথ ছিলেন মধ্যম। তাহার জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ অপর দুই ভ্রাতা ছিলেন। তিন ভ্রাতা তাহাদের স্বর্গত পিতৃশ্রাদ্ধে তাহাদের সাধ্যের অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া নিকটবর্তী দশ বার গ্রাম লইয়া যে একটি সমাজ, সেই সমাজের সকল ব্রাহ্মণকে ভূরি ভোজনে পরিতৃপ্ত করেন এবং তজ্জন্য তাঁহাদের পৈত্রিক সম্পত্তির এক বৃহত্তম অংশ পরহস্তগত হয় এবং তাহাদের জীবনে এক চরম আর্থিক সমস্যার সৃজন করে। দুঃখ কষ্টকে পায়ের ভৃত্য করিয়া চিত্তকে নির্ভাবনায় রাখিয়া তিনি

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শিক্ষাদান করিয়া এবং অবসর সময়ে পল্লীর জনগণ মধ্যে নির্মল আনন্দ বিতরণ করিয়া জীবনের পরিসমাপ্তি করিয়া ছিলেন। ভারতের সনাতন শাশ্বত ত্যাগধর্ম তাঁহার মধ্যে মূর্ত ছিল, এ কথা বলা যাইতে পারে।

অনাদিনাথ ছিলেন সহজ-কবি। সময়ে অসময়ে অনেক সুপ্রসিদ্ধ গানের হাস্যজনক অনুকরণ করিতেন। কলিকাতার মেসে থাকিবার সময়ে পল্লীগ্রামের ছাত্রগণের তাহাদের স্ব স্ব গৃহের সংবাদ জন্য উগ্রীব থাকা স্বাভাবিক। এজন্য তাহাদের ডাকপিওনের আগমন প্রতীক্ষা-চাতক পক্ষীর মেঘবর্ষণের প্রতীক্ষার মতো ছিল। এক দিন অনাদিনাথ সুপ্রতীক্ষিত ডাকপিওনের আবির্ভাবে তিনি গান ধরেন—"এস হে পিওন সখা। তুমি ঐ রূপে দাও দেখা, তোমার পায়ে নাগরাই জুতা হে!" অনাদিনাথ স্বয়ং খুব ভাল গান করিতে পারিতেন না। এজন্য গীতিকণ্ঠ কেহ সঙ্গে থাকিলেই তাহার কবিত্বের সুপরিস্ফুরণ হইত।

একদিন তিনি স্কুলের কার্যশেষে দিনান্তে তাঁহার স্বগ্রামে ফিরিতে ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে ছিলেন তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পর্কীয় পঞ্চানন। পথে তাঁহার যজমান ধনী গিরিধর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা। তিন জনে পথ চলিতেছেন এমন সময় অনাদিনাথ দেখেন—পথিপার্শ্বের একটি গৃহের সম্মুখে একটি পরিপুষ্ট ছাগবৎস খুঁটার সহিত বদ্ধ। দেখিয়া তিনি সেখানে দাঁড়াইয়া পঞ্চাননকে ডাকিয়া তাহার কানে একটি সুপ্রসিদ্ধ গানের সুর বলিয়া নিজের গানের পদ বলিতে লাগিলেন এবং পঞ্চাননের গান চলিতে লাগিল—

> কে তুমি হে পশুবর! আছো সুখে দাঁড়িয়ে
> খুঁটাতে আবদ্ধ তনু লেজে "হাগড়া" জড়াইয়ে।
> (হাগড়া একরূপ বন্যফল)
> তুমি সিংহ নহ, ব্যাঘ্র নহ, হস্তী নহ, মহিষ নয়
> তুমি সিংহের মামা ভোম্বল দাস, তুমি শুধু খাও
> ঘাস খাটো পুচ্ছ নাড়িয়ে।
> মানবে অসাধ্য যাহা, তোমাতে সুসাধ্য তাহা
> আহামরি! আহা! আহা। হাগো (কবিরাজী)
> বড়ী পাকাইয়ে।
> তোমার মাংস সদ্য সদ্য রন্ধনে পাতে পড়ে অস্ত
> কি ছার দেবতা ভোগ মণ্ডা মিঠাই হারাইয়ে।
> তোমা পেলে গিরিধর, করবে অতি সমাদর—
> লভিবে অসীম পুণ্য ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়ে॥

গানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য গিরিধরবাবুর বুঝিতে দেরী হইল না। তৎক্ষণাৎ তিনি নগদ মূল্যে ছাগবৎসটি কিনিয়া লইলেন এবং সেই রাত্রেই অনাদিনাথ সহ কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকে সমাংস আহার্য দানে পরিতৃপ্ত করিলেন।

সেই গ্রামের অঘোরচন্দ্র কাব্যতীর্থ একজন সুপ্রসিদ্ধ যাত্রা-নাট্য লেখক। তাঁহার প্রায় শতাধিক নাটক বিভিন্ন যাত্রাদলে প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছে। তিনি কলিকাতা ব্রাহ্মবয়েজ স্কুলে সংস্কৃতের প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন। প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার সময়ে তাঁহার গ্রামের ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকগণ কর্তৃক তাঁহার প্রণীত নূতন কোন নাটকের অভিনয় হইত। পল্লীগ্রাম সেই সময় যাত্রামোদে উৎফুল্লিত থাকিত। অঘোরচন্দ্র সকল ছুটিতে অর্থাৎ গ্রীষ্ম, পূজা ও বড়দিনের বন্ধে স্বগ্রামে আসিতেন। সেই সময় তাহার বাড়ীতে সকাল-সন্ধ্যায় একটি মজলিস বসিত—সে মজলিস্ দিনে দ্বিপ্রহর ও রাত্রেও তদ্রূপ সময়ে ভঙ্গ হইত। ঐ সময়ে এই স্থানে নানা সাহিত্য ও কবিতার সমালোচনা ও নানাবিধ হাস্যরসের অবতারণাও হইত। অঘোরচন্দ্র নিঃসন্তান ছিলেন। এজন্য গ্রামের যুবকবৃন্দ তাঁহার মাতা ও পত্নীর স্নেহের অধিকারী ছিলেন। একদিন পঞ্চানন গোপনে অনাদিনাথকে জানাইলেন—অঘোরচন্দ্রের বাড়ীতে তাঁহার এক শিষ্য একটি বড় কাঁঠাল দিয়া গিয়াছে। গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ। অঘোরচন্দ্রের গৃহ সম্মুখের বারান্দায় মজলিস্ বসিয়াছে, এমন সময় পঞ্চানন সহ অনাদিনাথের আগমন এবং সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চাননের গান এবং অনাদিনাথের পদসংযোগ—গানটি একটি প্রসিদ্ধ গানের প্যারোডি।

> "এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু গন্ধ পেয়েছি।
> গন্ধ পেয়ে জিভে জল ছেড়ে দিয়েছি।
> শুনেছি তার গা ভরা কাঁটা তার বোঁটাতে আঁঠা
> বল মাউই! তারে এনে ভেঙে দেবে কি?

অঘোরচন্দ্রের বৃদ্ধা মাতা বিব্রত হয়ে বললেন—"ওটা ভাল পাকেনি! কেন আজই নষ্ট করবি?"

প্রত্যুত্তরে গান চলিল—

গ্রীষ্মের কাঁঠালের ঐ এক ধারা।
বাহিরে কাঁচা দেখালেও, ভিতরে পাকা সারা
ভেঙে দেখ মাউই! সব রোঁয়া রসে ভরা
গরম গরম মুড়ি সহ খেতে দিবে কি?

দেখিতে দেখিতে গ্রামের অনেক যুবক ও কিশোর সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সকলের সমবেত আগ্রহে সেই বৃহদাকার কাঁঠালটির সদ্ব্যবহার সম্পূর্ণ হইল। অনাদিনাথ তৎকালীন এমন কোন প্রচলিত গান ছিল না যাহার প্যারোডি তিনি মুখে মুখে করেন নাই। সেগুলি সংগ্রহ ও রক্ষার কোন ব্যবস্থা না থাকায় তাহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে। ঐ পল্লীর অন্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়। তিনিও একজন ত্যাগনিষ্ঠ আত্মভোলা কর্মী।

উপযুক্ত গৃহে উপযুক্ত সময়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অনাদিনাথের অসাধারণ। গ্রামের চক্রবর্তী বাটীতে নূতন জামাতা আসিয়াছে। চক্রবর্তী পরিবারের অবস্থা স্বচ্ছল। পুকুর হইতে বৃহদাকার কয়েকটি রোহিত মৎস্য ধৃত হইয়াছে এবং বৃহদাকার এক খাসী ছাগল বিষ্ণুপূজায় আত্মদানে বাধ্য হইয়াছে—নানারূপ চর্বচোষ্য লেহ্য পেয়ের সুব্যবস্থা হইতেছে। এই সংবাদ দাবানলের মতো গ্রামবাসিগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইল। অনাদিনাথ সবে মাত্র তাঁহার কর্মস্থল হইতে স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন। গ্রামের কয়েক ভোজন-রসিক যুবক অনাদিনাথকে অনুরোধ করিলেন—আজ রাত্রে চক্রবর্তী বাটীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধে অনাদিনাথ কর্তব্য স্থির করিয়া যুবকবৃন্দকে সমস্ত পরামর্শ দান করিলেন এবং তাহাদিগকে যথাস্থানে যথাকর্তব্য কি বুঝাইয়া দিলেন। কোনো বাড়ীতে নূতন জামাতা বা কোন অভ্যাগত কেহ আসিলে গ্রামবাসিগণের তাহাদের সহিত পরিচিত হইবার জন্য আগমন করিবার রীতি গ্রামে বর্তমান। অনাদিনাথ তাহার সঙ্গী দীনবন্ধু জ্যোতিঃশাস্ত্রী সহ চক্রবর্তী বাটীর দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। তখন সন্ধ্যা প্রায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। চক্রবর্তীদের বাড়ীটি বহুবিস্তৃত। সম্মুখ দিকে সামান্য কিছু ঝোপ জঙ্গল আছে। তাহার কাছে আসিয়াই অনাদিনাথ "কিসে কামড়াইল" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—চক্রবর্তী বাটির বহির্বাটীর অঙ্গনে অনাদিনাথ বসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধু তাঁহাকে কোলে করিয়া "সাপ্ সাপ্" চীৎকার করিলেন। দেখিতে দেখিতে যে যেখানে ছিল সে স্থান হইতে সকলে ছুটিয়া আসিল। অনাদিনাথের পায়ে দুই বিন্দু রক্ত রেখা, পায়ে তাগা বাঁধা হইল। অনাদিনাথ মূর্ছিত। গ্রামের ওঝা আসিল—ঝাড়ফুক্, মন্ত্রোচ্চারণ, সর্ষে-পোড়া চলিতে লাগিল। সকলের মুখে হায় হায় শব্দ। যুবকদল লাঠি সোটা লইয়া জঙ্গল পিটাইতে ব্যস্ত। অনাদিনাথকে বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপ গৃহের বারান্দায় একটা শয্যায় শয়ন করান হইল। গ্রামে সর্পভয় অত্যধিক। এজন্য অনেক বাড়ীতে সর্পের ঔষধ 'লেক্সিন' থাকে। তাহা ক্ষত স্থানে দেওয়া হইল। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে অনাদি চক্ষু উন্মীলন করিয়া আবার চক্ষু মুদিলেন। সকলের মুখেই আশার ভাব দেখা গেল। আর ভয় নাই! ও দিকে এক বিষম কাণ্ড। চক্রবর্তী বাটির পরিবারবর্গ সকলেই বহির্বাটিতে আসিয়াছিলেন। রন্ধনগৃহের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। রন্ধন গৃহ হইতে সমস্ত মাংস অন্তর্হিত হইয়াছে। এদিক ও-দিক দুই একখণ্ড পড়িয়া আছে। চক্রবর্তী বাটির রন্ধনগৃহের পশ্চাতে একটি প্রকাণ্ড জঙ্গল। রাত্রে প্রতিদিন শৃগাল ডাকে। সুতরাং সকলের ধারণা হইল, শৃগাল কর্তৃক সমস্তই ভক্ষিত হইয়াছে। অনাদিনাথের ওখানে তখনও বহুলোক। শৃগাল কর্তৃক সমস্ত মাংস ভক্ষিত হইয়াছে অনাদিনাথ শুনিলেন। অতিক্ষীণস্বরে বলিলেন তাহার ভাগ্যদোষে চক্রবর্তী পরিবারের এই ক্ষতি হইল। অনাদিনাথ ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—পার্শ্ববর্তী কোন গ্রাম হইতে আর একটি খাসী চেষ্টা করিতে এবং তাহার মূল্য তিনি দিবেন। বলাবাহুল্য এক ঘণ্টা মধ্যেই পূর্বমত মাংস সংগৃহীত হইল। অনাদিনাথের অমূল্যজীবন রক্ষা পাইয়াছে ইহাও পরম আনন্দের বিষয়। চক্রবর্তী পরিবার অনাদিনাথের পিতার যজমান ছিলেন এবং তৎকালে অনাদিনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতাই যাজনিক ক্রিয়া করেন—এজন্য চক্রবর্তীপরিবারের সকলেই মহা উদ্বিগ্ন ছিলেন। সকল দিক রক্ষা পাওয়ায় যুবকবৃন্দের মুখে আনন্দের ধ্বনি উত্থিত

হইতে লাগিল, অতিরিক্ত একটি খাসা সংগৃহীত হইল। পুকুর হইতে আরো মৎস্য ধৃত হইল। আনন্দে চক্রবর্তী মহাশয় যুবকবৃন্দকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। পরে অবশ্য অনাদিনাথের সর্পাঘাত-অভিনয় নিমন্ত্রণ-গ্রহণের একটি ফাঁদ ইহা প্রকাশ পাইতে বিলম্ব হইল না। সেই রাত্রে গ্রামের যুবকবৃন্দ ভূরিভোজে পরিতৃপ্ত হইলেন। আনন্দ উৎসব হাসি তামাসা গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলিল। উপযুক্ত সময়ে এরূপ নিমন্ত্রণ গ্রহণ গ্রামবাসিগণের পক্ষে দোষাবহ ছিল না। কারণ নিমন্ত্রণকারী পরিবার এরূপভাবে নিমন্ত্রণ করিবার সৌভাগ্যলাভে পরম পরিতৃপ্ত হইতেন। আমাদের বাল্যকালে দেখিয়াছি—কোন বাড়ীতে নূতন জামাই আসিলে গ্রামের প্রায় সমস্ত গৃহেই তাহার নিমন্ত্রণ হইত এবং জামাই দেখিতে আগন্তুক সকলেই জামাতাবাবাজীর সঙ্গে আহারে পরিতৃপ্ত হইতেন। তাহার ফল হইত নিমন্ত্রণকারী পরিবারের অনেকেই শেষ পর্যন্ত অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত থাকিতেন বা যৎসামান্য বস্তু দ্বারা উদরপূর্তি করিতেন। পাশ্চাত্যপ্রথায় নিমন্ত্রণকারী ও নিমন্ত্রিতগণের একসঙ্গে আহার বিধি। কিন্তু প্রাচ্য প্রথায় নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তি সর্বশেষে আহার করেন। নিজে অনাহারী থাকিয়া অপরকে ভোজনে তৃপ্তিদান ভারতীয় ত্যাগধর্মী প্রথা। সামাজিক ক্রিয়া-কর্মে বর্তমানে এই প্রথা চলিতেছে। এরূপ অনাহারবিলাসে পল্লীবাসিগণের আনন্দের উৎস থাকিত।

আমি যে পল্লীগ্রামের কথা বলিতেছি—সে গ্রামে ছিলেন ভোজনরসিক স্বনামধন্য পুরুষ আধমণী কৈলাস। পরিপূর্ণ আহারের পর তিনি অর্ধমণ মিষ্টান্ন আহার করিতে সক্ষম ছিলেন এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিপাক করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য রক্ষা করিতেন। অতিরিক্ত আহার তখনকার দিনে পল্লীগ্রামে অসম্মানের বিষয় ছিল না। আধমণী কৈলাসের গ্রামে 'পাঁচসেরী' 'দশসেরী' ভোজন-রসিকের অসদ্ভাব ছিল না। কোন ক্রিয়াকর্মের বাড়ীতে তাঁহারা একসঙ্গে একদিকে আহারে বসিতেন। এজন্য সেই গ্রামে "পূর্বসারি"র প্রসিদ্ধি ছিল। ঐরূপ তদানীন্তন খুলনা জিলায় "আড়ংগড়া" গ্রামের মধ্যসারির প্রসিদ্ধি ছিল। এরূপ আহার দেখিবার জন্য তখনকার দিনে বহুজনসমাগম ও বহুনিমন্ত্রণী সমাগত হইতেন। বর্তমানকালে বিশুদ্ধ আহার্য বস্তু সংগ্রহ করা যেরূপ অসম্ভব, পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার মোহে সকলেই আত্মকেন্দ্রিক ভাবাপন্ন হওয়ায় ভোজনরসিকগণের সম্মান বিলুপ্ত হইয়াছে।

এই গ্রাম্যজীবনে যেমন এক দিকে আহার বিহারে একটি সার্বজনীনভাব বর্তমান ছিল, নিত্য নৈমিত্তিক পূজা অর্চনার মধ্যেও সার্বজনীন ভাব ছিল। "সকলে আমরা পরের তরে" এই মহাবাক্যের মূর্তস্থান ছিল ভারতের পল্লীগ্রাম। ভারতবর্ষের সাধকগণের জন্মস্থান এই পল্লী-মাতার নিভৃত প্রদেশে। আমি যে আদর্শ-স্থানীয় একটি পল্লীগ্রামের কথা লিখিলাম সেই গ্রামের একটি কন্যা শ্রীশ্রীকাশীধামে যাইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি গত ১৩৫০ সালে ১২ই বৈশাখ তারিখে মরদেহ ত্যাগ করিয়া পরমপদে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। বর্তমানে কাশীধামে তাঁহার মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নিত্য পূজাঅর্চনা চলিতেছে। তাঁহার সাধন জীবনে তাঁহার শরীরে নানা দেবদেবীর মূর্তি এবং নানা মন্ত্র ও বীজের প্রকাশ হইত। এই অদ্ভুত কায়ভেদী প্রকাশ অনেকে তাঁহাদের বাহ্যচক্ষে দেখিয়াছেন। সাধকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপী-নাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার ভূমিকাসহ "শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রসঙ্গ" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তক-প্রকাশিকা গ্রন্থকর্ত্রী শ্রীমতী রাজবালা দেবী ১৯৪নং গণেশমহল্লা বেনারস এ থাকেন।

পল্লীপ্রাণ অনাদিনাথের তেজস্বিতার একটী ঘটনা উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি যখন যশোহর জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশা ডি, সি, ইন্‌ষ্টিটিউসনের হেডমাষ্টার তখন তদানীন্তন ডিভিসনাল্ ইন্‌সপেক্টর স্কুল পরিদর্শনে আসেন। ইন্‌সপেক্টর খাঁন্ সাহেব হেডমাষ্টারের নিকট যেরূপ বিনয় এবং জো-হুকুম মনোভাব আশা করিয়াছিলেন তাহা না পাইয়া তাহার নানা কার্যে নানা দোষ ত্রুটির উল্লেখ করিতে থাকেন। অনাদিনাথ তাহার স্বভাবসুলভ নম্রতায় অকুণ্ঠ তীব্র ভাষায় প্রতিকথার প্রতিবাদ জানাইয়া যান। ইন্‌সপেক্টর সাহেব অবশেষে বিরক্ত হইয়া পরিদর্শন পুস্তকে স্কুলের হেডমাষ্টার সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য লেখেন। ইন্‌সপেক্টর সাহেবের মন্তব্যে ইংরাজী ভাষায় ব্যাকরণঘটিত কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ থাকায় তাহা অনাদিনাথ সাহেবের গোচরীভূত করিলে,

তাহা সাহেবের ক্রোধাগ্নিতে ঘৃতাহুতি স্বরূপ হয়। ইহার ফলে স্কুলে যে সরকারী সাহায্য ছিল তাহা বন্ধ হইয়া বিদ্যালয়টি দুর্দশার সম্মুখীন হয়। স্কুলের কর্তৃপক্ষ অনাদিনাথকে তাহার ত্রুটি স্বীকার করিয়া ইন্‌সপেক্টর সাহেবের মনোরঞ্জনের নির্দ্দেশদান করেন। অনাদিনাথ পদত্যাগ বাসনা প্রকাশ করিলে স্কুলের ছাত্রগণ তাঁহার পদত্যাগের বিরুদ্ধে একযোগে দণ্ডায়মান হয়। ইহ'তে স্কুলটি ভাঙ্গিবার উপক্রম হয়। তৎকালীন সম্পাদক মহাশয় তখন পদত্যাগ করেন। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল মহাশয় সম্পাদক পদ গ্রহণ করেন। স্কুলের ঘাটতি পূরণ জন্য চাঁদা গ্রহণ করা হয় এবং অনাদিনাথ স্বয়ং স্বপ্রণোদিত হইয়া তাঁহার বেতনের অর্দ্ধেক প্রতিমাসে চাঁদা দিতে থাকেন। একজন শিক্ষকের পক্ষে এরূপ স্বার্থত্যাগ সত্যই অতুলনীয়। তাঁহার মত উপযুক্ত একজন শিক্ষাবিদকে পাইলে পার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্কুল ধন্য হইত। ইনসপেক্টর সাহেব অনাদিনাথের এইরূপ স্বার্থত্যাগের সংবাদ পাইয়া অনুতপ্ত হন এবং পুনরায় স্কুল পরিদর্শন করিয়া সরকারী সাহায্যের পুনঃ প্রবর্ত্তন করেন।

অনাদিনাথের মতো পল্লীপ্রাণ শিক্ষাবিদ যে পল্লীতে জন্ম গ্রহণ করেন সেই পল্লী ধন্য। সেই পল্লীগামের প্রায় সকল গ্রামবাসী আজ উদ্বাস্তু হইয়া ভারতমাতার স্বাধীনতার পাদমূলে বিক্রীত! তথাপি খণ্ডিত ভারতের অখণ্ড সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক ইহা ভগবৎ চরণে প্রার্থনা। ওঁ শুভমস্তু ওঁ।

ফিরায়ে দিয়েছি যারে

মন্দাকিনী ভাদুড়ী

কত জন মোর দুয়ারে এসেছে ফিরায়ে দিয়েছি হায়,
অনুরোধ অতি তুচ্ছ তাদের রাখিতে পারিনি তায়।
কেহবা চেয়েছে এক মুঠো ভাত, বলেছি হবেনা ভাই,
খাওয়া দাওয়া সব মিটে গেছে দেখ হেঁসেলে কিছুই নাই।
পুরান বস্ত্র লাগি কোন জন আসিয়াছে কাছে মম,
বলেছি, হবেনা এবে যাও তুমি, হয়েছি পাষাণ সম।
হয়ত কেহবা কোন দিন এসে মেগেছে থাকিতে ঠাঁই,
বলিয়াছি তারে, অকুলান স্থান কোথা বল ঘর পাই।
পড়ার খরচ চেয়েছে বালক করুণ আঁখিটি মেলি,
মিথ্যা বলেছি, ক্ষমা নাই যার, হেটমুখে গেছে চলি।
চাকরীর তরে হয়ত বেকার এসেছে তরুণ ছেলে,
খালি নাই পদ, ফিরায়েছি তারে, গেছে'ছ চলিয়া গেলে।
যদি কেহ এসে বিপদে পড়িয়া চেয়েছে অর্থ ধার,
অমনি সরিয়া পড়েছি তখন, মুখটি করিয়া ভার।
আপদে বিপদে স্বজন বন্ধু সেবা আসিয়াছে কাছে,
এড়িয়ে গিয়েছি স্বার্থে আমার আঘাত লাগে বা পাছে।
সেই সব ঋণ এখন আমার অনেক হ'য়েছে জমা,
শোধ করিবার শক্তি কোথায়, করো সবে মোরে ক্ষমা।
বুঝিনি তখন বারে বারে নাথ তুমি গেলে ফিরে ফিরে,
তাইতো এখন সদাই আমি যে ভাসি নয়নের নীরে।

এ জীবনে কভু আপন করিনি ফেলিয়াছি দূরে যারে,
সমবেদনায় বুকের মাঝারে টেনে যেন নিই তারে।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

তেইশ

রমাকে আশীর্বাদ করে সাধুজি নমিতাকে রমার কাছে রেখে ফিরে গেলেন দেহুতে। আলোক নিয়ে গেল তাঁকে মোটরে। দেহুর পুণ্যসলিলা ইন্দ্রায়ণী নদীতে স্নান ক'রে ওদের দুজনের মনের তাপ জুড়িয়ে গেল। সাধুজির ঘরে এসে বসতে সাধুজি বললেন: "আজ আর তর্ক প্রশ্ন আলোচনা নয় বাবা। আশ্রয় মেলে শুধু ভজনে, নাম গানে, তাঁর শরণ নিলে। গাও শুধু আত্মসমর্পণের গান। ধরো ফের নমিতার বাঁধা ঐ গানটি—ওর গান বড় সুন্দর। মেয়েরা সহজেই চলে হৃদয়ের হুকুমে। বড় প্রাণস্পর্শী ওর সেই গানটি, যেটি রমা সেদিন ওর সঙ্গে গাইছিল—'তমসা যখন ছেয়ে আসে।' গানটি হচ্ছে যাকে তোমরা সাহেবরা বলো authentic."

আলোকও এ গানটি বড় ভালো বাসত। আজ মনটাও ওর ভার ছিল রমার কথা ভেবে—তাই গান জ'মে উঠল দেখতে দেখতে—শুধু সুরেলা হ'য়ে নয়, ভজন হ'য়ে:

"তমসা যখন ছেয়ে আসে
অকূলে জপিতে যেন পারি:
'সে আমারে বাসে, ভালো বাসে,
রবো আমি তারি অভিসারী।'

শৈল তাহার দুর্গম,
কালোয় আলোক মুখ ঝাঁপে,
তবু সবি নয় ছায়া-ভ্রম
অপার-বাঁশরী প্রাণে কাঁপে।

গায় সে: 'অচিন পাথারে যে
দেয় ঝাঁপ স্মরি' কাণ্ডারী,
না জেনেও জানে আঁধ'রে সে
সুধাও ক্ষুধার অভিসারী।'

গানের শেষে সাধুজি অনেকক্ষণ ভাবসমাধিতে মগ্ন থেকে একদৃষ্টে তাঁর ঘরের সামনে তুকারামের ছবির দিকে তাকিয়ে রইলেন। পরে হঠাৎ বললেন, "তুকারাম আমার আদর্শ কেন জানো? কারণ জীবনে নানা দুঃখ দৈন্য দুর্ভিক্ষের সঙ্গে তিনি লড়াই ক'রে গেছেন, অভাব অনটন উপবাসের মধ্যেই কেটেছে তাঁর সারা জীবন—তবু কোনো দিনই তাঁর ইষ্ট বিঠোবার পায়ে ছাড়া আর কোথাও ঠাই চান নি। বাপ মাকে হারালেন—সতেরো বৎসর বয়সে, দুর্ভিক্ষে স্ত্রী মারা গেল একুশ বৎসর বয়সে, দেখতে দেখতে সঙ্গতিপন্ন হ'ল পথের ভিখারী। কিন্তু ঐ যে বললাম—তুকারাম তো চাননি সম্পদ, প্রতিষ্ঠা, সংসার, পরিবার, দেহসুখ। দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে কাটাতেন নাম কীর্তনে—হয় ইন্দ্রায়ণীর তীরে, না হয় বিঠোবার মন্দিরে। তাঁর একটি অভঙ্গে তিনি গেয়েছেন—

বলেই সুর ক'রে:

"চাইল আমায় জনে জনে করতে নাথের চরণ ছাড়া।
ধনমান সুখ চায় না তুকা—বোঝে না সংসারী যারা॥
বিঠল করেন দাস যাকে তাঁর—দীক্ষা সে পায় তাদের কাছে
যারা হরির দাস হয়—তাঁর মন্ত্রজপি' বুকের মাঝে॥

সাধু তাদের নাম—যারা রয় সব ছেড়ে তাঁর চরণ ধরি'।
প্রেমের ঋণে তাদের কাছেই পড়েন বাঁধা বন্ধু হরি॥"

চব্বিশ

মন্টুভাই ফিরে এল ম্লান মুখে। নমিতা ও রমা জিজ্ঞাসা করতে কিছুই বলল না, ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। নমিতা ভয় পেয়ে আলোককে টেলিফোন করতে আলোক এসে ওকে সঙ্গে করে গেল ভক্তির কাছে। ভক্তিকে নমিতা বলল যে, সম্ভবতঃ অলিভিয়া মন্টুভাইকে টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে—মন্টুভাই দুর্বল তো—ভয় পেয়েছে। শুনে ভক্তি একটু আশ্চর্য হয়ে বলল: "সে কি? অলিভিয়া কোথাকার কে? রমা আমাকে বলেছিল যে, সে একদিন মাতাল হয়ে বেলেল্লামি করেছিল ব'লেই তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।"

আলোক (একটু চুপ করে থেকে): ভক্তি দি, রমা আপনাকে সবটা বলেনি। শুধু মাতাল হওয়াই নয়—আরো কিছু ঘটেছিল যা রমা মুখে আনতে পারে নি।

নমিতা (সবিস্ময়ে): কেমন ক'রে জানলে?

আলোক: গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন। রমা কেবল তাঁকেই বলেছিল সব কাহিনী। সে বলা যায় না।

ভক্তি: আমি শুনতেও চাই না। আমি কেবল একটা কথা জানতে চাই—মন্টুভাইয়ের আজ মন খারাপ হয়েছে কি অলিভিয়ার তর্জনগর্জনে?

নমিতা: অসম্ভব নয়। ও-জাতের মেয়ে তো ভয় বা লোভ দেখিয়েই কাজ হাসিল ক'রে থাকে। (একটু পরে) তুমি একটিবার চলো ভক্তি দি।

ভক্তি: আমি গিয়ে কী করব বলো ভাই—যখন জানি যে শোভনার মোহ ওর কাটেনি?

নমিতা: কাটে নি—এখনো?

ভক্তি: কাটলে কি অলিভিয়া ওকে ভয় দেখাতে পারত?

আলোক: কিন্তু হয়ত অলিভিয়ার দরুণ নয়—হয়ত মন্টুভাই মনমরা হয়ে আছে কান্সারের জন্য।

ভক্তি: না, তা হ'লে সে ফিরে এসে তোমাদের কাছে গোপন করত না। এর মূলে আছে ঐ শয়তানী। (আলোককে) তুমি একবার যাও গুরুদেবের কাছে। না—চলো আমিও যাবো।

নীলমণিকে ফের মালতীর কাছে দিয়ে আলোক, নমিতা ও ভক্তি সোজা গেল সাধুজির কাছে। তিনি সব শুনে অনেকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। ভাবস্থ অবস্থায় বললেন: "ঠাকুর!··· ঠাকুর!··· ঠাকুর!··· রমাকে দেখো।"

পঁচিশ

প্রায় আধঘণ্টা বাদে সমাধি ভাঙলে সাধুজি চোখ খুলে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন দিগন্তে দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে। তারপরে একটু একটু ক'রে সহজ চেতনায় ফিরে এসে বললেন ভক্তিকে: "আচ্ছা, তুমি অলিভিয়াকে জানতে?"

ভক্তি: না। আর জানার ইচ্ছেও হয় নি কোনোদিন। তবে নমিতা ওকে দেখেছিল দু'তিনবার।

নমিতা (সাধুজির প্রশ্নোৎসুক চোখের দিকে চেয়ে): হ্যাঁ, গুরুদেব, আমি মন্টুভাইয়ের ওখানে রমাকে দেখতে মাঝে মাঝে যেতাম তো? তাই ওকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

সাধুজি: তার নামে অনেক গুজব শুনেছি।

নমিতা: গুজব নয়—সত্যি। কিন্তু তার কথা আমি আলোচনা করতে চাইনে। আপনিই তো বলেন রঙ্গিণীদের চালচলনের আলোচনা করলেও সাধনার ক্ষতি হয়!

সাধুজি: হয় তো বটেই। কিন্তু আমি তার প্রসঙ্গ তুললাম শুধু এই জন্যে যে—এই মাত্র দেখলাম যে শোভনার সঙ্গে পরামর্শ করছে সমুদ্রের ধারে একটি ঘরে—কোনো হোটেলেরই হবে।

ভক্তি: বলেন কি গুরুদেব? শোভনা শেষে কি-না এত নিচে নামল যে অলিভিয়ার সঙ্গে—

কথাটা শেষ হল না অশ্রু-আবেগে।

সাধুজি: মা, মানুষ আর বিশেষ ক'রে মেয়েরা—যখন একবার নামতে সুরু করে তখন শেষ পর্যন্ত না নেমে প্রায় থামতে পারে না। (নমিতাকে) আচ্ছা, সান্টা-ক্রুজে ঠিক কী ঘটেছিল বলো তো? আমি ভুলে গেছি। কিম্বা হয়ত মন দিয়ে শুনি নি সেদিন।

নমিতা: না গুরুদেব, ভোলেন নি আপনি, কারণ আমিই সব কথা খুলে বলিনি। হয়েছিল কি রমাকে আনতে আমিও গিয়েছিলাম তো গত সোমবারে? সান্টা

ক্লাবে চায়ের ঘরে মনুভাইয়ের সঙ্গে আমি রমার কথা আলোচনা করছিলাম—এমন সময়ে মনুভাই শ্—শ্ করে উঠল—সঙ্গে আমাদের ঠিক পিছনের টেবিল থেকে একটি মেয়ে উঠে গেল। তার মুখটা ভালো দেখতে পাইনি আমি—কারণ একটা মোটা Veil ছিল—কিন্তু মনুভাই বললেন যে অলিভিয়া। তারপর সে আমেদাবাদে টেলিফোন করেছিল মনুভাইয়ের সঙ্গে কথা কইতে চেয়ে। কিন্তু মনুভাই টেলিফোন ধরে নি।

সাধুজি: ও। তা হ'লে ব্যাপারটা জলের মতন সাফ হ'য়ে গেছে। কারণ আমি দেখলাম সে শোভনাকে বলছে উইল পাল্টানোর কথা।

নমিতা (ত্রস্ত হ'য়ে): বলছে? আমরা ভেবে ছিলাম সে শুধু ভয় দেখাচ্ছে ব্ল্যাকমেল করতে।

সাধুজি: শুধু ভয় দেখানো নয় মা, একেবারে হাতে কলমে। সে বলছিল অনেককথা। সব বলতে ভালো লাগে না। বড় নোংরা কথা। তবে রমাকে একটু সাবধান ক'রে দেওয়া দরকার ভেবেই বলছি তাকে—তোমরা ফেরবার পথে বলতে ভুলোনা যে শোভনার সঙ্গে অলিভিয়ার একটা চুক্তি মতন হয়েছে। সে শোভনার হ'য়ে দাঁড়াবে—দুজনে জোট করে ভয় দেখাবে মনুভাইকে যে, উইল না বদলালে শোভনা কোর্টে যাবে undue influence এর চার্জ এনে, আর সে—মানে অলিভিয়া—কোর্টে সাক্ষী দেবে যে মনুভাই লম্পট, বলবে সব কেলেঙ্কারির কথা। ভয় পেয়ে মনুভাই উইল পালটাতে বাধ্য হবে, তখন শোভনা অলিভিয়াকে দেবে কুড়ি হাজার টাকা।

আলোক: বলেন কি? শোভনাদেবী টাকার জন্যে ব্ল্যাকমেলারের সঙ্গে চুক্তি করলেন—নিজের স্বামীকে আদালতে অপদস্থ ক'রে ভয় দেখাতে রাজি হ'য়ে? এযে—এযে অভাবনীয় গুরুদেব! দুর্জনকে দমন করবেন কথা দিয়েও ঠাকুর কী ক'রে সয়ে আছেন এমন পাপিষ্ঠাদের? দারুভূতো মুরারিই বটে!

নমিতা: বাবা, বাবা, বাবা! তুমি যে কী দুমদাম ক'রে কথা বলো—

ভক্তি (ঝরঝর ক'রে কেঁদে): গুরুদেব! কী পাপে আমার এমন বোন হ'ল? কী হবে এখন রমার?

সাধুজি: পাপ না মা—কালোয় পটেই আলো ফোটে বেশি। তবে রমার জন্যে ভেবো না।

নমিতা (উদ্বিগ্নকণ্ঠে) কিন্তু ধরুন যদি ও এখন আসে শোভনার সঙ্গে।

সাধুজি: যদি বলছ কেন?—আসবেই আসবে—শোভনার সঙ্গে সেই চুক্তিই হয়েছে—ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

আলোক: গুরুদেব, একটা প্রশ্ন মনে আসছে কিছুতেই ঠেকাতে পারছি না অপরাধ নেবেন না। কিন্তু আপনার ঠাকুর আপনার মতন সুবোধ সাধুদের যেটুকু দেখিয়ে দেন, তার ফলে আমরা—মানে অবোধ অসাধুরা—যেন আরো উদ্ভ্রান্তই হয়ে পড়ি।

নমিতা: বাবা, ফে—র এই ভাষা গুরুদেবের সঙ্গে?

সাধুজি: না মা, বলুক ও। গীতায় বলেন নি কি ঠাকুর: "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া—উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনঃ তত্ত্বদর্শিনঃ"—অর্থাৎ জানতে যদি চাও তবে যাও তাঁদের কাছে যাঁরা জ্ঞানী তত্ত্বদর্শী—তাঁদের কাছে নত হও, জিজ্ঞাসু হও, ও সেবা ক'রে ভক্তিমান্ হও। আলোক বাবাজি যখন নত হ'তে নারাজ নন, আর গুরুসেবায় বিশ্বাস করেন তখন পরিপ্রশ্ন করার অধিকারী বৈ কি। তাছাড়া বললে মানে, অভিমানের গ্যাস বেরিয়ে গেলে—মানুষ হালকাও তো হয় খানিকটা।

আলোক: ধন্যবাদ, গুরুদেব! আপনাকে ভালোবাসি সব থেকে কেন—বলব? আপনি জ্ঞানী ভক্তিমান্ ও পুণ্যাত্মা ব'লে তো বটেই, কিন্তু আরো বেশি এই জন্যে আপনি আমাদের মতন গড়পড়তা অবিশ্বাসীর দুঃখ বোঝেন অর্থাৎ দরদী।

সাধুজি (নমিতাকে): সেদিন কী বাউলটা গাইছিলে মা—"মনের কথা কইব কি সই, কইতে মানা, দরদী নৈলে প্রাণ বাঁচেনা"—না?

আলোক: সত্যিই বাঁচেনা গুরুদেব, তাই তো কাজ ছেড়েও ছুটে ছুটে আসি আপনার কাছে—যখনই প্রাণ বেশি আনচান ক'রে ওঠে। আজ কিন্তু আপনিই আলো ফ্যাসাদে ফেললেন—অর্জুনের ভাষায়: "ব্যামিশ্রেণেব

বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে—" উল্টোপাল্টা কথা ব'লে বুদ্ধি আমার আরো ঘুলিয়ে দিলেন। বলিহারি!

সাধুজি (হেসে): কিন্তু বুদ্ধি ঘুলিয়ে গেল কী দুঃখে শুনি? শোভনাদেবীর অশোভন আচরণের জন্যে, না অলিভিয়া দেবীর ফন্দিবাজির জন্যে?

আলোক: এ-দুয়ের একটাও নয়। কারণ মন্দ-লোক কুপথেই চলে এ দেখে দেখে আমাদের সকলেরই খানিকটা গা-সওয়া গোছের হ'য়ে গেছে। আমার বুদ্ধি ঘুলিয়ে যাচ্ছে ভাবতে—এই দুই মহীয়সী মিলে সড় করছে কী উদ্দেশ্যে? না, এক অসহায়া ভক্তিমতীকে লাঞ্ছনা ক'রে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে। যখন হঠাৎ তার বাপের সুমতি হ'ল তখন ঠাকুর কী ব্যবস্থা করলেন? না, এই দুই কুচক্রীর চক্রান্তে দুর্বল বাপ হোক নাজেহাল, আর বেচারি মেয়ে আসন্নপ্রসবা অবস্থায় এমন দিশেহারা হোক—যার দুঃখে শেয়াল-কুকুরও কাঁদবে। অথচ উঠতে বসতে গীতার আশ্বাস শুনি: ঠাকুর কথা দিয়েছেন—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং···সম্ভবামি যুগে যুগে?" তবে হয়ত কলিতে সবই উল্টে যায় তাই হয়ত এ-যুগে সজ্জনের লাঞ্ছনা ও দুর্জনের জয়জয়কারই যুগধর্ম?

নমিতা: বাবা বাবা বাবা! তোমার মুখ একবার ছুটলে—

সাধুজি: ছুটতে দাও মা, আমাদের ঠাকুরটি ছোটাছুটিতেও পিছপাও নন—বরং অনেক সময়ে ছুটিয়ে ক্লান্ত ক'রেই তিনি অশান্তকে শান্ত করেন। (আলোককে) শোনো বাবা, সৃষ্টির আদিম কাল থেকে দেখতে পাও না কি যে, দুর্বৃত্তরা শেষে হার মানলেও প্রথমদিকে অনেক সময়েই জিতেছে? বেশি দূরে যাবার দরকার কি? যখন ফ্রান্স পড়ল তখন রুষ জাপান ও ইতালীর ষড় ঠাকুর সয়েছিলেন—মানে sanction করেছিলেন—মানতেই হবে, কারণ কোনো কিছুই সংসারে ঘটতে পারে না তিনি veto করলে বা মঞ্জুর না করলে। কিন্তু তারপরে কী হ'ল বলো তো? হিটলার, মুসোলিনি, টোজোর শ্রীবৃদ্ধি বা লক্ষ্যসিদ্ধি হ'ল কি? বাবা, ঠাকুরের সব চাল কেউই বুঝতে পারে না, কিন্তু একটা অকাট্য সত্য কি চোখে পড়ে না তোমার—যে, হাজার ওঠা-পড়ার পরেও—ডুবতে ডুবতেও মানুষ শেষে তলিয়ে যায় নি? এ-বিরাট বিশ্বলীলার মধ্যে অগণ্য মানুষের জঘন্য কর্মফলে গড়ে উঠেছে এক এমন কুটিল গোলকধাঁধা যে, মানুষ আজ চোখে দেখছে সর্বের ফুল। বটেই তো। কিন্তু তবু চোরাবালিতে "গেল গেল" ব'লে মানুষ হাহাকার করলেও বারবারই মজতে মজতে সে বেঁচে যায় নি কি?—কুবুদ্ধির তুফানে ভরাডুবি হবার মুখে ভাঙা তরী বারবারই তীরে পৌঁছয় নি কি—যার ফলে পরে আবার আরো বড় জাহাজ গ'ড়ে মানুষ পাড়ি দিয়েছে অকূলে? অর্থাৎ বারবার দারুণ সঙ্কটে পড়া সত্ত্বেও মানুষের সভ্যতা মরিয়া-না-মরা রামের মতনই ডুবে গিয়েও ফের তর তর ক'রে ভেসেই চলেছে—বিলুপ্ত হয়নি আজো। সমষ্টির, জাতির বেলায় একথা যদি সত্যি হয়, তাহ'লে শুধু ব্যষ্টির বেলায়ই হবে অসত্য—এটাই কি তোমাদের বস্তুতান্ত্রিক বুদ্ধির শেষ রায়, অবিশ্বাসের শেষ সিদ্ধান্ত? বাবা, ঠাকুর মানুষকে তাঁর বিরাট বিশ্বলীলা বুঝবার বুদ্ধি আজো দেন নি, তাই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠরাও শেষে নাজেহাল হ'য়ে বলতে বাধ্য হয়েছে যে, তাঁরা মাত্র কিছুদূর দেখতে পান, তারপরে সবই ঝাপসা। কিন্তু এটুকু তিনি আমাদের বুঝবার শক্তি দিয়েছেন যে, কোনটা শ্রেয় আর কোনটা মাত্র প্রেয়। আর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন অগুন্তিবার যে, প্রেয়কে বরণ করার ফলে অনেক সময়ে প্রথম দিকে সহজ-পন্থীদের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হ'লেও—খতিয়ে তারাই জেতে যারা শ্রেয়কেই বরণ করে প্রেয়কে ছেড়ে। যদি সব সময়ে শ্রেয়-বাদীরা হেরেই মরত, তাহ'লে কেউই শ্রেয়কে চাইত না। বলবে—প্রেয়বাদীরা প্রথম দিকে অনেক সময়ে জেতে; মানি—কিন্তু শেষে টেঁকে কি? টেঁকে না, কারণ এইই হ'ল ঠাকুরের চিরন্তন বিধান: সত্যমেব জয়তে নানৃতম্—সত্যই বাঁচে মিথ্যা মরে। (মৃদু হেসে) অবিশ্যি যার মন আসুরিক ছাঁচে ঢালা—কিনা যার দৃঢ় বিশ্বাস—এর উল্টোটাই সত্য: অধর্মই টেঁকে, ধর্ম ডোবে—সে মিথ্যার পথেই চলবে, বটেই তো। তাই তাকে বলা বৃথা: "গুরুদেব গুরুমা বা রমাকে আদর্শ না ক'রে মনুভাই শোভনা ও অলিভিয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ কোরো না, "কারণ সে পরখ ক'রে দেখতে চাইবেই চাইবে—অধর্মের পথে খতিয়ে সুখ লাভ হয় না দুঃখ। কেবল এইটুকু লক্ষ্য কোরো যে, মনুভাই বা অলিভিয়া

যা শোভনা সুখী হয় নি—মানুষের শ্রদ্ধা পায় নি—যেখানে হাজার হাজার লোক গুরুদেব বা গুরুমার ছোঁওয়ায় পবিত্র হয়েছে, শ্রদ্ধা করতে শেখার ফলে জ্ঞান ও শান্তি পেয়েছে, দুঃখ ও দৈন্যের মধ্যেও পেয়েছে পথের পাথেয়। তাছাড়া আর একটা কথা: শোভনা ও অলিভিয়া রমাকে লাঞ্ছনা করতে এ-অবস্থায় পুণায় আসবে—হয়ত কাল-পরশুর মধ্যেই আসবে। তোমরা বলছ—না এলে ভালো হ'ত। কিন্তু কেমন ক'রে জানলে—তাদের এ-সময়ে আস'র ফল খতিয়ে ভালো হবে, না মন্দ?

আলোক: খতিয়ে কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কেউই বলতে পারে না আগে থেকে—মানি, কিন্তু রমার এই দুর্বল অবস্থায় তাকে ফের লাঞ্ছনা করতে আসবে এই দুই কুচক্রী—ভাবতেও মুষড়ে পড়ছি। আপনি কি বলতে চান যে, দুঃখ দুঃখ দেয় না? না, বলবেন বেদান্তের গর্জনে কিম্বা শঙ্করভাষ্য আওড়ে যে, যেহেতু হাত পুড়ে গেলে জ্বলুনিটাও মায়া, সেহেতু "মায়াময়ম্ ইদম্ অখিলম্ হিত্বা—ব্রহ্মে লীন হও?"

সাধুজি (হেসে): বাবা, আমি গুরুদেবের কাছে বেদান্তর মায়াবাদেও দীক্ষিত হইনি, শঙ্করপন্থী হবার নির্দেশও পাই নি। আমরা হ'লাম লীলাবাদী—তাই সুখ, হাসি-অশ্রু, আশা-নিরাশা জীবন-মরণ কিছুই মায়া বলি না। এও আমি মানি যে, যদি এই বিপুল দেহমনপ্রাণ লীলার রঙ্গ-মঞ্চে দুঃখ দৈন্য পাপ গ্লানি—এসবই নিছক মায়াদেবীর ছায়ানৃত্য হ'ত, তাহলে সে-ছায়া আবহমানকাল মানুষের ইতিহাসে দেশে দেশে যুগে যুগে জীবনের মানচিত্রের বারো আনা জায়গা জুড়ে থাকত না। আমি শুধু বলতে চাই যে অনেক সময় দুঃখের মধ্যে দিয়েই মানুষের চেতনার বিকাশ দ্রুততর হয়—ভাগবতী-লীলার পুষ্টি হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিই: যুধিষ্ঠিরের জুয়াখেলায় আসক্তি ছিল। এ আসক্তিকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। সেই কর্মফলে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা তাঁকে সইতে হ'ল। আর সে কী বীভৎস লাঞ্ছনা বলো তো? কল্পনা ক'রো তো একবার তোমার ঘরের নিরপরাধা কুলবধূকে তোমার সামনে বিবস্ত্রা করছে এক দস্যু! এ-অবস্থায় কৃষ্ণ এসে তার লজ্জানিবারণ ক'রে ভাগবতী কৃপার ভোজবাজি দেখালেও প্রশ্ন আসে বৈকি—দ্রৌপদীর এহেন লাঞ্ছনা হতে পারল কী ক'রে? এ-প্রশ্নের কেবল একটিমাত্র সদুত্তর আছে: যে দ্রৌপদীর এ দুঃসহ লাঞ্ছনা না হ'লে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হ'য়ে পাপিষ্ঠ কৌরবকুল নির্মূল হত না—পাণ্ডবরা সব সইতে রাজি ছিল—পারেনি কেবল তাদের প্রাণপ্রিয়ার এই অপমান। কাজেই কৃষ্ণের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে দ্রৌপদীকে হ'তে হল উপলক্ষ্য বা রক্তরাঙা মুষল যাই বলো—যার তাপে কৌরবকুল গুঁড়ো হ'য়ে গিয়ে কুরুক্ষেত্রে নব ধর্মরাজ্যের পত্তন হ'তে পারল।

আলোক। সবই বুঝলাম গুরুদেব, কেবল প্রশ্ন জাগে এতে দ্রৌপদীর সান্ত্বনা কোথায়—রাজনন্দিনী রাজবধূ হয়েও কেন তাকে হ'তে হ'ল রক্তরাঙা মুষল? কী দুঃখ সইতে হ'ল তাকে ভাবুন তো?

সাধুজি। দুঃখ যে দারুণ কে অস্বীকার করছে? কিন্তু গাছকে বিচার করতে হয় ফল দিয়েই তো। এ-দুঃখের ফল কী হ'ল—দ্রৌপদীর চরিত্র মহিমময় হয়ে উঠে সমস্ত মহাভারতকে দীপ্যমান্ ক'রে ধরে নি কি তাঁর তেজস্বিতা ও ভক্তির আলোয়? সীতা সাবিত্রী যদি দুঃখ না পেতেন তবে তাঁদের চরিত্র কি আজো প্রতি সতী-লক্ষ্মীর অন্তরে প্রেরণা জোগাতে পারত? তেম্‌নি শোভনা ও অলিভিয়া যদি পাপিষ্ঠা না হ'ত তা হ'লে রমা কি ফুটে উঠত এমন ছবিখানি হয়ে? (নমিতাকে) আমি বলছি না মা, যে শোভনা ও অলিভিয়া কাল আসে এ আমি চাই। কিন্তু হয়ত ঠাকুর চান—জানিনা, কারণ ঠাকুর আমাকে জানানো দরকার মনে করেন নি। আমি শুধু তোমাদের এইটুকু বলতে পারি যে তিনি যদি ওদের আসা সত্যিই চেয়ে থাকেন তবে তার কারণ এই যে, ওদের আসা দরকার ছিল তাঁর কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে—একে লীলা নাম দাও বা না দাও!

আলোক (ক্ষুব্ধ)। উদ্দেশ্য? কী উদ্দেশ্য? ধরুন যদি ওরা কাল এসে পড়ে—মনে করেন কি, মনুভাই পারবে ওদের দুজনের সামনে দাঁড়াতে?

সাধুজি: না। মনুভাইয়ের যদি সে মনের জোর থাকত তবে ওর আজ এ-দুর্গতি হত না। বাবা, তোমরা সব কিছুর জন্যেই আমার ঠাকুর বেচারীকে দায়ী করো! মনুভাইকে গুরুদেব গৌরী আমি সাবিত্রী সবাই কত

বুঝিয়েছিলাম কী বলব। ঠাকুরের করুণা বাঁচায় আমাদের নানা ভাবেই, অনেকদিন তিনি সয়ে থাকেন আমাদের কুকীর্তি—তিনি চান ব'লে—পাপী পাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে অশান্ত হ'য়ে ফিরবে অধর্ম ছেড়ে ধর্মের দিকে। কিন্তু যখন সে কিছুতেই ফেরেনা—ইচ্ছে ক'রে জেনে শুনে সাপ পোষে, তখন সে পাপ-মিতালির ফল না ফ'লে পারে?

আলোক: কিন্তু সে-ফল ভুগতে হচ্ছে এখানে কাকে? বহু জ্বলে পুড়ে রমা সবে একটু সুখ শান্তি পেয়েছিল—

সাধুজি: বাবা, ঠাকুর আমাদের সর্বদা সুখশান্তির মধ্যেই রাখতে চান না যে। তিনি চান আমাদের বিকাশ—যার ফলে মানুষ সুখ দুঃখের পারে গিয়ে পায় পরমানন্দে চির প্রতিষ্ঠা—যখন সুখের মধ্যে বিকাশ বন্ধ হয় তখনই দুঃখ আসে। কিন্তু দুঃখের মধ্যে অনেক সময়েই এমন বিকাশ হয়—বিশেষ ক'রে যারা তাঁকে চায় তাদের—যে বিকাশ সুখের মধ্যে দিয়ে হতে পারত না। কিন্তু এজন্যে চাই দুঃখকে শাপ ব'লে দেগে না দিয়ে তাঁর বিধান ব'লেই স্বীকার করা। এরই নাম আত্মসমর্পণ। সুখের দিনে তাঁর জয় গান না করে কে? কিন্তু যখন চোখের সামনে আলোও কালো হয়ে আসে তখনো যে হার মানে না কেবল তারই চোখে সেই কালোর নবজন্ম হয় আলোর আলোয়।

ভক্তি (অশ্রুজলকণ্ঠে): সব বুঝেও তবু প্রাণ কাঁদে গুরুদেব—আরো এই ভেবে যে, আমার জন্যই রমার দুর্দশা হ'ল। তাই আপনার দুটি পায়ে পড়ি—আপনি ওকে বাঁচান এ-দুর্লগ্নে।

সাধুজি: কে কাকে বাঁচায় মা? রাখতেও তিনি, মারতেও। আর দুঃখ কার নাম? যে তাঁর চরণে সত্যি শরণ নিয়েছে তার কাছে বিষও হবে অমৃত, ফণীরও মাথায় মণি জ্বলে উঠবে অন্ধকার কাঁটাবনে তাকে পথ দেখাতে—এই দীক্ষাই আজ পেতে হবে রমাকে, বলতে হবে মনে প্রাণে (উদ্দীপ্ত কণ্ঠে গান ধ'রে দিলেন):

"দুঃখ আমায় চাইলে দিতে পাব না আর দুঃখ আমি।
তোমার তরে দুঃখ, শ্যামল, সুখ হবে-যে দিবসযামী।
　　আশা-রঙিণ সুখের তরে
　　মন যার আজো কেমন করে,
তোমার পরশ ছাড়াও আরও নানা হরষ চায় যে স্বামী!
তাকে পারে দুঃখ দিতে—চায় যে মায়া যশ প্রণামী।

যে চায় তোমায় আশৈশবই থাকুক না তার হাজার ত্রুটি,
ত্রুটি নিয়ে পড়ে, শ্যামল, তোমারি তো পায়ে লুটি:
　　তাকে তুমি নেবে না কি?
　　সুখ দিয়ে হায় দেবে ফাঁকি—
সুখেও যার মন ভরে না—হোক না সে সুখ হাজার
　　　　　　　　দামী?—
দুঃখ দেবে তায় কেমনে দুঃখ যে পায় সুখ অনামী?"

ছাব্বিশ

নমিতা ফেরবার পথে মোটরে ভক্তিকে বলে: আর চোখের জল ফেলোনা দিদি।

ভক্তি: এ দুঃখের বরষা নয় ভাই, আনন্দাশ্রু। সত্যি বলছি নমিতা, আমার সব দুঃখ গলে তৃপ্তি হয়ে গেছে আজ। আমার মন উঠেছে গান গেয়ে: এমন গুরু যে পেয়েছে দুঃখ তাকে আর দুঃখ দেবে কেমন ক'রে? (আলোককে) এ আমার কথা নয় ভাই। নীলমণি তখন আমার গর্ভে তিন মাসের শিশু। স্বামী হঠাৎ মারা গেলেন। তাঁকে ভালো বেসেছিলামও সত্যি। তাই দুঃখ পাই নি এমন নয়—কিন্তু সে-দুঃখ আমাকে দুঃখ দিতে পারে নি সত্যিই—এনে দিয়েছিল মুক্তির স্বাদ। আর তার কারণ আমার নিজের মনের জোর নয়—গুরুর কৃপা। সেই গুরু আজ রমার জন্যে সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে দরবার করেছেন—এর পরেও দুর্ভাবনা? তবে আর শরণ নেওয়ার মানে কি? গুরুদেব সে সময়ে আমাকে কী বলেছিলেন জানো? শুধু একটি শ্লোক—কিন্তু তার পিছনে ছিল তাঁর কৃপা, তাই শ্লোকটি হয়ে উঠেছিল আমার কাছে মন্ত্র। বলেছিলেন: যদি কেউ তার কোনো গরু-ঘোড়া কারুর কাছে বিক্রি করে—তারপরে সে পশুর ভার কার? না, ক্রেতার, বিক্রেতার আর কোনো দায় থাকে না। তেমনি সে-ভক্ত সত্যি তার তনুমনপ্রাণকে গুরু বা ইষ্টচরণে নিবেদন করেছে তার আর কোনো দায়ই থাকে না, সব দায় ঠাকুরের। শ্লোকটি আমি মুখস্থ করেছিলাম

চিন্তাং কুর্যান্ন রক্ষায়ৈ বিক্রীতস্য যথা পশোঃ।
তথার্পয়ন্ হরৌ দেহং বিরমেদস্য রক্ষণাৎ॥

(গাঢ় কণ্ঠে) না, আমি আজ যাব না রমার কাছে। তোমরা শুধু বোলো—এই কথাটুকু যে, তার কাছে দুঃখ আসতে পারে কেবল মুক্তি কাতর রূপে। কারণ গুরুদেব ভার নিয়েছেন তার, দরবার করেছেন সাক্ষাৎ ঠাকুরের কাছে। ভক্তি আঁচলে চোখ ঢাকে।

সাতাশ

ভক্তিকে নারায়ণপেঠে পৌঁছে দিয়ে আলোক ও নমিতা গেল রমার ওখানে। রমাকে নমিতা সব কথাই বলল—কেবল অলিভিয়ার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে। আলোকের ইচ্ছা ছিল বলবার, কিন্তু নমিতা মোটরে ওকে মানা করল, বলল: "অনেক সয়েছে, দুদিন একটু শান্তিতে থাক্। তাছাড়া অলিভিয়া পুনায় না আসতেও তো পারে।"

দুঃখের দীক্ষা সম্বন্ধে সাধুজি যা যা বলেছিলেন সব রমাকে ব'লে উঠবার সময় নমিতা বলল: "রাত হ'ল চললাম ভাই। ভক্তিদি দুচারদিনের মধ্যেই আসবে অনাথাশ্রম থেকে এক মাসের ছুটি নিয়ে। আর আমি তো আছিই। দরকার হ'লেই টেলিফোন করিস—ছুটে আসব। সত্যি, আমারও মনে ভরসা এসে গেছে। তোর জন্যে আর ভাবব না। ভক্তিদিও বলছিল—কী বাবা? হাসছ যে!

আলোক বলল: "ভাবব না বললেই কি ভাবনা ছাড়ে মা? কম্‌লী নহী ছোড়তী। তবে একথা জানি যে, রমা অনেক ভাগ্য ক'রে এসেছে—এমন সদ্‌গুরু তার জন্যে ভাবেন—ঠাকুরের কাছে দরবার করেন!"

নমিতা টুকল: "তবু বলো তোমার বিশ্বাস কম!"

* * *

১০ই জুলাই ধ্রুবর ওখানে সাধুজি ভজন করলেন। অনাথাশ্রমের দাসীরা, মেয়েরা ও শিশুরা সবাই তুকারামের ভজনে তাঁর সঙ্গে দোয়ার দিল। ১১ই সকালে সাধুজিকে আলোক ফের দেহুতে পৌঁছে দিয়ে বাড়ী ফিরতেই নমিতা বলল: বাবা, শুনছি নাকি পনশেট বাঁধ টলমল করছে। ভাঙলেই তো পুনা ভেসে যাবে বন্যায়।

আলোক হেসে উড়িয়ে দিল: "দূর! যত সব alarmist এর দল। ভয় দেখাতে ওদের কী যে আনন্দ! একটা গুজব পেলে হয়।"

নমিতা একটু ভেবে বলল: "কিন্তু বাবা···যদি ধরো এটা গুজব না হয়—তা হ'লে রমার কী অবস্থা হবে? মনুভাইয়ের বাড়িটি একেবারে নদীর পাড়েই—লোকে বলছে হঠাৎ জল আসবে—কখন যে আসবে কেউ জানে না। আর ওর যে অবস্থা, বুঝতেই তো পারো?"

"আরে দূর! পুণায় বন্যা? শুনেছে কেউ? যত সব আষাঢ়ে গল্প!"

"তুমি বাবা কী যে! শুনছি পনশেট বাঁধ ভাঙলে, সেই বিপুল জলের তোড়ে নাকি খড়্গবাসলার বাঁধও ভাঙতে পারে। তা হলে?"

আলোক (হেসে): একা রামে রক্ষা নেই তা সুগ্রীব দোসর! পনশেটে শানালো না, তার উপর চাই খড়্গবাসলা! কোত্থেকে জোটাস তুই এসব গুজব?"

নমিতা (বলল): সাসুন হাসপাতালে। যে-দুটি নার্সের কাছে কাজ শিখতে যাই না? তারাই বলছিল।

আলোক (হো হো ক'রে হেসে): এতক্ষণে বোঝা গেল। ওদের একঘেয়ে জীবনে এই ধরণের গুজবেই শুধু আসে বৈচিত্র্য—রোমান্স, রোমাঞ্চ!

নমিতা: কিন্তু ধরো যদি বন্যা সত্যি আসেই রাতদুপুরে যখন রমা থাকবে ঘুমিয়ে—

আলোক: ওঃ! যদি—যদি—যদি! যাঃ—পালা:! না না, শোন্—তোকে বলতে ভুলে গেছি—সেদিন সাধুজি তোর 'তমসা যখন ছেয়ে আসে' গানটি আমার মুখে ফের শুনতে চাইলেন।

নমিতা: বাঃ! তুমি কি ওটা জানো? মানে সুর?

আলোক (হেসে): ঠিক জানি না—তবে শুনেই মেরে দিলাম! না না, ঠাট্টা নয়—সাধুজি খুব সুখ্যাতি করছিলেন তোদের। বললেন: "মেয়েরা হৃদয়ের হুকুম মেনে চলে সহজেই—আর যারা চলে—তাদের প্রেমের ঋণে হরি বাঁধা পড়েনই পড়েন।" ব'লেই হেসে, এ-হেন ঋণগ্রস্ত হরি ঋণ শুধবেন কি রমারূপিণী ঋণদাত্রীকে বানের জলে ভাসিয়ে দিয়ে? যাঃ! পাত্রে পিওর বই কী পড়লি এত রাত জেগে?

আটাশ

রমা টেলিফোন করল নমিতাকে ১১ই জুলাই : "দিদি শীগ্‌গির এসো। বড় বিপদ।"

আলোক নমিতাকে নিয়ে ছুটল। রমা নমিতাকে দেখেই বলল : "দিদি, সেই মেয়েটা" ব'লেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

*   *   *

নমিতার আদরে শান্ত হ'য়ে রমা বলল সব।

"এইমাত্র টেলিফোন করেছে সে—"

"অলিভিয়া ?"

রমা : ওর নাম উচ্চারণ করাও পাপ দিদি। বলল কি জানো ? বলল—সে কথা কী ক'রে মুখে আনব দিদি ? (ফের চোখে আঁচল দেয়)

নমিতা : বলতে হবে না ভাই, গুরুদেব আমাদের কালই বলেছিলেন। তোমার মা আদালত করবেন উইল নিয়ে, আর ও বলবে—যা ও জানে।

রমা : গুরুদেব বলেছিলেন ? কই বলো নি তো কাল ?

নমিতা : না, ভেবেছিলাম তোর মন খারাপ হবে—রাতে হয়ত ঘুমতে পারবি নে। তাছাড়া আমরা ভেবেছিলাম—তার ভাবনা কী যার জন্যে গুরু ভাবছেন—আর এমন গুরু !

রমা (চোখ মুছে) : ঠিক বলেছ দিদি। আর ঠিক সময়েই আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছ যে যে-মেয়ে পেয়েছে গুরুকৃপার রক্ষাকবচ—তাকে বিঁধতে পারে না কোনো অমঙ্গলের বাণ। তাছাড়া দিদি, দুঃখ যদি এখনো আমাকে শুধু দুঃখই দেয় তবে কিসের সাধনা করলাম এতদিন, আর কোন্ মুখেই বা গুরু গুরু করি ? না, আর অধীর হব না। কেবল দিদি, বাবার জন্যে বড় কষ্ট হয়। বাবা কেমন যেন একেবারে মিইয়ে গেছেন—কারুর সঙ্গে দেখা করেন না। আমি ডাকলেও বলেন : এখন থাক, একটু একলা থাকতে চাই।

নমিতা : কিন্তু কী হয়েছে ? অলিভিয়া কী বলল তোমাকে ?

রমা (শান্ত কণ্ঠে) : বলল অনেক কথা। সে মুখে উচ্চারণ করাও পাপ।

আলোক : তবু শুনি। আমাদের জানা দরকার।

রমা : বলল যে, ও পিন্টো সাহেবের কাছে শুনেছিল বাবার কীর্তিকলাপের কথা, কিন্তু বিশ্বাস করে নি। কিন্তু শেষে একদিন বাবা ওকে দূরে বনের মধ্যে এক ডাকবাংলোয় নিয়ে গিয়ে একলা পেয়ে নির্জনে—সে বলা যায় না দিদি—(দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে)।

নমিতা : এ-সব ওর বানানো—অন্ততঃ বারো আনা। কিন্তু মরুক গে তুই কাঁদিস নে ভাই। আর বলতেও হবে না কিছু। আয় একটু নাম করি।

রমা : না. বলব। (চোখ মুছে) ও বলল—ফলে নাকি ওর একটি সন্তান হয়। তখন বাবা ওকে দশ হাজার টাকা দিয়ে কলম্বো পাঠিয়ে দেন। কলম্বোয় ও এক বৎসর কী করেছিল তা অবশ্য আমাকে বলে নি, তবে বলল—দশ হাজার টাকায় আর কদিন চলে—তাই ও বাবার কাছে আরো কিছু টাকা চাইতে এসেছিল তাঁর অপিসে, কিন্তু বাবা ওকে খেদিয়ে দেন। তখন বাধ্য হ'য়ে ও জুহুতে গিয়ে মাকে সব বলে। মা টেলিফোনে এইমাত্র আমাকে যা মুখে আসে তাই ব'লে গালমন্দ করে বললেন তিনি কাল ফিরে আসছেন—ঐ মেয়েটাকে নিয়ে। বাবাকে গিয়ে একথা বলতেই তিনি একেবারে ভেঙে পড়লেন—বিছানায়। আমি যেতে আমাকে বললেন : "আমাকে একটু ছেড়ে দাও মা, আমি ভেবে দেখি। আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হ'য়ে গেছে।" (কেঁদে ফেলে) এখন কি হবে দিদি, আমি আমার জন্যে ভাবছি না, কিন্তু বাবার এত কষ্ট যে দেখতে পারি না, একে ক্যান্সার—তার উপরে—

আলোক : তোমার মা কবে আসবেন বললেন ?

রমা : আমাকে তো বলেছিলেন—কাল ফিরবেন বাবা বললেন সম্ভবতঃ ভোরবেলা মোটরে রওনা হবেন—এখানে পৌঁছবেন দশটা নাগাদ। বাবাকে নাকি মা ভয় দেখিয়েছেন—বম্বেতে তাঁর নিজের বিশ্বাসী উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করছেন। দরকার হ'লে নাকি মামলাও করবেন—বাবার মাথা খারাপ হয়েছে প্রমাণ ক'রে।

আলোক : মন্টুভাইকে একথা বললেন কে ? তোমার মা ?

রমা :—না—ঐ মেয়েটা—যার নাম মুখে আনাও পাপ। সেই তো মার সঙ্গে চক্রান্ত করছে।

নমিতা (ওর কণ্ঠ বেষ্টন ক'রে) : ভাবিসনে। কাল ওরা আসে আসুক—তুই চল্ আমার সঙ্গে।

রমা : না দিদি, গুরুদেব যখন আমাকে এখানেই থাকতে বলেছেন তখন্ আমি আর কোথাও যাব না।

নমিতা (একটু ভেবে) : কিন্তু শুনছি বন্যা—

আলোক : না না—ওসব বাজে গুজব।

রমা : গুজব হোক বা সত্যি হোক আমার কাছে একই কথা। গুরুদেবের অনুমতি বিনা আমি এখান থেকে যাব না। তাছাড়া বাবা একলা—তাঁকে ছেড়ে যাব কেমন ক'রে ?

আলোক : আচ্ছা আমি গুরুদেবকে ফোন করছি, তোমাকে জানাব।

* * *

ফোন করতে সাধুজি বললেন : "না, রমা ওখানেই থাকুক।

আলোক (টেলিফোনে) : লোকে বলছে পনশেট ড্যাম না কি ভেঙেছে—বন্যা আসতে পারে দু একদিনের মধ্যেই।"

সাধুজি (টেলিফোনে) : হোক। বন্যা যদি আসেও —রমার কিছু হবে না।

[ক্রমশঃ

ধাত্রীরূপা

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার

বিচিত্রিত ধাত্রী ধরা ম্লানোজ্জ্বল ধূম্রল ধূসর !
ছন্দোময়-ছন্দোহীনে গঠিত যে দ্বৈত ধাত্রীরূপা !
বৈপুল্য-ক্ষীণতাধারা দুয়ে মিলে হেথা একাকার
পার্থিব রঙের পাশে রঙোহীন অতি অপরূপা !

আকাশ-চাঁদোয়া-তলে পাণ্ডু পৃথ্বী ক্লেদাক্ত পঙ্কিল !
লালাস্রাবী পতঙ্গের নৃত্যগানে বীভৎস ভয়াল।
আকাশ বাসরে হোথা মেঘে মেঘে
রামধনু-শোভা !
পার্থিব পুষ্পের পাশে রোগ-শোক মূরতি
করাল !
কুটিল ক্রূরতা আর কাপট্যের নগ্ন বীভৎসতা—
তারি পাশে স্নেহ-প্রেম পৃথ্বী-পদ্মে
অতি মনোলোভা !

স্বামীজীর মতবাদ

৺সুশীলকুমার ঘোষ বি-এল্‌, বিদ্যাবিনোদ

প্রার্থনাকালে আমাদের মনে যে ভাবময়রূপের উদয় হয় তাহা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ঈশ্বর-চিন্তা আমাদের মনে পবিত্রতা আনে—আনে ধৈর্য্য, সহনশীলতা, প্রেম ও মৈত্রীভাব।

১। মূর্ত্তিপূজা

চিকাগো বক্তৃতায় অমরসাধক স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, (১৯.৯।১৮৯৩)—"ফলেই বৃক্ষের পরিচয়। যখন দেখি যে যাঁহাদিগকে পৌত্তলিক বলা হয়, তাঁহাদের মধ্যে এমন মানুষ আছেন, যাঁহাদের মতো নীতিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা ও প্রেম কখনও কোথাও দেখি নাই, তখন মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়: পাপ হইতে কি কখন পবিত্রতা জন্মিতে পারে?

কুসংস্কার মানুষের শত্রু বটে, কিন্তু ধর্ম্মান্ধতা আরও খারাপ। খ্রীষ্টানরা কেন গীর্জ্জায় যান? ক্রুশই বা এত পবিত্র কেন? প্রার্থনার সময় কেন আকাশের দিকে তাকানো হয়? ক্যাথলিকদের গির্জ্জায় এত মূর্ত্তি রহিয়াছে কেন?* হে আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিয়া জীবনধারণ করা যেমন অসম্ভব, চিন্তাকালে মনোময়রূপবিশেষের সাহায্য না লওয়াও আমাদের পক্ষে সেইরূপ অসম্ভব। ভাব পরম্পরানুক্রমে জড়মূর্ত্তি দেখিলে মানসিক ভাববিশেষের উদ্দীপন হয়, বিপরীতক্রমে মনে ভাব বিশেষের উদ্দীপন হইলে তদনুরূপ মূর্ত্তিবিশেষও মনে উদিত হয়। এই জন্য হিন্দু উপাসনার সময়ে বাহ্যপ্রতীক ব্যবহার করে। সে বলিবে—তাহার উপাস্য দেবতায় মন স্থির করিতে প্রতীক সাহায্য করে। সে তোমাদেরই মতো জানে, প্রতিমা ঈশ্বর নহে, সর্ব্বব্যাপী নয়। আচ্ছা বলতো, 'সর্ব্বব্যাপী' বলিতে অধিকাংশ মানুষ প্রকৃতপক্ষে সারা পৃথিবীর মানুষ কি বুঝিয়া থাকে? ইহা একটি শব্দ মাত্র—একটি প্রতীক। ঈশ্বরের কি বিস্তৃতি আছে? তা যদি না থাকে, তবে 'সর্ব্বব্যাপী' শব্দটি আবৃত্তি করিলে আমাদের মনে বড় জোর বিস্তৃত আকাশ অথবা মহাশূন্যের কথাই উদিত হয় এই পর্য্যন্ত।"

"হিন্দু ধর্ম্ম" শীর্ষক একটি শিক্ষাপ্রদ ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ চিকাগোর ধর্ম্ম সভার নবম দিবসের অধিবেশনে তিনি পাঠ করেন, তাহা হইতে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

বিশ্ব-বন্দিত বিবেকানন্দ আরও জানাইয়াছেন, আপ্ত বাক্য বেদ হইতে হিন্দুগণ তাঁহাদের ধর্ম্মলাভ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদসমূহকে অনাদি ও অনন্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন। একখানি পুস্তককে অনাদি ও অনন্ত বলিলে হাস্যকর বলিয়া মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু 'বেদ' শব্দ দ্বারা কোন পুস্তক বিশেষ বুঝায় না। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে যে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, বেদ সেই সকলের সঞ্চিত ভাণ্ডার স্বরূপ। আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও মাধ্যাকর্ষণের নিয়মাবলী যেমন সর্ব্বত্রই বিদ্যমান ছিল এবং সমুদয় মনুষ্য সমাজ ভুলিয়া গেলেও যেমন ঐগুলি বিদ্যমান থাকিবে, আধ্যাত্মিক জগতের নিয়মাবলীও সেইরূপ। আত্মার সহিত আত্মার যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ, প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত সকলের পিতাস্বরূপ পরমাত্মার যে দিব্য সম্বন্ধ—আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও সেগুলি ছিল এবং সকলে বিস্মৃত হইয়া গেলেও ঐগুলি থাকিবে।

২। ভগবৎ-প্রেম

বিশ্ববরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় সুরম্য বক্তৃতাদানে সকলের প্রাণে প্রেরণার আলোক জ্বালাইয়াছেন। তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের

* প্রোটেস্টান্টদের মনে প্রার্থনাকালে এত ভাবময় রূপের আবির্ভাব হয় কেন?

২৬শে সেপ্টেম্বর চিকাগোর তৃতীয় ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চের বক্তৃতাগৃহে বাগ্মিতাপূর্ণ আলোচনায় "ভগবৎ-প্রেম" বিষয়ে যে বাণী উদাত্তকণ্ঠে শুনান তাহাতে শ্রোতৃবর্গ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। পরদিন ২৫শে সেপ্টেম্বর চিকাগো হেরাল্ড নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র সপ্রশংস বিবরণীতে উহার সারাংশ এই ভাবে প্রকাশ করে:—"ঈশ্বর পৃথিবীর সর্ব্বত্র পূজিত হন, কিন্তু বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন উপায়ে। মহান ও সুন্দর ঈশ্বরকে উপাসনা করা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, এবং ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতিগত। সকলেই ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই মানুষকে দান, দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সৎকার্য্যে প্রণোদিত করে। সকলেই ঈশ্বরকে ভালবাসে, কারণ তিনি প্রেম স্বরূপ।"

অন্ধের মত জড়বিজ্ঞানের অনুসরণ তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ ছিল। তিনি পাশ্চাত্যের জড়বাদী দর্শন অনুমোদন করিতেন না, বরং অধ্যাত্মতত্ত্বের অনুশীলনে অপার আনন্দ অনুভব করিতেন। মানসিক উৎকর্ষ সাধনের আদর্শ ছিল প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার মহানুভবতা, উদারতা ও ব্যাপক প্রেম ধর্ম। আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তি প্রসব করে, ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা পরম জ্বালা, বিষাদ ও নৈরাশ্য আনয়ন করে বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম ও বাসনা-শূন্য আচরণ হিন্দুশাস্ত্রে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে।

৩। পরাভক্তি

পরাভক্তি ছিল তাঁহার কাম্য। নিষ্কাম যোগী নিবিড় সাধনাবলে যে অপার্থিব বস্তু লাভ করিয়াছিলেন তাহা অপ্রতিহত অবিকল্প পরাভক্তি। এই ভক্তির গুণে প্রাজ্ঞপ্রবর অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছিলেন, জগৎবাসীকে ভ্রাতৃসম্বোধন করিয়া প্রেমালিঙ্গন দিতে পারিয়াছিলেন। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া এই কর্ম্মযোগী মান্দ্রাজ, কলিকাতা ও হিমালয়ে তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ধীর ভাবে প্রচার কার্য্য আরম্ভ করাই ভাল মনে করিলেন। বেদান্তধর্ম্মের মহৎ আদর্শ প্রচার কার্য্য মানবের আত্মোন্নতির চরম ও প্রকৃষ্ট পন্থা তিনি বিশ্বাস করিতেন। এ কারণ আমেরিকা মহাদেশে শুদ্ধসত্ত্ব স্বামী সারদানন্দ ও ইংলণ্ডে পূতচরিত্র স্বামী অভেদানন্দ বেদান্ত ক্লাসে ছাত্র সমাজ কর্তৃক সাদরে গৃহীত হইয়াছেন দেখিয়া জনকল্যাণকামী বিবেকানন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই মহৎ বাক্য অনুসারে দেখা গেল স্বামীজীর ভক্ত মিসেস ওলিবুল তাঁহার ভারত প্রত্যাগমনের বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহাকে জানাইলেন—ভারতীয় কার্য্যের জন্য তিনি প্রয়োজন মত অর্থ প্রদান করিতে সম্মত আছেন। ইহা ভিন্ন প্রস্তাবিত রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সমাজের জন্য যে একটি স্থায়ী মঠ নির্ম্মাণ করিবার সঙ্কল্প তিনি করিয়াছেন দানশীলা পুণ্যবতী এই মহিলা উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠাকল্পে তাহার ব্যয়-ভার বহন করিবেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট রবিবার অপরাহ্ণে পাশ্চাত্য দেশে Thousand Island park-এ শিষ্যমণ্ডলীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন, "Until we realise God for ourselves we can know nothing about Him. Each man is perfect by his nature, prophets have manifested this perfection, but it is potential in us". (Inspired Talks)

৪। অদ্বৈতবাদ

দূরদর্শী তত্ত্বজ্ঞানী স্বামীজী অদ্বৈতবাদের আদর্শে জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সত্তা সর্ব্বত্র অনুভব করিতে পারিলে, মনের মধ্যে যত কলুষ, আবিলতা, দ্বৈতভাব দূরীভূত হয়। অপূর্ব্ব অদ্বৈতভাবে মন-প্রাণ উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠে। ঈশ্বর হইতে জীব পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়না,—জড় ও জীব এক হইয়া যায়। তাঁহার সর্ব্বব্যাপকত্ব গুণ উদ্ভাসিত হয়, প্রচারিত হয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভিন্ন অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলে পরমার্থ-লাভের পন্থা সুগম হইয়া উঠে। স্বামীজী সেইজন্য অদ্বৈতবাদী বেদান্তপ্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি শঙ্করাচার্য্য এই মূল্যবান তত্ত্ব ও জনপ্রিয় দর্শন নৈপুণ্যের সহিত যেভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য।

৫। মানব-প্রেম

মানব-প্রেম অদ্ভুতকর্ম্মা অমিত-তেজা স্বামীজীর রোমাঞ্চকর জীবনে সাফল্যের কারণ বলা যাইতে পারে। তাঁহার বিশাল হৃদয়ে মানব-প্রেম যে নিগূঢ়ভাবে বাসা বাঁধিয়াছিল তাহার পরিচয় তাহার জীবনচিত্রে নানা ভাবে প্রতিফলিত। দলিত, পতিত সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার

অকৃত্রিম করুণা সর্বজন-বিদিত। অনুন্নত জাতি সর্বত্র তাঁহার স্নেহের পাত্র হইয়া অনাবিল প্রেমের অংশ গ্রহণ করিত। বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ নাট্য-শিল্পী পরম শ্রদ্ধাভাজন স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বলিয়াছেন—তোদের স্বামীজীকে অদ্ভুত প্রতিভাশালী বেদান্তের পণ্ডিত বলিয়া ভালবাসিনা, তাঁহার করুণায় সতত দ্রব হৃদয়ের জন্যই তাঁহাকে ভালবাসি।

একদিন আমেরিকার এক প্রশ্নোত্তর সভায় একজন পরম পবিত্রস্বভাব স্বামীজীকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন, "স্বামীজী, অপবিত্রতার মূর্তিস্বরূপিণী বেশ্যাগণ দ্বারা সমাজে অকল্যাণ ভিন্ন আর কিছু হয় কি? ধীরপ্রজ্ঞ স্বামীজী সহনশীল হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ করুণাসিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "পথে দণ্ডায়মানা তাহাদের দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিও না। তাহারাই বর্মের মত দাঁড়াইয়া শত শত সতীকে লম্পটের অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতেছে বলিয়া ধন্যবাদ দিও। তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না।" বাইবেলে উক্ত হইয়াছে—পাপকে ঘৃণা করিও, পাপীকে নহে।

মানব-প্রীতি তাঁহার এত প্রবল ছিল যে ইহার প্রভাবে তিনি ১৮৯৬ খ্রীঃ ৬ই জুলাই লণ্ডন হইতে এক শিষ্যকে লেখেন, এংলো ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও দেবত্ব উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। সহ সুকৃতি ও ধৈর্য্যের সহিত, ৩৩ বৎসর বয়সেও বেশ্যাগণের সহিত এক বাড়ীতে বাস করিতে পারি, ঘৃণা আসেনা।

অজ্ঞ, দরিদ্র, নিপীড়িত ব্যক্তির কথা বাদ দিলেও উদারচিত্ত স্বামীজী পতিতা নারী ও সমাজে চির-ঘৃণিতাদের পর্য্যন্ত করুণার সহিত আহ্বান করিয়া গিয়াছেন।

অনন্ত অসীম বিশ্বসংসারে যে মহাশক্তি সকল ব্যবধান ভাঙ্গিয়া নিজ বশে সমস্ত আনিতে পারিয়াছেন তিনি বশী, পুরুষোত্তম। সেই এক বিরাট পুরুষবশী সর্বভূতান্তরাত্মা একরূপকে বহুরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে যে সকল ধীর পুণ্যবান্ ব্যক্তি আত্মস্বরূপ দেখেন তাঁহাদেরই শাশ্বত সুখ অন্যদের নহে, (কঠ ২।২।১২), যিনি সকল অনিত্যের মধ্যে নিত্য, কিংবা সকল নিত্যের মধ্যে নিত্য, সকল চেতনার মধ্যে যিনি চেতন, যিনি এক থাকিয়াই বহুর কাম বিধান করিতেছেন, যে ধীরগণ তাঁহাকে আত্মস্থ অনুদর্শন করেন, তাঁহাদেরই শাশ্বতী শান্তি,—ইতরদের নহে (কঠ ২।২।১৩)।

স্বামীজী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিরস, বাদ, সাধনা, চর্চা, উপাসনা, কুরীতি, অশান্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে চেতনার স্পর্শ, ভগবানের রূপ অনুভব করিতেন।

৬। শিক্ষাদান

জয়পুর হইতে ক্ষেত্রী ৯০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। অভ্যর্থনা সভায় সকলে উপবেশন করিলে রাজকর্মচারীগণ, সর্দার ও উপস্থিত সম্ভ্রান্ত নগরবাসীগণ একে একে স্বামীজীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া প্রথা অনুসারে তাঁহাকে সকলে দুই টাকা করিয়া প্রত্যেকে নজর দিলেন। রাজা বাহাদুর স্বয়ং তিন সহস্র মুদ্রা নজর দিয়া অভিনন্দনপত্র পাঠ করিলেন। পরিশেষে স্বামীজী রাজ-দরবারে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াসে প্রীত হইয়া তাঁহার ভাষণে বলিলেন—"শিশুদের শিক্ষা দিতে হইলে তাহাদের প্রতি অগাধ বিশ্বাস সম্পন্ন হইতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধার। শিশুদিগকে শিক্ষাদিবার সময় আমাদিগকে আর একটি বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে তাহারাও যাহাতে নিজেরা চিন্তা করিতে শিখে, তদ্বিষয়ে উৎসাহ দিতে হইবে। এই মৌলিক চিন্তার অভাবই ভারতের বর্তমান দীনাবস্থার কারণ। যদি এইভাবে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহারা মানুষ হইবে, এবং জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যাপূরণে সমর্থ হইবে।

বিশ্বে সৃষ্টিব্যাপার অনুধাবনযোগ্য। এই অসীম সৃষ্টি রহস্য বিশাল ও অলৌকিক, ইহা কতকগুলি নিয়মাবলীর বিস্ময়কর বা ভয়াবহ সমাবেশ মাত্র নহে। অনন্ত কার্য্য-কারণের ইহা বন্ধন স্বরূপও নহে। এই নিয়মের ঊর্দ্ধে প্রত্যেক পরমাণু ও শক্তির মধ্যে আছে প্রাণ, আছে জীবন, সত্তা। ইহার মধ্যে অনুস্যূত রহিয়াছেন এক অসীম ক্ষমতাশালী বিরাট পুরুষ, যাঁহার আজ্ঞায় বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারি-বর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগতে ভ্রমণ করিতেছে।

ভয়াদস্যাগ্নি স্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥

[কঠোপনিষদ ২।৩।৩]

৭। উত্তরাধিকার

উত্তরাধিকার সূত্রে যে সকল গুণ লাভ করা যায় তাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত। বৈজ্ঞানিক চিন্তা দ্বারা, পরীক্ষা-মূলক পদ্ধতি লইয়া যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করা হয় তাহা নিতান্ত অনিবার্য্য রূপে ফলপ্রসূ। বিজ্ঞান-সম্মত রীতিতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে এবং অনুমান-সাপেক্ষ সিদ্ধান্ত বিচার করিলে বুঝা যায় জীবতত্ত্ব শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ইহা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত এবং অপরিহার্য্য সকল বিবেচনা-বোধে সমুজ্জ্বল। এ কারণ বৈজ্ঞানিক পন্থা গ্রহণ করা যে সমীচীন তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্বামীজী জলদগম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা অস্বীকার করিতে পারি না, শরীর মাত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে কতকগুলি প্রবণতা লাভ করে, কিন্তু সেগুলি সম্পূর্ণ দৈহিক। এই দৈহিক প্রবণতার মাধ্যমেই মনের বিশেষ প্রবণতা ব্যক্ত হয়। মনের এরূপ বিশেষ প্রবণতার কারণ পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্ম। বিশেষ কোন প্রবণতা সম্পন্ন জীব সদৃশ বস্তুর প্রতি আকর্ষণের নিয়মানুসারে এমন এক শরীরে জন্মগ্রহণ করে, যাহা তাহার ঐ প্রবণতা বিকশিত করিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহায়। ইহা সম্পূর্ণভাবে বিজ্ঞান-সম্মত, কারণ বিজ্ঞান অভ্যাস দ্বারা সব কিছু ব্যাখ্যা করিতে চায়, অভ্যাস আবার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের ফল। সুতরাং অনুমান করিতে হইবে, নবজাত প্রাণীর স্বভাবও তাহার পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল এবং যেহেতু তাহার পক্ষে বর্ত্তমান জীবনে ঐগুলি লাভ করা অসম্ভব, অতএব অবশ্যই পূর্ব্বজীবন হইতেই ঐগুলি আসিয়াছে।

শিষ্টগণ ও আচার্য্যেরা বলেন, সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল সুখ, রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ ও তামসিক কর্ম্মের ফল মূঢ়তা বা পশুজন্মসুলভ দৃশ্যমান অজ্ঞানতা (গীতা ১৪।১৬)

৮। ঈশ্বর কৃপা

যোগীবর তরুণ-সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে এইরূপঃ বেদ শিক্ষা দেন—আত্মা ব্রহ্ম-স্বরূপ, কেবল জড় পঞ্চভূতে বদ্ধ হইয়া আছেন। এই বন্ধনের শৃঙ্খল চূর্ণ হইলেই আত্মা পূর্ণত্ব উপলব্ধি করেন। এই পরিত্রাণের অবস্থার নাম 'মুক্তি'—সকল প্রকার অপূর্ণতা, মৃত্যু ও দুঃখ হইতে—মুক্তি।

ঈশ্বরের কৃপা হইলেই কেবল এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে। আর পবিত্র হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপা লাভের উপায়।" (চিকাগো বক্তৃতা দ্রষ্টব্য)।

সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাপুরুষ গীতার ১৮শ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, সকল প্রকার আমিত্ব বিসর্জ্জন দিয়া মনপ্রাণ আমাতে অর্পণ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম করিলে ভক্ত আমার অনুগ্রহে অক্ষয়স্থান প্রাপ্ত হন। ৫৬॥ আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিলে, আমার কৃপায় দুস্তর সংসারও তাহার কারণসমূহ অতিক্রম করিতে পারিবে, নচেৎ তুমি পুরুষার্থের অযোগ্য হইবে।

১৮।৫৮॥

স্বামীজীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পাঠে, নিষ্কলুষ ও সাধনা-পূত জীবনযাপন পদ্ধতি সন্দর্শনে এই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ছিলেন সংশয়াতীত, চিন্ময় ও চিরভাস্বর। "সন্ন্যাসীর গীতিতে প্রতিভাত হইয়াছে অদ্বৈতবাদের সারবস্তু

একমাত্র মুক্তজ্ঞাতা আত্মা হয়
অনাম অরূপ অক্লেদ নিশ্চয়।
তাঁহার আশ্রয়ে এ মোহিনী মায়া
দেখিছে এ সব স্বপনের ছায়া।

স্বামীজীর সীমিত জীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে জগদ্ধিতায় লিপ্ত থাকিলেও তাঁহার মন ও চিন্তা ছিল অসীম জ্যোতির্লোকে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার প্রশান্ত অন্তর উৎসারিত আলোকে ভাসিয়া উঠিয়াছিল সুস্পষ্টরূপে এমন এক বিপ্লবের চিন্তা যাহা মহনীয়, উদার এবং পবিত্র। সমাজসংস্কারকের সে সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি অত্যন্ত কল্যাণকর এবং নিতান্তই অনুপম। তিনি অত্যাচারপীড়িত, অর্দ্ধাশনে মৃতপ্রায় জন-সাধারণ, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী, রাজা ও পুরোহিতের শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিয়া বলিয়াছেন, "আমি নেড়েচেড়ে এদের ভেতর সাড়া আনতে চাই, এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। অমোঘ মন্ত্রবলে এদের জাগাব। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত এই অভয়বাণীই শুনাতে আমার জন্ম, তোরা ঐ কাজে আমার সহায় হ। যা গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে এই অভয়বাণী আচণ্ডাল ব্রাহ্মণকে শোনাগে। সকলকে ধরে ধরে বলগে যা—তোমরা অমিতবীর্য অমৃতের অধিকারী।" স্বামীশিষ্য সংবাদে এইরূপ বহু সত্য কথিত হইয়াছে। তাঁহার স্নেহময় অমৃত ধারায় নিষিক্ত অসংখ্য জীবন

প্রভাবনীয় পুণ্যসমূহে উজ্জ্বল ও প্রাণ-চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে।

৯। সেবা-ধর্ম্ম

ক্রান্তদর্শী ধর্ম্মনিষ্ঠ সমাজনেতার উদাত্তবাণীর পরশ-মাধুরী ও কর্ম্মচিন্তা ও সেবাধর্ম্মের অরূপণ দান আনয়ন করে ভক্তির স্রোত,শ্রদ্ধার বন্যা এবং সমাজসেবার পবিত্র আনন্দ।

প্রাচীন ভারতে ঔপনিষদিক যুগে ঋষিবাক্যে ধ্বনিত হইয়াছে, অস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজ্ঞানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ॥" (ঈশ-উপনিষদ—৭) বিজ্ঞানী পুরুষের যে জীবনে সর্ব্বভূত সর্ব্বভূত থাকিয়াও আত্মাই বলিয়া গিয়াছে, একত্ব অনু-দর্শনকারীর সেই জীবনে শোকই বা কি বস্তু, মোহই বা কি বস্তু? পরবর্তী মন্ত্রে উদ্‌গীত হইয়াছে পুরুষোত্তমের স্বরূপ—তিনি সর্ব্বগামী, শুক্র, অকায়, ব্রণহীন, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, কবি, মনীষী, পরিভূ, স্বয়ম্ভূ। তিনি নিত্যকাল অর্থ সমূহকে যথাযথ ছন্দে বিধান করিতেছেন। ৮॥

সেবার সুর গীতায় ঝঙ্কৃত হইতে দেখা যায় যথা তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।৪।৩৪॥

ধর্ম্মের গ্লানি হইতে জগৎকে বিমুক্ত করিতে এবং মানব চিত্তের অভ্যুত্থান জন্য অব্যয় অক্ষয় অখণ্ড বিরাট-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বলিয়াছিলেন,

"যে নিষ্কামকর্ম্মী বা সন্ন্যাসী ঐকান্তিকী অচলা ভক্তির দ্বারা সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণকে উপাসনা করেন, তিনি ত্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হন।" ১৪।২৬॥ তিনি আরও বলিয়াছেন, "আমি অব্যয়, অমৃত, সনাতন, জ্ঞানযোগরূপ ধর্ম্মপ্রাপ্য ও অব্যভিচারী সুখস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা। সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা প্রত্যগাত্মারা পরমাত্মারূপে নিশ্চিত হন। ইহাই ব্রহ্মত্ব লাভ, কারণ যে ব্রহ্মশক্তি ভক্তানুগ্রহাদি প্রয়োজন বশতঃ সংসারে প্রবৃত্ত হন, সেই শক্তিব্রহ্ম আমিই।" (গীতা ১৪।২৭)। শ্রীভগবানের উক্তি "যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম সেই হেতু ইহলোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত (১৫।১৮)।

জ্যোতির্ম্ময় মহাবাহু স্বপ্রকাশ পুরুষোত্তম অষ্টাদশ অধ্যায়ে বহু আশার বাণী শুনাইয়াছেন, তথায় উল্লেখ করিয়াছেন—

"বিবেক বুদ্ধিদ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হও এবং সিদ্ধিতে ও অসিদ্ধিতে হর্ষবিষাদশূন্য রূপ বুদ্ধিযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক আমাতে সর্ব্বদা চিত্ত সমাহিত কর (১৮।৫৭)। হে ভারত, সংসার-দুঃখ নাশের জন্য চিন্তা, বাক্য, কর্ম্ম দ্বারা তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। তাঁহার প্রসাদে তুমি বিমল কান্তিও শাশ্বত পদ লাভ করিবে, পরম শান্তির অধিকারী হইবে। (১৮।৬২)।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী সেবাধর্ম্মের আদর্শে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং পরবৎসর ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে "সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত একদল আগুনের মতন তেজস্বী ও জোয়ান ছেলে তৈয়ার করার" জন্য বেলুড়মঠ স্থাপন করেন।

"জ্ঞানযোগের" সপ্তদশ সংস্করণের ৮৪ পৃষ্ঠায় স্বামীজী যে চিন্তাগত বাণী প্রকাশ করিয়াছেন তাহা এইরূপঃ নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ, অপরিণামী অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখনও পরিণাম হয় নাই, আর এই সকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নাম রূপ এই সকল বিভিন্ন স্বপ্ন-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।

ভগবৎ প্রেমের বিশ্লেষণ বিষয়ে স্বামীজী অতি মধুর-ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন "ভক্তিরহস্যের" অষ্টম সংস্করণের ১৪৭ পৃষ্ঠায়। এ স্থলে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা হইলঃ ঘোর স্বার্থপরতার মধ্যেও দেখা যায় "স্ব"-এর এই 'অহং'-এর ক্রমশঃ বিস্তৃতি ঘটিতে থাকে। সেই এক অহং একটা লোক,বিবাহিত হইলে দুইটা হইল,ছেলেপুলে হলে অনেক-গুলি হইল—এইরূপে তাহার অহংএর বিস্তৃতি হইতে থাকে অবশেষে সমগ্র জগৎ তাহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়। উহা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া সার্ব্বজনীন প্রেম—অনন্ত প্রেমে পরিণত হয়, আর সেই প্রেমই ঈশ্বর।

রেশ

তারাপ্রণব ব্রহ্মচারী

দোকানের লাগোয়া চালাঘরের ভেতর যখুনি গেছে, তখুনি দেখেছে, স্ত্রী-পুত্রবধূ-নাতিনাতনী যেন এক একটি বিষাদখিন্ন প্রতিমা। অভাব-অনটনের নিষ্পেষণে নিস্তেজ। হাসির ফোয়ারা শুকিয়ে গেছে একেবারে। বিফল হয়ে ফিরে এসে, ভাঁড়ায় উঠেছে আবার দীননাথ। আবার রঙেভরা মাটির সরায় তুলি ডুবিয়েছে। দুর্গা-প্রতিমার মুখে বুলিয়েছে। চোখ-ঠোঁটে রঙের যাদুতে হাসি ফোটাতে চেষ্টা করেছে। পারে নি। হাসির জায়গায় কান্নাই এনে ফেলেছে যেন প্রতিবারে। বার বার প্রতিমার মুখ-চোখ-ঠোঁটের রঙ তুলে ফেলতে হয়েছে তাকে এই একই কারণে। তার হাতের মূর্তি জীবন্ত হয়ে ওঠে তুলির ছোঁয়ায়। স্বর্গীয় হাসি হেসে ওঠে। বনেদি-ঘরের বৃদ্ধেরা এখনো বলে সে কথা। তাই এই বয়সে ষাটের কোঠা পেরিয়েও—অসমর্থ দেহ নিয়ে ঠাকুর গড়তে হয়। ছেলের গড়ামূর্তি পছন্দ হয় না বাবুদের। তার গড়া চাই! ভেতর ভেতর রাগে ফেটে পড়ে দীননাথ বাবুদের ওপর।—সে পারছে না। অভাবের তাড়নায় যে তারও ভাবের থলি শূন্য হয়ে গেছে—এটা কেউ বোঝেনা। শুধু জুলুম আর জুলুম!

মূর্তিগড়া—দোকানের ভার অমরনাথের ওপর দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চেয়েছিল, হওয়া গেল না। ঠাকুর্দার খদ্দেরদের ছেলেরা বাবার জীবদ্দশায় রেহাই দেয়নি। বাবার খদ্দেরদের ছেলেরাও তাকে দিচ্ছে না। দেবেও না।

পুজোর দিন যতোই এগিয়ে আসছে, ততোই যেন দীননাথ উগ্রমেজাজী হয়ে উঠছে। সদাহাসিখুশি মাটির মানুষ দীননাথের ব্যতিক্রম ঘটছে। সকলে বিস্মিত—তটস্থ।

হাসছে সকলে।

খুশিতে ডগমগ হ'য়ে হাসছে বন্ধুবান্ধব-আত্মীয় স্বজন। ওদের হাসির বৈঠকে যোগদান করতে পারছে না দীননাথ। হাসি দেখলে চাপাকান্না বুকের ভেতর উঠছে।...

একসময় হাসির খোঁজে অস্থির হয়ে পড়েছিল দীননাথ। নিজের মনের কোণে খুঁজতো। পথযাত্রী খদ্দের পরিবার-বর্গের চোখেমুখে অনুসন্ধানীদৃষ্টি ফেরাতো তাদের ফাঁকে ফাঁকে।

এতো তল্লাসেও,হাসিপাগল দীননাথ, তার আকাংক্ষিত হাসি দেখতে পায়নি কারো চোখেমুখে।

দোকানে খদ্দের এসেছে প্রতিমা কিনতে। ছেলে অমরনাথ আর্টস্কুলে পড়া শিল্পী—দেখাচ্ছে বোঝাচ্ছে জ্যামিতির ছকমাপা নিয়ম-কানুনে তৈরী প্রতিমা।—পিরামিডিক্যাল—ত্রিকোণের মধ্যে, চারকোণার কিউবি-ক্যাল, স্তম্ভপ্যাটার্ণের সিলিন্ড্রিক্যাল, গোলের ভেতর স্ফিঅ্যারিক্যাল।

খদ্দেরদের ঠোঁটের কোণে প্রশংসার হাসি ফুটে উঠছে। পুত্রের গালে খাঁজ পড়ছে গৌরবের হাসিতে। দেখলে খানিকক্ষণ সেকেলে বৃদ্ধ দীননাথ চেয়ে চেয়ে। মন ভরল না। মনে হল, ধনীর ধন্যবাদ আর গৌরব-গরবের মিতালী ঘটছে জ্যামিতির মাপেরই মতো—এ যেন যান্ত্রিক হাসি।

হাসির কলরোল শুনতে পেল রাস্তায় সেদিন। দোকান থেকে বেরিয়ে এলো ত্বরিৎগতিতে দীননাথ। যতো সবার মুখ দেখছে, ততো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছে।—শবযাত্রী-দের হাসির লহর। বোধহয় বৃদ্ধ মরায় বিষয় পেল এরা সব, তাই উত্তরাধিকারীর উল্লাস এদের হাসির রবে। বৃদ্ধশবের খাটশুদ্ধ নিয়ে নাচানাচি করে চলার বহর এতো!

কাউকে কিছু বলতে পারছে না দীননাথ—নিজের মনোবেদনার কথা। বলতে গেলে, আত্মসম্মানের কপাট বন্ধ হয়ে যায় মুখে তক্ষুণি। এদিকে দারুণ দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে—তাড়াতাড়ি মূর্তি শেষ করতে না পারলে, পূজোর সময় বিপদে পড়বে লোকে তার জন্যে। পূর্ব সুনাম ক্ষুণ্ণ করে যা' তা' মূর্তি গড়েও দেওয়া যায় না কিছুতেই। লোকের চোখে ধুলো দেওয়া বাপ ঠাকুর্দার কোষ্ঠিতেও লেখা নেই।

দীননাথ, আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও মনোমতো করে তুলতে পারছে না মায়ের মুখখানাকে।—অসুর নাশিনী করুণাময়ী সহাস্যবদনে অসুরকে বধ ক'রে মুক্তি দিচ্ছেন। ধ্যানের এই ভাবরূপ সারাজীবন ধরে প্রতিমায় ফুটিয়েও এখন অপারক হচ্ছে! আশ্চর্য! সহাস্যবদনাকে নিজের মনের ধ্যানে আনতে পারছে না এক মুহূর্তও। মায়ের হাসি ফুটছে না তাই।

নিজের ওপর ধিক্কার এলো দীননাথের। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস। এই রকম যখন মানসিক অবস্থা—সেই সময় একদিন ঈপ্সিত হাসি দেখতে পেল হঠাৎ। দেখতে পেল বড় করুণ অবস্থার ভেতর দিয়ে।

ভারায় উঠে, দিক্‌হারা পথিকের মতো, মায়ের মুখে যখন রঙ চড়াচ্ছে দীননাথ। দোকানের লাগোয়া চালাঘরের দরজা ঠেলে, এসে উপস্থিত হ'ল দু'বছরের নাতনী—রতনমণি। চোখে জল। জলের সংগে আব্দারের সুরের বায়না। একে মন মেজাজ সপ্তমে চড়েই আছে তার ওপর সোনায় সোহাগা যোগাল নাতনীর ছিচকাঁদুনেপনা। বিরক্ত হ'য়ে উঠল দীননাথ। নাতনীকে ভেতরে যেতে বললে, ধমকালে। হিতে বিপরীত হ'ল। রতনমণির গোঁয়ের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। অগত্যা ভারা থেকে নামতে হ'ল দীননাথকে।

নাতনী আলমারীতে সাজানো সারবন্দী মাটির ফলের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে কেবল। রঙের-কারিগরির মহিমায় নকল ফল আসল দেখাচ্ছে—তাজা—একেবারে যেন গাছ থেকে পাড়া হয়েছে সবে। খেয়াল ধরলে, ফলগুলো পাবার জন্যে হুলুস্থুল বাধায় রতনমণি। এ কাণ্ড ঘটে মাঝে মাঝে। অন্য সময় আদর করে, দোকান ঘর থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় রতনমণিকে দীননাথ। ফলের নেশা ভোলাবার চেষ্টা করে। ভোলায়ও। এবারে কিন্তু কোনো চেষ্টাই করল না সে সব। বরং আলমারী থেকে একটা মাটির আম বার করে ওর হাতে দিলে তাড়াতাড়ি বিদায় করবার জন্যে।

নিমেষে চোখের জলে হাসির ঝলক উছলে পড়ল রতনমণির। বাঞ্ছিত ফল পেয়ে মুখভরা হাসি।

বিমুগ্ধ চোখে দেখছে এই হাসি দীননাথ। এই হাসিই যেন খুঁজছিল সে এতোদিন ধরে। মনের জড়তা অবসাদ কেটে গেল মুহূর্তে। দ্বিগুণ শক্তি এসে পড়ল দেহমনে। ভারায় উঠল। তুলি হাতে নিলে!...

ফুটল স্বর্গীয় হাসি মৃন্ময়ীমূর্তির মুখের ভাঁজে ভাঁজে। —আগের সুনাম অক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে দীননাথের। লোকে বলবে, জীবন্ত প্রতিমা। দীননাথ মরেনি এখনো। বেঁচে আছে। তুলি তার মৃতসঞ্জীবনী!

দীননাথের চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে। প্রতিমার মুখ দেখছে বার বার। দেখেও সাধ মিটছে না। অন্যবারে নিজের অন্তরের হাসি প্রতিমার মুখে প্রলেপ দেয় সে। এবারে সে উৎসে তার অকাল লেগেছে। নাতনীর হাসির রঙে তুলি ডুবিয়েছে। আগেকার সমস্ত শিল্প-কৌশলের মাধুর্য ম্লান করে দিয়েছে তার এই নতুন সৃষ্টি!

তারস্বরে কেঁদে উঠল রতনমণি। বুঝল বোধহয় ঠকেছে দাদুর কাছে। মাটির আমে দাঁত বসিয়ে আঘাত পেয়েছে।

পিছন ফিরে তাকিয়ে এ দৃশ্য দেখলে দীননাথ। বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। নীচে নেমে এসে, কোলে তুলে নিলে নাতনীকে। প্রতিমার দিকে তাকালে একবার। প্রতিমা হাসছে আর ব্যংগ করছে যেন তাকে। এই তুমি স্রষ্টা! সৃষ্টির অহংকার! ঠকিয়ে হাসি চুরি!

চোখে জল এলো দীননাথের অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য। অন্যমনস্ক হ'য়ে—রতনমণিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দোকান থেকে।

রতনমণির শিশুমন যন্ত্রণা ভুলল। কান্না ভুলল। দেখা-দৃশ্য ভুলল না কিন্তু দীননাথ। দুষ্টক্ষতের মতো মনের গভীরে দাগ কেটে বসেছে। অন্যবারের মতো প্রতিমাকে জীবন্ত করে তোলার কৃতিত্ব তার এবারে এতোটুকু নেই। চুরিকরা হাসির প্রলেপ দেবীর মুখে।

প্রতিমা দেখে সবাই হেসেছে। পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছে। বলেছে, মা আমাদের সদানন্দময়ী হাসিমুখী!

সরে গেছে তক্ষুণি দীননাথ। খদ্দেরদের কথাগুলো যেন কানে গরম সীসেগলা ঢেলেছে। এ সুখ্যাতি পাবার অধিকারী সে নয়।

মূর্তিটি নিয়ে ছেলের সংগে, স্ত্রীর সংগে, বন্ধুবান্ধব—সকলের সংগেই ভীষণ মন কষাকষি সুরু হ'ল দীননাথের। কিছুতেই মূর্তিটি বেচবে না সে। ওরাও নাছোড়বান্দা—বেচতেই হবে।

সমবয়সীরা বললে, ভীমরথী ধরেছে। তা না হ'লে এতোবড় একটা যোগ কি কেউ ছেড়ে দেয়! আশ্চর্য! লক্ষ্মী-সরস্বতী একসংগে—যশ-অর্থ!

স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল—পুজো চলে গেলে তো মূর্তি পড়ে পড়ে কাঁদবে, তখন হাসি থাকবে কোথায়! মূর্তি ঘরে রাখলে, হাসি দেখলে কি পেট ভরবে? সারা বছরের পেটের যোগাড় তো এই সময়! কথা শুনলেও গা জ্বলে ওঠে। বলে কিনা ও মূর্তিতে আমার দেওয়া নেই কিছু, বেচার অধিকারও নেই তাই। মাথা খারাপের আর বাকি কোথায়? বলি তবে কার?

কার? বলতে গিয়েও পারল না দীননাথ। কথা জড়িয়ে গেল। সরম এলো। নিজের দুর্বলতা চাপতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল মৌনধর্মের আড়ালে।

অমরনাথও বোঝালে বাবাকে। দ্বিগুণ থেকে চতুর্গুণে দর উঠেছে। এই বেলা, আর দেরী নয়। পুরোনোরা পায়ের সুতো ছিঁড়িয়ে, ঘটপুজো করবে বলে চলে গেছে। এবারে ছেলের দলও সরবে কিন্তু। এখনো ঝোঁকটা রয়েছে—জ্যামিতির মাপের প্রতিমা ভালো লাগছে না। এই মূর্তিই প্রাণবন্ত ঠেকছে ওদের চোখে। মওকা ছাড়া ঠিক হবে না।

না, না, না। তিনটে অব্যক্ত স্বর যেন কষাঘাতে আহত হয়ে বুক ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো দীননাথের।

হতভম্ব স্তব্ধ সকলে।

দীননাথের এই ধনুক-ভাঙা পণকে ভাঙতে নিভৃতে পরামর্শ চলল। বন্ধুবান্ধব স্ত্রী-পুত্র এক জোট হল।

খদ্দের এসেছে।

দীননাথ চোখের সামনে অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখছে। বাক্য সরছে না মুখে। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার অনুমতির প্রত্যাশা না করেই সকলে মিলে লরীতে তুলে দিলে প্রতিমা। বিক্রি হয়ে গেছে! অপরিসীম আনন্দে মশগুল সবাই। একটি প্রতিমায় এতোগুলো টাকা আর এতো সুখ্যাতি কেউ পায়নি এই কুমারপাড়ায় এর আগে কখনো।

মূর্তি চলে যাচ্ছে। লরীর গতি বাড়ছে। মন্থর থেকে দ্রুত হচ্ছে। বড় রাস্তায় আরো বাড়ল। অদৃশ্য হয়ে গেল লরীসমেত প্রতিমা।

সমবেত সকলের হো-হো-হ'-হা শব্দের হাসি যেন দীননাথের কানে করুণকান্নার সুরে বাজছে—রতনমণির কান্না!

বিবেকানন্দ

শ্রীতারকপ্রসাদ ঘোষ

সংশয়-সংক্ষুব্ধ মন অপেক্ষার-প্রস্তরে কঠিন,
তারি তলে নিকষের গহনান্ত বিশাল বিস্তার
কোন্ সত্য-কাঞ্চনের স্পর্শ লাগি' সমূলে নির্হার
ক'রেছিল দ্বিধাহীন, মোক্ষবাদী অপস্মারী ঋণ!—
শ্রদ্ধার সান্নিধ্যে তাই মানুষের পুনঃআবিষ্কার
প্রতিভাত হ'ল সেই হিমাতুর অবসন্ন ক্ষণে;—
প্রতুল প্রণয়-দৃষ্টি, বাণী তব প্রাণের স্পন্দনে
উৎসারিল কালোত্তর জাগৃতির সম্পৃক্ত সম্ভার!-
তোমার আয়ুর তেজ, সামুদ্রিক সহন-বিন্যাস
কর্ম্ম-বিজ্ঞান-সূত্রে সঞ্চারিল শক্তির-বিদ্যুৎ
শিব-বক্ষে নৃত্যপরা যথা তার অফুরন্ত কণা
সমগ্র সত্তায় পূর্ণ—পুঞ্জ-ঘন আরাম-আশ্বাস,
হে বীর বিবেকানন্দ, তুমি তার প্রমূর্ত্ত ব্যঞ্জনা—
রূপাতীত রূপায়ণ, অপরূপ অপূর্ব্ব অদ্ভুত!

পশ্চিমবাংলার হস্তশিল্প—৩

কাশ্যপ শর্মা

নীলাম্বরীর ইতিকথা

এদেশের রেশমী সাড়ীর মহিমা কীর্তন দেখা যায় মধ্যযুগীয় সাহিত্যে। বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যে পড়া যায় যে রাধাকে কালা পাটের সাড়ী পরতে মানা করা হচ্ছে, কারণ কালা (কৃষ্ণ) নামের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, 'আগুন পাটের সাড়ী' বা 'অগ্নি পাট সাড়ী' ছিল অত্যন্ত দামী আর এক-মাত্র বড় ঘরের মহিলাদেরই পরিধেয়। 'পাট' শব্দ সংস্কৃত 'পট্ট' শব্দ হতে এসেছে। রেশমকে বলা হোত চীন পট্ট বা চীনাংশুক। বাংলাদেশে পাটের সাড়ী বলতে রেশমের সাড়ীই বুঝিয়ে এসেছে। বিষ্ণুপুরে বহুদিন ধরে পাটের সাড়ী বোনা হয়ে এসেছে। এ সাড়ীও নানা রকমের কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। এ ধরণের কোন কোন সাড়ীতে রঙ্গীণ সুতো দিয়ে বুনে অলঙ্করণ করা হয়। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেশমী সাড়ীর উপর নানা রকম ডিজাইন ছাপাবার রেওয়াজই চলে এসেছে। রেশমের ছাপা সাড়ী আজও মুরশিদাবাদে প্রচুর তৈয়ারী হয়। আর দিনে দিনে নানা রকম নতুন নক্সার অবতারণা করে ক্রেতা-চিত্তকে জয় করবার প্রয়াস পাচ্ছেন বাংলার সুনিপুণ কলাবিদ্, তাঁত-শিল্পীরা। এ ক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগও প্রশংসনীয়। নানা রকমের নতুন ডিজাইনের আইডিয়া দিয়ে তাঁরা সমূহভাবে সাহায্য করছেন এই শিল্পীদের। মুরশিদাবাদ ছাড়া রেশমবস্ত্রের অন্যান্য উৎপাদন কেন্দ্র মালদহ আর বাঁকুড়া জেলা। এছাড়া বীরভূম ও পুরুলিয়া এবং মেদিনীপুরের আনন্দপুর অঞ্চলেও রেশমবস্ত্রের উৎপাদন হয়। পশ্চিমবাংলার এই সব জেলাতে প্রতিবছরে প্রায় দেড় কোটি টাকার রেশম বস্ত্র উৎপন্ন হয়। রেশমী-বস্ত্রের জন্য বিখ্যাত পশ্চিমবাংলার কয়েকটি স্থানের নাম : গণকর, মির্জাপুর, ইসলামপুর (মুরশিদাবাদ), সোনামুখী, বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া), মালদহ, আনন্দপুর (মেদিনীপুর), সিংবাজার, রঘুনাথপুর (পুরুলিয়া) বসহাবিষ্ণুপুর, তাঁতিপাড়া (বীরভূম)।

রেশমশিল্পের সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে চলেছে কৃত্রিম রেশম

শয্যাবরণে শিল্প সৌন্দর্য

অথবা রেয়ণের উৎপাদন। রেশমশিল্পের অনেক কেন্দ্রেই অধুনা কৃত্রিম-রেশমের সাড়ী বোনা হচ্ছে। আর এ সাড়ীর বয়নে রেশমীসাড়ীর অনেক অলঙ্করণই অনুকরণ করা হচ্ছে।

কৃত্রিম রেশমের সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদনেও বহু ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন এবং বর্তমানে সমবায় সমিতির সদস্যেরা

নানারকম জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত কাঁথা
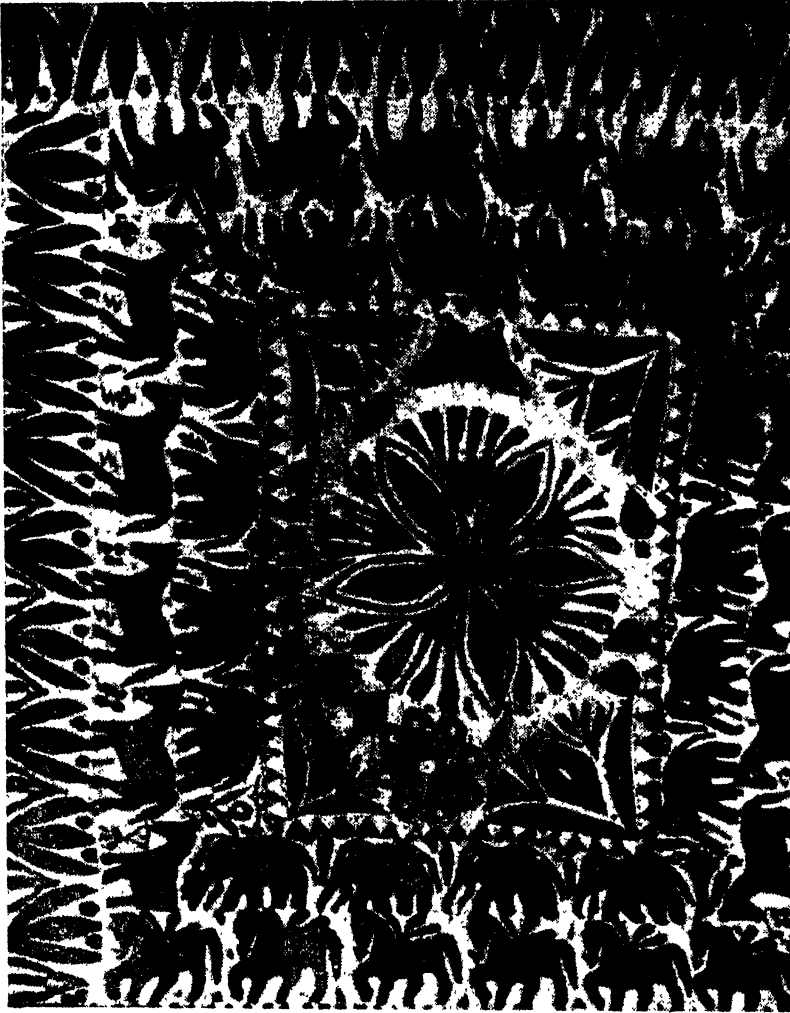
কেবলমাত্র বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বছরে প্রায় দুই লক্ষ টাকার বস্ত্র উৎপাদন করেন।

পাটতন্তু হতেও পশ্চিমবাংলায় কাপড় তৈয়ারী হয়। এই শিল্পে নিযুক্ত জনসংখ্যা ও তাদের উৎপাদন উপেক্ষণীয় নয়।

রেশমীসাড়ীর মতন বাংলার সূতির সাড়ীরও নাম বহুজনবিদিত। নানা রঙে বোনা এই শাড়ীর নাম থেকে এদের স্বরূপ বোঝা যায়। যেমন গঙ্গাজলী—বললেই মনে পড়ে স্বচ্ছ সাদা নরম বুনোটের সাড়ী—যা পরলে কোমলাকে আরো কোমল করে দেয়। মেঘডম্বর নীলাম্বরী, ময়ূরপেখম, আশমান তারা, অগ্নিফুল সাড়ীর নামও আমাদের প্রাচীন লোকসাহিত্যে ছড়িয়ে আছে। জামদানী সাড়ীর নাম না করলে বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এ সাড়ীর জমিতে নক্সাগুলি এমবয়ডারী করে বসান। নক্সাগুলি তেরছা ভাবে সাজান। অলঙ্করণের সম্ভারই জামদানী সাড়ীতে তার বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে। নক্সাতে নানা আকারের ফুল লতাপাতা কল্কার ব্যবহার জামদানী সাড়িতে দেখা যায়। তাছাড়া জ্যামিতিক অঙ্কনের কাজও এ সাড়ীতে প্রচুর চলে।

ঢাকা জেলার বসাক সম্প্রদায়ের লোকেরা 'কাশিদা'

কাঁথায় কল্কার নক্সা

ামে বিশেষ এক রকম কাপড়ের সৃষ্টি করেছিলেন। কাশিদা কাপড়ের সমস্ত জমিই নক্সায় ঢাকা। এক সময় মধ্যপ্রাচ্যে কাশিদার, বিশেষকরে কাশিদা রুমালের অত্যন্ত আদর ছিল এবং সেকালে এর রপ্তানীও হোত বহুল পরিমাণে।

ঢাকার বসাকেরা আজ অনেকেই পশ্চিমবাংলায় এসেছেন। আর পশ্চিমবাংলাতেই এখন তৈয়ারী হচ্ছে ঢাকাই জামদানী, আর ঢাকাই কাশিদা।

১৯৪০ সালে তথ্য-অনুসন্ধানকারী কমিটির হিসাবে সে সময়ে পশ্চিমবাংলায় মোট তাঁত ছিল ৪৩,০০০। বর্তমানে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৫৪ হাজার (অক্টোবর ১৯৬৩)। এর মধ্যে ৭৭ হাজারের বেশী তাঁত সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত এবং বর্তমান সমবায় সমিতির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী। কলের সঙ্গে তাঁতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁত নিজগুণেই টিকে আছে।

তাঁতশিল্পের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় পশ্চিমবাংলা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাঁত-শিল্পে পশ্চিমবাংলার দান বিশেষভাবে স্বীকৃত। শুধু উৎপাদনের দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে বর্তমানে সারা ভারতের মোট উৎপাদনের দশ-শতাংশ তাঁতের কাপড় এখানে তৈয়ারী হচ্ছে। অথচ ভারতের মোট তাঁতের তুলনায় পশ্চিমবাংলার তাঁতের সংখ্যা ৫ শতাংশ। সুতরাং গড়ে প্রতি তাঁতের উৎপাদন অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে এখানে বাড়ছে এবং ভবিষ্যতে আরও বাড়বে আশা করা যায়।

কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে তাঁতশিল্পের গুরুত্ব সর্ববাদি-সম্মত। কৃষির পরেই এর স্থান এ রাজ্যে। ১৯৬৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে ৩ লক্ষ ৩৮ হাজারের ওপর কর্মী প্রত্যক্ষভাবে এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পশ্চিমবাংলার তাঁতশিল্পের গুরুত্বের জন্ত এর প্রতি সরকারী দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট
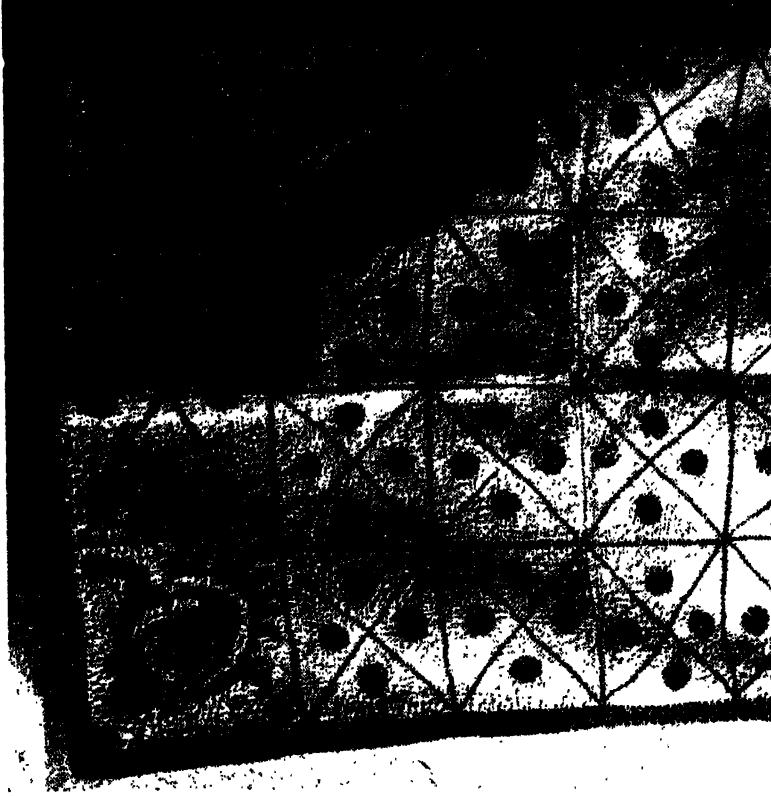
বুটিদার কাঁথা

১, ২, ৩ ও ৪ নং ছবিগুলির আলোকচিত্র শ্রীসুধীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়েছেন।

হয়েছে এবং তাঁতশিল্প উন্নয়নের জন্য এবং তাঁতশিল্পীদের সাহায্যের জন্য সরকারী অনেক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। এর মধ্যে তাঁতবস্ত্রের বিপনন তাঁতশিল্পীদের মূলধন দিয়ে সাহায্য করা, শিক্ষার ব্যবস্থা করা—এ সব ব্যবস্থাও আছে।

কিন্তু সবচেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করেছে কাঁচামালের অভাব। সুতোর জন্য বাংলার তাঁতশিল্পী এতদিন পরমুখ পেক্ষী হয়ে রয়েছে—আর সুতোর বাজার এই বাইরের বিশেষতঃ দক্ষিণের সওদাগরদের দাক্ষিণ্যের উপরই নির্ভর করেছে বাংলার তাঁতের কাপড়। 'বছরে ৪ কোটি পাউণ্ডের মত সুতো পশ্চিমবাংলার চাহিদা। এই অভাব মেটাবার জন্য কয়েকটি সুতোর কলের পরিকল্পনা হয়েছে। তার মধ্যে কল্যাণীতে ৫০ হাজার টাকুর যে সুতোকল চালু হয়েছে তা থেকে এখানকার সমস্যার কিছু লাঘব হয়েছে মনে হয়।

পশ্চিমবাংলার বাটিকের কাজ সম্বন্ধে কিছু না বললে বস্ত্রশিল্পের কথাশেষ হয় না। অনেকের ধারণা বাটিকের জন্মস্থান যবদ্বীপ, আর সেখান থেকে একাজ এখানে আমদানী করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। ভারতে বাটিকের কাজের বহুপ্রাচীন নিদর্শন আছে—যার বয়স খৃঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত টানা যায়। মসলীপত্তনের 'কলমকারী' কাজ আসলে বাটিকেরই এক রূপ।—অবশ্য বর্তমানধারায় বাটিকের কাজ যবদ্বীপ থেকেই এসেছে শান্তিনিকেতন হয়ে। বাটিকের কাজে মোমের আর

রঙনের ছাঁচ দিয়ে বস্ত্রের নানারকম অলংকরণ করা হয়।

অঙ্গাবরণের ক্ষেত্রে শিল্পীমন যে উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিল—অন্য সাধারণ ক্ষেত্রেও তার অভাব হয়নি। বাংলাদেশের কাঁথা অতি তুচ্ছ জিনিষে তৈয়ারী। পুরোনো কাপড় আর পাড়ের সুতো দিয়েই সাধারণতঃ এই আবরণের সৃষ্টি। নবাগত শিশুসন্তানের জন্য মা দিদিমাদের অবসর সময়ের এই শিল্পকাজ এখনও গ্রামে গ্রামে চলে আসছে। কাঁথা একেবারেই বাংলার নিজস্ব জিনিষ। শয্যার আবরণ ও গাত্রাবরণ হিসাবে গৃহস্থের ঘরে সমাদৃত। নক্সার কাজের জন্য বিখ্যাত অনেক কাঁথাই দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ, প্রমাণ সাইজের কাঁথা ৭½´×৩½´ আয়তনের হয়। দুতিন খানা বা তিন চারখানা কাপড় পর পর রেখে, সেগুলিকে লম্বালম্বি সেলাই করে নেওয়া হয়। এক দিক থেকে আরম্ভ করে সারা কাপড় সেলাই করা শেষ করে আবার সেই প্রান্তে ফিরে আসাই হলো কাঁথা সেলাইয়ের মোটামুটি নিয়ম। নানা রঙের সুতো দিয়ে ফুল, লতাপাতা, মানুষের মূর্তি ইত্যাদি দিয়ে নকসা করে সারা কাঁথার জমিতে সেলাই করা হয়। এক একটি কাঁথা শিল্পে অপরূপ—শিল্পরসিককে আনন্দ দেবার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে।
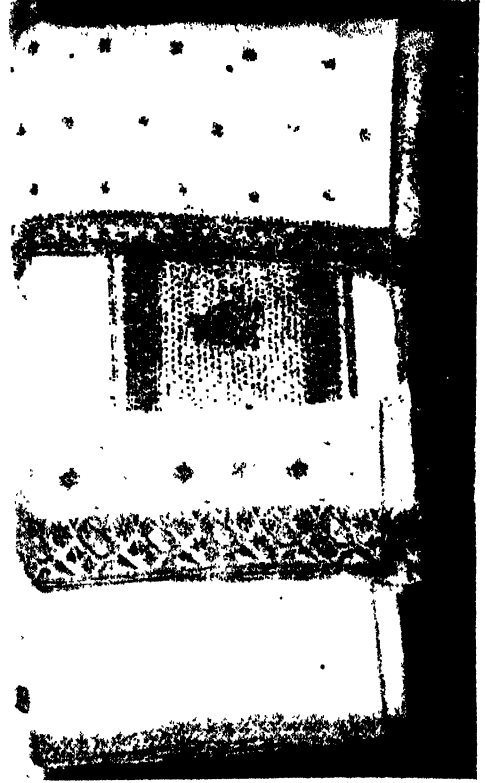
তাঁতের শাড়ীর অলংকরণ বৈচিত্র্য

অভিযান

শ্রীসুশীলকৃষ্ণ সেনগুপ্ত

যে বাণী বলার মেলেনি সুযোগ, যে কথা পেলো না ভাষা—
তা'রই 'পরে মোর আশা ;
তা'রই 'পরে মোর সাধন-সফল সিদ্ধ-সপ্ত সুর
মূর্চ্ছিত সুমধুর—
হবে চিরকাল বিশ্ববাসীর অন্তর-বীণা তারে
অশ্রুত ঝঙ্কারে !
মহৎ ব্যথার হাহাকার শুনি বঞ্চনা বিক্ষোভে
সংঘাতে, লাভে, লোভে—
এই তপোবন ধ্যান ধন্য বিশাল বিশ্ব 'পরে
মানুষের অন্তরে।
শুনি—সে কালের শরাঘাতাহত বিয়োগ-বিমূর্চ্ছন
ক্রৌঞ্চের ক্রন্দন :
সিন্ধুপারের রক্ষ-শক্তি বীভৎস বিক্রমে
প্রবেশি ভারত-ভূমে—
ভিক্ষুর বেশে ক'রেছে হরণ সীতা মা'রে উল্লাসি—
সত্যাদর্শ নাশি'।
আজ বক্ষের আক্রোশ জাগে অন্তরে বার বার
প্রতিশোধ চায় তা'র !
অবহেলিত সে কপিদল আর কাঠ-বিড়ালীরে নিয়ে
সমুদ্রে বাঁধ দিয়ে,
মাতৃশক্তি অন্তর-বাণী বন্দিনী জানকীরে
সম্মান সম্ভারে
পরাজিত করি সকল বিঘ্নে আনিবো ফিরায়ে ফের
স্বদেশেতে আমাদের।
অলিখিত এই মহাকালজয়ী শাশ্বত রামায়ণ
হবে তাই রূপায়ণ,
বিরচিত হবে মহান যুগের মহান উপাখ্যান :
এ যে তা'রই অভিযান !
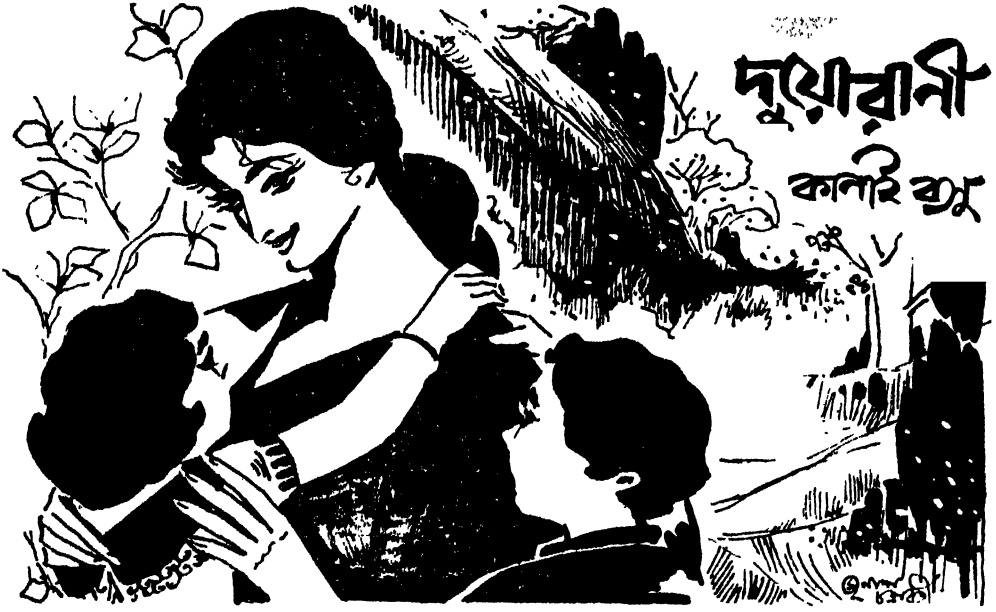
বৈশাখ মাস শেষ হইতে চলিল। মেঘের চিহ্নমাত্র নাই, কালবৈশাখীর আবির্ভাব হয় নাই। মার্তণ্ডতাপে দেশ জ্বলিয়া যাইতেছে। লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

বিহারের এক ছোট সহরের এক ছোট স্কুলে এক শুক্রবারে বেলা একটায় হঠাৎ ছুটি হইয়া গেল, স্থানীয় কোন বড়লোকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ উপলক্ষে। ছেলেমেয়েরা শোক মানে না। মার্তণ্ড মানে না। অপ্রত্যাশিত ছুটির আনন্দে হৈ হৈ করিয়া বাহির হইয়া গেল। শিক্ষিকাদের মনে শোক হইয়াছে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু উপরি ছুটি কয়েক ঘণ্টা মাত্র হইলেও পাইয়া খুশী হইয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই গৃহী ও এখানকার অধিবাসী। গৃহের টানে মার্তণ্ডদেবকে মাথায় রাখিয়া তাঁহারা গৃহে চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী রায় এখানকার লোক নহেন, এখানে আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, গৃহ সংসার এখনও হয় নাই। অল্পদিন হইল চাকরি লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহারই মতো প্রবাসিনী এক শিক্ষিকার সঙ্গে একটি ছোট বাসা করিয়া আছেন। সেই নীরস বাসায় ফিরিবার তাড়া নাই।

লাইব্রেরী-ঘরে বসিয়া জানালার বাহিরে রৌদ্রদগ্ধ মাঠের দিকে চাহিয়া শ্রীমতী ভাবিতে লাগিলেন কোথায় যাওয়া যায়। আলাপ বন্ধুত্ব তেমন কিছু হয় নাই। তা ছাড়া কাহারও বাড়ীতে যাইতে ইচ্ছাও করে না। যদি মেঘ করিত, যদি একটা নদী থাকিত কাছাকাছির মধ্যে, যদি নদীর ধার নির্জন হইত, তাহা হইলে সেখানে গিয়া বেড়ানো বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যাইত। কিন্তু এতগুলি যদির আবদার পূরণ হইবার নহে।

নদী না থাক, মেঘ না থাক, খর রৌদ্রের দিনে যাইবার জায়গাও থাকে। এমন রৌদ্রে মনকে টানে ঘনছায়াচ্ছন্ন আমবাগান। কচি হোক, কাঁচা হোক, কিছু না কিছু মেলেই। আর মেলে আলোর ঝিলিমিলি, গাছের ছায়া, বনের হাওয়া, পাতার মর্মর, পাখীর ডাক মেশানো দুপুরের নিস্তব্ধতা। কিন্তু এ-ও স্বপ্ন। এ-স্বপ্নে কেবল দেশের জন্য মন কেমন করা বাড়ে। দেশের জন্য, মায়ের জন্য, ছোট ভাইটির জন্য মন কেমন করে।

ঘণ্টাখানেক কাটিল লাইব্রেরীতে বসিয়া, বইয়ের পাতা উল্টাইয়া, বাহিরে চাহিয়া। আর ঘরের মধ্যে মন টিকিল না। বই তুলিয়া রাখিয়া শ্রীমতী পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। রঙীণ ছাতা দিয়া মাথা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন, বাসার দিকে নহে, অন্য দিকে। বাসায় গরম

বিছানায় পড়িয়া এ-পাশ ও-পাশ করা, ঘনঘন জল খাওয়া ও পাখা নাড়া বই তো নয়। অন্যমনে পথ চলিতেছেন শ্রীমতী। যাহাকে বলে যেদিকে দুচোখ যায় সেই দিকে চলিতেছেন। এমন সময় দেখিলেন একটা প্রকাণ্ড লরি ওদিক হইতে আসিতেছে। তাহাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিতে এবং চক্র তাড়িত ধূলি হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিতে শ্রীমতী পথের একান্ত ধারে দাঁড়াইলেন। সেই ধারে তাঁহার পিছনে একটা জঙ্গল। ধূলিজালে সহস্র গোধূলি সৃষ্টি করিয়া লরি চলিয়া গেল। নাকে রুমাল চাপিয়া শ্রীমতী পথে পা বাড়াইয়াছেন। অন্যমনস্ক বলিয়া শুনিতে পাইলেন না পিছনের মৃদু শিশুকণ্ঠের ডাক -"শোনো, এই শোনো।"

শ্রীমতী অগ্রসর হইলেন। আবার ডাক—"এই শোনো না, এই।" এবার কানে আসিল। শিশুর কণ্ঠ। অবশ্যই তাঁহাকে নহে। তথাপি পিছন ফিরিয়া ছিলেন শ্রীমতী। পিছনে জঙ্গল বা ভূতপূর্ব বাগান। সেই জঙ্গলের ধারে ভাঙ্গা নীচু পাচিলের ওপারে ফ্রকপরা পাঁচ ছয় বৎসরের একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার পানে চাহিয়া আছে। তিনি ফিরিতে ছোট হাত নাড়িয়া বলিল— "শোনো না।"

শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমায় বলছো খুকু? কী বলছো?"

উত্তর—শুনিলেন "খুকু কেন? আমি খুকু না।"

সকৌতুকে শ্রীমতী বলিলেন—"তবে তুমি কে?"

"আমি—আমি হচ্ছি—আমি কে রে দাদা?"

প্রশ্নটা পাশের এক ঝোপকে। ঝোপ উত্তর দিল— "কেশবতী।"

খুকু বলিল—"হ্যাঁ, আমি কেশবতী, বুঝলে? আমার নাম কেশবতী, আর ওর নাম (ঝোপকে নির্দেশ করিয়া) ওর নাম হলো—"

ঝোপ বলিল—"কাঞ্চনকুমার।"

"হ্যাঁ, ওর নাম কাঞ্চনকুমার। ও হোলো রাজপুত্তুর, আর আমি রাজকন্যে। বুঝতে পেরেছ?"

শ্রীমতী বলিলেন—"বুঝতে পেরেছি। তা কেশবতী, তুমি আমাকে ডাকছো কেন গো? কী বলছো?"

কেশবতী বলিল—"তুমি ঘুঁটে কুড়োতে পারো? ঘুঁটে?"

কাজটা কঠিন নয়, যদি মালিক আপত্তি না করে। কিন্তু উদ্দেশ্য না জানলে কুড়ানো নিরর্থক এবং বিনা-মূল্যে প্রাপ্তিস্থানটাও জানা দরকার। সুতরাং শ্রীমতী বলিলেন—"হুঁ, পারি বই কি। কোথায় ঘুঁটে?"

কেশবতী জিজ্ঞাসা করিল—"আর কাঠ? বন থেকে কাঠ, আর—আর কী রে দাদা?"

অদৃশ্য কাঞ্চনকুমার বলিল—"শুকনো পাতা আর বনের ফলটল।"

কেশবতী বলিল—"হ্যাঁ, বন থেকে কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনতে পারো? আর বনের ফল পাড়তে পারবে?"

কাজের ফর্দ বাড়িতেছে। তা হোক, সকল কাজেই তাঁহার পারদর্শিতা আছে জানাইয়া শ্রীমতী যখন রাজ-কন্যার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন, তখন রাজকন্যা খুশী হইয়া ডাকিল—"ওরে দাদা, পারে, সব পারে। তুই আয় না।"

এইবার এতাবৎ অদৃশ্য রাজপুত্র ঝোপের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিল। হাফপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা ধূলি-ধূসর বছর-আষ্টেকের কাঞ্চনকুমার ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কয়েক মুহূর্ত শ্রীমতীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিল, তারপর বলিল—"নাঃ, হবে না।"

কেশবতীর পছন্দ হইয়াছিল, সে বলিল—"কেন হবে না? বলছে তো পারে, ঘুঁটে কুড়োতে পারে, সব পারে, বলছে তো।"

রাজপুত্র গম্ভীর ভাবে বলিল—"ঠিক কাপড় পরতে পারে না। ও-রকম করে কাপড় পরলে কি হয়?"

কেশবতী বলিল—"কেন, বেশ তো কাপড় পরেছে?"

এই প্রশ্ন শ্রীমতীও করিলেন, মনে মনে। বহুমূল্য না হইলেও পরিধেয় সম্বন্ধে এবং তাহা পরিধানের পারিপাট্য লইয়া তাঁহার মনে একটু গর্ব আছে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বিচারকের কঠিন দৃষ্টিতে তাঁহার বেশ-বাসে কী দোষ ধরা পড়িল?

কেশবতীর প্রশ্নের উত্তরে তাহার দাদা বলিল— "ঐরকম করে নতুন কাপড় পরলে হয় না। তুমি কিছু

জানোনা খুকু। তার চেয়ে আমি মতির মাকে বলবো-'খন। সেই ঠিক হবে।"

কেশবতী প্রবল জোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—"চাই না আমি মতির মাকে। বিচ্ছিরি মতির মা। আমি কিছুতেই তাকে নেবো না। আমি চলে যাচ্ছি।"

বলিতে বলিতে খুকুর কণ্ঠে ক্রন্দনের সুর লাগিল। সে মুখ ফিরাইয়া দ্রুত চলিতে সুরু করিল। তখন খুকুর দাদা তাহার কাছে গিয়া তাহার গলা জড়াইয়া কানে কানে কী বলিল। খুকু মাথা নাড়িল এবং দাদার কানে কানে সেও কী বলিল।

দুই ভাই বোনে পরামর্শ চলিতেছে, শ্রীমতী দাঁড়াইয়া আছেন। অজানা প্রতিদ্বন্দ্বিনী মতির মার সহিত বেশবাসের প্রতিযোগিতায় হারিয়া ও ঘুঁটে কুড়াইবার কর্মে অমনোনীত হইয়া তাঁহার দাঁড়াইয়া থাকিবার কোনও প্রয়োজন ছিল না, যুক্তিসঙ্গত কারণও ছিল না। তথাপি, পরাজয়ের লজ্জা মাথায় লইয়া, শ্রীমতী উৎসুকচিত্তে দাঁড়াইয়া রহিলেন কেন, কে জানে।

কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপর কেশবতী ছুটিয়া আসিল। পিছনে কাঞ্চনকুমারও আসিল। ভাঙ্গা পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া কেশবতী শ্রীমতীর কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার ছেঁড়া কাপড় আছে? ছেঁড়া কাপড় পরতে পারো তুমি?"

ঘুঁটে কুড়ানোর অপেক্ষা সহজ কাজ। দুষ্প্রাপ্য বস্তুও নয়। কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া কেশবতী বলিল—"মতির মা'র ছেঁড়া কাপড় আছে। আমি তোমাকে চেয়ে এনে দেবো।" এবং মন্তব্য করিল—"মতির মা'কে আমার একটুও পছন্দ হয় না।" বলিয়া সে শ্রীমতীর একটি হাত আপন দুই হাতে ধরিল।

কেশবতীর কথা ও কাজের মিলিত অর্থ অস্পষ্ট নহে। তবু নিজের সম্বন্ধে ভালো কথা নিজের কানে শুনিতে ভালো লাগে। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমাকে পছন্দ হয়?"

ঘাড় হেলাইয়া ও টানা সুরে কেশবতী বলিল—"হ্যাঁ-হ্যাঁ।"

"কিন্তু তোমার দাদার যে পছন্দ হয়নি।"

"তুমি একটু থাকো না, ওর পছন্দ হবে। আর ছেঁড়া কাপড় পরলেই, জামাটামা পরবে না, বুঝলে? তুমি তো গরীব মানুষ শুধু ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরলেই না ওর খুব পছন্দ হবে। না রে দাদা?"

সে শ্রীমতীর হাত আকর্ষণ করিয়া বলিল—"তুমি ছেঁড়া কাপড় পরে তবে তো ঘুঁটে কুড়োবে। না গো?"

"হ্যাঁ, তা তো বটেই।" বলিয়া শ্রীমতী নির্বোধের মতো জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঘুঁটে কুড়িয়ে কী হবে গো?"

কেশবতীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। চোখ বড়ো করিয়া বলিল—"ও মা: দুয়োরানী বুঝি ঘুঁটে কুড়োবে না? তবে আমাদের মানুষ করবে কী করে?"

কাঞ্চনকুমার ইতিমধ্যে এক পা এক পা করিয়া কাছে আসিয়াছিল। সে স্মরণ করাইয়া দিল—"আর বন থেকে কাট-টাট কুড়োবে, কাট লতাপাতা সব দিয়ে তবে তো রান্না করবে।"

কেশবতী দাদার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল—"তবে তো রান্না করবে। নইলে কী দিয়ে রান্না করবে বল?"

শ্রীমতী আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন—"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে।"

তখন কেশবতীও আশ্বস্ত হইয়া আর একটু প্রবলভাবে তাঁহার হাত আকর্ষণ করিল।

এবং বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন না, শ্রীমতী বিনা আপত্তিতে আকৃষ্ট হইলেন। শ্রীমতী যুক্তিশাস্ত্র পড়িয়াছেন, দর্শনশাস্ত্র পড়িয়াছেন। আরও কতো জ্ঞানের বই পড়িয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও, যুক্তি না বুঝিয়া, কারণ দর্শন না করিয়া, নিতান্ত অজ্ঞানের মতো কেশবতীর সঙ্গে চলিলেন ও পাঁচিল ডিঙ্গাইলেন। চলিতে চলিতে অজ্ঞানের মতই জিজ্ঞাসা করিলেন—"এখন আমরা কোথায় যাবো? তোমাদের বাড়ী?"

কেশবতী বলিল—"না গো, ভয় নেই। বাড়ীতে যাবো কেন? বনে যাচ্ছি।"

ইহা অবশ্য ভরসার কথা। ভরসা করিয়া চলিলেন শ্রীমতী। বাড়ীতে ভয়, বনে অভয়, বন মনোরম, একথা শ্রীমতীর বয়স হইবার পর মনে ছিল না। কেশবতী ভরসার উপর আরও ভরসা দিল, প্রলোভন দেখাইল—"খুব ভীষণ বন, জানো? কী বন রে দাদা?"

দাদা বলিয়া দিল—"অজগর বন।"

"হ্যাঁ, অজগর বন। এত্তো বড়ো বড়ো (দুই হাত সারিত করিয়া দেখাইল) সব বাঘ সিংগি আছে, বন ভর্তি, ছাপ্পাছাপ্পি।"

দাদা বলিল—"আর রাক্কোস।"

"হ্যাঁ, আর রাক্কোস রাক্কুসি কত্তো আছে বনের ভেতরে। বুঝলে?"

তবে আর ভাবনা কী? একত্রে এত বাঘ সিংহ রাক্ষস ও রাক্ষসীর প্রত্যক্ষ সঙ্গ লাভের নিশ্চিত সম্ভাবনা, এ একটা দুর্লভ সৌভাগ্য। মানব জীবনে কদাচিৎ মেলে। বলা বাহুল্য, যাহার মেলে, তাহার বোধহয় একবারই মেলে, দ্বিতীয়বার নহে। সেই দুর্লভ ভাগ্যে ভাগ্যবতী শ্রীমতী অতএব অজগর বনে প্রবেশ করিতে চলিলেন।

ঘন-পত্র, বৃহৎ ও প্রাচীন গাছ, দীর্ঘ ঘাস, চোরকাঁটা, আগাছা, ছোটো বড়ো নানা ঝোপঝাড়, উঁচু-নিচু জমি, শুষ্ক পাতার রাশি, পথের রেখা নাই, স্থানে স্থানে নিবিড় ছায়া, স্থানে স্থানে প্রখর রৌদ্র, পাখীর ডাক, কাঠ-বিড়ালীর বিচরণ, জনমানব নাই,—সবসুদ্ধ মিলিয়া এ একটা মনোরম রাজ্য, নতন জগৎ বটে। লোকসমাজের বাহিরে, স্কুল কমিটির ভূগোলের পারে এ স্থান। নানা শৃঙ্খলে আবদ্ধ মানুষের মুক্তির স্থান।

সৌখীন শাড়ীর নিম্নভাগ প্রায় অর্দ্ধেকটা জর্জরিত হইল চোরকাঁটায়। উঁচুনিচু জমিতে পা মচকাইল এবং অনবধানতাবশতঃ একবার গাছের নিচু ডালে মাথা ঠেকিয়া গেল। ক্রমে শাড়ী গুটাইয়া জানুর কাছে তুলিলেন। এখানে অসুন্দর কুটিলচিত্ত নর-সমাজ নাই, আছে মনোহর বাঘ সিংহ ও সরল রাক্ষস। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কতদূরে গো অজগর বন?"

কেশবতীর ভয় হইল ঘুঁটে কুড়াইবার কাঠকুটা জ্বালিয়া রান্না করিবার এমন সুপাত্রীটি বুঝি বন অনেক দূর ভাবিয়া ফিরিয়া যায়। সে বলিল—"এই তো কাছেই গো। এসে পড়িচি। ঐ যে তালগাছটার নিচে দিয়ে—"

কাঞ্চনকুমারের ভৌগোলিক জ্ঞান বেশী, সে তাড়াতাড়ি সংশোধন করিয়া দিল—"ধেৎ, কাছে বুঝি বন হয়?" হাত তুলিয়া অনির্দেশের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল—"উই তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে নদী পেরিয়ে মস্ত উঁচু পাহাড় পেরিয়ে তারপর—তারপর—"

বনে যাইতে হইলে কত ত্রিপ্রান্তর, কত নদী, কত পর্বত পার হইতে হয় এবং আরও কত দুরতিক্রম্য বাধা বিপত্তি আছে, তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে কাঞ্চনকুমার। কিন্তু কেশবতীর ধৈর্য রহিল না, তাছাড়া আশঙ্কাও আছে, অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ সঙ্গিনী পাছে অত দুর্গম বনে যাইতে ভয় পাইয়া সরিয়া পড়ে। তাই সে দাদাকে আর স্মরণ করিবার অবসর দিল না। বলিল—"না গো, আজ আমরা সেই অনেক দূরের বনে যাবো না। আজ এই কাছেই একটা ছোটো অজগর বন আছে না, সেইখানে যাবো। না রে দাদা?"

দাদা বলিল—"হাঁ।"

অধিক দূর না হোক কিছু নদী পর্বত উত্তরণ করিতেই হয়। এই মানুষটি নূতন লোক, জানিবে কী করিয়া। তাই রাজকন্যা ও রাজপুত্র পথ চিনাইয়া ও প্রয়োজন-মতো নির্দেশ দিয়া লইয়া চলিল। কাঞ্চনকুমার হাত দেড়েক মাপের কঞ্চি জাতীয় একটা প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আগে আগে চলিয়াছে। হঠাৎ বলিল—"দাঁড়াও, নদীর ধারে এসে পড়েচি।" বলিয়া কঞ্চি দিয়া মাটিতে এক রেখা টানিয়া দিল ও কয়েক পা আগাইয়া গিয়া একটি রেখা টানিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"তুমি সাঁতার কেটে আসতে পারবে তো? সাঁতার কাটতে না পারলে ডুবে যাবে কিন্তু।"

কেশবতী বলিল—"ভীষণ বড়ো নদী! ডুবে যাবে কিন্তু।"

শ্রীমতীর এখন সঙ্গ গুণে সাহস বাড়িয়াছে, শক্তিরও অন্ত নাই। বলিলেন—"হ্যাঁ পারবো। তোমরা আগে আগে সাঁতরে যাও।" সত্যই তিনি কেশবতী ও কাঞ্চনকুমারের দৃষ্টান্তে মাথা নিচু করিয়া দুই হাতে অদৃশ্য জল কাটিতে কাটিতে সেই ভীষণ গভীর বিস্তৃত নদী অনায়াসে সন্তরণে পার হইলেন। এই রূপে পর্বত চিনাইয়া দিয়া ও তাহা উত্তরণ করাইয়া ভাই বোন তাঁহাকে লইয়া চলিল।

কাঞ্চনকুমার বলিল—"কাল দুকুর বেলা, যখন আর্দ্দেক

রাত্তিরে ঘুট্‌ঘুট্টি অন্ধকার হবে, তখন সেই অনেক দূরের বনে যাবো, কেমন বোনটি ?”

কেশবতী বলিল—“হ্যাঁ। ”শ্রীমতীকে বলিল—”তোমার কিচ্ছু ভয় নেই। আমার হাত ধরে যাবে। আমি চক্‌চকে পাতর দিয়ে আলো জ্বালবো—”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“চকচকে পাতর নয় বোনটি, চকমকি পাতর।” নূতন মানুষের সম্মুখে ভুল সংশোধন করাতে কেশবতী সন্তুষ্ট হইল না। এক্ষেত্রে ভুল স্বীকার করাও চলে না, সে বলিল—“জানি জানি। চকমকিও বলে চকচকেও বলে। চক্‌চক্ করে না বুঝি ? হ্যাঁ গো, চক্‌চক্ করে না ?”

শ্রীমতী জীবনে চকমকি পাথর দেখেন নাই, তাই নিশ্চিন্ত জোরের সহিত বলিলেন—“চক্‌চক্ করবে না ? বাঃ, খুব চক্‌চক্ করে।”

কাঞ্চনকুমার আর কথা বাড়াইল না। এই ঘুঁটে-কুড়ানীটা অনেক বিষয়ে অজ্ঞ হইলেও, বয়স হইয়াছে। সুতরাং সে চকমকি সম্বন্ধে তর্ক না করিয়া পাথরটাকেই উড়াইয়া দিল। বলিল—“আলো জ্বালতেই হবে না। আমার কাছে তো মাণিক থাকবে, সাপের মাথার মাণিক, তাতেই তো চার দিক আলো হয়ে যাবে। হ্যাঁ।”

বহুক্ষণ পথ চলিয়া—সুদীর্ঘ আধ মিনিটও হইতে পারে, অজগর বনে উপনীত হইলেন শ্রীমতী। একটা ভাঙ্গা চালাঘর এখনও কোন রকমে খাড়া হইয়া আছে। দেয়ালের চালার অনেক অংশ অনুপস্থিত। দরজা জানালার বালাই নাই, মেঝেতে আগাছার জঙ্গল হইয়াছে। এককালে হয়তো মালীর ঘর ছিল। দাওয়ার একধারে উনান ছিল, কালিঝুলির প্রলেপ এখনও আছে দেয়ালে। আবার পরে বোধহয় গোশালা হইয়াছিল। ঘরের কোনে মেঝেতে অর্দ্ধপ্রোথিত ভাঙ্গা গামলা ও খোঁটা তাহার সাক্ষ্য দেয়। মানুষ ও গরু কতকাল এ আবাস ত্যাগ করিয়াছে তাহা অনুমান করা শক্ত। এখন ইহা নির্বাসিতা দুয়োরাণীর উপযুক্ত কুটির বটে।

কুটির যেমনই হোক, স্থানটি আদর্শ। রাজার রাজত্বের বাহিরে, মানুষের দৃষ্টি কলুষের আশঙ্কা নাই, সভ্য সমাজের স্পর্শ দোষ লাগে নাই। চলিতে গেলে পায়ের তলায় পাতার রাশি মর্মরিয়া ওঠে। সূর্যের রৌদ্রকে এখান গাছের ডালপাতায় ছাঁকিয়া তবে গ্রহণ করে, চাঁদের আলো এখানে শুধু আলোই নহে, আলপনা আঁকিবার রঙ,নক্সা করিবার রেশম। কবে কোন ধনীর সখের বাগান ছিল, সখ শেষ হইয়াছে, সখ করিবার মানুষ শেষ হইয়াছে। তারপর অরণ্যে পরিণত হইয়া পড়িয়াছিল। এই দুইটি শিশু সেই অরণ্যকে নূতন আবিষ্কার করিয়াছে।

কুটিরের সম্মুখে আসিয়া কেশবতী বলিল—“তুমি রান্না করতে পারো ? আর নদী থেকে জল আনতে হবে, জানো তো ?”

কাঞ্চনকুমার বলিল—“আমি তোমাকে নদীতে নিয়ে যাবো, তাহলে রাক্কোস তোমাকে কিচ্ছু বলবে না।”

শ্রীমতী বলিলেন—“তাহলে আমি ঠিক যেতে পারবো। কাঞ্চনকুমার যদি সঙ্গে যাও, তবে আমার কিচ্ছু ভয় করবে না। নদীতে চান করে কলসী ভরে জল এনে রান্না চড়িয়ে দেবো।”

কেশবতী বলিল—“আমিও নিয়ে যাবো তোমাকে নদীতে। দাদা আর আমি।”

নদীতে যাওয়া আসার কালটিতে দুয়োরাণীর উপর দাদার একাধিকার তাহার ভালো লাগিল না। তাই সে বলিল—“আমিও যাবো।”

এবার ভালো না লাগিবার পালা কাঞ্চনকুমারের। সে বলিল—“তুমি যাবে না বোনটি। তুমি গিয়ে কী করবে ? তুমি কি রাক্কোসকে মারবে ? আমি তীর ধনুক নিয়ে যাবো, নদীর ধারে যে রাক্কোস আছে তার সঙ্গে যুদ্ধু করবো।

কেশবতী চুল দুলাইয়া বলিল—“না।”

কাঞ্চন বলিল—“রাক্কোস নেই ? নদীর ধারে রাক্কোস নেই বুঝি ? জিজ্ঞেস কর না। নদীর ওপারে পাহাড়ের চুড়োর ওপোর রাক্কোসদের দুগ্‌গ নেই ? হ্যাঁ গো ?”

কেশবতীর ও যুক্তি আছে। সে বলিল—“কই তোমার তীর ধনুক ? তীর ধনুক নেই, তরোয়াল নেই, তোমাকে রাক্কোস খেয়ে ফেলবে। না গো ?”

সে-ও শ্রীমতীর মুখের দিকে চাহিল। দুইজনেই দুয়োরানী মায়ের সমর্থন চাহে। শ্রীমতী দেখিলেন এক জনকে সমর্থন করা চলিবে না। আবার সমর্থন না

পারিয়াও পার নাই। তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে ক্রন্দন বেশী দূর নহে। তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, আমি বলছি শোনো। দুজনের কথাই ঠিক। রাক্ষোস তো নদীর ধারে থাকেই, আর তীর ধনুক তরোয়াল অবিশ্যি চাই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। কিন্তু তারা দিনের বেলা বেরোয় না কিনা, খালি রাত্তিরে বেরোয়—"

কাঞ্চনকুমার বলিল—"আমি জানি। ওরা রাত্তিরে চরতে বেরোয়, আর দিনের বেলা খালি ঘুমোয়, কেবল ঘুমোয়।"

শ্রীমতী বলিলেন—"হ্যাঁ, দিনের বেলায় একেবারে অচৈতন্যি হয়ে ঘুমোয় পাহাড়ের ওপোরে শুয়ে শুয়ে।"

কেশবতী সংশোধন করিয়া দিল—"ওপোরে নয়, পাহাড়ের নিচে, অনেক নিচে থাকে।"

শ্রীমতী সংশোধন মানিয়া লইলেন—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। পাহাড়ের ওপোরে গর্ত আছে, সেই গর্ত দিয়ে সিঁড়িতে নেবে পাহাড়ের নিচে অনেক তলায় একটা দরজা আছে, সেই দরজা দিয়ে—"

কাঞ্চনকুমার গল্পের বাহিরে থাকিবার পাত্র নয়। বলিল—"ম-স্তো বড়ো দরজা। আকাশের মতন উঁচু।"

শ্রীমতী বলিলেন—"তা আর বলতে। ও রে ব্বাবা, যেমন উঁচু তেমনি ভারি।"

কেশবতী বলিল—"ভীষণ ভারি।"

নদীতে যাওয়ার সমস্যা মুলতুবি রহিল। রাক্ষসদের পাতালপুরীর ভীষণ বাড়ীর মনোহর আকর্ষণে রাজপুত্র রাজকন্যার মন ভুলিল—সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় দুয়োরানীরও। তিনি একটি গাছের ছায়ায় ঝরাপাতার আসনে বসিলেন দুই পাশে দুই শিশুকে লইয়া। রাক্ষসের বাড়ীর ঘর বাড়ি ছাদ বাগান সব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের মতো বর্ণিত হইতে লাগিল। সবই ভীষণ ও সুন্দর। রাক্ষসের বাড়ী হইতে রাক্ষসের গল্পে আসিতে দেরি হইল না। দেশ বিদেশের রাক্ষস, রোমাঞ্চকর তাহাদের রূপ, বিচিত্র তাহাদের আচরণ। এক সময়ে কেশবতী দুয়োরাণীর কোলের উপর উঠিয়া বসিল। কাঞ্চনকুমার তাহা লক্ষ্য করিল, কিন্তু সে বড় হইয়াছে, দাদা হয়, কোলের ভাগ লইয়া ঝগড়া করিল না। দুয়োরানী মার একটি জানুর কিছুটা অধিকার করিয়া করতলে চিবুক স্থাপন করিয়া গল্প শুনিতে লাগিল।

যখনই রাক্ষস রাক্ষসী হাঁউ মাঁউ খাঁউ করিয়া প্রকাণ্ড গাছ বা পাথর লইয়া তাড়া করিয়া আসে, কেশবতী দুয়োরানী মা'র গলা জড়াইয়া ধরে এবং কাঞ্চনকুমার তাঁহার কোলের কাছে আরও নিবিড় হইয়া বসে।

বেলা পড়িয়া আসিল। হঠাৎ সেদিকে খেয়াল হইল শ্রীমতীর। হাতের ঘড়ির দিকে চাহিয়া গল্প থামাইতে হইল। গল্প থামে কিন্তু শেষ হয় না। ইতিপূর্বে যেখানেই গল্প শেষ হইতে চাহিয়াছে, শ্রোতাদের "তারপর?" মন্ত্রে সঞ্জীবিত হইয়া সেখান হইতেই তাহাকে আবার নূতন করিয়া চলিতে হইয়াছে। কিন্তু এবার দুয়োরানীকে বলিতে হইল—"তারপর কাল বলবো, কেমন? এবার বাড়ী যেতে হবে কিনা।"

শিশুরা খেলা করে, অবোধ, কিন্তু তাহারা নির্বোধ নহে। ভাই বোন দুজনেই বুঝিল এই মানুষটি বনে আসিয়া দুয়োরানী সাজিয়া ঘুঁটে কুড়াইতে রাজী হইলেও, তাহাদের বাড়ীর কেহ নয়, যেমন বাহির হইতে আসিয়াছে তেমনি বাহিরে চলিয়া যাইবে।

না গিয়া যে উপায় নাই। তাই দুয়োরানীকে আবার নির্বাসনে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। রাস্তার ধারে ভাঙ্গা পাচিলের এ পারে সঙ্গে সঙ্গে আসিল রাজপুত্র রাজকন্যা। তাহাদের আদর করিয়া চুমা খাইয়া বিদায় লইলেন শ্রীমতী। তাহারা বলিল—"কাল এসো, আসবে তো?" শ্রীমতী বলিলেন—"হ্যাঁ। তোমরা আসবে তো? তাহারা বলিল—"হ্যাঁ-া-া।"

শ্রীমতী বলিলেন—"কারুকে বোলোনা, আমার কথা কারুকে বোলোনা। বেশ মজা হবে, কেমন?"

যাহা অপরকে বলিতে নাই, কেবল তাহারাই জানিবে, সে-জানার গৌরবে বয়স্করাও মোহিত হয়, শিশুদের তো কথাই নাই। কাহাকেও না বলাই তো মজা। ভাই বোন ঘাড় কাত করিয়া স্বীকৃত হইল—"আচ্ছা।"

কেশবতী বলিল—"তুমিও কারুকে বোলো না, হ্যাঁ?"

শ্রীমতীও ঘাড় হেলাইয়া স্বীকার করিলেন—"আচ্ছা।"

বাগান হইতে বাহির হইয়া পথে নামিলেন শ্রীমতী

বাগান হইতে নহে, এক জগৎ হইতে বাহির হইয়া অন্য জগতে ফিরিয়া আসিলেন। এ রূপকথার জগতের কথা কাহাকে বলিবেন? বলিলে বিশ্বাস করিবার মতো বুদ্ধি কাহার আছে? এ খেলার কথা কাহাকেও বলিবার নয়।

বাসায় ফিরিয়া শ্রীমতী দেখিলেন, সহবাসিনী মাধবীদি তখনও ফিরেন নাই। স্কুলের বাহিরে তাঁহার ছাত্রী আছে। সকাল সকাল ছুটি পাইয়া ছাত্রীর বাড়ী গিয়াছেন। এতক্ষণ শ্রীমতী কোথায় ছিলেন, এ কৌতুহলী প্রশ্নের বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন শ্রীমতী। মাধবীদি খেলা ভালবাসেন না। আর বুড়া বয়সে শিশুদের সঙ্গে ছেলেখেলার পাগলামি শুনিলে তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না।

সেদিন সন্ধ্যায় নিত্যকার পড়াশোনায় বসিতে ইচ্ছা হইল না। স্কুলের ত্রৈমাসিক পরীক্ষা আসিতেছে, তাহার প্রশ্নপত্র তৈয়ারীর কাজ রহিয়াছে, সে কাজ পড়িয়া রহিল। বাড়ীতে চিঠি লিখিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন সকালে, সে সঙ্কল্প মনে পড়িল না। মন ঘুরিতে লাগিল কোন অরণ্যে এক রাজপুত্র এক রাজকন্যার সঙ্গে বিনা কাজের বাঁশী বাজাইয়া অকারণ খুশীর নেশায়।

পরদিন সকালে উঠিয়া প্রথমেই মনে পড়িল স্কুল আছে, স্কুলের রুটিন আছে, কিসের পর কী করিতে হইবে তাহার বাঁধা ছক আছে। এ চিন্তা ভালো লাগিল না। তারপর মনে পড়িল আজ শনিবার, স্কুলের ছুটি হইবে দেড়টার সময়, তখনও দিনের অনেক সময় অনেক খানি আলো হাতে থাকিবে। সেই সময় ও সেই আলো বিধিমুক্ত, নিয়মহীন কাজহীন শিশু-ইচ্ছার স্বাধীন নিয়ন্ত্রণে সার্থক হইবে। এ চিন্তায় মন খুশী হইল।

মাধবীদির সকালেও একটি ছাত্রী আছে, তিনি বাহির হইয়া গেলে শ্রীমতী তাঁহার ট্রাঙ্ক লইয়া বসিলেন। রাণী হইয়াছেন, রাণীর যোগ্য বেশ চাই। রাণী-বেশ খুঁজিতে লাগিলেন। সাধারণ রাণী নয়, দুয়োরাণীর বেশ। খুঁজিয়া না পাইয়া হতাশ হইয়া শ্রীমতী ভাবিতে লাগিলেন সুকিয়ার কাছে হাত পাতিলে খুব খারাপ দেখাইবে কিনা এবং কথাটা গোপন রাখা যাইবে কিনা। কত অল্প জবাবদিহিতে সুকিয়ার কৌতুহল মিটাইতে পারা যাইবে, সেও একটা ভাবিবার কথা। জামা কাপড় ট্রাঙ্কে তুলিয়া রাখিতে গিয়া লক্ষ্য হইল—ট্রাঙ্কের তলদেশে যে কাপড়টি আস্তরণ রূপে রহিয়াছে সেইটির প্রতি। বাহির করিয়া ভাঁজ খুলিয়া শ্রীমতী বলিলেন ইউরেকা। এ শাড়ী যেন দুয়োরাণীর জন্যই রাখা ছিল। দুয়োরাণীর মতোই নূতন অবস্থায় ইহার মূল্য ছিল, কদর ছিল। এখন পুরাতন হইয়া পরিত্যক্ত ও লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্বাসিত। এককালের আকাশি রঙ এখন বিবর্ণ হইয়া মলিন দেখাইতেছে। পরিধানের যোগ্য করিতে দুই তিন জায়গায় লম্বা সেলাই দিতে হইবে। এক জায়গায় গিঠ দিলে আরও শোভা হয়। তাহাই করিলেন। শাড়ীর সমতুল্য করিতে একটি পুরাতন জামাকে কিছু ছিঁড়িয়া লইতে হইল।

এতক্ষণে কাঞ্চনকুমারের পরীক্ষায় পাস করিবার মতো পোষাক জোগাড় করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন শ্রীমতী। পোষাক কাগজে মুড়িয়া রাখিলেন। তারপর আর দুই একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া লইলেন। পোষাক ও অন্য সব দ্রব্য একটি কাঠের হাতোলওলা নক্সাকরা কাপড়ের থলিতে ভরিয়া তাহাদের উপর বইখাতা চাপা দিয়া স্কুলে লইয়া গেলেন।

স্কুলের ছুটির পর শ্রীমতী লাইব্রেরীতে গিয়া একটি বই লইয়া বসিলেন। মাধবীদি যাইবার সময় দেখিলেন শ্রীমতী গভীর অভিনিবেশসহ বই হইতে খাতায় কী লিখিতেছেন।

মাধবীদি চলিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে অভিনিবেশ চলিয়া গেল। লেখা শেষ হইল।

স্কুল হইতে বাহির হইয়া শ্রীমতী প্রথমে গেলেন বাজারে। তেমন সময়ে গ্রামাঞ্চলের ছোট সহরে দোকান বাজার বন্ধই থাকে। দোকানীদের এইটা স্নানাহার ও বিশ্রামের সময়। আবার দোকান খোলে অপরাহ্নে। এই জানা কথাটা শ্রীমতী উৎসাহবশে ভুলিয়া গিয়াছিলেন এখন কী করা যায়? হতাশ হইয়া এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে ফিরিয়া চলিলেন। একটা সাধ হইয়াছিল মনে, তাহা আজ পূর্ণ হইবে না। অদৃষ্ট বিরূপ। কাল আবার দেখা যাইবে।

অদৃষ্ট কিন্তু বিরূপ নহে। ফিরিবার পথে দেখিলেন

একটি ঝাঁপবন্ধ দোকানের পাশের সরুগলির মুখে এক ব্যক্তি মুখ ধুইতেছে। গলিপথে দোকানের খিড়কি দরজা। ব্যক্তিটি দোকানের মালিক বটে। জিজ্ঞাসা করিতে কাজ হইল। অসময় হইলেও খরিদদার ফিরাইল না দোকানী। খিড়কি দরজায় দাঁড়াইয়া সওদা শেষ করিয়া শ্রীমতী আবার পথ ধরিলেন এবং যথাসাধ্য ও যথাশোভন দ্রুত পদে চলিতে লাগিলেন। কালিকার রাস্তার মোড়ে আসিয়া দূর হইতে যখন দেখিলেন বাগানের সেই ভাঙ্গা পাচিলের উপর দুইটি শিশু দাঁড়াইয়া আছে, তখন তাঁহার মন শান্ত হইল। উহারা বিপরীত দিকে চাহিয়াছিল, তাঁহার আবির্ভাব জানিতে পারে নাই, ক্ষণকাল পরে এদিকে ফিরিতে তাহাদের উৎসুক চোখ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হইল। পাচিল হইতে লাফ দিয়া নামিয়া দুজনে ছুটিয়া আসিল। শ্রীমতীর আনন্দের সীমা রহিল না।

সেদিন নির্বাসিত রাজপুত্র ও রাজকন্যার বনবাসের সুখ অপরিমেয় হইল। ভাঙ্গা কুটিরের দাওয়াতে উভয়কে পরস্পরের চোখ টিপিয়া ধরিয়া বসিতে বলিলেন শ্রীমতী। লুকোচুরি খেলার গন্ধ পাইয়া ভাই বোন উৎসাহিত হইল। তাহাদের ঐ ভাবে বসাইয়া শ্রীমতী নিঃশব্দ পদে কুটিরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মিনিট দুই পরে বাহির হইল দুঃখিনী ঘুঁটে-কুড়ানী দুয়োরাণী। পা টিপিয়া টিপিয়া দাওয়া হইতে নামিল।

ছেলে মেয়ে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"চোখ ছাড়বো?" কোনও সাড়া নাই। কিন্তু হঠাৎ অতি নিকটে কোথায় খস্‌খস্‌ খর্‌খর্‌ শব্দ উঠিল। শব্দটা অপরিচিত। এদিকে ওদিকে সরিয়া বেড়াইতেছে। আর চোখ টিপিয়া নির্বাক নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকা সম্ভব হইল না। চোখ ছাড়িয়া দিল। যাহা দেখিল তাহা বুঝিতে পারিল না। সম্মুখের জমিতে ছেঁড়া সেলাই করা গিঁঠ বাঁধা ময়লা শাড়ী ও ছেঁড়া জামা পরা, কপালের উপর হইতে টান করিয়া মাথার পিছনে ঝুঁটি বাঁধা চুল, একটি মেয়ে একটা গাছের পাতাওলা ডাল দিয়া উঠান ঝাঁটাইতেছে। তাহার গলায় হার নাই, হাতে চুড়ি নাই, ঘড়ি নাই, পায়ে জুতা নাই। কপালে গালে ধুলা মাটির দাগ, শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ানো। আধুনিক বেশবাস-প্রসাধন-সজ্জিতা মানুষটির পরিবর্তে এই নূতন মানুষটকে তাহারা প্রথমে চিনিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত বিস্মিত চোখে চাহিয়া রহিল। নূতন মানুষটি তাহাদের দিকে পিছন ফিরিয়া কাজ করিতেছিল। এইবার তাহাদের পানে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল—"ওমা, তোমরা ঘুম থেকে উঠে সকাল থেকে কোথায় ছিলে? পাহাড়ে গিয়েছিলে বুঝি?"

কাঞ্চনকুমার উৎফুল্লমুখে বলিল—"দুয়োরানীরে"! কেশবতী বলিল—"দুয়োরানী!" দুইজনে ছুটিয়া আসিয়া দুইপাশ হইতে দুয়োরানীকে জড়াইয়া ধরিল। কেশবতী নাচিতে লাগিল—"আমার দুয়োরানী।"

"ওমা, ছাড়ো, ছাড়ো, আমার কাজ আছে যে। ছাড়ো।" বলিয়া ঝাঁটা ফেলিয়া দুয়োরানী একটা ভাঙ্গা ঝুড়ি (কুটিরের মধ্যে পাওয়া) লইয়া জড়ো করা শুকনা পাতাগুলি তাহাতে তুলিতে গেল।

ছেলেমেয়ে কাজ করিতে দিল না। হাত হইতে ঝুড়ি টানিয়া লইয়া বলিল—"না, কাজ করতে হবে না, কিচ্ছু করতে হবে না।" দুইজনে আবার জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"দুয়োরাণী, আমাদের দুয়োরাণী।"

তখন কাজ ফেলিয়া পাতার রাশির আসনে বসিয়া দুয়োরাণী দুই ছেলে মেয়েকে কোলের কাছে টানিয়া চুমো খাইয়া বলিল—"ও কী গো? দুয়োরাণী কী? অন্য লোকেরা বলবে দুয়োরানী, তোমরা বুঝি দুয়োরানী বলবে? তোমরা তো বলবে—।" কিন্তু তাহারা কী বলিবে তাহা বলিতে পারিলেন না শ্রীমতী। লজ্জা করিবার মানুষ যদিও কেহ নাই এই বনের মধ্যে, তথাপি কথাটা মুখে বাধিয়া গেল।

কাঞ্চন বলিল—"তবে আমরা কী বলবো?"

বুদ্ধি দিল কেশবতী। তাহার মনে পড়িল। বলিল—"আমাদের তো মা হয়, আমি তো দুয়োরানীর মেয়ে। মা হও না? হ্যাঁ গো?"

কন্যার গালে চুম্বন করিল দুয়োরাণী। পুত্রও বঞ্চিত হইল না মায়ের আদর হইতে। তখন কাঞ্চনকুমার বলিল—"একটা গপ্পো বল না মা।" কেশবতী বলিল—"একটা নয়, দুটো গপ্পো বল মা। বাঘের গপ্পো।" তারপর বলিল—"তোমাকে এখন খুব ভালো দেখাচ্ছে।"

শুনিয়া শ্রীমতী আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে ভালো, একথা ইতিপূর্বে শুনেন নাই, তাহা নহে। শুনিয়া কখনও লজ্জিত হইয়াছেন, কখনও বিরক্ত হইয়াছেন। খুশী হইয়াছেন কখনও। কিন্তু এমন আনন্দ কখনো পান নাই।

দুয়োরাণী বলিল—"আগে বুঝি ভালো দেখাচ্ছিল না ?"

কাঞ্চনকুমার বলিল—"না।"

স্পষ্ট কথা। কেশবতী বলিল—"একটু একটু ভালো দেখাচ্ছিল, এখন বেশী বেশী খুব ভালো দেখাচ্ছে।"

কালিকার মতো কেশবতী কোলের উপর উঠিয়া বসিল। বলিল—"আমাকে আর একটা চুমু খাও। দুয়োরাণী হৃষ্ট মনে তাহার ইচ্ছা পূরণ করিল। কেশবতী "ওকেও চুমু খাও।" দুয়োরাণী বলিল—"সে তোমাকে বলে দিতে হবে না গো মেয়ে। আমি জানি।"

কাঞ্চনকুমার বলিল—"তোমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে। কালকের চেয়ে ভালো দেখাচ্ছে, সোন্দর দেখাচ্ছে।"

দুয়োরাণী হাসিয়া বলিল—"শোনো ছেলের কথা শোনো।"

কাঞ্চন ও কেশবতী সত্য কথাই বলিয়াছে। ভালোবাসার আলো শ্রীমতীকে উহাদের চোখে নূতন করিয়া সুন্দর করিয়াছে। যে আমাকে ভালোবাসে সে সুন্দর। যে আমার ভালোবাসা গ্রহণ করিয়া খুশী হয় তাহার চোখে আমি সুন্দর। ভালোবাসার সৌন্দর্য রূপের সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে না। রূপ সস্তা, সাধারণ, তাহা সকলের চোখের জন্য। ভালোবাসার দেওয়া সৌন্দর্য মহার্ঘ্য, অসাধারণ, যে ভালোবাসে, যাহাকে ভালবাসে, সেই বিশেষ মানুষদেরই দৃষ্টিগোচর।

গাছের তলায় বসিয়া দুয়োরাণী তাহার ছেলে-মেয়েদের গল্প বলিতে লাগিল। বাঘের গল্প, শিয়ালের গল্পের সূত্র ধরিয়া রাক্ষস আসিল। রাক্ষস না আসিলে বন মানায় না। রাক্ষসকে নিধন করিতে রাজপুত্র প্রয়োজন। হস্তিনাপুরের পাঁচ রাজপুত্র আসিল। দ্বিতীয় রাজপুত্র কর্তৃক একচক্রানগরে বকরাক্ষস নিধনের পালা হইল। অযোধ্যার দুই কিশোর রাজপুত্র কর্তৃক তাড়কা রাক্ষসী নিহত হইল। তারপর চার রাজপুত্রের বিবাহোৎসবে অযোধ্যার লোকেরা কী বিপুল ভোজ পাইয়াছিল, সেই ভোজ প্রস্তুত করিতে কী বিরাট রান্নাঘর তুলিতে হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা বানাইতে গিয়া দুয়োরাণীর একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িল। সে ব্যস্ত হইয়া বলিল—"ও মা, অনেক বেলা হয়ে গেল যে, আর নয়, উঠি।"

ছেলেমেয়ে তাহার চেয়ে ব্যস্ত হইয়া বলিল—"না, না, বেলা হয়নি, কিচ্ছু বেলা হয়নি। তুমি থাকো। গল্প বল।" তাহারা জড়াইয়া ধরিল দুয়োরাণীকে। তাহাদের ভয় হইয়াছে ইহারই মধ্যে বুঝি দুয়োরাণী মা চলিয়া যাইবে।

"বাঃ, আর কি গল্প বলবার সময় আছে ? রান্নাবান্না করতে হবে না ? সকালে কাঞ্চন বনের মধ্যে থেকে যে হরিণটা শিকার করে এনেছে সেটা রান্না করতে হবে।"

কাঞ্চন ও কেশবতী আশ্চর্য হইয়া শোনে। দুয়োরাণী বলিল—"আমি ঘুঁটে কুড়িয়ে কাঠকুটো কুড়িয়ে এনেছি না করবো বলে ?"

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি ঘুঁটে কুড়িয়ে এনেছ ? কখন গেলে ?"

দুয়োরাণী বলিল—"সেই যে সকাল বেলা, তুমি যখন তীর ধনুক নিয়ে শিকার করতে গেলে, তখন।"

কাঞ্চনকুমারের মনে পড়িল। সে বলিল—"ও, হাঁ, হাঁ।"

কেশবতী বলিল—"আমিও তীর ধনুক নিয়ে গিয়েছিলুম, না গো ?"

দুয়োরাণী বলিল—"না, তুমি তো আমার সঙ্গে নদীতে গেলে চান করতে। চান করে নদী থেকে কলসী ভরে দুজনে জল নিয়ে এলুম, সেই যে, মনে নেই ? তুমি আর আমি, জল আনলুম না ?"

কেশবতীরও মনে পড়িল। বলিল—"হাঁ, হাঁ. মস্তো-বড়ো কলসী করে জল আনলুম, না গো ?"

দুয়োরাণী বলিল—"তাহলে যাই রান্নাটা করে ফেলি। বেলা দুপুর হতে চললো। অত বড়ো হরিণটা রাঁধতে হবে। কী করে অমন বড়ো হরিণ কাঞ্চনকুমার নিয়ে এলো, তাই ভাবছি।"

কাঞ্চন লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"এই এমনি করে টানতে টানতে আনলুম—এত্তোবড়ো হরিণ। আরও বড়ো আনতে পারি।"

হঠাৎ কেশবতী বলিল—"হরিণের মাংস ভালো না, বড্ডো কাঁটা। আমি খাই না।"

দুয়োরাণী জিজ্ঞাসা করিল—"তবে তুমি কী মাংস ভালোবাসো গো ?"

"চিংড়ি মাছ।"

"ওমা, তাই তো। তুমি তো চিংড়ির মাংসই ভালোবাসো। আমার কী ভুলো মন! তাই জন্যেই তো সকালে নাইতে গিয়ে নদী থেকে চিংড়ি ধরে নিয়ে এলুম তোমার জন্যে।"

কাঞ্চন বলিল—"আমিও চিংড়ির মাংস ভালোবাসি। আর হাঁসের ডিম।"

কেশবতী বলিল—"আমিও।"

হরিণের মাংস খাইতে কেমন কে জানে। ভালো না হইবারই কথা। যে রকম গাছের মতো শিং মাথায়,—ছবিতে দেখা যায়! কিন্তু পরিচিত সুস্বাদু চিংড়ি ও হাঁসের ডিম নিষ্কণ্টক ভালো, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দুয়োরাণী বলিল—"নিশ্চয়। দুজনেই চিংড়ি আর হাঁসের ডিম খাবে। আচ্ছা, এবার তোমরা এইখানে বসে খেলা কর। কোথাও যেয়োনা। আমি রান্নাটা সেরে তোমাদের ডাকবো।"

কেশবতী বলিল—"তুমি রান্না করতে যাবে? আমি তোমার সঙ্গে রান্না করবো।"

"ওমা, সে কী কথা? তুমি যে রাজকন্যে। রাজকন্যেরা কি রান্না করে? কোথাও শুনেছো?"

রাজকন্যা জবাব দিল না।

"কাঞ্চনকুমার, তুমি শুনেছো রাজকন্যেরা রান্না করে?"

কাঞ্চনকুমার গম্ভীর মুখে বলিল—"না। রাজকন্যেরা রান্না করে না তো।"

দুয়োরাণী বলিল—"রাজকন্যেরা সোনার খাটে গা রূপোর খাটে পা দিয়ে শুয়ে শুয়ে হীরের বাটিতে পান খায় আর—"

আরও কী কী রাজকন্যাযোগ্য কাজ আছে তাহা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন হইল না। রাজপুত্র বলিয়া দিল। "আর নদী থেকে জল আনে কলসী করে আর বন থেকে ফুলটুল কাট টাট কুড়োয়।"

অতএব কেশবতী রন্ধনরূপ হেয় কাজের ইচ্ছা ত্যাগ করিল। ছেলে মেয়েকে বসাইয়া দুয়োরাণী তাহার পাকশালায় প্রবেশ করিল। ভিতর হইতে বলিল—"আমি টু না বললে তোমরা কেউ ভেতোরে আসবে না, বুঝলে? ততক্ষণ তোমরা খেলা কর।"

ব্যবস্থাটা মন্দ নয়। কিন্তু যতক্ষণ টু ডাক না আসে, ততক্ষণ কী খেলা করা যায়? দুয়োরাণী মা যখন ছিল না, বা থাকে না, তখন দুই ভাই বোন যে সকল খেলা খেলিত, এখন তাহাদের কোনটাই মনে পড়িল না। দুইজনে সেই ভাঙ্গা ঘরের কবাটহীন দ্বারের দিকে সাগ্রহ প্রতীক্ষায় চাহিয়া রহিল। কয়েক সেকেণ্ড মাত্র পরে কেশবতী ডাকিয়া বলিল—"কই, টু বলচো না?"

টু আসিতে অবশ্য দেরি হইল না। দুয়োরাণীর রন্ধনপটুতাই শুধু অসাধারণ নহে, রন্ধনের ক্ষিপ্রতাও বিস্ময়কর। টু শুনিয়া দুইজন ছুটিল। ভিতরে আসিয়া আনন্দে বিস্ময়ে তাহাদের বড়ো চোখ আরও বড়ো হইল। ছেলেমেয়েকে আনন্দিত দেখিলে কোন মা না আনন্দিত হয়। তাহা ছাড়া স্বহস্তে রান্না করিয়া ছেলেমেয়েকে খাইতে দিবার আনন্দ তো আছেই। দুয়োরাণী সানন্দে বলিল—"এই নাও, যা হোক করে এই চিংড়ির কাটলেট আর হাঁসের ডিমের কারি করেছি। দেখ দিকি খেয়ে কেমন হোলো।"

রঙীণ প্লাসটিকের দুই খানি ডিসে চার খানি করিয়া চিংড়ির কাটলেট ও চারটি করিয়া হাঁসের ডিমের কারি রাজপুত্র রাজকন্যার সম্মুখে ধরিয়া দিল দুয়োরানী। বিজ্ঞ নির্বোধ ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকিলে কাটলেটগুলির চেহারা দেখিয়া সেগুলিকে বিস্কুট জ্ঞান করিত, এমন কি অঙ্কের মতো উহাদের উপর বিস্কুট কোম্পানীর নামও পড়িয়া ফেলিত। এবং ডিমের কারিকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়া বসিত এগুলি ছানা ও চিনি সহযোগে তৈয়ারী, বাজারে যাহা সন্দেশ নামে চলে। কিন্তু নির্বাসিতা দুয়োরানীর পুত্র কন্যা তেমন নির্বোধ ও অন্ধ নয়। রূপ বর্ণ স্বাদ যতই বিস্কুট ও সন্দেশের মতো হোক না, খাদ্যগুলিকে চিংড়ি ও ডিম বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহাদের কোনও অসুবিধা হইল না।

শ্রীমতী তাঁহার ঝুলিতে দুইখানি চামচ আনিতে ভোলেন নাই। দুয়োরানী সেই চামচ ছেলেমেয়ের হাতে

দিল, খাবারে ধুলি-মলিন হাত লাগাইতে হইল না। কাট-লেট চর্বণ করিতে করিতে কাঞ্চনকুমার বলিল—"এই সব তুমি নিজে রান্না করেছ? সব?"

দুয়োরানী বলিল—"আর কে রাঁধবে বল? আমার কি বামুনঠাকুর আছে। আর এই অজগর বনের মধ্যে বামুন-ঠাকুররা কে আসবে?"

কেশবতী বলিল—"তুমি খাচ্ছ না? তোমার খাবার কই? বা রে!"

দুয়োরানী বলিল—"আমি কি এখন খেতে পারি বাছা? তোমাদের খাওয়া হোক, তারপর হাঁড়ি হেঁসেল তুলে তবে তো আমার খাওয়া গো?"

হাঁড়ি চেনে কেশবতী, কিন্তু হেঁসেল তাহার অপরিচিত বস্তু। সে বস্তুটিকে তোলা যে কেমন কাজ, তাহাও তাহার অজ্ঞাত। তবে সে কাজের জন্য তাহার দুশ্চিন্তা নাই। সে চামচে করিয়া একটু ডিমের কারি তুলিয়া ধরিয়া বলিল—"না, তুমি খাও, হাঁড়ি টাড়ি পড়ে থাকুক গে।"

দুয়োরানী বলিল—"ছি, ছি, ছেলেমেয়ের খাবার থেকে কি খেতে আছে?"

কাঞ্চনকুমার বলিল—"হ্যাঁ খেতে আছে, নিশ্চয় খেতে আছে। মা তো একদিন খেয়েছিল, না বোনটি? মা খায়নি?"

কেশবতী বলিল—"হ্যাঁ। আমার থালা থেকেও খেয়েছিল। আর বাবাও তো খায় আমার থালা থেকে।"

দুয়োরানী বলিল—"বাড়ীর মা'র কথা আলাদা। আমি যে বনের মা।"

এ যুক্তির উত্তর ভাবিয়া পাইল না ভাই বোন। তখন কেশবতী প্রবলতর যুক্তি প্রয়োগ করিল। বলিল—"খাও বলছি, শীগগির খাও, নইলে আমি তোমার মেয়ে হবো না।"

এত বড়ো শাস্তির ভয় সহ্য করা শক্ত। অতএব সেই ছোট হাতটি ধরিয়া তাহার চামচটি দুয়োরানীকে মুখে তুলিতে হইল। তখন আর একটি ছোট হাত আর একটি চামচ ধরিল তাহার মুখের কাছে।

দুয়োরানী বলিল—"কী রকম রান্না হয়েছে তা তো বল্লে না?"

কাঞ্চন বলিল—"বেশ ভালো হয়েছে।"

কেশবতী বলিল—"খু-উ-ব ভালো হয়েছে।"

রন্ধন ভালো হইয়াছে, আহারও ভালো হইল। কিন্তু শ্রীমতীর থলিতে জলের সংস্থান ছিল না, সুতরাং দুয়োরানী তাহার পুত্র কন্যার মুখ আঁচলে মুছিয়া দিল। তারপর থলির মধ্যে ডিশ চামচ পুরিয়া দুয়োরানী হাঁড়ি হেঁসেল তুলিতেছে, এমন সময় দূরে কোথায় কে যেন কাহাকে ডাকিতেছে এমন ধ্বনি আসিল। দুয়োরানীর কানে ধ্বনিই আসিল, ডাক আসিল না। সে ডাক তাহাকে নয়, কণ্ঠও অচেনা বলিয়া সে ধ্বনির কোন অর্থ হইল না। কিন্তু কাঞ্চন কেশবতী ঠিক শুনিতে পাইল।

কাঞ্চন বলিল—"ঐ রে বোনটি, মতির মা তোমাকে ডাকছে।"

কেশবতী বলিল—"আমাকে নয়, তোকে ডাকছে দাদা। ঐ দেখ বল্লে মণ্টু-উ-উ।"

কাঞ্চন বলিল—"না ওটা খু-কু-উ-উ বল্লে। তোমাকেই ডাকছে।"

দুয়োরানীর হেঁসেল তোলা হইয়া গেল। কাঞ্চনকুমার বলিল—"খুকুকে ডাকলে মতির মা, তুমি শুনেছ?'

কেশবতী বলিল—'দাদাকে ডাকছো, না গো? তুমি শুনলে না?"

দুয়োরানী নিরপেক্ষ সত্য কথাই বলিল—

'দুজনের কথাই ঠিক। দুজনকেই ডাকছে।"'

নেপথ্য হইতে ডাক আসিল—"মণ্টু খুকু শীগগির বাড়ী এসো। মা ডাকছেন।"

মণ্টু বলিল—"আমি যাবো না।'

যে স্বরে বলিল তাহা দূরবর্ত্তী মতির মা'র কর্ণগোচর হইবার নহে। খুকুও তেমনই অনুচ্চ স্বরে বলিল "আমিও যাবো না।"

দুইজনেরই প্রকৃত বক্তব্য এই যে—এখন যাইতে ইচ্ছা নাই। এখনই খেলা শেষ করিবার সময় আসে নাই। দূরের মানুষকে বলা নয়, কাছের মানুষকেই বলা হইয়াছে। কিন্তু হায়, কাছের মানুষের কী অধিকার আছে ইহাদের ধরিয়া রাখিবার।

বেলা যে পড়িয়া আসিয়াছে, গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে, আকাশের সীসা রঙ বদলাইয়া নীল হইয়াছে, বাতাসে তাপের খরতা কমিয়াছে। পৃথিবীতে কেবল

।কটি অরণ্যে একটি নির্বাসিতা দুয়োরানী এবং তাহার
গুরাজপুত্র ও রাজকন্যা আছে তাহা নয়। অরণ্যের
াহিরে মতির মা আছে, আরও অনেকে আছে, অরণ্যের
ধ্যে যাহাদের পদার্পণে ইহার রমণীয় শোভা অপসৃত
ইয়া ইহা বিশ্রী জঙ্গলে পরিণত হইবে। সুতরাং মতির
। যেন এখানে না আসিয়া পড়ে। আসিলে দুয়োরানীর
মূহ বিপদ।

দুয়োরানী বলিল—"বিকেল হয়ে গেছে, বোনটিকে
নয়ে বাড়ী যাও বাবা মণ্টু।"

মণ্টু বলিল—"মণ্টু নয়, কাঞ্চনকুমার।"

দুয়োরানীর সঙ্গে কাঞ্চনকুমারেরই সম্বন্ধ, মণ্টুর নয়।
ল সংশোধন করিয়া দুয়োরানী বলিল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কাঞ্চন-
মার। কিন্তু এবার বাড়ী যেতে হবে যে, নইলে মা
াগ করবেন।"

কাঞ্চন বলিল—"তুমিও তো মা।"

কেশবতী প্রতিধ্বনি করিল—"তুমি বুঝি আমাদের
। নও?"

দুয়োরানী বলিল—"হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি মা নই
তা কী? কিন্তু সে খালি দুপুর বেলায়। আর এই
নের মধ্যে। কিন্তু এখন যে বিকেল হয়ে গেছে—আর
ড়ীতে যে মা আছেন তাঁর যে মন কেমন করছে
তামার জন্যে।"

খুকু বলিল—"তোমার মন কেমন করে আমাদের
ন্যে? আমরা চলে গেলে?"

শ্রীমতী খুকুকে ও মণ্টুকে দুই হাতে জড়াইয়া লইয়া
লিলেন—"ভীষণ মন কেমন করে, তা আর বলতে।
কন্তু এবার বাড়ী না গেলে মতির মা এসে পড়বে, তখন
হা মুস্কিল হবে।"

খুকু বলিল—"মতির মা এলে কিন্তু আমি খেলবো না,
কছুতেই খেলবো না।"

শ্রীমতীরও তাহাই মত। মতির মা'র সহিত
খলা চলিবে না, এ আশঙ্কা তাঁহার আছে। শিশুর
হিত আলাপ আত্মীয়তা ও খেলা সহজ। তাহাদের
াছে পরিচয়ের বালাই নাই, নাম ধাম জাতি কুল পেশা
ইয়া প্রশ্ন উ.ঠ না। যে মানুষটিকে তাহারা গ্রহণযোগ্য
লিয়া মনে করে, কেন করে তাহা জানে না।—তাহাকে
বিনা পরিচয়ে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করে। কিন্তু মতির মা'র
সহিত সম্বন্ধ স্থাপন শুধু চারি চক্ষুর মিলনের দ্বারাই সম্ভব
হইবে না। সত্যই মহা মুস্কিল হইবে মতির মা'র
আবির্ভাবে। এ যুগে যাহা দুর্লভ সেই দুয়োরাণীগিরি
ছাড়িয়া শ্রীমতীকে পলাইতে হইবে।

শ্রীমতী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন—"তাইতো বলছি গো,
শীগগির বাড়ী যাও। মতির মা এলো বলে। কাল
আবার এসো। আর মতির মাকে আমার কথা বোলো
না, কারুকে বোলো না।"

দুই জনেই সায় দিল। "আচ্ছা। কাল তুমিও
এসো। কারুকে বোলো না, বুঝলে?"

সেদিন বাগানের প্রান্ত সীমায় আসিয়া বিদায় দেওয়া-
নেওয়া হইল না। মতির মা'র আক্রমণ হইতে দুয়োরানীর
অরণ্যকে রক্ষা করা দরকার। মতির মা'র ডাক আবার
শোনা গেল। মণ্টু খুকু দুয়োরানীর কুটির হইতেই
বাড়ীর দিকে ছুটিল। তাহারা চলিয়া গেলে রানীবেশ
ও রানীর সংসার থলির ভিতর ঢুকিল। থলিটি দেয়ালের
গায়ে ঝুলিল। ইহাদের সঙ্গে দুয়োরানীকে বনে রাখিয়া
শ্রীমতী বন হইতে বাহির হইলেন।

•

বাসায় ফিরিয়া শ্রীমতী দেখিলেন—মাধবীদি ও সুকিয়ার
মধ্যে প্রবল বিতণ্ডা হইতেছে। গৃহস্বামী দেখেন মাধবীদি।
তিনি জানেন যে সংসারের জিনিসপত্র সম্বন্ধে সদা সতর্ক না
থাকিলেই সেগুলি অযথা কমিতে থাকে। তিনি আরও
জানেন যে দাসদাসীরা সুযোগ পাইলেই মনিবের জিনিস
আত্মসাৎ করিতে থাকে। সুতরাং কোনও দাস বা দাসীকে
বিশ্বাস করিতে নাই। ফলে সুকিয়ার সঙ্গে চাল ডাল ঘি
তেল সাবান ইত্যাদির হিসাব লইয়া তাঁহার বাক্‌বিতণ্ডা
প্রায় নিত্যকার ঘটনা। শ্রীমতীর ভালো লাগে না। কোন
দিনই ভালো লাগে না। আজ আরও বেশী খারাপ
লাগিল। দুয়োরানীর সংসারে অভাব যতই থাকুক,
অবিশ্বাস নাই, কলরব প্রচুর আছে, কলহ নাই। সেই
বে-হিসাবের শান্তি হইতে সদ্য ফিরিয়া এই হিসাবের
সংসারের অশান্তি তাঁহার অসহ্য লাগিল। কিন্তু সহ্য না
করিয়াও উপায় নাই। প্রতিবাদ করিলে মাধবীদি
ক্ষেপিয়া গিয়া হয় দাসীর চৌর্যাপরাধ প্রমাণ করিতে

লাগিয়া যাইবেন, নয় শ্রীমতীকে গৃহস্থালীর ভার নিজহাতে লইতে বলিবেন। গৃহিণী হইবার সাধ বা সাধ্য কোনটাই না থাকাতে শ্রীমতী নীরবে নিজের ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাহিলেন। কিন্তু দরজা বন্ধ করিলেই শব্দের পথ রোধ করা যায় না। কানে আসিল—"আমার জিনিস না পাওয়া গেলে আমি নিশ্চয় বলবো, একশো বার বলবো। আর দুসরা লোক নেই বাড়ীতে, তুই জানবি না তো কে জানবে? জিনিস বার করে দে, আমি কিচ্ছু বলবো না।"

সুকিয়ার কোনও উত্তর নাই। তবে সে বোধকরি এতক্ষণে মাধবীদির কথা মানিয়া লইয়াছে। শ্রীমতী নিশ্চিন্ত বোধ করিলেন।

কিন্তু সে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। তারপরই সুকিয়া দরজা ঠেলিয়া শ্রীমতীর ঘরে আসিল ও জানাইল—সে আর কাজ করিবে না, চোরির বদনামি সইতে সে রাজী নহে, মাহিনা যাহা পাওনা আছে কবে দিবেন ছোট দিদিমণি বলিয়া দিন, না দিবেন তাহাও বলুন, সে এখনই চলিয়া যাইবেই। তাহার জামা কাপড় গামছা ও পিতলের ঘটিটি হাতে করিয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে সুকিয়া।

ছোট দিদিমণিকে কিছু বলিতে হইল না। বড়ো দিদিমণি ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন—"না কাজ করিস, চলে যাবি। তার আবার ছোট দিদিমণিকে বলবার কী আছে? কিন্তু যাবার আগে আমার জিনিস বার করে দিয়ে যাবি। এই সকালে দেখেছি, আর নেই? নেই বল্লেই নেই? পাখা গজিয়েছে, না? জিনিস ফিরিয়ে দিয়ে, যেতে হয় যাও, দূর হয়ে যাও। এই আমার শেষকথা।" বলিয়া মাধবীদি বাহির হইয়া গেলেন। শেষ কথা বলার পর অবশ্য থাকিবার প্রয়োজন নাই।

এবার শ্রীমতীকে কথা কহিতেই হয়। তিনি বলিলেন—"কী পাওয়া যাচ্ছে না, খুঁজে দেখ্ না সুকিয়া। সত্যিই তো, বাড়ী থেকে যাবে কেন? আর যাবেই বা কোথায়? ভালো করে খুঁজলেই পাবি। যা, দেখগে যা।"

মাধবীদি বাহিরে গেলেও কাছেই ছিলেন নিশ্চয়। তিনি পুনঃ প্রবেশ করিলেন। শেষ কথার পরও কথা শেষ হয় নাই। বলিলেন—"কোথায় পাবে? বাড়ীতে থাকলে তো খুঁজে পাবে। বাড়ীতে কোথাও নেই। আমি খুঁজে না দেখে বলি না। বাড়ী থেকে জিনিস বেরিয়ে গেছে, এ আমি ঠিক বলে দিলুম।"

মাধবীদি চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—জিনিষটা কী?

মাধবীদি বলিলেন—"চামচ। ভালো চামচ দু'দুখানা উবে গেছে। কেউ চুরি করেনি, কেবল উবে গেছে।"

অন্যদিকে ফিরিয়াই কথা বলিলেন মাধবীদি। তাই দেখিতে পাইলেন না চোরের মুখের ভাব। দেখিলে চুরি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতেন।

সুকিয়া বলিল—"আমি চামচ চোরি করবো? ন সোনা আছে, না চাঁদি আছে। এতো কুঠিতে কাজ করেছি আমি, কেউ আমাকে চোর বলেনি, তুমি আমাকে ছুটি দাও দিদিমণি—"

এতক্ষণে কথা সরিল শ্রীমতীর মুখে। বলিলেন—"তুমি চুরি করনি সুকিয়া। চামচ আছে, হারায়নি যাও, তুমি কাজ করগে।"

সুকিয়া বলিল—"না দিদিমণি, চোর বদনামি নিয়ে আমি কাজ করতে পারবো না। আমি হাত জোড়চি, আমায় ছুটি দিন।"

শ্রীমতী ব্যাগ হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া সুকিয়ার হাতে দিয়া বলিলেন—"না, না, তুই চোর নস আমি জানি। যা, রাগ করিসনি।"

সুকিয়া মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, করতলের টাকা অন্তরে কাজ করিতেছে। শ্রীমতী আবার বলিলেন—"যা সুকিয়া কাজ করগে যা, চামচ যদি হারিয়ে থাকে তার জন্যে তোর দোষ নেই, আমি জানি।

মাধবীদি আসিলেন, গম্ভীর মুখে বলিলেন—"এখন থেকে ঘরের কাজ তুমিই দেখে চালাও শ্রীমতী। এই চাবি আর হিসেবের খাতা রইল।"

দড়ি বাঁধা গোটা দুই চাবি ও একটা বাঁধানো খাতা টেবিলের উপর রাখিয়া মাধবীদি ফিরিয়া যাইতেছিলেন। শ্রীমতী বলিলেন—"চামচ চুরি যায়নি মাধবীদি। যদি গিয়েও থাকে, সুকিয়া চুরি করেনি।"

মাধবীদি বলিলেন—"ভালো কথা। খুব ভালো কথা। কিন্তু তুমি সংসার দেখ।"

শ্রীমতী বলিলেন—"চামচ আমি নিয়েছি।"

সুকিয়া বিস্মিত হইল। মাধবীদি বিস্মিত হইলেন না, তাঁহার রাগ বাড়িল, বলিলেন—"হুঁ, বুঝেছি।" অর্থাৎ এত সহজে ভুলিবার পাত্রী তিনি নন।

শ্রীমতী বলিলেন—"তুমি বিশ্বাস করছো না মাধবীদি? সত্যি আমি চামচ দুটো নিয়েছি। যা, সুকিয়া, তুই তোর কাজে যা।"

সুকিয়া মাধবীদির পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল—"না, দিদিমণি, আমি যখন চোরি করেছি, আমাকে ছুটি দিয়ে দিন।"

মাধবীদি বলিলেন—"মিছে কথা বলিসনে সুকিয়া। তুই চুরি করেছিস আমি একবারও বলিনি। আমার জিনিস গেছে, বার করে দাও, এই আমার কথা। তুমি ছাড়া আর দ্বিতীয় লোক কাজ করে না বাড়ীতে।"

সুকিয়া জবাব দিতে যাইতেছিল, শ্রীমতী তাহাকে থামাইয়া বলিলেন—"তোকে কিছু বলতে হবে না, তুই কাজ করগে যা।"

সুকিয়া প্রস্থান করিলে মাধবীদি বলিলেন— "এটা কী হচ্ছে? উদারতা? মহত্ব? তারপর? যতবার যা চুরি যাবে—এবার থেকে কত কী যাবে দেখো, সব তুমি নিয়েছ বলে রক্ষে করতে পারবে তো? বেশ, কোরো। এ যে বিশপেরও ওপোর যাও তুমি।"

"না মাধবীদি, বিশপস্ ক্যাণ্ডলস্টিক্‌স্ নয়, চোরকে রক্ষা করার মহত্বও নয়। সত্যিই আমি নিয়েছি কিনা, তাই।"

"সত্যিই তুমি নিয়েছ তাই? বটে? বেশ, বার করে দাও দিকি।"

মৃদু হাসিয়া শ্রীমতী বলিলেন—"বার করে দিতে পারবো না। কিন্তু আমি নিয়েছি।"

মাধবীদি জলিয়া উঠিলেন—"আমি কচি খুকি নই শ্রীমতী, আমাকে ন্যাকা বোঝাস নে। চামচ তুই নিয়েছিস। দু দুটো চামচ। কিন্তু তোর ঘরে নেই, বাড়ীতে কোথাও নেই, তুই আলাদা সংসার পেতেছিস, না? মহত্ব হচ্ছে? মিথ্যে কথা বলে মহত্ব হয় না, বুঝলি?"

শ্রীমতীর মুখের গোড়ায় উত্তর আসিল—'আলাদা সংসারই পেতেছি', কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলা যায় না যে।"

বলা যায় না বলিয়া উত্তর দিতে পারিলেন না শ্রীমতী। বলিলেন—"তোমাকে বিশ্বাস করাতে পারছি না. কিন্তু কাল তুমি পাবে, তোমার চামচ পেয়ে যাবে।"

"তা পাবো না কেন। চামচ এমন কিছু দুর্মূল্যও নয়, দুষ্প্রাপ্যও নয়। এখানকার বাজারেও পাওয়া যায়। কাল কিনে এনে দেবে, চোরকে রক্ষে করতে নিজে দণ্ড দেবে। এ নইলে আর মহত্ব কী?"

শ্রীমতী হাসিয়া বলিলেন—"ও:, তুমি ওকালতিতে গেলে না কেন মাধবীদি? স্কুল-মাস্টারীতে তোমার ট্যালেণ্ট নষ্ট করছো। ফৌজদারি উকিল হলে তুমি দশ হাজার টাকা কামাতে পারতে মাসে। তোমার যা মাথা!"

"থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না। খুব হয়েছে।" বলিলেন মাধবীদি। সুরটা কিঞ্চিৎ নামিয়াছে। বোধ করি তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও নামিয়াছে। প্রশংসায়, বিশেষ করিয়া রূপের ও বুদ্ধির প্রশংসায় নরম হয় না, এমন মন খুব কমই আছে।

"থাকগে, তোমাকে আর চামচ কিনে দণ্ড দিতে হবে না। চামচ আরও আছে।"

বলিয়া মাধবীদি ফিরিলেন। শ্রীমতী বলিলেন—"চুরি করলে দণ্ড দিতেই হয়। কিন্তু নতুন চামচ তোমায় কিনে দেবো না। তোমার পুরোনো চামচ দুটোই তুমি পাবে। তুমি নিশ্চিন্তে থাকো।"

"আমার আবার নিশ্চিন্ত। যাক, যা হয় হোক, উড়ে যাক, পুড়ে যাক, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার তো থেকো। আমি আর কথাটি কইবো না।"

মাধবীদি চলিয়া গেলেন।

শ্রীমতী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। প্লাসটিকের ডিশ দুইখানির তিরোধান কখন বা মাধবীদির গোচরে আসে, কখন আবার নূতন আক্রমণ ঘটে, এই শঙ্কায় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিলেন। কিন্তু ভাগ্য অতটা অপ্রসন্ন হইল না। মাধবীদি মাথা ধরিয়াছে বলিয়া সন্ধ্যার চা ও রাত্রির আহার নিজের ঘরেই সারিলেন। শ্রীমতী সাধিয়া

খাওয়াইলেন তাঁহাকে। রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘর সে রাত্রে পরিদর্শন হইল না। সুকিয়া ডিশের অভাব যদি বা লক্ষ্য করিয়া থাকে, তাহার উল্লেখ করিল না। আবার ডিশচুরির দায়ে পড়িবার মতো নির্বুদ্ধি সে নয়।

পরদিন রবিবার। শ্রীমতীর বেলা অবধি ঘুমাইবার ও বিছানায় গড়াইবার দিন। মাধবীদি অনিয়ম বিশৃঙ্খলার প্রশ্রয় কদাপি দেন না। যথারীতি ভোরে উঠিয়া নিত্য-কার প্রাতভ্রমণ সারিয়া হেডমিসট্রেসের বাড়ী গেলে টুকরা কথা ও দরজার শব্দে সে সংবাদ পাইয়া শ্রীমতী নিশ্চিন্ত আরামে আবার চোখ বুজিলেন। ঘণ্টাখানেক পরে সুকিয়া আসিয়া ডাকিল। বলিল, তাহার একটি আর্জি আছে। শ্রীমতীর ভয় হইল। আবার কী? কিসের আর্জি? সুকিয়া বলিল—"আজ আমাকে ছুটি দিবেন দিদিমণি? আমি—"

শ্রীমতী রাগিয়া বলিলেন—"আমি জানি না. যা দূর হয়ে যা। সব মিটিয়ে দিলুম, টাকা দিলুম, তবু জ্বালাতন। বেশ, যা, তোকে কাজ করতে হবে না।"

গৃহস্থালীর ঝঞ্ঝাট এমনিতেই তাঁহার ভালো লাগে না। প্রয়োজনে যখন করিতে হয় তখন কর্তব্যজ্ঞানেই করিতে হয়। কিন্তু আজিকার দিনটিতে এই সংসারের খাঁচায় বাঁধা পড়িয়া দুয়োরাণীর সংসার হইতে বঞ্চিত হইবার কল্পনাও তাঁহার সহ্য হইল না।

সুকিয়া বলিল—"সে ছুটি নয় দিদি, মেলা দেখতে যাবো, তাই একবেলার ছুটি চাইছি। বাচ্চাদের নিয়ে মেলা দেখতে যাবো। কাম কাজ আমি সব করে দিয়ে দুফোরে একটু সবের সবের যাবো, সনঝা বেলায় আসবো না দিদিমণি, এই ছুটি চাইছি।'

শ্রীমতী উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেলা দেখতে যাবি? ছেলেদের নিয়ে? কিসের মেলা রে?"

সুকিয়া বলিল—"সে আয়াসের একটা পরব আছে। তাহলে ছুটি মঞ্জুর দিদি?"

"তা যাস? বড় দিদিমণিকে বলেছিস্?"

"না দিদি, বড়দিদিকে তুমি বোলো।"

বলিয়া সুকিয়া চলিয়া যাইতেছিল। শ্রীমতী বলিলেন—"শোন না সুকিয়া, হাঁরে, মেলাতে কী জিনিস আসে রে? আমাকে নিয়ে যাবি দেখতে?"

সুকিয়া হাসিয়া বলিল—"হায় আমার কপাল! তুমি কী দেখবে দিদিমণি? দেহাতি মেলা। গরীব গাঁইয়া মানুষের বিকি-কিনির জিনিস আসে, আর বাচ্চাদের খেলনা দোলনা কিছু থাকে। না তোমাদের দেখবার, না কিনবার।"

শ্রীমতী তখন আর কিছু বলিলেন না। সুকিয়ার ছুটি মঞ্জুর করিয়া এ প্রসঙ্গ শেষ করিলেন। কিন্তু তাঁহার মাথার মধ্যে মেলা ঘুরিতে লাগিল। সুকিয়া রান্না করিয়া চলিয়া গেল। শ্রীমতী স্নানাহার তাড়াতাড়ি সারিয়া মেলা দেখিতে বাহির হইলেন। তখন বেলা মাত্র এগারোটা বাজিয়াছে। ভাগ্যে মেলার খবর পাওয়া গেল নচেৎ তাহার বাসা হইতে বাহির হইবার কী অজুহাত দেওয়া যাইত? মাধবীদি বলিলেন—"অবাক কাণ্ড! মাথা খারাপ হোলো নাকি?"

বলিবার কথাই। যে মানুষ রবিবারে ও ছুটির দিনে বেলা একটা না বাজিলে স্নান করিতে নামে না এবং স্নানাহারের সময়টুকু ছাড়া প্রায় সারাদিনই যাহার বিছানায় গড়াইয়া কাটে, তাহার আজ হইল কী? আর তাহাও কিনা খোট্টা গেঁয়ো লোকের মেলা। মাথা খারাপ না হইলে ঐ মেলা দেখিতে ছোটে কলিকাতার গ্রাজুয়েট মেয়ে? আর এই প্রচণ্ড সূর্য মাথায় করিয়া!

মাথা খারাপ না হইয়াও গ্রাজুয়েট মেয়ে এমন সময়ে এমন মেলায় ছুটিতেছে কেন, সে কারণ তো কাহাকেও বলিবার নয়। বলিলে মাথা খারাপেরই প্রমাণ দেওয়া হইবে।

সুকিয়া বাড়ী গিয়া ছেলেমেয়েদের খাওয়াইবে, নিজে খাইবে, বিশ্রাম করিবে, তারপর রৌদ্রের ঝাঁঝ কমিলে ছেলেমেয়ে লইয়া মেলায় যাইবে। সুতরাং মেলার ক্ষেত্রে তাহার সহিত দেখা হইবার ভয় নাই। শুধু দেখা হইলে বিপদ নাই, বিপদ হইত মাস্টার দিদিমণির কেনা জিনিস গুলি দেখিলে। এ-সব কিনিবার কোনও কৈফিয়ৎ শ্রীমতীর নাই। অর্থাৎ কাহাকেও বলিবার মতো নাই।

মেলাতে ধান, গম, চাল, ডাল, কাপড়, জামা, ধামা,

কুলো, গরু, ছাগল, প্রভৃতি সাধারণ তুচ্ছ বস্তুই বেশী থাকিলেও, অতি প্রয়োজনীয় ও লোভনীয় বস্তুও কিছু আছে। চকচকে টিনের তরবারি আছে। ঝকঝকে কাগজ জড়ানো চেঁচাড়ির তীর ধনুক আছে। টকটকে লাল রঙের উপর কুচকুচে কালো পাকানো গোঁফ আঁকা গোলচোখ উঁচু নাক ও আকর্ণ দাঁতলা রাক্ষসের মুখোস আছে, নানা রঙের টুকটুকে পুঁতির মালা এবং কড়ির বালা আছে, ধবধবে শাদা সোলার কাকাতুয়া ও অপরূপ ময়ূরপুচ্ছের পাখা আছে। এ জগতে সুখী হইবার ও প্রিয়জনকে সুখী করিবার জন্য ইহার চেয়ে বেশী সম্পদ কে আশা করিতে পারে? ইহাদের উপর ছোট একটি মাটির সোরাই, দুইখানি ডিস্ ও দুইখানি চামচ কিনিয়া মেলার সওদা শেষ করিলেন শ্রীমতী। নিজের দুইটি মাত্র হাতে এত রাজ-সম্পদ বহন করা যায় না। একটি ছোকরাকে বাহক রূপে সঙ্গে লইলেন। পথে মিষ্টান্নের দোকান হইতে খাদ্য ও সোরাই ভরিয়া পানীয় জল সংগৃহীত হইল। দুয়োরানীর অরণ্যের প্রবেশ পথের অদূরে বাহককে বিদায় দিলেন শ্রীমতী।

তখন কাঞ্চনকুমার ও কেশবতী আসে নাই। শ্রীমতীর সুবিধা হইল। সংসার গুছাইয়া দুয়োরানী দাওয়ায় বসিয়াছে, এমন সময় রাজপুত্র রাজকন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। দুয়োরানী মাকে পূর্বেই হাজির দেখিয়া তাহারা অতিশয় খুশী হইল। তার পর একে একে অমূল্য ধন সম্পত্তি পাইয়া খুশীর সীমা রহিল না। মা ও ছেলে মেয়ের মধ্যে আদর চুম্বনের প্রতিযোগিতা চলিল। শ্রীমতীর বুক ভরিয়া উঠিল।

সেদিন বর্তমান পৃথিবী ও কালের সীমানার বাহিরে এক অজগর বনের মধ্যে এক নির্বাসিতা দুয়োরানীর কুটিরের সম্মুখে কত যে ভীষণ দুর্লভ কাণ্ড ঘটিল, তাহা একালের পৃথিবীর লোক জানিতে পারিল না তাই রক্ষা। জানিলে বিশ্বাস করিত কিনা সন্দেহ। কাঞ্চনকুমার নামে এক অসমসাহসী রাজপুত্র উন্মুক্ত তরবারি ও উদ্যত তীরধনু লইয়া তপোবন রক্ষা কার্যে অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিল। সেদিন পলকহীন গোল চক্ষু, রন্ধ্রহীন উদগ্র নাসিকা ও নিত্য-প্রসারিত আকর্ণ দশনপংক্তি সমেত মুণ্ডধারী যে দুরাচার রাক্ষস বারবার তপোবনে হানা দিল, সে মায়াবী শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল বলিয়া রক্ষা পাইল না। রাজপুত্রের ধনু ও তীর অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিলেও তাহার অব্যর্থ শর সন্ধানে মায়াবী রাক্ষসকে বারবার ধরাশায়ী হইয়া বারবার প্রাণ ত্যাগ করিতে হইল। সেদিন সেই অরণ্য মধ্যে দৈত্যের মায়ায় বন্দিনী কেশবতী নামে এক রাজকন্যা নানাবর্ণের মহামূল্য মুক্তামালা গায় ও রত্নবলয় হাতে পরিয়া দুইচোখ খুলিয়া গভীর নিদ্রায় অচেতন হইয়া বসিয়াছিল। চোখ বুজিয়া ঘুমাইবার প্রাচীন প্রথা এই রাজকন্যার মোটেই মনঃপূত নয়, কারণ চোখ বুজিলে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। আর দৈত্যগৃহে অদৃশ্য সোনার পালঙ্ক থাকিলেও তাহাতে শুইয়া জামায় ধুলা লাগানোতে রাজকন্যার দুয়োরানী মায়ের আপত্তি থাকায় কেশবতী বসিয়া চোখ খুলিয়া নিদ্রাঘোরে অচেতন রহিল। রাজপুত্র আসিল মায়াঘুম ভাঙ্গাইয়া রাজকন্যার চেতনা আনিতে। বৃক্ষরূপী বনদেবতাদের প্রসাদে বনে সোনার কাঠির ছড়াছড়ি। যাহাদের চোখের দৃষ্টিতে, হাতের স্পর্শে ও মনের ইচ্ছায় সোনা জন্মায়, তাহাদের সোনার অভাব হয় না। সে-সোনা বণিকের মুখাপেক্ষী নয়, ধনিকের ভাণ্ডারে তাহা বন্দী হয় না, তস্করের সিঁধকাঠি তাহার নাগাল পায় না। উৎসাহী রাজপুত্র মুঠি মুঠি সোনার কাঠি বর্ষণ করিয়া রাজকন্যার চৈতন্য ফিরাইতে প্রবৃত্ত হইল। অতিসংখ্যক কাঠির অতিমাত্রায় স্পর্শে রাজকন্যার চৈতন্য অতিশয় প্রখর হইয়া জাগিল। তেজস্বিনী রাজকন্যা উত্যক্ত হইয়া অস্ত্রবিনাই শুধু হাতে হাফপ্যান্ট পরিহিত এক রাক্ষসকে তাড়া করিয়া দূরে খেদাইয়া দিল।

আবার এক সময়ে কাঞ্চনকুমার রাজপুত্র মৃগয়ায় গিয়া দূর বন হইতে যাবতীয় বাঘ সিংহ গণ্ডার তিমি মাছ ও জলহস্তী প্রভৃতি শিকার করিয়া আনিল এবং কেশবতী রাজকন্যা সোরাই কাঁখে বসাইয়া নদী ও ঝর্ণা হইতে এমন সুমিষ্ট জল লইয়া আসিল যে সেই জলে দুয়োরানী-মা বাঘ সিংহ প্রভৃতির মাংসকে রান্না করিয়া সন্দেশের মতো কোমল ও মিষ্ট করিয়া পুত্র কন্যাকে পরিবেশন করিল।

ক্ষুধা ও পিপাসা শান্ত হইলে দুই ভাই বোন মায়ের দুই জানু অধিকার করিয়া বসিল। কেশবতী বলিল—"আজ

এই মাটাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। নারে দাদা ?”

কাঞ্চন মায়ের আঁচল এক হাতে জড়াইয়া লইয়া অন্য হাতে তরবারি উঠাইয়া বলিল—“পালাতে গেলেই কেটে ফেলবো। ঘ্যাঁচ করে কেটে ফেলবো।”

দুয়োরানী ভীত কাতর কণ্ঠে বলিল—“ওমা গো, কেটে ফেল্‌বে কী গো ? কেটে ফেল্লে যদি আর না বাঁচি ? তা হ'লে মতির মা দুয়োরানী হবে তো ? বেশ।'

এই দুয়োরানীটার মরিয়া যাওয়া এবং মতির মায়ের তাহার স্থান গ্রহণ, এই ঘটনার সম্ভাবনা সমান অশঙ্কিত। কেশবতী তাড়াতাড়ি মায়ের কানে কানে বলিল—“সত্যিকারের কাটবে না গো, মিচিমিচি কাটবে, বুঝলে ?”

কাঞ্চন দেখিল তাহার কথায় কাজ হইয়াছে। বলিল—“তুমি চলে যাবে না বল না। তাহলে তো কাটবো না। বল ?”

কী জবাব দিবেন শ্রীমতী ? এই নির্বাসনের স্বর্গ হইতে নির্বাসিত না হইবার উপায় আছে কি ? এবং সেই নিরুপায় দুঃখের অনিবার্যতা ইহাদের বিশ্বাস করাইবার উপায়ই বা কোথায় ? ইহারা সব বিশ্বাস করে বলিয়াই বিচ্ছেদের অনিবার্যতা বিশ্বাস করে না। ইহারা বলে “যেতে নাহি দিব।”

কেশবতী বলিল—“বল না, ওমা, তুমি চলে যাবে না —বল না।”

দুয়োরাণী মতির মায়ের শরণ লইল। মানুষটির নহে, তাহার নামটির। ভক্তরা বলেন—নাম ও নামী অভেদ, তবু নামী হইতে নামের প্রভাব অধিক। দুয়োরাণী বলিল—“চলে যাব কেন ? লুকিয়ে থাকবো। তা নইলে মতির মা যে দেখে ফেলবে। ডাকতে ডাকতে যদি এখানে এসে পড়ে—ওরে বাবা, মতির মার সঙ্গে দেখা হলে আমি তো ভয়েই মরে যাবো। তাহলে আর একটুও খেলতে পারবো না।”

কথাটা মিথ্যা নয়। এ আসরে মতির মা, শুধু মতির মা কেন, অপর যে কোনও ব্যক্তির উপদ্রব ভাই বোনেরও ভয়ের কারণ। কেহই তাহা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে।

কিন্তু নূতন বীরত্বের আস্বাদ পাইয়া কাঞ্চনকুমার এখন অকুতোভয়। হাতে অস্ত্র থাকিতে অনুপস্থিত শত্রু নিধনে তাহার আলস্য নাই। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া তরবারি আন্দোলিত করিয়া বলিল—“মতির মা'কে কেটে ফেল্‌বো, ক্যাঁচ করে কেটে ফেলবো এখানে এলে।”

দুয়োরানী বলিল—“তাতেও হবে না। মতির মা যে কিছু জানে না। কেটে ফেল্লেও আবার বেঁচে উঠে সবাইকে বলে দেবে আমার কথা।”

এ রকম নির্লজ্জ রাক্ষসের কথা শোনা গিয়াছে বটে, যাহারা মরিয়া গিয়াও আবার বাঁচিয়া উঠিয়া যুদ্ধ করে। কেশবতী তাহার দাদাকে বুঝাইয়া বলিল—“মতির মা'টা বোকা কিনা, বুঝলি দাদা, কেটে ফেল্লেও কথা কইবে।”

কাঞ্চন বলিল—“নিষ্ঠুর কোথাকার।” তাহার ভাষার ভাণ্ডারে এই শব্দটি নূতন সংগৃহীত হইয়াছে। শব্দটি তাহার ভালো লাগিয়াছে, ব্যবহার করিতে ভালো লাগে।

দুয়োরানী মায়ের প্রস্তাবই ভালো। কাঞ্চনকুমার বলিল—“তুমি কোথায় লুকিয়ে থাকবে ?”

কেশবতী বলিল—“এই ঘরে থাকবে ? রাত্তিরে ভয় করবে না ?”

দুয়োরানী বলিল—“এই ঘরে কেন ? আমি থাকবো যেখানে রোজ লুকিয়ে থাকি। থাকি না ? তোমরাও তো লুকিয়ে থাকো। বিকেল হয়ে গেলে তোমরা চলে যাও, কোথায় থাকো, আমি জানি না, আমি চলে যাই, কোথায় থাকি তোমরা জানো না। বেশ মজা হয়। আবার এইখানে এসে দেখা হয়। কেমন মজা হয় লুকোচুরি খেলার মতন, নয় ?”

বক্তার ও শ্রোতার গুনেই অনেক মজার উপলব্ধি হয়, বস্তুর বা ঘটনার গুণে নয়। এমন হাসিমুখে এমন স্বরে দুয়োরানী প্রতিদিনের লুকোচুরির মজা ব্যক্ত করিল যে অস্বীকার করিতে ইচ্ছা হইল না। কাঞ্চন বলিল—“আমরা যে কোথায় লুকিয়ে থাকি সে তুমি কিছুতেই খুঁজে পাবে না। বোনটি, বলিস নি।”

কেশবতী বলিল—“তুমি মনে করছো কাছেই থাকি, তা নয়, সে অ-নে-ক দূরে এক জায়গায় থাকি। না রে দাদা ?”

দুয়োরানী বলিল—“একদিন দাঁড়াও না আমি ঠিক খুঁজে বার করবো। তোমরা খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাবে আমাকে দেখে।”

কাঞ্চনকুমার বলিল—"আমিও খুঁজে বার করবো তোমার ঘর। দেখো না।"

কেশবতী বলিল—"তুমি একলা থাকো ঘরে? তোমার ভয় করে না?"

"ভয় করবে কেন? আমি তো বড়ো হয়েছি গো।"

কাঞ্চন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আমিও বড়ো হয়েছি। আমি তোমার ঘর দেখতে যাবো। নিশ্চয় যাবো।

কেশবতী আরও এক পদ অগ্রসর হইল, বলিল—"আমি তোমার কাছে শোবো। হ্যাঁ?"

এটা কাঞ্চনেরও মনের কথা। নেহাৎ বড়ো হইয়াছে বলিয়া বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল। ঘর দেখিতে যাওয়ার প্রস্তাব মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা। এখন ছোট বোনের সাহসে সাহস পাইয়া সে বলিল—"আমিও শোবো।"

মায়ের কাছে শিশু পুত্র কন্যা শুইতে চাহে, ইহাতে মায়ের কী বলিবার আছে। অতএব দুয়োরানী জবাব দিতে পারিল না। জবাবের জন্য পুত্রকন্যার দুশ্চিন্তা নাই। কারণ এটা অধিকারের কথা, অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

কেশবতী বলিল—"আমি ডান দিকে শোবো।"

কাঞ্চনকুমার বলিল—"না, আমি ডান দিকে শোবো, তুমি বাঁদিকে।"

মায়ের দক্ষিণ ও বামদিকের মধ্যে কী প্রভেদ আছে, কে জানে। কিন্তু এক অংশীদার যদি বিশেষ করিয়া একটা দিক দাবী করে, তবে অপর অংশীদারও কেন সেই দাবী করিবে না?

কেশবতী বলিল—"না। আমি আগে বলিচি।" বলিয়া সে দুয়োরানীর ডান হাতটি নিজের ক্ষুদ্র হাত দুইটি দিয়া জড়াইয়া ধরিল।

কাঞ্চনকুমার গম্ভীর সুরে বলিল—"খুকু, আমি দাদা হই না? আমি তোমার চেয়ে বড়ো না?"

যুক্তি যেমনই হোক, কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কেশবতী তখন সেরা যুক্তি প্রয়োগ করিল। মায়ের হাতটা ছুঁড়িয়া ত্যাগ করিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল। দুয়োরানী সানন্দে তাহাকে লইয়া ছেলেমেয়েদের কলহ উপভোগ করিতেছিল। কিছু বলিল না। কিন্তু বেচারা কাঞ্চনকুমার এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিল না। ছোট বোনের অভিমানরূপ অকাট্য যুক্তির খণ্ডন না পাইয়া মামলা সালিশীতে দিল। বলিল—"আচ্ছা, মা যা বলবে। কেমন? হ্যাঁ?"

কেশবতী হাঁ, না, কিছু বলিল না। মুখ ঘুরাইয়াই বসিয়া রহিল। কাঞ্চন বলিল—"আমার কথা ঠিক না, মা? আমি বড়ো, আমি ডান দিকে শোবো, না?"

কেশবতী এবার ফিরিয়া বলিল—"না, আমি শোবো। না মা?" বলিয়া মায়ের হাতখানি পুনরায় হস্তগত করিল।

দুয়োরানী উৎকৃষ্ট রোয়েদাদ দিল। কেশবতীকে বলিল—"দাদা কিনা বড়ো হয়, তাই দাদার কথা শুনবো, কেমন?" এবং কেশবতীর প্রতিক্রিয়া প্রকাশের সময় না দিয়া প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনের দিকে ফিরিয়া বলিল—"কিন্তু খুকু ছোট বোন বলে খুকুর কথাটা দাদাকে রাখতেই হবে। নিশ্চয় রাখতে হবে। কী বল?"

কাঞ্চন সন্ধি করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল। বলিল—"হ্যাঁ।" প্রকৃতপক্ষে কাহার ভাগে কোন দিকটা পড়িল, তাহা যে নিশ্চিতভাবে নির্ণীত হইল, এমন বলা যায় না। কিন্তু তাহার প্রয়োজনও হইল না। মাকে লইয়া দায়-ভাগের মামলা এইখানেই মিটিল।

তিন দিনের দুর্গাপূজায় যেমন নবমীর রাত্রিতেই উৎসবের উল্লাস সবচেয়ে বেশী হয়, তেমনি ইহাদের কল্প-লোকের খেলা আজ তৃতীয় দিনে সর্বাধিক জমিয়াছিল। আজ খেলা সুরু হইয়াছে শীঘ্র, খেলা হইয়াছে নানা উপকরণ লইয়া নানা বিচিত্র রকমের। আবার আজ মতির মা'র ডাক আসিলই না, তাই মিলনের কালও দীর্ঘতম হইল। কিন্তু দীর্ঘতমেরও শেষ হয়। ক্রমে দুয়োরাণীর অরণ্যের আলো ম্লান হইল। খেলা ভাঙার কথা যেন মনেই ছিল না, মনে করিতে হইল। খেলা ভাঙিতে হইল।

রূপকথার সংসার, রাজপুত্রের অস্ত্রশস্ত্র, রাজকন্যার রত্নাভরণ ও রাক্ষসের রূপ—সব দুয়োরানীর কুটিরে গচ্ছিত রাখিয়া মণ্টু ও খুকুকে লইয়া শ্রীমতী বাহিরে চলিলেন।

বিদায়ের দুঃখ আজ ছেলেমেয়ের পক্ষে সহজ হইয়া আসিয়াছে। তাহারা উদ্বেগহীন চিত্তে শ্রীমতীর দুই হাত ধরিয়া বকিতে বকিতে চলিল। আজ খেলা শেষ হইয়াছে, কাল সুরু হইবে। এ তো নিত্যকার খেলা। কিন্তু শ্রীমতীর মন কাতর হইয়া আছে। তিনি জানেন আজ যে খেলা শেষ হইল কাল তাহা সুরু হইবে না, পরশুও হইবে না, পর পর কয়দিনই হইবে না। কাল সোমবার।

কিন্তু সে কথা তিনি বলিতে পারিলেন না।

বাগানের সীমানায় আসিয়া শ্রীমতী বলিলেন—"আর আসতে হবে না। এবার তোমরা বাড়ী যাও।"

কেশবতী ও কাঞ্চন সমস্বরে বলিল—"না।"

"না কী গো? বাড়ী যাবে না তো যাবে কোথায়?"

কাঞ্চন বলিল—"তোমার বাড়ী যাবো।"

কেশবতী বলিল—"তোমার বাড়ী যাবো। তা নইলে তোমাকে যেতে দেবো না।"

স্বার্থহীন দ্বিধাহীন ঘোষণা।

"কিন্তু যেতে নাহি দিব"র পরও যাইতে দিতে হয়। ক্ষুদ্র শিশুমুষ্টিতে সংসারের মানুষের দুর্বার যাত্রা বন্ধ করা যায় না।

শ্রীমতী বাসায় ফিরিয়া সেই জঙ্গলের মধ্যে ঘুরিতে লাগিলেন, যেমন পূর্বে দুই দিন ঘুরিয়াছেন। কিন্তু পূর্বে দুই দিন আবার সেখানে শীঘ্র ফিরিবেন জানিয়া মন আশ্বস্ত ছিল। আজ সে আশ্বাস নাই। কাল হইতে শুক্রবার পর্যন্ত পুরা স্কুল। ছাত্রীদের ছুটি সাড়ে তিনটায়, কিন্তু শিক্ষিকাদের ছুটি ঘণ্টাখানেক পরে। সামনেই পরীক্ষা আসিতেছে, তাহার প্রস্তুতি চলিবে।

সোমবার ও মঙ্গলবার ছটফট করিয়া কাটিল। দুইটি শিশুহৃদয় এই বঞ্চনা কেমন করিয়া সহিতেছে? বঞ্চনা বই কি। খেলা যে সুরু হইবে না, এ সংবাদ তো দেওয়া হয় নাই—বরং আশাই দেওয়া হইয়াছে যে এ খেলা নিত্যই চলিবে। বুধবার বিকালে শ্রীমতীর আর ধৈর্য রহিল না। ছুটীর ঘণ্টা পড়িবার পর অতিরিক্ত কর্তব্যের জন্য বসিলেন না। বইপত্র ডেস্কে বন্ধ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। একজনকে বলিয়া গেলেন একটা জরুরি প্রয়োজনে যাইতেছেন, অল্পক্ষণ পরেই ফিরিবেন।

দ্রুতপদে অরণ্যের ধারে আসিয়া দেখিলেন কেহ তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া নাই। থাকিবার কথা নয়। এমন অপরাহ্ন বেলায় তাঁহাকে উহারা প্রত্যাশা করে না। কিন্তু শ্রীমতীর মানস চক্ষুতে যে তিনি নিরন্তর দেখেন দুটি শিশু এই পথের ধারে সর্বক্ষণ তাঁহার আসার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। হতাশায় অভিমানে তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। তাই যুক্তিহীন কল্পনায় শ্রীমতী বুঝি মনে করিয়াছিলেন পথের ধারে তাহাদের দেখিতে পাইবেন।

মতির মা যদি এত শীঘ্র না ডাকিয়া থাকে, তবে রাজপুত্র রাজকন্যা এখনও দুয়োরাণীর বনে খেলা করিতেছে। আশার ছলনায় মানুষ অনেক বৃথা কাজ করিয়া থাকে। শ্রীমতী বাগানে প্রবেশ করিলেন। না, বাগান আজ অরণ্যই বটে। কেহ নাই।

আরও দুইদিন কাটিল। কোন মতেই শ্রীমতী সময় করিতে পারিলেন না। অবশেষে, বহু বিলম্বে, শনিবার আসিল। বেলা দুইটা নাগাৎ শ্রীমতী স্কুল হইতে বাহির হইলেন। আজ স্থির করিয়াছেন মণ্টু ও খুকুকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের বাড়ীতে যাইবেন, তাহাদের মায়ের সঙ্গে আলাপ করিবেন। শনিবার রবিবারের গণ্ডীর বাহিরে যখন সুবিধা হইবে মণ্টু খুকুকে দেখিয়া আসিবেন। ইচ্ছা হইয়াছিল বাজার হইতে বনবাসের জন্য কিছু খাদ্য সংগ্রহ করিবেন। কিন্তু দেরি হইবার ভয়ে সেদিকে গেলেন না। দীর্ঘ পাঁচদিন দুটি শিশু তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছে, দীর্ঘ পাঁচদিন তিনি তাহাদের সঙ্গে মিলিতে না পারিবার দুঃখ সহিয়া আছেন। সে প্রতীক্ষাকে সে দুঃখকে আর পনেরো মিনিটের দ্বারাও প্রলম্বিত করা সহিবে না।

আজও কেহ দাঁড়াইয়া নাই বনের প্রান্তে, পথের পাশে। তা, কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। কতদিনই বা পারে? আশা ত্যাগ করিয়া নিজেরাই খেলিতেছে, নিত্য যেমন খেলে। ভালোই হইয়াছে, পথের উপর রাগ অভিমানের পালা চলিলে কেহ হয়তো দেখিয়া ফেলিত। এখন বনের মধ্যে অপ্রত্যাশিত উপস্থিত হইলে বিস্ময়ের আনন্দে উহারা রাগ করিতে ভুলিয়া যাইবে। শ্রীমতী বনে প্রবেশ করিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া শুকনা পাতার উপর পদশব্দ পরিহার করিয়া চলিলেন।

কেহ নাই। আঙিনায় নাই। কুটিরে নাই। ইতস্তত: ঘুরিয়া দেখিলেন, কোথাও নাই। তবে এখনও আসে নাই। শ্রীমতী হাত ঘড়িতে দেখিলেন দুইটা বাজিয়াছে। এখনও ঘণ্টা দুই, দুই কেন, মতির মা না ডাকিলে তিন ঘণ্টাও হইতে পারে, খেলা চলিবে। গ্রীষ্মের দীর্ঘ দিনের এখনও অনেকখানি বেলা অবশিষ্ট আছে। শ্রীমতী কুটিরে প্রবেশ করিলেন। দুয়োরানী বাহির হইল। এইবার প্রতীক্ষার পালা।

মতির মা কি দুপুরের নিদ্রা ত্যাগ করিয়া এতক্ষণ গল্প বলিতেছে? না, পাঁচ দিনের নিরাশায় দুয়োরানীকে পরিত্যাগ করিয়া মণ্টু ও খুকু ঘরেই খেলিতেছে? কেমন করিয়া খবরটা দেওয়া যায় যে দুয়োরাণী আসিয়াছে। বিশ্রী ঘর ছাড়িয়া এই সুন্দর বনে চলিয়া এস।

কেহ আসিল না। তিনটা বাজিয়া গেল। সাড়ে তিন বাজিল। কেহ আসিল না। কী হইল? সারা দুপুর বিকাল ঘরে বন্দী হইয়া থাকিবার ছেলে মেয়ে তো উহারা নয়। সুস্থ থাকিতে নয়।

অকস্মাৎ বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল শ্রীমতীর। সুস্থ আছে তো? এ সন্দেহ তাড়ানো গেল না। যতো মনে করেন সুস্থ থাকিবে না কেন, নিশ্চয় সুস্থ আছে, এমন সুস্থ দেখিয়া গিয়াছেন সেদিন, ইহারই মধ্যে অসুস্থ হইবে কেন? কিন্তু সন্দেহ যায় না। ভাবিতে ভাবিতে সন্দেহ আশঙ্কায় ও আশঙ্ক বিশ্বাসে দাঁড়াইল। অসুখ না করিলে উহারা আসিতই। কাহার অসুখ? এক জনের, না দুই জনেরই? শিশুদের অসুখ প্রায়ই সংক্রামক হয়। কিছু মাত্র অসম্ভব নয় যে খুকু ও মণ্টু শয্যাগত হইয়া পড়িয়া আছে। যত রকম শৈশব ব্যাধির কথা শ্রীমতীর মনে পড়িতে লাগিল। সবগুলিই সাংঘাতিক হইতে পারে। অনেক সময় প্রথম হইতে উপযুক্ত যত্নের ও সাবধানতার অভাবে ব্যাধি বিষম রূপ ধারণ করে। এই রকম চিন্তা মন হইতে যতই দূর করিতে চেষ্টা করেন, ততই দুর্নিবার হইয়া মনকে আচ্ছন্ন করিতে থাকিল।

তখন সেই নকল দুয়োরানীর নকল মাতৃহৃদয়ে নকল পুত্রকন্যার জন্য অতিশয় আসল উদ্বেগ যন্ত্রণা সুরু হইল। আর স্থির হইয়া বসিয়া থাকা চলিল না। সেই পরিত্যক্ত বাগানের ভাঙ্গা চালায় বসিয়া পড়ন্ত বেলার ম্লান আলোয় নিঃসঙ্গ দুয়োরানীর নির্বাসন আজ সত্য হইল। রাজপুত্র রাজকন্যা রাজবাটীতে আছে, কিন্তু তাহাদের কাছে যাইবার পথ নাই, অধিকার নাই। এ নির্বাসন অসহ্য।

কুটিরের মধ্যে দুয়োরানীকে ছাড়িয়া শ্রীমতী বাহিরে আসিলেন। আসিবার সময় চোখে পড়িল মেঝের উপর এক স্থানে খোলামকুচি দিয়া লেখা: "আড়ি আড়ি।" মণ্টু লিখিয়াছে। খুকু এখনও লিখিতে শিখে নাই। সেই বড়ো বড়ো আঁকা বাঁকা চারিটি অক্ষর মণ্টুর হইয়া মুখ ভার করিয়া শ্রীমতীর মুখের পানে চাহিয়া আছে। সে মুখ প্রসন্ন করা এখনই, এই মুহূর্তে অবশ্য কর্তব্য।

বাগানের পাশের যে রাস্তা দিয়া শ্রীমতীর আসা যাওয়া, সেটা একটা বড়ো রাস্তায় পড়িয়াছে। বড়ো রাস্তায় আসিয়া মোড় ফিরিয়া অল্প দূরে দেখিলেন ফটক, ফটকের পিছনে বাড়ী। রাজবাড়ী না হোক, ধনীর প্রাসাদ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেমন সখের বাগান এখন জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে, সখের বাড়ীও তেমনি অযত্নে অব্যবহারে জীর্ণ বিবর্ণ হইয়া আছে। তথাপি বড়লোকের বাড়ীর ফটক। অনাহূত অপরিচিত দরিদ্রের প্রতি তাহার ভ্রুকুটি স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু সমস্ত সংকোচ সংশয় দ্বিধা প্রবল সঙ্কল্পের দ্বারা জয় করিয়া শ্রীমতী ফটক অতিক্রম করিলেন। কয়েক মিনিট পরে শ্রীমতী সেই ফটক পুনরায় অতিক্রম করিয়া পথে ফিরিয়া আসিলেন। রূপকথার খেলা শেষ হইয়াছে।

রূপকথার খেলা চিরতরে শেষ হইয়াছে, ইহাই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন শ্রীমতী বাসায় ফিরিয়া। রাজপুত্র কাঞ্চনকুমার, রাজকন্যা কেশবতী আর তাঁহার সহিত খেলা করিবে না, তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিবে না, তাঁহার আদর লইবে না। এ জীবনে তাহাদের সহিত আর দেখা হইবে না।

মণ্টু ও খুকু তাহাদের বাপমায়ের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া গিয়াছে। হাওয়া বদলের জন্য এই বাড়ী লইয়াছিলেন। আরও কিছুদিন থাকিবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ বাবু আসিয়া সকলকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। দারোয়ানের কাছ হইতে এইটুকু মাত্র সংবাদ লইয়া

আসিয়াছেন শ্রীমতী। দারোয়ান যতদূর শুনিয়াছে আর ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নাই।

রূপকথা তো শেষ হইয়াছে। শ্রীমতীর কথা কিছু বাকী আছে। শ্রীমতীর কিছু ভালো লাগে না। কাজ ভালো লাগে না। পড়া ভালো লাগে না। বেড়াইতে ভালো লাগে না। কেবল মনে হয় সেই তো গেলেন উঁহাদের বাড়ীতে, আর পাঁচদিন আগে কেন গেলেন না। মণ্টু খুকু হাত ধরিয়া টানিয়াছিল, কেন গেলেন না। গেলে তো এমন করিয়া তাহারা হারাইয়া যাইত না। মন হু হু করে, কান্না পায়।

সপ্তাহখানেক মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিয়া অবশেষে পরের রবিবারে শ্রীমতী দারোয়ানের সহিত আবার দেখা করিয়া ঠিকানা সংগ্রহ করিলেন। রাত্রে অনেক ভাবিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া মণ্ট খুকুকে চিঠি লিখিলেন। খুকু পড়িতে জানে না, মণ্ট পড়িয়া শুনাইবে। মণ্টুর পড়িবার মতো শিশুহাতের লেখার অনুকরণে বড়ো বড়ো বাঁকা অক্ষরে লিখিলেন:

"তোমরা কেমন আছ, তোমাদের জন্যে আমার মন কেমন করছে, খুব মন কেমন করছে। তোমরা কবে আসবে। আমার সঙ্গে আড়ি নয়, ভাব, চিরকাল ভাব। চিঠি লিখো। ওপোরে ঠিকানা দিলুম। ইতি দুয়োরাণী।" চিঠির মাথায় নিজের নাম ও স্কুলের নাম লিখিলেন।

চিঠি ডাকে ফেলিয়া একটু শান্তি পাইলেন শ্রীমতী। একেবারে হারাইয়া যাওয়া রক্ষা হইল। চিঠি তো শুক সংবাদবহ মাত্র নয়, চিঠি যে দুই হৃদয়ের মধ্যে স্পর্শযোগ। এই চিঠির দ্বারা তিনি মণ্টু খুকুকে স্পর্শ করিলেন, উত্তর আসিলে তাহার মধ্যে উঁহাদের স্পর্শ পাইবেন, হাতের অক্ষরের মধ্যে তাহাদের দেখা পাইবেন। উত্তরের জন্য দিন গণিতে লাগিলেন শ্রীমতী।

উত্তর আসিল না। দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস গেল, মাসের পর মাস গেল। উত্তর আসিল না। সব আশা যাইবার পরও চিঠি লিখিয়া নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। এ আশা ভঙ্গ যেন পূর্বের অপেক্ষা দুঃসহ। এতদিনে দুয়োরানীর নির্বাসন সম্পূর্ণ হইল।

সময়ে সকল দুঃখ সহিয়া যায়। আসল পুত্রবিয়োগ সহে, এ তো নকল পুত্র-বিচ্ছেদ। তবে কাহারও কিছু শীঘ্র সহে, কাহারও বড়ো দেরিতে।

শরৎকাল আসিল। বিহারের আকাশে বাতাসেও তাহা অনুভব করা যায়। পূজার ছুটি এ দেশে বড়ো ছুটি নয়। কিন্তু শ্রীমতী দেশে যাইবেন। এক মাসের ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন। ছুটি মঞ্জুর হইবার আশা নাকি নাই। মাধবীদি বলিয়াছেন, এত অল্পকাল কাজ করিয়া এত দীর্ঘ ছুটি পাওনা হয় না।

শনিবার। স্কুলের ছুটির পর লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া বই পড়িতেছেন শ্রীমতী। শনি রবিবার বড়ো বেশী মন কেমন করে, বড়ো বেশী একা বোধ হয়। বাসায় যাইতে ইচ্ছা করে না। মার জন্য ছোট ভাইটির জন্য মন অস্থির হইয়াছে।

স্কুলের দাসী আসিয়া খবর দিল এক সাহেব আসিয়াছেন শ্রীমতীর সহিত দেখা করিতে। বাঙ্গালী সাহেব। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার সঙ্গে? ঠিক শুনেছিস?"

"হাঁ, দিদি, আপহিকা সাথ।"

কে আসিবে তাঁহার কাছে? এই বিদেশে তাঁহার সহিত দেখা করিবার মতো বাঙ্গালী সাহেব কে আছে? সংশয় ও বিস্ময় লইয়া শ্রীমতী প্রধান শিক্ষিকার ঘরের দিকে চলিলেন। দাসী বলিল—বড়দিদিমণির কামরায় নয়, ভিজিটর কামরায় বসিয়া আছেন সাহেব। শ্রীমতী আরও বিস্মিত হইলেন। শিক্ষিকাদের সহিত অপরিচিত কেহ দেখা করিতে আসিলে বিশেষতঃ তিনি পুরুষ হইলে, প্রধানার ঘরেই সাক্ষাৎ করার নিয়ম এবং তাঁহার সম্মুখে।

ভিজিটারস্ রুমে যে ভদ্রলোক বসিয়া আছেন তিনি যে সম্পূর্ণ অপরিচিত তাহাতে সন্দেহ নাই। মূল্যবান বিলাতী সাজে ও চেহারাতে সম্পদ ও সম্ভ্রম প্রকাশ পাইতেছে। মুখে বয়সের ছাপ লাগিয়াছে কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের নয়, পূর্ণত্বের। বোধ করি বয়স্ক ও ধনী ব্যক্তি দেখিয়া প্রধানা সরাসরি সাক্ষাতের অনুমতি দিয়াছেন। জানলা দিয়া দেখা যাইতেছে পথের উপর ঝকঝকে মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে।

শ্রীমতী ঘরে ঢুকিতে ভদ্রলোক উঠিয়া নমস্কার করি-

লেন। শ্রীমতী প্রতিনমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?"

ভদ্রলোক বলিলেন—"আজ্ঞে না, আমি শ্রীমতী বলে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

"আমারই নাম শ্রীমতী রায়।"

মাফ করবেন। তা হলে দেখছি এক নাম বলে গোলমাল হয়েছে। আমি যাকে চাইছি সে একটি ছোট মেয়ে, এখানে পড়ে বোধহয়।"

শ্রীমতী বলিলেন—"কিন্তু এস্কুলে ও নামে কোনও ছাত্রী তো নেই।"

"নেই? সে কী? সাত আট বছর, কি ন'দশ বছরও হতে পারে—"

"ঐ বয়সের মেয়ে তো অনেক আছে। কিন্তু ঐ নামের তো নেই। আচ্ছা, আপনি দেখলে চিনতে পারবেন? সোমবার আসবেন—"

"আজ্ঞে না, আমি চিনি না, কখনো দেখিনি তাকে।" বলিয়া ভদ্রলোক মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"আপনি খুব আশ্চর্য হচ্ছেন, হবারই কথা। জানি না চিনি না অথচ দেখা করতে এসেছি, তাও একটি ছোট মেয়ে। ব্যাপারটা এমন কিছু নয়। হয়েছে কী, মেয়েটি আমার ছেলে মেয়ের বন্ধু, তাদের সঙ্গে খেলা করতো।"

কালো আকাশে অকস্মাৎ বিদ্যুতের ঝিলিক উঠিয়া যেমন অন্ধকার ভেদ করিয়া আলো দেখা দেয়, তেমনি শ্রীমতীর চিত্তে একটা হঠাৎ আলোর চমক লাগিল। তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আপনি খুকু মণ্টুর বাবা? আপনিই মিষ্টার আর, সেন? ঐ বাগান বাড়ীতে ছিলেন?"

ভদ্রলোক বিস্মিত হইলেন। তাই উত্তর দিতে দুই এক মুহূর্ত দেরি হইল। সেই দুই এক মুহূর্ত শ্রীমতী দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনি খুকু মণ্টুকে চেনেন? বাঃ।"

এই সৌভাগ্য আশাতীত ও আকস্মিক। ইহার আনন্দের আঘাত সামলাইতে শ্রীমতী একটা চেয়ারের পিঠ শক্ত করিয়া ধরিয়া ফেলিলেন। ভদ্রলোক বলিলেন—"আপনার নাম শ্রীমতী রায়। আপনিই সেই চিঠি লিখেছিলেন?" কিন্তু—

শ্রীমতী ধীরে ধীরে বলিলেন—"হ্যাঁ আমিই ওদের সেই বন্ধু। ওদের সঙ্গে খেলা করতুম। ওদের বন্ধু বলে ঐ রকম ওদের মতন করে চিঠি লিখেছিলুম।"

আর সেন চুপ করিয়া আছেন। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওরা এসেছে আপনার সঙ্গে?"

সেন বলিলেন—"না।"

হঠাৎ উদ্বিগ্ন হইয়া শ্রীমতী বলিলেন—"ওরা ভালো আছে? খুকু মণ্টু ভালো আছে তো?"

শ্রীমতীর এই উদ্বিগ্ন প্রশ্ন ও কণ্ঠের ব্যাকুলতা সেনকে বিস্মিত করিল। তিনি বলিলেন—"হ্যাঁ ভালো আছে। আমি এখানকার বাড়ীটাতে জিনিস পত্র যা আছে পাঠাবার ব্যবস্থা করে বাড়ীটা ছেড়ে দিয়ে যেতে এসেছি। আজ রাত্রেই চলে যাবো।" শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শ্রীমতী বসিলেন। খুকু মণ্টু ভালো আছে, উদ্বেগের শান্তি। তাই নিশ্চিন্ত। তাহারা আর আসিবে না, আর তাহাদের সঙ্গে দেখা হইবে না, আশার শেষ। তাই নিশ্চিন্ত। আর তাঁহার কিছু বলিবার নাই।

সেন নিজেই বলিলেন—'আপনার চিঠি ওরা দেখেনি এখনও। ওরা আমার বাড়ীতে নেই। আমিও বাড়ী ছিলুম না, কলকাতায় ছিলুম না। দিন দুই হলো ফিরেছি। কাগজ পত্র যা জমে ছিল, সব দেখা হয়নি, ব্যাগে ভরে নিয়ে গাড়ীতে উঠেছিলুম। সকাল থেকে বাড়ীর ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত ছিলুম। সে সব একরকম সারবার পর ব্যাগের মধ্যে হঠাৎ আপনার চিঠিটা চোখে পড়লো। ভাবলুম ওদের বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আসি। ফিরে গিয়ে খুকু মণ্টুকে বলবো।"

শ্রীমতী নীরবে একটু ম্লান হাসিলেন। আর কি তাহাদের মনে আছে এই নির্বাসিতা দুয়োরানীটাকে? রূপকথার মতো মিথ্যা বনবাসিনী দুয়োরানীকে কি মনে আছে রাজপুত্র রাজকন্যার?

কী আশ্চর্য! সেন যেন শ্রীমতীর অনুক্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। বলিলেন—দুয়োরানী তা হলে আপনিই? সেবার যখন এসেছিলুম নিয়ে যেতে, তখন ওরা বলেছিল বনের মধ্যে আমাদের একটা দুয়োরানী আছে লুকিয়ে। খালি আমরা জানি, আর কেউ জানে না। আমি জানতুম সে ওদের বানানো দুয়োরানী। মণ্টুর কল্পনা শক্তি অত্যন্ত প্রখর। আর খুকু তো দাদার প্রতিধ্বনি। ওরা

বলে, চিলের পিঠে চড়ে চাঁদের সঙ্গে গল্প করে এলুম। ওরা পুকুরের মধ্যে মাছেদের বাড়ীতে বেড়াতে যায়। ওদের বনের মধ্যে দুয়োরানীও আমি সেই রকম ভেবেছিলুম। ওদের মাকে দেখেছেন তো? রোগ শয্যায় বন্দী হয়ে পড়ে ছিলেন—"

শ্রীমতী বলিলেন—একটু কুণ্ঠার সঙ্গেই বলিলেন—"না, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে আমার কোনদিন দেখা হয় নি। খুকু-মণ্টুর সঙ্গে আমার পরিচয় আপনাদের বাড়ীর সদর দরজা দিয়ে হয় নি।" একটু থামিয়া শ্রীমতী বলিলেন—"আমাকে ঘুঁটে কুড়োবার জন্যে পছন্দ করে ডেকেছিল খুকু।"

সকৌতুক কৌতুহলে সেন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কী রকম?"

শ্রীমতী সেই প্রথম দিনটির স্মৃতিতে ফিরিয়া গিয়াছেন, দেখিতেছেন বাগানের ধারে ফ্রকপরা মেয়েটি ডাকিতেছে, 'এই শোনো, শোনো না।' একটি ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া শ্রীমতী বলিলেন—

"সে অনেক কথা। সে কি আপনার শোনবার সময় হবে? যদি সময় হয়, যদি কোনও কাজের ক্ষতি না হয় তো বলি।"

"কিছু ক্ষতি হবে না, কোনও কাজই নেই আমার। বরং আমিই আপনাকে কাজ থেকে আটকে রেখেছি।"

"না, আমার কাজ হয়ে গেছে। এইবার যাবো।"

"বাসায় যাবেন তো? আমার সঙ্গে গাড়ী আছে। যদি আপত্তি না থাকে—"

"না, বাসায় যেতে ইচ্ছে করছে না। গাড়ীতে আপত্তি নেই। যেখানকার কথা সেখানে গিয়ে বলবো। চলুন।"

যে আনন্দের অমৃত কাহিনী কাহাকেও বলা যায় নাই, শুনিলে বুঝিবে এমন বন্ধু কেহ নাই বলিয়াই বলা যায় নাই, তাহা শুনিবার লোক পাওয়া গিয়াছে। শুনাইবার আগ্রহে শ্রীমতী উৎসুক হইয়া উঠিলেন। অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে একগাড়ীতে বেড়ানো যুবতী শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে শোভন কিনা, দেখিলে কে কী বলিবে, এ সব প্রশ্ন মনে উদয় হইল না। শুনিবার লোক তো অপেক্ষা করিবে না। এখন না বলিলে আর বলিবার সময় পাওয়া যাইবে না। মনে অন্য প্রশ্ন উদয় হইবার সময় ছিল না।

আবার সেই অরণ্য। অরণ্যের মধ্যে সেই কুটির। কুটিরের সম্মুখে সেই অঙ্গন। কুটিরের দাওয়াতে বসিয়া এক রাজপুত্র ও এক রাজকন্যা এবং তাহাদের এক নির্বাসিতা দুয়োরানী-মা'র গল্প বলিলেন শ্রীমতী। প্রথম দিনের খুকুর আহ্বান হইতে শেষ দিনের 'যেতে দেবো না, কিছুতেই যেতে দেবো না, অবধি সব বলিয়া গল্প শেষ করিলেন।

সেন নীরবে শুনিয়াছেন, এখনও নীরব আছেন। শ্রীমতীর আর কিছু বলিবার নাই। সেনের নীরবতায় এখন শ্রীমতীর মনে হইল অবোধ শিশুদের সহিত তিনি যে ছেলেমানুষি করিয়াছেন তাহা শুনিয়া কী জানি উনি কী ভাবিতেছেন। কত নির্বোধ নির্লজ্জ মনে করিতেছেন তাঁহাকে। পরিণতবয়স্ক অপরিচিত এই পুরুষটিকে সেই অবোধ ও অবোধ্য ছেলেমানুষির কাহিনী এমন বিশদ ভাবে বলা উচিত হয় নাই, শোভন হয় নাই।

বলিবার আগে এ কুণ্ঠা এ লজ্জা তো আসে নাই! বলিবার আগ্রহে উৎসুক ছিলেন, আনন্দ ও বেদনা একা ভোগ করা বা সহ্য করা সহজ নয়। যাহারা আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ তাহারাই পারে। তাহাদের সংখ্যা বিরল।

শ্রীমতী বলিলেন—"কী রকম ছেলেমানুষি বোকামি করেছি বুড়ো বয়েসে তাই শুনে আশ্চর্য হয়ে গেছেন, না?"

সেন কী ভাবিতেছিলেন, বলিলেন—"না। তাহলে আমার কথাও একটু বলতে হয়। মণ্টু খুকু সত্যিই রাজপুত্র রাজকন্যা। আমার ঠাকুরমা আদর করে আমার নাম রেখেছিলেন রাজ্যেশ্বর, তার থেকে ডাক নাম হলো রাজা। তবে ওদের কাছে আমি প্রধানতঃ রাক্ষস বা দৈত্য। রাজার সঙ্গে রাজপুত্রের যুদ্ধ বড়ো একটা হয় না কিনা। দৈত্য রাক্ষসের সঙ্গেই হয়। যে ক'দিন বাড়ী থাকি, সকাল বেলায় বিছানার রণক্ষেত্রে রাজপুত্র ও দৈত্যের গদাযুদ্ধ প্রতিদিনের ঘটনা। দৈত্যের প্রতিদিনই মৃত্যু হয়। বালিশগুলোরও মধ্যে মধ্যে হয়। মৃত্যুর পরও দৈত্যের নিস্তার নেই। মৃত দৈত্যের পিঠে কাঁধে উঠে রাজপুত্র রাজকন্যার দেশভ্রমণ হয় বিছানা জুড়ে।"

একটুক্ষণ থামিয়া রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"মনে হচ্ছে কি যে বুড়ো বয়সে এ কী ছেলে মানুষি?"

শ্রীমতী স্মিতমুখে মাথা নাড়িলেন। রাজ্যেশ্বর বলিলেন—

"ওদের হাওয়া লাগলে বয়সটা গাছের শুকনো পাতার মতো গা থেকে মন থেকে ঝরে পড়ে যায়। মণ্টু খুকুর আসল জীবন কল্পনার জগতে। আপনাকে পেয়ে ঐ তিনটে দিন ওরা সত্যিকার বেঁচে ছিল। কলকাতায় গিয়ে খুকুকে একদিন বলতে শুনলুম 'ভাল্ লাগছে না। মা'র কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। না রে দাদা?' মণ্টু বল্লে 'আজ রাত্তিরে, নিশুতি রাত্তিরে, বুঝলে খুকু, পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে দুজনে মা'র কাছে চলে যাবো'। তখন বুঝিনি যে আপনার কথা বলছে। মনে করেছিলুম -"

কথা শেষ না করিয়া থামিলেন রাজ্যেশ্বর। শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন— "কেন, ওরা কি মা'র কাছে ছিল না তখন?"

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"এখান থেকে গিয়ে ওদের মাকে নিয়ে ধরমপুর স্যানাটেরিয়ামে রেখেছিলুম, কাছাকাছি বাসা নিয়ে আমাকে থাকতে হয়েছিল। মণ্টু খুকুকে কলকাতায় আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলুম। এইবার বাড়ীতে নিয়ে আসবো।"

শ্রীমতী জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওদের মা কেমন আছেন?"

"তিনি নেই। ওরা এখনও জানে ওদের মা বেড়াতে গেছেন। মায়ের সঙ্গছাড়া ওরা চিরকাল। খুকু জন্মাবার পর তিনি শয্যা নিয়েছিলেন। ডাক্তারের বারণ তো ছিলই, তা ছাড়া রোগে ভুগে ভুগে বড়ো খিট্‌খিটে হয়ে গিয়েছিলেন, ছেলে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় ছিলই না। ধরমপুর থেকে ফিরে ওদের দেখতে গেলুম। খুকু বল্লে—'জানো বাবা, আমরা কাল সকালে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্যে মার কাছে চলে যাবো, না রে দাদা?' রাজ্যেশ্বর চুপ করিলেন।

আকাশে পক্ষীরাজের দেখা নাই। কয়েকটি চিল নিশ্চিন্ত নিশ্চেষ্ট সুখে ভাসিয়া যাইতেছে। রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"কী দেখছেন? পক্ষীরাজ আসছে কিনা?"

শ্রীমতী ছলছল চোখে বলিলেন—"হুঁ"।

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"মায়ের আদর না পাওয়াটাই ওদের অভ্যাস হয়ে গেছে। বাড়ীতে একটা পিসি মাসীও নেই। আপনার কাছে আদরের স্বাদ পেয়েছে, আপনার কোলে উঠে, আপনাকে জড়িয়ে ধরে আবার আদর চেয়েছে।"

শ্রীমতীর চোখের জল আর চোখে ধরিল না। কত সামান্য আদর করিয়াছেন, আরও বেশী কেন করেন নাই।

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"ওদের অবস্থা আমি বুঝতে পারি। আমারও মাকে মনে পড়ে না। কিন্তু আমার এক পিসিমা ছিলেন, নিঃসন্তান বিধবা। আমি মায়ের অভাব বুঝতে পারিনি। তাঁকে মা বলে ডাকতুম।"

যেকথা শ্রীমতীর মনে বারবার আসিল, সে কথা তিনি বারবার মনেই চাপিয়া রাখিলেন, মুখে আনিতে পারিলেন না। রাজ্যেশ্বর সেন বুড়া হন নাই, অর্থের অভাব নাই, তাঁহার ছেলে মেয়েকে মাতৃহীন করিয়া রাখিবার দরকার কী? এ কথা আত্মীয় বন্ধুরা বলিতে পারেন, বলিবেনও হয়তো। অপরিচিতা শ্রীমতী তাঁহার ছেলেমেয়ের দুয়োরানী মা হইয়া কেমন করিয়া সে কথা বলেন।

আর তো কোনও কথা নাই। রাজ্যেশ্বর হাতঘড়ি দেখিলেন। শ্রীমতী দেখিলেন গাছের ছায়া দীর্ঘ হইয়াছে, দুয়োরানীর কুটির অঙ্গনের আলো ম্লান হইয়া আসিয়াছে। দুয়োরানীর দিন শেষ হইল। এবার বিদায়।

সেই বনের প্রান্তের সেই ভাঙ্গা প্রাচীর অবধি আসিলেন রাজ্যেশ্বর শ্রীমতীকে বিদায় দিতে। বলিলেন—"যদি কখনও কলকাতায় আসেন, আমাদের বাড়ী আসবেন, খুকু মণ্টুর সঙ্গে দেখা করবেন। আসবেন তো? আমি ওদের বলবো আপনার কথা।"

শ্রীমতী বলিলেন—"না। কিছু বলবেন না। আমার যাবার কথা, আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কিছু বলবেন না।"

রাজ্যেশ্বর বিস্মিত হইলেন, বলিলেন—"বলবো না? আচ্ছা। নমস্কার।"

শ্রীমতী নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলেন। এমন কখনও ভুলেন না। আজ ভুলিলেন। চলিয়াও গেলেন না। সুতরাং রাজ্যেশ্বরও দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শ্রীমতী বলিলেন—"আপনি তখন বলছিলেন আপনার পিসিমার কথা। খুকু মণ্টুর একটা পিসি থাকলে তার কাছে ওদের রাখতেন?"

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"তিনি যদি ওদের ভালবাসতেন, আদর করে নিতেন, রাখতুম বই কি। স্নেহ আদর বিনাও

ছেলেরা মানুষ হয়, শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সবই হয়, কিন্তু একটা বড়ো অভাব জীবনে থেকে যায়। ওদের যদি তেমন পিসি মাসি একটা থাকতো!

শ্রীমতী আবার দুই মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"পিসির বাড়ী যদি পল্লীগ্রামে, গভীর পল্লীগ্রামে হোতো?"

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"গভীর পল্লীগ্রাম মানে বন জঙ্গল পুকুর নদী বাঁশঝাড় আমবাগান ধানের মাঠ—এই সব তো? সেই তো মণ্টু খুকুর জগত।"

শ্রীমতী বলিলেন—"পিসি যদি খুব গরীব হোতো?"

এবার রাজ্যেশ্বর এক মুহূর্ত্ত দেরি করিলেন উত্তর দিতে। একটা ছোট নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—"পিসিমার বাড়ীটা মনে পড়ছে। ওদের পিসি থাকলে, আমার পিসিমার মতো পিসি থাকলে, ওটা কোনও প্রশ্নই হতো না। আমার পিসিমাও বড়লোক ছিলেন না। আমি তাঁর বাড়ীতেই ছিলুম। পিসিমা নিজের হাতে গরুর জাব দিতেন, আমি বাছুর বাঁধতুম। ওটা প্রশ্নই নয়।"

শ্রীমতী আর প্রশ্ন করিলেন না। আর কিছু তাঁহার জানিবার নাই। বলিলেন—"আচ্ছা, আমি যাই।"

রাজ্যেশ্বর বলিলেন—"নমস্কার।"

শ্রীমতী এবারও প্রতিনমস্কার করিলেন না। হঠাৎ নীচু হইয়া রাজ্যেশ্বরের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিলেন। অতি বিস্ময়ে রাজ্যেশ্বর এই আকস্মিক প্রণাম এড়াইবার সময় পাইলেন না। প্রণাম সারিয়াই শ্রীমতী ফিরিয়া অতি দ্রুতপদে চলিতে সুরু করিলেন।

সোমবার সকালে শ্রীমতীর পদত্যাগপত্র পাইয়া প্রধান শিক্ষিকা বলিলেন—"আপনার ছুটি মঞ্জুর হতেও পারে, আমি বিশেষ করে বলেছি সেক্রেটারিকে।"

শ্রীমতী বলিলেন—"না, ছুটির জন্যে নয়। ছুটির দরকার নেই।"

মাধবীদি বলিলেন—"কলকাতায় কোনও স্কুলে কাজ পেয়েছিস বুঝি? কত দেবে? আমার জন্যেও একটু খবর নিস ভাই।"

শ্রীমতী বলিলেন—"কলকাতায় নয়, দেশেই থাকবো। আমাদের গাঁয়েই একটা পাঠশালা আছে।"

মাধবীদি বিশ্বাস করিলেন না।

সমাপ্ত

কাব্য চর্চ্চা

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

চারদিকে তো অভাব খালি,—দেশের কপাল মন্দ,
সরস্বতীর ভাঙা হাটে ভাবের দোকান বন্ধ!
হাজার খুঁজে মিল মিলেনা
যায়না কোথাও ছন্দ কেনা,
সুর, তান, লয় কারো সাথে নাই কারো সম্বন্ধ।

সস্তা দামে নাম কিনিতে এই সুযোগে আমরা
ধাপ্পা মেরে দখল ক'রে একটা তাহার কামরা
যাই ক'রে এক কোণে তারি
ভেজাল মালের দোকানদারি
দুধের দামে ঘোল বেঁচে যাই, আমের নামে আমড়া।

পদ্যও নয়, গদ্যও নয়, যখন চাহে প্রাণ যা,'
তাই লিখিয়ে, লই ভিজিয়ে শান্তিরামের গাজা।

কাব্য কোথায়? সব তো খালি
বাজে কথার জোড়াতালি;
বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাসের শ্রাদ্ধ অভিযান যাঃ!

পাঠকেরা কেউ বলে—"ছি,—এই কি আবার পদ্য;
বামন হ'য়ে চাঁদ পেতে সাধ প্রগল্‌ভতার হদ্দ!"
নূতন যুগের সুযোগ প্রিয়
কেউ বলে,—"বেশ, মন্দ কি ও?
নূতন চলুক, হোক বা না হোক অর্থ কারো বোধ্য।

সরস্বতী নাই সদরে; এখন তিনি চেইঞ্জে
হয়তো আছেন ওয়ালটেয়ার, নয় হিমালয় রেঞ্জ-এ।
তা' নাহলে কমল বনে
বসে বসে ক্ষুণ্ণ মনে
কপালে কর হেনে তিনি কতই কাঁদিতেন যে!

রোগও মনের কথা শোনে—

বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়

শরীর আর মন ওরা হল এক কথায় যাকে বলা যেতে পারে যমজ ভাই। একে অন্যের সর্বক্ষেত্রে সংবেদনশীল। তাই বিজ্ঞান মতে মানসিক পরিস্থিতি দ্বারা দেহ এবং দৈহিক পরিস্থিতির দ্বারা মন প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে। ঠিক তাই দেখা যায় যদি কেউ কোন টক্ জাতীয় বস্তু বা ঐ রূপ কোন জাতীয় বস্তু খাবার কথা চিন্তা করেন কিংবা খেতে দেখেন মুখে তখন আপনাহতেই জল মানে সেলাইভা নিঃসরণ হতে থাকে। ঠিক তেমনি কোন অস্বাভাবিক বস্তু দর্শন যা হয়তো আপনার আমার স্বভাববিরুদ্ধ—তেমন জিনিষ দেখলে বা স্পর্শ করলে অনেক সময় আপনা-থেকেই শরীরের ভেতরের বিভিন্ন কলকব্জার মধ্যে বিশেষ করে হজমের যন্ত্র এবং সেন্সারী নার্ভ গুলিতে বিধর্ম্মী ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়ে দেহ ও মনে নানারকম বিভ্রান্তিও ঘটতে পারে। সুতরাং এ কথাই স্বীকার্য্য যে এই মন আর দেহ এই দু'এর মধ্যে কত নিবিড় আত্মীয়তা। আসল কথা 'কারো ছাড়া কারো নাহি চলে।'

ব্যায়ামবীর যাঁরা বা ব্যায়ামাচারী যাঁরা—তাঁরা যেন শরীরচর্চ্চার সাথে সাথে মনের বিভিন্ন চর্চ্চা থেকে কখনো বঞ্চিত না হন। এই অনুরোধ করার যথার্থ উদ্দেশ্য হল—ব্যায়ামচর্চ্চাকারীগণ যেন একটি গোটা মানুষ বলে পরিচিত হন—কারণ মন চর্চ্চা থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে শুধু মাত্র শরীর চর্চ্চা দ্বারা এই মহাজীবনের চরম সার্থকতা কোন ক্ষেত্রেই লাভ করা সম্ভবপর হয় না।

আমরা বলি বা আমরা সবাই জানি যে শরীর চর্চ্চা করলে দেহ রোগ মুক্ত হয়,—অবশ্য কথাটা আমি একেবারে উড়িয়ে দিতে যদিচ পারি না—কিন্তু কেন রোগমুক্ত হয়? হয় মনের প্রতি অজ্ঞাতসারে বিশ্বাস স্থাপন করা হয় বলে। সে ক্ষেত্রে যদি মনের প্রভাব কোন কারণে বিতাড়িত হয়ে যায়—একমাত্র ঐ দৈহিক ব্যায়াম চর্চ্চা রোগকে কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলে যে রোগ বলতে আমরা যা বুঝি তার শতকরা বেশীর ভাগ রোগই মনের দ্বারা প্রভাবিত।—তার যথার্থ প্রমাণ স্বরূপ বলা যেতে পারে—

মনের গণ্ডগোল থেকে কত রকম রোগ আসে :—

সাধারণ বা অসাধারণ ভয় ভ্রান্তি থেকে :—যেমন
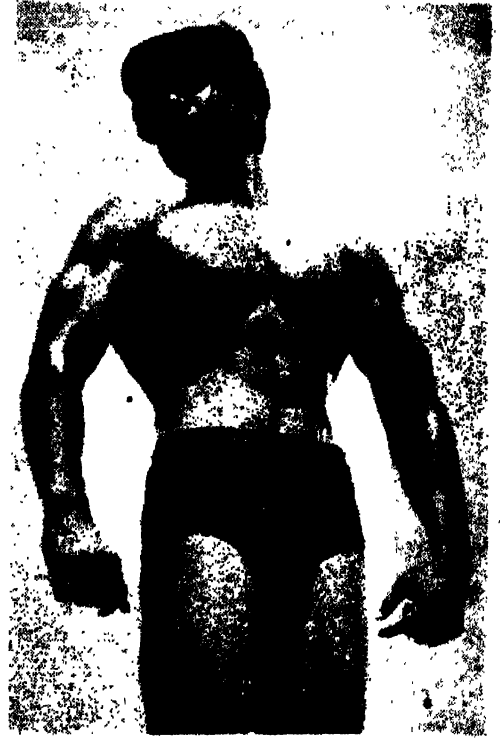
মলয় রায় (বয়স—১৪) অরবিন্দশ্রী শ্রেষ্ঠ দেহী
(বিশ্বশ্রী মনতোষ রায়ের পুত্র)

ধরুন বসন্ত, কলেরা রোগ। এসব কারণে ভয় থেকেও আপন দেহে ঐ জাতীয় রোগের বীজাণু মনোবিজ্ঞান মতে সংক্রামিত হতে পারে। খোস, পাঁচড়া, দাদ ইত্যাদি যুক্ত লোকের গা কিম্বা তাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুঁতখুঁতে

মন নিয়ে বা ভয়ে ভয়ে স্পর্শ করলে দেখা যায় অনেক সময় নিজের মধ্যে ঐ জাতীয় রোগের উপসর্গ।

হৃদরোগের ব্যাপারেও প্রায় তাই—। এই হৃদরোগের উপসর্গগুলি হঠাৎ কারো মধ্যে যখন প্রকট হয়ে দেখা দেয়—কোন একজন সুস্থ মানুষও অবচেতন ভাবে ভেবে বসেন তাই তো ঠিক্ অমন ধরণের উপসর্গতো আমাতেও প্রকাশ পাচ্ছে? এই যে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ভাব তার ফলেও দেখা যায় অকারণে একজন সুস্থ মানুষ হৃদরোগকে ডেকে নিয়ে আসেন।

শুনে অবাক হয়তো হবেন, এমন অনেক দৈহিক শক্তিমান মানুষ আছেন—যারা বেশ নিয়মিতভাবে ব্যায়াম চর্চা করে শরীরটাকে মজবুত করেছেন তারাও অনেক সময় নানারকম বই পুস্তকে বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন রকম বিবরণ পড়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, আর ভাবেন তাইতো মাঝে মাঝে এসব লক্ষণ তো আমার মধ্যেও বিরাজ করে? তাহলে কি হবে? শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যদিও যে সব রোগ কুল কিনারায় ছিল না ক্রমশ তা নূতন অতিথির বেশে আগমন করতে থাকে। বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় যৌন সংক্রান্ত বিষয়ে—। ঐ জাতীয় বইপুস্তক পড়ে অসুস্থ মনের পরিচয় স্বরূপ উদ্ভট কৌতূহল বশতঃ যৌন-প্রকৃতির বিভিন্ন দিক পরীক্ষামূলক ভাবে অনুষ্ঠান ও প্রয়োগ করার ফলে—শুক্রতারল্য এবং এমন কি যৌন-ব্যাধির সূচনা দেখা দিয়ে কত কি আশা ভরসাকে পঙ্গু করে দিয়ে যায়।

ভয়:—এই ভয় বড্ডো মারাত্মক ব্যাপার। এতে অনেক সময় মৃত্যুর সাথে পরিচয় হতে পারে। শরীরের জোর ভয়কে দূরে রাখতে পারে না, স্বাস্থ্যবান হলেই যে সে ভয়কে জয় করতে পেরেছে তেমন কোন কথা নেই, ভয়কে দূর করতে পারা যায় একমাত্র মনের জোর দ্বারা।

ছোট একটা গল্প শুনবেন?—বিরাট একটা মনো-বিজ্ঞানের পরীক্ষা। এই পরীক্ষাকাজ চালান হবে একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান ব্যায়ামবীরের ওপর দিয়ে—। একজন ডাক্তার মতলব পাকালেন। ১নং ডাক্তার হঠাৎ সেই ব্যায়ামবীরকে বললেন রাস্তায় দেখা হতে—কি হে তোমার হঠাৎ কাশি কেন?—ব্যাপারটাতো ভাল নয়, তুমি অমুক ডাক্তারকে একবার দেখিয়ে নিও।—আতঙ্কিত মন নিয়ে গেল। ডাক্তার বললেন—X-Ray করতে হবে, X-Ray হল। আসলে দোষ কিছুই নেই—অথচ তাকে দোষ আছে জানানো হল। একবার রক্ত পরীক্ষা করতে হবে তুমি অমুক ডাক্তারের কাছ যাও। মনের ভেতর প্রতিক্রিয়া সুরু হল, আসলে অশান্তির ফলে গা মেজ-মেজ সুরুকে জ্বরের আখ্যা দেওয়া হল, রক্ত পরীক্ষা হল, দোষ নেই। এক্ষেত্রেও দোষ আছে জানানো হল, চিকিৎসকের নির্দেশ গেল খাদ্য বিশ্রাম ইত্যাদি। জ্বর সত্যই ছদিন পর এসে গেল। কাসি নিয়মিত সুরু হল। পুনরায় ক্রমিক ভাবে সব পরীক্ষা হল—এবার ডাক্তাররা সবতাতেই যক্ষা রোগের বীজাণু পেলেন এবং সত্যিকারের চিকিৎসা সুরু করলেন যাতে ওকে বাঁচানো যায়—, দুর্ভাগ্য ওকে শত চেষ্টা করেও আর বাঁচানো গেল না, কারণ মন তার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছিল—অসুধের কোন ক্রিয়াই হল না। এমনও হয়।

এক ভদ্রলোক পায়খানায় বসে দেখতে পেলেন একটা ইঁদুর আশে পাশে ঘোরা ফেরা কচ্ছিল, এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না যখন—তখন নিশ্চয়ই তার গুহ্যদ্বার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। এ নিয়ে মহাপ্রলাপ, দেখা দিল মানসিক ব্যাধি। বহুভাবে চিকিৎসিত হয়েও কোন ফল যখন হল না, তখন এক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার বললেন ভাল করে দেখেই আমি। ডাক্তার তার গুহ্য-দ্বার থেকে ঠিক ইঁদুর বের করে দিলেন, এক নিমেষে তার সমস্ত রকম আবল্য অবসাদ দূর হয়ে গেল। আসলে ডাক্তার চিকিৎসা করা কালীন একটি ইঁদুর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং সেটাই কৌশলে তাকে দেখান হয়েছিল। (Principle & Pratice of Naturo-pathy of E, W. Cardinphy)

বিশ্বাস:—এবার শুনুন কি অদ্ভুত বস্তু। হৃদয়ে প্রকৃত বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলে নানারোগে অসম্ভব উপকার পাওয়া যায়। অসুস্থ ভাবনা-চিন্তা এবং কাতরতা যেমন বিভিন্ন রোগকে আমন্ত্রণ করতে পারে—তেমনি সুস্থ ভাবনা-চিন্তা এবং হৃদয় থেকে মঙ্গল কামনা নানারকম রোগকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, প্রমাণ স্বরূপ এখানে সিষ্টার নিবেদিতার কথা স্মরণ করা যেতে পারে। যখন দেশে প্লেগের মহামারী লেগে গেল—লোক জনের

ভয়ে-আতঙ্কে জবু থবু হয়ে যাবার মত। এগিয়ে এসে-ছিলেন সেই সিষ্টার নিবেদিতা। মানুষের মনের ভয়-ত্রাসকে বিদূরিত করার মানসে সিষ্টার নিবেদিতা আত্ম-বিশ্বাসে নির্ভর হয়ে এবং আরও কিছুসংখ্যক মানুষকে বাক্য দ্বারা বিশ্বাসের মর্য্যাদা উপলব্ধি করিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সেই প্লেগ মহামারীর বুকে। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কি প্লেগাক্রান্ত হয়েছিলেন—না মরে গিয়ে-ছিলেন? মরেননি একজনও। ঈশ্বরের পুত্র যিশু, ভগবান বুদ্ধ এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তের জীবন-আলেখ্যে ঠিক এ জাতীয় দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কাজে কাজেই যেখানে আত্মপ্রত্যয় আছে সেখানে মৃত্যু ভাবনার কাতরতা আসে না—রোগ বীজাণুও সহসা শরীরে প্রবেশ করতে পারে না। এই জিনিষ মনোবিজ্ঞান দিয়ে বিচার করলে তার যথার্থ সত্যটুকু সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়, তাছাড়া ধরুন দেহবিজ্ঞানের দিক দিয়েও যদি বিচার করা যায় তাহলেও এই সত্যই প্রমাণিত হয় যে, রোগ দেহস্থিত কর্ম্মময় যন্ত্রের এক অকর্ম্মণ্যতার প্রত্যক্ষ পরিচয়। আবার সেই অকর্মণ্য যন্ত্র বিশ্বাস প্রতিষ্ঠার প্রভাবে এবং স্পর্শের আকর্ষণে সহসাই উজ্জীবিত হয়ে কর্ম্মতৎপরতা লাভ করে রোগ দোষ নাশ করতে পারে।

আচ্ছা বলুন তো সত্য কিনা? অনেক সময় সুড়সুড়ী দেবার মতলব পাকালেও অনেকের হাসির উদ্রেক হয় কিনা? বা পায়ের তলায় সুড়সুড়ী দিলে সারা পা'টা কেঁপে ওঠে কিনা? এখানে দেহাভ্যন্তরীয় স্নায়ুর দর্শনও স্পর্শন চাঞ্চল্যের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি দেখুন যখন একটি শিশুকে ঘুম পাড়াবো এই মনোভাব যদি সুষ্ঠুভাবে রাখা যায়—কোলে তুলে ঘুম পাড়াবার কায়দা কানুন সব প্রয়োগ তখন সুস্থ ভাবেই দেখা দেয় এবং শিশুও ঘুমিয়ে পড়ে।—কিন্তু সেখানে যদি আপনার মন অস্থির বা বিরক্তির ভাব পোষণ করতো—শিশুর মনেও তা প্রতিফলিত হতো। ঘুম পাড়াবার অন্যান্য কৌশলগুলিও যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারতেন না। এটা ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান (applied psycho-logy)। যাই হোক এমনি ভাবেই অবচেতন মনে বিশ্বাসের বাঁধ দৃঢ় করিয়ে নানারকম রোগ মুক্ত করা যায়। বিজ্ঞান যখন এই মনোবিজ্ঞানের শ্রেণী-বিভাগ করার মানস কোরলেন, তখন তার প্রথম পদ্ধতিকে নাম দেওয়া হল "Suggestion" বা "ভাবনা"। এই Suggestion অনুষ্ঠানের প্রয়োগ কৌশল জানতে হলে এই মনো-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বেশ কিছু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক—যার দ্বারা রোগী নিজের রোগকে ভুলে গিয়ে ভয়-ত্রাসকে দূরে ঠেলে রাখতে পারেন।

আসলে ভাবনা-তথা Suggestion কাকে বলে? এই বিদ্যাটি জানতে হলে আসলে জ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মনোমুগ্ধকর ভাবনা যুক্তি দিয়ে অপরের মনের ভিতর নির্দিষ্ট

মিঃ ইণ্ডিয়া—বিশ্বনাথ দত্ত
(শ্রীমনোতোষ রায়ের ছাত্র)

ভুল ভ্রান্তিকে কৌশলে দূর করে বিশ্বাস উৎপন্ন করা এবং ঐ বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির দেহে ও মনে স্নায়ুতন্ত্র মধ্যে এক অপূর্ব্ব আন্দোলন সুরু হতে থাকে আর ঐ আন্দোলনই নির্দ্দিষ্ট রোগ মুক্তির ঈশারা।

এছাড়া আরও একটি অদ্ভুত পদ্ধতি আছে। সে পদ্ধতিটি বেশ স্বতন্ত্র ধরণের। ধরুন এমনও তো হতে পারে—বিশেষ কোন কারণে বা কৌশল প্রয়োগের ত্রুটীর জন্য কোন মনোবিজ্ঞানীর বাক্য প্রয়োগ কৌশল কোন

যতেষ্ট রোগীর মনোমত হচ্ছে না। অথচ সেই রোগীর ভাল হবার আশা অতি প্রবল। নানা ধরণের ডাক্তার বৈদ্য সব শেষ। কিন্তু তা বলে কি সেই রোগীর জীবনের প্রয়োজন সংসার থেকে ফুরিয়ে গেছে এটাই ধরে নিতে হবে? না, তা নয়। আছে আরও একটা পথ। সেই পথ ও পদ্ধতির নাম হল Auto-Suggestion. Suggestion যেমন কথার যাদুতে সম্মোহিত হয়ে কাজ করতো Auto-Suggestion-এর ব্যবহার পদ্ধতি কিন্তু একেবারে অন্য ধরণের।

Auto-suggestion (স্বকল্প ভাবনা):—তখন নিজেই নিজের সুস্থ ভাবনা মনে প্রাণে গ্রহণ করে ব্যাধি আরোগ্যের আপ্রাণ চেষ্টা করে থাকে। কারণ সাধারণতঃ মানুষের ধারণা এবং চিন্তা বিশেষ কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তরিত হয়ে থাকে। অতএব কোন ভাবনা এবং ধারণাকে অবচেতন মনে পৌছে দিতে পারলেই দেখবেন আপনার অজ্ঞাতসারে আপনার মনের ওপর এমন কি দেহের ওপর তার প্রয়োজন অনুসারে কাজ এগিয়ে চলেছে।

প্রমাণ ও প্রতিকার—যেমন ধরুন কিছুতেই সকালে ঘুম থেকে উঠতে পাচ্ছেন না। অথচ কাল খুব সকালে একটা বিশেষ দরকারে ঘুম থেকে উঠতেই হবে—এক্ষেত্রে আপনি যদি রাত্রে ঘুমাবার আগে বিছানার ওপর বজ্রাসনে বা পদ্মাসনে বসে চোখ বন্ধ করে একাগ্র মনে বেশ কয়েকবার—ধরুন ২।৩।৫ মিঃ জপ করেন কিম্বা আবৃত্তি করেন যে কাল সকালে আমায় খুব ভোরে উঠতেই হবে—হবে—হবে। দেখবেন সত্যি সত্যিই সকাল বেলা ঘুম ভেঙে যাবে। সঙ্কল্প যখন প্রাণ মন থেকে নেমে আসে তা সত্যে পরিণত হবেই হবে। যেমন ধরুন ভয়ের চিন্তা—এই চিন্তা অবচেতন মনে পৌছে গিয়ে অনেক সময় সত্যরূপ ধারণ করে এক কেলেঙ্কারীর সৃষ্টিও করে থাকে। Thoughts become realities এমনি করে আমাদের অবচেতন মনে সুস্থ এবং অসুস্থ ভাব বা ধারণা মনের মধ্যে বাসা বেঁধে যেমন নানা রোগ ভালও হতে পারে—আবার তেমনি নানা রকম রোগের আবির্ভাবও হতে পারে। এই কঠিন ভয়ের ওপরই স্বকল্প ধারণা বা ভাবনা সুপ্রতিষ্ঠিত।

আত্ম প্রত্যয়—অসুধ পত্র খান কেন? রোগ সারাবার জন্য তো? কিন্তু চিন্তা করুন তো সবক্ষেত্রে কি অসুধে রোগারোগ্য হয়? হয় না। এমনও হয়—ডাক্তার রোগীর কোন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে অসুধের বদলে রং জল, ইনজেকসানের বদলে গ্লুকোজ ওয়াটার ব্যবহার করেন, তাতেই কিন্তু রুগী দিব্যি ভাল হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও মনোবিজ্ঞানের এক বিশেষ যুক্তি রয়েছে। রুগী কিন্তু অসুধ ভেবেই গ্রহণ করেছেন এবং তাই নির্দিষ্ট রোগের যথার্থ উপশম পেয়েছেন—এখানে একটা বিশেষ যুক্তি নিহিত ছিল সেটা হল প্রথমত ডাক্তারের নিজের আত্মবিশ্বাস—দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারের প্রতি রোগীর শ্রদ্ধা—যেহেতু তার সুনাম আছে যেকোন ভাবেই হোক—তৃতীয়তঃ তাঁর বাচনভঙ্গিতে দৃঢ়তা—আর সাজপোষাকেও কিছুটা নির্ভর করে। এই প্রকৃতিগুলি রোগীর মনে ভীষণভাবে রেখাপাত করে। আসলে অসুধ পত্র স্বকল্প ভাবনার এক রকম বাহক বলা যেতে পারে। দৈব, টোট্‌কা বা স্বপ্ন প্রদত্ত নানা রকম গাছ-গাছড়া এবং বিশেষ দ্রব্যসম্ভার ইত্যাদির মধ্যে প্রাচীন শাস্ত্রীয় ভিত্তি ও আয়ুর্বেদীয় গুণ সন্নিবেশিত থাকলেও আসলে আত্ম বিশ্বাস ও ভক্তির জোরে রোগী তার রোগ মুক্তি লাভে সহায়তা লাভ করে থাকেন। সেক্ষেত্রে রোগী যদি তার একমাত্র রোগটাকেই প্রাধান্য দিয়ে অহরহ চিন্তা করেন—বলে দিচ্ছি কিছুতেই তার সহসা ফল পাবার সম্ভবনা নেই। আরও ফেসাদ হয় —রোগীর সামনে বসে অপর কোন ব্যক্তিরা যদি সহানুভূতিশীল হয়ে দুঃখ প্রকাশ করতে থাকেন অতীত বর্ত্তমান প্রমাণাদির সূত্র ধরে। মনে রাখুন তেমন সর্বনেশে লোকদের রোগীর ত্রিসীমানায় কদাচ থাকতে দিতে নেই। তার কারণ রোগী ভয় পেলে তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ক্রমশঃ কিন্তু হারাতে অনেক—যাতে সময় আরোগ্যের বাইরে চলে যায়—ঠিক্ যেমন তুচ্ছ মনে করতে পারলে শত করা ৯০ ভাগ রোগী নিজেকে হালকা মনে করতে পারেন। আমাদের এই দেহের মধ্যে অবচেতন মনই সমস্ত শক্তির মাধ্যম।

অবচেতন মনঃশক্তির প্রভাব!—অবচেতন মন দেহের অগণিত স্নায়ু তন্ত্র ইত্যাদির ভেতর দিয়ে দেহের অপরাপর যন্ত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এই যে আমাদের নিদ্রা

নৈমিত্তিক যন্ত্রের ক্রিয়া অনবরত রক্ত চলাচল এবং আরও সব যন্ত্রের নিয়মিত পরিচালনা—এ সবকিছুই অবচেতন মনের দ্বারা স্নায়ু প্রভৃতির সাহায্যেই নিত্য অনুষ্ঠিত হয়ে এসেছে প্রকৃতির বিধানমত। যখন স্বকল্প ভাবনা চিন্তা বা ধারণার দ্বারা যে কোন সুস্থ চিন্তা অবচেতন মনে স্থির করা যায় তখনও কিন্তু ঠিক একই নিয়মের অধীনে থেকে কাজ হয়েই চলে। আমার মনে হয় এর আর কোন বিকল্প সুস্থ যুক্তি নেই। Mr. C. Harry Brooks তার "the Practice of mutto-suggestion" বইএ একথাগুলি যথার্থই স্বীকার করেছেন।

স্বকল্প ভাবনার মন্ত্র :—রোগ যখন এলো—"আমি ভাল হয়ে উঠবোই—কারণ প্রকৃতির প্রদত্ত শাস্তিরূপী রোগের যথাযথ আইন-কানুন মেনে চলবোই। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার শরীরে লুপ্ত বল ফিরে আসবে, ফের আমি সমস্ত আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে পারব। নিশ্চয়ই আমি আমার জ্ঞানের অজ্ঞাতসারে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেহের প্রতি অবিচার করেছিলাম তাই এই পরিণতি—আর কখনো অমন করবো না।" এই ভাবনা মনে প্রাণে জপ করতে পারলে রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবেই।

রোগ যখন ভাল হতে সুরু করলো—"আমি এখন পূর্ব্বাপেক্ষ বেশ ভাল বোধ কচ্ছি। এই শান্তি আমার শরীরে দীর্ঘ দিন স্থায়ী হবে।" একথাগুলি কখনো কখনো মনেমনে আবার কখনো বা উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতে হবে, সুতরাং এ পদ্ধতিটি রাত্রে শোবার সময় এবং সকালে বিছানা থেকে উঠবার সময় এ জাতীয় স্বকল্প ভাবনা করা খুব ভাল। কারণ ঐ দু'টি সময় মনটা প্রায় সবদিকদিয়েই শূন্য থাকে—অথবা শূন্য করে নিতে হয় চোখ বন্ধ করে আপন চেষ্টার দ্বারা। Mr, Arnold, m, D, "Defec-tive memory and their treatment"—বইএ এক জায়গায় বলেছেন—

"স্বকল্প-ভাবনা যখন গ্রহণ কোরবেন তখন আপনার শরীরকে সম্পূর্ণ ভাবে শিথিল করে (Relax) করে দেবেন কারণ তাতে অবচেতন মনের প্রকৃতিগত ক্ষমতা লাভে সহায়তা করবে। অভ্যাসযোগ দ্বারা যখন আরও অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন আর আপনাকে চোখ বন্ধ করে মনঃসংযম আনবার প্রয়োজন হবে না" Mr, charles-Bandeum—তাঁর suggestion and Muti'suggestion বইএ এই কথা বলেছেন যে এই চিন্তা ট্রামে-বাসে-মাঠে-ময়দানেই শুধু নয় কোন মানুষের সঙ্গে কথা কইতে কইতেও সম্ভব করা যায়। ইনি আরও বলেছেন অবচেতন মনে ভাবনা প্রেরণের সময় ভুলেও কখনো রোগ সম্বন্ধে চিন্তা করতে নেই,—ভাবতে হবে সাময়িক এই দুর্ব্বলতা বা রোগ নিশ্চয়ই কেটে যাবে। রোগের ইতিহাস ত্রাস মনে চিন্তা করলে রোগারোগ্য অন্তরায় হয়ে

শ্রীশঙ্কর সাহা (ভারতের মিঃ মাসালম্যানের রানার্স-আপ—শ্রীমনোতোষ রায়ের ছাত্র)

দাঁড়ায়। স্বকল্প ভাবনা দ্বারা যে ধরণের সুস্থ অবস্থা লাভ করার ইচ্ছা প্রাণে জাগে সেই অবস্থার সঙ্কল্প লইতে হইবে। মনে রাখবেন নিয়মানুবর্ত্তিতা এবং অধ্যবসায় (Regularity and persistance) স্বকল্প ভাবনার একমাত্র প্রাণ। স্বকল্প ভাবনা গ্রহণ করা কালে ইচ্ছা-শক্তির প্রয়োগকৌশল আপাততঃ বন্ধ রাখুন—কারণ স্বকল্প ও ইচ্ছাশক্তি সমগোষ্ঠির নয় তাদের আলাদা প্রয়োগ বিধি। তাই ইংরেজিতে বলে the greatest enemy of auto suggestion is effort,

প্রমাণ :—ধরুন আপনার কোন একটা জটিল সমস্যার সমাধান কিছুতেই হচ্ছে না,—তখন আর ওটা নিয়ে আপনি যতই মাথা ঘামান না কেন, বরং তাতে সমস্যা আরও জটিলতর হয়ে দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্র যদি আপনি ঐ সমস্যাটিকে স্মরণ করে আপাততঃ সটান শুয়ে বা একটু ঘুমিয়ে নিতে পারেন, দেখবেন সমাধানের সূত্র আপনার স্মৃতির গোচরে এসে গেছে।

ইচ্ছাশক্তি (will Force) যে সর্বশক্তিমান একথা অনস্বীকার্য্য, তবে এই স্বকল্প ভাবনা ইচ্ছা শক্তির যথার্থ স্থান নয়, কারণ সচেতন মনকে ঘুম পাড়িয়ে অবচেতন মনকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। আর তাইতো তন্দ্রাতুর অবস্থায় এই জাতীয় ভাবনা চিন্তা অধিক ফলপ্রদ। এটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে ভাবনা করতে হয়। confidence is half the cure,

সচরাচর কি কি মারাত্মক রোগ আরোগ্য হতে পারে? মোটামুটি ভাবে বলা যেতে পারে স্নায়বিক দুর্বলতা (Neurasthenia) অনিদ্রা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আক্ষেপ (Spasm) মূত্রধারণের অক্ষমতা, হিষ্টিরিয়া, মৃগী, স্মরণশক্তি হীনতা, হাপানী, শুক্রধারণ ক্ষমতা ইত্যাদি আরও অনেক রোগ এই স্বকল্প ভাবনা দিয়ে ভাল ভাবে চিকিৎসা করা যায় ও আরোগ্য করা যায়।

চিকিৎসা পদ্ধতি

অনিদ্রা :—চিৎ হয়ে শোবার আগে "গোমুখাসন" অভ্যাস করে দেহকে শিথিল করে দিন, এবারে জোরে বা আস্তে আবৃত্তি করুন—"ঘুম আমার আসছে, দেহটি ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসছে—এখনিই ঘুমিয়ে পড়বো, এবার বাঁ কাৎ হয়ে ঐ কথা চিন্তা করুন—তার পর ডান কাৎ হয়ে—দেখবেন ঠিক ঘুমে দু'চোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

হিষ্টিরিয়া :—অনেক সময় আমরা ঘাবড়ে যাই,—বুঝি এবারই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। এ-রোগ থেকে রেহাই পাওয়াটা খুব একটা কঠিন কাজ নয়, বলুন "আজ থেকে আমার মনের শক্তির নতুন করে ধরা দেবো। হিষ্টিরিয়ার উপসর্গ সুরু হবার আগেই আমি টের পাবো তখনই আক্রমণ থেমে যাবে। ঐ আক্রমণের উপক্রম হলেই ভাবতে হবে "জ্ঞান আমার অব্যাহত থাকবেই। আমি ক্রমশঃ শান্ত হয়ে যাচ্ছি, আমার আত্মবল জেগে গেছে আর আমার কোন ভয় নেই"—মোটামুটি এই কথাগুলি আবৃত্তি করতে হবে বেশ খানিকক্ষণ আমি বিশ্বাস করি। এতে নিশ্চয়ই উপকার হবে, আর নিয়মিত শশঙ্গাসন ঘসুগ্রাসন এবং অর্দ্ধমৎস্যেন্দ্রাসন অভ্যাসে খুব উপকার হবে।

স্নায়ুবিক দুর্বলতা রোগে (neurasthenia) :—এ জাতীয় রোগ মারাত্মক না হলেও মনের দুর্বলতায় শেষ পর্য্যন্ত সত্যিই মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। অশান্তির দ্বারা মানসিক অবসাদ মানুষের একটা স্বাভাবিক ধর্ম। কারণ হয়তো এমন বিশেষ কিছু একটা জটিল নয় তবুও মনের যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা। বাইরে থেকে লোকে বুঝতে অনেক সময় ঠিক পারে না—আর যার হয় তাও যে তার ইচ্ছাধীন সেটাও সত্য নয়। আপনা থেকেই একটা সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। তাতে কেউ বা কেঁদে শান্তি পান, কেউ বা নীরবে অন্যমনস্ক হয়ে নিষ্প্রাণের মতন পুতুল হয়ে থাকতে ভালবাসেন, আবার কেউ বা স্নায়ুর উত্তেজনায় মানসিক বিকৃতির ইঙ্গিত স্বরূপ মারধর—জিনিষপত্র ভেঙ্গে তচনচ্ করে ঐ উত্তেজনা বন্ধ করতে চান, তা কিন্তু তখন মনের সুপ্রবৃত্তির গোপন ইঙ্গিতেই সম্ভাব্য করার চেষ্টা চলে। তবে মনের এই স্নায়ুবিক উত্তেজনার ভাবটা ২।৫ দিন থাকে, তার পর আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে যাবার কথা, কিন্তু ঘন ঘন এ জাতীয় আঘাতের ফলে স্নায়ুমণ্ডলী ভীষণ কমজোরী হয়ে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ হয়ে পড়েন। তখনকার অবস্থা অতি চিন্তনীয়। এমন কি মৃত্যু চিন্তাও তার কাছে অতি আরামপ্রদ মনে হতে থাকে। তবে এ জিনিষ প্রাথমিক অবস্থা থেকেই প্রশমিত করা যেতে পারে তার ২।১টি পদ্ধতি বলছি। ঐ রকম অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা আসামাত্র চোখ বুজে কপালে হাত বুলিয়ে নিয়ে অন্ততঃ ১ মিনিট নিবিষ্ট মনে ঘন ঘন আবৃত্তির মত বলে চলুন "ঠিক ভাল হয়ে যাচ্ছে—ভাল হয়ে যাচ্ছে"—জোরে শব্দ করুন, এতেই দেখবেন উত্তেজনা বা রোগ চিন্তার ছায়া দূর হয়ে যাবে। তারপর ডান হাতখানা নেড়ে ঝাড়া দিয়ে বলুন বাবা !! চলে গেছে। স্বকল্প ভাবনা দ্বারা একে দূর করা যায় বিশ্বাস রাখুন। প্রতিদিন ২।৩ বার অভ্যাস করবেন।

আলোয়।কালো।

ফটো : দীপঙ্ক চন্দ্র
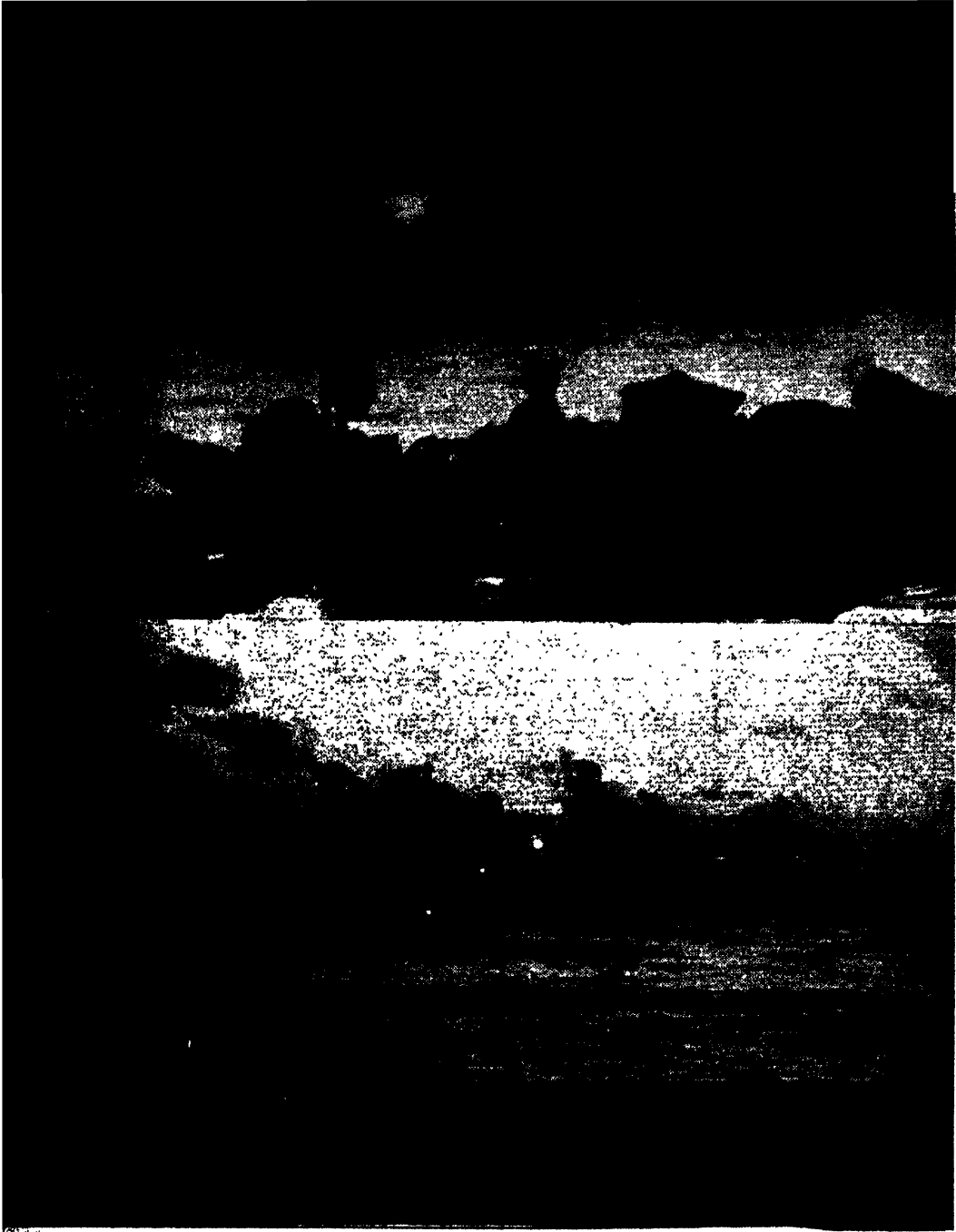
রামেশ্বরম্ ও মাদ্রাজ)

ফটো : দ্বিজেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

আর একটি কথা বলছি,—বিছানায় শুয়ে বা চেয়ারে হেলান দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে, হালকা করে (Relax) হাত দু'টো তলপেটে রেখে ধীর থেকে ক্রমশঃ উচ্চস্বরে বলুন "শা—ন্তি শান্তি শা—ন্তি।" অশান্ত মন শান্ত হবে। অভ্যাস করে দেখুন। এর জন্য আসন রয়েছে অর্দ্ধমৎস্যেন্দ্রাসন সলভাসন পদ্মহস্তাসন অন্যতম।

তোতলামী বধিরতা এবং স্মরণশক্তি হীনতা; সব ভাল হতে পারে এই স্বকল্প ভাবনা দ্বারা এবং কতকগুলি নিত্য অভ্যাস দ্বারা।

যেমন তোতলামী স্বকল্প ভাবনা মনের মধ্যে শুদ্ধভাবে পুষে রেখে খুব ধীর স্থিরভাবে পদ্য ও গদ্য আবৃত্তি করতে হবে খুব ভোরে এবং গভীর রাত্রে।

বধিরতা—ঐ একই ভাবনা মনে ধারণ করে মুখবন্ধ করে কানের পর্দ্দার ওপর দিয়ে মুখে একটা দীর্ঘ আওয়াজ রাখুন একদমে। কয়েকবার করুন। প্রতিবার শেষে মনে করবেন—"আমি আশে পাশের সব কথা শুনতে পাচ্ছি। এর জন্য কর্ণপিঠাসন, সিংহাসন, কপালভাতি প্রাণায়াম খুব কার্য্যকর।

স্মরণশক্তি হীনতা :—স্বকল্প ভাবনার সাথে মিতালী রেখে আপনি প্রত্যহ সকালে ও রাত্রে শোবার আগে ১ থেকে ১০০ পর্য্যন্ত এবং উল্টো দিক থেকে ৯৯-৯৮-৯৭ এ ভাবে গুণতে থাকুন। এবার শুয়ে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত আপনার সমস্ত কাজকর্ম্ম ক্রমশ গভীর ভাবে চিন্তা করুন। অভ্যাসযোগে সব ফিরে পাবেন। এর জন্য শশঙ্গাসন সলভাসন, পশ্চিমোত্থানাসন খুব ভালভাবে কাজ করে। শীর্ষাসনেও খুব ভাল ফল পাওয়া যায়, অবশ্য যদি হৃদযন্ত্র এবং চোখ ভাল থাকে।

যে কোন ব্যথা বেদনাও ঐ ভাবে স্বকল্প ভাবনা দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। ব্যথা বেদনা স্থানে হাত রেখে মানসিকে রোগীদের মত হাত বুলিয়ে চোখবুজে ভাবতে হবে "কমে যাচ্ছে—কমে যাচ্ছে,"—এবং মনকে যথারীতি অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারলে আরও অদ্ভুত উপকার পাওয়া যাবে। এতে যৌন ক্ষমতাও অতি বৃদ্ধি লাভ করে, দাম্পত্য জীবন সুখকর করে। শুধু তাইবা কেন?—ঈশ্বরধ্যানে মনকে নিবিষ্ট করতেও এই ভাবনার সহযোগিতা সফলতার সাক্ষ্য দেয়। আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে এই সাধনা অতিফলপ্রদ, কারণ তখন আত্মবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে। এই আত্মবিশ্বাস স্বকল্প ভাবনার রূপান্তর মাত্র। তাই মনের সবলতা ও শক্তির প্রতিষ্ঠা-যে কোন দুর্ব্বলতা বা হীনতাকে দূরে ঠেলে রাখতে পারে।

তবে সব কথার 'সার কথা হল দেহকে রোগমুক্ত রাখা। কারণ দেহ ও মনে যে ধরণের ব্যাধিই আসুক না কেন দূষিত পদার্থ যদি দেহে সঞ্চিত না থাকে—তা হলে উল্লিখিত 'স্বকল্প-ভাবনা (Auto-Suggestion) শীঘ্র কাজ করে ঐ জাতীয় রোগকে বিদূরিত করতে পারে। তাই বলছি—ব্যায়াম ও যোগ প্রত্যেকেরই নিয়মিত অঙ্গবিদ্যার অভ্যাস রাখা—মানে সত্য স্বাস্থ্যের ভিত দৃঢ় রাখা একটুতেই হার মানতে হবে না।

হাস্যরসস্রষ্টা কেদারনাথ

সন্তোষকুমার অধিকারী

১৯১৫ সালে কাশী থেকে একটি ব্যাঙ্গ কবিতার বই বেরোয়। বইটিতে লেখকের ছদ্মনাম দেওয়া ছিল নন্দিশর্মা। এই বইটিতে কাশীর ও কাশীবাসী বাঙ্গালীর সরস পরিচয় দেওয়া ছিল। সে পরিচয় যেমন বিচিত্র তেমনি সরস। বইটি বাঙ্গালী পাঠক সমাজে আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। অনেকেই সেদিন ভাবতে পারেনি যে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটির লেখক কে? কেউ বললেন—লেখক স্বয়ং রসরাজ অমৃতলাল, কেউ বললেন—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটির নামছিল "কাশীর কিঞ্চিৎ।"

সেদিনের সাহিত্য সাধনার কথা বলতে গিয়ে কেদারনাথ লিখেছিলেন,—অন্তরে কিন্তু সাহিত্য প্রীতির আসন পাতাই ছিল। কোথাও না লিখলেও বাড়ীতে একখানা খসড়া খাতা খোলা থাক্‌তো অবসর বিনোদনের উপায়-স্বরূপে। এই খাতাখানিকে তার নিভৃত স্থান থেকে উদ্ধার করেন কাশীরই এক ছাপাখানার মালিক—মণিভূষণ নাথ। এই ক্ষুদ্র কবিতার বইটি—কাশীর কিঞ্চিৎ—লেখক কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে খ্যাতি এনে দিল, তার ফলেই পরিণত বয়সে তাঁর পরিত্যক্ত সাহিত্য-সাধনা নতুন করে সুরু হলো। বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর রসসাহিত্য সৃষ্টির গৌরব যাঁরা পেয়েছেন—কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বা দাদামশাই) তাঁদের অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে হিউমার (Humour) সৃষ্টির ক্ষমতায় তিনি দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এবং শরৎচন্দ্রের সমধর্মী। তাঁর রচনায় যে সূক্ষ্ম রসবোধ স্বতঃ উৎসারিত হয়েছে তার মধ্যে কোন মালিন্য ছিলনা। মৃদু তিরস্কার হয়ত ছিল, কিন্তু তীক্ষ্ণ শ্লেষের আঘাত নয়।

বাংলা সাহিত্যে খাটি হিউমারের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। "কমলাকান্তের দপ্তর" ও "লোকরহস্তে" বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যরসকে মার্জিত ও পরিশুদ্ধরূপে সৃষ্টি করলেন। বঙ্কিম সাহিত্যের মননশীলতা ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য কেদারনাথকে অভিভূত করেছিল। তাঁর বাংলাসাহিত্যে রসরচনার প্রবৃত্ত হওয়ার কারণই ছিলেন বঙ্কিম। এ-কথা কেদারনাথ নিজের মুখেই স্বীকার করেছেন।

"বঙ্গদর্শন—বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাকে এতই মুগ্ধ করেছিল যে ইংরাজি লেখার মোহ একদম মুছে গেল।......আমাকে তখন বঙ্গদর্শন টেনেছে, বিশেষ কমলাকান্ত স্বয়ং।"

কেদারনাথের রসরচনার প্রথম আরম্ভ আনুমানিক ১৩০৩ সালে। তখন তাঁর বয়স ৩০। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "পঞ্চানন্দ" লিখছেন। কেদারনাথও 'বঙ্গবাসী' ও দৈনিক চন্দ্রিকায় চুট্‌কি হাস্যরসাত্মক লেখা সুরু করলেন—নন্দিশর্মার ছদ্মনামে। প্রথম প্রথম তাঁর লেখা আক্রমণাত্মক ছিল। "ভোটভিক্ষা" কবিতাটি তাঁর বিশেষ পরিচিত কোন ব্যক্তিকে তীব্র আঘাত দেয়। অনুতপ্ত হ'য়ে কেদারনাথ তাঁর রচনায় শ্লেষাত্মক ভাব বর্জন করার সংকল্প করেন। পরবর্তী যুগে তিনি নতুন ক'রে যখন লিখতে সুরু করলেন, তখন তাঁর মনে আর শাণিত শ্লেষের জ্বালা নেই। তাঁর মন তখন সমবেদনায় স্নিগ্ধ। যা মেকি, যা কৃত্রিম, তার প্রতি যে মৃদু তিরস্কার তাতে বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ কশাঘাত নেই। বরং হাস্যরসকে অতিক্রম করে তাঁর রচনায় করুণরসের প্রাবল্য ঘটেছে। কেদারনাথের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম 'আমরা কি ও কে', 'কবুলতি', 'কোষ্ঠির ফলাফল', 'ভাদুড়ি মশাই', 'আই হাজ'।

বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া সাহিত্যে হাস্যরসের স্রষ্টা হিসেবে যাঁরা কেদারনাথের পূর্বসূরী—তাঁদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, শরৎচন্দ্র, অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অমৃতলাল ও ইন্দ্রনাথ দুজনেরই রচনার মূল ছিল 'স্যাটায়ার'। বিশেষভাবে অমৃতলাল যেন সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে এসেছিলেন। তিনি আধুনিক বা নব্য ভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন শাসনকঠোর ভঙ্গিতে। কিন্তু কেদারনাথের রচনা নিছক হাস্যরসের উৎস ছিল। উদ্দেশ্যমূলক ভঙ্গি নিয়ে তিনি লিখতে বসেননি। তাঁর লেখায় হাসির সঙ্গে মেশানো ছিল করুণ বেদনার অনুভূতি। নিজের সম্বন্ধে কেদারনাথ বলেন—বরাবরই আমি বাজে কথার পক্ষপাতী। বাজে কথাই লিখে থাকি। বাজে কথাই আমার প্রিয়।

কেদারনাথের গল্পকথনে একটা মজলিসী ভাব ছিল। চাকুরিসূত্রে তিনি বহু জায়গায় ঘুরেছেন। প্রচুর অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল তাঁর চেতনা। অথচ ভঙ্গিতে রয়েছে নিরাসক্তি। বাস্তব জীবনের টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা নিয়ে তাঁর গল্প। এইসব খণ্ড ঘটনার মধ্যে তিনি কৌতুকের রস খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর বাক্‌পটুত্ব অসাধারণ। শব্দকে মুচ্‌ড়িয়ে তার মধ্যেকার রস বার করেছেন। রকমারি ভঙ্গিতে শব্দকে প্রয়োগ করে পাঠককে হাসিয়েছেন।

"কাশীর কিঞ্চিৎ" কবিতার বই "উড়ো খৈ" ও তাই। এই দুটি কবিতার বইয়ের ভাষায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব পড়েছে ব'লে মনে হয়। যখন তাঁর "কাশীর কিঞ্চিৎ" থেকে পড়ি—

"সেই ফ্যাসানের চুল ছাঁটা—সেই অলষ্টার বুকে
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে,

অথবা

"আমাদের লক্ষ্মীরা সব বোনেন বসে উল
পরিশ্রমের মধ্যে শুধু বাঁধেন নিজের চুল।"

তখন সন্দেহ থাকেনা যে দ্বিজেন্দ্রলাল কেদারনাথকে প্রভাবান্বিত করেছেন। এ ধারণা আরও দৃঢ় হয় তাঁর 'প্যারডি' কবিতায়।

"Curl দুলিল দুগালে যাদের—রমণীসুলভ মন্দাকি
চরণে পম্‌প্ রেশমী ওড়না—ভিটেটায় রেখে বন্দী।
পত্নীরে যারা প্রিয়তমা বলে—বাপে দিয়ে তার
ভিখারী বেশ

তুই বটেইত তাদের জননী—বটেই ত তুই তাদের দেশ।"

কেদারনাথের মনে যন্ত্রণার অনুভব ছিল। বাক্‌সর্বস্ব দেশবাসী ও অধঃপতিত দেশের জন্য ছিল গভীর বেদনাবোধ। সাধারণ বাঙ্গালী চরিত্রে পৌরুষের অভাব তাঁকে তীব্র আঘাত দিয়েছে। গোটা দেশের মানুষের মধ্যে যে গোলামিসুলভ হী-মন্যতার ভাব দেখা দিয়েছিল, তিনি তাকে বারবার তিরস্কার করেছেন। 'আই হাজ' বইয়ে মুকুন্দবাবুর মুখে এই ভীরু চরিত্রহীন জাতীয় মনোভাবের বর্ণণা:—যারা হারমনিয়ম বাজিয়ে সিগারেট টান্‌তে টান্‌তে গায় "বঙ্গ আমার" না হয় "বন্দেমাতরম্‌" তারা দেশকেই ব্যঙ্গ করে। তিরিশ টাকার চাক্‌রি পেলেই সব চুপ্‌—কৃতার্থ। তখন বন্দেমানবম্‌।

শিবুদার মুখে "আই হাজ" এর ব্যাখ্যা ভুলবার নয়।

"আমাদের আই (I) বলে কিছু নেইরে।—সব ইট (It)—"থার্ডপার্সন Singular! Iটা আমাদের ঝুটো অভিনয়ের'মুখোস।"

কেদারনাথের সমসাময়িক আর একজন হাস্যরসস্রষ্টা হ'লেন পরশুরাম। পরশুরামের কৃতিত্ব অভিনব ঘটনা সংস্থাপনে ও উদ্ভট কল্পনায়। এ বিষয়ে তিনি ত্রৈলক্যনাথের সমগোত্রীয়। কিন্তু কেদারনাথ রস জমিয়েছেন কথার সাজগোজে ও বাক্‌চাতুরীতে। তাঁর মনে সমবেদনার অনুভূতি। তাঁর গল্পের অনেক জায়গাতেই কারুণ্য নিবিড় হ'য়ে উঠেছে। হাসি যে কখন অশ্রুজলে মুখ ডুবিয়েছে তা' বুঝে ওঠা যায় না। তাঁর ভাষা সহজ ও সরল—অনেক ক্ষেত্রে আত্মজীবনী বলার ভঙ্গিতে লেখা। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর বুদ্ধিদীপ্ত রসবোধ বাংলাভাষায় যে হিউমারধর্মী সাহিত্যপ্রবাহের সৃষ্টি করেছে কেদারনাথ সেই ধারারই সার্থক বাহক।

তোমাকে

হাসিরাশি দেবী

আবার তোমায় দেখলেম,—
দেখলেম,—জানালার
ফ্রেমে আট্‌কানো ছবির মত
ব'সে আছ চুপ ক'রে।
পথের দিকে মেলে রেখেছ
ছুটি চোখের উদাস দৃষ্টি।
ও দৃষ্টি যেন পথিকদের ব'লছে—
'তোমাদের চিনি। জানি
এই যাওয়া আর আসার তাগাদা,
তাই কোনও আগ্রহ
নেই জানবার,
ঔৎসুক্যও নেই ভাব্‌বার।'
আর আমি দেখলেম,
তোমায় নতুন চোখে দে'খলেম॥

"আদর্শ পল্লী"
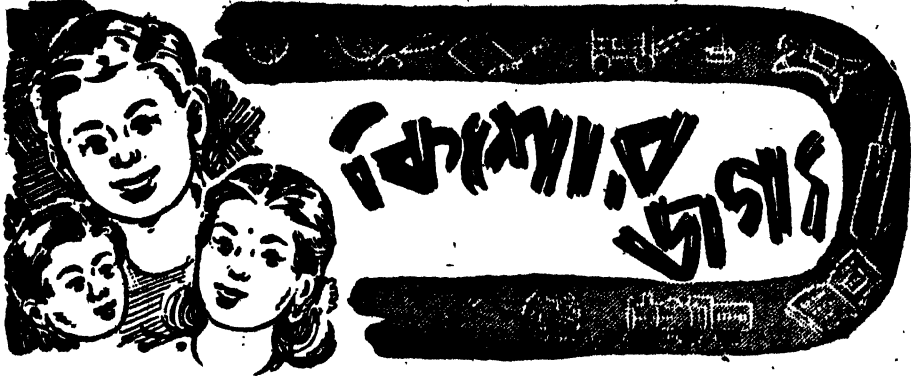
পূজার পরে

শ্রীজ্ঞান

বাঙ্গলা দেশের মহান উৎসব, বাঙ্গালী হিন্দুর মহাপূজা, আর বাঙ্গলার ছেলেমেয়েদের মহৎ অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি হয়েছে এ বৎসরের মতন। আবার আগামী বছরে দেবী দুর্গার আগমনে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে আনন্দের সাড়া জাগবে—শত দুঃখকষ্টে পীড়িত বাঙ্গলা মায়ের প্রাণে আবার নতুন আশার সঞ্চার হবে—অভাবে, অভিযোগে ক্ষতবিক্ষত বাঙ্গালী সংসারে কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের স্পর্শ হয়ত লাগবে—ছেলে মেয়েদের মুখে ফুটে উঠবে হাসি, অঙ্গে উঠবে নূতন পোষাক, আনন্দ উৎসবে মেতে উঠবে সবাই। কিন্তু তার তো এখন দেরী আছে অনেক, মাঝে পড়ে আছে পুরো একটা বছর! এই সময়টা কাজের সময়। উৎসব শেষ হয়েছে, এবার কর্ম্মের আহ্বান এসেছে। তোমাদের অর্থাৎ ছাত্রদের প্রধান কর্ম্ম কি? লেখাপড়া। ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ—অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা বা একান্ত করণীয় কর্ম্ম ও কর্ত্তব্য। সুতরাং তোমাদের সেই প্রধান কর্ম্মের প্রতি, কর্ত্তব্যের প্রতি নিশ্চয়ই তোমরা এবার মন দেবে। কর্ম্ম তো সকলকেই করতে হবে, কারণ, কর্ম্ম ছাড়া মানুষ তো থাকতে পারে না। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥ ৩।৫

অর্থাৎ, কেহ কখনও কর্ম্ম না করে ক্ষণকালও থাকতে পারে না, স্বভাবজাত সত্ত্বাদিগুণসমূহই মানুষকে অবশ করে কর্ম্ম করায়।

কর্ম্ম সবাইকেই করতে হয় এবং সদাই করতে হয়, তবে দেখবে সে কর্ম্ম যেন সৎকর্ম্ম হয়—দুষ্কর্ম্ম না হয়। আর কর্ত্তব্য কার্য্য না করে আলস্যে, আড্ডায় কাল কাটান অন্যায়ই শুধু নয়—এতে শরীর ও মনের প্রভূত ক্ষতিসাধনও করা হয়। অকর্ম্মণ্যতা সর্ব্বদাই পরিত্যাজ্য—এ কথাটা মনে রাখবে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে আরও বলেছেন—

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
ন চ শরীরযাত্রাপি চ প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥ ৩।৮

অর্থাৎ, তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম কর, কারণ কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল। কর্ম্ম না করলে তোমার শরীর রক্ষাও সম্ভব হবে না।

কর্ম্ম যখন করতেই হবে, তখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করাই শ্রেয়। আর কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করা অনুচিতই শুধু নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকরও; আর সে ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হতে পারে যে সারা জীবনই হয়ত তার জের টেনে চলতে হবে। উত্তরকালে ফেলে আসা পাঠ্যজীবনের দিকে চেয়ে হয়ত মনে হবে, কেন তখন কর্ত্তব্যে অবহেলা করেছিলাম, কেন পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়েছিলাম, কেন শুধু উৎসবে আনন্দে মেতে ছিলাম। কিন্তু যখন মনে এ অনুশোচনা

জাগবে, তখন সে ত্রুটি সংশোধনের সময় চলে গেছে—রেখে গেছে শুধু হতাশা আর অনুশোচনা।

তাই বলি, উৎসব তো শেষ হয়েছে—এবার কর্মে ব্রতী হও, কর্ত্তব্যে অবহেলা কর না, কর্মে ফাঁকি দিও না। সামনেই তোমাদের পরীক্ষা। এবার তোমাদের কর্ত্তব্য কর্ম লেখাপড়া মন দিয়ে কর। ফল শুভ হবেই, আর সে শুভ ফল ভোগ করবে সারাজীবন ধরে।

—

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত

দী কাউণ্ট অফ্ মণ্টি ক্রিষ্টো
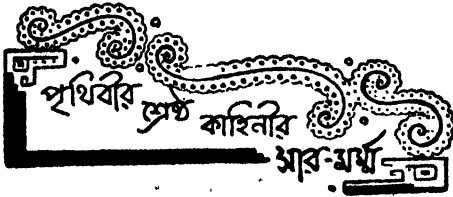
সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সে কাহিনী শুনে সজল-চোখে মিনতিভরে মার্সেডিজ্ বললে,—আমার মুখ চেয়ে তাকে তুমি ক্ষমা করো, এডমণ্ড!···

কাউণ্ট বললে,—বিধাতার বিধান অমান্ত করতে বলো?···যে বিধাতা আমাকে নির্ম্মম-মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে সুবিচারের শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন! অসম্ভব!··· দীর্ঘ চৌদ্দ বছর কী অমানুষিক দুঃখ-যাতনা আমি ভোগ করেছি··তার শোধ আমি নেবো কড়ায়-গণ্ডায়—অপরাধীদের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে!···এই আমার একমাত্র সঙ্কল্প!···এর আর নড়চড় নেই এতটুকু!

—বেশ, তাই যদি তবে শোধ নাও ফার্নান্দের উপর··· আমার উপর দিয়ে নয়···আমার পুত্রের উপর দিয়েও নয়! ···এতদিন আমিও কী যাতনা···কী দুঃখ ভোগ করেছি, তুমি জানো না···বুঝবে না।

কাউণ্ট বললে,—তুমিও যাতনা সয়েছো?···বিনাদোষে তোমার বুড়ো বাবা কষ্টে-দুঃখে-অনাহারে মারা গিয়েছে? ···যে-মেয়েকে মানুষ ভালোবেসে মাথার মণি করবে, তেমন মেয়েকে ভালোবেসে তুমি দেখেছো সে মেয়ে তোমার দুর্জ্জন-দুশমণকে বিবাহ করেছে?···তারা বিবাহ করে সুখে-স্বচ্ছন্দে বাস করছে, আর তুমি বিনাদোষে দুশমণের চক্রান্তের ফলে, অন্ধকার-গারদে পচে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করেছ!···

মার্সেডিজ বললে,—না, তা দেখিনি···তবে যাকে আমি প্রাণের চেয়েও ভালোবেসেছিলুম, তাকে দেখছি—সে আমার একমাত্র ছেলেকে হত্যা করতে উদ্যত!

এ কথা শুনে কাউণ্ট গম্ভীর হয়ে কি যেন চিন্তা করলো—তারপর নিশ্বাস ফেলে বললে,—বেশ, তাই হবে!··· তোমার ছেলের প্রাণ নষ্ট হবে না··আমিই মৃত্যুবরণ করবো!

—অসীম তোমার অনুগ্রহ, এডমণ্ড!···কিন্তু তুমিও দেখবে—আমার মনে এখনো তোমার উপর সেই আগের মতোই ভালোবাসা আছে!···আজ তাহলে আসি!··· বিদায়!···

মার্সেডিজ্ চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কাউণ্টের মনে অনুশোচনা জাগলো···সে ভাবলো,—কি নির্ব্বোধ আমি! শোধ নেবার জন্ত কেন আমি সেদিন তখনই আমার হৃদয়টাকে গুঁড়িয়ে চূর্ণ করে দিইনি!···

পরের দিন ভোরের আলো ফোটবার সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাক্সিমিলিয়ান এলো কাউণ্টের কাছে···হাতে একটা পিস্তল তুলে নিয়ে কাউণ্ট বললে,—আমাকে কখনো তুমি পিস্তল ছুঁড়তে দেখেছো?···

—না!

—তাহলে ছাখো।

দেওয়ালের গায়ে চিড়িতনের টেক্কার চার কোণ পেরেক দিয়ে গেঁথে, সেই টেক্কায় চিড়িতনের তিনটি কালো-গোলকে এবং বোঁটায় লক্ষ্য করে কাউণ্ট পিস্তলের চারটি গুলি ছুড়লো···গুলির চোট লেগেও দেওয়ালে-গাঁথা তাস

রইলো অটুট—শুধু ঐ কালো-গোলক তিনটি আর বোঁটা ভেদ করে গেল সেই গুলি।

আশ্চর্য্য হয়ে ম্যাক্স্মিলিয়ান বললে,—অদ্ভুত আপনার হাতের টিপ্!...তবে, আমি মিনতি করছি, আপনি এ্যাল্বার্টকে প্রাণে মারবেন না...তার মায়ের কথা মনে রাখবেন।

কাউন্ট বললে,—ঠিক বলেছো, ম্যাক্স্মিলিয়ান...আমি এ্যাল্বার্টকে মারবো না—এ্যাল্বার্ট আমাকে মারবে!

—কিন্তু কাউন্ট...

নিশ্বাস ফেলে কাউন্ট বললে,—অনেককাল আমি বেঁচেছি, ম্যাক্স্মিলিয়ান...বাঁচার আর সাধ নেই আমার।

ঘড়ীর কাঁটায় তখন ছ'টা বেজে দশ মিনিট...'ডুয়েল্'-লড়াইয়ের মাঠে পিস্তল হাতে নিয়ে কাউন্ট আর ম্যাক্স্মিলিয়ান অধীরভাবে অপেক্ষা করছেন, ওদিকে এ্যাল্বার্টের কিন্তু তখনও দেখা নেই!

বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করবার পর, অবশেষে এ্যাল্বার্ট এলো সেখানে—সঙ্গে তার বন্ধুর দল।

কাউন্টের সামনে এসে এ্যাল্বার্ট বললে,—আপনি শুনুন এবং বন্ধুরা তোমরাও সকলে শোনো...কাউন্টকে আমি যে কথা বলতে এসেছি।...

এই বলেই কাউন্টের পানে তাকিয়ে এ্যাল্বার্ট বললে, —আমার বাবাকে আপনি লাঞ্ছিত করেছেন, সেজন্য আপনাকে আমি 'ডুয়েল্' লড়াইয়ে আহ্বান করেছিলুম! ...যত বড় অপরাধই তিনি করে থাকুন, তার জন্য আপনি তাঁকে চূর্ণ করবেন—সে অধিকার আপনার নেই, এই বুঝেছি।...কিন্তু, এখন আমি যা শুনেছি—বলছি!... আপনার সম্পূর্ণ অধিকার আছে, তাঁকে ধরিয়ে দিয়ে অপদস্থ করার...লাঞ্ছনাভোগ করানোর!...তাঁর জন্য আপনি যে যাতনা ভোগ করেছেন দীর্ঘ চৌদ্দ বছর, তা সত্যই অমানুষিক। এ সব কথা জেনে, আমি এসেছি আপনার কাছে—আপনার মার্জ্জনা ভিক্ষা করতে!...সব কথা না জেনে যে অন্যায় ব্যবহার করেছি আপনার সঙ্গে, সেজন্য আমায় ক্ষমা করুন।...

এ্যালবার্টের কথা শুনে কাউন্ট সাদরে তার দুই হাত চেপে ধরে আবেগোচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বললে,—সর্ব্বান্তঃকরণে আমি তোমায় সব দোষ ক্ষমা করলুম, এ্যালবার্ট!...সুখী হও...দীর্ঘজীবি হও তুমি!

ওদিকে ফার্ণান্দ্ বসে আছে বাড়ীতে...অধীর-আকুল হয়ে—'ডুয়েলের' ফলাফল কি হলো, খবর জানবার জন্য। তার অনুচর ফিরে আসতেই ফার্ণান্দ্ জিজ্ঞাসা করলে,— 'ডুয়েলের' কি হলো?...

অনুচর বললে,—'ডুয়েল্'-লড়াই হয়নি, হুজুর!... আলবার্ট-সাহেব কাউন্টের কাছে মার্জ্জনা চেয়ে বিরোধ মিটিয়েছেন!

খবর শুনে ফার্ণান্দ্ রাগে জ্বলে উঠলো...কালবিলম্ব না করে তখনি তলোয়ার নিয়ে ফার্ণান্দ্ এলো কাউন্টের গৃহে! সটান্ গিয়ে কাউন্টের সঙ্গে দেখা করে ফার্ণান্দ্ সদম্ভে বললে,—আমার ছেলে 'ডুয়েল্' লড়েনি বটে, আমি কিন্তু 'ডুয়েল্' লড়বো...আনো তোমার তলোয়ার।...

নির্ব্বাক-দৃষ্টিতে কাউন্ট চেয়ে রইলো ফার্ণান্দের পানে ...চোখে তার কৌতুক! ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকেই কাউন্ট সেখান থেকে সরে যাবার জন্য যেমন পা বাড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে হাতের তলোয়ার উঁচিয়ে ফার্ণান্দ সদর্পে বললে—তার আগে একটা কথা!...তোমার বুকে এ তলোয়ার বেঁধবার আগে আমি জানতে চাই—কাউন্ট অফ্ মন্টি ক্রিষ্টো...এই নাম-রহস্যের অন্তরালে কি তোমার পরিচয়?...তুমি কে?...

পলকের জন্য ফার্ণান্দের পানে তাকিয়ে অবিচলিত-কণ্ঠে কাউন্ট বললে,—এখনি চিনতে পারবে।

এ কথা বলেই কাউন্ট সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল— ফিরলো খানিক পরে—নাবিকের বেশে! ফিরেই ফার্নান্দের সামনে দাঁড়িয়ে কাউন্ট বললে,—চেয়ে ছাখো, ফার্নান্দ—আমি কে, চিনতে পারছো?

কাউন্টের পানে তাকিয়েই ফার্নান্দ্ চমকে উঠলো— যেন ভূত দেখেছে—সে একেবারে স্তম্ভিত!—মুহূর্ত্তকাল ভালভাবে ঠাওর করেই স্খলিত-কণ্ঠে ফার্নান্দ বললে,— এড্মণ্ড্ দান্তে?

কাউন্ট কোনো জবাব দিলো না...মুখে-চোখে তার কৌতুকের ঝিলিক! ফার্নান্দের মুখেও আর কথা নেই!— কোনোমতে ভারী পা দুখানা ঠেলে টলতে টলতে গিয়ে

সে বাইরে ফটকের সামনে-রাখা তার নিজের গাড়ীতে এসে বসলো—কোচোয়ানকে বললে,—বাড়ী…বাড়ী চলো…শীগগির!—

বাড়ীতে এসে ফার্নান্দ দেখে—মার্সেডিজ আর আলবার্ট সামান্য কিছু জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার উদ্যোগ করেছে!

আলবার্ট বললে,—কিছু ভেবো না, মা—এ বাড়ীতে আর নয়!—আমি ফৌজে যোগ দিতে চলেছিলাম—ফৌজের কাজে যে খ্যাতি অর্জন করবো, তাতে শুধু আমি গৌরব বোধ করবো না—তুমিও মা, গৌরব বোধ করবে!

ছেলের পানে স্থির-দৃষ্টিতে চেয়ে সনিশ্বাসে মার্সেডিজ বললে,—আমিও মার্শেলে (merseilles) ফিরে যাবো…সেখানে জপ-তপ করে ভগবানের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়ে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাবো।

এমন আলোচনার পর, মার্সেডিজ আর আল্‌বার্ট বাড়ী থেকে বেরুলো…দূর থেকে ফার্ণান্দ দেখলো সব ঘরের জানালার পর্দা স'রিয়ে…দেখলো—তার স্ত্রী আর ছেলে দুজনে গাড়ীতে উঠে বসেছে!

তাদের গাড়ী বাড়ীর ফটক পার হয়ে পথে বেরুনোর সঙ্গেই ঘরে পিস্তলের শব্দ…দুঃখে-অপমানে-গ্লানিতে ফার্ণান্দ শেষ পর্য্যন্ত পিস্তলের গুলিতে আত্মহত্যা করলো!

ফার্ণান্দের মৃত্যুর পর, জেরার্ডের পালা…

জেরার্ডের স্ত্রী কাউন্টের সঙ্গে বিষ-তত্ত্বের সম্বন্ধে কত কি আলোচনা চালালেন…কাউন্ট বললো,—এমন আছে, যার জোরে পশু-পাখী, এমন কি, মানুষেরও মৃত্যু নিশ্চিত…অথচ, মৃত্যুর পর কেউ বুঝতেই পারবে না যে বিষের ফলে মৃত্যু হয়েছে! এ মৃত্যু দেখলে, লোকে বুঝবে—যেন সন্ন্যাস-রোগে প্রাণ হারিয়েছে!…বিশ্বাস না হয়—পরখ করে দেখতে পারেন!

কাউন্ট এ বিষ দিলে জেরার্ডের স্ত্রীকে—এবং বিষ দেবার পর, হঠাৎ একদিন হলো ভ্যালেনটিনের বৃদ্ধ মাতামহের মৃত্যু! ডাক্তারকে স্পষ্টভাবেই জিজ্ঞাসা করা হলো—ডাক্তার বললেন,—লক্ষণ যা দেখলুম, তাতে তো বেশ বুঝেছি—সন্ন্যাস-রোগ ছাড়া আর কিছু নয়!

স্বামীর মৃত্যুর পর, বিধবা মাতামহী এসে উঠলেন জেরার্ডের গৃহে—ভ্যালেনটিনের আগ্রহে। মাতামহী এ বাড়ীতে থাকবার সময় একদিন রাত্রে বাগানে ভ্যালেনটিনের সঙ্গে দেখা ম্যাক্সিমিলিয়ানের—দুজনে দুজনকে ভালবাসে—পছন্দ করে! কাজেই দেখা হতেই ভ্যালেনটিন ম্যাক্সিমিলিয়ানকে জানালো,—দিদিমার খুব শক্ত অসুখ—ডাক্তারেরাও দেখছি বেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছেন তাঁর সম্বন্ধে!

ম্যাক্সিমিলিয়ান বোঝালো,—এ বাড়ীতে থাকা উচিত হবে না, ভ্যালেনটিন…এমন করাল-রোগের ছায়া ঘনিয়ে রয়েছে এখানকার আকাশে-বাতাসে!…বরং চলো, এখান থেকে অন্য কোথাও নিরাপদ জায়গায় সরে…আমার সঙ্গে চলো…আমাকে বিবাহ করবে! বিবাহের পর, প্যারিস শহর ছেড়ে দূরে কোথাও গিয়ে থাকবো—তারপর তোমাদের এখানে আবার ফিরে আসবো—আমাদের আত্মীয়-বন্ধুরা যখন তোমার সঙ্গে এ-বাড়ীর বিরোধ মিটিয়ে দেবেন!—

ভ্যালেনটিনের কিন্তু প্রবল আপত্তি—সে বললে,…না ম্যাক্স…দিদিমাকে এমন রোগশয্যায় ফেলে আমি কোথাও যাবো না!…তাছাড়া বাবা!…বাবার মনেও বড় অশান্তি!…এঁদের দুজনকে ছেড়ে—

পরের দিন ভ্যালেনটিনের মাতামহীর হলো—মৃত্যু!

আর্তকণ্ঠে জেরার্ড সখেদে ডাক্তারকে বললে,—এ কি হলো, ডাক্তার!…বিধাতার এ কী অভিশাপ!…

জেরার্ডের বৃদ্ধ-পিতা নোর্ত্তিয়ারও পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে তখন তার পুত্রের গৃহেই বাস করছিলেন। রোগ-শয্যাশায়ী তাঁর সেবার জন্য বাড়ীর খাশ ভৃত্য সযত্নে দামী কাঁচের গেলাসে ভরে লিমোনেড এনেছিল—কিন্তু রোগে ভুগে এমনই অরুচির ভাব জন্মেছিল যে বৃদ্ধ সে লিমোনেড মুখেও স্পর্শ করেননি একবিন্দু! কাজেই মিছে অপচয় হবে, এই ধারণায় রোগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই ভৃত্য সে লিমোনেডটুকু পান করে—এবং পান করার সঙ্গে সঙ্গেই আচমকা হলো তার মৃত্যু! খবর পেয়েই ডাক্তার ছুটে এসেছিলেন অবিলম্বে—কিন্তু যথাসাধ্য ওষুধপত্র-চিকিৎসার ফলেও, তিনি কোনোমতেই

পারলেন না—মৃত্যুকে বাঁচাচ্ছে! ডাক্তারের মনে জাগলো সন্দেহ!

জেরার্ড সশঙ্কিত হয়ে ডাক্তারকে বললে,—মৃত্যু এসে আমাকে ঘিরেছে, ডাক্তার!

ডাক্তার বললেন.—মৃত্যু নয়—পাপ।

জেরার্ড বললে,—পাপ?—আমার বাড়ীতে?—

ডাক্তার বললেন,—হ্যাঁ!—আপনার শ্বশুর আর শাশুড়ী মারা গেলে—কার লাভ?—অর্থাৎ, তাঁদের সম্পত্তি পাবে কে?

জেরার্ড কোনো উত্তর দিলো না—নির্বাক-দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ডাক্তারের দিকে। ক্রমশঃ

—

ত্রিবিক্রম ভট্ট

শ্রীরামদুলাল ভট্টাচার্য

সংস্কৃত সাহিত্যে ত্রিবিক্রম ভট্টের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনি "নলচম্পূ বা দময়ন্তীকথা" ও "মদালসা-চম্পূ" নামে দুখানা বই লেখেন। "চম্পূ" শব্দের একটা বিশেষ মানে আছে। গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে যে কাব্য লেখা হয় তাকেই বলে "চম্পূ"। এই বইতে ত্রিবিক্রম ভট্ট তাঁর বংশ পরিচয় জানিয়েছেন। এ ছাড়া বরোদা রাজ্যের অন্তর্গত নবসারী বা নৌসারী গ্রামে একটা প্রাচীন তাম্রলিপি পাওয়া গেছে তা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি মান্যখেটের রাজা (বর্তমান বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত মানখেড়ের) রাষ্ট্রকূটকুলচূড়ামণি তৃতীয় ইন্দ্ররাজের রাজসভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তীটি প্রচলিত আছে।

অনেকদিন আগে মহারাষ্ট্র প্রদেশে ইন্দ্র নামে এক রাজা ছিলেন। সুশাসক ও বিদ্যোৎসাহী বলে রাজার খুব খ্যাতি ছিল। বড় বড় পণ্ডিতেরা তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করে থাকতেন। বিভিন্ন দেশ থেকে পণ্ডিতেরা যখন এই রাজ-সভায় আসতেন রাজা তাঁদের উপযুক্ত সম্মান দেখাতেন। দেবাদিত্য ভট্ট ছিলেন এই রাজসভার বিদ্বন্মণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। এমন কোনো শাস্ত্র ছিলনা যে বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যের অভাব ছিল। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিভিন্ন দেশের রাজসভায় এমন ছড়িয়ে পড়েছিল যে অনেক পণ্ডিতই তাঁকে ঈর্ষা করতেন এবং তাঁকে তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দিতে চাইতেন। কিন্তু কেউই তাঁকে হারিয়ে দিতে পারেন নি। শেষে তর্কযুদ্ধ করতে আর কেউই আসতে চাইতেন না।

এতবড় পণ্ডিত ও খ্যাতিমান লোকের মনে কিন্তু একটুও শান্তি ছিল না। কারণ তাঁর একমাত্র পুত্র ত্রিবিক্রম ভট্ট ছিল যেমন দুরন্ত তেমনিই শাস্ত্রপাঠে অমনোযোগী। পণ্ডিত-পিতা চেয়েছিলেন যে পুত্রও তাঁর মত খ্যাতিমান হোক। আর কোন পিতাই বা তা না চান? কথাই আছে "সর্বত্র জয়মিচ্ছতি, পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়ম্"। পিতা-পাণ্ডিত্যে সর্বত্রই জয়ী হতে চান কেবল পুত্র ও শিষ্যের কাছে পরাজয় কামনা করেন।

এমনি করে দিন যেতে লাগল। পণ্ডিতেরা সুযোগ খোঁজেন কেমন করে দেবাদিত্য ভট্টকে বা ইন্দ্ররাজকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করবেন। একদিন একজন পণ্ডিতের ভাগ্যে এই সুযোগ ঘটে গেল। তিনি খবর পেলেন কোনো এক কর্মোপলক্ষে দেবাদিত্য ভট্টকে কয়েকদিনের জন্যে দূরদেশে যেতে হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ইন্দ্র-রাজার রাজসভায় এসে উপস্থিত হলেন এবং নিজেকে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বলে ঘোষণা করে বললেন যে তিনি অন্য সমস্ত পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধে পরাস্ত করেছেন বাকী কেবল এই রাজ্য। যদি এখানে এমন কোনো পণ্ডিত থাকেন যিনি তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে প্রস্তুত—তবে তিনি তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আহ্বান করছেন। আর যদি কেউ না থাকেন তবে তাঁকেই জয়মালা দেওয়া হোক।

রাজা তখন দেবাদিত্য ভট্টকে ডেকে আনতে আদেশ করলেন। দেবাদিত্য ভট্ট দেশের বাইরে গেছেন শুনে সভার অন্যান্য পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধ করতে আহ্বান করলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই রাজী হলেন না। তখন রাজা দেবাদিত্য ভট্টের পুত্র ত্রিবিক্রম ভট্টকেই ডেকে আনতে আদেশ দিলেন।

ত্রিবিক্রম দুরন্ত হলেও খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি যখন শুনলেন যে রাজা তাঁকে পিতার অনুপস্থিতিতে

দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করতে ডেকে পাঠিয়েছেন তখন তিনি খুব চিন্তান্বিত হলেন। তাঁর খুব দুঃখ হল কেন এতদিন শাস্ত্রপাঠ না করে দিন কাটিয়েছেন। আজ তাঁর পিতার ও রাজ্যের সম্মান বিপন্ন। কেমন করে এ সম্মান তিনি অক্ষুন্ন রাখবেন! তখন তিনি উপায়ান্তর না দেখে তাদের গৃহে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর আরাধনা করতে গেলেন। আকুল হয়ে দেবীকে তিনি ডাকতে লাগলেন। সরস্বতী তাঁর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিলেন যে পর্যন্ত না তাঁর পিতা ফিরে আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত সরস্বতী ত্রিবিক্রমের মুখে বিরাজ করবেন ও তাঁর পিতার ও রাজ্যের সম্মান রক্ষা করবেন। কিন্তু যে মুহূর্তে দেবাদিত্য ভট্ট ফিরে আসবেন সেই মুহূর্তে তিনি ত্রিবিক্রমকে ছেড়ে চলে যাবেন।

সরস্বতীর কাছ থেকে এই বর পেয়ে ত্রিবিক্রম মহোৎসাহে রাজসভায় গেলেন আর তর্কযুদ্ধে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিতের সমস্ত গর্ব খর্ব করে দিলেন। পণ্ডিত লজ্জায় সেই মুহূর্তেই সেই দেশ থেকে পলায়ন করলেন। আর ত্রিবিক্রম ভট্ট রাজসম্মানে ভূষিত হয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরলেন।

বাড়ী ফিরে তিনি ভাবলেন যে পিতা ফিরে আসলেই ত' তাঁর পাণ্ডিত্যের শেষ হয়ে যাবে। সুতরাং তার আগেই তাঁকে এমন কিছু লিখে রাখতে হবে যাতে তাঁর যশ চিরস্থায়ী হয়ে থাকবে। কি নিয়ে লিখবেন এই ভাবতে ভাবতে তাঁর মনে পড়ল—

"পুণ্যশ্লোকো নলোরাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥"

তখন তিনি পুণ্যশ্লোক নলরাজার ও দময়ন্তীর বিষয় অবলম্বন করে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে এক কাব্য রচনা করলেন এবং তার নাম দিলেন 'নলচম্পূ' বা 'দময়ন্তী কথা'। এই নলচম্পূর সাতটি অধ্যায় আছে। কিন্তু ত্রিবিক্রম সপ্তম অধ্যায় শেষ করতে পারেন নি, কারণ তার আগেই তাঁর পিতা দেবাদিত্য ভট্ট বিদেশ থেকে ফিরে আসেন এবং সরস্বতী পূর্ব সর্ত অনুযায়ী অন্তর্হিতা হন।
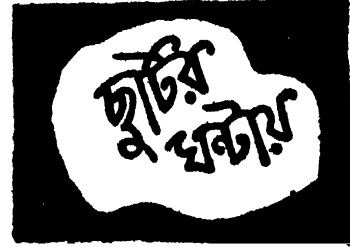
চিত্রগুপ্ত

এবারের পূজোর ছুটির দিনগুলি তোমরা সবাই আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলেমিশে বেশ আনন্দেই কাটিয়েছো, নিশ্চয় সে আনন্দের রেশ আজো তোমাদের মন ভরে রেখেছে অপরূপ স্মৃতি-সৌরভে। তাই ছুটির আনন্দোৎসবের সেই স্মৃতি সৌরভ যাতে আরো বেশী মধুর ও জমজমাট হয়ে ওঠে, তারই উদ্দেশ্যে, আপাততঃ বিচিত্র-অভিনব আজব-মজার একটি বিজ্ঞানের খেলার কথা বলি। এ খেলার কলা কৌশল রপ্ত করা নিতান্তই সহজ-সরল কাজ এবং কারসাজি দেখানোর জন্য সামান্য যে কয়েকটি সাজ-সরঞ্জাম প্রয়োজন—সেগুলি জোগাড় করাও এমন কিছু দুঃসাধ্য বা ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার নয়। অল্প চেষ্টাতেই, তোমরা অনায়াসে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের মজলিশে আজব-মজার এই বিজ্ঞানের বিচিত্র-কারসাজিটি দেখিয়ে তাঁদের রীতিমত তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। খেলাটির নাম—'ফুলের রঙ-বদলানোর ভেল্কী'।

এ-ধরণের ভেল্কী বাজী দেখানোর জন্য যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খেলা দেখানোর জন্য চাই —লাল রঙের একটি জবাফুল, একটি ধুনুচী, অল্প একটু ধুনোর গুঁড়ো, টিকে-কয়লা আর গন্ধকের গুঁড়ো, এক বাক্স দেশলাই, এক চাঙড় বরফ এবং বরফ রাখার উপযোগী একটি বড় পাত্র।

এ সব সরঞ্জাম জোগাড় হবার পর, ভেল্কীর আজব কলা কৌশল রপ্ত করার পালা। আসরে দর্শকদের সামনে খেলা দেখানোর সময়—প্রথমেই দেশলাইয়ের সাহায্যে

টিকে-কয়লা আর ধুনোর গুঁড়ো দিয়ে সাজানো ধুমুচীতে আগুন জ্বালিয়ে নাও। এবারে পাশের ছবিতে যেমন

দেখানো হয়েছে, ঠিক তেমনি ভঙ্গীতে জ্বলন্ত-ধুমুচীটিকে সমতল টেবিল বা জমির উপর সাবধানে বসিয়ে রেখে, আগুনের মধ্যে ধীরে ধীরে খানিকটা গন্ধকের গুঁড়ো ঢেলে দাও। এভাবে গন্ধকের গুঁড়ো ঢেলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলন্ত ধুমুচী থেকে ধূপের মতো শাদা-রঙের ধোঁয়া উঠতে সুরু করবে। শাদা-রঙের ধোঁয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছবির ভঙ্গীতে ধুমুচীর জ্বলন্ত-আগুনের ঈষৎ-উপরে লাল-রঙের ঐ জবা-ফুলটিকে হুঁশিয়ারভাবে কিছুক্ষণ ধরে রাখো তাহলেই দেখবে—জ্বলন্ত ধুমুচীর ঐ গন্ধকের ধোঁয়ার তাপ-স্পর্শে টুকটুকে-লাল রঙের জবাফুলটির রঙ বদলে গিয়ে নিমেষের মধ্যেই ক্রমশঃ শাদা হয়ে উঠবে। চোখের সুমুখে বিজ্ঞানের আজব-ভেল্কীর দৌলতে নিমেষের মধ্যেই জবাফুলের লাল-রঙ বদলে শাদা হয়ে যাবার দৃশ্য দেখে দর্শকরা যখন বিস্ময়ে অবাক, ঠিক সেই মুহূর্তে শাদা-রঙের ঐ জবাফুলটিকে জ্বলন্ত-ধুমুচীর গন্ধকের ধোঁয়া থেকে সরিয়ে এনে কিছুক্ষণ বরফের চাঙড়-ভরা পাত্রের কন্‌কনে-ঠাণ্ডা জলের মধ্যে চুবিয়ে রাখো—তাহলেই দেখবে, জবাফুলের শাদা-রঙ বেমালুম বদলে গিয়ে পুনরায় আগের মতোই দিব্যি টুকটুকে লাল-রঙের হয়ে উঠবে।

এই হলো—বিজ্ঞানের রহস্যময়-আজব নিয়মে 'ফুলের রঙ-বদলানো ভেল্কীর' খেলাটির আসল রহস্য।

খেলার কলা-কৌশলের মোটামুটি পরিচয় তো পেলে, এবারে নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে ভাখো এর বিচিত্র কায়দা-কেরামতী।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি নতুন মজার খেলার হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। ত্রিভুজের হেঁয়ালী ঃ

উপরের ছবিতে ছোট-বড় পাল-তোলা আর উড়ন্ত নিশান-আঁটা যে নৌকাটি দেখছো—সেটি আঁকা হয়েছে কয়েকটি ত্রিভুজ সাজিয়ে। ছবিটি ভালোভাবে দেখে হিসাব করে বলো, তো—মোট কতগুলি ছোট-বড় ছাঁদের ত্রিভুজ সাজিয়ে পাল তোলা আর নিশান-আঁটা নৌকার চিত্রটি রচনা করা হয়েছে?

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২। টাকায় যত আম কেনা যায়, তত আনায় মাত্র নয়টি আম মেলে। হিসাব কষে বলতে পারো—টাকায় কয়টি আম মিলবে ?

রচনা : গোপালচন্দ্র পাঁজা (কলিকাতা)

৩। তিন অক্ষরে নাম তার,
সুমধুর স্বর বাজে তায়…
আদ্যাক্ষর বিদায় নিলে,
কিছু নাহি রয় হায়।

রচনা : ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর :

১। এ হেঁয়ালির সমাধান করা যায় খুবই সোজা উপায়ে। সে উপায়টি মাথা ঘামিয়ে হিসাব কষে বার করবার প্রয়োজন নেই…সামান্য একটু মগজের বুদ্ধি খরচ করে গত সংখ্যায় প্রকাশিত কালির আঁচড় টেনে আঁকা সমান-রেখাটির পাশেই, সেটির চেয়ে আকারে বড় আরেকটি রেখা এঁকে দিলেই খুব সোজা উপায়েই হেঁয়ালির সমাধান হয়ে যাবে।

২। জবা।

৩। পিতা, পুত্র এবং পৌত্র।

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুলু মিত্র (কলিকাতা), রণি ও রিণি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), হাবলু, টাবলু, মুমা ও পুতুল (হাওড়া), সৌরাংশুকান্ত ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), পুপু ও ঝুটিন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (পানাগড়), সন্তোষ, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), সংঘমিত্রা ও শর্মিষ্ঠা রায় (কলিকাতা), বুবু ও মিধু গুপ্ত (কলিকাতা), কুলি বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঙ্গালোর), অনাবিল দত্ত (ভালকৌনী), লোকু ও মোনা বন্দ্যোপাধ্যায় (রাঁচী), সুধাংশু, হিমাংশু, হারান ও সীতাংশু মুখোপাধ্যায় (শিলিগুড়ি), কমলেশ রায়চৌধুরী (কলিকাতা), পৃথ্বীশ ও মনতোষ (বর্দ্ধমান), সুনীলকুমার ঘোষ (যজ্ঞছত্র)।

গতমাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

দেবকী ও বিশ্বনাথ সিংহ (নওয়াদা), কল্যাণ, শচীন, ইন্দ্রদত্ত, বিমল ও রজত (কলিকাতা), সমী, পুলু, খুকু ও খোকন চট্টোপাধ্যায় (কৃষ্ণনগর), অভিজিৎ হালদার (আলিগড়), সন্ধ্যা, পুষ্প, সতী ও ভারতী (কলিকাতা), মিতা, সঞ্চিতা ও মঞ্জুশ্রী (কলিকাতা), নন্দকিশোর, শিশির, সমীর, তপতী ও তামসী গোস্বামী (ভালাইগোড়া), রণধীর ও দীপঙ্কর নিয়োগী (কলিকাতা), শুভ্রা, সুশান্ত ও তাপস (বিদ্যাধরপুর), লক্ষ্মী ও সন্ধ্যা গুপ্ত (শাকনাড়া), মদন, বাপ্টি, ভারতী, মিঠু, বুবু ও মঞ্জু সরকার (নগুী), কমা, সীমা, দীপালী, অপর্ণা, রীতা ও জয়ন্তপ্রদীপ বাগচী (কোং), সুমন্ত সুকান্ত ও বনানী সিংহ (মদনপুর), বাণী, শুভ্র ও পার্থ হাজরা (আড়ুই শাকনাড়া), দেবাশীষ মৈত্র (কলিকাতা) ধীরেন্দ্রনাথ মোদক (বাঁশবেড়িয়া)।

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

রবি, দীপিকা ও ঝুনঝুন বন্দ্যোপাধ্যায় (বারাণসী), সত্যচরণ দাস (কলিকাতা), সমরেন্দ্র রায় (বোম্বাই), সুকৃতিকুমার, সুনীতিকুমার, মনোরমা, গৌরীবালা ও মদনমোহন মিশ্র (রামপুর), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (খঞ্জনী), ক্ষুদিরাম, শিবরাম, গোপাল ও শশাঙ্কশেখর মিশ্র (রুইনান)।
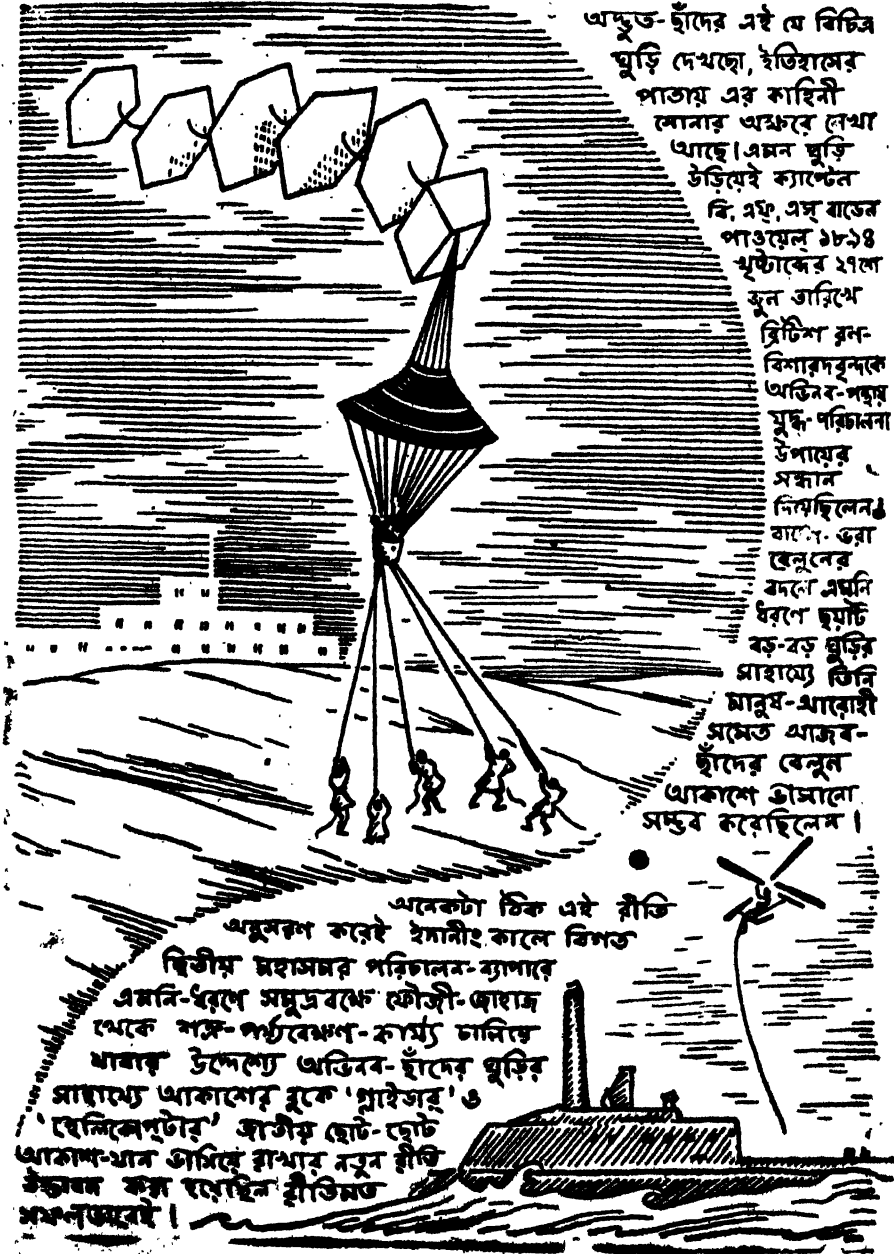
অদ্ভুত-ছাঁদের এই যে বিচিত্র ঘুড়ি দেখছো, ইতিহাসের পাতায় এর কাহিনী সোনার অক্ষরে লেখা আছে। এমন ঘুড়ি উড়িয়েই ক্যাপ্টেন বি. এফ্. এস্ বাডেন পাওয়েল্ ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে ব্রিটিশ রণ-বিশারদবৃন্দকে অভিনব-পন্থায় যুদ্ধ-পরিচালনা উপায়ের সন্ধান দিয়েছিলেন। বাষ্প-ভরা বেলুনের বদলে এমনি ধরণে ছয়টি বড়-বড় ঘুড়ির সাহায্যে তিনি মানুষ-আরোহী সমেত আজব-ছাঁদের বেলুন আকাশে ভাসানো সম্ভব করেছিলেন।

অনেকটা ঠিক এই রীতি অনুসরণ করেই ইদানীং কালে বিগত দ্বিতীয় মহাসমর পরিচালন-ব্যাপারে এমনি-ধরণে সমুদ্রবক্ষে ফৌজী-জাহাজ থেকে শত্রু-পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্য চালিয়ে যাবার উদ্দেশ্যে অভিনব-ছাঁদের ঘুড়ির সাহায্যে আকাশের বুকে 'গ্লাইডার্' ও 'হেলিকোপ্টার' জাতীয় ছোট-ছোট আকাশ-যান ভাসিয়ে রাখার নতুন রীতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল রীতিমত সফলতাভরেই।

ঝিলিক্
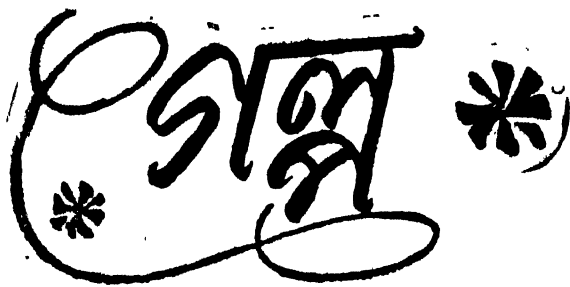
সুনীল রায়

থৈ থৈ জল চারিদিক। যেদিকেই চোখ মেলে তাকানো যাক্ জল চোখে পড়ে। পথ-ঘাট, দূরবিস্তৃত ধানের ক্ষেত সব ডুবে গিয়ে জলের একটা ঘোলাটে সাদা চাদর সারা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। কেবল দু-চারটে বড় গাছ মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে ওখানে ভাসছে কুঁড়ের চাল, ভাঙা গাছের ডাল, কচুরীপানার স্তূপ। একটা শূন্য স্তব্ধতা সেই আদিগন্ত জলের ওপর থমকে দাঁড়িয়ে আছে।

সনাতন শালতির ওপর দাঁড়িয়েছিল। ওর রোগা ছিপছিপে দেহটায় এখন একটা ঋজু কাঠিন্য। উত্তেজনায় চোখ দু'টা চকচক করছিল সনাতনের।

আমার কিন্তু মন্দ লাগছিল না। শালতির ওপর চাল, চিঁড়ের বস্তা আর শাড়ী-জামা কাপড়ের গাঁট নিয়ে আমি ঐ বন্যার জলের দিকে তাকিয়ে সনাতনের মহৎ অন্তঃকরণটার কথাই ভাবছিলাম।

অথচ আমি নিজে এতটা উৎসাহ অনুভব করিনি। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে দৈনিক সংবাদপত্রে সচিত্র বন্যার খবর দিনের পর দিন পড়ে গেছি, আলোচনা করেছি এবং কখনও ঈশ্বরকে কখনও বা রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্ণধারদের দোষা-রোপ করেছি বন্যাজনিত মানুষের সমূহ ক্ষতির জন্ত। কিন্তু সনাতন—। সনাতনের কথাই আলাদা। সনাতনই আমায় টেনে আনল এখানে ঝিলিকের কাছে।

নেহাতই নিরীহ স্কুল-মাষ্টার আমরা দশটা-চারটে দেশের ভবিষ্যৎদের পড়িয়ে দিন গুজরাণ করি। দেশ-সেবার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে কৈশোরে ও যৌবনে অনেকবার রোমাঞ্চিত হয়েছি। কিন্তু কৈশোরের একটী নির্মম স্মৃতি মনে থাকায় ওদিকে আর পা বাড়াইনি। সে সময় বিলিতী ট্রামে ঢিল ছুঁড়তে গিয়ে পিঠে পুলিশের ব্যাটনের মৃদু আঘাত বারবার ওপথে যেতে আমায় নিরস্ত করেছে। তারপর বড় হয়ে পুলিশের টিয়ার গ্যাস, গুলী আর জেলখানার ভয়াবহতার কথা ভেবে দেশসেবার আগ্রহটা একেবারেই চেপে গিয়েছিলাম।

কিন্তু সন তনও স্কুল-মাষ্টার। আমরা বি, এ, পাশের তক্‌মা এঁটে ঐ পথেই ঢুকে পড়েছি। দক্ষিণা যাই হোক্, ইজ্জত আছে। স্কুল-মাষ্টার হ'য়েও সমাজসেবার আগ্রহটা আমার মত ওর নিভে আসেনি, বরং দিনের পর দিন তা আরও জলন্ত হ'য়ে উঠেছে। সনাতনকে এ জন্তে আমি শ্রদ্ধা করেছি মনে মনে। দশটা-চারটে স্কুল মাষ্টারী করেও ও যে এখনও বিশেষ এক জীবে পরিণত হয়নি উপরন্তু সমাজ সম্পর্কিত বৃহৎ প্রশ্নটা মনে রেখেছে এ জন্তে আমার হৃদয়ের স্বতোৎসারিত ভক্তি সহজেই ও আকর্ষণ করতে পেরেছে।

সনাতন বলেছে—ত্যাখ্ অঞ্জন, এই ঠিক পথ। কি দরকার আমাদের বেশী পয়সায়। তবু তো মাষ্টারী করলেও খানিকটা দেশের কাজ হবে। ধর্ম্ম কর্ম্ম না করা গেলেও ধর্ম্মের ভাণটুকু তো ভাল। তাছাড়া তুই যা ভীতু আর কুঁড়ে, তোকে দিয়ে তো আর অন্ত কাজ হবে না। তোর পক্ষে এই মাষ্টারীই ভাল।

সনাতনের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তে আমি কোনদিন আপত্তি করতে পারিনি এবং তা আমার অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয়েছে। আমি রাজী হয়ে গিয়েছিলাম।

—আর একটা কথা কি জানিস, সনাতন একবার দম নিয়েছিল।—বিয়ে—আমাদের করা উচিত নয় আর ও হবেও না। কারণ মেয়েগুলো যা চায়, আমাদের তার কোনটাই নেই। তোরও নেই, আমারও নেই। টাকাও

নেই, রূপও নেই। অতএব—আমরা দেশের জন্যেই জীবনটা উৎসর্গ করব বলে ঠিক করে ফেলেছিলাম।

—রাজনীতি তুই পারবি না। লাঠি, গুলি, টিয়ার গ্যাস। নানান মত, নানান তত্ত্ব। আমিও ওসব করতে চাইনা। তার চেয়ে দুজনে সমাজসেবা করেই জীবনটা কাটাব, ব্যস। এই আজ থেকে আমাদের লাইন।

—কিন্তু একটা কথা কি জানিস অঞ্জন,—ডানহাতের তর্জনীটা তুলল সনাতন—সমাজের সেবা করতে গেলেও গায়ের জোরের দরকার। তোর যদি ক্ষমতাই না রইল তাহলে দেশের কাজ তুই আর কি করবি। এ জন্যে আমি একটা ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি। ঐ বড় রাস্তার ওপর পাঞ্জাবীদের প্রেম হোটেলটা দেখেছিস তো, ওখানে সপ্তাহে তিনদিন ক'রে রুটি আর মাংস খাব দুজনে, বুঝলি।

সনাতনের আশ্চর্য্য দূরদৃষ্টি দেখে আমিও আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলাম। সনাতনের বা আমার স্বাস্থ্য সমাজ সেবার মত কঠিন কাজের উপযোগী কি না সে সম্পর্কে প্রথম থেকেই আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এখন দেখলাম সনাতন সে কথাটাও ভেবে দেখেছে।

এরপর প্রায় বিনা বিতর্কেই আমরা একটা স্থির লক্ষ্যে আসতে পেরেছিলাম এবং আমাদের যৌবন সঞ্জাত কর্মপ্রেরণা একটা 'লাইন' পেয়ে গিয়েছিল।

আজ সেই লাইনের কাজেই সনাতন আমাকে টেনে এনেছে। আবাল্য বন্ধু সনাতন। একসঙ্গে পাশ করেছি, রুজী রোজগারও এক জায়গায় সুতরাং—

—দেখ্‌ছিস্ একবার দেশের চেহারাটা অঞ্জা। ছাখ্, চোখ খুলে ভাল করে একবার তাকিয়ে ছাখ্। ঘরকুণো হ'য়ে বসে থাকিস, চায়ের দোকানে বসে লম্বা লেক্‌চার ঝাড়িস আর এদিকে বাংলা দেশটা একেবারে—

সনাতনের সঙ্গে তুলনা করলে নিজেকে আমার সত্যিই ভারী ছোট মনে হয়। সৎসঙ্গে থেকেও আমার হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা আজও ঘুচল না। মহত্তর, বৃহত্তর কারণে নিজেকে আজও উদ্বোধিত করতে পারলাম না। অথচ সনাতন, সেও তো আমারই মত একটা মানুষ। ও যা পারে, আমি তা পারিনা কেন!

সনাতন মুখালে কথা বলে যাচ্ছিল মাঝির সঙ্গে। দামোদর, রূপনারায়ণ আর ঐ মরা খালের মত সরস্বতী—সেও ভাসিয়ে দিয়েছে গেরামের পর গেরাম। জোত জমি সব ডুবে গেল, গরু-ছাগল সব ভেসে গেল; মাটির ঘর, কুঁড়ের চাল—চিহ্নটা নেই বাবু আর কিছু।—আর সেই কালগাছিয়ে রূপনারায়ণের বাঁধ ভাঙল—হাজার হাজার লোকের ঝুড়ি কোদাল নিয়ে কি চেষ্টা বাবু। এখন তো তবু জল কমেছে, ওদিকের নতুন বাঁধের ওপর দিয়ে জল কাদা ভেঙে লোক হাঁটতে পারছে, কিন্তু তখন সব একাকার।

—অঞ্জা শুন্‌ছিস, শুধু ছেলেমেয়ে পড়িয়ে দেশের সেবা হয় না। আমি মরমে মরেই ছিলাম। সনাতনের কথায় এবার নিজেকে অপরাধী বলে মনে হোল। ভাবলাম আজ যখন সুযোগ এসেছে, তখন পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবই।

ষ্টেশন থেকে মাইল খানেক জল-কাদা ভেঙে আমরা চারটে দল মালপত্র নিয়ে শালতিতে এসে উঠেছি। আমার দলে আমি আর সনাতন। আর তিনটে দল তিনদিকে গেছে। পথে আসতে আসতে কিছু কাপড়-জামা বিলিয়ে দিয়েছি। এবার খানকয়েক প্রায় ধুয়ে-মুছে যাওয়া মাটীর বাড়ীর পাশে একটা ছোট পাকা বাড়ী আমাদের চোখে পড়ল।

—নে, চিড়ের বস্তাটা এবার খোল অঞ্জা। সনাতনের দৃষ্টিও দেখলাম ঐদিকে।

উঁচু জায়গায় জল কমে এসেছে। শালতিটা বাড়ীর কাছে যেতেই সনাতন লাফিয়ে নেমে পড়ল। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা খুলে দাঁড়ালেন এক মহিলা। সঙ্গে একটা খুকী, আর পাশের জানালায় উঁকি দিল নীল শাড়ী পরিহিতার একজোড়া ডাগর কালো চোখ।

আমি বোধহয় জানলার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে ছিলাম। সনাতন ধমক দিল—

—হাঁ করে দেখছিস্ কি! চাল-চিঁড়ের বস্তা আর কাপড় জামা নিয়ে আয় বাড়ীর ভেতর।

সনাতন হুকুম দিয়েই খালাস। চাল-চিঁড়ের বস্তা আর কাপড় জামার গাঁট নিয়ে যাওয়া আমার একার পক্ষে কষ্টসাধ্য। কিন্তু দেশের কাজ আর সনাতনের আদেশ—দুটোই অলঙ্ঘ্য। অনেক কষ্টে যখন একটি

একটি করে সেগুলো নিয়ে বাড়ীর ভেতর গেলাম দেখি সনাতন বক্তৃতা জুড়ে দিয়েছে।

ঐটেই সনাতনের স্বভাব। যেখানেই যাক্, লম্বা বক্তৃতা না করে সনাতন সেখান থেকে উঠবে না।

—মা, এই আমাদের লাইন। আপনাদের এতবড় বিপদে আমরা পাশে এসে দাঁড়াব না—দেশের এই দুর্গতিতে আমরা কাছে নামব না—লেখাপড়া শিখে বি, এ পাশ করলাম কেন তবে—অমানুষ তো নই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

তাই তো বাবা, তোমাদের মত ছেলেরা আছে বলেই তো আমরা আজও টিকে আছি। ভদ্রমহিলা বিগলিত হোলেন।

—কি যে বলেন মা, এটা আমাদের একটা পবিত্র কর্ত্তব্য। সনাতনের অনর্গল বক্তৃতা আমার কাছে এক একসময় পীড়াদায়ক, কখনও বা হাসির উদ্রেক করে। কিন্তু সেদিকে সনাতনের ভ্রূক্ষেপ নেই। সমানে বলেই চলেছে—

স্কুল-মাষ্টারী করি মা, বললাম ছুটি দাও। দেশের ডাক আমার কাছে সবচেয়ে বড়। আর ছুটি না দাও তো রইল তোমার চাকরী। কিসের ভয় বলুন না মা, কে আর আছে আমার—বিয়ে-থা যখন করিনি—

ঐ সনাতনের বড় দোষ। দম-দেওয়া কলের গানের মত কথা বলে চলে, হাঁড়ির খবর শুদ্ধ দিয়ে বসে। বিয়ে এখনও হয়েছে কি না হয়েছে জানাবার কি দরকার।

আধ-বস্তা চিঁড়ে আর বেছে বেছে থান ছয়েক ভাল শাড়ী সনাতন নামিয়ে দিল মেঝেতে। এতগুলো কাপড় এক বাড়ীতে দেওয়ায় আমি অনুচ্চকণ্ঠে বোধহয় কিছু বলে ফেলতে যাচ্ছিলাম, সনাতন তা লক্ষ্য করে ওর সেই সনাতনী নেতা সুলভ ভঙ্গীতে বলল—

বস্তাগুলো নিয়ে শালতিতে গিয়ে তুই ততক্ষণ ব'স। আমি যাচ্ছি একটু পরে।

ওর আদেশের সুরটা আমার কাছে পরিচিত। অগত্যা আমার উঠে এসে শালতিতে বসতে হোল।

বেশ কিছুক্ষণ পর সনাতন ঐ বাড়ীটা থেকে বা'র হোল। হাসিমুখ। এতগুলো বন্যাপীড়িত মানুষকে রিলিফ করার গৌরব নিয়ে ও ফিরছে। হাসিমুখেই তার ও দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে—সেই ডাগর কালো চোখ দুটিও এখন খুশীতে উজ্জ্বল।

সনাতন শালতিতে এসে বসে মুখ গম্ভীর করল।

আমি বললাম—চিঁড়ে তো প্রায় উজাড় করে—ওখানেই ঢেলে দিয়ে এলি, আর জামাকাপড় তো মোটে খানচারেক আছে। আর কোথাও রিলিফ দেওয়ার দরকার নেই বোধহয়।

সনাতন আমার কথাটা কানে নিল বলে মনে হোল না। কয়েকটা মাছরাঙা ছোঁ মেরে উড়ে বেড়াচ্ছিল। সেদিকে তাকিয়ে সনাতন বলল—

—এই তো আমাদের দেশের অবস্থা। বছরের পর বছর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে। একটা পরিবার আজ অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে। দুটি স্ত্রীলোক আর একটি শিশু।

—অজ্ঞা, বলতে পারিস, এদের কি হবে? সব ডুবে যেতে বসেছে যে!

আমার মনে হোল সত্যিই তাই। সনাতনের চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বিশ্বগ্রাসী প্লাবনের মধ্যে নোয়াকে স্মরণ করার চেষ্টা করলাম। দেখলাম নোয়া নয়—একমাত্র সনাতনই শালতি নিয়ে এই নিখিল বারিধির মধ্যে ভেসে রয়েছে।

সনাতনের চিন্তা আমাকেও চিন্তিত করে তুলল। খানিক পরে বললাম—কি করবি তাহলে?

সনাতন কোন জবাব দিল না। ধবধবে সাদা এক-ঝাঁক উড়ন্ত বকের দিকে চেয়ে রইল।

অনেক পরে গম্ভীরস্বরে বলল—এই আমাদের লাইন। তুই ফিরে যা, তুই পারবি নে। বড় শক্ত লাইন, আমাকে একাই সব করতে হবে।

খুবই মর্ম্মাহত হলাম। সনাতনকে আমি শ্রদ্ধা করি মনে মনে। ওর বিরাট হৃদয়টা দেশের দুঃখে অহরহ কাঁদছে আমি সব সময় দেখতে পাই। তাতে আমার মত অলস, কর্ম্মবিমুখ মানুষও অনুপ্রাণিত হয়। কিন্তু সেই সনাতনই এখন আমাকে বলছে ফিরে যেতে। সামান্য রিলিফ দিয়ে দেশসেবার গৌরবটুকুও ও আমার কেড়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু নান্যঃ পন্থাঃ। 'চিরকাল সনাতনী লেজুড়ই আমি

অত্যন্ত—পরিচালিতও। সুতরাং তাড়াতাড়িই আমাকে ফিরে আসতে হোল।

এরপর অনেকদিন সনাতনের দেখা পাইনি। খবর নেবার চেষ্টা করেও খবর পাইনি। হঠাৎ একমাসেরও পর সনাতন একদিন এসে হাজির হোল।

কি ব্যাপার তোর? কোন খবর নেই—ভুলে যাস না। তোর দেশের বাড়ীর ঠিকানায় দু-দু'খানা চিঠি দিলাম—জবাব নেই! বন্যার জল তো কবে স'রে গেছে। কি করছিলি এতদিন? কি ভেবেছিস কি?

একদমে অনেকগুলো কথা বলে আমি হাঁপাচ্ছিলাম। সনাতন কিন্তু আমার একান্ত সংশয়াকুল ও উদ্বিগ্ন মনের আঁচ পেয়েও একটুও বিচলিত হোল না। তা সত্বেও আমি আবার বললাম—তোর কি রিলিফের কাজ এখনও শেষ হয়নি?

—তুই ভুলে যেতে পারিস অজা কিন্তু আমাদের লাইন, আমি ভুলতে পারি না।

কথা বলতে বলতে আমার কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে বলল —চল্ হোটেলে চল্, সেখানেই সব বলব।

দীর্ঘদিন পর আবার প্রেম হোটেলের একটা নিরিবিলি ঘরে এসে বসলাম দুজনে।

সনাতন একবার তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশ দেখে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল-অজা, বোমা বানাতে পারিস? বোমা—

আমি হোটেলের চেয়ারেই বসেছিলাম কি মেঝের পড়ে গিয়েছিলাম ঠিক মনে নেই; তবে মনে হ'য়েছিল— আমি ঠিক আমি নেই—অথবা সামনে যে লোকটা বসে আছে সে সমাজসেবী সনাতন নয়।

খানিকপরে সনাতনের হাতে আর একটা ঝাঁকানি খেয়ে ফের ঐ কথা শুনলাম—

—কিরে, পারিস কিনা, বল্ না। বোমা বানাতে পারিস?

এবার সনাতনের দিকে তাকালাম। উস্কোখুস্কো চুলে ওকে এখন ভয়ানক মনে হচ্ছে। ভয়ে ভয়ে বলে ফেললাম —না তো।

ধমকে উঠল সনাতন। চাপা ফিসফিসে গলায় বলল—ইডিয়ট! তুই না সায়েন্স-গ্র্যাজুয়েট! একটা সামান্য বোমার ফর্মুলাও জানিস না। আরে অ্যাটম, হাইড্রোজেন, ভুষণ-তে বোমার কথা বলছি না—এমনি— মানে অতিনারী বোমা।

তারপর স্বগতোক্তি করল, আমার যে আর্টস ছিল। সত্যিই নিরতিশয় লজ্জিত হলাম। আমি একজন সায়েন্স গ্র্যাজুয়েট, অথচ একটা সামান্য বোমাও বানাতে পারি না।

হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল আমার মাথায়। বললাম— আচ্ছা, এক কাজ করলে তো হয়। আমাদের পাড়ার রামগুণ্ডাকে বললে নিশ্চয়ই হয়। ওরা তো ওসব বানাতে পারে। ওদের বললে –

—কে? কার কথা বলছিস? সনাতন প্রশ্ন করল।

—আরে রামগুণ্ডা মানে ঐ রাম—পাড়ার লোকে যাকে রামবাবু বলে ডাকে।

—ননসেন্স। সনাতন আর একবার ধমকে উঠল।

মনে মনে খুবই ক্ষুব্ধ হলাম। একটা ছোটো অতিনারী বোমা বন্ধুর বিপদে যদি না তৈরী করে দিতে পারলাম, তাহলে আমার দ্বারা আর কি হবে!

কিন্তু বিপদ! বিপদটাই বা কি হোল সনাতনের। এতক্ষণে যেন আমার সম্বিৎ ফিরে এল। আসল কথাটাই তো এখনও জানা হয়নি সনাতনের কাছ থেকে।

অনেক সাধ্য-সাধনার পর সনাতনের মুখ থেকে অল্পে অল্পে বেরুতে লাগল—

—তুই তো দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতন চলে এলি সেখান থেকে।

—তুইই তো চলে আসতে বললি আমায়। আমি বাধা দিলাম।—চুপ কর, বাজে বকিস না। সনাতন থামিয়ে দিয়ে আমায় বলে চলল এই দীর্ঘ একটা মাস ধরে সনাতনকে কি কঠোর পরিশ্রমই করতে হয়েছে তারই সবিস্তার কাহিনী শোনাল সনাতন একটু একটু করে।

—রিলিফের কাজ হাতে নিয়ে ওদের বাড়ীতে গিয়ে যখন পড়লাম, কি ভাবল সনাতন উদাস চোখে—কি করি বল্, একটা সহায়-সম্বলহীন পরিবারকে তো আর জলের মধ্যে ফেলে আসতে পারিনে—আমাদের লাইন—

সুতরাং এই একটা মাস সনাতনকে ওদের বাড়ী থেকে হয়েছে। চাল-চিঁড়ে সংগ্রহ করে দিতে এসেছে। উদ্ধৃত

শাড়ী-জামা-কাপড় সবই দিয়েছে এবং আরও কি কি সব দিয়েছে। আর শেষ পর্য্যন্ত বকুলকে—

বকুল? বকুল আবার কে রে? আমি সোজা হয়ে বসলাম চেয়ারটার ওপর।

ঐ মেয়েটি—সেই বড় মেয়েটি। সনাতনের গলাটা বড় মোলায়েম শোনাল।

হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সনাতন।

—জানিস, বকুল আমসত্ত খেতে খুব ভালবাসে। ক'বার নিয়ে গিয়েছিলাম।

কথাটা বলে ফেলেই সনাতন চকিতে আত্মসংবরণ করে নিল। আবার গম্ভীর হয়ে গেল।

—ঐ বকুলকে পড়াতে হচ্ছে। সামনেই ওর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। কি করব—এই যখন আমাদের লাইন।

এ পর্য্যন্ত শুনে গেলাম। কিন্তু বোমা?

এতক্ষণে সনাতন দার্শনিকের মত একটু হাসল।—বলেছিলাম না, সমাজের সেবা করতে গেলেও গায়ের জোরের দরকার হয়। কারণ তুমি ভাল করতে চাইলেও লোকে বুঝবে না। এখানেও ঠিক তাই হয়েছে। পরের উপকার করা যাদের সহ্য হয় না—ঐ গ্রামের এই রকম একদল লোক সনাতনকে শাসিয়েছে যেন সে আর এ গ্রামে না ঢোকে। বকুলের মাও ভয় পেয়ে গেছে। সনাতনকে ওদের বাড়ী যেতে নিষেধ করেছে। কিন্তু তাই বলে গোটাকতক লোকের ভয়ে সনাতন তো আর পিছিয়ে আসতে পারে না। একটা অসহায়—

সুতরাং বোমা। এতক্ষণে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। চোখের সামনে বন্যার জল আবার দেখতে পেলাম। বন্যার জল সরে গেছে, কিন্তু বন্ধুর হৃদয়ে আর এক প্রাণবন্যা দেখা দিয়েছে।

হঠাৎ কি ভেবে উঠে পড়ল সনাতন।

—ঠিক আছে, শনিবার রেডি হয়ে থাকিস। আমার সঙ্গে যাবি।

আবার সেই ঝিলিক। এবার দেশের জন্যে নয়—সনাতনের জন্যে।

গ্রামে পা দিয়ে আমার শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুততর হ'য়েছিল, মুখে-চোখেও হয়তো একটা আতঙ্কের ছায়া পড়েছিল কিন্তু সে কথা সনাতন'কে বলা যায় না, বলতে পারিওনি। কারণ যে মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা উৎসর্গীকৃতপ্রাণ, সেখানে তুচ্ছ প্রাণের ভয়কে প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। কাপুরুষের মত বলা যায় না—আমি যেতে পারব না।

সামনে চলতে চলতে আমরা গ্রামের হাটের কাছে এলাম। বকুলদের বাড়ী আর বেশী দূরে নয়। জনকয়েক লোক কিছুদূরে জটলা পাকিয়েছিল। আমাদের দেখেই হেসে, চোখে চোখে ইশারা ক'রে এবার গলা খাঁকারি দিয়ে এগিয়ে এল।

তারপর বোধহয় কয়েকটা মুহূর্ত্ত। কোথা দিয়ে কি ঘটে গেল আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। সনাতন আমায় একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আর নিজে গিয়ে দাঁড়াল একটু দূরে—একটা উঁচু জায়গায়। সনাতনের চীৎকারে আমার সম্বিৎ ফিরে এল।

—বা'র কর বোমাগুলো অজ্ঞা, দেখি একবার। সনাতন হালদা'কে এরা চেনে না। দেখি একবার কার কত বুকের পাটা—

ওর চীৎকার উত্তরোত্তর বিকট হ'য়ে উঠল—

প্রাণের মায়া যদি থাকে তাহলে আর এক পাও এগোবে না। এক একটি বোমাতে সব কটার মাথা এখানে রেখে দিয়ে যাব।

উঃ সে কী ভীষণ মূর্ত্তি সনাতনের। চকিতে হাতের ব্যাগটা থেকে বড় বড় তুবড়ীর মত বোমা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে—ওরা তো দূরের কথা আমি পর্য্যন্ত আর এক পাও এগোতে সাহস পেলাম না।

হতভম্ব লোকগুলো প্রথমটায় এক পা এক পা করে তিন পা পিছিয়ে গেল, তারপর পেছন ফিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ল। যাবার সময় চীৎকার করে বলে গেল—শালা বোমা এনে গাঁয়ের মধ্যে হামলা করছে—পুলিশে খবর দোব।

পলায়নপর লোকগুলোর দিকে চেয়ে আমি কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়েছিলাম। বুকটা আমার আরও জোরে ওঠা-নামা করছিল। গলাটা শুকিয়ে গিয়ে কি যেন একটা জমাট বেঁধে এসেছিল। অনেকক্ষণ পর আমার মুখ দিয়ে শুধু একটা কথা বা'র হোল—

—বোমা—

হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল সনাতন। দিগ্বিজয়ের হাসি। বুক টান করে আমার সামনে এসে দাঁড়াল যেন ছদ্মবেশী বৃহন্নলা।

—আরে দূর বোকা, বোমা কোথায়! ছেঁড়া কাপড়, টুকরো চট, রঙচঙে কাগজে জড়িয়ে মুখে পলতে লাগিয়ে দিয়েছি। বি, এ, তে আমার তো সায়েন্স ছিল না—আর্টস্ নিয়েছিলাম যে। চল, ঐ বকুলদের বাড়ী।

বকুলের বাড়ীতে ঢুকতেই বকুলের মা কাঁদো কাঁদো হ'য়ে ছুটে এলেন—

তুমি আবার কেন এলে বাবা। গাঁয়ের লোক জোট পাকিয়ে তোমায় মারবার চেষ্টা করছে। আমাদেরও দুর্নাম করছে—তুমি চলে যাও বাবা। আমাদের সত্যিই তুমি অনেক উপকার করেছ, তবু তুমি চলে যাও—

বকুলের মার ভয়কাতর মুখের দিকে তাকিয়ে সনাতন সশব্দে হাসতে লাগল—

কিচ্ছু ভাববেন না মা, সব ব্যাটাকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। এই যে বোমা—

সনাতন ব্যাগ থেকে একটা বোমা বার করে দেখিয়ে হাসতে লাগল।

দরজার কাছে থমথমে মুখে এসে দাঁড়াল বকুল বকুলই নিশ্চয়। সেই ডাগর কালো চোখ। কালো মেঘের মত একরাশ কালো এলোচুল পিঠময় ছড়িয়ে পড়েছে। বকুলকে সুন্দরীই মনে হোল।

সনাতন ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। অনেকক্ষণ ফিসফিস করে কথা হচ্ছিল ওদের। আমাকে বাইরে দালানে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল। আমি বাইরে বসে ওদের চাপা কথাবার্তা শোনবার চেষ্টা করছিলাম।

প্রায় দশমিনিট পর—ফোঁসফোঁসানি শুনলাম। কি হোল! বোধহয় বকুল কাঁদছে। সনাতন অনর্গল বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে। আর বকুল কাঁদতে কাঁদতে 'না'—'না' বলছে।

এরপর আরও পনেরো মিনিট বাদে যখন সনাতন ঘর থেকে বেরিয়ে এল তখন ওর মুখ দেখে মনে হোল সনাতনের জয় হয়েছে।

—চলে আয়—

আর কোন কথা নয়। সনাতন আমাকে নিয়ে বাড়ীর বাইরে চলে এল। আমার আশঙ্কা হোল বকুলই হয়তো ওর—মা'র—মত ওকে আসতে নিষেধ করল। কিন্তু সনাতন আমায় কোন কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দিল না। সেই সনাতনী নেতৃত্ব।

কিছুদূরে একটা খালের বাঁশের পুলের ওপর আমাকে নিয়ে দাঁড়াল সনাতন। তারপর উদাস শূন্য মনে অনেকক্ষণ থেমে থেমে একটির পর একটি বোমা খালের জলে ফেলতে লাগল।

সব বোমা ফেলে দিয়ে সনাতন ফাঁকা আকাশটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দেখলাম সনাতনের চোখদুটো আস্তে আস্তে জলে ভরে আসছে।

—কাঁদছিস? আমি এতক্ষণে আমতা আমতা করলাম।

—সব-মিথ্যে।

—কি মিথ্যে?

—বকুল আর পড়বে না আমার কাছে।

—না পড়ল তো ভারী বয়েই গেল। চটপট বোকার মত বলে ফেল্লাম আমি।

—তুই কোনদিন মানুষ হ'তে পারবিনে অজ্ঞ। এটাই যে আমাদের লাইন।

আমি আদর্শবাদী সনাতনের দিকে তাকিয়ে রইলাম। সনাতনকে দেখে দেখে আমার বিস্ময় আরও বাড়তে লাগল। কি এত মাথাব্যথা পড়েছে সনাতনের যে এত বিপদ তুচ্ছ ক'রে একটা অচেনা অজানা মেয়েকে পাশ করাতে হবে। শুধু আমাদের লাইন বলেই এত ঝুঁকি নেওয়া।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সনাতন বলল—চল্।

সেই চলে এলাম আমরা দুজনে। বকুলের মা'র নিষেধ, বকুলের প্রত্যাখ্যান। সনাতন আর—ওমুখো হয়নি। আমিও নিশ্চিন্ত ছিলাম। জোর করে কারোর ভাল করা যায় না। যারা ভয় পেয়ে ওর নিঃস্বার্থ উপকার ফিরিয়ে দিয়েছে সনাতন তাদের জন্যে আর কি করতে পারে! কিন্তু আমার চোখের সামনেই সনাতন ক্রমশঃ বদলে যেতে লাগল। কেবল গম্ভীর আর উদাসীন হয়ে থাকে; কথা বললেও ভাল করে জবাব দেয় না। ওর মুখে আস্তে আস্তে দাড়ি বাড়তে লাগল এবং সে দাড়ি মুখ ভর্তি হয়ে নীচের দিকে নামতে লাগল।

—কি ব্যাপার তোর, নাপিতের সঙ্গে অসহযোগিতা করছিস কেন? কি বিশ্রী দাড়ি রেখেছিস।

—অশৌচ—সনাতন শুধু একটি কথা বলল।

আমি খুব আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলাম। সনাতনের কোন আত্মীয়বিয়োগের কথা আমি শুনিনি। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

—অশৌচ কিসের?

—সমস্ত দেশের জন্যে অশৌচ।

—দেশের জন্যে অশৌচ পালন করছিস—সে আবার কি রে? আমি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম—অনশনও করছিস নাকি?

—না শুধু অশৌচ। আর সুরু হোল সনাতনের সেই অনর্গল বক্তৃতা।

—দেশটা জাহান্নামে গেছে—মানুষের কোন আদর্শ নেই।

—সবাই অর্থ আর ক্ষমতার জন্যে লালায়িত। কেউ কাউকে ভালবাসে না—মানুষের হৃদয় মরে গেছে।—সব [illegible] বিশ্বাস হারিয়েছে মানুষ—সন্দেহ আর হিংসার রাজত্ব চলেছে—ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে যে কত ভাল ভাল কথা সেদিন সনাতন বলেছিল তা লিখে রাখলে আজ হয়তো মনে থাকত।

কিন্তু সনাতন কেন যে এসব কথা বলতে আরম্ভ করল আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমি রীতিমত চিন্তিত হ'য়ে পড়লাম। আমার মনে হোল ও ঠিক সুস্থ নেই; ওর মাথায় হয়তো কিছু গোলযোগ ঘটেছে। বিশেষ ক'রে ওর রোগা খাটো চেহারাটা এখন একমুখ দাড়িতে আচ্ছন্নথাকায়—আমার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হ'য়ে উঠল।

এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত একদিন মামীকেই ধরে পড়লাম। আমার মামী যথেষ্ট আধুনিকা। কলকাতার কলেজের এককালীন মেধাবী ছাত্রী। সমাজ সেবাও এককালে কিছু কিছু করেছেন।

মামীকে গিয়ে বললাম—সনাতনকে বাঁচাতেই হবে।

মামী আমার কথা-বার্তা শুনে প্রথমটায় যাবড়ে গিয়েছিলেন; তারপর সবকথা শুনে সনাতনকে একদিন নিয়ে আসতে বললেন।

সনাতনকে গিয়ে বললাম—আমার ছোটমামীকে জানিস তো? চল্‌ তোকে ডেকেছেন।

কেন? সনাতন জিজ্ঞেস করল।

—তা তো জানি না, তবে চল না একবার দেখা করে আসবি।

আমার আসল উদ্দেশ্যটা সনাতনের কাছে গোপন করলাম।

—মামীও এককালে কিছু কিছু সোশ্যাল কাজ করেছে রে—চল্‌ না একটু আলাপ করে আসবি।

সনাতন রেগে উঠল।

—ঐ মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে বল্‌বে না আমায়। সোশ্যাল কাজ ওরা আবার করবে কি—ওদের জন্যেই কাজ পণ্ড হয়।

সনাতনের কাছ থেকে এরকম কথা এই প্রথম শুনলাম। হঠাৎ কি সনাতনের মত বদলে গেল না কি? মেয়েদের সম্বন্ধে সনাতনের বরং আগ্রহই দেখেছি এর আগে। সমাজের অর্দ্ধেককে আমরা ঘরে বন্ধ করে রেখেছি। ওদেরও কাজে লাগান দরকার।

আর সেই সনাতনই উল্টো কথা বলছে এখন। মামীর সঙ্গে দেখা পর্য্যন্তও করতে চাইছে না।

তবু সংসারে অঘটনও ঘটে। অনেকদিন সাধ্য-সাধনার পর যেদিন সনাতন মামীর সঙ্গে দেখা করল সেদিন থেকে সনাতনও বদলাতে লাগল। এখন আর মেয়েদের সম্বন্ধে কোনরূপ বিরূপ মন্তব্য করে না, মুখ ফিরিয়ে চলেও যায় না। বরং দিনে দিনে মামীর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা বাড়তে লাগল এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক-দিন মামীর কাছে সনাতনকে দেখতে পেতাম। মামী ও সনাতনের সঙ্গে কি সব পরামর্শ করতেন। মাঝে মাঝে দেখতাম সনাতন পোষ্ট অফিসে যাচ্ছে ঘন ঘন, আর মামীও কাকে কেবল চিঠি লিখছেন। এ সবই আমাকে আড়াল করে।

আমি অধৈর্য্য হয়ে উঠলাম। এরকম লুকোচুরি করার কি আছে। শেষে একদিন আর না থাকতে পেরে আমি মামীকে জিজ্ঞেস করে বসলাম—

—তোমরা তো বেশ লোক। আমাকেই বাদ দিয়ে দুজনে চুপিচুপি কি করছ কিছুই বুঝতে পারছিনে। কি বুঝলে বল তো?

—বুঝব আর কি! সমাজসেবা না ঘোড়ার ডিম। তোমার সনাতন বকুলকে বিয়ে করতে চায়। মামী মুচকে হাসলেন।

দপ করে মামীর ওপর আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। বোধহয় ঘুঁষিও পাকিয়েছিলাম। অন্য কেউ হ'ল কি হোত বলা যায় না, নেহাত মামী বলেই সেদিন থেমে গিয়েছিলাম। সনাতনের সমাজসেবা সম্বন্ধে কেউ কটাক্ষ করলে বা তার আন্তরিকতায় সন্দেহ করলে আমি কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারি নে।

মামী কিন্তু একটুপরেই অকাট্য প্রমাণ হাজির করলেন। বকুল আর বকুলের মায়ের চিঠি। সব ব্যবস্থাই পাকা হয়ে গেছে। তবে সবটুকুই গোপনে করা হবে। গাঁয়ের লোক কেউ আগে থেকে কিছু জানতে পারবে না।

সনাতনকে চিনতে সেদিন আমার একটু কা[illegible] হ'য়েছিল। মুখের দাড়ি অপসৃত। মাথার চুল তৈল স্নিগ্ধ হ'য়ে সযত্নবিন্যস্ত এবং নতুন সিল্কের পাঞ্জাবীতে ও[illegible] সনাতন চেহারাটাই বদলে গেছে।

সনাতনকে একদৃষ্টে দেখতে লাগলাম। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনটা দার্শনিক হ'য়ে উঠল। দেখলাম এই সেই নিত্য লীলা। ভাবলাম ইনি সনাতন—ইনিই আদিতে ছিলেন, ইনিই পুনর্নব। সনাতনম্ এনম্ আহু: উতাদ্যস্যাং পুনর্নব।

অনেক পরে বললাম—তোর মনে এই ছিল!

সনাতন হাসল না। আগের মতই গম্ভীর হয়ে বলল—নাঃ, তুই কোনদিন মানুষ হতে পারবিনে অজা। আমাদের লাইনটা—

ওদের বাসরে দাঁড়িয়ে আমার ঐ কথাটাই মনে হ'য়েছিল। সনাতন লাইনটা ঠিকই ধরেছে—অন্তত একজনকেও ও রিলিফ দিতে পেরেছে।

এ বিবাদ মিটিবেনা

শ্রীঅসিতবরণ চৌধুরী

তোমার সাথে আমার বিবাদ মিটবেনা আর…।
নীলাক্ত আকাশের আবরণে ঢাকা
পৃ'থবীটা বেকুবের মত শুধু বার বার
ওঁকে দিয়ে যায়
ক্লান্তিহীন অস্খলিত বিবৃত্তির রেখা॥
আমি তার বুকের নাড়ীর ধন ।
গোপন স্নেহের তাপে,—প্রেমের বেদনা দিয়ে
আমারে সে করেছে লালন।
আপনার সুখ নীড়ে
একান্ত সন্তুষ্ট ছিলো আপনারি
হাসি অশ্রু নিয়ে॥

তো'মার শাণিত চক্ষু ঈগলের তীব্র তৃষা মেখে
অকস্মাৎ ছিন্ন করে তার গুপ্ত নাড়ীর কামনা।
নিষ্করুণ দস্যু তুমি; দীপ্ত তব মায়াহীন চোখে
জলন্ত ঈর্ষার অগ্নি…।
ধ্বংস ধ্বংসের ক্ষেত্রে আয়োজিত তোমার সাধনা॥
তবু দেখি দুঃসাহস পৃথিবীর লোমে ঢাকা বুকে।
তোমার অনন্ত ধ্বংস,—তা'রি'পরে করিছে রচনা
নিঃসীম জীবন-তৃষা;…অন্তহীন হত্যার কৌতুকে
তোমার তাণ্ডব নৃত্য…।
তাই এই বার্ণিকের চির-বিদ্রোহিতা
তোমার বিরুদ্ধে বন্ধু,—এ বিবাদ কভু মিটাবোনা॥

সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ষ্টার থিয়েটার যখন বীডন ষ্ট্রীটে ছিল, সেই সময়ে ন্যাশানাল থিয়েটারের নাট্যশালায় ভুবনবাবু আর একবার গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার নাম দিয়া অভিনয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমারসম্ভব ও আনন্দমঠ অভিনয় করিয়া এই চেষ্টা পুনরায় লুপ্ত হয়। ষ্টার থিয়েটার-দল পরে ঐ নাট্যশালা ক্রয় করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ন্যাশানাল থিয়েটারের চিহ্ন এইরূপে লুপ্ত হয়।

গ্রেট-ন্যাশানাল-থিয়েটার স্থাপনাবধি বেঙ্গলের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। গ্রেট-ন্যাশানালের নানা পরিবর্ত্তনের ঘাত প্রতিঘাতে বেঙ্গলেও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। শেষে প্রতাপ জহুরীর হস্তে ন্যাশানাল থিয়েটার কিছুদিনের জন্য সুস্থ হইলে বেঙ্গলও সুস্থির হইয়া কার্য্য করিয়াছিল। এই সময়ে থিয়েটারের একটা যুগ-পরিবর্ত্তন। ভাল নাটকের অভাব হওয়ায় থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ন্যাশানালে গিরীশবাবুকে ও বেঙ্গলে বিহারীবাবুকে কলম ধরিতে হয়। উভয়েরই প্রথম নাটক রাবণবধ। এই সময় হইতে অভিনেতৃগণের মধ্যে সাহিত্য প্রবেশ করে। বেঙ্গল থিয়েটারে যতই পরিবর্ত্তন হউক, বিহারী বাবুর কর্ত্তৃত্ব বরাবর অব্যাহত ছিল বলিয়া বেঙ্গল বিশেষ কোন বিশৃঙ্খলায় পড়ে নাই। শেষে ১৩০৮ সালে বিহারীবাবুর মৃত্যু ঘটিলে বেঙ্গল থিয়েটার লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মধ্যে যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টর যখন কলিকাতায় আসেন, সেই সময়ে তাঁহার অভ্যর্থনা উৎসবে বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় হয়, তদবধি বেঙ্গল থিয়েটার "রয়েল" এই বিশেষণবিশিষ্ট হইবার অধিকার পাইয়াছিলেন। ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত বেঙ্গলের এই নাম ছিল।

জুবিলীর বৎসরে বাবু গোপাললাল শীল নাট্যশালা-স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর যত্নে দল গঠিত হয়। অতুল-বাবুর "ভীষ্মের শরশয্যার" আখড়াই বসে। অবশেষে বীডন ষ্ট্রীটের ষ্টার থিয়েটারের বাটী এবং জমি ক্রীত হইলে, কেদারনাথ চৌধুরী ইহার অধ্যক্ষ হন এবং তাঁহার রচিত "পাণ্ডব-নির্ব্বাসন" অভিনীত হয়। থিয়েটারের এই আর এক যুগ। এক গিরীশবাবু ও অমৃতবাবু ব্যতীত আর সমস্ত পুরাতন অভিনেতাকে অর্দ্ধেন্দুবাবু এই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই থিয়েটারের ব্যয়ভূষণ যেমন হইয়াছিল, অভিনয়ও সেইরূপ হইয়াছিল। চক্রান্তে পড়িয়া গোপালবাবু ছয় সপ্তাহ পরেই কেদারবাবুকে ত্যাগ করিয়া গিরীশবাবুর হস্তে অধ্যক্ষতা সমর্পণ করিলেন। গিরীশবাবু আসিয়াই কেদারবাবুর পুস্তক বন্ধ করিয়া নিজ রচিত "পূর্ণচন্দ্র" অভিনয় করাইলেন। পরে ক্রমশঃ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে ঘটিতে কালে এমারেল্ড থিয়েটার ধ্বংস হইল। শেষে গ্রেট-ন্যাশানালের ন্যায় ইহারও ভাঙ্গা

দেওয়া হইতে লাগিল। প্রথমে হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য, মতিলাল সুর, ব্রজনাথ দাস ও মহেন্দ্রলাল বসু ভাড়া লন, তাহার পর মহেন্দ্রলাল বসু একা, তাহার পর অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃতলাল মিত্র, মতিলাল সুর ও নিমাইচরণ বসু, তাহার পর বেণীমাধব দাস ভাড়া লইয়াছিলেন। এক্ষণে ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-রচনাকালে) অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাট্যশালা ভাড়া লইয়া ক্ল্যাসিক-থিয়েটার নামে এক সম্প্রদায় গঠন-পূর্ব্বক যোগ্যতার সহিত অভিনয় চালাইতেছেন।

এমারল্ড থিয়েটারের পতন হইলে গিরীশবাবুর যত্নে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র শ্রীনাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় ন্যাশানাল থিয়েটারের জমিতে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটার নামে নূতন নাট্যশালা স্থাপন করেন। গিরীশ-বাবুর ম্যাকবেথ ও "মুকুলমুঞ্জরা" এখানকার প্রথম অভিনীত পুস্তক। অর্দ্ধেন্দুবাবু এখানকার নাট্য-শিক্ষক ছিলেন। শ্রীদেবকণ্ঠ বাগচী এখানে সঙ্গীতাধ্যাপক হন। মিনার্ভা থিয়েটারের ধ্বংশ ৩ বৎসরের মধ্যে ঘটে। এই সময়ে গিরীশবাবু কিছুদিন ষ্টারে, কিছুদিন মিনার্ভায়, এইরূপে কাটাইতেন। এক্ষণে ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-রচনাকালে) শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাড়ে মিনার্ভা থিয়েটার চালাইতেছেন। মূল অধিকারী নাগেন্দ্রবাবুর হাত হইতে এই সম্পত্তি অনেক দিন বিক্রীত হইয়া গিয়াছে।

যখন এমারল্ড ধ্বংস হয়, সেই সময়ে কবি ৺রাজকৃষ্ণ রায় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট বীণা-রঙ্গভূমি নামে নাট্যশালা স্থাপন করিয়া বালক অভিনেতা দ্বারা অভিনেত্রীর কার্য্য চালাইয়া ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি সফলকাম হন নাই। পরে স্ত্রী-অভিনেত্রীও লওয়া হয়। কিছুতেই বীণা দাঁড়াইল না। রাজকৃষ্ণবাবু ঋণগ্রস্ত হইয়া বেচিয়া ফেলিলেন। সেখানে শ্রীনীলমাধব চক্রবর্ত্তী (ন্যাশানাল থিয়েটারের অভিনেতা) সিটি থিয়েটার স্থাপন করেন। তাহাও অল্প দিন চলিয়াছিল। অবশেষে এক্ষণে ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ রচনাকালে) এখানে একদল পারসী নাট্য-সম্প্রদায় উর্দ্দুতে অভিনয় করিতেছেন। এখন ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-রচনাকালে) বাঙ্গালার সকল জেলায় সখের রঙ্গমঞ্চ দৃষ্ট হয়। সর্ব্বত্রই থিয়েটারের আদর।

বাঙ্গালীর নাট্যশালার (বিংশ-শতকের প্রারম্ভকাল অবধি) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।...... এখন ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ প্রকাশকালীন আমলে) বাঙ্গালা নাট্যশালায় দুটি রীতিতে অভিনয় হইয়া থাকে। একটিকে গিরীশবাবুর স্কুল অর্থাৎ রীতি ও অপরটিকে মুস্তফীর (অর্দ্ধেন্দুবাবুর) স্কুল বা রীতি বলে। গিরীশবাবুর রীতিতে কি পদ্য-অভিনয়ে কি গদ্য-অভিনয়ে অভিনেতারা যেন একটা কবিতার সুর ধরিয়া শ্রোতৃসুখকর উপায়ে অভিনয় করিতে থাকে। ইহাতে স্বরের উন্নয়ন ও অবনয়ন আড়ম্বর দ্রুত নিষ্পন্ন হয়। মুস্তফীর রীতিতে কি গদ্য কি পদ্য কথোপকথনের সুরে অভিনীত হয়, কেহ কোনরূপ সকল সুর অবলম্বন করিয়া আবৃত্তি করে না। ইহাতে আবৃত্তির গুণে শ্রোতৃসুখকর করিবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া অপেক্ষা বক্তব্য বিষয়ের ভাবের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। গিরীশবাবুর রীতি আজকাল ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-প্রকাশনার যুগে) বহু বিস্তৃত। মুস্তফীর রীতি তত বিস্তৃত হইবার অবকাশ পায় নাই। গিরীশবাবু বহু নাটক রচনা করিয়া এক্ষণে ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-প্রকাশনা-কালে) প্রধান নাটককার ও বঙ্গীয় গ্যারিক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। আর অমৃতলাল বসু মহাশয় অভিনয়োপযোগী সামাজিক নাট্যরঙ্গ রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ দীনবন্ধু মিত্রের আসন লাভ করিয়াছেন। গিরীশবাবুর রীতি সহজে অভ্যাস হয় বলিয়া অল্পবিদ্য অভিনেতার সংখ্যা আজকাল ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-প্রকাশনাকালে) অনেক বেশী। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা আজকাল ('বিশ্ব-কোষ' গ্রন্থ-প্রকাশের আমলে) স্ত্রী-অভিনেত্রীরা বেশী উন্নতিপ্রয়াসিনী ও শিক্ষা-প্রিয়া হইয়া থাকে।"

* * *

বাঙলা রঙ্গালয়ের প্রবর্ত্তন ও গোড়ার দিকের মোটা-মুটি ইতিহাসের এ সব তথ্য-পরিচয় পাওয়া যায় অধুনা-দুষ্প্রাপ্য 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থে। 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের 'রঙ্গালয়' শীর্ষক প্রবন্ধে যে সকল তথ্য-বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে, সেগুলির সম্বন্ধে কিছু কিছু মতান্তর থাকলেও, সেকালের বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের বিচিত্র ক্রমোন্নতির বেশ একটি চমৎকার-কৌতূহলোদ্দীপক ধারাবাহিক-চিত্রের সুস্পষ্ট আভাস মেলে। তাই একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাদের কৌতূহল আগ্রহ নিবারণের উদ্দেশ্যে অতীত-যুগের বাঙলা-

রঙ্গমঞ্চের সেই সব স্মরণীয় কীর্ত্তি-কাহিনীর কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হলো। ছোট-বড়, ভালো-মন্দ নানান্ চিত্তাকর্ষক ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়ে ভেসে চলে বাঙালীর নাট্যকলানুরাগ ধীরে ধীরে কিভাবে ক্রমবিকাশ লাভ করেছে, তার আদি-যুগের অপরূপ একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আজো স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে সেকালের সুপ্রসিদ্ধ 'বিশ্বকোষ' গ্রন্থের পাতায়। পরবর্ত্তী যুগের বাঙলা-রঙ্গালয় সম্পর্কে আধুনিক কালের গবেষক-পণ্ডিতদের বহু মনোজ্ঞ রচনা আর তথ্য-বিবরণ ছড়িয়ে আছে বিবিধ গ্রন্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী—তাই তার পুনরুল্লেখ আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। নাট্যকলা-চর্চ্চা ছাড়াও, সেকালের দেশী ও বিদেশী সমাজে লোক-রঞ্জনের উদ্দেশ্যে আরো নানা ধরণের যে সব প্রমোদ-বিলাসের অভিনব-বিচিত্র ব্যবস্থাদি প্রচলিত ছিল, আগামী সংখ্যায় একালের কলারসিকদের কাছে তারও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

ক্রমশঃ

অলনাতু

নচিকেতা ভরদ্বাজ

(মহাকবি সেকস্‌পীয়রের ১৩০ সংখ্যক সনেটের অনুবাদ)

প্রিয়ার চোখের সঙ্গে সূর্যের তুলনা বহুদূর ;
প্রবালের রক্তরাগ আরো দীপ্ত তার
ওষ্ঠ সংরাগের চেয়ে ;
তুষার শুভ্রতা যদি, তবে তার দুগ্ধবক্ষ ঈষৎ পাণ্ডুর ;
কেশ যদি তন্ত্রী, তবে কৃষ্ণ তন্ত্রীগুচ্ছে তার মাথা
আছে ছেয়ে।
গোলাপ দেখেছি বহু—গোলাপী ও শ্বেত,
রক্ত নানান বর্ণের,
কিন্তু সে উজ্জ্বল গণ্ডে দেখিনি তো সে সব গোলাপ,
মাধুর্য উল্লাস আছে ঢের বেশী কোনো কোনো গন্ধ
নির্যাসের
প্রিয়ার নিঃশ্বাসে নেই সেই সব মদির সংলাপ।
আমার শ্রুতিতে তার চারুকণ্ঠ লোভনীয় ; তবু জানি স্থির
সঙ্গীতের সুরধারা আরো বেশী মধুর মোহনন।
দেবীদের পথক্রমা প্রতিভাত হয়নি কভু আমার দৃষ্টির ;
কিন্তু প্রিয়ার পদছন্দ পড়ে মাটিতেই—চক্রম হয়েছে যখন।
এবং তথাপি জানি কী আশ্চর্য,—সমস্ত দুর্লভ তুলনা
আমার প্রিয়ার কাছে পরিম্লান—সে যে অতুলনা।

আধুনিক বাংলা কবিগান

শ্রীপরমানন্দ হালদার এম-এ

কবিগান বাংলার আদিম সমাজ ব্যবস্থার একটি বিশেষ অবদান। কিন্তু কবে ও কি ভাবে প্রথম কবিগানের প্রচলন হয়েছিল—তা' আজ এই বিংশশতাব্দীর বুকে দাঁড়িয়ে বলা কঠিন। শুধু অনুমান এবং বিচার বিবেচনার মাধ্যমে বলা যেতে পারে যে কবিগান প্রাচীন যুগের মানুষের মনের একটি চরম অভিব্যক্তি—আর তা' সুর, ছন্দ, তাল ও লয়ের মাধ্যমে আনন্দ পরিবেশনের জন্য সৃষ্টি হয়েছিল। তাই কবিগানের জন্মসূত্র নির্দ্ধারণ করতে হলে আমাদের সেই ইশারাময় অন্ধকার যুগের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। একথা বলা যেতে পারে যে—কবিত্ব শক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার—আর তার উপাদান জুগিয়েছে বাংলার জলবায়ু। বাংলার এই জলবায়ু মানুষের মনকে উদাস করে সর্বরিক্ত করতে শিখিয়েছে—তাই উদাস প্রাণের মাধুর্য্য লহরী দিয়ে সে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে ভাবের সাধনায়। সুতরাং আমরা দেখতে পাই বাঙ্গালীর ধাতু কোমলতা দিয়ে গড়া এবং জন্মগত দিক দিয়া সে রিক্ত ও বৈরাগী। এই স্বভাবগত রিক্ততা ও বৈরাগ্য সুরে এবং ছন্দে গ্রথিত করে মানুষের প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে নূতন মূর্চ্ছনার সৃষ্টি করে চলেছে যুগের পর যুগ। তাই উদাসী মানুষের কণ্ঠে বারে বারে ধ্বনিত হয়ে উঠছে—'উদাসী পথিক শুনেছি তোমার ব্যাকুল বাঁশীর কামনা'। সে কামনা তো কোন দিন বাঙ্গালীকে ধরে রাখতে পারেনি ভোগবাসনার মধ্যে—সে কামনা ভোগবাসনার ঊর্দ্ধে এক নূতন প্রাণের সন্ধান। কিন্তু কি সে পেয়েছে আর কি সে পেয়েছে—এই চাওয়া পাওয়ার চিরন্তন দ্বন্দ্ব সর্ব্বকালের মানুষের কাছে এক বিরাট জিজ্ঞাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এইবার কবিগানের উৎপত্তি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য প্রবেশ করা যেতে পারে। পূর্ব্বেই বলেছি যে কবিত্ব শক্তি মানুষের জন্মগত অধিকার এবং সেই সূত্রেই সে মনের গহনে এক নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করে থাকে। এই প্রেরণা সুর ও ছন্দের মাধ্যমে গ্রথিত হয়ে গানের সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা ভাষার জন্মলগ্নে কোন লিখিত সাহিত্যের নিদর্শন আমরা পাই না। সুতরাং সেই যুগের মানুষের জীবন যাত্রা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান সীমিত এবং সে সম্পর্কে পণ্ডিতদিগের মধ্যে চরম মতভেদ বিদ্যমান। সুতরাং কবিগানের উৎপত্তির সন্ধানে এসে আমরা সে বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। মোটের উপর বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য-সৃষ্টির বিবর্ত্তন ইতিহাসে মৌখিক সাহিত্য থেকে আমাদের যাত্রা সুরু—আর তার যাত্রা পথে কবিতাই মানুষের আদিম সৃষ্টি। তা'হলে বলা যেতে পারে যে মৌখিক কবিতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে মানুষের কাব্যালোকে প্রথম অভিসার। আর মৌখিক কবিতাই যদি মানুষের আদিম সৃষ্টি হিসাবে ধরা যায়—তবে তা' সুর ও ছন্দের মাধ্যমে গান হিসাবে আত্ম প্রকাশ করেছিল অর্থাৎ গানই তার সহজাত মৌলিক সৃষ্টি। পৃথিবীতে গানের উপর আকর্ষণ নেই এমন লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম আছে। তাই গানই সর্ব্বকালের সর্ব্বমানুষের সার্ব্বজনীন চিরন্তন সৃষ্টি—আর এই সৃষ্টিই আদি যুগের মানুষের প্রথম প্রয়াস হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। তাই মানুষের মন সংগীতধর্মী! সংগীতের মূর্চ্ছনা মানুষের মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলে—আবার অশান্ত হৃদয়ে শান্তির অভয় বাণী দান করে থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাই সংগীতের মধ্যে বৈরাগ্য ও আসক্তি দুই-ই বিদ্যমান।

বাংলা ভাষার উষালগ্নে মানুষের নিজের মনকে উজাড় করে দিয়েছে সংগীতের সাধনায়—আর তারই ফলে সে ভুলে গেছে যুগ ও কালের ব্যবধান। স্বর্গ ও মর্ত্তকে এক সূত্রে গ্রথিত করে এই মাটির জগতে সৃষ্টি করেছে নন্দন-

কানন। মানুষ আর পশু হিংসাদ্বেষ ভুলে গিয়ে তন্ময় হয়ে গেছে এই সুরের মূর্চ্ছনায়। আবার এই মানুষের সুরের ঝঙ্কারে মর্ত্তভূমিতে নেমে এসেছে বারিবিন্দু—হিংস্র বিষাক্ত সর্প তন্ময় হয়ে গেছে সুরের মূর্চ্ছনায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে মানুষ সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে অসাধ্য সাধন করতে পেরেছে। তাই অনুমান করে বলা যেতে পারে যে বাংলা ভাষাসাহিত্য জন্মসূত্রে সংগীতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

আদিযুগ হতেই মানুষের স্বাভাবিক গতি সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করা। তাই সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর মানুষ চায় আনন্দ ও পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করতে। এই প্রয়োজনে দেখা যায় যে প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থায় সন্ধ্যার পর কোন বারোয়ারী জায়গায় মজলিসের আসর বসত। সেখানে গান বাজনা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তারা আনন্দ উপভোগ করত। এই ধরণের আসর গ্রাম্যসমাজ ব্যবস্থায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও দেখতে পাই। সেই দিক দিয়ে অনুমান করে বলা যেতে পারে যে এই ধরণের মজলিসের আসর হতে কবি-গানের প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম যুগে কবি গানকে সাহিত্যের অঙ্গীভূত হিসাবে দেখা হয় নি। তার কারণ বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রথম যুগের কবিগানের মধ্যে যে কিছু পরিমাণে রুচিবিকৃতির উপাদান ছিল তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। তাই সাহিত্যের দরবারে তার স্থান হয়নি বলে মনে করা যেতে পারে, অথবা গানের মধ্যে যে সাহিত্যাকৃতির কোন নিদর্শন থাকতে পারে একথা হয়ত কেউ সেদিন ধারণা করতে পারে নি। কবিগানের মধ্যে যে বিশাল রস ভাণ্ডার নিহিত আছে তা' তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থায় দাঁড়িয়ে কেউ মনে করতে পারেনি এবং ইহার মধ্যে যে অপরিসীম সাহিত্যিক মূল্য বিরাজমান তা' তাদের কল্পনার বাইরে ছিল। তাই দেখতে পাওয়া যায় যে বাঙলা সাহিত্যের মধ্যযুগ যুগান্তরের পথে দাঁড়িয়েও আধুনিক চিন্তাধারার পথিকৃতি হয়ে কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের দৃষ্টি এদিকে সর্ব্বপ্রথম আকৃষ্ট হয়। তিনি কবিগানের মধ্যে এক বিশাল রসভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু এইসব গান কবিগানের সুরকারদের মুখে মুখে ঘুরিত—তাই ইহার কোন দলিল দস্তাবেজ নেই। তার কারণ কবি সুরকারগণ প্রতিপক্ষীয় কবি সুরকারদের প্রশ্নের উত্তর আসরে দাঁড়িয়ে সুর ও ছন্দের মধ্য দিয়ে দিতে হত। এই ধরণের উত্তর প্রত্যুত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। ইহাতে যথেষ্ট জ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োজন। তা'ছাড়া ইহার জন্য প্রয়োজন সহজাত কবিত্বশক্তি, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসাধারণ জ্ঞান বা পাণ্ডিত্য। এই সব কবি সুরকারগণ পৌরাণিক শাস্ত্র, ধর্ম্মগ্রন্থ ও সামাজিক বিষয়সমূহ অধ্যয়নের দ্বারা অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জ্জন করে তার মধ্য হতে কবিগানের উপাদান সংগ্রহ করত এবং যুক্তিতর্কের মধ্য দিয়ে তারা এই সব বিষয়ের উপর সুচিন্তিত আলোচনা করত। তা' একদিক দিয়ে যেমন রসগ্রাহী হত—অন্য দিকে তেমনি ঐ সব বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্ভব হত। সে সব বিষয় অলিখিত থাকায় তা' লোকচক্ষুর অন্তরালে চাপা পড়ে গেছে—তার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরেরা ঐ সকল বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে এই সব প্রতিভাবান্ কবি সুরকারগণ এ বিষয় যত্ন নেননি এবং তাঁরা হয়ত আর্থিক রোজগারের কথা বেশী ভাবে চিন্তা করে-ছিলেন। এই সব গানের যে বিরাট কাব্য মূল্য থাকতে পারে, তারা যেমন তা' চিন্তা করেনি—তেমনি তৎকালীন সংস্কৃত-অভিমানী পণ্ডিতগণ এ বিষয় উদাসীন থাকায় বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারের এক বিশাল সম্পদ আজ বিলুপ্তির পথে। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন কবিগানগুলি সংগ্রহের জন্য ঘোষণা করেছিলেন যে যারা ঐ গানগুলি সংগ্রহ করে দিতে পারবেন তাদের কাছে তিনি সারা জীবন ক্রীত হয়ে থাকবেন। তখন তার প্রচেষ্টার ফলে সামান্য কিছু কবি-গানের পদ সংগৃহীত হয়েছিল। সেগুলি আজ বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে নিজেদের স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। এইসব প্রাচীন কবি সরকারদের মধ্যে হরু ঠাকুর, ভোলা ময়রা, রাম বসু, এণ্টনী ফিরিঙ্গীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই কবিগানের ধারা লুপ্ত-প্রায়—এবং বর্ত্তমানে কবি গানের বদলে কতকগুলি ধরা-বাঁধা বিষয়ে তর্জ্জাগান ক্ষীণ স্রোত বজায় রেখে সরকার পৃষ্ঠপোষিত হয়ে আজও বেঁচে আছে।

কিন্তু অনেকে মনে করেন যে কবিগানের ধারা

প্রাচীন কবি গায়কদের পক্ষে সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ বিষয় তাদের ধারণা সঠিক বলে মনে করা যায় না। এ বিষয় আমার ধারণা যে উল্লিখিত কবিগানের ধারা কোন দিন লুপ্ত হয় নি। যুক্তি এবং তথ্য দিয়ে দেখান যেতে পারে যে কবি গান বাংলা দেশের দুটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করে দুটি ধারায় প্রচলিত ছিল। একটি ধারা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের রুক্ষ আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল—যা' আজ তর্জ্জা গানের ধরাবাঁধা পথ দিয়ে ক্ষীণ স্রোত বজায় রেখে চলেছে। আবার ঠিক সেই সময় পূর্ব্ববঙ্গের নদীমাতৃক জলীয় আবাহাওয়াকে কেন্দ্র করে অন্য ধারাটি গড়ে উঠেছিল। সেই থেকে পূর্ব্ববঙ্গে এই কবিগানের ধারা এখনও বিদ্যমান। তবে দেশবিভাগের পরে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের উপরে যে আঘাত এসেছে—তার ফলে তাদের উপর যে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে তা' স্বত্বেও এই সব কবিগানের সুরকারগণ এখনও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে। হয়ত অনতিকালের মধ্যে ইহাও লুপ্ত হয়ে যাবে। কবিগান পূর্ব্ববঙ্গের পলিমাটির কোমল স্তর ভেদ করে যে সাংস্কৃতিক বনিয়াদ গড়ে তুলেছিল—তার মধ্যে একটা সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তার কারণ এই সব কবিগানের রচনাগুলি কোনদিন রুচিকে পীড়িত করেনি। হয়ত আদি রসের কিঞ্চিৎ প্রভাব এর মধ্যে ছিল। কিন্তু কোন আলোচনা রসজ্ঞ করে তুলতে হলে তার মধ্যে আদিরস কিছু না থাকলে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা সম্ভব হত না। দেশবিভাগের পরে কতিপয় কবি সুরকার এদেশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছে এবং কঠোর অর্থনৈতিক দুরবস্থা তাদের এপথ ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে। পূর্ব্ববঙ্গের এই কবিগান বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তার কারণ এইসব জেলাকে কেন্দ্র করে যে উচ্চ সাংস্কৃতিক বনিয়াদ সৃষ্ট হয়েছিল—তারই পরিপুরক হিসাবে কবিগানকে ধরে লওয়া যেতে পারে। কেননা পশ্চিমবঙ্গে যেমন জমিদার ও উচ্চজোতদার শ্রেণীর মনোরঞ্জনের জন্য কবিগানের প্রসার হয়েছিল—তেমনি পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষিত মানুষের ও কৃষক শ্রেণীর মনোরঞ্জনের এবং আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য কবিগান প্রসার লাভ করেছিল। যার জন্য থিয়েটার বা সিনেমা ততটা জনপ্রিয়তা সেখানে অর্জ্জন করতে পারে নি। তার জন্য কবিগান পূর্ব্ববঙ্গ হতে কোন দিন লুপ্ত হয় নি। পূর্ব্ববঙ্গের এইসব কবি সুরকারদের মধ্যে তারক সরকার, হরিহর সরকার, মনোহর সরকার, হরিচরণ সরকার, চন্দ্রকান্ত সরকার, রাজেন্দ্রনাথ সরকার, নকুল সরকার, নিশিকান্ত সরকার, বিজয় সরকার, পুলিন সরকার, মনোরঞ্জন সরকার, অনাদি সরকার প্রভৃতি কবি সুরকারদের নাম উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। এদের মধ্যে অনেকে জনপ্রিয়তার শীর্ষাসনে আরোহণ করেছিলেন এবং অনেকেরই রচনার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য বিদ্যমান। অনেকগুলি রচনা যা' সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তার অনেকগুলি পদ বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের পদগুলির সমকক্ষতা দাবী করতে পারে। সে সমস্ত পদগুলি সময়ান্তরে সন্নিবেশিত করার ইচ্ছা থাকল। তবে মোটের উপর বলা যেতে পারে যে এই সব আধুনিক কবি গায়কদের অনেকেরই রচনার মধ্যে যথেষ্ট সাহিত্যিক মূল্য নিহিত আছে এবং এগুলি যদি আজ সংগ্রহ করার ব্যবস্থা হত তবে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অমূল্য সম্পদ রক্ষিত হতে পারত। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক পরলোকগত কবি সুরকারের রচনাসমূহ আজ সংগ্রহ করা এক দুরূহ ব্যাপার এবং তাদের সম্যক পরিচয় আজ কালের গহ্বরে বিলীন হতে চলেছে। তাদের মূল্যবান রচনাসমূহের মধ্যে যে জীবন নন্দনজাত হলাহল প্রকাশ পেয়েছে তার কিছু পরিচয় পরবর্ত্তী সময়ে সন্নিবেশিত করার স্পৃহা ও কৌতুহল রইল। এইবার গানের পদ্ধতিগুলির কিছু উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে।

কবি গানের কতকগুলি পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে কিছু বলা যেতে পারে। এ সম্পর্কে সাধারণতঃ কয়েকটি পদ্ধতি আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে বিশেষত মালসী, টপ্পা, ভোরগান, কবিগান (রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ক গান) এবং সর্ব্বশেষে জোটের গান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জোটের গানের অর্থ গানের সমাপ্তির মুখ দুই সুরকার এক সঙ্গে আসরে দাঁড়িয়ে বিতর্ক বিষয়ের উপর একটা যবনিকা টেনে থাকে। কবি গানের বিষয়বস্তু এত বিস্তৃত যে তা লিখে রাখা অসম্ভব। মালসী

গান (সখী সংবাদ, বিরহ প্রভৃতি) গুলি আবার চিতান, পাড়ন, ফুকার (১ম, ২য় ও ৩য় ফুকার) মিল (১ম ও ২য়) মুখ, পেচ, খোচ ও অন্তরা প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এইগুলি সুর ও ছন্দের মাধ্যমে কবি সুরকার শ্রোতাদের সম্মুখে প্রথম গেয়ে থাকে এবং এবং পরে দোহারগণ কর্ত্তৃক তার অনুসরণ করে সেই গান পরিবেশন করে থাকে। অন্য দিকে টপ্পা গানের মধ্যে ধুয়া, ছড়া ও পাঁচালী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত গানের মধ্যে দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সুরকারের কাছে প্রশ্ন ও তার প্রশ্নের উত্তর দান করা হয়ে থাকে। পূর্ব্ববঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে এই প্রকার কবি গান চলে আসছে। পরপর দুই তিন দিন ধরে গান চলতে থাকে— আর শ্রোতৃবৃন্দ অধীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে দুই কবির জবাবের দিকে এবং বিদগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দ সেই বিশাল রস ভাণ্ডার হতে রস সংগ্রহ করে চলেছে। কবি গানের নামে সে কি বিরাট আগ্রহ ও উদ্দীপনা—দূর দূরান্তর হতে মানুষ ছুটে আসছে কবি গান শুনতে। এই কবি সুরকারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশেষ কিছু নাই— তথাপি তারা বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সম্প্রদায়ের শাস্ত্র অধ্যয়ন করে মহৎ জীবনের সঙ্গে এক করে নিয়েছে এবং যে কোন প্রশ্নের উত্তর তারা অন্য শাস্ত্রের দৃষ্টান্ত তুলে তা খণ্ডন করতে চেষ্টা করে। দুঃখের বিষয় এই সব কবি সুরকারদের সহজাত মৌলিক প্রতিভা লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়ে গেল। যদি শিক্ষিত জনমানসের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হত তবে তা দিয়ে বাঙলা সাহিত্যে একটি অমূল্য সম্পদ সৃষ্টি করা যেত। অনেক কবি সুরকার আছেন যারা কঠোর দুঃখ দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে নিজেদের ঈপ্সিত পথে এগিয়ে চলেছেন এবং সুযোগ সুবিধার অভাবে বহু প্রতিভা সমূলে নষ্ট হয়ে গেল। এ কলঙ্ক সমগ্র বাঙালী জাতির। তা' ছাড়া তাদের রচিত গানগুলি সংগ্রহ করে রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা হয় নি এবং কারো সপ্রশ্ন দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ না হওয়ায় সমস্ত কিছু কালের গহ্বরে লুপ্ত হয়ে গেল। বাংলার জল বায়ু মাটিতে কবি গানের উৎপত্তি এবং সেই দিক দিয়ে এগুলি বাঙালীর নিজস্ব সম্পদ বলা যেতে পারে। মানুষের সাংস্কৃতিক ক্রম বিকাশের দিক দিয়ে এর দান অপরিসীম।

এ বিষয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার দপ্তরকে জানিয়ে তাদের নিকট হতে কোন সুচিন্তিত অভিমত পাওয়া সম্ভব হয় নি। হয়ত পূর্ববঙ্গের সাংস্কৃতিক ধারাকে সুরক্ষিত করার তারা কোন প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নি, অথবা এর গুরুত্ব তাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। সভ্যতার ক্রমবিস্তার এবং সাংস্কৃতিক মানদণ্ড নিরূপণের দিক হতে এর যে মূল্য আছে এবং বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডার যে বৈচিত্র্য দিয়ে ঘেরা সে কথা আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সাহিত্যিক কৌশল্য যেন বঙ্গ সাহিত্যের যে বিভিন্ন দিক আছে তার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে না পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আর এই সব লুপ্ত কথা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় আমাদের নিয়োজিত হইতে হবে। তা' হলে বাংলা-সাহিত্য ভাণ্ডারের এই বিশেষ দিকটির যথাযথ গুরুত্ব এবং মূল্য দেওয়া হবে। এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে দুই একটি কবি গানের উল্লেখ করে বক্তব্য শেষ করা যেতে পারে। শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সরকারের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে'র গানটি এখানে উল্লেখ করে বিচার করা যেতে পারে।

চিতান—বাশুলি আদেশে,
ধিজ চণ্ডীদাসে,
রচিল শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন।

পাড়ন—ও তার যত কথা,
তাতে শুধু পবিত্রতা,
সুশিক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন॥

১ম ফুকার—একদিন নিভৃত নিকুঞ্জ বাসে,
রাইকে বলে ভালবেসে,
শ্যাম বনমালী,—
এই লও প্রেম পুষ্পের শেষের অঞ্জলি,
করে পঞ্চ-ইন্দ্রিয় চরিতার্থ,
হারাইলাম আমি পরমার্থ,
দুর্লভ জনম গেল ব্যর্থ,
আর তো চাহি না রাই রস-কেলী।

মিল—আমার বিদায় দেও জন্মের মত,
আমি স্বধামে যাই,—
তখন তাই শুনে কেঁদে কয় রাই,
একি বজ্র, বজ্র।

মুখ—তুমি যাবে যথা,
আমায় নিবে তথা,
এই না কথা ছিল ॥
পেচ—বিদায় বলিয়া নাথ কি দায় ঘটালে,
আমার হৃদয় সাগরে বাড়ব অনল উঠালে,
কে তোমায় সাধিয়ে ছিল করিতে পীরিতি,
বল, বল, এই কি নাকি পুরুষের রীতি,
আগে কত না করেছি মানা,
আমায় ছুইওনা, ছুইওনা
বলে কত না করেছি মানা,
মথুরার হাটে যেতে,
সখির সাথে পথে পথে,
কত বার বয়ে দিলে বাধা,
আমারে ভালবাসিতে,
তোমার ঐ ভাল বাঁশীতে,
ডেকেছিলে বলে রাধা, রাধা,—
আমার সেই শরে প্রাণ পাখী বিঁধে,
কালা কাল গেল হে কেঁদে কেঁদে,
তোমায় না পাইব যত দিন,
কেঁদে কেঁদে গত দিন,
করিব স্বরূপ রূপ ধ্যান বন্ধু হে, —
ত্যজিয়ে ব্রজ ভূমি,
কোন দেশে যাবে তুমি,
অন্তর জেনে হে অন্তর্য্যামী,
দুটো কথা বল।

* * *

অন্তরা—বন্ধুরে, আমারে কান্দায়ে কেন তুমি থাক সুখে,
তোমার যত রকম আগুন আছে,
দিয়ে যাও হে আমার বুকে।
বন্ধু তোমার ভালবাসায় ভুলে,
কালা কালি দিলাম কুলে,
লোক সমাজে বের হব কোন মুখে।
আমি ডুব দিব অকূল পাথারে,
তোমার প্রেম পীরিতির দুঃখে ॥
বন্ধু তোমার যত দুঃখ রাশি,
আমার বক্ষে না পরশে আসি,
যদি ভালবাসি দূর থেকে,
আমি যাই যদি অকূলে মিশে,
যাব পীরিতির স্মৃতি রেখে।

* * *

২য় ফুকার—আগে জানতেম তুমি রসিক সুজন,
করে কত সাধন ভজন,
লভিলে আমায়,
তোমার পীরিতির যে জাতিকুল যায়,
বন্ধু তোমার অদর্শনে,
দিন যাবে অশ্রু বরষণে,
আকর্ষণে বিকর্ষণে,
একদিন কেন পাব না তোমায়।

এই কবিগানটির মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ প্রেমের মধ্য দিয়ে নায়ক-নায়িকার প্রেম-বিরহের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। নারীর হৃদয়ে যে প্রেমের শাশ্বত ফল্গুধারা প্রবাহিত—তার অভিব্যক্তি গানটির মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। এই গানের প্রতিপক্ষীয় কবি শ্রীনকুলেশ্বর সরকারের প্রেমিক কৃষ্ণের উত্তরটি এখানে সন্নিবেশিত করা হ'ল। তা'হলে প্রশ্ন ও উত্তর দুটি পাশাপাশি রেখে বিচার করলে গানটির কাব্যিক মূল্য অনুধাবন করতে সুবিধা হবে।

চিতান—তখন রসময়ীর রসালাপে,
বলে রসময় কানাই।
পাড়ন—তুমি সামর্থা প্রেমের পাত্রী,
প্রেম তীর্থের সহযাত্রী,
কাম গায়ত্রী তোমার জানা নাই।
১ম ফুকার—রাধে নিত্যময় শ্রীবৃন্দাবনে,
নিত্যলীলা তোমার সনে,
করি আমি অবিরাম,
আমার আরাধ্যা শ্রীরাধানাম,
ত্রৈলোক্য পৃথিবী ধন্য,
মত্রপুরি বৃন্দারণ্য,
তোমার নিষ্কাম প্রেম সাধনার জন্য,
ধন্য হ'ল ব্রজধাম ॥
মিল—তোমার গুণে হ'ল আমার ইন্দ্রিয় দমন,
অপ্রাকৃত নবীন মদন,
হয়েছি তোমার গুণে।

মুখ—রাধে তোমার প্রেমের দেনা,
শোধ হবে না, আমার জীবনে ॥
পেচ—ব্রজভূমি ছেড়ে আমি কোন দেশে যাব,
ছেষছাড়া দেশ, ভাবের আবেশ,
যে দেশে পাব,
আর থাকব না এ ভূলোকে,
চলে যাব সেই গোলকে,
থাকব নিত্য প্রেম আলোকে,
তুমি আমি দুইজনে ॥
বললে উঠালে পারের তরীতে,
এখন হয় ডুবে মরিতে,
মরার ভয় কর না আর,
কভু মরণ হয় না প্রেমিকার,
কামের দেহে জরা মরা,
তাদের আছে ভাঙ্গাগড়া,
মধুর কৃষ্ণ প্রেমে যারা জারা,
জরা মরার পরপার ॥
অন্তরা—বললে দিন হবে অশ্রু বরষণে,
আকর্ষণে বিকর্ষণে,
পাব কি হে নন্দলাল,
ধরে নাকো আশা তরীর হাল,
শ্রীদাম শাপের সেই আকর্ষণ,
মর্ত্তলোকে পেলে দরশন,
এযে ক্ষণস্থায়ী বিচ্ছেদ বিকর্ষণ,
স্থায়ী-মিলন অনন্তকাল ॥
৩য় ফুকার—বললে কথা ছিল যাবে যথা,
আমাকেও নিবে তথা,
হয়েছে কি বিস্মরণ,
রবে যুগ যুগান্ত এমিলন,
তোমার প্রেম রস আস্বাদিতে,
গৌর হব নদীয়াতে,
থাকবে আমার সাথে দিবারাতে,
হয়ে রূপের আভরণ ॥

এই ধুয়া গানটির মধ্যে কবিসুরকারের স্পর্শকাতর মনের ভিতর দিয়ে শাশ্বত প্রেমের চরম অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। প্রেমিক আশা নৈরাশ্যের দোলাচল বৃত্তির মধ্য-দিয়ে প্রেমিকাকে যে সান্ত্বনা বাক্য দিয়ে স্বর্গীয় প্রেমের চিত্র দেখেছেন—সে প্রেম চিরন্তন ও শাশ্বত। সে প্রেমের ক্ষয় নাই—যুগ যুগ ধরে সে প্রেম হৃদয়ে ধরে রাখা যায়।

এইবার শ্রীনিশিকান্ত সরকারের একটি ধুয়া গানের কথা আলোচনা করে বর্ত্তমান পর্য্যায়ের আলোচনার যবনিকা টানা যেতে পারে।

আমার পরাণ যারে চায়,
দিনের শেষে পথে বসে আমি আছি তার আশায়।
১। যার লাগিয়া কাঁদে আমার প্রাণ,
একলা বসে বিজন ঘরে করি তাহার ধ্যান,
যদি জুড়ায় আমার পোড়া পরাণ,
সেই প্রেমিকের বাতাস লেগে গায় ॥
২। আমার মত নিশীথ তারা,
বুঝি সারা নিশি জেগে জেগে কাঁদিয়া সারা,
তাইতে ঝরে পড়ে শিশির ধারা,
এ যেন সেই বিরহীর কান্নায় ॥
আমার পরাণ যারে চায়… ।

* * *

এই কবি গানটির মধ্য দিয়ে কবি নিশিকান্তের স্পর্শকাতর মনের একটি করুণ অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। সারা দিনের বিরহখিন্ন হৃদয় নিয়ে প্রেমিকা অপেক্ষমানা, যদি দিনের শেষে প্রেমিকের দর্শন পাওয়া যায়। মানুষের জীবনে যে সব হাসি কান্না, প্রেম বিরহের দোলাচল বৃত্তি আছে—তা'ই বাংলা সাহিত্যের উপাদান হিসাবে মানুষের জীবনে বৈচিত্র্য ও রসের সঞ্চার করেছে। এই কবি গানের বিভিন্ন গানের মধ্যে তা' সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে —যা' সংগ্রহ করতে পারলে তার সাহিত্যিক মূল্য বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে একটি অক্ষয় জিনিষ হয়ে থাকত এবং রসপিপাসু বাঙ্গালীর সাংস্কৃতিক বনিয়াদের একটি মূল্যবান্ দলিল হতে পারত। রস পিপাসু বাঙ্গালী সে রস থেকে বঞ্চিত হয়ে আজ কি রুচিবিকৃতির পরিচয় দিবে?
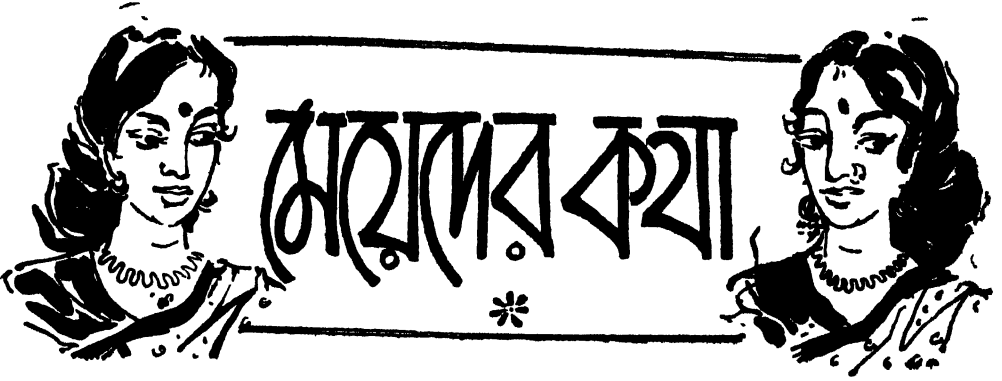
আধুনিকতার গতি কোন দিকে ?

সতী চক্রবর্তী

ভারতে শিক্ষার যত প্রসার হচ্ছে আধুনিকতার গতি তত বেশী বিচিত্র ও বহুমুখী হচ্ছে। এ যুগের আধুনিকারা অনুকরণ করে আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। শুধু অনুকরণ নয়, আগেকার আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিতরা যেমন বিলেত গিয়ে মেম বিয়ে করে ফিরে এসে নিজের সভ্যতার গৌরব প্রকাশ করত, তেমনি আজকাল কার ভারতের আধুনিকারা সাহেব বিয়ে করে নিজের প্রগতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছে মাদ্রাজী মেয়ে অ্যামেরিকান্ বিয়ে করছে, বাঙ্গালী মেয়ে ফরাসী, জার্মান কিংবা ইংরেজ বিয়ে করে সুন্দর "বল্ ডান্স" করে বেড়াচ্ছে। এই নেচে বেড়ানোর সুখ কার কত দিন স্থায়ী হচ্ছে জানা নেই। আর এ সম্বন্ধে ভেবেও কোন লাভ নেই। কারণ সকলেই জানেন কোন সুখই কোন কালে চিরস্থায়ী হয় না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বিদেশী বিবাহের মধ্যে আধুনিকদের আধুনিকত্ব কতখানি প্রকট হচ্ছে। পণ্ডিতেরা বলেন, পরদেশীর সঙ্গে বিবাহে বিন্দুমাত্রও আধুনিকতা নেই। গ্রীক-সেনাপতির কন্যা হেলেন চন্দ্রগুপ্তকে বিয়ে করেছিলেন। চীনের রাজকন্যা বিয়ে করেছিলেন পারস্যের রাজকুমারকে। প্রাচীনকালের আরবদের মধ্যে পরদেশী বিবাহের বিশেষ আগ্রহ ছিল। ওদের প্রবাদ ছিল—"Marry the distant; marry not the near. The newer filleth the eye." আমাদের চোখের কাছে যে নূতনতর, সেই আমাদের প্রাণ-মন হরণ করে নেয়। সেই প্রাচীন প্রবৃত্তিই আমাদের আধুনিকাদের প্রোৎসাহিত করছে বিদেশীয় যুবকদের পাণিগ্রহণে। এতে আধুনিকতার কিছু নেই!

তা'হলে আধুনিকাদের আধুনিকত্ব কোথায়? আমার এক মাঝবয়সী জামাইবাবু সেদিন আমাদের নিয়ে সিনেমায় গিয়েছিলেন। 'আমাদের সামনের সারিতে বসেছিল কয়টি আধুনিকা। তাদের কারো পরণে গাউন, কারো সালোয়ার পায়জামা, কারো বা সাড়ী, সকলেরই ঠোঁটে রঙ। আর সে রঙটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে সিগারেটের আলো। (তখন সিনেমা হলে ধূমপান নিষিদ্ধ হয়নি।) জামাইবাবু বললেন: দেখেছ? ওরা সব আধুনিকা—সিগারেট টানছে! বড়দি প্রতিবাদ জানালেন: ধোঁয়া টানলেই আধুনিকা হওয়া যায়? এদের চেয়ে অনেক বেশী ধোঁয়া টেনে থাকে আমাদের ঠুংরী মেথরাণী—সে তো তা'হলে খুবই আধুনিকা।—হেসে উঠলাম আমরা। আমাদের হাসিতে চকিত পেছন ফিরে তাকাল আধুনিকারা। তাদের সকলের চোখে যেন একই প্রশ্ন: তারা কি তবে আধুনিকা নয়?

ধূমপান আধুনিকতার পরিচায়ক কিনা তা নিয়ে তর্কের প্রয়োজন নেই। তবে সিগারেট টানা যে—যে কোন কুল

নারীর পক্ষে ক্ষতিকর পশ্চিমের ডাক্তারেরা সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌচেছেন। তাঁরা বলেন: যে সমস্ত গর্ভবতী নারী সিগারেটের ধূমপান করেন তাঁদের মধ্যে অকালীন গর্ভপাতের অনুপাত অপেক্ষাকৃত বেশী।

ইংলণ্ডের ল্যাংকেশায়ারে ১৩৫৭টি গর্ভবতী নারী নিয়ে অনুসন্ধানের ফলে ডাক্তারদের মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে যে গর্ভপাতের উপর ধূমপানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ঐ সকল নারীদের মধ্যে শতকরা ৪৫ জন ধূমপান করত। সিগারেটসেবী নারীদের মধ্যে গর্ভপাতের হার সিগারেট-সেবন যারা করে না তাদের দ্বিগুণ ছিল। তা ছাড়া, ধূমপায়ী মায়েদের শিশুদের ওজন গড়ে ধূমপানে বিরত মায়েদের শিশুদের চেয়ে সাড়ে আট আউন্স কম হয়েছিল! পশ্চিমের নারীরা এখন ধূমপানের কুফল বোধ হয় বুঝতে পারছে।

ভারতের আধুনিকাদের মতিগতি যে-ভাবে বিদেশীদের অনুকরণে ধেয়ে চলেছে তাতে দেশের ভবিষ্যৎ যে কি হবে তা বলা যায় না। তাঁরা কি একবার ভেবে দেখবেন না যে দেশের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত হয় তার মধ্যে প্রগতির বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই?

——

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৬

আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ-চিকিৎসকদের মতে, প্রসূতি-অবস্থায় প্রত্যেক ভাবী-জননীরই আহার-বিহার প্রভৃতির মতোই যথোচিত পোষাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারের বিষয়েও বিশেষভাবে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রসূতি-অবস্থায় খুব আঁটসাঁট শাড়ী-জামা, বডিস্, পেটিকোট প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ, তার ফলে, গর্ভস্থ সন্তান ও প্রসূতি উভয়েরই শারীরিক গোলযোগ ও স্বাস্থ্যহানির সবিশেষ আশঙ্কা ঘটে থাকে। কাজেই এ-সময়ে প্রসূতির পক্ষে বেশ হাল্কা এবং ঢিলা-ধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করাই সঙ্গত। প্রসূতি-অবস্থায় শাড়ী, সায়া, পেটিকোট প্রভৃতি পরিচ্ছদ ব্যবহারকালে, কোমরে খুব এঁটে না থাকে এমনভাবে আলগা বা ঢিলা ধরণে গেরোর ফাঁশ দিয়ে কাপড় পরিধান করাই ভালো—তাহলে পেটের উপর অযথা চাপ পড়ে কোনো অসুবিধা বা আশু-বিপদের সম্ভাবনা থাকবে না। যে সব মহিলা শাড়ীর বদলে ঘাগরা, পায়জামা বা 'স্কার্ট' (Skirt) ব্যবহার করেন. তাঁদের পক্ষেও উপরোক্ত নিয়মটি বিশেষভাবে মেনে চলা দরকার। তাছাড়া 'স্কার্ট' ব্যবহার কালে, তাঁর যদি কাঁধ থেকে ঝোলানো অথবা বডিস্ থেকে আঁটা ঢিলা-ঢালা-ছাঁদের পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন তো যথেষ্ট সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। অবশ্য প্রসূতি-অবস্থার গোড়ার দিকে, অর্থাৎ, প্রথম তিনমাসকালে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে খুব একটা কড়াকড়ি-ব্যবস্থা অবলম্বন বা আগাগোড়া পরিবর্ত্তন-সাধন করার বিশেষ প্রয়োজন না থাকলেও, এ সময়ে কিন্তু সজোরে ঘাগরা, পায়জামা, সায়া আর কাপড়ের গিঁট বা 'স্কার্টের' কোমরবন্ধ (Belt) কিম্বা আঁটসাঁট 'করসেজ' (Corsage) সর্ব্বদাই বর্জ্জনীয়। তাছাড়া যে সব প্রসূতির উদরের পেশী দুর্ব্বল, অভিজ্ঞ ধাত্রী বা সুচিকিৎসকের পরামর্শমতো এ সময়ে তাঁরা বিশেষ-ধরণে তৈরী 'মেটার্নিটি-বেল্ট' (Maternity Belt) বা 'প্রসূতিকালীন কোমর-বন্ধনী' ব্যবহার করলে সবিশেষ উপকৃত হবেন। প্রসূতিদের উপযোগী এই বিশেষ-ধরণের 'বেল্ট' বা 'কোমর-বন্ধনী ব্যবহারের ফলে, ভাবী-জননীর স্তন, উদর, কোমর এবং জরায়ুর উপর অযথা কোনো চাপ পড়ে না এবং গর্ভস্থ-সন্তানের ক্রম-বৃদ্ধি পুষ্টিসাধনের পক্ষেও কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে তোলে না। বহু অভিজ্ঞ ধাত্রী-চিকিৎসক প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের জন্য যে বিশেষ-ধরণের অন্তর্বাস-পরিচ্ছদাদির ব্যবস্থা করে থাকেন, সেগুলি সচরাচর খেলাধূলা (Sports step-in) অথবা সাঁতারের সময় (Swimming Costume) যেমন অঙ্গরাখা ব্যবহার হয়ে থাকে—অনেকটা সেই ধরণের। তবে এ ধরণের অঙ্গরাখা-পরিচ্ছদের রেওয়াজ অবশ্য সাধারণতঃ পাশ্চাত্য-সমাজের মহিলাদের মধ্যেই বেশী দেখা যায়—আমাদের দেশের

মহিলা-মহলে প্রসূতি-অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোমরে ঢিলাভাবে গিঁট বা কষি দিয়ে শাড়ী পরার রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া বহু প্রবীণ-সুচিকিৎসকই আজকাল অভিমত প্রকাশ করেন যে প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের আদৌ আঁটসাঁট-ধরণের কোনো প্রকার বক্ষ-বন্ধনী (Brassire) ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, স্বাভাবিক-অবস্থার মতো এ সময়েও বক্ষ-বন্ধনী ব্যবহারে প্রসূতির স্তন ও স্তনের বোঁটার সুষ্ঠুভাবে বৃদ্ধি-পরিপুষ্টির শুধু প্রচুর অসুবিধাই নয়, বরং সবিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনাও দেখা দেয়। অনেক আধুনিক ধাত্রীবিদ্যাবিশারদেরা প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের বিশেষ এক ধরণের 'কোমর-বন্ধনী' বা 'মেটারনিটি-বেল্ট' (Maternity Belt) পরিধান করার সুপরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিশিষ্ট ছাঁদে তৈরী এ-ধরণের কম-বেশী দামের নানারকম 'মেটারনিটি-বেল্ট' সচরাচর বড় বড় শহরের বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। কাজেই শহরবাসিনী-প্রসূতিদের পক্ষে, এ ধরণের 'কোমর-বন্ধনী' বা 'মেটারনিটি-বেল্ট' সংগ্রহ করা এমন কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়। তবে যে সব পল্লীবাসিনী-প্রসূতি বিশেষ ছাঁদে রচিত এ-ধরণের 'মেটারনিটি-বেল্ট' বা 'কোমর-বন্ধনী' ব্যবহার করতে চান, তাঁদের পক্ষে, অবশ্য এগুলি আত্মীয়-বন্ধুদের সহায়তায় শহরের দোকান থেকে সংগ্রহ করে আনা অথবা ঘরে বসে সেলাই করে বানিয়ে নেওয়াই সুবিধাজনক। এ ধরণের 'মেটারনিটি-বেল্ট' বা 'কোমর-বন্ধনী' রচনা করা খুব একটা কঠিন কাজ নয়—বিশেষতঃ সূচীশিল্পে যাঁদের অল্প-বিস্তর দক্ষতা আছে– সামান্য চেষ্টা করলেই তাঁরা এগুলি অনায়াসেই ঘরে বসে বানিয়ে নিতে পারবেন। এ-ধরণের 'মেটারনিটি বেল্ট' বা প্রসূতিদের ব্যবহারোপযোগী 'কোমর-বন্ধনী' বানানোর জন্য সচরাচর বেশ মোলায়েম নরম 'তোয়ালের কাপড়' বা 'Towel-Cloth' বা দেশী 'মলমল' জাতীয় কাপড় ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণতঃ লম্বায় সওয়া দেড়গজ (১¾ গজ— ১¾ গজ) এবং চওড়ায় একগজ দুই ইঞ্চি (১'গজ ২" ইঞ্চি) মাপের কাপড় নিলেই এ-ধরণের 'মেটারনিটি-বেল্ট' বা 'প্রসূতিদের কোমর-বন্ধনী' বানানোর কাজ চলবে। বিশেষ-ধরণের এই 'কোমর-বন্ধনী' রচনার রীতি হলো— প্রসূতির 'কুচ্‌কী' বা 'Groin' থেকে স্তনদ্বয়ের তলদেশ পর্যন্ত দেহাংশের যে ব্যবধান, তার মাপ নিয়ে কাপড়ের টুকরোর চওড়া দিক স্থির করা। তারপর সামনের দিকের কাপড়ের ৩' ইঞ্চি জায়গা মুড়ে, উপরের দিক থেকে এক-চতুর্থাংশ (¼) বাদ দিয়ে আকৃতিতে অনেকটা ঠিক তীরের ফলার মতো ধরণে পটি মুড়ে পরিচ্ছদটির উপর দিক থেকে নীচের দিকে ইতিপূর্বে বর্ণিত প্রথায় এক-চতুর্থাংশ (¼) কাপড় বাদ রেখে সেলাই দেবেন। কাপড়ের উপরদিকে তিন ইঞ্চি (৩") মাপ থাকলেও, নীচের দিকে বস্তির কাছে যতই অগ্রসর হবেন, ততই তীরের ফলার ছাঁদে ক্রমশঃ সরু ধরণে সেলাই শেষ করতে হবে। এভাবে সেলাইয়ের ফলে, 'বন্ধনীটি' প্রসূতির 'কটিদেশ' বা কোমরের মাপের সঙ্গে ঠিকমতো খাপ খেয়ে বসবে। 'বন্ধনীটি' যাতে বরাবর যথাযথ জায়গায় বজায় থাকে, সে জন্য প্রসূতির নিতম্বের কাছে সেলাইয়ের-কাপড়ের নীচের দিকে এক-চতুর্থাংশ জায়গা থেকে দু'পাশে দুটি 'ঝুলনী' বা 'সাস্‌পেণ্ডার্সের' (suspenders) সুব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পাশ্চাত্য-মহিলাদের পরিচ্ছদ-রীতি অনুসারে যাঁরা জানু পর্যন্ত লম্বা মোজা ব্যবহার করেন, এ 'ঝুলনী' বা 'সাস্‌পেণ্ডার্স' দুটি তাঁদের পরিধেয় দুটির উপর-প্রান্তে সংযুক্ত করে দিতে পারেন। তবে আমাদের দেশের মহিলারা, অর্থাৎ যাঁরা শাড়ী, ঘাঘরা প্রভৃতি পরেন এবং পাশ্চাত্য-মহিলাদের মতো মোজা ব্যবহার করেন না তাঁদের পক্ষে এ 'বন্ধনী' পরিধানের রীতি হলো—প্রসূতির নিতম্বের তলদেশ দিয়ে এনে কাপড়ের সামনের দিকে 'ঝুলনীর' ফাঁশ এঁটে দিলে, 'বন্ধনীটি' নাড়াচড়ার ফলে, সহজে সরে বা স্থানচ্যুত হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে। 'ঝুলনীর' দুদিকের দুটি ফাঁশ আঁটা ছাড়াও, 'বন্ধনী' যাতে আলগা হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে না পড়ে, সে জন্য 'বন্ধনীর' উপরাংশে অর্থাৎ, প্রসূতির দুদিকের কাঁধের উপর দিয়ে দুটি 'টানা' দেবার উদ্দেশ্যে, দুই ইঞ্চি (২") চওড়া এবং ৩৬" ইঞ্চি থেকে ৪০" ইঞ্চি লম্বা স্ট্র্যাপ-সেমিজের মতো দুটি ফিতা ৪" ইঞ্চি থেকে ৬" ইঞ্চি ব্যবধান রেখে পরিধানটিতে সেলাই করে দিতে হবে। এ-ধরণের 'কোমর-বন্ধনী' বা 'মেটারনিটি-বেল্ট' পরিধানকালে, প্রসূতির পক্ষে বিছানায় চিত্‌ হয়ে শুয়ে

পোষাকটি দেহে এঁটে সুষ্ঠুভাবে সেফ্‌টিপিন গেঁথে বেশ কায়েমী করে নেওয়া উচিত। 'বন্ধনী' পরিধানের রীতি হলো—প্রথমে নীচের দিকে ১॥" থেকে ২" ইঞ্চি বাদ রেখে, সুমুখের অংশের কাপড় বেশ আঁটসাঁটভাবে টেনে সামনের দিকে লম্বালম্বি-ভঙ্গীতে একটি সেফ্‌টিপিন্ এঁটে, সামান্য ব্যবধানে পরপর আরো অন্ততঃ চারটি সেফ্‌টিপিন্ গেঁথে পরিচ্ছদটি কায়েমী ধরণে অঙ্গে ধারণ করা। তারপর 'বন্ধনীর' উপরাংশে টানা-দেবার ফিতা দুটিকে একের পর এক কাঁধের উপর দিয়ে ডানদিকেরটি বাঁ-দিকে এবং বাঁ-দিকেরটি ডান-দিকে—অর্থাৎ, × -চিহ্নের মতো ছাঁদে নিতম্ব ও কুঁচকীর দু'পাশে মজবুতভাবে ফাঁশ দিয়ে এঁটে নিতে হবে। পাশ্চাত্য-প্রথায় মোজার সঙ্গে এ ধরণের 'বন্ধনীর' ফিতার ফাঁশ আঁটতে হলে অবশ্য শয্যায় শয়নের বদলে, প্রসূতির পক্ষে দাঁড়িয়ে পরে নেওয়াই সুবিধা এবং স্বাচ্ছন্দ্যও বেশী।

পোষাক-পরিচ্ছদ ছাড়াও, প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের যথোচিত-ধরণের জুতো ব্যবহারের দিকেও বিশেষ দৃষ্টিদান করা দরকার। আগেকার আমলে আমাদের দেশের মহিলা-সমাজে সচরাচর জুতা ব্যবহারের বিশেষ রেওয়াজ না থাকলেও, ইদানীং তার ব্যাপক-ব্যবহার সুপ্রচলিত হয়েছে—এমন কি, পল্লী-অঞ্চলেও। কাজেই যথোচিত জুতা ব্যবহারের দিকে প্রসূতিদের রীতিমত নজর রাখা প্রয়োজন। একালের অভিজ্ঞ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদদের মতে প্রসূতি অবস্থায় উঁচু গোড়ালীর জুতা আদৌ ব্যবহার করা উচিত নয়।—তার ফলে, প্রসূতির ও গর্ভস্থ সন্তানের সুপ্রসব-সংক্রান্ত ব্যাপারে নানান্ অসুবিধা ও বিপদ দেখা দিতে পারে। তাছাড়া খুব কড়া-চামড়ার তৈরী জুতাও যেমন প্রসূতির পক্ষে একান্তই বর্জ্জনীয়, পক্ষান্তরে, খুব নরম-চামড়া বা সৌখিন কাপড় দিয়ে বানানো জুতাও ব্যবহার করা অনুচিত। তবে শীতকালে এবং শীত-প্রধান অঞ্চলের প্রসূতিদের জুতা ব্যবহার করা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ, জুতা-বিহীন অবস্থায় বিচরণের ফলে, অচিরেই ঠাণ্ডা লেগে তাঁদের শরীর খারাপ ও অসুখ হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কাজেই মোটামুটিভাবে, সকল প্রসূতিরই কর্ত্তব্য—অভিজ্ঞ সুচিকিৎসকের পরামর্শা-নুসারে চামড়ার চটি-চপ্পল, স্যাণ্ডাল বা উপযুক্ত কোনো জুতা পরিধান করে নিজের ও ভাবী-সন্তানের স্বাস্থ্যরক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। খুব সরু-মুখের বা কষা-আঁট নয়, ভিতরে বেশ স্বচ্ছন্দে পা খেলে, প্রসূতি অবস্থায় এমন ধরণেরই চওড়া-মুখওয়ালা জুতা ব্যবহার করাই সমীচীন।

আগামী সংখ্যায় প্রসূতি পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল সম্বন্ধে আরো কয়েকটি দরকারী-প্রসঙ্গ আলোচনার বাসনা রইলো। (ক্রমশঃ)

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

ইতিপূর্ব্বে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের অবসরে নিজের হাতে কাজ করে রঙ-বেরঙের কাপড়ের টুকরো, কাগজ-কার্ডবোর্ড আর কাগজের মণ্ড (Paper pulp), মাছের আঁশ, চামড়া, রেশম ও পশমের সুতো, পুরোনো তোয়ালে মোজার টুকরো প্রভৃতি হরেক-রকম উপকরণের সাহায্যে বিচিত্র-অপরূপ ছাঁদের বিবিধ সৌখিন-সুন্দর ও নিত্য প্রয়োজনীয় কারুশিল্প সামগ্রী রচনার যেমন হদিশ দিয়েছি এবারেও তেমনি ধরণের আরেকটি অভিনব-প্রসঙ্গের আলোচনা করছি। এবারের প্রসঙ্গটি হলো—'কাদা-মাটির কারু-শিল্প।'

সচরাচর দেখা যায় যে কাদা-মাটির তাল নিয়ে নিজের খেয়াল-খুশীমতো ছোট বড়, ভালো-মন্দ নানা-ছাঁদের নানান সামগ্রী গড়ে তোলার দিকে আমাদের দেশের শিশু ও বয়স্কদের রীতিমত অনুরাগ। কারণ, কাদা-মাটির সঙ্গে নদী-মাতৃক বাঙলা দেশের জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ-

নিবিড় মধুর-সম্পর্ক আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। তাই ইতিহাসের আদিম যুগ থেকে আজও পর্য্যন্ত এদেশের অধিবাসীরা সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা মাটির বুকে নিপুণ কৌশলে নানা রকম ফল-ফুল, তরী-তরকারী, সোনার ফসল ফলানো ছাড়াও, নিছক কৃষ্টি-কলা চর্চ্চার ঐকান্তিক-আগ্রহে সামান্য কাদা-মাটির তাল দিয়ে অভিনব-প্রথায় হরেক-ছাঁদের এত সব বিচিত্র-অপরূপ ঘট, কলসী, সরা থালা, বাটি, গেলাস, কুঁজো, হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতি ঘরকন্নার নিত্য-প্রয়োজনীয় তৈজস-সম্ভার আর মনোরম-সুন্দর পুতুল-প্রতিমা, খেলনাপত্র, সৌখিন-কারুকার্য্যময় দেউল-মন্দির ইমারতের ইট, টালি, পোড়ামাটির পাটা (Terra-Cotta Plaques) প্রভৃতি বিবিধ কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে যে অসামান্য পটুতার পরিচয় দান করেছেন, বিশ্বের কলা-রসিক-সমাজে তার কদর অসাধারণ। বাস্তবিক, কাদা-মাটির কারুশিল্প-রচনায় বাঙলার মৃৎ-শিল্পীদের বহুমুখী-প্রতিভা এমনই অনন্যসাধারণ যে দুনিয়ার আর কোথাও সহজে তার তুলনা মেলে না। তাই এবারে বাঙলার সেই প্রখ্যাত-সনাতন অভিনব-অপরূপ লোক-কলা—'কাদা-মাটির কারু শিল্প' সম্বন্ধে মোটামুটি কিছু হদিশ দিচ্ছি।

অনেকের ধারণা—কাদা মাটির কারু-শিল্প সামগ্রী রচনা নিতান্তই দুঃসাধ্য-কঠিন কাজ···বিশেষ দক্ষতা না থাকলে, কারো পক্ষেই এ-ধরণের শিল্প-কাজে সাফল্যলাভ সহজে সম্ভব নয়। এমন গোঁড়া ধারণা পোষণ করা কিন্তু অনুচিত। আসলে, কাদা-মাটির কারু-শিল্প সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি সহজ সরল নিয়ম-পদ্ধতি জানা থাকলে, যে কোনো শিক্ষার্থী সামান্য চেষ্টাতে অনায়াসেই সোজা উপায়ে নিজের হাতে পুরোপুরি নিখুঁত-পরিপাটি ধরণের না হলেও অল্প-বিস্তর মনোরম-সুন্দর ছাঁদের নানা রকম ছোটখাটো সৌখিন ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী গড়ে তুলতে পারবেন। তবে সে সব নিয়ম-পদ্ধতির পরিচয় দেবার আগে, কয়েকটি দরকারী বিষয় জেনে রাখা ভালো।

কাদা-মাটির তাল নিয়ে সৌখিন অথবা দৈনন্দিন ব্যবহারের উপযোগী কোনো কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার সময় মৃৎ-শিল্পীকে সর্ব্বদাই খেয়াল রাখতে হবে যে সব রকম মাটিতে সব ধরণের কাজ করা যায় না···অর্থাৎ, পুতুল-প্রতিমা-খেলনা গড়তে সচরাচর যে-জাতের মাটি ব্যবহার হয়, ঠিক তাই দিয়েই হাঁড়ি, কলসী, সরা, ঘট, গেলাস, প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় সাংসারিক তৈজসপত্র বা ইট, টালি, খোলা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে তৈরী করা সম্ভব নয়। কাজেই বিশেষ ধরণের কাদা-মাটির কারুশিল্প-সামগ্রী বানানোর সময় এমনি নানান্ অসুবিধা দেখা দেয় বলেই অভিজ্ঞ মৃৎশিল্পীরা তাঁদের বিভিন্ন-ছাঁদের হাতের কাজের জন্য মোটামুটিভাবে—দো-আঁশ মাটি, বেলে মাটি, পলি বা ধ্বস মাটি, কাদা-মাটিআর এঁটেল মাটি —এই পাঁচটি বিশেষ-শ্রেণীতে মাটিকে বিভক্ত করেছেন।

দো-আঁশ মাটিতে সাধারণঃ বালির ভাগ আর আবশ্যকীয় জৈব-পদার্থ থাকে নিতান্তই অল্প—প্রায় অর্দ্ধেকেরও কম···বাকীটুকু শুধুই কাদা। তার ফলে, দো-আঁশ মাটিতে চট্‌চটে-বাঁধুনী ভাবেরও যেমন অভাব, বালির স্বল্পতার জন্য কারুশিল্প-সামগ্রী রচনার পক্ষেও তেমনি অসুবিধা জনক। কাজেই সচরাচর চাষবাস করে কেবলমাত্র ফসল-ফলানো ছাড়া মৃৎশিল্পীদের সৌখিন-সুন্দর কারুকলা-চর্চ্চার ব্যাপারে দো-আঁশ মাটি বিশেষ খুব উপযোগী নয়। তবে সূক্ষ্ম-শিল্পকলার কাজের জন্য অনুপযুক্ত হলেও, দো-আঁশ মাটি ইট, টালি, খোলা প্রভৃতি নানা রকম প্রয়োজনীয়-সামগ্রী রচনার কাজে ব্যবহার করা যায়।

বেলে-মাটিতে অবশ্য বালির ভাগ খুব বেশী থাকে··· তবে মাটির কণা অল্প থাকে এবং সেগুলিও তেমন সূক্ষ্ম নয়। তাই এ মাটিতে জলধারণের ক্ষমতার একান্ত অভাব সহজেই শুকিয়ে ঝরঝরে হয়ে যায়। কাজেই মৃৎশিল্পের কাজের পক্ষে এ-ধরণের মাটি বিশেষ সুবিধার নয়— তবে শাক-সব্জী, তরি-তরকারী ফলনের আর হিসাবমতো পরিমাণে এঁটেল-মাটির সঙ্গে মিশিয়ে মৃৎশিল্পের কাজ করার পক্ষে বেলে-মাটি অবশ্য বেশ উপযোগী হয়।

পলি বা ধ্বস-মাটি ফসলের পক্ষে খুব উপযোগী হলেও মাটির কারুশিল্পের ঠিক তেমনটি নয়। কারণ, নদীতীরে সংগৃহীত এ-ধরণের মাটিতে সচরাচর থাকে—জোয়ারের জল-স্রোতে পরিবাহিত বিবিধ রাসায়নিক লবণ (Chemical Salets), জৈব আর খনিজ-পদার্থ।

কাদামাটি নামে পরিচিত হলেও, নিছক-কাদামাটিতে

কিন্তু মৃৎশিল্পের কাজ করা বিশেষ সুবিধাজনক নয় আর দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তার কারণ, এ মাটিতেও থাকে বিবিধ জৈবপদার্থ আর বালির প্রাচুর্য্য। ভিজা-অবস্থায় কাদা-মাটি দিয়ে মৃৎশিল্পের কাজ করা সম্ভব হলেও,এ-ধরণের উপাদানে বন্ধনী-গুণের একান্ত অভাব থাকার দরুণ, রোদ বাতাস লেগে এ মাটি দিয়ে গড়া শিল্প-সামগ্রী শুকিয়ে গেলে অল্পকালের মধ্যে বালু-কণার মতো নিতান্ত সহজেই ঝরে পড়ে যায়। তার ফলে, মৃৎশিল্প-সামগ্রীটি বিশেষ দীর্ঘস্থায়ী ও সুন্দর-পরিপাটি ছাঁদের হয়ে ওঠে না।

মৃৎশিল্পের কাজের জন্য সব চেয়ে উপযুক্ত হলো—এঁটেল-মাটি। এঁটেল-মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলিকে জল দিয়ে ঠেসে মেখে নিলে আগাগোড়া বেশ ময়েন-দিয়ে-মাখা লুচির ময়দার তালের মতো চট্‌চটে-আঠালো ধরণের হয় এবং সে মাটিতে কোনো সৌখিন-ছাঁদের কারুশিল্প-সামগ্রী গড়ে রোদে-বাতাসে শুকিয়ে নিলে সেটির নরম তুলতুলেভাব ঘুচে গিয়ে আগাগোড়া বেশ পাথরের মতো শক্ত-মজবুত, দীর্ঘস্থায়ী আর কুচকুচে কালো-রঙের হয়ে ওঠে। এই কারণেই মৃৎশিল্পীরা সচরাচর পুতুল-প্রতিমা খেলনা প্রভৃতি সৌখিন কারুশিল্প সামগ্রী রচনার কাজে এঁটেল-মাটি ব্যাবহার করে থাকেন। তাছাড়া হিসাব মতো পরিমাণে এঁটেল-মাটির সঙ্গে বালি-মাটি সংমিশ্রিত করে তারা সাধারণত: ছোট-বড় নানা ছাঁদের হাঁড়ি, কলসী, ঘট-ফুলদানী, সরা-গেলাস-ভাঁড় প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় সামগ্রী বানিয়ে তোলেন।

সাধারণতঃ, মৃৎশিল্পীর প্রয়োজন এবং পছন্দ মতো উপ-রোক্ত এই পাঁচটি বিশেষ-ধরণের উপাদান ব্যবহার করেই সৌখিন ও দরকারী মাটির কারুশিল্পী সামগ্রী রচিত হয়। তবে একেবারে আনকেরা-ধরণের মাটি দিয়ে কোনো মৃৎশিল্প-সামগ্রীই বানানো যায় না। কাজেই সুষ্ঠু-পন্থায় টেঁকসই-ধরণের যে কোনো মৃৎশিল্প-বানাতে হলেই, গড়নের মাটিকে উপযুক্তভাবে হিসাব মতো পরিমাণে জল দিয়ে মেখে আগাগোড়া তৈরী করে নেওয়া দরকার। তবে এবারে স্থানাভাবের কারণে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে মোটা-মুটি আভাস দেবার বাসনা রইলো।

তবে এবারের মতো প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে,

শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য উপরে দু'টি সহজ-সরল ছাঁদের বিচিত্র নক্সাদার পুতুল অথবা ঘর-সাজানোর উপকরণ রচনার নক্সা-নমুনা প্রকাশিত করা হলো। বারান্তরে কাদা-মাটির সাহায্যে এই দুই ধরণের সৌখিন-অভিনব মৃৎশিল্প-সামগ্রী তৈরীর কলা-কৌশলের হদিশ জানানোর চেষ্টা করবো। ক্রমশঃ

সূচী-শিল্পের নতুন নক্সা-নমুনা

হিরণ্ময়ী দেবী

সহজ উপায়ে নানারকম রঙীণ সুতোর সাহায্যে সূতী, রেশমী বা পশমী কাপড়ের উপর বিচিত্র এম্ব্রয়ডারী-সেলাইয়ের কাজ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রক, রম্পার্, সান্-স্যুট, নিকারবোকার প্রভৃতি পোষাক-পরিচ্ছদ যাতে সুশোভিত-মনোরম ছাঁদের বানিয়ে তোলা যায়, সেই উদ্দেশ্যে এবারে কয়েকটি নতুন-ধরণের নক্সা-নমুনা উপহার দেওয়া হলো। রঙ-বেরঙের সুতো দিয়ে এম্ব্রয়ডারী ছাড়াও, মানানসই-ধরণের রঙীণ-কাপড়ের টুকরো দিয়ে 'এ্যাপ্লিক্'-পদ্ধতিতে (Applique-Work) সূচীশিল্পের কাজ করেও এ সব নক্সা-নমুনা অনায়াসেই ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।
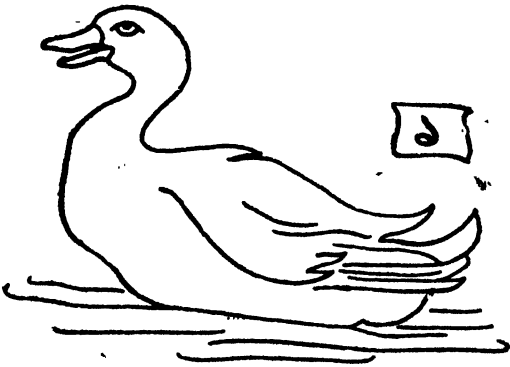
উপরের ১নং ছবিতে জলে-ভাসন্ত হাঁসের যে নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, হালকা বা গাঢ় ধরণের যে কোনো নীল, সবুজ, হলুদে, লাল, কালো, কাপড়ের শাদা, ফিকে-হলুদে, গোলাপী, আশমানী বা কালো রঙের সুতোর সাহায্যে এম্ব্রয়ডারী কিম্বা জমির কাপড়ের রঙের সঙ্গে মানানসই দেখায়, এমন কোনো রঙীণ-কাপড়ের টুকরোর সাহায্যে 'এ্যাপ্লিক' সূচীশিল্পের কাজ করে অনায়াসেই এবং দিব্যি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা যাবে।

নীচের ২নং চিত্রে শুঁড়-তোলা হাতীর যে বিচিত্র নক্সা-নমুনাটি দেখানো হয়েছে, সেটিকেও সহজেই রচনা করা যাবে—সূচীশিল্পের উপরোক্ত উভয়-প্রথাতেই।
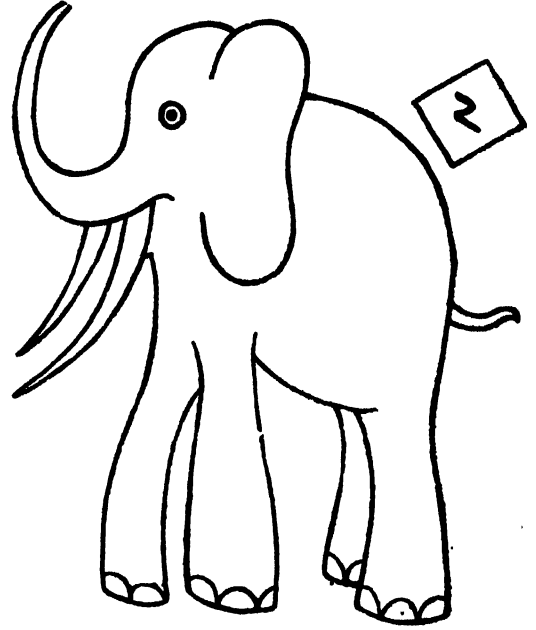
জীব-জন্তুর ছবির বদলে ছোট ছেলেমেয়েদের পোষাক-পরিচ্ছদে যদি কারো ফুল-লতা-পাতার সৌখিন-সুন্দর কারুকার্য্যময়—নক্সার ছাঁদ ফুটিয়ে তোলার বাসনা হয়, তাহলে নীচের ৩নং চিত্রে যে বিচিত্র নমুনাটি দেখানো রয়েছে, সেটিকে উপরোক্ত উভয়বিধ-প্রথায় অনায়াসেই সূচীশিল্পের কাজে ব্যবহার করতে পারেন।
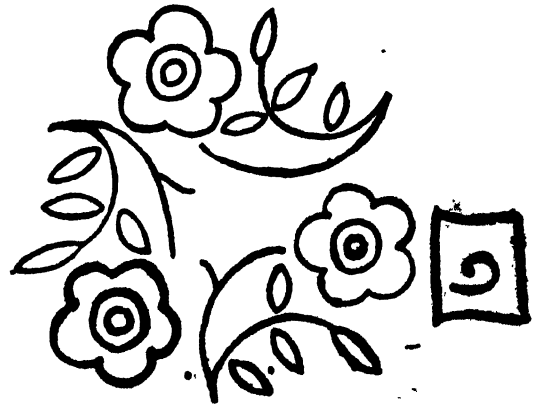
কাজেই সেলাইয়ের নক্সা বেছে নেবার সময়, ছোট

ছেলেমেয়েদের মতামত জেনে নেওয়াটাই বোধহয় সর্ব্বাগ্রে দরকার—তাই নয় কি?—অর্থাৎ, কোন্ নক্সাটি তাদের বেশী পছন্দ হয়—মন ভরে তোলে আনন্দে-উল্লাসে!

—

সুধীরা হালদার

এবারে বলছি—আমাদের দেশের গুজরাট-অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশেষ-প্রিয় অভিনব-সুস্বাদু বিচিত্র এক-ধরণের মিষ্টান্ন রান্নার। এ খাবারটির নাম—'বাসুন্দি'। অপরূপ-মুখরোচক মিষ্টান্ন-জাতীয় এই গুজরাতী-খাবার রান্নার জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, গুজরাতী-প্রথায় 'বাসুন্দি' রান্নার জন্য চাই—চায়ের পেয়ালার চার-পেয়ালা পরিমাণ দুধ, গোটা আষ্টেক বাদাম, তিনটি ছোট এলাচ, বড় চামচের দু'-চামচ চিনি আর চায়ের চামচের এক-চামচ চরৌলী। উপরের ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি দিয়ে তিন-চারজনের আহারের উপযোগী 'বাসুন্দি' মিষ্টান্ন রান্না করা যাবে।

উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে প্রথমেই বাদামের খোসা ছাড়িয়ে সেগুলিকে আগাগোড়া মিহি-ছাঁদে কেটে নিন। এ কাজ সারা হলে, ছোট এলাচগুলির খোসা ছাড়িয়ে, এলাচের দানা আগা-গোড়া বেশ মোটা-ধরণে গুঁড়ো করে রাখুন। তারপর উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে দুধটুকু ঢেলে, কিছুক্ষণ হাতার সাহায্যে অনবরত নাড়াচাড়া করে ভাল-ভাবে জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিন। এমনিভাবে জ্বাল দিয়ে ফোটানোর ফলে, চার-পেয়ালা দুধ ঘন এবং ক্রমে দেড়-পেয়ালায় পরিণত হলে, সেই ঘন-দুধের পাত্রে চিনি মিশিয়ে, মিশ্রণটিকে আরো কিছুক্ষণ উনানের আঁচে রেখে ফুটিয়ে নেবার পর, দুধ-ভরা রন্ধন-পাত্রটি উনানের উপর থেকে নামিয়ে ফেলুন। তাহলেই রান্নার পালা শেষ হবে। এবারে ঐ ফুটন্ত-ঘন দুধের পাত্রে বাদামের কুচি, ছোট-এলাচ-দানার গুঁড়ো আর চরৌলী মিশিয়ে, সদ্য-পাক করা 'মিশ্রণটিকে' কোনো পরিষ্কার-শীতল জায়গায় রেখে জুড়োতে দিন। এভাবে জুড়িয়ে নেবার ফলে, 'মিশ্রণটি' আগাগোড়া বেশ ঘন-থকথকে জমাট-ধরণের হয়ে উঠলে, খাবারটি সযত্নে প্রিয়জনদের পাতে পরিবেষণ করুন—আপনার হাতের রাঁধা বিচিত্র-অভিনব এই 'বাসুন্দি' মিষ্টান্নের উপাদেয়-সুস্বাদে তাঁরা যে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করবেন—সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরেকটি বিচিত্র-অভিনব ভারতীয় খাবার রান্নার পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

আর্টিষ্ট

ব্রজগোপাল মান্না

প্যালেটের সবকটা রং ওর মনের রসে শুষে খেয়েছে অনন্ত! সেই রংয়ে ছবি আঁকে সে। ছবি আঁকে সে মনের পটে। সেই ছবি টাঙিয়ে রাখে সেই দেওয়ালে—যার আদি নেই, অন্ত নেই। যার অধিকারী একমাত্র সে। সে দেওয়াল অনন্তর মন।

কিন্তু আর্টিষ্ট অনন্ত আজ যদি কবিতা লিখতে জানত, তাহলে শর্বরী রায়কে নিয়ে এখুনি কবিতা লিখে ফেলত। সেটা পারলনা বলেই, শর্বরীকে এঁকে নিল ওর সেই মনের পটে। ইচ্ছে রইল, কোয়ার্টারে ফিরে ক্যানভাসের ওপর ফোটাবে সে ছবিটা।

ছবি আঁকাটা তার পেশা নয়। পেশায় সে উদয়ন্তনগরের এ্যাসিস্ট্যান্ট ষ্টেশন মাষ্টার। ছবি আঁকাটা তার নেশা। সেই নেশার ঘোরেই কলকাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখানে এসে, এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় পচে মরছে। এ ব্যাপারে ওর নিজস্ব মতটা হ'ল—ছবি আঁকা, গান বা ললিতকলার যে কোন একটা দিক্ নিয়েই বলনা কেন, পেশা হিসেবে নিলেই তার অর্থ-মূল্য ছাড়া আর কোন দামই থাকেনা। ও বলে, যে কাজের প্রেরণা আসে একজন বা একটি বিশেষ গোষ্ঠির ফরমাস্ থেকে, কালের কষ্টিপাথরে যাচাই হওয়ার সময় ফাঁকিটা তার ধরা পড়বেই পড়বে।

ওর এই বড় বড় কথাগুলো যখন কলকাতার বন্ধুমহলে বলে বেড়াত, তখন বাহবা পেত সহজেই। কিন্তু শেষমেষে দেখা গেল,—ওর সেই বন্ধুরা, তাদের অনেকেই খ্যাতনামা হয়েছে শুধু বাংলা দেশেই নয়, ভারতের বাইরেও। আর অনন্ত পড়ে রয়েছে যে তিমিরে সেই তিমিরে।

বন্ধুরা ওর অসাক্ষাতে বলত, দুচারটে প্রবন্ধাদি পড়ে বড় বড় বুলি আওড়ান যায় সহজে। কিন্তু বাস্তব বলে একটা কথা আছে তো? তার কঠোরত্বকে অস্বীকার করবে কে! অর্থকে বাদ দিয়ে কোন কথাই ভাবা যায়না একালে। এটা অর্থনৈতিক যুগ। আর কিছু নাহোক, রং তুলি ক্যানভাস্টাও তো আর গাছের ফল নয়। তবে সেটাকে বড় করে না দেখলেই হল। এটা সমন্বয়েরও যুগ বটে। ওর বন্ধুরা বুদ্ধিমান্ ছিল নিশ্চয়।

তবে, অনন্ত যে একেবারে বোকা, সে কথাও বলা যায়না। পেটের চিন্তা তাকেও করতে হয়েছে। দৈনন্দিন রুটীনে বাঁধা ফরমাসী কাজই করতে হয় তাকে এখন। আর্টিষ্ট হিসেবে নয়। গোঁ বজায় রাখতে গিয়ে মূল্য দিতে হয়েছে তাকে পুরোমাত্রায়। আর্টিষ্ট অনন্ত চৌধুরীকে এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয় রেলের ঘানি টেনে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।

আজকেও যেমন ডাউন প্লাটফর্মটার ওপাশে ওয়েটিং রুমের পাশে ফেন্সিংয়ের যে গেটটা আছে, অনন্ত দাঁড়িয়েছিল তার একপাশে। এখানে দাঁড়িয়ে আগন্তুক যাত্রীদের কাছ থেকে সে টিকিট সংগ্রহ করে। এটাও তার কাজ। অনন্ত জানে,—রেলকর্মচারীদের জন্যে একটা অলিখিত নিয়মাবলী অদৃশ্যভাবে টাঙান থাকে রেলওয়ের সর্বত্র। তাকে না মেনে উপায় নেই। না মানলে অনেক সময় চাকরীতেও নাকি অদৃশ্য হাতের টান পড়ে। কোন্ কাজটা কার সে বিচারবোধ নেই সে হাতের।

কিন্তু আজকে, ওই টিকিট সংগ্রহের সময় অনন্ত যে কাজটা করে বসল, সেটা লিখিত অলিখিত কোন নিয়মের মধ্যেই পড়েনা। কাজটা গর্হিত। ওর অফিসঘরের দেওয়ালে টাঙান রেলকোম্পানীর ছাপান নিয়মাবলীটায়

লেখা আছে,—'কোন কর্মচারী কর্মরত অবস্থায় অন্যমনস্ক হয়ে কাজে গাফিলতি করলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।' অনন্তরও তাই পাওয়া উচিৎ। কিন্তু চার্জসীট দেওয়ার মত এখন এখানে কেউ নেই। এ ষ্টেশনের জোয়াল এখন অনন্তর কাঁধে।

আর কাজটা গর্হিত হলেও এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাওয়ার মত নয়। দুপুরের যে গাড়িটা 'এ্যাটেণ্ড' করতে ও দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়িটা থেকে যারা নামল, তারা প্রায় সবাই স্থানীয় জানা চেনা লোক। কিন্তু আজকে অনন্ত আর একজনকেও চিনতে পেরে ওর সেই রঙিন মনে তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল মাত্র। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা থেকে একজন বৃদ্ধার সঙ্গে একটি সুন্দর ফুটফুটে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে যিনি নামলেন, তাঁকে দেখতে গিয়েই ও যে এখানে ডিউটি করতে দাঁড়িয়েছে, সেটাই ভুলে গেল। যাত্রীরা কে কি দিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে, কোন খেয়ালই রইলনা তার।

অবশ্য এমনিতে। বাঙলা দেশ থেকে অনেকটা দূরে বাঙালী ছেলের পক্ষে অমন একটা দৃশ্য তাকিয়ে দেখবার মতও বটে। অনন্তও না তাকিয়ে পারল না—গাড়িটা প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে গেছে ততক্ষণে। ফুটফুটে বাচ্চাটা ছট্‌ফট্‌ করতে করতে কোন সময় কোল থেকে নেমে পড়ে গুট্‌গুটে পা-দুটো নিয়ে দৌড়তে আরম্ভ করেছে, মহিলাটিও দৌড়াচ্ছেন ওর পেছন পেছন ওকে ধরার জন্যে। সব মিলিয়ে প্লাটফর্মের লাল কাঁকর আর নীল আকাশের পটভূমিতে সুন্দর একটি ছবি। অনন্ত অভিভূত হয়ে গেল, চমৎকৃত হল আরও। যখন শুনল ওরই নাম ধরে ছেলেটিকে বকছিলেন মহিলাটি। সে তখন ধরা পড়ে গেছে মায়ের কাছে। মহিলাটি নিশ্চয় ওর মা।

ওভাবে তাকিয়ে থাকার আরও একটা কারণ ছিল, অনন্ত ওদের চেনে। অনন্ত জানে, শর্বরী যাচ্ছে তার মামাশ্বশুরের কাছে। সঙ্গের বৃদ্ধাটি ওর শাশুড়ী। এখান থেকে পুবদিকে কিছুটা তফাতে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে যে ফ্লাওয়ার মিলটা আছে সেই মিলের মালিক করুণাময় দত্ত বৃদ্ধার ছোটভাই, শর্বরীর মামাশ্বশুর তিনি।

কিন্তু শর্বরীর ছেলের নামের সঙ্গে ওর নিজের নামের ওরকম মিল থাকার ব্যাপারটা অনন্ত ঠিক বুঝতে পারল না। ভাবনাটা রইল রাত্তিরেও, যতক্ষণ না দেওয়ালে টাঙান ঘড়িটা পর পর নটা ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিলে,—শেষ গাড়ী আসার সময় হয়েছে এবার। অনন্তর ভাবনাটা ছিল শর্বরীর ছেলের নামের সঙ্গে ওর নিজের নামের মিল থাকার ব্যাপারটা নিয়েই। এত নাম থাকতে 'অনন্ত' নামটাই শর্বরী তার ছেলের নামের জন্য বেছে নিল কেন! কবিগুরুর একটা গানের কলি মনে পড়ে গেল এই মুহূর্তে। তাহলে নাম হিসেবে অনন্ত কি খুব সেকেলে নয়? ওসব নিয়ে আর কিছু ভাববে না ঠিক করল সে। কে কোথায় তার ছেলের কি নাম রাখল,—সে কথা মনে করে ওর এই নির্লিপ্ত জীবনকে আনন্দিত বা বিষাদময়, কোনটাই করতে রাজী নয় সে।

এতক্ষণে খেয়াল হল ওর, এদিকটায় লু চলে। যদিও রাত্তিরে খুব একটা ভয় নেই। তবুও জানলাটা বন্ধ করার জন্যে উঠে দাঁড়াল। জানলাটার কাছ বরাবর গিয়ে বন্ধ না করেই আবার ফিরে এল টেবিলটার কাছে। আসনে রাখা টেলিফোনের জেনারেটার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল কানের কাছে। আগের ষ্টেশনের সঙ্গে কিছু কথাবার্তা চললো প্রথমে। তারপর পাশে রাখা একটা খাতা টেনে নিয়ে ট্রেন রিসিভিংয়ের ডায়েরী লিখতে লিখতেই হেঁকে বলে উঠল,—চৌবে, ঘণ্টি লাগা দো। আওর দেখো তো কোই টিকট্‌ খরিদনোবালা হ্যায় য়ানহি।

জী আচ্ছা।—উত্তরটা এল তৎক্ষণাৎ। মনে হল, বাইরে প্লাটফর্মের ওপর অন্ধকারের যে আস্তরনটা পড়েছে, তার গায়ে ধাক্কা লেগেই কথাটা উত্তর হয়ে ফিরে এল অনন্তর কাছে।

ঘণ্টা পড়ার ঠিক সাত মিনিট পরে ট্রেণটা এখানে এসে পৌছবে। রেল কোম্পানীর ছাপমারা বোতামওলা সাদা রংয়ের যে কোটটা অনন্ত এতক্ষণ পড়েছিল, তার পকেট থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করে একটা বিড়ি ধরাল সে। জলন্ত বিড়িটাকে দু আঙুলের মাঝখানে ধরে হাতটা মুঠো করল প্রথমে। তারপর মুঠোটাকে মুখে লাগিয়ে সজোরে টান দিল একটা। হিস্‌ হিস্‌ করে আওয়াজ হল মুখটার কাছে। আয়েসে চোখ দুটো বুজে এল তার।

বিড়ি খাওয়াটা তার নতুন নয়। এখানে আসার

গোড়ার দিক থেকেই ট্রেণ আসার দেরী থাকলে সময় কাটানোর জন্যে ওটা তার প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। অবশ্য, প্রথমদিকে অনন্ত সিগারেটই খেত। কিন্তু এই পোড়া দেশে ও জিনিষটা টপ করে পাওয়া যায় না। তিনটে ষ্টেশনের আগের জংশন ষ্টেশন থেকে আপ ট্রেনের গার্ডকে পয়সা দিয়ে দিলে পরের দিন ফিরতী ডাউনে পাওয়া যেতে পারে সিগারেট্। অথচ ঝামেলা অনেক তাতে। প্রায়ই গার্ডেরা শুধু ভুলে গেছি বলেই কাজ সারত বলে নয়, সিগারেটের অভাবে বিড়িতে কাজ সারতে গিয়েই ভাল লেগে গেল বিড়ি। অন্য কারণও ছিল দু-একটা। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে বেশীর ভাগই চাষা-ভূষো শ্রেণীর। তাদের অনেকেই এসে থাকে নানা প্রয়োজনে 'টিশনমাষ্টারবাবুর কাছে'। কথায় কথায় বিড়ি আর দেশলাই এগিয়ে দেওয়াটা তাদের সম্মান দেওয়ার সামিল। না নিলে কিংবা চলেনা বল্লে তারা ক্ষুণ্ণ হতে পারে, প্রথম প্রথম এই ভেবেই অনন্ত হাত পেতে নিত। কিন্তু এখন আর বিড়ি না হলে মন ওঠেনা। মাঝে মধ্যে হাতে আসা দুএকটা সিগারেট খেয়ে দেখেছে, বড্ড পানসে লাগে সে'গুলো।

অনন্তর বিয়ে থা হয়নি। বুড়ো বাপ মা আছেন হুগলী জেলার মৃগালা গ্রামে। সেটাই ওর দেশ। এখানে ও একলা থাকে। সে ধরণের কোন তাগিদ্ নেই সাত্-তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার। তবুও এই ট্রেনটা 'পাশ' হয়ে গেলে ও কোয়ার্টারে ফিরবে। দুবেলা স্নান করাটা তার পুরণো অভ্যাস। তাই প্রথমেই স্নান করবে সে। তারপর স্নান শেষে সারাদিনের গায়ে দেওয়া রেলের ইউনিফর্মটার দিকে আর তাকাবে না। তার বদলে লুঙ্গি আর ফতুয়া-গোছের একটা জামা চড়িয়ে ইজেলের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। সামনের ক্যানভাসটার ওপর কিছুক্ষণ চোখ বোলাবে প্রথমে। তারপর তুলির গোছা থেকে তুলি আর রংয়ের প্যালেটটা হাতে তুলে নেবার আগে গোটাচারেক মোমবাতী জেলে দেবে সে ইজেলের সামনে দাঁড় করান উঁচু টুলটার ওপর। সন্দেহ নেই, বন্ধুদের কাছে বলা ওর বড় বড় কথাগুলো এই অর্থনৈতিক যুগে অবশ্যই ভুল ছিল। সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে তার। দিনের বেলায়, সূর্যের আলোয় ছবি আঁকার সুযোগ নেই আর্টিষ্ট অনন্ত চৌধুরীর।

ছবি আঁকবে বলে অনন্ত প্যালেটে রং বার করছিল টিউব থেকে। ইজেলে টাঙান-ক্যানভাসটার দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে কি মনে হল ওর, রং বার করা বন্ধ করে ঘরের কোণে দাঁড়ান টেবিলটার কাছে এগিয়ে গেল। ড্রয়ারটা টেনে তা থেকে বার করল কলম আর চিঠি লেখার প্যাড্। কি যেনভাবল কিছু সময়। তারপরে লিখল।—

প্রিয় সন্দিপন,

এ চিঠিটা পেয়ে একটু অবাক হবে চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার সুমতি হয়েছে দেখে। ইদানীং অনেক-গুলো চিঠির উত্তর না পেয়ে হতাশ হয়েই লেখা বন্ধ করেছ তুমি। আমারও আজ লিখব কাল লিখব করে আর হয়ে ওঠেনি।

যাক সেকথা। যে জন্যে এই হঠাৎ চিঠি। সেটাই বলি,—সুবীরদের ষ্টুডিওতে আমাদের সঙ্গে যে শর্বরী রায়ের দেখা হয়েছিল শেষবারের মত সেই শর্বরীকে আজকে আবার দেখতে পেলুম। ভুলতে পারিনি তাকে। শর্বরী রায়কে ভুলে যাওয়াটা সহজ নয় আমাদের পক্ষে। মনে আছে, তোমার আমার আর শর্বরীর মধ্যে একটা সরল বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল আর্টস কলেজে ঢোকার শুরুতেই। সেই বন্ধুত্ব অক্ষত ছিল শেষের দিকেও। কলেজ ছাড়ার পরেও আমরা কাজ করেছি একসঙ্গে। ছবির এক্জিবিশনও করেছিলুম আমরা তিনজনে মিলে। অবশ্য এর আগেই আমার আর শর্বরীর নাম নিয়ে কলেজের আনাচে কানাচে ক্যান্টিনের আড্ডা মারা ছেলে-মেয়েদের দল কিছু রটনা করে বেড়াত। তোমার কিন্তু কোন দিকেই কান ছিল না। তুমি প্রায় নির্লিপ্তই ছিলে।

মহানুভব তুমি। যখন বুঝতে পারলে, তখনই উঠে পড়ে লেগে গেলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারে। মনে আছে, একটা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলে শর্বরীর বাবার কাছে। আর তারপরই বড়লোক বাবার কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এল শর্বরীর। ছবি আঁকার উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্যে শর্বরী বিদেশে যাক্ এই তাঁর ইচ্ছা। সেদিন সুবীরদের ষ্টুডিওতে বসে শর্বরী কেঁদেছিল। মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। বুঝতে পেরেছিলুম, উভয়

বাবু সরাসরি তোমার প্রস্তাবে 'না' বলতে পারেননি। শর্বরীকে বিদেশ যাবার সুযোগ দিয়ে ঘুরিয়ে বলেছিলেন—শর্বরী আর আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কটা তাঁর ইচ্ছানুরূপ নয়। আর ছবি আঁকিয়ে বাঙালী ছেলেমেয়েদের বিদেশে শিক্ষানবিশী করাটা যে সামান্য ব্যাপার নয়। তা তুমিও জান, আমিও জানতুম।

তাই বোধহয়, শর্বরীকে সেই দোটানা থেকে বাঁচানোর জন্যে দৈব আমার সহায় হয়েছিল সেদিন। রেলের এই চাকরিটা পেয়ে গিয়েছিলুম প্রায় বিনা তদ্বিরে। চাকরির দরকার ছিল আমার। আমার মত আর্থিক অবস্থায় শুধু ছবি এঁকে পেট চলতো না।

তারপর অনেকগুলো দিন কেটে গেছে। শর্বরীকে ভোলবার চেষ্টা করেছিলুম। বলতে লজ্জা নেই, তোমাকে চিঠি না লেখার সেটাও একটা কারণ। আর কিছুদিন পরে সত্যিই মন থেকে মুছে যেত শর্বরী। কিন্তু তা আর হ'ল না। সেই শর্বরীকে আজকে আবার দেখলুম। সবচেয়ে অবাক ব্যাপার কি জান? তার মা কিংবা শর্বরী, কেউই চিনতে পারল না আমাকে। দোষ নেই ওঁদের। দাড়ি-গোঁফে আবৃত আমার মুখটাকে দেখলে তুমিও হয় ত' পারবেনা আজ।

আর তুমি তো জান, ছবি আঁকাটা আমার নেশা। সেই নেশা ছিল আমার চোখে। সেই চোখে দেখছিলুম আমি শর্বরীকে, শর্বরীর কোলে তার ছেলেকে, ওর কপালে যত্ন করে পরা সিঁদুরের টিপটাকে। সুন্দর একটা ছবির মত মনে হচ্ছিল ওকে। ম্যাডোনার যেন জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সত্যিই সন্দিপ, কড়া ভারমিলিয়নের অমন সুন্দর ব্যবহার সচরাচর চোখে পড়ে না।

এই পর্যন্ত লিখে লেখা থামাল অনন্ত। কি যেন আবার ভাবল কিছু সময়। তারপর প্যাড থেকে লেখা কাগজগুলো ছিঁড়ে নিয়ে ওর সামনে যে মোমবাতিটা জ্বলছিল, তার শিখাটার দিকে মেলে ধরল। অনন্তর ঘরের আলো দ্বিগুণ হ'ল কিছুক্ষণের জন্য। অনন্ত তার বন্ধুকে নতুন করে লিখল—

ভাই সন্দিপ,

আশা করি কুশলে আছ। তোমার ছবি আঁকার খবরও আশাকরি ভাল। খবরের কাগজের কল্যাণে জানতে পেরেছি, কিছুদিন আগে দিল্লীতে তোমার একটা 'এক রং প্রদর্শনী' হয়ে গেল। তোমার উন্নতির অবাধগতি দেখে শিহরিত হচ্ছি। এই শিহরণ আরও বৃদ্ধি পা'ক আমার—এই প্রার্থনাই করি।

কলকাতায় আমাদের এক্জিবিশনের কথা মনে আছে তোমার? শর্বরী রায়ের খবর কিছু জানো? ওকি বিদেশ থেকে ফিরেছে। অনেকদিন তোমার সঙ্গেও চিঠি দেওয়া নেই। শর্বরীকে তো প্রায় ভুলেই গেছি। শর্বরী রায়কে ভুলে গেলেও তোমাকে কখনও ভুলবনা আমি। তুমি আমার অনেক করেছ। কৃতজ্ঞতাভরা-মনে সে কথা স্মরণ করি আমি সব সময়।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিও,

তোমার অনন্ত

অনন্ত খুব ছোট করে শেষ করল চিঠিটা এবারে। ঠিক করল, কালই ডাকে পাঠিয়ে দেবে। তারপর চেয়ারটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ইজেলটার সামনে এগিয়ে গেল আবার, পুরণো ক্যানভাসটা নামিয়ে নতুন একটা রাখল তার ওপর। ওর ইচ্ছা, শুধুমাত্র তিনটে রং নিয়ে নতুন একটা কম্পোজিশনে হাত দেবে এবার।

কিন্তু আকাশ তো শুধু নীল নয়। আকাশ সব রংয়ের সম্মেলন ক্ষেত্র। চিত্রকলার এই সহজ কথাটা আর্টিষ্ট অনন্ত চৌধুরীও জানে বৈকি। তবুও শুধু তিনটে রং বেছে নেওয়ার কারণ—ওর বর্তমান ছবিটিতে থাকবে শুধু একটি রংয়ের প্রাধান্য। সেটা লাল রং, সেই লাল দেবে আকাশে। কড়া ভারমিলিয়নে আঁকবে শর্বরীর শাড়িটাও। আর শর্বরীর মুখ সে আঁকবে না। সেখানে থাকবে নারী মুখের একটা আভাষ মাত্র।

কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন—

গত ৫ই অক্টোবর সোমবার রাত্রিতে কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ ইন্দুভূষণ সেন, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী, ডি-এস সি তাঁহার কলিকাতা ১০১১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ বাস ভবনে ৬২ বৎসর বয়সে সহসা পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি নদীয়া জেলার শান্তিপুরের নিকটস্থ হরিপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতা কবিরাজ সত্যচরণ সেন কলিকাতায় খ্যাতিমান্ চিকিৎসক ছিলেন। যৌবনে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যালয় হইতে কবিরাজী চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া তিনি ৪২ বৎসরেরও অধিক কাল চিকিৎসা ব্যবসায়ে ব্রতী ছিলেন এবং গত প্রায় ২৫ বৎসর নানাভাবে শ্যামদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি কয় বৎসর পুরুলিয়ায় এক দাতব্য আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসালয়ে কাজ করিয়াছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরিয়া আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে শত শত প্রবন্ধ লিখিয়া নানা দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে প্রকাশ করিতেন এবং ভারতবর্ষেরও নিয়মিত লেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত বাঙ্গালীর খাদ্য, বাংলা দেশের গাছপালা ও ঔষধ প্রভৃতি বহু পুস্তক জনপ্রিয় হইয়াছিল এবং তিনি সাহিত্যবাসর প্রতিষ্ঠা করিয়া গত ৩০ বৎসর কাল কলিকাতার সাহিত্যসেবীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখিতেন ও তাঁহাদের নানাভাবে সাহায্য করিতেন। তিনি আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ে কয়েকখানি মাসিক পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন এবং শেষজীবনে নিজে আয়ুর্বিকাশ নামক একখানি মাসিকপত্র চালাইতেছিলেন। তাঁহার মত বন্ধুবৎসল মহাপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যা কম। আমাদের সহিত তাঁহার দীর্ঘ ৪৩ বৎসরের ঘনিষ্ঠতা ছিল, কাজেই তাঁহার মৃত্যুতে স্বজনবিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজনকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি। প্রার্থনা করি, তিনি যে আয়ুর্বেদ প্রচারের জন্য আজীবন আগ্রহের সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা যেন আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ভারতবাসীর কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয়।

আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন—

গত ৪ঠা নভেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্ব্বাচন ফল প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ লিন্ডন বেনজ জনসন অধিক ভোট পাইয়া প্রেসিডেণ্ট এবং শ্রীহুবার্ট হামফ্রে ভাইস-প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। সেনেটর গোল্ডওয়াটার প্রেসিডেণ্ট পদপ্রার্থী হইয়া পরাজিত হইয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহার নির্ব্বাচনে শতকরা ৬১ ভোট পাইয়া রেকর্ড সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জনসন সে রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছেন। জনসন পাইয়াছেন ৩৯৯০৪৫১৭ ভোট, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী গোল্ডওয়াটার পাইয়াছেন—২৫১৪২৭৬১ ভোট। জয়লাভ করার পর জনসন ঘোষণা করিয়াছেন— শান্তির জন্য যাহা করা প্রয়োজন আমি তাহা করিব ও যেখানে যাওয়া প্রয়োজন তথায় যাইব। জনসনের জয়ে জগতের সকল লোক সন্তুষ্ট হইবে, কারণ যাহারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তাহারা আমেরিকা ও রুসিয়ার নূতন ব্যবস্থায় পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বাধ্য হইবে—নচেৎ তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য হইবে।

সাংবাদিক অশ্বিনী গুপ্ত—

খ্যাতিমান সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকা ও হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের দিল্লীস্থ ভারপ্রাপ্ত প্রাক্তন কর্মী অশ্বিনীকুমার গুপ্ত গত ৫ঠা নভেম্বর রাত্রিতে ৫৬ বৎসর বয়সে কলিকাতাস্থ সুখলাল কারনানী হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রী, ২ পুত্র ও ২ কন্যা বর্তমান। বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের প্রসিদ্ধ কবিরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং এম-এ পাশ করিয়া কয়েক বৎসর অধ্যাপকের কাজ করিয়া ১৯৩৭ সন হইতে হিন্দুস্থান

ষ্ট্যাণ্ডার্ডের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি কয়েকবার ইউরোপ ভ্রমণ করিয়াছিলেন—বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল হটিনী গুপ্তা (দাস) তাঁহার ভগিনী ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন এবং সারা ভারতে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার অকাল বিয়োগে সংবাদিক মাত্রই দুঃখিত হইবেন—আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

কালোবাজার দমনে অর্ডিনান্স জারী—

কালোবাজারীদের দমন করিবার উদ্দেশ্যে বিচারের নূতন ব্যবস্থা করিয়া গত ৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রপতি দিল্লীতে এক নূতন আইন জারী করিয়াছেন। বিচারে অযথা বিলম্বের জন্য কালোবাজারীরা নানাভাবে সুবিধা পায়—নূতন আইনে সে সব সুবিধা বন্ধ করা হইবে এবং ধৃত অসাধু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সঙ্গে ১ বৎসর কারাদণ্ড দেওয়া হইবে। সারা দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—বিশেষ করিয়া খাদ্য ব্যবসায়ে যে দুর্নীতি দেখা দিয়াছে, তাহা বন্ধ না করিলে সাধারণ শান্তিপ্রিয় দেশবাসীদের রক্ষা করা যাইবে না। সেজন্য শ্রীগুলজারিলাল নন্দের বিশেষ চেষ্টায় এই নূতন আইনজারি করা হইয়াছে। এখন ইহার সুফল দেখা দিলে দেশের লোক আশ্বস্ত হইবে এবং খাদ্যের বাজারে মুনাফা বন্ধ হইলে মানুষ অর্থনৈতিক অসুবিধা হইতে রক্ষা পাইবে।

বক্সী গোলাম মহম্মদ গ্রেপ্তার—

কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদকে ২২শে অক্টোবর শ্রীনগরে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজি-এম-সাদিক এই গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। গোলাম মহম্মদের বিচারের জন্য একজন বিশেষ বিচারপতি নিযুক্ত করা হইবে—তাঁহার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহী কার্যের বহু অভিযোগ আছে।

বোধিবৃক্ষের চারা—

সিংহলের অনুরাধাপুর হইতে মহাবোধিবৃক্ষের ২টি চারা ২৫শে অক্টোবর দিল্লীতে আনা হইয়াছে। সিংহলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়ক আনুষ্ঠানিক ভাবে চারা ২টি ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীকে প্রদান করিলে সেগুলি দিল্লীর বুদ্ধ-জয়ন্তী পার্কে রোপন করা হইবে। ভারতের সহিত সিংহলের আড়াই হাজার বছরের এই সম্পর্ক দৃঢ় করাই বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্য।

খাজা নাজিমুদ্দীন—

অবিভক্ত বাংলার মন্ত্রী, ঢাকা নবাব পরিবারের সন্তান খাজা নাজিমুদ্দীন গত ২২শে অক্টোবর হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া ৭০ বৎসর বয়সে ঢাকায় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি পাকিস্তানেরও প্রধান মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্প্রতি সমস্ত বিরোধী দলকে একত্র করিয়া তাহার নেতা হইয়া মিস্ ফাতিমা জিন্নাকে তাঁহার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সাহায্য করিতেছিলেন। তাহার পত্নী, ২ পুত্র ও ১ কন্যা বর্তমান। ১৯২১ সাল হইতে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করিয়া তিনি ভারতে ও পাকিস্তানে জনপ্রিয় নেতা হইয়াছিলেন। উচ্চ শিক্ষা, বংশ মর্যাদা ও কর্মশক্তি তাঁহাকে উচ্চ সম্মান দান করিয়াছিল। সংযুক্ত বাংলার মন্ত্রিত্ব কালে বহু সময়ে আমরা তাঁহার সহৃদয় ব্যবহার ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইতাম।

শত শত কোটি কাল টাকা—

গত ২৬শে অক্টোবর কলিকাতায় প্রকাশ পাইয়াছে যে বোম্বায়ে চিত্র তারকাদের কালো টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করার পর কলিকাতার একদল ধনী তাঁহাদের শত শত কোটি কালো টাকা রাজস্থান ও উত্তর প্রদেশের গ্রামাঞ্চলে সরাইয়া ফেলিয়াছে। আয়কর, মৃত্যুকর প্রভৃতি ফাঁকি দিবার জন্য কলিকাতার একদল অসাধু ব্যবসায়ী শত শত কোটি টাকা গোপন করিয়া রাখিয়াছে এ সংবাদ সর্বজনবিদিত। ভারতরাষ্ট্রের পুলিশ প্রভৃতির কর্তব্যে অবহেলা ও অন্যান্য কারণে ঐ টাকা সরকার বাজেয়াপ্ত করিতে পারে নাই। ধরা পড়ার ভয়ে ব্যবসায়ী ও ধনীরা এখন ঐ টাকা গ্রামাঞ্চলে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের গৃহে সরাইয়া ফেলিয়াছে। পুলিশ একটু সতর্ক হইলে ঐ টাকার সন্ধান পাইবে এবং দুর্নীতিমুক্ত পুলিশ এখনও তাহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে। আমরা এ বিষয়ে সরকারকে কঠোরতার সহিত কর্তব্য পালন করিতে আবেদন জানাই।

ভারতে পাক-মুসলেম অনুপ্রবেশ—

কায়রোতে বিশ্বরাষ্ট্র সম্মিলনে ভারতের পক্ষ হইতে

এক পুস্তিকা বিতরণ করা হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে—১৯৫১ হইতে ১.৬১ সাল দশ বৎসরে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যে অত্যধিক পাকিস্তানী মুসলেম অনুপ্রবেশ করিয়াছে। গত দশ বৎসরে আসামে মুসলেম অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িয়াছে—৩৯ শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৫৮ শতাংশ এবং ত্রিপুরায় ৫৮ শতাংশ। ভারতে ৫ কোটি মুসলমানের বাস এবং পৃথিবীর যে সকল দেশে মুসলমান বাস করে, সংখ্যা হিসাবে ভারত তাহার তৃতীয়। এই ভাবে ভারতে, বিশেষ করিয়া আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে এই তিনটি রাজ্যও পরে পাকিস্তানে পরিণত হইবে। এ সমস্যা সমাধানের উপায় কি? শাস্ত্রী মন্ত্রিসভাকে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থায় মনোযোগী হইতে হইবে।

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ—

২২শে অক্টোবর ষ্টকহলম হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে ফ্রান্সের জাঁ পল সার্তে সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন। কিন্তু শ্রী সার্তে কর্তৃপক্ষকে জানাইয়াছেন যে তিনি কোন পুরস্কার লইবেন না। এবারে পুরস্কারে সর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ ছিল—তাহার পরিমাণ ২৭৩০০০ ক্রাউন। ফরাসী দেশে এ পর্যন্ত মোট ১১ জন সাহিত্যিক নোবেল প্রাইজ পাইলেন। শ্রী সার্তরের অর্থ নোবেল ভাণ্ডারে ফিরিয়া যাইবে। যিনি প্রকৃত সাহিত্যিক, তিনি কোন পুরস্কার প্রার্থী হন না।

কলিকাতায় রেশনিং—

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ৪ দিন দিল্লীতে থাকার পর ২৯শে অক্টোবর সন্ধ্যায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া তিনি সাংবাদিকদের জানাইয়াছেন—অন্যত্র যে ব্যবস্থাই হউক, কলিকাতা ও সহরতলীতে পুরা রেশনিং প্রথা চালু করা হইবে। তাহার ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের চাল, চিনি ও আটার সমস্যার সমাধান হইবে। এ অঞ্চলে বহু সমবায় ভাণ্ডার গঠিত হইয়া পরিচালিত হইতেছে—তাহাদের মধ্য দিয়া রেশনিং চালু করা হইলে দেশবাসী উপকৃত হইবে।

সিংহলে ভারতীয় সমস্যা—

গত ২২শে অক্টোবর সিংহলের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরনায়কের সহিত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর এক চুক্তি হইয়াছে। তাহাতে সিংহলস্থ ভারতবাসীদের মধ্যে ৩ লক্ষ লোককে সিংহলের নাগরিক করিয়া লওয়া হইবে, ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ভারতীয়কে ভারতরাষ্ট্র আগামী ১৫ বৎসরে ভারতে ফিরাইয়া আনিবে এবং বাকী ১ লক্ষ ৫০ হাজার ভারতবাসী সম্বন্ধে আগামী জানুয়ারী মাসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। এতদিন এই ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ভারতবাসী সিংহলে রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া বাস করিতেছিল। শ্রীমতী বন্দরনায়ক ৩ দিন দিল্লীতে থাকিয়া শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর সহিত এ বিষয়ে আলোচনার পর সমস্যার সমাধান করিয়াছেন।

কংসাবতী পরিকল্পনা—

বাঁকুড়া জেলার কংসাবতী ও কুমারী নদীর বন্যা হইতে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার একাংশকে রক্ষা করার জন্য তথায় ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে যে পরিকল্পনায় কাজ হইয়াছে, তাহার প্রথম অংশ সম্পূর্ণ হওয়ায় গত ৬ই অক্টোবর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বাঁধের নিকট যাইয়া জলধারা দানের উদ্বোধন করিয়াছেন। রাজস্ব ও সেচ মন্ত্রী শ্রীশ্যামাদাস ভট্টাচার্য এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী শ্রীমতী পূরবী মুখোপাধ্যায় তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ঐ কার্য শেষ করিতে আরও ২০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। ইহার ফলে প্রায় ৯ লক্ষ একর জমিতে সেচের জল দেওয়া সম্ভব হইবে। কংসাবতীর কাজ শেষ হইলে মোট ৭৭ হাজার একর জমী চাষের সুবিধা পাইবে ও ৩২ হাজার একর জমী জলাশয়ে পরিণত হইয়া অন্যভাবে দেশকে সমৃদ্ধ করিবে।

পাকিস্তানী অনাচার—

আমেরিকা ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশকে অস্ত্র-শস্ত্র দান করিয়া সাহায্য করিয়াছে—ঐ সাহায্যের সর্ত ছিল ভারত বা পাকিস্তান কেহই পরস্পরের বিরুদ্ধে ঐ অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। কিন্তু ৬ই অক্টোবরের সংবাদে জানা যায় যে পাকিস্তান কাশ্মীরের সীমান্তে যুদ্ধবিরতি রেখার এ পারে ভারতীয় সৈন্যদিগকে মার্কিন অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ করিতেছে। ভারতের পক্ষ হইতে এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং ভারতস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত নিজে যাইয়া কাশ্মীরে ঐ সকল মার্কিন অস্ত্র ব্যবহৃত হইতে দেখিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু "তারা

না শোনে ধর্মের কাহিনী"—পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন কথাই শুনেন না। শেষ পর্যন্ত কি ভারতকে পাকিস্তানের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে?

লাদকে কম্যুনিষ্টদের তৎপরতা—

ভারত সীমান্তে লাদকের একটি অংশ সৈন্যমুক্ত রাখা হইয়াছিল—তথায় ভারতীয় বা চীনা কোন সৈন্যদলকেই প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। গত ৭ই অক্টোবর খবর পাওয়া যায় যে চীনা সৈন্যরা লাদকের ঐ অংশে অবৈধ প্রবেশ করিয়া ভারত আক্রমণের জন্য তথায় সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। ভারত চীনের এই বে-আইনি কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছে এবং প্রতিবাদ স্বরূপ চীনকর্তৃক আহুত একটি বৈজ্ঞানিক সম্মিলনে যোগদান করে নাই—ঐ সম্মিলন পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহা বিজ্ঞান কর্মীদের ১৯৬৪ সালের বিশ্ব-ফেডারেশন বলিয়া ঘোষিত হয়। যাহা হউক, কম্যুনিষ্ট চীন নানাভাবে সর্বদা ভারতকে বিব্রত করে এবং রুসের সাহায্যের সম্ভাবনা হইলেই ভারত আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে হয়।

ভারতের বাহিরে প্রধান মন্ত্রী—

শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী নূতন প্রধানমন্ত্রী হইয়া গত ২রা অক্টোবর সর্বপ্রথম ভারতের বাহিরে কায়রোতে নিরপেক্ষ দেশ সমূহের শীর্ষ সম্মিলনে গিয়াছিলেন। তাহার পূর্বে শ্রীশাস্ত্রী একবার মাত্র নেপালে গিয়াছিলেন। ঐ দিন মহাত্মা গান্ধীর জন্ম দিন ও শ্রীশাস্ত্রীরও জন্ম দিন ছিল। তিনি বিমান বন্দরে যাইয়া ভারত ত্যাগের পূর্বে বৃদ্ধা মাতার চরণধূলি লইয়া তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার কায়রো ভ্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে—তিনি শীঘ্রই ইউরোপের কয়েকটি দেশ ভ্রমণে যাইবেন। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ভারতকে পৃথিবীর সকল লোকের সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া, সকল দেশের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করিয়া উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে হইবে। কেন্দ্রের অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রায়ই বিদেশে যাইয়া থাকেন—কিন্তু প্রধান মন্ত্রীর বিদেশ ভ্রমণ নানা-কারণে ভারতের পক্ষে কল্যাণদায়ক হয়।

ইন্দ্রকুমার চৌধুরী—

খ্যাতনামা সাংবাদিক, আনন্দবাজার পত্রিকার কর্মী ইন্দ্রকুমার চৌধুরী গত ৭ই নভেম্বর ভোর ৫টায় (শুক্রবার রাত্রি শেষে) ৮২ বৎসর বয়সে কলিকাতা ১৭৭ সি বিবেকানন্দ রোডের বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি নোয়াখালি জেলার লামচরের বিখ্যাত সিংহ চৌধুরী বংশের সন্তান—যৌবনে সর্টহ্যাণ্ড শিখিয়া ও পরে নিজস্ব বাংলা সর্টহ্যাণ্ড উদ্ভাবন করিয়া ১৯৩১ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টারের কাজ করিয়াছিলেন। অমায়িক ও সহৃদয় ব্যবহারের জন্য তিনি সর্বজনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগ বেদনা অনুভব করিতেছি।

বামপন্থী নেতার দল ধৃত—

একদল বামপন্থী সর্বদা ভারতে কংগ্রেসী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার করিয়া দেশের লোককে ভ্রান্ত পথে চালিত করার চেষ্টা করিতেছিল। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে সেরূপ একদল বামপন্থী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে—তাহাদের মধ্যে কয়েকজন উগ্র এম-পি, এম-এল-এ ও এম-এল-সি আছেন। কঠোরতার সহিত সরকার এ বিষয়ে কাজ না করায় দেশে অশান্তি বাড়িয়া যাইতেছিল—কাজেই সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি সরকারের এই কার্যে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। একদিকে পাকিস্তানী অধিবাসীদের অপপ্রচার ও অপরদিকে বামপন্থী কর্মীদের মিথ্যা প্রচার—এ দেশে সকল গঠন-মূলক কাজে বাধা দিতেছে—তাহার প্রতীকার হওয়া সত্বর প্রয়োজন হইয়াছিল। আমরা এ বিষয়ে সরকারকে অবহিত হইতে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়াছি।

ভারত হইতে পাকিস্তানী বিতাড়ন—

গত কয়েক মাস ধরিয়া ভারত সরকারের নির্দেশ মত পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলিকাতার বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হইতে পাকিস্তানী কর্মী বিতাড়নের কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশন, ডক, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই, রেল প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে হাজার হাজার পাকিস্তানী কর্মী কাজ করিতেছে। তাহাদের দেশে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ জানাইয়া নোটীশ দেওয়া হইয়াছে। কতকগুলি বিদেশী জাহাজ কোম্পানী পাকিস্তানীদের বিতাড়নে সময় চাহিয়া নানাভাবে আপত্তি করিতেছে। কিন্তু পাকিস্তানের সহিত ভারতের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী, সে জন্য ভারতের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন [illegible]

হইতে পাকিস্তানী না তাড়াইলে ভারত আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ আদেশ দেওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্তারা দ্রুত কাজ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এ বিষয়ে সাধারণের সহ-যোগিতা পাইলে সরকার আরও শীঘ্র কাজ করিতে পারিবেন।

সাহিত্যতীর্থে সাহিত্যিক সম্মিলন—

কলিকাতা ৬৭ পাথুরিয়া ঘাটা স্ট্রীটে বিখ্যাত মল্লিক-বাড়ীতে গত ৯।১০ অক্টোবর সাহিত্যতীর্থের বার্ষিক সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসরোজ কুমার রায়চৌধুরী, শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্র দেব, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় প্রভৃতি সম্মিলনে ভাষণ দেন। শ্রীদেব খ্যাতনামা স্বর্গত কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা করেন। তীর্থের সম্পাদক সুকবি রমেন্দ্র নাথ মল্লিকের চেষ্টায় এই সম্মিলনটি সর্ব প্রকারে সাফল্য মণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ উপলক্ষে তীর্থ একখানি বার্ষিক পুস্তকও প্রকাশ করিয়াছেন।

গ্রামে মন্ত্রিসভার অনুষ্ঠান—

চীন কর্তৃক ভারত আক্রান্ত হইলে ২৪ পরগণা জেলার টাকী গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার একদিন অধিবেশন হইয়াছিল। ঐ সময় বসিরহাট হইতে টাকী পর্যন্ত সমগ্র এলাকা উৎসাহ ও উদ্দীপনায় চঞ্চল হইয়া মন্ত্রিদিগকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে ও সাধারণ মানুষরা মন্ত্রীদের সহিত নানাভাবে মিলিত হওয়ার সুযোগ গ্রহণ করে। গত ৩রা নভেম্বর আবার নদীয়া জেলার হরিণঘাটা দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্রের ইন্‌স্‌পেক্‌সন বাংলোতে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার এক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এবার বাহিরের বেশী জাঁকজমক ছিল না—তবে মন্ত্রীরা সারাদিন তথায় থাকিয়া পরস্পর নানা সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন ও সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। পল্লী গ্রামে মন্ত্রিসভার অধিবেশন নানাদিক দিয়া দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণদায়ক হয় সন্দেহ নাই।

নন্দিনী ও কল্পনা—

কলিকাতা ১৪, সি-আই-টি বিল্ডিংস হইতে সি-আই-টি টেনাণ্টস্ এসোসিয়েশনের পরিচালনায় গত পূজার সময় কল্পনা নামক এক শারদীয় সাহিত্য প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে কবি কালিদাস রায়, নরেন্দ্র দেব, যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতা এবং রণজিৎ কুমার সেন, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার প্রভৃতির রচনা আছে। শ্রীশিবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লিখিত কলিকাতার গৃহসংকট মোচনের উপায় প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ইহা সদস্যদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত। শ্রীইন্দিরা দেবী ও শ্রীসুনীতি গুপ্তার সম্পাদনায় কলিকাতা-৬, ৮এ, কার্তিক বসু লেন হইতে নন্দিনী নামক একখানি পূজা বার্ষিকী প্রকাশিত হইয়াছে। দাম তিন টাকা। বহু রচনায় পূর্ণ, সবই মহিলাদের লেখা। লেখকদের মধ্যে আছেন, জ্যোতির্ময়ী দেবী, রেণুকা রায় এম-পি, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, বাসন্তী দেবী, রাধারাণী দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, উমা দেবী, লীলা মজুমদার প্রভৃতি। সংকলনখানি মনোজ্ঞ ও তথ্যবহুল হইয়াছে। এরূপ প্রচেষ্টা অভিনন্দনের যোগ্য।
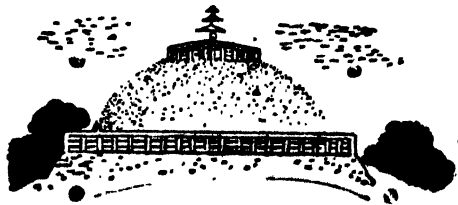
ভাইফোঁটার বোঝা

গৃহস্বামী—এই যে···নাও!—সাত্-সকাল থেকে তামাম্ বাজার চুঁড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় 'লাইন্' দিয়ে দাঁড়িয়ে এনেছি তোমার ফরমাশমতো ভাইফোঁটার সওগাত!···পঁচিশ টাকা জোড়ার ইলিশমাছ···পনেরো টাকা সেরের সন্দেশ ···পাঁচ টাকা কিলোর সরষের তেল···চল্লিশ টাকা মণের পোলাওয়ের চাল···আর বত্রিশ টাকা জোড়ার কাঁচি-পাড় ধুতি!···

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

প্রতিশ্রুতি পালন

চাঁদমোহন চক্রবর্তী

স্থান-ভবানীপুর—একটি ঘরে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলি পাঁজীপুঁথী ছড়ান। একটি থালু হুকায় তামাক টানছিলেন জ্যোতিষী রামনাথ জ্যোতিরত্ন অন্যমনস্ক—চিন্তাক্লিষ্ট মুখে।

আপনিই জ্যোতিষী মশাই?

রামনাথ ত্রস্তে উঠে বসলেন স্থিরভাবে কাপড় চোপড় সামলে।

কি চাই, আপনার?

হঠাৎ আপনার সাইনবোর্ড দেখে ঢুকে পড়লাম আপনার ঘরে!

বেশ বাবা, বেশ করেছ! বসো, বসো—

আচ্ছা, আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলতে পারেন?

পারি একথা বললে ভুল হবে—চেষ্টা করি, অনেক সময় মিলেও যায়।

আগন্তুক আশ্চর্য হলো জ্যোতিষীর সরল ব্যবহারে ও সৌম্য মূর্তি দেখে। চৌকির এক কোণে বসল, বন্ধু সহ।

জ্যোতিষী তাকাল যুবকের প্রশান্ত প্রতিভাদীপ্ত মুখের দিকে—আচ্ছা বাবা দেখি তোমার হাতখানি—

যুবক কৌতূহলী মুখে হাত বাড়াল—

জ্যোতিষী যুবকের হস্তরেখা পরীক্ষা করল পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে—

মুখে ফুটে উঠল বিস্ময়ভাব—বাঁ হাত চাইল—যুবক বাড়িয়ে দিল হাত জ্যোতিষীর দিকে।

জ্যোতিষী সোজা হয়ে বসল—খানিকক্ষণ দুই চোখ বুজল। বলল—কি জানতে চাও বাবা?

যুবক জ্যোতিষীর হালচাল দেখে হলো বিস্মিত—কৌতূহলভরা কণ্ঠে বলল—বেকার কত দিন থাকবো? কি দেখলেন?

জ্যোতিষী বলল—বেকার তুমি থাকবে না, বাবা। তুমি হবে বিখ্যাত দেশপ্রেমিক, কবি, ভক্ত ও আইনজীবী। তুমি তো সামান্য লোক নও বাবা!

যুবক বিদ্রূপ কণ্ঠে বলল—আমার কাছে একটি পয়সাও নাই—আপনি স্তোকবাক্যে ভোলাতে পারবেন না আমাকে। বর্তমান বলুন—আমার হস্তরেখায় কি দেখলেন?

—বর্তমান তোমার দুঃসময়—পিতৃরিষ্ট যোগ—আরো—তোমার যে রাশি নক্ষত্র তাতে তুমি পিতৃবিত্তহীন, স্বাবলম্বী—স্বীয় উদ্যম চেষ্টায় হবে অগাধ অর্থের মালিক—আবার সব বিলিয়ে দিয়ে হবে ফকীর—কি অদ্ভুত ভাগ্যবান ব্যক্তি!

—থাক! থাক! আর বলতে হবে না—আমি এবারে উঠি—

যুবক চিন্তাক্লিষ্ট মুখে চলে গেল—জ্যোতিষী বিস্মিতভাবে তাকিয়ে রইল যুবকের গতিপথে।

আবার ফিরে এলো যুবক—জ্যোতিষী প্রশ্নসূচক মুখে তাকাল যুবকের দিকে।

—আচ্ছা পণ্ডিত মশাই, বলতে পারেন আমার রুগ্ন বাবা এবারে সেরে উঠবেন?

—বড়ই কঠিন প্রশ্ন করলে বাবা? তোমার বাবার ঠিকুজী বা হাত না দেখে এই প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নয়, বাবা!

—আচ্ছা, আর একদিন আসবো, বাবার জন্ম তারিখ বা ঠিকুজী নিয়ে।

যুবকের সংগী বলল,—পণ্ডিত মশাই, এর বাবা ভবানীপুর তথা বাংলা দেশের বিখ্যাত এটর্নী ভুবনমোহন দাশ, আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

জ্যোতিষী উৎসুক কণ্ঠে বলল, নিশ্চয়ই জানি, তবে আমার ন্যায় গরীব ব্রাহ্মণের পক্ষে কখনও সাক্ষাৎ হবার সুযোগ হয় নি, বাবা।

এবারে জ্যোতিষী মশাই, যুবকের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোমার নামটি জানতে পারি বাবা ?

উত্তর দিল—চিত্তরঞ্জন দাশ।

—নামটি তো বেশ! আমার ভবিষ্যৎ বাণী, তুমি বাবা চিত্তহরণ করবে সর্বসাধারণের—তুমি হবে দিগ্‌বিজয়ী নেতা, সর্বদিকে, সর্ব বিষয়ে—আমার এই কথা লিখে রাখো তোমার নোট বইয়ে।

চিত্তরঞ্জন বিনীতকণ্ঠে বলল, পণ্ডিত মশাই, আমার প্রতিশ্রুতি রইল আপনার এই ভবিষ্যৎ বাণী সত্যি হলে আমি আপনাকে পুরস্কৃত করবো আপনার অভিরুচি মত —কিন্তু আজ আমি রিক্তহস্ত—পিতা আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য, হৃতসর্বস্ব।

চিত্তরঞ্জন চিন্তাক্রান্ত মনে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে চিত্তরঞ্জনের বাবা মারা গেলেন—অর্থাভাব, পিতার ঋণভার, অসংখ্য ঘাতপ্রতিঘাতে চিত্তরঞ্জন ক্ষতবিক্ষত হলেন। অসীম অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি ধাপে ধাপে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠ করলেন আইন ব্যবসায়ে। শ্রীঅরবিন্দের সংস্রবে এসে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। ইংরেজের দণ্ডনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। শ্রীঅরবিন্দের বিখ্যাত বিচার প্রসঙ্গে তিনি নিজে বিশ্ববিখ্যাত আইনজ্ঞ বলে প্রতিষ্ঠালাভ করলেন। শ্রীঅরবিন্দকে করলেন মুক্ত আদালতের বিচারে। দিকে দিকে প্রতিভাত হলো চিত্তরঞ্জনের প্রতিভা, খ্যাতি ও দেশ প্রেম। তিনি বিলাসিতার স্রোতে গা ভাসালেন কিছু দিন। চিত্তরঞ্জন বহু অর্থ উপার্জন করলেন, পিতার পাওনাদারদের বা উত্তমর্ণদের তাদের প্রাপ্য টাকা পরিশোধ করলেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করলেন গরীব দুঃখীকে।

মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় অহিংস আন্দোলন সুরু করলেন, সবরমতী আশ্রম তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হ'ল। হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত ভারতবাসী হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, শিখ, পাঠান সর্বজাতি সর্ব সম্প্রদায় একতাবদ্ধ হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজকে ছাড়তে হবে ভারত। গরম দল—বৈপ্লবিক দল দেশ-বিদেশ হতে অস্ত্র শস্ত্র আমদানী করে ইংরেজদের ধ্বংস করে ভারত স্বাধীন করবার সংকল্প গ্রহণ করল—উল্লাসকর, ক্ষুদিরাম প্রভৃতি যুবকবৃন্দ আত্মোৎসর্গ করল ফাঁসী কাঠে। ইংরেজ প্রমাদ গণল। গণ-আন্দোলন রাষ্ট্র বিপ্লবে পরিণত হ'ল।

সেই ক্ষণে মহাত্মা গান্ধী প্রচার করলেন ভারত স্বাধীন হ'বে অহিংসা নীতিতে—তাঁর এই আন্দোলন ব্যর্থ হলে তিনি ইংরেজদের সংগে অসহযোগ আন্দোলন সুরু করলেন। হিমালয় হ'তে কন্যাকুমারী পর্যন্ত সেই আন্দোলনে সাড়া দিল—দলে দলে স্বাধীনচেতা যুবকেরা সরকারী চাকুরী ত্যাগ করল—ব্রিটিশ শাসকের আদালতে ওকালতী বর্জন করল। কলেজ স্কুল থেকে ছেলেরা বেরিয়ে পড়লো মহাত্মার অসহযোগ আন্দোলনকে সাফল্য মণ্ডিত করতে। বহু ভারতবাসী রাজা, নাইট প্রভৃতি ইংরেজদের দত্ত খেতাব ত্যাগ করল। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ক্রুদ্ধ হয়ে বর্বরোচিত চণ্ডনীতি সুরু করলেন স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যর্থ করতে।

সেই শুভ মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন তাঁর বিলাস ব্যসন ত্যাগ করে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নিলেন—বিশুদ্ধ খাদী পরিধেয় বরণ করলেন। সেই সংগে তিনি পেলেন শ্রীকৃষ্ণের বাণী—"সর্বধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং স্মরণং ব্রজ" তিনি হলেন কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা—পরম বৈষ্ণব। দেশবাসী স্তম্ভিত হলো ত্যাগ, দান ও ভক্তি দেখে।

কিছুদিন পর চিত্তরঞ্জন ইংরেজ আদালতে ব্যারিষ্টারী ব্যবসা বর্জন করবেন মনস্থ করলেন—তিনি মক্কেলদের ডেকে ডেকে ফিরিয়ে দিতে সুরু করলেন তাদের 'ব্রিফস্'—কাগজপত্র। তিনি তখন আইনজীবিগণের শীর্ষস্থানে পৌঁচেছিলেন—তার এই ত্যাগে দেশবাসী হল বিস্মিত—বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দিলেন ওকালতীর অর্থ দ্বারা সাহায্য করতে স্বাধীনতা সংগ্রামকে—কিন্তু তাহা তিনি অগ্রাহ্য করলেন।

সেইক্ষণে একদিন দ্বারদেশে দেখা দিলেন এক প্রশান্ত সৌম্যমূর্তি ব্রাহ্মণ—চিত্তরঞ্জনের দ্বার তখন উন্মুক্ত সর্বজাতি ও সর্ব সাধারণের নিকট। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন, আমি দেখা করতে এসেছি চিত্তরঞ্জন দাশের সংগে।

চিত্তরঞ্জন সহাস্য মুখে সাদরে গ্রহণ করলেন আগন্তুক ব্রাহ্মণকে। প্রশ্ন করলেন—কি চাই বলুন? ব্রাহ্মণ উত্তর করলেন—আমি চাই তোমার প্রতিশ্রুতি পালন?

চিত্তরঞ্জন বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—প্রতিশ্রুতি? কি প্রতিশ্রুতি? আমি কখন করেছি আপনার সংগে?

ব্রাহ্মণ দীপ্তকণ্ঠে বললেন, স্মরণে পড়ে। একদিন তুমি গিয়েছিলে আমার জ্যোতিষালয়ে তোমার এক বন্ধু সহ। ফলেনি কি আমার গণনা অক্ষরে অক্ষরে? তুমি তখন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে আমাকে পুরস্কৃত করবে যদি সত্য হয় আমার ভবিষ্যৎ বাণী। আজ আমি এসেছি জানাতে আমার দাবী।

চিত্তরঞ্জনের স্মৃতিপথে উদিত হল সেই ইতিকথা—তিনি বললেন, হাঁ, চিনেছি, আপনি সেই ভবানীপুরের জ্যোতিষী ঠাকুর। আমি নিশ্চয়ই প্রতিপালন করব আপনার আদেশ—বলুন কি চাই।

ব্রাহ্মণ কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, বাবা, আমি আজ বিপন্ন আমি কন্যাদায়গ্রস্ত—আগামী সপ্তাহে স্থির করেছি কন্যার বিবাহ কিন্তু আমি রিক্তহস্ত।

চিত্তরঞ্জন মলিন মুখে বললেন, এতদিন কেন আসেন নি পণ্ডিত মশাই? আমিও যে রিক্তহস্ত।

ব্রাহ্মণ অম্লান বদনে বললেন, বাবা দরকার হয় নি তাই আসি নি—আজ নিরুপায় হয়ে এসেছি তোমার দ্বারে। তোমার অসুবিধা হয় আমি চলে যাব। এই বলে ব্রাহ্মণ হলেন প্রস্থানোদ্যত। চিত্তরঞ্জন বাধা দিলেন ব্রাহ্মণকে। মুখে বললেন—পণ্ডিত মশাই, দাঁড়ান আমি করব আপনার ভাগ্যপরীক্ষা।

চিত্তরঞ্জন ডাকলেন তাঁর 'বাবু' (মুহুরী) কে—জিজ্ঞাসা করলেন ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে কি সব 'ব্রিফস্' মক্কেলদের। 'বাবু' জানাল একটি 'ব্রিফ্' ফেরৎ নেয়নি—এক বড় পার্টীর আগামী কালই তার শুনানীর দিন। তিনি নির্দেশ দিলেন বাবুকে খবর দিতে সেই মক্কেলকে, তিনি নিজেই চালাবেন সেই মোকর্দমা। ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করলেন দেখা করতে আগামী রাত্রে।

সেই মক্কেল যখন খবর পেল চিত্তরঞ্জন স্বয়ং পরিচালনা করবেন তার মোকর্দমা সে পেল হাতে স্বর্গ—ছুটে এলো রাত্রেএটর্নীসহ মোকর্দমার জন্য তৈরী হ'তে। এটর্ণী প্রশ্ন করেছিল—হঠাৎ কি কারণে তিনি রাজী হলেন এই মামলা করতে—কিন্তু চিত্তরঞ্জন দিলেন না কোন উত্তর। মক্কেল খুব খুসী, চেক্ বই বের করে জানতে চাইল, কত হবে টাকার অঙ্ক—ফিস্ বাবদ। চিত্তরঞ্জন বললেন—চেক্ দেবেন না। আমার চাই নগদ টাকা—পরিমাণ আপনার অভিরুচি, আমি কিছু 'ডিমাণ্ড' করব না। এই আমার শেষ মামলা হবে আদালতে।

এটর্ণী ও মক্কেল মুখ চাওয়া চাওয়ি করল আশ্চর্য হয়ে। এই প্রস্তাবে রাজী হলো মক্কেল—কালই কোর্টে নগদ টাকা দেবে বলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যায়। জ্যোতিষী এলেন চিত্তরঞ্জনের গৃহে যথাসময়ে। চিত্তরঞ্জন বাবুকে আদেশ করলেন মক্কেলের দেওয়া টাকা আনতে। বাবু টাকার থলি এনে হাজির করলো। চিত্তরঞ্জন বিনীতভাবে অনুরোধ জানাল ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করতে সেই অর্থ। ব্রাহ্মণ কৃতজ্ঞভাবে অর্থ গণনা করে বললেন, বাবা, এযে ২০,০০০, টাকা। এত টাকার তো আমার দরকার নাই। আমার পাঁচ হাজার টাকা হলেই চলবে।

চিত্তরঞ্জন সহাস্যে বললেন, ঠাকুর, এই অর্থে আমার কোন অধিকার নাই—এ যে আপনার ভাগ্যে এসেছে। গ্রহণ করুন—আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে দিন।

কৃতজ্ঞতায় জ্যোতিষীর কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ—উর্ধ্বে দু'হাত তুলে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলল—ধন্য, বাংলার দাতাকর্ণ!

মিহিরাচার্য্য

আলোচনা

রবি হচ্ছেন গ্রহের রাজা। তেজে, প্রতাপে, দীপ্তিতে ও আকারে রবি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ঐশ্বর্য্যশালী গ্রহ বলে নির্ণীত। এই গ্রহরাজকে কেন্দ্র করে অপর সকল গ্রহেরা নিয়ন্ত্রিত হন। রবির কারণেই অন্যান্য গ্রহ উদিত ও অস্তমিত হয়। শুধু তাই নয়, রবির অবস্থান ও দূরত্ব অনুযায়ী অন্যান্য গ্রহগণের গতি শীঘ্র, মন্দ, বক্রী ও মার্গী প্রভৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

রবির তেজে সামনে এগুতে না পেরে গ্রহরা যখন পিছু হাটেন: সেই অবস্থাকে বক্রী বলে অভিহিত করা হয়। আবার যখন সোজা হাঁটেন তখন তাকে মার্গী বলা হয়। কোন কোন জন্মকুণ্ডলীতে দেখবেন গ্রহের নামের পাশে উ, অ বা বং লেখা থাকে। এর অর্থ হচ্ছে উদিত, অস্তমিত বা বক্রী। অর্থাৎ জাতকের জন্মকালে ঐ সব গ্রহগুলির ঐ ঐ অবস্থা ছিল। বক্রী গ্রহের ফলের সম্বন্ধে মোটামুটি শাস্ত্রে যা লেখে, তা হচ্ছে, ঐ গ্রহসূচিত ফল বিলম্বিত হয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে সব সময় না হলেও জন্মকালীন বক্রী গ্রহ গোচরে ভাল ঘরে বক্রী হলে এবং জন্মকালীন গ্রহ থেকে ত্রিকোণে বা তৃতীয় একাদশ সম্বন্ধ পেলে ফলদান করে। ভাল কি খারাপ ফল, তা নির্ভর করবে গ্রহটি কোন ঘরের মালিক তার ওপর। অবশ্য ফলদান করার ক্ষমতায় বলবত্তা বর্গবিচার থেকেই করতে হবে।

সুতরাং, যে রবিগ্রহের সৌরজগতে এতো প্রভাব, যার গমনাগমন, স্থিতি, দূরত্ব-নৈকট্য প্রভৃতির ওপর অন্যান্য গ্রহের নিয়ন্ত্রণ ও গতি নির্ভর করে, তিনি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারেও নিশ্চয়ই গুরুতর রকমের পোর্ট-ফোলিও যে কুক্ষীগত করে আছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

রবি গ্রহ একমাসে একটি রাশি ভোগ করেন। বিশেষ ভাবে বলবান থাকেন বৈশাখ ও ভাদ্রমাসে। এখন কথা হচ্ছে যে-সব ব্যক্তি বৈশাখ মাসে জন্মেছেন, তাঁরা সবাই কি ভাল এবং একই রকম ফল রবিগ্রহের কাছে পাবেন? না। কারণ, বৈশাখ মাসে জন্মান ব্যক্তিদের রবি যদিও একই অর্থাৎ মেষ রাশিতে রবি আছেন বটে কিন্তু জন্মলগ্ন থেকে নিশ্চয়ই একঘরে থাকবেন না।

এইখানে লগ্ন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি কথা বলে নেওয়া যাক। লগ্ন জিনিষটি কি? লগ্ন একটি বিন্দু, যেটি অঙ্ক কষে বের করতে হয়। বৈশাখ মাসে জন্মালে যেমন রবি মেষরাশিতে থাকেন, তেমনি এক একটি সময়ে জন্মালে এক একটি লগ্ন হয়। যে মাসে জন্মান যায়, সেই মাসে রবি যে রাশিতে থাকেন, সেইরাশি থেকে লগ্ন আরম্ভ হয় এবং মোটামুটি ধরে রাখুন, দুঘণ্টা অন্তর লগ্ন বদল হয়ে পরের রাশিতে নির্ণীত হয়। এখানেও রবি গণনার কেন্দ্র।

ধরুন একজন জন্মেছেন বৈশাখ মাসে সূর্য্যোদয়ের পর মোটামুটি দুঘণ্টার ভেতর। তাহলে রবি মেষরাশিতে থাকার দরুণ, তাঁর লগ্ন হবে মেষরাশিতে। অপর জন জন্মেছেন ঐ বৈশাখ মাসেরই দু'ঘণ্টা থেকে চারঘণ্টার মধ্যে। তাহলে তার লগ্ন হবে পরের রাশি বৃষতে। এমনি করে মোটামুটি দু'ঘণ্টায় লগ্ন এগিয়ে যাবে রবিকে পেছনে ফেলে।

যেমন বৈশাখ মাসের ১লা তারিখে রবি যেখানে

থাকেন, ১৫ তারিখে তার থেকে অনেক এগিয়ে যান, তেমনি ঐ দু'ঘণ্টার হিসাবও রবির এগিয়ে যাওয়ার অনুপাতে এগিয়ে যাবে। যেমন ধরুন ১লা তারিখে রবি যদি মেষরাশির এক বিন্দুতে থাকেন, তেমনি ২ ঘণ্টার পরে লগ্ন হবে বৃষরাশির এক বিন্দুতে। আবার মাসের ১৫ তারিখে রবি যখন ১৫ নম্বর বিন্দুতে থাকবেন তখন ওদিকেও বৃষরাশির ১৫ নম্বর বিন্দুতে লগ্ন হবে। এটি হল সূক্ষ্ম হিসাব—এর জন্যে ত্রৈরাশিকে অনুপাত কষতে হবে। তাহলে যিনি দু'ঘণ্টার মধ্যে জন্মালেন তাঁর রবির অবস্থিতি হল লগ্নে, আর যিনি দু'ঘণ্টার পরে জন্মালেন তার লগ্ন হল বৃষ, রবির অবস্থিতি হল দ্বাদশে। লগ্নে স্থিতি আর দ্বাদশে স্থিতি এক কথা নয়। কারণ লগ্ন থেকে জাতকের যাবতীয় শুভ সংযোগের বিচার হয়, আর দ্বাদশ থেকে বিচার হয় ইহলোকে যাবতীয় ক্লেশের—যেমন ক্ষয়, ক্ষতি, বিদেশ ও কারাবাস এবং পরিলৌকিক মোক্ষের বিচার হয়।

তাহলে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে লগ্ন থেকে যে ঘরে গ্রহের অবস্থিতি, সেই ঘর অনুযায়ী গ্রহেরা শুভাশুভ ফল দেয়।

লগ্ন থেকে রবি কোন্ ঘরে থাকলে কি ফল দেন, সে সম্বন্ধে পরবর্তী সংখ্যায় আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

দ্বাদশরাশির ফল

মেষ রাশি

অশ্বিনীজাত ব্যক্তির মাধ্যম, ভরণীর উত্তম ফললাভ। কৃত্তিকার মধ্যমাধম।

কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত স্ত্রীর বিরোধ। প্রতিবেশীর সহিত বিবাদ, ধর্ম্মভাব দেখাইয়া প্রতারণার সম্ভাবনা। অর্থপ্রাপ্তিতে বিঘ্ন ও বিলম্ব। ভূমি হইতে কিঞ্চিৎ লাভ। ব্যাপারে শুভ—দ্যূতে লাভ। স্ত্রীলোকের মধ্যম।

বৃষ রাশি

কৃত্তিকার উত্তম, রোহিণীর মধ্যম, মৃগশিরার অধমাধম।

মাসের প্রথম দিক মন্দ চলবে না, পরে ব্যয় বৃদ্ধি, হতাশা। কাজের উপর ১৮ তারিখ পর্য্যন্ত অভাবনীয় চাপ ও ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধি। পত্রে কিঞ্চিৎ আনন্দ সংবাদ প্রাপ্তি। সন্তানদের পড়াশোনায় বিঘ্ন, পত্নীর শারীরিক ক্লেশ। সম্ভব স্থলে পুত্র সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকদের মধ্যম।

মিথুন রাশি

মৃগশিরার অধম, আর্দ্রার মধ্যম, পুনর্ব্বসুর উত্তমাধম।

মাসের প্রথমাংশে ভাগ্যহানি ও হতাশা, পরে হঠাৎ বিপদুত্তীর্ণের উপায়প্রাপ্তি। কুটুম্ব বিবাদ, বুদ্ধিভ্রংশ। সন্তান বৃদ্ধিতে মানসিক ক্লেশ। লভ্যাংশে আশাবৃদ্ধি। জামাতার ক্লেশ। ১০।১১ তারিখ শুভ। স্ত্রীলোকদের দেহকষ্ট।

কর্কট রাশি

পুনর্ব্বসুর অধম—পুষ্যাজাতব্যক্তির মধ্যম, অশ্লেষার অধমোত্তম।

কারো কারো অকস্মাৎ ভাগ্যের উত্থান পতন দেখা যায়। মাসের শেষের দিকে দায়াবদ্ধ সম্পত্তি ও অনাদায়ী টাকার সম্বন্ধে সুবিধা ও সুযোগ দেখা দেবে। সামান্য রক্তপাত ও অর্শ রোগে ভোগার সম্ভাবনা। অর্থের অপ্রতুলতা থাকবে না। সাংসারিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা। স্ত্রীলোকদের উৎকণ্ঠা ও ভীতি।

সিংহ রাশি

মঘার অধম। পূর্ব্বফল্গুনীর মধ্যমোত্তম। উত্তরফল্গুনীর উত্তমাধম।

এ মাসে কেউ কেউ চাকরী পেতে পারেন। যাদের বদলীর চাকরী, তাঁরা দূর দেশে বদলী হয়ে যেতে পারেন। চিঠিপত্রের জবাব খুব তাড়াতাড়ি পাবেন। ব্যবসায়ীরা শেষের দিকে উদ্বেগ থেকে নিষ্কৃতি পাবেন। কোন ব্যক্তি দূর দেশ থেকে ঘরে ফিরে আসবেন। স্ত্রীলোকদের মানসিক শান্তি ও সামাজিকতা বৃদ্ধি পাবে।

কন্যারাশি

উত্তরফল্গুনীজাত ব্যক্তির মধ্যম। হস্তার উত্তম। চিত্রার অধম।

ব্যয়বৃদ্ধি ও ধনক্ষতির সম্ভাবনা—পত্নীকর্তৃক সংসারে অশান্তি সৃষ্টি হবার ইংগিত আছে। শত্রুরা বশীভূত থাকবে। কর্ম্মে পরিবর্ত্তন ঘটার কারণ উদ্ভূত হবে। ভূ-সম্পত্তি বা বাসস্থান নিয়ে বিবাদ কলহ প্রভৃতি দেখা দিতে

পারে। যাঁদের যানবাহন আছে, বা ঐ সংক্রান্ত ব্যবসা আছে, তাঁদের জটিলতা সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

স্ত্রীলোকদের গুপ্তশত্রুবৃদ্ধি—কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্যহানি।

তুলা রাশি

চিত্রাজাতব্যক্তির অধম। স্বাতীজাত ব্যক্তির উত্তম। বিশাখাজাত ব্যক্তির অধম।

১৬৷১৭ তারিখ দুটি শুভ। মাসের ৯ তারিখের পর মানসিক চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাবে। প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা মানসিক ক্লেশ পাবেন। অকারণে ব্যয়বৃদ্ধি পাবে। অর্থহানির সম্ভাবনা দেখা যায়। সন্তানসন্ততিরা ১৭ তারিখ থেকে পড়াশুনায় আগ্রহ ও নিয়মানুবর্ত্তিতা দেখাবে। কোন প্রকার কর্ম্মব্যপদেশে ঘোরাঘুরি করতে হবে। পত্নীর স্বাস্থ্যহানি।

বৃশ্চিক রাশি

১৯ তারিখটি শুভ। বিশাখাজাতব্যক্তির অধম। অনুরাধার মধ্যম—জ্যেষ্ঠার মধ্যমোত্তম।

গৃহস্থালীতে স্ত্রীর মুন্সিয়ানার পরিচয় পাবেন। মাতৃ-পীড়া সম্ভব স্থলে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ দেখা দিতে পারে,সম্ভব স্থলে অপারেশন প্রভৃতি হবার সম্ভাবনা। মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুফল পাবেন। সন্তানেরা অবাধ্য হয়ে বিপরীত ব্যবহার করবে। ১২ তারিখ থেকে ভূসম্পত্তি ক্রয়ের ইচ্ছা দেখা দিতে পারে।

স্ত্রীলোকদের কর্ম্মলাভ ও নানা প্রকারে আনন্দ।

ধনু রাশি

মূলার শুভ। পূর্ব্বাষাঢ়ার মধ্যম—উত্তরাষাঢ়ার উত্তম।

মাসটা অনিশ্চিত, উৎকণ্ঠা ও নানা আশার দোলায় কাটবে—বিশেষ কোন ফললাভ হবে না। কনিষ্ঠ ভ্রাতার উন্নতি—ভগিনীর পীড়া। প্রণয়াকাঙ্ক্ষীদের মনস্তাপ ও অপবাদ। ছোটখাট দুর্ঘটনা (যানবাহন সম্বন্ধে) মাসের প্রথমের দিকে ঘটতে পারে। লাভের ব্যাপারে অলাভই বেশী দেখা যায়।

মকর রাশি

উত্তরাষাঢ়ার উত্তম, শ্রবণার মধ্যম—ধনিষ্ঠার অতি উত্তম। ২৬ তারিখটি শুভ।

ধনাগম—সঞ্চয়ও শুভ। "সন্তানদের তেমন শুভ দেখা যায় না। সংসারের কেউ বিদেশ যেতে পারে। মাসের মাঝামাঝির পর লাভযোগ আছে। দ্যূতক্রীড়ায় ২৫৷২৬ তারিখে সাফল্য। বেকার ব্যক্তিদের এ মাসে চাকরী পাবার সম্ভাবনা। কলাবিভাগের ছাত্রীদের নানা সুযোগ। ব্যবসায়ীরা নূতন সুযোগ পেতে পারেন। স্ত্রীলোকরা নানা-ভাবে নিজেদের প্রতিভা প্রকাশ করবেন।

কুম্ভ রাশি

ব্যয়বাহুল্য সত্বেও নানাপ্রকারে আনন্দ ও সুখ। আর্থিক দিক মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বিশেষ অস্থির ও অনিশ্চিত। পত্নীর দিক থেকে সাহায্য না পাওয়ায় মধ্যে মধ্যে মানসিক গ্লানি। সন্তানদের সাফল্য দেখা যায়। কনিষ্ঠ ভ্রাতার পরিবর্ত্তন ও ভয়। মাতৃস্বাস্থ্য গণ্ডগোল করতে পারে।

স্ত্রীলোকদের সামাজিকতা ও সুখ বৃদ্ধি।

মীন রাশি

উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও ব্যবসায়ীদের আয়কর-সাড়াশীর ফাঁদে পড়ায় নিদারুণ ভয়ে মুখ শুকিয়ে উঠবে। কারো কারো হৃদরোগ দেখা দিতে পারে। সংসারে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির আবির্ভাবে অসন্তুষ্টি দেখা দিতে পারে। পুত্র-কন্যারা উদ্ভট বুদ্ধিতে চালিত হবে মাসের প্রথম দিকে। মাসের মাঝামাঝি মামলার সম্ভাবনা।

স্ত্রীলোকদের মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রসবাদি হলে কষ্ট অনিবার্য্য—১৫ তারিখের পর নির্ব্বিঘ্নে।

দ্বাদশ লগ্নের ফলাফল

মেষ:

এই মাসের ১২ তারিখ পর্য্যন্ত নানা শত্রুতা ও মানসিক অসন্তুষ্টি। পরে নিজ প্রতিভা, বুদ্ধি ও সম্ভবস্থলে পুত্রের চেষ্টায় সাফল্য। মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ঋণদান ও গ্রহণ ব্যাপারে সুযোগ সুবিধা। ভ্রাতার কারণে নানা বিপত্তির সৃষ্টি, কিন্তু নানা প্রকারে মাসের শেষাংশে ধনলাভ।

সন্তানদের মধ্যম ফল। স্ত্রীলোকদের মধ্যবিধ।

বৃষ:

দৃষ্টিশক্তির হ্রাস ঘটতে পারে। হঠাৎ প্রচুর লাভ বা প্রচুর লোকসানের সম্মুখীন হতে পারেন। এটি নির্ভর

করছে জন্মকুণ্ডলীর রাহুর বলবত্তা ও কোন ঘরে আছেন তার উপর। ব্যয়ের পরিমাণ অনেক কষাকষি করেও কমাতে পারবেন না। ১৭ তারিখের পর পত্নীর কারণে কিছু খোয়া গিয়ে লোকসান দেখা দিতে পারে।

সন্তানদের মধ্যম—স্ত্রীলোকদের অধম।

মিথুন:

বিলাস ব্যসন ও পানভোজনাদির মাত্রা বেড়েই চলবে। এই কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। মাসের প্রথমদিকে জুয়া, রেস প্রভৃতি থেকে অর্থলাভ ঘটতে পারে। কুটুম্বদের কেউ অগ্নিভীতিতে পড়ে সন্ত্রস্ত হতে পারেন। কনিষ্ঠা ভগিনীর পীড়া দেখা দিতে পারে। ১৭ তারিখের পর ভাগ্য পরিবর্ত্তন ঘটতে পারে। পুত্রকন্যাদের উন্নতি হবে। স্ত্রীর শরীরে গোপনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রোগের প্রকাশ ঘটবে। স্ত্রীলোকদের অনেকে কাজকর্ম পেয়ে আনন্দ পাবেন।

কর্কট:

মাসের প্রথম সপ্তাহ ভাল যাবে না। তারপর থেকে অর্থাগমের নতুন পথ আবিষ্কৃত হবে। সব কাজই কিন্তু ঢিলে ও মন্থর গতিতে চলতে থাকবে। কোন কোন গুপ্ত শত্রুর সন্ধান সহজে পেয়ে যাবেন। স্ত্রীর স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাবে না—পিতার স্বাস্থ্যও অনুরূপ। কনিষ্ঠ ভ্রাতার গোপনে বিবাহের বা প্রণয়ের সম্ভাবনা। কর্ম্ম স্থানে হঠাৎ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির আবির্ভাবে উৎকণ্ঠা ও বিশৃঙ্খলা। পুত্রকন্যার দ্বারা সাহায্য পাবেন।

স্ত্রীলোকদের বিঘ্নসঙ্কুল মাস।

সিংহ:

চিঠিপত্র লেখা ও জবাব পাওয়ায় প্রথমের দিকে বিলম্ব ঘটবে। মাসের মধ্যভাগে ধনাগমের পথ সুগম। ছোটখাট ভ্রমণের দ্বারা লাভবান হতে পারেন। ১৪।১৫ তারিখে দ্যূতক্রীড়ায় জয় হবার সম্ভাবনা।

দূর ভ্রমণে ব্যয় ও বিপদ দুইই বর্ত্তমান। স্ত্রীর সাহায্য সব সময়েই পাবার যোগাযোগ আছে। সন্তানসন্ততি উল্টো বুদ্ধি পোষণ করে মনঃপীড়ার কারণ হবে।

স্ত্রীলোকদের মধ্যম ফল।

কন্যা:

মাসের প্রথম দিকে কনিষ্ঠপ্রীতি, অর্থাগমের নতুন আশা প্রভৃতি দেখা যায়। শেষের দিকে গৃহাদির সংস্কার বা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায়। মাসের শেষের দিকে মামলা—মোকদ্দমা হবার সম্ভাবনা। শত্রুরা অবদমিত হবে। বেকারের কর্ম্মলাভের সম্ভাবনা। ভাগ্যনাশের ভীতি দেখা দিতে পারে। ১৫।১৬ তারিখ শুভ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে স্ত্রীরোগ বৃদ্ধি।

তুলা:

স্বনক্ষত্রে সিংহে শুক্র, মাসের প্রথমদিকে বেশ কিছু লাভ করে মনে আনন্দ পাবেন। ৯ তারিখের পর ব্যয়বৃদ্ধি হবে। শেষের দিকে অর্থাগম হবে। নানা প্রকারে এ মাসে আনন্দ পাবেন প্রচুর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর সম্বন্ধে কোন নিরানন্দকর সংবাদ পেতে পারেন। পুত্রকন্যাদের বিদ্যালাভের প্রচুর সুযোগ। স্ত্রীর সাহায্য প্রচুর পাবেন।

স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার শুভ।

বৃশ্চিক:

সারা মাসটি নানা ঝঞ্ঝাটে ও বিঘ্নবিপত্তিতে চলবে। দুর্ব্বুদ্ধির আশ্রয়ে ব্যয়, অর্থনাশ প্রভৃতি ঘটার সম্ভাবনা। কর্ম্মে নানা প্রকার ঝঞ্ঝাট বৃদ্ধি হবে। সরকারী কর্ম্মচারীদের উপর অতিরিক্ত চাপ ও বুদ্ধিবৃত্তির যাচাই কর্ম্ম হওয়ার সম্ভাবনা। অংশীদারীর ব্যবসায়ীরা নানা আইনের ফাঁদে পড়ে কাতর হবেন। ছোট খাট ভ্রমণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

স্ত্রীলোকদের সাংসারিক বিশৃঙ্খলা।

ধনু:

সারা মাসই শরীর ভাল যাবে না। শয্যা-শায়ী হবেন না বটে! সরকারী কর্ম্মচারীর শত্রুতা কিম্বা সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে সহকর্ম্মীর শত্রুতা দেখা যায়। অর্থাগম মধ্যম প্রকার। নীচস্থ মঙ্গলের জন্য রক্তপাত বা দুর্ঘটনাদি ঘটতে পারে। রক্তচাপের রোগীরা হঠাৎ বিভ্রান্ত হয়ে পড়তে পারেন। স্ত্রীর দ্বারা মাসের মাঝামাঝি কিছু লাভ হতে পারে। ঋণদান করে কিছু অর্জ্জন করতে পারেন।

মকর:

ধনসঞ্চয় পরিমিত হবে। গৃহিণীর স্বাস্থ্যের কারণে বায়ু পরিবর্ত্তন প্রভৃতি প্রয়োজন হতে পারে। যান-বাহনের মালিক হলে তা নিয়ে বিরক্তি উৎপাদিত হবে। সন্তানেরা আয়বৃদ্ধি করায় মন দেবে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। বেকার মেয়েরা বা ছেলেরা

কর্ম্মলাভ করতে পারেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীর কারণে কিছু ব্যয় হওয়া সম্ভব।

স্ত্রীলোকদের মাসটি ভাল নয়।

কুম্ভ :

ধনাগম যেমন হবে সঞ্চয় তদ্রূপ হবে না। নানা কারণে উর্দ্ধগামী ব্যয়ের মাত্রা আপনাকে পীড়িত করবে। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে বিনা আয়াসে কিছু কিছু ধনলাভ হতে পারে।

ভ্রমণকালে স্ত্রী অসুস্থ হয়ে কষ্ট পেতে পারেন, তবে সাংঘাতিক কিছু নয়। ব্যবসায়ী হলে, সরকারী আয়-করের ফাঁদে পা দিতে পারেন। পেশাজীবীদের মাসটি ভাল যাবে। সন্তান-সন্ততিরা দুর্বিনীত ভাব পোষণ করতে পারে।

স্ত্রীলোকদের সামাজিকতা বৃদ্ধি পাবে—সামান্য পীড়ার যোগও আছে।

মীন :

ছোটখাট ভ্রমণের ফল নিষ্ফল প্রমাণিত হবে। চিঠির জবাবে বিলম্ব—চেষ্টায় অসাফল্য—প্রার্থিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা না হওয়া প্রভৃতি ঘটবে। ঠিকাদারেরা আশায় আশায় দিন কাটাবেন। যদিও ন্যায্য কারণে ব্যয় করবেন, তবু সেই ব্যয়ের চাপ আপনাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। জুয়া-স্পেকুলেশন প্রভৃতিতে লোকশান হবার সম্ভাবনা। স্ত্রীর সহিত মতের অমিল ঘটবে। বেকার ব্যক্তিরা কর্ম্মলাভে হতাশ হবেন।

স্ত্রীলোকদের মধ্যম। অন্তঃসত্ত্বাদের ভয়।

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

জাতচক্র বা জন্মকুণ্ডলী

ফলিত জ্যোতিষের মতে কোন ব্যক্তির জীবনের ফলাফল বলতে হ'লে গোড়াতেই দরকার ঐ ব্যক্তির জন্ম সময়ের রাশিচক্র। অর্থাৎ, তাঁর যে সময় জন্ম সেই সময়ে তাঁর জন্মস্থানের আকাশে রাশি, গ্রহ, নক্ষত্র, ইত্যাদি কি ভাবে ছিল তা সূক্ষ্মভাবে জানা চাই। জন্ম সময়ের গ্রহ-স্ফুট ও ভাব-স্ফুট কষ্‌লেই তা জানা যায়। যে কোন স্থানের যে কোন সময়ের গ্রহ-স্ফুট ও ভাবস্ফুট কি ক'রে কষ্‌তে হয় তা মৎপ্রণীত "সরল জ্যোতিষে" বিস্তারিত ভাবে দেওয়া হয়েছে, এখানে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ভাবস্ফুট ও গ্রহস্ফুট পেলে, কি রকম ক'রে তা লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে এবং কি ভাবে তা লিপিবদ্ধ করা উচিত, এখানে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। এ আলোচনার একটু দরকার আছে এই জন্যে যে, জন্মকুণ্ডলীর এই গণিতাংশ এমন-ভাবে চোখের সামনে থাকা দরকার, যাতে বিচারের সব চেয়ে সুবিধা হয়। আমাদের দেশে সাধারণতঃ তিন রকম প্রণালীতে গ্রহ সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। (১) বঙ্গদেশ ও উৎকল প্রচলিত প্রণালী (২) পশ্চিম ভারতে প্রচলিত প্রণালী (৩) দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রণালী। শ্রীশ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্ম সময়ের গ্রহসংস্থান যদি এই তিন প্রণালীতে লিখে দেখাতে হয়, তা হ'লে এই রকম হ'বে—

বঙ্গদেশ ও উৎকল প্রচলিত প্রণালী
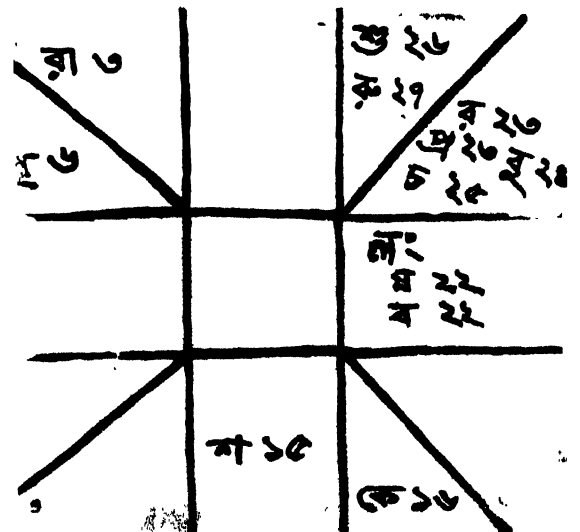
দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রণালী

শুক্র		রা	বৃ
বু র প্র চ			
লং ম ব			
	কে	শা	

বঙ্গদেশ ও উৎকলে যে ধরণে রাশিতে গ্রহ সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয় তাতে, রাশিগুলির স্থান চক্রের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট। অর্থাৎ, এই প্রণালীতে লিপিবদ্ধ করা একটি গ্রহ সংস্থান পেলেই বুঝতে হবে যে, উপরে ঠিক মাঝের চারকোণা ঘরটি মেষরাশি, তার বাঁয়ের তিন কোণা ঘরটি বৃষ রাশি, তার পরেরটি মিথুন, এই রকম ভাবে পর পর রাশিগুলি আছে। এদের গুণতে হবে ঘড়ির কাঁটা যে-ভাবে চলে ঠিক তার উল্টোভাবে। যে গ্রহ যে রাশিতে আছে, ছকটিতে সেই রাশির ঘরের মধ্যে সেই গ্রহের আদ্যাক্ষরটির পাশে সংখ্যা দিয়ে জানানো হয় তা কোন নক্ষত্রে আছে। কোন্ রাশিটি জন্ম সময়ে পূর্ব্ব দিকে উঠেছে, অন্য কথায় কোন্ রাশিটি লগ্ন, তা জানানো হ'য়ে থাকে, সেই রাশির ঘরে লং এই সাঙ্কেতিক শব্দটি লিখে। লগ্নের পাশে নক্ষত্র লেখবার প্রথা নেই।

পশ্চিম ভারতে যে ধরণে রাশিচক্র লেখা হয়, তাতে রাশিগুলির স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে না। এ হিসাবে উপরের চৌকো ঘরটি লগ্নকে বোঝায় এবং প্রত্যেক ঘরের মধ্যে যে ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক আছে, তা দিয়ে রাশি বোঝানো থাকে। ১ মানে মেষ, ২ মানে বৃষ ইত্যাদি। যেমন উপরের কুণ্ডলীতে মাথার চৌকো ঘরটিতে ১০ মানে মকর রাশি এবং তা মাথার উপরে থাকাতে সেইটেই লগ্ন। সেখানে ম, ব লেখার মানে, মকর রাশিতে মঙ্গল ও বরুণ আছে। এই মতেও লগ্নের রাশির পরে অন্য রাশিগুলি পর পর ঘড়ির কাঁটার গতির উল্টোদিকে লিখতে হয়।

দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত প্রণালী ভিন্ন ধরণের। এই প্রণালীতে বাংলায় প্রচলিত রাশিচক্র লেখার পদ্ধতির মত রাশির ঘরগুলি নির্দ্দিষ্ট বটে, কিন্তু ঘরগুলি উল্টোদিক দিয়ে পড়তে হয়। এই মতে ছকটির উপরের বাঁ-কোণের ঘরটি মীন, তার ডান পাশের ঘরটি মেষ, তার পরেরটি বৃষ ইত্যাদি। জৈমিনি-সূত্রের বিচারের সময়, দৃষ্টি প্রভৃতির বিচারে, এইরূপ চক্রের উপযোগিতা আছে। সে কথা পরে বলব।

এই তিন রকম রাশিচক্র দিয়ে আমাদের দেশে জন্ম সময়ের গ্রহ সংস্থান লিপিবদ্ধ করা হয়, এর কোনটিই কি চিত্রের দ্বারা, কি অঙ্কের দ্বারা, জন্ম সময়ে, জন্মস্থানের আকাশের একটা সঠিক ধারণা দিতে পারে না। এই তিন রকম চক্রের কোনটিই দেখে বোঝা সম্ভব নয় যে, জন্মকালে, জন্মস্থানের আকাশে ঠিক কোন্ কোন্ জায়গায় কোন্ রাশি নক্ষত্র বা গ্রহছিল। বাংলাদেশের হিসাবে লেখা রাশিচক্রে তবু কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে আছে তার উল্লেখ থাকে, পশ্চিম ভারতের বা দক্ষিণাত্যের হিসাবে লেখা কুণ্ডলীগুলিতে তাও থাকে না। বাংলা দেশে যে হিসাবে রাশিচক্র লেখা হয়ে থাকে, তাকে একটু পরিবর্ত্তিত ক'রে নিয়ে এমন ভাবে লেখা যেতে পারে, যাতে ক'রে এর ত্রুটি অনায়াসেই শুধরে যেতে পারে। আমার মতে জন্মকালের গ্রহ ও ভাবের সংস্থান, এই ভাবে লেখা উচিত। যেমন আগের লেখা কুণ্ডলীটি এই ধরণে লিখলে, একই সঙ্গে রাশিচক্রে গ্রহদের আপেক্ষিক অবস্থান এবং জন্মস্থানের আকাশের অবস্থান দুই-ই সহজে বোঝা যায়—

[ক্রমশঃ

পাট ও পীঠ

শ্রী'শ'—

॥ প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা ॥

মহান ব্যক্তিদের জীবনী অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্ম্মাণ সব দেশই করে আসছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই মহৎ প্রচেষ্টার অভাব বিশেষ করেই পরিলক্ষিত হয়। মহাজীবনের ও জীবনীর অভাব আছে—এ কথা একেবারেই বলা চলে না। পৌরানিক ও ঐতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে এই আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বহু ক্ষণজন্মা মনীষীর জন্ম এ ভারতের বুকে হয়েছে—বহু মহাপুরুষের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছে এ ভারত ভূমি। কিন্তু তাঁদের মহাজীবনী পুঁথির পাতায় বা লোকমুখে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে—চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দ্দায় প্রতিফলিত হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতার মন হরণে সমর্থ হয় নি। অবশ্য কিছু কিছু জীবনী-চিত্র যে তৈরী হয়নি তা নয়; তবে তুলনায় সেগুলি নগণ্য।

কর্ম্মবহুল ও ঘটনাবহুল জীবনীই চলচ্চিত্রে রূপায়ণের সবচেয়ে উপযোগী। অতীতের কথা ছেড়ে দিয়েও এই বর্ত্তমান কালেই এমন এক ঘটনাবহুল রোমাঞ্চকর জীবনী আমাদের সামনে রয়েছে যার তুলনা বিরল! এই মহাজীবনী ভারত মাতার মহান্ সন্তান, স্বাধীনতা যুদ্ধের মহান সৈনিক, দেশপ্রেমে উৎসর্গিত প্রাণ, মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর। নেতাজীর পূর্ণাঙ্গ, প্রামাণিক ও তথ্যবহুল জীবনী চিত্রের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। সুখের বিষয় এ বিষয়ে অনেক চিত্র-নির্ম্মাতাই চিন্তা করছেন এবং 'ভারতী চিত্রম' নামের একটি সংস্থা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছেন। এই ভারতী চিত্রম "নেতাজী সুভাষ" নামে নেতাজীর জীবনী অবলম্বনে একটি হিন্দী চিত্র নির্ম্মাণে ব্রতী হয়েছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইম্ফলের যে স্থানটি আজাদ হিন্দ বাহিনী অধিকার করে নিয়েছিল সেই জায়গাটিতেই সম্প্রতি "নেতাজী সুভাষ" চিত্রের শুভসূচনা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকোইরেং সিং এবং মণিপুর বিধানসভার সদস্যবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন থেকেই ছবিটির নিয়মিত চিত্র-গ্রহণ সুরু হয় মাউডাক ও বিষ্ণুপুর অঞ্চলে। আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং বৃটিশদের সঙ্গে এই সব স্থানে বড় রকমের যুদ্ধ হয়েছিল। এই চিত্রেও সেই সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যাবে।

এই চিত্রে নেতাজীর ভূমিকায় রূপদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন প্রেমনাথ। অন্যান্য বিশেষ ভূমিকাগুলিতে রয়েছেন বীণা রায়, বলরাজ সাহনী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, গজানন জাগীরদার এবং নাজির হোসেন প্রভৃতি। শেষোক্ত শিল্পী যুদ্ধের সময় "আই-এন-এ"-র প্রমোদ বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তিনিই ছবিটির চিত্রনাট্য এবং সংলাপও রচনা করেছেন।

চিত্রটি পরিচালনা করছেন 'ক্ষুদিরাম', 'বাঘা যতীন' প্রভৃতি চিত্রখ্যাত হিরন্ময় সেন।

চিত্রটির আভ্যন্তরীণ দৃশ্যগুলি কলিকাতা ও বোম্বাই-এর ষ্টুডিওতে তোলা হবে। বহির্দৃশ্যগুলির কিছুটা কাবুলে এবং সম্ভবত কিয়দংশ দূর প্রাচ্যেও তোলা হতে পারে।

এ ছাড়া বিলাতে ইংরাজী চিত্রের একমাত্র বাঙ্গালী প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার শ্রীউমেশ মল্লিক ও তাঁর সহকর্মিণী জেনেট বেনেট বর্তমানে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ভারত ত্যাগের কাহিনী অবলম্বনে একখানি চিত্রনাট্য রচনায় ব্যস্ত রয়েছেন। ছবিটির নামকরণ করা হয়েছে "এস্কেপ্ অফ্ চন্দ্রবোস" (চন্দ্রবোস নামেই নেতাজী জাপান ও ইউরোপে পরিচিত)। এ ছবির আখ্যানাংশ লণ্ডনের 'ডেলী টেলিগ্রাফ্' ও 'ইভিনিং নিউজ'-এর রোমাঞ্চকর বিবরণীর ভিত্তিতে রচিত। এই ছবিটি নির্ম্মাণের জন্য জোকাল নামে এক ক্রোড়পতি উদ্যোগী হয়েছেন এবং তাঁর বন্ধু বিখ্যাত অভিনেতা পিটার সেলার্সকে নেতাজীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণও করেছেন বলে শ্রীমল্লিক জানিয়েছেন।

চিত্রের নামকরণটি আমাদের মনঃপূত না হলেও শ্রীমল্লিকের এই উদ্যমকে এবং "ভারতী চিত্রম'-এর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দিত করছি।

খবরাখবর ঃ

তপন সিংহের পরবর্তী চিত্রটি হবে "অতিথি" নামে। রবীন্দ্রনাথের এই অসাধারণ ছোট গল্পটির পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়াও শ্রীসিংহকে প্রথম দেখা যাবে সঙ্গীত পরিচালকরূপে। নিউ থিয়েটার্স এক্সিবিটর্স প্রাইভেট লিমিটেডের এই চিত্রে একটি নতুন শিশু শিল্পীরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক শক্তি সামন্তর পরবর্তী ছবিটির নাম হচ্ছে 'আধি রাত'। এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করবেন শর্মিলা ঠাকুর ও মনোজকুমার। শক্তি সামন্ত স্বয়ং ছবিটি পরিচালনা করবেন এবং সুরযোজনা করবেন ও, পি, নায়ার।

'আধি রাত'-এর বহির্দৃশ্যগুলি গৃহীত হবে গোয়া, ম্যাঙ্গালোর, কালিকট ইত্যাদি অঞ্চলে।

* * *

প্রভাত মুখোপাধ্যায় কলিকাতায় একটি হিন্দী ছবি তৈরী করার পরিকল্পনা করেছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। বলরাজ সাহনীকে এই চিত্রের প্রধান শিল্পীরূপে দেখা যাবে।

* * *

অজয় কর-এর নতুন ছবি "কাঁচ-কাটা হীরে"র চিত্রগ্রহণ এই সপ্তাহেই সুরু হচ্ছে বলে জানা গেল। সৌমিত্র চটোপাধ্যায় হচ্ছেন নায়ক, আর নায়িকার ভূমিকায় থাকবেন খুব সম্ভব মাধবী মুখোপাধ্যায়। বিকাশ রায়কেও একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে।

* * *

হেমেন গুপ্ত পরিচালিত"অনামিকা' নামক চিত্রের একটি দৃশ্যে অংশ গ্রহণের জন্য হিন্দী চিত্রজগতের জনপ্রিয় শিল্পী শশিকলা সম্প্রতি কলিকাতায় এসেছিলেন। এই চিত্রের অন্য দুটি প্রধান ভূমিকায় শিল্পী হলেন অনিল চট্টোপাধ্যায় ও রত্না গুপ্ত। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় এই চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক।

* * *

এইচ, জি, প্রোডাকশন্সের 'সূর্যতপা' ছবির শুটিং রাধা ফিল্মস ষ্টুডিওতে চলছে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন অগ্রদূতগোষ্ঠী। প্রধান কয়েকটি চরিত্রের শিল্পী হচ্ছেন উত্তমকুমার, সন্ধ্যা রায়, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী ও শ্রীমান বাবলু। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ছবিটির সঙ্গীত পরিচালক।

* * *

হিন্দী চিত্রজগতের নামী শিল্পী দিলীপকুমারকে এবারে একটি বাংলা ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। ছবিটির নাম "পাড়ী"। জরাসন্ধর ওই নামেরই কাহিনীর ভিত্তিতে রচিত এই ছবিতে দিলীপকুমার অবতীর্ণ হবেন এক জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর ভূমিকায় এবং ছবির দুটি মুখ্য চরিত্রে থাকবেন ধর্মেন্দ্র ও শ্রীমতী প্রণতি ভট্টাচার্য।

নিউ ইণ্ডিয়া পিকচার্সের পতাকাতলে "পাড়ী" ছবিটি কলকাতাতেই তোলা হবে এবং এর গীত-রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন সলিল চৌধুরী। হেমন্তকুমারের কণ্ঠে ছবির একটি গান সম্প্রতি বম্বেতে রেকর্ড করা হয়েছে।

* * *

"সাজ ও আওয়াজ সিনে এণ্টার প্রাইজার্স'-এর "সুভা ও দেবতার গ্রাস" রাধা, পূর্ণ এবং অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের একটি ছোটগল্প ও একটি দীর্ঘ কবিতা অবলম্বনে নির্ম্মিত এই দুটি ছবি এক সঙ্গে দেখানো হবে। ছবি দুটি পরিচালনা করেছেন পার্থ প্রতিম চৌধুরী এবং সুর-রচনার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন ভি, বালসারা। 'সুভা' ছবিতে অভিনয় করছেন শর্মিলা ঠাকুর, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, লিলি চক্রবর্তী, গীতা দে প্রভৃতি। আর 'দেবতার গ্রাস' চিত্রের প্রধান শিল্পীরা হলেন বিকাশ রায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা,সৌমিত্র চটোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

অনেকদিন পরে চলচ্চিত্রকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় একটি বাংলা ছবি করেছেন। ছবিটির নাম 'দেবতার

দীপ'। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রীয় সম্মানপ্রাপ্ত অসমীয়া চিত্র 'পুবেরুণ'-এর বাংলা রূপ এটি। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিয়েছেন: অনিল চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, দীপ্তি রায়, জহর রায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত "কাঞ্চনরঙ্গ" নাটকটী 'বহুরূপী' সাফল্যের সহিত অভিনয় করেছেন এবং প্রেক্ষাগৃহে অনেকেই দেখেছেন। এই সফল নাটকের চলচ্চিত্ররূপ দিয়েছেন চলচ্চিত্র-প্রয়াস সংস্থা।

বহুরূপী সম্প্রদায়ের শিল্পীরাই ঐ ছবিতে অভিনয় করছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন: তৃপ্তি মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, শোভেন মজুমদার, লতিকা বসু প্রভৃতি। এ-ছাড়া আছেন তরুণকুমার, সুব্রতা, বিপিন গুপ্ত প্রভৃতি। সুরকার হচ্ছেন ভি, বালসারা। ছবিটি শীঘ্রই মুক্তি পাবে।

* * *

রহস্য-চিত্র "কে তুমি?" এখন মুক্তির প্রতীক্ষায় রয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, বিকাশ রায়, সবিতা চটোপাধ্যায় (বোম্বাই), তরুণকুমার, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। রবীন চট্টোপাধ্যায় চিত্রটির সুরকার।

* * *

আর, ভি, বনশালকৃত মগধী চিত্র "মোরে মন মিতোয়া'র চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ব্যয়বহুল এই চিত্রটির বিভিন্ন ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন: হেলেন, কুমারী নাজ, বেলা বসু, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্ত, ছায়া দেবী, সুজিতকুমার, সুধীরকুমার, বিপিন গুপ্ত, পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি।

'মোরে মন মিতোয়া'র গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন সুমন কল্যাণপুরী, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, মহম্মদ রফি, মুকেশ প্রমুখ জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পিবৃন্দ।

* * *

চিত্রাভিনেত্রী গীতাবালীর প্রথম ছবি "রানো"র (ইস্টম্যানকলার) চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি সুরু হয়েছে। এই পাঞ্জাবী ছবিটি সম্পূর্ণই বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে এবং ৩৫ দিনের মধ্যে এর শুটিং শেষ হবে বলে প্রকাশ। প্রধান ভূমিকায় গীতাবালী ও ধর্মেন্দ্র অভিনয় করছেন।

* * *

প্রাচ্যবাণী নাট্য সম্প্রদায় অধ্যক্ষা ডঃ রমা চৌধুরীর পরিচালনায়, সুবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত ও কবি পরলোকগত ডঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী বিরচিত দশটি সংস্কৃত নাটক দিল্লী, জয়পুর, জামনগর, দ্বারকা এবং গুথায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে আটটি পদক, একটি শীল্ড এবং বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। প্রথম অভিনয় হয় দিল্লীস্থ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণনের উপস্থিতিতে। তিনি আশীর্বাদ স্বরূপ প্রাচ্যবাণীকে পাঁচশত টাকা দান করেন। রাজস্থানের রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দও জয়পুরে অভিনয় দর্শনে সন্তুষ্ট হয়ে পুরস্কার প্রদান করেন।

* * *

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ পরিচালিত চিত্রের গৌরব অর্জন করার পর, আর ডি বনশল প্রযোজিত ও সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'মহানগর' চিত্রটি মেক্সিকো চলচ্চিত্র উৎসবের বিশেষ আমন্ত্রণ লাভ করেছে। উৎসবটি আগামী ১৪ই নভেম্বর শুরু হয়ে শেষ হবে ২৪শে নভেম্বর।

* * *

বিবাহের পর এলিজাবেথ টেলর এবং তাঁর নবতম স্বামী রিচার্ড বার্টনকে যে ছবিটিতে সর্বপ্রথম অভিনয় করতে দেখা যাবে তার নাম "দি স্যাণ্ডপাইপার"। সম্প্রতি মণ্টারের লোকেশনে মেট্রো গোল্ডুইন্ মায়ার প্রযোজিত এই চিত্রের কয়েকটি বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে।

* * *

ভারতের আগামী তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অংশ গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত ৩২টি দেশ তাদের সম্মতি জানিয়েছে। এছাড়া আরও কয়েকটি দেশের কাছ থেকে এ ব্যাপারে অবিলম্বে সম্মতি পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এমন কি রাষ্ট্রসংঘও এই উৎসবে একটি ছবি পাঠাচ্ছেন। এটি অবশ্য প্রতিযোগিতার বাইরে থাকবে।

এবারকার উৎসবটি যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক হবে, সেইজন্য যে-সব ছবি ১৯৬৩ সালের ১লা জানুয়ারীর পর তৈরী হয়েছে এবং যা ইতিপূর্বে অন্য কোনো প্রতিযোগিতামূলক উৎসবে দেখানো হয়নি, কেবলমাত্র সেই সব চিত্রই এই উৎসবে যোগদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যেই তাদের ছবির নাম পাঠিয়েছে। এদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল:—সুইডেনের 'ত্রোলপস্বেসেয়ার্' (পরিচালনা: আকে ফালক্), মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের 'আইল্যাণ্ড অব দি ব্লু ডল্ফিন্' (পরিচালনা: জেমস, বি, ক্লার্ক), পোল্যাণ্ডের 'কাফে ফ্রম দি পাস্ট' (পরিচালনা: জান রাইব-কাউস্কি), চেকোশ্লোভাকিয়ার 'জানোসিক' (কাহিনী ও পরিচালনা: পলো বায়েলিক), ফ্রান্সের 'এল হোম ভি রিও' এবং সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের 'ব্রাইডস্ মাদার'।

উৎসব চলাকালে চলচ্চিত্র শিল্পের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হবে এবং দেশবিদেশের চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞগণ এই আলোচনায় অংশ নেবেন।

সম্পাদনা : শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ ঃ

১৯৬৪ সালের ইংল্যাণ্ড সফর সমাপনান্তে অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট দল স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে ভারতবর্ষের মাটিতে তিনটি টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ খেলে গেল। এই নিয়ে অষ্ট্রেলিয়া সরকারীভাবে তিনবার ভারত সফরে এলো। সরকারীভাবে প্রথম আসে—জনসনের নেতৃত্বে ১৯৫৬-৫৭ সালে এবং দ্বিতীয়বার রিচি বেনোর নেতৃত্বে ১৯৫৯-৬০ সালে। ১৯৬৪ সালের ভারত সফরে ববি সিম্পসন অষ্ট্রেলিয়া দল পরিচালনা করেছিলেন। অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের ১৯৬৪ সালের টেষ্ট সিরিজটি অমীমাংসিত থেকে গেছে। মাদ্রাজের প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া ১৩৯ রানে জয়ী হয়। বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ২ উইকেটে জয়ী হলে খেলার ফলাফল সমান ১-১ দাঁড়ায়। ক'লকাতার তৃতীয় টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। পাঁচদিনের খেলা তিন দিন খেলা হওয়ার পর বন্ধ থাকে। বৃষ্টির দরুণ মাঠের অবস্থা খারাপ ছিল; ফলে চতুর্থ এবং পঞ্চম দিনে খেলা আরম্ভ করাই সম্ভব হয়নি। ১৯৬৪ সালের অষ্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের টেষ্ট সিরিজটিতে 'রাবার' অমীমাংসিত থেকে যায়। এই টেস্ট সিরিজটি ছিল উভয় দেশের চতুর্থ সরকারী টেস্ট ক্রিকেট সিরিজ। চারটি সরকারী টেস্ট সিরিজের ফলাফল : অষ্ট্রেলিয়ার 'রাবার' জয় ৩ বার এবং সিরিজ অমীমাংসিত ১বার (১৯৬৪ সাল)। এই চারটি টেস্ট সিরিজের ১৬টি টেস্ট খেলার ফলাফল: অষ্ট্রেলিয়ার জয় ৯, ভারতবর্ষের জয় ২, এবং খেলা ড্র ৫। অষ্ট্রেলিয়া ১৯৪৭-৪৮ সালের টেস্ট সিরিজে ৪-০ খেলায় (ড্র ১), ১৯৫৬-৫৭ সালের টেস্ট সিরিজে ২-০ খেলায় (ড্র ১) এবং ১৯৫৯-৬০ সালের টেস্ট সিরিজে ২-১ খেলায় (ড্র ২) 'রাবার' জয়ী হয়।

প্রথম টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ২১১ রান (বিল লরী ৬২ এবং নর্ম্যান ও'নীল ৪০ রান। বাপু নাদকার্নী ৩১ রানে ৫ এবং কৃপাল সিং ৪৩ রানে ৩ উইকেট পান) **ও ৩৯৭ রান** (ববি সিম্পসন ৭৭, ভিভার্স ৭৪, বার্জ ৬০ এবং লরী ৪১ রান। নাদকার্নী ৯১ রানে ৬ এবং রঞ্জনে ৫৩ রানে ২ উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ ঃ ২৭৬ রান (পাতৌদি নট আউট ১২৮ এবং চান্দু বোরদে ৪৯ রান। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৫৮ রানে ৬ উইকেট পান) **ও ১৯৩ রান** (হনুমন্ত সিং ৯৪ এবং মঞ্জরেকার ৪০ রান। ম্যাকেঞ্জি ৩৩ রানে ৪, হক ২৬ রানে ২ এবং ভিভার্স ১৮ রানে ২ উইকেট পান)।

মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত প্রথম টেষ্ট খেলার পঞ্চম দিনে চা-পানের নির্দিষ্ট সময়ের ১৯ মিনিট আগে জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়—অষ্ট্রেলিয়া ১৩ রানে জয়ী হয়।

দ্বিতীয় টেষ্ট ঃ

অষ্ট্রেলিয়া : ৩২০ রান (পিটার বার্জ ৮০, বেরী জার্মান ৭৮ এবং ভিভার্স ৬৭ রান। চন্দ্রশেখর ৫০ রানে ৪ এবং নাদকার্নী ৬৫ রানে ২ উইকেট পান) **ও ২৭৪ রান** (কাউপার ৮১, ব্রায়ান বুথ ৭৪ এবং বিল লরী ৬৮ রান। চন্দ্রশেখর ৭৩ রানে ৪ এবং নাদকার্নী ৩৩ রানে ৪ উইকেট পান)।

ভারতবর্ষ : ৩৪১ রান (পাতৌদি ৮৬, জয়সীমা ৬৬ এবং মঞ্জরেকার ৫৯ রান। ভিভার্স ৪৮ রানে ৪ এবং কনোলী ৬৬ রানে ৩ উইকেট পান) **ও ২৫৬ রান** (৮ উইকেটে। সরদেশাই ৫৬, পাতৌদি ৫৩, মঞ্জরেকার ৩৯, দুরানী ৩১ এবং বোরদে নট আউট ৩০ রান। কনোলী ২৪ রানে ৩, ম্যাকেঞ্জি ৪৩ রানে ২ এবং ভিভার্স ৮২ রানে ২উইকেট পান)।

বোম্বাইয়ের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় ভারতবর্ষ ২ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে—অষ্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সরকারী টেষ্ট ক্রিকেট খেলায় ভারতবর্ষের এই দ্বিতীয় জয়। প্রথম

জয় হয়েছিল ১৯৫৯-৬০ সালের টেষ্ট সিরিজের দ্বিতীয় টেষ্ট খেলায় (কানপুর) ১১৯ রানে।

বোম্বাইয়ের আলোচ্য দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাটি যে ভাবে উদ্বেগ ও উত্তেজনার মধ্যে শেষ হয়েছে তাতে টেষ্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এই খেলাটিস্মরণীয় হয়েথাকবে। এই খেলাটির বিশেষত্ব, কোন একদল খেলায় একটানা প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। ভাগ্যদেবী বারবার এক দলের কাঁধ ছেড়ে অন্যদলের কাঁধে ভর করেছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ তাঁকে ঘরে বেঁধে রাখতে পেরেছিল।

টসে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাট ধরে। প্রথম দিনের খেলায় তাদের ৬টা উইকেট পড়ে ৩০১ রান ওঠে। দ্বিতীয় দিনে ৩২০ রানের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ খেলার বাকি সময়ে ৪টে উইকেট খুইয়ে ১৭৮ রান সংগ্রহ করে। তৃতীয় দিনে ৩৪১ রানের মাথায় ভারতবর্ষের প্রথম ইনিংস শেষ হলে ভারতবর্ষ ২১ রানে অগ্রগামী হয়। এই দিনে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ১টা উইকেট পড়ে ১১২ রান ওঠে—তখন অষ্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলার গতি। কিন্তু চতুর্থ দিনে ২৭৪ রানের মাথায় অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙ্গেছিলেন চন্দ্রশেখর এবং নাদকার্ণী। লাঞ্চের সময় অষ্ট্রেলিয়ার রান ছিল ২০৫ (৩ উইকেটে)। লাঞ্চের পরের খেলাতে তারা ভেঙ্গে পড়ে। অষ্ট্রেলিয়ার ২৪৭ রানের মাথায় চন্দ্রশেখর তাঁর একই ওভারে ভিভার্স এবং বুথকে খালি হাতে বিদায় করেন। নাদকার্ণী ৪টে উইকেট পান মাত্র ১৬ রানে—৭.৪ ওভার এবং মেডেন ৫। লঞ্চের পর অষ্ট্রেলিয়া ৬টা উইকেট খুইয়ে ৮০ মিনিটের খেলায় ৬৯ রান সংগ্রহ করেছিল। অসুস্থ থাকায় ও'নীল দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট করতে নামেননি। ফলে ২৭৪ রানের মাথায় ৯ম উইকেট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অষ্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের খেলাও শেষ হয়। তখন খেলায় জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ২৫৪ রান করার প্রয়োজন হয়। চতুর্থ দিনের বাকি দু'ঘণ্টার খেলায় ভারতবর্ষের তিনটে উইকেট পড়ে গিয়ে ৭৪ রান ওঠে। খেলায় জয়লাভ করতে আরও ১৮০ রানের প্রয়োজন—হাতে জমা আছে ৭টা উইকেট এবং সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা খেলার সময়। ভারতবর্ষের দিকেই খেলার গতি।

কিন্তু পঞ্চম দিনের খেলার প্রথম ৭৫ মিনিটে ভারতবর্ষের আরও তিনটে উইকেট পড়ে যায়—ভারতবর্ষের তখন রান দাঁড়ায় ১২২ (৬ উইকেটে)। তখনও জয়লাভের জন্যে ১৩২ রান তুলতে বাকি—হাতে জমা চারটে উইকেট। অষ্ট্রেলিয়ার মুঠোতে তখন খেলার লাগাম। এই সময়ে অষ্ট্রেলিয়ারও জয়লাভের সম্ভাবনা আট আনা ছিল। দলের এই সঙ্গীন সময়ে ৭ম উইকেটের জুটি পতৌদি এবং মঞ্জরেকারের মুখ চেয়ে রইলেন সবাই। তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন। লাঞ্চের সময় ভারতবর্ষের রান দাঁড়ালো ১৪৬ (৬ উইকেটে)—পাতৌদির রান ১৬ এবং মঞ্জরেকারের ৯ রান। জয়লাভের জন্যে ভারতবর্ষের ১০৮ রান তুলতে হবে। চা-পানের বিরতির সময় ভারতবর্ষের জয় লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিল স্কোর বোর্ডে ২১৫ রান (৬ উইকেটে)—জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ৩৯ রান দরকার। উইকেটে তখন অপরাজিত ছিলেন পতৌদি (৫০ রান) এবং মঞ্জরেকার (৩৯ রান)। কিন্তু চা-পানের পর সবে আট মিনিট খেলা হয়েছে এবং চা-পানের সময়ের রানের সঙ্গে একরাণও যোগ হয়নি এমন সময় দলের ২১৫ রানের মাথায় মঞ্জরেকার নিজস্ব ৩৯ রান করে আউট হলেন। সপ্তম উইকেটের জুটিতে মঞ্জরেকার এবং পাতৌদি দলের ৯৩ রান যোগ করেছিলেন। দলের ২২২ রানের মাথায় পাতৌদি (৫৩ রান) খেলা থেকে বিদায় নেন্। নবম উইকেটে বোরদের সঙ্গে জুটি বাঁধলেন ইন্দ্রজিৎ সিংজী (উইকেট-কীপার)। দলের রান ২২২, হাতে আর জমা দুটো উইকেট এবং ভারতবর্ষের জয়লাভের জন্যে আর ৩০ রানের প্রয়োজন। তখন উত্তেজনা এবং উদ্বেগে খেলার অন্য চেহারা। টেস্ট ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে খেলার শেষ দিকে এই রকমের উত্তেজনা এবং উদ্বেগের সৃষ্টি খুব কম খেলাতেই হয়েছে। দৃঢ়তার সঙ্গে খেলতে লাগলেন বোরদে এবং ইন্দ্রজিৎ সিংজী। রান তোলার ভার নেন বোরদে। দলের রান ২৪৮ (৮ উইকেটে), জয়লাভের জন্যে আর মাত্র ৬ রান দরকার। আর খুচরো এক রান ক'রে নয়, ভিভার্সের বলে বো দে পর পর দুটো বাউণ্ডারী ক'রে জয়লাভের প্রয়োজনীয় রানের (২৫৪ রান) থেকে দু'রান বাড়তি করলেন, ২৫৬ রান (৮ উইকেটে) দাঁড়ালো। ভারতবর্ষের ২ উইকেটে জয় হলো। নবম উইকেটের জুটিতে বোরদে এবং ইন্দ্রজিৎ সিংজী দলের ৩২ রান যোগ করেছিলেন—এই রানের মধ্যে বোরদে একাই করেছিলেন ২৯ এবং ইন্দ্রজিৎ সিংজী ৩ রান। বোরদে (৩০ রান) এবং ইন্দ্রজিৎ সিংজী (৩ রান) নটআউট থাকেন। বেলা ৪—৩১ মিনিটে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলার জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়।

সম্পাদকদ্বয়—শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীশৈলেনকুমার চট্টোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে কুমারেশ ভট্টাচার্য কর্তৃক ২০৩।১।১, বিধান সরণী, (পূর্বতন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,) কলিকাতা ৬, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে ১৪।১১।৬৪ তারিখে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

অগ্রহায়ণ—১৩৭১

প্রথম খণ্ড | দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ | ষষ্ঠ সংখ্যা

বেদ ও প্রাচীন শাস্ত্রে স্বদেশ প্রেম

শ্রীমতী রেখা সিংহ

স্বদেশ প্রেম বলতে আমরা যে অর্থ গ্রহণ করে থাকি, তা' মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি বিশেষ দান। গুহাবাসী প্রাগৈতিহাসিক মানব স্বীয় আত্মরক্ষাতেই তৎপর থাকত। তারপর যখন সে পরিবার গঠন করে বাস করতে লাগল, তখন পরিবারকে বাঁচাবার জন্য সে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে ভয় পেতনা। ধীরে ধীরে সমাজ গঠন করে বাস করার প্রেরণা তার হৃদয়ের হিংস্র প্রবৃত্তিগুলিকে অনেকটা প্রশমিত করে, দয়া, মায়া, প্রেম ইত্যাদি সুকুমার বৃত্তিগুলিকে একে একে জাগিয়ে তুলতে লাগল। তারপর, তারা যে স্থানে বংশপরম্পরাক্রমে বাস করতে লাগল। সেই স্থানের প্রতিও তাদের হৃদয়ের নিবিড় স্থলে একটি মহান স্থান গড়ে উঠতে লাগল। Home sickness বা Nostalgia মানুষের একটি আদিম প্রবৃত্তি বলে ধরে নিতে পারা যায়। কিন্তু যাযাবর জাতিগুলির মধ্যে এধরণের ভাবধারা গড়ে উঠবার অবকাশ পায় নি। তাই, আমরা দেখি প্রাচীন যাযাবর আর্যদের রচনায় প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির প্রতি তাদের শ্রদ্ধা ও হৃদয়ের স্নেহভক্তি প্রদর্শিত হলেও কোন একটি স্থান বিশেষের জন্য তাদের একটি বিশেষ মমতা বা আকর্ষণপূর্ণ মনোভাব তাঁরা দেখিয়ে যাননি। যখন আর্যেরা এদেশে এলেন, তখন

গুহবাসী দ্রাবিড়গণের নাগরিক সভ্যতার স্পর্শ তাঁরা পেলেন। ধীরে ধীরে তাঁদের যাযাবর প্রবৃত্তি প্রশমিত হল। তাঁরাও এ স্থানে নগর নির্মাণ করে, নদীর তটভূমি অধিকার করে বাস করতে লাগলেন। ক্রমে ক্রমে সেই স্থানবিশেষ বা নদীবিশেষের মাহাত্ম্যের সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা জাগ্রত হয়ে উঠতে লাগল। ধর্মপ্রবণ জাতি হিসেবে ভারত ধর্মের মধ্য দিয়েই স্বদেশকে ভালবাসতে শিখেছিল। তবে তাঁদের এই ধারণার মধ্যে কোন সঙ্কীর্ণতা বাসা বাঁধেনি। ভারতের প্রাচীন আদর্শ পিতা মহেশ্বর, মাতা পার্বতী, ত্রিভুবন স্বদেশ ও কুটুম্ব সমগ্র বসুধা। এই সময় হতেই তাঁদের রচনায় স্থান-বিশেষের ও নদীবিশেষের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা প্রকটিত হতে দেখি। এই সময় থেকেই গঙ্গা যমুনা সিন্ধু কাবেরী ইত্যাদি তাঁদের শাস্ত্রে আরাধ্যা মাতৃস্থানীয়া হয়ে উঠল। তাঁরা দলে দলে ভারতবর্ষের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে নানাভাগে বিভক্ত হয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন, এবং দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে এক সংস্কৃতি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে লাগলেন। তাঁদের শাস্ত্রেও আমরা সেই একসূত্রে গ্রথিত হওয়ার নিদর্শন পাই। রাষ্ট্র, রাষ্ট্রসভা ইত্যাদি শব্দগুলি তাঁদের পরস্পর মিলনেরই দ্যোতক। অথর্ববেদের দুএকটি শ্লোকেও এই দুটি শব্দের উল্লেখ রয়েছে। একরাজার ছত্রপতাকার নিয়ে এবং একই সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে বাস করতে করতে তাদের মধ্যে ধীরে ধীরে একজাতীয়তা বোধ গড়ে উঠতে লাগল। অবশ্য অধুনা প্রচলিত "ন্যাশন্যালিজম্" এর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। তাঁরা জানতেন উন্নত ধরণের শান্তিপূর্ণ জীবন ধারণ করতে হলে সকলের একমন এক হৃদয় হয়ে কাজ করতে হবে। কয়েকটি ঋকের মধ্যে এই তথ্যেরই আভাস পাই। যেমন—

সঙ্গচ্ছধ্বম্ সম্বদধ্বম্ সংবো মনাংসি জানতাম্
দেবাভাগং যথাপূর্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানঃ মনঃ
সহচিত্ত মেষাম্।
সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা
জুহোমি॥

সমানী আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ
সমানমস্তু বো মনো যথ বঃ সুসহাসতি। মণ্ডল ১০,
অধ্যায় ১২ সূক্ত ১৯১। শ্লোক ২—৪

জন্মভূমিকে মাতা মনে করার শিক্ষা ঋষিগণই তাঁদের বংশধরদের দিয়ে গেছেন। অথর্ব বেদের পৃথিবী নামক সূক্তের বহুশ্লোকেই পৃথিবী বিবিধ ঐশ্বর্যের কথা বলা হয়েছে। ভূমাতা কেমনভাবে তাঁর সন্তানদের পালন করছেন, তেজ, অন্ন, বল ইত্যাদি দান করে তিনি মনুষ্য সকলকে সুখে বাস করতে সাহায্য করছেন—ইত্যাদি বিষয়ে কয়েকটি শ্লোক ঐ পৃথিবীসূক্তের মধ্যে পাওয়া যায়। বৈদিক কবি উচ্ছ্বসিত ভাবে ভূমাতার রূপ ও ঐশ্বর্যের বর্ণনা দিয়েছেন এই শ্লোকগুলির মধ্যে। পৃথিবী তাঁর নিকট স্বর্ণ নির্মিত* বলে মনে হয় একথাও লিখেছেন। স্বর্ণের সঙ্গে প্রিয় পদার্থের তুলনা করা বেদের মতই প্রাচীন মনে হয়।

মহত সর্বস্থং মহতী বিভূবিথ মহানবেগ এজথুর্বে
পথুষ্টে।
মহাংস্তেন্দ্রো রক্ষত্যপ্রমাদম্। সা নো ভূমে প্ররোচয়
হিরণ্যসেব সংদৃশি মা নো দ্বিক্ষত কশ্চন ॥—১৮নং
শ্লোক পৃথিবীসূক্ত অথর্ববেদ।

অর্থাৎ—হে পৃথিবী তুমি একত্রিত হবার জন্য এক মহান ভবন স্বরূপ; তোমার বেগ ভীষণ, তোমার কম্পনও ভীষণ। মহারাজাধিরাজ, ঐশ্বর্যবান পরমাত্মা তোমাকে রক্ষা করেন। হে সর্বোৎপাদক পৃথিবী, তুমি আমার নিকট সুবর্ণসদৃশা প্রতীত হও। আমার প্রতি কেহ যেন শত্রুতা না করে। আর্য ঋষিগণ বলছেন—যে ভূমিপালক রাজা প্রজাবর্গকে শাসন করার ক্ষমতা, জ্ঞান, কার্য করবার দৃঢ়সঙ্কল্প, তপোবল ইত্যাদি রাজোচিত গুণাবলী-সকলই পৃথিবী মাতারই দান স্বরূপ লাভ করেন। তাঁরই কৃপায় আবার প্রজাকুল অন্ন-গোধন ইত্যাদি পরিবৃত হয়ে সুখে কাল যাপন করতে পারে। ভূপতি ও প্রজাগণ উভয়েই এক পৃথিবীর সন্তান। ভূপতি লোক নায়ক স্বরূপ—তিনি সমগ্র প্রজাকুলের আদর্শ, প্রজাগণকে

---

* তুলনীয়—আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।

সুশা·ন করা তাঁর কর্তব্য। তিনি যেন শক্তির মদ-মত্ততায় নিজের কর্তব্য ও স্বীয় পদের দায়িত্ব বিস্মৃত না হন। শ্লোকটি নিম্নলিখিত রূপ—

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্ম যজ্ঞঃ
পৃথিবীং ধারয়ন্তি।
সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যুরুং লোকং
পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥
পৃথিবীসূক্ত।

পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রার্থনা করেও কয়েকটি শ্লোক রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি—

ভূমে মাতনি ধেহি মা ভদ্রয়া সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
সংবিদানা দিবা কবে শ্রিয়াং মা ধেহি ভূত্যাম্।
৬৩নং শ্লোক পৃথিবীসূক্ত।

অর্থাৎ হে ভূমি! হে মাতঃ আমাকে তুমি কল্যাণ ও সুখকারিণী লক্ষ্মী দ্বারা উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত কর। হে অন্তর্যামিনী দেবী, তুমি প্রকাশমান সূর্য দ্বারা সুসঙ্গত হয়ে আমাকে শ্রী, ধনসম্পত্তি ও বিভূতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর।

এরপর পুরাণের যুগে আর্যদের উপনিবেশের সীমা বর্ধিত হয়ে তাঁদের নিকট ভারতবর্ষ একটা বিশিষ্ট ভৌগোলিক সীমাবদ্ধ রূপ পেলো। তখন থেকেই শাস্ত্র তাঁদের শেখাল "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"। 'আকুমারী হিমাচল' কথাটি পৌরাণিক যুগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। ভারতের অন্তর্গত বিভিন্ন নদনদী পাহাড় পর্বত, নগর নগরী সকলই তৎকালীন ভারতবাসীদের নিতান্ত আপন হয়ে উঠে তাদের শাস্ত্রাদিতে স্থান লাভ করল। ধর্মভাবপ্রধান এই জাতি তখন এই দেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে ও ঐক্য সহজেই খুঁজে পেলো। পূজার আবাহন মন্ত্রে দেশের প্রধান প্রধান নদীর নাম, * তীর্থ হিসেবে বিভিন্ন নগর নগরীর নাম কীর্তিত হতে লাগল—তাঁদের তৎকালীন সাহিত্যে। দেশের ঐশ্বর্যে তারা গৌরব অনুভব করতে শিখল। বিষ্ণুপুরাণে আমরা নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাই। পরাশর মুনি 'জম্বুদ্বীপ অর্থাৎ ভারতবর্ষ ও অন্যান্য ভূখণ্ডের পরিচয় দিতে গিয়ে নারদকে বলেছেন—

শ্রীপরাশর উবাচ—

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥

আর এই ভারতবর্ষ—

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বু দ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্মভূরেষা হ্যতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
বিষ্ণুপুরাণ তৃতীয় অধ্যায়

জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতই শ্রেষ্ঠ—কেন না এটি কর্মভূমি—অন্যস্থানসমূহ ভোগভূমি।

আর সেইজন্যই—

গায়ন্তি দেবাঃকিল গীতকানি ধন্যাস্তু তে
ভারতভূমি ভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদ মার্গভূতে ভবন্তিভূয়ঃ
পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥
কর্মাণ্য সঙ্কল্পিত তৎফলানি সংন্যস্য বিষ্ণৌ
পরমাত্ম ভূতে।
অবাপ্য তাং কর্ম মহীমনন্তে তস্মিল্লয়ং যে
ত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥

অর্থাৎ—

স্বর্গ এবং মোক্ষের আশ্রয় যে পথ, এমন ভারতবর্ষে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি স্বর্গের দেবতা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন।

আবার নারদ পুরাণের মধ্যেও আমরা পাই—

ক্ষীরোদধেরুত্তরং যদ্ হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
জ্ঞেয়ং তদ্ভারতবর্ষং সর্বকর্ম ফলপ্রদম্॥
অদ্যাপি দেবা ইচ্ছন্তি জন্ম ভারত ভূতলে।
সঞ্চিতং সুমহৎ পুণ্যমক্ষয়ং হ্যমলং শুভম্।
এবং ভারতভূভাগং প্রশংসন্তি দিবৌকসঃ।
ব্রহ্মাদ্যাপি বিপ্রেন্দ্র স্বভোগক্ষয়ভীরবঃ॥
তস্মাৎ পুণ্যতমং ভেতরং ভারতবর্ষ মুত্তমম্।
দেবানাং দুর্লভং বাপি সর্বকর্ম ফলপ্রদম্॥

অর্থাৎ ভারতবর্ষ পুণ্যতম ভূমি রূপে দেবতাগণ কর্তৃকও উচ্চ প্রশংসিত হয়ে থাকে।

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটি পড়লে সন্দেহ থাকে না, পুরাণের যুগেও এদেশের ঋষি, মনীষিগণ স্বদেশকে কতটা উচ্চে স্থান দিতেন। তাই এদেশে জন্মগ্রহণ করাটাকে

---

* গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী—ইত্যাদি পূজার মন্ত্র।

তাঁরা মহাপুণ্যফল স্বরূপ মনে করতেন। হিমালয়ের দক্ষিণেও সমুদ্রের উত্তরে স্থিত এই ভূখণ্ডনিবাসীগণ সকলে এক পুণ্য কর্মভূমির অন্তর্ভুক্ত ও নিজেদের একজাতীয় মনে করতেন। নদী বিশেষ ও স্থান বিশেষের মাহাত্ম্যের প্রতি এই ভারতবাসীগণের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। তাঁরা যে স্বদেশকে ভালবাসতেন, এই শ্লোকগুলি তারই প্রমাণ। তবে তাঁদের এই একজাতীয়তা বোধের মধ্যে কোন উগ্রতা ছিল না। তাঁরা ছিলেন অধ্যাত্ম ধারণা-প্রবণ জাতি। নিজের দেশকে বিশ্বের সকল দেশাপেক্ষা উচ্চে স্থান দিলেও— বিশ্ব মানবতাবোধের ভাবটাই তাঁদের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন—

যস্ত সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ।

তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্ব মনুপশ্যতঃ॥

পাশ্চাত্যের বিবদমান জাতিগুলির উদ্ধত জাতীয়তা বোধের সঙ্গে এর কোন সাদৃশ্য নেই। যার সম্বন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

The truth is that the spirit of conflict of conquest is at the origin and in the centre of western nationalism. Its basis is not social co-operation. It has evolved a perfect organisation of Power, but not spiritual idealism —Nationalism in the West—R. N. Tagore. Page—21.

অবশ্য তাঁরা জানতেন বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতাবোধ বহু সাধনা সাপেক্ষ। তা' অর্জন করবার জন্য বহু ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রয়োজন—সে পথ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।' তবু তাঁরা সেই পথেরই পথিক ছিলেন। ভূমার জন্যই সাধনা তাঁরা শ্রেয়স্কর মনে করতেন। পূর্বোক্ত জাতীয়তাবোধ এই কারণেই এঁদের মধ্যে উগ্ররূপ ধারণ করতে পারেনি।

কালিদাসের রচনায় আমরা তাঁর প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমের বহু পরিচয় পাই তৎকালীন ভারতবর্ষের নদনদী গিরিকন্দর বনউপবন, নগর-নগরীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ছবি তাঁর রচনায় রূপায়িত হয়েছে। সেগুলিকে স্বদেশের সৌন্দর্যে মুগ্ধহৃদয় কবির স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন বললে খুববেশী ভুল হয় না। প্রকৃতদেশের প্রকৃতিকে না ভালবাসলে, দেশের ঐশ্বর্যে গৌরব অনুভব না করলে বা দেশের রাজচক্রবর্তী—জাতীয়বীরের 'শৌর্যে মুগ্ধ না হলে, এ প্রকৃতির রচনাসৃষ্টি তিনি অবশ্য করতে পারতেন না। 'চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য'—জনশ্রুতিমতে যাঁর সভাকবি তিনি ছিলেন—তাঁর ও তদীয় পিতা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় কাহিনী তাঁকে রঘুর দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণনা করার প্রেরণা দিয়েছিল। সেই বর্ণনার মধ্যদিয়ে আমরা বৈচিত্র্যময় অথচ অখণ্ড ভারতের একটি উজ্জ্বল ছবি পাই। এখানে তিনি যেন চারণ কবির কাজ করেছেন। বিক্রমাদিত্যের বীরত্ব তিনি রঘুর বীরত্ব বর্ণনার ছলে রচনা করেছেন। বীর রঘু স্বীয় শৌর্যবান দ্বারা পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ সমগ্র ভারতভূমি একছত্রের তলায় আনয়ন করেন। রঘুবংশকাব্যের মধ্যে এই বিজয় কাহিনী পাঠকরলে ভারতবর্ষের একটি ভৌগোলিক সীমান্তর্গত পূর্ণরূপ হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে যায়। হিমালয়ের সম্বন্ধে গৌরব প্রকাশ করে তিনি তাকে "পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" বলেছিলেন। দেশের সমগ্র প্রকৃতি তাঁকে আনন্দ দান করেছে—সেই আনন্দ তিনি প্রকাশ করে গেছেন প্রকৃতির সূক্ষ্মবর্ণনার মধ্য দিয়ে।' সেবর্ণনা স্বপ্নরঙীণ নয়, প্রকৃত উজ্জ্বল বাস্তব চিত্র, যদিও সেগুলি উপমার ছটায় পাঠকের মন স্বপ্নময় করে তোলে। কিন্তু কালিদাসের কাব্যে স্বদেশ প্রেম থাকলেও অধুনাতন পাশ্চাত্য দেশাগত জাতীয়তার ভিত্তির উপর যে সঙ্কীর্ণ স্বদেশ প্রেমের ভিত্তি, তার সঙ্গে এর সাদৃশ্য খুবই সামান্য রয়েছে। কোন দেশের মানুষের মধ্যে আত্ম-পর ভাব যতক্ষণ না জাগ্রত হয়, ততক্ষণ পাশ্চাত্যসুলভ দেশ প্রেম জন্মলাভ করতে পারেনা। জাতীয়তার সমালোচনা করে একটি নিবন্ধে বার্ট্রাণ্ড্ রাসেল যথার্থই বলেছেন যে It began in France with Joan of Arc's resistance to the English, It began in England with resistance to the Spanish Armada and found its first Literary expression in Shakespeare," ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত ভারতের ঋষি মনীষী বা কবিগণের সাহিত্যিক দানের মধ্যে যে দেশের প্রতি ভালবাসার পরিচয় পাওয়া যায়, তা' সম্পূর্ণ স্বার্থগন্ধহীন। স্বার্থহীনতা শূন্য বলেই অশোক তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে যে শিলালিপিগুলি খোদিত

করিয়েছিলেন,—তাতে নিজেকে প্রজাগণের পিতাস্বরূপ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। অবশ্য দেশের মানুষদের ভালবাসা যদি স্বদেশপ্রেম হয়, তবেই তাকে সে শ্রেণী ভুক্ত করা যেতে পারে; এবং একথা জোরের সঙ্গে বলা যেতে পারে, যে, সে শিলালিপিতে অশোকের কেবলমাত্র মানব প্রেমই নয়, স্বদেশ প্রেমেরও নিদর্শন রয়েছে। নীচে অশোকের ধৌলিও জৈগেড়ে প্রাপ্ত অনুশাসনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হল।

"দেবানং পিয়ে জেবং সহি…সমাপায়ং মহামতপ লব্দ বচনক বিতরিয়া—অং কি ছি দদামি, হকংতং ইছামি হকং কিতি? সব মুনিসা মে পজা, অথ পজায়ে ইছামি কিং তিমে সবেনো হিত সুখেন সুজেযু, অথ পজায়ে ইদামি কিং তমে সবেন হিতসুখেন যুজেযুতি হিদলোগিক পাললোকিকেন হেবং মেব মে ইছা সব মুনিসেসু সিয়া (।) অং (।) পাপুনেয়ু লাগা জেবং ইছতি অহু বিগিনা হেযু মমিযাযে অস্বসেযুচ মে সুখংমেবচ লহেযু মম ও নোখ (।) এবং চ পাপুনেযু য মগতি নে লাজা (।) এছ কি যে থমিতবে (।) মমং নিমিতং চ ধংম চলেযুতি জিদলোগং চ পললোগং চ আলধয়েযু (।) ইত্যাদি। অর্থাৎ "দেব প্রিয় এইরূপ কহিতেছেন—সমীপস্থিত মহাপাত্রগণকে রাজবচনানুসারে বলিতে হইবে যে, আমার যাহা মত তাহা প্রচারিত হউক ও সকলে তদনুযায়ী কার্য করুক আপনাদিগের প্রতি আমার উপদেশ আমার সেই উদ্দেশ্য সাধনের মুখ্য উপায়। সকল মনুষ্যই আমার পুত্রতুল্য। আমি যেমন ইচ্ছা করি যে আমার পুত্রগণ সর্বপ্রকার মঙ্গল ও সুখলাভ করুক, সেইরূপ ইচ্ছা করি যে সকল মনুষ্যই ঐহিক ও পারত্রিক সর্বপ্রকার সুখ লাভ করুক, যদি আপনারা জানিতে চাহেন যে "অবিজিত প্রত্যন্ত বাসিগণের সম্বন্ধে আমাদের প্রতি রাজার কি আদেশ?" এ বিষয়ে আমার এই অভিপ্রায় জানিবেন যে আমি ইচ্ছা করি যে তাহারা নিরুদ্বেগে থাকুক। আমার প্রতি আশ্বাস স্থাপন করুক, তাহারা আমার নিকট সুখই ভোগ করিবে কখনও দুঃখভোগ করিবেনা। রাজা যতদূর সম্ভব তাহাদের প্রতি ক্ষমাশীল হইবেন এই কথা তাহারা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করুক। ইহাদ্বারা তাহাদের ইহ পরলোকের আরাধনা হইবে।" ইত্যাদি রাজনীতি ও ধর্মনীতি এই উভয়ের সমন্বয় সাধন পূর্বক অশোক প্রজাগণকে পুত্রের ন্যায় শাসন করে গেছলেন। প্রাচীন অপভ্রংশ সাহিত্যের নিদর্শন স্বরূপ অশোকের অনুশাসন-গুলির মধ্যে অশোকের এই প্রজাপ্রেমের কথা লিখিত রয়েছে।

পেট্রিয়টিজম্ বা পাশ্চাত্য স্বদেশ প্রেম আমাদের দেশে ইংরেজ শাসন আরম্ভ হবার পরে দেখা গেছে একথা সত্য। তবে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি কবি ও সাহিত্যিকগণের রচনায় যে স্বদেশ প্রেমের পরিচয় আমরা পাই—বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের রচনায় সেগুলির মধ্যে প্রেমেরই আধিক্য দেখা যায়; এবং দেশের পূর্ব ঐতিহ্যই এর মূলে রয়েছে বলা যেতে পারে।

পূর্বপ্রকাশিতের পর

উনত্রিশ

পরদিন—১২ই জুলাই—সকাল আটটায় ধ্রুব আলোকের কাছে ছুটে এ'ল ওর টু-সিটার-এ। বলল: "শুনছি নাকি পনশেট বাঁধ ভাঙল ব'লে।"

আলোক (চা খেতে খেতে): নমিতাও কাল সকালে বলছিল এ-গুজবের কথা—রটিয়েছে তার সবজান্তা সখী নার্গিস। যত সব! নে—চা খা।

ধ্রুব (চুমুক দিয়ে): না রে, 'যত সব' টব নয়। এবার শুনছি সঙিন ব্যাপার! আমাকে কাল রাতে বলেছেন একজন ইঞ্জিনিয়র যিনি পনশেট বাঁধের খবর রাখেন। তাই আমি শুধু বলতে এসেছি তোকে যে, রমাকে এক্ষুণি নিয়ে আয়, আর দেরি করিস নি। হঠাৎ জল এলে সে তো ছুটতেও পারবে না। মালতীও বলল এই কথাই।

নমিতা: বলি নি বাবা? তোমার সব তাতেই অবিশ্বাস।

ধ্রুব (হেসে) যে সাধুকে অবিশ্বাস করে সে কি অসাধুকে গড় করবে নাকি? না—আমি বলি কি—হয়ত বাঁধ না ভাঙতেও পারে—তবু সাবধানের মার নেই এও কি বিশ্বাস করবি নে?

ক্রিং…ক্রিং…ক্রিং…

আলোক (টেলিফোন ধরে): কে?

টেলিফোনে মালতী: দাদা, আমি মালতী। আপনার বন্ধুকে এক্ষুণি পাঠিয়ে দিন। পনশেট ড্যাম ভেঙেছে।

আলোক: সত্যিই ভেঙেছে, না গুজব?

টেলিফোনে মালতী: সত্যিই ভেঙেছে—রেডিওতে এইমাত্র খবর দিল যে, মুতা নদীতে হু হু করে জল আসছে।

আলোক: হয়ত—

টেলিফোনে মালতী: হয়ত টয়ত নয়—শুনছি জল আর একটু বাড়লেই টেলিফোন, বিদ্যুৎ সব বন্ধ—

বলতে বলতে খট শব্দ—টেলিফোন নীরব। নমিতা ঘরের একটি সুইচ টিপল—বৃথা! আলোক ছুটল মোটরে কাছের "পাওয়ার হাউস"-এ খবর নিতে। তারা বলল মেঘলা মুখে—শুধু যে শহরের বহু তারই বিকল তাই নয়—"কম্‌সে কম্‌" সাত-আট দিনের আগে বিদ্যুৎ চলবে না, এমনকি হয়ত দুতিন সপ্তাহ পুণাবাসীদের লণ্ঠন জেলে রাত কাটাতে হ'তে পারে।

আলোক মোটর নিয়ে বাড়ি ফিরেই দেখে ওর এক সিন্ধি বন্ধু সাইকেলে ছুটে এসেছে দারুণ ভয় পেয়ে। বলল তাদের পল্লী "ওয়াকডে বাড়ি"-তে কুল কুল করে জল আসছে। কাঁদো কাঁদো মুখে বলল: "কী হবে ডাক্তারবাবু? শুনছি সারা পুণাশহর বন্যায় ডুববে।"

আলোক জোর ক'রে মুখে হাসি টেনে বলে: "অত ভয়ের কারণ নেই—আমি আসছি, দেখি কি করতে পারি—কেবল দেখবেন প্যানিক না হয়। দরকার হ'লে আমার বাড়ির সামনে মাঠে তাঁবু খাটানো যাবে—ভড়কাবেন না, কারণ গণেশখিন্দে জল আসবে না।"

ত্রিশ

আলোক নমিতাকে মোটরে নিয়ে ছুটল "ওয়াকডে

বাড়ি”-র অভিমুখে, সেখান থেকে সঙ্গম ব্রিজে যাবে রমার খবর নিতে।

কিন্তু কৃষি কলেজের উত্তর দিকে পৌঁছতে না পৌঁছতে কানে ভেসে আসে কলরব! ওয়াকডে বাড়ি-তে এসেই চক্ষুস্থির! এ কী ব্যাপার! শুধু যে নানা বাড়ির নিচু প্রাঙ্গণে জল থৈ থৈ করছে তাই নয় - মিনিটে মিনিটে হু হু ক'রে বাড়ছে, চোখে স্পষ্ট দেখা যায়! দু একটি বাড়ির বাগানে এক হাঁটু জল ঠেলে চীৎকার করতে করতে আসছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, যুবক-যুবতী, বালক-বালিকা। রাস্তাটা চার পাঁচ ফুট উঁচু ব'লে সবাই সেখানে ছুটে এসে জমায়েৎ হচ্ছে। প্রতি বাড়িরই দোতলার জানলায়, ছাদে, পাঁচিলে কেবল মানুষের মাথা আর মাথা—ঝুঁকে দেখছে জলের কীর্তি! মুখ চোখে তাদের ভয়ের অন্ধকার। কেবল কয়েকটি ছ' সাত বছরের শিশু একটি গাড়ি বারান্দায় নেচে কুঁদে আহ্লাদে আটখানা।

একটা বাড়ি থেকে এক পঙ্গু বৃদ্ধকে দু'জন যুবক ধরাধরি ক'রে টেনে আনছে। কুকুর-বেড়াল সাঁতার দিচ্ছে। দু' একটি বাড়ির বাগানে শিশুরা পার হচ্ছে কোমর-জলে মগ্ন বয়স্কদের কাঁধে চড়ে। ওকে দেখে ওর কয়েকটি সিন্ধি বন্ধু উদ্বিগ্ন মুখে বলল: "কী হবে ডাক্তার বাবু?" ও কী উত্তর দেবে ভাবছে এমন সময়ে দু' তিনটি সিন্ধি মহিলা ওদের মোটরের দিকে ছুটে এসে নমিতার হাতে গুঁজে দিল ওদের গহনার বাক্স।

নমিতা চিন্তিত মুখে আলোককে জনান্তিকে বলল: "ওরা বলছে চারদিকে চোর। তবে বাড়ি রেখে আসি? রাস্তায় ঘোরা চলে কি পরের গহনা নিয়ে?"

আলোক অগত্যা মোটর ফেরাল বাড়ির দিকে। ফিরে গহনাগুলি লোহার সিন্দুকে পুরে তবে যাবে রমাদের পাড়ায়। একটু দেরি হয়ে গেল—কিন্তু এখনো তো জলের তেমন তোড় হয় নি। রমা ডুবে যাবার ভয় নেই—ছাদও তো আছে।

মোটরে চলতে চলতে নমিতাকে একথা বলতেই সে বলল: "কিন্তু তুমি ভুলে গেলে বাবা, ওদের ছাদে উঠবার সিঁড়ি কোথায়?"

বলতে বলতে নমিতার চোখে জল এল, বলল: বললাম - ওকে কাল নিয়ে আসতে—দেখ তো, নিয়ে এলে—"

বাকি কথা শেষ চোখের জলের রেশে।

আলোক ওর মাথায় হাত রেখে বলল: "এখন কান্নার সময় নয়—চল্ যাই সঙ্গম ব্রিজে।" ব'লে বাইরে গিয়ে মোটরে উঠতে উঠতে: "আমিও তো কাল চেয়েছিলাম—গুরুদেব যে বললেন রমার কোনো ভয় নেই—এই জন্যেই তো বলি মা, যে বিশ্বাসেরও বাড়াবাড়ি ভালো নয়—"

নমিতা চিৎকার ক'রে উঠল: "বাবা! রমা!"

একত্রিশ

ভশ্ ক'রে মোটর ঢুকল ওদের গেটের মধ্যে। রমার পাশে আরোহী সারথি আলোকের এক রুগী, সিন্ধি, নাম—মির্চন্দানি।

নমিতাকে দেখেই রমা ভেঙে পড়ল ওকে জড়িয়ে ধ'রে। ওর কাঁধে মাথা রেখে সে কী কান্না: "দিদি... দিদি..."

দুধার থেকে রমার দুবাহু ধ'রে আলোক ও নমিতা রোরুদ্যমানাকে ভিতরে নিয়ে যায়। রমা নমিতার কোলে মুখ ডুবিয়ে শুধু কাঁদে হু হু ক'রে।

আলোক বেরিয়ে এসে মির্চন্দানিকে বলে: "কী ব্যাপার?"

মির্চন্দানি (রুষ্ট মুখে): আর কী? সেই দজ্জালটার কাণ্ড! আপনাকে সেদিন বলছিলাম না—মহুভাইয়ের শনি ও যম ঐ স্লাট। পাড়ার কি একজনও ওকে দেখতে পারে?

আলোক: কাল তো জুহুতে ছিলেন না?

মির্চন্দানি: হ্যাঁ আজ সকাল সাড়ে নটায় মোটরে ফিরেছেন সতীলক্ষ্মী:—জুহুতে নেচে কুঁদে। সঙ্গে এসেছে কে জানেন? সেই গভর্নেসটা—স্ন্যাণ্ডানাস!

আলোক: অলিভিয়া?

মির্চন্দানি: আর কে Public menace!

আলোক: তা তো হ'ল, কিন্তু মহুভাই কী করছেন?

মির্চন্দানি (ঠোঁট বেঁকিয়ে): কী আর করবেন? যা বরাবর ক'রে এসেছেন স্ত্রী যাই করুন না কেন—জো হুকুম মেমসাহেব—বান্দা হাজির!

আলোক : কিন্তু রমা আপনার সঙ্গে এল হঠাৎ? একটু খুলে বলুন—ধাঁধা লাগছে।

মির্চন্দানি (হেসে) : ধাঁধা শুধু আপনারই না ডাক্তার সাহেব। পাড়া শুদ্ধু লোকের ধাঁধা লেগেছে। উঃ! সে কী চিৎকার জানেন না। আমি ছুটে এলাম আরো দুজন প্রতিবেশীকে নিয়ে ভাবলাম বুঝি কোনো ডাকাত কি খুনে! এসে দেখি দজ্জালটা আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে বারান্দায় রণচণ্ডী মূর্তি ধরে—আর রমা দুহাতে মুখ ঢেকে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

আলোক : আর মনুভাই?

মির্চন্দানি : তার কথা আর বলবেন না। ওটা কি একটা মানুষ—যে স্ত্রীর কথায় বাঁদর নাচে! দেখলাম সে থ' হ'য়ে শুধু চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন—আপনি তো ওর ডাক্তার—পাগল টাগল হ'য়ে যায় নি তো?

আলোক : না। তবে পেটে ক্যান্সার—

মির্চন্দানি : ক্যান্সার!

আলোক : ডাক্তারে তো তাই বলছে—কিন্তু মরুক গে, শুনি কী হ'ল?

মির্চন্দানি : ঐ তো বললাম—রণচণ্ডী ফিরে এসেই আপ্রাণ চেঁচাচ্ছেন, বলছেন ওকে : "বেরিয়ে যা বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে—এই মুহূর্তে!"

আলোক : আপনার সামনেই?

মির্চন্দানি (হেসে) : আপনি বিজ্ঞ হ'য়েও মাঝে এমন ছেলেমানুষের মতই কথা বলেন ডাক্তারবাবু, যে মনে হয় বুঝি আপনি এ-জগতে হঠাৎ উড়ে এসেছেন কোনো একটা দেবলোকটোক থেকে। সবাই জানে মিসেস্ কাপাডিয়া রাগলে একেবারে ক্ষেপে যান যাকে বলে—আমি কী বলছেন? আমার সঙ্গে দুজন সিন্ধি প্রতিবেশিনী ছুটে এসেছিলেন। কিন্তু রণচণ্ডীর কি তখন দিগ্বিদিক জ্ঞান ছিল? আমরা না থাকলে হয়ত মেয়েটার গায়ে হাত তুলতেন—ওর এ অবস্থায় কী যে হ'ত কে বলতে পারে? কারণ—বললাম না—রণচণ্ডীর সঙ্গে এসেছিলেন চামুণ্ডা—(ব্যঙ্গ হেসে) জুড়ি মিলেছে খাসা—পেত্নীর সঙ্গে পিশাচী। হবে না কেন? Like attracts like বলে না? দরদী—ব্যথার ব্যথী আর কার নাম বলুন? (হঠাৎ সুর বদলে) কিন্তু একটা অপূর্ব দৃশ্য দেখলাম ডাক্তার সাহেব—স্বচক্ষে না দেখলে হয়ত বিশ্বাস করতে পারতাম না। আহা! (রুমাল বের ক'রে চোখ মুছে) সত্যি সে অভাবনীয়! কিন্তু ভাবুন পরিবেশটা—মনুভাই দুহাতে মুখ ঢেকে ব'সে—ভেড়া মুখ ঢাকলে বলতাম—ভেড়ার মতন—(একটু হেসেই তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হ'য়ে, গদ্গদকণ্ঠে)—ওদিকে খৃশ্চান পেত্নীটা খিল খিল ক'রে হাসছে : "কেমন? হয়েছে তো? আমাকে দূর ছাই ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিলে ভেবে যে বাপ রক্ষা করবে। এখন তাকে কে রক্ষা করে দেখি। ফাঁকি দিয়ে ওকে দিয়ে ড্যাম্‌ড্ উইল লিখিয়ে নেওয়া—তারপর সে যে কী সব নোংরা স্ল্যাং—মুখে আনা যায় না।

আলোক : তারপর?

মির্চন্দানি : রমা হঠাৎ চোখের জল মুছে চাইল পেত্নীটার দিকে। বলল : "আমি উইলের কথা জানতাম না—টাকাও চাই নি কোনোদিন। আমি শুধু চাই—বাবাকে তোমরা কষ্ট দিও না। যদি কথা দাও তবে আমি এই মুহূর্তে লিখে দিচ্ছি সব বিষয় প্রবীরের নামে।" আর বলবার সে কী ভঙ্গি ডাক্তার সাহেব! ঐ সাক্ষাৎ খৃশ্চান পেত্নীটাও হকচকিয়ে গেল, বলল : "লিখে দেবে?" রমা বলল : "হ্যাঁ, যে ঠাকুরের কৃপা পেয়েছে তার কাছে টাকা মাটি হয়ে গেছে। আমি—"বলতে না বলতে রণচণ্ডী—মানে মিসেস্ কাপাডিয়া—রেগে আগুন হ'য়ে এগিয়ে এসে চিৎকার ক'রে বললেন : ভণ্ডামির জায়গা পাস নি, না? বেরিয়ে যা বাড়ি থেকে এক্ষুণি। দেবিয়ানা ঢের দেখেছি। যা এক্ষুণি—বেরো, বেরো, বেরো—এই মুহূর্তে—এক কাপড়ে। তখন আমি আর থাকতে পারলাম না, এগিয়ে রমাকে জোর ক'রে টেনে নিয়ে এলাম আমার মোটরে ক'রে।

আলোক : আর মনুভাই?

মির্চন্দানি : দুহাতে মুখ ঢেকে শুধু কেঁপেই সারা—ওটা কি মানুষ, ডাক্তার সাহেব? বার বার ওর কথা তুলছেন কেন? পাড়ার সবাই জানে ও স্ত্রীর বান্দা—bond slave ভেড়ার কাছে আপনি কী আশা করেন বলুন তো—যে-বুড়ো বয়সেও যে-কোনো রঙ্গিনীকে নিয়ে ঢলাঢলি করতে লজ্জা পায় না, মেয়ের বয়সী কুমারীকে

করণী ক'রে তার হুকুমবরদার হয়—কিন্তু যাই এখন—আপনি ওকে দেখবেন। আহা—এই অবস্থায়—advanced stateএ-তা ভালোই হয়েছে, আপনিও ডাক্তার, নমিতাও নার্স—ও ঠিক জায়গায়ই এসে পড়েছে।

আলোক : একটু বসবেন না?—আরো কিছু জিজ্ঞাসা করবার ছিল।

মির্চন্দানি : কী?

আলোক : আপনারা কজন ছিলেন উপস্থিত?

মির্চন্দানি : দু তিন জন গিয়েছিলাম—তার পর চেঁচামেচি শুনে আরো কয়েকজন এসে হাজির হ'ল। গেটের বাইরে ভিড় জ'মে গেল।

আলোক : আপনাকে বহু ধন্যবাদ। ভগবানই আপনাকে পাঠিয়েছিলেন ওকে বাঁচাতে। কেবল আর একটা প্রশ্ন : শুনছি না কি পনশেট ড্যাম ভেঙেছে। গুজব না সত্যি?

মির্চন্দানি : ঠিক বলতে পারি না। আমি সেই খবর নিতেই যাচ্ছি এখন রেডিও আপিসে। আমার নিজের তো মনে হয় না যে পুণায় বন্যা হ'তে পারে। মুতা কি একটা নদী ডাক্তার সাহেব?—একটা নৌকাও কি কোনোদিন দেখেছেন মুতার জলে? তবে আর একটা দারুণ গুজব রটেছে—খড়গবাসলা বাঁধও না কি ভাঙতে পারে। তাই যাই—কারণ আমার বাড়ি যদিও একটু উঁচু মাটিতে—তবু মুতা নদীর ধারে তো—একটু সাবধান হওয়া ভালো। তবে আমার স্ত্রী ছেলে মেয়েকে কাল বম্বে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি আছি বাড়ী আগলাতে।

আলোক (হেসে) : নদীকে ঠেকাবেন না কি দুই বাহুর বাঁধে—বীরবলে?

মির্চন্দানি : না, তবে ডাকব—ঠাকুর—এসো আবার মাছ অবতার হ'য়ে আমার বাড়িটাকে কাঁধে করো—সাধুজি বলেন তিনি ভক্তবৎসল। আর—আর আমিও সাধুজির কাছে মন্ত্র নিয়েছি।

আলোক : তাই না কি? এতদিন বলেন নি তো?

মির্চন্দানি : আমার স্ত্রী এসব বিশ্বাস করেন না তাই লুকিয়ে লুকিয়ে ধর্ম করি ডাক্তার সাহেব। ঠাকুরকে চুপি চুপি ডাকি বিপদে পড়লে—কারণ স্ত্রী জানতে পারলে যে বিপদ তার তো আর কাটান নেই—হা হা হা।

আলোক : আপনার বুকে বল আছে বৈ কি। নৈলে এমন সময়েও হাসতে পারেন?

মির্চন্দানি : মহুভাই বলে প্রায়ই বাইরণ না কে বলেছেন—মানুষ হাসে প্রাণের দায়ে—নৈলে পাছে কেঁদেই সারা জীবন যায়। যা দেখে এলাম স্বচক্ষে—সত্যিই ট্রাজিডি—একটা জলজ্যান্ত মানুষ ভেড়া বনে গেল গা! ট্রাজিডি নয়?—বলুন তো? হ্যাঁ শুনুন, সাধুজি কেমন আছেন?

আলোক : ভালোই—দেহতে শান্তিতে আছেন সব দিক দিয়েই।

মির্চন্দানি : অমন কথা বলবেন না। কত ভাবেন তিনি আমাদের সবার জন্যে! সেদিন এসেছিলেন আমার মেয়েকে দেখতে তার টাইফয়েড শুনে, আর তিনি আসবার পরদিনই আপনি বললেন বিপদ কেটে গেছে, মনে আছে?

আলোক : তিনি এসেছিলেন তার আগের দিন? জানতাম না তো!

নমিতা বারান্দা থেকে ডাকল : "বাবা! রমা মূর্ছা গেছে—এস শীগগির!"

মির্চন্দানি : "আপনি ওকে সামলান ডাক্তারবাবু। আমি যাই।

বত্রিশ

মিনিট কুড়ি পঁচিশ বাদে রমা একটু শান্ত হ'য়ে কাঁদতে কাঁদতে যা বলল—শুনে আলোক ও নমিতা উভয়েই স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। অলিভিয়াকে নিয়ে এলেন কি না শোভনা দেবী স্বামীর উপর আরো চাপ দিতে! সাধুজি গতকাল বলেছিলেন বটে ওদের দুজনের চুক্তির কথা, কিন্তু আলোক নমিতা বা ভক্তি কেউই বিশ্বাস করতে পারে নি যে শোভনা দেবী সত্যি সত্যি এই জাতের মেয়ের সঙ্গে ব্ল্যাকমেলের চক্রান্ত করতে পারেন মহুভাইকে ভয় দেখিয়ে ফের উইল পাল্টে দিতে। তাই রমা চোখে অন্ধকার দেখল—আরো দেখে যে মহুভাইয়ের মুখে একটি কথাও ফুটল না। বলতে বলতে রমা কেঁদে ফেলল, বলল :

বোধহয় অলিভিয়াকে আনার উদ্দেশ্যও ছিল তাই—বাবাকে বিহ্বল ক'রে কাজ হাসিল করা"।

নমিতা আগুন হ'য়ে উঠল: "বিহ্বল করব বললেই কাউকে বিহ্বল করা যায় না কি—মানে, যদি সে মানুষ হয়?"

আলোক (নমিতার কাঁধে হাত রেখে): অত অধীর হ'লে তো চলবে না মা! রমার কথা একটু ভাবো। এখন মাথা খুব ঠাণ্ডা রাখা চাই। গুরুদেব কি বলেন নি—"সমত্বং যোগ উচ্যতে?" শুনি কী হ'ল তার পরে।

রমা (অশ্রুগাঢ় কণ্ঠে) কী আর হবে কাকাবাবু? মা আমাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়ে চিৎকারে পাড়া মাথায় ক'রে শেষে বললেন: দূর হ—শয়তানী! আমি দুধকলা দিয়ে সাপ পুষেছি। এক্ষণি এক কাপড়ে বেরিয়ে যা।

নমিতা (গলা পরিষ্কার ক'রে): তারপর?

রমা: তারপর আর কি? ভাগ্যে এই সময়ে মির্চন্দানিজি এসে পড়লেন যেন দেবদূত হয়ে—আমাকে জোর ক'রেই নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। তার পরে তাঁর মোটর বার ক'রে এখানে পৌঁছে দিয়ে গেলেন।

রমা ফের কান্নার তোড়ে নমিতার কোলে লুটিয়ে পড়ে। এমন সময়ে বাইরে গোলমাল শুনে চোখ মুছে উঠে বসল। আলোক ছুটে বাইরে গিয়ে নমিতাকে ডাক দিল। নমিতা ছুটল গেটের দিকে। একটু পরে রমাও বেরিয়ে এসে গেটের কাছে দাঁড়াল।

তারপর যে-দৃশ্য ওদের চোখে পড়ল সে সত্যিই অভাবনীয়:

সার সার লোক ছুটেছে চতুঃশৃঙ্গী কালীমন্দিরের দিকে। মন্দিরটি পাহাড়ের উপরে, সেখানে রোজই যাত্রীরা ধর্ণা দিতে যায় সাঁঝ-সকালে, কিন্তু এভাবে ভয় পেয়ে জনতাকে ছুটতে ওরা কখনও দেখেনি।

আলোক গেট পেরিয়ে একজনকে জিজ্ঞাসা করল: "কি হয়েছে?" সে মারাঠীতে বলল একগলা কথা, সবটুকু আলোক ধরতে পারল না কারণ তার ভাষা মেহাতী মারাঠী—তবে ভাবার্থটা বুঝতে বেগ পেতে হ'ল না: পুণা ডুবল ব'লে, সঙ্গম ব্রিজ ভেঙে গেছে, গণেশখিন্দ রোডেও জল এল ব'লে—এখন প্রাণ বাঁচাতে হ'লে শুধু পাহাড়ে ওঠা ছাড়া গত্যন্তর নেই। ব'লেই সে আঙুল দিয়ে দেখাল পাহাড়ের চূড়ায়। আলোক সবিস্ময়ে উপর দিকে তাকিয়ে দেখে, অবাক কাণ্ড!—সার দিয়ে পিঁপড়ের মতন খুদে খুদে মানুষ চলেছে, একদল কালী-মন্দিরের পাহাড়ে, আর একদল ওদিক্‌কার প্রশস্ততর চূড়ায়—যেখানে আলোক কতবার বেড়াতে গেছে নমিতাকে নিয়ে!

আলোক বলল: "শুনলে তো—গুজবসম্রাটেরা কী বলছেন?"

রমা বলল: "গুজব নয়, কাকাবাবু! আমি আজ সকালে নটার সময়ে স্বচক্ষে মুতার যে-রূপ দেখে এসেছি—সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। মির্চন্দানিজিও আমাকে বললেন মোটরে যে, যদি এর উপরে খড়্গবাসলার বাঁধও ভাঙে তাহ'লে শুধু রাস্তা বা ব্রিজ নয়—নদী-তীরের বাড়িগুলোর একটাও বাঁচবে না—বিশেষতঃ একতলা বাংলোগুলো। কী হবে কাকাবাবু! বাবা…বাবা…ব'লে ও টেলিফোন করতে ছোটে।

তেত্রিশ

কিন্তু তখন কে কাকে টেলিফোন করে? সব নিশ্চুপ। শহরের বিদ্যুৎপ্রবাহও ঠাণ্ডা। রমা আরও ভয় পেয়ে গেল। ওকে ভরসা দিয়ে নমিতার জিম্মায় রেখে আলোক মোটর হাঁকিয়ে চলল সঙ্গম ব্রিজের দিকে। এর পরে আর গুজব ব'লে হেসে উড়িয়ে দেয় কেমন ক'রে?

রাস্তায় সে কী ভীষণ ভিড়! পথে প্রথমেই পড়ে রেডিও অফিস, সেখানে নেমেই চক্ষুস্থির! অধ্যক্ষ মুখ মেঘলা করে বললেন অনেক কথা গড় গড় ক'রে, তার সারমর্ম এই যে, লকড়ি ব্রিজ, নিউ ব্রিজ, সঙ্গম ব্রিজ সব জলের নিচে—খড়গবাসলার বাঁধ ভেঙেছে বেলা এগারটায়। পুণার প্রায় অর্ধেক জলমগ্ন, হয়ত আরও বাড়বে বন্যার জল।

আলোক উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটল সঙ্গম ব্রিজের দিকে মঙ্গু-ভাইয়ের খবর নিতে। গিয়ে যা দেখল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারত না।

শীর্ণ মুতা নদী পদ্মার মতই ফুলে উঠেছে। আর জলের

সে কী গর্জন! অবলা প্রবাহিনী যে এক মুহূর্তে দানবীর মতন মহাকায়া হতে পারে কে ভেবেছিল?

সঙ্গম ব্রিজের চিহ্নও নেই। রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে নানা বাগানে নৌকা ক'রে উঁচু রাস্তার দিকে লগি ঠেলে আসছে কত যে ছেলে-মেয়ে, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা! মোতায়েন-করা পুলিস ও সৈনিকরা নানা বাড়ির বাসিন্দাদের ট্রাকে ক'রে পাঠিয়ে দিচ্ছে কোথায় কে জানে? সম্ভবতঃ কোনো "রিলিফ ক্যাম্প"-এ। রাস্তার মোড়ে সাইকেলের পাশে দাঁড়িয়ে বহু আরোহী মজা দেখছে। একজন তুষমণ চেহারার লোককে জিজ্ঞাসা করতেই সে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে জবাব দিল যে, সাইকেল "সেফ"—যদি জল হঠাৎ এদিক পানে লাফিয়ে আসে তো সাইকেলে ক'রে চম্পট দেবে চোখের পাতা না পড়তে। আলোক মনে মনে বলল, "বাহবা, বাহবা! আর সেই সঙ্গে অবিশ্যি ঐ সজাগ চোখ এদিক্ ওদিক্ ঢুঁড়বে কোন্ কর্তাহীন বাড়ীতে ঢুকে কোথায় কী হাতিয়ে নেওয়া যায়! (ও মিথ্যে সন্দেহ করে নি, দুদিন বাদেই কাগজে বেরিয়েছিল—একজন ডাকসাইটে চোর পর পর পনেরটি বাড়ি থেকে গ্রামোফোন, বাসন ও রেডিও চুরি ক'রে বামাল ধরা পড়েছে।)

হঠাৎ চমকে ওঠে: ধপাং ধ-স্! পুলের কাছে একটা মস্ত গাছ মাটির সঙ্গে ধ্বসে প'ড়েই তীরবেগে ছুটল ঢেউয়ের মাথায়। ঝন্ ঝন ঝন্ঝাং—ঐ ডানদিকে একটা মালগুদামের টিনের ছাদ ভেঙে পড়ে, আর ঢেউ-গুলো তাকে ছোবল মারা সুরু করে অসহ্য ক্রোধে। ওদিকে আর এক বিচিত্র দৃশ্য! অগণ্য পাটল-রাঙা মহাকায় উর্মিনাগিনী ফণা তুলে ছুটেছে ফুঁশতে ফুঁশতে—কাকে ছোবল মারবে! এদিকে ডাঙায় ছোট ছোট গাছ সবই ডুবে গেছে, শুধু কয়েকটির উপরের মাত্র দু'একটি ডাল দেখা যাচ্ছে। মহীরুহগুলির ডালে ডালে লোক আপ্রাণ চীৎকার করছে, চাদর নেড়ে পুলিশকে ডাকছে: "বাঁচাও বাঁচাও!" কিন্তু জলের এ-বিপর্যয় তোড়ে নৌকা নিয়ে সেখানে পৌঁছবেন কোন্ অভী-কাণ্ডারী? কয়েকটি দোতালা বাড়ির জান্‌লা থেকে এক রাশ মাথা ঝুঁকে সভয়ে দেখছে চেয়ে নিরীহ মুতা নদীর করালী কান্তি। এখানে ওখানে নিচু জমিতে খাপরার ছাদে, লালরঙা অর্ধবৃত্তাকার টিনের মাথায় বস্তার্তেরা কাঁপছে আতঙ্কে। সর্বোপরি, চারদিকে সে কী চীৎকার গোলমাল! খানিকটা প্রকাণ্ড বস্তিতে আগুন লাগলে যেমন হয়।

আলোক স্বভাবে ভীরু বা 'নার্ভাস' নয়, কিন্তু এ যে শ্মশানকালীর তাণ্ডবনৃত্য প্রলয়ের হিংস্র ক্রোধের তালে তালে! বুকের মধ্যে জেগে ওঠে সভয়সম্ভ্রম—awe!

দেখতে দেখতে জল আরো ফুলে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলে একদল আপ্রাণ ছোটে পিছন দিকে। গেল, গেল, গেল! রাশি রাশি পিঁপে কেনেস্তারা টেবিল-চেয়ার আসবাবপত্র উন্মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। ওদিকে একটা পাড় ভেঙে পড়ল। আহা! দশ পনের জন লোক জলে প'ড়েই ভেসে চলল চীৎকার ক'রে পাগলের মত—বাঁচাও! কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে? উর্মিদৈত্যদের এ মল্লভূমিতে নৌকা ভাসাবে কোন্ ভীমকাণ্ডারী? হঠাৎ পাশের একজন বলল: "দেখুন দেখুন! গরু বাছুর মানুষ মোষ তীরবেগে ভেসে চলেছে সঙ্গম ব্রিজের উপর দিয়ে। সত্যিই তো! আলোকের বুকের মধ্যে রক্ত দ্রুত বয়—হৃৎপিণ্ড পঞ্জরে হাতুড়ি মারছে। ও মন্টুভাইয়ের কথা স্রেফ ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। হঠাৎ মনে হয়—হয়ত কল্পান্তে যে-প্রলয়ের বর্ণনা পুরাণে পড়া যায়, বুঝি সে-প্রলয়ের আভাষ দিতেই আসেন শ্মশানকালী থেকে থেকে! কিম্বা বলা যেতে পারে—যখন আমরা ভুলে যাই শিবকে, তখন বোধহয় হুঙ্কারে রুদ্র আসেন আমাদের মনে করিয়ে দিতে যে, জীবনের নগণ্য দ্বীপটির চারপাশেই রাশি রাশি মৃত্যুর করাল জল! বাইবেলের একটি বিখ্যাত সূত্র মনে বেজে ওঠে।

"In the midst of life we are in death!"

হঠাৎ ওর চেতনা ফিরে এল—এ কী! মন্টুভাইয়ের খবর নিতেই এখানে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসা না? রমা জিজ্ঞাসা করলে কী বলবে? রাস্তা থেকে একটু বাঁদিকে একটা কাঁকরের রাস্তা, তার পরেই মন্টুভাইয়ের বাংলো। ও কাঁকরের রাস্তায় পা বাড়াতেই এক সৈনিক হাঁ হাঁ ক'রে ছুটে এসে বলল। "ওদিকে যাবেন না স্যর; জল বাড়ছে।"

"আমার এক বন্ধু—"

সৈনিক হাসল, "ওদিকে সব বাড়িই ডুবে গেছে

স্যর্! বন্ধু কী করছিলেন? ঘুমচ্ছিলেন?" বলেই সুর নামিয়ে। "মাফ করবেন স্যর্! কিন্তু দয়া ক'রে এখন এখানে ভিড় বাড়াবেন না। খড়গবাসলার বাঁধও ভেঙেছে—এ বন্যা তারই জল। পনশেটের পিঠে খড়গবাসলা। কাজেই জল আরো অনেক উঠবে—আধ মিনিটে। আপনি ফিরে যান—কোথায় থাকেন?"

"গণেশখিন্দ রোডে—চতুঃশৃঙ্গী মন্দিরের কাছে।"

"ওঃ। বড় বেঁচে গেছেন স্যর্!"

"কিন্তু আমার বন্ধু—"

"আপনাকে কে ঐ ডাকছে চাদর নেড়ে—"

আলোক চম্‌কে বাঁদিকে তাকাতেই দেখে একটা বাদামী রঙের টালির ছাদে একটি মাত্র মানুষ আপ্রাণ চেঁচাচ্ছে। আলোক চম্‌কে ওঠে, মনুভাই তো বটে! এতক্ষণে আলোককে দেখতে পেয়েছে ভিড়ের মধ্যে। কিন্তু একী মূর্তি!—জামা ভিজে, চুল উস্কো-খুস্কো, চোখ লাল!

আলোক ছুটে যাবে—এমন সময়ে সৈনিক ওর বাহু চেপে ধরল: "কোথায় যাচ্ছেন স্যর? ডুবে মরতে? বড় রাস্তা ছাড়বেন না—যদি আত্মহত্যা করতে না চান।"

"আত্মহত্যা কী বলছেন? দেখছেন না ঐ টালির ছাদে আমার বন্ধু কাপাডিয়া ডাকছেন?"

"অ্যাঁ! বিখ্যাত নিযুতপতি মনুভাই কাপাডিয়া?"

আলোকের এত দুঃখেও হাসি পায়: "টেকচাঁদ! কী নামই করেছ জাদু!" কিন্তু হাসি চেপে বলে: "হ্যাঁ, আর বলুন দেখি—এহেন মহাজনকে না বাঁচালে মান থাকে?" ব'লেই তার হাত ছাড়িয়ে জলে নামে···হাঁটু জল···কোমর জল···বুক জল আর এক পাও এগুনো অসম্ভব। স্রোত প্রবল। ত্রস্ত সৈনিকটি ছুটে এসে একটা দড়ি ছুঁড়ে দিল: "যদি যাবেনই এই দড়িটা ধরুন অন্ততঃ। আলোক ফের হাসে মনে মনে: "ক্রোড়পতি শুনলে টনক্ না ন'ড়ে পারে?" যাহোক্ ও দড়ি ধরে একটু ভরসা পেয়ে টালির ছাদের কাছে পৌঁছে এবার গলা জলে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বলল: "মনুভাই! বাঁচতে যদি চাও তো নেমে এসো এক্ষণি আর কালবিলম্ব না করে—ভয় নেই এখানে চার পাঁচ ফুটের বেশি জল হবে না—আমি আছি দড়ি ধ'রে। ওরা টেনে তুলবেই তুলবে আমাদের দু'জনকে।

মনুভাই পাগলের মতন হাহাকার করে উঠল, "শোভনা ···প্রবীর ভেসে গেছে···বাঁচান তাদের ডাক্তারবাবু··· দোহাই"

এত দুঃখেও আলোকের হাসি এল: "যদি ভেসে গিয়ে থাকে তাহলে বাঁচাব কেমন ক'রে?"

মনুভাই পাগলের ম'ত নদীর দিকে দেখিয়ে: ঐ দিকে এদিকে—

সৈনিক চেঁচিয়ে ধমকে বলে: "সে হবে এখন—আগে আপনি নেমে আসুন তো!"

মনুভাই বলল: "আমি এখানে বেশ আছি—শোভনা —প্রবীর—"

আলোক উষ্মার সুরে বলল: "বেশ আছ? মাথা খারাপ! এ টলমলে টালির ছাদ কখন ভেঙে পড়বে কে বলতে পারে? কথা শোনো, নেমে এসো—হ্যাঁ হ্যাঁ, ঝাঁপ দাও যদি বাঁচতে চাও। ভয় নেই আমি ধরব—ডুবে যাবে না। এখানে এখনো ডুব-জল হয় নি, কিন্তু হ'ল ব'লে।"

মনুভাইয়ের তখন সাড় এল—ঝপাং ক'রে জলে পড়ল ঝাঁপিয়ে। আলোক এক হাতে দড়ি অন্য হাতে মনুভাইয়ের কব্জি চেপে ধ'রে টেনে এনে বড় রাস্তায় ওর মোটরে তুলে শৃঙ্গধ্বনি ক'রে গণেশখিন্দের দিকে চলল ফিরে।

মনুভাই বুক চাপড়ে হাহাকার ক'রে উঠল: "আমার সব গেছে ভাই···শোভনা প্রবীর রমা—"

আলোক মোটর থামিয়ে বলল, "অশান্ত হোয়ো না। রমা অন্ততঃ বেঁচেছে।"

মনুভাই ককিয়ে কেঁদে ওঠে: "আমাকে কেন ভোলাচ্ছ ভাই? আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি···সে রাস্তায় বেরিয়ে গেল···আহা···মা-হারা মেয়ে···আমি কাপুরুষ, ইমবেসাইল···একটি কথাও কইতে পারলাম না —চোখ বুঁজে রইলাম স্ত্রীর ভয়ে। ভেবেছিলাম একটু পরেই শোভনার চোখ এড়িয়ে বেরুব—কিন্তু ও আর অজিজিয়া দোরের কাছে ব'সে রইল। আমি ভাবলাম একটু বাদে রমা ফিরে আসবে। কিন্তু সে এলো না—এলো এক রাশ জল—দশ পনেরো মিনিটের মধ্যে। আমি কোনো-

মতে সাঁতার দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ি ধ'রে পরে সে-গাছ থেকে লাফিয়ে এই ছাদে উঠলাম --কিন্তু শোভনা ও প্রবীর টাল সামলাতে পারল না···মেয়েটাও নিশ্চয় রাস্তায়ই ডুবে মরেছে—ঠিক হয়েছে···আমার সাজা হবে না তো হবে কার ?" ব'লে কপালে করাঘাত করে, মাথার চুল টেনে ছেঁড়ে।

আলোক ওর দু'হা'ত চেপে ধ'রে ধমকায় : "পুরুষ-মানুষ না ? থামো ! বলছি, রমা রাস্তায় ডোবে নি ! মির্চন্দানি তাকে মোটরে ক'রে আমার ওখানে পৌঁছে দিয়ে গেছে।"

"রমা বেঁচেছে ? বেঁচেছে ?" মনুভাই লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরেই ভেঙে পড়ে : "কিন্তু আমার প্রবীর··· শোভনা, ও হো হো হো হো !" আলোক আর দ্বিরুক্তি না ক'রে সোজা মোটর চালিয়ে দেয়। মিনিট কয়েক পরে যখন মোটর ওর বাংলোয় পৌঁছল তখন পিছনের সীটে মনুভাইয়ের সংজ্ঞা নেই। মূর্ছা গেছে। মন্দের ভালো।

চৌত্রিশ

মনুভাইকে ঘরে এনে খাটে শুইয়ে দিয়ে রমাকে ধাত্রী মোতায়েন ক'রে বাইরে এসে -চাপা স্বরে নমিতা আলোককে বলে : "বাবা ! আমার কেমন যেন বিশ্বাস হচ্ছে না ! এ কি ভাবা যায় ?"

আলোক ওর দিকে চেয়ে বলে : "সত্যি···আমার··· কি বলব ? মনে কেবলই ঝংকার দিয়ে উঠছে গুরুদেবের সেদিনকার একটি কথা—"ঠাকুর কোন্ শয়তানকে যে কোন্ ঘোড়ের চালে কখন কিস্তিমাৎ করবেন, আগে থাকতে কেউ আন্দাজ করতে পারে না।"

নমিতা (সোৎসাহে) : যা বলেছ বাবা ! আমিও ভুলতে পারছি না। ভাবো তো, যদি অলিভিয়া না যেত শোভনার কাছে—তাহ'লে আজ ওরা ফিরে আসত না। আর ফিরে না এলে ওরা ডুবে মরত না, কিন্তু রমা মরতই মরত। কোন্ পথ দিয়ে এলেন রমার তারক ! ভাবতেও যেন ধাঁধা লাগে।"

আলোক উঠে বারান্দায় পায়চারি ক'রে চিন্তিত মুখে। নমিতা সঙ্গ নেয়। বলে : "কী ভাবছ বাবা ?"

"একটা প্রশ্ন মনে জাগে—"

নমিতা হেসে ফেলে : "বাবা বাবাঃ—তোমার মনে প্রশ্ন যেন সমুদ্রের ঢেউ—একটা ভাঙতে না ভাঙতে আর একটা গ'র্জে ধেয়ে আসে ! কেবল আমি জানি কি ভাবছ তুমি।"

"কক্ষণো না।"

"বাজি ?"

"বলতে পারলে তুই পাবি ঘোড়া। না পারলে আমাকে দিতে হবে হাতী।"

"এরি নাম fairness বটে ! তবে ঘোড়া ঘোড়াই সই—মোটর হাঁকাতে হাঁকাতে হাত হয়ে উঠল হাতা। ঘোড়ায় চড়লে হাত একটু বিশ্রাম পাবে, ফ্ল্যাও কমবে। তুমি ভাবছিলে --সাধুজি জানতেন কিনা যে, রমাকে ওরা যথাকালে তাড়িয়ে দেবেই দেবে—যার ফলে তার প্রাণ বাঁচবে আর কুচক্রী কৈকেয়ী, মন্থরা আর শিশু দুঃশাসন ভেসে যাবে।"

আলোক : তুই সেদিন মনুভাই কী ভাবছিল ব'লে দিয়েছিলি বটে। কিন্তু কী ক'রে টের পাস বল্ তো ?

রমা ডাকল : "বাবা জেগেছেন।"

ওরা গিয়ে কাছে দাঁড়াতেই মনুভাই ফের চোখ বুজল। নমিতা জিজ্ঞাসা করল—চা আনবে কি না।

রমা বলল : "দেখ বাবা, কাকাবাবু এসেছেন আর দিদি জিজ্ঞাসা করছেন একটু চা খাবে ?"

মনুভাই মাথা নাড়ল, পরে ক্ষীণকণ্ঠে বলল : "বড় দুর্বল।···মাথার মধ্যে যন্ত্রণা···"

ব'লেই চোখ বোঁজে ফের।

* * *

নমিতা মনুভাইকে চামচে ক'রে ওভালটিন খাওয়াবার পরেই সে নেতিয়ে পড়ল। রমা ত্রস্ত নেত্রে আলোকের দিকে তাকাতেই আলোক বলল : "না। মূর্ছা নয় এবার। ঘা খেয়েছে ত বিষম। ঘুমিয়ে পড়েছে। utter prostration—যত ঘুমোয় ততই ভালো।

দোরে ঠক্···ঠক্···ঠক্···

নমিতা ছুটে বেরিয়ে এসে দোর খুলেই, এ কী ! গুরুদেব ! বলেই গড় হয়ে প্রণাম।

আলোক রমাকে নিয়ে বেরিয়ে প্রণাম ক'রে সাধুজিকে বসালো নিয়ে গিয়ে পূজার ঘরে। রমার কাহিনী বলতে

যাবে—এমন সময় সাধুজি থামিয়ে বললেন : "বলতে হবে না। আমি জানি সব। ঠাকুর আমাকে দেখিয়ে দিয়েছেন। আমি বলি নি—রমার কিছু হবে না?" রমা তাঁর পায়ে মাথা রেখে চুপ ক'রে রইল। সাধুজি বললেন : "তোমার তো ব্যবস্থা হ'ল মা, এখন খবর নিতে হবে নারায়ণ পেঠে।"

আলোক বলল, "অসম্ভব। মৃতার যে রণচণ্ডীমূর্তি দেখে এলাম সঙ্গম ব্রিজে—নারায়ণ পেঠে নিশ্চয় এখন অন্ততঃ বিশফুট জল। তাছাড়া এখন তো সব ব্রিজই বন্ধ—ওপারে পৌছবেন কী করে?"

সাধুজি : হোলকার ব্রিজ শুনছি খোলা আছে।

আলোক : সন্দেহ।

সাধুজি : না। আমি দেহু ক্যান্টনমেন্ট থেকে এলাম একটা মিলিটারি লরিতে। আমাকে সাধু দেখে ওরা তুলে নিল দয়া ক'রে। তাদের মুখেই শুনলাম যে, কেবল হোলকার ব্রিজ একটু দূরে ব'লে তার উপরে এখনো জল ওঠে নি।

আলোকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, "তাহলে একটু বসুন আপনি, আমি খোঁজ নিয়ে আসছি।"

সাধুজি বললেন : "না, বসব না। আমিও যাব।"

নমিতা মিনতির সুর ধরে : "আমিও বাবা! লক্ষ্মীটি!"

"কিন্তু মন্টুভাই?"

রমা বলল : "আমি তো আছি। আপনি যদি পারেন খোঁজ নিয়ে আসুন ধ্রুবদা, মালতীদি আর মাসীমার।"

পঁয়ত্রিশ

তিনজনে মোটরে বেরুতেই এক বিচিত্র দৃশ্য চোখে পড়ল : রাস্তায় ভিড় ফুলে উঠেছে··পথে ফুটপাতে অশ্রান্ত শোভাযাত্রা চলেছে গৃহহারা ভয়ত্রস্ত নরনারীর। সঙ্গে সঙ্গে অজস্র সাইকেল, গরুর গাড়ি, হাতে-ঠেলা গাড়ি, কোথাও বা ভদ্র ঘরের মা চলেছেন শিশুকে—হয় কোলে নিয়ে, না হয় প্যারাম্বুলেটরে। তবে অধিকাংশই চলেছে ছোট ছোট জটলায়—দেখলেই মনে হয় এক একটি দরিদ্র পরিবার চলেছে তাদের যৎকিঞ্চিৎ যথাসর্বস্ব নিয়ে। সাধুজি আঙুল দিয়ে দেখালেন পাহাড়ের দিকে। সেখানে পিল্ পিল্ ক'রে লোক উঠছে উপরের দিকে।

হোলকার ব্রিজে পৌছতেই এক অফিসার বাধা দিলেন। "কোথায় যাবেন?"

"ওপারে।"

"আপনাদের বাড়ি ওপারে?"

"না।"

"তাহলে মাপ করবেন। শুধু পুলিশ, মিলিটারি আর যাদের ওপারে বাড়ি তারা যেতে পারে।"

নমিতা বলল। "নারায়ণ পেটের খবর বলতে পারেন কি?"

অফিসার হাসলেন "নারায়ণ পেঠ? one of the worst affected areas, নারায়ণ পেঠ আজ ভেনিস হয়ে গেছে। কেবল রাস্তায় গণ্ডোলা চলতে পারে না—এই যা।"

নমিতা আলোককে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে। "বড় অফিসার।"

সে শুনতে পেয়ে হেসে বলে। "এখন আর বড় ছোট নেই, ম্যাডাম। জল সবাইকে কাঁধে সমান করে দিয়েছে। বাঁদিকে তাকান একবার—ঐ গাছের দিকে।"

ওরা তাকালো। নিচু ভূমিতে জল থৈ থৈ করছে। একটি জলমগ্ন গাছের শুধু একটি ডাল উচ্ছ্রিত হয়ে দুলছে। সে ডালে একটি বেড়াল, একটি পুষ্টকায় ইঁদুর, আর দু'টি সাপ নিশ্চল হয়ে পাশাপাশি আসীন—যেন "সহাবস্থান" মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে।

* * *

আলোক মোটর ঘোরাতেই সাধুজি বললেন। "জংলি মহারাজ রোডের দিকে একবার গেলে হয়। সেখানে মোটর যেতে দেবে কি?"

অফিসার শুনতে পেয়ে বললেন। "লকড়ি ব্রিজের অর্ধেক জলে ডুবে গেছে। একটি দোতলা বাড়ির মাথাও জলের উপরে নেই। সম্ভাজি পার্কও তথৈবচ। জল আরও বাড়বে। তাই বেশিদূর যাবেন না। আর একটি অনুরোধ। সাইট—সীইং এখন থাক্। পুলিশ ও মিলিটারি যে-কাজের ভার নিয়েছে সে-কাজে সবচেয়ে বেশি বাধা দিচ্ছেন তাঁরা—যাঁরা জল দেখতে বেরিয়ে ভিড় করে ফূর্তি করছেন মনের সাধে।"

সাধুজি হেসে বললেন ইংরেজিতে। "আমরা ঠিক তাদের দলে নই। নারায়ণ পেঠে আমার এক বন্ধু আছেন। জংলি মহারাজ রোডেও। আমার এই সঙ্গী ডাক্তার বন্ধুর বাড়িতে দু'জন বন্যার্ত আশ্রয় নিয়েছেন। আমরা চাই আরও দু' একজনকে ছেঁকে তুলতে—যদি পারি অবশ্য।"

অফিসার টুপি খুলে সসম্ভ্রমে, "I beg your pardon Sadhuji, don't take it personally, please!"

[ক্রমশঃ

বাঙলার চর্যাপদ

ডক্টর দুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাগ গবড়া

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই ।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী ।
কানেট চৌরি নিল অধরাতী ॥
সসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ ॥
দিবসই বহুড়ী কাউই ডরে ভাঅ ।
রাতি ভইলে কামরু জাঅ ॥
অইসনি চর্যা কুক্কুরীপাএঁ গাইউ ।
কোড়ি মাঝেঁ এক হিঅহিঁ সমাইউ ॥

পদটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদাবলীর অন্তর্গত। পদটি গেয় গবড়া বা গউরা রাগে ; পদকর্তা কুক্কুরীপাদ।

কায় সাধনের সঙ্কেত রয়েছে পদটিতে। দেহযোগী বা দেহতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত এর রসাস্বাদন সম্ভব নয়। সেই জন্য বাহ্যতঃ অসম্ভব প্রহেলিকায় পদটি আচ্ছন্ন বলে মনে হয়। এর বহিরর্থ ও আভ্যন্তরীণ অর্থ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

স্ত্রীকচ্ছপকে দোহন করায় পাত্রে দুগ্ধ ধরে রাখা যাচ্ছে না—এতই বেশী দুধ হয়েছে, কুমীরে খাচ্ছে গাছের তেঁতুল। (রুখের=বৃক্ষের) ওগো বধূ! শোন, ঘরের দিকেই আঙ্গিনা; চোর কর্ণভূষণ চুরি করে নিয়ে গেল মাঝরাত্রে। শ্বশুর নিদ্রিত, আর বধূ জেগে আছে ; চোরে যে-কর্ণভূষণ অপহরণ করে নিয়ে গেল, তা কোথায় গিয়ে পাওয়া যায়। বধূ দিবসেই কাকের ভয়ে ভীত, কিন্তু রাত্রি হলে সে কামরূপ চলে যায়। কুক্কুরীপাদ এইরূপ দেহচর্যার গান গাইলেন; কিন্তু কোটির মধ্যে একজনের হৃদয়ে এর অর্থ প্রবেশ করল।

উক্ত বহিরর্থের জটিলতা ছিন্ন করলে কায়সাধনে সহজানন্দ উপভোগ করার বিষয় এবং আচার্যের উপদেশে তান্ত্রিক যোগ পদ্ধতিতে নিঃস্বভাবীকৃত বোধিচিত্তের সাহায্যে সহজানন্দপ্রাপ্তির কথাই জানা যায়।

দুলি অর্থাৎ দুই যাতে লীন হয়েছে, এরূপ অদ্বয় মহাসুখকমলকে দোহন করায় সহজানন্দরস পীঠে অর্থাৎ বজ্রমণি-আদি ২৪টি দেহের পীঠ স্থানে ধরে রাখা যাচ্ছেনা ; এত অধিক দুগ্ধরূপ মহাসুখরসের সঞ্চার হয়েছে যে সেই রস দেহপাত্র থেকে উপছিয়ে পড়ছে। দেহবৃক্ষের তেঁতুলরূপী তির্যগ গতি সম্পন্না বোধিচিত্তকে ভক্ষণ বা আত্মসাৎ করছে কুম্ভীরে অর্থাৎ কুম্ভক সমাধিতে যোগী বোধিচিত্তকে আয়ত্ত করে সহজানন্দরস পান করছেন। কুম্ভক সমাধিমগ্ন সার্থক যোগী দেহ মন্থন করে এত মহাসুখরসের অধিকারী হয়েছেন যে তিনি দেহপাত্রে তা আর ধরে রাখতে পারছেন না।

ওগো বিআতী পরিশুদ্ধাবধূতী নৈরাত্মা দেবি, দেহবৃক্ষের নিকটেই সহস্রারপদ্মে মহাসুখরসের আঙ্গিনা বা স্থান; অর্ধরাত্রে অর্থাৎ যোগসাধনার মধ্যবর্তী অবস্থায় প্রবেশাদিবাতদোষরূপ কর্ণভূষণ অপহরণ করে নিল প্রভাস্বরশূন্যতারূপ চোর। রাত্রি অর্থে জ্ঞান; অর্ধরাত্রি বা গভীর নিশীথে অর্থাৎ যোগসাধনার চরমোৎকর্ষকালে সাধক শূন্যতাজ্ঞান লাভ করেন ; তখন কর্ণভূষণ অর্থাৎ রেচকপূরকাদির শক্তি ও দ্বৈতজ্ঞান বিনষ্ট হয়। কঠোর সংযমসাধনায় বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাজ্ঞ সাধক নৈরাত্মা শক্তিলাভে অদ্বয় মহাসুখের অধিকারী হন।

সসুরা অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচকপূরকের কার্য স্তব্ধ বা নিদ্রিত হয়ে পড়ে সাধনোত্থিত প্রজ্ঞাজ্ঞানের অভ্যুদয়কালে ; তখন বধূ অর্থাৎ পরিশুদ্ধাবধূতী কুণ্ডলিনীশক্তিরূপিণী নৈরাত্মা দেবী দেহমধ্যে জাগ্রত হয়ে অবস্থান করেন ; অর্থাৎ যোগীন্দ্র কুম্ভকযোগে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ করে তুরীয়ানন্দে নিমগ্ন হন, আর প্রকৃতিরূপিণী অবধূতিকা ভববিকল্প পরিহার করে নিত্য জাগ্রত থাকেন সেই দেহে।

এই বহুড়ী অর্থাৎ যোগলব্ধ পরিশুদ্ধাবধুতী নৈরাত্মা দেবী দিবসে বা চিত্তের জাগ্রত অবস্থায় কাকরূপ কালের বিধ্বংসী মূর্তি তথা জগতের ভীষণ পরিণাম লক্ষ্য করে সর্বদাই ভীত; কিন্তু রাত্রিতে অর্থাৎ প্রজ্ঞাজ্ঞানের উদয়ে ইন্দ্রিয়াদির সুষুপ্তিহেতু সেই পরিশুদ্ধাবধুতী বা নিবৃত্তি-বোধিচিত্ত কামরূপ অর্থাৎ কাম্যস্থান মহাসুখচক্রে গিয়ে তুরীয়ানন্দ লাভ করেন। চিত্তের সজাগ অবস্থায় হয় বস্তু-জগতের জ্ঞান; তখন পরিদৃশ্যমান জগতের প্রতি ইন্দ্রিয়-বর্গের গভীর আকর্ষণ ঘটে। ফলে, চঞ্চলমন সাধনায় সমাহিত হতে পারে না। ভোগপুষ্ট ইন্দ্রিয়চিত্তকে মায়ায় আলোকিত করে রাখে; কঠোর সাধনা ও সংযমে সেই ইন্দ্রিয়ালোকিত চিত্তকে প্রজ্ঞাজ্ঞানের গভীরান্ধকারে নিয়ে যেতে হয় যেখানে রূপরসাদির কখনও প্রবেশ ঘটেনা। সুতরাং, প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ করে সুকঠোর সাধনা করলে যোগের পূর্ণ অবস্থায় কাম্যবস্তু লাভে সহজানন্দ-প্রাপ্তি নিশ্চিত।

আলোচ্য পদে সাধনতত্ত্বের গোপনীয়তা রক্ষার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, কারণ পদটি হচ্ছে যোগতত্ত্বমূলক ও গুহ্যসাধনাশ্রয়ী। কোনো বিশেষ গূঢ় ও গুহ্য সাধনার সাধক ছিলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগের যোগীরা; তাঁরা সাধন পদ্ধতি ও অনুভূতি-প্রকাশে প্রহেলিকাময় ভাষা ব্যবহার করতেন। যোগতত্ত্বে শ্রদ্ধাহীন জনগণ যাতে সাধনার রহস্য উপলব্ধি না করতে পারেন সেজন্যই প্রহেলিকাময় ভাষার প্রয়োগ। এই ভাষাকে সন্ধ্যা বা সন্ধা বলা হয়েছে। সন্ধ্যায় যেমন সমস্ত বিষয় স্পষ্ট হয়না, তেমনই চর্যার ভাষাও কিছু বোঝা যায়, আবার কিছু অবুদ্ধও থেকে যায়। এই ভাষার উল্লেখ পাই বৌদ্ধতন্ত্র ও তার টীকা-টিপ্পনীতে এবং পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রে। পক্ষান্তরে, যে ভাষা বা শব্দের অর্থ সম্যক অনুধ্যান (সম্—ধ্যৈ বা ধা) করে বুঝতে হয় এবং যার অর্থ বিশেষভাবে নির্দিষ্ট তা 'সন্ধা' ভাষা। চর্যার অর্থ যেরূপ গূঢ় রহস্যময় তাতে তার ভাষাকে সন্ধ্যা বা সন্ধা উভয়ই বলা যেতে পারে।

প্রহেলিকা ভাষার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় ঋগ্বেদ ও অথর্ববেদের নানা স্থানে। মূল অর্থের গৌরব বৃদ্ধির প্রয়াসই এর উদ্দেশ্য। দেশে যখন তন্ত্রশাস্ত্রের এল জোয়ার, তখনই দেখা গেল সন্ধ্যা বা সন্ধাভাষার বহুল প্রচলন। যাতে সাধারণ মানুষের হাতে পড়ে বিকৃত না হয়, সেজন্যই এ-ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্য। দীক্ষিত সাধক ব্যতীত বিশেষ বিশেষ শব্দের অর্থোপলব্ধি সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়; এই কারণে প্রহেলিকাময় পারিভাষিক শব্দের অর্থ অদীক্ষিত সাধারণ জনসমাজের নিকট অবুদ্ধ। চর্যাপদে আছে বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সাধনার ইঙ্গিত। এই হেতু আলোচ্যপদে দুলি, পিটা, কুম্ভীর, বিআতী, সসুরা, কামরু, অধরাতী, কানেট ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।

অতঃপর আলোচিত পদের পদকর্তা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে বক্তব্যের উপসংহার করব।

কুকুরীপাদ বা কুকুরীপা ভণিতায় এ-পর্যন্ত তিনটি পদ পাওয়া গিয়াছে। পাদ বা পা কথাটি গৌরবসূচক ও পূজ্যবাচী, রামায়ণে (১।১।৩৪) 'রামপাদপ্রসাদক, পঞ্চতন্ত্রে 'দেবপাদ', 'স্বামীপাদ', উত্তররামচরিতে (১।১৯) 'তাতপাদ' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং আলোচ্য পদে পদকর্তা নিজের সম্বন্ধে সম্ভ্রমসূচক পাদ বা পা কথাটি ব্যবহার করতে পারেন না। এই হেতু মনে হয়, পদটি কুকুরীপাদের কোনো ভক্ত শিষ্যের রচনা। কুকুরীপাদ রচিত 'মহামায়া সাধন' নামে একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর চর্যাগীতি পদাবলীতে। তাতে নিম্নোক্ত বজ্রগীতিটি পাওয়া যায়,—

হলে সহি বিকসিঅ কমলু প্রবোহিউ বজ্জে।
অলল ললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চে॥

(ওগো সখি, বিকশিত কমলটি বজ্র বা শূন্যতা দ্বারা প্রবোধিত হোক; আর সেই পরম সৌন্দর্যময় পদ্মটি মহা-সুখহেতু নৃত্যধামে আরোহণ করুক)

কুকুরীপা, ভুসুকুপা, ঢেণ্ঢনপা ইত্যাদি ভণিতার মধ্যে সাধক হয়ত আত্মগোপন করে ছদ্মনাম ব্যবহার করেছেন। এই ছদ্মনাম ব্যবহারের পেছনে নিজের গৌরব প্রকাশের অনিচ্ছাই মুখ্য মনে হয়।

আর একটি পদ সম্বন্ধে এবারে আলোচনা করছি।

রাগ গবড়া
এক সে শুণ্ডিনী দুই ঘরে সান্ধঅ।
চীঅণ বাকলঅ বারুনী বান্ধঅ।

সহজে থির করি বারুনী বান্ধ।
জে অজরামর হোই দিঢ় কান্ধ॥
দশমি দুআরত চিহ্ন দেখইআ।
আইল গরাহক অপণে বহিআ॥
চউশঠী ঘড়িয়ে দেত পসারা।
পইঠেল গরাহক নাহি নিসারা॥
এক ঘড়ুলী সরুই নাল।
ভনন্তি বিরুআ থির করি চাল॥

চর্যাগীতির অন্তর্গত এই পদটি। পদ-কর্তার নাম বিরুআ। পদটি যে গান করা হত তারও পরিচয় রয়েছে গবড়া বা গউরা রাগ-উল্লেখে।

আলোচ্য পদে সহজাবস্থা লাভের ইঙ্গিত ও যৌগিক পদ্ধতির বর্ণনা রয়েছে মদচোলাই ও শুঁড়ির দোকানে মদ বিক্রয়ের রূপকের দ্বারা। পদটির রসাস্বাদন সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। অসম্ভব প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন পদটির অর্থ দেহযোগী ব্যতীত অনুধাবন করা শক্ত। আভ্যন্তরীণ অর্থ দেহযোগী আবিষ্কার না করলে বহিরর্থ দ্বারা পদের রসাস্বাদনে মনে অতৃপ্তি থেকে যায়, পক্ষান্তরে আভ্যন্তরীণ অর্থও যে সর্বদা কায়সাধনানুগ তাও জোর করে বলা যায় না। প্রকৃত কায়সাধন ব্যতীত এর অর্থনির্ণয় ও অর্থগ্রহণ উভয়তঃই দুঃসাধ্য।

পদটির বহিরর্থ এই—সেই এক শুঁড়িগিন্নি দুই ঘরে প্রবেশ করে, চিকণ বল্কলে বারুণীকে বন্ধন করে। সহজকে স্থির করে বারুণী এমনভাবে বন্ধন কর, যাতে অজরামর হয়ে দৃঢ়স্কন্ধ লাভ হয়। দশমী দ্বারে চিহ্ন দেখে গ্রাহক স্বয়ং পথ বেয়ে উপস্থিত হল। চৌষট্টি ঘড়ায় পসরা দেওয়া আছে; তাই দেখে সেখানে প্রবিষ্ট গ্রাহক আর নির্গত হল না। একমাত্র ছোট ঘড়া, আর তার নলও সরু, তাই দেখে বিরুআ বলেন, স্থির করে নলটি চালনা কর।

অন্তর্নিহিত অর্থে দেহযোগীর সহজানন্দ লাভের প্রণালী উল্লিখিত হয়েছে। সহজানন্দ-লাভ অত্যন্ত সংযমসাপেক্ষ ও আয়াসসাধ্য। সুকঠোর সংযমে সাধক একবার যদি সহজানন্দরসের আস্বাদ পান, তবে বস্তুজগৎ বা পার্থিব ভোগাসক্তির মধ্যে তিনি কখনও আর ফিরে আসেন না।

দেহযোগী সিদ্ধি লাভ করেন একমাত্র পরিশুদ্ধাবধূতিকার সাহায্যে। এই শক্তিকেই শুণ্ডিনী বলা হয়েছে। দেখা যায়, প্রায় সমস্ত শক্তির আধার নারীশক্তি। কালী, তারা, ষোড়শী প্রভৃতি দশমহাবিদ্যার প্রত্যেকেই নারীশক্তি। কেউ কেউ রাধাকেও তন্ত্রোক্ত শক্তিরূপে কল্পনা করেছেন। সমগ্র বিশ্বের চেতনরূপিণী প্রকৃতিও নারীশক্তি। দেহসাধক যে সহজানন্দ রস লাভ করেন তা নারীশক্তি শুণ্ডিনী অর্থাৎ অবধূতিকা শক্তির সাহায্যেই। দেহসাধনার মধ্যে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধনের ইঙ্গিত রয়েছে। এই সাধনায় ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না—এই ত্রিনাড়ীতত্ত্ব কখনও সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত, আবার কখনও রূপক উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে হেঁয়ালী ভাষায় বর্ণিত। মধ্যনাড়ী সুষুম্না বৌদ্ধতন্ত্রে অবধূতী বা আধুতিকা। ইনি কোথাও শুণ্ডিনী ডোম্বী—আবার কোথাও চণ্ডালী, নৈরামণি, সহজসুন্দরী অর্থেও গৃহীত। এঁরা সাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে; সুকঠোর সাধনায় এঁদের লাভ করতে হয়। সেজন্য এঁদের ডোমনী শবরী ইত্যাদি অস্পৃশ্যা রমণী রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

আলোচ্যপদে মধ্যনাড়ী সুষুম্না শুণ্ডিনী বা অবধূতিকারূপে উল্লিখিত। সেই শুণ্ডিনী শক্তি দুই ঘরে অর্থাৎ পার্শ্বস্থিত দ্বৈতজ্ঞানরূপ ইড়া পিঙ্গলার ঘরে প্রবেশ ক'রে অর্থাৎ পরিপন্থী উক্ত নাড়ীদ্বয়কে বশীভূত ও আত্মসাৎ ক'রে স্বস্থানে অধিষ্ঠিত আছেন। যোগীর দ্বৈতজ্ঞান অর্থাৎ সুখদুঃখ বোধ বিলুপ্ত না হলে তিনি অবধূতিকা বা সাধনাশক্তি লাভ করতে পারেন না। দুই ঘরের অর্থাৎ যোগপরিপন্থী সেই দ্বৈতবোধকে ধ্বংস ক'রে, অবধূতিকা শক্তি চিকন বাকলে অর্থাৎ অবিদ্যারহিত প্রভাস্বরশূন্যতারূপ বল্কল দ্বারা বারুণী বা সুখপ্রমোদ রূপী বোধিচিত্তকে বন্ধন করে। বারুণী মদ্যপানে যেমন সুখানুভূতি হয়, বোধিচিত্তকে লাভ করলেও দেহসাধক সেইরূপ অতীন্দ্রিয় সুখানুভব করেন। পাতলা কাপড় দিয়ে যেমন মদ চোলাই করতে হয়, তেমনই অবিদ্যারহিত শূন্যতারূপ সূক্ষ্ম আবরণে বোধিচিত্তকে বেঁধে রাখতে হয়। সুখে সুখানুভূতি ও দুঃখে দুঃখ বোধ না থাকলে হয় শূন্যতার উৎপত্তি। সুতরাং বোধিচিত্তকে বন্ধন করে আস্বাদন করতে হলে চাই চিকন বল্কল অর্থাৎ প্রভাস্বর শূন্যতা।

সহজানন্দকে স্থির করে বোধিচিত্তকে বন্ধন কর, যাতে অজরামর হয়ে দৃঢ়স্কন্ধ লাভ হয়। চঞ্চলচিত্তে বোধিলাভ

অসম্ভব ; সুতরাং ইন্দ্রিয়নিরোধে চিত্তকে অচিত্ততায় আনতে হয় সহজানন্দের সহায়তায়। চিত্ত নিঃস্বভাবীকৃত হলে জরা বা মৃত্যুর ভয় থাকেনা। প্রজ্ঞা ও উপায়ের মিলিতাবস্থাতে মহাসুখের উৎপত্তি ; সুখদুঃখাতীত মহাসুখের অবস্থাকে বলা হয় আনন্দময় অবস্থা। বোধিচিত্ত যখন মহাসুখচক্রে অবস্থান করে তখনই হয় মহানন্দ-লাভ। বৌদ্ধতন্ত্রে নির্মাণচক্র, ধর্মচক্র, সম্ভোগ চক্র, মহাসুখ চক্র—এই চারটি চক্রের কথা বলা হয়েছে। নাভিদেশে নির্মাণচক্রে বোধিচিত্তের প্রথম উদ্ভব ; তখন যে অনুভূতি, তা শুধু আনন্দ ; উর্দ্ধমুখী হয়ে বোধিচিত্তের ধর্মচক্র প্রবেশে হয় পরমানন্দ-লাভ ; তারপর সম্ভোগচক্রে ও মহাসুখচক্রে উপস্থিত হয়ে বোধিচিত্ত যথাক্রমে বিরমানন্দ ও সহজানন্দ লাভ করে। এই সহজানন্দ-লাভে ইন্দ্রিয়গুলি পড়ে ঘুমিয়ে, মন অন্তর্মুখী হয়, সমস্ত জাগতিক চেষ্টা হয় বিলুপ্ত, আর দেহ তখনই মহাসুখে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। আলোচ্য পদে তাই সাধক বলছেন, সহজানন্দকে দেহে স্থায়িভাবে অবস্থান করিয়ে বোধিচিত্তকে চিরকালের জন্য আবদ্ধ কর ; এতে দেহ দৃঢ় হয়ে অজর ও অমর হয়ে থাকবে।

সেকালে শুঁড়ির দোকানের চিহ্ন ছিল শ্বেত পতাকা। কোথাও ঐ চিহ্ন দেখলেই গ্রাহক বুঝতে পেরে এবং কাকেও জিজ্ঞাসা না করে নিজেই দোকানের ভিতর চলে যেত ; সেই রূপ দশমী দ্বার অর্থাৎ নির্বাণলাভের পথ বৈরচন দ্বারে মহাসুখরসের সন্ধান পেয়ে গ্রাহক অর্থাৎ প্রসুপ্ত বোধিচিত্ত স্বয়ং এসে উপস্থিত হয়। দেহামৃত মহাসুখরস সহস্রার কমলে অবস্থান করে শীর্ষস্থানে এবং সেখান থেকে শঙ্খিনী নামে সরু বক্র নলের সাহায্যে নিম্নগামী হয়। যোগসাধনায় শঙ্খিনীর এই মুখকে দশমীদ্বার বলা হয়েছে। ইন্দ্রিয়নিরোধপূর্বক যোগসাধনায় দেহমধ্যস্থিত দশমদ্বার অর্থাৎ শঙ্খিনীর মুখ বন্ধ করে মহাসুখরসকে রক্ষা করতে হয়। বোধিচিত্ত অবিদ্যাবশে প্রসুপ্ত থাকে ; কিন্তু অবিদ্যানাশে জাগ্রত হয়ে সে যদি মহাসুখরস বা সহজানন্দরসের সন্ধান পায় তবে আপনিই এসে সেখানে উপস্থিত হয় ; তখন চিত্তে আর বস্তুজগতের জ্ঞান থাকেনা, সহজানন্দরসে বিভোর হয়ে পড়ে।

চৌষট্টি ঘড়ায় অর্থাৎ দেহভাণ্ডের মধ্যে সর্বত্র মহাসুখরস ছড়িয়ে আছে ; অথবা দেহমধ্যে এরূপভাবে মহাসুখরস সঞ্চালিত হয়েছে যে ৬৪ দণ্ড বা দিবারাত্র ধরে সেই রস আস্বাদনহেতু দেহমধ্যে প্রবিষ্ট গ্রাহক বা বোধিচিত্ত আর সেখান থেকে নির্গত হলনা। মহাসুখরসাস্বাদনে বিভোর বোধিচিত্ত আর বস্তুজগতে বা পার্থিবভোগাসক্তির মধ্যে পুনরাগমন করল না। একবার মহাসুখামৃত পান করলে বস্তুজগতের প্রতি আকর্ষণ চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়।

মদ চোলাই করার একটিমাত্র ঘড়া, আর তার নলও সরু ; সুতরাং সাবধান হয়ে মদ চোলাই করতে না পারলে জিনিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে ; সেইরূপ একমাত্র অবধূতিকা সংবৃত্তিসত্য ও পরমার্থসত্যকে সংঘটন করে বলে তাকে ঘটী বা ঘড়ুলী বলা হয়েছে, আর সেই অবধূতিকার গ্রাহ্য-গ্রাহক ভাব ও পার্থিব ভোগ স্ফীতি একেবারেই নেই বলে তার নলও সূক্ষ্ম। অবধূতিকার এই সূক্ষ্ম পথেই বোধিচিত্তকে স্থিরভাবে চালনা করতে হবে—এই কথা সিদ্ধাচার্য বিরুআ বলছেন। অবধূতিকার পথই সুষুম্না নাড়ীর পথ, আর সে পথ অতি সংকীর্ণ ; পথের দু-পাশে যোগপরিপন্থী ইড়া ও পিঙ্গলা অথবা গ্রাহ্য ও গ্রাহক দুই আভাসদ্বয় বা দ্বৈতজ্ঞান বর্তমান। ইড়া-পিঙ্গলা সর্বদাই অবধূতিকাকে গ্রাস বা স্বস্থানচ্যুত করার চেষ্টা করে ; অবধূতিকা কবলিত হলেই সাধক আবার বস্তুজগতের মধ্যে ফিরে আসেন, আর তখনই তাঁর সাধনা হয়ে যায় ব্যর্থ। সেই জন্য সিদ্ধাচার্য বলছেন যে অবধূতিকার সেই সূক্ষ্ম পথে বোধিচিত্তকে চালনা করতে হবে যোগীকে সংযমসাধনায় বস্তুজগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে।

মদচোলাই ও শুঁড়ির দোকানে মদবিক্রয়ের বর্ণনায় রূপকের দ্বারা সহজানন্দরস প্রাপ্তির অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় হেঁয়ালির মাধ্যমে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে ধর্মদাসের ধর্মমঙ্গলে ;—

পশ্চিমোদয় দিতে গেছে পাত্রের ভাগিনা
সেই হইতে ময়নানগরে মদ মানা।
বৎসর অবধি হইল নাই সাদ্ধা বাদ্ধা
জত কিছু রূপা সোনা সব গেল বাঁধা।
আপনার বৃত্তি রাখি পরবৃত্তি করি
অবশেষে হৈল ধন গেল ঘরগাড়ি।

(দ্রষ্টব্য শ্রীসুকুমার সেন—চর্যাগীতিপদাবলী, পৃষ্ঠা ১২৮)

অতঃপর পদকর্তা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হল।

আলোচিত চর্যার পদকর্তার নাম বিরুআ। এঁর লিখিত একটিমাত্র চর্যা পাওয়া যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, ভণিতায় ক্রিয়াপদটি রয়েছে বহুবচনে। গৌরবার্থে বহুবচনের প্রয়োগ দেখা যায় প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনেক স্থানে। যেমন—

বড়াই কহন্তি কথা বসি তার মাঝে।
গোপী সে নিঃশ্বাস ছাড়ে বোলন্তি বিষাদে।

(দ্রষ্টব্য মৎসম্পাদিত 'গোপাল বিজয়' পৃষ্ঠা ১৪৯, ১৫৭) 'বড়াই কহন্তি' বা 'গোপী সে বোলন্তি' লিখেছেন কবি; এখানে তিনি বড়াই বা গোপীর গৌরবার্থ ক্রিয়াপদের বহুবচন ব্যবহার করতে পারেন; কিন্তু আলোচিত চর্যাপদে 'ভবন্তি বিরুআ' থাকায় নিশ্চিত মনে করা যেতে পারে যে পদটি সিদ্ধাচার্য বিরুআর গুণমুগ্ধ কোনো শিষ্যের রচনা; কারণ নিজের গৌরব প্রকাশ নিজে কেউ করেনা।

তিব্বতী অনুবাদে 'কর্মচণ্ডালিকা নাম গীতি, দোহা-কোষ এবং বিরূপ-পদচতুরশীতি নামে বিরুআর তিনখানি রচনা পাওয়া যায়। তারানাথ বলেছেন—'বিরুআ ছিলেন কাহ্নপার নামান্তর; কাহ্নভণিতার এক চর্যায় তার প্রমাণ মেলে—,

কেহো কেহো তোহোরে বিরুআ বোলই।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী'তে বিরুআকে বলেছেন কাহ্নপার গুরু। নবম শতকের শেষার্ধে তাঁর আবির্ভাব—তাই রাহুলজীর ধারণা। সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। সুতরাং নবম শতকের শেষার্ধে বিরুআর আবির্ভাবকাল নির্ণয়ে মতদ্বৈধ থাকা সঙ্গত নয়।

জীবন নদীর কূলে কূলে

শ্রীশক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

জীবন নদীর কূলে কূলে
ভাঙা গড়ার খেল
খেলেছি তাই আপন মনে
সকাল সন্ধ্যা বেলা
সত্যিকারের হৃদয় নিয়ে
চেনা মুখের আলো
একদিন সে দীপ্তিটুকু
বেসেছিলাম ভালো।
ছায়ায় ঘেরা তীরে তীরে
সেদিন মনোবনে
শান্ত চোখের দৃষ্টি পথে
পড়তো ক্ষণে ক্ষণে।
কতো হৃদয় দীপের শিখা
নিভলো প্রতিকূলে
কতো হৃদয় দেবতা হীন
পূজার বাসি ফুলে।
জীবন নদীর কূলে কূলে
স্মৃতির ভাঙা ঘাটে।
আসে না কেউ তরী বেয়ে
বেচা কেনার হাটে।
অনেক ভালোবাসার আলো
আজও তবু জ্বলছে
শেষ হতে হায় হল না শেষ
হৃদয় যেন বলছে।
ভালোবাসার দোহাই দিয়ে
সকল দেনা পাওনা
মিটিয়ে ফেলা কঠিন বটে
যতো দূরেই যাওনা।

অসুরের দেশে সুসেন বংশ

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আদিযুগে পূর্ব্বসমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর যখন হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সেই সময়ে একটি সংকীর্ণ পয়ঃপ্রণালীর ব্যবধানে দুইটি পাশাপাশি দ্বীপ ছিল। ঐ দ্বীপ দুইটির উত্তর-পূর্ব্বে ছিল পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্ত (দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব অংশ ও সমগ্র রংপুর জেলা)। আর পশ্চিমে ছিল পশ্চিম-আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত বীরদেশ বা বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণা। পূর্ব্বপার্শ্বের দ্বীপটি গোপালক ও মাহিষীপালকগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় উহার নাম হয় গৌড়। পরে ঐ দ্বীপে মুনিঋষিগণ আগমন করিয়া একটি বিস্তীর্ণ জলাভূমির পাহাড়ীর উপর পীঠস্থান স্থাপন করিয়া ঐ পীঠস্থানের নাম দেন দেবী পাটলা (পাতাল চণ্ডী)। চন্দ্রবংশীয় নহুষের পুত্রের নাম ছিল যযাতি। রাজার অভিশাপে তাঁহার একপুত্র তুর্ব্বসু বৃষলত্বপ্রাপ্ত হন এবং সুহ্ম বা যবন নামে অভিহিত হইয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ দ্বীপটিতে আসিয়া বসবাস করেন। কাজেই ঐ দ্বীপটির নাম হয় সুহ্ম। পরে চণ্ড (চাঁড়াল) ও মুণ্ড (মুণ্ডা) প্রভৃতি অনার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত জাতিবর্গও তাঁহার সহিত যোগদান করে। তুর্ব্বসুর বংশধরগণের নামও হয় সুহ্ম।

কিছুদিন পরে মহিষীপালকগণের সহিত পাতাল-চণ্ডী নিবাসী মুনিঋষিগণের সংঘর্ষ বাধে। তাহার ফলে রাজশক্তি আহূত হইয়া মহিষীপালকগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইহাই হইল মহিষাসুর-বধ, আর ঐ পাতাল-চণ্ডী হইলেন শ্রীশ্রীচণ্ডী এবং রাজশক্তি হইলেন দেবতাগণের শক্তি।

পুনরায় কিছুদিন পরে নিসুহ্ম (গোপালক, যাঁহারা যবন নহেন) ও সুহ্মবাসী সুহ্মগণের (যবনগণের) সহিত মুনিঋষিদের পুনরায় সংঘর্ষ বাধে। অনার্য্য গোষ্ঠীবর্গও সুহ্ম-নিসুহ্মগণের সহিত যোগদান করে। রাজশক্তি পুনরায় আহূত হইয়া মুনিঋষিদের বিপক্ষ শক্তিকে পরাজিত করেন। ইহাই হইল চণ্ড-মুণ্ড-বধ ও সুহ্ম-নিসুহ্ম-বধ। কাজেই আদি গৌড়কে অসুরের দেশ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

যযাতি রাজার অপর পুত্র পুরু প্রথমে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। পরে যযাতি রাজার অপর পুত্র যদু কর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হইয়া পুত্র জন্মেজয় সহ পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তে আসিয়া ঐ প্রদেশের পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত নাগবংশীয় রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তে দৈত্যরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আর যদু পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধারপূর্ব্বক পশ্চিম-আর্য্যাবর্ত্তে দেবরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ছিলেন ঐ পুরুরাজার অধস্তন উনবিংশ পুরুষ। বিশ্বকোষ "চন্দ্রবংশ" শব্দের বংশ-তালিকা মধ্যে হিরণ্যকশিপুর স্থানে উষদ্রথ, হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদের স্থানে ফেন, প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচনের স্থানে সুতপা এবং সুতপার পরবর্ত্তী পুরুষের নাম বলি লিখিত আছে। আবার বিশ্বকোষ বলি শব্দ মধ্যে লিখিত আছে যে প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন হইতে বলির জন্ম হয়। এই বলির একশত পুত্র হয়, তন্মধ্যে বাণরাজা শ্রেষ্ঠ এবং এই বলিকে দমন করার জন্য ভগবান্ বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। আবার জীবনীকোষ, প্রথম খণ্ডের ৮৯৩ পৃষ্ঠায় বলি প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, বিরোচনের পুত্র বলির দৌহিত্রী বজ্রজালাকে রাবণ-অনুজ কুম্ভকর্ণ বিবাহ করিয়াছিলেন। ইহা রামায়ণের উক্তি।

এক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে যে কুরুবংশীয় দৈত্যরাজগণের সহিত যযাতি বংশীয় অপর কোন শাখাসম্ভূত বাণরাজার পিতা বলির সঙ্গে একটা ভয়ানক জট্ পাকিয়া রহিয়াছে। কেননা বাণরাজার পিতা বলির আবির্ভাব ঘটিয়াছিল মহা-ভারতের যুগে। এই বাণরাজার কন্যা অর্থাৎ বাণরাজার পিতা বলির পৌত্রী উষা নিজ সহচরী চিত্রলেখার সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে মানসপতিরূপে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। হিরণ্যকশিপু এবং তৎপুত্র প্রহ্লাদের

আবির্ভাব ঘটিয়াছিল নৃসিংহ অবতার কালে। প্রহ্লাদের পৌত্র বলিরাজার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বামন অবতারে এবং এই বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত রামায়ণের যুগে কুম্ভকর্ণের বিবাহ হইয়াছিল। সুতরাং বাণদুহিতা উষা এবং দৈত্যপতি বলি-দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার মধ্যে বহু বর্ষ ব্যবধান রহিয়াছে। আবার দৈত্যপতি বলি অপুত্রক ছিলেন, পরে দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে তাঁহার পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। আর বাণরাজার পিতা বলি একশত পুত্রের পিতা ছিলেন। এক্ষেত্রে দৈত্যবংশীয় হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ, বিরোচন এবং বলির সঙ্গে বাণরাজার পিতা বলির কোনই সম্বন্ধ নাই।

হিরণ্যকশিপুর প্রপৌত্র মহারাজা বলির রাজত্বকালে বঙ্গোপসাগরের মধ্যে আরও কয়েকটি দ্বীপের উদ্ভব হয় এবং হিমালয়প্রদেশের পাদদেশে তীরহূত নামে একটি দ্বীপ বা উপদ্বীপের সৃষ্টি হয়; তাহাই বর্ত্তমান মিথিলা বা দ্বারভাঙ্গা। যতদূর সম্ভব মিথিলার উত্তরে (নেপাল) ছিল রাক্ষস রাজ্য। রামায়ণের যুগে দৈত্যপতি বলিরাজার সখা জম্ভের পুত্র সুনন্দ (তাড়কার স্বামী ও মারীচের পিতা) ছিলেন রাক্ষস রাজ্যের রাজা। রাক্ষস রাজ্যের পূর্ব্বে ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশ ও কামাখ্যা (কাম্যক বন); ইহা গুহ্যলোক নামে খ্যাত ছিল। গুহ্যলোকের পূর্ব্বে ছিল গন্ধর্ব্বরাজ্য এবং গন্ধর্ব্বরাজ্যের পূর্ব্বে চীন-সমুদ্রের উপকূলভাগ বিদ্যাধর দেশ (কিন্নর দেশ) নামে খ্যাত ছিল। পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বে অপর একটি উপদ্বীপ ছিল। ঐ উপদ্বীপটিতেও নাগবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। রাজা জন্মেজয়ের নাগযজ্ঞ সম্পন্ন (নাগবংশীয়-গণ রাজা জন্মেজয় কর্ত্তৃক বিতাড়িত) হইলে পর পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের নাগবংশীয়গণও পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপার্শ্বস্থ নাগরাজ্যে যাইয়া নাগবংশীয়গণের শক্তি বৃদ্ধি করেন। এই নাগরাজ্যটিই বর্ত্তমান আসাম। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে মহাবাহু বভ্রুবাহন এই নাগরাজ্যের রাজা ছিলেন। মহাভারতের যুগে প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশের রাজা ছিলেন পৌণ্ড্র বাসুদেব এবং ঐ প্রদেশ পুণ্ড্রদেশ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। ইহা তৃতীয় পুণ্ড্র, দ্বিতীয় পুণ্ড্র হইতেছে বর্ত্তমান বাঁকুড়া জেলা আর আদিপুণ্ড্র হইতেছে বর্ত্তমান মালদহ জেলার অন্তর্গত উত্তর বরেন্দ্রভূমি। মহাভারতের যুগে চিত্ররথ-বংশীয়গণ গন্ধর্ব্বরাজ্য শাসন করিতেন।

বলিরাজা যখন বামনরূপী মহাযোগীর আদেশে ও নির্দ্দেশে গৌড়ের পাতালচণ্ডী পীঠস্থানের মুনিঋষিগণের আশ্রয় লন, তখন তাঁহার গুরু ও প্রধানমন্ত্রী শুক্রাচার্য্য গৌড়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বস্থ একটি ক্ষুদ্র দ্বীপকে আশ্রয় করেন। ফলে ঐ দ্বীপটির নাম হয় শুক্রবাড়ী-চৌডলা। বলিরাজার ক্ষেত্রজ পাঁচজন পুত্র অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম প্রত্যেকে পূর্ব্বোক্ত নব উদ্ভূত এক একটি দ্বীপ অধিকার করিয়া নিজ নিজ নামে নামকরণ করেন। কনিষ্ঠ সুহ্ম পূর্ব্বোক্ত সুহ্ম দ্বীপকেই অধিকার করিলে ঐ দ্বীপবাসী তুর্ব্বস্থ বংশীয় সুহ্ম (যবন) গণ প্রসুহ্ম নামে পরিচিত হয় আর বলিরাজপুত্র সুহ্মের বংশধরগণ সুহ্ম নামে অভিহিত হয়। আর ইক্ষাকু রাজার পুত্রও শুক্রাচার্য্যের প্রিয়শিষ্য দণ্ড পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের অন্তর্গত বর্ত্তমান বিহার প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। তাহাই পরবর্ত্তীকালে দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হইয়াছিল। ঐ প্রসঙ্গে ইহাও বলা যায় যে ইক্ষাকুরাজার জ্যেষ্ঠ তিন পুত্র—বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ড পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যস্থলকে তিনভাগে ভাগ করিয়া তিনজনে নিজ নিজ রাজ্যস্থাপন করেন। আর বাকী ৯৭ জন পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে ঐ তিন রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেন।

মহাভারতের যুগে অঙ্গ, পুণ্ড্র, সুহ্ম, গৌড় ও মিথিলা ক্রমশঃ নদনদীর ব্যবধানে পরস্পর মিলিত হইয়া পূর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের সহিত যুক্ত হয় এবং গঙ্গাকে ব্যবধান রাখিয়া ঐ সমগ্রপ্রদেশ পশ্চিম-আর্য্যাবর্ত্তের সহিতও যুক্ত হয়। কিন্তু আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) উত্তরবঙ্গ হইতে সমুদ্রশাখা কর্ত্তৃক বিচ্ছিন্নই থাকে। আর কলিঙ্গ প্রদেশ (বর্ত্তমান মেদিনীপুর) আনুমানিক মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত পশ্চিম-আর্য্যাবর্ত্তের সহিত বিচ্ছিন্নই থাকে। অপর দিকে বীরদেশ সহ দামোদর প্রদেশ (বর্ত্তমান বাঁকুড়া ও তৎসহ দামোদর নদের উভয় পার্শ্বস্থতীরভূমি) আদি যুগ হইতেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। অনুমান, মহাভারতীয় যুগের পরে উৎকল ও কলিঙ্গ দেশ একত্রযোগে পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের বর্দ্ধিত অংশের সহিত যুক্ত হয়। আর বগড়ীভূমির উদ্ভব হইয়াছিল গৌড়ের সেন-রাজাদের

সমসাময়িক কালে বা পালরাজগণের রাজত্বের শেষ দিকে।

পুরুবংশীয় রাজগণের মধ্যে নিজনিজ প্রদেশে কোন্ বংশ কতদিন রাজত্ব করিয়াছেন, তাহার সঠিক সন্ধান না পাওয়া গেলেও অঙ্গবংশের সঠিক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, বলিপুত্র অঙ্গের ষষ্ঠপুরুষে জন্মলাভ করেন, শ্রীরামচন্দ্রের পিতৃবন্ধু লোমপাদ দশরথ। লোমপাদ দশরথের প্রপৌত্রের নাম চম্প। ইনি বর্ত্তমান পূর্ণিয়া সহরের সন্নিকটে চম্পানগরী স্থাপন করেন, তাহাই দাতা কর্ণের রাজধানী। চম্পের প্রপৌত্র-পুত্রের নাম ছিল বৃহন্নলা, বৃহন্নলার পুত্রের নাম ছিল বিজয়, আর বিজয়ের প্রপৌত্র-পুত্রের নাম ছিল অধিরথ। ইনি সূতবৃত্তি অবলম্বন জন্ম ক্ষত্রিয় সমাজে নিন্দিত হইয়াছিলেন। তৎপরে দাতা কর্ণ অঙ্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন।

দাতা কর্ণ যে সময়ে অঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন, সেই সময়ে বিরাট রাজা পুণ্ড্র, গৌড় ও সুহ্মের অর্থাৎ দ্বিতীয় মৎস্যদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। অনুমান, সুহ্মবংশীয় রাজগণ বহু পূর্ব্বেই সূর্য্যবংশাধীন সগর বংশীয় 'ভগীরথ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন।' তৎপরে পুণ্ড্র বংশীয় রাজগণ ও ভগীরথ কিম্বা তাঁহার কোনবংশধর কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন। বিরাট রাজাও হয়ত ভগীরথের কোন আত্মীয় পুরুষ ছিলেন এবং তিনি হয়ত যদুবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। কেননা সগর রাজার মাতা যাদবী ছিলেন যদুবংশীয়া, ঐ প্রসঙ্গেই অনুমিত হয় যে মহাভারতীয় যুগ পর্য্যন্ত কলিঙ্গ দেশে কলিঙ্গ বংশীয় ও বঙ্গে বঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয়গণই নিজ নিজ প্রদেশ শাসন করিতেন। পরে কলিঙ্গ-দ্বীপ পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্তের সহিত যুক্ত হইলে বীরদেশের বীরবংশীয়গণ ঐ প্রদেশে অধিপত্য বিস্তার করিয়া নিজেদেরকে বীরাৎ নাম অভিহিত করেন। আর বর্ম্ম ও চট্টল দ্বীপ বঙ্গের সহিত পরস্পর যুক্ত হইলে বঙ্গে বর্ম্ম এবং খড়্গ বংশের আবির্ভাব ঘটে। তৎপরে ব্রহ্মক্ষত্রিয় (কায়স্থ) বৃষকেতুর প্রভাবে তাঁহাদের ক্ষত্রিয় প্রভাব খর্ব্ব হয় এবং তাঁহারাও কালক্রমে কায়স্থ আখ্যা লাভ করেন। মুসলমান আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালাদেশে কায়স্থ প্রভাবই বিস্তৃত ছিল। আর মুসলমান আগমনের বহুদিন পর পর্য্যন্ত বঙ্গ ও কলিঙ্গ প্রদেশে কায়স্থ প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল।

কলিঙ্গ প্রসঙ্গে আরও কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আদিতে পশ্চিম-আর্য্যাবর্ত্তের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূল অর্থাৎ বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগণার উত্তর সীমান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটনাগপুরের শৈলমালা পর্য্যন্ত নিবিড় বনে আচ্ছাদিত ছিল এবং মাঝে মধ্যেই ঐপ্রদেশে দাবানল প্রজ্বলিত হইত। তজ্জন্য ঐ প্রদেশ বীরদেশ নামে অভিহিত হয়। কেননা 'বী' শব্দের অর্থ প্রজনন। আর 'র' বর্ণের অর্থ এস্থানে পাবক। অর্থাৎ যে প্রদেশে পাবকের প্রজনন কার্য্য সংঘটিত হয়, তাহাই বীরদেশ।

ঐ বঙ্গ বিভাগের রাজগণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে সমুদ্রোপকূলে রাজত্ব করার দরুণ তাঁহারা অপরাজেয় রাজা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। অনুমান, সেই হেতু তাঁহারা বীর রাজা নামে অভিহিত হন। এমন কি পরশুরামও তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয়। কেননা তিনি কশ্যপমুনি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ক্ষত্রিয় নিধন কার্য্য ত্যাগ পূর্ব্বক ঐ প্রদেশের রাজাদের আশ্রয় লাভ করেন। পরে শ্রীরামচন্দ্রের বীরত্বদর্শনে পুনরায় উত্তেজিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মিথিলা হইতে অযোধ্যায় ফিরিবার পথে তাঁহার গতিরোধ করেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গিয়া কোঙ্কন প্রদেশ (বর্ত্তমান কেরোল) জয় করতঃ সেইখানেই শেষ জীবন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন।

ঐ বীররাজগণ ক্রমশঃ রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করিতে থাকেন। অনুমান, এমন সময়ে কলিঙ্গদেশের কলিঙ্গবংশীয় রাজগণ হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন এবং তৎসহ কলিঙ্গ দ্বীপ পশ্চিম-আর্য্যাবর্ত্তের সহিত যুক্ত হইয়া যায়, তখন ঐ বীর রাজগণ ঐ প্রদেশ জয় করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন এবং বীরবংশোদ্ভব বলিয়া নিজেদেরকে হয়ত বীরাৎ নামে অভিহিত করেন। ঐ বীরাৎশব্দই কালক্রমে বিরাট নামে পরিচিত হইয়াছে। ঐ কলিঙ্গ প্রদেশ মহাভারতীয় যুগের পরে মৎস্য নামে অভিহিত হইয়াছিল এবং ইহা তৃতীয় মৎস্য। আর আদি মৎস্য বর্ত্তমান সৌরাষ্ট্র প্রদেশ, ইহা মনুপ্রোক্ত মৎস্য।

এস্থানে পরশুরাম সম্বন্ধে একটু আরও আলোচনা করা প্রয়োজন, নচেৎ পাঠকমনে কৌতূহল জাগিতে পারে। সোম বংশাধীন (চন্দ্রবংশীয়) পুরুরবা বংশীয় রাজা

সুহোত্রের পত্নী ঐক্ষাকী অজমীঢ়, সুমীঢ় ও পুরুমীঢ় নামে তিন পুত্র প্রসব করেন। অজমীঢ়ের দ্বিতীয় পত্নী কৌশলীর গর্ভে জহ্নুর জন্ম লাভ ঘটে। এই জহ্নুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তামস মনুর অর্থাৎ ৪র্থ মনুর সময়ে ঐ সময়ে ইনি সপ্তর্ষি মধ্যে গৃহীত হইয়াছিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। আর তাহার কিছু পরেই পূর্ব্বোক্ত চন্দ্রবংশের প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে। রাজা ভগীরথ ছিলেন সূর্য্যের অধস্তন পঞ্চচত্বারিংশ (৪৫) পুরুষ। সুতরাং যে জহ্নু রাজা ভগীরথের সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনি ঐ জহ্নু হইতে স্বতন্ত্র। অনুমান, রাজা ভগীরথের সমসাময়িক জহ্নু ছিলেন অপর একজন ঋষি। রামায়ণের আদি পর্ব্বের ৪৩ শ্লোকে তিনি কেবল "মুনি" আখ্যা লাভ করিয়াছেন। কোন কোন পুরাণ দুই জহ্নুতে জট্ পাকাইয়া সূর্য্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা সূর্য্যের সমসাময়িক আদি জহ্নুকে বিভিন্নভাবে সূর্য্যের অধস্তন পঞ্চচত্বারিংশ পুরুষ ভগীরথের সময়েও টানিয়া আনিয়াছেন।

অনুমান, রাজা ভগীরথের সমসাময়িক জহ্নুমুনি দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তৎকালীন অবহেলিত প্রদেশে সুহ্মদ্বীপে (যবন রাজ্যে) বসবাস জন্য তাঁহার বংশ পরিচয় ঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই। মালদহ জেলায় কালিয়াচক থানার অন্তর্গত "জাহ্নির ঘাটা" এখনও তাঁহার নামের সহিত জড়িত থাকিয়া তাঁহার স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সপ্তর্ষি আদিজহ্নু ছিলেন ঋগ্বেদোক্ত জহ্নু এবং ইহার বংশধারা এইরূপ :—সুহোত্রের পুত্র অজমীঢ়, অজমীঢ়ের পুত্র জহ্নু, জহ্নুর পুত্রের নাম ছিল বলাকাশ্ব, এবং বলাকাশ্বের পুত্রের নাম ছিল কুশিক। ইহারাই বংশধরগণ কৌশিক গোত্রীয়, এই কুশিকের পুত্রই কনৌজাধিপতি গাধি। গাধির পুত্র ঋষি বিশ্বামিত্র এবং কন্যা সত্যবতী। এই গাধিপুত্র বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্র রাজার বা তৎপিতা ত্রিশঙ্কুরাজার সময়ের বিশ্বামিত্র হইতে স্বতন্ত্র।

সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ ছিলেন পরমেশ্বর, পরমেশ্বরের প্রপৌত্র-পুত্রের নাম ছিল সূর্য্য। ইনিই সূর্য্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। সূর্য্যের পুত্রের নাম ছিল বৈবস্বত মনু। ইনি ছিলেন সপ্তম মনু। এই সপ্তম মনুর পূর্ব্ববর্ত্তী চাক্ষুষ মনুর সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি ছিলেন সপ্তর্ষির মধ্যে গণ্য। কাজেই ইনি দেবর্ষি ছিলেন, এবং ইহার পিতা গাধি ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব। তাহা ছাড়াও ইহার ভগ্নীপতি ঋচীক তপঃ প্রভাবে এবং সত্যবতীর ভুলে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর ইহার জন্মগত ক্ষত্রিয় প্রভাব সত্যবতীর পুত্র জমদগ্নিতে অর্পিত হইয়াছিল। কাজেই ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য ইহাকে কঠোর তপস্যা করিতে হয় নাই। ইনি ঋগ্বেদোক্ত বিশ্বামিত্র। ইনি ছিলেন বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ সহোদর উতথ্য ঋষির স্ত্রী মমতার গর্ভজাত বৃহস্পতি ঋষির পুত্র ভরদ্বাজ এবং উক্ত গর্ভে উতথ্য ঋষির নিজ ঔরসজাত পুত্র দীর্ঘতমা ঋষির পুত্র গৌতম ঋষির সমসাময়িক। এই দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসেই পূর্ব্বোক্ত দৈত্যপতি বলিরাজার পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মের জন্মলাভ ঘটে। এই সময়ে ঋচীক মুনির অপর পুত্র শুক্রাচার্য্য দৈত্যকুলের গুরু ছিলেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের পিতা ত্রিশঙ্কুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল বৈবস্বত মনুর অধস্তন ত্রিংশ পুরুষে। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রোপাখ্যানোক্ত বিশ্বামিত্র দেবর্ষি বিশ্বামিত্র হইতে স্বতন্ত্র এবং ইনি ত্রিশঙ্কুযাজী নামে পরিচিত ছিলেন। কাজেই ইহারও জন্মলাভ ব্রাহ্মণ কুলেই হইয়াছিল। ইনি দ্বিতীয় বিশ্বামিত্র।

তৃতীয় বিশ্বামিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সূর্য্যবংশীয় সৌদাস বা কল্মাষপাদের পিতা সুদাসের সময়ে। সুদাস ছিলেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের অধস্তন উনবিংশ পুরুষ। ইহার সঙ্গেই সুদাসের পুরোহিত বশিষ্ঠের কলহ হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত কঠোর তপঃপ্রভাবে ইনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মর্ষি আখ্যা লাভ করেন। ইনিই প্রকৃত পক্ষে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব ছিলেন।

৪র্থ বিশ্বামিত্রের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথের সময়ে। রাজা দশরথ ছিলেন পূর্ব্বোক্ত সুদাসের অধস্তন একাদশ পুরুষ। এই বিশ্বামিত্রের আশ্রম যতদূরসম্ভব বাঙ্গলা দেশের উত্তর সীমান্তে হিমালয় পাদদেশে প্রাগ্‌জ্যোতিষ প্রদেশের সন্নিহিত কোন স্থানে ছিল। তজ্জন্যই তাড়কাবধ জন্য শ্রীরামচন্দ্রকে ঐ প্রদেশে আনিয়া তাঁহার দ্বারা তাড়কারাণী বধ, গৌতমজায়া অহল্যা উদ্ধার ও মিথিলার (দ্বারভাঙ্গার) রাজবাড়ীতে হরধনুর

ভগ্নসাধন করিয়া সীতাদেবীর বিবাহকার্য্য সম্পাদন করান।

পূর্ব্বোক্ত বৈবস্বত মনু হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরামচন্দ্র পর্য্যন্ত ঐ বংশীয় বাষট্টিজন রাজা ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছেন। অথচ পুরাণকারগণ উক্ত সময়ের বিভিন্ন বিশ্বামিত্রকে এক করিয়া দিয়াছেন। তৎকালীন ঐ বাষট্টি জন রাজার কাল ন্যূনপক্ষে দুই-তিন হাজার বর্ষের কম নহে।

এখন পরশুরাম প্রসঙ্গে আসা যাক। ভৃগুমুনির পুত্র ঋচীকের সহিত গাধিকন্যা সত্যবতীর বিবাহ হয়। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়। তিনি প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করেন। রেণুকার গর্ভে মহাবীর পরশুরামের জন্ম হয়। ইনি জমদগ্নির পঞ্চমপুত্র এবং ইনি পিতৃ আজ্ঞা পালনজন্য পিতৃগুণের (ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমধর্ম্মাচারী) অধিকারী হইয়াছিলেন। পরশুরামের জন্মস্থান ছিল, বেনার বোলার অন্তর্গত ভুর্ত্তী পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী ভার্গবপুরে (বর্ত্তমান নাম খয়েরাগড়)। কিন্তু তাঁহার পিতা জামদগ্নি ঋষির আশ্রম মিথিলার পার্শ্বেই কোন স্থানে ছিল। যযাতিরাজপুত্র যদুরপুত্র হৈহৈরাজ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন (ইহার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান জব্বলপুরে) ঋষি জমদগ্নি ও তৎপুত্র পরশুরামের বীরত্ব দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া নিজপুত্রগণ সহ পিতাপুত্রের অনুপস্থিতি সময়ে তাঁহাদের আশ্রম হইতে গোবৎসাদি হরণ করিয়া লইয়া যান। পরশুরাম উক্ত সংবাদ জ্ঞাত হইয়া মাঝ পথে যাইয়া তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজ গোবৎসাদি পুনরায় ফিরাইয়া আনেন। পরে তাঁহার অনুপস্থিতি কালে হৈহৈ রাজপুত্রগণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জমদগ্নি ঋষিকে হত্যা করিয়া পলায়ন করেন। এখন হইতেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেন। আর ক্ষত্রিয়াণীগণ নিজ নিজ শিশুকুমারগণকে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য বা অনার্য্য সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারবর্গের আশ্রয়ে স্থাপন করেন। ক্ষত্রিয়নিধন জন্য সামাজিক এবং রাজনৈতিক ব্যভিচারে দেশ কলঙ্কিত হইতে থাকে। তখন কশ্যপ মুনির অনুরোধে পরশুরাম উক্ত কার্য্যে নিবৃত্ত হইয়া বীরপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। আর কশ্যপ মুনি ঐ সব পরাশ্রিত কুমারগণকে আনিয়া নিজ নিজ পিতৃসিংহাসনে উপবেশন করান।

ইতি পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের নিকট পরাজিত হইয়া কোঙ্কন প্রদেশে যাইয়া রাজ্য স্থাপন করেন। পরবর্ত্তী কালে হৈ হৈ রাজবংশের একটি শাখা পরশুরামের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে পরাজিত করিয়া কেরোল প্রদেশ জয় করেন এবং ত্রৈকুটে রাজধানী স্থাপন করেন।

যযাতিপুত্র তুর্ব্বসুর বংশধরগণ সুহ্ম (যবন) নামীয় অসুর এবং পুরুর বংশধরগণ দৈত্য আখ্যালাভ করিয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যদুর বংশধরগণ যদুবংশীয় দেব, সুর বা সেন উপাধিতে অথবা সুরসেন উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যে শাখাটি দাক্ষিণাত্যে গমন করেন, সেই শাখাটি কলচুরি বা চেদী রাজবংশ নামে খ্যাত হয়। মগধ গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষদিকে অর্থাৎ হর্ষবর্দ্ধনের আবির্ভাবের কিছু পূর্ব্বে ঐ চেদী রাজবংশীয় নৃপতিগণ পুনরায় প্রবল হইয়া মধ্যভারত আক্রমণ করেন এবং গৌড়রাজ্যে দেববংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কর্ণদেব। এই কর্ণদেব হর্ষচরিতে কর্ণসেন নামে উক্ত হইয়াছেন। ইনি রাঙ্গামাটির গৌরবরবি গুপ্তবংশীয় কর্ণসেন হইতে স্বতন্ত্র। দেববংশীয় কর্ণসেনের (কর্ণদেবের) আবির্ভাব ঘটিয়াছিল ৫ম শতাব্দীতে আর রাঙ্গামাটির গুপ্ত বংশীয় কর্ণসেনের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল একাদশ শতাব্দীতে। রাঙ্গামাটির গুপ্ত বংশীয় কর্ণসেনের প্রতিষ্ঠিত কর্ণসেনপুরী বা কাণসোণা নগরী কর্ণসুবর্ণ নগর হইতে স্বতন্ত্র। কর্ণদেবের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ছিল রাজমহলের পরপারে, সুহ্ম দ্বীপের উত্তর সীমান্তে। কর্ণসুবর্ণ নগরের নামকরণ কোন ব্যক্তি বিশেষের নামের সহিত জড়িত নহে। জহ্নুমুনির সুবর্ণ নামক যজ্ঞক্ষেত্র এবং কালিন্দী নদীর (পবন দূতের মতে যমুনা এবং ভট্ট গ্রন্থের মতে কর্ণ) তীরভূমি বা কর্ণ একত্রে নাম গ্রহণ করিয়াছিল কর্ণসুবর্ণ। মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব ছিলেন ঐ চেদী বংশীয় কায়স্থ কর্ণদেবের সুযোগ্য বংশধর।

এ স্থানে নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক গুপ্ত প্রসঙ্গেও কিছু বলা ভাল। কেননা ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ দুই শশাঙ্ককে লইয়া একটা ভয়ঙ্কর জট পাকাইয়া রাখিয়াছেন; যাহার ফলে বর্ত্তমান সরকার বাহাদুরকে বিভ্রান্ত করা হইতেছে এবং তৎসহ ক্ষতিগ্রস্তও করা হইতেছে।

যে সময়ে মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব কর্ণসুবর্ণ নগরে থাকিয়া সুহ্ম দ্বীপসহ অঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার অধীনে থাকিয়া গুপ্তবংশীয় নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক গুপ্ত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজধানীতে থাকিয়া গৌড় ও পুণ্ড্র দ্বীপ শাসন করিতেন। হর্ষবর্দ্ধন ও ভাস্করবর্ম্মার প্রথম আক্রমণেই নরেন্দ্র গুপ্ত কামরূপপতি ভাস্কর বর্ম্মা কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। মহাসামন্ত শশাঙ্কদেব এবং নরেন্দ্র গুপ্ত বা শশাঙ্ক গুপ্ত উভয়েই বড় গঙ্গার পূর্ব্বপারে ছিলেন, বড় গঙ্গা বা দ্বিতীয় ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কেহই রাজত্ব করেন নাই।

কর্ণসুবর্ণ নগর বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশে নহে। যে সময় হইতে মহানন্দার পূর্ব্বপার বরেন্দ্র আখ্যা লাভ করে, সেই সময় হইতে পুরাণকারক এবং ঐতিহাসিকগণ মহানন্দার পশ্চিমপ্রদেশ অঙ্গ, গৌড় ও সুহ্মকে রাঢ় নামে পরিচিত করান।

সুবিখ্যাত অশোক স্তূপ ও বাশিভা সঙ্ঘারাম (রক্তবর্ণ-ভাতিযুক্ত বিহার বা মঠ) বা রক্তবিটি (রক্তবসনা অপ্সরী) রাঙ্গামাটিতে ছিল না। উহা ছিল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের প্রায় ৫ মাইল পশ্চিমে। অর্থাৎ গৌড়ের উত্তরে, অঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনের পশ্চিমে এবং কর্ণসুবর্ণ নগরের পূর্ব্বে উহার অবস্থিতি ছিল।

হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভাস্করবর্ম্মা মিথিলা, অঙ্গ, পুণ্ড্র, গৌড় ও সুহ্মসহ সমগ্র পূর্ব্ব-আর্য্যাবর্ত্তের আধিপত্য লাভ করেন। আর বর্ত্তমান রাঢ়প্রদেশসহ সমগ্র পশ্চিম আর্য্যাবর্ত্ত মগধাধিপতি মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেনের হস্তে যায়। ভাস্করবর্ম্মা ঐ নবপ্রাপ্ত রাজ্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক রাজ্যে এক একজন সামন্ত রাজা প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের মধ্যে তাঁহার নিজ বংশধর হর্ষদেব মহাসামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনে। আর কবিশূর সামন্ত পদে সুহ্মের রাজধানী কর্ণ-সুবর্ণ নগরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাধব-শূর মহাসামন্ত পদ লাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে আদিশূর বা জয়ন্ত পুণ্ড্র, গৌড়, সুহ্ম, অঙ্গ ও মিথিলা এই পঞ্চ বিভাগের একচ্ছত্রাধিপতি হইয়া রাজাধিরাজ উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁহার পুত্র মহারাজ ভূশূর পালবংশীয় নৃপতি রাজা ধর্ম্মপালদেব কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া বর্ত্তমান রাঢ়-প্রদেশের দক্ষিণে যাইয়া সপ্তশতী ব্রাহ্মণদের সাহায্যে রাজ্য জয় পূর্ব্বক রাজত্ব করিতে থাকেন। ভূশূরের বংশধরগণ ১০৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাঢ়প্রদেশের নানা স্থানে রাজত্ব করিয়াছেন। ঐ বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মীশূর। তাঁহার বংশধরগণ পূর্ব্ববঙ্গে যাইয়া ভুলুয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। বারভূঁইয়ার অন্যতম লক্ষ্মণমাণিক্য ঐ শূরবংশেরই বংশধর।

ঐ শূরবংশের আদিপুরুষ কবিশূর কোন্ বংশোদ্ভব এবং কোথা হইতে আসিলেন, তাহার কোনই সন্ধান মিলে না। মথুরা প্রদেশে আদিতে যাঁহারা রাজত্ব করিতেন তাঁহারা শূরসেন বংশীয় ক্ষত্রিয়; ঐ শূরসেনবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আবার যদুবংশেরই একটি শাখা। ইতিপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, বিরাট রাজা ছিলেন যদুবংশীয়। বিরাট রাজার পতনের পর যদুবংশীয় বিভিন্ন শাখারই লোলুপ-দৃষ্টি পড়ে গৌড় সিংহাসনের প্রতি। ফলে কালক্রমে সুযোগ সুবিধানুসারে যদুবংশের শাখা চেদীরাজ বংশীয়গণ দেব উপাধি ধারণ করিয়া গৌড়ে আগমন করেন। হয়ত যদুবংশের অপর শাখা শূরসেন বংশীয়গণ তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। মহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের অবসানে ঐ বংশীয় কবিশূর ভাস্করবর্ম্মার প্রিয়ভাজন হইয়া কর্ণসুবর্ণের সিংহাসন লাভ করেন। শূরসেন রাজ্য ত্যাগ করার পর হয়ত তাঁহারা শূর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। শূর শব্দ দেব শব্দেরই রূপান্তর। গৌড়রাজ্য আদিতে অসুর ও দৈত্যের রাজ্য ছিল ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। পরে ক্রমান্বয়ে দেব ও শূরের আবির্ভাব ঘটে। অতঃপর শূরসেন-বংশীয় অপর শাখা সেন উপাধি ধারণ করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পালরাজত্বের (শক বংশীয় কায়স্থ রাজত্বের) অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

ঐ সেনবংশের আদিপুরুষ সামন্ত সেন। তিনি রাজেন্দ্র চোলের সহিত আসিয়া ফিরিবার পথে বর্ত্তমান রাঢ় প্রদেশের দক্ষিণে স্বর্ণরেখা নদীতীরে কাশীপুর (বর্ত্তমান নাম কাশিয়াড়ী) নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেনও পিতৃরাজ্যে রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র বিজয় সেন ১০৭২ খৃষ্টাব্দে গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পৌত্র লক্ষ্মণ সেন ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড়ে রাজত্ব করেন। তৎপরে বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ)

ও কলিঙ্গ প্রদেশ কিছুদিন যাবত তাঁহার এবং তাঁহার বংশধরগণের শাসনাধীন থাকে।

১১৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমান রাজগণ গৌড়ে রাজত্ব করেন। মাঝে রাজা গণেশ কিছু দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। শেষের দিকে গৌড় হইতে আদি ভাগীরথীর পশ্চিম পারে টাঁড়ায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। শেষে মানসিংহ ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করেন। ঐ বৎসরেই সুসেন বংশ কর্তৃক গৌড় সিংহাসন অধিকৃত হয়।

ঐ সেন বংশ প্রসঙ্গে বহু আলোচনা এবং বহু মতামত দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন—তাঁহারা কায়স্থ বা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় ছিলেন। কেহ বলেন—তাঁহারা বৈদ্য ছিলেন, আবার গ্রন্থের মহান্ ভারত প্রণেতা বলেন যে আদিতে তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়রূপে বাঙ্গলায় আসিয়া রাজ্যপন করেন। কিন্তু আবুলফজলের মতানুসারে দেখা যায় যে বঙ্গদেশে ২৪১৮ বর্ষ ক্ষত্রিয় অধিকার, তৎপরে ২০৩৮ বর্ষ কায়স্থ প্রভাব চলিয়াছিল, তাহার পরেই মুসলমান আগমন ঘটে। (বিশ্বকোষ, বঙ্গদেশ ৪০৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

সেন বংশ যদি কায়স্থ ছাড়া অন্য জাতি হইতেন তাহা হইলে আবুলফজলের মত ঐতিহাসিক তাহার উল্লেখ নিশ্চয়ই করিতেন। বল্লাল-চরিতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহারা ব্রহ্মক্ষত্রিয় বা কায়স্থই ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা পূর্ব্ববঙ্গে কায়স্থ ঘরেই বৈবাহিক সূত্রে জড়িত হইয়াছিলেন। অনেকে হয়ত তাঁহাদের সেন উপাধি দেখিয়া তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু কায়স্থগণও সময় সময় সেন উপাধি ধারণ করিতেন। যেমন কর্ণসুবর্ণ নগরে রাজধানী-প্রতিষ্ঠাতা কর্ণদেব এবং তাঁহার পুত্র রুদ্রদেব ভট্টগ্রন্থে কর্ণসেন ও বৃষসেন নামেই অভিহিত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া শূর শব্দের অর্থ যেমন দেব, তেমনি সেন শব্দের অর্থও দেব। কাজেই গৌড়ের দেব বংশ, শূর বংশ ও সেন বংশ একই বংশের, যদু বংশের এক একটি শাখা। তাঁহাদের মধ্যে দেব বংশ হইতেছে আদি যদু বংশের শাখা। আর শূরবংশ ও সেনবংশ মথুরা প্রদেশের শূরসেন বংশের দুইটি বিভিন্ন শাখা। শূরবংশ হয়ত দেব বংশের সহিত আসিয়া শূরসেন শব্দের প্রথমাংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর সেন বংশ হয়ত কর্ণাট প্রদেশে যাইয়া একশ্রেণীর শূদ্রভাবাপন্ন বা নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ (কর্ণাট ব্রাহ্মণদিগের ৪র্থ শাখা) শাখার সহিত বিবাহাদি সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ঐ শূরসেন শব্দের প্রথমাংশ বাদ দিয়া শেষ অংশ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহাই হউক, মুসলমান রাজগণ যেমন বিনা বাধায় গৌড় সিংহাসন অধিকার করেন, তেমনি মানসিংহ রাজধানী রাজমহলে স্থানান্তরিত করার সঙ্গে সঙ্গে এক দল সুসেনবংশীয় গৌড় অধিকার করেন। তাঁহারা শুধু সেন বংশেরই আদিপুরুষ নহেন, সমগ্র মানব জাতিরই নাকি আদিপুরুষ। তাঁহারা গৌড় রাজধানীকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া তিনটি শাখা রাজধানীতে অবাধে অদ্যাপিও রাজত্ব করিতেছেন। ঐ তিনটি বিভাগ উত্তরে দ্বারবাসিনী বিভাগ (এই স্থানে মাটির গড়ের সম্মুখভাগে ভগবতীর সুবৃহৎ প্রস্তরমূর্ত্তি বসান আছে), মধ্যে পাতালচণ্ডী বিভাগ (এই স্থানে মুনিঋষিদের দেবীপীঠস্থানে বেদী রহিয়াছে), আর দক্ষিণে গৌড়েশ্বরী বিভাগ (রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের দক্ষিণে গৌড়েশ্বরীর বেদী অবস্থিত, শ্রীশ্রীরামকেলী এই বিভাগের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত)। তাঁহাদের অঙ্গে কৌলিন্যের ছাপ না থাকিলেও কৌলিন্য প্রসঙ্গে তাঁহারা সেন রাজাদের অপেক্ষাও সজাগ। কেন না গৌড়ের পশ্চিম পার্শ্বস্থ সুহ্ম বা আদি নদীয়া বড়গঙ্গার গঙ্গাজলে পুনঃ পুনঃ বিধৌত হইলেও সুহ্মদ্বীপ আদিতে যবনগণ কর্তৃক অধিকৃত হওয়ায় তাঁহারা অদ্যাপিও উহাকে পতিতের দেশ বলিয়া মনে করেন এবং ঐ প্রদেশের অভ্যন্তরভাগে যান না। যদিই বা কেহ কখন যান, তবে তিনি রাজদণ্ডাজ্ঞা ভোগ করিবার জন্যই যাইয়া থাকেন। কিন্তু সুহ্মদ্বীপের পূর্ব্ব সীমান্তে ভাগীরথী তীরে তাঁহাদের নিজস্ব তিনটি কোটালখানা আছে। যেমন উত্তরে রামচন্দ্রপুর (রামাবতী) হইতে মধুঘাট, মধ্যে নাজিরপুর, আর দক্ষিণে কদমতলা হইতে খিড়কীঘাট (রাজপ্রাসাদের ঘাট বা লক্ষ্মণসেনের পলায়নের ঘাট)। ভাগীরথীতীরে ঐ রামচন্দ্রপুর হইতে খিড়কী ঘাট পর্য্যন্ত তাঁহারা টহলদারী করেন। অনুমান, রামচন্দ্রপুর হইতে খিড়কী ঘাট আদিতে গৌড় দ্বীপেরই অন্তর্গত ছিল; পরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে সুহ্ম বা আদি নদীয়ার অন্তর্গত হইয়াছে। মানসিংহের আবির্ভাবে গৌড় পতিতের দেশ আখ্যা লাভ করে। ঐ সুসেনবংশীয়গণ শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া বহু পূর্ব্ব হইতেই নাকি গৌড় উপকণ্ঠে বসবাস করিতেছিলেন। কাজেই পতিতের দেশ তাঁহাদের অধিকৃত হয়। আর যাঁহারা কৌলিন্য ছাপ লইয়া পদ্মা বা বড় গঙ্গা পারে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারা উহাকে পতিতের দেশ বলিয়া অবহেলার চক্ষে গ্রহণ করেন। কাজেই সাধারণতন্ত্রের যুগেও গৌড় পতিতের দেশ হইয়াই রহিয়াছে।

ফুল

অর্চিনারায়ণ ভট্টাচার্য

কাছের যারা যেই শোনে সেই চম্‌কে ওঠে।

সেকি! "পিংক্ প্যারাডাইসের" নাম শোনেন নি। বলেন কি মশাই?

কথাটা নেহাৎ অবান্তর নয়। এ অঞ্চলে পিংক্ প্যারা-ডাইসের নাম শোনে নি এমন লোক দুর্লভ। শুধু দর্শনীয় নয়, একটু স্বাতন্ত্র্যও যেন জড়ানো আছে এই বাড়ীটির সংগে।

দিনের বেলা যে দেখেছে সে সহজে ভোলে নি। সকাল বেলার ঝল্‌মলে রোদ হেসে উঠবার সাথে সাথে সাড়া প'ড়ে যায় চারদিকে। এখানে ওখানে টুক্‌টুকে লাল পপি ফুলের হাসিখুশী মুখ সর্বদা চোখে প'ড়বে। আর পাখীদের কিচির্ মিচির্ শুনে আস্তে আস্তে এখানে ডালিয়াদের তন্দ্রা ভাঙে। গ্লাস হাউসের স্বচ্ছ আবরণের নীচে মহার্ঘ দেশী বিদেশী ফুলেরা রঙীণ চোখ মেলে তাকায়। যেন পাশাপাশি একরাশ রঙের জটলা ব'সেছে।

বাগান বাড়ীটা এখানে সকলেই চেনে। সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদ ডাঃ বোসের গবেষণাগার—ছোটখাট একটা বোটানিক্যাল গার্ডেনও বলা চ'লতে পারে। রকমারী সস্তা-দামী, দুর্লভ ও সুলভ রঙীণ ফুলের গাছে ভর্তি বাগানটা। গত পনের বছর ধ'রে শুধু ফুল নিয়েই গবেষণা ক'রে আসছেন ডাঃ বোস। নানা বর্ণাঢ্য ফুলের সম্ভারে সাজানো বোটানিক্যাল্ গার্ডেনটা কারুর নজরে না প'ড়ে উপায় নেই।

দোতালার ব্যাল্‌কনীটায় রোজ সকালে একবার ঋজু ভংগীতে এসে দাঁড়ান ডাক্তার বোস। হাতে থাকে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা—প্রভাতী চায়ের আমেজে মুখটা খুশীতে ঝল্‌মল্ ক'রে ওঠে। স্পঞ্জী হাওয়াই চটিটা পায়ে দিয়ে সামনের কাঁকর ঢালা পথ দিয়ে আস্তে আস্তে একবার এসে দাঁড়ান গ্লাস-হাউসের সামনে। অপত্যস্নেহে একবার তাকান টিউলিপের চারাগুলির দিকে। তারপর দুর্লভ এক শ্রেণীর অর্কিডের দিকে তাকিয়ে কি যেন এক অদ্ভুত আনন্দের সন্ধান পান।

ল্যাবরেটরীর হাড়-ভাঙা খাটুনির আগে এই এক-টুক্‌রো স্বল্প অবসর। লাঞ্চের আগে আর কোনদিকেই কাজের ফুরসৎ পাবেন না তিনি। গত পনের বছর ধ'রে এই রুটিনে কোনদিন ফাঁক পড়েনি। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে, কোন ছেদ পড়ে নি—কোন ছন্দপতন ঘটে নি কোনদিন।

একটা প্রচণ্ড নির্জনতায় আত্মগোপন ক'রে কোন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি ডাঃ বোস। কোনও দিনও না। যেন বাইরের ঝামেলার হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যেই এই প্রাকৃতিক বর্মের সৃষ্টি।

কিন্তু মাত্র সেদিনকার ঘটনা। এই কঠিন নির্জনতা ভেদ ক'রে অশুভ নক্ষত্রের মত উদয় হ'য়েছিল যে অপরিচিত লোকটি—তার খবর হয়ত লোকসমাজ রাখে না। কিন্তু ডাঃ বোস আজও তার কথা ভুলতে পেরেছেন কি? আজও কি সে কথা ভাবতে শরীরের লোমে অস্বাচ্ছন্দ্য জেগে ওঠে না?

দারোয়ানেরা হৈ হৈ ক'রে এনে হাজির ক'রল এমন একজন লোককে যাকে দেখলে পাগল ব'লে সন্দেহ হয়। উদ্‌ভ্রান্তের মত চেহারা, পরণে বিবর্ণ একটা ফ্লানেলের প্যান্ট, গায়ের ব্রাউন্ রঙের কোটটা ময়লা—তালি-মারা। সম্ভবতঃ লোকটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্। বয়সে সে তরুণ—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গায়ের রঙ এক-কালে বোধ হয় বেশ ফর্সা ছিল—এখন রোদে পুড়ে তামাটে হ'য়ে গেছে। কপালে দুশ্চিন্তার রেখা দাগ কেটে

ব'সেছে—চোখে ক্লান্তির কালি। কাঁধ থেকে ঝোলানো আধ ময়লা একটা ক্যান্‌ভাসের ব্যাগ—তার মধ্যে থেকে বাগান থেকে পাড়া সদ্য তাজা কতকগুলি ফুল উঁকি মারছে।

ছোটুলাল ব'ল্ল, "রোজ ফুল চুরি ক'রে বাবুসাব্। আজ বহুত মেহনতসে পাকড়্ লিয়া।"

রামকিষেণ ব'ল্ল, "হাঁ বাবুজী। বহুত দুশ্‌মন্ আছে সাহেবটা।"

ভ্রূকুটি কুটিল হ'য়ে উঠেছিল ডাঃ বোসের মুখ। তবু যেন যতটা কঠোর হবেন ভেবেছিলেন ততটা কঠোর হ'তে পারলেন না। গম্ভীর মুখের মাংসপেশী খানিকটা শিথিল হ'য়ে এল।

ব'ল্লেন, "নাম কি তোমার? ফুল চুরি ক'রছিলে কেন তুমি?"

হাসির একটা সরু রেখা খেলে গেল লোকটির মুখে। ইংরেজীতে উত্তর দিল লোকটি।

ব'ল্ল, "আমার নাম ভিভিয়ান্ স্মিথ্।"

—"তুমি কিসের জন্য এখানে আস? ফুল চুরি ক'রতে?"

চুপ ক'রে রইল ভিভিয়ান। কথার উত্তর দিল না। মাতালের মত ঘোলাটে দৃষ্টিতে একবার শুধু ফিরে তাকাল ডাঃ বোসের মুখের দিকে।

—"চুপ ক'রে আছ কেন? কথার জবাব দাও?"

মাটির দিক থেকে মাথা তুলে এবার ফিরে তাকাল ভিভিয়ান। ধারালো ছুরির মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সব কিছু যেন ভেদ ক'রতে চায় ঐ তীব্র দৃষ্টি দিয়ে।

ব'ল্ল, "মিথ্যা কথা ব'লব না ডক্টর। সত্যিই আমি এখানে আসি। ফুল চুরি ক'রতেই আসি। কিন্তু শুনেছিলাম আপনি একজন বড় বোটানিষ্ট্। আপনাকে একটা ছোট্ট সহজ প্রশ্ন ক'রব—জবাব দেবেন?"

চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে যেন ভিভিয়ান। ওর সম্মোহনী দৃষ্টির সামনে কেমন যেন নিস্তেজ হ'য়ে গেলেন ডাঃ বোস।

ভিভিয়ান ব'ল্ল, "এই ফুল নামধেয় জিনিবটি আসলে কি ব'লতে পারেন? মাত্র দু-অক্ষরের শব্দ—রঙীণ কয়েকটা পাপড়ি আর তার সুগন্ধ মিলে তৈরী। অতি সামান্য জিনিষ কিন্তু অসামান্য নয় কি?"

গোঁফের রেখায় কৌতুক ও তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল ডাঃ বোসের। এত বড় উদ্ভিদ্‌বিদ্যাবিশারদের কাছে এই শিশুর মত সরল প্রশ্নের আশা করেন নি কোনদিন। পাগলের খেয়াল চরিতার্থ ক'রতে গিয়ে কতকগুলি অমূল্য সময় নষ্ট হ'চ্ছে মিথ্যা মিথ্যি। যাই হোক নিরুপায়। টেবিলের পাশের কাচের আলমারীর দিকে ঝুঁকে প'ড়ল তাঁর শরীর।

ঘরের কোণে একটা কৌচের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন ডাঃ বোস। ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ভিভিয়ান—গিয়ে ব'সল সেখানে।

ভিভিয়ানের সামনে কয়েক মিনিট পরেই এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার একটা ঝকঝকে ভল্যুম এগিয়ে এল। তাকিয়ে দেখ'ল ভিভিয়ান—লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দেওয়া কালো অক্ষরগুলিকে। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠ'ল ভিভিয়ানের চোখ—বিজ্ঞানের ভাষায় ফুলের বিশ্লেষণ।

কিন্তু এতেও যেন সন্তুষ্ট হ'ল না ভিভিয়ান। ঠোঁটের গোড়ায় আবার কৌতুকের হাসি খেলে গেল তার। অবজ্ঞার ভংগীতে ফিরে তাকাল সে। ব'ল্ল, "আপনারা সব একই দলের ডক্টর। বৈজ্ঞানিকেরা সব একই জাতের। মাইক্রোস্কোপের নীচে জীবনকে চুলচেরা বিচার ক'রে দেখতে চান। কিন্তু পান কি? ওতে জীবনের সমস্ত রস নিংড়ে নিয়ে চ'লে যায়। শুধু খোসা প'ড়ে থাকে।"

তারপর কি রকম একটা যেন অস্বাভাবিক মুখের ভাবান্তর হ'ল ভিভিয়ানের। মনে হ'ল কোন দূরাতীত স্মৃতিকে রোমন্থন ক'রতে চাইছে ভিভিয়ান। একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস প'ড়ল। তারপর দার্শনিকের গম্ভীরতা নিয়ে কথা ব'ল্ল সে।

ব'ল্ল, "ফুল কি জিনিষ তার হিসেব বৈজ্ঞানিকেরা রাখে না। হয়ত আমিও রাখতাম না। কিন্তু আজ জেনেছি মাটিতে জন্মালেও ফুল এক অপার্থিব জিনিষ। আমাদের জন্ম-মৃত্যুর সংগে এর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। জন্ম-জন্মান্তরের যোগ।"

কথার সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল ভিভিয়ান। মাতালের

মত টল্‌তে টল্‌তে এক পা এগিয়ে এল সামনে। হায়নার মত একবার দপ্‌ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল চোখে। তারপর ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে ব'ল্ল—"এই সুগন্ধি ফুলের সংগে আমাদের মৃত্যুর সম্বন্ধ আরও ঘনিষ্ঠ। জানেন আপনি ?"

অসহ্য যন্ত্রণা একটা সারা বুকের ভিতরটা যেন দুমড়ে মুচ্‌ড়ে ছিঁড়ে ফেলছে ভিভিয়ানের। অভিশপ্ত প্রাণীর মত মুখের রেখায় ফুটে উঠছে যন্ত্রণার ছাপ। মনের যে সব বিক্ষোভ বেদনার বোঝা আবর্জনার মত জমে আছে তার কবল থেকে মুক্তি পেতে চায় যেন ও। হাল্কা হ'তে চায় যেন। বুকের ভিতরটা কে যেন ধারালো ছুরি দিয়ে কুরেকুরে কাটছে, টের পায় ভিভিয়ান।

ডাঃ বোসের ঘরের এক প্রান্তে কৌচের উপর এলিয়ে প'ড়ে ক্লান্ত গলায় ভিভিয়ান ব'ল্ল —"এক গ্লাস জল !"

*　　　　*　　　　*

পাঁচ বছর আগে ভিভিয়ান কল্পনাও করেনি এইভাবে ডাঃ বোসের গবেষণাগারে ব'সে থাকবার কথা। আর তার প্রয়োজনই বা ছিল কি। ফুটন্ত জলের নেশায় যৌবন তখন টগ্‌বগ্‌ ফুটছে। জীবনকে উপভোগ ক'রতে শিখেছিল ভিভিয়ান।

প্রাচীন গোথিক স্থাপত্যের রীতিতে তৈরী পুরনো ক্যাথিড্রালের সেই চূড়াটা। বিরাট ক্লক ঘড়িটাতে পনের মিনিট অন্তর ছন্দের টুংটাং বেজে উঠত। ক্লক-টাওয়ারের চূড়ার পাশ দিয়ে ভোরের সোনালী রোদে চক্র দিয়ে উড়ত ফাদার ব্রাউনের সাদা—কালো—খয়েরী পোষা পায়রার ঝাঁক।

গীর্জার কার্পেট-সবুজ লনের মধ্যে ব'সে সহজেই কয়েক শতাব্দীর আদিম বন্যতার মধ্যে ফিরে যাওয়া যেত। মাথার উপর কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল লাল ফুল ঝ'রে ঝ'রে প'ড়ত মুঠি মুঠি। বাদাম গাছটার ডালে ব'সে একটা নাম-না-জানা পাখী মুহুর্মুহু শিষ দিত। কখন কখন উড়ন্ত সবুজ বিদ্যুতের মত এক ঝাঁক উড়ন্ত টিয়ার তীব্র ডাকে—চকিতে চঞ্চল হ'য়ে উঠে ব'সত ভিভিয়ান। একদিন দুদিন নয়। দিনের পর দিন।

ক্যাথিড্রালের কয়ার (chair) বয় ভিভিয়ান স্মিথ্‌। অনাথ অবস্থায় কুড়িয়ে এনে যাকে মানুষ ক'রেছেন ফাদার ব্রাউন্‌ সেই ভিভিয়ান। প্রার্থনা সংগীত গাইবার সময় দলের মধ্যে অমন মিষ্টি গলা ছিল না কারুর।

কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে ব'সে শেলীর কবিতার বই হাতে নিয়ে অনেকদিন তন্ময় হ'য়ে ভেবে দেখেছে ভিভিয়ান। সারা ক্যাথিড্রালটার চারদিকে কেমন যেন একটা বিষাদের মায়া আছে। সেই বিষাদ পিতৃমাতৃহীন ভিভিয়ানের অভিশপ্ত জীবনে কেমন যেন কুয়াশার মত ধোঁয়াটে ব'লে মনে হ'ত। শেলীর কবিতা প'ড়তে পড়তে উনবিংশ শতকের গভীরে মন চ'লে যেত ভিভিয়ানের। মনে এসে লাগত সেই শতকের বেদনা আর বিষাদের ঢেউ। ভাবতে ভাবতে মন বড় খারাপ হ'য়ে যেত তার। মনে হ'ত নিজেদের ব্যক্তিত্বও একদিন এইভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

কিন্তু একদিন ছায়াঘন দুপুরে বাদাম গাছের নীচে ব'সে কীট্‌স্‌ প'ড়তে প'ড়তে নিজের চোখের সামনে আরেকটা জানলা খুলে গেল ভিভিয়ানের। কীটস্‌ প'ড়ে মনে হ'য়েছিল জীবনকে উপভোগ করার গান খুব বেশী দূরে নয়। তবে তো বাঁচবার অধিকার আছে। জীবন-পাত্রের মদের শেষ ফেনাটুকুও নিঃশেষে পান ক'রে নাও। একটা বন্য আনন্দের নেশায় ভ'রে উঠেছিল ভিভিয়ান।

অথচ সেই আনন্দের প্রকৃতিটা যে কি রকম ভিভিয়ানের কল্পনায় তা কোনদিন আসে নি।

ক্যাথিড্রালের বিরাট হলঘরে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা সংগীত গাইবার সময় কেমন যেন চম্‌কে উঠেছিল সেদিন ভিভিয়ান। শিরায় শিরায় অনুভব ক'রেছিল অভূতপূর্ব এক জ্বালা। পাইপ্‌ অর্গ্যান্‌ বাজাতে বাজাতে এরিক্‌ বাউওার অবাক হ'য়ে তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। কই ভিভিয়ানের তো কোনদিন সুরে ভুল হয় না। ফাদার ব্রাউনের নিজের হাতে গড়া ছাত্র।

ভিভিয়ানও প্রথমটা ভালো ক'রে বোঝে নি। বোঝেনি নবাগতা কয়ার্‌ গার্ল সিল্‌ভিয়া মিলের মধ্যে কি মাদকতা আছে। গ্রীক ভাস্করের হাতে তৈরী শ্বেত-পাথরের যেন একটি মানবী মূর্তি। পায়ের নখ থেকে চোখের ভুরুতে কোন খুঁত পায় নি ভিভিয়ান। রেশমের মত নরম—চিকণ মনে হ'ত ওর ঘন গভীর সোনালী চুল।

অদ্ভুত ভাবালু মনে হ'ত ওর বড় বড় কালো চোখ দুটিকে। গলার কণ্ঠস্বর শুনে চমকে গিয়েছিল সকলে। নারীকণ্ঠ এত মিষ্টি হয়! ঠিক যেন গীটারের ঝংকার। কই হেলা আছে, এমিলি আছে, লিজা আছে—কারুর গলা তো অমনি নয়। সিল্ভিয়া যখন মেয়েদের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা সংগীত গায় তখন যেন রাজেন্দ্রাণীর মত মনে হয় ওকে। এক রাশ সুগন্ধ যেন স্তূপ হ'য়ে জমে আছে সে জায়গায়।

ফাদার ব্রাউন সেদিন যখন উদাত্ত কণ্ঠে "Imitation of Christ" থেকে sermon প'ড়ে শোনাচ্ছিলেন সেদিন যেন তন্ময় হয়ে গিয়েছিল ভিভিয়ান :

"Love is a great thing, yea, a great and thorough good by itself it makes everything that is heavy, light ; and it bears evenly all that is uneven."

"Love feels no burden, thinks nothing of trouble, attempts what is above its strength, pleads no excuse of impossibility ; for it thinks all things lawful for itself and all things possible."

শুনতে শুনতে চোখাচোখি হ'য়ে গেল দুজনের। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিল সিলভিয়া। ভিভিয়ান কিন্তু চোখ সরিয়ে নেয় নি—এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে লক্ষ্য ক'রেছে কেমন আবীরের আভায় লাল হ'য়ে উঠেছে সিল্ভিয়ার নিটোল শ্বেতাভ মুখ।

শুধু একবার নয়। একাধিকবার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল এ দৃশ্যের।

পুরুষকণ্ঠের সুর আল্টো আর নারীকণ্ঠের সুর সোপ্রানো গুলিয়ে যেত দুজনেরই। পাইপ্ অর্গ্যানের মিষ্টি ঝংকারের মাঝখানে দুজনের চোখাচোখি হ'লেই সব তলিয়ে যেত রসাতলে। প্রৌঢ় এরিক্ বাউওয়ার্ অবাক হ'য়ে দেখত কি ক'রতে চ'লেছে এরা। বিস্ময়ে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠত চোখ দুটো।

সিল্ভিয়া মিল্ আর ভিভিয়ান্ স্মিথ। সন্ধ্যায় পিয়ানোর মিষ্টি টুং টাংএর মত দুটি নাম পাশাপাশি একসাথে বেজে উঠত। কোন ছন্দের গরমিল হ'ত না।

চেরী গাছের কালো ছায়ার নীচে ব'সে বাদামী ঘোড়ের খেলা দেখতে দেখতে ভিভিয়ান ব'লেছিল সিল্ভিয়াকে।

—"তুমি ফুল ভালবাস না ?"

—"সন্দেহের কোন কারণ আছে কি ?"

কিছু না ব'লে সিল্ভিয়ার সোনালী চুলে একটা রক্ত গোলাপ গুঁজে দিয়েছিল ভিভিয়ান। তার জবাবে কয়েকটা শ্বেত গোলাপের পাপড়ি ছিঁড়ে কৌতুকে ছুঁড়ে দিয়েছিল সিল্ভিয়া—ভিভিয়ানের মুখের উপর।

তারপর একটা মুহূর্ত।

"হাউ নটি ! নাও ড্রাউন্‌ড্ ইন্ এ কিস্।"

সিল্ভিয়াকে জড়িয়ে ধ'রে তার নিটোল গালে নিজের স্মারকচিহ্ন রেখে দিয়েছিল ভিভিয়ান। কোন আপত্তি করেনি সিল্ভিয়া।

তারপর ছবির মত অনেকগুলি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। কোনদিন আপত্তি করে নি সিল্ভিয়া। ফাদার ব্রাউন যেদিন ভিভিয়ান আর সিল্ভিয়ার হাত দুটো একত্র ক'রে পবিত্র শপথ উচ্চারণ করিয়েছিলেন সেদিনও নয়। শুধু মিষ্টি একটু হেসেছিল।

শ্বেত গোলাপের তোড়াটা হাতে নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লেছিল ভিভিয়ানকে, "এই ফুল জিনিষটা আমার এত অপূর্ব লাগে ভিভিয়ান !"

ভিভিয়ান ব'লেছিল, "সত্যিই তাই সিল্ভিয়া। মানুষ আর স্বর্গের মধ্যে যেটুকু ব্যবধান তা দূর ক'রে দেয় এই সামান্য ফুল।"

সেদিনকার সেই পবিত্র দিনটাকে আজও প্রতি বছর সম্মান ক'রে আসছে ভিভিয়ান। ফুলের উৎসবে সাজিয়ে। ঝিনুকের মত জলজলে চোখ জোড়া দেখে সব কিছু যেন ভুলে যেতে ইচ্ছা করে ভিভিয়ানের। মেরীর চোখের দিকে তাকিয়ে শেলী যেমন সব ভুলে যেত।

প্রতি বছর বিকেলে ফুলের একটা সুন্দর তোড়া তৈরী করে ভিভিয়ান। ঐ দিনটা তাদের বিয়ের স্মরণোৎসব। মাঝখানে থাকে রক্ত গোলাপ আর শ্বেত গোলাপ। দেবদারু আর ঝাউএর পাতা দিয়ে সম্পূর্ণ ক'রে তোলে স্তবকটা।

সন্ধ্যাবেলা সিল্ভিয়ার হাতে প্রতিবার হাসিমুখে তোড়াটা তুলে দিতে কোন ভুল চুক হয় না। সিল্ভিয়ার

মুখের দিকে—চোখের দিকে তাকিয়ে হৃৎপিণ্ড দ্রুত তালে ওঠা নামা করে ভিভিয়ানের। আবীরের মত লাল হ'য়ে ওঠে সিল্‌ভিয়ার মুখ। চোখের কোণে হাসি চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে।

বলে, "ধন্যবাদ ভিভিয়ান্! এর চাইতে দামী উপহার আমি কল্পনাও ক'রতে পারি না কোনদিন।"

শুধু সামান্য কটি কথার আশায় যেন সারা বছর অপেক্ষা ক'রে থাকে ভিভিয়ান। বুকের রক্তে জোয়ারের ছলাৎ টের পায়।

এর পরে ভিভিয়ানের বন্ধুরা আসে একে একে। বড় গোল টেবিলটার চারপাশে ব'সে ব'সে হৈ হল্লা করে সকলে। মাঝখানে বড় ফুলদানীতে সাজানো থাকে ফুলের তোড়াটা।

আসে দৌড়ঝাঁপের খেলোয়াড় গোমেজ সাট্‌ক্লিফ্, আর বেহালাবাদক বিল্ এমার্স'ন। সেই সাথে আসে ব্রিজ্ খেলোয়াড় জ্যাক্ মর্গ্যান্, প্যাট্রি বাট্‌লার্ আর তার মাতাল বন্ধু টম্ কর্‌বেল্।

ওদের জন্য গ্লাসে ক'রে চেরীর সরবৎ নিয়ে আসে সিল্‌ভিয়া। আদর্শ গৃহকর্ত্রী। ডিক্যান্টরে হুইস্কি আর সোডা আস্তে আস্তে পাঞ্চ্ ক'রে নিয়ে এক কোণে বুম্ হ'য়ে ব'সে থাকে মাতাল টম্ কর্‌বেল্।

পান—ভোজন শেষ করে নিয়ে হৈহৈ ক'রতে ক'রতে অনেক রাত্রে বেড়িয়ে যায় বন্ধুর দল। ফুলের তোড়াটাকে ফুলদানী থেকে তুলে আরেকবার বুকের কাছে এনে আঘ্রাণ নেয় সিল্‌ভিয়া।

বলে, "তোমার চুমোর মত মিষ্টি, ডার্লিং!"

আরেকবার ভিভিয়ানের মাতাল আলিংগনের মধ্যে নিজেকে আত্মসমর্পণ ক'রে দেয় সিল্‌ভিয়া।

তোড়াটা হাতে নিয়ে ভিভিয়ান বলে, "ঠিক তোমার চুলের মত মিষ্টি গন্ধ! তাই না ডিয়ারি?"

বছরের পর বছর একই নিয়মে এইভাবে দিনগুলি কেটে গেছে। ফসিলের পুরনো স্তূপে তাদের হয়ত সন্ধান পাওয়া যাবে।

সেবারের শুভরাত্রিতে হঠাৎ কি রকম যেন পুরনো সুরের তাল কেটে গেল অকস্মাৎ। একটা গড়ে ওঠা সুন্দর জীবন যেন অপ্রত্যাশিত আঘাতে ধাক্কা খেয়ে বোবা হ'য়ে গেল কেন।

সেদিন রাত্রে বন্ধুরা চ'লে যাবার পর নতুন একটা জিনিষ লক্ষ্য করল ভিভিয়ান। ফুলদানীর উপর আজকের ফুলের তোড়াটা নেই। আনাচ—কানাচ সারা বাড়ী তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজেও কোথাও পাওয়া গেল না তোড়াটা। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা কাঁটার মত জিনিষ বিঁধে ক'রে বিঁধে রইল ভিভিয়ানের।

সিল্‌ভিয়া তখন ঘর-কন্নার কাজ ক'রছিল শোবার ঘরে।

"আমার ফুলের তোড়াটা কোথায় জান?" সংশয়া-ব্যাকুল চিত্তে প্রশ্ন ক'রল ভিভিয়ান।

"ঠিক মনে প'ড়ছে না।" কাজ ক'রতে ক'রতে মুখ না তুলেই উত্তর দিল সিল্‌ভিয়া।

কেমন যেন গম্ভীর দেখাল ওর মুখ। বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠল ভিভিয়ানের। তবে কি সিল্‌ভিয়া কাউকে—?

আর সেই কাঁটাটা যেন নড়ে চড়ে আরও গভীর হ'য়ে চেপে ব'সল ভিভিয়ানের বুকের উপর। ক্লান্তিকর দিনগুলি অসহনীয় মনে হ'ল। একটা অজানা আশঙ্কায় শির্ শির্ ক'রে উঠল বুকের ভিতরটা।

এই ভাবান্তরটা কেন হ'ল টের পায়না ভিভিয়ান। অতলে তলিয়ে দেখলে সন্দিগ্ধ মনটা যেন কি সব খুঁজে খুঁজে ফেরে। চিন্তার জালে জট পাকিয়ে সব একাকার হ'য়ে যায়।

আর সেই সাথে বিল্ এমার্স'নের মুখটা হঠাৎ কেমন যেন মনে পড়ে যায় ভিভিয়ানের। অনেক বার চোখে প'ড়েছে ওর নেকড়ের মত চকচকে ক্ষুধার্ত চোখ। সিল্‌ভিয়ার দিকে কখন কখন তাকিয়ে থাকত বিল্। চোখে লোলুপ দৃষ্টি।

অথচ সেদিনকার ফুলের অন্তর্ধান কাহিনীর সংগে বিলের কোন যোগ আছে কি? আর সিল্‌ভিয়ার দৃষ্টিটা অমন ঠাণ্ডা—মুখটা অমন গম্ভীর মনে হয়েছিল কেন সেদিন? বিলের মুখে নিজের রূপের প্রশংসা শুনে সিল্‌ভিয়াকে কতদিন গর্বে স্ফীত হ'তে দেখেছে ভিভিয়ান।

একটা দুঃস্বপ্ন যেন সংক্রামক রোগের মত ধীরে ধীরে অসংখ্য বীজাণুতে মন ছেয়ে ফেলছে ভিভিয়ানের। কতক-

গুলি জটিল অংকের হিসাব ক'ষে ক'ষে আস্তে আস্তে হাল ছেড়ে দেয় ভিভিয়ান।

কিন্তু সেদিন গল্পের টেবিলে বিসদৃশ কাণ্ড ঘটে গেল একটা।

টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি প'ড়ছিল সেদিন। বন্ধুদের আসার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু রাত আটটার সময় রেন্ কোট মুড়ি দিয়ে হাজির হ'ল এসে বিল্ এমার্সন্।

কোণের চেয়ারে হুইটম্যানের কবিতার বই হাতে নিয়ে ব'সেছিল ভিভিয়ান। অলস দৃষ্টিতে লক্ষ্য ক'রেছিল ওর আগমন। হঠাৎ খিল্ খিল্ হাসির শব্দে তাকিয়ে দেখল বিলের একটা কৌতুকে খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙে প'ড়ছে সিল্‌ভিয়া আর বিল্।

আর সহ্য ক'রতে পারল না ভিভিয়ান। চীৎকার ক'রে উঠল বজ্রগম্ভীর স্বরে।

"এই মুহূর্তে এই জঘন্য হাসি বন্ধ কর ব'লছি। তোমরা দুজনেই।"

গম্ভীর হ'য়ে গেছে সিল্‌ভিয়া। কোন উত্তর দিল না। অপমানের ঝাঁজে সারা মুখটা বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে বেশ বোঝা যায়।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে পরিষ্কার গলায় কৈফিয়ৎ তলব ক'রেছিল সিল্‌ভিয়া।

—"অভিনাটকীয়তার মধ্যে বেশ একটু ঝুঁকি আছে ভিভিয়ান। অনেক সময় জিনিষটা অভিনেতাকে দর্শকের কাছে হাস্যাস্পদ ক'রে তোলে।"

—"তোমার প্রশ্নের মর্ম বুঝতে আমি অক্ষম।"

অসহিষ্ণু গলায় উত্তর দিল ভিভিয়ান।

—"আমি শুধু আজ সন্ধ্যার টেবিলের সামনে তোমার বীরত্বপূর্ণ অভিনয়ের কথা ব'লছিলাম!"

"বীরত্বপূর্ণ অভিনয়!" অন্ধকারের মধ্যেও চোখ জ্ব'লে উঠল ভিভিয়ানের।

"সিল্‌ভিয়া ভুলে যেও না—সব ব্যাপারে আমি তোমাকে জবাবদিহি ক'রতে বাধ্য নই।"

"ঠিকই ব'লেছ। তোমার কর্তৃত্ব অস্বীকার করি আমার সাধ্য কি!"

একটু যেন হোঁচট খেল ভিভিয়ান। বিদ্রূপের খোঁচায় মুখের মাংসপেশীগুলি কঠিন হ'য়ে উঠেছে। বড় গোছের একটা শক্ত আঘাত হানবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিল ভিভিয়ান।

চীৎকার ক'রে ব'ল, "একটু বাস্তব কথাবার্তা ব'লতে শেখ সিল্‌ভিয়া। হেঁয়ালী ক'র না।"

একটু দম নিল ভিভিয়ান। তারপর ফের দাঁতে দাঁত চেপে ব'ল—"একটা প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব চাই আমি। তোমার সংগে বিলের এখনকার সম্পর্কের স্বরূপটা কি?"

—"বিলের সংগে সম্পর্ক? তোমার ইংগিতটা একটু অভদ্র মনে হ'চ্ছে ভিভিয়ান।" ভুরু কুঁচকে ব'ল সিল্‌ভিয়া।

চোখ উগ্র হ'য়ে উঠল ভিভিয়ানের। ব'ল,—"আমি স্ত্রীর সংগে লুকোচুরি খেলতে চাই না সিল্‌ভিয়া। আমার কথার ইংগিত এবং কারণ তোমার কাছে নিশ্চয় দুর্বোধ্য নয়। সব কথা জেনেও না জানার ভাণ করাটা আর যাই হোক পরিচ্ছন্ন মনোভাবের পরিচায়ক নয়।"

অন্ধকারেও স্পষ্ট বোঝা গেল বিবর্ণ হ'য়ে উঠেছে সিল্‌ভিয়ার মুখ।

ব'ল, "তুমি এতটা নীচ আমি জানতাম না ভিভিয়ান। একটা কুৎসিৎ আর হিংসুক মনকে এতদিন চিনতে পারি নি।"

সারা রাতটা সেদিন ঘুমোতে পারে নি ভিভিয়ান। কুৎসিৎ এবং হিংসুক মন! গরম লোহা দিয়ে কাণ দুটো পুড়িয়ে দিয়েছে কে যেন। বুকের ভিতরটা যেন গন্‌গনে আগুনে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লছে।

কৃষ্ণচূড়া গাছটা লাল ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে বাগানের কোণটায়। মনে হ'চ্ছে ঝ'রে প'ড়ছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তের বিন্দু। গাছের নীচে ব'সে ব'সে সারা দিনটা মনটা কেমন উদাস হ'য়ে গেল ভিভিয়ানের। সামনের গাছের ডাল থেকে শীষ দিয়ে উড়ে গেল একটা নাম—না—জানা পাখী। ক্যাথিড্রালের পেটা ঘড়িতে ঢং ক'রে একটা বা'জল। ক্লক-টাওয়ারের উঁচু চূড়ার পাশ দিয়ে কাদার ব্রাউনের সাদা-কালো—খয়েরি উজ্জ্বল পায়রার ঝাঁক তখনও চক্রাকারে উড়ছে। দূরে ছোট্ট টাউনের সীমানা পেরিয়ে শালবন থেকে উড়ে আসা ঠাণ্ডা হাওয়া হাল্কা আরাম বুলিয়ে দিয়ে যাচ্ছে শরীরে। অনেক দূরে মন উধাও হ'য়ে চ'লে গেছে ভিভিয়ানের।

ভাবতে ভাবতে মনটা পক্ষাঘাতের আক্রমণে যেন অসাড় হ'য়ে আসে। সেই বিশেষ দিনটায় ফুল দিয়ে তোড়া আর বাঁধবে না ভিভিয়ান। ফুলের মত সুন্দর—ফুলের মত নিষ্পাপ সিল্‌ভিয়ার জন্ত তৈরী করা উপহার! সব কিছুই—কোন একটা বিদ্রূপের আঘাতে বন্ধ হ'য়ে গেছে যেন আজ। বুকের ভিতরটায় একটা ধারালো করাতের স্পর্শ—নিঃশ্বাসে একটা কষ্ট টের পায় ভিভিয়ান। ভাবতে কঠিন লাগে—সেই সিল্‌ভিয়া আজ অন্যাশ্রয়ী। বিশ্বাস ক'রতে মন চায় না। মনে হয় এ অসম্ভব। সিল্‌ভিয়াকে ছেড়ে যে পাগল হয়ে যাবে ভিভিয়ান। কোন ধূর্ত বিল্ এমাসনের ক্ষমতা নেই সিল্‌ভিয়াকে গ্রাস ক'রে নেবার।

কিন্তু কই। অনেকগুলি অভিশপ্ত বিকেল কেটে গেছে। বেসুরো এবং বেতালা ভাবেই চ'লছে সব কিছু। আজ সিল্‌ভিয়ার চোখের দিকে ভিভিয়ানের তাকাতে ভয় করে। রসাল ঠোঁটের গোড়ায় একটা বিষাক্ত দৃঢ়তা জমাট বেঁধে র'য়েছে। চিবুকের নীচে কঠিন ভাব। ভুরুর ভংগীতে উপেক্ষা।

ভিভিয়ানের মনের ঝাপ্‌সা কালো ছায়াটা আরও যেন ঘন কালো হ'য়ে উঠেছে এ কদিন। বিলের সাথে সন্ধ্যাবেলা ব'সে গল্পের আসর—হাসির মাত্রাটা আরও যেন বেড়ে গেছে সিলভিয়ার। চ'লতে চ'লতে ভিভিয়ানের মুখোমুখী হ'লে চোখের কোণে হাসি আর দর্প ক'রে জ্ব'লে ওঠে না—বরঞ্চ থম্‌থমে গম্ভীর মনে হয় মুখের ভাব।

দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবিশ্বাসের আগুনে বুক জ্বলে ভিভিয়ানের—সন্দেহের বিষে পুড়ে খাক্ হয় মন। কৃষ্ণচূড়া গাছের নীচে ব'সে নেকড়ের মত হিংস্র সবুজ হ'য়ে ওঠে চোখ।

সেদিন বিকেল বেলা ক্যাথিড্রালের বাগানের গোলাপ-ঝাড় থেকে একটা রক্ত গোলাপ হাতে তুলে নিয়েছিল ভিভিয়ান। হঠাৎ একটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল মনটা। মনে প'ড়ে গেল ভিভিয়ানের। অনেক দিন আগে একবার সিল্‌ভিয়ার সোনালী চুলে রক্ত গোলাপ গুঁজে দিয়েছিল একটা। এই বাগানেরই এক নির্জন কোণে ব'সে ব'সে।

অনেকগুলি চিন্তার জটিল জাল মাথার শিরা উপশিরায় জ্বালা ধরিয়ে দিল ভিভিয়ানের। একটা দ্বন্দ্বের জট জমে উঠল। সত্যি যদি এখনো ভিভিয়ানকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে সিল্‌ভিয়ার মন। যদি এখনও নরম গলায় এসে বলে সিল্‌ভিয়া, ভিভিয়ান আমি একটুও বদলাই নি। "সবটাই তোমার মনের ভুল।" এ আশা তো দুরাশা নাও হ'তে পারে। সেদিনকার রক্তগোলাপ কি এতই মূল্যহীন?

মাঝে মাঝে তাই মনে হয় সিল্‌ভিয়া নিরপরাধ। কখনো কখনো ভিভিয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে একটা বেদনাকরুণ ভাব ফুটে ওঠে ওর চোখে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে ছায়ার মত স'রে যায় সিল্‌ভিয়া। একটা অনুশোচনা চুপিসাড়ে উঁকি মারে ভিভিয়ানের মনে।

রান্নাঘরে কাবার্ডের সামনে দাঁড়িয়ে কাজ ক'রছিল সিল্‌ভিয়া। বহুদিন ধ'রে দুজনের কথা বন্ধ। দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ভিভিয়ান। চোখে অপরাধীর দৃষ্টি—মুখ ফ্যাকাশে। একটা শেষ বোঝাবুঝির প্রস্তাব নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ভিভিয়ান। গরমিলের বদলে মিলের সর্ত নিয়ে।

দু'এক মিনিট ইতস্তত ক'রল ভিভিয়ান। তারপর নরম গলায় আস্তে আস্তে ব'ল্ল, "সিল্‌ভিয়া, আমরা ঝগড়া-ঝাঁটি অনেক ক'রেছি। বিশ্বাস কর, আর আমার একটুও ভালো লাগছে না। পুরণো মনোমালিন্য ভুলে যাওয়া কি এতই কঠিন? আমরা কি আবার নতুন ক'রে সুরু ক'রতে পারি না? সত্যি ব'লছি, দিনের পর দিন জীবন অসহ্য ব'লে মনে হ'চ্ছে আমার।"

ভ্রূকুটিকুটিল মুখ তুলে ফিরে তাকাল সিল্‌ভিয়া। বড় বড় চোখের কোণে বিরক্তির বাষ্প। ক্লান্তির ভারী শিথিলতা রক্তের মত লাল ঠোঁটের গোড়ায়। সাপের মত সোনালী কোঁকড়ানো চুলের রাশ ঘাড়ের কাছে কেমন আপত্তির ভংগীতে জড়ানো।

ক্লান্ত গলায় অনেক অপরিচিত স্বরে অনেক দূর থেকে যেন কথা ব'লছে সিল্‌ভিয়া।

—"দোহাই ভিভিয়ান, আমাকে একটু একলা শান্তিতে থাকতে দাও।"

'একলা' এবং 'শান্তি'! সামান্য দুটি কথা যেন তিক্ত-

ভিয়ানের অগ্ন্যুৎপাৎ ঘটিয়ে দিল। এক মুহূর্তে কপালের মাংসপেশী আর চোয়ালের হাড় কঠিন হ'য়ে উ'ঠল ভিভি-য়ানের। চোখ দুটো কুটিল হ'য়ে এল সেই সাথে। মনের নরম ভাবটা থেঁৎলে গেল ভিতরে অদ্ভুত ভাবে। এতই অস্বাস্থ্যকর ভিভিয়ানের সংগ সিল্‌ভিয়ার কাছে! এতই অশান্তির বীজাণুবাহক ভিভিয়ান! কই এতদিন তো এ রকম ছিল না! গভীর রাতে ভিভিয়ানের উষ্ণ বুকের উপর মাথা রেখে সিল্‌ভিয়া ফিস্ ফিস্ ক'রে ব'লেছে, "আরো কিছুক্ষণ ভিভিয়ান, সারা রাতটা আমার শান্তিতে কাটুক।"

সমস্ত মাথার রক্ত চন্‌মন্ ক'রে উ'ঠল ভিভিয়ানের। সিল্‌ভিয়ার একটা হাত চেপে ধরল ভিভিয়ান। বোঝা-পড়ার ভংগীতে কঠিন হ'য়ে উঠ'ল চোখের দৃষ্টি।

দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ ক'রল সিল্‌ভিয়া। "হাত ছাড়, ইউ ব্রুট্।"

ব্রুট্! সারা পৃথিবী যেন একবার অন্ধকার দে'খল ভিভিয়ান। তারপর অদ্ভুত একটা দানবীয় মত্ততা এসে সহসা যেন গ্রাস ক'রল সমস্ত বুদ্ধি বিবেক। অলন্ত কয়লার মত ধক্ ধক্ ক'রে চোখ জ্ব'লে উঠল ভিভিয়ানের। চিতা-বাঘের মত হিংস্র হ'য়ে উঠল হাতের পেশী।

লম্বা দু'হাত বাড়িয়ে সিল্‌ভিয়ার মোমের মত নরম সাদা গলা চেপে ধ'রল ভিভিয়ান। পাইথন্ যেমন শিকারকে জড়িয়ে ধরে ঠিক্ সেইভাবে। তারপর সিল্‌ভিয়ার নরম গলার উপর ভিভিয়ানের অসুরের মত দশটা আঙুলের দশটা ছাপ ধীরে ধীরে ব'সে গেল। কোথাও কিছু বাধ'ল না। একেবারে অভিনয়ের মত।

তারপর আস্তে আস্তে ফের সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার দেখল ভিভিয়ান। পায়ের কাছে মাটি স'রে যাচ্ছে যেন ক্রমশঃ—চারদিক ঢাকা একটা ফিকে অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে এসে গ্রাস ক'রে ফেলছে যেন সব কিছু।

* * *

"বিশ্বাস করুন ডাঃ বোস, এরপ্রতিটি কথা সত্য—আমার জীবনের জলন্ত সত্য! এখনও ব'লবেন আপনি যে, ফুলের সংগে আমাদের মৃত্যুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়? অথচ কি আশ্চর্য, এর পিছনেই সারাটা জীবন ঘুরে মরছি। এর চাইতে বড় ট্রাজেডী ভাবতে পারেন ডক্টর?"

ডাঃ বোস আচ্ছন্নের মত ব'সে রইলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কোন উত্তর তাঁর মনে আসে নি, লোকটি যে বাগানে অনধিকার প্রবেশ ক'রেছে সে কথাও নয়।

সেক্‌সপীয়ার

অধ্যাপক আশুতোষ সেনগুপ্ত

মূল রচনা: ম্যাথ্যু আর্নল্ডের 'সেক্‌সপীয়ার'।

জ্ঞাত সর্ব্বজন—শুধু তুমিই অজ্ঞাত!
আমাদের প্রশ্নবানে অক্ষত, অটল
হাস্যানন তুমি যেন মৈনাক অচল—
তারকার দলে শুধু তব বার্ত্তা রাজে,
প্রোথিত তোমার পদ সিন্ধু জল মাঝে,
নভের অন্তর দেশে তোমার আগার,
পাদদেশে কুতূহলী নরের বিহার

তোমার রহস্যভেদে বৃথা পণ্ডশ্রম;
তোমার সংবাদ সূর্য্য, নক্ষত্রের দলে,
স্বতন্ত্র, স্বয়ম্ভু, তুমি আপনি ভাস্বর,
অলক্ষ্য-জীবনে ভ্রমি ভালই করিলে।
যে দুঃখ অমর-আত্মা পীড়ে নিরন্তর,
যে হীনতা, যে বেদনা মাথা করে নত,
তব বিজয়িনী কাব্যে প্রকাশিত স্বতঃ।

জীবনী সাহিত্যে বসওয়েল ও শ্রীম

অধ্যাপক শ্রীশান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বসওয়েলের কোন বন্ধু বসওয়েলকে বলিয়াছিলেন, "you have made them all talk Johnson." তাহার উত্তরে বসওয়েল বলিলেন "yes, I may add, I have Johnsonised the land , and I trust they will not only talk, but think, Johnson."

শ্রীশ্রীমা একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতকার শ্রীম'কে লিখিলেন "তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শুনিয়া আমার বোধ হইল, তিনিই ঐ সমস্ত কথা বলিতেছেন।" বসওয়েলের মত 'শ্রীম' ইহার কোন উত্তর দিলেন কিনা জানি না। কিন্তু সত্যের এক স্পন্দসুন্দর রূপসৃষ্টি করিলেন সেই রূপই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত।

মনে হয় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন, তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ তেমনি তাজাই রহিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাঁহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।

জীবন সাহিত্য হইবে অথচ তাহার পারিপার্শ্বিক সত্যটুকু বিসর্জন দিবে না, Imagination এর এই শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থা ভাবা কঠিন। রোমান্টিক সাহিত্য পড়িতে পড়িতে Imagination এর ঐ বল্গাহীন রূপই দেখিতে শিখিয়াছি। দেখি নাই তো যে সত্যকে সহজে দেখিলে এবং সেই দেখার অনায়াস রূপটি কী সুন্দর সাহিত্যই না সৃষ্টি করে। কথামৃতলেখকও কি ভাবিতে পারিয়াছিলেন যে শুধু সেই অমৃতকথা লিপিবদ্ধ করিতে করিতে তিনি 'জীবনকথা' রচনা করিয়া ফেলিবেন।

আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে যে আকাঙ্ক্ষা-কামনা, যে ভক্তির একান্তমূর্তি জাগাইয়া রাখিতে চাই , এই গার্হস্থ্য জীবনের দুঃখবেদনা মিটাইয়া যাহার দীপটি নিয়ত জ্বালাইয়া রাখিতেছি—শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত যে সেই দীপালোক। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সেই আরতির বিগ্রহ, 'শ্রীম' শুধু সেই বিগ্রহটির রূপসৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার আরতির দীপটিও জ্বালিয়াছেন।

জীবনী সাহিত্যের পথপ্রদর্শক ডঃ জনসন দেখাইলেন যে জীবনী সাহিত্য আমাদেরই জীবনের পাশে পাশে আর একটি জীবন কথা রচনা করে। সেই জীবন কথাকে সহজেই আমরা আমাদের করিয়া লই। ঐ জীবন কথার সাথে আমাদের আন্তর কথার যে লীলার সৃষ্টি হয়, সেই লীলারসই নাকি Biographyর মুখ্য কথা। দুইটি সহৃদয়ের এই হৃদয়সংবাদই নাকি জীবনী সাহিত্যের রসসৃষ্টির মূলে, কিন্তু জীবনকে উনকৃত বা অতিকৃত করিয়া লইবার উপায় নাই; বিষয়কে এখানে কবিচিত্তের অধিবাসনে নতুন হইবার উপায় নাই। সত্যের বাঁধা পথে চলিতে হইবে। তাঁহার মতে—"Biography lies midway between falsehood of fiction and the useless truth of history."

কিন্তু এমন করিয়া জীবনী সাহিত্যের সত্য ও কল্পনার মধ্যবর্ত্তী পথটির বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিয়া তো শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী বুঝিবার উপায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণজীবন যে আমাদের কাছে symbolএ পরিণত হইয়াছে। তাহার নামটিকে কেন্দ্র করিয়া যে বাসনার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই বাসনা বা সংস্কার হইতে স্বভাবতঃ রসসৃষ্টি ঘটে, লেখক জনচিত্তের এই ভক্তির আবেগটিকে রক্ষা করিয়াও সত্যের পথে চলিয়াছেন। লেখকের সত্যনিষ্ঠা ও গভীর সংযমের ফলেই এইরূপ সম্ভব হইয়াছে।

একপ্রকার সজ্ঞান সৃষ্টি প্রেরণা বসওয়েলের জনসন জীবনী রচনার মূলে রহিয়াছে। যাহার ফলে বিষয়ের সাথে সাথে লেখক উহার formটিও প্রথমেই দেখিতে পাইয়াছেন। তাই লেখক অনায়াসে বলিতে পারিলেন

"As it is. I will venture to say that he will be seen in this mov work completely than any man who has ever yet lired." বসওয়েল তাহার এই জীবনী সাহিত্যকে Odysseyর সাথে তুলনা করিয়াছেন কারণ, "Amidst a thousand entertaining and instructive epioodes the Hero is never long out of sight." শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের সম্বন্ধে কিন্তু অমন করিয়া বলা চলে না। উহার প্রধান চরিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ নহে 'শ্রীরামকৃষ্ণকথা এক অপূর্ব্ব বিষয় যেন ভক্তিকেই এই গ্রন্থের নায়ক করিয়াছে। অথচ লেখকের ভক্তি রোমান্টিক আবেগে নিজেকে বড় করিয়া তুলিয়া ধরে নাই। বসওয়েলের লেখা পড়িলে তাঁহার style এর কথা বার বারই মনে হয়। কিন্তু 'শ্রীম'র style যেন আমাদের সকলের style কারণ উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের খেয়ালই থাকে না।

সমালোচক Nicolson জীবনীসাহিত্যকে 'pure' এবং impure বা উহার বিশুদ্ধ এবং মিশ্ররূপ দেখাইয়াছেন, এবং বলিয়াছেন যে একপ্রকার ভক্তিচেতনা জাত জীবনী সাহিত্য প্রায়ই ঐ 'impure' শ্রেণীতে পড়ে, অর্থাৎ এখানে সত্যের সেই দীপ্তিগুণ বা intellectual quality কে ছাপাইয়া কৃত্তিগণ বা লেখকের emotion কেবলই প্রধান হইয়া উঠিতে চায়। তাহার মতে জীবনী সাহিত্যকে প্রধানতঃ সত্যের পথে চলিতে হইবে বলিয়া ঐ সাহিত্য কখনও সত্যের দীপ্তিগুণ বা intellectual quality কে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না। তিনি কার্লাইলের সেই কথাকে স্বীকার করিতে চাহেন না যে "The history of man kind is the history of its greatmen," এই ধরণের কথার মধ্যে তিনি Biographyর সত্যরূপের সাধনার পরিচয় পান নাই। ইহা তাঁহার মতে Hagiography সৃষ্টির মূলকথা। ভিক্টোরিয়ান্ যুগে নাকি Biography নামে তাই Hagiography সৃষ্টি হইয়াছে। বসওয়েল সার্থক জীবনী-সাহিত্য স্রষ্টা কারণ জীবনের শুধু সত্যছবি তিনি অঙ্কন করেন নাই, তাহার চলমান রূপটিও তিনি গ্রন্থে ধরিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু এমন করিয়া কেবল সংজ্ঞার পর সংজ্ঞা রচনা করিয়া যতই ঐ hagiography অনুসারে 'শ্রীম' রচিত কথামৃতকে বিচার করিতে যাই দেখিতে পাই যে ঠিক মিলিতেছে না। দেখি—

মানুষের দিব্যরূপটির কথা বলিতে বলিতে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সেই রূপটি কেমন অনায়াসে স্থান করিয়া লইয়াছে। কেমন অনায়াসে চারিদিকের 'জীবন কথা' আসিয়া সেই দেবকথার চারিদিকে ভীড় করিতেছে। ঘরের কথা হইতে কত সহজে মানুষ দিব্যকথায় উত্তীর্ণ হইতেছে আবার সহজেই ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে। এই আসা যাওয়ার কী সুন্দর রসরূপই না সৃষ্টি হইয়াছে। ভক্তগণ যেন সেই রসরূপের কীর্ত্তন করিতেছেন। জীবন ও জীবনাতীতের এই মিলন তো ভারতবর্ষের জীবনে অলৌকিক নহে, উহাই তো real বা অতিপ্রাকৃত, সুতরাং যাঁহার জীবনে এই অতিপ্রাকৃতের মিলন ঘটিল তাহাকে পারিপার্শ্বিক শুদ্ধ তুলিয়া ধরায় যে সাহিত্যসৃষ্টি হইল তাহা যে অসাধারণ জীবনীসাহিত্য।

বাংলা সাহিত্যে আদিতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে জীবনী সাহিত্যের যে রূপটি পাই তাহা নিতান্তই পণ্ডিতদের কথা। উহার একটি পণ সংস্করণই যেন কথামৃত। জীবনে অমৃত আস্বাদনের প্রবৃত্তি হইতে সেই ষোড়শ শতাব্দী হইতে এই ধরণের অমৃত কথার সৃষ্টি হইয়া চলিতেছে। বসওয়েলের মত সজ্ঞান একটি comic sense সেখানে জাগিয়া নাই, বসওয়েলের এই comic sense একদিকে জীবনের একটি বলিষ্ঠ রূপ আঁকিয়া চলিতেছে, অপরদিকে একটি বিশেষ কৌতুকবোধ জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে, এই কৌতুকবোধ ক্রমশই ইংরাজী সাহিত্যে তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল এবং stracheyর মধ্যে উহা একপ্রকার ব্যঙ্গে পরিণত হইল। জীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখিবার প্রয়াসে তাহাদের সাহিত্যসৃষ্টি। দূর হইতে জীবনকে দেখার বিচিত্রপ্রয়াস সেখানে কৌতুকরসাশ্রিত হইয়া জীবনকে সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু আমাদের সাহিত্য তো তেমন নহে; জীবনকে আমরা কেবলই আমাদের দিব্যচেতনার সাথে মিলাইয়া লই। আমাদের real এখনও রামায়ণ মহাভারতের real হাস্যরসের দূরত্ববিলাসের অবকাশ তো এখানে নাই। আমাদের ঐ realএরই নব্যব্যাখ্যা পাইলাম শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে। জীবনকথা এখানে ব্যাখ্যা হইয়া উঠিয়াছে সেই পরম অতিপ্রাকৃতের জীবন ব্যাখ্যা।

তাই মনে হয় জীবনকে গতিশীল দেখাইবার যে শিল্প চেতনাকে Nicolson "Boswell formula" বলিয়াছেন এখানে তাহা পাই না। জীবন এখানে কয়েকটি চিত্রের সমষ্টি; কিন্তু সেই চিত্রগুলি একটি জীবনকে হয়ত পূর্ণ জাগ্রত করে নাই, হয়ত সেই হাস্যরস পরিশ্রুত 'round character' পাই নাই; কিন্তু কয়েকটি অপূর্ব্ব চিত্র পাইলাম, সেই অমৃত কথার চিত্র।

তত্ত্বকথায় চিত্রক্ল দানের অপূর্ব্ব ক্ষমতাছিল শ্রীরামকৃষ্ণের। এই চিত্ররূপের মধ্য হইতে আমাদের গার্হস্থ্য জীবনের রূপটি ফুটিয়া উঠিত। অথচ তাহা সাধারণ হইয়াও অসাধারণ হইয়া উঠিত। ইহাই তো grand style Aristotle এর মতে যাহাকে বলা চলে to be clear without being mean পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে 'শ্রীম'ও ঐ চিত্ররূপ পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছেন। লেখকের কথা বিভিন্ন চিত্রগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেছে এবং সেই সংযোগ রক্ষাটুকুই তাহার কাজ। এই কাজও এত অনায়াসকৃত সে উহার অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হয় না।

"সন্ধ্যা হইল। ফরাশ ৺কালীমন্দিরে ও ৺রাধাকান্তের মন্দিরে ও অন্যান্য ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল। ঠাকুর ছোটখাটটিতে বসিয়া জগন্মাতার চিন্তা ও তৎপরে ঈশ্বরের নাম করিতেছেন। ঘরে ধুনা দেওয়া হইয়াছে, এক পার্শ্বে একটি পিলসুজে প্রদীপ জ্বলিতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে শাঁখঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। ৺কালীবাড়ীতে আরতি হইতেছে। শুক্লা দশমী তিথি, চতুর্দ্দিকে চাঁদের আলো।"

উপরের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে লেখক কত সহজে সত্য ঘটনাটি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই সত্যবর্ণনা 'স্বভাবোক্তি' বলিতেও যেন বাধে। অথচ এই বর্ণনার মধ্যে কত সহজে ক্ষুদ্র গৃহকোণ হইতে মন্দির হইতে, সমগ্র বিশ্বে আলো জ্বলিয়া ওঠার কী সুন্দর কাহিনী ব্যক্ত হইল। লেখক মন্দিরের কাসর ঘণ্টার আরতির আলোর কথা বলিতে বলিতে কত সহজে সেই আলো-কে সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া দিলেন, বলিলেন—

"শুক্লা দশমী তিথি, চতুর্দ্দিকে চাঁদের আলো" শ্রীরামকৃষ্ণের কথার পাশে পাশে লেখকের এই চিত্র রচনা এক 'অমৃত কথাকেই আপন করিয়া তুলিতেছে। পূজার পূর্ব্বে প্রাঙ্গণ যেমন পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়, গঙ্গাজল ছিটাইয়া শুদ্ধ করা হয়, লেখকও যেন তেমনি কয়েকটি কথা ছিটাইয়া চিত্রগুলিকে রাখিবার স্থান করিয়া লইতেছেন।

বসওয়েল নিজেকে ক্ষুদ্র করিয়াছেন, কিন্তু সেই দীনতা ভেদ করিয়াও তাঁহার সম্রাটি জনসন চিত্রের পাশাপাশি চলিতে থাকে, বসওয়েলের জনসন জীবন চরিত্রের ছবি তুলিলে জনসনের পার্শ্বে অবনতমস্তকে উপবিষ্ট বসওয়েলের ছবিটিও পাওয়া যাইবে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের ছবি তুলিলে শ্রীরামকৃষ্ণের একক জীবনের একটি ভক্তি চিত্র জাগিয়া উঠিবে। শ্রীম সেই ছবি তুলিবার অহংকৃত প্রচেষ্টার কখন যে সেখান হইতে পালাইয়া গিয়াছেন কেহই জানিতে পারেন নাই।

আমরা সাহিত্যে "রস"কে বড় স্থান দেই। ইংরাজী সাহিত্য দেয় 'সৌন্দর্য্যকে' তাই রসানন্দে আমরা সাহিত্যের formকে অস্বীকার করি, আর সৌন্দর্য্যের আবেগে ইংরাজী সাহিত্য কেবলই formকে মানিতেছে, এবং সেই form এর দ্বারা সাহিত্যের আনন্দকে পরিচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মূল আনন্দ রূপটি ঐ রসানন্দের, কিন্তু সেই রসস্রোতই প্রবাহিত হইয়া মাটির সাথে সহজ বন্ধন সৃষ্টি করিয়াছে। মাটিও সোনা হইয়া উঠিয়াছে। বসওয়েলের 'Rapid style' এর পাশে শ্রীম রচনা static বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ঐ স্থিতিশীলতা শান্তরসাশ্রিত। বসওয়েলের দ্রুততার সময়ের গতির পটভূমিকায় জীবনের ক্ষণিকতার কথা জাগিয়া উঠে কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত যেন অনন্তের পটভূমিকায় জীবনের কথা। জীবনের প্রত্যক্ষ স্পর্শের অভাব এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যক্তি জীবনের বিশেষ কথায় সমৃদ্ধ নহে বলিয়া অনেকে হয়ত ইহাকে Biography বলিবেন না। এমনকি প্রথম খণ্ডে কত তাড়াতাড়ি লেখক শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনী বলিয়া গিয়াছেন। যখনই কথোপকথনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন লেখক তখনই যেন আশ্বস্ত হইয়াছেন। কোন রকমে যেন ঐ অমৃত কথায় আসিয়া পড়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। কখনও বা 'কথামৃত' গানে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তত্ত্বকথার এমন সঙ্গীত ব্যাখ্যা বাংলা গ্রন্থে দুষ্প্রাপ্য।

বহুক্ষেত্রে অলৌকিকতার সুযোগে fact fiction হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু ভক্তির অনাবিল নিষ্ঠায়

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত জীবন কত স্বাভাবিক হইয়া উঠিয়াছে। পরমপুরুষ লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লৌকিক ও অলৌকিকের মিশ্রণে যে shock সৃষ্টি হয় তাহার মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তাঁহার গ্রন্থে এই shockজাত চমৎকৃতি বার বারই আমাদের অভিভূত করে। কিন্তু একটি সহজ ভক্তিতে হৃদয় অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠে না। লেখকের কাহিনী বর্ণনার দ্রুততার এবং ঘটনার চমৎকৃতি সংস্থাপনের মধ্যে আবর্ত্তিত হইতে হইতে সহজ ভক্তির সুরটি কেবলই কাটিয়া যাইতে থাকে।

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পড়িতে পড়িতে কখনও লেখককে ভুলি না, আর শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণময় ছাড়া কিছুই দেখি না। বর্ণনায় নাট্যরূপ বসওয়েলে দেখিয়াছি, দেখিয়াছি জনসনের চিঠি, জনসনের কথোপকথনের অপূর্ব্ব উপস্থাপন শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও নাট্যরূপ পাইয়াছে শ্রীরামকৃষ্ণ কথোপকথনে। কিন্তু ইহার নাট্যরূপ বারবারই এক অপূর্ব্ব lyric রূপ লাভ করিয়াছে। শুধু বিভিন্ন গানগুলির জন্যই নহে, সমস্ত চিত্রগুলির পিছনে মনে হয় সংকীর্ত্তনের খোল করতাল বাজিয়া চলিয়াছে। উহার মূল 'গায়ক' শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং এবং অন্যান্য চরিত্রগুলি সেই পরম সঙ্গীতের দোহারের কাজ করিতেছে। আর শ্রীম?— বোধহয় ঐ সংকীর্ত্তনের কোন নীরব কোণে দাঁড়াইয়া তন্ময়চিত্তে তাল দিয়া চলিয়াছেন এবং আপন অন্তরে সমগ্র উৎসবটিকে ভরিয়া লইতেছেন। আপন অন্তরের নিবেদনটি হয়ত বা ঐ সংকীর্ত্তনের ছন্দে ছন্দে বাজিয়া উঠিতেছে।

বিশুদ্ধি

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ক্ষীয়মান ক্ষীণ পুণ্য মোদের
নূতন তপঃ শক্তি চাহে,
আবার জোয়ার আনতে হবে—
সে আগ্রহে সে উৎসাহে।
সুদূর লক্ষ্য ভেদ করিবার
শক্তি সায়ক চাই পুনঃ তার।
সব কালিমা করবে হরণ
বৈশ্বানরের দহন দাহে।

২

বিলাসিতা, শিথিলতা—
অনাচার দূর করিতে,
লড়তে হবে বিশুদ্ধি যে—
পঞ্চতপের হোমাগ্নিতে।
অধঃপতন হচ্ছে যে দিন,
স্বেচ্ছাচারী রয় কি স্বাধীন,
শৃঙ্খলই সে আনবে ডেকে
গড়বে বানর, শিব গড়িতে।

৩

শঙ্খ, বিষাণ, ডঙ্কা, বাজুক
ঝাণ্ডা নিশান, উচ্চ রহে।
অবসাদ ও অপরাধের
জঘন্যতায় আর কি বহে?
সবাই সেনা, সবাই যে বীর—
গর্ব্ব হবে এই পৃথিবীর,
অমৃতের হায় পুত্র যারা
কারও তারা ভৃত্য নহে।

কলম্বাসের পূর্ব্বে আমেরিকা আবিষ্কার

শ্রীভাগবতদাস বরাট

আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক কলম্বাস—এ তথ্য সবারই জানা আছে। স্পেন দেশের তদানীন্তন রাজা ফার্ডিনাণ্ড ও রাণী ইসাবেলার অর্থসাহায্য নিয়ে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইতালীয় নাবিক ক্রিষ্টোফার কলম্বাস্ ভারতবর্ষ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করেন। তাঁর প্রথম আবিষ্কার বামাস, কিউবা ও অপরাপর পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রায় তিনি দক্ষিণ আমেরিকার নিম্নভূমিতে অবতরণ করেন ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে।

এরপর অপর এক ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় পৌছান। তিনি জানতেন না যে তাঁর ঠিক এক বৎসর আগে কলম্বাস আমেরিকায় এসেছিলেন। তিনি ভাবলেন যে তিনিই এই দেশটির প্রথম ও প্রধান আবিষ্কর্ত্তা। সুতরাং ঐ নূতন দেশের নাম তিনি স্বনামে আখ্যাত করেছিলেন। অনেকের ধারণা,—এই দু'জনই আমেরিকার আবিষ্কারক। এ কথা ঐতিহাসিক সত্য।

কিন্তু কয়েক বছর পূর্ব্বে দীর্ঘ গবেষণার পর দক্ষিণ আফ্রিকার একজন বৈজ্ঞানিক এই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়তর প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর মতে কলম্বাসের প্রায় ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন আরবীয় নাবিক কর্ত্তৃক আমেরিকার প্রথম আবিষ্কার হয়। উইট ওয়াটারস্ র‍্যাণ্ড নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ ডি. ডবলিউ. জেফ্রিজ জোহানেসবার্গের এক সভায় জানান যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের প্রায় চার শ' বৎসর পূর্ব্বে কয়েকজন আরবীয় নাবিক আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁদের আবিষ্কারের কাল ১০০০ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পরে বলে মনে হয়।

কলম্বাস যখন আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ করেন সেই সময় তিনি দেখতে পান যে সেখানে কতকগুলো ছোট ছোট নিগ্রো কলোনী গড়ে উঠেছে; এই নিগ্রোরা আরবাধিকৃত অঞ্চলের ক্রীতদাসদের বংশধর। প্রভু-মালিকদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার পাবার মানসে তারা গোপনে এই সকল স্থানে এসে বসবাস করে।

অধুনা টেক্সাস নদীগর্ভে কতকগুলো নিগ্রো হ্যামাটিক কঙ্কাল পাওয়া গেছে। এই কঙ্কালসমূহ প্রাপ্তির পর এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় যে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পূর্ব্বে অপর কারো দ্বারা আমেরিকা নিশ্চয়ই আবিষ্কৃত হয়েছে। ডাঃ জেফ্রিজের অভিমত এই যে আরবেরাই আফ্রিকাজাত শস্য বীজ নিয়ে গিয়ে সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় কৃষিকার্য্যের প্রবর্ত্তন করে এবং আমেরিকাজাত শস্যাদিও আফ্রিকায় নিয়ে আসে।

কলম্বাসই যে প্রথম আমেরিকা আবিষ্কারক নয়,—এ কথা স্বীকার করেন কানাডাবাসী সুধী ঐতিহাসিক জন্ মারে জিবন। কয়েক বৎসর গভীর গবেষণার পর জন্ মারে জিবন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে এশিয়াবাসী চৈনিক বৌদ্ধভিক্ষু হিউসান প্রথম প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে আমেরিকা আবিষ্কার করেন। তাঁর "Steel of Empire" গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন,—"America was first discovered from abroad by a Chinese Buddhist Priest named Hul Sien, who crossed the Pacific and landed somewhere around what is now Vancouver in 499 A. D."

অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৯৯ সালে জনৈক চৈনিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে বর্ত্তমান ভ্যাঙ্কুভারের নিকট কোনও স্থানে অবতরণ করেন। কোন বিদেশী কর্ত্তৃক ইহাই প্রথম আমেরিকা আবিষ্কার।

উত্তর আমেরিকার আবিষ্কারক যে একজন চৈনিক তা

প্রমাণ করবার জন্মে Steel of Empire গ্রন্থের লেখক বহু তথ্যের উল্লেখ করেছেন। Liang রাজবংশের রাজত্বকালে "ফুসাঙ্" পরিভ্রমণ করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউ সান। ইহা ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্তীকালে কয়েকজন ভৌগোলিক ও প্রাচ্যদেশীয় পণ্ডিত আমেরিকাকে ফুসাঙ্ নামে অভিহিত করেছেন। রাজবংশের ইতিহাসের এক অধ্যায়ে এইরূপ উল্লেখ আছে—"During the reign of * Tsi Dynesty in the first year of the year (A. D 499) Came a Biddhist priest from the kingdom, Who bore the cloister name of Hocischin (or Hui Sien meaning universal compassion) to the present district of Hunwong who narrated that Fusang is about 20,000 chinese miles in an easterly direction from Tahau (Alaska) and east of the middle kingdom."

* চীনের ইতিহাস হতে জানা যায় যে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ওখানে টসি (Tsi) রাজবংশ রাজত্ব করত।

Tom Macinnes নামে আর একজন কানাডার লেখক "Chinook Days" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে তিনি লিখেছেন যে "Chinese had visited Nootka in the west coast of vancouver island a thousand years before Columbus discovered America."

অর্থাৎ কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের এক হাজার বৎসর আগে চীনারা ভ্যাঙ্কুভারের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত নৌটকাতে এসেছিল।

প্রাচ্য দেশীয় বিখ্যাত পণ্ডিত Samuel Couting এই মত স্বীকার করেন।

চীনদেশের ইতিহাস পাঠে আমরা জানতে পারি যে সেখানে ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে Tsi রাজবংশ রাজত্ব করত। এই Tsi রাজবংশের মুদ্রা জনৈক নাবিক কর্তৃক নৌটকাতে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে।

সে যাই হোক, এই সব তথ্য হতে প্রমাণিত হয় যে কলম্বাসের আমেরিকায় পদার্পণের পূর্ব্বে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছিল। কলম্বাস আমেরিকার প্রথম আবিষ্কারক নয়।

দোপাটি

মিনতি নাথ

সাজিয়ে দেব তোমার খোঁপা
আজ দোপাটি ফুলে
রাঙা ঠোঁটে কেমন দেখ
হাসছে দুলে দুলে।
সুরমাপরা নয়ন দুটি
হেসেই যেন কুটোকুটি
লুটোপুটি খায় দোপাটি
আপন মনের ভুলে
কালো নয়ন তুলে।

ফুলের সারি সাজিয়ে দেব
আঁখির প্রদীপ জেলে
কবি যেমন ছন্দ মেলায়
উদাস নয়ন মেলে—
পাতা'র পাশে যেমন করে
ঐ দোপাটি আছে পড়ে
ওড়না ওড়ে মাথার 'পরে
আবেশ নয়ন তুলে
এসো খোঁপা খুলে।

টেষ্ট-টিউব

নারায়ণ চক্রবর্তী

[একাঙ্ক নাটিকা]

পাত্রপাত্রী

সত্যেন	...	উচ্চশিক্ষিত যুবক।
হরিহর	...	সত্যেনের বাবা।
বিনয়	...	সত্যেনের বন্ধু।
		পুলিশ অফিসার।
ডঃ সেনশর্মা	...	হনুমানমল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টার।
হনুমান মল	...	কোটিপতি
সুজর মল	...	ব্যবসায়ী।
লছমন মল	...	হনুমান মলের ছেলে।
সঞ্জয়	...	কেমিষ্ট।
রামনাথ পোদ্দার	...	ধনী ব্যবসায়ী।
রামদহিন দুবে	...	ল্যাবরেটরীর বেয়ারা।
মুনিয়া	...	হনুমান মলের কর্মচারী।
ডাঃ রায়	...	চিকিৎসক।
মনোরমা	...	সত্যেনের মা।
অঞ্জলি	...	সত্যেনের বোন।
বেলা	...	বিনয়ের বোন।

প্রথম দৃশ্য

[কলকাতার ফ্ল্যাট বাড়ি, দেড়খানা ঘর, সামনে একটু বারান্দা। চারদিকে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট ছাপ। বড়ো ঘরখানার তক্তাপোষে মলিন বিছানা পাতা। শিওরের কাছে একটি টুলে ছোটবড়ো ওষুধের শিশি। বিছানায় শুয়ে আছেন প্রৌঢ় গৃহস্বামী হরিহর, পঙ্গু। দেওয়ালে দু' তিনটে ক্যালেণ্ডার। তক্তাপোষের নীচে এক কাঁড়ি জিনিষপত্র, বাক্স, তোরঙ্গ। এককোণে আলনায় শাড়ি, জামা, সেমিজ, ধুতি, গেঞ্জি, পাঞ্জাবি ঝুলছে।]

দুপুরবেলা

হরিহর। (দুর্বল কণ্ঠে) অঞ্জলি—অঞ্জলি—অঞ্জু—

অঞ্জলি। (ঘরে ঢুকে) কী বলছ বাবা?

হরিহর। সত্যেন কি ফেরেনি এখনো?

অঞ্জলি। না বাবা, দাদা এখনো ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরেন নি—

হরিহর। তোর মা কোথায়?

অঞ্জলি। মা দরজা খুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে দাদার জন্য। ডাকব মাকে?

হরিহর। না না, থাক, কিন্তু সত্যেন কেন ফিরল না এখনো? ক'টা বাজল বল দেখি—

অঞ্জলি। দেড়টা বেজেছে বাবা। বাবা—ঐ বুঝি দাদা এলো—

হরিহর। অ্যাঁ সত্যেন এসেছে? অঞ্জু, আমায় একটু তুলে ধরত মা, বিছানায় বসিয়ে দে, উঃ এই জ্বর আমায় এমন কাবু করে ফেলেছে।

অঞ্জলি। দিচ্ছি বাবা—

(অঞ্জলি এগিয়ে এসে হরিহরকে তুলে বিছানায় বসিয়ে দিল। দরজার কাছে পদশব্দ)

সত্যেনের প্রবেশ, পেছনে পেছনে মনোরমা এলেন।

সত্যেন। (সবেগে ঘরে ঢুকে হরিহরের পায়ের ধুলো নিয়ে) বাবা—বাবা, আমি ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছি,—এ কী! বাবা তুমি অমন করছ কেন? কী হল তোমার?

মনোরমা। জ্বরটা বাড়ল নাকি?

হরিহর। না না। হয়নি কিছু। জ্বর নয়, আনন্দের ঢেউ এসে আমার সারা শরীরটাকে যেন দুলিয়ে দিয়ে গেল। আঃ, সত্যেন, বাবা, কাছে আয়, তোকে একটু দেখি। আহা, কতো রোগা হয়ে গেছিস তুই,—আর

শুধু তুই কেন, তোর মা, অঞ্জু,—সবাই,—অভাবের নিশ্বাস সবার রক্ত শুষে নিচ্ছে—

মনোরমা। অমন করে বোলোনা তুমি, আমরা বেশ আছি।

হরিহর। হ্যাঁ, বেশ তো থাকবেই। কলকাতা সহরে গোণা গুনতি দেড়শো টাকা আয়ে চারজন লোক যে কতো ভালো থাকতে পারে তা কি আর আমি জানি না? খুব জানি। জানবো না কেন, আমি যে ইকনমিক্‌স্‌এর এম-এ, তবে পা ভেঙে পঙ্গু হয়ে না পড়লে হয়তো এতটা দুরবস্থা হ'ত না তোমাদের—

মনোরমা। ওগো তুমি থামো তো। আজ আনন্দের দিনে কী সব দুঃখের পাঁচালী গাইছ—

হরিহর। আনন্দের দিন বলেই তো দুঃখের কথাগুলো মনে ভীড় করে আসছে। এগিয়ে গিয়ে সত্যেনকে যে একবার বুকে জড়িয়ে ধরব সেটুকু ক্ষমতাও যে আজ আমার নেই। এ যে কতোবড়ো দুঃখ—

সত্যেন। আমি তো তোমার পাশেই আছি বাবা, এই যে তোমাকে ছুঁয়ে আছি—

হরিহর (আবেগ ভরে) সত্যেন, তুই আমার হীরের টুকরো ছেলে—

[বাইরে থেকে গলার আওয়াজ]

বিনয়। সত্যেন আছিস নাকি?

সত্যেন। (সাড়া দিয়ে) কে? বিনয় দা? আরে এসো এসো—

[পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টারের ইউনিফর্ম পরা বিনয় ঘরে ঢুকলো, সঙ্গে কুড়ি একুশ বছরের একটি সুন্দরী, সুচারু-সজ্জা যুবতী]

বিনয়। শুধু বিনয় নয় রে, বেলাও আছে সঙ্গে। মোটর বাইকে লালবাজার যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি কলেজ ষ্ট্রীট্ ট্রাম ষ্টপে ট্রামে উঠবার নিষ্ফল চেষ্টা করছে বেলা। আমাকে দেখতে পেয়েই হুকুম করল মোটর বাইকের পেছনে করে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিতে। অন্য কোনো মেয়ে ওর আগেই তোকে অভিনন্দন জানাবে এ চিন্তাও ওর অসহ্য—

বেলা। (চাপা সুরে) আঃ, কী হচ্ছে দাদা! মাসীমা মেসোমশায় রয়েছেন না?

বিনয়। আই অ্যাম সরি। পুলিশের কাজ করে করে একেবারে কাঠখোট্টা বনে গেছি, তাই অস্থানে অনুচিত কথা গুলো মুখ ফস্কে হুড় হুড় করে হড়্‌ হড়্‌ জল-প্রপাতের মতো বেরিয়ে আসে। ওয়েল। আমার ডিউটি শেষ, এবার আমি যাই—

মনোরমা। সে কি বাবা বিনয়, এখুনি যাবে কি? একটু মিষ্টি মুখ করে যাও। সত্যেনের এম, এস, সি, পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে, ফার্ষ্ট ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছে ও—অঞ্জু, যা তো মা, রান্নাঘরে নারকেল নাড়ু আছে, প্লেটে করে নিয়ে আয় তো চারটি—

অঞ্জলি। এখুনি আনছি মা, বিনয় দা পালিও না কিন্তু— অঞ্জলির প্রস্থান

বিনয়। বেলার কাছে সব কথা শুনেছি মাসীমা। আই কংগ্রাচুলেট—ইউ সত্যেন, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্ট করেছ তুমি—

সত্যেন। ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হলে তোমার এ কথা মেনে নিতে আপত্তি করতাম না বিনয়দা।

বিনয়। আমার নামের অর্থগত গুণটুকু বেশ আয়ত্ত করেছিস তুই সত্যেন—

[প্লেটে করে চারটি নারকেল নাড়ু আর এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকলো অঞ্জলি]

অঞ্জলি। এই নাও বিনয়দা, জল আর নারকেল নাড়ু, —রসগোল্লা খাওয়াবার ক্ষমতা আমাদের নেই—

বিনয়। (প্লেট নিয়ে) অঞ্জলির জয় হোক। উঃ, যা তেষ্টা পেয়েছিল,—আর পাবেই বা না কেন? সেই কোন সকাল থেকে অনবরত টো টো করে মরছি—

অঞ্জলি। চোরগুলো সব রাতারাতি সাধু হয়ে গেলে বেশ হয়, তাই না বিনয়দা?

বিনয়। (জল খেয়ে) আঃ, বাঁচলুম। চোরগুলো সাধু হোক বা না হোক, ভেজালওয়ালারা দেশছাড়া হলে যে প্রাণটা বাঁচে আমার—

অঞ্জলি। ও, তোমার বুঝি ভেজাল ধরবার ডিউটি পড়েছে আজ কাল?

বিনয়। হ্যাঁ, আর সত্যি বলছি অঞ্জলি দেশের লোকের দুঃখ কষ্টের কথা মনে পড়লে ওদের ধরে ধরে জেলে পুরবার জন্য আমার হাত নিশপিশ করতে থাকে। চারে ভেজাল

চিনিতে, চালে, দুধ, ঘি, তেল, আটা. ডাল, মসলাপাতি, সব কিছুতেই মারাত্মক রকমের ভেজাল চলছে. এমন কি ওষুধও বাদ যায় নি—

অঞ্জলি। তা ওদের ধরে ধরে জেলে পুরতে বাধাটা কি তোমার শুনি? ওরা তো সমাজের দুষ্ট ব্রণ, ওদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়াই তো উচিত—

বিনয়। উচিত তো বটেই অঞ্জলি কিন্তু ব্যাটারা এমন সেয়ানা আর এমন আটঘাট বেঁধে কাজ করে যে তাদের টিকির নাগাল পাওয়াও শক্ত, তা ছাড়া—

অঞ্জলি। তা ছাড়া?

বিনয়। বলা উচিত নয়, তবু গোপনে বলছি, কিছু অসাধু সরকারী কর্মচারী ওদের রীতিমতো সাহায্য করে থাকে, সবচেয়ে মুস্কিল তো সেখানেই—

মনোরমা। তবু তুমি লেগে থাকো বাবা বিনয়, এতে তোমার কর্তব্য করাও হবে আবার দেশের লোকের সেবা করাও হবে। দেখ না ভেজাল জিনিষ খেয়ে খেয়ে ছেলে-বুড়ো সবার কী হাল হয়েছে, অথচ মানুষের স্বাস্থ্য না থাকলে সবই বেকার।

হরিহর। ভারতবর্ষ না হয়ে এ যদি অন্য কোনো দেশ হ'ত তা হলে এ সব অসাধু ব্যবসায়ীদের ধরে ধরে গুলি করে মারা হ'ত। একটা লোককে খুন করলে বিচারে তার ফাঁসি হবার বিধান আছে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যারা হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের জীবনে অভিশাপ ডেকে আনছে তাদের ওপর আমাদের সরকারের রুদ্র রোষ কেন যে নেমে আসে না তা বুঝি না।

সত্যেন। তুমি অত উত্তেজিত হোয়ো না বাবা, শান্ত হও—

হরিহর। কী করে শান্ত হব সত্যেন? আমার বুকের ভেতরে যে অভিযোগের ভিসুভিয়াস জ্বলছে—

বিনয়। দেরীতে হলেও গভর্ণমেণ্ট এ বার ভেজাল বন্ধ করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন। আপনি ভাববেন না মেসোমশায়, কিছুদিনের মধ্যেই আমরা তাদের শায়েস্তা করে ফেলব। আচ্ছা:, আমি এবারে চলি। এসো সত্যেন, বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাই—

সত্যেন। চলো,—বেলা তুমি একটু বোসো, আমি এখুনি আসছি—

[দরজা দিয়ে বারান্দায় এলো দু'জনে]

বিনয়। এম, এস, সি, তো পাশ করলে, এবার কি করবে?

সত্যেন। ইচ্ছা ছিল রিসার্চ করব,—বিজ্ঞান লক্ষ্মীর আশীর্বাদে নতুন কিছু আবিষ্কার করব। এ স্বপ্ন আমার বহুদিনের, কিন্তু—

বিনয়। খুব ভালো কথা, খুব ভালো কথা সত্যেন! আমাদের দেশে বিজ্ঞানগবেষকদের খুবই অভাব, তোমাদের মতো মেধাবী ছেলের দল এগিয়ে না এলে সে অভাব পুরণ হবে কী করে বলো? বিজ্ঞান কলেজে রিসার্চ করবার সুযোগ নিশ্চয়ই পাবে—

সত্যেন। কিন্তু পেলেও সে সুযোগ নিতে পারছি কই বিনয় দা?—

বিনয়। তার মানে?

সত্যেন। আমাদের আর্থিক অবস্থা তো আর তোমার অজানা নয় বিনয় দা,—মায়ের গায়ের গয়নার শেষ সোনাটুকুও আমার পড়বার খরচ মেটাতে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে, এই বয়েসেও মাকে স্কুলে শিক্ষিকার কাজ করতে হচ্ছে, অঞ্জলির পড়ার খরচ আছে, ওর বিয়ের কথাও ভাবতে হবে। বাবা বেকার কাজেই রিসার্চ স্টাইপেণ্ডের সামান্য কটা টাকা দিয়ে সংসারের খিদে মেটাবো কী করে?

[বেলার প্রবেশ]

বেলা। এখন তা হলে কী করবে তুমি সত্যেন দা?

সত্যেন। কলকাতার কোনো ফার্মে একটা চাকরী চেষ্টা করব—

বেলা। এত ভালো রেজাল্ট করে শেষে এই?

সত্যেন। কী আর করব বলো? আমার যে মুরুব্বীর জোর নেই, থাকলে হয়তো জাতীয় গবেষণাগার গুলোর কোনো একটাতে ঢুকতে পারতাম। ওকি, বিনয় দা, তুমি কি চললে নাকি?

বিনয়। হ্যাঁ তোমার কথা শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি চললুম। বেলাকে পৌঁছে দিও বিকেলে। চলি—

সত্যেন। আচ্ছা—

বিনয়ের প্রস্থান

বেলা। সত্যেন, তোমার এই সাফল্যে আমার মনে যে কী আনন্দ—

সত্যেন। মুখ ফুটে বলতে হবে না, তোমার ঐ ঝকঝকে মুখখানাই মনের সব কথা প্রকাশ করে দিচ্ছে—

বেলা। মনের সব কথাই কি আর মুখে ফুটে ওঠে?

সত্যেন। ওঠে বৈকি বেলা, আর ভালোবাসার চোখ থাকলে তা পড়ে নিতে একটুও অসুবিধা হয় না।

বেলা। সত্যি বলছ? পড়তে পেরেছ আমার মন?

সত্যেন। পেরেছি বই কি বেলা, শুধু আজই নয়, অনেক আগে, অনেক দিন ধরে—

বেলা। আমার কাছে তোমার মন কিন্তু এখনো অজ্ঞাত মহাদেশই হয়ে আছে সত্যেন।

সত্যেন। তা হয় তো এই জন্য যে আমার মনের মহাদেশ জুড়ে আছে অসংখ্য সমস্যার বিশাল অরণ্য, তোমার চোখের আলো ঢুকতে পারে না সেখানে।

বেলা। সমস্যাগুলো দু' জনের মধ্যে ভাগ হয়ে গেলে হয়তো হাল্কা হয়ে যেতো সত্যেন।

সত্যেন। তা হয়তো যেতো, কিন্তু হৃদয়লক্ষ্মীকে টেনে এনে দারিদ্র্যের আসনে বসাতে আমার বাধে বেলা—

বেলা। হৃদয় যদি পূর্ণ থাকে তবে দারিদ্র্য তাকে স্পর্শ করতে পারবে না সত্যেন, প্রেমই সব অভাব দূর করে দেবে—

সত্যেন। স্বচ্ছল তোমাদের সংসার বেলা, তাই নির্মম দারিদ্র্যের সত্যিকারের চেহারাটা তোমার চোখে পড়ে নি, তাই এমন কথা বলতে পারলে। ভাবাবেগ, মহৎ আদর্শবাদ, সব কিছুই গুঁড়িয়ে যায় অভাবের নিষ্ঠুর চাকার তলায়, ধ্বংস হয়ে যায় চরিত্র।

বাইরের দরজায় ঠক ঠক শব্দ

লছমন। (বাইরে থেকে) সত্যেন, বাড়িতে আছো নাকি? সত্যেন—

বেলা। কে যেন ডাকছে তোমাকে,—আমি যাই, মাসীমার কাছে গিয়ে একটু বসি গে— বেলার প্রস্থান

(সত্যেন দরজার দিকে এগিয়ে গেল)

সত্যেন। (দরজায় দাঁড়িয়ে) কাকে চান

লছমন। এই যে সত্যেন, কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেশন—তুই তো সেই রকম রোগাই আছিস দেখছি—

সত্যেন। কিন্তু আপনি কে? চিনলাম না তো আপনাকে—

[লছমন ভেতরে এলো। পরণে নিখুঁত স্যুট। ভুঁড়ি বেল্টের শাসন অমান্য করবার লক্ষণ দেখাচ্ছে। কপালে শ্বেত চন্দনের ফোটা; কানের লতিতে শ্বেত চন্দন, সোনার মাকড়ি, মাথায় রেশমী পাগড়ি]

লছমন। সে কি রে। আমাকে চিনতে পারলি না, আমি যে লছমনমল হনুমানমল, তোর ক্লাস ফ্রেণ্ড। হিন্দু স্কুলে এক সঙ্গে বসতাম, ম'নে নেই?

সত্যেন। (লছমনের হাত চেপে ধ'রে) বলিস কি? তুই সেই লছমন? একেবারে মারোয়াড়ী বনে গেছিস যে. ভুঁড়িখানাও বাগিয়েছিস মন্দ না—

লছমন। বাঃ বেশ কথা তো তোর! মারোয়াড়ীর ছেলে মারোয়াড়ী বনব না তো কি বাঙালী বনব? আর ভুঁড়ির কথা কি বলছিস, আমাদের ইষ্ট দেবতা গণেশ ঠাকুরের ভুঁড়ির কাছাকাছিও যেতে পারলাম কই?

সত্যেন। কিন্তু ছেলেবেলায় তোর যে বড় সাধ ছিল যে বাঙালীর মতো কথা বলবি, বাঙালীর মতো কাপড় পরবি, বাঙালীর আচার ব্যবহারের নকল করবি, তেল, আটা, তিসি, ভুষির পথই মাড়াবি না,—আর এখন দেখছি একটা হাতির মতো মুটিয়েছিস। হাতির আবার ভুঁড়ি থাকে না, তোর তো তা ও আছে দেখছি—

লছমন। (কৃত্রিম কোপে) এই, খবরদার,—ভুঁড়ি তুললে ভালো হবে না বলছি—

সত্যেন। তা না হয় নাই তুললাম, কিন্তু এতদিন পরে তুই আমার বাড়ি চিনে এলি কি করে?

লছমন। বাঃ, ছেলেবেলায় তোদের বাড়িতে কতবার এসেছি মনে নেই তোর? তোর কাছে এসে হোমটাসক গুলো করে নিয়ে যেতাম।

সত্যেন। ম্যাট্রিকে দু' বার ফেল করে সেই যে কোথায় উধাও হয়ে গেলি আর দেখাই পাইনি তোর। কী করছিস এখন?

লছমন। জাস্ত ব্যবসা—

সত্যেন। মানে ?

লছমন। বাবার কারবারে ঢুকেছি, চুটিয়ে বিজনেস করছি। আমার বাবাকে চিনিস তো ? হনুমানমল গুজরমল।

সত্যেন। পদ্মভূষণ হনুমানমল তোর বাবা। তিনি তো কোটিপতি রে—

লছমন। তা দু' দশ কোটি টাকা খাটছে বৈ কি আমাদের ব্যবসাতে—

সত্যেন। আর আমার দু' দশ পয়সারও মুরোদ নেই।

লছমন। চাকরী করতে চাস ?

সত্যেন। 'মেধো ভাত খাবি ? না হাত ধুয়ে বসে আছি'র মতো কথা বলছিস যে। শুধু চাই বললে খুব কমই বলা হল,—এক্ষুণি পেলে বর্তে যাই—

লছমন। ইয়ার্কী রাখ, আমি সিরিয়াসলি বলেছি কথাটা।

সত্যেন। আমিও কম সিরিয়াস নই লছমন।

লছমন। তবে শোন, চাকরীটা আমার বাবার হাতেই। বিজ্ঞান চর্চায় বাবার ভয়ানক উৎসাহ। পাতিপুকুরে তাঁর একটা বিরাট ল্যাবরেটরী আছে, আধুনিকতম যন্ত্রপাতি সব আছে সেখানে, আমিই তার ম্যানেজার। দশবারো-জন বিজ্ঞানী কাজ করছে সেখানে। তুই এবার ফলিত রসায়নে খুব ভালো ভাবে এম-এস-সি পাশ করেছিস শুনেই বাবা তোর সম্বন্ধে খোঁজ করতে বললেন আমাকে।

সত্যেন। বলিস কি লছমন, তোর কথা শুনে যে সেই সাত রাজার ধন মানিক খোঁজার কথা মনে পড়ছে—

লছমন। খোঁজ নিতে গিয়ে তো আমি তাজ্জব বনে গেছি, যার খোঁজে বেরিয়েছি শেষকালে সেই কিনা আমার ক্লাসফ্রেণ্ড সত্যেন! বল, আমাদের ল্যাবরেটরীতে কাজ করবি তুই ?

সত্যেন। কিন্তু আমি যে—

লছমন। তুই কি ভাবছিস তা আমি জানি সত্যেন। ভয় নেই, আমরা মারোয়াড়ী হলেও মাইনে-পত্র ভালোই দিয়ে থাকি। আপাততঃ মাসে সাড়ে ছ'শ টাকা পাবি—

সত্যেন। সাড়ে ছ'শ!

লছমন। হ্যাঁ, আর ভালো কাজ দেখাতে পারলে সেটা মাসে হাজার টাকা হয়ে যেতে দেরী হবে না, কী, রাজী ?

সত্যেন। (লছমনকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে) সত্যি বলছিস লছমন ? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো ?

লছমন। সত্যি রে সত্যি। তুই তা হলে রাজী ?

সত্যেন। রাজী ? কী বলছিস তুই ? একশো বার রাজী, হাজারবার রাজী, আঃ, আমাকে মহা দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচালি তুই লছমন। আয় আয় ভেতরে আয় মা বাবার সঙ্গে একবার দেখা করে যা, একটু চা—ওরে অঞ্জু—

লছমন। না ভাই, আজ একটু তাড়া আছে, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে জরুরী কাজে আমাকে আসানসোল যেতে হবে এক্ষুণি। তুই তা হলে কাল বেলা দশটায় বড়বাজারে আমাদের গদীতে আসিস, আমিও থাকব সেখানে।

সত্যেন। কী কাজ করতে হবে আমাকে ?

লছমন। আমাদের ল্যাবরেটরীতে ডিরেক্টারের নির্দেশ মতো রিসার্চ করবি। তবে গীতা ছুঁয়ে গোপনীয়তার শপথ নিতে হবে আগে—

সত্যেন। গোপনীয়তার শপথ ?

লছমন। হ্যাঁ, এটা আমাদের কোম্পানীর নিয়ম, যাতে আমাদের ল্যাবরেটারীর গোপন তথ্য বাইরে পাচার না হয়ে যায় তার জন্যই এই ব্যবস্থা। তোর ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই, কারণ তুই যাঁর অধীনে রিসার্চ করবি সেই ডক্টর সেনশর্মাও এই শপথ নিয়েছিলেন।

সত্যেন। ডক্টর সেনশর্মা ? কোন্ সেনশর্মা ?

লছমন। ডক্টর কমল সেনশর্মা।

সত্যেন। বলিস কি লছমন ? যিনি গতবার নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনে ফলিত রসায়ন শাখার সভাপতি ছিলেন ?

লছমন। হ্যাঁ রে হ্যাঁ, তিনিই। তিনিই আমাদের হনুমানমল ল্যাবরেটরীর অধ্যক্ষ, তিন হাজার টাকা মাইনে তাঁর।

সত্যেন। ডক্টর সেনশর্মার মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন বিজ্ঞানীর অধীনে রিসার্চ করা তো মহা সৌভাগ্যের কথা লছমন, আমার আর কোনো আপত্তি নেই—

লছমন। তা হলে ঐ কথাই রইল। কাল সকাল দশটায়, আচ্ছা, এবার আমি চলি সত্যেন—

[প্রস্থান

সত্যেন। (স্বগতঃ) একেই বলে 'খোদা যব্ দেতা তব্ ছপ্পর ফোড়কর দেতা'। মাসে সাড়ে ছ'শো টাকা মাইনে, তার ওপর ডক্টর সেনশর্মার সঙ্গে কাজ করা— (উচ্চকণ্ঠে) মা, মা, বেলা, অঞ্জলি—আর ভাবনা নেই,—দুঃখের দিনের অবসান হয়েছে, আর আমাদের ভাবনা নেই—

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিরাট লেবরেটরী। পেছন দিকে নানা ধরণের আধুনিক যন্ত্রপাতিতে ঠাসা একসার অপারেশান টেবিল, লম্বা এ্যাপ্রণ পরা তিন চারজন যুবক একমনে নানা রিএজেণ্ট নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সামনের দিকে ফাঁকা জায়গায় একটা প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল, পাশেই দুটি ইস্পাতের আলমারি। রিভলভিং চেয়ারে বসে প্রৌঢ় গবেষক ডক্টর কমল সেনশর্মা একটা মোটা খাতায় কী যেন লিখে চলেছেন একমনে। তাঁর পরণে দামি সুট, গম্ভীর মুখে ভীম দর্শন চুরুট]

বিকেলবেলা

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) পিঁপড়ের মতো মানুষ জন্মাচ্ছে, মানুষে মানুষে ছেয়ে গেল গোটা পৃথিবী, পৃথিবীর ভার লাঘব হবে কী করে? যুদ্ধ বন্ধ, রোগেও মানুষ মরে না আর, তাহলে উপায় কি?

(পেছনের পরীক্ষণ কেন্দ্র থেকে দ্রুতপদে এগিয়ে এলো সত্যেন, তার হাতে একটা টেষ্ট টিউব)

সত্যেন। আপনি কি এখন খুব বিজি আছেন ডক্টর সেনশর্মা?

ডঃ সেনশর্মা। কী বলতে চাও সত্যেন?

সত্যেন। টেষ্ট টিউবে ব্রাউন প্রেসিপিটেট পড়ছে স্যার।

ডঃ সেনশর্মা। ব্রাউন প্রেসিপিটেট্? কৈ দেখি দেখি—হ্যাঁ, তাইতো, (উৎফুল্ল স্বরে) চমৎকার চমৎকার রেজাল্ট। তোমার কাজ খুব পরিষ্কার সত্যেন—(স্বগতঃ) এই পেয়েছি অমোঘ উপাদান—

সত্যেন। দশদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে এক্সপেরিমেণ্টটা সফল হয়েছে বটে, কিন্তু এটা কী কাজে লাগবে তা তো বুঝলাম না স্যার—

ডঃ সেনশর্মা। তা না বুঝলেও ক্ষতি নেই সত্যেন। আমার নির্দেশ মতো শুধু কাজ চালিয়ে যাও তুমি—

সত্যেন। গত তিন মাস ধরে তো তাই করছি স্যার, বেশ ক'টা এক্সপেরিমেণ্ট সাক্সেসফুলও হ'ল, কিন্তু কী শিখলাম আমি? কী লাভ হ'ল আমার?

ডঃ সেনশর্মা। লাভ? তোমার? তোমার লাভ মাস গেলে মোটা মাইনে আর বাকী লাভটুকু কোম্পানীর।

সত্যেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে এ সব পরীক্ষা চালানো হচ্ছে তা তো—

ডঃ সেনশর্মা। বুঝতে পারছ না, না? বুঝতে চেও না সত্যেন, শপথ ভঙ্গ হবে, চোখ কান বুজে শুধু কাজ করে যাও—

সত্যেন। এই ল্যাবরেটরী ঘিরে রয়েছে একটা গভীর রহস্যের আবরণ, এতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসচে ডক্টর সেনশর্মা.—অথচ এতো বড়ো মডার্ণ ল্যাবরেটরী, এত সব অতি আধুনিক ইকুইপমেণ্টস, নিপুণ সহকর্মী, সবার ওপর আপনার মতো একজন মাষ্টার গাইড্, মন আনন্দে ভরে থাকবার কথা। প্রতিটি সফল এক্সপেরিমেণ্টের পর মনে যে তৃপ্তির ঢেউ ওঠে তা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। এর কারণটা কি তা বলতে পারেন স্যার?

ডঃ সেনশর্মা। পারি বইকি সত্যেন। যে রহস্যের আবরণের কথা বললে একটু আগে, তাই শুষে নিচ্ছে সব।

সত্যেন। কিন্তু কেন, কেন? কেন তা হবে ডক্টর সেনশর্মা? অজ্ঞানের অন্ধকারে প্রজ্ঞার আলো ফেলাই তো বিজ্ঞানীর ধর্ম, এ ধর্ম থেকে আমি বিচ্যুত হব কেন স্যার?

ডঃ সেনশর্মা। এর বেশী কিছু জানতে চেও না সত্যেন।

সত্যেন। কিন্তু এই অন্ধকারে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে স্যার, এই রহস্যের গুরুভার আমাকে যে পিষে মারছে—

ডঃ সেনশর্মা। এ নিষ্পেষণ কি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণের চেয়েও কঠোর সত্যেন?

সত্যেন। আপনি কি বলতে চাইছেন ডক্টর সেনশর্মা ?

ডঃ সেনশর্মা। তোমার হাতে এখন প্রতি মাসে মোটা টাকা আসছে, তার ফলে তোমার বাবার সুচিকিৎসা হচ্ছে, তোমার বোন হাসিমুখে কলেজে যাচ্ছে, তোমার মা স্কুল সেক্রেটারীর ভ্রূকুটিকে এখন আর ততটা পারোয়া করছেন না,—জীবনে এ সবের কি কোনো দাম নেই সত্যেন ?

সত্যেন। আছে ডক্টর সেনশর্মা—

ডঃ সেনশর্মা। তাহলে আর কিছু জানতে চেওনা, বুঝতে চেওনা, আমার সঙ্গে ডিস্‌কাস্ করতে চেওনা, শুধু অধীত বিদ্যাকে আমার নির্দেশে পরিচালিত করে যাও। তোমার এক মাসের কাজে খুশী হয়েছেন হনুমানমল গুজর মল, আগামী মাস থেকে তুমি সাড়ে সাতশো টাকা পাবে—

সত্যেন। সাড়ে সাত শো! কিন্তু এত টাকা পাবার উপযুক্ত কোন কাজটা আমি করেছি ডক্টর সেনশর্মা ?

ডঃ সেনশর্মা (অধীর কঠিন স্বরে) আর কোনো কথা নয় সত্যেন, আর কোনো প্রশ্নও নয়। তোমার ডেস্কে তোমার পরবর্তী কাজের নির্দেশ পৌঁছে গেছে, যাও,—কাজে লেগে যাও—

সত্যেন। যাচ্ছি স্যার। কিন্তু এই টেষ্ট টিউবের ব্রাউন প্রেসিপিটেটটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে, গিনিপিগের কিডনীতে এর একটা অদ্ভুত ক্রিয়া লক্ষ্য করেছি—

ডঃ সেনশর্মা। (ক্রুদ্ধ গর্জনে) আঃ সত্যেন বিরক্ত কোরো না আমাকে, তোমার কৌতূহল একদিন তোমার সর্বনাশ ডেকে আনবে—গো টু ইয়োর জব্ এণ্ড বি কুইক—

[সত্যেন আরও কী যেন বলতে গেল, কিন্তু ডক্টর সেনশর্মার রুদ্রমূর্তি দেখে থেমে গেল। আস্তে আস্তে ঘরের কোণে তার কাজের টেবিলের দিকে ফিরে গেল।

ডঃ সেনশর্মা। (আপন মনে) সত্যেনের কৌতূহলটা বড়ই বেশী দেখছি। ওর বিবেকটা টাকার আফিম খেয়ে ঝিমিয়ে যায় নি এখনো, তাই ওকে আমার ভয়,—কে ? কে ওখানে ?

লছমনের প্রবেশ

লছমন। আমি লছমন ডক্টর সেনশর্মা—

ডঃ সেনশর্মা। ও, এসো, বোস ঐ চেয়ারটায়। কী ব্যাপার লছমন ?

লছমন। বাবুজী সে দিন যে জিনিষটা নিয়ে পরীক্ষা করতে বলেছিলেন তা কি করা হয়েছে ডক্টর সেনশর্মা। বড্ড ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বাবুজী. আমাদের গুদামে আর মাল রাখবার জায়গা নেই কিনা—

ডঃ সেনশর্মা। হ্যাঁ হয়েছে, সত্যেনই করেছে, মাথা আছে ছেলেটার—

লছমন। হেঁ হেঁ, সে জন্যই তো ওকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসেছিলাম ডক্টর সেনশর্মা, যেমন গুরু চেলাটিও তার তেমনি হওয়া চাইতো—তা হলে পরীক্ষাটা সফল হয়েছে ওর ?

ডঃ সেনশর্মা। হাঁ, দিয়ে গেল এইমাত্র,—এই যে,—দেখ না—

(টেষ্ট টিউব উঁচু করে দেখালেন)

লছমন। কই দেখি দেখি—

(লছমন টেষ্ট টিউবটা হাতে তুলে নিল, দেখতে লাগলো লুব্ধ জলজলে চোখে)

বাঃ, খাসা রং তো, ঠিক সরষের তেলের রং—! খাসা মিশ খাবে—

ডঃ সেনশর্মা। পরিমাণ মতো এই দ্রাবণটি মেশালে শতকরা দশভাগ ওজন বেড়ে যাবে, স্বাদে বা গন্ধে বিন্দুমাত্র তফাৎ হবে না, তবে এই দ্রাবণটি রক্তের শ্বেত কণিকাকে আস্তে আস্তে ধ্বংস করে ফেলবে বলে মনে হয়—

লছমন। তা করুক না ডক্টর সেনশর্মা, আমাদের তাতে কি ? আমাদের স্রেফ্ মুনাফা লোটা নিয়ে কথা। এই নিন আপনার টেষ্ট টিউব। বাবুজী খুব খুশী হবেন এই নতুন আবিষ্কারের কথা শুনে। আচ্ছা, সত্যেনের গলা শুনছিলাম একটু আগে, ওকি কিছু আঁচ করেছে এখানকার ব্যাপার স্যাপার ?

ডঃ সেনশর্মা। না, আঁচ এখনো করে নি, তবে—

লছমন। তবে ?

ডঃ সেনশর্মা। তবে ওর মনে একটা বেয়াড়া কৌতূহল চাড়া দিয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে। এক কাজ করো, ওর মাইনেটা এবার বাড়িয়ে দাও লছমন। জানো তো, টাকার মধ্যে বিষ আছে, সে বিষে আচ্ছন্ন হয়ে থাক

ওর মন, অসাড় করে তুলুক ওর শরীর, দেখবে তখন সব কৌতূহল, সব অনুসন্ধিৎসা মরে যাবে, ও হয়ে যাবে এই টেষ্ট টিউবটার মতোই নিষ্প্রাণ—

লছমন। ঠিক আছে ডক্টর সেনশর্মা বলব আমি বাবুজীকে, বাবুজীর কোনো অমত হবে না কারণ আপনি যখন যা বলেছেন তাই তো মঞ্জুর হয়ে এসেছে চিরকাল—

ডঃ সেনশর্মা। হ্যাঁ, সে স্বাধীনতাটুকু তোমার বাবা আমাকে দিয়েছেন বলেই আমি টিঁকে আছি এখানে। এখানে আমার কথাই আইন, আমার নির্দেশ অমোঘ, কিন্তু যে দিন এর ব্যতিক্রম হবে সে দিন আমার রুদ্রমূর্তি দেখতে প্রস্তুত থেকো লছমন—

লছমন। না না, সে কি কথা, ব্যতিক্রম হবে কেন? আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্যার, সে দিন কখনো আসবে না। আমরা কারবারী লোক, আপনার মতো বিজ্ঞান প্রতিভার দাম আমরা জানি—

ডঃ সেনশর্মা। সত্যেনকেও আমি আমার মতো করেই গড়ে তুলব, ওর ওপর কেন যেন আমার একটা স্নেহ জন্মে গেছে—

লছমন। আমি তা হলে এখন যাই স্যার, বাবুজীকে নিশ্চিন্ত করি গিয়ে—

ডঃ সেনশর্মা। যাও—

লছমনের প্রস্থান

ডক্টর সেন শর্মা উঠে দাঁড়ালেন। চুরুটে ঘন ঘন টান দিয়ে দেখলেন যে চুরুটটা নিভে গেছে—

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) চুরুটটাও দেখছি সময় বুঝে নিভে গেছে, আমার কিন্তু নিভতে এখনো ঢের দেরী, দিয়াশলাইটা আবার কোথায় গেল? এই যে পেয়েছি, —আঃ-কাঠিগুলো জ্বলছে না কেন? দিয়াশলাই এর বাক্সের বদলে গোবরের পুঁটুলি দেখছি, দেশটা যে ভেজালে ছেয়ে গেল,—যাক্ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক সব, এ মেরুদণ্ডহীন জাতির বেঁচে থাকার কোনো অর্থ হয় না—

[হাত দুটো পেছনে মুঠো করে বেঁধে টেবিলের সামনে সামান্য ফাঁকা জায়গাটুকুতে পাইচারী করতে লাগলেন]

হ্যাঁ, অর্থ। অর্থই সব। সবাই বলে যে টাকাই সব কিছু কিনতে পারে বর্তমান দুনিয়ায়, মান, সম্মান, সম্ভ্রম প্রতিপত্তি, এমন কি মন্ত্রীত্বও সব কিছুই কেনা যায় টাকার জোরে। আজ আমার অনেক টাকা কিন্তু কই, তবু বুকের ভেতরে চেপে বসা সেই পুরোনো বেদনাটাকে তো সরাতে পারলাম না এখনো, ভুলতে তো পারলাম না তাকে! সে পাশে থাকলে জীবনের গতিপথ হয়তো অন্য ধারায় বইতো। উঃ কতকাল, আর কতকাল এই দুঃসহ জ্বালা বুকে বয়ে নিয়ে বেড়াবো। সুনীতি,—আমার আসতে একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল, তাই কি তুমি অভিমানে দূরে সরে গেলে!

সঞ্জয়। (এক্সপেরিমেন্ট টেবিলে কাজ করতে করতে মুখ ফিরিয়ে) স্যার—

ডঃ সেনশর্মা। (ধমক দিয়ে) ডোণ্ট ডিষ্টার্ব মি সঞ্জয়—নিজের কাজ করে যাও—

সঞ্জয়। তাই তো করছি স্যার, কিন্তু—

ডঃ সেনশর্মা। কিন্তু কী?

সঞ্জয়। এ ইকোয়েশনটায় ভুল আছে বলে মনে হচ্ছে স্যার, কেমিক্যাল রি-এ্যাকশানে ঠিক রেজাল্ট আসছে না—

ডঃ সেনশর্মা। ভুল? আমার ভুল? অসম্ভব—কমল সেনশর্মা জীবনে কোনোদিন ভুল করে নি,—হ্যাঁ, মাত্র একবার ছাড়া, আর সেই মারাত্মক ভুলের জন্যই তার জীবনটা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে—

সঞ্জয়। সে ভুল শোধরাবার আর কি কোনো উপায় নেই স্যার?

ডঃ সেনশর্মা। না সঞ্জয়, আর কোনো উপায় নেই আমার ছোট্ট ভুলের পর আমারই দেশের লোক আরও বড়ো ভুল করে বসেছে, ভুলের পাহাড় তৈরী হয়ে গেছে আর এটা এমনই মজবুত পাহাড় যে সদিচ্ছার কোনো ডিনামাইট দিয়েও এটা ভাঙা সম্ভব নয় আর—

সঞ্জয়। একজন বিজ্ঞানী হয়ে আপনার একথা মানি কি করে স্যার—

ডঃ সেনশর্মা। এমন অনেক অজ্ঞাত অন্ধকার সমস্যা আছে যার ওপর বিজ্ঞানও তার প্রখর আলো ফেলতে পারে না, মন্দকে ভালো আর ভালোকে মন্দ করা বিজ্ঞানের ক্ষমতার বাইরে সঞ্জয়।

সঞ্জয়। কিন্তু মানুষের পক্ষে তা সম্ভব স্যার, সদিচ্ছা থাকলে সমস্যার সমাধান আপনিই হয়ে যায়—

ডঃ সেনশর্মা। তা যায় বটে, কিন্তু সে মন জীবন্ত, তাজা হওয়া চাই সঞ্জয়, মানুষের মন আজ মরে গেছে, সঞ্জয়—মরে গেছে সব সদিচ্ছা। স্বার্থ আজ বিকট মূর্তি ধরে সারা পৃথিবী চষে বেড়াচ্ছে, মানুষ জাতটাতেই আজ ঘুণ ধরে গেছে। এ জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিলেই আবার পৃথিবীর বুকে নতুন মানুষের ফসল ফলবে—

সঞ্জয়। আপনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছি স্যার—

ডঃ সেনশর্মা। ভয় পাচ্ছ? ভয়? হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, (হঠাৎ পাগলের মতো হেসে উঠলেন)।

বেয়ারা রামদহিনের প্রবেশ

রামদহিন। হুজুর হুজুর—

ডঃ সেনশর্মা। ক্যা মাংতা রামদহিন?

রামদহিন। এক আওরৎ বাহর মে খড়ী থা, সত্যেন বাবুসে ভেঁট করেকে মাঙ্গতান—

ডঃ সেনশর্মা। আওরৎ? কৈসী আওরৎ?

রামদহিন। হাম নৈ থে পহচানী—সেয়ানা আউর খুবসুরৎ থা—

ডঃ সেনশর্মা। বোল দেও কোই বাহর্ কা আদমী কো হিঁয়া আনা মনা হৈ, ভেট নেহী হোগা—

রামদহিন। লেকিন হুজুর—

ডঃ সেনশর্মা। (ধমক দিয়ে) দিক মৎ করো,—যাও—

অঞ্জলি ব্যস্ত পায়ে ঘরে ঢুকে দোর গোড়ায় এসে দাঁড়াল

অঞ্জলি। আমাকে মাপ করবেন, অনুমতির অপেক্ষা না করেই ভেতরে এসেছি, বড্ড বিপদে পড়েছি বলেই--

ডঃ সেনশর্মা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে অঞ্জলির মুখে তাকিয়ে) একী, সুনীতি!! তুমি এখানে? কী আশ্চর্য! আমি যে একটু আগেই তোমার কথাই ভাবছিলাম—

অঞ্জলি। সুনীতি? সুনীতি আপনি কাকে বলছেন? আমার নাম তো অঞ্জলি,—

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) দু'জনের চেহারায় এত মিল। হঠাৎ একে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে কালের অবগুণ্ঠন-টুকু ঘুচিয়ে দিয়ে অনেক দিন আগের সেই চিরচেনা সুনীতি যেন তার ছলছল লাবণ্যের জোয়ারে ভেসে এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে—

অঞ্জলি। (স্বগতঃ) এই বুড়োটা কি রকম লোক? সেই থেকে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, কী বিশ্রী—(প্রকাশ্যে) ইয়ে,—আমার দাদা সত্যেনবাবুকে একটু ডেকে দিন না দয়া করে, বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে যে—

ডঃ সেনশর্মা। আই অ্যাম সো সরি, আমি তোমাকে অন্য কেউ বলে ভেবেছিলাম প্রথমে,—আমারই ভুল, কিছু মনে কোরোনা তুমি,—হ্যাঁ কি বলছিলে সত্যেনের কথা?

অঞ্জলি। তিনি আমার দাদা, তাঁর সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, জরুরী দরকার—

ডঃ সেনশর্মা। তোমার দাদা এখন একটা রিসার্চ নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত আছেন, এখন তো তাকে ডাকা যাবে না—

অঞ্জলি। কিন্তু আমাকে যে দেখা করতেই হবে—

ডঃ সেনশর্মা। (স্বগতঃ) কথাগুলোও অবিকল সুনীতির মতো—(প্রকাশ্যে) দেখা করতেই হবে? এতই তাড়া—

অঞ্জলি। বাঃ তাড়া হবে না? মা যে হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, খুব বাড়াবাড়ি, আমি তো দাদাকে নিয়ে যেতেই এসেছি—

ডঃ সেনশর্মা। বটে! কী হয়েছে তোমার মার?

অঞ্জলি। আজ দুপুরে ক্লাস নিতে নিতে হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেছেন, সমস্ত শরীরে খিঁচুনী, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হেড্‌মিস্ট্রেস একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ডঃ সেনশর্মা। ডাক্তার ডাকো নি?

অঞ্জলি। হ্যাঁ, খবর পেয়ে ডাক্তার রায় এসে দেখে দু'টো ইন্‌জেকশন দিয়েছেন, তিনিই বললেন—তাড়াতাড়ি দাদাকে ডেকে আনতে -

ডঃ সেনশর্মা। ভয় নেই, ইন্‌জেকশন পড়েছে,—এবার তাড়াতাড়ি সেরে উঠবেন তোমার মা।

অঞ্জলি। মা দাদাকে দেখবার জন্য খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন, ডেকে দিন না দাদাকে,—বড্ড দেরী হয়ে গেল—প্লীজ্—

ডঃ সেনশর্মা। আচ্ছা—আচ্ছা, আমি দিচ্ছি ব্যবস্থা করে,—(উঁচু গলায়) রামদহিন—

রামদহিন। (দূর থেকে) হুজুর—

ডঃ সেনশর্মা। ইধার আও জল্‌দি—

রামদহিনের প্রবেশ

রামদহিন। ফরমাইয়ে মালিক—

ডঃ সেনশর্মা। সত্যেনবাবুকো বুলাও,—তুরন্ত।

রামদহিন। বহুত আচ্ছা হুজুর,—

[প্রস্থান

ডঃ সেনশর্মা। অঞ্জলি, তুমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছো, বোসো ঐ চেয়ারটায়—

দু'জনে দু'টি চেয়ার নিয়ে বসল

ডঃ সেনশর্মা। তোমার বাবা নেই ?

অঞ্জলি। আছেন—

ডঃ সেনশর্মা। কি করেন তিনি ?

অঞ্জলি। প্রফেসরি করতেন আগে, কিন্তু হঠাৎ একদিন চলন্ত বাসে উঠতে গিয়ে এক্সিডেন্ট করে বাঁ-পাটি ভেঙে যায়,—

ডঃ সেনশর্মা। আই অ্যাম সো সরি, তোমার মা বুঝি স্কুলে পড়ান ?

অঞ্জলি। আজ্ঞে হ্যাঁ—

দ্রুত পদে সত্যেনের প্রবেশ

সত্যেন। আমায় ডাকছিলেন স্যার ? একি ! অঞ্জু ? তুই এখানে ?

অঞ্জলি। (উঠে দাঁড়িয়ে) দাদা, মা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—

সত্যেন। সে কিরে ! কখন ?

অঞ্জলি। আজ দুপুরে পেপ্‌সিনোজেন ট্যাবলেট খাবার পরেই শরীরটা মার কেমন কেমন করছিল, কিন্তু তা গ্রাহ্য না করেই মা স্কুলে গিয়েছিলেন—

সত্যেন। তারপর ?

অঞ্জলি। তারপর ক্লাস নিতে নিতে মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান।

সত্যেন। পেপ্‌সিনোজেন ট্যাবলেট তো মা বরাবরই খান, কিন্তু এ রকম তো এর আগে হয় নি কখনো—

অঞ্জলি। ডাক্তার রায়ও তাই বললেন, তারপর পেপ্‌সিনোজেনের ফাইলটা আমার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন—

ডঃ সেনশর্মা। পেপ্‌সিনোজেন ? তোমার মা পেপ্‌সিনোজেন ট্যাবলেট খান ? কিন্তু কেন ?

অঞ্জলি। ছেলেবেলা থেকেই মার পেটে মাঝে মাঝে একটা ভয়ানক যন্ত্রণা হয়—

সত্যেন। তাই ডাক্তার রায় মাকে পেপ্‌সিনোজেন ট্যাবলেট খেতে বলেছিলেন, —আমি তা হলে যাই স্যার,—এক্সপেরিমেন্টার যেটুকু বাকী আছে সেটুকু কাল এসে শেষ করব, চল্‌ অঞ্জু—

ডঃ সেনশর্মা। একটু দাঁড়াও,—(স্বগতঃ) ছেলেবেলা থেকে মাঝে মাঝে পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা ! পেপ্‌সিনোজেন পেপ্‌সিনোজেন,—তাইতো—(প্রকাশ্যে) অঞ্জলি, তোমার মা কি ছেলেবেলায় ঢাকায় থাকতেন ?

অঞ্জলি। হ্যাঁ, পার্টিশনের আগে, কিন্তু কেন বলুন তো—

ডঃ সেনশর্মা। (অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে) (স্বগতঃ) কী আশ্চর্য যোগাযোগ ! একি তবে সে ? (প্রকাশ্যে) সত্যেন, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে—

সত্যেন ও অঞ্জলি। (একসঙ্গে) সে কি ! কোথায় ?

ডঃ সেনশর্মা। তোমাদের বাড়ি, তোমার মাকে দেখতে—

সত্যেন। হঠাৎ এ খেয়াল হল কেন স্যার ?

ডঃ সেনশর্মা। পেপ্‌সিনোজেন ট্যাবলেট যে হনুমানমল গুজরমল,—না না, এ আমি কী বলছি,—মানে তোমার মায়ের অসুখের কথা শুনে মনটা হঠাৎ কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে, মরা মন যেন আবার বেঁচে উঠেছে—

অঞ্জলি। মরা মন ?

ডঃ সেনশর্মা। হ্যাঁ, যাকে হারিয়ে আমার মন মরে গিয়েছিল আজ তারই কথা বার বার মনে আসছে, মনে পড়ছে আমার প্রথম যৌবনের সঙ্গিনী সুনীতির কথা,—যাকে হারিয়ে আমি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলাম,—তার পেটেও মাঝে মাঝে একটা ভয়ানক যন্ত্রণা হ'ত, বেদনায় নীল হয়ে যেতো সারা শরীর,—তাই দেখেই তো আমি ফলিত রসায়নে এম, এস, সি পাশ করে ওষুধ তৈরীকরার ব্যাপারে রিসার্চ করতে জার্মেনী গিয়েছিলাম—যাতে তার এ দুঃসহ ব্যথা সারাবার ওষুধ আবিষ্কার করতে পারি—

অঞ্জলি। তার পর ? সারিয়ে তুললেন তাঁকে ?

ডঃ সেনশর্মা। কাকে হারাবো? আমি ফিরে আসবার আগেই যে সে ফেরার হয়ে গেল—

সত্যেন। বলেন কি স্যার ফেরার?

ডঃ সেনশর্মা। ফাঁকি দিল আমাকে—

অঞ্জলি। আহা, মারা গেছেন বুঝি?

ডঃ সেনশর্মা। না না, মারা সে যায়নি। আমি জার্মেনী থেকে ফিরে আসবার আগেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল, বাংলা দেশ ভেঙে দু' টুকরো হল, আর সেই অন্ধকার দিনে দাঙ্গার প্রাংগনে আমার জন্য চির জীবন প্রতীক্ষা করে থাকবার কথা ভুলে কোথায় যেন ভেসে গেল সুনীতি,—

সত্যেন। আহা—

ডঃ সেনশর্মা। ফিরে এসে হিন্দুস্থান আর পাকিস্থানের সব যায়গায় আমি তাকে খুঁজেছি, কিন্তু দেখা আর পাইনি, হয়তো কোনো দাঙ্গাবাজের হাতে লুঠের মাল হিসেবে পড়ে জীবন্ত কবর হয়ে গেছে তার, কিংবা হয়তো কোনো—কিন্তু সে কথা এখন থাক, চলো আমার গাড়িতে, তোমাদের পৌঁছে দিয়ে আসি, কোনো মেয়ে সুনীতির মতো কষ্ট পাচ্ছে ভাবলে আমি আর স্থির থাকতে পারি না—

সত্যেন। তবে চলুন স্যার—

তিন জনের প্রস্থান

(ষ্টেজ আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে এলো)

তৃতীয় দৃশ্য

[হনুমানমল গুজরমলের গদী। সামনে ফরাসের ওপর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে আছে হনুমানমল গুজরমল। বয়েস প্রায় ষাট, শক্ত গড়ন। পরণে খাটো ধুতি, গায়ে সাদা ফতুয়া, কপালে সাদা চন্দনের ফোঁটা, কানে মাকড়ি, বাহুতে পাঁচ ছ ভরি ওজনের সোনার তাবিজ বাঁধা। বিপুল ভুড়ি, বাঘের মতো প্রকাণ্ড মুখ। সামনে তিনটে টেলিফোন।

পেছন দিকে চার পাঁচ জন কর্মচারী লাল মলাটের খেরো খাতায় কিসের হিসেব লিখছে। কুলুঙ্গীতে গণেশ ঠাকুর। পেছনে দুটি আধুনিক লোহার সিন্দুক, তার মাথায় তেল-সিঁদুর লাগানো] (বিকেল বেলা)

হনুমানমল। (সাদা রংএর টেলিফোন তুলে) হ্যালো বোম্বাই?...কে বলছেন? হাঁ হাঁ—আমিই হনুমানমল গুজরমল,...গদী থেকে কথা বলছি, আচ্ছাঃ...বাদাম তেল কি তাও যাচ্ছে...ঠিক আছে, বিশ লাখ টাকার মাল ধরে রাখুন,...হাঁ—

রামনাথ পোদ্দারের প্রবেশ

[পাকানো চেহারা, বয়েস আন্দাজ করা শক্ত, তোবড়ানো গাল, চোখে মুখে ধূর্ততা, খদ্দরের ধুতি পাঞ্জাবি পরা, মাথায় গান্ধীটুপি]

রামনাথ। রাম রাম হনুমানমলবাবু—

হনুমানমল। (ফোন রেখে) আরে আরে রামনাথবাবু যে, কী মনে করে? বসুন—ওরে মুনিয়া, পোদ্দার মশাইকে ঠাণ্ডা সরবৎ দে—

রামনাথ। গভর্ণমেণ্ট বড়ো বাড়াবাড়ি শুরু করেছে হনুমানমলবাবু, আমি তো আর মাল ধরে রাখতে সাহস পাচ্ছি না —

(সরবৎ হাতে মুনিয়ার প্রবেশ)

হনুমানমল। নিন, আগে সরবৎ খান, ঠাণ্ডা হন।

রামনাথ (সরবৎ খেয়ে গ্লাস ফিরিয়ে দিয়ে) ঠাণ্ডা হবার জন্য সরবৎ খাবার দরকার ছিল না হনুমানমলবাবু, ভয়ে আমার হাত পা এমনিতেই ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—

মুনিয়ার প্রস্থান

হনুমানমল। বিজনেস করে আপনার চুল পেকে গেছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি এখনো পাকেনি রামনাথবাবু —

রামনাথ। এ আপনি কি বলছেন হনুমানমলবাবু? গত একমাস ধরে ছোট বড়ো সব রকমের মন্ত্রীদের হুমকিগুলো কি খবরের কাগজে পড়েন নি?

হনুমানমল। পড়েছি বৈ কি, রেডিওতে ভি শুনেছি—

রামনাথ। তবে?

হনুমানমল। পড়েছি আর মনে মনে হেসেছি—

রামনাথ। ঐ গরম গরম পাতা ভরতি বক্তৃতা পড়ে আপনি হেসেছেন?

হনুমানমল। হাসব না তো কি! আপনি কি ঐ সব হুমকিগুলো সত্যি বলে মনে করে বসে আছেন?

রামনাথ। হাঁ, তা কিছুটা—

হনুমানমল। কিছু না, কিছু না, ও সব হচ্ছে স্রেফ ভাঁওতা—

রামনাথ। ভাঁওতা, কাকে?

হনুমানমল। পাব্‌লিক নামে ছোটছেলেকে ভোলবার কথা ওসব, উচ্চাংগের রাজনীতি, আপনি ওসব নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাবেন না রামনাথবাবু—

রামনাথ। কিন্তু সেদিন যে বেশী দামে চাল বিক্রী করবার জন্ত আমাদের পাড়ার ছিদামমুদীকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে—

হনুমানমল। আরে সে তো ধরবেই,—ছিদাম মুদী, রামধন পসারী, বাঞ্ছারাম দাস, ক্ষিরি মেছুনী, নফ্‌রা জেলে, এদের তো ধরবেই পুলিশে, বিচারে দশবিশ টাকা জরিমানাও হবে, খবরের কাগজে সরকারের সুখ্যাতি বার হবে,—তা বলে কি আর আমি আপনি ধরা পড়ব? তা পড়ব না—

রামনাথ। কিন্তু—

হনুমানমল। এর মধ্যে আর কিন্তু বলে কিছু নেই রামনাথবাবু, আপনি নিশ্চিন্ত মনে চুটিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যান, কোনো মিঞার সাধ্যি নেই যে আমাদের গায়ে হাত দেয়। এই যে আমরা পার্টি ফাণ্ডে হাজার হাজার টাকা চাঁদা দিচ্ছি সে কি মাগ্‌না? পাব্‌লিকের কাছ থেকে সে টাকা সুদ সমেত তুলে নিতে হবে না? মন্ত্রীরা যতো গরম গরম বক্তৃতাই করুন আর যতো হুমকিই দিন, আমাদের গায়ে আঁচটিও লাগবে না জানবেন।

রামনাথ। এদিকে গোয়েন্দা পুলিশ কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় মজুদ তেল চাল আর ভেজালের খোঁজে ছোঁক ছোঁক করে বেড়াচ্ছে—

হনুমানমল। করুক না, হোক না ঘুরে ঘুরে হয়রাণ, আমাদের ভয়টা কি? ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে রাঘব বোয়ালদের মুখ বন্ধ করা আছে, চুনোপুঁটিরা কি করতে পারে আমাদের?

রামনাথ। কিন্তু আমি বলি কি মজুদ চালের আধা-আধি এখন বাজারে ছেড়ে দি, বাজার বেশ তেজী আছে, ভাল লাভ লোটা যাবে—

হনুমানমল। ও কথা মনের কোণেও স্থান দেবেন না রামনাথবাবু, চালের দর তো মোটে পঁয়তাল্লিশ টাকায় উঠেছে, ষাট টাকায় উঠুক তখন গুদাম খালি করার কথা ভাবা যাবে, তা ছাড়া—

রামনাথ। তা ছাড়া আবার কি?

হনুমানমল। তাছাড়া এখন একসঙ্গে বাজারে অত ছাড়লে দাম পড়ে যাবে—

রামনাথ। দেখবেন শেষে অতি লোভে তাঁতি নষ্ট না হয়—

হনুমানমল। আরে না—

(টেলিফোনের শব্দ : ক্রিং ক্রিং ক্রিং)

(ফোন তুলে) হ্যালো,…কে? সুরজপ্রসাদ?… কী ব্যাপার …ও, ঠিক আছে,…কটকে তার করে দাও, গুদাম থেকে এক দানা চালও যেন কলকাতায় না পাঠায়, হাঁ পাথর কুচির ওয়াগন আনলোড করে সে-গুলো মিলে পেষাই করে নিও, আর সেই সঙ্গে কিছু বালি…সের প্রতি যেন দু'ছটাক ওজন বেড়ে যায়—হাঁ হাঁ …আর শোন, বাজারে যত বাদাম তেল পাবে সব কিনে গুদামজাত করো…আথেরে কাজে লাগবে…হাঁ হাঁ, ভেজাল দেবে বই কি…আমি ল্যাবরেটরীতে ফোন করে জেনে নিচ্ছি কি জিনিষ মেশাতে হবে…হাঁ ঠিক আছে, আমি লছমনমলকেই পাঠাবো…আচ্ছা আচ্ছা ‥

ফোন রেখে দিল

রামনাথ। কে ফোন করছিল হনুমানমলবাবু?

হনুমানমল। রথতলার গুদাম থেকে আমার কর্মচারী সুরজপ্রসাদ—

রামনাথ। ল্যাবরেটরীর কথা কী বলছিলেন?

হনুমানমল। পাতিপুকুরে আমার একটা ল্যাবরেটরী আছে জানেন না?

রামনাথ। হাঁ, তা তো জানি, ওষুধ তৈরী হয় সেখানে—বিজ্ঞানের উৎসাহদাতা বলে বাজারে আপনার কতো নাম, গত বছর পদ্মভূষণ হলেন তো শুধু এই জন্যেই—

হনুমানমল। আপনি এখনো ছেলেমানুষই আছেন রামনাথবাবু,—আমি কারবারী লোক, ওষুধ তৈরী করতে গেলে পোষাবে কেন আমার—

রামনাথ। তবে কী হয় সেখানে?

হনুমানমল। বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা রিসার্চ করেন সেখানে, মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচা হয় আমার ঐ ল্যাবরেটরীর পেছনে—

রামনাথ। বাঃ, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্ত এত টাকা

খরচা করেন আপনি? তাই তো দেশে আপনার এত সুনাম—

হনুমানমল। আরে রাম রাম। বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য যেন আমার রাতে ঘুম হচ্ছে না। খরচা করি স্রেফ্ নিজের উন্নতির জন্য – লাখ লাখ টাকা আমদানী হচ্ছে ঐ ল্যাবরেটরী থেকে!

রামনাথ। তাই বলুন। আমি এ দিকে ভাবছিলাম যে আপনার মতো ধুরন্ধর কারবারী লোকের মাথায় আবার এ বদখেয়াল চাপল কেন?

হনুমানমল। রামনাথবাবু, আপনি আমার নিজের লোক, তাই দুটো ভেতরের কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের যুগ। ভেজালের কারবারে এই বিজ্ঞান যে কী আশ্চর্য সাহায্য করছে তা শুনলে তাক লেগে যাবে আপনার। আমার কামধেনু ঘি'র নাম শুনেছেন তো?

রামনাথ। হাঁ হাঁ। কামধেনু ঘি' তো বাজারের আর সব ঘি-কে কোনঠাসা করে, ধরতে গেলে কানা করে দিয়েছে—বাজার একেবারে ছেয়ে গেছে 'কামধেনু ঘি'এ—

হনুমানমল। বছরে পাঁচ লাখ টাকা আমদানী হয় ঐ ঘি থেকে। কোনো কেমিষ্টের বাবারও ক্ষমতা নেই যে ওটা আসল ঘি না বলে। সেইজন্যই তো ডক্টর সেন-শর্মাকে অত খাতির করে চলি আমি। 'কামধেনু ঘি'র সঙ্গে গরু বা মোষের দুধের কোনো সম্পর্কই নেই—

রামনাথ। বলেন কি হনুমানমল বাবু—

হনুমানমল। হাঁ, ওটা তৈরী হয় আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরীতে ডক্টর সেনশর্মার ফর্মুলা অনুসারে—

রামনাথ। বটে! ডক্টর সেনশর্মার মাথা তো খুব—

হনুমানমল। পনেরো বছর আগে জার্মেনী থেকে রসায়ন বিজ্ঞানে বিরাট এক ডিগ্রী নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। গভর্ণমেণ্টের চাকরী খুঁজছিল। মুরুব্বীর জোর নেই,—কে ওকে মোটা মাইনের সরকারী চাকরী দেবে? শেষটায় আমার নজরে পড়ামাত্র ওকে লুফে নিলাম আমি। ভেজাল ওষুধ তৈরী করার কাজে ওর কোনো জুড়ি নেই বাংলাদেশে—

(লাল টেলিফোন বেজে উঠল : ক্রিং ক্রিং ক্রিং)

(ফোন তুলে) হ্যালো, হাঁ আমি হনুমানমল গুজরমল কথা বল'ছ। কী বললেন? আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরী সার্চ হবে?......একী অসম্ভব কথা!...ও, ও, বুঝলাম...কখন? কাল দুপুরে? ...হ্যা হাঁ, খবরটা দিয়ে সত্যিই খুব উপকার করলেন মিষ্টার গুপ্ত, আচ্ছা, একদিন গদীতে আসবেন, প্রণামী নিয়ে যাবেন...ঠিক আছে, এখুনি সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে—

রামনাথ। কী ব্যাপার হনুমানমলবাবু?

হনুমানমল। (বিরক্ত হয়ে) আ:, সব কথা জানতে চাইবেন না রামনাথ বাবু, আপনি এবারে আসুন, আপনার সঙ্গে যে লেনদেন করবার কথাটা ছিল তা প'রে একদিন হবে—

রামনাথ। (উঠে দাঁড়িয়ে) দেখলেন তো, মন্ত্রীরা শুধু ফাঁকা আওয়াজই করে না—

হনুমানমল। ফাঁকা না আসলি সে আমি বুঝব, আপনাকে তার জন্য ভাবতে হবে না, কারবারী লোককে ঘায়েল করা অত সোজা নয়, বাঁচবার হাজার পথ খোলা আছে—

রামনাথ। আচ্ছা, আপনি তবে সেই খোলা পথই খুঁজে বার করুন, আমি এখন যাই, রাম রাম—

হনুমানমল। রাম রাম

এ মুনিয়া   রামনাথের প্রস্থান

(ভৃত্য মুনিয়ার প্রবেশ)

মুনিয়া। ক্যা কঁহতে হেঁ মালিক?

হনুমানমল। লছমনমল কো বুলাও জলদী—

মুনিয়া। অভি বুলা লাতা হুঁ মালিক—

মুনিয়ার প্রস্থান

হনুমানমল। (স্বগতঃ) পুলিশ আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরীর হদিশ পেল কি করে? এ নিশ্চয়ই ঐ সত্যেন ছোকরার কাজ, আচ্ছা গোলমালটা মিটুক, দেখে নেব তাকে। ভাগ্যিস পুলিশ মহলে আমার দু'চার জন দোস্ত আছে, তাই খবরটা আগাম পেলাম। মালপত্র সব তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলতে হবে।

(লছমনের প্রবেশ)

লছমন। হঠাৎ তলব কেন বাবুজী—

হনুমানমল। ঘরের কথা বাইরে চলে যাচ্ছে লছমন, এর কারণ কি ?

লছমন। ঘরের কথা বাইরে ?

হনুমানমল। হাঁ, খবর পেলাম যে পুলিশ আমার পাতিপুকুরের ল্যাবরেটরী সার্চ করবে—

লছমন। সে কি কথা বাবুজী ?

হনুমানমল। তুমি এখুনি চলে যাও লোকজন নিয়ে, মাল পত্র সব সরিয়ে ফেল, বিশেষ করে ভেজাল ওষুধ তৈরী করবার কোনো মাল মশলা যেন পুলিশের হাতে না পড়ে, বুঝলে ?

লছমন। ঠিক আছে বাবুজী। কিন্তু আমি ভাবছি যে পুলিশ-এ গোপন কথা জানলো কি করে ?

হনুমানমল। তোমার বন্ধু সত্যেন নতুন ঢুকেছে ল্যাবরেটরীতে, আমার মনে হয় এ তারই কাজ, আমি খবর পেলাম যে পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্টার বিনয় বোস ওর দোস্ত—

লছমন। তা যদি হয় তা হলে আমাদের হাত থেকে ওর আর নিস্তার নেই। বন্ধু বলে রেয়াৎ করব না তাকে, হাঁ—

হনুমানমল। তুমি কাল্লু মিঞাকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে, সত্যেনকে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা আমিই করব। মনে নেই সেই ভয়ানক সাধু ইনকামট্যাক্স অফিসারের কথা ? ঠিক তেমনি করেই সরাতে হবে এই সত্যেনকে—কিন্তু তুমি আর দেরী কোরোনা লছমন, এক্ষুণি রওনা হয়ে যাও—

লছমন। আচ্ছা বাবুজী

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

[সত্যেনের বাড়ি। ভেতরের ঘরের বিছানায় মনোরমা নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছেন, মাথার কাছে বসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন হরিহরবাবু। সামান্য স্বচ্ছলতার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে চারদিকে।]

সময় সন্ধ্যা

হরিহর। (মনোরমার মুখের ওপর ঝুঁকে) মনোরমা, মনোরমা, এ কি কথা বলছ না কেন ? বুকের ব্যথাটা একটু কমল ? আঃ, অঞ্জলি এখনো ফিরল না কেন, একা একা এখন আমি কী করব—

(সবেগে বেলার প্রবেশ)

বেলা। কী, কী হয়েছে মাসীমার ?

হরিহর। ঐ দেখনা, মড়ার মতো পড়ে আছে, ডেকেও সাড়া পাচ্ছিনা, কিন্তু তুমি কোত্থেকে এলে বেলা ? কে তোমাকে খবর দিল ?

বেলা। অঞ্জলি সত্যেনদাকে ডাকতে গেল পাতিপুকুর, পথে আমাদের বাড়িতে নেমে আমাকে বলল, 'মা একা আছে তুমি একবার যাও বেলাদি'—শুনেই আমি চলে এলাম—

হরিহর। বেশ করেছ, একা একা বড় ভাবনায় পড়েছিলাম।

বেলা। ডাক্তার রায়কে ডেকে আনব একবার ?

হরিহর। ডাকতে হবে না তিনি নিজেই আসবেন বলে গেছেন, ঐ দেখ, জ্ঞান ফিরল বোধ হয়—

মনোরমা। (চোখ মেলে তাকিয়ে দুর্বল স্বরে) তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে,—একটু জল—

বেলা। জল ? এখুনি দিচ্ছি মাসীমা—

(কাঁচের গ্লাস নিয়ে ঘরের কোণের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে এনে একটু একটু করে ঢেলে দিল মনোরমার মুখে) এখন কেমন বোধ করছেন মাসীমা ?

মনোরমা। আমি বোধ হয় আর বাঁচব না বেলা, তোমাদের বিয়েটা দেখে যেতে পারলাম না এই যা দুঃখ—

বেলা। অমন কথা বলবেন না মাসীমা, ডাঃ রায় মস্ত বড়ো ডাক্তার, তাঁর চিকিৎসায় নিশ্চয়ই ভালো হয়ে উঠবেন।

মনোরমা। বাঁচতেই তো আমি চাই বেলা, বাঁচার আমার বড়ো সাধ, এতদিনে একটু সুখের মুখ দেখেছি—সত্যেন কোথায় মা ?

বেলা। অঞ্জু তাকে ডাকতে গেছে, এখুনি এসে পড়বে, ঐ যে, বাইরে পায়ের শব্দ শুনছি—

[দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকলো সত্যেন, সঙ্গে অঞ্জলি, একটু পেছনে ডক্টর সেনশর্মা]

সত্যেন। মা—মা—কী হয়েছে তোমার মা ?

মনোরমা। সত্যেন এলি? কাছে আয় বাবা, তোর মুখখানা একবার দেখি—

সত্যেন। এই যে আমি মা—

মনোরমা। অবিকল—অবিকল তাঁর মতো দেখতে—জীবন্ত প্রতিচ্ছবি—

সত্যেন। মা—কী বলছ তুমি মা? অঞ্জু,—মা ভুল বকছে, শিগ্‌গির ডাক্তার রায়কে নিয়ে আয়—

মনোরমা। না বাবা, ভুল আমি বকছি না, তবে বেশ বুঝতে পারছি যে আয়ু আমার ফুরিয়ে এসেছে, উনি রইলেন, অঞ্জু রইলো, বেলাকে দেখিস, ও বড়ো ভালো মেয়ে রে,—একি! অঞ্জুর পাশে দাঁড়িয়ে ও কে? (চীৎকার করে) কে? কে ওখানে দাঁড়িয়ে?

ডঃ সেনশর্মা। (এগিয়ে এসে) আমি—আমি কমল সুনীতি—

মনোরমা। (উঠে বসবার চেষ্টা করতে করতে) কমল! তুমি—তুমি—এতদিনে এলে, আমি যে—

ডঃ সেনশর্মা। উঠো না, উঠো না—(ধরে আস্তে আস্তে মনোরমাকে শুইয়ে দিয়ে)—তোমার দেখা পেলাম এতেই আমার এতদিনের প্রতীক্ষা সার্থক হল সুনীতি—

মনোরমা। সেই তুমি এলে,—কিন্তু কতো দেরিতে, কত দেরিতে—

ডঃ সেনশর্মা। সে দেরীর জন্য আমি দায়ী ছিলাম না সুনীতি, দায়ী ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সে সময়ে শত্রুপক্ষ জার্মেনী থেকে কোনো মতেই আসা গেল না—

মনোরমা। অনেকদিন আশায় আশায় থেকে শেষে শুধু লোকলজ্জা মুছবার জন্যই ওঁকে সব কথা খুলে বললাম, উনি আমায় পায়ে ঠাঁই দিলেন, তোমার ছেলেকে নিজের ছেলে বলে মানুষ করলেন—

ডঃ সেনশর্মা। আমার ছেলে! এ তুমি বলছ কি সুনীতি?

মনোরমা। হ্যাঁ, আমাদের মুহূর্তের অসংযমের ফল ঐ সত্যেন।—আমি এখন মৃত্যু পথের পথিক তাই কোনো কথা আর গোপন করতে চাই না কমল—

ডঃ সেনশর্মা। কিন্তু এসব কথা তো কোনোদিন ঘুণাক্ষরেও—

মনোরমা। তোমার জার্মেনী যাবার আগের দিনের ঘটনা এটা, কিন্তু তোমার তো কিছু না জানবার কথা নয় কমল, আমি নিজের হাতে চিঠি দিয়েছি তোমাকে—

ডঃ সেনশর্মা। আমি অমানুষ ছিলাম না সুনীতি, বিশ্বাস করো তোমার সে চিঠি পেলে মহাসমুদ্র সাঁতরে পার হয়ে আসতাম আমি—

মনোরমা। তোমাকে অবিশ্বাস করলে আমি যে নিজের ওপরই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলব কমল, তুমি আজ দেশে জ্ঞানী গুণীদের মধ্যে একজন, এ যে আমার কত বড়ো গর্ব, কতো বড়ো দুঃখ—

ডঃ সেনশর্মা। সব মিথ্যে, সব মিথ্যে সুনীতি, আমি আর সে কমল নই, তোমাকে হারিয়ে মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি, আমি আজ এক জঘন্য নায়ক—

মনোরমা। একী বলছ তুমি! উঃ মাগো—

হরিহর। (মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে) কী হল,—কী হল মনোরমা—

ডঃ সেনশর্মা। তুমি অমন করছ কেন সুনীতি, কোথায় তোমার কষ্ট হচ্ছে বলো, একটিবার বলো, আবার আমি সেই আগের মতো কমল হব সুনীতি, পাপে ভরা পৃষ্ঠা ক'টা জীবনের খাতা থেকে ছিঁড়ে ফেলব, শুধু তুমি সুস্থ হও, সেরে ওঠো, পেয়ে আবার হারানো আমার সইবে না সুনীতি—

মনোরমা। (কষ্টের সঙ্গে) বুকের ভেতরটা কেমন যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে,—উঃ, মাগো,—কমল, কোথায় তুমি? একী—ঘরটা অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে কেন?

ডঃ সেনশর্মা। ডাক্তার, ডাক্তার,—একজন ডাক্তার চাই এক্ষুণি,—সত্যেন, বাবা,—তুমি ছুটে যাও, মাকে বাঁচাও, টাকার জন্য ভেবো না,—সুনীতি—সুনীতি—

ডাক্তার রায়ের প্রবেশ

ডাক্তার রায়। যেতে হবে না, আমি নিজেই এসেছি, কই দেখি,—আপনারা একটু সরে দাঁড়ান—

(রোগিণীকে পরীক্ষা করে দেখে গম্ভীর মুখে সিরিঞ্জ বার করে একটা ইনজেকশন দিলেন)

শেষ চেষ্টা হিসাবে এই ইনজেকশনটা দিয়ে দেখা যাক।

ডঃ সেনশর্মা। শেষ চেষ্টা। এ আপনি বলছেন কি ডাক্তারবাবু? অসুখটা কি এতই সিরিয়াস?

ডাক্তার রায়। আসল অসুখটা এমন কিছু সিরিয়াস ছিল না, তাকে সিরিয়াস করে তুলেছে একটি ভেজাল ওষুধ—

ডঃ সেনশর্মা। ভে-জা-ল-ও-ষু ধ!

ডাক্তার রায়। হ্যাঁ, ভেজাল পেপ্ সিনোজেন ট্যাবলেট। আমি অ্যানালিসিস করে তার ভেতর সায়ানাইড্ পেয়েছি। ও কি, কী হল আপনার?

ডঃ সেনশর্মা। (অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে) কই দেখি সেই স্পুরিয়াস ফাইলটা—

ডাক্তার রায়। এই যে নিন—

ডঃ সেনশর্মা। (ফাইলটা ছোঁ মেরে নিজের হাতে নিয়ে একদৃষ্টে দেখতে দেখতে) স্বগতঃ হুম্, কোনো সন্দেহই নেই, ওঃ ভগবান্, এ আমি কী করেছি, কী করেছি (প্রকাশ্যে) সুনীতি—সুনীতি—শোনো, আমিই—আমিই তোমাকে—

ডাক্তার রায়। কী বলছেন আপনি? সুনীতি কে?

ডঃ সেনশর্মা। (নতজানু হয়ে মনোরমার মাথার কাছে মুখ নিয়ে) সুনীতি,—আমিই তোমাকে খুন করেছি, আমাকে তুমি কোনোদিন ক্ষমা কোরো না—

ডাক্তার রায়। ব্যাপারটা তো কিছুই বুঝতে পারলাম না, এমন করছেন কেন ইনি, সত্যেন, কে এই ভদ্রলোক?

সত্যেন। আমার বাবা!

ডাক্তার রায়। (চমকে উঠে) তোমার বাবা!

সত্যেন। হনুমানমল ল্যাবরেটরীর ডিরেক্টর ডক্টর কমল সেনশর্মা।

ডাক্তার রায়। আপনিই বিখ্যাত ডক্টর সেনশর্মা। আমার সৌভাগ্য যে আপনার দেখা পেলাম—

ডঃ সেনশর্মা। সৌভাগ্য নয় ডাক্তারবাবু, এ আপনার দুর্ভাগ্য—

ডাক্তার রায়। এ কী বলছেন ডক্টর সেনশর্মা?

ডঃ সেনশর্মা। আমি অপরাধী ডাক্তারবাবু, মানব-সমাজের জঘন্যতম অপরাধে অপরাধী আমি। সুনীতির মতো কতো শত জীবনদীপ আমি নিভিয়ে দিয়েছি আমার বিষাক্ত নিশ্বাসে—

হরিহর। তার মানে?

[পুলিশ অফিসারের ইউনিফর্ম পরিহিত বিনয়ের প্রবেশ, সঙ্গে দু'জন কনেষ্টবল]

বিনয়। তার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি মেসোমশায়, ডক্টর সেনশর্মা, আপনাকে আমি ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করলাম,—সিপাহি,—হাতকড়া লাগাও—

কনেষ্টবল এগিয়ে এসে হাতকড়া লাগিয়ে দিল।

সত্যেন। এ তুমি কী করলে বিনুদা।

ডঃ সেনশর্মা। সত্যেন, আমার অপরাধ গুরুতর, তুমি অফিসারকে তাঁর কর্তব্য পালন করতে দাও,—অফিসার, আমি প্রস্তুত। সায়ানাইডের বিষে আচ্ছন্ন সুনীতি ঘুমিয়ে পড়েছে,—আমি জানি ওর এ ঘুম আর ভাঙবে না। আমার যাতে ফাঁসি হয় আপনি তার ব্যবস্থাই করুন অফিসার—

সত্যেন। বাবা,—বাবা—

বিনয়। বিচারের ভার আমার ওপর নয় ডক্টর সেনশর্মা, সে ভার আদালতের। তবে আপনি যদি রাজসাক্ষী হয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সব কথা খুলে বলেন তা হলে সরকারের অনুকম্পা পেতে পারেন—

ডঃ সেনশর্মা। অনুকম্পা আমি চাই না অফিসার, আমি চাই ঘৃণা, হ্যাঁ, সবাই আমাকে ঘৃণা করুক, সবাই আমাকে ধিক্কৃত করুক, এ অভিশপ্ত জীবনের অবসানই আমি চাই। তবে যাবার আগে যারা আমাকে এ পথে নামিয়েছিল তাদের মুখোশ আমি খুলে দেব। যারা টাকার জোরে আমার বিজ্ঞানপ্রতিভাকে মানুষের কল্যাণকর কাজে নিযুক্ত না করে নিযুক্ত করেছিল ভেজাল খাবার আর ভেজাল ওষুধ তৈরী করার কাজে—তাদের ওপর সরকার আর সমাজের নির্মম রোষ নেমে আসুক এই আমি দেখতে চাই—

বিনয়। তা আপনি দেখতে পাবেন ডক্টর সেনশর্মা, লছমনমল হনুমানমলকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি, হনুমানমল গুজরমলের বাড়িও এতক্ষণে ঘিরে ফেলেছে পুলিশ।

ডক্টর সেনশর্মা। আপনি ওদের চিনলেন কি করে অফিসার?

বিনয়। একটু আগেই যে আমরা পাতিপুকুরের হনুমানমল ল্যাবরেটরীতে হানা দিয়েছিলাম। আপত্তিকর

রূপময় ভারত　　　　ফটো : রামকিঙ্কর সিংহ

ইতিহাসের দ্বারপথে

ফটো : সন্তোষকুমার দাস

ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

জিনিষপত্র সরাবার সময়ে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করেছি লছমনকে। আমাদেরই পাতা ফাঁদে ধরা পড়েছে সে, তা না হলে তাদের সেই দুর্গম গুপ্ত স্থানের খোঁজ আমরা কোনোদিনই পেতাম না—

ডঃ সেনশর্মা। ভালোই হয়েছে—পৃথিবী গ্লানিমুক্ত হোক—

বেলা। কিন্তু ডক্টর সেনশর্মা যে এখানেই আছেন তা তুমি কি করে জানলে দাদা?

বিনয়। ল্যাবরেটরীর বেয়ারা রামদহিন দুবে আমাদেরই লোক, ছদ্মবেশে বেয়ারা সেজে ঢুকেছিল ওখানে—

ডঃ সেনশর্মা। কী আশ্চর্য! ওকে তো একটা হাবা-গোবা লোক বলেই জানতাম আমি—

সত্যেন। বিনয়দা, তুমি আমাকেও অ্যারেষ্ট করো, বাবার মতো আমিও তো ঐ একই অপরাধে অপরাধী—

ডঃ সেনশর্মা। না না, সত্যেন, তুমি কেন অপরাধী হতে যাবে? তুমি ফুলের মতোই নিষ্পাপ, পবিত্র। তুমি তো কিছুই জানতে না ভেতরের ব্যাপার, সে শুধু জানতাম আমি—

সত্যেন। কিন্তু আমার হাত দিয়েও তো কতো ভেজালের উপকরণ বেরিয়েছে, ঐ কালোবাজারীর পাপের টাকার বিষ আমার শরীরে ঢুকেছে—আর সেই পাপেই বুঝি মা আজ আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন। আমাকে তুমি অ্যারেষ্ট করো বিনয়দা, তোমার কর্তব্য পালন করো—

বেলা। (ছুটে এসে সত্যেনের হাত ধরে) এ কী পাগলামী করছ তুমি সত্যেন—

এত কথা জানার পরও কি আমার ওপর তোমার ঘৃণা হয় না বেলা—

বেলা। ঘৃণা! ঘৃণা হবে কেন সত্যেন? তোমার জন্মের জন্য তো তুমি দায়ী নও, না জেনে যে কাজ করেছ তার জন্যও না, তবে কেন মিছিমিছি মনে কষ্ট পাচ্ছ আর আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ—

বিনয়। তুমি সরকারের পক্ষে প্রধান সাক্ষী হবে সত্যেন, তোমার মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে যারা টাকার লোভে সমাজ ধ্বংসের কাজে লাগাতে পারে তাদের মতো ঘৃণ্য জীব আর জগতে নেই, আদালতে তাদের আসল চেহারাটা প্রকাশ করে দেবে সত্যেন।

অঞ্জলি। দাদা, বাবা, ঐ দেখ মা যেন কেমন করছে, মা—মা—

হরিহর। ডাক্তার রায়,—দেখুন দেখুন আপনার পেশেণ্টকে দেখুন।

(ডাক্তার রায় এগিয়ে এলেন)

অঞ্জলি। মা, মা, অমন করছ কেন মা? কোথায় তোমার কষ্ট হচ্ছে মা?

সত্যেন। (মনোরমার পায়ে মাথা গুঁজে) আমার পাপেই তোমার এ দশা মা—

ডঃ সেনশর্মা। অফিসার, জীবন্ত নরক কি একেই বলে? আমার বুকের ভেতরেই কি বাসা বেঁধেছে সেটা?

বিনয়। চুপ করুন, মাসীমা কী যেন বলছেন—

মনোরমা। (বিকৃত উচ্চারণে প্রলাপের ঘোরে) আমার সব কষ্ট দূর হয়ে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে,—এই তো ঢাকা সহর, ঐ বুড়ি গঙ্গা, ঐ রমনার মাঠ—আঃ, কী সুন্দর নরম সবুজ ঘাস,···কমলদা, এসো না, মাঠে নেমে দু'জনে লুকোচুরি খেলি, আমি তোমাকে ঠিক খুঁজে বার করব; কমলদা, তুমি জার্মেনী যাবে? মস্ত বৈজ্ঞানিক হবে তুমি, দেশ বিদেশের সম্মান কুড়াবে। আ ম—আমি তোমার যোগ্য নই কমলদা, আমি চলে যাচ্ছি, ঐ যে, কারা যেন হাতছানী দিয়ে ডাকছে আমাকে, যাই, যাই,—ছোটঘর থেকে বড়ো ঘরে যাই,—আঃ—

সত্যেন ও অঞ্জলি। (মনোরমার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে) মা—মা—

ডাঃ রায়। তোমাদের মা আর নেই সত্যেন—

বেলা। মেসোমশায় পড়ে যাবেন যে, আমাকে ধরুন, বসুন এই চেয়ারটাতে—

ডঃ সেনশর্মা। সুনীতি, দেখা পেয়েও আবার তোমাকে হারাতে হল, এরজন্য আর কেউ দায়ী নয়, দায়ী শুধু আমি। টাকার নেশা আমাকে ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিল। আমি কোনো দিনই তোমার যোগ্য ছিলাম না। হরিহর-বাবু মহাপ্রাণ, তুমি যোগ্য আশ্রয়ই পেয়েছিলে। অফিসার, আপনার লক-আপে নিয়ে চলুন আমাকে। আমার রক্তে বিষ আছে, একমাত্র ফাঁসির দাড়ই মুছতে পারে সে বিষ।

বিনয়। সিপাহী—লে চলো আসামীকো।

(ডঃ সেনশর্মাকে নিয়ে কনেষ্টবল দু'জন আর বিনয় আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। স্টেজে আস্তে আস্তে নেমে এলো অন্ধকার)

বাংলাগদ্য ঃ সাংবাদিকতা ঃ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

শ্রীপ্রশান্তকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এম. এ.

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের আসলনাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ নাম সংসার জীবনের। অথচ সংসার তিনি করেন নি। বিবেকানন্দের সহাধ্যায়ী। দুই বন্ধুর জীবনাচরণে তাই ঐক্যও দেখা যায়।

বাংলা সাহিত্যে আর একজন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিরল-খ্যাত হয়ে আছেন। নামে ও পদবীতে এমন সাদৃশ্যও কদাচিৎ ঘটে। শুধু নামে বা পদবীতেই বা কেন, অন্য বিষয়েও আছে ঐক্য। প্রথম ভবানীচরণের ছদ্মনাম 'প্রমথনাথ শর্ম্মা'। এ নামেই তিনি লিখেছেন 'কলিকাতা কমলালয়' 'নববাবুবিলাস', নববিবিবিলাস। উনিশ শতকের দুই দশকের ভবানীচরণ (সমাচার চন্দ্রিকার প্রকাশ বর্ষ) ওরফে প্রমথনাথ শর্ম্মাও সাংবাদিক। ব্রহ্মবান্ধব অর্থাৎ দ্বিতীয় ভবানীচরণও সাংবাদিক। দুজনেই হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কারে গভীর আশাহীন। প্রথম ভবানীচরণ শুরুতে ব্রহ্মবাদী—রামমোহন রায়ের সমর্থক। মতান্তর ঘটায় পরে তিনি 'সংবাদ চন্দ্রিকা' প্রকাশ করেন। প্রথম ভবানীচরণ সাংবাদিক, জাতীয় সংস্কার ও সংস্কৃতিতে আস্থাশীল। দ্বিতীয় ভবানীচরণ (উপাধ্যায়) প্রথম জীবনে ব্রাহ্ম, পরে খ্রীষ্টান, শেষে গোময়ভক্ষণ দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করেন। ইনিও সাংবাদিক, সংস্কার অনুগামী ও দেশাত্মবাদী। 'সংবাদ-চন্দ্রিকা'র প্রমথনাথ শর্ম্মা (প্রথম ভবানী) ব্যঙ্গবিদ্রূপের শলাকায় নগরবিলাসীদের বিদ্ধ করতে দ্বিধা করেন নি। দ্বিতীয় ভবানীচরণ (উপাধ্যায়) স্বদেশ চিন্তায় আত্মমগ্ন। ইংরেজ বিরোধিতার জলন্ত অগ্নিপিণ্ড। এঁরও লেখায় বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা আছে। আছে রঙ্গরসিকতা। কিন্তু এ বিদ্রূপ নিরাসক্ত প্রেমিকের। ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয়।

উপাধ্যায়ের সাংবাদিকতার সঙ্গে চলতি যুগের জার্ণালিজমের সবটাই অমিল। আবার প্রথম ভবানীচরণের সাংবাদিকতার সঙ্গেও আছে অনৈক্য। এই অনৈক্য, বৈসাদৃশ্যকে যুগের বিচারে দেখতে হবে।

সংবাদপত্রের সব কিছুই সাময়িক নয়। উপাধ্যায়ের "সন্ধ্যায়" যা প্রকাশিত হতো তার সবটাই সময় গণ্ডীতে আবদ্ধ নয়। কালকে অস্বীকার করে তাঁর কিছু কিছু রচনা বাংলা গদ্যে অক্ষয় পরমায়ু অর্জ্জন করেছে। অস্বীকার করা চলে না, অষ্টাদশ শতক থেকে আজকের সাহিত্য ও সাহিত্যিক সাময়িকপত্রকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে।

ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন: "...আদি নিবাস হুগলী জেলা।...অল্প বয়সে কেশব সেনের অনুরাগী হয়ে ব্রাহ্ম হন। পরে প্রথমে প্রোটেষ্টাণ্ট ও তারপরে ক্যাথলিক সাধুদের কঠোরতা দেখে তিনি ঐ ধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং সে জন্য Roman Catholic Monk হন।...'সন্ধ্যা' নানা রকম গরম গরম হাস্য-রসাত্মক প্রবন্ধ বাহির করতো। ...উপাধ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যে কি দিয়ে গেছেন তা আজকালকার লোক উপলব্ধি করে না।...উহাতে চলতি বাংলায় রসাত্মক টীকা-টিপ্পনী থাকত। একবার তিনি লিখলেন—হাইকোর্ট স্বদেশী শূয়ার। আমার মকর্দ্দমার সময় আমি statement দিয়া আদালতের সঙ্গে অসহযোগ করিলাম। পরের দিন ম্যাজিষ্ট্রেট আমার উকিল আশুতোষ চৌধুরীকে বলিল: Where do we stand now? সেই দিনই 'সন্ধ্যায়' বার হলো—"তোমরা এখন বাবুঘাটে দাঁড়িয়েছ।" (ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—শ্রীবলাই দেবশর্ম্মা লিখিত পুস্তকের ভূমিকা থেকে)।

ঐতিহাসিক নজীর বলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পত্তনে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ব্যাপক শুরু। এই যুগই বৈচিত্র্যাভিসারী গদ্যের ধীর বিকাশ। রামমোহন রায়ের সাংবাদিক ভাষা, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবোধচন্দ্রিকার' ষ্টাইল ভবানীচরণের (প্রমথনাথ শর্ম্মা) সংস্কার-বদ্ধ সাংবাদিক রচনা-

শৈলী, অক্ষয়কুমার দত্তের তত্ত্ববোধিনীর ভাষা এক নয়। সাময়িক সাহিত্য তথা সংবাদপত্রের ভাষারীতি, উপস্থাপনা-পদ্ধতি, বাক্যবিন্যাস, পদগঠন পৃথক হওয়াই স্বাভাবিক।

'সন্ধ্যা'ও দৈনিক সংবাদপত্র। প্রচলিত দৈনিকের সঙ্গে 'সন্ধ্যা'র তফাৎ অনেকটা ভাষাও স্বতন্ত্র। সে ভাষা নতুন ধরণের। মুখের ভাষায় লেখা সবচেয়ে কঠিন। বল্‌তে কি, প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষা সাধারণ পাঠকের কাছে হৃদয় সংবাদী নয়। এ ভাষার রস-বোদ্ধাদের একটা শ্রেণী আছে। সে শ্রেণী বিদগ্ধ পাঠকেরা। কিন্তু 'সন্ধ্যা'র পাঠক বিদগ্ধ এবং অ-বিদগ্ধ সকলেই। উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা', 'করালী' ও 'স্বরাজ'-পত্রিকায় যে ভাষা-রীতি নিয়েছিলেন তার কিছু কিছু অনুসরণ দেখি বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সম্পাদিত "যুগান্তর" (বিপ্লব যুগের) এবং কাজী নজরুল সম্পাদিত "ধূমকেতু" ও উপাধ্যায় ভাব-শিষ্য বলাই দেবশর্মার লেখায়। দৈনিক পত্রিকায় চ্যাটাং চ্যাটাং, রসাল ভাষার ব্যবহার সার্থকভাবে ইনিই করেছেন। সে ভাষার নমুনা: "ছেলেরা দেখ দেখরে (look look)—বোলে আমার পানে ছুটে আসে—পুরুষেরা মুচকে হাসে—আর মেমসাহেবরা একটু শিউরে উঠে বা অল্প দন্তরুচিকৌমুদী বিস্তার করে।...আমি মনে করেছিনু কেবল আমারই এই দুর্দ্দশা। তা নয়। আমার সব দেশীভায়াকে নজর-শিহরণি আর মৃদু মন্দ হাসি সহিতে হয়। তবে ইংরেজের পুষ্যিপুত্তুর সেজে হ্যাটকোট পরিলে—কতকটা গোঁজামিল দিলে বেঁচে যাওয়া যায়।...যদি রংটা মটরডালবাটার মতন হয় আর খুব পুষ্যিপুত্তুরি করা হয়—তা হোলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে।

.. এখানে একজন ভারতবাসী আছেন। ইনি ঝন্‌ঝনে সংস্কারক।

...এঁর রংটা একেবারে নবজলধরশ্যাম।...

...গ্রামান্তরে গেলাম। চাষাভূষা দেখে মনে ধারণা হয় যে, ইংরেজরা আমাদের মতনই মানুষ। সেই চাষ করে, মরাই বাঁধে, গরু চরায়।...অক্সফোর্ডে এক স্ত্রী-লোকের সভা আছে। আমাকে সেই সভার হিন্দু গৃহস্থালী সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে হয়েছিল। এক অধ্যাপকের ঘরণী ভারি বিদুষী—সভাপতি (পত্নী) ছিলেন। মেয়ের পাল সভায় উপস্থিত আর দু-একজন পুরুষও ছিল। আমাদের ছোটমেয়েরা কি রকম পুণ্যিপুকুরের যমপুকুরের ব্রত করে—গোলাপ টগর পাতায় বলেছিলাম। হিন্দু বিবাহের বিবরণ শুনে তারা ভারি খুশি। চেলী তাঙ্গানি, শয্যা তোলানি, বাসরঘর ইত্যাদিও বলতে হয়েছিল। ছাঁদনাতলায় বর কানমলা ও কীল খায় শুনে রমণীদের কেবল হো হো হাসি। ঘাটে নাইতে গিয়ে মেয়েরা কি রকম কমিটি করে—শাশুড়ী কেবল ক'নে বউকে শাসেস্তা করে, স্বামী স্ত্রী অন্যের সামনে বিশেষ গুরুজনের সমক্ষে দেখাদেখি বা কথা কইতে পারে না—আমরা ভালবেসে বিয়ে করিনে, বিয়ে করে ভালবাসি। সেদিন কোর্টে পণভঙ্গের মকদ্দমায় এক স্ত্রীলোক দাখিল হয়েছিল। তারমর্ম্ম এইরূপ—আমার প্রণয়ী (ভাবী স্বামী) আমাকে প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসে—তা আমি জানি, কিন্তু যদি কোন আকস্মিক কারণে আমায় বিবাহ না করে তাহলে আমি ১৫০ টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইব, আর সব প্রেমপত্র (Love letters) ফিরাইয়া দিব। প্রেমেও ব্যবসাদারি বাহবা সভ্যতা।" ('বিলাতপ্রবাসী সন্ন্যাসীর চিঠি')

এ পত্র বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হয়। 'বিলাত ফেরত সন্ন্যাসীর চিঠির' আরো নমুনা:

"মহামায়ার কৃপায় আমি দেশে ফিরে এসেছি। বেঁচে গেছি, হাড় জুড়িয়েছে ...খাবার সময় যে একটু হাঁ করে খাবো তার যো নেই। আবার যদি খেতে খেতে আওয়াজ হয়—একটু সপ্‌ সপ্‌ চপ্‌ চপ্‌ মড় মড় বা কট্‌ কট্‌—তাহলে নিন্দার আর সীমা থাকে না। এখানে ঘরে এসে হাঁ করে খেয়ে বাঁচি।...আহা সজনে খড়খড়ি কী মিষ্টি—যেন বিরহীর পুনর্মিলন-সুখের আভাস পাওয়া যায়:

সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।

আমার ডাক পড়ে কেবল টানাটানির বেলা॥

সজনে—বাস্তবিকই তুমি বিপদের বন্ধু। আবার লাউডগা ভাতে—কচুর শাক, মোচার ঘণ্ট ও কচি আমড়ার টক খেয়ে মনে করেছি যে পারতপক্ষে বঙ্গমাতার কোল ছেড়ে আর কোথাও যাব না।..." এতে স্বদেশপ্রাণ, স্বজাতি-প্রেমিক ব্রহ্মবান্ধবের পরিচয় পাই। এ রচনা দেশ-কেন্দ্রিক। দেশপ্রীতির এ এক স্বতন্ত্র রীতি। মাঝে মাঝে সাংবাদিক ঝাঁঝ ও পরিহাস টিপ্পনীর রঙ্গ-রসিকতা মিশে এ লেখা খাস হয়ে উঠেছে। প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের

গভীরতা এতে অনুপস্থিত। যা আছে, তার কাছে পাণ্ডিত্যের দ্যুতি ম্লান হয়ে যায়। উপাধ্যায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করে ভাবের প্রকাশ করেছেন। সে ভাব স্বদেশী ভাব। ভাব সমৃদ্ধ এই লিরিক্যাল গদ্য বাংলা গদ্যের এক নতুন শৈলী। পূর্ব্বে ও পরে এ শৈলীর খুব অল্পই অনুসরণ হয়েছে। বাংলা দেশে দু'একজন মাত্র এই রচনায় যারা পরবর্ত্তীকালে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

উপাধ্যায়ের রচনা প্রকাশের ক্ষেত্র সাময়িকপত্রিকা। তাঁর দেশ-চেতনার প্রকাশও সাময়িকপত্র। সাময়িক-পত্রের লেখায় যে চটুলতা ও হৃদয় নিবিড়তার অনুপস্থিতি থাকে, উপাধ্যায়ের রচনায় সে অভাব দেখা যায় না। লেখার ধার ও ধারা তীক্ষ্ণ কিন্তু চটুল নয়। আঘাত ব্যক্তিকে নয়, সমষ্টিকে। আঘাত যেটুকু তা পরাধীন জাতির আত্ম চেতনাকে জাগাবার জন্য। এই জাগরণের জন্য উপাধ্যায় যে রীতি অনুসরণ করেছিলেন, তাকে বাংলা গদ্যের নিজস্ব ও মৌলিক ধারা বলা চলে। তাই 'সন্ধ্যা' পত্রিকা তথা পত্রিকান্তরে লেখা প্রবন্ধসমূহকে 'উপাধ্যায়ী-ষ্টাইল' বলা সঙ্গত। এঁর বচনবিন্যাস, ভাষা প্রয়োগ এবং উপস্থাপনা রীতিতে প্রাচীনের অনুসরণ নেই, আবার প্রচলিত রীতির আনুগত্যও নেই। ব্যবহারের কৌশলে প্রবাদ প্রবচনগুলি উপাধ্যায়ী সাহিত্যকে সমৃদ্ধও কম করেনি। উপাধ্যায়ের ভাষা ও পদবিন্যাস পদ্ধতি প্রবাদ প্রবচন জাতীয়। দৃষ্টান্ত : "এই গোলাম গড়ে প্রাণ থাকিতে চায় না। স্বরাজ গড়ে যাইতে প্রাণ উড়ু উড়ু করিতেছে।" (সন্ধ্যা ১৯০৬)। "কালী মাইকি বোমা "গঙ্গাজলে বাঁধা গোস্ত," "মদন-ছাপা" (মটন-চপ্), "ফিরিঙ্গির দুয়ারে হাসেন হোসেন," "ফিরিঙ্গি-সাজিও না," "ধানী-লঙ্কার ঝাল, "হাওয়াই তো হাওয়াই কাবুলী হাওয়াই," "গোলদীঘির গোলাম খানা" (বিশ্ববিদ্যালয়)। এগুলি উপাধ্যায়ী বচন। নিজস্ব গৌরবে মণ্ডিত। তিনি বলতেন, মুদি মাকাল, পানের দোকানী সবাই পড়বে সন্ধ্যা। কাজেই সকলের বোধগম্য ভাষার প্রতি তাঁর আনুগত্য লক্ষ্য করা যায়।

এ ভাষা পশ্চিম বঙ্গের মুখের ভাষা। আটপৌরে শব্দও যে সাহিত্যে চলনীয়, উপাধ্যায় এ' কথা বুঝতেন। তাই তাঁর লেখায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন, 'এলোপাতাড়ি', 'ঠোকর', 'লাউ ডগা ভাতে' (পূর্ব্ববঙ্গে 'সিদ্ধ'), 'বকাবকি-ঝাকাঝাকি'-ইত্যাদি। এরই সঙ্গে রয়েছে তরল সংস্কৃতান্বিত শব্দ। স্বামিজী পত্রাবলীতে যেমন ইংরেজী বাংলা হিন্দীর আশ্রয় নিয়েছেন, উপাধ্যায়-জীও সেই পথ নিয়েছেন। তবে পাল পার্ব্বণ জাতীয় রচনাগুলি মুদি মাকালের পড়বার জন্য নয়। এ-গুলি পাশ্চাত্য ভাব বিলাসী, ইংরেজী শিক্ষায় অন্ধ বাঙ্গালীকে পড়াবার জন্যে।

সাহিত্যিক গরজ অপেক্ষা জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল অধিক। সেই গরজের তাগিদে তিনি 'সন্ধ্যা', 'করালী' ও 'স্বরাজ' পত্রে কলম ধরেছিলেন। এ ধরায় পেছুতে সাংবাদিক মন, চোখ ও কানই কাজ করেছে। সে মন ও চোখ সহৃদয় সামাজিকের। তাই জাতীয় রচনাগুলি হৃদয়-সংবাদী হতে পেরেছে। পেরেছে বলেই তাঁর স্বল্পপরিমিত প্রবন্ধাদি বাংলা-গদ্যের এক বিশিষ্ট অধ্যায়।

ব্রহ্মবান্ধবের পরিচয় দ্বিবিধ : সাংবাদিক ও স্বদেশ-সেবক। আগে দেশসেবক পরে সাংবাদিক। সাংবা-দিকতায় সাহিত্যিক প্রেরণা ও উপলব্ধি অপরিহার্য্য। আধুনিক যুগের সাংবাদিকতায় ভাব অপেক্ষা তথ্যের আধিক্য স্বীকৃত। ভাবমুখী সাংবাদিকতার যুগ অবসিত কিন্তু এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, স্বদেশী যুগের সাংবাদিকতায় ভাবের প্রাধান্য অপরিহার্য্য না হয়ে উপায় ছিলনা। ভাবের দুটি দিক উচ্ছ্বাসী এবং আত্ম-প্রত্যয়ী। উপাধ্যায়ের সাংবাদিক রচনা শুধু আবেগ উচ্ছ্বাস নয়, আত্মমুখী ও আত্মসচেতনী। এ ভাব জাতীয় ভাব, যাকে বলেছি 'ঘরের ভাবনা'।

ব্রহ্মবান্ধবের সাংবাদিক রচনা কোন্ কারণে সাহিত্য গুণ সম্পন্ন ? ছোট-খাটো বিষয় ভাবনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতির আত্মচৈতন্যকে চেয়েছিলেন প্রবুদ্ধ করতে। আর এই কারণেই অবলম্বন করেননি কোন কঠিন বিষয় ভাবনা। লোক সাধারণ যা বুঝতে পারে তাকেই তিনি হৃদয়গ্রাহী করে তুলতেন। এই বাছাই করার মধ্যেই সাহিত্যিক কলাকৃতি। 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব', 'জামাই-ষষ্ঠী', 'স্নানযাত্রা', '৺ কোজাগর লক্ষ্মীপূজা', 'শিব চতুর্দ্দশী', 'দোললীলা' প্রবন্ধে জাতির পালপার্ব্বণ তথা সংস্কার ও

সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছিলেন। এ জাতীয় রচনা অনেকেই লিখেছেন, কিন্তু তা তথ্য ও উক্তির ভারে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। তাঁর আবেদনের 'কলা কৌশল:

"সেই মঙ্গল দিবসে আমি নিজেকে নিবেদন করিব—ভারতের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকে নিবেদন করিব—স্বদেশীয় সমস্ত বস্তু নিবেদন করিব। এই উৎসর্গের পর নিবেদিত স্বদেশজাত দ্রব্যকে উপেক্ষা করিলে মহাপাতকে পড়িবে—পিতৃপিতামহ'দগের অবমাননা করিবে ও মূলাধার কৃষ্ণের বিরোধী হইবে।...এক-টুকরা প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়া বিদেশীর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে স্বদেশানুরাগ জন্মায় না।" —'শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসব'।

"হিন্দুর বিবাহ এক যজ্ঞ। সংসার রক্ষার মহাব্রতে আমার ভোগসুখকে বলিদান দিতে হইবে। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। তাই হিন্দুর গৃহে উদ্বেল-যৌবন দম্পতির দাম্পত্যকে ধর্ম্মবিধির দ্বারা সংযত করা হয়।... ...বিবাহ যজ্ঞে যে লোকরক্ষারূপ মঙ্গল কামনা করা হইয়াছিল তাহারই সিদ্ধির জন্য সুখময় ষষ্ঠী'টা অনুষ্ঠিত হয়।"— "জামাই ষষ্ঠী"

"তুমি যাহাতে ক্ষুদ্রতার ভিতর দিয়া মহৎকে দেখিতে পার তাহারই জন্য তিনি ছোট হইয়া আসেন। আর তুমি যদি সেই প্রেমের বিকাশে কেবল ক্ষুদ্রতাই দেখ তাহা হইলে আর গতি হইবে না। সাবধান—আজ স্নানযাত্রার দিনে ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া দাও।

"আজ স্নানযাত্রার দিনে ভেদ ভুলিয়া যাও। অসীম অম্বর হইতে ঝর ঝর ধারা ঝরিতেছে—বিপুল ভূমণ্ডল অভিষিক্ত হইতেছে। ভাল করিয়া বুঝিলে জানিতে পারিবে যে ইহা বিশ্বরূপের স্নানযাত্রা ভিন্ন আর কিছুই নহে।...যে মুহূর্ত্তে ছোটর ভিতরে বড় দেখিবে সেই মুহূর্ত্তে তোমার মুক্তির পথ খুলিবে।'—'স্নানযাত্রা'।

"আমাদের শরীর একটি জীবন্ত রথ। সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ন্তা চৈতন্যস্বরূপ আত্মা এই রথের রথী। কর্ম্মচক্রে ইহা তাড়িত, ঘূর্ণিত হইতেছে। হৃদিস্থিত হৃষীকেশ যেরূপ নিয়োগ করিতেছেন সেইরূপ ইহা চলিতেছে।...

"...এস আজ রথ দেখিতে যাই। আমাদের ছোট মন, ছোট বুদ্ধি। এস ঐ রথে বিশ্বরথ আরোপ করি, আর ঐ ছোট জগন্নাথটিকে দেখিয়ে বিশ্বনাথের ধ্যান করি।" 'রথযাত্রা'।

"যে পূজা বেদে নাই—সে পূজা পূজাই নয়। বেদে যদি কোন পূজা থাকে তো শিবপূজাই আছে।......

"...শিবচতুর্দ্দশীর দিনে কালের কাল মহাকালের পূজা করিতে হইবে। ঐ কালনিশায় সংসার-শ্মশানে তাঁহার ঘোর রূপ দেখ। তাঁহার ঊর্দ্ধনয়ন হইতে কোটি সূর্য্যের তেজের ন্যায় সংহার কোপের জ্বালা বাহির হইতেছে। তাঁহার ভূতগণ অট্টরোল তুলিয়া ভীষণ রঙ্গভঙ্গে নাচিয়া বেড়াইতেছে। আর স্বয়ং মহামায়া নৃত্যকালী রূপ ধারণ করিয়া নৃত্য করিতেছেন ও জয়া-বিজয়া—আর কত ডাকিনী যোগিনী মুণ্ডমালিনীকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ভয় পাইও না—ঐ যে রুদ্রের ঘোররূপ দেখিতেছ—উহার অন্তরে শান্ত অঘোর অদ্বৈতরূপ লুক্কায়িত আছে।...

"...এই বেদমন্ত্রের দ্বারা ভোলানাথের পূজা কর। তিনি আশুতোষ, তিনি ঘোররূপ ছাড়িয়া শান্তরূপ ধরিবেন। তিনি ভেদ বিনাশের ভিতরে অমৃত পথ দেখাইয়া দিবেন—তোমার শিবনিন্দার প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" 'শিবচতুর্দ্দশী'।

"এই দোললীলা বিশ্বব্যাপিয়া চলিতেছে। ধরাধামে নববসন্ত সমাগমে এই লীলার বিশেষ ঘটা। গ্রীষ্মের অসাড়তা নাই—বর্ষার ঝটিকা নাই—শীতের হিমপাত নাই। আবার সকল দিক নির্ম্মল ও আনন্দময়। কোথা হইতে ধীর সমীরণ ঝুরু ঝুরু বহিয়া আসিতেছে আর প্রকৃতিকে দুরু দুরু বিধূনিত করিতেছে। ঐ যে সরসী লহরী তুলিয়া নাচিতেছে আর বিকশিত কমলদলকে নাচাইতেছে উহা শ্রীহরির দোলা। তিনি ঐ লহরী-বিকম্পিত কমলদোলায় শ্রীচরণকমল রাখিয়া দুলিতেছেন। ঐ যে বল্লরী বিজড়িত নব পল্লবিত কুসুম-পরিপূরিত তরুবর অনিলস্পর্শে মৃদুমন্দ দুলিতেছে—উহাতে তিনিই দোলায়মান হইয়া বিরাজ করিতেছেন। প্রকৃতি হাসে আর দোলে—প্রকৃতির ঠাকুর হাসে আর দোলে।...কুঞ্জে কুঞ্জে মালঞ্চে মালঞ্চে কতই না লালের খেলা—ও যে আমার ঠাকুরের রঙ্গলীলা।

"...দে দোল দে দোল—আজ প্রকৃতি তাহার দেবতাকে দোলাইতেছে। আমিও এই দোলপূর্ণিমায় আমার অচল-অটল অরূপ ঠাকুরকে হৃদয় দোলায় বসাইয়া দোলাইব ও প্রেমের ফাগে—প্রকৃতির লাল রঙে—ভক্ত ভগবান দোঁহে লালে লাল হইয়া যাইব।" 'দোললীলা'।

উদ্ধৃতিগুলি থেকে কি পাচ্ছি? সমাজ, সংস্কার, ধর্ম ও উৎসবের সঙ্গে আমিত্ব ও ক্ষুদ্রত্বকে পরিহারের ঐকান্তিক আবেদন। প্রতীক ছেড়ে অরূপ অনন্তকে ভালবাসার হৃদয়াবেগ। স্বদেশীয় উৎসবকে বিশ্বউৎসবে রূপান্তরিত করার ঔদার্য্য। রয়েছে প্রকৃতি প্র ণতার নিষ্ঠা। প্রবন্ধগুলিতে শাস্ত্রীয় বচনের উদ্ধৃতির জটিলতা অনুপস্থিত। যা বুঝেছেন, আত্মপ্রত্যয়ীর হৃদয় দিয়ে তাকে ভাব-স্বচ্ছ করেছেন। অথচ, তৎসম-তদ্ভব শব্দের অঙ্গাঙ্গি মিলনে কোথাও লঘুতার সৃষ্টি হয়নি। প্রবহ-মানতাও অটুট আছে। ভাবমুখী গদ্য লিরিক্যাল। উপাধ্যায়ের গদ্যেও এই লিরিকের পরিমিত উচ্ছ্বাস। এসব রচনাকে মননশীল প্রাজ্ঞের বা গবেষণাধর্মীর নয়। নয় তার কারণ, রচনাগুলি ভাব-বিদ্ধ। ভাবের ঘরে জ্ঞানের ও মননধর্মের ছুঁৎমার্গতা থাকে না।

লেখাগুলি মূলস্বরূপে দেশকেন্দ্রিক। দেশাত্মবোধের চেতনাকে জাগাবার চেষ্টাই এতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উপাধ্যায় লিখেছেন অল্প। তাঁর স্বল্প পরিমিত লেখাকে চার ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম, দৈনন্দিন রাজনৈতিক ঘটনার কথা। ইংরেজ বিদ্বেষ, জাতি-প্রীতি। গরম গরম ভাষায় এসব রচনা পূর্ণ। আর এইগুলিই সাময়িক লেখা। সময়ের প্রয়োজনে এগুলির উদ্ভব। এদের প্রয়োজনও সীমিত। কিন্তু এরা "বিপ্লবী বাংলার সাহিত্যে" স্থান লাভের যোগ্য। দুই, পালপার্ব্বণ নিয়ে লেখা। এতে সমাজ সংস্কার ও ধর্মের মধ্য দিয়ে দেশাত্মবোধকে জাগাবার প্রয়াস আছে। আসলে এইগুলিই সাহিত্যিক রচনা। তিন, 'আমার ভারত উদ্ধার'। দেশ উদ্ধারের প্রেরণায় তিনি কি করেছেন তারই অহংসর্বস্ব ঘটনাবহুল পরিচয় আছে। এতে রয়েছে কেমন ভাবে তিনি লেকচারে আকৃষ্ট হন: "শ্যামের বাঁশী শুনিয়া যেমন গোপীজন উন্মত্ত—আমিও তদ্বৎ। আমার পিতামহী বলিতেন—নেক-চারেই দেশটাকে খেলে।" শুধু লেকচারই নয়, দেশের স্বাধীনতার জন্যে সৈনিক হবার প্রচেষ্টার কথাও এই ক্ষুদ্র-আত্মপরিচিতিতে রয়েছে। বলছেন: "কলম বাজিতে হইবে না, তলোয়ার বাজিতেই ভারত উদ্ধার হইবে।" তাই গোয়ালিয়রে সৈনিক ও যুদ্ধবিদ্যা শিখে ফিরিঙ্গি তাড়াবার চেষ্টা করেন। চার, বিলাতযাত্রী, প্রবাসী ও বিলাত-ফেরত সন্ন্যাসীর চিঠিগুলি। এতে ভ্রমণকাহিনীর আমেজ রয়েছে। সমাজ-ধর্ম শিক্ষা ও দেশাচারের নানা সংবাদে এ লেখা পূর্ণ। বিদেশটা যে কেমন, তাদের জীবন যাত্রা, খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছেদ, তাদের মেয়ে-পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অনেক কথাই তিনি বলেছেন। কিন্তু কাউকে ছোট করার বা বড় করার প্রয়াস এ সব রচনায় নেই।

বাংলার সাময়িক তথা দৈনিক পত্রের পাতায় দেশের পাল-পার্ব্বণকে কেন্দ্র করে দেশাত্মবোধক প্রবন্ধের স্রষ্টা ব্রহ্মবান্ধব। এর আগে এ জাতীয় প্রবন্ধ যে লেখা হয়নি, তা নয়। কিন্তু সে সব লেখার সঙ্গে উপাধ্যায়ের রচনার তফাৎ মূলে। অর্থাৎ উপাধ্যায়ের রচনার মূল বিষয়-ভাবনা এদের নিয়ে এবং তার প্রসার ও কেন্দ্রিকতা এদের ওপরই নির্দিষ্ট ছিল। পাশ্চাত্য-সভ্যতা ও শিক্ষার প্রসার এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরুর সময় থেকে উপাধ্যায় দেশকে চেনার ও চেনাবার যে পদ্ধতি নিয়েছিলেন, নানা কারণেই তা নতুন। এসব রচনা সাহিত্যসৃষ্টির জন্যে না হলেও এরা বাংলা গদ্যসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান পাবার যোগ্য।

উগ
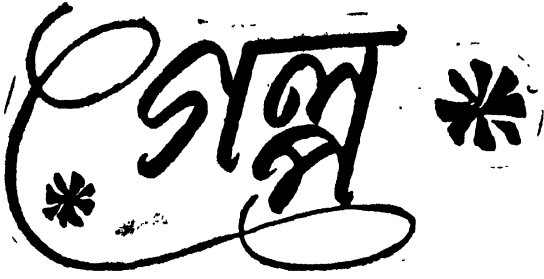
রথীন সরকার

ডালহৌসী টু কলেজস্কোয়ার। বড়ো জোর আধঘণ্টার পথ। কিন্তু এটুকু পথই অতিক্রম করতে আপনাকে গলদ্‌ঘর্ম হতে হবে। বিশেষ করে আপনি যদি অফিস ফেরতা হন! দেখবেন এক একটি বাস আসছে যেন টালমাতাল হয়ে। থামছে কি থামছে না। কিন্তু তারই মধ্যে সকরুণ আবেদন আসবে, একটু করুণ মিনতি—দাদা, পা রাখার জায়গাটা—

অথচ সেই সৌভাগ্যবান্ ফুটবোর্ডটি তখন দু'ডজন পদযুগলের মহিমায় মণ্ডিত। নেহাৎ বাস চড়িয়েরা রীতিমত কসরৎ জানা লোক—তাই যা রক্ষে।

ফিরছিলাম বাদুড়ঝোলা হয়ে। ভেতরে অসহ্য চাপ মানুষে মানুষে জমাট বেধে গেছে। তাই ট্রাপিজের খেলা দেখাচ্ছিলাম ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই। হঠাৎ ভেতরে একটা গুঞ্জন শুরু হলো—চোর—চোর।

বক্তব্য অনুধাবন করবার পূর্বেই অঘটনটা ঘটে গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। আর একদল হুড়মুড় করে নেমে পড়লেন একটা জোয়ান ছোকরাকে টানতে টানতে। পথচারী লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। একে একে জনতা।

—কি হয়েছে মশাই?

—কি আর শুনি তাই বলুন। পকেটমার, পকেটমার।

—পকেটমার! আমার পাশের ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, দিন দিন আচ্ছা করে গোটা দুই রদ্দা দিয়ে দিন। ব্যাটার শিক্ষা হোক। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখেছেন দুপুরে ডাকাতি।

বললাম, ওদের আর দিন রাত্রি কি বলুন। এই সেদিন বড়বাজারের মোড়ে এক ছোকরাকে দেখে বেদম প্রহার! তারপর বলবো কি মশাই—দশটা দিনও কাটেনি, পিঠের বেদনা মরেনি, সেই ছোকরাকে হ্যারিসন রোড দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে একদল জনতা। কি ব্যাপার? না—সেই একই অপরাধ হাতসাফাই। কি বলবো বলুন? ও ওদের স্বভাব। কথায় বলে না স্বভাব যায় না ম'লে—

কিন্তু কথা আর শেষ করতে হলো না। বাসের ঘণ্টি বেজে উঠলো।

আবার ছুটলাম ঊর্দ্ধশ্বাসে। রেসের ঘোড়াও বোধহয় অমন ছুটতে পারেনা। নেহাৎ বাস চড়িয়ে অভ্যস্ত লোক, তাই কারুর কাঁধের ফাঁক দিয়ে হাতের তল দিয়ে সড়াৎ করে গলে গেলাম পাঁকাল মাছের মতো।

বাস তখন চলতে শুরু করেছে।

কিন্তু গুঞ্জন থামলো না, ভাগ্যিস্ আপনি হাতে নাতে ধরে ফেলেছিলেন তাইতো, নইলে এখনই তো দিচ্ছিলো পকেটটা স্রেফ গড়ের মাঠ করে।

ওপাশ থেকে আর এক ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন, তা কত ছিলো মশাই পকেটে।

—আজ্ঞে সাড়ে তিন শ'।

—সাড়ে তিন শ'।

—উঃ! চিন্তা করতে পারেন। এদের জ্বালায় পথে হাঁটবার উপায় আছে, সর্বত্র চোর ছ্যাচোড় আর পকেটমার। গেল, গেল, চোর ডাকাত আর পকেটমারে রাজত্বটা ভরে গেল মশাই।

—তা আর কি করবেন বলুন। ওপাশের আর এক ভদ্রলোক ব্যঙ্গ করে উঠলেন: যে যুগে আমরা বাস করছি, সে যুগের সবই যে মেকী। বাইরে শুধু জৌলুস, ঝুটো সভ্যতার জাক জমক। কিন্তু ভেতরে কি দেখছেন? দেখবেন—অন্ধকার আর অন্ধকার—দেশ জোড়া দুর্নীতি। মানুষ আজ এত নীচে নেমে গেছে যে—

আলোচনাটা আর শেষ হলো না।

ততক্ষণে গাড়ি এসে থেমেছে কলেজস্ট্রীটের মোড়ে। আর সেই মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলাম ভেতর থেকে। তারপরই এক ভদ্রলোক বোমার মত ছিটকে ফুটপাথে গিয়ে পড়লেন। আর—

আর সবার অলক্ষ্যে তখন সুদৃশ্য পার্কার কলমটি গড়াতে গড়াতে আমার পায়ের কাছে এসে থেমেছে। মাত্র এক মুহূর্ত। কিন্তু সেই এক মুহূর্তেরসুযোগই সদ্ব্যবহার করলাম। এদিক ওদিক ইতস্ততঃ তাকাতে তাকাতে সেটি পায়ের তলায় চালান করে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এবার আর নীতিতত্ত্ব কানে গেল না। রোরুদ্যমান ছেলেটির মুখও ভেসে উঠলো না। যা ভেসে উঠলো তা হলো আমার বড়ো মেয়ে বীণার ব্যাকুল দু'টি আঁখি, বাবা আমায় কিন্তু এবার একটা ভালো পেন কিনে দিও। দেখো না এ পেনে মোটেও লেখা যায় না। আমাদের ক্লাশে সবার ভালো পেন আছে।

জিজ্ঞাসা

কবিকঙ্কণ হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঝঞ্ঝাহত বেদনার ক্রন্দন বক্ষে ধরে
বসে আছি। ম্লান হয়ে গেছে আজ আনন্দ যাত্রী
মরুপথে। সম্বল শুধু দু-ফোঁটা লোনা জল
তাও শুকিয়ে সাদা হয়ে ফুটে উঠেছে।
আমি একটা বেদনার তালপিণ্ড।

যারা এসেছিল বলেছিল ভয় কি
তোমার দুর্গম চলার পথে
আমরাও সাথী হব। তারা দাঁড়িয়ে পড়েছে,
ঠেলে দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিয়েছে
বলেছে আর প্রয়োজন নেই—
তুমি একটা নিশ্চল হৃতপিণ্ড।

কৈফিয়ৎ নেই আমার। লজ্জা, ভয়, ভাবনা
সব থেকে দূরে সরে গেছি।
একটা কাল পাথরের
জীবন আমার। নিশ্চল হতবাক হয়ে
অবাক বিস্ময়ে চেয়ে আছি। দূর দিগন্তের রেখা
আজ আরও সরে সরে যাচ্ছে দূরে।

নিবিড় অন্ধকারের পথে চলেছি একা,
বেদনার বোঝা আজ রক্তের গোলাপ
হয়েছে জানি। এই কি আরম্ভ না শেষ,
সম্মুখে শুধু একখানা জিজ্ঞাসার চাকা
এগিয়ে চলেছে দূর হতে দূরে।
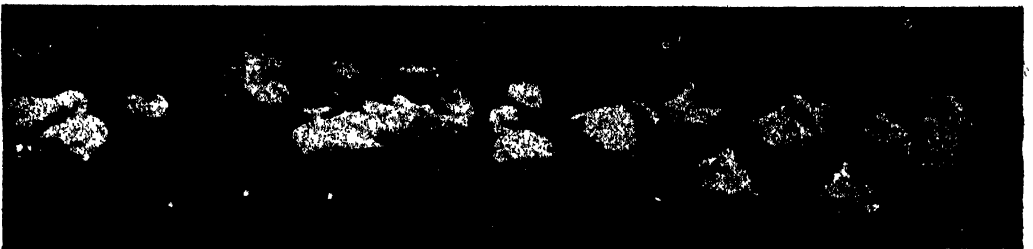
সেকালের আমোদ-প্রমোদ

পৃথ্বীরাজ মুখোপাধ্যায়

ছোট-বড় বিভিন্ন ধরণের সৌখিন ও পেশাদারী রঙ্গালয় ছাড়াও, প্রাচীন কলিকাতা সহরাঞ্চলের প্রমোদ-বিলাসানুরাগী দেশী এবং বিদেশী অধিবাসীদের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে আরো নানান্ অভিনব ব্যবস্থা ছিল—সেকালের পুরোনো পুঁথি পত্রে তারও বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকে ভারত-প্রবাসী বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখিন সাহেব-বিবি, আর তাঁদের প্রবর্ত্তিত পাশ্চাত্য কৃষ্টি সভ্যতার অনুকরণ-প্রয়াসী এদেশী শিক্ষিত-সম্ভ্রান্ত গোলাম-অনুচরবৃন্দের মনোরঞ্জনের জন্য ইংরাজ-বণিকদের হাতে-গড়া কলিকাতা শহরে তখন হামেশাই—বিশেষতঃ শীতের মরশুমে, সুদূর ইউরোপের নানান দেশ থেকে বিচিত্র-অভিনব বহুবিধ প্রমোদানুষ্ঠানের দল এসে হাজির হতো—স্রোত চঞ্চল ভাগীরথী নদীর কূলে বাঙলার এই বিশিষ্ট জনাকীর্ণ ব্যবসা-বাণিজ্যের মহামিলন-কেন্দ্রে। অধুনা রেওয়াজ না থাকলেও, মাত্র কয়েক বছর আগে…অর্থাৎ, বিগত দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পরেও প্রতি বছরই দুনিয়ার নানান্ দেশ থেকে শীতের মরশুমে কত যে ছোট-বড়, ভালো মন্দ ভ্রাম্যমান সার্কাস, ম্যাজিক, নাচ-গান-বাজনা আর রঙ্গাভিনয়কারীর দল আমাদের এখানে আনন্দ-বিতরণের সফরে এসেছেন, তার আর ইয়ত্তা নেই। আনন্দ-পরিবেষণের বিচিত্র রীতিটি সুরু হয়েছিল কিন্তু সেকালে—এদেশে বিলাতীবণিক-সম্প্রদায়ের পীঠস্থল গড়ে ওঠার সঙ্গে। দেশী-বিলাতী সমাজের বিলাসী-সৌখিন জনগণের চিত্ত-বিনোদনের উদ্দেশ্যে বিদেশাগত সেকালের এই সব ভ্রাম্যমাণ কলাবিদ্‌দের কীর্ত্তি-কাহিনীর প্রচুর পরিচয় মেলে প্রাচীন সংবাদ-পত্রে। একালের অনুসন্ধিৎসু পাঠকপাঠিকার কৌতূহল নিবারণের জন্য নীচে তার কয়েকটি নমুনা প্রকাশিত হলো।

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ২৭শে মার্চ, ১৮২৩)

Mermaid and Sea-Monster's Head

Just brought in on the ship *Indian Oak*, the first that have ever been seen in India These natural curiosities were found on the beach at Olra.a by some Fishermen, and brought to the Emperor's court at Jedo, the Capital of Japan... The greatest Care has been taken of them, and the Mermaid *in particular* is in the most *perfect* state, and well worthy the notice of the Public. The esteemed value of this once supposed fabulous creature may be in some measure estimated by the numerous offers received for the purchase of it, the last of which was the sum of Sicca Rupees 9000, and this sum

refused...Terms of admission for each person Sicca Rupees 6 Cash.

N. B—No credit can upon any account be allowed,

* * *

বিদেশী আদর্শানুকরণে, এদেশেরও কয়েকজন উৎসাহী কলাবিদ্ সেকালে রীতিমত ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছিলেন—প্রাচীন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত টুকরো খপরটি তারই সুস্পষ্ট নজীর।

* * *
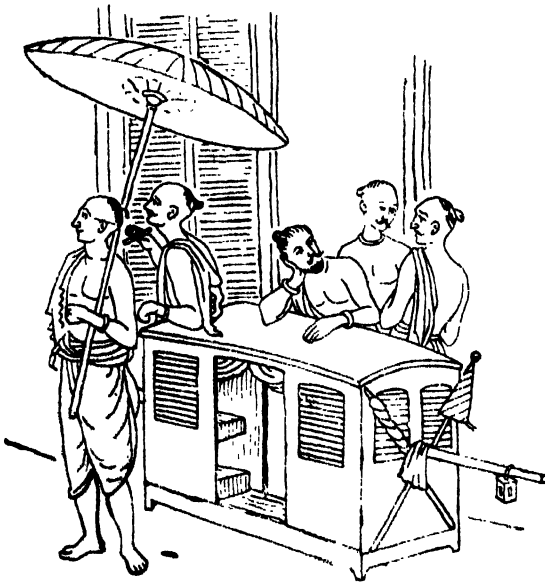
(সমাচার দর্পণ, ২০শে নভেম্বর, ১৮২৪)

ভোজবিদ্যা।—রাম স্বামী নামে একজন এতদ্দেশীয় লোক আমেরিকা দেশে ভোজবিদ্যাপ্রভাবে একুশ বুরুল একখান তলবার (তলোয়ার) পুনঃ পুনঃ গ্রাসোদগার করিয়া অনেককে চমৎকৃত করিয়াছে ও আপনার থলি পূর্ণ করিতেছে।

* * *

থিয়েটার, অপেরা, ভোজবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ কৌতুক ক্রীড়া প্রদর্শন ছাড়াও, সেকালের ইউরোপীয় কলাকুশলী-শিল্পীরা খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকেই এদেশের লোকজনকে তাক্ লাগিয়ে দেবার আরেকটি অভিনব-উপায়েরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার আমলে দুনিয়ার কোনো দেশেই একালের মতো 'ছায়াছবি' বা 'Cinema' দেখানোর আদৌ কোনো ব্যবস্থা ছিল না। কারণ, সে যুগে 'ছায়াছবি' বা 'Cinema' ছিল লোকের কল্পনাতীত...চলচ্চিত্র-শিল্পও ছিল সম্পূর্ণ অনাবিষ্কৃত। তবে 'photography' বা 'আলোক-চিত্র' গ্রহণের কলা-কৌশল তখন, একালের মতো এত উন্নত-ব্যাপক না হলেও, পাশ্চাত্য-জগতে বেশ কতকটা সুপ্রচলিত হয়ে উঠতে সুরু করেছে। আলোক-চিত্রশিল্পের কলা-কৌশলের ক্রমোন্নতির ফলেই—পাশ্চাত্য সৌখিন-সমাজে অচিরেই দেখা দিল—'ম্যাজিক-লণ্ঠন' বা 'Magic-lantern'-এর কারু-কলা...এবং প্রাচ্যভ্রমণকারী এক ফরাসী শিল্পীর আগ্রহ-উৎসাহে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশে জনসাধারণের আসরে সর্ব্বপ্রথম প্রদর্শিত হলো—সে যুগের নব-উদ্ভাবিত এই অভিনব-বিচিত্র কারুকলা-কৌশল। নতুন-ধরণের এই চিত্র-প্রদর্শনের ফলে, সেকালে আমাদের দেশে জনগণের মনে যে প্রতি-ক্রিয়া দেখা দিয়েছিল...তার পরিচয় মেলে নীচে উদ্ধৃত প্রাচীন সংবাদ-পত্রের ছোট্ট মন্তব্যটিতে।

(সমাচার দর্পণ, ১০ই ডিসেম্বর, ১৮২৫)

কলিকাতা॥—অনেকে অবগত আছেন যে কলিকাতায় অনেক দিবসাবধি থিয়েটার-পেকানিক নামে একটা যাত্রা মধ্যে মধ্যে রাত্রিযোগে হইত। সেখানে পৃথিবীর কতক উৎকৃষ্ট নগর ও স্থানের নক্সা উত্তমরূপে লোকেরদিগকে দর্শান যাইত। গত মঙ্গলবার ঐ যাত্রা শেষবার হইয়াছে এবং সেই যাত্রাকর সাহেব সেই সকল ছবি বিক্রয় করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি কলিকাতায় বিক্রয় হয় তবে ভালই, নতুবা তিনি সে সকল ছবি ফ্রান্সদেশে ফিরিয়া লইয়া যাইবেন।

* * *

সেকালের এ সব বিচিত্র আনন্দ-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছাড়াও, প্রাচীন কলিকাতার সৌখিন-বিলাসী ইউরোপীয় সমাজের কলারসিক অধিবাসীদের চিত্ত-বিনোদনের আরেকটি অভিনব উপায় ছিল—শহরের বিশেষ বিশেষ স্থানে আয়োজিত চারুকলা বা চিত্র-প্রদর্শনী…খৃষ্টীয় উনবিংশ-শতকের গোড়ার দিকে প্রকাশিত সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপনে তার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সে আমলে শহরের কোথাও একালের মতো স্থায়ীভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত 'আর্ট গ্যালারী' বা 'চিত্র-প্রদর্শনী' ভবন ছিল না। তাই সেকালে হয় শহরের 'টাউন হলে', কিম্বা কয়েকটি নামজাদা চিত্র-ব্যবসায়ীদের দোকান-ঘরের সুবিস্তৃত-অঙ্গনেই প্রতি বছরই বিলাত থেকে নানা ধরণের চিত্র-সম্পদ আমদানী করে এ সব চারুকলা-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হতো এবং সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে কলারসিক দর্শকদের সাদরে আমন্ত্রণ জানানো ছিল সে যুগের রীতি। এ সব চিত্র-প্রদর্শনীতে প্রবেশের জন্য সেকালে দর্শকদের বেশ মোটা টাকা খরচ করে টিকিট কিনতে হতো। প্রদর্শনী দেখে কোনো ছবি পছন্দ হলে, সেকালের সৌখিন-ক্রেতাকে ছবির দাম দিয়ে দিতে হতো চিত্র-ব্যবসায়ীর হাতে। সচরাচর কোন ধরণের চিত্র এ সব প্রদর্শনীতে রাখা হতো, তার পরিচয় মিলবে নীচে উদ্ধৃত সেকালের সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞাপন থেকে।

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ২১শে নভেম্বর, ১৮১৭)

* * *

The propietor of the panorama of the Battle of waterloo most respectfully informs the Public, that it will be opened for inspection on Monday next. Admission for the first few days only, by the advice of his Friends, Five Rupees, instead of Three ; Children half price.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮২৬)

Pengelly, Mortimer & Co. have the honor to acquaint the Public, with their having received the immense *Painting of the Battle of Waterloo* which, having been exhibited to the *Admiring Thousands* of the British Metropolis, has been sent to the *City of Palaces* for the gratification of the Indian community.

It is Intended to exhibit it at a reasonable price, and when put up, Admission Tickets will be issued.

Other Particulars will be given in a future Advertisement.

Miscellaneous Depot.

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৬)

The Watterloo Painting

The Large and Beautiful Picture is now put up.

Admission Tickets, price Four Rupees cash, can be had of the undersigned.

It Having been suggested, that persons wishing to see the picture frequently, should be admitted at all periods by paying *Ten Rupees* per Mensem, a book will be kept for registering names ; so that the payment of *Ten Rupees* in advance, will entitle the person paying, to an Admission Ticket at all times (Sundays excepted) for Thirty days from the payment.

The Room has been hung with pier Glasses, to allow of the painting being seen by reflection supposed to be the most advantageous mode of viewing it.

The sale price of the picture is Sicca Rupees *Nine Thousand* ; the superb gold frame, measures about 13½ feet by eight feet and a half.

The Likenesses are said to be the life.

Design, by Alexander Sauerweid, Esquire.

Portraits, by Georgo Cifnt Esquire, A. R. A.
Painti"g, by Abraham Cooper, Esquire. R A.
The Admission Rates have been fixed from judgement of several scientific *Gentlemen*.

Pengelly, Morttimer & Co.

* * *

Notice

A Gentleman having stated that the large *Picture* of the *Battle of Watterloo*, now exhibtting at our Rooms, has been seen by him before in Calcutta ; we deem it fair to notice it to the public ; that all who hereafter come to see it, may do so with their eyes open :—We have given the dimentions, and the names of the Artists employed on it.

The Frame left London on the H. C. Ship "Marquis of Wellington" in 1825, and *Painting* in the same year, on the private Ship 'George Home."

We are entirely in *India*—if however it has, there must still be numbers who have not seen it; and probably numbers more, who would not regret the opportunity of seeing it again ;—for it is allowed to be a most beautiful production—the likeness faithful—and the whole execution in a highly spirited style.

Pignelly, Mortimer & Co.

* * *

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট, ৫ই ডিসেম্বর, ১৮২৫)

Beautiful Oil Paintings

In handsome Gold Frames (being the remainder of our *investment of Pictu es*)—received on saturday, may be seen at our Rooms.

Pengelly, Mo, timer & Co.

* * *

পরবর্তীকালে চিত্র-ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ছাড়া তখনকার আমলের বিলাতী-সমাজের কলারসিকেরা শহরে নিজেদের একটি সমিতি গড়ে তুলে চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন।

* * *

(ক্যালকাটা গেজেট ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৩১)

Exhibition of *Paintings*, &c. 1831.—A collection of Drawings and paintings will this day be exhibited at the Town Hall and will remain open from 10 to 5 0' clock on weekdays only until further notice.

Terms of Admission
For Gentlemen Single Ticket Rs, 2
Ticket for the season Rs, 4
Ladies admitted free of Charge
W, Ca r, secy, Brush Club
February *1*, 1831

* * *

[ক্রমশঃ

স্বামী বিবেকানন্দের দূরদর্শিতা ও ভবিষ্যদ্বাণী

শ্রীসমর দত্ত

A man may possess a colossal intellect while his faculty of observation may be of feeblest kind.

Sir Archibald Geikie.

এমন বহু দেশনেতা দেখা যায় যাঁরা প্রখর বুদ্ধি-সম্পন্ন। কিন্তু দৃষ্টি শক্তি বিশেষ ক'রে দূরদৃষ্টির অভাবে তাঁদের বহ্নিগর্ভ তেজস্বিতা, অপরিসীম শ্রমশীলতা ও অনন্য-সাধারণ একাগ্রতা নিজ নিজ ক্ষেত্রে শিক্ষা সাধনে ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে। দেশনেতা বোলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, মানব-প্রেমিক বিবেকানন্দ ঠিক তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সর্ব্বোপরি ভারত প্রেমিক এবং তাঁর ভারত-প্রেম নির্জীব, ক্লীব, ভীরু ভাববিলাস ছিল না। ভারতের দুর্দ্দশা, তার পরাধীনতা, তার লাঞ্ছনা স্বামীজিকে বেদনায় ব্যাকুল ক'রে তুলেছিল। সেইজন্য তিনি তাঁর দুর্জ্জয় পৌরুষ, অসামান্য আত্মিক শক্তি, অতুলনীয় ধী-শক্তি—সব কিছু নিবেদন করেছিলেন পরাধীন ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির উদ্দেশ্যে। যে মহামানব বেদান্তকেশরী বীর সন্ন্যাসীরূপে বিশ্বজয়ী হয়েছিলেন সেই ব্রহ্মবিদ্ পুরুষেরই জীবনবোধ ও জীবনচিন্তার মূল লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তি।

জাতির পূর্ণায়ত বিকাশ সাধনের জন্য বিদেশী প্রগতি-শীল আদর্শের অনুসরণ প্রয়োজনীয় হলেও যথেষ্ট নয়। এর জন্য চাই আভ্যন্তরীণ সম্প্রসারণ। তাই জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা ও আত্মনির্ভরহীনতার সহস্র পাকে জড়িত জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অবস্থাটিকে তিনি যে শুধু তাঁর অন্তর দৃষ্টি দিয়ে নিখুঁতভাবে দেখেছিলেন তা নয়, তাঁর দূরপ্রসারী দৃষ্টি সমকালীন ভারতবর্ষের ঐরূপ অবস্থা অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার চিত্রটির উপরও প্রতি-ফলিত হয়েছিল। তাই মুক্তিকামী ভারতবর্ষের নানারূপ সমস্যা সম্বন্ধে দূরদ্রষ্টা বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ-ভাবে স্মর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য ভ্রমণ শেষ ক'রে ভারতে প্রত্যা-বর্ত্তনের পর একদা বেলুড়মঠে তাঁর দর্শনপ্রার্থী একজন যুবককে তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্য্যা-লোচনা কালে বলেন—What India needs to-day is bomb.' মৃত্যুর পূর্ব্বে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙলাদেশে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদী-গণ কর্তৃক বোমা ব্যবহৃত হয়। (এই প্রসঙ্গে আলিপুর বোমার মামলা যার সঙ্গে ঋষি অরবিন্দ জড়িত ছিলেন তা স্মরণীয়)। স্বামীজির জীবনীকার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত রোমাঁ রোলাঁ তাঁর এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি ক'রে লিখেছেন :—

The Indian Nationatist Movement Smouldered for a long time until vivekananda's breath blew the ashes into flame and erupted violently three years after his death in 1905.

স্বামীজি তাঁর সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন যে তদানীন্তন কংগ্রেসের কার্য্যাবলী মুক্তি আন্দোলনের সুদৃঢ় ভিত্তি পত্তনের পক্ষে উপযোগী নয়। বছরের পর বছর গতানুগতিক প্রস্তাব পাশ করা ছাড়া আর কোন কাজ তখন কংগ্রেসের ছিল না। পূর্ব্বযুগের স্বদেশী জিনিষ ব্যবহারের আন্দোলনও তখন অনুনয়-বিনয় ও ভিক্ষার রাশি রাশি প্রস্তাবের তলায় চাপা পড়ে গেছে। ভারত-বর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনে তখন আবেদন-নিবেদনকারী রাজনীতিজ্ঞদের প্রভাব পড়েছে। সেদিন ভয় ও কাপুরুষতা জাতির প্রাণকে পঙ্গু ক'রে তুলেছিল। আত্ম অবিশ্বাস সেদিন কর্ম্মশক্তিকে এমন করে দমিয়ে রেখেছিল যে আত্ম-বিশ্বাস, সাহস ও পৌরুষ ফিরিয়ে আনাই সেদিন ছিল,

ভারতবর্ষের মুক্তি সাধনার সবচেয়ে বড় কাজ। এই বৈপ্লবিক ব্রত সাধনে এগিয়ে এলেন একদল তরুণ। তারপর বিদেশী শাসকদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করতে হবে এবং এই বল-প্রয়োগ নৈতিক—এই বিশ্বাস নিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্রষ্টারূপে এলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন ঘোষ, সত্যেন বসু প্রমুখ বিপ্লবীগণ। তারপর প্রাণ নিবেদনের রক্তরাঙা পথ ধ'রে এলেন বহু মুক্তিকামী সাধকেরা। তারপরের ইতিহাস যে আঁকাবাঁকা পথ ধরে জাতিকে যেতে হয়েছে মুক্তির সন্ধানে তার ইতিহাস। সে ইতিহাসের পাতা উল্টে গেছে স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে।

ভারতবর্ষ কিভাবে স্বাধীন হয়েছে—হিংসার পথে অথবা অহিংসপন্থায় কিংবা এই দুই উপায়ের সংমিশ্রণে সে কথার আলোচনা এখানে না করেও নিশ্চয়তার সঙ্গে এ কথা বলা যেতে পারে যে অগ্নিযুগের সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপের দান জাতির স্বাধীনতা তহবিলে বড় কম নয়, কারণ সেই জমাট ভয় ও কাপুরুষতার দিনে তাঁদের জন্যই জাতি আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়, ফিরে পায় সাম্য ও আত্মত্যাগের উদ্দীপনা। আর এই প্রসঙ্গে স্বামীজির অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত ভবিষ্যদ্বাণী (দেশের মুক্তি আন্দোলনে আজ যে জিনিষটার প্রয়োজন তা বোমা) বিশেষ উল্লেখনীয়।

স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় জাগরণের মহাযজ্ঞে কংগ্রেসের কার্য্যাবলীর দিকে স্বামীজি মনোযোগ দিয়েছেন কি না জনৈক ব্যক্তির এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'কংগ্রেসের আন্দোলনের দিকে আমি খুব মনঃসংযোগ করেছি এমন কথা বলতে পারি না, কারণ আমার কার্য্যক্ষেত্র বিভিন্ন; তবে এই আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি সর্ব্বান্তঃকরণে এর সাফল্য কামনা করি।' তিনি আরো বলেন—'ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে একটি মহাজাতি সৃষ্টি হ'তে চলেছে এবং এ দেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় এই মহাজাতি দেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এক বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে।'

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন-সার্ব্বভৌম-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। কোন প্রাচীন রিপাবলিকের মত নামেমাত্রই ভারতবর্ষ 'রিপাবলিক' রূপে পরিচিত নয়। এর প্রত্যেকটি লাইনে আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার পূর্ণ প্রকাশ পরিস্ফুট। আমাদের পবিত্র সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, উপদেশমূলক বিধান, যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে রাজ্য সংগঠন, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার ইত্যাদি ব্যবস্থা নিশ্চয় প্রশংসনীয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও এ দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা প্রচলিত তাতে গণতন্ত্রের পরিপন্থী শক্তি সমূহের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু সমাজে প্রচলিত বর্ণ বৈষম্য হিন্দু সমাজের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক, ঠিক সেইরকম গুরুতর বাধাও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে। অবশ্য অস্পৃশ্যতাকে ভারতের শাসনতন্ত্রে অপরাধ ব'লে ঘোষণা করা হয়েছে। দ্বিধাহীন ভাষায় বলা হয়েছে যে শ্রেণী ও বর্ণ বৈষম্য হেতু কাহাকেও জনগণের মৌলিক অধিকার হ'তে বঞ্চিত করা চলবে না। ভোটদানের ব্যাপারেও সামাজিক বৈষম্য কোন রকম বাধার কারণ হ'তে পারবে না। কিন্তু আইনের দৃষ্টিতে সমাজ ও রাষ্ট্রে অনিষ্টকর বৈষম্যমূলক বাধা না থাকলেও জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারা যতদিন না গণতন্ত্রের উপযোগী হিসাবে পরিচালিত হয় ততদিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সফলতা সুদূর-পরাহত।

বিস্ময়ের কথা এই যে ভারতবর্ষের বৃহত্তম জনতার গণতন্ত্র সম্বন্ধে কোন ধারণাই নেই। যুগযুগান্তর ধরে আমরা যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি, যে উৎপাদন ব্যবস্থা আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করছে তার কোন বৈপ্লবিক ও সামগ্রিক পরিবর্ত্তন ঘটেনি। ভারতবর্ষের ছয় লক্ষ গ্রামে সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৮০ জনের বাস এবং এই বিরাট জনসংখ্যার অধিকাংশ এখনও গ্রাম্য মনোভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন। ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারির রিপোর্ট অনুসারে ভারতবর্ষের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ১৬.৬ জন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন। এই ন্যূনতম মানদণ্ডে বিচার করেও ৬ কোটি লোক লেখা পড়া জানার পর্য্যায়ে পড়ে। এর মধ্যে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমাধারী লোকের সংখ্যা মাত্র ১৮ লক্ষ। গ্রাজুয়েট নারীর সংখ্যা মাত্র ৩৭ হাজার, অথচ পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের গৌরব বিচারে আমাদের দেশের ভোটদাতার সংখ্যা সর্ব্ববৃহৎ অর্থাৎ ১৮ কোটি কিম্বা সমস্ত প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকারের উপর আমাদের গণতন্ত্র দণ্ডায়মান। কিন্তু অন্যদিকে

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ অর্থাৎ ৩০ কোটিই বর্ণ জ্ঞানহীন, আবার এই সমগ্র জনসংখ্যার দৈনিক আয়, জীবিকার উপায় এবং স্বাস্থ্য, বস্ত্র ও গৃহের কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে যে বাস্তব বিচারে আমাদের দুর্গতি অপরিসীম—কেননা বৃটেনে যখন গড়ে মাথা পিছু মাসিক আয় ৬৮২৲ টাকা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে যখন ৭৩৭৲ টাকা ভারতবর্ষে তখন মাত্র ২৩৲ টাকা। তবুও এ কথা অনস্বীকার্য্য যে স্বাধীন ভারতে গণতন্ত্রের বীজ বোনা হ'চ্ছে এবং আশা করা যায় অনতিদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ও স্বাধিকারের সোনার ফসল ফলবে, কারণ ১৯৬১ সালের আদমসুমারির রিপোর্ট পাঠে দেখা যায় যে ভারতবর্ষে শিক্ষিত জনসংখ্যার হার এবং মাথাপিছু মাসিক আয়ের হার গত দশ বৎসরে (১৯৫১—১৯৬১) অনেকটা বেড়েছে। এতদ্ব্যতীত উন্নত ধরণের উৎপাদন প্রণালীর ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জনসাধারণের বাসগৃহের সমস্যার সমাধানও বহুলাংশে করা হয়েছে, এই কারণে স্বামীজির উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলার নব যুগের সাধনমন্ত্র ছিল মানব প্রেম, মানুষই বড়—মানুষ আগে, ব্রহ্ম পরে, ভগবানের ভেতর দিয়ে মানুষকে নয়, মানুষের ভেতর দিয়েই ভগবানকে লাভ করতে হ'বে। ভগবানের মহিমা নয়, মানুষের মহিমাই মানুষকে উপলব্ধি করতে হ'বে, মানুষকে বিশ্বাস করতে হ'বে, এই বিশ্বাসই আত্মবিশ্বাস এবং এতেই মানুষের আত্মা জাগবে। এই ছিল বিবেকানন্দের বাণী। তাই যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ মানুষের দুঃখ-বেদনাকে কেন্দ্র ক'রে তাঁর সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস, প্রেম, জ্ঞান এবং শক্তি মানব সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন—A hundred thousand men and women ...should go over the length and breadth of the land preaching the gospel of salvation, the gospel of equality.

এই কথা যখন তিনি বলেছিলেন ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। বিদেশী বণিকের শোষণের ফলে দেশের প্রাণশক্তি তখন নিঃশেষিত, প্রাচীন শিক্ষা-সংস্কৃতির বিরাট ঐতিহ্য বিপর্য্যস্ত, খনিজ-কৃষিজ-বনজ সকল ধনসম্পদ অপহৃত ও লুণ্ঠিত।

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ সর্বহারা জাতির সম্বন্ধে তাঁর এই বাণী সর্ব্বতোভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন। স্বাধীন ভারত নানারূপ গঠনমূলক কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত, স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে স্বাধীন ভারত-সম্বন্ধে স্বামীজির এই কথাগুলি তাৎপর্য্যপূর্ণ কিনা। এই প্রশ্নের মীমাংসায় উপনীত হ'তে গেলে ভারতের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক চেহারাটা একটু দেখে নিতে হয়।

দুটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কাজ শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার অন্যতম ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক ছাঁচের সমাজ গঠন। কথা ছিল পরিকল্পনার লক্ষ্য হ'বে জনগণের জীবন মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস এবং অধিকতর সমসুযোগ-বিশিষ্ট সমাজ গঠন। কিন্তু এসব লক্ষ্য পূরণ তো হয়ই নি, লক্ষ্যগুলির সান্নিধ্যেও পৌছানো যায়নি। পরিকল্পনা কর্ত্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে গত দশ বৎসরে অর্থাৎ দুটি পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়ার পর জাতীয় আয় শতকরা ৪২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ও ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ২০ শতাংশ ও ১৬ শতাংশ। কিন্তু এ হোলো গড়পড়তা হিসাব। জনসাধারণের কোন কোন শ্রেণীর অংশের মাথাপিছু আয় ও ভোগবৃদ্ধির হার গড়পড়তা আয়ের চেয়ে অনেক বেশী। অনেকের ক্ষেত্রে ঐ হার গড়পড়তা হারের সমান, কিন্তু বিপুলসংখ্যক অংশের ক্ষেত্রে ঐ আয় ও ভোগবৃদ্ধির হার গড়পড়তা হারের চেয়ে শুধু কমই নয়, অনেকের ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। এই রকম অবস্থার নানা কারণ আছে। পরোক্ষ-করের ক্রমবর্দ্ধমান বোঝা তার মধ্যে অন্যতম, জনসাধারণের মাথাপিছু আয় যা বেড়েছে কর বৃদ্ধিতেই তা খেয়ে গেছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৬০—এই দশ বৎসরে প্রত্যক্ষ কর বেড়েছে ২০ কোটি টাকা, অথচ পরোক্ষ-কর বেড়েছে ৩৮০ কোটি টাকা। এর উপর আবার মুদ্রাস্ফীতি, গত পাঁচ বৎসরে মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে ৩০ শতাংশ। অর্থনীতির সাধারণ নিয়মানুসারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নির্দিষ্ট আয়সম্পন্ন লোকেরা অর্থাৎ দেশের শ্রমজীবি মানুষ। লাভবান হয় শিল্পপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি। এ ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বড় বড় বুলির পেছনে উৎকট অর্থনৈতিক অসাম্য ক্রমাগত বেড়েই

চলেছে। ২টি পরিকল্পনার ফলে গ্রাম রাজ্যের তুলনায় শহরগুলি—লাভবান হয়েছে। আবার গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নের সুবিধাগুলো হস্তগত করেছে কৃষি মজুরের পরিবর্তে জমির বৃহৎ মালিক মহাজনগণ। শহরাঞ্চলে শিল্পশ্রমিক ও বেতনভুক কর্মচারীদের চাইতে শিল্পপতি, বড় বড় কারবারী, ফাটকাবাজ ইত্যাদি প্রধানত লাভবান হয়েছে। দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতিগণ শিল্প বাণিজ্য তথা আর্থিক জগতের উপর নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বিস্তার করে জাতীয় আয়ের এক বিরাট অংশ করায়ত্ত করেছে। মধ্যবিত্ত আজ শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থায় দিশাহারা। চাষী, মজুর, তাঁতী প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর মানুষ আজ ফসল ফলিয়েও উপবাসী, কাপড় বুনেও বিবস্ত্র, রক্ত ও ঘর্ম্ম বিন্দু দিয়ে শিল্পোৎপাদন করেও দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথরের তলায় তারা পিষ্ট। তাই প্রকৃত সমাজতন্ত্র যা সর্ব্বপ্রকার বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা দূর ক'রে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোকে উজ্জ্বল জীবন যাপনের পথ উন্মুক্ত করে দেবে তার জন্য প্রয়োজন প্রচার ও আন্দোলন। স্বামীজির পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি কি অদ্ভুত তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক! কি অশ্রুতপূর্ব্ব তাঁর ভবিষ্যবাণী।

এই প্রসঙ্গে আরো একটা কথা বলা যেতে পারে। শুধু ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণীর সর্ব্বহারা মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তির কথা তিনি চিন্তা করেননি। ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে সমগ্র পৃথিবীর সর্ব্বহারা মানুষের দাসত্ব মোচন এবং সার্বিক কল্যাণের কথা—তাঁর নিত্য চিন্তার বিষয় ছিল। প্রাচীন ভারতের অবিস্মরণীয় বেদান্তের বাণীর মধ্যে নব্যবিজ্ঞান যুগের আত্মিক জাগরণকে আহ্বান ক'রে তিনি এক মহান্ ঐক্য রূপের সন্ধান দিয়ে গেছেন। তাঁর সুবিস্তৃত বিশ্ব-চেতনা রূপ পেয়েছিল বস্তুর মধ্যে লাঞ্ছিত বঞ্চিত জীবনের প্রতি সীমাহীন প্রীতি এই সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর চিত্তকে এমনই উদ্বেলিত করেছিল যে তিনি বলিষ্ঠ ঘোষণা করেছিলেন—The only god in whom I believe is the sum total of souls and above all I believe in my god the wicked, my god the miserable, my god the poor of all races.

এই লাঞ্ছিত সর্ব্বহারা মানুষের মুক্তির আহ্বানে ভারতবর্ষের কায়েমী স্বার্থের বাহকগণ ও শ্রেণী আভিজাত্যের গর্ব্বোস্ফীত ব্যক্তিগণের কাছ থেকে তিনি কোন সাড়া পাননি। পাশ্চাত্য দেশগুলির জনসাধারণের অবস্থাও যে তখন (পঞ্চাশ-ষাট বৎসর আগে) খুব উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল তা বলা যায় না। শ্রেণীচেতনা তখন তাদের মধ্যে প্রকট হয় নি। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাদের দাপটে তখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ জর্জ্জরিত। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন তখন পররাজ্যলুণ্ঠিত ধনদৌলত ভোগে মত্ত সাম্রাজ্যলিপ্সু ফ্রান্স তখন উপনিবেশ এবং অধীনস্থ রাজ্যের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত। পুরাণো রীতিনীতি এবং অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে ফেলে।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পোন্নত দেশরূপে পৃথিবীর সামনে নিজেকে তুলে ধরতে জার্মানী তখন ব্যাপৃত। রাশিয়া জারের স্বেচ্ছাচারী জার শাসিত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। প্রগতিশীল নায়কদের নেতৃত্বে সে দেশের জনসাধারণ তখন মুক্তিপথের যাত্রী। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তখন নিজেকে বেশ গুছিয়ে নিয়েছে এবং তার ধনতন্ত্রের স্বর্ণচূড়া যাতে গগনস্পর্শী হয় সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

এদিকে এশিয়া মহাদেশে তুরস্কের অবস্থা সঙ্কটজনক। সামন্ততন্ত্রী এবং ধর্ম্মীয় ভিত্তিতে শাসিত তুরস্কের প্রতিবেশীরা (বৃটেন, অষ্ট্রিয়া, রাশিয়া ইত্যাদি) ওৎ পেতে অপেক্ষমান ছিল। সুযোগ পেলেই ইউরোপের এই রুগ্ন মানুষটিকে ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। শিল্প-ব্যবসায়ে এবং রণ কৌশলে শক্তিশালী হয়েও জাপানের শাসকদের মন তখনও সেই সামন্তযুগেই পড়েছিল। চীনের অর্থনৈতিক অবস্থায় তখন ভাঙন ধরেছে, সেখানে তাই পিং বিদ্রোহ সবেমাত্র ঘটে গেছে, ধর্ম্মান্তরকরণে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অসহনীয় অত্যাচার চলেছে, চীন বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। চীনের এই রকম অবস্থা দেখে স্বামীজি মন্তব্য করেছিলেন:—Cnina is like a disorganised mob.

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের এই রকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা স্বামীজি তাঁর পরিশীলিত হৃদয়বৃত্তির ব্যাপকতায় এবং তাঁর উদার, সমুন্নত ও বিশ্বমুখী দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে বিচার করে এই উপসংহারে উপনীত হয়েছিলেন যে:—

Perhaps Russia will be the first prolaterian state in the world.

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এই মন্তব্য ভাবীকালের ইতিহাসের পাতায় আলোক সম্পাত করেছিল এবং ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। অয়যুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ হোলো সেই মহাজীবনের ভবিষ্যৎউক্তির বহিঃপ্রকাশ।

পরীক্ষা ও শিক্ষা

শ্রীজ্ঞান

তোমাদের অনেকেরই পরীক্ষা হয়ে গেছে। ফলাফল কিন্তু সকলকারই যে একই রকম হবে না এ তোমরা সকলেই জান। যারা মন দিয়ে পড়াশুনা করেছ—একাগ্রচিত্তে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের পড়ানো শুনেছ, অনন্যমনা হয়ে পাঠাভ্যাস করেছ—তারা পরীক্ষায় যে ভাল ফল দেখাবেই তাতে সন্দেহ নেই মোটেই। কিন্তু যারা পড়াশুনায় ফাঁকি দিয়েছ—আলস্যে-আড্ডায় কালহরণ করেছ, আমোদে-আহ্লাদে সময় অপব্যয় করেছ, উৎসবে-অনুষ্ঠানে মত্ত হয়ে অমূল্য সময় নষ্ট করেছ,—পরীক্ষায় যে তাদের ফল ভাল হবে না তাতো জানা কথাই; এমন কি অনেকে হয়ত উত্তীর্ণই হতে পারবে না—পাবে না প্রোমোশন্, পড়ে থাকবে একই ক্লাসে! কিন্তু সেটা কি খুব গৌরবের হবে? কিংবা কোনও রকমে প্রোমোশন্ পাবার জন্যে ফাঁকি দিয়ে, নকল করে ও অন্যান্য অসাধু উপায় অবলম্বন করে যেন-তেন-প্রকারেণ উত্তীর্ণ হওয়াটাও কি খুব শ্লাঘার বস্তু হবে? তোমরা, যারা ছাত্র ও পরীক্ষার্থী, তাদের আজ এ বিষয়ে বিশেষ করে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। লেখাপড়া করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান লাভ করা, শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই নয়। পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রের যদি কোনও জ্ঞান লাভ না হয়ে থাকে, তাহলে তার লেখাপড়া করা বৃথাই হয়েছে বুঝতে হবে এবং উত্তরকালে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে এদের পদে পদে বাধা, বিঘ্নের ও অকৃতকার্যতার সম্মুখীন হতে হবে, হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হাস্যাস্পদও হতে হবে! আর যারা নিষ্ঠাভরে পাঠাভ্যাস করে পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনের সঙ্গে জ্ঞানার্জনও করেছ, তারা ভাবীজীবনে শুধু সুপ্রতিষ্ঠিতই হবে না, অপরকেও তাদের দৃষ্টান্তে, সহযোগিতায়, সাহচর্যে অনুপ্রাণিত করে তুলবে।

স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, ফাঁকি দিয়ে কখনও কোনও বড় কাজ হয় না। স্বামীজীর এ কথাটা তোমরা মনে রেখ। ফাঁকি দিলে নিজেদেরই সেই ফাঁকির ফাঁদে পড়তে হয়, এটাও জেনে রেখ। আমাদের মহান গ্রন্থ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে একস্থানে বলেছেন।—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।

আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৬।৫

অর্থাৎ, স্বকৃত যত্নের দ্বারা নিজের উদ্ধার সাধন করা কর্ত্তব্য। নিজেকে অধঃপাতিত করা উচিত নয়। মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, আবার নিজেই নিজের শত্রু।

যারা লেখাপড়া বা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কষ্ট করতে রাজী নয়, বা যারা অল্পায়াসে ফাঁকি দিয়ে পরীক্ষা পাশের সার্টিফিকেট্ লাভ করতে চায়, তারা নিজেদেরই নিজেরা ফাঁকি দেয়, নিজেদের প্রতি নিজেরাই শত্রুর মতন আচরণ করে, নিজেদের অধঃপতিত করে!

আশা করি তোমরা, এই কিশোর জগতের পাঠক

পাঠিকারা, কেউই পড়াশুনায় কখনও ফাঁকি দেবে না বা অসাধু উপায়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টাও কখনও করবে না। সব সময়ই মনে রেখ তোমাদের ওপর রয়েছে বিশেষ দায়িত্ব—তোমাদের কার্য্যকলাপের ওপর নির্ভর করছে ভবিষ্যতের অনেক কিছুই। তোমাদের সাধুতা, সততা, একনিষ্ঠতা আমাদের সমাজের, জাতির তথা দেশের পরম মূলধন—এর ওপরই নির্ভর করছে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ; আর সে ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করে তোলবার দায়িত্ব শুস্ত রয়েছে তোমাদের মতন কিশোর-কিশোরীদের ওপরই! তোমাদের সততায়, সাধুতায়, অধ্যবসায়, একনিষ্ঠতায় ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠুক এবং তোমরাও জ্ঞানে, গুণে, গরিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠ—এই প্রার্থনা, এই কামনাই আমরা করি।

আলেকজান্দার ডুমা

রচিত

দী কাউণ্ট অফ মণ্টি ক্রিষ্টো

সৌম্য গুপ্ত

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ডাক্তার বললেন,—ওঁরা মারা গেলে, ওঁদের সম্পত্তি পাবে একমাত্র নাত্‌নী—আপনার কন্যা ভ্যালেন্টিন্…তাই না?

জেরার্ড চমকে উঠলো…বললে,—বলেন কি…ভ্যালেন্টিন্!…না, না…অসম্ভব!

ডাক্তার বললেন,—তিন-তিনজনের মৃত্যু…রোগ নেই কোনো রকম চিকিৎসার অবসর মিললো না…হঠাৎ মৃত্যু!…মৃত্যু নয়—তিন-তিনটে মানুষ খুন!…আপনি হাকিম—অপরাধীকে সাজা দেওয়া আপনার কাজ!

জেরার্ড বললে,—না, না…ভ্যালেন্টিন্ সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ! আপনি বলেন কি…আমার মেয়েকে আদালতে দাঁড় করিয়ে তার ফাঁশি দেবো!

ডাক্তার নিশ্বাস ফেললেন…বললেন,—বেশ আপনি যা ভালো বুঝবেন, করবেন—তবে আমার স্পষ্ট কথা—আপনার বাড়ীতে যদি এর পর কারো অসুখ করে তো আমাকে ডাকবেন না…ডাকলে আমি আসবো না!

ক'দিন পরে ভ্যালেন্টিনের কঠিন অসুখ…জেরার্ড নিজে এলো ডাক্তারকে ডাকতে…চট্ করে আসুন ডাক্তার…ভ্যালেন্টিনের শক্ত অসুখ—বুঝি সেও এবার যায়।

খবর শুনে ডাক্তারের দু'চোখ বিস্ফারিত…তিনি বললেন,—ভ্যালেন্টিন্! তাহলে আমার সন্দেহ মিথ্যা!

তিনি অবিলম্বে এলেন ভ্যালেন্টিন্‌কে দেখতে।

ভ্যালেন্টিনের অসুখের খবর শুনে ব্যস্ত হয়ে ম্যাক্স-মিলিয়ান্‌ও এলো কাউণ্টের কাছে…কাউণ্ট বলেছিলেন—যখনি দরকার মনে করবে, তুমি আমার কাছে এসে আমাকে বলবে।

ম্যাক্স্‌মিলিয়ানকে দেখেই কাউণ্ট্ শুধোলেন,—ব্যাপার কি?

ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্ বললে,—জেরার্ডের কন্যা ভ্যালেন্টিন বুঝি বাঁচবে না!

কাউণ্ট্ বললেন,—তাতে আমার কি! বিধাতার অভিশাপ আছে ও-পরিবারের উপর…ওদের কেউ বাঁচবে না!

কাতর-কণ্ঠে ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্ বললে,—কিন্তু আমি তাকে ভালোবাসি, কাউণ্ট!

কাউণ্ট বললেন,—ভ্যালেন্টিন্‌কে ভালোবাসো!…ঐ লক্ষ্মীছাড়া বংশের মেয়েকে তুমি ভালোবাসো!

ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্ বললে,—ভ্যালেন্টিন বড় ভালো…তার উপর যে পীড়ন চলেছে বিধাতার…

কাউন্টের মনে পড়লো—ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের পিতা মোরেলের কথা...তার মনিব মোরেল!...মোরেল তাঁর জন্য যা করেছেন—সে ঋণ জীবন দিলেও শোধ হবার নয়!

কাউন্ট্‌ বললেন,—বেশ, আমি তোমাকে সাহায্য করবো!...ভেবো না...ভ্যালেন্টিন্‌ বাঁচবে!

ওদিকে চারদিন চাররাত্রি ভ্যালেন্টিন্‌ প্রায় মূর্চ্ছিতের মতো রোগশয্যায় পড়ে আছে...জ্বর-বিকারে প্রলাপ বকছে ·হঠাৎ মূর্চ্ছার ঘোর ভাঙলে চোখ মেলে চাইতেই দেখে —ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে—কাউন্ট্‌ অফ্‌ মন্টি-ক্রিষ্টো!

আচম্‌কা কাউন্ট্‌কে দেখেই ভ্যালেন্টিন্‌ আঁত্‌কে উঠলো! অভয় দিয়ে কাউন্ট্‌ বললেন,—ভয় নেই...আমি তোমাকে দেখছি...তোমাকে আমি সারিয়ে বাঁচিয়ে তুলবো—ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের জন্য!...ক'দিন আমি চারিদিকে নজর রেখেছি...কারা তোমার কাছে আসে...কেন আসে ...তাও লক্ষ্য করছি!...তোমার জলে, দুধে, ওষুধের গ্লাসে বিষ মিশিয়েছে...আমি সে বিষ ফেলে দিয়েছি!...তোমাকে সজাগ থাকতে হবে—রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত!...ঐ সময়েই আসে খুনী!

একটু পরেই ঘড়ীর কাঁটায় ঢং-ঢং করে বাজলো—রাত্রি বারোটা!...কাউন্ট্‌ ভ্যালেন্টিন্‌কে বললেন,—ঐ রাত বারোটা বাজছে...এবারে সে আসবে! তুমি ঘুমের ভাণ করে চোখ বুজে বিছানায় পড়ে থাকো...তাহলেই দেখতে পাবে, কে আসে!...ভয় নেই...আমি ঐ দরজার আড়ালে লুকিয়ে থাকবো...দরকার হলেই...

এ কথা বলেই কাউন্ট্‌ নিঃশব্দে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন...ভ্যালেন্টিন্‌ও তাঁর উপদেশমতো চোখ বুজে নিঃশব্দে বিছানায় শুয়ে রইলো।...হঠাৎ ঘরে খশ্‌খশ্‌ পায়ের শব্দ...সে শব্দ শুনে ভ্যালেন্টিন চোখ মিটুমিটু করে চেয়ে দেখলো—ওদিককার দরজা খুলে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলো আগাগোড়া বস্ত্রাবৃতা এক নারী-মূর্ত্তি...ধীরে ধীরে সে মূর্ত্তি এগিয়ে এলো তার বিছানার পাশে...পালঙ্কের পাশে টেবিলে রাখা দুধের গ্লাস...সেই গ্লাসে বস্ত্রাবৃতা-মূর্ত্তি কি যেন মেশালো!...ভ্যালেন্টিন্‌ দেখেই চিনলো...বস্ত্রাবৃতা সেই নারী-মূর্ত্তি—তারই বিমাতা!

নিমেষের মধ্যেই নিঃশব্দে তার কাজ সেরে বস্ত্রাবৃতা মূর্ত্তি ঘর থেকে চলে গেল! এ সব রহস্যময় কীর্ত্তিকলাপের পরিচয় পেয়ে ভ্যালেন্টিন্‌ তো স্তম্ভিত!

পরে ভ্যালেন্টিন্‌ এ কথা জানালো কাউন্ট্‌কে...বললে, এ বাড়ী থেকে আমি চলে যাই যদি ওর হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য?

কাউন্ট্‌ বললেন,—যেখানে যাবে, ছায়ার মতো ও তোমার পিছনে ফিরবে...নিস্তার নেই কোথাও!

ভ্যালেন্টিন্‌ আকুলভাবে বললে—তাহলে উপায়?

কাউন্ট্‌ বললেন,—আমি যা বলবো, অক্ষরে অক্ষরে তা তোমাকে পালন করতে হবে!...আমি যা খেতে দেবো, খাবে...ভয় পেলে চলবে না!...আমার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে!...খুব ঘুমোবে...যদি ক'দিনের মধ্যে ঘুম ভাঙে, তবু ভয় পেয়ো না!...চুপচাপ থাকলে জেনো— তোমার আর ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের উপর, দুজনের মঙ্গলের জন্য একজন হিতাকাঙ্ক্ষী-বন্ধু—সারাক্ষণই বাপের মতো সজাগ-নজর রাখছে।...পারবে, এ বিশ্বাস রাখতে?

কাউন্টের মুখের পানে তাকিয়ে অবিচল কণ্ঠে ভ্যালে-ন্টিন্‌ বললে,—পারবো!

কাউন্ট্‌ তখন ভ্যালেন্টিনকে কি যেন একটা বড়ি খেতে দিলেন। বড়িটি খাওয়ানোর পর কাউন্ট্‌ বললেন, —এখন তাহলে আসি!...কোনো ভয় নেই...এ যাত্রা তুমি প্রাণে রক্ষা পেয়েছো, জেনো!

পরের দিন ভ্যালেন্টিন্‌কে সকলে দেখে মৃতের মতো পড়ে আছে...নাড়ীতে স্পন্দন নেই...শ্বাস-প্রশ্বাস নেই... নোর্ত্তিয়ার তখন জেরার্ডকে বললেন,—কে এমন হত্যা করেছে?...

জেরার্ড বললে,—এর বিচার আমি করবো!...এ প্রাণের জন্য, তাকেও প্রাণ দিতে হবে!...

যথাসময়ে ভ্যালেন্টিনের দেহ হলো কবরিত...কাউন্ট্‌ তখন এলেন ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের কাছে...ম্যাক্স্‌মিলিয়ান তখন শোকে-দুঃখে অধীর হয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করে একখানি পত্র লিখতে বসেছে!

কাউন্ট্‌ বললেন,—আত্মহত্যা করতে চাও?...

ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্‌ বললে,—হ্যাঁ !…কারো সাধ্য নেই, আমাকে বাধা দেবে !

কাউন্ট্‌ বললেন,—বটে !…আমি বাধা দেবো !… মোরেলের পুত্র আজ মরতে পাবে না !…

ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্‌ বললে,—হঠাৎ আমার বাবার কথা বললেন কেন ?

স্থির-কণ্ঠে কাউন্ট্‌ বললেন,—তার কারণ, তোমার বাবা আমার দারুণ বিপদের দিনে আমার পরম-বন্ধুর কাজ করেছিলেন…তিনি আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্য কি চেষ্টা না করেছিলেন !…আশ্চর্য্য হয়ো না…আমি কে, জানো ? …আমি হলুম—এডমণ্ড্‌ দান্তে !

কাউন্টের আসল পরিচয় পেয়ে ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্‌ চমকে উঠলো !

কাউন্ট্‌ বললেন,—শোনো ম্যাক্স্‌মিলিয়ান্‌—তোমাকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসি !…আমার নিজের ছেলে থাকলে, সে ছেলেকে এর চেয়ে বেশী ভালোবাসতুম না !…আমি শপথ করেছি, তোমাকে বাঁচাতে হবে…তার কারণ, একদিন তুমি সুখী হবে !

এ কথার সঙ্গে সঙ্গেই কাউন্ট্‌ সস্নেহে ম্যাক্স্‌মিলিয়ানের হাত দু'খানি নিজের হাতে নিয়ে বললেন,—আমাকে কথা দাও—একমাস অন্ততঃ আত্মহত্যার কথা চিন্তা করবে না …তোমাকে বাঁচতে হবে !…আমায় আশাহারা করো না, বৎস !

কাউন্টের কথা শুনে ম্যাক্স্‌মিলিয়ান ক্ষণকাল স্তব্ধ-দৃষ্টিতে তাঁর পানে তাকিয়ে দৃঢ়কণ্ঠে বললে,—কথা দিচ্ছি, একমাস আমি আত্মহত্যার বিষয় মনেও আনবো না !

| ক্রমশঃ
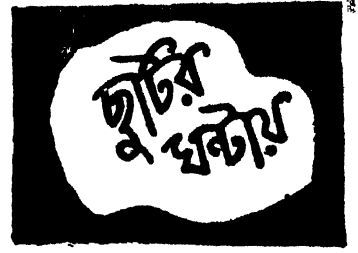
চিত্রগুপ্ত

এবারে শোনো—বিজ্ঞানের আরেকটি বিচিত্র-মজার আজব রহস্যময় খেলার কথা। এ খেলাটির নাম দেওয়া যায়—'বিনা-ফুঁয়ে বেলুন ফোলানোর কারসাজি'। খেলাটির কলা-কৌশল নিতান্তই সহজ-সরল…একটু চেষ্টা করলেই বিজ্ঞানের এই আজব-মজার কারসাজি দেখিয়ে খুব সোজা উপায়ে তোমরা তোমাদের আত্মীয় বন্ধুদের 'রীতিমত তাক্‌ লাগিয়ে দিতে পারবে। এ খেলার কেরামতী দেখানোর সামান্য যে কয়েকটি সাজ সরঞ্জাম দরকার, সেগুলিও অতি সাধারণ ঘরোয়া সামগ্রী…তোমাদের অনেকের পক্ষেই এ সব জিনিষ জোগাড় করা এমন কিছু ব্যয়বহুল বা কঠিন কাজ নয়। তাই বিজ্ঞানের এই আজব কারসাজির খেলা দেখানোর জন্য যে সব উপকরণ প্রয়োজন, গোড়াতেই তার একটা মোটামুটি ফর্দ্দ দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, বিনা ফুঁয়ে বেলুন ফোলানোর কশরৎ দেখাতে হলে দরকার—একটি জলশূন্য বোতল…সাধারণতঃ, বাজারে আজকাল সরু ছাঁদের মুখওয়ালা যে সব বোতলে সোডা লেমোনেড সরবরাহ করা হয়ে থাকে, সেই ধরণের জিনিষ হলেই চলবে। বোতল ছাড়া আরো জোগাড় করা চাই—ছোট বা মাঝারি সাইজের একটি রবারের তৈরী বেলুন (Rubber baloon) বেলুনের মুখে বাঁধবার উপযোগী খানিকটা লম্বা সুতো একটি মাঝারি সাইজের গামলা কিম্বা ডেকচি এবং এক কেটলী ফুটন্ত-গরম জল।

ফর্দ্দমতো সাজ-সরঞ্জামগুলি সংগ্রহ হবার পর, আসরে দর্শকদের সামনে একটি টেবিল অথবা টুলের উপর

পরিপাটিভাবে এ-সব সামগ্রী সাজিয়ে রেখে তোমাদের আত্মীয়-বন্ধুদের সাদরে আহ্বান জানাও যে তাঁদের মধ্যে এমন বাহাদুর কে আছেন, যিনি হাত দিয়ে কিম্বা মুখের ফুঁয়ের সাহায্যে ঐ টেবিল বেঞ্চি বা টুলের উপরে সাজানো রবারের বেলুনটিকে আদৌ স্পর্শ না করে, সেটিকে কেবল-মাত্র বিজ্ঞানের আজব-যাদুমন্ত্রে খুব সোজা উপায়ে অনায়াসে আগাগোড়া বাতাস ভরে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে পরিপাটি-নিটোল গোল-ছাঁদের বানিয়ে তুলতে পারবেন।

তোমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আসরের দর্শকদের মধ্যে কয়েকজন হয়তো উৎসাহভরে নিজেদের বাহাদুরী দেখানোর উদ্দেশ্যে নানা রকম কায়দা-কেরামতীর পরিচয় দিয়ে এমন আজব-উপায়ে বেলুনে বাতাস ভরে নিটোল-গোল ছাঁদে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে তোলবার জন্য এগিয়ে আসবেন, কিন্তু বিজ্ঞানের আসল-রহস্যটি অজানা থাকার দরুণ, তাঁদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হবে শেষ পর্য্যন্ত এবং রবারের বেলুন যেমন না ফোলানো অবস্থায় রাখা ছিল, আসরের মাঝখানে বরাবর ঠিক তেমনিই রয়ে যাবে। অবশেষে একে একে এঁরা সবাই যখন কারসাজি দেখাতে এসে হার মানবেন, তখন সুরু করো—তোমাদের কেরামতীর পালা।

কিন্তু সে কেরামতী কি উপায়ে দেখানো সম্ভব, আপাততঃ তারই মোটামুটি হদিশ দিয়ে রাখি।

অর্থাৎ, আসরের দর্শকদের সামনে সুষ্ঠুভাবে বিজ্ঞানের এই আজব-কারসাজি দেখাতে হলে, গোড়াতেই শূন্য-বোতলটিকে খাড়াভাবে টেবিল, বেঞ্চি বা টুলের উপর রাখো। তারপর ফুঁ দিয়ে বাতাস-ভরবার জন্য রবারের বেলুনের মুখের ফুটোটিকে বেশ ভালোভাবে এঁটে বসিয়ে দাও ঐ শূন্য বোতলের মুখে—পাশের ছবিতে যেমন দেখানো রয়েছে, অবিকল তেমনি ভঙ্গীতে।

এভাবে বোতলের মুখে রবারের বেলুনটিকে এঁটে বসানোর সময়, বেলুনের গলায় সুতোর ফাঁশটিও পরিয়ে দিতে ভুলো না কারণ, বিজ্ঞানের আজবলীলার ফলে, বেলুনটি ধীরে ধীরে বাতাস-ভর্ত্তি হয়ে আগাগোড়া নিটোল বলের মতো গোলাকার ধারন করলেই, সুতোর ফাঁশ টেনে সেটিকে অনায়াসে এমন মোক্ষমভাবে বেঁধে নিতে পারবে যে বেলুনের ভিতর থেকে বাতাসের যেন ফাঁক গলে সহজে বাইরে বেরিয়ে যাবার একটু উপায় না থাকে।

উদ্যোগ-পর্ব্বের এ কাজটুকু সারা হলে, বেলুন আঁটা শূন্য বোতলটিকে উপরের ছবির ভঙ্গীতে গামলা কিম্বা ডেকচিতে খাড়াখাড়িভাবে বসিয়ে রেখে খুব সাবধানে কেৎলী থেকে ফুটন্ত গরমজল ঢেলে পাত্রটি ভরে তোলো। এমনি ভাবে গামলা কিম্বা ডেকচিতে গরমজল ভর্ত্তি করার কিছুক্ষণ বাদেই ফুটন্ত-জলের তাপে শূন্য-বোতলটি ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে ঐ বোতলের মুখে-আঁটা রবারের বেলুনটিও ধীরে ধীরে দিব্যি ফুলে ফেঁপে আগাগোড়া নিটোল-গোলকার হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

এমন আজব-কাণ্ড কেন ঘটে, জানো?...শোনো তাহলে...এর আসল রহস্যের কথা খুলে বলি তোমাদের।

তোমাদের সকলেরই হয়তো জানা আছে যে গরম তাপ পেলে বাতাস আয়তনের বেড়ে যায়—এই হলো বিজ্ঞানের বিচিত্র নিয়ম। এ রীতি অনুসরণ করেই—'বিনা-ফুঁয়ে বেলুন ফোলানোর' আজব কারসাজিটি দেখানো সম্ভব। অর্থাৎ, বেলুন-আঁটা শূন্য-বোতল বসিয়ে রাখা পাত্রটির ভিতরে কেৎলীর ফুটন্ত গরম-জল ঢেলে দেবার ফলে, বোতলটি জলের তাপে ক্রমশঃ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোতলের ভিতরের বাতাসের আয়তনও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়... অথচ, সেটির মুখে
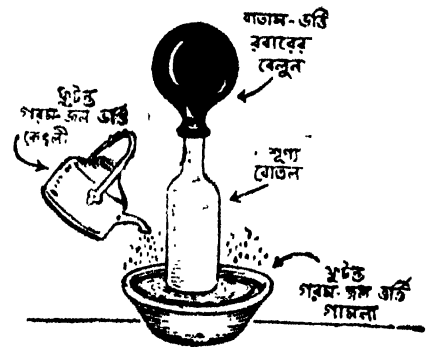
রবারের বেলুন আঁটা রয়েছে বলে বোতলের ভিতরকার বাড়তি-বাতাস এতটুকু বাইরে গলে বেরিয়ে আসতে পারে না। কাজেই বোতল-বদ্ধ সেই বাড়তি বাতাস তখন আয়তন বৃদ্ধির ফলে, ক্রমশঃ ঠেলে উঠে সেঁধিয়ে যায় ঐ

বোতলের মুখে-অাঁটা রবারের বেলুনের কন্দরে এবং তারই জন্য বেলুনটি ধীরে ধীরে ফুলে ফেঁপে বাতাসে ভরাট হয়ে দিব্যি সহজ-উপায়ে নিটোল-গোলাকার রূপধারণ করে। এবারের আজব মজার বিজ্ঞানের কারসাজিটির এই হলো আসল রহস্য।

আগামী সংখ্যায় এমনি বিচিত্র অভিনব আরেকটি নূতন ধরণের মজার খেলার হদিশ দেবার ইচ্ছা রইলো।

মনোহর মৈত্র

১। গানের হেঁয়ালী :

ন, ম, জ, অ, ন, গ, না, ণ, ক, য়, জ, ধি, হে, য়, গ্য, ত, ভা, র, ভা, তা, জ্ঞা, বি, পা, ধা, সি, গু, ন্ধু, ব, ট, মা, জ, ধা, দ্রা, রা, বি, রা, ড়, ক, ৎ, ল, ব, উ, ন্ধ্য, ঙ্গ, হি, বি, চ, মা, য, য, ল, না, মু, ঙ্গা, চ্ছ্, গ, উ, ল, ধি, জ, ত, ল, ঙ্গ, র, ব, শু, ত, ভ, মে, জা, না, গে, আ, ত, শু, শী, ভ, মা, ব, ষ, গে, য়, গা, ত, হে, জ, ব, থা, গা।

উপরে এলোমেলোভাবে যে সব অক্ষর ছাপা রয়েছে, সেগুলিকে যদি মগজের বুদ্ধি খাটিয়ে পর-পর ঠিক মতো সাজিয়ে বসাতে পারো, তাহলে খুব সহজেই খুঁজে পাবে আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ কবির রচিত সর্ব্বজনপ্রিয় একটি জাতীয়-সঙ্গীতের প্রথম কয়েকটি পংক্তি। হঠাৎ দেখলে, এ হেঁয়ালির মীমাংসা যতটা সোজা মনে হবে, আসলে কিন্তু কাজটা ঠিক ততখানি সহজ নয়। কথাটি খাঁটি কিনা—এক টুকরো কাগজ আর পেন্সিল নিয়ে নিজেরা বুদ্ধি খাটিয়ে উপরের ঐ একরাশ অক্ষর পর-পর সাজিয়ে বসানোর চেষ্টা করে দেখলেই তোমরা স্পষ্ট বুঝতে পারবে। কাজেই নিজেরা হাতে-কলমে পরখ করে দ্যাখো তোমরা। এবারের এই আজব হেঁয়ালির সঠিক সন্ধান যদি আমাদের দপ্তরে লিখে পাঠাতে পারো চটপট, তাহলে পরের মাসের সংখ্যায় সবাইকে জানিয়ে দেবো তোমাদের নাম-ধাম।

কল্যাণী মুখোপাধ্যায়

'কিশোর-জগতের' সভ্য-সভ্যাদের রচিত ধাঁধা :

২।

চার অক্ষরে নাম আমার···খেতে সুস্বাদু বিশেষ এক-ধরণের মরশুমী ফল। প্রথম ও শেষাক্ষর জোড়া দিলে, মাছ ধরা যায়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় অক্ষর জোড়া দিলে বোঝায়—বালুকাময় বিস্তীর্ণ অঙ্গন। প্রথম অক্ষর দুটিতে বোঝায়, বিশেষ এক-ধরণের সুস্বাদু-মুখরোচক ফলের নাম···আর শেষাক্ষর দুটিতে সহজেই কাগজের বুকে লাইন টানা যায়। বলো তো—এ ধাঁধার উত্তর কি ?

রচনা : অরুণ ও মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তী (আড়িয়াদহ)

৩।

তিন অক্ষরে নাম···থাকে আমাদের মাথার খুলির ভিতরে। প্রথম অক্ষর বাদ দিতে, সেটি মিলবে দর্জ্জীর দোকানে আর শেষের অক্ষরটি বাদ দিয়েই হয়ে যাবে জল রাখবার পাত্র। বলো তো, সেটি কি ?

রচনা : খুকু ও টুকু (সিঙ্গুর)

গতমাসের 'ধাঁধা আর হেঁয়ালি'র উত্তর :

১। ১০টি ত্রিভুজ।
২। টাকায় ১২টি আম।
৩। সানাই।

গতমাসের তিনটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বুলু মিত্র (কলিকাতা), সৌরাংশু ও বিজয়া আচার্য্য (কলিকাতা), রিনি ও রনি মুখোপাধ্যায় (কাইরো), পুতুল, সুমা, হাবলু ও টাবলু (হাওড়া), পুপু ও মুটিন

মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), বাপি, বুতাম ও পিন্টু গঙ্গোপাধ্যায় (বোম্বাই), সত্যেন, মুরারি, সঞ্জয় ও সুনীল (ভিলাই), রাণা ও বুনা মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্যাঙ্গালোর),

গত মাসের দুটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে ঃ

বুবু ও মিঠু গুপ্ত (কলিকাতা), কবি ও লাড্ডু হালদার (পানাগড়), শুভা, সোম, অরিন্দম ও কল্পনা বড়ুয়া (কলিকাতা), শ্যামাদাস দেবশর্মা (উত্তরপাড়া), বিশ্বনাথ ও উষানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলিকাতা), শীলা মিত্র (বাঁশদ্রোনী), অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (আলীগড়), নরেন্দ্রনাথ ঘোষ (খলসী), বাণী, শুভ্র ও মিলন হাজরা (আড়ুই),

গতমাসের একটি ধাঁধার সঠিক উত্তর দিয়েছে :

বিশ্বনাথ ও দেবকী সিংহ (গয়া), বাপ্পা ও শিবাজী রায় (কলিকাতা)।

খেলার সাথী—

ফটো : দীপক চন্দ

কন্ঠ সঙ্গীত ছাড়াও, বিবিধ ধরণের বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে সুর-সৃষ্টি ও বিচিত্র সঙ্গীতালাপের আগ্রহ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। সে পরিচয় মেলে মানব-সভ্যতা বিকাশের আদি-যুগ থেকেই। ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আদিম-মানবের মনে দেখা দিয়েছিল সঙ্গীত-চর্চ্চার সৌখিন অনুরাগ। সে যুগে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে আদিম-মানবের আনন্দ-অনুষ্ঠানে বাজানো হতো সামান্য দুটি কাঠি।

তারপর ... কালে-কালে ক্রমশঃ সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আদিম-মানব একদা দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের কোন এক ফাঁকে সহসা সন্ধান পেয়েছিল সুমধুর তারের সাহায্যে সুর-সঙ্গীত চর্চ্চার উপযোগী অভিনব-বিচিত্র ধরণের বাদ্যযন্ত্র বানিয়ে তোলার অপূর্ব্ব কলা-কৌশল। সেই থেকেই সুরু হলো — মানব-সমাজে তারের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারের ইতিহাস।

আর প্রাচীন যুগের মিশর রাজ্যের সুসভ্য অধিবাসীরা সুমধুর সুর-সঙ্গীতের আলাপ করতেন তাঁদের উদ্ভাবিত বিচিত্র-অভিনব ধরণের এই 'হার্প্' (HARP) বা বীন্-সেতারের মতো অপরূপ-সৌখিন তার-যন্ত্রে। কালের প্রবাহে মিশরের আদি-যুগের বাসিন্দাদের পরম-প্রিয় এই তার-যন্ত্রের ব্যবহার অধুনা অপ্রচলিত হলেও, ওদেশের যাদুঘরে এখনো চোখে পড়ে সেকালের এমনি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের নমুনা।

গান

রাগ—ভৈরবী তাল—দাদরা

সোনালী ধানের কামনা কাঁপিছে
বুক ভ'রা মধু তার,
গন্ধ ছড়ায়ে বিছানায় আসন
রচি নব উপহার ॥
এস পরবাসী মুখ ভরা হাসি
দুয়ারে দুয়ারে ঐ বাজে বাঁশ,
ধুলায় বিছায়ে আছে রাশি রাশি
আহ্বান সবাকার ॥

কৃষাণী বধুর আঁখির স্বপনে
কৃষাণের বুক নাচে,
রোদ-ঝল-মল আকাশের গায়ে
মরা প্রাণ আজ বাঁচে।
এস মেলি হাত তুলে লও সবে
মাটির দানে এ মহোৎসবে
সবার হৃদয় বাঁধা হোক ভবে
রাখী জয়-যাত্রায়।

রচয়িতা—কামাখ্যা সরকার   স্বরলিপি—শ্রীকালীনাথ মুখোপাধ্যায় (সঙ্গীতবিশারদ)

	১´				•				১´				•			
II	সা	জ্ঞা	পা	|	পা	পা	পা	|	পা	দা	পামা	|	মা	পা	মা	I
	সো	না	লী		ধা	নে	র		কা	ম	না°		কাঁ	পি	ছে	
	১´				•				১´				•			
	সা	দা	পা	|	মা	মা	ঋা	|	জ্ঞা	সা	সা	|	-া	-া	-া	I
	বু	ক	ভ°		রা	ম	ধু		তা	°	র		°	°	°	
	১´				•				১´				•			
	সা	মা	মা	|	মা	মা	মা	|	মা	পামা	জ্ঞামাপা	|	পা	পা	পা	I
	গ	ন্	ধ		ছ	ড়া	য়ে		বি	ছা°	°°য়		আ	স	ন	

১´ ০ ১´ ০
জ্ঞা দা দা | দা মা দা | র্সা । র্সা | -া -া -া I
র চি ন ব উ প হা ০ র ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
সা দা পা | মা সা ঋা | জ্ঞা সা সা | -া -া -া II
বু ক ভ রা ম ধু ভা ০ র ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
II দা মা দা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা না | ঋ´া র্সা র্সা I
এ স প র বা সী মু খ ভ রা হা সি

১´ ০ ১´ ০
র্সা ঋ´া ঋ´া | ঋ´া ঋ´া ঋ´া | র্সা ঋ´া জ্ঞ´া | ঋ´াজ্ঞ´া ঋ´া র্সা I
দু য়া রে দু য়া রে ঐ ০ বা জে ০ বা শি

১´ ০ ১´ ০
র্সা ঋ´া র্সা | ণা র্সা ণা | দা ণা দা | পা পা পা I
ধু লা য় বি ছা য়ে আ ছে রা শি রা শি

১´ ০ ১´ ০
সা দা পা | মা সা ঋ | জ্ঞা সা সা | -া -া -া II
আ য় হা ন ব বা কা ০ র ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
II সা ঋা মা | মা মা মা | মা পামা জ্ঞামাপা | পা পা পা I
কু মা রী ব ধু র আ খি০ ০ ০ র স্ব প নে

১´ ০ ১´ ০
জ্ঞা দা দা | দা দা ণা | দা পা -া | -া -া -া I
কু মা রে র বু ক না চে ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
পা দা পা | মা মা মা | জ্ঞা পা মা | জ্ঞা ঋা সা I
যৌ ব ন ল য় ল আ কা শে র গা য়ে

১´ ০ ১´ ০
সা মা মা | মা পামা জ্ঞামাপা | মা পা -া | -া -া -া I
ম রা প্রা ণ আ০ ০ ০ জ বা চে ০ ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০
দা মা দা | র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা না | ঋ´া র্সা র্সা I
এ স মে শি হা ত ফু লে ল ও স বে

র্সা ঋ´া ঋ´া | ঋ´া ঋ´া ঋ´ | র্সা ঋ´া জ্ঞ´া | ঋ´া র্সা র্সা I
মা টি র দা নে র এ স হো ত স বে

১´ ০ ১´ ০
র্সা ঋ´া র্সা | ণা র্সা ণা | দা ণা দা | পা পা পা I
স বা র হৃ দ য় বা ধা হো ক ভ বে

১´ ০ ১´ ০
সা দা পা | মা সা ঋা | জ্ঞা সা সা | -া -া -া II
রা খি জ য় য়া ০ আ ০ র ০ ০ ০

পূর্ণকুম্ভ

বিমানকুমার রাজগুরু

দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলো সুলতা। মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে। তাছাড়া পাড়াটা খারাপ। বেড়াল, কুকুর তো আছেই, অভাব নেই চোর ছ্যাঁচড়েরও। মূল্যবৃদ্ধি আর খারাপ লোকের বৃদ্ধি পাশাপাশি হাঁটছে এখন। কদমে কদম। সংবাদপত্রগুলি তো, অণুর বাবা যা দু-একদিন নিয়ে আসে কালভু বেহেসিবী খরচ বলে যার জন্যে উক্তিও করেছে সে, চোর বাটপাড়ের কাহিনীতে ভরা। এছাড়া আবার স্পেশ্যাল (ইংরেজী কথাটা এবং ঐ ধরণের আরো দুএকটি কথাও শিখেছে এর আগের পাড়ায়, পাড়াটা কিছু ভালো ছিল) আইন আদালতের পাতা। সাবধানের মার নেই। স্বামী বাইরে বেরলেই দরজা বন্ধ। একটা কিছু পটকে দিলেই আতান্তরে পড়া। সেটা কেনা মানেই অন্যদিকের ব্যয় সঙ্কোচ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষ নেই বাড়ীতে। আর তার অর্থই, স্বামীর দুধ বন্ধ। তার কথায় ঐটেই এসব বাড়ীর প্রয়োজনের অতিরিক্ত, অদরকারী। অথচ অভ্যেসটা ওর খারাপ। রাত্রে খাওয়ার পর একটু গরম দুধ না পেলে তারপর দিন পেটের গোলমাল। বারবার জল খাওয়া, পেট চাপড়ানো, আর মেজাজ খিটখিটে।

এ নিয়ে ঠাট্টাও করেছে সে স্বামীকে—তুমি তো অণুরও অধম।

মনের উপর, মনকে নিয়ে মানুষের বসতি আর বেসাতি দুই-ই। মন ভালো থাকলে সব কিছুই ভালো, না হলে তাবৎ ব্রহ্মাণ্ড খারাপ, অসহ্য নুনগোলা! ভালো মন থাকলে ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে তার স্বামী—অণু তো তবু দুধ পায়…কি বলতে কি বলবে, আলগা-হওয়া মুখে কি বেরুবে (যদিও বুঝতে আর লজ্জানুভব হয়) তাই রুক্ষ চেয়ে স্বামীর মুখে হাতচাপা দিয়ে অপ্রস্তুতকে মিষ্টতর করেছে। আবার স্বামীর মন ভার থাকলে গলা ভার হয়েছে—সত্যি, বাবা মা যে কী অভ্যেস করিয়ে ছিলেন। এসব ঘরে ওসব বিলাসিতা…

ঘন হয়ে এসেছে সুলতা। গায়ে গা ঠেকেছে। সান্ত্বনার বিলি কেটেছে চুলে। মিষ্টি হাতে চুলের গোড়ায় গোড়ায় নখ টেনেছে। আরো আস্তে আরো দরদমাখা মরমিয়া স্বর বেরিয়েছে—আমি কি তাই বলেছি, আমি কি তাই বলতে পারি?

কোনো কোনো দিন হয়তো ঐ একই কারণে, কিংবা অন্য কোনো অনুরূপ কারণে আর ভারী গলা না, রুক্ষ হয়েছে গলা। কলকারখানার লোক, যেমন গলা হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে—ঝগড়া করছে। সে ঝগড়া মিটিয়েছে রাতের বিছানা নয়তো অণু। বিছানায় মা বাবার মধ্যে যে ব্যবধানটুকু ওর রচনা—বিছানার বাইরে সেটা মেটাবার যেন দায়িত্ব নিয়েছে ও।—বাবা, দেখু। ওপাড়ায় দস্তুরী ছিল ওটা। কলেজ-ফেরতা প্রফেসারগুলি, স্কুল-ফেরতা মাষ্টারগুলি, কোর্ট-ফেরতা উকিল মোক্তারগুলি বলতো বাড়ীগুলোর পিছনে পশ্চিমখোলা মাঠটায়। আর সুলতা ভাবতো, এখনো ও ভে:—হ্যাঁ এখনো ভাবে, ওদের কি এইসব সাধারণ জিনিষগুলি নিয়ে মন ভারী হয়, ঝগড়া করে? আর এসব প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়ে আসে সুলতার কাছে। অতি সাধারণবিত্ত আর মধ্যবিত্তর চিন্তা নিজেকে ছাড়া সবাইকেই বিত্তশালী দ্যাখে। নিজেদের জীবনের ছলনা কখন হীনমন্য করে তোলে নিজেকেই।

মধ্যবিত্তর সংসার ছলনায় ভরা। আজকের ঘটনার জের ধরেই চিন্তা করতে লাগলো সুলতা। যদিও ওরা ঠিক সাধারণবিত্ত, তবুও সুলতা নিজেকে ভাবে মধ্যবিত্ত। বড়লোক আর খেতে-না-পাওয়া লোক ছাড়া সবাই

মধ্যবিত্ত—ঠিক এই পরিপ্রেক্ষিতেই ও নিজেকে ভাগে মধ্যবিত্ত। বড়লোক আর গরীব লোকের জীবনে বোধহয় ছলনা নেই। তাই বোধহয় ওদের বাঁচায় ফাঁক নেই, ফাঁকি নেই। নিজেকে কেমন মার খাওয়া ক্লান্ত ঘুমিয়ে থাকা ছেলেটার পাশে বসে অসহায় বোধ করতে লাগলো ও।

বেড়ার ধারে ঐ চুপমারা মেটে গাছটাকে দেখলো খানিকক্ষণ, কেমন বিরক্ত হলো। শূন্যে তাকালো। চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান একটা চিল কিংবা পাখি চোখে পড়লো—তাও খারাপ লাগলো।

স্বামী চলে গেলে অন্যদিন তাহলেও কাজ থাকে। ছেলেটাকে একটু আদর করা। একটু সাজানো, দুটো আবোল তাবোল বকা, তারপর ঘুম পাড়ানো। কিন্তু আজ প্রকৃতপক্ষে বড় ফাঁকা লাগছে সুলতার। ছেলেটা মার খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজেই ঘুমিয়েছে। ওকে নিয়েই স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া।

ঘটনাটা চশমা ভাঙা। গগ্‌লস্‌ ভাঙা। স্বামী যখন অণুর একটা খেলনা তৈরীতে ব্যস্ত, নিজে রান্নায়, অণু তখন চশমায়। ফলে চসমা ভেঙেছে।

—ভাংলি, ভাংলি বদমাইস ছেলে—

গলার জোরেই ছুটে আসতে হয়েছিল সু তাকে। ভয় পেয়ে অণু আশ্রয় নিয়েছিল তার কোলে।—আঃ চুপ কর ছোটো ছেলে—

ছোটো ছেলে চসমা ভাংলে কি চসমা নতুন হয়—এ্যাই লক্ষ্মীছাড়া—টান মেরেছে ছেলেটাকে। আচমকা টানে হতভম্ব হয়েছে সুলতা। হাত ছেড়ে গ্যাছে। (ও নিশ্চয় ঐ রকম আঘাত দিতে চায়নি) এতক্ষণ পরে কথাটা চিন্তা করতে পারলো সুলতা। কারণ ভাঙায় জোড় খাওয়াতে হয় ঘটনা, নয় সময়। কিন্তু তখন সুলতা গিয়েছে রেগে।

—নিজের জিনিষ নিজে বাগিয়ে রাখোনা কেন?

—সব কিছু আমাকেই করতে হবে? রান্নার কাজ ছেড়ে রাখিলাছেবার এ কাণ্টা কি খুব কষ্টকর হতো?

কথাটা মনে পড়াতে কেমন একটু হাসি হাসি পেল সুলতার। লোকটা হাতুড়ি ঠুকলে কি হবে—কথাগুলোই। আর এই কথাটাতেই অনেক ছলনায় একটা ধরা পড়ে গ্যাছে আজ।

—রান্না ছাড়া কাজ নেই তোমার সংসারে? না করতে হয় কোন্ কাজটা? কটা লোক রেখেছ তুমি?

দুর্বলের দুর্বল স্থানে ঘা। দুর্বলতা ঢাকতে তোড়ে বেরিয়েছে অনেক কথা। কথায় কথা বাড়ে। বেড়েওছে। কিন্তু এতক্ষণে সুলতার রাগ অনেকটা পড়েছে। যেমন ফোয়ারায় জল কমে আস্তে আস্তে। অনুতাপ হচ্ছে। সত্যিইতো কাজে যাবার মুখে ঝগড়া। কড়া রদ্দুরে চোখ যদি চড়ে যায় তাহলেই কাজের ভুল আর তাহলেই, তাহলেই …। সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিথর হয়ে গেল সুলতার, দেহের ভিতর একটা তীব্র তরল স্রোতকে অনুভব করতে পারলো সুলতা। স্রোতটার তীব্র বেগটা, তার দুঃসহ নাচন যে অনুভূত হলো তাইনা সেই প্রলয়ঙ্করী নৃত্যটা অকস্মাৎ স্থানান্তরের মধ্যে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে যেন লুকিয়ে রইল। হিংস্র শ্বাপদ যেন পুনর্বার বেরুনোর আশায় আশ্রয় নিল ঝোপে। শিউরে উঠলো সুলতা। চোখগুলো বুজে ফেল্ল। স্তব্ধ হয়ে গেল সুলতা। 'না, না, যার কেউ নেই তাঁর ভগবান আছে।' উপুড় হয়ে ঘুমন্ত ছেলেটার পিঠে সঞ্চরমান হাত হঠাৎ থমকে থেমে দ্রুতগতি লাভ করলো। ভুল, ভয়াল চিন্তাটাকে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করলো ওর দ্রুত সঞ্চরমান হাত।

অনুশোচনায় দগ্ধ হলো সুলতা। সযত্নে চেপে থাকা একটা ইচ্ছাকে কলহের মুখে কেন প্রকাশ করে ফেল্ল সে। শুধু কি তাই, স্বামীর অক্ষম ইচ্ছাটাকে যেন ব্যঙ্গ করে বলেছে সে। সত্যি তোমার রেস্ট নেই. আমার তাহলেও অফ আছে, ছাড়া আছে। ও, টি, টা একটু বাড়ালেই, অন্তত এই কিছুদিনের জন্যে একটা রাঁধুনী কাম ঝি…। ইচ্ছাটা অক্ষম বলেই হয়তো মাঝপথে থেমে থেকেছে স্বামী।

—খুব হয়েছে, এতে মেয়েদের কষ্ট হয়না, বলেছে সে, কিন্তু একটু কি ইচ্ছেও হয়নি ঐ রকম একটা ব্যবস্থা কিছুদিনের জন্যে করতে? মনে মনে পুলকিত হয়নি কি স্বামীর সে সুব্যবস্থার কল্পনায়? রাঁধুনী থাকবে ঘরের কাজে ব্যস্ত। স্বামীর ছুটির দিনগুলোতে বারান্দায় বসে তার সঙ্গে গল্প। অণু সামনে সমানে, ছুটোছুটি করবে। দুজনেই হয়তো সেদিকে কখনো তাকাবে। হঠাৎ যেন লক্ষ্য করবে

অণু কতটা বড় হয়ে গেল। এই তো সেদিনের কথা। কিছু মনে পড়বে। লজ্জা লাগবে, ভালো লাগবে দুজনেরই। পড়ালেখার কথা হবে তার। দুপুরে তাকে কাজল পরাবে, পরে থাকা ইজেরটা ঠিকঠাক করে দেবে। গায়ে পিঠে পাউডার লাগিয়ে ঘুম পাড়াবে। তারপর ওদিকে স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে অলস ক্লান্তিতে নিজেকেও বিছানায় ঢেলে দেবে, হাতে হয়তো একটা সিনেমা পত্রিকা সরল গল্প থাকবে তাতে। পড়ার শেষে যেন মনে প্রশ্ন না জাগে—কেন এমন হলো। ঠিক এইরকম একটি নিরবচ্ছিন্ন জীবন একটি নিটোল সুখের ছায়া কি কখনো দোলায়িত হয়নি তার মনের গভীরে? (আশ্চর্য কিন্তু এই, এই প্রায় সবগু'লই সুলতা প্রতিদিন করে আসছে—কিন্তু নিজেই জানেনা সে কথা)।

এই সব দিনের দুপুরের নিঃসংগতা বড় বিশ্রী। দিন বড় মন্দাক্রান্তা। খররোদ বাইরে পড়ে থাকে। পথ চলতি শব্দ নেই। প্রথমে জাগে চিন্তা। ছেঁড়া খোড়া। আগের জেরটানা চিন্তা বর্তমানে পৌঁছয়। বর্তমান ভাবনায়। চিন্তা আর ভাবনা পরিব্যাপ্ত হয় সমগ্র চেতনায়। ক্রমে চেতনাও অবশ হয়, অলস হয়। তখন ভাবে সুলতা অবস্থাটা অন্যরূপ নিলে অর্থাৎ ভালো হলে এই সব মনান্তর থাকতো না। বড় বড় সমস্যার অনায়াসে সমাধান হতো। একদিকের ব্যয়ভার বহনের জন্যে অন্যদিকের ব্যয় সঙ্কোচ করতে হতো না। মিথ্যে করে বলতে হতো না কাউকে—এ পাড়াটায় তো অনেকদিন রইলুম—দেখি অন্য পাড়াগুলোও। কলকারখানার মানুষ লাফঝাঁপ না করে একজায়গায় থাকতে পারে না যে, বলে স্বামী গরবিনীর লজ্জাটুকু মুখে লেপন করতে হতোনা। অতএব মনের মধ্যে সৃষ্টি হতোনা ছলনায় চাপা দেওয়া কোনো ফাঁকের, কোনো কষ্টের। এ যেন ঠিক সৌখিন বাড়ীর কোথাও গিয়েছে ফেটে। সেইটেকে উপর উপর পলস্তারা মেরে রং দিয়ে বাড়ীর সমস্ত রঙের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া। কিন্তু সে যব বেশীদিন টিকবে না। তার ফাঁক তো ফাঁকি দিয়ে চাপা রইল। সে তো পড়ে যাবে কিছুদিন পরে। কিন্তু কই জীবন তো পড়ে যাচ্ছে না, বসে পড়ছে না, থেমে থাকছে না। সে তো চলছে। পড়বো পড়বো করেও তো টিকে থাকছে। তাহলে কি উপমাটা ভুল। ভুল হবে কেন—সেটা যে বাড়ী, এটা যে জীবন। আরো হাস্যকর চিন্তায় এসে একবার থামলো সুলতা।

সেই সঙ্গে ছিল ছেলে, চিন্তায়, ভাবনায়। এলানো চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা দেহটা প্রমাণ করলো সেটা। ছেলেটার দিকে পাশ ফিরলো সুলতা। ছেলেটা একপাশে শুয়ে। পিঠটা ওর সুলতার সামনে পড়লো। হাতবুলিয়ে আদর করলো ছেলেটাকে—ঘাম বিন্দুগুলো মুছিয়ে দিল নিজের কাপড় দিয়ে। 'কত আপনার, কত ভীষণ নিজের এই নরম শীতল দেহটুকু।' সমস্ত বুক জুড়ে নরম শীতল দেহটুকুকে চেপে ধরতে ইচ্ছে হলো সুলতার। 'ছেলেরা যেন বড় হয়ে যায়? মায়ের কোলজুড়ে গলা জড়িয়ে ঠিক এইরকম বরাবর কেন থাকে না! গলা জড়িয়ে, বুক জড়িয়ে ধরার, এই অতলে তলিয়ে যাওর সুখ, এই চাপ সুখ ছেলে বড় হয়ে গেলে থাকে! ছেলে বড় হলে মা স্বস্তি পায়, কিন্তু সুখ তো এখন। আচ্ছা অণুও তো বড় হবে যাবে।'

ছেলেটাকে কিন্তু বুকে টানলো না সুলতা। বরং কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে ডান হাতের তালুতে গাল রেখে বাঁ হাতে ধরা নিজের একগাছি চুল দিয়ে ছেলের নাকের নীচে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগাবার চেষ্টা করলো সুলতা। কিন্তু ব্যর্থ হলো।—"উঃ কী ঘুম রে বাবা। বেলা যে গেল!' স্পষ্ট উচ্চারণ করলো কথাগুলো সুলতা এবং শেষের কথাটায় নিজেই যেন জেগে উঠলো। সত্যি তো বেলা যে গ্যাছে। তাড়াতাড়ি কলে যেতে হবে। না হলে লম্বা লাইনের পিছনে দাঁড়াতে হবে অনেকক্ষণ। মুখ বাঁকা মোক্তারের বৌ, আর কিন্তু ধোপার বৌ আগে গেলে তো আর দেখতে হচ্ছেনা। একগাদা বালতি কলসী। আর ততোধিক ওদের বক্তব্য। পাড়ার গেজেট।

তাড়াতাড়ি উঠলো। বালতি কলসী নিয়ে বেরিয়ে গেল সুলতা। দুজনের পরে তবুও দাঁড়াতে হলো সুলতাকে। চুপচাপ দাঁড়িয়েই থাকলো সুলতা। স্কুল কলেজের ছুটি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা আসছে। সামনের মেয়ে দুটিকে তো চিনে নিয়েছে সুলতা। একটির লম্বা বেণী—ছাপা শাড়ি, অন্যটির খোঁপা চুল, একরঙা শাড়ী। ওরা আরো নীচে দিকের পাড়ায় থাকে। সে দিকেই চলে যাবে।

যাবার সময় সুলতার দিকে দুজনেই তাকাবে। চোখ-চেনার হাসি হাসবে। তিনজনেই চোখের চেনা। চোখেই হাসবে। পিছনে আসা ছেলে দুটি এইখানটা পেরিয়ে ডাইনে বাঁক নেবে। আড়ালে চাইবার চেষ্টা করবে মেয়ে দুটি।

কলে নিজের কলসী লাগালো সুলতা। মেয়ে দুটি কাছে এসে পড়লো। হাসলো চোখে। সুলতাও হাসলো। ওর চোখ যেন আরো কিছু বল্ল। সারাদিনের বিরক্তি আর চিন্তা আর ভাবনা সেই হাসির সঙ্গে সঙ্গে কোথায় চলে গেল। কল থেকে কলসীটা তুলেই কোমরে বসালো। বসাতে গিয়েই তলপেটে খিচ করে বেদনা অনুভব করলো সুলতা। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনে একটা তরল আনন্দ বয়ে গেল সুলতার। পায়ে জোর এল। অণু ঘুম থেকে উঠবে। স্বামী কারখানা থেকে ফিরবে। কত কাজ! পা চালালো সুলতা।

জাতিস্মর

শ্রীআশুতোষ সান্যাল

এই মতো কতো শত মল্লীঘেরা পল্লীর প্রাঙ্গণে,
ঝঙ্কৃত ভ্রমরগীতে, সমাকীর্ণ কিংশুক-রঙ্গণে,
নশ্বর কুলায়খানি বাঁধিয়াছি তোমার আমার—
আজি কি গিয়েছ ভুলে স্বপ্নসম শেষ ত্রিযামার?
কতো জন্ম মৃত্যু বাহি' কতোবার এমনি গুণ্ঠিত
দেখিয়াছি অপলক ঐ মুখ সরম-কুণ্ঠিত,
ভূলুণ্ঠিত লতাসম লীন যবে বাসক শয্যায়
নববধূবেশে তুমি! এমনি সহস্র রাত্রিছায়
কপোতীর বুকে তব কান পেতে শুনেছি স্পন্দন,
প্রথম প্রেমের স্বাদ দেহপাত্রে করেছি ভুঞ্জন!
এবারের লীলা যবে একদিন হবে অবসান,—
নবজন্মতীরে সখি, করিবে কি আবার আহ্বান
নবীন মূরতি ধরি' রুনুঝুনু বাজায়ে কাঁকণ
অবিশ্রাম? হায় অয়ি, আর কভু হবে কি মিলন!

শাশ্বত

শান্তশীল দাশ

শয়তান আঘাত হানে বারে বারে আর
প্রত্যয়ের ভিৎ কেঁপে ওঠে বারবার।
মনে হয়, ওই হিংস্র নখদংষ্ট্রাঘাত
ছিন্ন ভিন্ন করে দেবে সব অকস্মাৎ।
যা কিছু সুন্দর শুভ্র নিমেষে নিঃশেষ
হয়ে যাবে, রবে শুধু ধ্বংস অবশেষ
ভস্মরাশি, শয়তানের দুর্দান্ত প্রতাপ
বুকে নিয়ে; কী নিষ্ঠুর রূঢ় অভিশাপ।
সব শঙ্কা দূরে যায়, নেমে আসে ধীরে
রুদ্রের প্রচণ্ড দণ্ড শয়তানের শিরে।
ধুলায় লুণ্ঠিত হয় বৃথা দম্ভ তার,
ঘুচে যায় নিমেষেই সমস্ত আঁধার।
আবার আবার জাগে প্রসন্ন আশ্বাস,
আলোকের, আনন্দের, দীপ্ত নীলাকাশ।
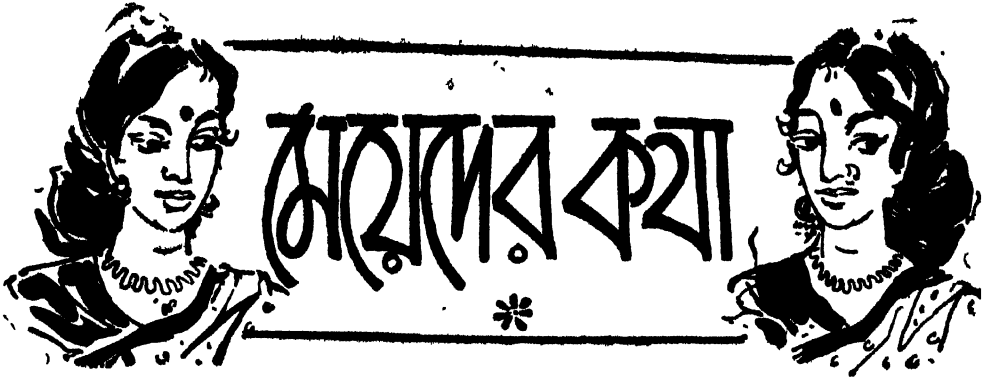
পাত্রী ও পছন্দ

মীরা ঘোষ

রাষ্ট্রসংঘের সমাজ বিজ্ঞানীরা তথ্য বিচার করে বলেছেন ..."এখনকার আধুনিক মেয়েদের সংসারে আরও কঠিন কাজ করতে হয়। কাবুলীওয়ালা থেকে মুদীর দোকানের তাগাদাকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়, বা কানাকড়ি দিয়ে বিদায় করতে হয়। সংসারের শত দারিদ্র্যের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখে স্বামী সন্তানের শতসহস্র দৈনিক চাহিদাকে মেটাতে হয়। সুদক্ষ সংসারকর্ত্রীর পারিশ্রমিক তাই পঁচিশ বছর আগের তুলনায় অন্ততঃ আটগুণ বেশী। রাষ্ট্রসংঘের বিশেষজ্ঞের বিচারে তাদের মূল্য প্রায় চারহাজার থেকে পাঁচহাজার টাকা।"

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের বিজ্ঞানীদের মত যাই হোক না কেন, বাঙালী ঘরের সাধারণ মেয়ের দাম কী সত্যিই বেড়েছে? সেই মেয়েটির কথা মনে পড়ছে।

শুধু গৌরবর্ণা বললেই সবটুকু বলা হয়না, অত্যুক্তি না করেও দুধে-আলতা রঙ তাকে বলা যেতে পারে। সামান্য উত্তেজনায় কারণ ঘটলেই ওর গালের লালিমা ছড়িয়ে পড়ে সারা মুখে। শিক্ষিতা ও স্মার্ট,—ধনী পিতার ধনগর্ব্ব ওর মনে ছাপ ফেলে নি সেটা প্রথম পরিচয়েই বোঝা যায়। এমন মেয়ের পাত্র পেতে দেরী হবে না, সাধারণ ভাবে এই ধারণাই সবার মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আপনি যদি একথা বলেন তাহলে এইটুকুই বলা যায় এখনও আপনি বাংলাদেশের পাত্রপক্ষকে চেনেন নি! তাই হাজার মাইলের দূরত্ব থেকে দেখাশোনা করতে এসে মেয়ের বাবা যখন শোনেন সম্ভাব্য পাত্র ইঞ্জিনীয়ার ছেলের পিতৃদেব নগদ দশহাজারের কমে কথাই বলবেন না, তখন যদি ভদ্রলোকের ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বালা করে উঠে, তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় কী?

স্নেহে যত্নে যারা মেয়েকে এতদিন মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন তাঁরা যে মেয়েকে যথাসাধ্য দেবেন এতো স্বতঃসিদ্ধ। আর সেই যথাসাধ্য যে নিতান্ত অল্প হবে না তাও তো তাঁদের আর্থিক অবস্থা দেখে বোঝা যায়। তবে কেন এই হীনমন্যতার পরিচয়? আর আরও আশ্চর্য্য এই যে সেই ছেলেটিও তো বিংশ শতাব্দীর যুবজনোচিত দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এলো না! দাঁড়ালো না এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানিয়ে!

রবিবাসরীয় পত্রিকার 'পাত্রী চাই' পৃষ্ঠা খুললে যা চোখে পড়ে, তা হলো প্রকৃতসুন্দরী, গৌরবর্ণা, শিক্ষিতা, দীর্ঘাঙ্গী, ছন্দোময়ী, গান বাজনা জানা ইত্যাদি...। সর্ব্বগুণান্বিতা পরমাসুন্দরী মেয়েটি যার জন্য চাওয়া হচ্ছে তিনি হয়ত রূপে গুণে একেবারেই এর বিপরীত। আর এই 'সর্ব্বগুণান্বিতা' হওয়ার প্রয়োজন শুধু মেয়েদের জন্যই। ছেলেদের ক্ষেত্রে এগুলো বাহুল্য মাত্র! শুধুমাত্র লেখাপড়া শিখে একটা চাকরী করতে পারাই তার গুণপনার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ! সে ভালো স্পোর্টসম্যান কিনা, বাজনায় তার

যথেষ্ট পারদর্শিতা আছে কিনা, গৌরবর্ণ কিনা, ইত্যাদি তার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় নয়! এ ক্ষেত্রে সেই পুরণো প্রবচনই প্রযোজ্য,—'হীরের আংটির আবার বাঁকা আর সোজা।" শুধুমাত্র পুরুষ হয়ে জন্মানোই তার দাম বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। তাই পাত্র পক্ষের মন যোগাবার চেষ্টায় আজও বাঙ্গালীর মেয়েকে আত্মসম্মানের প্রশ্নকে শিকেয় তুলে রেখে পাড়াপ্রতিবাসীর বিরক্তি উৎপাদন করে হারমোনিয়াম সহযোগে গান শেখার নামে বেসুরো চিৎকার করতে হয়। শেখার ইচ্ছে না থাকলেও শিখতে হয় গীটার।

সবাইকে সবার চোখে সমান সুন্দর লাগে না। ইংরাজী প্রবচন উদ্ধৃত করে বলা যায়—"বিউটি লাইজ ইন দ আইজ অফ্ দ বিহোল্ডার।" সেদিকে কিছুই বলবার নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে তখনই যখন দেখি, যে যা নয়, তাকে তাই করার ব্যর্থ চেষ্টা করা বা অদ্ভুত কোন কারণ দেখিয়ে প্রস্তাব নাকচ করা। তাই পাত্রপক্ষের বলতে বাধে না—'সবই তো ভাল চশমাটা যদি না থাকত ...।" অবাক হয়ে ভাবি এঁরা কী মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না চশমার সঙ্গে ?

আজকাল দীর্ঘাঙ্গী মেয়েই সবাই চান। এঁরা ভুলে যান সাধারণ গড়পড়তা বাঙ্গালী মেয়ের উচ্চতা চারফুট দীর্ঘাঙ্গী দশইঞ্চি মাত্র। অবশ্য যে নিজে লম্বা তার জীবনসঙ্গিনীও হবে, এ চাওয়ার মধ্যে অযৌক্তিকতা নেই। কিন্তু সেই চাহিদায় গা ভাসিয়ে পাঁচফুট চারইঞ্চি লম্বা পাত্র যখন পাঁচফুট লম্বা মেয়েকে অপছন্দ করে লম্বা কমের ওজুহাতে, তখন হতবাক্ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। অবশ্য স্বামীর চাইতে লম্বা স্ত্রী এ দৃশ্য খুব বিরল নয় আজও। কিন্তু দর্শকের পক্ষে সে দৃশ্য খুব সুষম ঠেকে না। এক দম্পতির কথা জানি যে ভদ্রলোক শুধু এই কারণেই সস্ত্রীক কোন পার্টি ইত্যাদিতে যান না।

তবে এর বিপরীত উদাহরণও মেলে বৈকি। সেই ছেলেটির কথাও জানি যে কন্যাপক্ষের কাছে বাবার অতিরিক্ত পণের দাবী শুনে আপত্তি জানিয়ে প্রায় বিনা পণেই সেই মেয়েটিকে বিয়ে করেছে এবং যতটুকু জানি সে অসুখী হয় নি। তবে এ উদাহরণ তো অতি কম, "কোটিকে গুটিক" মাত্র। কাগজে কলমে দেখি শিক্ষাহান নাকি বেড়েছে—শিক্ষিত জনসাধারণের সংখ্যা বিগত পঞ্চাশবছরের তুলনায় অনেক বেশী। কিন্তু সে শিক্ষা কী শুধুমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে! সে শিক্ষা কি মনের উদারতা আনবে না।—বাঙালী যুবসমাজকে পণপ্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহিত করবে না?—তবে সে শিক্ষার সার্থকতা কোথায়?

প্রসূতি-পরিচর্য্যা ও শিশুমঙ্গল

কুমারেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,বি

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

৭

প্রসূতি-অবস্থায় স্তনের যত্ন নেওয়া বিশেষ দরকার। কারণ, নবজাত শিশুর শারীরিক স্বাস্থ্য, ক্রমবৃদ্ধি ও পুষ্টি মূলতঃ নির্ভর করে প্রসূতির স্তন্য-দুগ্ধের উপর। তবে দুঃখের বিষয় যে এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের শিক্ষিত সহরে সমাজের অনেকেই আজকাল বড় বেশী নজর দেন না। তার ফলে, অধুনা আমাদের দেশে শিক্ষিত-সমাজে শিশুদের মাতৃস্তন্য-দানের রীতি প্রায় বাতিল হয়ে যাবার দুরবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং অধুনা সহরে সমাজের সৌখিন-রেওয়াজ অনুকরণে সুদূর পল্লীগ্রামাঞ্চলে পর্য্যন্ত মায়ের দুধের বদলে কৃত্রিম বা টোকা-দুধ পান করিয়ে শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে সুরু করেছে। অথচ এই সৌখিন রীতি অনুসরণে, প্রসূতি এবং নবজাত-শিশু—উভয়েরই যে কতখানি অপকার ঘটছে, সে দিকে কারো এতটুকু দৃষ্টিদানের আগ্রহ নেই। সন্তান-প্রসবের পর, প্রসূতির জরায়ুর স্বাভাবিক ও সুস্থ অবস্থা ফিরে আসার জন্য নবজাত-শিশুকে নিয়মিতভাবে মাতৃস্তন্য পান করানোই যে উচিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য—সে বিষয়ে সুবিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ উইলিয়াম্‌স্, স্বর্গীয় ডাঃ কেদারনাথ দাস প্রমুখ বিচক্ষণ দেশী ও বিলাতী চিকিৎসকেরা সকলেই একমত।

ইতিপূর্ব্বেই বলেছি যে প্রসূতি অবস্থায় প্রত্যহ নিয়মিত-

ভাবে ঠাণ্ডা অথবা ঈষৎ গরম জলে ধুয়ে সাফ্ এবং শুখ্নো নরম তোয়ালে দিয়ে সযত্নে ঘষে মুছে রাখলে, মহিলাদের স্তনের গঠন সুপরিপুষ্ট ও দুগ্ধ-সঞ্চারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের সুপ্রসিদ্ধা ধাত্রী লিডিয়ার্ড এবং স্বনামধন্য প্রবীণ চিকিৎসক স্যার ট্রাবি কিং প্রভৃতি অনেকেই তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ব্যক্ত করেছেন এবং প্রসূতিদের বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন যে নবজাত সন্তানের মঙ্গলার্থে প্রত্যেক জননীই যেন তাঁর স্তনের বোঁটা বা চুষি (Nipples or Tits) সুস্থ রাখার উদ্দেশ্যে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে ভালো করে ধুয়ে-মুছে অল্প একটু জলপাইয়ের তেল (Olive oil) দিয়ে বেশ টেনে টেনে মার্জনা বা সংবাহন (Massage) করেন। তাঁদের মতে—এ ব্যাপারে আদৌ স্পিরিট (Rectified spirit or Alchohol) কিম্বা মলম (Ointment) ব্যবহার না করাই ভালো। কারণ, স্পিরিট ব্যবহারে প্রসূতির স্তনের চর্ম শুষ্ক হয়ে ওঠে ও ফেটে যায় এবং মলম ব্যবহারে আগাগোড়া হেজে ওঠে। তাছাড়া প্রত্যহ নিয়মিতভাবে প্রসূতির স্তন ধোয়া-মোছার পর ঈষৎ কষ্টকর ও অসুবিধাজনক হলেও—শক্ত বুরুষ দিয়ে ঘষে-মেজে রাখার জন্ম তাঁরা বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন। স্তনদ্বয় প্রত্যহ এভাবে ঘষা-মাজার ফলে, পর্য্যাপ্ত দুগ্ধ সঞ্চার প্রভৃতি যে সব উপকার সাধিত হয়, প্রসূতি অচিরেই তার সুস্পষ্ট ফলাফল উপলব্ধি করতে পারেন। এই সব ব্যবস্থা-বিধি ছাড়াও তাঁরা প্রসূতিদের প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্তনে সূর্য্যকিরণের তাপ লাগানোরও যে সবিশেষ সুপারিশ করেছেন, তার ফলেও প্রচুর হিতসাধন ঘটে।

প্রসূতি-অবস্থায় স্নানাহার, বিশ্রাম ও শয়ন যথোচিত, সুনিয়ন্ত্রিত ও নিয়মিত হলে, শুধু যে জননীর শারীরিক-স্বাস্থ্য এবং মানসিক প্রফুল্লতা অক্ষুণ্ণ থাকবে তাই নয়, উপরন্তু গর্ভস্থ সন্তানও যথাযথভাবে সুপরিপুষ্ট ও সুস্থ-সবল হয়ে উঠবে। তবে স্বাভাবিক অবস্থাকালে মহিলার প্রতি মাসে যে সময়ে ঋতুমতী হতেন, প্রসূতি অবস্থায় সেই বিশেষ সময়টিতে তাঁদের সকলেরই কিঞ্চিৎ সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার। অর্থাৎ, এই মাসিক-ঋতুকালীন সময়ে তাঁদের সবাইকেই চলাফেরা, ব্যায়াম, বিশ্রাম ও বিবিধ সাংসারিক কাজকর্ম রীতিমত সাবধানে এবং আগাগোড়া হুঁশিয়ারভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে। কারণ, এ সব বিষয়ে অজ্ঞতা এবং অসাবধানতার ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রসূতিদের সচরাচর নিতান্ত অসময়ে গর্ভপাত হতে দেখা যায়।

প্রসূতি-অবস্থায় আহার-বিহারে যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন না করার ফলে, বহু মহিলাকেই কোষ্ঠকাঠিন্ম বা পেট অপরিষ্কার থাকার গোলযোগে সবিশেষ অসুবিধা-অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে হয়। এ দুর্ভোগের কবল থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে, অনেক প্রসূতি প্রায়ই নানা রকম কড়া ও নরম ধরণের জোলাপ (Purgative বা Laxative) ও ওষুধ সেবন করেন।...তাঁদের অনুসৃত ঘন-ঘন জোলাপ-সেবনের রীতিটি কিন্তু অভিজ্ঞ-ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদদের মতে আদৌ সমীচীন নয়। বরং এভাবে জোলাপ-সেবনের পরিবর্তে প্রসূতি মহিলারা যদি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে—প্রয়োজনানুরূপ পরিমাণে ফলমূল, শাক-সব্জী ও পর্য্যাপ্ত জলপান করেন তো কোষ্ঠকাঠিন্যের দুর্ভোগ অশান্তির উপশম হবে অনেকখানি। তাছাড়া নিয়মিতভাবে কোষ্ঠ সাফের উদ্দেশ্যে প্রসূতিরা যদি রোজ রাতে শয্যা গ্রহণের আগে চায়ের চামচের দু'চামচ 'সিরাপ অফ ফিগ্স্ (Syrup of Figs) বা ডুমুরের আরক কিম্বা দশ পনেরো ফোঁটা 'লিকুইড এক্সট্রাক্ট অফ্ ক্যাস্কারা' (Liquid Extract of Cascara) সেবন করেন, তাহলে বিশেষ উপকার পাবেন। প্রসূতিদের পক্ষে পেট পরিষ্কার রাখা ও নিয়মিত দাস্তের আরো কয়েকটি সহজ উপায় আছে। সে উপায়গুলি হলো—প্রতিদিন সকালে শয্যাত্যাগের পর নিয়মিতভাবে এক গ্লাশ জল পান করা, অথবা রোজ প্রাতরাশের পর নিয়ম করে একটি আপেল-ফল কিম্বা আপেল অভাবে গাজর খাওয়া প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে সুবিখ্যাত ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ প্রবীণ চিকিৎসক স্যার ট্রাবি কিং পরামর্শ দেন যে প্রসূতি অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতার দুর্ভোগ অসুবিধা থেকে রেহাই পেতে হলে—প্রত্যহ ছয় আউন্স কিসমিস এবং সম পরিমাণে খেজুর (Dates), ডুমুর (Figs), 'প্রুন্স' (Prunes) ও আখরোট (Walnut) বেশ ভালোভাবে পিষে নিয়ে তার সঙ্গে আধ আউন্স গ্লিসারিন (glycerine), চায়ের চামচের দু'চামচ মধু আর দু'চামচ সোনামুখীর গুঁড়ো

(Senna leaves) গুঁড়ো মিশিয়ে পরিষ্কার একটি কাঁচের শিশিতে রেখে দিতে হবে এবং রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্ব্বে প্রয়োজনবোধে একচামচ পরিমাণে এই বিচিত্র মিশ্রণটি সেবন করলে সবিশেষ সুফল লাভ হবে। সংগ্রহের অসুবিধা হলে, এ মিশ্রণটি থেকে আখরোট ও সোনামুখীর পাতা বাদ দেওয়া যেতে পারে এবং মধু আর গ্লিসারিণের পরিবর্ত্তে সরেস জাতের গুড়ও ব্যবহার করা চলবে।

প্রসূতি অবস্থায় মহিলাদের মানসিক উৎফুল্লতা ও শান্তি স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখার দিকে সবিশেষ দৃষ্টিদান করা একান্ত আবশ্যক। প্রসূতি যাতে সর্ব্বদাই দিব্যি হাসি-আনন্দে ভরপুর শান্তিময় পরিবেশে থাকেন—প্রত্যেক গৃহেই উপযুক্ত সুব্যবস্থা করা বিশেষ দরকার। সচরাচর দেখা যায় যে প্রসূতি অবস্থায়...বিশেষতঃ, জীবনে সর্ব্বপ্রথম জননী হবার সময় বহু মেয়েই নিজেদের অজ্ঞতা বা যথোপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে, গর্ভে সন্তান ধারণকালে অহেতুক নানা রকম অজানা বিপদের সম্ভাবনায় রীতিমত ভীত-ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। যে কোনো কারণেই হোক, প্রসূতিদের পক্ষে কিন্তু মনে মনে এমন ধরণের অলীক-আতঙ্ক পোষণ করা উচিত নয়...বরং তার চেয়ে বাড়ীর অভিজ্ঞা আত্মীয়া বা ঘনিষ্ঠ কোনো পরিচিতা বান্ধবী কিম্বা সুনিপুণা ধাত্রী অথবা সুচিকিৎসকের সঙ্গে এ সম্বন্ধে খোলাখুলিভাবে আলাপ-আলোচনা করে তাঁদের সুচিন্তিত মূল্যবান্ পরামর্শ উপদেশ অনুসারে নিজেদের দেহ-মনের যথোচিত সাবধানতা অবলম্বন ও যত্ন নেওয়াই সমীচীন। কারণ জগতের প্রায় সকল অভিজ্ঞ-প্রবীণ ধাত্রীবিদ্যাবিশারদেরাই অভিমত প্রকাশ করেন যে জননী হবার আগ্রহে-উৎসাহে প্রসূতি-অবস্থায় বেশীর ভাগ মহিলাদেরই শরীর ভালো এবং মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। তবে যদি কোনো বিশেষ কারণে প্রসূতির শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে নিছক চক্ষুলজ্জা বা মিথ্যা সঙ্কোচের বশে প্রকৃত তথ্য গোপন না করে অবিলম্বে অভিজ্ঞ চিকিৎসক বা ধাত্রীর সহায়তা নেওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রসূতি-অবস্থায় নিজেদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা বজায় এবং গর্ভস্থ-সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি-সাধনের উদ্দেশ্যে, প্রত্যেক মহিলাকেই সংসারের দৈনন্দিন-কাজকর্ম্মের মধ্যেই যথোচিত আহার বিহার-বিশ্রামের সুযোগ-সুবিধা আর প্রয়োজনানুযায়ী অবসরের সুব্যবস্থা করে নিতে হবে। সুখী ও যৌথ-পরিবারে অবশ্য এখনও এ ব্যাপারে সচরাচর অনেকখানি সুবিধা মেলে—তবে যেখানে স্বামী-স্ত্রী একক-সংসারে, সেখানে কিন্তু প্রসূতিকে অভিজ্ঞ-স্নেহশীলা আত্মীয়া-বান্ধবী বা সুপরিচিতা প্রতিবেশিনীদের সযত্ন-সহায়তা গ্রহণ করাই বিধেয়।

সাধারণভাবে, প্রসূতি-অবস্থায় মহিলাদের পক্ষে দূর-ভ্রমণ, সেলাইয়ের কল চালানো, উঁচু-নীচু রাস্তায় সজোরে গাড়ীতে চড়ে পাড়ি দেওয়া, স্বয়ং মোটর বা সাইকেল চালানো, প্রচুর দৈহিক-পরিশ্রম-সাপেক্ষ ব্যায়াম, দৌড়-ঝাঁপ বা ক্রীড়ানুশীলন, অধিকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে শরীর ডুবিয়ে স্নান বা সাঁতার কাটা, উঁচু টুল, মই কিম্বা সিঁড়িতে আরোহণ প্রভৃতি যথাসম্ভব বর্জ্জন করাই বাঞ্ছনীয়। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে প্রাচীন একটি প্রবাদ বাক্য সুপ্রচলিত আছে—প্রসঙ্গক্রমে তার উল্লেখ করা যেতে পারে। লোকে কথায় বলে—"আটে কাঠে"...অর্থাৎ, প্রসূতি-অবস্থায় আটমাসকালে পদার্পণ করলেই শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা এবং অবাধে চলা-ফেরার বিষয়ে মহিলাদের সবিশেষ সাবধান ও সচেতন হওয়া দরকার। তাছাড়া মানসিক প্রফুল্লতা বজায় রাখার জন্যও এ সময়ে প্রসূতিদের পক্ষে কোনো কারণেই কোনো অপ্রিয়-ঘটনায় লিপ্ত থাকা কিম্বা কোনো রকম বীভৎস ভয়ঙ্কর এবং শোকময় দৃশ্য পরিদর্শন অথবা নিদারুণ আতঙ্ককর ব্যাপারে ত্রস্ত-সচকিত হয়ে ওঠা আদৌ মঙ্গলজনক নয়। কারণ, প্রসূতি অবস্থায় মনে আচমকা কোনো রকম ক্রোধ শোক দুঃখ দুশ্চিন্তা ভয় কিম্বা অনিষ্ঠ আশঙ্কায় প্রবল আলোড়নে ভাবী-জননী এবং গর্ভস্থ সন্তান—উভয়েরই অপরিসীম এমন অনেক অপকার ঘটে যে—ভবিষ্যতে সারা জীবনেও তার ক্ষতি সহজে অপসারণ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। এই জন্যই প্রসূতিকে সর্ব্বদা সুন্দর, শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দময় পরিবেশে রাখার দিকে সযত্ন দৃষ্টিদান করা একান্ত দরকার...কারণ, সু-মাতার গর্ভেই হয় সুসন্তানের বিকাশ।

এছাড়াও প্রসূতি অবস্থায় সচরাচর অন্যান্য আরো যে সব অসুবিধার কারণ ঘটে, আগামী সংখ্যায় মোটামুটি ভাবে সেগুলির আলোচনা করার বাসনা রইলো। [ক্রমশঃ

—

স্থপর্ণা দেবী

গতবারের মতো এবারেও, অভিজ্ঞ-আধুনিক রূপচর্চ্চা-বিশারদদের গবেষণা-প্রসূত মহিলাদের মুখের রূপ-লাবণ্য-শোভা রমণীয়-মনোরম করে তোলার উপযোগী বিশেষ ধরণের আরো কয়েকটি সহজ-সরল ব্যায়াম-পদ্ধতির পরিচয় দিচ্ছি।

মহিলাদের মুখের শ্রী-সৌষ্ঠব ও সৌকুমার্য্য সাধনের জন্য, উপরের ৩নং ছবিতে দেখানো ব্যায়াম-ভঙ্গীটি বিশেষ উপযোগী হবে বলেই আধুনিক-বিশেষজ্ঞেরা অনেকেই সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন। এ ব্যায়ামের অনুশীলন-পদ্ধতি হলো—উঁচু পিঠওয়ালা মজবুত একটি চেয়ারে (High Backed chair) দেহকে সিধা-খাড়া রেখে পিঠ-টান বসে, দেহের দু'দিকে হাত দুখানি লম্বালম্বিভাবে নীচের দিকে প্রসারিত করে দিয়ে শক্ত-মুঠিতে চেয়ারের আসনের প্রান্তভাগ আঁকড়ে ধরে, উপরের এই ছবির ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মাথাটিকে পিছনদিকে হেলিয়ে দিন। ব্যায়ামের এই বিশেষ-ভঙ্গীটি অনুশীলনকালে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, চেয়ারের পিছনদিকে মাথা হেলিয়ে দেবার সময় চিবুকটি যেন উর্দ্ধমুখী থাকে এবং মাথাটিও যতখানি সাধ্য নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিছুক্ষণ এমনিভাবে মাথাটিকে পিছন দিকে হেলানো অবস্থায় রেখে, নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকবার ধীরে ধীরে মুখ ফাঁক করুন ও মুখ বুজুন। এভাবে মুখ-খোলা এবং মুখ-বন্ধ করার সময়, আপনার মুখের পেশীগুলিতে যেন বেশ টান বা চাড় পড়ে—সেদিকে দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন। এমনিভাবে অন্ততপক্ষে দশবার, মুখ খোলা এবং মুখ-বোজার এই ব্যায়াম-ভঙ্গীটি অভ্যাস করার পর, ধীরে ধীরে নিশাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে পিছনদিকে-হেলানো, মাথাটিকে পুনরায় সামনের দিকে স্বাভাবিক-অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। মাথাটি সামনের দিকে স্বাভাবিক-অবস্থায় ফিরিয়ে আনার সময়, দু'চোখের দৃষ্টি যেন সম-রেখায় (on a level line) থাকে—সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত আবশ্যক।

এমনিভাবে পিছনদিক থেকে মাথাটিকে সামনের দিকে স্বাভাবিক-অবস্থায় ফিরিয়ে আনার পর, চিবুক ডান-কাঁধের উপর রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে দেহের ডানদিকে যতখানি সম্ভব মাথা হেলান। তবে এ ভঙ্গীটি অনুশীলনের সময় খেয়াল রাখবেন যে চিবুক স্পর্শ করবার জন্য কদাচ যেন কাঁধ উপর দিকে তোলা না হয় এবং চিবুক সামনের দিকে না হেলে পড়ে বরাবর কাঁধের উপরেই স্থাপিত থাকে। এ ভঙ্গীটির অভ্যাসকালেও, আগের মতোই ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মুখ-খোলা এবং মুখ-বন্ধের রীতি অনুসরণ করা এবং মুখের পেশীগুলিতে যেন যথাসম্ভব টান বা চাড় পড়ে, সেদিকেও নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন।

ঝুঁকে-চলা বা বেয়াড়াভাবে দাঁড়ানোর ফলে, অনেক মহিলার রূপ-শ্রী 'ঘাড়ে গর্দানে' হাদের খুঁত ত্রুটিতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ ত্রুটি মোচন করা সম্ভব—

নিয়মিতভাবে উপরের ৪নং ছবিতে দেখানো ব্যায়ামভঙ্গী অভ্যাস-অনুশীলনে। এ ব্যায়ামের অনুশীলন-পদ্ধতি হলো—সমতল জমি বা আসনের উপর সটান দাঁড়িয়ে কিম্বা বসে, বরাবর সিধা-খাড়াভাবে মাথা উঁচু রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে চিবুকের নীচের দিক দিয়ে ডান হাত উবুড় করে গলা ও চিবুকের তলদেশ পর্য্যন্ত মুখের আগাগোড়া অংশ মৃদু চাপ দিয়ে ঘর্ষণ-মর্দ্দন করা। এভাবে ঘর্ষণ-মর্দ্দনকালে হাতে অল্প একটু 'অলিভ-অয়েল' (Olive Oil) বা 'ক্রীম' (Cream) জাতীয় তৈলাক্ত-পদার্থ প্রলেপিত করে নেওয়া ভালো। ঘর্ষণ মর্দ্দনের সময়, প্রথমে ডান-হাত উবুড় করে চিবুকের ডান-দিক থেকে বাঁ-দিকে এবং পরে অনুরূপ-ভঙ্গীতে বাঁ হাত উবুড় করে চিবুকের বাঁ-দিক থেকে ডান-দিকে অন্ততঃপক্ষে বা দশেক এমনিভাবে মালিস করতে হবে। এ ব্যায়াম-পদ্ধতি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে, মুখের খুঁত-ত্রুটি অচিরেই মোচন করা সম্ভব।

আগামী সংখ্যায় এমনি ধরণের আরো কয়েকটি সহজ সরল ব্যায়াম-পদ্ধতির পরিচয় দেবার বাসনা রইলো।

কাদা-মাটির কারু-শিল্প

রুচিরা দেবী

সুষ্ঠুভাবে টেঁকসই-মজবুত ধরণের মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানাতে হলে, কোন্ কাজের জন্য কি ধরণের কাদা-মাটি ব্যবহার করা দরকার এবং সরাসরি আনকোরা-মাটি দিয়ে যে নিখুঁত-সুন্দর কাজ করা যায় না—সে কথা ইতিপূর্ব্বেই বলেছি। কাজেই কাদামাটি দিয়ে বিচিত্র-ছাঁদের খেলনা, পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি, ফুলদানী, ফুলের টব, ঘট, কলস, হাঁড়ি-কুড়ি, ভাঁড়-সরা-গেলাস, থালা, বাটি, টালির পাট। প্রভৃতি বিবিধ ধরণের সৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র গড়ে তোলার জন্য বিশেষ-পদ্ধতিতে বিভিন্ন শ্রেণীর মাটিকে হিসাবমতো পরিমাণে জল মিশিয়ে মেখে কাজের উপযোগী করে তোলা দরকার। এভাবে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজের উপযোগী কাদা-মাটি মাখা ও তৈরী করে নেওয়া—রীতিমত পরিশ্রম, কলাকৌশল-নৈপুণ্য এবং অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতালব্ধ রাসায়নিক হিসাবনিকাশের ব্যাপার। তবে এ সব ব্যাপার রপ্ত করে নেওয়া, এমন কিছু দুঃসাধ্য-কঠিন কাজ নয়...মোটামুটি কয়েকটি মূল তথ্য জেনে রাখলেই যে কোনো শিক্ষার্থী অনায়াসেই নিখুঁত-পরিপাটি ছাঁদে মনোরম-সুন্দর বিভিন্ন ধরণের সৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার কাজে সবিশেষ কলা-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারবেন। সাধারণতঃ, এঁটেল-মাটি ও বালি-মাটি—এ দুই শ্রেণীর কাদা-মাটিতেই মৃৎশিল্প সামগ্রী রচিত করাই রীতি।

কাদা-মাটি দিয়ে মৃৎশিল্প সামগ্রী বানাতে হলে, প্রথমেই কাজের উপযোগী মাটি তৈরী করে নেওয়া প্রয়োজন। মাটি তৈরীর মোটামুটি নিয়ম হলো—মৃৎশিল্পীর শিল্প-সৃষ্টির প্রয়োজন অনুযায়ী বিশেষ শ্রেণীর মাটি বাছাই করে নেওয়া। কোন্ ধরণের কাজের পক্ষে কি শ্রেণীর মাটি ব্যবহার করতে হবে—সে বিচারের ভার মৃৎশিল্পী করবেন নিজের শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজন অনুসারে। কাজেই এ সম্বন্ধে কোনো ধরা-বাঁধা নিয়মের নির্দ্দেশ দেওয়া চলে না। যাই হোক, পছন্দসতো মাটি বাছাই করে নেবার পর, মাটির মধ্যে থেকে যাবতীয় বালি, কাঁকর, পাথর-কুচি, কাঠকুটোর টুকরো, প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় আবর্জ্জনাদি সাফ করে ফেলা দরকার। মাটি সাফ্ হলে, মৃৎশিল্পীর প্রধান কাজ—হিসাবমতো পরিমাণে জল এবং বিশেষ-ক্ষেত্রে, পাটের কুচো, তুঁষ, বালি-মাটি বা এঁটেল-মাটি প্রভৃতি আরো কয়েকটি উপকরণ মিশিয়ে মাটির সূক্ষ্ম-কণাগুলিকে আগাগোড়া হাতের তালুর সাহায্যে বেশ ময়েন-দিয়ে-মাখা লুচির ময়দার তালের মতো চটকে-ঠেসে মেখে মৃৎশিল্প-সামগ্রীর চনার উপযোগী চট্‌চটে-আঁঠালো ধরণের বানিয়ে তোলা। এভাবে মাটির তাল মাখার সময় নজর রাখা দরকার—মাটিতে যেন প্রয়োজনাতিরিক্ত এতটুকু জল-বাতাস না রয়ে যায় এবং মাটির সূক্ষ্ম-কণাগুলি যেন আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ভেঙে-গুঁড়িয়ে মিলে-মিশে একাকার হয়ে ওঠে। সচরাচর হাঁড়ি-কুড়ি, সরা, বাটি, থালা, গেলাস, ইট, টালি প্রভৃতি নিত্য-প্রয়োজনীয় মোটা-ছাঁদের অতি-সাধারণ মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানাতে হলে কাজের উপযোগী এঁটেল মাটির তালটিকে মোটামুটিভাবে জল আর আন্দাজমতো পরিমাণে অল্প-বিস্তর বালি-মাটি মিশিয়ে আগাগোড়া ভালোভাবে চট্‌কে-ঠেসে মেখে নিলেই চলবে। কিন্তু পরিপাটি-ছাঁদের খেলনা, পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি, ঘট, কলস, ফুলদানী, ফুলের টব, বিচিত্র নক্‌সাদার টালি কিম্বা পাটা প্রভৃতি মনোরম-সুন্দর সৌখিন মৃৎশিল্প সামগ্রী রচনার জন্য, কাজের উপযোগী এঁটেল-মাটির তালটিকে সযত্নে আন্দাজমতো পরিমাণে জল ও পাটের কুচো, তুঁষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপকরণাদি মিশিয়ে মাটির সূক্ষ্ম-কণাগুলিকে মিহি-ছাঁদে আরো ভালোভাবে চট্‌কে ঠেসে মেখে ময়েন-দিয়ে-মাখা লুচির ময়দার তালের মতো আগাগোড়া বেশ তুলতুলে-নরম ও আঠালো-চট্‌চটে ধরণের করে তুলতে হবে। কারণ, নিত্য-প্রয়োজনীয় মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার মোটা-কাজের জন্য ময়দার তালের মতো খুব সূক্ষ্ম মিহি-মোলায়েম গুঁড়ো-মেশানো নরম-তুলতুলে আঁঠালো-চটচটে কাদা-মাটি ব্যবহার করার প্রয়োজন না থাকলেও, খেলনা, পুতুল, প্রতিমা, প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি সৌখিন-সুন্দর সূক্ষ্ম-কারুকলার মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানানোর জন্য উপরোক্ত-ধরণের কাদা-মাটির তাল একান্ত অপরিহার্য্য উপকরণ।

সচরাচর স্রোতবহা-নদীর কূলে—বিশেষতঃ বাঁকের কিনারা থেকেই মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী কালো-রঙের এঁটেল-মাটি এবং হাল্‌কা-হলদে রঙের বালি-মাটি সংগ্রহ করা হয়। এঁটেল-মাটির বিশেষ গুণ হলো—এটি বেশ নরম-মোলায়েম এবং চট্‌চটে আঠালো ধরণের। এমন আঠালো-চট্‌চটে এবং মোলায়েম-নরম ধরণের হয় বলেই—মৃৎশিল্পের কাজে এঁটেল-মাটির সবিশেষ কদর আছে। বালি-মাটিতে কিন্তু এই আঁঠালো-চটচটে নরম এবং মোলায়েম মাটির বিশেষ অভাব···তার ফলে, বালি-মাটি আগাগোড়া ধুলোর মতো ঝুরঝুরে মিহি-ছাঁদের দানা হয়েই থাকে। তাই বালি-মাটি দিয়ে এঁটেল-মাটির মতো সহজে অনায়াসে সৌখিন-সুন্দর নিখুঁত-মোলায়েম সূক্ষ্ম-কারুকলার কাজকর্ম্ম করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে অনেক সময় এঁটেল-মাটির সঙ্গে অল্প-পরিমাণে বালি-মাটি মিশিয়ে কিছু কিছু মোটা-ধরণের মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানানোর যে সব কাজ করা হয়—তার হদিশ ইতিপূর্ব্বেই দিয়েছি, গত সংখ্যায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের কাদা-মাটির প্রসঙ্গালোচনাকালে। কাজেই এ বিষয়ে আর নতুন করে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য আপাততঃ, এঁটেল-মাটির গুণাগুণ বিচারের একটি সহজ-পন্থার পরিচয় দিয়ে রাখি। অনেকের ধারণা—কাদা-মাটির রঙ কালো হলেই, সেটি এঁটেল-মাটি হবে। এমন ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। এঁটেল ছাড়াও, বিশেষ-ধরণের আরো নানান্ কারণে বিভিন্ন শ্রেণীর কাদা-মাটির রঙও কালো হতে পারে। কাজে-কাজেই মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী কালো-মাটি, যথার্থ এঁটেল কিনা, সেটি ভালোভাবে পরখ করে নেওয়া দরকার। এভাবে মাটির গুণাগুণ পরখ করে দেখবার খুবই সহজ-

সরল বিশেষ একটি উপায় আছে। সে উপায়টি হলো—নমুনা-হিসাবে কাদা-মাটির খানিকটা তাল হাতে তুলে নিয়ে, তাইতে সামান্য একটু জল মিশিয়ে চটকালে, মাটি যদি বেশ আঠালো-চটচটে বোধ হয় তাহলেই বোঝা যাবে যে সেটি হচ্ছে খাঁটি-জাতের এঁটেল-মাটি। এই ধরণের এঁটেল-মাটি দিয়েই সাধারণতঃ মৃৎশিল্পের বিবিধ সৌখিন-সুন্দর সামগ্রী বানানো হয়ে থাকে। তবে নদী-তট থেকে সদ্য-সদ্য এঁটেল-মাটির তাল সংগ্রহ করে এনেই তাই দিয়ে মৃৎশিল্প-সামগ্রী বানানো চলে না। কারণ সদ্য-সংগৃহীত মাটির তাল থেকে গোড়াতেই যাবতীয় কাঠি-কুটো, কাঁকর-পাথর, ঢিল-পাটকেল আর অনাবশ্যক ময়লা-আবর্জ্জনাদি ভালোভাবে বাছাই ও সাফ্-সুতরো করে না নিলে, শিল্পীর হাতে-গড়া মৃৎশিল্প-সামগ্রীটি আগাগোড়া মোলায়েম-সুন্দর ও পরিপাটি ছাঁদের হয়ে ওঠে না…উপরন্তু, রচিত শিল্প-সামগ্রীটির নানা জায়গায় অল্প-বিস্তর ঢিল-পাথর কাঁকরের ছোট-বড় টুকরো আর নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় কাঠি-কুটি-খড় প্রভৃতি জঞ্জাল-আবর্জ্জনার খোঁচখাঁচ লেগে থাকে বলেই, এ-ধরণের অপরিষ্কার মাটিতে তৈরী মৃৎশিল্প সামগ্রী আগাগোড়া বেশ পরিপাটি-নিখুঁত ছাঁদের গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে ওঠে না এবং রচনাকালে মৃৎ-শিল্পীকে বিবিধ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাই মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী কাদা-মাটিকে, নদীর কূল থেকে সংগ্রহ করে আনার সঙ্গে সঙ্গেই অপ্রয়োজনীয় কাঠিকুটি-জঞ্জাল আর ইট-পাথর-কাঁকরের টুকরোগুলিকে আগাগোড়া নিখুঁত-ভাবে বাছাই ও সাফ্‌সুতরো করে নেওয়া দরকার।

এমনিভাবে গোড়াতেই কাদা-মাটি থেকে যাবতীয় আবর্জ্জনা বাদ দিয়ে আগাগোড়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে তোলবার পর, সেটিকে জল দিয়ে মেখে ময়েন-দিয়ে-মাখা লুচির ময়দার তালের মতো বেশ মোলায়েম-নরম এবং আঠালো-চটচটে ধরণের করে তুলতে হবে। কারণ, ইতিপূর্ব্বেই বলেছি, মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী কাদা-মাটি ময়দার তালের মতো নরম-মোলায়েম ও আঠালো-চটচটে নাহলে, সেটি দিয়ে শিল্পীর অভিরুচি-অনুযায়ী বিভিন্ন ছাঁদে সৌখিন বা নিত্য প্রয়োজনীয় কোনো মৃৎশিল্প সামগ্রীই বানানো চলবে না। কাজেই সহজ, সুন্দর ও পরিপাটিভাবে কাদা-মাটির শিল্প-কর্ম করতে হলে, মৃৎ-শিল্পীকে এ বিষয়ে রীতিমত নজর রাখতে হবে।

মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী মাটি তৈরী করে নেওয়ার সহজ উপায় হলো—বাড়ী-ঘর রচনাকালে সচরাচর বালি-চুণ-সুরকীর যেমনভাবে তাগাড় মাখা হয়, ঠিক তেমনি-

ভাবেই উপরের ১নং নক্সার নমুনা-অনুসারে সংগৃহীত কাদা-মাটির তালের চারিদিকে ঈষৎ-উচু প্রাচীরের 'বেড়' দিয়ে ঘিরে, সেই বেড়ের ভিতরে-রাখা কাদামাটির তালটির চূড়োর মাঝখানে একটি গর্ত্ত করে, সে গর্ত্তে আন্দাজমতো পরিমাণে জল ঢেলে মাটির তালটিকে অন্ততঃ-পক্ষে ২২।২৪ ঘণ্টাকাল ভিজিয়ে রেখে আগাগোড়া নরম, মোলায়েম ও থলথলে ধরণের বানিয়ে তোলা চাই। তারপর সচরাচর যেমন-পদ্ধতিতে ময়েন দিয়ে লুচির জন্য ময়দার তাল মাখা হয়, ঠিক তেমনি ধরণে জলে-ভিজানো ঐ কাদা-মাটির তালটিকেও হাতের বা পায়ের সাহায্যে আগাগোড়া বেশ ভালোভাবে ঠেসে-চট্‌কে তুলতুলে-ছাঁদে মেখে নেওয়া দরকার। এভাবে বেড় রচনার অসুবিধা হলে, নীচের ২নং নক্সার নমুনানুসারে বড় গামলাতেও
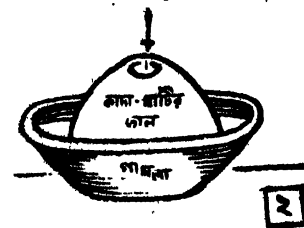
উপরোক্ত-উপায়ে কাদামাটির তাল ভিজিয়ে রাখা চলে। ছোটখাটো-ধরণের মৃৎ-শিল্প সামগ্রী বানানোর জন্য হাত দিয়ে প্রয়োজন মতো অল্প মাটি মেখে নিলেই চলবে… তবে কাদামাটি দিয়ে বড়-ধরণের কোনো জিনিষ গড়তে হলে, সাধারণতঃ, কুমারেরা যেমনভাবে পায়ের সাহায্যে

মাটির বিরাট তাল চটুকে-ঠেসে মেখে নেয়, তেমনিভাবেই কাজ করতে হবে। এভাবে হাত বা পা দিয়ে ঠেসে-চটকে মেখে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী মাটি তৈরী করে নেবার সময়েই দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত-ধরণের গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে, কাদা-মাটির সঙ্গে পাটের কুচি, তুঁষ প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে দেওয়া হয়।

এমন-পদ্ধতিতে কাদা-মাটির তালটিকে আগাগোড়া ভালোভাবে মেখে তৈরী করে নেবার পর, সেটিকে একখণ্ড ভিজে-কাপড় দিয়ে সিক্ত-অবস্থায় ঢেকে রাখাই রীতি। কারণ, মাটি শুকিয়ে গেলে, সে মাটিতে মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনা করা যায় না। সঞ্চয়কালে বাতাসে ভিজে-কাপড় শুকিয়ে গেলে, সেই কাপড়টির উপরে জলের ছিটা ছড়িয়ে দিয়ে পুনরায় আগের মতোই সুসিক্ত এবং স্যাঁতসেঁতে অবস্থায় রেখে দেওয়া দরকার। এভাবে তৈরী-কাদা-মাটির তালকে দীর্ঘকাল মৃৎশিল্পের কাজের উপযোগী ভিজা-স্যাঁতসেঁতে এবং ময়দার তালের মতো নরম-মোলায়েম ও আঠালো-চটচটে অবস্থায় রাখা সম্ভব। মোটামুটিভাবে, মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগা মাটি-তৈরী এবং মাটি-মজুত রাখার এই হলো সহজ-সরল চিরাচরিত প্রথা।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাঁদের এভাবে মাটি তৈরী করে নেওয়ার অসুবিধা আছে, তাঁরা অবশ্য স্থানীয় কুমোরদের সহায়তায় তাঁদের ব্যক্তিগত-প্রয়োজনমতো মৃৎশিল্প-সামগ্রী রচনার উপযোগী কাদা-মাটির তাল সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

এবারে এই পর্য্যন্তই বললুম...আগামী সংখ্যায় কাদা-মাটির কাজ করতে হলে, বিশেষ-ধরণের যে সব সাজ-সরঞ্জাম দরকার, সেগুলির মোটামুটি পরিচয় দেবার বাসনা রইলো। ক্রমশঃ

পশমী-সুতোয় বোনা শীতের কার্ডিগ্যান-জ্যাকেট

হিরণ্ময়ী দেবী

শীতের মরশুমে সংসারের দৈনন্দিন কাজকর্মের অবসরে আজকাল নিজের হাতে ছোট-বড়, সৌখিন ও নিত্য-প্রয়োজনীয় নানা ধরণের পশমী-সুতোয় বোনা পোষাক-পরিচ্ছদ রচনার দিকে প্রায় প্রত্যেক মহিলারই বিশেষ উৎসাহ-আগ্রহ নজরে পড়ে। এবারে তাই পশমী-সুতোয় বোনবার উপযোগী সহজ-সরল-অনায়াসসাধ্য নূতন প্যাটার্ণের একটি কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটএর কথা আলোচনা করছি।

আলোচনার সুবিধার জন্য, ধরে নেওয়া যাক—মহিলাদের সচরাচর-ব্যবহারোপযোগী প্রমাণ-সাইজের এই কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটটির মাপ হবে:—

ঝুল—২০″ ইঞ্চি
ছাতি—৩২″ ইঞ্চি
হাতা—১৯″ ইঞ্চি

উপরের মাপমতো কার্ডিগ্যান-জ্যাকেট বুনতে হলে, উপকরণ চাই—১০ আউন্স তিন-তারের পশম (10 Oz 3-Ply Wool) ১০ নং ও ১২ নং পশম-বোনবার কাঁটা দু'জোড়া, এবং পশমের রঙের সঙ্গে মানানসই ও সৌখিন-ছাঁদের ৬টি বোতাম।

এ সব উপকরণ সংগ্রহের পর, বোনবার পালা সুরু করতে হবে ১২নং কাঁটায় পোষাকের সুমুখের অংশের ডানদিক থেকে পর-পর ৬৫টি ঘর তুলে। এভাবে চার

কাঁটা রিব বুনে পোষাকের প্রথম বোতামের ঘর বানাতে হবে। একাজের সময় যেদিকে পটি বানাবেন, সেদিকটিতে ২টি ঘরের পর ৪টি ঘর বন্ধ করবেন এবং ঘুরে এসে পুনরায় ঐ ৪টি ঘর তুলে নেবেন। বোনার সময় হিসাব রাখবেন যে 'রিব' (rib) যেন মাপে ৪″ ইঞ্চি চওড়া হয়। এমনিভাবে ৩½″ ইঞ্চি বোনবার পর, পোষাকের দ্বিতীয় বোতামের ঘর বানাতে হবে এবং 'রিব' বোনার পালা শেষ করে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের হাতার-বগলের দিকে ৩টি বাড়াতে হবে।

এ কাজ সারা হলে পছন্দমতো প্যাটার্ণ অনুসারে পশমী-সুতোর সাহায্যে জ্যাকেটের 'Body' বা 'দেহাংশ' রচনায় হাত দেবেন—১০নং বোনবার-কাঁটা ব্যবহার করে। জ্যাকেটের 'বডি' বা 'দেহাংশ' বোনবার সময় পোষাকের সুমুখের দিকে সুদৃশ্য 'পাড়' বা 'বর্ডার' (border) রচনার জন্য পর-পর ৮টি ঘর বরাবর সোজা সমান-লাইনে বুনে তুলতে হবে। পোষাকের নীচের দিকে তৃতীয় বোতাম বসানোর জন্য মাপ অনুযায়ী 'পটি' ও বোতামের ঘর রচনা করতে হবে। কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের সামনের দিকের 'বডি' বা 'দেহাংশ' বোনবার সময়প্রত্যেক ৭ কাঁটা অন্তর পটিতে একটি করে জোড়া বুনে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাঁটায় ৫৩টি ঘর বোনা হয়, ততক্ষণ এই রীতি অনুসারে কাজ করে যাবেন। মোট ১৩″ ইঞ্চি বোনা হলে, জ্যাকেটের হাতা ও বগলের ছাঁদ (shape) সুস্পষ্ট-পরিপাটি হয়ে উঠবে। জ্যাকেটের বগল-মোহড়ার ছাঁদ রচিত হবে—তিন কাঁটায় ৩টি, ২টি ও ও ১টি—এই ধরণে বুনে। এই সঙ্গে পটিতেও জোড়া বুনে যেতে হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ৩৭টি ঘর তোলা না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ রীতি অনুসারেই কাজ করে যাবেন। এবারে ২″ ইঞ্চি বোনবার পর, 'পাড়' বা 'বর্ডারের' পাশে ২টি জোড়া বুনতে হবে। কাঁটায় ৩৫টি করে ঘর তুলে ৩″ | ৩½″ ইঞ্চি বুনে যাবেন। অতঃপর ২৭টিতে জ্যাকেটের কাঁধের 'সেপ' (shape) বা 'ছাঁদ' রচিত হবে এবং কাঁধের ঘর বন্ধ করে, 'পাড়' বা 'বর্ডারের' (border) ১¼″ ইঞ্চি অংশে ৮টি ঘর সোজাসুজি বুনে গিয়ে ঘর বন্ধ করবেন। এমনি নিয়মে কাজ করে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের সুমুখের ডানদিকটি বোনবার পর অনুরূপ-রীতিতে পোষাকের সুমুখের বাঁ দিকের অংশটিকে আগাগোড়া বুনে ফেলতে হবে। তাহলেই মহিলাদের পরিধানোপযোগী কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের সামনের অংশটি বোনার কাজ শেষ হবে।

সামনের অংশ বোনার পালা শেষ হলে, পোষাকের পিঠের বা পিছনের দিকের অংশটিকে পরিপাটি ছাঁদে বুনে তোলার কাজে হাত দিতে হবে।

কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের পিঠের বা পিছনের অংশ বোনবার জন্য গোড়াতেই ১২নং কাঁটায় ১১০টি ঘর তুলে ৪″ ইঞ্চি 'রিব' (rib) বা 'পটি' বুনে তোলা প্রয়োজন। 'পটি' বা 'রিবের' প্রান্ত-সীমায় দুই পাশে ১০টি করে ঘর বাড়িয়ে তুলবেন। তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত ১৩″ ইঞ্চি অংশ বোনা শেষ না হয়, ততক্ষণ ১২নং কাঁটায় পোষাকের সুমুখ-দিকের 'বডি' বা 'দেহাংশ' বোনার অনুরূপ-পদ্ধতিতে বরাবর বোনবার কাজ করে যাবেন। অতঃপর, পোষাকের সামনের অংশে যেমনভাবে ঘর তুলে জ্যাকেটের হাতা ও বগলের 'ছাঁদ' বা 'সেপ্' (shape) রচনা করেছেন, হুবহু তেমনি ধরণেই আগাগোড়া বুনে যেতে হবে। এবারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাঁটায় ৬২টি ঘর বোনা শেষ হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক কাঁটায় দু'দিকে ১টি করে ঘর বন্ধ করতে হবে। এবারে পোষাকের সুমুখের অংশের মতোই জ্যাকেটের ঝুল সুনির্দ্দিষ্ট করে কাঁধের 'সেপ্' বা ছাঁদ বোনার কাজ চুকিয়ে ফেলতে হবে ঘর বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে।

এ কাজটুকু মিটলে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের 'হাতা' বোনবার পালা সুরু করতে হবে। জ্যাকেটের হাতা রচনার জন্য—১২নং কাঁটায় ৩½″ 'রিব' (rib) বা 'পটি' বুনে এক সঙ্গে ১২টি ঘর বাড়িয়ে তুলতে হবে। তারপর ১০নং কাঁটা ব্যবহার করে বুনতে হবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কাঁটায় ৮৪টি ঘর বোনা হয়, ততক্ষণ প্রত্যেক ৮ কাঁটা অন্তর দুই পাশে ১টি করে ঘর বাড়িয়ে বুনে যেতে হবে। এমনিভাবে ১৫½″ ইঞ্চি বোনা শেষ হলে, জ্যাকেটের হাতার মোহড়ার ছাঁদ সুস্পষ্ট-পরিপাটিভাবে রচিত হয়ে উঠবে। এবারে প্রত্যেক কাটায় দু'পাশে ১টি করে ঘর বন্ধ করবেন এবং কাঁটায় যখন ৩৪টি ঘর হবে তখন সব ঘরগুলি একসঙ্গে বন্ধ করতে হবে। তাহলে, দিব্যি

পরিপাটিভাবে কার্ডিগ্যান-জ্যাকেটের পিঠের বা পিছন-দিকের অংশ বোনার কাজ শেষ হবে।

এমনি উপায়ে পোষাকের সামনের ও পিছনের—উভয়-দিকের অংশ বোনার কাজ শেষ হলে, কার্পেট-সেলাইয়ের ছুঁচ ও মানানসই-রঙের মজবুত-খাপি সুতোর সাহায্যে আগাগোড়া সুষ্ঠুভাবে সেলাই দিয়ে, পোষাকের সুমুখের ও পিছনের দিকের হাতা অংশের দেহাংশ পাকা-পোক্ত-ধরণে একত্রে জোড়া লাগিয়ে দিলেই মহিলাদের ব্যবহারোপযোগী কার্ডিগ্যান-জ্যাকেট রচনার কাজ সহজেই সুসম্পন্ন হবে।

—

সুধীরা হালদার

শীতের মরশুম এসে গেল…বাজারে আজকাল শিম, বেগুন, বরবটি, কপি, কড়াইশুটি, ঢেঁড়শ, টোম্যাটো প্রভৃতি নানা রকম শীতের সব্জী দেখা দিয়েছে…তাই এবারে শিম দিয়ে রান্নার উপযোগী অভিনব-ধরণের একটি দক্ষিণ-ভারতীয় খাবারের পাক-প্রণালীর হদিশ দিচ্ছি। বিচিত্র-উপাদেয় নিরামিষ-জাতীয় এই দক্ষিণ-ভারতীয় খাবারটির নাম—'শিমের কুট্টু'।

দু'তিনজনের আহারোপযোগী 'শিমের কুট্টু' রান্নার জন্য যে সব উপকরণ দরকার, গোড়াতেই তার মোটামুটি তালিকা দিয়ে রাখি। অর্থাৎ, এ খাবারটি রান্নার জন্য চাই—আধপোয়া শিম, আধখানা নারিকেল, একটি বড় পেঁয়াজ, চায়ের চামচের সিকি-চামচ লঙ্কার গুঁড়ো, প্রয়োজনমতো পরিমাণে খানিকটা গুঁড়ো-নুন আর বড় চামচের এক-চামচ পরিমাণ ঘী।

ফর্দ্দমতো উপকরণগুলি সংগ্রহ হবার পর, রান্নার কাজে হাত দেবার আগে শিমগুলিকে বেশ মিহিভাবে কুটে পরিষ্কার-জলে ধুয়ে সাফ্ করে নিন এবং নারিকেলটিকেও কুরুনীর সাহায্যে আগাগোড়া মিহি-ধরণে কুরে ফেলুন। তারপর পেঁয়াজটিকেও বেশ মিহি-ছাঁদে কুচিয়ে নিন।

এ সব প্রাথমিক-কাজ সারা হলে, উনানের আঁচে রন্ধন-পাত্র চাপিয়ে, সে পাত্রে ঘি গরম করে পেঁয়াজের কুচো-গুলিকে ভালোভাবে ভেজে নিন। কিছুক্ষণ এভাবে ভাজার ফলে, পেঁয়াজের কুচোগুলি আগাগোড়া বেশ বাদামী-রঙের হলে, উনানের আঁচে বসানো রন্ধন-পাত্রে রান্নার বাকী উপকরণগুলি মিশিয়ে অল্প একটু জলের ছিটে দিয়ে সেই 'মিশ্রণটিকে' খানিকক্ষণ ফুটিয়ে পাক করুন। এমনিভাবে পাক করার সময়, হাতা বা খুন্তির সাহায্যে মাঝে মাঝে নেড়েচেড়ে রন্ধন-পাত্রের 'মিশ্রণটিকে' ঢিমে-আঁচে রেখে রাঁধবেন এবং কিছুক্ষণ বাদে 'মিশ্রণটি' আগাগোড়া বেশ সু-সিদ্ধ ও নরম হলে, উনানের উপর থেকে রন্ধন-পাত্রটিকে নামিয়ে নেবেন। তাহলেই দক্ষিণ-ভারতীয় প্রথায় 'শিমের কুট্টু' খাবার রান্নার কাজ শেষ হবে।

অতঃপর প্রিয়জনদের পাতে সাদরে পরিবেষণের পালা। দক্ষিণ-ভারতীয়দের বিশেষ-প্রিয় অভিনব-ধরণের বিচিত্র-উপাদেয় এই নিরামিষ-জাতীয় 'শিমের কুট্টু' খাবারটি যে তাঁদের রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করবে—এ কথা আমরা নিঃসন্দেহেই বলতে পারি।

আগামী সংখ্যায় আর একটি অপরূপ মুখরোচক ভারতীয় খাবারের পাক-প্রণালীর হদিশ দেবার বাসনা রইলো।

শ্রীঅরবিন্দের 'শিব'

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

[ভারতের মননের ইতিহাসে "শিব"-চেতনা এক অপরূপ সম্পদ। যুগ যুগান্তর ধরে এই 'শিব'কে আমরা গড়েছি, ভেঙেছি, সাজিয়েছি, সাধনোচিত মার্গে স্থাপন করেছি, বেদবেদান্তের পরমতত্ত্বে পরিণত করেছি, আবার তাকে টেনে নিয়ে গেছি হাটে মাঠে বাটে, ভাঙ খাইয়েছি, কোঁদল করিয়েছি, নিবাতনিষ্কম্প মহাযোগীকে করেছি গরীব নেশাখোর শ্মশানবাসী পাগল ভোলানাথ—এই 'শিব'কে নিয়েই কল্পনা করেছি তিনি মহেঞ্জোদড়োর নাসাগ্রবদ্ধদৃষ্টি দেবতা না বেদের রুদ্র, হিরণ্যকেশিন্ গৃহ্যসূত্রের শতরুদ্রীয়ের প্রতীক্ না শুক্রদের দেবতা পশুপ, শিশ্নদেবতাদের মানসভৌম ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রী না মহাভারতের দিগবাস্ নগ্ন; ঘোর ব্রহ্মচারী, উগ্র মহাতপা। ইনিই কি মহাকাল, অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, বজ্রসত্ত্ব, বজ্রধর, তোষীশবরীর লীলাসহচর, আদামণী, 'নৈরামণির' কক্ষে ও বক্ষে বিহার করেন মহাসুখচক্রে। তামিল সঙ্ঘ পরিষদের সভাপতি 'শিব' কবিমনীষ, কাশ্মীরের কুলীশরা, দক্ষিণের শৈবসিদ্ধান্তীরা, তামিল নায়নারেরা, বাংলার আগমবাগীশরা সৃষ্টি স্থিতি সংহার তিরোভাব অনুগ্রহের পঞ্চক্রিয়ার মধ্যে কোন্ পরিপূর্ণ 'ঐক্যকে পেতে চেয়েছিলেন। আমরা আচার্য শংকরের কাছে শুনেছি যে তিনি অজ, তিনি নিত্য, তিনি শাশ্বত, তিনি চিদানন্দময়—তাঁর তন্দ্রা নেই নিদ্রা নেই, দেশ নেই, বেশ নেই। আধুনিক কালেও মহামনীষি বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ এই চেতনাকে রূপ দিয়েছেন। 'শিব', 'শিব', ছিল বিবেকানন্দের মুখের বুলি। অমরনাথে তিনি অমরলিঙ্গের সঙ্গে একাত্ম হয়েছিলেন। 'শিব' ছিল তাঁর 'নেয়ে পারে নিয়ে যাবে। কালী হচ্ছেন সেই শিবেরই Vision। রবীন্দ্র চেতনাতেও এই শিবকে দেখেছি নানা বেশে, ঝড়ের রুদ্রদেবতার মধ্যে, ধ্যাননিমগ্ন আপনি-মগ্ন স্তব্ধের মধ্যে, নৃত্যরত নটরাজে, হরগৌরীর প্রেমে, ধূর্জটির মুখের পানে পার্বতীর হাসিতে, শ্মশানচারী ভৈরবের, পরিচয় জ্যোতিতে, শিশু-ভোলানাথে, তিমিরান্তক শিবশংকরে, জীবনের মুক্তধারার কবির দীক্ষায়, নম শতবার নমোস্তবায়। শিবের মৃত্যু-রূপই তাঁকে চঞ্চল করেনি, যখন বিবাহে চলেন বিলোচন, জীবনের পরিপূর্ণ কল্যাণের আদর্শই শিবমূর্তিতে রূপায়িত রূপান্তরিত করেছিলেন কবি।

শ্রীঅরবিন্দ পরিপূর্ণ যোগের আসনে বসে 'শিব'-চেতনাকে অর্ধনারীশ্বরের যে স্তরে নিয়ে গেছেন তারই একটি নমুনা নিয়ে প্রস্তুত হলো। 'শিব' সম্বন্ধে প্রথম কবিতা তিনি লেখেন তাঁর যৌবনে। এ কবিতাটি শেষের যুগের—১৬—৯-১৯৩৯ সালের। এই তিন স্রষ্টা পুরুষের 'শিব' চেতনাকে নিয়ে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো। রবীন্দ্রনাথের কবিতার কয়েক লাইন মনে পড়ছে···

অসীম আকাশে মহাতপস্বী মহাকাল আছে জাগি
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেখনি যে দেখা আজো কোনো খানে
সেই অভাবিত কল্পনাতীত লাগি···
মহাকাল আছি জাগি।
তুষারতুঙ্গী শুভ্র নীরবতার উর্ধে
নিরলঙ্কার অনন্তের প্রতীক
বসে আছেন একাকী, মজ্জিগিরিনিভ
শান্ত দীপ্ত স্তব্ধ একটি মহান সত্তা
আত্মারাম দেবতা;
শান্তির অনিময় দ্যুতির পিছনে সযত্নে রক্ষিত
নব বয়সের একটি অনিন্দ্য মূর্তি।
কিন্তু তাঁকেও এসে স্পর্শ করলো তরঙ্গ
আর একটি অশরীরী আনন্দের অনাগত ছন্দ
মহাযোগী চোখ খুললেন, দেখলেন
সীমাহীন গভীরতার অতল পেরিয়ে
আনন্দোচ্ছলা মহাপ্রকৃতির বুক প্রসার
যা অজানের নৈঃশব্দের মাঝেও

পাচ্ছে ধীরে ধীরে প্রকাশ;
মাতার যোগনিদ্রা গেছে টুটে
সেই অর্ধ জাগরণে তন্দ্রায় হলো দৃষ্টি বিনিময়
পরের দিকে চাইলেন প্রকৃতি
রক্তের প্রতিটি স্পন্দনে জেগে উঠলো আলোড়ন
ছন্দময় জগতে এলো প্রবল নর্তন
সেই নৃত্যের তালে তালে প্রাণ পেলো বিবশবিশ্ব
জন্ম নিলে মন
তখন তিনিই নিজের মুখকে
তুলে ধরলেন তাঁর দিকে
তিনিই যে তিনি
প্রকৃতির আলিঙ্গনে ধরা পড়লো পুরুষ
পুরুষের অশ্লেষে প্রকৃতি
সত্তা লাফিয়ে পড়লো সত্তার উন্মুক্ত বক্ষে।

কালো-ঘোড়ার দাপট

কালো-ঘোড়া:—চিঁ হিঁ হিঁহিঁহিঁহিঁ... আমি উদ্দাম...আমি দুর্দ্দম...আমি শান্তি-সুখের শনি, আমি লোভাতুর...বন্ধন-হারা, মানি না শাসন, মানি না পাহারা, দুর্ব্বার ক্ষুধা... তেজে ছুটে চলি দুনিয়ারে আমি তৃণসম গণি...সোয়ারী সামাল্‌-হও!

শিল্পী—পৃথ্বী দেবশর্ম্মা

খাদ্যাভাবের পরিস্থিতি—

গত আগষ্ট মাস হইতে পুরা ৪ মাস কাল দিন দিন দেশের খাদ্যাবস্থা জটিল হইয়াছে ও তাহার ফলে সারা ভারতে বিক্ষোভ হইতেছে। কেরলে খাদ্যাভাবের ফলে বিপুল বিক্ষোভ হইয়াছে ও ভারতের সকল রাষ্ট্র হইতে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া কেরলে প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার পর গুজরাটে ও মহীশূরে খাদ্যাভাবের জন্য নানারূপ বিক্ষোভ হইয়াছে—পুলিস লাঠি ও গুলী চালাইয়া তাহা বন্ধ করিতে পারে নাই—শেষ পর্য্যন্ত অবস্থা শান্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে দারুণ খাদ্যাভাব চলিলেও বিক্ষোভ তত বেশী হয় নাই। কয়েকটি জেলায় ছাত্র বিক্ষোভ দেখা দিলেও তাহা শান্ত করা হয়। কিন্তু এই কয়মাস খাদ্য মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের দুর্গতির সীমা নাই। অক্টোবর মাসে পূজার সময় একদল লোক বোনাসের টাকা পাইয়া তাহা দ্বারা খাদ্য সমস্যার সমাধান করে- যাহারা বোনাস পায় নাই—তাহাদের সংখ্যাই অধিক—শতকরা ৮০ জন সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিয়া, এমন কি অনেকে তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিয়াছে। চাউল দুষ্প্রাপ্য হইল—৭৬ পয়সার চাউল লোকে ১ টাকা ২৫ পয়সা কিলো দরে ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। পূজার সময় কিছু বেশী চাউল পাওয়া গেল এবং তাহার পর হইতে চাউল সমস্যা কতকটা কমিয়া গিয়াছে। তখন গম ও আটা বেশী পরিমাণে পাওয়া যাইত—আবার নভেম্বরের প্রথম হইতে গম দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—টাকা দিয়াও গম পাওয়া যায় না। পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে চিনি উধাও হইল—পূজার সময় গুড় দিয়া বা ঐ জাতীয় লাল চিনি দিয়া মিঠাই প্রস্তুত হইল—গুড় বা লাল চিনির দরও কম ছিল না. গত ১ মাস যাবৎ বাজারে চিনি নাই—১৩৫ পয়সা কিলোর চিনি ১৬০ পয়সা দরে বিক্রীত হইতেছে। চাল, আটা ও চিনি রেশন দোকানে পাওয়া যায়—পূজার সময় সরকার রেশন দোকান হইতে ময়দা ও সুজি দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল. কিন্তু তাহার পরিমাণ এত কম যে শতকরা মাত্র ৩৫ জন লোক ময়দা সুজি পাইয়াছে। তাহার জন্যও তাহাদিগকে কয় দিন ধরিয়া সর্ব্বত্র ঘোরাঘুরি ও ছুটাছুটি করিতে হইয়াছে। আবার এখন আর তাহা মোটেই পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী ডাল প্রিয়—ডালের দর ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া ৯০ পয়সার স্থলে ১৪০ পয়সা হইয়াছে—তাহাও এখন আর ছোলার ডাল বা মটর ডাল আদৌ পাওয়া যায় না। এ সকল জিনিষ লোকে হঠাৎ বেশী পরিমাণে খাওয়া অভ্যাস করে না—কাজেই মনে হয়—মজুতদারদের কাছে ডাল আছে—তাহা বাজারে না ছাড়িয়া কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। সর্বশেষ কথা—সরিষার তেল। বাঙ্গালী বহু শত বৎসর সরিষার তেল ব্যবহার করে। এক সময়ে সরিষার তেলের সের ছিল ৩ আনা—তাহা বাড়িয়া এখন সরিষার তেলের সের হইয়াছে ৪ টাকা—কিন্তু তাহাও আবার অধিকাংশ সময় আদৌ পাওয়া যায় না। বহু ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে তৈলভাণ্ড লইয়া গত ৩।৪ মাসকাল কলিকাতার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছি। সরিষার তেল না পাইয়া লোক ক্রমে তিলের তেল ও বাদাম তেল খাওয়া অভ্যাস করিতেছে। সরিষার তেলের সমস্যা যে এত কঠোর হইতে পারে, এ কথা পূর্বে কেহ কখনও কল্পনাও করে নাই। তাহা সত্যে পরিণত হইল। নারিকেল তৈলও ৪।৫ টাকা সের—তাহাও অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না। বাদাম তেল বা তিলের তেল ৪ টাকা দরে পাইলে সুলভ বলিয়া আমরা মনে করি। তরিতরকারীর অবস্থাও ঐরূপ। ১৩৭০ সালে পশ্চিম বাংলায় আলুর চাষ ভাল হয় নাই—১৩৭১ সালে প্রায় ১ টাকা কিলো দরে সারা বৎসর আলু কিনিতে হইয়াছে—শুনা যাইতেছে ১৩৭১ সালেও আলু ভাল হইবে না—কাজেই আলুর দাম ক্রমশঃ বাড়িবে, তাহা কমিবার

কোন সম্ভাবনা নাই। আলুর দামের অনুপাতে বাজারে অন্যান্য তরী তরকারীর দাম স্থির হয়—কাজেই আলুর দাম বেশী হওয়ায় বেগুন, বরবটি, সিম, ফুলকপি প্রভৃতিও ১ টাকা কিলো দরে বিক্রীত হইতেছে। লাল কুমড়া এক সময়ে লোকে খাইত না—তাহাও ১ টাকা কিলো হইয়াছে। কেন এমন হইল? লোকসংখ্যা বাড়িয়াছে সত্য—পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে ১ কোটিরও অধিক লোক পশ্চিমবঙ্গে আসিয়াছে; উড়িষ্যা, বিহার ও উত্তর প্রদেশ হইতে পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিক আগমন বন্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহাদের জন্য নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য উৎপাদনে কি আমরা আদৌ সচেষ্ট হই নাই। দাম বাড়া স্বাভাবিক—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধি হয় নাই কেন? সে বিষয়ে সরকারী কর্ত্তৃপক্ষদের প্রশ্ন করিয়া কোন উত্তর পাওয়া যায় না। তাহার পর ডিম, মাংস ও মাছের কথা। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় বাঙ্গালীকে ছাগল, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালন করিতে বার বার উপদেশ দিতেন—আমরা সে কথায় কর্ণপাত করি নাই—কাজেই এক-জোড়া ডিম ৫০ পয়সা ও মাংসের কিলো ৫ টাকা কিনিতে হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে মাছ আসা বন্ধ—পশ্চিমবঙ্গে যে মাছ উৎপন্ন হয়, আমাদের চাহিদার তুলনায় তাহা অতি কম—কাজেই বাজারে মাছ পাওয়া যায় না—ভাল মাছ ৬৲ টাকা কিলোর কম দর নাই—সাধারণ নিম্নবিত্তের তাহা নাগালের বাইরে। পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যমন্ত্রী মধ্যে মধ্যে আশ্বাস দেন উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি মাছ আমদানী করিবেন—কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কিছুই দেখা যায় না। চিংড়ীমাছ আমরা বাল্যকালে এক পয়সা সের দরে কিনিয়াছি—এখন তাহাই ২ টাকা কিলো দরে বিক্রীত হইতেছে। তাহাও রোজ বাজারে পাওয়া যায় না। কত ঘটা করিয়া সমুদ্রের মাছ ধরার ব্যবস্থা করা হইল—কিন্তু সাগরও বোধ হয় আমাদের ভাগ্যক্রমে শুখাইয়া গেল—সাগরের মাছ পাওয়া গেল না। কলিকাতার কাছে গঙ্গায় এক সময় প্রচুর ইলিস মাছ ধরা হইত—ইলিস মাছও আর পাওয়া যায় না—গঙ্গায় অন্যান্য যে সব মাছ পাওয়া যাইত তাহাও আর পাওয়া যায় না। জেলেরা মাছের পরিমাণ কম বলিয়া মাছ ধরা ছাড়িয়া দিয়াছে। আমরা ৩৫ বৎসর পূর্বে কয়েকদিন সুন্দরবন অঞ্চলে নদীর উপর বাস করিয়াছিলাম, সে সময়ে সেখানে প্রচুর মাছ ধরা হইত দেখিতাম—এখন সেখানেও নাকি আর মাছ পাওয়া যায় না। ৪০ বৎসর পূর্বে বসিরহাট অঞ্চলে ইচ্ছামতীর উপর দিয়া নৌকায় যাতায়াতকালে কত মাছ দেখিতাম—সে মাছ কোথায় গেল? এখন আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালী শিক্ষিত যুবকরা কি এই সকল খাদ্যসমস্যার কথা চিন্তা করিবেন না? মহাত্মা গান্ধী নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—যে, যে কোন কাজই করুক না কেন, প্রত্যেক মানুষকে সারা দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা সময় করিয়া লইয়া খাদ্য উৎপাদনে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এ কথা কি আজ নূতন করিয়া শুনাইবার প্রয়োজন নাই? দেশে দুধ শুধু দুষ্প্রাপ্য নহে, দুর্মূল্য। পূজার সময় এক কিলো দুধের দাম কয়দিন ২ টাকা হইয়াছিল। দুধ উৎপাদনে আমরা কেহ আগ্রহশীল নহি। বাজার হইতে বেবী ফুড কিনিয়া আনি, শিশুদিগকে খাইতে দিয়া থাকি। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ীদের কৃপায় সে বেবীফুডও বাজার হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। বেবী ফুডের নূতন কারখানাও হইতেছে না—কারণ দুধ পাওয়া যায় না। আমরা বহুবার দেশের শিক্ষিত ও ধনী যুবকগণকে খাদ্য উৎপাদানে ব্রতী হইতে আহ্বান জানাইয়াছি—কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন, কেহ সে কথায় কর্ণপাত করে না। আমরা স্বেচ্ছায় নিজেদের সবংশে ধ্বংস করিব—কে আমাদের সে পথ হইতে উদ্ধার করিবে?

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়—

প্রবীণ সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় গত ১লা ডিসেম্বর মঙ্গলবার রাত্রিতে ৮৩ বৎসর বয়সে তাঁহার কলিকাতা নিউ আলিপুর, ৫৯, কৈলাশ পণ্ডিত লেনের বাড়ীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার আদিনিবাস ২৪ পরগণা জেলায় জয়নগর-মজিলপুরে—তিনি কালীঘাটে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ও কয়েক বৎসর দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা পত্নী ইন্দুবালা দেবী, ৭ পুত্র ও ৩ কন্যা বর্তমান। তিনি সারাজীবনে প্রায় ৫০ খানি গল্পের বই ও উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তিনি গান, কবিতা, প্রহসন, নাটক, প্রবন্ধ, স্কুল পাঠ্য বই প্রভৃতি বহু লিখিয়াছিলেন। এ বৎসর বঙ্গসাহিত্যসম্মিলন তাঁহাকে বিশিষ্ট সদস্য করিয়া সম্মানিত করিয়াছিল। তিনি বহুকাল ধরিয়া

'ভারতবর্ষে'র লেখক ছিলেন—আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

নরেন্দ্রনাথ বসু—

রবিবাসর নামক সাহিত্যিক সমিতির দীর্ঘকালের সম্পাদক ও কিছুকালের সর্বাধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ বসু গত ১৫ই নভেম্বর রবিবার বেলা ২টার সময় কলিকাতা ৪৫ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটস্থ বাড়ীতে ৭৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি এক সময়ে বাঁশরী নামক সাহিত্যিক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন 'ভারতবর্ষে'র লেখক ছিলেন ও নানাবিধ গ্রন্থের লেখক ছিলেন। তাঁহার ৪টি বিবাহিতা কন্যা বর্তমান। আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করি।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত—

প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর মৃত্যুতে লোকসভায় যে আসন শূন্য হইয়াছিল সেই আসনে উত্তর প্রদেশের ফুলপুর কেন্দ্র হইতে জহরলালজীর ভগিনী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত গত ২৩শে নভেম্বর লোকসভায় সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার বিরোধী অপেক্ষা ৫৮ হাজার ভোট বেশী পাইয়াছেন। শ্রীমতী পণ্ডিত রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুপরিচিত—তিনি বহু বৎসর ইংলণ্ড, আমেরিকা, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভারতের রাষ্ট্রদূতের কাজ সুখ্যাতির সহিত সম্পাদন করিয়াছেন। তিনি এখন ভারতে থাকিয়া দেশ সেবা করিবেন।

রাঁচীতে কংগ্রেসনেতা সম্মেলন—

গত ২১শে ও ২২শে নভেম্বর দুই দিন ধরিয়া রাঁচীতে আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, মণিপুর ও নেফার কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ এক সম্মেলনে সমবেত হইয়া ভারতের পূর্বাঞ্চলের সকল সমস্যার কথা আলোচনা করিয়াছেন। কংগ্রেস নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ ২ দিনই সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীকামরাজ সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন -নেতাদের বৎসরে অন্ততঃ পক্ষে একমাস করিয়া গ্রামে গিয়া বাস করা উচিত। সম্মেলনে নিম্নলিখিত বিষয়ে ৪টি প্রস্তাব গৃহীত হয় (১) খাদ্য সমস্যা (২) ছাত্র উচ্ছৃঙ্খলতা (৩) বিভিন্ন রাজ্যের ভাষা শিখিয়া সাংস্কৃতিক ঐক্যের শক্তি বৃদ্ধি ও (৪) মণিপুর, নেফা ও নাগাভূমিতে কংগ্রেস সংগঠনের শক্তি বৃদ্ধি। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত ব্যবস্থার কথা আলোচিত ও নীতি পরিবর্তনের দাবী করা হইয়াছিল

নেতাজী সুভাষচন্দ্র—

গত ৩০শে নভেম্বর দিল্লীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জীবন সম্বন্ধে একটি আলোক-চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইয়াছে। দিল্লীর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রীচিন্তামণি দেশমুখ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ও লোকসভার অধ্যক্ষ সর্দার হুকুম সিং ঐ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শ্রীদেশমুখ নেতাজীকে স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান বলিয়া উল্লেখ করেন। সভায় নেতাজীর জীবনকথা বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। বর্তমান সময়ে নেতাজীর সাহস, বীরত্ব, কর্মশক্তি ও সর্বোপরি দেশাত্মবোধের কথা সর্বত্র আলোচিত হইলে দেশ উপকৃত হইবে। দিল্লীতে যাঁহারা তাঁহার জীবন কথা ছবিতে দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের অভিনন্দন জানাই।

চার্চিলের জন্মোৎসব—

ইংলণ্ডের গত মহাযুদ্ধকালের প্রধানমন্ত্রী ও বৃদ্ধ রাজনীতিবিদ্ স্যার উইনষ্টন চার্চিল গত ৩০শে নভেম্বর ৯০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। তিনি এই বয়সেও বেশ শক্ত আছেন। ঐ দিন তাঁহার গৃহে জন্মোৎসবে ৬০ হাজার পত্র ও টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে। আমরাও মিঃ চার্চিলকে তাঁহার ৯০তম জন্মদিনে অভিনন্দিত করি।

আনন্দবাজার পত্রিকার রাঁচি কার্য্যালয়—

গত ২১শে নভেম্বর সন্ধ্যায় রাঁচিতে আনন্দবাজার-পত্রিকা, হিন্দুস্থান-ষ্ট্যাণ্ডার্ড ও দেশ পত্রিকার নূতন কার্যালয়ের উদ্বোধন উৎসব হইয়া গিয়াছে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজ নূতন গৃহের উদ্বোধন করেন ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরামসুভগ সিং একটি আলো জ্বালাইয়া দেন। উৎসবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী কে. বি. সহায় সভাপতিত্ব করেন। বিহারের রাজ্যপাল শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়াঙ্গার, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, কংগ্রেস-নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষ প্রভৃতি বহু নেতা উৎসবে বক্তৃতা

করেন ও আনন্দবাজারপত্রিকা প্রভৃতি সংবাদপত্রগুলি দেশকে তাহার সংগঠন কার্য্যে যে ভাবধারা দান করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। শ্রীঅশোক কুমার সরকার মহাশয়ের কৃতিত্বে আনন্দবাজার গোষ্ঠীর পত্রগুলি আজ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ায় সকলে তাঁহার কার্য্যের প্রশংসা করিয়াছেন।

চীনের আক্রমণ আশংকা—

গত ৩০শে নভেম্বর দিল্লীতে সৈন্যবিভাগের প্রধানদিগের এক সভায় ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীচ্যবন জানাইয়াছেন—চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা ১৯৬২ সালে যে অবস্থায় ছিল, এখনও সেই অবস্থায় আছে। চীন ভারতের সমগ্র উত্তর সীমান্তে প্রচুর সৈন্যসমাবেশ করিয়াছে ও অস্ত্রশস্ত্র আনিয়া জমা করিয়াছে। চীন ভারতের সহিত কোন আপোষমীমাংসা করিতে চাহে না—বরং পাকিস্তান যাহাতে ভারত আক্রমণ করে, সে জন্য চীন সর্বদা পাকিস্তানকে উৎসাহিত করিয়া থাকে। তবে ভরসার কথা ভারত সরকার চীন আক্রমণের প্রতিরোধ ব্যবস্থার ত্রুটি রাখে নাই। ভারত আক্রান্ত হইলে বহু লোক মারা যাইবে বটে, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা চীনকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইবে।

দেস্‌দিমোনা

শ্রীসুধীর গুপ্ত

উদ্‌ভ্রান্ত তারুণ্য-তীব্র রোমাঞ্চনাময়
সে দুরন্ত দিনগুলি আজও মনে পড়ে;
সাহিত্য-কাননে—কুঞ্জে কুঞ্জ নেশা-ভরে
মকরন্দ-লুব্ধ মত্ত ভ্রমর-হৃদয়
করিয়াছে আনাগোনা। অহো কী বিস্ময়,
উত্তাল 'ওথেলো'-মহাকান্তার-মর্মরে
যেদিন আনিল আর্তি এ ভুক্ত-অন্তরে!

সে রস-রোমাঞ্চ—মূর্চ্ছা বিস্মৃতিরও নয়।
'ওথেলো'-কান্তার-কান্ত অমৃত-মন্দার
দেস্‌দিমোনার মূর্তি, দাম্পত্য-প্রেমের
ক্রুশ-বিদ্ধ-খ্রীষ্ট-সত্তা। সাহিত্য-সংসার
স্বর্গের সমৃদ্ধি পেলো হেন সৃজনের
অচিন্ত্য দীধিতি লাভে। সে কি ভুলিবার!
দেস্‌দিমোনা যে পুষ্প অনিন্দ্য স্বর্গের।

নেশা
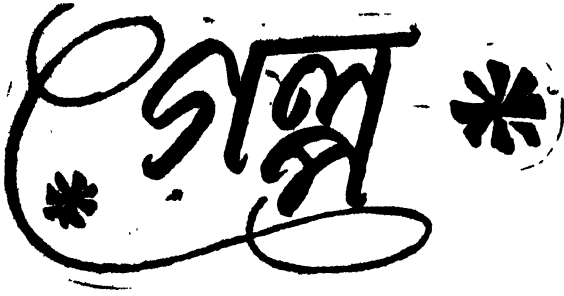
মধুকর

সাতমণ ভার মাথা নিয়ে ঘুম ভাঙলো গুরুপদর। কাল রাতের উচ্ছল নেশার থিয়োরি ভাঙতে সকালের অনেকটা সময় খরচ হল—এই ভেবে ভীষণ বিরক্ত হল। জানালার ভাঙা কপাটের ফাঁকে ফলসে রোদ ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। এক সার পিঁপড়ে হলুদ রঙের রেখাটা পার হয়ে যাচ্ছে। পিঁপড়ের লাইনটাকে অনেকক্ষণ ধরে দেখলো গুরুপদ, ঘোরের মধ্যে। চোখ দুটো ভারভার, কোণায় পাকা-করমচার লাল রস মাখানো যেন। সমস্ত মুখটা বিস্বাদ ভেতোভেতো, পচা দুর্গন্ধ লালা জমা। 'এতো খারাপ লাগছিল, মুখ নাড়ার ভয়ে লক্ষীকে ডাকলোনা। নিজেই বিছানা থেকে ওঠে গাড়ু গামছা নিয়ে নর্দমার ধারে গেল।

সারা বিছানায় রাতের উচ্ছৃঙ্খলতার পরিষ্কার চিহ্ন—জুয়াড়ীর নেশার পরীক্ষা হয়ে গেছে বিছানাটার উপর দিয়ে।

কাল জিতেছে গুরুপদ, বেশ কিছু টাকা। দিন সাতেক অন্ততঃ লক্ষীকে আর কাঁচা কয়লার উনুন ধরাতে হবেনা। মোড়ের মাথার পাঞ্জাবী হোটেলের কষা মাংস আর হাতে-গড়া নরম গরম রুটিতে তোফা পেট ভরাতে পারবে দু'জন। কটা দিন বেশ দিলাসা করেই কাটিয়ে দেবে।

বেশ শব্দ করে কুলকুচো করে গুরুপদ, চোখে মুখে জল ছিটোয় বারবার। খোয়াড়ি ভাঙছে তার আস্তে আস্তে। ঠোঁট জোড়া আপনা থেকে কখন ছুঁচলো হয়ে গেছে, টের পায়না গুরুপদ। হাওয়ায় ধাক্কা মেরে ঠোঁটের ক্ষুদ্রবৃত্ত থেকে তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ ওঠে—চমকে ওঠে মনের আনন্দে নিজেকে ধমকে ওঠে—'আ-রে শালা !'

এ গলির দিন আর রাত প্রকৃতির নিয়মে চলেনা। নিজেদের রুজিরোজগারের ধান্দা ফিকির অনুযায়ী চলে, মানে চালিয়ে নিতে হয়। কাজের জোয়ালে যে যেভাবে বাঁধা পড়েছে, বিশ্রাম আর কাজের সময়টাকে তাকে তেমন করেই ভাগ করে নিতে হয়, দিনের বেলাই ঘরের ঝাঁপ জানালা বন্ধ করে রাতের ঘুম ঘুমিয়ে নেয়—যাদের কাজ কারবার রাত বিরেতে। সে হরেক, কোনটা বৈধ কোনটা বা আইনের রাঙ্গা চোখকে ফাঁকা দিয়ে চুপিসারে। সে কাজ যেমনি বিপজ্জনক তেমনি অনিশ্চিত। জীবন নিয়ে জুয়াখেলা চালিয়ে যায় মানুষ নামধারী প্রাণীগুলো, নিশাচর জীবের মত অন্ধকারে এদের চোখও জ্বলে ধক্ ধক্ করে।

এ গলির বাসিন্দা গুরুপদ—উভচর। দিনে রাতে কখন ঘুমোয় কখন জেগে থাকে কেও বলতে পারেনা। দিনের কাজটা তার ভদ্র—অন্ততঃ আইনের চোখে। কিন্তু রাতের কাজটা কি আইনের লোকেরা, কি সাধারণ গৃহস্থ—কেও ভালো চোখে দেখেনা। ময়লা চিটচিটে এক জোড়া তাস আর সমশ্রেণীর কতগুলো মানুষ নিয়ে রাতের কারবার বস্তীর কানাগলির গোলক ধাঁধা পেরিয়ে ওরা এসে হাজির হয় আড্ডায়। বাইরের কোন লোকের পক্ষে এর লোলুপ সন্ধান সহজসাধ্য নয়, হোকনা সে যত বাঘা টিকটিকি।

কোন কোনদিন আড্ডা ভাঙ্গার পর খুসীমনে বাড়ী ফেরে গুরুপদ, মুখে চলতি হিন্দীসিনেমার গানের দু' একটা কলি। পকেটে একমুঠো অগোছালো টাকা, মগজ অনেক শিথিল তরল পানীয়ের প্রভাবে। হঠাৎ অকারণে 'হেসে ওঠে হাহা করে।

আর যেদিন হেরে গিয়ে শূন্য পকেটে বাড়ী ফেরে, সেদিন গুরুপদর চেহারা অন্যরকম। মুখে সেদিন গান নেই, আকণ্ঠ মদগিলে চলাতেও কেমন বেসামাল ভাব। গানের বদলে মুখথেকে তুবড়ীর মতো ছুটতে থাকে অজস্র আর অশ্রাব্য গালি গালাজ।

সেদিন লক্ষীর ভীষণ কষ্ট। বেসামাল মানুষটার হাতের

কিল চড় আর লাথি খেয়ে যেখানে ছিটকে পড়ে। দল পাকিয়ে যাওয়া শরীরটা বার বার ফুলে ফুলে ওঠে। কিন্তু কাঁদে না লক্ষ্মী। দাঁতে কামড়ে মুখ বুজে পড়ে থাকে, নোনারক্ত ছড়িয়ে পড়ে কাটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে, কিন্তু নোনাজলের দাম লক্ষ্মীর কাছে এর চেয়ে অনেক বেশী।

একটু পরেই মাটি থেকে শরীরটাকে তুলে গুরুপদর বমি পরিষ্কার করে হাত দিয়ে, টেনে হিঁচড়ে অচৈতন্য দেহটাকে বিছানায় নিয়ে তুলে, ঠাণ্ডা জলে গামছা ভিজিয়ে বার বার করে গা মুছিয়ে দেয়, হাতপাখা দিয়ে বাতাস করে। অভ্যেস হয়ে গেছে—এই মারের পর এমন সেবা করা।

টাকা নিয়ে ঘরে যেদিন ফেরে সেদিনটা আবার অন্য-রকম। আদরে আদরে দিশেহারা হয়ে যায় লক্ষ্মী। বৌকে আচ্ছা করে দলে চটকে পিষে একেবারে হাঁপ তুলিয়ে ছেড়ে দেয় গুরুপদ। ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে যায় লক্ষ্মী। মার খাওয়া—না এই আদর, কোনটাতে বেশী যন্ত্রণা বুঝে উঠতে পারে না। কিন্তু বুঝতেও চায় না যেন। এই বিদঘুটে বিকৃত আদর খাওয়াও অভ্যাস হয়ে গেছে তার। বরঞ্চ খুসীই হয় সে। গুরুপদর অত্যাচার আর আদর দুটোতেই পরম রমণীয় কি একটা খুঁজে পায় লক্ষ্মী, আর সে পাওয়ার আনন্দে ওর চোখ দুটো বার বার ঝিলিক মেরে ওঠে।

নেশা করলেও মেয়ে মানুষের নেশা নেই গুরুপদর—লক্ষ্মীই তার সব, তার জীবনে একমাত্র নারী। আর সেই আনন্দেই অত অত্যাচারের পরও হাসি মুখে পরদিন ভোর হতে না হতেই কাঁখে কলসি নিয়ে জল আনতে ছুটে, হাত ঘুরিয়ে গল্প করে গুরুপদর, জল আনতে যাওয়া মেয়েদের সংগে। আহ্লাদে দুলতে দুলতে বাড়ী আসে ওদের ঈর্ষাকাতর মুখের ছবি সারা মনে ভরে নিয়ে। গুরুপদর জুয়ার নেশার মতো এও একটা নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্মীর। সারা বস্তীর মেয়েদের কেউ বুকে হাত দিয়ে বলুক দেখি লক্ষ্মীর মতো একপুরুষ নিয়ে ওরা ঘর করে।

সেদিন বিকেলেই খবরটা শুনতে পেল গুরুপদ। জুয়া খেলার সঙ্গী বিভূতিই শোনাল। বিড়ীর পাকানো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—এবার দাও সর্দার, (গুরুপদকে সবাই সর্দার বলেই জানে) এদের মধ্যে খেলার জাগাটা ওরই বেশী। তাইতো ওর গভীর প্রকৃতি আর দিলের জন্য কাজের জন্যও তাকে ওরা সমীহ করে। তোমার জারিজুরি সব ভেঙে গেল।

ভেতরে ভেতরে কৌতূহল জেগে উঠলেও নির্লিপ্ত মুখে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়ে গুরুপদ। দাঁতের ফাঁকে বিড়ীটাকে আটকে রেখে তাচ্ছিল্য করে বলে—কি ভেঙে গেল বলি?

—তোমার সর্দারি গো সর্দারি, মুচকি হাসে বিভূতি, সর্দারেরও সর্দার আছে জানোত? রাজার যেমন রাজা?

রেগে ওঠে গুরুপদ—শালা, ভাণতা না করে কি বলতে চাস সোজা বলে ফেল, নইলে…।

নইলে কি হবে বুঝতে পেরে দুপা পিছিয়ে বসে বিভূতি, তারপর ওখান থেকেই বলে—আমাদের রামাইকে চেনোত? ঐ যে গো চটকলে কাজ করে? তার এক ভাইপো এসেছে নাকি। কি যেন শালা নাম তার, ও সব ভদ্দরলোকেদের মত নাম মনেও থাকে না। হ্যাঁ হ্যাঁ সুরেন্দর না কি যেন। তারি হুঁশিয়ার মালুম হল। বড়ো বড়ো সব লাইট কেলাবে নাকি ওসব খেলে। রামাই তো বগল বাজিয়ে লাফাচ্ছে দেখে এলুম: রোজ বাজি জেতা তোমার নাকি আর চলবে না, গুম হয়ে বসে থাকে গুরুপদ। কোন কথা বলে না। বিড়ীটা কখন নিভে গেছে। দাওয়ায় বসে হিজিবিজি আঁচড় কাটে শুধু।

বিভূতি ব্যঙ্গ করে—কি ওস্তাদ, এক সুরেন্দর তোমার মুখে কুলুপ এঁটে দিল। হায় হায় এই……।

কথা শেষ হলনা বাজখাঁই ধমকে আঁতকে ওঠে বিভূতি। দাওয়া থেকে এক লাফে ঘরে ঢুকে' গুরুপদ, যেতে যেতে বলে—গুরুপদ সাঁপুই কোন শালাকে ডর করেনা, সে বলে দিস তোদের রামকানাইকে। আর এও বলবি আজ সন্ধ্যাতেই পরীক্ষা হবে। খুশীমনে শিস দিতে দিতে খবর দিতে হবে বিভূতি। ওস্তাদের চুপ মেরে থাকাতে সে সত্যি ঘাবড়ে গিয়েছিল। গুরুপদকে সত্যি ভালবাসে বিভূতি।

সেই পরীক্ষাই আরম্ভ হল, তবে আর সব পরীক্ষাতেই, ফেল হবে এই ভাগ্য নিয়েই গুরুপদ খেলায় বসেছে মনে হয়। ওর থমথমে কালো মুখটার দিকে তাকাতে পারেনা বিভূতি। রগের পাশঘেঁষে একজোড়া শিরা কি

অসম্ভব মোটা হয়ে ওঠেছে, এক সময় ওটা ফেটে পড়বে মোটা হতে হতে, এই ভাবে বিভূতি ভয়ে হাতে ধরা বিড়ীটাতেও টান দিতে ভুলে গেছে। কখন ওটা নিভে গেছে। জলছে গুরুপদর চোখ। যত হারছে রোখ চেপে যাচ্ছে তত। কালকের জেতা বাজির টাকাটা কখন রামাই নিয়ে নিয়েছে। বিভূতিকে বাড়ী পাঠিয়ে শেষ সম্বল তেরোটি টাকাও আনাতে হয়েছে। তারও গোটা পাঁচেক মাত্র হাতে।

সমস্ত ঘরটা থমথম করছে কিসের এক চাপা আতঙ্কে, কালিপড়া লণ্ঠনটা ভাঙ্গা চিমনীর পাস দিয়ে গলগল করে কালো ধোঁয়া ছড়াচ্ছে ঘরে। বাইরে থেকে একটা পোকা এসে বার বার ঝাঁপিয়ে পড়ছে চিমনীটার উপর। ওটার পাখা ঝলসে যাচ্ছে, তবু আবার ফিরে আসছে। আবার আবার। এ কোন্ সর্ব্বনেশে নেশা!

দুবার বিভূতি হাতধরে টেনেছে গুরুপদর—আর না সর্দ্দার, বলতে চায়; রাত অনেক হয়েছে।'

দু বারই হেসে ওঠেছে সুরেন্দ্র, আর দুবারই টেনে নিয়েছে গুরুপদ।

বাইরে অন্ধকার ঝিঁঝিঁ করছে। ভেতরে অস্পষ্ট আলোয় ওদের ভুতুড়ে ছায়া পড়েছে দেয়ালে। ভূত চেপেছে গুরুপদর ঘাড়ে। সুরেন্দ্রর ঠোঁটের একচিলতে হাসিটা কালিপড়া চিমনীটার চাইতেও গরম। খুনে আগুন হয়ে গেল, যখন শেষ সম্বল দুটাকার নোটটাও রামাই সুরেন্দ্রর লোক হিসেবে নিজের পকেটে তুলে রাখলো।

বুক পকেটটা ফুলে ওঠেছে। খুব বেশী টাকা নয়, অবশ্য ভাঁজ করে রাখলে এর পাঁচ দশ গুণও রাখা যায়।

বিভূতি আশা করেছিল এবার ঐ সর্ব্বনেশে খেলাটা বন্ধ হবে। সব খুইয়ে, উঠি উঠি ভাব করে পাটা তক্তপোষ থেকে তুলেও ছিল, কিন্তু সুরেন্দ্রর একটা কথা যেন ঘাড় ধরিয়ে আবার বসিয়ে দিল। বিভূতির পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে যায়। আর কি সুস্থ করতে পারবে ওস্তাদ? ওর সবল হাতে টুঁটি টিপে ধরবে শয়তানটার। একটা মারামারির আশঙ্কায় স্থির হয়ে বসে থাকে। কিন্তু আজ একি হল সর্দ্দারের। অত বড় কথাটা শুনেও ও চুপ মেরে রইল।

তাসজোড়াটা গোছাতে গোছাতে সুরেন্দ্র বলেছিল—নাও এবার হলত সর্দ্দা-র। যাও বাড়ী গিয়ে বৌএর আঁচল ধরে ঘুমোওগে। শুনেছি খাপসুরৎ বৌ নাকি তোমার—আর খুব পেয়ারও করে...হাঃ হাঃ হাঃ—প্রাণখোলা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সুরেন্দ্র। ভাইপোর কুৎসিত রসিকতায় খিক খিক করে হাসে রামাইও। কোথায় একটা ঘুমভাঙ্গা ছেলে ককিয়ে ওঠলো।

কিছুক্ষণের জন্য ঘরটা যেন বাজপড়ার মতন স্তব্ধ হয়ে রইল। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারেনা বিভূতি—গুরুপদর কথাগুলো সে ঠিক শুনেছে কিনা। ওস্তাদ বলেছে তো ঠিক—না খেলা শেষ হয়নি। শেষ সম্বল আছে একটা, হ্যাঁ আমার বউটা, ওকেই বাজি রাখলাম। জিতলে এক রাত্রির জন্যে তোমার, হেরে গেলে আমার সব টাকা আমাকে ফিরিয়ে দেবে, বল রাজি?

অত যে পাকা খেলোয়াড় সুরেন্দ্র, সেও ঘাবড়ে গেল। কিন্তু অল্প একটু পরেই আবার কাকা ভাইপোতে চোখাচোখি হল। মুখে একটা কুৎসিত হাসি ঝুলিয়ে রেখে সুরেন্দ্র বলে—সমাদ্দার সব বাজিতেই রাজি। কিন্তু তুমি? ...তোমার কথা শেষ পর্য্যন্ত ঠিক থাকবেতো, না...।

সুরেন্দ্রর গলাকে যেন থাবা মেরে নীচে নামিয়ে দিল—'গুরুপদ সাঁপুই কথার খেলাপ করেনি কোনদিন'।

তারপর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাস বাটাবাটি চালাচালি হল, অসাড় হয়ে বসে রইল বিভূতি। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা দুঃস্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে তার কাছে।

আজ নেশা করেনি গুরুপদ, তবু চিরদিনের সেই চেনা পথটা দিয়ে আসতে বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। বস্তী বাড়ীর সঙ্কীর্ণ গলি, প্রায়ই ধাক্কা লাগছিল এপাশে ওপাশে দর্মার বেড়ায়। পাশাপাশি দুজন আসা যায়না, নয়তো তাকে ধরে ধরেই ঘরে নিয়ে তুলতো বিভূতি। অবশ্য সর্দ্দার রাজি হত কিনা কে জানে। তবু সাবধানে অন্ধকারে চোখের মণি দুটোকে অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ করে সর্দ্দারের পেছনে আসছে সে, যদি হঠাৎ পড়ে যায়—পেছন থেকে ধরে ফেলবে এই আশায়।

আড্ডাঘর থেকে এখন পর্য্যন্ত একটাও কথা বলেনি গুরুপদ। অনবরত একটা চিন্তাই তার মগজটাকে খাচ্ছে

বার ঘুরে ফুরে খাচ্ছিল—লক্ষ্মীকে কেমন করে বলবে কথাটা। এ সর্বনেশে কথাটা কি করে উচ্চারণ করবে। চোখে ভেসে আসে সুরেন্দ্রর লোভী কুকুরের মতো মুখখানা।

শয়তান ভর করেছিল তার মাথায়—নইলে এ ফাঁদে সে পা দিল কি করে,সাধারণ সুস্থ মাথায় কেউ এমন একটা বাজি ধরতে পারে? মনে মনে একটা অশ্লীল গালি দেয় —কিন্তু আশা মেটেনা এতে। লক্ষ্মীকে ঐ মাংসখেকো জানোয়ারটার হাতে তুলে দিতে হবে—কথা দিয়েছে গুরুপদ। সে যদি পুলিশে খবর দেয়? নিজের বৌকে পরের হাতে তুলে দেবার অধিকার কি তার আছে! কিন্তু সে নিজে? পুলিশ সমস্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে সে নিজেও তো রেহাই পাবেনা, সুরেন্দ্রর সঙ্গে জেলের দরজা তার জন্যও খোলা থাকবে। তা ছাড়া সুরেন্দ্র বে-পাড়ার হলেও মস্তো দল আছে তার। লক্ষ্মীকে সহজে না দিলে জোর করে ছিনিয়ে নেবে। কোলকাতার রাস্তায় হয়তো একদিন লোকে একটা লাশ পড়ে থাকতে দেখবে—সে লাশ গুরুপদর। শিউরে ওঠে গুরুপদ। না-না ছাগলের মতো রাস্তায় মরে পড়ে থাকতে পারবেনা। যে ভাবেই হোক লক্ষ্মীকে রাজি করাতেই হবে। দরকার হলে মুখ হাত-পা বেঁধে পৌঁছে দিয়ে আসবে সুরেন্দ্রর দরজায়। হন্ হন্ করে পা চালায় গুরুপদ। অবাক হয়ে তাকে অনুসরণ করে বিভূতি।

সারা রাস্তা পা চালিয়ে হেঁটে বাড়ীর কোণায় এসে আবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। কোথা থেকে যে কি একটা বাধা দিচ্ছে। মনের সাহস লোপ পেয়ে যাচ্ছে। বিভূতি আস্তে আস্তে ওস্তাদের পিঠে হাত দিয়ে, কি করবে কিছু না বুঝেই হঠাৎ গলা খাঁকারি দেয় একটা। আর সে সঙ্গেই জেগে থাকা লক্ষ্মী টেমি হাতে দরজা খুলে বাইরে আসে। অন্ধকারে ভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তি দুটোর দিকে অনেক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন ঠাণ্ডা হয়ে গুরুপদ কোনদিন বাড়ী আসেনা, এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেনা।

—কি হয়েছে তোমাদের, ঘরে আসছোনা কেন?—লক্ষ্মীর কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই ধোঁয়াটে ঠেকছে। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে যায়। বিভূতিই আগে দাওয়ায় ওঠে বসে। প্রদীপটা এক কোণায় রেখে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্মী। নিঃঝুম বস্তীর মধ্যে ওর চুড়ির আওয়াজ শোনা যায়। কাঁপা গলায় বিভূতিকে বলে—কি হয়েছে বলোত, তোমরা অত চুপ মেরে আছো কেন?

—এ্যা—না মানে কিছু না, মানে…সর্দার… কিছু বলার সাহস পায়না বিভূতি।

কিন্তু গুরুপদ আবার সাহস ফিরে পেয়েছে। অন্ধকারের ভেতর থেকে গমগম করে ওঠে ওর কণ্ঠস্বর—স্পষ্ট, ফেটে ফেটে বেরুচ্ছে শব্দগুলো—তোকে যেতে হবে লক্ষ্মী। বাজি ধরে খেলেছিলাম। হেরে গেলে এক রাত্রি সুরেন্দ্রর ঘরে থাকতে হবে।

একটা চীৎকার, নয় তো বুক ফাটা কান্না—এরকম কিছু একটা শোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসেছিল গুরুপদ। শিকারী বাঘের মতো ওৎপেতে বসেছিল। শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গেই টুঁটি টিপে ধরবে। কিন্তু—স্পষ্ট লক্ষ্য করলো একটু কালো হয়ে উঠেই সারামুখ হাসিতে ছেয়ে গেল লক্ষ্মীর। সত্যের স্নায়ু শিথিল হয়ে এল দুজনেরই। প্রস্তাব করা হয়ে গেছে, দুশ্চিন্তার বোঝা ঘাড় থেকে নেমেছে—তাতেই বিভূতি নিশ্চিন্ত, আর গুরুপদ সাঁপুই তার পরাজয়ের গ্লানি ভোলার জন্য প্রতিশোধ নিতে চাইছে লক্ষ্মীর উপর দিয়ে। অনুশোচনা নেই তার মনেও। এমন তো হেরে গেলেই সে করে। গায়ের কাপড় খুললে অমন চিহ্ন দু-দশটা লক্ষ্মী দেখাতে পারবে। গুরুপদর পরাজয় লক্ষ্মীর শরীরে দাগ কেটে রাখে। কিন্তু লক্ষ্মীও আজ প্রতিবাদ না করে শাস্তিটা মাথা পেতে নিল? একবারও না করলে না!

সেদিন রাতে সুরেন্দ্রর ঘরে যে কুৎসিত আর অশ্লীল হাওয়া বয়েছিল তার সাক্ষী কেও নেই। অন্ততঃ গুরুপদ যায়নি দেখতে। একটা পাথরের মূর্তির মতো দাওয়ায় বসে রইল সে। আর এই প্রথম উপলব্ধি করলো লক্ষ্মীকে সে ভালোবাসে—তার শরীরের চেয়ে বড়ো আর একটা জিনিষের জন্য। ভাঙা চৌকাঠে মাথা ঠোকে নিষ্ফল আক্রোশে। ভাবে ছুটে গিয়ে লক্ষ্মীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে—কিন্তু সুরেন্দ্রর বিশাল মস্ত শরীরটা আবার তাকে ভয় পাইয়ে দেয়। দরজা খোলা রেখে বস্তী থেকে বেরিয়ে পড়ে। এখানে বসে থাকতে পারছেনা কিছুতেই। নির্জন

রাস্তা দিয়ে পাগলের মতো হাটতে থাকে। ঘুমন্ত শহরটাকে তার মতো নিষ্ঠুর, ক্লেদাক্ত মনে হয়। লাথি মেরে যদি চূর্ণ করে দিতে পারতো সমস্ত শহরটাকে!

লক্ষ্মী ফিরে আসুক। কাল সকালেই শহর ছেড়ে চলে যাবে ওরা। দূরে বহু দূরে। যেখানে বস্তী নেই, নেই সুরেন্দ্র মামাই এর দল—নেই কানাগলি আর মাতালের চীৎকার। যেখানে আছে শুধু খোলা মাঠ আর নদী—আর ধানক্ষেত। সেখানে ঘর বেঁধে থাকবে ওরা দুজনে। খাবার অন্ন জোগাড় করবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সারাদিন সারারাত খেটে। কোন কু-চিন্তা আর প্রলোভনকে মনে স্থান দেবে না। সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়—আর সান বাঁধানো রাস্তার উপর থুথু ছিটোয় গুরুপদ।

সকাল হল এক সময়। পাখী ডাকা তাজা রোদের সকাল নয়। খাটালের গরু-মোষ আর দ্রেণঘাঁটা মুরগীর কর্কশ সুরের সকাল। মরা আলো অতি সতর্কতায় একটু উঁকিঝুঁকি দেয় বস্তীতে। যেন কার নিষেধ আছে এখানে ঢুকতে। চোখে মুখে, সারা শরীরে জ্বালা নিয়ে বস্তীতে ঢুকে পড়ে গুরুপদ। অর্জুন মণ্ডলের খাটালটা পার হয়ে আসতেই দেখলো বিভূতি দৌড়ে আসছে। উত্তেজনায় তার চোখ মুখ লাল। দম নিয়ে বলে—ওস্তাদ, সারারাত কোথায় ছিলে তুমি? এদিকে কি কাণ্ড হয়েছে জানো। সুরেন্দ্র বলেছে তোমাকে পেলে আর রাখবে না। যতো শীগ্‌গির পারো এখান থেকে পালিয়ে যাও তুমি।

গুরুপদ অবাক হয়ে বলে—কেন কি হয়েছে, আমিতো কথা রেখেছি।

'সে কথা তো তুমি বলছো, কিন্তু ওরা বিশ্বেস করবে কেন? লক্ষ্মী বৌদি তো কালরাতে সুরেন্দ্রর ঘরে যায়নি!

—যায়নি? উত্তেজনায় বিভূতির হাতটা চেপে ধরে গুরুপদ। কি বলছিস তুই?

—তবে আর বলছি কি ওস্তাদ! সেই রাগেই তো কাল রাতে ওরা হামলা করেছে তোমার ঘরে। তোমাকে না পেয়ে জিনিষ পত্র ভেঙ্গে চুরে তচনচ্ করে দিয়ে গেছে।' তারপর ওস্তাদের হাতটা গভীর মায়ায় জড়িয়ে ধরে বলে—ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে না ওস্তাদ, নইলে তোমাকে খুন করে ফেলতো।

—খুন করে ফেলতো—পেলে তো শালারা—হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। তারপর হঠাৎ থেমে গিয়ে মুখটা উজ্জ্বল করে বলে—লক্ষ্মী যায়নি নারে—কুত্তাটার ঘরে? আমি জানতাম লক্ষ্মী ও কাজ করতে পারে না। ও অমন মেয়ে নয়।' চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে গুরুপদর—ওকে আমি খুঁজে বার করবোই—হ্যাঁ বিভূতি ওকে খুঁজে বের করতেই হবে। ওকে আমার দরকার যে। বলে আর দাঁড়ায় না গুরুপদ। কানাগলি পেরিয়ে বড় রাস্তার দিকে হাটিতে থাকে সে। বিভূতি দু' চোখ মেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর চলে যাওয়া দেখে। ঝাপসা হয়ে আসছে বারবার, বারবার চোখ দুটো হাত দিয়ে মোছে সে।

কোষ্ঠীর বিচার

জ্যোতি বাচস্পতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

	৫ম ২০/১৬	৪র্থ ২৪/১৬	৩য় ২৪/১৬	
৬ষ্ঠ ১৪/১৬	শ ২/২৪ বু ১৪/১৪ ব		শু ৯/০ র ৬/৫০ প্র ৮/৫১ বৃ ১৫/১০ চ ২২/১৮	২য় ১৮/১৬
৭ম ১১/১৩			লং ১২/১৩ র ১২/৫২ ম ২২/১০	
৮ম ১৮/১৬		রা ১৬/৪৪ ব	কে ২/৫৪	১২শ ১৪/১৬
	৯ম ২৪/১৬	১০ম ২৪/১৮	১১শ ২০/১৬	

এই চক্রে ইচ্ছা করলে, প্রত্যেক গ্রহের বাঁ পাশে নক্ষত্রের অঙ্ক এবং ডান পাশে স্ফুটের অংশ, কলা লেখা যেতে পারে। যেমন উপরের কুণ্ডলীতে ম ২২।১৩ লেখা আছে, তার বদলে ২২ম ২২।১৩ লেখা চলে। এর অর্থ হবে মঙ্গল ২২ নক্ষত্রে অর্থাৎ শ্রবণা নক্ষত্রে ও মকরের ২২ অংশ ১৩ কলায় আছে। কিন্তু আমার মনে হয় এলেখা বাহুল্য মাত্র।

কেন-না, যিনি কোষ্ঠী বিচার করবেন, গ্রহের স্ফুট দেখবামাত্র তাঁর বলতে পারা উচিত তা কোন্ নক্ষত্রে আছে। যাই হোক, যাঁদের অসুবিধা হবে তাঁরা এই ভাবে গ্রহের বাঁদিকে নক্ষত্রটি লিখে নিতে পারেন।

কোষ্ঠীবিচারে আত্মকারক

আমাদের দেশের অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ কোষ্ঠীবিচারের সময় সাধারণতঃ লগ্ন ও গ্রহের রাশিস্থিত নিয়েই বিচার ক'রে থাকেন। যে রাশিতেই লগ্ন হোক্ তাঁরা তার দ্বিতীয় রাশিকে দ্বিতীয় ভাব, তৃতীয় রাশিকে তৃতীয় ভাব—এই রকম ধ'রে এবং সেই সেই রাশিস্থ গ্রহকে দ্বিতীয়স্থ তৃতীয়স্থ ধ'রে ভাব বিচার করবার চেষ্টা করেন। যেমন, কোন ব্যক্তির যদি মেষ লগ্ন হয়, তাহ'লে তাঁরা মেষস্থ গ্রহকে লগ্নস্থ, বৃষস্থ গ্রহকে দ্বিতীয়স্থ, সিংহস্থ গ্রহকে পঞ্চমস্থ, ধনুস্থ গ্রহকে নবমস্থ মনে ক'রে বিচার করবেন এবং তাঁরা মঙ্গলকে লগ্ন-অষ্টম-পতি, শুক্রকে দ্বিতীয়-সপ্তম-পতি, শনিকে দশম-একাদশ পতি বলবেন। যদিও প্রায় প্রত্যেক জ্যোতিষ গ্রন্থে ভাব সাধনের নিয়ম দেওয়া আছে, তা হ'লেও জ্যোতির্বিদদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখা যায়। বিচারের বেলায় তাঁরা ভাব ছেড়ে দিয়ে রাশি নিয়ে পড়েন। দ্বিতীয় ভাবস্থ গ্রহ, তৃতীয় ভাবস্থ গ্রহ, তৃতীয় রাশিস্থ গ্রহ। যাঁরা শিক্ষিত জ্যোতির্বিদ তাঁরা অবশ্য জানেন যে, ভাবস্ফুট এবং গ্রহস্ফুট নিয়ে বিচার করা উচিত, কিন্তু তাঁদেরও সে সম্বন্ধে নানা-রকম গোলযোগ উপস্থিত হয়ে থাকে। অনেক সময় বিংশোত্তরী বা অষ্টোত্তরী দশা বিচারের নিয়ম এবং ভাব-বিচারের নিয়ম নিয়ে একটার ঘাড়ে আরেকটাকে চাপিয়ে তাঁরা গণ্ডগোলের সৃষ্টি করেন এবং এই নিয়ে নানা মুনির নানা মতের সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভাব-বিচারের সময়ও বিংশোত্তরী দশা বিচারের পারিভাষিক শুভগ্রহ, পাপগ্রহ নিয়ে বিচার করতে বসেন। অনেকে রাশিকে বাদ দিয়ে কেবল ভাব-কুণ্ডলী নিয়েই বিচারের পক্ষপাতী। আসল কথা রাশি, গ্রহ এবং ভাব সম্বন্ধে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা না থাকাতেই, এরকম গোলযোগ সম্ভব হয়েছে। একথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও বলা প্রয়োজন। কেন না রাশি, গ্রহ ও ভাব সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না হ'লে আত্মকারকের ব্যাপার (অন্ততঃ আমি যাকে আত্মকারক বলছি তার ব্যাপার) বুঝতে অসুবিধা হবে।

রাশি ও গ্রহ পদার্থগুলি কি, তা দিয়ে জ্যোতির্বিদদের

মধ্যে অর্থাৎ প্রাচ্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। প্রাচ্য জ্যোতির্ব্বিদেরা নাক্ষত্র রাশি বা নিরয়ণ রাশিকেই রাশি ব'লে থাকেন। পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আমাদের মতভেদ থাকলেও, এখানে তা আলোচ্য নয়। আমরা এই প্রবন্ধে রাশি বলতে নিরয়ণ রাশিকেই বুঝব। গ্রহ বলতে আবিষ্কৃত অনাবিষ্কৃত সমস্ত গ্রহ তার সঙ্গে সূর্য্য, চন্দ্র, রাহু, কেতু এই চারটিকে বুঝতে হবে।

ভাব বস্তুগুলি যে কি, এ সম্বন্ধে খুব সুস্পষ্ট ধারণা কোন জ্যোতিষের গ্রন্থে দেখেছি বলে মনে হয়না। প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য অধিকাংশ গ্রন্থে ভাব সম্বন্ধে যা কিছু লিপিবদ্ধ আছে, তা প'ড়ে মনের মধ্যে একটা গোলযোগেরই সৃষ্টি হয়। কোন কোন জায়গা প'ড়ে মনে হয়, ভাবগুলি রাশির মতই ব্যাপক পদার্থ—একটা রাশির কোন এক বিন্দু থেকে—অপর রাশির আর একটা বিন্দু পর্য্যন্ত—সমস্তটাই একটা ভাব। আবার, আর একটা জায়গা পড়লে, এই রকম ধারণা আসে যে, ভাবগুলি এক একটি বিন্দুমাত্র। ভাব কষবার যে সব নিয়ম আছে, তাতে ভাবকে বিন্দু ছাড়া আর কিছু মনে করা যায় না, এবং ভাব যদি বিন্দু না হয়, তাহ'লে ভাবস্ফুট কথাটি—নিরর্থক হয়ে যায়, এবং কোন একটি ভাবের সঙ্গে কোন গ্রহের কোন রকম প্রেক্ষা (aspect) অসম্ভব হয়ে পড়ে। কাজেই, পাঠকের মনে ভাব-সম্বন্ধে একটা সঠিক বা পরিষ্কার ধারণা কোন মতেই গড়ে উঠতে পারে না। পাশ্চাত্য গ্রন্থগুলিতে এক ভাবস্ফুট থেকে পরবর্ত্তী ভাবস্ফুট পর্য্যন্ত সমস্তটাকেই প্রথমোক্ত ভাবের অন্তর্গত ব'লে ধরা হ'য়ে থাকে, যেমন লগ্ন যদি সিংহের ২০ অংশ হয় এবং দ্বিতীয় ভাব যদি হয় কন্যায় ১৯ অংশ, আর মঙ্গল যদি থাকে কন্যার ৫ অংশে, তাহলে পাশ্চাত্যমতে মঙ্গলকে লগ্নস্থ বলেই মনে করতে হবে। প্রাচ্যমতে কিন্তু মঙ্গল হবে দ্বিতীয়স্থ, কেন-না প্রাচ্যমতে ভাবস্ফুটটিকে ভাবের মধ্যবিন্দু ব'লে ধরা হ'য়ে থাকে, এবং দু'টি ভাবের ঠিক মাঝখানে একটি বিন্দুকে দুই ভাবের সীমাবিন্দু বলা হয়—একে প্রাচ্যেরা ভাবসন্ধি বলেন। কাজেই উপরের উদাহরণটিতে লগ্নভাব শেষ হয়েছে কন্যার ৪½ অংশে এবং সেইখান থেকেই দ্বিতীয় ভাবের সুরু।

এখন জ্যোতিষকে যদি বিজ্ঞান ব'লে স্বীকার করা যায়, তাহ'লে এ দুটোই ঠিক হ'তে পারে না, মঙ্গল একমতে লগ্নস্থ ও অন্য মতে দ্বিতীয়স্থ হওয়া কোন মতেই সম্ভব নয়। অতএব, এখানে আমাদের বুঝতে হবে যে গোড়ায় কোন জায়গায় গলদ আছে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, যদিও অন্ততঃ ৫০।৬০ বৎসর ধ'রে আমাদের দেশে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষের চর্চ্চা চলে আসছে, তত্রাচ এদিকে কারও নজর পড়েনি।

আসল কথা ভাবগুলি বিন্দু-মাত্র। গণিতের যাঁর কিছু মাত্র ধারণা আছে, তিনিই বুঝতে পারবেন, ভাব কষবার যা নিয়ম আছে তাতে ভাবকে বিন্দু ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। এই বিন্দুগুলি কি? আমার মতে কোনও এক বিশেষ সময়ে কোন এক বিশেষ স্থানে যে বারটি বিন্দু দিয়ে পৃথিবী রাশিচক্রের প্রভাবকে গ্রহণ করেন, সেই বারটি বিন্দুই সেই সময়ের ভাব-বিন্দু। এই বারটি বিন্দুর উপর যে সকল গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব থাকে, তারাই শুধু সেই সময়ের পৃথিবীর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, এবং যে গ্রহ বা নক্ষত্রের যতখানি প্রভাব (কম বা বেশী) কোন ভাব-বিন্দুর উপর থাকে, ঠিক ততখানি প্রভাবই সেই সময়ে পৃথিবীর সেই স্থানের উপর অভিব্যক্ত হয়। আর, সেই সময় যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, তার উপরও সেই সকল গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ঐ ভাবেই প'ড়ে থাকে। এই উপপত্তিটির উপর আমি বিশেষ ভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কেন না, আত্মকারক সম্বন্ধে এর পরে যা বলব, তার ভিত্তি এরই উপর। এই উপপত্তি ভুল বা ঠিক সে তর্ক এখানে করব না, অন্ততঃ এর চেয়ে যুক্তি সঙ্গত কোন উপপত্তি এখনো আমি পাই নি।

জৈমিনি সূত্রে আছে—"আত্মাধিক কলাভির্নভোগঃ-সপ্তানামষ্টানাং বা"—এর সোজা অর্থ এই—রাহুকে বাদ দিয়ে সাতটি বা রাহু ধ'রে আটটি গ্রহের মধ্যে যে গ্রহের কলা সব চেয়ে বেশী সেই গ্রহই আত্মকারক।

টীকাকারেরা এর মানে করেছেন যে, যে গ্রহের স্ফুটের অংশ সবচেয়ে বেশী তাকেই আত্মকারক ব'লে গণ্য করতে হবে। আমার মনে হয়, এই অর্থ একেবারে অযৌক্তিক। নীলকণ্ঠ তাঁর সুবোধিনী টীকায় "কলাভিঃ" কথাটির ব্যাখ্যা করেছেন—"কলায়াঃ আদয়ঃ অংশাদৈয়স্তৈঃ

অংশাদিভির্মিতি যাবৎ" অর্থাৎ "কলাদি" মানে কলাদি কিনা অংশ, "কলাদিভিঃ" মানে "অংশাদিভিঃ", বারাণসী হিন্দু ইউনিভারসিটির জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক পণ্ডিত রামযত্ন ওঝা তাঁর টীকায় লিখেছেন—"কলাদিভিঃ কলা-শব্দস্যাপ্যংশবাচকত্বাৎ অংশাদিভিঃ" কলা শব্দের মানে অংশও হয়, অতএব কলাদিভিঃ মানে অংশাদিভিঃ—তার পোষকতা স্বরূপ তিনি বলেছেন "বৃদ্ধবাক্যে ভাগশব্দেনা-পাংশস্ত-প্রসিদ্ধিত্বাদ্ ঋষিণা কলাদিভিরিত্যুক্তম্" অর্থাৎ—বৃদ্ধের (পরাশরের) বাক্যে ভাগশব্দ দ্বারা অংশকে বুঝায়, অতএব ঋষি (জৈমিনি) "অংশাদিভিঃ" বলতে "কলাদিভিঃ" বলেছেন। টীকাকারেরা সকলেই প্রমাণ করতে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন যে, যদিও জৈমিনি লিখেছেন যে, কলা তিনি বলতে চেয়েছেন অংশ। আমার কাছে কিন্তু কথাটা একটু বিসদৃশ বলে মনে হয়। জৈমিনি তো অনায়াসেই লিখতে পারতেন—"আত্মাধিকোঽংশাদিভির্নভোগঃ" তা না লিখে তিনি "কলাদিভিঃ" লিখেন কেন? এই আত্মকারকের লক্ষণ তিনি দিচ্ছেন "স ইষ্টেবন্ধমোক্ষয়োঃ" অর্থাৎ আত্মকারক গ্রহ বন্ধন এবং মুক্তির কর্তা। এর মানে এই যে, যে কোন কোষ্ঠীতে আত্মকারক গ্রহই সবচেয়ে বলবান—সেই গ্রহই কোষ্ঠীর হর্তা-কর্তা-বিধাতা। যদি ধরা যায় যে, যে গ্রহের স্ফুট সবচেয়ে বেশী (অংশহিসাবে) সে-ই আত্মকারক, তাহ'লে অনেক সময় দেখা যাবে যে সারাদিনের মধ্যে একটি মাত্র গ্রহই আত্মকারক হয়ে থাকে, এবং তাহ'লে সেদিন যত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করবে সকলেরই ফল প্রায় একই রকম হবে। আমার মনে হয় এটা সম্পূর্ণ অ-যুক্তিযুক্ত। আমি বলতে চাই, জৈমিনি এখানে যে "কলাদিভিঃ" বলেছেন, এর মানে স্ফুটের অংশকলা নয় এর মানে ভাবস্থিতির বল কলা—যাকে চয়বল, ক্ষয়বল ব'লে উল্লেখ করা হ'য়ে থাকে। যে গ্রহ ঠিক ভাব-বিন্দুর উপরে পড়ে, তার পূর্ণ বল অর্থাৎ ৬০ কলা বল। গ্রহটি ভাব-বিন্দু থেকে যতদূরে থাকে, তার বলও সেই অনুপাতে কমে যায়। যদি ধরা যায় যে, "আত্মাধিকঃ কলাদিভি র্ন ভোগঃ" মানে যে গ্রহ ভাববিন্দুর সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ যে গ্রহের চয়বল বা ক্ষয়বল সব চেয়ে বেশী কলা, সে-ই আত্মকারক, তাহ'লে কষ্ট-কল্পনাও করতে হয় না, এবং আত্মকারকের সবচেয়ে সঙ্গত অর্থও আবিষ্কৃত হয়। এই অর্থই ঠিক এবং প্রচলিত অর্থ যে ভুল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ পাওয়া যায়, একখানা নির্ভুল কোষ্ঠী নিয়ে দুই-মতে আত্মকারক ঠিক ক'রে বিচার ক'রে দেখলে।

অবশ্য, আমি এ কথা বলি না যে, আমি জৈমিনি সূত্রের আত্মকারকের যা অর্থ করেছি, শুধু, এইটুকু দিলেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আত্মকারক নির্ণয় করা চলবে। আমি একথাও বলতে চাই না যে, জৈমিনি সূত্রে আত্মকারকের যা লক্ষণ দেওয়া হয়েছে—তা স্ব-সম্পূর্ণ। আমি এ প্রবন্ধে দেখাতে চাইছি যে, শুধু লগ্ন ও গ্রহসংস্থান দিয়ে সব বিচার করা চলে না। প্রত্যেক কুণ্ডলীতে এক একটি প্রধান গ্রহ আছে, যার দ্বারা সূচিত ফলাফল অন্য সকল গ্রহকে অতি-ক্রম ক'রে প্রবল হ'য়ে থাকে। জৈমিনির মতে তারই নাম আত্মকারক।

কেবল লগ্নাদি ভাব ও গ্রহসংস্থান দিয়ে যে একটা কোষ্ঠীর সঠিক বিচার করা যায় না, এবং যে কোন কোষ্ঠীর বিচার করতে হ'লে যে তার ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ তা আগে ঠিক করা প্রয়োজন, পাশ্চাত্য জ্যোতির্বেত্তারাও এটা লক্ষ্য ক'রে এসেছেন। তাঁরা এই গ্রহের নাম দিয়েছেন Ruler বা Ruling Planet—এ সম্বন্ধে এ্যালেন লিও লিখছেন—

"The ruling Planet* is either the lord of the ascending sign, or else that planet which is strongest or most prominent in the horoscope.

অর্থাৎ লগ্নরাশির অধিপতি কিম্বা যে গ্রহ কুণ্ডলীর মধ্যে সব চেয়ে বলবান্ অথবা যে গ্রহের প্রভাব সবচেয়ে বেশী সেই গ্রহই ভাগ্যনিয়ন্তা (Ruling Planet)।

কিন্তু কোন্ গ্রহ সব চেয়ে বলবান তা ঠিক করবার নিয়ম-নির্দ্দেশের বেলায় তিনি বলেছেন—

No hard and fast rule can be given to indicate which this will be ; and this is one of the many points that must be left to the judgement of the astrologer. Sometimes one planet seems to dominate the whole of the character and destiny ; while in the other cases two or even more may have equal way. Planets in the four angles have the first claim to consideration, as they are always important, and of them the first house is the most in-

portant and the fourth the least. If any planet is rising, it will be part ruler ; if more than one rises, then that which is strongestly sign, or nearest to the clusp of the ascendant is ruler and of the considerable importance, but attention must also be given to any planet close to the clusps of the tenth and seventh houses as well as to any that may be in close aspect to the degree rising, The planet that is in closest aspect to the Sun is always important.

অর্থাৎ কোন গ্রহ যে ভাগ্য নিয়ন্তা (ruling planet) হবে সে সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম দেওয়া যায় না, এবং এটা অনেকটা জ্যোতির্ব্বিদের নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, কুণ্ডলীর মধ্যে একটা গ্রহই জাতকের চরিত্র এবং ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করছে ; আবার অনেক সময় এ-ও দেখা যায় যে, দুটো, তিনটে গ্রহও সমানভাবে জাতকের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। কেন্দ্রস্থ গ্রহগুলিই সকলের আগে লক্ষ্য রাখা উচিত, কেননা ; তাদের প্রভাবই বেশী হওয়া সম্ভব, কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল লগ্ন এবং সবচেয়ে দুর্ব্বল চতুর্থ। যদি লগ্নে কোন গ্রহ থাকে, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে সেই গ্রহ আংশিক ভাবে ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে, যদি একাধিক গ্রহ লগ্নে থাকে, তাহলে রাশিস্থিত হিসাবে যে গ্রহ বলবান্ অথবা যে গ্রহ লগ্ন-বিন্দুর নিকটতম সেই গ্রহই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে। যদি লগ্নে কোন গ্রহই না থাকে তাহ'লে লগ্নাধিপতিই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়। কিন্তু যদি কোন গ্রহ দশম কি সপ্তম ভাববিন্দুর কাছাকাছি থাকে, তাকেও দেখা দরকার, কিম্বা যদি কোন গ্রহ লগ্ন-বিন্দুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষায় (close aspect) বদ্ধ হয়, তাহ'লে তার দিকেও লক্ষ্য রাখা উচিত। তা ছাড়া, রবির সঙ্গে যে গ্রহের ঘনিষ্ঠ প্রেক্ষা থাকে সে গ্রহেরও একটা গুরুত্ব আছে।

পাশ্চাত্যগণ ভাগ্যনিয়ন্তা গ্রহ বা Ruling planetএর যে লক্ষণ দিয়েছেন, তা থেকে এটুকু বোঝা যায় যে তাঁরাও লক্ষ্য করেছেন, যে গ্রহ লগ্ন, দশম, সপ্তম বা চতুর্থ এই চারটি কেন্দ্র ভাববিন্দুর যে কোনটির খুব কাছে থাকে, সে গ্রহ প্রায়ই ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমাদের প্রাচ্য জ্যোতিষের ভাষায়, কেন্দ্রস্থ গ্রহগুলির মধ্যে যার চয়বল বা ক্ষয়বল সবচেয়ে বেশী কলা সেই গ্রহই পাশ্চাত্যদের মতে ভাগ্যনিয়ন্তা বা Ruling planet ; এই লক্ষণের সঙ্গে জৈমিনির আত্মকারকের আমি যা অর্থ করেছি তার সাদৃশ্য আছে, তফাৎ এইটুকু যে পাশ্চাত্যেরা বলেছেন কেন্দ্রবিন্দুর নিকটতম গ্রহ Ruling planet, জৈমিনি বলছেন যে কোন ভাববিন্দুর নিকটতম গ্রহ আত্মকারক। [ক্রমশঃ

শ্রী'শ'—

॥ প্রামাণ্য চিত্রের প্রাশংসা ॥

ভারত সরকারের "ফিল্ম ডিভিশন্" নির্ম্মিত প্রামাণ্য (ডকুমেণ্টারী) চিত্রগুলি বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে যে বিশ্ব-চিত্ররসিকদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এ বছরের তিনটি আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্রের প্রথম পুরস্কার লাভ করার থেকে।

গত জুলাই মাসে ইতালীতে অনুষ্ঠিত নৃত্য বিষয়ে চতুর্থ আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র পর্য্যালোচনা উৎসবে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্র "দি ডান্সিং ফিট্" লোক-নৃত্য সম্পর্কিত শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসাবে 'সিটি অব্ জেনোয়া' কাপ্ লাভ করেছে।

লণ্ডনের কমনওয়েলথ্ ফিল্ম এওয়ার্ড উৎসবেও ভারতের পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কিত রঙ্গিন কার্টুন চিত্র "এ গ্রেট্ প্রবলেম্" শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্র রূপে বিবেচিত হয়ে রৌপ্য পদক ও যোগ্যতার ডি প্লোমা অর্জ্জন করেছে।

এরপর নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত সান্‌ফ্রান্সিস্কোর আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও ভারতের "ওয়ান্ ডে" চিত্রটি শ্রেষ্ঠ চিত্রের সম্মান 'গোল্ডেন্ গেট্' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে।

এ ছাড়া কানে আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "গৌতম দি বুদ্ধ" এবং ভিক্টোরিয়া আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্রোৎসবে "হিমালয়ান্ হেরিটেজ্", এই চিত্র দুইটিও 'অনারেবল্ মেন্‌শান্' পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়েছে।

ভারত সরকারের এই 'ফিল্ম ডিভিশন্' এ পর্য্যন্ত তাঁদের নির্ম্মিত প্রামাণ্য চিত্রের জন্য দেশে ও বিদেশে সর্ব্বসমেত ২৩৬টি পুরস্কার লাভ করেছে।

আন্তর্জ্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ক্ষেত্রে ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্রের এই বিজয় অভিযানে এ দেশের চিত্ররসিক মাত্রেই যে সন্তোষ লাভ করবেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কাহিনী চিত্রের ক্ষেত্রেও ভারতীয় চলচ্চিত্রের বিশেষ অগ্রগতি আমরা প্রত্যাশা করি। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায় কৃত কয়েকটি বাংলা চিত্র ও হিন্দীভাষী দু'একটি কাহিনী চিত্র আন্তর্জ্জাতিক সম্মান লাভে সমর্থ হলেও, কাহিনীচিত্রের ক্ষেত্রে ভারত যে এখনও অনেক পেছিয়ে আছে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তবে ভারতীয় চিত্র

নবাগতা সোমা

নির্ম্মাতারা এ বিষয়ে সজাগ হয়ে উঠেছেন বলেই মনে হয় এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় কাহিনী চিত্রও ভূরি ভূরি সম্মানে ভূষিত হয়ে ভারতীয় চিত্রের উচ্চ স্থানের পরিচয় প্রদানে সমর্থ হবে।

ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্রের এই উন্নতি করণের জন্য আজ আমরা ভারত সরকারের "ফিল্ম ডিভিশন্"কে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি ভবিষ্যতে

তাঁদের নির্ম্মিত চিত্র আরও আন্তর্জাতিক সম্মান বহন করে আনবে।

***

উপন্যাস অবলম্বনে এর চিত্রনাট্য রচনা করেছেন চিত্র-পরিচালক মৃণাল সেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন অজয় কর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখোপাধ্যায় নায়ক-

বাঙলার সর্ব্বজনপ্রিয় নায়ক
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বিকাশ রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছায়া দেবী প্রভৃতি অন্যান্য ভূমিকায় আছেন।

* * *

খবরাখবর ঃ
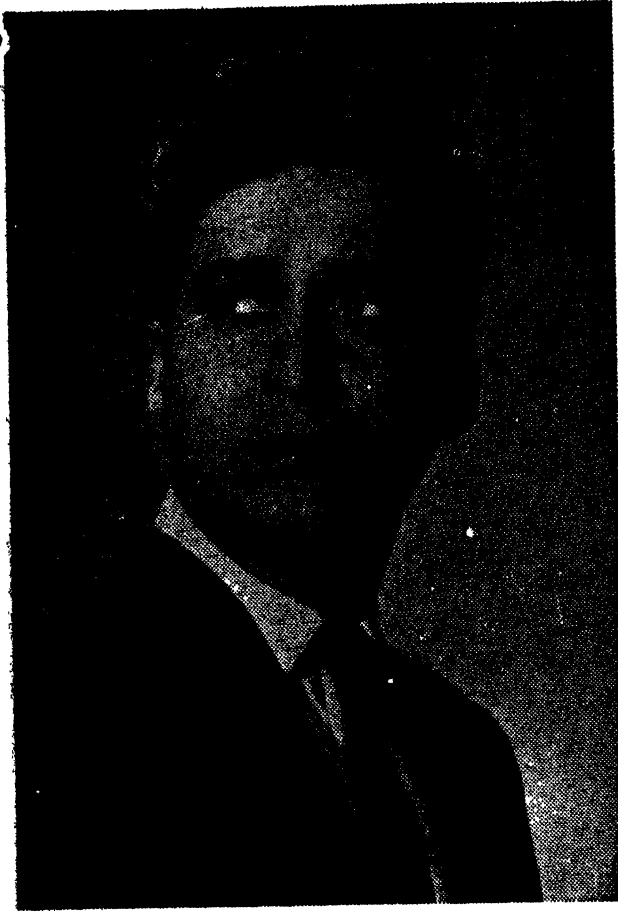
সত্যজিৎ রায়ের 'কাপুরুষ ও মহাপুরুষ' চিত্রটি বাংলা দেশের বাইরে হিন্দীতে 'ডাব্' করে দেখানোর আয়োজন করা হচ্ছে বলে জানা গেল।

* * *

আর, ডি, বনশলের নতুন চিত্র 'কাচ-কাটা হীরে'র চিত্র-গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছে। প্রবোধকুমার সান্যালের

তরুণ মজুমদার "আলোর পিপাসা" ও "একটুকু বাসার" পর যে ছবিটির কাজে হাত দিয়েছেন তার নাম "পান্থশালা"। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের এক সরাইখানার পটভূমিতে এর কাহিনীটি লিখেছেন শ্রীমজুমদার স্বয়ং। ছবিটি আগাগোড়া বহির্দৃশ্যে গৃহীত হবে বলে জানা গেছে। মুখ্য

*

বোম্বাই চিত্রজগতের সর্ব্বজন

স্নেহ-ধন্যা অভিনেত্রী

মীনা কুমারি

*

চারিত্রিটিতে অভিনয় করবেন অরুণকুমার। হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় এই চিত্রের সঙ্গীত পরিচালনা করবেন।

* * *

কে, জি, প্রোডাকসন্স সুবোধ ঘোষের 'কান্তিধারা' এবং সুবোধ বসুর 'পাখির বাসা' উপন্যাস দুটির বাংলা চিত্রস্বত্ব ক্রয় করেছেন বলে জানা গেল।

আগামী বছরের জানুয়ারী মাসে উক্ত ছবি দুটির সুটিং শুরু হবে। ছবি দুটি পরিচালনা করবেন সম্ভবত পার্থ-প্রতিম চৌধুরী।

* * *

পরিচালক চিত্ত বসুর পরবর্তী ছবিটির নাম হ'ল "গৃহ সন্ধানে"। প্যারাডাইস্ পিকচার্সের এই ছবিখানির প্রধান ভূমিকাগুলিতে অংশ নেবেন অনিল চট্টোপাধ্যায়, নলিতা চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, তরুণকুমার, রবি ঘোষ, সন্ধ্যা রাণী, শ্যাম লাহা, রেণুকা রায় প্রভৃতি।

* * *

গত অক্টোবর মাসে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে 'লাইট এণ্ড শেড'-এর প্রথম ছবি "এই করেছ ভালো"-র নিয়মিত চিত্র গ্রহণ সুরু হয়েছে। অভিনয়াংশে আছেন কানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, রবি ঘোষ, তরুণকুমার ও নবাগত শ্যামলবরণ। স্বরচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিখানি পরি-চালনা করছেন বিধায়ক ভট্টাচার্য্য।

* * *

পূর্বাচল ফিল্ম প্রযোজিত এবং আর, ডি, বনশল, পরিবেশিত "আকাশ কুসুম"-এর সুটিং মৃণাল সেনের পরি-চালনায় চলছে। আশীষ বর্মণের কাহিনী অবলম্বনে

ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক স্বয়ং। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা দাসগুপ্ত এই চিত্রের দুই প্রধান শিল্পী।

* * *

জৈন প্রোডাকসন্সের আগামী ছবিটি সুখ্যাত সাহিত্যিক হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের 'বৃত্ত' গল্প অবলম্বনে প্রস্তুত হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন তারাপদ দেব এবং সুর-সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন ভি, বালসারা।

* * *

মিতালী ফিল্মসের পরবর্তী ছবি হচ্ছে "গুলমহর"। কার্তিক চট্টোপাধ্যায় চিত্রটি পরিচালনা করছেন এবং নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিশ্বজিৎ। আর খুব সম্ভব নায়িকার চরিত্রটিতে রূপ দেবেন মালা সিংহ। রুমা গুহঠাকুরতা এবং বসন্ত চৌধুরীকে এই চিত্রের দুটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যাবে বলে আশা করা যায়।

* * *

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বাক্স বদল" কাহিনীটিকে ভি, এম, প্রোডাকসন্স চিত্রে রূপায়িত করেছেন। ছবিটি শীঘ্রই কলকাতার বিশিষ্ট চিত্র গৃহগুলিতে মুক্তিলাভ করবে।

অপর্ণা দাশগুপ্ত "বাক্স বদল"-এর নায়িকা এবং নায়কের চরিত্রে রূপদান করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য চরিত্রে আছেন সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, গীতালী রায়, ইলা চট্টোপাধ্যায়, সুপ্রভিম, চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রভৃতি।

চিত্রটি পরিচালনা করেছেন নিতাই দত্ত।

* * *

শ্যামল মিত্র প্রযোজিত 'রূপছায়া' চিত্রের দ্বিতীয় চিত্র "রাজকন্যা"র সুটিং এগিয়ে চলেছে। শ্যামল মিত্রের সঙ্গীত পরিচালনায় ও আশা ভোসলের কণ্ঠে কয়েকটি গানের রেকর্ডিং-এর কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে বোম্বেতে। এ-ছবির কাহিনীকার ও চিত্রনাট্য রচয়িতা হলেন ঋত্বিক ঘটক। বিভিন্ন চরিতে অংশ গ্রহণ করেছেন উত্তমকুমার, নবাগতা রীণা ঘোষ, শেখর চটোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যো-পাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ও তরুণকুমার। তাছাড়া একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দীর্ঘদিন পর আত্মপ্রকাশ করেছেন শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী।

রাজশ্রী প্রোডাকসন্সের চিত্র নিবেদন 'দোস্তী' প্রায় একশত চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করেছিল। এই কিশোর চিত্রের আবেদন বহু দর্শককে তৃপ্ত করছে। জানা গেছে, মধ্যপ্রদেশ সরকার এ ছবিকে প্রমোদ-কর থেকে রেহাই দিয়েছেন। পণ্ডিচেরিতেও এ ছবির জন্য কোনো প্রমোদ-কর দিতে হবে না।

* * *

প্রযোজক-পরিচালক প্রমোদ চক্রবর্তীর ইষ্টম্যান কলার চিত্র 'লাভ ইন্ টোকিয়ো"র সুটিং বোম্বাইয়ে আরম্ভ হয়েছে।

শচীন ভৌমিকের লেখা একটি কাহিনী অবলম্বনে তৈরী এই "লাভ ইন্ টোকিয়ো"তে সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন শঙ্কর-জয়কিষণ এবং এর প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করছেন জয় মুখার্জি ও আশা পারেখ।

ছবিটির একটি বৃহৎ অংশ টোকিওতে তোলা হবে। এজন্য শ্রীচক্রবর্তী শিল্পী ও কলাকুশলীদের নিয়ে টোকিও যাবেন এবং সেখানে কয়েক সপ্তাহ অবস্থান করবেন।

* * *

সরকার প্রোডাকসন্সের বাংলা ছবি "একটুকু ছোঁয়া লাগে"র চিত্রগ্রহণ বোম্বাইয়ের আন্ধেরী ষ্টুডিওতে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। ছবিটি পরিচালনা করছেন কমল মজুমদার এবং সঙ্গীত পরিচালনায় রয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বজিৎ ও কিশোরকুমার এই চিত্রের প্রধান চরিত্র দুটীতে অভিনয় করেছেন, আর নায়িকার চরিত্রটিতে রূপ দিচ্ছেন নবাগতা আজরা।

* * *

বর্তমানে বোম্বাইয়ে পদ্মশ্রী প্রডাকসন্সের "ঝঙ্কার" নামে যে হিন্দী ছবিটি তোলা হচ্ছে, সেটিতে উত্তমকুমার ও আশা পারেখ নায়ক-নায়িকা রূপে অভিনয় করছেন।

* * *

তারাচাঁদ বার্জতিয়া এবং আর, ভি, বনশলের যুগ্ম প্রচেষ্টায় রাজশ্রী-বনশল প্রোডাকসন্স নামে সম্প্রতি একটি নতুন প্রযোজক সংস্থার পত্তন হয়েছে। এই নতুন সংস্থাটি কলকাতায় হিন্দী ছবি প্রযোজনা করবে বলে জানা গেছে।

এই প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবিটি তোলা হবে ইষ্টম্যান কলারে।

বিশ্ব-খ্যাত রাশিয়ান লেখক বরিস পাস্তারনাকের নোবেল পুরস্কারজয়ী উপন্যাস 'ডক্টর জিভাগো' চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত হতে চলেছে। চিত্রটির প্রযোজক হচ্ছেন কার্লো পন্টি এবং পরিচালনা করবেন ডেভিড লীন। নাম-ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছেন 'লরেন্স অব অ্যারেবিয়া'-খ্যাত ওমর শরিফ।

স্পেনে ছবিটির স্যুটিং শীঘ্রই আরম্ভ হবে।

*   *   *

ভারত সরকারের উদ্যোগে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুস্থান ফোটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং-এর ফটোফিল্ম তৈরীর কাজ আগামী বছরের শেষভাগে শুরু হবে বলে জানা গেছে।

ফ্যাক্টরী নির্মাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ এগারো কোটি টাকার মধ্যে যন্ত্রপাতি ও ঘরবাড়ী নির্মাণের জন্য গত অক্টোবর পর্যন্ত মোট সাড়ে ছয় কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছে। ফিল্ম তৈরীর জন্য সেলুলোজ ট্রায়াসিটেট নামক প্রয়োজনীয় উপাদানটি তৈরী করার জন্য মহীশূরের অ্যাসিটেট লিঃ মহীশূরের মান্দিয়াতে একটি প্লান্ট বসাচ্ছেন। তাছাড়া ফোটোফিল্ম তৈরীর শিল্পের ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যগুলি তৈরীর জন্য একটি সংস্থার উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

মার্জার কথা

রমেশ মজুমদার

—ম্যাও।

—গুর্‌ম্যাও!

মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে কাছে এগিয়ে যায় বিড়াল-ছানা, মা বললে, তোর জন্য মাছের কাঁটা এনেছি, মুখ-পোড়া!

ছানাটা তার জবাব দেবার অবকাশ পেলে না। তার সামনে নাবিয়ে দেওয়া কাঁটা খেতে আরম্ভ করলো। ভারী খুশী বিড়ালছানা। মা তার সামনে সামনের দুট থাবা গেড়ে বসে দেখতে লাগলো ছেলের খাওয়া। বললে, খেতে শেখ এমনি করে। নইলে আর কতদিন মাইএর বাঁট চুষবি! আর পারিনে।

হঠাৎ পাশের ঘরে শব্দ হতেই ছুটে গেল বেড়ালটা। কোন বিপদ এলো কি? না কোন শত্রু? বাচ্চাটা আছে। তার কত গণ্ডা শত্রু! পিলুটা তো ওকে মারবার জন্য ঘোরাফেরা করে। কালো ভূতের মত চেহারা। হিংসে হয় আমার কচি ছেলেটাকে দেখে। ফিরে এলো। বুড়োটা শব্দ করছে।

পিলু আর টনা দু'জন এদেরই সাথে বাস করে একই বাড়ীতে, একই ঘরে। আর থাকে থেঁদি। থেঁদি আজ-কাল বুড়ো হয়েছে। তাই তার সবচেয়ে বেশী হিংসে আমাদের দিকে চেয়ে। পাশ দিয়ে বাচ্চাটা যখনই যায় আর অমনি ক্যাঁচ্ করে থাবা মারে। বলে মরিসনে মুখ-পোড়া? আমার বাছাকে দু' চোখে দেখতে পারে না। আমি আদর করে বাছাকে কখনো যদি মুখপোড়া বলেই থাকি, তাই বলে ও বলবে নাকি? দোষের ভেতর আমার বাছার মুখের খানিকটা রং কালো। তাছাড়া সারাটা শরীর কেমন সুন্দর সাদা ধবধবে। পিঠের ডানদিকে একটুখানি কালো। সে যে কত সুন্দর দেখতে!

মায়ের কত গর্ব্ব, কত আহ্লাদ ঐ বাচ্চাকে নিয়ে। কোন ভয় নেই—সান্ত্বনা দেয় ছেলেকে। ওর মুখের সামনে লেজ নাড়াতে থাকে মা। খেলা শেখাতে চায়। একটু চট্‌পটে গড়ে তুলতে চায়। নইলে ইঁদুর ধরবে কি করে! ওমা! দেখ, খেলতে-খেলতে লাফিয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরেছে। মা ওকে মৃদু থাবা মেরে খেলা করছে। ফিঁসফিঁসিয়ে বলছে, ভারী আহ্লাদ হয়েছে!

কিন্তু আহ্লাদ মায়েরও বেশী। সে বেশীক্ষণ ওকে ছেড়ে থাকতে চায় না। পাছে তার আদরের ছেলেকে কেউ মারে। বাড়ীর লোকজন কেউ কখনো বাছার দিকে চাইলে সে ভয়ে মরে। চোখ পাকিয়ে তাকায় সেদিকে। কিম্বা ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচ্ করে গর্জ্জন করতে থাকে। বাচ্চাকে ইসারা করে সরিয়ে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় খাটের নিচে অথবা কাগজের গাদার আড়ালে। গা চেটে দেয় আদর করে। খুব আনন্দ পায়!

—ম্যাঁও—ও!

মায়ের নজর পড়েছে হঠাৎ দরজার দিকে। পাশের বাড়ীর হুলোটা এসেছে দরজার কাছে। ওঁৎ পেতে আছে। সুযোগ পেলেই বাচ্চাকে মেরে ফেলবে। হুলোটা কোন বাচ্চাকে, কোন পুরুষকে দেখতে পারে না। পেলেই মেরে ফেলবে। ভীষণ স্বার্থপর ওটা! পুরুষ জাতটাই এই রকম বুঝি। ঘেন্না ধরে যায় বেড়ালটার। ঐ হুলোটাই শীতকাল পার হতে না হতেই পাড়ার সব বেড়ালদের অতিষ্ঠ করে তোলে। ভারী বদস্বভাবের! এতটুকু মায়া দয়া নেই!

বাড়ীর নতুন বৌটা খাটে পা ঝুলিয়ে বসে পা দুটো দোলাচ্ছে, আর বাচ্চাটা গিয়ে তার পায়ে থাবা মেরে খেলা করছে। যদি বৌটা মেরে দেয় লাথি? ভয়ে মায়ের বুক কাঁপছে। চোখ পাকিয়ে আছে বৌটার দিকে। বৌটা একবার বাচ্চাটাকে লক্ষ্য করে পা দুটো তুলে বসে বুকে পিঠে পাউডার ছড়াতে ব্যস্ত হলো। যাক্, তবু রক্ষে। এত খবরদারী আর করতে পারে না মা। দরজার দিকে চেয়ে দেখে হুলোটা চলে গেছে। বাচ্চা তা লক্ষ্য করে ছুটে গেছে দরজার কাছে। আর মায়ের সেকি ভয়।

যদি হুলোটা দু'কয়ে থাকে, তাহলে একেবারে মেরে ফেলবে না ওকে! ছুটে গেছে বাচ্চাকে আগলাতে।

পিলু এসেছে মুখ চাটতে চাটতে। কোথা থেকে কিছু খেয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। কারো বাড়ীর চায়ের দুধ, অথবা বাচ্চার খাওয়াবার জন্ম ঢাকা দুধের বাটি শেষ করে এসেছে, কিম্বা মাছের বাটি।

মায়ের মনে কত সুখ। বাচ্চাটা যে কতদিনে বড় হবে, কতদিনে যে ভেঙে-চুরে, কেড়ে-কুড়ে খেতে শিখবে! তাহলে বাঁচা যায়। নিজেও ওর জন্ম কোথাও গিয়ে দু'দণ্ড কাটাতে পারে না। ভাল করে না খেতে পেয়ে মায়ের শরীর খারাপ হয়েছে। তাই বাঁটেও দুধ নেই যেন! আর কত দুধই বা দেওয়া যায়?

দু'দিন আগেও বাচ্চাটা ঘরের বার হতো না। আজ কয়েকদিন থেকে ওর মা ওকে ডেকে-ডেকে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে ঐ দুটি দেওয়ালের মাঝখানের আস্তাকুড়ে। ওখানে যত মাছের কাঁটা, চোয়াল, মাথা, ভাত, তরকারী পড়ে থাকে। তা ওদিকে সে যেতেই চায় না। আগে মুখে করে ইচ্ছে মত এদিক-ওদিক নিয়ে যাওয়া যেতো, আজকাল বড় হয়েছে, টানতে কষ্ট হয়।

টনার মেয়ে এই বেড়ালটা। কিন্তু মা-মেয়ের সম্পর্ক আর নেই। বড়ো হলে কেউ কারো সাথে সম্পর্ক রাখে না। সবাই পৃথক্। কেউ কারো আত্মীয় নয়। যে যেমন ভাবে পারছে খাচ্ছে-দাচ্ছে ফুর্তি করছে। এদের বাড়ীর অনেকে এই বিড়ালগুলোকে বলতো চীনা ফৌজ।

এবার এই টনারও বাচ্চা হবে মনে হচ্ছে। টনাও কারো কোন বাচ্চা বা বুড়োকে বরদাস্ত করতে পারে না। পাশ দিয়ে এই বাচ্চাটা গেলে সে কি রাগ! ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করে থাবা মেরে দেবে।

রাত হলে বাচ্চাটা মায়ের কাছে ঘুমাবে। মাঝে মাঝে তারী অতিষ্ঠ করে তোলে। যে বুড়োটা এই বেড়ালদের সযত্নে আশ্রয় দিয়েছে, সে অকৃতদার। তারই দয়ায় এরা এ বাড়ীতে বাহাদুরী দেখাচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। নইলে এ বাড়ীর কেউ ওদের স্থান দিতে চায় না। রাতদিন ঐ বুড়োটা এদের তারতম্য লক্ষ্য করে।

বাচ্চাটা ছুটে গিয়ে তাই বুড়োর জীর্ণ বিছানার উত্তাপে নিজের দেহ উত্তপ্ত করে ঘুমাতে যায়। ওর মাও যায়, যায় আরো টনা, পিলু, খেঁদী। বুড়ো আদর করে, চোখ রাঙিয়ে কখনো ভয় দেখায়। ওরা কেউ ভয় পায় না। ভয় পায় বুড়োর ভাই, ভাই-বৌ, আর তার ছেলে-বৌকে। ছেলে-বৌ তো একেবারে খড়্গহস্ত।

—ওমৃ্যাও!

মা তার বাচ্চাকে দেখতে পাচ্ছে না। কোথায় যেন চলে গেছে। তাই ডাকছে। বাচ্চাকে ডাকতে-ডাকতে এঘর-ওঘর করতে থাকে বেড়ালটা। ঐ দিকের ঘরে খাটের নিচে বসে বাচ্চাটা কি যেন শুঁকছে। খাটের উপর মুখোমুখি বসে বুড়োবুড়ি। বেড়ালটা বাচ্চার গা চাটতে চাটতে শুনতে পেলো বুড়ী বুড়োকে বলছে, আমাদের সে দিন আর ফিরে আসবে না গো! সেই প্রচণ্ড আনন্দ, সেই সুখ!

বুড়োর একটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো। বললে, আজকাল ছেলে-বৌদের আনন্দ দেখেই আনন্দিত হতে হবে। আমাদের যৌবন যে চলে গেছে গো!

তাতে যেন অসন্তুষ্ট হলো বুড়ী। বললে, কি যে বলো! এরই ভেতর তোমার বুঝি যৌবন চলে গেল! কত বয়স হলো? খবরের কাগজে পড়ছো না, বিদেশে আশি বছর, নব্বই বছরের মিন্সেরা বিয়ে করছে যে! আর তুমি কিনা—

—আরে কনকচাঁপা, তাদের কথাই আলাদা! তারা সব খুব খায়, তাই।

—আমিও খাওয়াবো তোমাকে!

বেড়ালটা আর থাকতে পারলো না। বাচ্চাটা আবার ছুটে পালালো। তার পিছু পিছু ছুটলো। রাত হয়েছে। কোথায় যাবে, কে ধরে আছড়ে মারবে! না, সে বাইরের ঘরে ছেলে-বৌয়ের খাটের নিচে ঢুকেছে।

—ম্যাও-ও!

আদর করে কাছে গিয়ে বাচ্চার মুখের উপর মুখ রাখে। বলে, দুষ্টু ছেলে, রাতদিন ছুটাছুটি! কোথাও স্থির হয়ে থাকবে না রাতের বেলায়! হুলোটা তোকে দেখতে পেলে যে মেরে ফেলবে!

বাচ্চাটা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে থাকে। ঠিক তার একটু পরেই বুড়োটা পাশের ঘর থেকে

কেশে উঠলো। কাশির দাপটে অস্থির হয়ে ওঠে। অবিবাহিত লোকটা। কেউ তার দিকে দেখবার নেই। সে যে কত অসহায়! বিড়ালটা কান পেতে শোনে, লক্ষ্য করে সব কিছু, সবার গতি-বিধি। সে যদি মানুষই হতো তাহলে বুড়োটাকে সেবা করতো। পরক্ষণেই ভাবে, যদি সে মানুষ হতো তাহলে হয়তো অত্যধিক স্বার্থপর হয়ে উঠতো। এ রকম মায়ামমতা থাকতো না। পশু বলেই বোধ হয় মানুষ হতে পারিনি।

এমন সময় বাচ্চাটা আবার কোথায় যেন ছুটলো। বেড়ালটা তার পিছু ছুটলো। নতুন বৌটা স্বামীকে নিয়ে খাটের উপর শুয়ে আছে—তারই পাশে গিয়ে হাজির বাচ্চাটা। বিড়ালটা এবার তার ঘাড় কামড়ে ধরে ঝাকিয়ে নিয়ে এলো।

—ম্যাও, ঔ ঔঁ।

রেগে গেছে বেড়ালটা। বললে, নতুন বউটা যদি রেগে যায় তাহলে তোকে আমার সাথে ঝেটিয়ে বার করে দেবে বাড়ী থেকে। রাতে ওদের বিছানায় যাবিনে কখনও।

—মি—উ।

বাচ্চাটার খিদে পেয়েছে। ও দুধ খাবে। আর কথা নেই, মা তাকে দুধ খাওয়াতে বসলো। যতদিন না এটা বড় হচ্ছে, ততদিন তার কাছে থাকতে হবে। নিজের আনন্দের সন্তান। মায়ের কত খুশী, যখন ওকে আদর করে দুধ খাওয়ায়, কিম্বা গা কেটে দেয়। বাচ্চাদের গায়ে কি সুন্দর মিষ্টি গন্ধ। এই বাচ্চার আর একটা বোন হয়েছিল। সে মরে গেছে! অকৃতদার সমাদ্দারবাবু বলে, ওর মা—ই ওকে মেরে ফেলেছে। কিন্তু সে কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

সমাদ্দারবাবু বলে, আছড়ে মেরে না ফেললেও নিশ্চয়ই মেয়েকে দুধ খেতে দেয়নি। নইলে মরলো কেন?

কেউ কেউ বলে, তা হলেও হতে পারে। সমাদ্দারবাবু ওদের দিকে লক্ষ্য রাখে।

একটু পরেই বেড়ালটা কানদুটো খাড়া করলো। নতুন বৌটা তার স্বামীকে বলছে, ও বাড়ীর মিলনবাবু খুব ভাল লোক, তাই না? সবাই ভালবাসে লোকটাকে।

—বাজে কথা! আমি ওকে ঘৃণা করি। অনেকেই ঘৃণা করে। অত্যধিক বদলোক!

—তাহলে ধীরেশবাবু কেমন? ধীরেশবাবুর চেহারা কিন্তু বেশ!

—ধীরেশবাবু মাতাল, বদমাস। আমরা সামনি কেউ সেকথা বলতে পারে না, সবাই নীরবে সহ্য করে। কতজনের সর্বনাশ করেছে।

—ও বাবা! ভীত হয় নতুন বৌটা।

বেড়ালের পায়ের থাবা প্রসারিত হয়, নখগুলো বেরিয়ে আসে। কেন যেন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। বাতাস হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে! চারিদিকে চেয়ে দেখে।

বৌটা জিজ্ঞেস করলে, আচ্ছা, তোমার জ্যাঠাবাবু বিয়ে করলেন না কেন?

—মেয়েদের উনি মোটেই পছন্দ করেন না! তা কে বিয়ে দেবে?

—কিন্তু কে যেন বলছিল, ওঁর মা মরে যাবার পর ব্যথিত হয়ে আর বিয়ে করতে চাননি।

—বাজে কথা!

সেই মুহূর্তে ঘরের কোণে একটু শব্দ হতেই বেড়ালটার কানে ঢুকেছে। চোখ মেলে দেখেছে সেদিকে। ছুটে গেছে চুপি চুপি। ওৎ পেতে থেকে একসময় সেই ইঁদুরটাকে ধরে ফেলেছে। তারপর সেটাকে মুখে করে নিয়ে এসেছে বাচ্চার কাছে। নিজে খানিকটা খেয়ে বাকীটুকু বাচ্চাকে তুলে তার সামনে দিয়েছে। বাচ্চাটা একবার সেটা শুঁকে খেয়ে ফেলেছে। তখন মায়ের কি যে আনন্দ! বাঁচতে শিখেছে তাহলে!

আবার মায়ের কোলের কাছে ঘুমিয়ে পড়লো বাচ্চা। জায়গাটা বেশ গরম। খুব আরামপ্রদ জায়গাটা।

শেষ রাতের দিকে সমাদ্দারবাবুর কাশির শব্দ ভেসে এলো। তার একটু পরেই নতুন বৌটার চুড়ির ঝমঝমানি ভেসে উঠলো। কিছু পরেই সে যেন বলছিল তার স্বামীকে—তুমি সবচেয়ে ভাল! তোমায় কেন যে এত ভাল লাগে। সবার চেয়ে তুমি ভাল, খুব ভাল।

—সত্যি?

—হ্যাঁ!

বেড়ালটার চোখ বন্ধ হলো। একটা দীর্ঘশ্বাস বের হলো। ঘুমাতে চাইলো, ঘুম এলো না।

৺সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায়

খেলার কথা

ক্ষেত্রনাথ রায়

টোকিও অলিম্পিক গেমস :

জাপানের রাজধানী টোকিও সহরে আধুনিক কালের অষ্টাদশ অলিম্পিক গেমস মহাসমারোহে এবং সাফল্যের সঙ্গে সুসম্পন্ন হয়েছে। রেকর্ড সংখ্যক দেশ (৮৪) এবং প্রতিযোগীর যোগদান, বিভিন্ন খেলাধুলায় নতুন বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ডের ছড়াছড়ি, সুবন্দোবস্ত এবং সর্ব্বোপরি খেলাধুলায় জাপানের অনুকরণীয় নিষ্ঠা—এই সমস্তের সমন্বয়ে টোকিওতে অনুষ্ঠিত এই অষ্টাদশ অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানটি আধুনিককালের অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে একটি পৃথক অধ্যায় যোজনা করেছে। টোকিওর এই অলিম্পিক গেমসটি ছিল এশিয়ার ভূখণ্ডে প্রথম অলিম্পিক গেমসের আসর।

এ্যাথলেটিক্স : অলিম্পিক গেমসের প্রধান আকর্ষণ এ্যাথলেটিক্স অনুষ্ঠানে আমেরিকা এবারও সর্ব্বাধিক পদক জয় করেছে—পুরুষ বিভাগে স্বর্ণ ১২, রৌপ্য ৬ ও ব্রোঞ্জ ৩ এবং মহিলা বিভাগে স্বর্ণ ২ ও রৌপ্য ২—মোট পদক সংখ্যা ২৫টি।

সাঁতার : পুরুষ ও মহিলা বিভাগ নিয়ে মোট ১৮টি অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক পেয়েছে আমেরিকা ১৩, অষ্ট্রেলিয়া ৪ এবং রাশিয়া ১। সাঁতারের মোট ৫৪টি পদকের মধ্যে একা আমেরিকাই পেয়েছে ২৯টি—স্বর্ণ ১৩, রৌপ্য ৮ এবং ব্রোঞ্জ ৮।

ওয়াটার পোলো : স্বর্ণ পদক হাঙ্গেরী, রৌপ্য পদক যুগোশ্লাভিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক রাশিয়া।

ডাইভিং : পুরুষ এবং মহিলা বিভাগের মোট ১২টি পদকের মধ্যে আমেরিকা পেয়েছে ৮টি (স্বর্ণ ৩, রৌপ্য ২ এবং ব্রোঞ্জ ৩), জার্মানী ২টি, রাশিয়া এবং ইতালী একটি ক'রে।

ভলিবল : পুরুষ বিভাগে স্বর্ণ পদক পেয়েছে রাশিয়া, রৌপ্যপদক চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ব্রোঞ্জপদক জাপান। মহিলা বিভাগে স্বর্ণ পদক জাপান, রৌপ্য পদক রাশিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক পোল্যাণ্ড।

ফুটবল : স্বর্ণপদক হাঙ্গেরী, রৌপ্যপদক চেকোশ্লোভাকিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক জার্মানী।

ফাইনালে হাঙ্গেরী ২—১ গোলে চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত ক'রে দ্বিতীয় বার স্বর্ণ পদক জয়ের গৌরব লাভ করে। ১৯৫২ সালে হাঙ্গেরী প্রথম স্বর্ণ পদক জয় করেছিল।

হকি : স্বর্ণ পদক ভারতবর্ষ, রৌপ্য পদক পাকিস্থান এবং ব্রোঞ্জপদক অষ্ট্রেলিয়া। ফাইনালে ভারতবর্ষ ১—০ গোলে পাকিস্থানকে পরাজিত করে সাত বার স্বর্ণপদক জয়ের গৌরব লাভ করে। ভারতবর্ষ উপর্য্যুপরি ৬ বার (১৯২৮—৫৬) স্বর্ণ পদক জয় ক'রে ১৯৬০ সালের রোম

অলিম্পিকের হকি খেলার ফাইনালে ০—১ গোলে পাকিস্তানের কাছে পরাজিত হয়েছিল।

বাস্কেটবল: স্বর্ণপদক আমেরিকা, রৌপ্য পদক রাশিয়া এবং ব্রোঞ্জ পদক ব্রেজিল।

আমেরিকা উপর্যুপরি সাতবার স্বর্ণ পদক পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় অন্য কোন দেশ স্বর্ণ পদক জয় করেনি।

মুষ্টিযুদ্ধ: মোট দশটি অনুষ্ঠানের মধ্যে স্বর্ণ পদক জয় করেছে রাশিয়া ৩, পোল্যাণ্ড ৩, ইতালী ২, জাপান ১ এবং আমেরিকা ১।

কুস্তি: ফ্রিস্টাইল এবং গ্রিকো-রোমান—এই দুটি বিভাগে মোট অনুষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৬টি। স্বর্ণ পদক পেয়েছে জাপান ৫, বুলগেরিয়া ৩, রাশিয়া ৩, হাঙ্গেরী ২, তুরস্ক ২ এবং যুগোস্লোভাকিয়া ১।

ভারোত্তোলন: স্বর্ণপদক পেয়েছে রাশিয়া ৪, জাপান ২, পোল্যাণ্ড ১ এবং চেকোস্লোভাকিয়া ১।

ব্যক্তিগত ক্রীড়াচাতুর্য্য

টোকিও অলিম্পিক গেমসে যাঁরা ব্যক্তিগত ক্রীড়া-চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এই কয়েকজনের সাফল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

ডন স্কল্যাণ্ডার (আমেরিকা) পুরুষদের সাঁতারে চারটি স্বর্ণপদক জয় করেন।

ডন ফ্রেজার (অস্ট্রেলিয়া) উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে মহিলাদের ১০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতারে স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন। উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে সাঁতারের কোন ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে স্বর্ণ পদক জয়ের রেকর্ড ইতিপূর্ব্বে কোন পুরুষ বা মহিলা সাঁতারু প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি।

আলফ্রেড অর্টার (আমেরিকা) পুরুষ বিভাগের ডিসকাস নিক্ষেপে স্বর্ণ পদক জয়ী হ'লে উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকের ডিসকাস অনুষ্ঠানে স্বর্ণপদক জয়ের রেকর্ড করেন।

বিয়াচেস্লাভ আইভানোভ (রাশিয়া) রোয়িংয়ের সিঙ্গলস স্কালস অনুষ্ঠানে উপর্যুপরি তিনটি অলিম্পিকে স্বর্ণ-পদক জয়ের রেকর্ড করেন।

আবেবে বিকিলা (ইথিয়োপিয়া) ম্যারাথন দৌড়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার প্রথম স্থান লাভের রেকর্ড করেন। এমন কি অলিম্পিক গেমসের ইতিহাসে কোন একজনের পক্ষে দু'বার স্বর্ণপদক জয় করাও সম্ভব হয়নি।

জিমন্যাস্টিক্স:

সর্বাধিক পদক পেয়েছে জাপান।

জাপানের পদক—স্বর্ণ ৫, রৌপ্য ৭ এবং ব্রোঞ্জ ১।

পদকের খতিয়ান

টোকিও অলিম্পিক গেমসে পদক লাভের তালিকায় প্রথম চারটি দেশ:

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ	মোট
আমেরিকা	৩৬	২৬	২৮	৯০
রাশিয়া	৩০	৩১	৩৫	৯৬
জাপান	১৬	৫	৮	২৯
জার্মানী	১০	২২	১৮	৫০

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষ:

তৃতীয় টেষ্ট:

অস্ট্রেলিয়া: ১৭৪ রান (সিম্পসন ৬৭ এবং লরী ৫০ রান। দুরাণী ৭৩ রানে ৬ এবং সুর্ত্তি ৩৮ রানে ৩ উইকেট পান) ও ১৪৩ রান (১ উইকেটে। সিম্পসন ৭১, লরী নট আউট ৪৭ রান। সুর্ত্তি ৩০ রানে ১ উইকেট)

ভারতবর্ষ: ২৩৫ রান (বোরদে নট আউট ৬৮, জয়সীমা ৫৭ এবং সরদেশাই ৪২ রান। সিম্পসন ৪৫ রানে ৪ এবং ভিভার্স ৮১ রানে ৩ উইকেট পান)।

কলকাতার রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারতবর্ষের তৃতীয় টেস্ট খেলা ড্র যায়। পাঁচ দিনের খেলার শেষ দু'দিন বৃষ্টির দরুণ মাঠের অবস্থা খেলার অনুকূলে না থাকায় খেলা আরম্ভই হয়নি।

অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তান:

করাচীতে অনুষ্ঠিত অস্ট্রেলিয়া বনাম পাকিস্তানের টেস্ট খেলা ড্র যায়।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাকিস্তান: ৪১৪ রান (ইবাদুল্লা ১৬৬, কাদির ৯৫, ইনতিকাব আলম ৫৩ এবং আসিফ ইকবাল ৪১ রান। গ্রাহাম ম্যাকেঞ্জি ৬৯ রানে ৬ উইকেট পান) ও ২৭৯ রান (৮ উইকেটে ডিক্লেয়ার্ড। জাভেদ বার্কি ৬২। ভিভার্স ৪৪ রানে ২ এবং ম্যাকেঞ্জি ৬২ রানে ২ উইকেট পান)